প্রবাসী, ৫২শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৯

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

বাল-কৃষ্ণ [শ্রীমতী দেবী

দুই বোন [শ্রীমতী দেবী

"সত্যম শিবম সুন্দরম
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৯ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার উন্নয়ন

বাংলার দুর্দ্দিনের ছায়া এবার পূজার মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছিল। পূজার বাজার বাঙালী ব্যবসায়ী মহলে বৎসরের সেরা মরশুম বলিয়া খ্যাত। এবার সেই বাজারে কেনা-বেচা যাহা হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর পক্ষে ঘোর নৈরাশ্যজনক। পূজার উৎসবের বাহ্যিক প্রকাশেও বাংলা ও বাঙালীর দুর্দ্দশার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাঙালী আজ কি দারুণ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

শুনিতেছি এবার বাংলার শস্যের ক্ষেত্রে সোনা ফলিয়াছে। জানি না প্রকৃতপক্ষে উহা ঠিক কিনা, এবং খোঁজ লইতেও ভয় হয়, কি জানি যদি উহা সকল সরকারী তথ্যের মতই অর্দ্ধেক সত্য ও অর্দ্ধেক স্বপ্ন হয়।

আরও শুনিতেছি, এবার পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার প্রসন্ন হইয়াছেন। গান্ধী-জন্মদিবসে এই প্রদেশের আটটি কেন্দ্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বীরভূম জেলায় মহম্মদ-বাজার, নলহাটি ও আমেদপুর, বর্দ্ধমানে শক্তিগড় ও গুসকরা, মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম, ২৪ পরগণায় বারুইপুর ও নদীয়া জেলায় ফুলিয়া এই আটটি স্থান ঐ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যক্ষেত্র রূপে স্থির করা হইয়াছে। কি হিসাবে ঐ আটটি কেন্দ্র বাছিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার গূঢ় তথ্য আমরা জানি না।

বলা বাহুল্য, বাংলা ও বাঙালীর আজ যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে কোন জেলার যে কোন অঞ্চলেই উন্নয়নের ক্ষেত্র অতি বিশাল। এমন কি, কলিকাতার ও তাহার সহরতলীর উন্নয়নেরও বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং ঐ স্থানগুলিতে উন্নয়নের প্রয়োজন নাই, একথা আমরা বলি না। বরঞ্চ বলিব, আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঐ আটটি কেন্দ্র লালদীঘি, গোলদীঘি, চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, বড়বাজার, তালতলা, নিমতলা ও কেওড়াতলায় স্থাপিত হয় নাই। তাহাও হওয়া অসম্ভব ছিল না। কেননা পশ্চিমবাংলার কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বলিতে বুঝেন কলিকাতা।

হয়ত বাংলার কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, ঐ সব অঞ্চলে অল্পদিনেই চটকদার ও চমকপ্রদ উন্নয়নের ফল তাঁহারা দেখাইতে পারিবেন, যাহাতে তাঁহাদের সহজেই মোটারকম রাজনৈতিক "ডিভিডেণ্ড" প্রাপ্তি ঘটে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, আমরা ঐরূপ সাফল্যে আনন্দিতই হইব। পশ্চিমবাংলা যে ভাবে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহাতে আটটি ক্ষুদ্র অঞ্চলও যদি রক্ষা পায় তো আনন্দেরই কথা।

একথাও সত্য যে, বাংলা-সরকার সকল বিষয়েই এত দিন যেরূপ কেরামতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত—পশ্চিমবাংলার হিসাবে—অঞ্চল আটটি হাতে লইলে ঐ সকল উদ্যোগই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় অর্থব্যয়েই শেষ হইত।

সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা এখন ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। প্রশ্ন এই যে, পশ্চিমবাংলার দুর্দ্দশার অবসান হইবে কোন্ পথে এবং কাহার হাতে?

কংগ্রেসী সরকার ত পাঁচশালা পরিকল্পনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবামাত্রই ভাবনায় পড়িয়াছেন। নক্সা ত আঁকা হইয়াছে, কিন্তু ইমারত গড়িবে কে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, সে কাজ করিবে "ভারত-সেবক সমাজ"। এই সেবক সমাজের সদস্য নির্ব্বাচন করা হইয়া গিয়াছে, সভাপতি হইয়াছেন খোদ শ্রীনেহরু—কর্ম্মসচিব শ্রীগুলজারিলাল নন্দ। শুনিতেছি প্রদেশে প্রদেশে সঞ্চালক ও আহ্বায়কও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অভাব শুধু কর্ম্মীর।

ঘরের অন্ন ধ্বংস করিয়া বন্য মহিষ বিতাড়ন এককালে বাংলার বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু আজ যে প্রায় সকল ঘরেই অন্নও নাই, বস্ত্রও নাই। শুধু তাই নয়, অন্ন-বস্ত্র আহরণের সকল দ্বার ক্রমে বাঙালী জাতির সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এখনও যেটুকু সম্বিৎ আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া যদি কাজ আরম্ভ করা হয় তবে হয় ত কিছু উৎসাহী লোক প্রকৃত উন্নয়নে উদ্যোগী হইতে পারে।

দেশের ডাকে বাঙালী বহু বার সাড়া দিয়াছে। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াসের দরুন সকলেই হতোদ্যম ও অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেখা প্রয়োজন শক্তি কাহার আছে।

এবারও ত অনেক স্থলে মহা আড়ম্বরে শক্তিপূজা হইয়াছে। বাঙালীর মনে ও বাঙালীর দেহে সেই শক্তিসাধনার কি পরিচয় প্রকাশ পায় তাহাই আমরা দেখিতে উৎসুক।

দারিদ্র্য রাক্ষসী ভারত ছাড়

ভারতের প্রাচুর্য্যের খ্যাতিই ইংরেজকে ভারত-আগমনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ইংরেজ যখন চলিয়া গেল তখন এই দেশকে দ্বিধা-বিভক্ত ও নানা ভাবে বিপন্ন রাখিয়া গেল। দেশের বিপন্নতা ও দারিদ্র্য আজ বৃদ্ধির পথে। বিনোবাজী বলিতেছেন, "দারিদ্র্য রাক্ষসীকে আজ আমাদের বলিতে হইবে 'ভারত ছাড়'।"

জনসাধারণের অভাব দূর করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা খুব সহজেই ভারতে উৎপন্ন হইতে পারে। জনসংখ্যাও এখানে বিরাট। এই জনসংখ্যাকে বোঝা হিসাবে চিন্তা না করিয়া দারিদ্র্যকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে যদি এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হয় তবে দারিদ্র্যের অবসান নিশ্চিত। বিনোবাজী তাই বলিতেছেন, "বিদ্বান্‌দিগের বিদ্যা, শ্রমিকের শ্রম, ধনিকের ধন ও কৃষকের চাষ—এই সকল শক্তি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া উচিত।" সকলের সমবেত ত্যাগের দ্বারাই বৃহত্তর কল্যাণ সাধন সম্ভব—এই সত্যকে ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী ৯ই আগষ্টের প্রার্থনা সভায় বলেন,

"আমি ভূমি চাহিতেছি এবং সমস্ত ভূমি চাহিতেছি। সমস্ত ভূমি দান পাওয়া উচিত। লোকেরা বলে ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আমি প্রশ্ন করি কেন ইহা সম্ভব হইবে না? যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, এই কাজ আমাদের কল্যাণের তখন গ্রামের সমস্ত ভূমি আমরা গ্রামবাসীর কল্যাণের জন্য কেন দিব না। আমরা চিন্তা করি না, বুঝিতে চাহি না, বুঝাইতেও চাহি না। এই অবস্থায় অপর লোকেরা ত্যাগের জন্য কি করিয়া প্রস্তুত হইবে? ত্যাগের দ্বারা নিজেরও লাভ হয় এবং অপরেরও লাভ হয়। তাহা হইলে সম্পত্তি নিজের ঘরে রাখার প্রয়োজন কি? উহা সকলের ঘরে থাকিলে বেশি সুরক্ষিত থাকিবে।"

ভূমি বুনিয়াদী জিনিষ। জমি পাওয়া গেলে পুঁজির অভাব হইবে না। আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি আমাদের চেষ্টাতেই হওয়া সম্ভব এই আত্মবিশ্বাস আজ একান্তভাবে প্রয়োজন, এবং সাফল্য লাভ করিতে হইলে আজ সংকল্প লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসিত করিবার সংকল্প লইয়া আজ "দেশের সকল শ্রমশক্তি, সকল বুদ্ধিশক্তি ও অর্থশক্তি···কাজে লাগাইয়া দেওয়া উচিত।···বলিতে হইবে 'ওরে দারিদ্র্য, তুই দূর হ। তুই ভারতের বাহিরে চলিয়া যা কিন্তু অপর কোন দেশে নয় তুই সমুদ্রে প্রবেশ কর্। ভূমির উপর থাকার তোর কোন অধিকার নাই।' আমরা দারিদ্র্যকে অপর কোন দেশে পাঠাইতে চাহি না। সে কাজ ত সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদীরা করিয়া থাকে। আমরা উহা করিতে চাহি না।"

বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণ

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ গত মহাযুদ্ধের একটি বিশিষ্ট দান। ইউরোপের নিয়ন্ত্রণ আর ভারতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম আছে। এদেশে সাদাবাজারের নিয়ন্ত্রণ মানেই দাঁড়াইয়াছে কালো-বাজারের সমৃদ্ধি আর মুনাফাখোরের চোরাকারবার। ইউরোপের দেশগুলিতে উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং অধিকন্তু কালোবাজার কারবারিদের শাস্তি অতি কঠিন। হিটলারের জার্ম্মানীতে তাহাদের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ভারতে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, কিন্তু উৎপাদন ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মালিকদের হাতে। এ ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজন নাই, সবাই ভুক্তভোগী এবং ব্যথা কোথায় জানে। গত তিন বৎসর আগে যখন বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন কাপড় সব বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়। তাই আবার নিয়ন্ত্রণের প্রবর্ত্তন করা হয়—তবে এবারে যাহা চোরাকারবারি মূল্য ছিল তাহাকেই আইনের ছাপ দিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পরিণত করা হইল। এই সব এখন ইতিহাস।

ভারতে শিল্পপতিরা মাঝে মাঝে জিগীর তোলেন যে শিল্প উৎপাদন খুব বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কাটতি হইতেছে না। ফলে গবর্ণ্মেণ্ট নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লন যাহাতে জিনিষের কাটতি বাড়ে, কিন্তু দেখা যায় যে অল্প সময়ের মধ্যে সে দ্রব্য বাজারে ঘাটতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং চোরাকারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ প্রথার পুনরাবর্ত্তন হয়। ইহাই হইতেছে ভারতে নিয়ন্ত্রণ-বিনিয়ন্ত্রণ প্রথার ইতিকথা।

আবার রব উঠিয়াছে, বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাট্‌তি বাড়ানোর জন্য ১লা অক্টোবর হইতে কয়েক প্রকার বস্ত্রের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। কয়েক রকম বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, যথা, ধুতি, শাড়ী, মলমল, ভয়েল, পপলিন, ক্রেপ, ড্রিল, মজরি কাপড়, দোসূতী, বিছানার টিকিং কাপড় এবং অন্যান্য বস্ত্রাদি। ইহা ব্যতীত কয়েক প্রকার বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হইয়াছে। উপরি-উক্ত প্রকার বস্ত্রসমূহের বিক্রয় সম্বন্ধেও কোন বাধা রহিল না। এই বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণ আদেশ সূতার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁতিরা যাহাতে সূতা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পায় তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

মিলগুলিকে নিজেদের ইচ্ছামত ভারতীয় সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রের শতকরা ৫০ ভাগ বাজারে বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আগে তাহারা এরূপ বস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ বাজারে বিক্রয় করিতে পারিত। ভারতবর্ষে মাসে নাকি ৬৮,০০০ হাজার গাঁইট ধুতি ও শাড়ীর চাহিদা আছে, সেই তুলনায় গত সাত মাসে গড়পড়তা মাসিক উৎপাদনের হার হইতেছে ৭৮,০০০ হাজার গাঁইট। মলমল এবং ভয়েলের চাহিদা মাসিক প্রায় ১৬,০০০ গাঁইট এবং এই প্রয়োজন নাকি মিটান হইয়াছে। অন্যান্য প্রকার বস্ত্রের উৎপাদনও নাকি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত ১লা অক্টোবর ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী টি. টি কৃষ্ণমাচারী বিবৃতি দিয়াছেন যে, যদিও বস্ত্রমূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, তথাপি উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ চালু থাকিবে। শার্টের ও কোটের

কাপড়ের উপর, লংক্লথ ও বিছানার চাদর প্রভৃতির মূল্য সম্ভ বিনিয়ন্ত্রণ করা হইবে না। গত জুলাই মাসে বস্ত্র উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশ তাহাদের ধার্য্য পরিমাণ লইতেছে না, ফলে কাপড় জমিয়া যাইতেছে। কাপড়ের দামও ইদানীং নাকি যথেষ্ট কমিয়াছে। এক বৎসর আগে কাপড়ের পাইকারী মূল্যের সূচী ছিল ৪১০, ১৩ই সেপ্টেম্বর আসিয়া দাঁড়ায় ৩৮৯।

বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে, কিন্তু মূল্য এখনও এত অধিক যে সাধারণ লোকে সে মূল্য দিতে পারিতেছে না। লোকের কাপড়ের প্রয়োজন, কিন্তু ক্রয় করিবার অর্থ নাই। এবারকার মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ যাহাতে ভবিষ্যতে বস্ত্রাভাব প্রহসনে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

লোক-সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

গত ২রা অক্টোবর ভারতে লোক-সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সূচিত করা হইয়াছে। নামটা একটু ঘোরালো হইয়াছে, সহজ করিয়া গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিলেও কোন ক্ষতি হইত না, কারণ আসলে গ্রামের উন্নতিই হইতেছে এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। মহাত্মা গান্ধীর প্রধান আদর্শ ছিল গ্রামোন্নয়ন, তাই অনেকের মতে, তাঁহার নামের সঙ্গে যোগ রাখিলে শোভন হইত। তাঁহার জন্মদিনে সূচনা করিয়া তবু খানিকটা তাঁহার মান রাখা হইয়াছে।

এই বৎসর ৫ই জানুয়ারী ভারত-মার্কিন শিল্পকলা সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আগামী পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষকে তাহার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অর্থ এবং শিল্পজ্ঞান দ্বারা সাহায্য করিবে। বিভিন্ন রকম পরিকল্পনার মধ্যে, লোক-সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে।

একটি বিশিষ্ট গ্রাম্য এলাকার সমবেত প্রচেষ্টাদ্বারা গ্রামীণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা লোক-সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষির উন্নতি, সামাজিক শিক্ষা, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিল্পী প্রশিক্ষণ (technical training) এবং জীবিকা নির্ব্বাহ কার্য্যে নিয়োগকরণ ইহার অন্তর্গত।

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—কিন্তু দুই ভাগ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। প্রথম ভাগের পরিকল্পনা চালিত হইবে "লোক-সমাজ পরিকল্পনা শাসন ব্যবস্থা" দ্বারা এবং ইহার অর্থসাহায্য আসিবে ভারত-মার্কিন শিল্পকলা সহযোগিতা অর্থভাণ্ডার হইতে। প্রথম ভাগ পরিকল্পনাতে তিন রকম কার্য্যক্রম থাকিবে, যথা,—(১) মুখ্য লোক-সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, (২) সংযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং (৩) গ্রাম্য কর্ম্মীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র। মুখ্য উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য হইতেছে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করা। এক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার এলাকা হইবে—৩০০ গ্রাম, দুই লক্ষ জনসাধারণ, পাঁচ শত বর্গমাইল জায়গা এবং দেড় লক্ষ একর কৃষিজমি। ইহা ছাড়া প্রত্যেক উন্নয়ন পরিকল্পনায় থাকিবে তিনটি উন্নয়ন ব্লক; এক শত গ্রামকে লইয়া হইবে একটি ব্লক। এক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য মোট খরচ হইবে ৬৫ লক্ষ টাকা।

সংযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার এবং ব্লকের কার্য্য হইবে—কুটির শিল্প ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্পের উন্নতি করা, আর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বর্ত্তমানে ফরিদাবাদ এবং নীলোখেরীতে যে ভাবে শিল্পোন্নতি করা হইতেছে সেই ভাবে সংযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে। এক একটি সংযুক্ত পরিকল্পনায় খরচ হইবে এক কোটি এগার লক্ষ টাকা। মুখ্য বা বনিয়াদী পরিকল্পনায় কৃষিকার্য্য প্রধান উদ্দেশ্য, আর সংযুক্ত পরিকল্পনায় কৃষিকার্য্য ব্যতীত গ্রাম্য শিল্পোন্নতিও করা হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগ পরিচালিত হইবে আমেরিকার ফোর্ড প্রতিষ্ঠান দ্বারা। ফোর্ড প্রতিষ্ঠান অর্থদ্বারা সাহায্য করিবে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বিভাগ দ্বিতীয় ভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার তদারক করিবেন। দ্বিতীয় ভাগ পরিকল্পনা বহুপূর্ব্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে এবং ইহাদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিধিগুলির সীমা অপেক্ষাকৃত ছোট, মোটে এক শত গ্রাম লইয়া একটি পরিকল্পনার এলাকা। এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র একসঙ্গে ৫০ জন শিক্ষাব্রতীকে শিক্ষা দিতে পারিবে।

লোক-সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা মোট ১৭,৫০০ গ্রামকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, তাহাদের মোট জনসংখ্যা হইবে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ। বর্ত্তমানে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে ৫৫টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২৬টি উন্নয়ন ব্লকে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ফোর্ড প্রতিষ্ঠানের তদারকে ১০টি উন্নয়ন পরিকল্পনা, ৫টি উন্নয়ন তথা শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ২৫টি শুধু শিক্ষাকেন্দ্র কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে লোক-সমাজ পরিকল্পনা নাই, তাহার বদলে আটটি উন্নয়ন ব্লক ধার্য্য করা হইয়াছে। এক একটি উন্নয়ন ব্লকের সীমা প্রায় তিনটি উন্নয়ন পরিকল্পনার সমান। ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরে এই রকম একটি উন্নয়ন ব্লকের সূচনা করা হইয়াছে। ৫৭ বর্গ মাইল পরিধি লইয়া এক শতটি গ্রামে (জনসংখ্যা প্রায় ৭০,০০০) কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। তিন বছরের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা করা হইবে। ১৬০ একর জমির উপর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হইবে, কৃষি-উন্নতি, জনবসতি, কুটিরশিল্পের উন্নতি, সেচ-উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি উন্নয়ন করা হইবে।

পরিকল্পনাগুলির মোট খরচ হইবে ৩৮ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ৩৪ কোটি টাকা ভারতের খরচ, বাকী ৪ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইবে। এই খরচ বাবদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রায় পাঁচ কোটি ডলার দিবে।

কাশ্মীর ও গ্রেহাম রিপোর্ট

রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবার কাশ্মীরের ব্যাপার উঠিয়াছে। স্বস্তি-পরিষদ

এখন প্রায় বেকায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোরিয়ার যুদ্ধ আজ বানচাল, ইরাণ যেন বুনো মহিষ—তার গায়ে হাত বুলান অসম্ভব। তাই আসিল কাশ্মীর প্রহসন—প্রহসনই বটে। অন্ততঃ সময় কাটান যায়, প্রতিনিধিবর্গের বাক্যবাদের নায়কের মত গলাবাজি করায় সুযোগ হয়—আর স্বস্তি-পরিষদ দুনিয়াকে দেখায় যে সে অপ্রয়োজনীয় নয়, অন্ততঃ কিছু কাজে সে ব্যাপৃত আছে। কাশ্মীরের সোজা ব্যাপারটাকে আজ চারি বৎসর ধরিয়া ঘোলা করিয়া করিয়া একেবারে আবিল করিয়া তোলা হইয়াছে এবং তাহা অনর্থক। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা স্বস্তি-পরিষদ জানে যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান তাহাদের দ্বারা হইবে না—কিংবা তাহারা করিবে না, কারণ সে ইচ্ছা তাহাদের নাই। তাহারা সহজকে ঘোরাল করার প্রহসন করিয়া যাইবে।

১৯৪৭ সনে যখন ভারত বিভক্ত হয় তখন এই কথা দু'পক্ষই মানিয়া লইয়াছিল যে, অবিভক্ত ভারতের দেশী রাজ্যগুলির রাজারা নিজেদের ইচ্ছামত যে-কোন একটি রাষ্ট্রে—ভারত কিংবা পাকিস্থানে যোগ দিতে পারিবেন এবং রাজাদের মতামতই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত। তবে অবশ্য এই কথা খাটে সেই রাজ্যগুলি সম্বন্ধে যাহারা ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের মাঝখানে অবস্থিত। যে সকল রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সংস্থান ভারত কিংবা পাকিস্থান যে-কোন একটি রাষ্ট্রের অন্তর্বর্ত্তী, তাহারা স্বাভাবিকভাবেই সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হায়দরাবাদ পাকিস্থান রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্র হিসাবে সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে। আর একটি উদাহরণ—সার-প্রদেশ ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর ঠিক মধ্যস্থলে। এ অবস্থায় সার-প্রদেশই ঠিক করিতে পারে যে, সে ফ্রান্সের সঙ্গে থাকিবে না জার্ম্মানীর সঙ্গে মিলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া বার্লিন বলিতে পারে না যে, সে ফ্রান্সের সঙ্গে থাকিবে।

১৯৪৮ সনে যখন পাকিস্থানী সৈন্য কাশ্মীর রাজ্যে হানা দেয় তখন মহারাজা হরি সিং ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দেন। তখন হইতে কাশ্মীর আন্তর্জাতিক আইনের চক্ষে ভারতীয় রাজ্য। বিদেশী রাষ্ট্রের সৈন্য যদি কাশ্মীর রাজ্যে হানা দেয় তাহা হইলে তাহারা বে-আইনী কাজ করিবে—ইহাই হইতেছে সহজ কথা। কাশ্মীর রাজ্যের ভারতে যোগ দেওয়ার পর হইতে যখন পাকিস্থানী সৈন্য কাশ্মীর আক্রমণ করিল তখনই পাকিস্থান হইল আক্রমণকারী এবং তাহা বে-আইনী। এই সহজ তথ্য আজ পর্য্যন্ত জাতিসঙ্ঘ সহজভাবে ধরিতে পারিল না। কাশ্মীর-সমস্যা উঠিলেই তাহারা না বুঝিবার ভান করে এবং ঘুরাইয়া নাক দেখায়। ম্যাকনটেন, ডিক্সন, গ্রেহাম সবাই একই দোষে দোষী—কেহই সহজ করিয়া বলিতে পারিলেন না যে পাকিস্থান আক্রমণকারী এবং তাহার সৈন্যদের কাশ্মীর রাজ্যে থাকিবার কোন অধিকার নাই। পরন্তু ভারত ও পাকিস্থানকে এ ব্যাপারে একই পর্য্যায়ে ফেলা হয় এবং আজ চারি বৎসর ধরিয়া চেষ্টা হইতেছে যে ভারত অন্যায় করিয়া কাশ্মীরে আছে। এই কথা ইঙ্গ-আমেরিকা আঁতাত বহু বার বহু রকমে বলিয়াছে এবং এখনও বলিতেছে। ভারতের মান-সম্মান জ্ঞান থাকিলে অন্ততঃ আজ কমনওয়েলথ থাকা উচিত ছিল না। গত বৎসর স্বস্তি-পরিষদে ব্রিটেনের প্রতিনিধি স্যার গ্ল্যাডউইন জেব কাশ্মীর ব্যাপারে যে ভাবে ভারতের বিপক্ষতা করিয়াছেন তারপর ব্রিটেনের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখা উচিত হয় নাই।

এইখানে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, কাশ্মীর লইয়া বর্ত্তমানে যে অপরূপ পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহার জন্য মূলতঃ দায়ী শ্রীনেহরুর বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা এবং তাঁহার পরামর্শদাতাদিগের বুদ্ধি বিবেচনার অভাব। এই পরিস্থিতির গোড়ায় গলদ অবশ্য উহা রাষ্ট্রসঙ্ঘে দাখিল করা। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে সকল সমস্যার সমাধান অস্ত্রবলেই হইয়া যাইত যদি শ্রীনেহরু মৌলানা আজাদ ও শেখ আবদুল্লার চক্রান্তের ফাঁদে না পড়িতেন। ঐ দুই ব্যক্তির সঙ্গে আবার মাউণ্টব্যাটেন যোগ দিয়া ত্র্যহস্পর্শ পূর্ণ করিলেন। ভারতের জয়যাত্রায় অশুভের ছায়াপাত তখনই হইল।

তারপর রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের উকীল হিসাবে গেলেন শ্রীগোপাল-স্বামী আয়েঙ্গার। এই কীর্ত্তিধ্বজ সেখানে ভারতের আশাভরসায় চূণকালি মাখাইয়া ফিরিলেন। তাহার পর তিনি ভারতীয় রেলের শ্রাদ্ধ প্রায় শেষ করিয়া এখন ভারতীয় সৈন্যশক্তির দফা নিকাশে ব্যস্ত আছেন। সে যাহা হউক, ইহা অন্য কথা। কাশ্মীরের বিষয়ে একদিকে শ্রীমান্ গোপালস্বামী অন্য দিকে ভারতের দূত শ্রীমান্ আসফ আলী।—এই দুই জনেই ভারতের প্রায় চূড়ান্ত ক্ষতির গোড়াপত্তন করিয়া আসিয়াছেন। দুই জনেই শ্রীনেহরুর তাঁবেদার।

কাশ্মীর সম্বন্ধে গ্রেহামের রিপোর্ট এইবার লইয়া চতুর্থ বার হইল। গ্রেহাম অতি পুরানো কথাই নূতন করিয়া বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কাশ্মীর ব্যাপার লইয়া মিল হইল না এবং এ ব্যাপারে তিনি কোন নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। এবারের বিপত্তি একটি অতি সামান্য ব্যাপারে আটকাইয়া গিয়াছে—যুদ্ধবিরতি লাইনের দুই দিকে কি রকম এবং কি পরিমাণ সৈন্য উভয় দেশের তরফ হইতে থাকিবে। ভারতের কথা হইতেছে যে কাশ্মীরে ভারতীয় অংশে ভারতের সৈন্যসংখ্যা থাকিবে ২১,০০০, কাশ্মীর রাষ্ট্রের সৈন্য ইহার মধ্যে ধরা হইবে না, তাহাদের সংখ্যা হইবে ইহার অতিরিক্ত। আর কাশ্মীরের পাকিস্থানী অংশে পাকিস্থানী সৈন্য থাকিবে ৪,০০০।

পাকিস্থানের দাবি হইতেছে কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে ভারতীয় সৈন্য থাকিবে ১৮,০০০ এবং কাশ্মীর রাষ্ট্রের সৈন্য থাকিবে ৬,০০০। আর পাকিস্থানী অংশে পাকিস্থানের সৈন্য থাকিবে ৬,০০০ ও গিলগিট স্কাউট সৈন্যদের সংখ্যা থাকিবে ৩,৫০০।

সৈন্যসংখ্যা বিরোধ বড় কথা নয়। ভারতের প্রধান কথা হইতেছে যে, পাকিস্থান যখন আক্রমণকারী তখন তাহার সৈন্য কাশ্মীরে না থাকাই উচিত। স্বস্তি-পরিষদে গ্রেহাম তাঁহার বক্তৃতা

এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন যে, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান না হইলে বিশ্ব-শান্তি বিপন্ন হইয়া উঠিবে। সে কথা সবাই জানে। তবে এই অশান্তির জন্য দায়ী কে? রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বয়ং এবং গ্রেহাম সাহেব। গ্রেহাম সাহেব প্রহসন না করিয়া কেন সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না—কেন আক্রমণকারী পাকিস্থান, ও ভারতবর্ষকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিলেন।

হায়রে শান্তির অশান্তি! কোরিয়া, ইরাণের সমস্যা বিশ্ব শান্তির অশান্তি করিল না, অশান্তি করিল যত কাশ্মীর সমস্যা।

আন্তর্জাতিক চা-প্রচার বোর্ড ও ভারতবর্ষ

সম্প্রতি ভারত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আন্তর্জাতিক চা বাজার বিস্তার বোর্ড" হইতে ভারতবর্ষ বিদায় গ্রহণ করিবে। এই ঘোষণার কয়েকদিন পূর্ব্বেই পাকিস্থান জানাইয়াছে যে, সেও বোর্ডের সভাপদ ত্যাগ করিবে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া তাহার চাঁদা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের পর সভ্য থাকিবে ইন্দোনেশিয়া, সিংহল এবং পূর্ব্ব আফ্রিকা। পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্যে পড়ে ন্যায়জাল্যাণ্ড, কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানাইকা।

ভারতের ঐ বোর্ডের সভাপদে থাকা লইয়া সম্প্রতি আইন-পরিষদে ও বাহিরে যথেষ্ট বিরুদ্ধ আলোচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঐ বোর্ডে দেয়, অর্থাৎ বোর্ডের বাৎসরিক খরচের অর্দ্ধেক টাকা ভারতবর্ষ দেয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা নিজেরাই ভারতীয় চায়ের প্রচার বিদেশে করিবেন। ইদানীং ভারতের চা রপ্তানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। ১৯২৯-৩৩ সনের পৃথিবীব্যাপী মন্দার বাজারে ১৯৩৩ সনে "আন্তর্জাতিক চা বাজার বিস্তার বোর্ড" স্থাপিত হয় এবং সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষ অর্দ্ধেক খরচ বহন করিয়া আসিতেছে। সেই সময় হইতে চা উৎপাদন ও রপ্তানীর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। তারপর ১৯৩৮ সনে যখন দ্বিতীয় বার চুক্তি হয় তখন মালয় ও পূর্ব্ব আফ্রিকা সভ্যপদে যোগ দেয়।

যুদ্ধশেষে নূতন চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ এখন তাহার উৎপাদন বাড়াইতে পারে এবং রপ্তানী বৎসরে ৪৭ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক করিতে পারে। কিন্তু ভারতের চা রপ্তানী সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই, পরন্তু চা রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে। ১৯৪৯-৫০ সনে ভারত ৪৪.১৫ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করে; ১৯৫০-৫১ সনে ৪৩.৯২ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯৫১-৫২ সনে রপ্তানী হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪২,৫৫ কোটি পাউণ্ডে। নূতন চুক্তি অনুসারে শতকরা ৫ ভাগ পর্য্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু খরচ বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমানে ভারতের চা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬৪ কোটি পাউণ্ড। ইদানীং ভারতের আভ্যন্তরিক চায়ের বাজার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সনে ভারতবাসীর ১০ কোটি পাউণ্ড চা বৎসরে লাগিত, এখন লাগে বৎসরে প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড।

ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বাজারে তাহার নিজের চায়ের জন্য প্রচার করিলে চা রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। চা উৎপাদনও বাড়িবে। আভ্যন্তরিক চাহিদাও বাড়িবে যদি চায়ের দাম কমানো হয়। চায়ের উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অনুসারে দাম কমে নাই। চায়ের দাম কমিলে আভ্যন্তরিক চাহিদা বাড়িবে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

আন্তর্জাতিক বোর্ড কোন বিশেষ দেশের চায়ের প্রচার করে নাই। তাই ভারতের চা রপ্তানী হ্রাস পাওয়ার অন্যান্য অনেক কারণ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে অধিক মূল্য এবং নিকৃষ্টতা। ভাল চা উৎপাদন এবং রপ্তানী করিতে না পারিলে চায়ের বাজার খুব বৃদ্ধি পাইবে না।

এশিয়াতে পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রভাব হ্রাস

'নিউ লীডার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এডোয়ার্ড হান্টার এশিয়াতে আমেরিকা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব হ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন যে, চীনের কম্যুনিষ্টরা গণতান্ত্রিক দেশগুলির দুর্ব্বলতা এবং দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের সুযোগ লইতেছে। কম্যুনিষ্টদের নিজস্ব শক্তি খুবই অল্প। তাহারা প্রচার-কৌশলে পশ্চিমকে পর্য্যুদস্ত করিতেছে। এশিয়ার দেশগুলিতে মস্কো এবং পিকিং হইতে প্রেরিত কম্যুনিষ্ট সাহিত্য অসম্ভব রকম কম মূল্যে বিক্রীত হয়। বিপরীত পক্ষে আমেরিকা হইতে প্রেরিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প এবং সেই পুস্তকের দাম সাধারণতঃ এত বেশি যে, তাহা সেই সকল দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্দ্ধে। আমেরিকান সাহিত্য এশিয়াতে বহুল প্রচার না হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হইতেছে মুদ্রাবিনিময় সমস্যা।

কম্যুনিষ্টরা প্রচারের মারফত এই ধারণা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছে যে, পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন ঐক্য নাই। তাহারা দেখায় যে ব্রিটিশ সরকার চীনের "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র"কে স্বীকার করিতে ব্যগ্র, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রিটিশ জনসাধারণ এবং চীনের জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রীকে ব্যাহত করিতেছে। ইংরেজ জাতির প্রধান ভরসা ব্যবসা-বাণিজ্য। কম্যুনিষ্টরা প্রচার করিতেছে যে, আমেরিকার পুঁজিপতি গোষ্ঠী ক্রমশঃই ব্রিটেনের বাজারকে সঙ্কুচিত করিতেছে। যদিও ইহা এক প্রচণ্ড মিথ্যা তবুও জনসাধারণের মনে এই প্রচার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বিভিন্ন মহল হইতে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, চীনের কৃষক এবং শ্রমিকশ্রেণী কম্যুনিজম সম্পর্কে মোহমুক্ত হইয়াছে। আজ সেখানে করভার এবং কাজের ঘণ্টা

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই এই অসন্তোষ আজ সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রামে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তবুও আজ কি করিয়া কম্যুনিষ্টরা চীনে টিকিয়া আছে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বর্ত্তমান সরকারের অনেক সমর্থক আছে। তাহা ছাড়া কোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগ লইয়া তাহারা দেশবাসীর সম্মুখে এক কাল্পনিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া দেশের লোককে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাতে কিয়ৎ-পরিমাণে সাফল্য লাভও করিয়াছে।

কম্যুনিষ্টদের দুইটি কৌশল আছে। একটি হইতেছে অসন্তোষ এবং গোলমাল জীয়াইয়া রাখা এবং দ্বিতীয়, শান্তির বুলির আড়ালে কম্যুনিষ্ট আক্রমণের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান।

এই একনায়কত্বকে দূর করিতে হইলে যাঁহারা দেশের অভ্যন্তর হইতে এই সর্ব্বব্যাপী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন বাহির হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ-সঙ্ঘাত

উপরোক্ত শিরোনামা দিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বরের "সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রের সংবাদ ও অভিমত" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ওয়াই. জুভিয়াগিন বর্ত্তমান বিশ্বে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ-সঙ্ঘাতের এক দিক প্রাঞ্জলরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিকট ও মধ্য প্রাচ্য ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিযোগিতা মোটামুটি ব্রিটেনেরই অনুকূল ছিল। এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশ—মিশর, ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করিতে সমর্থ হয় এবং গড়িয়া উঠে জালবুনানির মত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি—সৈয়দ বন্দর, সুয়েজ, এডেন, বসরা, সাইপ্রাস ও আরও কয়েকটি স্থানে।"

কি ভাবে ব্রিটেন এই দেশগুলিকে শোষণ করিয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়া দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক বলিতেছেন যে, "অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ইরাণের খনি হইতে তুলিল ৩০ কোটি টনেরও বেশী তেল, আর এই তেল হইতে তাহাদের নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াইল ৫০০ কোটি ডলার।"

"অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীরা যাহাতে নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে মাথা গলাইতে না পারে তাহার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি নিঃশেষ হওয়ার পরিস্থিতি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার আগেই নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে, বিশেষ ভাবে সৌদী আরবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কর্ম্মতৎপরতা শুরু হইয়া যায়। যুদ্ধের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কেও শক্ত খুঁটি গাড়িয়া বসিল।

"বলা বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার অংশীদার ব্রিটেনের উপকারে লাগার জন্য নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে আসিয়া আস্তানা গাড়ে নাই।

"সৌদী আরব ও তুরস্ক ভাল করিয়া বসিয়া লইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বলিতে লাগিল, নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ভূমিকা বদলাইয়া দিতে হইবে—বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে শক্তিগুলির নূতন সম্পর্ক অনুযায়ী। এই দাবীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত 'মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থ' নামক পুস্তিকায়।

"১৯৪৯ সন ও ১৯৫০ সনে নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জোর আক্রমণ সুরু করে—বিশেষ ভাবে ইরাণে।" লেখকের মতে ইরাণে ব্রিটিশ তৈলশিল্প জাতীয়করণের বিধান পাস হওয়ার সময় আমেরিকা যে ব্রিটেনের সমর্থনে অগ্রসর হইয়া আসে নাই তাহার মূলে এই দুই শক্তির বিরোধ নিহিত আছে। পরে তৈল-বিরোধের মধ্যস্থতা করিতে আমেরিকা স্বীকৃত হইলেও মার্কিন প্রতিনিধি কোটিপতি ও রাজনীতিজ্ঞ আভেরল হ্যারিম্যান যে প্রস্তাব করেন তাহার নির্গলিতার্থ হইল ইরাণের তৈলশিল্পের চাবিকাঠি আমেরিকার হাতে তুলিয়া দেওয়া। উহাতে ব্রিটিশ পুঁজিপতিবৃন্দ এতই বিরক্তিবোধ করে যে, লণ্ডনের "ইকনমিষ্ট" পত্রিকা প্রকাশ্যেই মার্কিন আচরণকে "বিশ্বাস-ঘাতকতা" বলিয়া অভিহিত করিল।

ইরাণ ব্যতীত ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশেও আজ ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সম্প্রতি ট্রান্সজর্ডানের রাজা তালালের সিংহাসন ত্যাগের পশ্চাতে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ সুপরিস্ফুট। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক বলিতেছেন, "ট্রান্সজর্ডানের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব এখন যে রিজেন্সী কাউন্সিলের হাতে তাহার সদস্যরা সবাই ব্রিটিশ অনুরক্ত।" রাজা তালালের মস্তিষ্কবিকৃতির কথা অবশ্য লেখক একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন।

১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্য্যন্ত সিরিয়াতে চারি বার বিদ্রোহ ঘটিয়াছে; কয়েকটি হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে। গত বৎসর নবেম্বর বিদ্রোহের ফলে সিরিয়ার শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছে যে সরকার তাহা মার্কিন সমর্থনপুষ্ট।

"মধ্য প্রাচ্য প্রতিরক্ষা" পরিকল্পনা লইয়াও আজ ব্রিটেন এবং আমেরিকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। ভূমধ্যসাগরে নৌ-সেনাপতি নিয়োগ এবং মধ্য প্রাচ্যে সর্ব্বাধিনায়কের নিয়োগের ব্যাপারে সে বিরোধ জনসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের মঙ্গলের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কারণ "এই স্ববিরোধ সত্ত্বেও নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন দমন করিবার কাজে ব্রিটেন ও আমেরিকা কিন্তু একজোট। কিন্তু এই মিতালির মধ্যে উভয় পক্ষই নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট।"

আমেরিকা ক্রমশঃই ব্রিটেনকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু "আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চক্রান্ত সফল করার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের জনসাধারণ। ব্রিটিশ ও আমেরিকান এই উভয়বিধ সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশের হাত হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্ত নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের জনগণ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

পাকিস্থানের বৈদেশিক নীতি

১১ই অক্টোবরের "ভিজিল" পত্রিকায় চামু কেওয়াল রামণী এক প্রবন্ধে পাকিস্থানের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সাধারণভাবে বলিতে গেলে তিনটি উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের বৈদেশিক নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা এই :

(ক) ভারতের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার এবং তদনুযায়ী মৈত্রীগঠন।

(খ) উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত পাকিস্থানের নেতৃত্বে পৃথিবীর সকল মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন।

(গ) সুয়োরাণীর অংশ অভিনয়ে অভ্যস্ত মুসলীম লীগের ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতকে জব্দ করিবার জন্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ক্রীড়নক হইতেও স্বীকৃতি এবং ভারতকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আওতায় রাখিবার জন্য সকল চেষ্টায় সহযোগিতা।

কিন্তু পাকিস্থানের বৈদেশিক নীতি এই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে আজ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের যে তরঙ্গ আসিয়াছে তাহার স্রোতে পাকিস্থানের নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারত-বিরোধিতাও আজ আর তত কার্য্যকরী হইতেছে না এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী পাকিস্থানের আশানুরূপ কার্য্য করিতেছে না। তাই পাকিস্থান আজ এক নূতন চাল দিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহার সারাংশ হইতেছে আমেরিকার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপন। পাকিস্থানের নায়কগণ মনে করেন যে, আমেরিকার নির্ব্বাচনে যদি রিপাবলিকান প্রার্থী আইসেনহাওয়ার জয়লাভ করেন তবে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থান কাশ্মীরে আমেরিকার নিকট হইতে সক্রিয় এবং ব্যাপকতর সাহায্যলাভ করিতে সমর্থ হইবে। তাই আজ নূতন প্রভুর অধীনে "ইসলামিস্থান" গঠনের বাণী তুলিয়াছেন চৌধুরী খালিকুজ্জমান।

ভারতের প্রতি 'ডনে'র অভিযোগ

গত সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভাতে কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহার ব্যর্থতার জন্ত করাচীর "ডন" পত্রিকা ভারতকে দায়ী করিয়াছে। "ডন" ব্রিটেন, আমেরিকা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে নিষ্ক্রিয়তার জন্ত অভিযুক্ত করিয়াছে। ডনের মতে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি গ্রেহাম ঠিক স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন না। সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানে সোভিয়েট ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট প্রস্তাব যদি সাফল্যলাভ নাও করে তবুও তাহাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। "জেনেভা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'ডন' লিখিয়াছে যে, আর আলাপ-আলোচনা করিয়া কোন লাভ হইবে না।

পাকিস্থানের এই চাল সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা এবং ব্রিটেন নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরে বিদেশী সৈন্ত মোতায়েন রাখিবার এক প্রস্তাব আনিলে পাকিস্থান অভিনন্দন জানায়। কিন্তু ভারত এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কারণ উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে কাশ্মীর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক ঘাঁটিতে পরিণত হইত। উহা ব্যতীত 'ডন' পত্রিকার এত দিনকার রুশ-বিরোধিতার কথাও নিশ্চয় সোভিয়েটের নেতৃবৃন্দ সহজে ভুলিবেন না। রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র-মামলা প্রভৃতি হইতে পাকিস্থানের কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার রূপ সম্পর্কে সোভিয়েটের ভুল হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

নেগুইব ও নাহাশ

ঘটনার গতি দুর্ব্বার—যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ। মিশরের ঘটনাবলী যেমনি চমকপ্রদ, তেমনি তা চলিয়াছে সুনির্দিষ্ট গতিপথে। রাজা ফারুককে বিতাড়ন করিলেন সেনাপতি নেগুইব সামরিক বিদ্রোহ দ্বারা—অবশ্য আলি মাহের পাশাকে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া। পরে আলি মাহেরকে বিদায় লইতে হইল, কারণ আর শিখণ্ডীর প্রয়োজন নাই। এখন সেনাপতি নেগুইব প্রকাশ্যভাবে নিজেকে মিশরের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া ঘোষণা করিলেন —তিনি হইলেন একাধারে প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি ও বৈদেশিক মন্ত্রী। কিন্তু তবুও তিনি নিষ্কণ্টক হইলেন না, পথের কাঁটা রহিয়া গেল শক্তিশালী ওয়াফদ্ দল ও তাহার নেতা নাহাশ পাশা। নেগুইব আইন করিলেন যে, মিশরের রাজনৈতিক দলগুলিকে সংস্কার করিতে হইবে, আর তাহা না হইলে দলগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। সংস্কার অর্থে, যাহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে কিংবা যাহারা চোরাকারবারী মুনাফাখোর তাহারা কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য থাকিতে পারিবে না। "সংস্কার কর কিংবা ভাঙিয়া দাও" এই আইন অনুসারে ছোট-খাট রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সংস্কারসাধন করিল। কিন্তু গণ্ডগোল বাধিল ওয়াফদ্ দল ও তাহার নেতা নাহাশ পাশাকে লইয়া। ওয়াফদ্ শক্তিশালী দল এবং তার যথেষ্ট জনসমর্থন আছে। কিন্তু নাহাশ প্রথম চালে ভুল করিলেন। নেগুইবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত দলের সচিব সেরাগ-এল-দিনকে নাহাশ দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নাহাশ ভাবিয়াছিলেন এইরূপে তিনি নিজেকে বাঁচাইতে পারিবেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে—নেগুইব নাহাশকেও বাদ দিলেন না। গত জানুয়ারী মাসে কায়রো-দাঙ্গাতে সেরাগ-এল-দিন পাকিস্তান্তি করিয়াছিলেন। তিনি যথোপযুক্ত সাবধান হইলে

কায়রো-দাঙ্গা হয়ত ঘটিত না। তাই সেরাগ-এল-দিনের বিদায়ে মিশরে আলোড়ন হইবে না। কিন্তু তার পরেই নাহাশের পালা। নাহাশের নেতৃত্বে ওয়াফদ দলকে নূতন আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিতে নেগুইব আপত্তি করিলেন। কথায় বলে যে শত্রুর আর সাপের শেষ রাখিতে নাই—নাহাশকে ওয়াফদ্ দল হইতে সরাইতে না পারিলে তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গা যাইবে না। আর নাহাশ ওয়াফদ্ দলে থাকা মানেই নেগুইবের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আজ নাহাশ ছিন্নাস্তরের কোঠায়—রাজনৈতিক বাহাত্তুরে কাটাইয়া উঠিয়াছেন। ওয়াফদ দলের প্রতিষ্ঠাতা জগলুল-পাশার মৃত্যুর পর হইতেই নাহাশ ওয়াফদ্ দলের নেতা। এক সময়ে তিনি ছিলেন জাতির আদর্শ, তাই তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে নেগুইব দ্বিধা করিলেন—কারণ তাহা বিপজ্জনক। নেগুইব চতুর খেলোয়াড়, সময় নিলেন। নাহাশের রাজনৈতিক সহচর তথা অনুচরগুলিকে একে একে সরাইলেন। তারপর পড়িলেন নাহাশকে লইয়া। নেগুইব ঘোষণা করিলেন যে, যদি নাহাশ নির্দোষ হন তো তিনি শ্রদ্ধেয়, কিন্তু যদি দোষ পাওয়া যায় তবে আইনানুসারে তিনি দণ্ডনীয়। ওয়াফদ্ দল ঘোষণা করিল—"নাহাশ বিনা ওয়াফদ চলিবে না।" এই দিকে রাজনৈতিক দলগুলির রেজেষ্ট্রী করার শেষ তারিখ আগাইয়া আসিল—৮ই অক্টোবরের মধ্যে রেজেষ্ট্রী না করিলে রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। কোন উপায় নাই। আজ সকল ক্ষমতা নেগুইবের হাতে—ভবিষ্যৎ নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত দলগুলিকে মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতে হইবে। ঐ তারিখের মধ্যে রেজেষ্ট্রী না করিলে ওয়াফদ্ দলের অস্তিত্ব থাকিবে না এবং তাহার সঙ্গে দলের ৯২,০০০ পাউণ্ড বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। তাই ওয়াফদ্ দল নামিয়া আসিল—নাহাশকে বাদ দিয়াই ওয়াফদ্ দল রেজেষ্ট্রী করিল।

ওয়াফদ্ ও নেগুইবের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা ভবিষ্যতের গর্ভে মুলতুবী রহিল। সাধারণ নির্বাচনের পর কাহার কি ক্ষমতা বুঝা যাইবে। আজ নেগুইব দরিদ্র ও প্রপীড়িত জনসাধারণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহার সকল প্রচেষ্টা সেই দিকে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া কোরিয়ার যুদ্ধে মিশর তুলার বাজারে যথেষ্ট লাভ করিতে পারিত। কিন্তু ওয়াফদ্ দলের অসাধুতার জন্য মিশরকে আন্তর্জাতিক তুলার বাজারে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে—ফলে মিশরের দ্রব্য-মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে—গরীব চাষী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ওয়াফদ দলের এই দুষ্কৃতি নেগুইবের প্রধান অস্ত্র হইবে—কে জানে ভবিষ্যৎ মিশরের রাজনৈতিক গগনে নেগুইব-তারকার উদয় হইতেছে কিনা। ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ও পুনর্বণ্টনের দ্বারা নেগুইব তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতে কম্যুনিজমের প্রসার

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত "নিউ লীডার" পত্রিকার ৮ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কেটো ছদ্মনামে জনৈক ভারতীয় লেখকের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন যে, ১৯৫০ সনে কমিনফর্মের নির্দেশিত নূতন পন্থা গ্রহণ করার ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টি গত সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টে কংগ্রেসের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা প্রায় ৫৫ লক্ষ ভোট পাইয়াছে। তাহা ব্যতীত অনেক কংগ্রেসী এবং কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের সভ্যও কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। দেশের লোকের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা এই ভাব ছড়াইবার চেষ্টা করিতেছে যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহারাই একমাত্র দল এবং নিজস্ব প্রয়োজনে কংগ্রেসও এই ভাবটিকে সমর্থন করিতেছে। আগামী নির্বাচন পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকিলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সকল অসন্তোষ জনসাধারণকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থনে ঠেলিয়া দিবে।

নির্বাচনের সাফল্যের সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা অপর একক্ষেত্রে দ্রুত সফলতা লাভ করিতেছে। তাহারা বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বুদ্ধিজীবীদের উপর কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তারে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রভূত সাহায্য করিয়াছে :

(১) ভারতের বাজারে কম্যুনিষ্ট সাহিত্যের ছড়াছড়ি। এইগুলির মধ্যে কিছু ভারতে ছাপা হইলেও অধিকাংশই আসে মস্কো এবং পিকিং হইতে। "সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস" এবং "জোসেফ ষ্টালিনের জীবনী" এই দুইটি বইয়ের প্রচার বিপুল। যে সকল যুবক-যুবতী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আগ্রহের সহিত এই সকল পুস্তক পাঠ করেন; কারণ তাঁহাদের কাছে অন্য কোন বই সহজলভ্য নয়।

(২) কম্যুনিষ্টদিগের প্রচারের দক্ষতা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মারফত কম্যুনিষ্টরা তাহাদের মতবাদ প্রচার করে। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে তাহাদের নিজস্ব ইংরেজী সাপ্তাহিক "ক্রশরোডস্" (বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "ব্লিৎজ" আজকাল অন্যতম সহযোগীর কার্য্য করিতেছে); বাংলা দৈনিক "স্বাধীনতা"; মলয়ালম ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক "দেশাভিমানী"; তামিল দৈনিক "জনশক্তি"; তেলুগু দৈনিক "প্রজাশক্তি"; উর্দু সাপ্তাহিক "নয়া আদব"। এই সকল পত্রিকা পরিচালনা করিবার মত প্রচুর টাকা যে কম্যুনিষ্টদিগের আছে কেবলমাত্র তাহাই নয়, তাহারা এখন নূতন নূতন ছাপাখানা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। মরাঠী, কানাড়ী এবং হিন্দী ভাষায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ।

(৩) বর্ত্তমান বৎসরের গোড়ার দিকে বোম্বাই নগরে তথাকথিত "আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা"র অনুষ্ঠান। এই মেলাতে লৌহ-যবনিকার অন্তরালবর্তী দেশগুলিতে উৎপন্নদ্রব্যের আধিক্য ছিল। উহার ফলে বিশ্বাসীদের মনে প্রশংসার মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অংশ-বিশেষের মধ্যে মানসিক বিপ্লব ঘটে। ভারত-সরকার এই প্রদর্শনীর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন।

(৪) সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্ট চীন হইতে তথাকথিত সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদলের অবিরাম আসা-যাওয়া। এই সকল প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকটিকে স্থানীয় কম্যুনিষ্টগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে যে, কত ঘন ঘন এই সকল তথাকথিত প্রতিনিধি-দলের আগমন ঘটে। বোম্বাই শহরের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে সেখানে এক সরকারী চীনা সাংস্কৃতিক মিশন আসে; ১৯৫২ সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক শিল্প মেলার অনুষ্ঠান, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, মার্চ্চ মাসে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির আমন্ত্রণে রুশ প্রতিনিধি দলের আগমন, এবং মে মাসে সোভিয়েট শিল্পকলার প্রদর্শনীর সহিত সোভিয়েট শিল্পী প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে।

(৫) কমিনফর্ম্ম বা বিশ্ব-শান্তি সংসদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি দল প্রেরণ। বিশ্ব-শান্তি সংসদের প্রেরণায় মস্কোতে যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতিবিদ্‌গণকে লইয়া এক শক্তিশালী "প্রস্তুতি কমিটি" গঠিত হয়। ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত "পঙ্গু শিশুদিগকে যত্নের জন্য সম্মেলনে" প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য অনুরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই বৎসরের শেষের দিকে রোমে যে "বিশ্ব-চিকিৎসা সম্মেলন" হইবার কথা তাহাতে এবং পিকিঙে অনুষ্ঠিত এশিয়ার "শান্তি" সম্মেলনে এবং অপরাপর আন্তর্জাতিক ছাত্র এবং যুব-সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের নিমিত্ত প্রস্তুতি চলিতেছে।

(৬) এই সকল ব্যাপারে কমিউনিষ্ট চীনের (ভারতে যাকে নয়া চীন বলা হয়) ভূমিকাকে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিক হইবে না। সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে যাঁহাদের মোহমুক্তি ঘটিয়াছে তাঁহারা পর্য্যন্ত এই নূতন এশিয়ান কমিউনিজমের আওয়াজে উৎসাহের সহিত সাড়া দেন। ১৯৫২ সনে সোশ্যালিষ্ট পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ঠিকই বলিয়াছেন যে, কমিউনিষ্টদিগের সাফল্যের মূলে আছে তাহাদের সৃষ্ট "দুই মন্দির"—একটি রাশিয়া, অপরটি চীন; এবং তিনি নির্ভুল ভাবে আরও বলেন যে, ভারতের সরকার এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উপরোক্ত এক "মন্দিরে" অন্ততঃ অর্ঘ্য প্রদানে উৎসাহ জোগাইয়াছেন।

কম্যুনিজম প্রতিরোধে আমেরিকান পত্র-পত্রিকার সাহায্য

নিম্নলিখিত পত্রটি নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "নিউ লীডার" পত্রিকায় ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল:

"সম্পাদক মহাশয়, আমরা আপনাদের দেশ সম্পর্কে জানতে খুব উৎসুক, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত সংবাদ পাচ্ছি না। এই ত্রুটি সংশোধনে আপনাদের পত্রিকা খুব সহায়ক।

"দিনে দিনে পাকিস্থান অধিকতর গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা বিনামূল্যে বা খুব অল্প মূল্যে রুশ সাহিত্য প্রচার করে জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছে। সুতরাং আমি আপনাদের পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি বিনামূল্যে আমেরিকান পত্র-পত্রিকা আমাদের পাঠাবার জন্য—এখানে তার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। আমার ঠিকানা: শহিদ ক্লাব, পোঃ শ্রোয়াতালি, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ব-পাকিস্থান। নেপাল দস্তিদার"

ক্রেমলিনের নূতন কৌশল

"নিউ লীডার" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ৭৩ বৎসর বয়স্ক জেনারেলিসিমো ষ্টালিন তাঁহার চীনা অতিথিদিগকে দুইটি বাছা বাছা প্রচারমূলক চালের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ঘোষণা করেন যে, অক্টোবর মাসে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির উনবিংশতি কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ১৯৩৯ সনের পর ইহাই পার্টির কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। অতঃপর তিনি সোভিয়েটের পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করেন—পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ এবং পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব লইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি। পশ্চিমের রাষ্ট্র-নায়কগণ যখন এইগুলির তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে ঘুরিয়া মরিতেছেন সেই সুযোগে ষ্টালিন এবং চৌ-এন্-লাই-এর নেতৃত্বে তাঁহার অতিথিবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনাতে মনোনিবেশ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারীতে যখন চৌ ক্রেমলিনে আসেন তাহার পরই সোভিয়েট-চীন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়—মিত্রপক্ষীয় কূটনীতিবিদ্‌দিগের নিকট যাহা আজও ভয়াবহ কণ্টকস্বরূপ; তার পর চারি মাসের মধ্যেই কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সর্ব্বশেষে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে চীন কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে আটলাণ্টিক চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের মধ্যে গভীর বিভেদ দেখা দেয়। চৌ-এর প্রথম আগমনের পর পূর্ব্ব-এশিয়াতে পশ্চিমের সাফল্যের অভাবের কথা বিবেচনা করিলে তাঁহার বর্ত্তমান আগমন কমিউনিজমের পক্ষে আরও সম্ভাবজনক সাফল্য আনয়ন করিতে পারে বলিয়া মনে হয়।

ইন্দোচীন গৃহযুদ্ধে বিভক্ত; বর্ত্তমানে সার্ব্বভৌম জাপানে কম্যুনিষ্ট প্রচারের সকল সুবিধাই আছে। ব্রহ্মদেশ এবং সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভারতে কমিউনিজমের অবস্থা মন্দ বলা চলে না। এই অংশে এমন সামরিক আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে যাহার নিকট কোরিয়ার যুদ্ধ সামান্য টেনিস খেলার ন্যায় তুচ্ছ প্রতিভাত হইলেও উহা অসম্ভব নহে। ষ্টালিন এবং চৌ উভয়েই জানেন যে, এরকম কোন ঘটনাকে প্রতিহত করিবার মত কোন নীতি বা সেই নীতিকে কার্য্যকরী করিবার মত অস্ত্রবল কোনটাই পশ্চিমের শক্তিগুলির

নাই। ডিক্টেটরদিগের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা খুবই কঠিন।

সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেস (পলিটব্যুরো এবং অর্গব্যুরোর সংহতি স্থাপনের কথা) বলিতে গেলে স্পষ্টই দেখা যায় বলশেভিজমের ভগবানের মৃত্যুর পর তাহার যন্ত্রকে শক্ত করাই ক্রেমলিনের উদ্দেশ্য। জর্জি ম্যালেনকভ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন কিনা সে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নহে। স্পষ্টতঃই এই সিদ্ধান্তের পিছনে দীর্ঘকাল যাবৎ অনেক রুশ অংশ গ্রহণ করিবে। ষ্টালিনের পরে যাহাতে অধিকসংখ্যক রুশবাসী সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তাহার জন্যই বর্ত্তমান এইরূপ কড়াকড়ি।

সমাবর্ত্তন উৎসবে স্নাতকদিগের প্রতি চু-তের আহ্বান

"চীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব গঠনমূলক কর্ম্মের পূর্ণ স্রোতে চীনাজনগণের সহিত যোগদান করা গ্রাজুয়েটদিগের কর্ত্তব্য"—চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সহসভাপতি চু-তে ২১শে আগষ্ট পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে এই বলিয়া ছাত্রদিগকে আহ্বান করেন।

তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যেন তাঁহারা এই গৌরবময় কার্য্যে তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "যখন স্নাতকদিগকে বেকার দশার সম্মুখীন হইতে হইত সেইদিন চলিয়া গিয়াছে।"

স্নাতকদিগের মধ্যে অনেকেই নূতন নূতন বা পরিবর্দ্ধিত কারখানা ও খনিতে যোগদান করিতেছেন। যানবাহনব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং নানাবিধ যান্ত্রিক কার্য্যে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। অন্যেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্যে বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে সহকারীর কার্য্যে অথবা চীনা বিজ্ঞানপরিষদে গবেষণার কার্য্যে যোগদান করিতেছেন। যাঁহারা চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে কারখানা এবং খনিতে ও সরকারী কর্ম্মীদিগের চিকিৎসার জন্য নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসালয়ে নিয়োজিত করা হইতেছে।

জাতীয় পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক উত্তর-চীনের তেইশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক মাও-ৎসে-তুং এবং চীনা জনগণের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে লেখা চিঠিগুলি পাঠ করেন। মাও-ৎসে-তুংয়ের নিকট লিখিত পত্রে ছাত্রগণ লিখিয়াছেন, "আমরা এমন সময় স্নাতক হইতেছি যখন আমাদের মাতৃভূমির বৈষয়িক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতির সূচনা দেখা দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বব্যাপী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে। উহা আমাদের দেশের পক্ষে এক নূতন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা। এই মহান্ ঐতিহাসিক যুগের উদ্বোধনে ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়া আমরা প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং সম্মান অনুভব করিতেছি। আমাদের মাতৃভূমির শক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য, বিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য এবং আমাদের দেশে কম্যুনিজমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বাস্তব সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতে আমাদের হৃদয় দ্রুততর তালে বাজিতে থাকে।

চীনা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে লিখিত পত্রে ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন।

চীনে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন

উত্তর চীন শাসন-সংসদের সভাপতি লিউ ল্যান-টাং উত্তর-চীনে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন শাখায় উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব্ব সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে উত্তর-চীনে গড়পড়তা শস্য উৎপাদন যাহা ছিল এই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট শস্য উৎপাদন তদপেক্ষা শতকরা তিন ভাগ এবং তুলা উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব্ব সর্ব্বোত্তম উৎপাদনের তুলনায় শতকরা সত্তর ভাগ বেশি হইয়াছে। তাহা ব্যতীত শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় ইস্পাত এবং লৌহ উৎপাদন শতকরা সত্তর ভাগ, ইস্পাতজাত দ্রব্য শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি এবং কয়লা ও শক্তি উৎপাদন শতকরা আঠার ভাগ বাড়িয়াছে। যন্ত্রপাতির উৎপাদন দেড় গুণ এবং বৈদ্যুতিক মোটরের উৎপাদন আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সরকারী সাহায্যে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন শিল্পগুলিও যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৫১ সনের শেষে তিয়েনসিনে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৪৯ সনের তুলনায় প্রায় শতকরা ৫৩টি বেশি ছিল। পিকিঙে ১৯৪৯ সনের তুলনায় ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় শতকরা ষাট ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সাত গুণ। উত্তর-চীনের বিভিন্ন প্রদেশ এবং পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা ঋণদান করিয়া ও ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া এবং আরও নানাপ্রকারে ঐ সকল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতেছেন। ১লা জুন হইতে ২৪শে জুলাইয়ের মধ্যে পিপলস ব্যাঙ্কের তিয়েনসিন শাখা ২০,০০০ ব্যক্তিগত শিল্প এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৫০ কোটি য়ুয়ান ঋণদান করিয়াছেন। উত্তর-চীনের ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ উৎপন্ন করে এবং ছয় লক্ষ শ্রমিক ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করেন।

বর্ত্তমান বৎসরে উত্তর-চীনে ৪,০০০ কোটি য়ুয়ান মূল্যের উদ্বৃত্ত ধন উৎপাদন করার কথা ঠিক হয়। পরে আলাপ-আলোচনার ফলে পরিকল্পিত উদ্বৃত্ত ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ছয় হাজার কোটি য়ুয়ান করা হয়। উত্তর-চীনের কৃষি উৎপাদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খুব তীব্র প্রতি-

যোগিতা চলিতেছে। উত্তর-চীনের প্রায় শতকরা ৬০ জন কৃষক পরস্পর সাহায্যকারী দলে সংগঠিত হইয়াছেন এবং সেখানে ১৬০০ কৃষি-সমবায় স্থাপিত হইয়াছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, প্রায় ৫,৩৩,৩০০ হেক্টর বেশি জমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের মূল্যও কমিয়াছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় ৪,০০০ পণ্যদ্রব্যের শতকরা ৫ ভাগ মূল্যহ্রাসের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

চীন হইতে ভারতে খাদ্য আমদানী হওয়ার ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে একটা ধারণা হইয়াছে যে, চীন খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করিয়াছে। উপরোক্ত বিবরণী পাঠ করিলেও সেই ধারণাই দৃঢ়তর হয়। কিন্তু নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত "পিপল" পত্রিকায় প্রদত্ত তথ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। কম্যুনিষ্ট প্রচার-যন্ত্রের মহিমাই আমাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে। নিম্নোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে চীনে খাদ্যোৎপাদন কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীনে খাদ্যোৎপাদনের সূচক সংখ্যা :

বৎসর	শতকরা
১৯৩১-৩৭	১০০
১৯৪৬	৯১
১৯৪৭	৯২
১৯৪৮	৯৪
১৯৪৯	৮৯
১৯৫০	৮৭
১৯৫১	৯৩

খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পাওয়া ব্যতীত সেখানে মাথাপিছু গড়পড়তা খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণও কমিয়াছে, নিম্নের হিসাব তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ :

চীন (২২টি প্রদেশ)	খাদ্যশস্য কিলোগ্রাম	ক্যালোরী
১৯৩৪-৩৮	১৭১·৬	২২২৬
১৯৪৮-৪৯	১৬৫·১	২১৭২
১৯৪৯-৫০	১৫৩·০	২০২০

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চীন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করিতেছে। অনেকে ইহার কারণ খুঁজিয়া বিস্মিত হন। কারণ আর কিছুই নহে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিরোধী দলের অস্তিত্ব না থাকায় সেখানকার সরকার কৃষকদিগকে নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারী গুদামে শস্য চালান দিতে বাধ্য করিতে সক্ষম হয়। ফলে দেশের লোককে অর্দ্ধাহারে রাখিয়াও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করা চলে।

সোভিয়েট রাশিয়াতেও ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সনে খাদ্যোৎপাদন প্রায় একই ছিল—৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন, কিন্তু এই একই সময়ে সরকারী অংশ ৬৩ কোটি 'পুড' হইতে বাড়িয়া ২৩০ কোটি পুডে দাঁড়ায়—বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৭৫ ভাগ।

পশ্চিমবঙ্গে বয়স্কশিক্ষা

আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকরণের অন্তর্গত বয়স্কশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে নিয়োজিত বিভাগের একখানি ইংরেজী বিবরণ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে উক্ত বিভাগের ১৯৪৭-৫১ সনের কার্য্য-বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ নানা সমিতিও প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত বয়স্কশিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পদার্পণের সুযোগ করিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ বয়স্ক শিক্ষা সমিতির সম্পাদক বা পরিচালক সমিতির কোন সদস্যও চোখে তাহাদের কার্য্য দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। পূর্ব্বতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বা বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু বয়স্কশিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী কতগুলি প্রতিষ্ঠানে পদার্পণ করিয়াছেন তাহা জানি না। তাঁহাদের উপমন্ত্রীবৃন্দও এ বিষয়ে অধিক তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই যে "লাল ফিতার" রাজত্ব তাহা কবে যে দূর হইবে সেই প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর পাইব না বলিয়াই তাহা করিলাম না।

কার্য্যবিবরণীখানিতে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে উৎসাহিত হইবার কিছু নাই। অর্থাভাবের অজুহাতে প্রথমাবধি যে ভাবে গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে বঞ্চিত করিয়া কলিকাতার আপিসের ও জেলার আপিসের ঠাট বজায় রাখিতে প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তাহা অমার্জ্জনীয় অপব্যয়।

বৈগাছিতে স্কুল, হেষ্টিংস হাউসে স্কুল—এরূপ স্কুল উপেক্ষার নয়। কিন্তু এই স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া যদি তাঁহাদের ভাত-কাপড়ের সুব্যবস্থা না করা হয়, তবে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। দালান-কোঠায় মানুষ তৈয়ার হয় না, বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া বা বিদেশে প্রচার করিয়া বা শিক্ষার্থী পাঠাইয়া যে অর্থের অপব্যয় করা হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের জনমত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে।

১৯৪৭ সনের বয়স্কশিক্ষা কমিটির রিপোর্ট শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিন বৎসরের যে পাঠ্য বিষয় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ইংরেজী হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয় নাই। তাহা পাঠ করিলে বাঙালী গ্রামবাসী বুঝিতে পারিতেন যে, বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামে মধ্যযুগীয় মন লইয়া টিকিতে পারা যাইবে না। বয়স্ক-শিক্ষা তখনই সার্থক হইবে যখন গ্রামবাসী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া ও মানভূমের কোন কোন অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়ার প্রস্তাব

বিহারের পার্লামেণ্ট সদস্য শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ২৭শে আশ্বিন এক বিবৃতিযোগে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু

সমস্যা সমাধানে উক্ত রাজ্যকে সাহায্যের জন্য সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া, মানভূম প্রভৃতি জেলার কোন কোন অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হউক এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উত্তর প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের কয়েকটি জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

সিংহ মহাশয় বলেন, "নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা হউক, ইহা অত্যন্ত ন্যায়সম্মত কথা। পক্ষান্তরে, দেওরিয়া, বালিয়া, গাজীপুর এবং আজমগড় জেলার অধিবাসীদের ভাষা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে বিহারবাসীদের ভাষা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকায় উক্ত অঞ্চলগুলি বিহারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

"উত্তর প্রদেশের জেলার সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী। ইহা নেহাৎ কম নহে। উপরে বর্ণিত পন্থায় উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সীমা পুনর্নির্দ্ধারিত হইলে শাসন-ব্যবস্থায় তাহা কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না; বর্ত্তমান অসুবিধা বরং লাঘবই করিবে।

"পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, তাঁহার সহচরবৃন্দ এবং উত্তর প্রদেশের অধিবাসিগণ তাঁহাদের দয়া ও উদারচিত্ততার জন্য বিখ্যাত। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা সকলেই আমার প্রস্তাবটি দয়া-দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্য এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া দেখিবেন।"

এই প্রস্তাবে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উৎখাত হিন্দু নরনারীর সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হইবে এই বিশ্বাস আমাদের নাই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও বিহারের সিংহদ্বয়ও যতই মিশ্র অমিশ্র রাজনৈতিক হুঙ্কার করুন, তাহা ফলপ্রসূ হইবে না। উৎখাত সমস্যা যুগে যুগে নরনারীকে কষ্ট দিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহা হইয়া থাকে। জন্মের সময় মায়ের শরীর হইতে যে রক্ত মোক্ষণ হয়, তাহা কল্যাণপ্রদ।

ভারত-মার্কিন চুক্তিনামা

মে মাসের তিন তারিখ ও দশ তারিখের 'হরিজন'এ ভারত-মার্কিণ কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি সম্পর্কে শ্রীসুরেশরাম ভাইয়ের দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার জবাবে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলেন, "যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন। লেখক যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার এক একটি করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব না। কয়েক মাসের কাজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, চুক্তির ব্যবস্থা সন্তোষজনক। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহার যথার্থতা বুঝা যাইবে:

(১) ভারত-মার্কিন কারিগরী-সহযোগিতা চুক্তিপত্রে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এমন কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হন নাই যাহা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়ভুক্ত নয় অথবা সেই পরিকল্পনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। সর্ব্বক্ষেত্রেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাথমিক দাবি স্বীকার করা হইয়াছে।

(২) কোন কোন বিষয়ে এই কারিগরী-সহযোগিতার চুক্তি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে এমন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছে যাহা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হইত না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, (ক) নলকূপ সম্বন্ধে গৃহীত কার্য্যাবলী, (খ) সমুদ্র হইতে মৎস্য সংগ্রহ, (গ) সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তির আবশ্যক সাজসরঞ্জাম।

(৩) কৃষিকার্য্যের উপযোগী সার ও ইস্পাতাদি যে সকল দ্রব্য-সামগ্রীর এই দেশের বাজারে চাহিদা আছে তাহা আমদানির ব্যবস্থা করা। এই উপায়ে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহে সুবিধা হইবে।

(৪) কারিগরী-সহযোগিতা চুক্তিতে এমন কোন সর্ত্ত নাই যাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোন সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে ভারত বাধ্য থাকিবে। যে স্থান হইতে ক্রয় করিলে দাম কম পড়িবে ও দেশে আনিতে সুবিধা হইবে ভারত-সরকারের সেই দেশ হইতে নিজের কর্ম্মচারী মারফত আনিবার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিবে।

(৫) ভারত-সরকারের বিশেষ অনুরোধ ছাড়া কোনও মার্কিন বিশেষজ্ঞ অথবা কর্ম্মচারী এদেশে আসে না বা নিযুক্ত হয় না। সত্যকার প্রয়োজন না হইলে ভারত-সরকার কোন বিশেষজ্ঞের জন্য অনুরোধও জানান না। আমাদের দেশের লোকদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিকাশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করার নীতি গবর্ণমেণ্ট অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। যদি কর্ম্মের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় যে, কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশেষজ্ঞের কাজে অন্য দেশীয় বিশেষজ্ঞ সহায়ক হইতে পারে তবে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বিদেশীয় বিশেষজ্ঞকে আসিবার অনুরোধ জানান হয়। এই সকল বিশেষজ্ঞের ব্যাপারেও খরচের দিক হইতে শুধু স্থানীয় খরচ যোগাইতে হয়, বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ কারিগরী-সহযোগিতা-চুক্তি-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদান করা হয়।

(৬) চুক্তিনামার এক দফায় রহিয়াছে, কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারীবৃন্দ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারত-সরকারের পরামর্শ অনুযায়ীই এরূপ করা হইয়াছে, কারণ ইউরোপে যেমন স্বতন্ত্র কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি মিশন রহিয়াছে, সেরূপ স্বতন্ত্র মিশনের প্রয়োজনীয়তা ভারতে নাই বলিয়া ভারত-সরকারের ধারণা। তাহা ছাড়া যদিও চুক্তি অনুসারে ডিরেক্টর ও তাঁহার অধীনস্থ বিশেষজ্ঞগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন তথাপি তাঁহাদের যোগদান ভারত-সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ।

(৭) কারিগরী-সহযোগিতা-কার্য্যসূচীর সকল কাজই কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থাৎ পরিকল্পনা কমিশন ও তাহার সভাপতি প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে করা হয়। কোনও সিদ্ধান্তে আসা না-আসার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কেন্দ্রীয় কমিটির রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এবং কারিগরী-সহযোগিতা সংস্থানের ডিরেক্টরের মধ্যে মার্কিনী তহবিল খরচ সম্পর্কে আলোচনা হয়। তবে এই আলোচনা এই তহবিলের টাকা খরচের ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

(৮) কেন্দ্রীয় কমিটি ভারত-সরকারের নিকট ত্রৈমাসিক হিসাব দাখিল করিবার পূর্ব্বে ডিরেক্টরের সহিত পরিকল্পনার বিভিন্ন

বিভাগের হিসাব সম্বন্ধে পরামর্শ করিবে এইরূপ সর্ত্ত চুক্তিতে রহিয়াছে। এই প্রকার সর্ত্ত থাকিবার কারণ এই যে, আমেরিকার কংগ্রেস যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছে সেই টাকা কি কি কাজে কি পদ্ধতিতে খাটান হইতেছে তাহার বিবরণী কংগ্রেসের নিকট মার্কিন ব্যবস্থাপনা বিভাগকে দাখিল করিতে হয়। ডিরেক্টরের সহিত পরামর্শের সুবিধা এই যে, ভারত-সরকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল করা হয় সেই বিবরণীতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ থাকে যাহা মার্কিনী ব্যবস্থাপনা বিভাগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিকট পেশ করিতে হয়। এই সর্ত্ত রহিয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি উঠিতে পারে এরূপ আমি মনে করি না।

ইহার রাজনৈতিক দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করি না, কারণ প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন উপলক্ষে পরিষ্কার করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভারত-সরকার মনে করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিদেশী মূলধন প্রয়োগের প্রয়োজন রহিয়াছে, তবে ভারত-সরকারের সর্ব্বদা চেষ্টা রহিয়াছে যাহাতে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন না হয় এবং আবশ্যক হইলে এই সাহায্য ছাড়াও কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

(৯) আমার বিশ্বাস আপনার পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে এবং আপনি নিজেও হয়ত যে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহা আমার এই পত্র দূর করিতে সমর্থ হইবে।"

গান্ধীধাম

"কচ্ছ উপকূলের কাণ্ডলা বন্দরটি চারিদিকে এককালে ছিল উষর ভূখণ্ড। চার বছর আগে সেই উষর ভূমির উপর গড়ে উঠে এক নতুন শহর, আজ সে শহর সিন্ধু থেকে আগত ছিন্নমূল শত সহস্র বাস্তুহারার আশার কুসুমরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

"শহরটির নাম দেওয়া হয়েছে গান্ধীধাম। সিন্ধুর আশ্রয়হীন বাস্তুহারার দল নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও শ্রমে এটি নির্ম্মাণ করেছে।

"বার হাজার লোকের ঠাঁই হয়েছে এখানে। মধ্যবিত্ত পরিবারের উপযোগী করে ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে নানাধরণের বাড়ী করা হয়েছে মোট চার হাজারখানি; একটি জলসরবরাহ কারখানা, একটি বিদ্যুৎ কারখানা, স্কুল, হাসপাতাল, একটি সামবায়িক ব্যাঙ্ক, একটি ক্রীড়া-সঙ্ঘ, একটি গ্রন্থাগার, পাঁচ শত আসনবিশিষ্ট একটি রঙ্গালয় এবং শাকসব্জী-উৎপাদন, হাঁস, মুরগী প্রতিপালন ও দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

"এই উপনগরটিতে ভূগর্ভে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ হচ্ছে। নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। শাকসব্জী চাষের জন্য ইতিমধ্যেই নর্দ্দমার নিষ্কাশিত জল ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। শহরের মধ্যে ১৫ মাইল পাকা রাস্তা তৈয়ার করা হয়েছে, আর এই রাস্তার দুই পাশে ১১ হাজার চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে।

"১৯৪৭ সালের শেষের দিকে সিন্ধুর খ্যাতনামা সমাজসেবী ভাই প্রতাপ দয়াল দাস কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় সিন্ধী শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। সিন্ধীরা যাতে একই জায়গায় বাস করে নিজেদের অভ্যস্ত সাংস্কৃতিক জীবন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, তারই নিমিত্ত তিনি সিন্ধীদের জন্য একটি শহর গড়বার পরিকল্পনা করেন। মহাত্মা গান্ধী এবং সর্দ্দার প্যাটেল পরিকল্পনার কথা শুনে খুবই পছন্দ করলেন। গান্ধীজী কচ্ছের মহারাওকে অনুরোধ করলেন শহরটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করতে। ১৯৪৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী কচ্ছের মহারাও ১৫ হাজার একর ভূমিদান করেন।

"ভাই প্রতাপ আশা করেছেন এক দিন এই ক্ষুদে শহরটি করাচীর মত সিন্ধী ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠবে। ভাই প্রতাপের লক্ষ্য, সিন্ধী শরণার্থীদের এখানে এনে এমনভাবে সমবেত করা যাতে তারা শুধু আশ্রয়ই পাবে না, জীবিকারও সংস্থান করতে পারবে। তাঁর এই লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ সফল করবার জন্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি সিন্ধী পুনর্বাসন করপোরেশনের অবৈতনিক ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই করপোরেশনটিই গান্ধীধামের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করছে।

"দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে করপোরেশনটি গঠিত হয়। এক হাজার টাকার ২৫ হাজার শেয়ারে এই মূলধন বিভক্ত হয়। কুড়ি হাজার শেয়ারের বিলিকৃত মূলধনের শতকরা পঁচিশ ভাগ ক্রয় করেন ভারত-সরকার। কোনও ব্যক্তিকেই পঁচিশটির বেশী শেয়ার কিনতে দেওয়া হয় নি, স্থির হয়েছে লভ্যাংশও শতকরা ছয় ভাগের বেশী কাউকে দেওয়া হবে না। করপোরেশনের ডিরেক্টর—কতিপয় বিশিষ্ট সিন্ধী ও কচ্ছনিবাসী কোনও বেতন গ্রহণ করেন না।

"শহরটিতে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের সাজসরঞ্জাম উৎপাদনকল্পে কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিনশ লোক সেই কারখানায় কাজ করছে। একটি কংক্রিট ব্লক নির্ম্মাণ কারখানায় দৈনিক এক হাজার করে ৮″×৮″×১৬″ ব্লক তৈরি হয়েছে। ছয়খানি গৃহের পক্ষে এই ব্লকগুলি যথেষ্ট। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এই নির্ম্মাণ কাজ চলছে। এ ছাড়া একটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ ও একটি অটো-ওয়ার্কশপও এখানে আছে। গান্ধীধামের বিজলী কারখানায় ১,০৫০ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

"এ সমস্তই সিন্ধু পুনর্বাসন করপোরেশনের সম্পত্তি। কর্পো-রেশনের বেতনের তালিকায় এক হাজার ব্যক্তির নাম আছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ারও আছেন।

"আট শত একর জমির উপর চার হাজার গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়েছে। ভারত-সরকার এক কোটি দশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন এর জন্য। বার শত থেকে ১৫ শত টাকার মধ্যে এক থেকে তিনখানা শয়নঘর এবং রান্নাঘর ও একটু উঠান সহ প্রতিখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়েছে। শরণার্থীদের কাছে বাড়ীগুলি বিক্রয় করা হয়েছে।

প্রত্যেক ক্রেতাকে বাড়ীর প্রকৃত মূল্যের শতকরা দশ ভাগ প্রথমে দিতে হয়েছে। বাকী টাকা সমান কিস্তীতে ছয় মাস অন্তর ২০ বছরে পরিশোধ করতে হবে। নতুন বাড়ী নির্মাণ করবার জন্যে জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। শরণার্থীদের মধ্যে যারা কিনছে তাদের আড়াই হাজার টাকা ধার দেওয়া হচ্ছে। সমান কিস্তীতে ২০ বছরে এই টাকা পরিশোধ করতে হবে।

"আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গান্ধীধামের লোকসংখ্যা বাড়ে বেড়ে যাবে বলে অনুমান করা যায়। বোম্বাই বন্দরে উক্ত এলাকার ভিড় কমাবার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার পশ্চিম উপকূলের কাণ্ডলা বন্দরকে আরও সম্প্রসারিত করে একটি প্রধান বন্দরে পরিণত করবার পরিকল্পনা করেছেন। একটি ১৩ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়েছে ও প্রাথমিক কাজের জন্য চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হবে। ছয় মাস আগে পুরান কাণ্ডলা বন্দর থেকে আড়াই মাইল দূরে প্রধান মন্ত্রী নেহরুই নূতন বন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

"গান্ধীধামকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে রেলপথ মারফৎ সংযুক্ত করার ব্যবস্থাও হয়েছে। ডিশা থেকে কাণ্ডলা পর্য্যন্ত ১৭৭ মাইল লম্বা মিটারগেজ রেলপথ বসান হয়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এই রেলপথে ট্রেন চলাচল সুরু হয়েছে।

"কচ্ছের এই অংশটিতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত মাত্র ১৩ ইঞ্চির মত। ফলে যে অঞ্চলে গান্ধীধাম গড়ে উঠেছে সেখানকার ভূমি অত্যন্ত ঊষর। গান্ধীধামে জল সরবরাহের যে সুচারু ব্যবস্থা হয়েছে তার ফলে কচ্ছে সামগ্রিক ভাবে জলসরবরাহ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে।

"এই পরিকল্পনার মূলনীতি হ'ল শহরটিকে কয়েকটি আত্মনির্ভরশীল জেলায় ভাগ করা। প্রত্যেকটি জেলা আবার কয়েকটি প্রতিবেশী এলাকায় বিভক্ত হবে। প্রত্যেক প্রতিবেশী এলাকায় দশ হাজার করে লোক বাস করবে। প্রত্যেক এলাকায় নিজেদের স্কুল, ঔষধালয় ও মন্দির প্রভৃতি থাকবে। এরূপ গোটাছয়েক এলাকা নিয়ে যে জেলা গঠিত হবে তাতে বাজার, দোকানপাট, সিনেমা, হাসপাতাল প্রভৃতি থাকবে।

"গান্ধীধামে প্রত্যেকটি শরণার্থীর বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির দিকে যে ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ গড়ে তুলবার দিকেও অনুরূপ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ছুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আট শত ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষালাভ করছে। পৃথক কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছে। ওভারশিয়ার, ফিটার, অয়ারম্যান ও মিস্ত্রী হিসাবে যুবকদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

উপরোক্ত বিবরণটি "আমেরিকান রিপোর্টার" নামক ইংরেজী-বাংলা দৈনিক পত্রিকার গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবরণের মধ্যে যে অংশে পনর শত টাকায় ২।৩ খানি ঘরসম্বলিত বিশিষ্ট বাড়ীর উল্লেখ আছে, তৎপ্রতি আমরা আমাদের পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই এবং যে ভাবে ঋণদান ও তাহা প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা অনুকরণীয়। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কিন্তু এই বিষয়ে অনুদারতা দেখাইতেছেন, ভুক্তভোগী মাত্রই তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

ভূদান-যজ্ঞ—আচার্য্য বিনোবার আবেদন

লোকসেবক প্রেস হইতে প্রকাশিত এই আবেদন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি তেলঙ্গানায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। সেখানে তখন যে কঠিন সমস্যা বিদ্যমান ছিল উহার সম্পর্কে আমি অনুক্ষণ চিন্তা করিতেছিলাম। এক দিন হরিজনেরা আমার নিকট জমি চাহিল, আর আমি গ্রামবাসীদের কাছে তাহাদের জন্য জমি চাহিলাম। গ্রামবাসিগণ আমার কথা মানিয়া লইয়া জমি দান করেন। উহাই আমার প্রথম ভূমিদানপ্রাপ্তি। ঐ দিন ১৮ই এপ্রিল ছিল। অতঃপর ভূদান-যজ্ঞের কল্পনা আমার মনে উদয় হয় এবং তেলঙ্গানায় ভ্রমণে আমি উহার প্রয়োগ করি। উহার ফল ভাল হইল। দুই মাসে বার হাজার একর জমি পাওয়া গেল। আমার বিশ্বাস ওখানকার পরিস্থিতি শান্ত করিবার পক্ষে উহা বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। সারা দেশের উপর উহার প্রভাব পড়িল। আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তেলঙ্গানার আবহাওয়া বহুল পরিমাণে শান্ত হইয়াছে।

"গান্ধীজীর তিরোধানের পর অহিংসার প্রবেশের পথ আমি খুঁজিতেছিলাম। এই উদ্দেশ্যেই মেওরাতে মুসলমানদিগের পুনর্ব্বাসনের কাজ আমি হাতে লইয়াছিলাম। উহা হইতে আমার কিছু অনুভূতি আসে। উক্ত বনিয়াদের বলে আমি তেলঙ্গানা যাইতে সাহসী হই। সেখানে ভূদান-যজ্ঞ রূপে আমি অহিংসার সাক্ষাৎকার লাভ করি।

"তেলঙ্গানাতে আমি যে ভূমিদান পাইয়াছিলাম, উহার এক পৃষ্ঠভূমিকা ছিল। উক্ত পৃষ্ঠভূমির অবিদ্যমানে ভারতের অন্যান্য অংশে এই পরিকল্পনা চলিতে পারে কিনা, এই সম্পর্কে আশঙ্কা করিবার অবকাশ ছিল। উক্ত শঙ্কা নিরসনকল্পে অন্য প্রদেশে ভূদান-যজ্ঞের পরীক্ষা করার আবশ্যকতা ছিল। প্ল্যানিং কমিশনের সমীপে আমার মতামত উপস্থাপিত করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু আমাকে আমন্ত্রণ করেন। সেই উদ্দেশ্যে আমি পদব্রজে যাত্রা করি এবং দিল্লী পৌঁছন পর্য্যন্ত দুই মাসে আমি প্রায় আঠার হাজার একর ভূমিদান প্রাপ্ত হই। আমি দেখিতে পাই যে, অহিংসার পথ আশ্রয় করার জন্য জনতা উৎসুক হইয়া আছে।

উত্তর প্রদেশের সর্ব্বোদয়-প্রেমিক কর্ম্মিবৃন্দের আবেদনক্রমে আমি উত্তর প্রদেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে ভূদান-যজ্ঞের সূত্রপাত করি। উত্তর প্রদেশে এক লক্ষের উপর গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামে কমপক্ষে একটি করিয়া সর্ব্বোদয় পরিবার বসান হইবে এবং ঐরূপ এক পরিবারকে

কমবেশী পাঁচ একর করিয়া জমি দেওয়া হইবে, এই হিসাব অনুসারে পাঁচ লক্ষ একর জমিদান পাইবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। তিন মাসকাল বহু কর্মী নির্বাচন ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের নিকট হইতে বেশ সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। আমরা এ যাবৎ এক লক্ষ একর জমি পাইয়াছি। আমি তো ইহাতে ঈশ্বরের ইঙ্গিত দেখিতেছি। আমার অনেক সহকর্মীও তাহাই মনে করেন। ইহার ফলে সেবাপুরী সর্ব্বোদয় সম্মেলনে সমবেত ব্যক্তিরা আগামী দুই বৎসরের মধ্যে সারা ভারতে কমপক্ষে পঁচিশ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। আপনারা সে কথা ইতিমধ্যে অবগত হইয়াছেন। পঁচিশ লাখ একর ভূমির দ্বারা ভারতের ভূমিহীনদের সমস্যা সমাধান হইয়া যাইবে এরূপ নহে। তাহার জন্য কমপক্ষে পাঁচ কোটি একর ভূমি প্রয়োজন। কিন্তু যদি প্রথম কিস্তি-স্বরূপে আমরা পঁচিশ লক্ষ একর জমি পাইয়া যাই এবং ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামে অহিংসার বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে ভূমির ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থার অনুকূলে আবশ্যক আবহাওয়া সৃষ্ট হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

"বড় বড় কৃষক এবং জমিদারগণের নিকট হইতে ত আমি জমি চাহিয়া থাকি কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষককেও এই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করি। উদারহৃদয় এই সব ছোট ছোট চাষী শ্রদ্ধার সহিত সাড়া দিয়াছে—ইহা আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি। এই যজ্ঞে কতিপয় শবরী আপন আপন 'কুল' দান করিয়াছেন এবং কতিপয় সুদামা নিজেদের 'তণ্ডুল' দান করিয়াছেন। ইহা আমার নিকট চিরস্মরণীয় ভক্ত-গাথা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে দরিদ্রগণের মধ্যে আত্মোন্নতির প্রেরণা জাগিয়াছে এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা আত্মশুদ্ধি ও স্বামিত্ব-বিসর্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছে।

"সর্ব্বশ্রেণীর লোকে আমাকে ভূমিদান করিয়াছেন। হিন্দুরা দিয়াছেন, মুসলমান ভাইরা দিয়াছেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও দিয়াছেন। যাঁহারা সব দিক হইতে 'সর্ব্বহারা' বলিয়া গণ্য, সেই হরিজনগণও দিয়াছেন। যাহাদের জমিতে কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না—সেই স্ত্রীলোকগণও দিয়াছেন। দাতাগণের মধ্যে সকল স্তরের ও পর্য্যায়ের লোক আছেন। দরিদ্র নারায়ণকে নিজ পরিবারের অন্যতম অংশীদার মনে করিয়া কর্ত্তব্যবোধে ভূমিদান করা হউক—আমি এইরূপ আবেদন করিয়া থাকি এবং সেই মনোভাব হইতে লোকে ভূমিদান করিয়া থাকে।

"ভূমিদান-যজ্ঞে 'দান' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—উহা পরিত্যাগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ শঙ্করাচার্য্য 'দান' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দানম্ সংবিভাগঃ" অর্থাৎ সম্যক্ বিভাজন (সঙ্গত বণ্টন)। এই অর্থেই আমি 'দান' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমি যে পাইবে, এমনি উহা সে ভোগ করিতে পাইবে না। জমিতে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে, নিজের ঘাম ফেলিতে হইবে—তবেই তাহা সে ভোগ করিতে পাইবে। এইজন্য তাহাকে দীন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহার নিজের স্বত্ব আমরা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।

"আমরা সবিনয়ে প্রেমের সহিত এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাচ্ঞা করিতেছি। আমাদের তিনটি সূত্র আছে:

১। আমাদের কথা উপলব্ধি করিয়াও যদি কেহ ভূমি না দেন তবে আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই, কারণ আমরা মনে করি আজ যিনি দিতেছেন না কাল তিনি দিবেন। 'বিচার-বীজ' অঙ্কুরিত না হইয়া যায় না।

২। আমাদের কথা বুঝিয়া যদি কেহ ভূমি দেন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়—কারণ তাহার ফলে সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩। আমাদের কথা না বুঝিয়া কোনরূপ চাপে পড়িয়া যদি কেহ দেন তাহাতে আমাদের দুঃখ হইবে, কারণ যে-কোন উপায়ে জমি সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু আমাদিগকে সর্ব্বোদয়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে।

"আমার মনে হয়, একটি এমন কার্য্যক্রম যেখানে সব দলের লোকে একই ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। লোকে কংগ্রেসের শুদ্ধি সাধনের কথা বলিতেছে। শুদ্ধি সকল সংস্থার পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু শুদ্ধি সম্পর্কে কংগ্রেসের নাম শুনা যায় এইজন্য যে, কংগ্রেস এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। আমার এই বিশ্বাস যে, কংগ্রেস ও অন্যান্য সংস্থা যদি এই কার্য্যক্রম গ্রহণ করে এবং সত্য ও অহিংসার নীতিতে উহা পরিচালনা করে তাহা হইলে সকলেরই শুদ্ধি হইবে—সকলেরই শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং সকলের মধ্যে একতা আসিবে।

"আমি ইহা জানি যে, সারা ভারতের সামনে কোন কার্য্যক্রম রাখিবার অধিকার আমার নাই। আমি জনগণের প্রতি নির্দেশদানের অধিকারী নেতা নহি। গ্রামবাসীর সেবাকে নিজ পরমার্থ-সাধন মনে করে—আমি এরূপ একজন ভক্তিমার্গী মনুষ্য। আজ গান্ধীজী যদি থাকিতেন তাহা হইলে আমাকে আপনাদের সম্মুখে আসিতে হইত না, পক্ষান্তরে গ্রামের ঝাড়ুদারের কাজে এবং ঐ কাঞ্চন-মুক্ত কৃষিকার্য্যে আমাকে আপনারা নিযুক্ত দেখিতে পাইতেন। কিন্তু অবস্থাবশে আমাকে বাহিরে আসিতে হইয়াছে, এবং এক মহান্ যজ্ঞের পৌরোহিত্য করার ধৃষ্টতা দেখাইতে হইয়াছে। ধৃষ্টতা হউক বা নম্রতা হউক, তাহা পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া আমি সকল ভাই-বোনের সহযোগ ভিক্ষা করিতেছি।"

অধিক খাদ্য ফলাও

"আমি এক জন সাধারণ চাষীর ছেলে এবং গত দশ বৎসর যাবৎ আধুনিক প্রথায় চাষবাস করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ না করিলে ফসল করিবার কোন আশা করা যায় না। আমাদের দেশের চাষীগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ধারায় চাষবাস করিতেন তাহার পরিবর্ত্তন করিতে বড় ইচ্ছুক নন, অবশ্য আজকাল কেহ কেহ রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন, আবার উহার অপপ্রয়োগে অনেকে ক্ষতিগ্রস্তও হন। অবশ্য বর্ত্তমান বাজারে শস্যের দরের তুলনায়

রাসায়নিক সারের দাম এত বেশী যে, চাষী তার সমস্ত ফসলে উক্ত সার ব্যবহার করা লাভজনক মনে করে না বা হয়ও না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি হইতে বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক ফসল পাইতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন :

১। শস্য পর্য্যায় :—অর্থাৎ একই জমিতে কোন ফসলের পর কোন ফসল করা উচিত।

২। জমির ক্ষয় নিবারণ ও উর্ব্বরা শক্তি রক্ষণের সুব্যবস্থা।

৩। শস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জল সেচন সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

৪। কীট পতঙ্গ প্রভৃতি হইতে শস্যের রক্ষার ব্যবস্থা।

আমাদের চাষীগণকে হাতে কলমে এই সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পারদর্শী গ্রাম্য কর্ম্মীর প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সরকারী কৃষি বিভাগে যাঁহারা ভীড় জমাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও নাই। আমার এই উক্তি যে কতটা বাস্তব তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই বৎসর খরিপ ফসলের মধ্যে বিশেষতঃ ধানের রোগ ব্যাপক ভাবে দেখা গিয়াছে, রোগের প্রাদুর্ভাব বাঁকুড়া অঞ্চলে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল, ক্ষতির পরিমাণ ফসল উঠিবার পূর্ব্বে বলা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলে চাষীগণ হতাশ হইয়া যিনি যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে, ইউনিয়ন কৃষি সহকারী মহোদয়রা প্রথমে ধানের গাছের উপরে Gammexane পাউডার ছড়াইতে নির্দ্দেশ দেন, তাহাতে যখন কোন ফল হইল না, তখন কোন কোন কর্ম্মী ধানের গোড়ায় উক্ত পাউডার দিতে বলেন, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশ্য Gammexane পাউডার সরকার কৃষি বিভাগ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। তার পর সরকারী বিশেষজ্ঞ বিভাগ ইউনিয়ন কৃষি সহকারী মহোদয়ের মারফৎ বলিয়া পাঠাইলেন কোন ব্যাধি নহে, ধান গাছের খাদ্যাভাব, চাষীরা যেন এমোনিয়া ও ফসফেট সার অবিলম্বে জমিতে দিবার ব্যবস্থা করেন। এতটা করিতে এক মাস অতিবাহিত হইল, তখন দেখা গেল এমোনিয়া পাওয়া যায় না। হায়রে হতভাগ্য চাষী, তাহার সমস্ত বৎসরের একমাত্র ফসল তাহাও অজ্ঞতার জন্য নষ্ট হইল। আমার বিশ্বাস প্রতি মহকুমায় যদি এক জনও উপযুক্ত কর্ম্মী থাকিতেন তবে ইহার প্রতিকার সাত হইতে দশ দিনের মধ্যেই হইতে পারিত।..."

—শ্রীমণি সিংহ, বাঁকুড়া।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং মাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াও অদম্য অধ্যবসায় এবং কার্য্যদক্ষতা বলে জীবনে যে এতখানি সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে ব্রজেন্দ্রবাবু মোগলযুগের কোন কোন দিক সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্য সুরু করেন। আর এই বিষয়ে তাঁহার ইংরেজী বাংলা পুস্তক প্রবন্ধও তখন প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সমুদয় সুধীসমাজের প্রশংসা লাভ করে। পরে, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু আপিসে কার্য্যারম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্যের গবেষণায়ও তৎপর হন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লইয়া তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা তাঁহার গবেষণার নিদর্শন। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া গত শতাব্দীর শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গেও ব্রজেন্দ্রনাথের গভীর পরিচয় ঘটে। ঐ সকল জীবনীগ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তকে ইহার ছাপ সুস্পষ্ট।

"সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (দুই খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথের আর একটি সাহিত্য-কীর্ত্তি। গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা ও বাঙালীর অবস্থা, নব্যশিক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত, আর ইহার দরুন বাঙালী সমাজ তখন যে নব রূপ ধারণ করিতেছিল, এ সকলের পরিচয় লাভ এই সঙ্কলন গ্রন্থখানি প্রকাশে সহজসাধ্য হইয়াছে। বাংলার সংবাদপত্র ও নাট্যশালার ইতিহাসও তিনি স্বতন্ত্র দুইখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন। বাংলার জাতীয় বা সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে এ তিনখানি গ্রন্থই অপরিহার্য্য। প্রধানতঃ এই প্রকার গবেষণা-পুস্তকের উপরে বাংলা-সরকার বর্ত্তমান বৎসরে ব্রজেন্দ্রবাবুকে রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উন্নতির জন্যও তাঁহার একনিষ্ঠ কর্ম্ম-তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পরিষদ গত তের-চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বাংলা-সাহিত্যের ক্লাসিক ভারতচন্দ্র, রামমোহন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি সাহিত্যরথী ও শ্রেষ্ঠ মনীষীদের রচনাবলী প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই সকল গ্রন্থ প্রকাশের মূলে ছিলেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি অন্যতর সম্পাদকরূপে এই সব পুস্তকের সুষ্ঠু সম্পাদনা ও শোভন সংস্করণ প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার বাংলা-সাহিত্য গবেষণার দরুন বাঙালী জাতির সম্মুখে নিজস্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের অর্গল খুলিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বাংলার সন্তান-সন্ততিগণ পূর্ব্ব-সূরীদের কীর্ত্তিগাথা জানিয়া আবার আত্মস্থ হইতে পারিবে। ব্রজেন্দ্রবাবু আমরণ আমাদের সহকর্ম্মী ছিলেন। প্রথমে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিলেও, ১৯৩৫ সনের শেষ ভাগ হইতে পূর্ব্ব-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি-ক্রমে প্রধানতঃ প্রবাসীর কার্য্যেই তিনি রত হন। এ সময় হইতে গবেষণা কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ সুবিধা হয়। এখানে কর্ম্মকালের শেষ প্রায় আট-নয় বৎসর শারীরিক ও পারিবারিক কারণে প্রবাসীর কার্য্য করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না, যদিও এ বিষয়ে আন্তরিকতা ও উৎসাহের অভাব তাঁহার কখনও হয় নাই। তাঁহার বিয়োগে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

শাহজাদা দারাশুকো

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

সপ্তম অধ্যায়—গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সম্রাট্ শাহজাহান দিল্লীর শাহীমহলে রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন। সাত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, দারা ও জাহানারা পিতার শুশ্রূষা করিতেছিলেন; দারার বিশ্বস্ত কয়েকজন আমীর ব্যতীত কাহারও সম্রাটকে দেখিবার অনুমতি ছিল না। ইহার ফলে ভিতরে বাহিরে লোকের মনে ধারণা হইল সম্রাট স্বর্গবাসী হইয়াছেন, সংবাদ চাপা দিয়া ভিতরে কিছু একটা কাণ্ড চলিয়াছে। অন্দরমহলে রোশেনারা বেগম এবং মোরাদের পক্ষে সর্ব্বকনিষ্ঠা গোহরারা পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব মনোনীত ভাবী দিল্লীশ্বরের নিকট গুপ্ত সংবাদ সরবরাহ করিতেন এবং পিতার নাভিশ্বাসের অপেক্ষায় ছিলেন; তাঁহারা এই সুযোগ ছাড়িবেন কেন? দরবারে শহরে দারার শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরের বেড়জাল; সত্যের অপেক্ষায় কালক্ষেপ না করিয়া দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত মিথ্যা গুজবের ফোয়ারা জুম্মামসজিদ-ফতেপুরী ভাসাইয়া রাজমহল দৌলতাবাদ ও আহমদনগরের দিকে ছুটিয়াছে। দর্শন-ঝরোকায় সূর্য্যোদয়ে যথারীতি সম্রাটের মুখ না দেখিয়া ভাল মানুষের মনেও সন্দেহ হইল তিনি জীবিত নাই। আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেল জনমতকে শান্ত করিবার জন্য সাত দিন পরে শয্যাশায়ী সম্রাট নীচে যমুনা-সৈকতে দর্শনার্থী প্রজাগণের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন; তবুও লোকে বলাবলি করিতে লাগিল ঐ মূর্ত্তি আর কেহ, শাহানশাহ নহেন। অন্দর মহল হইতেই "সঠিক খবর" বাহির হইল, সম্রাট শাহজাহান পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছেন, শাহজাদা দারা নিজের মতলবে অন্তঃপুরের একটি সুশ্রী বৃদ্ধ খোজা নপুংসককে শাহজাহান সাজাইয়া ধাপ্পাবাজী খেলিতেছেন। এই কাণাঘুষা দারা ও সম্রাটের কানে পৌঁছিল।

অসুস্থ শরীর লইয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর সম্রাট প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইয়া শুশ্রূষার পুরস্কার-স্বরূপ শাহজাদা দারার মন্‌সব বাড়াইয়া পঞ্চাশ হাজারী করিলেন এবং তাঁহাকে আড়াই লক্ষ টাকা ইনাম দিলেন। ইহার পরে সম্রাট উচ্চপদস্থ আমীর-মনসবদারগণকে তাঁহাদের সম্মুখে অহিয়ৎ-নামা সম্পাদন করিলেন এবং আদেশ দিলেন, আজ হইতে সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বসময়ে এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, শাহজাদা দারার হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে। প্রায় এক মাস পরে সম্রাট স্বাস্থ্যলাভের আশায় দিল্লী হইতে আগ্রা চলিয়া আসিলেন এবং সমস্ত সুবায় তাঁহার আরোগ্য-সংবাদ প্রেরিত হইল; কিন্তু তবুও আগ্রার বাহিরে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা—আসল বাদশাহ মারা গিয়াছেন, বাদশাহী এখন বে-ওয়ারিশ। ইহার ফলে প্রজারা খরীফ [বর্ষার ফসল] কিস্তির খাজানা বন্ধ করিল, ফৌজদার আমীন আমলা দিশাহারা হইয়া পড়িল; শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু রহিল না। সে-কালে দিল্লী সিংহাসন হস্তান্তর হওয়ার প্রাক্কালে প্রায়ই এই রকম অর্দ্ধ অরাজকতা দেখা দিত।

আকবর বাদশাহের মৃত্যুর খবর সুদূর জৌনপুরে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল উহা হইতে আমরা শাহজাহানের মৃত্যুর মিথ্যা গুজবে রাজ্যের কি অবস্থা ঘটাইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে পারি—সমসাময়িক ইতিহাসেও ইহার ছায়া পড়িয়াছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দীকবি লিখিয়াছেন, [আকবরের মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছিতেই] শহরে সোরগোল উঠিল; চারিদিকে খলমল [উলংগল] পড়িয়া গেল। ঘরে ঘরে দরজা দরজায় কপাট, হাটে হাটুরিয়া নাই। ভাল ভাল কাপড়চোপড় গহনাগাঁটি সকলেই মাটির নীচে গাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। প্রত্যেক বাড়ীতে লোক-জন হাতিয়ার যোগাড় করিতেছে; পুরুষেরা মোটা কাপড়, স্ত্রীলোকেরা কম্বল কিংবা খেস্ জড়াইয়া মোটা পোশাক পরিয়া আছে। উচ্চ নীচ বর্ণ চিনিবার যো নাই; ধনী দরিদ্র এক সমান; এমন কি শহরে চুরিধারি পর্য্যন্ত নাই;—এমনই অপভয় লোকদের পাইয়া বসিল।*

ইংরেজ আমলে রাজা মরিলে ছেলেরাও খুশি—দুই দফা ছুটি; দুই কিস্তি মিঠাই। সেকালে আকবর বাদশাহের রামরাজ্যের যখন উক্ত অবস্থা—আসন্ন গৃহযুদ্ধের আতঙ্ক শাহজাহানের রাজত্বে নিশ্চয়ই চতুর্গুণ হইয়াছিল।

---

* জৌনপুরবাসী এক হিন্দী কবি আকবরের মৃত্যুসংবাদ শহরে পৌঁছিবামাত্র লোকের কি অবস্থা হইয়াছিল উহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়াছেন।

"ইসহি বীচ নগর মেঁ সোর। ভয়ে উদংগল চারিহু ওর।
ঘর ঘর দর দর দিয়ে কপাট। হটবাণী নহি বৈঠে হাট।
ভলে বস্ত্র অরু ভূষণ ভলে। তে সব গাড়ে ধরতী তলে।
ঘর ঘর সব বিসাহে সস্ত্র। লোগন পহিরে মোটে বস্ত্র।
ঠাঢ়ো কম্বল অথবা খেস। নারিন পহিরে মোটে বেস।
উঁচ নীচ কোউ ন পহিচান। ধনী দরিদ্র ভয়ে সমান।
চোরি ধারি দিখৈ কঁহু নাঁহি। যোঁহি হি অপভয় লোগ ডরাহিঁ

—শ্রীরামনরেশ ত্রিপাঠিকৃত কবিতা-কৌমুদী, পৃঃ ৪০

২

রোগশয্যা গ্রহণ করিবার পর প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত সম্রাট শাহজাহান দারার হাতেই যাবতীয় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, শাহজাদাকে পরামর্শ দেওয়া কিংবা তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার মত মানসিক স্বাস্থ্য তিনি তখনও লাভ করেন নাই; সুতরাং এই সময়ে দরবারে যাহা ঘটিয়াছিল উহার জন্য শাহজাদাই দায়ী। তাঁহাকে উচিত পরামর্শ দেওয়ার মত জাহানারা ব্যতীত আর কেহ ছিল না; থাকিলেও কিছু বলিবার ভরসা পাইতেন না। তাঁহার প্রথম ভুল, সম্রাটের অবস্থা গোপন রাখিবার জন্য অতিরিক্ত কড়াকড়ি ও সাবধানতা; প্রধান দোষ ছিল অপরের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি কোন কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিতেন না, করিবার শক্তিও ছিল না। ইহার ফলে ভিতরে বাহিরে মিথ্যা গুজব ও অনর্থ সৃষ্টি হইয়াছিল। ভগিনী রোশনারা-গোহরারা, মেসো জাফর-খলিলুল্লা এবং দরবারে নিযুক্ত আওরঙ্গজেব-শুজা-মোরাদের প্রতিনিধিগণকে যদি তিনি প্রথম অবস্থায় সচক্ষে পীড়িত সম্রাটকে দেখিবার সুযোগ দিতেন, তাহা হইলে ইঁহারা জ্যান্ত লোককে গুজবে মারিয়া ফেলিতে অন্ততঃ ইতস্ততঃ করিতেন; বুদ্ধি ও সৎসাহস থাকিলে অন্য কাজ ছাড়িয়া তিনি নিজের হাতে চিঠি লিখিয়া দুরন্ত ভ্রাতাদের আশ্বস্ত করিতেন, তাঁহার মনে পাপ ছিল না বলিয়াই লোকে তাঁহাকে নিষ্পাপ মনে করিবে এমন কোন কথা নাই।

দরবারে ভ্রাতাদের দূতগণকে দারা কয়েক মাস প্রায় নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ধোলপুরে এবং অন্যান্য স্থানে অনভিপ্রেত সংবাদ আটকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সত্য মিথ্যা সংবাদ কিন্তু চিরকাল মাটি চুয়াইয়া কিংবা আকাশে উড়িয়া সরকারী শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। ইহার ফল দাঁড়াইল, লোকে পরবর্ত্তী সত্য সংবাদ বিশ্বাস করিল না, শাহজাদাগণ পত্রগুমারা বাদশাহী ফরমান জাল বলিয়া উড়াইয়া দিলেন; কেননা দারার হস্তাক্ষর অবিকল শাহজাহানের হাতের লেখার মত ছিল, বাদশাহী গোপনীয় দারার হাতে।

শাহজাদাগণের মন তখন সত্যগ্রহণে বিমুখ, যেহেতু তাঁহারা তিন জন যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত, দারাকে প্রস্তুত হইবার সময় না দেওয়ার জন্য পরিকর। ভ্রাতারা দোষী; তাঁহারা দারার নিকট হইতে কিছুই প্রত্যাশা করিত না—এই কথা সত্য; তবুও তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হওয়া দারার পক্ষে অশোভন হইয়াছিল। যে দিন প্রকাশ্য দরবারে শাহজাহান রাজদণ্ড এক প্রকার দারার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, সে দিন হইতে রাজদণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া ভ্রাতাদের প্রতি পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে দারার মহান্ চরিত্র মহত্তর হইত, অনেক দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিত। সম্রাটের লিখিত চিঠিতে শুজার কাছে বাংলা-উড়িষ্যার পরিবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যের পাঁচ সুবা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব এবং মোরাদকে গুজরাট হইতে সরাইয়া আওরঙ্গজেবের বেরার-সুবায় বদলী ইত্যাদি দারার প্ররোচনায় লেখা হইয়াছিল মনে করা অসঙ্গত নয়; ইহা কিন্তু নিতান্ত কাঁচা চাল ও ছেলেমানুষী। শাহজাহান এক সময়ে সাম্রাজ্যের যে ভাগাভাগি করিয়াছিলেন ক্ষমতা ও সুযোগ হাতে পাইয়া দারা উহা করিলে প্রশংসার্হ হইতেন। ভ্রাতাদের স্ব স্ব সুবায় বহাল রাখিবার আশ্বাস, শুজাকে বিহার, মোরাদকে গুজরাটসহ সিন্ধু মুলতান ছাড়িয়া দিলে গৃহযুদ্ধ হয়ত বন্ধ হইত না; কিন্তু কিছু বিলম্ব হইত, দারার আত্মরক্ষার আয়োজন কেহ আক্রমণাত্মক বলিয়া মিথ্যা প্রচারের সুযোগ পাইত না।

যাহা হউক, নিয়তি নিজের গতি অনুসরণ করিল। ভ্রাতৃগণকে বিবাদ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টায় সম্রাট ও জাহানারা দুই জনেই অকৃতকার্য্য হইলেন। পুত্রগণ পিতার জন্য "ফাতেহা" পাঠ পূর্ব্বেই সমাপ্ত করিয়াছিল; সুতরাং বাঁচিয়া উঠিয়াও সম্রাট জীবন্মৃত, ভগিনী জাহানারা মিথ্যাবাদিনী।

৩

মোগল সাম্রাজ্যে তখন প্রলয়ের ঝড়ের পূর্ব্বে তমোময়ী প্রকৃতির অশুভ নিস্তব্ধতা। প্রজাদের দীর্ঘকালের বিষাদ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া মহামেঘের মত হিন্দুস্থানের বুকে নামিয়া আসিতেছে, সুদূর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিশার কোলে বিদ্রোহের যুগপৎ বিদ্যুৎচমক। সম্রাট শাহজাহানের করধৃত রাজদণ্ড জরা এবং শোকে কম্পমান, যৌবনের বজ্রমুষ্টি শিথিল, সতেজ চিন্তাধারার গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; উপস্থিত উভয় সঙ্কটে তাঁহার বুদ্ধি মলিনীভূত, নীতি অন্ধস্নেহ ও আত্মরক্ষার চিন্তার সংঘাতে দোদুল্যমান। অথচ বিপন্ন দিল্লী সিংহাসনের তিনিই অধীশ্বর, পুত্রগণ সকলেই মমতাজের মাতৃহারা সন্তান, শুক্তির স্নেহগর্ভে কর্কটাণ্ড জন্মগ্রহণ করিতে পারে না।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আগ্রায় সংবাদ পৌঁছিল শাহজাদা শুজা রাজমহলে সাড়ম্বরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সম্রাট আবুলফৌজ নাসির উদ্দীন মহম্মদ তৃতীয় তৈমুর, দ্বিতীয় সিকেন্দর শাহ শুজা গাজী উপাধি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং বাঙ্গলার রণতরী-বহর মুঙ্গের দুর্গে উপস্থিত, সুবা বিহার দারার

হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। গুজরাট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, শাহজাদা মোরাদ সম্রাটের প্রেরিত উপদেষ্টা নির্দ্দোষ আলী-নকীকে হত্যা করিয়া নিজকে সম্রাট ঘোষণা করিয়াছেন (৫ই ডিসেম্বর, ১৬৫৭), এবং সুরাট বন্দর অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সংবাদ দরবারে পৌঁছিবার পথ আওরঙ্গজেব দুই মাস পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নর্ম্মদা নদীর সমস্ত ঘাটে কড়া পাহারা। অসহিষ্ণু মোরাদকে তাড়াহুড়া না করিবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং নিজেও হাতের তাস ফেলেন নাই।

বিদ্রোহী ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে বাধা দিবার মত উপযুক্ত সৈন্যবল নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত বাদশাহী ফৌজের রাজপুত মনসবদারগণ এবং সেনানী মহাবত খাঁ হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; অন্যান্য মুসলমান মনসবদারগণকে আওরঙ্গজেব নিজের দলে ভিড়াইয়া লইয়াছিলেন। গুজরাট সুবা তখন "লস্কর-খেজ" বা যোদ্ধাবহুল দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, মোরাদ ঐখান হইতে বহু অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আওরঙ্গজেবের তোপখানা শাহী তোপখানা হইতেও অধিক শক্তিশালী ছিল। তিনি নানা দেশীয় ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ তোপখানায় ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব ও মোরাদ শুধু পিতৃদ্রোহী এবং ভ্রাতৃদ্বেষী নহেন; তাঁহারা মোগলের প্রবল শত্রু ইরাণের দ্বিতীয় শাহ-আব্বাসের হাতে হিন্দুস্থান তুলিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা শাহ-আব্বাসকে এই সুযোগে দারার অধীনস্থ কাবুল সুবা অধিকার করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহান বিশ্বস্ত সেনাপতি মহাবত খাঁকে কাবুল সুবার নায়েব সুবাদার হিসাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভার দিলেন; কিন্তু পুত্র তিন জনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সম্রাট তখনও আশা করিতেছিলেন, বাদশাহী ফরমান্ দ্বারা তিনি গোলমাল মিটাইয়া ফেলিতে পারিবেন; ইহার কিছু কারণও ছিল।

বিহার অধিকার করিয়া সুচতুর শাহ শুজা পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিলেন, অনেকদিন হইতে তিনি সুবা বিহার তাঁহার কাছে ইনাম চাহিতেছেন, "দাদাভাই" উক্ত সুবা ইনায়ৎ করিলে আর কিছু অভিযোগ থাকিবে না। সম্রাট গলিয়া জল হইয়া গেলেন; অগত্যা শাহজাদা দারা দুইটি সর্ত্তে শুজাকে বিহার সুবা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন; প্রথম সর্ত্ত মুঙ্গের দুর্গের নূতন রক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ শুজা কিংবা তাঁহার পুত্রপরিজন ঐ দুর্গে বাস করিতে পারিবে না। এই মর্ম্মে সম্রাটের আদেশ পাইয়া শুজা ভাবিলেন, দারা যুদ্ধে ভয় পাইয়াছেন; মুঙ্গের হইতে আর কিছু আগাইয়া বেনারস দখল করিতে পারিলে এলাহাবাদ অযোধ্যা "ফাউ" পাওয়া যাইতেও পারে। তিনি সময়ক্ষেপ করিবার জন্য সম্রাটের কাছে উত্তর লিখিতে বিলম্ব করিলেন। বিজাপুরের সহিত বুঝাপড়া এবং দাক্ষিণাত্যের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আওরঙ্গজেবেরও কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন ছিল। জাহানারার কাছে তিনি লিখিলেন, পিতা জীবিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছেন; কিন্তু শুনা যায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি শাহজাদা দারার হস্তে বন্দী, তাঁহার দুঃখকষ্টের সীমা নাই। সম্রাট মনে করিলেন ইহা সুলক্ষণ।

৪

দরবারে উপস্থিত সেনানীমণ্ডলের মধ্যে দারার মিত্র অপেক্ষা গুপ্ত শত্রুই ছিল বেশী। শাহজাহান তাঁহার শ্বশুর ইতিমাদ্-উদ্দৌলার প্রাসাদ এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির এক অংশ শাহজাদা দারাকে দিয়াছিলেন। এইজন্য রাজশ্যালক শায়েস্তা খাঁ প্রথম হইতে সম্রাট এবং তাঁহার প্রিয় পুত্রের উপর ইহার শোধ লইবার জন্য আওরঙ্গজেবের পক্ষ লইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটের সংযোগস্থল সুবা মালবা এই সময়ে মাতুল শায়েস্ত খাঁর হাতে নিরাপদ নহে মনে করিয়া, দারার অনুরোধে সম্রাট তাঁহাকে দরবারে তলব করিয়াছিলেন। শাহজাদা দারা মেসো খলিল উল্লা খাঁ এবং জাফর খাঁর কোন অনিষ্ট করেন নাই; কিন্তু শাহান্‌শাহের ভায়রাভাই হইয়াও তাঁহারা সুখী ছিলেন না। সম্রাটের শ্যালিকাদ্বয়ের শাহী মেজাজ, উহার উপর বাদশাহী আশকারা মসৃকারা*; সম্রাটের প্রতি সন্দেহ ও আক্রোশ অন্য কোন পথ না পাইয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের প্রতি হয়ত অহেতুকী ঈর্ষার খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বাদশাহী তোপখানা বিভাগের অধ্যক্ষ "মীর আতস" কাসিম খাঁ বকধার্ম্মিক দরবারী; তাঁহার ভয় ছিল শাহজাদা দারা বাদশাহ হইলে শাহজাদার তোপখানার মীর আতস অপদার্থ জাফর তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া যাইবে; এইজন্য তিনি আওরঙ্গজেবের জয় কামনা করিতেন। প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ রুস্তম খাঁ বাহাদুর দলাদলির মধ্যে ছিলেন না, ভালমন্দ সম্রাটের উপর ছাড়িয়া দিয়া হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। দারা

---

* মনুচী লিখিয়াছেন, লোকে কানাঘুসা করিত এবং বেয়াদব ফকীরেরা নাকি বলিত শ্যালিকাদের এক জন বাদশাহী "ছোট হাজিরী", অন্য জন দুপুরের "বড় নাস্তা"। সত্যমিথ্যা খোদাতালাই জানেন, "দুর্জ্জনের" হাত হইতে কাহারও রেহাই নাই।

তাঁহার সদ্‌গুণের শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন।

শাহজাদা আজীবন হিন্দুর উপকার ব্যতীত কোন অনিষ্ট করেন নাই, শাহীদরবারে আকবরের মৃত্যুর পর হইতে স্তিমিত রাজপুত গৌরব তাঁহারই সহৃদয়তা এবং পৃষ্ঠ-পোষকতায় শাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে শেষবারের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দারার প্রধান ভরসা ছিলেন সাম্রাজ্যের রাজপুত সামন্তগোষ্ঠী। রাঠোরকুল সম্রাট শাহজাহানের মাতুলবংশ, কচ্ছবাহগণ আকবরশাহী আমল হইতে শাহী পরিবারের সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ; ইঁহারাই ছিলেন দরবারে হিন্দুর মুখপাত্র। স্বাতন্ত্র্যাভিমানী শিশোদিয়া কোটা-বুন্দীর ভীমকর্ম্মা হাড়াবংশ, অমিতবিক্রম গোর রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন, রাঠোর-কচ্ছবাহ প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ। মহারাণা রাজসিংহ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া চিতোর দুর্গের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। এই অপরাধ এবং অন্যান্য ব্যাপারের জন্য সম্রাট শাহজাহান মেবাড়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ আওরঙ্গজেবের বন্ধু উজীর সাদুল্লা খাঁকে মহারাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৬৫৪ ইং)। যুদ্ধ করিয়া রাজ্য ও মানরক্ষার জন্য হঠকারিতাবশে মহারাণা চিতোর রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মোন্মাদনায় প্রতিহিংসা-পরায়ণ সাদুল্লা খাঁ ও মুজাহিদগণ (ধর্ম্মযোদ্ধা) আরাবল্লীর পাদদেশস্থ সমগ্র সমতলভূমি দখল করিয়া ছারখার করিল। সম্রাট স্বয়ং আজমীরে উপস্থিত হইলেন, মহারাণার সাহস টুটিয়া গেল। জয়সিংহের কাছে দারার লিখিত পত্রে মহা-রাণার জন্য দারার দুর্ভাবনা ও সহানুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তখন আলাহজরতের জেহাদী মেজাজ। অবশেষে মহারাণা সাদুল্লার শত্রু দারার শরণাপন্ন হইয়া বশ্যতা স্বীকারের অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। দারা অনেক কষ্টে সম্রাটের ক্রোধ শান্ত করিয়া সন্ধি স্থাপন করাইলেন; কিন্তু সাদুল্লা খাঁকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মহারাণার পুর মাণ্ডল প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা [বর্ত্তমান মুসলমান রিয়াসৎ জাওরা] বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন; সাদুল্লা গাজী হইয়া চিতোরকে পুনরায় ধ্বংস করিলেন। দারার পক্ষে ইহার ফল হইল বিপরীত। দারার প্রতি মহারাণার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তিনি উদয়করণ চৌহান এবং শঙ্করভট নামক দুইজন দূতকে গোপনীয় কূটনৈতিক প্রস্তাব লইয়া দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বন্ধুত্বের উপঢৌকন-স্বরূপ শাহজাদার নিকট হইতে তাঁহার অতি বিশ্বস্ত দূত ইন্দ্রভট এবং ফিদাই খোজা মারফত এক প্রস্ত খেলাত, একটা হাতী এবং একটি হীরকাঙ্গুরীয়ক পাইয়া ধন্য হইলেন ও সুদিনের (?) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে "হিন্দুকুল-সূর্য্য" মহারাণা রাজসিংহ হিন্দুজাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিলেন।

৫

মোগল সিংহাসনের দুই মহাসিংহ জয়সিংহ-যশোবন্তকে লইয়া এই সঙ্কটে সম্রাট এবং শাহজাদা দারা কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বয়সে এবং সামরিক অভিজ্ঞতায় মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহের সমান না হইলেও যশোবন্ত তাঁহার এক মাস পূর্ব্বেই ছয়হাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন এবং আরও কিছু আগে "রাজা" হইতে উন্নীত বংশানুক্রমিক "মহারাজা" উপাধি পাইয়াছেন। ইহাতে মীর্জ্জা রাজা নিজকে উপেক্ষিত এবং কচ্ছবাহ কুলকে অপমানিত মনে করিলেন, এবং বহু শতাব্দীর পুরাতন অথচ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অনির্ব্বাণ রাঠোর-কচ্ছবাহ বৈরাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল।

মারোয়াড়ের মরদ্ ["মারোয়াড়ী" নহে], বিকানীরের উট, জয়সলমীরের স্ত্রীলোকের রাজস্থানে জুড়ি নাই বলিয়া আজও প্রসিদ্ধি আছে। সেকালে জাঁদরেল চেহারা, বেপরোয়া হিম্মত ও হম-বড়া দেমাকে শাহী দরবারে পাঠান ব্যতীত রাঠোরের জুড়ি ছিল না। রাঠোরের নজরে যোধ-পুরের বাহিরে "মরদ" কোথায়? কচ্ছবাহ? তাঁহার তিন হাত দেহে সাড়ে তিন শত প্যাঁচ, তলোয়ারের ধারে চামড়া কাটে ত হাড় কাটে না! কচ্ছবাহের কাছে রাঠোর আর যাহাই হউক অন্ততঃ "ভদ্রলোক" নহে; বাজরার রুটি খায়, আদব-কায়দা মানে না; অকারণে ঝগড়া বাধাইয়া বসে; মাথায় গোঁ আছে, মগজ নাই; হুজুর "না" মুখে আনিতেই রাঠোর হামলা করিয়া বসে, কচ্ছবাহ "হাতরাস"* ঘুরিয়া যাইবার ইশারা বুঝিয়া থাকে।

শাহজাহানের দরবারে উক্ত দুই প্রতিস্পর্দ্ধী রাজপুত-সিংহের মনোভাব ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল না, সমান তালে পিঠ না চাপড়াইলে মালিকের বিপদ।

শাহজাহান যশোবন্তকে স্নেহ করিতেন, মীর্জ্জা রাজাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিতেন; দুই জনের উপরই তাঁহার সমান বিশ্বাস—তবে মীর্জ্জা রাজাকে বেশী কাজের লোক মনে করিতেন। যশোবন্তকে দূরে রাখিয়া আওরঙ্গজেব জয়সিংহকে তাঁহার পক্ষে টানিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু রাজপুত হইলেও মীর্জ্জা রাজা গভীর জলের মাছ, বুদ্ধি ও নীতি নৈপুণ্যে আওরঙ্গজেবের টক্কর লইবার মত পাকা খানদানী "মোগল"। চরিত্র হিসাবে দারা এবং আওরঙ্গজেব যাদৃশ বিপরীত, দারার প্রিয়তম বন্ধু মহারাজা যশোবন্ত এবং জয়সিংহের মধ্যেও হুবহু ঐরূপ বৈপরীত্য লোক-চক্ষুর অগোচর ছিল না। মীর্জ্জা রাজা দাক্ষিণাত্যে বলখ-বদকৃশানে কান্দাহারে আওরঙ্গজেবের

* এন-আর-রেল জংসন।

অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কান্দাহারের তৃতীয় অভিযানে যোদ্ধা,'লোকনায়ক এবং মানুষ হিসাবে শাহজাদা দারাকে যাচাই করিবার সুযোগও তিনি পাইয়াছিলেন; সুতরাং ঘোড়া সওয়ার চিনিয়া ফেলিয়াছিল। মীর্জ্জা রাজা মহারাজা যশোবন্ত নহেন, এক পা ফেলিয়া আর এক পায়ে সামনের মাটি হাতড়াইয়া দেখা তাঁহার চিরকালের অভ্যাস: আকবরশাহী আমলের প্রাণে মায়াহীন, স্বার্থে উদাসীন মজবুত "রাজপুত" তিনি নহেন; বন্ধুত্বের খাতিরে মিথ্যা অভিমানে ঔদার্য্যের প্রেরণায় বিপদ ডাকিয়া আনিয়া নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থকে বিপন্ন করিতে পারে নির্ব্বোধ-রাঠোর, কচ্ছবাহ নহে। মীর্জ্জা রাজা দরবারে কার্য্যহানি হইবার ভয়ে দারাকে বাহিরে খোশামোদ করিতেন, অথচ ভিতরে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের ভাব।

সম্রাট শাহজাহান আম্বের-যোধপুরের সহিত কোন পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ করেন নাই; এক ডোগরা রাজপুত রাজা-রাজুর এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যার সহিত আওরঙ্গজেবের বিবাহ দিয়াছিলেন। শাহজাদা দারা মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহের সহিত মিত্রতা ঘনিষ্ঠতর এবং রাঠোর ও কচ্ছবাহ উভয় কুল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নাগোরের পরলোকগত রাজা অমরসিংহের কন্যা এবং মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহের ভাগিনেয়ীর সহিত পুত্র সুলেমান শুকোর বিবাহ দিয়াছিলেন। পিতা কর্ত্তৃক যোধপুরের গদী হইতে বঞ্চিত অমরসিংহ ছিলেন যশোবন্তের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৬৫৩ হইতে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত পত্রাবলী হইতে জানা যায়, মীর্জ্জা রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন, এমন কি খোশামোদ পর্য্যন্ত করিয়াছেন; কিন্তু ফাটা বাঁশ ও ভাঙ্গা মন জোড়া লাগিবার নহে। মীর্জ্জা রাজা মালা জপ করিতেন, ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন; বোধ হয় এইজন্য তাঁহাকে "হিন্দু" মনে করিয়া শাহজাদা তাঁহার কাছে চিঠির শিরোনামায় "সচ্চিদানন্দ" লিখিতেন। হিন্দুত্বের নামে ভিজিবার মত মন যশোবন্তের ছিল, মীর্জ্জা রাজার নয়। তিনি হিন্দুর ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন বস্তুর কল্পনাও করিতে পারিতেন না; তাঁহার সঙ্কীর্ণ বাস্তবধর্ম্মী মন নিজের স্বার্থ ও আম্বেরের ভবিষ্যতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

হিন্দুর উপকার ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ধার করিতে বসিয়াই দারা গোঁড়া মুসলমান সমাজকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবকে "ইসলাম বিপন্ন" মিথ্যা চীৎকারে মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন; অথচ হিন্দুর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না।

৫

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অবস্থা চরমে উঠিল। মুঙ্গের হইতে শাহ-শুজা পূর্ব্বমুখী না হইয়া সুবা এলাহাবাদের সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন এবং শাহজাদা মোরাদ ও আওরঙ্গজেব মালবের দিকে সৈন্য চালনা করিতেছেন—এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট অবশেষে বিদ্রোহী পুত্রগণের বিরুদ্ধে সৈন্য-সজ্জার আদেশ দিলেন। শাহজাদা দারার সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত এবং বিশ্বস্ত যোদ্ধা লইয়া গঠিত বাইশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী শাহ-শুজার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইল। কুমার সুলেমান শুকো এই বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। সুলেমানের বয়স তখন বাইশ বৎসর, পূর্ব্বে কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন নাই; এই জন্য সম্রাট তাঁহার বিশ্বাসপাত্র প্রবীণ সেনানী সুচতুর মীর্জ্জা রাজাকে কুমার সুলেমানের "আতালিক" [উপদেষ্টা এবং অভিভাবক] নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধ চালনার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত করিলেন। রাজা মানসিংহের পরে কোন শাহজাদার "আতালিক" হওয়ার সম্মান কোন হিন্দুর ভাগ্যে ঘটে নাই। মহারাজা যশোবন্ত শায়েস্তা খাঁর স্থলে মালবের সুবাদার এবং শাহজাদা মোরাদকে বেরার সুবায় বদলী করিয়া মীর-আতস কাসিম খাঁকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। রাঠোর, শিশোদিয়া, হাড়া, গৌর প্রভৃতি রাজপুত মনসবদারগণের সেনা লইয়া গঠিত এক বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত হইলেন সিংহবিক্রম মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। মহারাজার সঙ্গে মীর আতিস কাসিম খাঁ বাদশাহী মুসলমান লইয়া মালবে যাইবার আদেশ পাইলেন। ডিসেম্বর মাসের (১৬৫৭ ইং) শেষ সপ্তাহে দরবার হইতে উভয় বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ বিদায় লইয়া বিদ্রোহী শাহাজাদাগণের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বিদায় দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত সম্রাটের মন দ্বিধাগ্রস্ত; সৈন্য প্রেরণ করিয়াও রক্তপাত নিবারণের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন, পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কাগ্রস্ত। আওরঙ্গজেব এবং মোরাদকে বলপ্রয়োগে নর্ম্মদার অপর তীরে রাখিবার ভার যশোবন্তের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি পুত্রদ্বয়ের জন্য দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলেন; তাঁহার ভয় ছিল অমর্ষপরায়ণ যশোবন্ত সুযোগ পাইলেই যুদ্ধ বাধাইবে, দারার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য পুত্রদ্বয়কে প্রাণে রেহাই দিবে না। এইজন্যই তিনি সিংহের লেজ টানিয়া ধরিবার জন্য বিশ্বাসঘাতক কাসিম খাঁকে সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, কাসিম খাঁ মহারাজার হুকুমের অধীন না হইলেও যশোবন্তের সঙ্গে মিলিতভাবে কার্য্য করিবেন, আক্রান্ত না হইলে কিংবা মালব সুবা হাতছাড়া হইবার উপক্রম না হইলে বাদশাহী ফৌজ প্রথম আক্রমণ করিবে না ইহাই ছিল সেনাপতিদ্বয়ের উপর সম্রাটের আদেশ।

শুজার বিরুদ্ধে প্রিয়তম পৌত্র সুলেমান শুকোকে

পাঠাইয়া সম্রাট অনুরূপ আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছিলেন। সুলেমান নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসুক এবং শুজা অক্ষত শরীরে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক ইহাই ছিল স্নেহাতুর বৃদ্ধ সম্রাটের আন্তরিক কামনা। ইহা চাপিয়া রাখিবার মত মানসিক স্বাস্থ্য সম্রাটের তখন ছিল না। এই উভয় সঙ্কট হইতে একমাত্র স্থিরবুদ্ধি ও যুদ্ধ-কৌশলপরায়ণ মীর্জ্জা রাজাই মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ হাসিল করিতে সক্ষম। এই বিবেচনায় তিনি কুমার সুলেমানের রাশ টানিয়া ধরিবার জন্য মীর্জ্জা রাজাকে সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, এবং প্রয়োজনীয় মৌখিক উপদেশ তাঁহাকেই দিয়াছিলেন। দারার কার্য্যোদ্ধারের জন্য তিনি চলিয়াছেন; কিন্তু দারার উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই। পাছে সম্রাটের নামে কোন আদেশ পাঠাইয়া শাহজাদা তাঁহাকে বিব্রত বিভ্রান্ত করেন এই আশঙ্কায় মীর্জ্জা রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম-সিংহকে দরবারের হালচালের উপর নজর রাখিয়া সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য আগ্রায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, বড় বড় যুদ্ধও করিয়াছিলেন। সুতরাং যোদ্ধা—বিদ্রোহী পুত্রের পিতার প্রতি মনোভাব তিনি হয়ত জানিতেন; তবুও এই দুর্ব্বলতা কেন? বড় বড় সেনাপতিকে তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য নয়, যেন লাঠি উঁচাইয়া সাপ তাড়াইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। লড়াইয়ের ময়দানে সাপের মাথা ও লাঠি দুইটার জন্য সমান দরদ নিতান্তই বুদ্ধিভ্রংশের লক্ষণ। দারা নিরুপায়, বাদশাহী ফৌজ জয়সিংহ-কাসিম খাঁর আনুগত্য তাঁহার প্রতি নয়, তাঁহার হুকুম সম্রাটের জীবদ্দশায় তামিল করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। যশোবন্তের উপর কাসিম খাঁ, তেজস্বী সুলেমানের উপর জয়সিংহ দুই জগদ্দল পাষাণ লইয়া সম্রাটের সৈন্যদল ডিসেম্বর মাসের (১৬৫৭ ইং) শেষ সপ্তাহে বিজয়োল্লাসে আগ্রা হইতে যাত্রা করিল।

৬

কুমার সুলেমান শুকো দারার পুত্র হইলেও বাইশ বৎসর বয়সে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মতৎপরতায় উদীয়মান শাহজাদা আওরঙ্গজেব। তাঁহার নিজের মনসবদারী ফৌজ এবং তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী জয়সিংহের অধীনে বাদশাহী ফৌজ অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অধিক শক্তিশালী ছিল। তিনি দ্রুত লম্বা লম্বা মঞ্জিলে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য অস্থির হইলেন, "সহসা ন বিদধীত ক্রিয়াম্" উপদেশে তাঁহাকে নিরস্ত করা জয়সিংহের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। মীর্জ্জা রাজা স্থির করিয়াছিলেন, সম্রাটের ইচ্ছানুরূপ তিনি শাহশুজাকে চালেই হঠাইবেন, অসতর্ক অবস্থায় বাদশাহী ফৌজের কোন অংশকে আক্রমণ করিবার অবকাশ শত্রুকে দেওয়া হইবে না। যমুনা পার হইয়া মীর্জ্জা রাজা এই ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া মামুলি কায়দামত কুচ করিতে লাগিলেন যেন শাহশুজা ইটাবা-ফতেপুর দখল করিয়া বসিয়া আছেন! এইরূপ অনর্থক বিলম্ব সুলেমানের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল, মীর্জ্জা রাজাও ফাঁপরে পড়িলেন। কুমার সুলেমান বাপের মত সকলকেই ভালমানুষ মনে করিতেন না; পিতামহের স্নেহাবিল দুর্ব্বল নীতিও তাঁহার মনঃপুত ছিল না; কিন্তু মীর্জ্জা রাজার সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি খুল্লতাত আওরঙ্গজেবের মতই সজাগ ছিলেন। এই অভিযানের সময় সুলেমান অগ্রগামী সেনাদল লইয়া কিঞ্চিৎ দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন, মীর্জ্জা রাজার অধীনে মূল বাহিনী পিছনে থাকিত; এইজন্য দুই জনেই পরস্পরের প্রতি পরোক্ষে দোষারোপ করিয়া দরবারে চিঠি লিখিয়াছিলেন। জয়পুর দরবারে রক্ষিত এই সমস্ত "আখবরাত" বা দৈনন্দিন সংবাদ-তালিকাভুক্ত চিঠির নকল পড়িলে বুঝা যায়, দারা ও সম্রাট যেন জয়সিংহের কাছে তটস্থ; তাঁহাদের নিশান ফরমানে হুকুম অপেক্ষা তোয়াজ অনেক বেশী—কিঞ্চিৎ তাড়াতাড়ি করিবার জন্য রাজার কাছে "অনুরোধ", কুমার সুলেমানকে রাজার উপদেশমত কার্য্য করিবার কড়া নির্দ্দেশ।

৭

শীতকাল, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। চুণার দুর্গকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তর বাহিনী গঙ্গা কাশী যাত্রা সমাপ্ত করিয়া নগরীর অদূরে যেখানে আবার পূর্ব্বগামিনী হইয়াছেন উহার বাঁকে কয়েক মাইল ভাটিতে সুবা বাংলার রণতরীবহর নদীবক্ষ অবরুদ্ধ করিয়া নঙ্গর ফেলিয়াছে; দক্ষিণ তীরে বালুকাভূমিতে গঙ্গার উচ্চ সুপ্রশস্ত পারের উপর বহুদূর ব্যাপী শিবিরশ্রেণী রণকোলাহলে মুখর; বাংলার হস্তি-অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী এইখানে ছাউনী ফেলিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বারাণসীর ঘাটে গঙ্গার বুকে নবনির্ম্মিত নৌসেতু; এই পুল পার হইয়া বাদশাহী ফৌজ বর্ত্তমান রেলপুলের পূর্ব্বমুখ হইতে আড়াই মাইল আন্দাজ উত্তর-পূর্ব্বে বাহাদুরপুরে ছাউনী ফেলিয়াছিল; শাহশুজা অল্পের জন্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বেনারসকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়দৌড়ের বাজীতে হারিয়া গেলেন। আগ্রা হইতে বেনারসের দূরত্ব সেকালের মাপেও প্রায় ৪০০ মাইল, এবং মুঙ্গের হইতে বেনারস অন্যূন ১৫০ মাইল। প্রায় একই সময়ে জানুয়ারির প্রথমে (১৬৫৮ ইং) বাদশাহী ফৌজ পশ্চিম হইতে এবং শুজার বাহিনী মুঙ্গের হইতে বেনারসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সাধারণতঃ দিনে গড়পড়তা ৫ মাইলের বেশী রাস্তা চলা কোন বড় ফৌজের পক্ষে সম্ভব ছিল না;

বোধ হয় মীর্জ্জা রাজার ফৌজও এই হারে চলিয়াছিল। কেবল পায়ে হাঁটিলে কিংবা ঘোড়া দৌড়াইলে যুদ্ধযাত্রা হয় না; বাইশ হাজার মোগল ফৌজের কুচ বরযাত্রীর হাঁটা কিংবা বিরাট মিছিল আগাইয়া যাওয়ার তুলনায় শম্বুক গতিই বটে। প্রত্যেক মনসবদারের দুই প্রস্থ তাঁবু ও সরঞ্জাম; ভোরবেলা একটি চলমান নগর গুটাইয়া সন্ধ্যাবেলা পূর্ব্বসজ্জিত আর একটি তাঁবুর শহরে রাত্রি যাপন—এই ব্যবস্থা না থাকিলে কুচ হয় না; মানুষের গরজ থাকিলে দৌড়াইতে পারে, কিন্তু কামানের গাড়ীর বলদ নিজের চাল ছাড়িবার নহে। শাহ শুজার সেনাবাহিনী গঙ্গার কূল ধরিয়া এবং তাঁহার নানা রকমের ছোটবড় জঙ্গী নৌকার বহর গুণ টানিয়া গঙ্গার উজানে কাশীর দিকে আসিতেছিল; এইজন্য তিনিও বাদশাহী ফৌজ অপেক্ষা দ্রুততর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সুতরাং মামুলি হিসাবে মুঙ্গের হইতে শাহশুজার ২৫ দিনে এবং মীর্জ্জা রাজার আগ্রা হইতে আশী দিনে বেনারস পৌঁছিবার কথা; কিন্তু সুলেমান শুকো চাচার হিসাব বানচাল করিয়া দিয়াছিলেন।

রাস্তায় কোন জায়গায় এবং কয় তারিখ কাশীর দিকে শাহশুজার সৈন্যচালনার সংবাদ বাদশাহী শিবিরে পৌঁছিয়াছিল জানা যায় না। শুজা বেনারস পৌঁছিতে পারিলে চুণার এবং এলাহাবাদ হাত ছাড়া হইবে, এই কথা জানিয়াও মীর্জ্জা রাজা বিচলিত হইলেন না, শাহী ফৌজের মন্থর গতি দ্রুততর হইল না; কিন্তু যাযাবর তাতার রক্ত মোগলের ধমনীতে তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। কুমার সুলেমান শুকো জয়সিংহের হিন্দুস্থানী চাল ছাড়িয়া আদিম জঙ্গীসর্থানী কায়দায় ঘোড়ার জিন ও নিজের পিঠে গাঁটরী কম্বল বাঁধা কয়েক হাজার অশ্বারোহী লইয়া ঝড়ের বেগে বেনারসের দিকে ছুটিলেন, এবং দশ দিন প্রায় একটানা ঘোড়া দৌড়াইয়া জানুয়ারী মাসের ১৯।২০ তারিখে শহরে প্রবেশ করিলেন, মানের দায়ে মীর্জ্জা রাজা পিছে পিছে হাঁকাইতে লাগিলেন। যাহারা পিছনে পড়িয়াছিল তাহাদিগের জন্য কাশীতে তিন দিন অপেক্ষা করিয়া ত্বরিতকর্ম্মা কুমার সুলেমান চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রশস্ত নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গার এই পারে থাকিয়া নৌ-বলে বলীয়ান খুল্লতাতকে বাধা দেওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সম্ভবতঃ ২৩শে জানুয়ারী (১৬৫৮ ইং) সুলেমান গঙ্গা পার হইয়া বাহাদুরপুরে ছাউনী ফেলিয়াছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী বাহাদুরপুরের কাছাকাছি পৌঁছিয়া শাহশুজা সংবাদ পাইলেন ভ্রাতুষ্পুত্র কাশী ও চুণারের পথ আগলাইয়া সেনা সন্নিবেশ করিয়াছেন; সুতরাং এই যাত্রা কাশীপ্রাপ্তির আশা ভঙ্গ হওয়ায় বাহাদুরপুরের ২।৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে উচ্চভূমির উপর শিবির সন্নিবেশ করিয়া আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৮

মীর্জ্জা রাজার ভাবগতিক দেখিয়া বাদশাহী ফৌজ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বাহাদুরপুরের শিবিরে কনৌজের ফৌজদার বিখ্যাত যোদ্ধা দেলের খাঁ রোহিলা কয়েক হাজার দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্য লইয়া কুমার সুলেমানের সাহায্যার্থ মিলিত হওয়ায় তাহারা জয়ের আশায় আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; জয়সিংহ কিন্তু একাধিক কারণে অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। দেলের খাঁর সহিত বয়সের কম পার্থক্য এবং পাঠানের সাহস ও সরলতার গুণে কুমার সুলেমান তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, মীর্জ্জা রাজার সহিত কুমারের মনের ব্যবধান আরও দূরতর হইয়া গেল। বাহাদুরপুরে যুদ্ধ অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল, কোন পক্ষের হাতেই যুদ্ধোদ্যম রহিল না। উভয় সেনার মধ্যে স্বল্প অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। শাহশুজার শিবির একটি সুরক্ষিত বন-দুর্গ; উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ঘিরিয়া বহুদূর দীর্ঘ এবং অন্যূন আড়াই মাইল প্রস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অনন্যপ্রবেশ্য অরণ্যভূমি। বর্ষায় গঙ্গার প্লাবনে পাড় ভাঙিয়া এই জঙ্গল জলে ভরিয়া যায়, কাঁটা বাবুলগুলির মাথা শুধু দেখা যায়। বাহাদুরপুর হইতে বর্ত্তমান আলীনগর ছাউনী এবং মোগলসরাই ছাড়াইয়া আরও পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণে এই অনূপ ভূমি এখনও অনাবাদী কাঁটা বাবুল ও ঝোপে ভরা জঙ্গল। শীতকালে টানের সময় জঙ্গলের মাটিতে মাঝে মাঝে বড় বড় ফাটল ১০।১২ হাত গভীর স্বাভাবিক পরিখা সৃষ্টি করিয়া থাকে। জঙ্গল কাটিয়া নালা খাদ সমান করিয়া তোপখানা ও অশ্বারোহীর চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা প্রস্তুত করিলেও শুজার বাহিনীকে নাগাল পাওয়া অসম্ভব; বাংলার নৌবহর অনায়াসে শুজার সৈন্যকে গঙ্গার অপর পারে সরাইয়া লইতে পারে। শুজার রসদের ভাবনাও নাই, নদীপথ সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত, বেনারস জেলা হইতে বাদশাহী ফৌজ রসদ সংগ্রহ বন্ধ করিলে গাজীপুর বালিয়া জেলা হইতে নৌকায় রসদ আসিয়া পড়িবে। সুতরাং শাহশুজাকে বেকায়দায় যুদ্ধে নামাইবার সাধ্য বাদশাহী ফৌজের নাই; লড়াই করা না করা অপর পক্ষের মর্জি। আপাততঃ জঙ্গল কাটা ছাড়া উপায় না দেখিয়া মীর্জ্জা রাজা গোকুল উবাইয়া নামক স্থানীয় এক ভোজপুরিয়া জমিদারকে বাদশাহী মনসবের লোভ দেখাইলেন, জমিদারের লোকজন জঙ্গল কাটিতে লাগিল; কিন্তু ইহা "বাইশ মন তেল" পোড়াইবার ব্যাপার।

বাহাদুরপুরে এই ভাবে সময়ক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া সম্রাট ও দারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দক্ষিণ হইতে সংবাদ আসিল যশোবন্ত নর্ম্মদাতীরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই

আওরঙ্গজেব সসৈন্যে নদী পার হইয়া শাহজাদা মোরাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিহার সুবা পাইয়াও শাহ-শুজা বেইমানী করিল দেখিয়া সম্রাট আগুন হইয়া ছিলেন। আগ্রার দরবার-ই-আমে তিনি কুমার রামসিংহকে বলিলেন, রাজার কাছে লিখিয়া দাও, ঐ "বেয়াদবের" মাথাটা আমি চাই। দারা এক চিঠিতে এই কথা মীর্জা রাজাকে জানাইয়া লিখিলেন—আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আপনি কুমার রাম-সিংহের নিকট লিখিতে পারেন। যুদ্ধ পরিচালনা লইয়া পূর্ব্ববৎ কুমার সুলেমান এবং রাজার অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ দরবারে পৌঁছিতেছিল। সেখান হইতে কুমার সুলেমান পাইলেন মৃদু তিরস্কার; রাজার উপর বর্ষিত হইল প্রশংসা ও খোশামোদের গোলাপ জল। এক চিঠিতে দারা লিখিলেন, শাহান্‌শার মুখে দৈববাণী হইয়াছে রাজা মানসিংহ যেমন অল্প সময়ে মীর্জা হাকিমকে দমন করিয়াছিলেন সেইরূপ মীর্জা রাজাও এই "বেয়াদব বদ্‌-বখ্‌ত"কে নাস্তনাবুদ করিবেন। উহার পরের দিন শাহজাদা আর এক চিঠি ডাক চৌকি মারফৎ ছাড়িয়া জানাইলেন—গত রাত্রিতে আমি সুফী-তরিকায় ধ্যানে বসিয়া জানিয়াছি এবং নজুমী কেতাবে পাইয়াছি একটা বড় রকমের জয়লাভ আপনার ভাগ্যে আছে; এই প্রকার গায়েবী ব্যাপার আল্লার হেদায়তে [নির্দ্দেশে] আমি সত্য বলিয়া দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। দারার অন্যান্য চিঠি পড়িয়া মনে হয়, এই সময়ে আলাহজরতের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল; আগ্রায় বসিয়া এক দিন বলিতেছেন রাজা হতভাগার [শুজার] মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়াছেন; পরের দিন বলিতেছেন কাটা মাথা দরবারে রওনা হইয়া গিয়াছে! দারা রাজাকে জানাইলেন, শাহানশাহ আদেশ করিয়াছেন যদি শত্রুকে স্থানচ্যুত করিবার কোন উপায় সম্বন্ধে আপনি মন স্থির না করিয়া থাকেন ঐখানকার অবস্থা বিশদ ভাবে লিখিবেন, দরবার হইতে শাহানশাহ একটা পরিকল্পনা পাঠাইয়া দিবেন। আর এক চিঠিতে মীর্জা রাজাকে জরুরী আদেশ প্রেরিত হইল—সামনে তোপখানা রাখিয়া যেন অবিলম্বে জঙ্গলবেষ্টিত আশ্রয়স্থানের উপর আক্রমণ করা হয়।

কচ্ছবাহপতি যুদ্ধ করিয়া চুল পাকাইয়াছেন। তিনি জানিতেন—বাংলার ফৌজ টিয়া পাখীর ঝাঁক নহে, ফাঁকা আওয়াজে পলাইবে না। মালা জপ করিলেও ধূর্ত্ততা এবং স্বার্থবুদ্ধিতে মীর্জা রাজা পাকা মোগল; তাঁহার এক চোখ সামনে শুজার উপর, অন্য চোখ মালবে যশোবন্ত আওরঙ্গজেবের উপর। কুমার সুলেমান বুঝিতে পারিলেন যুদ্ধের গরজ তাঁহার পিতার, মীর্জা রাজার নহে।

৯

শাহশুজা বাহাদুরপুরের নিকট গঙ্গাতীরে ২৫শে জানুয়ারী হইতে একুশ দিন নিজের সুরক্ষিত শিবিরে নিশ্চিন্ত মনে অভ্যস্ত আরামেই দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি বাংলা দেশ হইতে মশারি [পশাদান] লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার আমীরওমরাহ সিপাহী বরকন্দাজ কেহই বোধ হয় সফরে মশারি ফেলিয়া যায় নাই। মশারির ভিতর নাকি পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানীর দম আটকাইয়া যায়; কিন্তু মোটাকম্বলে নাক মুখ গুঁজিয়া থাকিলে শ্বাসকষ্ট হয় না। শাহশুজার ফৌজে মোগল পাঠান খোট্টা বাংলা মুলুকে সত্তর বৎসর মশার কামড় খাইলে বাহাদুরপুরে যুদ্ধ করিতে আসিতে হইত না। বাংলার মাটির গুণে পেশওয়ারী পাঠান, দুবে চোবে খোট্টা ভোজ-পুরিয়া সাত বৎসরেই মোলায়েম "বঙ্গালী" হইয়া যায়, সত্তর বৎসরে শুজার সিপাহী নিশ্চয়ই "বাঙ্গালী" হইয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালীর "মশার মশারি" কি বস্তু তাহারা বুঝিয়াছিল; বিলাসী ও দরদী শাহজাদার দৌলতে তাঁহার অনুযাত্রিবর্গের কাছে ঢাকা-রাজমহল এবং লড়াইয়ের ডেরার মধ্যে গঙ্গা-পারের কন্‌কনে শীত ছাড়া আর কোন তফাৎ মালুম হইবার কথা নয়। কয়েক দিন পরেই যুদ্ধের গরমে ঠাণ্ডা পড়িয়া গিয়াছিল, জঙ্গল কাটার আওয়াজ কানসহা হইয়া গেল। পাহারার ব্যবস্থায় শুজা কোন ত্রুটি করেন নাই; জঙ্গলের আড়ালে তাঁহার অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে সিপাহীগুলি শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিত, রাত জাগিয়া পাহারা দিত, যদিও কোন নৈশ আক্রমণ সম্ভব ছিল না। যে স্থানে এখনও দিনের বেলায় ছাগল ছাড়া কোন জন্তু পথ পায় না সেখানে রাত্রে মানুষ কি করিবে? শাহশুজা যুদ্ধ করিবার জন্য আদৌ ব্যস্ত ছিলেন না; সময় ও স্থান দুই তাঁহার অনুকূল। জঙ্গলের মধ্যে বাংলার পায়দল সিপাহী ও হাতী, জলে বিরাট রণতরী-বহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার শক্তি বাদশাহী ফৌজের ছিল না; সুতরাং জঙ্গল সাফ করিতে করিতে হয় বর্ষা নামিয়া আসিবে, না হয় আওরঙ্গজেব মোরাদকে ঠেকাইবার জন্য জয়সিংহের ডাক পড়িবে—এই জন্য কোন রকমে কালহরণ করাই ছিল শুজার উদ্দেশ্য; কিন্তু সময়ের সহিত না দৌড়াইয়া বিপক্ষের উপায় নাই।

বৃদ্ধ মীর্জা রাজার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার কায়দা কুমার সুলেমানের আদৌ মনঃপূত ছিল না, অথচ তাঁহার অমতে কিছু করিবার উপায় নাই। এত দিন সুলেমান নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন নাই। তিনি বিশ্বাসী গুপ্তচরসমূহ শাহ-শুজার শিবিরে নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহার অনুচর-গণকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে চোরা রাস্তা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে ঐ এলাকার এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

জঙ্গলে অসমসাহসিক চোরা হামলায় রোহিলা পাঠান মরদানের হিন্দুস্থানী সওয়ার অপেক্ষা বেশী ওস্তাদ; এবং দেলের খাঁ রাজা অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য;—এইজন্ম সুলেমানের যাহা কিছু পরামর্শ তাহা খুব সম্ভব দেলের খাঁর সঙ্গেই চলিত। সুলেমানের গুপ্তচর সংবাদ আনিল দিন দুপুর পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকাই শাহশুজার অভ্যাস, রাত্রে চৌকি পাহারার বন্দোবস্ত থাকিলেও কোন উপরিস্থ সেনানী সান্ত্রী-সিপাহীর থানা থানা ঘুরিয়া দেখেন না; প্রহরীরা ভোর হইলেই ঘুমাইয়া পড়ে।

বাদ-বাকী সহজেই অনুমেয়। শুজার সেনানায়ক ও দরবারী বাহাদুরগণ বোধ হয় হুজুরের সহিত তাল রাখিয়া ঘুমাইতেন; সিপাহীরা চব্বিশ ঘণ্টা কোমর বাঁধিয়া মশার সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধির কাজ মনে করিত না। বাহাদুরপুরের আশপাশ হইতে শুজার শিবির পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাইবার পথ ছিল না; কয়েক মাইল পূর্ব্বদিকে যেখানে জঙ্গল প্রায় শেষ এবং গঙ্গার গতি কিঞ্চিৎ উত্তরমুখী হইয়া বাঁক সৃষ্টি করিয়াছে উহাই বোধ হয় শুজার শিবিরের পশ্চাদ্‌ভাগের খিড়কী-দরজার মত ছিল। দরবারের তাগিদ ও কুমার সুলেমানের অনুরোধে মীর্জ্জা রাজা বাহাদুরপুর হইতে আসন গুটাইয়া অন্যত্র ছাউনী করিতে রাজী হইলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৬৫৮ ইং) সন্ধ্যাবেলা বাদশাহী শিবিরে ঘোষণা করা হইল দিন ভোরে সকলকে ডেরা উঠাইয়া কুচ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

১০

১৩ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রি শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের জন্যই "অন্ত রজনী"। ভোরের আঁধারে তল্পী-তল্পা বাঁধিয়া ঘোড়ার জীন, হাতীর হাওদা কষিয়া, কামানবাহী গাড়ীতে বলদ জুড়িয়া হাতিয়ার-বন্দ বাদশাহী ফৌজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত;—এমন সময়ে দূরে গঙ্গার তীর হইতে যুদ্ধধ্বনি ও কোলাহল জঙ্গল ভেদ করিয়া তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ভিতরের ব্যাপার সম্ভবতঃ মীর্জ্জা রাজাও জানিতেন না, জানিলে হয় বাধা দিতেন, না হয় সুলেমান ও দেলের খাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া, এমন কি শুজাকে সাবধান করিয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। এইরূপ কার্য্য মোগল-শিবিরে প্রায়ই হইত।

কুমার সুলেমান শুকো এবং দেলের খাঁ নিজ নিজ তাবিনের ফৌজ লইয়া কুয়াশার পর্দায় শুজার নিদ্রিত প্রহরীগণকে পাশ কাটাইয়া পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে হঠাৎ অপ্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; যাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল জামা হাতিয়ার হাতরাইতে হাতরাইতে তাহারা বাধা দিবার অবকাশ পাইল না।

আক্রমণের লক্ষ্য ছিল শিবিরের মধ্যস্থলে শাহশুজার তাঁবুর খাসমহল। আয়েসী হইলেও শুজা বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেন নহেন। অকাল-জাগ্রত ব্যাঘ্রের ন্যায় মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত যোদ্ধা পরিবৃত হইয়া তিনি সুলেমান ও দেলের খাঁর সম্মুখীন হইলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইল। শুজাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে একজন যোদ্ধা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাঁহার হাতীর পায়ে আঘাত করিল; কিন্তু নির্ভীক আরোহী কিংবা আহত হস্তী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল না। ইতিমধ্যে মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ, অনিরুদ্ধ গৌর প্রভৃতি রাজপুত বীরগণ আসিয়া পড়িলেন। শুজার মাহুত প্রভুকে রক্ষা করিবার কোন উপায় না দেখিয়া অঙ্কুশাঘাতে হাতীকে নদীর দিকে তাড়না করিল, খোঁড়া হাতী বাদশাহী বাহাদুরগণের ব্যূহ গলাইয়া চলিয়া গেল। হাতী গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেই নৌবহর শাহশুজাকে তুলিয়া ভাটির দিকে ছুটিল; স্থলসৈন্যের বাদ-বাকী যে যেদিকে পারে পলাইয়া গেল; যাহারা নদীর ধারে ধারে নৌকায় উঠিবার জন্য কাতর চীৎকার করিতেছিল তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য কোন নৌকা কূলে ভিড়িল না। দুশমনের জান অপেক্ষা মালের উপর লোভ বেশী; সুতরাং লোকক্ষয় খুব বেশী হইয়াছিল মনে হয় না। শাহশুজার নগদ আসবাবে দুই কোটি টাকার সম্পত্তি বাদশাহী ফৌজের হাতে পড়িল। এইভাবে বাহাদুরপুরে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় পুনরায় অভিনীত হইয়াছিল।

১১

শাহশুজার পলায়নের ঘটনা লইয়া যুদ্ধ-শিবিরে এবং পরে আগ্রা দরবারে অনেক জল্পনা ও কানাঘুষা চলিয়াছিল। জয়সিংহ সন্দেহ করিলেন কুমার সুলেমান তাঁহার সম্বন্ধে অপবাদ [?] রটাইয়াছেন, শাহজাদা দারা উহা শাহানশাহের কানে তুলিয়াছেন। এই কথা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া সম্রাটের কাছে তিনি জানাইয়াছিলেন এবং উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সত্য যাহাই হউক, মীর্জ্জা-রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অভিযোগের জবাবে সম্রাট লিখিয়াছিলেন—এই রকম কথা আমাকে কেহ জানায় নাই; আপনার প্রভুভক্তির উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভরতার কথা সকলে এতই ভাল রকম জানে যে, আমার কাছে এমন বেয়াদবি কথা বলিবার দুঃসাহস কাহারও হইতে পারে না।

সরকারী মুন্সীয়ানাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিলে ইতিহাস হয় না, অবস্থার ফেরে পড়িয়া সরকারকে "অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজ" করিতে হয়। বার্নিয়ার লিখিয়াছেন, "বাহাদুরপুরে যুদ্ধ না বাধাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইলেন···নিশ্চিতভাবে বলা

যাইতে পারে যদি জয়সিংহ ও তাঁহার বুকের বন্ধু [?] দেলের খাঁ ইচ্ছা করিয়া হাত না গুটাইতেন শত্রু-সৈন্য অধিকভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত এবং সম্ভবতঃ তাহাদের সেনাপতি [শাহশুজা] বন্দী হইতেন।" বানিয়ারের এই উক্তির মধ্যে কেবল দেলের খাঁর অংশটুকু মিথ্যা—যাহার জন্য দোষী সম্ভবতঃ মীর্জ্জা রাজা স্বয়ং। সুলেমানের সহিত দেলের খাঁর ঘনিষ্ঠতা ভঙ্গ করিয়া পাঠানের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার জন্য জয়সিংহের প্ররোচনায় তাঁহার চরগণ মন্দের ভাল হিসাবে দেলের খাঁর নামও এই অপবাদের সহিত জুড়িয়া দিয়াছিল। বানিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনার সময়ে পরে দেলের খাঁ রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু বাহাদুরপুরে তাঁহারা মনে মনে অন্য রকম ছিলেন।

যাহা হউক, বাহাদুরপুর যুদ্ধের সরকারী ফতেহ-নামা বা বিজয় পত্রিকার জয়সিংহের জয়জয়কার, দারা ও শাহজাহান চিঠিপত্রে রাজার প্রশংসার পঞ্চমুখ; সুনাম এবং পুরস্কারের মোটা অংশ তাঁহার ভাগেই পড়িয়াছিল। এক হাজার "জাত" ও পাঁচ শত "সওয়ার" মনসবে ইজাফা পাইয়া মীর্জ্জা রাজা মহারাজা যশোবন্তের উপর টেক্কা মারিয়া "হপ্ত হাজারী" [সাত হাজারী] বা বাংলা কথায় "বড়লাট" হইয়া গেলেন। শাহজাদা দারা মীর্জ্জা রাজাকে সর্ব্বাগ্রে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিলেন, "এই যুদ্ধে আপনি যাহা 'নিমকহালালী', দানাই [বুদ্ধিমত্তা] এবং 'সিপাহ্-গিরী' [শৌর্য্য] জাহির করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস স্বয়ং রাজা মানসিংহ উহা করিতে পারেন নাই; গত এক শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানে এই রকম বিজয় লাভের সৌভাগ্য কাহারও হয় নাই।" বিপরীত অর্থে দারার কথাই ঠিক। রাজা মানসিংহ যদি আকবরশাহী আমলে এই প্রকার নিমকহালালী ও বাহাদুরী দেখাইতেন তাহা হইলে কাবুল বিহার বাংলা উড়িষ্যা মোগল-সম্রাটের পদানত হইত না।

দেলের খাঁর ভাগ্যে জুটিল মীর্জ্জা রাজার অর্দ্ধেক সম্মান পাঁচশতী প্রমোশন—যাহা মীর্জ্জা রাজার অধীনস্থ তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার রাজা অনিরুদ্ধ গৌরকেও দেওয়া হইয়াছিল। ইহাকেই বলে "ইতিহাস"—কে বা মারে মশা, কে বা "মারে" [খায়] যৌসা!

বেদনা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখিতেছি পড়ে পুরাতন দিন-লিপি
আনন্দ চেয়ে বেদনা দীর্ঘজীবী।
মিলায় না ব্যথা, হারায় না ব্যথা,
গতি তার বহুদূর,—
তারা যেন রাগরাগিণী তাহারা সুর।
অঙ্গে কি দাগ রাখে হেমহার
আভরণ শত শত?
শুকাতে চায় না কুশাঙ্কুরের ক্ষত।

২

শত রাজসূয় যজ্ঞের চিনা নাহি,
ক্রৌঞ্চের ব্যথা হয়েছে চিরস্থায়ী।
সুখের কাহিনী ত্বরা মুছে যায়,
সহজেই হয় হারা,
উৎসব-গৃহে পুরাতন বসুধারা।
কোন্ বাদুকর আর্দ্র মাটিতে
ব্যথার পুতুল গড়ি,
দীর্ঘশ্বাসে রাখে মর্ম্মর করি?

৩

স্বর্গপ্রাপ্তি দুখের সহজ নয়,
তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।
গাত্রে তাহার নিত্য আঘাত,
চক্ষে তাহার জল,
ভুগিতে যে হয় তাকেই কর্ম্মফল।
সুখ লভে অতি সহজে স্বর্গ,
মোক্ষ ও নির্ব্বাণ,
ধুলার ধরাই সব বেদনার স্থান।

৪

দেবতারা বুঝি ব্যথিতেরে ভালবাসে,
সদয় হৃদয় তাই এ ধরায় আসে।
স্বর্গে তাহারা বেদনা পায় না,
কাঁদিতে পায় না বলে,
হেথা বারবার এসে কেঁদে যায় চলে।
বৈজয়ন্ত চঞ্চল যবে
বাজে বেদনায় বেণু,
ক্ষরে সুধাধারা, ঝরে পারিজাত-রেণু।

বঙ্গে বিপ্লব-আন্দোলন—গোড়ার কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রবন্ধাদি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় কেহ কেহ বিপ্লব-কার্য্য সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। এই সকল প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এক সময়ে বঙ্গের বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস-রচনা সম্ভবপর হইবে আশা করা যায়।

তবে অদ্যাবধি এ সম্পর্কে যে-যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহা হইতে বঙ্গে বিপ্লববাদের প্রথম যুগ সম্বন্ধে আমরা কতকটা ধারণা করিয়া লইতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কথাই কিছু আলোচনা করিব। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিপদ কম নহে। অন্য কোন কোন বিষয়ের মত, বিপ্লববাদ বা বিপ্লবী কার্য্যের পাথুরে প্রমাণের বড়ই অভাব। কারণ ইহা ছিল একান্তই গোপনীয়। লিখিত তথ্য বা সাঙ্কেতিক লিপি-আদিও আজিকার দিনে পাইবার উপায় নাই। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'বন্দেমাতরম্'—বাংলা ইংরেজী কোন কাগজের ফাইলই, দুই-একখানার কিছু কিছু পাওয়া গেলেও, ধারাবাহিক ভাবে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই গোড়ার কথা—প্রথম দিককার বিপ্লবীদের উক্তি ও রচনা হইতেই প্রধানতঃ আমাদের সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও যে কত সাবধানতা আবশ্যক, এ বিষয় লিখিতে গিয়া তাহা বুঝিতেছি।

২

গত শতাব্দীর শেষ দশকে মহারাষ্ট্রে গণপতি-উৎসব, শিবাজী-উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় অভ্যুত্থানের আয়োজন হয়। এই সকল উৎসবে যে শুধু যুযুৎসু, কসরৎ, লাঠি ও অসি খেলা, অশ্বচালনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা এবং লেখনী মারফত তথাকার অধিবাসীদের জাতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টাও চলিত। বঙ্গকন্যা সরলা দেবী (পরে চৌধুরাণী) মহারাষ্ট্রে মধ্যম-মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে বাসকালে এ সকল বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি পরে কিছুকাল সাময়িক ভাবে বাঙ্গালোরে এবং আহমদাবাদে শিক্ষাব্রতীর কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের জাতীয় ভাবাদর্শ বাঙালী যুবকদের মধ্যে অনুক্রামিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী ধারণ করেন। দীর্ঘকাল 'ভারতী'র সম্পাদিকা থাকিয়া (১৩০২-৪ ও ১৩০৬-১৪) ইহাকেই এই ভাবাদর্শ

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)

প্রচারের বাহন করিয়া লন। পথে-ঘাটে শাসকজাতির অবমাননা ও লাঞ্ছনার সমুচিত জবাব দিতে বঙ্গ-সন্তানদের উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চ্চার বিবিধ আয়োজন দ্বারা তাহাদিগকে বীর্য্যের উপাসক হইবারও তিনি সুযোগ করিয়া দিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রে শিবাজী-উৎসবের মত, বঙ্গের পূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সরলা দেবী 'প্রতাপাদিত্য' ও 'উদয়াদিত্য' উৎসব বাংলায় প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার এই সকল প্রয়াসের পরিণতি 'বীরাষ্টমী ব্রতে' (১৯০৪)। পুষ্পাভরণে ভূষিত অসির নিকট যুবকগণ সরলা দেবী-রচিত একটি গান গাহিয়া স্বদেশসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিত। গানটির কয়েকটি চরণ এই :

"স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে, অতি মহাপাপী হোক না কেন,
তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো।

দেশহিতব্রত এ পরশমণি, পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে,
অপঘাত-ভয় আশু তার যায় মরণে গোলোকে যায় সেই জন।"*

বঙ্গে নব-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গেও সরলা দেবী প্রথম প্রথম যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে নানা কারণে তাঁহাকে ইহার সংস্রব ত্যাগ করিতে হয়। তিনি অতঃপর নিজেই স্বতন্ত্র ভাবে যুবশক্তি সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

৩

বাংলার যুবকদল গত শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ও সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা দ্বারা যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা নিতান্তই জানা কথা। এই সময়ের মধ্যে তরুণ ব্রহ্মবান্ধব ভারত-উদ্ধারের আশায় সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্য দেশত্যাগী হইয়াছিলেন এ বিষয়ও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষদশকে একজন বাঙালী যুবক সত্য সত্যই বাংলার বহু দূরে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া ভারত-উদ্ধার-প্রচেষ্টাকে কার্য্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন, 'বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব-বাদের প্রবর্ত্তক' যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক নিরালম্ব স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তিনি বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিলেন, লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল; কিন্তু পরীক্ষার জন্য পঠনীয় পুস্তক পাঠে তেমন মনোযোগী তিনি ছিলেন না।"

বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথের এলাহাবাদ গমনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দী ভাষা, বিশেষতঃ কথ্য হিন্দী ভাল করিয়া অধিগত করা। সে যুগে 'অসামরিক' জাতি বলিয়া বাঙালীদের সৈন্য বিভাগে গ্রহণ করা হইত না। হিন্দী ভালরূপ শিখিয়া হিন্দীভাষী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হওয়া সম্ভব হইবে, যতীন্দ্রনাথের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ দেহাতী হিন্দী বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিলেন। ইহার পর তিনি বরোদায় গিয়া তথাকার কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং মহারাজা গাইকোয়াড়ের খাস সচিব অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হন। সৈন্য বিভাগের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্তরে তিনি ভর্ত্তি হইতে পারিতেন, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যার খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণ সৈন্যপদ গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, কিছুকালের মধ্যে মহারাজার দেহরক্ষী দলভুক্ত হইবার সুবিধা তাঁহার হয়। বরোদায় অবস্থানকালে যতীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে ভারতবর্ষের পুনঃ স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে অনেক আলাপ-আলোচনা চলিত। রামানন্দবাবু লিখিয়াছেন: "কথিত আছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মন্ত্র লাভ করেন।"* আবার যতীন্দ্রনাথের শিষ্য বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "যতীন্দ্রনাথের নিজমুখে শোনা যে তিনি ক্রমশঃ দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা আলোচনা করতে করতে দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতিতে টানেন এবং বাংলায় আনেন।"†

এ বিষয়ে আমরা কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়াও বলিতে পারি যে, যতীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক প্রয়াসী হইয়াছিলেন। উভয়েই কোনরূপ বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হন। শ্রীঅরবিন্দ বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিলাতে বসিয়া পার্নেল প্রভৃতির উপরে 'সনেট' বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা এবং এদেশে কংগ্রেসের আবেদন-নীতির সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলী (বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত) তাহার প্রমাণ। তবে বাংলায় বিপ্লবকার্য্য প্রবর্ত্তনে যতীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয় শ্রীঅরবিন্দকেও যে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতীন্দ্রনাথ সৈনিকের কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ১৯০২ সনে বাংলায় আসেন। সঙ্গে আনিলেন সরলা দেবীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের একখানি পরিচয়-পত্র।

৪

বাংলার আকাশে-বাতাসে বিপ্লবের আদর্শ কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজকাল একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ কি বিপ্লবী ছিলেন? যদি বিপ্লবীই ছিলেন তাহা হইলে বিপ্লব-আন্দোলনের গোড়ায় তাঁহার দ্বারা ইহা কতটাই বা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল? ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে (জুন ১৯৪৯) গোড়ার দিককার বিভিন্ন ঘটনার উপর আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিদ্যাসাগর,

* ভারতী—কার্ত্তিক ১৩১১, পৃ. ৭৩০

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, পৃ. ২৮৩

† শ্রীমৎ স্বামী নিরালম্ব, পৃ. ৬

বঙ্কিম, ভূদেব, হেম প্রভৃতির বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহারাও সশস্ত্র প্রয়াসের কথা ভাবিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তদানীন্তন ভারতীয় ভাবধারার মূর্ত্ত প্রতীক। জাতিগঠনের অত্যাবশ্যক উপায়গুলির প্রতি তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অনুশীলন সমিতির মূল প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর উক্তি হইতে বুঝা যায়, তৎকালে বঙ্গ-যুবকগণ অনেকে স্বামিজীর কাছে যাতায়াত করিতেন। স্বামিজীর উপদেশ ছিল—'স্বদেশী, জিমনাষ্টিক, লাঠিখেলা, বস্তীতে sanitary work প্রভৃতি করা।' স্বামিজীর কথায় —"যে কার্য্য করিতেছ, তাহা করিবে, কখনও তাহা ছাড়িবে না", "একটা কাক দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলে যেমন ঝটপট করে, তেমনি তোমরাও বা কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবে না? Sister Niveditaর কাছে যাহা বলিয়া গিয়াছি তাহা তোমরা ছাড়িবে না। তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন।"*

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার মূলে যে স্বামিজীর অনুপ্রাণনা যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিল তাহা সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি হইতে জানিতে পারি। স্বামী সারদানন্দের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক দল যুবক ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাপৃত হইলেন। সতীশচন্দ্র প্রমুখ যুবকদের উপর ভার পড়িল 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম' প্রচার করার। স্বামিজীর ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনার জন্য প্রিন্সিপাল ওয়ানের অনুমতিক্রমে জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশনের (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) আমতলায় "Historical Club" স্থাপিত হইল; অনতিদূরে, ২১নং মদন মিত্র লেনে সতীশচন্দ্র লাঠিখেলা ও শারীরচর্চ্চার আখড়া স্থাপন করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ— "সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশপ্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না"—যুবকদের মনে যেন গাঁথিয়া গিয়াছিল। নিউ ইণ্ডিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই আখড়াটির নামকরণ করেন "অনুশীলন সমিতি।" ১৯০২ সনের ২৪শে মার্চ্চ (১৩০৮, ১০ই চৈত্র) দোল-পূর্ণিমার দিনে অনুশীলন সমিতি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হইল। ইহার সন্নিকটে একটি ছোট বাড়ীতে স্থিত হইল ইহার কার্য্যালয়।† ইহার পর তেঘরিয়ার শশীভূষণ রায়-চৌধুরীর সহায়তায় সতীশচন্দ্র প্রমুখ সমিতির সভ্যগণ ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহাদের কোন সভাপতি বা নেতা নাই শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় বলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রই (পি. মিত্র) ইহার নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি। তিনি প্রমথনাথের নামে একখানি পরিচয়-পত্র তখন লিখিয়া দিলেন। সতীশচন্দ্রের কথায় বলি:

"চৌধুরী মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন; পরে তিনি ক্লাবের Commander-in-chief (পরিচালক) হইলেন।"*

অরবিন্দ ঘোষ
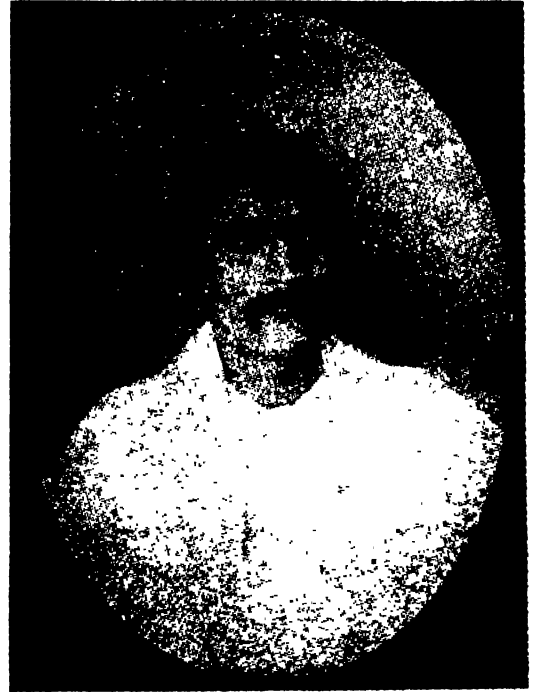
সম্প্রতি শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় 'অনুশীলন সমিতির পি, মিত্র' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ প্রবন্ধে† ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা হইতে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। প্রমথনাথ যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গলাভে, তাঁহার সহিত স্বদেশের হিতকল্পে আলাপ-আলোচনায় মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। অনেকের ধারণা তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহা ঠিক নহে। পিতামাতা পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্টান হইলেও প্রমথনাথ বরাবর হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। ব্যারিষ্টার হিসাবে

* ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৭৯

† অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীজীবনতারা হালদার। ফাল্গুন ১৩৫৬। পৃঃ ৪

* ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ১৮১

† পত্র-ভারতী, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৮

নানা জায়গায় অবস্থান করিয়া দেশ-জ্ঞানও তিনি প্রচুর লাভ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের দ্বারাও তিনি কম প্রভাবিত হন নাই। তবে তাঁহার রাজনীতি ছিল বরাবর উগ্র ধরণের। ১৮৮৩ সনে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হইলে কারাগার ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিবারও স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন প্রমথনাথ। স্বদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশজ খেলাধুলা, কুস্তি-কসরৎ লাঠিখেলা প্রভৃতিরও তিনি ছিলেন বিশেষ পক্ষপাতী, আর তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পর'কে শিখাইতেন। বীর্য্যবান্ ও সাহসী বাঙালীদের সশস্ত্র বিপ্লবে যে একদিন এদেশ হইতে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। দেশের বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হইতে বিলম্ব হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দের নিকট হইতে সরলা দেবীকে লেখা পরিচয়-পত্র লইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। সরলা দেবী তাঁহাকে প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গেও নিশ্চয়ই পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় যতীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার কলিকাতা আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়া লইলেন। এই ঘটনা ঘটে প্রমথনাথের অনুশীলন সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণের মাত্র সাত দিন বাদে। সতীশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন: "সাত দিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্ব্বপ্রকারের training (সামরিক শিক্ষা) তাহারা দিবে। তাহাদের সঙ্গে তোমাদের amalgamate (সংযোগ) করিতে হইবে। আমরাও রাজী হইলাম। এই সময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল।"* এই মিলিত দলেরও সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র। ইহার যে পরিচালক-সভা গঠিত হয় তাহাতে সভাপতি প্রমথনাথ বাদে সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে, 'দেশবন্ধু') ও অরবিন্দ ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দলে আরও আসিলেন ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার। সরলা দেবী এবং সিষ্টার নিবেদিতাও প্রথম হইতেই এই দলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুশীলন সমিতির সম্মিলিত কার্য্যকলাপের কথা কিছু বলিব।

৫

কিন্তু ইহার আগে আর একটি কথা বলিয়া লই। ১৯০২ সন যেমন বিপ্লবী দল গঠনের জন্য জাতীয় ইতিহাসে অতিশয় গৌরবের, তেমনি এই বৎসর ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু নব্য-বাংলার অপরিসীম ক্ষতির কারণও বটে। তবে স্বামিজীর দেহত্যাগের পক্ষকালের মধ্যেই তাঁহার মন্ত্রশিষ্যা আইরিশ জাতীয়া বিপ্লবী নারী ভগিনী নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যারম্ভে যুবক-বাংলার মনে কতকটা আশারও সঞ্চার হইল। তিনি নবগঠিত বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন ও রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে নেতৃস্থানীয়া বলিয়াও গণ্য হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি নেতৃ-পরিষদেরও অন্যতম সদস্যা হন, আর তাঁহাকে লইয়া পরিষদের সদস্য-সংখ্যা হয় পাঁচ জন।* ভগিনী নিবেদিতা বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা জাতীয় বিদ্রোহ ও বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার ইতিহাসমূলক নিজস্ব পুস্তক-সংগ্রহ এই দলের গ্রন্থাগারে দান করিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০২ সনের শেষ ভাগে মহারাজা গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে বরোদায় গিয়া সাক্ষাৎ ভাবে অরবিন্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। উপরে বর্ণিত পরিচালক-সভাও মনে হয় এই সাক্ষাতের পরে গঠিত হইয়াছিল।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়া ১০৮ নং আপার সারকুলার রোডে, থানার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাড়ী ভাড়া লইলেন। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী চিন্ময়ী দেবী এবং জনৈকা দূরসম্পর্কীয়া বিধবা ভগিনীও আসিয়া বাস করিতে থাকেন। আগে বলিয়াছি, অনুশীলন সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণের সাত দিন পরেই প্রমথনাথ মিত্রের উপদেশে এই সমিতি যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। সারকুলার রোডের উক্ত বাটীর পার্শ্বে তখন বিস্তীর্ণ মাঠ ও একটি পুষ্করিণী ছিল। এই মাঠে কুস্তী-কসরতাদির এবং পুষ্করিণীতে সন্তরণের সুবিধা। কাজেই যতীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তীরা এখানে ব্যায়ামচর্চ্চা ও সন্তরণ শিক্ষা করিত। ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, সাইকেল চড়া, মুষ্টিযুদ্ধ এ সকলও ছিল শিক্ষার অঙ্গ। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিলিত হইবার পর স্থির হইল, মদন মিত্র লেনের আখড়া পৃথকভাবে থাকিবে, এখানে অল্প বয়সের সভ্যেরা (Junior members) শারীরচর্চ্চাদি করিবে, আর বয়স্ক সভ্যেরা (Senior members) যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আপার সারকুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করিবে।† অশ্বারোহণ শিক্ষা এখানকার একটি প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। যতীন্দ্রনাথ এবং সতীশ-

* ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ১৮১

* ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ৯৪

† ঐ, পৃ. ১৮১

চন্দ্র বসু উভয়েই ছিলেন পাকা ঘোড়সওয়ার। সুরেন্দ্রনাথ হালদার একটি ছোট ঘোড়া সমিতিকে দিয়াছিলেন।

এইরূপে কর্ম্মের সুচনা হইল। কিন্তু যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবাদর্শ প্রচার তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। যতীন্দ্রনাথ ইহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাতে আদর্শ এবং বাস্তবের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল। এই জন্যই হয়ত যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'তিনিই বাংলার বিপ্লব-বাদের জন্মদাতা।'* বারীন্দ্রকুমার ঘোষও, তাঁহার 'অগ্নি-যুগে' (১৩৫৫) যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্গীরণ করিলেও, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু ভাল কথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনিও যতীন্দ্রনাথকে বাংলার বিপ্লববাদের 'প্রথম মন্ত্রী', 'কর্ম্মীনেতা' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দবাবুর উক্তি হইতে আমরা জানিয়াছি, যতীন্দ্রনাথ সুলেখক ছিলেন। কলিকাতার বিপ্লব-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বিপ্লবের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। সরলা দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী'তে 'ইতালীর নব্যজীবন। ম্যাটসিনি' (আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৯) এবং 'উত্তর ইতালীর উদ্ধার। কাভুর' (পৌষ ১৩০৯) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। নিবেদিতা-প্রদত্ত পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইটালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গারিবল্ডীর জীবনী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডিগবী, দাদাভাই নৌরজীর অর্থনীতির বই, অধ্যাপক ওকাকুরার পুস্তকাদি। যতীন্দ্রনাথ এই সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ বিপ্লববাদের মর্ম্মকথা প্রথম হইতেই অনুবর্ত্তীদের গোচরে আনিবার প্রয়াস পান।

৬

ক্রমশঃ সারকুলার রোডের বাসাবাড়ী একটি বিপ্লবী শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইল। এই মাত্র বলিলাম, যতীন্দ্রনাথে আদর্শ এবং বাস্তবের মিলন ঘটিয়াছিল। তাঁহার অনুসৃত কর্ম্মপদ্ধতি অনুধাবন করিলে ইহাই আমাদের প্রতীতি হয়। এখানে যাঁহারা প্রথমে বিপ্লবী কর্ম্মীরূপে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের ফিরিস্তি অনেকেই দিয়াছেন। অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ইন্দ্র নন্দী, সতীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্র বসু, বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিশচন্দ্র সমাজপতি, দেবব্রত বসু, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (অধুনা ডক্টর), অধ্যাপক শ্রীশ সেন, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজেদের বন্ধুবান্ধব ও দলবল সহ এখানে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের অনেকে সমিতির রীতিমত সদস্যও ছিলেন। এখানে শীঘ্রই একটি পাঠচক্রও গড়িয়া উঠিল। প্রমথনাথ মিত্র পড়াইতেন ইতিহাস—বিশেষ করিয়া সিপাহী

ভগিনী নিবেদিতা

যুদ্ধ, শিখ অভ্যুত্থান ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। তাঁহার লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়ীতে গিয়া কর্ম্মীদের প্রায়ই পাঠ লইতে হইত। সেখানে তিনি তাহাদের লাঠিখেলাও শিক্ষা দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়াইতেন—ইটালীর জাগরণ-কাহিনী, মার্কিনের স্বাধীনতা-সমরের কথা, আইরিশ মুক্তি আন্দোলন, ডাচ রিপাবলিকের জন্মকথা, ইত্যাদি। সখারাম গণেশ দেউস্কর অর্থনীতি বিষয়ক বক্তৃতা দিতেন। ইহার ভিত্তি ছিল—ডিগ্‌বির *Prosperous British India* বইখানি। এখানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমষ্টিই তাঁহার সুবিখ্যাত 'দেশের কথা' নামে, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং পড়াইতেন রণনীতি। কিন্তু অধ্যাপনাকালে বিপ্লববাদের ভাবাদর্শ এরূপ সুন্দর ও সরল করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিতেন যে, যুবকগণ তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া পারিত না। এমন কি বারীন্দ্রকুমারও 'স্বকীয়' ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন :

'যতীনদা' ছিলেন আমুদে ও রসিক মানুষ, আশ্রিতবাৎসল্যতা ও নেতৃত্ব তাঁর ছিল স্বভাবসিদ্ধ গুণ। জিহ্বাখানি ছিল ক্ষুরধার, আর দুই চক্ষে ছিল তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তর্ক-যুক্তিতে ঠিক অপরাজেয় না হলেও, তাঁর মুখের কাছে এঁটে ওঠা যার তার সাধ্যে কুলাতো না। ইতিহাসের নজির তুলে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা

* অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৫

এমন আপাতদৃষ্টিতে অকাট্যভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন যে, বড় বড় বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক পণ্ডিতের বাক্যস্ফূর্তি হ'ত না। তবে তাঁর প্রধান গুণ ছিল অদম্য উৎসাহ ও অপরাজেয় সাহস এবং মনের বল। জন্মগত ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন এই মানুষটি যেন আগুন নিয়ে খেলা করবার জন্যই জন্ম নিয়েছিলেন।"*

যতীন্দ্রনাথের পরিবারের এবং আখড়ার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া। সভাপতি প্রমথনাথ মিত্র, সহঃ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ উভয়েই ছিলেন ব্যারিষ্টার। কাজেই ব্যারিষ্টারগণের নিকট হইতেই প্রতি মাসে বেশী অর্থ সংগৃহীত হইত। যতীন্দ্রনাথ অশ্বারোহণে বালিগঞ্জ পরিক্রমা করিতেন এবং ব্যবহারাজীব মহল হইতে চাঁদাদি আদায় করিতেন। এই ব্যাপার লইয়া বারীন্দ্রকুমার 'অগ্নি-যুগে' (পৃ. ৬২-৭৩) বেশ কিছু রঙ্গরস করিয়াছেন। আজ যতই আমরা তাচ্ছিল্য বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি না কেন, সে যুগে সাধারণ লোকে শুধু নয়, তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজও বিপ্লব তথা ইংরেজ তাড়ানোর নামে আঁৎকাইয়া উঠিতেন। বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টাররাই প্রথম যুগে অর্থাদি দ্বারা বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন। অরবিন্দও বরোদা হইতে নিয়মিত মোটা টাকা পাঠাইতেন।† এইরূপে আদায়ী অর্থ যতীন্দ্রনাথ যদৃচ্ছ ব্যয় করিতেন। যতীন্দ্রনাথের এই যথেচ্ছ অর্থব্যয়, পরে তাঁহার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটি। এ প্রসঙ্গেই আমরা এখন যাইতেছি।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ছাত্রদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ। তাঁহার বাসাবাড়ী ক্রমে কয়েকজন কর্ম্মীরও আবাসস্থলে পরিণত হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নাম যতীন্দ্রনাথ তথা এই সময়কার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজেই তাঁহার কথাও এখানে কিছু উল্লেখ করিতে হয়। 'অগ্নিযুগ' গ্রন্থে বারীন্দ্রকুমার যে-সব প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন এবং সে সমুদয় যে ভাবে ও ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন তাহা সকলই সমীচীন একথা মোটেই বলা যায় না। এক অরবিন্দ বাদে প্রথম যুগের অন্য সকল নেতাই তাঁহার লেখনীমুখে কিম্ভূতকিমাকার রূপে আমাদের নিকটে উপস্থাপিত হইয়াছেন। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, সে সময়কার ঘটনাদির সঙ্গে ঘরোয়া ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মনে হয়, তিনিই একমাত্র জীবিত আছেন। তথাপি তাঁহার রচনা হইতে সারাংশটুকু মাত্র গ্রহণ করিলেও অনেক কথা জানা যায়।

৭

১৯০২ সনে যতীন্দ্রনাথ বরোদা ত্যাগ করিবার পর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তথায় 'সেজদাদা' অরবিন্দের নিকট গমন করেন। সেখানে তাঁহারই উপস্থিতিতে বরোদার ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে অরবিন্দ দীক্ষা প্রাপ্ত হন। অরবিন্দের নিকট বিপ্লবের ব্যাখ্যা কিছুকাল ধরিয়া শুনিবার পর বারীন্দ্রের মন যখন প্রস্তুত হইল তখন তিনি (অরবিন্দ) তাঁহাকে "কোষ-মুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দীক্ষাপত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান।" এই দীক্ষা-পত্রের মর্ম্মও বারীন্দ্রকুমারের ভাষায়—"দেহে যত দিন জীবন আছে ও যত দিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না ঘটে—তত দিন এই বিপ্লবব্রত পালন করে যাব। যদি কখনও এই গুপ্তসমিতির কোন কথা বা ঘটনা প্রকাশ করি বা সমিতির অনিষ্ট করি তা হলে চক্রের গুপ্ত-ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ যাবে।"* ইহার পর হইতে ১৯০৩ সনের প্রথম, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে বারীন্দ্রকুমারের কলিকাতা যাত্রা পর্য্যন্ত অরবিন্দ-সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিষয়ের কথা জানা যায়। যথা—(১) ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়া বঙ্গদেশের বিপ্লব-সমিতির সংবাদ দেন; (২) এই সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি অরবিন্দ, এবং গুজরাট বিপ্লব-সমিতিরও তিনি সভাপতি। বারীন্দ্রকুমার জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিয়া সারকুলার রোডের বাসা-বাড়ীতে উঠেন। এই বাড়ীতে প্রথমে তিনিই বিপ্লব-কর্ম্মীরূপে আশ্রয় পান। পরে অবিনাশ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ আরও কেহ কেহ এখানে যতীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে একান্নবর্ত্তী রূপে বাস করিতে থাকেন। এই একত্র বাসই প্রথম বিপ্লব-প্রয়াসের পক্ষে কাল হইয়াছিল। একথা পরে বলিতেছি।

১৯০৩ সনে সারকুলার রোডের বাসাবাটীতে যোগ দিবার পর যে যে কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে বিপ্লব-প্রয়াস চলিত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'অগ্নিযুগে' নিজস্ব ভঙ্গীতে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানার্জ্জন ও শক্তিচর্চ্চা—প্রথম যুগের বিপ্লব-প্রয়াসের মূলে নেতৃবর্গ এই দুইটিকে প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন। নিয়মানুবর্ত্তিতা, একনায়কত্ব-স্বীকার—বিপ্লব-কার্য্যের এই দুইটি প্রধান অঙ্গের দিকে যতীন্দ্রনাথের ছিল শ্যেনদৃষ্টি। তখনও রাজনৈতিক ডাকাতি আদির কথা কেহ মনেও আনিতেন না। তারকেশ্বরের ডাকাতি-ব্যাপারে নিবেদিতার নিকটে রিভলভার চাহিয়া যুবক-কর্ম্মীগণ তিরস্কৃত হইয়াছিল। নিবেদিতার মুখে এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন যুবকের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

---

* অগ্নিযুগ, পৃ. ৫৭, ৬৩-৪

† ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ১৯১

* অগ্নিযুগ, পৃ. ৩৯

তাহারা নীরব থাকিলে তিনি চাবুক হাতে মারিবার জন্য অগ্রসর হন এবং যুবকগণ তখন তাহাদের কৃতকর্ম্মের কথা প্রকাশ করে। বারীন্দ্রকুমার নিজেই বলিয়াছেন, এরূপ কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা কাহারও পছন্দ হইত না, এবং তিনি আসিয়া কঠোরতার মধ্যে কোমলতার আমদানী করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের নিয়মনিষ্ঠা বারীন্দ্রকুমারের কোমল প্রেমপ্রবণ হৃদয়তন্ত্রীতে বড়ই বেসুরা বাজিয়াছিল। মফস্বলে প্রচারকার্য্য পরিচালনা এবং যোগ্য কর্ম্মী-সংগ্রহ এই বিপ্লবী-সমিতির অন্যতম প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই উপলক্ষ্যে যতীন্দ্রনাথ চব্বিশ-পরগণা ও মেদিনীপুরে গমন করেন। বারীন্দ্রকুমার একা বর্দ্ধমানে এই নিমিত্ত যান। ১৯০৩ সনে অরবিন্দ বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে মেদিনীপুরে গিয়া মাতুল যোগেন্দ্রনাথ বসু এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুকেও কেন্দ্রীয় গুপ্ত-সমিতিতে যোগ দিতে প্ররোচিত করেন। এই স্থলে হেমচন্দ্র কানুনগো অরবিন্দের নিকট গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় হইল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যতীন্দ্রনাথও বরাবর কলিকাতার কার্য্যকলাপের বিষয় অরবিন্দকে পত্র দ্বারা জানাইতেন। যতীন্দ্রনাথের উপর অরবিন্দের এতই শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল যে, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তিনি তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অরবিন্দ যথাসময়ে বরোদায় ফিরিয়া গেলেন।

যতীন্দ্রনাথের কর্ম্মদক্ষতা বারীন্দ্রকুমারের বিশেষ ঈর্ষ্যার কারণ হইয়াছিল; তাঁহার ঐকান্তিক নিয়মনিষ্ঠা ইহাতে ইন্ধন যোগায়। বারীন্দ্রকুমারের লেখা হইতে বুঝা যায়, তিনি নিজে সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ মিত্রের কার্য্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তবু কাজ হাসিল করিবার জন্য তাঁহার কাণে যতীন্দ্রনাথের নামে নানা কথা ও অভিযোগ আনিতে দ্বিধা করেন নাই। হেমচন্দ্র কানুনগো এই ব্যাপারে বারীন্দ্রের প্রতি অরবিন্দের পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করিলে ইহার প্রতিবাদে বারীন্দ্রকুমার যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠেও মনে হয়, যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তথা যতীন্দ্র-বিতাড়ন বিষয়ে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বারীন্দ্রেরই কথায়—

"অরবিন্দ যতীনদা'কে দল থেকে তাড়ান নাই, স্বয়ং বাংলার বিপ্লব-কেন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি পি মিত্র মহাশয়ের সরাসরি হুকুমে ও ফরমানে যতীনদা প্রথম বিতাড়িত হন; যদি কেউ বারীনের চোখে দেখে থাকে, বারীনের কাণ দিয়ে শুনে থাকে এবং বারীনের মুখ দিয়ে বিতাড়নের আদেশ দিয়ে থাকে ত সে পি মিত্র মশাই করেছিলেন।..." ইত্যাদি।*

যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বেশী খরচের যে অভিযোগ বারীন্দ্রকুমার পি. মিত্রের নিকটে আনিয়াছিলেন, সতীশচন্দ্র বসু বলেন, তাহা 'মিথ্যা' ছিল।* যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ বিতাড়িত হইলেন। সারকুলার রোডের বাসাবাড়ীতে যে, বিপ্লব-চক্রটি গড়িয়া উঠিতেছিল, কাহারও কাহারও অদূরদর্শিতার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সভাপতির নির্দ্দেশে ঘোড়া ও সাজসরঞ্জাম সতীশচন্দ্র বসুর জিম্মায় রহিল। সতীশচন্দ্রের উক্তিতে মনে হয়, বারীন্দ্রকুমার যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হুকুমনামা লিখাইয়া লইলেও, তাঁহার প্রতি প্রমথনাথ কোনরূপ বিপরীত ভাব বা মত পোষণ করিতেন না। সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন,

"মিত্র সাহেব আমাকে বলেন, 'দলাদলির কথা শুনিস্‌নে, সব জিনিষ তোর কাছে রাখ···, যতীনকে আশ্রয় দিবি।"†

যতীন্দ্রনাথ কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। পরে রামাপুকুর লেনে একটি মেসে আসিয়া উঠেন। এখানে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পুত্রসহ থাকিতেন। যোগেন্দ্রনাথ ম্যাট্‌সিনি গারিবাল্ডির জীবনীকার—বঙ্গদেশে বিপ্লববাদের প্রবীণ প্রচারক। এই স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া আবার একটি বিপ্লবী-চক্র গড়িয়া উঠে। যতীন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক অরবিন্দকে পত্রদ্বারা জানাইতেন। অরবিন্দ এক দিকে বারীন্দ্রকে যেমন অর্থসাহায্য করিতেন, অন্য দিকে তেমনি যতীন্দ্রনাথকে প্রয়োজনীয় অর্থাদিও রীতিমত পাঠাইতেন। বিরোধীদের মধ্যে মিলন স্থাপনোদ্দেশ্যে অরবিন্দ ১৯০৪ সনে দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আসেন ও রামাপুকুর মেসে বিদ্যাভূষণ-যতীন্দ্রনাথের অতিথি হন। এই সময় বারীন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী অবিনাশ ভট্টাচার্য্য মদন মিত্র লেনে বাস করিতেছিলেন, অরবিন্দের নির্বন্ধাতিশয্যে ইঁহাদের মধ্যে মিলন সংঘটিত হইল। অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। বিরোধীদের মধ্যে পুনরায় মতান্তর দেখা দিল। ইহা ক্রমে চিরবিচ্ছেদে পরিণত হয়। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে অবস্থানকালে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনের আলাপ-পরিচয় হয়। বাঘা যতীন তাঁহার নিকট হইতে যে অনুপ্রাণনা লাভ করেন, নিজের জীবন দানে তিনি তাঁহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐ সময় সতীশচন্দ্র বসু নেতৃবর্গের নির্দ্দেশে নন্দন-বাগানে একটি 'বক্সিং ক্লাব' খুলেন। ইহার কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া অনুশীলন সমিতির প্রথম বিপ্লব-প্রয়াসকে জীয়াইয়া রাখা হয়। পরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে ইহার দ্বিতীয় পর্ব্ব শুরু হয়।

* অগ্নিযুগ, ১০৩

* ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ১৮৩

† ঐ

যেন বাজারের গোলমাল, কাছে এলে হঠাৎ মনে হয়। প্রকাণ্ড বাড়ি বৌবাজার স্ট্রীটের উপর। নিচের তলায় সারি সারি দোকান। বাড়ির পেট চিরে অল্প প্রশস্ত প্রবেশ-পথ। দূর থেকে বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু একটু কাছে এলেই কান বন্ধ করতে হয়।

গোলমালটা সত্যিই বাজারের, কারণ সেটি একটি প্রসিদ্ধ বাজার। তরিতরকারি সব্জীর বড় আড়ৎ। ভিতরে প্রবেশ করে কার সাধ্য। সব সময় ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার। এক পয়সা দু' পয়সার খুচরো জিনিস পাবে না সেখানে, সব পাইকেরি হারে কিনতে হবে। আলু বেগুন পটল প্রভৃতি মণ দরে, অথবা মণের ভগ্নাংশ। কোনো কোনো জিনিস ডজন-দরে। খুচরো ব্যবসায়ীরা দলে দলে আসে এখানে তরিতরকারির বাজার কিনতে। সীমাবদ্ধ জায়গা, পণ্য আর ক্রেতাবিক্রেতায় ঠাসা, তদুপরি এরই মধ্য দিয়ে উপরতলাবাসীদের যাতায়াত। সুতরাং কেউ শখ করে এখানে প্রবেশ করে না, সৌধমধ্যস্থ এই বাজারে যারা ঠেলাঠেলি চিৎকার করে, তারা নিতান্তই দায়ে পড়ে করে।

কিন্তু তবু একটি কুড়ি-বাইশ বছরের যুবককে দেখা যায় এর মধ্যে অকারণ ঘুরতে। রাধাচরণ তার নাম। বহু জনের ধাক্কা খেয়েও সে নির্ব্বিকার। তার গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, পরিধানে ছিন্নবাস। কোমরে ছোট্ট একটি থলে। সে ক্রেতা নয়, বিক্রেতা নয়; সে কবি নয়, শিল্পী নয়, দার্শনিক নয়; লেখক নয়। তা যদি হ'ত, তা হলে দোতলার বারান্দার নিরাপদ উচ্চতায় দাঁড়িয়ে বাজারের চরিত্র লক্ষ্য করতে পারত; তার দৃষ্টি পালা করে বাজারের সামগ্রিক ক্ষেত্র এবং সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে চলাচল করত। রাধাচরণের দৃষ্টি একই ক্ষেত্রে নিবদ্ধ—পায়ের দিকের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তাকে বলা চলে বৈজ্ঞানিক। শূন্যে নক্ষত্র আবিষ্কারের দৃষ্টিই তার। মাটির আকাশের নক্ষত্র, কিংবা উল্কা।

ঐ যে আলুর গাদা থেকে একটি ছোট্ট আলু গড়িয়ে বেরিয়ে এল, ভিড়ের পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল, তা দেখে রাধাচরণের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার বহু-বাঞ্ছিত দৃশ্য এটি। এমনি ভাবে কখন একটি পটল বেরুবে, কখন একটি উচ্ছে, কখন একটি বেগুন। অপেক্ষা করে থাকবে সে অনেক দুঃখ সয়ে। বেরোলেই ছুটে গিয়ে খপ করে ধরে সেটাকে থলেতে পুরবে। একটি বেলার পরিশ্রমে কখনও চারটি আলু, দুটি পটল, তিনটি উচ্ছে, একটি সিম, কখনও ছটি আলু, তিনটি পটল, চারটি কচু, চারটি লঙ্কা। সবই ছোট ছোট, অতি তুচ্ছ, গাদা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে যার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

কিন্তু আজ তার ভাগ্য নিতান্তই অপ্রসন্ন। সব মিলিয়ে মাত্র ছটি তার জুটেছে। কতই বা হবে এর দাম? চার পয়সা? ভাবতেও রাধাচরণের মনটা দমে যায়। কালও সে দশ পয়সা ঘরে এনেছে।

এসে বসেছে সে তার অভ্যস্ত জায়গায়, বড় রাস্তার ফুটপাথের উপরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তার খদ্দের এই সময়েই আসবে সে জানে। তাকাচ্ছে সে মাঝে মাঝে পথচারীদের মুখের দিকে। বুঝতে পারে সে শত শত পথচারীর মধ্যে কে এই সস্তা পাঁচমিশেলি তরকারি কেনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সমস্ত দিন। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে আসবে সে, তার দীনতাকে নিজেরই কাছে থেকে আড়ালে রাখতে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ফেরার পথে

আধা-অন্ধকারে ফুটপাথে-বসা বিক্রেতার কাছ থেকে সস্তায় একভাগ আধা-অখাদ্য তরকারি কিনে নিয়ে যাবে। আছে এমন খদ্দের অনেক।

রাত বেড়ে যাচ্ছে, সাড়ে সাতটা বাজে। রাধাচরণের মনের মধ্যেটা তোলপাড় করতে থাকে। শেষে কি যে কোন দামে ছাড়তে হবে? তিন পয়সা? দু' পয়সা? এলোমেলো কল্পনা সব। তা হলে তো দিনটা তার বৃথাই গেল! শঙ্কিত চোখে তাকায় সে দীর্ঘ বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাবর। প্রকাণ্ড সরল রেখা—দূর পশ্চিমে কোথায় মিলিয়ে গেছে রাত্রের অন্ধকারে। শুধু আলোর সারি, আর চলমান ট্রামের মাঝে মাঝে দুটি নীল চোখ, আর কিছু না।

হঠাৎ চমক ভাঙে রাধাচরণের। "এগুলো কত নেবে?"

খদ্দের ডানপাশ থেকে কখন এসে ঝুঁকে পড়েছে ওর প্রায় ঘাড়ের উপর। হঠাৎ খদ্দের চমকে উঠে বলে "আরে এ যে রাধাচরণ! তুই—"

রাধাচরণ খদ্দেরের মুখের দিকে চেয়ে চিনতে পারে শক্তিপদ মুখুজ্জেকে। রাধাচরণ মজুমদার ছাত্র, আর শক্তিপদ মুখুজ্জে মাষ্টার। সম্পর্কটি অবশ্য বছর পাঁচেক আগেকার। শক্তিপদর বেতের চিহ্ন এখনও হয় ত রাধাচরণ পিঠে বহন করছে—দু'চারটে দাগ এখনও দেখা যায় ভাল করে লক্ষ্য করলে।

"তার পর তুই স্কুল ছেড়ে দিয়ে এই করছিস?" শক্তিপদ মধুর স্বরে প্রশ্ন করে, অর্থাৎ শক্তিপদর পক্ষে যতটা সম্ভব মধুর স্বরে।

"না, অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলাম, ম্যাটিক পর্য্যন্ত পড়েছি।—"

রাধাচরণ থামিয়ে দেয় কথা। হয় ত অনেক দুঃখের কাহিনী মনে পড়ে যায়, কিংবা বেশি ঘনিষ্ঠতা করলে দর কমে যেতে পারে, ভয় হয়।

শক্তিপদও বেশি আলাপ করতে চায় না। রাধাচরণ অঙ্কে কাঁচা ছিল, শক্তিপদ সেজন্যে তার উপর বরাবর হিংস্র ব্যবহার করেছে, সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

"কিন্তু যাকগে পড়াশোনার কথা। কত নিবি এগুলো?"

"দু' পয়সা, সার।"

খুব খাতির করেই রাধাচরণ দু' পয়সা বলল, নইলে দু' আনা তিন আনা বলা তার অভ্যাস।

শক্তিপদ আলু পটলগুলো আঙুলের স্পর্শে খুব তাচ্ছিল্যের ভাবে পরীক্ষা করে বলল, "নে চারটে পয়সাই দিচ্ছি"—বলে পকেটে হাত দিল।

রাধাচরণ বলল, "হবে না, সার।"

"এর বেশি কি আর কেউ দেবে?—এত রাত্রে আর কেই বা আসবে নিতে?" বলে গদ গদ ভাবে তার হাতের মধ্যে আনিটি গুঁজে দেবার চেষ্টা করল শক্তিপদ।

রাধাচরণ হাত সরিয়ে নিল।

"আরে দে দে, মাষ্টার মনে করে একটুখানি না হয় লোক্‌সানই খেলি।"

"না, মাষ্টার মশাই, দু'পয়সার এক পয়সা কম হবে না।"

রাধাচরণের ঘাড়ে দু'পয়সার ভূত চাপল। অথচ মনে মনে সে জানে চার পয়সাই ওর ঠিক দাম। কিন্তু যাকে চির দিন শত্রু মনে করে এসেছে, তার কাছে আজ সে মাথা নীচু

করবে না, এই রকম একটা জেদ মনে জেগে উঠল। তা ছাড়া চার পয়সা দাম হলেও চার পয়সা পেলে যে তার চলবে না। পরিশ্রম ত ছ'আনারই হয়েছে, তার ত একটা দাম আছে।—কিন্তু এ যুক্তি নিতান্তই অবুঝের যুক্তি। আজ সে জোর করেই অবুঝ হতে চায়।

শক্তিপদর দোষ নেই। দাম সে ঠিকই বলেছে, তা ছাড়া চার পয়সাই তার সম্বল, তার বেশি একটি পয়সাও নেই সঙ্গে। অথচ তরকারি তাকে কিনতেই হবে।

কিন্তু রাধাচরণকে কেন এ ভাবে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় এবং শক্তিপদকে কেন এক পয়সা দু'পয়সার জন্যে হ্যাংলামি করতে হয়—তা সম্পূর্ণ বলতে গেলে এদের পিছনে যে বেদনার ইতিহাসটি আছে তা বলতে হবে এবং তা বলতে গেলে তারও পিছনে আরও অনেক ইতিহাসে টান পড়বে, তখন দেখা যাবে তা সমস্ত বাংলাদেশেরই ইতিহাস। আর এ ইতিহাস ত সকলেরই জানা, অতএব তার দরকার নেই।

দরকষাকষি ওদের আরও কিছুক্ষণ চলল এবং শক্তিপদ বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। কিন্তু আশা-ভরসা ছেড়ে নয়। কারণ সে উঠে গিয়ে রাধাচরণের একটু পিছনে কয়েক হাত দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উদ্দেশ্য—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করবে এবং রাধাচরণের উপর নজর রাখবে। কারণ তার বিশ্বাস এত রাত্রে অন্য খদ্দের পাবার আশা তার নেই, অতএব শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঐ চার পয়সাতেই ছাড়তে হবে। কতক্ষণ আর না ছেড়ে থাকবে?

দৃশ্যটি বড়ই করুণ। পাঁচ বছর আগেকার একটি দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। রাধাচরণ আঁক কষছে, শক্তিপদ তার দেরিতে অধীর হয়ে উঠছে। অবশেষে যথেষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই একের বেত আর একের পিঠে। আজও সেই ছাত্র এবং শিক্ষক। আজও অঙ্ক-ফলে মতভেদ। রাধাচরণের ছ' পয়সা, শক্তিপদর চার পয়সা। অঙ্ক-ফলে শতকরা পঞ্চাশ তফাৎ। কিন্তু তবু শিক্ষকের ধৈর্য্য আজ অসীম। এই ধৈর্য্য পাঁচ বছর আগে দেখালে রাধাচরণ আজ পথে বসত কি না কে জানে।···

শক্তিপদ চলে যাবার পর রাধাচরণ প্রথমে ভাবল যাক গে। কিন্তু তার পর তার অনুতাপ হতে লাগল। যদি অন্য খদ্দের আর না আসে! শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে আবার তাকাতে থাকে পথচারীদের দিকে।

শক্তিপদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আত্মতৃপ্তিতে মাতছে। যত সময় যাচ্ছে তত তার মনে আশা জাগছে। একটুখানি দাঁড়িয়ে শতকরা পঞ্চাশ লাভ। ছয়ের জায়গায় চার। ভাবনা এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে—দেড়শ'র জায়গায় একশ', দেড় হাজারের জায়গায় এক হাজার···

ভাবতে ভাবতে শক্তিপদ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এমন সময় হঠাৎ দেখে খদ্দের জুটে গেছে এবং আলুপটলগুলো হাতে তুলে নিচ্ছে।

রাধাচরণ এবারে আর বোকামি করে নি, খদ্দের আসতেই সে চার পয়সায় ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা এমনই অতর্কিতে ঘটে গেছে যে, শক্তিপদ সামান্য একটুখানি অন্য-মনস্ক হওয়াতেই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

শক্তিপদর মাথা ঘুরে উঠল এ দৃশ্য দেখে। মুখ থেকে শিকার-ছুটে-যাওয়া বাঘের মত ছুটে এল সে রাধাচরণের কাছে এবং এসেই দেখতে পেল রাধাচরণ সদ্যপ্রাপ্ত হাতের আনিটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছে। দুর্ব্বল দেহ সত্ত্বেও শক্তিপদর মাথায় রক্ত চড়ে গেল, সে সহসা বহুদিন পরে অঙ্কের মাষ্টারে পরিণত হয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, "কেন আমাকে দিলি না চার পয়সায়, কেন আমাকে দিলি না" আর সেই সঙ্গে রাধাচরণের পিঠে মাথায় কিল ঘুঁসি চালাতে লাগল হতাশায়, ক্ষোভে ও রোষে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। রাধাচরণ এই অতর্কিত আক্রমণে সহসা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু

সামলে নিল তখুনি। সে একলাফে উঠে শক্তিপদর মাথায় এমন এক ঘুঁসি কষল যার ফলে শক্তিপদ লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে ফুটপাথের উপর পড়ে গেল। হৈ হৈ করে চারদিক থেকে লোক ছুটে এল। তার পর সেই হট্টগোলের মধ্যে কার বিচার কেমন হ'ল তা আর জানা গেল না।

কিন্তু যাই হোক, এমনি একটি ঘটনাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এটিকে একটি প্রহসন মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু এটি প্রহসন নয়, প্রতিদিনের জীবনেরই একটি খণ্ড দৃশ্য মাত্র, এবং শুধু গল্পের খাতিরেই খণ্ড। কৌতূহলী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে, এই যদি স্বাভাবিক জীবনধারা, তা হলে আরও একটু দেখি না?

এ কৌতূহল স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাক পরবর্তী দৃশ্যটাও। দৃশ্যটি সংক্ষিপ্ত।

রাধাচরণের যখন সম্বিৎ ফিরে এল, তখন দেখে এক পাহারাওয়ালা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে। তখন রাধাচরণ তাকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, তার কোন অন্যায়ই হয় নি, সে যা করেছে তা শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু শ্রোতার কানে কিছু ঢুকছে বলে তার মনে হ'ল না।

তারপর বেশ কিছুদূর গিয়ে পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে গেল। রাধাচরণ ভাবল মন ভিজেছে। কিন্তু তবু ছাড়ে না যে!

রাধাচরণ বিমূঢ়বৎ পাহারাওয়ালার দিকে চায়, সেও ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টি তীরের মতো এসে রাধাচরণের চোখে বিঁধতে থাকে।

এক মিনিট যায়, দু' মিনিট যায়, পাহারাওয়ালার চোখের পলক পড়ে না।

রাধাচরণ ধীরে ধীরে সম্মোহিতহয়।

তারপর ট্যাঁক খুঁজে আনিটি বের করে তার হাতে তুলে দেয়।

গ্রহীতা বুঝতে পারে আর কিছুই নেই নেবার মত।

তার আলিঙ্গন সহসা শিথিল হয়, রাধাচরণ ছুটে চলে বাড়ির দিকে। এমন হাল্কা যেন উড়ে চলেছে।

জীবনধারা যেমন চলছিল তেমনি চলে। পরদিন আবার দেখা যায় রাধাচরণকে সেই বাজারে সেই একই অবস্থায়।

ভুলে তুমি গেছো যদি

শ্রীযতীন্দ্র সেন

ভুলে তুমি গেছো যদি, সে ভুলে আমার কিবা ক্ষতি?
তোমারে বেসেছি ভালো, সেই মোর পাথেয় পরম;
সে প্রেমে জেগেছে মোর জীবনের ছন্দ সুর যতি।
ভালোবাসা অপরাধ? তাই যদি, ক্ষম' মোরে ক্ষম'।

চাহি নি রূপের তব অপরূপ দেহের দেউলে
কামনার ধূপ জালি' করিবারে রতির আরতি।
পরি নি পূজার ফুলে মালা গাঁথি' গলে কভু ভুলে;
দূর হ'তে দিনু অর্ঘ্য ও পাষাণ-প্রতিমার প্রতি।

বালুকা-বেলায় আঁকি আলিপনা জলের রেখায়;
আঁকি আর মুছে যায়, বেলাভূমে কোথা চিহ্ন তার!
নয়নের জল দিয়ে পলে পলে সংগোপনে হায়,
আমার হৃদয়ে আঁকা মোছে না তো মুখটি তোমার!

ভুলে গেছো অকরুণা? স্মৃতি হ'তে দিলে নির্বাসন?
সেই ভালো, মনে তব হোক মোর নিশ্চিহ্ন মরণ॥

কেন?

শ্রীহরিহর শেঠ

অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ যেমন একটি অতি ক্ষুদ্র বীজকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়, তেমনই বর্তমান প্রবন্ধের শিরো-নামায় যে অতি ক্ষুদ্র শব্দটি আছে তাহা হইতে কত বড় বড় কার্য্য সাধিত হইয়াছে; জগতে কত মনীষী এই 'কেন'কে ধরিয়া ইহার পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক কত অমূল্য সম্পদ আহরণ দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিয়াছেন এবং চিরবরেণ্য হইয়া আছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

একটি বৃন্তচ্যুত আপেল কেন আকাশের দিকে না উঠিয়া মাটির উপর পতিত হইল এই চিন্তাকে অবলম্বন করিয়াই নিউটন মাধ্যাকর্ষণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যে বৈদ্যুতিক শক্তি বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির একটি প্রধান বাহন, তাহাও একটি কেনর পশ্চাৎ অনুসরণের ফলেই পাওয়া গিয়াছিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ এক মেঘলা দিনে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে উহার রেশমী সুতার সহিত লোহার চাবির সংস্পর্শে একটি স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইতে দেখিয়া, কেন এরূপ হইল, এই সূত্র ধরিয়াই এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অদৃশ্য শক্তির পরিচয়লাভ করিয়াছিলেন। বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত এঞ্জিন — কি রেল ষ্টীমার কি কলকব্জা পরিচালনায় আজ দুনিয়ার চেহারা বদলাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। জেম্স্ ওয়াট জল গরম করিতে একটি কেটলির ঢাকার স্পন্দন দেখিয়া কেন এরূপ হয় এই প্রশ্নের অনুসরণ করিতে এই বাষ্পীয় শক্তিকে পাইয়াছিলেন। যে রঞ্জনরশ্মি আজ চিকিৎসা-জগতে এবং অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহাও একটি কেন খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া গিয়াছিল। ফরাসী বৈজ্ঞানিক রন্টজেন যখন ক্রুক্স টিউব লইয়া কোন একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ অতি উজ্জ্বল বেরিয়ম সল্ট হইতে বিচ্ছুরিত একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব রশ্মি দেখিয়া কেন উহা নিঃসৃত হয় তাহার কারণ খুঁজিতে গিয়া 'রঞ্জন'-রশ্মির আবিষ্কার করেন। আধুনিক কালের এই সমস্ত ঘটনার ন্যায় প্রাচীন কালেও আর্কিমিডিস স্নানার্থ চৌবাচ্চার জলে বসিয়া দেহের লঘুত্বের অনুভূতি কেন হয় তাহার কারণ অনু-সন্ধানেই তাঁহার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এইরূপ 'কেন'র অনুধাবনের ফলে যে বিশ্ববাসী কত দিক দিয়া লাভবান হইয়াছেন তাহার আর অন্ত নাই। বিজ্ঞানের মধ্যে কেন'র স্থান সর্ব্বত্র। রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, জ্যামিতি প্রভৃতিতেও এই 'কেন' ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যাহা-কিছু সত্যের পরিচয় মানব-মনের গোচরে আসিয়াছে, তজ্জন্য সকল গবেষণা এবং অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত কত কেন'র পশ্চাতেই না অবিরত মানুষকে ধাবিত হইতে হইয়াছে। সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর ও সমস্যা সমাধানের জন্য এই দুই অক্ষরের শব্দটিকে যদি একটু শ্রদ্ধার সহিত মনে মনে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনেক সংশয় ও সাংসারিক বিপর্য্যয় হইতে সময় সময় নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

ভাষার মধ্যে নানা অলঙ্কারযুক্ত সুন্দর সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ অনেক থাকিলেও, কেন'র মত বুঝি এমন শক্তিশালী শব্দ বড় অধিক মিলে না। কিছু কাল পূর্ব্বে জনৈক লেখক "যুগান্তর" পত্রিকায় আর একটি ছোট শব্দ 'যদি'র কথা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 'যদি'র মহিমা-কীর্ত্তনে পঞ্চ-মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়িতেছে, তিনি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিন্তানায়ক, প্রেমিক-প্রেমিকা, শিশু যুবা বৃদ্ধ প্রাসাদবাসী ধনী হইতে পর্ণকুটীরবাসী দীনের উপর এই দ্বি-অক্ষরের শব্দটির যে প্রভাব তাহারই কথা, তাহারই ব্যাখ্যা সবিস্তারে সুন্দরভাবে লিখিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন, ব্যর্থ ও সার্থক জীবনে উভয়ত্রই সকলেরই দরকার 'যদি'। তাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন পথে মানুষ যে ভাবে চলে তাহা লেখক বিশদ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি এই কেন'র কথা যে ভাবে চিন্তা করিয়া থাকি, ইহার ভিতরে যে মহত্ত্বের ছায়া দেখিতে পাই, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'যদি' ও 'কেন'র মধ্যে আমি দেখি আকাশ-পাতাল পার্থক্য। 'যদি' কতকটা অযাচিত ভাবে আসিয়া তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে। সহস্র যদি আপনা হইতে আসিয়া প্রায় প্রতিটি মানুষকে আশায় সংশয়ে আশঙ্কায় আনন্দে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে। স্বীকার করি, অনেক সময় দুঃখীর আর্ত্তের সন্তপ্তের মনে ইহা একটা অলীক সান্ত্বনার মত আনিতে পারে। নৈরাশ্য-বিহ্বল মানব বিরলে বসিয়া ইহাকে লইয়া চিন্তারাজ্যে আকাশকুসুমের সৃষ্টি করিয়া কত সময় কাটাইয়া দেয়। মানুষের চিন্তায় ভাবে ভাষায় যদির অবারিত প্রভাব হেতু ইহা এক হিসাবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত এ কথা সত্য হইলেও, যদি যেমন অনেক সময় মানুষের ফাঁকা সান্ত্বনার আধার, 'কেন' তাহা নহে। ইহা জগতের সত্যকারের বহু কল্যাণের মূল কারণ। যদি আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হয়, কেন বাস্তব ও সত্যের

পুজারী। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠে জানা যায়, তাঁহার শৈশবের কি এবং কেন'র অঙ্কুরিত প্রশ্নই ভাবীকালে অনন্ত জিজ্ঞাসার কারণ হইয়া তাঁহার বড় হওয়ার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

এ হেন 'কেন' যাহার এত শক্তি, এত প্রভাব তাহা যদির মত এত সহজলভ্য নহে। সে সর্ব্বদাই মানব-কল্যাণের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, একটু আবাহনসাপেক্ষ। এই হিসাবে আভিজাত্য-গৌরবে সে কিছু বড়। অনেক বড় কাজ তাহার মাধ্যমে হইয়াছে, হইতেছে এবং চিরদিনই হইবে। কিন্তু দুঃখের কথা, কত নর-নারী নিত্য এই সংসারে অন্ধকারময় আবর্ত্তে জীবনের প্রায় প্রতিটি বিভাগে বিরামহীন ঘূর্ণনের মধ্যে এই আলোক-বর্ত্তিকাটিকে অনেক সময় দেখিতে পান না।

সংসারাশ্রমে পারিবারিক জীবনে তর্ক-বিতর্ক মনোমালিন্য প্রভৃতি হইতে যত অশান্তি উদ্ভূত হয়, তাহার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিহিত থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় সবই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদিগের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এই সব সহজাত অর্থাৎ স্বভাবের সহিতই আসিয়া থাকে। ক্রোধ সম্বন্ধে কিন্তু সব সময় ঠিক তাহা বলা চলে না। কোন বৃত্তি চরিতার্থ না হইলে, যে ব্যক্তির জন্য তাহা হইতে পারে না তাহার উপর ক্রোধ জন্মে সত্য, কিন্তু তাহা ছাড়াও অন্যের অতি সামান্য কথা এবং কার্য্য হইতে পারিবারিক জীবনে অনেক সময় ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই সময় ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ক্রোধ-ভাজন ব্যক্তি সেই কথা কেন বলিল বা সেই কার্য্য কেন করিল সে বিষয় চিন্তা করিয়া কারণ অথবা উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রোধের উপশম হয়। এমন কি, ক্রোধ-ভাজনকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা দ্বারাও তদুত্তরে অনেক সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধের নিরসন হইয়া মহা অনর্থ হইতে তাহাকে রক্ষা করে।

মহাজ্ঞানী মহাজনগণ যে কেন'কে ধরিয়া নানা ভাবে জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, সেই কেন-কে অগ্রাহ্য ও অবহেলা করার ফলে সাংসারিক জীবনে কত বিপদ-আপদ, কত বিপর্য্যয়ই না সর্ব্বদা আসিয়া উপস্থিত হয়। সাংসারিক শান্তি কিয়ৎ পরিমাণেও অব্যাহত রাখার উপায় নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সংসারের সকল স্তরে বন্ধুতে-বন্ধুতে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, শাশুড়ী-বধূতে এই যে বিবাদ-বিসম্বাদ, এই যে মনের অমিল হইতে গৃহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি, এমন কি পিতা-পুত্রের মধ্যেও অমিল—ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বহু স্থলে বহু ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে ভ্রান্তিই ইহার মূল। এই ভ্রান্তি সংসারের শান্তির একটি প্রধান শত্রু। পারিবারিক জীবনে উদ্ভূত সমুদয় অশুভেরই মূল যে ভ্রান্তি তাহা না হইলেও, ইহা দ্বারা কত যে অশান্তি প্রশ্রয় পায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

পুনরায় বলি, কাহারও কোন একটি কাজ দেখিয়া বা কথা শুনিয়াই প্রতিকূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। কে কি করিল, কে কি বলিল অথবা কেন অসম্মান বা অন্যায় আচরণ করিল তাহার উদ্দেশ্য কি সে সব কথা চিন্তা না করিয়া, কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, এমন কি একটি প্রশ্ন পর্য্যন্ত না করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অধিকাংশ মানুষের স্বভাব। এ সময় ব্যক্তিবিশেষের যে কার্য্য বা কথাকে অন্যায় অসঙ্গত মনে হইতেছে, তাহা সে কেন করিল বা বলিল একটু স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলে অনেক সংশয়ের নিরসন হইতে পারে, অনেক অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ অপরাধী সন্দেহভাজন ব্যক্তির—সন্দেহকারীর ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলিবার থাকে ত সর্ব্বপ্রথম তাহাকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত।

পরের উত্তেজনা বা ষড়যন্ত্রের ফলে যে সব প্রমাদের উদ্ভব হয় তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সব ভ্রান্তির উদ্ভব হয় তাহার কতকগুলি নিদর্শন দিতেছি। যেমন পিতা দেখিলেন পুত্র রাত্রিকালে শৌণ্ডিকালয় হইতে বহির্গত হইতেছে। প্রভু দূর হইতে ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে সোনার বোতাম দেওয়া জামায় হাত দিতে দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ পিতা ও প্রভু কোন বিচার-বিবেচনার পূর্ব্বেই যথাক্রমে পুত্র ও ভৃত্যের চরিত্রে সন্দিহান হইয়া বিরূপ হইলেন। অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসামাত্র করিলেই হয়ত জানিতে পারিতেন, কোন সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র প্রতিবেশীর কঠিন পীড়ার জন্য পুত্র বরফ আনিতে গিয়াছিল। আর ভৃত্য জানালা হইতে পথে পতিত জামাটি যথাস্থানে রাখিতেছিল।

এই প্রকারে একটি কেন'র অনুসরণের অভাবে কত অনর্থেরই না সৃষ্টি হয় এবং হয়ত জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। কেন'র অনুসন্ধান হইতে পৃথিবীতে যে সব মহামূল্যবান আবিষ্কার হইয়াছে, কতিপয় উদাহরণ দ্বারা প্রবন্ধারম্ভে তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ যদি কেন'কে আশ্রয় করিয়া চলে তাহা হইলে সে যে কত অশান্তি ও বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে তাহা কিছু উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে না। তবে কেন'র অনুসরণ না করার ফলে কত গুরুতর অনিষ্ট

হইয়াছে তাহা পুরাণ, ইতিহাস, উপন্যাস, নাটকাদি হইতে প্রচুর দেখান যাইতে পারে। উপন্যাস, নাটকাদি কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহা বহুক্ষেত্রে বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি। এখানে কয়েকটির কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীতে দেবীচরিত্র মৃণালিনী কোন অপরাধে স্বামী কর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হইয়াছিলেন? দেবী-চৌধুরাণী উপন্যাসের ভিত্তিই হরবল্লভের ভ্রান্তি। প্রফুল্লের মাতার চরিত্র সম্বন্ধে অকারণ ভ্রান্ত ধারণা হইতেই প্রফুল্ল পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। ভ্রমরও স্বামীর ভ্রমে কতই না যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকে নিরপরাধা সতী ডেসডিমনা স্বামী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা হারমিয়নী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও নির্ব্বাসিতা হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। সিম্বেলিন নাটকে যে পস্থিউমাস ইমোজেনকে ভালবাসার ফলে রাজ-আজ্ঞায় চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কত সহজে তিনি ইমোজেনের চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা সন্দিহান হইয়া তাঁহার হত্যার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভ্রম-প্রমাদে প্রেমের বিনষ্টির এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারা যায়।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার দেবতাসদৃশ পরমহিতৈষী খুল্লতাত বসন্ত রায়কে স্বহস্তে নিধন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ' উপন্যাসে গৃহিণীর এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে রাজলক্ষ্মীর আচরণে নির্দ্দোষ মধ্যমা বধূ ও অন্নপূর্ণাকে কতই না ক্লেশ-ভোগ করিতে হইয়াছিল! তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র বড় ভাই শশী-ভূষণের আচরণে আদর্শচরিত্র সরলার শোচনীয় মৃত্যু ও সরলতার জীবন্ত মূর্ত্তি জ্যেষ্ঠগত-প্রাণ বিধুভূষণের দুঃখের কাহিনী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই সব উপাখ্যানে যাঁহাদের ভ্রান্তি হইতে নিদারুণ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল তাঁহারা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অপরের কথায় বা কার্য্যের ফলে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কেন বলিতেছে, কেন করিতেছে কেহই তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। সত্যই কি সংসারে এই সব ঘটনা নিত্যদৃষ্ট বিষয় নহে?*

* আমার 'প্রমাদ' নামক পুস্তকে এ সব বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।—লেখক

অমন্তের পথে

শ্রীনমিতা দেবী

আসে ওই মুক্তির আহ্বান,
অন্ধকারে বহু দূরে শুনিতেছি আলোকের গান।
ঘোরা রাত্রি থরথরি কাঁপে ছায়াপথ,
সপ্তর্ষির চক্ষু হতে ভেসে আসে আহ্বানের রথ।
উন্মাদল খসে আর জলে,
বুকের স্পন্দন আরো দ্রুতবেগে চলে।
যন্ত্রধূমে ভরে গেছে শান্তির আকাশ
মর্ত্তে ভরা বেদনার ঘন দীর্ঘশ্বাস,
মনের পঙ্কিল স্রোত আকাশেতে ভেসে ঐ যায়,
মানুষ করেছে বন্দী আজিকে আপনি আপনায়।

আমি যাব ছিন্ন করি এই সব অজস্র বন্ধন,
শুনিতেছি চারিদিকে নিঃশব্দ ক্রন্দন,
অজানিত মহাত্রাসে ধরণী হয়েছে অতি ভীতা,
মানুষের বেদনায় ভরা আজ তাহার কবিতা।
নিজে সে করেছে বন্ধ মুক্ত তার আনন্দের পথ,
মহাপাপ বিষবাষ্পে ভরা তার এ মনোজগৎ।

মুক্তি দাও—মুক্তি দাও মোরে,
দাও শক্তি মুক্ত করি শত বন্ধ ডোরে,
অমৃতের পেয়েছি সন্ধান,
গ্রহে গ্রহে শুনিয়াছি ভেসে আসে মুক্তির আহ্বান

মোর মুক্তি দিয়ে আমি মুক্তি লব জিনে,
মোর সব সীমা দিয়ে অসীমের বীণে
বাজাব অসীম সুর,
সঙ্গী মোর বিদ্রোহী সে তরুণ গরুড়।
দিকে দিকে হাহাকার মরণের ক্ষুধা,
জীবন-সাগর মথি'—মৃত্যুঞ্জয় করিতে বসুধা—
সে আজিকে দিতে চাহে পানপাত্র ভরি,
নিষ্পাপ সন্তানে বুঝি পরিপূর্ণ করি!
স্বর্গ হতে আরো উচ্চে—আরো ঊর্দ্ধলোক
আমার এ তৃষ্ণা দিয়ে এ অনন্ত পরিপূর্ণ হোক।

পরমেশ

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে চলার পথে অনেকের সঙ্গেই হঠাৎ আলাপ হয়। বাস্তবের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সর্বক্ষণই মানুষের মানুষ নিয়ে কারবার। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য অচেনা কাউকে অতর্কিতে কাছে পেলে কথা আপনি থেকেই ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে আসে। তবে এই যে দিনের পর দিন নানা লোকের সঙ্গে নানা সূত্রে অজস্র আলাপ, এর মধ্যে প্রায় সমস্তই ক্ষণিকের পরমায়ু নিয়ে আসে। তবু এই অসংখ্য ক্ষণিকের ক্ষণভঙ্গুর হঠাৎ আলাপের মাঝেও দু'একজন দুর্দান্ত ব্যতিক্রমে এগিয়ে আসে আলাপের স্বল্প পরমায়ুকে দীর্ঘায়িত করে রাখতে।

পরমেশের সঙ্গে আমার হঠাৎ আলাপকে অনায়াসে এই ব্যতিক্রমের তালিকায় ফেলা যেতে পারে।...

রাস্তার গ্যাসের আলো অন্ধকারের কালো পদক্ষেপের আনাগোনা অনেকক্ষণ জানিয়ে গেছে। আমার গন্তব্য স্থানে ট্রাম থামতেই কোথা থেকে জানি না অতর্কিতে নামল বৃষ্টি। ভাগ্যিস সঙ্গে ছাতা ছিল, যা সচরাচর থাকে না—বৃষ্টির অতর্কিত আক্রমণ সামলে নিলাম। সামলে নিতেই চোখ পড়ল আর একজনের দিকে। আমি ছাড়া এখানে দ্বিতীয় যাত্রী ও-ই নেমেছে। নেমে লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত ভিজছে, কিংবা ভিজতে ভিজতে ভাবছে ভেজার হাত থেকে পরিত্রাণের পথ।

'ওকি ভিজছেন কেন, আসুন না আমার ছাতায়।' দু' পা এগিয়ে এলাম বলতে বলতে—কি যেন ভাবছিল সে। স্পষ্ট দেখলাম আমার ডাক কানে যেতেই একটু চমকে উঠল। তারপর জড়সড় ভিজে দেহটা টেনে আনল আমার পাশে, ছাতার তলায়—কেমন এক রুক্ষ সঙ্কোচে। সামান্য একটু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, থ্যাঙ্ক ইউ।' সেই হাসিতে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গাল একটু টোল্ খেলে, দু'চারটে কালো ময়লা দাঁত বেরিয়ে এল। তবে হাসিটা এমন নীরব ও নির্জীব যে ও হাসি আনন্দ না দুঃখের, সঙ্কোচ না কৃতজ্ঞতার বুঝতে পারা গেল না।

'আপনার কদ্দূর?' যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম।

'এই ত কাছেই, দ্বিতীয় মোড়টা পেরোলেই।' জবাব এল।

'তবে ত ভালই। চলুন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে।'

'হ্যাঁ চলুন।' ওর জড়তা কেটে এসেছে অনেকটা।

ট্রামে অনেকক্ষণ বসেছিল পরমেশ। দেখেছি। এখন খুব কাছে পেয়ে ভাল করে দেখলাম। খোঁচা খোঁচা দাড়ির সঙ্গে তাল রেখেছে মাথার এলোমেলো রুক্ষ চুল।. রোগা দেহটা উচ্চতার সঙ্গে সমতা রাখতে না পেরে পিঠ থেকে সামনে কতকটা ঝুঁকে পড়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদেও বিশ্রী অবস্থা। হাবভাব এবং কথাবার্তাও অসাবধানতার আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।

'রেন্‌কোট বা ছাতা এই দুটোর একটাও না নিয়ে এই বৃষ্টির সময় কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় নাকি?'

ওকে সচেতন করার জন্যেই প্রশ্নটা তুললাম। পরমেশ উত্তর দিতে গিয়ে হাসল একটু। সেই দুর্বোধ্য হাসি। তারপর বলল, 'তা ঠিক। তবে যার দুটোর কোনটাই নেই?'

ওর জবাব লঘু পরিহাসে তোলা আমার প্রশ্নটাকে লজ্জায় স্তব্ধ করে দেবার মতই। তবু একেবারে থমকে না গিয়ে ভাবলাম, নিজের সত্যিকারের অবস্থাই সে প্রকাশ করেছে, না ভাল কিছু বলতে হবে বলে ভেবেচিন্তে বেশ একটা জুৎসই জবাব বার করেছে? আমার ক্ষণিকের অপ্রস্তুত ভাবটা হয় ত ওর চোখ এড়ায় নি। কেননা পরেই সে যে কথায় নামল তা তখনকার প্রসঙ্গ থেকে একেবারে পৃথক।

'আপনার বাসা কোথায়?'

'ওই ত।' হাতের একটা আঙুল লম্বা করে দেখালাম। বাড়ী ও আমাদের দূরত্বটা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে বর্ণনার চেয়ে হাত তুলে দেখানই বেশী সহজ।

'ও, তা হলে আমরা ত বেশ কাছাকাছিই থাকি।'

'তাই ত পরিচয় হতে এত দেরি লাগল।' পরমেশের হাসিটা এবার আমি নিজের মুখে টেনে নিলাম।

বৃষ্টিটা টিপটিপে নেমেছিল, বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতে আবার চেপে ধরল।

'ছাতাটা মাথায় দিয়ে আপনি যান পা চালিয়ে।' ঘরের দরজায় দু'পা দিয়ে বললাম। 'এ বৃষ্টি সারা রাতে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

পরমেশ কথা তুলল, 'আর আপনি?'

'আমার জন্যে ভাববেন না, আমার ছাতা, রেন্‌কোট দুই-ই আছে।' কথাটা বলেই নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম। 'না, মানে রাত্তিরে আর ছাতার কি দরকার হবে!'

পরমেশ এ ভাবে তাকাল, মনে হ'ল কোন কথা তার কানে যায় নি। বৃষ্টির বেগের সঙ্গে এবার যোগ দিলে দুরন্ত হাওয়া। পরমেশের মাঝে তাড়ার কোনই আভাস না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাড়া দিলাম, 'তাড়াতাড়ি বাড়ী যান মশাই, দেখছেন না জল বেড়েই চলেছে। ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন গিয়ে।'

সার্ট আর ধুতির দু-একটা জায়গা হাত দিয়ে অনুভব করল পরমেশ। 'জামা কাপড় আমার খুব ভিজেছে কি?'

'খুব না হলেও ভিজেছে বৈকি। আর ভিজে কাপড়ে বেশীক্ষণ থাকলে অসুখ করতে পারে।'

'অসুখ? হ্যাঁ হতে পারে। ঠিক বলেছেন আপনি।' পরমেশ

বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল। তার পর দরজার কোণে দাঁড় করানো ভিজে ছাতাটা টেনে নিলে। ভেবেছিলাম হাবভাব দেখে, পথে নামবে। কিন্তু এগোল না, ছাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'ইয়ে, সারাটা দিন কেমন খটখটে রোদ ছিল দেখেছেন, আর এখন হঠাৎ কোত্থেকে বৃষ্টি!'

বললাম, 'ও অমন হঠাৎই আসে।

'ঠিক, ঠিক বলেছেন। যেমন ভালবাসাও হয় হঠাৎ, বিচ্ছেদও হয় হঠাৎ।' হাসল পরমেশ। সেই অর্থহীন, উদাসীন হাসি। তারপর দু'পা এগিয়ে থামল আবার। 'চা খাওয়াবেন? এক কাপ কড়া গরম চা? চা খেলে বেশ তাজা মনে হয়। আপনার মনে হয় না? চা খাবার এই ত সময়। আপনার খেতে ইচ্ছে করছে না?'

কথার স্রোত কোথা থেকে কোথা গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, ভেবে হদিস পেলাম না।

প্রথম পরিচয়ের ক্ষণ থেকেই পরমেশকে পরম বিস্ময় মনে হচ্ছে। এক কাপ চা খাওয়ানো বড় কথা নয়। তবে আবার বৃষ্টি ভেঙে মোড় অবধি যেতে হবে। কেননা ওখানে আমার কেউ নেই, আর থাকলেও ঘরে এ সময়ে চা তৈরি হ'ত কিনা বলা যায় না। পরমেশের কথায় যে কয়টা প্রশ্ন ছিল এক রকম এড়িয়েই গেলাম সবগুলোকে।

'ও তবে থাক।' পরমেশ এবার সত্যি সত্যিই যাবার জন্যে তৈরি হ'ল। ছাতিটা খুলে একটা পা ফুটপাথে নামিয়ে আবার থেমে গেল। তবে তা মুহূর্তের জন্য। ঘাড় ফিরিয়ে জানাল, 'তবে এই বৃষ্টি-বাদলায় চায়ে চুমুক দিতে লাগত বেশ।' তারপর পরমেশের রোগা লিকলিকে দেহটা কালো ছাতার নীচে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। একঘেয়ে শ্রাবণের ধারায় কালো ছাতিটা অনেকক্ষণ নড়তে লাগল কালো বিন্দু হয়ে।

শ্রাবণের সেই রাতে পরমেশের কথাই আমার একান্ত ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। এই রকম পথে ঘাটে দেখা অনেকের সঙ্গেই হয়, কিন্তু পরমেশ এমন ভাবে কাছে এল, আকস্মিক হঠাৎ আলাপের সাধারণ পরিণতির মত হঠাৎ মিলিয়ে যাবার জন্যে নয়। সামান্য আলাপে ওকে আর কিছুই চেনা গেল না, বরং যেটুকু চেনা হ'ল তাতে কৌতূহলই বেড়ে উঠল—যা সচরাচর ঘটে না। আর সত্যিই ওর হালচাল, কথাবার্তা স্বাভাবিক লোকের মত সহজ নয়। অতর্কিত বৃষ্টির সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত পরিচয়ের সহসা মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। ছাতা ফেরাতে আসতে হবে পরমেশকে। না এলেও এত কাছাকাছি আছি, দু'পক্ষই জানবার পরও দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয় কোনমতেই।

ছাতা ফেরাতে পরদিন সকালেই হাজির পরমেশ। আশা করি নি, তাই বললাম, 'ফেরত দেবার এত তাড়া কি ছিল? পরমেশ হাসল। সেই হাসি। বললে, 'বর্ষার দিনে ছাতার দরকার সব সময়। তাই ওটা বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়।'

'না না, সেজন্যে ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না। আমার তো রেনকোট আছে।' সত্যি কথা ও সত্যি ইচ্ছাই ব্যক্ত করলাম। ছাতা আমি কালে-ভদ্রে ব্যবহার করি। বেশীর ভাগ সময় ওতে ময়লা আর ঝুলের বাসা বসে।

'তা হোক। কাল ওটা দিয়ে অসময়ে আপনি আমার সাহায্য করেছেন, আমার কর্তব্য যত শীগ্‌গির সম্ভব ফেরত দেওয়া। নইলে আপনার উপকারের অপমান করা হবে।'

পরমেশের কথাগুলো আমায় বেশ একটু লজ্জায় ফেলল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না, এ আর কি এমন বড় কাজ! এ ত সব মানুষই করে থাকে।'

পরমেশ প্রতিবাদ করতে দেরি করল না। 'উঁহু, তাই বলে আপনি আপনার প্রাপ্য প্রশংসা এড়িয়ে যেতে পারবেন না।'

কাল রাতের পরমেশের চেয়ে আজ সকালের পরমেশকে অনেক সহজ, অনেক সরল মনে হচ্ছে। রহস্যের দুর্বোধ্য অবগুণ্ঠন ও যেন রাতারাতি সরিয়ে ফেলে সকাল হতেই সহজ হয়ে নেমেছে। তবু বৃষ্টির রাত্রে ছাতা দিয়ে সাহায্য করবার প্রতিদানে এতখানি প্রশংসা আমাকে সহজ ভাবে মুখ খুলতে বাধাই দিচ্ছিল। যা হোক বাধা যে এনেছিল, সেই-ই বাধা সরিয়ে নিলে, একটু পরেই পরমেশ বললে, 'ইয়ে, সকালেই ছুটে আসার আরও একটা কারণ আছে। আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।'

হাসলাম। 'ভালোই।'

'আমারই শুধু নয়, বাড়ীর সকলেরই।'

'আরও ভাল। আপনার ভাল লাগাটা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু বাকী সকলের? ওরা না দেখেই ভালবেসে ফেলল?'

'না দেখলেও আমার মুখে সব শুনেছে ত।' পরমেশ ওদের সমর্থন করল। বললাম, 'আপনি আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

হলেই বা ওরা বিশ্বাস করে কই? ছাতা নিয়েই কথা উঠল। বলে, 'কার ছাতা, কোত্থেকে পেলি?' বলি, এক ভদ্রলোক দিয়েছে—তা মানতেই চায় না। বলে কোত্থেকে গেঁড়িয়েছি। শুনুন কথা একবার।' বেশ খানিকটা হাসল পরমেশ। এই প্রথম ওর হাসিতে প্রাণ দেখলাম।

ওর উপর বাড়ীর লোকজনের এমন হীন সন্দেহে অবাকই লাগল। এমন কথা কখনও শুনিই নি। তাই সন্দেহ ও দ্বিধার প্রশ্ন করলাম, আপনি চুরি-টুরি করেন নাকি?

হেসেই উড়িয়ে দিলে পরমেশ। 'আপনিও যেমন, ওদের কথায় কান দিতে আছে নাকি! ওরা অমন বলেই। আরে মশাই, চুরি আবার ভদ্রলোকে করে নাকি!'

সন্দেহ কতকটা গেলেও চুরি যে শুধু ছোটলোকেই করে পরমেশের এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারলাম না।

পরমেশই আবার কথা বলল। এবার অন্য প্রসঙ্গ, আপনাকে কিন্তু আমার বাড়ী যেতে হবে।

যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব।

চলুন না, যাবেন এখ্‌খুনি ? পরমেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এখন হবে না, কাজ আছে একটু। যাব একদিন।

'সেই ভাল'। পরমেশ চারদিকে তাকাল কিছুক্ষণ। 'ইয়ে, ঘরটা আপনার দিব্যি সাজানো-গুছানো।'

তা বলতে পারেন।

আপনি একাই থাকেন ?

একাই।

আর কেউ নেই বুঝি ?

আছে। তবে এখানে কেউ থাকে না।

পরের প্রশ্ন উঠল, বিয়ে করেছেন ?

এখনও নয়।

'ভাল'। পরমেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হ'ল। 'একা থাকেন, একার পক্ষে ঘরটা বেশ বড়। এখানে দু'জনও থাকতে পারে, কি বলেন ?

তা পারে।

সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ বলে উঠল, আমায় থাকতে দেবেন ?

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই ভেবে চিন্তে সময় নিয়ে জবাব দিলাম, আপনি এখানে থেকে কি করবেন ?

আরামে পা ছড়িয়ে ঘুমোব, বসব, হাঁটব।

প্রয়োজনটা হয়তো সত্যিই। সেখানকার ছোট্ট বাড়ীতে অনেকের ভিড়ে ঘুমোনো, বসা, হাঁটার স্থান পাওয়া সমস্যা। তবুও রাজী হতে পারলাম না। ওখানে সকলে কষ্ট করবে, আর আপনি স্বার্থপরের মত এখানে আরাম করবেন, সেটা কি উচিত, না সেটা ভাল দেখায় ?

সহজেই মেনে নিলে পরমেশ। বললে, ঠিকই বলেছেন আপনি, সেটা উচিত হবে না, না ?

কোনমতেই না।

'তবে থাক।' পরমেশ একটু পরে আবার চারপাশে তাকাল। 'ইয়ে, আপনি নেশা-টেশা করেন না নাকি ?'

ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিসের নেশা ?

এই বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি আর কি।

না। কেন বলুন তো ?

না কিছু নয়, মানে তা হলে এখন একটা সিগারেট টানা যেত—বলেই পরমেশ উঠে দাঁড়াল।

চললেন ?

হ্যাঁ চলি। আসব আবার।

নিশ্চয়ই আসবেন।

একটা ঘর নিয়ে থাকি। ভোজনপর্ব হোটেলে চলে। এই করেই কলকাতায় কাটাচ্ছি অনেক দিন থেকে।

দুপুরে খেতে খেতে ম্যানেজার শুধাল, কাল রাত্রে আপনি কোন লোক পাঠিয়েছিলেন ?

'আমি ?' অবাক হলাম।

হাঁ, আপনার নাম করে দু'কাপ চা খেয়ে গেছে।

লোকটাকে কেমন দেখতে বলুন ত ?

লম্বা, রোগা, একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একটু পাগলাটে ধরণের।

চিনতে সময় লাগল না। পরমেশ। শুনে বেশ রাগ হ'ল। ও নির্জীব উদাসীন মোটেই নয়, বেশ বদমায়েস আছে। আঁকা-বাঁকা, এলোমেলো কথার ফাঁকে ফাঁকে ও দিব্যি এটা-সেটা চেয়ে বসে। নিজের সম্বন্ধে সব সময় বেশ সচেতন।

নীরবে খাওয়া শেষ করে উঠে গেলাম।...

বিকেলেই আবার পরমেশের সঙ্গে দেখা। ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। একগাল হাসির সঙ্গে ও সম্ভাষণ করল, 'এই যে, ভাল আছেন ত ?

দুপুরে ম্যানেজারের কাছে কুকীর্ত্তির ইতিবৃত্ত শোনা অবধি মনটা ওর ওপর বিশেষ বিরূপ ছিল। তা ছাড়া সকালেই সবেমাত্র যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বিকেলবেলা দেখা হতেই আবার তার কুশল জিজ্ঞাসা করার কি এমন দরকার উথলে উঠল! শুষ্ক জবাব দিলাম, 'ভালই।'

'দেখছেন ত মজাটা, কাল সারারাত কেমন তেড়ে বৃষ্টি হ'ল, আর আজ খটখটে রোদ।'

'দেখছি।'

'আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম, দেখা হয়ে গেল—ভালই হ'ল।'

'কেন, কিছু দরকার আছে নাকি ?'

'দরকার ? না, তেমন কিছু নয়।' একটু ইতস্ততঃ করল পরমেশ। 'ইয়ে, দশটা টাকা দিতে পারেন ?'

আবার সেই চাওয়া! শুধালাম, 'টাকা কি হবে ?'

'বড্ড দরকার। সংসার চলে না যে!'

'এই ত পয়লা গেল। মাইনে পেয়েছেন দিন পাঁচেকও হয় নি; এরই মধ্যে আবার টাকার দরকার ?'

'মাইনের টাকা ? সে ত সেদিনই শেষ হয়ে গেছে।' পরমেশ বেশ গর্ব্বের সঙ্গে জানাল!

'শেষ হয়ে গেছে! করলেন কি ?'

'বেহালা কিনেছি।'

এ জবাবের জন্য তৈরি ছিলাম না। ভেবেছিলাম কোন একটা কুকাজে টাকাগুলো উড়িয়েছে।

'বেহালা কিনেছেন!'

'হাঁ।' আমার কথায় বিস্ময়ের সুর ওকে অবাক করেছে মনে হ'ল। 'খুব ভাল বেহালা, পুরো একশো টাকা দাম নিলে। তাও বেশ কমে পেয়েছি। চলুন না একদিন, শোনাব। খুব ভাল একটা গৎ শিখেছি।'

বললাম, 'এভাবে নিজের জন্যে টাকা নষ্ট করে সংসারের সবাইকে কষ্ট দেওয়া, আর ইচ্ছে করে অভাব টেনে এনে পরের কাছে হাত পাতা—এমন অপরাধের মার্জ্জনা নেই।'

পরমেশ একটু যেন দমে গেল আমার কথায়, তবু বলল, 'নষ্ট? না না, নষ্ট নয়। আর এ আমার একার জন্যে ত নয়। বেহালার তারে তারে যে সুর ঝরে সে সুর ত আমার একার নয়, সে সকলের।'

'থামুন।' ধমকে উঠলাম। 'যাদের দু'বেলা পেট ভরে না, তাদের এ সখ করতে লজ্জা করে না?'

আমার ধমকে থমকে গেল পরমেশ। দেখলাম মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর কোন কথা না বলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ধমকে দেবার পরমুহূর্তেই মনটা আমার অনুশোচনায় ভরে উঠল। অতখানি শক্ত না হলেই হ'ত!

'ইয়ে, একটা কথা একেবারেই মনে ছিল না। ভুলেই গিয়েছিলাম।' একটু পরেই আবার কথা বললে পরমেশ।

'কোন কথা?'

'সেই বৃষ্টির রাতে যখন আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হ'ল, চা খেতে চাইতে আপনি বললেন, আবার মোড়ের মাথায় হোটেলটায় যেতে হবে। বুঝলাম ঐ হোটেলটায় আপনি খান টান। ফেরার পথে আপনার নাম করে ওখানে দু' কাপ চা সাঁটিয়ে এলাম। দেখুন দিকি, এ খবরটা আপনাকে দিতেই ভুলে গেছি।'

কোন জবাব দিলাম না। জবাব না পেয়ে সে আবার শুধাল, 'রাগ করলেন কি?'

'না ত।'

'করলেও কিছু বলতাম না। মা, বউ, সবাই রাগ করে রোজই। ও আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।'

'কেন?' শুধালাম।

'কি জানি, মেয়েদের মন!' মুখ কুঁচকাল পরমেশ।

দশ টাকার একটা নোট বার করলাম এবার। 'নিন।'

'সত্যি দিলেন তা হলে?'

'হ্যাঁ। সত্যিই।'

দুটো চোখ বড় বড় করে তাকাল পরমেশ। তারপর এক রকম ছোঁ মেরেই নোটটা টেনে নিয়ে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল।

পরমেশ লোকটা এমন, যতই সে খারাপ কাজ করুক তার উপর রাগ করে বেশীক্ষণ থাকতে পারা যায় না। এর একটা কারণ এই যে, নিজের অপরাধের জন্য যা কিছু তিরস্কার, সমালোচনা, অপমান প্রাপ্য সব সে নীরবে মেনে নেয়। প্রতিবাদের চেষ্টা করে না। তাই ত অবাক লাগে।

যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে উঠে না, একদিন পরমেশ এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেল।

দেখলাম সব। ছোট্ট বাড়ী। অপরিষ্কার, ময়লা, ক্ষত-বিক্ষত দেয়ালের তিনটি ঘর। এখানে একগাদা অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট মানুষের ভিড়! অনেকগুলি অর্দ্ধনগ্ন রুগ্ন ছেলেমেয়ে কঙ্কালসার অহেতুক সোরগোল করছিল। তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে পরমেশ আগেই সন্দেহভঞ্জন করে দিল, সব তা বলে আমার নয়। দাদার, দিদির ও অন্যান্যদেরও আছে।

হেসে বললাম, 'না বললেও সন্দেহ হয়েছিল।'

পরমেশের মা বিধবা। ছেলের সঙ্গে আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। এস বাবা, এস। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। তোমার নাম করতে খোকা ত অজ্ঞান।

আমার সৌভাগ্য।

ও বাবা, তুমি যে দাঁড়িয়েই রইলে, বস। কিসেই বা ছাই বসবে, ঘরে চেয়ারও নেই একটা। ওরে টেঁপি মাদুরটাই না হয় আন। ও হরি, সেটাও ত আবার ছিঁড়ে কুটি-কুটি হয়েছে। হতভাগা আঁকুটেগুলির জ্বালায় কোন জিনিষ কি আস্ত থাকতে পারে?

ওদের ব্যস্ততায় বিব্রত হয়ে বললাম, 'থাক না, এই তো বেশ ভাল।'

না না, সে কি হয়! দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। হতভাগারা হাঁ করে হাঁদার মত দেখছিস কি, রান্নাঘর থেকে একটা পিঁড়েই নিয়ে আয় না।

ধমক খেয়ে একটা ছোট ছেলে পিঁড়ে নিয়ে এল।

পরমেশ এতক্ষণ পর এবার কথা কইল, 'ইয়ে, চা খাবেন ত?'

খাবার হাঙ্গামায় ওদের ফেলবার ইচ্ছে ছিল না। বললাম, 'চা-টা আবার কেন!'

'টা আবার কোথায়, শুধু চাই পাবেন।' দাঁতগুলো বার করে পরমেশ কেমন এক রকম হাসল।

ওর জবাবটা যে মোটেই শোভন হয় নি, মা পর্য্যন্ত থমকে যেতে তার আরও প্রমাণ হ'ল। ইচ্ছাকৃত নয় বলেই আমি আর বেশী মাথা ঘামালাম না। পেট আমার সত্যিই ভরপুর।

তা হোক, একটু চা খেলে কিছু ক্ষতি হবে না। মা বললেন। আর চা ছাড়া অন্য কিছু খাওয়াবার সামর্থ্যই বা আমাদের কোথায়!

পরমেশ বলল, 'একটু ভাল কাপে চা এনো মা।'

'থাম। তোর সংসারে সকলের দু'বেলা পেটের ভাত জোটে না, ভাল কাপ আসবে কোত্থেকে?' তারপর আমার দিকে তাকাতে মা কেমন একটু লজ্জায় পড়লেন। 'না, না, তুমি এসব কথায় কিছু মনে করো না বাবা।'

চা এল। বেশ ভাল কাপেই এল, পাতলা কালো জড়সড় মেয়েটা চা এনে দিলে। মাথায় লাল দাগ দেখে বুঝলাম, এ বাড়ীর বউ। কালো হলেও মুখখানা বেশ। রোগা, শীর্ণ দেহেও এখনও লেগে রয়েছে লাবণ্যের একটু স্নিগ্ধ ছোঁয়াচ। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে চোখ পড়ল রোগা হাতে। শিরগুলি উঁচু হয়ে রয়েছে। অনাবৃত হাতের আভরণ বলতে একটা সরু নোয়া নড়-বড় করছে শুধু।

ফেরবার পথে আমায় পৌঁছে দিতে এসে পরমেশ প্রায় বাড়ী অবধিই হাজির হ'ল।

রাস্তায় নেমেই প্রশ্ন তুলল, 'ইয়ে, উর্ম্মিলাকে কেমন লাগল?'

'উর্ম্মিলা!' নামটা কানে নূতন ঠেকল।

'হাঁ, আমার বউ। ওই যে চা দিয়ে গেল।'

'ও, বেশ ভালই।'

বউয়ের প্রশংসায় বেশ খুশী হ'ল পরমেশ। সবাই তাই বলে।

আর আপনি কি বলেন?

আমি? আমিও তাই বলি। তবে কি জানেন, ওর মেজাজ মোটেই ভাল নয়। সব সময় এমন কাঁট্ কাঁট্ ক'রে কথা বলে!

একটু কৌতুক বোধ করলাম। শুধালাম, 'তবু ওকে আপনার ভাল লাগে?'

'তা হোক, ওর মনটা খুব ভাল। মনই ত মানুষের সব, কি বলেন?' ও আমার দিকে সাগ্রহে তাকাল।

সায় দিলাম, 'সে ত নিশ্চয়ই।'

আমার সাড়া অনেকটা উৎসাহ দিল পরমেশকে। 'ইয়ে, আপনাকে বলতে লজ্জা কি, উর্ম্মিলাকে আমি খুব ভালবাসি।'

এ ত খুব ভাল কথা। সকলেরই বউকে ভালবাসা উচিত।

পরমেশ সগর্ব্বে বলে উঠল, সকলেই কি তাই করে? তারপরেই হঠাৎ সে অন্য পথে লাফিয়ে পড়ল। 'এই দেখুন, কি ভুলটা হয়ে গেল! আপনি আমাদের বাড়ী গেলেন, এতক্ষণ রইলেন, বেহালা শোনানোই হ'ল না। চলুন না, শুনবেন এখন?

যাবার ও শোনবার, দুটোর কোনটাই এখন ইচ্ছে করছে না। বললাম, 'আজ থাক। তবে একদিন।'

'আচ্ছা বেশ কাল, কেমন?

আচ্ছা।

ভোলে নি কিন্তু পরমেশ। পরের দিনই হাজির হ'ল একেবারে বেহালা নিয়েই। বললে, 'আজ আর কোনও কথা নয়, শুনুন।' বেহালার কথা রোজই শুনছি। আজ কৌতূহল হ'ল। দেখি ওর দৌড় কতদূর। বললাম, 'বেশ শোনাও।'

পরমেশ সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করল। কিন্তু আজ ওর বাজনা সত্যিই ভাল লাগল। তারগুলোতে সত্যিই ও ছড়ের টানে বাঙ্ময় করতে পারে। মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন বেরিয়ে এলো, 'বাঃ, সাবাস।'

পরমেশ খুশীতে মাথা নেড়ে উঠল। 'আপনি গুণী লোক, গুণের আদর না করে থাকতেই পারবেন না। কিন্তু বাড়ীর সবাই, ওরা মানতেই চায় না। বেহালায় হাত দিলেই বউ তো খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে।

হেসে বললাম, 'সংসারের নানা কাজে ওরা ব্যস্ত, অভাবের আক্রমণে সব সময় উত্যক্ত; ওদের শোনবার সময় কোথায়, আর শোনবার মনই বা কোথায়? তাই এমন করে।'

'হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন; তাই হবে।' পরমেশ সহজেই মেনে নিলে। 'ইয়ে একটা কথা বলব?'

'কি?'

'বেহালাটা আপনার ঘরে রাখবেন? এখানে অনেক জায়গা, ছেলেমেয়েদের ভিড় নেই, কেউ হাত দেবে না, ভাঙবে না। বাড়ীতে সব সময় এটা আগলে রাখতে রাখতে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

বললাম,' বেশ ত'

বেহালাটা রেখে চলে গেল পরমেশ। মিনিট পাঁচেকও হয়েছে কিনা সন্দেহ, আবার সে হাজির।

ওর এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসাতে অবাক লাগল। 'কি হ'ল?'

না কিছু নয়। মানে বেহালাটা নিয়ে যেতে এসেছি।

নিয়ে যেতে! কেন, আমাকে বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

না না তা নয়, তা কেন—পরমেশ জুৎসই কোন জবাব দিতে পারল না। বেহালাটা হাতে নিয়ে কোনরকমে সরে পড়ল।

দিন দশেক আর কোন পাত্তা নেই পরমেশের। ওর সঙ্গে রোজ এক বার দেখা হওয়া একরকমের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই এই দীর্ঘ অদর্শন কেমন যেন বেসুরো মনে হ'ল। পরমেশের দোষগুণ যা কিছুই থাকুক, ওর সঙ্গ মন্দ লাগত না।

এত দীর্ঘ অনুপস্থিতি ওর পক্ষে অস্বাভাবিক বৈকি। অসুখ-বিসুখ কিছু হ'ল নাকি! অনেককিছু ভেবে শেষে এক দিন ওর বাড়ীতে হাজির হলাম।

মা বললেন, কি জানি কোন চুলোতে গেছে হতভাগাটা। আমার হাড়-মাস্ চিবিয়ে খেল সারাজীবন। স্বভাব শুধরোবে বলে বিয়ে দিলুম, ও মা, তাতেও সেই যে-কে সেই!

শুধালাম, কোন চুলো মানে? কি বলছেন আপনি!

কি জানি কোন সেই জুয়োর আড্ডায়। জুয়ো খেলছে আর গাদা গাদা মদ গিলে মরছে। মার কণ্ঠ শুষ্ক আর্ত্তনাদের মত শোনাল।

মানে? এতক্ষণেও কিছু আমার বোধগম্য হ'ল না। কার কথা বলছেন আপনি? আর এসবই বা কি বলছেন?

কার আবার, তোমার হারমজাদা বন্ধুটির কথা। তার পর মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। ওমা, তুমি বুঝি কিছুই জান না?

না ত!

ও ছেলেটা আমার একেবারেই গোল্লায় গেছে। হতভাগা মাতাল, জুয়াড়ী। যা পায় মদ টেনে আর জুয়ো খেলে ওড়ায়। নিজের সর্ব্বনাশ করল, নিজের বউ, ছেলেমেয়ে, সংসার সব ছারখার করল। ও আমার সারা জীবনের অশান্তি।—মার রুক্ষ চোখে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

আশ্চর্য্য। এ যেন এক নূতন কাহিনী। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। বললাম, আশ্চর্য্য ত। এ রকম কবে থেকে?

এ রোগ অনেক দিনের। মা জানালেন।

দেখে ত আমার সন্দেহ হয় নি কোন দিন।

তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে এই ক'দিন বেশ ভাল ছিল। ও পথ মাড়াত না। আবার সুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে এমনি হয়, ক'দিন বেশ হাসিখুসি, কে বলবে ও মন্দ, তার পর হঠাৎ বদলে গেল।

এখন বাড়ী আসে না নাকি?

এই তো পরশু এসেছিল। টলতে টলতে মাঝরাতে এল, হৈ-হল্লা করল কিছুক্ষণ। খুব গালাগাল দিলাম। শুনে হি হি করে হাসল। ভোর হতে না হতেই আবার পালাল।

মাকে সান্ত্বনা দিলাম, আমি বলছি ও ভাল হয়ে যাবে। এবার একেবারেই ভাল হয়ে যাবে।

তাই যেন হয়। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

মনটা পরমেশের সত্যি ভাল।

আমার পোড়া কপাল; মন নিয়ে কি হবে আর! মা বললেন, ভাল সখের মধ্যে আছে এক বেহালা। তাও আবার উৎকট সখ। পুরো মাইনের টাকা দিয়ে ঝট করে নতুন একটা কিনে ফেলল! শুনে এত দুঃখের মাঝেও আলোর ঝিলিক দেখতে পেলাম। তা হলে আমায় সেদিন মিথ্যা বলে নি পরমেশ। বেহালাকে সত্যিই সে ভালবাসে দেখছি।

বললাম, 'কিন্তু বাজায় সে চমৎকার।'

মাকে খুশি করবার জন্যে একথা মোটেই বলি নি। এটা সত্যিই আমার ধারণা। তবু মা নীরস মুখে বললেন, 'ছাই।'

মাকে সেদিন বলেছিলাম, এবার ও একেবারেই ভাল হয়ে যাবে। সেই কথাগুলিই আমার মনে গুন্ গুন্ করতে লাগল। খুঁজে বেড়াই পরমেশকে। কিন্তু পেলাম না। রোগা, রুক্ষ, এলোমেলো চেহারা, অদ্ভুত হাসির সেই ছেলেটা চিরকালের মত হারিয়ে গেল নাকি?

আবার খোঁজ করলাম বাড়ীতে। শুনলাম কালই রাতে এসেছিল। এবার অনেক শান্ত, বেশী হৈ-হল্লা করে নি। সারা রাত ধরে একমনে বসে শুধু বেহালা বাজিয়েছে। সকাল হতেই চলে গেল আবার। তাই ত অল্পের জন্যে ফসকে গেল! বড় আক্ষেপ হ'ল।

অবশেষে দু'দিন পরে ওকে আবিষ্কার করলাম এক ঘোলাটে সন্ধ্যায়। ট্রাম লাইন পার হয়ে সে আস্তে আস্তে হাঁটছিল—বাড়ীর দিকেই হয় ত। আমায় দেখে থেমে গেল।

এই যে, ভাল আছেন ত? সেই বিচিত্র নির্জীব হাসি অনেক দিনের পর।

তা আছি। কিন্তু ও যে ভাল নেই, ময়লা পোশাক, লাল চোখ, কালসিটে আঁকা চোখের কোল, টলমল দেহ—সবই তার প্রমাণ দিচ্ছে।—"কিন্তু আপনি কোথায় এতদিন অজ্ঞাতবাস নিয়েছিলেন শুনি?'

'অজ্ঞাতবাস!' কথাটা উচ্চারণ করে পরমেশ কৌতুকে হেসে উঠল। 'কে বললে, রোজই ত বাড়ী আসতাম, বেহালা বাজাতাম।'

'কে আবার, বাড়ীর লোকেরাই বলেছে।'

'ওদের কথায় কান দেবেন না। ওরা আমায় দেখতে পারে না, বিশ্বাস করে না। ওরা কি বলে জানেন, আমি নাকি মদ খাই! আপনিই বলুন, ভদ্দরলোকের ছেলে আবার মদ খায় নাকি? আচ্ছা দেখুন না, আমার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে কিনা।'

'থামুন।' আমি বললাম, আর বেশ কঠিন কণ্ঠেই, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি না।'

পরমেশ আশা করেছিল আমার কাছ থেকে ভরসা পাবে। আমার এমন অপ্রত্যাশিত জবাব ওকে একেবারেই দমিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে পা চালাল।

'কোথায় চললেন?' ওকে থমকে দিলাম।

'বাড়ীতে।' পরমেশ মৃদু কণ্ঠে জানাল।

'ঠিক ত?'

'বাড়ী ছাড়া মানুষ আর কোথায় যায়?' সেই হাসি পরমেশের।

'শুনুন? বাড়ী গিয়ে ভাল ছেলের মত থাকতে হবে এবার থেকে! আবার ওসব সুরু করলে ভাল হবে না, এখন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমাকে এখনও আপনি চেনেন নি।'

নীরবে শুনল পরমেশ, নীরবেই পা বাড়াল।

কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এল।

'ইয়ে।'

'আবার কি?'

'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, খাওয়াবেন কিছু?'

বললাম, 'আসুন।'

পরের দিন পরমেশের বাড়ীতে খবর নিতে গিয়ে শুনলাম, সন্ধ্যার দিকে এসেছিল—সকাল হতেই চলে গেছে। তবে এবারও একা যায় নি, বেহালাটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

শুধালাম, 'কোথায় গেছে জানতে পেরেছেন?'

মা ছিলেন না, ঊর্মিলাই কথা কইল। 'আপনার ওখানেই গেছে। আপনি নাকি বেহালা শুনতে চেয়েছেন।'

'আমি?' অবাক হলাম।

'হ্যাঁ, তাই ত বললে। আপনার সঙ্গে কাল বিকেলে দেখা হয়েছিল কি?'

'তা হয়েছিল।'

'ওকে আপনি পেট ভরে খাইয়েছিলেন?'

হ্যাঁ।

ঊর্মিলা ঘাড় নাড়ল, 'তবে ত ঠিকই আছে।'

ঠিক আছে? আমি ত তার কিছুই দেখছি না! আবার সেখানে পালিয়ে গেল না ত? কাল ওকে ধরে রাখলেই হ'ত। উন্মনা হয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলাম। না, পালায় নি সে। আশ্চর্য্য।

আমার বন্ধ ঘরের দরজার সামনে বেহালা হাতে সে আমারই অপেক্ষায় বসে।

'এই যে, সকালে উঠেই কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'আপনার ওখানে।'

'তাই নাকি ? আর আমি আপনার এখানে। দেখুন দেখি কি মজা !'

পরমেশ হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল।

বললাম, মজাই বটে।

নিন, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভেতরে চলুন। বাজনা শুনবেন না ? বেহালা শোনাব বলে কখন থেকে আমি বসে রয়েছি।

দরজা খুলে দু'জনেই ভিতরে এলাম। বললাম, নিন, সুরু করুন।

কিন্তু সুরু আর করল না পরমেশ। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বলল, এ বেহালা আমি আর বাজাব না।

অবাক লাগল, কেন, কি হ'ল ?

এটা বেচব আমি।

বেচবেন ! কেন ?

টাকা নেই, বাড়ীতে খাবার নেই। মা, বউ সবাই কাল খা-নয় তাই বলে বকাবকি করেছে।

ওঃ।

কিনবেন আপনি ? পুরো একশো টাকায় কিনেছি, পঞ্চাশে দিতে পারি। তার কম হবে না।

বেহালায় আমার দরকার নেই। চুপ করে রইলাম।

আচ্ছা চল্লিশ, আচ্ছা তিরিশ। পরমেশ সাগ্রহে তাকাল।

বললাম, না না, আমি কিনব না। ওতে আমার প্রয়োজন নেই।

'আচ্ছা কুড়ি।' আমার কথা মনে হ'ল ওর কানে যায় নি। 'না না, এর কমে দিতে পারব না। মাফ করবেন। দোহাই বলছি, পারব না—পারব না। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল পরমেশ। তার পর বেহালাটা বুকে আঁকড়ে ধরে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

হঠাৎ কি যে হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না। বুঝতে যখন পারলাম, পরমেশ অনেক দূর চলে গেছে। একলা ঘরে অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম। এতক্ষণের স্বচ্ছন্দ গতিকে পরমেশ বেসুরো তালে ভেঙে চুরমার করে দিলে।

বিকেলে গেলাম। পরমেশ বাড়ীতে বসে। দিব্যি হাসিখুশি। ঘটা করে অভ্যর্থনা করল। আজেবাজে নানা কথা পাড়ল। কথার ফাঁকে এক সময় শুধালাম, 'বেহালাটার কি করলেন ?'

'বেচে দিয়েছি।' হাসল সে। 'তিরিশটা টাকা পেলাম।'

মা কাছে ছিলেন, বললেন, 'সুবুদ্ধি হয়েছে খোকার। পুরো টাকাটাই আমার হাতে তুলে দিয়েছে।'

'ও টাকাটায় কসে ক'দিন মাছ-মাংস খাওয়া যাবে, কি বলেন ?'

'ভালই ত।' সায় দিলাম।

পরমেশের ঘাড় থেকে ভূত নেমেছে। আর ওদিকে যায় না। মন দিয়ে কাজকর্ম করে, সংসার করে। দেখেই ভাল লাগল। মনে মনে কামনা করতাম, ওই রোগ যেন না আসে। ওর স্নেহ-ময়ী মা, লাবণ্যময়ী উর্ম্মিলা, ছোট ছেলেমেয়ে---ওর কথা ভাবলে সবার আগে মনে পড়ত এই সব সরল, নিরপরাধ মানুষদের কথা।

তবু মাঝে মাঝে কষ্ট হ'ত পরমেশের জন্যে। বেহালাটা ছিল ওর বড় সখের, বড় আদরের। হাসিমুখে বেচে দিলে। কিন্তু ওই হাসির অন্তরালে একটা গোপন কান্না অহরহ ঝরছে কিনা, কে বলতে পারে !

রাত মন্দ হবে না। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঘরে বসে আলো জেলে নতুন একটা বিলিতি উপন্যাসে মেতে ছিলাম। হঠাৎ দরজায় শব্দ হ'ল। কে যেন দরজা ঠেলছে। বই রেখে এগিয়ে এলাম।

আর কেউ নয়, পরমেশ।

ইয়ে, কি করছেন ? ছোপ-খাওয়া দাতগুলো অনেক দিনের পর দেখা দিলে।

বিশেষ কিছু নয়, বই পড়ছিলাম। বসুন না।

হাঁ হাঁ, বসি। আপ্যায়নে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করল পরমেশ। ইয়ে, আপনার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম।

বেশ তো, বলুন।

গোটা তিরিশ টাকা হবে ?

কি করবেন ?

ইয়ে, বেহালা কিনব। দেখে এসেছি এক জনের বাড়ী। বেশ ভাল কন্‌ডিশানে আছে। আর খুব সস্তাতেই দিচ্ছে। মাত্তর ষাট টাকা। সস্তা নয়, কি বলেন ?

কি জানি, তবে আপনি যখন বলছেন, হবেও বা। কিন্তু আর একটা কিনতেই যদি হবে, আগেরটা তবে বেচলেন কেন ?

হাসল একটু পরমেশ। আগের বেহালাটা বেচবার কারণ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দেখেই হয়ত। ওটা কি আর ইচ্ছে করে বেচেছি ! বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে নি তিন দিন, সকলেই বেহালাটার দিকে লক্‌লক্ করে তাকাচ্ছে। একে তো সকলেরই ওটার উপর রাগ, তার উপর ও-ই এখন এই অবস্থায় কিছু টাকা জোগাড় করতে পারে। এর পর না বেচে উপায় ছিল ? তা নইলে ওই জিনিষ এত সস্তায় কেউ হাতছাড়া করে ?'

'তা বটে।' পরমেশ সত্যি কথাই বলেছে। সায় দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু বলার ছিল না।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল পরমেশ; তখন বুঝিনি কেন।

'যাবেন একবার আমার সঙ্গে লোকটার কাছে ?'

'কোন্ লোক ? কার কাছে ?'

'সেই যে, যাকে বেচলুম। ইয়ে, সত্যি বলতে কি, ওকে বেহালাটা বেচা অবধি মনটা আমার খুঁত খুঁত করছে।'

'কেন?'

'আরে মশাই, লোকটা নতুন বাজনা শিখছে; আমার বেহালাটাকে তছনছ করছে আর কি। আনাড়ি হাতে ভাল জিনিষ ক'দিন টিঁকবে। চলুন না, দেখি ব্যাটা করেছে কি বেহালাটার।'

হাসি পেল, তবু বুকটায় লাগল। বললাম, 'ওকে বেচেছেন, ওটা এখন ওর। যা ইচ্ছে করবে সে। তাতে আপনার কি?'

'তাই বলে বেসুরো বাজাবে, আনাড়ি টানে তারগুলো আলগা করে দেবে, মেরে ফেলবে স্বরকে?' পরমেশ মানতে পারছে না।

'হ্যাঁ।'

'গেল তবে বেহালাটা।' কান্না যেন কেঁপে উঠল।

বড় অসহায় মনে হ'ল পরমেশকে। পুরানো বেহালার দুঃখ-স্মৃতি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

'এই বেহালাটা কততে দিচ্ছে বললেন?'

'ষাট।'

'আমি যদি তিরিশ টাকা দিই, বাকী তিরিশ কোত্থেকে জোগাড় করবেন?' শুধালাম আবার।

দেবেন আপনি? ঠিক ত? পরমেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'ব্যস্, ত হলেই হ'ল। বাকী টাকা ঠিক হয়ে যাবে।'

'কি করে?' তবু প্রশ্ন করতে হ'ল।

'ইয়ে, আপনাকে বলতে আর আপত্তি কি! তবে উর্মিলাকে যেন বলবেন না। আপনি নাকি ওকে বলেছেন, আমি এবার একেবারেই ভাল হয়ে যাব। বেশ বলেছেন যা হোক।' পরমেশ হেসে উঠল। 'তবে ও বিশ্বাস করে নিয়েছে। আপনাকে দেখছি খুব মানে। কি দিব্যি করেছে জানেন, এবার কিছু করলে আমি নাকি ওর মরা মুখ দেখব। মেয়েরা কিন্তু বেশ টিকিটিকি করতে পারে!' আবার হাসি টানল পরমেশ।

ওর কথাগুলো একটুও ভাল লাগল না। পরমেশ যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আমার মনের সমবেদনা রুক্ষ দেয়ালে আছাড় খেল। বললাম, 'বলে যান।'

আমার স্তব্ধতায় পরমেশ কেমন যেন অস্বস্তির স্পর্শ পাচ্ছে দেখলাম।

'ইয়ে, মানে মোড়ের মাথায় একটা গনৎকার বসে দেখেছেন, ওকে এই হাত দেখিয়ে আসছি। ওই কি বলল জানেন? বলল, আমার এই হপ্তাটা হচ্ছে তাসের বরাত। তাস ছুঁলেই মাত। তাই ত এলুম সোজা এখানে। ইয়ে, 'আপনার তিরিশ টাকা তিন হাজার না করেছি ত, আমি বাপের ব্যাটা নই।'

ও থামতেই বললাম, 'টাকা আমি দেব না।'

'বারে, সে কি! এই ত বললেন।' পরমেশ অবাক হ'ল।

'আমার খুশি।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছেন তিরিশ টাকা মারা যাবে?'

'জুয়োখেলা ভাল নয়।' আমার কণ্ঠ গম্ভীর।

'কিছু ভাল নয়, কিছু ভাল নয়—আমি যা করি তা কিছুই ভাল নয়! তবে ভাল কি? সংসারে হাঁপিয়ে মরা ভাল? না-পেতে পাওয়া, পেতে হাত বুলিয়ে বসে থাকা ভাল? বলুন না, চুপ করে কেন? সবাই পরের হাতড়ে, পরকে ধাপ্পা মেরে বড় হ'ল, আর আমরা করলেই অপরাধ? আমাদের কিছু নেই, যারা আমাদের ছিনিয়ে বড় হ'ল তাদের দরজায় হাত পেতে অপমান পাওয়াটাই ভাল, হাতড়ে নিলেই অন্যায়? আমাদের বেলায় এমন নিয়ম কেন? চুপ করে থাকলে চলবে না। বলুন, কিসে আমি খারাপ, কিসে বাকীরা ভাল?' পরমেশ দু'হাতে আমায় ঝাঁকাতে লাগল।

শান্ত, উদাসীন পরমেশকে এমন উত্তপ্ত হতে দেখিনি কোন দিন। উত্তেজনায় সারা দেহ ওর কাঁপছে।

'বসুন, কি হচ্ছে? শান্ত হন, বলছি।'

'না না, আপনার জবাব চাই না। এ জবাব ওদেরই জবাব।'

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে সবেগে। সেই দুর্যোগে রাতের অন্ধকারে পরমেশ ছুটে নেমে গেল।
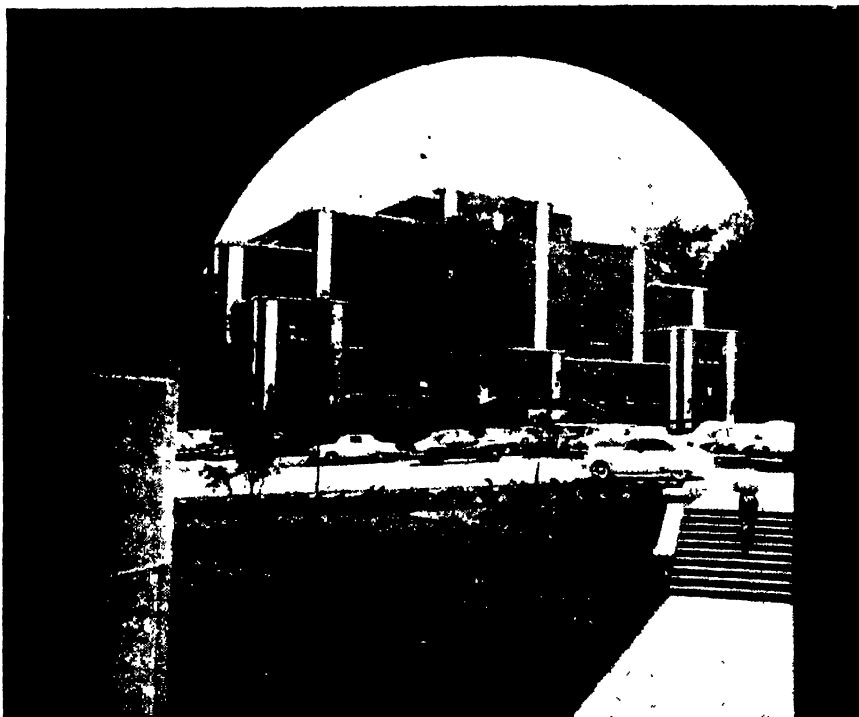
যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিলভানিয়া কলেজ—ষষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক গ্রাসল্যাণ্ড কংগ্রেসের অধিবেশন-স্থল

পেন্‌সিলভানিয়া কলেজের 'প্যাস্‌চার রিসার্চ্চ লেবরেটরী'
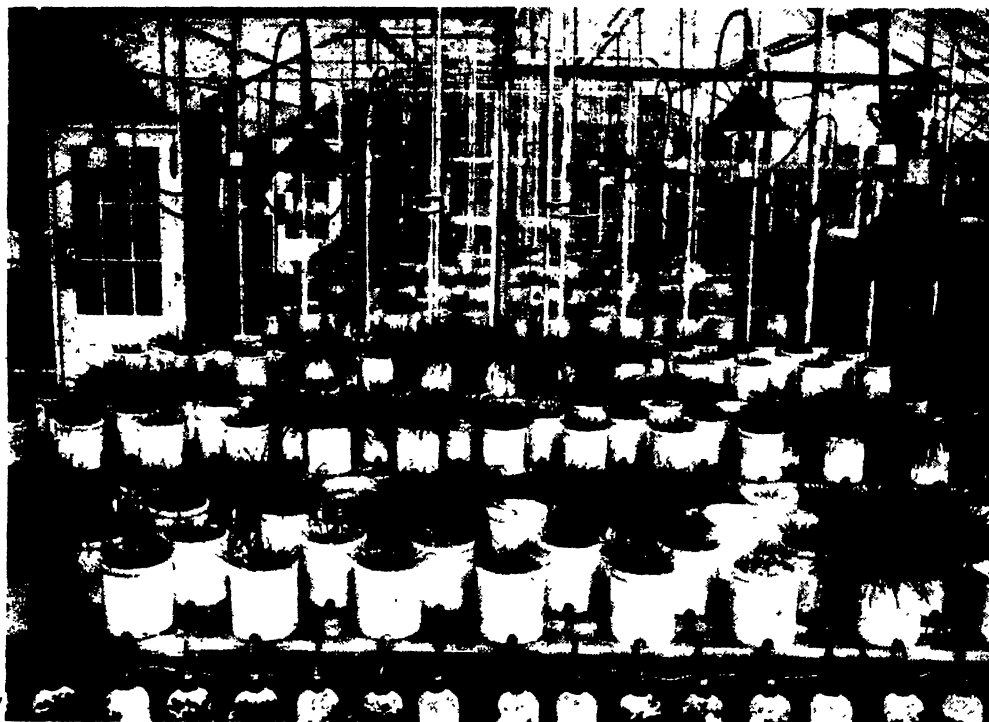
জর্ডনের যুবরাজ হোসেন বি-বি-সিতে বেতার-বক্তৃতা রেকর্ড করিতেছেন
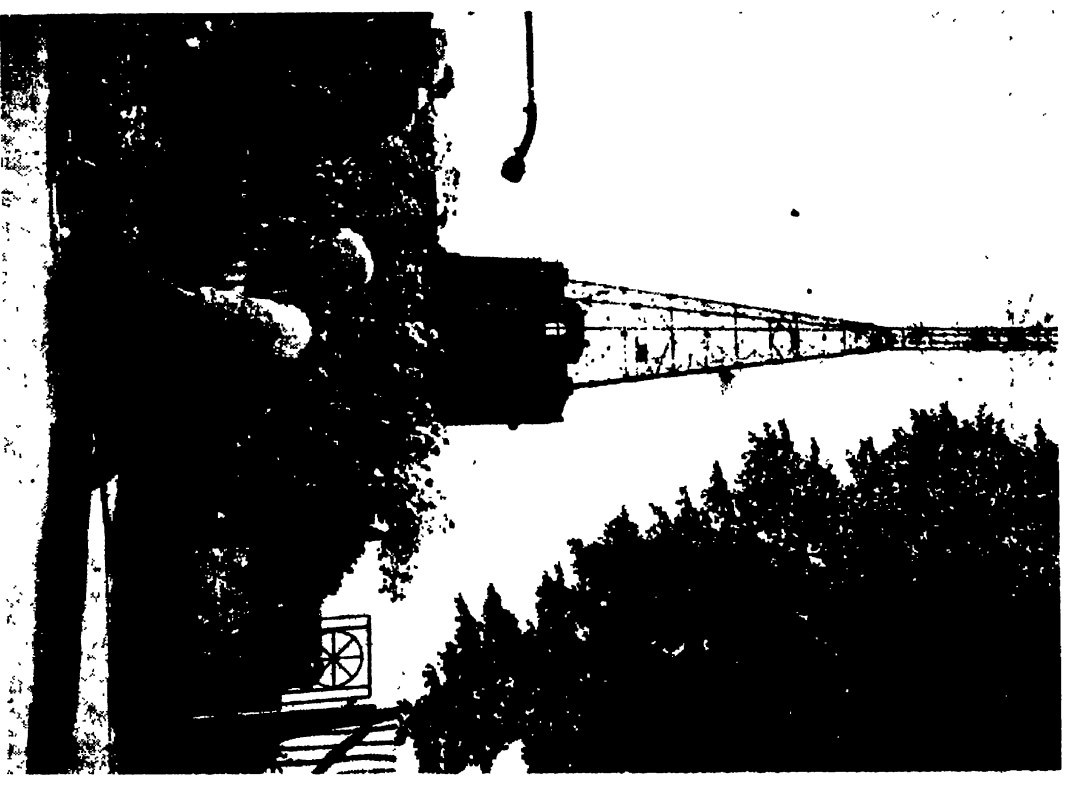
ব্রিটিশ টেলিভিশন দর্শকদের জন্য বি-বি-সি কর্তৃক সংরক্ষিত একটি উদ্যান

ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের গোড়ার কথা

শ্রীশোভনা নন্দী

সেদিনে আজিকার মত অলি-গলিতে মেয়েদের স্কুল, কলেজ, শিল্প-বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি যে ছিল না একথা বলাই বাহুল্য। কলকাতায় স্কুল বলতে ছিল বেথুন, আর ছিল লরেটো যেখানে ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের গুটিকতক ও ফিরিঙ্গীদের মেয়েরাই পড়ত। আর ছিল খ্রীষ্টান মিশনরীদের স্থাপিত ও পরিচালিত কয়েকটি স্কুল যেখানে লেখাপড়া শেখানোর চেয়ে যীশু ভজনের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হ'ত—এ সব স্কুলে এ কারণে পারতপক্ষে অভিভাবকেরা মেয়ে দিতে চাইতেন না। বেথুন বিদ্যালয় ছিল গবর্ণমেন্ট স্কুল, ব্রিটিশরাজের রুচি ও আদর্শানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া সেখানে অন্য কিছু আশা করা যেত না, এখানকার আদর্শ ও শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে যে ভারতীয় আদর্শ এবং ভাবধারার সঙ্গে খাপ খেত তা বলা যায় না। এ সকল কারণে নারীকল্যাণকামী কর্মীদল আদর্শ কন্যা শিক্ষায়তনের অভাব দূরীকরণে কৃতসংকল্প হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মী ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। আজ থেকে ৬০ বৎসর আগে এমন একটি স্বপ্নকে রূপায়িত করে তোলা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না।

যা হোক বহু প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে এক পরম শুভ মুহূর্ত্তে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাসভবনের (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত ফুটপাথের লালবাড়ী) বাহির-বাড়ীর দুর্গাদালানে ভগবানের নাম স্মরণ করে একটি কন্যা-বিদ্যালয়ের গোড়া-পত্তন হ'ল, নাম রাখলেন শাস্ত্রী মশাই "ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়।"

সেদিনে প্রায় সকল সংস্কার-ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মসমাজ ছিলেন অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা ও কর্মীদের মধ্যে সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে মেয়েদের গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল, কিন্তু বলতে আনন্দ হয় যে, যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীসমাজ আজ উদার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছে। তাই আজ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ও একটি সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমি ছিলাম এই বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ছাত্র ছাত্রী দলের একজন। সেদিন ছিল না অর্থবল, ছিল না চাকর দরোয়ান বা স্কুলের উপযুক্ত বাড়ী, কিন্তু ছিলেন এমন কয়েকজন নিঃস্বার্থ সহকর্ম্মী যাঁরা শাস্ত্রী মশায়ের কর্ম্মপন্থা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষালয়ের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করেছিলেন। অতি সামান্য উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে যে বীজ সে দিন রোপণ করা হয়েছিল, আজ তা শাখা-পল্লবে, ফুলে-ফলে সুশোভিত কি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

শাস্ত্রী মশায়ের নামের সঙ্গে মনে পড়ে অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাশ, উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ মহলানবিশ, কালীনারায়ণ রায়, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রমুখ মনীষীদের, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে আজীবন শিক্ষাব্রতী ভগিনীদ্বয় সরলাবালা রায় ও লেডী অবলা বসুকে! শিক্ষালয়কে যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে এর আদর্শকে সার্থক করে তুলতে এঁদের তখনকার দিনে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা আজ গল্প-কথা বলেই মনে হবে। এঁরা কেউই আজ এ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু শিক্ষালয়ের আজিকার সফলতা ও প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁদের অতুলনীয় কৃতির কথা এদেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আজ জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ছায়াচিত্রের মত গত দিনের কত ছবি মানসপটে ফুটে উঠছে। মনে পড়ে সেদিনকার কথা যেদিন প্রথম শুনলাম, আমাদের জন্য নাকি আমাদেরই বাড়ীতে একটা স্কুল হচ্ছে। সেদিন সে কি উত্তেজনা! প্রতিবাসিনী মেয়েদের নিত্য গাড়ী চড়ে স্কুলে যাওয়া আমাদের কাছে একটা ঈর্ষার ব্যাপার ছিল, তাই যেদিন শ্লেট বগলে গুটি গুটি পূজার দালানে প্রবেশ করে মাদুরে বসলাম, সেদিন গাড়ী চড়ে যেতে না পারায় ক্ষণিকের জন্য মনটা বিষণ্ণ হলেও গর্ব্ববোধ হ'ল অনেক বেশী—আজ থেকে ত আমরাও স্কুলের মেয়ে!

১৩ নম্বরের বাড়ীতে বহু ব্রাহ্ম-পরিবারের সঙ্গে আমরাও থাকতাম। বাহির বাড়ীর একতলায় প্রথম স্কুল সুরু হলেও অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহির-বাড়ীটা খালি করা হ'ল, উপর নীচ সবটাতেই স্কুল হতে লাগল। এ সময় আমরাও মাদুর থেকে বেঞ্চিতে প্রোমোশন পেলাম, ক্রমে আসবাবপত্র ও স্কুলের আবশ্যক সরঞ্জামাদিতে ঘর ভরে উঠতে লাগল।

প্রথম থেকেই শিক্ষালয়ে নীচের ক্লাশে ছেলে নেওয়া হ'ত, তারা ৮ বছর পর্য্যন্ত এখানে পড়তে পারত।

যতদূর মনে পড়ে প্রথম দিকে আমাদের হেডমাষ্টার ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। আমার অক্ষরপরিচয় হয় অবিনাশচন্দ্র বসুর কাছে। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেনের 'সাথী'র পর এঁর "কাকাবাবুর গল্প"ই বোধ হয় প্রথম শিশু-পাঠ্য গল্পের বই। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী আমাদের গল্প বলতেন, খেলার গান বা action song শেখাতেন, নানা খেলাধূলাও করতেন। আজও মনে পড়ে এক দিন এক গামলা জলে একটি চকচকে সিকি ফেলে দিয়ে বললেন, যে নিতে পারবে সিকিটা তারই হবে। আমরা ত সব হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লাম— এ আর শক্ত কি—কিন্তু সে যেন এক ভৌতিক ব্যাপার, জলে হাত দেওয়া দূরের কথা ছোঁয়া-মাত্র যেন হাতটা খসে গেল, লাফ দিয়ে দূরে সরে গেলাম! এক এক করে সবাই চেষ্টা করল, কেউ পারল না। ভৌতিক কিছু মনে করে ভয়ে সবাইকার মুখ শুকিয়ে উঠল, তখন উপেন্দ্রবাবু রহস্য ভেদ করে দিলেন; বললেন, ব্যাটারী বলে একটা যন্ত্র জলে চালিয়ে দেওয়াতে

এমনি হয়েছে ইত্যাদি। বুঝলাম যে কত, তবু ভূত নয় জেনে আশ্বস্ত হলাম। সিকি না পাওয়ায় মনটা যেন খুব প্রসন্ন ছিল না। এমন সময় উপেন্দ্র বাবু এক ঠোঙা মুড়ী লজেঞ্চুস এনে লুঠ দিলেন, আর সে কি হুল্লোড়-কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি ও হাসির ধুম। বলা বাহুল্য, তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। উপেন্দ্র বাবু মুখে মুখে এমন সরস ও চিত্তাকর্ষক গল্প তৈরি করে বলতেন, কত রকম কৌতুক চিত্র বোর্ডে আঁকতেন, মোট কথা তাঁর ঘণ্টাটা ছিল আমাদের বড়ই লোভনীয়। বাংলায় action song-এর প্রচলন বোধ হয় প্রথম তিনিই করেন।

তাঁর রচিত

বড় গরম ভারি গরম ঠাণ্ডা সরবত আন
হাত পা কেমন করছে ছন ছন জোরে পাখা টান।
বড় মাথা ধ'রেছে গো আমারও যে তাই
আমার দাঁতে বড় ব্যথা, আমার কানে ভাই।

প্রভৃতি গানগুলি নাতিনাতনীকে শেখানোর সময় আজও সেই পুরানো দিনের স্মৃতি মনকে আলোড়িত ক'রে তোলে।

আমাদের পৌরাণিক গল্প বলতেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী লাবণ্যপ্রভা সরকার, তবে ইনি বোধ হয় প্রথম দিকে ছিলেন না, পরে আসেন। কুন্তলীন আবিষ্কারক হেমেন্দ্রমোহন বসুও আমাদের কিছুদিন গান শিখিয়েছিলেন। তিনি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁকে বড় বিরক্ত করতাম। তিনি বেহালা বাজাতেন, অনেক সময় বেহালার ছড়ি দিয়ে চেয়ারের গায়ে আঘাত করে আমাদের চেঁচানি থামাতে চেষ্টা করতেন। এক দিন হঠাৎ তাঁর ছড়িটা ভেঙ্গে গেল, আমরাও অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করলাম। তারপর থেকে তাঁকে আর বিরক্ত করতাম না।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যে মফস্বলের মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। মফস্বল শহরে তখন মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। কলকাতায় থেকে মেয়েদের পড়ার সুবিধা করার জন্য শিক্ষালয় সংলগ্ন একটি স্থায়ী ছাত্রীনিবাস স্থাপনে কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে উঠলেন, কিন্তু বহিরাগত ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত মহিলা কোথায়? আজিকার মত মহিলাকর্ম্মীও তখন বেশী ছিলেন না, তা ছাড়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কাউকে আনার মত সঙ্গতিরও অভাব ছিল। কর্ত্তৃপক্ষের মনে হ'ল স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচারের আদর্শ বুঝি বা ব্যহত হয়! অবশেষে এ সমস্যার সমাধান করলেন দীনতারিণী দেবী। তিনি ছিলেন পল্লীগ্রামের এক ধনীগৃহের বধূ, নিজের জীবনে শিক্ষা-লাভে বঞ্চিতা বলে ক্ষোভের তাঁর অন্ত ছিল না। লোকাভাবে নারীহিতকর এমন একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে এ চিন্তা তাঁকে আকুল করে তুলল। তিনি সসঙ্কোচে শাস্ত্রী মশায়কে জানালেন তাঁর দ্বারা যদি এ কাজ সম্ভব হয় তবে তিনি প্রস্তুত আছেন। দীনতারিণী দেবীর বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মক্ষমতা ও উদার মনোভাবের কথা সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। এ অযাচিত সাহায্য সাদরেই গৃহীত হ'ল। একমাত্র রুগ্না পুত্রবধূ, পুত্র, সচ্ছল সংসার সব ছেড়ে প্রৌঢ় বয়সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে নারীকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করা বড় কম কথা নয়! সেই অভাব-অনটনের দিনে তিনি ছিলেন একাধারে মেট্রন নার্স সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। এমন কি সময়-বিশেষে ছাত্রীও, কিন্তু কোন দিন কিছুতে তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না। এমন কর্ম্মিষ্ঠা নারী আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। মেয়েদের চরিত্রগঠন ও তাদের সাংসারিক কাজকর্ম্ম শেখানোর প্রতিও তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এক কথায় তিনি ছিলেন এ বৃহৎ পরিবারের মাতৃস্বরূপা! মেয়েদের আদর আবদার, স্নেহের অত্যাচার তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন। আজও মনে পড়ে তাঁর তৈরি আচার চাটনী আমসত্ত্ব প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য আমাদের কত প্রিয় ছিল। তাঁকে সকলে 'কর্ত্তামা' বলত, তাঁর স্নেহে মেয়েরা অল্পদিনেই বাড়ীর অভাব ভুলে যেত। শাস্ত্রী মশায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী (সরকার) ছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন কলেজে পড়েন, বোর্ডিঙের লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজ তিনিই করতেন। অল্প দিনে ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষদিকে বিরাজমোহিনী দেবী (শাস্ত্রী মশায়ের ছোট স্ত্রী) এলেন, এঁকে সকলে ছোট মা বলত। ইনি ও কর্ত্তামা দু'জনে দুটি-বোনের মত এই বৃহৎ সংসারটির দেখাশোনা করতেন। সেদিনে এঁদের অযাচিত সাহায্য না পেলে হয়ত আজিকার এ বোর্ডিং কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হ'ত।

ছাত্রীনিবাস-স্থাপনের অল্প কিছুদিন পর আমরা তিন বোন বোর্ডিঙে আসি। আমার পাঠ্যাবস্থার প্রায় সবটাই এখানে কেটেছে। বোর্ডিংকেই আমরা বাড়ী বলে মনে করতাম। কর্ত্তামার মত আরও কয়জন স্নেহময়ী মহিলার কথা মনে পড়ে, যাঁদের আন্তরিক স্নেহ ও যত্নে মাতৃহীনা আমরা মায়ের অভাব জানতে পারি নি। হেমলতা দেবীর পর লাবণ্যপ্রভা বসু (সরকার) সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হন; ইনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর ও রাশভারি মহিলা। নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল এঁর চরিত্রের বিশেষত্ব, স্বভাব চঞ্চল শিশুদের সর্ব্বদা নিয়মানুগ হয়ে চলা সম্ভব হ'ত না, কাজেই লাবণ্য মাসিমার কড়া শাসনের হাত থেকে প্রায়ই রেহাই পেতাম না, ফলে তাঁকে আমরা বাঘের মত ভয় করতাম। কিন্তু এত রুক্ষতার অন্তরালে যে একটি স্নেহকোমল অন্তঃকরণ লুক্কায়িত ছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেল আমার ছোট বোনের বেলায়। তখন ৬ বৎসর পূর্ণ না হলে বোর্ডিঙে নেবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হ'ল আমার ৪ বছরের শিশু বোনকে ভর্ত্তি করবার সময়—লাবণ্য মাসীমা মাতৃহীনা শিশুকে নিজ দায়িত্বে নিলেন। ক্লাসের সময়টুকু সে থাকত কর্ত্তামার কাছে। আর বাকী সব সময় তাকে দেখতেন, রোগে শুশ্রূষা করতেন লাবণ্য মাসীমা।

স্মাইলসের ***Plain living and high thinking*** ছিল সেদিনের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আদর্শ, এই আদর্শে মেয়েদের গড়ে

তোলার দিকে ছিল বিশেষ লক্ষ্য। আমাদের শিক্ষয়িত্রীদের ছিল বিলাসবাহুল্য-বর্জ্জিত সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন, সমাজসেবার এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের যে স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী জীবনেও তা ছিল অক্ষুণ্ণ। লাবণ্য মাসীমার শাসন সেদিন যতই বিরক্তিকর লাগুক না কেন, তাঁর শিক্ষা তাঁর আদর্শ যে আমাদের চলার পথে পাথেয় স্বরূপ হয়েছে এ ঋণ অবশ্যস্বীকার্য্য। মনে পড়ে, সরলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়কে; সেবার কঠিন পীড়ায় তাঁর অক্লান্ত সেবা আমায় মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছিল। তখন ত নার্স থাকত না, শুশ্রূষার ভার শিক্ষয়িত্রীরাই নিতেন। এজন্য কোনও বাধ্য-বাধকতা ছিল না; তবু তাঁরা স্বেচ্ছায় সব করতেন। নিম্ন শ্রেণীতে পড়ানো, সেলাই ও গান শেখানোর জন্য দু-চার জন শিক্ষয়িত্রী ছাড়া আর সব শ্রেণীতেই শিক্ষকেরা পড়াতেন। শিক্ষয়িত্রীরা বেশীর ভাগ বোর্ডিংএ থাকতেন। স্কুল ও বোর্ডিংএর মোট ফিস ছিল ১১।০ টাকা, তা ছাড়া কোনও পরিবারের একটির বেশী মেয়ে পড়লে ৯।০ টাকা হিসাবে দিতে হ'ত। আজিকার মত সেদিনের শিক্ষা ব্যয়বহুল হলে স্ত্রীশিক্ষার এত দ্রুত উন্নতি কখনও সম্ভবপর হ'ত কি না সন্দেহ।

বাংলার বাহিরেরও অনেক মেয়ে বোর্ডিংএ থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পড়াশোনা করতেন। নানা ভাষা নানা মত নানা পরি-ধান হলেও আমরা ছিলাম যেন একই পরিবারভুক্ত। সিন্ধু, পঞ্জাব, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেরই মেয়ে ছিলেন। অনেক সময় অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা বলার চেষ্টায় আমাদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টার অন্ত থাকত না। কিন্তু তাই নিয়ে মনোমালিন্য বা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

বর্ত্তমানে সমাজ-জীবনে এক অভাবনীয় যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে। সে সময় অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হলেও আজিকার মত তরুণীরা দূরের কথা, প্রবীণারাও একা রাস্তায় চলা-ফেরার কথা ভাবতেও ভয় পেতেন। বন্ধ-গাড়ী পাল্কী ছাড়া হেঁটে চলার রেওয়াজ একদম ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। মেয়ে স্কুলের ঘোড়ার বাসের দরজা-জানালাগুলি ছিটকিনি আঁটা থাকত, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে ফাঁক করে রাস্তা দেখার চেষ্টা করা মানেই কঠিন শাস্তি ভোগ করা! এ রকম যখন সমাজ-ব্যবস্থা তখন মেয়েদের বোর্ডিং ও স্কুল পরিচালনা করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কত ঝড়-ঝাপ্টা, কত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে, এ যুগের ছেলেমেয়েরা তা কল্পনাও করতে পারবে না; তখন যে সব প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হ'ত মনে করলে আজও হাসি পায়। সমাজহিতৈষীরা সে অসম্ভবকে কি করে সম্ভব করতে পেরেছেন সে সব কথা ইতিহাসের পাতায় আছে। এ সব কারণেই বোর্ডিংএর মেয়েদের উপর নিত্য-নূতন নিষেধ জারির অন্ত থাকত না। জানালার ধারে দাঁড়াবে না, ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে রাস্তা দেখবে না, বারান্দায় যাবে না, চাকর দরোয়ানের সঙ্গে কথা বলবে না, রাস্তায় যদি বের হও তবে তের বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কাদের মাথায় কাপড় দিতে হবে ইত্যাদি আরও কত কি! মনে পড়ে একদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রাত্রে কিছুতে ঘুম আসছে না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে! বলাই বাহুল্য ইলেকটি কের কথাই শুনি নি ত ফ্যান। পরামর্শ হ'ল জানালার মোটা পর্দ্দাগুলি একটু সরিয়ে দিই। সেদিন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিক যেন অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে, লোভ সামলাতে পারলাম না। সব বিধিনিষেধ ভুলে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গে শুনি কে যেন মোটা গলায় বলে উঠল—জানালায় দাঁড়ানো হচ্ছে কাল ঠিক লাবণ্যদিকে বলে দেব। চমকে দেখি রেলিং-ঘেরা কম্পাউণ্ডের বাইরে দুটি লোক! মুহূর্ত্তের মধ্যে নীচে বসে পড়লাম আর সে কি কম্প, কি আতঙ্ক! কোথায় গেল গরম, হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা! সব এক অবস্থা! আমাদের ভয় জিনিষটা ছিল অত্যন্ত হাস্যকর! চাকর দরোয়ান ও শিক্ষয়িত্রীদের প্রহরাধীনে সামনের রাস্তাটুকু পার হয়ে মন্দিরে যেতে আমাদের বুক কাঁপত, পা জড়িয়ে আসত, এমনি ছিলাম সব জড়ভরত! আজকাল ছোট মেয়েরাও কেমন নির্ভীক দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলাফেরা করে দেখলে সেদিনের কথা মনে পড়ে—কি পরিবর্ত্তন!

আজ মেয়েদের স্কুলে কত রকম খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছে, আমরা কি খেলতাম তা শুনলে একালের মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়বে। আমরা লুকোচুরি, কুমীর-কুমীর কি ভাত-আসন ছাড়া অন্য খেলা জানতামই না। এখন বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস—কত বলব, সব নাম হয়ত জানিও না—এ সকলের প্রচলন হয়েছে। আজ যদি আমাদের ঠাকু'মা দিদিমার দল এসে উপস্থিত হন তবে তাঁরা নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যাবেন—এ কি মেয়েছেলেরা আবার মাঠে খেলছে, তা আবার কি না বেটা-ছেলেদের মত হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি!

'ইনডোর গেমস' বলে কিছু ছিল না, ড্রিল বা শরীরচর্চ্চারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। মোট কথা খেলাধুলা বা ব্যায়াম ছেলেদের মত মেয়েদেরও একান্ত প্রয়োজনীয় এ চিন্তা মনে উদয় হলেও কাজে পরিণত করা সম্ভব ছিল না।

বোর্ডিংএর ক্ষুদ্র কম্পাউণ্ডটুকু ছিল রাস্তার উপর, তাই বিকেলে ছাতে বেড়ানোই ছিল আমাদের একমাত্র ব্যায়াম। বেলা ৫টা থেকে ৬টা একজন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে ছাতে বেড়াতাম। কোন কোন দিন কর্ত্তামা যেতেন। সেদিনে আমাদের স্ফূর্ত্তির অবধি থাকত না। তাঁর কাছে গল্প শোনা যেত, তা ছাড়া একটু-আধটু কার্নিসের কাছে দাঁড়াতে বারণ করলেও টাক্ষ লিখতে দিতেন না। আমারাও যে খুব শান্তশিষ্ট ছিলাম তা নয়। রাস্তার বিচিত্র দৃশ্যগুলি আমাদের কাছে যেমনি লোভনীয় তেমনি রহস্যপূর্ণ। বায়োস্কোপের ছবির মত ক্রমাগত দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন শিশুমনকে প্রলুব্ধ করবে এ আর বিচিত্র কি! অথচ এ লোভ সংযত করে না রাখলে তখনকার দিনের রক্ষণশীল সমাজে এমন একটা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভবই ছিল। আজিকার বুদ্ধি-বিবেচনা সেই

অপরিণত বয়সে ছিল না; মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত, নিয়ম মানতে একেবারেই নারাজ হ'ত। এখন আর সে দিন নেই, এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে এ যুগের ছেলেমেয়ের দায়িত্ব সহস্র গুণ বেড়ে গেছে। ছাত্রাবস্থায় নিয়মানুবর্ত্তিতা বোধ একান্ত আবশ্যক এবং তা হলেই আমরা জাতীয় জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারব।

মনে পড়ে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেদিন ছাদে বেড়াচ্ছি এমন সময় হঠাৎ বহু কণ্ঠে উচ্চারিত গম্ভীর হরিবোল ধ্বনি কানে এল। এ কি, যে হরিধ্বনি শরীরের রক্ত জল করে দেয়, আতঙ্কে দেহে কম্পন আনে এ সে হরিবোল নয়! দ্বিতীয় বার আওয়াজ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব বিধিনিষেধ ভুলে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীর ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়ে কার্নিসে ঝুঁকে দেখলাম একটি শবানুগমনের বড় মিছিল! একখানি বড় খাটে দীর্ঘদেহ এক বিরাট পুরুষের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি আর তার পুরোভাগে আমার পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর-জীবনী-লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়! মিছিল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষয়িত্রী গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ দিলেন যারা পাঁচিলে ঝুঁকেছিলে তারা নীচে গিয়ে পঞ্চাশ লাইন করে টাস্ক লিখবে।

মহাপুরুষদের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে যে আজ দেশ শিখেছে তার পরিচয় পাই শবানুগমনের মিছিল বা স্মৃতিসভা থেকে, কিন্তু সেদিনে এ রকম দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যেত। অতএব শতাধিক লোকের ভিড় মনে কৌতূহলের উদ্রেক করল, ধারণা হ'ল নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে! যা হোক নীচে গিয়ে খাতা ভরে পঞ্চাশ বার একই কথা লিখলাম 'আর কার্নিসে ঝুঁকে দেখব না! এর থেকে কেউ যদি মনে করে যে এমন দুষ্কর্ম আর কোনও দিন করি নাই তবে ভুল হবে। শাস্তি বা নিষেধের কথা একদিনের বেশী মনে থাকত না। কাজেই পরের দিনই রাস্তার চেঁচামেচি, ব্যাণ্ডের শব্দ বা বিয়ের মিছিলের সোরগোল কানে এলেই 'যথাপূর্ব্বং তথাপরম্' হতে মুহূর্ত্তও দেরি হ'ত না। পরের দিন ডে স্কলার মেয়েদের কাছে খবর পেলাম কে এক জন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন, তিনি নাকি এক জন লেখক! ডে স্কলার মেয়েরাই ছিল আমাদের বহির্জ্জগতের যোগসূত্র, যা-কিছু বাইরের খবরাখবর ওদের মারফতই আমাদের কাছে আসত—কিন্তু কানে কানে শত গোপনতার মধ্য দিয়ে! কারণ কোনও কোনও শিক্ষয়িত্রীর এটা অত্যন্ত অপছন্দ ছিল—দুনিয়ার খবরে কি দরকার, পড়ার সময় পড়া করবে!

এখন দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়েছে, মনীষীদের জীবনকথা আলোচনা যে জাতীয়-জীবন গঠনের অন্যতম সোপান এ বোধ স্মৃতি-সভার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে ভাবীকালের মনে জাগিয়ে তোলার দিকে আজ দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র যে কে, কত বড় তাঁর মনীষা সেকথা কেউ আমাদের সে দিন বলে দিল না, তাঁকে জেনেছি বহু পরে! আজ আট বছরের শিশুর হাতেও আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি পুস্তকের শিশু-সংস্করণ দেখা যায়, কিন্তু তখন বাংলা শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নি বললেই চলে।

উপরোক্ত ঘটনার বেশ কিছুদিন পর তখন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্ত্তমানের Class III) পড়ি। এক দিন দেখি স্কুলের সময় চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব! শিক্ষয়িত্রীরা গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বড় মেয়েরা সন্ত্রস্ত ভীত, এখানে-ওখানে জটলা করছে, হেড মাষ্টার মশায়ের দৃষ্টিও ভ্রূকুটিপূর্ণ, বুঝতে দেরি হ'ল না যে কিছু একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটেছে। ফলে আমাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা গেল। ঘটনাটি জানার জন্য ঔৎসুক্যের অন্ত নেই অথচ কাউকে জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত শোনা গেল এণ্ট্রান্স ক্লাসের একটি মেয়ে মাষ্টার মশায়ের ক্লাসে 'দেবী-চৌধুরাণী' নামে একটা খুব খারাপ বই পড়ছিল। আরও শুনলাম যে সে বই নাকি সেদিনের সেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা! উৎকট সুনীতি-বাদী আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জন্ম, লেখক বলে তাঁর উপর যেটুকু শ্রদ্ধা জন্মেছিল তা কর্পূরের মত উবে গেল; ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করে মনে হ'ল এমন খারাপ লোক মরে গিয়ে ত ভালই হয়েছে! সরলা দেবী চৌধুরাণী কোনও এক উৎসব উপলক্ষে বন্দে মাতরম গানটি আমাদের শেখান, গান শেখা হ'ল, দল বেঁধে গাওয়াও হ'ল, কিন্তু এর অর্থই বা কি, কে বা রচয়িতা কেউ কিছু বলে দিলেন না। জানলাম সেদিন, যেদিন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিকে দিকে সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল 'বন্দে মাতরম্'। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ রাজ-শক্তি শঙ্কিত ভীত হয়ে উঠল! জানলাম সেদিন যেদিন এ দুটি শব্দে দেহের অণুতে অণুতে শিহরণ জাগিয়ে তুলল, এই মহামন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবুড়ো, মেয়ে পুরুষ উন্মত্ত হয়ে উঠল, ভুলল ঘর বাড়ী, মা-বাপ, আত্মীয়স্বজন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিরাম!

১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্কুল বোধ হয় প্রায় ছয়-সাত বৎসর ছিল। তার পর এক বার গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে শোনা গেল বাড়ীওয়ালা নাকি নোটিশ দিয়েছে, ছুটির পর এখানে আর স্কুল থাকবে না। এ সময় শশীভূষণ বসু ছিলেন হেড মাষ্টার আর শ্রদ্ধেয়া সরলাবালা রক্ষিত ছিলেন সুপারিটেণ্ডেণ্ট, সম্পাদক বোধ হয় ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। তখন স্কুলে ছাত্রী-সংখ্যা অনেক, এত বড় স্কুলের মত উপযুক্ত বাড়ী ভাড়া করার অর্থও নেই—বুঝি স্কুল উঠেই বা যায়! এ সংবাদে শিক্ষয়িত্রীরা হলেন বিমর্ষ, কর্ত্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন, আর আমরা—যাদের স্কুলই ছিল বাড়ী, কি হবে ভেবে ভয়ে আকুল! যা হোক শেষে ঠিক হ'ল এখন একটা ছোট বাড়ীতে যাওয়া যাক, তার পর ছুটিতে দেখা যাবে কি করা যায়।

তখন স্কুল বন্ধের সঙ্গে বোর্ডিং সচরাচর বন্ধ হ'ত না। মেয়েদের বাড়ী যাওয়ার সুবিধা-অসুবিধার উপরই এটা নির্ভর করত। এমনও হ'ত, তিন-চারটি মেয়ের জন্য বোর্ডিং খোলা রাখা হ'ত, দুই-এক জন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে তারা থাকত। বলা বাহুল্য, তাঁরা স্ব-ইচ্ছায়ই এ ভার গ্রহণ করতেন, এজন্য কোনও দাবি ছিল না।

তার পর এক দিন সরলাদি ও গানের শিক্ষয়িত্রী সোনা মাসীমার (সরলাবালা গাঙ্গুলি) সঙ্গে আমরা ছয়টি মেয়ে ৭০ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে এলাম, সঙ্গে এল স্কুলের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি আর এক জন দারোয়ান। এ বাড়ীতে আসার দু-এক দিন পরের একটি বিশেষ ঘটনা আজও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কলিকাতার বড় ছোট প্রায় সব রাস্তায় তখন মিটমিট করে গ্যাসের আলো জ্বলত। কিছুদিন ধরে বড়দের বলতে শুনতাম যে, শীঘ্রই নাকি হ্যারিসেন রোডে ইলেকট্রিক আসবে, সেজন্য রাস্তা খুব বড় করা হচ্ছে। একথা শুনলেও মনে কোন ঔৎসুক্য জাগে নি। কিন্তু এখানে এসে রাস্তায় বড় বড় পোষ্ট ও তাদের মাথায় নতুন রকম সব ডোম দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, শুনলাম দু-এক দিনের মধ্যেই নাকি এখানে এক রকম আলো দেওয়া হবে, তাতে রাস্তাঘাট সব নাকি দিনের বেলার মতই আলোকিত হবে এবং তাতে তেল বা জ্বালানির জন্য দেশলাই লাগে না। ক'টা দিন কি উত্তেজনায় যে কাটল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনা-আপনি দপ করে একসঙ্গে সব-গুলো বাতি জ্বলে উঠল—সে যে কি অপূর্ব্ব শোভা, আলোয় আলো-ময় ঠিক যেন পরীর দেশ! বারান্দায় যাওয়ার নিষেধের বালাই তুলে নেওয়া হ'ল, আর রাস্তায় সে কি ভিড়! সারা কলিকাতা ভেঙ্গে পড়ল এই অদ্ভুত আলো দেখতে আর সেই সঙ্গে দলে দলে কীর্ত্তন খোল করতাল বাজিয়ে সারারাত সে যেন এক মহোৎসব চলল! আমরাও সারারাত জেগে দেখতে লাগলাম। আলো দেখে দেখে যেন আশা মিটছিল না। যেমন সুন্দর তেমনি অদ্ভুত মনে হয়েছিল!

এ বাড়ীতে আমরা বোধ হয় মাস ছয়েক ছিলাম। কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে ৫৬ নম্বর মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ী পাওয়া গেল, সেখানেই আপাতত স্কুল খোলা হবে ঠিক হ'ল। আমরা এক দিন নূতন বাড়ীতে উঠে গেলাম। ১৩ নম্বরের বাড়ী থেকে এ বাড়ী ছোট হলেও উপর নীচে খান পাঁচ ছয় ঘর ছিল। আর ছিল চারদিকে দেয়াল ঘেরা ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি বাগান—তার মাঝখানে ফোয়ারা। বাগানে আমাদের যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল, এর জন্য এ বাড়ীটা আমাদের খুব ভাল লাগল।

এ বাড়ী আসার অল্পদিন পরই সরলাদি ঢাকা ইডেন স্কুলে চলে যান। তাঁর জায়গায় এলেন সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি কামিনী রায়ের ছোট বোন প্রেমকুসুম সেন, ইনি বেশী দিন এখানে থাকেন নি।

উপরের ক্লাসে সরলাদি ছাড়া অন্য কোনও শিক্ষয়িত্রী তখন পড়াতেন বলে আমার স্মরণ হয় না। ভবসিন্ধু দত্ত, অন্নদাচরণ সেন, নেপালচন্দ্র রায়, গোলোকচন্দ্র দাস, অধরচন্দ্র দাস—এঁদের কাছে আমরা পড়েছি, সংস্কৃত পড়াতেন একজন পণ্ডিত। যেটুকু শিখেছি তা এঁদেরই যত্নে ও চেষ্টায়। এ ঋণ অপরিশোধ্য। শশী-বাবুও চলে যাওয়ার পর শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু আমাদের হেডমাষ্টার হলেন। ইনি আগেও আমাদের পড়াতেন।

এ বাড়ীতে স্থানাভাবের দরুন আগের নিয়মকানুন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। এ সময় আমাদের অনেক কাজ করতে হ'ত—বোর্ডিং বাড়ী ঝাঁটপাট, খাবার জায়গা (মাটিতে আসনে বসে খাওয়া হ'ত) পরিষ্কার করা, পরিবেশন, সকালে তরকারি কোটা প্রভৃতি কাজ পালাক্রমে করতে হ'ত। আমাদের রুটিন করে রান্নার ক্লাস ছিল না তবে ছুটির দিনে রান্না ও খাবার করতাম। এখানে আমাদের মনে হ'ত যেন ঠিক বাড়ীতে আছি—বিধি-নিষেধের বালাই ছিল না বললেই হয়, তাই খুব ভাল লাগত। ছোট মেয়েদের কাপড়চোপড় ঠিক করে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সব বড় মেয়েরা করত। কাজ করতে আমাদের খুব উৎসাহ ছিল।

এই সময় যতদূর মনে পড়ে কালীনারায়ণ রায় ছিলেন সেক্রেটারী, প্রাণকৃষ্ণবাবু ছিলেন আমাদের ডাক্তার। তিনি এলেই মেয়েদের প্রত্যেকের খোঁজ নিতেন গল্প করতেন, তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আমরা তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে উমেশচন্দ্র দত্ত, শাস্ত্রী মশায় প্রভৃতি বোর্ডিঙে উপাসনা করলেও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নিয়মিতরূপে সপ্তাহে দু'দিন উপাসনা করতেন। রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ও এবাড়ীতে হ'ত—বাইরের থেকে অনেকে এসে ক্লাস নিতেন, তার মধ্যে অনেক মহিলাও থাকতেন। বায়োস্কোপ তখন ছিল না, স্কুলে প্রায়ই ম্যাজিক লণ্ঠন বা ছায়াবাজি যোগে নানা চিত্র দেখানো হ'ত। বিষয়বস্তু সাধারণতঃ বাইবেলের গল্পই থাকত। ছায়াবাজি হবে শুনলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না, সে দিনের কথা আজ মনে করলে হাসি পায়।

এ বাড়ীতে আমি বোধ হয় দুই বৎসরের অধিক কাল ছিলাম। আমরা শুনেছিলাম যে স্কুলের জন্য জমি কেনা হচ্ছে এবং শীঘ্র বাড়ী তৈরি সুরু হবে। তত দিনে স্কুলের পড়া শেষ হয়ে যাবে, কাজেই নূতন বাড়ী দেখা আমার ভাগ্যে নেই মনে করে আফশোষের অন্ত ছিল না। ১৯০৩ সালের শেষভাগে আমার ছাত্রী-জীবনের অবসান হ'ল, এক দিন বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলাম। ছাত্রী হিসাবে শিক্ষালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এখানে শেষ হলেও অন্তরের যোগ কোনও দিন ছিন্ন হয় নি, আজও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

শৈশবের ক্রীড়াভূমি, বাল্যের আনন্দনিকেতন, শত সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত পিত্রালয় যেমন বিবাহিতা কন্যার বড় আদরের বড় গর্ব্বের জিনিষ, ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ও আমার কাছে তেমনি গর্ব্বের জিনিষ।

তার পর এক দিন মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের পর্ণকুটীর ছেড়ে শিক্ষালয় তার প্রাসাদোপম ভবনে উঠে এল। তখন থেকে এক নূতন পরিবেশে শিক্ষালয়ের জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল।

টিউনিসিয়া

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

ঐতিহাসিক বিবরণ: প্রাচীন অবস্থা—প্রাচীন কার্থেজ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ফিনিসীয়রা টিউনিসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এই ঔপনিবেশিকেরা সমুদ্রোপকূলবর্তী লোকেদের ফিনিসীয় ভাষাভাষী করিয়া তুলে; কিন্তু অভ্যন্তরভাগের বারবারদের (Berber) তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতঃপর রোমকেরা এখানে প্রবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে কার্থেজীয় বা ফিনিসীয় ভাষা ও সভ্যতা বিস্তার-লাভ করিল। রোমবাসীরা এই অঞ্চলের নাম রাখিল 'আফ্রিকা'। লাটিন ভাষায় এই আফ্রিকা শব্দটি বোধ হয় বারবারীয় শব্দ 'ইফ্রিকা' বা 'ইফ্রিগিয়া' (আধুনিক আরবীয় ভাষায় 'ইফ্রিকিয়া') হইতে আসিয়াছে।

টিউনিসিয়া আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই আফ্রিকা রোম সাম্রাজ্যের অধীনে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ইহার অন্তর্গত কার্থেজ রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী ছিল এবং লাটিন সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। ৪৩৯ সনে বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ উপকূলস্থ অসভ্য জাতি (Vandals) দ্বারা কার্থেজ অধিকৃত হয়। অতঃপর ১০০ বৎসর পরে (৫৩৩-৫৩৪) এই প্রদেশ বেলিসারিয়াস কর্তৃক পুনরায় মুক্তি লাভ করিয়া আরবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত (৬৪৮-৬৬৯) না হওয়া পর্য্যন্ত রোমের অধীনে ছিল। বিজয়ী ওক্‌বা-বিন-নাফা কাইরওয়ান শহর স্থাপন করেন (৬৭৩)। ইহা ওমাইয়াডদের অধীনস্থ ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্ত্তাদের বাসস্থান ছিল এবং সিসিলি বিজেতা রাজাদের (Aghlabite princes) রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। ইহারা আব্বাসের বংশধরদের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থান শাসন করিত।

শীঘ্রই এখান হইতে ইটালীয় বা লাটিন সভ্যতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিশ্বাস লোপ পাইল। পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি বারবার—যাহারা লাটিন ভাষা গ্রহণ করে নাই এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহারা সহজেই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহারা কি মুসলমান ধর্ম্ম পালনে, কি রাজনৈতিক আন্দোলনে উগ্র জাতীয়তামূলক মনোভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। তুর্কীদের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় ইহাদেরই প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য ছিল। ইহাদের সাহায্যের উপর মহম্মদের কন্যা ফাতিমার বংশধরদের সাম্রাজ্য রক্ষা নির্ভর করিত। ইহারা বলিত যে, ইহারা আরবের কোন বিখ্যাত বংশ-সম্ভূত। যখন ফাতিমার বংশধরদের সাম্রাজ্যের রাজধানী মিশরে স্থানান্তরিত হয় তখন জিরাইটরা মাদিয়ায় বারবারদের প্রতিনিধি রূপে শাসন করে। তাহারা সিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মান্দোলন সম্পর্কে খলিফার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ায় ফাতিমার বংশধরেরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ উত্তর মিশর হইতে বিরাট এক দল বেদুইনকে আফ্রিকায় প্রেরণ করে। ইহারা রাজ্য জয় করিতে পারিল না বটে, কিন্তু সমগ্র উত্তর আফ্রিকার বুকে উপদ্রব করিতে লাগিল। অতঃপর সিসিলির প্রথম রোজার ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাহদিয়া জয় করিয়া টিউনিসিয়া উপকূলে আধিপত্য স্থাপন করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই আলমোহেদ খালিফ আবদুল মামিন মাহদিয়া দখল করিয়া ইহার অবসান ঘটাইলেন।

ক্রমে আলমোহেদ সাম্রাজ্যও লোপ পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে টিউনিসের যুবরাজ আবু জ্যাকেরিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে রাজবংশ স্থাপন করিলেন তাহা 'হাফ্‌স' নামে পরিচিত হয়; কারণ আবু জ্যাকেরিয়ার পূর্ব্বপুরুষের নাম ছিল আবুহাফ্‌স। তিনি আবার ছিলেন আলমোহেদ মাদির শিষ্য। এই হাফসরা "বিশ্বাসের রাজা" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজ্য লেমজন হইতে ট্রিপোলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। হাফ্‌সরা বহুবার ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ যাহাতে ফ্রান্সের সেণ্ট লুইয়ের মৃত্যু হয়, এবং ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ যাহাতে বোরবনের ডিউক নিহত হন আর যখন ইংরাজ সেনারা মাহদিয়া অবরোধে অসমর্থ হয়।

এই হাফ্‌সরা টিউনিসকে মসজিদ বিদ্যালয় ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছিল এবং মুসলমান রাজাদের আমল অপেক্ষা ইহার মান উন্নত করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে লিও আফ্রিকানাস টিউনিসকে বৃহৎ শহর আখ্যা দিয়াছেন।

তুর্কিগণ কর্তৃক আলজিরিয়া বিজিত হওয়ার ফলে ইহা টিউনিসিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ফলে খৈরাদ্দিন বারবারোসার পক্ষে কনষ্টাণ্টিনোপলের সুলতানের নামে এই নগর দখল করিবার সুযোগ ঘটে। তখন মহম্মদের পুত্র আল হাসান সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে মুক্ত করিয়া স্পেনীয়দের তাঁবেদার রূপে রাখা হয়। পঞ্চম চার্লস ও এডমিরাল অব্রিয়া ডোরিয়ার নেতৃত্বে যে বাহিনী ইহা আক্রমণ করে তাহা টিউনিসিয়াকে সম্পূর্ণ জয় করিতে না পারিয়া গোলেট্টায় দুর্গ স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে থাকে। তাহারা জেরবা দ্বীপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের কোন কোন অংশও দখল করিয়াছিল। ইহার অভ্যন্তর ভাগে কিন্তু তখন গৃহবিবাদ এবং অরাজকতা চলিতেছিল। অবশেষে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালজিয়ার্সের গলি-পাশা অল-হাসানের পুত্র উত্তরাধিকারী হামিদকে পরাজিত করিয়া টিউনিস দখল করিলে পর সমস্ত গোলযোগের অবসান হয়। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ডন জুয়ানের আগমনের ফলে তুর্কীরা সেখান হইতে পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু ডন জুয়ান ইহাকে বেশী দিন করায়ত্ত

রাখিতে পারিলেন না। সুলতান দ্বিতীয় সেলিম পরবর্তী বৎসরেই স্পেনীয়দের টিউনিস ও গোলেটা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

তুর্কী-বিজয়ের পর রাজ্যপরিচালনের ভার একজন 'পাশার' উপর অর্পিত হইল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটি সামরিক বিদ্রোহের ফলে সমস্ত ক্ষমতা এই সৈন্যদল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন 'ডে'-র (Dey) হাতে আসিয়া পড়িল। এই ডে-সরকার ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টি কিয়া ছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই 'বে'রা তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দেয়। ইহাদের আসল কাজ ছিল পার্ব্বত্য জাতিদের বশে রাখা এবং তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা। ১৬৩১ হইতে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বে'র পদ কর্সিকা হইতে পলাতক মুরাড নামে এক ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এযাবৎ কাল বে ও ডে-দের মধ্যে রেষারেষি ও মতানৈক্যের ফলে দেশে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। সর্ব্বশেষ ডে ইব্রাহিম—যিনি ১৭০২-১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন, মুরাডের বংশ ধ্বংস করিয়া দেন ফলে বে'র শাসন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু আলজিরীয়দের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে ক্রীট হইতে পলাতকের পুত্র হুসেন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন এবং বে উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা এমন বংশ-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, তাহা আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

বে'র রাজত্বকালে অনেকদিন ধরিয়া আলজিরিয়ার সহিত টিউনিসিয়ার অনবরত যুদ্ধ হইতেছিল। টিউনিসিয়ার এই পররাজ্য আক্রমণ হেতু তাহাকে দস্যুরাজ্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ পুনঃপুনঃ চুক্তি সম্পাদন করার ফলে টিউনিসিয়ার এই দস্যুবৃত্তি মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। অবশেষে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আয়-লা-চাপেলে সম্মিলিত শক্তিবর্গের দ্বারা 'বে'কে যুক্ত ভাবে লিখিত পত্রের ফলে প্রকৃতপক্ষে ইহার অবসান ঘটে। ইহার পর ঐ দেশে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা পর পর দেখা দিয়াছে। উপরন্তু ইউরোপীয় শক্তিবর্গ টিউনিসিয়ায় তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল। এ সমস্ত ব্যাপারে জর্জ্জরিত হইয়া 'বে' তখন ব্রিটিশের পরামর্শপ্রার্থী হন এবং রেলপথ, জল ও গ্যাস সরবরাহ ও অন্যান্য শিল্প ব্রিটিশের হস্তে সমর্পিত হয়। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে ফরাসী কর্ত্তৃক ব্রিটিশকে সাইপ্রাস দ্বীপ নিজের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপনের প্রতিদানে লর্ড সলিসবেরী টিউনিসিয়ায় ফরাসীদের অবাধ অধিকার দিলেন।

ফরাসী অধিকার: ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইটালী টিউনিসিয়ার ব্যাপারে গভীর ভাবে মনোযোগ দিতে লাগিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই দেশ দেউলিয়া হইয়া পড়ে তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী এই তিনটি দেশ নিয়ামক হিসাবে ইহার অর্থ বা রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীয়েরা টিউনিস হইতে গোলেটা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রেলপথ কিনিয়া লয়। ইহাতে ফরাসীদের টনক নড়ে এবং বার্লিন কংগ্রেসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিবের সহিত গোপন সর্ত্ত বা বোঝাপড়া অনুযায়ী তাহারা কাজ করিতে থাকে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাবাহিনী খ্মীর বা ক্রুমির নামক স্বাধীন উপজাতিকে শোধরানোর অছিলায় এলজিরীয় সীমা অতিক্রম করে এবং শীঘ্রই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বে-কে ফরাসীর তাঁবেদার হইতে বাধ্য করে। অতঃপর মুসলমানদের সহিত ভীষণ দ্বন্দ্বের পর সমগ্র টিউনিসিয়া ফরাসীর অধীনে আসে। তৎকালীন বে ষষ্ঠ মহম্মদ ১৮৮১ সনের ১২ই মে ফরাসী আধিপত্য স্বীকার করিয়া এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৮৮৩ সনের ৮ই জুন যিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তিনি লা মার্সার নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফরাসীরা ইহার শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিল এবং ইহাকে রেসিডেন্ট জেনারেলের অধীনে রাখিয়া শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ ও অন্যান্য শক্তিবর্গ ফরাসী-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল; কিন্তু তুরস্ক তাহা মানিল না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি দ্বারা টিউনিসিয়া ও ত্রিপলিটানিয়ার সীমা স্থিরীকৃত হইলেও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লুজা চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত তুরস্ক প্রতিনিধি দ্বারা এই দেশ শাসনের দাবি প্রত্যাহৃত হয় নাই। ইটালীয়েরা অবশ্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী আধিপত্য স্বীকার করে। সেই সময় অনুষ্ঠিত চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী ইটালীয়েরা টিউনিসিয়ায় তাহাদের জাতীয়তা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পায়। ব্রিটিশ প্রজাদেরও এখানে অনুরূপ অধিকার ছিল। ইহাতে টিউনিসিয়ায় বসবাসকারী মাল্টা দ্বীপের অধিবাসীরা অসুবিধায় পড়ে। তখন ইটালীয়েরা ও মাল্টাবাসীরা তাহাদের জাতীয়তা বজায় রাখিবার জিদ ধরিলে ফরাসীদের অসুবিধার সৃষ্টি হইতে থাকে, ফলে তাহারা বিরক্ত হয়। অতঃপর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করা হইল যে, যে সকল প্রজা টিউনিসিয়ায় জাত ব্রিটিশ ও ইটালীয়দের বংশধর তাহারা 'ফরাসী' বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে সকলে বিশেষতঃ ইটালীয়েরা রুষ্ট হইল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশদের (অর্থাৎ মাল্টাবাসীদের) সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থার ফলে যাহারা এই আইনের কবলে পড়িয়াছিল তাহারা ফরাসী জাতীয়তা অস্বীকার করিবার অধিকারী হইল।

দক্ষিণের যাযাবর জাতিরা মাঝে মাঝে গোলমাল করিলেও সাধারণভাবে ফরাসী-শাসন মানিয়া লইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কী অফিসারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ফেজান হইতে আগত উপজাতীয় লোকেরা দক্ষিণ টিউনিসিয়ার ঘাঁটি বা ফাঁড়িগুলি আক্রমণ করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে জোর লড়াই হওয়ার পর ফরাসীরা শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পরে ফ্রান্সে বহু টিউনিসীয় সৈন্য নিযুক্ত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর ইটালীর সহিত চুক্তির বলে টিউনিসিয়ার দক্ষিণভাগে অবস্থিত স্থান অর্থাৎ ঘাডামেস ও ঘাট এবং ঘাট ও তাম্মোর মধ্যবর্ত্তী স্থান লিবিয়াকে দেওয়া হইল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টিউনিসিয়ায় এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ১৯১৮ ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী-কালমধ্যে দস্তুর পার্টি (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) ও নিও-দস্তুর পার্টি (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার বা গঠনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি করিতে লাগিল। তখন পরিচালন ব্যাপারে টিউনিসীয়দের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ৪৪ জন ফরাসী ও ১৮ জন স্থানীয় মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি সাধারণ পরিষদ ও কতকগুলি আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল। সাধারণ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত পরামর্শ-সভা বাতিল হইয়া যায় এবং বর্ত্তমান পরিষদের অধিকতর ক্ষমতা হয়। ১৯২৪-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ১৯১৪ সাল অপেক্ষা চতুর্গুণ হইল তখন জাতীয় আন্দোলন দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনও দেখা দেয় এবং শহরে কিছু কিছু গোলমাল হয়। শিক্ষিত টিউনিসীয়রা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি করিতে থাকে, কিন্তু সে দাবি পূরণ হয় নাই।

১৯৩০ সালে দেশের সর্ব্বত্র পুনরায় জোর আন্দোলন দেখা দিল। ইহা দমনার্থ শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দস্তুর ও নিও-দস্তুর উভয় পার্টি বা দলকে ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ফলে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত দেশ শান্ত ছিল।

১৯৩৯ সালে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ বাধার ফলে টিউনিসীয়রা দলে দলে সৈন্যবিভাগে স্বেচ্ছায় যোগদান করে। ১৯৪০ সালে ফরাসী-জার্ম্মানীর যুদ্ধ বিরতির পরে দেশে গোলমাল হয় নাই। এই সময় বে' সিদি মনসেফ টিউনিসিয়ায় দস্তুরীয় মন্ত্রী নিয়োগ করিতে সক্ষম হন। অতঃপর ১৯৪৩ সালের মে মাসে মিত্রশক্তিবর্গ পুনরায় টিউনিসিয়া অধিকার করিলে ফরাসীরা বর্ত্তমান বে-কে পদচ্যুত করিয়া সিদি লামিনে-ক বে-র পদে অভিষিক্ত করে এবং বিপুলসংখ্যক আরবকে বন্দী করে। তাহাতে দেশের জনমত ফরাসীর বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। তদুপরি আর্থিক দুরবস্থা ও জ্বালানি, খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদির অভাব জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। ফলে ১৯৪৩ সালের শেষভাগে আরব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইল এবং বহুবিধ সংস্কারের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। এ ছাড়া টিউনিসীয়দের নূতন নূতন চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং কিছু কিছু উন্নতির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতেও টিউনিসীয়রা শান্ত হইল না।

বর্ত্তমান অবস্থা : ১৯৫১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর টিউনিসিয়াকে স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদসমূহ গঠনের পন্থা নিরূপণ ও পরিশেষে স্বাধীনতা দেওয়ার কথাবার্ত্তা ফরাসী সরকার বন্ধ করিয়া দেয়। টিউনিসীয়রা প্রথমে সমস্ত নির্ব্বাচিত টিউনিসীয় সদস্য দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা দাবি করে, কিন্তু ফরাসী সরকার তাহা অগ্রাহ্য করেন এবং টিউনিসিয়ার বসবাসকারী ফরাসীরা কি বাণিজ্য, কি বিধানসভা, কি সরকারী কর্ম্ম সর্ব্বত্রই টিউনিসীয়দের সহিত সমান স্থান লাভ করিবে এরূপ দাবি ফরাসী সরকার করেন। এমতাবস্থায় কথাবার্ত্তা চালানোর সকল পথ বন্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া টিউনিসিয়া মন্ত্রিসভা মহম্মদ চেনিকের নেতৃত্বে জাতিপুঞ্জের নিকট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই ফরাসী কর্তৃপক্ষ টিউনিসিয়ার জাতীয় নেতাদের বন্দী করিল। তখন সমগ্র টিউনিস জাতি দস্তুর দল ও ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত হইয়া ফরাসীদের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। ফলে ফরাসীরা ইহাকে দমন করার জন্য আরও সৈন্য পাঠাইল। কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরোচিত অত্যাচার সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলন প্রশমিত হইল না। অতঃপর ২৬শে মার্চ্চ ফরাসীরা টিউনিসীয় মন্ত্রিবর্গকে বন্দী করিল এবং সমগ্র দেশে মার্শাল আইন জারী করিল। এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া টিউনিসীয়রা লাঞ্ছনা ও মৃত্যু বরণ করিয়াছিল।

গত এপ্রিল মাসে জাতিপুঞ্জের ১১টি সভ্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে যাহাতে টিউনিসিয়া ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হয় সে জন্য অনুরোধ করিয়াছে। কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্য ইহাকে সত্বর কার্য্যতালিকাভুক্ত করার জন্য ভোট দিয়াছিলেন; কিন্তু অপর কয়েকজন সভ্য ভোটদানে বিরত থাকায় প্রয়োজনীয় কোরাম হয় নাই। সুতরাং এই আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও তখন কাউন্সিল কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইতে পারে নাই।

গত ২০শে জুন আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, লেবানন, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, সিরিয়া ও ইয়েমেন সেক্রেটারি জেনারেলকে জাতিপুঞ্জের এসেমব্লির বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া টিউনিসিয়ার পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিয়াছে। এবারও টিউনিসিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় ৩১টি ভোট পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই আলোচনা স্থগিত রহিয়াছে।

ভৌগোলিক বিবরণ : টিউনিসিয়া উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত। ইহা উত্তর ও পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ট্রিপোলি ও পশ্চিমে আলজিরিয়া দ্বারা বেষ্টিত। ইহার আয়তন ৪৮,৩০০ বর্গমাইল। ইহার উপকূলে ৩টি উপসাগর আছে, যথা—টিউনিস, হামামেত ও গেবস উপসাগর। পূর্ব্বদিকে একটি নিম্ন ও বালুকাময় মরুভূমি ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ইহার উত্তরাঞ্চল একটি মালভূমি এবং এই মালভূমি ক্রমাগত উত্তরে খাড়া পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ অঞ্চল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি এবং তাহার কোন কোন স্থান সমুদ্রতল হইতেও নিম্ন। ইহার মধ্যে আবার বিরাট বিরাট লবণাক্ত জলাভূমি আছে, তাহাদিগকে বলে শোল্টস (sholts), ইহার উত্তর দিকস্থ পর্ব্বত ওক বৃক্ষ দ্বারা সমাচ্ছাদিত। এখানকার প্রধান নদী হইতেছে মেজিরদা।

১৯৪৬ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ইহার লোকসংখ্যা ফরাসী ১,৪৩,৯৭৭, ইটালীয় প্রভৃতি বিদেশী—৯৫,৫৭২, ইহুদী—৭১,৫৪৩, আরব ও বেদুইন—২৮,৩২,৯১৮ জন। ইহার স্থানীয়

লোকসংখ্যা (আরব বেদুইন, বারবার ও ইহুদী) সর্ব্বসমেত—২৯,০৩,৯৪৯।

টিউনিসিয়ার প্রধান প্রধান শহর ও লোকসংখ্যা: টিউনিস (রাজধানী)—৩,৬৪,৫৯৩ জন; স্ফাক্স—৫৪,৬৩৭; বিজার্তা—৩৯,৩২৭; সুস—৩৬,৫৬৬ জন। কাইরওয়ান—৩২,২৯৯; গেবস—২২,৫১২; বেজা—২২,২০৮; মোকনিন—১৫,৬৯৯; নেফতা—১৪,১৬৭ জন।

খনিজ উৎপাদন (১৯৪৮): ফসফেট—১৮,৬৪,০০০ মেট্রিক টন; লৌহ—৬,৯৬,০০০ মেঃ টন; লিগনাইট—৭১,০০০ ও সিসা—২১,৬০০ মেঃ টন।

কৃষিজাত দ্রব্য (১৯৪৮): গম—২,৫২,৪০০ মেট্রিক টন; বার্লি—১,০০,০০০ মেঃ টন; জলপাইয়ের তেল—২৬,০০০; খেজুর—৪৬,০০০; কমলী ফল—২১,৩০০ ও মদ—৭,২৬,০০০ মেট্রিক টন।

পশুসম্পদ: ১৯৪৮ সালের হিসাব অনুযায়ী গো-মহিষ—৩,৪১,০০০; মেষ—১৫,৮৮,০০০; ছাগল—১০,৮৩,০০০; শূকর—৪২,০০০; অশ্ব—৭২,০০০; গর্দ্দভ—১,০৯,০০০; অশ্বতর—৪৭,০০০; উষ্ট্র—১,৭৭,০০০।

বৈদেশিক বাণিজ্য (১৯৪৮): আমদানী ৩৩,৮২৬ ও রপ্তানি ১২,৬৭৫ ফরাসী মিলিয়ন।

যানবাহন ও যোগাযোগ: রাস্তা (জানুয়ারী, ১৯৪৯)—৮,৭০৪ কিলোমিটার; রেলপথ—২,১৭৪ কিঃ মিঃ; মোটরগাড়ী (মার্চ ৩১, ১৯৪৯)—মনুষ্যবাহী যান (cars)—১,১০,৬২৪ ও বাণিজ্যিক—৬,৪৬৫। টেলিফোন গ্রাহক (জুন, ১৯৪৯)—২২,৮৩২। টিউনিসীয় বন্দরসমূহে (টিউনিস, বিজার্তা, সুস ও স্ফাক্স, ১৯৪৮) ২,০২৮টি জাহাজ প্রবেশ করিয়াছে; ১০,২৮,০০০ মেট্রিক টন মাল খালাস ও ৩১,১৫,০০০ মেঃ টন মাল বোঝাই হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ৬,৯৭২টি বিমান অবতরণ করিয়াছে। ৩০,২০৯ জন বিমান আরোহী এখানে আসিয়াছে এবং ৩০,৭৩০ জন আরোহী এখান হইতে বাহিরে গিয়াছে।

শিক্ষা (১৯৫০-৫১)—এখানে ৫৭৫টি প্রাথমিক, ১৫টি মাধ্যমিক ও ৬১টি যন্ত্র বা শিল্পশিক্ষালয়, ২টি শিক্ষক-শিক্ষণালয়, ১টি উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। বেসরকারী বিদ্যালয়—৪৩টি ফরাসী, ১১৮টি মুসলমান ও ৫টি ইহুদী বিদ্যালয় ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল—১,৭৫,২৬২। তন্মধ্যে মুসলমান—১,১৩,৩০১, ফরাসী—৩৭,৫১৭; ইহুদী—১৪,৩৯২ এবং অন্যান্য জাতি—৯,৯১২

বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা: ফরাসী বৈদেশিক আপিসের নির্দ্দেশমত ইহার শাসনকার্য্য চলে। এই আপিসে টিউনিসিয়ার কার্য্যের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ আছে, তাহা ফরাসী রেসিডেন্ট জেনারেলের (তিনি নিজে বৈদেশিক মন্ত্রী) অধীন। এখানকার মন্ত্রিসভা ১১ জন সদস্য লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে ৫ জন ফরাসী ও ৬ জন টিউনিসীয়। টিউনিসিয়া ২০টি জেলা ও ৬টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় দেশীয় কর্ম্মচারীরা বে-র প্রতিনিধিস্বরূপ থাকেন এবং রেসিডেন্ট জেনারেলের প্রতিনিধি ফরাসী কণ্ট্রোলারদের তত্ত্বাবধানে অধীন।

জাতীয় মহাসভা (Great Council) নির্ব্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত, ইহার অর্দ্ধেক সভ্য ফরাসী ও অর্দ্ধেক টিউনিসীয় প্রতিনিধি। ইহার কার্য্য অর্থ নৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি ব্যাপারে পরামর্শ দান।

জাগরের নিশি জাগি

শ্রীমহাদেব রায়

শরতে-হরিৎ নিখিলের কায়ে জাগে সুবর্ণ-শুভ্র ছায়া,
স্থলে, জলে, দিঙ্‌মণ্ডলে জাগে একাকার একি স্বপ্ন-মায়া!
শ্যামলীর বুকে—কাশের আঁচলে লয় শুভ্র জ্যোছনা-রাশি,
শারদ স্নিগ্ধ গরিমা দিব্য মহিমার নামে ধরায় আসি।

নীল-নির্ম্মল সান্ধ্য-সায়রে কুমুদের মুখে শুভ্র হাসি
হেরিয়া পূর্ণ-চন্দ্র গগনে বরষে হিয়ার অমিয়-রাশি,
প্রথ-পার্বিনীর অনুরাগ জাগে হরিৎ-কাঁচিতে শুভ্র-বাসে,
পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নাজিনে শারদা তটিনী হরষে ভাসে।

দেহে-লাবণ্যে একাকার হেন—কামনার-প্রেমে ঐক্যলীলা
এমনি পৌর্ণমাসীরই রজনী রচিল মধুর রাসের-লীলা,
পৌর্ণমাসীতে জনমি বুদ্ধ সিদ্ধ জীবনে মোক্ষ দানে,
রাধা-শ্যামের একক মুরতি গোরায় পৌর্ণমাসীই আনে।

তাদের মর্ম্ম মন্থন করা ঐক্য সুধায় দিল কি ভরি'
মহালক্ষ্মীর বর-অঞ্জলি শরতে শুভ্র এ কোজাগরী?
বিভেদ-লোপের এ আলো নিখিল বিশ্ব-মানসে উঠুক ভাসি
শুচিতা-শুভ্র—তারই আগে জাগি জাগরের নিশি পৌর্ণমাসী

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় "সোঽহং"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

শান্তিনিকেতন আশ্রম। সান্ধ্যোপাসনার ঘণ্টা তখনো বাজে নি। চারদিক নিরালা, নিস্তব্ধ। আলো-ছায়ায় ঘোরালো মাধবীবিতানে ঢাকা তোরণতল। তারি আশে-পাশে ঘুরছেন ফিরছেন চার জন লোক। তোরণে মার্বেল-পাথরে উৎকীর্ণ আশ্রমের মন্ত্র ও নিয়মাবলী। তাড়াতাড়ি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। সহসা সামনে অন্য লোক দেখে তাঁরা মুখ ফেরালেন। আর কিছু তাঁদের দেখা হ'ল না। তাঁরা ফিরে চলেছেন, আমি পাশ কাটিয়ে আগে আগে চললাম। ক্ষুদ্র দলটির অগ্রণী এক জন যুবক, সঙ্গে একটি নবীনা বধূ, একটি বালক ও একটি বালিকা। মনে হয় সাধারণ শ্রেণীর। কাছের শহরের বা গ্রামের লোক। যুবকটি বোঝাচ্ছিলেন আশ্রমের ধর্ম। বলে চলেছিলেন—রবীন্দ্রঠাকুর বড় কবি, আর খুব জ্ঞানী। এখানকার গুরু ছিলেন। বড়লোকে, মানে—খুব হাইক্লাস লোক ছিলেন তিনি। ওঁরা ব্রাহ্ম, এখানে হ'ল নির্গুণের উপাসনা, তাঁদের মন্ত্র হ'ল ওম্, ওঁকার; মূর্ত্তি-টুর্ত্তি নেই, পূজো-আর্চ্চা হয় না। বধূটি বাধা দিয়ে বললেন, সে কি রকম? যুবক বললেন, শব্দ ব্রহ্ম; আমাদের দেশেরই যে। হাইক্লাস শাস্ত্রকথা,—মানে, সব চেয়ে উচ্চ জ্ঞান, সেটাই হ'ল গিয়ে ওঁদের সাধনা কি না! কবিই এ সব করে গেছেন, ভেদবুদ্ধির বালাই ছিল না, লোককে খুব ভালবাসতেন। কথায় মধ্যে মধ্যে বেগ লাগছিল, মাঝে মাঝে চেপে-যাওয়ার ভাবটাও ছিল। বোধ হয় অন্য লোকের সান্নিধ্য ছিল তাঁর ইতস্ততঃ করার কারণ। চৌমাথায় এসে পড়া গেল। যুবকটি বললেন, ঘোর হয়ে গেছে যে, কখন ঘর পৌঁছব, চল চল পা চালিয়ে। বোলপুরের পথে তাঁরা চলে গেলেন। ভাবতে ভাবতে ফিরলাম, তাই তো, মোটামুটি এঁরা তা হলে তো মন্দ বোঝেন না। মূর্ত্তি কেউ মানে না, পূজা করে না,—এ সব অশ্রদ্ধার কথা নয়, আপত্তির কথা হতে পারে। ঐ কারণেই এঁরা কবিকে ও তাঁর আশ্রমকে একটু পর করেই দেখেন। তাতেও হয়তো তত বাধত না,—তার উপর নানা সমাজের নানা দেশীয় লোকের আনাগোনা, খানাপিনা! এত অবাধ মেলামেশা কেন? আচার বিচার নেই, ধর্ম্মের এ কোন কারখানা!—কোথাও তো এমন দেখা যায় না! এটা দেশেরও নয়, বিদেশেরও নয়,—কেমন যেন খাপছাড়া!

দেখা গেল, সাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা এখনো সহজ হয়ে ওঠে নি। একটা স্থলে বিশেষ করেই আটকাচ্ছে, সে তাঁর আচারের ক্ষেত্রে। আচারের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন একটি গণ্ডিতে বাঁধা পড়েন নি, একথা ঠিক, কিন্তু কেন বাঁধা পড়েন নি, সে কথার মর্ম্মানুধাবন করে দেখলে সাধারণের মনোগত দূরত্ব অনেকটা দূর হতে পারে।

আশ্রমদর্শনার্থী এই সব আগন্তুকের মত অনেক লোকেই জানেন কবি ব্রাহ্ম। শান্তিনিকেতন হ'ল ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠান, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাস্থল। সেখানে প্রতিমা-পূজা তাই প্রতিষ্ঠা না পাওয়ারই কথা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধের দিক থেকেই যে এরূপ ঘটছে, একথা ভাববার আগে আরো কতগুলি বিষয় এ সম্বন্ধে ভাববার আছে।

প্রতিমা-পূজকেরা ব্রহ্মকে মানেন। প্রতিমা-পূজার রীতি শান্তিনিকেতনে না থাকতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা তো সেখানে বিহিত আছে। সেটি প্রতিমার পূজক বা অপূজক কারোরই বিরুদ্ধ নয়; সকলেরই তাতে যোগ দেবার আহ্বান আছে, আর তার আয়োজন এমনই যে, সকলেই তাতে যোগ দিতেও পারেন। বর্দ্ধমানের বৈষ্ণব-চূড়ামণি নীলকণ্ঠ শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের উৎসবে যাত্রাগান করতে এসে রবীন্দ্রনাথের উপাসনায় যোগদান করে গলদশ্রু হতেন। বহু দেশ হতে আগত খ্রীষ্টীয় সাধকেরা এখানকার সাধনায় মুগ্ধ হয়ে আত্মনিবেদন করেছেন, আশ্রমের সেবা করে গেছেন, কোন প্রতিদান চান নাই।

শান্তিনিকেতন আদিতে ছিল একেশ্বরবাদীদের নিভৃত সাধনস্থল। কবি এখানে তাঁর আসন পাতলেন, মানবকল্যাণকর সকল প্রকার সাধনার সমাবেশ হ'ল। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, আশ্রম হ'ল সর্ব্বজনের একটি তীর্থস্থল। যেমন হ'ল সে সমাজ-চেতনায় বৃহত্তর, তেমনি এল তার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দায়িত্ব। অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে লাগল।

দেখা গেল, জীবনের প্রান্তে এসে তাঁর "নরদেবতা" প্রবন্ধে (১৩৩৮ আশ্বিন, প্রবাসী) দৃঢ় ও সুস্পষ্ট করে কবি এই লিখলেন যে, "সমাজে আর একটি বাহ্যিকতা আছে তারও আতিশয্যে বিপদ। সে হচ্ছে আচার। প্রেমে সত্যের উপলব্ধি পূর্ণ হয় তাই মিলন সেখানেই, শান্তি সেখানে। আচার সত্যের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠে, সর্ব্বব্যাপী যে ভগবান সর্ব্বগত শিব তাঁকে অতিক্রম করে নিজেকে দাম্ভিকতার সঙ্গে প্রচার করে, সমাজেরই দোহাই দিয়ে সমাজের নিত্যধর্ম্মকে খর্ব্ব করতে থাকে। তখন আচারীতে আচারীতে সর্ব্বনাশ বাধে।

"বিষয়ের অভিমান যেমন, আচারের অভিমানও তেমনি। বৈষয়িকতা সর্ব্বজনীনতার বিরুদ্ধ, আচারিকতাও তাই। আচার সাম্প্রদায়িক অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে, এই অহং-এর তাপ ব্যক্তিগত অহং-এর চেয়ে বেশি বই কম নয়। এ কথা মনে রাখা চাই যে, সেই সকল প্রবৃত্তিতে আমরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর করে মারি, যারা বিশ্বমানবের বোধকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ ধর্ম্মে সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বাধা পদে পদে।"

নানা কোণ থেকে এইরূপ বাধা তাঁর বৃহৎ সামাজিক 'বিশ-

নীড়'কে পাছে পদে পদে ব্যাহত করে, সেইজন্তে ছিল তাঁর সতর্কতা। প্রয়োজনস্থলে এই সতর্কতায় চেষ্টায় তিনি কঠোরও হতে পারতেন। সর্ব্বমানবের যেখানে যোগ ঘটেছে, সেখানে সর্ব্বজনস্বীকৃতিযোগ্য ব্যবহারই আচরণীয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা, বা উপলব্ধির পৃথক বিবর যদি বা কিছু থাকে, তা নিয়ে এমন কিছু দৈব তাৎপর্য্যের দুর্লঙ্ঘ্য ও দুজ্ঞের্য় ঘের দেওয়া চলে না, যা মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়, মানুষের মহিমা মানুষের কাছে ক্ষুণ্ণ করে। তা করলেই দেখা দেয় জড়বাদ। একদা আদি ব্রাহ্মসমাজেও কেবল ব্রাহ্মণেরই উপাসনা-পরিচালনার অধিকার ছিল। কবি তাঁর কালে সে বিধি তুলে দেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে যোগ্য-ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি আচার্য্যরূপে বরণ করে নেন। (দ্রঃ প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ, মাসিক বসুমতী ১৩৫৮ জ্যৈষ্ঠ) সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের আচারকেই যে তিনি যথাপূর্ব্ব অনুসরণ করেছেন, তা নয়, তাকে আর সকলের উপরে চাপানোর মত কোন সাম্প্রদায়িক প্রবর্ত্তন বিধানের তো দূরের কথা।

আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া মানুষ নেই। কম আর বেশী। মুখ্যতঃ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-সংস্কৃতি আপন প্রকাশ খোঁজে। পৃথক পৃথক প্রশস্ত কোঠায় আচার-অনুষ্ঠান যত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেতে পারে, সর্ব্বজনের মিলনের স্থলে তা হয় না। আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষার গোঁড়ামিই মিলনের বাধা হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কারণগুলি যাতে উদ্ভূত না হয়, কবি সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন।

আচার-অনুষ্ঠান বাইরের দিক। কিন্তু তাই তো সব নয়,—ভিতরের কোন্ মহৎ উপলব্ধি বাইরে তাঁকে আচারে এমন সরল ও সমন্বয়ী করে তুললে, সেটি জানাই বড় কথা। কেবল 'হাই-ক্লাস' জ্ঞান, ওঁকার, নির্গুণের উপাসনা, শব্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি গুটিকয় কথা জানলে বা বললে ভিতরের বা বাইরের বাধা দূর হবার নয়। তা অমনি থেকে যাবে,—লোকে সম্ভ্রম বা ভ্রমের বাহুল্যে ঐরূপ দেখে শুনে ভাসাভাসা দু-চার কথা বলাবলি করবে মাত্র। তার চেয়ে ভিতরে বাইরে মিলিয়ে ভাবে ও কর্ম্মে কবির উপলব্ধির সত্যবস্তুটিকে সুসমঞ্জসরূপে দেখতে পেলে তবেই যথার্থ শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী হওয়া যেতে পারে। তিনি যে ভাবধারা অবলম্বন করেছিলেন তার মূল উপনিষদের মধ্যে নিবদ্ধ। সুতরাং দেশের সাধারণের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর যোগ নাড়ির যোগ বললে অত্যুক্তি হবে না।

কবিকে তাঁর ভিতর থেকে সম্যক্‌ভাবে জানতে হলে, তাঁর আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিচারধারার সঙ্গেও অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা দরকার।

"সঞ্চয়" নামক দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থের "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধে কবি বলছেন, "আধ্যাত্মিক সাধনা কখনই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে।...সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অনন্ত পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনও মতে উজান পথে চলিতে পারে না।"

উদাহরণ দিয়েও তিনি এ সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে আরও বলছেন, "সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্ত্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটি মাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না...এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্য্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনও একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা সিংহ মায়ের বাহন। শক্তিকে সিংহ-রূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ যে-কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনও এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।"

রূপ-সাধনার সীমা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে পরবর্ত্তীকালের 'নরদেবতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "জাগতিক ক্রিয়া যে-ইচ্ছার চালনায় ঘটে বলে মানুষ স্থির করেছে তাকে নিজের আনুকূল্যে আনবার বিবিধ প্রক্রিয়ায় মানুষের পূজা আরম্ভ। জগতের শক্তিকে নিজের শক্তির সহায় করবার এই সাধনাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান বলে ধরা যেতে পারে।"

কিন্তু কবি এর পরেই বিচারধারায় এসে পৌঁছেছেন অরূপের সাধনতত্ত্বে। বলছেন, "মানুষের এই প্রত্যয় জন্মেছে বাস্তব বলে যা-কিছু সে দেখছে জানছে সেই দেখা-জানার মধ্যেই তা চরম নয়, এমন কিছুকে সে আশ্রয় করে আছে যা দেখা-জানার মূলে। মানুষ নিজেকে যদি একান্ত বাইরে থেকেই দেখে তবে দেখতে পাবে পরে-পরে কতকগুলি কর্ম্ম ও ছবি। মানুষ পদার্থের বাস্তব প্রমাণ এর বেশী আর কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম ও ছবির চেয়েও নিঃসংশয় ও অব্যবহিতভাবে এমন একটি সত্যকে সে জানে, যে সত্য তার সমস্ত কর্ম্মকে ও প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সম্বন্ধযুক্ত করে এক করে তুলেছে। এই হচ্ছে তার আত্মোপলব্ধি।"

"এই যে নিজের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে মানুষ আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। এমন কথা বলেছে, যে মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। যে ঐক্যতত্ত্ব তার নিজেকে অখণ্ড করেছে সেই তত্ত্বই অন্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেছে।"

কবির এই কথাগুলি যে কত সত্য, তা বুঝতে পারা যায়, যখন

একটু ভেবে দেখি—আকারে ও আচারে অর্থাৎ বাহ্যিক রূপে সীমা আমাদের গোচরে স্পষ্টতই বিদ্যমান, সেই সীমায়-সীমায় বস্তু থেকে বস্তু পৃথক। কিন্তু সেই পার্থক্য নিয়েই আবার সমস্ত বস্তু রয়েছে একটি নিখিল স্থিতিসূত্রে বিধৃত।—মালার গাঁথা মণিগণের মত। এই পরম ঐক্যের সত্যে সকলের সঙ্গে সকলের যোগ অন্তহীন,—আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধতা বা অনুকূলতা—ভিতরে ভিতরে যাই যত থাক না কেন। এই ঐক্যসূত্রের প্রবাহ শুধু জানা জগতের বস্তুরাশির মধ্যেই শেষ হয়ে নেই, আগে জানি না পরে জানতে পাই, আপাত ধারণার অগম্য এমন সংখ্যাতীত বিষয়ও একই সেই সূত্রের অন্তর্গত।

জগতে যত বস্তুই এরূপ থাক না কেন, বাহ্য বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য রক্ষা করে আভ্যন্তরীণ এই ঐক্যধারায় শাশ্বত ধর্ম লক্ষণ দ্বারা সকলেই যে সমধর্মা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মেলে না। আমার এই বাহ্যিক, আভ্যন্তরীণ ধর্মলক্ষণে আমাকে আমি সুস্পষ্ট করে সহজে জানতে পাই, জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের ভিতরে সেই একই ধর্মের শাশ্বত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে নিখিল ধর্মে সকলের মধ্যেই সমধর্মা এক 'আমি'-বোধক শক্তিকে একই কালে বাইরে স্বতন্ত্র থাকলেও ভিতরে এক করে অনুভব করতে পারি। আত্মবিষয়ী ও বহির্বিষয়ী জানা এভাবে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেকের ভিতরকার এই 'আমি'টির মতই বিচিত্র অবস্থা ও গুণের সমাবেশ দ্বারা তার বিরুদ্ধ পক্ষও তৈরি; সেই বিপক্ষের মত করেই বিপক্ষের দিকটা ভেবে দেখা ও তার মূল্য ও অধিকার নিজের মত করে সহজ আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করা—যখনই এটি সম্ভব হয় তখন একটি ভাব মনে উদ্রেক হতে থাকে, সেটি "সোঽহং"-এর ভাব। যা-কিছু জানার মধ্যে আসে, সেই সবকিছুই যে আমি এবং একই পার্থক্য ও ঐক্যের গুণ সমাবেশের সাধর্ম্য নিয়ে আমিও যে সে-সবই,—এইভাবে জগতের বিষয়সমূহকে জানতে সুরু করলে তখন বাইরে ভিতরে কোনখানেই কোন কিছুকে ছোট করে সীমায় খণ্ডিত করে জানার উপায় থাকে না। কবি বিশ্বজগৎকে এই ভাবেই জানতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত "সোঽহং" সাধনায় সমাহিত হয়ে জগতের সর্বত্র এক অনন্ত অখণ্ড শক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর গান ছিল—"শক্তিরূপে হেরো তাঁরে আনন্দিত অতন্দ্রিতে।" তিনি জগতের "রূপসাগরে ডুব" দিয়েছিলেন সেই এক "অরূপ রতনের"ই আশায়। এক অখণ্ডরূপে আপনার মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে আপনাকে জানা যাঁর আজীবনের সাধনা, বাইরের জীবনযাত্রাতে তাঁর সেই সাধনার উপযোগী প্রয়াস স্বভাবতঃই সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বিশেষের আচার-বাহুল্যের যে অবিচ্ছিন্নমানতা, সে এই বহুর সমাবেশের প্রসারেরই নামান্তর মাত্র। কবির কাছে বা তাঁর সাধনাক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই প্রতি সমাদর, তাঁর এই "সোঽহং" সাধনার প্রধান প্রক্রিয়া বলে গণ্য। সকলের মধ্যে বিশেষের স্থান-গ্রহণ কি ভাবে করতে হবে, এই প্রক্রিয়াটি সেজন্য জানা থাকা দরকার। তা হলেই কেউ কাউকে সেখানে পর করে মনে করতে পারবে না, কোন কিছুকেই বিদেশী ঠেকবে না। প্রাণের এই প্রসার-সাধনাই সেখানকার জীবনধর্ম "সোঽহং"। এখানকার বিগ্রহহীন সেই "সোঽহং"-তত্ত্ব পূজার উপচার হচ্ছে সংস্কৃতি।

কিন্তু যখন দেখি কবির গল্পগুচ্ছের "অনধিকার প্রবেশ" গল্পে রাধানাথ জীউর বিগ্রহের রাসকুঞ্জে পরম শুচিপরায়ণা সেবিকা প্রৌঢ়া বিধবা জয়কালী দেবী একটি প্রাণভয়-ভীত শূকরশাবককে সস্নেহে আশ্রয় দিচ্ছেন, তখনই বোঝা যায় তাঁর প্রাণ জড় হয়ে যায় নি; মৃত্তিকায় গড়া ঠাকুরকে অবলম্বন করেও শেষটা তাঁকে ছাড়িয়ে সে-প্রাণ কেমন জড়ে জীবে সর্বত্র প্রসার লাভ করেছে। সার্থক সেই পূজা। পাশাপাশি মনে পড়ে কবিরই 'বিসর্জন' নাটকের জীববলি-উৎসাহী পুরোহিত রঘুপতিকে, মনে পড়ে 'অচলায়তন' নাটকে নীতি-যূপকাষ্ঠের বলিরূপী বালক সুভদ্রের নির্বাসনদাতা জনড়চিত্ত আচার্য মহাপঞ্চককে। কলিকাতার কালীঘাটে বলি বন্ধ করার জন্য রামপ্রাণ শর্মা নামক জনৈক রাজপুত পণ্ডিত যখন প্রায়োপবেশন করেছিলেন, কবি তখন তাঁর আচরণকে সমর্থন করেন এবং প্রশস্তিবাচক একটি কবিতা লিখে তাঁকে উৎসাহ দান করেন। কবিতাটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তাঁর শেষ বয়সের ঘটনা। যজমান বা পূজকের প্রাণের মূল্য আছে, আর সামান্য জীব বলেই কি ছাগ-বলি বিহিত হবে জগজ্জননী মহাকালীর প্রীত্যর্থে?—এ হচ্ছে প্রাণের প্রসার-নীতির স্বভাব বিরুদ্ধ। এ থেকে বেদনায় কোনও পরম সুর বাজে না। কেবল সীমাবদ্ধ স্বার্থ-সিদ্ধির স্থূল উপলক্ষগুলিই উঁকি মারে। ধর্মের নাম করে এই যে হিংসা, এইটিই ধর্মের বিকৃতির রূপ। এর দ্বারাই প্রাণের অনন্ত বিকাশকে হিংসিত প্রাণীর মধ্যে কার্যতঃ অস্বীকার করা হয়ে থাকে। পরম শক্তিকে দলের সীমায় বদ্ধ করে দেখার ফলেই এই হিংসাত্মক অনুষ্ঠান ঘটে থাকে।

কবি গেয়েছেন—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" যেখানেই সীমাকে কবি দেখেছেন অসীমের ব্যঞ্জনামুখর বংশীরূপে, সেখানেই তাঁর কাছে রূপ-চিন্তার একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি এসে পড়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ হচ্ছে যখন অসীমকে সীমাতেই এরূপ নিবদ্ধ করে দেখা হয়। এজন্যই বিগ্রহের সঙ্গে অনন্তের কোনও সাম্য কবি স্বীকার করেন নাই, এবং পশুশালার সিংহের মধ্যে শক্তিকে দেখবার আগ্রহে তাঁর মন বিরূপ হয়েছে। কবির 'সোঽহং' সাধনার এটি একটি বিশেষ দিক। "ধর্ম" গ্রন্থে 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য খর্ব্ব করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখ সৃষ্টি করিবে, দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কি করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।"...এই বিচিত্র জগৎ সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের

অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনও বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনও বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনও বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার জটিলতা সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতায় এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে।"

কবির পূজাক্ষেত্রে এই ভূমাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আয়োজন সার্থক হয়েছে যে-কয়টি ক্ষেত্রে—তার মধ্যে পরিণত বয়স্ক কর্মীদের কথা আজ বলব না, বলব একটি ছাত্রের উদার বনস্পতির কথার চেয়ে ক্ষুদ্র ফলের কথা, মননশীলতার কথা, সকলেরই যা এত দিনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছাত্রটি মুসলমান। কর্মজীবনে "সত্যপীর" নাম ধরে জ্ঞান-ভারতীর পূজা জুগিয়েছেন প্রথম সাহিত্যের 'আনন্দবাজারে"। আজ সে পরিচয় রটতে বাকি নেই "দেশে-বিদেশে"। দেশ-বিদেশের সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য ভারতরাষ্ট্র দপ্তর খুলেছেন। সেখান থেকে এমন ধরণের কাজ হওয়ার কথা, যাতে বিশ্বমৈত্রীকামী রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা কিছু সার্থক হলেও হতে পারে। সেখানে সেই "নর-দেবতা"র পূজাপীঠে রবীন্দ্রনাথেরই এই মুসলমান ছাত্রটি আজ সাংস্কৃতিক যোগের ভারপ্রাপ্ত গুরুতম ঋত্বিক। বিচক্ষণতার সঙ্গে সরলতার সংযোগ ঘটেছে তাঁর লেখনীতে। সংস্কারের চেয়ে সংস্কৃতির আবেদনই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলে মানুষের মিলনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের পূজা আচারের পথে প্রত্যক্ষ হয়ে চলে নি, তার কাজ চলেছে মানুষের মন গড়াকে উদ্দেশ্য করে নিরিবিলিতে। সুতরাং শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নয়, মতামতেও নয়, মানুষের জীবনগত পূজার ক্ষেত্রেও তাঁর সাধনার সার্থকতার রূপ খুঁজতে হবে।

জপতপ পূজা-অর্চনা ধ্যানধারণার দিক দিয়ে তাঁর পরিচয় দেশের অনেকে খোঁজেন এবং সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেলে তাঁদের অধিকাংশই, পরিতৃপ্ত হতেন বটে, কিন্তু সে-সুযোগ মেলে কম। জড়ত্বের গ্লানি ঘুচিয়ে প্রাণ-সমুদ্রে অসীম বিস্তারকেই কবি উপলব্ধির পরম বিষয় করে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মধ্যে জড়বাদের প্রতিবাদগুলি একদিকের কাজ মাত্র। কিন্তু তাঁর সর্বভূত নিয়ে সৃষ্টি ও সংযোগের অজস্র কাজের পরিচয় রয়েছে বহু পথে। মানুষের মিলন-সাধনার ক্ষেত্র এই তাঁর বিশ্বভারতীর মধ্যে যাতে জড়ত্বের ছোঁয়াচ না লাগে, সেজন্যও তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল না। একখানি পত্রে তিনি বলেছেন: "যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠে নি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত করে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলার প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানাঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট করে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হ'ল প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়ি-পেটা। কথা-নির্দিষ্টের শাসন আইনেকানুনে পাকা হ'ল, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস করে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শাল-বীথি-ছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কত দূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অভ্যস্ত পাকা গাঁথুনির কাজ।···মন বলছে, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।' এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে; সেদিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে, পাঁচ জনে মিলে আমাকে কারখানাঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ইতি ৮ এপ্রেল, ১৯৩৫।" "পথে ও পথের প্রান্তে" গ্রন্থের ৫৪ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত ঐ "রক্তকরবী"র মধ্যে কবি যে মুক্তির প্রেরণা খুঁজেছেন, সে প্রেরণার আরও ব্যাপক প্রত্যক্ষ বিকাশের চেষ্টা থেকেই দেখা দিয়েছে শান্তিনিকেতনের শুষ্ক ভূমিতে মানুষের যোগাযোগ-ক্রিয়ার পাশে-পাশে প্রকৃতি ও তৃণলতা-উদ্ভিদেরও যোগ কামনা করে—বৃক্ষরোপণ উৎসব, সীতাযজ্ঞ, বর্ষামঙ্গল উৎসবাদি।

কবির সত্তর বৎসরের জন্মোৎসব হবে। কি কি অনুষ্ঠানের সমাবেশ করলে তাতে কবির যোগ্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয়, এই নিয়ে নানা প্রস্তাব হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নানা আয়োজনই হয়েছিল এবং সুষ্ঠু ভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়ে সকলের আনন্দবিধানও করেছিল। তার অনুষ্ঠান-সূচীতে সেদিন আশ্রমবাসী ও সমাগত বন্ধুবান্ধবাদি অতিথি সজ্জনের আদর-আপ্যায়ন ও ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পশুপক্ষীদের জলদানের জন্যও সেদিন "প্রপা" উৎসর্গের অনুষ্ঠানটি সমান ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল।

এর দ্বারা সর্বভূতের বেদনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রসার আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সূচনাগুলি ক্ষুদ্র হলেও বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক। এই কবিরই বাণী—

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

দেবালয় তাঁর কোনও একটি বিশেষ দেবতাকে নিয়ে বিশেষ মাহাত্ম্যে মণ্ডিত হয়ে উঠে স্বতন্ত্র ভাবে কোনও এক জায়গায় সাধনার সীমা টানে নি। তাঁর দেবতা বিরাজ করেন সর্বলোকে এবং সর্বত্র। এই দেবতার সহজ উপলব্ধি নিয়েই তাঁর দিন কেটেছে।

তাঁর উদার 'সোঽহং-সাধনার প্রত্যক্ষ ফল এইটুকু দেখা গেছে যে, যখন দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার অনলে মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে মারছিল, মারামারি-কাটাকাটিতে কলিকাতার বুকে রক্তগঙ্গা বইছিল, তখন অনতিদূরবর্তী শান্তিনিকেতনে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীষ্টান পাশাপাশি এক পরিবারের মত বাস করেছে। চীন-জাপান যুদ্ধের চলতি পর্বেও চীনা ও জাপানীরা পরস্পরের মধ্যে মানুষকে

এখানে হারায় নি। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—সমস্ত বিশ্বের এক নীড়ে অবস্থানের চিত্র ভেসে ওঠে কবির 'বিশ্বভারতী' এই আখ্যাটিতে।

দেশ-বিদেশকে কবি নিজের মধ্যে কোন গভীরে পেয়েছিলেন, কেমন করে সর্বত্র নিজেকে বিস্তৃত দেখেছিলেন, "সোঽহং" ধর্মের সর্বানুভূতি জিনিসটি কতখানি তাঁর জীবনে স্বদেশে বিদেশে বাস্তব হয়েছিল, সাধারণের অবগতির জন্য সে কথার ব্যঞ্জনাযুক্ত একখানি অপ্রকাশিত পত্র এখানে প্রকাশ করা গেল। এর আনুষঙ্গিক ইতিহাসটি এই: আশ্রমবিদ্যালয় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে সরকারী ম্যাট্রিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র (পরে অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে জেনিভা থেকে কবি এই পত্রখানি লিখে পাঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কবির অবাঞ্ছিত ছিল। পত্রের মধ্যে এক স্থলে তিনি বলছেন, সেটা আশ্রমের উপর "ভূতের মতো চেপে ছিল।" একদিকে সেই ভূতের উপদ্রব, অন্যদিকে আবার উৎকট অসহযোগনিষ্ঠা! আশ্রমের ঘটেছিল উভয়সঙ্কট। প্রাণহীন নিয়মতান্ত্রিকতা ও নির্মম-নৈষ্ঠিকতার বাড়াবাড়িতে মাঝখান থেকে কতকগুলি নিরপরাধ বালকের শিক্ষার সুযোগ নষ্ট হচ্ছিল। আর, এর থেকে পাছে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণের প্রসার চাপা পড়ে জড় যান্ত্রিকতা পূজার প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেই আশঙ্কা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পত্রে কবির সহানুভূতি ও বিবেচনার সাড়া জেগেছে প্রতিষ্ঠানকে জড়তার গ্রাস থেকে বাঁচাতে। সে বছর পরীক্ষার সুযোগ না থাকায় অনেক ছাত্রকে অভিভাবকগণ বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। ছাত্রগণ আশ্রম ছেড়ে যেতে স্বভাবতই কাতর হয়ে পড়ে। ব্যথিত চিত্তে তাদের বিদায় নিতে হয়। কবি একথা জানলেন। সন্তানবাৎসল্য দিয়ে যাদের তিনি হাতে গড়ে ছিলেন তাদের ছেড়ে দিতে দূরে থেকে কবির নিজেরও কেমন লেগেছিল এ পত্রে সে সবই জানা যাবে:

Geneve

কল্যাণীয়েষু

অনেক কষ্টে এগুরুজকে নিয়মমত চিঠি লিখি—তার কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ যে এইটুকু দাবি না মিটিয়ে থাকতে পারি নে। কিন্তু তার উপরে আর বোঝা বাড়ানো চলে না। একটুও সময় নেই। আশ্রমের কথা, তোদের কথা কেবল রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবি—দিনের বেলা ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে হয়। আমার মতো কুঁড়ে লোকের পক্ষে এত বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? আমি কর্মবিধাতার হাত এড়াবার জন্যে অনেক ভেবে চিন্তে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তার ফল হ'ল এই যে সেখান থেকে হিঁচড়ে এনে তিনি আমাকে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াচ্ছেন। ছেলেবেলা ইস্কুলের হাত এড়াবার জন্যে যা না করবার তা করেছি, বৃদ্ধবয়সে একখানা গোটা ইস্কুল ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি—তাতেও প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না, অবশেষে একটা ইউনিভার্সিটির বোঝা তৈরি হচ্ছে, সেটা যখন ঘাড়ে চাপবে একেবারে চেপটা হয়ে যাব। গোড়ায় কাজ ফাঁকি দিলে অন্তে কাজ বেড়ে যায় আমি তার নিদারুণ দৃষ্টান্ত—অতএব সাবধান হবি—এবং শিশুদের জন্যে নীতিশিক্ষার বই যদি কখনো লিখিস তা হলে আমার দুঃখের দশা উল্লেখ করে তাদের সতর্ক করে দিস।

ম্যাট্রিক তুলে দেওয়া নিয়ে তোদের যখন ঝুটোপুটি চলছিল আমি চুপ করে ছিলুম। তার কারণ, দূরের থেকে সমস্ত অবস্থা সুস্পষ্ট বোঝা যায় না—তার পরে তোদের মধ্যে উত্তেজনার তাপ উগ্র হয়ে উঠেছিল—আমি সমুদ্রপার থেকে যদি কোনো পক্ষ অবলম্বন করতুম তা হলে নিঃসন্দেহই তার ফল ভাল হ'ত না—আমি জানতুম তোরা আপনাদের মধ্যে থেকেই একটা মীমাংসা করে নিতে পারবি, আর সেইটেই সঙ্গত। আমি পারতপক্ষে আমার মত জোর করে চালাতে চাইনে—আশ্রমের অনেক ব্যবস্থা ও নিয়ম আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে প্রচলিত হয়েছে, আমি তাতে হস্তক্ষেপ করি নি। আমি নিজে জবরদস্তির পক্ষপাতী নই, অন্যের কাছ থেকেও আমি সেই নীতি প্রত্যাশা করি। ম্যাট্রিক আমার মনের মত জিনিষ নয়—কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক যখন এটা চায় তখন ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিন্ন করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ পাকা করে তুলে মান্ত্রিক এবং অমান্ত্রিক এই দুই ধারা রক্ষা করব—শেষকালে দুই ধারা যথাসময়ে একে এসে মিলবে। আমি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই কোন ছাত্রকে কাঁদিয়ে বিদায় করতে পারতুম না। এ সমস্ত সত্ত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করিনে—কারণ ওটা ভূতের মতই আমাদের বিদ্যালয়ের ঘাড়ের উপর চেপে ছিল—গেছে আপদ গেছে।

কিন্তু আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হ'ল না, এটা হ'ল নন্‌-কো-অপরেশন পর্বের একটা অধ্যায়রূপে। বাহির থেকে পলিটিক্সের ঝাঁটা আমাদের শান্তিনিকেতনের পিঠের উপর পড়ল। তাতে করে তার পিঠের যদি কোনো ময়লা উঠে গিয়ে থাকে সেই সঙ্গে তার অনেকখানি চামড়াও উঠে গিয়েছে—তার ব্যথা এবং তার দাগ সহজে মিটবে না।

আমি এখানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোরা যদি আমার সঙ্গে থাকতিস তা হলে দেখতে পেতিস এখানকার লোকে আমাকে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। এরা আমার কাছ থেকে কি পেয়েচে তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নেই যে আমার দেশের লোক আমার কাছ থেকে এমন করে কিছুই গ্রহণ করে নি। ভাবের বীজ যেখানেই ফসল দেয় সেইখানেই তার যথার্থ আপনক্ষেত্র—সে হিসাবে এই পশ্চিম দেশের জমিতেই আমার সম্পূর্ণ সফলতা। এরাও মানুষ—এরা যখন আমার কাছে এসে বলে "তুমি আমাদের" তখন বিদেশীয়তার বাহ

ব্যবধানই অন্তরের আত্মীয়তাকে আরো সুপরিস্ফুট করে তোলে। এরা যখন আমাকে এমন করে চায় এমন করে ডাকে তখন আমি এদের আপন বলেই গ্রহণ করি—কেন না এদের এই চাওয়া বড় গভীর, এদের এই ডাক বড় সত্য কেবল ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে আমার দেশের সীমানা আমি নির্ণয় করতে পারি নে। তার চেয়ে আরো গভীরতর সত্যতর স্বদেশ আছে—সেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের সহজ সাড়া চলে। সেখানে নাড়ীর যোগের টেলিগ্রাফি নেই, সেখানে আকাশে আকাশে বিনাতারের টেলিগ্রাফি।

আশ্চর্য্য এই যে তবু সেই দেশের টান এড়াতে পারি নে। সেই মাঠ, সেই আলো, সেই আমবাগান, সেই দীঘীর কালোজল, সেই নবীন অঙ্কুরে শিউরে-ওঠা ধানের ক্ষেত, সেই মর্ম্মরিত তালবনের উপরে নববর্ষার ঘনস্নিগ্ধ ছায়া, বাঁশির নব নব তানের মত আমার বুকের মধ্যে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্চে। যা হোক, দেশে ফেরবার দিন কাছে এসেচে। কিন্তু দীর্ঘপথের শেষ অংশটাই সব চেয়ে দীর্ঘ বলে মনে হয়, আমারো তেমনি এক বৎসর এক রকম করে যখন কেটে গেল ছমাস যেন আর কাটতে চায় না।

যা হোক তোদের সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবে রেখেছি—দেশে ফিরে গিয়ে তার আলোচনা হবে। আজ নানা জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে তৈরি হয়ে নিই গে। ইতি ৫ মে ১৯২১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুরভিসার

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

আয়তনে দীর্ঘ নয় ঘরখানি। দিনকয়েক হ'ল মাত্র কলি-ফেরানো হয়েছে। শাদা ঝক্‌ঝকে দেয়ালে আব্‌ছা নীলের প্রলেপ। অল্প পাওয়ারের নীল বালবের আলোয় অপূর্ব্ব একটা শোভার সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত ঘরখানিতে। দরজার দিক ঘেঁষে দেয়ালে একটা হরিণের শিঙে ঝুলছে তিন ব্যাটারির একটা টর্চ। ওপাশের দেয়ালে স্থির হয়ে আছে একটা বড় ক্লক, অবিশ্রান্ত ভাবে টিক্ টিক্ করে চলেছে পেণ্ডুলামটা। তারই নীচে সযত্নে সাজানো ড্রেসিং টেবিল। স্বচ্ছ আয়নায় ঐ নীল বালবের আলোর রেখাটা প্রতিফলিত হয়ে তির্য্যক্ ভাবে গিয়ে পড়েছে যেখানটায়, সেখানে কে-একজন মহা-পুরুষের ছবির নীচে ঝুলছে ইংরেজী-বাংলায় মেশানো একটি ক্যালেণ্ডার।

নীল বালবের আলোর একটা অপরূপ স্নিগ্ধতা। স্তিমিত রেখায় ঘুমের জড়তা নামল এক সময় এই ঘরে। অনবরত টিক্ টিক্ করে চলেছে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা, আর মাঝে মাঝে বেজে উঠছে সচকিত শব্দে। একজোড়া মানুষ ছাড়া আরও একজোড়া জীব থাকে এই ঘরে: টিক্‌টিকি-দম্পতি। মাঝে মাঝে ঐ পেণ্ডুলামের শব্দেই তারাও কোন একটা গোপন প্রণয়-মুহূর্ত্তে ডেকে ওঠে: টিক্—টিক্—টিক্—।

আদিত্য বিছানায় শুয়ে শুভক্ষণে হয়ত কোন একটা গোপন সত্যকে আবিষ্কার করে বসে আদিত্য। লম্বা একহারা ছিপছিপে চেহারা। হাতের কব্জীতে পুরনো একটা দাগ এখনও চোখে পড়ে। ওটা প্রথম জীবনে সাইকেল-চড়া শিখবার পুরস্কার। দুর্জ্জয় শিক্ষানবিশির মুহূর্ত্তে হঠাৎ একটা এক্সিডেণ্ট। পুরো তিন মাস ভুগতে হয়েছিল হাতখানি নিয়ে। কলেজ-জীবনের প্রেমের স্মৃতির সঙ্গে এই স্মৃতিটাও অবচেতন মনের মধ্যে মাঝে মাঝে খচ খচ করে বেঁধে বৈ কি! সেই সঙ্গে একটা মন্থর আবেশেও সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় আদিত্যের। আঃ—কি উজ্জ্বল দিনগুলিই না কেটেছে কলেজ-জীবনে! তপতী সেদিন ফিলজফির নোটখাতাখানি ফিরিয়ে দিতে এসে নিজেকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে গেল তার কাছে, তিথিটা সেদিন পূর্ণিমা ছিল কিনা, মনে নেই, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল—তপতী নামে যেন ওকে ঠিক মানায় না, নামটা পূর্ণিমা হলেই ষোলকলায় পূর্ণ হ'ত। এলও এক দিন সেই পূর্ণিমা, কিন্তু সে আর-একজন।

ঢন্…ঢন্…ঢন—।

তিনটের বেল বাজল ঘড়িতে। নিবিড় নিশুতি রাত্রির তিনটে। অবচেতনার বিস্মৃত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সেই সব টুকরো টুকরো স্মৃতি-গুলি লুকোচুরি খেলছে এখন। মুছে গেছে মনের অতলে বিলীন হয়ে সবকিছু এই মুহূর্ত্তে। রাত তিনটে। পেণ্ডুলামের ঐ টিক্ টিক্ শব্দপ্রবাহ এসে যেন এক সঙ্গে আছাড় খাচ্ছে বুকের পাঁজরায়।

একবার পাশ ফিরে শুল আদিত্য।

হঠাৎ একটা স্পর্শ। ছ'গাছা চুড়ির মৃদু একটা শব্দমাত্র।

—কে?

—কেন, ভয় পাচ্ছ? চিনতে পারছ না—আমি পূর্ণিমা!

—কেন, তুমি কেন এ সময়ে এখানে? আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে হঠাৎ একবার উঠে বসতে চেষ্টা করল আদিত্য।

—আমি নই, তোমার তপতী। কেমন যেন একটা কান্নার

স্বরে আর্দ্র হয়ে উঠল পূর্ণিমার কণ্ঠ।—আমার নিজের জন্তে হলে কোন দিনই এ দরজায় আসতাম না। শুধু তোমার ছেলেকে তোমার হাতে তুলে দিতে এলাম।

—আমার ছেলে? কে, অন্নু? মনে মনে একবার অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠল আদিত্য।—না, না, তা হয় না। তা হবে কি করে? অন্নু এখানে থাকতে পারে না। ওর জন্তে ত মাসোহারারই ব্যবস্থা করেছি—তবু এমন করে হঠাৎ এসে উপদ্রব আরম্ভ করলে কেন, বল ত পূর্ণিমা?

—উপদ্রব! দৃঢ় চিত্তে মাথা খানিকটা তুলে দাঁড়াল পূর্ণিমা, তার পর মুখায় ঠোঁট উল্টে নিলে।—উপদ্রব বৈ কি! বাপ হতে এক দিন লজ্জা ছিল না, আজ ছেলের ভার বওয়াটাকে উপদ্রব বলেই ত মনে করবে! এই ত পুরুষের মত কাজ।

—পূর্ণিমা! খানিকটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল আদিত্যের স্বরে।

এতটুকুও ভয় পেল না পূর্ণিমা। বলল, জানি, তুমি একথায় চটবে, একটি দিনের জন্তেও তাই এসে বাধা জন্মাই নি তোমার সুখে। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ভগবান অদৃষ্টে দেন নি। আর-একবার গলাটা ধরে এল পূর্ণিমার।—কিন্তু আমারও কি কোন অধিকারই ছিল না এমনি করে সুখী হবার? স্বামীর সুখে মেয়েদের যে কত সুখ, তা কি এতটুকুও জান না তুমি?

কথাটা বলে যেন হঠাৎ নিজের কাছেই বোকামিটা ধরা পড়ল পূর্ণিমার। তেমন সুখের কথা সত্যিই কি এমন কিছু দুর্বোধ্য আদিত্যের কাছে? রমাকে নিয়ে ঘর করে আজ অন্ততঃ সেটুকু জানে বৈ কি আদিত্য!—আদিত্যের মনে হ'ল রমার কথা ভাবতে গিয়ে যেন এতটুকুও ঈর্ষা এল না পূর্ণিমার মনে, বরং একটা তৃপ্তিতে সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

নীল বালবের স্তিমিত আলোয় কেমন যেন একটা অদ্ভুত শোভা সারা ঘরময়। অলক্ষ্যে পূর্ণিমার বুকের মধ্যে একবার নড়ে উঠল অন্নু। নরম এঁটেল মাটির মত তকতকে একমুঠো মাংসপিণ্ড। অবিকল আদিত্যের মত চেহারা পেয়েছে অন্নু। নামটা যদিও দিদিমার দেওয়া, কিন্তু আদ্য অক্ষরে স্বরবর্ণের একটা স্বাভাবিক মিল রয়েছে বাপের সঙ্গে: আদিত্য রায় আর অঞ্জন রায়।

নিজেকে নিয়ে দুঃখ ছিল যা পূর্ণিমার, সমস্ত দুঃখ আজ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে শুধু অন্নুকে নিয়েই। ওর মুখের দিকে তাকাতেই কেমন যেন আদিত্যের মুখখানি কেবল দু'চোখে ভেসে ওঠে। পাড়া-প্রতিবেশীর ধারালো কথার তীরে তীরে বিদ্ধ হয়ে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে না পূর্ণিমা। এর চেয়ে আদিত্য যদি একটু বিষ এনে মুখে তুলে ধরত, তবে অনেক শান্তি পেত সে।

ওপাশের জানলা দিয়ে মৃদু হাওয়া এসে একবার ঢেউ খেলে গেল মশারির উপর। নড়ে উঠল একবার পূর্ণিমার শাড়ীর আঁচলটা। অন্নুকে আরও খানিকটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে কতকটা আঁটসাট হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে পূর্ণিমা।

বিশ্রী একটা অস্বস্তিতে দম আটকে আসছিল আদিত্যের। কতকটা ইতস্ততঃ করে বলল, অধিকারের পালা ত অনেকদিনই শেষ হয়েছে, আজ তাকে আবার নতুন করে প্রকাশ করবার অর্থ কি পূর্ণিমা?

—না, অর্থ কিছু নেই, বাঙালী মেয়েদের জীবনের সত্যিই কোন অর্থ হয় না। থামল একবার পূর্ণিমা, তার পর আবার বলল, কিন্তু তাই বা মাঝে মাঝে বড় বেশী বিশ্বাস করে উঠতে পারি কৈ? রমার দিকে তাকালে মনে হয়—কত গভীর অর্থপূর্ণ মেয়েদের জীবন! নিজের দিকটা এই প্রসঙ্গে নাই বা বললাম।

—শুধু এই জন্তেই তোমাকে সহ্য করতে পারি নি। একটা বিকৃত সুরের স্পর্শ বোধ হ'ল আদিত্যের কণ্ঠে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ অন্তের সম্পর্কে হিংসা তোমার প্রচুর, যাকে ছাপিয়ে তোমার শিক্ষা সংস্কৃতি বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

অতি দুঃখেও সম্ভবতঃ একবার হাসল পূর্ণিমা।—সেটাকে হিংসা বলে না, বলে আভিজাত্য। মেয়েরা চায় সবার থেকে স্বতন্ত্র করে স্বামীকে পেতে, আর সেই পাওয়ার মধ্যেই নিজের আভিজাত্য নিয়ে বাঁচতে চায় সে সংসারে, সমাজে। আমি ত মূর্খ, একথা তোমার রমাকেই বরং জিজ্ঞেস করে দেখো।

ঘড়ির পেণ্ডুলামটা তখনও তেমনি অবিশ্রান্ত ভাবে টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে। পিছনের দেয়াল থেকে সেই সঙ্গে আর একটা শব্দ শোনা গেল—টিক্...টিক্...টিক্—। অলক্ষ্যে আত্ম-উপস্থিতি ঘোষণা টিক্‌টিকি-দম্পতির। ঈষৎ একবার ঘাড় বাঁকাতেই ক্যালেণ্ডারের পাতায় একটা নির্দিষ্ট তারিখের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল পূর্ণিমার: ২৩শে আষাঢ়। এই দিনে প্রথম যৌবনের দুয়ারে সানাই বেজেছিল তার। এখনও সেই সুরটা স্পষ্ট কানে বাজে—আকুল করে, আচ্ছন্ন করে, আলোড়িত করে তোলে মনকে। কিন্তু আজ সবকিছু স্বপ্ন; সবকিছু শান্তি জীবন থেকে গুঁড়িয়ে গেছে।

পূর্ণিমার মনের এই ভাবগুলি আদিত্যও জানে বৈ কি! কিন্তু তাতে সাড়া দেবার মত মন আজ আর আদিত্যের নেই।

ঢং—।

আর একবার বেলের আওয়াজ হ'ল ঘড়িতে। সাড়ে তিনটা। নিশুতি অমাবস্যা রাত্রির সাড়ে তিনটা।

বার-কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টানল আদিত্য। গলার মধ্যে খানিকটা কেমন যেন গোঁ গোঁ করে শব্দ হ'ল, ঠিক বুঝা গেল না। পূর্ণিমার কথাটা এত স্পষ্ট, এত সত্য অথচ ধারালো যে, প্রতিবাদ তুলতে পর্য্যন্ত গলায় বেধে গেল আদিত্যের। একটা কোণের দড়ি ছিঁড়ে মশারির কতকটা অংশ এসে ঝুলে পড়েছে পায়ের উপর, তারই সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে কিছুক্ষণ আলস্য-জড়তায় আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল আদিত্য। মনটা চলে গেল পশ্চাতের দূর কোনও পট-

ভূমিতে—যেখানে উত্তাল সমুদ্র-গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে সৈকত-ভূমি, ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি যেখানে ছন্দে আর সুরে সুরে গেঁথে উঠছে অনন্ত কথামালায়।

তপতীর কথাটাই প্রথম মনে এল আদিত্যের। সহপাঠিনীর প্রতি অলক্ষ্য আকর্ষণ। মনে হয়েছিল—সে-ই স্বর্গ। বি-এ অনার্সের ছাত্র আদিত্য রায়ের জীবন বেয়ে স্বর্গ নামল সেই প্রথম। রাশি রাশি কবিতা লিখেছিল সে তপতীকে নিয়ে; একটা কবিতার প্রথম পংক্তিটা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে:

পূর্ণিমা তুমি এলে কি রাঙায়ে দিগঙ্গন,
শ্বেত পারাবত ঝাঁ ঝাঁ দিনান্তে যেথায় মেলেছে পাখা,
অজ্ঞাতে তুমি ফুটেছ কখন আলো করে এই বন,
সহসা তোমার ঘন জোছনায় নীরবে পড়েছি ঢাকা।

নীল আকাশের পূর্ণ চাদের মতই একটা নরম আলোময়তা ছিল তপতীর সারা দেহে। সেই আলোয় অবগাহন করে যে কত শান্তি ছিল—তা বিশেষ করে বোধ হ'ল ভাঁটার মত আদিত্যের জীবন-সমুদ্র থেকে তপতী সরে যাবার পর। কবিতা-রচনাও সেইখানেই বন্ধ হয়ে গেল আদিত্যের। আরও কিছুদিন যদি তপতী কাছে থাকত, অন্ততঃ আরও কিছুদিন যদি অনার্স ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ইসারায় ডাকত তাকে তপতী, তবে ভবিষ্যৎ বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আসন নির্দিষ্ট হয়েই থাকত বৈ কি আদিত্যের জন্য! কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন একটা মেঘ-ডাকা বিদ্যুৎ চমকে গেল চোখের সামনে দিয়ে। পূর্ণ চাদের মধ্যে যে শুক্লপক্ষের উদয়, বজ্রকঠিন বিদ্যুতের মধ্যে তা শেষ দৃশ্যে এসে বিলীন হয়ে গেল। বাস্তবের মূর্তিতে এক সময় সামনে এসে দাঁড়াল পূর্ণিমা।...

আবার বারকয়েক জোরে জোরে শ্বাস টানল আদিত্য। দেখল—স্থির হয়ে কাঠের মত ঠিক একই ভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণিমা। আর একবার স্মৃতির সাগরে অবগাহন করে উঠল সমস্ত মনটা।

—কার্ত্তিকপুর থেকে এক দিন সম্বন্ধ পাকা করে ফিরলেন ছোট কাকা। সংসারে বেঁচে থাকবার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন একমাত্র তিনিই। নামটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল আগে থেকেই। আবার যেন খানিকটা স্বপ্নের স্পর্শ পেল আদিত্য। মনে মনে যতবার পারল উচ্চারণ করল—পূর্ণিমা, পূর্ণিমা—পূর্ণিমা—। কল্পনায় চেহারাটাকে ভেবে নিল বহুবার: তপতীর মত হবে ত? না হোক, অন্ততঃ খারাপ নয় তার চাইতে পূর্ণিমা। বাসরবাত্রে আলাপ করবার সুযোগ ছিল না, প্রথম কথা হ'ল ফুলশয্যার শুয়ে।—'কি কি বই পড়তে তোমার ভাল লাগে পূর্ণিমা?'

—'দীনেন রায় আর পাঁচকড়ি দে'র ডিটেক্‌টিভ।' লজ্জারক্ত অধরে কথাটা মিলিয়ে গেল বাতাসে। পিট পিট করে খানিকক্ষণ তাকাল পূর্ণিমা।

—'কেন, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র, এঁদের বই পড়তে ভাল লাগে না তোমার?'

—'হুঁ, কেন ভাল লাগবে না?' মৃদু কণ্ঠে পূর্ণিমা বলল, 'আমাদের পাশের বাড়ীর জ্যেঠিমা একদিন মেঘনাদবধ কাব্য পড়ে শুনিয়েছিলেন, খুব জোরালো আর করুণ; না কি বল? তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, শরৎ চন্দ্রের দেবদাস আর রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা পড়েছি। তবে কি জান, কবিতার ভাব বুঝা বড় কঠিন। দেবদাস কি চমৎকার, দেখবো তো?'

—'তা বটে।' কতকটা স্বগতোক্তি করবার মত ভঙ্গীতেই কথাটা উচ্চারণ করল আদিত্য।—'পার্ব্বতীদের জন্যে অমন করে সংসারের দেবদাসেরা মরলে সত্যিই চমৎকার হয় বৈ কি?'

—'ওমা, সে আবার কি কথা গো?'

মনে করতে পারল না আদিত্য—পূর্ণিমার ও কথার পর আর কিছু বলেছিল কিনা সে! তারপর একে একে পুরো একটা বছর কেটে গেল। পূর্ণিমার কোলে এল অঞ্জু। অঞ্জুকে নিয়ে যে কতখানি মুখর হয়ে উঠল পূর্ণিমা, কতখানি যে আলোড়িত হয়ে উঠল সে তার মাতৃত্বের গৌরবে, তা দেখবার অবকাশ হয় নি আদিত্যের। আসলে দেখার মত মনই ছিল না তার। পাখী যেমন করে নীড় ছেড়ে এসে বসে নদী-সৈকতে, আদিত্যও তেমনি করে এক সময় উড়ে বসল এসে শিলঙের পাহাড়ে। অধ্যয়ন ছেড়েছিল আগেই, নূতন করে সুরু করল এবারে অধ্যাপনার সাধনা। লক্ষ্য কস্ কাল না। কাছেই থাকতেন নূতন রায়বাহাদুর বিলাসবাবু। মেয়েকে হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'সবে থার্ড-ইয়ার, মনে করি—নিশ্চয়ই ওকে তুমি ভাল রেজাল্ট করিয়ে দিতে পারবে।'—বি-এ অনার্সের পাস-করা ছাত্র আদিত্য রায়ের সান্নিধ্যে এল সেদিন থেকে থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী রমা। ওকে তুলনা করা যায় একমাত্র ওয়াল্টার স্কটের রেবেকার সঙ্গে; তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি রমণীয়। ওর কাছে সব চাইতে প্রিয় কবি হচ্ছেন টেনিসন। আদিত্য দেখল—তপতীর চাইতে ঢের বেশী ক্ষুরধার, আর তীক্ষ্ণ রমা। জ্ঞানের সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়াতে পারলে আর কিছু চাই না রমার। গ্রামের সাধারণ বুদ্ধির সরল মেয়ে পূর্ণিমাকে মনে হ'ল একটা জড়পিণ্ডের মত। মনে মনে বিশ্বাস করে নিল আদিত্য—পূর্ণিমার মত মেয়ে ছড়িয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে—যারা স্বামীর মুখের ছোট্ট একটি কথা, একটু হাসি আর সোহাগেই নিজেকে একেবারে বরফের মত গলিয়ে দেয় পলকের মধ্যে। কতদিন চলে এদের সঙ্গে ঘর করা?

অনার্সের ছাত্র আদিত্য রায়ের জীবনে পূর্ণিমা একটা একসিডেন্ট। যাকে নিয়ে শুধু বাসা বাঁধাই চলে কিন্তু মন দেওয়া-নেওয়া চলে না। মনের রাজ্যে প্রথম এসেছিল তপতী, কিন্তু সেও একটা ক্ষণকালের স্ফুলিঙ্গ; হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তখনই আবার নিভে গেল। কিন্তু তারও চাইতে জ্যোতির্ম্ময়ীকে আজ যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে আদিত্য। থার্ড-ইয়ারের ক্ষুরধার...তীক্ষ্ণ রমা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে মনটাকে আকাশচারী করে দেয়; ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী আর রসেটির কবিতা নিয়ে প্রকৃতির কোলে প্রেমের আসর জমা করে; আবার, ইলিয়েট আর স্পেণ্ডারকে নিয়ে তর্ক তোলে।

আদিত্যের কবি-মনে অকস্মাৎ কোথা থেকে আবার এসে ক্ষ্যাপামির ঝঙ্কার লাগল। গৃহ-বৈরাগ্যের ধুয়ো তুলে ন'মাসে ছ'মাসে পুরো পনেরটা মাস কাবার করে জীবনসঙ্গিনী করে নিলে রমাকে। নির্মম হাতে পূর্ণিমাকে সে দূর থেকেই পার করে দিল তার বাপের বাড়ীতে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ ছিল না, পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বেঁচে থাকবার মত এ ছাড়া আর কিছু একটা ভাবতেই পারল না আদিত্য।···

বাইরে যেন হঠাৎ কেমন এক ঝলক হাওয়া খেলে গেল। ওদিকের খোলা জানলাটা দিয়ে হু-হু করে এসে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটাকে একবার দুলিয়ে দিয়ে গেল, নাড়া দিয়ে গেল একবার মশারিটাকে। কি করবে আদিত্য? উঠে বসবে? বাথরুম থেকে একবার ঘুরে আসবে? 'সঞ্চয়িতা'খানি খুলে বসবে খানিকক্ষণ টেবিলে?—নাঃ, কিছু ভাল লাগছে না। অস্ফুট ভাবে একবার কাতরোক্তি করে উঠল সে।

ঢন্ ঢন্ ঢন্ ঢন্—।

ক্রমে শেষ প্রহরের দিকে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা।

কতকটা কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল পূর্ণিমা।—

—'তোমার কাছে আজ আমার এই শেষ ভিক্ষে, অপুকে তুমি আজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। ওকে ওর বাবার পরিচয়ে বড় হবার সুযোগ দাও জীবনে। এমন করে আমার মত ওকেও সরে যেতে দিও না। এতখানি সইবে না বিধাতা।'

—বিধাতাকে আর এর মধ্যে জড়াতে চেষ্টা করো না, তাতে কাজ এগোবে না পূর্ণিমা। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল আদিত্য।

—কেন, কাজটা কি শুধু তোমাদের পুরুষদেরই? ভাল হোক্, মন্দ হোক্, তোমাদের কাজটাই কাজ, আর আমরা কিছু নই? যত দুর্ভোগ আর দুঃখের বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তোমরা দিব্যি ভালমানুষ সেজে পালাতে চাও? কিন্তু তারও একটা কাল আছে; অন্ততঃ এ যুগে তাতে রেহাই পাবে না। বিধাতা না হলেও সমাজ এক দিন এত বড় অন্যায় সইবে না। অশ্রুতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে এল পূর্ণিমার।

—হুঁ, তা হলে ইদানীং কিছু শিখেছ দেখছি। দু'পাটি দাঁতের মধ্যে কথাটাকে সংক্ষেপে শেষ করে নিলে আদিত্য: আচ্ছা, শীগগিরই এক দিন গিয়ে দেখা করব তোমার সঙ্গে, আজ যাও।

—না। আরও খানিকটা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল পূর্ণিমা। চলে যাবার জন্যে আজ এভাবে আসি নি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি অপুকে নিজের হাতে তুলে না নিচ্ছ, ততক্ষণ এক পা-ও নড়ব না এখান থেকে।

রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী যাবার যেন শব্দ শোনা গেল এক বার। ভোর হবার আর তবে বেশী দেরি নেই। কিছুক্ষণ পরেই ধাঙড়েরা একে একে পথে বেরিয়ে পড়বে, হোস্‌পাইপের মুখ থেকে ঝরণা ঝরে পড়বে শহরের সারা পথে। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা ঠিক একই ভাবে টিক্ টিক্ করে চলেছে।

আদিত্যের মনে হ'ল—রমা জেনে ফেলছে না তো কিছু? তা হলে যে অনর্থ বাধবার আর কিছুই বাকী থাকবে না আজ। রমাকে নিয়ে এনে সুখের নীড়ে সে আছে তার মধ্যে হঠাৎ এমন করে ঝড় ডেকে আনবার ঔদ্ধত্যকে পূর্ণিমা যে আখ্যাই দিক না কেন, আদিত্যের কাছে কিন্তু এটা জুলুম আর দুঃসাহসিকতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

—বলেছি তো, অপুর স্থান এখানে হতে পারে না! এত রাত্রে এমন পাগলামি করো না পূর্ণিমা। যে মাসোহারা পাঠানো হয়, ওর মায়ের কাছে থেকে তাতেই ওর দিব্যি চলে যাবার কথা। যাও, ওকে আর এমন করে বাইরে রেখো না, ঠাণ্ডা লাগবে, অসুখ করবে।

—যথেষ্ট আদিখ্যেতা করেছ, আর লোক-হাসানো কেন? ভেতরে ভেতরে একবার মরিয়া হয়ে উঠল পূর্ণিমা। একমাত্র মাসোহারাটাই জীবনে সবকিছু নয়। তা যাক্, তোমার সঙ্গে আজ তর্ক করব না।

—আদিত্যের প্রায় হাতের কাছেই অপুকে এবারে এগিয়ে ধরল পূর্ণিমা। নাও, ধর, অপুকে টেনে নাও নিজের কোলে, আমি বিদেয় হই। ভোর হয়ে এল, দিনের আলোয় তোমার সুখের সংসারে আর এ মুখ দেখাতে চাই না।

—আঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি করছ; সরে যাও বলছি। হাতখানি সরিয়ে নিয়ে রাগে রীতিমত ফুলতে লাগল আদিত্য।

—এই তবে তোমার শেষ উত্তর? চোখ দিয়ে যেন এক বার আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে এল পূর্ণিমার। অপুর ভাগ্য যদি শুধু ওর মার সঙ্গেই জড়িত থাকে তবে তোমার সামনেই আজ সে ভাগ্যের পরীক্ষা হয়ে যাক্। এ ঘর থেকে আমি ফিরলেও অপু আর ফিরবে না।

দু'হাতের শক্ত আঙুলের মধ্যে হঠাৎ যেন ফাঁস লেগে গেল অপুর। আগুনের হল্‌কা বেরচ্ছে দু'চোখ দিয়ে পূর্ণিমার।

—ম্—মা—আ—। ক্ষীণকণ্ঠে গভীরতম কাতর চীৎকার করে অনবরত চোখ উল্টাচ্ছে অপু।

—পূর্ণিমা, পূর্ণিমা, তুমি কি মানুষ না রাক্ষুসী? প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল আদিত্য।

পাশে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল রমা। চকিতে জেগে উঠে এক বার আদিত্যকে ঠেলে দিলে। ওগো শুনছ, হঠাৎ অমন শব্দ করে উঠলে কেন? স্বপ্ন দেখলে না তো? ওগো—!

—অ্যাঁ, কে, রমা? হঠাৎ দু'চোখ থেকে সারারাত্রির ঘুমের জড়তা কেটে গেল আদিত্যের। এক বার টর্চটা আন্ ত, মনে হচ্ছিল—অপু যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ আবার থেমে গেল আদিত্য। গলার ভিতরটা কেমন যেন তার অনবরত রুদ্ধ হয়ে আসছে।

ঘড়িতে আর এক বার যেন পড়ল—ঢন্—।

নয় ত্রিপদী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীমদ্ভাগবতে এই মর্ম্মে উক্ত হইয়াছে : "কলিকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল্প অল্প নারায়ণপরায়ণ বৈষ্ণব আবির্ভূত হইবেন ; কিন্তু দ্রাবিড় দেশে বহু সংখ্যায় ভগবদ্ভক্ত আবির্ভূত হইবেন। উক্ত দ্রাবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা (বৈগাই নদী), পয়স্বিনী (পালার), মহাপুণ্যা কাবেরী ও পশ্চিমবাহিনী মহানদী (পেরিয়ার) নাম্নী নদী-সমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে। হে রাজন্! যে সকল মানব উক্ত নদীসমূহের জল পান করেন, তাঁহারাই প্রায়ই বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া শ্রীবাসুদেবের ভক্ত হন।" (১১।৫।৩৮-৪০)

শ্রীরামানুজাচার্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিটি আলোয়ারগণের দ্রাবিড়দেশে আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া অনেকে বিচার করেন। কারণ তাম্রপর্ণী নদীর তটে পরবর্ত্তীকালে নম্মা আলোয়ার ও মধুর কবির আবির্ভাব হয়। কৃতমালা বা বৈগাই নদীর নিকটে শ্রীবিল্লীপুত্তুর নগরে পেরি-ই আলোয়ার বিষ্ণুচিত্ত ও তাঁহার পালিত কন্যা গোদাদেবী, পয়স্বিনী (নামান্তর পালার) নদীর উপকূলস্থ প্রদেশে পয়গই আলোয়ার (কাষার মুনি বা সরোযোগী), পুদম্ব আলোয়ার (ভূতযোগী), পে-আলোয়ার (ভ্রান্তযোগী) ও তিরুমড়িসাই আলোয়ার (ভক্তিসার) আবির্ভূত হন। কাবেরীর তটস্থ প্রদেশে তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আলোয়ার (ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু), তিরুপ্পাণ আলোয়ার (যোগিবাহ) ও তিরুমঙ্গই আলোয়ার (পরকাল স্বামী বা চতুষ্কবি) আবির্ভূত হন। মহানদী বা পেরিয়ার নদীবিধৌত প্রদেশে সম্রাট কুলশেখর জন্মগ্রহণ করেন।

নয় ত্রিপদী দক্ষিণ ভারতের তিনেভেলী জেলার অন্তর্গত নয়টি সুপ্রাচীন বিষ্ণুতীর্থ এবং বিষ্ণুপার্ষদগণের আবির্ভাব ও ভজনস্থান। তামিল ভাষায় 'তিরু' শব্দে 'শ্রী' বা শোভা ও 'পদী' শব্দে ভগবৎস্থান বা ধাম বুঝায়। সুতরাং 'ত্রিপদী'

আণ্ডাল (শ্রীগোদাদেবী)

বা 'তিরুপদী' শব্দের অর্থ শ্রীধাম। স্বয়ম্ভু শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ও শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণের অবতারপীঠ-স্বরূপ এই নয়টি ভৌম বৈকুণ্ঠ বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীনম্মা (শ্রীশঠকোপ) ও শ্রীমধুর কবি প্রমুখ আলোয়ারগণের আবির্ভাব কালেরও পূর্ব্ব হইতে এই নয়টি বিষ্ণুক্ষেত্র ও তথায় অবতীর্ণ অর্চাবতারগণের নাম ও ইতিহাস পাওয়া যায়।

গৌড়মণ্ডলে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও লীলাক্ষেত্র

যেরূপ শ্রীবিষ্ণুপাদোত্তবা শ্রীভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে নয়টি দ্বীপাকারে বেষ্টিত থাকিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তথা সজ্জনবৃন্দের পরমারাধ্য শ্রীনবদ্বীপধামরূপে বিদিত ও পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ দক্ষিণ-ভারতেও মহাপুণ্যা মলয়পর্ব্বতোত্তবা তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তটে স্বয়ম্ভু-শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ এবং দিব্যস্থরি- (আলোয়ার)গণের অবতারক্ষেত্র 'নবত্রিপদী' (নব শ্রীধাম) নামে আখ্যাত হইয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের তথা আস্তিক জনসাধারণের নিত্য পূজার্হ হইয়াছেন। পুণ্যসলিলা
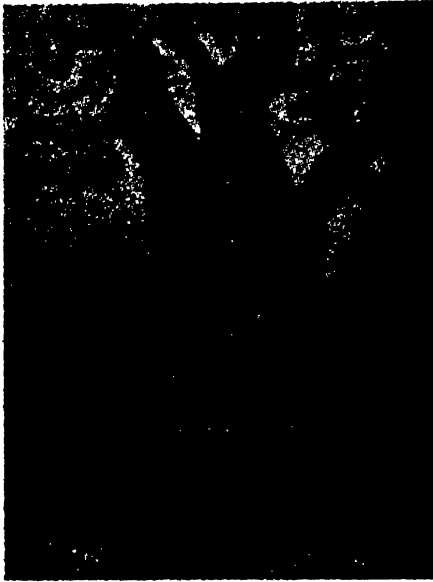
তিন্তিড়ী বৃক্ষের কোটরে আসীন নম্মা আলোয়ার (শ্রীশিবকাল ও তৎসম্মুখে মধুর কবি)

তাম্রপর্ণীর উত্তর তটে ছয়টি ও দক্ষিণ তটে তিনটি শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠশ্রী, ভজনানুকূল পরিবেশ ও ভগবদুন্মুখতার ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

তাম্রপর্ণীর উত্তর-তীরে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র অবস্থিত। (১) শ্রীবৈকুণ্ঠম্—মূল শ্রীবিগ্রহের নাম "শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথম্" (দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ); (২-৩) তিরুবল্লীমঙ্গলম্—পূর্ব্বভাগের মন্দিরের মূল শ্রীবিগ্রহ—'শ্রীনিবাসম্' (ইনি দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ); পশ্চিমভাগের মন্দিরের মূল শ্রীবিগ্রহ "শ্রীঅরবিন্দলোচনম্" (উপবিষ্ট চতুর্ভুজ); (৪) তিরুপল্লী-ত্রজডী নামক স্থানে মূল শ্রীবিগ্রহের নাম "কাশীনিবেদ্দন্" পেরুমল (দ্বিভুজশয়ান বিগ্রহ); (৫) নাথম্—মূল শ্রীবিগ্রহের নাম "বিজয় আসনম্" (তামিল), পরমপদনাথম্ (সংস্কৃত); উপবিষ্ট চতুর্ভুজ; (৬) তিরুকুলনথাই বা পেরুকুলম্। মূল শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীনিবাসম্ (পূর্ব্বে শয়ান ছিলেন, কোন লীলাপ্রকাশের পর হইতে দণ্ডায়মান আছেন, চতুর্ভুজ)।

তাম্রপর্ণীর দক্ষিণ তটে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র অধিষ্ঠিত। (১) আলোয়ার তিরুনগরী—মূল শ্রীবিগ্রহের নাম "আদিনাথ পেরুমল" (চতুর্ভুজ পদ্মাসনে আসীন); (২) থেনতিরুপেরাই—মূল শ্রীবিগ্রহের নাম "নিকরিলমুহিলবন্নর" (তামিল), মকর আয়ুধকর্ণ পাসম্ (সংস্কৃত) উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ; (৩) তিরুকোলুর—মূল বিগ্রহের নাম "বক্ষপবিত্রম্" শেষশায়ী দ্বিভুজ।

(১) আলোয়ার তিরুনগরী হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে (২) শ্রীবৈকুণ্ঠম্; শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে (৩) নাথম্; নাথম্ হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বভাগে (৪) তিরুপল্লীত্রজুডী; তথা হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে (৫) তিরুকুলনথাই; এখান হইতে পুনরায় আলোয়ার তিরুনগরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলে সুবিধা হয়। পদব্রজে বা গোযানে সমস্ত নব ত্রিপদী এক দিনে দর্শন করা সম্ভব নহে। মোটরযানে আরোহণ করিয়া সমস্ত নব ত্রিপদীতে যাইতে হইলেও এক বেলায় দর্শন সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কারণ শ্রীবিগ্রহের মন্দির বেলা ১১টা, কোথাও বা ১২টার সময় বন্ধ হইয়া যায়। এজন্য মোটরযানে সমস্ত নব ত্রিপদী দর্শন করিতে হইলে দুই বেলা লাগে। সুতরাং আলোয়ার তিরু-নগরী হইতে পুনরায় যাত্রা করিয়া প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্ব দিকে (৫-৭) তিরুবল্লীমঙ্গলম্; তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে দুই মাইল, (৮) থেনতিরুপেরাই; তথা হইতে পশ্চিম দিকে আসিয়া দুই মাইল দূরে (৯) তিরুকোলুর; এই নয়টি ত্রিপদীর পরিক্রমায় প্রায় ২০ মাইল পথ পড়ে।

শ্রীবৈকুণ্ঠম্ ও আলোয়ার তিরুনগরীতে গোশকট, মোটর ট্যাক্সি প্রভৃতি যান পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনেভেলী হইতে টিউটিকোরিন পর্য্যন্ত মোটর-বাস যাতায়াত করে। তাহাতে আরোহণ করিয়া নব ত্রিপদীর চারিটি স্থানে এবং তিনেভেলী হইতে তিরুচন্দুরে যে বাস যাতায়াত করে, উহার সাহায্যে নব ত্রিপদীর ৫টি স্থানে (আলোয়ার তিরুনগরীসহ) দর্শন করিতে পারা যায়।

(১) শ্রীবৈকুণ্ঠম্—সাদার্ন রেলওয়ের তিনেভেলি-তিরু-চেন্দুর লাইনে 'শ্রীবৈকুণ্ঠম্' ষ্টেশন; ইহা তিনেভেলি জংশন হইতে ১৮ মাইল। শ্রীবৈকুণ্ঠমের পরবর্ত্তী ষ্টেশনই 'আলোয়ার-তিরুনগরী'। এই ষ্টেশন শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে তিন মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

শ্রীবৈকুণ্ঠম্-নামক ষ্টেশন হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠম্-নগর প্রায় এক মাইল পথ হইবে। এই স্থানে 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ' স্বয়ম্ভু-

বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা তাম্রপর্ণীর উত্তর তটে অবস্থিত নব ত্রিপদীর অন্যতম বিষ্ণুক্ষেত্র। পাণ্ড্য রাজগণ বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। সম্মুখে গোপুরম্ অবস্থিত। শ্রীবৈকুণ্ঠমের মূল-বিগ্রহের নাম 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ'। ইনি দক্ষিণে শ্রীদেবী ও বামে ভূদেবীর সহিত বিরাজমান। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দণ্ডায়মান—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অভয়-মুদ্রাযুক্ত চতুর্ভুজ স্বর্ণ-কবচ পরিহিত শ্রীবিগ্রহ। বক্ষঃস্থলে মহালক্ষ্মী। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের শিরোপরি আদিশেষ-মূর্ত্তি ; এই শেষমূর্ত্তিও রৌপ্যকবচ-মণ্ডিত।

আলোয়ার তিরু নগরীতে আদিনাথের মন্দির-প্রাকারের মধ্যে সুপ্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষ। নম্মা আলোয়ার এই বৃক্ষের কোটরে সমাবিষ্ট ছিলেন

উৎসব-বিগ্রহ বা ভোগ-বিগ্রহের নাম শ্রীচোরনাথ ; ইনি চতুর্ভুজ। শ্রী ও ভূ এবং বৈকুণ্ঠনায়কী ও চোরনায়কী নামক শক্তিগণসহ অধিষ্ঠিত।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে 'মানপডই' নামক এক রাজা ছিলেন। ইনি অত্যন্ত কৃপণ ও বৈষ্ণব-হিংসক ছিলেন। সেই প্রদেশের 'কাল' ও 'দূষণ' নামক দুই জন দস্যুনায়ক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথমের নিকট অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত তাহাদের দারিদ্র্যের কথা জ্ঞাপন করে। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বৈষ্ণব-হিংসক রাজার এবং 'কাল' ও 'দূষণে'র কল্যাণ তথা বৈষ্ণবগণের সন্তোষ-বিধানার্থ দস্যুদ্বয়কে পূর্ব্বোক্ত রাজার ধনকোষ হইতে ধন অপহরণ করিতে বলেন। উক্ত চোরনায়কদ্বয় রাজকোষ হইতে ধন অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে ভগবদিচ্ছায় প্রহরিগণ নিদ্রাভিভূত হয়। তাহাতে চোরগণ রাজকোষ হইতে যথেচ্ছভাবে অর্থ অপহরণ করিতে সমর্থ হয় এবং অপহৃত-ধন ভগবৎসেবায় নিয়োগ করিতে থাকে। এক দিন রাজা তাঁহার ধনকোষ শূন্যপ্রায় দেখিয়া স্থানীয় প্রখ্যাত দস্যুনায়ক কাল ও দূষণকে সন্দেহ করেন এবং তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক বহু যন্ত্রণা প্রদান করেন। চোরদ্বয়ের প্রার্থনায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ব্রাহ্মণবেশে রাজার সমীপে আসিয়া বলেন, 'আমিই তোমার ধনভাণ্ডার অপহরণ করাইয়াছি। ইহা সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবায় লাগিয়াছে।' তখন রাজা সমুদয় সম্পত্তি প্রদান করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কৃপণ ও বৈষ্ণব-হিংসক রাজা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং চোরগণও চিরতরে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের একান্ত শরণাগত হন। যাবতীয় অসদ্বৃত্তিও ভগবানে অর্পণ করিলে জীবের মঙ্গল হয় "কামিনাস্ত সর্ব্বার্থেব সর্ব্বচ্ছকর্ম্মার্পণম্" এই শাস্ত্রবাক্যের

তিরুমাপি আলোয়ার

তিরুমলাই আলোয়ার

প্রমাণরূপে 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ' সেই দিন হইতে 'চোরনাথ' নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সম্মুখে শ্রীচোরনাথাখ্য উৎসব-বিগ্রহ শ্রীবৈকুণ্ঠমে অদ্যাপি নিত্য পূজিত হইতেছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের এই সকল উৎসবসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (১) অগ্রহায়ণ মাসে বৈকুণ্ঠ একাদশীতে 'অধ্যয়নোৎসব'। এই উৎসব বিশ দিন ব্যাপী হয়। বৈকুণ্ঠ একাদশীর পূর্ব্বের দশ দিন হইতে আরব্ধ হইয়া বিংশতি দিবসে উৎসবের সমাপ্তি হয়। শ্রীনম্মা আলোয়ার-কৃত 'সহস্র-গীতি' (তিরুভায়ামোল্লি) সেই সময় অধ্যয়ন করা হয়। ইহাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। (২) পৌষ মাসে 'তাই'-উৎসব। এই উৎসব দশ দিন ব্যাপী হয়। উৎসব-বিগ্রহ শ্রীচোরনাথ নৌকাবিহার করেন। (৩) চৈত্রমাসে চৈত্রোৎসব। চৈত্র মাসে মৃগানক্ষত্র হইতে আরম্ভ হইয়া দশ দিবসব্যাপী উৎসব হয়। নবম দিবসে রথযাত্রা উৎসব হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মন্দির তিনটি প্রাকারবিশিষ্ট। মূল মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রাকারে শ্রীবিষ্ণুর অষ্টোত্তর-

শস্ত লীলা অতি সুন্দর চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে এবং চন্দ্রাতপে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা অঙ্কিত আছে। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে চারিটি পক্ষবিশিষ্ট গরুড়বাহনের স্বর্ণময় মূর্ত্তি এবং বিমানে (গর্ভ মন্দির) অখণ্ড ঘৃত-প্রদীপ অহোরাত্র প্রজ্জলিত থাকে। শ্রীবিগ্রহের দর্শনকাল—প্রাতঃ সাতটা হইতে এগারটা; সায়াহ্ন ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা।

দেবস্থানম্ এণ্ডাউমেন্ট বোর্ডের দ্বারা নিযুক্ত বেতনভুক্ ট্রাষ্টি সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের বেতনভুক্ বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করেন।

নাথম্ (বিজয়াসন পেরুমলের মন্দির)

শ্রীবৈকুণ্ঠম্ একটি ছোট শহর। এখানে একটি পঞ্চায়েৎ বোর্ড আছে। যাত্রিগণের থাকিবার জন্য দুইটি প্রধান ছত্র আছে—(১) লোক্যাল ফণ্ড ছত্রম্ ও রামানুজ-কোট-ছত্রম্।

(২-৩) তিরুবল্লীমঙ্গলম্—এখানে যুগ্ম ত্রিপদী অর্থাৎ দুইটি বিষ্ণুস্থান রহিয়াছে। তাম্রপর্ণীর উত্তর তীরে এই দুইটি বিষ্ণুক্ষেত্র সংযুক্তভাবে বিরাজমান। আলোয়ার তিরুনগরী হইতে তিরুবল্লীমঙ্গলম্ পূর্ব্ব দিকে তিন মাইল। তাম্রপর্ণী নদীর একেবারে উত্তর তীরেই এই দুইটি মন্দির অবস্থিত। কিন্তু সকল সময় উক্ত মন্দিরে যাওয়া সম্ভবপর নহে। যখন তাম্রপর্ণী অত্যন্ত খরস্রোতা হইয়া পড়ে, তখন দক্ষিণ তট হইতে উত্তর তীরে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক এবং সময় সময় অসম্ভব। অন্য পথ দিয়া যাইতে হইলেও বহু ঘুরিয়া যাইতে হয়। এইজন্য পূজকগণও সকল সময় নিয়মিতভাবে পূজাদি করিতে সমর্থ হন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এইস্থানে দুইটি মন্দিরের পূর্ব্বভাগের মন্দিরে মূল বিগ্রহ 'শ্রীনিবাসম্' দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। ইনি 'দেবরপিরান্' নামেও খ্যাত। এই স্থানকে কেহ কেহ 'রেটাত্রিপদী' বলেন। পশ্চিম ভাগে মন্দিরের মূল-বিগ্রহ 'অরবিন্দলোচনম্' উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু।

(৪) তিরুপল্লীত্রয়ুড়ী—শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে তিরুপল্লীত্রয়ুড়ী নামক ত্রিপদী তাম্রপর্ণীর উত্তর তটে বিরাজমান। এই স্থানের মূল বিগ্রহের নাম 'কাশীনিবেদ্যন্ পেরুমল।' এই মহাবিষ্ণু মালারবল্লীনাচার ও নেলামঘলনাচার নাম্নী শক্তিদ্বয়ের সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। তৎসম্মুখেই উৎসব-বিগ্রহ ভূমিপালবিষ্ণু, দক্ষিণে শ্রীদেবী ও বামে ভূ-দেবীর সহিত অধিষ্ঠিত। কাশীনিবেদ্যন্ পেরুমল (শ্রীবিগ্রহ) পঞ্চফণাযুক্ত শেষনাগের উপর উত্তানশয় বিরাট বিগ্রহ। বিগ্রহের বিশাল দক্ষিণ হস্ত শিরোপাধানরূপে এবং বামহস্ত জানুদেশে স্থাপিত, নাভিকমলে ব্রহ্মা উপবিষ্ট, দক্ষিণ চরণকমল মালারবল্লীনাচার ও বাম পদকমল নেলামঘলনাচার লক্ষ্মীদ্বয় যথাক্রমে সেবা করিতেছেন। মূল-মন্দিরের বিমানের গবাক্ষ দ্বারা আলোকবর্ত্তিকা-সংযোগে বিগ্রহের দর্শন হয়। বিমানের সম্মুখস্থ দ্বার হইতে বিগ্রহের সম্পূর্ণ অঙ্গ দর্শন হয় না। এই বিগ্রহের বিমান বা গর্ভগৃহকে 'শয়নাগার-বিমানম্' বলে কারণ শয়ান বিগ্রহের এইটি নিত্য আবাসস্থান বা গর্ভগৃহ। শ্রীমন্দিরের আকার সাধারণ মন্দিরের মত নহে। শয়নাগারবিমান বলিয়া মন্দিরটি দীর্ঘাকৃতি। এখানে একটি তেঙ্গলৈ বৈষ্ণব শ্রীনিবাসভট্ট নিষ্ঠার সহিত মহাবিষ্ণুর সেবা করেন।

(৫) নাথম্—তিরুপেলেঙ্গুড়ী হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে নাথম্ নামক ত্রিপদী। ইহা 'বরগুণমঙ্গইক্ষেত্রম্' নমেও পরিচিত। বিজয়াসনর্ (তামিল) বা পরমপদ নাথম্ নামক মূলবিগ্রহ পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি। উপরের বাম ও দক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্র ধৃত, নিম্নের দুই হস্তের মধ্যে একটি চিৎ ভাবে আর একটি মুষ্টিবদ্ধ ভাবে স্থাপিত। শ্রীবিগ্রহের বক্ষঃস্থলে মহালক্ষ্মী। উৎসব-বিগ্রহের নাম ত্র্যাম্পাড়াকাড়াই আম্ ও লক্ষ্মীর নাম বরগুণ-মঙ্গইতায়ার। মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ। এখানে পূজারী অন্যত্র হইতে আসিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যান। পুনরায় সন্ধ্যাকালে একবার আসেন। এইজন্য দর্শনের কাল ঠিক থাকে না। এখানে পূর্ব্বে উৎসবাদি হইত। এখন বড় একটা হয় না।

(৬) তিরুকুলন্থাই বা পেরেকুলম্—শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব দিকে এই ত্রিপদীটি বর্ত্তমান। শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে এই স্থানে যাতায়াতের ভাল রাজপথ আছে। সর্ব্বদাই মোটর যান যাতায়াত করে। এই স্থানের মূলবিগ্রহের নাম

শ্রীনিবাসম্। ইনি চতুর্ভুজ, বিশাল কৃষ্ণপ্রস্তরময় শ্রীমূর্ত্তি। উৎসব-বিগ্রহের নাম মায়াকুত্তম্ (সংস্কৃত নাম চৌরনাট্যম্)। শ্রীবিগ্রহের বক্ষে কমলাবতী লক্ষ্মী, গলদেশে অষ্টোত্তরশত শালগ্রামের মালা, উপরের দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র, নিম্নের এক হস্ত কটিদেশে স্থাপিত; আর এক হস্ত দ্বারা বরমুদ্রা প্রদর্শিত। এই স্থান বালুকাবনক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। এখান হইতে তাম্রপর্ণী নদী প্রায় এক মাইল দক্ষিণে প্রবহমাণ। এই বিগ্রহ বৃহস্পতি-প্রত্যক্ষীকৃত বলিয়া কথিত। মূল-গর্ভমন্দিরের নাম আনন্দনিলয়-বিমানম্।

উৎসব-বিগ্রহ মায়াকুত্তম্ আলমেরুমঙ্গতায়ার ও কুলন্দ-বল্লীতায়ার শ্রীগরুড়ের সহিত একই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

কথিত আছে যে, এই মহাবিষ্ণুর বেদব্যাস নামক এক অর্চ্চকের পত্নীকে জনৈক অসুর হরণ করিয়া হিমালয়-পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছিল। অর্চ্চক মহাবিষ্ণুর নিকট ইহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীভগবান অর্চ্চকের পত্নী ও অসুর উভয়কেই এই স্থানে উপস্থাপিত করিলেন। বিষ্ণু যখন রাক্ষসকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রাক্ষস বিষ্ণুর পদযুগল দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া সকাতরে 'রক্ষ রক্ষ' বলিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে। তখন শ্রীবিষ্ণু নারীহরণকারী রাক্ষসকে পদতলে স্থাপন করিয়া তদুপরি নাট্য করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবিষ্ণু 'চোরনাট্য' নামে খ্যাত হন। যে গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণু হিমালয়ে গিয়াছিলেন, সেই গরুড় শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের সমসিংহাসনে পূজিত হইতেছেন। প্রভুর ভক্তবৎসল মুগ্ধ হইয়া অর্চ্চক স্বীয় কমলাবর্তী নাম্নী কন্যাকে বিষ্ণুর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অর্চ্চক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুমুদবতী উভয়ের মূর্ত্তি মূল মন্দিরে উপবিষ্টাবস্থায় বিদ্যমান এবং কমলাবতী লক্ষ্মীহৃদয়ে বিরাজিতা।

পূর্ব্বে এই শ্রীবিগ্রহ (মূলবিগ্রহ) শায়িতাবস্থায় ছিলেন। অর্চ্চকের পত্নীকে হিমালয় হইতে আনয়ন করিতে যাইবার সময় নাকি তিনি দণ্ডায়মান হন।

(৭) আলোয়ার তিরুনগরী: সাদার্ণ রেলওয়ের তিনেভেলি-তিরুচেন্দুর লাইনে আলোয়ার তিরুনগরী ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নব ত্রিপদীর অন্যতম আলোয়ার তিরু নগরীর শ্রীমন্দির। এই স্থানের অধিষ্ঠাতা ও মূল শ্রীবিগ্রহের নাম 'আদিনাথপেরুমল'। ইনি স্বয়ম্ভু শ্রীবিগ্রহ। ইঁহার দক্ষিণে আদি নায়িকী ও বামে পুরুষা-নায়িকী নাম্নী লক্ষ্মীদ্বয়। ইঁহার সম্মুখস্থ উৎসব-মূর্ত্তির নাম পূর্ণসিদ্ধেশ্বর; উৎসব-মূর্ত্তির দক্ষিণে শ্রীদেবী এবং বামে ভূ-দেবী ও নীলাদেবী। মূল বিগ্রহের দক্ষিণে—ভৃগুঋষি ও বামে মার্কেণ্ডেয় ঋষি উপবিষ্ট। মূল বিগ্রহ চতুর্ভুজ; উপরের দক্ষিণ হস্তে চক্র, বাম হস্তে শঙ্খ, নিম্নের বাম হস্তে গদা ও দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা। সমস্ত শ্রীঅঙ্গ স্বর্ণকবচে আবৃত। কেবলমাত্র মুখকমল অনাবৃত। শ্রীকৃষ্ণপ্রস্তরময়

তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আলোয়ার

বিশাল শ্রীমূর্ত্তি পদ্মাসনে আসীন। আদিনাথম্ পেরুমল মন্দিরের উত্তর দিকে একটি বহু প্রাচীন অপূর্ব্বদর্শন তিন্তিড়ী বৃক্ষ বিরাজমান। পুরীর সিদ্ধ বকুলের ন্যায় বৃক্ষের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা। মূল বৃক্ষ হইতে সাতটি বৃক্ষ ও শাখা নির্গত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই পাদপশ্রেণী উচ্চ বেদীর উপর অবস্থিত। কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া বৃক্ষের সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়। স্থানটি সুরক্ষিত। ঐ বৃক্ষের তলেই নম্মা আলোয়ার বা শঠকোপস্বামীর মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীরে খোদিত অনেক-গুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, উহাতে নম্মা আলোয়ারের চরিতকথা লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমনবরেয

আলোয়ার তিরুনগরীতে সুপ্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ ও তৎসংলগ্ন মন্দির

উপস্থিত হইয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে উক্ত সমাধিস্থ পুরুষ চক্ষুরুন্মীলন করেন এবং মধুর কবির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। মধুর কবি কারিতনয়কে সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কারিতনয় চারি বেদের সার-রহস্য-স্বরূপ যে চারিটি প্রবন্ধ গীত আকারে তামিল ভাষায় রচনা করেন, তাহাই 'দিব্য প্রবন্ধম্' বা 'তামিল বেদ' নামে খ্যাত হইয়াছে। ঋক্ বেদার্থ উদ্ধার করিয়া শত গাথাযুক্ত 'শ্রীবৃত্ত'-নামক প্রবন্ধ, যজুর্ব্বেদার্থ লইয়া সপ্ত গাথাসমন্বিত 'অশির্য' নামক প্রবন্ধ, অথর্ব্ববেদার্থ লইয়া 'মহান্ত'-নামক সাতাশী গাথা সমন্বিত এবং সামবেদার্থ সারের দ্বারা সুবৃহৎ ১২০০ গাথা সমন্বিত 'সহস্র গীতি' নামক প্রবন্ধ কারিতনয় নম্মা আলোয়ার কর্ত্তৃক রচিত হয়। অদ্যাপি উক্ত তিন্তিড়ী বৃক্ষে নরজানুর চিহ্ন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্য এই যে, এই বৃক্ষটি বহু প্রাচীন এবং ইহার কাণ্ড বাহ্য দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বৃক্ষের পত্র-সমূহ অতিশয় সজীব ও হরিদ্বর্ণ। এই পত্রগুলি নাকি রাত্রিতেও প্রসারিত থাকে। প্রবাদ, এই বৃক্ষ কখনও নিদ্রিত হয় না।*

নাকি উক্ত পবিত্র তিন্তিড়ী বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হন। কলি-যুগের প্রথম বৎসরে বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে বিশাখা নক্ষত্রে শ্রীনারায়ণের সেনানায়ক বিষ্বকসেনও শূদ্রবংশীয় কারির গৃহে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন।*

কথিত আছে, নম্মা আলোয়ারের মাতাপিতা পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া তিরুনগরীস্থ আদি নাথম্ পেরুমলের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে এক প্রত্যাদেশ পান যে, শ্রীবিষ্ণুর অংশ তাঁহাদের পুত্ররূপে শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন। সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু মাতৃস্তন্য গ্রহণে বিরত থাকে। দ্বাদশ দিবসে শিশুকে আদিনাথ পেরুমলের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, তখন শিশুর নামকরণ করা হয় 'মার'। ইহার পরে শিশুকে একটি দোলায় করিয়া উক্ত তিন্তিড়ী বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেইখানেই ঐ শিশু বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় একাসনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকে। মাতা-পিতা পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে সেই মহা-পুরুষ উক্ত বৃক্ষের কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। আলোয়ার তিরুনগরীর পূর্ব্বদিকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত তিরুকোলুর গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় মধুর কবি নামক এক ব্যক্তি অযোধ্যা পর্য্যটনকালে এক অলৌকিক আলোকের প্রভা অনুসরণ করিতে করিতে উক্ত তিন্তিড়ী বৃক্ষের কোটরে সমাধিস্থ কারিতনয়ের সম্মুখে

নম্মা আলোয়ারের অনুগত মধুর কবি ও নাথমুনি পরম ভাগবত ছিলেন। নম্মা আলোয়ার বিষ্বকসেনের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'নম্মা' শব্দের অর্থ 'আমাদের' অর্থাৎ সজ্জনমাত্রই এই মহাপুরুষকে 'আমাদের প্রভু' বলিয়া বোধ করিতেন। অথবা ভগবান্ আদিনাথকে তিনি প্রণয়-রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আদিনাথের দ্বারা 'আমার নিজ-জন' এইরূপ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার জগতের যাবতীয় ব্যক্তিগণের আচরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম 'মার'। তিনি ভক্তদ্বেষী সৎ বা মায়ার প্রতি কোপযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্য নাম শঠ কোপ, শঠারি বা শঠ রিপু। যেরূপ হস্তী তীক্ষ্ণধার অঙ্কুশকে ভয় করে, সেইরূপ অসদ্ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভয় করিত। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম পরাঙ্কুশ। আদি-নাথ পেরুমল তাঁহার নিজ কণ্ঠদেশ হইতে নম্মা আলোয়ারকে বকুল পুষ্পের মালা উপহার দিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার

* শ্রীপ্রপন্নামৃত, ১০৪ অধ্যায়; শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সং ১৮২৯ শক

* প্রপন্নামৃত, ১০৩ অধ্যায় ৪৭-৬১, ৭৭-৯৩; ১০৪ অধ্যায় ৩৮-৪৫ শ্লোক

আর এক নাম বকুলাভরণ। তিনি এইরূপে বন্দিত হইয়া থাকেন—

বৈশাখে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরী কারিজম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপ্যং ভজে ॥*

নম্মা আলোয়ার পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল জগতে প্রকট ছিলেন। মহাত্মা যামুনাচার্য্যও তাঁহাকে এইরূপে বন্দনা করিয়াছেন—

মাতাপিতা—যুবতয়স্তনয়াবিভূতিঃ,
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদাঙ্ঘ্রি-যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥†

"আমাদের কুলপ্রভু বকুলাভিরামের শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তনগণের সর্ব্বস্বই তাঁহার শ্রীপদযুগল। তাঁহাদের মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র ও ঐশ্বর্য্য —সমস্তই শ্রীশঠকোপের শ্রীচরণ।"

শ্রীআদিনাথ পেরুমলের মন্দিরের চারিদিকে চারিটি বীথি বা রাজপথ। এই চতুর্দ্দিক দিয়া রথযাত্রাকালে রথ টানা হয়। এইজন্য এই সকল পথ 'রথবীথি' নামে খ্যাত। এই রথবীথির দুই পার্শ্বে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের গৃহ অবস্থিত।

উৎসব :—(১) বৈশাখ মাসে নম্মা আলোয়ারের আবির্ভাবোপলক্ষে দশ দিবস উৎসব হইয়া থাকে। (২) মাঘ মাসে শ্রীবৈকুণ্ঠ একাদশীতে তিরু-অধ্যয়নোৎসব ২১ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। (৩) চৈত্র মাসে দশ দিবসব্যাপী আদিনাথের উৎসব হয়। এই সময় উৎসব-বিগ্রহ রথে আরোহণ করেন।

প্রাতঃকালে ৬৷৷০টা হইতে বেলা ১১৷৷০টা ও সায়াহ্ন ৬টা হইতে রাত্রি ৮৷৷০টা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহের দর্শন হয়। প্রাতঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের সময় প্রথম দর্শনকে এই অঞ্চলে 'বিশ্বরূপ দর্শন' বলা হয়।

আলোয়ার তিরুনগরী নম্মা আলোয়ার ও বরবরমুনির আবির্ভাব-স্থান বলিয়া কথিত। আদিনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাকারের বহির্ভাগে উত্তর-পশ্চিম কোণে তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণ তীরে শ্রীশ্রীবরবরমুনির আবির্ভাব-স্থান ও আবির্ভাব-পীঠের উপর শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দিরে অচল, ত্রিদণ্ডধৃক্ প্রস্তরময় মূর্ত্তি ও সম্মুখে স্বর্ণধাতুময় উৎসবমূর্ত্তি। এতৎসংলগ্ন তাম্রপর্ণী নদীর স্নানঘাট। আমরা সকলেই সেই পুণ্যসলিলা তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। নিকটে শ্রীরামানুজ স্বামীর একটি মন্দির আছে। আলোয়ার তিরুনগরীতে নিম্নলিখিত চারিটি শ্রীমূর্ত্তি বিখ্যাত :—(১) স্বয়ম্ভু আদিনাথ পেরুমল, (২) তিন্তিড়ী বৃক্ষের তলে নম্মা আলোয়ার, (৩) তাম্রপর্ণী

আলোয়ার তিরুনগরীতে আদিনাথের মন্দির ও গোপুরম্

নদীর দক্ষিণ তটে বরবরমুনির আবির্ভাব-স্থান ও শ্রীমূর্ত্তি এবং (৪) শ্রীরামানুজ কোট। আলোয়ার তিরুনগরীতে বরবরমুনির মন্দিরের বরাবর তাম্রপর্ণীর উত্তর তীরে কাশীশ্বর শিবের মন্দির। এই ত্রিপদীতে বৈশাখ মাসে বিশাখানক্ষত্রে যে উৎসব হয়, তাহাতে অন্যান্য আটটি ত্রিপদীর সমুদয় উৎসব-বিগ্রহ বিমানে আরোহণ করিয়া তিরুনগরীতে শুভবিজয় করেন এবং সেই দিন রাত্রিতে গরুড়োৎসব হয়। তৃতীয় দিবসে উৎসব-বিগ্রহগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আলোয়ার তিরুনগরীতে দর্শনার্থিগণের অবস্থানের জন্য : উত্তরাদি মঠের ছত্র ও কাকুমুনি আদিকেশবলু চেট্টিয়ার দাতব্য ছত্র নামক দুইটি যাত্রিনিবাস আছে।

আলোয়ার তিরুনগরীর মধ্যস্থলে আদিনাথের মন্দির অবস্থিত এবং দক্ষিণ বীথিতে তিরুবেঙ্কটমুদায়ন ও তিরুবরজনাথমের মন্দির, উত্তর বীথিকায় পিল্লাইলোকাচার্য্য,

* প্রপন্নামৃত ১০৩ অধ্যায় ৫৮ শ্লোক, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সং, ১৮২৯ শকাব্দ

† যামুনাচার্য্যস্তোত্রম—৭ম শ্লোক, বহরমপুর সং, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২

আলায়, মেয়াকুদেশিক ও গোদাদেবীর মন্দির। পশ্চিম বীথিকার পাঁচটি মন্দির আছে; তন্মধ্যে একটি শ্রীকৃষ্ণ-স্বামীর মন্দির। এই স্থানটি 'রামানুজ-চতুর্ব্বেদী মঙ্গলম্' নামে কথিত। নম্মা আলোয়ারের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান, শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে 'পরাঙ্কুশ চতুর্ব্বেদী মঙ্গলম্' নামে খ্যাত। আলোয়ার তিরুনগরীর অপর নাম তিরুকুরুগর (সংস্কৃত নাম কুরুকা নগরী)।

প্রবাদ এই, ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছিলেন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাম্রপর্ণী নদীর তটে গিয়া তাঁহার আরাধনা করিবার আদেশ প্রদান করেন।

তিরুক্কোলুর বৈত্তমানিধির মন্দিরের তল্পধার ও প্রাচীন মন্দির

তদনুসারে ব্রহ্মা তাম্রপর্ণী নদীতটে আসিয়া আদিনাথের সেবা করিতে থাকেন। শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে গুরুরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান 'গুরুক্ষেত্রম্' নামেও কথিত হয়। শ্রীবিষ্ণু এই স্থানে ব্রহ্মাকে দর্শনদান করিয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন। স্বয়ম্প্রকাশ বিষ্ণু তখন হইতে এই স্থানে 'আদিনাথ' নামে পরিচিত হন। এই স্থান আদিক্ষেত্রম্, বর্গক্ষেত্রম্, শেষক্ষেত্রম্ তীর্থক্ষেত্রম্ ইত্যাদি নামেও কথিত।

(৮) থেন্‌তিরুপেরাই: তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণ তটে ও আলোয়ার তিরুনগরী হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে উক্ত ত্রিপদী বা বিষ্ণুস্থানটি অবস্থিত। 'তিরু-চেন্দুর' যাইবার রাজপথ ধরিয়া তাম্রপর্ণীর দক্ষিণ তীরে তীরে তথায় যাওয়া যায়। মন্দিরটি একটি গণ্ডগ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং উচ্চ প্রাকার-পরিবেষ্টিত। শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে বিশাল কৃষ্ণপ্রস্তরময় শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। ইনি মকরকুণ্ডলধারী উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এবং পূর্ব্বাভিমুখী। ইঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও বরমুদ্রা, সম্মুখে উৎসববিগ্রহ—শ্রী, ভূ এবং মকরভূষণ নায়কী ও পেরাপুরী নায়কীসহ বিরাজমান। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি পৃথক মন্দিরে মকরভূষণ নায়কী, উত্তর-পশ্চিম কোণে আর একটি পৃথক মন্দিরে পেরাপুরী নায়কী প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের বিগ্রহের নাম 'মকর আয়ুধকর্ণপাশম্'।

এই স্থানে যাত্রিগণের থাকিবার কোন পৃথক্ ছত্র নাই। তবে তোতাদ্রিমঠের একটি শাখামঠ (শ্রীসম্প্রদায়ের) এখানে আছে। এখানে অভ্যাগতগণ থাকিতে পারেন। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা নিজেদের করিতে হয়।

এই মন্দির হইতে প্রায় দুই ফার্লং পশ্চিমে তাম্রপর্ণীর উত্তর তীরে তিরুবল্লীমঙ্গলম্ বা যুগ্মত্রিপদীর মন্দির দৃষ্ট হয়।

(৯) তিরুক্কোলুর: 'থেন্‌তিরু পেরাই' হইতে পশ্চিম দিকে আসিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে 'তিরুক্কোলুর' নামক ত্রিপদী। এই স্থান তাম্রপর্ণীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই স্থানের অধিষ্ঠাতা স্বয়ম্ভু শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের নাম 'বক্ষপবিত্রর' এবং উৎসব-বিগ্রহের নাম—'বৈত্তমা-নিধি'। মূল বিগ্রহ শেষশায়ী দ্বিভুজ, বামহস্ত উত্তোলিত ও দক্ষিণ হস্ত লম্বমান—বিশাল শ্রীবিগ্রহ। শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথ হইতেও যেন আকারে বড় মনে হইল। মন্দিরটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং খুব প্রাচীন। তেঙ্গলই বৈষ্ণবগণ বিগ্রহের সেবা করেন। উৎসববিগ্রহ বৈত্তমানিধির বামে কুমুদবল্লী ও দক্ষিণে কোলুরবল্লী লক্ষ্মীদ্বয়। এই স্থান শ্রীমধুর কবি (কেহ কেহ গোদাদেবীর পরিবর্ত্তে মধুর কবিকে আলোয়ারের তালিকাভুক্ত করেন) আলোয়ারের আবির্ভাবক্ষেত্র বলিয়া কথিত। মধুর কবি তিরুক্কোলুরে কোন ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হন এবং অযোধ্যায় গমন করিয়া শিক্ষালাভ করেন। তথা হইতে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া আলৌকিক ভাবে নম্মা আলোয়ারের আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিয়া তিরুনগরীতে আগমন করেন এবং নম্মা আলোয়ারের কৃপা-লাভ করেন।

তিরুক্কোলুরের মূলমন্দিরের জগমোহনে মধুর কবি আলোয়ার ও অন্যান্য আলোয়ারগণের শ্রীমূর্ত্তি ও রাজনীতা

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ও মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্দির ও বিগ্রহ পূর্ব্বাভিমুখী।

মন্দির প্রাতঃ ৬টা হইতে বেলা ৯টা ও বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রাতে ৯টা ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় কেবলমাত্র শুদ্ধান্ন ভোগ হয়। এখানে পূর্ব্বে শ্রীমধুর কবির আবির্ভাব-উৎসব ও অন্যান্য উৎসবাদি হইত; কিন্তু মন্দিরের আয় খুব কম বলিয়া এণ্ডাউমেণ্ট কোন উৎসবই প্রচলিত রাখিতে পারে নাই, এইরূপ শুনিতে পাওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বর হইয়া দক্ষিণ মথুরায় (মাদুরায়) গিয়া রামদাস বিপ্রকে কৃপা করিলেন এবং তথা হইতে পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী নদীতীরে শুভবিজয় করেন এবং তাম্রপর্ণীতে স্নান করিয়া তাম্রপর্ণীর তীরে তীরে 'নয় ত্রিপদী' দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়:

"সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি' তাঁহা করিল বিশ্রাম॥
বিপ্র সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম পুরাণ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা উপাখ্যান॥"

*　*　*　*

"পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে পত্র আনি দিলা॥"

*　*　*　*

"সেই রাত্রি তাঁহা রহি' তাঁরে কৃপা করি'।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত, ৯। ২০০-২০১, ২১০, ২১৮-২১৯)

বন্ধু তোমারে খুঁজিয়া পাইব

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

ঝিম্‌ঝিম্ রবে ঝরিছে বাদল একটানা সারাদিন,
শাওন-আকাশ মেঘাবলুপ্ত, দিকস তপনহীন।
মৌন প্রকৃতি নীরব নিথর,
বিরাম-বিহীন বারি ঝর ঝর,
পুবালি বাতাস থাকিয়া থাকিয়া ব'য়ে যায় ধীরে ধীরে,
হৃদয় আজিকে অতীতের পানে শুধু চায় ফিরে ফিরে।

শুধু অবিরাম ঝরিছে বাদল, কেহ আর কোথা নাই—
কি জানি কেন যে বুঝিতে পারি না কি কথা
বলিতে চাই।
বন্ধু গো তুমি এসো এসো আজ,
রেখে দিয়ে তব শত গৃহকাজ,
মুখর করিব আজিকার ক্ষণ মধুর আলাপনে,
সুদূর অতীত আসিবে ফিরিয়া বাদলের বরিষণে।

মনে প'ড়ে যায় জীবনে আমার এসেছিল কারা সব,
হাসি, প্রীতি আর গানে আনন্দে দিয়েছিল গৌরব।
বহমান এই জীবন-ধারায়,
দূরে হ'তে দূরে তারা যে মিশায়,
ফিরে যায় শুধু নির্জ্জন ক্ষণে সুখ-স্মৃতি-সৌরভ,
হৃদয় যখন মৌন নীরব, নেই কোনো কলরব।

আসিবে না তুমি? নাই বা আসিলে, যদি নাহি প্রয়োজন,
শূন্য হৃদয়ে আমি গো বন্ধু করিব যে আয়োজন।
হৃদয়-বীণার ছেঁড়া তারগুলি
বাঁধিব আজিকে রিক্ততা ভুলি,
গাহিব তোমার সেই গাওয়া গান আজিকার বরষায়
বন্ধু তোমারে খুঁজিয়া পাইব সজল মেঘের ছায়।

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার যাত্রীর ডায়েরী

ক্যাপ্টেন শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র কর, এম-এ

গত বৎসর ভারতীয় সৈন্য-বিভাগ হইতে একটি অভিযাত্রী দল পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারে প্রেরিত হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমিও সেই দলের এক জন ছিলাম।

১৮ই মে দেরাদুন হইতে হাওড়া মেলে আমি, মেজর পন্থ ও লেফ্‌টেনাণ্ট বাগচী কাঠগুদাম রওনা হইলাম। গভীর রাত্রে বেরিলি ষ্টেশনে গাড়ী বদলের উদ্দেশ্যে নামিতে হইল। আমাদের গাড়ী ভোরের দিকে। রাত্রি কাটিল প্ল্যাটফর্মে বেড়াইয়া। মেঘমুক্ত আকাশের অবারিত জ্যোৎস্না ও ফুলের গন্ধভরা স্নিগ্ধ হাওয়ার সেই রাত্রি-জাগরণ মনে অপূর্ব্ব আনন্দ জাগাইয়াছিল। ভোরবেলা যখন ট্রেনে চাপিলাম তখন বনবিহগের কাকলী শুনিয়া

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারের পথে হিমালয়ের দৃশ্য

সুদূর বাংলাদেশের পল্লীর কথা মনে পড়িল। কাঠগুদামে পৌঁছিলাম বেলা দশটায়। এইটিই এ লাইনের শেষ ষ্টেশন, এখান হইতে মোটরযানে নাইনিতাল আলমোড়া ও রাণীখেতে যাইতে হয়।

পাহাড়ের উপর দিয়া আঁকাবাঁকা পথ সরীসৃপের মত চলিয়া গিয়াছে—সেই পথে আমাদের বাস দ্রুতবেগে নাইনিতালের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কখন কখন চোখে পড়িতেছিল বহু নিম্নে অধিত্যকার সবুজের সমারোহ ঘেরা দু'একটি পল্লী। একটার সময় নাইনিতাল শহরে পৌঁছানো গেল। গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র শতাধিক কুলি আমাদিগকে ঘিরিয়া অবস্থা সঙ্কটজনক করিয়া তুলিল। দেশবিভাগের সময় যাঁহারা চাঁদপুর গোয়ালন্দ ষ্টীমারে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা সেই অবস্থাটা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। একটি পুলিস অদূরে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতেছিল। কুলিদের ইতস্ততঃ ছুটাছুটিতে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিল। ফলে অবস্থাটা শীঘ্রই স্বাভাবিক হইল।

নাইনিতাল উত্তর প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। একটি সুন্দর হ্রদের চারিদিকে এই শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে কয়েকটি ভাল হোটেল ও পাবলিক স্কুল আছে। আমরা হ্রদের তীরে 'এলফিনষ্টোন হোটেলে' আশ্রয় লইলাম। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া পদব্রজে দুপুরের রোদেই রাস্তায় বাহির হওয়া গেল। এখানকার আবহাওয়া স্বভাবতঃই শীতল বলিয়া ঐ সময়েও মোটেই ক্লান্তি বোধ হয় নাই। শহরটি বেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। হ্রদের তীর হইতে শহরের অট্টালিকাগুলি শ্বেত কপোতের মত দেখাইতেছিল।

২০শে মে। ভোরের দিকে বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল। এখন শীতের প্রকোপ কতকটা অনুমান করিতে লাগিলাম। আমাদের বাস রাণীখেত অভিমুখে চলিল। দুপুর একটায় রাণীখেত

পৌঁছিলাম। রাণীখেত হিমালয় পর্ব্বতমালার পাদদেশে একটি ছোট শহর। পৃথিবীর কর্ম্মকোলাহলের বাহিরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের মধ্যে কয়েকটা দিন কাটাইবার পক্ষে রাণীখেত একটি উপযুক্ত স্থান। পূর্ব্বে সংবাদ দিলে এখানকার ডাকবাংলোতে স্থানাভাব হয় না। তা ছাড়া এখানে একটি ভাল হোটেলও আছে। রাণীখেত বিখ্যাত কুমায়ুন রেজিমেণ্টের কেন্দ্রস্থল। আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা সেখানেই হইয়াছিল। আমাদের দলের বিভিন্ন অফিসার এখানে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের আরও দুই জন সঙ্গী জুটিল—উভয়েই বাঙালী, ক্যাপ্টেন মজুমদার ও লেফটেনেণ্ট ভট্টাচার্য্য। যাত্রার পূর্ব্বে যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হইল। হিমালয়ের ভিতর দিয়া তিব্বতের সীমান্তে যাইতে হইবে—পথে খাওয়া দাওয়া কিছুই জুটিবে না, তাই রেশন, পাচক ও বেয়ারা সঙ্গে লইতে হইল। যতই উপরে উঠিব ততই শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে। এজন্য গরম পোশাক সঙ্গে লইলাম। নাইনিতাল হইতে আসিবার সময় একটি আল্‌পাইন লাঠিও সঙ্গে লইয়াছিলাম। লাঠিটি পর্ব্বত আরোহণ করিবার সময় এবং বরফের উপর দিয়া চলার সময় বেশ কাজে লাগিয়াছিল।
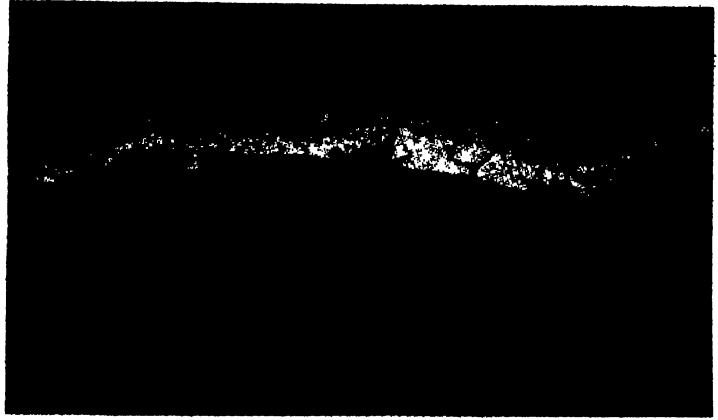
২১শে মে ভোর পাঁচটায় মোটরে আমরা পিণ্ডারী যাত্রা করিলাম। রাস্তা আঁকাবাঁকা। কোথাও খাড়া পাহাড়, আবার কোথাও-বা ঢালু। গাড়ীতে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম এবং আমার বমনের ভাব হইয়াছিল। সোয়া
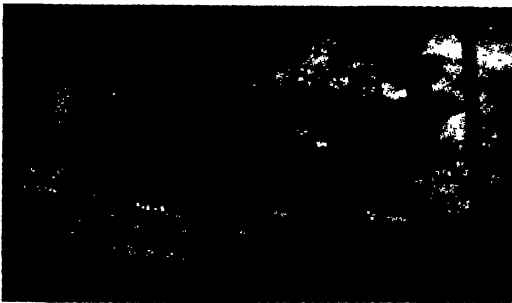
নয়টায় গরুড়ে পৌঁছিলাম। গরুড় কুমায়ুন জেলার একটি সমৃদ্ধ পল্লী। এখান হইতে আমাদিগকে পায়ে হাঁটিয়া চলিতে হইবে। পিণ্ডারী এইস্থান হইতে ৫৪ মাইল দূরে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চা পান করিলাম। তার পর আবার পথ ধরিলাম। পাঁচ ঘণ্টায় ১৪ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা বাগেশ্বর পৌঁছিলাম। বাগেশ্বর সরযু ও বাগমতী নদীর

লোহারখেতের দৃশ্য

সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বাগেশ্বরী মন্দির এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসরই মাঘ মাসে এখানে একটি মেলা হয়। শুনিতে পাইলাম সুদূর তিব্বত হইতেও ব্যবসায়ীরা বিবিধ পণ্য লইয়া এখানে আসে। এখানকার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়।

বাগেশ্বর হইতে পিণ্ডারী পর্য্যন্ত ৪০ মাইল রাস্তার মধ্যে কয়েক মাইল পর পরই ডাকবাংলো আছে। বাগেশ্বরে আমরা সরযু নদীতে স্নান করিলাম। বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দ হইল। এ সেই সরযু নদী যাহার কথা কবিগুরু বাল্মীকি তাঁহার অমর লেখনীতে রামায়ণে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার পুণ্য সলিলে রঘুকুলরবি রামচন্দ্র ও তাঁহার অনুজেরা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। একদা যেদিন লক্ষ্মণ সীতা দেবীকে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসন দিবার জন্য নৌকায় এই নদী অতিক্রম করিতেছিলেন সেইদিন মাতৃস্বরূপা এই সরযু নদী সীতার শোকে অভিভূত হইয়াছিল এবং তাহার উদ্বেলিত তরঙ্গমালা যেন সীতাদেবীকে কোলে টানিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিল।

সেইদিন ডাকবাংলোতে থাকিয়া ভোরে আবার পথ ধরিলাম। এই অঞ্চল হইতেই কুমায়ুন রেজিমেণ্টের সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত কুমায়ুন বিভাগের ভূমি মোটেই উর্ব্বর নয়। কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঢালু পাহাড়ের বুক চিরিয়া এখানে শস্য উৎপাদন করিতে হয়। এখানকার জনসাধারণ বড়ই গরীব, সৈনিক-বৃত্তিই তাহাদের প্রধান জীবিকা। এখানে মেয়েদের পর্য্যন্ত চাষের কাজ করিতে দেখা যায়।

২২শে মে আবার পথ ধরিলাম। পথ পূর্ব্বের ন্যায় কোথাও পাহাড়ের উপর দিয়া আবার কোথাও সমতল ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে। আমাদের রাস্তার পাশেই সরযু নদী। পথ চলিতে চলিতে আমাদের হঠাৎ মাছ ধরার সখ হইল। সময় অল্প। তাই একটা অভিনব উপায় অবলম্বন করা গেল। একটা গ্রেনেড (হাতবোমা) জলে ছুড়িয়া ফেলা গেল, অমনি জলের মধ্যে একটা

পথের দৃশ্য (দেওয়ালী)

তীব্র আলোড়ন সুরু হইল এবং ছোট বড় প্রচুর মাছ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। মাছগুলি সংগ্রহ করিলাম। কিছু মাছ গ্রামবাসী-দিগকে বিলাইয়া দেওয়া হইল। বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা বাগেশ্বরটে ডাকবাংলোতে পৌঁছিলাম। নিকটেই একটি ঝরণা প্রায় ছয় শত ফুট উঁচু হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার জল অতি স্বচ্ছ শীতল। পথশ্রমের পর ঝর্ণার জলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। এরূপ ঝর্ণা পথে পথে আরও কয়েকটি দেখিয়াছি। একটি ঝর্ণার নিকটে বিকানীর রাজ্যের এক দল বয়স্কাউটের সঙ্গে আমাদের দেখা। এই তাজা ও তরুণ বয়স্কাউটদের চোখেমুখে অভিযানের দুঃসাহসিক দৃঢ় সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি—পরীক্ষার পর দিবানিদ্রায় বা চায়ের টেবিলে রাজনীতি আলোচনায় বা রাজা উজীর মারায় সময় না কাটাইয়া এইরূপ দুরধিগম্য অঞ্চলে যে অভিযানে বাহির হইয়াছে তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তাহাদের নিকট হইতে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার সম্পর্কে আবশ্যক তথ্য জানিয়া লইলাম। জনহীন এই দুর্গম নিভৃত প্রদেশে এই দুইটি দলের সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাদের মনে উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল।

আনুমানিক দুপুর বারটার সময় আমরা লোহারক্ষেত পৌঁছিলাম। ঐদিন রাত্রিতে সেখানে থাকিয়া ভোরে আবার চলিলাম। ঐদিন সকাল হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু পথের নেশা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল বলিয়া আমরা এই দুর্যোগের ভিতরেই চলিলাম। রাস্তায় এক দল মেষপালকের সঙ্গে দেখা। ইহারা কেহ বাঁশী বাজাইতেছিল, কেহ বা গান গাহিতেছিল। ইহাদের গান ও বাঁশীর সুর হিমালয়ের এই নির্জ্জন প্রদেশে বড়ই করুণ মনে হইতেছিল এবং পথ চলিতে চলিতে বহুদূর পর্য্যন্ত আমরা সেই ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম।

প্রায় সোয়া এগারটায় আমরা চাকুরীতে পৌঁছিলাম। বৃষ্টিপাত তখন বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু কালো মেঘ আকাশ ও পর্ব্বতচূড়ায় লুকোচুরি খেলিতেছিল। এখান হইতে কুমারায়ূঁর নন্দকোট পর্ব্বতশৃঙ্গ (২২৫০ ফুট) দেখা যায়। ঐ দিনটি আমরা চাকুরী ডাকবাংলোতে কাটাইলাম। এখানে বেশ শিকারের সুবিধা আছে। বিকালের দিকে আমরা তিন জন মৃগয়ায় বাহির হইলাম। সারাদিন পর্ব্বতে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও একটি শিকার আমাদের ভাগ্যে জুটিল না। বাংলো হইতে আমরা বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে এই পার্ব্বত্যভূমিকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। আমরা ক্লান্তদেহে ফিরিতেছিলাম, এমন সময় একটি বন্য বরাহ কিছু দূরে একটি ঝোপ হইতে বাহির হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। আমরা ইহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম এবং ইহাকে গুলিবিদ্ধ করিলাম। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বরাহটি সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। ক্রমশঃ রাত্রির অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। দিনমানে ফিরিয়া আসিব ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য রাত্রি হইলেও যাহাতে আমরা ফিরিতে পারি তজ্জন্য পথে কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্রির এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে টর্চের আলোতে তাহাদের একটিও বাহির করিতে পারিলাম না। নিবিড় তমিস্রায় বনস্থলীর সবই যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের চূড়াগুলি যেন দৈত্যদানবের মত দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ে উঠানামা করিতে করিতে বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তদুপরি ভয়ানক শীত। মনে হইতেছিল যেন আমাদের পথ আর ফুরাইবে না। ক্লান্ত হইয়া একটি বড় শিলাখণ্ডে বসিয়া পড়িলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। অদূরে একটি প্রাণপ্রাচুর্য্যে উচ্ছল ঝরণা রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। আকাশে তখন লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র উঠিয়াছে। আজ এই গভীর অরণ্যে রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নক্ষত্রগুলিকে আমাদের একান্ত পরিচিত বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল।

রাত্রি প্রায় দশটা। সহসা একটি আলো নীচু হইতে উপরে ছুটিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বুঝিতে পারিলাম আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য ডাকবাংলোতে পিস্তল হইতে সঙ্কেতসূচক আলো নিক্ষেপ করা হইয়াছে। দেখা গেল আমরা বাংলো হইতে তিনশত গজের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। ডাকবাংলোতে পৌঁছিয়া জানিলাম আমাদের খুঁজিতে অনুসন্ধানী দল বাহির হইয়াছে।

পরদিন ভোরে আবার পথ ধরিলাম। বেলা এগারটায় আমরা দেওয়ালীতে পৌঁছিলাম। দেওয়ালী হইতে ফুরকিয়া ডাকবাংলো দুই ঘণ্টার পথ। পিণ্ডারী যাইবার পথে ইহাই সর্ব্বশেষ ডাক-বাংলো।

২৮শে মে। সকালেই অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিলাম।

চমৎকার রোদ উঠিল। সূর্য্যালোকে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তুষারাবৃত নন্দকোট এবং বাল্জাটিয়া (২৫৫৩০ ফুট) শৃঙ্গসমূহ তাহাদের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। আমরা গ্লেসিয়ারের উপরে যাইবার জন্ত যেন একটা উন্মাদনা অনুভব করিলাম। ছয় মাইল পথ চলার পর আকাশে আবার মেঘ দেখা দিল এবং প্রবল তুষার-বৃষ্টি সুরু হইল। নিকটে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত কুটীর ছিল। শুনিয়াছি সন্ন্যাসীরা নাকি এখানে তপস্তার জন্ত আসিয়া থাকেন। সাধন-ভজনের পক্ষে বেশ উপযুক্ত স্থান। তবে একেবারে সমাধিলাভও বিচিত্র নয়। শুনিয়াছি পিণ্ডারীযাত্রীদের কেহ কেহ বরফাচ্ছাদিত হইয়া এই অঞ্চলে সমাধিলাভ করিয়াছে। আমরা ঐ কুটীরেই আশ্রয় লইলাম। দুর্য্যোগের জন্ত সেই দিন আর গ্লেসিয়ারে আরোহণ করিলাম না।

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারের দৃশ্ত

পরদিন আকাশ মেঘমুক্ত হইল। সারাদিন বৃষ্টিপাতের পর প্রকৃতিদেবী যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমরা গ্লেসিয়ার আরোহণের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। পাহাড়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলি বরফে ঢাকা। কোন গাছপালা বা জীবজন্তু চোখে পড়ে না। কেবল রজতশুভ্র তুষাররাশি রবির কিরণে ঝলমল করিতেছে। প্রভাতালোকে উদ্ভাসিত সেই গিরিচূড়াগুলি দেখিয়া একটি কবিতার কয়টি পংক্তি মনে পড়িয়া গেল—

"সুনীল গগন ঘনতর নীল, অতি দূর গিরিমালা
তারি পরপারে কনক-কিরণ রবির কিরণ ঢালা।"

ঐ বরফের আচ্ছাদনের নিম্নদেশে ফল্গুধারার মত জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল। সরযূ এবং পিণ্ডারী নদী এই গ্লেসিয়ার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ছয় ঘণ্টায় পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় পনর

একটি কুমারী রমণী

হাজার ফুট উপরে উঠিলাম। কোন রাস্তা নাই। লাঠিতে ভর দিয়া উপরে উঠিতে হইয়াছে। লাঠি ছাড়া তুষারপথ অতিক্রম করা যায় না। প্রচণ্ড শীত। মনে হইতেছে এক-একটা দমকা হাওয়া হাজার হাজার ফুট নীচে আমাদিগকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে। এইভাবে কোন কোন যাত্রী নাকি মারাও গিয়াছে। আমরা ঐ স্থান হইতেই ফিরিলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম আমাদের কোন কোন বন্ধু ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় পড়িয়াছেন। তাঁহারা উঁচুতেও উঠিতে পারেন না, আবার নীচুতে নামিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। অতি কষ্টে তাহাদিগকে নীচুতে নামাইয়া আনা হইল। তারপর আমরা ডাকবাংলোতে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

কয়েক দিন পথ চলার পর ৫ই জুন রাণীখেত পৌঁছিলাম। সেখানে কুমায়ুন রেজিমেণ্ট আমাদের সম্মানার্থে একটি ভোজের আয়োজন করিলেন। আমরা ৭ই জুন রাণীখেত ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ পল্টনে যাত্রা করিলাম।

এই কয়টি দিনের স্মৃতি ভুলিবার নয়। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে হিমালয় সাধক, যোগী এবং কবিদের প্রেরণা যোগাইয়াছে, যাহার অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য এবং দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চতা বিশ্ববাসীর চির বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে, যাহার নদ-নদীগুলি ভারতের মৃত্তিকাকে সরস এবং উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে, সেই হিমালয়ের ডাকে আকুল হইয়াই আমি দুর্গমপথের অভিযাত্রী হইয়াছিলাম। এই কয়টি দিনের স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়া থাকিবে।

চিরন্তনী

শ্রীগোপাললাল দে

ভালবাসি কি না প্রশ্ন জাগিছে বুঝি ?
আমি বলি—শুধায়ো না,
সহজ নহেক এর উত্তর দেওয়া,
আরও সুকঠিন কাহিনী তাহার শোনা।
সঙ্কট-পথে ভালবাসাবাসি লীলা।
বড় অঘটন, কেহ জমিবে না সখি,
কেহ যা' চাহে না হেন কিছু যদি থাকে,
অজানিতে থাক, কি হবে বলো তা লখি' ?
পথ বেয়ে যেতে ফুল কুড়াবার মত,
ধরো যদি কিছু হ'য়ে গিয়েছিল ভুল,
সমাদর তার কি হবে কাহার কাছে ?
জীবনের পথ বড় ভীতি-সঙ্কুল।
ভুল বুঝিবার পুরোপুরি আছে ভয়,
হয়ত শোনাবে বাছা বাছা রূঢ় বাণী,
নয়নের জলে আমারে ফিরিতে হবে,
রোষারুণ হবে তোমার আননখানি।
যদি আধুনিকা সাহসিকা কিছু হও,
অবিচল যদি শুনিতে পারো সে কথা,
তবুও কি হবে ? সে ভার বহিতে পারো,
নাহিক তোমার সে হেন সক্ষমতা।
সহিবারে পারি এ হেন বেদন রাশি,
আমারও যে নাই কবচাবৃত মন,
খুঁজো না হৃদয়-কোণ।
যদি প্রতিদান দিতে সাধ হয় মনে,
কি করিয়া দেবে ? কিছু যে উপায় নাহি,
অতি ক্ষীণ খাতে জীবনের ধারা বহে,
কোনমতে বাঁচা শতজনা মুখ চাহি।
এ বিড়ম্বনে সাধের কি দাম আছে ?
জীবনে বাড়িবে আরও একগোছা ভুল,
'চাওয়া আর পাওয়া' আজও নয় সমতুল।
নীতির বিধানে অনুচিত যারে বলে,
হেন কিছু যদি করিয়া ফেলেছি আমি,
আমি ত জানি না, অঘটনপটীয়সী
জানেন বিধাতা আর অন্তরযামী।
ব্যাধ-বাণ লাগি হরিণের কোথা সাধ ?

আঁকা ছবি পরে অবুঝ শিশুর তুলি,
অকারণে এক বাড়ায় রেখার কাঁদ।
তাই বলি, যদি আছে, আহা থাক্ থাক্,
এ জনার মাঝে অথবা দোঁহার বুকে,
গোপনে রহিয়া স্বপনে সফল হবে,
বাধা সে দিবে না কারো জীবনের সুখে।
বিশ্ব ব্যাপিয়া এই হের প্রাণবায়ু
অনাদিকালের দীর্ঘ নিশাস বায়ে,
অণুতে অণুতে বেদনার বাণী বহে,
আরো কয়েকটা মিশাবে তাহার গায়ে।
ধরণী শ্যামলী বুক-ভাঙা আঁখি-জলে,
সেই শ্যামলতা বাড়াবে কয়েক ফোঁটা,
চির পুরাতন ওটা।
দিকে দিকে হের তুফান আসিছে নেমে
পুবে পশ্চিমে উত্তরে বড় কাছে,
এ ঝড়ের শেষে দু'জনে রহিব কি না,
মনে মনে সখি, বড় সন্দেহ আছে।
তাই বলি আজ কোন কথা শুধায়ো না,
তার চেয়ে এস, বসি দোঁহে কাছাকাছি,
রক্ত-ক্ষরণ রণে দাঁড়াবার আগে,
শুধু ভাবি আজ, তুমি আছ আমি আছি।
তোমার গলায় যদি দিই মালাখানি,
রোষ করিও না, শুধু মনে ক'রো খেলা,
অভিনয় ছলে বাহু দিয়ে বাহু বাঁধি,
ভুল বুঝিও না, মধু হাসি' ক'রো হেলা।
করপল্লব যদি বা পীড়ন করি,
উত্তরে তার তুমিও পীড়ন দিও,
খেলা-মনোভাবে নিও।
তার পরে যবে সংগ্রাম এসে যাবে,
আমি পরিখায়, তুমি কোথা কতদূর ?
আর মিলিবে না সুর।
যাহা চাই তাহা না পাওয়ার পাদপীঠে
যদি গড়ি' উঠে মঙ্গল-মন্দির,
তবে তাই হবে, চির চাওয়া রবে,
অনাগত মঞ্জীর।

কালিদাসের কথা

শ্রীছায়া ভট্টাচার্য্য

"সকল সভ্যদেশেই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।"—কথাটা বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশের বড় বড় কবি বা দার্শনিকগণের আত্মপ্রকাশের আগ্রহ ছিল না, অপর কেহও তাঁহাদের যথাযথ জীবনকথা লিখিয়া রাখেন নাই। যে মহাকবির কাব্যপ্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তি দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে, সেই কালিদাসের জীবন সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত করিয়া কোন কথা বলিতে পারি না। ইতিহাস ও চরিতকথায় সেকালের সহজাত নিরাগ্রহের ফলেই এমনটি হইতে পারিয়াছে।

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কতকাল পূর্ব্বে কালিদাস তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবির কোনও রচনার মধ্যে সেকথার উল্লেখ নাই। সাতটি অমর গ্রন্থে তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিল, অথচ কবি সেই মহতী সৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া গেলেন। তিনি নিরাসক্ত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন: তাহাতে যশমানের আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মপ্রচারের চেষ্টা নাই। কিন্তু আজ সুধী-সমাজ কবিসম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, অশ্রান্ত অধ্যবসায়ে কবিজীবনের ঘন যবনিকার কোন কোন প্রান্ত তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন।

যিনি প্রকৃত মহাকবি তিনি কখনও নিজেকে আপন সুখদুঃখের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বা প্রত্যক্ষ পরিবেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। তিনি আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়া বিশ্বের সহিত একাত্মতা লাভ করেন। কাজেই তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের কোন সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু কবিকে চিনিতে হইলে এই কঠিন কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হয়, উৎসাহের সহিত কবির রচনা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়, যদি তাহাতে কবির অলক্ষ্যে আত্মজীবনের কোন ছাপ পড়িয়া থাকে। কালিদাসের ক্ষেত্রেও তাহাই করণীয়।

কালিদাসের বাসভূমি: কালিদাস কোনও স্থলে আপন বাস-ভূমির নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি নানা প্রসঙ্গে কত গ্রাম জনপদের বর্ণনা দিয়াছেন। সে বর্ণনা নিখুঁত। অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ, নদনদীর নামধাম, পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয়—যখন যাহা লিখিয়াছেন সবই যেন তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া মনে হয়। কবি এক দিকে দ্রাক্ষা কুঙ্কুমের উৎপত্তি-স্থানের কথা বলিয়াছেন, অপর দিকে সাগরসঙ্গমের বিবরণ লিখিয়াছেন। দক্ষিণে 'বনরাজিনীলা' সমুদ্রবেলা আর উত্তরে 'দেবতাত্মা নগাধিরাজ' সবই তাঁহার পরিচিত। ইহাই 'ক্রান্তদর্শী' কবির মহিমা। যাবত প্রদেশগুলি সবই কালিদাস স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না কে জানে? কবি অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষের মত সুস্পষ্ট ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন। কালিদাসও যাহাকিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই যেন বাস্তব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই কোন্ দেশের সহিত কবির জন্মাবধি পরিচয় ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। এইজন্যই ভারতের উত্তর প্রান্তে কাশ্মীরও তাঁহাকে আপন বলিয়া দাবি করে, পূর্ব্বপ্রান্তে বাংলাও তাঁহার সহিত সম্পর্ক পাতাইতে উৎসুক হয়। অনেকের মতে কবি ছিলেন বিদর্ভ মালবের অধিবাসী। প্রাচীন ঐতিহ্য এবং কাব্য-নাটকের আভ্যন্তর প্রমাণ এই মতের সমর্থনে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

কবির সকল গ্রন্থে দেশবর্ণনার অবসর হয় নাই, আপন দেশের মাহাত্ম্যখ্যাপনের সুযোগও ঘটে নাই। তিনি 'রঘুবংশে' ইন্দুমতীর স্বয়ংবর, প্রসঙ্গে একবার অবন্তীর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'মেঘদূতে' প্রাণ ভরিয়া বহু জনপদ নদী গিরির বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। যক্ষের গমনপথে অবন্তী, উজ্জয়িনী, দশার্ণ, বিদিশা, রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, রামগিরি, আম্রকূট, নীচ পর্ব্বতের বর্ণনার সুযোগ ঘটিয়াছে। এগুলি বিদর্ভ মালবের অন্তর্গত। বার্ত্তাবহ মেঘ রামগিরি হইতে সোজা পথে বাগেলখণ্ড, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ হইয়া অলকায় যাইতে পারিত, কিন্তু কবি তাহাকে মালবের প্রধান নগরগুলি না দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন নাই। তিনি তেরটি শ্লোকে উজ্জয়িনীর বিবরণ দিয়াছেন। এই নগরীর প্রতি এত বেশী পক্ষপাত দেখিয়াই অনুমান করা হয় যে, ঐ প্রদেশেই ছিল কবির বাসভূমি।

নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে নানা মতের উদ্ভব হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে কবি সুঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের প্রণয়কাহিনীর চিত্র দিয়াছেন। অগ্নিমিত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪৮ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং কালিদাস কোন মতেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতকের আগে বর্ত্তমান ছিলেন না। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত রবিকীর্ত্তির আইহোল লিপিতে কালিদাসের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। সুতরাং কবি ইহার পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৎসভট্টির মাপাসোর শিলালিপির রচনারীতি বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লিপির রচয়িতা অবশ্যই কালি-দাসের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। এই লিপিতে সময় উল্লিখিত আছে ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা হইলে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কোন কোন গবেষক সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনার সাহায্যে অনুমান করেন—কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্যে এবং মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন

তাবে গুপ্তবংশের নৃপতিগণের নাম এবং গুপ্তযুগের ঘটনার ইতিহাস সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে কুমারসম্ভব কাব্যখানি আপন নামের মধ্য দিয়া একজন গুপ্ত রাজকুমারের জন্মস্মৃতি বহন করিতেছে।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন এইরূপ জনবাদ অতি প্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে একথার উল্লেখ আছে। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে শকারি বিক্রমাদিত্য বলা হইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষদিকে এই শক্তিমান গুপ্ত-সম্রাটের আশ্রয়ে থাকিয়া কালিদাস কাব্য-রচনা আরম্ভ করেন—এই সিদ্ধান্ত অনেকে মানিয়া লইয়াছেন। কবি অভিনন্দ তাঁহার রাম-চরিত কাব্যে ৩৩শ সর্গের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—খ্যাতিং কামপি কালিদাসকৃতয়ো নীতাঃ শকারাতিনা।

কালিদাসের রচনাবলীর খ্যাতি প্রচারে শকারি সহায় হইয়াছিলেন।

এই স্থলে 'শকারাতি' পদে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যই লক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনিই সুরাষ্ট্রে শকাধিপত্য নির্মূল করেন। কতকগুলি ঐতিহাসিক সূত্র কালিদাসের সহিত গুপ্তরাজের যোগসাধনে সহায়তা করে।

কালিদাসের প্রবাস : কালিদাস বিক্রমাদিত্যের প্রতিনিধিরূপে কুন্তলদেশে গিয়াছিলেন—সে সম্পর্কে সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের এক অংশের নাম ছিল কুন্তল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বাকাটক রাজবংশ মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই রাজবংশের সহিত মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের হস্তে আপন কন্যা প্রভাবতী গুপ্তাকে সম্প্রদান করেন। রুদ্রসেন অকালে পরলোক-গমন করিলে তাঁহার রাজ্য ও রাজকুমারগণ চন্দ্রগুপ্তের আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভাবতী গুপ্তার শাসনলিপিগুলির মধ্যে স্পষ্টই গুপ্তসম্রাটের প্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত বিশ্বস্ত কর্মচারিগণকে বাকাটক রাজ্যে পাঠাইয়া কন্যার নামে রাজ্যশাসন করিতেন, ইহা স্বাভাবিক। তিনি কালিদাসের উপর নাবালক দৌহিত্রগণের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও অযৌক্তিক নয়। কালিদাস যে চন্দ্রগুপ্তের দূতরূপে কুন্তলদেশের রাজসভায় অর্থাৎ বাকাটক রাজধানীতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে রাজশেখর, ভোজরাজ ও ক্ষেমেন্দ্রের উক্তি প্রমাণ।

রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় (গাইকবাড় গ্রন্থমালা, তৃতীয় সংস্করণ, ৬০ পৃঃ) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

অসকলহসিতত্বাৎ ক্ষালিতানীব কান্ত্যা
মুকুলিতনয়নত্বাৎ ব্যক্তকর্ণোৎপলানি।
পিবতি মধুসুগন্ধীন্যাননানি প্রিয়াণাং
ত্বয়ি বিনিহিতভারঃ কুন্তলানামধীশঃ।

শ্লোকের বক্তা কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'কুন্তলদেশের অধীশ্বর তোমার উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া প্রিয়জনগণের আনন-মধুপানে ব্যাপৃত আছেন।'

এই প্রাচীন শ্লোকটি ভোজপ্রণীত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (কাব্যমালা, ১৬৮ পৃঃ) ও শৃঙ্গারপ্রকাশ (২য় খঃ ৭ম অঃ, ১৯ পৃঃ) নামক দুই-খানি অলঙ্কারগ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ভোজরাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য যখন কালিদাসকে প্রশ্ন করিলেন, 'কুন্তলেশ্বর কি করিতেছেন', তখন কালিদাস প্রত্যুত্তররূপে এই শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন—

"কালিদাসঃ কিং কুন্তলেশ্বরঃ করোতীতি বিক্রমাদিত্যেন পৃষ্ট উক্তবান্।" ভোজ আরও জানাইয়াছেন যে, বিক্রমাদিত্য কালি-দাসের প্রত্যুত্তর শুনিয়া চতুর্থ চরণে 'ত্বয়ি' স্থলে 'ময়ি' প্রয়োগে শ্লোকটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা কুন্তলেশ্বরের আচরণে স্বীয় অনুমোদন জ্ঞাপন করেন—

ইদমেবোহস্বিষ্য বিক্রমাদিত্যঃ প্রত্যুবাচ
পিবতু মধুসুগন্ধীন্যাননানি প্রিয়াণাং
ময়ি বিনিহিতভারঃ কুন্তলানামধীশঃ।

'কুন্তলাধীশ আমার উপর [রাজ্য] ভার দিয়া প্রিয়াগণের মুখমধু পান করুক।'

প্রভাবতী গুপ্তার পুত্র বাকাটক প্রবরসেনই এ স্থলে কুন্তলেশ্বররূপে অভিহিত হইয়াছেন। কুন্তলপ্রদেশ পূর্বেই বাকাটকরাজ্যের অধিকারে আসিয়াছিল। ভরতচরিতের রচয়িতা কৃষ্ণকবি কুন্তলেশ বলিয়া প্রবরসেনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পরে উল্লেখ করিব। বিক্রমাদিত্য (চন্দ্রগুপ্ত) প্রবরসেনের মাতামহ। তাঁহার মন্তব্যের মর্ম এই যে, স্নেহান্ধ মাতামহ পিতৃহীন দৌহিত্রের বিলাসব্যসনে বাধা না দিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসনক্লেশ স্বীকার করিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, নীতিকুশল গুপ্তসম্রাট অপর এক রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচারচর্চা নামক গ্রন্থে (কাব্যমালা ১৩৯ পৃঃ) কুন্তলেশ্বরদৌত্যে কালিদাসের উক্তি বলিয়া আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

কুন্তলেশ্বরদৌত্যে কালিদাসঃ
ইহ নিবসতি মেরুঃ শেখরঃ ক্ষ্মাধরাণা-
মিহ বিনিহিতভারাঃ সাগরাঃ সপ্ত চান্যে।
ইদমহিপতিভোগস্তম্ভবিভ্রাজমানং
ধরণীতলমিহৈব স্থানমস্মদ্বিধানাম্।

'এই ধরণিতলে পর্বতশ্রেষ্ঠ মেরু অবস্থান করিতেছে, ইহার উপর সপ্ত সাগরের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, ইহা নাগরাজের ফণস্তম্ভে বিরাজমান ; আমার মত লোকের ইহাই উপযুক্ত স্থান।'

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন—'[কালিদাস] মহারাজের দূত হইয়াও যখন সামন্তরাজ [কুন্তলেশ্বরের] সভায় স্বীয় প্রভুমর্যাদার উপযুক্ত আসন পাইলেন না, তখন কার্য্যোদ্ধারের জন্য ভূমিতলেই উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্লোকে প্রগল্ভ-গম্ভীর বচনে ধরাসনের গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন।'

অত্র মহারাজদূতোঽপি সামন্তাস্থানে স্বপ্রভুসমুচিতগৌরবপূজার্হ-

মাসনমনাসাম্ভ কার্য্যবশেন স্থুয়াবেবোপস্থিঃ প্রাগলভ্যগাম্ভীর্য্যেণৈবং বক্তে।

উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় কুন্তলরাজ-সভায় কালিদাসের দৌত্যসম্পর্কে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা মহাকবি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কিংবা অপর কোনও কবি উহার রচয়িতা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্লোক দুইটি 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য' নামক কোন কাব্য বা নাটকের অংশ কিংবা প্রাসঙ্গিক উদ্ভট কবিতা-মাত্র তাহাও স্থির করা কঠিন।

প্রবরসেনের সহিত যে কালিদাসের সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। সেতুবন্ধ নামে একখানি প্রাকৃত কাব্য প্রবরসেনের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু টীকাকার রামদাস সেতুবন্ধের রচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন—

ধীরাণাং কাব্যচর্চাচতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা
যং চক্রে কালিদাসঃ কবিকুমুদবিধুঃ সেতুনামপ্রবন্ধম্।

'সুধীগণ যাহাতে কাব্যানুশীলনচাতুর্য্য লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় কবিকুমুদবিধু কালিদাস সেতু নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।'

টীকার আর এক স্থলে এইরূপ আছে, 'এই গ্রন্থ মহারাজাধিরাজ-বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় নিখিলকবিচক্রচূড়ামণি কালিদাস মহারাজ প্রবরসেনের জন্য রচনা করেন।'

"মহারাজপ্রবরসেননিমিত্তং মহারাজাধিরাজবিক্রমাদিত্যেনাজ্ঞপ্তঃ নিখিলকবিচক্রচূড়ামণিঃ কালিদাসমহাশয়ঃ সেতুবন্ধপ্রবন্ধং চিকীর্ষুঃ" ইত্যাদি।

প্রবরসেন নামে কাশ্মীরেও এক রাজা ছিলেন। এই প্রবরসেন বিতস্তানদীর সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, কাশ্মীররাজ প্রবরসেন সেতুবন্ধনের স্মৃতিরক্ষার্থ 'সেতুবন্ধ' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই ধারণার অনুকূলে তেমন কোনও প্রমাণ নাই। অপরপক্ষে সেতুবন্ধ কাব্যের কোন কোন পুথির পুষ্পিকায় গ্রন্থকারকে স্পষ্ট কুন্তলেশ্বর বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কৃষ্ণকবির ভরতচরিত কাব্যে (১।৪) সেতুবন্ধকাররূপে কুন্তলেশের নাম পাওয়া যায়—

"লোকেষলঙ্কারমপূর্ব্বসেতুং ববন্ধ কীর্ত্ত্যা সহ কুন্তলেশঃ।"

সুতরাং সেতুবন্ধরচয়িতা প্রবরসেন ও কুন্তলেশ্বর প্রবরসেন অভিন্ন। কুন্তলেশ্বর প্রবরসেনের সহিত যে কালিদাসের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে আর একটি প্রমাণ প্রবরসেনেরই পট্টন-শাসনলিপি। এই লিপির মধ্যে রচয়িতার নাম উল্লিখিত আছে 'কালিদাস'।

রুদ্রসেনের অকাল মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত পিতৃহীন দৌহিত্রগণের শিক্ষার জন্য কালিদাসকে বাকাটক রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন একথা যদি সত্য হয়, তবে প্রবরসেন শৈশব হইতেই কালিদাসের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন একথাও সত্য। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা ত আছেই, অনুকূল প্রমাণেরও অভাব নাই।

প্রাচীন যুগের রাজগণ মধ্যে মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া বাস করিতেন। একথা বহু তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় প্রবরসেনের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজমাতা প্রভাবতী গুপ্তা রামগিরির দেববিগ্রহ রামগিরিস্বামীর সম্মুখে বসিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে যখন বাকাটকরাজপরিবার রামগিরিশিবিরে বাস করিতেছিলেন, তখন রাজপরিবারের উপদেষ্টা চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিনিধি কালিদাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। কবি কি সেই সময়েই 'মেঘদূত' রচনার প্রেরণা লাভ করেন? হয় ত বর্ষার কোন এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসে প্রবাসী কবির চিত্ত প্রিয়তমার বিরহে বেদনাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রভু চন্দ্রগুপ্তের আদেশে বাকাটকরাজ্যে আসিয়াছিলেন। রাজরোষভয়ে বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে কবিকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। আজ নবমেঘদর্শনে রাজাদেশ তাঁহার কাছে অভিশাপ বলিয়া মনে হইল। তখন নিজ হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগকে তিনি বিরহী যক্ষের বেদনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিলেন। যক্ষের বিরহার্ত্ত স্বরের মধ্যে যে কবি-হৃদয়ের অন্তর্ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই তাহা কে বলিতে পারে? উত্তর মেঘের প্রত্যেকটি শ্লোকের মধ্য দিয়া যে আকুল পত্নীপ্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহা কেবল কাব্যের কল্পনা নাও হইতে পারে। যক্ষের প্রণয়বার্ত্তার মধ্যে হয় ত কবির দাম্পত্যজীবন প্রতিফলিত হইয়াছে।

কালিদাসের শেষজীবন: কালিদাস দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় তাঁহাকে স্বীয় নাটকের উপাদেয়তা সম্বন্ধে যুক্তিপ্রয়োগ করিতে হইয়াছে। তিনি যে তখনও 'নব কাব্যে'র অপ্রসিদ্ধ কবি তাহাও মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং এই নাটক তাঁহার প্রথম বয়সে রচিত হওয়া সম্ভব। 'শকুন্তলা' নাটক কবির প্রবীণ বয়সের রচনা এইরূপ অনুমান করার কারণ আছে। এই নাটকে কবির দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা যেন মধ্যে মধ্যে প্রকাশলাভ করিয়াছে। সমগ্র নাটকখানির মধ্যে যেন একটি অতি সূক্ষ্ম নৈতিক আদর্শের ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে। কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয়ে কবিজীবন আরম্ভ করেন, কিন্তু পরবর্তী রাজা কুমারগুপ্ত এবং তৎপুত্র স্কন্দগুপ্তের রাজসভায় সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয় নাই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুদীর্ঘকালের সভাকবি রাজসভার আড়ম্বরময় পরিবেশে অবশ্যই নানাব্যাপারে রাজভৃত্যগণকে প্রভুর কার্য্যে শঠতা ও কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। হয় ত তাহার আভাস পাওয়া যায় 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের প্রতি মৃগয়াক্লান্ত সেনাপতির জনান্তিক ভাষণের মিথ্যা ব্যবহারে:

'অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুবর্তিষ্যে।'

এইরূপ কপট চিত্তানুবর্ত্তন নিশ্চিতই রাজসেনাপতির যোগ্য নয়। এই নাটকে বিদূষকের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাহার ব্যবহারে স্থানে স্থানে রাজার প্রতি সরলতা ও সমবেদনার অভাব লক্ষিত হয়। দুষ্মন্তের মাধব্যের মধ্যে চারুদত্তের মৈত্রেয়ের

মত অকপট সংপ্রীতি পাওয়া যায় না। কালিদাস কি এই সকল চিত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্কিত করিয়াছেন? শকুন্তলা নাটকের নগরপাল ও রক্ষিপুরুষগণের নির্লজ্জ উৎকোচগ্রহণ এবং শৌণ্ডিকাপণে গমনের মধ্যেও কি তৎকালীন রাজকর্ম্মচারীদের অনুচিত আচরণ চিত্রিত হইয়াছে?

কালিদাসের শেষজীবনে বোধ হয় নবীন গুপ্তনৃপতি আর কবির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। হয়ত বা তিনি প্রজাপালনরূপ রাজধর্ম্ম হইতেও কিছুত হইয়া পড়িতেছিলেন। কবি পূর্ব্ববর্তী নৃপতিগণের চরিত্রে যে আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে তাহা সম্ভবতঃ লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শকুন্তলা নাটকের শেষ শ্লোকে 'ভরতবাক্যে'র চারি পংক্তিতে যেন কবিচিত্তের আক্ষেপ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে:

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।

'রাজা প্রজার হিতসাধনে নিরত হউন, এবং জ্ঞানবৃদ্ধদিগের বাক্য সম্মানিত হউক।'

তবে কি কবির শেষজীবনে গুপ্তরাজ প্রকৃতিবর্গের মঙ্গলসাধনে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন? স্বয়ং কবিও কি তখন আর রাজার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় সমাদরলাভ করিতেন না? ক্ষুব্ধ কবি সেইজন্যই কি রাজার শুভবুদ্ধির উদয় কামনা করিতেছেন?

শকুন্তলা নাটকের সমাপ্তিকালে কালিদাস বার্দ্ধক্যের প্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ভরতবাক্যের শেষার্দ্ধে বৈরাগ্য-পূরিত চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন:

মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।

'স্বয়ম্ভু মহেশ্বর আমার জন্মান্তরপ্রাপ্তি নিবারণ করুন।'

বিপর্য্যস্ত সংসারের প্রতি কবির আর কোনও আসক্তি নাই।

শিশুর সহজাত বা সহজ প্রবৃত্তি

শ্রীঅভয়কুমার সরকার

প্রাণীমাত্রেই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় এবং এই প্রবৃত্তি জন্মগত। বানর-শিশু জন্মিবার সময় বৃক্ষের ডাল ধরিয়া নিজেকে রক্ষা করে। গো-বৎস জন্মিবামাত্র জলাশয়ে পড়িলে সাঁতার কাটিয়া জীবন রক্ষা করে। যে সকল প্রবৃত্তি লইয়া জীবগণ জন্মগ্রহণ করে এবং যাহা দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা কোন প্রকার শিক্ষা বা অর্জ্জিত জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মাদি সম্পন্ন করে তাহার নাম সহজাত বা সহজ প্রবৃত্তি। শিক্ষা, সভ্যতা ও অনুশীলনের প্রভাবে মনুষ্যগণ সহজ প্রবৃত্তিসমূহকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা এই প্রকার করা সম্ভব। কিন্তু ইতর প্রাণীরা সম্পূর্ণরূপে সহজ প্রবৃত্তির বশে চালিত হয়। এই প্রবৃত্তিগুলিকে মনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায়।

দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিচালনা আবশ্যক তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা নিমিত্ত আবার এই সকল প্রবৃত্তির সুপরিচালনা প্রয়োজন। সহজ প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে আবার তিনটি প্রধান—(১) অহম (ego), (২) যৌন এবং (৩) সঙ্ঘ-প্রবৃত্তি।

অহং-প্রবৃত্তি: নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং আহার, বিহার প্রভৃতির দ্বারা ঐ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার প্রবৃত্তির নাম অহম্ (আত্মবোধ), অর্থাৎ নিজ সত্তার বোধ বা বিকাশ মাত্র বুঝায়। এই সত্তাবোধ ক্রমে অহংকে বিশ্বজগতের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশরূপে প্রতিভাত করিয়া থাকে। এই প্রকার বোধের দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিশ্বসত্তার সহিত জীবাত্মার যে সংযোগ আছে, তাহাও উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

শরীরের বিভিন্ন অংশজাত সংজ্ঞা (Sensation) দ্বারা অহম প্রবৃত্তি পুষ্ট হয়। নিজের সহিত পরিপার্শ্বের, বিশেষতঃ অপর লোকের যে সম্বন্ধ, তাহার অভিজ্ঞতাই অহম্ প্রবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। অহম্ প্রবৃত্তি আবার দ্বিবিধ:

(১) আত্মহীনতা (self-abasement), অর্থাৎ কখনও কখনও নিজেকে তেজোহীন ও কর্ম্মের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হয়; ইহার নামই আত্মহীনতা। এই প্রকার প্রবৃত্তি লোককে কর্ম্মবিমুখ ও কাপুরুষ করিয়া তুলে।

(২) আত্মপ্রয়াস (self-assertion) যাহা দ্বারা লোকে কখনও কখনও নিজেকে তেজস্বী ও কর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া বোধ করে, তার নাম দেওয়া হয় আত্মপ্রয়াস। এই অবস্থাকেই মানসিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা হয়। আত্মপ্রয়াসী লোক কৌতূহলী ও কর্ম্মোৎসাহী হইয়া থাকে। আত্মপ্রয়াস না থাকিলে লোকের ব্যক্তিত্ব পুষ্ট হয় না। ইহার অভাবে কেহ কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব স্বাভাবিক আত্মপ্রয়াস যতটুকু থাকুক না কেন, অভ্যাসের দ্বারা তাহার উন্মেষ ঘটাইয়া জীবনে উন্নতিশীল হইবার চেষ্টা করা প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজন।

যৌন প্রবৃত্তি: প্রাণীমাত্রেই শৈশবাবধি যৌন প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যৌবনেই উহার পরিপুষ্টি লাভ ঘটিয়া থাকে। জন্মের পর হইতে দুই বৎসরের শিশুগণ দেহের বিভিন্ন অংশ উত্তেজিত করিয়া প্রীতিপ্রদ সংজ্ঞা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। কাতুকুতু দিলে তাহার আহ্লাদ হয়, শিশু আনন্দ উপলব্ধি করিয়া

থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে বালক-বালিকাগণ অন্তকে, বিশেষতঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি যাহাদের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা, তাহাদিগকে ভালবাসিতে চাহে। কৈশোরে উক্ত ভালবাসার ভাব মাতা, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়ের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিলেও ক্রমে উহা ভিন্নমুখী হইয়া সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবের উপর ন্যস্ত হইতে থাকে। এই প্রকারে ভালবাসার আকর্ষণে ক্রমে যৌন প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হয়।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালে শরীর ও মনের বহুপ্রকার দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় ভালবাসা আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়। তাহার কারণ সাধারণতঃ মাতা-পিতা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণের শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য অজ্ঞাতসারে তাহাদের অধিকতর স্পৃহনীয় হইয়া থাকে। এই আকর্ষণের অবস্থাকে মোহগ্রস্ত অবস্থাও বলা হয়। এই অবস্থায় শিক্ষিত মাতাপিতার দ্বারা সন্তানের কল্যাণপ্রদ যৌন জ্ঞান বিধান করিবার সুব্যবস্থা না হইলে উহারা নানাপ্রকারে স্বাভাবিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হারাইয়া দেহমনের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এই অবস্থার প্রভাবে অনেক যুবক-যুবতী নানারূপ দুরারোগ্য ব্যাধিতেও আক্রান্ত হইতে পারে। অতএব বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান স্বভাবতঃই বিকশিত হইতে থাকে তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝাইবার ব্যবস্থা করিলে সমাজের বা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এইজন্যই কুমার-কুমারী ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন-বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালীগুলি অবশ্য অবলম্বনীয় বিধায় প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, মাতা-পিতা কোন প্রকার সঙ্কোচ না করিয়া তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিবেন। এইজন্য বাৎসায়নের সমাজকল্যাণমূলক কামসূত্র এবং অনুরূপ গ্রন্থাদি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শৈশবকালে যৌন প্রবৃত্তির আভাস পাওয়া গেলেও উহা সুস্পষ্ট হয় না। প্রকৃতপক্ষে আট-নয় বৎসর বয়স হইতে বালক-বালিকাদের যৌন-চেতনা জাগ্রত হইতে আরম্ভ হয় এবং চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সে পূর্ণভাবে আনুষঙ্গিক দৈহিক পরিবর্ত্তনও পরিলক্ষিত হয়। কুশিক্ষা ও মাতাপিতার অতিরিক্ত আদরের ফলে বালক-বালিকাদের মধ্যে নানাপ্রকার যৌন বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক শিক্ষিত নর-নারী এ বিষয়ে সময়মত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া উহাদের কল্যাণ করিতে অবশ্য চেষ্টা করিবেন।

সঙ্গ প্রবৃত্তি: জীবমাত্রেই সঙ্গ-প্রয়াসী। কেহই একা বাস করিতে ইচ্ছুক নয় এবং পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক জীব। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করাই তাহার স্বাভাবিক সংস্কার। শিশু অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্বস্তি এবং অনুপস্থিতিতে অস্বস্তি অনুভব করিয়া থাকে। ছয়-সাত মাসের শিশুরাও পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পরস্পরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। এক হইতে তিন-চারি বৎসরের শিশু মাতা-পিতার সঙ্গ পছন্দ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সমবয়স্কদের সঙ্গপ্রার্থী হয়। ছয়-সাত বৎসরের বালক-বালিকা সমবয়সী দুই-তিন জনের সহিত থাকিতে ও খেলা করিতে ভালবাসে। এই সঙ্গপ্রিয়তা দশ হইতে পনর বৎসরের বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। এই কারণেই উহারা দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে। আবার তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে অধিক মূল্যবান মনে করিয়া তাহারা একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা করে। গৃহে এবং বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে দেওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই প্রবৃত্তি যতটা বিকাশ লাভ করে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া অবশেষে উহারা সমাজকল্যাণজনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি সুপরিচালিত না হইলে লোক নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে।

বৃত্তি নির্ব্বাচন: আমাদের জাগ্রত অবস্থায় মন সর্ব্বদা সক্রিয় থাকে বলিয়া আমরা চিন্তা করিতে বাধ্য হই। ইচ্ছা করিয়া মনকে শূন্য রাখা সম্ভব হয় না। সাধনমার্গে যাঁহারা অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহারাও সাধ্য বিষয়ে মন স্থির করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন, কারণ বাহ্যদৃশ্য সর্ব্বদা বহু প্রকারে ব্যাঘাত জন্মানোয় তাঁহারা চঞ্চল মনকে স্থির করিতে কষ্টানুভব করিয়া থাকেন। মন স্থির হইলে ধীর ভাবে চিন্তাগুলিকে সংযত করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার অভ্যাস করিতে হয়। প্রয়োজনীয় ও গঠনমূলক বিষয়ে নিযুক্ত না রাখিলে মন স্বভাবতঃই অপ্রয়োজনীয় ও ধ্বংসমূলক বিষয়ে ব্যাপৃত হইবে।

বিভিন্ন প্রকার শরীরের অংশ যেমন বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত, মনও তেমনি সকল কার্য্যের উপযুক্ত হয় না। জীবনে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, শরীরের ন্যায় মনকেও যথোচিত ভাবে, অর্থাৎ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক সামর্থ্য এবং তাহার মন কোন্ বৃত্তির উপযুক্ত, তাহা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া যথোচিত কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই বিধেয়। এ দেশে সাধারণতঃ অভিভাবক ও শিক্ষক মহাশয়গণ প্রত্যেক বালক-বালিকার জন্য একই প্রকার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহার ফলে দেখা যায় সকলের পক্ষে ঐ প্রকার শিক্ষায় তেমন উপকার দর্শে না। শিক্ষার বিষয় ছাত্রের পক্ষে তাহার মানসিক সামর্থ্য ও উপযুক্ততার অনুকূল না হইলে ঐ বিষয়ে সে তেমন কিছু উন্নতি করিতে পারে না এবং এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্রের জীবনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর বা পরিচালক মনস্তত্ত্ববিদ হওয়ায়, কোন্ বয়সে কোন্ ছাত্রকে কি ভাবে কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এই প্রণালী আবিষ্কার করায় তথাকার শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে, এদেশেও সামাজিক কল্যাণ অবশ্য সাধিত হইবে। যদি ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন কার্য্যে অগ্রসর

হইলে এদেশের ছেলেমেয়েরাও প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

কাহার মনের গতি কোন্ দিকে, এবং কাহার মন কোন্ বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহা জানিতে হইবে। পরে তাহাদের নিজ নিজ প্রিয় বিষয়ের ভিতর দিয়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টা করিতে হইবে। হিতোপদেশ-রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা কি প্রণালীতে রাজপুত্রদের রাজ্যশাসনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে, এদেশেও যে বহুকাল পূর্ব্বে মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অপরের দ্বারা নির্ব্বাচিত বিষয় বালক-বালিকার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিলে, তাহাদের সুকোমল মনের উপর অবিচার করা হয়। একথা প্রত্যেক শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবকের স্মরণ রাখা উচিত। কারণ এই প্রকার অবিবেচনার ফলে উহাদের মানসিক সামর্থ্য ক্রমশঃ এত ক্ষীণ হইতে থাকে যে, অবশেষে উহা সর্ব্ব বিষয়ের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতে পারে।

বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী অনুসারে প্রত্যেককে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত করিলে তাহাদের মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ কোন্ দিকে তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়। এই প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দক্ষতার সহিত বৃত্তি নির্ব্বাচন করিলে প্রায়শঃই সফলতা লাভ করা যায়। প্রত্যেক বালকের স্বনির্ব্বাচিত বৃত্তি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইলে উহাদের মনকে অন্যান্য বিষয়ে অনায়াসে নিযুক্ত করা যায়। তথাকথিত নির্ব্বোধ বালকেরও মানসিক গতি অনুযায়ী বৃত্তি নির্ব্বাচিত হইলে সুফল পাওয়া যায়। এই অবস্থা বহু ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের যে প্রকারে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে আলোচিত হইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। অতএব প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী যদি একটু যত্ন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি নির্ব্বাচনে সহায়তা করেন তবে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।

আত্মপ্রত্যয়: শিশুর দেহমনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। নিয়ত তৃপ্তির সঙ্গে কাজ করিয়া যাওয়া এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার আবেগকে আত্মপ্রত্যয় বলা হয়। ইহার দুইটি অন্তরায় আছে—(১) পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়া; (২) পরিণত বয়সের পরিমাপে শিশু-চরিত্রের সমালোচনা করা।

ক্রোধপ্রবণতা: আত্মপ্রত্যয় কোন কারণে ব্যাহত হইলে এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করার কোন প্রকার বাধা পাইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। অতএব শিশুর কার্য্য সম্পাদনের সময় যাহাতে কোন রূপ বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ামাত্র উহার সমাধান যথাসাধ্য সহজ হয় এমনতর ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোন কাজে অমূলক ভয় থাকাও উচিত নয়; যে স্থানে কোন ভয়ের কারণ ঘটিতে পারে তথায় সেই কারণটি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া চলার অভ্যাস করিলেই আর ভয় থাকে না এবং ক্রোধও প্রকাশ পায় না। সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, ক্রোধ যেন হিংসাতে রূপান্তরিত না হয়। কারণ হিংসা-প্রবৃত্তি জীবনের সহজ গতিকে ব্যাহত করিয়া তুলে।

সহজাত সংস্কারের শাসন: শিশুর মধ্যে এমন কয়েকটি সহজাত সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বুদ্ধি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন। যেমন—(১) সামাজিক ক্ষুধা, (২) আবেগ ক্ষুধা, (৩) সৌন্দর্য্যবোধ। সামাজিক ক্ষুধা যথাযথ ভাবে বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ না পাইলে দম্ভ প্রভৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিশেষ কোন আবেগ প্রবল হইলে সামাজিক-জীবন ব্যাহত হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাজ: শিশুর স্বভাব চঞ্চল, সব সময়ই কিছু করিতে ভালবাসে। শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াই ডাক্তার মাদাম মন্‌টেসরী—স্বল্পবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের তত্ত্বাবধান করার সময় বিজ্ঞানসম্মত রূপে ছোটদের শিক্ষার পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বিবিধ পরীক্ষার ফলে তাঁর শিশু-স্কুলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহাতে শিশু তার সকল রকমের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মিটাইয়া আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়িয়া উঠিতে পারে। মাদাম মন্‌টেসরীর অভিজ্ঞতার পর আরও বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যে শিশু বিদ্যালয় (nursery school) স্থাপিত হইতেছে তাহা বহুলাংশে এই প্রকার পরীক্ষার ফল বলিয়াই ইহাকে মানবসভ্যতার ভিত্তি রূপে গণ্য করা হইয়াছে। প্রতি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর ভিতরেই শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের প্রেরণা স্বভাবজাত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সাহায্য ব্যতিরেকেও বিভিন্ন প্রকার কার্য্যপ্রবণতার পরিচয় শিশু-প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই বিচিত্র প্রবণতাকে শক্তি ও কর্ম্মকুশলতায় পরিণত করিতে হইলে উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগের অত্যন্ত প্রয়োজন। সুস্থ স্বাভাবিক শিশু তার নিজের অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি ও সকলের কথাবার্ত্তা আলাপে উৎসাহিত হইয়া ভাষা শিক্ষা করিতে প্রয়াস পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধির স্ফুরণ হইতে থাকে। এই কারণে দুই হইতে চার বছরের শিশুর সামাজিক পরিবেশ যদি বাঞ্ছনীয় হয় এবং সে যদি শুদ্ধ ভাষা ইত্যাদি শুনিবার সুযোগ না পায় তবে ঐ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়, শিশু-বিদ্যালয়ের পরিবেশের ভিতর শিশু স্বতঃই মন খুলিয়া ভালভাবে কথা বলিতে পারে এবং তার শব্দ-সম্পদও বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আবার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইলে তার চিত্তের স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও গড়িয়া উঠে।

এই প্রকারে বাড়িয়া উঠিবার যে স্বাভাবিক প্রেরণা শিশুর মধ্যে নিহিত আছে তাহা আরও প্রকট হয় তাহার খেলার ভিতর দিয়া। এই প্রবৃত্তি অতি অল্প বয়স হইতে সুরু হইয়া বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পরিবেশের সাহায্য ব্যতিরেকে এই খেলা হইতে যে পর্য্যবেক্ষণ, মনোযোগ, স্মৃতি,

বিচারবুদ্ধি, কল্পনা, সৃজনী শক্তি প্রভৃতি কখনও গড়িয়া উঠিবে না, শিশুর সমস্ত শক্তিই উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যে নষ্ট বা ব্যয়িত হইবে। এই নিমিত্ত এমন সব খেলনা ও ক্রীড়োপকরণ তাহাদের কাছে আনিয়া হাজির করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধি, বিচার, কল্পনা ও সৃজনী-শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রকার উপযুক্ত পাখি-পাখিকের অভাবে শিশুর সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি যাহা বিকশিত হইতে পারিত তাহা ভোঁতা হইয়া থাকিবে বা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইবে।

শিশুর মনঃসংযোগে বিতৃষ্ণা : শিশুর স্বভাব বুঝিয়া যদি তাহাকে ইচ্ছামতভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে তাহার মনঃসংযোগের অভাব ঘটে ও কার্য্যে বিতৃষ্ণা আসিয়া থাকে। শিশু বেশীক্ষণ মনোযোগের সহিত কার্য্য করিতেও অক্ষম। অতএব এ বিষয় বেশ বিবেচনা করিয়া তাহাকে পাঠ দিতে হয় এবং উহা তাহার মনের মত করিয়া দিলে সে সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া থাকে। এই অবস্থায় উহার মনঃসংযোগ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় এমন সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উহার বয়স অনুসারে পাঠ যথোচিত সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক।

শিশুর অনুভূতিতে আনন্দ : শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের দ্বার অনুভব করার ক্ষমতা হয় এবং কার্য্যসমাপ্তির অনুভূতিতে খুব সে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অতএব তাহার কার্য্যসিদ্ধির সহায়তা করিয়া তাহাকে আনন্দিত করার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। রঙীনবলের খেলনা দ্বারা এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করিলে উৎসাহ দেওয়া যায়।

শিশুর অনুকরণ-ক্ষমতা : জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু মাতার কার্য্যক্রম দেখিয়া অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ভ্রাতাভগিনীদের সঙ্গে মিশিয়া সে এই অনুকরণস্পৃহা চরিতার্থ করিতে থাকে। বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে প্রত্যেকের সাবধানতা অবলম্বন করিয়া শিশুর সহিত আচরণ-ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শিশুর কল্পনা-শক্তি : কল্পনা-প্রভাবে কাগজ বা কাদামাটি দিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনন্দ পায়। তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় ঐ সৃজনী শক্তির উন্মেষের ব্যবস্থা হওয়ায় শিশু আনন্দের সহিত শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়।

শিশুর সহানুভূতি-শক্তি : খেলা, কথা ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া শিশুর সহানুভূতি-প্রবৃত্তি বিকাশ পাইবার সুযোগ পায়। এইজন্যই শিশু অপর শিশু বা জীবজন্তুর সহিত খেলা করিতে ভালবাসে।

শিশুর স্মরণ-শক্তি : ছড়া, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি মুখে মুখে বলিয়া উহাদের স্মরণ-শক্তির ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়। পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ আলোচনা করার ফলে স্মরণ-শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

শিশুর নৈতিক শক্তি : শিশুরা পরস্পরের সহিত মিশিতে অভ্যস্ত হওয়ায় আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া তাদের নৈতিক শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। এই শক্তির প্রভাবেই শিশুর সামাজিক ও অন্যান্য জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রেণীকক্ষে সামাজিকতা এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যবহার দ্বারা নৈতিক জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়।

শিশুর বিচারশক্তি : অভিজ্ঞতার প্রভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে শিশুর যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহা দ্বারা উহার বিচার বা যুক্তি-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া শিশুপালনে অভ্যস্ত হইলে শিশু-মনের যথোচিত বিকাশ হওয়া সম্ভব হয়। বর্ত্তমান কালে নারীসমাজ এই সকল বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হইয়া শিশুর জীবন গঠনে সহায়তা করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইবে। প্রত্যেক মাতা যদি তাঁহার সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া প্রতি-নিয়ত শিশুমনের বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করেন, তবেই জগতের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে।
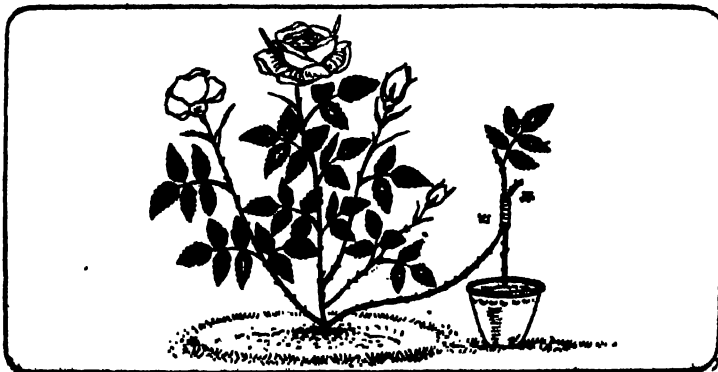
কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১৮

মায়ের মন্দিরে, মায়ের নির্মাল্য কানে গুঁজে, নরোত্তম যেদিন একশো-আটটা পাঁঠা-বলি দিলে—ঠিক সেই দিনই কলকাতায় মুসলমানেরা ঘোষণা করল—প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম ! ফলে বহু নিরপরাধ হত্যা। হিন্দু-মুসলমানের রক্তে রাজপথ সিক্ত হতে লাগল।

এই ধর্মোন্মত্ততার ঢেউ এসে পৌঁছল—পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে। মুসলমান-পল্লীতে মুসলমানেরা একত্র সমবেত হতে আরম্ভ করল। হিন্দু-পল্লীতে হিন্দুরাও সচেতন হয়ে উঠল।

রমাদেবীর জমিদারী একটি বিরাট হিন্দু-প্রধান এলাকায়। দু'চার মাইলের মধ্যে কোনো বন্ধিষ্ণু মুসলমানের বসতি নেই। হিন্দু-চাষী মোড়লরাই বহুদিন থেকে এখানকার সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে নিশ্চিন্তে বসবাস করছেন। শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে জমিদারের উপর।

এই জমিদারীর অধীনে পার্শ্ববর্তী জেলায় একটি মুসলমানপ্রধান এলাকাও আছে। সেখানে আছে একটি কাছারিবাড়ি। বছরে দু'একবার জমিদার সেই কাছারিবাড়ীতে গিয়ে উঠেন। স্থানীয় মাতব্বর মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের আনুকুল্যে নিয়মিত খাজনা আদায়ের কোন অসুবিধা ঘটে না।

আজ হঠাৎ সেই কাছারির নায়েব পালিয়ে এসে খবর দিলেন—কাছারি লুঠ হয়ে গেছে।

বিস্মিতভাবে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি? কে লুঠ করলে ?

নায়েব বললেন—স্থানীয় মুসলমান প্রজারা খবর পেয়েছে, কলকাতার হিন্দুরা নির্বিচারে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তার প্রতিকার ও প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে তারাও হিন্দুদের উপর নাকি অত্যাচার চালাবে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে দেখে আমি কাছারি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।—একথা শুনে ম্যানেজার ছুটলেন রমাদেবীর কাছে।

'দ্বিজাতিতত্ত্ব' বাংলার মুসলমানদের কাছে এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আচারে, ব্যবহারে ও ধর্মানুষ্ঠানে বাংলার হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও সহনশীল। উৎসবে ও আনন্দে পরস্পরের অকুণ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়েই পরোক্ষে গড়ে উঠেছে বাংলার লোক-সাহিত্য। কবিগান, জারিগান, তরজা ও যাত্রার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান কবিরা বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

আজ হঠাৎ তাঁদের মধ্যে এ ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলেছে কে? কার প্রয়োজনে হিন্দু ও মুসলমান আজ পরস্পরের বুকে ছুরি মেরে আত্মঘাতী হচ্ছে?—রমাদেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

নরোত্তম শুনল—পার্শ্ববর্তী গাঁয়ের মুসলমানেরা হিন্দুদের হত্যা করছে। সে গাঁয়ের কেরামত শুনল—স্থানীয় হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করছে। মোটের উপর দু'দিকেই উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্যে প্রচারমূলক অপচেষ্টা চলতে লাগল। ধূমায়িত আগুনকে বাতাসের সাহায্যে প্রজ্বলিত করে, একটা ভীষণ দাবানল-সৃষ্টির আগ্রহ নিয়ে বহু অশান্তিপ্রিয় মতলববাজ লোক সক্রিয় হয়ে উঠল।

হঠাৎ জনরব শোনা গেল—বিয়ের রাত্রে নরোত্তমের বোন কাদম্বিনীকে মুসলমানেরা ধরে নিয়ে গেছে। কি ভয়ানক মিথ্যা-রটনা! নরোত্তম তীব্র প্রতিবাদ জানাল। অনুসন্ধানে সঠিক জেনেছে সে···কানাই তাকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টীমারে উঠেছে। দুখানা কলকাতার টিকিটও কিনেছে। পরের দিন নরোত্তম কলকাতায় রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। রমা দেবী বাধা দিলেন, তিনি বললেন—কলকাতার অবস্থা ভয়ানক। খুলনা থেকে গাড়ী যাচ্ছে না। ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই। দু'একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তারা ফিরে আসবে। যাবে কোথায় ?

কিন্তু এ কি? সবাই বলছে—কাদম্বিনীকে মুসলমানেরা ধরে নিয়ে গেছে; কেউ বলছে—তাকে দেখে এলাম কেরামত মিঞার বাড়িতে—ছালন রাঁধছে। কেউ বলছে—কেরামতের বড় ছেলে নেয়ামত তাকে 'সাদি' করেছে। নরোত্তমের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। কিন্তু সে মনেপ্রাণে জানে এ সব মিথ্যা রটনা। তাকে উত্তেজিত করার একটা অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। নরোত্তমের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারলে, পার্শ্ববর্তী গাঁয়ের মুসলমানদের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

নরোত্তমকে ডেকে রমাদেবী বললেন—সাবধান নরোত্তম। উত্তেজিত হয়ো না। আগুন যেখানে জ্বলছে সেখানেই জ্বলুক। চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে সবাই পুড়ে মরবে। আত্মঘাতী হবে কেন ?

—কিন্তু মা, আর যে সহ্য করতে পারছি নে? যারা মিথ্যে অপবাদ রটাচ্ছে, তারা কেন কানুর মরার খবরটা আমাকে এনে দিচ্ছে না? তা হলেই তো সুখী হতাম।

—তাদের উদ্দেশ্য তোমাকে শান্ত ও সংযত রাখা নয়। তারা চায়, তোমাকে নাচিয়ে নিয়ে এ দেশেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা পাকিয়ে তুলতে, আগুন নিয়ে খেলা করতে।—নরোত্তম সেকথা স্বীকার করলে। কিন্তু উপায় কি? কানুকে সে ভুলতে পারছে না।

দু'একদিনের মধ্যেই শোনা গেল—বহুদূরে নোয়াখালি জেলায় আগুন জ্বলে উঠেছে। কতকগুলি পশ্চিমা মুসলমান এসে স্থানীয় শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। চারিদিকে ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে।

অহিংসা-মন্ত্রের উদ্গাতা মহাত্মা গান্ধী তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করছেন। রমাদেবী দৈনিক সংবাদপত্র পড়ে নরোত্তমকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—গান্ধীবাদের সার্থকতা। জগতে শান্তিরক্ষার জন্যে মানুষকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, অহিংসার সাহায্যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতে হবে।

শাক্ত নরোত্তমের চোখে শক্তি-সাধনার আর একটা দিক্ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সত্যাশ্রয়ী গান্ধীজী তো কাপুরুষ নন্? তাঁর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে নরোত্তম বুঝল—অহিংসা মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করে। লাঠিসড়কী ও গোলাবারুদের চেয়েও তার শক্তি অনেক বেশী। নির্ভীক গান্ধীজী কি একাই নোয়াখালি জয় করবেন ?

কিছুদিন পরে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল, যে ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু-পল্লী ও মুসলমান-পল্লীর মাঝখানে আছে একটা বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চল। নদী-নালা দিয়ে অসংখ্য বড় বড় রুই-কাতলা মাছ বর্ষাকালে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই বিলে। বর্ষা অন্তে, যখন নদীর সঙ্গে বিলের সংযোগ-পথগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, তখন মাছগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই মাছ ধরবার জন্যে দু' তীরের অধিবাসীরা মিলিত ভাবে 'পোলো' নামায়। হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হাটে 'কাড়া' দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে 'আঁকশি ও 'পোলো' কাঁধে নিয়ে ধাওয়া করে বিলমুখো। মৎস্য-শিকারী হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে সে এক অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্র। কত বড় বড় রুই কাতলা, শোল বোয়াল আঁকশিতে গেঁথে তারা ঘরে নিয়ে যায়। এরূপ মৎস্য-শিকারের প্রতিযোগিতার মধ্যেও কেউ কোনদিন শোনে নি যে, হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বেধেছে।

আজ হঠাৎ বেধে উঠল। কোন এক মুসলমান যুবক মনোহরকে 'শালা' বলে গালাগালি দিয়েছে। মনোহর উত্তেজিত হয়ে উঠল। আর একটি মুসলমান যুবক এসে মনোহরকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলল, চটছিস কেন ভাই ? তোর বোন কানুকে যেদিন সোনারপুরের নেয়ামত সাদি করেছে—সেদিন তুই আমাদের সবারই শালা ব'নে গিয়েছিস—বলেই সে হো হো করে হাসতে লাগল।

মনোহরের আঁকশিতে গাঁথা ছিল খুব বড় একটা বোয়াল আর দু' তিনটা ছোট বড় রুই। লম্বা বেতের আঁকশির গোড়া ধরে মনোহর মারল তার মাথায় সেই রুই বোয়ালের প্রচণ্ড আঘাত। ছোক্‌রা মাটিতে পড়ে গেল। আর কি রক্ষা আছে ? তখন মুসলমান জনতা চড়াও হ'ল মনোহরের উপর। মনোহরও সেখানে একা ছিল না। মোড়লরা এসে তার পক্ষে দাঁড়াল। বেধে গেল দাঙ্গা। খবর গেল নরোত্তমের কাছে। মনোহরকে মুসলমানরা মারছে। সখিচরণ, শ্যামাচরণ ও নরোত্তম বেরিয়ে পড়ল ঢাল সড়কী নিয়ে। বিলের ওপার থেকে মুসলমানেরাও আসতে লাগল কাতারে কাতারে।

দু'দিন ধরে সেই দাঙ্গা চলল। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে দাঁড়াল। দারোগা সদরে 'তার' করে সশস্ত্র পুলিস আমদানী করলেন। মোড়লদের বাড়ী ঘেরাও করে—চার ভাইকেই গ্রেপ্তার করে ফেললেন। তাদের বেউরেরা যে যার বাপের বাড়ীতে পালিয়ে গেল, পুলিসের অত্যাচারে মোড়লপাড়াই হয়ে পড়ল একেবারে জনমানব-শূন্য।

তখনও পূর্ব্ববঙ্গে পাকিস্থান ঘোষণা হয় নি। লীগের শাসন-পরিষদ ধীরে ধীরে পাকিস্থান-পরিকল্পনাকে রূপদান করছিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা রোধের জন্যে কিছু দিন পর্য্যন্ত মোড়লদের মত দুর্দ্দান্ত লাঠিয়ালদের তাঁরা অবরুদ্ধ রাখলেন। দেশে শান্তিরক্ষা করাই আশু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হ'ল। তার ফলে, মুসলমানদের সাহস ও লুঠতরাজের প্রবৃত্তি বেড়ে গেল। স্থানীয় হিন্দুরা ডানা-ভাঙা হয়ে পড়লেন।

রমাদেবী শুনলেন, লীগ্‌পন্থীরা নাকি জমিদার-বাড়ী আক্রান্ত হবে। তিনিও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু হঠাৎ কোন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে পারলেন না।

রমাদেবীর লাইব্রেরীতে অনেক বই আছে। সেই সব বই পড়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। কুমারবাহাদুরের আত্মম্ভরিতাপূর্ণ মতবাদকে তিনি বলেন—অতি পুরাতন বন্যনীতি! দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা করে তিনি যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—তা হচ্ছে ভারতীয় ত্যাগপ্রবৃত্তি, সত্য ও প্রেমধর্ম্মের আদর্শ। এটম-বোমার সাহায্যে বিশ্বশান্তি-রক্ষার কল্পনা বাতুলতা। পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে অতিমাত্রায় বিষয়মুখী করে ফেলেছে। তার অন্তরের দৈন্য ভয়ানক বেড়ে গেছে। আত্মসুখপরায়ণ মানুষ কখনই পারবে না, শান্তিরক্ষার পথ বাত্‌লাতে।

এই ভারতীয় ত্যাগবুদ্ধিই রমাদেবীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—প্রজা-সাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাতে। কিন্তু এ কি হ'ল ? তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাই যে আজ স্বপ্নের মত অলীক প্রতিপন্ন হয়ে গেল! কুমারবাহাদুর এখন কোথায় ? তিনি ফিরে এলেই খোকাকে বুকে নিয়ে রমাদেবী এদেশ ত্যাগ করতে চান।

রমাদেবী আজ খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছেন—সবই বিধি-নির্দ্দেশ। বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটিও নড়ে না।

১৯

পূর্ব্ববঙ্গে পাকিস্থান ঘোষণা হওয়ার পর কুমারবাহাদুর দেশে ফিরলেন। গুরুজীর সঙ্গে প্রায় দুই বছর নানা দেশ ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করেছেন। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন প্রচুর। শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অগ্রসর হয়েই ফিরে আসেন নি, ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছেন তিনি।

বিকেলবেলা। জমিদারবাড়ীর অন্দরের এক ফুলবাগানে, পাঁচ বছরের খোকাবাবু খেলা করছিলেন রমাদেবীর সঙ্গে। ছুটোছুটি ও লুকোচুরি খেলা। রমাদেবী কখনও মোটা গাছের

আড়ালে কখনও পুষ্পবীথির ভিতরে লুকোচ্ছিলেন। খোকাবাবু কখনও খুঁজে পাচ্ছেন, কখনও পাচ্ছেন না।

সন্ন্যাসীবেশে কুমারবাহাদুর দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন—মা-ছেলের সেই স্বচ্ছন্দ আনন্দ-চঞ্চল লুকোচুরি খেলা। লুকোচুরির—চুরির উপরেও বাটপাড়ি করে, আর একজন যে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করছেন, তা তাঁরা জানতেও পারছেন না।

কুমারবাহাদুর ভাবছেন—এই খেলাই তো সংসার-রঙ্গমঞ্চে চলছে। ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মা তাকে ধরা দিচ্ছেন না। দেখতে দেখতে কুমারবাহাদুরের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হ'ল—খোকাবাবুর কানে কানে বলে আসেন—ওরে খোকা! একবার ধরতে পারলে আর ছাড়িস নে। এ খেলা ভেঙেছে, ভেঙেছে। মাকে ছেড়ে আত্মকর্তৃত্ব নিয়ে যেতে ওঠে বলেই তো ছেলেরা এত দুঃখ পায়।

রমাদেবী দাঁড়িয়েছিলেন পামগাছের আড়ালে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ ছিল খোকাবাবুর দিকে। চুপি চুপি পিছন দিক থেকে এসে কুমারবাহাদুর তাঁর চোখ দুটি চেপে ধরলেন।

—কে? কে?

রমাদেবী ভাবতেই পারছেন না—তাঁর চোখ চেপে ধরার মত দুঃসাহস এ জমিদারবাড়ীতে কার থাকতে পারে? তবে কি তিনি এসেছেন? সুদীর্ঘ বিরহের পর এতখানি অনুরাগ নিয়ে এসেছেন? নিজের হাতে কুমারবাহাদুরের বলিষ্ঠ হাত দুখানা পরখ করে রমাদেবী বুঝলেন—এ হাত কার?

চোখের উপর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রমাদেবী একটু হাসলেন। বিদ্রূপের সুরে বললেন—হুঁ! তা হলে ফিরে এলে?

—হ্যাঁ রমা, মানুষ হয়ে ফিরেছি—আর ভয় নেই···

—ভয় তোমাকে আগেও করি নি, এখনও করছি না। মদ্যপানের কদভ্যাসটা ঠিক আছে তো? কি বল?

—না···

—নন্দরাণী কোথায়?

নন্দরাণীর নাম শুনে কুমারবাহাদুর একটু চমকে উঠলেন। তাঁর চোখমুখ রাঙা হয়ে গেল। লজ্জিতভাবে বললেন—বুঝতে পেরেছি রমা, তুমি কি বলতে চাও। বিশ্বাস কর—আমি দুটোই ছেড়েছি···

—বোধ হয় ভোর পাঁচটা থেকে এই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, মাত্র বারো ঘণ্টার জন্যে···তাই নয় কি?

রমাদেবীর নির্মম পরিহাসে কুমারবাহাদুর অত্যন্ত কাতরভাবে অনুনয়ের সুরে আবার বললেন—বিশ্বাস কর রমা, দুটোই ছেড়েছি। একেবারে নিবিয়ে দেবার আগে, গুরুদেব আমাকে খুব বেশী জাগিয়ে দিয়েছিলেন—সেকথা সত্যি···

হাসতে হাসতে রমাদেবী বললেন—যেমন গুরু, তাঁর তেমনি শিষ্য

—আমার গুরুদেবটি কে তা জান?

—কে তা জানি না। কি তা জানি। দু'চার বোতল কড়া মদেও যাঁর পা টলে না, তোমার গুরু সাজবার যোগ্যতা তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

—তোমার বাবাকে কখনও দেখেছ?

—তার মানে?

—নিশ্চয়ই দেখ নি। বোধ হয় শুনেছ—তোমার মায়ের মৃত্যুর পরেই তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন? কুমারবাহাদুর একটু হাসলেন।

রমাদেবীর চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থর থর করে সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। কাঁপা-গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি বলতে চাও, তিনিই···আমার···

—হাঁ। তোমার বাবাই আমার গুরুদেব। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ো না রমা! মদ তিনি খান না। মদ্যপানে কোন আসক্তি নেই তাঁর। শুধু আমাকে মদ ছাড়াবার জন্যেই তিনি মদ খেয়েছিলেন।

খোকার হাত ধরে রমাদেবী গিয়ে বসে পড়লেন একটা বেঞ্চের উপর। তাঁর দু'চোখ থেকে অবিশ্রান্ত জল গড়াতে লাগল।

গুরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে কুমারবাহাদুর বললেন—আশ্চর্য সেই তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী! খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার নেই তাঁর কাছে। মদ কেন? আমার মনে হয় বিষ খেয়েও হজম করতে পারেন তিনি। মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে আমাকে আকণ্ঠ মদ খাইয়েছিলেন। তার পর যে সব দৃশ্য দেখিয়েছিলেন—তা মনে পড়লে গায়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠে! না, না, সে সব কিছু তোমাকে বলব না। শুধু এই একটি কথাই বলব—তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ! যোগবলে মানুষ যে কি অসাধ্য-সাধন করতে পারে, তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

রমাদেবী ভাবলেন—কিছুই অসম্ভব নয়। বস্তু-জগতে মানুষ যে বিদ্যুৎ ও বেতারের খেলা দেখাচ্ছে, মনোজগতের খেলা তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও শক্তিশালী। মানুষের মন এই মুহূর্তেই দিল্লী-লাহোর-এলাহাবাদ ঘুরে এখানেই আবার ফিরে আসতে পারে! একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তিই তো জড়জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তার সন্ধান আমরা কতটুকু রাখি?

চোখ দুটো মুছে রমাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি আমার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন না কেন?

—সেকথা আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। একটু হেসে বলেছিলেন—আমার আচরণ দেখে রমা আমাকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে। তোমার পরিবর্তন দেখে, এই ঘৃণাই যেদিন শ্রদ্ধা হয়ে উঠবে—সেইদিন পরিচয় দেব···

—এখন তিনি আছেন কোথায়?

জানি না। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আমাকে বিদায়

দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আমাকে আদেশ করেছেন—আবার সংসারে ফিরে আসতে···

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক কথা হ'ল। অতীতের সুখ-দুঃখের কথা, ভবিষ্যের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, কিছুই বাদ পড়ল না। রমাদেবী পাকিস্থানে আর একটি দিনও থাকতে চান না। তাঁর যত দুর্ভাবনা খোকাকে নিয়ে।

পাকিস্থান ঐস্লামিক রাষ্ট্র। ইস্লামের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ নেই। কোন ধর্ম্মমতই মানুষকে অমানুষ হতে বলে না। সেকথা সত্যি। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সংস্কারের মধ্যে যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা চলছে, মানব-ধর্ম্ম প্রচারের ভিত্তিতে ও বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে, জগতের চিন্তাশীল মনীষীরা আজ যে পরমত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছেন—তা থেকে আমার খোকা কেন বঞ্চিত হবে ?—এই প্রশ্নটাই রমাদেবীর মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে।

খোকা সম্বন্ধে রমাদেবীর মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। পাকিস্থানী ধর্ম্মসংস্কারের অক্টোপাস বন্ধন কখনই তাঁর খোকাকে উদার মানব-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করবে না। কিন্তু তিনি যে দেখতে চান ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি যেন কখনই তাকে স্পর্শ না করে। সে হবে বিশ্বপ্রেমিক। অত্যুদার মানব-ধর্ম্ম প্রচারের অগ্রদূত !

বহু তর্ক-বিতর্কের পর রমাদেবী ও কুমারবাহাদুর একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। খোকাকে নিয়ে রমাদেবী থাকবেন তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে। কুমারবাহাদুর থাকবেন পাকিস্থানে—জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে। রমাদেবীর অনুরোধে দীনবন্ধু-ঠাকুর আবার নিযুক্ত হলেন সভাপণ্ডিত। সর্ব্ববিষয়ে কুমার-বাহাদুরের পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা।

তল্পিতল্পা গুছিয়ে রমাদেবী যেদিন কলকাতামুখো রওনা হচ্ছিলেন, ঠিক সেইদিন মোড়লরা চার ভাই মুক্তি পেয়েছে। নরোত্তম এসে রমাদেবীর পায়ের উপর মাথা খুঁড়তে লাগল—মা ! তুমি চলে যেয়ো না···

সস্নেহে নরোত্তমের মাথায় হাত বুলিয়ে রমাদেবী বললেন—নরোত্তম তুমিও চল আমার সঙ্গে।

—বল কি মা ? নরোত্তম একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমার এই দেশ ! এই দেশের মাটিতে আর আলো-বাতাসে আমি মানুষ হয়েছি—কত স্বপ্ন দেখেছি। কার ভয়ে আমার দেশ-মাকে ফেলে পালাব ? মরতে হয় এখানেই মরব।

নরোত্তমের দেশপ্রীতি রমাদেবীর অন্তর স্পর্শ করল। তবু তিনি খোকাকে নিয়ে রওনা হলেন।

প্রায় এক বছরের অধিককাল হাজতবাসের পর, বাড়ীতে ফিরে এসে শ্যামাচরণ, সখিচরণ ও মনোহর দেখল—তাদের পাড়া ছেড়ে প্রতিবেশীরা সবাই পালিয়ে গেছে। বাড়ী-ঘর জঙ্গলাকীর্ণ শেয়াল-কুকুরের আড্ডা। বহুদিন পরে অবাঞ্ছিত মানুষের পদশব্দ শুনে যেখানে-সেখানে সাপেরা ফণা তুলে রুখে দাঁড়াচ্ছে। শ্যামাচরণ চোখ মুছে শ্বশুর-বাড়ীমুখো রওনা হ'ল। মনোহর পথে বসে কাঁদতে লাগল। হৈ-হৈ ক'রে আর হাততালি দিয়ে দু-চারটে সাপ তাড়িয়ে সখিচরণ ঢুকল তার ভাঙা ঘরে। দেখল গোপীযন্ত্রটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। পাকা-লাউয়ের শক্ত খোলটার ভিতর আরসোলা ভর্ত্তি। বেরসিক ইঁদুর-ভায়া তার কেটে রেখেছেন।

দাওয়ার একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে সখিচরণ বসল। আবাল্য-সঙ্গী বাদ্যযন্ত্রটিকে অভিনিবেশ-সহকারে মেরামত করতে লাগল। এক কাঁদি ডাব-নারকেল পেড়ে এনে মনোহর জিজ্ঞাসা করল—সেজ-দা, খাবে ?

—না ভাই, আমার খিদে নেই। তুই খা···

সখিচরণ গান ধরল—

> সুখের চেয়েও—দুঃখের ওজন ভারি।
> মুখের হাসি মিশবে হাওয়ায়—
> বুক ভেজাবে নয়ন-বারি,
> —দুঃখের ওজন ভারি।
> ব্যাধের তীরে ভাঙ্লে ডানা,
> মিছেই হবে উড়তে-জানা !
> কাঁদিস কেন ও মন-কানা ?
> কাজ সেরে নে তাড়াতাড়ি—
> —দুঃখের ওজন ভারি।
> কোন্ কাজে তুই এলি ভবে ?
> সদাই স্মরণ রাখতে হবে—
> মিছেই হাসি-কান্না তবে,
> বল দেখি তার কি ধার ধারি ?
> —দুঃখের ওজন ভারি।

বিকেলে নরোত্তম এসে বলল—ওরে সখে ! রাত্রে কি খাবি ? জমিদারবাড়ী থেকে চাল-ডাল নিয়ে এসেছি। খিচুড়ি রেঁধে নে-না ?

—সেজন্য হাঁড়ি-কড়াই, উনুন দেশলাই লাগবে তো ?

—সে সব ঘরে নেই ?

—হ্যাঁ আছে। কড়াই সাপ হয়ে ভিড় জমিয়েছে, হাঁড়ি ব্যাঙ হয়ে পেট ফোলাচ্ছে, আর দেশলাই আরসোলা হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে···

—কি মুশকিল ! তা হলে কি হবে ? মনোহর কোথায় ?

—দু-চারটে ডাব খেয়ে পিত্তি ঠাণ্ডা করে বোধ হয় এখন বৌমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে···

—শ্যামা ?

—সে তো পার হয়েছে আগের খেয়ায়। এতক্ষণ নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে গেছে। বেচারা কত দিন বৌদির পদসেবা করে না !

এমন সময় সেজবৌ সুহাসিনী এসে হাজির হ'ল কাঁদতে

কাঁদতে। তার এক ভাই আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দশ মাইল রাস্তা ছুটে এসেছে। বাড়ীতে পৌঁছেই সখিচরণের গলাটা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। অধৈর্য্য ছোট ভাই-বৌয়ের অবস্থা দেখে নরোত্তম জিভ কেটে সরে গেল। সখিচরণের ছোট ছেলেটা ছুটে গিয়ে জ্যেঠাকে জড়িয়ে ধরল। বলল—জ্যেঠা! কত দিন তোমার কোলে উঠি নি। একবারটি কোলে নাও না?

অপুত্রক নরোত্তমের অপত্যস্নেহ উথলে উঠল। সেও তাকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে লাগল।

এলোকেশী সুহাসিনীর মাথাটা সজোরে বুকের উপর চেপে ধরে সখিচরণ হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু তার চোখের জল সে কৃত্রিম হাসির বাধা মানল না।

হাতে একটিও পয়সা নেই, তবু নরোত্তম রওনা হ'ল বাজারের দিকে। বহুদিন পরে দেখে দোকানীরা তাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানাল। সকলেই বলল—মোড়ল! তোমার যা যা দরকার নিয়ে যাও দামের কথা এখন থাক। যেদিন পার দিও···

একটা জেলে ছুটতে ছুটতে এসে নরোত্তমের হাতে তুলে দিল এক জোড়া ইলিশ মাছ। রুদ্ধ আবেগে বলল—মোড়ল, মাছ দুটো নিয়ে যাও, দাম দিতে হবে না···

—তা কি হয়?

—কেন হবে না? তুমি দেশে থাকলে অনেক মাছ ধরতে পারব। নরোত্তম মোড়ল হাজতে আটক পড়েছে শুনে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। আমরাও তো পালাব ভাবছিলাম। তোমার খালাসের মানত করে দু'বেলা মা-কালীর দরজায় মাথা খুঁড়েছি।

বিপদে পড়লে অসহায় দীন-দুঃখীরা বলে থাকে—'দোহাই নরোত্তমের।' নরোত্তমের কানে পৌঁছালে, যে-কোন অত্যাচারের প্রতিকার হবে—এ বিশ্বাস ধনী-দরিদ্র সবাই করে। কিন্তু পাকিস্থান ঘোষণার পরে নরোত্তম যে কতখানি শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, সেকথা আর কেউ না জানলেও সে নিজে জানে। নিজের হাতে একশ' আটটা পাঁঠা বলি দিয়ে যেদিন নরোত্তম কাদম্বিনীর কল্যাণ-কামনা করেছিল, ঠিক সেই দিনই স্নেহের কানু তার বুকের পাঁজরা ভেঙে দিয়ে গেছে। ছোট বোন কানুকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসত। মা-মরা মেয়েটাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। চন্দ্রকলার অপমৃত্যুর চেয়েও কাদম্বিনীর কলঙ্ক নরোত্তমকে বেশী আঘাত দিয়েছে। কানুর মৃত্যু-সংবাদ শুনলে সে মাত্র এক দিন কাঁদবে। বেঁচে থেকে সে যে নরোত্তমকে আমরণ কাঁদাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাজার-বেসাতি আর দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে নরোত্তম বাড়ীতে ফিরে এল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সুহাসিনী সংসার ধর্ম্মে মনোনিবেশ করল।

যেখানে-সেখানে সাপ দেখে সখিচরণের ছেলেটা ভয়ে সিঁটিয়ে উঠছিল। তাকে কোলে বসিয়ে নরোত্তম বলল—ভয় কি? ওরা মানুষের মত খল নয়। ওদের কিছু না বললে ওরাও কিছু বলে না।

সাপের ভয়ে সারারাত ঘরের ভিতর আলো জেলে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। সখিচরণের ঘুম হ'ল না। সে গোপীযন্ত্রটা নিয়ে বাইরে এসে বসল।

গান ধরল—

> আমি, ঘর বেঁধেছি ভাঙন-কূলে!
> পাগ্‌লা নদী, নিরবধি—
> ভাঙছে দু'কূল দুলে দুলে।
> জল চলেছে কলকলিয়ে—
> কোথায় যাবে আমায় নিয়ে?
> কোন্‌ সাগরে ডুব্‌ব আমি—
> ঘরে পরের মাথায় তুলে।

২০

শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে মনোহর শুনল—তার বৌ নীহারিকা কলকাতায় চলে গেছে—নিজের এক ধর্ম্মসম্পর্ক পাতানো সবজান্তা দাদার সঙ্গে। নীহারিকা তাকে 'ধর্ম্মদা' বলে ডাকে। ধর্ম্মদা না জানেন এমন কাজ নেই, না বোঝেন এমন বিষয় নেই, না চেনেন এমন নামী লোক নেই কলকাতা শহরে। বাঙালীর কাছে তিনি হিন্দী বলেন, হিন্দুস্থানীর কাছে বাংলা বলেন। মেয়েদের কাছে ইংরেজী বুক্‌নি ছাড়া কথাই বলেন না।

মনোহরের শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়েই তাঁর বাড়ি। অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। মুগ্ধবিস্ময়ে মনোহর ধর্ম্মদার ডাক্তারি, ওকালতি ও ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের তারিফ করেছে। কত বড় বড় লোক তার হাতে হাত মেলায়, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এ সব গল্প শুনতে শুনতে ধর্ম্মদার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে মনোহরের মনে কোন সন্দেহ নেই। কত মেয়ে তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাদের কেউই ধর্ম্মদার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী বিবেচিত হয় নি। এহেন চির-কুমার ধর্ম্মদা কেন যে হঠাৎ নীহারিকাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন, সেকথাটা মনোহর বুঝে উঠতে পারছে না।

নীহারিকার খোঁজে মনোহর গেল কলকাতায়। ধর্ম্মদার বাসায় গিয়ে দেখল, তাঁরই শয়ন-কক্ষে একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীহারিকা প্রসাধন করছে। ঘড়ি-বাঁধা হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, চোখে চশমা, পায়ে হাইহিল্‌ জুতো। মুখে পাউডার মেখে, লিপস্টিক দিয়ে ঠোঁট রাঙাচ্ছিল সে। যে নীহারিকা কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঢেঁকির উপর নেচে নেচে চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা করত, কাঁখে একটা কলসী ও হাতে এক-পাঁজা বাসন নিয়ে পুকুরঘাট থেকে বাড়ী ফিরত, তার এ কোন্‌ রূপসজ্জা?

বিস্মিত চোখে চেয়ে, দরজায় দাঁড়িয়ে মনোহর ডাকল—নীহার!

নীহারিকা ঘুরে দাঁড়াল। এমনভাবে চেয়ে থাকল মনোহরের মুখের দিকে, যেন তাকে চিনতেই পারছে না। কে ও অসভ্য লোকটা?

মনোহরের পায়ে জুতো নেই। গায়ে বোতামহীন ফোতাই

কাজিজ। তার উপর দিয়ে পরণের নতুন লাল-পেড়ে কোরা-কাপড়খানা খুব কষে বাঁধা। এমন একটা অসভ্য গেঁয়ো চাষাকে চিনতে পারাও যেন আজ হঠাৎ-আধুনিকা নীহারিকার পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর। কেন ওই বণ্ডামার্ক জংলী-ভূতটা লাঙল ছেড়ে ট্রাম-বাস আর ছায়া-ছবির রোশনাইভরা এই স্বপ্নপুরীতে এসে হাজির হয়েছে? কি লজ্জা! ওর সঙ্গে এক দিন বিয়ে হয়েছিল—একথা নীহারিকা আজ আর ভাবতেও পারছে না। ও আপদ কেন এল এখানে?

চোখ রাঙিয়ে একটু উত্তেজিতভাবে নীহারিকা বলল—সরে দাঁড়াও···আমার আপিসের বেলা হয়ে গেছে। বলেই প্রেস-করা রঙিন শাড়ীর আঁচলটা ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

আপিস? কোন্ আপিসে নীহারিকা চাকুরি করে? মনোহর ছুটে গেল তার পিছনে পিছনে। সদর-দরজা পর্য্যন্ত যেতেই নীহারিকা ক্রুদ্ধভাবে ঘুরে দাঁড়াল। তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল—কোথাকার একটা জংলী-জানোয়ার তুমি? তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সেই চাষার দেশেই আবার ফিরে যাও—এ কলকাতা তোমার জন্যে নয়···

নীহারিকা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অবাক হয়ে পথের দিকে চেয়ে বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল মনোহর। সাতপাকের বিয়ে যে এমন তুড়ি দিয়ে, চড়ুইটার মত উড়িয়ে দেওয়া যায়—একথা সে ভাবতেই পারছে না। সে কি ধম্মদার আপিসে গেল? কোথায় সে আপিস?

ভাবতে ভাবতে মনোহর বসে পড়ল—বাইরে একটা রোয়াকের উপর। গত রাত্রি থেকে সে অনাহারী। এত বেলা পর্য্যন্তও জল স্পর্শ করে নি। কলকাতার পথঘাট তার অপরিচিত। দেশ থেকে এসেছে একটি লোকের সঙ্গে। ধম্মদার ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই লোকটি চলে গেছে। এখন মনোহর কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। মাথায় হাত রেখে রোয়াকটার উপর শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত দেহে ঘুম এসে গেল।

বিকেলে সাহেবী-পোশাকপরা ধম্মদা এলেন। রং তাঁর বার্ণিশের মত চকচকে কালো। কোটরগত চোখ। মাংসহীন চোয়ালের শক্ত হাড় চামড়া দিয়ে ঢাকা। পোশাকের পারিপাট্যে দৈহিক স্বাস্থ্য বুঝবার উপায় নেই। ঘাড়ের চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। সামনের কাঁচাপাকা লম্বা চুলগুলি পিছন দিকে উলটানো। মাথার টুপিটা বগলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে ধম্মদা জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে ঘুমিয়ে আছে কে?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মনোহর বলল—ধম্মদা, আমি···মনোহর, প্রণাম করে জুতোর ধুলো জিভে ঠেকাল।

—ও, মনোহর! হঠাৎ কি মনে করে?

—নীহারের খোঁজে এসেছি···

—কেন? সে কি হারিয়ে গেছে?

—না, না, হারিয়ে যাবে কেন? আপনার এখানেই তো আছে। দেখাও হয়েছে···

—তাই নাকি? তবে আর ভাবনা কি? বহুৎ খুশ হো যাও···একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

ব্যাপার কি? মনোহর যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কিছুক্ষণ পরে আপিস-ফেরত নীহারিকাও এসে হাজির হ'ল সেখানে। মনোহরের দিকে কটমট করেত তাকিয়ে সে বলল—এখনও বসে আছ কেন? তোমার মতলব কি?

—সত্যই খিদে পেয়েছে নীহার! সারাদিন কিছু খাই নি। তোমাদের ঘরে যদি খাবার কিছু থাকে···

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা কাগজের টাকা বের ক'রে নীহারিকা ছুঁড়ে দিল মনোহরের দিকে। টাকাটা ঘুরে এসে পড়ল নীহারিকার পায়ের কাছে। নাচের ভঙ্গীতে জুতো দিয়ে টাকাটা দেখিয়ে আঙুল তুলে বলল—ওই যে একটা হোটেল আছে। ওখানে যাও···

নীহারিকাও ধম্মদার মত ঢুকে পড়ল ভিতরে। মনোহর অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল—এই কি সেই নীহার? মাত্র এক বছরেই তার এই পরিবর্ত্তন?

বহুক্ষণ পরে ধম্মদা বাইরে এলেন। সস্নেহে বললেন—মনোহর! এখুনি পুলিস কমিশনার আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। এখানে আর দেরি করো না। সরে পড়···

এক বছরের বেশী হাজত-বাসের পর পুলিসের নাম শুনেই মনোহর একটু ভীত হ'য়ে পড়ল। টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে যথেচ্ছ চলতে আরম্ভ করল। কাগজের টাকাটা পড়েই রইল সেখানে।

শ্যামাচরণের বৌ সৌরভিণীও তার ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে এসেছে কলকাতায়। কয়েক জন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে একটা রিলিফ ক্যাম্পে। শ্যামাচরণও এসে হাজির হয়েছে আজ। সৌরভিণীর হাড় জুড়িয়েছে। কোলের মেয়েটাকে সর্ব্বদা কোলে না রাখলেই কান্না জুড়বে। তার এ অভ্যাসটা তৈরি করে দিয়েছে শ্যামাচরণ। সে কারণে মায়ের কোলের চেয়েও বাবার কোলটাই সে বেশী পছন্দ করে।

শ্যামাচরণ আর মনোহর যে তাদের বৌয়ের সন্ধানে কলকাতা পর্য্যন্ত ছুটেছে—নরোত্তম সেকথা সঠিক জানল দু-তিন দিন পরে। সবাই বলছে—পাকিস্থানে আর থাকা চলবে না। নরোত্তম সে মত সমর্থন করে না। তবু সে সখিচরণকে জিজ্ঞাসা করল—তুই কি করবি?

—কি আর করব বড়দা! দেশ ছেড়ে পালালেও, কপাল ছেড়ে তো পালাতে পারব না? সে আমার সঙ্গেই থাকবে···

নিজের বুকে হাত রেখে ইসারায় সুহাসিনী বলল—আর আমিও থাকব···

পথে বহু লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করে মনোহর দেশে ফিরে এল। সখিচরণ জিজ্ঞাসা করল—কৈ ছোট বৌমাকে নিয়ে এলি না কেন?

সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে মনোহর বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইল—মাথা হেঁট করে। কোন দুর্ঘটনা আশঙ্কা করে সখিচরণ এগিয়ে এল তার কাছে।

হঠাৎ চীৎকার করে মনোহর বলে উঠল—সেজদা! আমি মোছলমান হব…

চীৎকার শুনে নরোত্তম এসে দাঁড়াল সেখানে।

বিস্মিতভাবে সখিচরণ জিজ্ঞাসা করল—কেন রে? হঠাৎ তোর মোছলমান হবার সাধ হ'ল কেন?

—শহর কলকাতার আইনে—শালার বৌ যদি যখন-তখন খোশ-খেয়ালে সাতপাকের সোয়ামীকেই তালাক দিতে পারে, তা' হলে আর হিঁদুয়ানীর থাকল কি?

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—বৌমা তোকে তালাক দিয়েছে? বলিস কি?

—সে বৌ আর নেই বড়দা! বলেই মনোহর কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল নীহারিকার নির্মম আচরণের কথা, তার বিলাসিতা ও পোশাক-পরিচ্ছদের বাহারের কথা, ধন্মদার আপিসে তার দশটা-পাঁচটা চাকরি করার কথা। অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে বলল—নীহারিকার সেই ঘোর অধার্ম্মিক দাদাটির কথা।

শঙ্কিতভাবে সখিচরণ বলল—শিবুর ফাঁসি হয়েছে। শেষে কি তোরও তাই হবে?

—নাঃ, আমি কেন শিবুর মত ধন্মদাকে খুন করতে যাব? নীহার তো নন্দরাণীর মত অবুঝও নয়, অশিক্ষিতাও নয়। ও পাড়ার মেজবাবুর কাছ থেকে কত ভাল ভাল বই এনে নীহারকে আমি পড়িয়েছি…

নরোত্তম বলল—তা হলে তার কপাল তো তুই নিজেই পুড়িয়েছিস। এখন কাঁদছিস কেন?

নরোত্তম ভাবতে লাগল—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কি এতই ঠুনকো, এতই হালকা? তাদের ভালবাসা কি পাতলা কাগজের ঠোঙায় ভরা মুদিখানার মশলাপাতি? বাজারে কেনা-বেচার জিনিষ? কি ছিল, আর কি হ'ল? আরও কি হবে—তাই বা কে জানে?

এ বিশ্বাসটা নরোত্তমের মনে বদ্ধমূল আছে যে—'সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।' আমরা নিমিত্তমাত্র। তা'হলে কি এই সব অবাঞ্ছিত বিপর্য্যয় তিনিই ঘটাচ্ছেন? কেন ঘটাবেন না? নিশ্চয়ই এর প্রয়োজন আছে। উদ্বাস্তু হিন্দুরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হওয়াই তো উচিত। এত অপরাধ তিনি সহ্য করবেন কেন? পাষাণী মা কি ওই মন্দিরেই বন্দিনী? দিকে দিকে মাতৃত্ব লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত। ছেলেরা মাকে অগ্রাহ্য করছে—অবজ্ঞা করছে। শুধু কি ওই মন্দিরের মাকে ফুলজল দিয়ে, আর একশ' আটটা পাঁঠার রক্ত দিয়ে পূজো করলেই ছেলের কর্ত্তব্য করা হবে? সে প্রাণহীন শুষ্ক অনুষ্ঠানের মূল্য কি? ক্রমশঃ

এই ত জীবন

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

হঠাৎ কোন নিবিড় রাতে জীবনটাকে যদি
রাত্রিশেষের মেঘের মত ব্যর্থ মনে হয়,
আকাশ থেকে উপচে আসা অন্ধকারের নদী
যদিই ঢাকে মনের আলো, বুকের চাপা ক্ষয়
রক্ত হয়ে ফুটে ওঠে, জলে আগুন হয়;—

পায় না হাসি যখন দেখি মর্ম্মমূলে মোর
আমারই হাত ছড়িয়ে গেছে বিষের বীজাণুকে।
যখন দেখি রাত্রি আমার হবে না আর ভোর,
জীবন শুধু ফুরিয়ে যাবে; জীর্ণ ক্ষওয়া বুকে
আসবে না আর রক্তধারা; কেবল ধুঁকে ধুঁকে
অতীতটাকে চলব টেনে ভবিষ্যতের মুখে।

যখন দেখি এই জীবনের সহজ হওয়া মন
মহত্বে নয়—অবহেলায় আত্মবলি দিয়ে
দেয় নি কিছু পৃথিবীকে, যখন এজীবন
যায় হারিয়ে অগোচরে; যখন দেহ নিয়ে
বেঁচে থাকাও আঘাত করে মর্ম্মমূলে গিয়ে।

সর্ব্বশেষের আশা যে হায় অলীক হয়ে যাজে
পায়ে চলার পথটা দেখে আশঙ্কা হয় মনে,
তখন কোন রাত্রিশেষের ধূসর কুয়াশাতে
হঠাৎ জেগে বিষণ্ণ হিম হাওয়ার পরশনে
শুনি, আঁধার ফুঁপিয়ে কাঁদে বুকের কোণে কোণে।

হঠাৎ নিবিড় আকাশভরা বাতাসচাপা রাতে
গুমরে-ওঠা হৃদয়টাকে আঘাত করে দেখি,
আগুনটা তার শুকিয়ে গেছে; কঠিন দুটো হাতে
নাড়াতে চাই রাত্রিটাকে—জীবনটা যে মেকি,—
বুকের জমা রক্ত দিয়ে ব্যর্থতাকে লিখি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। অবশ্য তিনি সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না, সাহিত্য-সমালোচকও ছিলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবীন সাহিত্য ও নবীন সংস্কৃতির পরিচয় ও ইতিবৃত্ত সংকলনকে তিনি জীবনের মুখ্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কার্য করিয়া গিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা, সাংসারিক অশান্তি কিছুতেই তিনি ব্রতভ্রষ্ট হন নাই। শরীর তাঁহার নানা কারণে অপটু হইয়া পড়িতেছিল। চক্ষু ছানিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য এদিক-ওদিক করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তথাপি তিনি কার্যত্যাগ করেন নাই। দীর্ঘদিন এক চক্ষু লইয়াও কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। গৃহের একমাত্র অবলম্বন গৃহিণী দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণের ফলে হাসপাতালে প্রেরিত হইলে শূন্য-গৃহে অশান্ত মনকে কর্মব্যস্ত রাখিয়া তিনি কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। অবশ্য ক্রমশ তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পরিচয় পাই দুইখানি চিঠিতে। একবার তিনি লিখিলেন—বীণাপাণির নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমার বীণাপাণিরও নিরঞ্জন হইল। তিনি হাসপাতালে গেলেন। কবে ফিরিবেন জানি না।—তাঁহার স্ত্রীর নাম বীণাপাণি। আর এক পত্রে লিখিলেন—শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আর বেশি দিন নয়।

নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অনুসন্ধানে তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। একবার সন্ধান পাইলে যেখান হইতে হউক যেভাবে হউক তিনি তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন এবং সংগ্রহ না করা পর্যন্ত কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয়, এই ব্যাপারে তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইতে বড় দেখি নাই। বস্তুতঃ কাজ আদায় করিবার শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ।

কোন বিষয়ে 'পাথুরে প্রমাণ' যতক্ষণ পর্যন্ত না পাওয়া যাইত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না—অপরের কথা বা লেখা, এমন কি কাহারও আত্মচরিত পর্যন্ত, তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেন না। প্রমাণ পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেক স্থলে ইহাদের ভুল ধরা পড়িয়াছে। তাই তিনি এ সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। ইহাই হইল আদর্শ ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তি। বিশ বছরের বেশি সময় তাঁহার সাহিত্যিক কার্যাবলির সহিত ঘনিষ্ঠভা ব সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নিরন্তর তাঁহার এই মনোবৃত্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পত্রে পত্রে তাঁহার এই মনোবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাই তাঁহার কৃত
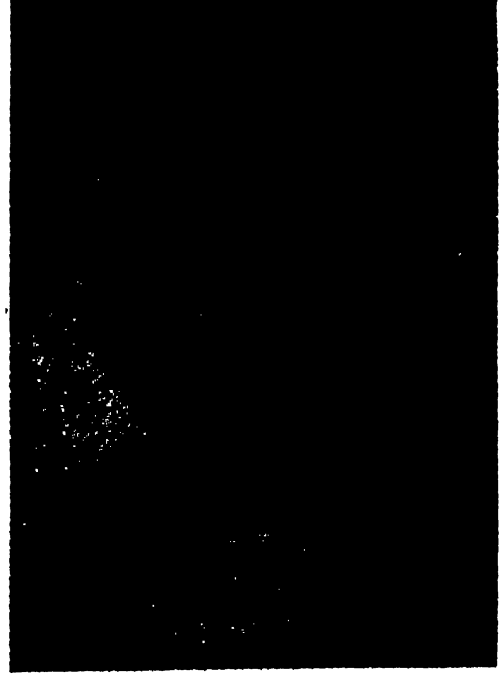
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্যকে অপূর্ব গৌরবে ভূষিত করিয়াছে—বাংলার সুধীসমাজে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্মপদ্ধতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুপ্রেরণায় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এক সময়ে সর্বতোমুখী উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, রামেন্দ্র-যুগের অবসানে তাহার কর্মস্রোত দিন দিন ক্ষীণ ও মন্থর হইয়া আসিতেছিল—তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থার মধ্যে বিশ-বাইশ বছর পূর্বে সাহিত্য-পরিষদে ব্রজেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে ব্রজেনবাবু ও যোগেশবাবু (শ্রীযোগেশ-চন্দ্র বাগল) 'প্রবাসী'র কাজ সারিয়া একসঙ্গে নিয়মিত পরিষদে আসিতেন—পুরান বই-পত্র লইয়া কাজ করিতেন। ক্রমে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হইল। 'সমাচার দর্পণ'

হইতে সংকলিত তাঁহার সংবাদের সংগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম —পরিষদ হইতে 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। ধীরে ধীরে ব্রজেন্দ্রনাথের উপর পরিষদের কার্যভার ন্যস্ত হইতে লাগিল। নিদারুণ অর্থাভাব হইতে মুক্ত করিয়া ইহাকে সাহিত্যানুরাগী বাঙালীর আদরের বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শ্রীসজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় এ ব্যাপারে তিনি আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ—'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র মধ্য দিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদেরই সাহিত্যিক জীবনের নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রচার—বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের (যথা সংবাদপত্র, নাট্যশালা) সপ্রমাণ ইতিহাস প্রকাশ এক দিকে বাঙালীর নিকট নব্য বাংলার উদ্ভবের অনতিপরিচিত রূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, অপর দিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অর্থাভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিল। একমাত্র পুস্তক বিক্রয়ের অর্থেই পরিষদের জীবন-ধারণের ব্যবস্থা হইল। ব্রজেন্দ্রনাথের নিয়মিত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েও পরিষদের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

এখন ব্রজেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রারব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহার উত্তরাধিকারীদের লইতে হইবে। বাংলা-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার যে বর্তিকা তাঁহার হাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা যাহাতে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রকেই তুল্যভাবে আলোকিত করিয়া তুলে এবং এই আলোচনার মূলকেন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথের সযত্নপোষিত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদকে চিরভাস্বর করিয়া রাখিতে পারে সে বিষয়ে সমস্ত সাহিত্য-রসিককে অবহিত হইতে হইবে। সাহিত্যালোচনার সকল দিকে উচ্চ আদর্শের মর্যাদা বজায় রাখিতে পারিলে ব্রজেন্দ্রনাথের পারলৌকিক তৃপ্তি-বিধান করা হইবে—তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে—তাঁহার স্মৃতি সুরক্ষিত হইবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পরিচয়, সে তো আজ হ'ল দীর্ঘ দিন।
মনে নাই মাস তিথি, বিস্মরণে সে সব বিলীন।
নাই থাক্, দুঃখ নাই। কিন্তু এই অমূল্য সঞ্চয়
সে তো নহে ভুল, বন্ধু, সে যে সত্য, নাই তার ক্ষয়।
তিন যুগ কেটে গেছে, বহ্নিমান গিরিশৃঙ্গসম
আলোর দিশারা হয়ে রয়েছে তা জাগি চিত্তে মম।

একান্ত নির্জনে মোর বাড়িয়াছে প্রীতি দিন দিন
চরিত্র-মাধুর্যে তব, নিষ্ঠায়, সেবায় ক্লান্তিহীন,
দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, যশোলক্ষ্মী লাভে উদাসীন,
স্বয়ং পরিগৃহীত এ তপে মগ্ন তাপস মহান্
হয়ত জান না তুমি তোমার কীর্তির পরিমাণ—
কস্তুরী মৃগের মত: সাধিয়াছ দেশের কি হিত
দিয়া পথ-সন্ধান ও অজানারে জানার ইঙ্গিত!
শতাব্দীর ধূলি-চাপা অবলুপ্ত বহু মহাজনে
জীয়াইলে তুমি বীর জীয়নকাঠির পরশনে
বাঙালা ও বাঙালীর নষ্টপৃষ্ঠ মহা ইতিহাস
বহু লবণাম্বু মথি উদ্ধারিয়া করিলে প্রকাশ।

সুখশান্তিহীন গৃহ, দেহ জরাব্যাধি কবলিত—
কর্তব্যে অটল তবু, কর্মশক্তি যুবজনোচিত,
সতত প্রসন্ন হাস্য, অকৃপণ সখ্যে সুদুর্লভ,
হেরি যাহা মহামানে মানিয়াছে লক্ষ্মী পরাভব।
তাই ত তোমারে বন্ধু ভালবাসি, এত ভালবাসি,
সুদীর্ঘ কালের এই পুঞ্জীভূত প্রীতি প্রেমরাশি
রূপায়িত হয়ে এই সুগভীর শ্রদ্ধা পূজাকারে
কৃতার্থ হইতে চায় নম্র এক পূর্ণ নমস্কারে।*

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের কয়েকদিন মাত্র পূর্বে অনুষ্ঠিত তাঁহার জন্মোৎসব-সভায় পঠিত।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

চন্দননগর হইতে যাত্রা করিবার পরে দেবানন্দের প্রব্রজ্যার কাহিনীর অংশ তাহার ডায়ারী হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

চন্দননগর থেকে বেরুতে আমার এক দিন দেরী হ'ল জ্ঞান-দার জন্য। গন্তব্য স্থানেরও পরিবর্ত্তন হ'ল। জ্ঞান-দা বললেন, আমি বাঁকীপুর, রাঁচি ও চাইবাসা যাব কাজের জন্য। আমার সঙ্গে চল।

সন্ন্যাসীর পোশাক বদলাতে হ'ল তাঁর কথায়।

জ্ঞান-দার সঙ্গে আগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। শুনেছিলাম ফরিদপুরের এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারি করতেন। ছেলেদের যে সব শিক্ষা তিনি দিতেন তাই নিয়ে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলমাল বেধে যায়। ইতিমধ্যে যুগান্তর কাগজ বের হ'ল। কোথায় কি খবর পেয়ে এক দিন হাতিবাগানে এসে উপস্থিত হলেন। তার পর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে চাঁপাতলার বাড়ীতে স্থায়ী আড্ডা নিলেন। কখন চাঁপাতলায়, কখন গোপীমোহন দত্তের লেনে থাকতেন। সমিতির কাজে তিনি কয়েক বার বিহার, ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যায় ঘুরেছেন। তাঁর কাছে পুরানো খবর অনেক শুনলাম।

জ্ঞান-দা বললেন, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে যখন প্রথম গুপ্ত সমিতি গড়বার চেষ্টা হয় সেই সময় থেকে সমিতির দু'চার জন করে লোক ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে বিহারের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছে। লোকে কথা শুনত, কিন্তু দলে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসত না। তার পর যেবার ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন হয় সেবার আরা ও বাঁকীপুরের অনেক সহানুভূতিসম্পন্ন ছাত্র, মাষ্টার, উকিলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দলের দু'চার জন মাষ্টারি নিয়ে কয়েকটা শহরে কেন্দ্র স্থাপন করে ছেলেদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকে। বড় বড় শহরের কয়েক জন নেতা এই কাজে সহানুভূতি দেখালেন। কয়েক জন বিহারী ছাত্রের সঙ্গে কথা হয়েছে, যুগান্তরের একটা হিন্দী সংস্করণ বের করবে তারা।

আমি বললাম, কাজ কতখানি এগিয়েছে এদিকটাতে?

জ্ঞান-দা, কাজ বলতে আমরা যা বুঝি তার কিছু সুবিধে হচ্ছে না। কয়েকটা শহরের বাঙালী বাসিন্দাদের কাছে যা কিছু সাহায্য পাওয়া গেছে। বিহারী ছাত্র বল, আর শিক্ষিত লোক বল বিপ্লব-বাদের পুরোপুরি ভার নিতে চান না। নেতারা অনেক বড় বড় কথা বলেন মুখে, কিন্তু কাজে নামতে ভয় পান। অনেকের ভাবখানা এই রকম—বাঙালীরা এদেশে ইংরেজকে এনে বসিয়েছে। স্বাধীনতা আমরা নিশ্চয় চাই, কিন্তু বাঙালীদের কি করে বিশ্বাস করি বলুন? কেউ বলেন, আমরা কুমার সিংহের দেশের লোক, ইংরেজ তাড়াবার কথা আমাদের কাছে আর নূতন কি বলছ? আমাদের বিহারী বন্ধুরা ভুলে গেছেন যে, জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ বাঙালী ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের আগে ইংরেজরা দক্ষিণ-ভারতে খুঁটি গেড়ে বসেছিল। তেলেঙ্গী সিপাহী দিয়ে তারা বাঙালীদের বেধড়ক পিটিয়েছিল। আসল কথা কি জান, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিহারী ও হিন্দুস্থানীরা যে মার খেয়েছিল ইংরেজের হাতে, এখনও তার স্মৃতি তারা ভুলতে পারে নি। আর একটা বিদ্রোহের কথায় তারা ভয় পায়।

আমি বললাম, তা হলে আর এদিকটাতে চেষ্টা করবার কি আছে?

জ্ঞান-দা হেসে বললেন, লোককে দলে আনতে পারছি না বলে চেষ্টা করতে হবে না? আর পারছি নে একথা বলি নি। রাঁচি ও চাইবাসায় অনেক বাঙালী ও বিহারী ছাত্র সমিতিতে নাম দিয়েছে। রাঁচি গেলে অবস্থা বুঝতে পারবে। সেখানকার হিন্দুস্থানী পল্টনের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে সহানুভূতি জানিয়েছে।

জ্ঞান-দা চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন। আমাদের গাড়ী তখন আদ্রা ষ্টেশন ছেড়ে চলেছে। চক্রধরপুরে নেমে আমরা চাইবাসা যাব স্থির হয়েছে। দুই দিকে পাহাড় ও জঙ্গল। গাড়ীতে অনেক লোক—স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। ওদের দিকে চেয়ে জ্ঞান-দা বললেন,

—চাইবাসার কোলরা ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল। ওদের একটা নাম আছে লড়কা কোল। বিরসা ভগবানের কাহিনী শুনেছ?

আমি—শুনিনি তো।

জ্ঞান-দা—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বিরসা মণ্ডল আপনাকে ভগবানের অবতার বলে প্রচার করলেন আর ঘোষণা করলেন কোলস্থানে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোল বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করল। সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে ইংরেজ সরকার বিরসা ভগবানকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাল, কিন্তু সেই থেকে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ কোলেদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে। বিরসা ভগবানের অনুগামীরা গুপ্তভাবে বিদ্রোহ প্রচার করছে এখনও। চাইবাসায় গিয়ে এই দলের নেতাটিকে খুঁজে বের করতে হবে। এদের হাত করতে পারলে কাজ এগিয়ে যাবে।

গাড়ীর মধ্যে অপর প্রান্তে কি নিয়ে একটা ঝগড়া চলছিল আর কোল মেয়েগুলো মুখ টিপে হাসছিল। গোলমাল একটু থামলে আমি বললাম, আমরা ত উড়িষ্যাতেও যাব। উড়িষ্যার সমিতির কাজ কতদূর এগিয়েছে?

জ্ঞান-দা—সত্যব্রত ও হারীত কটকে কাজ আরম্ভ করেছিল বছর দুই আগে। আমি নিজেও বার দুই গিয়েছি। আগে

পূর্ব্ববঙ্গের পরেই উড়িষ্যা আমাদের বড় কেন্দ্র ছিল। প্রথম দিকটাতে লোকের উৎসাহ দেখে আমরাই অবাক হয়ে যাই। বাংলার লোকের চাইতেও উড়িষ্যার লোকেরা যেন বিপ্লববাদ গ্রহণ করতে বেশী উৎসুক মনে হ'ল। উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙালী ও ওড়িয়া ছাত্র, মাষ্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার, মোহান্ত প্রভৃতি পদস্থ লোক কেউ সমিতির সভ্য হলেন, কেউ বিশেষ সহানুভূতি জানালেন। কটক, পুরী, বালেশ্বরে স্বদেশী আন্দোলনে ও বিপ্লবী আন্দোলনে খুব জোর দেখা গেল। এই সময়ে উড়িষ্যার মালিকা নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা আমরা প্রথম জানতে পারলাম। তাদের শাস্ত্রে নাকি আছে সম্বলপুরে কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে। আমাদের বিপ্লববাদ প্রচারের সঙ্গে এই কল্কি অবতারের আবির্ভাবের কথা কি ভাবে জানি যুক্ত হয়ে কাজ অনেকখানি সহজ হ'ল। লোকের কি উৎসাহ!

—তার পর গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী ও ওড়িয়াকে ডেপুটি ও সাব-ডেপুটি চাকুরি দিলেন। বিপ্লবের খাতায় যারা নাম লিখেছিল তারা সরকারী চাকুরি পেয়ে সরে পড়ল। প্রদীপের শিখার মত যে উৎসাহ জ্বলে উঠছিল দেখতে দেখতে দপ্ করে তা নিবে গেল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকারী চাকুরি নিয়ে খসে পড়ায় ছাত্রদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল।

একটু থেমে জ্ঞান-দা বললেন, বাংলাতেও আমরা পুলিস ও অন্য সরকারী চাকুরিতে বিপ্লবী দলের লোক ঢুকিয়েছিলাম কাজের সাহায্য হবে বলে। চাকুরি পেয়ে এরা দল থেকে সরে গেছে।

আমি বললাম, উড়িষ্যায় গিয়ে কি লাভ হবে এখন?

জ্ঞান-দা—লাভ কি হবে জানি নে, তবে যে সহানুভূতি এক সময় পাওয়া গিয়েছিল তার সবটুকু না চলে যায় দেখা দরকার।

জ্ঞান-দার মত ঠাণ্ডা মেজাজের, প্রণালীবদ্ধ কাজের পক্ষপাতী বিপ্লববাদী আমি এর আগে দেখিনি, আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি তাঁর মধ্যে। বিপ্লববাদীদের এক দলের মধ্যে যে যোগাভ্যাস, ধ্যান-ধারণার বাড়াবাড়ি ও অন্য এক দলের মধ্যে উচ্ছ্বাস-প্রবণতার ছড়াছড়ি দেখা যেত, তাঁর মধ্যে এর কোনটি ছিল না। বিপ্লববাদ তাঁর ধর্ম্ম, একে খাড়া ও সতেজ রাখবার জন্য কোন প্রকার যৌগিক প্রক্রিয়া বা অধ্যাত্মবাদের সাহায্য আবশ্যক হ'ত না।

কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে থেকে দেখলাম রুশিয়ার নিহিলিষ্ট ও ইটালীর কার্বোনারী দলের দর্শন ও ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস তাঁর মুখস্থ।

তিনি বললেন—আমাদের বিপ্লববাদ শিখতে হলে এই দুই দেশের বিপ্লববাদীদের কাছে শিখতে হবে। ইটালীর সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু মিল আছে। অষ্ট্রিয়ানরা বলত—ইটালী কি আবার একটা দেশ নাকি? ইটালী ইজ এ জিওগ্রাফিকাল এক্সপ্রেশন। নানা জাতের বাস এই ভৌগোলিক অঞ্চলে। ইটালীয়ান বলে জাত কোন কালে ছিল না, কোন কালে হবে না। ইংরেজরাও বলে, ইণ্ডিয়া ইজ এ জিওগ্রাফিকাল এক্সপ্রেশন, ইট ইজ এ সাব-কণ্টিনেণ্ট। তাদের কথায় ইণ্ডিয়ান নেশন একটা কল্পনার বস্তু।

জ্ঞান-দা—"রাশিয়াম প্যামফ্লেট" তিনি খুব ভাল করে পড়েছেন। এই পুস্তিকাগুলিতে রুশিয়ার বিপ্লবীরা বিপ্লবের যে ছক গড়েছে, আমাদেরও সেই পথে চলতে হবে, নইলে ভারতীয় বিপ্লববাদ সফল হবে না, আমাকে বললেন।

চাইবাসা থেকে পুরুলিয়া হয়ে রাঁচি, তার পর কয়েকদিন কটকে ঘুরে আমরা বাঁকীপুরে এলাম। বাঁকীপুরে এসে জামালপুরের গোলমালের খবর কাগজে পড়লাম। জ্ঞান-দাকে বললাম—আমি জামালপুর যাব।

তিনি বললেন—সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে?

আমি—ইংরেজরা মুসলমানদের লেলিয়ে দিয়ে হিন্দুদের মারবে, আর আমাদের সেখানে কোন কর্ত্তব্য নেই? আমি আজই রওনা হব।

জ্ঞান-দা—এটা বিপ্লবীর মত কথা হ'ল না তোমার। মুসলমানরা ইনষ্ট্রুমেণ্ট। আমাদের লক্ষ্য এই ইনষ্ট্রুমেণ্ট যে চালাচ্ছে সে।

আমি—ইনষ্ট্রুমেণ্টরা যদি জঘন্য অত্যাচারে লোকের মনোবল ভেঙ্গে দেয়, তাদের যদি আমরা ঠেকাতে না পারি তবে বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দেবে কে?

আমার কথা শুনে জ্ঞান-দা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন—তোমার কথার মধ্যে কিছু সত্যি আছে। লোকের সহানুভূতি না পেলে আমাদের চলবে না। তবে তোমার যাবার বিশেষ দরকার আছে মনে হয় না। পুলিন বাবুর দল ছড়িয়ে আছে সারা উত্তর বাংলা ও পূর্ব্ববাংলায়। হি ইজ এ রিয়ালিষ্ট এণ্ড এ ফার্ষ্ট ক্লাস অরগ্যানাইজার—তিনি বাস্তববাদী ও প্রথম শ্রেণীর সংগঠনকামী। বর্ত্তমান অবস্থায় যা করা সম্ভব তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।

জ্ঞান-দার মুখে অনুশীলন সমিতির নেতার এই প্রশংসা শুনেও আমি আমার মতলব ছাড়লাম না। বাঁকীপুরের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে কলকাতা ফেরবার জন্য জ্ঞান-দাকে তাড়া দিতে লাগলাম।

যে দিন রওনা হব তার আগের দিন আমার খুব কম্প দিয়ে জ্বর এল। মাথায় খুব যন্ত্রণা। পরের দিন বিছানা ছেড়ে উঠবার শক্তি রইল না। মাঝের কয়েক দিনের কথা আমার কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম আমি অন্য জায়গায়, নূতন বিছানায় রয়েছি। ঘরে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমার মার মত মনে হ'ল। ভাবলাম আমার অসুখের খবর পেয়ে মা এসেছেন। মা বলে ডাকলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এসে হেঁট হয়ে বললেন—কি বাবা? কেমন আছ?

আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আমার মা নন। মার মুখের মত তাঁর মুখের ভাব।

আমি বললাম—ভাল আছি।

তার পরের কথা সব মনে আছে। জ্ঞান-দা সারা রাত জেগে বসে থাকতেন আমার শিয়রে আর পাখা করতেন। ঔষধ দিতেন, জল চাইলে জল দিতেন। মাঝে মাঝে একটি মেয়ে বসত মাথার কাছে। বড় চমৎকার সে মাথায় হাত বুলোত। একদিন স্বপ্ন দেখলাম কিটি এসেছে আমার অসুখের খবর পেয়ে। আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ চুপ করে। তার পর কি যেন সে বলল কানে এল না। শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল চুলে টান লেগে। চেয়ে দেখি মাথায় কে হাত বুলোচ্ছে। বললাম—কিটি এসেছ? আমার মুখের উপর হেঁট হয়ে কে বলল—কাকে ডাকছেন? মনে পড়ল স্বপ্ন দেখছিলাম। বললাম—কাউকে ডাকছি না ত। এক দিন স্বপ্নে দেখলাম ইন্দ্র আর লক্ষ্মী হাত ধরাধরি করে আসছে আমার দিকে। দোরের কাছে এসে ওরা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কত আজগুবি কথা মাথায় আসত কয়েক দিন।

গায়ে বল হতে কয়েক দিন লাগল। জ্ঞান-দা তিন চার দিন কোথায় যেন ঘুরে এলেন। সেই মেয়েটি তাঁর অনুপস্থিতিতে ঔষধ পথ্য দিত। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমার ঘরে থাকত। তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে খুব হাসিখুশী মেয়ে, মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হয়ে যেত। তার নাকটা একটু ছোট লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কথা বললে, হাসলে সেটা মনে থাকত না। এক দিন সে বলল—আপনার মত দুর্ব্বল লোক ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে? তাদের দূর করে দিতে পারবে? আমি বললাম—এ সব কথা তুমি শুনলে কোথায়? সে বলল—শুনব আবার কোথায়? আমার কি বুদ্ধি নেই? সন্ন্যাসী নন, কিন্তু এইটুকু বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন কেন? জ্ঞান-দাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি। আমাদের বাড়ীতে কত ছেলে আসে তাঁর কাছে। তাদের মধ্যে কি সব কথা হয় আমি তাও জানি। আমি বললাম—আমি দুর্ব্বল কি করে জানলে? সে হেসে বলল—হাত দেখে জানতে পেরেছি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কিটি কিটি বলে ডাকেন কাকে? আমি হেসে বললাম—ও, এই তোমার হাত দেখে জানা? কিটি আমার এক বোন। সে বলল—সত্যি বলছেন? কি রকম বোন? আপনার আর ক'টি বোন আছে? তাদের নাম কি? আমি চোখ বুজে পাশ ফিরে শুলাম। হাতটা নিজের অজ্ঞাতসারে বোধ হয় মাথায় দিয়েছিলাম। সে তাড়াতাড়ি বলল—আবার মাথায় ব্যথা হচ্ছে বুঝি? আর কথা বলবেন না, চুপ করে ঘুমোন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আমি মনে মনে বললাম—বোন ছাড়া আর কি হতে পারে? যত মেয়ে আছে দেশে তাদের কেউ আমার মা, কেউ আমার বোন। আমি বিপ্লবী, আমি সতীন-দার শিষ্য। আর এক জনের কথা মনে এল। জ্ঞান-দার কথা। মনে পড়ল রাতের পর রাত তাঁর নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন সেবা, তাঁর আকুল প্রশ্ন—দেবু, ভাই বড় কষ্ট হচ্ছে কি? আমি জানতাম জ্ঞান-দা যখন রাস্তায় বেরোন তাঁর পকেটে থাকে গুলিভরা পিস্তল। আমি জানি প্রয়োজনের সময় এই পিস্তল পকেট থেকে বের করে শত্রুর বুক লক্ষ্য করে চালাতে তাঁর হাত একটু কাঁপবে না। মায়ের মত, বোনের মত কোমল হৃদয় জ্ঞান-দা কাজের সময় লোহার মানুষ।

শরীরে বল পেতে পুরাতন খবরের কাগজ নিয়ে বসলাম। জামালপুরের সংবাদ জানবার জন্য। বাংলায় যে কয়খানা কাগজ পাওয়া গেল তাই পড়ে অস্থির হয়ে উঠলাম। জ্ঞান-দা আবার কোথায় বেরিয়েছেন—আমি ভাল আছি দেখে। তিনি ফিরলে বললাম—দাদা, আর এখানে নয়। আমি ভাল হয়েছি। এবার কলকাতায় চলুন। আমাকে একবার জামালপুরে যেতে হবে। জ্ঞান-দা বললেন—একে একে অনেক জায়গায় বাবার মত হয়ে উঠছে, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বক্সিগঞ্জ, সেরপুর—। চল কাল বেরুই।

যাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলাম তাঁরা আপত্তি করে বললেন—আমি এখনও দুর্ব্বল। বাড়ীর গৃহিণী যাঁর মুখ কতকটা আমার মার মুখের মত, সেবাপরায়ণা সেই মেয়েটি এমন করতে লাগলেন যে যাওয়া বন্ধ হয় আর কি। আমি হাত জোড় করে তাঁদের অনুমতি চাইলাম। মেয়েটি কেঁদে ফেলল, তার মায়ের চোখ ছল ছল করতে লাগল।

আমরা চলে এলাম। বাড়ীটা যখন আড়ালে পড়ল, মনে মনে হাত জোড় করে তাঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালাম। বললাম—তোমরা কেঁদো না, চোখের জল তুলে রাখো ভবিষ্যতের জন্য। অনেক কাঁদতে হবে তোমাদের এর পর।

১৬

হাবড়া পৌঁছিয়া জ্ঞান কাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শিবপুর চলিয়া গেল, দেবানন্দ একা চাঁপাতলার বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

বাহিরের ঘরে যুগান্তরের ম্যানেজার ও কয়েক জন লোকের মধ্যে কি পরামর্শ হইতেছিল। সেই ঘরের এক পাশে ছাপাখানার এক অংশের কাজ চলিতেছে। দেবানন্দ দেখিল এক কোণে হারীত-দা বসিয়া সোডাওয়াটারের বোতলের মধ্যে বারুদ ভরিতেছেন, তাঁহার পাশে কয়েকটা খালি বোতল পড়িয়া আছে। ছাপাখানার কম্পোজিটাররা, বাহিরের লোক মাঝে মাঝে ঘরে আসিতেছে। কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হারীত-দা নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন।

দেবানন্দ বুঝিতে পারিল বোতলে বারুদ ভরিয়া বোমা তৈয়ারী হইতেছে। সকলের চোখের সম্মুখে এই বোমা তৈয়ারীর ব্যাপার দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ভিতরে গেল। বিকালের দিকে ক্ষুধা বোধ হওয়াতে ভাবিল মোড়ে উড়িয়ার দোকান হইতে মুড়ি আনিয়া খাইবে। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে রাস্তার ওপারে দোকানে চলিল। মুড়ি ও বেগুনী কিনিয়া দেবানন্দ রাস্তা পার হইতেছে সম্মুখে

একখানি ফিটন-গাড়ী আসিয়া পড়ায় একটু সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর আরোহী কোচম্যানকে ডাকিয়া বলিলেন, এই রোকো! গাড়ী থামিয়া গেল। ঠোঙাহাতে দেবানন্দ পাশ কাটাইয়া রাস্তা পার হইতেছে কে তাহাকে ডাকিল—হ্যালো দেবানন্দ?

দেবানন্দ চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তাহার সম্মুখে ডাঃ চক্রবর্ত্তী, হাতে সিগার ও ছড়ি।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী দেবানন্দের সন্ন্যাসীর বেশ শুষ্ক, শীর্ণ মুখ ও হাতের ঠোঙার দিকে চাহিলেন। চাহিয়া মাথা নাড়িলেন। বলিলেন, এক যুগ তোমার সঙ্গে দেখা নাই। তোমার হোষ্টেল ত এই দিকটাতে, নয়? বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে হোষ্টেল ছেড়েছ। কোথায় আছ?

দেবানন্দ বলিল, এই পাড়াতেই থাকি।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী নিজের মনে কি চিন্তা করিলেন। বলিলেন, আই সি। চাঁপাতলার আপিসে ভিড়েছ, নয় কি? হাতের ঠোঙায় কি? মুড়ি?

দেবানন্দ মাথা নাড়িল।

আবার তিনি চিন্তা করিলেন নিজের মনে। কোচম্যান ততক্ষণ গাড়ী সরাইয়া ফুটপাতের পাশে দাঁড় করাইয়াছে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, আমার স্কটস লেনে একটু কাজ আছে। সেটা সেরে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তোমাদের আড্ডায় উপস্থিত হব। আই নো দি হাউস। আই হোপ টু সি ইউ দেয়ার (আমি বাড়ীটা জানি, সেখানে তোমার দেখা পাব আশা করি)।

তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। মুড়ির ঠোঙা হাতে দেবানন্দ অগ্রসর হইল।

খাওয়া শেষ করিয়া দেবানন্দ বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল হারীত-দার বোমা তৈয়ারী শেষ হইয়াছে। বারুদভরা বোতলগুলি কোথায় সরাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া হারীত জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়, কোথায় গিয়েছিলে? টাকা-পয়সা কিছু সংগ্রহ হ'ল?

দেবানন্দ—জয়নগর থেকে পঁচিশ টাকার এক মনিঅর্ডার পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন?

হারীত—জয়নগর? বোধ হয় পেয়েছি, ঠিক মনে পড়ছে না। টাকাটা তুমি যোগাড় করেছিলে বুঝি? কে এক জন প্রোফেসর দিয়েছিল, নয় কি? মনে পড়েছে। ভদ্রলোক একখানা লম্বা চিঠি লিখেছিলেন নানারকম প্রশ্ন করে। কাকে যেন বলেছিলাম একটা উত্তর দেবার জন্ত।

দেবানন্দ পকেট হইতে পনেরটি টাকা বাহির করিয়া হরীতের হাতে দিল। বলিল, চন্দননগরে পাঁচ টাকা, বাঁকীপুরে দশ টাকা পেয়েছি। জ্ঞান-দার কাছে কিছু টাকা আছে।

হারীত—জ্ঞান? তাকে কোথায় পেলে? আমি তাকে চাইবাসা পাঠিয়েছিলাম। যায় নি? জ্ঞান কখনও কথামত কাজ করে না।

দেবানন্দ—চন্দননগরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হাবড়ায় নেমে তিনি শিবপুর গেছেন, সন্ধ্যার পরে এখানে আসবেন।

দেবানন্দ একা ও পরে জ্ঞানের সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়াছিল বলিল। কথা শেষ করিয়া সে বলিল, আমি জামালপুরে যেতে চাই।

হারীত গম্ভীরভাবে বলিল, জামালপুরে তোমাকে পাঠানো ইউজলেস। পাঁচ জন পাকা লোককে সেখানে পাঠিয়েছি মাল-মশলা দিয়ে। শুনছি পুলিস ক'টাকে ধরেছে। কোন হিন্দু ছোকরাকে বাইরে থেকে জামালপুরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

দুই জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে—ডাঃ চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিছনে গাড়ীর কোচম্যান, তাহার হাতে বড় একটা চাঙারি। যাহারা ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে চিনিত তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে অভ্যর্থনা করিল। হারীত আগাইয়া আসিয়া নমস্কার করিল। বলিল, চাঙারীতে কি আছে স্যার? আমরা কি দেখতে পারি?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলন, অবশ্য। হ্যালো দেবানন্দ, চাঙারিটা ধর দেখি।

চাঙারি দেবানন্দের হাতে দিয়া কোচম্যান চলিয়া গেল। দেবানন্দ চাঙারি হারীতের হাতে দিল। উহাতে ছিল একরাশি সিঙারা, কচুরী ও সন্দেশ। দেখিয়া যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ডাকাডাকিতে বাড়ীর যেখানে যে ছিল সেই ঘরে আসিল। দুই-তিন মিনিটের মধ্যে চাঙারি শূন্য হইয়া গেল।

হারীত বলিল—চক্রবর্ত্তী সাহেব, দেবানন্দ জামালপুরে যেতে চায়। যে ক'টি গিয়েছে এখান থেকে, তাদের এরেষ্ট করেছে শুনছি।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—দেবানন্দকে আমি জামালপুরের খবর দিতে পারি। আজ রাতটা ওকে ছাড়তে পার হরীত?

হারীত—নিশ্চয়। ও অনেক ঘুরেছে, একটু বিশ্রাম করুক। দেবানন্দ, কাপড়টা বদলে ওঁর সঙ্গে যাও। জামালপুরের খবর উনি যা দেবেন তুমি নিজে সেখানে গেলেও তা সংগ্রহ করতে পারবে না।

কাপড় বদলাইয়া দেবানন্দ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

জামালপুরে গোলমাল চলিতেছিল। জামালপুরের মুসলমান সাব-রেজিষ্ট্রার নবাব আলি চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল বক্তৃতা করিবার জন্ত। বক্তৃতার ফলে স্থানীয় হাওয়া আরও গরম হইয়া উঠিল। লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী-স্নান আসিয়া পড়িল। স্নান উপলক্ষে মেলা বসিয়াছিল। গোলমালের আশঙ্কায় হিন্দুরা স্নানে যাইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লার্ক ঢোলসহযোগে জানাইয়া দিলেন হিন্দুরা নির্ভয়ে স্নান করিতে পারে। মুসলমানরা কিছু বলিবে না। স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসিল। হঠাৎ দলে দলে লাঠিধারী গুণ্ডা আসিয়া মেলা

তছনছ করিয়া দিল, আনার্থী হিন্দুদের উপর বেপরোয়া আক্রমণ সুরু হইল। মেলার বাহিরে লাঠিধারী পুলিস লইয়া পুলিসের দারোগা উপস্থিতছিল। ব্যাপার চরমে উঠিলে দারোগা মেলাক্ষেত্রে আসিল। গুণ্ডাদের ধমকাইয়া বলিল—হট যাও তোমরা, দাও তোমাদের লাঠি। কয়েকখানা লাঠি কুড়াইয়া জমা করিয়া রাখিল এক জায়গায়। মেলাক্ষেত্র হইতে সরিয়া গুণ্ডারা অন্য কার্য্যক্ষেত্রে গেল।

দুর্গাবাড়ীতে চড়াও হইয়া তাহারা বাসন্তী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। নাটোররাজের কাছারিবাড়ী ও আরও কয়েকটি কাছারি-বাড়ী লুণ্ঠিত হইল। তার পর ব্যাপক লুটতরাজ, নারীহরণ, গৃহ-দাহ আরম্ভ হইল জামালপুর অঞ্চলে। ভয়ার্ত্ত হিন্দুরা দলে দলে পলাইতে লাগিল ঘরবাড়ী ফেলিয়া। গুণ্ডাদলের ভয়ে স্ত্রীলোকেরা পুকুর, খানা-ডোবার জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া সারা রাত্র দাঁড়াইয়া থাকিত।

গুণ্ডাদের এই তাণ্ডবের সঙ্গে চলিতে লাগিল সরকারী তাণ্ডব। পুলিস লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জমিদারের কাছারি ও গৃহস্থদের বাড়ী তল্লাস করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে দলে দলে লাঠিধারী-গুণ্ডা। তাহারা যে হিন্দু-বাড়ী দেখাইয়া দেয় তাহাই তল্লাস হয়, যে হিন্দুকে দেখাইয়া দেয় তাহাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। জমিদারের কাছারি হইতে লাইসেন্সধারী হিন্দু গৃহস্থের বাড়ী হইতে বন্দুক কাড়িয়া লওয়া হইল। একগাছা লাঠি পর্য্যন্ত কোন হিন্দুর বাড়ীতে রাখা হইল না। পুলিস তল্লাসীর জন্য হিন্দুর বাড়ীতে প্রবেশ করে, সঙ্গের গুণ্ডার দল তাহাদের সাহায্য করে। দুই দলে মিলিয়া বাড়ীতে মূল্যবান যাহা পায় আত্মসাৎ করে, যাহা লইতে ইচ্ছা হয় না তাহা ভাঙিয়া-চুরিয়া, ফেলিয়া, ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

জামালপুরের খবর ক্রমে কলিকাতায়, দেশের সর্ব্বত্র পৌঁছিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল মৈমনসিং রওনা হইলেন। গুজব রটিল পুলিস তাঁহাদের মৈমনসিং-এ নামিতে দিবে না, পথে গ্রেপ্তার করিবে। দেশের বিভিন্ন সমিতির কেন্দ্র হইতে যুবকগণ জামালপুরে যাইবার জন্য রওনা হইল। তাহাদের আটকাইবার জন্য পুলিস আটঘাট বাঁধিয়া প্রস্তুত ছিল। কেহ কেহ গ্রেপ্তার হইল, কেহ কেহ পুলিসের বেড়াজাল ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে যাইবার পথে দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, ডাঃ চক্রবর্ত্তী ভবেশ-দার কোন খবর জানেন কিনা।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—ভবেশ দেওঘরে অজ্ঞাতবাস করছে।

দেবানন্দ শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল। অজ্ঞাতবাস? কিসের জন্য? সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া ডাঃ চক্রবর্ত্তী দেবানন্দকে বলিলেন—জামাল-পুরে গিয়ে তোমার পক্ষে যে খবর সংগ্রহ করা সম্ভব তার চাইতে বেশী খবর এখানে বসে পাবে। তুমি একটু বস, আমি আসছি।

দেবানন্দকে লাইব্রেরি ঘরে বসাইয়া ডাঃ চক্রবর্ত্তী ভিতরে গেলেন। দেবানন্দ চাহিয়া দেখিল ঘরের সাজসজ্জা আগেকার মত আছে। এক জন বেয়ারা আসিয়া ঘরে ধূপদানিতে ধূপকাঠি জ্বালাইয়া দিল, একটি রূপার রেকাবে কতকগুলি চাঁপাফুল তেপায়ার উপর রাখিল। আস্তে আস্তে ঘরের হাওয়া সুগন্ধি হইয়া উঠিল।

মিনিট কয়েক পরে বাহিরের পোশাক বদলাইয়া সিগার হাতে ডাঃ চক্রবর্ত্তী ঘরে আসিলেন। দেবানন্দকে বলিলেন—ইউ ওয়াণ্ট এ ওয়াশ। এসো দেখি এদিকে।

লাইব্রেরি-ঘরের পাশে একটি বাথ-রুম দেখাইয়া দিয়া বলিলেন —ঐ ঘরে যাও, সাবান তোয়ালে সব ওখানে আছে।

দেবানন্দ হাত-মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল। দেখিল লাইব্রেরি-ঘরে এক প্লেট মিষ্টি ও গ্লাসে সরবৎ রহিয়াছে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—খেয়ে নাও।

দেবানন্দ খাইতে লাগিল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—জামালপুরের কথা ভেবে মন খারাপ করো না। জামালপুরের তামাশা শেষ হয়ে এল।

দেবানন্দ খাওয়া বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—আমাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। আপনি তামাশা বলছেন?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলেন—সব বড় বড় ট্রাজেডীর একটা হাস্যকর দিক আছে। খেয়ে নাও, বলছি।

দেবানন্দের খাওয়া শেষ হইল। বেয়ারা আসিয়া প্লেট ও গ্লাস লইয়া গেল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী কিছুক্ষণ সিগার টানিলেন একমনে। তার পর সিগারটি এশ ট্রেতে রাখিয়া বলিলেন—সেখানকার ছেলেদের তারিফ করতে হয়। জামালপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে তোমাকে বলছি। নানা জায়গা থেকে ছোকরারা সেখানে গিয়েছে, মোষ্টলি ফ্রম দি ডিষ্ট্রিক্টস অব ইষ্ট বেঙ্গল। এখান থেকেও গিয়েছে। তাদের বেশীর ভাগ ধরা পড়েছে। সেরা প্রশংসা প্রাপ্য সুধীর নামে একটি ছেলের। বহু হিন্দু মেয়ের মান বাঁচিয়েছে সে। একটা উপদ্রুত অঞ্চলের সব বাড়ীর মেয়েদের সরিয়ে এনে একটা মন্দিরে রাখা হয়েছিল। বিশ হাজারের এক ক্ষিপ্ত জনতা মন্দির আক্রমণ করে, সঙ্গে পুলিস অফিসার। সুধীর ফেসড দেম উইথ এ ড্যামেজড গান (একটা ভাঙা বন্দুক নিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ায়)। দিস ইজ এন একট্ অব হিরোইজম (এটা বীরত্বের কাজ)। আরও দু' তিন জায়গায় এ রকম হয়েছে।

—এবার তোমাকে ফানি সাইডের কথা বলছি। যে বাসন্তী প্রতিমা ভাঙা নিয়ে এত হৈ চৈ সেটা যখন প্রকাশ্যে ভাঙা হয় তখন কত জন ধর্ম্মপ্রাণ লোক আহত বা নিহত হয়েছে সে খবর পাওয়া যায় নি। স্থানীয় হিন্দু নেতারা বন্ধুভাবাপন্ন রাজপুরুষদের সুপরামর্শে ভলান্টিয়ারদের জামালপুর থেকে বের করে দিয়েছেন। রাজপুরুষরা বুঝিয়েছিলেন ভলান্টিয়াররা থাকাতেই মুসলমানরা চটে গিয়ে উপদ্রব করছে। ভলান্টিয়াররা চলে গেলে হিন্দুরা প্রতিমা ভাঙার জন্য মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করলেন উপবাস করে। ভলান্টিয়ার

বিতাড়ন ও উপবাসের পরেও মুসলমানদের রাগ পড়বার লক্ষণ দেখা গেল না, তাদের উপদ্রব চলতে লাগল। তখন ঘরদোর ছেড়ে সবাই পালাতে লাগলেন।

—জামালপুরের ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি। এর মধ্যেও কিছু ফানি জিনিস পাবে।

পরদা সরাইয়া মৃণাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিল।

মৃণাল বলিল—বসুন দেবানন্দবাবু। সে নিজে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন—প্রথমে হিন্দুপক্ষের কথা শোন। মডারেট দলের কাগজ বলছে—"জামালপুর ও পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনা হচ্ছে ওয়ার্নিং, ওয়ার্নিং ফ্রম দি গবর্নমেণ্ট টু দি হিণ্ডুস। তোমরা যদি বয়কট বন্ধ না কর তা হলে মোসলেম রাউডিদের (গুণ্ডাদের) লেলিয়ে দেওয়া হবে পূর্ব্ববঙ্গে তোমাদের সায়েস্তা করবার জন্য। তোমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আমাদের কাছে কোন সাহায্য পাবে না।" 'বেঙ্গলী' ভাইসরয়ের কাছে আপিল করছে হাঙ্গামা দমন করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছে, লোকের ধারণা সরকারী কর্ম্মচারীদের ইঙ্গিতে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়েছে। অন্য একখানা মডারেট কাগজ লিখছে, "ফ্যানাটিক গুণ্ডাদের চাইতে সরকারী কর্ম্মচারীরা বেশী দায়ী, দে হ্যাভ হেলপড ইন সেটিং দি ইঞ্জিন অব মব ভায়োলেন্স ইন মোশন (হিংস্র গুণ্ডার দলকে লেলিয়ে দিয়েছে তারা)। সঞ্জীবনীর কথা শোন। সঞ্জীবনী বলছে, বিদেশী বণিক ও ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীরা আজ চারদিকে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। জামালপুরের মেলায় আহত, রক্তাক্তদেহ হিন্দু ছেলেদের পুলিস গ্রেপ্তার করছে আর আক্রমণকারী গুণ্ডাদের কেশ স্পর্শ করছে না। হিন্দু মেয়েদের আর্ত্ত চিৎকারে আজ পূর্ব্ববঙ্গের আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে। গবর্নমেণ্ট দলে দলে হিন্দু ছেলেদের ও নেতাদের জেলে পুরছে। মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার জন্য যারা জীবন দিতে প্রস্তুত তারা তৈরি হও। শস্যশ্যামলা বাংলার মাটি আজ নররক্তের পিপাসায় আকুল হয়েছে। হে বাঙালী, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য ভগবান তোমাকে আহ্বান করছেন। একখানা কাগজে বলছে—"আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করায় হিন্দু ছেলেদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে গবর্নমেণ্ট তাদের জেলে পুরছে।" আর একখানা কাগজের কথা, "মুসলমান গুণ্ডারা পুলিস সাহেবের আদেশে প্রকাশ্যে লুঠপাট করছে, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব গুণ্ডাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে"। ওল্ড ডিয়ার হিন্দু পেট্রিয়টের সুর অন্য রকম, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পাল গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটির বুনিয়াদ নষ্ট করছেন বলে হিন্দু পেট্রিয়ট বড় গাপ্পা হয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজখানি হইতে খানিকটা পড়িয়া শুনাইলেন। দেবানন্দ ও মৃণাল উত্তরে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ও বিপিনচন্দ্র পালকে "লাভার্স অব্ সেনসেশন এণ্ড মার্টার্ডম" এবং "উড বি গ্রেটেষ্ট ইণ্ডিয়ান" বলিয়া হিন্দু পেট্রিয়টকে বিদ্রূপ করিতে শুনিয়া হাসিল। ডাঃ চক্রবর্তী সিগার উঠাইয়া দেখিলেন নিবিয়া গিয়াছে। সিগার ধরাইয়া কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন। তারপর সিগারটি রাখিয়া বলিলেন,

—এবার এক্সট্রিমিষ্ট দলের কথা শোন। জামালপুরের ভাঙা বাসন্তী প্রতিমার ছবি ছেপে 'সন্ধ্যা' বলছে—মুখোমুখি লড়াই চালাতে গিয়ে ফুলার পরাস্ত হয়েছিল। তাই আজ ফিরিঙ্গীরা কায়দা পালটে লড়াই চালাচ্ছে। কয়েকখানা ম্যানচেষ্টারের কাপড় বেচবার জন্য তারা এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যত। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে ফিরিঙ্গী গুণ্ডারের আঁতে ঘা লেগেছে, তাই তারা ক্ষেপে গেছে। জামালপুরের কাণ্ডের পরেও ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর দলের লোকেরা চাঁদা তুলছেন বিলাতে তার পাঠাবার জন্য। ঐ টাকায় পাঁচশ' লাঠি ও পাঁচশ' বোমা সংগ্রহ করলে অনেক কাজ হ'ত। কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে আমাদের ছেলেরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাদের ব্যবহারে আমাদের মনে আশার উদয় হয়েছে। 'বন্দে মাতরম' বলছে, বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে জামালপুরের ব্যাপার তার প্রত্যক্ষ ফল। সরকার পক্ষ তাদের মুখোস ফেলে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাদের নীতি হ'ল— "টু গিভ স্কোপ ফর এণ্টি-স্বদেশী ভায়োলেন্স, এণ্ড দেন পানিশ দি স্বদেশীষ্টস্ ফর দি ক্রাইম অব সেলফ-ডিফেন্স অর সিমপলি ফর দি ক্রাইম অব বিইং এসলটেড" (স্বদেশীওয়ালাদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদিগকে উস্কাইয়া দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার জন্য অথবা শুধু আক্রান্ত হইবার অপরাধের জন্য স্বদেশীওয়ালাদের শাস্তি দেওয়া)।

এবার 'যুগান্তরে'র বক্তব্য শোন—পায়োনিয়ার ভয় দেখিয়েছে ইংরেজের চরিত্রে 'লিওনাইন এলিমেণ্ট' ঘুমিয়ে আছে, অতএব সাবধান। কিন্তু আমরা আজ দেখছি যে, ইংরেজ শৃগালের চেয়ে বড় জানোয়ার নয়। সরল, অশিক্ষিত মুসলমানদের শিখণ্ডী খাড়া করে নিরস্ত্র ভারতবাসীর সঙ্গে যারা লড়াই চালাচ্ছে তাদের বাঘ বা সিংহ বলা বাঘ ও সিংহের পক্ষে মানহানিকর। ইংরেজ বাঘ নয়, সে সয়তান। এক হাজার বাঘ জামালপুরে ছেড়ে দিলেও সেখানে যা ঘটেছে তা ঘটত না। হিন্দু, এখনও কি তোমরা শান্তির মোহে আচ্ছন্ন থাকবে? ধনী ভারতবাসীরা, ভবিষ্যতে ইংরেজরা একদিন লুঠে নেবে এজন্য এখনও কি তোমাদের ধন যক্ষের মত আগলে রাখবে? লোক তৈরেরী হচ্ছে কিন্তু লড়াইয়ের রসদ কোথায়? উপযুক্ত অর্থ পাওয়া গেলে হিন্দু মেয়েদের ছোরা হাতে নিয়ে জঙ্গলে, পুকুরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হ'ত না। হিন্দুদের এই অপমান, তাদের ওপর এই অত্যাচারের জন্য দায়ী কে? দায়ী ইংরেজ। কার ওপর এর প্রতিশোধ নিতে হবে? ইংরেজের ওপর।

যুগান্তরের বক্তব্য শুনাইয়া ডাঃ চক্রবর্তী নীরবে ধূমপান করিতে

লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—একটা মজার কথা বলছি। হিন্দুদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকখানা হিন্দু কাগজ কি রকম উপদেশ দিয়েছে শোন। একখানা কাগজের কথায় মণ্ড মিণ্টো যদি পূর্ব্ববঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের সংযত না করেন ও শাস্তি না দেন হিন্দুদের সম্মুখে তিনটি পথ খোলা রয়েছে। প্রথম পথ হচ্ছে জামালপুর ও ঐ রকমের অন্য সব অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে যে সব শহরে ও গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে চলে আসা। এর পরেও যদি তাদের উপর উৎপীড়ন চলে তা হলে এ দেশ ছেড়ে তারা আফগানিস্থানে চলে যাবে। আমীর হবিবুল্লার রাজ্যে আর কিছু না হোক তাদের ধর্ম্মরক্ষা হবে। মুসলমানের ভয়ে দেশত্যাগ করবার বিস্ময়কর আইডিয়া দু'তিনখানা কাগজে দেখছি। একখানা কাগজের পরামর্শ হচ্ছে রাজনীতির সংস্রব বর্জ্জন করে হিন্দুরা পূর্ব্বপুরুষদের মত সাধাসিধে সরল জীবন যাপন করতে পারে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী টেবিলের ডান দিকের টানা খুলিয়া কি খুঁজিতে লাগিলেন। দেবানন্দ ভাবিতেছিল—এই আমার দেশ আর আমার দেশবাসী। আমার প্রতিবেশী যদি আমার শত্রু হয় বিদেশী শাসকের ইঙ্গিতে, আমার সর্ব্বনাশ করিতে একটু ইতস্ততঃ না করে কি করিয়া আমরা বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করিব? ঘরের শত্রু ও বাহিরের শত্রুর সঙ্গে কি একসঙ্গে লড়াই করা সম্ভব?

মৃণাল উঠিয়া দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি আসছি। সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী অনেক খুঁজিয়া একখানি কাগজ বাহির করিলেন। বলিলেন—এই অপূর্ব্ব ইস্তাহারখানা শোন দেবানন্দ। "বহুত জরুরী খবর। বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে ও মফস্বলে যে সকল মোছলমান বাস করে মনে কোন শাস্তির ভয় না রাখিয়া তাহারা জোরপূর্ব্বক হিন্দুদের বিধবা ও অবিবাহিত স্ত্রীলোকদের নিকা করিবে ও পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত করিবে। কেবল সধবা স্ত্রীলোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে। নিকা করিবার পূর্ব্বে রাজদ্রোহী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিবে না। তাহারা জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়। তোমরা হিন্দুদের উপর, তাহাদের ধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিলে সরকার বাহাদুর তাহা গোচরে আনিবেন না। হিন্দুরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে সরকার বাহাদুর পুলিসের দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন। কোন ভয় না করিয়া এই মত কর্ম্ম করিয়া যাও। এই হইল হিন্দু-গুণ্ডাদের রাজদ্রোহ ও স্বদেশী আন্দোলনের শাস্তি। ১৫ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গদেশের সরকার বাহাদুর ও নবাব সলিমুল্লাহের নামে এই ইস্তাহার ছাপা হইল।"

পড়া শেষ হইলে ডাঃ চক্রবর্ত্তী কাগজখানা ভাঁজ করিয়া ড্রয়ারের মধ্যে রাখিলেন। আরও কয়েকখানা ঐ রকম কাগজ ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া দেবানন্দকে দেখাইয়া বলিলেন—ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে এগুলো মূল্যবান দলিল। কি ভাবে দেশের বডি পলিটিকে একটা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি শিকড় গেড়ে চলেছে তার নিদর্শন এগুলোতে পাওয়া যাবে। আমাদের নেতাদের অনেকে আত্তাতের বড় ভক্ত, যে কোন উপায়ে আত্তাত হলেই স্বর্গরাজ্য ভারতবর্ষে নেমে আসবে এই তাঁদের ধারণা। তাঁদের বিশ্বাস করতে পারা যায় না, নইলে ডকুমেণ্টগুলো তাঁদের হাতে দিয়ে যেতাম ফর ফিউচার রেফারেন্স। এগুলোর মধ্যে দেওয়ানগঞ্জে বিলি করা হিন্দুদের ঘরবাড়ী আক্রমণ করবার জন্য ইস্তাহার, মাদারের চক, পুলকাদিতে যা বিলি করা হয়েছিল সেই লুঠের নোটিশ, লাল ইস্ত'হার প্রভৃতি আছে। লাল ইস্তাহারের আসল নাম হচ্ছে "স্বজাতি আন্দোলন", মৈমনসিংহের টোঙ্গাপাড়া থেকে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের পক্ষে ইব্রাহিম খাঁর রচিত। ৪০নং কড়েয়া গোরস্থান, কলকাতা থেকে কলকাতার মুসলমানদের মধ্যে এই ইস্তাহার বিলি হয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী চুপ করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন—আমি অন্য কথায় এসে পড়েছি। গবর্ণমেণ্ট ও মুসলমান এই দুই পক্ষের কমবাইণ্ড এটাকের ফলে হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অসহায় অবস্থা খানিকটা রিয়ালাইজ করেছে মনে হয়। তারা সাহায্যের জন্য চারদিকে চেয়ে দেখছে। একখানা কাগজ বলছে—পূর্ব্ববঙ্গে আজ ঘোর অরাজকতা। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা এই অবস্থায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়েছে। সেখানকার বীভৎস অত্যাচার বন্ধ না হলে বাঙালীরা সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করবে। অন্য একখানা কাগজ বলছে, পূর্ব্ববাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু ভারতবর্ষে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। ভারতবর্ষের ছয় কোটি মুসলমান লাঠির ঘায়ে চিরকাল হিন্দুদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে বাঙালী হিন্দুদের মাথায় আজ লাঠি পড়ছে। অন্য প্রদেশের লোকেরা এটাকে স্থানীয় বা প্রাদেশিক ব্যাপার বলে উপেক্ষা করছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতার অপমান এই দেশের লোকে বরাবর উপেক্ষা করিতে পারে না। গোটা ভারতবর্ষে এক বার আগুন জ্বলে উঠলে মুসলমানের লাঠি, গুর্খার কুকরি ও গোরার মাস্কেট মিলে সে আগুন নিবাতে পারবে না।

জামালপুরের মাড়োয়ারীরা বিকানীরের মহারাজার কাছে তার পাঠিয়েছে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করে অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য। ক্রমশঃ

"সবৈ ভূমি গোপালকী"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যত ভূমি দেখো গোপালেরই সব।
ভূস্বামী ব'লে যে করে গরব—
পরধনে সে তো করে পোদ্দারি।
সবাই আমরা সন্তান তাঁরই।
তাঁর ধনে কার নেই অধিকার?
তাঁর রোদ্দুর করে কি বিচার
জাতিধরমের? অরুণ-কিরণ
পড়ে না কোথায়? তাঁর সমীরণ
ছোট ও বড়োতে করে না প্রভেদ;
হেরো, ভাগীরথী ঘুচাইছে ক্লেদ
সব মানুষের। বিধাতার জল
কার দেহ বলো করে না নির্মল?
কার তৃষা নাহি করে নিবারণ?
আকাশ কারও কি একেলার ধন?
আকাশ, বাতাস, আলো আর বারি—
কে বলে ইহারা কেবল আমারই?
আর কাহারেও ভাগ নাহি দিব?
দুনিয়ায় একা আমিই বাঁচিব?

ক্ষিত্যপতেজব্যোম ও মরুৎ—
সকলেরই তরে এই পঞ্চভূত।
আকাশ-আলোক-জল-বায়ু—চায়
—এ সকলে যদি থাকে অধিকার
সব মানুষের, ভূমিতে কেবল
দু'চার জনের রহিবে দখল?

বিধাতা কখনো একচোখো নন;
সমদর্শী তিনি—ন্যায়পরায়ণ।
সর্বভূতের প্রাণের যে প্রাণ
বলিতে চাও কি তাঁর সব দান
শুধু কতিপয় মানুষের লাগি?

কেন করো তাঁরে কলঙ্কভাগী
অপাপবিদ্ধ যিনি অমলিন,
সমভাবে যিনি সর্বত্র আসীন?
কালিমা তোমার, কালিমা আমার,
কালিমা তাদের যারা বিধাতার

নিজস্ব ধন আত্মসাৎ করে,
যাহারা খোদার মাটির উপরে
স্বীকার করে না আর কারও দাবি।
ভেবেছি কি মোরা বলে হাবিজাবি
সত্য যা—তারে রাখিব আড়ালে?
সূর্য্য রহিবে ঢাকা মেঘজালে?
শুনিতে কি পাও কণ্ঠে বিনোবার
যুগ-দেবতার বীণার ঝঙ্কার?
ধন-সাম্যের দামামার রব
শোন কান পেতে, ওরে, জরদগব।
ইতিহাস নিয়ে করিও না খেলা;
নর-সিংহেরে মারিও না ঢেলা।
সে যখন জাগে—সব তোলপাড়;
হিরণ্যকশিপু দেখে অন্ধকার।
রক্তসাগরে তরঙ্গ তুলে
আসে বিপ্লব; ওঠে দুলে দুলে
প্রাণের বন্যা শিরায় শিরায়;
জারের গৌরব-রবি অস্তে যায়;
চ্যাঙ-কাই-শেক দিগন্তে বিলীন;
মাও-সেতুঙের জাগে নবচীন।
কোথা মুসোলিনী? কোথা হিটলার?
ফারুক পালায় সাগরের পার।

মানুষ তো নয় মাংস কেবল।
মাটির ভিতরে করে জলজল্
আগুনের শিখা; অত্যাচারীরে
যত দিন পারে সয় নত শিরে।
তার পরে কবে ধৈর্য্যের বাঁধ
ভেঙে যায়, ওঠে ডমরু-নিনাদ;
মরণ-নৃত্য হয়ে যায় সুরু;
প্রলয়ের মেঘ ডাকে গুরুগুরু;
আগ্নেয়গিরি করে উদ্গার
তরল-বহ্নি, জাগে হাহাকার
দিগ্ দিগন্তে; গৃহকাজে মেতে
ছিল যে-মানুষ ঘরের কোণেতে
সহসা তাহার এ কি রূপান্তর!
কোথায় পিছনে পড়ে থাকে ঘর!

কোথা পড়ে থাকে ক্ষেত ও খামার !
কানে বাজে শুধু রণদামামার
ধ্বনি গুরু গুরু ; চোখে বিদ্যুৎ ;
হাতে হাতিয়ার ; অতীতের ভূত
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লবী ধায়
বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মাদনায় ।
রক্তে রাঙিয়া ওঠে 'গিলোটিন' ;
আসে ইতিহাসে প্রলয়ের দিন ;
ঝটিকার শেষে শান্ত আকাশ ;
সুরু হ'য়ে যায় ফের চাষবাস ;
হাতিয়ার ফেলে কিষাণ আবার
ঘরে ফিরে এসে পাতে সংসার ।
ভাবের সুরায় ছিল যে মাতাল—
গৃহকাজ নিয়ে কাটে তার কাল ।
তাই বলি শোন ওরে উন্মাদ—
বৈষম্যের ভেঙে ফেল বাঁধ ;
পাতালপুরীর আঁধারে যাহারা
আছে দারিদ্র্যে সর্বহারারা—
ফসল ফলায়—তবু উপবাসী !

ইহাদের মুখে তৃপ্তির হাসি
ফোটাও, ফোটাও। যাহা বিধাতার
তাহাতে সবারে দাও অধিকার ।
গোপালের ভূমি গোপালেরে দাও ;
নিজে বাঁচো আর সবারে বাঁচাও ।
সর্বোদয়ের অমরাবতীর
স্বপ্ন রবে কি কেবল কবির
অন্তরলোকে ? ধনী-নিঃস্বের
এই ব্যবধান রবে বিশ্বের
ভাগ্য-আকাশে ধূমকেতু-প্রায় ?
বারে বারে, হায়, রক্তধারায়
কলঙ্কিত কি হবে ইতিহাস ?
মেঘমুক্ত কি হবে না আকাশ ?
মানুষে মানুষে এই ব্যবধান
ঘুচিবে না কভু ? বিধাতার দান
জনকয়েকের রবে অধিকারে ?
দেখা কি দেবে না আঁধারের পারে
ধন-সাম্যের নূতন তপন ?
হবে না সত্য কবির স্বপন ?

বাংলাদেশের মন্দির

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

২

ইতিপূর্ব্বে বাংলাদেশের মন্দিরের বিভিন্ন শ্রেণী ও উপবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।* এক্ষণে প্রধান শ্রেণী-সকলের সংজ্ঞা নির্ণয় এবং উপবিভাগগুলিরও বিভিন্ন প্রকার-ভেদ সম্পর্কে কিছু বলিতেছি। প্রাচীন মন্দিরগুলিই আমাদের আলোচ্য।

বাংলাদেশে স্মরণাতীত কাল ধরিয়া প্রচলিত মাটির চার-চালা ঘর, আটচালা মণ্ডপ, দোচালা ঘর বা মণ্ডপ এবং খিলান বা কড়িবরগার সাহায্যে নির্ম্মিত সমতল ছাদযুক্ত অট্টালিকার পরিকল্পনা হইতেই নিজস্ব রীতির মন্দিরসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। নিজস্ব রীতির সহিত বৈদেশিক রীতির সংযোগে মিশ্র রীতির উৎপত্তি হয়। বাংলা ও ভারতের বহির্ভূত অঞ্চলে প্রচলিত মন্দির, মসজিদ ও গীর্জ্জার আদর্শেই বৈদেশিক রীতির প্রচলন। এই সকল রীতির পরস্পর মিশ্রণে বিভিন্ন উপরিভাগ কল্পিত।

মাটির ঘরের মেঝে, চারিদিকের গাং দেয়াল ও দাওয়া হইতে সকল রীতির মন্দিরের কুট্টিম বা পীঠ, সমচতুষ্কোণ চারিটি দেয়াল হইতে উহাদের প্রাচীর এবং উল্টানো নৌকার মত কাঠামোর খোড়ো অথবা পাতার চালের আদর্শ হইতে নিজস্ব রীতির মন্দিরগুলির উপরিভাগ গঠিত।

চতুঃশাল বা চারচালা মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ মেটে ঘরের চারিটি চালের আদর্শে নির্ম্মিত। উহাতে খিলানের ব্যবহারই দেখা যায়। চারি চালের মধ্যভাগ কাটা বা উপরি-উপরি দুইটি চারিচাল হইলে আটচালা হয়—অষ্টশাল মন্দিরের উহাই আদর্শ।

পাশাপাশি দুইটি চালে বিশাল এবং উহাদের দুইটির সংযোগে যোড়বাংলা গঠিত হয়। থামযুক্ত বা থামহীন খিলান অথবা কড়ির দ্বারা নির্ম্মিত ছাদই সমতল ছাদযুক্ত

---

* প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৮

মন্দিরের লক্ষণ; উহার অপর নাম চাঁদনী প্রাসাদ, সৌধ, বেশ্ম বা অট্টালিকা।

সোয়াদার লিপিযুক্ত দেউল।
[ফটো—শশাঙ্ক ভরোয়াল

নিজস্ব রীতির চতুঃশাল মন্দিরের তিনটি ঢং এদেশে দেখা যায়। প্রথমটি অলঙ্কারহীন সমতল ঢালু ছাদযুক্ত; দ্বিতীয় ঐরূপ ঢালু ছাদে খাঁজ, তৃতীয় উৎকল-রীতির সহিত মিশ্রিত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল-জাতীয় নক্সার দেয়ালের উপর ঐ নক্সার চতুঃশাল। প্রথমটির উদাহরণ নদীয়ার পালপাড়া, মুর্শিদাবাদের খাগড়া ও মেদিনীপুরের ঘাঁটালে আছে। কলিকাতার শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের পশ্চিম দিকের উত্তরাংশে দ্বিতীয়টি ও মেদিনীপুরের দাসপুর থানার ঘনশ্যামবাটীতে ও শিমুলিয়ায় তৃতীয়টির নিদর্শন বর্ত্তমান। ঘাঁটালে একই আকারের দুইটি চতুঃশাল সামনাসামনি অবস্থিত। উহাদের একটি দেউল অপরটি জগমোহন। শিবনিবাসের চতুঃশাল শিবমন্দিরটি উচ্চতা ও গঠনবৈশিষ্ট্যে অভিনব।

বাংলাদেশে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর কাটা চালের আটচালাই বেশী দেখা যায়। ঐরূপ কাটা চালের অষ্টশাল মন্দির মেদিনীপুরের কর্ণগড় ও চন্দ্রকোণার নিকটস্থ বাঁকা নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। অষ্টশাল বা আটশালা মন্দিরের সংখ্যাই বাংলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক স্থানে উহারা যুগ্ম, একশত আটটি একত্রে অবস্থিত। প্রত্যেকটিতে পৃথক শিবলিঙ্গ থাকে, কিন্তু ঘাঁটালের নিকটস্থ

কাটামের এরূপ যুগ্ম মন্দিরের একটি দেউল অপরটি জগমোহন; দেউলে একটি দেবতা।
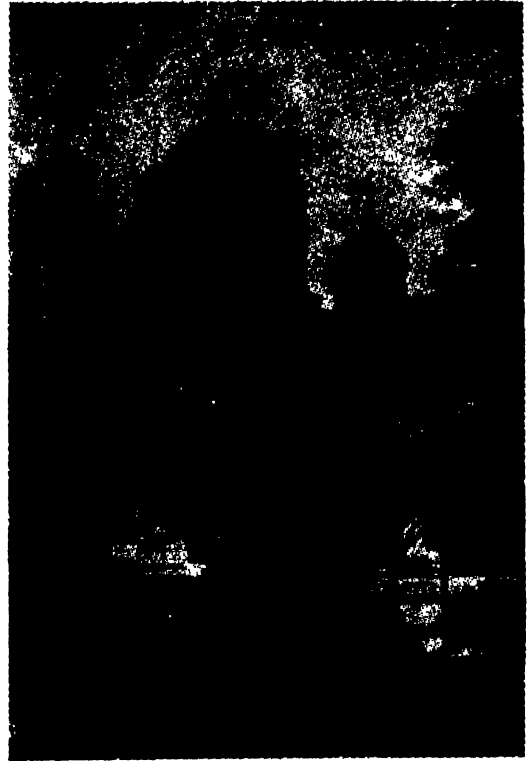
মেদিনীপুর ডেবরা-ত্রিলোচনপুরের বিশিষ্ট খাঁজযুক্ত চতুঃশাল চূড়া পঞ্চরত্ন মন্দির

চূড়া, চাল, থাম ও তলভেদে অষ্টশাল মন্দিরের প্রকারভেদ আটটি। একচূড়, ত্রিচূড়, কাটাচাল, আটচাল, থামহীন, থামযুক্ত, একতল ও দ্বিতল। একচূড় অষ্টশালে আমলার উপর কলস তদুপরি ত্রিশূল। ত্রিচূড়ের মধ্যেরটিতে আমলা ও কলস, দুই পাশে ত্রিশূল ও চাঁদা। কাটাচালের উপরের চারটি চাল নীচের চারটির সহিত প্রায় সংলগ্ন—আটচালার উপর নীচের চালগুলির মাঝে ব্যবধান। থামহীন অষ্টশালের অলিন্দ বা বারান্দা নাই—একেবারেই দ্বার। থামযুক্ত অষ্টশালে অলিন্দের সম্মুখে, দ্বারের দুই পাশে দুইটি পুরা থাম ও দেয়ালে সংলগ্ন দুইটি আধা থাম। একতল অষ্টশালের উপরের চতুঃশালের নীচে কোন কক্ষ নাই—দ্বিতল অষ্টশালে উপরের চতুঃশালের নীচে কক্ষ ও নীচের চতুঃশালের উপরের চারিদিকে ক্ষুদ্রপরিসর অলিন্দ। উপরের কক্ষে ক্ষুদ্র দ্বার ও ভিতরে বেদী—ঐ তলে উঠিবার কোন সোপান নাই। যুগ্ম ও দ্বাদশ অষ্টশাল একত্র থাকার কথা পূর্ব্বে

বলিয়াছি—কোন কোন স্থানে একত্র একশত আট অষ্টশালও আছে। অষ্টশালসমূহের মধ্যে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির

জগমোহনযুক্ত দেউল—বঙ্গোৎকল মিশ্ররীতি।
[ফটো—নারায়ণচন্দ্র মান্না

ও কলিকাতার নন্দরাম সেনের মন্দিরের ন্যায় বৃহৎ মন্দির বাংলাদেশে আর নাই। গড়ভবানীপুরের মণিনাথের মন্দির প্রাচীনতম লিপিযুক্ত, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র। মেদিনীপুর জেলায় একচূড় অষ্টশালের সংখ্যা বেশী। হাওড়া ও কলিকাতার সকল অষ্টশালই ত্রিচূড়। কর্ণগড় ও বাঁকার অষ্টশালে কাটা চাল। অন্যান্য স্থানে উহারা আটচালা। থামহীন একতল অষ্টশালই (৯নং ও ১১নং চিত্র) বাংলাদেশে বেশী। নন্দরাম সেনের মন্দির প্রভৃতি অষ্টশালগুলি থামযুক্ত ও দ্বিতল। যুগ্ম সিংহ ও পুত্তলিকাবিন্যাস ভেদে সকল অষ্টশালেরই আরও চারিটি রীতি আছে। সিংহহীন, দ্বারশীর্ষে যুগ্ম সিংহ (৮নং চিত্র) অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধরণে এক পংক্তি পুত্তলিকা, ঐরূপ ভাবে দুই পংক্তি পুত্তলিকা (১০নং চিত্র)। সকল অষ্টশালই আবার কোণের অলঙ্কার ও অলঙ্কারহীনতা ভেদে দুই প্রকার। উহারা সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে অবস্থিত। শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের অষ্টশালের পাঁচটি চূড়া। ইহা অষ্টশাল শ্রেণীর বৃহত্তম মন্দির।

দ্বিশাল ও জোড়বাংলা মন্দির বাংলাদেশে বহু স্থানেই আছে। মেদিনীপুর পাঁশকুড়ার মঙ্গরদীঘি ও দাসপুরের রাণীচকে এই শ্রেণীর মন্দির দুইটি দেখা যায়। কলিকাতায় এই রীতির মিশ্র মন্দির আছে। বাগবাজারে একটি বিশাল মন্দিরও আছে।

সমতল ছাদযুক্ত বা প্রাসাদশ্রেণীর মন্দিরের মোটামুটি প্রকারভেদ পাঁচটি। খিলানের ছাদযুক্ত, কড়ির ছাদযুক্ত,

মেদিনীপুর কলমিজোড়ের একটি পঞ্চরত্নের পুত্তলিকাবিন্যাস
[ফটো—নারায়ণচন্দ্র মান্না
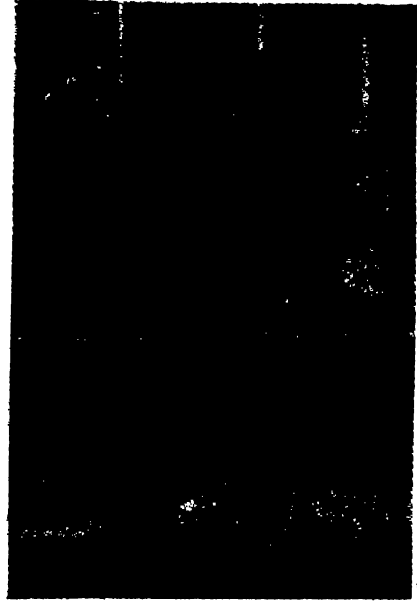
জোড়াথামযুক্ত, এক থামযুক্ত ও থামহীন। অধিকাংশ বাঙালীর গৃহদেবতার মন্দির এই রীতিতে গঠিত। অলঙ্কারবিন্যাস প্রভৃতিভেদে ইহাদের বিবিধ শ্রেণীনির্ণয় দুঃসাধ্য।

নিজস্ব রীতির মন্দিরের পীঠ, কুট্টিম ও প্রাচীর বা দেয়ালের উপর বৈদেশিক রীতির মন্দিরের আদর্শে চূড়া গঠিত হইলে, উহাই মিশ্ররীতি হয়। একুশরত্ন মন্দির বাংলাদেশে বোধ হয় একটিই ছিল ; উহা ছাড়া মিশ্ররীতির তিনটি ঢঙের মন্দিরও এদেশে দেখা যায়। একরত্ন বা আলগোছচূড়া, পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন। একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দির দ্বিতল এবং নবরত্ন ত্রিতল হয়। উহাদের সবগুলির সিঁড়ি থাকে না। ইহাদের সকলেরই প্রকারভেদ প্রধানতঃ দশটি। ছত্রাকার চূড়া, দেউলচূড়া, চতুঃশালচূড়া, পিরামিড চূড়া, খাঁজযুক্ত দেউল চূড়া, খাঁজযুক্ত চতুঃশাল চূড়া, চারি পাশে থাম, এক পাশে থাম, সোপানযুক্ত ও সোপানমুক্ত। এই তিন শ্রেণীর সবগুলি মন্দিরের চূড়াই উৎকলীয় রীতির দেউল ও নিজস্ব রীতি চতুঃশালের আদর্শে গঠিত।

হাওড়া জেলায় গড়ভবানীপুরে ভুরশুটের প্রাচীন রাজ-

পরের আলগোছটুঙ্গী মন্দির সোপানযুক্ত ছিল। ঐরূপ মন্দির মেদিনীপুরের ডেবরা থানার পুস্তাপাটে ও দাসপুরে আছে। দাসপুরের চৌধুরীদের এই শ্রেণীর মন্দিরটির চূড়া চন্দ্রাকার; রাধাকান্তপুরের দাসেদের মন্দিরের দেউলচূড়া, বনিহারপুরের রামদেব মন্দিরটির ছত্রাকার চূড়া—কোণে খাঁজ।

পুত্তলিকা ও লিপিযুক্ত পঞ্চরত্ন এবং প্রাসাদ।

[ফটো—শ্রীললিতমোহন মণ্ডল

পঞ্চরত্নে সিঁড়ি ও থাম ডেবরা থানার গোলগ্রাম ও পুস্তাপাটে আছে। ডেবরা থানার ত্রিলোচনপুর গ্রামের ৺আনন্দময়ী শীতলা মাতার দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মন্দিরটি খাঁজযুক্ত চতুঃশাল চূড়ার নিদর্শন। ঘাঁটাল নবগ্রামে ও পূর্ব্বোক্ত সুতাপাঠের পঞ্চরত্নে দেয়ালের সহিত সমান্তরাল ভাবে ও অন্য প্রকারে নানা গুপ্ত কক্ষ আছে। সাধন ও ধনরক্ষার উদ্দেশ্যে ঐগুলির প্রয়োজন। দেউলচূড় পঞ্চরত্ন নানা স্থানে আছে।

চেতুয়া বাসুদেবপুরের (পোঃ শঙ্করপুর মেদিনীপুর) ৺মহাপ্রভুর নবরত্ন থামও সোপানযুক্ত। পাঁশকুড়া নন্দর দীঘির নবরত্ন সম্ভবতঃ জেলার মধ্যে উচ্চতম ছিল—সংস্কারকালে উচ্চতা হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা, দক্ষিণেশ্বর ও দিনাজপুর কান্ত নগরের এরূপ নবরত্নের চারিপাশেই থাম ও অলিন্দ। অন্যান্য স্থানেও এরূপ নবরত্ন আছে।

বৈদেশিক উৎকলীয় রীতির মন্দির অনেক স্থানে বাংলার নিজস্ব রীতির সহিত মিশ্রিত দেখা যায়। খাঁটি উৎকলীয় রীতির মন্দির—মেদিনীপুরের গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা, চন্দ্রকোণার গিরিধারীলাল, ধলহরার বটেশ্বর, কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া, মাড়তলার সত্যেশ্বর, হাওড়া খাঁন্নার পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবতার পীঠস্থানে আছে। পদ্মাতীরে কেদার রায়ের মাতার সমাধিমন্দিরটিও এই রীতির ছিল। এক্ষণে উহা পদ্মাগর্ভে বিলীন। বীরভূম কেন্দুবিল্বের ইন্দ্রাই ঘোষের দেউলটিও এই শ্রেণীর নিদর্শন। কলিকাতার ২০নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে এই শ্রেণীর একটি নূতন মন্দির হইয়াছে।

এই শ্রেণীর মন্দির বাংলার নিজস্ব রীতির সহিত মিশিয়া গিয়া দুইটি প্রকারভেদ পাইয়াছে। একটি একক, অপরটি জগমোহনযুক্ত। শীর্ষদেশে ক্ষুদ্রাকারের আমলা ও দেউলপৃষ্ঠে চতুঃশাল চণ্ডের বেড় এই শ্রেণীর প্রধান লক্ষণ। সম্ভবতঃ চন্দ্রকোণার নিকটস্থ কুঁয়াই গ্রামের নেড়া দেউল এই মিশ্র উৎকল শ্রেণীর প্রথম মন্দির। ৺কামেশ্বরের এই মন্দিরটির সম্পর্কে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বাংলার সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া।" ইহাতে জানা যায়, এই মন্দির এক সময় বাংলা ও উড়িষ্যার সীমানির্দ্দেশ করিত। বহু স্থানের পরগণা বা দণ্ডপাট নামক দেশবিভাগের ত্রিসীমানায় এই শ্রেণীর মন্দির দেখা যায়। পীঠের উপর হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভদ্র শ্রেণীর মণ্ডলের নক্সা, কার্ণিসের উপর ঐ নক্সাতেই চতুঃশাল—এই শ্রেণীর মন্দিরের গঠনরীতি। তমলুকের বর্গভীমার মন্দির ও মেদিনীপুরের জগন্নাথ-মন্দির জগমোহনযুক্ত। এই শ্রেণীর একক মন্দিরের সংখ্যা মেদিনীপুরের শহর ও পল্লীতেই বেশী। অপর স্থানের মন্দিরগুলির চেয়ে মেদিনীপুর শহরের মন্দিরসমূহ উচ্চতর। যাহাদের জগমোহন আছে তাহাদের ঐগুলি উড়িষ্যার মন্দিরের অনুরূপ নহে—ক্ষুদ্র ও খাঁজযুক্ত চতুঃশালাকৃতি এবং ভিতরের পরিসরও অল্প।

উত্তর-ভারতীয় রীতির কোন মিশ্রভেদ বাংলাদেশে দেখা যায় না। হাজারীবাগের মন্দির, অযোধ্যার মহারাজার মন্দির, বুদ্ধগয়ার মন্দির উত্তর-ভারতীয় রীতির মন্দিরের সহিত বাংলার পঞ্চরত্ন রীতির মিশ্রণ। বুদ্ধগয়ার প্রাচীন বুদ্ধ মন্দিরটির রত্নগুলির গঠন দক্ষিণ-ভারতীয় গোপুরম ধরণের বলিয়া মনে হয়। বাংলার পঞ্চরত্নের রত্নগুলির সহিত এই সকল মন্দিরের রত্নগুলির গঠন ও অন্তরালে ভেদ আছে।

ইসলামীয় রীতির সহিত উৎকলীয় রীতির মিশ্রণ চেতুয়া বাসুদেবপুরের গুলাব দত্তের মন্দিরে দেখা যায়। খড়্গাপুরের খড়্গেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটে একটি গম্বুজযুক্ত ইসলামীয় রীতির মন্দির আছে। মুর্শিদাবাদ লালগোলা রাজবাটীর সত্যনারায়ণের মন্দির মুসলমান মিস্ত্রীর দ্বারা ইসলামীয় রীতিতে নির্ম্মিত। উহা দেওয়ানী আম বা দেওয়ানী খাসের অনুরূপ চকমিলান মণ্ডপ।

নবদ্বীপের পোড়ামার মন্দির ও শিবনিবাসের রামসীতার মন্দির খ্রীষ্টীয় বা বিলাতী রীতির সহিত মিশ্রিত অষ্টশাল। উহাদের চতুঃশালদ্বয়ের দীর্ঘ ব্যবধান লক্ষণীয়।

একটি [illegible] সিংহযুক্ত প্রাসাদ রীতির মন্দির ;
[ফটো—শ্রীরামপদ মণ্ডল]

বাংলাদেশে মূল রীতির মন্দিরসমূহের অসংখ্য উপভেদ দেখা যায়। মূল রীতি ছাড়া কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরে ভিন্ন প্রকার রীতিবৈচিত্র্য আছে। উহাদের সংজ্ঞা ও ঢং নির্ণয় করা কঠিন। ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির, নদীয়া শিবনিবাসের শিবমন্দির প্রভৃতি অভিনব রীতিতে গঠিত। মেদিনীপুরের নাড়াজোলের রাজগণের সমাধি-মন্দিরগুলির গঠনরীতিও অভিনব। ঘাঁটালের জলসরার একটি দ্বাদশশাল মন্দির আছে।

যে সকল মন্দিরের চিত্র দেওয়া হইয়াছে সেগুলি এবং চিত্রোক্ত ও অন্যান্য মন্দিরের অবস্থিতি মেদিনীপুর জেলার কটক রাস্তার, মেদিনীপুর হইতে উনিশ মাইলের দক্ষিণাংশে ও উত্তরাংশে ঘাঁটাল-বিষ্ণুপুর রাস্তার আট মাইল পোস্টের নিকটবর্ত্তী স্থান কলমিঘোড়ের মধ্যে আঠার মাইলব্যাপী স্থানে। প্রথমটা লোয়াদা গ্রামের উৎকলরীতির জগমোহনযুক্ত বিরাট দেউল। জগমোহনের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর গাত্রে দুই সারিতে রামলীলা, চণ্ডী আখ্যান প্রভৃতি অবলম্বনে উৎকীর্ণ পুত্তলিকা। তিন সারির খোপে দশাবতারাদির মূর্ত্তি। দুই সারি পুত্তলিকার উপরিস্থ সারিতে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধামূর্ত্তি। দেউলগাত্রেও জগমোহনে নক্সা ও অলঙ্কার। দেউলের পিছনের গাত্রেও বৃহদাকার মৎস্যাদি অবতার মূর্ত্তি। জগমোহনের সম্মুখভাগে মর্ম্মরফলকে নিম্নোক্ত রেখালিপি :

৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ সন ১২৬৫ বারশও পৌসটী সাল তারিখ ৪ কার্ত্তিক আরম্ভ সন ১২৬৭ বারশও সাতসটী সাল তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ সমাপ্ত শ্রীমহেন্দ্র সূত্রে

যুগ্মসিংহ ও সীতারাম মূর্ত্তিযুক্ত সাধারণ অষ্টশাল ;
[ফটো—নারায়ণচন্দ্র মান্না
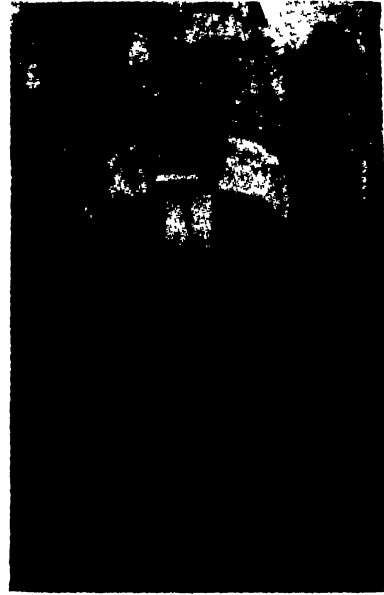
শীর্ষে আমলার উপর দুইটি বড় ও ছোট কলসের উপর ভাঁজ-করা বিষ্ণুচক্র। উৎকলীয় রীতির মন্দিরে এরূপ পুত্তলিকা বিন্যাস বাংলাদেশে বিরল। চিনি ও মিছরির ব্যবসায়ে ধনী মোদক সৃষ্টিধর চৌধুরী এই মন্দির নির্ম্মাণ করান, কিন্তু গৃধ্র-কুলের উপবেশন ও বজ্রপাতনের জন্য ইহাতে কখনও দেবতা প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বর্ত্তমানে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতার বংশ লুপ্ত।

লোয়াদা গ্রামটি ঘাঁটাল রোডের উনিশ মাইলের নিকট কংসাবতী বা কল্যাণ রায়ের খালের পারে অবস্থিত। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। একসময় চিনি ও মিছরির ব্যবসায়ে এখানকার মোদক জাতি সমৃদ্ধ হইয়া স্থানটিকে শহরে পরিণত করিয়াছিলেন। বিদেশী শাসকের প্রভাবে ব্যবসায়লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব গৌরবও গিয়াছে। অপূর্ব্ব পুত্তলিকা ও অলঙ্কারমণ্ডিত আরও কয়েকটি মন্দির অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এখনও টিকিয়া আছে। নিকটে একটি নির্ম্মল জলাশয়ের পাকা ঘাটের পাশে দুইটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মন্দির। পশ্চিমেরটি নবরত্ন শিবালয়, নানা সুঠাম পুত্তলিকার

সহিত খানে নৌকা—ঢেঁকিবাহন নারদও আছেন। ইহার লিপির ফলক : শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শকাব্দা ১৭৪১ সন ১২২৭ সাল ২ অঘাণে আরম্ভ করি। শ্রীলোচন চন্দ, শ্রীবিন্দ্,বন চন্দ কারি (কর) সাং দা (সপুর)।—পঞ্চরত্নটি খাঁজযুক্ত দেউলচূড়, সুঠাম পুত্তলিকা ও অলঙ্কার মণ্ডিত। তিনটি খণ্ড ও দুই সারিতে পুত্তলিকা, দুইটি ফলকে লিপি। ১নং ফলক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সন ১২১২ সাল তারিখ—২নং ফলক শ্রীগোপাল শ্রীশত্রুঘন মিস্ত্রী সাকিম দাসপুর।

সর্ব্বমঙ্গলার নবরত্নের খোপ ও কোণের কারুকার্য্য
[ফটো—শ্রীপুরুষোত্তম দাস হালওয়াসীয়া

এই লোয়াদার চিনি মিছরির কারখানার জন্য প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটিত ; উহা নিবারণের জন্য ব্রহ্মা বারোয়ারী পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। উহার বিশাল ইষ্টকমণ্ডপটির সাতটি দ্বার ও থাম। প্রতি দ্বারশীর্ষে রঙের কাজ। মণ্ডপটির পশ্চিম দিকে অবস্থিতিই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মর্ম্মরফলকে লিপি : শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ শরণম্ শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুদেবাদি মণ্ডপ। শকাব্দা ১৭৬৪ বৈশাখ পৌর্ণমাস্যাং সন ১২৪৯ সাল।—বর্ত্তমানে মণ্ডপটি ভগ্ন। এই মণ্ডপের পূর্ব্ব দিকে একটি উৎকলীয় রীতির শিবালয়ে লিপি : শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সকাব্দা ১৭৬৪ সন ১২৫০ (?) সাল আরম্ভ ২৯ আসাড় কারিকর শ্রীবিন্দাবন চন্দ মিস্ত্রী সাকিম দাসপুর।—এখানে আরও মন্দির আছে।

প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে কাঁকড়া গ্রামে ভুঁইয়াদের এই অঞ্চলের বৃহত্তম নবরত্নে কোন লিপি নাই। ছয় মাইল দক্ষিণে পলাশী গ্রামে নন্দী-জমিদারগণের প্রাসাদ বা চাঁদনী রীতির মন্দিরে ১৭৪৬ শকাব্দা ও ১২৩১ সাল লিখিত। ইঁহাদের বিরাট ত্রিতল নাটমন্দিরটি দর্শনীয়। লবণ-ব্যবসায়ে ইঁহারা ধনী হন। "নন্দীর টাকা চিন্তীর পাকা" প্রবাদের নন্দী ইঁহারাই। এখানকার রাসমঞ্চ ও রাসোৎসব চিত্তাকর্ষক। নিকটে ঘোষপুর গ্রামে নিমাইচাঁদ দে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদরীতির থামযুক্ত মন্দির ও নাটমন্দির—নাটমন্দিরে লিপি শকাব্দা ১৮০৮।

লোয়াদা হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে সত্যেশ্বরের খাঁটি উৎকলীয় রীতির দেউল—বাবার কৃপায় নাকি অপুত্রকের পুত্রলাভ হয়। সাহাপুর পরগণায় এই সত্যপুরে মুকুট রায় রাজত্ব করিতেন—একজন পণ্ডিতার চতুষ্পাঠী তাঁহার অন্তঃপুরে ছিল। লোয়াদার উত্তরে কংসাবতীর তীরে পুড়াপাট গ্রামে পালেদের সুঠাম পুত্তলিকাবহুল আলগোছটুঙ্গী দুর্গা-মণ্ডপটি ভগ্নপ্রায়। উহার ভিতরে সিঁড়ি আছে। বাঁধের দক্ষিণাংশে কিছুদূরে চক্রবর্ত্তীদের উৎকলরীতির মন্দিরে পাঁচ সারি অস্পষ্ট লিপি ছিল। উহার ১২৬০টি মাত্র পড়া যাইত—এখন লিপি নষ্ট, চক্রবর্ত্তী বংশও কতুর। এইস্থানের উত্তরে ভঞ্জদের ভগ্নপ্রায় সুঠাম পঞ্চরত্নের পুত্তলিকাবিন্যাস ও অলঙ্কার মনোরম। ভিতরে সিঁড়ি ও প্রতি দেয়ালেই গুপ্ত-কক্ষ, চূড়া খাঁজযুক্ত। উহার লিপি : ১নং ফলক সকাব্দা ১৭১৩ মাহ আশ্বিন। ২নং ফলক সন ১১৯৯ মিস্ত্রি গোপাল দত্ত (চন্দ ?)।—খোপে বন্দুকধারী ও বৃহৎস্থানে জগন্নাথ। গাত্রে গিরি গোবর্দ্ধন ও বৃক্ষমূলে বিবিধ পুত্তলিকা। প্রবাদ—ভঞ্জ বংশের কোন বলবান পুরুষ রাত্রিশেষে এক দল ডাকাতকে ধরিয়া পাঁচ হাজার টাকা কাড়িয়া লইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। মেদিনীপুর "দানে চন্দু মানে মান্দু" প্রবাদ আছে। সেই মান্দু বা মানগোবিন্দ ভঞ্জ এই বংশের লোক।

নিকটে কুতুবপুর (প্রাচীন নাম মহাকালঘাট) পরগণার চন্দ্রামেড় গ্রামে সুপ্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশেষের নিকট ৺কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্থাপিত ৺কাশীনাথের উৎকলীয় রীতির শিবালয় আমলাশীর্ষক। দ্বারে জপরত দ্বারপালদ্বয় লিপি : শ্রীশ্রীকাশীনাথ শিব-শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৬৫ সন ১২৫২ তারিখ ২৫শে চৈত্র। ঐস্থানের নিকটস্থ রাসমঞ্চে লিপি : শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর রাসমণ্ডপখন্দিত শ্রীআনন্দ মিস্ত্রী সাদ্দাশপুর পংচেতুয়া সন ১২৫২ সাল তাং ২৯ শ্রাবণ।—একটি স্তম্ভে লিপিটি আছে। মঞ্চের চূড়া নবটি।

গোলগ্রামে বহু ভূস্বামীকুলের উত্থান-পতন হইয়াছে। এখানে পরিখা জলাশয়াদি বেষ্টিত প্রাচীন রাজবাটীর পশ্চিমাংশে ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর বিরাট নবরত্ন গোপীনাথের পঞ্চরত্ন, লক্ষ্মীনারায়ণের উৎকলীয় ও বাগদিদের চতুঃশাল মন্দিরগুলি দর্শনীয়—কোনটিতেই লিপি নাই। ন্যস্ত পঞ্চ ঘোড়ইয়ের মাথার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের দেওয়াল

কবাট ও চূড়ার তান্ত্রিক যন্ত্র। মন্দিরমধ্যে গুপ্ত-কক্ষ ছিল। পঞ্চরত্নে সিঁড়ি আছে। নিকটে জলাশয়ে জলহরি নামক মন্দির এখন ভগ্নপ্রায়। গোপীনাথ স্বর্ণবহুল অষ্টধাতু নির্মিত, ওজন এক মণ পাঁচ সের, রাধারাণী ছিলেন ছত্রিশ সের। রাধারাণীর মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে। সর্বমঙ্গলা অষ্টধাতুর

সর্বমঙ্গলার নবরত্নের একাংশ
[ফটো শ্রীপুরুষোত্তম দাস হালওয়াসীয়া

ঘটের উপর মুখ। বাণলিঙ্গ গুরুভার ডিম্বাকার। লক্ষ্মী-নারায়ণ অপহৃত। তাঁহার বহু সিংহচিহ্নিত প্রাচীন সিংহাসনটি দর্শনীয়। প্রাচীন রায় রাজবংশের প্রথম রাজা রঘুনাথ, শেষ রাজা হাড়ারাম। তাহার পর দেশী-বিদেশী বহু ভূস্বামীর পরে রায়বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল হালওয়াসীয়া এই রাজ্য ক্রয় করেন। তাঁহার অছিগণ দিল্লী বিড়লা-ভবনের সভায় দেবীর মন্দির সংস্কার বাবদ ছয় হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার পরও কয়েক বৎসর মন্দিরটি টিকিয়া ছিল। এখন ঊর্ধ্বাংশ পড়িয়া গিয়া প্রাচীন লুপ্ত রাজবংশের প্রধান কীর্তিটিকে নিশ্চিহ্নপ্রায় করিতেছে।

এই অঞ্চলের পূর্বাংশে মুক্তেশ্বর গ্রামে প্রাসাদরীতির মন্দিরে বিরাট কৃষ্ণপ্রস্তরময় মুক্তেশ্বর লিঙ্গ। মনে হয় ইহা কোন স্তম্ভের ভগ্নাংশ—হয়তো ইহা তাম্রলিপ্তির সেই নিখোঁজ অশোকস্তম্ভ। ত্রিলোচনপুরে শ্রীআনন্দময়ীর খাঁজযুক্ত দেউলচূড় পঞ্চরত্ন প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন। ইনি এই অঞ্চলের বিখ্যাত জাগ্রত ঠাকুর। ইঁহার পূজার বৈশিষ্ট্য আছে। প্রবাদ, এই শিলামূর্তি শঙ্খ-ব্যাপারিগণ আনিয়া প্রথমে ঘোষেদের ফুল-পুকুরে স্থাপন করে। পরে গোপগ্রামের রাজা মন্দির তৈরি করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন লিপি নাই। মন্দিরে আরও কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি আছে। পূজার পদ্ধতিও ভিন্ন প্রকার।

ঘাটাল মহকুমার কলমিঘোড় গ্রামে পূর্বে থানা ছিল। এখানকার কংসাবতীর খাতটির সরকারী নাম পলাসপাই খাল। একটি চিত্রের উৎকলীয় রীতির খাঁজযুক্ত জগমোহন

সর্বমঙ্গলার নবরত্নের থামের দৃশ্য
[ফটো শ্রীপুরুষোত্তম দাস হালওয়াসীয়া

দেউলটি এখানকার গ্রাম্য দেবতা পঞ্চানন, শীতলা, মনসা-দেবীর মন্দিরমধ্যে ইঁহাদের মৃন্ময়ী মূর্তি আছে। সংস্কারের সময় প্রাচীন লিপিটি ঢাকিয়া গিয়াছে। যতটুকু পড়া যায় তাহা এই: শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতা সন ১২৮৬ সাল মিস্ত্রী শ্রীরূপচাঁদ কুণ্ডু সাং কলমিঘোড়। সন ১৩৫৭ সালে শ্রীবিভূতি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির যত্নে মন্দির সংস্কার হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে দশভুজা সিংহবাহিনীর একটি সুঠাম পুত্তলিকা আছে।

কাদিলপুরের শঙ্খবণিক দত্তগণের গৃহদেবতার অলঙ্কার ও পুত্তলিকাবহুল খাঁজযুক্ত দেউলচূড় সুঠাম পঞ্চরত্নটি এখানকার প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। কাঠের কবাটে চার সারি দেবদেবী-মূর্তি—নিকটের আর একটি মাটির দেবালয়ের দ্বারও ঐরূপ মূর্তিশোভিত। পূর্বোক্ত মন্দিরটির পোড়ামাটির ফলকে লিপি: শকাব্দা ১৭০ (?) ২২ সন ১২০৬ তারিখ ৭ বৈশাখ মন্দির আরম্ভ। কর্তা শ্রীশান্তিরাম দত্ত শঙ্খবণিক সাকল মিস্ত্রী শ্রীবলরাম। ৮ লাইন লিপির প্রথম লাইন অস্পষ্ট। সংস্কারকালীন লিপি —শ্রীশ্রীহরি শ্রী৺পিতাম্বর দত্ত শ্রীনিস্তারিণী দাসী ১৩৩০। মন্দিরের সম্মুখে তিন খণ্ডে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, নৌকারথ, বৃক্ষ, কুটীর, অসুর প্রভৃতির সুঠাম পুত্তলিকা। উপরে দু' লাইন ও পাশে এক লাইন খোপে দশাবতারাদির মূর্তি— বুদ্ধস্থানে জগন্নাথ। শঙ্খের ব্যবসায়ে ধনী হইয়া শান্তিরাম ধর্ম ও কলাপ্রীতির যে নিদর্শন রাখিয়া যান, তাঁহার পৌত্র

পীতাম্বর তাহা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ইনি এই দেশের বিখ্যাত ধ্রুপদী ওস্তাদ ও সেতার বাদক ছিলেন। এখানকার শীতলা মাতার পঞ্চরত্ন শকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৫ সালে নির্ম্মিত। দাতা শ্রীমহন পরামাণিক। কমলে কামিনী নৌকা প্রভৃতি পুত্তলিকা।

ব্রাহ্মণকসান গ্রামের বনিয়াদী মণ্ডল-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রেশমের ব্যবসায়ে যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন তাহারই পরিণতি কয়েকটি দেবালয়ের মধ্যে এই অষ্টশালটি পূর্ণাঙ্গ —সম্মুখে ত্রিখণ্ড ও চার সারির খোপে পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর বিবিধ পুত্তলিকা। ইহাতে লিপি নাই। তাতারপুরের অষ্টশালে দুই সারিতে শিবলীলা ও রামলীলার মূর্ত্তি, মকরবাহিনী গঙ্গাও আছেন। চতুঃশালের উপর যুগ্ম সিংহ। অন্যান্য মন্দিরের তেমন বৈশিষ্ট্য নাই—চিত্রের নিয়ে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। উল্লিখিত মন্দিরগুলি হইতে শিল্পকারগণের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সৃজনী-প্রতিভার ক্ষীণ আভাস পাই। চেতুয়াদাসপুরের এই শিল্পকার-কুল এখন বিলুপ্ত। উঁহাদের সহিত শিল্পবিদ্যার চর্চ্চা এদেশ হইতে বহুলাংশে লোপ পাইয়াছে। ইহাদের স্থান লইয়াছে সূত্রধর ও পটীদার জাতি। মন্দিরের দেশ ছিল এই চেতুয়াদাসপুর।

হে সুন্দর

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

হে সুন্দর পৃথিবীর কবি—
বিশ্বে এত গন্ধ গান—বিচিত্র বর্ণের রূপ-ছবি,
নীল সবুজের ছায়া সমারোহ পল্লবে পল্লবে
এত প্রাণ সজীবতা আলোকের বিপুল গৌরবে।
ফুলে ফলে চঞ্চলতা—রোমাঞ্চের নিঃশব্দ সঞ্চয়
তৃণে তৃণে শাল তাল শিরীষের পত্রে বাঙ্ময়,
অব্যক্ত প্রাণের ভাষা—মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনার দাহ—
আনন্দের শিহরণ অবিরাম প্রাণের প্রবাহ
তৃণ থেকে তারাদলে, ধূমকেতু ছুটেছে উদ্দাম
লক্ষ যোজনের পথে—আজও তার নাহি যে বিরাম।
পথে পথে গ্রহে গ্রহে যাত্রা তার নিত্য অহরহ
এই শান্ত নদীতটে—তরঙ্গিত ফেনগন্ধবহ
অশান্ত সাগরবুকে—এই প্রাণ মাধবী লতায়,
এই দেহে রক্তে রক্তে কি আনন্দ শিরায় শিরায়।
এত প্রাণ রূপে রসে আনন্দে ও অব্যক্ত ব্যথায়
দুঃখে সুখে শ্যামশষ্পে মরুবুকে তারায় তারায়
শুধু প্রাণ মুক্তি স্বাদ প্রকাশের লীলা বিচিত্রায়—
হে সুন্দর মহাকবি, অপরূপ ছন্দে কবিতায়
সে কি প্রাণ-চেতনার উন্মাদনা আবেগ উচ্ছ্বাস
সে কি ছন্দ কি আনন্দ বেদনার রক্তিম আভাস।
সুন্দর কবিতা বন্ধু—তুমি কবি আমিও যে কবি
রূপকার শিল্পী তুমি আরও কত আঁকিয়াছ ছবি,
সে ছবি কবিতা তুমি দেখাবে না একান্তে আমায়
একান্তে আমারে শুধু? সংগোপনে মর্ম্মের ছায়ায়
দেখিব নির্জ্জনে বন্ধু—কি সে ছবি অন্ধকার রাতে
তারার অক্ষরে আঁকা নীহারিকাপুঞ্জের সংঘাতে
কত না নবীন সৃষ্টি—আকাশে ও সাগরের নীলে
রজনীগন্ধার বৃন্তে একান্তে যে কবিতা লিখিলে,
আমারে দেখাবে সেই সংখ্যাহীন কবিতা তোমার
তুমি কবি, আমি কবি— আমার এ কামনা দুর্ব্বার।

মধুসূদনের যুগ

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

সে এক প্রচণ্ড ভাঙা-গড়ার যুগ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যুবমনে এনেছে অসংখ্য নূতন প্রশ্ন, অজস্র নূতন স্বপ্ন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদল মেতে উঠেছে ডিরোজিও-রিচার্ডসনের যুক্তিবাদী বক্তৃতায়, হিন্দু সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতিতে তাদের জেগেছে অবিশ্বাস। এক দিকে সকল বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে তাদের এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা, ভয়ঙ্কর ভাঙনের ঢেউ, অন্য দিকে কোন কোন মনীষীর জাতীয় সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের প্রয়াস, অতীতের সঙ্গে যোগরক্ষার সাধনা।

এমনিই হয়। উত্তাল সাগর-তরঙ্গ ছুটে চলে সম্মুখে, ঝাঁপিয়ে পড়ে বালুবেলায়, তলায় অদৃশ্য থাকে অন্তঃস্রোত, টানে বিপরীত মুখে। উনবিংশ শতাব্দীর নব ভাবপ্লাবনের অন্তরালেও লুকিয়ে ছিল 'প্রাচীনাভিমুখী আকর্ষণ—একটু ভেবে দেখলেই সে কথা বেশ বুঝতে পারি। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের পাশাপাশি রামমোহন-কেশবচন্দ্র-পরমহংস-ভূদেব প্রভৃতির স্বাজাত্যবোধ ও স্বধর্ম্মানুরাগ লক্ষ্য করবার বস্তু।

আপাতদৃষ্টিতে হয়ত সেদিনের বিদ্রোহের দিকটাই আমাদের বেশী চোখে পড়ে; কিন্তু আত্মস্থ হবার, স্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার সাধনাও যে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, সে কথা ভুলে যাওয়া সঙ্গত নয়।

এমন কি, মধুসূদনের জীবনেও মিলবে তার প্রমাণ। তৎকালীন অনেকে তাঁর সাহেবিয়ানা এবং ধর্মান্তর-গ্রহণকেই বড় করে দেখেছিলেন। এসবের অন্তরালে যে তাঁর অশান্ত চিত্ত স্বদেশের বিগত মহিমা স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জন করেছে এবং তার সব জাগরণের স্বপ্ন দেখেছে, সেদিকে তাঁরা তেমন দৃষ্টি দেন নি। বহু বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন করলেও মাতৃভাষার সেবাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অভাব-অভিযোগের নিত্য পীড়ন উপেক্ষা করে আমরণ আরাধনা করেছেন বঙ্গভারতীর।

এ অভাব-অভিযোগের মূলে হয়ত ছিল তাঁর স্বভাবগত কোনও ত্রুটি। কিন্তু সেইটেই সব কথা নয়। কবিকে জানতে হলে বাইরের বিচার ছেড়ে তাকাতে হবে তাঁর অন্তরের পানে। সংসার-সুখীদের কাছ থেকে ক'খানা উৎকৃষ্ট কাব্যই বা আমরা পেয়েছি? কাঁটায় বুক রেখে যে পাখীরা গান গায়, বেশীর ভাগ কবি তাদেরই দলে। কবি যে আদর্শের স্বপ্নে বিভোর, এ কঠিন সংসারে সে স্বপ্নের চরিতার্থতা কোথায়? কোথায় মিলবে আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ প্রেম, আদর্শ জীবন?

'মেঘনাদবধের' বিরুদ্ধে এক দিন বহু অভিযোগ শোনা গিয়েছে। জাতীয় আদর্শবিরোধী, বিদেশী কাব্যের নকল—এই সবই অভিযোক্তাদের প্রধান যুক্তি। হোমার-ভার্জিল-ট্যাসো-মিল্টনের ছায়াও ঐ কাব্যের নানাস্থানে পড়েছে সন্দেহ নেই; তেমনি ছায়া পড়েছে বাল্মীকি-কালিদাস-জয়দেব-কৃত্তিবাসের। রামায়ণের পুরাতন আদর্শ যে তিনি অনুসরণ করতে পারেন নি, তার কারণ সুস্পষ্ট। প্রায় প্রত্যেক বড় কবির কাব্যেই যুগের হৃদয় আপনাকে ব্যক্ত করে; অসংখ্য মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অনুচ্চারিত, তা যেন আপনার ভাষা খুঁজে পায়। তা যদি না হ'ত তবে কবির কাব্য হ'ত কৃত্রিম, নিষ্প্রাণ।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপুষ্ট আমাদের আধুনিক মন নিছক ত্যাগ-বৈরাগ্যের মন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, এ সত্য প্রত্যক্ষ। শক্তি, সাহস, বীর্য্য—আজ আমাদের সাধনমন্ত্র। মাথা উঁচু করে মানুষের মত বাঁচতে চাই, দেশকে ঐশ্বর্য্য-গৌরবে ভূষিত করতে চাই, এই আমাদের আজকের দিনের আদর্শ। সেই আদর্শই তো কীর্তিত হয়েছে 'মেঘনাদবধে'। "জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে জলাঞ্জলি" দিয়েছেন বলে বিভীষণ মেঘনাদের কাছে হয়েছেন ভর্ৎসিত। প্রাণের চেয়ে যাদের কাছে দেশ বড়, অদৃষ্টের চেয়ে পুরুষকার বড়, সেই রাবণ এবং মেঘনাদ মধুসূদনের কাব্যের নায়ক। একটু তলিয়ে দেখলে দেশপ্রেমিক মধুসূদনের মনের কথা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। আর একথাও অনুভব করব যে আমাদের বর্তমানকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ নিয়েছে তাঁর মহাকাব্যে, পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে।

দেশের প্রতি ভালবাসা মিলিয়ে আছে তাঁর সকল কাব্য-কবিতায়। সুদূর ফ্রান্সে বসে কবির মনে পড়েছে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কপোতাক্ষ নদ', 'বিজয়া দশমী', 'দেবদোল', 'নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির'। রাক্ষসগণের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে হিন্দুর সামাজিক অনুষ্ঠানের আদর্শে। এ সবের মধ্য দিয়ে কি অনুভব করি না, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর?

মধুসূদনের কবিকীর্তির প্রধান চূড়া হলেও 'মেঘনাদবধ' সে কীর্তির অংশ মাত্র। তাঁর প্রতিভাকে সম্পূর্ণরূপে

উপলব্ধি করতে হলে তাঁর বিচিত্র নব নব সৃষ্টির আলোচনা করতে হবে। 'তিলোত্তমাসম্ভবে' এবং 'মেঘনাদবধে' তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ, অথচ ভাব-কল্পনার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! 'বীরাঙ্গনা'য় পৌরাণিক যুগের বহু নারীর উপেক্ষিত বীরত্ব ও প্রেম পেয়েছে কবির অভিনন্দন। 'ব্রজাঙ্গনা'য় অভিনব মিত্রাক্ষরে গীত হয়েছে মধুর বৈষ্ণবগীতি। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' ফুটেছে সনেটের গাঢ়বদ্ধ রূপ। নীতিকবিতাগুলিও ছন্দের নূতনত্বে কৌতূহলোদ্দীপক। রবীন্দ্রকাব্যে নূতন ভঙ্গীর হ্রস্বদীর্ঘ পংক্তি-বিন্যাসের যে সকল দৃষ্টান্ত পাই, মধুসূদনের কবিতায় রয়েছে তার পূর্বাভাস। নতুন পথে পা বাড়ানোর সাহস—শুধু সাহস নয়, সে পথে চলার সাফল্য তাঁর প্রত্যেক রচনায় পরিস্ফুট। নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি এনেছিলেন যুগান্তর। আর অসম্পূর্ণ গদ্য মহাকাব্য 'হেক্টরবধ' তাঁর এক নূতন পরীক্ষা। উৎকৃষ্ট রচনা নয়, তবু অভিনব প্রচেষ্টারূপে গ্রন্থখানি স্মরণীয়।

ভাষায় তিনি যে দৃঢ়তা, গতিবেগ ও বৈচিত্র্য এনে দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। "নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, রে দূত" অথবা "বায়ুদল বহিলা চৌদিকে বৈশ্বানরশ্বাসরূপে, জলিল কাননে দাবাগ্নি"—এ শব্দবিন্যাস, ভাষার এই গতি ও দীপ্তি পূর্ববর্তী কাব্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, পরবর্তী কাব্যেও এর তুলনা নেই। আবার নূতন মিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার দৃষ্টান্ত আছে 'ব্রজাঙ্গনা'য়:

"কেন এত ফুল তুলিলি সজনি, ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী তারার মালা?"

এবং নীতি কবিতায়:

"হইল বিষম রণ তুলনা না মিলে,
ভীম দুর্য্যোধনে
ঘোর গদারণে
হ্রদ দ্বৈপায়নে
তীরস্থ যে রণচ্ছায়া পড়িল সলিলে,
ভরাইয়া জলজীবী জলজন্তুচয়ে
সভয়ে মনেতে সবে ভাবিল প্রলয়ে
বুঝি এ বীরেন্দ্রদ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল।"
[সিংহ ও মশক]

মধুসূদনের যুগ সম্পর্কে যে কথা প্রধানতঃ মনে আসে, সে হচ্ছে এই যে, ওটি অভাবিতপূর্ব আন্দোলন-উদ্দীপনার, উদ্‌যোগ-পরীক্ষার যুগ। অনেকের আচরণে বিভ্রান্তির পরিচয় মিলেছে সত্য; তবু যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা এবং কর্ম-প্রেরণা জাতির জীবনের এবং উন্নতির লক্ষণ তারও দৃষ্টান্ত সেদিন মিলেছে প্রচুর। সেদিনের তুলনায়, মনে হয়, আজ জাতি ঝিমিয়ে পড়েছে।

ধর্মে, সমাজে, শিক্ষাপ্রচারে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে—সকল ক্ষেত্রে সেকালে একসঙ্গে যত প্রতিভাবান্ কর্মতৎপর বাঙালীর অভ্যুদয় হয়েছিল, বাংলায় আর কোন যুগে তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম। তার পূর্ববর্তী ৬।৭ বৎসরের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর-আদির এবং পরবর্তী ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে রাজনারায়ণ, ভূদেব, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব।

নব জাগরণ এবং নব আদর্শের যে-সূচনা মধুসূদনে—তারই বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে পরবর্তীদের রচনায়। শৌর্য্যে-সম্পদে-প্রেমে পরিপূর্ণ যে জীবনের আদর্শ ও উগ্র দেশাভিমান রূপ নিয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যে—হেম-নবীন-বঙ্কিমে তারই স্ফুটতর প্রকাশ। বীরত্ব ও কোমলতার মিলনে নারীত্বের যে অভিব্যক্তি দেখেছি দেবীচৌধুরাণীতে, তারই কি পূর্বাভাস ছিল না প্রমীলায়? সমাজ-নিয়মের মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা প্রেমের অসম্মান করি, আধুনিক সাহিত্যের এই কথাই কি ব্যক্ত হয় নি 'বীরাঙ্গনা'য়?

ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে পাশ্চাত্ত্য ভাব-কল্পনা থেকে প্রাণের পরিপোষক উপাদান সংগ্রহ করে জাতির মনে নবশক্তি সঞ্চার করা, যুগোপযোগী আদর্শে তাকে উদ্বুদ্ধ করা—এই কাজটি পরম যত্নে করে গিয়েছেন মধুসূদন ও তাঁর কালের মনস্বী বাঙালীরা। আজকের বাঙালী যদি বিশ্বের সংস্কৃতি-সভায় স্থান করে নিয়ে থাকে, তবে তা সম্ভব হয়েছে তাঁদের একাগ্র সাধনার ফলে।*

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে পঠিত এবং বেতার-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

নর ও নারী

এরস্কিন কল্ডওয়েল

অনুবাদক—শ্রীসমীর ঘোষ

রাত্রের পিছনে ফেলে আসা ছায়ার মত বর্ণবিহীন প্রত্যুষের মধ্য দিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'ল্ল। তাদের শরীরে কোন গতি নেই; তবু তাদের পাগুলো জমা ধুলো যথাসম্ভব শীঘ্র বেড়ে ফেলতে লাগল। সূর্য্যের প্রথম রক্ত-রশ্মির জন্য প্রতি পদক্ষেপেই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাতে লাগল দিগন্তের দিকে।

মেয়েটি তার দাঁতের মাঝে বেশ দৃঢ় ভাবে অধর চেপে রয়েছে। এতে সে যন্ত্রণা পাচ্ছে, কিন্তু সামনের দিকে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে যাওয়ার এটিই একমাত্র প্রেরণা। মাইলের পর মাইল, একটা পা আর-একটা পায়ের পিছনে এগিয়ে দেওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে সে গোঙাচ্ছে বটে, কিন্তু জোরে কেঁদে উঠছে না।

রিং বলল—এবার থামলে বোধ হয় ভাল হয়, আবার কিছু বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

মেয়েটি নিরুত্তর।

তারা চলতে লাগল।

পাহাড়ের মাথায় উঠে তারা সূর্য্যের সঙ্গে মুখোমুখি হ'ল। বৃক্ষহীন দিগন্ত এক-চতুর্থাংশ পথকে ছুরির ফলার মত কেটে দিয়েছে। তাদের পায়ের নীচে কুয়াসাচ্ছন্ন সমতল ভূমি; মাটি থেকে ধীরে ধীরে কুয়াসায় ছেয়ে গিয়েছে জমিটা। কতকগুলি কুটীর ও গোলাবাড়ী তাদের চোখে পড়ল, কিন্তু ওগুলো এত দূরে রয়েছে যে কুয়াসায় প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম বাড়ীর চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে।

রুথ তার পাশের মানুষটির দিকে তাকাল। সূর্য্যের লাল আলোয় তার ফ্যাকাশে মুখটা রক্তের মত লাল দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো অত্যন্ত ক্লান্ত, নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। তাকে দেখে মনে হয় সে অতি কষ্টে দু'পায়ের ভারসাম্য রক্ষা করছে। পরমুহূর্ত্তেই হয়ত সমতা বজায় রাখতে না পেরে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যাবে।

—সামনে প্রথম বাড়ীতে হয়ত কিছু খাবার মিলতে পারে—মেয়েটি বলেই থামে, পুরুষটির উত্তরের জন্য মিনিটের পর মিনিট অপেক্ষা করে।

পুরুষের বদলে সে-ই জবাব দেয়—ওখানে আমরা কিছু পাব। আমাদের পেতেই হবে।

দ্রুতগামী আরক্ত সূর্য্য মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। কাঠের ধোঁয়ার পুরু আস্তরণের মত পাঁশুটে মেঘের দল তাকে ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করে। হঠাৎ দেখতে না দেখতে সূর্য্যকে চোখ-ধাঁধানো একটি জ্বলন্ত বোতামের মত দেখায়। তার পর তার দিকে আর চোখ রাখা সম্ভব নয়।

—যাই হোক, চেষ্টা করা যাক—রুথ বলল।

রিং পরিচ্ছন্ন দিবালোকে তাকে দেখতে লাগল; গত সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের পর এই প্রথম সে তাকে দেখছে। মেয়েটির মুখ আরও ম্লান, কপোল আরও শুকনো দেখাচ্ছে।

কথা না বলে, সে পাহাড়িয়া পথ ধরে নীচে নামতে সুরু করে। পিছন ফিরে দেখেও না, মেয়েটি তাকে অনুসরণ করছে কিনা—কিন্তু যথাশক্তি একটা পা-কে টেনে জোর করে আর একটা পায়ের সামনে দিয়ে রাস্তা ধরে নেমে চলে। এবড়ো-খেবড়ো পথটি ছাড়া যাতায়াতের আর কোন রাস্তা নেই।

বাড়ীটার সামনে এসে সে থেমে পড়ে আর লক্ষ্য করে উপর দিয়ে কেমন রাশীকৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ে চলেছে। এমন সময়, মেয়েটি এসে তাকে ধরে ফেলে।

—আমি ভেতরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি,—মেয়েটি বলে, তুমি বসে একটু বিশ্রাম কর, রিং।

কিছু বলার জন্য সে ঠোঁট ফাঁক করে, কিন্তু রুদ্ধ গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরুল না। ধোঁয়াভর্ত্তি চিমনি, পর্দ্দা-টাঙানো জানালা, ভাঙা দরজাওয়ালা বাড়ীর দিকে সে তাকায়। ওগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার সময় তার মনেই হ'ল না যে সে একজন বিদেশী আর এটা হচ্ছে বিদেশ। রুথ দরজা দিয়ে সোজা বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ল; থামল একেবারে রান্নাঘরের দরজার সামনে। পিছনে ফিরে দেখে, রাস্তা ধরে রিং উঠানের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

একটি জানালার পর্দ্দার পিছনে কে যেন তাদের উঁকি দিয়ে দেখছে।

রিং বলে—ধাক্কা দাও।

ডান হাতের আঙুলের গাঁট দিয়ে সে দরজার গায়ে আঘাত করে চলে, যতক্ষণ না, আঙুলে ব্যথা অনুভব করে।

সে ঘুরে, চোখের পলকে রিংকে দেখে নেয়, রিং মাথা নাড়ে।

তখন রান্নাঘরের দরজা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে যায়; একটি স্ত্রীলোকের মুখ উঁকি দেয় তার ভিতর থেকে। স্ত্রীলোকটি মধ্যবয়সী, তামাটে মুখ, আর কপালজোড়া আগুনে-পোড়ার দাগ, হয় ত কোন ফুটন্ত আচারের পাত্র ফেটে গিয়ে দাগটির জন্ম দিয়েছে।

সে তাদের বলল—দূর হয়ে যা—

আত্মা ও চৈতন্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যাঁহারা বলেন যে আত্মার অস্তিত্ব নাই, তাঁহাদের মতে চৈতন্য হইতেছে দেহের গুণ। কিন্তু রূপ যেরূপ দেহের 'গুণ', চৈতন্য যদি সেইরূপ দেহের গুণ হইত তাহা হইলে যতক্ষণ দেহ থাকিত ততক্ষণ চৈতন্যও থাকিত। রূপ দেহের গুণ। যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ রূপও আছে। দেহ না ধ্বংস হইলে দেহের রূপ ধ্বংস হয় না। কিন্তু ইহা বলা যায় না যে, যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ চৈতন্য থাকে। মৃত্যুর পর দেহ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এক খণ্ড লৌহ কখনও উত্তপ্ত থাকে কখনও শীতল হয়, সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকে না। সেইরূপ দেহে কখনও চৈতন্য থাকে, কখনও থাকে না। অতএব তপ্ত লৌহের সহিত তাপের যেরূপ সম্বন্ধ চেতন দেহের সহিত চৈতন্যের সেইরূপ সম্বন্ধ। কিন্তু একথাও বিচারসহ নহে। লৌহখণ্ড শীতল হইয়া গেলে অগ্নি-সংযোগে পুনরায় উত্তপ্ত হয়। কিন্তু দেহের মৃত্যু হইলে পুনরায় তাহাতে চৈতন্য আনয়ন করা যায় না। প্রত্যুত দেহের মৃত্যু হইলে দেহকে বেশীক্ষণ রাখা যায় না, দেহ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য বলা যায় যে, চৈতন্যই দেহকে ধারণ করিয়া রাখে—অর্থাৎ দেহকে নষ্ট হইতে দেয় না। সুতরাং দেহকে চৈতন্যের কারণ না বলিয়া, চৈতন্যকেই দেহের কারণ বলা অধিকতর সঙ্গত হয়। উপনিষদ বলিয়াছেন যে, জীব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে দেহ প্রাপ্ত হয়, যাহারা পূর্ব্বজন্মে উত্তম কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা উত্তম দেহ প্রাপ্ত হয়, যাহারা পূর্ব্বজন্মে নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা নিকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়।[1] অতএব জীব বা জীবের চৈতন্য তাহার দেহের কারণ। জীব পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য বর্ত্তমান জন্মের দেহ প্রাপ্ত হয়, যখন কর্ম্মফল ভোগ সমাপ্ত হয়, তখন জীব দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন আর দেহের কোনও প্রয়োজন থাকে না, তখন দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং জড়বাদীর যেরূপ ধারণা—দেহ হইতেছে কারণ, চৈতন্য হইতেছে তাহার কার্য্য, ইহা যথার্থ নহে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য বা চৈতন্যযুক্ত জীবই কারণ, দেহ তাহার কার্য্য, জীবের কর্ম্মফলের জন্য দেহ। অতএব ইহা বলা যায় না যে, তাপের কারণ যেমন তপ্ত লৌহ, সেইরূপ চৈতন্যের কারণ দেহ।

আরও একটি যুক্তি আছে তাহা আলোচনা করিলেও বুঝা যাইবে যে, চৈতন্য দেহের গুণ নহে। কোনও দ্রব্যের গুণ বা শক্তি তাহার নিজের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। অগ্নির দাহিকা-শক্তি অন্য সকল দ্রব্য পোড়াইয়া নষ্ট করিতে পারে কিন্তু অগ্নিকে পোড়াইতে বা নষ্ট করিতে পারে না।

অর্থাৎ, অগ্নির শক্তি অগ্নির উপর কার্য্য করে না। সেইরূপ মোটর-কারের শক্তি মোটর-কারকে ঠেলিতে পারে না। মোটর-কার মাটিকে ঠেলে, মাটি মোটর-কারকে ঠেলে, তাই মোটর-কার চলে। মাটি যদি মোটর-কারকে না ঠেলিত তাহা হইলে মোটর-কার চলিতে পারিত না। এজন্য বালুর উপর, বা খুব পিছল জায়গায় মোটর-কার চলিতে পারে না। কারণ বালু বা পিছল জায়গা মোটরকে ঠেলিতে পারে না, শক্ত মাটি যেমন পারে। চৈতন্য যদি দেহের গুণ হইত তাহা হইলে কোনও ব্যক্তির চৈতন্য তাহার দেহের উপর কাজ করিতে পারিত না, তাহার দেহকে অনুভব করিতে পারিত না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্য তাহার দেহকে অনুভব করিতে পারে। সুতরাং চৈতন্য দেহের গুণ নহে, অন্য দ্রব্যের গুণ। বাস্তবিক পক্ষে চৈতন্য আত্মার গুণ। এজন্য চৈতন্য আত্মাকে অনুভব করিতে পারে না, দেহকে অনুভব করিতে পারে।

একটা দেহের রূপ ঐ দেহ ছাড়িয়া অবস্থান করিতে পারে—ইহা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এক ব্যক্তির চৈতন্য

১। রমণীয় চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭)। অর্থাৎ "যাহারা রমণীয় কর্ম্ম করে তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, যথা ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, বা বৈশ্যযোনি। যাহারা কপূয় (=নিন্দিত) কর্ম্ম করে তাহারা নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়, যথা কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।" মনে হইতে পারে, কি ভয়ানক অন্যায়। উপনিষদ কুকুর ও শূকরের সঙ্গে চণ্ডালকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সত্যদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের চক্ষে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই। এজন্য গীতায় কেবল চণ্ডাল নহে, পণ্ডিত ব্রাহ্মণকেও কুকুরের সহিত সমান দৃষ্টিতে দর্শন করিতে বলা হইয়াছে। "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (গীতা ৫।১৮)। সকল প্রাণীর আত্মাই সমান, সকল আত্মাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ। প্রভেদ বিভিন্ন দেহের মধ্যে। আত্মার তুলনায় দেহ তুচ্ছ। এই সকল তুচ্ছ দেহ বাদ দিলে সকল আত্মাই সমান—ব্রাহ্মণের আত্মা ও কুকুর বা শূকরের আত্মায় কোনও প্রভেদ নাই। "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।"

তাহার দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে অবস্থান করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতে কোনও বাধা নাই। পুনর্জ্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ সত্য কিনা তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিতে কোনও বাধা নাই যে, যে-চৈতন্য একটি দেহের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে তাহা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য এক দেহের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে। এক ব্যক্তির বাল্যের দেহ এবং বার্দ্ধক্যের দেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উভয়ের মধ্যে একটি পরমাণুও সাধারণ ভাবে বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু বাল্যের দেহে যে চৈতন্য ছিল, বৃদ্ধের দেহেও সেই চৈতন্যই থাকে। যে আমি বাল্যে ক্রীড়া করিতাম, সেই আমি-ই বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মালোচনা করিতেছি। চৈতন্যকে যদি দেহের গুণ বলা হয় তাহা হইলে এই চৈতন্যটি কোন্ দেহের গুণ? বাল্যের দেহের গুণ, না বৃদ্ধের দেহের গুণ? ইহা কোনও দেহেরই গুণ নহে। ইহা আত্মার গুণ। বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে এক আত্মাই থাকে। এজন্য অনুভব হয়—"আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি।"

মনে করুন বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হইল। একটি জীবন্ত মনুষ্যের যেরূপ রক্ত, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি আছে, বিজ্ঞান সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিল এবং একটি মনুষ্যের দেহে যেখানে যাহা আছে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী ঠিক সেইভাবে সন্নিবেশ করিল। আত্মা, মন প্রভৃতি যদি দেহের গুণ হয় তাহা হইলে আসল মানুষের যেরূপ আত্মা ও মন, নকল মানুষেরও সেইরূপ আত্মা ও মন হইবে। আসল মানুষটি যদি স্মরণ করে আমি বাল্যকালে অমুক বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, যৌবনে অমুক স্থানে গিয়াছিলাম, অমুক লোকের সহিত আমি অমুক কথা বলিয়াছি, তাহা হইলে নকল মানুষেরও ঐরূপ চিন্তা মনে উদয় হইবে। কিন্তু ঐ সকল চিন্তা তাহার মনে উদয় হইতে পারে না, কারণ ঐ সকল কার্য্য সে করে নাই। অতএব আত্মা ও মনকে দেহের গুণ বলিলে যে সকল ব্যাপার হওয়া উচিত তাহা হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা ও মন কখনও দেহের গুণ হইতে পারে না। আত্মা ও মন উভয়ই দেহ হইতে স্বতন্ত্র। আত্মা ও মন যেরূপ ইচ্ছা করে দেহ সেইরূপ কার্য্য করে। সুতরাং দেহ হইতেছে আত্মা ও মনের অধীন। দেহ যখন আত্মা ও মনের অধীন, তখন আত্মা ও মন কখনও দেহের গুণ হইতে পারে না। যাহা অধীন তাহা কখনও প্রধান হইতে পারে না। যদি আত্মা ও মন দেহের গুণ হইত তাহা হইলে দেহ হইত প্রধান, এবং আত্মা ও মন হইত অপ্রধান। কিন্তু তাহা নহে।

আলোচনা
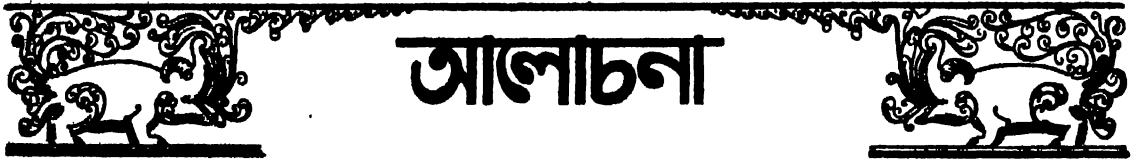
"বাংলা বানান ও উচ্চারণ"

শ্রীস. দাস

গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়ার "বাংলা বানান ও উচ্চারণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে তা নিবেদন করছি।

বাংলা বানান সম্বন্ধে যে দুটি জিনিষ সকলের আগে নজরে পড়ে তা হচ্ছে :

১। বানান ও উচ্চারণের অসংগতি ;

২। বানানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অরাজকতা।

স্বভাবতঃই প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলে মনে হতে পারে। পরোক্ষভাবে কতকটা তা হলেও, বানানের অরাজকতার জন্ম বানান ও উচ্চারণের অসংগতিকে সরাসরি দায়ী করা চলে না। কারণ তা হলে তো ইংরেজী ভাষার অরাজকতার চরম হওয়া উচিত ছিল। ইংরেজী ভাষার মত বানান ও উচ্চারণের মধ্যে এত অসংগতি অন্য আর কোন্ ভাষায় আছে? অথচ ইংরেজীতে বানানের অরাজকতা আদৌ নেই বললেই চলে। আসলে বাংলা ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দের একটি করে সুনির্দিষ্ট বানান না থাকাটাই বাংলা বানানের অরাজকতার কারণ। ইংরেজীতে বানানের এই সুনির্দিষ্টতা রয়েছে, তাই অরাজকতা নেই। খেয়াল-খুশীতে কেউ Brought-এর স্থলে Brot বা Braught লিখতে পারেন না, London-এর বানান Lundun করতে পারেন না। Brought-এর বানান Brought-ই হতে হবে, London-এর বানান London-ই রাখতে হবে। বাংলাতেও যেসব ক্ষেত্রে বানানের এই সুনির্দিষ্টতা রয়েছে—যেমন তৎসম শব্দগুলির বেলায়—সেসব ক্ষেত্রে অরাজকতা নেই। 'দ্বন্দ্ব'কে নিয়ে 'দ্বন্দে' পড়েন সম্ভবত কেউ কেউ, ঠিক যেমন Trouble-কে নিয়ে Trubble-এ পড়েন সম্ভবত কোন কোন ইংরেজ। কিন্তু তাই বলে 'দ্বন্দ্ব' 'দ্বন্দ' কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই—'দ্বন্দ্ব' নিঃসংশয়েই শুদ্ধ আর 'দ্বন্দ' নিঃসংশয়েই অশুদ্ধ। পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে বানানের এই সুনির্দিষ্টতা নেই—যেমন বেশীর ভাগ তদ্ভব ও দেশজ শব্দের বেলায়—সেসব ক্ষেত্রে অরাজকতার চূড়ান্ত। একটি ছোট্ট শব্দ শিঙী (মৎস্যবিশেষ), কিন্তু এর বানান সিঙি, সিঙী, শিঙি ইত্যাদি সাত আট রকমে করা যেতে পারে। ইংরেজীতে English কে Inglish হয় না, কিন্তু বাংলায় ইংরাজী, ইংরেজী, ইংরিজী ইংরাজি, ইংরেজি, ইংরিজি—কোন-কিছুতেই আপত্তি নেই। হোলো, হ'লো, হো'ল, হ'ল—সবই হতে পারে।

এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে বাংলা বানানকেও ইংরেজী বানানের মতই 'ষ্ট্যাণ্ডারডাইজ' করা প্রয়োজন। কিন্তু এই ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেশন করা হবে কেমন ক'রে? সংস্কৃত অ-সংস্কৃত যাবতীয় শব্দই কি এই আওতায় পড়বে? আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, উচ্চারণ (কলকাতা শহরের) ও বানানের সংগতিবিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেশন করা উচিত, আর এই ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেশন কেবলমাত্র দেশজ ও তদ্ভব শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃতের মতই থাকতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এতে করে অবশ্য বানান ও উচ্চারণের পুরোপুরি সংগতি বিধান হবে না। পুরোপুরি সংগতিসাধন হতে পারে শুধুমাত্র তবেই (১) যদি ব্যতিক্রমনির্বিশেষে সর্বত্র বানান অনুযায়ী উচ্চারণের রীতি প্রবর্তিত করা যায়।

কিংবা বিপরীত ভাবে (২) যদি ব্যতিক্রমনির্বিশেষে সর্বত্র উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের রীতি প্রবর্তিত করা যায়:

কিন্তু এ দুটি পন্থারই বাংলা ভাষায় অনুসৃত হওয়ার পক্ষে মুশকিল আছে। বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করা মানে নিখুঁতভাবে হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর যত্বণত্ব ব-ফলা য-ফলা মেনে উচ্চারণ করা। বাঙালীর জিহ্বা এসব হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর ব-ফলা য-ফলা উচ্চারণে সমর্থ কি অসমর্থ সেটা এখানে আসল প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হচ্ছে এ সব উচ্চারণ বাঙালীর জিহ্বার ধাতে সয় কি না। চেষ্টা করলে হয়তো বাঙালীর পক্ষে ওয়াজীর কথাটার সঠিক উচ্চারণ অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও আরবের ওয়াজীর বাংলাদেশে এসে হয়েছে উজির। কারণ ওয়াজীর এর চেয়ে উজিরই বাঙালীর জিহ্বার পক্ষে বেশী ধাতসই। আর এই 'ধাত' জিনিষটি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়—যার যা ধাতে সয় না, তাকে দিয়ে তাই করাতে যাওয়া অনেক সময়েই বিপজ্জনক। তা ছাড়া আরো একটা কথা। হ্রস্ব-দীর্ঘ যত্ব-ণত্ব পুরোপুরি মেনে বাংলা পড়লে তা আর বাংলা থাকবে কিনা সন্দেহ।

এবারে আসা যাক্ উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের প্রসঙ্গে। তদ্ভব ও দেশজ শব্দের ক্ষেত্রে এ নীতির আবশ্যকতা আমি স্বীকার করেছি

ইতিপূর্ব্বেই। কিন্তু তৎসম শব্দের বেলাতেও যদি এ নীতি অনুসৃত হয় তবে সর, শর, স্বর; ধ্বনি ও ধনী, স্মরণ ও শরণ, সত্য ও সত্ত্ব সব একাকার হয়ে গিয়ে এক গোলমেলে অবস্থার উদ্ভব হবে। ফরাসী ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাতেও এই রকম বিভিন্ন অর্থসূচক অথচ অভিন্ন উচ্চারণবিশিষ্ট বহু শব্দ আছে—তাদের চেনবার উপায় হচ্ছে তাদের বানান। ফরাসী "সাঁ" শব্দটি এর একটি দৃষ্টান্ত। C-E-N-T সাঁ মানে শত, S-A-N-S সাঁ মানে ব্যতীত, S-A-N-G সাঁ মানে রক্ত, S-E-N-S সাঁ মানে দিক। ইংরেজীতে Sale এবং Sail, Weak এবং Week, বানানের দ্বারাই নিজেদের পার্থক্য বজায় রেখেছে। তাই আমার মতে বাংলা তৎসম শব্দগুলিরও বানানের নড়চড় না করাই ভাল।*

* শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর মতেও "সংস্কৃত শব্দের বানান এবং সন্ধি সমাসপদ্ধতি বাংলায় বজায় রাখাই কর্ত্তব্য। হিন্দী, মারাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সংগে বাংলার এই একমাত্র যোগসূত্র নষ্ট করা অন্যায়।"—(শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ৮৬)

অতএব আমার বক্তব্যের মোট কথা হচ্ছে এই যে, (১) বানানের রেশনেলাইজেশন-এর চেয়ে বানানের ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেশন-টাই বড় কথা। (২) দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বানানের রূপ নির্ধারণের সময় উচ্চারণের সংগে বানানের যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্যসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (৩) তৎসম শব্দের বানান সর্বত্রই সুনির্দিষ্ট। সুতরাং ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেশন-এর কোন প্রশ্ন উঠে না।

পরিশেষে কতকটা অপ্রাসংগিক হলেও এই সুযোগে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হ'ল বাংলা রচনায় ব্যাকরণ-শৈথিল্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্য থেকে এ ধরণের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ব্যাকরণের এমন অসংকোচ উপেক্ষা অন্যান্য ভাষায় কচিৎই নজরে পড়ে। বাঙালী লেখকগণ (এবং পাঠকগণও) ব্যাকরণ সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হবেন কি?

"বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-বিরচিত বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা পুস্তকখানি* আমি প্রণিধিতভাবে সমগ্র অংশ পাঠ করিয়াছি এবং এখনও অবসর সময়ে পাঠ করি। এই গ্রন্থের গৌরব এক কথায় বা অল্প কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যে-কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আমাদের এই কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। প্রথম কথা, বর্ত্তমান সময়ে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, যে প্রাচীন পণ্ডিতসমাজ সর্ব্বথা উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের বিষয় লইয়া দীনেশবাবু তাঁহার মূল্যবান্ জীবন ব্যয় করিয়া যে অসাধারণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা স্থিরচিত্তে পাঠ করিয়া এই বাংলাদেশের অতীত গৌরব ও প্রাচীন পণ্ডিতগণের অসাধারণ মনীষার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়া নিজে যথার্থ গৌরব অনুভব করিবেন, এইরূপ বাঙালী পাঠক নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে অপরিসীম প্রয়াস, সুমহান্ ক্লেশ ও অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন ইহাকে আমরা এক কথায় ভগীরথপ্রযত্ন বলিতে পারি। রাজর্ষি ভগীরথ সুকঠোর তপস্যায় ভাগীরথীকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীলোকে অবতরণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দীনেশবাবুও সুদীর্ঘ কাল হইতে বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্ন প্রাচীন বাংলার মনীষিবৃন্দকে তাঁহাদের নামধাম, রচিত গ্রন্থরাশি ও তাঁহাদের যোগ্যতম শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের যথার্থ কালনির্দ্দেশ পূর্ব্বক বাঙালী জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত করাইয়াছেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণের লুপ্ত নামের নির্দ্দেশ, তাঁহাদের রচিত লুপ্ত গ্রন্থরাশির আবিষ্কার ও তাঁহাদের দিক্‌পাল সদৃশ শিষ্যবৃন্দের সম্পূর্ণরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার প্রাচীন পণ্ডিত-জগতে সমুজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন। যাঁহারা সমাজে উপেক্ষিত, অনাদৃত ও বিস্মৃত সেই চিরাতীত পণ্ডিতগণের এমন সমুজ্জ্বল ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে এইরূপ নির্ব্যাজে আয়ুঃশও যিনি ব্যয়িত করিতেছেন তিনি পণ্ডিতগণের অকারণ বান্ধব উপাধির যোগ্যতম পাত্র।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে দীনেশবাবুর অনুসন্ধিৎসার অসাধারণ রূপ স্বতঃই পাঠকের হৃদয়ে ভাসমান হয়। দীনেশবাবু বাল্যকাল হইতে পণ্ডিতগণের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং গৃহীতবিদ্য হইয়া তাঁহার সঙ্কলিত বিষয়গুলিকে একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মত সুদৃঢ় প্রমাণসমূহের উপন্যাস করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বস্তু দৃঢ় ইতিহাসের ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন প্রবাদসমূহের প্রতি আস্থাসম্পন্ন পাঠকগণের নিকটে দীনেশবাবুর আবিষ্কৃত বহু নূতন তথ্য হৃদয়সম্বাদী নাও হইতে পারে, কিন্তু দীনেশবাবুর প্রমাণোপন্যাসের এত সুদৃঢ়তা আছে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠককে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যই যথার্থ ইহা স্বীকার করাইবে। এক এক জন গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া সেই গ্রন্থকাররচিত বিলুপ্তপ্রায় হস্তলিখিত গ্রন্থ ভারতের

* বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—প্রথম ভাগ, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত। মূল্য ১০৲

এবং ভারতের বাহিরেও অবস্থিত নানা পুথিশালা হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি অক্লান্ত মনে তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ সমস্ত নব্যন্যায়ের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের আলোচনা করিয়া তাহা হইতে নিজের অভিলষিত বস্তু সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব, যাঁহার সেই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা নাই। গ্রন্থকারদের কালনিরূপণাদির জন্য এক অপূর্ব্ব বিস্ময়াবহ প্রয়াস দীনেশবাবু করিয়াছেন। সেই সেই জেলার কালেক্টরীতে সংরক্ষিত প্রাচীন তায়দাদ প্রভৃতি, প্রতিষ্ঠিত জমীদারের গৃহে সংরক্ষিত প্রাচীন দলিল প্রভৃতি এবং বংশ ও কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি নিরূপণের জন্য অসংখ্য কুলপঞ্জীগ্রন্থও তিনি অতি নিপুণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দীনেশবাবুর দৃষ্টি এত সুমার্জ্জিত ও প্রমাণানুসারী যে তাঁহার রচিত এই বিশাল গ্রন্থে যে অসংখ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি অতি দৃঢ়তর প্রমাণসহ হইয়াছে। যেমন, ভাষাপরিচ্ছেদ, মুক্তাবলী এই দুইখানি গ্রন্থ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিগৃহীত এবং ইহাতে কোন বিবাদ নাই, ইহাই পণ্ডিতসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু দীনেশবাবু দৃঢ়তর অকাট্য প্রমাণসমূহ উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত দুইখানি গ্রন্থই বিশ্বনাথ হইতেও প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম বিরচিত (পৃ. ১১৭-২০) এবং এই সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে বহু পরিচয় দীনেশবাবু সংগ্রহ করিয়াছেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে নব্যন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন ইহাও যে অলীক প্রবাদমাত্র এবং রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন, ইহাও যে হইতে পারে না, তাহা দীনেশবাবু বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রঘুনাথ শিরোমণির সহিত এক সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাও নিতান্ত কল্পনামাত্র (পৃ. ৯৩-৫)। এইরূপ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের রচিত অদ্বৈতমকরন্দের টীকার আবিষ্কার ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অদ্বৈতবেদান্তে রুচির সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকও বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর হইয়াছিলেন। দীনেশবাবুর আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার এই যে, ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থপ্রণেতা অতি প্রাচীন প্রগল্‌ভ মিশ্র তাঁহার সময়ে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বাঙালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন (পৃ.২৪৮-৫৮)। প্রগল্‌ভের পিতা মহানৈয়ায়িক নরপতি মহামিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াই প্রগল্‌ভ মহানৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। প্রগল্‌ভ মিশ্রের যোগ্যতম ছাত্র মহানৈয়ায়িক বলভদ্র মিশ্র ও বলভদ্রের পুত্রসর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহানৈয়ায়িক পদ্মনাভ মিশ্র—ইঁহারা সকলেই বাঙালী ছিলেন। পদ্মনাভের যে গৌরব দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন তাহা অতি বিস্ময়কর ও বাঙালী মাত্রেরই অত্যন্ত গৌরববর্দ্ধক (পৃ. ২৬৩-৭০)। এই পদ্মনাভ মিশ্র সুদূর গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীর রাজসভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং রাণীর আদেশে "দুর্গাবতীপ্রকাশ" নামক স্মৃতিশাস্ত্রের বৃহৎ নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাণী দুর্গাবতীর পণ্ডিতসভায় পূর্ব্বে মৈথিল পণ্ডিতগণের প্রাধান্য ছিল—পদ্মনাভ মিশ্র স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রভাবে মৈথিল পণ্ডিতগণের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া বাঙালীর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে কত অপূর্ব্ব কথাই যে লিখিয়াছেন তাহার সীমা নাই। গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তাঁহার কোন কথাটি ছাড়িয়া কোন কথাটি বলি ইহাতে আমি বিহ্বল হইতেছি। ন্যায়শাস্ত্রে বহুস্থলে নৈয়ায়িকগণ "রত্নকোষ" গ্রন্থের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অথচ এই উপাদেয় গ্রন্থখানির প্রণেতা কে ইহা দীনেশবাবুর গ্রন্থ দেখার পূর্ব্বে আমিও জানিতাম না। দীনেশবাবু সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, রত্নকোষ গ্রন্থের প্রণেতা তরণি মিশ্র (পৃ. ১৩-১৪)। এইরূপ মীমাংসামহার্ণবকারের নাম বংশেশ্বর এবং ন্যায়াচার্য্য উদয়নের গুরুর নাম শ্রীবৎসাচার্য্য (পৃ. ২) আমরা জানিতাম না। মিথ্যা প্রবাদবাক্যসমূহের খণ্ডনপূর্ব্বক অতিনিপুণ সমীক্ষার দ্বারা রামভদ্র সার্ব্বভৌম যে জগদীশের গুরু ছিলেন ইহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলির হরিদাসী টীকা সর্ব্বত্র প্রখ্যাত—অথচ হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারের ন্যায়শাস্ত্রে কত অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, কত বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা দীনেশবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। বহুদিন হইতে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন বহু পণ্ডিতের নাম ও তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাবলীর আবিষ্কার করিয়া দীনেশবাবু সেই সমস্ত বিস্মৃত পণ্ডিতের অজস্র শুভ আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,. লুপ্তস্মৃতি এই সমস্ত পণ্ডিতের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ আবিষ্কার করিয়া দীনেশবাবু নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া বাংলার শিক্ষিত সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য দীনেশবাবু ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালী মাত্রের বিশেষভাবে বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলীর শুভাশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। ইঁহারা নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করুন ইহাই শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক বিনীত প্রার্থনা।

আহরণ—শ্রীকালিদাস রায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

এখানি কাব্যসঙ্কলন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের পর্ণপুট, ব্রজবেণু, লাজাঞ্জলি, রসকদম্ব, বল্লরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে নির্বাচিত প্রায় একশ' আশীটি কবিতা এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-যুগের খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে কবিশেখর কালিদাস রায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ছন্দের পারিপাট্য রবীন্দ্রযুগের এক সাধারণ লক্ষণ। শুধু ছন্দের সৌন্দর্য্য সম্বল করিয়া তাঁহার কাব্য মনোহর হইয়া উঠে নাই, ভাব এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়া গীতিকবিতাগুলি একটি বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছে। "আহরণ"র শেষ কবিতা 'শেষ কথা'র মধ্যে গোড়ার কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে।

'আমি বাঙালীর কবি বাঙালীর অন্তরের কথা,
বাংলার আশা-তৃষা, স্মৃতিস্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা,
ছন্দে গেয়ে যাই আমি।'

তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসী-মঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কালিদাস রায়ের কাব্যের মধ্যে তরঙ্গায়িত আবেগ, আহতের আর্ত্তনাদ, বেদনার বিস্ফুরতা নাই, কিন্তু একটি স্বচ্ছ নির্ম্মলতা, শান্ত প্রবাহ, একটি স্নিগ্ধতা এবং প্রশান্তি কবিতাগুলিকে লক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'প্রত্যাবর্ত্তনে' আছে:

'তুলসী-ছায়ায় ঢাকা লক্ষ্মীর চরণ আঁকা কুটীর অঙ্গনে,
শ্যাম গোঠে দীঘিজলে তব দোলমঞ্চতলে বেণুকুঞ্জবনে,
ফিরিনু পুন ও বুকে, প্রীতিসুখে স্মৃতিদুখে জাগে শিহরণ।

'শরতের গ্রামপথে' পাই:

'সমুখে গাঁয়ের দীঘি কহ্লারকুমুদ-কল-কলস-চঞ্চল।'

সম্পাদক তারাচরণ বসু নিম্নোক্তরূপে কবিতাগুলিকে বিভক্ত করিয়াছেন: প্রাচীন বঙ্গে, ব্রজের পথে, প্রেমের স্বপ্ন, পল্লীপথে, গার্হস্থ্য জীবনে, পুষ্পকুঞ্জে, প্রবাসপথে, প্রাচীন ভারতে, ঋতুরঙ্গে, বেলাশেষে; এ-ছাড়া কতকগুলি গানও আছে। কৃত্তিবাসকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন:

'সীতার নয়নজলে বসিয়া অশোকতলে
লিখেছিলে তব গ্রন্থখানি।'

জয়দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:

'পদ্মাবতীর চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী কবি!
দোলগোবিন্দ পদারবিন্দে মাখিলে ব্রজের ফাগ,
কোমল কান্ত ষট্‌পদে তব বঙ্কৃত হয় রাগ।'

কাব্যের গতি সাবলীল কিন্তু কোথাও সংযমের বাঁধ ভাঙে নাই। 'বাসর স্মৃতি'তে পাই:

'মোদের অশোক-বকুলবাগে মলয় সেদিন প্রথম জাগে,
ভুলি নি সই ভুবন-ভোলা প্রথম ভালবাসার-রাতি।'

'নীড়ের স্মৃতি'তে আছে: 'যৌবনের মৌ তপ্ত-মদির পান করেছি নেশায় মেতে।'

'গানের বাণী'তে আছে: 'মোদের দোঁহার মিলেই প্রিয়া এ সুর উঠে ঝঙ্কারিয়া।'

যেখানে জীবনের আলোচনা সেইখানেই কবিতা সার্থক। জীবন দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কালিদাস রায় কাব্যে বাঙালী-জীবনকে রূপায়িত করিয়াছেন। সে জীবন নাগরিক নয়, তাহা পল্লীশ্রীমণ্ডিত। সোনার বাংলা বাঁশী বাজাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, তিনি বার বার সেই রৌদ্রোজ্জ্বল ছায়াচিত্রিত বঙ্গপল্লীর আকাশ-বাতাস, মাঠ-ঘাট, রাখাল-মাঝি, কন্যা-বধূ, কৃত্তিবাস-রামপ্রসাদ, পদাবলী-শ্রীচৈতন্য, মেনকা-উমা, রাধিকা-কৃষ্ণ, বিরহ-মিলন, চম্পক-শেফালী, অশ্বত্থ-তুলসী, শরৎ-হেমন্ত, বর্ষা-বসন্ত, গঙ্গা-অজয়ের গান গাহিয়াছেন। 'পল্লীশ্রী'তে আছে:

'শুধু ছায়া, শুধু ছায়া আধা আলোকের মায়া—
উঠে ধূম খ'ড়ো চাল ভেদি';
দেখা যায় দুটি গোলা কুয়া হ'তে জলতোলা
বেড়াখানি রচেছে মেহেদি।'

'মাথুর বেদনায়' পাই:

'অরূপ হেরে নি রূপে, গন্ধ ফেরেনিক' ধূপে, শ্যাম বৃন্দাবনে,
তাই আজো রাধিকার বিলাপন হাহাকার ধ্বনিছে ভুবনে।'

'নৌকা-বিলাসে' বলিতেছেন:

'বসনে গুণ্ঠিত-মন বাসনা-কুণ্ঠিত জন
অকূলে কেমনে দিবে পাড়ি।'

চাঁদসদাগরকে বলিতেছেন:

'এ বঙ্গের সমতলে তৃণ-লতা-গুল্মদলে
বস্তুজয়ী তুমি বনস্পতি।'

'সন্ধ্যার কুলায়ে' আছে:

'আকণ্ঠ পূরি সৃষ্টি-মাধুরী প্রাণ ভরি কর পান,
অংশভুক্ত রয়েছে মুক্ত প্রকৃতি-মাতার দান।'

'বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালা', 'ঘুমিয়ে ছিলাম অঘোর-বরণ কাজলবরণ রাতে', 'বাংলার দীঘি গভীর শীতল কবির মর্ম্মে গড়া', বা 'কুহর গিয়াছে দিন কেকা আজ কাঁপায় অম্বর' মনের তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে। কবিশেখরের কাব্যে সুরার তীব্রতা নাই, শীতল পানীয়ের স্নিগ্ধতা আছে। একদিকে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, আর একদিকে কতকগুলি কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অজস্র শব্দ ও

উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বথ, গঙ্গা, হিমাদ্রি, আদিত্য, বেদ, বৈশ্বানর, শঙ্খ প্রভৃতি শেষোক্ত কবিতার উদাহরণ।

'কবে কোটি কোটি তৃষিতকণ্ঠ গাহিল তোমার আমগ্নী ;

মেঘে এসে বেগে দুর্বার বেগে তুলি মেঘে মেঘে কলধ্বনি।'

কিংবা,

'শশি-সূর্য্য-কর-মাত-ভালে তব হয়হাক্তসংহত মুকুট।

অথবা, 'তপস্যাতে শিলা তব হয়েছে তরল দ্রব লীলাময়ী ধারা।'

প্রভৃতি পংক্তিগুলি মনের পটে ছবি আঁকিয়া যায়। কবি বেদ সম্পর্কে বলিতেছেন, 'নমি ব্রহ্মের বাঙ্ময় রূপ', সোমকে বলিতেছেন, 'গৌরীর তুমি মুকুরখানি।' সহজ সরলই হোক আর গম্ভীরশব্দযুক্ত হোক তাঁহার কবিতার মধ্যে কোথাও অস্ফুটতা নাই, সমস্তই পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। মাটির সহিত সংযোগ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। বাংলার উর্ব্বর কোমল মাটির সহিত কালিদাস রায়ের কাব্যের সংযোগ আছে। পল্লীর ঘাট, কৃষাণীর ব্যথা, বন্যার শেষ, বৌদি, গঙ্গা, হিমাদ্রি, বুদ্ধধ্বনি, কবির কৈফিয়ৎ, কবির নিমন্ত্রণ, কবির বিদায় প্রভৃতি কবিতাগুলি চমৎকার। ভক্ত কবির হৃদয় হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে :

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,

চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।

জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ

ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।

যাঁহারা রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য, যুগবিপ্লব, ভাববিদ্রোহ এবং এমনি-সব তুরীয় কথার অবতারণা করেন তাঁহারা কবিতার ঐতিহাসিক আলোচনা করেন মাত্র' কাব্য হিসাবে কবিতার বিচার করেন না। মাসিকপত্র ছাড়া কালিদাস রায়ের কাব্যের সহিত যাঁহাদের সবিশেষ পরিচয় নাই তাঁহাদের এই কাব্যগ্রন্থখানি পড়া উচিত। "আহরণ" একগুলি ভাল কবিতার একত্র সমাবেশ কাব্যামোদী পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভুতুড়ে—শ্রীপুষ্প বসু। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০ আনা।

কার্য্য-কারণ সম্পর্কশূন্য ব্যাপারকে আমরা বলি ভুতুড়ে ব্যাপার। ইহ-জগতের সীমায় যতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানের আলো পৌঁছায়—ততদূরই বাস্তবভূমি, তার পরেই কল্পনার প্রসার। এই কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে গাঁথিয়া দিবার প্রচেষ্টা আজ অবধি কম হয় নাই ; 'অপর লোকের বার্ত্তাচয়ণের উৎসাহ তাই আমাদের অপরিসীম। কিন্তু ব্যাপারটাকে যে ভাবেই আমরা বিচার করি না, অলৌকিকত্বের মোহ এবং সেই মোহ মোচনের কৌতূহল আমরা পোষণ করি। জ্ঞানবৃদ্ধির পাশে বসিয়া সে বস্তু খানিকটা ভয়েরও বটে। যাহাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা—তাহা আসলে মন হইতে বাহির করিয়া মনের এক কোণেই সঞ্চিত করিয়া রাখার প্রয়াস। দুই লোকের সংযোগ-সেতুতে বিস্ময় আর কৌতূহল প্রচুর বলিয়াই অবিশ্বাস করিয়াও ভূতের গল্প শুনিতে আমাদের এত আগ্রহ—এমনই কয়েকটি পারলৌকিক কাহিনীর সংগ্রহ এই ভুতুড়ে বইখানি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—গল্পগুলিতে উদ্ভট কল্পনার সমাবেশ নাই। এক জগতের অপূর্ণ-তৃপ্তি আর একটি জগতে অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত অঘটন ঘটায়—তাহারই বৈচিত্র্যে ভরা গল্পগুলি প্রীতি প্রণয় ঈর্ষ্যা কৃতজ্ঞতা প্রতিহিংসা প্রভৃতি জীবনের যতকিছু মধুর এবং তিক্ত সম্বন্ধ—সবই গল্পের উপজীব্য। সুন্দর আর ভয়ঙ্করকে পাশাপাশি রাখিয়া লেখিকা ছবি আঁকিয়াছেন। মানুষের সঙ্গে প্রেতের কার্য্য-কারণের সম্পর্কটি বেশ নিবিড় হইয়াছে বলিয়াই দুই জগতের প্রভেদটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া মনে লাগে না। বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ—দুই প্রান্তের জীবনের লীলারস আস্বাদ করিয়া খানিকটা আশ্বাসও পাওয়া যায়।

লেখিকার ভাষা মিষ্ট—ঝরঝরে। কাহিনীকে মনের মাঝে পৌঁছাইয়া দেয় অনায়াসে এবং কাহিনী-সমাপ্তি পর্য্যন্ত কৌতূহলের তীব্রতাটুকু জাগাইয়া রাখে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
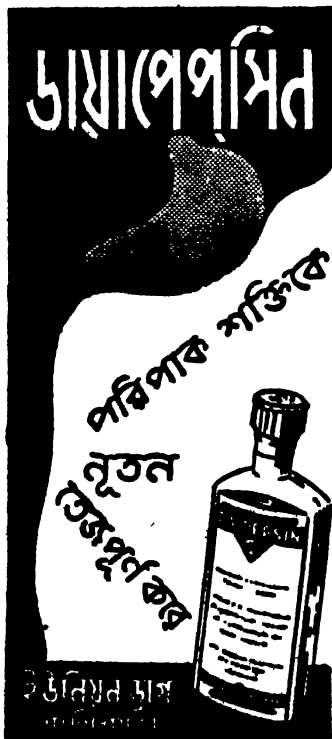
আমাদের লেখা, ১৩৫৬ বার্ষিকী—শান্তিনিকেতন, পাঠভবন। মূল্য এক টাকা।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লেখা। ছোটদের রচনা, কিন্তু বিশেষ উপভোগ্য। তাজা কচি মনের সরসতায় প্রত্যেকটি রচনা ঝলমল করিতেছে। বয়স্ক গ্রন্থকীটদের গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বা বাঁধা বুলি নয়; নবীন কল্পনায়, নূতন অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তাই বলিয়া ভাসা ভাসা ভাঙা কিংবা এলোমেলো নয়। ইন্দ্রাণী, আলোক ও অতীন্দ্রের ভাষার উপর বেশ দখল জন্মিয়াছে। তান-লী'র বাংলা শুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল।

পূজার ফুল, সোনার দেশ, সোনার কুঞ্জ, মর্ম্মবীণা, পারের খেয়া অথবা, পূজার ফুল ১-৫ খণ্ড—শ্রীশিশিরকুমার দত্ত। বুক হাউস। ২৯, রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ॥০, ৷৵০, ৷৵০, ৷৵০ ও ৷৵০ আনা।

সৌন্দর্য, প্রেম, ভক্তি, দেশানুরাগ প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত গীতিকবিতার সমষ্টি পাঁচখানি পুস্তিকা। কবিতাগুলি মাঝারি শ্রেণীর। প্রথম খণ্ড লেখকের নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল। পঞ্চম খণ্ডে নামের পূর্বে কবিগুরুশিরোমণি এবং পরে এম-এ, সংযোজিত না করিলেই ভাল হইত। কবি একটু 'আত্মস্থ' হইতে পারিলে ইহা অপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিতে পারিবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবন-কথা—আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য দেড় টাকা।

প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের সংরক্ষক ও পরিপোষক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কীর্তিকাহিনী আধুনিক সমাজে তেমন পরিচিত নয়। অথচ নানা দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন অনাদর-অবহেলার মধ্য দিয়া ইঁহারা আমাদের প্রাচীন গৌরবধারাকে, আমাদের জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শকে যথাসম্ভব সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। ইঁহাদের অকৃত্রিম সাহিত্য-প্রীতি সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রবাহকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রুদ্ধ হইতে দেয় নাই—বর তাহারই রসে বাংলা-সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই জীবন-কথা যথাযথভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে। সুখের কথা আলোচ্য পুস্তকে এই সম্প্রদায়েরই এক জন কৃতকর্মা পুরুষ বিশ্রুতকীর্তি বাঙালী বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বৃত্তান্ত সংকলিত হইয়াছে। বৈদিক গ্রন্থ প্রচার ও বৈদিক সাহিত্যের আলোচনাকে জীবনের মুখ্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইনি প্রত্নকম্রনন্দিনী (১৭৮৯ শকাব্দ) ও ঊষা (১৮১১ শকাব্দ) নামে দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইহাদের মধ্য দিয়া বা স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত অপরিচিত বহু বৈদিক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন—অনেকগুলির সংস্কৃতব্যাখ্যা বা বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে দেশে-বিদেশে ইঁহার প্রতিষ্ঠা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১০ সালে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহাকে 'মাননীয় সদস্যে'র (অনারারি ফেলো) গৌরবে ভূষিত করেন। তবে 'তিনি সর্বপ্রথম উক্ত সভায় ভারতীয় 'অনারারি ফেলো' নির্বাচিত হন'—সমালোচ্য গ্রন্থের এই উক্তি বিভ্রান্তিজনক। বস্তুতঃ 'অনারারি ফেলো'র পূর্বনাম ছিল 'অনারারি মেম্বর' এবং মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৮৯৪ সালে প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। পুস্তকখানিতে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ বা অনবধান উক্তি অল্পত্রও যে দেখিতে পাওয়া যায় না এমন নয়। আচার্যদেবের মৃত্যু বৎসর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে উল্লিখিত হইয়াছে—১৯১৯ (পৃঃ ৬০), ১৯১৪ (পৃঃ ১২৩) ১৯১১ (পৃঃ ৯১)। শেষোক্ত সালটিই সঠিক বলিয়া মনে হয়।

পুস্তকের মধ্যে আচার্যদেবের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, অধিকাংশ স্থলে তাহাদের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায় না—অনেক ক্ষেত্রেই জনশ্রুতি ইহাদের প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে যে সব পত্র-পত্রিকার উল্লেখ কোথাও কোথাও করা হইয়াছে প্রায়শঃই তাহাদের নির্দিষ্ট খণ্ড বা পত্রের বিবরণ দেওয়া হয় নাই। ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তাহাতে তৃপ্তি হইবে না। সামশ্রমী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় বিভিন্ন বক্তা যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন গায়ক যে সমস্ত গান গাহিয়াছিলেন সেগুলি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করা ঠিক শোভন হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইয়াছে নানা দিক দিয়া তাহা অসম্পূর্ণ ও প্রমাদবহুল। উহাতে গ্রন্থের প্রকাশকাল উল্লিখিত হয় নাই—নাম এবং বিবরণেও মাঝে মাঝে ত্রুটি আছে। পুস্তকমধ্যে বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য পাঠককে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে এত ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
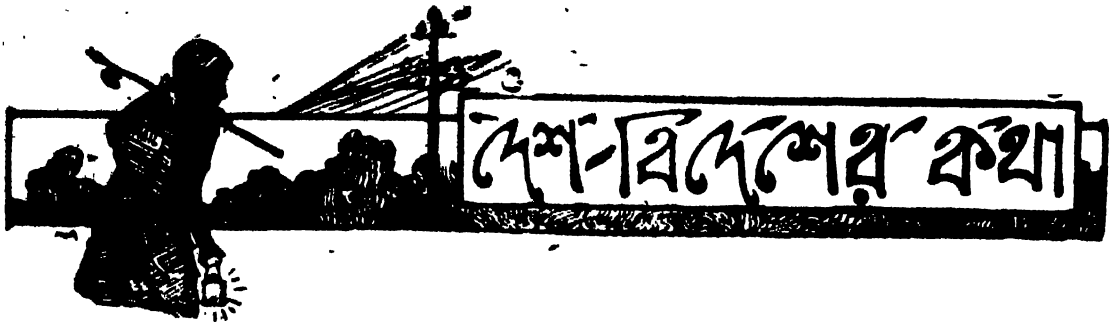
অন্ধ ছাত্রীর কৃতিত্ব

জন্মান্ধ শ্রীমতী প্রতিভা বাগচি এই বৎসর সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী প্রতিভা আই-এ পরীক্ষাতেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ সেন

ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ সেন গত ৮ই আগষ্ট পাটনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। এই বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালীর মৃত্যুতে বিহারের শিক্ষা-জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সুরাপুর গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ সেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ দিনাজপুর জেলাস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পান। ১৮৯১ সালে দর্শনে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কিছুকাল কলিকাতায় অবস্থান করেন; অবশেষে পাটনা বি, এন. কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ভগবতী-চরণ দাশ বিহার এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের কার্য্যে যোগদান করিলে দেবেন্দ্র-নাথ তাঁহার স্থান লাভ করেন। তখন কলেজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। এই সঙ্কট-সময়ে মুখ্যতঃ দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই কলেজটি নানা বিপর্য্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পায়। সরকার বি, এন্, কলেজের ভার গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে গৃহীত হন। তিনি জাথান কমিটির সভ্য ও বিহার রিসার্চ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে পাটনা বিশ্ববিভালয় হইতে ডি-লিট উপাধি ও ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস হইতে মানপত্র দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার কলেজে 'এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি'র (পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান) ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। এক মিস্ত্রীকে শিখাইয়া-পড়াইয়া তাহার সাহায্যে 'এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকো-লজির' গবেষণার উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কলেজের ওয়ার্কশপে তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি দেখিয়া ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু ও আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিভালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক মার্ফি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কলেজের উন্নতিকল্পে তাঁহাকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার দরুন তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে।

১৯৩৫ সালে তিনি কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে তিনি ইহার সিণ্ডিকেট ও সিনেটের সদস্যরূপে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। বাংলা, ইংরেজী ব্যতীত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। "ট্রান্স হিমালয়ান্ রেমিনিসেন্সেস" ও "রাজগীর" নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার গবেষণা-শক্তির নিদর্শন। তিনি একজন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে দেবেন্দ্রনাথ একজন সদাচারী, ধর্ম্মপরায়ণ, পরদুঃখকাতর ও কোমলহৃদয় লোক ছিলেন। তাঁহার গোপন দান ছিল প্রচুর। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন।

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

নীরব কর্ম্মী শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক শ্রীযুত নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবনের পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় ১৯৫২, জুলাই মাসে তাঁহার ছাত্রদের উদ্যোগে রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০০ সালে নির্ম্মলনাথের জন্ম হয়। তাঁহার শৈশবকাল আসামের বিলাসীপাড়ায় অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ধুবড়ী গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি বিজ্ঞানের ইণ্টারমীডিয়েট কোর্স অধ্যয়নের জন্য কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২০-এ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এস সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২২-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূবিদ্যায় এম-এস্ সি উপাধি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুবর্ণপদক এবং পুরস্কার লাভ করেন।

১৯২৩-৪ সালে নির্ম্মলনাথ কয়লা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা-গবেষণা সুরু করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া কয়লা-ক্ষেত্রে তিনি কয়লা খনি এবং বাজারের জন্য কয়লা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান কার্য্যে নিয়োজিত হন। ১৯২৬ সনে লেক্‌চারার রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যাবিভাগের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টে যোগদান করিবার জন্য তিনি আহূত হন এবং তার পর দীর্ঘকাল এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎ লাল বিশ্বাসের পরলোকগমনের পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যাবিভাগের প্রধান রূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯৫২, জুন মাস হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যায় 'চেয়ার' অধিকার করিয়া আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪৮ সনে ভূবিদ্যায় অধ্যাপক-পদ সৃষ্ট হয় এবং নির্ম্মলনাথেরই প্রথম উক্ত পদের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য হয়।

মুষ্টিমেয় যে কয় জন ভারতীয় কয়লা-বিষয়ক গবেষণা সম্বন্ধে প্রধানতঃ বিদেশে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বাদ দিলে, ভারতীয় কয়লা এবং শিল্পক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অধ্যাপক নির্ম্মলনাথই বাস্তবিক পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কয়লা সম্বন্ধে তিনি ব্যাপক ভাবে গবেষণাকার্য্য করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তিনি ভারতের প্রায় সবগুলি কয়লাক্ষেত্র এবং খনিজ দ্রব্যের 'ডিপজিট' পরিদর্শন করিয়াছেন। কয়লা এবং অর্থনৈতিক ভূবিদ্যা (Economic Geology) বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের

পরিচয় দিয়াছেন। গবেষণা এবং শিক্ষাদানের ভিতর দিয়া তিনি যে ভাবে দেশের সেবা করিয়াছেন তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশনে তাঁহাকে ভূবিদ্যা এবং ভূগোল বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। তথায় তিনি "ইণ্ডিয়াজ পজিসন উইথ রিগার্ড টু হার কোল রিসোর্সেস" (কয়লা-সম্পদে ভারতের অবস্থা) শীর্ষক এক মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৪৮-এ তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৪৯-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'জিওলজিক্যাল মাইনিং এণ্ড মেটালারজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া" নামক প্রতিষ্ঠানের—১৯২৮ সাল হইতে তিনি যাহার অন্যতম অনারারী সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন—প্রতিনিধি রূপে তিনি লণ্ডন এবং অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত '৪র্থ এম্পায়ার মাইনিং এণ্ড মেটালারজিক্যাল কংগ্রেসে' যোগ দেন। ইংলণ্ডে এই এক বৎসর অবস্থানকালে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় লণ্ডনের ইম্পীরিয়াল কলেজের অধ্যাপক হিনাসের গবেষণাগারে কয়লা পরিক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্য চালান। এতদ্ব্যতীত তিনি বিলাতের অধ্যাপক উইলিয়ামস, অধ্যাপক রীড প্রভৃতি আরও কয়েক জন অধ্যাপকের নিকট এ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৯৪৯ সনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার্লণ্ডের কতকগুলি বিশিষ্ট গবেষণাগার ও মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। তিনি ষ্টকহোম, উপসালা, অসলো, কোপেনহেগেন, আমষ্টারডাম, লিডেন, ব্রুসেলস প্রভৃতি স্থানেও যান। এই ভ্রমণকালে তিনি তৎ তৎ স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূবিদ্যা-বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপকদের সংস্পর্শে আসেন এবং এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মান ও গবেষণাপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগও তাঁহার হয়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাহিরেও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য। দেশের আসন্ন স্বার্থরক্ষা কি ভাবে হইবে তাহাই তাঁহার প্রধান ভাবনা। ভারতের জিওলজিক্যাল, মাইনিং এবং মেটালারজিক্যাল সোসাইটির তরফ হইতে তৎকর্ত্তৃক সংগঠিত 'আলোচনী'তে (symposia) 'কয়লা সংরক্ষণ', 'ভারতের অভ্রশিল্প' প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। 'নেশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অফ্ ইণ্ডিয়া' নামক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সংগঠিত আলোচনীতেও তিনি "ভারতের কয়লা", "কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার" প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়লা কমিশনের সমক্ষে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। স্বাধীন ভারতে খনিজ শিল্পের উন্নয়নকল্পে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রচিত খনিজ-সম্পর্কিত আইনকানুন বিষয়ে তিনি অকপটভাবে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভূবিদ্যাদি চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় কলিকাতার মাসিক পত্রিকাসমূহে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের (বিজ্ঞানশাখার) অধিবেশনে বিতর্কসভায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া সাধারণ্যে ভূবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঝরিয়া কোল সার্ভে কমিটি, জিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যুক্ত আছেন, ভারতের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউশনের সঙ্গেও তাঁহার যোগাযোগ রহিয়াছে।

একজন আদর্শ শিক্ষকরূপেও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁহার কোন কোন ছাত্র ভারত ও পাকিস্থানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।
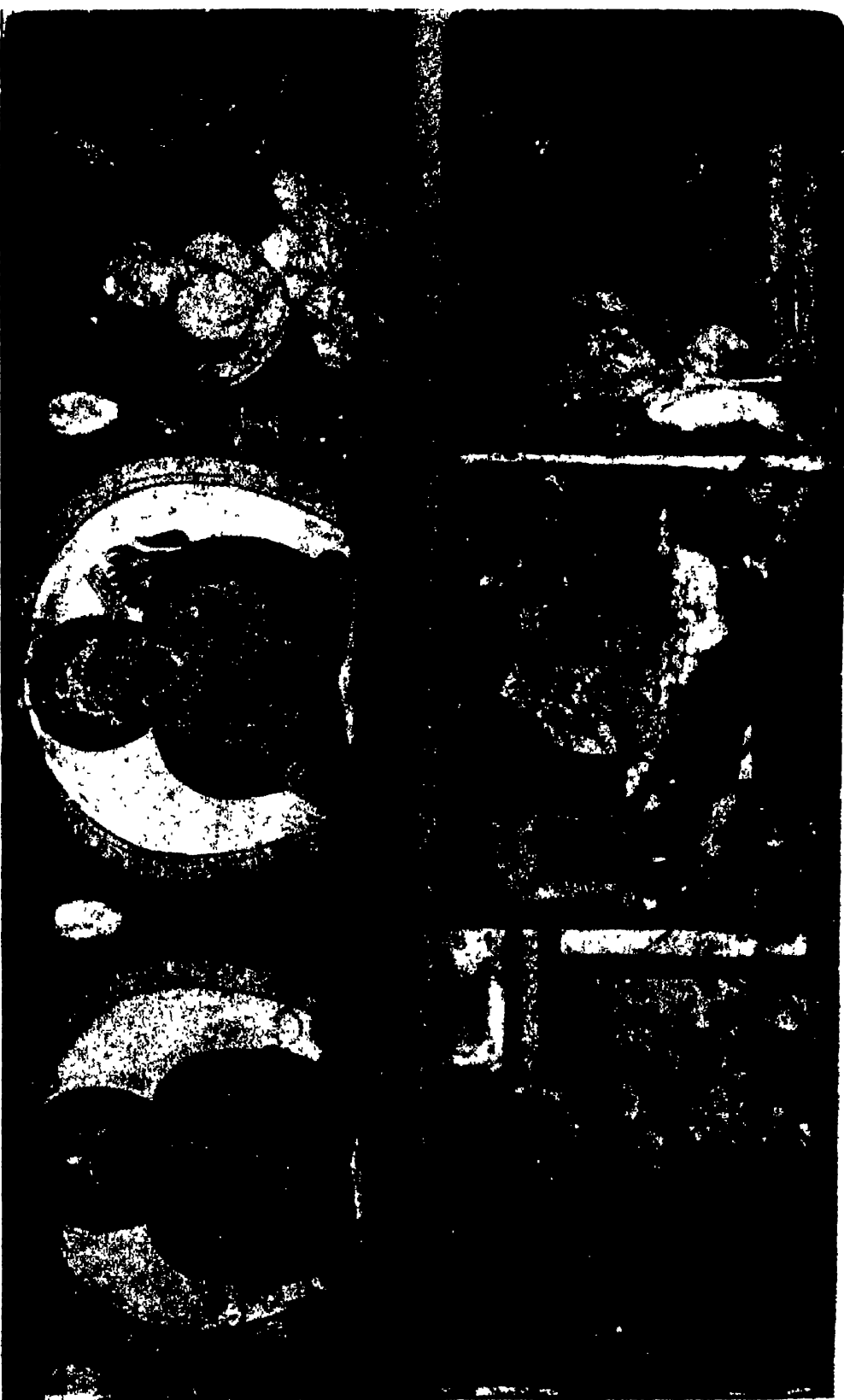
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

নে প্রাপ্ত বুদ্ধচরিতের প্রাচীনতম পুথির পাটার চিত্রাবলী

(আনুমানিক নবম শতাব্দী)

শ্রীযুক্ত শিবনারায় নর সৌজন্যে

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের 'জিরো'তে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক একটি উপজাতীয় বালককে পুষ্পমাল্য প্রদান

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু। (বাম দিক হইতে) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জবাহরলাল, মণিপুরের মহারাজা ও মহারাণী

৫২শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দায়িত্ব ও অধিকার

একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক—বোধ হয় জর্জ্জ বার্ণড শ—গণতন্ত্রের (ডেমোক্র্যাসি) অর্থ বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, ঐ শাসনতন্ত্রে লোকসাধারণ তাহাদের যোগ্যতার অনুযায়ী শাসক পায় ("People get the government they deserve")।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ উক্তির সার্থকতা সকলেরই বোধগম্য হওয়া উচিত। এই অল্পদিন পূর্ব্বেই নির্ব্বাচনের জুয়া-খেলা হইয়া গিয়াছে। দেশের লোক নিজ নিজ দায়িত্বজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় উহাতে দিয়াছেন। কেহ বা মনে করিয়াছিলেন উহা নির্ব্বাচন-প্রার্থীদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ বা কন্যাদায়। কেহবা অর্ব্বাচীন ও বাচালদিগের কথায় ভুলিয়া সাময়িক উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের বশে কংগ্রেস-সরকারকে 'জব্দ' করার জন্য ভাগ্যান্বেষী চতুর নির্ব্বাচনপ্রার্থীর সমর্থন করিয়াছেন। কেহবা ভোট দেওয়ার দায়িত্ব একেবারেই বুঝেন নাই, সুতরাং ঘরে বসিয়া রাজা-উজিরের ভবিষ্যৎ চর্চ্চা করিয়াছেন। ফলে আমরা পাইয়াছি বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের অপরূপ অধিকারীবর্গকে এবং পাইয়াছি ততোধিক অপরূপ বিপক্ষ দলগুলিকে। দুই দলই, আমাদের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচায়ক এবং আমাদেরই সৃষ্টি; সুতরাং আমাদিগের অধিকারের প্রশ্ন এখন অবান্তর।

অধিকারের প্রশ্ন সকলের পক্ষেই অবান্তর, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর পক্ষে উহা মারাত্মকরূপে অবান্তর। অন্য সকলের ক্ষেত্রে দুই-চারি জন লোক মাঝে মাঝে প্রান্তীয় বিধান পরিষদে বা কেন্দ্রীয় লোকসভায় দু'দশ কথা বলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র আমরা কোথায়ও খুঁজিয়া পাই না। অথচ ইহাও শুনি যে, সকল প্রদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাসঙ্কুল প্রান্ত। অসংখ্য বেকার যুবক-যুবতী পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে রহিয়াছে। তাহাদের জীবিকার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, সে ত্রিবর্ণ ঝাণ্ডা পক্ষই বলুন বা লালঝাণ্ডাই বলুন। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক জেলায় জেলায় ছড়াইয়া আছে। তাহাদের একমাত্র ভরসা ভগবান। দেশের শাসকবর্গ তাহাদের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, কেন্দ্রীয় সরকার তো দূরের কথা। রোগদুঃখ তো পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর জন্মস্বত্ব। দেশের ভূতপূর্ব্ব সেবকদিগের চেষ্টায় কয়েকটি জেলায় রোগের প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের সাহায্যে কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের বুদ্ধির কৃপায় সেগুলিও ধ্বংস হইতেছে, নূতন প্রতিষ্ঠানের কথা তো চিন্তারও অতীত। ব্যবসা-বাণিজ্য এদেশে প্রায় সবই পরহস্তগত, সামান্য যাহা কিছু বাঙালীর হাতে ছিল তাহাও কেন্দ্রীয় সরকারী বিমাতারূপ ক্রূরতায় ও প্রাদেশিক সরকারের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রকোপে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের একাধিপত্যযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের এমনই গুণ। মন্ত্রিমণ্ডলের কথা বলাও বৃথা, সেখানে তো একা ডাক্তার রায়, বাকী প্রায় সকলেই বিশ্ব-গুণযুক্ত শূন্য—সাইফার। অর্থাৎ, তাঁহাদের অধিকাংশই ডাঃ রায়ের গুণের কোটায় দশমিকের বিন্দু রূপে ক্ষয়কারী ও দোষের কোটায় দশকের শূন্যের ন্যায় বৃদ্ধিকারী। সুতরাং বেকার সমস্যা, ভূমির অভাব, রোগদুঃখের অবসান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ধ্বংস এ সকল সমস্যা সম্পর্কে আমাদেরই অবহিত হইতে হইবে নহিলে খাণ্ডবদাহের অরণ্যের পশুপক্ষীদিগের ন্যায় আমরাও নিশ্চিহ্ন হইতে পারি। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পরিণতি উহাই হইবে।

বাকী রহিল অন্নবস্ত্র ও উদ্বাস্তু সমস্যা। অন্নের ব্যাপারে বিধাতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন এই আশার বাণী শুনিতেছি। বস্ত্রের ব্যাপারে, দেশের লোক "কৌপিনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত" এই আপ্তবাক্য হৃদয়ঙ্গম করায় কিছু ফল ফলিয়াছে—অন্ততঃপক্ষে সাময়িক ভাবে।

সুতরাং শেষ সমস্যা উদ্বাস্তুর। ঐ ভয়ত্রস্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারী-শিশুর প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে নিশ্চয়। অন্য সকল দায়িত্বের তর্কযুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও মনুষ্যত্ব ও মানবতার কর্ত্তব্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু সে দায়িত্ব আমাদের শুধু তাহাদেরই জন্য যাহারা প্রকৃতই দুঃস্থ ও ক্লিষ্ট। তাহারা এই শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী নয় এবং প্রকৃত উদ্বাস্তু বিপক্ষ দলের সৃষ্টিতেও বিশেষ হাত দেয় নাই, দিয়াছে ঘোর স্বার্থকামী নকল উদ্বাস্তু। সুতরাং সকল দিক হইতেই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া তর্কযুদ্ধে নামিয়াছেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ কিছু না বলাই ভাল। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ এখনও ছায়া-পথের ন্যায় আকাশে রহিয়াছে। কবে তাহা বাস্তবের ক্ষেত্রে দেখা দিবে জানি না। পথ খুঁজিতে হইবে উদ্বাস্তুদিগের প্রকৃত মঙ্গলকামী-দিগকেই। এ দায়িত্ব তাঁহাদেরই, কেননা অন্যথায় যে ছিন্নমূল জনসমষ্টি অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া এই প্রান্তে আসিয়াছে, তাহাদের এখানেও দুর্গতির সীমা থাকিবে না। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অসার, অবাস্তব ও সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিদুষ্ট।

পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু-অধিকার-সংরক্ষণ সম্মেলন

বিগত ১লা এবং ২রা নবেম্বর কলিকাতায় নিখিল-ভারত পূর্ব্ব-বঙ্গ সংখ্যালঘু-অধিকার-সংরক্ষণ সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী সভানেত্রী ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেস ব্যতীত এগারটি বিরোধী দল এই সম্মেলনে যোগদান করে।

শ্রীমতী কৃপালনী বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যাকে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। এই সমস্যা কেবলমাত্র কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমস্যাও নহে। ইহা একটি জাতীয় সমস্যা এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর উপরই ইহার প্রভাব পড়িতে বাধ্য।

পাকিস্থান এক সুপরিকল্পিত নীতির সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের সঙ্কল্প করিয়াছে। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘুরা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তৃতীয় বার দলে দলে পাকিস্থান হইতে সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুরা আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। ভারতের উপর ইহার প্রভাব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ কয়েক দিন পর পর দলে দলে উদ্বাস্তু আসার ফলে জাতীয় অর্থনীতি এবং পুনর্গঠনের কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহার ফলে ভারতের হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হইয়া জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয়। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে অচিরেই ভারতের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া বক্তা দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেন।

বর্ত্তমান উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও ভারতীয় জনগণ যে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন বক্তা তাহার প্রশংসা করেন।

শ্রীমতী কৃপালনী বলেন যে, সাম্প্রদায়িক দুই-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দেশ-বিভাগ হয় নাই, ভৌগোলিক ভিত্তির উপরই ভাগ হইয়াছে; এবং বিভাগের সময় স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে, উভয় দেশেই সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকিবে। পাকিস্থানের হিন্দুরা পাকিস্থানের নাগরিক হইলেও তাহাদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ভারত-সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া পরাধীন অবস্থায়ও ভারত নির্যাতিত মানবতাকে সমর্থন করিয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও সিংহলে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভারত তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। পাকিস্থানের হিন্দুরা ঠিক দক্ষিণ-আফ্রিকা বা সিংহলে অবস্থিত ভারতীয়দের সমগোত্রীয় নহে। তাহাদের প্রতি ভারতের নৈতিক দায়িত্ব আরও অধিক।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তি পূর্ব্ববঙ্গে কি ভাবে কার্য্যকরী করা হইয়াছে? উত্তরে বক্তা বলেন যে, হিন্দুদের রক্ষার জন্য যে সংখ্যালঘু কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও এক বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ডের একটি অধিবেশনও হয় নাই এবং সংখ্যালঘুদের অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় নাই। তাহার কারণ পাকিস্থান সকল হিন্দুকে বিতাড়িত করিতে চাহে। তিনি বলেন, ভারত-সরকার স্বীকার করেন নাই যে, নেহরু-লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে। যখন সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পাকিস্থান পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তন করিল তখন তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন।

সম্মেলনের সভানেত্রীপদে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর নাম প্রস্তাব করিয়া ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এখন উদ্বাস্তু সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অবরোধ সম্পর্কে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বাবু রামনারায়ণ সিংহ বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করিতে পণ্ডিত নেহরু বাধ্য। যদি তিনি সেই দায়িত্ব অস্বীকার করেন তবে সরকারের নেতৃত্ব করিবার কোন দাবিই তাঁহার থাকিবে না। ডঃ রামমনোহর লোহিয়া ভারত-সরকারের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে সুভেচ্ছা মিশন পাঠাইবার জন্য কম্যুনিষ্টরা যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহার বিদ্রূপ করেন।

কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা সম্পর্কে ৮ই নবেম্বরের 'যুগবাণী'তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। যুগবাণী লিখিয়াছেন যে, ১লা নবেম্বরের "কম্যুনিষ্ট সভায় যে সব শোভাযাত্রা যাইতেছিল তাহাতে একটু নূতনত্ব দেখা গেল। প্রথমে একটি বৃহৎ লুঙ্গি শোভাযাত্রা ব্যাণ্ড বাজাইয়া 'পাকিস্থানের দাবি মানতে হবে' বলিয়া পরম উৎসাহের সঙ্গে গেল। অনেক পিছনে ছিল হিন্দু কম্যুনিষ্টদের দল। নীরব, বিরস-বদন, দেখিলেই বুঝা যায় যেন চলিতে চরণ নাহি চায়। এক দিকে বিবেক ও দেশ, আর এক দিকে পার্টি....।"

লোকসভায় উদ্বাস্তু সমস্যা

১৩ই নবেম্বর লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগের কারণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন যে, নিরাপত্তার অভাব এবং অর্থনৈতিক অবনতির জন্যই পল্লীগ্রাম অঞ্চলের বহুসংখ্যক গরীব লোক পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। আগষ্ট মাসে এই উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল—সেপ্টেম্বর মাসে তাহা বেশ বৃদ্ধি পায় এবং পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার ফলে অক্টোবরের প্রথম দিকে তাহা অভূতপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে। প্রধানমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী শ্রী এ. কে. চন্দের প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, "১৯৫২ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত রেলপথে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে পঁচিশ লক্ষের বেশী লোক আগমন করে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজারের বেশী লোক পূর্ব্ববঙ্গে গমন করে—ইহার অর্থ পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম হইতে প্রায় এক লক্ষ ৭৬ হাজার বেশী লোক পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে।" (যুগান্তর, ১৪ই নবেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর এই তথ্যে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মাস হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন, সেই স্মারকলিপির হিসাবের সহিত প্রধানমন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিসাবের উল্লেখযোগ্য গরমিল রহিয়াছে।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পর ভারত-সরকার আর পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রত্যাহারের কথা বলিতে পারেন না।

১৫ই নবেম্বর পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে লোকসভায় প্রবল বিতর্ক হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও সোয়া ঘণ্টা ধরিয়া সভার অধিবেশন চলে। উদ্বাস্তু আগমনের সমস্যা সম্পর্কে গবর্মেণ্ট এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেগুলি সমর্থন করিয়া কংগ্রেসী দল যে প্রস্তাব আনেন বিতর্কের শেষে সেই প্রস্তাবটি ২১৬-৫৯ ভোটে গৃহীত হয়। বিরোধী দল ও কম্যুনিষ্টরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সংখ্যালঘুরা যাহাতে শান্তিতে ও পূর্ণ মর্য্যাদা লইয়া বসবাস করিতে পারে, তজ্জন্য পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন ও অন্যান্য দৃঢ় ও কার্য্যকরী পন্থা এবং উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাইয়া কম্যুনিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দল একটি যুক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ভোট-গণনা না করিয়াই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ভারত-পাক সমস্যার সমাধানের দাবি জানাইয়া কম্যুনিষ্ট দল যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও অগ্রাহ্য হয়। লোক-বিনিময় সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার শ্রীদেশপাণ্ডে যে সংশোধনী প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন তাহাও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। লোকসভার আলোচনা সম্পর্কে ১৬ই নবেম্বরের যুগান্তরে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :

"উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় এবং যথোপযুক্তভাবে ইহার সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন হওয়ায়, সরকার সর্ব্বপ্রথম এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এবং কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিসটিকাল ইনষ্টিটিউটের অফিসারদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবির ও পুনর্ব্বাসন কলোনী, বিশেষ করিয়া বাসগৃহ ও চাকরী, উদ্বাস্তুদের পেশাদারি ও কারিগরি শিক্ষা এবং অন্যান্য পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার ফলাফল কি হইয়াছে, এই কমিটি সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবেন।

এই কমিটি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে লইয়া গঠিত অপর একটি কমিটির নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। তথ্য সংগ্রহ কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনাগুলি সন্তোষজনকভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিবেন এবং না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিবেন। ভবিষ্যতে কি ভাবে অবস্থার উন্নতি করা যায়, এই কমিটি সে সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন ও নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, "পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা যে দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে দিন-যাপন করিতেছে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, কখনও সরকারের সরাসরি চাপে, কখনও ভীতি ও আশঙ্কাজনক আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তাহারা কষ্টভোগ করিতেছে।"

পণ্ডিত নেহরু জনসাধারণকে ভারত-পাকিস্থান সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যা হিসাবে গণ্য না করিয়া রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষের বক্তৃতার জন্য সরকার এই সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করিতে পারিতেছেন না, অথবা সেভাবে ইহার সম্মুখীন হইতে পারিতেছেন না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ হউক, কাল হউক, কিংবা কয়েক বৎসর পরে হউক, শান্তির প্রলেপ দিয়া ভারত-পাকিস্থান সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কারণ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী, যাহারা একসঙ্গে বসবাস করিয়াছে, কাজ করিয়াছে, কখনও কখনও কলহ করিয়াছে, অথচ উভয়েই একই সংস্কৃতি-সম্ভূত, তাহারা দীর্ঘকাল অশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে পারে না। যে কোন ভাবে হউক, আমাদের মিলিত হইতে হইবে, কি ভাবে আমি জানি না, তবে এইটুকুই জানি, ভবিষ্যতে আমরা ঘনিষ্ঠতরসূত্রে আবদ্ধ হইব। যদি কয়েকজন সদস্যের কথামত সরকারকে চলিতে হয়, সেই উত্তেজনার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারত ও পাকিস্থানের অবস্থা কি হইবে, তাহা ভাবিতেও আমি শিহরিয়া উঠিতেছি।"

শ্রীনেহরু অতঃপর বলেন, "আমাদের সমক্ষে আজ এই কথাটিই বড় যে আমরা কি উগ্র ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া এই প্রশ্নের বিচার করিব এবং যে সকল মর্ম্মন্তুদ কাহিনী একবার প্রকাশিত হইয়াছে বারবার তাহার উল্লেখ করিতে থাকিব? এই বিরাট রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া আমরা কি শুধু কাহিনী বর্ণনা করিব এবং উত্তেজনায় অধীর হইতে থাকিব? কোন পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন জাতি কিংবা আইনসভা কি এইভাবে সমস্যার সমাধান করিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যতের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর আজ আমরা অনেকটা প্রলাপের পন্থা অনুসরণ করিতেছি এবং আখ্যানের সাহায্যে উগ্র ভাবাবেগ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছি।"

বিতর্কের সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশ-বিভাগের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের আচরণের বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? ছত্রিশ কোটি স্বাধীন ভারতবাসীর প্রতিনিধি সভাকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা অনুসরণীয় পন্থা স্থায়ীভাবে নির্দ্ধারণ করুন। তাঁহারা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন, বর্ত্তমান অবস্থায় পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের বাস করা সম্ভবপর কিনা? যদি সকলে মনে করেন যে, না, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে আর পাকিস্থানে থাকা সম্ভবপর নহে, তবে স্বাধীন ভারত-সরকারকে এই সব হতভাগ্যের রক্ষার পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে।"

অতঃপর ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, "দেশ বিভক্ত হওয়ার সময়

ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা তাহাদের নিজ নিজ দেশেই বসবাস করিবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, একটি হিন্দু বা একটি শিখ বা একটি অমুসলমানও দেশ-বিভাগ চাহে নাই। দেশ-বিভাগ চাহিয়াছিল মুস্লিম লীগের সমর্থক মুসলমানরা। পাকিস্থান যখন দেশ-বিভাগের মূল সর্ত্ত মানিয়া চলে নাই, তখন দেশ-বিভাগের ব্যবস্থা রদ হইবে না কেন ?"

"এই সরকারের নিকট আমি জানিতে চাই যে, পাকিস্থানের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে রক্ষায় তাঁহাদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা ? প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৭ সনের ঐতিহাসিক ১৫ই আগষ্ট দিবসে উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমাদের যে-সব ভ্রাতা-ভগ্নী রাজনৈতিক সীমারেখার কবলে আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, আমরা তাঁহাদের কথাও ভাবিতেছি ; তাঁহারা বরাবর আমাদের ছিলেন এবং চিরদিনই আমাদের থাকিবেন। ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা তাঁহাদের ভাল-মন্দের সম অংশীদার হইব।"

"পণ্ডিত নেহরুকে আমি এক্ষণে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে বলি।"

"দেশ-বিভাগে আপত্তি করিলেও আমরা বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগে সম্মত হইয়াছিলাম, তাহার কারণ, মিঃ জিন্না ইহার সবটুকুই পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আমরা জনগণ ও সম্পত্তি বিনিময়ের প্রস্তাব তুলিয়াছিলাম কিন্তু কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তাহাতে সম্মত হন নাই। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উহা হয় নাই। তখন পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল এবং গান্ধীজী পাকিস্থানের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এখন আমি তাঁহাদের তাহা পূরণ করিতে বলি। পাকিস্থান যদি বারে বারে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তবে তাহার প্রতিকার কি ? এই কথাটিও আমি জানিতে চাই।"

কাশ্মীর সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব

৬ই নবেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যর গ্লাডউইন জেব কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে একটি ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব পেশ করেন। ৮ই নবেম্বর তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবটির সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"স্বস্তিপরিষদে গৃহীত ১৯৫১ সনের ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫১ সনের ১০ই নবেম্বর, ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সনের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবসমূহের উল্লেখ করিয়া নয়া ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের মুখবন্ধে বলা হয় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গণভোটের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের ভাগ্য নির্দ্ধারণে ভারত ও পাকিস্থান সরকার সম্মত হইয়াছিলেন।

"অতঃপর প্রস্তাবটিতে বলা হয় : এক্ষণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাশ্মীর প্রতিনিধির নিকট হইতে ১৯৫২ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখের এবং ১৯৫২ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের রিপোর্ট পাইয়া স্বস্তি পরিষদ কাশ্মীর-প্রতিনিধির নিষ্পত্তি-প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছে।

"ভারত ও পাকিস্থান সরকার যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিনিধির বার দফা প্রস্তাবের মাত্র দুইটি দফা ছাড়া বাকী সবগুলি মানিয়া লইয়াছে তাহা জানিয়া স্বস্তিপরিষদ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

"এই বার দফা প্রস্তাবের যেখানে সৈন্যাপসারণের সুপারিশ আছে, সেই ৭ম অনুচ্ছেদটির সমগ্র অংশ যে ভারত ও পাকিস্থান সরকার মানেন নাই, স্বস্তিপরিষদ তাহা লক্ষ্য করিয়াছে।

"সৈন্যাপসারণের শেষে কোন্ পক্ষে কত সংখ্যক সৈন্য থাকিবে, তাহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্দ্ধারণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর কার্য্যালয়ে ভারত ও পাকিস্থান সরকার যাহাতে অবিলম্বে আলোচনায় নিযুক্ত হন এই মর্ম্মে স্বস্তিপরিষদ তাঁহাদের তাগিদ দিতেছেন। তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাশ্মীর প্রতিনিধির ১৯৫২ সনে ১৬ই জুলায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পাকিস্থান প্রান্তে এই সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার হইতে ছয় হাজার এবং ভারতীয় প্রান্তে বার হইতে আঠার হাজারের মধ্যে হইবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিনিধির ১৯৫২ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের ৭ম অনুচ্ছেদের নীতি মানিয়া চলিতে হইবে।

"কাশ্মীর সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি যে কঠোর শ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য স্বস্তিপরিষদ তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সমস্যার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানকে সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইতেছেন।

"এই প্রস্তাব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ভারত ও পাকিস্থান যাহাতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানান এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাশ্মীর প্রতিনিধি যাহাতে সকল হালচাল সম্পর্কে স্বস্তিপরিষদকে ওয়াকেবহাল রাখেন, ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবে তাঁহাদের সেই মর্ম্মেও অনুরোধ জানান হয়।"

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে এই নূতন ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি নানা দিক হইতে উল্লেখযোগ্য এবং প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার সময় স্যর গ্লাডউইন সৈন্যাপসারণ ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "সীমারেখার পাকিস্থানের দিকে সশস্ত্র অসামরিক পুলিস বাহিনী রাখা আর ভারতের দিকে সামরিক বাহিনী রাখার ব্যবস্থা প্রকৃত গণভোট গ্রহণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এ কথা ব্রিটিশ সরকার কোনও দিনই মনে করেন নাই।"

কাশ্মীর সমস্যার আলোচনার সময় পাকিস্থানের প্রতি ব্রিটেনের পক্ষপাতিত্বের কথা আজ আর অবিদিত নাই। ব্রিটেন চিরকালই ভারতের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। যাহাতে কাশ্মীর ভারতের সহিত যুক্ত না হয় এবং গণভোটের ফলাফল যাহাতে পাকিস্থানের অনুকূল হয় তজ্জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীরে এক আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার প্রস্তাব আনিয়াছিল। সেই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে কাশ্মীর চিরদিনের মত ভারতের বাহিরে চলিয়া

যাইত। সুখের বিষয়, গত বারের মত এবারেও ভারত-সরকার অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই নূতন ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

একটি স্বতন্ত্র সংবাদে প্রকাশ, ভারতকে জব্দ করিবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ফ্রান্স উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের পিছনে তাহাদেরও সমর্থন রহিয়াছে। যেহেতু ভারত দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং টিউনিসিয়া ও ফরাসী ভারতে ফরাসী গুণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে সেজন্যই তাহাদের এই আক্রোশ।

বিনিয়ন্ত্রণ সমস্যা

ভারতবর্ষে নিয়ন্ত্রণ প্রথা থাকিবে কি থাকিবে না এই লইয়া আবার আলোচনা সুরু হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রচলন হয় যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্য দিয়া, যুদ্ধবিরতির পরও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ চালু রাখা হইয়াছে। যেখানে সরবরাহে ঘাটতি আছে, এবং কালোবাজারে মুনাফাখোর সরবরাহ তথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে সেখানে অবশ্য সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রচলন করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে নিয়ন্ত্রণ প্রথা বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশের মত কার্য্যকরী হয় নাই। ইউরোপে নিয়ন্ত্রণ প্রথার দ্বারা কালোবাজারের লোপ করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে হইয়াছে ঠিক উল্টা—এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রথার দ্বারা পরোক্ষভাবে কালোবাজারের বিস্তারসাধন করা হইয়াছে। এদেশে নিয়ন্ত্রণ প্রথা মুনাফাখোরদের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। তাই জনসাধারণের বরাবরই একটা বিতৃষ্ণা আছে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তথা মুনাফাখোরদের উপর। তবে সব জিনিষই যে বিনিয়ন্ত্রণ (decontrol) করিতে হইবে এমন নয়।

কয়েকটি প্রধান জিনিষের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রত্যাহার করা আজ অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেমন ধান ও চাউল। চাউলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রাখিয়া চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালে চাউলের উৎপাদন হইয়াছে ২ কোটি ১২ লক্ষ টন· ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টন; ১৯৪৯-৫০ সালে ২ কোটি ২৭ লক্ষ টন; ১৯৫০-৫১ সালে ২ কোটি ৩ লক্ষ টন এবং ১৯৫১-৫২ সালে ২ কোটি ৭ লক্ষ টন। কাগজে খুব ফলাও করিয়া খবর বাহির হয় যে, উত্তরপ্রদেশে আট লক্ষ পতিত জমি চাষ-আবাদ করা হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু জায়গাতে পতিত জমি আবাদ করা হইতেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে ফসল বৃদ্ধি পায় নাই কেন? ফসল বৃদ্ধি না হওয়ার অনেক কারণ আছে এবং তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইতেছে যে, জমির মালিকরা ইচ্ছা করিয়া সকল জমি চাষ করে না। পূর্ব্বে ধানের মণ ছিল দুই টাকা, এখন মূল্য হইয়াছে যোল হইতে কুড়ি টাকা। জমির মালিকরা অল্প জমি চাষ করে, কারণ তাহাতে খরচ কম পড়ে এবং ধানের মূল্য অধিক হওয়ায় অল্প পরিমাণ ফসল বিক্রী করিয়া লাভ বেশী থাকে। সেইজন্য অধিক পরিমাণ জমি চাষ করিবার আগ্রহ কিংবা প্রয়োজন তেমন নাই। নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একটি কৃত্রিম অভাব এ বিষয়ে সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে মূল্যও অধিক হওয়ায় জমির মালিকদের সুবিধা যথেষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশ যে, পণ্ডিত নেহরু বিনিয়ন্ত্রণ করণের বিরুদ্ধে। তিনি সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা হইলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করায় ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু বিনিয়ন্ত্রণ করিলেই যে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে তাহা সবক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলা যায় না। বরং দেখা যায় যে, এদেশে নিয়ন্ত্রণ প্রথা মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। ইংরেজ আমলে যুদ্ধের সময় চিনি পাওয়া যাইত আট আনায় এক সের, আর কাপড় পাওয়া যাইত চার-পাঁচ টাকায় এক জোড়া। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের পর মিল-মালিকেরা দরবার করিলেন যে, যুদ্ধের সময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, সেইজন্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হউক। সদাশয় গবর্মেণ্ট চিনি এবং কাপড় বিনিয়ন্ত্রণ করিলেন। ফল হইল আট আনা সেরের চিনির মূল্য পাঁচ সিকা ও দেড় টাকা আর পাঁচ টাকার কাপড়ের মূল্য হইল কুড়ি হইতে পঁচিশ টাকা। প্রায় এক বছর এই অবস্থা চলিয়াছিল, ফলে দেশে আলোড়ন হইলে গবর্মেণ্ট আবার চিনি ও বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তন করেন তবে পূর্ব্বের মূল্যে নয়। চিনির নিয়ন্ত্রণ হইল চৌদ্দ পনের আনায় এবং বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হইল আঠার কুড়ি টাকায়, তাহাও মাঝারী কাপড়। দোষ কাহার? গবর্মেণ্টের। মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী কে—গবর্মেণ্ট। চাউলের মূল্য সাধারণ মূল্যের মাপকাঠি। চাউলের মূল্য হ্রাস পাইলে অন্যান্য জিনিষের মূল্য আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। চাউলের মূল্য না কমিলে অন্যান্য জিনিষের মূল্য কমিবে না। সেইজন্য আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন চাউলের বিনিয়ন্ত্রণ। চাউল বিনিয়ন্ত্রণ না করিলে উহার মূল্য কমিবে না এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে না।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

১৯৫২ সালের প্রথম ছয় মাসের ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাব বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, জুন পর্য্যন্ত ঘাটতি হইয়াছে ৭৮ কোটি টাকা। গত বৎসরের শেষে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯২ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাসের মূলে আছে কলম্বো-পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার অর্থসাহায্য। হিসাবের খাতায় এই টাকাটা জমার খাতে ধরা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের খাতে এ বছরের প্রথম ছয় মাসে ভারতের ঘাটতি হইয়াছে ১৩১ কোটি টাকা, গত বছর প্রথম ছয় মাসে মোট লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১৮ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক লেনদেন কোনও দেশের মোট দেনাপাওনার খতিয়ান এবং বহির্বাণিজ্যের খতিয়ান এই মোট দেনাপাওনার একটি অংশবিশেষ। দেশের

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করিতে হইবে তাহার সামগ্রিক দেনাপাওনার হিসাব ধরিয়া, কেবলমাত্র বহির্বাণিজ্যের খতিয়ান দ্বারা নয়। সেই হিসাবে ভারতের মোট আন্তর্জাতিক দেনা জুন পর্য্যন্ত ছিল ১৩১ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি হইতেছে ৭৮ কোটি টাকা।

এ বৎসর জুন মাস পর্য্যন্ত মোট আমদানী হইয়াছে ৪৪৪ কোটি টাকার এবং রপ্তানী হইয়াছে ৩১৩ কোটি টাকার। গত বৎসর প্রথম ছয় মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪৭৩ কোটি টাকার এবং রপ্তানী হইয়াছিল ৩৫৫ কোটি টাকার। এ বৎসর রপ্তানী হ্রাসের কারণ হইতেছে প্রধানতঃ রপ্তানী মূল্যের হ্রাস, গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর রপ্তানী মূল্য শতকরা প্রায় ২০ টাকা হিসাবে কম হইয়াছে। পাটের রপ্তানী কর কমাইয়া দেওয়াতে পাটের রপ্তানী মূল্য শতকরা ৫৫ টাকা হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি না পাওয়ায় এই খাতে আয় বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার পরের হিসাবে দেখা যায় যে, জুলাই মাসে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইয়াছে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, আগষ্ট মাসে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা এবং সেপ্টেম্বর মাসে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই তিন মাসে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

শুল্ক আইন সংশোধন বিল

ভারতীয় পার্লামেণ্টে শুল্ক আইন সংশোধন বিল উত্থাপন করা হইয়াছে—বিলের উদ্দেশ্য হইতেছে ২৯টি শিল্পের উপর রক্ষাশুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি করা। এই বিষয়ে পার্লামেণ্টে বহু রকম আলোচনা হইয়াছে। পুরানো সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য সুবিধা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিরুদ্ধ আলোচনা হইয়াছে এবং হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ধারায় আজ পরিবর্তন আসিয়াছে—আমেরিকা ক্রমশঃ ভারতের বড় ক্রেতা হইতেছে। সে অবস্থায় ভারতকে পারস্পরিক সুবিধার কথা ভাবিতে হইবে। সাম্রাজ্যিক শুল্ক সুবিধার ব্যবস্থা আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চক্ষুশূল। স্বাধীন ভারত অতীতের বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে পারে নাই—পরিবর্তিত অবস্থাতেও পুরাতনকে আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন নূতন নূতন রপ্তানীর বাজারে প্রভাব বিস্তার করা ও রপ্তানী বৃদ্ধি করা। আমেরিকাতে পাট ও চা রপ্তানী করার এখনও সুযোগ আছে এবং এদিকে ভারতের পক্ষে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাম্রাজ্যিক শুল্ক ব্যবস্থায় ভারতের ক্ষতি বৈ লাভ হয়না, সে অবস্থায় রপ্তানী বৃদ্ধি করার জন্য পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে শুল্ক বসান প্রয়োজন। সাম্রাজ্যিক শুল্ক ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা, আভ্যন্তরিক শিল্পগুলিকে রক্ষাশুল্ক দ্বারা সাহায্য করার পূর্ব্বে দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন যাহাতে ক্রেতাদের উপর অযথা মূল্য না বৃদ্ধি পায়। অকেজো শিল্প, কিংবা যে সকল শিল্প রক্ষাশুল্কের সাহায্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে তাহাদের রক্ষাশুল্ক দ্বারা সাহায্য করা উচিত নয়।

এশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কলেজ

গত ৫ই নবেম্বর নিউ আলীপুরে নলিনীরঞ্জন এভিনিউতে এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কলেজের উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জে. এইচ. ওলডেনব্রুক। এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত শিক্ষা দান করা হইবে। প্রথম দলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছেন ভারত, মালয়, শ্যাম, জাপান এবং সিঙ্গাপুর হইতে আগত শিক্ষার্থীরা। শ্যামদেশের জনৈক মহিলা শ্রমিক কর্ম্মীও এই দলে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই উপলক্ষ্যে তাঁহার শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া মিঃ ওলডেনব্রুক বলেন যে, আজ স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গড়িয়া তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

শ্রমিকদের কার্য্যের সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণ, আর্থিক ও সামাজিক নীতির ব্যাপারে ও সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আন্তর্জাতিক স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বলিয়া যে প্রচার করা হয় মিঃ ওলডেনব্রুক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ইঙ্গ-মার্কিন এবং রুশ এই উভয় প্রকার সাম্রাজ্যবাদেরই বিরোধী। স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন সরকারী সাহায্যে চলে তিনি এ কথা অস্বীকার করেন।

পশ্চিমবঙ্গে কারা-সংস্কার

৩১ অক্টোবর তারিখের সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গে কারা-সংস্কার সম্পর্কে এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কারাগারের অবস্থার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। জেলের অভ্যন্তরে যে সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। হাতে-টানা ঘানি চালান বন্ধ করিয়া সে স্থলে শক্তি-পরিচালিত ঘানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কারাগার সংস্কারের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য এবং পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বাংলা কারা কোডের (বেঙ্গল জেল কোড) সংশোধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একজন বিশেষ অফিসার নিয়োগ করেন। তাঁহার সুপারিশসমূহ বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং অবস্থা অনুকূল হইলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

হাতে টানা ঘানির বিলোপ সাধন ব্যতীত কেন্দ্রীয় এবং জেলা জেলগুলিতে কয়েদীদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেতনভুক্ শিক্ষকদের সাহায্য করেন কয়েদী শিক্ষকরা। কয়েদীদের শুধু যে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে,

তাহাদের জন্য কারিগরি শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া তাহারা নিজেদের যোগ্য নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

কয়েদীদের মানসিক উন্নতির জন্য এবং তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশস্ততর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং জেলা জেলখানাগুলিতে সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্ত্তৃক শিক্ষামূলক এবং তথ্যমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েদীদের অবশ্য জেলের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু তাহাদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের সুবন্দোবস্ত আছে। কয়েদীরা ইচ্ছামত ভলিবল, কপাটি, দাড়িয়াবান্ধা, দাবা, গোলকধাম প্রভৃতি খেলাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। শারীরিক উন্নতির জন্য কয়েদীদের ব্রতচারী নৃত্যে যোগদানে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই সকল খেলার খরচ সরকার বহন করেন। তাহা ছাড়া প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা নিজ ব্যয়ে ব্যাডমিন্টন, ক্যারম বোর্ড প্রভৃতি খেলাও খেলিতে পারেন। কয়েদীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে তৈল এবং সাবান সরবরাহের ব্যবস্থাও সরকার করিয়াছেন।

দমদম এবং প্রেসিডেন্সী জেলে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের প্রতি বিশেষজ্ঞদের মারফত বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। যক্ষ্মা রোগীদিগকে সিউড়ী জেলে রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল ব্যবস্থাই গৃহীত হইয়াছে।

কিশোর এবং অল্পবয়স্ক কয়েদীদের নৈতিক উন্নতির কথাও সরকার বিস্মৃত হন নাই। রাজ্যের বর্ষ্টাল স্কুলটি বহরমপুরের পুরাতন জেলখানার বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানে ৫০০ জনের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, ছেলেদের জন্য খেলার মাঠ, খাবার ঘর, কারখানা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সবই তাহার মধ্যে আছে। কিশোর অপরাধীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য এবং তাহাদের অপরাধের চিকিৎসার জন্য একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে ঐ জেলের সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত রাজনৈতিক বন্দিগণ যাহাতে উচ্চতর শ্রেণীর মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাংলা জেল কোডের নিয়মাবলীর সংশোধন করিবার কথাও সরকার স্মরণ রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে কোন জেলার সিবিল সার্জ্জনই আংশিকভাবে জেলের অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দুইটি পদের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, বিচারাধীন বন্দী বিচারের পূর্ব্বে দাগী অপরাধীদের সঙ্গে বাস করিতে বাধ্য হন; ফলে তাঁহাদের মানসিক ক্ষতি হয় প্রভূত। এই ক্ষতিকর ব্যবস্থাকে রহিত করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বিচারাধীন বন্দীদের জন্য আলিপুরে একটি জেল খুলিয়াছেন।

গ্যাডগিল কমিটির অভিমত

১৬ই অক্টোবর তারিখের "যোগাযোগ" পত্রিকায় গ্যাডগিল কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে:

"ভারত-সরকারের কর্ম্মচারিগণকে বর্ত্তমানে যে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হইতেছে, উহার অর্দ্ধেক মূল বেতনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্প্রতি গ্যাডগিল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

"যাঁহারা মাসিক অনধিক ৭৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান, সেই সকল কর্ম্মচারী, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী সম্পর্কে এই সুপারিশ প্রযুক্ত হইবে।

"কমিটি এই মর্ম্মেও সুপারিশ করিয়াছেন যে, অল্প বেতনের কর্ম্মচারীকে ১৯৪৯ ও ১৯৫১ সনে বর্দ্ধিত হারে যে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বভারতীয় জীবনযাত্রার ব্যয়-সূচী ৩০৫ পর্য্যন্ত নামিয়া না আসা পর্য্যন্ত উহা হ্রাস করা উচিত হইবে না।

"এ সকল সুপারিশ গৃহীত হইলে ভারত-সরকারের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ছয় কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পনর লক্ষাধিক কর্ম্মচারী এ সকল সুপারিশের ফলে লাভবান হইবেন। মাসিক ৭৫০৲ টাকার বেশী বেতন পান, এমন কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় চারি হাজার—গ্যাডগিল কমিটির সুপারিশে তাঁহারা উপকৃত হইবেন না।

"সরকারী কর্ম্মচারীদের এক বৃহৎ অংশই সরকারী বাস-ভবন পান না। গ্যাডগিল কমিটির সুপারিশের ফলে তাঁহাদের বাড়ী-ভাতা বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহারা সরকারী কোয়ার্টারে রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প বেতনের অনেক কর্ম্মচারীই কোনরূপ ভাড়া দেন না। যাঁহারা ভাড়া দেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দুর্ম্মূল্য ভাতার যে অংশ বেতন বলিয়া গণ্য হইবে, উহার উপর সুবিধাজনক হারে (সাধারণতঃ শতকরা ১০ টাকার স্থলে শতকরা মাত্র ৫ টাকা) ভাড়া দিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ বর্ত্তমানে অন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, সেগুলি অক্ষুন্ন রাখা সম্পর্কেও কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

"প্রকাশ, কমিটির এ সকল সুপারিশে অধিকাংশ সদস্যেরই অনুমোদন রহিয়াছে। কেবলমাত্র শ্রী এস. গুরুস্বামী ভিন্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।"

গোরক্ষা সমিতি

১লা নবেম্বরে 'হরিজন' পত্রিকায় শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখিতেছেন যে, "গো-জাতির উন্নয়নমূলক গঠনকর্ম্ম এবং বৃদ্ধ ও অক্ষম গরুগুলির যত্ন লইবার ব্যবস্থা করিয়া গোধন রক্ষায় সহায়তা করাই এই সমিতির কাজ।..." বেআইনী গোহত্যা নিবারণ, পশ্চিমবঙ্গে গো-কুলের বংশোন্নয়ন, গাভীর উন্নত পরিচর্য্যাবিদ্যার বিস্তারসাধন এবং বৃদ্ধ গাভী ও বলদগুলির পালনের আশু উদ্দেশ্য লইয়া গো-সদন স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

এক আবেদনে তিনি বলিয়াছেন, "প্রাণিজগতে গোজাতিই মনুষ্যসমাজের সহিত সর্ব্বাধিক ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য গোজাতির জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দান করিয়া সকল প্রাণিজীবনকে শ্রদ্ধা করিবার মনোভাব ভারতবাসিগণ সুদীর্ঘকাল পোষণ করিয়াছেন। গোজাতির যত্ন করিলে ভারত তাহার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমিতি সাধ্যমত প্রয়াস করিয়া চলিতে চায়।"

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সঙ্ঘের ও হিন্দু সভার উদ্যোগে "গো-রক্ষা" আন্দোলন নূতন উদ্যমে পরিচালিত হইতেছে; এবং এই বিষয় সমর্থন করিয়া স্বাক্ষর লওয়া হইতেছে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এই সব স্বাক্ষর বিধান সভায় প্রেরিত হইবে ও গো-হত্যা বন্ধের নিমিত্ত আইন পাস করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে আসানসোলের "বঙ্গবাণী" (সাপ্তাহিক) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী। ১৮ই কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে :

"সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জিত হইয়াও একথা আজ নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমানে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য দেশে গো-সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হওয়া। গো-হত্যা নিবারণ ইহার অন্যতম উপায় মাত্র এবং অন্যতম উপায় হিসাবে ইহার গুরুত্বও অনস্বীকার্য্য।

"কিন্তু কেবল গোহত্যা নিবারণ করিলেই গো-সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে সবকিছু করা হইবে না। আরও অনেককিছু করা প্রয়োজন। যেমন, উত্তম গোশালা, পুষ্টিকর খাদ্য, ভাল ষণ্ডের দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

"বাঁধা খাইলে গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এইজন্যই গোচারণ মাঠ অত্যাবশ্যক।

"বৃষ্টি আকর্ষণের ও জমির ক্ষয় নিবারণ প্রভৃতির জন্য যেমন দেশের কতকটা অঞ্চল বনভূমিরূপে ফেলিয়া রাখিতে হয়, উহাকে জমির লোকসান বা waste বলা চলে না, তেমনি প্রতি গ্রামেই কতকটা করিয়া শস্যশ্যামল জমি গোচারণের জন্য রাখিয়া দিতে হয়, উহা লোকসান নয়, ভবিষ্যতে জাতির পক্ষে পরম লাভের কারণ হইয়াই দাঁড়ায়।"

গোহত্যা নিবারণ যদি শুধু রাজনৈতিক খেলামাত্র না হয় তবে গো-ধন রক্ষা ও পুষ্টি-ব্যবস্থার চেষ্টাও হওয়া প্রয়োজন। না হইলে সেই গোহত্যাই চলিবে—তিলে তিলে ও অতি নির্দ্দয়ভাবে।

ডানকুনি খালের সংস্কার

ডানকুনি খাল ও উহার শাখাসমূহের সংস্কার এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে লকগেট নির্ম্মাণের দাবিতে বৈদ্যবাটী লক-গেটের নিকটে ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা ও সিঙ্গুর থানার এলাকার অধিবাসীদের এক সম্মেলন হয়।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ৬৭ বছর পূর্ব্বে কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ডানকুনি ড্রেনেজ ক্যানালটির সংস্কারের কথা উঠে। ঐ টাকা সরকারে জমা দেওয়া হয়; কিন্তু ক্যানালের সংস্কার আজও হয় নাই। প্রায় ১৫ মাইল লম্বা এই ক্যানালটির দুই পাশে দেড় শতাধিক গ্রামের লোক প্রতি বৎসর হাজা ও শুকায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। চটকলের মালিকদের স্বার্থে সরকার চাঁপদানীর নিকট গঙ্গার সহিত ক্যানালের সংযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, ভদ্রেশ্বর এবং চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলিতে দেওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে বৈদ্যবাটী, খড়পাড়া, পিয়ারাপুর প্রভৃতি গ্রামের কৃষকগণ চাষ-আবাদ করিতে পারে না, কারণ জল বিষাক্ত হইয়া যাওয়ায় কৃষকদের নানা রোগ হয় ও গরুবাছুর মরিয়া যায়। আরও দক্ষিণে শ্রীরামপুর ও কোন্নগরের নিকট যথাক্রমে শ্রীরামপুর খাল ও বাঘ খাল—এই দুইটি জল নিকাশী পথ একেবারে মজিয়া যাওয়ায় মাঠের জল নিকাশ হয় না। দক্ষিণে উত্তরপাড়া, মাখলা ও বালীর নিকটে বহু ইটখোলা থাকায় এবং ঐ ইটখোলাগুলির প্রায় দুই শত কাটা খানা থাকায় ক্যানালের জল অন্য দিকে ছড়াইয়া পড়ে, চাষ-আবাদের কাজে লাগে না।

৬৭ বৎসর পূর্ব্বে ১ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডানকুনি খালের সংস্কার সাধন করিতে পারিলেন না। আজ ৫ বৎসর হইল বিদেশী শাসনের অবসান হইয়াছে। কিন্তু এই অঞ্চলের লোকের দুঃখ ঘুচিতেছে না। "হুগলী গ্রুপ" বলিয়া একটা সংগঠিত দল পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার নীতি ও কার্য্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তবুও ডানকুনির সুব্যবস্থা হইল না কেন, তাহার কোন সদুত্তর পাই না। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে সেই উত্তর পাওয়া উচিত।

বাংলাদেশের অন্নসমস্যা

১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে শহরের নরনারী "কত ধানে কত চাল হয়" তৎসম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন। কিন্তু সজাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কথার ও সংখ্যাতথ্যের বেড়াজালে জড়াইয়া আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতেছে।

গণতন্ত্রের দেশে সরকারী প্রচার-যন্ত্রের কেরামতি দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইতেছি। সংখ্যা-শাস্ত্রী (statisticians) দুই পক্ষে কথা বলিতেছেন। এই নগরীর দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-বাড়তি অঞ্চল—এই সিদ্ধান্ত ১৯৪৯ সনে সমর্থন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় বিধান সভার সভ্য শ্রী কে. সি. নিয়োগী নানা আলোচনায় সময় সারা ভারতবর্ষ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী এই কথা জোরের সহিত বলিতেন। তার পর তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অগণিত মন্ত্রী উপ-মন্ত্রীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন। এদিকে সরকারী অব্যবস্থার কল্যাণে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে এক শত পঞ্চাশ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা হইতেছে।

গত ১লা কার্ত্তিকের "খাদ্য-উৎপাদন" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগীয় অধিকর্তা ডঃ হীরেন্দ্রকুমার নন্দীর এক প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা-তথ্য বিভাগের শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু একটা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন। ডঃ নন্দীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল :

"১। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি রহিয়াছে এবং তাহার পরিমাণ বৎসরে আনুমানিক দুই কোটি মণ।

২। শুধু উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করিলে বৎসরে আড়াই কোটি মণের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। তাঁহার নিজের উক্তি হইতেছে এইরূপ : 'শুধু উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করলেই ফলন একর প্রতি পাঁচ মণ বাড়ানো যায়, আমরা যদি অন্ততঃ তিন-চার বছরের ভিতরও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জমিতে উন্নত ধানের চাষ করতে পারি তা হলে আমাদের মোট উৎপাদন বেড়ে যাবে আড়াই কোটি মণেরও বেশী এবং একমাত্র এই কাজ করেই বর্ত্তমানের ঘাটতি পূরণ করা যায়।'

৩। জলসেচ ও জলনিকাশের সুবিধা এবং উপযুক্ত সার ব্যবহার করলে ফসল অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।"

ইহার উপর শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসুর বক্তব্য এই :

"মন্তব্যগুলি যখন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তার নিকট হইতে আসিয়াছে তখন ইহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রবন্ধে আমরা আরও জানিতে পারিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরোক্ত উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি করিতে বিশেষভাবে গত পাঁচ বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও জমির ফসল বাড়িতেছে না। আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, পল্লীগ্রামের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে। ইহার কারণ কি? ডঃ নন্দী প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "সরকার প্রদত্ত এই সব সুযোগ অবলম্বন করে আপনারা যদি আপনাদের কর্ম্মশক্তি নিয়ে কাজে অগ্রসর হন তা হলেই আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়ে আসে।

আমার বদ্ধমূল ধারণা যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তর অন্ন-সমস্যা সমাধানের যে ব্যবস্থাগুলি করিয়াছেন তাহাতে প্রবন্ধে সমস্যার সমাধান হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা মোটেই সম্ভবপর হইবে না। দেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ডঃ নন্দীর মন্তব্যগুলি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট নয়।

আমাদের দেশে জমির প্রকৃত মালিক চাষী যত দিন না হইবে তত দিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবিতকালে চাষী যাহাতে জমির মালিক হন, জমিদারী প্রথা যাহাতে দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন···।"

কৃষির উন্নতি, উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার, সারের ব্যবহার—এই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবু তাঁহার সঙ্গে জমিদারী প্রথার অবলোপ, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর ধ্বংস—এরূপ প্রস্তাব জুড়িয়া দিয়া, মূল বিষয় হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যও উদ্ধৃত করা হইল :

"নন্দী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়, তালিকাতে যে উন্নত বীজ এবং সারের হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা মোট চাহিদার কত অংশ? এই বীজ, সার সরবরাহ করিবার জন্য দূর পল্লীগ্রামে সরকারী ব্যবস্থা কি আছে? পল্লীগ্রামবাসীদের উক্ত জিনিষগুলি প্রয়োজনের সময় সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। প্রতি ইউনিয়নে বর্ত্তমান কৃষিদপ্তরে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাঁহারা কি উন্নত ধরণের বীজ ও সারের ব্যবহার পল্লীগ্রামের চাষীদের হাতে কলমে দেখাইয়া থাকেন? বহু বৎসরের সংস্কার দূর করিতে হইলে কৃষিদপ্তরের কর্ম্মচারীদের প্রতি গ্রামে জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া উন্নত ধরণের বীজের সাহায্যে চাষ করিয়া দেখাইতে হইবে। যত দিন না এইভাবে ফসল উৎপাদন বাড়াইবার প্রণালী চাষীদের দেখান হইবে তত দিন কৃষি-অধিকর্তা যতই প্রবন্ধে তাঁহার কথা বলুন না কেন তাহার কোন ফল হইবে না। ইউনিয়নে কৃষি-কর্ম্মচারীরা আছেন বা তাঁহারা চাষের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন তাহা বহু অজ্ঞ চাষী জানে না। যে দিন কৃষি-কর্ম্মচারীরা গ্রামের চাষীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করিতে পারিবেন সেদিন তাঁহারা উন্নত চাষের প্রণালী মাঠে চাষ করিয়া দেখাইতে পারিবেন, যেদিন জমির মালিক চাষীরাই হইবে সেদিনই গ্রামের লোক তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি লইয়া সরকারের সহিত যোগদান করিবে, তাহার পূর্ব্বে তাহা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান ব্যবস্থা যাহা করা হইয়াছে (তালিকা অনুযায়ী) তাহাতে কোন স্থায়ী সুফল হইবে না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বাধীনতালাভের ৫ বৎসরের পরও আমরা খাদ্যের ব্যাপারে মোটেই অগ্রসর হইতে পারি নাই যদিও প্রতি বৎসর বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় বীজ এবং সারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীদের, মন্ত্রী মহাশয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আশু প্রয়োজন। পুরানো গতানুগতিক পথে চলিলে আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান কোন প্রকারে সম্ভব হইবে না, পক্ষান্তরে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে।"

পূর্ণেন্দুবাবু কোন কোন ইংরেজী গ্রন্থকারের মন্তব্য গ্রহণ করিয়া জমিদারী প্রথার অনিষ্টকারিতা, কৃষকের ঋণ প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া ডক্টর নন্দীর মূল প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কারণ উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতির ব্যবহার ত কৃষির অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আর ইংরেজী গ্রন্থকার সকলেই একমত নহেন। স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের *Annals of Rural Bengal*—বাংলার পল্লীজীবনের কথা পাঠ করিলে দেখা যায় যে জমিদারী প্রথা যে কেবল ইংরেজরা নিজের স্বার্থে প্রবর্ত্তন করেন, সেই অভিযোগ বিচারসহ নহে, এবং আমরা মনে করি কৃষক জমির মালিক হইলেই ধানের ক্ষেতে সোনা ফলে না। মাদ্রাজ রাজ্যে ত রায়তওয়ারি প্রথা প্রচলিত, সেখানে কি অভাব-অনটন কম?

গোরখা সৈনিক

ইংরেজ রাজত্বে গোরখা সৈনিক এক নূতন প্রসিদ্ধি লাভ করে। ছোটখাট মানুষগুলি ইংরেজের জন্য প্রাণ দিয়াছে নানা রণস্থলে। তাহা আজ বিশ্ব-ইতিহাসের অঙ্গ। ভাত-কাপড়ের জন্য এই যে বৃত্তি অবলম্বন তাহার মধ্যে একটা হীনতার ইঙ্গিত আছে। ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই বোধটা গোরখা জাতির অনেকের মনে নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীতে গোরখা সৈনিকের রংরুট বন্ধ হইতেছে।

গত ১৯শে কার্ত্তিক ভারতীয় বিধান সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহর-লাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতরাষ্ট্রের ও নেপালের জাগ্রত জনমতের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনে গোরখা পরিবারসমূহ নূতন বৃত্তির সন্ধানে বাহির হইবে। তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতের কুৎসা প্রচার

"এশিয়া" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১৫ই কার্ত্তিক সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বিষয়বস্তু আমাদের দেশের নরনারীর জানিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ আমাদের সমাজের বুকে অনেক কম্যুনিষ্ট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহারা কম্যুনিষ্ট মতবাদের বাহক। শেষোক্ত শ্রেণী অধিক অনিষ্ট করিয়া থাকে। "এশিয়া"র প্রকাশিত প্রবন্ধের চুম্বক দেওয়া হইল: "সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইন ইণ্ডিয়া নামক এক-খানি ছায়াচিত্র নানা চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে। এই চিত্রে নানা ভঙ্গীতে দেখান হইতেছে যে, ব্রিটিশ-মার্কিনী পুঁজিবাদীরা আমাদের আর্থিক জীবনকে নানা ভাবে দুর্ব্বল করিয়া রাখিতেছে। তাহাদের ধৃষ্টতার অন্ত নাই; কলিকাতায় ও সম্ভবতঃ অন্যান্য নগরীতে সাঁতার কাটিবার স্থানগুলি নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া রাখিতেছে।"

ইন ইণ্ডিয়া ছবিতে আমাদের পরবশ্যতার প্রমাণ-স্বরূপ দুইটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রথমটি হইল দুই জন মার্কিনী ও শ্রমিকের মধ্যে বাহু যুদ্ধ। সেই ছবিতে দেখান হইতেছে যে, এক জন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী তাহাদের চালাইতেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি এই— এক জন খদ্দরধারী লোক একটি স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছে, এবং একজন ভারতীয় সৈনিক আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিল। এই নারী হত্যার পর কংগ্রেসকর্ম্মী জয়ের গর্ব্বে ফুলিয়া রঙ্গস্থল হইতে অবতরণ করিল। "এশিয়া" পত্রিকা জিজ্ঞাসা করিতেছেন: "রাশিয়া সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইতে পারে না—এই কথাটি কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বুঝেন না? এবং বুঝিয়া তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা হয় নাই কেন?"

যে সব প্রযোজক এই ছবির জন্য দায়ী তাঁহারা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারত-রাষ্ট্রের ছিলেন অতিথি। আতিথ্যের প্রতিদান কি ভাবে করিতে হয় এই সব সোভিয়েট নাগরিক তাহার নূতন নমুনা দেখাইলেন।

নেহরু কি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী?

নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত "নিউ লীডার" পত্রিকায় জনৈক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ 'কেটো' ছদ্মনামে তিনটি প্রবন্ধে ভারতে কম্যুনিষ্টদের অবস্থা, সরকারী নীতি এবং মার্কিন আচরণের আলোচনা করিয়াছেন। গত মাসের প্রবাসীতে আমরা প্রথম প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কম্যুনিজম সম্পর্কে নেহরু সরকারের নীতি কিরূপ। নিম্নে উহার চুম্বক দেওয়া গেল:

"নির্ব্বাচনের পর ভারতে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধির পর মনে হইয়াছিল যে, ভারত-সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। একমাত্র রাজাগোপালাচারী ব্যতীত অন্য কোন নেতাই কম্যুনিজমের বিপদ সম্পর্কে দেশকে সাবধান করিয়া দেন নাই। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে প্রধান মন্ত্রী নেহরু বা অপর কেহই এই সমস্যার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। কংগ্রেস অধিবেশনে এ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব পর্য্যন্ত উত্থাপিত হয় নাই। কম্যুনিজম সম্পর্কে নেহরু-সরকারের নীতিকে যথার্থ ই বলা হয়—সযত্নে সত্যকে পরিহার করিবার নীতি। নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতেই এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইবে:

"সাধারণ নির্ব্বাচনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সরকার বহুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট বন্দীকে মুক্তিদান করেন। এই সকল ব্যক্তি অনেক দিন যাবৎ বিনা বিচারে আটক ছিলেন। ঠিক এই সময়ে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে কম্যুনিষ্টদের যে লাভ হইয়াছিল অন্য কোন সময়েই তাহা হইত না।

"দ্বিতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে আট জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন (কম্যুনিষ্ট) সহযোগী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসক জেনারেল এস. এম. সোখে। তাঁহার সম্বন্ধে কম্যু-নিষ্টদের মুখপত্র "ক্রশরোডস্" লিখিয়াছে যে, "বিজ্ঞানের যে জঘন্য ব্যভিচার আমাদের প্রতিবেশী এশিয়ার দেশগুলিতে মৃত্যু এবং বর্ব্বরতা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে উদ্বুদ্ধ করিতে আর একবার নেতৃত্ববরণ করিবার জন্য ভারতের বিজ্ঞানীরা তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন।" অপর জন পৃথ্বীরাজ কাপুর। মনোনয়নের সংবাদ যখন তাঁহার নিকট পৌঁছায় তখন তিনি কলিকাতায় কম্যুনিষ্ট-উদ্যোগে পরিচালিত 'নিখিল ভারত শান্তি-সংস্কৃতি সম্মেলনে' উপস্থিত ছিলেন।

"গত বৎসরের শেষদিকে ভারত-সরকার চীন হইতে এক তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানান। ভারতের সর্বত্রই এই প্রতিনিধি দলকে সরকারীভাবে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। দিল্লীতে এক আধাসরকারী সম্বর্দ্ধনা সভায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ এবং পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্য ডঃ জাকির হোসেন প্রতিনিধি দলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, চীনের গণতান্ত্রিক সরকার "কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে এক রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার মহৎ প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ করিয়াছেন; সেখানে প্রত্যেকেই নিজের যথাসাধ্য দান করিতে পারেন এবং সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের অধিকারী হইতে পারেন।...আপনাদের এই অভীষ্ট সাধনে ভারতীয় জনসাধারণের শুভেচ্ছা আপনারা পাইবেন।

"বর্ত্তমান বৎসরের ২৬শে এপ্রিল ভারতবর্ষ হইতে এক সরকারী সাংস্কৃতিক দল চীন যাত্রা করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদিগকে নূতন চীনে তাঁহাদের পরিভ্রমণের বিরাট তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বলেন। এই প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সভ্যই চীনের কম্যুনিষ্ট একনায়কত্বের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বালকৃষ্ণ শর্ম্মা, এম-পি; চলপতি রাও, লক্ষ্ণৌর "ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রিকার সম্পাদক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি. এন. গাঙ্গুলী, পররাষ্ট্র বিভাগের লীলামণি নাইডু এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্লড অ্যাফেয়ার্সের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভি. পি. দত্ত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যে নূতন চীনের উন্নতি দেখিয়া প্রশংসামুখর হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

"মস্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে আহূত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে যখন পররাষ্ট্র-দপ্তরে খোঁজ করেন যে-তাঁহাদের মস্কো গমনে সরকারের কোন অনিচ্ছা আছে কি না তখন তাঁহাদিগকে সরকারী উৎসাহ জানান হয় এবং সকল প্রকার সরকারী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

"সোভিয়েট হইতে যে চিত্র-প্রদর্শনী ভারতে আসে দিল্লীতে তাহার উদ্বোধন করেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাতে রাজ্যপাল স্বয়ং। ইহার ফলে কম্যুনিষ্টদের মনোবল বৃদ্ধি পায় প্রচুর। বিপরীত দিকে ভারত-সরকার স্থানাভাবের অজুহাতে ভারতে এক টিটোপন্থী শান্তিসম্মেলনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসর চীনা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রদূতের চাপে ভারত-সরকার দিল্লীতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কংগ্রেসের অধিবেশনের অনুমতি দেন নাই।

"জে. সি. কুমারাপ্পাকে পণ্ডিত নেহরু ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে সেখানকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য জাপানে পাঠান। প্রত্যাবর্ত্তনের পর ডঃ কুমারাপ্পা ঘোষণা করেন যে, মার্কিন অধীনতার ফলে জাপান এক নির্জীব এবং ক্ষয়িষ্ণু দেশে পরিণত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তিনি বলিতে ভুলেন নাই যে, চীনে তিনি যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন তাহা গান্ধীজীর আদর্শেরই অনুরূপ। অধ্যাপক কুমারাপ্পা তার পর কম্যুনিষ্ট প্ররোচিত 'জাতিসঙ্ঘের বীজাণু যুদ্ধে'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং মস্কো অর্থনৈতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

"ভারত-সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগ হইতে যে সকল সংবাদচিত্র এবং তথ্যমূলক চিত্র পরিবেশিত হয় গত দুই বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া তাহার ভাষ্যকার হইতেছেন রমেশ থাপর—যিনি কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "ক্রশরোডস্"-এর সম্পাদক ছিলেন।

"একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, কাশ্মীর-সরকার এবং জাতীয় পরিষদের মধ্যে বহুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ করিয়াছে। টোকিওতে ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. কে. চেট্টুরের সহিত মোসাবুরো সুজুকির নেতৃত্বে জাপানের বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত মে মাসে ভারত-সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলের সভ্য হিসাবে যাঁহাদের নাম ঘোষিত হইয়াছে তাহার ফলে স্পষ্টতরই ভারতীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে ভারসাম্যের অবনতি ঘটিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই কথাই বলা হইত যে, ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী এবং পশ্চিমের প্রতি অনুরক্ত। একমাত্র নেহরুই তাহার বিরোধী। এতদিন পর্য্যন্ত ইহাই সত্য ছিল যদিও সর্দ্দার প্যাটেলের মৃত্যুতে এবং রাজাগোপালাচারীর পদত্যাগে এই ভারসাম্য যথেষ্ট বিচলিত হইয়াছিল। নূতন মন্ত্রিসভা হইতে এন্. ভি. গ্যাডগিল এবং কে. এম. মুন্সীর অপসারণে প্যাটেলের শেষ সমর্থকদ্বয়ও মন্ত্রিসভা হইতে বিদূরিত হইলেন। কম্যুনিষ্ট সমর্থক ব্লিৎস্ উল্লসিত হইয়া ২৪শে মে লিখিয়াছেন, "ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে খাদ্যমন্ত্রীর ভার এখন যোগ্যতর এবং অধিকতর নিরাপদ হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

"জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইতে এত দিন পর্য্যন্ত ভারত-সরকার 'বৃহৎ জাতিসমূহের ঐক্যের নীতি'র সমর্থক ছিলেন। গত এপ্রিল মাসে টিউনিসিয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ যে নৈরাশ্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহার সুযোগ লইয়া ভারত-সরকার পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে আলোচনায় বাধা দানের জন্য তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ বার 'ভেটো' প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনায় বাধা দান বা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে বানচাল করিবার যে চেষ্টা করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ভারত-সরকার এরূপ কোন প্রতিবাদ জানান নাই।"

আমেরিকা এবং ভারতীয় নিরপেক্ষতা

তৃতীয় প্রবন্ধে কেটো ভারত-মার্কিন নীতির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা অবাস্তব এবং মার্কিন জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছে। "আমেরিকার সরকারী মহল ভারত-সরকারকে তুষ্ট করিতেই ব্যস্ত, ভারতীয় জনসাধারণের কথা তাঁহারা মোটেই ভাবেন না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কূটনীতি শুধু সরকারী মহলেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ভারতীয় জনগণের সহিত সংযোগ স্থাপনের কোন চেষ্টাই মার্কিন সরকারী মহল করিতেছেন না।

অবশ্য সম্প্রতি শিক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং অন্যান্য মহলের সহিত সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রই রাজনীতি-বহির্ভূত। মার্কিন প্রচার-বিভাগের উপর পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন কোন বিতর্কমূলক ব্যাপার না উত্থাপিত করা হয়। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনের কম্যুনিষ্ট শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা করিলে প্রধানমন্ত্রী নেহরু বিরক্ত হইবেন। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে মার্কিন প্রচার-বিভাগ সোভিয়েট রাশিয়ার অভিসন্ধিসমূহ জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। ভারতবর্ষে কিন্তু তাহারা সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে কিছু বলিতেই চাহেন না। ভারতে এই কাজের সমগ্র ভার পড়িয়াছে ব্রিটিশ প্রচার-বিভাগের উপর। তাহা ছাড়া গণতান্ত্রিক-গবেষণা সংস্থাও এই ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন। মার্কিন প্রচার-দপ্তর সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার হইতে বিরত থাকিলেও ব্রিটিশ প্রচার-দপ্তর এবং যুগোস্লাভ মিশন প্রত্যক্ষভাবে ষ্টালিন-বিরোধী সংবাদ প্রচার করিতেছেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতীয় গণতান্ত্রিকদের নিকট আমেরিকার এই নীতি 'তোষণনীতি'র সমতুল প্রতিভাত হয়।"

" 'ভারতে মার্কিন নীতি'র এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব যে কত দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলিতেছেন যে, যখন মিসেস রুজভেল্ট ভারতে আসেন, তিনিও আমেরিকার নীতি ভারতবাসীর সম্মুখে স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার কতকগুলি মন্তব্য বর্ত্তমান জটিল অবস্থাকে জটিলতর করিয়াছে। তাঁহার বিভিন্ন বিবৃতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে মার্কিন-বিরোধিতা বর্ত্তমান ছিল তাহা আরও দৃঢ় হইয়াছে।"

লেখকের মতে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলস তাঁহার উদ্যম এবং বন্ধুভাবের দ্বারা ভারতীয় জনগণের মনের উপর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষকদের উৎকণ্ঠা দূর হয় নাই। ১৭ই মে দিল্লী হইতে প্রকাশিত কংগ্রেসের মুখপত্র 'পিপল' সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, দেশে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বাড়িতেছে।"

সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবার মত কিছু নাই। লেখক বলিতেছেন, "মনে হয় চীনের শিক্ষা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই এবং যুক্তরাষ্ট্র ভারতেও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবার বিপজ্জনক অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতে সেই শিক্ষা হইতেছে: (১) এমন কি বন্ধুভাবাপন্ন সরকারকেও বিনাসর্ত্তে সাহায্য দেওয়া উচিত নয়, পরন্তু পূর্ব্বাহ্নেই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে যে, যাহাদের জন্য এই সাহায্য তাহাদের নিকট ইহা পৌঁছায় কিনা এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য এই সাহায্য তাহা সাধিত হয় কিনা; (২) সাধারণ জনতাকে উপেক্ষা করিয়া সরকারের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিলে সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদের সৃষ্টি হইতে পারে; এবং (৩) আদর্শগত শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিলে অর্থনৈতিক সাহায্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।"

কেটো লিখিতেছেন, "ভারতে মার্কিন প্রতিনিধিবৃন্দ কেবল কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাহার নেতা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। মনে হয় তাঁহারা ভাবেন যে, নেহরুকে বন্ধুরূপে পাইলেই ভারতকে পাওয়া হইবে। কিন্তু ইহা ভুল। নেহরু এবং ভারত এক নহে। গত নির্ব্বাচনে নেহরুর পার্টি শতকরা চল্লিশটির বেশী ভোট পায় নাই। চার্চিল বা এটলীকে যে অর্থে ব্রিটেনের প্রতিনিধি বলা চলে সেই অর্থে নেহরুকেও ভারতের প্রতিনিধি বলা চলে। এই কথা স্মরণ না রাখিলে কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যবর্ত্তী দলগুলিকে অস্বীকার করা হইবে, এবং চীনের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। ভারতের শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং অধিকতর আশাপ্রদ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধারা যে সুযোগ উপস্থিত করিতেছে তাহাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।

"সকল কম্যুনিষ্ট পেটের দায়ে কম্যুনিষ্ট হয় না। ভারতেও তাই। এম. আর. মাসানী 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন, 'খালি পেটের মত শূন্য মন এবং আত্মাও কম্যুনিজমের জন্মস্থান।' সুতরাং ভারতের জনগণের মানসিক ক্ষুধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লেখকের মতে এখনও সময় আছে; কাজেই ভারতের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক স্রোতোধারা আছে আমেরিকাতে যাঁহারা স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বন্ধু আছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবিলম্বে এই ধারাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা।"

আমেরিকার রাজনৈতিক পট-পরিবর্ত্তন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়া গিয়াছে। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের বিজয় শুধু আকস্মিক নয়, তা অস্বাভাবিক। আইসেনহাওয়ারের নিজস্ব প্রতিভাবল বিশ্বজন-বিদিত, কিন্তু তবুও তাঁর বিজয় সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিল। তিনি আমেরিকার রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি। ১৯৩৩ সাল হইতে আমেরিকার রাজনৈতিক সমুদ্রে রিপাবলিকান দল ভাটার টানে পড়িয়াছিল। ১৯৩০-৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হুভার সময়ের পরিবর্ত্তনশীলতার সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে পারেন নাই। ১৯৩৩ সন হইতে আমেরিকার রাজনৈতিক গগনে ডেমোক্রাটিক দলের তারকা উদিত ছিল; ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে রিপাবলিকান দল আবার রাজ্যশাসন-ভার প্রাপ্ত হইবে।

১৯৩৩ হইতে ১৯৫৩ সাল—এই কুড়ি বছরে দুনিয়া অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের রাষ্ট্র জনসামাজিক রাষ্ট্র হইতে বাধ্য—ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির পাতা আওড়াইয়া কোন রাষ্ট্রকর্ণধার নিজেকে

হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। একথা আমেরিকাবাসীরা জানে, তাই ক্ষমতা পরিবর্ত্তনে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেও তাহারা সঙ্কুচিত হয় নাই। ডেমোক্রাট বা রিপাবলিকান—যে দলই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হউক, জনসাধারণের অর্থ নৈতিক মঙ্গল সকলকে দেখিতে হইবে। তবে রিপাবলিকানদের গোঁড়ামি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা এখনও যথেষ্ট আছে, তাই তাহাদের অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কি রূপ লয় তাহা এখনও সঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। পূর্ব্ব জার্মানীতে সামরিক শাসনের অপকীর্ত্তিতে আইসেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছে।

আইসেনহাওয়ারের বিজয়ে বিদেশে যাহারা আনন্দিত হইয়াছে তাহারা হইতেছে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল এবং তাহাদের নেতা মিঃ চার্চ্চিল। আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে চার্চ্চিলের যেন রাজনৈতিক নাড়ীর টান আছে—দুই জনেরই যুদ্ধবিগ্রহে একটা মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ পায়। আমেরিকার রাজনৈতিক পটপরিবর্ত্তনের ধারায় ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অতীতের ম্রিয়মাণ সাম্রাজ্যবাদকে আবার আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে ব্রিটেন সুর পাল্টাইয়া বলিতেছে যে, ইহা তাহার ঘরোয়া ব্যাপার। কাশ্মীর বিবাদে অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় ভাবে মাথা গলাইতেছে—ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যর গ্লাডউইন জেব দাবি করিতেছেন যে, ভারত ও পাকিস্থান সমপর্য্যায়ভুক্ত—উভয়েরই সমপরিমাণ সৈন্য কাশ্মীরের উভয় দিকে থাকিবে।

কোরিয়ার যুদ্ধ বানচাল হওয়াতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তথা ডেমোক্র্যাটিক দল আমেরিকাবাসীদের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমেরিকা আজ যুদ্ধক্লান্ত। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইলেও আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হয় নাই। আমেরিকা চাহে যুদ্ধবিরতি—ডেমোক্র্যাটিক দল পুনঃনির্ব্বাচিত হইলে কোরিয়ার যুদ্ধ সহজে নিষ্পত্তি হইবে না, আমেরিকা তাহা জানে। বিশ্বযুদ্ধের পর ডেমোক্রাটিক দল রাজনৈতিক চিন্তাধারায় খেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল—এলোমেলো চিন্তা ও কার্য্যাবলী তাহাদের পতনের কারণ।

এই নির্ব্বাচন নানাদিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নির্ব্বাচনের ফলে শুধু যে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা নহে, ইহার প্রভাব মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির উপরেও পড়িবে। নির্ব্বাচনের পরমুহূর্ত্তেই জেনারেল আইসেনহাওয়ার কোরিয়া ভ্রমণের অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন। ৯ই নবেম্বর লণ্ডন হইতে প্রচারিত পি. টি. আই.-রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, আইসেনহাওয়ার শীর্ষস্থানীয় একজন রুশ মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পিকিং যাইতে প্রস্তুত আছেন। আইসেনহাওয়ারের কোরিয়া সফরের পর এই সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা এবং অবিলম্বে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোই নাকি ইহার উদ্দেশ্য।

এই নির্ব্বাচনের অপর বিশেষত্ব হইতেছে যে, আইসেনহাওয়ার যত ভোট পাইয়াছেন (৩ কোটিরও বেশী) ইতিপূর্ব্বে অপর কোন প্রেসিডেন্টই এত অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হন নাই।

আইসেনহাওয়ার আগামী ২০শে জানুয়ারী ট্রুম্যানের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

নূতন ভারত-মার্কিন চুক্তি

৬ই নবেম্বরের আমেরিকান রিপোর্টারে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও শিল্পোন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষকে আরও অধিক পরিমাণ অর্থসাহায্য করার কথা যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ঘোষণা করেছে বলে জানা গিয়েছে। গত সোমবার নয়াদিল্লীতে ভারতবর্ষকে অতিরিক্ত ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ডলার (প্রায় ২১ কোটি ৭০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) সাহায্য দান সম্পর্কে একটি ভারত-মার্কিন চুক্তি সম্পন্ন হয়। এ বছরের ৫ই জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা অনুযায়ী যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তারই পরিপূরক হিসাবে উপরোক্ত অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

"এই অর্থের মধ্যে ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার (প্রায় ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা) ব্যয় করা হবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য। এই পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের পরিচালনাতেই কার্য্যকরী করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বাকি ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার কতকগুলি বিশেষ পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি হ'ল সিন্ধ্রি সার উৎপাদন কারখানার সম্প্রসারণ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় সহযোগিতা, ঢালাই প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ শিল্পের সম্প্রসারণ এবং উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ।

"উল্লিখিত অর্থসাহায্য নিয়ে এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মঞ্জুরীকৃত অর্থসাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৯৯ লক্ষ ডলার (প্রায় ৪৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা)।"

শাখটের নেতৃত্বে তৃতীয় ব্লক ?

হিটলারের যাদুকর অর্থনীতিবিদ্ হ্যালমার শাখ্‌টের সাম্প্রতিক গতিবিধি পৃথিবীর কূটনৈতিক মহলে বিশেষ চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। শাখ্‌ট হিটলারের অন্যতম সহযোগী হইলেও নুরেনবার্গ বিচারে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। তিনি কর্ম্মঠ ব্যক্তি এবং তাঁহার বর্ত্তমান গতিবিধি আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

গত বৎসরের প্রথম দিকে তিনি ইন্দোনেশিয়া যান। সেই দেশের সমস্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি যে সুপারিশ করেন জাকার্ত্তা সরকার তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তখন মনে হইয়াছিল যে, সে কাজের বোধ হয় কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই ; কিন্তু গত মার্চ্চ মাসে তাঁহার স্পেন ভ্রমণের পর সে ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে। স্পেনে দুই সপ্তাহকাল অবস্থানকালে তাঁহাকে প্রায়ই বিখ্যাত জার্ম্মান নাৎসী নেতা অটো স্কর্‌জেনির সহিত ঘুরিতে দেখা যায়। চার বৎসর পূর্ব্বে স্কর্‌জেনি জার্ম্মানীর বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়া ফ্রাঙ্কোর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্কর্‌জেনি শেষ দিন পর্য্যন্ত হিটলারের

সমর্থক ছিলেন এবং বর্তমানেও নয়া নাৎসীবাদের একজন উৎসাহী সমর্থক। যদিও শাখ্ট হিটলারের সহিত হিসাব নিকাশ (*Settling Accounts with Hitler*) শীর্ষক পুস্তকে হিটলারের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করিয়াছেন এবং নিজেকে হিটলারের বিরোধী হিসাবে প্রচার করেন তবু তিনি স্পেনে ফ্রাংকোর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই বা সে ঘনিষ্ঠতার কথা গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। মাদ্রিদের জার্মান রেস্তোরাঁয় ফ্রাংকোর ভোজনরত মিঃ এবং মিসেস শাখ্ট এবং ফ্রাংকোর একটি ছবি সংবাদপত্রে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে।

অবশ্য ফ্রাংকোর সহিত সাক্ষাতের জন্যই তিনি স্পেনে যান নাই। ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় স্পেনেও শাখ্ট সরকারী অতিথি ছিলেন। তিনি স্পেন সরকারকে বৈষয়িক উপদেশ দান করেন। স্পেনে তিনি এক বক্তৃতায় তাঁহার বর্তমান মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি বলশেভিকবাদ এবং ডলারবাদ দুইয়েরই বিপক্ষে।

স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর অনতিবিলম্বে তিনি হামবুর্গে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন এবং তাঁহার প্রয়াস আইনের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। তিনি সে ব্যাঙ্কের নাম দিয়াছেন হ্যালসার শাখ্ট এণ্ড কোম্পানী। সেই কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক হইতেছেন রাইখ্স ব্যাঙ্কের একজন ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ওয়ালডেমার লুডউইগ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচেষ্টা দুইটি কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, রূঢ় শিল্পের সহিত তাঁহার সংযোগ যুদ্ধ এবং নাৎসী-বিরোধী অভিযানের পরেও টিঁকিয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যই ব্যাঙ্কের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইহার পরই শাখ্ট ইরাণ গমন করেন। ঠিক সেই সময় ডাঃ মোসাদ্দেক্ ব্রিটিশ এবং আমেরিকার নিকট তৈল বিরোধের মীমাংসার সর্ত হিসাবে অসম্ভব দাবি পেশ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। শাখ্টের ভ্রমণের পরই ইরাণের তৈল খনিতে কয়েক শত জার্মান যন্ত্রবিদের নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হইল এবং তাহার অল্প দিনের মধ্যেই ব্রিটেনের সহিত ইরাণের কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষিত হইল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে শাখ্ট মিশরে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক কোন সংবাদ জানা যায় না। কিন্তু শাখ্টের অতীত জীবনের কথা মনে রাখিলে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে, শুধুমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই তাঁহার মিশর গমন।

ওয়ার্লডওভার প্রেসের সংবাদদাতা জোয়াকিম জোয়েস্টেনের মতে তিনটি সুবিদিত তথ্যের পটভূমিকায় শাখ্টের এই ভ্রমণপঞ্জী বিচার করিতে হইবে: প্রথমতঃ জেনারেল ফ্রাঙ্কো গত বৎসর হইতে নিজেকে আরবদের এবং সাধারণ ভাবে ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ফ্রাঙ্কোর আশ্রিত ফ্রাংকোমি যুদ্ধপরবর্ত্তী জগতে সকল নয়া-ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের সহিত জড়িত আছেন, তৃতীয়তঃ একাধিক আরবদেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"তৃতীয় শক্তি"র কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা রাশিয়া এবং পশ্চিমের মধ্যে এক অবাস্তব নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়া চলে। তাহা সত্ত্বেও জাতিসঙ্ঘে এই তৃতীয় শক্তি অনেক সময় যুদ্ধবাদী প্ররোচনা দমন করিয়া শান্তির প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ডাঃ শাখ্টকে কেন্দ্র করিয়া যে "তৃতীয় শক্তি" গড়িয়া উঠিতেছে তাহা উপরোক্ত তৃতীয় শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পেরনের আর্জেন্টিনা এবং তাঁহার কুক্ষিগত আমেরিকান রাষ্ট্রগুলি হইতে সুরু করিয়া সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিত সর্বব্যাপী একনায়কত্বের অধীন স্পেন এবং তথা হইতে মধ্যপ্রাচ্য পর্য্যন্ত আরব লীগের ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দকে লইয়া কি আর একটি তৃতীয় শক্তির উত্থান আমরা প্রত্যক্ষ করিব? ওয়ার্লড ওভার প্রেসের মতে এই বিপজ্জনক গতির প্রতি আজ সাবধানী নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের নূতন নেতা মোরকা

ওয়ার্লডওভার প্রেসের সংবাদদাতা ফ্রেডা ট্রুপ জোহান্সবার্গ হইতে লিখিতেছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে সে সম্পর্কে বিশদ সংবাদ প্রকাশিত হইলেও সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ জেমস এস্ মোরকা সম্পর্কে অতি অল্প লোকই কিছু জানেন।

ডাঃ মোরকার পিতা ছিলেন বারালঙের দলপতি। গত শতাব্দীতে বারালঙরা বেচুয়ানাল্যাণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া বাসুতোল্যাণ্ড সীমান্তে অবস্থিত থাবান্চু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই সময় ওয়েসলিয়ান ধর্মপ্রচারকদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ ঘটে এবং তখনকার প্রথামত সেই ধর্মযাজকরা বারালঙদের দলপতির পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। তাঁহাদের পরামর্শক্রমে দলপতি মোরকা দেশীয় ও বুয়োর প্রতিবেশীদের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন, এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল যাবৎ এই উপজাতি সমৃদ্ধি লাভ করে। অবশেষে যখন অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট উক্ত অঞ্চল অধিকার করে এবং অধিকাংশ জমিই শ্বেতকায় জোতদারদের হাতে চলিয়া যায় তখনও বারালঙরা এক অংশে টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হন। ফ্রী ষ্টেটের মধ্যে ইহাই বর্ত্তমানে দেশীয়দের একটি মাত্র বৃহৎ সংরক্ষিত অঞ্চল।

বাল্যজীবনে ডাঃ মোরকা স্বভাবতঃই ওয়েসলিয়ান ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। থাবান্চুর মিশনরী স্কুলে পাঠ আরম্ভ করিয়া ১৯১১ সালে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা আরম্ভ করিবার জন্য এডিনবরা যান। এম-বি উপাধি লাভের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাবান্চুতে দশ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত

থাকেন। তাহার পর তিনি স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের জন্য পুনরায় ভিয়েনা এবং এডিনবরা যান। তিরিশ সালের প্রথম দিকে সি-এইচ-বি ডিগ্রী অর্জন করিয়া দেশে ফিরিবার পর তিনি রাজনীতি হইতে আর দূরে থাকিতে পারিলেন না।

সাধারণ তালিকা হইতে কেপ প্রদেশের দেশী ভোটারদের নাম বাদ দিয়া তাহার পরিবর্তে তাহাদের প্রতিনিধি রূপে চার জন ইউরোপীয়কে লওয়ার আইন গৃহীত হওয়ায় আফ্রিকান জনগণের রাজনৈতিক পঙ্গুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। এই আইনের বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নিখিল-আফ্রিকা দেশীয় সম্মেলন গঠিত হয়। ডাঃ মোরকা এই সংগঠনে যোগদান করেন। যদিও এই সংগঠন উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই তবু ইহারই মাধ্যমে ডাঃ মোরকার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হইল। আফ্রিকাবাসীদের সহিত সংযোগ রাখিবার জন্য সরকার যে দেশীয় প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করেন ডাঃ মোরকা তাহাতে নির্বাচিত হন। এই পরিষদের হাতে কোন ক্ষমতা না থাকায় ইহার অধিবেশন একরকম স্থায়ীভাবেই মুলতুবী আছে। যাহা হউক, ১৯৪৯ সালে মোরকা আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আফ্রিকাবাসীদের জাতীয় আন্দোলনের এক বিরাট উত্থানের সময় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব এতদিন পর্যান্ত মধ্যপন্থীদের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মন্দ না হইলেও কেবলমাত্র আবেদন-নিবেদনের মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ আফ্রিকাবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন উন্নতিই সাধন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে এই প্রতিষ্ঠানে নূতন রক্তের সঞ্চার হইল। মধ্যপন্থী ডাঃ এ. বি. কুজুমার (xuma) পরিবর্তে ডাঃ মোরকা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

এতদিন পর্যান্ত আফ্রিকান নেতৃবৃন্দ এবং স্মাটস সরকার যাহা করিতে পারেন নাই, দুই বৎসরের মধ্যেই ডাঃ মালানের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে—শ্বেতকায়দের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার বিরুদ্ধে আজ রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন আফ্রিকাবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।

১৯৫০-৫১ সালে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে স্মরণীয় কাল। মালান সরকারের জাতিবিদ্বেষের নীতির ফলে তখন হইতে আফ্রিকান, ভারতীয় এবং কৃষ্ণকায় জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিলন ঘটে, এবং সরকারের বিরোধিতার জন্য অসহযোগ, বর্জ্জন, ধর্মঘট প্রভৃতি উপায়ের পরীক্ষামূলক ব্যবহার হয়।

গত জানুয়ারী মাসে ডাঃ মোরকা এবং কংগ্রেসের সম্পাদক ওয়াল্টার সিসুলু প্রধানমন্ত্রী ড্যানিয়েল মালানকে লেখেন: "আমাদের জনসাধারণ যে সংগ্রাম আরম্ভ করিতে যাইতেছে তাহা কোন জাতি বা জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নহে, পরন্তু যে সকল অন্যায় আইন সংখ্যাগুরুদের চিরস্থায়ী পরাধীনতা এবং দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে তাহার বিরুদ্ধেই ইহা প্রযুক্ত।" বৈষম্যমূলক আইন-গুলিকে প্রত্যাহার করিবার জন্য তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছিলেন ডাঃ মালান তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া লেখেন যে, যেহেতু ইউরোপীয় এবং বান্টুদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে সেহেতু তাহারা উভয়ে একই সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, এই পার্থক্য ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মানুষ ইহার পরিবর্তন করিতে পারে না। পরিশেষে তিনি জানাইয়া দেন যে, যে কোন আন্দোলনকে দমন করিবার মত ক্ষমতা সরকারের আছে।

আফ্রিকান কংগ্রেস তাহাদের উদ্দেশ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা সরকারের নীতি টলাইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। কংগ্রেস বলেন, "আমরা জোর দিয়া এই কথা বলিতে চাই যে, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালানই আমাদের অভিপ্রেত···আমরা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করিব না···।" আফ্রিকাবাসী এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা ভগবানের সৃষ্ট এই উক্তির জবাবে তাঁহারা বলেন, জৈবিক পার্থক্য মূল প্রশ্ন নহে, প্রশ্ন হইতেছে নাগরিক এবং সামাজিক অধিকারের। সেই অধিকার জনসংখ্যার একাংশকে দেওয়া হইতেছে, কিন্তু অপর অংশকে সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

৬ই এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়গণ যখন আফ্রিকাতে ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের আগমনের ত্রিশতবার্ষিকী পালনের আনন্দে মগ্ন তখন আফ্রিকানরা নানা সভাসমিতির মারফত তাঁহাদের প্রতিবাদ জানান। ২৬শে জুন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দল গ্রেপ্তার হন এবং ১৪ই আগষ্ট ডাঃ মোরকাসহ কুড়ি জন নেতা গ্রেপ্তার হন।

ডাঃ মোরকা চিকিৎসক হিসাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তিনি জমিদার এবং ধনী ব্যক্তি, স্বভাবতঃই রক্ষণশীল। তিনি এবং অন্যান্য নেতারা শৃঙ্খলারক্ষার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের সংগ্রামের ভিত্তি হইতেছে অহিংসানীতির উপর। আমরা জনসাধারণের কোন অংশকে পীড়ন করিবার জন্য সংগ্রাম করি না। শ্বেতকায়দিগকে বহিষ্কার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বুঝি যে শ্বেতকায়গণ এখানে থাকিবেন এবং এই দেশের উন্নতির জন্য তাঁহারা অনেক কিছু করিয়াছেন···আমরা বলি না যে কেবলমাত্র আমরাই এই দেশ শাসন করিব, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের পাইতে হইবে এবং আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র আফ্রিকানরাই নাই···সকল অ-ইউরোপীয়গণই আছেন।"

ডাঃ হ্বাইজম্যান

নবগঠিত ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রাইলের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং ইহুদীদের নিজস্ব বাসভূমি আন্দোলনের প্রধান নেতা ডাঃ চেম হ্বাইজম্যান গত ৯ই নবেম্বর তেল আভিভে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর।

১৮৭৪ সালের নবেম্বর মাসে ডাঃ হ্বাইজম্যান রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী-

[illegible] জাতের রাশিয়ায় পড়াশুনা করিতে না পারিয়া তিনি জার্মানীতে আসেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জন করিয়া অধ্যাপকরূপে সুইজারল্যাণ্ড গমন করেন। সেখানে লেনিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের চেহারার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য থাকিলেও ভাবী বিশ্বের রূপ সম্পর্কে তাঁহাদের মৌলিক মতভেদ ছিল। পরবর্তীকালে তিনি মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করেন। সেখানে থাকাকালে ১৯১৬ সনের মার্চ মাসে বৃটিশ নৌবিভাগ অ্যাসিটোন উৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঐ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার কাজের জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভা পুরস্কৃত করিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে থাকার সময় ডাঃ হ্বাইজম্যান ইহুদীদের বাসভূমি আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। তিনি এই দাবির স্বীকৃতি আদায় করিবার জন্য অক্লান্ত আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তখন ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ইহুদীদের মধ্যেও অনেকে এই নিজস্ব বাসভূমি আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। বিরোধী পক্ষের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ডাঃ হ্বাইজম্যান এবং লর্ড রথ্‌স্‌চাইল্ডের নেতৃত্বে ইহুদীদের স্বতন্ত্র বাসভূমি আন্দোলনের মূলনীতি ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করেন ১৯১৭ সনের ২রা নবেম্বরের ব্যালফুর-ঘোষণায়। লর্ড রথ্‌স্‌চাইল্ডের নিকট লিখিত পত্রে ব্রিটিশ সমর-মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন :

"মহামান্য সম্রাটের সরকার প্যালেষ্টাইনে ইহুদীজনগণের এক জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। স্পষ্টরূপেই বুঝিতে হইবে যে, এমন কিছু করা হইবে না যাহা প্যালেষ্টাইনের বর্তমান ইহুদী-বহির্ভূত সম্প্রদায়সমূহের নাগরিক এবং ধর্মীয় অধিকার অথবা অপর কোন দেশে ইহুদীদের অধিকার এবং রাজনৈতিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।"

কিন্তু সুদীর্ঘ ৩১ বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর ও সামরিক বিভাগের স্থায়ী কর্মচারীদিগের চক্রান্তের ফলে এই সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ১৯৪৭ সনের ২৯শে নবেম্বর জাতিপুঞ্জের এক প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইন-বিভাগের নীতি স্থিরীকৃত হয় এবং ঠিক হয় যে, এক অংশে ইহুদীদের হাতে এবং অপর অংশে আরবদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সনের ১৫ই মে তারিখে ব্রিটিশ প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করে এবং ২০০০ বৎসর পর পুনরায় ইহুদীরাষ্ট্র স্থাপিত হয়। ডাঃ হ্বাইজম্যান তখন ছিলেন আমেরিকাতে। তাঁহার অনুপস্থিতিতেই প্যালেষ্টাইনের ইহুদী নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে ইজরাইলের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করেন।

প্যালেষ্টাইন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় দেশেই সাম্রাজ্যবাদ বিভেদনীতির চূড়ান্ত খেলা দেখাইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্তে ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সহিত প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী সংঘর্ষের বেশ মিল আছে এবং সর্ব্বোপরি দেশ-বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফলও উভয় দেশ সমান ভাবে ভোগ করিতেছে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে যে স্বার্থ-সঙ্ঘাত বাধিয়াছে, প্যালেষ্টাইনেও তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। আরব-গোষ্ঠীকে ভর করিয়া চলিতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, আর আমেরিকানরা সমর্থন খুঁজিতেছে ইজরাইলের নেতাদের কাছে। ডাঃ হ্বাইজম্যান ব্রিটেনের সদিচ্ছার আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইজরাইলে মার্কিন-প্রভাব বৃদ্ধির পথ সুগম হইল।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ গত ২৩শে কার্তিক রবিবার ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বাড়গ্রামস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিপুল যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু অবদানের মধ্যে অবিস্মরণীয়—কীর্ত্তি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথি আবিষ্কার। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য লইয়া দেশীয় পণ্ডিত সমাজের গবেষণার ইতিহাস শতবর্ষব্যাপী, এই কথা বলা যাইতে পারে। এই দীর্ঘ ইতিহাসে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জনের গবেষণা ও কীর্ত্তি স্থায়ী হইয়া থাকিবে। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক পুথির আবিষ্কারান্তর তিনি ইহা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ইহার গুরুত্ব প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদ্ ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা এম-এ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুস্তকখানির ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে তখনই পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা, বাংলা লিপি, বাংলা উচ্চারণ ও বানান, বাংলা সাহিত্য ও ছন্দ ইত্যাদির উপর এই গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব আলোকপাত করিয়াছে।

বসন্তরঞ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপনা-কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ইহারই পূর্ব্বজ বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচারেরও তিনি সদস্য ছিলেন। এই একাডেমি পরিষদে রূপান্তরিত হইলে তিনি সাগ্রহে ইহার সঙ্গে যোগ দেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও বাক্যালাপে তরুণ গবেষকগণ মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার অক্লান্ত সাহিত্য-সেবা বাংলা-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরও বিশেষ প্রেরণা দান করিয়াছে। বসন্তরঞ্জনের গবেষণার ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলাভাষীর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ। তাঁহার বিয়োগে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

ভূ-দান-যজ্ঞ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-গুহ

'বুভুক্ষমাণঃ রুদ্ররূপেণ অবতিষ্ঠতে'। অন্নহীন লোক রুদ্রের অবতার। ভারতের অগণিত লোক অন্নহীন। এক দিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, অন্য দিকে চরম আমিরী। ভারত রুদ্রাবতারের অনুকূল ভূমি।

রুদ্রাবতারকে শান্ত করার উপায় অন্নাভাব দূর করা, আর্থিক বৈষম্যের নিরসন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অথচ এ দেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন। অতএব যদি অন্নাভাব দূর করিতে চাই ত চাষীকে ভূমির মালিক করিতে হইবে। আর তাহা অচিরে হওয়া আবশ্যক। জমি চাষীর হস্তগত হইলে অন্য সব ক্ষেত্রের আর্থিক অসমতা দূর করা সহজসাধ্য হইবে। ভূমি-সমস্যার সেই সমাধানের নিমিত্তেই ভূ-দান-যজ্ঞ। বিনোবা বলিয়াছেন:

'তেলঙ্গানায় আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, কাল সারা ভারতে সে সমস্যা দেখা দিবেই। অন্যথা হইবার নহে। উহার সম্মুখীন আমাদের হইতে হইবে। আর তাই ত অহিংস উপায়ে উহার সমাধানের চেষ্টায় আমি ব্রতী হইয়াছি।'

'বিপ্লব ঠেকানো আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি হিংস্র বিপ্লব নিবারণ করিতে ও অহিংস বিপ্লব আনিতে চাহি।'

বিনোবা আগামী পাঁচ বৎসরে পাঁচ কোটি একর তথা ভারতের মোট আবাদী জমির ষষ্ঠমাংশ ভূমিহীন চাষীদের জন্য চান। জমির মালিকদের তিনি এই কথা বলেন, 'ভারত-পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান জ্ঞানে ভূমিহীন চাষীদের আপনারা জমি দিন।' কিন্তু ভূমি প্রাপ্তিতেই ভূ-দান-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি নহে। জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ভূ-দান-যজ্ঞের আসল লক্ষ্য। ভূ-দান তাহার প্রথম সোপান। ভূ-দান-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইবে গান্ধী যেরূপ সমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন সেইরূপ সমাজগঠনে, অন্নবস্ত্র ইত্যাদি জীবন ধারণের একান্ত আবশ্যক বস্তুর উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণে, স্বাবলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়—যাহার বনিয়াদে রাষ্ট্র-কাঠামো নির্ম্মিত হইবে। বিনোবা বলেন:

'এ সব আমি করিতেছি কি? আমার লক্ষ্য কি? আমি পরিবর্ত্তন চাই। প্রথমে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, পরে জীবনধারার পরিবর্ত্তন, আর তারপরে সমাজ-রচনার পরিবর্ত্তন আনয়নে আমি প্রয়াসী। এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন, ত্রি-ধারা বিপ্লব সাধন আমার লক্ষ্য।'

"I will not be satisfied unless the entire village-land comes to be freely owned by the whole village as one family. The power and authority which is at present centred in Lucknow or Delhi should get distributed to the villages."—*Harijan, August*, 16, 1952.

ভূ-দানের দান শব্দে ভিক্ষার আভাসও নাই। সমাজকে পরিবারের অন্যতম হিস্সা জ্ঞানে, উহার ন্যায্য প্রাপ্য অংশ সমাজকে দেওয়ার কথা দান শব্দে সূচিত হয়। বিনোবা বলেন:

'ভূমিদানে কেবল যে দানের মহত্ব বিদ্যমান তাহা নহে। সম-বিভাজনের মহত্বও তাহাতে নিহিত। দানের অর্থই সম-বিভাগ। 'দানম্ সংবিভাগঃ'।...সমাজ নিজ পরিবারের এক হিস্সা, এই বোধ হইতে দান করার প্রেরণা আসা চাই। ভূমিহীনদের ভূমিতে দাবি আছে এই কথা উপলব্ধি করিয়া দান করিতে হইবে, ভূমিহীন-দের উপকার করিতেছি এ ভাব হইতে নহে।'

অন্যত্র বিনোবা বলিয়াছেন:

'আমি ভিক্ষা চাহিতেছি না; আমি দীক্ষা দিতেছি, স্বামিত্ব নিরসনের দীক্ষা।'

ভূ-দানকে যজ্ঞ কেন বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিনোবা বলিয়াছেন:

'যজ্ঞে অংশ-বহন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, তাই ত ইহাকে আমি যজ্ঞ নাম দিয়াছি।...কেবল ধনীদের কাছ হইতেই লইতে হইবে তাহা যেন কেহ মনে না করেন। সবে ত যজ্ঞের আরম্ভ।...গরীবদের কাছ হইতেও আমি জমি লইতেছি। যাহার এক একর আছে তাহার কাছ হইতেও আমি এক গণ্ডা লইয়াছি। আধ গণ্ডা যদি দিত তবে তাহাও লইতাম। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, এক গণ্ডা জমি দিয়া আপনি কি করিবেন? উত্তরে আমি বলি, অসুবিধা ত কিছু নাই; এক গণ্ডা যে দিয়াছে তাহাকে ট্রাষ্টী বানাইয়া তাহার হাতেই ঐ জমি সঁপিয়া দিয়া বলিব, উহাতে যে ফসল হইবে তাহা গরীবদের দিয়া দিও। এক একরের মালিকের এক একর হইতে এক গণ্ডা দেওয়ার এই যে মনোবৃত্তি ইহাকে আমি চিন্তা-বিপ্লব বলি। যেখানে চিন্তা-বিপ্লব বিদ্যমান, সেখানে জীবন প্রগতির দিকে অগ্রসর। 'অভিপ্রাজ্যম্ রাজ্যম্ তৃণমিব পরিত্যজ্য সহসা'—তৃণজ্ঞানে রাজ্য পরিত্যাগকারী ত্যাগী এই দেশে হইয়া গিয়াছেন।...অতএব ইহার প্রসার-কল্পে সহস্র সহস্র লোকের হবির্ভাগ চাই। দরিদ্রনারায়ণের জন্য সকলের কাছ হইতে কিছু না কিছু জমি পাইতেই হইবে। ইহাকেই যজ্ঞ বলে। তাই ত আমি সকলকে বলি কিছু না কিছু দিন। এই বিপ্লবই ভারতবর্ষে সংঘটিত হইতে যাইতেছে। সে দৃশ্য আমি আমার চক্ষের সামনে দেখিতেছি।'

কেবল কিছু না কিছুতে বিনোবার সোয়াস্তি নাই।

তিনি চান সব ; সমস্ত জমির হস্তান্তর, সকল জমির সু-সম বন্টন। 'সবৈ ভূমি গোপাল কী' (গোপালের—জনগণের) যত দিন না হইতেছে তত দিন তাঁহার মাটির ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই।

'যে শত একর পাইয়াছি তাহাই মাত্র আমার নহে। আরও যে চারি হাজার একর পাওয়া যায় নাই, তার সবটাও আমারই। বামনের তিন পাদক্ষেপে যেমন ত্রিভুবন আসিয়া গিয়াছিল, এ ব্যাপারও তদ্রূপ।'

বিনোবা সব ভূমির হস্তান্তর চাহেন। তাহার কারণ নূতন সমাজগঠনের জন্য, নূতন যুগ সৃষ্টির নিমিত্ত নূতন ভূমিকা দরকার। নূতন যুগের প্রবর্ত্তন যে তাঁহার লক্ষ্য সে কথা উপরে বলা হইয়াছে। ভূ-দান-যজ্ঞ দ্বারা বিনোবা তাহার বুনিয়াদ রচনা করিতেছেন। বিনোবা বলেন :

'...গান্ধীজীর পরে জনসাধারণের কাছে এমন একটি পন্থা ধরার আবশ্যকতা ছিল যাহা দ্বারা শান্তির পথে সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে।'

সেই পন্থা সর্ব্বোদয়ের পন্থা।

'স্বরাজ আমরা পাইয়াছি। সাম্যযোগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এখন আমাদের কাজ করিতে হইবে। আমি ইহাকে সর্ব্বোদয় নাম দিয়াছি। আপনারা ইহাকে সাম্যযোগ বলিতে পারেন। সর্ব্বোদয়ও বলিতে পারেন—যে নামে আপনাদের অভিরুচি সেই নামেই ইহাকে অভিহিত করিতে পারেন। এই সর্ব্বোদয়ের বা সাম্যযোগের প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছি।'

ভূ-দান-যজ্ঞ আসলে কি সে সম্বন্ধে বিনোবার কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

'ভূদান-যজ্ঞ গান্ধীজীর সর্ব্বোদয়বাদের তথা সাম্যযোগের যুগোপযোগী পরিণত রূপ।'

সর্ব্বোদয়ের অর্থ সকলের উদয় ; কাহারও উদয় আর কাহারও অস্ত নহে। পাশ্চাত্ত্যের greatest good of the greatest number-এ অস্তের কথা আছে—হইলই বা তাহা অতি অল্প সংখ্যকের অস্তের কথা। ছিদ্রের স্বভাব, তাহা সুবিধা অনুসারে বাড়ে। সর্ব্বোদয়ের লক্ষ্য greatest good of all অর্থাৎ সকলের সর্ব্বোত্তম হিতসাধন। অতএব সর্ব্বোদয়ে হিত-বিরোধের অবকাশ নাই।

আর সাম্যযোগের লক্ষ্য, মুদ্রার প্রতিষ্ঠা কমাইয়া ও শ্রমের প্রতিষ্ঠা বাড়াইয়া সমাজের বৈষম্য দূর করা। এই সাম্যযোগের তথা 'কাঞ্চন-মুক্তির' সাধনা বিনোবা পরম-ধাম পাওনারে এত দিন করিতেছিলেন। বিনোবা বলেন যে, ভূ-দান-যজ্ঞে এতাবৎ যে সাফল্য লাভ হইয়াছে তাহা এই 'কাঞ্চন-মুক্তি' সাধনার ফল। বিনোবা যে সাম্য সংস্থাপনের জন্য কাজ করিতেছেন তাহা গণিতের সমতা নহে, পঞ্চ অঙ্গুলির সমতা। হাতের পাঁচটি আঙুল লোকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলেন :

'এই পাঁচটি ঠিক সমান না হইলেও সহযোগী, এবং একত্রে লাখো কাজ করিয়া থাকে। এই পাঁচটি সমান নহে, তাই বলিয়া একটি এক ইঞ্চি, আর অপর একটি এক ফুট এমনও নহে। অন্য কথায়, সমতা যদি না হয়, বৈষম্যও চাহি না ; তুল্যতা থাকা চাই। এই পাঁচটিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে। তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের আলাদা আলাদা শক্তি থাকে। সেই সকল শক্তির পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই। ইহাকেই পঞ্চায়েত ধর্ম্ম কহে।'

এই পঞ্চায়েত ধর্ম্ম সংস্থাপনের তথা আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধনের নিমিত্ত গান্ধী তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে। কিন্তু পঞ্চায়েত ধর্ম্মের (পঞ্চায়েত ধর্ম্ম পাশ্চাত্ত্য হইতে আমদানী মেজরিটি মাইনরিটি রূপ ফর্ম্মাল ডিমোক্র্যাসি বা গতানুগতিক গণতন্ত্র নহে। পাঁচের মুখে ভগবান কথা কহেন ইহাই এই ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য.) দর্শন এখনও মিলে নাই। সরকার গতানুগতিক পথে চলিতেছেন। ভারতের সংস্কৃতি ও প্রকৃতি বিরোধী পাশ্চাত্ত্য 'ফর্ম্মাল ডিমোক্র্যাসির' কলম এখানে পোঁতা হইয়াছে। গান্ধীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বিনোবা গান্ধীর অভিপ্রেত সমাজ রচনার জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। তিনি উহার ভিত্তি রচনা করিতে-ছেন। বিনোবা বলেন :

'তাই ত বলি আপনারা সকলে সহায়তা করিলে আমার চেষ্টা সফল হইবে, সাম্যযোগের এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে। আর তাহা হইলে ভারতবর্ষ জগতে গুরুর স্থান লাভ করিবে। জগৎ সেই আশায় ভারতের দিকে তাকাইয়া আছে। অতএব অন্য সব কাজ ছাড়িয়া আপনারা যদি এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, গান্ধীর অভিলষিত সমাজ-ব্যবস্থা আপনারা সংস্থাপন করিয়াছেন।'

সেই সমাজ-ব্যবস্থার রূপ কি ? প্রজা নামে রাজা, কাজে ভৃত্য। আর শাসক নামে ভৃত্য, কাজে রাজা। প্রজা-স্বাধীনতার নামে দুনিয়া-জোড়া এই কার চুপি চলিতেছে। ভৃত্যের সেবার আতিশয্যে বেচারা প্রজা আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া বলিতেছে, 'কাজ নেই সেবায়, রক্ষে করো।' সেবার এই খেলা সর্ব্বত্র চলিতেছে।

ইহার কারণ প্রজার স্বামিত্বের আধার নিঃস্বত্ব। মানুষের হাতে অঙ্কুশ নাই। 'প্রভু' প্রজার হাতে এমন কোন অস্ত্র নাই—যাহা দ্বারা সে ভৃত্য-শাসককে তাঁবে রাখিতে পারে, বেয়াদবি করিলে, প্রজার অধিকার হরণ করিতে বা ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারে। রাজার হাতে রাজদণ্ড

নাই—তাই অমিত শক্তিশালী হইলেও প্রজা নাকে-দড়ি ভালুকের মত বলহীন। তাহার মধ্যে এমন কোন শক্তির উন্মেষ হওয়া চাই, এমন কোন অস্ত্র তাহার হাতে আসা চাই। আর সে অস্ত্র এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে রাজ-শক্তির সাধ্য নাই প্রজার হাত হইতে সে তাহা কাড়িয়া লয়। বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞান এ যাবৎ নানা মোহন চিত্র প্রজার কাছে ধরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এরূপ কোন অস্ত্র তাহার হাতে দেওয়ার আগ্রহ কোন সমাজ-বিজ্ঞান কোন দিন দেখায় নাই; সে প্রয়োজনও বোধ করে নাই। গান্ধীর সকল কাজের লক্ষ্য ছিল প্রজাকে সেই শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তোলা। সত্যাগ্রহ সেই শক্তি বা অস্ত্র। আত্মিক শক্তি তথা অহিংস সঙ্ঘ শক্তি কাড়িয়া লওয়া যায় না। আর এই অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রয়োগ করার নিমিত্ত দালালও ধরিতে হয় না। প্রজাতে এই শক্তির বিকাশ হইলেই কেবল প্রজার অভিষেক হইবে। ভূ-দান-যজ্ঞ সেই অভিষেক-আয়োজন। বিনোবা বলেন:

'...মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা আছে। আমার এই যজ্ঞ প্রজাসূয় যজ্ঞ। ইহাতে প্রজার অভিষেক হইবে। তাহা এমন রাজ হইবে যাহাতে মজুর, কৃষক, ভাঙ্গি সকলেই বুঝিবে যে আমাদের জন্য কিছু হইয়াছে। এরূপ সমাজেরই নাম সর্ব্বোদয়। ঐ প্রেরণা হইতেই আমি ঘুরিতেছি।'

এই অভিষেক-আয়োজনে আর একটি উপচার আবশ্যক। আর তাহা অহিংস শক্তির তথা সত্যাগ্রহের বনিয়াদ-স্বরূপ। অন্ন বস্ত্রাদি জীবনের অত্যাবশ্যক বস্তুর উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে স্বয়ং-প্রভু, স্বাবলম্বী, স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হইলে কস্মিন্ কালেও প্রজা এই শক্তির অধিকারী হইবে না। অতএব প্রত্যেক পল্লীকে অন্ন বস্ত্রাদিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক একটি ক্ষুদ্র পল্লী প্রজাতন্ত্র হইতে হইবে—অন্ন বস্ত্রাদিতে স্বাবলম্বী কিন্তু অপর সকল বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী। রাষ্ট্রের হাতে জীবন ধারণের সকল অবলম্বন সঁপিয়া দিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়িবে? রাষ্ট্র অন্ন বন্ধ করিবে বস্ত্র বন্ধ করিবে। জল বন্ধ করিবে, আলো বন্ধ করিবে। তখন? অতএব প্রজার অভিষেক চাহিলে রাষ্ট্রের হাতে বা অপর কাহারও হাতে জীবন ধারণের প্রধান প্রধান উপকরণের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ভার দেওয়া চলে না।

বলা হইবে, হিংসার দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারণ করা যায় না, এমন নহে। আর সে নজির ভূরি ভূরি আছে। আছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই নজিরও প্রচুর পরিমাণেই আছে যে, সরকার-বিরোধী হিংস্র আন্দোলনের সংঘটক দালালকে দালালি দিতেই লব্ধ অধিকার প্রজার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। King Log-এর জায়গায় King Stork আসিয়াছে। শাসকের চিরন্তন আসক্তি ক্ষমতা আহরণের, অতএব প্রজার অধিকার হরণের দিকে। উহার প্রতিকারের পন্থার সন্ধান জগৎ চিরকাল করিয়া আসিয়াছে। নানা পরীক্ষা চলিয়াছে। আজও তাহার অন্ত হয় নাই। সমাধান মিলে নাই। গান্ধী সেই সমাধানের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন। বিনোবা ভূ-দান-যজ্ঞ রূপে সেই সমাধানের কাজ অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।

'ইহাকে আমি আমার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলি। আগামী পাঁচ বৎসর আপনারা যদি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ঐ সময়-মধ্যে পাঁচ কোটি একর জমি হস্তান্তর করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ভারতে এক মহান্ অহিংস বিপ্লব সংঘটিত হইয়া যাইবে।'

—বিনোবা

ভূ-দান-যজ্ঞ যুগ-ধর্ম্ম, যুগ-কর্ম্ম। বিনোবার উক্তি:

'আমি যাহা করিতেছি তাহা এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন (হিষ্টরিকাল নেসেসিটি)। আমি যাহা করিতেছি তাহা ইতিহাসের বিপরীত নহে। তাহা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। কালের দাবি।'

'ভারতের সংস্কৃতিতে যাঁহারা আস্থাবান, গান্ধীজীর পথে যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল, তাঁহাদের কাছে আমার নিবেদন,—এই ভূ-দান-যজ্ঞে আপনারা যোগ দিন, পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এইরূপ কাজ, এইরূপ সুযোগ আর একবার আপনারা পাইবেন না। লোকে অনিশ্চিত কাল পর্য্যন্ত আপনাদের পথ চাহিয়া থাকিবে তাহা হইতে পারে না। সে স্থলে এমন সব লোক আসিবে যাহাদের মত-পথ ভিন্ন, কার্য্যক্রম আলাদা। আমরা যদি কালের দাবি না চিনি এবং তদনুযায়ী নিজ নিজ কর্ত্তব্য না করি, আমরা যদি সুযোগ হারাই ত তার অর্থ হইবে এই যে, যুগ-ধর্ম্ম আমরা চিনি না। যে যুগ-ধর্ম্মের পরিচয় পায় না, ধর্ম্ম যে কি তাহা সে জানে না। ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য উপস্থিত হয়, তাহা তখনকার মুখ্য ধর্ম্ম হয় এবং অপর সব ধর্ম্ম হইয়া যায় গৌণ। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি শান্তির পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান করিতে পারি তবে আমাদের দেশে শান্তি ত প্রতিষ্ঠিত হইবেই, জগৎও তাহা হইতে শান্তিময় বিপ্লবের সন্ধান পাইবে।'

বিনোবা বলেন যে জমির যাহারা যথার্থ মালিক তাহাদের দিকে জমি দৌড়াইতেছে, তাহাদের হাতে পৌঁছিবার জন্য জমি নিজেকে সঁপিয়া দিতেছে, না তাহাদের হাতে গিয়া জমি পৌঁছিয়াছে। কিরূপে উহার হস্তান্তর হইবে তাহাই প্রশ্ন:

'কিরূপে উহার হস্তান্তর হইবে—ধৃতপাত্রে আগুন ধরাইয়া বা রক্তরূপে ঘি আহুতি দিয়া একথা আপনাদের ভাবিয়া দেখিতে বলি। মরসুমের মত বিচার বাহির হইতে আমাদের এখানেও আসে।'

'আপনারা কতটা জমি দিলেন সে-কথা আমি ভাবি না। জমি যেখানে ছিল সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে। আর জমিতে যাহাদের অধিকার তাহাদের কাছে জমি চলিয়াও গিয়াছে। ভগবান গীতায়

অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, 'হে অর্জুন! এ সকলের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। সেই ভগবানই আজ কহিতেছেন, জমি গরীবের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ধনবানেরা নিমিত্ত মাত্র হোন। যাহাদের জমি নাই তাহাদের হাতে জমি পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজে আমাকেও তিনি নিমিত্তমাত্র বানাইতে চাহেন—ধনবান ও জমির মালিকদের কাছে প্রেরণা বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত।···জমি গরীবের হাতে পৌঁছুক তাহাই মাত্র আমি চাহি না। যজ্ঞরূপে পৌঁছুক তাহাই আমি চাই। অতএব মুখ্য কথা জমির হস্তান্তর নহে। ঠিক পথে হস্তান্তরিত হওয়াই মুখ্য কথা। আর ভগবান সে কাজই আমাকে দিয়া করাইতেছেন।'

তাই ত তাঁহার মুখ হইতে এমন গভীর প্রত্যয়ের কথা এরূপ জোরালো ভাবে নিঃসৃত হইয়া থাকে :

'যাঁহারা আজ জমি দিলেন না, তাঁহারা কাল দিবেন। না দিয়া তাঁহাদের চারা নাই। আমাকে জমি দিতে অস্বীকার করিবে এমন কেহ ভারতবর্ষে নাই।'

সরকার জমিদারী উচ্ছেদের আইন প্রণয়ন করিতেছেন, জমিদারী উচ্ছেদ করিতেছেন তবে আর ভূ-দান-যজ্ঞের আবশ্যকতা কোথায়? এই প্রশ্ন লোকের মনে জাগে। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলিব যে, লোকমতের সমর্থন না থাকিলে আইন অকেজো। আর জমিদারীর উচ্ছেদ ইতিমধ্যেই 'লিগাল ফিক্‌শনে' পরিণত হইয়াছে বলা যায়। বিনোবা বলেন :

'জমিদারী উচ্ছেদের আইন প্রবর্তিত হইয়াছে; তাহাতে আমার অন্তরে আনন্দের প্রতিধ্বনি উঠে নাই। কেন উঠে নাই? আমি কি রাক্ষস? কিন্তু আমি দেখিতেছি গরীব ভূমিহীনদের তাহাতে কোন লাভ হয় নাই। তাহাদিগকে আমি কি বলিব?'

— সর্বোদয় আগষ্ট '৫২

অন্যত্র বিনোবা বলিয়াছেন 'জমিন্দারী গয়ী, ফারমদারী আয়ী' :

'জমিদারী উচ্ছেদের যে আইন সম্প্রতি এখানে (উত্তর প্রদেশে) জারি হইয়াছে, তাহাতে কৃষকের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। বড় বড় জমিদারেরা নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জমি ভাগ করিয়া লইয়াছে, আর বাদবাকি জমিতে বড় বড় ফার্ম্ম বানাইয়াছে। জমিদারী গিয়াছে, ফার্ম্মদারী আসিয়াছে। "অধিক অন্ন ফলাও"য়ের নামে ফার্ম্মগুলিকে বাছিয়া সুবিধার পর সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ফার্ম্ম দুই-এক হাজারের নহে, পনর হাজার একরের পর্য্যন্ত আছে। বহু বৎসর যাবৎ যে সব চাষী ঐ সকল জমি চাষ-আবাদ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের উৎখাত করা হইতেছে। ঐ সব ফার্ম্মে যাহারা কাজ করে তাহাদের অবস্থা দুঃখদায়ক। তাহারা ফার্ম্মে যে ধান-গম-যব উৎপন্ন করে তাহাতে তাহাদের অধিকার নাই। তাহারা পরবার লোকর। মজুরি পায়। রেশন দোকান হইতে যব গম তাহাদের কিনিতে হয়।···এই অসহ্য ও অসহায় অবস্থার প্রতিকারও ভূদান-যজ্ঞ।'

জমিদারী উচ্ছেদের পরে উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় শিকমি (যাহারা জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ-আবাদ করে) চাষীদের বিপুল সংখ্যায় উচ্ছেদ করা হইতেছে। তাহাদের বিনোবা উপদেশ দিয়াছেন :

'উৎখাত হইও না। নিজ জমি আঁকড়াইয়া থাক। মার-ধর করিবে, ধীরভাবে তাহা সহ্য করিবে। ইহাও এক প্রকার ঠাণ্ডা শক্তি।···'

আমেরিকার অর্থ, যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সরকার অন্নাভাব দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন তবে আর এই বৃথা আন্দোলন কেন? অন্নাভাব এই পথে ঘুচিয়া যাইবে, অতএব রুদ্রাবতারের ভয় নাই।

কিন্তু আমেরিকার যন্ত্রপাতির নিমিত্ত বড় বড় ফার্ম্ম চাই। আর সেজন্য চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করা দরকার। আর করাও হইতেছে। ফলে আজিকার অন্নপুষ্ট চাষী কাল অন্নহীন হইয়া নিরন্নের সংখ্যা বাড়াইবে।

জমি কোথায় যে দানে দেওয়া যাইবে, ভাগ করা যাইবে, এরূপ কথাও শোনা যায়। চিয়াঙের কৃষি-বিশারদেরাও এমন কথা এক দিন বলিয়াছিল। জ্যাক বেলডেন-কৃত *China Shakes the World*-এ চীনা বিপ্লবের যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

'চীনা চাষীদের পিঠে সওয়ার হইয়া চিয়াং-কাইশেক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন···কিন্তু তাহার পুরস্কার স্বরূপ চাষীরা জমি পাইল না, খাজানা পর্য্যন্ত তাহাদের কমিল না, উল্টা লাভ হইল হুমকি, গাল-মন্দ, মারধর, আর ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত। সাংঘাইয়ের আকস্মিক ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্ব্বে চীনের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। তদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে জমি কৃষকের মধ্যে বাঁটিয়া দিলে প্রত্যেক কৃষক চারি মাউ বা দুই-তৃতীয়াংশ একর জমি পাইত। সবদিকে চাষের অবস্থা অনুকূল হইলে উহাই হইতে পারিত কৃষকের খাজানা, খাদ্য, বস্ত্র—এক কথায় গাতি হইতে শবাধার পর্য্যন্ত—জীবনের সকল উপকরণ আহরণের একমাত্র অবলম্বন। স্পষ্টতঃ অবস্থাটা ছিল এই—হয় ভূস্বামীদের ভূমিতে স্বামিত্ব পরিহার করিতে হইবে, নয়তো চীন সর্ব্বনাশের পথ ধরিবে। কিন্তু চিয়াঙের কৃষি-বিশারদগণ জমির ঐ অঙ্ক হইতে অন্য সিদ্ধান্ত, অন্য যুক্তি বাহির করিলেন। 'What is the use of dividing the land? they blandly asked. There is not enough any way.'—ঠাট্টার সুরে তাহারা বলিলেন, জমি ভাগ করিয়া কি হইবে? কতটুকুই বা জমি। অল্প লোকের হাতে অধিক জমি থাকিলেই না বিপদ, তাহা যখন নহে, তখন বিপ্লবের ভয় নাই। কৃষকদের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছিল,

অর্থনীতিবিদেরা এই ভাবে তাহার আলাপ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে কৃষক রক্ত-মাংসের মানুষ। নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্ত বশে কৃষকের আকাঙ্ক্ষা তাহারা অগ্রাহ্য করিলেন। কেবল তাহাই নহে, প্রকৃত জমি আহরণের যে পর্ব্ব তাহাদের চক্ষের উপর চলিতেছিল সে দিকে তাঁহারা চোখ বুজিয়া রহিলেন।' (পৃ. ১৪৮)

সরকারের মনে কি আছে, তাঁহারাই জানেন। জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ (ceiling কত নির্দ্ধারণ করিবেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। ফার্ম্ম গঠনের ও প্রজা উচ্ছেদের যে পালা চলিতেছে তাহা রুদ্রাবতারকে শান্ত করিবার পন্থা নহে। কম্যুনিজমের প্রতিরোধকল্পে জেনারেল ম্যাক্ আর্থার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া জাপানের জমি বণ্টন করিয়া দেন। তাহার ফলে কোনও একজনের হাতে এখন তিন একরের বেশী জমি নাই।

কেহ কেহ এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভূদান-যজ্ঞের ফলে জমি টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, সুতরাং উৎপাদন কমিয়া যাইবে। এই আশঙ্কা অমূলক। জাপানের একর প্রতি উৎপাদন এ কথার প্রমাণ। জাপানের একর প্রতি উৎপাদন ভারতের একর প্রতি উৎপাদনের চারিগুণ। চাষীর হাতে জমি গেলে উৎপাদন বাড়িবে। তাহার কারণ জমির মালিকানাবোধ তাহাদিগকে প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করিতে প্রেরণা যোগাইবে। আর আসল লক্ষ্য যে গ্রামকে গোষ্ঠী-পরিবারে রূপান্তরিত করা সে কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। তখন সমবায় কৃষির ভাবনা আপনা হইতে লোকের মধ্যে আসিবে।

ইহা অলীক কল্পনা নহে। প্রমাণ মঙ্গরোট। মঙ্গরোট হামিরপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া গ্রামের সমুদয় ভূমি ভূ-দান-যজ্ঞে দিয়াছেন। আন্দোলনের সবে সুরু। বেগ সংগ্রহ করিতেছে। এখনই এক মঙ্গরোট, পরে বহু মঙ্গরোট হইবে। অহিংস আন্দোলনের ধারাই এই। গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ অভিযানের কথায় লোকে মুচকি হাসিয়াছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সারা ভারত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভূ-দানের প্রগতি লক্ষণীয়। তেলেঙ্গানায় পাওয়া গিয়াছিল দৈনিক প্রায় শত একর, তথা হইতে ওয়ার্দ্ধা ফেরার পথে দৈনিক দুই শত একর, দিল্লী পর্য্যন্ত দৈনিক আড়াই শত একর, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে দৈনিক তিন শত একর মেলে। উত্তর প্রদেশের পূর্ব্বদিকের জেলাগুলিতে দৈনিক অনুপাত আরও বৃদ্ধি পায়। সেবাপুরীর পরে দৈনিক গড় বাড়িতে বাড়িতে হাজার একরে দাঁড়াইয়াছে। বিনোবার জন্মতিথি ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার একরের কিছু বেশী পাওয়া গিয়াছে।

জমিপ্রাপ্তির মূল্য ত আছেই। কিন্তু উহা হইতে যে মনোভাবের সৃষ্টি হইতেছে, যে চিন্তা-বিপ্লব ঘটিতেছে তাহার মূল্য ঢের বেশী। যে চিন্তা-বিপ্লব মঙ্গরোটের অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সেই চিন্তা-বিপ্লবই জৌনপুর জেলার টিকারাও গাঁয়ের লোকদের সেই গ্রামের ভূমিহীনদের ভূমি দিতে প্রেরণা দিয়াছে। গ্রামে বত্রিশ ঘর লোকের বাস। বার-ঘরের কোন জমি ছিল না। অপর কুড়ি ঘর নিজেদের জমি হইতে ভূমিহীন বার ঘরকে সাঁইত্রিশ একর জমি দিয়াছেন। অথচ বিনোবা সে গ্রামে যানও নাই। ইহা চিন্তা-বিপ্লবের নিদর্শন। ইহা প্রসার লাভ করিতেছে। অচিরে এই চিন্তা-বিপ্লব ভূমি-বিপ্লব ঘটাইবে।

বিপ্লব কোথা হইতে আসিবে! বিনোবা একা কাজ করিতেছেন, সাধু বিনোবা। জনশক্তি এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইতেছে না। গান্ধী যাহাই করিতেন গণশক্তি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে করিতেন। অতএব এই কাজকে গান্ধীর কাজ বলা যায় না—এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

অথচ বিনোবা বলেন যে, গান্ধীর প্রেরণায় তাঁহারই কাজ তিনি করিতেছেন। আর তাহা উপরে বিনোবার নিজের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। বিনোবার এই কথা অগ্রাহ্য করা চলে না। বড় জোর বলা যাইতে পারে উহা তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসে অঘটন ঘটিতেছে।

আর কাজ তিনি একা করিতেছেন তাহা নহে। এই কাজে জনশক্তি জাগ্রত হইতেছে না এ ধারণাও ভ্রান্ত। বিনোবা সকলকে আহ্বান করিতেছেন। আর সকলের সহায়তাও তিনি পাইতেছেন। লোকে ঘরে ঘরে তাঁহার কথা, তাঁহার যুক্তি, তাঁহার আবেদন পৌঁছাইয়া দেয় তবে না তাহারা জমি দান করে। গত এপ্রিল মাসে সেবাপুরীতে সর্ব্ব-সেবা সঙ্ঘ সংকল্প করিয়াছেন আগামী দুই বৎসরে সমগ্র ভারত হইতে পঁচিশ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিবেন! ভূ-দান-যজ্ঞ বিনোবার ব্যক্তিগত আন্দোলন নহে। উহা সমগ্র ভারতের প্রশ্ন, সর্ব্ব-ভারতীয় আন্দোলন। জমি সন্ন্যাসী বিনোবা পাইতেছেন না, পাইতেছেন কাল পুরুষ বিনোবা। কোথাও বিনোবা বলিয়াছেন—'আমি যেখানেই যাই, সিংহের মত যেন গর্জ্জন করিতে থাকি।' কাল তাঁহার মুখে কথা বলিতেছে, দাবি পেশ করিতেছে। বিনোবা গণিতজ্ঞ হিসাবী লোক। তাঁহার সব কর্ম্ম ছক-কাটা। মস্তক তাঁহার গগনস্পর্শী বটে, কিন্তু পদযুগল তাঁহার এই পৃথিবীর মাটিতে সংলগ্ন। অধিকার দেওয়ার জিনিস নয়; অধিকারীকেই অধিকার বরণ করে, এ কথা তিনি জানেন। তাই ভূ-দান-যজ্ঞের কথায় তিনি বলিয়াছেন:

'এই ভূ-দান-যজ্ঞে আমার প্রথম দাবি গরীবদের কাছ হইতে।

আমার এই কথায় লোকে আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু লোকমাত্রের উদ্ধার যে কেবল তাহার আত্ম-বলেই সম্ভব একথা মনে রাখিলে আমার কথায় আশ্চর্য্য হইবার মত কিছু নাই।'

গণ-মনে বিনোবা এই আত্মশক্তির সঞ্চার করিতেছেন। আর যেভাবে তাহা তিনি করিতেছেন তাহা জন-জাগৃতি ও জনশক্তি উদ্বোধনের সর্ব্বোত্তম পন্থা। প্রথমে তাঁহার কর্ম্ম যুগ-কর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ উহা সম্পাদনের জন্ম যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। বিনোবা হাজার হাজার মাইল পায়ে চলিতেছেন। হাজার লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। আগামী পাঁচ বৎসরে তিনি সারা ভারত পদব্রজে পর্য্যটন করিবেন। লোকে তাঁহার কথা শুনিতেছে, কাজ দেখিতেছে, বিচার করিতেছে, সাড়া দিতেছে। লোকে তাঁহার কাজ করিতেছে। বিনোবা লক্ষ হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন—জনগণের সহিত একরস, একরূপ হইতেছেন। ইহা জনশক্তির উদ্বোধন ও সংগঠন নয় ত কি?

ভূ-দান-যজ্ঞে ভূমি-বিপ্লব সংগঠনের কাজ কি ভাবে এবং কত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহা লক্ষ্য করার বিষয়। সরকার জমিদারী উচ্ছেদ করিতেছেন খেসারত দিয়া। বিনোবা জমি চাহিতেছেন, জমি পাইতেছেন। উল্টা তিনি খেসারত আদায় করিতেছেন বলা যাইতে পারে। জমি যে দিল তাহাকে অনেক সময় তিনি বলেন, 'জমি দিলেন, জলের ব্যবস্থা করিয়া দিন, কুয়া খুঁড়িয়া দিন।' সে কথা লোকে রাখিতেছেও। বিনোবা লাঙ্গল চান, হালের জোড়া গরু চান। তাহা তিনি পানও। যে সব জমিদার ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে তাহাদের কাছ হইতে তিনি ক্ষতিপূরণের ভাগও আদায় করেন। সকলের কাছ হইতেই পান তাহা নহে। কিন্তু লোকে দেখিতেছে বিনোবা জমি পান, উল্টা খেসারতও আদায় করেন। অন্যদিকে তাহারা দেখিতেছে এতকাল যাহারা চাষীর পিঠে সওয়ার হইয়া বিনা শ্রমে আরাম করিয়া আসিয়াছে সরকার খামকাই তাহাদের খেসারত দিতেছেন। অতএব বিনোবার ভূ-দান-যজ্ঞে ভারতের জনগণের মনে আজ এই প্রশ্ন: ভাল, একটা লোক পথ চলিতেছে, জমি চাহিতেছে জমি পাইতেছে। সরকার ক্ষমতার অধিকারী, তাহারা ইচ্ছা করিলে অবিলম্বে সমস্ত জমি হস্তান্তর করিয়া দিতে পারেন। তাহা নয়, উল্টা সরকার জমিদারদের খেসারত দিতেছেন, তাহাদের বড় বড় ফার্ম্ম বানাইতে দিতেছেন, ফার্ম্ম হইতে চাষীদের উৎখাত করিতেছেন, আর ক্ষুদ্র কৃষকেরা যে সুবিধা ও সহায়তা মাথা কুটিয়াও সরকারের কাছ হইতে পাইতেছে না, তাহার পাঁচ গুণ সুযোগ-সুবিধা অযাচিতভাবে ফার্ম্মের মালিকগণ পাইতেছে। এরূপ বিভিন্নতা কেন? এই কেন প্রশ্নটা দিন দিন বৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে। বিনোবা যাহা পারেন, সরকার কি তাহা পারেন না? ভারতের কৃষকের মনে আজ এই প্রশ্ন। আর এই প্রশ্ন বক্তৃতা-মঞ্চের বক্তৃতায় জাগ্রত হইতেছে না। এই প্রশ্ন জাগ্রত ও পুষ্ট হইতেছে কার্য্যে। বিনোবা বলিতেছেন, জমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে; কৃষক চির-কাঙ্ক্ষিত জমি পাইতেছে। বিনোবার ভূ-দান-যজ্ঞ তাহাদের আন্দোলন—মুক্তির আন্দোলন হইয়া যাইতেছে। গান্ধীর দেহত্যাগে তাহারা যাহা হারাইয়াছিল বিনোবাতে তাহারা তাহা পাইয়াছে। কালের এই সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করার অর্থ হইবে বিপদ টানিয়া আনা। আমরা সহযোগিতাই করি আর বিরোধিতাই করি, জমি জমির মালিক কৃষকের কাছে যাইবেই—ভূমি-বিপ্লব ঘটিবেই। কোন্ রূপে? ইহাই প্রশ্ন। বিনোবা বলিতেছেন:

'ভারতবর্ষে এই প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটিতে যাইতেছে। আমি চক্ষের সামনে সেই দৃশ্য দেখিতেছি। রুশে একরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে। আমেরিকায় আর একরূপ বিপ্লব ঘটিতেছে। উভয়ই আমি লক্ষ্য করিতেছি। এই দুইটির কোনটিই ভারতের প্রকৃতির অনুরূপ ও ভারতের সভ্যতার অনুকূল নহে।'

বিনোবার ভূ-দান-যজ্ঞে ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সভ্যতার অনুকূল তৃতীয় এক বিপ্লবের পটভূমিকা রচিত হইতেছে। বিনোবার কথায়:

'এই যে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাজ আমরা করিতেছি তাহার উপর জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ, কারণ আজ জগতে যাহা চলিতেছে এ কাজ তাহার বিপরীত।'

এই অভিনব বিপ্লবের কাজে, নব-সৃষ্টির কাজে—যাহা জনগণের বন্ধন মোচন করিবে, জগৎকে মুক্তির সন্ধান দিবে, ভারতকে জগতের গুরুর আসনে সমাসীন করিবে—বিনোবা যুব-শক্তিকে আহ্বান করিতেছেন:

'আমার এই কাজে আমি আপনাদের সহযোগ-বাঞ্ছা করি। এই বিবের কাজে আপনারা আত্মনিয়োগ করুন। আমি চিন্তা-বিপ্লব আনিতে চাহি। কর্ম্মপন্থায় বিপ্লব আনিতে চাহি। যুবকদের রুচি নবব্রহ্মের সৃষ্টিতে—ইহা ঋষিবাক্য। তাই ত আপনাদের জন্য আমি এই নূতন ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছি।'

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সুন্দরের ধারণা

ডক্টর শ্রীসুধীর নন্দী

যাঁরা জীবনকে শিল্প এবং শিল্পায়নকে জীবনায়ন বলে গ্রহণ করেছিলেন, শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। সুদীর্ঘ জীবনের পথপরিক্রমায় শিল্পীগুরু সাধ্যকে সিদ্ধ করেছেন, আশেপাশে ছড়িয়ে গেছেন সুন্দরের তিলক-আঁকা অজস্র খেলনা। সে খেলনার শিল্পমূল্য উদ্‌ঘাটিত করেছে শিল্পীর প্রতিভা-ঐশ্বর্য। সোনার আলো স্ফটিকাধারে প্রতিফলিত হয়ে যে অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সৃজন করে—তা আমরা দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে। যে পরম সুন্দরের লীলা চলেছে বিশ্বময়, তাকে দেখবার সাধনাই হ'ল শিল্পীর সাধনা। সে অ-ধরার, অদেখার পিছু পিছু শিল্পী অভিসারে চলে। পরম সুন্দর চিরদিনই থেকে যায় মানুষের নাগালের বাইরে। হঠাৎ কখনও সায়াহ্নের সোনাগলানো সূর্যাস্তের চকিত আভায় সেই পরম সুন্দরের দেখা পায় শিল্পী—আভাসে হয়ত প্রত্যক্ষ হয় সেই পরম সুন্দর। শিল্পীর অন্তরলোক উদ্ভাসিত হয়, উৎসারিত হয় তার কল্পনা। তবুও সুন্দর ধরা দেয় না। আর সেই পরম সুন্দরের ধরা না দেওয়ার জন্যই ত সম্ভব হয় যুগে যুগে শিল্প-বিবর্তন। শিল্পীর মনে যে পরম সুন্দরের ধারণা বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিচিত্রতর হয়ে ফুটে উঠছে, সেই পরম সুন্দরের দেখা পেলে না বলেই ত শিল্পী-মনের অভিসার চলল এক কালের বেড়া ডিঙিয়ে কালান্তরে। অন্তরে সুন্দরের ধারণার দীপ জ্বালা—সেই দীপের আলোয় পথ চিনে অভিসারে চলেছে শাশ্বত শিল্পী-মানস। শিল্পীগুরুর ভাষায় বলি: 'যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোন দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভ'রে ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হ'য়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা মূর্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না।' [সৌন্দর্যের সন্ধান]

মানুষের পরম সুন্দরকে কখনও পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়ে ওঠে না, তাই তার আর্টও কোথাও কখনও পূর্ণ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের সহজাত অপূর্ণতা তাকে পূর্ণের দিকে নিয়ে চলে—তার অপূর্ণ শিল্পবোধ পূর্ণের সন্ধান করে যুগে যুগান্তরে। দেশে দেশে দেখি তাই শিল্পকলার ক্রমবিবর্তন। লিওনার্দোর কালজয়ী প্রতিভা যখন শিল্পসৃষ্টি করল তখন সে যুগের মানুষ ভেবেছিল বুঝি বা শিল্পসৃষ্টির শেষ কথা বলা হয়ে গেছে। লিওনার্দোর বিজ্ঞানী মন, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁর শিল্পশৈলীকে নূতন রূপ দিয়েছিল—তাঁর সৃজনী প্রতিভা সৃষ্টি করেছিল রূপে ও রেখায় অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্য। তবু শিল্পের ক্রমবিবর্তন, শিল্পীমনের এগিয়ে চলা সেখানেই থেমে যায় নি। আমরা দেখি জার্মানীর পরবর্তী শিল্প আন্দোলনের নায়ক ড্যুরারকে—ড্যুরার এগিয়ে চলেছেন লিওনার্দো-যুগকে পিছনে ফেলে। ড্যুরার তাঁর স্বজাতীয় 'রিয়ালিটি' বোধকে ইটালীয় আঙ্গিক ও শিল্পদর্শনের আলোকচ্ছটায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে পরিবেশন করেছেন রসিকজনের দরবারে, একথা ইতিহাস বলে।

শিল্পেতিহাসের এই বিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি গ্রীসদেশে, ভারতবর্ষে এবং মিশরে—এই প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশগুলির সংস্কৃতিবান মানুষের মন পরম সুন্দরকে দেখতে চেয়েছে—সাধনা করেছে সবকিছু পণ করে। তবু দেখা পায় নি এই পরম সুন্দরের। এই দেখা না পাওয়ার জন্যই শিল্পীদের রূপ নিয়ে আর রঙ নিয়ে, রেখা নিয়ে আর ঢং নিয়ে পরীক্ষা চলেছে কেমন করে আভাসে দেখা কল্পলোকের পরম সুন্দরকে ধরে দেওয়া যায় সহৃদয়হৃদয়সংবাদী মানুষের কাছে। তাই এত পরীক্ষা নিরীক্ষা—তাই খানিক এগিয়ে আবার পিছিয়ে যাওয়া, তার পর আবার এগিয়ে চলা। 'আজ যেখানে মনে হ'ল, আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হতে পারে তাই হ'ল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে, হয় নি, আরও এগোতে হবে কিংবা পেছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হ'বে। পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছচ্ছে আর্ট এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে। ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি, অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে চল আরও বাকি আছে। এই ভাবে সামনে আশেপাশে নানাদিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চির যৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন।'

শিল্পীর এই পরম সুন্দরের অনুধ্যান একতরফা নয়। পরম সুন্দরও শিল্পীকে খুঁজছেন—কখনও বা চকিত আভাসে আপনাকে প্রকাশ করছেন শিল্পীর অনাবৃত দৃষ্টির প্রত্যক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথ এই পরম সুন্দরের কথাই বলেছেন তাঁর ছন্দোময় ভাষায়:

"চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর
দেয় না তবুও ধরা।
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃতপাত্র ঢাকা,
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা,
তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর
নিজ অর্থ না জানে।
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।"

অমৃতপাত্রের সুবর্ণময় আবরণে প্রচ্ছন্ন পরম সুন্দর শিল্পীর মনকে ইঙ্গিতময় আহ্বানে ব্যাকুল করে তোলে। শিল্পী সাড়া দেয়—সে সাড়ায় সুর ফুটে ওঠে, বর্ণাঢ্য আলিম্পন আঁকা হয়। আগেই বলেছি যে শিল্পীই যে কেবল পরম সুন্দরকে খুঁজে ফিরছে তাই নয়, পরম সুন্দরও শিল্পীকে খুঁজছেন। বিশ্বজোড়া রূপ সন্ধান করে ফিরছে একজন 'খেলুড়ি আর্টিষ্ট'কে—যে তাদের নিয়ে লীলা করবে। পরম সুন্দরও খুঁজে ফিরছেন শিল্পীমনকে, নেমে আসছেন তাঁর উত্তুঙ্গ স্বর্গলোক থেকে মর্তলোকের সীমানায়, শিল্পীমনের প্রত্যন্ত তটে। এ যেন হেগেলের 'absolute', এ যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, যাঁর উদ্দেশে কবি বলেছেন:

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।"

এ অভিসার দু' তরফা—মহাপ্রাণ এবং ক্ষুদ্র প্রাণের দ্বিমুখী যাত্রা শেষ হয় সার্থক শিল্পের রূপায়নে। আবার শিল্পীগুরুর কথাতেই বলি:

"এমনি রূপ সমস্ত দিকে দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিষ্টকে খোঁজে তারা সবাই। তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন একজন খেলুড়ি আর্টিষ্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে। সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে একটা শুকনো গাছ—মাঠের ধারে সে অপেক্ষা করছিল যে তাকে নিয়ে একটি বার সত্যি সত্যি খেলবে তার জন্য। রাজা গেলেন পথ দিয়ে, দেখলেন শুকনো গাছ। রাজার সঙ্গেই রাজকবি—তিনি কবি নয় কিন্তু পদ্যে কথা বলেন—তিনি বললেন, 'এ যে দেখি শুষ্ক কাষ্ঠ'। ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সত্যিকার কবি ও খেলুড়ি। তিনি বলে উঠলেন: 'কি কও শুকনো কাঠ?'

'ও সে তরুবর রসের বিরহে
হুতাশে দহে'।" (রূপ)

এ কাহিনী শুধু বিক্রমাদিত্যের আমলের নয়, একথা সকল কালের ও সকল দেশের। সত্যিকারের কবি-খেলুড়ির দল অপেক্ষমাণ রূপকে দেখে দু'চোখ ভ'রে, তার পর রসসৃষ্টি হয়। সে রস হ'ল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। সে রস সম্পর্কে দার্শনিক বলেছেন রসো বৈ সঃ।

খেলুড়ি আর্টিষ্ট যে রূপকে দেখে সে রূপ objective—সে রূপ পরম সুন্দরের প্রকাশ। এই পরম সুন্দরকে যদি **Platonic idea** বলি তা হলে হয়ত অনেকটা ঠিক বলা হবে। এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপের কথা নিয়ে, পরম সুন্দরের তত্ত্ব নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এই ধারণার পাশাপাশি আর একটি বিপরীত ধারণাও আমরা শিল্পীগুরুর লেখার মধ্যে অনুস্যূত দেখতে পাই। সে ধারণা হ'ল **subjective** সৌন্দর্যের ধারণা। সুন্দর পরম সুন্দরকে চকিত আভাসে হঠাৎ দেখার আনন্দ নয়, সুন্দরের আনন্দের মধ্যে শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ রয়েছে। সুন্দর যাকে বলছি সে পরম সুন্দরের প্রকাশ বলেই সুন্দর নয়, সে সুন্দর কারণ আমি তাকে সুন্দর করে দেখছি। আমার চোখের আলোয় বিশ্বজগৎ আলোকিত হচ্ছে, আমার মনের সুন্দরকে আমি বাইরে দেখে পুলকিত হচ্ছি—আমার রুচি বাইরের সুন্দরকে সৃষ্টি করছে, সুন্দরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন:

"একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট-পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর অসুন্দরের বোঝাপড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে।" (সৌন্দর্যের সন্ধান)

এখানে সুন্দরকে ব্যক্তিনির্ভর হিসেবে দেখা হয়েছে—সুন্দর এখানে পরম সুন্দরের চকিত প্রকাশ নয়। অবনীন্দ্রনাথ এখানে objective determination-এর কথা বলছেন না। সুন্দর যেন এখানে স্রষ্টার রুচির খেয়াল-খুশিতে চলছে। শিল্পীর সুন্দরের ধারণা বাইরে থেকে আহৃত হয় নি। এখানে শিল্পীগুরু একথা বলছেন না যে রূপ রয়েছে বিশ্বময় ছড়িয়ে। রূপ যেন আসছে শিল্পীর খেয়াল-খুশির পাখায় ভর করে। রূপ যেন বাঁচছে শিল্পীর রুচিকে আশ্রয় করে। এই ধরণের কথা ছড়িয়ে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের নানান্ লেখায়। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে তিনি বলছেন:

"দেখলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে সয় না। অনেক দিন ধরে মনের ভিতরে যা তৈরি হ'ল তাই ছবিতে বের হ'ল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ। আর সবই কি ঠিকঠাক বের হয়। মুসৌরি পাহাড়ের একটি সন্ধ্যের পাখি আঁকলুম, কি ভাবে সে ছবিটা এল? সন্ধ্যে হচ্ছে, বসে আছি বারান্দায়, বাপ্পাদেশ সেদিন

বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে একটা লাল আলো পর পর পাহাড়-গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়ের উপরে ঘাসপাতা ঝিলমিল করে উঠল। মনে হ'ল যেন ভগবতী আজ ফিরে এলেন কৈলাসে, আঁচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রং, আলোর ঝিলমিল, তার সঙ্গে একটু ভাব— উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে। তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেই ভাবেই কি বের হ'ল ছবি। তা তো নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রূপোলি রং নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যের পাখি—সে বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারি নে। এত আলো, এত ভাব, সব তলিয়ে গিয়ে বের হ'ল একটি পাখি, একটি কালো পাহাড়ের খণ্ড, আর তার গায়ে এক গোছা সোনালি ঘাস। অনেক ছবিই তাই—মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু।"

শিল্পীর কাছে সুন্দর হ'ল মনের তলা থেকে উঠে আসা সোনা। তার যত কিছু কারিগরি, যত কিছু রঙের বাহার সব সেখান থেকে করে দেওয়া। বাইরে যখন এল তখন সে ভুবনমনোমোহিনী—তার কাছে চাইবার আছে অনেক; তাকে আর দেবার কিছু নেই। তার ঐশ্বর্য ঐ শিল্পীমনের তলা থেকে কুড়িয়ে আনা সাত রাজার ধন। মনের অন্তহীন সম্পদের কতকটা সে গায়ে মেখে এসেছে তাই সে সুন্দর। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে শিল্পীগুরু বলেছেন :

"কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি···সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজেপেতে আনতে হয় নিজের মনোমতটি।"

একথা সত্য। তবে এই নিজের মনোমতটি যদি সুন্দরের নমুনা হয় তা হলে শিল্পের সার্বিকতা বা ইউনিভার্সালিটি বলে কিছু থাকে না বলেই মনে হয়। অন্যের মনোমতকে মনে স্থান না দিতে পারলে শিল্পের জগতে সর্বজনগ্রাহ্য সুন্দর বলে কিছুই বা থাকবে কি করে? পরম সুন্দরকে স্বীকার করে নিলে অবশ্য আর্টের সার্বিকতাকে যথাযোগ্য মূল্য-দেওয়া হয়—একথা আমরা জানি। শিল্পীগুরু এখানে কিন্তু শিল্পের subjectivityকে এত প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আর্ট তার সর্বজনগ্রাহ্য আবেদনকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য কোন শিল্পেরই সর্বজনগ্রাহ্য আবেদন আছে কি না সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান। মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, সহৃদয়হৃদয়সংবাদী রসিক মন ছাড়া অন্য কারও রসের অমৃতময়লোকে প্রবেশের অধিকার নেই। একথা অনেকেই স্বীকার করেন। শিল্প শিল্পীকেন্দ্রিক। তবে ভোক্তার কথাও, রসিকজনের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। তাই অবনীন্দ্রনাথ আর্টকে শিল্পীর মনের কিনারা থেকে বিশ্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দেবার কথা ভেবেছেন। তিনি বলছেন :

"আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না লাগল তা নিয়ে দু'চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হলে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে সবার করে দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয়; সেখানে individuality-কে universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায় তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করলে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, পাত্র ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিষ্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে।"

শিল্পীগুরু ইউনিভার্সালিটির হাতুড়ি দিয়ে ইণ্ডিভিজুয়ালিটির জমাট বাঁধা রূপকে ভাঙতে চাইছেন জনতার মধ্যে সেই রূপকণিকাগুলিকে পরিবেশন করবার জন্য। নিজের মনোমতকে ভেঙেচুরে তচনচ করে অপরের মনোমত করতে হবে। সমরুচি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে যদি ইউনিভার্সালিটি না থাকে, তবে ইউনিভার্সালিটি নাই বা রইল। সকলের পাতে পরিবেশন করতে হলে সাধারণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয়, একথা সহজেই বোঝা যায়। আর যা সাধারণ তার শিল্পমূল্য অসাধারণ হবে কেমন করে? তাই, অনেকের মতে শিল্পের সর্বজনবোধ্য আবেদন থাকে না। সালভাডোর ডালি বা জন ফ্রেডারিক হেরিং সবার জন্য আঁকেন নি। আর সবার জন্য আঁকলে আমরা এঁদের কথা হয়ত জানতে পারতাম না। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে হয়ত এঁরা আমাদের কাছে এসে পৌঁছুতে পারতেন না। শিল্প সবার জন্য নয়। যাঁরা শিল্পীর সমানধর্মা, তাঁরা শিল্পীকে বুঝবেন, শিল্পের রসোপলব্ধি করবেন। সেখানে দেশ কালের বাধা নেই। হাজার বছর পরে হয়ত এক বোদ্ধা মন এসে আবিষ্কার করবে অজন্তা ইলোরার গুহা-চিত্রের সৌন্দর্যকে। সে মন গুহাচিত্রের স্রষ্টা শিল্পীদের সমধর্মী। এই সহৃদয়হৃদয়সংবাদী রসিকজনকে রস পরি-বেশনের জন্য শিল্পীকে ইউনিভার্সালিটির হাতুড়ি দিয়ে তার সুন্দরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলার দরকার হয় না। শিল্পীর নিজস্ব রূপবোধ যা ধরা পড়ে শিল্পে, তাকে সহজেই বোঝে সত্যিকারের রসিক মন। কবি তার অনুভূতির কথা বলে গেল, সবাই বুঝল কি না বুঝল সেকথা তার ভাববার দরকার নেই। তার স্থান ইউনিভার্স্যাল হচ্ছে কি না, এদিকে মন দেবার তার অবকাশ কোথায়? উদাহরণ-

স্মরণ রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

"তোমার সে ভাললাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা একা দেখি দু'জনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।"

পত্নীবিয়োগবিধুর কবিমানস রক্তের আখরে যে কথা লিখল সে কথা ত সবার জন্য নয়। যারা কোনদিনও প্রিয়া হারানোর ব্যথা বুঝল না নিজের অভিজ্ঞতায়, তাদের কেমন করে দেখাবেন কবি তাঁর অন্তরের অশ্রুর প্রস্রবণকে। তারা শুধু ভাষা পড়ল, অর্থ বুঝল, তারা বুঝল না কবির ব্যথার তল কোথায় ? অশ্রুর সমুদ্রে কত বড় বান ডাকলে এমনিধারা কথা বলা যায় ? তাই বলছিলাম যে শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল করা যায় না—শিল্পের আবেদন কেবল সহৃদয়হৃদয়সংবাদী রসিকমনের কাছে সত্য। আর সেই রসিকমনের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য শিল্পীকে সজ্ঞানে ইউনিভার্স্যালিটি বা সার্বিকতা দিয়ে ইণ্ডিভিড্যুয়ালিটি অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে ভ‌াঙতে হয় না। সেটুকু আপনি আসে।

আমাদের মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে অবীনন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী ছিলেন। ব্যক্তি তার নিজের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ভাবনা, বেদনার কথা বলবে, তাকে রসোত্তীর্ণ করবে প্রতিভার জারক-রসে জারিত করে। সুন্দর তার মনের আলোয় সুন্দর হয়ে উঠবে। তাঁর কথাতেই বলি :

"সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে, কথায় দোলে সুরে দোলে, ফুলে দোলে ফলে দোলে, বাতাসে দোলে পাতায় দোলে —সে শুকনোই হোক তাজাই হোক সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হ'ল এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে।" (সৌন্দর্য্যের সন্ধান)

শুধু মন দোলালেই সুন্দর হবে একথা এখানে স্পষ্ট করে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু একথাই শেষ কথা নয়। এই সাবজেক্টিভিটির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গেলে শিল্পীগুরুর পরবর্তী লেখাগুলোও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তিনি অন্যত্র বলছেন :

"বালক যখন সুরে বেসুরে তালে বেতালে মিলিয়ে নেচে গেয়ে চলল তখন তার সব অক্ষমতা সব দোষ ভুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেলে শিশুকণ্ঠের এবং সুকুমার দেহের ভাবটির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, কিন্তু বড় হয়ে ছেলেমো করা সাজে না একেবারেই। তবেই দেখা যাচ্ছে স্থান কাল পাত্র হিসেবে সুন্দর ও অসুন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রুচির মধ্যে।"

এখানে আবার অবনীন্দ্রনাথ শুধু পাত্রের উপরই সুন্দরের স্বরূপ নির্ণয়ের গুরু দায়িত্ব দেন নি, স্থান এবং কালকেও অনেকখানি মর্যাদা দিয়েছেন সৌন্দর্যের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে। অবশ্য যদি স্থান এবং কালকে সাবজেক্টিভ বলে গ্রহণ করা যায় তা হলে সুন্দরকে পুরোপুরি সাবজেক্টিভ বলে নেওয়া চলতে পারে। অন্যথায় সুন্দরের ব্যক্তিনির্ভর স্বরূপটি হারিয়ে যায় স্থান এবং কালের স্থূল হস্তাবলেপে। রূপ হ'ল সাবজেক্টিভ—এ তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনার নানা অধ্যায়ে। কাজেই একথা মনে করাই সঙ্গত হবে যে, অবনীন্দ্রনাথ স্থান এবং কালকেও 'ব্যক্তিনির্ভর' হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ স্থান এবং কালকে অবজেক্টিভ বলে গ্রহণ করলে তাঁর পরবর্তী অনেক লেখাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। রূপ যে পুরোপুরি দ্রষ্টানির্ভর—একথা কোনমতেই বলা চলবে না যদি আমরা স্থান-কালকে 'ব্যক্তিনিরপেক্ষ' মনে করি। রূপের জগতে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী। আবার তাঁর কথা উদ্ধৃত করছি :

"মানুষের মন বা চিত্তপট তো ক্যামেরার প্লেট নয় যে চোখ খুললেই ধরলে ছবি বুকে, ক'র কাছে কি যে মনোরম ঠেকে, কোন্ রূপটা কখনই বা প্রাণে লাগে তার বাঁধাবাঁধি আইন একেবারেই নেই ; কিন্তু মনে না ধরলে সুন্দর হ'ল না, মনে ধরলে তবেই সুন্দর হ'ল—এ নিয়ম অকাট্য।"

এই মনে ধরার ব্যাপারটা শিল্পীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। মনে ধরল, চোখে লাগল ত সেই হ'ল সুন্দর—আর অপরের মনে ধরানোর কৌশলটুকুই হ'ল সৌন্দর্যসৃষ্টির গূঢ় রহস্য। সুন্দরকে সৃষ্টি করা মানে অপরের মনে ধরানো। তবে এই অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীকে সজ্ঞানে কোন কসরৎ করতে হয় না—নিজের মনে ধরলে শিল্পীর সমানধর্মা রসিক-জনের কাছে তার আবেদন সত্য হয়ে থাকবেই। একথা অনস্বীকার্য যে সুন্দর কখনই একই রূপে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। আমার সুন্দর আর তোমার সুন্দরের দুস্তর ব্যবধান, কারণ আমাদের মননধর্ম বিভিন্ন। আলোঝলমল-দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘার অমল ধবল পাথরের গায়ে দেখেছি সোনালী আলোর রঙ্গনলীলা—রং ফুটেছে বরফের গায়ে, জমে উঠা মেঘের পাহাড়ে আর আমার মনে। আমার বিস্ময় বাধা মানে নি কোথাও—তাকে ছড়িয়ে দিয়েছি আমার সমস্ত সত্তায়। আর একজনের বিস্ময় হয়ত অতখানি সীমাহারা হবার সুযোগ পেল না—সেও দেখেছে সুন্দরের ঐ অতুলনীয় লীলা, তবু তার হিসেবী মন পারে নি উঠতে তার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতির হিসাবনিকাশের ঊর্ধ্বে—তার চোখে তাই ব্যর্থ হয়ে গেছে সুন্দরের ঐ ভুবনভোলানো রূপ। রূপ সার্থক হয় শিল্পীর চোখে। নিজের মনে না ধরলে, নিজের

সুন্দরকে সৃষ্টি করতে না পারলে অপরের মনে ধরানোর কথাই ওঠে না। আগেই বলেছি যে অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীর কোন সজ্ঞান প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। যদি শিল্প সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তবে অপরের মনে ধরবেই, তবে অপরকেও বোদ্ধা হতে হবে। শিল্প-প্রচেষ্টাকে শিল্পসৃষ্টি করে তোলার কৌশলটুকুই হ'ল শিল্পীর হাতে বিধাতার দেওয়া সোনার কাঠি—এই সোনার কাঠির মায়ায় জেগে ওঠে ঘুমন্ত-পুরীর রাজকন্যা, তার চরণপাতে বেজে ওঠে লক্ষ নূপুরের ধ্বনি-মূর্চ্ছনা; জড়ত্বের ধ্বংসস্তূপে প্রাণের ভাগীরথী নেমে আসে দুকূলপ্লাবী উদ্দামতায়। শিল্পীগুরুর কথায় বলি:

"পাষাণ তার একটা আকৃতি আছে, বর্ণও আছে, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণও আছে কিন্তু চেতনা নেই। সুতরাং তার সুখদুঃখ মান-অভিমান কিছুই নেই—এই হ'ল নিয়তির নিয়মে গড়া সে পাষাণ, কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী অহল্যা নিয়তিকৃত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন রূপ পেলে তখনো সে পাষাণ কিন্তু তার সুখদুঃখ মান অভিমান জীবনমৃত্যু সবই আছে। যে মাটির খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের খেলার সাথীরূপে ছেড়ে দিলে।"

জড়ত্বের বন্ধনে বন্দীকে প্রাণময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল শিল্পীর ধর্ম্ম। পাষাণী অহল্যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না যদি না শিল্পীকে দেওয়া হয় সর্ব্বপ্রকার বন্ধন থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি—যদি না তাকে তিনটি ভুবনে অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র দেওয়া হয় তা হলে তার শিল্পলোকে প্রাণের দূতীদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাবে। নিষেধের বন্ধনে শিল্পী পঙ্গু হয়ে পড়ে—আর সে শুকনো গাছে ফুল ফোটার অবকাশ থাকে না।

জাপানী শিল্পে এই প্রাণধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করে শিল্প-সমালোচক বউইক (Bowic) জাপানী শিল্পী সম্বন্ধে লিখছেন:

'Should he depict the sea coast with its cliffs and moving waters, at the moment of putting the wave bound rocks into the picture he must feel that they are placed there to resist the fiercest movement of the Ocean, while to the waves in turn he must give an irresistibe power to carry all before them; thus by this sentiment called living movement reality is imported to the inanimate object.'

(*On the Laws of Japanese Painting*)

এই জড়কে প্রাণ দেওয়া হ'ল শিল্পীপ্রতিভার ধর্ম্ম। কিন্তু আইনের বাঁধনে শিল্পীকে বাঁধলে বা কোন মডেলের অনুকরণ করতে বললে শিল্পী তার নিজের দেবার সম্পদটুকুকে নিঃশেষে দিতে পারে না। সে মডেল পরম সুন্দরের মডেলই হোক অথবা কলাভবনের সযত্নরক্ষিত কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিই হোক—মডেল শিল্পীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে, তার নির্ব্বাধ মুক্তি ঘটবে না অসীম নীলের নিঃসীমতায়। 'রূপের মান ও পরিমাণ' শীর্ষক নিবন্ধে শিল্পীগুরু এমনিধারা কথাই বলেছেন:

"স্থির প্রতিমা নিয়ে ধর্ম্মের কারবার, মান পরিমাণের অস্থিরতা রাখলে সেখানে কায চলেই না, সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবের উপরে প্রতিমা লক্ষণ ছেড়ে রাখা চলল না, এই মাপ এই লক্ষণ এই দেবতা এমনি বাঁধাবাঁধির কথা উঠল এবং শাসন হ'ল—নান্যেন মার্গেন। এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপজোখ তার সঙ্গে রীতিমত শাস্ত্রীয় শাসন যা প্রতিমার চোখের তারা ঠোঁটের হাসি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী ইত্যাদিকে একটু এদিক-ওদিক হ'তে দিলে না, তাতে ক'রে চুল তফাৎ হ'ল না মূর্ত্তিটির প্রথম সংস্করণে ও দ্বিতীয় এবং পর পর তার অসংখ্য সংস্করণে, এতে ক'রে পূজারীর কাজ ঠিকমত হ'ল কিন্তু আর্টের কাযে ব্যাঘাত এল। শাসনের জোরে মানুষের ক্রিয়া হয়ে উঠল কল তবে চলল যেমন যুদ্ধের কাজ, তেমনি ধর্ম্মটা প্রচার করতে শিল্পজগতে কতকগুলি আর্টিষ্ট ফৌজ সৃষ্টি করলেন শিল্পশাস্ত্রকার।... এই সব দেখেই শিল্পশাস্ত্রকার বলেছেন, যে পূজার জন্ম যে সব মূর্ত্তি তারি কেবল লক্ষণ ও মাপ লেখা গেল। অন্য সকল মূর্ত্তি যথেচ্ছা গড়তে পারেন শিল্পী মনোমত মাপজোখ দিয়ে।"

তাই বলছিলাম শিল্পীগুরুর শিল্পশাস্ত্রে নিষেধের বাঁধন নেই কোথাও—অবনীন্দ্রনাথ এমনিতর কথা বলতে পেরেছেন, তার কারণ তিনি সাবজেক্টিভ তত্ত্বে বিশ্বাসী। অবশ্য এই বন্ধন-হীন মুক্তির খাঁটি শিল্পীরাই অধিকারী, শিক্ষার্থীদের এতে অধিকার নেই। শিল্পে যাদের হাতেখড়ি হচ্ছে, তাদের জন্য কানুনের বাঁধাবাঁধি, আর যারা এই সৃষ্টির মন্ত্রটি আয়ত্ত করেছে তারা সব নিয়মকানুনের নাগালের বাইরে।

"মুক্তি ধার্ম্মিকের; আর ধর্ম্মার্থীর জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের নাগপাশ। তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য; আর শিল্পীর জন্য তাল, মান, অঙ্গুল, লাইট-শেড, পার্সপেকটিভ আর অ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি।' [ভূমিকা, ভারতশিল্পে মূর্ত্তি]

মুক্তপক্ষ শিল্পীর কাছে অবজেকটিভ সুন্দরের কোন দাবি নেই—বাইরে থেকে আনা কোন নির্দ্দেশের চোখরাঙানি নেই। শিল্পী তার অন্তরের রূপকে বাইরে মেলে ধরবে—সুন্দরকে বাইরে এনে দেখবে, আর পাঁচ জনকেও দেখাবে। নিজের অনুভূতির সৌন্দর্যকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করবে শিল্পী আর তখনই হবে সত্যিকারের সৃষ্টি। রূপ ফুটে উঠবে সহৃদয় রসিকজনের চোখে, রসের ঝরণাধারায় অভিষিক্ত হবে তার সমগ্র চেতনা। সাবজেক্টিভ সুন্দরের ধারণা শিল্পীর বন্ধনহীন আত্মার যথেচ্ছ সঞ্চরণের সম্ভাবনাকে সত্য করে—আর সেই বন্ধনমুক্তির উল্লাসে সম্ভব হয় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এই সৃষ্টি সব প্রয়োজনের আওতার বাইরে—এ হ'ল শিল্পীর লীলাসম্ভূত।

বেবীর বিয়ে হ'ল না

শ্রীহরলাল রায়

বিশ্বাস এণ্ড ব্যানার্জ্জি কোম্পানিতে মিস্ লতা রায় যখন প্রথম এসে কাজে যোগ দিলে তখন পরিচয়-পর্ব্বটা বুঝি এমনই ভাবে অগ্রসর হতে সুরু হ'ল।

সুব্রত বলল—অপরাধ যদি না নেন ত একটা কথা বলব :

—বলুন।

—আচ্ছা, দুনিয়ার এত জিনিস থাকতে চাকরি করার দিকেই বা আপনার এত ঝোঁক হ'ল কেন?

—কারণ বসে থাকার চেয়ে চাকরি করাই ভাল বলে। কিন্তু ঐ এত জিনিস বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? বিয়ে?

সুব্রত ঘাড় নাড়ল।

লতা বলল—বিয়ের দিকে অবশ্য এমন বিশেষ কোন ঝোঁক নেই আমার। তবে করব না, এমন কথাও বলি না। স্বপ্ন দেখলেই যে রূপকথার রাজপুত্র প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেবে তেমন ভরসা আমার নেই।

—রূপকথার রাজপুত্র?

—মানে রূপবান ছেলে, বাপের প্রচুর পয়সা। কিন্তু আমার কথা থাক। আপনি কেন বিয়ে করেন নি বলুন তো সুব্রতবাবু?

সুব্রত বলে—আমার মত সাধারণের দিকে কেউই দৃষ্টি দিতে চায় না বলে। মিস রায়, সব মেয়েই আজ অসাধারণের খোঁজে বেরিয়েছে।

তার মুখভঙ্গী দেখে লতা রায় হেসে ফেলল, কিন্তু বলল না কিছু।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল আবার সুব্রতই। বলল—শাস্ত্রের বিধান মানতে হলে মেয়েদের কারো-না-কারোর অধীনে থাকাই উচিত।

লতা বলল—আপনাদের হিন্দুধর্ম্মের আলোয় আমায় যাচাই করতে গেলে ভুল করা হবে না সুব্রতবাবু? আমি ক্রীশ্চিয়ান। আমি যে একটু অন্য ভাবে গড়ে উঠেছি।

—না, হবে না। কারণ বাইবেলেও ত এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আর বাইবেলকে যে আপনি সত্যিকারের স্বীকার করেন তার প্রমাণ রয়েছে আপনার মাথায় ঐ এক রাশ চুলে। আপনি অন্য ক্রীশ্চিয়ান মেয়েদের মত ঘাড় ছাঁটেন নি কেন মিস রায়?

—ছাঁটি নি যে তার কারণ আমার মা। কিন্তু ওকথা থাক। মনে হচ্ছে বাইবেলখানা আপনি ভালভাবেই পড়েছেন। আপনার সঙ্গে বাবার আলাপ হলে বাবা কিন্তু ভারি খুশি হবেন। আর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কথা বুঝি বলছিলেন, কিন্তু ভঙ্গ করলাম কোথায়। কারণ আমার বাবা রয়েছেন যে মাথার ওপর।

মিঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল মাস ছয়েক পরে, অবশ্য লতাদেরই বাড়ীতে। লতা পরিচয়টা করিয়ে দিলে—সুব্রতবাবু। আমার বাবা।

বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক চা পান করতে বসেছিলেন; এগিয়ে এসে সুব্রতর হাত ধরলেন, বললেন—আপনি বলে তোমায় সম্বোধন করতে কোথায় যেন বাধছে আমার! আর সত্যি বলছি সুব্রত, তোমার সঙ্গে এই যে আমার পরিচয় হয়ে গেল, এতে আমি ভারি খুশি হয়েছি।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—বেবী, সুব্রতকেও ত তা হলে এক পাত্র চা দিতে হয় মা।

বেবী লতা রায়ের ডাক নাম।

সে বলল— বাবা, কিছু ভেব না তুমি। সব ব্যবস্থাই আমি করছি?

তারপর সুব্রতর মুখের দিকে তার হাসি-হাসি মুখখানা তুলে বলল—এসেই পড়েছেন যখন দয়া করে, সেবা-যত্নে কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে মার্জ্জনা করে যাবেন যেন। বাইরে গিয়ে আর নিন্দা করবেন না।

তারপর সুব্রতকে কথা বলবার মোটেই আর অবসর না দিয়ে সে তাকে চায়ের টেবিলে এনে বসাল। পেয়ালায় গরম চা ঢেলে দিয়ে পাশের ঘর হতে এক থালা খাবার এনে হাজির করল। বলল—না বললে কিন্তু শুনব না সুব্রতবাবু। এ সব আমার নিজের হাতের তৈরি। কিছু ফেলে রাখলে সত্যি বলছি ভারি রাগ করব।

মিঃ রায় চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন—প্রথম দিন আপিস থেকে এসে বেবী আমায় বললে, বাবা, আজ একটি ছেলের সঙ্গে ওখানে আলাপ হ'ল, কি যে সুন্দর তার স্বাস্থ্য আর কি তার মানসিক ঐশ্বর্য্য!

বেবী লজ্জিত হয়ে আপত্তি করল—কখন আবার তোমায় এত কথা বলে বসলাম বাবা। আমি বুঝি শুধু বলেছিলাম, সুব্রতবাবু কেমন বাইবেল নিয়ে কথা বলেন। অনেক পড়েছেন বোধ করি।

মিঃ রায় বেবীর আপত্তিকে আমলই দিলেন না। শেষের কথাটিতে শুধু সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, বেবীমা আমায় বলেছিল বটে। শুধু প্রথম দিনই নয়, এর মধ্যে যতবারই তোমার সঙ্গে তার আলোচনা হয়ে গেছে, ও এসে আমায় বলেছে আর তাড়া দিয়েছে, বাবা সুব্রতবাবুর সঙ্গে আলাপ করবে না। আমি বলি, মা বুড়ো হয়েছি, বাতে ধরেছে। ছুটোছুটি করব সে সাধ এখনও আছে বটে, কিন্তু সামর্থ্য আর নেই। সুব্রতবাবুকে এইটুকু

জানিয়ে আমার হয়ে ব'লো, তিনি দয়া করে এক দিন সময় করে যদি আসেন।

সুব্রত সশঙ্কে আপত্তি জানাল—মিঃ রায়, এ আপনার অন্যায়, ভারি অন্যায়। আপনার ছেলের বয়েসী আমি। এমন ভাবে যদি আপনি কথা বলতে থাকেন তো আজ আমায় তা হলে উঠতে হ'ল।

চায়ের পাত্রটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সুব্রত বোস সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়াল। সামনের দেওয়ালে যে বড় ফটোখানা টাঙানো ছিল সেখানা এবার তার চোখে পড়ল। চেহারার মিল দেখে মনে হয় ফটোখানি লতার মায়ের।

মিঃ রায় কি যেন বলতে সুরু করেছিলেন, কিন্তু সুব্রতকে এক বার লতার মুখের দিকে আর একবার সামনের ফটোর দিকে তাকাতে দেখে তিনি থামলেন, বললেন—হ্যাঁ, বেবীর মা, মানে আমার স্ত্রীর ফটো। কিন্তু সুব্রত তুমি বসো বাবা, অকারণে অমন গরম চাটুকু ঠাণ্ডা হতে দিও না।

সুব্রত চা পান করতে বসল।

মিঃ রায় বললেন—এক বছর আগেও ত বেঁচে ছিল। বুঝেছ সুব্রত, বেবী শুধু তার মায়ের মুখের আদলটুকুই পায় নি, তার ধরণটুকুও পুরো মাত্রায় পেয়েছে। ধর্ম্মে ছিল যেমন তার অখণ্ড বিশ্বাস তেমনই গভীর ভাবেই সে ভালবাসত তার এই বেবীকে। মরবার দিন আমায় বলল, তোমার হাতে যে বেবীকে রেখে যেতে হবে একথা ভেবে আমার মরতেও যেন মন চাইছে না।

অতঃপর মিঃ রায় যে কথা তুললেন তা বেবীর আর অজানা নেই। কারণ এর পূর্ব্বে বহুবার এ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে। বেবী বলল—থাক না বাবা। সুব্রতবাবুর এসব বোধ করি ভাল লাগছে না।

মিঃ রায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন, বললেন—তাই ত মা, ঠিক কথাই ত। আমাদের পারিবারিক ব্যাপার সুব্রতবাবুর ভাল না লাগারই কথা। আমার ত এ কথাটা মনেই হয় নি আগে।

সুব্রত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—মিঃ রায় সুরু যখন একবার করেই ফেলেছেন তখন শেষও আপনাকে করতে হবে। আর তা যদি আজ না করেন ত সত্যি বলছি, আমি যারপরনাই দুঃখিত হব। মনে করব পর বলেই আপনি আজ আমায় দূরে ঠেললেন। আপনার মনে করলে তা আর পারতেন না।

মিঃ রায় উচ্চ হাস্য করলেন, বললেন—বেঁচে থাক বাবা। তুমি আমার অতি বড় দুশ্চিন্তা দূর করলে।

মেয়ের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করে বললেন—এই মেয়েটা আমায় অকারণে এমন ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল।

লতা উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মিঃ রায় বললেন—তারপর সুব্রত। মরবার কিছু আগে সে আমায় শপথ করতে বলল। বলল, 'কথা দাও আমায়, এইটুকু তুমি দেখবে যে, বেবী আমার এমন ছেলেকেই শুধু বিয়ে করবে ধর্ম্মের ওপর যার আছে অগাধ বিশ্বাস—যে ছেলে তোমার মত নাস্তিক অন্ততঃ হবে না।' আমি একটু অবাক হলাম সুব্রত। ক্রীশ্চিয়ান হলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের ওপর অত শক্ত বিশ্বাস আমার ছিল না। তবু বললাম, 'চেষ্টার ত্রুটি হবে না জেনো। কিন্তু এমনই যদি হয় যে অমন ছেলে না মেলে, কিংবা মিললেও যদি সে ছেলে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে না চায় তো কি উপায় আমি করব তা বলে যাও।' কিন্তু উত্তর দিয়ে যেতে সে আর পারে নি। তার আগেই কখন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে।

মিঃ রায়ের চোখ দিয়ে নিঃশব্দে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। হাতের চেটোর উলটো দিক দিয়ে তিনি চোখ মুছলেন। তার পর হঠাৎ কেমনতর ব্যাকুলভাবে সুব্রতর হাত দুটি নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললেন—শুনছি তুমি অনেক কিছুই পড়েছ কিন্তু সত্যি করে বল ত আমায় আমাদের শাস্ত্রে মানে এই বাইবেলের ওপর তোমার কি বিশ্বাস হয় না সুব্রত।

সুব্রত কণ্ঠস্বরে উদারতা মিশিয়ে ঘাড় নাড়ল—হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি আপনারা শাস্ত্রে যতটা বিশ্বাস করেন আমার বিশ্বাস তার চেয়ে এক তিলও অন্ততঃ কম হবে না।

মিঃ রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে আরামে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন—তুমি আমায় বাঁচালে সুব্রত। আজ আমার মনে হচ্ছে বেবীর মাকে তার মরবার সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিলাম, যাবার আগে তা বোধ হয় রক্ষা করেই যেতে পারব। কিন্তু বেবী আবার গেল কোথায়!

তিনি হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে লতার নাম ধরে ডাকাডাকি সুরু করলেন।

পাশের ঘর হতে লতা বের হয়ে এল। বলল—ডাকছ বাবা।

বাবা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় যে থাক তুমি মা। এই যে সুব্রতবাবু এসে বসে রয়েছেন, তার সঙ্গে কোথায় দু'দণ্ড গল্পগুজব করবে, তা না ঘরের মধ্যে কোন্ কোণে গিয়ে তুমি মিশে গেছ।

বেবী শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল—যাব আর কোথায় বাবা। পাশের ঘরেই ছিলাম। তোমাদের কথাবার্তাই শুনছিলাম।

মিঃ রায় খুশি হয়ে বললেন—শুনেছিস সব তা হলে।

—শুনেছি। কিন্তু আমার মনে হয় বাবা, বই পড়লে বিদ্যা হয়ত যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের ভিত্তি ততটা পাকা বোধ করি হয়ে ওঠে না।

—মানে?

লতা মুখখানা কঠিন করে বলল—মানে খুব সহজ। সত্যিকারের বিশ্বাসের মাপকাঠি হ'ল সহজ ভাবে সত্যকে বুঝতে পারা আর সরল ভাবে তাকে প্রকাশ করা। অকারণে কেনিয়ে কেনিয়ে বিজ্ঞের বোঝা নামানো নয়। বলেই সে ত্বরিতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিঃ রায় ও সুব্রত উভয়েই তার এই অকারণ উষ্মার কারণটুকু বুঝতে না পেরে তার গমন-পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু যে পথ দিয়ে সে নিক্রান্ত হয়েছিল সে পথ দিয়েই আবার কিছু পরে ফিরে এল। এসে বলল—বাবা, সুব্রতবাবুকে একটু যে থেকে দিতে হবে। আমার একটু দরকার রয়েছে।

মেয়ের আচরণে বাবা বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন, কেন? তোমার এখন আবার এমন কি দরকার পড়ল মা?

আঙুলটা আলু কুটতে গিয়ে কেটে ফেলেছি, রক্ত পড়ছে। উঁচু তাকের ওপর হাত যায় না। সুব্রতবাবু যদি দয়া করে বেঞ্জাইনের শিশিটা নামিয়ে এনে একটু লাগিয়ে দেন।

শুনে মিঃ রায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, বললেন, দেখ সুব্রত, ব্যাপারটা একবার দেখ। এই মেয়েটি আমার এক দিন একটা কাণ্ড না বাধিয়ে আর ছাড়বে না।

সুব্রত পাশের ঘরে এসে উঁচু তাকের উপর হতে বেঞ্জাইনের শিশিটা নামিয়ে এনে লতার আঙুলে অল্প একটু লাগিয়ে দিল। তার পর শিশিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে সে বলল—মিস রায়, সব শুনলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করি আপনাকে, শাস্ত্রের শব্দজাল হতে কোন দিন সত্যকে যদি আবিষ্কার করে আনতে পারি, সেদিন হাত পাততে বঞ্চনা করবেন না ত?

লতা কথা বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

সুব্রত বলল—চললাম তা হলে। কিন্তু লতা যেদিন শাস্ত্রের দুর্গম দুর্গ হতে দুর্লভকে বেঁধে আনব, সেদিন যেন এসে না দেখতে হয় পুরস্কার আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অন্যের আয়ত্তে ইতিমধ্যেই চলে গেছে।

লতা ঘাড় নাড়ল। এবারও বলল না কিছু। লজ্জায় তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে।

সুব্রত এগিয়ে এসে হঠাৎ তার একখানি হাত ধরল।

লতা বলল—কি?

—কিছু না।

—ওঃ, এমনই?

তার পর তার হাতখানি ঠেলে দিয়ে বলল—আপনাকে আমার ভয় করে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে সে হাসল আর বলল—আপনাকে আমার ভয় করে। সত্যি বলছি, আপনাকে আমার বড্ড ভয় করে।

মাসখানেক পরে। সুব্রত তার টেবিলে বসে কয়েক দিন আগে লেখা কবিতাটা বারকয়েক পড়ল। লিখেছিল অবশ্য এই ভেবে যে, সুযোগ পেলে লতাকে একবার পড়ে শোনাবে, কিন্তু হয়ে ওঠে নি আর। কত কথাই সে লিখে ফেলেছে। তার মনের সমস্ত সুর নিঙড়ে নিঙড়ে সে যেন লতা রায়কে নূতন করে সৃষ্টি করেছে। লতার দৃষ্টিপাতে সে দেখেছে এক অভিনব স্বর্গলোক! তার কালো কেশদামের মধ্যে অশান্ত আষাঢ়-রাত্রি! আর তার প্রতি মুহূর্তের পদপাতের সঙ্গে পদ্মফোটার সম্ভাবনা। সে আবিষ্কার করে বসেছে লতার মধ্যে যা সত্যিকারের নাই আবার যা সত্যি সত্যিই আছে। সব জড়িয়ে এমন একটা জটিল অনর্থের সৃষ্টি করে বসেছে সে যা পুরুষচিত্তই একমাত্র অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায়, মানে প্রেমে পড়লে, করে থাকে। লতা পড়লে হয়ত হেসে ফেলত আর নয় ত তার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহই করে বসত। আর তা ছাড়া লতা তার কাছে ত কোন স্তুতিবাদ প্রত্যাশা করে না; সে চায় সুব্রত তবে বেরিয়ে পড়ুক সত্যের সন্ধানে শাস্ত্রের পাতায় পাতায়। সে চায় সুব্রত অবজ্ঞাত সত্যিকারের সত্যকে অজানা হতে জানার সীমার মধ্যে টেনে আনুক।

সুব্রত একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার পর উঠে সামনের জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। আলোছায়ায় বিচিত্র এক ফালি আকাশ, কলকাতার আকাশ তার চোখে পড়ে, এক ঝলক বাতাস এসে ঘরে ঢোকে।

দেয়ালে টাঙানো যীশুখ্রীষ্টের ফটোটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুব্রত প্রার্থনা করে—হে মহামানব! দলবিশেষ, জাতিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের জন্যই কি তুমি করেছিলে প্রচার সেই সত্য যাকে উপলব্ধি করেছিলে তোমার সাধনার মধ্য দিয়ে? সত্য বিশ্বের সকল মানবের সর্বসাধারণের সম্পত্তি হোক এই কি তুমি চাও নি। আর যদি চেয়েই ছিলে ত হে মানবপ্রেমিক আজকের বিচিত্র ব্যাখ্যায় বিব্রত সত্যকে সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে আমায় জানতে দাও।

দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে সুব্রত প্রণাম করল।...

সে রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল একজনকে। সুন্দর একহারা তাঁর চেহারা। চোখ দিয়ে তাঁর জ্যোতিঃ ফুটছে। হেঁটে যেতে তাঁর পা টলছে। কে যেন তাকে বলে দিলে—ঐ আসছেন মহামানব ন্যাযারেথের যিশস ক্রায়েষ্ট।...

সুব্রত এক মাসের ছুটি নিলে, সুরু করল খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র পাঠ। সে যেন তপস্যায় বসেছে। তার দুটি চোখের আলোয় যেন বাইবেলের শব্দস্রোতের ওপর সত্য এবার পদ্ম হয়ে ফুটে উঠবে। সে হাত বাড়িয়ে শুধু চয়ন করবে, সে চিৎকার করে শুধু বলবে—পেয়েছি। সমগ্র ক্রিশ্চেনডম তার প্রশংসায় অমনি মুহুর্মুহু মর্মরিত হয়ে উঠবে—জয়তু সুব্রত! সুব্রত চোখ বুজে যেন দেখতে পেল, মিঃ রায় এগিয়ে এসে তার মেয়ের হাতখানি ধীরে ধীরে তার হাতের উপর তুলে দিচ্ছেন।

কাজে যোগ দেওয়ার দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আর মাত্র দুটি দিন আছে এমন সময় অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটল। হাজরা রোডের মোড়ে একখানি বাস একখানি চলন্ত ট্রামের উপর এসে পড়ল। সুব্রত ছিল ট্রামের ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে। দারুণ ভাবে আহত হওয়ায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হ'ল।

খবর পেয়ে পরদিন লতা এল তার বাবার সঙ্গে হাসপাতালে। সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সুব্রত তখন অচৈতন্য। দারুণ জ্বরের ঘোরে সে প্রলাপ বকছে—

টু ফেজেস অব দি কিংডম, দি কিংডম অব হেভেন এণ্ড দি কিংডম অব গ্লোরি।

বুঝেছ লতা, বাইবেল বলছে—টু ফেজেস—নিত্য আর লীলা।

বাইবেল বলছে—Two phases—the Absotute and the Relative.

বাইবেল বলছে—

লতা বিছানার উপর মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললো।

মিঃ রায় তার ডান হাতটা মেয়ের মাথার উপর রেখে পাথরের মত বসে রইলেন।

সেই রাত্রেই সুব্রত বোস মারা গেল।

জার্মেনিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সমাদর

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

১

গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ-লিখিত মহাবীর আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বিবরণ এবং খ্রীষ্টীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত বুদ্ধের জীবনী 'বারলাম্ ও জোসাফট্' প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি হইতে জার্মেনি মধ্যযুগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মান ভাষায় অনূদিত প্রথম ভারতীয় গ্রন্থ—'পঞ্চতন্ত্র' নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান-পুস্তক। ওয়ারটেম্বার্গের কাউণ্ট এবারহার্ডের প্রোৎসাহে য়্যাণ্টন ফন্ পফর্ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'পঞ্চতন্ত্রে'র লাটিন-সংস্করণ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। পঞ্চতন্ত্রের এই লাটিন সংস্করণখানির ভিত্তি আবার কতকগুলি হিব্রু, আরবী ও পহ্লবী অনুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের হিতোপদেশ-সম্বলিত এই পুস্তকখানি অত্যাশ্চর্যরূপে ও প্রভূত পরিমাণে জার্মান উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, কারণ অনেক জার্মান কাহিনী এই পুস্তক হইতে উদ্ভূত। অবশ্য সেই সুদূর প্রাচীনকালে ভারত সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময় অদ্ভুত গজ, একশৃঙ্গবিশিষ্ট কল্পিত জন্তুবিশেষ (unicorn) পুরোহিত—রাজা জনের উপকথা প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোনও কাহিনী ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে পৌঁছে নাই। ইটালীদেশীয় মার্কো পোলো প্রমুখ কেবল কয়েকজন পাশ্চাত্ত্যবাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইবার পর ভারত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ উত্তরোত্তর প্রচারলাভ হইতে থাকে। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৬৬৩ খ্রীঃ জার্মান ভাষায় অনূদিত এব্রাহাম রোজারের 'ওপেন ডোর টু হিডেন্ হিদেনডম্' নামক পুস্তক হইতে ক্যাথলিক মিশনরীর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের বিবরণ সর্বপ্রথম জানা যায়। ফাদ'র হেনরি রথ্ ও হানক্সলেডেন প্রমুখ কয়েকজন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সংস্কৃত সাহিত্য অনুসন্ধানের কার্য্যে অগ্রগামী হন। প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনরী বারথলোমিউস্ জিগেনবাল্গ তামিল ব্যাকরণ ও মালাবারের ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা জীবিত ছিলেন সার চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স কৃত 'ভগবদ্গীতা'র অনুবাদ (১৭৮৫), সার উইলিয়ম জোন্সের মহাকবি কালিদাসকৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক ও 'মনুসংহিতা'র ইংরেজী অনুবাদ (১৭৮৯) এবং সার কোলব্রুকের বিখ্যাত 'নিবন্ধাবলী'-প্রকাশের দ্বারা ভারতীয় বিদ্যার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন আরম্ভ হইবার পূর্বে।

সংস্কৃতজ্ঞ এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা প্রথম জার্মান পণ্ডিত ফ্রিড্রিক্ শ্লিগেল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি আলেকজাণ্ডার হামিল্টন নামে জনৈক ইংরেজের সহিত পরিচিত হন। হামিল্টন ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াছিলেন। ভারত হইতে ফিরিয়া হামিল্টন ফ্রান্সে অবস্থান করিতে বাধ্য হন, কেননা তখন নেপোলিয়ন রাজনৈতিক কারণবশতঃ ইংলণ্ডকে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ শূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। হামিল্টনের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও জার্মান পণ্ডিত শ্লিগেলের নিকট ইহা প্রকৃতই আশীর্বাদস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, কারণ সেই সময়ে সংস্কৃত-শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষকলাভ অথবা ব্যাকরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হওয়ায় প্রতিভাশালী তরুণ জার্মান কবি ইংরেজ হামিল্টনের নিকট হইতে সংস্কৃত শিখিবার অপূর্ব সুযোগ পাইলেন। জার্মেনীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্লিগেল ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় ভারতীয়দের ভাষা ও জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশ-

দ্বারা এযাবৎ প্রায় অজ্ঞাত ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি জার্মান মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পরবর্তীকালে শ্লিগেল সংস্কৃত অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর প্রসিদ্ধ অনুবাদক অগাষ্ট উইল্‌হেলম্‌ শ্লিগেল সংস্কৃত অধ্যয়নকে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি 'ভগবদ্গীতা' ও 'রামায়ণে'র এক সংস্করণ বাহির করিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ হইতে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মানীতে প্রথম ভারতীয় বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

শ্লিগেল-ভ্রাতৃদ্বয়ের সমসাময়িক ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সুবিখ্যাত গবেষক ফ্রান্‌জ বপ। ১৮১৮ খ্রীঃ তিনি 'সংস্কৃত ভাষায় ধাতুরূপ রীতি' সম্বন্ধে একখানা পুস্তক এবং 'নলদময়ন্তীর উপাখ্যান' ও মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে জার্মান কবি ও দার্শনিকগণ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান কবি গ্যেটে 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', ও 'গীতগোবিন্দে'র ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অভিনয়ের প্রারম্ভে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে সূত্রধারের মুখে প্রস্তাবনার রীতি দেখিয়া কবি গ্যেটে তাঁহার 'ফাউষ্ট' নামক বিখ্যাত নাটকে উহার অনুকরণ করিতে প্রবোচিত হইয়াছিলেন। গ্যেটে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটকের সুখ্যাতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "তুমি যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের একত্র সম্মিলন দেখিতে চাও তবে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে তাহা পাইবে।" 'মেঘদূতের' প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ হইয়া গ্যেটে বলিয়াছেন, "ভারতের ভৌগোলিক চিত্রের বর্ণনায় এমন অসামান্য কবিত্বশক্তি ও অনন্যসাধারণ সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি কালিদাস 'মেঘদূত' ব্যতীত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।"

কবি ফ্রিড্‌রিক্‌ রুকর্ট বহু প্রাচ্যভাষায় পারদর্শী ছিলেন; তিনি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্‌' ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অতি দুরূহ শ্লোকগুলিরও জার্মান-কাব্যচ্ছন্দে অনুবাদ করিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। উইলহেল্‌ম্‌ ফন্‌ হাম্‌বল্ড বহু বৎসর বার্লিনে শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি সংস্কৃত জানিতেন এবং ১৮১৫ খ্রীঃ রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদে 'ভগবদ্গীতা' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা অনুধাবনযোগ্য যে, তৎকালীন জার্মান দার্শনিকগণ ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। ইতঃপূর্বে ইমান্যুয়েল কাণ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। মূল সংস্কৃতের সুন্দর অনুবাদ সহজলভ্য হওয়ায় শেলিং, হেগেল ও শোপেনহাওয়ার ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বগুলি বিশদরূপে আলোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা সুবিদিত যে, শোপেনহাওয়ার উপনিষৎসমূহকে 'তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালে সান্ত্বনাস্বরূপ' মনে করিতেন এবং বুদ্ধকে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইতেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাচীন ভারতের যে জ্ঞানভাণ্ডার জার্মান মনীষিগণ অধিগত করিয়াছিলেন তাহা খুব নৈপুণ্যের সহিত খ্রীষ্টান পণ্ডিত লাসেন্‌ তাঁহার চারি খণ্ডে বিভক্ত 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব' (১৮৪৩ ৬২) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংক্ষেপতঃ সংকলন করিয়াছেন। নরওয়েদেশীয় লাসেন জার্মান শ্লিগেলের ছাত্র ছিলেন এবং পরে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে জার্মেনির বন্‌ সংস্কৃতশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় উহাকে 'রাইন নদীর তীরস্থ বারাণসী' বলা হইত।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হওয়া অবধি তদানীন্তন জার্মেনির সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠনপাঠন হইতে থাকে। এত অধিকসংখ্যক পণ্ডিত সংস্কৃত অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের কয়েকজন বিদেশে অধ্যাপনাকার্যের জন্য আহূত হইলেন। তন্মধ্যে ম্যাক্সমূলারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ডেসৌতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ছিল উইলহেল্‌ম্‌ মূলার। ম্যাক্সমূলার বিখ্যাত ফরাসী মনীষী বারনোফের ছাত্র ছিলেন। যৌবনকালেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'র একটি সংস্করণ বাহির করেন (১৮৪৯-৭৫)। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'ভাববার কথা' নামক পুস্তকে ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "অধ্যাপক মোক্ষমূলার পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক, পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী। মোক্ষমূলার অপেক্ষা ভারতহিতৈষী ইউরোপ-খণ্ডে অপর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। তিনি যে শুধু ভারতহিতৈষী তাহা নহে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে, ভারতের ধর্মে তাঁহার আস্থা ছিল, অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া তাহা অধ্যাপক সর্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। চল্লিশ বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিরাম অধ্যবসায় ও গভীর সংস্কৃত-নিষ্ঠার অত্যাশ্চর্য ফলস্বরূপ সটীক ঋগ্বেদ-সংহিতার একটি সুন্দর সংস্করণ-মুদ্রণ মোক্ষমূলারের জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ডুবিয়া ছিলেন। অধ্যাপকের অন্যতম কীর্ত্তি ইউরোপীয় মনীষিগণের অবগতির জন্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট-সংখ্যা 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি' নামক

ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ। 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশ', ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত', ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারিক টনি সাহেবের লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত' এবং মাদ্রাজ ও কলিকাতা হইতে সংগৃহীত বিবরণাদি হইতে উপকরণ লইয়া ম্যাক্সমুলার 'রামকৃষ্ণের জীবনী ও উক্তি' সম্বন্ধে 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন।" ম্যাক্সমুলার 'ভারতীয় ষড়দর্শন' এবং পনর খণ্ডে 'প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থরাজি' নামক পুস্তক রচনা করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে, ম্যাক্সমুলার অক্সফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমৃত্যু (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জার্মান পণ্ডিত থিওডোর গোলষ্টুকার, থিওডোর ওফ্রেক্ট ও এগেলিন ইংলণ্ডে এবং কিলহর্ণ, বুলার, হোয়ারনলি ও থিবো ভারতবর্ষে পর পর সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ম্যাক্সমুলারের সময় হইতে বেদাধ্যয়ন বরাবরই ভারতীয়-বিদ্যানুরাগী জার্মান পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই যে, জার্মান পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথম চতুর্বেদসংহিতার সমালোচনামূলক সংস্করণ বাহির করেন। ম্যাক্সমুলার ও থিওডোর ওফ্রেক্ট ঋগ্বেদের, থিওডোর বেনফে সামবেদের (১৮৪৮), এলব্রেষ্ট ওয়েবার (১৮৫২-১৮৭১) ও লিওপল্ড ফন্ শ্রোয়েডার (১৮৮১-১৯০০) যজুর্বেদের এবং রুডলফ রথ অথর্ববেদের (১৮৫৬) সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে যে সকল জার্মান পণ্ডিত বৈদিক সূক্তের অনুবাদ এবং প্রাচীন বৈদিক কাহিনীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গ্রাসম্যান, লুড্‌উইগ, গেল্ডনার, ওল্ডেনবার্গ, হিলেনব্রাণ্ড এবং লুডার্স-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতচর্চার প্রথম শতকে জার্মান পণ্ডিতগণ ইংরেজী অভিধান ব্যবহার করেন। ইংরেজী অভিধান ব্যয়বহুল ও দুর্লভ হওয়ায় কবি রুকার্ট নিজের ব্যবহারের জন্য উইলসনের সমগ্র অভিধানখানি নকল করিয়াছিলেন। বপ (১৮৫০) ও বেন্‌ফে (১৮৬৫) ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য জার্মান পরিভাষা এবং থিওডোর গোল্ডষ্টুকার (১৮৫৫) ইংরেজীতে একখানি অসম্পূর্ণ সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। সাত খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জার্মান অভিধান অটো বোটলিঙ্ক কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ১৮৫২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গস্থিত ইম্পিরিয়াল একাডেমি অব সায়ান্সেস্ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সঙ্কলনের পর বোট্‌লিঙ্ক আর একখানা ক্ষুদ্র অথচ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়ন করেন; ইহাও রুশদেশীয় একাডেমির আনুকূল্যে মুদ্রিত হয় (১৮৭৯-৮৯)। এই দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ হইতে জার্মানগণ পরম্পরাক্রমে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন। ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ 'পিটার্সবার্গার ওরটারবাক্' প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইবার ষাট বৎসর পর এমন অনেক শব্দ জানা গিয়াছিল যেগুলি এই দুইটি অভিধানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এইজন্য ১৯২৪-২৮ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড স্মিড্‌ট্ উহাদের অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই অতিরিক্ত সংস্করণগুলিও যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, সম্প্রতি পুণাতে যে নূতন পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান-সঙ্কলনের আয়োজন চলিতেছে তাহা এই অভাব দূর করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ক্যাপেলার প্রথম শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য পিটার্সবার্গ অভিধানগুলির ভিত্তিতে ৫৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি অত্যন্ত উপযোগী ক্ষুদ্র সংস্কৃত ওরটারবার্গের সংস্করণ বাহির করেন। কয়েক বৎসর পর ইহার একখানি পরিবর্ধিত ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সার মনিয়ার উইলিয়ামস্-কৃত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ভারতীয় বিদ্যা-পারদর্শী জার্মান মনীষিগণের প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের উপর প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল, কারণ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নূতন সংস্করণ লিউম্যান ও ক্যাপেলারের সহযোগিতায় লিখিত হইয়াছিল।

২

যে সকল জার্মান পণ্ডিত সংস্কৃত কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্য ও নাটকসমূহের জার্মান ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থ বহু বার অনূদিত হইয়াছে—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' দশাধিকবার, 'বিক্রমোর্বশী' পাঁচ বার, 'মৃচ্ছকটিক' চার বার, 'দশকুমারচরিত' তিন বার। অমরু এবং ভর্তৃহরির কবিতাগুলিরও অনেক জার্মান অনুবাদ আছে। ভারতীয় গল্প এবং কাহিনীগুলিও জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অটো-বোট্‌লিঙ্ক পাণিনি ব্যাকরণের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন (প্রথম সংস্করণ—১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮৮৭)। পরলোকগত অধ্যাপক লিবিক্ প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণদের সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা করেন। বুলার ও জলি কর্তৃক 'প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থমালা' পর্যায়ে কতকগুলি ভারতীয় আইন পুস্তক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে, অন্যান্য কতকগুলিরও জার্মান অনুবাদ আছে। আমেরিকান-সুইস্ পণ্ডিত জোহান জ্যাকব মেয়ার-কৃত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র একখানি অত্যুৎকৃষ্ট জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাগুক্ত অধ্যাপক জলি একাধারে ভারতীয় আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই উভয় বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করায় জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাঁহাকে সম্মানজনক 'ডক্টর অব্ ল এণ্ড মেডিসিন্' উপাধিতে ভূষিত করেন।

জার্মেনীতে সকল সময়েই দর্শনচর্চায় সমধিক অনুরাগ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়; বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উপনিষৎসমূহ ও ভগবদগীতার বহু অনুবাদ হইয়াছে। রিচার্ড গার্বে সাংখ্যদর্শন এবং হাল্‌ৎস্, ম্যাক্স-মুলার, রোয়ার ও উইণ্টার ন্যায়বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল দার্শনিক পল ডয়সনের। ডয়সন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাচার্যের পুত্র ডয়সন জীবনের প্রথমেই ধর্মতত্ত্ব চর্চা করিতে আরম্ভ করেন, শোপেনহাওয়ারের শিক্ষা দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং আচার্য শঙ্করের উৎসাহী অনুগামী হন। কোন রুশ-পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য করিবার সময় তিনি অদ্বৈতদর্শন অধ্যয়ন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শাঙ্কর-বেদান্ত প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার শাঙ্করভাষ্য-সমেত 'বেদান্ত সূত্রে'র জার্মান অনুবাদের (১৮৮৭) সহিত 'ষাটখানা উপনিষদে'র (১৮৯৭) এবং তাঁহার ছাত্র অটো ষ্ট্রৌজের সহযোগিতায় 'মহাভারতে'র (১৯০৬) অনুবাদ সংযোজিত হইল। ছয় খণ্ড দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম তিন খণ্ডে ভারতীয় দর্শন, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিতে ডেকার্ট হইতে শোপেন-হাওয়ার পর্যন্ত গ্রীস, মধ্যযুগ ও বর্তমান কালের দর্শন আলোচিত হইয়াছে। সমসাময়িক জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় আর কেহই পাশ্চাত্ত্যের জন্য বেদান্তের উপযোগিতা এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ-ভ্রমণ কালে জার্মেনীর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত পল ডয়সনের সহিত সাক্ষাৎকার এবং বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অধ্যাপক ডয়সন একখানি বিশেষ অনুরোধ-লিপি দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ কিয়েলস্থিত বাসভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডয়সন স্বামিজীর বক্তৃতাদি পাঠ এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একজন মৌলিক চিন্তাশীল ও প্রথম শ্রেণীর আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন মনীষী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ডয়সন নিজে বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন এবং স্বামিজীর ন্যায় একজন উপযুক্ত উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনার জন্য বড়ই অভিলাষী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী মহাসমাদরে স্বামিজীকে তাঁহাদের বাসভবনে অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকাগারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে পুস্তকের কথা উঠিলে অমনি বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক ডয়সন উপনিষদ্ হইতে ২।৩টি শ্লোক সুমধুর স্বরে পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, 'বেদচর্চাজনিত আনন্দ একটি পরম লোভনীয় বস্তু এবং সেই উচ্চ আনন্দ-ভূমিতে আরোহণ করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অত্যাশ্চর্যরূপে প্রশস্ত হয় ও প্রাণে অপরিমেয় আনন্দরসের সঞ্চার হয়। উপনিষদ্ ও শঙ্করের ভাষ্যসমেত 'বেদান্তসূত্র' সত্যান্বেষী মানব-প্রতিভার বিরাট ও বহু মূল্যবান্ ফল। বর্তমানে জড়বাদের দিক হইতে আধ্যাত্মিকতার মূল প্রস্রবণের অভিমুখে একটা ঝোঁক আরম্ভ হইয়াছে, ইহার ফলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই সমস্ত জগতের ধর্ম-গুরু হইয়া দাঁড়াইবে।" স্বামিজী অধ্যাপকের কতকগুলি অনুবাদও দেখিলেন। ডয়সন ও তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। স্বামিজীও তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নে বিশেষরূপে প্রীত হইয়াছিলেন।

লণ্ডনেও পল ডয়সন দুই সপ্তাহ দিবারাত্র বিবেকানন্দের সন্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া বেদান্তের গূঢ়ার্থ আরও বিশদরূপে অধিগত করিতে সমর্থ হইলেন। ডয়সনের কিয়েলস্থিত বাসভবনে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্বে স্বামিজী চারি শত পৃষ্ঠার একখানি কবিতা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে উহা অর্ধঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বামিজী অধ্যাপকের সহিত কথোপকথন-কালে উক্ত পুস্তক হইতে পঠিত কথাগুলি অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দের এই অদ্ভুত মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অধ্যাপক বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "এ পুস্তকখানি নিশ্চয়ই আপনি ইতঃপূর্বে পাঠ করিয়াছেন, নতুবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া চারি শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা কেবল দুঃসাধ্য নহে—অসাধ্য।" তদুত্তরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "সংযতমনা যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের ফলস্বরূপ এই ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে ব্রহ্মচর্যের বলে এইরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বিরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই। এই ক্ষমতা সকলেই লাভ করিতে পারে।" অধ্যাপক বিবেকানন্দ-প্রদত্ত যুক্তি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মশাস্ত্রবিদ্ রুডল্‌ফ অটোকে পল ডয়সনের অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতে তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল এবং তিনি আচার্য রামানুজের একজন বিশেষ

অনুরাগী ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক ব্যতীত তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তুলনামূলক ধর্মে হিন্দুধর্মের যথোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিতে প্রভূত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত ও হিন্দু সাহিত্যে সবিশেষ অনুরাগী এই সকল পণ্ডিত ব্যতীত আরও অনেকে আছেন যাঁহারা প্রাকৃত ও পালি এবং এই দুই ভাষায় লিখিত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। হালের কবিতাবলীর প্রথম সম্পাদক এলব্রেক্ট ওয়েবার এবং পালি ব্যাকরণ-প্রণেতা রিচার্ড পিসেল ব্যতীত হারম্যান জেকবি ও আর্নষ্ট লোম্যানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইঁহারা জৈনদের ইতিহাস ও তাহাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সকল পালিগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে 'বিনয়' ধর্মগ্রন্থের বিখ্যাত সম্পাদক ও অনুবাদক এবং 'বুদ্ধের জীবনী'-প্রণেতা হারম্যান ওল্ডেনবার্গের স্থান সর্বপ্রথম। বুদ্ধের জীবনীর বারটি জার্মান এবং তিনটি ফরাসী সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং ইহা গৌতমের জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়া আছে। উইল্‌হেল্‌ম গিগার সিংহলী ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে 'সমযুক্ত-নিকায়' গ্রন্থের একাংশ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। নব সিংহলী অভিধানের গবেষণাকার্য্যের তত্ত্বাবধানও তিনি করিয়াছিলেন।

এলবার্ট গ্রনওয়েডেল ও এলবার্ট ফন্ লেকখ্-এর নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্বতুর্কীস্থানে প্রুশিয়ান অনুসন্ধানের ফলে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কারক দুই জনই ভারতীয় কলাবিদ্যা ও পাশ্চাত্যের সহিত ইহার সম্পর্ক সম্বন্ধে পুস্তকাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল জার্মান পণ্ডিত টারফানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে হিন্‌রিক্ লুডার্স এবং তাঁহার পত্নীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রনষ্ট বৌদ্ধ পুস্তকসমূহের পাণ্ডুলিপির অংশগুলি সম্পাদনা করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয় যে, অধ্যাপক ওয়ালেসারের ন্যায় মাত্র অল্প কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধানতঃ ফরাসী ও বেলজিয়ান পণ্ডিতগণই বরাবর মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মরিস উইণ্টারনিজ-লিখিত তিনখানি পুস্তক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রথম দুই খণ্ড ইংরেজিতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কে জার্মেনীতে ভারতীয় বিদ্যার স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যেই প্রাগুক্ত পণ্ডিতবর্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন প্রায় সকল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের চর্চা হইত এবং তাহাতে ভারতীয় সাহিত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিগত দুইটি মহাসমরের বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অশান্তি জার্মেনীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না; এইজন্যই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কতিপয় সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও সংস্কৃতের পঠন-পাঠন সেখানে এখনও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি এবং আমেরিকা অপেক্ষা জার্মেনীতে এখনও সংস্কৃতাধ্যাপকের সংখ্যা অনেক বেশী। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় যে সকল পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেছেন তাঁহাদের নাম সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল: বন বিশ্ববিদ্যালয়ে—পুরাণ, জৈনধর্ম ও চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক কিরফেল্, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর লস্, বেদান্তের অধ্যাপক ডক্টর হ্যাকার; ফ্রাঙ্কফর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে—বেদের অধ্যাপক লোমেল; গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে—বৌদ্ধধর্ম ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ওয়াল্ডস্মিড, হিন্দীর অধ্যাপক ডক্টর ষ্টেচি; হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে—বেদের অধ্যাপক থিম্; হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে—জৈনধর্মের অধ্যাপক সুব্রিং; জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে—বেদ ও হিন্দীর অধ্যাপক ডক্টর হাউসচাইল্ড; কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে—হিন্দুধর্মের অধ্যাপক স্রাডার; লিপ্‌জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে—ভারতীয়, চীনা ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ফ্রিডরিক্ ওয়েলার; মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে—ভারতীয়, চীনা ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক নোবেল; ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে—বেদের অধ্যাপক ওরটেল, ভারতীয় ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক হেলমুথ হফম্যান; মান্‌ষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে—প্রাকৃত ও জৈনধর্মের অধ্যাপক য়্যালস্‌ডরফ; টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে—হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ফন্ গ্লাসেনাপ এবং নাট্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হারম্যান ওয়েলার।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, অতীতে ইউরোপের অন্যান্য জাতি যেরূপ ভারতের কোন-না-কোন অংশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেরূপ জার্মেনী ভারতের কোনও অংশে কখনও আধিপত্য করে নাই বলিয়াই আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি অপেক্ষা জার্মেনীতে এখনও সংস্কৃতাধ্যাপনার আয়োজন ও আগ্রহ অনেক বেশী। জার্মেনীর উদ্দেশ্য বরাবরই নিছক বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক; এই দেশবিখ্যাত কবি হিনরিক হায়েন্-এর সুবিদিত উক্তির মর্ম অনুসরণ করিতেছে—'পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাতি বড় বড় জাহাজ বোঝাই করিয়া ভারতের সম্পদরাজি নিজেদের দেশে আনয়ন

করিয়াছে, আর আমরা জার্মানরা এ বিষয়ে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ ব্যতীত আমাদের চলিবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কারখানা হইবে।' ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল জার্মানজাতি ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত স্বাধীনতা-আন্দোলনকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের অনেক প্রখ্যাত বিপ্লববাদী নেতা জার্মেনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার জন্য জার্মানজাতির সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য জার্মানরাষ্ট্রের অধিনায়ক হিটলারের কিরূপ সহযোগিতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী যতীশ্বরানন্দ জার্মেনীর ওয়েজবেডেন্ শহরে বেদান্ত প্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ওয়েজবেডেন্‌কে কেন্দ্র করিয়া যতীশ্বরানন্দ সমগ্র জার্মেনিতে এবং মধ্য-ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরে ভারতের বেদান্ত, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণী প্রচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁহার প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া আমেরিকা চলিয়া যান। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি জার্মান জাতির আন্তরিক অনুরাগের তাগিদেই এই বেদান্ত-প্রচারকার্য সম্ভবপর হইয়াছিল।

বহুসংখ্যক জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ থাকায় ভারতের গৌরবময় অতীত ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির অধ্যয়নই বরাবর তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্যই তাঁহারা আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের যথোপযুক্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। মিশনরীগণ প্রাদেশিক ভাষাসমূহ হইতে কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে বাদ দিলে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তিই আধুনিক ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড়দের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গভীরভাবে চর্চা করিয়াছেন। অধ্যাপক ফোমেরাস একখানা তামিল ব্যাকরণ এবং ডক্টর বেথান শৈবসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডক্টর রেইমহার্ড ওয়াগ্‌নার এক জন প্রতিভাশালী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পারস্যভাষায় বিশেষজ্ঞ ভূতপূর্ব বৈদেশিক মন্ত্রী ডক্টর রোসেন উর্দু সাহিত্যের বিবরণ এবং আমানতের 'ইন্দরসভা' অনুবাদ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় জার্মেনিতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহেরও বিশেষ চর্চা হইবে। জার্মান ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক এবং ছাত্র-বিনিময়ের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সকল জার্মান ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি সাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের তুলনায় যাঁহারা ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা করেন, অনুবাদের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেন, অথবা ভারতীয় বিদ্যাবিশারদগণের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত পুস্তকাবলী পাঠ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্যই সামান্য। জার্মেনিতে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী সর্বাধিক পঠিত হয়; রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থও জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'ডাকঘর' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক জার্মেনিতে অভিনীত হইয়াছে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থকারদের পুস্তকাবলীও খুব পঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশরাজি এবং বিবেকানন্দের বক্তৃতার প্রতি জার্মানজাতির ক্রমবর্ধমান অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে।

যদিও জার্মেনী বিশাল স্থল ও জলভাগ দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি গত শতাব্দীর প্রথম পাদে যে সহানুভূতির বন্ধনে উভয় দেশ সম্বদ্ধ হইয়াছিল তাহাই গুণগ্রাহিতা ও সখ্যসূত্রে পরস্পরকে সম্মিলিত রাখিবে।

ইংরেজী বর্জ্জন ?

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ, এম-এ

আজ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ একটি নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে—এ সমস্যা ভাষাগত, আর এ সমস্যা বহুমুখী। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান কোথায়—এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

আমাদের প্রাক্তন শাসকদের ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা যে আজ অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি ইহার চির-নির্ব্বাসনেরও হুমকি দেওয়া হইতেছে। উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে আজ দাবি জানান যাইতেছে যে, বিদেশী শাসনের এই প্রতীকের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে, যদিও সকলেই জানেন এই প্রতীক সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছু নহে। আমাদের মন্ত্র হইতেছে "ইংরেজী ছাড়"। অতএব অতি ধীর চিত্তে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। অতি সূক্ষ্ম ভাবে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী প্রকট হয়:

১। পূর্ব্বের মত এখনও কি "ইংরেজী" উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে?—অর্থাৎ পূর্ব্বের মত এখনও কি ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা (রাষ্ট্রভাষা বলিতে আইন-আদালতেরও ভাষা বুঝিতে হইবে) আর শিক্ষার (বিশেষতঃ উচ্চতর ও উচ্চতম বিভাগে) প্রধান বাহন থাকিবে?

২। স্বাধীন ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী কি এখনকার মত যোগসূত্র স্বরূপ থাকিয়া যাইবে?

৩। স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের শিক্ষার বাহন কি ইংরেজী হইতে পারিবে?

৪। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজী কি বৈকল্পিক (optional) দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে থাকিতে পারিবে?

৫। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নিম্নতম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজী কি এখনকার মত বাধ্যতামূলক থাকিবে? এবং সর্ব্বশেষে—

৬। ইংরেজী যে সকল সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা, তাহাদের মধ্যে ইংরেজীর স্থান কোথায় থাকিবে?

এখানে বলা আবশ্যক যে, ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা নহে তাহাদের মধ্যে ইংরেজীর স্থান কোথায় হইবে, ইহাই বর্ত্তমান নিবন্ধে আলোচ্য। সুতরাং ৬নং প্রশ্নটি বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে। শুধু এইটুকু এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে ইংরেজী মাতৃভাষা, সেখানে মাতৃভাষার যতটুকু ন্যায্য দাবি সে সমস্তই ইংরেজী ভাষা সেখানে পাইবে।

প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদের রায় ইতি-মধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে যে, স্বাধীন ভারতে বিদেশী ভাষা ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে থাকিতে পারে না। কোন স্বাধীন দেশে রাষ্ট্র-ভাষা (কিংবা স্থানীয় ভাষা) ভিন্ন অন্য ভাষা যখন আইন-আদালতের ভাষা হইতে পারে না, তখন স্বাধীন ভারতে আইন-আদালতেও ইংরেজীর স্থান কোথায়? সুতরাং রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার যখন একটি 'বিহিত' হইয়া গিয়াছে, তখন এখানে ইহার পুনরুত্থাপনের আর প্রয়োজন নাই। শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মাতৃভাষার যখন শিক্ষা সুষ্ঠু ভাবেই দেওয়া যায়, তখন ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা অন্ততঃ নিম্নস্তরে একেবারেই অচল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরগুলিতে শিক্ষার বাহন কি হইবে?—মাতৃভাষা না স্থানীয় ভাষা না রাষ্ট্রভাষা?—এই প্রশ্নটি আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার ঠিক অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং আমরা আপাততঃ এ প্রশ্নের উত্থাপন করিব না।

সুতরাং ইংরেজী যদি রাষ্ট্রভাষা ও আইন-আদালতের ভাষা না হয় এবং ইংরেজী যদি শিক্ষার বাহনরূপে পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে ইংরেজী কেমন করিয়া শিক্ষিত সাধারণের প্রচলিত ভাষায় পরিণত হইতে পারিবে?—যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার আর তত "চল" থাকিবে না, তখন জনসাধারণের মধ্যে ইহার সাধারণ ভাষারূপে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, ভবিষ্যতের পানে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব এমন একটি সময় আসিবে যখন ইংরেজী ভাষা স্বাধীন ভারতে ক্রমে ক্রমে ভাববিনিময়ের মাধ্যম আর থাকিবে না, তখন উহাকে শিক্ষার্থীর পাঠাগারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

এবার আরও কতকগুলি প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতেছে: স্বাধীন ভারতে শিক্ষার্থীর পাঠাগারেও ইংরেজী ভাষার স্থান থাকা কি উচিত? প্রাক্তন শাসকদের ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য এত শ্রম করায় আমাদের কি লাভ? যে ভাষা আমাদের রাষ্ট্রপরিষদে, আদালতে, কর্ম্মকেন্দ্রে, হাটবাজারে আদৌ প্রয়োজন হইবে না, সে ভাষা আয়ত্ত করার শ্রম কি পণ্ডশ্রম নয়? অর্থাৎ শুধু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখায় কি সার্থকতা?

বর্ত্তমান ভারতের যেরূপ মানসিক অবস্থা, সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলি স্বভাবতঃই প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আমরা যেন ধীর চিত্তে এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করি। তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদের রাষ্ট্রপরিষদ হইতে, আমাদের আইন-আদালত হইতে, আমাদের হাটবাজার হইতে ইংরেজী ভাষা বিতাড়িত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজী ভাষা যেন

অপাংক্তেয় না হয়। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, প্রাক্তন শাসকদের ভাষা সেক্সপীয়র ও বার্ণাড শ'রেরই ভাষা, সুতরাং এই ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টাকে আদৌ সময় ও পরিশ্রমের অপব্যবহার বলা যায় না। সুতরাং আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজীর স্থান রাখিতে হইবে। শুধু এইটুকু পার্থক্য থাকিবে যে, কোন স্তরেই (নিম্নতম বা উচ্চতম হউক) ইহা শিক্ষার মাধ্যম অথবা বাহনরূপে ব্যবহৃত হইবে না। অর্থাৎ ইংরেজী ভাষাকে শুধু ভাষা হিসাবেই অধ্যয়ন করিতে হইবে, রাজভাষারূপে পূর্ব্বে ইহা যে সকল অধিকার ভোগ করিত সেগুলি আর পারিবে না। পূর্ব্বে "রাজভাষা" ছিল বলিয়াই আজ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পথে যত অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—পূর্ব্বে যেগুলি সুবিধা ছিল আজ সেগুলিই বাধাবিঘ্ন রূপে দেখা দিতেছে।

সুতরাং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি আমাদিগকে সুষ্ঠু ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ইংরেজী ভাষা আর শুধু অতলান্তিকস্থ দ্বীপপুঞ্জের ভাষা নহে, ইহা নব্য আমেরিকারও ভাষা, এই ভাষার মাধ্যমেই আব্রাহাম লিঙ্কন বক্তৃতা দিয়াছিলেন আর হুইটম্যান উদাত্ত কণ্ঠে নব্য সভ্যতার গান গাহিয়াছিলেন। এই ভাষা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণের গবেষণা ও চিন্তার বাহন হইয়া উঠিয়াছে, আর এই ভাষাই আজ ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। আজ পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষাভাষীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আজ ইহা বেসরকারী ভাবে "বিশ্বভাষা"র পরিণত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই : আমরা কি এই ভাষাটির সহিত সকল সংস্রব বর্জ্জন করিব? আমরা কি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই ভাষায় যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেটুকুও খোয়াইব? স্বাধীন ভারতেও ইংরেজী বর্জ্জন চলিতে পারে না, কারণ ইংরেজী বর্জ্জন করিলে ভবিষ্যৎ ভারতের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। শুধু ইংরেজী-সাহিত্য-সম্পদের দিক দিয়া আমরা এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই নাই, যদিও বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় জীবনগঠনে ইংরেজী সাহিত্যের কতখানি দান রহিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সাহিত্য-সম্পদের দিক দিয়া একমাত্র ইংরেজী ভাষাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে পারে না—এই কারণেই একটি বিদেশী ভাষাকে আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইবে এ যুক্তি অচল। এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ইংরেজী ভাষা যে স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাই আমাদের মুখ্য বিবেচ্য হওয়া উচিত। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ইংরেজী ভাষার অধিকার না থাকিলে আমরা বর্ত্তমান জ্ঞান-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব।

প্রতিক্রিয়াশীল দলের যুক্তি এই যে, ইংরেজী ভাষার বর্জ্জনে আমাদের যেটুকু অসুবিধা হইবে সেটুকু পোষাইয়া যাইবে অনুবাদ-সাহিত্যের দৌলতে। অনুবাদের সীমা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে সচেতন। তাই একটু অবান্তর হইলেও অনুবাদের সীমা সম্বন্ধে (বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ে) আলোচনা করিব। বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রতিদিনই আয়তনে বাড়িয়া চলিতেছে, তাই অনুবাদ কখনও এই সাহিত্যের সহিত এক সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে পারিবে না, অনুবাদকে পিছাইয়া পড়িতেই হইবে। সুতরাং যদি একমাত্র এই উদ্দেশ্য লইয়াই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয় তাহা হইলে তাহারা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি শুধু বিপুল ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। তার পর পরিভাষা-রচনা একটি কঠিন সমস্যা। নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দগুলি সুষ্ঠু হইবার আশা অতি অল্পই এবং যাহাদের জন্য এগুলি রচিত হইবে তাহাদের কাছে অধিকাংশই যে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে যে নূতন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বাহির হইবে, সেগুলি একে আধুনিকতম হইবে না, তাহার উপর দুর্ব্বোধ্য পারিভাষিক শব্দসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট ছাপ পড়িবে না।

অনুবাদের পথে আরও যে সকল অন্তরায় আছে আমরা সেগুলি আর এখানে আলোচনা করিলাম না। কিন্তু যে দুটি প্রধান অন্তরায়ের অবতারণা এখানে করা হইল, সে দুটিই বৈজ্ঞানিক অনুবাদ-সাহিত্যের পরিপন্থী। ভারতবর্ষের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে বিরাট "পরীক্ষা" করিয়াছিল, কিন্তু অনুবাদের কার্য্যকারিতা অতি সীমাবদ্ধ বলিয়াই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই, যদিও পথিকৃৎ হিসাবে এই প্রয়াস ধন্যবাদার্হ। আজ ভারত স্বাধীন বলিয়া মাতৃভাষা কিংবা রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য স্বভাবতঃই দাবি উত্থাপিত হইবে, সুতরাং স্বাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হয়ত ব্যাপকভাবে অনুবাদের পরিকল্পনা স্থির করিতে পারে। কাজেই অনুবাদ-সমস্যার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন—অনুবাদ যে কতখানি সীমাবদ্ধ সে বিষয়ে সজাগ থাকা আবশ্যক। যদি বৈজ্ঞানিক সাহিত্য অনুবাদ করিতে হয় তাহা হইলে যে সকল বিদেশী গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত, শুধু সেগুলিরই যেন অনুবাদ হয়। এখানেও বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সকলের নিকট ইহার ফসল পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে মঙ্গল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আমরা যেন অনুবাদের উপর অর্থ ও শ্রম বৃথা ব্যয় না করি, কারণ এই অনুবাদ-সাহিত্য কখনও আধুনিকতম হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভারত যদি ইংরেজী ভাষা বর্জ্জন করে তাহা হইলে উচ্চতম শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানানুশীলন সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে।

অতএব আমাদের এই সিদ্ধান্তেই ফিরিয়া আসিতে হইবে যে, স্বাধীন ভারতের পক্ষেও ইংরেজী-জ্ঞান একপ্রকার অপরিহার্য্য। তাহা হইলে স্বাধীন ভারতেও ইংরেজী শিক্ষা অবহেলা না করিয়া

অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষার আমরা যেন মনোযোগ দিই।

বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতিতে বহু ভাষা শিক্ষার সচেষ্ট হইলে আমাদের মঙ্গলই হইবে। প্রথমতঃ মাতৃভাষা; দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় ভাষা; তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রভাষা এবং সর্ব্বশেষে একটি আধুনিক ভাষা, ইহারই সাহায্যে আমাদিগকে বহির্জ্জগতের সহিত যোগ রাখিতে হইবে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আমাদের সকলেরই আদি বা মৌলিক একটি ভাষা রহিয়াছে, আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি হইল এই ভাষায়। অনেকের নিকট মাতৃভাষা ও স্থানীয় ভাষা এক, সুতরাং নূনকল্পে চারিটি ভাষা শিক্ষা না করিলে বর্ত্তমান জগতে প্রায় চলে না। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা বিষম ভার বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু আমরা যদিও জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি নিম্নস্তর হইতে শুধু দুরূহ পাঠ্য পুস্তকের মারফতে শিক্ষার বন্দোবস্ত না করি, তাহা হইলে সময় ও শ্রমের যে অপচয় বন্ধ হইবে তাহার দরুন নিম্নতন স্তর হইতেই বহু ভাষায় হাতে খড়ি চলিলে তাহা আদৌ গুরুভার বলিয়া সুকুমার শিক্ষার্থীদের মনে হইবে না। কিন্তু শুধু নীরস পাঠ্যপুস্তক মারফত বিজ্ঞানের জটিল বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষাদানের চেষ্টা হইলে সেই সুকুমারমতি শিক্ষার্থগণের পক্ষে না বুঝিয়া শুধু স্মৃতিশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বনে ও নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি আর ছবির সাহায্যে নিম্নতম স্তর হইতে বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় বা হাতেখড়ি করিতে আমাদের কোনরূপ আপত্তি নাই, বরং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে সেরূপ বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

নিম্নতন স্তর হইতেই ইংরেজী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়ত বা অনেকের মনঃপূত না হইতে পারে। কিন্তু যদি উচ্চতর স্তর হইতে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রবেশিকা বা তদনুরূপ পরীক্ষার জন্য যে কয় বৎসর হাতে থাকিবে তাহা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে না। বিলম্বে আরম্ভ করিলে যে কয় বৎসর পিছাইয়া পড়িতে হইবে, সে কয় বৎসরের নাগাল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। ফল হইবে যে,ইংরেজীর মান অনেক নামিয়া যাইবে। শুধু যে প্রবেশিকা বা অনুরূপ পরীক্ষার ইংরেজীর মান নামিয়া যাইবে তাহা নহে, ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজীর মান নিশ্চয়ই অবনমিত হইবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। ভাষাশিক্ষার নীতির দিক দিয়া দেখিলে বিদেশী ভাষা ঈষৎ বিলম্বে আরম্ভ করা ভাল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভাষাশিক্ষা দিবার যেরূপ আয়োজন আমাদের দেশে রহিয়াছে তাহাতে ইংরেজী শিক্ষা বিলম্বে আরম্ভ করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না। অল্পবয়সে বিদেশী ভাষার সহিত পরিচয় লাভ হইলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার অনেক সুবিধা হয়, সুতরাং অল্পবয়সে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলে বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও কোন ক্ষতি হইবে না।

ইংরেজী ভাষা বিদেশী ভাষা হইতে পারে কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পথে অন্তরায়গুলি অধিকাংশই অতিরঞ্জিত করিয়া ব্যাখ্যা হইয়াছে। অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সহজসাধ্য হইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার্থগণ যে দিন দিন ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই চিন্তার কারণ, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী-সংখ্যার মারাত্মক হারের জন্য যে সকল কারণ দায়ী, তাহাদের মধ্যে ইংরেজী ভাষার পরীক্ষাই যে একটি প্রধান কারণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আমাদিগকে এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে হইবে ও বর্ত্তমান পরিস্থিতির কারণ বাহির করিতে হইবে। ধীর চিত্তে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভাষাশিক্ষা সম্পর্কীয় অন্তরায় এই পরিস্থিতির একমাত্র কারণ নহে। প্রকৃত কারণ আরও গভীরে নিহিত। এই বিদেশী ভাষা ত পূর্ব্বে সহজেই আয়ত্ত হইত!— ইহা বর্ত্তমানে কি নূতন নূতন জটিলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা ত একেবারে অসম্ভব। সুতরাং একাজ সত্য হইবে যে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে অন্তরায়গুলি অধিকাংশই অতিরঞ্জিত—যে-কোন দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত শিক্ষার্থীই এই সকল অন্তরায় অনায়াসে অতিক্রম করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে। বলিতে গেলে শিক্ষার্থিগণের দায়িত্বজ্ঞানের অভাবই বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এই দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাও সহজসাধ্য হয় না। অন্ততঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং অল্পবয়সে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিলে এই বিদেশী ভাষা শিক্ষার অন্তরায়গুলি অনেক কমিয়া যাইবে।

জাতীয় কল্যাণের জন্য যখন একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য্য, তখন আমাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করাই সমীচীন, কারণ এই ইউরোপীয় ভাষাটির প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন বহুলাংশে গঠিত হইয়াছে। এই ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন এই অজুহাতে আমরা যেন ইহার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন না হই। যে সকল অন্তরায় সত্ত্বেও পূর্ব্বে আমরা ইহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, আজ কেন ঠিক সেই সকল অন্তরায় আমাদের নিকট এত উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে? কিন্তু এই সমস্যার আরও একটি দিক আছে। বহু বর্ষ যাবৎ শিক্ষা করিবার পরও কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হওয়ার অর্থ হইতেছে শিক্ষাপদ্ধতির দোষত্রুটি ত বটেই, উপরন্তু শিক্ষার্থিগণের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, একাগ্রতা প্রভৃতি সদ্গুণেরও অভাব, আর এই গুণাবলীর অভাবে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। কাজে কাজেই বিদেশীর ভাষা শিক্ষা আমাদের জাতীয় শক্তির অপব্যয়—এরূপ বলিলে চলিবে না। তাহাতে আমাদের

নৈতিক দুর্বলতাই উৎসাহ পাইবে। আমাদিগকে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। এই বাধা-বিঘ্ন সকল যেন আমাদের নৈতিক বৃত্তিগুলিকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে—তাহাদের এই আহ্বানবাণী শ্রবণ করিতে হইবে।

ইতিহাসের বার বার পুনরাবৃত্তি হয়—এ নীতির কখনই ব্যতিক্রম হয় না। প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে শিক্ষা-সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, আজ আবার সেই সমস্যা উপস্থিত! ইংরেজী ভাষা আমাদের পাঠ্য হইবে কিনা, আজ আমরা সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। আজ এই সমস্যার সামান্য অদল-বদল হইতে পারে, তথাপি পূর্ব্বের মত ইহা সমান গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইহার বাহন-স্বরূপ ইংরেজী ভাষার প্রচলন—ইহাই ছিল প্রধান সমস্যা। আজ ঠিক এ সমস্যা নয়—আজ ইংরেজী ভাষার প্রচলন নয়, ইংরেজী ভাষাকে পাঠ্যতালিকামধ্যে সংরক্ষণই হইতেছে বিতর্ক-সাপেক্ষ। আমাদের শিক্ষার বাহন হিসাবে নয়, শুধু পাঠ্যবিষয় হিসাবে ইংরেজী ভাষা আমাদের পঠনীয় থাকিবে কিনা ইহাই হইল উপস্থিত আমাদের বিবেচনার বিষয়। আজ দেড় শত বৎসর পরে ইংরেজী ভাষা যখন আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুল প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন 'ইংরেজী-বর্জ্জন' প্রস্তাব উঠিয়াছে। আজ যদিও ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার না করিয়া আমরা পূর্ব্বযুগের ধারা কতকটা পরিবর্তন করিয়াছি তথাপি ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বর্জ্জননীতি স্থির করিলে আমাদের পূর্ব্বযুগের সুচিন্তিত ধারাকে একেবারে উল্টাইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যুগধর্ম্ম আমাদিগকে প্রাক্-ইংরেজী শিক্ষাযুগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অতএব আমাদের সম্মুখে পুনরায় একটি শিক্ষা ও সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত। তখন ইংরেজী ভাষা একটি নূতন জগতের নূতন বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং এক দল উৎসাহী ব্যক্তি (যাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার্থী যুবকগণও ছিলেন) ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজীতে কথা কহিতেন, ইংরেজীতে লিখিতেন, ইংরেজীতে চিন্তা করিতেন এবং এমন কি ইংরেজীতে স্বপ্নও দেখিতেন। সুতরাং নূতন শিক্ষার বাহন রূপে ইংরেজী ভাষা তখন অতি সহজেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু আজ অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে—কারণ এখন যুবকদলই বিদ্রোহী। তাহাদের নিকট ইংরেজী ভাষা আমাদের পরাধীন যুগের প্রতীকস্বরূপ, সুতরাং বর্জ্জনীয়।

ইহার উপরে আর একটি নূতন সমস্যা "মাথা চাড়া" দিয়া উঠিয়াছে—ইংরেজী ভাষা বর্ত্তমানে নাকি পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথে বিষম অন্তরায়। ইহা স্বাভাবিক যে, ভারত যখন স্বাধীন হইয়াছে তখন সকলেই বলিবে: কেন এই বিদেশী ভাষা এরূপ একটি অন্তরায় হইয়া থাকিবে? সুতরাং ইহাও অস্বাভাবিক নয় যে, সকলেই আজ দাবি করিবে এই বিদেশী ভাষাকে অপসারিত করিতে হইবে। তাই আজ ইংরেজী বর্জ্জন প্রস্তাবের ইহাও একটি বাড়তি কারণ, অর্থাৎ শিক্ষার্থিগণের শৈথিল্যের জন্য ইংরেজী ভাষাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। তত্ত্বকথা শুনিবার অল্প লোকই আজ আছে। সুতরাং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পথে এই যে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে-ইহার সমাধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ গভীর ভাবে বিবেচনা করুন ও নূতন শিক্ষানীতি এবং ব্যবস্থা উদ্ভাবন করুন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজী ভাষা যেন শিক্ষার্থিগণের নিকট যন্ত্রণাদায়ক একটি যন্ত্রে পরিণত না হয়। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিবার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি স্থিরীকৃত হউক এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা স্বাধীন ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয়কে নূতন রূপে দোলা দিবে।

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমরা পুনরায় একটি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়াছি। এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে আমাদের যেন ভুল না হয়। আমরা কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় পথের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এখন আমাদের অতি সাবধানের সহিত পথ বাছিয়া লইতে হইবে। আমরা কি ক্রোধভরে কিংবা হেলায় আমাদের বিদ্যানিকেতনগুলি হইতে ইংরেজী শিক্ষা একেবারে তুলিয়া দিব? না, জগতের সেই সকল স্বাধীন জাতির অনুসরণ করিব যাহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয় অথচ যাহারা ইংরেজী শিক্ষা করিতে আদৌ শৈথিল্য করে না?

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হইতেছে "বিমাতার প্রাসাদে মাতার একটি স্থান স্থির করিয়া দেওয়া"। এরূপ বাণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তির গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু কালচক্রের ঘূর্ণনে আজ বিমাতা সেই প্রাসাদে "অনধিকার-প্রবেশকারিণী" বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। আমরা বিমাতাকে এই প্রাসাদের উচ্চাসন হইতে নামিয়া আসিতে বলিব বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কি চির-নির্ব্বাসন-দণ্ড দিব?

সুতরাং আমাদের পাঠ্যতালিকায় ইংরেজী ভাষাকে তাহার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিবার এখন সময় আসিয়াছে। আমাদের বিধানসভায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত না হইতে পারে, আমাদের ধর্ম্মাধিকরণে ইহার স্থান না থাকিতে পারে, রাষ্ট্রপরিচালনাকার্য্যে ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের উচ্চপদসমূহে ইহা আর ছাড়পত্র না হইতে পারে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষার সকল স্তরেই ইহা আর শিক্ষার বাহন না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি ইংরেজী ভাষাকে আমাদের পাঠ্যতালিকা হইতে নির্ব্বাসিত করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হইবে না, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে ইংরেজী ভাষাকে তাহার উপযুক্ত স্থান দিতে হইবে, ইহাকে অগ্রাহ্য করিলেও চলিবে না, বিতাড়িত করিলেও চলিবে না। এখন ইংরেজী ভাষাকে তাহার উপযুক্ত স্থান দেওয়াই স্বাধীন ভারতের ভাষাগত একটি প্রধান সমস্যা। যথোচিত ভাবে অনুধাবন করিয়া এ সম্বন্ধে সমুচিত নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

কবিতীর্থে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আভন নদীতীর।

তরু-তৃণ-লতা-গুল্মে আবৃত শ্যামল সুন্দর পরিবেশ। আভনের নীলজলে ধবধবে সাদা রাজহাঁসের দল খেলে বেড়াচ্ছে। এই নদীকূলে ছিল ছোট একখানি গ্রাম—ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড। মহাকবি সেক্সপীয়র এখানে জন্মগ্রহণ করায় এস্থান আজ বিশ্বের নর-নারীর কাছে কবিতীর্থ হয়ে উঠেছে। এই বিশ্ববিশ্রুত অদ্বিতীয় নাট্যকার ও মহাকবি সেক্সপীয়রের পুণ্য জন্মস্থান দেখে আসবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা লণ্ডনে পৌঁছে পর্য্যন্ত মনটাকে উতলা করে রেখেছিল।

মহাকবি সেক্সপীয়রের প্রতিমূর্ত্তি

উনিশ শ' পঞ্চাশ সাল। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মত জুলাইয়ের প্রথম দিনেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিডল্যাণ্ড অঞ্চলের ওয়ারউইকশায়ারের দিকে। ইংলণ্ডে তখন কিন্তু 'মেঘমাল্লিষ্ট সানু' নয়। মৃদু রৌদ্রোজ্জ্বল নিদাঘ।

কট্‌সোয়াল্ডস পার্ব্বত্য অঞ্চলের একেবারে উত্তর প্রান্তে আভন নদীতীরে সেক্সপীয়রের গ্রাম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড। একে আর এখন 'গ্রাম' বলা চলে না। গ্রাম্য শহর বা জনপদ হয়ে উঠেছে। আভন নদীতীরের এই ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড তীর্থে ট্রেনেও আসা যায়, আবার মোটর-কোচেও আসা যায়। আমরা মোটর-কোচে যাওয়াই ভাল মনে করেছিলাম। তার দুটো কারণ: মোটর-কোচওয়ালারা আশা দিয়েছিল যে, ফেরবার পথে তারা আমাদের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়ে নিয়ে আসবে; দ্বিতীয়তঃ, এই মোটর-কোচ যাবে একেবারে মধ্য ইংলণ্ডের বুকের উপর দিয়ে, কত নাম না-জানা অপরিচিত শহর ও ছোটবড় গ্রামের ভিতর দিয়ে, দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, মানুষের বসতিগুলির গা ঘেঁষে ঘেঁষে, তাদের ঘরবাড়ী, বাগান, ক্ষেতখামার ও নিভৃত পল্লীকুঞ্জের
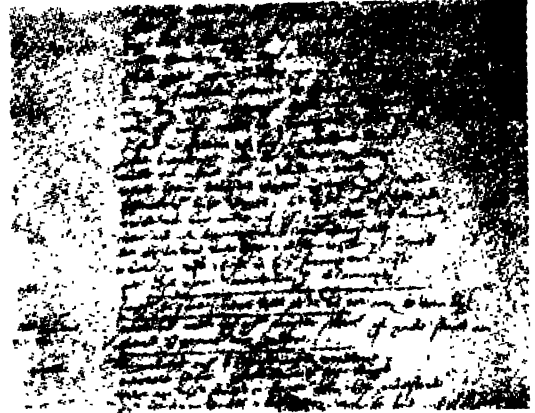
মহাকবি সেক্সপীয়রের হস্তাক্ষর

আনাচে-কানাচে দিয়ে হবে এর মন্থর যাত্রা। মাঝে মাঝে থামবে—যাত্রীদের মধ্যাহ্নভোজন এবং বৈকালিক চা ও জলযোগের সুযোগ দেবার জন্য। আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পথে দাঁড়ায়। সেই ফাঁকে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নেওয়া যাবে। আশেপাশের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও হবে। কিন্তু রেলে গেলে এ সুযোগ-সুবিধাটুকু পাওয়া যাবে না।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে ভরা অতি মনোরম স্থান এই ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড। মহাকবি সেক্সপীয়র এখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর এখানেই কেটেছে। বালক সেক্সপীয়র এইখানেই বড় হয়েছেন। স্কুলে পড়েছেন। বন্ধু ও সহপাঠীদের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়িয়েছেন এরই চার পাশে।

ভাবতেও কেমন ভাল লাগে। বিশেষ করে আমরা ভারতবাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই একটু অহেতুকী ভক্তিরসে জারিত জীব!

বৈষ্ণবী-মায়ার ছোঁয়াচে রোগে কমবেশি সকলেই প্রায় আক্রান্ত। 'এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয়' বলে কেঁদে ককিয়ে উঠার জাত আমরা। এজন্য আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত নই। এটা আমাদের জাতীয় প্রকৃতি। ভাববিহ্বলতা মানবচরিত্রের একটা সুকুমার গুণ বলেই মনে করি। কাজেই 'ওরে বাপরে! এ যে সেক্সপীয়র! একি যে-সে, বা যেমন-তেমন কবি?' এমনিতর একটা দুর্জ্জয় ভক্তিভাব তো মনের মধ্যে

হোলি ট্রিনিটি চার্চ

ছিলই। কাজেই নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার নির্ম্মম ঐতিহাসিক বা সত্যানুসন্ধিৎসু সমালোচকের কঠোর মন ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে এখানে আসি নি। এসেছি ভক্তের বিনম্রাবনত হৃদয় নিয়ে, কবির প্রতি আমাদের অপার শ্রদ্ধা-বিমুগ্ধ প্রীতি নিয়ে।

মোটর-কোচ আমাদের লণ্ডন থেকে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড আসবার পথে মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়েছে দেখে একটি রেঁস্তোরায় নামিয়ে বেশ ভালই 'লঞ্চ' খাওয়ালে। আহারান্তে আমাদের বলে দেওয়া হ'ল যে, বৈকালীন চা ও জলযোগের ব্যবস্থা অক্সফোর্ডে করা হয়েছে। যাত্রীদের এই আহারের যা কিছু ব্যয় তা মোটর-কোচ কোম্পানীরাই বহন করেন; কারণ তাঁরা আমাদের কাছে পাথেয় হিসাবে যা নেন, অতিথি-সৎকারের ব্যয় নাকি তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এ ব্যবস্থাটি বেশ ভাল। ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টা বা আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে কোথাও যাবার সময় রেল কোম্পানীগুলিতে এ ব্যবস্থা থাকলে যাত্রীদের ভারি সুবিধা হ'ত। রেষ্টুরেন্ট-কারে গিয়ে খাওয়া যেমনি ব্যয়সাধ্য তেমনি শ্রমসাধ্য!

সকালে প্রাতরাশের পর সাড়ে নয়টায় আমরা লণ্ডন ছেড়েছিলাম। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে এসে পৌঁছলাম ঠিক বেলা দুটোয়। গাড়ী থেকে নামবামাত্র মোটর কোম্পানীর গাইড আমাদের ধুলোপায়েই তাড়িয়ে নিয়ে চললেন সেক্সপীয়রের বাড়ীঘর দেখাতে। ধুলোপায়ে তীর্থের বিগ্রহ-মন্দির দর্শন করে আসা আমাদের ভারতীয় প্রথা বলে আমরা কিছুমাত্র আপত্তি করলাম না।

গাইড আমাদের একখানি বাড়ী দেখিয়ে যখন বললেন, এই যে, আসুন আপনারা ভিতরে। এই বাড়ীতে এই ঘরে ঠিক এইখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন; স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করব না, আমাদের দেহমনে একটা শিহরণ এসেছিল। বিমুগ্ধ ভক্তদের অবস্থা যে স্বাভাবিক থাকে না মনোবিকলন-বিশারদেরা সেটা মন-কষা যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। অবশ্য সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে প্রথম সন্দর্শনের সে আবেগময় আনন্দ-উত্তেজনা ধীরে ধীরে অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। আমাদেরও এসেছিল।

গাইড ধরে নিয়ে চলেছেন এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী। তাঁর রসনার বিরাম নেই। কেউ শুনুক বা না শুনুক সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তিনি তাঁর অভ্যস্ত নিয়ম অনুসারে গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বলে চলেছেন—'এই যে গ্রামার স্কুল দেখছেন এইখানে, আসুন না সবাই ভিতরে—এই যে, এই ঘরে এই ডেস্কে বসে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। আসুন এইবার। এই যে বাড়ীটা দেখছেন, এইটিরই নাম 'নিউ প্লেস'।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক সময় এসে পড়লাম আভন নদীতীরে। গাইড বলে চলেছেন—'এইখানে এই শান্ত নির্ম্মল আভন প্রবাহিনীর নির্জ্জনকূলে—এই তরুতলে বসে তিনি বিশ্বরঙ্গমঞ্চের কথা ভাবতেন। কবির স্বপ্নালু চোখ দুটি থাকত ঐ অদূরবর্ত্তী উপাসনা-মন্দিরের চূড়ার উপর নিবদ্ধ, কিংবা আকাশের কোন নিরুদ্দেশ মেঘের সঙ্গী হয়ে অকূলে ভেসে যেত তাঁর ভাবতন্ময় দৃষ্টি! সহসা প্রার্থনা ঘরের ঘণ্টা বেজে উঠলে, সেই ঢং ঢং শব্দে তবেই হয়ত কবির ধ্যান ভঙ্গ হ'ত।'

আমরা আভনের মৃদুতরঙ্গ স্রোতের দিকে চেয়েছিলাম।

সেই ছাত্রাবস্থা থেকে শুনে আসছি 'ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড অপন আভন'! এই সেই সেক্সপীয়রের প্রিয় প্রবাহিণী। প্রণয়িনী এ্যানা হ্যাথাওয়েকে পর কবি একেই ভালবেসেছিলেন বেশি। এ যেন মহাকবি বাল্মীকির আশ্রমের সেই তমসা নদী। এরই শ্যামস্নিগ্ধ তরুকূলে কবির জীবনের কত না অমূল্য সময় আনন্দে কেটেছে। ধীরে বয়ে চলেছে সেই আভন, যেমন করে সে বয়ে যেত আজ থেকে পৌনে চার শ' বছর আগে, মহাকবি সেক্সপীয়র যখন ছিলেন মাত্র একটি ভাবপ্রবণ কিশোর বালক। আভনের চঞ্চল নীলজলে সেদিনও হয়ত এমনি করেই কুমুদ-কহ্লারের আশেপাশে রাজহংসের দল চঞ্চুপুটে মৃণাল-দণ্ড খুঁটে খুঁটে খেলা করে বেড়াত!

যৌবন-জয়ন্তী যুগে কবি হয়ত এই পথ ধরেই, যে পথে চলেছি আমরা আজ—এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি—সুদূর প্রাচ্যের এক অখ্যাত অজ্ঞাত কবি-দম্পতী, এই পথে, এই সুশ্যামল শস্যক্ষেতের পাশ দিয়ে, এই ফলভারাবনত তরুতল অতিক্রম করে, কত কুসুমিত পল্লীকুঞ্জের ভিতর দিয়ে, তৃণশষ্পাচ্ছাদিত অভিরাম প্রান্তর পার হয়ে প্রেম-বিহ্বল কবি আসতেন শটারীর দিকে তাঁর বাল্যের সখী ও যৌবনের প্রণয়িনী শ্রীমতী এ্যানা হ্যাথাওয়ের কুটীর-দ্বারে।

এই সেই কুটীর। কবির তরুণ যৌবনের অমরাবতী। এইখানে এই দ্বারপ্রান্তে বেড়ার ধারে অযত্নে পড়ে থাকা এই কাঠের গুঁড়িটার উপর পাশাপাশি দু'জনে বসে প্রণয়-রভসে হয়ত কত মধুর গুঞ্জন করতেন। গাইড আমাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে বলে উঠলেন—এই যে পোলের উপর দিয়ে পথটি চলে গেছে দেখছেন দক্ষিণ-পূর্বে, এই পথে এক দিন তরুণ কবি চলে গিয়েছিলেন ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে। আপনারাও হয়ত এই পথেই লণ্ডনে ফিরে যাবেন।

বাধা দিয়ে বললাম, তা হয়ত যাব, কিন্তু ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে আর ফিরব কি? সেক্সপীয়র ফিরে এসেছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের নিবিড় অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও লণ্ডন তার বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে কবিকে ধরে রাখতে পারে নি। কবি শেষ-জীবনে তাঁর পল্লীমায়ের কোলে ফিরে এসেছিলেন। ফিরে এসেছিলেন বিশ্ববিজয়ীর বরমাল্য কণ্ঠে নিয়ে, ফিরে এসেছিলেন জীবন ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে জয় করে।

পথপ্রদর্শক দেখিয়ে দিলেন, কবি গ্রামে ফিরে এসে এইখানে একখানি বাড়ী কিনে বাস করতেন। সে বাড়ী বহুদিন ধরাশায়ী হয়েছে। কিন্তু সেই পুণ্যগেহের ভিত্তি-মূলটি সযত্নে ঘিরে রাখা হয়েছে। এইখানেই তাঁর শেষ-নিশ্বাস পড়েছিল। ওই যে ও পাশে "ফ্যালকন-ইন" সরাইখানাটি দেখছেন, ওইখানে কবি নিত্য সন্ধ্যায় গিয়ে বসতেন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পান ভোজন করতেন। এই যে গাছতলাটি দেখছেন, এরই এই বাঁধানো চত্বরে পানশালা বন্ধ হয়ে যাবার পরও কবির মজলিশ বসত অনেক রাত পর্য্যন্ত। আমরা পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে এমনি করে দেখতে দেখতে চলেছি মহাকবির স্মৃতিবিজড়িত কত না পুণ্য স্থান। আভন নদীকূলে আছে সেক্সপীয়রের এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি। কাছেই 'সেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার'। সুন্দর সুদৃশ্য
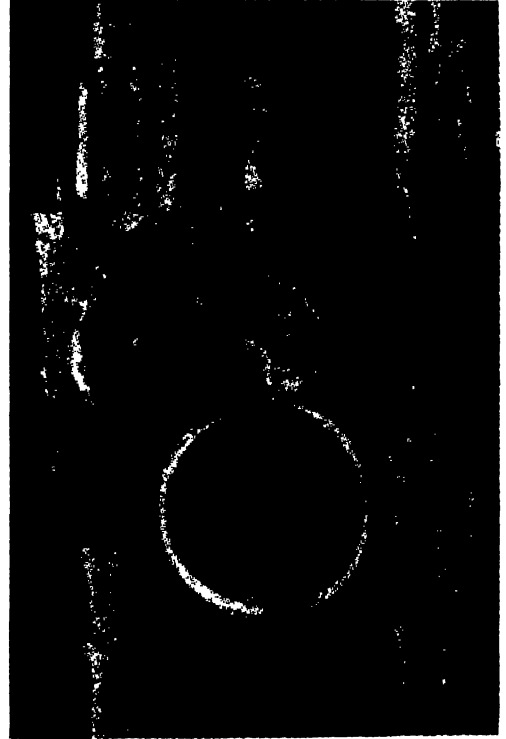
শরণাগতদের জন্য মন্দির দ্বারে সংযুক্ত বিশেষ ঘণ্টা

এই নাট্যশালাটি। অতি আধুনিক ঢঙে তৈরি। এখানে তখন লণ্ডনের 'সেক্সপীয়র ড্রামাটিক সোসাইটি' কবির শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এক এক করে প্রায় প্রত্যহ অভিনয় করছিলেন। সুতরাং এ সুযোগ কি আর ছাড়া যায়? থেকে গেলাম আমরা সে রাত্রে এই কবিতীর্থ 'ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড অন আভনে'। আমাদের পথপ্রদর্শক মহাশয়ই ঠিক করে দিলেন আমাদের একটি ডেরা। জনৈকা মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলার 'পেয়িং গেষ্ট' হলাম আমরা। কোনও হোটেলেই তখন স্থান ছিল না। অসম্ভব ভিড়। ভিড় অবশ্য কবির জন্মস্থান দর্শনের জন্য যত না হোক, সেক্সপীয়রের নাটকাভিনয় দেখবার জন্যই চারিদিক থেকে লোক ভেঙে পড়েছিল। বহুকষ্টে টিকিট সংগ্রহ হ'ল। অবশ্য সেদিনের নয়, তার পরের দিনেরও নয়।

অর্থাৎ শনি রবিবারের অভিনয়ের সব আসনই পূর্ব্বাহ্নে বিক্রী হয়ে গেছে। এই ছ'দিন ছুটির বাজার বলে 'উইক্-এণ্ড'-ওয়ালাদেরই ভীড় হয় বেশি। সোমবার অভিনয়ের আসন পাওয়া গেল, তাও বেশি দামের।

আমাদের গাইড মোটর-কোচের রিটার্ণ-টিকিট বদলে মঙ্গলবার ফেরবার উপযুক্ত করে দিলেন। এ রকম নাকি তাঁদের প্রায়ই করতে হয়। এই সীজ্‌নে প্রত্যহ তিন-চারখানা মোটর-কোচ এখানে যাতায়াত করে। প্রাইভেট কারেরও সংখ্যা হয় না। এ ছাড়া ট্রেন তো আছেই।
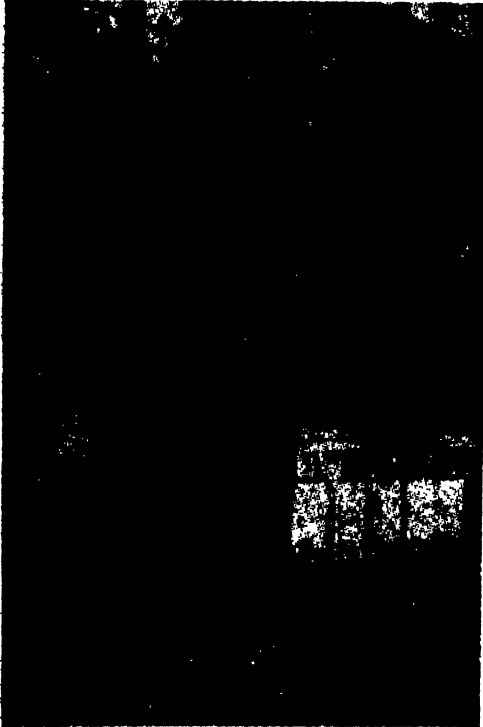
হোলি ট্রিনিটি চার্চের মধ্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত সমাধি দেওয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ স্মৃতি ফলক

আধাবয়সী বাড়ীওয়ালী শ্রীমতী এলিজাবেথ করবেট আমাদের যতদূর সম্ভব আরামে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে বর্ণ-বিদ্বেষ বলে কিছু নেই। আমরা যেন আত্মীয় এসে অতিথি হয়েছি তাঁর বাড়ীতে, এমনিতর আদরযত্ন করেছিলেন তিনি। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড একটুখানি জায়গা। পরদিন সকালে কাউকে সঙ্গে না নিয়েই আমরা প্রাতরাশের পর বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘুরে আসতে। কিন্তু পথে বেরিয়ে দেখি সব বন্ধ। নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথঘাট। সেদিন যে রবিবার এটা একেবারেই খেয়াল ছিল না।

সেদিন কেবল রেস্তোঁরা আর থিয়েটার ছিল খোলা। আর খোলা ছিল মহাকবির বর্ণিত সেই 'হোলি ট্রিনিটি চার্চ'। ঢুকে পড়া গেল সেই গির্জ্জার মধ্যে। ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট গির্জ্জাটি। মাত্র শতাবধি লোকের বসবার আসন আছে। রবিবার প্রার্থনা সুরু হবে শুনলাম বেলা সাড়ে দশটায়। আমরা যখন ঢুকেছিলাম তখন ৯টা বাজে নি। গির্জ্জাটি ক্রুশের আকারে-কাটা ভিতের উপর তৈরি। প্রবেশ-পথের দু'পাশে সুন্দর একটু ফুলের বাগান আছে। নক্সাখানি দেখলে বোঝা যাবে উত্তর দিকে 'এ' চিহ্নিত অংশে প্রবেশ-দ্বার। দ্বারে আশ্রয়প্রার্থী শরণাগতদের করাঘাত করবার জন্য বিশেষ একটি বড় আংটা ঝুলছে। যে কোনও অপরাধী রাজপ্রহরীর হাতে বন্দী হবার ভয়ে পালিয়ে এসে এই উপাসনা-মন্দিরের পক্ষপুটাশ্রয়ের শরণ নিলে আইন অনুসারে সে সুদীর্ঘ ৩৭ দিন নিরাপদে এখানে আশ্রয় পাবে। এই সময়ের মধ্যে সে আদালতে নিজের দোষ ক্ষালনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করবার সুযোগ পায়। অথবা যদি প্রকৃতই দোষী হয় তবে শ্রীভগবানের কাছে অনুতপ্ত চিত্তে অপরাধ স্বীকার করে রাজার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে আবেদন পাঠাতে পারে। ধর্ম্মের প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি ও-দেশে।

'বি' চিহ্নিত অংশে আছে, কবিকে শৈশবে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত বা ব্যাপটাইজ করবার জন্য ব্যবহৃত জলপাত্র, জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী নয়, Birth Certificate), ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি পুরাতন বাইবেল, জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ ও জাতকের নামধাম লিখে রাখবার রেজেষ্টারী বই। এর মধ্যে কবির নাম ও জন্মতারিখ আছে। 'সি' অংশে আছে বর্ত্তমানের শিশুদের ব্যাপটাইজ করবার জলপাত্র। 'ডি' ওয়ারউইকশায়ার ভলাণ্টিয়ার রেজিমেন্টের পতাকা। 'ই' কয়েকজন বিশিষ্ট নরনারীর সমাধি। 'এফ' লেডি মার্টিনের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা একটি উপদেশ-প্রচারপীঠ (pulpit)। 'জি' ক্যাণ্টারবারির সেণ্ট টমাস চ্যাপেলের শিলাসন। 'এইচ' অংশে সেই পর্দ্দাখানি রয়েছে যার অন্তরালে কবির মৃতদেহ রাখা হয়েছিল কবরে নামাবার আগে! 'আই' সেণ্ট পীটারের মঠ। 'জে' ভজন গায়কদের আসন-ঢাকা পর্দ্দা। 'কে' নিভৃতে উপাসনা, অপরাধ স্বীকারান্তে অনুতপ্ত চিত্তে ভগবানের দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রিয়জনদের কল্যাণকামনায় বিশেষভাবে ভগবানের নামে কিছু মানত করা প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান।

'এল' চিহ্নিত অংশে অতি সুন্দর কারুকার্য্য করা সেক্সপীয়রের কবর। কবরের উপর লেখা আছে:

"Good Friend, for Jesus' sake forbear

To dig the dust enclosed here.
Blest be the man that spares these stones,
And curst be he that moves my bones."

"হে সুবন্ধু, যীশুর নামে মিনতি করি, ধৈর্য্য ধর :
এখানে যে ধুলি সমাহিত হয়েছে তা খনন করে নিও না।
এই হাড়গুলো যে ছোঁবে না ভগবান তাকে আশীর্ব্বাদ করবেন :
আমার অস্থি যদি কেউ সরায়, সে যেন অভিশপ্ত হয়।"

'এম' প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ করা কবির আবক্ষ শিলা-চিত্র ও স্মৃতিফলক। শিল্পী জেরার্ড জ্যান্সান কর্ত্তৃক ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি রচিত। কবির হাতে একটি হাঁসের পালকের কলম আছে আর মূর্ত্তির পাদমূলে লেখা আছে :

In wisdom a Nestor, In genius a Socrates,
in Art a Virgil,
The Earth shrouds him, the Nation mourns
him, Olympus guards him.

প্রতিভায় যিনি সক্রেটিস্, জ্ঞানরাজ্যে বৃহস্পতি সম,
ভার্জ্জিলের তুল্য শিল্পী যিনি,
মৃত্তিকা ঢেকেছে তাঁরে, অশ্রুজল বরষিছে জাতি,
স্বর্গরাজ্যে সুরক্ষিত তিনি।

'এন' হ'ল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডীন বালসালের করব।

এই গির্জ্জাটি দেখবার জন্য মাথা পিছু ছয় পেন্স দর্শনী দিতে হ'ল। গির্জ্জার পুরোহিত বললেন, এ অর্থ মন্দির রক্ষার জন্য ব্যয় হয়। তিনি আমাদের কবির জামাতা ডাঃ হাল, কবির কন্যা সুজানা হাল, কবির পত্নী ও নাতজামাই টমাস ন্যাশের কবরগুলিও দেখিয়ে দিলেন। গির্জ্জার বড় বড় বাতায়নগুলির প্রত্যেকটি কাঁচের উপর যে সব রঙীন চিত্র ছিল সজ্জন পুরোহিত ঘুরে ঘুরে তার প্রত্যেকটির পরিচয় আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

'হোলি ট্রিনিটি চার্চ্চ' থেকে বেরিয়ে আমরা খানিকটা পথে পথে নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়িয়ে সময়টা কাটালাম। বেশ লাগছিল সেক্সপীয়রের জন্মভূমিতে ঘুরে বেড়াতে। পত্নী বললেন, সেক্সপীয়রের কবরের উপর যে চার লাইন কবিতা উৎকীর্ণ করা রয়েছে সে ত মহাকবির নিজের রচনা বলে মনেই হয় না!

বললাম, great men think alike.—মহামানবেরা এক রকমই চিন্তা করে থাকেন। ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডও এ কথাই বলেছিলেন। বলে-ছিলেন, 'তোমার এ লেখার কি দরকার ছিল কবি?' তুমি যে—

"And thou, who didst the stars and sunbeams
know,
Selfschooled, selfscanned, selfhonoured, selfsecure
Didst walk on earth unguessed at—"

মহাকবি মিলটনও এ লেখা পড়ে আক্ষেপ করে বলে-ছিলেন—

"What needs my Shakespeare for his honoured
bones
The labour of an age in piled stones?
Thou in our wonder and astonishment,
Hast built thyself a live-long monument."
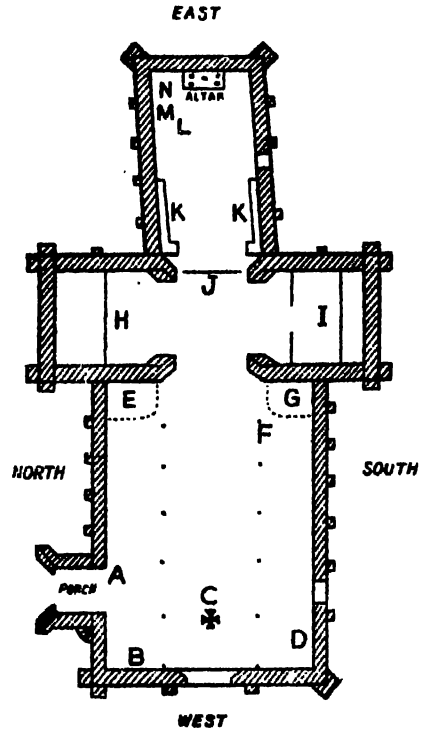
হোলি ট্রিনিটি চার্চের নক্সা

মধ্যাহ্নভোজের আগেই আমরা শ্রীমতী করবেটের কুটীরে ফিরে এলাম। তিনি সহাস্য মুখে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'লঞ্চ রেডি মিঃ দেব। কিন্তু আজ রবিবার—নো মীট! মাংস নেই!' বললাম, 'ধন্যবাদ! আমরা ভারতবাসী নিরামিষে অভ্যস্ত।'

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে বিকেলে বেরুলাম আভন নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসতে। আভন সেতুর সামনেই মনোরম একটি ছোট উদ্যানের মধ্যে সেক্সপীয়রের বিরাট প্রতিমূর্ত্তি। এটি কাল এক নজরে দেখে গেছি। আজ ভাল করে দেখলাম। শিল্পী লর্ড রোণ্যাল্ড গাওয়ারের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কবির এই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি। এটি ব্রোঞ্জের তৈরি। কবিকে ঘিরে আছে তাঁর নাটকের চারটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। হাস্যরস পরিবেশনের প্রতীক-স্বরূপ 'ফলষ্টাফ', ঐতিহাসিক

কীর্ত্তি-কাহিনীর প্রতীক 'প্রিন্স হেনরী, দর্শন ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রতীক 'হ্যামলেট' এবং বিয়োগান্ত নাট্যরসের প্রতীক 'লেডী ম্যাকবেথ'।

এরই সামনে সেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার। থিয়েটার-সংলগ্ন একটি চিত্রশালা, মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী আছে। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাটিয়ে শ্রীমতী করবেটের কুটীরে ফিরে

কবিপ্রণয়িনী এ্যানা হ্যাথাওয়ের কুটীর

আসা গেল। ডিনার টেবিলে বসে করবেট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইংরেজ তার দেশের লোকদের কাছে ভারতের পরিচয় বরাবরই অস্পষ্ট রেখে-ছিল। এর পশ্চাতে কি কূটরাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বোঝা গেল না। ভারত শোষণে কি তারা বাধা দিত?

পরদিন সকালে গেলাম কবি যে ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁর সেই স্মৃতিকাগার পরিদর্শনে। সেদিনের দর্শনে আশ মেটে নি। আজ এসে ভাল করে চেয়ে দেখি ঘরখানির ছাদ থেকে আরম্ভ করে চারদিকের দেওয়াল এমন কি জানালা দরজা ও সার্শির কাঁচগুলিতে পর্য্যন্ত যে কত লোকের নাম আঁচড়ান রয়েছে তা গুনে বা পড়ে শেষ করা যায় না। এই নাম-সমুদ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম চোখে পড়ল—স্যার ওয়াল্টার স্কট, রবার্ট ব্রাউনিং, টমাস কার্লাইল, এডমণ্ড কীন, লর্ড বায়রন, ডিকেন্স ও থ্যাকারের নিজের হাতে উৎকীর্ণ করে যাওয়া স্বাক্ষর। এর মধ্যে বায়রন, থ্যাকারে ও ডিকেন্সের নাম অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কালে হয়ত অন্যগুলিও মিলিয়ে যাবে।

বাড়ীখানিতে মোট আটখানি ঘর। সেক্সপীয়র স্মৃতি-ভাণ্ডারের ট্রাষ্টীরা তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় কবির ব্যবহৃত জিনিস-পত্র নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে এনে সব ঘরগুলিই প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন। এগুলির সংখ্যা ক্যাটলগে দেখলাম প্রায় চার শ'র উপর। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল কবির নিজের হাতের লেখা, কবির পিতামাতা, দুই কন্যা, কনিষ্ঠ সহোদর ও বন্ধু বেন জনসনের হাতের লেখা ও স্বাক্ষর। কত দলিলপত্র, দুর্লভ সংবাদপত্র, চিত্রাবলী, পত্রাবলী ও প্রতিকৃতি সংগৃহীত রয়েছে যার প্রত্যেকখানি আজ অমূল্য।

অর্দ্ধশতাব্দীকাল কবি ছিলেন নিরুদ্দেশ। দুটি মেয়েকে নিয়ে তাঁর পত্নী ছিলেন কবির ফিরে আসার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে। অবশেষে কবি একদিন সত্যসত্যই ফিরে এলেন তাঁদের কাছে। ইতিমধ্যে কবির পিতৃমাতৃ বিয়োগ ঘটে গেছে। যে শিশু পুত্রটিকে রেখে গিয়েছিলেন সেটিও পরলোকে। কবির দুটি যমজ ভাইবোনও তখন বেঁচে নেই। সেক্সপীয়রের বাড়ীর পাশেই ছিল টমাস ন্যাশের বাড়ী। ইনি সেক্সপীয়রের নাতনীকে বিবাহ করেছিলেন। কবি তাঁর গৃহে ফিরে আসবার বছর ছয়েক পরেই বিধবা পত্নী ও কন্যা সুজানাকে রেখে স্বর্গারোহণ করেন।

কবির মৃত্যু সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। যে 'ফ্যালকন-ইনে'র কথা পূর্ব্বে বলেছি, কেউ কেউ বলেন একদা অনেক রাত্রে মত্ত অবস্থায় বাড়ী ফেরবার পর কবি নিউমোনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবার কেউ কেউ বলেন বাড়ী ফিরতে তিনি পারেন নি। 'ফ্যালকন-ইন' থেকে বেরিয়ে যে গাছতলায় এসে তাঁদের মজলিশ চলত, বাকি রাতটুকু কবি সেখানেই মত্ত অবস্থায় বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-বিকারে তাঁর মৃত্যু ঘটে! যাই ঘটুক, তা নিয়ে মাথা-ঘামাবার প্রয়োজন দেখি না, কারণ কবি মৃত্যুঞ্জয়ী!

এখান থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে গ্রাম্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে মাইলখানেক দূরে চলে এলাম 'শটারী' অঞ্চলে, কবি-প্রণয়িনী এ্যানা হ্যাথাওয়ের কুটীরখানি দেখতে। সেদিন গাইডের তাড়াহুড়োয় ভাল করে দেখা হয় নি। ভারি সুন্দর এই কুটীরখানি। শটারীর প্রায় সব কুটীরগুলিই ছবির মত দেখতে। জানি না, চোখে সেক্সপীয়রের প্রেমাঞ্জন

লেগেছিল কিনা। এ্যানার কুটীর ঘাসের ছাউনি দিয়ে ঢাকা চালাঘর। কিন্তু কি অপরূপ! শোভায়, সৌন্দর্য্যে ও মর্য্যাদায় রাজপ্রাসাদকেও হার মানিয়ে দেয়। সেক্সপীয়রের তরুণ জীবনে এমন এক দিনও যেত না যেদিন তিনি একবার এ্যানার কাছে না আসতেন। কুটীর-প্রাঙ্গণে সুন্দর একটি বাগান। ল্যাভেণ্ডার, মেরিগোল্ড, গোলাপ আরও নাম-না-জানা কত না ফুল ফুটে আছে। যেমন তারা চারশ' বছর আগে এক দিন ফুটত কবিকে তাঁর প্রণয়িনীর গৃহে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। সেক্সপীয়রের জীবিতকালে এই কুটীর, এই বাগান, এর ভিতর-বাহির ঠিক যেমনটি ছিল আজও ঠিক তেমনি ভাবেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এ্যানের সঙ্গে তিনি যে টেবিলে বসে খেতেন, যে কাঠের প্লেটে করে তাঁকে আহার্য্য পরিবেশন করা হ'ত, শীতের সন্ধ্যায় আগুনের ধারে যে চেয়ারখানিতে বসে তিনি এ্যানের কানে মৃদু গুঞ্জনে প্রেম নিবেদন করতেন সেগুলি সব এখানে সযত্নে রাখা হয়েছে। কবির প্রথম যৌবনের সুখস্মৃতি দেখলাম অক্ষয় হয়ে রয়েছে এইখানে।

আভন নদীতীরে সেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার

প্রসিদ্ধ মহিলা ঔপন্যাসিক কুমারী মেরী কোরেলীর বাস-গৃহ দেখলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদেই তিনি এখানে এসে বসবাস সুরু করেন। তাঁর বাড়ীর নাম 'মেসনক্রফট'। এ বাড়ীতে এখন স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের আপিস। শোনা গেল, ষ্ট্রাটফোর্ডের বিবিধ সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান এখন এই বাড়ীতেই হয়। এখানকার রাস্তার দু'ধারে এখনও বহু পুরানো বাড়ী চোখে পড়ে। টাউন হলটি অবশ্য কবির স্বর্গারোহণের অনেক পরে কবিরই স্মৃতিসৌধ হিসাবে নির্ম্মিত হয়েছিল। এ বাড়ীর সামনের দিকে দেওয়ালের গায়ে একটি খিলানযুক্ত খোপের মধ্যে সেক্সপীয়রের একটি মূর্ত্তি আছে। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক এটি সেক্স-পীয়রের দেশকে উপহার দিয়েছিলেন। এ মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব হচ্ছে কবি একটি পাদপীঠের উপর হেলে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর কাছে রয়েছে পঞ্চম হেনরী, তৃতীয় রিচার্ড আর কুইন এলিজাবেথের আবক্ষ মূর্ত্তি।

বাড়ী ফিরে স্নানাহার সেরে আজ শুধু সেক্সপীয়রের আলোচনাই চলল। সেক্সপীয়রের প্রথম রচনা সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প শোনা গেল। কবির অল্প বয়সে অনুষ্ঠিত কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মাতব্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন। সেক্সপীয়র তাঁর উপর রুষ্ট হয়ে তাঁর নামে ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ একটি কবিতা রচনা করে ভদ্রলোকের বাড়ীর ফটকে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সেই কবিতাটিই নাকি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চবিলাপের ন্যায় সেক্সপীয়রের সর্ব্বপ্রথম স্বতঃস্ফূর্ত্ত রচনা। এই কবিতায় এমন তীব্র শ্লেষোক্তি ছিল যে ভদ্রলোক সেক্সপীয়রকে জব্দ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি শক্তিশালী ও বিত্তশালী ছিলেন। প্রবাদ, এঁরই ভয়ে সেক্সপীয়র দেশ ছেড়ে লণ্ডনে পালিয়েছিলেন। লণ্ডনে এসে তিনি নাকি থিয়েটারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থিয়েটারে আগত দর্শকদের ঘোড়া ধরা এবং তাদের ঘোড়া আগলে ও সামলে রাখার কাজ করতেন। সেকালে যানবাহনের প্রচলন না থাকায় দূরের লোক যাঁরা, তাঁদের ঘোড়ায় চড়েই থিয়েটারে আসতে হ'ত। সেদিন তাঁরা কেউ জানতেন না যে, তাঁদের এই অশ্বপালক ছেলেটি এক দিন এই থিয়েটারের নাট্যমঞ্চ থেকেই পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করে যাবেন।

যদিও অভিনয় আরম্ভ হবার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল, কিন্তু আমরা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ক্ষুদ্র জনপদ 'ষ্ট্রাটফোর্ড অপন আভন'-এর যেখানে যা ছিল এই ক'দিনে সব খুঁটিয়ে দেখা হয়ে গেল। সেক্সপীয়র মেমেরিয়াল থিয়েটার মাত্র ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়েছে। আধুনিক ধরণের বৃহৎ বাড়ী। বহিরঙ্গের কোনও প্রসাধন নেই। কিন্তু এর রঙ্গমঞ্চ লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে সমান। এটিকে ব্রিটেনের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় রঙ্গালয়ও বলা

যেতে পারে। কারণ দেশের জনসাধারণের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত চাঁদায় প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে মহাকবির এই স্মৃতিনাট্যপীঠ নির্ম্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে চিত্র-শালা, যাদুঘর ইত্যাদি দেখতে দেখতে অভিনয়ের সময় এগিয়ে এল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম। সে দিন প্লে হ'ল কবির 'কিং লীয়ার' নাটকখানি। অপূর্ব্ব অভিনয়। যেমনি পরিচ্ছন্ন এর প্রযোজনা তেমনি মর্য্যাদাপূর্ণ রূপদক্ষতা। অভিনয়ের মধ্যে আবেগের উত্তেজনার চেয়ে বেদনার গাম্ভীর্য্যই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল বেশি, দৃশ্যপট ও পোশাক-পরিচ্ছদ অনবদ্য। রূঢ় বাস্তবতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশের সঙ্গে ভাবগর্ভ রূপকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য সম্মিলিত হয়ে একটা সুসঙ্গত স্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

ষ্ট্রাটফোর্ডের বাড়ীওয়ালী ও আমরা

খুশীতে ভরে-ওঠা মন নিয়ে ঘরে ফিরলাম। বার বার মনে হতে লাগল সার্থক হ'ল আজ আমাদের এখানে আসা।

পরের দিন সকালের মোটর-কোচে আমরা অক্সফোর্ড বেড়িয়ে লণ্ডনে ফিরে এলাম। ফেরবার আগে দিয়ে এলাম পরম শ্রদ্ধাভরে মহাকবির সমাধিতে আমাদের পুষ্পাঞ্জলি।

দোটানা

শ্রীকালিদাস রায়

হাতে পেলে নতুন নতুন বই
কাজ ফেলে সব পড়ায় রত হই।
মনটা তখন কয়,
'লিখলে কিছু হয়,'
বই ফেলে তাই কাগজ কলম লই।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে তাকাই বইয়ের দিকে
মন বলে, 'মোর কি হবে ছাই লিখে।'
লেখার চেয়ে ভাবি,
পড়ার বেশি দাবি,
লিখ্‌ব পরে, বই প'ড়ে নিই শিখে।

নগরমাঝে শান্তি না পাই প্রাণে,
পল্লী আমায় হাতছানিতে টানে।
গ্রামে যখন যাই,
সঙ্গ নাহি পাই,
নগর আবার নিজের বুকেই আনে।

গুঞ্জনে সুখ নেই কি উড়ে উড়ে
ফুলবাগানের সভায় ঘুরে ঘুরে ?
হয় না মধুপান,
কে শোনে মোর গান ?
ডাকে ফুলের মধুই তৃষাতুরে।

এ যেন ঠিক নববধূর মত,
শ্বশুর-ঘরে মন বসে না তত।
বাপের ঘরে যায়
ফিরতে কেবল চায়,
ডাকে বঁধুর আদর অবিরত।

মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ্রদেশ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

৫

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ

চিরল সত্যাগ্রহ—অন্ধ্ররত্ন তুগ্গিরালা গোপালকৃষ্ণাইয়া—১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহের আদর্শ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধ-শক্তিকে জাগ্রত করে তোলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ব্ব-বঙ্গের চট্টগ্রামে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ন্যায় অন্ধ্র দেশের চিরল গ্রামের অধিবাসীদের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামও দেশবাসীর মনে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের জবরদস্তির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করে চিরলের নর-নারী সেদিন যে আদর্শনিষ্ঠা ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছিল তা বিস্ময়কর। এই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম যাঁর নেতৃত্ব ও সংগঠনশক্তির দরুন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সেই বিচিত্রকর্ম্মা অন্ধ্ররত্ন গোপালকৃষ্ণাইয়ার কৃতির কথা আজও অন্ধ্রদেশে ঘরে ঘরে পরিকীর্ত্তিত।

কৃষ্ণা জেলার পেন্নুগাঞ্চিপ্রলু নামক স্থানে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন গোপালকৃষ্ণাইয়ার জন্ম হয়। তিনি তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং নয়নের মণিস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিধাতাপুরুষ যেন তাঁর ললাটে দুঃখের জয়টীকা এঁকে দিয়ে তাঁকে নিজের চিহ্নিত সেবক করে নিলেন। তিনি যখন মাত্র তিন দিনের শিশু তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হ'ল, এবং অদৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, ঠিক তিন বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতাকেও হারালেন। তখন এই পিতৃমাতৃহীন অনাথ অনাশ্রিত বালকের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন তাঁর খুল্লতাত শ্রীশিবরামাইয়া। যথাসময়ে তাঁকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল লেখাপড়ায় তাঁর তেমন মনোযোগ নেই। তার আসল অনুরাগ খেলাধুলা আর নাট্যাভিনয়ের উপর। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করবার পর গোপালকৃষ্ণাইয়া নাট্যকলার সাধনায় কায়মনোবাক্যে আত্ম-নিয়োগ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং ১৯০৭ সালে বন্ধু পঞ্চপাকা-সাইয়ারের সহযোগিতায় ন্যাশনাল ড্রামাটিক এসোসিয়েশন নামে একটি নাট্যসমিতি স্থাপন করলেন। ক্রমে নৃত্যকলার প্রতিও তাঁর অনুরাগের সৃষ্টি হয় এবং ভরত নাট্যমের অনুশীলনে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। এর পর থেকে চার বৎসর কাল অন্ধ্র-দেশে ভরত নাট্যমের প্রচারই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের ব্রত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার দরুন অন্ধ্রদেশে যে জাতীয়তার বান ডেকে-ছিল তার তুমুল গর্জন কলালক্ষ্মীর এই একনিষ্ঠ সাধকের ধ্যান ভঙ্গ করতে সমর্থ হয় নি।

গোপালকৃষ্ণাইয়া জন্মেছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও প্রচণ্ড কর্ম্ম-শক্তি নিয়ে। ১৯১১ থেকে ১৯২০ এই দশ বৎসর তিনি যেন উল্কার মত দুর্ব্বার বেগে লক্ষ্যহীন ভাবে এগিয়ে চলছিলেন—খুঁজে পান নি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি। অবশেষে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় মহাত্মা গান্ধীর উদাত্ত আহ্বান তাঁর সুপ্ত দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল—মহাত্মাজীর জীবনাদর্শের আলোকে এই কর্ম্মবীর
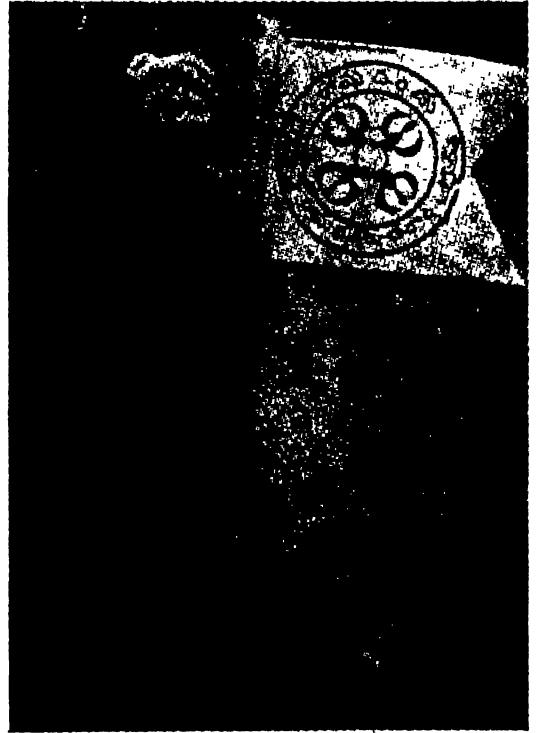
অন্ধ্ররত্ন তুগ্গিরালা গোপালকৃষ্ণাইয়া

পেলেন চলার পথের হদিস। অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করলেন—তারপর থেকে কণ্টকমুকুট মাথায় পরেই তাঁকে সারাজীবন চলতে হয়েছে কর্ত্তব্যকঠিন ক্ষুরধার বন্ধুর পথে।

অন্ধ্রদেশের জনসাধারণের উপর গোপালকৃষ্ণাইয়ার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব দেখে সরকার তাঁকে শাস্তি দিয়ে দমন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। বেজওয়াদাতে এক জনসভায় প্রদত্ত মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা তেলুগু ভাষায় অনুবাদ করার অপরাধে তাঁর "গোষ্ঠীসভে"র বাট একর জমি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। কিন্তু এই শাস্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে অন্ধ্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক তিনি অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচার করতে

জাগালেন, তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা অন্ধ্রজনের জনমানসে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পরে অনুষ্ঠিত গুন্টুর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁকে "অন্ধ্ররত্ন" উপাধিতে ভূষিত করা হ'ল।

অতঃপর গোপালকৃষ্ণাইয়া গুন্টুর জেলায় চিরল নামক স্থানকে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করলেন। সেখানে তিনি রামদণ্ডু (রামের বাহিনী) নামে এক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনপূর্ব্বক বক্তৃতা এবং ভজন গানের মাধ্যমে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জাতীয় ভাবধারা প্রচার করতে লাগলেন। এই গৈরিকবসন-পরিহিত,

ডাঃ ব্রহ্মজহ্বালা সুব্রাহ্মণীয়ম
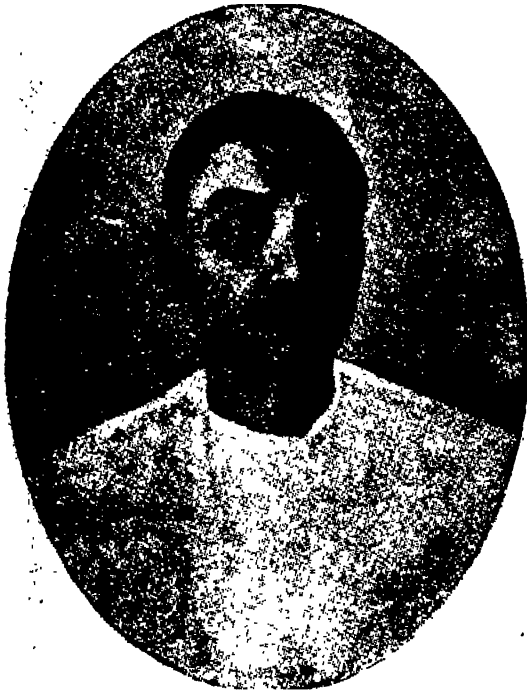
'কপিধ্বজ'ধারী, সন্ন্যাসীকল্প স্বদেশপ্রেমিকের প্রচারকার্য্যের ফলে চিরল এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র অসন্তোষ প্রধূমিত হয়ে উঠল। ৩১শে মার্চ বেজওয়াদায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভার অধিবেশনের অব্যবহিত পরে, সরকার যখন চিরল গ্রামকে মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত করতে উদ্যত হলেন তখন চিরলবাসীরা এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হ'ল।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন পানাগলের রাজা—তিনি নানাভাবে কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন।...চিরলের লোকেরা কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির জন্য আদৌ আগ্রহান্বিত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যখন গান্ধীজীর পরামর্শ চাওয়া হ'ল তখন তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, জনসাধারণ যদি মিউনিসিপ্যালিটি না চায় তা হলে তাদের কর্ত্তব্য মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাইরে গিয়ে অবস্থান করা।...মহাত্মাজী যে কর্মপন্থার নির্দেশ দিলেন তা চিরল-গ্রামবাসীদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল, তারা বাস্তুত্যাগ করতে হ'ল বদ্ধপরিকর। এই সঙ্কট-সময়ে তাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন অন্ধ্ররত্ন গোপালকৃষ্ণাইয়া। যে গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে সেটি সুসম্পন্ন করবার জন্যে তিনি সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করলেন এবং সুষ্ঠুভাবে এই বাস্তুত্যাগীদের অভিযান পরিচালনা করে তাদের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় চিরলের অধিবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশার পরিসীমা রইল না এবং তাদের দুর্গতি হ'ল দীর্ঘকালস্থায়ী। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করে সেগুলিতে তাদের বাস করতে হ'ল দশ মাসেরও অধিককাল। সরকার নেতাদের গ্রেপ্তার করতে লাগলেন নানা অছিলায়, তন্মধ্যে যাঁরা অসহযোগী ছিলেন না তাঁদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানো হ'ল। প্রজাসাধারণ প্রায় বৎসরখানেক বাস্তুহারা অবস্থায় দিন গুজরাণ করে অবশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করলে তাদের ভদ্রাভিটায়।'*

এমনি ভাবে অশেষ দুঃখবরণ ও অপূর্ব্ব সংগঠনশক্তি বলে চিরল সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে গোপালকৃষ্ণাইয়া চিরলবাসীদের হৃদয়ে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন—তিনি লাভ করলেন চিরলের 'মুকুটহীন রাজা'র মর্য্যাদা।

এই বৎসরেই গোপালকৃষ্ণাইয়া বেরামপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং অন্ধ্র সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করতে গেলে পর তাঁর উপর এই মর্ম্মে ১৪৪ ধারার এক নোটিশ জারী হ'ল যে সম্মেলনে তিনি কোন বক্তৃতা করতে পারবেন না। এই আদেশ অমান্য করায় তিনি এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কারাগার থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি প্রচার করতে লাগলেন তাঁর অভিনব আধুনিক 'স্মৃতি'—তা এই যে, ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা প্রত্যেক ভারতবাসীকে অর্জ্জন করতে হবে ব্রাহ্মণত্ব।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণাইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তার পর থেকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র হয় বেজওয়াদা। কংগ্রেস-সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে নিজের অপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতা বলে তিনি বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে সক্ষম হন। কিছুকাল তিনি অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সেক্রেটারি ছিলেন। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেও তিনি কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করেন।

১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে কোকনদায় মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে গোপালকৃষ্ণাইয়া নিজের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। ঐ বৎসরের কংগ্রেসের রিপোর্টে বার বার তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ দিবসে

*The History of the Congress—Vol. I by Pattabhi Sitaramayya, p. 219.

তিনি সভাপতির বক্তৃতা মুখে মুখে তেলুগু ভাষায় তর্জমা করেন। অধিবেশনের শেষ দিবসে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, ডাঃ সইফুদ্দীন কিচলু এবং গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে এই তিন জন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলে পর, বিদায়ী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি গোপালকৃষ্ণাইয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন :

—"I hope you will all place on record your sense of gratefulness to our retiring Secretaries. I would particularly like to mention Mr. Gapalakrishnayya, our Working Secretary, who has been most indefatigable in assisting us."

অর্থাৎ—'আমি আশা করি আপনারা সকলেই আমাদের বিদায়ী সম্পাদকদের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। আমি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই আমাদের ওয়ার্কিং সেক্রেটারি গোপালকৃষ্ণাইয়ার কথা, যিনি অক্লান্তভাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করেছেন।'

গোপালকৃষ্ণাইয়া শুধু রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধনেও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। ১৯২৪-২৬ এই দুই বৎসর সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র অন্ধ্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। কিছুকাল তাঁর পরিচালনাধীনে 'সাধনা' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এমনিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুন তাঁর স্বাস্থ্য অকালে ভেঙে পড়ল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নিদারুণ ব্যাধিতে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং দীর্ঘ দুই বৎসরকাল দারিদ্র্য ও ব্যাধির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে অবশেষে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন গুণ্টুরে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোপালকৃষ্ণাইয়ার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ চিরালের নিকটবর্তী রামনগরে তার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়।

বীরমন্দিরে গোপালকৃষ্ণাইয়ার তৈলচিত্র উন্মোচিত হয় আচার্য্য বিনোবা ভাবে কর্তৃক।

ব্রহ্মজস্যুলা সুব্রাহ্মণীয়ম—অসহযোগ আন্দোলনের সময় অন্ধ্রদেশের দিকে দিকে যেন একটা নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে যুগে মহাত্মা গান্ধীর নূতন আদর্শ ও ভাবধারাকে কর্মে রূপায়িত করবার সাধনায় অন্ধ্রদেশের যে সকল দেশপ্রেমিক আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার ব্রহ্মজস্যুলা সুব্রাহ্মণীয়ম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বীরমন্দিরে তাঁর তৈলচিত্র উন্মোচন করেন দেশভক্ত ভেঙ্কটাপ্পাইয়া।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর গুণ্টুর জেলার ফিরাঙ্গিপুরে সুব্রাহ্মণীয়মের জন্ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহেন্দ্রীতে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়েন্দা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে হাতেখড়ি হয় সত্য, কিন্তু এতে তিনি যেন তাঁর অন্তরের সায় পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নীরব কর্মী নিজের পথ খুঁজে পেলেন, তিনি সক্রিয়ভাবে এতে যোগদান করলেন। ১৯২৩-এর কোকনদা কংগ্রেসেও তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দেশভক্ত ভেঙ্কটাপ্পাইয়ার ন্যায় সুব্রাহ্মণীয়মও ছিলেন মনে-প্রাণে গঠনমূলক কর্মের অনুরাগী। শান্ত প্রকৃতির হলেও তিনি সংগ্রামবিমুখ ছিলেন না।

ইয়েল্লাপ্রি সম্মাবিগারু
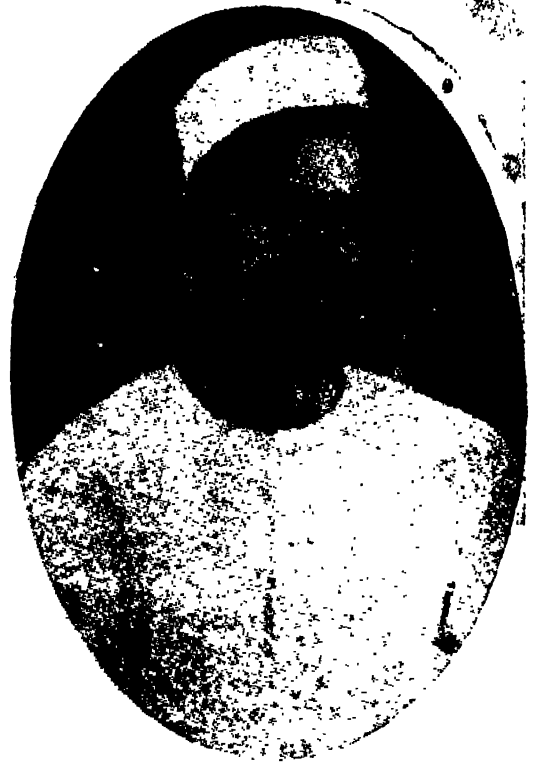
কিন্তু ভাঙা অপেক্ষা গড়ার দিকেই ছিল তাঁর মনের প্রবণতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলাদলি তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন একান্তভাবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কংগ্রেসের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যখন জটিল আবর্তের সৃষ্টি হ'ল তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরে এলেন এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সীতানগরমে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তার নামকরণ করলেন সত্যাগ্রহ আশ্রম। তখন থেকে মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মের আদর্শে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা, বিশেষভাবে খদ্দর-প্রচারই হ'ল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। ক্রমে ক্রমে আশ্রমটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী এই আশ্রম পরিদর্শন করেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহের সময় মহাত্মা গান্ধীর এই মন্ত্রশিষ্যটি আশ্রমের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিত্যাগ করে আবার অহিংস-সংগ্রামের পথে পা বাড়ালেন। তাঁর অধিনায়কত্বে একদল সত্যাগ্রহী লবণ আইন অমান্য করবার উদ্দেশ্যে কোকনদার

পট্টভি সীতারামাইয়া

পথে অগ্রসর হ'ল। পুলিসের বেপরোয়া লাঠিচালনার ফলে ডাঃ সুব্রাহ্মণ্যম আহত হলেন, অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হ'ল—এটা তাঁর তৃতীয় বার কারাবরণ। কিন্তু শুধু তাঁকে এই শাস্তিপ্রদান করেই সরকার নিবৃত্ত হলেন না, কর্তৃপক্ষের আদেশে পুলিসের লোকেরা তাঁর এত সাধের আশ্রমটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্মসাৎ করে দিলে। কিন্তু যে উন্নত আদর্শবাদ ডাঃ সুব্রাহ্মণ্যমকে দেশের জন্য অম্লান বদনে অশেষ দুঃখদুর্গতি, লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করবার ক্ষমতার অধিকারী করেছিল তাকে ধ্বংস করা রাজশক্তির পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি আবার জনকল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন—এবার তিনি দীক্ষা নিলেন উপেক্ষিত অবজ্ঞাত মানবতার সেবার নবমন্ত্রে। সীতানগরমে পুরানো সত্যাগ্রহ আশ্রমের ভস্মস্তূপের উপর গড়ে উঠল নূতন সেবা-প্রতিষ্ঠান—হরিজন আশ্রম। এ ধরণের সেবাকার্য্য যে জাতিগঠনের প্রকৃষ্ট পন্থা একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে তিনি দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, নিদারুণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে অন্ধ্রদেশের এই শ্রেষ্ঠ লোকসেবক অকালে পরলোকগমন করলেন।

ইয়েল্লাপ্রগাড়া সন্নারিগাক্—অসহযোগ আন্দোলনের সময় ডাক্তার সুব্রাহ্মণ্যমের ন্যায় অন্ধ্রের আর একজন দেশপ্রেমিক জনমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন—তাঁর নাম ইয়েল্লাপ্রগাড়া সন্নারিগাক্। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন সুব্রাহ্মণ্যমের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর বিপুল দেহ যেমন অমিত শক্তির আধার ছিল, তেমনি তাঁর প্রকৃতিতে যোদ্ধার ভাবও ছিল প্রবল। অন্ধ্রের রাজনৈতিক আকাশে তিনি যেন অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন এক প্রচণ্ড ধূমকেতুর মত।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্নারিগাকর জন্ম হয়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা প্রথম যৌবনে তাঁকে দীক্ষিত করে অগ্নিমন্ত্রে। ১৯১৯ সালে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২০ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্য্য পরিত্যাগ করে সন্নারিগাক্ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তাঁর এক বৎসরের জন্য কারাবাস হয়। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের আদর্শ তাঁর মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। তিনি স্বরাজ্য পার্টির একজন নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুস্থান সেবাদলে যোগদান করে বোম্বাইয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করায় তিনি তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাঁর পত্নীরও ছয় মাসের জেল হয়। জেলের কুব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে সন্নারিগাক্ অনশনব্রত অবলম্বন করেন। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের দরুন পুরা এক বৎসর দণ্ডভোগের পূর্ব্বেই তিনি ছাড়া পান। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরে আবার সরকারকর্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হন।

সন্নারিগাক্ ছিলেন পৌরুষ শক্তিমত্তা জ্বলন্ত দেশানুরাগ এবং তেজ ও বীর্য্যের প্রতীক। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে রীতিমত ভীতির চক্ষে দেখতেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬

গুদেম এজেন্সীর সশস্ত্র বিদ্রোহ—অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি অন্ধ্রদেশের গুদেম এজেন্সীতে—গোদাবরী এবং বিশাখাপত্তন জেলায় অন্ধ্র বীর আল্লুড়ি শ্রীরামরাজা (সীতারাম রাজু) কর্ত্তৃক পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহের কাহিনী অন্ধ্রের তথা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।* যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে এই

* শ্রীরামরাজা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আলোচনা বর্ত্তমান লেখক প্রথম করেন। এ সম্বন্ধে তাহার একটি প্রবন্ধ ১৩৫৮ সনের শারদীয়া সংখ্যা 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়। 'মডার্ণ রিভিউ', ১৯৫২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত বর্ত্তমান লেখকের "On The Bank of the Godavari." নামক প্রবন্ধেও শ্রীরামরাজা সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু নূতন তথ্য—যা তাহার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে দেওয়া হয় নি, তা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হ'ল।

বিদ্রোহের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তথাপি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এর জন্য কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক প্রভাবকে দায়ী করেছিলেন।

রুম্পা বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মোপলা বিদ্রোহের অনতিকাল পরে। পুলিসবাহিনী প্রেরণ করেও সরকার ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহ-দমনে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নাই। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সরকারকর্ত্তৃক 'আসাম রাইফেল্‌স' অন্ধ্রের এজেন্সী অঞ্চলে প্রেরিত হ'ল—২৫০ জন অফিসার এবং অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন এই সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। সীতারাম রাজু মাত্র দুই শত জন অনুচরসহ প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রায় তিন বৎসর গরিলা যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে পরাভূত হন এবং রুম্পা বিদ্রোহের অবসান হয়। এই বিদ্রোহের সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার গুলিবর্ষণের ফলে সীতারাম রাজুর শোচনীয় জীবনাবসান। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগ এই যে, গ্রেফতারের সময় তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁকে গুলি করে মারা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান এবং রিপোর্ট প্রকাশের জন্য বহুবার চ্যালেঞ্জ করা হয়। সরকার কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেন নাই।*

৭

গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের পরে—ভাদাপল্লীতে পুলিশের গুলিবর্ষণ—অসহযোগ আন্দোলনের দশ বৎসর পরে ১৯৩০ সালে মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করে দেশবাসীকে দ্বিতীয় বার অহিংস-সংগ্রামের পথে আহ্বান করলেন। অন্ধ্রবাসীরা এবারও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অন্ধ্রদেশের যে সকল জননায়ক নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন—এবারও তাঁদের অনেককে দেখা গেল জনতার পুরোভাগে। তাঁদের নেতৃত্বে 'অসহযোগ আন্দোলনের সূতিকাগার' (Cradle of Non co-operation movement) অন্ধ্রদেশে আর একবার বিরাট জনজাগৃতির লক্ষণ দেখা দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই সরকার চণ্ডনীতির প্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠলেন, ফলে আইন অমান্যকারীদের অদৃষ্টে জুটল কারাবরণ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর নির্যাতন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হ'ল বটে, সরকারী দমননীতি কিন্তু রইল অপরিবর্ত্তিত। ফলে ভারতের নানা স্থানে লোকেদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও আচরণ আত্মপ্রকাশ করল। ওদিকে সরকারী কর্ম্মচারীরা অনবরত চুক্তিভঙ্গ করে চলল। এর প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসীর তরফ থেকে এখানে সেখানে চুক্তির সর্ত্ত প্রতিপালনে সামান্য একটু ব্যত্যয় হলেই সদাসতর্ক সরকারী কর্ম্মচারীরা কংগ্রেসীদের উপর হুকুম জারি ও জোরজবরদস্তি করতে লাগলেন। দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উপর লাঠিচালনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাতে তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। গান্ধী-আরউইন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও যে সকল অঞ্চলে পুলিস এ ধরণের অত্যাচার অবাধে চালিয়ে যেতে থাকে, অন্ধ্রদেশের গুণ্টুর তার অন্যতম। ঐ সময়ে পূর্ব্বগোদাবরী জেলার ভাদাপল্লীতে এক অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। পুলিস সেখানে নির্ব্বিচারে গুলি চালিয়ে চার জনকে নিহত এবং বহু

অন্ধ্রকেশরী টি. প্রকাশম

লোককে আহত করে। জনগণের অপরাধ এই যে, তারা একটি গাড়ীর উপর গান্ধীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেছিল এবং পুলিসের নিষেধসত্ত্বেও নামাতে রাজী হয় নি।

৮

হরিপুরা কংগ্রেসের পরে: অন্ধ্রের পৃথককরণ ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-পুনর্গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব—১৯৩৮ সালের ১৯, ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারি এই তিন দিন হরিপুরা, বিঠল-নগরে কংগ্রেসের একপঞ্চাশত্তম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের পর প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের ব্যাপারে ভাষাগত সমস্যার জটিলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশ এই তিনটি প্রদেশ হচ্ছে বহু ভাষাভাষী লোকের বাসভূমি। দক্ষিণ প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে এমন শতাধিক অন্ধ্র সভ্য ছিলেন, তামিল মলয়ালম বা কেনারিজ ভাষা যাঁদের বোধগম্য হ'ত না। এতে ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্য-পরিচালনায় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কেনারিজ এবং মলয়ালী সদস্যদের নিয়েও এই একই ধরণের সমস্যা

* *History of the Indian National Congress* by Pattabhi Sitaramayya, Vol. I, p. 294.

দেখা দেয়। এই অবস্থায় প্রতিকারকল্পে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অন্ধ্র ও কেরলের পৃথককরণ এবং কর্ণাটক একীকরণের (unification) এক ডেপুটেশন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট একযোগে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠন সম্পর্কে নিজ নিজ দাবি উপ-

মণ্ডপতি পূর্ণচন্দ্র রাও

স্থাপিত করে। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের দাবি শুনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে এই বিষয়ে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, ভবিষ্যতে যথাযোগ্য ক্ষমতা করায়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত প্রশ্নের সমাধান ভারত-সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হবে।*

৯

ত্রিপুরী কংগ্রেস : পট্টভি সীতারামাইয়া ও সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—হরিপুরা কংগ্রেসের পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরীতে। এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র এবং অন্ধ্রের কংগ্রেস-নেতা, গান্ধিজীর মন্ত্রশিষ্য পট্টভি সীতারামাইয়ার মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তা সমগ্র দেশে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এই নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গে পট্টভি সীতারামাইয়া স্বয়ং তাঁর *History of the Indian National Congress* নামক পুস্তকে যা বলেছেন তার সারমর্ম এখানে দেওয়া যাচ্ছে :

"তখন দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কতকটা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অন্তরের সহজ প্রেরণাবশে গান্ধীর মনে এই প্রতীতি জন্মাল যে, ত্রিপুরীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি নির্বাচিত হলে সেই সুবাদে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে। সেইজন্যই তিনি সুভাষচন্দ্রের সভাপতি-পদ-প্রার্থিতায় উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। তা সত্ত্বেও কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বন্ধুবর্গ কর্তৃক তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করা হ'ল এবং তিনি নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে রাজী হলেন। মৌলানার নাম যথাসময়ে ঘোষিত হ'ল।

বারদৌলি থেকে চলে আসার সময় গান্ধী লেখককে (পট্টভি) জানালেন, মৌলানা যদি রাজী না হন ত' হলে সে বছর কাঁটার মুকুট তাঁর (পট্টভির) মাথায় পরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে তাঁর (গান্ধীর) মনোগত অভিপ্রায়।...শেষ পর্যন্ত মৌলানা নিজের নাম প্রত্যাহার করলে পর লেখক এবং সুভাষবাবু প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এই প্রতিযোগিতা—প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যে অন্ততঃ একজনের নিকট ছিল অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত।...সুভাষবাবু ৯৫ ভোটে তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে কৃতকার্য হলেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তার ফলাফল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের পরিবর্তে মূলনীতি এবং কর্মপন্থাগত বিরোধে পরিণতিলাভ করবে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হ'ল এবং ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন গান্ধী তাঁর সেই ঐতিহাসিক বিবৃতি দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন যে, সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় তাঁর নিজেরই পরাজয়। এই বিবৃতি সমগ্র দেশে বিস্ময়মিশ্রিত ত্রাসের সৃষ্টি করল।"*

পট্টভি সীতারামাইয়া যে প্রসন্ন মনেই এই পরাজয়কে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর নিজের লেখাতেই তার প্রমাণ আছে। আদর্শ এবং নীতিগত পার্থক্যসত্ত্বেও, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কত উচ্চ সেকথা ব্যক্ত হয়েছে আই-এন-এর বিচার-প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত তাঁর নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে :

Suffice it for the contemporary world to know that here was a man, every inch a 'man' that did not shine by reflected light, that had his own inner radiance, that could dare and act, for he knew the truth of great dictum that success often comes to those who dare and act. It seldom goes to the timid . . . Subhas did dare and did act with what measure of success, posterity alone must judge.†

অর্থাৎ, সমসাময়িক পৃথিবীর পক্ষে এইটে জানাই যথেষ্ট যে, তিনি এমন একজন পুরুষ—একেবারে ষোল আনা 'পুরুষ' যিনি ধার-করা আলোকে প্রদীপ্ত হন নি, যাঁর ছিল নিজস্ব আভ্যন্তরীণ দীপ্তি, যাঁর ছিল সাহস, ছিল কর্মক্ষমতা। কেননা তিনি এই নীতির সত্যতা অবগত ছিলেন যে, কৃতকার্য তারাই হয়, যারা সাহসী, যারা করিতকর্মা। ভীরুর ভাগ্যে সাফল্যলাভ ঘটে কদাচিৎ। সাহসিকতা এবং কর্মিষ্ঠতা দ্বারা সুভাষ কতটা সাফল্যলাভ করেছিলেন ভাবীকালই তার বিচার করবে।

* *History of the Indian National Congress*, Vol. II, p. 76.

* *History of the Indian National Congress*, Vol. II, p. 105, 106.

† *Ibid.*, p. 106.

পট্টভির বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাদেশের দান কতখানি তার যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করেন নাই, বাংলাদেশের উপর অবিচার করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত ততটা নয়, যতটা অজ্ঞতাপ্রসূত। আসলে বাংলাদেশের জাতীয়তা এবং জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। বাঙালী গবেষক এবং সন্ধানীদের চেষ্টায় বাংলায় জাতীয় জাগরণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে অধিকাংশই বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ। সেগুলি ইংরেজীতে অনূদিত হলে পট্টভির গ্রন্থ এই ত্রুটি থেকে হয়তো মুক্ত হতে পারত।

তথ্যঘটিত ত্রুটি থাকলেও পট্টভি কিন্তু বাংলাদেশকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত হন নি, বরং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার যুবক এবং দেশপ্রেমিকরাই যে সবচেয়ে বেশী দুঃখবরণ করেছে, জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে তাদের প্রচেষ্টাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক, এ ধরণের কথা তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায়। ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি-নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

He (Subhas Babu) comes from a province whose young men had suffered most in the annals of India, had striven most in promotiong national culture and suffered most in effecting Indian emancipation."*

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় (১৯৪৮) পট্টভি তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন—তখন তাঁর বয়স সত্তর বৎসর।

গান্ধীজীর যোগ্য শিষ্যদের মধ্যে পট্টভি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। গান্ধীবাদকে জনপ্রিয় করবার জন্যে তাঁর কর্ম্ম-প্রচেষ্টার তুলনা নেই। তাঁর অদম্য উৎসাহ এবং একাগ্র নিষ্ঠার দরুন অন্ধ্রদেশ গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। একদা অখ্যাত এবং উপেক্ষিত অন্ধ্র যে আজ কংগ্রেসের মানচিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়ে স্থান পেয়েছে তার মূলে রয়েছে বিশেষভাবে তাঁরই কর্ম্মসাধনা। জনকল্যাণমূলক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উঁচুদরের সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

'স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ' গঠনের দাবি যে আজ এত জোরালো হয়ে সর্বভারতীয় গুরুত্ব অর্জন করেছে তার জন্য অন্ধ্রবাসীরা ডাঃ ভোগরাজু পট্টভি সীতারামাইয়া—এই তাঁর পুরা নাম—নিকট অশেষ ঋণী। এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি যেভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করেছেন তা বিস্ময়কর।

পট্টভির জীবনের আর একটি স্বপ্ন ছিল ভারতের দেশীয় রাজ্য-সমূহের বিলুপ্তিসাধন। বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিনি দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণের পক্ষাবলম্বন করেন তখন স্বয়ং গান্ধীজী পর্য্যন্ত তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠেন। শেষে অবশ্য গান্ধীজী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেল এঁরা তিন জনেই পট্টভির যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া কর্তৃক কাকনাদার বীরমন্দিরের উদ্বোধন

দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিদের ক্ষমতাবিলোপ এবং ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশগঠন এই দুইটি ছিল পট্টভির জীবনের প্রধান ব্রত—সারা জীবন ধরে তিনি এ দুটির কথা প্রচার করে আসছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিতে তাঁর প্রথম স্বপ্নটি সফল হয়েছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিও আজ এরূপ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে যে তা অন্ধ্রবাসীদের মনকে আশায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

অন্ধ্রের উন্নয়নকল্পে পট্টভির বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু নিজের প্রদেশে জনমনে তাঁর তেমন প্রতিষ্ঠা নেই, সেখানে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নাই। অন্ধ্রের জনপ্রিয় নেতা হচ্ছেন টি. প্রকাশম্। কে. রামরাও ১৯৪৮-এর কংগ্রেস-সংখ্যা হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় এর হেতু বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

"You can do nothing great in the world, unless you try to be a hero, even if you are not one by nature. It is why in Andhra Prakasam is popular, deservedly because, though, modest intellectually, he is lion-hearted and can face bullets like flowers."

পট্টভির চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এই 'বীরোচিত ভাবধারা'র

---

* *History of the Indian National Congress*, p. 75.

(heroic elements) একান্ত অভাব এবং এরই দরুন তিনি জনচিত্তে আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন নাই।

১৯৪০-৪১-এর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন : পট্টভি এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের চেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শ অন্ধ্রদেশের জনসাধারণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে কিরূপ সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৪০-৪১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যাপারে। সত্যাগ্রহীদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সরকার দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড এবং মোটা রকম জরিমানা ধার্য্য করলেন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের সত্যাগ্রহীদের নিকট থেকে সব চেয়ে বেশী জরিমানা (১৬,৫৩৩ টাকা) আদায় করা হয়েছিল এবং এই প্রদেশে গ্রেপ্তার হয়েছিল ৮৮২ জন। গ্রেপ্তারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হয় যুক্তপ্রদেশে—তার পরেই অন্ধ্রের স্থান।

১০

৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন : ১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরে সরকারের স্বৈরাচার যখন সীমা অতিক্রম করল তখন অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় অন্ধ্রদেশেও জনগণ বৈপ্লবিক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশ্য ভাবে ধ্বংসাত্মক কার্য্যে মেতে উঠল।

তারা অন্ধ্রদেশের কুড়িটি প্রধান রেল ষ্টেশন ধ্বংস করল, ট্রেনের অনেকগুলি বগি পুড়িয়ে দিলে। প্রায় হাজার মাইলব্যাপী রেল লাইনের 'রেল' স্থানে স্থানে সরিয়ে ফেলল। আমলাতন্ত্রের বর্ব্বরোচিত হিংস্র আচরণে ক্ষিপ্তপ্রায় জনতা কর্ত্তৃক সরকারী আপিস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিস লাইন, পোষ্ট আপিস, পুলিসের ডেপুটি-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আপিস ইত্যাদি ধ্বংসের চেষ্টা হ'ল সাফল্যমণ্ডিত—গুন্টুরে লবণের ডিপোতে হানা দেওয়ার ব্যাপারটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ এবং গুন্টুরের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবস্থা এক সপ্তাহেরও অধিক কালের জন্য অচল হয়ে রইল।

৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে অন্ধ্রদেশের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ছাত্রসমাজ এবং তরুণরাই ছিল পুরোভাগে। সেই সঙ্কট-সময়ে জনগণের নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে তারা এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নূতন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছে, এবং এটা তাদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা যে, তাদের কাজের দরুন একটিও প্রাণহানি হয় নাই।

আন্দোলনকে দমন করবার জন্য অবশেষে সুরু হ'ল পুলিসের অত্যাচার—গুলিবর্ষণে একুশ জন নিহত এবং বহু শত লোক হ'ল আহত এবং প্রায় ২০০০ জনকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ছয়টি আন্ধ্র জেলায় পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হ'ল সমস্ত ছয় লক্ষ টাকা। এত উৎপীড়ন সত্ত্বেও কিন্তু অন্ধ্রবাসীদের মনোবল রইল অটুট, সাহস ও বীরত্বসহকারে তারা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হ'ল। ফুলনাবরপক্কমের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে যে কয়টি তরুণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত লড়াই করে শ্রীরাজাগোপালাচারী তাদের মুক্তিবিধান করতে সমর্থ হলেন। যে সকল যুবক যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিল, তারাও শেষ পর্য্যন্ত ছাড়া পেলে।'*

আগষ্ট আন্দোলনে অন্ধ্রদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল পুলিসের গুলিবর্ষণে তরুণ দেশকর্ম্মী মণ্ডপতি পূর্ণচন্দ্র রাওয়ের মৃত্যুতে। তিনি ছিলেন একজন নীরব কর্ম্মী—খদ্দর প্রচার ইত্যাদি গঠনমূলক কর্ম্মকেই তিনি জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ অন্ধ্রের যুবমনে নূতন কর্ম্মপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল। বিপ্লবের অনলে আত্মাহুতি দিয়ে এই বীর যুবক অন্ধ্রদেশে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৮৮৫ থেকে ১৯৪২ এই সাতান্ন বৎসর ধরে অন্ধ্রদেশ কি-ভাবে মুক্তিসাধনার পথে অগ্রসর হয়েছে, দুটি প্রবন্ধে তার আভাসটুকুমাত্র দেবার চেষ্টা করা হ'ল। এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ,—আদিবাসী সমাজের 'ভীষ্ম' মান্নি কামাইয়া, বীর মোগলাইয়া-অন্ধ্র সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতা এম অন্নপূর্ণিয়ার পত্নী ভেঙ্কটরমণাম্মা প্রভৃতি আরো কত জনের কথা অনুক্ত রয়ে গেল। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ত্যাগ তপস্যা এবং দুঃখবরণের দিক দিয়ে বোধ হয় বাংলার পরেই অন্ধ্রের স্থান। অথচ স্বাধীন ভারতেও এই দুটি প্রদেশের দুঃখদুর্গতির অবসান হয় নাই। একদিকে যেমন দেশ-বিভাগের ফলে খণ্ডিত বাংলার জনগণ আজ অন্নসংস্থান ও বাসস্থানের সমস্যায় জর্জ্জরিত, অন্যদিকে তেমনি ভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যের কবল থেকে নিষ্কৃতিলাভ না করার দরুন অন্ধ্রের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সংস্কৃতি নিষ্পিষ্ট। এই উভয় প্রদেশের মরণ-বাঁচন সমস্যার সমাধান যে নির্ভর করে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের উপর, বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ ফিরে পাওয়ার জন্য বাঙালীর দাবি যে ন্যায়সঙ্গত—এ সকল কথাই দৃঢ়তার সহিত উদ্‌ঘোষিত হয়েছে গত ১৭ই আগষ্ট ডক্টর লঙ্কাসুন্দরমের সভাপতিত্বে অমরা-বতীতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সম্মেলনে'র অধিবেশনে গৃহীত পাঁচটি প্রস্তাবে। বহুকাল পূর্ব্বে বাংলার জাতীয়তার পরোক্ষ প্রভাবে অন্ধ্রদেশে যে প্রদেশ পুনর্গঠনের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল আজ তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

বাংলা ও অন্ধ্রের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদা যে মানসিক ও আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, বেদনার ভিতর দিয়ে আজ যদি তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে এই উভয় প্রদেশের সম্মিলিত দাবি কর্ত্তৃপক্ষকে বহুপ্রতিশ্রুত ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠনে বাধ্য করতে যে সক্ষম হবে তাতে সন্দেহ নেই ; এবং এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত বাংলা এবং অন্ধ্র এই দুই প্রদেশেরই মুক্তিসংগ্রামের অবসান হওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

---

* *Amrita Bazar Patrika*—Independence Number 1947.

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১৭

দেবানন্দ আজ তাহাদের অতিথি ডাঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে এ কথা শুনিয়া মৃণাল খুশী হইয়াছিল। প্রথমে সে যখন আড়াল হইতে ছেলেটিকে দেখে তখন হইতে কেমন একটা মায়া পড়িয়াছিল তাহার উপর। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে তাহার বিস্তারিত ইতিহাস শুনিয়া সে দুঃখ অনুভব করিয়াছিল। তিনি দেবানন্দকে ধরিয়া আনিয়াছেন খবর পাইয়া তাহার জন্য খাবার পাঠাইয়া দিয়া সে নিজে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক হইয়া বসিবার ঘরে উপস্থিত হইল।

অসুখের পরে দেবানন্দের শরীর ভাল করিয়া সারে নাই। তাহার শীর্ণ, তীক্ষ্ণ মুখখানি বড় করুণ দেখাইল তাহার চোখে। তাহার মনে হইল পারিলে সে ইহাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখিত—স্নেহে, শুশ্রূষায় সুস্থ করিয়া তুলিত। কিন্তু যে ছেলে মায়ের কোল ছাড়িয়া, ভাই-বোনের স্নেহ ছাড়িয়া দুঃখ সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে সে আটকাইয়া রাখিবে কি উপায়ে?

দেবানন্দের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য সে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতার স্রোত বহিয়া চলিল; একটু ফাঁক নাই সে স্রোতে। অগত্যা সে উঠিয়া দেবানন্দের আহারের ব্যবস্থার তদ্বির করিতে গেল।

আহার প্রস্তুতপ্রায়। ডাঃ চক্রবর্ত্তী সমানে বকিয়া চলিয়াছেন। পরদা সরাইয়া মৃণাল ঘরে প্রবেশ করিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, আর কতক্ষণ চলবে? তোমাদের খাবার দিতে বলি?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, খাবার দেবে? ইজ ইট নট টু আর্লি?

তারপর দেবানন্দকে বলিলেন, দেবানন্দ, এখন খাবে?

তাঁহার প্রশ্নে দেবানন্দ একটু চমকিয়া উঠিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর কথার সূত্র ধরিয়া সে নিজের মনে কি চিন্তা করিতেছিল।

দেবানন্দের ভাব দেখিয়া মৃণাল মৃদু হাসিল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, মৃণাল, আর পাঁচ মিনিট সময় দাও। দেবানন্দ, এবার জামালপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে মুসলমান পক্ষের কথা শোন। মুসলমান পরিচালিত কাগজ সংখ্যায় কম হলে কি হয়, তাদের গলার জোর বেশী, আর তারা যা বলে এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো তাতে রং চড়িয়ে প্রচার করে। বেশীর ভাগ সময়ে এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি খেই ধরিয়ে দেয় কি বলতে হবে, মুসলমান কাগজগুলো সেদিকে কান রেখে চেঁচিয়ে যায়। সে যা হউক, এই কাগজগুলোর বক্তব্যকে দুই ভাগে ফেলা যায়। প্রথম দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে। বক্তব্যে ওরিজিনালিটি আছে। তারা বলতে চায়—দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশেষ কিছু হয় নি, হিন্দু কাগজগুলো মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত উক্তির অভিযান চালাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে জামালপুরে প্রতিমা ভাঙ্গাটা হিন্দুদের কারসাজি। ওটা তারাই ভেঙ্গে নিরীহ মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। কেউ বলছে মুসলমানরা হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করছে এ কথা মিথ্যা, মুসলমান সেজে কোন কোন দুষ্ট হিন্দু মুসলমানদের ক্ষ্যাপাচ্ছে। কেউ বলছে হাঙ্গামা হিন্দুরাই সুরু করেছিল, মার খেয়ে তখন দোষটা বেচারা মুসলমানদের উপর দিতে চায়। কেউ গবর্ণমেণ্টের কাছে আপীল করছে জামালপুরে হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা কর। কেউ বলছে, হাঙ্গামা কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু স্বদেশীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে মুসলমানরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা হিন্দু-জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন, দোকানীদের বয়কট করবে। এর অর্থ দি ট্রাবল ইজ এগ্রেরিয়ান, পোলিটিকাল বা কম্যুনাল নয়।

—দ্বিতীয় দফা বক্তব্য হিন্দুদের আত্মরক্ষার চেষ্টা সম্বন্ধে। ফরাসীতে একটা কথা আছে, "জন্তুটার স্বভাব বড় খারাপ, মারলে কামড়াতে আসে।" মুসলমান মারবে আর হিন্দুরা চুপ করে মার খাবে মুসলমানরা এই চায়। হিন্দু ছেলেরা লাঠি ধরেছে দেখে তারা বেজায় খাপ্পা হয়েছে। "হিন্দু গুণ্ডা, এডুকেটেড গুণ্ডা," "বন্দেমাতরম ভলাণ্টিয়ার," "হিন্দু-বিপ্লবী," "বাঙ্গালী-বিপ্লবী"দের উপর তাদের বড় রাগ। একখানা কাগজ বলছে, আগে অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য থেকে গুণ্ডা বেরুত, এখন দেখছি কংগ্রেস ও বন্দেমাতরম পার্টির শিক্ষিত হিন্দুরা গুণ্ডামি আরম্ভ করেছে। এরাই কুমিল্লায় নবাব সলিমুল্লার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ কারসেটজিকে প্রহার করেছিল। এই হিন্দু গুণ্ডারা মগরায়, ঘাটরায় মুসলমান দোকান-পাট লুঠ করেছিল। তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। হিন্দু-পুলিস, উকিল, মোক্তার, পেন্‌সনপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী এই সব গুণ্ডাদের সাহায্য করে। গবর্ণমেণ্ট এদের শায়েস্তা না করলে দেশের শান্তিভঙ্গ হবে। বাখরগঞ্জের ঝালকাঠি বন্দরে তিন শত হিন্দু গুণ্ডাকে সেদিন লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করতে দেখা গিয়াছে। একখানা কাগজে বলছে, স্যর এনড্রু ফ্রেজার পাদ্রির ছেলে। সারাদিন ধর্ম্মপুস্তক পড়ছেন, হেয়ার সাহেব বন্দেমারতম দলের ভয়ে সন্ত্রস্ত আর লর্ড মিণ্টো বার্দ্ধক্য-গ্রস্ত। হিন্দু গুণ্ডারা নির্ভয়ে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে চলেছে। মিহির ও সুধাকর কাগজখানা বলছে, সরকার যত শীঘ্র হিন্দু-বিপ্লবীদের আন্দামানে পাঠান তত শীঘ্র দেশে শান্তি ফিরে আসবে। একখানা কাগজ যুগান্তর দলের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে "গলায় গামছা দিয়ে ঘর থেকে টেনে এনে নাগরা জুতোর বাড়িতে তাদের মাথা গুঁড়ো করে তাদের না-পাক দেহ ঘুঁটের আগুনে পোড়াতে"—চেয়েছে।

দেবানন্দ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। কথা বন্ধ করিয়া ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। দেবানন্দ তাঁহার হঠাৎ হাসির কারণ বুঝিতে পারিল না।

হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, আমরা ইংরেজের ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসির কথা বলি। জান এ সম্বন্ধে এই সব মুসলমান কাগজের মত কি? এরা বলে, "কংগ্রেস ত আঁতুড়ঘরে থাকতেই কথাটা বলতে সুরু করেছে। সব জেনে-শুনেও কংগ্রেস ন্যাকা সেজেছে। হিন্দু ও আমরা কি এক জাত যে ডিভাইড করবে? আমরা বরাবর ডিভাইডেড্ ছিলাম, ডিভাইডেড্ আছি। কংগ্রেসের ছেঁদো কথায় আমরা ভুলি না। আমরা রাজার জাত, হিন্দুরা গোলামের জাত।"

সিগার ধরাইয়া তিনি টানিতে লাগিলেন। বলিলেন, বাই দি বাই, দেবানন্দ, এতদিন ছিলে কোথায় বল ত? তোমার চেহারা বড় সুবিধের দেখাচ্ছে না।

দেবানন্দ—অসুখ হয়েছিল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবানন্দ কয়েক বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর তাহার চোখ পড়িল টেবিলের খবরের কাগজের উপর। বড় বড় হেডলাইন, "আনরেষ্ট ইন দি পঞ্জাব, প্যাসিভ রেজিষ্টান্স বিগিন্স, রাওয়ালপিণ্ডি ট্রাবল"—সে কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিল।

পঞ্জাবের অসন্তোষ তীব্র সরকার-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হইতেছিল। লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহ এই গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব-ভার লইলেন। প্যাসিভ রেজিষ্টান্স বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল হিন্দু ও শিখদের মধ্যে। আন্দোলনের তীব্রতায় সরকারী কর্ম্মচারীরা সন্ত্রস্ত হইয়া ভাবিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপার বুঝি পঞ্জাবে আরম্ভ হইবে এবার। রাওয়ালপিণ্ডিতে বিরাট সভা হইল বিক্ষোভ জানাইবার জন্য। সরকার নেতৃস্থানীয় কয়েক জন উকিলকে গ্রেপ্তার করিল। রাওয়ালপিণ্ডিতে দাঙ্গা আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ জনতা কয়েকজন ইংরেজকে ধরিয়া প্রহার করিল, জেলা-জজের বাড়ীর আসবাব পোড়াইয়া দিল, একটি গীর্জ্জার দরজা জানালা ও আসবাব ভাঙ্গিয়া দিল। শহরে সামরিক আইন জারি হইল, বড় বড় কামান আনিয়া হিন্দু-মহল্লাগুলির সম্মুখে পাতা হইল। সরকার লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে জেলে পুরিবার ভয় দেখাইলেন।

দেবানন্দকে মনোযোগের সঙ্গে পঞ্জাবের খবর পড়িতে দেখিয়া ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, রাওয়ালপিণ্ডির দাঙ্গার খবর পড়লে? পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববাংলার গবর্ণমেণ্টের এটিচুডের তফাৎ দেখছ? পূর্ব্ববঙ্গে সশস্ত্র গুণ্ডারা পুলিসের চোখের উপর হিন্দুদের বাড়ী-ঘর, দোকানপাট লুঠ করছে, আগুন লাগাচ্ছে, তাদের প্রতিমা ভাঙছে, জমিদারের কাছারী লুঠপাট করছে আর পঞ্জাবে একটা গীর্জ্জার কয়েকটা কাঁচের ফুলদানি ও জানালার কাঁচ ভাঙবার জন্ত হিন্দুদের দিকে তাক করে কামান পাতা হয়েছে ও মার্শাল ল জারি হয়েছে।

দেবানন্দ—পঞ্জাবীরা সামরিক জাত, গবর্ণমেণ্ট তাদের ভয় করে। বাঙালীরা ভীরু, গুণ্ডার লাঠির ভয়ে তারা বাড়ী-ঘর ফেলে পালাচ্ছে। দশ-বিশ জন লোক বাধা দিতে গিয়ে মরলেও একটা ফল হ'ত।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই এক জিনিস আর গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপুষ্ট আমাদের প্রতিবেশীদের, ঘরের পাশে যাদের ঘর, তাদের সঙ্গে লড়াই আলাদা জিনিস। একসঙ্গে সিভিল ওয়ার ও প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে এমন জাত দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা দুই পক্ষের সাঁড়াশী আক্রমণের মধ্যে পড়েছে। একখানা কাগজে সেদিন একটা খবর দেখলাম। পঞ্জাবে যত বাঙালী সরকারী কর্ম্মচারী আছে গবর্ণমেণ্ট পুরো বেতনে তাদের নাকি ছ'মাস ছুটি দিয়ে পঞ্জাব থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। এর কারণ, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলোর মতে বাঙালীরা নাকি পঞ্জাবের গোলযোগের মধ্যে আছে।

মৃণাল আবার পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—আর দেরি করো না। দেবানন্দবাবু, আসুন, খাবার দেওয়া হয়েছে।

সকলে খাবার ঘরে গেল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী দেখিলেন আসন পাতিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন দেবানন্দের অসুবিধার কথা মনে করিয়া মৃণাল এই ব্যবস্থা করিয়াছে।

খাইতে খাইতে ডাঃ চক্রবর্ত্তী নানা রকম গল্প করিতে লাগিলেন। খাবার আয়োজন দেখিয়া তিনি মৃণালকে একটু ঠাট্টা করিলেন। বলিলেন, এই আয়োজন দেখে একটা ভোজের কথা মনে পড়ল। ভোজটা হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, অবিশ্যি নিজে আড়ালে থেকে। বেঙ্গল পার্টিশান উপলক্ষে কলিকাতার পুলিস এই ভোজ দিয়েছিল কলকাতার মুসলমানদের।

খাইতে খাইতে দেবানন্দ একটি প্লেটে ক্রিকেট বলের মত সাইজের লেডিকেনির দিকে চাহিয়া দেখিল কয়েক বার। এত বড় আয়তনের লেডিকেনি সে দেখে নাই। ডাঃ চক্রবর্ত্তী ইহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, প্লেটে ও জিনিসটা কি জান? ওটা কালীমায়ীর বোমা।

দেবানন্দ একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল, বলিল, কালীমায়ীর বোমা?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী ও মৃণাল দুই জনে হাসিলেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, কালীমায়ীর বোমার কথা শোন নি? সলিমুল্লা পাঁচ হাজার ঢাকাই গুণ্ডা নিয়ে কলকাতা লুঠ করতে আসছে এ খবর শোন নি?

দেবানন্দ ভাবিল ডাঃ চক্রবর্ত্তী রহস্য করিতেছেন। বলিল, আমি বাইরে ছিলাম, তারপর অসুস্থ ছিলাম। কলকাতায় লুঠপাট হবে নাকি?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী উচ্চ হাস্য করিলেন। বলিলেন, সে আশঙ্কা খানিকটা গেছে। কালীমায়ের বোমা কলকাতাকে বাঁচিয়েছে। সে একটা রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

দেবানন্দ—আমি এর কিছু জানি নে। কি হয়েছিল ?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী কি বলিতে যাইতেছিলেন, মৃণাল বাধা দিয়া বলিল, তোমরা খাওয়া শেষ করে নাও আগে। দেবানন্দবাবু, গল্পে গল্পে লোকে বেশী খেয়ে ফেলে, আপনি কিন্তু কিছু খাচ্ছেন না।

দেবানন্দ একটু হাসিয়া প্রতিবাদ করিল। বলিল, আমি ত খাচ্ছি।

খাওয়া শেষ হইলে ডাঃ চক্রবর্ত্তী ও দেবানন্দ বসিবার ঘরে গিয়া বসিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী সিগার ধরাইলেন। দেবানন্দ বলিল, কালীমায়ের বোমার কথা কি বলছিলেন ?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী কি ভাবিতেছিলেন। দেবানন্দের কথায় বলিলেন, ওঃ, উপাধ্যায়ের সেই কালীমায়ীর বোমার কথা বলছ ? মাসের গোড়ায় নানা রকমের গুজবে কলকাতা গরম হয়ে উঠল। তখন ঢাকায় ছেলেদের সঙ্গে মুসলমান গুণ্ডাদের মারামারি চলছে।

বগুড়ায় যে-কোন সময় দাঙ্গা বেধে যায় এই অবস্থা। পাবনায় মুসলমানরা মিটিং করে জানিয়ে দিলে হিন্দুদের বাড়ীঘর লুঠপাট করে জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষা দেবে। ময়মনসিংহে নানা জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে লাল ইস্তাহার বিলি হচ্ছিল। ওয়েলেসলি স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, আরও গোটা তিনেক স্কোয়ারে মুসলমানদের সভা হ'ল।

লোকের মুখে মুখে গুজব রটল বৌবাজার ও চাঁদনীর স্বদেশী দোকান লুঠ হবে, কাল রাত্রে পাঁচ হাজার গুণ্ডা নিয়ে সলিমুল্লা কলকাতা পৌঁছেছে। এই গুণ্ডারা লুঠপাট সুরু করলেই কলকাতার যত ফিরিঙ্গী, পাঠান ও বিদেশী অধিবাসী তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। হিন্দুর দোকানপাট, বাড়ী ও মন্দির হবে তাদের টারগেট। পুলিস ও কয়েকজন মৌলভী নাকি শহরের বস্তিতে বস্তিতে গুণ্ডাদের উস্কাচ্ছে।

—শহরের হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বাড়ীতে বাড়ীতে ছাদের উপর ইট-পাটকেল, ঘরে ঘরে লাঠি সংগ্রহ করা হতে লাগল। গুজব উঠল কালীঘাটের কালীমন্দির আগে আক্রান্ত হবে। মন্দির রক্ষার জন্য রক্ষীদল তৈরি হ'ল, পাড়ায় পাড়ায় ভলান্টিয়ার দল তৈরি হ'ল। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর কাগজে ঘোষণা করলেন, "আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি এক ধরণের চমৎকার বোমা তৈরি হচ্ছে। এর নাম কালীমায়ীর বোমা। এই বোমা নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, পরীক্ষা সফল হলে ঘরে ঘরে এই বোমা রাখতে হবে। কালীমায়ীর বোমা এত হাল্কা যে লোকে তা হাতে করে নিয়ে যেতে পারে। ছেলেরা কালীমায়ীর বোমা নিয়ে খেলতে শিখুক।"

ডাঃ চক্রবর্ত্তী কথা শেষ করিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবানন্দ ভাবিল, সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়া রহিল, এত সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল সে কিছু জানিল না। সে ভাবিল, লোকের মানসিক অবস্থা এতখানি উত্তেজিত হইয়াছে যে প্রকাশ্যে বোমা তৈরি হইতেছে বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। ইংরেজ কি তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া দিবে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাহার মনে পড়িল, কোথায় যেন সে পড়িয়াছিল। "দি ইংলিশম্যানস ওনলি কনসার্ণ ইজ হিজ সেলফ-ইণ্টারেষ্ট, হোয়্যার হিজ ইণ্টারেষ্ট ইজ এট ষ্টেক দেয়ার ইজ নো সিন অন আর্থ ছাট হি ক্যানট কমিট।" (ইংরেজের একমাত্র চিন্তা নিজের স্বার্থ। নিজের স্বার্থের জন্য সে না করিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নেই।)

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, উপাধ্যায় বোমার লক্ষ্য বলেছেন, সঞ্জীবনী বলেছে আর একটা অস্ত্রের কথা, সিরিঞ্জেস ফর ইনজেকটিং সালফিউরিক এসিড। অবিশ্যি লাঠি, সড়কি, তীরধনুকও থাকবে।

দুই জনেই কিছুক্ষণ নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। একটু পরে ডাঃ চক্রবর্ত্তী খুব আস্তে, যেন নিজের চিন্তার সূত্র অনুসরণ করিয়া বলিলেন, হিন্দুরা নূতন বিপদের মুখে কি করে ঘর সামলায় আর কি করে পোলিটিক্যাল এজিটেশন চালায় ইংরেজ একবার দেখে নিতে চায়। তোমাদের দলের মত কি দেবানন্দ ?

দেবানন্দ নিজের মনে চিন্তা করিতেছিল। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, কথাটা আমি শুনতে পাই নি, কি জিজ্ঞেস করলেন ?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইউ আর টায়ার্ড। আজ কথা থাক। শুতে যাও।

তিনি মৃণালের দিকে চাহিলেন। মৃণাল বলিল, আসুন, আপনার শোবার জায়গা দেখিয়ে দি। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, যাও দেবানন্দ, আর রাত করো না। গুড নাইট।

তিনি নিজে উঠিয়া সিগার হাতে লাইব্রেরী-ঘরের দিকে গেলেন। মৃণাল দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া যে ঘরে তাহার বিছানা হইয়াছিল সেই ঘরের দিকে গেল।

ঘরের ও বিছানার পারিপাট্য দেখিয়া দেবানন্দ অস্বস্তি বোধ করিল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে, লোকের বাড়ীর রোয়াকে, দেবমন্দিরের চাতালে, দোকানঘরের খালি তক্তপোশে বা বাঁশের মাচানে যেখানে-সেখানে শুইয়া সে আজ কয়েক মাস হইল রাত কাটাইয়াছে। হঠাৎ আজ রাজসিক বন্দোবস্ত তাহার ভাগ্যে। তাহার কুণ্ঠার ভাব মৃণাল লক্ষ্য করিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, দেবানন্দবাবু আপনার শরীর ভাল নয়, এবার শুয়ে পড়ুন।

দরজার দিকে দুই-এক পা গিয়া সে কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। দেবানন্দ দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে বড় ছেলেমানুষ, বড় অসহায় বলিয়া মৃণালের মনে হইল। ইচ্ছা হইল তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। সঙ্কোচে বাধিল। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় দরজা ভেজাইয়া দিল।

দেবানন্দ বিছানায় বসিল। তাহার শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছিল। ডাঃ চক্রবর্তীর দীর্ঘ বক্তৃতা, দেশের অবস্থার বিশ্লেষণ তাহার চিন্তাশীল মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়াছিল।

সে ভাবিল নানাদিকে অগ্রসর হইবার আয়োজন চলিতেছে। যাত্রার আরম্ভে এ কি বিভ্রাট! আবার ভাবিল এই বিভ্রাটে দিশাহারা হইলে ত আমাদের চলিবে না। দেশবাসীর এক অংশ আজ শত্রুতা করিতেছে, অনেকে উদাসীন, কিন্তু সহানুভূতিও কিছু লোকের কাছে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িবে আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছি দেখিলে। কিন্তু বাড়িবে কি? শুধু সহানুভূতি দেখাইবার লোক বাড়িলে কি হইবে? আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে প্রচুর অর্থ চাই। প্রচুর অর্থ ত কেহ দিতেছে না। দশটা বোমা, পাঁচটা বন্দুক, ছয়টা রিভলবার ও পিস্তল লইয়া বিরোধী মুসলমানদের ভয় দেখাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাইবে কি? আয়োজন অতি সামান্যই হইয়াছে, সে শুনিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই সকলকে শুনাইয়া বলা আরম্ভ হইয়াছে, আমরা বোমা বানাইতেছি। ইংরেজ দেশের সকলের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছে বিদ্রোহের ভয়ে। বোমা ফাটিতে শুনিলে তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে নাকি? বোমাওয়ালাদের যাহাতে ঝাঁকসুদ্ধ…

দেবানন্দ বিছানায় বসিয়া এলোমেলো নানা চিন্তা করিতেছে। ওদিকে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া ডাঃ চক্রবর্তী সিগার টানিতেছেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতেছেন। ভাবিতেছেন, ব্রিটিশ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান পেপারগুলো হ্যাভ বিগান বিটিং দি ড্রাম অব ওয়ার (যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে)। কেহ বলিতেছে হিন্দু স্বদেশীওয়ালাদের ভায়োলেন্সের ফলে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানরা বিদ্রোহ করিয়াছে; কেহ বলিতেছে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার এই বিদ্রোহের জন্ম দায়ী। টাইমসের মতে ফুলারকে রিজাইন করিতে বাধ্য করায় মুসলমানরা ক্ষেপিয়াছে। প্রাচ্য জাতিরা শুধু শক্তির দাপট বুঝে, সুতরাং শক্তির দাপট দেখাও। ডেলি ক্রনিকল "দি রাইজিং ইন ইণ্ডিয়া" হেডিং দিয়া ফলাও করিয়া লিখিয়াছে স্বদেশী এজিটেটর ও নেটিভ কাগজগুলোর মুখ বন্ধ কর। এম্পায়ার বয়কটওয়ালাদের মাথা কাটিতে চাহিয়াছে। ডাঃ চক্রবর্তীর মনে পড়িল সেই ইলবার্ট বিলের সময় হইতে ইংরেজী কাগজগুলি বলিয়া আসিতেছে, বাঙালী ও সিডিশান সিনোনিমাস টার্ম্মস (একার্থবোধক শব্দ)।

তিনি হাতের সিগার এ্যাশ-ট্রেতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাত দুইখানি পিছনে জড়ো করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। দেশের এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্য্যক্রমের কথা তাঁহার মনে হইল। মডারেটরা ইংলণ্ডে কংগ্রেসের অধিবেশন করিবার আইডিয়া এখনও ছাড়ে নাই। এক্সট্রিমিষ্ট দলের ইনটেলেকচুয়াল রাইট উইং প্যাসিভ রেজিষ্টান্স প্রচার করিতেছে, আর লেফ্‌ট্ উইং প্রচার করিতেছে নন্-বম্ব কাল্ট। কিন্তু ইহারা বড় বেশী চীৎকার করিতেছে নয় কি? কাজের চাইতে ভয় দেখাইবার চেষ্টা যেন বেশী হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা বলি কি করিয়া? গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইলে কি হইবে, আমরা রক্ত দেখিয়া বাস্তবিক এত ভয় পাই যে খবরের কাগজে লিখিয়া লোককে শিখাইতে হয়—"ইট ইজ নো সিন টু কিল ফর দি সেক অব ফ্রিডম" (স্বাধীনতার জন্য হত্যা করায় পাপ হয় না)। প্যাসিভ রেজিষ্টান্স থিওরির আরও প্রচার দরকার, লোকে যেন জিনিষটা বুঝিতে পারিতেছে না।

লাইব্রেরী-ঘর হইতে বাহির হইয়া যে ঘরে দেবানন্দের বিছানা করা হইয়াছিল সেই দিকে তিনি আস্তে আস্তে আগাইলেন। ঘরের সম্মুখে আসিয়া থামিলেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কথার আওয়াজ কানে আসিল। ডাঃ চক্রবর্তী দাঁড়াইলেন। তিনি মৃণালের গলা শুনিতে পাইলেন। মৃণাল বলিতেছে, দেবানন্দ, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তোমার মা বাবা আছেন, ভাই-বোন আছে। তাঁদের কথা ভেবে বাড়ী ফিরে যাও।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া ডাঃ চক্রবর্তী লাইব্রেরী-ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। মনে মনে বলিলেন, সো শী ইজ মাদারিং দি বয়। স্বভাব যাবে কোথা?

সকালে উঠিয়া দেবানন্দ চাপাতলা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাত্রের কথা মনে করিয়া তাহার বড় খারাপ লাগিতেছিল। সে শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে, ঘুম আসিতেছে না। নানা রকমের এলোমেলো চিন্তা তাহার মাথায় আসিতেছে যাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল কে যেন ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। মুখ তুলিয়া সে চাহিয়া দেখিল মৃণাল বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিল। অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। ভদ্রমহিলা ঠিক তাহার মায়ের মত মুখের ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি নিজে একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন। তারপর তাহার বাড়ীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে "বাড়ী ফিরে যাও, বাড়ী ফিরে যাও", এই রকমের কথা কিছুক্ষণ বলিলেন। সে আর কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া গেলেন। যাইবার আগে তাহার মাথায় কপালে একবার হাত বুলাইয়া দিলেন। সে ভাবিল সব মেয়ের ধরণই এক রকম দেখছি।

কখন এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না। রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্ন দেখিল তাহার মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছেন, আর কাছে কে একজন মেয়ে পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহার মুখখানা দেখিতে পাইল না। মার হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া আসিতেছে তখন সেই মেয়েটি বলিল, দাঁড়াও, প্রণাম করি! সে চমকিয়া উঠিল, এ ত কিটির গলা। সে ডাকিল কিটি! চাহিয়া দেখিল মেয়েটি সেখানে দাঁড়াইয়া, তার কাছে একটি সোডার বোতল রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বোতলটা সরাইয়া লইবে এমন সময়

ভয়ানক শব্দ করিয়া বোতলটা ফাটিয়া গেল, চারদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার হইল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সে ভাবিল অসুখ হইয়া তাহার মাথা দুর্ব্বল হইয়াছে। ছোট-বড় যাহা হউক কাজের ভার তাহাকে লইতে হইবে। আর কোন কাজ না থাকে, কেন নেতারা তাহাকে আদেশ দিতেছেন না—এস্‌প্লানেডে দাঁড়াইয়া যে ইংরেজ দেখিবে তাহাকেই গুলি করিয়া মারিবে ?

ভোর হইতে হাত-মুখ ধুইয়া সে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর লাইব্রেরী-ঘরে গেল। সেখানে কাহাকেও দেখিল না। বোধ হয় কেহ এখনও ঘুম হইতে উঠে নাই। সে আর অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর সম্মুখের লন পার হইয়া রাস্তায় পড়িল।

১৮

পূর্ব্ববঙ্গে ও পঞ্জাবে দমননীতির চাকা ঘুরিতে লাগিল। লালা লজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার তাঁহাদিগকে অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইলেন।

নেতৃদ্বয়ের নির্বাসনের ফলে পঞ্জাবে শিখ ও হিন্দু সমাজে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। কয়েক জন শিখ সিপাহী চাকুরি ত্যাগ করিল। ষ্টেটসম্যানে সংবাদ প্রকাশিত হইল গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রকাশ করায় আম্বালায় একটি শিখ রেজিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রেজিমেণ্টের দুই শত শিখ সিপাহীকে বাংলায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। রাওয়ালপিণ্ডিতে ও পঞ্জাবের আরও কোন কোন শহরে গুজব রটিল ইংরেজ ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে ও মারাঠারা আবার হিন্দুস্থানের শাসনভার গ্রহণ করিবে। ইংরেজরা এই সকল গুজবে আতঙ্কিত হইয়া বন্দুক ও গুলি কিনিতে লাগিল এবং লর্ড কিচেনারকে শান্তিরক্ষা করিবার পরামর্শ দিতে লাগিল।

শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবার জন্য রিজলে সারকুলার জারি করিবার পর লর্ড মিণ্টোর গবর্ণমেণ্ট ১৯০৭ সনের এক নং অর্ডিনান্স জারি করিল রাজদ্রোহকর সভা-সমিতি বন্ধ করিবার জন্য। পঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা সকলের আগে এই অর্ডিনান্সের আওতায় আসিল। শহরে লাঠি লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ হইল, গুর্খার দাপট নূতন করিয়া শুরু হইল। মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন বরিশালে গ্রেপ্তার হইলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধিতে পারে এই অজুহাতে খুলনায় জেলা কনফারেন্সের অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ জারি করিল। সংবাদপত্রের মারফত সিডিশন প্রচার সম্বন্ধে সরকারী রেজোলুশন প্রকাশিত হইল। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে পূর্ণ ক্ষমতা দিল।

এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলি রাজদ্রোহী বাঙালী হিন্দু এবং পঞ্জাবী হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সরকারকে ব্যাপক দমননীতি চালাইবার জন্য ক্রমাগত উস্কাইতে লাগিল। এই সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে চলিতে লাগিল বন্দেমাতরমের ভাষায় "রিপ্রেশন বাই রেপ"। মৌলভীরা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে কোম্পানীর এই মর্ম্মে চুক্তি হইয়াছে যে, মুসলমানরা স্বদেশী ও বন্দেমাতরম বন্ধ করিতে পারিলে পূর্ব্ববঙ্গ নবাবের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই চুক্তির সর্ত্ত কাজে পরিণত করিবার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টকে নানাভাবে সাহায্য করিবার পুরস্কার-স্বরূপ নবাব সলিমুল্লাকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ঋণ দিবার সংবাদ প্রকাশিত হইল। ইংলিশম্যান লিখিল গবর্ণমেণ্টের কাজে নবাবের বহু ঋণ হইয়াছে, তাঁহাকে সাহায্য করা সঙ্গত হইয়াছে।

দেবানন্দ কাজের ভার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, সে কাজ পাইল। হারীত কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া মাণিকতলা বাগানে কাজের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। দেবানন্দের উপর আদেশ হইল গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে বোমা ফ্যাক্টরিতে থাকিয়া সে কাজ শিখিবে। গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ী ছাড়া হ্যারিসন রোড, স্কট্‌স লেন, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ও গ্রে ষ্ট্রীটের কয়েকটা বাড়ীতে দলের লোকের আড্ডা ছিল। নূতন নূতন লোক আসিয়া দলে ঢুকিতেছিল। মেদিনীপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর হইতে লোক যাতায়াত করিত। অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে চট্টগ্রাম, আকিয়াব পর্য্যন্ত লোক যাইত, খিদিরপুর-ডকে লোক ঘোরাফেরা করিত। খুব বেশী দাম দিয়া অস্ত্রশস্ত্র কিনিতে হইত। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা লইয়া সমস্যা দেখা দিল।

ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ব্যারিষ্টার মহল হইতে চাঁদা পাওয়া যাইত, কোন কোন জমিদার ব্যবসায়ী কিছু কিছু দিতেন। কিন্তু এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থে অভাব মিটিত না। কি উপায়ে টাকা সংগ্রহ করা যায় সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল।

বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার যাঁহারা চাঁদা দেন তাঁহারা কেবল জিজ্ঞাসা করেন,—তোমাদের যুগান্তর দল কি করিতেছে ? ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, রংপুর, কুমিল্লার নেশন্যাল ভলাণ্টিয়াররা কাজ দেখাইতেছে, তোমরা কি করিতেছ ? দেখিতেছ না বিলাতের টাইম্‌স হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশের সবগুলি এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ আদা জল খাইয়া নেশন্যাল ভলেণ্টিয়ারদের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে ? তাহারা রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। কাজ দেখাও আগে তবে ত লোকে পয়সা দিবে।

যাহারা চাঁদা আদায় করিতে যাইত তাহারা এই সব কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারিত না। তাহারা ভাবিত ইংরেজকে তাড়াইয়া দেশকে স্বাধীন করা বড় সহজ কাজ কিনা, দশ-বিশ টাকা চাঁদা দিলেই এ কাজ হইয়া যাইবে। তাঁহারা আরামে, বিলাসে, নিরাপদে থাকিবেন, দূরে থাকিয়া আদেশ করিবেন ইহাকে মারো, উহাকে মারো। তাঁহাদের গায়ে

আঁচড় লাগিবে না, আরাম-বিলাসের কোন ত্রুটি হইবে না, দশ-বিশ টাকা চাঁদা সম্বল করিয়া কয়েকজন ছোকরা ইংরেজ মারিয়া দেশের স্বাধীনতা তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিবে। স্বাধীনতা এত সহজলভ্য জিনিস নাকি ?

বোমা ফ্যাক্টরিতে কাজ শিখিবার জন্য নিযুক্ত হইলেও দেবানন্দকে কখনও একা, কখনও অন্য দুই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইত। কাজও ছিল নানা রকমের। কখন অস্ত্রসংগ্রহ, কখন লোকসংগ্রহ, কখন প্রচার কখন বা সংবাদ সংগ্রহের জন্য যাইতে হইত। কখন আবার অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে নূতন সভ্যদের শিক্ষাদান সম্পূর্ণ করিবার ভার পাইয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে হইত। এমনি একটি কাজের ভার পাইয়া দেবানন্দ ও চন্দননগরের বলাই কয়েকটি ছেলেকে লইয়া মেদিনীপুর জেলার কোন জায়গায় গিয়াছিল। কাজ শেষ করিয়া তাহারা ফিরিতেছিল। খড়্গপুরে কলিকাতাগামী গাড়ীর জন্য তাহাদের অপেক্ষা করিতে হইল। তখনও অন্ধকার হয় নাই, প্ল্যাটফরমের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল। একটু বাদে যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল গাড়ী আসিতেছে। গাড়ী প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইতে বলাই ছেলেদের লইয়া আগাইয়া গেল, দেবানন্দ ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের পিছনে চলিল। ছেলেরা গাড়ীতে উঠিতেছে, বলাই আগেই উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিতেছে—দেবু ? দেবু ! দেবানন্দ সাড়া দিবে এমন সময় পাশ হইতে একজন হাঁকিল—হট্ যাও, ম্যাজেষ্টর বাহাদুর যাতে, হট যাও ! দেবানন্দ দেখিল এক উর্দিপরা চাপরাশি। তাহার হাঁক শুনিয়া যাত্রীরা কেহ শশব্যস্তে সরিয়া দাঁড়াইল, কাহাকেও চাপরাশি ঠেলিয়া দিল। চাপরাশির পিছনে একজন দেশী সাহেব গর্ব্বিত পদক্ষেপে চলিয়াছেন। দেবানন্দ দেখিল সাহেবের পাশে একটি মহিলা যাইতেছেন। গাড়ীর আলো জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে খানিকটা পড়িয়াছে। বলাই আবার ডাকিল—দেবু ! দেবানন্দ ! দেবানন্দ উত্তর দিল, এই যে। মহিলাটি ঘাড় ফিরাইয়া পাশে চাহিলেন। জানালার আলো তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। দেবানন্দ দেখিল সে মুখ কিটির। কিটি দেবানন্দকে দেখিতে পাইয়াছিল। চিনিতে পারিল কিনা বলা যায় না। মনে হইল নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার গতি একটু শ্লথ হইল, সে যেন পিছাইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার। চাপরাশি আবার হাঁকিল—হট যাও, মাজেষ্টর বাহাদুর যাতে। সাহেবের সঙ্গে কিটি চলিয়া গেল। দেবানন্দ জানালার পাশে দাঁড়াইল, সেই মুহূর্ত্তে কিটি ঘাড় ফিরাইল। বলাই ডাকিল, উঠে আয় শীগগির, জায়গা পাবি না। দেবানন্দ হাতল ধরিয়া পাদানিতে উঠিয়া সম্মুখের দিকে চাহিল। ঐ যে কিটি 'মাজেষ্টর বাহাদুরে'র সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া যাইতেছে। দেবানন্দের মুখে তাহার অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। সে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলাইয়ের পাশে গিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া বসিল। বলাই তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, হাঁ করে কি দেখছিলি বল ত ? চেনা লোক নাকি ?

দেবানন্দ কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিল।

অপ্রত্যাশিতভাবে লর্ড মিন্টো পঞ্জাব ল্যাণ্ড কলোনাইজেশন বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিলেন। মডারেট মহল উৎফুল্ল হইল। মাদ্রাজের মহাজন সভা স্থির করিল বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাইবে। মহাজন সভা যখন ডেপুটেশন পাঠাইবার মতলব করিতেছিল তখন কোকনদে সংঘর্ষ বাধিল। কোকনদের সিবিল সার্জন মেজর কেম্প রাস্তায় একটি ছাত্রের মুখে বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনিয়া চটিয়া গিয়া তাহাকে প্রহার করিল। ইহার ফলে লোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ইউরোপীয়দের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বাংলা ও পঞ্জাবের পর আসিল মাদ্রাজের পালা। বাংলার এক্সট্রিমিষ্ট দলের কাগজ লিখিল, ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে এই সব ভায়োলেন্স দেশে নবজাগরণের লক্ষণ।

মডারেটদের মুরুব্বী মর্লে সাহেব ঘোষণা করিলেন, "ভারত-বাসীরা ইংরেজী শিখিয়া কথায় কথায় বার্ক, হারবার্ট স্পেনসার, মিল আওড়ায়, কিন্তু তাহারা জানে না যে ডিমোক্র্যাসি ইজ নট স্যুটেবল টু ইণ্ডিয়া (গণতন্ত্র ভারতবর্ষের উপযোগী নহে)। অতি দূর ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষে ডিমোক্র্যাসী প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাইতেছি না।" তিনি আরও ঘোষণা করিলেন, এডুকেটেড ইণ্ডিয়ানস আর আওয়ার এনিমিজ (শিক্ষিত ভারতীয়েরা আমাদের শত্রু)। মুরুব্বী অনেষ্ট মর্লের মুখে এই কথা শুনিয়া মডারেট মহল হতবুদ্ধি হইলেন। শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনায় যতখানি তাঁহারা জানিতে পারিলেন তাহাতে তাঁহাদের হতাশা বাড়িল। বন্দেমাতরম বলিল—"অনেষ্ট জনের কমিক অপেরা রিফর্মস এদেশে কেহ চাহে না।"

দমননীতি আরও কঠোর করিবার জন্য এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি অক্লান্তভাবে গবর্ণমেণ্টকে উস্কানি দিতে লাগিল। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মুসলমান কাগজগুলিও মুখ খুলিল। একখানি মুসলমান কাগজ লিখিল, "গবর্ণমেণ্ট সেই দমননীতির প্রবর্ত্তন করিলেন, মিছামিছি দেরি করিলেন। মেকলে সাহেব এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করিয়া প্রথম ভুল করিয়াছিলেন, ভারত-গবর্ণমেণ্ট ফ্রিডম অব দি প্রেস দিয়া দ্বিতীয় ভুল করিয়াছেন। বাংলায় প্রেস সেন্সরশিপ নাই।' বাংলার সাহিত্য সিডিশনে ভর্ত্তি। বাংলা নাটক, বাংলা ষ্টেজ সব সিডিশনে পূর্ণ। নীলদর্পণ, প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, মীর কাশিম বাঙালী-দের প্রিয় নাটক। বিনা বাধায় এখনও শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য উৎসব হইতেছে, বীরাষ্টমী উৎসব হইতেছে। নবাব সলিমুল্লা বাহাদুর ও নবাব আলি চৌধুরী মহোদয় সরকারকে সতর্ক করিয়া-ছিলেন, সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া-ছিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন স্যর ডেনজিল ইবেটশন লজপত রায় ও অজিত সিংহকে নির্ব্বাসিত আর কয়েকজন রাজদ্রোহী বক্তাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি কয়েক জন পঞ্জাবী রাজ-

দ্রোহী বক্তাকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত হৈ চৈ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট গাছের শিকড় সহ মূল কাণ্ডটিকে অক্ষত রাখিয়া ছোট ছোট ডালপালাগুলি কাটিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। নদীর উৎসে হাত না দিয়া শুধু বালতি বালতি জল তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন। প্রকৃত অপরাধী বাঙালী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা নির্বিঘ্নে দেশের সর্বত্র রাজদ্রোহকর বক্তৃতা দিয়া দিয়া বেড়াইতেছে, গবর্ণমেণ্ট নগণ্য বক্তাদের ধরিয়া চালান দিতেছেন। লজপত রায় ও অজিত সিংহকে নির্বাসিত করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু মূল উৎস বন্ধ না করিলে নূতন নূতন লজপত রায় ও অজিত সিং দেখা দিবে।"

মুসলমান কাগজগুলি "পারভার্টেড স্বদেশী"র বিরুদ্ধে, হিন্দু স্বরাজিষ্ট, হিন্দু বিপ্লববাদী কাগজগুলির বিরুদ্ধে কলম চালাইয়া চলিল। হিন্দু কাগজ বয়কট করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইল মুসলমানদের মধ্যে। মিহির ও সুধাকর ঘোষণা করিল, "ইংরেজ ও মুসলমানদিগকে একই জাতির লোক বলা যাইতে পারে, হিন্দুরা এই উভয়েরই গোলাম ও চিরশত্রু।" হিন্দু স্বরাজিষ্টদের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া লিখিল—"হিন্দু স্বরাজওয়ালার বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে। তাহাদের ধারণা স্বরাজ হইয়া গিয়াছে। দুই ঘা লাঠি খাইয়া তাহারা মনে করে বড় বীরত্বের কাজ করিয়াছে। কেহ কেহ জেল গিয়া ঘানি টানিতেছে। ঘানি টানিয়া তাহারা গর্ববোধ করে। এই সব উপায়ে সরকার তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইবেন না। রীতিমত কড়া দমননীতি ছাড়া এই জাতীয় উদ্ধত লোকগুলির চৈতন্য হইবে না। ইহাদের নেতাদের ধরিয়া আন্দামান বা ফিজিদ্বীপে পাঠাইলে কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে। গুলি করিয়া দশ-বিশ জনের মাথা উড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কতকগুলিকে ফাঁসিকাঠে লটকাইয়া দিতে হইবে। তাহারা যত বড় শয়তান তত শক্ত চপেটাঘাত করিতে হইবে। হিন্দু-সমাজের সকলেই এই রকম বিকৃতমস্তিষ্ক নহে। কতকগুলি মাথাখারাপ নাস্তিক এই হাঙ্গামার নেতা। তাহাদের অনেকে সেরা নাস্তিক মিঃ ব্রাডলর সাকরেদ। ইংরেজী কেতাব পড়িয়া ইহাদের মাথা বিগড়াইয়াছে।

"হিন্দু বিপ্লবী কাগজগুলি মিথ্যা প্রচার করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে লোকেদের উত্তেজিত করিতেছে। সরকার ইহাদের টুঁটি চাপিয়া না ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এই কাগজগুলি বন্ধ করিতে হইবে। ইহাদের বিরুদ্ধে কড়া দমননীতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। বর্তমান অবস্থায় পেনাল কোডের বহু সংশোধন করা প্রয়োজন। ইহার ফলে মুসলমানদের অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই অসুবিধা তাহাদের সহ্য করিতে হইবে।"

এই সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে নূতন রাজনৈতিক দর্শন গড়িয়া উঠিতেছিল। "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দুরা যে আন্দোলন চালাইতেছে তাহাতে মুসলমানরা কোন্ অংশ লইবে তাহা স্থির করা প্রয়োজন। একদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও অন্যদিকে হিন্দু-সমাজ, এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে মুসলমান-সমাজ। তাহাদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ এবং তাহাদের কর্তব্য স্থির করা কঠিন। মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি। তাহাদের পৃথক জাতীয়তা ও সত্তা রক্ষা করিতে হইবে। তাহাদের নিজ স্বার্থ যে পথে রক্ষিত হয় মুসলমানরা সেই পথে চলিবে।" (ছোলতান)

মুসলমানরা হিন্দু-সরকারী কর্মচারীদের উপর নজর রাখিত। কোন কর্মচারীর স্বদেশী "প্রোক্লিভিটিজ" দেখিলে উপরওয়ালা ইংরেজ কর্মচারীর কাছে তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাইত। পূর্ববাংলায় এই মুসলমান গোয়েন্দাগিরির ফলে হিন্দু কর্মচারীদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এদিকে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে লেলাইয়া দিবার যে নীতি ১৯০৫ সন হইতে অনুসৃত হইতেছিল তাহাতে একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে ব্যাপক অশান্তি চলিতে থাকিলে পাটের ব্যবসায় মার খাইবে ভয়ে বেঙ্গল-চেম্বার অব কমার্স গবর্ণমেণ্টকে অশান্তি দমন করিবার উপদেশ দিল। ইঙ্গিত পাইয়া নবাব সলিমুল্লা এক শান্তি-বৈঠক আহ্বান করিলেন। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদারগণ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থসাহায্য করিতেছেন এই অভিযোগ করিয়া পাইওনিয়ার ঘোষণা করিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিবার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। এই ভয়প্রদর্শনের ফল হইল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জমিদার-সভ্যগণ এক লয়ালটি ম্যানিফেষ্টো বাহির করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। একসট্রিমিষ্ট দলের কাগজ বিদ্রূপ করিয়া বলিল—চমৎকার লয়ালটি কবুলিয়ত হইয়াছে। কেহ আবার তাঁহাদিগকে পলাতক বা ডেজার্টার্স বলিয়া গালি দিল। পঞ্জাবের বিয়াল্লিশ জন উকিল, ব্যারিষ্টার, জমিদার প্রভৃতি তাঁহাদের অকপট রাজভক্তি জানাইয়া সিবিল ও মিলিটারী গেজেটে এক পত্র প্রকাশ করিলেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, রাওয়ালপিণ্ডির মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সবুর করিল না ইহারা; সরকারের ভ্রূকুটিতে ঘাবড়াইয়া মডারেট দল পাবনা ও যশোহর কনফারেন্সে রাজনৈতিক আন্দোলন বর্জন করিলেন। এসকট্রিমিষ্টরা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—মডারেটরা রাজনীতি ছাড়িয়া এবার শিল্পোন্নতি ও স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন।

সকল প্রকার বিরোধিতা, কংগ্রেসী মডারেট দলের পিছুটান ও মেরুদণ্ডহীন আচরণ, দেশের বিত্তশালী শ্রেণীর ঔদাসীন্য, সচ্ছল মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর সরকারী রোষের ভয়ে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ এবং সকলের উপরে সরকারী অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে একদল লোক লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছিল। ইহাদের মধ্যে ছিল একসট্রিমিষ্ট ও বিপ্লবী দল। মডারেট দল বলিত একসট্রিমিষ্টরা "মাইক্রোস্কপিক মাইনরিটি"। এই মাইনরিটি দলের কাগজগুলি ও নেতারা—বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব "নিউ স্পিরিট" অর্থাৎ সরকার ও মডারেট পলিটিক্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করিতেছিলেন। নিউ ইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম ও সন্ধ্যার সঙ্গে

ছিল মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নবশক্তি, দুর্গামোহন সেনের বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি। বিপ্লবীদলের মুখপত্র ছিল যুগান্তর।

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইল। প্রথম আসামী হইল "সোনার বাংলা" নামে পত্রিকার বালক-সম্পাদক। পুলিস যুগান্তর আপিস তল্লাস করিয়া সম্পাদককে সিডিশানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিলে যুগান্তর লিখিল—"আইরিশ পেট্রিয়ট বীর ওলিয়ারীকে সিডিশানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ড ইজ নট মাই নেটিভ কানট্রি, ইট ক্যানট দেয়ারফোর বি সিডিসন অন মাই পার্ট টু গো এগেনষ্ট ব্রিটিশ রুল ইন আয়ার্লণ্ড।" (ইংলণ্ড আমার জন্মভূমি নহে। আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমার পক্ষে রাজদ্রোহ হইতে পারে না) আমরাও বলিতেছি। ইট ইজ নো সেডিসন অন আওয়ার পার্টি টু গো এগেনষ্ট ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া। (ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমাদের পক্ষে রাজদ্রোহ নহে।) যুগান্তর চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেন হইতে প্রকাশিত একখানি পত্রিকামাত্র নহে, ইহা গোটা বাংলার বাণী। এইবার যুগান্তর আরম্ভ হইবে। সুরুতে কারাবাস, মাঝে লঙ্কাকাণ্ড, তার পর ভেরী বাজাইয়া স্বরাজের আবাহন হইবে। যুগান্তরের যে বীজ বপন করা হইয়াছে তাহা নষ্ট হইবার নহে। আজ চোখের সম্মুখ হইতে ইহা অন্তর্হিত হইলেও ফল্গুর মত ইহার ধারা বাংলার অন্তরে প্রবাহিত হইবে। প্রয়োজন হইলে আবার সেই কাগজ, সেই লেখা, সেই উপদেশ পাওয়া যাইবে। যুগান্তরকে কে বিনাশ করিতে পারে?" তার পর লিখিল, "এখন হইতে মাতৃ-পূজার আয়োজন খুব গোপনে করিতে হইবে। এত গোপনে করিতে হইবে যে আমাদের ডান হাত না জানিতে পারে বাম হাত কি করিতেছে।"

যুগান্তরের মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে একজন যুবক পুলিসের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল যে প্রবন্ধগুলির জন্য সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সেগুলির দায়িত্ব সে নিজে লইতে প্রস্তুত। ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্ম্মচারী তাহাকে বলিল—আপনি আদালতে যাহাই বলুন না কেন ভূপেন দত্তকে বাঁচাইতে পারিবেন না। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা, এই কারণেই তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে।

লাহোরের ইণ্ডিয়া ও হিন্দুস্থান পত্রিকার সম্পাদক পিণ্ডিদাশ ও দীননাথের পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও তাঁহাদের প্রেস বাজেয়াপ্ত হইল।

সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভাবিল যুগান্তরকে সে মারিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা প্রেসে ছাপা হইয়া যুগান্তর আবার প্রকাশিত হইল। যুগান্তর লিখিল—"যুগান্তর মরে নাই ভবিষ্যতে মরিবে এমন আশ্বাস ইংলিশম্যান ও ডেলী নিউজকে দিতে পারিতেছে না।" ইংলিশম্যান ও ডেলী নিউজ বলিল—গবর্ণমেণ্ট এবার দেখিয়া লইবে যুগান্তরের কত জন সম্পাদক আছে। পুলিস সন্ধ্যা ও যুগান্তর আপিসে হানা দিল। এক বাড়ীতে দুই কাগজের আপিস ছিল। পুলিশ যুগান্তরের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করিল, যুগান্তরের কম্পোজ করা ফর্ম্মা লইয়া গেল। ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যায় লিখিলেন, "পুলিস সন্ধ্যা প্রেসের অনেক টাইপ সরাইয়াছে। সন্ধ্যার টাইপ কম। আমরা লাখ টাকা বাজি রাখিয়া বলিতেছি যেমন করিয়া হউক ভূপেন্দ্র ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমরা যুগান্তর ছাপিয়া যাইব।"

সন্ধ্যার ম্যানেজার গ্রেপ্তার হইল। যুগান্তরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা আরম্ভ হইল। বন্দেমাতরম আপিস দ্বিতীয় বার তল্লাস করিয়া পুলিস অরবিন্দ ঘোষ ও হেমেন্দ্র বাগচিকে গ্রেপ্তার করিল। মৈমনসিংহের চারু মিহির আপিস তল্লাস হইল।

বন্দেমাতরমের বিচারের সময় দুইটি বিভ্রাট ঘটিল। প্রথম বিভ্রাট বন্দেমাতরমের বিচার চলিবার কালে পুলিসকোর্টে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে ইন্সপেক্টার হুয়ের সঙ্গে ছেলেদের মারামারি বাধিল। নেশ্যনাল কলেজের পনের বৎসরের ছাত্র সুশীলকুমার সেন ইন্সপেক্টারের বেত্র প্রহারের জবাবে একটি ছাতা লইয়া তাহাকে কয়েকটি আঘাত করিল। ইন্সপেক্টারকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইল। মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে সুশীলের বিচার হইল। শাস্তির আদেশ হইল পনের ঘা বেত্রদণ্ড। ইংলিশম্যান লিখিল—"সুশীলের বয়েস পনের বৎসর সুতরাং পনের ঘা বেত্রদণ্ড ঠিক শাস্তি হইয়াছে। এই শ্রেণীর অপরাধীদের যাহার যত বয়েস তত ঘা বেত্রদণ্ড হওয়া উচিত।" যুগান্তর নেশ্যনাল কলেজের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া লিখিল—"সুশীলের এই শাস্তির প্রতিকার করিতে হইবে তোমাদের। যদি তাহা না পার তোমাদের জাতীয় শিক্ষা বৃথা।"

দ্বিতীয় বিভ্রাট ঘটিল বিপিনচন্দ্র পালকে লইয়া। অরবিন্দ ঘোষ বন্দেমাতরমের সম্পাদক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পুলিস তাঁহাকে সাক্ষী হিসাবে তলব করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন। তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর. এ. সিংহের আদালতে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার বিচার হইয়া ছয় মাস কারাদণ্ড হইল।

বয়কট ও স্বদেশীর এক জন প্রধান নেতার কারাদণ্ডে এংলো-ইণ্ডিয়ান ও বিলাতের কাগজগুলি মনের উল্লাস চাপিতে পারিল না। ইহাদের উল্লাস দেখিয়া এদেশের কাগজ বলিল—"রক্তপিপাসু হিংস্র জন্তু ছাড়া কোন সভ্য মানুষের মুখে স্বাধীনতার সেবকের অন্যায় শাস্তিতে এমন হাসি দেখা যায় না।"

সাক্ষ্যের অভাবে মিঃ কিংসফোর্ড অরবিন্দকে জেলে পাঠাইতে পারিলেন না; তিনি মুক্তি পাইলেন। অরবিন্দের গ্রেপ্তারের পরে তাঁহার স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার! নবশক্তি কাগজে এই কবিতা প্রকাশিত হইল।

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বহু জেলায়,

১১ই অক্টোবর নিউ দিল্লীতে প্রেস কমিশনের প্রথম অধিবেশন (বাম দিক হইতে) টি. এন. সিং, জে নটরাজন, এম চলপতি রাও, এ. আর. ভাট, জয়পাল সিং, পি. এইচ. পটবর্দ্ধন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, সি. পি. রামস্বামী আয়ার, জাষ্টিস জি. এস. রাজাধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান) এম. এল. চৌলা (সেক্রেটারি), ডক্টর জাকির হোসেন

বি বি. সি. লণ্ডনের 'এশিয়ান ক্লাবে'র এক অধিবেশনে বিখ্যাত গ্রন্থকার সি. মা

আভন নদী-তীর

মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মস্থান

সদরে ও মফঃস্বলে অসংখ্য স্বদেশী মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। বিলাতী জিনিস না কিনিতে অনুরোধ করা বা অন্যপ্রকারে বাধা দেওয়া এই সকল মোকদ্দমার মূল অভিযোগ। আসামীরা হিন্দু, ফরিয়াদী মুসলমান, সাক্ষী মুসলমান। বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সকল স্বদেশী বৈরাগী, স্বদেশী ভাট, স্বদেশী চারণ গান গাহিয়া বেড়াইত পুলিস খবর পাইলেই তাহাদের ধরিতে লাগিল। মুসলমানদের খবর দিবার তৎপরতায় বহু পেশাদার ভিক্ষুক যাহারা রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত তাহারাও জব্দ হইতে লাগিল। বাংলায় ও মাদ্রাজে কীর্ত্তন গানের বিরুদ্ধে পুলিস তৎপর হইল। স্বদেশী যাত্রাওয়ালারা পুলিসের হাতে টিট্ হইতে লাগিল। ঢাকায় ও বরিশালে অনেক স্বদেশী যাত্রাওয়ালাকে পুলিস মামলায় জড়াইল। অর্ডিনান্স পাস হইবার পর পুলিস শুধু স্বদেশী মিটিং নয় সকল রকম সভাসমিতি বন্ধ করিয়া দিল। লাহোরে কয়েক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ইকবালের "হিন্দুস্থান হামারা" গান করিবার অপরাধে বরখাস্ত হইল। ফরিদপুর, ঝালকাঠি ও বারাসতে মিলিটারী পুলিস বসিল। রংপুরে ও মৈমনসিংহে পিটুনী পুলিস বসিল। পিটুনী পুলিসের ট্যাক্স আদায় হইতে লাগিল হিন্দুদের পকেট হইতে। বরিশাল আদালতের বিচারে স্বদেশী প্রচারক মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের কারাদণ্ড হইল।

সিডিশন দমনে সরকারী তৎপরতা দেখিয়া দি নেক্সট অর্ডিনান্স হেডিং দিয়া বন্দেমাতরম লিখিল :

"The Gurkhas seem now to be the standing ornament of every district conference ; they are there, we suppose, as the representatives of Mr. Morley's sympathy to prevent the sympathetic Empire from being blown to pieces by Congress eloquence. Not satisfied with the Gurkha rifles, the defenders of the Empire are closing every possible approach to the advent of sedition into their peaceful districts. Swadeshi songs are prohibited, Swadeshi speeches are a thing of the past, the lips of the Swadeshi *Bairagis* are being sealed, the Swadeshi dogs cannot bark, the Swadeshi cats cannot mew, the Swadeshi birds cannot chirp, the Swadeshi lions have long ceased to roar and everything Swadeshi is going to be deported. Steps will shortly be taken to prevent the blowing of Swadeshi winds from Calcutta where Swadeshi and sedition vex the souls of Max and Newmaniac of the Englishman. Rats carry the plague and Babus carry the Swadeshi. The next ordinance will, therefore, put two annas on the head of every Babu and thus prevent the spread of Swadeshi. The blood of Aswinikumar Dutta, Bipin Chandra Pal and Surendranath Banerjea are being examined at the Pasteur . Institute of Simla for Swadeshi bacilli and as soon as the result is known, the ordinance will be issued. The campaign against the Babus is a settled fact and Mr. Morley will not unsettle it. In the meantime, all the other provinces are being isolated against the infection from Bengal."

(প্রত্যেক জেলা কনফারেন্সের অধিবেশনের সময়ে অধিবেশনের শোভা বর্দ্ধনের জন্য গুর্খারা নিয়মিত উপস্থিত থাকে। সম্ভবতঃ মর্লের সহানুভূতির প্রতীক-স্বরূপ উপস্থিত থাকিয়া তাহারা লক্ষ্য রাখে যে, সহানুভূতিশীল সাম্রাজ্য কংগ্রেসী বাগ্মিতার দাপটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া না যায়। গুর্খার রাইফেলের উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করিয়া সাম্রাজ্যের রক্ষকগণ তাঁহাদের অধীন শান্তিপূর্ণ জেলাগুলিতে রাজদ্রোহ সংক্রমিত হইবার সকল পথ রুদ্ধ করিতেছেন। স্বদেশী গান নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্বদেশী বক্তৃতা আজ অতীতের কথা, স্বদেশী বৈরাগীদের মুখ বন্ধ করা হইয়াছে, স্বদেশী কুকুরের ঘেউঘেউ, স্বদেশী বিড়ালের মিউ মিউ, স্বদেশী পাখীর কিচিরমিচির আজ স্তব্ধ, স্বদেশী সিংহের গর্জ্জন থামিয়া গিয়াছে এবং স্বদেশী সব কিছুকে নির্ব্বাসন দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতায় স্বদেশী ও সিডিসনের উপদ্রবে ইংলিশম্যানের ম্যাক্স ও নিউম্যানিয়াক ক্রুদ্ধ হইয়াছে ; শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে কলিকাতা হইতে স্বদেশী বায়ু কোন দিকে বহিয়া না যাইতে পারে। ইঁদুর প্লেগের বীজাণু বহন করে। বাবু বহন করে স্বদেশীর বীজাণু। পরবর্তী অর্ডিনান্সে প্রত্যেক বাবুর মস্তকের দুই আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, ইহার ফলে স্বদেশীর প্রচার বন্ধ হইবে। স্বদেশীর বীজাণু আবিষ্কারের জন্য সিমলায় পাস্তুর ইনস্টিটিউটে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ত পরীক্ষা করা হইতেছে। পরীক্ষার ফল জানা গেলেই অর্ডিনান্স জারি করা হইবে। বাবুদের বিরুদ্ধে অভিযান সেটেল্ড ফ্যাক্ট, মিঃ মর্লে উহা আনসেটেল্ করিবেন না। ইতিমধ্যে আর সকল প্রদেশগুলিকে বাংলার সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।)

প্রতিবেশী বাংলাদেশে অশান্তি ও উপদ্রবের পরিমাণ ও সরকারী দমননীতির প্রখরতা দেখিয়া উৎকলীয় কাগজ বলিল, "বাংলায় বড় রাজভক্তির অভাব। সৌভাগ্যের কথা যে, এই ঢেউ উৎকলে লাগে নাই। উড়িষ্যার কোন স্থানে বিন্দুমাত্র অশান্তি বা চাঞ্চল্য নাই। বাংলা রাজদ্রোহী, উৎকল রাজভক্ত। এই সেদিন বাঙালী মহিলারা এক সভা করিয়া রাজদ্রোহী যুগান্তর-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রশংসা করিয়া তাঁহার মাতাকে পত্র লিখিলেন। ইহা অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে।" বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ কাগজ ভূপেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অর্থহীন ও উৎকট আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে বিরক্তি ও করুণা প্রকাশ করিল। মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও মাদ্রাজ ছাড়া আর সকল প্রদেশ রাজদ্রোহী বাঙালীদের অর্ব্বাচীনতায় তখন বিরক্ত। পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ ছাড়া আর কোন প্রদেশ বাঙালীর বয়কট আন্দোলন সমর্থন করে নাই। ক্রমশঃ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও দর্শনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অবদান

অধ্যাপক শ্রীপরিতোষ দাস

সর্ব্বদেশে মুখ্যতঃ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশে আর্য্য ও আর্য্যেতর দেব-দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কাব্য, ছড়া, গাঁথা, পাঁচালী প্রভৃতি রচিত হইয়া আসিতেছিল। তবে মনসা-মঙ্গল, ধর্ম্ম-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল শিবায়ন প্রভৃতি মঙ্গল-কাব্যগুলি তেমন করিয়া সাহিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যের ধারা শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় জাতীয় জীবনের এক পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল—ভাবপ্রবণ বাঙালী-জাতির প্রাণপ্রবাহের সহিত তখনও কাব্যের সুর-ধারার সংযোগ-সেতু স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যেন বাঙালীর জীবনে প্রাণের জোয়ার আসিল। সাহিত্যের যে ধারা এতদিন ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, শ্রীচৈতন্যদেব যেন তাহার মধ্যে প্রেমের প্লাবন বহাইয়া দিলেন। প্রাণের স্পর্শে উচ্ছল কাব্য-নদী তখন দু'কূল প্লাবিত করিয়া বাঙালীর জীবনকে শ্যামল, সরস, উর্ব্বর করিয়া প্রবাহিত হইল। বাংলা-সাহিত্য নূতন মহিমা লাভ করিয়া আপন মর্য্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বাংলা-সাহিত্যকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে।

প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির ন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যও যে ধর্ম্মের সংস্রবমুক্ত নহে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের রচনার মর্ম্মস্থলে মনুষ্য-হৃদয়ের এমন একটা রাগিণী স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে যাহার আবেদন চিরকালের। এখানে শাক্তের সকাম উপাসনা নাই, শৈবের সন্ন্যাসের বৈরাগ্যের আদর্শ নাই, আছে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিরসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছলতা। প্রাচীনকাল হইতে ভারতের অধ্যাত্মসাধনা প্রধানতঃ তিন ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে জ্ঞানমার্গ। "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি," "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। কিন্তু এ পথ সাধারণের পথ নহে। জ্ঞানের পথকে শাস্ত্রেও শাণিত ক্ষুরধার পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, কর্ম্মের পথ। বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম, দান, সেবা ইহারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কর্ম্মমার্গের পথও মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধন করিতে পারে না—'আনন্দরূপম্ অমৃতম্'-এর সন্ধান দিতে পারে না। তৃতীয় পথ ভক্তির পথ। প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ভিতরে এই ভক্তির অমৃতধারা সকল আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিয়া সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া কিরূপে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে ভক্তিধর্ম্মে সেই ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তি-ধর্ম্মের মাধুর্য্য উপলব্ধি আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত যে ভক্তি-ধর্ম্ম—দুঃখ-দৈন্য প্রপীড়িত, অভাব-অনটন, রোগ-শোক জর্জ্জরিত, নানা ব্যথায় ক্লিষ্ট, বিবিধ বৈষম্যে অশান্ত, মানব-হৃদয়ের নিকট সান্ত্বনা ও আশার সমাচার লইয়া আসিল, সেই ভক্তি-ধর্ম্মের বীজ প্রথম রোপিত হইতে দেখিতে পাই শ্রুতিতে—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতী"।

তার পর দেখি সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল ভাগবতে। ভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক—

> "এবং ব্রতঃ স প্রিয়নামকীর্ত্যা
> জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
> হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি
> উন্মাদয়ন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ভাগবতের প্রভাব প্রেমের অবতার মহাপ্রভুর জীবনে সমধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

কিন্তু ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দৈব শক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহা কতকটা বিস্ময়েরই উচ্ছ্বাস; কিন্তু ভক্ত ও ভক্তিভাজনের মধ্যে তুল্যজ্ঞান না হইলে তো ভক্তিভাজনকে আপন পরমাত্মীয় জ্ঞানে বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না!

ভাগবতের এই অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে পূরণ করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতি যে কয়জন ভক্ত মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অরুণোদয় সূচিত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধর বসু তাঁহাদের এক জন। তাঁহার কাব্যের দানলীলা খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধরা পরিহিত বংশীধারী একটি পাষাণ-বিগ্রহ নহেন;

তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুরশিরোমণি ; ভাগবতের কৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেম দান করিয়া অনুগৃহীত করেন ; শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ কতার্থ করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

এইখানে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আমরা প্রথম প্রাণের খেলা—প্রেমের মাধুর্য্যের এক নব বিকাশের চেষ্টা দেখিতে পাই যাহা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ও সাহিত্যে পরবর্ত্তী কালে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্ত-সংযোগ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অভিনব বস্তু। ভালবাসার শাস্ত্রে ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণবিজয় আর এক পদ অগ্রসর হইয়াছিল।

ভাগবতের পর রাগমার্গে ভজনের প্রথম সঙ্কেত পাই কবি জয়দেবের কান্ত-কোমল পদে বিরচিত গীত-গোবিন্দে। কিন্তু গীত-গোবিন্দের রাধার মধ্যে চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমের সেই গভীরতা, আকুলতা, তন্ময়তা নাই। গীত-গোবিন্দের রাধার মধ্যে প্রেমের চাঞ্চল্য চপলতা, ছলা-কলা, বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য্যই সমধিক। গীত-গোবিন্দের রাধা বলিতেছে :

"কথিতসময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনং।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপ-যৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজন-বচন-বঞ্চিতা॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং
তেন মম হৃদয়মিদমসমশর-কীলিতম্॥"

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছে :

"সই! কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অঙ্গ অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥"

গীত-গোবিন্দের রাধা-প্রেম যেন বায়ুতাড়িত বীচিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপরিভাগ, আর চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেম-সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় প্রশান্ততা, স্তব্ধতা, গভীরতা, পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভক্তি-ধর্ম্মের এই বিশেষ ধারাটি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, অদ্বৈতাচার্য্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে আসিয়া একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কৃষ্ণ-বিরহের তীব্র ব্যাকুলতা যখন মূর্ত্তিমান হইল শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে, তখনই প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য পরোক্ষকে ছাপাইয়া গেল। তখন হইতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গীতিকবিতা আদিরসের নির্মোক ত্যাগ করিয়া ভক্তি-প্রেমরসের মহিমা বরণ করিল।

যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে নূতন আকার ধারণ করিল, এইবার আমরা তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভক্তি-ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম—মানুষের ভূমানন্দপিপাসু হৃদয়ই হইতেছে ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি। এই ধর্ম্মে ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হইতেছে হৃদয়ের প্রেম। ভক্তি-ধর্ম্মের 'ভক্তি' কি ? ভগবানে প্রগাঢ় অনুরক্তি বা প্রেমই হইতেছে ভক্তি—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। জ্ঞানযোগী চায় পরাবিদ্যার দ্বারা মুক্তি, মোক্ষ, অমৃতত্বলাভ করিতে—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা, বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'। কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদী চায় কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসঙ্গ—তাঁহাদের সাধ্য-সাধন তত্ত্বে মুক্তি বা মোক্ষের কোন স্থান নাই। প্রেমের দ্বারাই তাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের মিলন সংঘটন করিতে চান। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রেম সাধন নয়, সাধ্য—End in itself। তাই চৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতার মুখে আমরা শুনি :

"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন—
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ,
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন।
* * *
ভক্তি-সুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥"

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ভগবান লীলাশুককে বলিলেন, "তুমি ভক্তি চাহিলে কেন ? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলের একটিও চাহিলে না, আমাকেও চাহিলে না, ইহার কারণ কি ? লীলাশুক উত্তর করিলেন :

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

আমি তোমাকে না চাহিয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি চাহিয়াছি। আমার যদি ভক্তি থাকে তবে মুক্তি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আমাকে সেবা করিবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম আর বৈষ্ণব কবিতার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এবং উভয়ের প্রেমলীলা সংঘটিত হইয়াছে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-রাজ্যে। এই কৃষ্ণ কে, আর রাধাই বা কে ? উভয়ের স্বরূপ প্রকৃতি কি ? বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ বা মথুরার শ্রীকৃষ্ণ নহেন্। শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলাও বৈষ্ণবদের মুগ্ধ করে না। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ তবে কে ? না—"আমার পরাণ যাহা চায়—তুমি তাই, তুমি তাই গো।" মানুষ রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে সেই নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিকেই খুঁজিতেছে। সেই চিরকিশোর, চিরসুন্দর নিত্যরসময়কে সন্ধান করে বলিয়াই যতক্ষণ সেই চিরবাঞ্ছিত প্রাণজুড়ানো পরম সুন্দরের

সাড়া না পায়, আপনার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া তাঁহাকে ধরিতে না পারে, ততক্ষণ বিশ্বের সকল রূপ, রস সম্ভোগের ভিতরে কি অপূর্ণতা, কি অতৃপ্তি রহিয়া যায়—কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটে না। এইজন্যই আমার মনে হয়, ইন্দ্রিয় ভোগের ভিতরে, সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয়ের মধ্যে মগ্ন হইয়াও মানুষ পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ, শান্ত হইতে পারে না। এই জন্যই রূপ-রস-স্পর্শ-সুখের ভিতরেও মানুষের প্রাণ সেই পরম সুন্দরের সাড়া না পাইলে আরও কিছু চায়; কি যেন পাওয়া হইল না এই অভাব আর মেটে না। এই পরাণ পাগলকরা অতৃপ্তি এই কি যেন চাই অথচ পাই না—এই সূত্র ধরিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়ের, রূপ হইতে অরূপের অথবা বিশ্বরূপের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আর শ্রীরাধা হইলেন ঐ মানব-হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা, অশান্ত বেদনা ও চির আকুলতার নিত্যস্বরূপা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা চিত্ত ইন্দ্রিয় কায় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণসুখ সাধনের জন্য কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকেন— এই রাধাপ্রেম বৈষ্ণবের সাধ্য শিরোমণি। এই প্রেম আদর্শ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে এই ধরণের কথা লিখিয়াছেন—যে প্রেম ভক্তকে নাচায়, ভগবানকে নাচায়, নিজেও নাচে—তিন এক ঠাঁই নাচে।

এই প্রেমমার্গে ভজন, রাগানুগা ভক্তির প্রচার এবং প্রেমকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃতি ভক্তিধর্ম্মের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নূতন অবদান। বেদমার্গ, বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া সর্বস্ব সমর্পণ ও কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিসর্জন রাধাভাবের প্রাণ। এই রাধাভাব ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পরিপূর্ণ সঙ্কেত। চৈতন্যদেব শ্রীরাধার মধ্যেই 'গোপীভাব' বা কান্তাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছিলেন—

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥"

রাধাপ্রেম কি ভাবে সাধন করিতে হয়, রাধাপ্রেম কি অপূর্ব্ব বস্তু তাহা তিনি আপন জীবনে 'আপনি "আচরি" প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যজগতে ও ধর্ম্মের ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যমাত্র নয়। চৈতন্যের জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম বিবরণ ও বিশ্লেষণ অবিচ্ছেদ্যভাবে আছে। চৈতন্যলীলা এবং বৈষ্ণব নীতি, দর্শন ও রসতত্ত্ব ইহার মধ্যে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল "শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার" করিয়া স্বাত্মানন্দ অনুভব করা। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা যে কিরূপ এবং ইহার মাধুর্য্যই বা কিরূপ আস্বাদ্য তাহাই উপলব্ধি করিবার জন্য চৈতন্যদেব করুণাবশতঃ কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ভাবটি কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার কাব্যের মঙ্গলাচরণে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈ বা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

তাই আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণবের ভগবান রসঘন আনন্দরূপ—'স এব রসানাং রসতমঃ'—Supreme Delight। মানবের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সকল মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া তিনি আপনার সেই রসস্বরূপকেই প্রকাশ করিতেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মানসিক, আত্মিক, সকল প্রকার সম্ভোগের ভিতরে এই রসস্বরূপকে উপলব্ধি করাই মানবের পরম সার্থকতা; শুধু রসের সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের প্রতি জীবের অহেতুক প্রকৃত অনুরাগ জাগিয়া উঠে।

এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পঞ্চভূত'-এর 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

Religion of Man গ্রন্থের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"I was sure that these poets were speaking about the Supreme Lover whose touch we experience in all our relations of love—the love of nature's beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between man and Man the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependence for a perfect union of individuals and the Universal.

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে ঈশ্বর-ভক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি—

"এই ত' সাধন ভক্তি দুই ত' প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥

রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলে তারে সর্ব্বশাস্ত্র গায়॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥"

বিধিমার্গে-বেদমার্গে পদচারণ, শাস্ত্রের অনুজ্ঞা পালন, সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ হইতেছে বৈধী ভক্তির লক্ষণ। আর গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এইরূপ ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতে ক্রমশঃ 'শুদ্ধা ভক্তি'র উদ্ভব হয়। আর এই 'শুদ্ধা ভক্তি'ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রেমে পরিণত হইয়াছে। যে সাধক প্রেমকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের পথে অগ্রসর হন, বিধিমার্গের ভজনা তাঁহার জন্য নয়—'রাগানুগা ভক্তি'ই তাঁহার একমাত্র পথ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে 'প্রেম' আর 'রাগানুগা ভক্তি' সমার্থক শব্দ। এই শাস্ত্রে রাগানুগা ভক্তিকেই বলা হয় 'রতি'। এই রতি আবার পঞ্চবিধ—

"অধিকার ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যেই রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥"

যেখানে ভক্তি সেখানেই কৃষ্ণ—এই ভাব শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই। সেখানে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয় সতাম্।
ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই, কবি বলিয়াছেন—

"ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত
* * *
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি।
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্ব ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥"

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত যে ভগবদ্ভক্তি তাহাতে নানা প্রকার বিধি ভক্তির, নানা প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঈশ্বর ও আমি এই ভাবে ধারণা করিতে গেলেই উভয়ের মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত ব্যবধান আসিয়া পড়ে। আমি দীন-হীন, ঈশ্বর করুণাময় পরিত্রাতা এই ভাবে ভজনা করিলে প্রেমভক্তির সাধন হয় না, আর মধুর রসের আস্বাদনেরও সুযোগ হয় না। তুমি আমার সকলের চেয়ে প্রিয়, আমার দ্বারে তুমি প্রেমভিখারী হইয়া অপেক্ষা করিতেছ—রাগমার্গের এই ভক্তিই শ্রীচৈতন্য প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইয়াছে।

'রতি' পঞ্চ প্রকার হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাবের তারতম্য রহিয়াছে। শান্তরতি হইতেছে নিষ্ঠাময়; দাস্য—সেবা ও নিষ্ঠাময়; সখ্য—বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবাময়; বাৎসল্য—মমতা, নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাসময়; মাধুর্য্য—আত্মসমর্পণ, মমতা, নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাসময়। সুতরাং 'মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ'। এই জন্য মধুর রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কান্তাভাবে ভগবানের ভজনাই হইল মধুর ভক্তের লক্ষ্য। মধুর ভজনে 'রতি'—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের সীমা ছাড়াইয়া 'মহাভাব'-এ পর্য্যবসিত হয়।

বৈষ্ণব দর্শন ও তত্ত্ব অগাধ সমুদ্র-বিশেষ। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করিতে পারিলে সকল ধর্ম্ম ও দর্শনের সারমর্ম্ম অন্তরস্থ হইতে পারে। ধর্ম্মের বিরাট সমুদ্র মন্থন করিয়া যেন প্রেমাবতার চৈতন্যদেব মাধুর্য্য-মণ্ডিত প্রেমভক্তিরূপ অমৃত আহরণ করিয়াছেন—যা চিরকাল মানবের আত্মার ক্ষুধা মিটাইবে। ভগবান ও ভক্ত উভয়কে এক অনাবিল রসসমুদ্রে নিমজ্জন বাংলাদেশে যেভাবে সাধিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

এমার্সনের জীবন-দর্শন

রেজাউল করীম

ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী সভ্যতার নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা তীব্র কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাঁহারা পুনঃ-পুনঃ এই কথাটার উপর জোর দিয়াছিলেন যে, দেহ ও দেহের স্বার্থ সর্ব্বস্ব নহে, দেহের সুখসুবিধা মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং দেহের বাহিরে ও দেহের অন্তরালে যে মহান্ আত্মা সদা জাগ্রত আছে তাহাকেই ভালরূপে জানিতে হইবে, সেই আত্মার উন্নয়ন, স্ফুরণ ও বিকাশই সত্যকার মনুষ্যত্ব—মনীষী এমারসন তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সচেতন বিবেকের বাঙ্ময় প্রকাশ, তাঁহার লেখার মধ্যে আছে একটা তেজস্বী ও ওজস্বল ভাবের প্রবাহ। তিনি যেন তাঁহার যুগের Oracle বা দৈববাণী। মানুষ এমার্সনকে আমরা ততটা জানি না, যতটা জানি দার্শনিক চিন্তাশীল ও মহতী বাণীর বাহন এমার্সনকে। তিনি যেন একটা transcendental বা অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রতীক। তিনি যেন একটা উচ্চ নিনাদী পাঞ্চজন্য—আর তাহা হইতে সতত উদ্গীরিত হইতেছে একটার পর একটা আহ্বানধ্বনি—যে ধ্বনি জড়বাদী সভ্যতার সমস্ত কোলাহল ভেদ করিয়া কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের মর্ম্মমূলকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলী পাঠ করিলে মনে হইবে যে, আমরা যেন বাইবেলের যুগের কোন মহামানবের কণ্ঠ হইতে দৈববাণী শুনিতেছি। তাঁহার সে বাণীতে আছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মলতার মহান্ আদর্শ। কর্ত্তব্যভ্রষ্ট মানুষের কাছে তিনি বারবার শুনাইয়াছেন কর্ত্তব্যের সার্ব্বজনীন আদর্শ।

কিন্তু এমার্সনের রচনা হইতে একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, তিনি কেবল স্বপ্নদর্শী অবাস্তব সাধক—কতকগুলি 'counsel of perfection' শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সত্যই তাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উদার ছিল। তিনি ছিলেন এক জন মরমী সাধক, মিষ্টিক কবি ও লেখক। কিন্তু তাঁহার এই মরমীভাবের মধ্যে কোন বৈরাগ্য ছিল না। তিনি সংসারত্যাগী হইতে কাহাকেও উপদেশ দেন নাই। তিনি সত্যই মরমী সাধক। কিন্তু এই দিকটাই তাঁহার চরিত্রের সবটুকু নহে। তাঁহার যুক্তিবাদ, তাঁহার বাস্তববাদ ও জগতের প্রয়োজনের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহাকে সংসারবিরাগী ফকির হইতে দেয় নাই। তাঁহার মিষ্টিক মনের পার্শ্বেই ছিল একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধীর মেধা ও স্বচ্ছ চিন্তা। তিনি অদৃশ্য জগৎকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে। নির্জ্জন গুহাবাসী সাধকরূপে নহে, বরং এই জগতের রক্তমাংসের অধিবাসীরূপে তিনি অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার রহস্য ভেদ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমেরিকার বাস্তব দৃষ্টিও তিনি কোন দিন ভুলেন নাই। তিনি যখন বলিতেন 'Hitch our wagon to the star', অর্থাৎ—মালগাড়ীকে নক্ষত্র-লোকে লইয়া যাও, তখন তাঁহার মধ্যে মরমী নীতিবিদকেই দেখি। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, তাঁহার এই উপদেশের মধ্যে বেশ একটা বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় আছে। অর্থাৎ তিনি মালগাড়ী সম্বন্ধে যেমন সচেতন তেমনই সচেতন ঊর্দ্ধলোকের তারার সম্পর্কে। অর্থাৎ—তাঁহার মতে বাস্তব জগতের বস্তুকে যেমন ভুলিলে চলিবে না, তেমনই অনন্ত জগতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করাও সমীচীন নহে। মানুষের জন্য এই দুইয়েরই সমন্বয় প্রয়োজন—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থকে মহৎ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই হইল তাঁহার সাধনা। কেবলমাত্র যাঁহারা আদর্শবাদী তাঁহারা সর্ব্বদাই নক্ষত্রলোকে তাকাইয়া থাকেন, এমার্সন তাহাদিগকে মৃদু ভর্ৎসনাই করিয়াছেন উপরের ঐ উক্তির মধ্যে।

কিন্তু বাস্তববাদী হইলেও এমার্সন সত্যই মিষ্টিক ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যেই তাঁহার এই মিষ্টিক বা মরমীভাবটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জীবনের অনেকটাই মরমী ভাব দ্বারা উন্নত। মিষ্টিক দিকটাই তাঁহার জীবনদর্শনের মূলকথা। তাঁহার বিখ্যাত রচনা 'Over Soul' পড়িলেই তাঁহার অন্তরের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই 'Over Soul' প্রবন্ধটি দার্শনিকেরা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন:

> We live in succession, in division, in parts, in particles. Meantime, within man is the soul of the whole; the wise silence, the universal beauty to which every part and particle is equally related; the eternal One . . . from within or from behind, a light shines through us upon things, and makes us aware that we are nothing, but the light is all. A man is the facade of a temple, wherein all wisdom and all good abide."

যিনি এমন মহান্ বাণী শুনাইতে পারেন, তাঁহাকে মরমী দার্শনিক ব্যতীত আর কি বলিব? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই যে পৃথিবী তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে একটা আধ্যাত্মিক আত্মা। প্রশ্ন হইতে পারে, এই আত্মা কি বস্তু? এমার্সন বলেন যে, ইহা একটা সার্ব্বজনীন বেগবান

জীবন-স্রোত, যাহা ব্যক্তিগত জীবনের উপর উপচাইয়া উঠে। ইহা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। আত্মার জীবনই মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা দান করে। এই আত্মাই মানুষের অন্তরকে অধিকার করে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব হইতেছে এক একটা দ্বীপ বিশেষ, আর তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যাপৃত রহিয়াছে অনন্ত সমুদ্র। জীবনে আত্মার প্রভাব যাহারা স্বীকার করে তাহারা পরস্পরের সহিত ঐকান্তিকভাবে মিলিত হয়। প্রত্যেক মানুষই ইহার প্রভাব স্বীকার করে। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি এই আত্মার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষই তাহার আত্মার ফটোগ্রাফ হইতে পারে। সুতরাং আমাদের গোপন দরজা খুলিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে প্রতিফলিত হইতে দেওয়া উচিত। এমার্সনের আর একটি উক্তি বড়ই সুন্দর : —"আমি সব সময় মানুষ সম্বন্ধে এই কল্পনা করি কে যেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছে, তাহার সহিত কথা বলিতেছে। মানুষ পশ্চাতের দিকে চাহিলে তাহাকে দেখিতে পাইবে না, অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়তই এই বাণী শুনিতেছে। কিন্তু তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই।"

এমার্সনের মতে জীবনের উদ্দেশ্য হইল, মানুষকে তাহার নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া। প্রতিনিয়ত যে সব নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে তাহাকে অন্তরে প্রতিফলিত করিতে হইবে এবং বাঁধাধরা পথ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন : "আমি যাহা অনুভব করি ও চিন্তা করি, তাহা অকপটে বলিতে চাই, তবে তাহাতে এই একটিমাত্র সর্ত্ত থাকিবে যে, হয়ত আগামী কাল আমার আগেকার সমস্ত কথারই প্রতিবাদ করিয়া বসিব। সেজন্য আমাকে দোষ দিলে চলিবে না। এ অধিকারও আমি চাই। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে গত কাল, আজ ও আগামী কাল সব সময়ই আমাদের মত ও ধারণা একই থাকিবে। কালকের মতের সহিত আজিকার ও আগামী কালের মতের একটা সঙ্গতি রক্ষা করিতে আমরা সদাই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সত্যোপলব্ধি যাঁহার উদ্দেশ্য, অন্তরকে নূতন নূতন ভাব দ্বারা সমৃদ্ধিশালী করিতে যিনি সদা উদ্‌গ্রীব, তিনি এই প্রকার সঙ্গতিকে আমার বলিয়া মনে করেন। তাই "Self-reliance" প্রবন্ধে এমার্সন বলিয়াছেন :

"A foolish consistence is the hobgoblin of little mind, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do."

এমার্সন এই প্রবন্ধে যাহা বলিতে চান তাহার তাৎপর্য্য এই : "তুমি যদি খাঁটি মানুষ হইতে চাও, তবে তুমি আজ যাহা চিন্তা করিয়াছ তাহা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা কর, আগামী কাল যে চিন্তা তোমার মনে আসিবে তাহাও তেমনি বজ্রনাদে প্রকাশ কর, যদিও তোমার এই চিন্তা তোমার পূর্ব্বের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইরূপ করিলে হয়ত লোকে বলিবে, 'তোমাকে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব', অথবা লোকে তোমাকে ভুল বুঝিবে।" এমার্সন বলেন, ভুল বুঝুক আর যাহাই করুক তোমার মনে যে চিন্তা আসিবে তাহা কাহারও পরোয়া না করিয়া প্রকাশ কর। লোকে পিথাগোরাস, সক্রেটিস, যীশুখ্রীষ্ট, লুথার, কোপারনিকাস—ইঁহাদের প্রত্যেককেই ভুল বুঝিয়াছিল। তাই বলিয়া কি তাঁহারা মনের কথা প্রকাশ করিতে ভয় পাইয়াছিলেন? তাই এমার্সন বলেন,—

"To be great is to be misunderstood."

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এমার্সন একদিকে যেমন মিষ্টিক ভাবে বিভোর, অপর দিকে আবার সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারার সমালোচক। বস্তুতঃ তিনি সমালোচনার দৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। এমার্সন ছিলেন শান্ত স্বভাবের মানুষ। ক্রোধ, হিংসা এসব চিত্ত-বিলাসী পাপকে তিনি সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন গভীর চিন্তাশীল লেখক। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দার্শনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিতে চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন তাঁহার চিন্তারাজির দ্বারা এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে যাহা পাঠকবর্গকে ধীরে ধীরে অনুপ্রাণিত করিবে, তাহাদের অন্তরকে দোলা দিবে। তবে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার মনে করিতেছি। এমার্সনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এই যে, তাঁহার চিন্তার মধ্যে মৌলিকতার বড়ই অভাব। এ অভিযোগ কতকটা সত্য। তাঁহার প্রতিটি রচনা বহু পরিচিত। তাহা হইতে দেখা যাইবে তিনি পৃথিবীর নানা দেশের সুধীবৃন্দের নিকট হইতে বহু আদর্শ ও নীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী ছিল অপূর্ব্ব। পুরাতন কথাগুলিই তাঁহার হাতে আসিয়া তাঁহার নিজস্ব ভাষায় এমন রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহা পাঠকদের সম্মুখে সজীব, সতেজ হইয়া উঠিয়াছে।

মরমী ভাবের মতই এমার্সনের বাস্তবতাবোধও প্রবল ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন আচরণই মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। তাঁহার মরমী মতবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন অপেক্ষা নৈতিক চরিত্রগঠনের দিকেই অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিল। তিনি মনে করিতেন জীবনের প্রধান বিষয় হইতেছে 'আচরণ'। তিনি বলিয়াছেন :

"প্রত্যেক মানুষ সাধারণতঃ এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখে যে, তাহার প্রতিবেশী যেন তাহাকে প্রতারিত না করে। তাহার

পর এমন সময় যেন আসে যখন সে তাহার প্রতিবেশীর সহিত প্রতারণা করে না। এই অবস্থা যদি সকলের হয়, তবে সকলই ভাল ভাবে চলিবে। তখন সে তাহার বাজারের গাড়ীকে স্বর্গে যাওয়ার রথে পরিণত করিতে পারিবে। তাঁহার মতে সৎ চিন্তা ও সৎ জীবন একই সঙ্গে চলিতে পারে। সাধারণ নীতিবিদ্‌গণ বলেন: "সদ্‌ভাবে বাস কর, এবং মানসিক সত্যোপলব্ধির জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিও না।" কিন্তু এমার্সন বলেন, "যদি সদ্‌ভাবে বাস করিতে চাও, তবে তোমাকে সৎ চিন্তা করিতে হইবে।" তিনি দেহ ও মনের সুস্থ অবস্থাকেই Morality বা নীতি বলিয়া মনে করেন। সৎ চরিত্র বলিতে তিনি বুঝেন:

"A habit of action from the permanent vision of truth."

অর্থাৎ, সত্যের শাশ্বত দৃষ্টি হইতে যে কর্ম্মের অভ্যাস তাহাই চরিত্র। এইখানে আমরা দেখিতে পাই কেমন সুন্দর ভাবে Moralitst এবং Mystic একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এমার্সন মনে করেন যে, সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া যে 'স্পিরিট' বা আত্মা রহিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ পালন করা অন্ধ অদৃষ্টবাদ নহে। এই 'স্পিরিটে'র নির্দ্দেশ পালন হইতেছে মানুষের সচেতন আগ্রহ। প্রত্যেক মানুষকে সেই মহান্ বিশ্বব্যবস্থার সহিত এক হইয়া যাইতে হইবে। মানুষ যদি তাহাই হইতে পারে, তবে সে বিশ্ববিধাতার বিধিকে নিজের জীবনে সার্থক করিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিব: "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।" আমরা এই ভাবে নিজেদের উপলব্ধি করিয়া বিশ্বের বিরাট শক্তির সহিত একাত্ম হইয়া অপরের নিয়ন্তা হইয়া থাকি। এমার্সন পুনঃপুনঃ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, জড়জগতের বিধির মতই নৈতিক বিধিও পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থতাবিহীন। যেমন মাধ্যাকর্ষণশক্তি ও রাসায়নিক শক্তি মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেইরূপ নৈতিক বিধিও তাহার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। এমার্সন ধর্ম্ম, নীতি সবই মানিতেন। কিন্তু তিনি কখনও গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন না। কার্লাইলের মত তিনি মনে করিতেন, ধর্ম্মের সার হইতেছে "নৈতিক জীবন"—ধর্ম্মতত্ত্বকে তিনি বলেন "Rhetoric of morals", অর্থাৎ নীতির অলঙ্কার। কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবাদকে বর্জ্জন করিয়া কেবল "নীতির জন্য নীতি" একথাও স্বীকার করেন না। যাহারা নীতির মূল উদ্দেশ্য বোঝে না, তাহারা কেবল নীতি, নীতি করিয়া চীৎকার করে। তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন:

"Men talk of morality, which is much as if we should say, "Poor God, with nobody to help him!."

হিতবাদী দার্শনিকগণ বলেন, "নীতি সুখ সৃষ্টি করে।" কিন্তু এমার্সন এ মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন—এ-কথা সত্য যে, রাষ্ট্র অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণ ভালর ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু ভালর মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক মঙ্গলকেও স্থান দিতে চান। আর এই আধ্যাত্মিক মঙ্গল পাইতে হইলে যদি কিছু সাংসারিক অসুবিধা আসে, তবে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে:

"He that feeds men serveth few
He serves all who dares to be true."

যে ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে খাওয়ায় সে অল্প লোকেরই সেবা করে, কিন্তু যে সত্যসন্ধ হইতে সাহসী হয় সে সকলেরই সেবা করে। ইহাই হইল এমার্সনের জীবনদর্শন।

এমার্সন ছিলেন চরম আশাবাদী। তাঁহার সমস্ত রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভিক্টোরীয় যুগে ইংলণ্ডের চতুর্দ্দিকে জড়বাদের জয়জয়কার দেখিয়া মনীষী কার্লাইল হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। লণ্ডন নগরের পথে পথে মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁহাকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই সব দৃশ্য দেখিয়া এমার্সন হতাশ হইয়া পড়েন নাই। তিনি মানুষের সামনে বলিষ্ঠ আশাবাদের আদর্শ তুলিয়া ধরেন। তাই তিনি ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন, "Evil has no real existence"। আমরা প্রতিটি বস্তুকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি বলিয়া "মন্দ" দেখিয়া ভীত হইয়া পড়ি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে না দেখিয়া যদি সামগ্রিক ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হই, তবে সমস্ত Evil বা মন্দ দূর হইয়া যাইবে। এমার্সনের নিজের জীবনে কম দুঃখ ছিল না। তাঁহাকে চিরকালই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাঁহার চিরপোষিত বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু কিছুই তাঁহাকে হতাশ করিতে পারে নাই। তিনি সব সময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেন:

"That which befits us, embosomed in beauty and wonder as we are, is cheerfulness and courage and the endeavour to realise our aspiration . . . Shall not the heart which has received so much, trust the power by which it lives? May it not quit other leadings, and listen to the Soul that has guided it so gently, and taught it so much, secure that the future will be worthy of the past?"

এমার্সন নিজের যুগের নৈতিক শক্তির আধার ছিলেন। এ যুগেও মানুষ তাঁহার বলিষ্ঠ আশাবাদ ভুলিতে পারিবে না। আজিকার যুগে এমনি লোকের প্রয়োজন, যিনি বর্ত্তমান জগতের সম্মুখে আশার আলো জ্বালাইয়া রাখিতে পারেন।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত কয়েক মাস হইতে 'প্রবাসীতে' 'পাড়াগাঁয়ের কথা' প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কি মূল্য আছে বলিতে পারি না; এই সকল প্রবন্ধ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি না তাহাও জানি না। তবে বহু পরিচিত ও অপরিচিত পল্লী-দরদী ব্যক্তির নিকট হইতে 'পাড়াগাঁয়ের কথা' লিখিবার জন্য অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে ও আসিতেছে। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ কারণ ইহা পল্লীর প্রতি শিক্ষিত সমাজের দরদের পরিচয় দেয়।

কৃষিই পল্লী অঞ্চলের প্রধান পেশা; সুতরাং "পাড়াগাঁয়ের কথা" লিখিতে গেলে প্রথমেই কৃষির কথা মনে আসে। আমন ধানের চাষের পক্ষে এই বৎসরের আবহাওয়া মোটামুটি অনুকূল ছিল; ফসলও সন্তোষজনক হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে রোগে ও পোকায় ফসলের খুবই ক্ষতি হইয়াছে। কৃষি-বিভাগ ইহার বিশেষ কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অনেক স্থানে তাঁহাদের উপদেশ ও ব্যবস্থা খুবই দেরীতে পৌঁছিয়াছে।

কৃষি-বিভাগ কর্তৃক বিতরিত] বীজের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ আস্থা এখনও জন্মায় নাই।

গ্রামের গরু

উন্নত শ্রেণীর গরু

[দুই-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি অতি সহজে বুঝা যাইবে। বর্ত্তমান বৎসরে কৃষি-বিভাগ অতি অল্প পরিমাণ পাটের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মূল্য ছিল প্রতি মণ ৭০৲ টাকা। আমার অঞ্চলের অনেক ইউনিয়নের বহু কৃষক এই বীজ ক্রয় না করিয়া শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষের পাটের বীজ সের প্রতি ৪।৷৹ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহার বীজের চাহিদাও খুব বেশী ছিল। স্থানে স্থানে কৃষি-বিভাগের পাটের বীজ অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। ইহার হিসাব-নিকাশ কি ভাবে হইয়াছে জানি না। কৃষি-বিভাগ দেশী ও বিলাতী শাকসব্জীর বীজও বিতরণ করিয়া থাকেন। এই সকল বীজের প্রতিও কৃষকদের তেমন আস্থা নাই। গত ঋতুতে কৃষি-বিভাগ উন্নত শ্রেণীর গমের বীজও সরবরাহ করিয়াছিলেন। আমার অঞ্চলের অনেক স্থানে ইহারও কিছু অংশ অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়াছিল। অবশেষে আটা প্রস্তুতের জন্য উহা বিক্রয় করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ বীজ সরবরাহের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক উন্নত শ্রেণীর শস্যের চাষের পরিমাণ হিসাব করা হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা যাইতেছে প্রত্যেক উন্নত
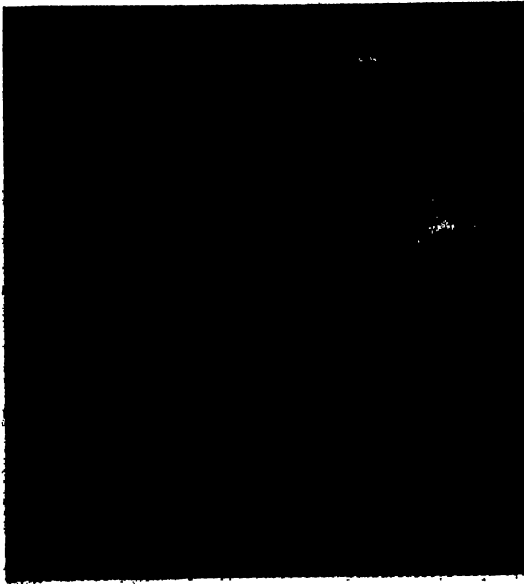
উন্নত শ্রেণীর বাছুর
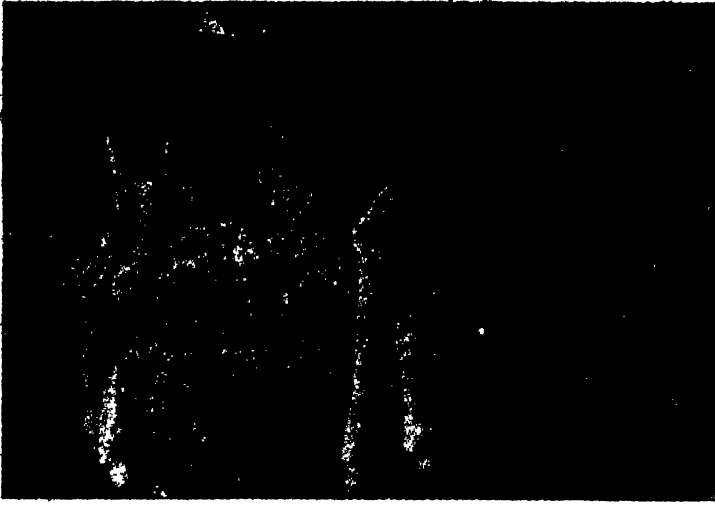
শ্রেণীর শস্যের বীজ সম্পূর্ণরূপে বপনের জন্য বিক্রয় হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে উহা খাদ্যের জন্য বিক্রীত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাও হয় না। উন্নত শ্রেণীর শস্যের চাষের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য ঠিক বপনের নিমিত্ত কি পরিমাণ বীজ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা জানা বিশেষ দরকার।

ধান, গম ও গোল আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি-বিভাগ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইউনিয়ন কৃষি-কর্ম্মচারিগণ এই বিষয়ে নিজ নিজ এলাকায় প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কৃষকদিগের নিকট হইতে বিশেষ সাড়া মিলিতেছে না। দুই টাকা ভর্ত্তি ফি দিয়া অনেক কৃষক এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। নিম্নতম স্তরের কর্ম্মচারিগণকে চাকরি রক্ষা করিবার জন্য জোরজবরদস্তি করিয়া প্রতিযোগী সংগ্রহ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গত বৎসরের আলুর প্রতিযোগিতার ফল এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। কাজেই এই প্রতিযোগিতার উপরও কৃষকদের আস্থা হ্রাস পাইয়াছে।

সম্প্রতি আমার গ্রামে (আঁটপুর, আঁটপুর পোঃ, জেলা হুগলী) একটি কল বসিয়াছে। ইহাতে গম ও ধান ভাঙা হয়। জানি না এইরূপ কলের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় কি না। তবে এই কলটি স্থাপনে গ্রামবাসীদিগের খুবই সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে 'কন্ট্রোলের' দোকান হইতে গম লইয়া উহা ভাঙাইবার জন্য তিন-চার মাইল দূরে যাইতে হইত, এখন সে অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। এক সের গম ভাঙাইবার জন্য এক আনা লাগে, অর্থাৎ মণ প্রতি ২॥• টাকা খরচ পড়ে। এক মণ ধান ভাঙাইবার জন্য দশ আনা দিতে হয়। বর্ত্তমানে ঢেঁকিতে এক মণ ধান ভাঙাইতে ২॥• টাকা লাগে। সুতরাং কলে ধান ভাঙাইবার জন্য লোকের ভিড় যথেষ্ট হয়। কলে ধান ভাঙাইলে আর একটি সুবিধা এই হয় যে, চাউলের সঙ্গে সঙ্গে তুঁষ, কুঁড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। ঢেঁকির বেলায় তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই কারণে অনেক দুঃস্থ ও দরিদ্র স্ত্রীলোক—যাহারা ঢেঁকিতে ধান ভাঙিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত এবং বর্ত্তমান সময়ের গ্রাসাচ্ছাদনের অনেকটা ভার লাঘব করিত—খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে।

এই বৎসর আমাদের অঞ্চলে বৃক্ষ-রোপণের কোন উৎসাহ বা প্রেরণা
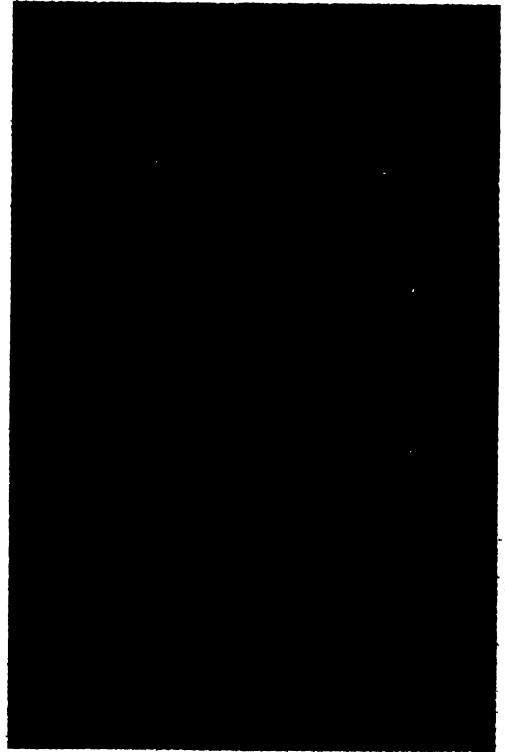
শান্তিনিকেতনে আতা গাছ

দেখি নাই। গত বৎসর আমারই গ্রামের এক বাঁধের উপর খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মৎস্যমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বাবলা গাছের চারা রোপণ

করিয়াছিলেন এবং সেই দিনই ঐ গ্রামে পশ্চিম বাংলায় প্রথম ভূমি-সেনা দল গঠিত হইয়াছিল। সেই দিন যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়াছিলাম তাহা যে এত শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহা কখনও ভাবি নাই। বাঁধের উপর রোপিত বাবলা চারাগুলি অযত্নে এবং অবহেলায় মরিয়া গিয়াছে ; স্থানীয় কৃষি-কর্ম্মচারিগণের এই দিকে কোন দৃষ্টি ছিল না। স্থানীয় জনসাধারণ ত এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। ভূমি-

ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের অনুকম্পায় উক্ত বাঁধের উপর সম্প্রতি একটি টিউব ওয়েল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলের বহু দিনের জলকষ্ট দুরীভূত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ ইহা বিনা খরচায় পাইয়াছে এবং তাহারা ইহার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতনের মোসাম্বি লেবু
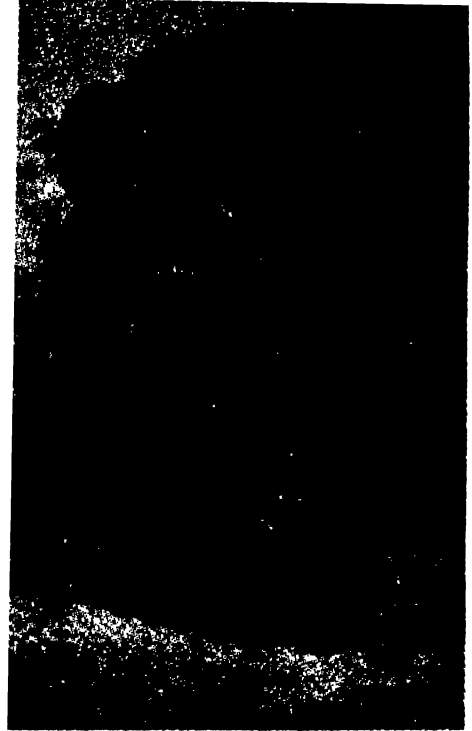
শান্তিনিকেতনে আঙুর

সেনাদলেরও অস্তিত্বের তেমন কোন পরিচয় পাই না। গত ২৮শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় যখন আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণের জন্য সেখানে গমন করিয়াছিলেন তখন আঁটপুর ষ্টেশনে ভূমি-সেনাদল কোদাল স্কন্ধে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। রাজ্যপাল মহোদয় তাহাদের কোদাল দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—"কোদাল ত সব নূতন ও চক্‌চকে দেখিতেছি, কাঁধে বহন করিবার জন্যই কি এদের কোদাল দেওয়া হইয়াছে ?"

যাহা হউক, উক্ত বাঁধের উপর বাবলা চারাগুলির মৃত্যু

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের কথা লিখিতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। তিনি যে নিষ্ঠা ও অনুরাগ লইয়া স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিতেন সেই নিষ্ঠা ও অনুরাগ আর কাহারও আছে কি না জানি না ; তিনি বলিতেন :

"Trees have been so kind to me. I have always sought their advice. They are beautiful like poems. The earth would be desolate without trees. I have really a passion for them. To cultivate a tree is to sit with God.*

* Tagore's Garden at Santi Niketan, Indian Farming Vol. VII, No II.
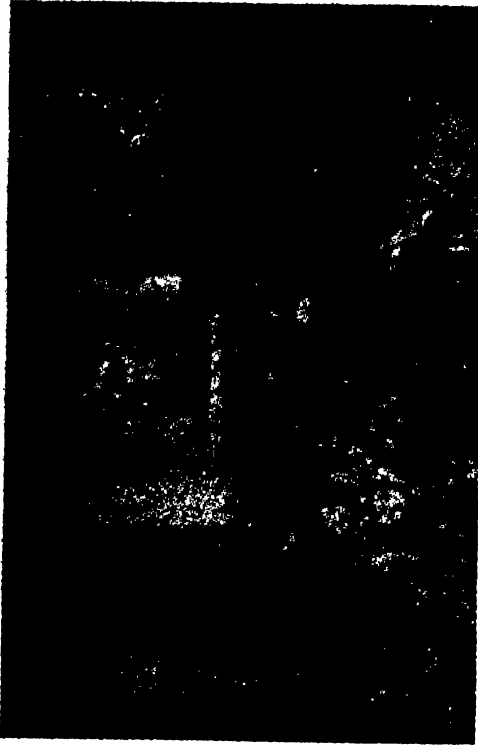
শান্তিনিকেতনে লিচু গাছ

বৃক্ষরোপণের প্রতি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিষ্ঠা ও অনুরাগ কম নহে। বৃক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাকে 'যাদুকর' বলা যায়। "যাদুকরে"র স্পর্শে শান্তিনিকেতনের অনেক বৃক্ষ এমন ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের চেনা কঠিন হইয়া পড়ে। লতানে আম, লতানে বাতাবী লেবু, লতানে আতা, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি তাঁহারই সৃষ্টি।

পল্লী অঞ্চলে গো-জাতির অবস্থা অতি শোচনীয়। এখানে-সেখানে দুই-একটি উন্নত শ্রেণীর গরু, বাছুর দেখা যায়। গো-জাতির উন্নতি না হইলে কৃষিরও উন্নতি হইবে না। ইহার নিমিত্ত বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এবং বিশেষজ্ঞগণের সেই দিকে তেমন দৃষ্টি দেখা যায় না। ইঁহারা শহর লইয়াই ব্যস্ত; শহরের উপরই ইঁহাদের অধিকতর নজর।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত

আজ দেশের অর্দ্ধেকের উপর জনসমষ্টি কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও যখন প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন হইতেছে না, তখন অধিকসংখ্যক লোককে যদি বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষা দিয়া কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করা যায় তবেই খাদ্যোৎপাদন সমস্যার সমাধান সম্ভবপর, তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমির উন্নয়ন সাধিত ও কৃষিকার্য্যে অধিকসংখ্যক লোক নিয়োজিত হইতে পারিবে। পরলোকগত কৃতী বাঙালী কৃষিবিদ্ রায়বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাফল্য-মণ্ডিত কর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা দেশবাসীকে কৃষিশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য আজ তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের পর্য্যালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন :

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা
জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।"

অর্থাৎ, কৃষি ধন্য, কৃষি পূজ্য এবং কৃষিই প্রাণীদিগের জীবনস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য্য রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই কৃষির উন্নয়ন, কৃষি-শিক্ষা বিস্তার ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-পদ্ধতি প্রচারের জন্য তিনি সারাজীবন প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশে তখনকার দিনে কৃষিশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না, সেই অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাঁহার সংগঠন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। চুঁচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের পত্তন ও উন্নতির মূলে তাঁহার উদ্যম ও প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল, আজ তাহাই কৃষিবিষয়ক একটি প্রধান ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান-রূপে জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। এই

প্রসঙ্গে ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের পরিকল্পনা ও সৃষ্টির কথা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য।

কৃষি-গবেষণার তথ্যগুলি যাহাতে কেবলমাত্র পুস্তকে নিবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণ কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইয়া সার্থক হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ডিমনস্ট্রেটর বা কর্ম্মপ্রদর্শক পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃষকেরা যাহাতে অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিতে পারে সেইজন্য তাঁহারই উদ্যোগে প্রত্যেক জেলায় সরকারী বীজ-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা "কৃষিকথা"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা—তাঁহারই কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আজ বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বাংলার কৃষির উন্নতির জন্য রাজেশ্বরবাবু তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

১৮৭৮ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩ই আশ্বিন) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্ববঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি তাঁহার পিতামাতা উভয়কেই হারান। তাঁহার শৈশবকালীন শিক্ষা বরিশালে আরম্ভ হয়, বরিশাল হইতেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কৃষি-বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলিয়া শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উচ্চ কৃষি-শ্রেণীতে বিশেষ ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্থান হইতে তাঁহার জীবনের সাধনার পথ উন্মুক্ত হয়। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। কৃষিশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি ঠাকুর রাজ ওয়ার্ড এষ্টেটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। পরে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন, এবং ১৯০৪ সালে কৃষি-বিভাগের পরিদর্শকরূপে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। পরবর্ত্তীকালে শিলং কৃষিক্ষেত্র ও জোরহাট কৃষিক্ষেত্রের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

১৯০৮ সালে রাজেশ্বরবাবু ঢাকা সরকারী বীজবিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপে বদলী হইয়া যান। ১৯১২ সালে গো-মহিষাদির গণনা, পাটের হিসাব ও বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া তিনি কৃষি-বিষয়ক প্রয়োজনীয় বহু তথ্য প্রচার করেন; তাহাতে কৃষকসম্প্রদায় ও জনসাধারণের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। সেই সময় তিনি প্রাদেশিক কৃষি-সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সার্ভিসে অস্থায়ীভাবে ডেপুটি ডিরেক্টর পদ লাভ করেন, এবং যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

সেই পদে ১৯১৯ সালে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সার্ভিসের পদ লাভ করেন। ১৯২৬ সালে রাজকীয় কৃষি কমিশন যখন বাংলা পরিদর্শন উপলক্ষে এদেশে আসেন তখন রাজেশ্বরবাবুই যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচিত হওয়ায় লিয়াজন অফিসার অর্থাৎ বহু প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগরক্ষাকারী ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত হন এবং কমিশনকে পরিদর্শন-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। সেই সময়েই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ বৎসর ২২শে নবেম্বর রাত্রি ১টার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দেশের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-পদ্ধতি প্রচলনের জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কৃষিকার্য্যে উন্নতির জন্য তিনি নানা স্থানে শিক্ষাপ্রদ বহু কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালে ময়মনসিংহের কৃষিশিল্প প্রদর্শনী, ১৯০৮ সালে জোড়হাটে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী, ধুবড়ীতে ১৯১০ সালের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কৃষিপ্রদর্শনী এবং কলিকাতায় ভবানীপুরে নিখিল-ভারত কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী এবং আরও ছোটবড়

বহু প্রদর্শনীতে তিনি সংগঠন-ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদর্শনী-সংক্রান্ত কার্য্যে যোগ্যতার জন্য তিনি কয়েকটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। উত্তর বাংলার সান্তাহারের বন্যায় তিনি তাঁহার সংগঠন-ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।
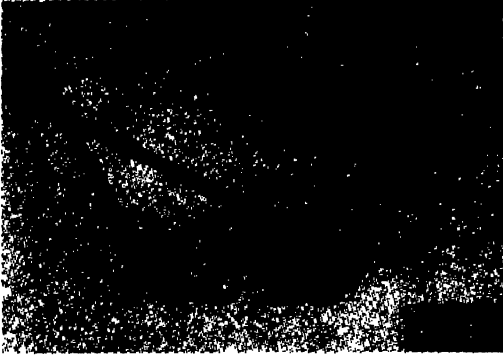
'রাজেশ্বর প্লাউ'

অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমি চাষ করার জন্য তিনি যে একটি উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা 'রাজেশ্বর প্লাউ' নামে খ্যাত। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজেশ্বর দাশগুপ্ত রচিত কৃষি-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

জলসেচের সুব্যবস্থার জন্যও তিনি একটি উন্নত শ্রেণীর গভীর নলকূপের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রপ্তানির অসুবিধার জন্য পাটের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন তিনি পাটচাষীদের কুটীর-শিল্পে উৎসাহ দিবার জন্য একটি অভিনব তাঁত প্রস্তুত করেন। ইহাতে সুন্দর চটের বস্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কৃষিশিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত পুস্তকের অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন। সেই অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি কৃষিবিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক তাঁহার রচিত তিনখানি কৃষি-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। কৃষি-বিজ্ঞান (কৃষির মূলনীতি) নামক গ্রন্থখানি বহুল প্রচার হইয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞান দ্বিতীয় খণ্ড (ফসল, সব্জী ও ফল) অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে এবং কৃষি-বিজ্ঞান তৃতীয় খণ্ড (গো-পালন) শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতির বহুল প্রচারের জন্য রাজেশ্বরবাবু এই পুস্তকের বিষয়বস্তু অতি সহজ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান অধ্যায়ে তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধীয় শব্দের উৎকৃষ্ট বাংলা পরিভাষা প্রবর্ত্তন করেন। এই পুস্তকখানি প্রাথমিক শিক্ষার্থী ও উচ্চশিক্ষার্থী উভয়েরই পক্ষেই অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে।

তাঁহার কর্ম্মশক্তি শুধু কৃষি প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের বহু জনহিতকর কার্য্যেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, উন্নত চরিত্র, উদার অন্তঃকরণ, হৃদয়ের মাধুর্য্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইত না। তিনি বহু দুঃস্থ ছাত্রের আশ্রয়দাতা এবং বহু নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতিপালক ছিলেন।

"অন্নং বহু কুর্বীত"

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, শিষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এই সন্ধিকালে আচার্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন :

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)
গৃহী হইয়া বহু অন্ন উপার্জন করিবে। ইহাই ব্রত।

উপনিষদের ঋষি যেদিন সমাগত শিষ্যকে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন সংকল্পবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি।
যথা বক্তব্য বলিব। সত্য বলিব।

শিক্ষা সমাপনান্তে গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বনে ইচ্ছুক শিষ্যকে তাঁহার প্রধান কর্তব্যের অনুশাসন প্রদান করিলেন—'অন্নং বহু কুর্বীত'।

সেকালে শিষ্যেরা গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, অন্নের ভাবনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিত না। এখন গৃহী হইতে চলিয়াছেন, এখন হইতে অন্ন সংগ্রহের কথা তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইবে। কিন্তু, গুরু কেন যৎসামান্য অন্ন-সংগ্রহ করিয়া অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়া তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ হইতে না বলিয়া বহু অন্ন উপার্জন করিতে বলিলেন। সংসারধর্মে ইহলোকের সুখসম্ভোগ ভারতীয় ঋষিদিগের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত। তবে কেন এই বহু অন্ন উপার্জনের অনুশাসন। ইহা গৃহীর প্রতি উপদেশ, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি নহে। গৃহী এবং সন্ন্যাসীর কর্তব্য স্বতন্ত্র। উভয়েই তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহান্—যদি তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় আশ্রমোচিত কর্ম পালন করেন।

গৃহীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য অন্ন উপার্জন করা এবং এই অন্ন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উপার্জন করিতে হইবে। গৃহীকে প্রচুর অন্ন উপার্জন করিতে হইবে—তাঁহার নিজের ভোগের জন্য নহে। অপরিমিত আহার গ্রহণের বিধি ভারতীয় জীবনধারায় নাই। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি বানপ্রস্থী, কি সন্ন্যাসী কাহারও পক্ষে অসংযত আহারের ব্যবস্থা নাই। গৃহী প্রচুর অন্ন উপার্জন করিবেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে যাঁহারা অন্নপ্রার্থী হইয়া আসিবেন তাঁহাদিগের জন্য।

আচার্য বলিলেন—"ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত"—যাঁহারা তোমার নিকটে বাস করিতে আসিবে তাঁহাদের কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না। "তদ্ ব্রতম্"—তাহা তোমার ব্রত। যাহারা আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আসিবে, তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে হইবে, অন্নও দিতে হইবে। এই কারণে গৃহীর প্রচুর অন্ন চাই। শিষ্যকে তাই উপদেশ দিলেন :

তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।

এ কারণ যে কোনও বিধিসঙ্গত উপায়ে বহু অন্ন আহরণ করিবে।

প্রাচীনকালের ঋষিরা সকলেই গৃহী ছিলেন। এই গৃহস্থাশ্রমে তাঁহারা মাত্র নিজের কথা বা নিজের পরিবারভুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করিতেন না। এমন কি তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক কেবল মানুষ কেন, নিকটে অবস্থিত পশুপক্ষীদের কথাও তাঁহারা ভাবিতেন। নিজে যাহা আহার করিবেন বা উপভোগ করিবেন, তাহারাও তাহার অংশভাক্ হইবে, সকলেই সুখে থাকিবে, দেবতার নিকট এই প্রার্থনাই তাঁহারা করিতেন।

ঋগ্বেদের প্রার্থনায় রহিয়াছে :

যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বংপুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্ (১।১১৪।১)

দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ যেন সুস্থ থাকে। এই গ্রামে সকলেই যেন পুষ্ট হয় ও রোগশূন্য থাকে।

অস্মাকং দেবা উভয়ায় জন্মনে শর্ম যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে।
অদৎ পিবদূর্জয়মানমাশিতং তদস্মে শং যোররপো দধাতন।

১০।৩৭।১১

হে দেবগণ, আমাদের নিকট যে সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী আছে, তাহাদের সকলকে তোমরা সুখী কর। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হউক। আমাদিগের সংসর্গে তাহারা অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছন্দতা লাভ করুক।

মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ হইলেও সকল অবস্থাতেই সে আর সকলের সহিত, এমন কি পশুপক্ষী, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, ঋষিরা ইহা উপলব্ধি করিতেন। যাবতীয় পদার্থের সহযোগে তাহার উৎপত্তি ও স্থিতি। মৃত্যুতেও সে তাহাদের সহিত মিলিত হয়। হিন্দু তাহার পিতৃতর্পণে অতীত-কুলকোটি, সপ্তদ্বীপনিবাসী, বান্ধব, অবান্ধব, অন্যজন্মে বান্ধবগণের সহিত 'ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ' ইহাদের উদ্দেশ্যেও তর্পণ-বারি প্রদান করিয়া থাকেন।

পৃথিবীতে সকলে সমান শক্তিবিশিষ্ট হয় না, সুযোগ-সুবিধাও সকলে সমান পায় না। মানুষে মানুষে পার্থক্য সকল দেশে সকল কালেই ছিল এবং আছে। এ কারণ

কেহ ধনী কেহ দরিদ্র। সকল দেশে সকল কালে ধনীরা দরিদ্রকে দান করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় আদর্শে দরিদ্রকে অন্নদান ধনীর দয়াদাক্ষিণ্য নহে। উহা তাহার ব্রত।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে আছে :

> মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
> সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য।
> নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
> কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥১০।১১৭।৬

যাহার মন উদার নহে তাহার ভোজন মিথ্যা। নিশ্চয় জানিবে তাহার ভোজন তাহার মৃত্যুস্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। কেবল নিজে যে ভোজন করে, সে কেবল পাপই ভোজন করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও আছে :

> ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। (৩।১৩)

যে কেবল নিজের জন্য রন্ধন করে, সে পাপান্ন ভোজন করে।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তটি দানস্তুতি। এই দানস্তুতিতে দান সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। স্তুতিতে আছে :

"দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনাশী। আহার করিলেও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি নাই। দাতার ধন হ্রাস পায় না। অদাতাকে কেহই সুখী করে না। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আসিয়া যখন অন্ন ভিক্ষা করে, তখন যে ব্যক্তি অন্নবান্ হইয়াও হৃদয় কঠিন করিয়া রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ সুখী করিতে পারে না। যাচককে অবশ্যই দান করিবে। রথের চক্র যেমন ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে ঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ ধন কখনও এক ব্যক্তির নিকট কখনও অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে। যাহার মন উদার নহে তাহার ভোজন মিথ্যা। যে কেবল নিজে ভোজন করে সে পাপই ভোজন করে। আমাদের দুই হস্ত আকৃতিতে সমান হইলেও উভয় হস্তের ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুই গাভী এক মাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও দুধ সমান দেয় না। দুই জনে যমজ ভ্রাতা হইলেও উভয়ের পরাক্রম সমান হয় না। দুই জনে এক বংশের সন্তান হইলেও উভয়ে সমান দাতা হয় না।"

বৈদিক চিন্তাধারা পরবর্তীকালে উপনিষদে আরও পরিস্ফুট হইল। ঋষিরা বলিলেন :

> অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে।
> জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে।

অন্নই সকল সৃষ্ট পদার্থের জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ প্রথম জাত। অন্ন হইতেই সকলে জন্মলাভ করে। অন্নদ্বারাই তাহারা বর্দ্ধিত হয়।

আর বলিলেন :

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্।
অন্নের নিন্দা করিবে না। তাহা ব্রত।

বহু অন্ন উপার্জন করিয়া বহু লোককে অন্ন দান করিবে। তাহা তোমার ব্রত।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।
অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। অশ্রদ্ধা করিয়া দিবে না।
শ্রিয়া দেয়ম্। বৃদ্ধির সহিত দান করিবে।
হ্রিয়া দেয়ম্। হ্রী—লজ্জা, অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে।
ভিয়া দেয়ম্। ভী—ভয়, অর্থাৎ ধর্মভয়ের সহিত দান করিবে।
সংবিদা দেয়ম্। মিত্রভাবে দান করিবে।
এষ আদেশঃ। ইহাই আদেশ।
এষ উপদেশঃ। ইহাই উপদেশ।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য প্রাণীমাত্রকেই অন্ন গ্রহণ করিতে হয়। মানুষ এবং ইতর প্রাণীতে পার্থক্য এই, ইতর প্রাণীরা যে-যাহার নিজ-নিজ উদর পূরণ করিয়া থাকে। মানুষের দায়িত্ব—সে কেবল নিজের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিবে না, তাহাকে আরও অনেককে অন্ন প্রদান করিতে হইবে। আচার্যের একান্ত সান্নিধ্য লাভ করিয়া ও তাঁহার ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত হইয়া ছাত্রেরা এই শিক্ষা পাইতেন এবং তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনে এই অনুশাসন পুরোভাগে রাখিয়া গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য পালন করিতেন।

কালবশে শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন অন্ন উপার্জনের অর্থ হইয়াছে অর্থ উপার্জন। অর্থের বিনিময়ে পার্থিব সুখ-সম্ভোগের যাবতীয় উপকরণই ক্রয় করা যায়। অন্ন, অর্থাৎ খাদ্যবস্তুও অর্থ থাকিলে পাওয়া যায়। এ কারণ সাংসারিক মানুষমাত্রেই অর্থোপার্জনে আগ্রহান্বিত। সামর্থ্য ও সুযোগ-সুবিধার তারতম্যে কেহ বেশী কেহ কম উপার্জন করে। ধনী দরিদ্রের এই পার্থক্য পুরাকালেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধানে দরিদ্রের প্রতি ধনীর যে দায়িত্ব ছিল, এ কালের ধনী সে দায়িত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার উপার্জিত অর্থ তিনি যে কোনও পথে ব্যয় করিবেন বা সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। দিন দিন তাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধনিক সম্প্রদায় আরও ধনী হইতেছেন, দরিদ্র আরও দরিদ্র হইতেছেন। অর্থলোভে উপার্জনের উপায়ও বিধিসঙ্গত কি না তাহার বিচারও যেন এখন অবান্তর প্রসঙ্গ।

ভারতীয় আদর্শে গৃহীর পক্ষে পার্থিব সম্পদকে কখনও হেয় জ্ঞান করা হয় নাই। উপার্জন সদ্ভাবে করিতে হইবে, উপার্জিত অর্থের ব্যয়ও সৎপথে করিতে হইবে। এই নীতি এখন বিস্মৃত। যে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিশু বালক

হয়, বালক যুবা হয় ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সংসারী হয়, সে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথাও তাহাদের ভারতীয় গৃহীর আদর্শের সহিত পরিচয় ঘটে না।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ ধনী ও দরিদ্রে বিরোধ দেখা দিয়াছে। বিরোধ সংঘর্ষে পরিণত হইয়াছে। এদেশেও এই দুর্য্যোগ উপস্থিত। ইহার শান্তি হইতে পারে একমাত্র ভারতের ঋষিদিগের উদাত্ত উদার মন্ত্রে। সে মন্ত্র হইতেছে ধনীর অর্থ তাহার একার বা তাহার মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর ভোগের জন্য নহে, সে অর্থে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করিতে হইবে। তিনি সেই অন্ন দিবেন শ্রদ্ধার সহিত, বুদ্ধির সহিত, বিনয়ের সহিত, ধর্মভয়ের সহিত ও মিত্রভাবের সহিত। ইহারই জন্য তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিবেন। প্রাচীন ঋষিদিগের ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কারখানায় নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন খুব পুরনো নয়। নবসৃষ্ট দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিরা ক্রমাগত অধিক মুনাফা অর্জন করার ফলে শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় দুরবস্থায় পড়তে হয়েছিল তা থেকে মুক্তির আহ্বান জানাল শ্রমিক আন্দোলন। মালিকদের কাছ থেকে অধিক সুবিধা আদায় করে দেওয়াই হ'ল এর লক্ষ্য। ফলে এই আন্দোলন হয়ে উঠল আদায়ধর্মী ও শ্রমিকেরা ভাবল চাঁদা দিয়ে শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ার উদ্দেশ্য—সঙ্ঘশক্তির চাপে কিছু সুবিধা করে নেওয়া। অবশ্য দুনিয়ার সর্বত্র এই ভাবেই শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধে। এই জন্য শ্রমিকদের বহুবার লাঠি চার্জ্জ ও গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ধর্ম্মঘট, মন্থর গতিতে কাজ করা এবং লক-আউটের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হয়েছে। শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ এই সব আন্দোলনের সময় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য সভায় বাছা বাছা কটূক্তি প্রয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ মালিকপক্ষ দ্বারা নির্ম্মম ভাবে শোষিত হবার দরুন শ্রমিকদের মনে তাঁদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হ'ত, অন্য কোন উপায়ে তার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব না হওয়ায়, কেউ তাদের অপ্রিয়ভাজনদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করলে শ্রমিকরা তাতে কথঞ্চিৎ মানসিক তৃপ্তি লাভ করত, উপরন্তু ঐ সকল নেতার সততায় তারা অপরিসীম শ্রদ্ধা-শীল হয়ে উঠত। এ ছাড়া চট করে লোকপ্রিয় হবার জন্য বহুক্ষেত্রে নেতৃবর্গ শ্রমিকদের মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে মালিকদের সঙ্গে লড়ে সঙ্ঘশক্তির চাপে ও মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা তাদের অনেক সময় জিতিয়ে দেওয়ায় শ্রমিকদের মনে আজ এই ধারণা হচ্ছে যে, 'মবোক্র্যাসিই' বুঝি গণতন্ত্র। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ সময় যাবতীয় দুঃখকষ্টের জন্য একমাত্র ইংরেজকে দায়ী করার যে মনোবৃত্তি ছিল তার প্রভাবও পড়ল শ্রমিক আন্দোলনে এবং শ্রমিকদের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, তাদের যাবতীয় দুঃখকষ্টের জন্য যে মালিকবর্গ দায়ী তারা একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই যে নেতা অন্ততঃ মুখেও যতটা বেশী শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার করেন তিনি ততটাই পূজ্য। এ ছাড়া রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য সরকার-বিদ্বেষ তো তাদের মধ্যে জাগলই। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে জনসাধারণ যেমন শুধু অধিকার চিনল, কিন্তু কর্ত্তব্য শিখল না, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তেমনি শ্রমিকরা দাবিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হ'ল; কিন্তু কর্ত্তব্যশিক্ষা তাদের হ'ল না। এত দিনের শ্রমিক আন্দোলনের ধারা পর্য্যালোচনা করে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, শ্রমিকদের মধ্যে এক নব উদ্দীপনা এবং সংগঠন-শক্তি জেগে উঠে ভারতের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত করল বটে; কিন্তু প্রধানতঃ আশুপ্রাপ্তি এবং লাভের উপর সংগঠিত ভারতের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বেশীর ভাগের উৎপাদক প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে এক সমস্যা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। ঘন ঘন এবং ক্রম-বর্দ্ধমান দাবির জন্য শ্রমিকবিক্ষোভ শুধু জনসাধারণের কাছেই সমস্যা-স্বরূপ নয়, শ্রমিক-নেতৃবর্গের কাছেও এ সব এক আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছে। নেতৃবৃন্দের অবস্থা ঠিক জুলিয়াস সিজারের মত, কখন যে ব্রুটাসের ছুরিকার সম্মুখীন হতে হবে তার স্থিরতা নেই। শ্রমিক-সঙ্ঘের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের বিরোধী যে কেউ এসে যদি আর একটু উচ্চৈঃস্বরে মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় কটূক্তি বর্ষণ করে এবং কার্য্যতঃ ক্ষমতা না থাকলেও, শুধু বড় বড় আশা ও প্রাপ্তির সম্ভাবনার সংবাদ শোনায়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে পূর্ব্বতন নেতার অতীতের যাবতীয় ত্যাগ, সততার কথা নিঃশেষে মন থেকে মুছে শ্রমিকসম্প্রদায় নবাগত নেতার গলায় জয়-মাল্য পরিয়ে দেয়। বহুক্ষেত্রে নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য (এমন কি অবিমৃষ্যকারী নবাগত নেতার করায়ত্ত হয়ে শ্রমিকরা যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, সে জন্যও হয়ত) পুরাতন নেতৃবর্গ নবাগতের চেয়ে তাদের অধিক উচ্চ আশা দেন এবং ডাক উত্তোরত্তর বেড়েই চলে। এর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা—মরীচিকার মত যার পরি-পূরণের আশা দূরে যাওয়ায় তারা হয়ে উঠে ক্ষুব্ধ, তাল রাখতে গিয়ে নেতৃবর্গ হন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত এবং সেই শিল্প, উৎপাদিত মালের গ্রাহক অগণিত জনসাধারণ এবং সরকারের যে কি অবস্থা হয় তা সহজেই অনুমেয়।

এ সমস্যার সমাধানকল্পে মালিক, উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ এবং সরকারের দায়িত্বের কথা আলোচনা না করে আলোচ্য বিষয়কে শ্রমিক-কর্মী ও নেতৃবর্গের কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। দেশে নানা মত ও দলের শ্রমিক-কর্মী আছেন। জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝা গিয়েছিল যে, বহুদিনের শোষণ ও মহাযুদ্ধের পরিণাম-স্বরূপ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভগ্নোন্মুখ। এ অবস্থায় শ্রমিকদের অবাঞ্ছিত ধর্মঘট বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় সরকার শ্রমশিল্পে শান্তিচুক্তির প্রবর্তন করলেন। ধর্মঘট ও মন্থর গতিতে কাজ করা থেকে শ্রমিকদের বিরত থাকবার অনুরোধ জানিয়ে, অভাব-অভিযোগ দূরীকরণার্থ সালিশী, শ্রমশিল্প-বিরোধ-নিষ্পত্তি আদালত ইত্যাদির প্রবর্তন করা হ'ল। তিনটি কারণে মূলতঃ এ ব্যবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া গেল না। প্রথমতঃ, অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবার পর জীবনযাত্রার ব্যয়ভার হ্রাস না পেয়ে বেড়ে চলল। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করার ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা, মালিক কর্তৃক শ্রমবিরোধ আদালতের রায়কে উপেক্ষা ও রায় মানতে বাধ্য করার ব্যাপারে সরকারের অকৃতকার্যতা। এর তৃতীয় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিদ্যমানতা। একমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক দল এবং তাদের ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার আর কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিষ্ট-নিয়ন্ত্রিত না হলেও কম্যুনিষ্ট প্রভাবাধীন নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছাড়া স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে প্রায় প্রত্যেকটি দলই বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করত। ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের প্রভাব বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদ্বারা পরিচালিত নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চেয়ে ছিল অনেক কম।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর অবস্থা বদলে গেল। পূর্বে কংগ্রেসী শ্রমিক-কর্মীরা জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়েছিলেন। তবে সমাজতান্ত্রিকরা এতে যোগ দিলেন না এবং তাঁরা নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও রইলেন না। তাঁরা গড়লেন হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত। এধারে কম্যুনিষ্ট আধিপত্যে বিরক্ত হয়ে এন. এম. যোশী প্রমুখ অ-দলীয় শ্রমিক নেতৃবর্গ এর সংস্রব ত্যাগ করে সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়লেন। এর সঙ্গে যোগ দিলেন কিছু ফরওয়ার্ড ব্লক-পন্থী। ফরওয়ার্ড ব্লকের কতক কর্মী অবশ্য পুরনো নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেই রয়ে গেলেন। শুধু রুইকর এবং তাঁর দল যোগ দিলেন হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতে। তবে কিছু দিন হ'ল দলীয় রাজনীতির চাপে পড়ে হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের সংস্রব তাঁরা ত্যাগ করেছেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হবার পর, কোন্‌টি সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কর্তৃক তার হিসাব নেওয়ার ফলে দেখা গেল, নবগঠিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রভাবই শ্রমিক মহলে সবচেয়ে বেশী। সমর্থক শ্রমিকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হলেও হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের প্রভাব নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চেয়ে বেশী। কারণ হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ আছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেখা গেল যে, একমাত্র জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছাড়া কোন শ্রমিক সঙ্ঘই জাতীয় সঙ্কটের দিনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় অগ্রসর হলেন না। বরং কংগ্রেসবিরোধী হওয়ায় সরকারকে অপদস্থ করার জন্য ও আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার নিমিত্ত বহুক্ষেত্রে এরা সরকারের সঙ্গে অহেতুক অসহযোগিতা এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে বিরোধ সুরু করলেন। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চাশার চার ফেলে ক্ষমতার মাছ ধরার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, সেই সব উচ্চাশা পূরণ না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে লাগল শ্রমিকদের অসন্তোষ।

এ প্রসঙ্গে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও সব সময় তাঁদের আদর্শ বজায় রাখতে পারেন নি। অন্যান্য দলের সঙ্গে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মৌলিক পার্থক্য এই যে, শ্রমিকদের তাঁরা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন এবং সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তা পালন করাবারও প্রযত্ন করেন। এ ব্যবস্থা প্রচলিত শ্রেণী-সংগ্রামের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-প্রচারক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী বলে এতে হাত দেওয়া বিশেষ বিপজ্জনক—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রমিক-সমাজ ও দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের দিক থেকে বিচার করলে এই কার্যক্রম অতীব সঙ্গত এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মীরা এ পন্থানুসরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে তাঁদের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন বোধ করি। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সমপর্যায়ে নেমে যাওয়ায় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মীরা কোন বৈপ্লবিক নেতৃত্বের নমুনা দেখাতে পারছেন না এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাঁরা শ্রমশিল্পে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামা অনুচিত বিবেচনা করায় অন্যান্য দল কর্তৃক "দুর্বল নেতা" এই আখ্যা পাচ্ছেন। বিরোধী দলসমূহের এ সব বিবেচনা নেই। তাঁরা অহিংস বিপ্লবে বিশ্বাসী নন্‌ বা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাও তাঁদের অভিপ্রেত নয়। বরং শ্রমিকদের হাতিয়ার-স্বরূপ ব্যবহার করে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেই তাঁদের লাভ। নেতৃত্ব ও সংগঠনের ত্রুটি বা অন্য কোন কারণে ধর্মঘট আদি ব্যর্থ হলে তাঁরা "গাছেরও খাব তলারও কুড়াব" এই প্রবচন অনুযায়ী ব্যর্থতার যাবতীয় দায়িত্ব সরকারের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেন। এর ফলে আবার শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শ্রমিকদের মনে নেতৃবর্গ যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিলেন, বুমেরাং-এর মত ফিরে তা তাদেরই আঘাত করছে। বিরোধী শ্রমিক নেতৃবর্গের প্রতি শ্রমিকরাই সরকারের প্ররোচনায় কটূক্তি প্রয়োগ করছেন। কংগ্রেস-বিরোধী শ্রমিক নেতৃবর্গ একথা ভাবছেন না যে, কংগ্রেসের

ফলে পরবর্তী নির্ব্বাচনে তাঁদের দল শাসনক্ষমতা পেলে তাঁদের প্রদর্শিত পথে তখন তাঁদের বিরোধী দলসমূহ তাঁদের এই ভাবে বিব্রত করবে। ইংলণ্ডের সমাজতান্ত্রিক সরকারকে প্রায়ই ডক, কয়লার খনি ইত্যাদির ধর্ম্মঘটে যে কি রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় একথা রাজনীতির ছাত্রেরা জানেন।

অলডাস হাক্সলি ঠিকই বলেছেন, "কোন সামাজিক অন্যায় আচরণের কারণ শুধু একটি মাত্র থাকে না, এই জন্য যে-কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সঠিক সমাধানে অসুবিধা হয়।" শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ যে সমস্যা সে সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তবে এ আলোচনা সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। জাতীয় স্বার্থ ও বৃহত্তর মানবতার মঙ্গলের জন্য আজ শ্রেণীসংগ্রাম ও এর আনুষঙ্গিক শ্রেণীবিদ্বেষ এক মৃত মতবাদের পর্য্যায়ভুক্ত হচ্ছে। এর বিশদ আলোচনা করব না। উৎসাহী পাঠক এইচ. জি. ওয়েলসের "এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" এবং জেমস বার্ণহামের "দি ম্যানেজারিয়াল রিভলুশন" ইত্যাদি বই পড়লে উপকৃত হবেন। এ অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনে ধর্ম্মঘট, মন্থর গতিতে কাজ করা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এবং মালিকদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করা অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হচ্ছে। এখন প্রয়োজন আলাপ আলোচনা এবং সালিশী ও মধ্যস্থতার দ্বারা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ দূর করা। ধর্ম্মঘট শেষ পন্থা। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এ নীতি গ্রহণ করলেও শ্রমিক মহলে এর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা নেই। বামপন্থীরা একে দুর্ব্বল নেতৃত্ব আখ্যা দেন এবং অনেক সময় মালিকও একে শ্রমিকদের দুর্ব্বলতা মনে করেন। শ্রমিকদের মধ্যে এ নীতিতে উদ্দীপনার অভাবের কারণ দুটি। প্রথমতঃ, এযাবৎ কাল প্রচারিত শ্রেণীবিদ্বেষের প্রভাব এবং দ্বিতীয়তঃ, তাদের ভিতর যে বাড়তি কর্ম্মোদ্যম ও উত্তেজনার প্রতি যে আকর্ষণ আছে তার বহিঃপ্রকাশের সুযোগও নেই। তথাকথিত সভ্য মানব জামায় কাপড়ে নিজেকে ঢাকলেও প্রেম, ভালবাসা, দয়া, উত্তেজনা, রোমাঞ্চকর কার্য্যের প্রতি আকর্ষণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘৃণা ইত্যাদি বহুবিধ আদিম ও চিরন্তন প্রবৃত্তি তার মধ্যে রয়ে গেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই প্রবৃত্তির অন্ততঃ একটিরও যদি ছোঁয়াচ না থাকে তবে জীবন হয় নীরস ও বৈচিত্র্যহীন। এ সকল প্রবৃত্তিকে সৎ এবং অসৎ উভয়বিধ উদ্দেশ্যেই লাগান যায়। এযাবৎ এ সবের অধিকাংশই সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে নিয়োগ করে সহজে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা গেলেও এখন ফল ভয়াবহ হচ্ছে। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন :

"আমাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক এবং সৃজনাত্মক উভয় ধরণের প্রবৃত্তিই বিদ্যমান। সমাজ আমাদের সর্ব্বদা এই সব প্রবৃত্তির অধীন হতে দেয় না। তবে এর বিকল্পস্বরূপ ফুটবল প্রতিযোগিতা বা কুস্তি ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থা সমাজে চলে তাকে মোটেই যথেষ্ট বলা যায় না।...আমার মনে হয় না যে, কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনা মানুষ সুখী হতে পারে, কারণ সৃষ্টির প্রথমাবস্থা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হচ্ছে মানুষের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপের অন্যতম প্রধান কারণস্বরূপ। সুতরাং আমরা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটানোর চেষ্টা না করি। শুধু এটুকু যেন নজর রাখি যে, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন খুব একটা ক্ষতিকর রূপ পরিগ্রহ না করতে পারে।"

স্যার আর্থার কিথ্ তাঁর "দি নিউ থিওরি অব হিউম্যান ইভলুশন" পুস্তকে এ সম্বন্ধে আমেরিকার "ক্রো ইণ্ডিয়ানদের" মধ্যে ডা. আর লাউরির অভিজ্ঞতার যে উদাহরণ দিয়েছেন, সেটিও প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ লাউরি বলছেন,

"এক জন 'ক্রো'কে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে সে এখনকার মত নিরাপত্তা চায়, না আগের মত বিপদ বেষ্টিত হয়ে থাকা পছন্দ করে? তার জবাব হবে—পূর্ব্বের মত বিপৎসঙ্কুল অবস্থা, তাতে গৌরব ছিল।"

এ সম্বন্ধে আর নজীরের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে বলা যায় যে, এই "গৌরবের" অভাব পূর্ণ করা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্যা। এসম্বন্ধে দুটি সুপারিশ আছে—

(ক) উৎসাহী এবং কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট শ্রমিককে শ্রম-বিরোধ-নিষ্পত্তি আদালতে শ্রমিক-পক্ষ সমর্থন, Collective bargaining বা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সমষ্টিগত দরদস্তুর ইত্যাদি যে সব কাজে বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, সে সব কাজে নিযুক্ত না করে তাদের কর্ম্মোদ্যমকে সক্রিয় করবার জন্য গান্ধীজী-কথিত গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া উচিত। শ্রমিকদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার, অবসরকালকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নাদি কার্য্যে নিয়োগ, শ্রমিক মহলে সুরা, অন্যান্য মাদক দ্রব্য ও যাবতীয় দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান, স্বাস্থ্যচর্চ্চার জন্য আখড়া ও অন্যবিধ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা এবং এই জাতীয় আরও অনেক কাজ এর আওতায় আসে। এ সম্বন্ধে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কাজে যারা আত্মনিয়োগ করবেন তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে পূর্ব্বে বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার যে সব কাজের কথা বলা হয়েছে তাতে হাত দেবেন না এবং পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রের কর্ম্মীরাও গঠনমূলক বিভাগের কর্ম্মীদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মীদের মনে এই বিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা থাকা চাই যে, শুধু আর্ত্তত্রাণই নয়, এক শোষণবিহীন আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যই এসব কার্য্যক্রম।

(খ) শ্রমিককে কারখানার মালিকে পরিণত করার কথাটির শব্দগত অর্থ ছেড়ে দিয়ে তাদের মধ্যে অন্ততঃ "আমাদের কারখানা" বা "আমাদের কাজ" এই মনোভাব সৃষ্টির ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা যেন স্মরণ রাখি যে, শ্রমশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ সরকারী আমলাতন্ত্র মালিকের আমলাতন্ত্রের চেয়ে যে বেশী গণতান্ত্রিক হবে এমন কোন কথা নেই। এই জন্য কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিচালনা-ব্যাপারে শ্রমিকদের ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা দাবি করতে হবে। ফোরম্যান, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ম্যানেজার ইত্যাদি তাদের মধ্যে থেকে নির্ব্বাচিত করা উচিত। বর্ত্তমানে উপর থেকে উচ্চতন পদগুলিতে লোক চাপিয়ে দেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে যে প্রবল অসন্তোষ

দেখা যায় এ পদ্ধতিতে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং এসব পদে নির্ব্বাচিত হবার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হওয়াতে উৎপাদনেরও উৎকর্ষ দেখা দেবে। এইভাবে বিভাগীয় বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য জয়েণ্ট কমিটি এবং উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য "প্রোডাকশন কমিটি" ইত্যাদিও বেশ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়। কর্ম্মোদ্যমকে স্থায়ী করার জন্য দুই বা তিন বৎসর অন্তর এই সব পদের নূতন নির্ব্বাচন করা যেতে পারে। প্রয়োজন বোধে এই সব উচ্চ পদে নির্ব্বাচিত শ্রমিকদের কিঞ্চিৎ অধিক পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে, তবে তাতে সাধারণ শ্রমিকের আয়ের সঙ্গে খুব বেশী অসামঞ্জস্য যাতে না হয় তাও দেখতে হবে। এ সম্বন্ধে মিঃ জন স্পিডান লুই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা "পার্টনারশিপ ফর অল—এ ফরটীফোর ইয়ার এক্সপেরিমেণ্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেমোক্রাসি" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, শুধু যারা কঠিন কাজ করে তাদেরই যে ভাল মাইনে হওয়া উচিত তা নয়, বরং ভাল মাইনে দিলে ভাল কাজ পাওয়া যায়। এই সব কমিটি মারফত শ্রমিকদের কারখানা পরিচালন-কার্য্যে ভাগ দেওয়া ও তাদের বাড়তি কর্ম্মোদ্যম এবং গৌরবের ভাবকে মঙ্গলজনক উপায়ে পূর্ণ করার ব্যাপারে দুটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে। নির্ব্বাচিত ফোরম্যান প্রভৃতি যেন যথার্থ যোগ্য হন এবং এজন্য প্রয়োজন হলে সম্ভাব্য ফোরম্যান ও শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক শ্রমিকদের জন্য টেকনিকাল স্কুলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতালিপ্সার পরবশ হয়ে কোম্পানির উচ্চপদাধীকারিবর্গ এবং শ্রমিক-সঙ্ঘ-কর্ত্তৃপক্ষ যেন কমিটিগুলির কাজে অকারণ হস্তক্ষেপ না করেন। এ ভাবে কাজে লাগলে বোধ হয় "আমাদের বিভাগের উৎপাদন অমুকের চেয়ে বেশী", বা "ওদের চেয়ে আমরা বেশী উৎপাদন করব" কিংবা "আমাদের বিভাগে rejection কম হবে" ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উত্তেজনার প্রতি আকর্ষণ ও রোমাণ্টিক প্রবৃত্তি কাজে রূপায়িত হবার পথ পাবে। শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি দিকের এবার আলোচনা করব। শ্রমিক সঙ্ঘগুলির ক্রমকেন্দ্রীকরণ এক অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সূচিত করছে। অলডাস হাক্সলির ভাষায়,

"...সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পের মত শ্রমিক সঙ্ঘগুলিও বিশালতা ও কেন্দ্রীকরণের প্রভাবে পড়ে যায়। অতএব প্রায়ই দেখা যায় যে, শ্রমিক-সঙ্ঘের আওতায় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকরা দুটি স্বৈরতন্ত্রী নিয়ন্তার উপর নির্ভরশীল ও তাদের অধীন হয়ে পড়েছে। একধারে তাদের মালিকরা ও অন্যধারে শ্রমিকসঙ্ঘের নেতৃবর্গ। ধর্ম্মঘট বা ধর্ম্মঘটের হুমকি দেওয়া ছাড়া প্রথমোক্তের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা তাদের নেই এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অতি ক্ষীণ ও ভাসা-ভাসা ধরণের।"

রুশ-বিপ্লব কম্যুনিজম প্রবর্ত্তন করার বদলে যে "ম্যানেজারিয়াল ষ্টেট" প্রতিষ্ঠা করেছে তার জন্যে অনেকাংশে এই কারণটি দায়ী। এইজন্য ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘগুলির (কোন দলকেই এ দোষমুক্ত বলা যায় না) নেতৃবর্গের ভিতরে বেশ খানিকটা ক্ষমতালিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়। একত্র কেন্দ্রীভূত সহস্র সহস্র শ্রমিকের শক্তি পিছনে থাকায় এর দ্বারা নেতৃবর্গ অনেক সময়ে শাসন-ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করতে চান। শ্রমিক-নেতৃবর্গের সাবধানতার সঙ্গে নিজেদের হৃদয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, কারণ এ রোগের ওষুধ তাঁদের মনেই, অন্য কোথাও নয়। এরই দরুন বহু শ্রমিক-সঙ্ঘের একই দলভুক্ত কর্ম্মীদের মনে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং নেতৃবর্গ অন্য কর্ম্মীদের লোকপ্রিয় হবার বা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ দেন না। ফলে সংগঠনে ফাটল ধরে ও প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন নূতন কর্ম্মী গড়ে উঠে না। শ্রমিকদের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত অভিযোগ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা বা মীমাংসার ভার সঙ্ঘের 'কর্ত্তাব্যক্তি' স্থানীয় কয়েক জন নিজেদের হাতে রেখে দেন। ফলে একদিকে যেমন নূতন কর্ম্মীরা কাজ শিখতে পারে না তেমনি অন্যদিকে নেতৃবর্গের হাতে অনেক কাজ থাকায় শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অভিযোগের মীমাংসায় দেরি হয় ও অনেক সময় ধীরভাবে বিষয়টি বোঝাপড়ার অবকাশ না পাবার জন্য 'মামলা' খারাপ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের অসন্তোষ বেড়ে ওঠে। তা ছাড়া এর দরুন সঙ্ঘের সঙ্গে শ্রমিকদের একাত্মতা থাকে না, "আমাদের শ্রমিক সঙ্ঘ" এভাব তাদের মনে জাগে না এবং সঙ্ঘের ব্যাপারে তাদের কোন দায়িত্ব না থাকায় সঙ্ঘ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে।

শ্রমিকসঙ্ঘের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই এর প্রতিকারের উপায়। যাবতীয় ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ এবং সঙ্ঘের মৌলিক নীতির সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনাবিহীন যাবতীয় বিচার্য্য বিষয় বিভাগীয় শ্রমিক-প্রতিনিধির হাতে ছেড়ে দেওয়া দরকার। আন্তর্বিভাগীয় অভিযোগ মীমাংসার জন্য মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত উপযুক্ত আন্তর্বিভাগীয় কমিটি থাকবে ও এইভাবে ধাপে ধাপে উঠে শুধু মৌলিক নীতি সম্পর্কিত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে হাত দেবেন সঙ্ঘের সম্পাদক বা সভাপতি। এতে কাজ হাল্‌কা হবে, মীমাংসা হবে দ্রুতগতিতে এবং ঘটনাস্থলে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় মিথ্যা অভিযোগে জয়লাভ করার সম্ভাবনা হবে স্বল্পতর।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের সামনে যে সমস্যা, তার স্বরূপ ও প্রতিকার সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনার পর কয়েকটি ছোটখাট অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ দুই-একটি দল ব্যতীত আর কেউই শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেন নি; কিন্তু বর্ত্তমানে এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। কারণ এখন প্রায় সব শ্রমিক-সঙ্ঘই কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হয়েছে। প্রথমে শ্রমিক-কর্ম্মীদের এই শিক্ষা দিতে হবে। পাঠচক্র, আলোচনা-সভা, ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক বক্তৃতামালা ও সুলভে রাজনৈতিক সাহিত্য প্রচার (কম্যুনিষ্ট দল এ বিষয়ে খুব উৎসাহী) ইত্যাদি এ বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হবে। এ যাবৎ শ্রমিক-নেতৃবর্গ বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্য্যকলাপকে

শ্রমিক-সমাবেশে শুধু নিন্দাই করে এসেছেন। এ রকম না করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও মানবতার কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে অপর পক্ষের অনুসৃত কার্যক্রমের ত্রুটি যুক্তির সাহায্যে শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের স্বমতে আনতে হবে। গালাগালিতে সহজে জনপ্রিয় হওয়া যায় বটে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী শ্রোতা,—যাঁরা সাধারণ শ্রমিকদের পরিচালিত করেন, এর ফলে তাঁরা বক্তার প্রতি বিরূপ হন। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহও শ্রমিক নেতৃবর্গের ছাড়তে হবে। "গরীব মজদুর", "ভুখা মজদুর" এই সব কথা বলে শ্রমিকদের খুব হাততালি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে যে প্রচণ্ড অহং-ভাব (vanity) বাসা বাঁধে তা কারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। জনপ্রিয় হবার জন্য অনেক সময় নেতৃবর্গ শ্রমিকদের অসঙ্গত দাবির কাছে নতি স্বীকার করেন এবং জ্ঞাতসারেই মিথ্যা অভিযোগসমূহে তাদের জেতাবার চেষ্টা করেন। এই দূরদৃষ্টিবিহীন কার্যক্রম যত শীঘ্র বর্জ্জন করা যায় ততই ভাল; কারণ এর প্রতিক্রিয়ার দরুন শ্রমিকেরা শ্রমিক-নেতার সঙ্গেও অনুরূপ লুকোচুরি খেলা সুরু করেন। ব্যক্তিগত অভিযোগ, স্থায়ী বা সাময়িক পদোন্নতি সংক্রান্ত গোলযোগে বিবদমান পক্ষের যে-কোন একটিকে জেতালে অপর পক্ষ সঙ্ঘ-নেতৃবৃন্দের বিরোধী হয়ে উঠেন। দুই পক্ষকে এক জায়গায় বসিয়ে সালিশী বা আপোষে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ হলেও প্রস্তাবটি পরীক্ষার যোগ্য। মজুরির হারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে শ্রমিকদের আগ্রহ থাকা অসঙ্গত নয়। অনেকে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের যুক্ত বৈঠকে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা বলেন, কিন্তু বিখ্যাত শ্রমিক- ও কৃষক-নেতা অধ্যাপক রঙ্গের মত এই যে, এ ব্যাপারে উৎপন্ন দ্রব্য-ব্যবহারকারীদেরও হাত থাকা উচিত; কারণ শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বোঝা বইতে হয় তাদেরই।

প্রতি বৎসর আই-এল্-ও'র অধিবেশনে বেশ কিছু শ্রমিক কর্ম্মী বিদেশে যান। সে সব দেশে এই রকম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাপূর্ণ সমস্যার সমাধান কিভাবে করা হচ্ছে, কি করে শ্রমিকদের বাড়তি কর্ম্মোদ্যমকে কাজে লাগান হচ্ছে এ সব জানা উচিত। রাশিয়ার সাধারণ শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতৃবর্গের সঙ্গে শ্রম-শিল্পের পরিচালক ও সরকারের কি রকম সম্পর্ক এ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা দরকার। আমেরিকার 'টি-ভি-এ'র মত জাতীয় কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধের কথা জানাও আবশ্যক। প্রয়োজন হলে দু'চার জন বুদ্ধিমান শ্রমিক-কর্ম্মীর শুধু এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য ইউরোপ, রাশিয়া ও আমেরিকায় যাওয়া উচিত।

প্রবন্ধের পর্য্যালোচনায় মূল বিষয়বস্তু ছিল শ্রমিক-কর্ম্মী ও নেতৃবর্গ। সে সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে। এখন শ্রমিকদের উদ্দেশ্যেও উপসংহারে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। শ্রমিকদের মধ্যে স্রোতের মুখে বেতস-পত্রের মত মনোবৃত্তি দেখে বহু সৎ ও সুযোগ্য কর্ম্মী ক্রমশঃ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সরে যাবার কথা ভাবছেন। পয়সা দিয়ে শ্রমিকদের দলে টানা যায়—শ্রমিকদের সম্বন্ধে এই মনোভাব গড়ে উঠা মোটেই মঙ্গলজনক নয়; ক্রমাগত বর্দ্ধিত হারে শ্রমিকদের দাবি মেটানোর দায় এসে পড়ছে শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন-দ্রব্য-ব্যবহারকারী মধ্যবিত্ত ও কৃষককুলের উপর। উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে তারা এ দায় মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে; কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল থাকতে পারে না। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার জন্য সঙ্ঘশক্তির চাপে শ্রমিকরা সরকারকে বিব্রত করছেন, ফলে উৎপাদনে ক্ষতি হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দেশের অধিকতর সংখ্যক জনসাধারণের স্বার্থের জন্য যেমন শ্রমিকদের কতকগুলি অধিকার হরণ করতে বাধ্য হয়েছেন, ভারতেও তেমন হতে পারে। বামপন্থীরা অবশ্য আগে থেকেই উল্টো সুর গাওয়া সুরু করেছেন যে, ভারত-সরকার সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী, এর ফলে ভারতে 'টোটালিটেরিয়ান' শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হওয়া অসম্ভব নয়। টোটালিটারিয়ানিজমের এক রূপ ফ্যাসিবাদ কারও কাম্য নয়। আর রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে খবর পাওয়া যায় তাতে এর অপর রূপ সাম্যবাদ সম্বন্ধেও খুব উৎফুল্ল হবার মত কারণ নেই বলেই মনে হয়।

শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষজ্ঞ হিসাবে এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়, কর্ম্মী ও পর্যবেক্ষক হিসাবে সমস্যার যে রূপ চোখে ধরা পড়েছে তারই কথা বলা হয়েছে ও কয়েকটি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-নেতৃবর্গ ও কর্ম্মীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের প্রাবল্য ও দেশ জোড়া ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়ে যাবার কারণে সব দলের শ্রমিক-নেতৃবর্গ এ বিষয়ে মন দেবেন এমন আশা করা যায় না। কম্যুনিষ্ট দল "গোলযোগের সৃষ্টি করে ক্ষমতা হস্তগত করার" নীতির উপাসক বলে তাঁরা হয়ত এর সমাধানই চাইবেন না। অন্যান্য দলের মধ্যে শ্রমিকমহলে র‍্যাডিক্যাল মৃত, ফরোয়ার্ড ব্লক শতধা-বিচ্ছিন্ন, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীর প্রভাব নগণ্য এবং বিপ্লবী সাম্যবাদীর অবস্থাও তথৈবচ। সমাজতান্ত্রিকদের হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং অ-দলীয় শ্রমিক নেতৃবর্গ ক্ষমতালাভের ইচ্ছা মনে না রেখে, শ্রমিকদের মধ্যে সত্যকার বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম সুরু করে শ্রমিক আন্দোলনকে আসন্ন সঙ্কট থেকে বাঁচানোর জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন কি?

কপিলাশ্রমে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বেণুকর এক অতিথি হইল
কপিল মুনির আশ্রমে।
মনে হয় বুঝি ভ্রমক্রমে।
দেখে উল্-চাল্ সকল দ্রব্য
কিছুই নাহিক সজ্জিত,
মুনিও হলেন লজ্জিত।
কোথায় পড়িয়া নীবার-মুষ্টি,
অর্দ্ধপিষ্ট ইঙ্গুদী,
ফেরে ফড়িঙের পঙ্গতই।
চুঁ মারিতে আসে আশ্রম-মৃগ
নবোদিত দৃঢ় শৃঙ্গেতে,
থামে না মুনির ইঙ্গিতে।
ডাঁস মধুপেরা গুঞ্জন করে,
সদা দংশনে উদ্যত,
মরালেরা সব উদ্ধত।
নাহিক তুষ্টি, নাহিক পুষ্টি,
রুক্ষ বৃক্ষ অঙ্গনে,
রঙ-হারা ফুল রঙ্গনে।
ভাবে গুণী কেন শান্ত ভূমেতে
রৌদ্র রসের আধিক্য?
মুনি যে তেজের প্রতীক গো।
পদ্মনাভের তুল্য মুনিরে
ঊর্ণনাভে যে বেষ্টিল,
আগে আশ্রম বেশ ছিল।
কহে বেণুকর আসিয়াছি তব
চরণপ্রান্তে আজ কেন?
অন্তর্যামী সব জানো।
সংখ্যা লয়েই আমারও সাধনা
তাহাই করেছি অঙ্গীকার,
তুমি ব্যথা বোঝো সাংখ্যকার।
সাত সুর তবু একজনে চায়
করিবারে রস-সৃষ্টি তো।
দিতে অমৃত বৃষ্টি তো।
মিলনের এক সুর উঠিতেছে
সপ্ত সুরের সঙ্ঘাতে,
এক রহিয়াছে সব তাতে।

আশ্রমে তব প্রকৃতি কই?
পুরুষ রয়েছে উহ্য যে,
বালখলি কত বুঝছো হে?
বেসুরা করেছ সকলি যে তুমি,
বেসুরা তোমার সংসারও।
সৃজিতে পার না সংহারো।
অনল চিনেছ, চেন না জীবন
রাখ না শ্যামের সংবাদই।
তুমি বড় বিসম্বাদী।
আমার বাঁশরী দীপকে জ্বালায়,
সৃজে পুনঃ মেঘ-মল্লারে—
কমল কুমুদ কহ্লারে।
সুরে গড়ি আমি চৌদ্দ ভুবন,
করি আনন্দে নন্দিত।
স্পন্দিত আর ছন্দিত।
আমার ধরণী নিতি বিচিত্র,
কভু শ্যামা, কভু পিঙ্গলা,
সবেতেই কত শৃঙ্খলা।
আমার বীণার তানে তানে নাচে
গ্রহ তারা রবি ইন্দুও,
তেরো নদী সাত সিন্ধুও।
ওড়ানো পোড়ানো নহে তো কঠিন
সাজানো-গোছানো শক্ত হে
তুমি ভস্মের ভক্ত যে।
শ্যাম অঞ্জন দিব আমি তব
অশনি-গর্ভ চক্ষেতে—
সুর-শল্যে অলক্ষ্যেতে।
খর জ্যোতি তব দ্রব করে দেবো
সুর-সুরধুনী গঙ্গাতে।
সংজ্ঞা আনিব সংখ্যাতে।
জেনো মুনিবর চলে না ভুবন
কেবল পঞ্চভূত নিয়ে,
বাদ দিয়ে পরমাত্মীয়ে।
পঞ্চকে তুমি বাড়াইয়া কর
যদিই পঞ্চবিংশতি,
তাতেও সেই অসঙ্গতি।
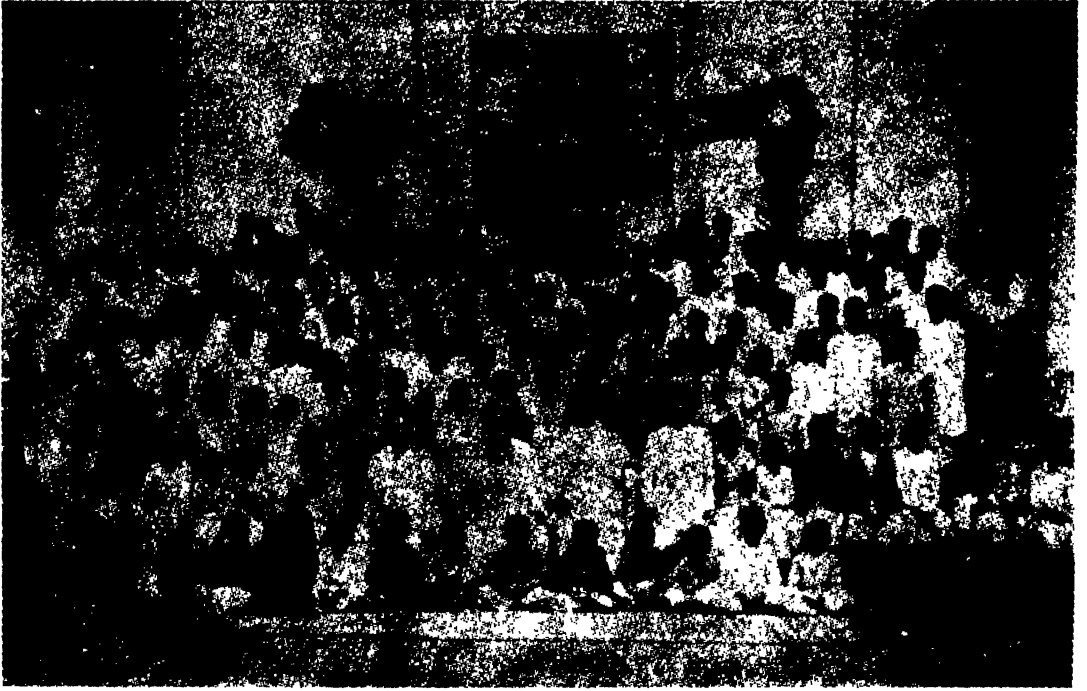
"বন্ধু সম্মেলন"। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্রগণের সামাজিক অনুষ্ঠান। উক্ত শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের সময়ে ১৯২০ সালে ইহার শেষ অধিবেশন হয়। এইটি তাহার চিত্র।

শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাস

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

গত ১৭ই ভাদ্র বালীগঞ্জ একডালিয়া রোডের নিজভবনে শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাস মহাশয় ছিয়াশী বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। অশেষ গুণের আকর এই মহাপুরুষের জীবনে "সবার উপরে মানুষ সত্য" কথাটির এমন একটি বিশেষ প্রকাশ দেখিয়াছিলাম যাহা এ যুগে বিরল।

চট্টগ্রাম জেলার সরোয়াতলী বেণীমাধবের জন্মস্থান। মধ্যবিত্ত পরিবারে পিতার অধীনে ইঁহার কঠোর পঠদ্দশা অতিবাহিত হয়। ইনি এম-এ পাশ করেন।

কলিকাতার কোন এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি কটক র‍্যাভেনশ কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন। সেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, অন্নদা চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সকল অধীনস্থ শিক্ষককে এক পরিবারভুক্তের মতই মনে করিতেন বলিয়া কাহারও বিপদে-আপদে বা আধি-ব্যাধিতে তিনি উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। কাঠজুড়ির বালুকাময় সুদীর্ঘ সৈকত পদব্রজে অতিক্রম করিয়াও তিনি আর্ত্ত শিক্ষকের সেবার ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। উৎকলীয় ছাত্রগণও এই সকল গুণের জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। উৎকলের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের অনুরাগী বেণীবাবু অবকাশ সময়ে কোণারক প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে অভিযান করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন। সংস্কৃত কলেজের পরবর্ত্তী অধ্যাপক ও নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় বেণীবাবুর ছাত্র ছিলেন। তিনি কটক র‍্যাভেনশ স্কুলে উঁহার সহকর্ম্মী হন। শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে তিনি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেন।

কটকের পর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ও তৎপরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করিয়া বেণীবাবু ১৯২১ সনে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরে রাণী ভবানী স্কুলে কয়েক বৎসর প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করিবার পর ইনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণপূর্ব্বক শেষজীবন অতিবাহিত করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইবার পর তিনি কলিকাতা, বালীগঞ্জ একডালিয়া রোডে নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করান। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে আমরা দীর্ঘকাল তাঁহার ছাত্র ছিলাম। এই সময় তাঁহার অন্তরের অসীম দরদ—চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব্ব মিশ্রণে আমরা স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইতাম। ছাত্রগণের সহিত তাঁহার

সম্পর্ক বিদ্যালয়ের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন কার্য্য-কালে তেমনই অবসর লইবার পরও ছাত্রগণের মঙ্গলসাধনে তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। অপর সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রগণ এক-পরিবারভুক্ত পরিজনের মতই ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বেণীবাবু ও অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সময়ে এই ভাবটি চরম বিকাশ লাভ করে। এই সময় কালীপদ নামক উচ্চশ্রেণীর একজন ছাত্র গুরুতর পীড়ায় মেডিক্যাল কলেজে থাকিতে বাধ্য হন। ইঁহার সেবা ও সৎকারে ছাত্র-গণের সহযোগিতায় বেণীবাবুর কার্য্যকারিতা উল্লেখযোগ্য।

লেখক ঐ সময় (বাং ১৩২৪ ১লা শ্রাবণ) অপর চারি জন সহপাঠীর সহিত একযোগে কখনও পদব্রজে, কখনও রেলগাড়ীতে সুদূর বারাণসীতে পলায়ন করে। কারণটা অবশ্য গুরুতরই ছিল, অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা, মাতৃহীন লেখকের গৃহে রন্ধনের লোকাভাব। বেণীবাবু এই পলাতক দলের সন্ধানে সহকর্ম্মিগণসহ সমগ্র শহর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজেন এবং সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত চিন্তাকুল মনে কালযাপন করেন। পরে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন সূত্রে ডাকে ও তারে সংবাদ পাঠাইলে তাঁহার উদ্বেগ প্রশমিত হয়। ঐ দল ফিরিবার পর তিনি কঠোর আচরণ না করিয়া উহাদের উন্নতি বিষয়ে যত্নবান হন।

ছাত্রগণের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলির বিকাশের জন্য তিনি সর্ব্বদাই অবহিত থাকিতেন। লেখক ঐ আমলে কবিতা লিখিতেন—বেণীবাবু ঐ শক্তিকে "এ হ্যাপি গিফ্‌ট অব রাইটিং ভার্সেস" বলিয়াছিলেন এবং সকল সভা-সমিতিতে আমাদের ঐ গুণের প্রকাশের সুযোগ দিতেন। তখনকার সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষকগণ আদর্শ পুরুষ ছিলেন—সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবকুমার দত্ত, ক্ষেত্র-গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বান্‌গণ তখন এই বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিতেন। ঐ সময়কার ছাত্রগণেরও অনেকে পরবর্ত্তী জীবনে খ্যাতনামা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সবজজ গৌরীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ সময়কার ছাত্র। এই গুণী শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা ছিলেন বেণীবাবু। ঐ সময় সংস্কৃত স্কুলের ছাত্রগণ নিজস্ব বয়েজ সার্কুলেটিং লাইব্রেরী, সানডে স্কুল, চ্যারিটি ক্লাব পরিচালনা করিতেন। আগষ্ট কিংবা 'বন্ধু-সম্মেলন' ও 'সারস্বত সম্মেলন' প্রতি বৎসর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইত।

সারস্বত সম্মেলন শ্রীপঞ্চমীর অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হইয়া বাংলার নেতৃবৃন্দকে আকর্ষণ করিত। ঐ সভায় স্যার গুরু-দাস, ডাঃ রাসবিহারী, স্যার আশুতোষ, পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়, ডাঃ চুনীলাল বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিকে সমবেত হইয়া সাহিত্য আলোচনায় অন্তর খুলিয়া দিতে দেখিয়াছি। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভাতে

বেণীমাধব দাস

ছিলই—উহার স্মারক বেণীবাবুর সহিযুক্ত শ্রেণীর দ্বিতীয় পুরস্কার *Imitation of Christ* বইখানি লেখক এখনও সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। বাংলার তৎকালোচিত সমস্যা ও নেতৃগণের তিরোধান প্রভৃতিতে প্রায়ই সংস্কৃত স্কুলে সভার অধিবেশন হইত। সকল সভারই প্রাণসঞ্চারী বক্তা থাকিতেন বেণীবাবু। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে তখন ছাত্ররা শিক্ষকগণকে ফলাহার করাইতেন। এই ব্যাপারে আমরা নৈষ্ঠিক ও উদার শিক্ষকগোষ্ঠীর পঙ্‌ক্তিভোজনে অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া উৎসাহ পাইতাম।

ধর্ম্মে বেণীবাবু কেশবভক্ত নববিধান দলভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহাকে নগ্নপদে হিন্দুর অশৌচ পালনের রীতি মানিয়া চলিতে দেখিয়াছি। ডঃ বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার যত্নে সংস্কৃত কলেজ ঐ সময় একটি সিংহল, দ্রাবিড়, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের ছাত্রকুলের সমাগমে সর্ব্বভারতীয় বিদ্যাপীঠের রূপ পাইয়াছিল। ১৯২১ সালে বেণীবাবু অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরের পর আর বন্ধু-সম্মেলন হয় নাই। আজ সেই দরদী মানুষটির অনেক পুরানো কথাই স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতেছে।

অন্তঃসলিলা

আঁদ্রে থেরিস্ক

অনুবাদক—শ্রীতন্ময় বাগচী

প্রকাণ্ড অবেরিভের জেলখানা। তারি সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের ফেনিল জলধারা। সমুদ্রের মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ। কোন কোনটা আবার গভীর বনরাজিতে ভরা।

নবেম্বরের বিকালবেলা।

জেলখানার প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তেইশ-চব্বিশ বছরের এক যুবতী। দেহে ধূসর রঙের ছেঁড়া গাউন আর মাথায় আঁটা বিবর্ণ ছেঁড়া টুপী। হাতে ঝুলছে একটা ছোট্ট থলে। যুবতীটির নাম লা ব্রিটোনী!

আজ থেকে ছ' বছর আগে নিজের শিশুপুত্রকে হত্যার অপরাধে সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল ব্রিটোনী। আজ সেই দণ্ডের মেয়াদ শেষ হতেই জেলখানার কেরানীর মারফত সরকার থেকে কিছু অর্থসাহায্য পেয়ে এখন সে নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে শেষবারের মত জেলখানাটা দেখে নিয়ে ধীর-মন্থর পদে এগিয়ে চলল শহরের দিকে।

দীর্ঘ কারাবাসের ফলে দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে। চোখেমুখে নেমেছে অকাল বার্দ্ধক্যের দুশ্চিন্তার ব্যাকুলতা। শহরে যাবার শেষ গাড়ীটাও ততক্ষণে ছেড়ে গেছে। এখন শহরে পৌঁছতে হলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই রাতটুকু কাটাবার জন্য আশ্রয়ের খোঁজে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগল।

রুক্ষ শ্রীহীন দেশ! পথ-ঘাট নির্জ্জন আর বন্ধুর। রাস্তার একপাশে ইউকাকার ইত্যাদি নানা গাছের সারি, অপর পারে ছোটখাটো কুটিরগুলি প্রেতপুরীর মত নিস্তব্ধ আর নির্জ্জন। কেবল দূরে শোনা যায় মোষের গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজ। কিন্তু তা করেক মুহূর্ত্তের জন্যই। তার পর আবার নেমে আসে অখণ্ড নীরবতা।

একটা কোলাহলমুখরিত বিরাট সরাইখানার সন্ধান শেষ পর্য্যন্ত পেয়ে গেল ব্রিটোনী। প্রতিদিন দেশ-দেশান্তর থেকে কত যাত্রীর যাওয়া-আসা চলছে সেখানে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু পরিচয় গভীর হবার আগেই চলে যেতে হয় অনেককে। ক্ষণিকের আলাপ চিরতরে মনের মাঝে দাগ কেটে যায় কিনা কে জানে? রাত কাটাবার আশায় সেই হোটেলেই এসে উঠল। মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করে—'রাতটুকু কাটাবার জন্যে জায়গা পাওয়া যাবে কি?'

ব্রিটোনীর আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিতে এক বার দেখে নিয়ে মালিক বলল—'দুঃখিত মাদাম! এখানে তো জায়গা নেই!'

পিছন ফিরে রাস্তায় নেমে পড়ল ব্রিটোনী। অব্যক্ত বেদনা সমস্ত বুকখানায় ফেনিয়ে উঠছে। নবেম্বরের শীতের সন্ধ্যা নামতে আর বেশী দেরি নেই। আবার হাঁটতে সুরু করে দিলে। পথের মাঝে এবার মেলে একটা ছোট পার্ব্বত্য নদী। নানা রঙে নুড়িগুলি রাঙানো। অগভীর স্বচ্ছজলে ধীরে ধীরে পা ডুবিয়ে নদীটি পার হয়ে যায়। অপর পারে এসেও আশ্রয়স্থল সংগ্রহের চেষ্টার ত্রুটি করল না। দু'একটা বাড়ীর দরজায় কড়াও নাড়ল—কিন্তু সবার মুখেই সেই একই ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখানের ইঙ্গিত। জেলখানা-ফেরত বন্দী নারীকে জায়গা দিতে কারো সাহস হয় না!

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দীর্ঘ তিন মাইল বিস্তৃত অবেরিভের বনের সামনে এসে পড়েছিল সে খেয়াল ছিল না। এই বন পার হতে পারলে তবে শহরে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এসেছে। তার উপর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সবগুলো নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম। অনাহারে এই ঠাণ্ডা কনকনে রাত বিনা আচ্ছাদনে কাটাতে হবে ভেবে শিউরে উঠল ব্রিটোনী। টানাটানা চোখ দুটিতে নামল ভয়বিহ্বলতার ব্যাকুলতা! শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

আর হাঁটতে না পেরে সেখানকার মাটিতেই বসে পড়ে। এক পাশে গভীর বন; মাথার উপর কুয়াশা-ঢাকা বিস্তৃত আকাশ! হঠাৎ তার যেন মনে হয়, এ মুক্ত অবস্থার চেয়ে জেলখানার সেই নিয়মবাঁধা জীবন ঢের ভাল ছিল! মুক্ত আকাশের হাতছানি, জ্যোৎস্নার মায়া এখন যেন আর প্রাণে সাড়া জাগায় না। তবু আজকের আকাশের সৌন্দর্য্যের মাঝে ভুলে গেল নিজের বেদনা-বিধুর অবস্থার কথা!

কতক্ষণ সেইভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ এই জনহীন বনরাজির মাঝে বাতাসে ভেসে এল বহুদূরের ঘুমপাড়ানি গানের সামান্য একটু রেশ! বিস্ময়ে চমকে উঠল ব্রিটোনী!

সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিতেই দেখতে পেল খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট কুটির। গানের সুর যে সেখান থেকেই আসছে সে সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা থাকে না। শেষ চেষ্টা হিসাবে সেই দিকেই হেঁটে চলল।

কুটিরের দরজায় ব্রিটোনীর হাতের টোকা পড়তেই যাদু-মন্ত্রের মত গান থেমে গেল। আর খানিক পরে বেরিয়ে এল এক কৃষক-রমণী। ব্রিটোনী দেখল রমণীটি বয়সে তার চেয়ে বেশী হবে না; বরং ছোটই হবে। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কশাঘাত রমণীর সমস্ত সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। পরণে তার চেয়েও ছিন্ন বস্ত্র!

'নমস্কার!' হাতের আলোটা ব্রিটোনীর মুখের কাছে তুলে ধরে কৃষক-রমণী বলল—'কি দরকার আপনার?'

ত্রিটোনী অধীর আগ্রহে বলে ওঠে—'অনাহারে আর পথশ্রমে আমি বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই হাঁটতে পারছি না আর। এদিকে শহরও অনেকটা দূরে। আপনি যদি দয়া করে রাতটুকু থাকবার জন্তে আশ্রয় দেন!'

উদগত অশ্রু চাপবার জন্ত চুপ করে যায় ত্রিটোনী। কিন্তু চোখের জল তবু বাধা মানে না। শীর্ণ কোটরগত দু' চোখ বেয়ে বন্তার ধারার মত দর দর করে গালের উপর দিয়ে নেমে আসে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'অবশ্য আমার কাছে অর্থ আছে। এর জন্ত যদি কিছু দিই আশা করি আপত্তি হবে না!'

কয়েকটি অলস মুহূর্তের দীর্ঘ পদক্ষেপ···!

'এস বোন, আমি তোমায় আশ্রয় দেব। কিন্তু অবেরিভের হোটেলে থাকলেই ত পারতে?'

'তারা আমায় থাকবার অনুমতি দিলে না।'—ক্লান্ত রুক্ষ অথচ শান্ত স্নিগ্ধ চোখ দুটি মাটির দিকে নামিয়ে ত্রিটোনী জবাব দিলে—'কারণ অবেরিভের জেলখানা থেকে আজই আমি মুক্তি পেয়েছি!'

কৃষক-রমণীর কঙ্কালসার শরীরটা মুহূর্তের জন্ত কেঁপে উঠল!

'তাই নাকি বোন! কিন্তু আমি তোমায় নিশ্চয়ই আশ্রয় দেব!'

ত্রিটোনীকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তার পর নিজের ঘরে নিয়ে এসে একটা টুলে বসতে দিয়ে নিজে বসল বিছানায়। প্রদীপের স্তিমিত আলোয় ঘরের সবকিছুই দেখা যায়। অতি দরিদ্রের ঘর। এক পাশে খড়ের গাদার উপর ছ' সাত বছরের এক শিশু শুয়ে আছে। সুন্দর শান্ত মুখের উপর টানা টানা চোখ দুটি বোঁজা। অবাধ্যভাবে এক গোছা চুল চোখের উপর এসে পড়েছে! ঘরের ম্লান আলোয় শিশুর গালের ছোট্ট তিলটুকু পর্য্যন্ত চোখ এড়াল না ত্রিটোনীর!

নীরবতা ভেঙে এক সময় সে বলল—'এখানে তুমি একলা থাক?'

'হাঁ, কিডিকে নিয়ে আজ প্রায় সাত বছর একলাই আছি।'

'তোমার স্বামী কোথায়?'

'কিডি জন্মাবার দু' বছর পরেই তিনি মারা গেছেন।'—কৃষক-রমণীর চোখ দুটো জলে টল্ টল্ করে উঠল! তাই প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্ত তাড়াতাড়ি বলল, 'খেয়ে নাও বোন। ঐ পাত্রে খাবার ঢাকা আছে।'

খাওয়ার পর পাশের ঘরে শোবার ব্যবস্থা হ'ল ত্রিটোনীর।

ঘুমের চেষ্টায় শান্তভাবে খড়ের গাদার উপর শুয়ে পড়ে ত্রিটোনী। কিন্তু ঘুম আর আসে না। বাইরে সুরু হয়েছে গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের কানাকানি আর অরণ্যের মাথার উপর তারা-দলের দুলুনি!

বিছানা ছেড়ে উঠে এল!

কৃষক-রমণীর কথা ভাবতেই শ্রদ্ধায় আপনি যেন মাথা নুয়ে এল তার। কি সুন্দর মন! স্বামী মারা গেছে তবু সন্তানকে নিয়েই সে গর্ব্বিত আর আনন্দে মত্ত! এখন তার আত্মহারা মাতৃত্ব পুত্রস্নেহের অসীমতায় মুগ্ধ! সন্তানের মধ্যে দিয়েই যেন নারী-জন্মের সার্থকতা ফুটিয়ে তুলছে···!

নিজের সন্তানের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় ত্রিটোনীর। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট স্বরে বলে চলে—'বাছা রে! সুদীর্ঘ কারাবাসের প্রতিটি মুহূর্ত্তে তোর কথা ভেবেছি। তোর কথা মনে হতেই আমার মন স্বপ্নে রাঙিয়ে যায়। তোর রক্তস্নাত মুখখানার কথা ভাবলে আজও আমি ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠি। আমার উদ্যত বাহু কেন তোর উপর আঘাত হেনে তোকে হত্যা করেছিল তার কারণ জানাতে আজও আমি অক্ষম! তুইও বুঝিস নি, রাজার বিচারকও এতটুকু বোঝেন নি। আজ যদি তুই বেঁচে থাকতিস···'

নাঃ, আর ভাবতে পারে না ত্রিটোনী। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় ঘুম!

হঠাৎ পাশের ঘরে বেজে ওঠে হাসিকান্নাভরা শিশুকণ্ঠের আওয়াজ। ত্রিটোনীর বুকের স্পন্দন অকারণে দ্রুততর হয়ে ওঠে। কান পেতে শুনল ছেলেটি বলছে—

'না, না···আর আমি ঘুমোব না। শীগ গির আমার খেলনা এনে দাও।'

'খেলনা কোথায় পাব বাবা। আমরা যে গরীব।' কৃষক-রমণীর আকুল কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেল ত্রিটোনী।

কিন্তু কথাটা শেলের মত আঘাত করে তার অন্তরে।

'তা হলে আমিও আর ঘুমুচ্ছি না কিন্তু।'

'এখন ঘুমোও লক্ষীটি। কাল সকালে নিশ্চয়ই খেলনা এনে দেব।'

'ঠিক বলছ মানি!'

'হাঁ, হাঁ ঠিক।'

তারপর নেমে আসে নিস্তব্ধতা।

কিন্তু কিছু পরেই কৃষক-রমণীর বুকচেরা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল শুধু দুটি কথা—'উঃ, ভগবান!'

আবার কয়েকটি অলস মুহূর্তের দীর্ঘ পদপাত···

ত্রিটোনীর মনে হ'ল শিশুর সঙ্গে মাও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে কেবল সে। কি মনে হতেই দরজা খুলে সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন কথা না ভেবে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল অবেরিভের হোটেলের দিকে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা ছোট্ট খেলনার দোকান! দোকানের দরজায় মৃদু করাঘাত করতেই ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে ফেলল দোকানদার।

এক আশ্চর্য্য কাণ্ড করে বসল ত্রিটোনী। সঙ্গের সমস্ত অর্থ দিয়ে, দোকানদারকে অবাক করে ভাল ভাল খেলনাগুলো কিনে আবার দ্বরিত পদে কুটিরের দিকে ফিরে চলল।

আজ ত্রিটোনীর মনে জেগেছে বহুদিনের অতৃপ্ত মাতৃত্বের অপূর্ব্ব বাৎসল্য। কত বর্ণ-সমাবেশেই না উজ্জ্বল!

বনের কাছে পৌঁছানো মাত্রই কাঁধের ওপর ভারী করস্পর্শে চমকে পিছন ফিরে তাকাতেই সে দেখল রাতের পাহারাওয়ালা। সদ্য-কারামুক্ত বন্দিনী মাতৃত্বের নেশায় ভুলে গিয়েছিল তার মত নর-নারীদের গভীর রাত্রে পথে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

প্রহরীর পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেল ত্রিটোনী!

'এখানে রাত কাটানোর চেয়ে অবেরিভের কয়েদখানাই বোধ হয় বেশী সুবিধাজনক হবে—না?'

প্রহরীর গলায় সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মাখানো রয়েছে যেন!

এক নিমেষে সমস্ত কল্পনা, সকল রঙীন স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার। তবু ধীর স্থির ভাবে বলল—'এখনই যেতে হবে?'

'হাঁ'—প্রহরীর গম্ভীর স্বর আবার শোনা গেল।

বন্দীর গাড়ী এসে পড়তেই দু'জনে উঠে বসল।

দুরন্ত বাতাসের একটানা গোঙানি যেন গাড়ীর মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। জনহীন পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে বিকট শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে ঘোড়ার গাড়ীটা ছুটে চলেছে জেল-খানার দিকে। হঠাৎ দূরে সেই কৃষক-রমণীর ভাঙা কুটিরখানি চোখে পড়তেই প্রহরীকে মিনতি জানায় ত্রিটোনী একবার সেখানে থামবার জন্য। ঐখানে তার এক আত্মীয় আছে, যাবার আগে একবার শেষ দেখা করতে চায়। প্রহরী কি ভেবে রাজী হয়ে গেল!

প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে খেলনাগুলোকে কোমরে গুঁজে কুটিরের দিকে এগিয়ে চলল। দোরগোড়ায় কৃষক-রমণীকে বসে থাকতে দেখে অবাক না হয়ে পারে না। একমুখ বিস্ময় নিয়ে বলে ওঠে—'একি এত রাতে এখানে বসে আছ? খোকা ঘুমুচ্ছে?'

'হাঁ বোন! কিন্তু তুমি কেন রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে?'

'চুপ! কোন কথা নয়। এই খেলনাগুলো ধর। এগুলো দেখলে খোকা নিশ্চয়ই খুশী হবে—না?'

অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্তরটা টন টন করে ওঠে, চোখের কোণ বেয়েও বুঝি বা গড়িয়ে পড়ে দু' ফোঁটা জল! বিস্ময়-বিহ্বল কৃষক-রমণীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ত্রিটোনীর মুখচ্ছবি। নিজের কথায় জোর টেনে ত্রিটোনী বলে চলে—'লক্ষীটি, বলো না যেন আমি দিয়েছি। বড় আপসোস রয়ে গেল যাবার সময় খোকাকে একটা চুমুও খেয়ে যেতে পারলাম না!'

নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল ত্রিটোনী। কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে খেলনা পেয়ে শিশুর মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে উঠেছে। কচি চঞ্চল পায়ের শব্দে মুখর করে তুলেছে সমস্ত কুটিরটা। কুঞ্চিত কুন্তলরাশির নীচে টানা টানা বড় বড় চোখ দুটো শিশুসুলভ সরলতা মাখানো যেন। আনন্দ-উচ্ছ্বাস বার বার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

স্বপ্ন ভেঙে গেল!

'কে—কে—কে তুমি?—ভগবান—? তুমি কে?'—কৃষক-রমণী যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল।

'চুপ! খোকা জেগে উঠবে যে।' রুদ্ধ আবেগে গলার স্বর আটকে যায় ত্রিটোনীর। খেলনাগুলো তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে।

খেলনাগুলো হাতে নিয়ে কৃষক-রমণী স্তব্ধভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ত্রিটোনীর অপস্রিয়মান দেহের দিকে।

'আমি প্রস্তুত।' প্রহরীর কাছে ফিরে এসে দৃপ্ত কণ্ঠে জানাল ত্রিটোনী। অরণ্যের মাথার উপর নীল আকাশে উজ্জ্বল তারকারাজি যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে। বনের মাঝে জেগেছে এ কি বেদনার চঞ্চলতা?…জ্যোৎস্নালোকিত নির্জ্জন পথে দু'জন যাত্রীকে নিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে বন্দীদের ঘোড়ার গাড়ীটা। গন্তব্য তাদের অবেরিভের জেলখানা।

আর তারি সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য ঘোড়ার গলার ঘণ্টাটাও একটানা বেজে চলেছে টুং টাং টুং টাং!*

---

* ফরাসী গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে ভাবান্তরিত।

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম-এ

কবিমন তাহার অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে চায় সুরে ও ছন্দে। নিজের সম্পদকে সকলের সম্পদ করিয়া তুলিবার জন্য কবি, শিল্পী, সুরকার হন ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতাই কাব্য চিত্র সঙ্গীতের রূপে রসিকের পিপাসু মনের দ্বারে দ্বারে রস সম্পদ বহন করিয়া লইয়া যায়।

সঙ্গীত-সাধনারও মূল কথা ইহাই—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের ধ্যানময় মূর্ত্তিকে দেখিবার জন্য যে অলৌকিক দৃষ্টির প্রয়োজন, গানের সুরই তাহা উন্মীলিত করিয়া দেয়। কবি বলিয়াছেন, "গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্ব্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, যেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।" সুরের বাহনে সেই সত্যলোকে ছিল কবির আনাগোনা। আমরাও তাঁহার সেই সুরের সহায়তায় অন্ততঃ সাময়িকভাবে সত্যলোকের দিব্যানন্দের স্পর্শ লাভ করি।

ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের যে ধারা সুদূর অতীতকাল হইতে গতানুগতিক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বাংলাদেশে তাহার প্রথম ব্যতিক্রম হইল কীর্ত্তন-সঙ্গীতে। বৈষ্ণব ভক্তেরা চাহিয়াছিলেন, অসীমকে সীমার মধ্যে রসের আবেষ্টনীতে অনুভব করিতে, তাই তাঁহারা অপরূপ বাণীর বন্ধনে অসীমকে দিয়াছিলেন অভিনব রূপ। কীর্ত্তন-সঙ্গীতে তাই সুর অপেক্ষা বাণীর, তান অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার গানে বাণীকে প্রাধান্য দিয়া রসিকের মনের অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভারতীয় সাধক অসীমকে ধ্যানমূর্ত্তির সীমার মধ্যে যেমন রসময় রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথও তেমনি গানের বাণীর মধ্যেই অসীমকে সুরময় রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির কথায়—

"কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখ-দুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অপরূপতা লাভ করে। তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে।"

সুরের ক্ষেত্রে কবির কৃতিত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ কর্ম্ম সহজ ছিল না, মুসলমান আমলের দরবারের প্রভাবে সৃষ্ট দরবারী সঙ্গীত হইতে এ দেশের পল্লীগ্রামের পরিবেশে সৃষ্ট বাউল প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের সুর-পারাবারে নব সুর যোজনার অবকাশ নাই বলিলেই চলে। এ যুগের সুরস্রষ্টাকে অগত্যা পুরাতন সুরকেই নবীন ভাবের পাত্রে পরিবেশন করিতে হইবে; সুরস্রষ্টা কবি কাব্যের অঙ্গেই সুরের মুক্তি দিয়াছেন। কবিগুরু তাঁহার অজস্র গীতি-কবিতাকে সুরের মোহিনী সজ্জায় উপস্থাপিত করিয়াছেন, কেবল ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্ত অলঙ্কার এ সজ্জা সমাপ্ত করিতে পারে নাই, বিদেশী সঙ্গীত হইতেও নব নব সুর-অলঙ্কার সযত্নে তিনি আহরণ করিয়াছেন। সজ্জা, অলঙ্কারের অন্তরালে সুন্দরীর বিধিদত্ত রূপের মত সর্ব্বত্র রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কবিত্বই গানের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সুরের ঐশ্বর্য্য ভাবের কাছে অনেক সময় তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানে যে সুরটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা অসীমের জন্য ব্যাকুলতার সুর। 'Yearning for something afar from the sphere of our sorrow'। সুরের মূর্চ্ছনা-মীড়ের মধ্য দিয়া ছাড়া সে আবেদনের বেদনা প্রকাশ করার জন্য কোন পথ নাই—

"আমার কি বেদনা সে কি জান, ওগো মিতা, সুদূরের মিতা"

সৃষ্টির অপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যেও এই বেদনা জাগিয়া থাকে। এই বেদনা বৈষ্ণব কবির সেই প্রেম বৈচিত্র্যের বেদনার মত। যে প্রেম-বৈচিত্র্যে 'দুহুঁ ক্রোড়ে, দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়া কবি অনুভব করেন অসীমের সহিত মিলন, সসীম মানবাত্মার মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠার আবেদন। এ মিলনে থাকে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া, তাহাই করে কবিকে উন্মনা, তাহার কারুণ্যই কবির সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়। এই বেদনার রসই অভিব্যক্ত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গানে—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস্ নে কি শুক্‌নো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে।

সুন্দর যে সুন্দরতর হইল না—তাহার জন্যই এই আক্ষেপ। সুরের যে চাঞ্চল্য অন্তরলোকের তীব্র ভাবাবেগকে প্রকাশ করে, কবি তাহা সব সময়ে অনুভব করিতেন, "গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী, তোড়ি, রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন করে আপন মনে আলাপ করেছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হ'ল, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে দেখা দিল, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার একটা সঙ্গীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দ্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে

লাগল।" এই ভাবঘন মুহূর্তই শিল্পীর জীবনের আবিষ্ট অবস্থা : এই সময়ে যে সৃষ্টি হয়, স্রষ্টা নিজেও তাহার উৎস সন্ধান করিতে পারেন না। এ অবস্থা কদাচিৎই আসে—'Rarely, rarely it comes'; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে এই ধরণের ভাবাবেগ-উদ্বেলিত মুহূর্তের বিরাম, অবসান ছিল না বলিলেই হয়। সে জন্তই কবির সুর-সৃষ্টিরও বিরাম হয় নাই।

কবি শুধু চিরন্তনের সঙ্গে বিরহের ব্যাকুলতাই প্রকাশ করেন নাই সুরে, সুরে বিরহ-বেদনার তৃপ্তিই শুধু খোজেন নাই, মুক্তিও খোজেন তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের মধ্যে তাঁহার কবিচিত্তের মুক্তিরও সন্ধান পাইয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ যে ভাবে তাঁহাদের তপস্যার মধ্য দিয়া পরম-পুরুষের সন্ধান করিতেন, এ যুগের ঋষিকবি সঙ্গীত-সাধনার মধ্য দিয়াই তাঁহার সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়াছেন—

দাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

কেবল ব্রহ্ম স্পর্শ-লাভে কবি তুষ্ট নহেন। ইহাতে অসীমের সহিত একাত্ম হইবার জন্ত পিপাসাই বাড়িয়াছে। এই আধ্যাত্মিক পিপাসার জন্তই সাধক সংসার ত্যাগ করেন, ধর্মগুরু আত্মোৎসর্গ করেন, ভক্তগণ তীর্থে তীর্থে পরম সম্পদের সন্ধান করিয়া বেড়ান। কবি তাঁহার এই পিপাসার পরিতৃপ্তির সন্ধান করিয়াছেন গানের সুরে। ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।

এই গানে সুরের মধ্যেই তিনি নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে, নিজেদের শ্রেষ্ঠ সম্বলকে ভগবানের নামে উৎসর্গ করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভারতীয় কবি কবিত্বকে তাই উৎসর্গ করিয়াছেন ইষ্টদেবের চরণে, ভারতীয় শিল্পীরা তাঁহাদের সমস্ত সৃষ্টি নিবেদন করিয়াছেন দেব-দেবীর বা বুদ্ধদেবের উদ্দেশে, ভারতীয় নট-নটীদের নৃত্য-শিল্পের রঙ্গভূমি দেবতার মঠ দেউলের নাটমন্দিরে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা প্রধানতঃ ছিল শান্তরসের। কবি তাঁহার গীতি-প্রতিভাকে পরম দেবতার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ছন্দের বৈচিত্র্যে, সুরের অপূর্বতায়, ভাবের গাম্ভীর্যে অনুভূতির গাঢ়তায় রবীন্দ্রনাথের ভাগবতী গীতি অসীমের অনন্ত মহিমায় মহিমঃ গীতি। গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের যুগে তাঁহার শান্তভাব অনেক স্থলে দাস্য ও সখ্যভাবের স্তরে আরোহণ করিয়া বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে একাত্ম হইয়াছে। ভগবান বন্ধুরূপে, সখারূপে, পরমাত্মীয়রূপে দেখা দিয়াছেন।

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।

কবি শুধু বিশ্বনাথের বিশ্ব-মন্দির-প্রাঙ্গণেই গান গাহেন নাই, বিশ্বজনের মেলাতেও তাঁহার কণ্ঠ নীরব ছিল না। বিশ্বনাথের সিংহ-দুয়ারে তিনি বাঁশী বাজাইবার ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু পথের পথিকদেরও তিনি তাঁহার বংশী ধ্বনি হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ভাগবত গান ছাড়াও তাঁহার অজস্র গান আমাদের নিত্য-সঙ্গী সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে।

কবি জানিতেন তাঁহার গান এক দিন কালের সীমা ছাড়াইয়া অগণ্য জনসাধারণের দুঃখ-সুখের বাহন হইবে। নর-নারীর বিরহ-মিলনে তাঁহারই সুরের ডাক পড়িবে, তাঁহার অজস্র প্রেমের গানকে সেই ডাকে চিরদিন সাড়া দিতে হইবে। যখন কবির কেশে পাক ধরিয়াছে, জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, দেহ-মনও শ্রান্ত হইয়াছে তখনও—

যদি হোথায় বকুল বনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে,
কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো মন্দই গণি

কাজেই কবি কোন দিনই প্রেমের বাসর, রসিকের আসর হইতে মুক্তি পান নাই। তবে তাঁহার প্রেমের গানে বন্ধনহীন আবেগ, মাত্রাহীন উচ্ছ্বাস নাই। তাহার অধিকাংশ প্রেম-সঙ্গীতের উপজীব্য শান্ত কামনাহীন নিস্তরঙ্গ প্রেম, সেই সঙ্গে বিরহের ব্যাকুলতাই তাঁহার প্রেম-গীতিতে সুরূপ লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতির একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন কবি। ছোটবেলা হইতে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতে নবোদিত সূর্য্য যে তাঁহার সপ্তাশ্ব রথে গগন-পরিক্রমায় বাহির হন তাঁহাকে সুস্বাগতম্ জানাইবার ভার লইয়াছিলেন কবি। নিশাবসানে অস্তগামী ম্লান চাঁদের মুখ হইতে কালো মেঘের আবরণ সরাইবার বিধাতৃদত্ত ভারও ছিল তাঁহার উপর। ঋতুতে ঋতুতে নানা রঙের ফুল ফুটাইয়া পাখীর ঘুম ভাঙাইয়া প্রকৃতির অঙ্গনে যে রঙ্গলীলার অভিনয় হয় কবি ছিলেন সেই লীলার সূত্রধার, প্রাবৃট-লক্ষ্মীর শারদশ্রী ও ঋতুরাজের মাঙ্গলিক গীতিতে মুখরিত হইয়া উঠিত তাঁর কণ্ঠ—দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় কবির চিত্ত ছিল সতত সচেতন। স্বদেশের প্রতি ধূলিকণা, প্রতি তৃণাঙ্কুর, প্রত্যেকটি নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নরনারীর প্রত্যেক তুচ্ছাদপিতুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার

সমবেদনার অন্ত ছিল না। অলস কল্পনার দিন গিয়াছে, বাক্যজালের বাধা সৃষ্টি আজ বৃথা—কাজের মধ্য দিয়া তিনি দেশকে জাগ্রত দেখিতে চাহিয়াছিলেন—

> আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
> স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই
> এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই,
> তন্দ্রা ততই ছুটবে,
> মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা গতানুগতিকতার, প্রাত্যহিকতার স্রোতে ভাসিয়া যাই। কতকগুলি উৎসব অনুষ্ঠানই একমাত্র এই জীবনধারার ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করে। এই উৎসবের দিনগুলি অন্য দিনগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই উৎসবগুলিকে নব নব সঙ্গীতের সুরে পরম উপভোগ্য ও মহামহিমান্বিত করিয়াছেন। এই রকম আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতে তিনি সুরের লাজবর্ষণ ও ছন্দিত বাণীর সুগন্ধি পুষ্প বিকীরণ করিয়াছেন। এই ভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহার পালাগানগুলি। এক একটা গল্প কাহিনীকে আগাগোড়া সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন কবি; করুণ, রুদ্র, মধুর এবং হাস্য প্রভৃতি নানা রসের গানের ভিতর দিয়া। নানা সুরের গানের সমাবেশ করিয়াছেন এই পালাগানগুলিতে।

তাঁহার গানের সুরলোকে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে একটা মুক্তির আনন্দ লাভ হয়। মনে হয় এই জরাজীর্ণা প্রাচীনা পৃথিবী তাহার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক উৎপীড়ন বাধা-নিষেধ লইয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে; তাঁর সঙ্গীতধারা যেন কোন অমর্ত্যলোকে, কোন মায়ারাজ্যে আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। কবি নিজে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের জীবনেও তাহা আংশিক ভাবে সত্য হইয়া উঠে—"আমি এ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সঙ্গীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্য্যটা কি? অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভাল করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবামাত্রই এই জন্ম-মৃত্যুময় সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্ম্মের আলো-আঁধারের পৃথিবীটি বহু দূরে, যেন একটি পদ্মা নদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়—সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মত বোধ হতে থাকে।"

গড় মান্দারণ

"সত্যবান"

যযাতির জরা নিয়ে প'ড়ে আছে গড় মান্দারণ।
যৌবনের তাজা রক্ত বৃথা আজ খুঁজে অন্ধকারে
ধুলার জনতা-মাঝে
অতীত জৌলস।
প'থের ধুসর ধূলি
ইতিহাসের জমানো কঙ্কাল,
অতীতের বিবর্ণ ফসিল
গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে উড়ে যায়
শতাব্দীর মন্থর চাকায়,—
ধীর পায়ে চলে বৃদ্ধ কাল।
শৈলেশ্বর পূজা পায় মৃত্তিকায় বল্মীক-বাসরে;
আয়েষার স্মৃতি আজ ছবি দেখে আমুলায় জলে,
জহরের বিষে নীল নিস্তরঙ্গ জলে
শত খণ্ড হীরকের করুণ উচ্ছ্বাস
জাগে আর ভেসে ভেসে যায়।
কতলু বীরেন্দ্র আজ মিতালি পাতায়
ফাগুনের স্বপ্নে ভোর কাঁটার কবরে।
পাতালের বিলুপ্ত কারায়
কাঁদে শুধু বিমলার বঞ্চিত যৌবন।
কুতূহলী পথচারী
সোনার বাসর খোঁজে স্বপন-দেউলে—
শ্মশানের উপহাস জাগে শুধু সবুজ মরুতে।
বসন্ত তেমনি আসে
অবলুপ্ত আমের বাগানে,
যুগান্তের প্রান্ত হ'তে সাড়া আনে নিঃশঙ্ক কোকিল—
"হে অতীত কথা কও"
বুনো হাওয়া লুকোচুরি খেলে,
বাঁশী বাজে পাথরের ফাটলে ফাটলে—
সরীসৃপ নাগরিক তার।
ট্রাকের টায়ারে আজ মুছে গেছে রূপকথা সব,—
অশ্বের খুরের রেণু, পদচিহ্ন সহস্র সেনার,
আকাশের চন্দ্রাতপে ছাতা করে হাওয়াই জাহাজ,
পেট্রোলের কটুগন্ধে
কান্না ধরে বসোরাই উদ্ধত গোলাপ।
মন্থর অতীতের ছিন্নদল লুপ্ত পারিজাত
কাব্যের নন্দনে শুধু গন্ধবহ অন্তহীন কাল।

ব্রহ্মদেশ—নারী

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

রূপ-রস-গন্ধে ভরা, সুষমাময় যে মায়াপুরীর মায়াজাল ছিন্ন করে চলে এসেছিলাম এক দিন, তার মোহময় স্মৃতি আজও মনের মণি-কোঠায় সযত্নে জীবন্ত করে রেখেছি, মাঝে মাঝে দরজা খুলে গোপনে একবার দেখে নিয়ে আনন্দ পাই। যে আনন্দ চিরন্তন উপভোগের বস্তু হয়ে আছে, সে আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হয় না কি সবাইকে?

দেশটাকে ইংরেজী ভাষায় লোকে 'ল্যাণ্ড অব প্যাগোডাজ' বলে, অক্ষরে অক্ষরে দৃশ্যটি সত্যই মিলে যায়। আকাশের নীলিমার সঙ্গে মিশে গেছে যেখানে দিগন্ত রেখা তারই কোল ঘেঁষে ঘন শ্যামল অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর মাঝে মাঝে ধব্‌ধবে সাদা সুগঠিত স্তূপগুলি মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা লোকালয়-বর্জ্জিত নির্জ্জন দুর্গম পর্ব্বতশিখরেও ছোট ছোট স্তূপ এবং মঠ দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপের সু-উচ্চ চূড়ায় বাতাসের কম্পনে ছোট ছোট ঘণ্টার ঠুন্ ঠুন্ মিষ্টি আওয়াজে পথিকের মনকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যায়!

প্রকৃতি তাঁর অকুণ্ঠ দানে এ দেশটিকে যেন সাজিয়ে দিয়েছেন। শ্যামল শস্যভরা মাঠ, ফল-ফুলে পরিপূর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণ, কূলে কূলে ভরা নদীর তীর, স্বাস্থ্যে নিটোল, স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বল শিশুর হাসি-মুখ, এ দৃশ্য কি দুর্লভ নয়?

যে-কোন জাতির সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে প্রথমেই ভাবতে হয় তাদের মাতৃজাতির কথা। ব্রহ্মদেশের নারীর জীবনযাত্রা, গৃহস্থালি, কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখি ভারতীয় নারীর সঙ্গে তার স্বভাবের, ধরণ-ধারণের যথেষ্ট মিল আছে। ব্রহ্ম-রমণী অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁর ঘর-দুয়ার ধোয়া-মোছা, স্নানাদি সব সমাপন হয়ে যায়। অধিকাংশ নারীই গৃহ-পরিবারের যাবতীয় কাজ, রন্ধনাদি নিজ হস্তে করে থাকেন। খাওয়া-দাওয়া এঁদের বেশ সংক্ষিপ্ত এবং সাদাসিধে ধরণের। অনেক জিনিসই এঁরা কাঁচা, সিদ্ধ বা পোড়া খান। জলখাবার অনেক পরিবারই কিনে খায়, দুই বেলার প্রধান আহার্য্য —ভাত-তরকারি সাধারণ সব গৃহস্থের ঘরেই হয়।

নারী গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী, সন্তান এবং পরিবারস্থ সকলেই গৃহিণীর কর্ত্তৃত্ব মেনে চলে। বর্ম্মী পুরুষ সাধারণতঃ অলস, কর্ম্মঠ মোটেই নয়। সংসারের দায়িত্ব তার প্রায় সবটাই নারীকে বহন করতে হয়। বাজার-হাট করা, গৃহের যাবতীয় কাজ, ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা, পরিধেয় বস্ত্রাদি সেলাই, ধোলাই, ইস্ত্রী, সবই নারীর কাজ। গৃহের সব কাজ করেই যে তার নিষ্কৃতি তা নয়, রোজ-গারের চিন্তাও মুখ্যতঃ তার। পুরুষ রোজগার করে, কিন্তু নারী কখনও তার উপর নির্ভর করে না। বড় বড় বাজারে গেলে রমণী-পরিচালিত দোকানই বেশী চোখে পড়ে। কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, গালা-নির্ম্মিত সুদৃশ্য টেবিল, বাক্স, ট্রে, পানের বাটা, ফুল-দানি, নানাবিধ মনোহর খেলনা, ঘর-সাজানো টুকিটাকি জিনিস থেকে আরম্ভ করে ফলমূল, শাকসব্জী, মাছ-মাংস, হাঁড়ি-কুড়ি পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যের ব্যবসাই নারী সুনিয়ন্ত্রিত করছে দেখা যায়। তামাক, চুরুট, চাল প্রভৃতির বড় বড় কারবারও মেয়েরা সুচারুরূপে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চালায়। পণ্য উৎপন্ন করা, গুদামে রক্ষার ব্যবস্থা, স্থানীয় বাজারে এবং অন্যত্র আমদানী রপ্তানি করা সকল ব্যাপারেই পুরুষের সাহায্যনিরপেক্ষ ভাবে মেয়েরা অনায়াসে করছে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

আমাদের দেশের বহু উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আজও জীবনের নানা ক্ষেত্রে এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ব্যবসাক্ষেত্রে যে সকল বর্ম্মী নারীকে স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম্ম করতে দেখেছি, তারা তথাকথিত শিক্ষিতা অর্থাৎ ইংরেজী-পড়া বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মার্কামারা মেয়ে মোটেই নয়, মাতৃভাষায় সামান্যই শিক্ষা পেয়েছে। ব্রহ্মদেশে নিরক্ষরের সংখ্যা কম। মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে, হিসাব করতে জানে অনেকেই। মেয়েদের চলা-ফেরায়, মেলামেশায় কোনও জড়তা, অস্বাভাবিক লজ্জাশীলতা নেই; অথচ নারীসুলভ নম্রতা, শান্তভাব এবং কমনীয়তা যেন ব্রহ্ম-রমণীর স্বাভাবিক ভূষণ-স্বরূপ।

যে সকল গৃহস্থ-রমণী ঘরের কাজে, সন্তান প্রতিপালনে অত্যধিক ব্যস্ত, রোজগারের জন্য বাইরে ছুটোছুটি করার অবসর যাদের নেই, তারা কর্ম্মের ফাকে ফাকে গৃহ-প্রাঙ্গণে উৎপন্ন শাক-সব্জী, ফল ইত্যাদি একটি সাজিতে ভরে নিয়ে বাজারে বিক্রয় করে এবং সেই অর্থের বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে আনে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে গৃহস্থের মান-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না বা কিছু নিন্দার কারণও নয়। কোনও কোনও বাড়ীর খোলা বারান্দায় বা রোয়াকে একটি ছোট টেবিলে গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু—পান, চুরুট, দেশলাই, লজেন্স, বিস্কুট, ছুঁচ, সূতা, বোতাম, নানাবিধ সুস্বাদু আচার প্রভৃতি বস্তু সাজিয়ে বাড়ীর গৃহিণী বা ছোট ছেলেমেয়েরা বসে থাকে, অবসর-বিনোদন এবং ব্যবসা একত্রে চলতে থাকে।

বর্ম্মীরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাতি। অতি সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ী-ঘরও সুন্দর করে সাজিয়ে, ঘরের সামনে দু'চারটে ফুলভরা টব ঝুলিয়ে, নিজেরা পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্মত পোশাক পরে বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকল গৃহস্থের ঘরেই প্রতিদিন বাজারের অন্য সকল দ্রব্যসম্ভারেরও সঙ্গে কিছু ফুল কেনা হবেই। যার ঘরে বাগান আছে, সে প্রতিদিন ফুল দিয়ে ছোট ছোট তোড়া বেঁধে বাজারে বিক্রি করতে পাঠায়, ফুল দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য নয় সেদেশে।

বর্মী-নারী সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণা, গোঁড়া-হিন্দু-রমণীর ন্যায় প্রাচীন প্রথা এবং সংস্কারবিশ্বাসী গেরুয়াধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রভাব গৃহস্থ-রমণীদের উপর বেশ প্রবল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে ভিক্ষাপাত্র হস্তে গৃহস্থের দরজায় উপস্থিত হন। ব্রহ্ম-রমণী শেষ রাত্রে স্নান করে নিষ্ঠার সহিত শুচিশুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর আহার্য্য রন্ধন করে প্রস্তুত থাকেন, ভিক্ষু নীরবে নতমুখে দাঁড়ালেই নারী নিজ হস্তে আহার্য্যদ্রব্য ভিক্ষা-পাত্রে ঢেলে দেন। এই শ্রদ্ধার দান একটি দেখবার মত ব্যাপার। পূর্ব্বনির্দিষ্ট এক একটি পাড়ায় ভিক্ষুর দল সারি বেঁধে ভিক্ষাপাত্র হস্তে যান। দূর থেকে, উষার অস্পষ্ট আলোয়, মুণ্ডিতশির, গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ঢাকা গেরুয়া আলখাল্লা-পরিহিত, কালো মসৃণ গালামণ্ডিত ভিক্ষাপাত্র হস্তে সন্ন্যাসীর সারি (বৌদ্ধ ভাষায় 'ফোঙ্গী') ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলেছেন বৃক্ষ-ছায়ায় ঘেরা লাল মাটির পথ বেয়ে, একটা নীরব গাম্ভীর্য্য বিস্তার করে, আর পথের দু'ধারে খোলা দরজার সম্মুখে নিষ্ঠাবতী রমণী সুস্বাদু আহার্য্যের ডালি হাতে প্রতীক্ষা করছেন, প্রত্যেকের দরজায় মুহূর্ত্তের জন্য থেমে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করে তাঁরা আবার নীরবে চলেছেন মঠের পানে ফিরে। কতবার এ দৃশ্য রাত্রি থাকতে উঠে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছি, আশা যেন মেটে নি, আজও প্রাণ চায়, আবার দেখি!

এ দানের মাধুর্য্য এই যে, দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই নীরব, দান এবং গ্রহণ যেন কলের মত মানুষের অজ্ঞাতে হয়ে যাচ্ছে।

বর্মী-নারীর উপাসনায় নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। প্রতি ঘরে তথাগত ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় ঘণ্টা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্র আবৃত্তি শোনা যায়। মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু, যুক্তকর, প্রার্থনা রত ভাব বিভোর রমণীকে দেখে মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আমার প্রতিবেশী এক বন্ধুকে দেখেছি, প্রতিদিন পরিবারের জন্য যা-কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করতেন, কাউকেও দেবার পূর্ব্বে একটি থালায় সবরকম সাজিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে রেখে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতেন, তার পর সন্তানদের খেতে দিতেন। তিনি নিজের ভাষায় তাঁর মনের ভাব যা ব্যক্ত করতেন তার মর্ম্মার্থ এই—গৃহদেবতা যিনি তাঁরই দেওয়া জিনিষ তাঁর কাছে উৎসর্গ করে তবে প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করতে হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাও এইরূপই ছিল। গৃহে-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ভোগ রান্না হ'ত এবং সেই প্রসাদই গৃহস্থ গ্রহণ করতেন। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বাস আজ কত শিথিল!

বর্মী-নারীর সন্তান-পালন-প্রথা আমাদের চোখে একটু কঠোর বোধ হয়। শিশুকাল হতেই সন্তান বেশ একটু অবহেলার মধ্যেই বড় হয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ বর্মী ছেলেমেয়েরা বেশ স্বাস্থ্যবান ও তাদের শরীর সুগঠিত হয়। বর্মী মাকে সংসারে, ঘরে, বাইরে নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়, সেজন্যেই বোধ হয় সন্তানের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখার অবসর বা ইচ্ছা তাদের হয় না।

আমাদের দেশের মায়েরা যেমন অতি আদরে রেখে সন্তানের স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠবার পথে বাধা দেন, বর্মী মা ঠিক যেন তার বিপরীত। শিশু হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ধুলো, বালি, কাদার মধ্যে সে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, নিজের আনন্দ, নিজের খেলার সম্বল নিজেই আহরণ করে। কত বার আছাড় খায়, কত আঘাত পায়, কেউ 'আহা' বলে না, তাই তার কান্নাও কম শোনা যায়। যত দিন শিশু খুব ছোট থাকে, বর্মী-মা ঘরের কড়িকাঠ হতে ঝোলানো মস্ত একটা চাদরের দোলনায় (খানিকটা বিদেশী 'হ্যামকে'র মত) শিশুকে চারদিক ঢাকা দিয়ে ফেলে রাখে। এর মধ্যে শিশু আরামে ঘুমায়। স্থানীয় শিশু-মঙ্গল-সমিতির তরফ থেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে শিশু-পরিদর্শন করতে গিয়ে ঐ ভাবে শিশুকে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বলেছে বাড়ীতে তেল, ঘি, মশলার রান্না যা হয়, তার ঝাঁজ এবং গন্ধ শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গেলে শিশুর ব্যারাম হবে। এই ধারণা এমনই বদ্ধমূল যে, অনেক যুক্তি দিয়েও বোঝাতে পারি নি মোটা চাদরের আচ্ছাদনে বদ্ধ হাওয়ায় শিশুর স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। দাঁত উঠবার আগেই শিশুকে মোটা মোটা কলা চটকে, ভাপে-সিদ্ধ ভাত মেখে, অনেক সময় মা নিজে চিবিয়ে নরম করেও খাওয়ায়, স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এরা। অনেক পাস করা শিক্ষিতা রমণীকেও উচ্ছিষ্ট খাওয়ানোর বিপদ কত মারাত্মক, বোঝাতে পারি নি। উচ্ছিষ্ট-জ্ঞান এ জাতির মধ্যে নেই। একই পাত্র হতে একই চামচে বিভিন্ন লোকে আহার করছে. জলের হাঁড়ির ভিতর একটি পেয়ালা ডুবিয়ে জল তুলে সকলেই চুমুক দিয়ে পান করছে, একটু দ্বিধাবোধ করছে না—এ দৃশ্য দেখে বিস্ময় বোধ হয়। এই কারণেই বোধ হয় শিশুদের দাঁত ছোটবেলা থেকেই পোকায় ধরে আর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ খুব বেশী দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রেম ও অহিংসার ধর্ম্ম। অহিংসা-নীতি এরা বড় অদ্ভুতভাবে পালন করে। "জীবহত্যা করিবে না" এই নীতি—অথচ গরু, শূয়োর, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী, সাপ, ইঁদুর সবই এরা খায়, কিন্তু কোনটাই গৃহে হত্যা হয় না। 'মরা' অথবা 'অন্যের মারা' জীব খেলে অপরাধ স্পর্শ করবে না এই বিশ্বাস।

বর্মী-নারীর প্রচণ্ড রাগও দেখেছি। ছেলেমেয়ে কোন অপরাধ করলে তাকে চেলা-কাঠ দিয়েও মারতে দেখেছি, মারতে মারতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে তবু থামে না, রাগ মেটে না। অথচ সময়বিশেষে সেই নারীরই স্নেহসুকোমল মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

প্রবৃত্তিকে বশে আনবার শিক্ষাই বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন, প্রতি-দিনের 'শীল' সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ও অহিংসার পথেই মানুষের মুক্তির বিধান যিনি দিলেন, তাঁর সে বিধান গ্রহণ না করে এখনকার বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করল, তার ফল আজ নানা ক্ষেত্রে মারাত্মক রূপে দেখা দিয়েছে।

বর্মী নারীর পতিপরায়ণতা অপূর্ব্ব। যে স্বামী রোজগার করে না, অলস ভাবে কেবল বিলাসিতায় দিন কাটায়, মাতাল হয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে, সেই স্বামীর সকল অন্যায় অত্যাচারও রমণী

নীরবে সহ্য করে এবং পতির প্রাপ্য সম্মান তাকে দিয়ে থাকে। নিজে রোজগার করে স্বামী-পুত্রকে খাওয়ায়, স্বামীর বিলাসিতার ইন্ধন যোগায়, কখনও অনুযোগ দেয় না।

বর্ম্মী মেয়েরা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, তারা কখনও শ্বশুরবাড়ী যায় না, স্বামীই এসে স্ত্রীর গৃহে বাস করে। অবশ্য এই প্রথা চিরন্তন হলেও আধুনিক সামাজিক পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বিয়ের পর নিজ কর্ম্মস্থলে পত্নীকে নিয়ে নূতন সংসার পেতে সুখে বাস করছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ভাষার অজ্ঞতার ব্যবধান থাকায়, বর্ম্মী-নারীসমাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ না পেলেও, শিক্ষিতা বর্ম্মিণী বন্ধুদের কথাবার্ত্তায় এবং নিজের পর্য্যবেক্ষণের ফলে বুঝেছিলাম, বর্ম্মিনীদের বিদেশী, বিশেষ ভাবে "সাহেবকে" বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা এক সময় খুব প্রবল ছিল। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে অবশ্য এ বাসনা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। এই মনোভাবের মূল অন্বেষণে বোঝা যায়, ইংরেজ অথবা ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ীসম্প্রদায়—যারা কর্ম্মস্থল হিসাবে ব্রহ্মদেশে বাস করত, তারা অনেকেই পরিবার দেশে রেখে আসত। বর্ম্মিণী নারীর কর্ম্মপ্রবণতা, সেবাপরায়ণতা সর্ব্বোপরি কোমল, অমায়িক স্বভাব, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ইত্যাদি গুণাবলী বিদেশীর মন আকর্ষণ করে, অপর পক্ষে বিদেশীদের উচ্চশিক্ষা, সংস্কৃতি, নারীদের প্রতি জাতিগত সম্মান-বোধ প্রভৃতি বর্ম্মী নারীর মনে বর্ম্মী পুরুষের স্বভাবের ত্রুটিমূলক দিকটা স্পষ্ট করে তোলে এবং বহু কাল এক দেশে বাস করার ফলে পরস্পর ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমে এরাই ব্রহ্মদেশে একটি ইঙ্গ-বর্ম্মী-সমাজ গড়ে তুলেছে। ভারতীয় পুরুষদেরও বর্ম্মী নারী এক সময় খুবই সুনজরে দেখত—তারা স্ত্রীকে খুব যত্নে আদরে রাখে, পেটে খেতে হয় না, এই বিশ্বাস ছিল (যদিও, অধুনা রাষ্ট্রের নানা পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের লোকের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী), এবং এক সময় ভারতের নানা প্রদেশের পুরুষের সঙ্গে বর্ম্মিণীর সংমিশ্রণের ফলে বিরাট মিশ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে সে দেশে, যাদের চাল-চলন, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার অধিকাংশই ব্রহ্মদেশের অনুরূপ। পরিবারে, সমাজে ব্রহ্ম-নারীর একচ্ছত্র প্রভাব থাকায়, এই সব মিশ্র জাতির মধ্যেও স্থানীয়, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

বর্ম্মী-পরিবারে, বাঙালী সমাজে অনুষ্ঠিত বার মাসে তের পার্ব্বণের অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। "ব্রহ্মদেশীয় পূজা পার্ব্বণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবাসীতে আমি কিছু কিছু সে দেশে থাকতেই লিখেছিলাম। গত মহাযুদ্ধের সময়ে অকস্মাৎ ব্রহ্মদেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হওয়ায় আমার অনেক চেষ্টায় সংগৃহীত নানা তথ্য এবং ছায়াচিত্র হারিয়েছি, সেজন্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও ছবির সাহায্যে সে সব অনুষ্ঠানের পরিচয় দিতে না পারায় খুবই দুঃখ হয়।

বর্ম্মী-পরিবারে পুত্রসন্তানদের জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন উপনয়ন-প্রথার অনুরূপ একটি প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ তের-চৌদ্দ বছরে বর্ম্মী মা একজন ধর্ম্মযাজকের (ফোঙ্গীর) হাতে ছেলের ধর্ম্মশিক্ষার ভার দেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে ("ফোঙ্গী-চাউঙে") ছেলেকে কিছুকাল (তিন মাসই নিয়ম, খুব কম পক্ষে সপ্তাহকাল) গিয়ে থাকতে হয় এবং মস্তক মুণ্ডন করে, গেরুয়া-বসন পরে ফোঙ্গীদের কঠোর নিয়মাদি পালন করে ফোঙ্গী-জীবন যাপন করতে হয়। এই ব্রত উদযাপানের দিনে পরিবারে খুব সমারোহ হয়। এই বয়সে কন্যাসন্তানেরও পরিবারে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, সুসজ্জিত সভায়, আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে মেয়েকে মূল্যবান বসন-ভূষণে সাজিয়ে উপস্থিত করে, সকলের সমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার কর্ণ বিদ্ধ করা হয় এবং হীরার গহনা পরিয়ে দেওয়া হয়, দরিদ্র-ঘরে একটি নকল হীরা দেয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বর্ম্মী-ভাষায় "না-তুইন-মিংগালা" বলে। অনুষ্ঠানটির দ্বারা মেয়ে যে বিবাহযোগ্যা হয়েছে, তা যেন প্রচার করে দেওয়া হয়, কারণ এর পর থেকে মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ আসতে থাকে। এদের বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বা মন্ত্রের স্থান নেই, সুতরাং গাম্ভীর্য্যেরও অভাব। পিতামাতা পরস্পরের সাহায্যে বিয়ে স্থির করেন এবং এক দিন একটা উৎসবানুষ্ঠান দ্বারা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়, এরা পরস্পর বিবাহিত হইল। তরুণ-তরুণীরা, যারা স্বাধীনভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পায়, তারা ভালবেসেও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। সে ক্ষেত্রে দু'জনে কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করে। যখন তারা ফিরে আসে, তখন অভিভাবকেরা একটি উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে বর কনে সাজিয়ে তাদের আনা হয়, ফোঙ্গীগণ এবং আত্মীয়-বন্ধুরা তাদের আশীর্ব্বাদ করেন।

একটি বিশেষত্ব দেখেছি এদের পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলিতে, যা আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রত্যেককে আদর-আপ্যায়নের পর বিদায়-বেলায় যার যেরূপ সাধ্য তদনুযায়ী একটি উপহার-দ্রব্য প্রত্যেকের হাতে গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রী দেন এবং বিনয়ের সঙ্গে নিতে অনুরোধ করেন। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া নিমন্ত্রিতেরা কোনও উপহার দিতে পারেন না। বিবাহ, শ্রাদ্ধ সকল অনুষ্ঠানেই এই এক নিয়ম।

বর্ম্মী-নারীর গৃহস্থালি এবং জীবনযাত্রা আমার খুবই ভাল লেগেছে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভাল, মন্দ—দুই-ই আছে। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারগুলির ধরণ-ধারণের সঙ্গে বাঙালী-গৃহস্থের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিয়ম-শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, নিরলসতা, মিতব্যয়িতা, পরিচ্ছন্নতা, কর্ম্মকুশলতা, অতিথিবৎসলতা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা—বর্ম্মীদের এই সব গুণ আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল।

ব্রহ্মদেশ সত্যই মায়াপুরী, আজও তার মোহে আবিষ্ট হয়ে আছি। দীর্ঘ কুড়ি-একুশ বৎসরের ফেলে-আসা-জীবনের স্মৃতি, সাগর-দোলার ঢেউ, আজও প্রাণে আকুল আহ্বান জানায়।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

দুপুরবেলা। ফাঁকা মাঠে একটা বটগাছের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে নরোত্তম ভাবছিল তার মায়ের কথা। ধান পেকে উঠেছে। মা আমার সারা মাঠে যেন সোনা ছড়িয়ে রেখেছেন! এত জল, এত আলো, এত বাতাস! স্নেহময়ী মা কি তাঁর ছেলেকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকেন? তবু তোরা মাকে চিনলি না—মাকে বুঝলি না। চোখের জলে নরোত্তমের বুক ভেসে যাচ্ছে।

এমন সময় মনোহর এসে খবর দিল—বড়দা! ওপারের কেরামৎ সর্দার এসেছে···

—কেন?

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—ওই যে এদিকেই আসছে···

কেরামৎ সর্দার এক জন খাঁটি মুসলমান। অশিক্ষিত চাষী হলেও, হিন্দুসমাজে নরোত্তমের মত, মুসলমান-সমাজে কেরামতের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। কেরামতের চেষ্টাতেই নরোত্তম এত শীঘ্র হাজত থেকে মুক্তি পেয়েছে। খাস কামরায় গিয়ে দেখা করে, ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে বলেছে—অবিলম্বে যদি নরোত্তমকে ছেড়ে দেওয়া না হয়, তা হলে এক জনও হিন্দু-চাষী এদেশে থাকবে না। মাঠকে-মাঠ জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে। পাকিস্থানের ক্ষতি হবে।

কেরামতের এই গোপন চেষ্টার কথা নরোত্তম কিছুই জানে না। সে জানে কেরামৎ তার শত্রু!

কেরামৎ এসে বলল—মোড়লের পো! তুমি নাকি পাকিস্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

—কে বললে?

—যেই বলুক—খবরটা সত্যি কিনা—তাই বল?

—যদি যাই, তা হলে তোমরা কি খুব খুশী হও সর্দার?

কেরামৎ সদম্ভে বলল—শোন মোড়ল! 'তুমি একটা মানুষের মত মানুষ' একথা শুধু আমিই বলি না, দশখানা গাঁয়ের লোকে বলে। পাকিস্থান মানে পবিত্তির স্থান। দেশ তো শুধু গাছপালা আর নদীনালা নয়? খাঁটি মানুষকে নিয়েই দেশ! একথা কে না জানে?

নরোত্তম একটু হেসে বলল—তোমাদের সঙ্গে আমাদের আর বনিবনাও হবে না সর্দার!

—কেন? বিস্মিতভাবে কেরামৎ জিজ্ঞাসা করল।

—পণ্ডিত দীনবন্ধু ঠাকুর কি বলেছেন জান?

—কি?

তোমাদের নাকি আর বিশ্বাস করা যায় না।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নরোত্তম বলল—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি; গরু খাওয়াটা ছাড়তে পার সর্দার?

—তোমরাও কি পার পাঁঠা খাওয়াটা ছাড়তে?

—কেন পারব না?

—তা হলে আমরাই বা কেন পারব না? পাঁঠাও যাঁর—গরুও তাঁর। জীব-হিংসে আমাদের পক্ষেও গোনা। কি দরকার বলতে পার? যে দেশের মাঠে এত ধান, গাছে এত ফল, সে দেশে শেয়াল-কুকুরের মত কেন যে আমরা এক টুকরো মাংস নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে মরি—তা তো বুঝতে পারি না?

—সত্যি বল সর্দার! একি তোমার মনের কথা?

—মুখের কথা, আর মনের কথা দু'রকম হয় তাঁদের, যাঁরা লেখাপড়া জানেন। তোমার-আমার তা হবে কেন?

—তোমার কাছে আজ আমি হার মানলাম···

উচ্ছ্বসিতভাবে কেরামৎ বলল—মানতেই হবে। তোমরা আর আমরা যে আসলে এক—একথা কি দীনবন্ধু ঠাকুর অস্বীকার করতে পারেন?

—তা কি করে পারবেন···

—তবে বুঝে দেখ মোড়ল! আমাদের এ ঝগড়াঝাঁটি একেবারেই মিথ্যে···

এক জন খাঁটি হিন্দু, আর এক জন খাঁটি মুসলমানের অন্তরঙ্গতা যে কত গভীর হয়ে উঠতে পারে, তা দেখে মনোহর অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল—কথাকাটাকাটির মধ্য দিয়ে দু'জনেরই মেজাজ উগ্র হয়ে উঠবে—বিবাদ বেধে যাবে। আবার সেই ডাক-হাঁক—লাঠি-সড়কির কসরৎ আর মাথা ভাঙাভাঙি চলবে—কিন্তু একি?

আরও অনেক কথা বলাবলির পর, হঠাৎ নরোত্তমের দুখানা হাত চেপে ধরে কাতরভাবে কেরামৎ বলল—আমাদের ছেড়ে চলে যাস নে ভাই!

সজল চোখে নরোত্তম বলল—না ভাই! যাব না।

২০

ভোর হয়ে গেছে। পূর্ব্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। দূরে বন-বিহঙ্গের কলকাকলী শোনা যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠে প্রায় নিভে-যাওয়া আগুন ঘিরে বসে আছে উদ্বাস্তুরা। দীনেশবাবুর গড়গড়াটা সঙ্গেই আছে। বেঁটে ঘনশ্যাম মাঝে মাঝে এসে কল্‌কেটা পালটে দিয়ে যাচ্ছে। ভোর হতেই পদ্মাবতী ঘনশ্যামকে পাঠিয়ে দিলেন দূরের একটা টিউব ওয়েল থেকে এক কলসী জল আনতে। তার-

পর পদ্মাবতীর নির্দেশমত খুব বড় এক কেট্‌লি ভর্তি জল নিয়ে ঘনশ্যাম গেল সেই প্রচণ্ড আগুনের চুল্লীর কাছে।

দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—চা হবে বুঝি?

—আজ্ঞে হাঁ।···ঘনশ্যাম জবাব দিল।

ঔপন্যাসিক একটু হেসে বললেন—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' গৃহিণী যাঁদের সঙ্গে আছেন—তাঁরা কখনই বাস্তহারা নন্। এই তেপান্তরের মাঠেও গৃহীর ষোল আনা আরাম জুটে যাচ্ছে আপনার ভাগ্যে···

একটা হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে দীনেশবাবু স্বীকার করলেন—

তা সত্যি। আপনারা কে কে চা-পানে অভ্যস্ত, সে কথাটা বলে দিন ঘনশ্যামকে···

দেখা গেল—শুধু দীনেশবাবু ও ঔপন্যাসিক ছাড়া সেখানকার সবাই চা-রসে বঞ্চিত! সারারাত কেউ চোখের পাতা বোজে নি। গল্পের নেশায় মেতে সবাই চুপ করে বসে আছে ঔপন্যাসিকের মুখের দিকে চেয়ে। সবারই চেহারা হয়েছে মড়া-পোড়ানো শ্মশান-বন্ধুর মত।

নিবারণের কোলে মাথা রেখে নরোত্তম একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মা মা বলে ডেকে উঠে বসল। ঔপন্যাসিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আপনার গল্প বলা কি শেষ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, এখুনি সূর্য্য উঠবে। গল্পের আগুন তো আর জ্বলবে না? আজকের মত নিভে গেছে···

—যা ঘটেছে তা তো বললেন। যা ঘটবে তা বোধ হয় বলতে পারেন না?

—কেন পারব না? আমার গল্পের নায়ক হচ্ছেন নরোত্তম। তার পরিণতি যে কি হতে পারে তা অনুমান করা মোটেই শক্ত নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরোত্তম বলল—খুব শক্ত! এই তেষট্টি বছর বয়স পর্য্যন্ত যা ভাবলাম তা কিছুই হ'ল না। যা হ'ল, তা কখনও ভাবতে পারি নি···। এই মাত্তর একটা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠছি। কেবল মনে হচ্ছে—আহা-হা, এই স্বপ্নই যদি সত্যি হ'ত···

—কি স্বপ্ন? দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

নরোত্তম বলতে লাগল—দেখলাম আপনারা সবাই মিলে একটা চিতা সাজিয়েছেন। তার পর আমাকে সেই চিতার উপরে তুলে, এই নিবারণ দিলে মুখে আগুন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। পুড়তে লাগলাম আমি। পুড়তে পুড়তে যেন খুব ছোট হয়ে আসছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শরীরে আমার কোন জ্বালাও নেই, যন্ত্রণাও নেই।

—তার পর?

—তার পর বাচ্চা-খোকার মত খুব ছোট হয়ে আমি যেন হামাগুড়ি দিচ্ছি, আর মা, মা বলে কাঁদছি।. মা ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন আমাকে। আর অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল···

দীনেশবাবু বললেন—মোড়ল! তোমার প্রাণটা এখন মায় কোলে ফিরে যেতেই চাইছে···

—খুব সত্যি! আর কত সইতে পারি বলুন তো? নরোত্তম চোখ মুছে বলল—কানুর কল্যাণের জন্যে নিজের হাতে এক'শ আটটা পাঁঠা বলি দিয়েছিলাম। সেই কানুর অবস্থা এখন কি, এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন।

ভোরের সোনালী রোদ তখন সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুগুলি মুক্তাফলের মত চিক্‌মিক্ করছে। নরোত্তমের জলভরা চোখ দুটিও জ্বলছে ভোরের আভায়।

কানাই কাদম্বিনীর কীর্ত্তি-কাহিনী দীনেশবাবু শুনেছেন। চিঠিখানা খুলেই তিনি চমকে উঠলেন। অস্ফুটস্বরে বললেন—একি? ঠিকানাটা দেখছি—একটা কুখ্যাত পল্লীর।

—তাই নাকি? তা হবে। কলকাতার পথঘাট তো আমি চিনি না? কোথায় কি, তাও জানি না। নরোত্তম চোখ মুছল।

চিঠিতে লেখা ছিল—"আপনার বোন্ কাদম্বিনী আজ মৃত্যু-শয্যায়। সর্ব্বাঙ্গে ঘা হয়ে গেছে। চোখ দুটিও অন্ধ! দিনরাত 'দাদা, দাদা' বলে কাঁদে। যদি দেখতে চান—আসবেন।"

দীনেশবাবু বহুক্ষণ মাথাটা চেপে ধরে বসে রইলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—মোড়ল! তুমি যেও না, এ জাতনাশা মেয়েটাকে দেখতে···

—বলেন কি? সে যে আমার বড় আদরের ছোট বোন। দাদা, দাদা বলে কাঁদছে। না গিয়ে কি পারি? সে যে আমার বোন···

—এ চিঠি তো এসেছে প্রায় এক মাস আগে?

—আজ্ঞে হাঁ। একখানা চিঠি পড়বার চোখও নেই আমার। পড়তে দিয়েছিলাম দীনবন্ধু ঠাকুরকে। তিনি আমার কাছে সবকিছু গোপন রেখেছিলেন। সেদিন তাঁর বৌয়ের কাছে চিঠিখানা পেয়েছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীনেশবাবু বললেন—বোধ হয় চন্দ্রভাগিনী এতদিন বেঁচে নেই···

ঔপন্যাসিক বললেন—হাঁ, বেঁচে আছে।

নরোত্তম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—আপনি জানেন, বেঁচে আছে? তাকে একবার শেষ দেখা দেখতে আমি পাব?

—নিশ্চয়ই পাবে। শেষ দেখা নয়। আমার এ উপন্যাসকে মিলনান্ত না করেই ছাড়ব না আমি···

দীনেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। আপনি একেবারেই নাছোড়বান্দা?

এমন সময় ঘনশ্যাম দু'কাপ চা দিয়ে গেল। শীতের সকালে এক চুমুক গরম চা চোঁ করে টেনে নিয়ে, ঔপন্যাসিক গলাটা ভিজালেন। তার পর বললেন—শুনুন তবে···

ওই চিঠি পড়েই দীনবন্ধু ঠাকুর রমাদেবীর কাছে চিঠি লিখলেন।

কাদম্বিনীর ঠিকানা জানিয়ে অনুরোধ করলেন—মা, এই নিরপরাধ বুদ্ধিহীনা পল্লীবালিকাকে রক্ষা করতেই হবে। আশা করি, কাদম্বিনীর বিয়ের দুর্ঘটনাটা ভোলেন নি। আপনি যে তার মা। সন্তান কখনও মার কাছে অস্পৃশ্য হয় না। নরোত্তম কি করতে পারে? তাই তাকে কিছুই জানতে দিই নি।'

চিঠি পেয়েই রমাদেবী ছুটে গেছেন। কাদম্বিনীকে আনিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত করে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছেন।

নরোত্তমের দু'চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল—মার দয়ায়, আমার কাদু তা হলে বাঁচবে?

চা-পান শেষ করে ঔপন্যাসিক বললেন—শুধু বাঁচবে না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন—তাকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে তার শরীরে নূতন রক্ত ও মাংস তৈরি করে দেবেন। তবে তার চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। তা বোধ হয় আর ফিরে পাবে না সে। তার মানে হচ্ছে—তুমি তাকে দেখতে পাবে। সে তোমাকে দেখতে পাবে না। এইটুকুই বোধ হয় তার পাপের শাস্তি!

—শ্রীমান কানাই কোথায়? দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

ঔপন্যাসিক বললেন—শ্রীঘরে। কি এক জালিয়াতি কেসে ধরা পড়ে, সরকারী অতিথি হয়ে পাথর ভাঙছেন।

এমন সময় দূরে বড় রাস্তায় মোটরের হর্ণ শোনা গেল। একখানা লরী ও গাড়ী এসে থামল। দীনেশবাবুর ডেপুটি-ছেলে এসেছেন, তার মা-বাপকে নিয়ে যেতে।

দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোথায় যাবে মোড়ল?

—যাব তো কলকাতায়। কিন্তু ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। শুনেছি আমাদের জমিদার-বাড়ী নাকি কোন্ সাহেবপাড়ায়…

ঔপন্যাসিক বললেন—ব্যস্ত হয়ো না নরোত্তম, তোমার গাড়ীও আসছে।

—তোমার গাড়ী মানে? দীনেশবাবু বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন ঔপন্যাসিকের মুখের দিকে। নরোত্তমের গাড়ী আসবে কোত্থেকে?

ঔপন্যাসিক হাসতে হাসতে বললেন—আমি তো উদ্বাস্তু নই? তবুও কাল থেকে এখানে এসে পড়ে আছি। কেন তা জানেন? নরোত্তমের খোঁজে রমাদেবীই আমাকে পাঠিয়েছেন। বোনকে দেখবার জন্যে সে যে পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছে—এ সংবাদও তিনি রাখেন।

দীনেশবাবু জমিদার। নিশ্চয়ই তিনি অনেক জিনিষপত্র নিয়ে আসছেন দেশ থেকে। তাই তাঁর ছেলে একখানা লরীও এনেছেন। বহু জিনিষ সীমান্ত পার করা সম্ভব হয় নি। পথেই ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সামান্য জিনিষ ঘনশ্যামের পাহারায় লরীর এক কোণে পড়ে রইল। বহু যাত্রী লরী চেপে কলকাতা যাওয়ার সুযোগ লাভ করল। দীনেশবাবুও তার বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

এমন সময় একখানা নূতন গাড়ী এসে থামল। দরজা খুলে বাইরে এলেন রমাদেবী। নরোত্তম দূর থেকে ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেল না।

ঔপন্যাসিকের দিকে চেয়ে একটু হেসে রমাদেবী বললেন—আমার মা-পাগলা ছেলেটাকে খুঁজে পেয়েছেন তা হলে?

—না পেলে তো আমিই পড়তাম মুশকিলে। বিয়োগান্ত উপন্যাস আমি মোটেই পছন্দ করি না।

রমাদেবীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে দীনেশবাবু ও পদ্মাবতী গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে দীনেশবাবু বললেন—কাল সারারাত আমরা একটা উপন্যাস শুনেছি। যে বিভীষিকাময়ী কালীমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করে নাটকীয় ঘটনাগুলি ঘটেছে, তার পাশেই আপনার শান্ত ও সংযত কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছে। আজই আপনাকে এখানে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করব, সেকথা ভাবতেও পারি নি। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে বাংলা আজ বিপর্যস্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন। কাল সারারাত মনে মনে একটিমাত্র আশা পোষণ করেছি—যে জাতির মধ্যে এখনও নরোত্তমের মত মাতৃভক্ত বীরসন্তান, আপনার মত সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী জননীর পা ছুঁয়ে ধন্য হচ্ছে—সে জাতি কখনই নিশ্চিহ্ন হবে না। বাঙালীর সংস্কার ও সাধনা জয়যুক্ত হবেই…'

দীনেশবাবুর উচ্ছ্বাস শুনে রমাদেবী একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। ঔপন্যাসিকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—এ বুঝি আপনার কীর্ত্তি? ভগবান আপনাকে ছবি-আঁকবার ক্ষমতা দিয়েছেন। তা বলে ছবিটাকে নিখুঁত করবার উদ্দেশ্যে—যে-যা-না, তাকে তাই আঁকলে, আপনার শিল্পী-মনের পরিচয় দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তব বা অসত্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা হয় নাকি?

ঔপন্যাসিক বললেন—আপনার এ মন্তব্যের প্রতিবাদ না করে পারছি না। এ কথা সত্যি যে, আপনি আপনাকে চেনেন না।

—নিশ্চয়ই! দীনেশবাবু ঔপন্যাসিককে সমর্থন করে বললেন—নরোত্তম আপনার কে? কেন আপনি গাড়ী নিয়ে ছুটে এসেছেন এখানে? এমন করে পরের ছেলের মা হতে ক'জন মা পারেন? এমন মার গৌরব-প্রচার না করলে ঔপন্যাসিকের কলম অভিশপ্ত হ'ত।

রমাদেবী লজ্জিতা হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সেই লজ্জারুণ মুখের উপর পড়ল প্রভাতী সূর্য্য-রশ্মি। সবাই দেখল—সেই উদাস পল্লীমাঠে সর্ব্বহারা উদ্বাস্তুদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন—অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত বাংলার পবিত্র-মাতৃমূর্ত্তি! মাতৃভক্ত নরোত্তমের অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করে বলছিল—'ওরে তোদের আর ভয় নেই। আমার মা অভয়া এসেছেন।'

উদ্বাস্তু বালক-বালিকারা রমাদেবীর গাড়ীখানাকে ঘিরে ধরেছিল। গাড়ীর ভিতরে ছিলেন—খোকাবাবু আর তার সঙ্গে ছুনি

এক ঝুড়ি কমলালেবু। দু' হাতে তিনি সেগুলো বিতরণ করছিলেন। ঔপন্যাসিক হাসতে হাসতে বললেন—ঐ দেখুন আপনার ছেলে কি করছে। এ বিতরণের আনন্দ ওর ভিতরে কে জাগিয়েছে? মা না হলে ছেলে তৈরি হয় না। সেই কারণেই বলছিলাম—আপনি আপনাকে চেনেন না।

আমাকে আপনি বড্ড বেশী বাড়িয়ে তুলেছেন···বলেই প্রশংসাক্ষুব্ধ রমাদেবী ত্বরিতপদে ছুটে গিয়ে উঠে বসলেন গাড়ীতে। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে একটা চুমো খেলেন। নরোত্তম আর ঔপন্যাসিককেও ইঙ্গিত করে বললেন গাড়ীতে উঠতে।

রমাদেবীর গাড়ী ছুটল। পিছনে পিছনে ছুটল দীনেশবাবুর গাড়ী।

২১

পাঁচ বছর পরে, তান্ত্রিক সাধু এসে হাজির হয়েছেন রমাদেবীর কলকাতার বাড়ীতে।

গাড়ী-বারান্দার ছাতে বসে রমাদেবী মোজা বুনছিলেন খোকা-বাবুর জন্যে। হঠাৎ সামনে সাধুজীকে দেখে চমকে উঠলেন। হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে। তার পর ধীরে ধীরে গলবস্ত্র সাধুজীকে করলেন একটা প্রণাম। তিনিও সস্নেহে রমাদেবীকে টেনে নিলেন বুকের কাছে।

—কৈ, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলি না যে? সাদরে রমাদেবীর চিবুক ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—সাধুজী।

—কেন আপনাকে ঘৃণা করব? রমাদেবীর সুন্দর চোখ দুটি শিশির-ঝরা পদ্ম-পাপড়ির মত টলমল করতে লাগল।

সাধুজী হেসে বললেন—অতি স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর পিতা আমি। কোন দিন সন্তানের প্রতি কোন কর্তব্য করি নি—এ অভিমান তোর মনে নিশ্চয়ই আছে? কি বলিস্—? নেই?

দৃঢ়তার সঙ্গে রমাদেবী জবাব দিলেন—কখ্খনো নেই। আমি জানি—আপনার আশীর্বাদ চিরদিন আমাকে ঘিরে রেখেছে। বাবার কাছে মেয়ের দাবি তার বেশী আর ত কিছু নেই? আপনি বলুন···চোখ মুছে রমাদেবী ভিতরে ঢুকলেন।

সিঁড়িতে দেখা হ'ল ত্রিশূলধারিণী এক ভৈরবীর সঙ্গে। রমাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—কে আপনি?

—তোমার বোন। তোমার বাবা—আমারও বাবা। তার বেশী আর কিছু জেনে কাজ নেই···

এই কি সেই নন্দরাণী? রমাদেবী নন্দরাণীকে কখনও দেখেন নি। শুনেছেন—সে তীর্থভ্রমণে গেছে তার বাবার সঙ্গে। যে চরিত্রহীনা মেয়েটাকে নিয়ে কুমারবাহাদুর একদিন মেতে উঠেছিলেন; বাগানবাড়ীতে নিয়ে যাকে মদ খাওয়াতেন, তার একি মূর্তি? কপালে ফোঁটা, সিঁদুরের কৌটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে রক্তবস্ত্র, হাতে ত্রিশূল! এ বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে কোন লালসাতুর ভয়ে দূরে পালিয়ে যাবে—সে বিষয়ে রমাদেবীর মনে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।

একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে রমাদেবী নিজেই একটি কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেন, তাঁর বাবার বিশ্রামের জন্যে। সুগঠিত-দেহ কিশোর কুমার খোকাবাবু এসে তার দাদুকে প্রণাম করলে। সাধুজী তাকে কোলের উপর বসিয়ে আদর করতে লাগলেন।

পাকিস্থানের নূতন আইনে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। কুমারবাহাদুরও চলে এসেছেন কলকাতায়। আর্থিক অনটনের আশঙ্কায় পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানি হ্রাস পেয়ে গেছে। জমিদারী-ঠাটের অনেকগুলি অনাবশ্যক দাসদাসীকে বিদায় দিয়ে, নিজের হাতেই সংসারের বহু কাজ করতে পারার আনন্দে রমাদেবী আজ মেতে উঠেছেন। প্রয়োজনাতীত বিলাসিতা বা অনাবশ্যক বাহুল্য রমাদেবী চিরদিনই অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, যে দেশের বহু লোক অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে দুঃখ পায়, সে দেশে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্য-উপভোগ করা পাপ। সেই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে, সব বিষয়েই তিনি জমিদার-বাড়ীর ব্যয়-সঙ্কোচ করে ফেলেছেন।

এক-তলায় এখন আর জমিদারী-সেরেস্তা নেই। সেখানে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু মেয়েদের জন্যে একটা কারখানা। নবজীবন লাভ করে অন্ধ, দুঃখিনী কাদম্বিনীও করছে সেই কারখানায় বসে হাতের কাজ। স্বপ্ন-বিলাসী ও অব্যবসায়ী ঔপন্যাসিকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কারখানাটি পরিচালনার ভার। তাতে রমাদেবীর আর্থিক ক্ষতি যতই হোক—একদল বিপন্ন মেয়ে যে হাতের কাজ শিখে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের পথ খুঁজে পাবে—সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই তিনি আনন্দিত। এরোপ্লেনে কাঁচা তলদা বাঁশ আনিয়ে চৌরঙ্গীর বাড়ীতে বসে ঝুড়ি-ঝাঁপি তৈরি করার খরচ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকও ভাবেন না, রমাদেবীও ভাবতে চান না।

জমিদারী হাতছাড়া হয়ে গেছে। অর্থোপার্জ্জনের একটা কোনও পথ আবিষ্কার করতেই হবে। খদ্দরের জামা-কাপড় পরে কুমার-বাহাদুরও মেতে উঠেছেন নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়ে। আজ ফিল্ম, কাল কাপড়ের মিল, পরশু লোহালক্কড়ের কারখানা, কোনটাই দানা বাঁধছে না। তবু একটা আপিস, তাতে টেবিল-চেয়ার-আলমারি, টেলিফোন, কলিং বেল ও চাপরাশওয়ালা আর্দ্দালী। সারাদিন বন্ধু-বান্ধবের হাজিরা ও চা-সিগারেটের বে-হিসাবী খরচ!

রমাদেবী ভাবছেন—কুমার বাহাদুর যে মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে উঠছেন না, সেই তার ভাগ্যি। কুমারবাহাদুর ভাবছেন—রমাদেবী যে নিউ-মডেলের গাড়ী ট্রায়াল দিচ্ছেন না, নিত্য নূতন পোশাক-পরিচ্ছদের দাবিও জানাচ্ছেন না, সেই তাঁর ভাগ্যি। মোটের উপর দু'জনের ভাগ্যিই ভাল হয়ে উঠেছে অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ফলে।

স্বচ্ছন্দ আলো-বাতাসের মানুষ নরোত্তম বেশী দিন কলকাতায়

টিকতে পারে না। দু'চার দিন থাকলেই সভ ভাতার-জোয়া জলের মাছের মত ছট্‌ফট্‌ করে। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেই ছুটে বেরিয়ে পড়ে। জলের দেশে পৌঁছে শান্তি পায়। তবু মাঝে মাঝে আসে কাদম্বিনীকে সান্ত্বনা দিতে, আর জীবন্ত মাতৃ-দর্শনের পুণ্য-সঞ্চয় করতে।

স্নেহময় দাদা যে তাকে এতখানি ক্ষমা করবে—ঘৃণা করবে না—একথা অন্ধ-কাদম্বিনী কখনও ভাবতে পারে নি। যাত্রার আসরে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় কানাইকে দেখে, যার সরল মনে জেগেছিল অতি পবিত্র শ্রীরাধা ভাব, সে যে তাকে পাঁকে ডুবিয়ে, জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সাধ—অবুঝ পল্লীবালা তা বুঝবে কি করে? জগতে যত নিষ্ঠুর আচরণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ঘটে থাকে, কোন যুদ্ধ-বিগ্রহেও তা ঘটে না। অজ্ঞবিদ্যা ভয়ঙ্করী নীহারিকার নির্ব্বুদ্ধিতার কথাও কাদম্বিনী শুনেছে নরোত্তমের কাছে। কাদম্বিনী মনে মনে বলে—বৌদি! আমার শাস্তি হয়েছে, তোমারও হবে।

দীনেশবাবু ও পদ্মাবতী মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন রমাদেবীর বাড়ীতে। পদ্মাবতীর সঙ্গে থাকে তার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়েটি। সে যেমন ফুটফুটে সুন্দরী তেমনি হাসিখুশী। তাঁরা এলেই রমাদেবী মেয়েটিকে কোলে তুলে নেন, আর নামাতে চান না। পদ্মাবতীকে বলেন, দিদি! আপনার এ মেয়েটি কিন্তু আমি নেব···

—খোকা বড় হলে সেকথা কি আর মনে থাকবে ভাই? পদ্মাবতীর মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠে।

খোকার বয়স এখন বার বৎসর। সে আড়াল থেকে খুব লক্ষ্য করে মেয়েটিকে। মনে মনে ভাবে—এ মোমের পুতুলটিকে এনে মা বুঝি ঘর সাজাতে চায়? নইলে ওকে আনতে চায় কেন?

সন্ধ্যার পর জমিদার-বাড়ীর বৈঠকখানায় মজলিশ জমে উঠেছে। গুরুদেব এসেছেন। কুমারবাহাদুর তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য এবং অলৌকিক ক্ষমতার কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছেন নিজের বন্ধু-মহলে। বন্ধুরা সবাই এসে বসেছেন গুরুদেবকে দেখবার ও তাঁর বাণী শোনবার আগ্রহ নিয়ে। ঔপন্যাসিক আর দীনেশবাবুও আছেন তাদের মধ্যে।

দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, স্বাধীনতালাভের পর ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনার মত কি?

গুরুদেব বললেন, জাগতিক সমস্যা থেকে ভারতীয় সমস্যা কোন দিকেই বিচ্ছিন্ন নয়। ধরিত্রী আজ প্রসব-বেদনা-ক্লিষ্ট। তার গর্ভে সামগ্রিক ধ্বংস আছে কি সৃষ্টি আছে, যান্ত্রিক সভ্যতার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে, কিংবা অন্য কোনও পথে পরিচালিত হয়ে জগতের আরও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করবে—সেকথা মা-ইচ্ছাময়ী ছাড়া আর কেউ জানে না। একটু থেমে গুরুদেব বলতে লাগলেন—মানুষের মন আজ ভয়ানক বহির্মুখী। বিষয়-বাসনায় প্রলুব্ধ। অন্তরের সম্পদ-বৃদ্ধির চেষ্টা ও যত্ন তার একটুও নেই। সংযম ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা মানুষকে অন্তর্বিষয়ে সম্পন্ন করে তোলে। তার অভাব ঘটলেই মানুষ নেমে যায় পশুর পর্য্যায়ে। একটা বাঘ যদি যন্ত্র-কৌশল আয়ত্ত করতে পারত, আমেরিকা থেকে এটম-বোমা নিয়ে এরোপ্লেনে রাশিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারত, তা হলে একটা প্রলয়ঙ্কর হানাহানি ঘটতে বেশী বিলম্ব হ'ত না। আমেরিকা ও রাশিয়ার যন্ত্র-কৌশলীরা যদি আজ বাঘ-ভালুকের পর্য্যায়ে নেমে যায়, মানুষের সংযম ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা বিস্মৃত হয়—তা হলেই জগতের বারুদ-স্তূপে আগুন লেগে যাবে। কেউ রুখতে পারবে না।

ঔপন্যাসিক জিজ্ঞাসা করলেন—সেরূপ দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় কি?

গুরুদেব বললেন, মানব-মনের বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে প্রেম। প্রেম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত মানুষ—সত্য, শিব ও সুন্দরকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। বিষয়ভোগী বহির্মুখী মানুষ কখনই প্রেমধর্ম্মের সন্ধান পায় না। তাই ত আজ পাশ্চাত্য যান্ত্রিকসভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ। বহু মারণাস্ত্রের অধিকারী হয়েও বিশ্ব-শান্তির জন্যে অন্ধকারে সে হাতড়াচ্ছে। আত্মরক্ষার জন্যে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাই এক দিন হবে তাদের পথপ্রদর্শক। কিন্তু—আত্ম-বিস্মৃত ভারত! তার স্বাধীনতালাভের যদি কোন মূল্য থাকে, তা আছে তার আত্মোপলব্ধির মধ্যে। শুধু নিজের জন্যে নয়, জগতের কল্যাণের জন্যেই তাকে কুসংস্কারের আবর্জনা ঘেঁটিয়ে প্রেমধর্ম্মকে উদ্ধার করতে হবে। খাঁটি ভারতীয় বুদ্ধিকে জাগাতে হবে। আজ আর কিছু বলব না। কালও আমি আছি এখানে।

—পরশুই কি চলে যাবেন?

—হ্যাঁ···

অনেকেরই জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল—তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন? কিন্তু প্রশ্নটা একটু নীতিবিরুদ্ধ মনে হচ্ছিল। বুঝতে পেরে গুরুদেব বললেন, তোমরা আমার সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী হয়েছ বলেই মনে হচ্ছে। জেনে রাখ—আমাদের সাধনার লক্ষ্য ভারত বা এশিয়া নয়। যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিশ্ব-সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের এই লীলামাহাত্ম্য প্রচারিত হচ্ছে, তাঁকেই উপলব্ধি করতে চাই আমরা। আত্মোপলব্ধির পরেই সে ইচ্ছা জাগে। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা আত্মস্থ হও। ভারতীয় প্রেমধর্ম্মের মহিমা প্রচার কর···

গুরুদেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সকলেই অনুভব করলেন—যেন একটা মন্ত্রশক্তি তাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পবিত্রতা বিরাজ করছে।

—রমা! রমা!

—কি বাবা! রমাদেবী ছুটে এসে গুরুদেবের হাত ধরলেন।

—তুই বুঝি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিলি?

—হ্যাঁ···আসুন···চলুন উপরে যাই। হাত ধরে রমাদেবী তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ওদিকে গুরুদেব চলে যাওয়ার পর বন্ধু-মহলে কল-গুঞ্জন উঠল। একজন বললেন, নাঃ, ওসব পুরনো কথা, ফোঁপা কাগজের

ধূলিতে ফেলবার দিন এসে গেছে। জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে মার্কস্‌বাদ। ধনবণ্টন-ব্যবস্থা। শাসন ও শোষণের হুমকি যত দিন আছে, তত দিন বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠার কথা অবান্তর। এ বিক্ষোভ শান্ত হবে না, হতে পারে না।

দীনেশবাবু বললেন, তা হলে ত ওঁর কথাই ঠিক হ'ল। সাম্যবাদের ভিত্তি ত মানুষের মন? সেখানে প্রেম-ধর্ম্মের উদ্বোধন ছাড়া কোনও জবরদস্তির ফল কি কার্য্যকরী হতে পারে?

ঔপন্যাসিক মন্তব্য করলেন—রাশিয়ায় আত্মোপলব্ধি ও প্রেম-ধর্ম্মের উদ্বোধন হয়েছে।

আর একজন চীৎকার করে বলে উঠলেন, যারা ভগবানকে অস্বীকার করে, তাদের প্রেমধর্ম্মের উদ্বোধন, নিছক ধাপ্পাবাজি! নাস্তিকের আবার ধর্ম্ম?

ঔপন্যাসিক একটু হেসে বললেন, আত্মোপলব্ধির পর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধ নেই।

কুমারবাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন, আপনাদের আলোচনা বড্ড বেশী ব্যক্তিগত হয়ে উঠছে। আসুন, একটু চা-এর ব্যবস্থা করেছি।

পাশের ঘরে গিয়ে সবাই দেখলেন—চা উপলক্ষ্য মাত্র। দেশী-বিদেশী খাবারের বিপুল আয়োজন! রমাদেবী ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করলেও, কুমারবাহাদুরের জমিদারী-রক্ত মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। খরচের অঙ্ক বেড়েই চলে।

ক্রমশঃ

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ শিবনারায়ণ দাস

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মালবাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা ভোজদেব (১০১০-৫৫ খ্রীঃ) নানাশাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে দুইটি গ্রন্থের নাম "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ", একটি অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যতম আকরগ্রন্থ এবং অপরটি তাঁহার স্বরচিত ব্যাকরণ (সম্প্রতি ত্রিবান্দ্রুর হইতে সটীক মুদ্রিত হইয়াছে)। শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবীর কণ্ঠের আভরণস্বরূপ গ্রন্থদ্বয়ের নাম এক সময়ে বাংলাদেশে গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের উপাধিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ সরস্বতীকণ্ঠাভরণরচিত "ণকার-প্রদীপ" নামক উৎকৃষ্ট ব্যাকরণগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়—এই ২১ শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র গ্রন্থের টীকাও গ্রন্থকার স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। যথা:

> নত্বা বাণীচরণৌ সরস্বতীকণ্ঠাভরণঃ শ্রীমান্।
> নিজকৃতিরচিত-ণকারপ্রদীপটীকাং সমাখ্যাতি॥

সটীক ণকারপ্রদীপ গ্রন্থটি সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত মাসিকপত্র "বিদ্যোদয়ে" দুই বার মুদ্রিত হইয়াছিল—১৩০৬ ও ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, এই সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ উপাধিধারী গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম গ্রন্থমধ্যে কিংবা অন্যত্র পাওয়া যায় না—তিনি উপাধি দ্বারাই পরিচিত ছিলেন বুঝা যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' উপাধিধারী অপর একজন বাঙালী কবি ও পণ্ডিতের বিবরণ সঙ্কলিত হইল—আত্মবিস্মৃত জাতির নিকট তাঁহার চিরলুপ্ত নাম, গ্রন্থাবলী ও বঙ্গের বাহিরে কীর্ত্তির কথা সামান্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেও আমাদের গবেষণা সার্থক হয়। তৎ-রচিত চারিটি গ্রন্থ এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে—আমরা সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লিখিতেছি। দুঃখের বিষয়, একটি গ্রন্থও আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারি নাই—আবিষ্কৃত প্রতিলিপিগুলি সবই ভারতবর্ষের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

১। "নন্দিঘোষবিজয়"—ইহা একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব ইহার সুপ্রাচীন নাগরাক্ষর প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অধুনা তাহা লণ্ডনে রক্ষিত আছে। ইণ্ডিয়া আপিসের পুথিবিবরণীতে (Egg. ling, *10, Cat*. pp. 1606-8) ইহার প্রস্তাবনাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। তিনটি মনোহর নান্দীশ্লোকে শ্রীহরির মূর্ত্তিত্রয়ের বন্দনা আছে—দৈত্যারি, 'ব্রজবধূপ্রাণা' ও অর্জ্জুনসখা। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ তৃতীয় নান্দীশ্লোক উদ্ধৃত হইল:

> যদ্ব্যাপ্তি সমস্তবস্তু তথাপ্যেকান্তভক্তেচ্ছয়া
> লীলোৎপত্তিতনৌ তনৌ তু দধতঃ সৃষ্টিক্রিয়াসাধনং।
> পার্থায়োপদিশংস্তথৌপনিষদং তত্ত্বং স্বরূপোদয়াদ্
> ভূয়োঽয় জিতযামমর্জ্জুনসখং ধ্যায়েম মধ্যেরথম্।

সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ গদ্যরচনায় কবি বলিতেছেন, "গজপতি নরসিংহদেবে"র সভাসদ্‌গণের আদেশে রথযাত্রামহোৎসব উপলক্ষ্যে এই নাটক অভিনীত হয়—কবির নাম শিবনারায়ণ দাস এবং তিনি জাতিতে ছিলেন "অম্বষ্ঠসূনু"। প্রথমাঙ্কের নাম "অভিষেক"—ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন, বিষ্ণু কমলাকে ছাড়িয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিলেন এবং ইন্দ্রপ্রেরিত চিত্ররথ-উর্ব্বশী আসিয়া কমলার সখ্য লইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে "কমলাবিরহ"—শ্রীক্ষেত্রের রত্নবেদি

তাঁহার নিকট পত্নীরূপে প্রতিভাত হইল। তৃতীয়াঙ্কে "পুনরাবির্ভাব"—নারদাদির সান্ত্বনার ফলে কমলা বিষ্ণুর সহিত পুনর্মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। চতুর্থাঙ্কে "রথ-বিজয়"—স্বয়ং মহারাজ নরসিংহদেব তাঁহার গুরু ("রায়গুরু") ও মন্ত্রিগণসহ দেবদর্শনে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চমাঙ্কে "কমলাবিলাস"—সাক্ষাৎ কমলার আবির্ভাব এবং বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিরূপে স্বয়ং মহারাজকর্ত্তৃক তাঁহার স্তুতি। সর্ব্বশেষে তিন শ্লোকে ভরতগীত সম্পন্ন হয়, শেষ শ্লোকটি এই :

> ভক্ত্যা বিষ্ণুং হৃদি পরিচরন্ মোদয়ন্ সজ্জনাংসি
> ভ্রান্তিং ধুন্বন্ হুরবিটপিনাং বাপয়ন্ বৈরিকান্তাঃ।
> নীতিং ধর্ম্মেঽনিশমুপনয়ন্ বর্দ্ধয়ন্ রাজলক্ষ্মীং
> বৈরিক্ষাব্দং ভুবি বিজয়তাং কেসরী সিংহবীরঃ॥

প্রতিলিপির লিপিকাল এই—"সংবৎ ১৭২৩" ফাল্গুণে কৃষ্ণপক্ষস্য অমায়াং ভৌমবাসরে" (=১২ ফেব্রুয়ারী ১৬৬৭ খ্রী)। এই গ্রন্থে কবির উপাধি এবং বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই—কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থের বিবরণ হইতে তদ্বিষয়ে সংশয়ের নিরসন হইবে। গ্রন্থটির সঠিক রচনাকাল আমরা অবধারণ করিতে পারি—প্রস্তাবনাতে প্রথমতঃ "শ্রীমন্মহারাজকুমারস্য" লিখিত ছিল, তাহা হরিতাল লেপিয়া মুছিয়া পরে লিখিত হয় "গজপতের্নরসিংহদেবস্য"। অর্থাৎ রাজার অভিষেকের পূর্ব্বে রচনা আরম্ভ হইয়া রাজ্যারোহণের পরে শেষ হইয়াছিল। উড়িষ্যার এই অধিপতি নিঃসন্দেহ খুরদার রাজা নরসিংহদেব —তাঁহার রাজত্বকাল ১৬৩০-৫৫ খ্রী (Stirling's *Orissa*, p. 87)। বৃহস্পতিচক্রের "প্রজাপতি" বৎসর দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত গণনানুসারে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে পড়িয়াছিল। ভরত-বাক্যের "বৈরিঞ্চাব্দ" শব্দে প্রজাপতি বৎসরের সূচনা থাকিলে ঠিক ঐ সনেই গ্রন্থের রচনা শেষ হইয়াছিল—তৎকালে ভারত-সিংহাসনে সম্রাট্ সাহজাহান অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২। কোলব্রুক্ সাহেবের ন্যায় চেম্বার্স নামক সাহেব বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তাহা বার্লিনের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ ওয়েবর সাহেব ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের পুথিবিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন—তন্মধ্যে "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" রচিত তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ৯৪ শ্লোকাত্মক "দানকুসুমাঞ্জলি" কাব্য একটি—প্রতিলিপির পত্রসংখ্যা ১০, লিপিকাল "সম্বৎ ১৭৩৬ কাল্গুন লিখিতং বালকৃষ্ণ আশ্বলায়নেন"। দুঃখের বিষয়, ওয়েবর সাহেব এতদতিরিক্ত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং গ্রন্থকারের নাম লিখিত হইয়াছে শুধু "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" (Weber's *Berlin Cat*, vol. 1, p. 169)।

৩। "শ্রীশিবনারায়ণ দাস-সরস্বতীকণ্ঠাভরণ"-রচিত কাব্যপ্রকাশের টীকা বার্লিনে রক্ষিত আছে—নাম "কাব্য-প্রকাশদীপিকা" ১০ "আলোকে" সম্পূর্ণ, পত্রসংখ্যা ৭৩ (ঐ, p. 227)। এ স্থলেও ওয়েবর সাহেব এই মূল্যবান্ গ্রন্থের এতদতিরিক্ত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। গ্রন্থটি বার্লিন হইতে আনাইয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য—সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীর রচনার প্রতি প্রগতি-পরায়ণ বাংলার শিক্ষিত সমাজের যেরূপ শোচনীয় মনোবৃত্তি তাহাতে আমাদের এই অনুরোধ অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে সন্দেহ নাই। বাংলার বহু ধনী বৈদ্যসন্তানের মধ্যে এই বৈদ্যরচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থটি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিতে কেহ যদি অগ্রসর হন তাহা হইলে একটি পুণ্যকার্য্য সম্পাদিত হয়।

(৪) "সেতুসরণি" মহাকাব্য, ১৫ সর্গে সম্পূর্ণ। সৌভাগ্য-বশতঃ ১১০ পত্রাত্মক প্রতিলিপিটির উৎকৃষ্ট বিবরণ ওয়েবর সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়া (পৃ. ১৫৪-৬) গ্রন্থকার সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য রক্ষা করিয়াছেন। কাব্যটি প্রসিদ্ধ প্রাকৃত কাব্য "সেতুবন্ধে"র সংস্কৃত অনুবাদ—গ্রন্থকারের মতে মূল কাব্য কালিদাস-রচিত। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (মির্জ্জা-রাজা) জয়সিংহের পুত্র "শ্রীরামসিংহঃ প্রভুঃ" এবং কাব্যটি রচিত হইয়াছিল "তস্য শ্রীযুতরামসিংহজগতীজৈত্রস্য লীলাজ্ঞয়া।" গ্রন্থশেষে যে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

> অম্বষ্ঠেষু প্রথিতজনুষামাদরপ্রেমপাত্রং
> মিত্রং তত্তৎ কুবিকৃতিজুষাং দুর্গমং প্রাকৃতেন।
> দাসশব্দে কবিকুলগুরোঃ কালিদাসস্য বাচাং
> সেতুং প্রোদ্যৎপদবি-"শিবনারায়ণঃ" সংস্কৃতেন॥ ২১ শ্লোক
> যোঽভূদ্-গৌড়ক্ষিতিপতিমনঃপদ্মমার্ত্তণ্ডমূর্ত্তিঃ
> "দুর্গাদাসঃ" প্রথিতমহিমা বৈদ্যবংশাবতংসঃ।
> তৎপুত্রস্য প্রথয়তু সতাং শর্ম্ম বৈদগ্ধ্যভাজাং
> মুগ্ধাক্ষীণামধরজমধুস্পর্দ্ধিনী বাগ্‌বিভূতিঃ॥২২
> জীয়াৎ সর্ব্বক্ষিতিপতিলকো "জাহাঁগিরি"-ক্ষ্মামহেন্দ্রঃ
> তদ্বিশ্বাসপ্রথিত-মথুরানাথরায়াগ্রজেন।
> অম্বষ্ঠেন ব্যরচি শিবনারায়ণেনাতিহৃদ্যাৎ
> সত্তত্মাদিহ সকরণং চিত্তমুন্মীলয়ন্তু॥২৩

ই(তি) শি(ব) নারায়ণদাসসরস্বতীকণ্ঠাভরণকৃতৌ মহাকাব্যে পঞ্চদশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥

ভাবার্থ—বৈদ্যদের প্রেমপাত্র ও কাব্যামোদীর মিত্র "দাস"বংশীয় শিবনারায়ণ কালিদাসের দুর্গম প্রাকৃত কাব্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস গৌড়েশ্বরের অন্তরঙ্গ ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র (সাহজাহানের) বিশ্বস্ত মন্ত্রী মথুরানাথ রায় কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

পুষ্পিকায় কবির 'প্রোদ্যৎপদবি' সরস্বতীকণ্ঠাভরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবির সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল রচনা-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় উদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে পাওয়া যায়।

এই সম্ভ্রান্ত বৈদ্যগোষ্ঠীর বংশধর আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কোথায়ও বিদ্যমান আছে কি না অনুসন্ধানযোগ্য। আমরা ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভায় এবং কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় দাসবংশের বিবরণে দুর্গাদাস ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। উভয় গ্রন্থই আলোচ্য কবির প্রায় সমসময়ে যথাক্রমে ১৫৯৭ শকে (=১৬৭৫ খ্রীঃ) এবং ১৫৭৫ শকে (=১৬৫৩ খ্রীঃ) রচিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান এই বংশে কৌলীন্য বিদ্যমান ছিল না। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মথুরা রায় সাহজাহানের "বিশ্বাস" ছিলেন এবং নিঃসন্দেহ তৎকালীন একজন দরবারী প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। আইন্-ই-আকবরীর ব্লকম্যান-কৃত অনুবাদে "মথুরা দাস" নামক এক বাঙালীর নামোল্লেখ আছে (১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯-২০)—এই "দাস" উপাধি মথুরাই কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া ধরা যায়। আকবরের অধীনে "রায়শাল দরবারী" নামক শেখাওয়াৎ বংশীয় রাজপুরুষ ১২৫০ মনসবদার ছিলেন—তিনি পরে জাহাঙ্গীরের সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিশিষ্ট রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার পৌত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার নিজস্ব রাজ্য (অম্বরের নিকটবর্তী কন্ধার) কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং রায়শালের "মুনশী ও উকীল" বাঙালী মথুরা দাস তাহা অংশতঃ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মথুরা দাসই পরে যোগ্যতাবলে সাহজাহানের দরবারে উন্নীত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। নতুবা প্রায় একই সময়ে মথুরা নামক দুইজন দাসবংশীয় বাঙালীর সম্রাট-দরবারে উপস্থিতি কল্পনা করিতে হয়। ইহাও অনুমান করা যায় যে, কবি শিবনারায়ণ উড়িষ্যার রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যেই জয়পুরের সভাকবি হইতে পারিয়াছিলেন। রায়শাল ও রামসিংহ একই বংশের পৃথক্ শাখাসম্ভূত ছিলেন।

কবিকণ্ঠহারের কুলপঞ্জিকায় এক মথুরা রায়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুলপঞ্জীকার গুপ্তবংশীয় এক গোবিন্দের পুত্র-কন্যার উল্লেখ করিয়াই একটি ধারা সমাপ্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ এই গোবিন্দ কবিকণ্ঠহারের সমকালীন ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠকন্যার বিবাহ বর্ণনা করিয়া লিখিত হইয়াছে:

> রায়শ্রীনরসিংহেন "মথুরারায়"সূনুনা।
> প্রথমাগর্ভজা কন্যা পরিণীতা গুণান্বিতা॥
> (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, চন্দ্রকান্ত হড়ের সং, পৃঃ ৩২৫)

সমকালীন এই দুই জন মথুরা রায় অভিন্ন হইতে পারেন।

দুজে'য়

শ্রীশান্তশীল দাশ

গভীর নিশীথে নিদ্রামগন সকলে যবে,
শুধু তারাদল সুনীল নভে
তন্দ্রাহারা;
মোর বাতায়ন-পাশে এসে তুমি সুকল্যাণী,
কোন বেদনায় নাহিক জানি,
ঝরাও নীরবে নয়ন ধারা।
তোমার নয়নে অশ্রুর কণা,
আমার হৃদয়ে আঘাত হানে,
চাহ না তো তুমি আমার পানে,
হে কল্যাণী!
দিগ দিগন্ত ভরে তোলো শুধু দীর্ঘশ্বাসে,
নিবিড় ব্যথার কি উচ্ছ্বাসে,
কি বেদনা তব কিছু না জানি।
স্তব্ধ নিশীথে আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া ওঠে,
কোন দেবতার চরণে লোটে
বেদন-মালা;
চেয়ে থাকি শুধু দূর নভতলে, তারার সনে,
নিদ্‌হারা মোর নয়নকোণে,
শুধু অকারণ ঘনায় জ্বালা।
বারে বারে ডাকি দাও না সাড়া,
জলভারে নত আঁখি দু'টি তব—
আমার নয়ন সুপ্তিহারা।

হিজলীর উপভাষা

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

শত বর্ষ পূর্বে হিজলী একটি স্বতন্ত্র জেলা ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মেদিনীপুর জেলার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ইহা কখনও উড়িষ্যা রাষ্ট্রের, কখনও বঙ্গ-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার সীমানা কখনও সঙ্কুচিত, কখনও প্রসারিত হইয়াছে। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার পরিমাণফল ছিল ১০৯৮ বর্গমাইল। বাঙলা ও উড়িষ্যার প্রান্তে অবস্থিত হিজলীর কোন কোন অংশ কখনও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, আবার কখনও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের কোন কোন অংশ হিজলীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ফলে বঙ্গ-উড়িষ্যা সংস্কৃতির গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ধারা এই জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

একই মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাঙলা, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি। অসমীয়ার কথা বাদ দিয়া আমরা কেবল উড়িয়া ও বাঙলা ভাষার কথাই বলিব। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে অনন্তবর্মদেবের তাম্রশাসনে যুগপৎ উড়িয়া ও বাঙলা শব্দ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে দেখিতে পাই: 'জয়দেব সনিধে গাড়সীমা এতস্চ ভিতুর সামাহ্ন পদনর…।' দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের পর হইতে বাঙলা ও উড়িয়া ভাষা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও, ইহারা সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় বহুদিন পাশাপাশিই অবস্থান করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রভুরাম বাঁড়ুজ্যের 'ধর্মমঙ্গলে' দেখি, গৌড়-দরবারে বাঙলা, উড়িয়া ও নাগরীর চর্চা হইতেছে[1]। পক্ষান্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও উড়িষ্যার আদালত ও বিদ্যালয়-সমূহে বাঙলা ভাষার বহুল প্রচলন ছিল, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙলার পরিবর্তে উড়িয়ার প্রবর্তন হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্ত্যস্বরের উচ্চারণ (পঞ্চদশ শতকের বাঙলা ভাষাতেও ইহা ছিল) ও দু'একটি বর্ণের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ছাড়া বাঙলা ভাষার সহিত উড়িয়ার মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। উড়িয়া লিপি দেখিয়া ইহাকে বঙ্গভাষা হইতে পৃথক মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু একজন কলিকাতাবাসীর পক্ষে পূর্বপ্রান্তিক বঙ্গের ভাষা অপেক্ষা উড়িয়া বোঝা অনেক সহজ। উড়িষ্যায় বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে যিনি অভিযান করিয়াছিলেন, সেই ফকিরমোহন সেনাপতির 'আত্মচরিতে'ই আছে—'একথা যথার্থ বটে যে কেবল ক্রিয়ামাত্র পরিবর্তন করি দেলে বঙ্গলা উড়িয়া হোই যাএ।' হিজলীর ভাষা বাঙলা ও উড়িয়া ভাষারই সংমিশ্রণ। এই অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে ডঃ গ্রীয়ারসনের মন্তব্য এইরূপ :—

"As we cross the boundary between Balasore district and Midnapore, we find at length almost a new dialect. It is not, however, a true dialect. It is a mechanical mixture of corrupt Bengali and of corrupt Oriya. A man will begin sentence in Oriya, drop into Bengali in its middle, and go back to Oriya at its end."

১২৩০ বঙ্গাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থ সম্ভবতঃ প্রথম বাঙলায় প্রাদেশিক শব্দসংকলনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে লেউইন, জে. ডি. এণ্ডারসন, পার্জিটার প্রভৃতি বিদেশী এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, যোগেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বাঙালী বিদ্বানগণ বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়াছেন। ১৩৩৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ একটি 'গ্রাম্য শব্দকোষ সমিতি' গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে ইহার কার্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, বাঙলা দেশে একখানি প্রাদেশিক শব্দকোষ সঙ্কলিত হয়।[2]

পূর্ণাঙ্গ গ্রাম্যশব্দকোষ দেখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে অন্তরে পোষণ করিতেছি এবং ইহাও অনুভব করিতেছি যে, বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ লইয়া যদি আলোচনা করা হয় তাহা হইলে এ বিষয়ে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে আমি হিজলীর অন্তর্গত খেজুরীতে থাকিয়া যে সমস্ত শব্দ ও ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি এবং সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, কিঞ্চিৎ পরিচয়সহ তাহার একটি তালিকা দিলাম। স্থানীয় ব্যক্তিরা চেষ্টা করিলে ব্যাপকভাবে শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং তাহাতে বাঙলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

ধ্বনিতত্ত্ব : উড়িয়া ভাষার মত এ অঞ্চলেও 'র' ও 'অ' ধ্বনিতে প্রভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যথা—অজানবাড়ি, নারায়ণগড়। 'ঋ' কার ও 'রি'-র উচ্চারণে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। ঋ অনেকটা সংস্কৃতের মতই উচ্চারিত হয়। যথা ঋণ, রিপু। উড়িয়া ভাষার মত মূর্ধণ্য 'ল'-এর (অর্থাৎ 'ড়'-এর কাছাকাছি) ধ্বনি এখানকার বৈশিষ্ট্য। যথা আলু, কতকগুলা ইত্যাদি।

হিজলীর উপভাষায় 'অপিনিহিতি' কিছু রহিয়া গিয়াছে। যথা পোলা<পুইলা।

বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে কিছু কিছু অদলবদল ঘটিয়া থাকে। যথা কাঁথা—গাঁথা ; গোচনা—কেচনা।

ট বর্গেও কিছু অদলবদল দেখা যায়। যথা কুঠিয়া—কুড়ে [অলস]।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদে 'এ' স্থানে 'ই' উচ্চারণ হয়। যথা করি দে, পরি কেন।

---

[1] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৯৪৮) ডঃ শ্রীসুকুমার সেন

২ বঙ্গীয় গ্রাম্যশব্দকোষ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রবাসী, আষাঢ়—১৩৩৯

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মধ্যবর্তী 'ই' কার লোপের ইঙ্গিত মেলে। যথা খাইয়া>খায়া; যাইয়া>যায়া।

'ন' আর 'ল' এর অদলবদল হয়। যথা নৌকা—লোকা, লম্বর—নম্বর।

কোন কোন শব্দে 'স' স্থানে 'ছ' উচ্চারণ হয়। যথা সম্মুখ> ছামুক বা ছামু।

রূপতত্ত্ব: কর্তার বহুবচনে 'মনে' বা 'নে' বিভক্তি হয়। যথা আমরা—আমাংমনে বা আমাংনে; তোমরা—তোমাংমনে বা তোমাংনে ইত্যাদি।

হিজলীর উপভাষার ক্রিয়াপদে উড়িয়া ভাষার যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ক্রিয়াপদই হিজলীর উপভাষাকে বাঙলা ভাষা হইতে অনেকটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

আমরা যাচ্ছি—আমারনে যাইঠি
তোমরা যাচ্ছ—তোমাংনে যাওঠ
তারা যাচ্ছে—তাংনে যায়ঠে
তোরা যাচ্ছিস—তোংনে যাউঠু
আমরা গেছি—আমাংনে যাছি, যেছি বা যাইছি
তোমরা গেছ—তোমাংনে যাছ, যেছ বা যাইছ
তারা গেছে—তাংনে যাছে বা যাইছে
তোরা গেছিস—তোংনে যাছু বা যাইছু
আমরা গিয়েছিলাম—আমারনে যাথলি বা যাইথিলি
তোমরা গিয়েছিলে—তোমারনে যাথল বা যাইথল
তারা গিয়েছিল—তারনে যাথলা বা যাইথলা
তোরা গিয়েছিলি—তোরনে যাথলু বা যাইথুলু।

[উপরোক্ত ক্রিয়াপদগুলির 'চ'-র 'ছ'-এ, 'ট'-র, 'ঠ'-এ ও 'ত'-র 'থ'-এ অদলবদল হয়।]

উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদে 'অ' স্থানে 'আ' এবং মধ্যম পুরুষের ঐ ক্রিয়াপদে 'এ' স্থানে 'অ' হয়। যথা: আমি বাবা? (=আমি যাব?); তুমি বাব? (=তুমি যাবে?)।

ষষ্ঠীর একবচনে 'কে' বিভক্তি কচিৎ দেখা যায়। ইহা আমা-দিগকে মৈথিল রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যথা: আমাকে (=আমার) বলতে লজ্জা করে।

শব্দকোষ: হিজলীর উপভাষায় উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যতই উড়িষ্যার নিকটবর্তী অঞ্চলে যাওয়া যায়, ততই উড়িয়া ভাষার প্রভাব বেশী। দুই-চারিটি উড়িয়া শব্দ এই ভাষার সহিত বেশ মিশ খাইয়া গিয়াছে। যেমন এঠি= এখানে; সেঠি=সেখানে; কুঁঠি=কোথায় ইত্যাদি। সংস্কৃতের বিকারজাত দু-একটি শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যেমন কত্রূপ< কুরূপ; আজ্ঞারখা<অজ্ঞরাখা। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার সহিত শ্রীহট্টের উপভাষার বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সংগৃহীত শব্দাবলীর একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল।

অজ্ঞিতা—অজ্ঞাখা
অবতলিয়া—থিঞ্জী গন্ধ [বিপরীত শব্দ মুখৌল]
অলাগাবসা—নোংরা, অপরিচ্ছন্ন
আইল্ মাইল—আলস্য
আউজি দেওয়া—ঠেকিয়ে রাখা, ঠেস দেওয়া
আঁচু—ঝুল (যেমন রান্নাঘরের)
আনক—চশমা
আপা—বড় জাকে ছোট জায়ের সম্ভাষণ
আলতি—কচু
উছাল—বমি
উরকুণ্ডিয়া—বেঁটে বদমাস
উলিকাঁদাল—বাড়ীর বহির্ভাগের আনাচকানাচ
উলিয়া—বীজধান জড়ানো খড়ের পুলিন্দা
একখণ্ড—একখানা
একশোট—একটান (যেমন তামাক খাওয়ায়)
এঁড়ুয়া—বহুরূপী
কটিয়া—কচি
কতরি বা পাতিয়া—নোয়া (যেমন হাতের)
কবিলা—পত্নী (আলালের ঘরের দুলাল দ্রঃ)
কানা—(১) ন্যাকড়া
(২) ছেঁদা [তুলনীয় কানাকড়ি—কলিকাতা]
কিলকুটা বা কিটানিয়া—যে কোন কথা গায় মাখে না
কুঁচি [<কুঞ্চিকা]—চাবি [তুলনীয় সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল—চর্যাগীতি]
কুড়থুল—লুটোপুটি (যেমন হাসিয়া)
[তুলনীয় কুর্তইল—শ্রীহট্ট]
কেচনা—গোমূত্র
কোঁচা—বেতের তৈরি এক সের পরিমাণ দ্রব্যের মাপক বস্তু
কোঁপা বা ছটাঙ্গী—ছোট মাটির ভাঁড়
কোঠা—মেঝে
কোলা—জলের জালা [তুলনীয় কৈলা—শ্রীহট্ট]
ক্ষদি—ছোট মোটা ধুতি
খন্ত্রী [<খনিত্র]—শাবল
খরকা—ঝাঁটা
খাইশোধ—অভ্যাস, স্বভাব
খাচি—কাঠি
খাড়ুয়া—পায়ের মল
খুসকুণ্ডি—দুর্গন্ধ
গট্যায়—একটা
গঁপ—ট্যাক
গর—পেটুক
গরাক—গ্রাহক, ক্রেতা

গাড়া—গর্ত
গাড়ি—প্লেট
গাড়ু—ছোট হাঁড়ি
গাঁথা—কাঁথা
গিদড়—শিয়াল
গীনা—ছোট বাটি (যেমন নুনের গীনা)
গুজি—ছোট
গুণ্ডি—ছেলেমেয়ে
গুয়াধরা—মড়্‌চেধরা
গেঁড়া—শামুক
গেড়িয়া—পুকুর [তুলনীয় গেড়ে—বর্ধমান]
গের পোকের ভাতার—অর্থহীন শব্দগুচ্ছ (যেমন পশ্চিমবঙ্গে— 'ঘোড়ার ডিম')
গোড়—পা
গোড়া—ঝিনুক
গ্যান্‌সা—নোংরা
ঘইতা-মাইপো—স্বামী-স্ত্রী
ঘরবরা—(১) কাদু ; (২) ছেনি
ঘসি—ঘুঁটে
ঘিনি [<গেছিস]—নেওয়া [তুলনীয় কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস—চর্যাগীতি]
ঘুড়ি পেকা—পরিয়া ফেল (যেমন জামা)
চটি—পিঁপড়া [তুলনীয় মত্ত হস্তী টের পেল না চেউটি মরম জেনেছে—বাউল গান]
চুড়িয়া—উত্তরীয়
ছেপ—থুতু
ছেলি—ছাগল [তুলনীয় বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রমেণ যুবতী— কবিকঙ্কণ]
ছোঁচ্ দেওয়া—চৌকা দেওয়া, নিকানো
জাড়া—এরণ্ড
জুড়া—খোঁপা
ঝাড়াফিরা [হিন্দী]—পায়খানা করা
ঝুটিয়া—পদাঙ্গুষ্ঠ
টাট—মাটির গামলা
টোকামনে—ছেলেমেয়েরা
ঠেকি—মাঝারি হাঁড়ি
ডাব—নীচু মাঠ
ডুমরা—মাদুলি
ডেরি দেওয়া—হেলিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া (যেমন থালাবাটী ডেরি দাও)
ডোজা বা গোড়াদান—গবাদি পশু বাহির করিবার জায়গা
ঢেলা—চোখের তারা [তুলনীয় ত্রিনাথের মেলা চক্ষের বেরুবে ঢেলা—মেয়েলি ছড়া]

তবকা [<Tobacco]—তামাক
তন্ত্রী—তেলাকুচা
তাড়া—চালের জালা
দা বা কাছিয়া—কাস্তে
দাউলি—কাটারি
দুস্পুতা—কুপুত্র
ধাগা—মানত (যেমন ঠাকুরের কাছে ধাগা বাঁধা)
নাড়িয়া বা লাড়িয়া [উড়িয়া]—নারিকেল
নামান—ওলাউঠা
নিয়া—আগুন
পচরাবোল—নর্দমা [তুলনীয় পচরাগাদা—২৪ পরগণা]
পতরফল—ঝিঙা
পনিক—বঁটি
পাখিয়া—তালপাতার তৈরি মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা বর্ষাতি
পাছিয়া—চুবড়ি [তুলনীয় পেছে—বর্ধমান]
পাতলা বা কৈলাড়ি—শালুকফুল
পানবোল—পানের পিক
পনিয়া বা কাঙ্গই [<হিন্দী—কংঘী]—চিরুণী [তুলনীয় কঁকই—শ্রীহট্ট]
পিঁধা—ধুতি
পিপচ্ছড়া—খিট্‌খিটে
পুইলা—ছেলে
পুতা—নোড়া [তুলনীয় পুতইল—শ্রীহট্ট]
পেহুর—পেয়ারা
ফরুয়া—সিন্দুরকৌটা
বজনা—খড়ের দড়ি
বড়জন—ভাসুর
বনি—শালিক
বয়েরকুল—দিশীকুল
বাতি দেওয়া [হিন্দী]—ব'লে দেওয়া
বায়াবায়ানি—খোকাখুকী
বিচা—খোসপাঁচড়া
বিলাই—বিড়াল [তুলনীয় উন্দুর পাইয়া গুয়া বিলাই ধরি খাএ —গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল]
বিল্লা—ভবঘুরে
বেদগু—অসভ্য
বেহাদাদ—বেহায়া
ব্যাদা বা ব্যাধা—জারজ
ব্যানধান—বীজধান [তুলনীয় বেমনধান—২৪ পরগণা]
ভঁস বা উঁস—ছারপোকা
ভড়কা—হুকা
মইপিঠিয়া—সহুর মেজাই

মল্লি বা মলা—ছোট বা বড় ঝিঁঝিঁ
মাং [হিন্দী]—সিঁথি
মাইড়া—মেয়েছেলে
মাউসা-মাউসী [হিন্দী মৌসা-মৌসী]—মেসোমাসী
মুছি বা টাঁঠী—ছোট হাঁড়ির ঢাকনা
মুদি—রূপা বা পিতলের আংটি
মেবা—মোটা
লাগড়ে-লাগড়ে—ঘন ঘন [তুলনীয় নাগাড়ি—২৪ পরগণা]
লুগা [উড়িয়া]—কাপড়
লেদকা—নরম (যেমন লেদকা কাদা)
শুড়া—সরু মেঠো রাস্তা
সদল—চন্দন
সান [উড়িয়া]—ছোট, দেবর
সিকন [<সিঙ্ঘানিকা ?]—সর্দি [তুলনীয় সিকনি—কলিকাতা]
হাইচানি—শ্যাওলা
হড়া—বড় মাটির ঢেলা
হরি বা চকার—গণ্ডগোল
হ্যাদি—খোশামোদ ।৩

৩ এই শব্দসংগ্রহে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা প্রমীলা দেবীর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

মাদল ও মহুয়া

রাঙামাটির পথ।

দু'ধারে সারিবাঁধা মোল্ গাছ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বিদায়ী সূর্য্যের কয়েক ফালি রাঙা আলো এসে পড়েছিল লাল ধুলোর উপরে। চলার পথে কে যেন ফাগ ছড়িয়ে রেখে গেছে।

বরকু মাঝি পিছুপানে চাইলে—"পা চালিয়ে আয় কেনে, রাত লেগে যাবেক।"

'সাঁঝতক কাজ করবি তো কি হবেক ? আকটু সকাল সকাল কাজ ছাড়তে পারিস না ?"

একটু দূরে পড়েছিল লখিয়া। বরকু দাঁড়াল—"মনিব মাইনে দেবেক কেনেরে পাগলি, কাজ দেখে দাম তো, আর পা বাড়িয়ে চলে আয়।"

লখিয়া সঙ্গ নিলে—"তু বস্তাটা একবার লে কেনে।"

লখিয়ার মাথায় একটা বস্তা। বস্তার মধ্যে আছে কয়েকটা কাঁসার পাত্র, এগুলোতে ঘর হতে মাঠে দুপুরের খাবার আনা হয়; আরও আছে কতকগুলো কাঠের কুচি—কাজ করতে করতে এক ফাঁকে সংগ্রহ করা হয়েছে জালানীর জন্তে। বরকু বস্তাটা মাথায় নিলে—"এই টো তুকে খুব ভারী লাগলো! ভারী অয়েসী তু!"

"ওরে আমার মরদ রে। তুই বুঝি খুব খাটিয়ে ? মাদল বাজিয়ে এত দিন গেল—কাজে মন লাগাইছিস এখন।"

"কাজ না করলে চলবেক কেনেরে পাগলি! তুকে এনে যখন বাসা বাঁধলম।"

'হো, হো' করে হেসে উঠল লখিয়া, বরকুর পিঠে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিলে—"কথা শুন একবার। আমি বুঝি পাখী, আমাকে লিয়ে বাসা বাধলি তু ?"

লখিয়ার হাতে একটা চিমটি কাটলে বরকু—"শুধু পাখী লয়, তু মাইরি উড়ো পাখী।"

লখিয়া আর কিছু বললে না, চুপ করে গেল।

আঁধার ঘনিয়ে এল। বরকুর মনের চোখে ফুটে উঠল একটা অতীতের ছবি—

পৌষ-পার্ব্বণ। ডিপাহাড়ে মাদলের দল নিয়ে এল বরকু। এ অঞ্চলের বিখ্যাত মাদলিয়া সে।

লখিয়ার তখন ভরা যৌবন। মাঝিপাড়ার সর্দ্দার মংলুর একমাত্র মেয়ে লখিয়া। শ্বশুরবাড়ী গড়ের ডাং ছেড়ে বাবার বাড়ী ডিপাহাড়ে এসে বাস করছিল। ঝগড়া হয়েছিল স্বামী জংলা মাঝির সঙ্গে।

এক দিন মাঠের কাজ সেরে লখিয়া ও জংলা বাড়ী ফিরছিল।

লখিয়া জিজ্ঞাসা করলে জংলাকে—"কাল কাজে আসবি ?"

—"কেনে কি করবি কাল ?"

"রোজ রোজ কাজ ভাল লাগে না। বনে মোল কুড়ুতে যেতম কাল। মাদল লিয়ে যেতিস সঙ্গে। তু বাজাতিস আমি শুনতম।"

"মাদল বাজালে প্যাট ভরবেক কি ? কাজে না গেলে চলবেক নাই। খাটালির কিছু টাকা জমাতে হবেক এবারে। তুর কোমরের একটা বিছে গড়াই দিব। একটা ছাগল কিনে দিব তুকে, পালবি। বাচ্ছা হলে মোটা টাকা হবেক।"

লখিয়া কিছু বলল না, চলতে থাকল।

পুনরায় বললে জংলা—"বড্ড চোট পাড়তে হইছে আজ। লোহার মতন শক্ত মাটি। হাত লরাতে লারছি। মহুয়াটা রেখেছিস ? পেকেছে ? একটু বেশী করে খেতে হবেক আজ, নইলে গা হাতের দরদ মরবেক নাই।"

"কবে তু কম খাস ? সাঁঝ লাগলেই বেহুঁস, মরা।"

"খাটাখাটির গতর কতই সয়। আচ্ছা আজ মাদল বাজাব, গান শুনব তুর।"

ঘরে এলো তারা। রাঁধা খাওয়া সারলে।

সেদিন ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা।

সন্ধ্যার পর আলোর জোয়ার এল যেন। নিকটেই বন। পাশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝখানে সাঁওতাল পল্লীর ছোট ছোট মাটির ঘর। দেওয়ালে অনেক রকমের নক্সাকাটা। দেখলে মনে হয় কোন মায়াপুরী। কাক-জোছনার মত হয়েছিল সে রাতটা। কলরব সুরু করেছিল মোহাবিষ্ট পাখীগুলো। নির্ব্বাক বনানী মুখর হয়ে উঠল। ঝিরঝিরে হাওয়ার সে কথার কিছু ভেসে এল লখিয়ার কানে। তাকে উৎসবে যোগ দিতে ডাক এল বুঝি। জংলা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

লখিয়া জংলাকে একটা নাড়া দিলে, "এ মাঝি। তু পড়ে পড়ে ঘুমুবি—বাইরে দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে।"

জংলা বিরক্ত হ'ল—"আঃ। কি যে করে। চাঁদ দেখার সখ নাই আমার। তুর রং লেগেছে, তু দেখ কেনে।"

লখিয়া ক্ষুব্ধ হ'ল। বাইরের মাতাল পরিবেশ আরও যেন চঞ্চল হয়ে উঠল—তাকে বিদ্রূপ করলে বুঝি।

লখিয়া কাঁদল—মাঝি একটুও ভালবাসে না তাকে।

আর একদিনের ঘটনা—সেদিন ছিল সাঁওতালদের "বোঙ্গা-পরব।" ভূতের মূর্ত্তি গড়ে তারই পূজা করা হ'ল সেদিন। যাতে তাদের পল্লীতে কোন অপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে তার জন্যে পূজার পর সকলে মিলে গ্রামের বাইরে গিয়ে চীৎকার করে প্রার্থনা জানাল। ঠাকুরের সামনে শুয়োর বলি দেওয়া হ'ল। তারপর ছুটল অফুরন্ত জোয়ার 'মদমাস এবং নাচগানের'। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের গুচ্ছ। গলায় বনফুলের মালা। বেশভূষা আঁটসাট। প্রস্ফুটিত অবাধ্য যৌবন যেন তবুও বাধা মানে না, বাইরে উঁকি দেয়। মেয়েরা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়েছে একসারে। ভিন্ন সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে পুরুষগুলো। পুরুষগুলোর গলায় সাদা কড়ির কাটির মালা। হাতে বাঁশের বাঁশী। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গোল করে আটকানো ফিতে দিয়ে। সামনের দিকে বুনো পাখীর পালক গোঁজা আছে ফিতের মধ্যে। যেন আদিম যুগের আদিম মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির প্রথম উপাদান খুঁজে পেল।

মাদলিয়া মাদল বাজায়—ধা-ধিন্ না তিন্
ধা-ধিন্ না তিন্।

মেয়েরা নাচে, গান গায়, 'গীতিরিলাং ডাডি, দাদোমাইরি,
দাদোমাইরি গীতিরিলাং ডাডি।'

পুরুষগুলো নাচে তাল দেয়—হেঁইও, হেঁইও, হুর রর।
হেঁইও, হেঁইও, হুর-রর।

নাচ গানে মেতে উঠেছিল লখিয়া। ফুটন্ত যৌবনের ছাপ সারা দেহে। নিটোল স্বাস্থ্য, যেন কালো পাথরে খোদাই করা নিরেট স্ত্রীমূর্ত্তি। প্রতিটি অঙ্গ পরিস্ফুরণের সুষমায় মনোরম। মাদলের তালে তালে নাচছিল লখিয়া। আজ যেন সে সারা পল্লীর একটা আকর্ষণ। জংলাও সেদিন খুব মদ খেয়েছিল। দূরে দাঁড়িয়ে ছিল—পা টলছিল তার। নাচের আসরে যোগ দিতে পারে নাই।

জংলা লখিয়াকে ডাকলে—এই লখি, শুন! লখিয়া জংলার মুখের দিকে তাকালে।

"ঘর আয় বলছি।" রূঢ় ও কর্কশ স্বরে বললে জংলা। নাচের আসর ছেড়ে জংলার সঙ্গে বাড়ী এল লখিয়া।

জড়িত কণ্ঠে বললে জংলা—"তু আত কেনে নাচ্‌বি? আও লোকের মেয়ে আছে। তুর্ পানে কেনে চেয়ে থাকবেক্ সবাই।"

লখিয়া বিস্মিত হ'ল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

জংলা বললে, "কি! কথা কইছিস্ নাই যে এড়?"

"মাতাল হয়ে গেইছিস তু। কি কথা কইব তুর্ সাথে?"

প্রকৃতই মাতাল হয়েছিল জংলা। লখিয়ার একটা হাত শক্ত করে ধরলে।

"হাত ছাড়্ বলছি। কি লচ্ছাড়ী দেখলি তু আমার। কুন্ মরদটাকে আঁকড়ে ধরেছি আমি।"

"আমার চোখ নাই লয়? তুর পানে কেনে সবাই চেয়ে থাকবেক। তুর মরদ নাই। তুকে আমি লিব নাই।"

"বেশ, না লিবি ত বাপের বাড়ী দিয়ে আসবি।" গর্জ্জে উঠল জংলা—"তু আমার বিয়েলী মাগ্ লোস? বাপের বাড়ী দিয়ে আসব হারামজাদী, তুকে মেরে খুন করব। লখিয়াকে মার দিলে জংলা। লখিয়া কাঁদতে থাকে। পাড়ার দু'পাঁচ জন এসে জমায়েত হ'ল—জংলাকে ছাড়িয়ে নিলে। একজন বললে, "মাতাল হয়ে গেইছে জংলা। শালাকে বলি আত মদ খাস্ না।"

"এবারকায় মহুয়াটা খুব জোর বটেক্"—অপর একজন বললে।

একটু পরেই অজ্ঞান হয়ে গেল জংলা। পাড়ার লোকেরা তাকে ধরাধরি করে উঠান হতে ঘরের মধ্যে এনে শুইয়ে দিলে। উবু হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল লখিয়া। বিনা দোষে আজ তাকে মরদটা মারলেক্। রাত একটু গভীর হতেই সে বাবার বাড়ী ডিপাহাড়ে পালিয়ে এল। সেই অবধি সে আর জংলার বাড়ী যায় নি। জংলাও লজ্জায় আসতে পারে নি শ্বশুরবাড়ী।

পৌষ-পার্ব্বণের সময় মাদলের একটা দল নিয়ে ডিপাহাড়ে এল বরকু। মংলু সর্দ্দারের বাড়ীর পাশে একটা কুঁড়েতে বাসা নিলে। সারাদিন থাকে বাসায়। রান্না-খাওয়া করে। মাঝে মাঝে আপন-মনে গুন্ গুন্ গান গায় আর মাদল বাজায়। সন্ধ্যার পর বোঙ্গাতলায় বাজনার আসর বসে।

আজ মাঝি-পাড়ার সকলে শিকারে গেছে। বরকুর দলের লোকেরাও গেছে শিকারে। দুপুরের দিকে বাসায় বসে আপন-মনে মাদল বাজাচ্ছিল বরকু।

লখিয়া এল।

বরকু বললে, "তু মাংলু সর্দ্দারের বেটি লয়? নাচ ত জানিস

লখিয়া লজ্জিত হ'ল, মৃদু হাসলে—"খুব ভাল মাদল বাজনা তুর, পা আপনি লেচে উঠে।"

"একবার লাচ কেনে আমি মাদল বাজাই।"

"দূর হ, কেউ এসে পড়বেক এখুনি।"

"পাড়াতে কেউ নাই আজ।"

"মেয়েগুলো আছে, দেখলে এখুনি বদনাম রটাবেক।"

বরকু জিদ করে—"কেউ নাই, লাচ কেনে একটু।"

অগত্যা রাজি হ'ল লখিয়া—বরকু ধীরে ধীরে মাদল বাজায়। লখিয়া নাচে।

"বেড়ে লাচ কিন্তু তুর।"

বাঁকা করে চাইলে লখিয়া, 'ভাল না ছাই। ইস একটা মেয়ে দেখলে রে মাঝি, বাঃ।'

চলে এল লখিয়া। পাড়ার মেয়েরা কুৎসা রটাল লখিয়ার নামে। পুরুষদের কানেও কথাটা উঠল।

লখিয়া এক দিন বরকুকে বললে, "তুকে বললাম লাচবো নাই। কার মুখে হাত দিবি এখন।"

বরকু কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলে—"উতে কিছু হয় না বুঝলি। গরম জলে ঘর পুড়ে না।"

সাঁওতাল-পাড়ার লোকেরা এ নিয়ে কানাঘুষা করে—"বরকু বায়েন এসে খুব মজা লাগাইছে বটেক্ শুনেছিস।"

—"শুনেছি ত, কিন্তু সর্দারের বেটি যে।"

—"কেনে সর্দার কি লাট বটেক।"...বলে সে যোল আনায় ডাক করুক। বিচার করতে হবেক।" "সর্দারের বেটি বলে যা খুশী তাই করবেক্ লিকি?"

পরের দিন বিকালে পাড়ার সকলকে বোঙ্গাতলায় ডাক দেওয়া হল।

লখিয়ার বিচার হবে।

লখিয়া এল। মুখ্যা প্রশ্ন করলে তাকে—"এ লখি তুর নামে কি সব শুনছি।"

উত্তেজিত হ'ল লখিয়া "মিছে কথা। আমি দোষী লই।"

—"যা রটে তার কিছু বটেক। লোকে কেনে মিছে কথা বলবেক তুর নামে, ওয়া কি তুর দুষমন?"

"তা জানি না। আমি হলপ করতে পারি।"

মুখ্যা মজলিসের অন্যান্য লোকদের মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

তাদের মধ্যে একজন বললে, "হঁ-ত, হলপ করুক উ। বোঙ্গা ঠাকুরের পাটায় হাত দিয়ে হলপ করতে হবেক।"

যে সে ঠাকুর লয় বাবা, এখুনি সত্যি মিথ্যে সব জানা যাবেক।"

মংলু সর্দার নিষেধ করলে লখিয়াকে, "এ লখি, হাত দিস না পাটায় যা হয় হবেক।"

লখিয়া সে কথা শুনলে না, বোঙ্গা ঠাকুরের পাটায় হাত দিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করলে।

কিন্তু একি! বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে কেনে। ঠাকুরের পাটায় হাত দিলাম বলে ঠাকুর রাগ করলেক বোধ হয়। আমি দোষী লয় তবু এমন হচ্ছে কেনে। চারদিক থেকে কতক-গুলো ভূত তাকে গিলতে আসছে। হাঁড়িপানা মুখ, লম্বা লম্বা দাঁত, গোল গোল চোখ, ঐ তো হাঁ করে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ভয় পেলে লখিয়া। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এসে শুয়ে পড়ল। ঐ তো বোঙ্গা ঠাকুরের লম্বা লম্বা রোমশ হাত দুটো এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে। উঃ কি লম্বা লম্বা ধারাল নখ তার আঙুলে। "উঃ রে বাপরে মেরে ফেললেক রে," বলে ভয়ে চীৎকার করে উঠল লখিয়া। অজ্ঞান হয়ে খিঁচতে থাকে। বাড়ী এল মংলু সর্দার। কাঁদতে থাকে। পাড়ার লোকেরা এসে বোঙ্গা ঠাকুরের কাছে মানত করতে এবং ওঝা ডাকবার পরামর্শ দিয়ে গেল।

"যে সে ঠাকুর লয় বাবা—হাতে হাতে ফলে গেল। গরম কেটে গেইছে লচ্ছারির।"

বরকু ভয় পেল, মুষড়ে পড়ল। সংবাদ নিতে এল লখিয়ার।

—"সর্দার আছিস।"

—"ক্যারে ক্যা বটিস তু?"

"আমি বরকু বায়েন।"

"বরকু বায়েন!" মারমুখো হ'ল মংলু সর্দার। "এখুনি পালা ই গাঁ ছেড়ে, নইলে ছই কাঁড় বাঁশ দেখেছিস, ভীড়াই দিব।"

বরকু মাঝি সেই রাত্রেই সদলবলে ডিপাহাড় ছেড়ে চলে গেল। শীতের নিঝুম রাত। উত্তরের হিমেল হাওয়ায় গা হাত সির সির করছিল বরকুর। নিজের মনেই গুন্ গুন্ করে গান গাইতে সুরু করলে। মনের চোখে ভেসে উঠল নৃত্যশীলা লখিয়ার ছবিখানা। গরম রক্তস্রোত বইতে থাকে মাথার মধ্যে। কন্‌কনে শীতের মধ্যেও কিছুখানা আরাম বোধ করল বরকু।

ওঝার ঝাড় ফুঁকে এবং বোঙ্গা ঠাকুরের কাছে মানত করার ফলে লখিয়া শীঘ্রই সেরে উঠল।

পাড়ার লোকেরা ধরে বসল মংলুকে, "জংলাকে দিয়ে আয়, তারপর তার সঙ্গে লখিয়ার ছাড় করে সাঙা দে বরকুর সঙ্গে। সেইতো উকে নষ্ট করেছে বটেক।"

এ কথা শুনে খুবই উৎফুল্ল হয়েছিল লখিয়া।

তার একজন সঙ্গিনীর কাছে বললে এক দিন—"বেড়ে বাজায় কিন্তু বায়েন, মরাকে ও লাচাতে পারে।" —

"তবে তো ভালই হবেক লো তুর। তু লাচবি আর উ বাজাবেক। তুর মতন লাচুনি মেয়ে কি জংলায় পোষ মানে।"

ক্রুদ্ধ হল লখিয়া—"উ কথা বলিস না, মাইরি। জংলার সঙ্গেও খুব ভাব ছিল আমার। হুঁ, মরদ একটা বটেক। তবে মহুয়া পিয়ে বড্ড মারপিট করতোক। শুকনো কাঠ বটেক রস নাই একটুও।"

একটা দিন স্থির করে মংলু সর্দার। বরকু এবং জংলাকে—দুই জনকেই ডাক দিলে।

বোজা তলায় মজলিস বসল—জমায়েত হ'ল পাড়ার সকলে। মুখ্যা প্রশ্ন করলে জংলাকে—তুর বিয়েলি মাগ কে গলায় দড়ি খুলে ছাড় দিয়ে রেখেছিস। কবে কার ফসল খায় তার খবর রাখিস? মেয়ে বশ করতে লারবি তা বিয়ে করেছিলি কেনে?

"কেউ তুকে লিয়ে চলবেক নাই।"

জংলা এ কথায় কোন উত্তর দিলে না, মাথা নীচু করে মাটি খুঁটতে থাকে।

অপর একজন বললে, "যা হবার হইছে—খালে ডোবে পা পড়ে বই কি। উঃ আর কি হবেক লখিকে ছেড়ে দিয়ে যা। উ আপনার দেখে লিগ, তু আপনার দেখ গা যা।"

একেবারে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে জংলা—' লখিকে আমি ছাড়তে লারব।"

জংলার কথায় বিস্মিত হলে সকলে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। একটু দৃঢ়তার ছাপ পড়েছিল জংলার কালো মুখখানার ওপরে।

"নষ্ট মেয়েটাকে আবার লিবি তু?" প্রশ্ন করলে অন্য একজন। জংলা শুধু দৃঢ়তার সহিত একটা "হু" দিলে।

রায় দিলে মুখ্যা—"তবে তাই লেগা যা। কিন্তু তুকে জেতে উঠতে পাঁচ গোলা মদ লাগবেক।"

"তাই দিব," বলল জংলা।

"দিব লয় এখনই দু গোলা দে আজ খাব কি আমরা?"

খুঁট থেকে টাকা খুলে দিলে জংলা। মদ কিনে এনে আড্ডা জমালে সকলে।

বরকুর দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় বললে বরকুকে—"যা তুই খুব বেঁচে গেলি। যার মাগ সে যখন লিবেক তুর আর কি দোষ। আর লে মদ খা। আজ থাকবি আমার ঘরে, কাল সকালে চলে যাবি।"

জংলা একটা হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বরকুর দিকে। মদের আড্ডা ভাঙলে জংলাকে ঘরে নিয়ে গেল মংলু সর্দার।

লখিয়া সবই শুনেছে কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করলে না। গভীর রাত!

লখিয়া ঘুমায় নি, ঘুমাবার ভান করে চুপ করে শুয়েছিল। রাত নিশুতি হতেই বিছানার উপর উঠে বসল সে। জংলাকে একটা নাড়া দিলে। নাঃ, সে জেগে নাই। বেহুঁস পড়ে আছে নেশায়। বাইরে বেড়িয়ে এল লখিয়া। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। যেন বুকটা একবার ধক্ করে উঠল তার। এমনি এক জ্যোৎস্না রাতে সে জংলাকে কাছে পেতে চেয়েছিল। জংলা বেকুব। তার কথা বুঝলে না। লখিয়া ধীরে ধীরে চলতে থাকে। পিছুপানে চাইলে একবার, দাঁড়াল। নাঃ, সে জংলার ভাত আর কিছুতেই খাবেক নাই। মিমি দোষে তাকে মারপিট করে। আবার চলতে থাকল সে।

একজন মাঝির একটা দাওয়ায় শুয়েছিল বরকু—লখিয়া এসে তাকে নাড়া দিলে—"এই উঠ্।"

বরকু চমকে উঠল। উঠে বসল। "ক্যারে তু?"

"আমি লখিয়া, চিনতে লারছিস।"

বিস্মিত হ'ল বরকু। "এত রেতে কি বলছিস কি তু।"

"আমাকে লিয়ে চল্ আমি উয়র ভাত খাব নাই। মিমি দোষে মারপিট করে।"

"একজনের বিয়েলি মাগ তু। তোর মরদ ছাড়ে না দিলে লিয়ে যাব কি করে।"

"যা হয় হবেক, চল্ পালিয়ে যাই। তুরও তো মাগ নাই। তুর কাছেই থাকব। তু মাদল বাজাবি, আমি লাচব। বেড়ে মাদল বাজনা তুর।"

"জেয়াতে যখন ধরবেক।"

"দিবি পাঁচ গোলা মদ। আমার জন্যে কিছু খরচ করবি নাই—তবে কিসের ভাব?"

বরকু আর কিছু বললে না। লখিয়া পুনরায় বললে, "উঠ চল্ আবার কেউ উঠে পড়বেক্ এখুনি।"

বরকু উঠানে দাঁড়াল। অভিসারিকার আবেগ নিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরলে লখিয়া, বরকু রোমাঞ্চিত হ'ল, লখিয়ার গালে একটা চুমু দিলে। লখিয়ার একটা হাত ধরল বরকু। ঘরের দিকে চলতে থাকে।...

এই ঘটনাগুলো কয়েক বৎসর পূর্ব্বের। লখিয়ার কথায় এই সব অতীত ঘটনার ছাপমারা স্মৃতিপটের উপর আলোকপাত হ'ল। স্মৃতি-পট-চক্রে ঘুরপাক খাইয়ে বরকু মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলছিল ছবি একটার পর একটা। নির্ব্বাক পথ চলার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে লখিয়া—"তু গুম্ করে চুপ করে গেলি যে বড়।"

"আমি তুকে নিয়ে পালিয়ে আসার সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলম রে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে লখিয়া—"এই এক দিন আর সেই এক দিন। তু তো বাজনা ছেড়েই দিলি এখন। মাদলটা ছিঁড়ে গেইছে। বাগাচ্ছিস নাই। সারাদিন গাধার মত খাটবি—সাঝ লাগলেই মহুয়া পিয়ে বেহুঁস পড়ে রইবি।"

"চিরকাল কি রঙে মেতে থাকলে চলবেক রে পাগলি। তুকে যখন আনলাম কামাই করতে হবেক নাই।"

"কামাই তো করছিসই। মাঝে মাঝে আমোদও করতে হয় তো।"

"পয়সা হলেই আমোদ—শুধু শুধু মাদল বাজালে কি হবেক?"

"হবেক নাই কিছু! তুর বাজনা শুনেই তুর কাছে এইছিলম।"

"এলি তা কি হ'ল! সুখে থাক ভাল খা, ভাল পর। এ বছর একটা গয়না গড়াই দিব তুর। তুর জন্যেই তো এতো খাটছি রে পাগলি।"

লখিয়া আর কিছু বললে না। লখিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে বরকু—"ছারে জংলা আবার সাঙ্গা করেছে।"

"না,—একটা মাদলের দল করেছে সে। তার কাজটা তু লিয়েছিস—তোর কাজটা সে লিয়েছে।"

বাড়ী পৌঁছে গেল তারা। রাঁধা-খাওয়ার ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠল লখিয়া।

গড়ের ডাং-এর মাঝিপাড়া।

জংলার মনিব খোঁজ নিতে এল জংলার। জংলা ঘরের ভিতরে বসে মাদল বাজাচ্ছিল। মাটির ঘর। বাইরের দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা জায়গায় চটাছেড়ে পড়ে গেছে। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বিশ্রী ক্ষত হয়ে আছে যেন। উঠানে এক উঠান ঘাস। তার ওপর আবর্জ্জনা জমেছিল এক রাশ। দাওয়ার সামনে কয়েকটা গাঁদা ফুলের গাছ। যত্নাভাবে বেঁকে পড়ে গেছে। ধুলোতে লুটোপুটি খাচ্ছিল সুন্দর ফুলগুলো। ঘরের চালে একটা ফুটো। একটা আলোর রেখা ঢুকেছে তার মধ্য দিয়ে। আলোকিত ধূলিকণাগুলি ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মনিব ডাক দিলে—"জংলা রইছিস, জংলা!"

"ক্যারে", ঘরের ভিতর হতেই সারা দিলে জংলা।

"আমি রে তোর মনিব। তুই আবার মাদল বাজাতে ধরলি কবে থেকে রে।"

জংলা বাইরে এল। ছোট্ট করে বললে, "ধরলম।"

"কোথায় ছিলি ক'দিন?"

"মাদলের দল লিয়ে গেইছিলম।"

"কাজে যাবি কাল।"

"কাল ঘরে থাকব নাই। বাঁশবেড়ে যেতে হবেক দল লিয়ে।"

"দল লিয়ে তো খুব ঘুরছিস রোজগার-পত্র হচ্ছে কিছু?"

"রোজগার কুথা হবেক। আমোদ হয়, থাকা খাওয়া হয়। পয়সা ক্যা দেবেক?"

"তুই এমন হলি কেন বল দেখি, মাঝিপাড়ার থাকা-লোক ছিলি তুই। ঘরের চালে তোর খড় নাই। ঘর-দোর হয়ে আছে যেন পোড়ো বাড়ী। কাজে তো বাসই না। কি হ'ল কি তোর?"

জংলার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। "কি আর হবেক? হয় নাই কিছু। গাধার খাটালি আর খাটব নাই। একটা প্যাট খেতে আর কত লাগবেক্।"

"তুই আবার বিয়ে কর না। টাকাকড়ি যা লাগে আমি দেব'খন। এমন করে ছন্নছাড়া হয়ে বেড়ালে কি হবে?"

"বিয়ে আর করব নাই মনিব। তুরা জানিস না। আমাদের মেয়েগুলো বড্ড নিমকহারাম। উ শালার জাতকে ঘরে না আনাই ভাল।"

মনিব একটু হাসলে—"লখিয়া তোর মাথাটা খেয়ে দিয়ে গেছে রে। নইলে পাড়ার সেরা খাটিয়ে ছিলি তুই। একেবারে মাটি হয়ে গেলি।"

জংলা আর কিছু বললে না। চালের একটা কোণ হতে কিছু খড় টেনে উনানে আগুন দিলে।

হেসে উঠল মনিব—"একে তোর চালে খড় নাই আবার তুই চালের খড় টানছিস?"

"জালন আনা হয় নি ক'দিন। উ শালার ঘর পড়ে গেলেই ভাল। গাঁ ছেড়ে চলে যাব। উর মায়াতেই যেতে লারছি।"

মনিব ব্যথিত হ'ল। আর কিছু বলল না—চলে গেল।

কিছু দিন পরের কথা।

লখিয়াকে নিয়ে বনে কাঠ কাটতে গেল বরকু।

"এ বছর বেশ খাটালি হইছে কি বল লখি! তুকে এক জোড়া মল গড়াই দিব।"

বনের ভেতরের পথ দিয়ে চলছিল তারা। পথের দু'ধারে ছোট ছোট ঝুঁপি গাছ। অনেক রঙের ফুল ফুটে আছে। কতকগুলো খুবই সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। এদিকে দৃষ্টি পড়েছিল লখিয়ার। আনমনে বললে, "দিস তাই।"

একটা ফুলের গুচ্ছ তুললে লখিয়া। জবা ফুলের মত লাল টক্‌টকে রঙ।

"দেখ মাঝি দেখ। রং যেন কেউ···তাজা লহু ফেলে গেইছে।"

বরকুর দৃষ্টি পড়েছিল একটা মরা শুকনো গাছের ওপর। "আরে ওসব রাখ এখন। তুই দেখ কত বড় একটো শুকনো গাছ। মেলা কাঠ হবেক। তু একবার কুড়ুলটা ধর কেনে, আমি কোমরটা বেঁধে লি।" কুড়ুল ধরলে লখিয়া। ক্ষুব্ধ হ'ল সে।

বরকু পুনরায় বললে—"দেখ লখি, পাড়ার আর কারুকে এ কথা বলিস না। এ কাঠ সব আমরা লিয়ে যাব। মেলা কাঠ হবেক। সারা বছর পুড়িয়েও অনেক বিক্রী করা চলবেক্।"

লখিয়া বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল একটা বনলতার দিকে। লতাটা কেমন এঁকে বেঁকে গাছে জড়িয়ে উঠেছে। মানুষের হাতের মত দু'দিকে দুটো ডাল বেরিয়ে গেছে গাছ থেকে। মাঝখানে গাছের বুকের উপর লতা নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে যেন। লখিয়া লতাটার নিকট গিয়ে তার উপর হাত দিলে। একটু নড়ে উঠল লতাটা।

বরকু ডাক দিলে লখিয়াকে—"উখানে কি করছিস? ইদিকে আয়। কাঠগুলো বেঁধে লে, সাঁঝ লেগে যাবেক।"

"সাঁঝ ত লাগলোই, তুর খেদ মিটুক। তু আরও কাট কেনে। ঘোর কুপী বন, মরবি পথ হারিয়ে।"

প্রকৃতই পথ হারালে বরকু। দু'জনে দু'বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে চলছিল। একটা তেমাথার মোড়ে এসে আর পথ ঠিক করতে পারলে না বরকু। বনপথে আঁধার ঘনিয়ে এল। কাঠের বোঝা দুটো ফেলে দিয়ে বহু কষ্টে বন হতে বেরিয়ে এল তারা। রাত্রি তখন গন্ গন্ করছে। নির্জ্জন প্রান্তর। কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই।

"তুর খুব ভয় করছে লখি?"

"ভয় করলেই আর কি হবেক। একটা কুনো গাঁয়ে যেয়ে উঠি চল। বাও বাতাস লাগবেক।"

গ্রামের উদ্দেশ্যে চলতে থাকে তারা। অনেকক্ষণ চলার পর দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল।

বরকু বলে উঠল, "ইটা একটা গাঁ বটেক রে, আয় তাড়াতাড়ি চলে আয়।"

দু'জনেই চলতে থাকে।

"উঃ আমাকে কিসে কাটলেক রে মাঝি।" কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল লখিয়া।

"উ কিছু লয় কাঁটাখোঁচা হবেক। চলে আয়।"

"বড্ড জ্বালা করছে রে মাঝি।" কেঁদে উঠল লখিয়া, বসে গেল তখনই।

মনে মনে সাপের দেবতাকে প্রণাম করল বরকু—"ইখানে আর কি হবেক, গাঁয়ে চল ওঝা ডাকব।"

লখিয়াকে কোন রকমে ধরাধরি করে গ্রামে নিয়ে এল বরকু। গ্রামের বাইরে একখানা ঘর। গৃহস্বামী আপন মনে মাদল বাজাচ্ছিল। বরকু দরজায় ধাক্কা দিলে—হোই শুনছিস কা আছিস রে ঘরে।"

"কারে কা বটিস তু?"

"আমরা মাঝি বটি গো। কাটি ঘা হইছে আমার মেয়েনের। এক বার দোরটা খোল কেনে।"

গৃহস্বামী দরজা খুলে বাইরে এল।

লখিয়া আর বসে থাকতে পারলে না বাইরে, মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

"ইখানে তুদের গাঁয়ে ওঝা আছে?"

"ভাল ওঝা আছে ইখানে। এই পথে চলে যা। ডাইনের বাঁকে যে ঘরটা আছে উখানে ওঝা আছে। ডাকলেই আসবেক।"

গৃহস্বামীর নির্দেশে ওঝা ডাকতে গেল বরকু। গৃহস্বামী চকমকি ঠুকে একটা লম্প জ্বালালে। আলোটা নিয়ে এল লখিয়ার কাছে—"ঐ কা তু! লখি! লখিয়া।" আলোটা আরও মুখের কাছে নিয়ে গেল—"লখিয়া, লখিয়া,"—চীৎকার করে উঠল গৃহস্বামী।

সমবেদনা জানালে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার হিমশীতল বিবর্ণ ওষ্ঠে কয়েকটা চুমু দিলে। লখিয়ার বিবর্ণ মুখখানা একটু উদ্ভাসিত হ'ল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একটু—কি যেন বলতে চাইছিল লখিয়া, কিন্তু কথা বলতে পারলে না, শুধু কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ থেকে।

ওঝা নিয়ে ফিরে এল বরকু। ততক্ষণ লখিয়ার নিস্পন্দ মৃত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে।

ভারতের উন্নতি কোন্ পথে?

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

একটা কথা হামেশাই শুনতে পাই যে, ভারতকে পাশ্চাত্যের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বর্ত্তমান সমস্যাগুলোকে দেখতে হবে। কেননা নিছক আধ্যাত্মিকতা ভারতের সর্ব্বনাশ করেছে। এই সম্পর্কে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের উপর দোষারোপ করা দেখে মনে হয় যেন বর্ত্তমান যুগে মানুষের বিচারবুদ্ধি হয়ে গেছে আচ্ছন্ন।

আমাদের উন্নতি করতে হলে নাকি চাই পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা। কিন্তু 'পশ্চিম' কি সত্যই শান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছে? তাই আবার কেউ বলেন, শুধু বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে শান্তি নাই, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতার মিলনেই শুধু গড়ে উঠতে পারে একটা আদর্শ সভ্যতা, পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে স্বর্গরাজ্য। কথাটার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আধ্যাত্মিকতা যেন যথেষ্ট নয়, যেন তাতে কোথাও একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এঁরা অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার একটা সমন্বয় ঘটাতে পারলেই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আবার একথাও তাঁরা বলেন, পশ্চিমকে নিতে হবে এই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, সাথে তার বস্তুতান্ত্রিকতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করবে নূতন যুগ, গড়ে তুলবে নূতন পৃথিবী। কথাটা শুনতে হয়ত ভালই লাগে। কিন্তু একটু বিচার করলেই মনে হয় মিলনটা কত দুরূহ ব্যাপার। আধ্যাত্মিকতা জিনিসটা কি? মানুষের অস্তিত্বকে শুধু এ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ না করে চিরন্তনের ভিতর দেখা; জীবন, মৃত্যু এবং তদতীতকে নিয়ে যে সত্য তাকে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়া; দেহাতীত 'আত্মা' বা সত্তার সন্ধান করা এবং সেই সন্ধানী আলোকে অস্তিত্বকে আলোকিত করা—এ সকলই আধ্যাত্মিক দৃষ্টির লক্ষণ। এটা পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতার বিপরীত। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে হয়ত বস্তুপুঞ্জের মূল্য আর পূর্ব্ববৎ থাকে না। জাগতিক প্রতি বস্তুর ক্ষণিকতা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দেয়। আর পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি তো সম্পূর্ণ

বিপরীত; তাতে যে জীবনের প্রতি আগ্রহ, বস্তুর প্রতি আকর্ষণ, বস্তুকে জানবার ও ভোগ করবার প্রয়াস—তা সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরণের।

বিপরীতধর্ম্মী এই মনোভাব দুইটির মিলন কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? একটিতে যথাসম্ভব সত্যকে জেনে জীবনের পথ চলার সচেতন চেষ্টা, অপরটিতে সত্যকে ভুলে তবে জীবন উপভোগ করার প্রয়াস। কাজেই ঐরূপ আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তুতান্ত্রিকতার মিলন অসম্ভব একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তবে ভারতের আজ প্রশ্নই বা কি এবং কেনই বা এই প্রশ্ন? ভারত কি সত্যই আধ্যাত্মিকতাকেই অবলম্বন করেছে? তবে সেই আধ্যাত্মিকতার বিরোধী পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে তার এই লোলুপ দৃষ্টি কেন? ভারতের অভাব কোথায়? জগতেরই বা অভাব কোথায়? বিভ্রান্ত জগতের সমস্যার সমাধান কোন্ পথে? ভারতের "ক পন্থাঃ"।

ভারত তার আধ্যাত্মিকতার জন্যই পিছিয়ে পড়েছে এ কথা সত্য নয়। বরং একথাই সত্য যে, ভারত তার আধ্যাত্মিকতা হারিয়েই জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারত যে বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। বরং এটাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে যুগপৎ তার আধ্যাত্মিকতা এবং বাস্তবজীবন এই উভয় ক্ষেত্রে এই দেশ উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল। অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাচুর্য্যই বাহিরে জীবনের সমৃদ্ধিতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই আধ্যাত্মিকতা তার বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয় নি। এবং বাস্তবজীবন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার গোঁজা মিল দিয়ে ভারত এই আদর্শের সৃষ্টি করে নি। তখন দৃষ্টি ছিল আধ্যাত্মিকতার আলোকে প্রদীপ্ত, লক্ষ্য ছিল এক আর তাই করে তুলেছিল জীবনকেও সুস্থ। আর আজকের দিনের যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার মধ্যে নিহিত আছে আধুনিক ভারতের চিত্তবিক্ষেপ, লক্ষভ্রষ্টতা। ভারতের পক্ষে অধিকতর বাস্তববাদী হওয়ার প্রয়োজন আজ নেই, যতটা আছে ভারতের নিজেকে জানার পুনরায় সেই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যকতা।

আজকের দিনে স্বতঃই এই প্রশ্নটা মনে জাগে যে, প্রাচীনকালে কি প্রকারে ঐ অপূর্ব্ব সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। উত্তরটা সহজ—আধ্যাত্মিকতা তো জীবনের বাস্তব উন্নতির পরিপন্থী নয়। মানুষ জন্মেছে বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি নিয়ে—সকলকে একই ছাঁচে ফেলতে গিয়েই যত গোলযোগ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভেদে মানুষের স্বাভাবিক কর্ম্মভেদ হবেই—তা না হলেই হবে শক্তির অপচয়। আজকের দিনে সকলেই এক পথে চলতে চায়, তাই বিভ্রাট।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

জীবনের আদর্শ যাই হোক্ না কেন, মানুষ একভাবে না একভাবে কর্ম্মকে অবলম্বন না করে পারে না। ভারতীয় আদর্শে কর্ম্মও ভগবদ্মুখী, ভোগমুখী নয়। প্রাচীন ভারতে গুণ অনুযায়ী কর্ম্মের বিভাগ হয়েছিল এবং সেই কর্ম্ম ছিল অধ্যাত্ম জীবনেরই অঙ্গ। তাই অধ্যাত্ম উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব' কথাটি বাদ পড়ে নি। ভারতের উন্নতির পথ জীবনকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে স্বীকারের ভিতর নয়—পুনরায় অধ্যাত্ম জীবনের প্রতিষ্ঠার ভিতর। লক্ষ্য স্থির হলে কর্ম্ম স্বতঃই তার কুটিল পথ ছেড়ে সেই পরম লক্ষ্যমুখী সহজ পথ ধরবে—জীবনের স্রোতস্বিনী আবার প্রাণশক্তিতে বেগবতী হবে—ইহজীবনে সজীবতা আসবে।

ইহাতে হয়ত কতক উন্নত স্তরের সত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তিদের জীবনে লৌকিক অর্থে কর্ম্ম বলতে যা বুঝায় তা কমে যেতে পারে, কিন্তু তাঁদেরই অধ্যাত্ম জীবনের জ্ঞান ও আলোক ছড়িয়ে পড়বে সমাজের প্রতি স্তরে এবং ক্রমোন্নতির পথ করে দেবে সুগম।

যদি কেউ বলেন, 'তবে এ উন্নতির শেষ গতি কোথায়? ক্রমোন্নতির পথে সমগ্র মানব-সমাজ যদি একদিন সত্ত্ব প্রধান হয়ে ওঠে তখন কি উপায় হবে? তখন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র যে অচল হয়ে পড়বে!' এ চিন্তা অলীক। 'কর্ম্ম' আজ যে অর্থে বুঝছি সে অর্থে কর্ম্মের জন্যই কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকে ধরে রাখবার প্রয়োজন নেই। কর্ম্ম তো একটা উদ্দেশ্যকেই সাধন করবে। সমগ্র মানব-সমাজের উন্নতিকে উপলক্ষ্য করে যদি আজকের এই তথাকথিত 'কর্ম্মে'র প্রয়োজনীয়তা কোনকালে শেষ হয়ে যায় এবং সেই কর্ম্মস্রোত চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায় তাতে ক্ষতি কি? মানব-সমাজের অস্তিত্বের সার্থকতাই তো বড় কথা—আজকের কর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখাই তো একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। ভারতের উত্থানের পথ, ভারত কেন জগৎ ও মানব-জাতির উত্থানের পথ—'আধ্যাত্মিকতা' এবং জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্য গুণ অনুযায়ী কর্ম্মকে পন্থারূপে গ্রহণ করা, আর আধ্যাত্মিকতার আলোকে কর্ম্মপথকে আলোকিত করে চির আলোকের পথে চলা। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'!

কবি ভাসের নাট্যপ্রতিভা

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য

প্রাচীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে এমন বহু নগরীর উল্লেখ আছে যেগুলো উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাদের নিয়ে কত কাব্য ও কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সব নগরী জনসাধারণের নিকট জনশ্রুতি অথবা মনোরম কবিকল্পনামাত্রই ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সুদীর্ঘ গবেষণা ও সুকঠোর পরিশ্রমের ফলে খনন-অন্তে হঠাৎ এক দিন এরা লোকচক্ষুর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে সমস্ত সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। নাগরিক সভ্যতার মত কবির কাব্যও অনুরূপভাবে সহস্র বৎসর প র হঠাৎ এক দিন লোকচক্ষুর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে সমস্ত সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছে—এমন নজীর একেবারে বিরল নহে। অন্ততঃ সংস্কৃত সাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারের বেলায় এরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। তিনি হলেন নাট্যকার ভাস।

ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর অতীত হইবার পর মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতিশাস্ত্রী মহাশয় দৈবাৎ দাক্ষিণাত্যে ভাসের তেরখানি নাটকের সন্ধান পান ১৯১০ সনে। যদিও আবিষ্কৃত নাটকসমূহ ভাসের কিনা—এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, তথাপি ভাসের পরবর্তী কবি, নাট্যকার ও আল-ঙ্কারিকদের রচনায় ভাসের নাটকসমূহ হতে উদ্ধৃতি ও আবিষ্কৃত নাটকসমূহের তুলনামূলক বিচার করে পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এদের রচয়িতা নাট্যকার ভাস (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী)। সাগর নন্দী, রামচন্দ্র, গুণচন্দ্র, সারদাতনয় (দ্ব দশ শতাব্দী) তাঁদের নাট্য-শাস্ত্রবিষয়ক পুস্তকসমূহে, ভোজরাজ (১১শ শতাব্দী) শৃঙ্গার প্রকাশে, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকলাবিৎ আচার্য অভিনবগুপ্ত (৯ম শতাব্দী) ভরত-নাট্যশাস্ত্রদীপিকায়, বামন (৮ম শতাব্দী) কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তিতে, ভামহ (৭ম শতাব্দী) কাব্যা-লঙ্কারে, দণ্ডী (ষষ্ঠ শতাব্দী), কালিদাস (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে, কৌটিল্য (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) অর্থশাস্ত্রে নাট্যকার ভাসের বিভিন্ন নাটক হতে শ্লোক বা বাক্য উদ্ধৃত করেছেন অথবা শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিস.বে শ্রদ্ধার সহিত তাঁর নামোল্লেখ করেছেন।

এইমতে ক্রমানুসারে যে সব মনীষীর নাম ও জীবিতকাল উল্লেখ করা গেল, তাতে একথা স্বচ্ছ.ন্দ বলা চলে যে, ভাস খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক। প্রচলিত মত এই—ভাস অজাতশত্রুর পুত্র দর্শকের সমসাময়িক এবং এই দর্শক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই হিসাবে ভাসকে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলে ধরা যেতে পারে। ভাসের নাটকসমূহের নাম যথাক্রমে—(১) স্বপ্নবাসবদত্তা (ষষ্ঠাঙ্ক), (২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ (চতুরঙ্ক), (৩) পঞ্চরাত্র (ত্রয়াঙ্ক), (৪) চারুদত্ত (চতুরঙ্ক), (৫) অভি-মারক (ষষ্ঠাঙ্ক), (৬) প্রতিমা (সপ্তাঙ্ক), (৭) অভিষেক (ষষ্ঠাঙ্ক), (৮) দূতবাক্য (অসম্পূর্ণ), (৯) বালচরিত, (১০) দূতঘটোৎকচ (একাঙ্ক নাটিকা), (১১) মধ্যম-ব্যায়োগ (একাঙ্ক), (১২) কর্ণ-ভার (একাঙ্ক) এবং (১৩) উরুভঙ্গ (একাঙ্ক)।

যদিও স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, চারুদত্ত, অভিমারক এই কয়টি নাটক ব্যতীত সকল নাটকেরই বিষয়-বস্তু রামায়ণ মহাভারত হতে গৃহীত, তথাপি ভাসের নাট্য-প্রতিভার জাদুস্পর্শে গতানুগতিকতার গণ্ডী কাটিয়ে সকল নাটকই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী কবি-নাট্যকারগণের উপর, বিশেষ করে কালি-দাস, ভবভূতি ও শূদ্রকের উপর ভাসের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। কালিদাস ও ভবভূতির কতিপয় শ্লোক ও শ্লোকাংশ ভাসের কয়েকটি শ্লোকের অনুরূপ। শূদ্রকের উপর ভাসের প্রভাব অধিকতর লক্ষণীয়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের কতিপয় শ্লোক ভাসের 'চারুদত্ত' থেকে প্রায় হুবহু উদ্ধৃত। ভাষা ও প্রধান ভাবসমূহের সাদৃশ্যও উভয়ের মধ্যে খুবই বেশী।

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে সাধারণ অভিযোগ এই যে, কাব্য হিসাবে নিখুঁত হলেও এগুলো রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী নয়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি মুষ্টিমেয় নাটক ক'খানির কথা ছেড়ে দিলে সংস্কৃত নাটকমাত্রই শ্রব্যনাট্য ("Book-drama") মাত্র। কিন্তু হয়ত অনেকেই জানেন না যে, ভাসের নাটক সম্বন্ধে একথা খাটে না। ভাসের প্রায় প্রত্যেকটি নাটক বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও প্রস্তুতিতে, আঙ্গিকের উৎকর্ষে, চরিত্র সৃষ্টিতে ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার চিহ্ন বহন করে। বিশেষতঃ অভিনয়োপযোগিতার প্রশ্ন সর্বদা সম্মুখে রেখে স্বল্প পরিসরে রসোত্তীর্ণ নাটকের সৃষ্টি ভাসের নাট্যপ্রতিভার উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ভাসের নাটকসমূহ তাঁর পরবর্তী নাট্যকারদের নাটকসমূহের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। কালিদাস-ভবভূতির নাটকসমূহ কাব্যহিসাবে যতই নিখুঁত হউক না কেন, তাদের

পরিবর্তন-পরিবর্জন না করে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগ শুধু কষ্টসাধ্য নয়, প্রায় অসম্ভব। শ্রোতাদের অবসর ও ধৈর্যচ্যুতির প্রশ্নও এ প্রসঙ্গে অবশ্য-বিবেচ্য। কিন্তু ভাসের নাটকসমূহের প্রধান গুণ এই যে, স্বল্প পরিসরে সহজ ভাব, ভাষা ও বর্ণনার মাধ্যমে তিনি নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন, যা সহজেই দর্শকের চিত্ত জয় করে। ভাসের নাটকসমূহ প্রকৃত নাট্যগুণসম্পন্ন, প্রাণবন্ত ও ঘটনাবহুল। ভাবের অভিনবত্ব, সংলাপের সরসতা, ঘটনার সংঘাত, প্রাণবান চরিত্র চিত্রণ—এককথায় সফল নাটকের প্রায় সব উপাদানই ভাসের নাটকে বিদ্যমান।

আজকাল মহাকাব্যের রসাস্বাদনের সময় ও সুযোগ অতি অল্প। লোকের জীবন বর্তমানে সমস্যাসঙ্কুল। সুবৃহৎ কাব্য-উপন্যাস পাঠের বা সুদীর্ঘ নাটকের অভিনয় শ্রবণ ও দর্শনের মত অবসর এবং ধৈর্য খুব অল্প লোকেরই আছে। এই জন্যই মনে হয়, একাঙ্ক নাটিকার সৃষ্টি। ইংরেজী সাহিত্যে একাঙ্ক নাটিকা স্বল্পপরিসরে নাটকীয় রসসৃষ্টি ও পরিবেশনে খ্যাতি অর্জন করেছে। বড় আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এক নাট্যকার কয়েকটি একাঙ্ক নাটিকা রচনা করেছিলেন। অথচ সে যুগে না ছিল লোকের অবসরের অভাব, না ছিল বর্তমানের অতিব্যস্ততা। অল্প সময়ে দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও পাত্র-পাত্রীর বাহুল্য ব্যতিরেকে জনসাধারণের অবসর বিনোদনের জন্য হয়ত নাট্যকার এগুলি রচনা করেছিলেন। যাই হউক, দূত ঘটোৎকচ, মধ্যম-ব্যায়োগ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ—এই কয়টি ভাসের একাঙ্ক-নাটিকা। এর সব কয়টিই অল্প সময়ে সামান্য কয়েকজন পাত্র-পাত্রীর সাহায্যে অভিনয়যোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ডক্টর ভিন্টারনিজ ভাস সম্বন্ধে বলেছেন,

"The author must have been a great poet and above all a dramatic genius. Kalidas and Bhababhuti may be greater poets, greater masters of language than the author of these plays, but I know in the whole of Sanskrit literature no drama that could compare as stage-play with anyone of the thirteen plays ascribed to Bhasa. All the classical dramas are more or less book-dramas, while these plays are one and all the works of a born dramatist wonderfully adapted to the stage."

এর চেয়ে উত্তম প্রশস্তি আর হতে পারে কি?

"আমি ভাল আছি"

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভারত-সীমান্ত সফর করিয়া ফিরিতেছিলাম। সারাদিন দুর্দান্ত গতিতে 'জীপ'-রথ চলিয়াছিল পথ-বিপথ নির্বিচারে; অপরাহ্ণে আসিয়া গতিরুদ্ধ হইল মাজদিয়া ষ্টেশনে। কলিকাতার গাড়ীর তখনও তিন ঘণ্টা দেরি।

ষ্টেশনের বিশ্রামাগার নামক কারাকক্ষে বসিয়া আইঢাই করিতেছিলাম। বিশ্রামাগার জনশূন্য। ওদিকের প্ল্যাটফর্মের উপর জনকতক দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষ কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে আর প্রভূত মূল্যহীন লটবহর লইয়া বসিয়া আছে। হয়ত নবাগত উদ্বাস্তু—যমালয়ের প্রথম সিঁড়িতে আসিয়া এইমাত্র পদক্ষেপ করিয়াছে। যে জ্ঞানের আলোকে মানুষ ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে বিভিন্নতা দূর হইয়া যায় সে আলোকের আমি অধিকারী।...কিন্তু সে কথা থাক।

একটু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, আর পিপাসারও। সঙ্গে খাবার বা পানীয় কিছুই নাই, কারণ মাজদিয়ায় দেরি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি নাই।

কিছুক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করিতেছিলাম, একটি আট-নয় বৎসরের ছেলে বিশ্রামাগারের জানালা দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। ছেলেটি যে কিছুকাল পূর্বে সুশ্রী ছিল তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু অধুনা শীর্ণ ও শুষ্ক। হয়ত ম্যালেরিয়ার রোগী। পরনে একটা ময়লা খাকী হাফপ্যাণ্ট—কয়েক সাইজ বড়। গায়ে একটা সস্তা ছিটের হাফশার্ট—অপেক্ষাকৃত ফর্সা, কিন্তু অত্যন্ত জীর্ণ; পিঠের দিকের খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। চুল অবিন্যস্ত, পদ নগ্ন। তবু কচি মুখখানা ও সরল চক্ষু দুইটির একটা মাদকতা আছে। দেখিলে আদর করিতে ইচ্ছা করে—তবে ভয় হয়, পাছে সাহায্য চাহিয়া বসে!

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ছেলেটিকে ইসারায় ডাকিলাম। নিছক প্রাণের টানে নয়—কিঞ্চিৎ স্বার্থের খাতিরে। ষ্টেশনের খাবারওয়ালাকে এদিকে-ওদিকে দেখা যাইতেছিল না। সুবিধা হইলে ছেলেটিকে দিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিব এই আশা। ভুক্তাবশিষ্ট কিছু ছেলেটিকে দিয়া নিজের মনের তৃপ্তি আর তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার ইচ্ছাও যে ছিল না তাহা নহে।

ছেলেটি কাছে আসিল। বলিলাম, খোকা, ষ্টেশনের খাবারওয়ালাকে দেখিয়াছ ?

আজ্ঞে হাঁ, সে ত আমারই গ্রামের লোক। সম্পর্কে দাদা হয়।

নিমেষমধ্যেই বুঝিলাম ছোকরার উঁকি-ঝুঁকির অর্থ। খদ্দের সংগ্রহ। তা দোষ কি ? তবে তাহাকে ভুক্তাবশিষ্ট কিছু দিবার বাসনা সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল।

কিছু খাবার ও পানীয়ের অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণ পরে পরিষ্কৃত পাত্রে সে খাদ্য ও পানীয় আনিয়া উপস্থিত করিল। সমস্ত জিনিষ যথাসাধ্য সুসজ্জিত করিয়া আনিবার প্রয়াস দেখিয়া মনে হইল, ছেলেটা এখনি বকশিশের দাবি করিবে। বকশিশের কথা ভাবিতেই মনটা বিষাইয়া গেল। ব্যবসায়ীর পোয়াবারো। জিনিষপত্রের দাম এমনিই অগ্নি-তুল্য ; তাহার উপর আবার বকশিশ !

ছেলেটাকে যথাসত্বর বিদায় দিবার জন্য খুচরা পয়সায় তাহার সমস্ত দাম চুকাইয়া দিলাম। টাকা ভাঙাইতে গেলে হয়ত কিছু বকশিশ দিতে ইচ্ছা হইতে পারে ভাবিয়া আর সে পথ দিয়া গেলাম না। কিন্তু যা ভাবিয়াছি তাই। ছেলেটা নড়ে না। পয়সা তুলিয়া লইয়াও সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীটিও চমৎকার আর মুখখানাও সরস, কিন্তু নিরর্থক অর্থব্যয়ের কথা ভাবিয়া সেদিকে বেশী নজর দিতে সাহস হইল না। তথাপি কিছু না বলিলে নয়। বলিলাম, কি হে, আবার কি ?

—আজ্ঞে, আমার একটা কাজ করিয়া দিবেন ?

এ যে বকশিশেরও উপরে ! ছেলেটা কাজ চায়—কি আবদার। মনে হইল, জোরসে বলি, 'ভাগো হিঁয়াসে'। বিরক্তির স্বাভাবিক ভাষা। কিন্তু কি মনে করিয়া চাপিয়া গেলাম ; বলিলাম, আজকাল কাজ কি আর সহজে মিলে ?

— আজ্ঞে তা নয়।

—তবে ?

—আমার একখানা চিঠি লিখিয়া দিবেন ? মার কাছে—অনেক দিন তাঁর কাছে চিঠি লিখি নাই।

মেজাজটা পড়িয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা। ছেলেটি সহাস্যে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। বলিল, 'পোষ্টকার্ট' নিয়া আসি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিল। তাহার প্যাণ্টের পকেটে একখানা পোষ্টকার্ড। আমি বলিলাম কেন, তোমার চিঠি লিখিবার লোক এখানে মিলে না নাকি ?

—আজ্ঞে মিলে। তবে জানাজানি হইয়া যায়। তাহা হইলে চিঠিও ডাকে যায় না—আমিও বেদম মার খাই।

ব্যাপারটা তখন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু পরে বুঝিলাম।

সে চুপি চুপি অনেক কথা বলিল। সব যে সে গুছাইয়া বলিতে পারিল এমন নহে। যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, আজ ছয় মাস যাবৎ সে বাড়ীছাড়া। বাড়ী তাহার বরিশাল জেলার এক গ্রামে। সেখানে তাহাদের এক শত সুপারি আর দুই শত নারিকেল গাছ আছে। বাবা নাই—মা আছেন। দুই বড় বোন আছে তাহাদের বিবাহ হইয়া অনেক দূর-দেশে চলিয়া গিয়াছে। মা এখনও দেশেই আছেন। গ্রামের স্কুল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় গ্রামের সম্পর্কে এক দাদার সহিত মা তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। সেই গ্রাম-সম্পর্কে দাদা তাহাকে এখানকার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন, ইহাই ছিল ব্যবস্থা। ইহার জন্য মা তাহাকে কিছু টাকাও দিয়াছিলেন। সেই দাদা এখানে খাবারওয়ালার সঙ্গে কাজ করে আর আজ ছয় মাস যাবৎ তাহাকেও তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে হয়। হাঁ, সমস্ত কাজই তাহার করিতে হয় ; চায়ের বাসন ধোয়া, চা তৈরি করা, চা পরিবেশন করা এমন কি বাড়ীতে রান্না করিতেও সাহায্য করা। না, স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া আর হয় নাই আর ইতিমধ্যে তিন বার জ্বর হইয়া গিয়াছে। সে বিষম জ্বর।

সে নিজে চিঠি লিখিতে পারে না। আবার এখানকার অন্য কাহাকেও দিয়া এ খবর মার কাছে লিখাইতে পারে না। একবার রেলের মালবাবুকে দিয়া লিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দাদাকে বলিয়া দেন। তাহার ফল হইয়াছিল ভয়াবহ।

নির্ব্বিকারচিত্তে বালকের কাহিনী শুনিয়া গেলাম। গ্রামের সম্পর্কে দাদাটি অবশ্য জঘন্য চরিত্রের লোক ; কিন্তু আমিই বা কি করিব ? এরূপ নির্দ্দয়তা ও স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত ত রোজই কত চোখে পড়ে। তাহার উপর ছেলেটিই যে সত্য কথা বলিয়াছে তাহার স্থিরতা কি ? অন্য পক্ষের কথা না শুনিয়া ত আর বিচার করা যায় না। অবশ্য ছেলেটির মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু নিশ্চিত করিয়া কে বলিতে পারে ?

কিন্তু কথা যখন দিয়াছি তখন চিঠিটা লিখিয়াই দিতে হইবে। তবে এত বড় একটা পাঁচালি কি ছোট পোষ্টকার্ডে ধরে ; না অত বড় চিঠি লিখিবার কোন সার্থকতা আছে ?

নির্ব্বিচারে কয়েক ছত্র লিখিয়া দিলাম। ছেলেটির মনের কথা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আমার ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। মোটামুটি লিখিলাম, এখনও স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া হয় নাই, আর জায়গাটাও তত ভাল নহে। ভাবিলাম, ছেলেটির

মাকে আর বেশী ব্যতিব্যস্ত করিয়া লাভ কি? তাই পরিশেষে বড় বড় অক্ষরে লিখিলাম, আমি ভাল আছি—ইতি খোকা।

ইতিমধ্যে গাড়ী প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। চিঠির ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় কাহারও সে খেয়াল নাই। একটা হৈ হৈ শব্দ হইতেই চিঠিটা হাতে লইয়া ছেলেটি দৌড়াইয়া চলিয়া গেল; গাড়ী আসিবার পূর্ব্বে তাহার অনেক জিনিষ ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে—চায়ের জল, চায়ের বাসন, খাবারের ডিস। নহিলে বহুল পরিমাণে তাড়না অনিবার্য্য।

ছেলেটি চলিয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা সোরগোল উঠিল। মল্ গিয়া, গেল গিয়া—'আহারে' বলিয়া কয়েকজন ছুটাছুটি করিতে লাগিল; গাড়ীর শব্দ, ফেরিওয়ালার চীৎকার, কুলীর হৈ-চৈ সব একসঙ্গে মিলিয়া তালগোল পাকাইয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, প্ল্যাটফর্ম্মের এক স্থানে বেশ বড় ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ওদিক হইতে পুলিসের দারোগাবাবু আসিতেছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? উত্তর হইল, বলেন কেন, অ্যাক্সিডেণ্ট—অই খাবারওয়ালার ছোঁড়াটা। কানা, মশাই কানা—গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে তবুও লাইন পার হইয়া দোকানে যাওয়া চাই।

সোজা ভিড়ের কাছে চলিয়া আসিলাম। ছেলেটার রক্তাক্ত, প্রাণহীন দেহ প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া আছে; বুকের পকেট হইতে পোষ্টকার্ডখানা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'আমি ভাল আছি।'

বিশ্ব-শান্তি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বিগলিত রক্ত মুখে, চোখে অশ্রুধারা,
বনের ব্যাঘ্র ব্যগ্রকণ্ঠে কহে আত্মহারা,
শান্তি শান্তি শান্তি, বন্ধু, জপ নিরন্তর,
মুক্তি পাবে, বিশ্বে কিছু নাহি এর বাড়া।

লক্ষ লক্ষ রক্তপায়ী-বেয়নেটের ফলায়,
শীতল শান্তি ফুটে ওঠে পূর্ণ ষোল কলায়,
ভজ শান্তি, নহে মৃত্যু, তীক্ষ্ণকণ্ঠে তারা
স্তব্ধজিহ্ব ত্রস্ত জীবে শান্তি-মন্ত্র বলায়।

রাইফেল আর হাউইটজার আর মেশিন গানের মুখে
অন্য কোন কথা নাহি, শব্দারিত সুখে
কেবল বলে, শান্তি চাহি, অন্য গতি নাহি,
যে বলে 'না' তাহার দিকে ফিরে দাঁড়াই রুখে।

ঊর্দ্ধে বিমান ঘর্ঘরিয়া শান্তি প্রচার করে,
শান্তি বাজে সিন্ধুতলে সাবমেরিনের স্বরে,
ল্যাণ্ড মাইনের বিস্ফোরণে শান্তি ফুটে ওঠে,
স্তম্ভায়িত জলোচ্ছ্বাসে শান্তি ফেটে পড়ে।

ব্রেনগান আর ষ্টেনগানেরা শান্তির গান গাহে,
গোলাগুলির করতালি বলে 'বাহ্, বা-হে'।
শান্তি আসে ঊর্দ্ধশ্বাসে লৌহবর্ম্ম রথে,
শান্তি বিস্তারিয়া পড়ে দারুণ বহ্নিদাহে।

রাষ্ট্রনীতির ধুরন্ধর সব করে কানাকানি,
যুদ্ধ-দ্রামে স্পন্দিত হয় শান্তিভরা বাণী।
অস্ত্রাগারে পুঞ্জীভূত শস্ত্র সংখ্যাতীত,
প্রলয়গর্ভ ভয়ঙ্করের বাহন তারা জানি।

বিস্ফুটিত পরমাণুর লক্ষ ডিগ্রী তেজে
মুহূর্ত্তে যে অন্তবিহীন শান্তি ওঠে বেজে!
সব কোলাহল স্তব্ধ করে চিরনীরবতা;
আকাশ ভেঙে এল নেমে—শান্তির দূত সে যে!

হিরোসিমা নাগাসাকির উন্মুক্ত প্রান্তরে,
এখনো যে ফিরে বেড়ায় বায়ু হা-হা স্বরে।
প্রাণের চিহ্ন খোঁজ কোথায়? দগ্ধ মরুভূমি,
চিরশান্তি বিরাজ করে নির্জ্জন-নগরে।

যুক্ত-জাতি পরিষদের যুক্তি মনোগ্রাহী,
স্থায়ী শান্তি ভিন্ন তাদের অন্য চিন্তা নাহি,
হাইড্রোজেনের বোমায় শান্তি-বার্ত্তা বিঘোষিত,
আর্ত্ত মানব রুদ্ধকণ্ঠে ডাকে পরিত্রাহি।

হোয়াইট-হাউস আর ক্রেমলিনের ওই উচ্চতম চূড়ায়।
সজ্জনেরা পত পত শান্তি নিশান উড়ায়।
মহাকালের বিষাণ বাজে, এগিয়ে চলে রথ,
সভ্যতার সেই চক্রতলে মানবতা গুঁড়ায়।
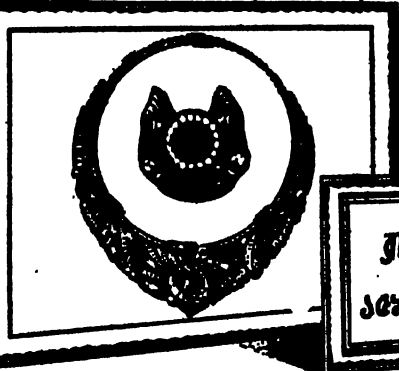
বায়ুর সাম্যকরণ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

বায়ুতে চারিটি প্রধান গ্যাস আছে। তন্মধ্যে জল-বাষ্প একটি। বায়ু যে-কোন পরিমাণ বাষ্প ধারণ করিতে পারে না। প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এরূপ চমৎকার যে, ইহার ক্ষমতার অতিরিক্ত বাষ্প বায়ুতে জমা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ শিশির-বিন্দু, কুয়াশা বা বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করে। এই বাষ্প ধারণ করিবার ক্ষমতার সঙ্গে তাপেরও যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। ৫০° ডিগ্রিতে (ফেরানহাইট) এক ঘনফুট—বায়ু মাত্র ৪°১৭ গ্রেন বাষ্প রক্ষণ করে। তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বাষ্প-ধারণশক্তি বৃদ্ধি পায়। ৭০° ডিগ্রিতে এক ঘনফুট বায়ু ৭·৯৮ গ্রেন বাষ্প রক্ষণ করে। একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় বায়ু যতটা বাষ্প রক্ষণ করে তাহাকে বলা হয় বায়ুর পরম আর্দ্রতা (absolute humidity)। অবশ্য ধারণ করিবার ক্ষমতা যাহাতে বেশী হইতে পারে—এই যে চরম ক্ষমতা তাহাকে বলা হয় চরম আর্দ্রতা (capacity to hold the maximum)। একটি পাত্রের জল ধারণ করিবার চরম ক্ষমতা এক সের, ইচ্ছা হইলে ইহাতে আমি আধ সের জল রাখিতে পারি। বায়ুতে বাষ্প সম্বন্ধেও অনুরূপ অবস্থা বিবেচনা করা যায়—তখন বায়ুর পরম আর্দ্রতা আধ সের ও চরম আর্দ্রতা এক সের। এই আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) ব্যবহার করা হয়। ইহা আর কিছুই নহে—চরম আর্দ্রতা ও পরম আর্দ্রতার ভাগফল।

তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং তাপহ্রাসের সঙ্গে ইহা বৃদ্ধি পায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমিলে বায়ু বেশ শুষ্ক হয়, কিন্তু ইহা বৃদ্ধি পাইলে বায়ু অত্যন্ত আর্দ্র হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ১০০ হইলে শিশিরবিন্দু পড়িতে থাকে, কিন্তু তদতিরিক্ত হইলে শিশির জমিয়া বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি খুব বেশী হয় তবে গ্রীষ্মকালের গরম এবং শীতকালের ঠাণ্ডা দুই-ই অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং বায়ুতে অতি মাত্রায় বাষ্প মোটেই আরামপ্রদ নয়। স্বাস্থ্যকর, উপভোগ্য আবহাওয়া নির্ভর করে অনেকটা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপের উপর।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৬০ ভাগের নীচে যায় তখন ঘাম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি উড়িয়া যায় এবং আমাদের দেহ বেশ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা থাকে। এই অবস্থায় আমরা গরমও কম বোধ করি। কারণ ঘাম দ্রুত বাষ্পাকারে পরিণত হওয়ায় শৈত্যের উৎপত্তি হয়। আবার আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি শতকরা ৬০ ভাগের ঊর্দ্ধে যায় তবে ঘাম সহসা বাষ্পাকারে পরিণত হয় না, ফলে চামড়া সিক্ত ও আঠালো থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর গরম বোধ হয়। এ সমস্ত দেখিয়া মনে হয় শতকরা ৪০ হইতে ৬০-এর মধ্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা রক্ষা করিতে পারিলে মানুষ বেশ আরামে বসবাস করিতে পারে।

পূর্ণবয়স্ক একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ বৎসরে প্রায় ১ টন খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তাহাকে ৬০ টনের অধিক বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়। আমরা সব সময়ই খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সাবধান। আমাদের খাদ্যাদি অতি যত্নে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিশেষ পরিস্রুত জল আমরা সদাসর্ব্বদা পান করি। কিন্তু যে বায়ু দেহমধ্যে খাদ্যাপেক্ষা ৬ গুণ বেশী প্রবিষ্ট হয় সেই বায়ু সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। কলিকাতা শহরের বায়ু কিরূপ দূষিত গ্যাসদ্বারা জর্জ্জরিত তাহা সম্ভবতঃ কাহারও অজানা নাই।

এ সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বায়ুর দিকে পতিত হইয়াছে। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বায়ুকে বস্তুতঃ চারিটি সুসংসিদ্ধ অবস্থায় আনিতে পারিলে আমরা উৎসাহবর্দ্ধক, সুখকর, কার্য্যকরী আবহাওয়া পাইতে পারি। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, শীতকালের বায়ু যথোপযুক্ত উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালের বায়ু তদনুরূপ শীতল হইবে। অবশ্য মানুষ সব রকম অসুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং করিতেছে। তাহারা অতিরিক্ত শীত ও অতিরিক্ত গরম সহ্য করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু অত্যধিক গরম ও শীত যে কার্য্যকরী ক্ষমতার উপর আঘাত করে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখা গিয়াছে, যদি তাপমাত্রা ৬৫° ডিগ্রি হইতে ৭৫° ডিগ্রির মধ্যে থাকে তবে কার্য্যক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর এরূপ তাপমাত্রা আরামপ্রদও বটে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্বন্ধে। যদি আপেক্ষিক আর্দ্রতা খুব বেশী হয় (শতকরা ৬০ বা ৭০ ভাগের উপরে) তবে বায়ু হইতে কিঞ্চিৎ বাষ্প হ্রাস করিতে পারিলে ভাল হয়। আবার আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৩০ ভাগের নিম্নগামী হইলে বড়ই অস্বস্তির কারণ

হয়। এমতাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে কতকটা বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত করিলে আমাদের পক্ষে সুখকর হয়। কাজেই বায়ুর আর্দ্রতার সমতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

তৃতীয় ব্যবস্থায় বায়ুকে সম্পূর্ণ দূষিত গ্যাস বা জীবাণু হইতে মুক্ত করা দরকার। এই সমস্ত অপকারী গ্যাস বায়ুতে অবস্থান করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের স্বাস্থ্যহানি করিতেছে। এজন্যই বড় বড় শহরের হাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দোষযুক্ত এবং শহরবাসীদের মধ্যে ফুসফুসের ব্যাধি বেশী।

চতুর্থ ব্যবস্থায় স্তব্ধ বায়ুকে সঞ্চরণশীল করিবার আয়োজন হইয়াছে। স্তব্ধ বায়ুকে বদ্ধ ডোবার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বায়ু স্তব্ধ হইলে আমরা বলি গুমোট ভাব হইয়াছে। এমতাবস্থায় ঘর্ম্মের বাষ্পীভবন বন্ধ হইয়া যায় এবং নানা প্রকার অসোয়াস্তি উপস্থিত হয়। সুতরাং যাহাতে আমাদের গৃহে সদাসর্ব্বদা বায়ু সঞ্চারিত হয় তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

বায়ুর উক্ত চারিটি সমস্যা অপনোদনের জন্য বর্ত্তমানে বায়ু-সাম্যকরণ নামে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত তাপ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং মৃদু সঞ্চরণশীল পরিশ্রুত বায়ুর প্রতিষ্ঠাই এই আয়োজনের কেন্দ্রে অবস্থিত। সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের ঘরবাড়ী, হোটেল, রেলগাড়ী, আপিস, স্কুল প্রভৃতি উক্ত তাপ, আর্দ্রতা ও বিশুদ্ধ বায়ুর সাম্যাবস্থা পাইয়া ধন্য হইয়াছে। কিন্তু আজও ইহা এত মহার্ঘ যে, ঘরে ঘরে বা গরীব দেশে ইহার প্রচলন সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের দেশেও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের ঘরবাড়ী, সিনেমা হল, সরকারের আপিস ইত্যাদি এই 'এয়ার কণ্ডিশনে'র ব্যবস্থা পাইয়া খুবই আরামপ্রদ হইয়াছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে আমরা সাধারণ মানুষও এ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

—

বাংলা প্রবাদ—শ্রীসুশীলকুমার দে সম্পাদিত। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য কুড়ি টাকা

প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ, সুমুদ্রিত এবং সুপরিকল্পিত সংগ্রহ-গ্রন্থখানি অশেষ ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করে। এরূপ সঙ্কলন অল্পায়াসসাধ্য নয়, ইহা যে বহু বৎসরের নিয়মিত পরিশ্রমের ফল তাহা সহজেই অনুমেয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। গবেষণাক্ষেত্রে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি প্রবাদ-সঙ্কলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ধরণের সংগ্রহ নূতন নয়। বাংলা ব্যাকরণের মত বাংলাপ্রবাদ-সংগ্রহেও সাহেবেরা অগ্রণী। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবজার্ভারে' মর্টন বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন করেন। ইহার তেত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত লং সাহেবের "প্রবাদমালা" এই সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তারপর এই কার্য্যে অনেকেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তবে সেই সব চেষ্টা সম্পূর্ণ এবং সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। অধ্যাপক সুশীলকুমারের প্রচেষ্টা "বাংলা প্রবাদে" সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

এখানি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। পরবর্ত্তী সংস্করণ বলিতে যাহা বুঝায় গ্রন্থখানি তাহা নয়। ইহা অনেক বিষয়ে অভিনব। সাড়ে ছয় হাজারের স্থলে বর্ত্তমান গ্রন্থে নয় হাজারের অধিক প্রবাদবাক্য বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাসঙ্গিক ছড়া ও চলিত কথাও বাদ পড়ে নাই। আমূল পরিশোধিত হইয়া গ্রন্থখানি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তবুও গ্রন্থকার ইহাকে চূড়ান্ত সংগ্রহ বলিয়া দাবি করেন নাই। বহু ক্ষেত্রে উদাহরণ প্রবাদের অর্থকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন যুগের বাংলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন রচনা হইতেই অধিকাংশ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার উপর অনেক স্থলে গ্রন্থকার টীকা-টিপ্পনী দিয়া দুরূহ শব্দ ও ভাবের অর্থ বুঝাইয়াছেন। পরিশিষ্টে অতিরিক্ত প্রবাদ, খনার বচন এবং প্রমাণপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী বইখানির মূল্য বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। শুধু সাধারণ পাঠকের পক্ষে নয় যাঁহারা ভাষা লইয়া আলোচনা করিবেন তাঁহাদের পক্ষেও এই শব্দসূচী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্রমিক সংখ্যা দিয়া প্রথম শব্দের বর্ণানুক্রমে প্রবাদগুলি সাজানো হইয়াছে। পুনরুক্তি যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া রূপান্তর এবং পাঠান্তরগুলিও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান। নব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যপূর্ণ ভূমিকার প্রথমে সাধারণভাবে প্রবাদপ্রসঙ্গ আলোচনা এবং তাহার সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া পরে গ্রন্থকার বিশেষভাবে বাংলা প্রবাদের বিচার করিয়াছেন। প্রবচনের সাহায্যে প্রাচীন বাঙ্গালী গৃহের যে কথা-চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তথ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহা কথা-সাহিত্যের মতই হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থকার শুধু পণ্ডিত নন, রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সহজ জ্ঞান এবং মাত্রাবোধ প্রখর। তাই প্রবাদগুলি সুনির্ব্বাচিত। অযথা ভারাক্রান্ত না করিয়া, সেই পরিমাণবোধ পুস্তকখানিকে সংহত ও সুবিন্যস্ত করিয়াছে। ইহা প্রবচনের অভিধান নয়। অভিধানের সহিত এইরূপ সাহায্যগ্রন্থের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শব্দকোষে শব্দগুলি স্থাণু, সাহিত্যে বা আলাপে তাহা সচলতা লাভ করে। প্রবাদের মধ্যে শব্দ গতিশীল। সাহিত্যের মতই প্রবাদ-প্রসঙ্গে জাতির জীবনের পরিচয় পাই। সুপরীক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য এই সংগ্রহ ভাষা এবং সমাজ-তত্ত্ববিৎকে প্রচুর সাহায্য করিবে। শব্দকোষের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শ ভিন্ন হইলেও, কালে গ্রন্থখানি বাংলা অভিধানের মতই অপরিহার্য্য এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ঝড় (দ্বিতীয় খণ্ড)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক : শ্রীঅশোক গুহ। ভারতী লাইব্রেরী। ১৪৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৩৷০।
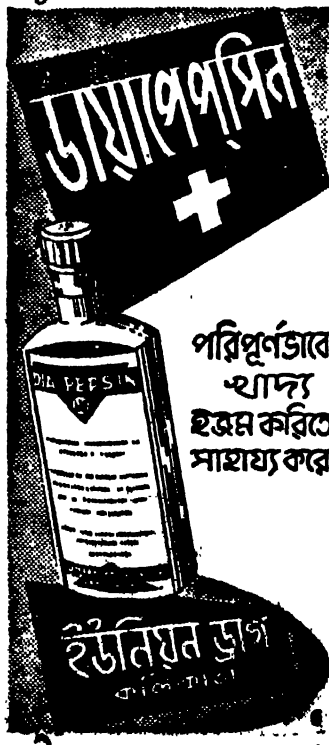
সমালোচ্য পুস্তকখানি ষ্টালিন্‌ পুরস্কারপ্রাপ্ত পৃথিবীখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। এখানি "ষ্টর্ম"-এর মূল বিরাট গ্রন্থের একটি অংশের অনুবাদ মাত্র। কিন্তু এমন এক স্থানে ইহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে যাহাতে পাঠক মনে পরবর্ত্তী খণ্ডের জন্য রীতিমত ঔৎসুক্য জাগিয়া থাকে। পুস্তকখানি বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত। ইহাতে যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যে মানবমনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির ধারা কোথাও ব্যাহত হয় নাই, বরং ইহার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য নানা পরিবেশের ভিতর দিয়া আরও বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশোকবাবু অনুবাদে নিপুণহস্ত। বর্ত্তমান পুস্তকখানিও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ভাষায় এই সাবলীল অনুবাদ-গ্রন্থখানি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

ঊর্দ্ধগামী—শ্রীসুবোধ বসু। গ্রন্থাগার, পি. ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৩৮। দাম ৩৲।

সামাজিক উপন্যাস। স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে লইয়া কাশীপতির সংসার। কাশীপতি কেরানী। কায়ক্লেশে দিন চলে। বড় ছেলে বিদেশে স্ত্রীসহ বাস করে। সে পিতাকে সাহায্য করিতে অক্ষম। এক ছেলে মোটর মেকানিক আর একটি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির—বাড়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। মেয়ে দুটি বিবাহযোগ্যা, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। বড়টি শান্তস্বভাব, ধীর স্থির। পিতার অবস্থা সে বোঝে, কিন্তু ছোটটি দেয় অনুযোগ। দৃষ্টি তার উপরতলার প্রতি—ঘটনাচক্র তাকে এক দুর্নীতিমূলক পরিবেশের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়। উমার নারীধর্ম্ম হয় লাঞ্ছিত। শেষ পর্য্যন্ত আত্মগ্লানিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং আত্মহত্যা করিয়া সে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল। মোটামুটি কাহিনীটি এইরূপ।

বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে, বহু ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উপন্যাসখানির রস জমিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকে দুইটি সুর। একটিতে মিলনের আনন্দ, অপরটিতে বিয়োগের বেদনা। কিন্তু সবার ঊর্দ্ধে স্থানলাভ করিয়াছে জীবনাদর্শ—যে আদর্শ জীবনকে করিয়াছে ঊর্দ্ধমুখী।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শমনদূত—শ্রীতারাপদ ঘোষ। বুক ষ্টোর, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

শমনদূতের ভ্রমণচ্ছলে উত্তর-ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা—ক্ষুদ্র কাব্যাকারে রচিত। রচনাভঙ্গী মন্দ নয়।

প্রলাপ—শ্রীআনন্দ বাগচী। সাহিত্যচক্র। ১০৫ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, মূল্য চারি আনা।

দুঃখের অভিনয় সাহিত্যে ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইতেছে। কি জানি, হয়ত বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। ভূমিকায় 'বড়াই করি নে' বলিয়া কবি জানাইয়া রাখিয়াছেন যে কল্পনাবিলাসীদের তিনি 'থোড়াই কেয়ার' করেন; বলিয়াছেন, "বুকের ব্যথাই মুখের প্রলাপ, কি হবে কলম ঢেকে?" কিছুই হইবে না। কিন্তু সত্যকার বুকের ব্যথায় ভাষা এমন 'মুমূর্ষুর'র প্যাঁচ কষিতে সুরু করে না। 'বীণাদি'কে যখন কবি শুনাইতে আরম্ভ করেন—

"পুষ্যলক্ষ সে জীবন বৈজ্ঞানিক বীভৎস বন্ধনে

* * *

বাঁচার ব্যাসার্দ্ধ নিল ঘৃণিত আংশিক ঠিকানায়

* * *

প্রথম প্রার্থনা এলো কুৎসিত জুগুপ্সা ফেলে দিয়ে

* * *

শুনাবে না নিরেট মার্জ্জিনে

সমাধিস্থ জীবনের করুণ ক্রন্দন কথিকায়"

তখন বীণাদি'র কি অবস্থা হয় জানি না, আমাদের বুকের মধ্যে 'করুণ ক্রন্দন' মোচড়াইয়া উঠিতে থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিতোর—শ্রীশ্রীপতিচরণ পড়ুয়া। ইউনিভার্সাল পাবলিশার্স, ২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

পদ্যে চিতোরের বীরগণের কাহিনী—ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত। ভাষা অমিত্রাক্ষরের উপযোগী মার্জ্জিত, গম্ভীর, কিন্তু বানান ভুল এবং ছন্দপতন অনেক স্থলে পাঠের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত জন্মায়।

দিশারি কপোত—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। বর্ত্তমান প্রকাশনা, ৩৩-এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতাগুলিতে কল্পনার আভা আছে, ছন্দেও আছে সাবলীল গতি, অথচ কোনটিই মনে দাগ কাটিয়া যায় না। অভাব বোধ করি রসনিবিড়তার, ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতির। "মেঘছায়াময় গোধূলি সময়"-এর একটু পরেই যখন পড়ি "ভয়ে আড়ষ্ট খামকা নষ্ট করিবে সময় নাকি?" তখনই মনে হয়, কবি যাহা দিতে পারিতেন তাহা দেন নাই, আমাদের আশা দিয়া নিরাশ করিয়াছেন।

ব্যথার প্রলাপে—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। এণাক্ষী গ্রন্থমন্দির, ১৫৯, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আন্তরিকতা এবং ভাষা ও ছন্দের পরিচ্ছন্নতা কবিতাগুলিতে সৌন্দর্য্য সঞ্চার করিয়াছে।

নব কমলাকান্ত—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। টি, কে, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ৬-এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'সবুজপত্রে' যাঁহাদের লেখা এক দিন সাহিত্যরসিকদের মনোহরণ করিয়াছিল, গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম। রাবীন্দ্রিক ও বীরবলী ভঙ্গীর সমন্বয়ে তাঁহার রচনা একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়াছিল। 'নবযুগের কথা' ও 'সবুজ কথা' বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের দুইখানি স্মরণীয় গ্রন্থ, কিন্তু বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

এই গ্রন্থে 'সবুজ কথা'র দুইটি প্রবন্ধও স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমের কমলাকান্ত কবিত্বে ও রসিকতায় মিলাইয়া রসসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; সুরেশচন্দ্রের কমলাকান্ত তাঁহারই নিষ্ঠাবান্ উত্তরসাধক। আশা করা যায়, রসজ্ঞ পাঠকেরা এ বইয়ের সমাদর করিবেন।

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসন্তোষকুমার দাস। ডায়মণ্ড হারবার।

উনসত্তর পৃষ্ঠার পাঠযোগ্য আলোচনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আত্মহত্যা—স্বপনবুড়ো। সাহিত্য-চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

কিশোরদের অভিনয়োপযোগী স্ত্রী-চরিত্র বর্জ্জিত কৌতুকনাট্য। জ্যেঠা-মশায়ের কাছে পরম স্নেহে পালিত পিতৃমাতৃহীন বালক বিমান খেলাধুলায় ক্রিয়াকর্ম্মে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াও পড়াশুনায় মনোযোগের অভাবে সংস্কৃতে ফেল হওয়ায় উপরের ক্লাশে উঠিতে পারিল না। ইহাতে সে জ্যেঠামশাই হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গিগণ পর্য্যন্ত সকলের নিকট তিরস্কৃত ও উপহসিত হইল এবং জ্যেঠামশায়ের আদেশে শব্দরূপ মুখস্থ করিতে ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া যে শাস্তি ও মর্ম্মবেদনা অনুভব করিল তাহাতে মরিয়া হইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, সকলকেই সে পরীক্ষা করিবে। মনে মনে ফন্দী আঁটিয়া, বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া সে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া বিমান পড়ার ঘরে আলমারির পিছনে লুকাইয়া রহিল। তার পর সেই চিঠি পড়িয়া সকলে ছেলেটির জন্য সারা গ্রাম তোলপাড় করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতে যেরূপ হায়রান ও নাস্তানাবুদ হইল তাহা পরম উপভোগ্য। বুদ্ধিবলে বিমানের এই অভিনব পরীক্ষায় সকলেই ফেল হইল, কিন্তু ভালবাসার পরীক্ষায় সে এবং সকলেই পাস করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইল। অভিনীত হইলে ইহা সকলের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ধন্যি ছেলে—স্বপনবুড়ো। এ. মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

ছোটদের জন্য রচিত কৌতুকোপন্যাস। জমিদার চৌধুরী মশায়ের প্রায় প্রৌঢ় বয়সে একটি পুত্রলাভ হইল। সকলের মাথার মণি এই জমিদার-পুত্রের জন্ম হইতে পড়াশুনার জন্য গ্রামত্যাগ পর্য্যন্ত, কলিকাতা যাত্রা ও বহুবিচিত্র কীর্ত্তিকাহিনী ইহাতে গ্রন্থকার স্বকীয় সরস ভঙ্গীতে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। দুষ্টামিবুদ্ধিতে সারা গ্রামে তাহার জুড়ি কেহ ছিল না—নানা ছোটবড় ঘটনায় খোকাবাবুর এইসকল কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহা নীতিবিরুদ্ধ ও জ্যেঠামি বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিবেন তাঁহারা এই পুস্তকে রস পাইবেন না, কিন্তু কৌতুক ও মজা উপভোগ করিবার বয়স এবং মন যাঁহাদের আছে তাঁহারা এই পুস্তকে প্রচুর আমোদের খোরাক পাইবেন। বহু চিত্রযুক্ত এবং উপহারোপযোগী করিয়া ইহার অঙ্গসজ্জা করা হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

নিত্যপূজা পদ্ধতি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, প্রকাশিকা—শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী। পোঃ দক্ষিণগড়িয়া, চব্বিশ পরগণা। মূল্য ১৸০। কালিঘাটের কালীমাতা ও খড়দহের শ্যামসুন্দরের দুইখানি ছবি সম্বলিত।

ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর নিত্যপূজা ও পাঠের পুস্তক। ইহাতে আছে তর্পণ, সন্ধ্যা, মুদ্রা, সমস্ত দেবদেবীর পূজা, আরতি, ভোগ, স্তব, কবচ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্রতের কথা ও ছড়া ইত্যাদি। বইখানি যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে ইহার সংস্করণ-বাহুল্যই তাহার প্রমাণ। এখানি ঘরে থাকিলে অনুষ্ঠানিক ধর্ম্মাচরণে বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীগৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা (মিস মার্গারেট নোবল) এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৮ সালের কালীপূজার দিনে ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট শিষ্যগণের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদামণি দেবী এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষকমণ্ডলীর সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া শিক্ষাপ্রসারে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সময় হইতে মাত্র মাধ্যমিক বিভাগে বেতন লওয়া হইতেছে। নিয়মিত ছাত্রীগণ ব্যতীত রক্ষণশীল পরিবারের বহু মহিলা এবং বহু

দরিদ্র রমণী প্রতিষ্ঠানের শিল্পবিভাগে শিল্পশিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া নারীজাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এদেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-কার্য্যে এবং স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টায় তাঁহার দান এবং অনুপ্রেরণা কম নহে।

ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ইহার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাত্রীর প্রতি তাঁহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, ১৯৫২ সনে ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী এবং বিদ্যালয়ের ইতিহাস-সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ, শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনার্থ ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে সাধারণ সভা, ভগিনীর স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিবেদিতা বক্তৃতা'র ব্যবস্থা করা, শিল্পবিভাগের প্রসারের জন্য এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সকল প্রকার দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :

১। রেণুকা বসু, সম্পাদিকা, নিবেদিতা সুবর্ণজয়ন্তী পরিষদ। ৫, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩

২। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন। বেলুড় মঠ, পোঃ. হাওড়া।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতি

১। কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির উদ্যোগে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বার্ষিক স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক বাটীর যে অংশ দ্বিজেন্দ্রস্মৃতি-সমিতি কর্তৃক কবির স্মৃতিরক্ষার্থে সংগৃহীত হইয়াছে সেখানে প্রাতে কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুধাংশুকুমার গুহ-ঠাকুরতার নেতৃত্বে কবির অনুরাগী সাহিত্যিকগণ কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা

কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্র 'স্মরণোৎসবে' কবির জন্মভিটায় সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

ফটো—শ্রীগোপালদাস মজুমদার

নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় 'কলেজ হলে' কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্মরণোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতিসমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রস্মৃতি-সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত জমিতে কবির স্মৃতিরক্ষার সুব্যবস্থা সম্পাদনে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য আবেদন করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার লিখিত অভিভাষণে বাঙালীর জাতীয়তা উন্মেষে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও সঙ্গীতের দানের পরিচয় প্রদান করেন। অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবধারার বিবর্তনের চিত্র উপস্থাপিত হয়। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য সভায় গীত গানের মুখবন্ধ হিসাবে কবির বিভিন্ন মনোভাবের ব্যাখ্যা করেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিল্পী ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তিনটি দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীত গান করিলে পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

২। কবি হেমচন্দ্র বাগচি কৃষ্ণনগরে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিনযাপন করিতেছেন। কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির ৫ই অক্টোবর (১৯৫২) তারিখের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার সম্বন্ধ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ার কবি শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি নবীন উদ্যমে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। নূতন সম্ভাবনা লইয়া তাঁহার কবিতা—তাঁহার 'দীপান্বিতা', 'তীর্থপথে', 'মানসবিরহ',

আত্মপ্রকাশ করে। সুধীসমাজ বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার দানের কথা স্বীকার করিয়া লয়। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্য, তাঁহার চালচলন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'তেমন হয়েছে তেমন কবি যাঁর সান্নিধ্যে এসে বসলে মনে হয় নিবিড় স্নিগ্ধ বৃক্ষ-ছায়াতলে এসে বসেছি। সবল বিশাল চেহারা, চোখ দুটি দীর্ঘ ও শীতল স্বপ্নময়। তীব্রতার চেয়ে প্রশান্তি, গাঢ়তার চেয়ে গভীরতার দিকে দৃষ্টি বেশী। কোন উদ্দামতার হেম নেই, সে আছে নির্ম্মল ধৈর্য্যে, কোন তর্ক তীক্ষ্ণতায় সে নেই, সে আছে উত্তপ্ত উপলব্ধিতে। নিকষকষিত সোনার মতই সে মহার্ঘ।'

বাঙালীর পরম পরিতাপের কথা এই যে, উদীয়মান কবির স্বল্পকালব্যাপী কর্ম্মজীবনের উপর বিধাতা সহসা একটা ছেদ-রেখা টানিয়া দেন। কবিকে অবাঞ্ছিত অবসর গ্রহণে বাধ্য হইতে হয়।

বাংলা-সাহিত্যের এই অনাড়ম্বর সাধক দীর্ঘকাল যাবৎ আধি-ব্যাধি এবং দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে নিদারুণ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিন যাপন করিতেছেন। দৈবদুর্বিপাকে আজ তাঁহার কণ্ঠ মূক—লেখনী স্তব্ধ। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সমস্ত বাঙালীর পবিত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার এই ঘোর সঙ্কটের দিনে তাঁহার জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা না করিলে আমাদিগকে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে।

তাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও ঐকান্তিক আশা, সরকারের শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে বিপন্ন কবিকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া গুণীর সমাদর করিবেন—তাঁহার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

প্রচারের অভাবে কবির গ্রন্থাবলী আজ সাধারণের নিকট অপরিচিত। অথচ কবির নিকট তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের অনেক খণ্ড এখনও অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। বাঙালী সাহিত্য-রসিক কবির গ্রন্থ ক্রয় করিয়া যুগপৎ কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে পারেন।"

যেমন তাঁহার পুস্তক ক্রয় করিয়া তেমনি অন্য ভাবেও অর্থ সাহায্য দ্বারা তাঁহার অভাবমোচনের চেষ্টা করা শিক্ষিত বাঙালী-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। টাকাকড়ি, সম্পাদক, কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতি, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট পল্লী-সেবা সমিতি

১৩৫৩ সালে বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট পল্লী-সেবা সমিতি নামক জন-হিতকর সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। গত বৎসর "নব ভারত শক্তি-সঙ্ঘ" এই প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হওয়ায় ইহার কর্ম্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যেভাবে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিয়া আসিতেছে তাহা প্রশংসনীয়। ইহাতে বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসার এবং ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

গত বৎসর সূর্য্যগ্রহণের সময় উক্ত সেবা-সমিতির উদ্যোগে আহিরী-টোলা গঙ্গাতীরে একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়। অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়টি স্বল্প ভাতায় এক জন উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইহার বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ৫২ জন। ১৩৫৪ সনে সংশ্লিষ্ট হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৮৪ জন, ১৩৫৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৬৩৮০ জনে দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বৎসরে ১৮,৯৮১ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। বড়বাজার অঞ্চলের বস্তির অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও চিকিৎসাদির ব্যাপারে সমিতি বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন। স্থানীয় চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন।

এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্দ্ধমান সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। টাকাকড়ি ৫।২-এ, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় সম্পাদক শ্রীমাণিকলাল ধরের নিকট প্রেরিতব্য।

শোক-সংবাদ

গত ২৯শে আষাঢ় সুগায়িকা অমিয়া দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র [ডাক নাম টোটন] দেড় মাস টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছে। এই সুদর্শন বালকটির গানে বড় ঝোঁক ছিল। তার দাদামহাশয়,

টোটন (শৈশবে তোলা ছবি)

সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে বসিতেন, সে তখন নিয়মিত ভাবে তাঁর নিকট গান শিক্ষা করিত। অতি অল্প বয়সেই সে চার, পাঁচটি উচ্চাঙ্গের গান উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল। এই বালকের সঙ্গীত শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।
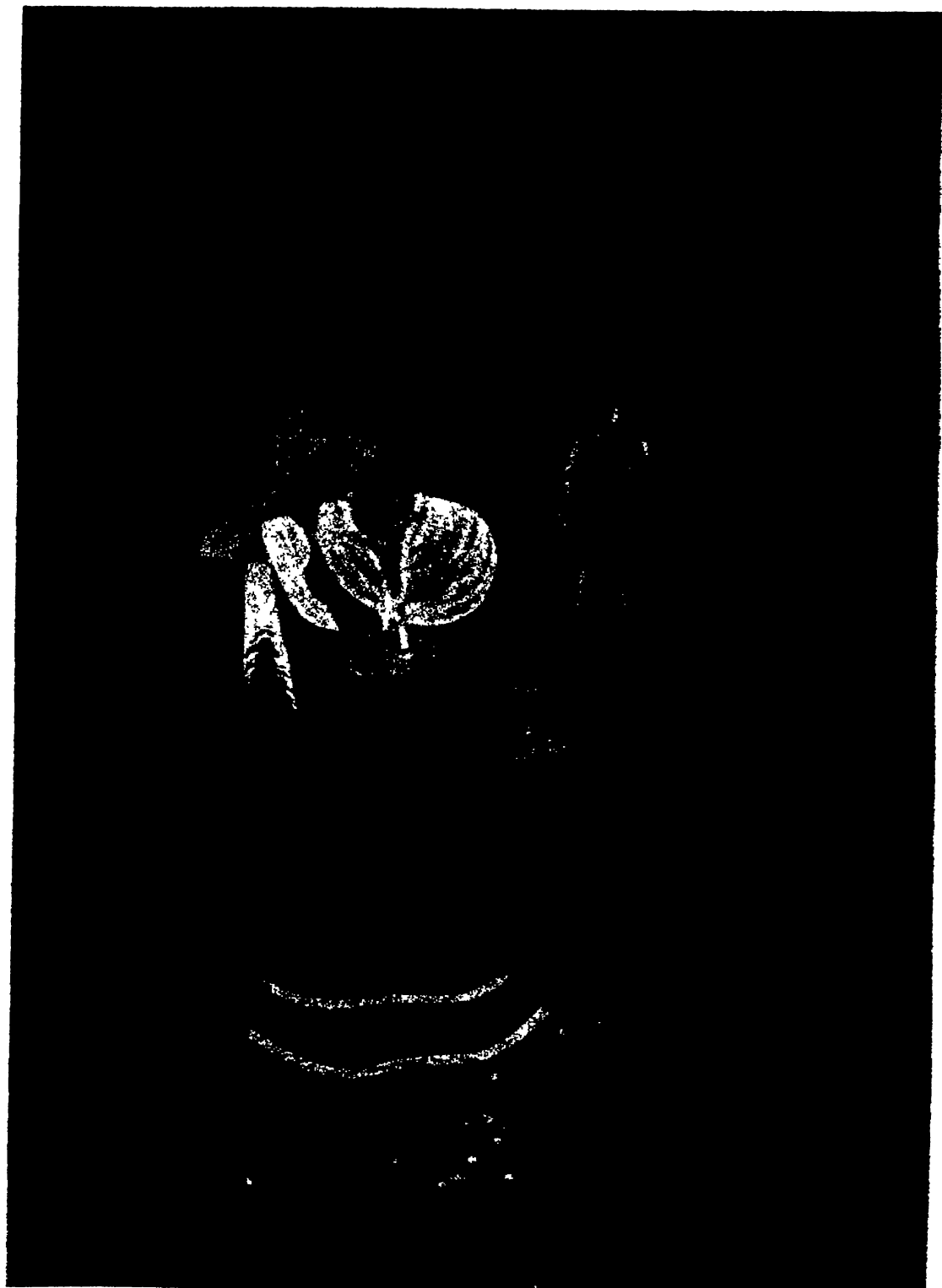
বিদায় অভিশাপ
শ্রীমায়া দাস

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
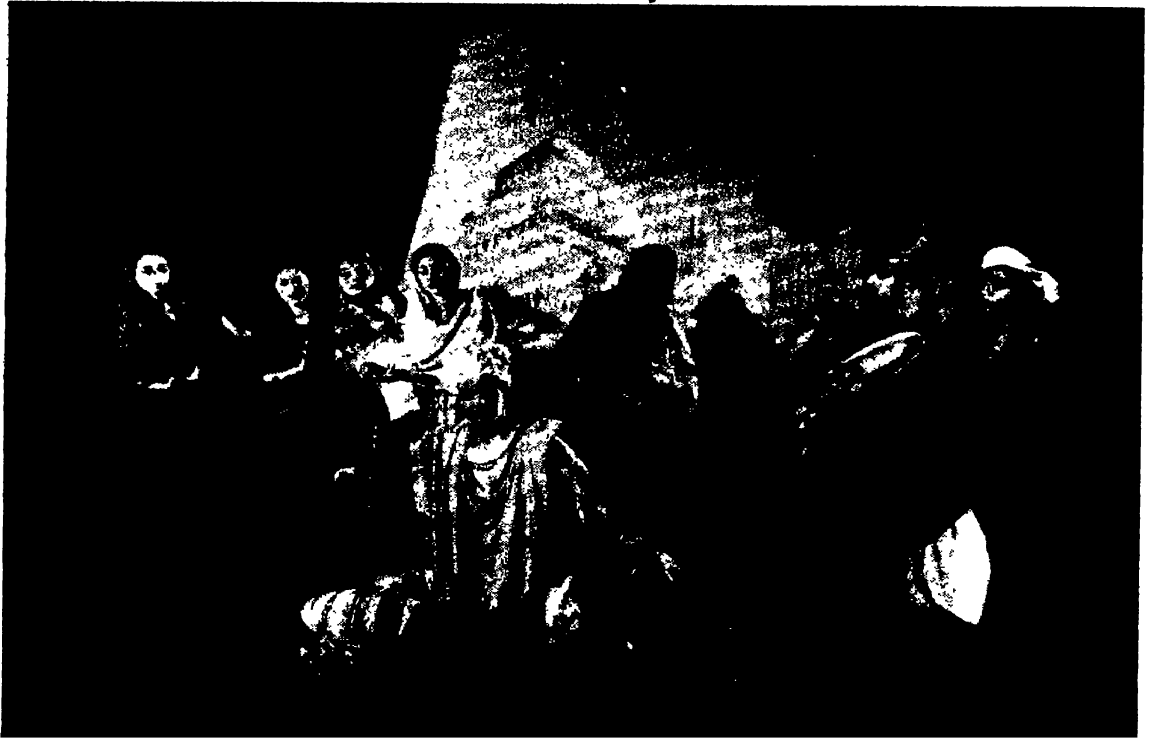
বুদ্ধচরিত (উদয়শঙ্কর)—সংসার-বৈরাগ্যের প্রারম্ভ

বুদ্ধচরিত। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রলোভন (উদয়শঙ্কর-অমলা)

"সত্যম শিবম সুন্দরম
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭৫
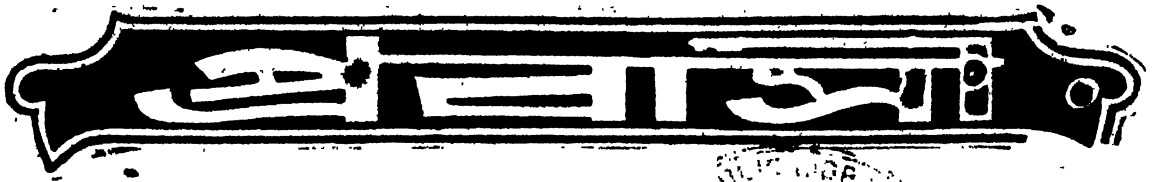
৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরিকল্পনার গোড়ার কথা

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিক হইতে জগতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। রুশদেশে লেনিন, ট্রটস্কি ও ষ্টালিন, মার্কিনদেশে রুজভেল্ট ও তুর্কীদেশে কামাল আতাতুর্ক ঐরূপ রাষ্ট্রগত পরিকল্পনার তিন প্রকার নিদর্শন দেখাইয়াছেন। বাস্তব জগতের বস্তুতান্ত্রিক মানে রুজভেল্টের পরিকল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ফলপ্রদ হইয়াছে, প্রচার ও নূতন গণ-আন্দোলনের হিসাবে রুশীয় পরিকল্পনা বিরাট ও চমকপ্রদ এবং জাতীয় পুনরুত্থানের নিদর্শনে তুর্কীজাতির নব-জাগরণ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য।

মানুষের শক্তিসামর্থ্য ও বুদ্ধি এবং সততা— যাহাকে এককথায় মানবত্ব বলা যায়—অর্থবল এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এই তিন উপকরণের সমষ্টিতে সকল পরিকল্পনা রচিত ও মূর্ত্ত হয়। মার্কিন-দেশে তিনটিই ছিল অপরিমেয়, সুতরাং বহির্জগতের সাহায্য ব্যতিরেকেও উহা নিঃশব্দে বিরাট আকারে ফলিত ও মূর্ত্ত হয়। রুশদেশে অভাব ছিল প্রথম ও দ্বিতীয়টির কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূমির বিস্তার প্রায় অসীম, কাজেই রাষ্ট্রচালকগণ দেশের সমস্ত জনবল, সমস্ত অর্থ উহাতে নিয়োগ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। গোড়ায় সেই কাজে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে, রক্তের প্লাবন বহিয়াছে এবং কোটি কোটি লোক ক্রীতদাসের মত কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে নির্ম্মম, আত্মাহীন রাষ্ট্রতন্ত্র প্রচণ্ড শক্তি ও সম্পদ লাভ করিয়াছে। মানবত্বের মূল্য সেখানে কাণাকড়ি নাই, আছে যন্ত্রবলের ও অস্ত্রবলের। তুর্কপিতা কামালের রাষ্ট্রে অর্থবল ছিলই না, প্রাকৃতিক সম্পদও অতি অল্পসীমায় আবদ্ধ। কিন্তু দেশে শৌর্য্য, ধৈর্য্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন ও কর্ম্মপ্রবণতার কোনও অভাব ছিল না। উপরন্তু ছিল সততা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা —যাহাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন বিনয়। ঐ এক উপকরণের জোরে সুপ্ত, অহিফেনসেবী ধ্বংসপ্রায় তুর্ক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ "ইউরোপের রুগ্নব্যক্তি" (Sickman of Europe) সবল ও দৃপ্ত মানব।

আমাদের দেশে প্রধান অভাব মানবত্বের। আছে তাহার পরিবর্ত্তে দলগত ও ব্যক্তিগত লোভ ও নীচতা, আছে ঈর্ষা ও হিংসা। অভাব প্রধানতঃ সততার ও কর্ম্মপ্রবণতার। প্রাদেশিক হিংসা তো পরিকল্পনাকারীদিগের মানসচক্ষু প্রায় অন্ধ করিয়া দিয়াছে, নচেৎ ফরাক্কা বাঁধের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পাইল না কেন?

পৃথিবীতে আর বোধ হয় কোনও জাতি নাই, কোনও দেশ নাই, যেখানে গঙ্গার মত নদীর অসীম জলস্রোতের পূর্ণ ব্যবহার যে কোনও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার শীর্ষে স্থান পাইত না। কলিকাতা শুধু ভারতের অন্যতম বন্দর নহে, উহা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সংযোগস্থল ও পূর্ব্ব-এশিয়ার দ্বার। অন্য দিকে সারা ভারতের লৌহ ও কয়লার আকর এই গঙ্গার মুখের কাছে। সুতরাং পরিবহনের অন্য সকল পরিকল্পনা গঙ্গার জলপথ সংস্কারের তুলনায় তুচ্ছ। খরচও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শতকরা ১·৭৫ মাত্র। অথচ উহা স্থান পাইল না একটি মাত্র দোষের কারণে—দোষ এই যে, বাঙালীর উপকার হইবে!

বাঙালীর মুখপাত্র যাঁহারা কেন্দ্রের লোকসভায় আছেন তাঁহাদের এখন সকল দলাদলি ছাড়িয়া এই ফরাক্কা বাঁধের ব্যাপারে সম্মিলিত দাবি জানানো উচিত। বাংলার ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ ইহার উপর নির্ভর করে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

কয়েক বছর আগেও ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির একচেটিয়া ব্যবস্থা। মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিকল্পনা অসম্ভব বলিয়াই পরিগণিত হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্র-আদর্শের ভিত্তি বহুল পরিমাণে বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র মাঙ্গলিক রাষ্ট্র—সামাজিক তথা মানবিক মূল্য সকল রাষ্ট্র দ্বারা অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই পটপরিবর্ত্তনের ধারায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। শেষ হিসাবে মোট খরচ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রাথমিক পরিকল্পনায় প্রথম ভাগের খরচ ছিল ১৪৯৩ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় ভাগের ছিল ৩০০ কোটি টাকা। শেষ পরিকল্পনায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র করিয়া সংবদ্ধ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। মোট খরচ ধরা হইয়াছে ২০৬৯ কোটি টাকা এবং নিম্নলিখিত ভাবে খরচ করা হইবে:

(কোটি টাকা)

	১৯৫১-৫৬ সালে খরচ	মোট খরচের শতকরা পরিমাণ
কৃষি এবং কম্যুউনিটি উন্নতি	৩৬০'৪৩	১৭'৪
সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ	৫৬১'৪১	২৭'২
যানবাহন	৪৯৭'১০	২৪ ০
শিল্প	১৭৩'০৪	৮ ৪
জন-মঙ্গল	৩৩৯'৮১	১৬'৪
পুনর্বসতি	৮৫'০০	৪'১
বিবিধ	৫১'৯৯	২'৫
	২০৬৮'৭৮	১০০'০

কৃষিজাত উৎপন্নের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে খাদ্য। বর্ত্তমান উৎপাদন পরিমাণ ৫ কোটি ২৭ লক্ষ টন হইতে ১৯৫৬ সনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টনে, অর্থাৎ প্রায় ৮৯ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। তুলার উৎপাদন ২৯ লক্ষ গাঁইট হইতে ৪২ লক্ষ গাঁইটে বৃদ্ধি পাইবে; পাট ৩৩ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫৩ লক্ষ গাঁইটে বৃদ্ধি পাইবে এবং আখ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৫৬ লক্ষ টন হইতে ৬৩ লক্ষ টনে। তুলার গাঁইট সাধারণতঃ হয় ৩৯২ পাউণ্ডে এবং পাটের গাঁইট ৪০০ পাউণ্ডে। ১৯৫২ সনে পাটের উৎপাদন ধরা হইয়াছে প্রায় ৪৭ লক্ষ গাঁইট এবং তুলার উৎপাদন হইবে ৩৬ লক্ষ ৪১ হাজার গাঁইট।

সেচ উন্নতির খাতে দেখা যায় ৫ কোটি একর হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একরে সেচ সরবরাহ করা হইবে। বিদ্যুৎ-শক্তি ২০ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে সাড়ে তিরিশ লক্ষ কিলোওয়াটে বৃদ্ধি পাইবে।

কাঁচা লোহার উৎপাদন সাড়ে তিন লক্ষ টন হইতে ৬৬ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে, ষ্টীল ৯ লক্ষ ৮০ হাজার হইতে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার টনে দাঁড়াইবে; সিমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ২৬ লক্ষ টন হইতে ৪৮ লক্ষ টনে; মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৩৭১ কোটি গজ হইতে ৪৭০ কোটি গজে বৃদ্ধি পাইবে; ১৯৫৬ সন হইতে বছরে ১৭০টি রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুত হইবে; পাট শিল্পোৎপাদন ৯ লক্ষ টন হইতে ১২ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে।

বর্ত্তমানে ভারতে জাহাজ আছে মোট ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টনের; ১৯৫৬ সনে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টনে।

শিল্পোন্নতি খাতে খরচ হইবে মোট ১৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় শিল্পে খরচ হইবে ৫ বছরে ৯৪ কোটি টাকা, বাকী টাকা খরচ হইবে ব্যক্তিগত শিল্পের উন্নতিতে। শিল্পোন্নতিতে খরচ হইবে মোট খরচের শতকরা আট ভাগ মাত্র। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে শতকরা ৭০ জন চাষী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, ভারত গবর্ণমেন্টের মনোবৃত্তি এখনও ঊনবিংশ শতকে, তাই শিল্পোন্নতি পরিকল্পনা অনাদরে ভরা। মধ্যযুগে লক্ষ্মী ছিল কৃষি উৎপাদনে। কৃষিলক্ষ্মীর বরজ এখন শিল্পলক্ষ্মী—শিল্পোন্নতিতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় শতকরা ৭০।৮০ জন শিল্পে নিযুক্ত, এবং শতকরা ১০।১৫ জন কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। ভারতবর্ষের আজ সবচেয়ে বড় অভাব উৎপাদক যন্ত্রের। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী হইতে ভারত উৎপাদক যন্ত্র আমদানী করে এবং তার জন্য কোটি কোটি টাকা তাহাকে দিতে হয়। এ বিষয়ের অনুল্লেখ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি মারাত্মক রকমের ত্রুটি।

মূলধনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, ১২৫৮ কোটি টাকা পাঁচ বছরে গবর্ণমেণ্ট বাজেটের আয় হইতে পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বাজেটে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হইতে ৭৩৮ কোটি টাকা আসিবে। ব্যক্তিগত জমা, যেমন পোষ্ট আপিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে ৫২০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। ১৫৬ কোটি টাকা আন্তর্জাতিক ঋণ ও সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইবে—যথা, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি। ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি মূলধন হিসাবে অতিরিক্ত নোট ছাপান হইবে। বাকী ৩৬৫ কোটি টাকা হয় আন্তর্জাতিক ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে আর না হয় ত আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং কর হিসাবে তোলা হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে যে, ভারতের মূলধন বৃদ্ধির হার বছরে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ টাকা হিসাবে হইবে। ১৯৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আয় হইবে ১০,০০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় পাঁচ বছরে শতকরা ১১ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৮,৭৩০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু গড়পড়তা আয় দাঁড়ায় ২৫৫ টাকায়। এখানে তুলনামূলক ভাবে বলা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাথা-পিছু গড়পড়তা আয় হইতেছে ৮,৫৮৩ টাকা এবং ইংলণ্ডে হই-তেছে ২,৯৭৬ টাকা। ব্রিটেন কিংবা আমেরিকা তাহাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ টাকা হারে সঞ্চয় করে এবং তার প্রায় সমস্তই নূতন শিল্পসৃষ্টিতে খাটান হয়। যে দেশে ব্যক্তিগত আয় বেশী, সে দেশে সঞ্চয়ের হার অধিক হওয়া সম্ভবপর। ভারতে গড়পড়তা আয় এত কম যে, সঞ্চয় হয় যৎসামান্য। ভারতে জাতীয় সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ৪।৫ ভাগ। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী লইয়া ঘর করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এদেশের পক্ষে জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ টাকা হারে সঞ্চয় করা যেন কবির কল্পনা-বিলাস। আর, মূলধন এদেশে লাজুক। নূতন নূতন শিল্পোন্নতিতে টাকা খাটানোর সাহস আমাদের নাই। যাহাদের টাকা আছে হয় তাহারা টাকা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখে আর নয় ত শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলে। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ভারতের শিল্পোন্নতির ভার ছাড়িয়া না দিয়া গবর্মেণ্ট এ ব্যাপারে অধিকতর সজাগ এবং সচেষ্ট হইলে দেশের পক্ষে শুভ হইত।

ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুমোদন হইতেছে যে, মাধ্যমিক স্বার্থ রহিত করিয়া দিতে হইবে—থাকিবে শুধু রাষ্ট্র ও চাষী। জমিদারী প্রথা আজ ক্রমশ বিলীয়মান এবং অদূর ভবিষ্যতে

তাহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। প্ল্যানিং কমিশনের মতে প্রত্যেক মালিকের জমির একটি সর্ব্বোচ্চ সীমারেখা থাকিবে। মিশরে সম্প্রতি সর্ব্বোচ্চ হার ২০০ একরে স্থিরীকৃত হইয়াছে। কমিশনের মতে পতিত জমি এবং চাষীহীন আবাদী জমির চাষ সমবায় কৃষিপ্রথার দ্বারা করিতে হইবে। সমবায় কৃষি রাশিয়া এবং চীন গ্রহণ করিয়াছে। তবে রাশিয়াতে ব্যক্তিগত মালিকানা সঙ্কুচিত এবং ভারতে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। এদেশে মোট জমির প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ অনাবাদী পতিত জমি এবং সমবায় কৃষি দ্বারা এই রূপ জমিতে কৃষিকার্য্য সম্ভবপর হইবে।

ভাল জিনিষের কল্পনাও ভাল। সুপরিকল্পিত অর্থনীতি জাতির পক্ষে মঙ্গলকর। তবে ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাহা কার্য্যকরী হওয়া সময়সাপেক্ষ। প্রথমতঃ, যেমন নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা। আজ কয়েক বৎসর হইল এইরূপ অনেকগুলি নদী-পরিকল্পনা আরম্ভ করা হইয়াছে, সে সবগুলি শেষ হইতে কয়েক পুরুষ লাগিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, খাদ্য-পরিকল্পনা। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার দরুন দেশের উৎপাদন কি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে? তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ফলদায়ক করিতে হইলে হয়ত আরও কয়েক 'পাঁচ' বছর লাগিতে পারে।

ফরাক্কা বাঁধ

সাপ্তাহিক "ওয়েষ্ট বেঙ্গল" পত্রিকায় প্রকাশ যে ভারতের রেলপথ এবং যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, বিশেষজ্ঞগণের অভিমতে অবিলম্বে ফরাক্কাতে গঙ্গার উপর বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, কিন্তু এই ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

হুগলী নদীতে জল কমিয়া যাওয়ার ফলে গত ১০০ বৎসরের মধ্যে অনেকবার কলিকাতা পোর্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে। উপরোক্ত সম্মেলনে শ্রীশাস্ত্রীর বিবৃতি হইতে প্রকাশ যে পুনাতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় জল এবং শক্তি-কমিশনের (Water and Power Commission) গবেষণা-কেন্দ্রে হুগলী নদীর দুইটি প্রতিকৃতি (model) লইয়া গবেষণা চলিতেছে। এই কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এবং বিশেষতঃ কলিকাতা পোর্টের সীমার মধ্যে হুগলী নদীর উন্নতিবিধানের উপায় নির্দ্দেশের নিমিত্ত গত জুলাই মাসে সর্দ্দার মানসিং-এর সভাপতিত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োজিত হয়। হুগলীতে জলসরবরাহের উপর দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার প্রভাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্যও কমিটিকে বলা হয়।

শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমতে হুগলী নদীকে কার্য্যকরী অবস্থায় রাখিতে হইলে গঙ্গায় বাঁধ দেওয়াই হইতেছে একমাত্র ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে অন্যান্য খাতে যে ক্ষতি হইবে তাহা সহজেই পূরণ হইবে। এই পরিকল্পনাকে যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গে যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তাহার ফলেই গঙ্গানদীতে বাঁধের কথা উঠে। বহুদিন হইতেই দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার মৃতপ্রায় এবং মজা নদীগুলি পশ্চিমবঙ্গের এক গভীর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ বাংলার এই অংশের দুর্ভাগ্যের মূল হইতেছে এই সমস্যা। পলি জমিয়া নদীগুলির মুখ বুজিয়া যাওয়ায় জলসেচ ব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে এবং খাদ্যোৎপাদন কমিয়াছে। তাহা ছাড়া জল জমিয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতা বন্দরেরও নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। তাহার উপর দেশবিভাগের ফলে আভ্যন্তরীণ জলপথের সমস্যাও প্রকটরূপে দেখা দিয়াছে।

এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গঙ্গানদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানান। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, গঙ্গানদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে—

(১) পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটিবে এবং সুন্দরবনের নদীগুলিরও উন্নতি ঘটিবে;

(২) জলসেচের এবং নৌ-চলাচলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে;

(৩) কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে;

(৪) রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশের মধ্যে রেলপথ এবং স্থলপথের দ্বারা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইবে;

(৫) কলিকাতা হইতে বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পরিশেষে আসাম পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্য দিয়া জলপথের সৃষ্টি হইবে; এবং

(৬) খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, যানবাহন চলাচলের উন্নতি এবং কলিকাতা বন্দরের সুষ্ঠু পরিচালনা, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য-রক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্যের মৌলিক অর্থনীতির সমৃদ্ধি ঘটিবে।

১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় যানবাহন বোর্ড এ বিষয় অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্দেশ দেন এবং সমগ্র ব্যয় (২৮ লক্ষ টাকা) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সমপরিমাণে বহন করেন।

কেন্দ্রীয় জল এবং শক্তি-কমিশন চার বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান চালান। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য:

প্রথমতঃ, গঙ্গার উপর বাঁধ দেওয়া যান্ত্রিক দিক হইতে অসম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, দুইটি সম্ভাব্য স্থানের কথা আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, রাজমহল অপেক্ষা ফরাক্কাতে বাঁধ নির্ম্মাণই অধিকতর লাভজনক। রাজমহলে বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০০০ ফুট হইবে—ফারাক্কায়

বাঁধের প্রায় দ্বিগুণ। তাহা ছাড়া রাজমহলে নদীর একটি বাঁক আছে; নদী যে কোন মুহূর্ত্তে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ বাঁক দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। উপরন্তু গঙ্গার সহিত ভাগীরথীকে যুক্ত করিবার জন্য যে খাল কাটিতে হইবে ফরাক্কাতে তাহা প্রায় ১৭ মাইল কম লম্বা হইবে। ফরাক্কাতে খাল কাটিলে গুমানী নদীকে অতিক্রম করিতে হইবে না। তাহা ব্যতীত কতকগুলি যান্ত্রিক কারণেও ফরাক্কাতে বাঁধ দেওয়ার সুবিধা বেশী এবং তাহাতে প্রায় ৭'৬ কোটি টাকা কম খরচ হইবে।

ফরাক্কাতে গঙ্গানদীর উপর একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জঙ্গীপুরের নিকট একটি খাল খনন দ্বারা ভাগীরথীর সহিত সংযোগস্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় জল আনয়ন করাই হইতেছে আসন্ন কর্ম্মসূচী। জঙ্গীপুরে প্রায় ৪০০ ফুট লম্বা আর একটি ছোট বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন হইবে। কেবলমাত্র পরিকল্পনার এই অংশ হইতেই নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইবে:

(ক) ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবন ঘটিবে।

(খ) ভাগীরথীতে সারা বৎসর অন্ততঃপক্ষে ৯ ফুট জল থাকিবে, ফলে এই জলপথে ষ্টীমার এবং বড় বড় নৌকা উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে যাতায়াত করিতে পারিবে।

(গ) উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইবে; ফলে কেবল যে শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হইবে তাহা নয়, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থারও যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

(ঘ) প্রথম অবস্থারই অন্ততঃ দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে।

(ঙ) পলিমাটি দূর হইয়া নালার উন্নতির ফলে কলিকাতা বন্দরের বিকাশ ঘটিবে।

(চ) কলিকাতা অঞ্চলের জলের মধ্যে লবণের পরিমাণ কমিবে।

(ছ) স্থানীয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি হইবে।

পরিকল্পনার সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক ৩৬'৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৩'৩ কোটি টাকা রেলপথ ও স্থলপথ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

বৈষয়িক দিক হইতেও এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পরবর্ত্তী স্তরে ভাগীরথী হইতে খাল খনন করিয়া জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা এবং চব্বিশ পরগণার অন্যান্য নদীর সহিত সংযোগ স্থাপিত হইবে। ফলে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসার এবং নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে; সুন্দরবনের দীর্ঘকালব্যাপী দুর্দ্দশার চিরস্থায়ী সমাধান হইবে; খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধিত হইবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী আসাম, বিহার ও এমন কি উত্তর-প্রদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিকাশের পথ সুগম হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার নদ-নদীর ভবিষ্যতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। পশ্চিম-উত্তরে দামোদর ও ময়ূরাক্ষী এবং পূর্ব্ব-উত্তর অঞ্চলে তাহার শাখা ভাগীরথী ইত্যাদির জলস্রোতের সংরক্ষণ ও নির্দ্দিষ্ট পথে সঞ্চালনের উপর এই প্রদেশের জীবন নির্ভর করিতেছে। এই তিনটি নদ-নদীর জলে প্রায় আশী লক্ষ বিঘা জমির সেচ এবং প্রায় বার হাজার বর্গ মাইলের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে। উপরন্তু প্রচুর জলজাত স্বল্পমূল্য বিদ্যুতে শিল্পের উন্নতি, জলপথে বাহিত গুরুভার পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস, সেচ খাল ও নদীপথের নিকটস্থ গ্রাম ও নগরে জলকষ্ট দূর ও ম্যালেরিয়া হ্রাস এবং কলিকাতা বন্দরের আয়ু ও কার্য্যকরী ক্ষমতার বিশেষ বৃদ্ধি—এই সবকিছুই ঐ নদ-নদীর সংরক্ষণ ও যথাযথ সঞ্চালনের উপর নির্ভর করিতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের এই সকল কথা চিন্তার মধ্যে আনেন কিনা জানা প্রয়োজন। কলিকাতা বন্দর সমগ্র ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যপথ। কলিকাতা সমগ্র ভারতের বৃহত্তম শুল্ক আদায়ের উৎস। উপরন্তু কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের আয়-করের অন্যতম প্রধান আকর। ইহা সত্ত্বেও ফরাক্কা বাঁধের বিষয় পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পাইল না কেন, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহি প্রয়োজন।

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা বিহারের অধিকারীবর্গের ঘৃণ্য অপচেষ্টার ফলে ও কেন্দ্রের অবহেলার ফলে প্রায় নষ্ট হইয়াছিল। তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের প্রাণপণ চেষ্টা, অবিশ্রাম আবেদন-নিবেদন ও অনুযোগের ফলে ঐ পরিকল্পনার প্রথমাংশের মত অর্থ কেন্দ্র হইতে দেওয়া হয়। তারপর সিংহল সম্মেলন অনুযায়ী অর্থ দানে কানাডার অংশ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় প্রদত্ত হওয়ায় উহা এখন যথাযথ ভাবে অর্থবল পাইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা নানাভাবে বানচাল করার চেষ্টা গত বৎসর চলিয়াছিল। এখনও যেভাবে উহা চালিত হইতেছে তাহা আশাপ্রদ নহে।

পরিশেষে ফরাক্কা বাঁধের ব্যাপার এইরূপ। বাঙালীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের মধ্যেই রহিয়া গেল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি

খাদ্যনীতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস নোট দিয়াছেন; তাহার সারমর্ম এইরূপ:

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রত্যাহার করিয়া অবাধে চাহিদা ও সরবরাহের আদান-প্রদানের অন্তরায় আছে। ১৯৪৮ সনের এপ্রিলে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ও ১৯৪৯ সনের সেপ্টেম্বরে চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার ফলে দেখা গিয়াছে ঐ দ্রব্যগুলি কালোবাজারের দখলে যায় এবং ফলে দরিদ্র সাধারণ অন্ততঃ অসুবিধাগ্রস্ত হয়, কেননা ঐ সময়ে ঐ দ্রব্যগুলিতে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক কম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লওয়ার সেরূপ কুফল হয় নাই, কেননা এখন সরবরাহের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট আছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, সরকারী মত সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। এখন চাহিদা অনেক বেশী কমিয়াছে কেননা জনসাধারণ নিঃস্ব, সেই জন্যই সরবরাহ চাহিদা অপেক্ষা অধিক।

১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে বস্ত্র ও চিনি লইয়া কালোবাজারে

যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা দৃষ্টে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য সম্পর্কে ঐরূপ অনিশ্চিতের মধ্যে চলিতে চাহেন না। এ বৎসর ফসল ভাল, কিন্তু আগামী বৎসরের পরিস্থিতি কি হইবে কে জানে? যদি পরিস্থিতি খারাপ হয় বা খাদ্যশস্য কালোবাজারে যায় তবে ৬৮ লক্ষ নগরবাসী শ্রমিক-কর্ম্মচারী ইত্যাদির খাদ্য সংস্থান করিবে কে? তাহাদের অনশন তো কাম্য নহে?

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে মহার্ঘভাতা তাহার প্রতিকার নহে, কেননা তাহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে ও খাদ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়া এক গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিবে, যাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইবে। মাদ্রাজ ৪। লক্ষ টন চাউল মজুত রাখিয়াও অজন্মার ফলে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে।

এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথা থাকিতেও কলিকাতায় দ্রব্যমূল্য সমস্ত ভারতের অন্য প্রদেশস্থ সকল নগর ও গ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী। বাঙালীর রক্ত সকলেই শুষিয়া খাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রণ-অধিকারীবর্গ তাহার কোনও প্রতিকার করিতে অসমর্থ।

আরও বলা হইয়াছে যে, রেশনিং ব্যবস্থা থাকায় তাহার অধীন অঞ্চলের জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে গম খায়। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে উহারা চাউলই লইবে, ফলে গ্রামের চাউলে টান পড়িবে, মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাষী ব্যতীত অন্য সাধারণের জন্য উপযুক্ত মূল্যে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব লইতে বাধ্য। উপরন্তু ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকারের এবং ইহাও সত্য যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রীত হইলে কালোবাজারের প্রভাব ঐরূপ অঞ্চলে কমিয়া যায়। ঐরূপ দায়িত্বপালন ও সুফললাভের একমাত্র উপায় খাদ্যসংগ্রহ-নীতি।

বর্ত্তমানে যে সংগ্রহ-নীতি পশ্চিমবঙ্গে চলিতেছে তাহাতে (১) উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলি ঘেরা হয়; (২) ঘেরা এলাকা হইতে চাউল ও ধানের লেনদেন নিষিদ্ধ থাকে; (৩) যাঁহারা স্বেচ্ছায় ধান চাউল বিক্রয় করেন, নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা কেনা হয়; (৪) ১৫ বিঘা বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ জমির মালিকেরা স্বেচ্ছায় ধান না বিক্রয় করিলে বাধ্যতামূলক ভাবে তাহা আদায় করা হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয় নাই এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে একথা সরকার স্বীকার করেন। তাহার দুইটি কারণ, প্রথমতঃ, মুনাফাখোরের সুযোগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, ঘাটতি অঞ্চলে মূল্যও অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়।

সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে দরিদ্র কৃষকদের উপর চাপের লাঘব হয় সেজন্য সরকার খাদ্যসংগ্রহের যে নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইতেছে: (১) আগামী বৎসর হইতে 'লেভি' প্রথায় সংগ্রহকার্য্য করা হইবে। কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্সিয়াং-এর ৬৮ লক্ষ অধিবাসীকে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত মাথাপিছু দৈনিক ৬ আউন্স চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করা হইবে। উহার জন্য বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ টন চাউল প্রয়োজন হইবে। আগামী বৎসর ভারত-সরকার এক লক্ষ টনের বেশী চাউল দিতে পারিবেন না। সুতরাং অন্ততঃ ৩ লক্ষ টন চাউল আগামী বৎসর সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য আরও এক লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করা প্রয়োজন হইবে।

(২) এক জেলায় অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা এক জেলা হইতে অন্য জেলাতে খাদ্য চলাচলের উপর কোন বিধিনিষেধ থাকিবে না।

(৩) রেশন অঞ্চলগুলির এবং প্রদেশের চারিদিকে সুদৃঢ় অবরোধ-ব্যবস্থা চালু করা হইবে যাহাতে রেশন এলাকার বা প্রদেশের বাহিরে চাউলের চোরাই চালান বন্ধ হয়।

(৪) রেশন-বহির্ভূত অঞ্চলে চাউলের কলগুলি যথেচ্ছ চাউল ক্রয় করিতে পারিবে। তবে একটি সর্ত্ত থাকিবে যে, তাহাদের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ তাহারা সংগ্রহ-মূল্যে সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) প্রস্তাবিত পরিকল্পনানুযায়ী যাঁহারা ৩০ বিঘা বা তাহার বেশী জমি চাষ করেন কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে ধান সংগ্রহ করা হইবে।

লাভে হাত পড়িবার আশঙ্কায় কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিতে পারেন বা বিশেষ বিশেষ মনোভাবের জন্য যাঁহারা কোন কিছুকেই ভাল চোখে দেখেন না তাঁহারাও ইহাতে আপত্তি তুলিতে পারেন। পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, ৩০ বিঘা বা তদূর্দ্ধ জমিচাষীদিগকে ব্যক্তিগত ও চাষের প্রয়োজনের জন্য প্রচুর শস্য রাখিতে দেওয়া হইবে এবং 'লেভি' নির্দ্ধারণের সময় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদনের তারতম্যও বিবেচিত হইবে। ক্ষুদ্র চাষীদিগকে স্পর্শ করা হইবে না। আরও বলা হইয়াছে ইহা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা মাত্র, জরুরী অবস্থার প্রতিকারের উপযুক্ত পরিমাণ শস্য সরকারের আয়ত্তে আসিলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শিথিল করা হইবে। সুতরাং সরকার আশা করেন যে, ত্রিশ বিঘা বা তদূর্দ্ধ জমি যাঁহাদের তাঁহারা সততার সহিত ধান-চাউলের হিসাব সরকারকে জানাইবেন।

কিন্তু দুর্নীতি ও সততার অভাব তো সংক্রামক মহামারীর ন্যায় দেশ ছাইয়াছে এবং উহার প্রধান আকর বেসামরিক সরবরাহ ও খাদ্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগ—সংগ্রহে ও বণ্টনে। উহার প্রতিকার কি?

চা-আবাদে সঙ্কট

ভারতীয় চা-বাগানের কারবার আজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই বহু বাগান বন্ধ হইয়াছে এবং আরও অনেক বাগানের উৎপাদন বন্ধ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। গত মে মাসে সরকার শ্রী ই. রাজারাম রাওয়ের সভাপতিত্বে এক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। গত ১২ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী স্বীকার করেন যে, মৌলিক ও জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক। তিনি বলেন যে, অচিরে

অবস্থায় উন্নতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। চা-উৎপাদকদিগের প্রতিনিধিবৃন্দও মনে করেন যে, কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উৎপাদকদিগের পক্ষে এখন কিছু সাহায্য প্রয়োজন। সরকারের নিকট বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স যে স্মারকলিপি পাঠাইয়াছেন তাহাতে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যে বিলম্ব করিতেছেন তজ্জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

চা-ব্যবসায়ের সম্মুখে আজ যে মৌলিক সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কারণ বর্দ্ধিত উৎপাদন-ব্যয় এবং ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের সমস্যা। দার্জ্জিলিং এবং আসাম ব্যতীত সকল স্থানেই উৎপাদন খরচ এবং রপ্তানী মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য কোন ক্ষেত্রেই পাউণ্ড প্রতি চার আনার কম নহে। দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যের ব্যাপারে এই পার্থক্য সকলক্ষেত্রেই পাউণ্ড প্রতি এগার আনা বা তাহার বেশী। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বাণিজ্য-মন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী যে তিন শত বাগান অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন সেই সকল বাগানই ভারতীয় কর্তৃত্বাধীন। ইহা চা-বাগানের ভারতীয় মালিকদিগের দূরদর্শিতা ও ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

চা-বাগানের মালিকদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় চায়ের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইলেও চায়ের উৎপাদন-ব্যয় একই আছে। এই ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগের উপরই ব্যবসায়ীর কোন হাত নাই। যেমন, শ্রমিক এবং শ্রমকল্যাণের জন্য একটা মোটা অংশ খরচ হয়। মজুরীর মান প্রথম হইতেই উচ্চ ছিল, সর্ব্বনিম্ন মজুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়ায় তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বনিম্ন মজুরী আইনের প্রয়োগের ফলে উৎপাদন-ব্যয় অনেক ক্ষেত্রে পাউণ্ড প্রতি দুই আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকদিগকে অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার ফলে পাউণ্ড প্রতি খরচ পড়ে দশ পয়সা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত। শ্রমিকদিগকে খাদ্য সরবরাহের ভার থাকার ফলে খাদ্যশস্য মজুত রাখিবার জন্য পুঁজির একটা মোটা অংশ আটক থাকে। যুদ্ধের সময় জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিকদিগকে এই সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার এতকাল পরও শিল্পপতিদের এই বিরাট ব্যয় বহন করিতে হইতেছে। অপর কোন কারবারে মালিকদিগকে এই ভার বহন করিতে হয় না; সুতরাং কেবলমাত্র চা-বাগানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রচলন রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চা-বাগানের গুদামের অপরিবর্ত্তনীয় গুদাম খরচও উৎপাদন-ব্যয়ের আধিক্যের আর একটি কারণ। তদুপরি কয়লার দাম অত্যধিক। কয়লার নিয়ন্ত্রিত মূল্য টন প্রতি ১৭৸৹; কিন্তু যানবাহনের ব্যয়বহুলতার জন্য কোন কোন বাগানকে এক টন কয়লার জন্য এমন কি ৯০৲ হইতে ৯৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কমান সম্ভব হইতেছে না।

চা-শিল্পের সাহায্যের জন্য রাজারাম কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অন্যতম হইতেছে: আবগারী শুল্ক প্রদানের সময় পিছাইয়া দেওয়া, আগাম আয়কর প্রদানের নীতির শিথিলতা সাধন, কয়লা এবং চা বাগানের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য রেল-চলাচলের উন্নততর ব্যবস্থা; চা-বাগানগুলিকে বৈষয়িক সাহায্যদানের ব্যবস্থা; প্ল্যানটেশন লেবার আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখা; চা-বাগানের শ্রমিক এবং তাহাদের পোষ্যদের স্বল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখা।

সরকার যে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা-উৎপাদকদের কিছু সুবিধা হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত ফ্যাক্টরী হইতে চা বাহির হইলেই আবগারী শুল্ক দিতে হইত। এখন হইতে পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শুল্ক দিলেই চলিবে। ভারতীয় আয়কর আইনের ১৮ (এ) ধারা ইতিমধ্যেই শিথিল করা হইয়াছে এবং এই মর্ম্মে আয়কর-কর্ম্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চা-বাগানে কয়লার জন্য সকল রেল লাইন দ্বারা যতগুলি সম্ভব ওয়াগন প্রেরণের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

শিল্পপতিদের অভিমতে এই সকল ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে না। আয়কর প্রদান এবং আবগারী শুল্ক প্রদানের সময় পিছাইয়া দেওয়ার ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই; অবশ্য উহাতে সাময়িক সাহায্য হইবে। শিল্পের পক্ষে বৈষয়িক সাহায্য প্রয়োজন। বৈষয়িক সাহায্য না পাইলে আগামী বৎসরে অনেক ভাল বাগানও উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। চা-এর উৎপাদন এবং রপ্তানীর উপর কর হ্রাস না করায় শিল্পপতিগণ হতাশ হইয়াছেন।

শিল্পপতিগণ বলেন, পরিত্যক্ত চা (Tea waste)-এর উপর আবগারী শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে ভারতীয় চায়ের মান নিম্নগামী হইবার আশঙ্কা আছে। যদি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয় তবে সকল চায়ের উপর হইতেই উহা প্রত্যাহার করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে চায়ের গুণমান (standard) নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে।

আমরা চা-এর মানের এই উন্নতি বিধানের প্রস্তাব সমর্থন করি —যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাজারে সরবরাহ অপেক্ষা মালের চাহিদা বেশী থাকে ততক্ষণ অধিক লাভের জন্য উৎপাদক লোভে পড়িয়া নিকৃষ্ট পন্থাও অবলম্বন করিয়া থাকে। ভারতীয় চা-বাগানের মালিকরাও তাহা করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। ফলে অবস্থা এমন হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ মানের চায়েও আর সেই পূর্ব্বের আস্বাদ ও সুগন্ধ পাওয়া যায় না। চা-বাগানের মালিকদের এই প্রভূত লাভের পরিমাণ দেখিয়া শ্রমিকরাও সরকারের নিকট দরবার করিতে লাগিল এবং সরকারী শ্রমবিভাগ ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া তাহাদের দাবি পূরণ করিল।

তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিয়াছে। বিদেশে চায়ের বাজার এখন ক্রেতার অধীন। বিদেশে চায়ের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতারা এখন চায়ের গুণ দেখিয়া দাম দেয়। অবশ্য ভারতের

আভ্যন্তরীণ বাজারে এখনও ব্যবসায়ীদের অখণ্ড প্রতাপ বজায় রহিয়াছে—ক্রেতারা বিদ্রোহ করিয়া চা ক্রয় বন্ধ না করিলে এই দুরবস্থা দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে ভারতীয় চা-কে কি তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :

১৯৪০ সালের জুলাই মাস হইতে ব্রিটেনে চায়ের উপর যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ ছিল গত ৫ই অক্টোবর হইতে তাহার অবসান ঘটিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া খাদ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারত, পাকিস্থান এবং সিংহলে চা'র উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইয়াছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রচুর পরিমাণ প্যাকেট করা চা মজুত আছে। সকল দোকানেই উপযুক্ত পরিমাণ মজুত আছে এবং দেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। (২য় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর ৫০ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিক্রয় হইত)। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি বিভিন্ন রকম চায়ের দর আরও কমিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যের নীচে নামিয়া আসায় নির্ব্বিঘ্নে রেশনিং প্রথার অবসান ঘোষণা করা যায়। ফলে এখন হইতে ক্রেতা তাহার পছন্দমত চা কিনিতে পারিবে।

ব্রিটেনে চা আমদানী এবং রপ্তানীর উপর সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ৬ই অক্টোবর হইতে দূর-প্রাচ্য ব্যতীত যে কোন স্থানে চা রপ্তানী করা যাইতে পারে।

১৯৫০ এবং ১৯৫১ সনে ব্রিটেনে যে পরিমাণ এবং মূল্যের চা আমদানী হইয়াছিল নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে :

যুক্তরাজ্যে চা আমদানী

	পরিমাণ (হাজার পাউণ্ড)		মূল্য (হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং)	
	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫০	১৯৫১
কেনিয়া	২,৩৩০	৩,৫৬৫	৩০৪	৫৬৩
নিয়াসাল্যাণ্ড	৭,৯৪০	১২,৭০৫	৯৮৬	১,৮৪১
ভারতবর্ষে	২৩৯,১১২	২৭৬,২২৫	৩৪,৭০৫	৪৪,৪২৮
পাকিস্থান	১৮,০৩৯	৩৪,৭৩৫	৩,৩০১	৫,১৭৫
সিংহল	৯৩,৭৫৬	১১০,২৭১	১৬,৮৩৮	২০,০১১
কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশ	১,৭৩০	৩,৯৬৩	২৯১	৬১৫
চীন	৩৮৯	১৫৭	৭৯	২৮
অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানতঃ				
ইন্দোনেশিয়া	৫,২৭৬	২৩,০৬৯	৮৮৩	৩,৬৫৪
মোট	৩৬৮,৫৭২	৪৬৪,৬৯০	৫৭,৩৮৭	৭৬,৩১৫

ভারতীয় চায়ের সহিত বিদেশী চায়ের প্রতিযোগিতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

তুলনামূলক মূল্যমান হিসাবে লণ্ডনের চা-বাজারের দর এইরূপ : উত্তর-ভারত গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ডে (১৯৫২-৫৩ সন) ৩ শিলিং ৯'০৯ পেন্স, দক্ষিণ ভারত গড়পড়তা ২ শিলিং ৭'৫ পেন্স, সিংহল ৪ শিলিং ৪'৪৪ পেন্স, ইন্দোনেশিয়া ৩ শিলিং, কেনিয়া (আফ্রিকা) ২ শিলিং ৫'৪ পেন্স, অন্যান্য স্থান (আফ্রিকা) চা ১ শিলিং ৭ পেন্সের কাছাকাছি, পাকিস্থান ২ শিলিং ৪ পেন্স।

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ সরকার চা-বাগানগুলিকে প্রদত্ত ঋণের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনুমান করা যাইতেছে যে, বাগানগুলি ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ২ কোটি টাকা ঋণ চাহিবে। ১৯৫২ সনের বকেয়া হিসাব পরিশোধের জন্য বাগানগুলি যে টাকা ব্যয় করিবে সরকার কাছাড়, ত্রিপুরা এবং ডুয়ার্সের বাগানগুলির পক্ষ হইতে তাহার শতকরা ১৫ ভাগ এবং অন্যান্য স্থানের বাগানগুলির জন্য শতকরা ১০ ভাগ দায়িত্ব লইবেন। যাহাতে সঙ্কটগ্রস্ত উৎকৃষ্ট বাগানগুলিকে ব্যাঙ্ক অধিকতর অর্থ প্রদান করিতে পারে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু যে সকল বাগান বৈষয়িক দিক হইতে নিতান্তই দুর্ব্বল (uneconomic) তাহাদের পক্ষ হইতে সরকার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। প্রতিশ্রুতির সর্ত্ত অনুসারে এই পরিকল্পনায় অনুযায়ী গৃহীত ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বাগানগুলি লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবে না এবং বাগানে শ্রমিক ছাঁটাই করা চলিবে না।

স্বর্ণ-ডিম্বপ্রসূ রাজহংসী হননের যে রূপকথা তাহার উদাহরণ এই চায়ের কৃষি ও ব্যবসায়। ব্যবসায়ীর উৎকট ও অসঙ্গত লোভ, শ্রমিকের দায়িত্বশূন্য কাজ—উপরন্তু দাবি, সরকারী অবহেলা এবং নিশ্চিন্তে শুল্ক ও কর আদায়, এই তিনের ফল আজ ফলিতেছে।

কংগ্রেসে দুর্নীতি

দুর্নীতি কতদূর পর্য্যন্ত সরকারী কংগ্রেস দলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ৯ই ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদ হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :

"বিহার কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্তকে তদন্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

"শ্রীগুপ্ত বর্ত্তমান বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বাতিল, কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও রাজ্যের বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সমুদয় কংগ্রেসী সদস্যের পদত্যাগ পেশের সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

"তিনি নাকি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, আইন-সভার সদস্যদের পদত্যাগের পর কংগ্রেস আর নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে না বলিয়াও কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করিতে হইবে।"

উক্ত পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী গত ১৮ই নবেম্বর শ্রীগুপ্ত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রীমান নারায়ণ আগরওয়ালার নিকট প্রেরিত রিপোর্টে ভুয়া কংগ্রেসসদস্য সংগ্রহ সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ২০ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫ লক্ষই ভুয়া। বিহার কংগ্রেসের দুইটি উপদল নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই কলঙ্কজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।'

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৮ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠকে বিহারে সংগৃহীত ২১ লক্ষ প্রাথমিক সদস্য এবং ঐ রাজ্যে কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনের জন্য এ পর্য্যন্ত যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহা বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কারণ সংগৃহীত ২১ লক্ষ সদস্যের মধ্যে ১৫ লক্ষই নাকি ভুয়া। কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতে নূতন ভাবে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ আরম্ভ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, হায়দরাবাদ অধিবেশনের পর প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে। কংগ্রেসের বিগত দিল্লী অধিবেশনে যাঁহারা বিহারের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের হায়দরাবাদ সম্মেলনে তাঁহারাই প্রতিনিধিত্ব করিবেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে আরও প্রকাশ "কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে যাঁহারা বিহারের প্রতিনিধি আছেন, তাঁহারা হায়দরাবাদ অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইবার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন কমিটিকে তাঁহাদের তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। যদি কোন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে, তবে তাঁহাকে কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না।

"কংগ্রেসের ইতিহাসে বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম ঊর্দ্ধতন কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং ইহার ফলে বিহারের সকল নির্ব্বাচন বাতিল হইল।"

এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে "বিহার প্রদেশ-কংগ্রেসের যে পাপ ধরা পড়িয়াছে, সে পাপ কমবেশী প্রত্যেক প্রদেশ-কংগ্রেসকেই কলুষিত করিয়াছে। বিহার-প্রদেশ-কংগ্রেসের উপর ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কোপ প্রথম পড়িয়াছে, বিহারের কংগ্রেসীদিগের পক্ষে ইহাই হইল বিশেষ 'গৌরবে'র বিষয়।"

বিহারের কংগ্রেসে যাঁহারা উচ্চতম অধিকারী তাঁহারাই এই কলঙ্কের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কংগ্রেসের ক্ষমতালাভের পর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই দুর্নীতি ও অত্যাচারের সরকারী সমর্থন অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছে। ফলে ইংরেজ আমলের সরকারী নোকরশাহি প্রজাপীড়ন ও দমন এবং উৎকোচ গ্রহণের যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে বর্ত্তমানে তাহা বহু ক্ষেত্রে আবার দেখা দিয়াছে। বিহারের বাঙালী-বিদ্বেষ সীমাহীন ও অমানুষিক। তাহা নিত্যই মানভূমে বাঙালী-পীড়নে দেখা যায়। নিম্নের উদাহরণ ২২শে অগ্রহায়ণের "মুক্তি" (পুরুলিয়া) হইতে গৃহীত:

"স্থানান্তরে, পুঞ্চা থানায় বান্দা গ্রামের নিকট সঙ্ঘটিত জনৈক ফরেষ্টারের একটি সত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা রমণীর উপর দানবীয় ও পৈশাচিক অত্যাচারের এক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনায় যে নির্ম্মমতা ও পাশবিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বর্ণনা দিবার মত ভাষা আমাদের নাই। প্রকাশিত বিবরণে দেশবাসী কল্পনা করিয়া লইতে পারেন মাত্র।

"ঘটনার বিবরণে দেখা যায় যে, একজন সরকারী কর্ম্মচারী ফরেষ্ট অফিসার একটি সত্তর বয়স্কা বৃদ্ধা রমণীকে বনের মধ্যে পাইয়া তাহাকে নিজেকে দিয়া পাথরে আঙ্গুল ছেঁচিয়া রক্ত বাহির করাইয়া সেই রক্ত দেখিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। লাঠি দ্বারা সেই বৃদ্ধাকে মারা ত সামান্য কথা। আরও কিছু মৌলিক উপায়ে ঐ অসহায়া বৃদ্ধা রমণীকে বনের মধ্যে যন্ত্রণা দিয়া যদি সরকারী ফরেষ্ট অফিসার তাহার জীবন সংহার করিত তবে তাহার সার্থকতার আনন্দ হয়ত পূর্ণতা লাভ করিত। কারণ তাহার দ্বারা সে ইহাই মনে করিত যে, বিহার গবর্মেণ্টের একজন সরকারী কর্ম্মচারীর মানভূম জেলার অধিবাসীদের সহিত যে রকম আচরণ করা উচিত সে তাহাই করিয়াছে। ইহা অত্যুক্তি নহে। ইহা এই জেলার স্বাভাবিক পরিস্থিতি। বিহারের উচ্চতম শাসন পরিচালকবৃন্দ মানভূমে যে নীতি ও যে পাশবিকতা নিরঙ্কুশ ভাবে চালাইয়া আসিতেছেন ভারতবর্ষের বৃহত্তর ক্ষেত্রের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ণধারগণ যেমন তাহার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন মনে করেন না বরং কেহ কেহ ইহা যোগ্যই হইতেছে বলিয়া মনে করেন, তেমনি মানভূমের ক্ষেত্রে বিহার গবর্মেণ্টের সরকারী কর্ম্মচারিগণ যাহাই যে ভাবে করুন না কেন তাহা অবারিত ও নিরঙ্কুশ ভাবে করিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা শুধু জানেনই নয়—ইহা দ্বারা মানভূমে বিহার গবর্মেণ্টের নীতি কার্য্যকরী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন বলিয়াই মনে করেন। কারণ মানভূমে মানুষের প্রতি অমানুষিকতা ও পাশবিকতার আচরণ করিয়া তাঁহারা অনেকে বহু ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ প্রভুদের নিকট সমর্থনই শুধু পান নাই, উৎসাহও লাভ করিয়াছেন। মানভূমের গত চারি বৎসরের ইতিহাস ইহার পরিচয় দিয়াছে এবং আজ গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে যে নিরঙ্কুশ দুঃসহ পীড়নের ক্রমবর্দ্ধমান অভিযান চলিয়াছে তাহা এই সত্যকে আরও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।"

শ্রীনাড়ুগোপাল দেঘরিয়া ও শ্রীশরৎচন্দ্র কৈবর্ত্ত জানাইতেছেন:

"আমাদের গ্রামের ঠাকুরদাস কুম্ভকার আজ দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে একমাত্র পুত্র ও ষাট বৎসর বয়স্কা এক বিধবা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। অভাগিনীর একমাত্র সম্বল ঐ পুত্রটি আঠার বৎসর বয়সে, আজ আট বৎসর পূর্ব্বে মারা যাওয়ায় গরীব ভদ্র বিধবা এই বয়সে পুত্রশোকে পাগলের প্রায় হইয়া কোনমতে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মৃতপুত্রের শ্মশানে 'জঙ্গল মধ্যে নদীতে কাঁদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।' গত ১লা ডিসেম্বর তিনি শ্মশান হইতে আসিবার কালে বেলা দশটার সময় আশ্রমের একজন সাইকেলে চড়া পিছনে তলবার ঝুলান টুপীপরা ফরেষ্টার ও একজন ফরেষ্ট গার্ড দ্বারা আক্রান্ত হন। বিধবার হাতে কয়েকটি শুষ্ক পলাশডাল দেখিয়া ফরেষ্টার সাইকেল হইতে নামে ও আশ্রম হইতে একটি লাঠি লইয়া তাহাকে কয়েক ঘা বসাইয়া দেয়। বিধবা ডাল কয়টি ফেলিয়া কাঁদাকাঁদি করে এবং আর কোন দিন আসিব না বলিয়া অনুনয় করে তাহাতে টুপীধারী সাহেব তাহাকে নিজ কপাল হইতে রক্ত বাহির করিয়া সেই স্থানে চিহ্ন দিতে বলে। সে ভূমিতে

বার বার মাথা ঠুকার রক্ত বাহির না হওয়ায় গার্ড মহাশয় দুইটি পাথর আনিয়া দেন ও তাহার দ্বারা অঙ্গুলী ছেঁচিয়া রক্ত বাহির করিতে বলেন। বিধবা বার বার পাথরের ঘায়ে রক্ত বাহির করিতে অপারগ হইলে গার্ড সাহেব ধমক দিয়া উঁহার সে কড়ি আঙুলের নখ খিঁতো করিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলে ও তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে পাথরে পাঁচটি রক্তের অঙ্গুলী চিহ্ন দিলে পরিত্রাণ পান। বাইবার কালীন সাহেব বলিয়া যান—ইহাই আমাদের নির্দ্দেশ, বনে আর আসিও না। তিনি ঐ দিনেই বাগদার ডাক্তারখানায় চিকিৎসার্থে যান ও ঐ শুষ্ক পলাশ ডালসহ (যাহার ওজন ২।৩ সের) বৈকালে পুঞ্চা পুলিসে দেখান ও ডাইরী করেন; ২রা প্রাতে সদর হাসপাতালে প্রেরিত হন। সেখানে হাসপাতাল ও কোর্টের খরচ ইত্যাদি বহনে অপারগ বিধায় কোন সহৃদয় মোটর-ড্রাইভার কোনমতে তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তিনি আসিয়াই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। কেবল বলিতেছেন আমিও ছেলের কাছে চলিলাম। আশঙ্কা করা যায় ইহা দেশবাসীর গোচরীভূত হইবার পূর্ব্বেই তিনি হয়ত এ সংসার হইতে চিরবিদায় লইবেন। বৃদ্ধার শারীরিক ওজন পঁচিশ সেরেরও নীচে, লম্বায় ৪ ফুট মাত্র।"

মানভূমের লোকগণনায় সরকারী হাত-চালাকি

"গত লোকগণনার ব্যাপারে ইহা বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে কংগ্রেসী রাজত্বে খাস মানভূমে কোন আইন-কানুন, নিয়ম বা বিধি-বিধানের বালাই নাই—হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা খুশী করা চলে। কিন্তু মানভূমের ব্যাপারে উপর দিকেও কি করা হয় সেন্সাসের সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদটি তাহার একটি দিগ্‌দর্শন। মানভূম জেলার লোকগণনা সম্বন্ধীয় হিসাবপত্রের কাগজ সম্বন্ধে বিভাগীয় ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এমনি গোলমাল করিয়া ফেলেন যে, তাঁহাকে সরাইতে হয়। ভারপ্রাপ্ত সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শুধু অন্য লোক দিয়াই নয় নিজের পারসনেল সেক্রেটারী অর্থাৎ একান্ত সচিব দিয়া কাগজপত্রের হিসাব করিতে গেলে দেখা যায় যে, একমাত্র মানভূম জেলার লোকগণনা সম্বন্ধীয় বহু কাগজ উধাও হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ধরা পড়িয়া যত দূর পারা গিয়াছে জালিয়াতির আরও কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। একমাত্র মানভূম জেলার লোকগণনার সম্বন্ধে গোলমাল ধরা পড়িবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের লোকগণনার ফলাফলের প্রকাশ বিলম্বিত হইয়া আছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মানভূমের লোকগণনার সম্বন্ধেই এইরূপ গোলমাল ধরা পড়িয়াছে। আমরা মনে করি, বিহারের মধ্যে বাংলাভাষী অঞ্চলগুলির লোকগণনার হিসাবপত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার। ধলভূম সম্বন্ধেও অনুরূপ বহু অভিযোগ রহিয়াছে। সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের ব্যাপারে সর্ব্বত্রই এইরূপ কারচুপি করা হইয়াছে। এই অবস্থায় আমরা মনে করি যে, মানভূম ও বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের লোকগণনা নিরপেক্ষভাবে পুনরায় করা উচিত।"

পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় লোকগণনার কর্ত্তা শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় এই বিষয়ে তদন্ত করিবেন, এ আশা করিতে পারি।

বস্ত্রশিল্পের মূল সমস্যা

শ্রীমগনভাই দেশাই ২২শে নবেম্বর 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিতেছেন, "ভারতে এখনও মূলতঃ দুইটি শিল্পই প্রধান। প্রথম হইল কৃষিকার্য্য, দ্বিতীয় হইল বস্ত্র-উৎপাদন। ভারতবাসীদের অধিকাংশের জীবিকা এই দুইটি শিল্পের উপর নির্ভর করে। বিদেশী শাসকেরা এদেশে আসিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই উভয় শিল্পকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।" রায়তদের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্রিটিশ এমন ভূমিব্যবস্থা প্রচলন করে যাহাতে কৃষক অবহেলিত হইতে থাকে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্প গঠন করিয়া তুলিবার জন্য সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে আমদানী-রপ্তানী শুল্ক নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হয়। ফলে "যে দেশ বহুযুগ ধরিয়া সারা পৃথিবীতে দেশে দেশে বস্ত্র রপ্তানী করিত, সেই দেশ কোটি কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী করিতে লাগিল।" শ্রীদেশাইয়ের মতে রঙীন শাড়ী এবং পাড়-ধুতি শুধু হাতে বুনিতে দেওয়া এবং মিলে বোনা নিষিদ্ধ করার জন্য রাজাজী যে দাবি তুলিয়াছেন তাহা এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, এই দাবির সমর্থনে সরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সমগ্র মাদ্রাজ আইনসভা একযোগে উহা সমর্থন করে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন মিলগুলিকে ধুতি ও শাড়ী উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ কমাইতে হইবে এবং তাঁতীদিগকে এই পরিমাণ কাপড় বুনিতে দেওয়া হইবে।

মিল-বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস

মাদ্রাজে তাঁতিদের অবস্থা ইদানীং খুব খারাপ হইয়াছিল, কারণ সস্তার মিলের কাপড়ের সহিত তাঁতের কাপড় প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। রাজাজী তাঁতিদের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রভাবান্বিত করিলেন যাহাতে মিল-বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ভারত-সরকারের আদেশ জারী হইয়াছে যে, ১লা ডিসেম্বর হইতে মিলগুলি তাহাদের মাসিক উৎপাদনের গড়পড়তায় শতকরা ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত ধুতি উৎপাদন করিতে পারিবে। অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ ধুতি উৎপাদন হ্রাস পাইবে। মাসিক উৎপাদন সাধারণতঃ হইত ৫০,০০০ গাঁইট, এখন মাসে ৩০,০০০ গাঁইট ধুতি প্রস্তুত হইবে। অধিকন্তু মিলগুলি রঙীন শাড়ীও প্রস্তুত করিতে পারিবে না। প্রায় আড়াই মাস আগে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ঘোষণা

করেন যে, তিনি এইরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। রাজাজী অনেক দিন হইতেই মিলধুতি উৎপাদন হ্রাসের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সে প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হন নাই, কারণ তিনি বলেন যে, একটি প্রদেশের সমস্যাকে সারা ভারতের সমস্যা হিসাবে পরিণত করা উচিত নয়। শেষ পর্য্যন্ত রাজাজীরই জয় হইয়াছে।

অবশ্য সমস্যাকে আরও ঘোরালো করা হইয়াছে, সমাধান কিছু হয় নাই। মিশ্র অর্থনীতি গবর্ণমেণ্টের আর একটি অবিমৃষ্যকারিতার উদাহরণ। ভারতের মিল-বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত বহু রকম দুর্ব্বুদ্ধি এবং দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোয় তাঁতিদের অবস্থা খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতিদের টিকিয়া থাকা মুশকিল, কিন্তু তাহার প্রতিকার মিলের উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিয়া হয় না। এ কথা মনে রাখা উচিত যে, মিলগুলি সেবাশ্রম নয়— উৎপাদন হ্রাস তাহারা নিজেই চাহিয়া আসিতেছিল। বাজারে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় মিলে উৎপন্ন সকল বস্ত্রের কাটতি হইতেছিল না এবং রপ্তানীর বাজারও খুব মন্দা যাইতেছিল। মিলগুলি সুযোগ খুঁজিতেছিল উৎপাদন হ্রাস করিয়া দেওয়ার জন্য, কারণ তাহা হইলে শ্রমিকদের ছাঁটাই করা যাইবে। এ কথা মনে করিয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই যে, ভারতের মিলগুলি অত্যধিক উৎপাদন হইয়াছে এই ওজুহাতে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ করিয়া দেয়, ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়। এবারে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সে সুযোগ দিলেন। যেখানে অল্প উৎপাদন সেখানে শ্রমিক ছাঁটাই হইতে বাধ্য। তার জন্য গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন? আমেরিকায় যদি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগিতা করিয়া শিল্প বন্ধ রাখিত তাহা হইলে রাষ্ট্র সে প্রতিষ্ঠানকে জোর করিয়া চালু রাখিত। ভারতে চিনির কল ও কাপড়ের কলগুলি যখন মাঝে মাঝে অসহযোগিতা করিয়া উৎপাদন বন্ধ রাখিতেছিল, তখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের এমন সাহস ছিল না যে সেই শিল্পগুলি গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে লইয়া চালু রাখেন।

তাঁতিদের সুবিধার জন্য বোম্বাই, আমেদাবাদে যে মিল শ্রমিকেরা বেকার হইবে সেকথা কি গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যদি ভাবিয়া থাকেন ত তাহার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? এই ব্যাপারে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। এত তাড়াতাড়ি মিলের বস্ত্র উৎপাদনের হ্রাসের আদেশ না দিয়া কমিটির সুপারিশের জন্য অপেক্ষা করিলে কি ভাল হইত না? দেশের লোক যাহাতে প্রয়োজনানুসারে কাপড় পাইতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কি সজাগ থাকিবেন? দুই দিকেরই বিচার প্রয়োজন।

তাঁতের কাপড়ের দাম মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশী হইবে। অতিরিক্ত খরচের বোঝা জনসাধারণের উপর জোর করিয়া চাপানো হইবে না কি? মাদ্রাজের তাঁতিরা কি মাসে কুড়ি হাজার গাঁইট বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিবে? না হইলে কালোবাজারের জয়।

রেশম ও তাঁতশিল্পের সঙ্কট

"বীরভূম জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ হইতে নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ও তথ্য-সংগ্রাহক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল জানাইয়াছেন যে, 'বিগত যুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর থেকেই ভারতীয় রেশম শিল্পের দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে। সেই দুরবস্থা আজ এমন চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, রেশমের তাঁতীরা অন্নাভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। বিশেষতঃ রামপুরহাট মহকুমার বসোয়া-বিষ্ণুপুর' অঞ্চলের তাঁতীদের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এক জন তাঁতীর অনশনে মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়াছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপঞ্চানন শেঠ, এম-এল-এ-দ্বয় সরকারকে দীর্ঘ দিন থেকে নানাভাবে তাঁতীদের দুর্দ্দশার কথা জানান সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে লোক-দেখানভাবে এক বার খবর নেওয়া ব্যতীত সম্পূর্ণ নির্ম্মমভাবে উদাসীন। সরকারের এই উদাসীনতার কারণ রেশম যেহেতু গরীব দেশবাসীর কাজে লাগে না, সাধারণতঃ ধনীরা ব্যবহার করে এবং বাংলা তথা ভারতীয় সরকার যেহেতু গরীবের সরকার সেইজন্যই নাকি এই উদাসীনতা! সত্যই দরিদ্রসখা ভারত-সরকার প্রশংসার্হ। তবে বর্ত্তমানে গরীবের মা-বাপ (?) ভারত-সরকার যদি একবার মুখ তুলে তাকান, দেখতে পাবেন যে, রেশম আর বড়লোকে ঘৃণায় ব্যবহার করছে না, কারণ সূতার কাপড়ের চেয়ে তার দাম নাকি নীচে নেমে গেছে! কাজেই সরকার যদি এখন একবার তাঁতীদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাদিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন, তা হলে বোধ হয় বড়লোকের সরকার বলে আর অপবাদ হবে না! আমাদের দাবি হ'ল, সরকার এই সব রেশমের তাঁতীদিকে সরকারী সাহায্য দানের জন্য অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। এটি একান্ত কর্ত্তব্য'।"

"বীরভূম-বার্ত্তা" পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিবরণ বীরভূমের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা নিঃসহায় হইয়া রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া আছেন। এদিকে আবার ইঁহারা ব্যক্তিস্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোক কি বীরভূমে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে?

স্বর্ণমূল্য পরিস্থিতি

সোনার দাম এবং রূপার দাম ইদানীং যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে সোনার ভরির মূল্য ৭৭৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদিও তাহা আবার ৮০৲ টাকায় উঠিয়াছে, কিন্তু ঠেকা দিয়াও দাম ৮০৲ টাকার উপর রাখিতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহ। রূপার দাম ১৪৪৲ টাকায় (১০০ ভরি) নামিয়াআসিয়াছে। ১৯৪৭-৫০ সাল পর্য্যন্ত অনেকগুলি কারণে সোনার বাজার খুব তেজী ছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা, অল্প উৎপাদন, চীনের সোনা ক্রয়, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির জন্য এবং ফাটকা-বাজারে লাভের আশায় সোনার দাম খুব চড়া ছিল। ভারতে কয়েকবার সোনার দাম ১১৮৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ভরি উঠিয়াছিল। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্ত-

যুদ্ধের আশঙ্কা কম। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, চীন সোনা ক্রয় বন্ধ করিয়াছে এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ফাটকা-বাজারে প্রচুর লোকসান হইয়াছে।

সোনার মূল্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার হিসাবে, অর্থাৎ আড়াই ভরির দাম হইতেছে ১৬৬৲ টাকা। এই হিসাবে এক ভরির দাম বর্ত্তমানে হওয়া উচিত ৬৬৲ টাকা, টাকার মূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে দাম হইত ৪৪৲ টাকা ভরি। ভারতে এই দামে সোনা যুদ্ধের পর কোন দিনই পাওয়া যায় নাই। সোনার দাম ভারতে প্রায় নির্দ্ধারিত হয় বোম্বাই বুলিয়ন সমিতি দ্বারা। বুলিয়ন সমিতি নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। সোনার ফাটকাবাজারে তাহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছে এবং গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট ছিল। স্বর্ণমূল্য মুদ্রামানের মাপকাঠি। ভারতের দ্রব্যমূল্যমান অধিক হওয়ার কারণ স্বর্ণমূল্য এদেশে অত্যধিক। সোনার চোরা-আমদানীর পক্ষে ভারতবর্ষ নাকি স্বর্গরাজ্য, কারণ পৃথিবীর বাজার যখন পড়তির মুখে, তখন ভারতের বাজারে সোনা চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে।

ভারতের সোনার দাম হ্রাস পাইলে তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। সোনার দাম কমিলে জিনিষের দাম কমিবে এবং জীবিকার মান (cost of living) কমিতে বাধ্য। সোজা কথায়, সোনার দাম কমিলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইবে।

স্বর্ণ-উৎপাদক দেশগুলি—দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া দাবি করিয়া আসিতেছে যে, স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহাদের কথা হইতেছে যে, যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে সোনার উৎপাদন-ব্যয়ও বাড়িয়াছে। আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার ১৯৩৪ সালে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সাধারণ মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ায় সোনার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সোনার দাম না বাড়াইলে এই সকল দেশের পক্ষে সোনার উৎপাদন বৃদ্ধি করা অসম্ভব, কারণ খরচ বর্ত্তমানে নাকি অত্যধিক। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সোনার দাম বাড়াইতে একেবারে নারাজ, ফলে সোনার দাম আউন্স প্রতি সেই ৩৫ ডলার আছে। তবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বাধীনভাবে সোনা বিক্রয় করিবার অনুমতি দিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা পৃথিবীর বাজারে দুই-এক বৎসর সোনা প্রতি আউন্স ৩৮ ডলার বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু সোনার চাহিদা এত কমিয়া গিয়াছে যে, ঐ দামে আর সোনা বিক্রয় হয় না।

তবে সোনার "অফিসিয়াল" দাম বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যদি সোনার দাম বাড়ায় তাহা হইলে স্বর্ণ-উৎপাদক দেশগুলি উপকৃত হইবে। অন্ততঃ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহারা অল্প সোনার পরিবর্ত্তে অধিক জিনিষ আমদানী করিতে পারিবে।

সোনার দাম বাড়ানোর জন্য ভারত-সরকার কোন দিনই দাবি জানান নাই। কারণ প্রথমতঃ ভারতের অতিরিক্ত সোনা নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ভারত এখন দেনদার। সোনার দাম বৃদ্ধি পাইলে ভারতকে অধিক জিনিষ রপ্তানী করিতে হইবে দেনা শোধের জন্য। ভারতের যদি আজ অতিরিক্ত সোনা থাকিত তাহা হইলে সোনার মূল্য বৃদ্ধিতে আমাদের লাভ হইত। ভারতবর্ষের যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ঘাটতি যাইতেছে, তখন সোনার মূল্য হ্রাস তাহার পক্ষে শুভ। সুতরাং সোনার মূল্য হ্রাসে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। তবে ভারতের আজ আভ্যন্তরীণ স্বর্ণমূল্য যে ধাপে অবস্থিত (অর্থাৎ ৮০৲ হইতে ৮৫৲ টাকায় ভরি), তাহা যদি আন্তর্জাতিক বাজারে "অফিসিয়াল" মূল্য হইত তাহা হইলে ভারতের পক্ষে লাভ হইত। কারণ সোনার মূল্য ৩৫ ডলারের উপরে বৃদ্ধি পাইলে ডলারের মূল্য হ্রাস হইবে, ফলে ভারতের পক্ষে হইবে লাভ। কারণ ডলারের মূল্য হ্রাস পাইলে ভারতের ঋণভার অনেক কমিবে। ডলারের মূল্য হ্রাস পাইলে আমাদের টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং আমেরিকার সহিত ব্যবসায়ে আমাদের অবস্থা ভাল হইবে। ভারতের আভ্যন্তরীণ সোনার দাম আন্তর্জাতিক সোনার দাম হইতে বেশী হওয়ায় ভারতের জিনিষ আজ আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। সোনার শুধু ডলার মূল্য বাড়িলে ভারতের পক্ষে লাভ, কিন্তু সকল মুদ্রার বিরুদ্ধে বাড়িলে ভারতের পক্ষে ক্ষতি।

পশ্চিম দিনাজপুর বালুরঘাট যাতায়াত প্রসঙ্গ

"বিগত ১৪ই ও ১৭ই অক্টোবর মধ্য রাত্রি হইতে ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বালুরঘাট গতায়াতের সহজপথ রুদ্ধ হয়। অথচ বালুরঘাট যাইতেই হইবে। তজ্জন্য আমি গত ১৭।১০।৫২ তারিখ সন্ধ্যা ৫-২২ মিঃ এর ট্রেনে জলপাইগুড়ি হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৭টায় শিলিগুড়ি নর্থ ষ্টেশনে পৌঁছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দিন ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস সাড়ে ছয় ঘণ্টার উপর বিলম্বে শিলিগুড়ি নর্থ ষ্টেশনে পৌঁছায়। এজন্য বারসুই ষ্টেশনে কালীয়াগঞ্জগামী ট্রেন ধরা যায় না। ফলে যাত্রীদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। এইরূপ একটি অত্যাবশ্যক ট্রেন এত অধিক বিলম্বে পৌঁছিবার কারণ সম্বন্ধে শিলিগুড়ি নর্থ ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক কারণ জানিতে পারিলাম না। আমার যতদূর মনে হয়, পূর্ব্বে যদি কোন সংযোগ রক্ষাকারী ট্রেন পথে 'সিডিউল্ড' সময়ের অধিক বিলম্ব করিত, তাহা হইলে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য দ্বিতীয় একটি ট্রেন ছাড়িবার ব্যবস্থা করিতেন। এক্সপ্রেস অসময়ে পৌঁছানোর ঐ দিন কলিকাতাগামী যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ অনিবার্য্য হয়। যাহা হউক, প্রায় সাত ঘণ্টা শিলিগুড়ি নর্থ ষ্টেশনে এবং প্রায় ৮।৯ ঘণ্টা বারসুই ষ্টেশনে স্নানাহার বিহীন অবস্থায় কাটাইবার পর অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় কালীয়াগঞ্জগামী ট্রেন পাই এবং সন্ধ্যা প্রায় ছয়টায় কালীয়াগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছি। কালীয়াগঞ্জ হইতে বালুরঘাটের দূরত্ব বাহান্ন মাইল এবং ঐ রাস্তা মোটর বাসে

যাইতে হয়। শুনিয়াছিলাম যে ঐ রাস্তার নাম "National High Way" এবং উহা সরকারের রক্ষণাবেক্ষণাধীন। কিন্তু রাস্তাটির দুরবস্থা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে উহার প্রকৃত কোন 'মালিক' নাই।

আরও দুঃখ ও বিড়ম্বনার কথা এই যে, গত জুলাই মাসের প্লাবনে আবার ঐ রাস্তার কয়েকটি পুল একেবারে চলাচলের অযোগ্য হইয়া যায়। অদ্যাপি ঐগুলি সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই। এই কারণে এক্ষণে তিন মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গিয়া বাসে উঠিতে হয়। সেদিন (অর্থাৎ ১৮।১০।৫২ তারিখে) দীপান্বিতা কালীপূজা, অমানিশাজনিত সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেরূপ অন্ধকারে অপরিচিত পথে চলা কত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকর, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা জানেন।"

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী গত ২৪শে কার্ত্তিক তারিখের "জনমত" পত্রিকায় উপরোক্ত অব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকাখানির সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে পত্রিকাখানি জলপাইগুড়ি শহর হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল যেরূপ ভাবে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কল্যাণে একটি সূত্র দ্বারা ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রথিত আছে, তার বিপদ যে কোন লোক বুঝিতে পারে। সেইজন্য এই অঞ্চলের যাতায়াতের উন্নতি সময়সাপেক্ষ করিয়া রাখিয়া দিলে চলিবে না। শৈলেন্দ্র বাবুর বিবৃতি অবলম্বন করিয়া সান্যাল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভায় নিজেই প্রশ্ন করিতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিবর্গ এই বিষয়ে তৎপর হইলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ব্যারাকপুরে মৎস্যচাষ সংক্রান্ত গবেষণা

"বাংলাদেশে এমন লোকও আছেন যাঁহারা পুকুর হইতে মাছ ধরিয়া মাছগুলিকে ভাল করিয়া দেখিয়া আবার জলে ছাড়িয়া দেন! একদিন নয়—প্রায়ই তাঁহারা এইরূপ করেন এবং বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহা করেন। ইঁহারা গবেষণারত বৈজ্ঞানিক, কলিকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্রে ইঁহারা মিষ্ট জলের মাছ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। মাছের খাদ্য, মাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁহারা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। খাইবার মাছ এবং ঔষধাদির জন্য প্রয়োজনীয় মাছ উভয় প্রকার মাছ সম্বন্ধেই তাঁহারা পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের এই সকল পরীক্ষা সার্থক হইলে দেশের খাদ্যসম্পদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও বাড়িবে এবং মৎস্যের ন্যায় একটি অতি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের সম্ভাবনা দেখা দিবে। ব্যারাকপুর গবেষণা কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞগণ ইলিশ, খোয়সোলা প্রভৃতি জাতীয় মাছের জীবনেতিহাস, আবাসস্থান, অভ্যাস প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। ইহাদের জীবনধারণ প্রণালী, শরীরের যন্ত্রপাতি এবং যে সকল জীবাণু ইহাদের অনিষ্ট সাধন করে সেইগুলিও তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

"মাছের বীজ বিমান বা ট্রেনে চালান যায়। ব্যারাকপুর গবেষণা কেন্দ্রের এইটি একটি অন্যতম প্রধান কাজ। বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে বীজ বলিতেছেন, আমরা অবশ্য তাহাকে বলি মাছের বাচ্চা বা পোনা। এক অথবা দুই ইঞ্চি পরিমিত এই সকল মৎস্য-শাবক টিনে অথবা খোলা মৃৎপাত্রে করিয়া দেশ ভ্রমণ করে।

"বোম্বাই, হায়দরাবাদ, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, মাদ্রাজ এবং আসামে এই ভাবে এইগুলি চালান যায়। জুন মাসের শেষ ভাগ হইতে অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চৌদ্দ সপ্তাহের এক মরশুমে গড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২,০০,০০০ পোনা ব্যারাকপুর গবেষণা কেন্দ্র হইতে বিমানে অথবা ট্রেনে চালান যায়।

"বিমানে বদ্ধ টিনে করিয়া এইগুলি চালান দেওয়া হয়। এই সকল টিনের মধ্যে জল থাকে এবং ভ্রমণকালে মৎস্যকুলের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে যাহাতে কোনও বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য পাম্প করিয়া ঐ সকল টিনের মধ্যে অতিরিক্ত অক্সিজেন ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ট্রেন ভ্রমণের সময় ইহারা প্রকাণ্ড মৃৎপাত্রে জলে সন্তরণ করে। ইহাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীও থাকে।

"রেলওয়েসমূহের সঙ্গে বিশেষ বন্দোবস্ত অনুসারে মেল গাড়ীগুলিতে ইহাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা থাকে। সাধারণতঃ সঙ্গে থাকে একজন ধীবর এবং চারি জন প্রহরী।

"গবেষণা ছাড়া ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ব্যবহারিক মৎস্যচাষ সংক্রান্ত শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাকাল দশ মাস। শিক্ষার্থীরা সকল রাজ্য হইতেই আসিয়া থাকেন। ইঁহাদের অধিকাংশই রাজ্য সরকারসমূহের মনোনীত। এই শিক্ষাদান কেন্দ্রে যোগ দিতে হইলে শিক্ষার্থীদের অন্ততঃ প্রাণিবিদ্যায় একটি ডিগ্রী থাকা চাই। বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও কোনও সময় এই ডিগ্রী ব্যতিরেকেও শিক্ষার্থী-দিগকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।"

উপরোক্ত বিবরণটি পত্রান্তর হইতে সংকলিত হইল। এসব গবেষণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার ফল গ্রামবাসীর হাতে পৌঁছাইয়া দিলেই সমস্ত ব্যয় ও শ্রম সার্থক হইবে। এই সম্বন্ধে আরও বিবরণের জন্য প্রতীক্ষায় রহিলাম।

অধিকারী কে?

সর্ব্বোদয়, ভূদান ও সাম্যবাদ সম্পর্কে স্বর্গত কিশোরলাল মশরুওয়ালা ও শ্রী এস. কে. পাটিলের মধ্যে গভীর ও সারগর্ভ আলোচনা হয়। ২২শে নবেম্বরের "হরিজন" পত্রিকায় কিশোরলাল মশরুওয়ালার ঐ বিষয়ক পত্রাবলীর এক স্তবক প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "সর্ব্বোদয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না; কারণ 'সমস্ত ভূমিই ভগবানের' এই বিশ্বাসের উপর ভূদান আন্দোলনের ভিত্তি। কোন বিশেষ লোকের কোনও এক বিশেষ ভূমিখণ্ডের উপর অধিকার—সীমাবদ্ধ অধিকার। তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে সেই জমির দিকে মনো-যোগ দেয়, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা জমির উন্নতি সাধনে প্রয়োগ করে। সে ভূমিকে আপন মনে করিয়া পরিশ্রম করিবে,

কিন্তু শুধু আপনার প্রয়োজন মিটাইতে নয়। 'সমস্ত ভূমিই ভগবানের' এই বিশ্বাস 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' (ঈশ্বর সবকিছু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন) এই নীতির আংশিক প্রয়োগে। শুধু জমি নয়, জগতে যাহা কিছু আছে, আর মানুষ যাহা কিছু উৎপাদন করে সকলই ভগবানের, মানুষ কেবল তাহার প্রাপ্য অংশ মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' (নির্লিপ্তভাবে ভোগ কর) স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম অংশকে অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবেই। ইহার সঙ্গে খাজানা, সুদ মুনাফা সকলই যাইবে। ভূদান আন্দোলনের লক্ষ্য হইতেছে এইরূপ অবস্থার-প্রতিষ্ঠা করা— তবে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি সহায়ে, রাষ্ট্রের দ্বারা বা পরোক্ষভাবে চাপ দিয়া অথবা রক্ত বিপ্লবের দ্বারা নয়। পরন্তু জমির মালিকদের, এমন কি যাহাদের জমি নাই তাহাদের মধ্যেও যত বেশী লোককে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায় সেই প্রচেষ্টার দ্বারা। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বেশীর ভাগ লোকই, এমন কি যাহাদের চালচুলা নাই সেই সকল লোকও অন্তরে পুঁজিবাদী, তাহারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তির, মুনাফার ও মাহিনার কথা ভাবে।"

মশরুওয়ালার পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমিহীন চাষী থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যাহাতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব চাষের কিছু জমি থাকে তাহার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিতে এইরূপ চাষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নাও হইতে পারে, কারণ চাষের আয়ে সকল ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না। মশরুওয়ালা নিজেও মনে করেন যে, "কৃষিকাজ বা পশু পালন ছাড়া করিবার মত অন্য কোন কাজ কৃষক পাইবে না তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। "যেখানে চাষের কাজে লোক সারাবৎসর লাগিয়া থাকিতে পারে সেখানেও চাষের সঙ্গে কিছু শিল্পকার্য্য (ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নহে) সংযুক্ত থাকা উচিত। তেমনই প্রত্যেক শিল্পী অথবা কারিগরের হাতে কিছু চাষের কাজ থাকাও উচিত।"

লভ্যাংশ প্রদান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মশরুওয়ালা লিখিতে-ছেন যে, "লভ্যাংশ প্রথা যদি রাখিতেই হয় তবে মধ্যবর্ত্তীকালের ব্যবস্থারূপে রাখিতে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়া দিতে হইবে, ডিবেঞ্চার অথবা প্রেফারেন্স শেয়ারের আকারেও রাখা চলিবে না। মাংরোথ গ্রামের লোক গ্রামের সমস্ত জমি যেমন বিনোবার হাতে তুলিয়া দিয়াছে, সেইরূপ জমি দান করাই হয়ত জমি বণ্টনের আদর্শ হইয়া উঠিবে। সকল ভূমিই গোপালের এ নীতি যখন কার্য্যকরী হইবে তখন লভ্যাংশ প্রদানের নিয়ম পুরাপুরি লোপ পাইবে" ইহাই মূল কথা।

তিনি বলেন যে, "পারিশ্রমিক এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে সমস্ত খরচ চলিয়া যায়। ইহাতে ভাগ করিবার মত মুনাফা অবশিষ্ট না থাকিলেও কিছু যায় আসে না। সত্যিকার কর্ম্মী যাহারা তাহাদের ইহাতে ভীত হইবার কিছু নাই। অকেজো অংশীদারের ভাগে যদি কিছু না পড়ে তবে তাহাকে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে, আর না হয় কর্ম্মী অংশীদার হইতে হইবে ও সুদের পাওনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

শ্রীপাতিলের পত্রের কয়েকটি অনুচ্ছেদের উত্তর দিতে গিয়া তিনি বলেন যে, সমবায় সমিতিই হউক আর পঞ্চায়েৎই হউক তাঁহার বিবেচনায় ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা উহা পরিচালনা হওয়া উচিত নয়। কার্য্য পরিচালক সমিতি থাকিতে পারে তবে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য। চরম নিষ্পত্তির অধিকার কার্য্যকরী সমিতির হাতে থাকিবে না, থাকিবে সদস্যদের হাতে।

তাঁহার মতে বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে খাজানা, সুদ, মুনাফা ও মাল চলাচলের ব্যয়ের উপর অর্থ নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করিলে চলিবে না। কর্ম্ম-সৃষ্টির জন্য নূতন নূতন শিল্প গড়িয়াও কোন লাভ হইবে না। কারণ "বিশ্লেষণের শেষে দেখা যায়, মাহিনা উৎপাদন ব্যয়েরই অংশ, মাহিনাবৃদ্ধির সহিত উৎপাদন-ব্যয়ও বাড়িয়া যাইবে এবং সেই অনুপাতে দ্রব্যমূল্যও বাড়িবে। ফল এই দাঁড়াইবে যে, আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা মাহিনা কোন রকমেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং মাহিনা বৃদ্ধির দাবিরও শেষ নাই। ইহার উপর যদি যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি আরও অগ্রসর হয় তবে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে।" উপরন্তু বৃহদাকার শিল্প ও সামরিক ব্যবস্থা দুই যমজ ভাইয়ের মত। বৈজ্ঞানিক শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে সামরিক ব্যয় হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিবে। "রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মতই হউক অথবা ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মতই হউক, কলকারখানা যত বৃহৎ হইবে ততই অধিক সংখ্যার পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কের আবশ্যক হইবে—ইহারা উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে কোনও কাজে আসে না অথচ যাহারা হাতেনাতে কাজ করে তাহাদের অপেক্ষা অধিক বেতন পায়। এই ভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মাহিনা বাড়াইয়া দিলেও শ্রমিকরা আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করিতে সমর্থ হয় না। অল্প মাহিনা আর বেশী মাহিনার বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। রুশিয়াতেও ইহা দেখা দিয়াছে।"

ভারতের মত জনবহুল দেশে বৃহদাকার শিল্প ও কৃষিকার্য্যের প্রসার সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, নতুবা জনসাধারণ রক্ষা পাইবে না। যে সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে চাষ হইত না কেবলমাত্র সে সকল অঞ্চলে বৃহদাকার কৃষিপদ্ধতি চালু করা যাইতে পারে। এ স্থলেও ভূমি ভূমিহীনদের চাষের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হিমালয় ও অন্যান্য পাহাড়িয়া অঞ্চলের ঢালু পাথর ও মৃত্তিকা-স্তূপকে সমতলভূমিতে পরিণত করিবার কাজ মানুষের হাত তত ভাল করিয়া করিতে পারে না, সেখানে যান্ত্রিক চাষের দ্বারা অনেক সুবিধা হইতে পারে। মশরুওয়ালার বিবেচনায় বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে জমি উন্নয়ন পরিকল্পনা ঐরূপ স্থলেই ভাল হইবে যেখানে জমি উন্নয়ন মানুষের দৈহিক শক্তির অতীত। সেইজন্য সেচ পরিকল্পনাও তাঁহার মতে পার্ব্বত্য অঞ্চলেই ভাল কাজ করিবে।

আমরা এই পত্রের সঙ্কলন পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত

করিলাম দুইটি বিশেষ কারণে। বর্ত্তমানে কৃষি ও ভূমির যে সকল সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহার সমাধান কিভাবে সম্ভব তাহা কোন দিক হইতেই সঠিকভাবে দেখা যায় না। কয়েকটি দল ঐ সমস্যাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পথ বলিয়া দেখেন, সুতরাং সমাজের মধ্যে শ্রেণীযুদ্ধ বাধাইয়া ভূমিহীনদিগকে নিজেদের দিকে টানিয়া লইতে চাহেন। কম্যুনিষ্ট নীতি অনুসারে চাষীর এক কাঠা নিজস্ব জমিও থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র নামক জীবনহীন, দয়ামায়া-হীন, আত্মানাশী এক যন্ত্রদানব সকল ভূমির একচ্ছত্র অধিকারী। চাষী সেই কলের ইন্ধন মাত্র যোগায় তাহার রক্তে ও ঘর্ম্মে, এবং চাষীর রক্ত ও ঘর্ম্ম যোগাইবার শক্তি যাহাতে থাকে সেইজন্য তাহাকে ভরণপোষণের সামগ্রী দেয় রাষ্ট্র। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্র ও চাষীর মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের নির্দ্দয় ও নির্ম্মমভাবে বিলোপ না করিলে রাষ্ট্রদানবের কুক্ষীপূর্ণ হইতে দেরী হয়, সুতরাং তাহাদের হিংসাত্মক পন্থায় বিনাশ করাও প্রয়োজন। চাষীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন ইহাতে হইবে না, কেননা বিভিন্ন জমিদারের পরিবর্ত্তে এক বিরাট জমিদার সকল অধিকার গ্রহণ করিবে।

অন্য দিকে কংগ্রেসের সাহস নাই কোনও পন্থা স্পষ্টভাবে ও সরল ভাবে চালাইবার। সততা নাই যে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনও নীতির প্রবর্ত্তন করার। ফলে ছলনা ও দীর্ঘসূত্রিতাই তাহাদের এ বিষয়ে সাধারণ পন্থা দাঁড়াইয়াছে।

এরূপ অবস্থায় গান্ধীবাদের মতে পথ কি তাহা আমাদের বিবেচনা ও চর্চ্চা করা নিতান্তই প্রয়োজন।

ভূদান

গোপালগঞ্জে পনর হাজার বিশাল জনতার সম্মুখে ভাষণ দিবার সময় আচার্য বিনোবা বলিলেন, "আমার আহ্বান চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। অবালবৃদ্ধবনিতা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভূমি ভগবানের দেওয়া বস্তু। ইহার উপর সকলের সমান অধিকার। ভূমিহীনদের মনে এমন আশা জাগিয়াছে। তাহাদের আর নিরাশ করা চলে না। আপনারা যদি তাহাদের আশা পূরণ না করেন তবে বিপদ ত আসিবেই। কিছু লোক বলিতেছেন যে, বিনোবাজীর কাজ বিপজ্জনক। কিন্তু আপনারা যদি মনে মনে এই ঠিক করিয়া থাকেন যে, ভূমিহীনকে ভূমি দিবেন না, তবে বিপদ আসিবে। এরূপ হইতে পারে না যে, আপনাদের ঘরে আগুন লাগিবে এবং আপনারা তাহা নিবাইতেও যাইবেন না আর বলিবেন, আমরা গঙ্গার শীতল জলে বিহার করিতেছি। যদি প্রাণ খুলিয়া আপনারা দান না করেন তবে বিপদ আমি আনিব না, আপনারাই ডাকিয়া আনিবেন। যাহারা আমার কাজে বিপদ দেখিতে পান তাঁহাদের হৃদয় কপটতাপূর্ণ। আপনারা নিজের হৃদয়ে যে বিষের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যদি দূর করিতে পারেন তবে দেখিবেন যে, আমি সকলকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমার লক্ষ্য হইতেছে 'সর্ব্বোদয়'। আমার বিশ্বাস আছে যে, সকলেই এই কাজে সহযোগিতা করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, "ধর্ম্মস্য ত্বরিতা গতিঃ"। যে কাজ করিতে হইবে তাহা সময়ে যদি না করা হয় তবে উহা না করার সামিল হইয়া যায়। ধর্ম্মাচরণ ত্বরিত হওয়া উচিত। যদি আজ আপনারা ধর্ম্মকে নাশ করিতে উদ্যত হন, তবে ধর্ম্মও আপনাদের নাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। কিন্তু যদি আপনারা ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তবে ধর্ম্মও আপনাদের রক্ষা করিবেন।

আমার এই কাজ অবশ্য সফল হইবে, যেহেতু ইহা কালপুরুষের দাবি। যখন ঝড় আসে তখন শুধু বালিই নয়, পাতাও উড়িতে সুরু করে। ইহার জন্য কাহারও কোন রূপ আর বাধা আসিতে পারে না। সুতরাং সকলেই দান করিবার প্রেরণা পাইবে। যত শীঘ্র ধর্ম্মাচরণ করা যাইবে তত শীঘ্রই ফল পাওয়া যাইবে। যে কোন কাজ সময়ে করিলেই তাহার প্রয়োগ ঠিক হয়।"

বিনোবাজী আরও বলিলেন, "ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে অশান্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এইমাত্র আমি শুনিলাম যে, নেপালেও অশান্তি হইতেছে। এই সকল অশান্তি সৈন্য বা পুলিস দ্বারা দূর হইবে না।· শুধু অস্ত্রে নয়, অশান্তির মূল উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। আমার কাজ হইতেছে অশান্তির মূল উৎপাটন করা। মূল উৎপাটন মানে ভূমিহীনকে ভূমি দান করা। তখনই কেবল শান্তি স্থাপিত হইবে।

শ্রিয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্,
শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্।"

বিনোবাজী বলেন "দান শ্রদ্ধার সহিত দিতে হইবে। প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী দান করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে সভায় আসিতে বাধা দানের বিরুদ্ধে বিনোবা বলেন যে, উহা সমাজের কল্যাণের অত্যন্ত পরিপন্থী। পরিশেষে তিনি গ্রামবাসীদের সামনে পঞ্চবিধ কার্যক্রম তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন, "গ্রামবাসিগণকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং তাহার জন্য কুটীর-শিল্প প্রয়োজন। গ্রামে পরিচ্ছন্নতা আনিতে হইবে···প্রত্যেক দিন সভায় প্রার্থনা হওয়া উচিত।···প্রত্যেক দিন রাত্রে স্মরণ-মননেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সকলের আগে নিজের নিজের জমির ছয় ভাগের এক ভাগ ভূমিহীন ভাইদের দেওয়া প্রয়োজন।···গ্রাম তখনই স্বর্গে পরিণত হইবে যখন এই পঞ্চবিধ কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। আপনারা সর্ব্বপ্রকার বিপ্লব সাধন করিয়া অহিংস সমাজের আদর্শ রচনা করুন।"

"ষ্টেপ এসাইড" ভবনে জাতীয় স্মৃতি-মন্দির

দার্জ্জিলিঙে যে গৃহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগ করেন তাহার নাম "ষ্টেপ এসাইড"। এই ভবনটিকে ক্রয় করিয়া সেখানে একটি জাতীয় স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। দেশবাসীর নিকট এক আবেদনে ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জ্জিলিঙে "ষ্টেপ এসাইড" ভবনে দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর শত শত দেশবাসী এই ভবন দর্শন করিবার

জন্ম যান। বহুদিন পূর্ব্বেই এই ভবনটি একটি জাতীয় মন্দিরে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং আজ ঐ ভবনটি ক্রয় করা উচিত; কেবলমাত্র জাতীয় মহান্ নেতার স্মৃতিরক্ষা করা বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য নহে, পরন্তু দরিদ্রের সেবার জন্য; যে আদর্শ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা হিসাবেও উহা প্রয়োজন। যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই একমত যে, যে কক্ষে দেশবন্ধু শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেটি এবং বাড়ীটির দ্বিতলের অংশকে পৃথক করিয়া সেখানে দেশবন্ধুর সামান্য আসবাবপত্র, মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, ছবি, পাণ্ডুলিপি, রচনাবলী এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অনুরাগী এবং বন্ধুদের নিকট বিক্ষিপ্ত স্মৃতিচিহ্নগুলি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হওয়া উচিত। বাড়ীটির নীচতলায় কি হইবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনও স্থির হয় নাই।

রাজ্যপাল আরও বলেন যে, শুধু বাড়ীটি ক্রয় করিয়া উহার সংস্কারসাধন করিলেই হইবে না, একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠন করিতে হইবে যাহার আয় দ্বারা বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্য করা যাইবে।

যাহাতে শীঘ্রই এই কার্য্য সম্পন্ন করা যায় সেজন্য দার্জ্জিলিঙের অধিবাসীদের বহুবিধ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাজ্যপাল দেশবাসীর নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। দেশবন্ধু ছিলেন জাতির নেতা—সকল দল ও উপদলীয় সঙ্কীর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে। সুতরাং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, দেশবাসী স্বেচ্ছায় অর্থসংগ্রহের কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে: রাজ্যপালের সেক্রেটারী অথবা কোষাধ্যক্ষ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

দার্জ্জিলিঙের অধিবাসীদের অধিকাংশই অবাঙালী। অতীতে বাঙালীদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আশানুরূপ প্রীতিকর ছিল না। অবিশ্বাস্য দুরবস্থার মধ্যে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন কাটাইতে হয়। রাজ্যপাল 'ষ্টেপ এসাইড' ভবনটি ক্রয় করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করি। উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যদি সেখানে একটি হাসপাতাল বা শিশুসেবাকেন্দ্র বা অনুরূপ কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায়, যাহাতে স্থানীয় অধিবাসীরাও উপকৃত হইতে পারে, তবে সেখানকার অধিবাসী ও বাঙালীদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধির পথ সুগম হইবে, এবং দার্জ্জিলিংকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে সংগঠিত করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক যে বিভেদমূলক প্রচারকার্য্য চালাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের মত সংগঠিত করিতে প্রভূত সাহায্য করিবে। দার্জ্জিলিঙের অধিবাসী অনুন্নত পাহাড়ী জনগণ যে আমাদের আপন জন, তাহা আমরা মুখে বলিলেও কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এখন সময় আসিয়াছে সে কার্য্যে হাত দেওয়ার। দেশবন্ধুর নামে সে কাজ উৎসর্গ করিলে সকল দিক দিয়াই তাহা সমীচীন হইবে।

স্বাধীন ভারত

শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই পত্রিকা গত ২৬শে বৈশাখ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তখন "আমাদের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"কেবলমাত্র বাস্তবতার দিক হইতেই যে স্বাধীনতাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না তাহা নয়, রাজনৈতিক কলা-কৌশলের দিক হইতেও সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা আমাদের বিচারে আত্মঘাতী পন্থা। যে জনগণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন, স্বাধীনতার তড়িৎ-স্পর্শে যে জনগণ জাগ্রত ও সঞ্জীবিত, দেশের রাজনৈতিক মুক্তির মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় মুক্তির চক্র সংগ্রাম ও সাধনা করার যোগ্যতাসম্পন্ন অধিকারী তাহারাই। 'ঝুটা আজাদীর' আওয়াজ তুলিয়া যাঁহারা আস্ফালন করিয়া বেড়ান, স্বাধীনতার চেতনা হরণ করিয়া, মিথ্যা শ্লোগানের মন্ত্রে সম্মোহিত করিয়া জনগণকে প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করাই তাঁহাদের প্রাথমিক কার্য্যসূচী; তাঁহারা চান, গণদেবতাকে আগে হত্যা করিতে এবং তাহার পর তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা অর্ঘ্য তাঁহার পায়ে নিবেদন করিতে। কালের স্রোতে উজান বাহিয়া জাহান্নামের পথে যাঁহারা যাত্রা করিতে চান, দলীয় নৌকায় দুরাশার পাল তুলিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহারা নিজে তাহা করিতে পারেন; সমগ্র জাতিকে আত্মঘাতের সে পথে টানিয়া লইয়া যাইবার নৈতিক অথবা রাজনৈতিক কোন অধিকার তাঁহাদের নাই।

আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা মাত্র সম্বল করিয়া, 'সব পেয়েছির আসর' সাজাইয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন এবং সরল বিশ্বাসী জনসাধারণকে সে আসরে আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছেন—তাঁহাদেরও দলভুক্ত আমরা নই। ঝুটা আজাদীর ধ্বনি যেমন ধোঁকায় ভরা, 'সব পেয়েছির' শ্লোগানও তেমনি সম্মোহনজনক।"

সাহিত্যের অভিভাবকত্ব

"উত্তর সূরী" নামক পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় শ্রীকালিদাস রায় একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনামা হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, শিক্ষিত সমাজের কর্ত্তব্য, জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া তিনি পুস্তকাগারের পরিচালকবর্গের নিকট যে অনুরোধ জানাইয়াছেন তৎপ্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি!

"বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক পাঠাগার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার একটা নিবেদন আছে। আমি বাংলাদেশের বহু পাঠাগার পরিদর্শন করেছি। অধিকাংশ পাঠাগারে দেখেছি বইগুলি জরাজীর্ণ, ছিন্নভিন্ন অর্থাৎ বইগুলির সবই উপন্যাস। কাজেই গৃহলক্ষ্মী ও তাঁদের শিশুসন্তানদের শ্রীকরমাদত, দলিত, মথিত। এই সব পাঠাগার দেখে মনে হয়েছে সরস্বতীর কমলবনে বুঝি বারণযূথ স্নানে পানে নেমেছিল। ফলে পাঠাগারের অভ্যন্তরের সৌষ্ঠব

একেবারে নেই। তাঁরা যদি পাঠাগারগুলির কিয়দংশে শ্রীসৌষ্ঠব ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে চান তা হলে 'ইতর সাহিত্যে'র বই অন্ততঃ এক-চতুর্থ ভাগ কিনুন। ঐ অংশের বইগুলি নতুনের মতই থেকে যাবে, কোন 'ভিজিটার' এলে ঐগুলিকে দেখান চলবে। তরুণদের ঠাকুরদাদাদেরও ত সময় কাটে না—আহা, বেচারাদের জন্ম দু'চার খানা বই রাখা কি সঙ্গত নয়? তাঁরা না হয় পৃথক চাঁদাই দেবেন।"

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি

এই সমিতির আগামী অধিবেশন আগামী পৌষ মাসে ওড়িষ্যা রাজ্যের কটক নগরীতে অনুষ্ঠিত হইবে। তাহার কার্য্যক্রম এখনও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। গতানুগতিক ভাবে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু গতানুগতিক পথে চলিয়া বঙ্গভাষার প্রসার ভারতবর্ষে কতদূর হইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। নূতন সাহিত্যিক ও গবেষক যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনায় বৃত আছেন, তাঁদের এই সব অধিবেশনে টানিয়া আনা উচিত। কটক সম্মেলনে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইলে আমরা সুখী হইব।

ইন্দোচীন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

চার বৎসর যাবৎ ফরাসীরা এক ভাবে ইন্দোচীনে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বুঝিতে পারিয়াছে যে, যদি ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট আধিপত্য স্থাপিত হয় তাহা হইলে মালয়, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশে চীনের ন্যায় "জনগণের প্রজাতন্ত্র" স্থাপিত হইবে এবং এই সকল দেশের মূল্যবান সম্পদ মস্কোর সমরায়োজনকে প্রভূত সাহায্য করিবে। ওয়ার্লড্ওভার্ প্রেসের সংবাদদাতা উইনবার্ণ টি. টমাসের মতে কম্যুনিজম প্রতিরোধকে একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে ফরাসীদের সাহায্য-কল্পে আমেরিকার গৃহীত নীতিকে খুবই সমীচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৯৪৭ সন হইতে যুদ্ধে ফরাসীদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গড়ে প্রতি ঘণ্টায় একজন করিয়া ফরাসী সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছে। ফ্রান্সের জাতীয় কোষাগারও আজ শূন্যপ্রায়। কিন্তু ভিয়েৎমিন্ দলের জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশ-বিরোধী মনোভাবকে যথোচিত গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে এই সিদ্ধান্তকে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যায় না। ফরাসী-সরকারের পক্ষে যোগদান করিবার ফলে আমেরিকা-সরকারের শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীদের নিকট তাঁহারা পুরানো উপনিবেশিক শাসকবর্গের সমগোত্রীয় বলিয়া ধার্য্য হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

উপরোক্ত সংবাদদাতা বলেন সন্দেহ নাই যে ডাঃ হো চি মিন্ এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গের দল কম্যুনিষ্ট। কিন্তু যাহারা যুদ্ধের অগ্রভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই গ্রামবাসিগণ কম্যুনিষ্ট নহে। জনসাধারণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপনিবেশিক শাসনের অবসান কামনা করিয়া এমন লোকদের নেতৃপদে বরণ করিয়াছে যাঁহারা তাহাদিগকে এই পরাধীনতা হইতে মুক্তি আনিয়া দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে এশিয়ায় বহু জাতীয়তাবাদী নেতা মনে করিতেন যে, একমাত্র কম্যুনিজমকে অবলম্বন করিয়াই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শাসন এবং শোষণ হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার পরও ভিয়েৎমিনের সেই ধারণা বদ্ধমূল আছে। ফরাসীদের অনমনীয় মনোভাবের জন্যও ভিয়েৎমিনের বুঝিবার সুযোগ হইতেছে না যে, কম্যুনিজম সত্যকার স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারে না।

যে সকল জাতীয়তাবাদী সৈন্য ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত আছে তাহাদের নিকট স্বাধীনতা ধর্ম্মের ন্যায় এবং ফরাসীরা স্বয়ং শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। কিছুদিন পূর্ব্বে ভিয়েৎমিন্ হইতে সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গের বিতাড়নে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের জাতীয় রূপকে ভয় করেন। বিতাড়ন তখনই শুরু হইল যখন মস্কোর নির্দ্দেশ পালন না করিয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সুলতান শারীর যখন বলিয়াছিলেন যে, "আমরা ইন্দোনেশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা হো চি মিনের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল" তখন তিনি জাতীয়তাবাদের কথাই বলিতেছিলেন, কম্যুনিজমের নহে।

ভিয়েৎমিনের সংগ্রাম সোভিয়েট প্রভুত্ব বিস্তারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছু নহে এই কথা মনে করিয়া আমেরিকা এশিয়ায় যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা আছে—কারণ স্পষ্টই যুক্তরাষ্ট্র-সরকার ভিয়েৎনামের শক্তিসমূহের কার্য্যের সম্যক্ পরিচয় লাভে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমানে হো চি মিনের বিজয় মস্কোর জয়ই সূচিত করিবে। ফরাসীদের জয় হইলে গৃহযুদ্ধ চলিতেই থাকিবে এবং বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কোন অবসান হইবে না। আমেরিকা সরকারকে ফরাসী পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া এবং কোন গঠনমূলক কার্য্যক্রমের প্রস্তাব তাহার সহিত সংযুক্ত না দেখিতে পাওয়ায় এশিয়াবাসী মনে করিতেছে যে, আমেরিকা যে স্বাধীনতার কথা বলে তাহা শুধু তাহার নিজের দেশের জন্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে এই দ্বন্দ্বের অবসানের নিমিত্ত কোন পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করা কি একেবারেই অসম্ভব? একথা সত্য যে ভিয়েৎমিন্ মস্কোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত। কিন্তু যদি সম্রাট বাওদাইকে অপসারিত করিয়া কোচীন চীন, টংকিং এবং আনামে জাতিপুঞ্জের আশ্রিত রাজ্য স্থাপিত হইত যাহার ফলে ভবিষ্যতে অবাধ নির্ব্বাচন এবং স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা হইত তবে হয়ত এই বিক্ষুব্ধ দেশে শান্তি দেখা দিত। দুই পক্ষই যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত। কোন পরিকল্পনা পেশ করা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিত। সংবাদদাতার প্রশ্ন তবে কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও আজ এত ক্লান্ত যে, তাঁহারা গঠনমূলক মীমাংসার জন্য কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে অক্ষম?

সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

১

চলার পথে আমাদের পৃথিবী যখন সূর্য্যের অভিমুখী থাকে, জ্যোতিষশাস্ত্রে সেই সময়টাকে বলে পৃথিবীর উত্তরায়ণ ; আর সূর্য্য থেকে বিমুখ যখন হয় আমাদের পৃথিবী, তখন আসে তার দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে পৃথিবী হয় সৌরকরে প্রদীপ্ত, বর্ষা-বারিতে বিধৌত, পত্রপুষ্প ফলশস্যে সমৃদ্ধ। তখন আকাশে বাতাসে তার প্রাণের স্পন্দন হয় স্বরান্বিত, সৃষ্টির পুলক ছড়িয়ে পড়ে তার সর্ব্বত্র। আর দক্ষিণায়নে হয় ঠিক এর বিপরীত। আমাদের ধরার আলো তখন হয় দুরাপসৃত। ফলে জড় ও জীব জগৎ কুয়াসায় আচ্ছন্ন, তুষারে আবৃত আর শীতে আড়ষ্ট হয়। সৃষ্টির অগ্রগতি তখন হয় ব্যাহত, আর চৈতন্য স্তিমিত।

পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নির্ব্বিশেষে আমাদের সারা দেশের মনোজগতের গতি যে আজ একান্তই দক্ষিণায়ন-অনুসারিণী, তা বুঝতে হলে জ্যোতিষের অঙ্কপাতের আদৌ প্রয়োজন হয় না। ব্যাপারটা এত সুস্পষ্ট যে, আশেপাশে যদৃচ্ছ দৃষ্টিপাত মাত্রেই তা নেহাৎ সাদা চোখেও ধরা না পড়ে যায় না। সূর্য্য থেকে বিমুখ হলে পৃথিবীতে নেমে আসে অন্ধকার; আর আদর্শের আলোক থেকে বঞ্চিত হলে জাতির মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তামসিকতায়। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ আর মোহ ঐ তামসিকতারই বিভিন্ন লক্ষণ। আজ আমাদের মন ও বুদ্ধির, চিন্তা ও কর্ম্মের সর্ব্ব বিভাগেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তামসিকতার ঐ সব উপসর্গ নানা ভাবে, নানা বেশে।

২

এমনধারা পরিস্থিতি এদেশের ইতিহাসে নতুন নয়। মধ্যযুগে বৌদ্ধমত যখন শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হ'ল, আর হিন্দুর দর্শন হ'ল মায়াবাদে আচ্ছন্ন; যখন ইসলামের উগ্র প্লাবন ক্রমশঃ পরিণত হ'ল বিচ্ছিন্ন পল্বলে, তখনও খুব সম্ভব এ-দেশের জনগণের মনোজগতে এমনিধারা ব্যাপক বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়েছিল।—প্রেম আর ভক্তির মন্ত্রে চৈতন্যদেব মুক্ত করেছিলেন এদেশকে সে আবিষ্টতা থেকে।

তার পর আবার যখন আধুনিক যুগের আদিতে, বিদেশী 'বণিকের মানদণ্ড' এদেশে 'রাজদণ্ডে' রূপান্তরিত হতে চলল; বিদেশীর রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সমানুপাতে যখন উত্তরোত্তর এদেশের মোহ বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখনও নিশ্চয় দেশ জুড়ে নেমে এসেছিল—'ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।' ফলে দেশের অভিজাত সম্প্রদায় হয়েছিল আদর্শভ্রষ্ট, বুদ্ধিজীবী হয়েছিল আত্মবিস্মৃত, আর জাতীয় বিবেক হয়ে পড়েছিল ম্রিয়মাণ। দেশের সেই দুর্দ্দিনে চরম দুর্গতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাট-পুরুষ রাজা রামমোহন।

তাঁর তিরোধানের পরবর্ত্তী শতবর্ষকে নব-ভারতের জাতীয় আত্মচেতনার উদ্বোধনের যুগ বলা যেতে পারে। বিদেশীর নির্ম্মম শাসন আর নিঃশেষ শোষণের মধ্যেও ঐ যুগে ভারতের এই প্রান্তে চলেছিল দিব্য প্রতিভার অতন্দ্র সাধনা। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রতিভার দীপ্তিতে ভারতের চিরন্তন আদর্শকে নব রূপে জ্যোতিষ্মান্ করেন নাই, নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁরা নিজ নিজ আচরণ দিয়ে সিদ্ধির পথ নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন।

নবলব্ধ সেই আদর্শের আলোকে উদ্দীপিত হয়ে সে যুগের বাঙালী জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতি, জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই অসাধ্য সাধন করেছিল অবলীলাক্রমে। বিশাল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্ব-ভূমিতে বাঙালী সে যুগে জাতীয়তার বীজমন্ত্র বপন করে চলেছিল অক্লান্ত উদ্যমে। বিদেশী শাসকের মন স্বভাবতঃই হয়ে উঠেছিল শঙ্কাতুর। হাতের রাজদণ্ড ক্রমশঃ আবার বণিকের মানদণ্ডে পরিণত হতে চলেছে,—এই উপলব্ধির সূচনামাত্রেই রাজরোষে বাংলা হয়েছিল দ্বিখণ্ডিত। আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালী বুকের রক্ত দিয়ে দেশ-মাতৃকার দেহের সে ক্ষত ধুয়ে মুছে মিলিয়ে দিয়েছিল অচিরে। আবার যখন গান্ধী-যুগে, স্বরাজ-সংগ্রামের শেষ পর্ব্বে, বিদেশীর ভেদনীতির চরম পরিণতি হিসাবে, ভাই-ভাই-ঠাঁই-ঠাঁই হওয়া অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল তখনও আদর্শ-উন্মত্ত বাংলা নিজের বুক চিরে বিশাল ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির মূল্য দিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করে নি।

৩

স্বরাজলাভের পরেই কিন্তু দেশ জুড়ে নেমে এল অবসাদ আর অপ্রবৃত্তি; আর তারই আনুষঙ্গিক হিসাবে এল অনৈক্য আর দলাদলি। এর মূলে রয়েছে আমাদের আদর্শের দৈন্য। আদর্শ আমাদের অবস্থার চাপে বিক্ষুব্ধ আর পরিক্লিষ্ট হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিল গিয়ে শুদ্ধমাত্র রাজনৈতিক মুক্তিতে। অর্থাৎ, যেন তেন প্রকারেণ ইংরেজ-বিতাড়নে। আদর্শ হিসাবে ওটা যে পূর্ণাঙ্গ নয়; পরাধীনতার নাগপাশ

থেকে জাতির মুক্তি যে তার প্রগতি-পথের প্রথম সোপান মাত্র, সে অনুভূতি সুদীর্ঘ স্বরাজ-সংগ্রামের ক্রমবর্দ্ধমান চাপে জাতীয় চিত্তে নিতান্তই কোণঠাসা হয়ে, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা 'ততঃ কিম্'-এর ফাঁক আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বতঃই এদেশে। নব-জাগ্রত জাতির উদগ্র প্রেরণা বহুল পরিমাণে অপসৃত হয়ে গিয়েছিল ঐ ছিদ্র পথেই। তাকে সংগঠনী-শক্তিতে পরিণত করবার উপযোগী রসায়ন আমাদের মনে ছিল না। আবার ঐ ছিদ্র-পথেই ঠেলাঠেলি করে ঘনিয়ে আসছে আজ নানাবিধ অকল্যাণ নব নব রূপে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, দেশের অন্তরে ও বাহিরে।

আদর্শের আলোকে দেশ আবার উদ্ভাসিত না হলে এমনধারা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির অবসান হবার কোনই সম্ভাবনা নাই। রাজনৈতিক স্বরাজ পেয়ে যেদিন দেশ বৃহত্তর স্বরাজের আদর্শ থেকে বিমুখ হ'ল সেদিন থেকেই তার প্রগতির মূলসূত্র ছিন্ন হয়েছে; তার দক্ষিণায়ন শুরু হয়েছে। ফলে দুঃখ আর দুর্গতি জাতির মনকে ক্রমশঃ বিব্রত ও বিভ্রান্ত করে ফেলছে। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে—কায়-মনোবাক্যে আবার দেশকে আদর্শের প্রতি অবহিত করা।

৪

বিদ্যা আমাদের পুস্তকস্থা। নইলে আদর্শের দিক দিয়ে দরিদ্র আমরা মোটেই নই। বেদ উপনিষদের কথা ছেড়ে দিলেও সেকালের রামায়ণ মহাভারত থেকে সুরু করে একালের গান্ধী-দর্শন, রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত যে বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার, তাতে মানবতার যে আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে, জাতীয়তার যে আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে, সে সমস্ত দৈবী সম্পদের উত্তরাধিকার ত আমাদেরই। তবু কিন্তু 'পরধন লোভে মত্ত' আমরা আজ আদর্শের প্রেরণার জন্য কখনও পুবে, কখনও পশ্চিমে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করছি। এ শুধু অনাবশ্যক নয়; এমনধারা মোহ অকল্যাণের অগ্রদূত।

কিন্তু এমনটা কেন হয়? কেন এদেশে জাতীয়তার উদ্দীপনা স্থায়ী হতে চায় না? প্রতাপাদিত্যের পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার রাজ্য পরিণত হয়েছিল সুন্দরবনে। মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের পরে, যেখানে তাঁর সিংহাসন পাতা ছিল, বিশাল ভারতের সেই মনের রাজ্যেরও হ'ল এমনিধারা অধোগতি। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে ভক্তি আর প্রেমের মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, যুগ যুগ ধরে তার অনুরণন চলেছে বাংলার সাহিত্যে, গানে, বাঙালীর প্রাণে। ধর্ম্মের জন্যে প্রবণতা এদেশের মাটির প্রতিটি কণায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, আর জাতীয়তার ছোঁয়া এদেশের গায়ে লেগেও লাগে না। ধর্ম্মের কৃষ্টি আমাদের ব্যাপক আর গভীর, কর্ম্মের সাধনা আমাদের প্রায় অবহেলিত। এ পরিণতি আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

তথাকথিত জাতীয়তা আসলে জাতীয় স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূলে প্রথমতঃ আর প্রধানতঃ রয়েছে অন্নচিন্তা। অতীতে অন্নসংস্থানের জন্যে এ দেশের লোককে খুব বেশী বেগ পেতে হ'ত না। কাজেই দল বেঁধে জাতীয়তার চর্চ্চাও ছিল কতকটা নিষ্প্রয়োজন। ও-বস্তুর বিকাশ এদেশে স্বভাবতঃই বিলম্বিত হয়েছে। জমি অকর্ষিত পড়ে থাকলে তার উর্ব্বরতা কমে যায়। অমনধারা পতিত, ঊষর জমিতে ফসল ফলাতে হলে তা বার বার চাষ করতে হয়; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে সরস করে নিতে হয়। সিদ্ধি আর অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার থেকে, ধৃতি আর উৎসাহ সমন্বিত হয়ে কেমন করে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়, কেমন করে ধর্ম্মকে মাথায় রেখে দেশজননীর পায়ে কর্ম্মের অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়, জাতির জনক আজীবন নিজ আচরণ দিয়ে তা শিখিয়ে গেছেন।

৫

আজ দেশের সর্ব্বত্র অন্নাভাব, অর্থাভাব। দেশজোড়া বিরাট কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া এর নিরাকরণ অসম্ভব। জনগণের সুপ্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধন আর সমবেত কর্ম্মের ঐকান্তিক সাধনা আজ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অবশ্যকর্ত্তব্য। আজকার এই ভারতব্যাপী অন্নসমস্যা হচ্ছে অবহেলিত জাতীয়তার অলঙ্ঘনীয় আহ্বান। এর জবাবে রাজনীতির বাঁধা বুলি আওড়ালে সমাধান তিলমাত্রও নিকটতর হবে না; শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাই সার হবে। মার্ক্স-মিল মন্থন করলেও এর জবাব মিলবে না।

আমাদের দেশ বিরাট এবং বিচিত্র। এর জনগণের মুষ্টিমেয় ভগ্নাংশ শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত। দেশ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা অনেক ক্ষেত্রেই সত্যিকারের জ্ঞান নয়; প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যার অভিমান। শাস্ত্রে বলে কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। রাজনীতি এবং সমাজতত্ত্বের নব নব সূত্র আর ভাষ্যের সন্ধানে আমরা ভূ-প্রদক্ষিণ করতে প্রস্তুত; অথচ নিজ নিজ গ্রাম, তার সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, এসব সম্বন্ধে কৌতূহল, এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, আমাদের অল্পই। ইউরোপ, আমেরিকার ছোট বড় প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই দেশের কল্যাণকার্য্যে নিয়োজিত অসংখ্য কর্ম্মিসঙ্ঘ নানা দিকে নানা কাজে সদা ব্যাপৃত। সমবেত কর্ম্মের অক্লান্ত সাধনার ভিতর দিয়েই ঐ সব দেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতরে

জানাশোনা, সহানুভূতি এবং প্রাণের পরিচয় ঘটে। এমনি করেই ওসব দেশে জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিমার্জ্জিত হয়, জাতীয় ঐক্যবোধ সুদৃঢ় হয়। দেশের সবাই উৎসবে আনন্দে হাত মেলায়, আপদে-বিপদে কাঁধ মেলায়। আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াটাও সঙ্গত নয়। কর্ম্মের দ্বারাই আমাদেরও সংসিদ্ধি অর্জ্জন করতে হবে।

ভারতের অবহেলিত জাতীয়তা তার বহুদিনের পুঞ্জীভূত দাবি নিয়ে, স্বাধীনতার মুক্ত দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছে আজ ভারতের অগণিত নরনারীর সামনে। জাতীয় আত্মার উদ্বোধন, জাতীয় শক্তির সাধনা, জাতীয় স্বার্থের সমীকরণ—এই সব এবং তার আরও বহু দাবি আমাদের সবারই কাছে। স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বেঁচে থাকবার অধিকার তখনই আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যখন জাতীয়তার দাবিপরম্পরা শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্গীকার করে নিয়ে, নিরন্তর সেবাদ্বারা আমরা আমাদের জাতিকে সমৃদ্ধ করতে, আমাদের দেশজননীকে জগৎ-সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কায়মনোবাক্যে যত্নবান হব। যে সৎ সঙ্কল্প আর সাধু উপায়ের উদ্দীপনা আমাদের স্বরাজের পথকে উদ্ভাসিত করেছিল, তাকেই আজ সঞ্চারিত করতে হবে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে। জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই গঠনমূলক কর্ম্মের আহ্বানধ্বনি আজ সুস্পষ্ট।

আমাদের আদর্শের উদ্‌যাপনে বিরোধের অবকাশ কোথায়? বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে, মানবতার বিরোধী, উন্নতির পরিপন্থী যে সব অনাচার, অবিচার জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে, আর নির্ম্মূল করে তাদের উচ্ছেদসাধনের কাজে অগ্রসর হতে, দেশের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে মতদ্বৈধের অবকাশ কোথায়? অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণায় কার আপত্তি হতে পারে? কৃষির উৎকর্ষ, পল্লী-শিল্পের প্রসার, গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, এ সব ত আমাদের সবারই কাম্য। জাতীয়তার আহ্বানে জবাব আমরা যে সুরেই দিই না, তাতে আন্তরিকতা থাকলে তা যথাস্থানে পৌঁছবেই। এ বিষয়ে ত শাস্ত্রের নজিরই রয়েছে।—পত্র, পুষ্প, ফল বা জল ভক্তির সঙ্গে দিলে, ভগবানের কাছে কিছুই অগ্রাহ্য হয় না। পথ আর পাথেয় সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা থাকলেও লক্ষ্য আমাদের একই।

নিজেদের অক্ষমতায়, অপূর্ণতায় সঙ্কুচিত হয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতনের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে কর্ত্তব্যের আহ্বানে আজ যদি আমরা সাড়া না দিই, তা হলে অদূরভবিষ্যতে উপেক্ষিত কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্তের আকারে এসে তার প্রাপ্যের চেয়ে ঢের বেশী আদায় করে নেবে আমাদের কাছ থেকে। এ অতি সুনিশ্চিত।

আদর্শপ্রীতি আমাদের মধ্যে আবার উদ্দীপিত করতে হবে। জাতি হিসাবে বিশ্বের ভাণ্ডারে আমাদের যা দেয়, তা দেবার মত শক্তি, সমৃদ্ধি আমাদের অর্জ্জন করতে হবে। দুর্ব্বলতার যে অসংখ্য বীজ আমাদের সমাজ-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আদর্শের আলোকে, কর্ম্মের উত্তাপে তাকে ধ্বংস করতে হবে। কর্ম্মের ভিতর দিয়েই আমরা আমাদের শক্তির সন্ধান পাব, আত্ম-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হব।

৬

এই কর্ম্মের আহ্বানই রূপায়িত হতে চলেছে আমাদের সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায়। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কর্ম্ম-যজ্ঞের পাদপীঠ স্থানে স্থানে। প্রথম শ্রেণীর বৃহদায়তন প্রদেশগুলিতে সাধারণতঃ একাধিক বৃহত্তর সেবা-মণ্ডল (projects) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকটির গ্রামসংখ্যা ন্যূনাধিক তিন শত, আর জন-সমষ্টি প্রায় দুই লক্ষ। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রদেশসমূহে প্রায় শত-সংখ্যক গ্রাম নিয়ে ক্ষুদ্রতর সেবা-মণ্ডল (blocks) গঠিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকটির জনসমষ্টি প্রায় ৭০ হাজার। সর্ব্বসমেত ৫৫টি সেবা-মণ্ডলে পরিসেবিত হবে ভারতের ১৮ হাজার ৪ শত ৬৪টি গ্রাম। তাদের মোট আয়তন ২৬ হাজার ৯ শত ৫০ বর্গমাইল, আর অধিবাসী দেড় কোটির উপর।

অগণিত জনগণ-অধ্যুষিত বিশাল ভারতের পক্ষে এই পঞ্চান্নটি সেবা-মণ্ডল সংখ্যায় খুব বেশী; এবং আয়তনে খুব বিস্তীর্ণ না হলেও একেবারে নগণ্য নয়। নিষ্ঠা আর ত্যাগে পূত কর্ম্মের উদ্দীপনায় যদি সিদ্ধির আলো এই কয়টি পাদ-পীঠে এক বার জলে ওঠে, তা হলে তা হবে অনির্ব্বাণ, আর তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে সমস্ত ভারত—এ সুনিশ্চিত।

গ্রামোন্নয়নে সেবা হবে সর্ব্বাত্মক। গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প, আর্থিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হবে তার লক্ষ্য। গ্রামের গৃহপালিত পশুর উৎকর্ষসাধন, প্রাকৃতিক সম্পদের বৃদ্ধি ও সদ্ব্যবহার, প্রয়োজনমত গৃহনির্ম্মাণ, রাস্তা-ঘাটের প্রবর্ত্তন ও সংস্কার, অযত্ন-বর্দ্ধিত জঙ্গল পরিষ্কার, বদ্ধ জলাশয়ের উন্নতিবিধান আদি করে সর্ব্বপ্রকারের গঠনমূলক কাজই হবে গ্রামোন্নয়ন কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারত-সরকার এই দেশব্যাপী বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞের উদ্‌যাপনে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছেন। উন্নয়ন-ভাণ্ডারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া গেছে চার কোটি।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ পঞ্চান্নটি সেবা-মণ্ডলের প্রত্যেকটিকেই সব দিকে লক্ষ্য রেখে, বিশেষ বিবেচনার পরে মনোনীত করা হয়েছে। এই সব অঞ্চলে উন্নয়ন-প্রচেষ্টার অনুকূল সুযোগ-সুবিধা

বর্ত্তমান ; যেমন—চাষের উপযোগী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, সেচ-পরিকল্পনার সান্নিধ্য ও সম্ভাবনা, কুটির-শিল্প-প্রচেষ্টার উপযোগী সুলভ উপকরণ, বৈদ্যুতিক শক্তির সুলভ সরবরাহের আশা ইত্যাদি।

সেবা-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী একটি গণ্ডগ্রামকে করা হবে সেই মণ্ডলের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। এইটিই পরিণত হবে সেবা-মণ্ডলের প্রধান নগরে। ভারপ্রাপ্ত উন্নয়ন-কর্ম্মচারীর সঙ্গে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি উপদেষ্টা সমিতি থাকবে মণ্ডলের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে। কৃষি, পশুপালন, স্থাপত্য, কুটির-শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের এক এক জন বিশেষজ্ঞ-মণ্ডলের উন্নয়ন-কার্য্যে তৎপর থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে মণ্ডলের অধিবাসিগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, তাঁদের মনকে উন্নতির জন্য উন্মুখ করে তোলা, তাঁদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধানে তাঁদের সহায়তা করা। পরামর্শ দিয়ে, দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা গ্রামবাসীকে এই বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে তাঁদের সতীর্থ করে নেবেন।

সেবা-মণ্ডলের সম্পদ আর সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁরা থাকবেন সর্ব্বদা অবহিত। তাঁদের অতন্দ্র লক্ষ্য থাকবে—কোন্‌দিকে কতখানি উন্নতি সম্ভব কৃষি এবং শিল্পপ্রচেষ্টায়। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সংঘবদ্ধ হয়ে যাতে বহুমুখী সমবায় সমিতি-সমূহ গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে, আর ঐগুলির মাধ্যমে জনগণের মন যাতে কৃষি, গো-পালন, কুটির-শিল্প প্রভৃতির উন্নতিবিধানে অভিনিবিষ্ট হয় তাই হবে উপদেষ্টা সমিতির সাধনা। উৎপন্ন দ্রব্যের সুষ্ঠু লেন-দেন, নগর, উপনগর আর গ্রামের মধ্যে সুস্থ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ গড়ে তোলাই হবে তাঁদের লক্ষ্য। যে শ্রমের, যে লোকবলের আজ দেশে নানাদিকে নানাভাবে অপচয় ঘটছে, তাকে সুচিন্তিত শিল্প-পরিকল্পনায় সংহত করে কেন্দ্রে নানাবিধ শিল্প-সংস্থা স্থাপনও হবে উপদেষ্টা-সমিতির কাজ। সরকারী সহায়তা আর স্থানীয় উৎসাহ এবং উদ্যমের সহযোগিতায় শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও এই সব সংস্থায় থাকবে।

সেবামণ্ডলের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি উপমণ্ডল গঠিত হবে। প্রত্যেক উপমণ্ডলে গ্রামবাসীদের সর্ব্বাত্মক সেবার জন্য থাকবেন এক জন গ্রামসেবক। কৃষি, গোপালন, কুটির-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামসেবক হবেন সুশিক্ষিত আর বিশেষ অভিজ্ঞ। উন্নয়নের বাণী, আশা আর আশ্বাস গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বহন করা, গ্রামবাসীদের সামাজিক বিবেক জাগ্রত করা, কর্ম্মের আহ্বান তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া—এই সবই হবে তাঁর কাজ। তিনি হাতে-কলমে কাজ করে গ্রামবাসীদের সার প্রস্তুতের উন্নত প্রণালী শিখিয়ে দেবেন, কুটির-শিল্পের সম্ভাবনা বুঝিয়ে দেবেন, গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের উপায় দেখিয়ে দেবেন। গ্রামসেবক নিজ উপমণ্ডলে কৃষক আর শিল্পীর স্বার্থের সমীকরণ ও সমন্বয় করে যেখানে সম্ভব বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করবেন, আর গ্রামের তরুণদের নিয়ে ব্যায়াম সমিতি, চারণদল, সেবকসঙ্ঘ প্রভৃতি গঠন করবেন। গ্রামবাসীদের সুখে-দুঃখে, আমোদে-প্রমোদে তিনি এক হয়ে যাবেন তাঁদের সঙ্গে, অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সর্ব্বদাই গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করবে, প্রীতি আকর্ষণ করবে, তাঁর আচরণে গ্রামবাসী শিখবে কি করে 'দুরূহ কাজে' নিজের 'কঠিন পরিচয়' দিতে হয়।

জন-কল্যাণের এমন ব্যাপক প্রয়াস এদেশে এর আগে আর কখনও হয় নাই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, বিশেষ বিশেষ কুটির-শিল্পের উন্নতি-বিধান—এমনিধারা ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু প্রচেষ্টা অতীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে দেশের স্থানে স্থানে। কিন্তু ফল কোন ক্ষেত্রেই আশানুরূপ হয় নাই। এর কারণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহের অভাব নয়, অধিকাংশ স্থলেই এর মূলে রয়েছে আয়োজনের স্বল্পতা। দেশের সমস্যা বহু এবং জটিল। পৃথক পৃথক ভাবে এদের সমাধানের চেষ্টায় অনেক সময় জটিলতা বাড়ে বৈ কমে না। কাজেই বর্ত্তমান উন্নয়ন-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব দিক থেকে সর্ব্বপ্রকারে অভাব-অভিযোগ অকল্যাণের বিরুদ্ধে নির্ম্মম যুদ্ধ ঘোষণা—'টোটাল্ ওয়ার'। রোগ-জীর্ণ শরীরে রোগের ঔষধের চাইতে বলাধানের প্রয়োজন কোনও অংশে কম নয়। শুধু শরীরের নয়, পুরাতন রোগীর মনের বলের দিকেও দৃষ্টি রাখা নিতান্ত দরকার। তারপর রোগ আবার যদি একটানা হয়ে বহু হয়, তবে তাদের পারস্পরিক কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সাবধানতার সঙ্গে বিচার এবং বিশ্লেষণ করে তবেই যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব ও সমীচীন—একথাও অস্বীকার করা চলে না।

৭

স্বাধীন ভারতের প্রধান সমস্যা আজ দারিদ্র্য, অন্নাভাব। দেশের শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কৃষিজীবী, অথচ বছরের পর বছর বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে এ দেশে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য। দেশ-বিভাগের ফলে অখণ্ড ভারতের জনসমষ্টির শতকরা ৮০ ভাগ রইল ভারতরাষ্ট্রে, কিন্তু খাদ্যশস্য-ক্ষেত্র রইল মাত্র শতকরা ৭০ ভাগ। বছরের পর বছর লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির উপরে চাপ বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানোর কোন ব্যাপক চেষ্টাই দেশে হয় নাই। কৃষির অবনতির ফলেই দেশের আর্থিক অবস্থা আজ এত শোচনীয়। এদেশের কোন শিল্প-প্রচেষ্টাই কৃষিনিরপেক্ষ নয়।

কৃষক থাকে গ্রামে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'তাজ্জব খবর' সেখানে জনরব মারফত কচিৎ কখনও যায়। তারা অবাক হয়ে শোনে! তাদের মান্ধাতার আমলের কর্ম্মপদ্ধতি আর যন্ত্রপাতি আঁকড়ে ধরে তারা কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছে। অবস্থা ক্রমেই হয়ে উঠছে অচল। কৃষির উন্নতি মানে কৃষকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, তার দৃষ্টিভঙ্গীর দরকারমত পরিবর্ত্তন, জমির ক্ষয়-নিবারণ, উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধন, রাসায়নিক সার আর স্বাভাবিক সারের যথাযথ ব্যবহার প্রচলন, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ, সেচের বন্দোবস্ত, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা, কৃষি-পণ্যের অর্থনীতি-সঙ্গত বিক্রয়-ব্যবস্থা; এক কথায় কৃষকের অন্তরে আর বাহিরে একটা বিপ্লবের আয়োজন। শান্তিপূর্ণ এই বিপ্লব হবে দেশজোড়া কর্ম্ম-যজ্ঞ। গীতায় আছে:

> অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
> যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম-সমুদ্ভবঃ॥

অর্থাৎ,

> প্রাণিগণ অন্ন হতে উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘ হতে, মেঘ যজ্ঞ হতে, আর যজ্ঞ কর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয়।

প্রাণিগণ যে অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। আমরা সবাই জানি প্রাণ অন্নগত। বাঘেও দায়ে ঠেকলে নাকি ধান খায়; আর, খুশীমত যা খায় তাও নিঃসন্দেহ ধান থেকেই আসে। আবার অন্ন যে পর্জ্জন্য থেকে সম্ভব হয় সে সম্বন্ধেও দুই মত নাই। আমরা সবাই জানি নোনাজলে আবাদ হয় না, আবাদ নষ্ট হয়। তারপর গীতাকার বলছেন—পর্জ্জন্য হয় যজ্ঞ থেকে, আর যজ্ঞ হয় কর্ম্ম থেকে। যজ্ঞের ধোঁয়া থেকে নিশ্চয়ই মেঘ হয় না; তার চেয়ে বরুণাস্ত্রে বর্ষণের সম্ভাব্যতা মেনে নেওয়া বরং সোজা। কিন্তু বরুণ-বাণের ব্যবস্থা যুদ্ধক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে নয়। কৃষির জন্যে যে যজ্ঞ, যা থেকে পর্জ্জন্যের সম্ভব হয় সেটা হচ্ছে কর্ম্ম-যজ্ঞ। এ বিষয়ে শাস্ত্রকার কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নাই। সংস্কৃত পর্জ্জন্য শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে পৃষ্, যার মানে সেচন করা। দামোদরের বাঁধ নির্ম্মাণ থেকে গাঁয়ের পুকুর কাটা পর্য্যন্ত সবই পর্জ্জন্যের জন্য কর্ম্ম-যজ্ঞ—মহাভারতের সভাপর্ব্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করছেন:

> রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"
>
> (বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিবিধ প্রবন্ধ')

কর্ম্ম-যজ্ঞ অবহেলিত হয়েছে, কৃষিকর্ম্ম অবজ্ঞাত হয়েছে এদেশে বহুদিন।

কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য, জমির উপরে যে অত্যধিক এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাপ, তার অপসারণ নিতান্ত আবশ্যক। আজ গ্রামের জোলা, তাঁতি, কামার, কুমার সবাই কৃষক। কুটির-শিল্প সর্ব্বত্র লুপ্তপ্রায় হওয়াতেই এ অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে চাষীর জমির পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তাতে যা উৎপন্ন হয় তা দিয়ে চাষী পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনই চলে না; উদ্বৃত্ত থাকা ত দূরের কথা। দেশের অর্থনীতির সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে আজ কৃষকের স্থান। কৃষক মাত্রেই ঋণজালে অল্পবিস্তর জড়িত। তাদের অধিকাংশই বছরের অর্দ্ধেক সময় হতাশায়, আলস্যে কাটায়। কাজের মর্য্যাদা তাদের নাই, আনন্দও নাই। নিতান্ত পেটের দায়ে, অপর কোন গ্রহণযোগ্য বৃত্তির অভাবেই তারা যেন চাষ করে। এমনি করেই চাষী আজ এদেশে 'চাষা' বনে গেছে।

এ অবস্থার আশু প্রতিকার একান্ত আবশ্যক। কৃষককে জমির মালিকের মর্য্যাদা দিয়ে, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করে, প্রয়োজনমত জলসেচের বা জল নিকাশের সুবিধা করে দিয়ে, জমির গুণানুযায়ী, আর ঈপ্সিত ফসলের প্রয়োজনানুযায়ী সার সরবরাহ করে, দরকার হলে কৃষিঋণ দিয়েও কৃষককে আবার তার স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সরকারী রসায়নাগারে অথবা আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা এবং পরীক্ষার ফলে যে সব তথ্য জানা যাচ্ছে, যে সব সুফল পাওয়া যাচ্ছে, সে সব পুনঃ পুনঃ দেশের নিরক্ষর কৃষকের গোচরে আনতে হবে। শস্যের বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিষেধকও সরবরাহ করতে হবে। শস্যের শত্রু পোকার মারণাস্ত্রও কৃষকের হাতে তুলে দিতে হবে। এমনি করে সর্ব্বপ্রকারে সেবাকর্ম্মীর দল কৃষকের সাহায্য করে দেশমাতার সেবা করবেন। আবাদযোগ্য পতিত জমি এবং অর্দ্ধমগ্ন জলা-জমির উদ্ধারসাধন করে তা কৃষকের হাতে তুলে দিতে হবে, অথবা কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধ করে ওসব কাজে উৎসাহিত করতে হবে, দরকার হলে কৃষিঋণ দিয়ে। সর্ব্বপ্রকারে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়িয়ে জমির উপরে আজ যে অত্যধিক চাপ পড়েছে তাকে যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। পল্লীশিল্প পুনরুজ্জীবিত করলেও ভূমির উপরকার অত্যধিক চাপ কতকটা অপসারিত হবে।

৮

এদেশের কৃষির 'পরে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আজ অত্যন্ত অস্পষ্ট। কৃষকের জমির আয়তনের ক্ষুদ্রতাই তার একক কারণ নয়। ভারতে খাদ্যশস্য-উৎপাদিকা ভূমি জন-প্রতি পড়ে অর্দ্ধ একর; আর চীন দেশে পড়ে সিকি একর—আমাদের অর্দ্ধেক। চীন দেশের লোকসংখ্যা প্রায় আমাদের দেড় গুণ। তাদের কিন্তু খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না।

জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিল্প কৃষিও এদেশে অবনমিত হয়েছে। ইটালীতে প্রতি একরে ধান হয় ১৯০৩ পাউণ্ড, জাপানে হয় ২২৭৬ পাউণ্ড, মিশরে ২১৫৩ পাউণ্ড, শ্যামে ৯৪৩ পাউণ্ড আর আমাদের ভারতে হয় প্রতি একরে মাত্র ৭২৮ পাউণ্ড। গম, আখ, কার্পাস প্রভৃতি প্রায় সমস্ত কৃষিপণ্যের বেলাতেই ঐ একই কাহিনী বার বার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।

গ্রামোন্নয়ন সেবামণ্ডলের কৃষি-সেবকদের কাজ হবে কৃষককে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রণালীতে দীক্ষা দেওয়া। ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত জলসেচন আর যথোপযুক্ত সারের সুষ্ঠু প্রয়োগ কৃষিকর্ম্মের অপরিহার্য্য প্রাথমিক অঙ্গ। সমবায় সমিতি আর সরকারের সমবেত চেষ্টায় সর্ব্বত্র সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সার সহজপ্রাপ্য করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সারের গুণাগুণও কৃষককে বুঝিয়ে দিতে হবে। যাতে করে অন্ধ বিশ্বাসের বশে বা অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে সারের অপপ্রয়োগ না হয়।

উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবার জন্য জমিতে দু'রকমের সার দেওয়া যেতে পারে। নাইট্রোজেনপূর্ণ রাসায়নিক সার, যেমন—নাইট্রেট, এমোনিয়াম সালফেট; কার্ব্বনযুক্ত জৈব সার, যেমন—পচা গোবর, চোনা, চিটেগুড়। জৈব সার বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করে ও-বস্তু জমিতে সঞ্চিত করে। জমিতে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য এই নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ালেই জমির উর্ব্বরতা বাড়ে। রাসায়নিক সার তৈরি হয় কারখানায়, আর জৈবসার তৈরি হয় গ্রামে, কৃষকের কুটিরে। কারখানা আর কুটিরের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, দু'রকমের সারের গুণাগুণ নির্ণয় ব্যাপারেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

গবেষণা আর অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে, রাসায়নিক সারে জমির উর্ব্বরতা সাময়িকভাবে বাড়ে, কিন্তু ওতে জমির স্থায়ী কোন উন্নতি হয় না। বরং বেশী প্রয়োগে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণই হয়। কারণ রাসায়নিক সারের নাইট্রোজেন বেশীর ভাগই বায়বীয় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়ে হাওয়ায় উবে যায়, মাটিতে সঞ্চিত হতে পারে না। আশু সুফল পাবার জন্যে, আর জৈবসার যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে, জৈবসারের সঙ্গে রাসায়নিক সার মিশিয়ে নেওয়া অসঙ্গত হবে না।

জমির স্থায়ী উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য, আর উৎপাদনের সমতা রক্ষার পক্ষে জৈবসারই উপযোগী। কৃষক যাতে নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় সার তৈরি করে নেয় সেজন্য তাকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষীই সাধারণতঃ এ বিষয়ে উদাসীন। প্রায়ই দেখা যায়, বেশীর ভাগ গোবরই ঘাটে-মাঠে পড়ে নষ্ট হয়; কিছু বা চাষী-বউ পুড়িয়ে ফেলে। যা অবশিষ্ট থাকে তাও যত্ন করে' না পচিয়েই, যেমন তেমন করে চাষী মাঠে ছড়িয়ে দেয়। কৃষককে বুঝিয়ে দিতে হবে গোবর পোড়ানো মহাপাপ। আর যত্ন করে শেখাতে হবে কম্পোষ্ট সারের প্রস্তুত-প্রণালী। আবর্জ্জনা বলে যে সব জৈব পদার্থ বৃথাই নষ্ট করা হচ্ছে, সে সবই জমির উর্ব্বরতাবৃদ্ধির কাজে লাগান যেতে পারে। মানুষ ও পশুর মলমূত্র, এলবুমেন ও নাইট্রোজেনযুক্ত জৈবপদার্থ, খড়-কুটা, লতাপাতা, ন্যাকড়া-কাগজ, সর্ব্বপ্রকার জঞ্জালকেই কম্পোষ্ট সারে পরিণত করা যেতে পারে।

গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই একান্তে একটি কম্পোষ্ট তৈরির গর্ত্ত থাকবে। ঘর-দুয়ার, আঙিনা-গোয়ালের যত আবর্জ্জনা সবই দিনের পর দিন জমবে ঐ গর্ত্তে। কালে ঐ সব পচেই তৈরি হবে মূল্যবান সার। এই জৈবসার তেজ আর শক্তি দিয়ে জমিকে সমৃদ্ধ করে, কোনপ্রকারে কখনও তার শক্তি ক্ষুণ্ণ করে না।

ভারতের মত দরিদ্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার হ'ল এই কম্পোষ্ট। গ্রামে যাতে প্রচুর পরিমাণে কম্পোষ্ট সঞ্চিত হয়, উন্নয়নের কর্ম্মীরা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। চীন দেশে কম্পোষ্ট প্রস্তুতের নানারকম সহজ প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। প্রাচীনকাল থেকে সেদেশে এর বহুল ব্যবহার চলে আসছে। ফলে তাদের জমিতে ভারতের চার গুণ ফসল ফলে। তা ছাড়া সমস্ত আবর্জ্জনা নিঃশেষে সারের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে গ্রামগুলিও তাদের বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আর আমরা আমাদের আলস্য এবং ঔদাসীন্যে ধরিত্রীকে অপবিত্র করি আর ক্ষেত্রকে করি বঞ্চিত তার অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে। কাজেই আমাদের দেশে খাদ্যাভাব। গ্রাম-সেবক যদি অবিরাম চেষ্টা দ্বারা নিজ নিজ উপমণ্ডলে এই কম্পোষ্ট সঞ্চয়ের অভ্যাসের ধারা প্রবর্ত্তিত করতে পারেন তবে সত্যিই তাঁরা সবরকমে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করবেন।

ভারতের কৃষিকর্ম্মে সেচ-সারের চাইতেও অপরিহার্য্য হচ্ছে গোধন। আবার শৈশব থেকে আমরণ শরীরপুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গো-দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা, শুধু এদেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই সবার উপরে। এককালে গো আর ব্রাহ্মণ এদেশে সমাসবদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে একত্র উচ্চারিত হ'ত। আজ সে শ্রদ্ধা নাই। যা আছে তা অধিকাংশ স্থলেই হয় চরম ঔদাসীন্য, নয় ত নিতান্তই সংস্কারমাত্র। তাতে করে ব্রাহ্মণেরও গৌরব বাড়ছে না, গোজাতিরও উন্নতি হচ্ছে না। বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ্যের সার্থকতা হয়ত একালে

আর নাই ; কিন্তু গো-জাতির প্রয়োজনীয়তা আরও বহুকাল এদেশে থাকবে, একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে। কাজেই গ্রামোন্নয়ন যজ্ঞে গো-পালন আর গো-প্রজননেরও নিঃসন্দেহ বিশিষ্ট স্থান থাকবে।

স্থানীয় গোধনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা হবে গ্রামসেবকগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। ভার-বহনের সামর্থ্য আর দুগ্ধদানের যোগ্যতা এই উভয় বিষয়ের প্রতিই এ দেশে সমান লক্ষ্য রাখতে হবে গো-প্রজনন ব্যাপারে। ইংলণ্ড-আমেরিকার মত দেশে, যেখানে চাষের কাজে বলদের ব্যবহার নাই, আর বাছুরের মাংস খাদ্য হিসাবে চলে, সে সব দেশে গরু যত দুগ্ধবতী হবে ততই তাদের লাভ, শক্তিমান্ বলদ না হলে তাদের কোন ক্ষতি নাই। বাইরে থেকে বলদ না কিনে যাতে গ্রামেই সুপ্রজনন দ্বারা বলশালী ভাল বলদ গড়ে তোলা যায় তাই করতে হবে। গ্রামসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকবেন যাতে গ্রামে গো-পালনে এতটুকুও শৈথিল্য, অযত্ন বা নিষ্ঠুরতা না থাকে। গ্রামের সাধারণ গোচারণ ভূমি যেন দেবায়তনের মতই সযত্নে সুরক্ষিত থাকে। গ্রামে গো-চিকিৎসার যাতে সুবন্দোবস্ত থাকে গ্রামসেবক সে ব্যবস্থাও করবেন।

৯

কৃষি এবং গো-পালনে সমবায় সমিতির সংস্থাপনে কর্ম্মীদের সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। সমবায়ে কৃষকের দুশ্চিন্তা আর শ্রান্তি দুইই কম হয়—কাজও ভাল হয়। চাষ-আবাদ, গো-পালন, দুগ্ধ মন্থনাদি কাজ, ঘানিতে তৈল উৎপাদন, চামড়া শোধন, কমপোস্ট সার তৈরি এ সমস্ত কাজই স্বচ্ছন্দে এক কর্ম্মকেন্দ্রে হওয়া সম্ভব।

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় সরাসরি কৃষক বা শিল্পীকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা নাই। গ্রামের কৃষক-শিল্পী দায়িত্ব-যুক্ত সমবায় সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরের দায়িত্বে অথবা যথাযোগ্য জামিনে ঋণ পেতে পারবেন। এমনধারা বহুমুখী সমবায় সমিতির (multi-purpose co-operative society) কাজ শুধু ঋণ আদান-প্রদানের সচ্ছলতা বিধানেই পর্য্যবসিত হবে না। গ্রামের বহুধা-বিভক্ত কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণ, কৃষিকার্য্যে যৌথ প্রয়াস, উন্নততর কৃষি-প্রণালীর প্রবর্ত্তন, এ সবই সমিতির পক্ষে সহজ হবে। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন, ক্ষেত্র হতে জলনিকাশ প্রভৃতি বহু শ্রম এবং ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পাদন, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন প্রভৃতি কাজ ব্যক্তিগত ভাবে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অসাধ্য, সমবায়ের পক্ষে সে সব সহজসাধ্য হবে।

প্রয়োজনের তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ হতে, পরস্পরের অকৃপণ সহায়তা দিতে আমাদের কৃষকেরা অনভ্যস্ত নয়। প্রথম বর্ষণে জমিতে 'জো' এসেছে ; হালমাত্র একখানি, হালের গরু মাত্র দুটি সম্বল—কৃষকের পক্ষে তার বিলের বড় জমি-খানি 'জো' থাকতে থাকতে চাষ করা সম্ভব নয়। গ্রামের দশ-বারোখানি হাল একত্র হয়ে এক দিনেই তার দশ দিনের কাজ করে দিল! পাটের ক্ষেতে 'নিড়ান' দিতে হবে—রবাহুত হয়ে চলে এল কুড়ি-পঁচিশ জন চাষী-সাঙাত, এক বেলাতেই সমস্ত ক্ষেত ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল! বিল ভেসে গিয়ে বন্যার জল এসে গ্রামের 'নাবাল' জমি ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করেছে, পঁচিশখানি কোদাল একসঙ্গে কাজ করে এক রাতেই কাঁচা বাঁধ বেঁধে ফেলল! আখমাড়াই, ধান মাড়াইয়েও এমনিধারা পারস্পরিক সহায়তার অভাব হয় না। এই সহজ সহযোগিতার মনোভাবকে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসারিত করে বিপুল সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। সেবামণ্ডলের সেবক কর্ম্মীগণের কাজ হবে এই সব সমবায় সমিতির গঠনে সহায়তা করা, এর অর্থনীতি গ্রাম্য কৃষক আর শিল্পীকে বুঝিয়ে দেওয়া আর এর কার্য্যকারিতা হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া।

১০

এদেশে কৃষককে সাধারণতঃ বছরের মধ্যে পাঁচ-ছয় মাস বাধ্য হয়েই ক্ষেতের কাজ বন্ধ রাখতে হয়। সেই সময়টা কৃষকের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী হাতের কাজ শিখবার আর করবার সুযোগ করে দেওয়াও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় একটা বিশিষ্ট স্থান পাবে। এমন যে অতি কুখ্যাত নিষ্কর্ম্মার কাজ মাছধরা, তাকেও যত্ন আর উদ্যম দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-সেবার কাজে পরিণত করা যেতে পারে। মাঠে যেমন ফসলের চাষ হয়, ঠিক তেমনি মাছের চাষও সুপরিকল্পিত প্রণালীতে সহজেই করা যেতে পারে গ্রামের খাল-বিল, নদী-নালাতে। মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম—শনের সুতা, জালের কাঠি, জাল, এ সব কুটীর-জাত জিনিষও তখন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে সন্দেহ নাই।

ভারতের কুটির-শিল্পে চরকার স্থান চিরদিনই থাকবে সবার উপরে। এমন অল্প খরচে এত প্রয়োজনীয়, এরূপ অপরিহার্য্য, সরল সহজায়ত্ত যন্ত্র বোধ করি কোথাও আর একটিও নাই। গ্রামোন্নয়নে অবশ্যই চরকার বিশিষ্ট স্থান থাকবে। চরকা ছাড়া আমাদের বিপুল জনশক্তির সম্যক্ ব্যবহার আর কিসে হতে পারে? কাউকে শোষণ না করে কোটি কোটি নরনারীকে কাজ দিতে পারে এমন বৃত্তিই বা আর কি আছে? সেবামণ্ডলের গ্রামে গ্রামে চরকায় সুতাকাটা সার্ব্বজনীন না হলেও যাতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্যে চাই—কার্য্যোপযোগী

চরকা, লাটাই, ধনুক, বাড়তি তাঁত (jut) আর কার্পাসের অবাধ এবং সুলভ সরবরাহ; চরকা বিকল হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মেরামতের ব্যবস্থা; নিয়মিত সুতা সংগ্রহ আর চটপট কাটা সুতায় বস্ত্র-বয়নের আয়োজন। শিক্ষা আর উৎসাহ পেলে, অবসর সময়ে সুতা কেটে সহজেই গ্রামের কৃষক পরিধেয় বিষয়ে স্বাবলম্বী হবে। আর গ্রামের তাঁতী, মিস্ত্রীও এ কাজে সহযোগিতা করে লাভবান হবে।

আমাদের দেশে কুটির-শিল্পের সম্ভাবনা অনন্ত। বিশুদ্ধ দেশী চিনির আদর কলের চিনির চেয়ে কম নয়, উপকারিতা যে বেশী সে ত সর্ব্ববাদিসম্মত। কলুর বাড়ীর ঘানির তেল যে 'কানপুরি' টিনের তেলের চেয়ে সব রকমে ভাল, সে বিষয়েও দুই মত নাই। পোড়ামাটির 'চিত্তির' করা পুতুল দামেও সস্তা, দেখতেও সুন্দর চিনেমাটির পুতুলের চেয়ে। কাঠ আর শোলার খেলনার সঙ্গে 'ডল' পুতুলের তুলনাই হয় না। গাঁয়ের কামারের হাতের তৈরি দা-কাটারি ছুরি-কাঁচি এখনও ভাল, উৎসাহ পেলে সহজেই আরও ভাল হতে পারবে। আমাদের দেশের 'কাগজী'দের হাতে তৈরি কাগজের মর্য্যাদা বিলিতি কলের তৈরি কাগজের চেয়ে বেশী, উৎসাহ পেলে রূপে গুণেও তাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে অনায়াসে। আমাদের সূতির কাজ, রেশমের কাজ, সোনারূপার কাজ, লাক্ষার কাজ আজও জগতে অতুলনীয়।

আসল কথা, আমাদের গাঁয়ের কুঁড়েঘরের মত শান্তিপূর্ণ কুটির, আর তার অধিবাসীদের মত শান্তিপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, সহজ শিল্পনিপুণ লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। শিক্ষা আর উৎসাহ পেলে পল্লীর কুটির-শিল্প এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর আনবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেবামণ্ডলের প্রত্যেক কর্ম্মীর কাজ হবে এ দিকে দেশের আত্মচেতনা জাগ্রত করা; শিক্ষা দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে কায়মনোবাক্যে পল্লী-শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করা। আর দেশের মনে আবার 'স্বদেশী' ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করা।

দেশ আমাদের বিচিত্র। নানাবিধ শিল্পের কাঁচা মাল এর সর্ব্বত্র ছড়ান রয়েছে। শ্রম আর কর্ম্মপটুতা দিয়ে তার সম্যক সদ্ব্যবহার করে নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। সেবামণ্ডলের কেন্দ্রীয় শহরে এবং সন্নিহিত গ্রামসমূহে ছোট ছোট শিল্পাগার সহজেই গড়ে উঠতে পারে। ধুতি, শাড়ি, গামছা, মোজা, গেঞ্জি, ছাতা, কাগজ, সাবান, ফিনাইল, তেল, কালি, গঁদ, ছুরি, কাঁচি, দা, কাটারি, ফিতা, দড়ি, কাঠের আসবাবপত্র—চৌকী, চেয়ার, টেবিল, টুল প্রভৃতি, ঝাঁটা, বুরুশ, বাঁশের ঝুড়ি, বেতের বাক্স, চুলের তেল, দাঁতের মাজন, কাঠের খেলনা, মাটির পুতুল, চামড়ার জিনিষ প্রভৃতি বহু নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য ঐ সব শিল্পাগারে তৈরি হতে পারবে। ঔষধের উপকরণ গাছ-গাছড়াও গ্রামে বহুল পরিমাণে রয়েছে—ভেষজ ফলমূলেরও অভাব নাই। উদ্যম আর উৎসাহের অভাবে বহুলপরিমাণে এই সব মূল্যবান উপাদানের অপচয় হচ্ছে। গ্রামোন্নয়ন কর্ম্মীদের কাজ হবে এই সব সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলা।

১১

দেশের ধনোৎপাদিকা শক্তির আবাহন, উন্মেষ আর সুস্থ বিকাশই উন্নয়ন-পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না। অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, গৃহসমস্যা প্রভৃতি প্রায় সব সমস্যার মূলেই রয়েছে আমাদের দেশজোড়া দারিদ্র্য। আর দারিদ্র্য যে 'গুণরাশি নাশি' সে কথা ত ভারতের কবি বহু পূর্ব্বেই বলে গেছেন। একটা কথা কিন্তু তিনি বলেন নাই; সেটা হচ্ছে 'দারিদ্র্য দোষ' নিত্য-নূতন দোষেরও সৃষ্টি করে। খুব সম্ভব ব্যাপারটা আধুনিক—একালের সভ্যতার আওতাতেই হয়ত এর অভিব্যক্তি। অর্থের অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের দারিদ্র্যও আমাদের আজ সমাজ-জীবনের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এতে করে সমস্যার গ্রন্থি আমাদের ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আজ আমাদের আর্থিক দারিদ্র্য মনের উন্নতির অন্তরায় আর মনের দারিদ্র্য আর্থিক উন্নয়নের পরিপন্থী। জাতীয় জীবনের এই যে রাহু এবং কেতু এ দুটিকে দূর করলে তবেই আমাদের স্বরাজ সার্থক এবং সম্পূর্ণ হবে। কৃষি আর কুটির-শিল্পের ক্রমোন্নতির দ্বারা দেশের আর্থিক দারিদ্র্য, আর শিক্ষার বহুল প্রসার দ্বারা মানসিক দারিদ্র্য বিদূরিত করবার সঙ্কল্প নিয়েই সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যক্রম রচিত হয়েছে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বিদেশী সরকার বহু গবেষণার পরে শিক্ষার যে ধারা এ দেশে প্রবর্ত্তিত করেছিলেন তার গতি ছিল একান্তভাবেই সরকারী দপ্তরের দিকে—'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি'। দেশের মধ্যবিত্ত আর অভিজাত এই শিক্ষার টানে গ্রাম ছেড়ে নগরের দিকে প্রথমে একে একে, পরে দুইয়ে দুইয়ে, শেষে দলে দলে আসতে সুরু করল— 'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ'। এমনি করেই নগরীর সৌধ হ'ল গগনচুম্বী, আর দেশের গ্রাম হ'ল শ্রীহীন। চাষীরা হ'ল দুঃস্থ আর বাবুরা হলেন বিলাসী। তাঁরা শিশু-শিক্ষা প্রথমভাগ থেকেই শিখলেন—'লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'। এমনি করে দেশের বুদ্ধিজীবীর সমস্ত বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট হ'ল বিদেশীর আশ্রয়ে আত্মোন্নতিসাধনে, আর শ্রমজীবী কৃষকের দৃষ্টি রইল একান্তই ভূমি-নিবদ্ধ হয়ে। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির ভাব চলে গেল, রইল শুধু দেনা-পাওনার সম্বন্ধ। তাও নিতান্তই একতরফা।

শিক্ষার এই শোচনীয় পরিণতি জাতির জনকের দিব্য-দৃষ্টি এড়ায় নাই। স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায় সহকারে তিনি দীর্ঘদিন এ সমস্যার পর্য্যালোচনা করেছেন। আজ তাঁর প্রস্তাবিত বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় শিক্ষানীতি বলে গৃহীত হয়েছে। এ পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে—শিক্ষা কোন অবস্থাতেই নিরালম্ব হবে না। সর্ব্বাবস্থাতেই কোন-না-কোন প্রয়োজনীয় শিল্পের মাধ্যমে অনুশীলিত হবে। জাতীয়-জীবনের পরে এ শিক্ষাপদ্ধতির সম্ভাবিত প্রভাব সম্বন্ধে গান্ধীজীর বাণীর একাংশের বঙ্গানুবাদ (বাংলা 'হরিজন পত্রিকা') নীচে উদ্ধৃত হ'ল। এ বাণী নিঃসন্দেহে প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর মনে, প্রত্যেক গ্রামসেবকের মনে অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হবে ঃ

"হস্ত শিল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের যে পরিকল্পনা আমি করিয়াছি, তাহা বহু দূরপ্রসারী পরিণতির সম্ভাবনা-পূর্ণ। একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ-বিপ্লবের কর্ম্মসূচী হিসাবেই তাহা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা শহর ও গ্রামের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ধর্ম্মময় সম্পর্কের ভিত্তি পাওয়া যাইবে এবং বর্ত্তমানে যে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বিষময় সম্পর্কের প্রভাব রহিয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ইহা অনেক দূর সহায়তা করিবে। ইহা দ্বারা আমাদের গ্রামসমূহের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয় নিবারণ হইবে এবং অধিকতর ন্যায়ানুগত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হইবে।"

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় বনিয়াদী শিক্ষার অনুশীলন হবে গ্রামে গ্রামে। আজ এই নবপদ্ধতিতে অধ্যাপনায় সুশিক্ষিত শিক্ষাব্রতী দেশে অনেক আছেন। অনেক কর্ম্মী বাণীপুর, বলরামপুর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ও আশ্রমে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করছেন। আজ এঁদের সবারই সামনে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।

১২

দেশের অভিজাত আর বুদ্ধিজীবী সকলেরই মনেপ্রাণে যোগ দিতে হবে এই উন্নয়নের কর্ম্ম-যজ্ঞে। আজ যে গ্রামের কৃষকের এমন ধারা অধঃপতন হয়েছে এর মূলে রয়েছে—তার দৈনন্দিন জীবনের পথে সৎ শিক্ষা, সৎ সঙ্গ আর সৎ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গায়ের রক্ত জল করে এ দেশের কৃষক চিরকাল ধনোৎপাদন করে এসেছে। দেশের যাঁরা মাথা এদের শিক্ষা-সংস্কৃতির, এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালীর উন্নয়নের জন্যে তাঁরা সামান্যই প্রয়াস পেয়েছেন। সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা আজ কর্ম্ম-যজ্ঞ দিয়ে যুগ-সঞ্চিত সেই অকর্ম্মের ত্রুটি সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

উন্নয়নের কর্ম্মীদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে—গ্রামের কৃষক আর গ্রামের শিল্পী এদের উন্নতিতেই জাতির উন্নতি। এদের পরিতুষ্টিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা। এদের প্রসন্নতার 'পরেই নির্ভর করে জাতীয় চিত্তের প্রশান্তি আর এদের অসন্তোষের মধ্যেই নিহিত থাকে জাতির দুর্দ্দশার বীজ।

দেশের সর্ব্বাত্মক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আজ গণদেবতার উদ্বোধন সুরু হয়েছে। পুরুষানুক্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা হাজার রকমে প্রমাণ করেছে যে তারা দেশের জন্য, পরাধীন দেশে এমন অনুষ্ঠান খুব কমই ছিল---যাতে বুঝিয়ে দেয় দেশটাও তাদেরই জন্য। নানাকারণে এদেশের জন-গণের মনে দৃঢ় দেশাত্মবোধ গড়ে উঠবার সুযোগ সেকালেও হয় নাই, একালেও আশানুরূপ নয়। আর এই হয়েছে রাজনৈতিক ভারতের চিরন্তন না হলেও পুরাতন অভিশাপ। এই অভিশাপই ডেকে এনেছিল এদেশে একে একে পাঠান, মোগল, ইংরেজ। আর আজ স্বাধীন ভারতেও এই অভি-শাপের ভূতই দেশের বাইরে ইতস্ততঃ সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ জোড়া যে বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞ আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, এর উদ্‌যাপনে জাতির যে সমবেত সাধনা, যে ঐকান্তিক তপস্যা, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারতের শাপমুক্তির বীজমন্ত্র। ভারতবাসী মাত্রেই এ যজ্ঞের ঋত্বিক।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১৯

দেবানন্দ গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে থাকিয়া নারিকেলের মালা ও সিগারেটের টিন লইয়া বোমা তৈয়ারি করা শিখিতেছিল।

দেবানন্দ বোমা তৈয়ারি করিত, কিন্তু এই বোমা মারিয়া ইংরেজকে এদেশ হইতে তাড়ান যাইবে কিনা এই সন্দেহ আপনা হইতে মাঝে মাঝে তাহার মনে উদয় হইত। সহকর্ম্মীদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিত সে, কিন্তু এ ধরণের আলোচনা অনেকে করিতে চাহিত না।

দলের অনেকের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল—তিন তুড়িতে তাহারা ইংরেজকে উড়াইয়া দিবে। এই তিন তুড়ি কথাটা হারীতদা প্রায় ব্যবহার করিতেন। কেহ কেহ বলিত, দশ পাঁচটা ইংরেজ মরিলে বাকী ইংরেজ ভয়েই পলাইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। যদি বা না পালায় আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া শাসনভার আমাদের হাতে দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া থাকিবে। অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি করিবার কল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। দেবানন্দ দুই-এক জন অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীকে বলিত, ডাকাতি করলে দেশের অনেক লোক, বিশেষতঃ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা আমাদের উপর বিরূপ হবে। পুলিস আমাদের পিছনে লাগবে। ডাকাতির জন্য দলের লোক ধরা পড়তে থাকলে দলের কাজ চলবে কি করে? অন্য উপায়ে কি টাকা সংগ্রহ করা যায় না? উত্তরে শুনিত—চাঁদা সংগ্রহ করবার অভিজ্ঞতা নেই বুঝি তোমার? দেবানন্দ বলিত, সামান্য কিছু আছে। উত্তর হইত—ভেবে দেখ এই ভাবে চাঁদা তুলে বড় রকমের আয়োজন করা সম্ভব কিনা। লোকে শুধু মুখে সিমপ্যাথি দেখায়, সিন্দুকের চাবিটি স্ত্রীর কাছে রেখে দেয়। উঞ্ছবৃত্তি করে কি বিপ্লবী-বাহিনী গড়া যায়? স্বেচ্ছায় যখন কেউ কিছু দেবে না তখন জোর করে আদায় করতে হবে। উপায় কি?

এই যুক্তি শুনিয়া মন সায় না দিলেও দেবানন্দ চুপ করিয়া যাইত। মনে মনে ভাবিত রাশিয়ায়, ইটালীতে, আয়র্লণ্ডে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে কেমন করিয়া? এই সব দেশে ত বিপ্লবীদের ডাকাতি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয় নাই। নিজের মনকে সে জিজ্ঞাসা করিত—এদেশের লোক কি তাহা হইলে বিপ্লব আন্দোলনকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়? নিজেই উত্তর দিত, প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত দুই রকম লোকই দেশে আছে দেখিয়াছি। আরও দেখিয়াছি যাহারা প্রস্তুত তাহারা গরীব, সামর্থ্য তাহাদের কম। যাহাদের টাকা আছে তাহারাই অপ্রস্তুত। আচ্ছা, দেশের স্বাধীনতা আসিলে ইহারা কি ফল ভোগ করিতে আগাইয়া আসিবে না? নিশ্চয় আসিবে। তবে কেন কাজের জন্য টাকা দিতে চাহে না? এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজের মন হইতে চট্ করিয়া দিতে পারিত না, কিন্তু একটা সংশয় উঁকি দিত তাহার মনে। এ দেশের লোক কি বিপ্লববাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই? বিপ্লববাদে কি তাহাদের আস্থা নাই? বিপ্লববাদের অর্থ কি, তাহার সম্ভাবনা কি তাহারা বুঝে না? ইংরেজের উপর রাগ ত সকলেই প্রকাশ করে দেখি, এ ক্রোধ কি আন্তরিক নহে? মডারেটরা ইংরেজদের তাড়াইয়া দিবার কথা ভাবা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছায় ইংরেজ কোন দিন এদেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারে এ সম্ভাবনার কথা মনে হইলে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হন। এক্সট্রিমিষ্টরাও ইংরেজ তাড়াইবার কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। তাহা হইলে দেশের সর্ব্বত্র যে ইংরেজ-বিদ্বেষ দেখা যায়, সে বিদ্বেষের আসল অর্থ কি? পাকা মডারেট নেতাদের কেহ কেহ টাকা দিয়া বিপ্লবীদের সাহায্য করেন দেখি। কেন করেন? হঠাৎ তাহার মনে হইল তাঁহারা কি ভাবেন ইংরেজকে তাড়াইবার সাধ্য বিপ্লবীদের কখনও হইবে না, সে রকম আয়োজন ইহারা কখনও করিতে পারিবে না, কিন্তু দশ-বিশ টাকা দিলে ইহারা যদি একটা গোলমাল চালাইয়া যাইতে পারে তাহাতে ইংরেজকে ভয় দেখাইবার, চাপ দিবার সুবিধা হইবে তাঁহাদের? তাঁহারা কি মনে করেন এই দুঃসাহসিক ছেলেদের হাতে রাখিবার জন্য কিছু টাকা খরচ করা প্রয়োজন, তাই খরচ করেন? দেশের নেতারা কি বিপ্লবীদের লইয়া খেলা করেন? কথাটা মনে হইতে কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য সংশয় ও বিষাদে তাহার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হইত। তখনই আবার ইহার প্রতিক্রিয়া হইত তাহার মনে। অস্পষ্ট একটা হিংস্র চিন্তা জাগিয়া উঠিত মনের এক কোণে, ভাবিত এই খেলা করিবার প্রতিফল এক দিন ভাল করিয়া পাইবে তোমরা। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করিয়া ক্ষমতা পাইবার লোভে যাহাদের লইয়া খেলিতেছ—

সবলে এই দুষ্ট চিন্তার হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিত সে, মনে মনে বার-বার আবৃত্তি করিত—আমি একজন সৈনিক মাত্র,

We are not to reason why
We are but to do or die.

আবৃত্তি করিত তাহার প্রিয় বিদ্রোহীর কবিতা,

আমি মরণ আজিকে বরণ করেছি
শরণ তবু না চাই—
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি
অশ্রু তাহাতে নাই।
বৃশ্চিক শত দংশনরত, যন্ত্রণা তাহে নাই
আমি বজ্র ধরিতে চাই।

গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে থাকিবার সময়—সে বাড়ীতে

যাহারা থাকিত তাহাদের উপর আদেশ হইয়াছিল জানা-শোনা লোকের সঙ্গে যাহাতে পথেঘাটে সাক্ষাৎ না হয়, এজন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনে রাস্তায় বাহির হইবে না।

এক দিন সন্ধ্যার পরে গ্রে ষ্ট্রীটের কেন্দ্রে কোন কাজে যাইবার জন্য দেবানন্দ পথে বাহির হইল। সে দাড়ি কামান বন্ধ করিয়াছিল, মুখে ইতিমধ্যে ছোটখাটো দাড়ি গজাইয়াছে। এই দাড়ির জন্য জানা-শোনা লোকেও সহজে তাহাকে চিনিতে পারিবে না জানিত। বড় রাস্তায় পড়িয়া সে কিছু দূর গিয়াছে এমন সময় অন্যমনস্কতার জন্য সাহেবি পোশাক-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগিল। ভদ্রলোক রুষ্ট হইয়া বলিলেন, আর ইউ ব্লাইণ্ড অর ড্রাঙ্ক? দেবানন্দ তাঁহার দিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল—ভবেশদা?

ভদ্রলোকটি বাস্তবিক ভবেশ। সে বিস্মিত হইয়া দেবানন্দের মুখের দিকে চাহিল, চট্ করিয়া চিনিতে পারিল না, গলা শুনিয়া আন্দাজে ধরিল। দেবানন্দ তখন আত্মস্থ হইয়াছে। সে পলাইবার জন্য পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, ভবেশ তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, এস দেখি ঐ ল্যাম্প-পোষ্টটার কাছে, চিনতে পারি কিনা দেখি। গালপাট্টা দাড়ি দেখে সন্দেহ হচ্ছে। তিন-চার মাসে এত বড় দাড়ি হয়েছে?

দেবানন্দ দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, পলাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ভবেশ তাহার দাড়িতে হাত বুলাইতে সে হাসিয়া ফেলিল। ভবেশ বলিল, তা হলে তুমি দেবু বটে. কোথায় চলেছ চোখ-কান বুঁজে? এস দেখি আমার সঙ্গে।

রাস্তার ওধারে একখানা ফিটন-গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ভবেশ গাড়ী ডাকিল এবং দেবানন্দের আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে এক রকম জোর করিয়া গাড়ীতে উঠাইল। ভবেশ কোচম্যানকে শ্যাম-বাজারের একটা ঠিকানা বলিয়া দিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে দেবানন্দ বলিল, ভবেশদা, আপনার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে? কাউকে কোন খবর না দিয়ে দেওঘরে ছিলেন কেন? আপনার মামাবাড়ীর লোকেরা পর্য্যন্ত কোন খবর জানত না?

ভবেশ—আমার মামাবাড়ীর লোকেরা জানত না তুই কি করে জানলি? আমি হিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট-ক্লাস অনার্স পেয়েছি জানিস না?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, আমি যে বদরিকাশ্রমে ছিলাম, কি করে জানব?

ভবেশ—সন্তান-সম্প্রদায়ে ঢুকে তোর উন্নতি হয়েছে দেবু। আগে তোর কথাবার্ত্তার এত ষ্টাইল ছিল না। আমার মামাবাড়ীর কথা কি বলছিলি? মনে পড়েছে এবার। সরমা, কিটি আর ভূধর হোষ্টেলে গিয়েছিল আমার খোঁজে, বলেছিল বটে। কিটির বিয়ে হয়েছে জানিস?

দেবানন্দ—সে নিজেই বলেছিল শীগ্ গির হবে।

কিছুদিন আগে খড়্গপুর ষ্টেশনে কিটি ও তাহার ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামীকে সে দেখিয়াছিল সেকথা দেবানন্দ ভবেশকে বলিল না। কিটি তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, নিজের পদমর্য্যাদার হানি করিয়া দেবানন্দের সঙ্গে কথা বলে নাই, এই কিটি রাস্তার মধ্যে তাহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছিল, লজ্জা-বোধ করে নাই। হয়ত একটিবার একথা তাহার মনে হইয়াছিল। অথবা হয় নিজের মনে একটু হাসিয়া সে ভাবিয়াছিল তাহার আশীর্ব্বাদের ফল সদ্য ফলিয়াছে। কিটি তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই, কিন্তু তাহার কয়েক সেকেণ্ডের দৃষ্টির মধ্যে কি যেন ছিল। কয়েক দিন ধরিয়া সে দৃষ্টি তাহার মনকে খোঁচাইয়াছে। শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া এই সব চিন্তা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিল।

ভবেশ—কে, কিটি বলেছিল? আই ফীল ভেরি সরি ফর হার। মেয়েদের মত ও মন বলে কিছু থাকতে পারে একথা কল্পনা করতে এদেশের পুরুষদের ভ্যানিটিতে আঘাত লাগে। কিটিদের বাড়ীর খবর বোধ হয় কিছু জানিস না। আচ্ছা এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। মিস বাঙ্কল বলে যে মেম গভর্ণেস ছিল, এক কেচ্ছা রটিয়ে মামার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবিতে নালিশ করেছিল সে। শুনেছি হাজার দশেক টাকা নিয়ে মিটমাট করে সেটা সরে পড়েছে। এই ব্যাপারের পরে মামী পাঁচ দিন নাকি শুধু বিস্কুট আর কফি খেয়ে ছিলেন। বোধ হয় স্থির করেছিলেন প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবেন।

একটু থামিয়া বলিল, কিটির বিয়ের আগে ব্যাপারটা ঘটলে ভাল হ'ত।

দেবানন্দ—আপনি এত দিন দেওঘরে কি করছিলেন? কেউ বলছিল কুমিল্লায় গিয়েছেন, কেউ বলছিল জামালপুরে গিয়েছেন।

ভবেশ হাসিয়া বলিল, একরাশ অপঠিত পাঠ্য-পুস্তক হজম করছিলাম। দুটি বছর স্বদেশী করে কাটিয়ে দিলাম। পড়াশুনো করবার সময় পাই নি। তা ছাড়া কলকাতা আমার সহ্য হচ্ছিল না নানা কারণে। তবে দেওঘরেও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নি। শীল্স লজে তোমাদের দলের নেতারা মাঝে মাঝে গিয়ে ধ্যান-ধারণা ও পরামর্শ করেন। কি করে খবর পেয়ে তাঁরা আনা-গোনা আরম্ভ করলেন। হাত জোড় করে বললাম, দাদারা, পরীক্ষাটা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন দিকে মন দেব না। ঠেকা পড়লে দশ-পাঁচ টাকা দিতে পারি। এই ভরসা পেয়ে তাঁরা আমাকে রেহাই দিলেন।

কোচম্যান গাড়ী দাঁড় করাইয়া বলিল, হুজুর, ডাগ্দার সাহাব কা কোঠি ত এহি হ্যায়।

ভবেশ গাড়ী হইতে নামিল। দেবানন্দকে বলিল, নেমে আয়। ভাড়া লইয়া কোচম্যান গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

দেবানন্দ—ভবেশদা, এবার আমি যাই। আমার হাতে কাজ আছে। অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে—

ভবেশ—কৃতার্থ হলাম অথবা পরম আনন্দ লাভ করলাম,

কেমন? এটা আমার বড়মামার বাড়ী। আমি এখানে থাকি এখন। আয় আমার সঙ্গে।

দেবানন্দ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া ভবেশ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবানন্দ উপরে খোলের বাজনা ও কীর্ত্তন-গানের আওয়াজ শুনিতে পাইল। ভবেশ দেবানন্দকে লইয়া তেতলায় উঠিয়া একটা ঘরে আসিল। আলো জ্বালাইয়া দিল। দেবানন্দকে ঘরে বসাইয়া ভবেশ বলিল, তুই এখানে বসে কীর্ত্তন শোন। আমি নীচে থেকে একটু ঘুরে আসছি। দেরি হবে না।

সে নীচে নামিয়া গেল। দেবানন্দ দেখিল ঘরখানি বেশ সাজানো। এক পাশে খাটে বিছানা করা আছে। আলমারি, আলনা, আরাম-কেদারা, ড্রেসিং-টেবিল রহিয়াছে। জানালায় রঙীন পরদা ফেলা। একটা জানালার কাছে একখানি পড়িবার টেবিলের উপর কতকগুলি বই। কুশন দেওয়া দুইখানি চেয়ার টেবিলের দুই পাশে রহিয়াছে। ইহার একখানায় দেবানন্দকে ভবেশ বসাইয়াছিল।

কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল, ভবেশ ফিরিল না। দেবানন্দের কানে খোলের শব্দ আসিতেছিল। কি গান হইতেছিল সে বুঝিতে পারিল না। মাঝে মাঝে শুধু—"ওরে ব্রজের দুলাল ওরে-রে" কথা কয়টি তাহার কানে আসিতেছিল, বাকী সব খোলের আওয়াজে ডুবিয়া যাইতেছিল। কীর্ত্তন কোন দিন তাহার ভাল লাগে না। সে টেবিলের উপরে রক্ষিত বইগুলি দেখিতে লাগিল। বেশীর ভাগ বই ইতিহাসের। চীন, জাপান, রুশিয়া ও পারস্যের ইতিহাস আছে। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস কয়েক ভল্যুম আছে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আছে। একখানা দেখিল রবসপিয়রের জীবনী। দেবানন্দ ভাবিল হোষ্টেলে ভবেশদার কাছে এই সব বই ত সে দেখে নাই। ভবেশদা তাহা হইলে সত্যই পড়াশুনা লইয়া মাতিয়াছিলেন।

—ছোড়দা, তুমি এত দেরি করে—বলিতে বলিতে একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট দেবানন্দকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

দেবানন্দ তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। এই মেয়েটিকে সে গাড়ীতে কিটির সঙ্গে তাহার হোষ্টেলের সম্মুখে দেখিয়াছিল। মেয়েটি দাড়িওয়ালা দেবানন্দকে চিনিতে পারিল না। দেবানন্দের শুধু দাড়ি ছিল না, তাহার পোশাক-পরিচ্ছদও অপরিচ্ছন্ন। সুঠাম গঠন, গভীর দৃষ্টি ও অত্যন্ত মসৃণ ললাট ছাড়া দেবানন্দের কয়েক মাস আগেকার বাহিরের চেহারার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। বিশ্রী চেহারার ময়লা কাপড়-পরা একজন ছোকরাকে উদাসীনভাবে কুশন-দেওয়া চকচকে পালিশ করা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর সাজান বইগুলি ঘাঁটিয়া এলোমেলো করিতে দেখিয়া মেয়েটি আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইল। সাহেবী কায়দা-দোরস্ত, শীঘ্রই বিলাতগামী ছোড়দার এই রকমের কোন বন্ধু থাকিতে পারে মনে করিতে তাহার বাধিল। একটু রুক্ষস্বরে সে বলিল, আপনাকে এখানে এনে কে বসিয়েছে? কাকে চান?

তাহার ভাব দেখিয়া দেবানন্দের একটু আমোদ বোধ হইল। সে ভাবিল এই মেয়েটি কিটির কোন রকম বোন বোধ হয়। কিটির সঙ্গে ইহার কত পার্থক্য। মেয়েটি একটু উদ্ধত প্রকৃতির। প্রথমে ইহাকে যখন দেখিয়াছিল, মুখের ভাব দেখিয়া তাহা মনে হয় নাই। বাঁকীপুরে একটি মেয়েকে সে দেখিয়াছিল, কত যত্নে তাহার সেবা করিয়াছিল। তাহার প্রকৃতি আবার অন্য রকমের।

উত্তর পাইতে বিলম্ব হওয়াতে মেয়েটি চটিল। ক্রুদ্ধস্বরে সে কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ভবেশ ঘরে ঢুকিল। মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি রে সরমা, এত রাগ কেন? দেবুর দাড়ি দেখে রাগ করছিস? জানিস দেবু, সরমা দাড়ি গোঁফ একেবারে পছন্দ করে না। বলে ভদ্রলোক হবে ক্লিন-শেভড্। এক রাখো-হরি ছাড়া এ বাড়ীতে কারো দাড়ি গোঁফ নেই। রাখোহরি বড়-মামাকে, ছোটমামাকে, মাকে মানুষ করেছে। সেই জোরে সরমার 'নো-বিয়র্ড ক্যাম্পেন রেজিষ্ট' করে এ বাড়ীতে টিকে আছে। রাখো-হরি একজন পোয়েট। মুখে মুখে ছড়া বেঁধে তাক লাগিয়ে দেয়। বড়মামা আগে সাহেব ছিলেন, এখন বৈষ্ণব হয়েছেন।

বড়মামাকে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে রাখোহরি বলে, "রাধা, রাধা, রাধা করে দাদা আমার গেল রে।" বড়মামা তার কোমর দুলিয়ে নাচ দেখে ও ছড়া শুনে হাসেন।

সরমার দিকে ফিরিয়া ভবেশ হঠাৎ বলিল, বাট ইউ টু হ্যাভ মেট বিফোর (তোমাদের দুই জনের আগে দেখা হয়েছে)। নয় কি? গম্ভীর ভাবে সরমা বলিল, নেভার।

দেবানন্দ তাহার গম্ভীর 'নেভার' শুনিয়া হাসিল। ভবেশ বলিল, কিটির বিয়ের আগে তার সঙ্গে তুই আমার হোষ্টেলে যাস নি? ইউ মেট মাই ফ্রেণ্ড দেয়ার। দেখ ত মনে করে।

সরমার এবার মনে পড়িল। তাহার আরও মনে পড়িল কিটি অসভ্যের মত রাস্তার মধ্যে দেবানন্দকে প্রণাম করিয়াছিল। কিটিকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কতদিন ছেলেটির সঙ্গে তাহার আলাপ। কিটি তাহাকে কোন জবাব দেয় নাই, সারা রাস্তা সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। সরমা ভাবিল তখন দেবানন্দ দেখিতে চমৎকার ছিল। রংটা একটু ময়লা বটে, বাট হি ওয়াজ এট্রাক্টিভ। আজকের এই জংলী—

ভবেশ—দেবু রাতে এখানে খাবে। মামীমাকে বলেছি। আমাদের দু'জনের খাবার এই ঘরে দেবার ব্যবস্থা করিস সরমা। আর একটু তাড়াতাড়ি করবি।

সরমা একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল। দেবানন্দ ভবেশের বিশেষ বন্ধু ও লেখাপড়ায় ভাল সে কিটির কাছে শুনিয়াছে। আরও শুনিয়াছিল তাহার পিতা গবর্ণমেণ্টের পদস্থ চাকুরীয়া। সকলের চাইতে বড় কথা কিটি তাহার সম্বন্ধে ইণ্টারেষ্ট লইত। একটু বেশী ইণ্টারেষ্ট লইত তাহার মনে হইয়াছিল। একজন আই.সি.এস.-এর সঙ্গে যাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে তাহার পক্ষে একজন সাধারণ কলেজের ছেলের সম্বন্ধে এতখানি ইণ্টারেষ্ট লওয়া তাহার কাছে

অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। তখন তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছিল এই ব্যাপারে। তারপর সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। কোন কথা না বলিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

দেবানন্দ একটু হাসিয়া বলিল, মাস কয়েক আগে ডাঃ চক্রবর্তী এক দিন ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে রাত্রে আটক করে রেখেছিলেন তাঁর বাড়ীতে। সকালে উঠে পালিয়েছিলাম। আজ আবার আপনি ধরে এনেছেন। আমার হাতে সত্যি কাজ আছে ভবেশদা।

ভবেশ—নিশ্চয় কাজ আছে। বেকার বসে থাকবার জন্য তুই বাড়ীঘর ছেড়ে পালাস নি আমি জানি। তুই যে পথ ধরেছিস সে পথ সম্বন্ধে আমার বলবার অনেক কথা থাকলেও বলি নি। আগে বলি নি এখনও বলব না। মত ও পথের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে, এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভবেশ আবার বলিল, ডাঃ চক্রবর্তীর কথা তুই কি বলছিলি দেবু? কতদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দেবানন্দের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে বলিল,—আমার সঙ্গে পরশু দেখা রাস্তায়। টানাটানি করে গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল।

দেবানন্দ—কি কথাবার্তা হ'ল?

ভবেশ পকেট হইতে সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট লইয়া ধরাইল। দুই-একটি টান দিয়া বলিল—সিগারেট খাওয়া অভ্যাস করছি বিলেত যাব বলে। এখনও রপ্ত হয়নি, মাঝে মাঝে কাশি আসে। তুই কি জিজ্ঞেস করলি যেন? ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে কি কথা হ'ল? কথা অনেক বললেন তিনি।

পূর্ব্ববঙ্গে নেশনাল ভলান্টিয়ারদের সাপ্রেস করবার জন্য টাইমসের "The national volunteers was an evil which Government should do their best to suppress and if the first blow fail sharper weapons must be employed." (নেশনাল ভলান্টিয়ার দল এমন বিপজ্জনক যে ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং প্রথম আঘাত ব্যর্থ হইয়া থাকিলে আরও তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।) এই ধমকানির কথা উল্লেখ করে বললেন এজিটেটরদের ঠাণ্ডা করবার জন্য নানা রকম দাওয়াই এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো বাতলে দিচ্ছে। ইংলিশম্যানের দাওয়াই এজিটেটরদের ধরে সলিটারী কনফাইনমেণ্টে রাখ, এবোলিশ দি কংগ্রেস, দুই বাংলার কয়েকজন এজিটেটর নেতাকে ডিপোর্ট কর, সিডিশাস ভারনাকিউলার কাগজগুলোর মুখ বন্ধ কর। এজিটেটররা হিন্দু জেনানাতে পর্য্যন্ত সিডিশান ছড়াচ্ছে, ষ্টপ দিস রট। ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, দি হোল এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস হাজ বিকাম ব্লাড-থার্ষ্টি (সমস্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ রক্তপিপাসু হইয়াছে)।

খুলনা সিডিশান কেসের আপিলে মিঃ জাষ্টিস মিটার ও মিঃ জাষ্টিস ফ্লেচার স্বরাজ মানে কলোনিয়াল সেল্ফ-গবর্ণমেণ্ট বলে মত প্রকাশ করায় এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো বেজায় খাপ্পা হয়েছে বললেন। তারা ভয় দেখিয়েছে—কলোনিয়াল সেল্ফ-গবর্ণমেণ্ট হলে গবর্ণমেণ্টের মেসিনারি একেবারে বদলে যাবে—ডোম ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন তফাত থাকবে না, তাদের ভোটের মূল্য হবে সমান।

বেলফাষ্ট রায়টের কথা হ'ল। বললেন, পুলিশ ও মিলিটারী আইরিশ মবের ইষ্টকবৃষ্টি সহ্য করে চুপ করে থাকে আর এখানে পাঁচ জন লোক একত্র হলে পুলিস বেটন নিয়ে তেড়ে আসে। এত খুন-জখম হওয়া সত্ত্বেও আয়ারলণ্ডে ক্রাইমস এক্ট প্রয়োগ করা হয় নি।

নীচে কীর্ত্তনের শব্দ থামিয়া গিয়াছিল। একজন চাকরের সঙ্গে সরমা ঘরে ঢুকিল। চাকর মেঝেয় আসন পাতিয়া জলের গ্লাস রাখিল। সরমা তাহাকে বলিল—খাবার আনতে বল।

ভবেশ ও দেবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইতে ঠাকুর খাবার আনিল। সরমা তাহাদের সম্মুখে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল।

খাইতে খাইতে ভবেশ বলিল—আজকাল পার্টি-টার্টিতে যাচ্ছিস সরমা? কোন সুবিধে হ'ল?

সরমা—কিসের সুবিধে?

ভবেশ—সুবিধে মানে সন্ধান-টন্ধান পেলি? সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা দিতে যারা গিয়েছে তারা কে কেমন করল, নূতন কারা যাচ্ছে এসব খবর রাখছিস? আমি যাবার আগে "ডিজায়রেবলদের" একটা লিষ্টি করে আমাকে দিস। খোঁজখবর নেব, সাউণ্ড করে দেখব। কারো টাকা'র টানাটানি থাকলে একটা চুক্তি করে ফেলবার চেষ্টা করব।

সরমা একটু হাসিয়া বলিল,—বিলেতে পা দিয়ে আগে নিজের মাথা ঠিক রেখো, তারপরে অন্য কথা।

ভবেশ—আমার মাথা ঠিক রাখব মানে? তোর ভয় আছে নাকি আমার মাথা গুলিয়ে যাবে? আমার মাথাটা এমনি নিরেট যে কিছু কিছু গুলোলে আমি খুশী হয়ে যাই। বাট ইট রিফুজেস, কোনমতে গুলোতে চায় না।

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ হাসিতে গিয়া বিষম খাইল। ভবেশ বলিল—যাট, যাট, ওরে সরমা ওর মাথাটা থাবড়ে দে। জল খা রে জল খা।

জল খাইয়া দেবানন্দ সুস্থ হইল। সরমা হাসিয়া বলিল—ভবেশদা, ইউ হাভ বিকম ভেরী নটি।

ভবেশ বলিল,—থ্যাঙ্ক ইউ। নটিনেস ইজ এ কমপ্লিমেণ্ট হোয়েন ইট কামস ফ্রম এ ইয়ং লেডি।

হাসি-গল্পের মধ্যে খাওয়া শেষ হইল। একটা জামা গায়ে দিয়া ভবেশ বলিল,—চল দেবু, তোকে একটু এগিয়ে দি।

২০

দেবানন্দ নানা রকম কাজের ভার পাইয়া আজ এখানে কাল

ওয়ানে ঘুরিতেছিল। সে এখন যন্ত্রমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নিজের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াছে।

কয়েকদিন আগে খড়গপুর হইতে হাঁটিয়া তাহাকে নারায়ণগড়ে যাইতে হইয়াছিল। প্রাচীন দুর্গ হান্দোলগড়ের ভগ্নাবশেষের পশ্চিম পাশ দিয়া কটক যাইবার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কাছেই ধলেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দিরে একাকী অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে রাত কাটাইতে হইয়াছিল। চারদিকে ভীষণ জঙ্গল। মাঝে মাঝে সে হিংস্র জন্তুর ডাক শুনিতে পাইতেছিল। সকালে উঠিয়া রাণী মধুমঞ্জরীর বিশাল রাণীসাগরের ঘাটে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া নারায়ণগড় ষ্টেশনের চার দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া গাড়ীতে খড়গপুর ফিরিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের কাজ সারিয়া দুই দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

তখন নূতন নূতন লোক আসিতেছে নানা জায়গা হইতে। কয়েক দিন পরে সে শুনিল, সুশীল সেনকে ও বহু স্বদেশীওয়ালা ছাত্রকে বেত্রদণ্ড, জেল ও জরিমানা শাস্তি দিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে যে পাঁচ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি ও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল সেই কিংসফোর্ড সাহেবকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে।

ষ্টেটসম্যান কাগজে সংবাদ বাহির হইল গতকল্য ৬ই ডিসেম্বর খড়গপুর হইতে ১৪ মাইল দূরে মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের কাছে ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজার অল্পের জন্য সাংঘাতিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। রেল লাইনের উপর বোমা রাখিয়া কাহারা গাড়ী উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। বোমা ফাটিয়া পাঁচ ফুট চওড়া গর্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গাড়ী উলটায় নাই বা ছোটলাটের কোন আঘাত লাগে নাই।

মেদিনীপুরে তখন কনফারেন্স চলিতেছিল। মডারেট ও নেশন্যালিষ্ট দলের কলহ প্রায় হাতাহাতিতে পৌঁছিল। পুলিসের সাহায্য লইয়া মডারেট দল আলাদা সভা করিল। বেঙ্গলী লিখিল, মেদিনীপুর কনফারেন্সে অতিরিক্ত পুলিস আমদানীর কারণ বি. এন্. আর. লাইনে ছোটলাটের ট্রেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টা।

সন্ধ্যা ও যুগান্তরের লেখা উদ্ধৃত করিয়া ইংলিশম্যান এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নেশন্যালিষ্ট দলকে এই ঘটনার জন্য দায়ী বলিয়া মত প্রকাশ করিল। এসিড ও কেমিক্যাল কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া দিবার উপদেশ দিল গবর্ণমেণ্টকে। সন্ধ্যা উত্তরে বলিল—"ছোটলা এই পাগলা কুকুরটার মুখ শীঘ্র বন্ধ করুন। উহার গালাগালিতে কেহ পাগল হইয়া গাড়ী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই!"

বিডন স্কোয়ারের দাঙ্গার সম্বন্ধে বে-সরকারী অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বাহির হইল। স্বদেশী সভা বিডন স্কোয়ারে হইতেছিল। রেগুলেশন লাঠি হাতে দুই শত পাহারাওয়ালা, বেটন হাতে পঞ্চাশ জন কনেষ্টবল ও ডজনখানেক পুলিস ইন্সপেক্টর সভাস্থলে শান্তিরক্ষা করিতেছিল। রাত নয়টা পর্য্যন্ত শান্তিতে সভার কাজ চলিল। নয়টার সময় একজন পুলিস অফিসার হঠাৎ আদেশ দিল সভা বন্ধ করিতে হইবে। এই আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে একজন গোরা সার্জেণ্ট বলিল—আমাদের লক্ষ্য করিয়া ইট পাটকেল ছোড়া হইতেছে। এই বলিয়া সে হুইস্‌ল বাজাইল। কনেষ্টবলরা স্কোয়ার হইতে বাহির হইবার চারিটি ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া সভায় উপস্থিত লোকজনের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। স্কোয়ারের ভিতরে যখন এই ব্যাপার চলিতেছিল তখন উত্তরে বড়তলা হইতে দক্ষিণে জোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত সমগ্র এলাকায় পুলিসের তাণ্ডব আরম্ভ হইল। দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তার আলোগুলি নিভাইয়া দিয়া পুলিস পথচারীদের বেপরোয়া মারপিট ও দোকান লুঠপাট করিতে আরম্ভ করিল, ট্রামগাড়ীতে উঠিয়া যাত্রীদের প্রহার করিল।

ক্রমে ফৌজদারী বালাখানা হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল—পূর্ব্ববাংলার মত কলিকাতাতেও স্বদেশী সভা-সমিতি বন্ধ করিবার জন্য পুলিস কমিশনার এই দাঙ্গা বাধাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বুধ ও বৃহস্পতিবার ধরিয়া উত্তর-কলিকাতায় লুঠতরাজ চলিল। দোকানী ও উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীরা বলিল—পুলিস দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে ও গুণ্ডাদের উসকাইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যা এই মর্ম্মে লিখিল—"বোম কালী কলকাত্তাওয়ালী! ইট-পাটকেল খাইয়া পলাইয়া গিয়া পুলিস দলে ভারী হইয়া আবার যুদ্ধে নামিল। তখন ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। স্বদেশী গোলা ছুটিতে লাগিল। ত্রিশ-চল্লিশ জন পাহারাওয়ালা ও কয়েকজন লালমুখো জখম হইল। পুলিস নরম লোককে ধরিয়া মারিতে লাগিল, শক্ত লোকের কাছ হইতে পলাইতে লাগিল। রাত দুইটা পর্য্যন্ত লড়াই চলিল। থানায় তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে। পুলিসকে মারে বাঙালীর এত সাহস হইয়াছে? বড়কর্ত্তারা স্থির করিলেন ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। শহরের ধাঙ্গড়, মেথর ও গুণ্ডাদের ডাক হইল সাহায্যের জন্য। বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত ও শুক্রবার সকাল পর্য্যন্ত লুঠতরাজ চলিল। মিঠাইয়ের দোকান, কাপড়ের দোকান, বাজার লুঠ হইল। পতিতাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হইল। লোকে বুঝিতে পারিল গোপন আদেশমত এই সব অত্যাচার হইতেছে। আঘাতের বদলে আঘাত—এই নূতন মন্ত্রের শরণ লইল লোকে। রাস্তায় গ্যাসের আলো নিবিল, স্বদেশী গোলা ছুটিতে লাগিল আবার। চারিদিকে কেবল "মারে মারো" শব্দ। কলিকাতায় অনেক দাঙ্গা হইয়াছে। পুলিসকে কেহ কি আগে মার খাইতে দেখিয়াছে? "বোম কালী কলকাত্তাওয়ালী! চালাও স্বদেশী গোলা! লাগাও মার!"

দাঙ্গার ফলে উত্তর-কলিকাতায় কাজকারবার সব বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। লোকে ঘরের বাহির হইবার সাহস পায় না। তখন শহরের নানা রকম সমিতির কেন্দ্র হইতে দলে দলে সভ্যরা বাহির হইল সন্ত্রস্ত রাজধানীর রাস্তায়। দল বাঁধিয়া বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাহিয়া তাহারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল। লাঠি হাতে

তিন শত ছাত্র অনুচর লইয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বিডন স্কোয়ারের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাগুলিতে প্যারেড করিয়া বেড়াইলেন। সন্ধ্যা লিখিল—"ডেপুটি-কমিশনার টাগা ফিরিঙ্গীর (মিঃ টেগার্ট) দরখাস্ত পাইয়া দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহো মৌলবী সাহেবের উপর আদেশ জারি করিয়াছে, তিনি শোভাযাত্রা লইয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারিবেন না বা কলিকাতায় কোন সভা করিতে পারিবেন না। পুলিশ নাকি রিপোর্ট দিয়াছে মৌলবী সাহেবের অনুচরেরা পুলিসের কোমল অঙ্গে ঢিল মারিয়াছে। তাহারাই নাকি দাঙ্গা বাধাইয়াছিল।" ইহার পর গ্রেপ্তার হইয়া মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে তাঁহার বিচার ও ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। পুলিস কমিশনার মিঃ হ্যালিডের আদেশে শহরের পাঁচটি স্কোয়ারে সভা করা নিষিদ্ধ হইল।

দাঙ্গা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ওয়েষ্টন কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়া একজন দোকানদার বলিল, পুলিসের প্রহারে সে রাস্তায় পড়িয়া যায়। একজন আতরওয়ালা আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া নিজের দোকানে লইয়া যায়। কমিটি জিজ্ঞাসা করিল—পুলিস আতরওয়ালাকে মারে নাই? সে বলিল—মারিবার জন্য লাঠি তুলিয়াছিল, সে মুসলমান শুনিয়া ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, পি. মিত্র, সুবোধ মল্লিক, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গুরুদাস ব্যানার্জ্জিকে লইয়া বে সরকারী অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হইল। কমিটি রিপোর্টে লিখিলেন—The cause provoking the assaults was Swadeshi and Bande mataram and the object of the assaults was the Bengali Hindu (মারধোর করিবার কারণ স্বদেশী ও বন্দেমাতরম, লক্ষ্য ছিল বাঙালী হিন্দু)।

বিহারের জমিদার বাবু বৈদ্যনাথ, এম-এ, তাঁহার সাক্ষ্যে বলিলেন—"তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য লাঠি উঠাইয়া তাঁহার অবাঙালী পোশাক দেখিয়া পাহারাওয়ালা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। পুলিস চিৎকার করিতেছিল—'মারো বাংগালী লোগকো'। একজন দশ টাকা ঘুষ দিয়া প্রহার হইতে অব্যাহতি পাইল। একটি দোকান লুঠ হইবার সময় তিনি দোকানের সম্মুখে দুই জন ইংরেজ সার্জ্জেন্ট ও কয়েকজন কনেষ্টবলকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

বৎসরের শেষের দিকে ব্যাপক শস্যহানির ফলে দেশবাসীর সম্মুখে বিপদ ঘনাইয়া আসিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মানভূম, নদীয়া, ঢাকা, পাবনায় খাদ্যসঙ্কট তীব্র হইয়া উঠিল। অন্নাভাবে অনেক লোক শাকপাতা, কচু খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিল। ব্যাপক ভাবে উদরাময়, আমাশয়, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল অনশনক্লিষ্ট দরিদ্রদের মধ্যে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা সমানে চাউল রপ্তানী করিয়া চলিল, মূল্য কমিবার কোন আশা রহিল না। আগের বৎসর পূর্ব্ববাংলার অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এ বৎসরেও খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। ঢাকায় বর্ম্মা আতপ চাউলের মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা ও বালাম চাউলের মূল্য সাড়ে সাত টাকায় উঠিল। যশোহরে চাউলের মূল্য চার টাকা বারো আনায় উঠিল, পাটের মণ দুই টাকা।

পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশেও খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। গুজরাট ও বিহার অব্যাহতি পাইল না। যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট স্যর জন হিউয়েট ছাড়া আর কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাহিলেন না।

বন্যা ও অনাবৃষ্টিতে উড়িষ্যার সর্ব্বত্র শস্যহানি হইয়া লোকের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। গরীব লোক লতাপাতা খাইতে লাগিল। কয়েক দিন সামান্য পরিমাণ সাহায্য দিয়া প্রাদেশিক সরকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। হাজার হাজার লোক অনশনে মরিতে লাগিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা বিবেচনা করিতে লাগিলেন টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করা হইবে কিনা। এই অবস্থায় চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের জন্য লোকের ঘটি, বাটি, কাঁথা কাড়িয়া লওয়া আরম্ভ হইল। ঘটিবাটি শেষ হইলে লোকের ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া লইয়া বিক্রয় করা আরম্ভ হইল। দুর্ভিক্ষের হাত ধরিয়া মহামারী লোক উজাড় করিতে লাগিল। ঔষধ ও চিকিৎসকের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করিয়া লোক হতাশ হইল। ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের জন্য অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। অনশনে লোক মরিলে পুলিস তাড়াতাড়ি মৃত দেহগুলি সরাইয়া ফেলিতে লাগিল। যাহারা ষ্টেট্‌সম্যান কাগজের জন্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল মহকুমা শাসকগণ তাহাদের ধরিয়া শাস্তি দিলেন।

দেবানন্দের পূর্ব্ব-পরিচিত মেদিনীপুরের নারায়ণ কয়েকটি নূতন ছেলেকে আনিয়া হাজির করিল কেন্দ্রে। দেবানন্দের উপর আদেশ হইল তিনটি নূতন ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পরদিন তাহাকে দেওঘর রওনা হইতে হইবে। সে শুনিল বলাই তাহার সঙ্গে যাইবে। বলাই পুরীতে ছিল। সেইদিন সকালে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রওনা হইবার আগে একজন নেতা আসিয়া দেবানন্দকে কিছু উপদেশ দিলেন ও এক বাণ্ডিল কাগজপত্র তাহার হাতে দিলেন।

ছোট দলটি দেওঘরে শীল্‌স লজে আসিয়া উঠিল। দেবানন্দ ও বলাইয়ের কাজ হইল নূতন ছেলে তিনটিকে এবং বর্দ্ধমান হইতে আরও যে দুইটি ছেলে আসিবার কথা আছে তাহাদের শিখাইয়া পড়াইয়া তৈয়ারি করিতে হইবে। একসঙ্গে বিপ্লবী নীতি ও হাতের তাক ঠিক করা শিখাইতে হইবে।

বলাই বলিল—দেবু, পড়াবার মাষ্টারিটা তুই কর। তোর কাছে পরীক্ষার পাস হলে জশিডির মাঠে নিয়ে গিয়ে আমি হাতের কাজ শেখাব।

দেবানন্দ দেখিল তাহাকে যে সকল কাগজপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে যুগান্তর কাগজের কয়েকটি সংখ্যা, "বর্ত্তমান রণনীতি" ও "মুক্তি কোন্ পথে" নামে দুইখানি বই ছিল। ছেলেদের লইয়া

দেবানন্দ কাজ আরম্ভ করিল, যুগান্তর হইতে তাহাদের পড়িতে দিল—

"হে ভারতবাসী, স্বধর্মে নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেম এক জিনিস। যে শিরে চন্দন ও কস্তুরী লেপন করিয়া তুমি ভগবানের চরণতলে লুটাইতে সে শিরে আজ পাদুকা বহন করিতেছ। তোমার উন্নত শির আজ বিধর্মীর পায়ে লুটাইতেছে। হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, দেশমাতৃকার মুক্তির পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছ। পরবশতা তোমাকে পঙ্গু করিয়াছে। উঠ, জাগো, সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আজ দেশকে বাঁচাইবার কার্যে আত্মনিয়োগ কর। দেশ বাঁচিলে তোমার ধর্ম্ম বাঁচিবে।

"কলিযুগে একতাই শক্তি। স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য এই শক্তি প্রয়োগ কর। পরাধীন দেশের ভূমি বিনা রক্তপাতে উর্ব্বর হইতে পারে না। রক্তপাতে উর্ব্বর ভূমিতেই স্বাধীনতার বীজ বপন করা যায়।

"আজ মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। পূজার আয়োজন করিয়া, বলির পশুকে চিহ্নিত করিয়া আর আলস্যে কালহরণ করিও না। মা বলির রক্তের জন্য অধীর হইয়াছেন।"

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাংড়িপোতা ষ্টেশনে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইল। বঙ্গবাসী বলিল, দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। ইংলিশম্যান বলিল, এক্সটি মিষ্টরা ও বাংলায় যে সকল সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সকল সমিতির সভ্যরা ডাকাতি ও ট্রেন-রেকিঙের জন্য দায়ী।

বলাই ছেলেদের লইয়া শহরের বাহিরে গিয়াছিল তাহাদের হাতের তাক ঠিক করা শিখাইবার জন্য। দেবানন্দ বাজার করিয়া কাগজ কিনিয়া বাসায় আসিল। কাগজ খুলিয়া প্রথমে যে সংবাদের উপর তাহার চোখ পড়িল তাহা পড়িয়া সে লাফাইয়া উঠিল। সংবাদটি এই—গোয়ালনন্দে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সি. এলেনের উপর গুলি চলিল।

উত্তেজনায় সে বলাই বলাই বলিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল। তাহার মনে পড়িল বলাই বাড়ীতে নাই। সে বসিয়া সংবাদটি আগাগোড়া পড়িল। তিন জন ছেলে দলে ছিল। গুলি করিয়া তাহারা দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। মিঃ এলেনের সঙ্গে যে সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন তিনি তাহাদের পিছনে দৌড়ান, কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পারেন নাই। ছেলেদের দেখিয়া ছাত্র বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

বলাই ছেলেদের লইয়া ফিরিবার সময় বাজারের মধ্যে লোকের মুখে সংবাদ শুনিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবাই সে দেবানন্দকে জড়াইয়া ধরিল। জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে সুদ্ধ লইয়া পাক খাইতে লাগিল আর চিৎকার করিতে লাগিল—থ্রি চিয়ার্স ফর ঢাকা নেশন্যাল ভলান্টিয়ার্স।

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—তুই কি করে জানলি ঢাকা নেশন্যাল ভলান্টিয়ার্স।

বলাই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—জানি গো জানি।

পরের দিন বলাই এক গাদা খবরের কাগজ কিনিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া পড়িতে লাগিল। ইংলিশম্যান ও অন্য একখানি এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ লিখিয়াছে—ঢাকার সিডিশাস নেশন্যাল ভলান্টিয়ারস্ এই কাজ করিয়াছে। দেশী কাগজ বলিল—বাঙালী ছেলেরা এমন কাজ করিতে পারে না, মি. এলেনের কোন ব্যক্তিগত শত্রু গুলি করিয়াছে। একখানি মুসলমান কাগজ এই মর্ম্মে লিখিল—"বাংলার কাপুরুষ নিহিলিষ্টরা মি. এলেনের উপর আক্রমণের জন্য দায়ী। ইহারা ইউরোপের এনার্কিষ্ট পার্টির নূতন সংস্করণ। দিন-দিন ইহারা বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে।"

সেই দিন কলিকাতা হইতে দেবানন্দ ও বলাই আদেশ পাইল ছেলেদের লইয়া কলিকাতা রওনা হইবার জন্য।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দেবানন্দ দেখিল যাঁহারা তাড়াতাড়ি আসিবার জন্য সংবাদ দিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই গরহাজির। সবাই সুরাট কংগ্রেসে গিয়াছেন। যাইবার সময় কর্তৃপক্ষ আদেশ দিয়া গিয়াছেন দেবানন্দ ও বলাইকে কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতে। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা তার করিবেন। তার পাইলে যতগুলি সম্ভব ছেলে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের রওনা হইতে হইবে।

এক দিকে সুরেন্দ্রনাথ ও ড. রাসবিহারী ঘোষ এবং অন্য দিকে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ তাঁহাদের দলবল লইয়া সুরাটে গিয়াছেন। নেশন্যালিষ্টদের ভয়ে নাগপুর হইতে কংগ্রেস সুরাটে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। বাংলা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের এক্সট্রিমিষ্টরা সদলে সুরাটে উপস্থিত হইয়া দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বাধাইলেন। কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ স্কোয়ারের মিটিঙে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ, বয়কট সমর্থন ও জাতীয় শিক্ষা-সমর্থনের প্রস্তাবের পক্ষে জোরাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কংগ্রেস ভাঙিবার পরে যে মডারেট কনফারেন্স হইল তাহাতে তিনি সুর পাল্টাইলেন। সন্ধ্যা এই মর্ম্মে আরও বলিল—"কংগ্রেসে নেশন্যালিষ্ট নেতাদের লইবার জন্য মডারেট নেতাদের আমরা অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এবার দখিনী নাগরার আস্বাদ পাইয়া তাঁহাদের জ্ঞান লাভ হইবে বোধ হয়।" সন্ধ্যা আরও লিখিল, "বাঙালীরা এত শীঘ্র তাহাদের প্রতিজ্ঞা, তাহাদের সকল ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকারের কথা ভুলিয়া গেল ইহা দুঃখের কথা। কত জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জেলে গিয়াছেন ও অন্য ভাবে কঠোর উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন; জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বক্সীগঞ্জে কত হিন্দুনারী ধর্ষিতা হইয়াছেন, হিন্দু দেবমন্দির ও বিগ্রহ কলুষিত হইয়াছে; গুর্খা ও পিটুনি পুলিসের কত অত্যাচার হিন্দুরা সহ্য করিয়াছে; শ্রীযুক্ত অশ্বিনী দত্তের উপর উৎপীড়ন হইয়াছে; বরিশালে কনফারেন্স ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে, এণ্টি সারকুলার সোসাইটির সভ্যদের রক্তপাত হইয়াছে; চিত্তরঞ্জনের উপর বর্ব্বর আক্রমণ হইয়াছে; ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, বসন্তকুমার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন; সুশীল সেনের উপর বেত্রাঘাত হইয়াছে,

বৃদ্ধ মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের উপর উৎপীড়ন হইয়াছে। মডারেটরা সব ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা বিডন স্কোয়ার ও শ্যামবাজারের দাঙ্গা, বৌবাজারে পুলিসের অত্যাচার, পূর্ব্ববঙ্গে শত শত স্বদেশীওয়ালার উপর উৎপীড়ন ভুলিয়াছে। আজ তিন বৎসর ধরিয়া যত অত্যাচার, যত উৎপীড়ন হইয়াছে তাহারা সব ভুলিয়াছে।"

মুসলমান কাগজ লিখিল—"কংগ্রেসের মৃত্যু হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর উপাস্ত বয়কটও কবরস্থ হইয়াছে।" ষ্টেটসম্যান, ইংলিসম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ, এম্পায়ার প্রভৃতি এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ সমস্বরে বালগঙ্গাধর তিলকের উপর কটূক্তি বর্ষণ ও মডারেটদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

ঋষিপত্তন ও উরুবিল্বে দুই দিন

শ্রীস্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী

আগ্রা থেকে কাশীতে এসে আমরা উপস্থিত হলাম। একটি দিন বিশ্রাম করে কাটল। পরের দিন ভোরবেলা সারনাথ (ঋষিপত্তন) যাওয়ার জন্য সকলে মিলে একটি টাঙ্গায় আরোহণ করা হ'ল। কাশী থেকে সারনাথ মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। শহর অতিক্রম করে ক্রমে আমরা জনবিরল গ্রাম্য পথে এসে

মূলগন্ধকুটী বিহার—সারনাথ

পৌঁছলাম; এই পথের শেষে পাওয়া গেল সুন্দর বাঁধানো সড়ক। তার দুই ধারে ছায়াশীতল আম্রবৃক্ষের সারি। যতদূর দৃষ্টি যায়—দু'ধারে সবুজের লীলায়িত রেখা রামধনুর মত শূন্যপটে আঁকা রয়েছে। দীর্ঘ তিন মাইল-ব্যাপী এই আম্রতরুছায়াচ্ছন্ন পথ অবশেষে শেষ হয়েছে এসে ধর্মপাল রোডের প্রত্যন্তসীমায়। সারনাথের নিকটবর্তী হয়ে এক সময় আমরা দেখতে পেলাম একটা বৌদ্ধ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। এটি ইষ্টকনির্মিত এবং এর নাম চৌখণ্ডীস্তূপ। এই স্তূপটির শীর্ষে একটি আট কোণযুক্ত বুরুজ আছে এবং তার স্তম্ভে প্রস্তরফলকে পারস্তভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ। আমরা দেখলাম স্তূপটির সংস্কারসাধন হচ্ছে। তার সু-উচ্চ প্রাচীরগাত্র বেয়ে পিঁপড়ের সারির মত মজুরের দল উঠছে আর নামছে।

অনেকে মনে করেন এই ভগ্নপ্রায় স্তূপের অভ্যন্তরে কোনও গভীর কূপ আছে, কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ভগবান বুদ্ধ উরুবিল্ব (গয়া) হতে বোধিপ্রাপ্ত হয়ে এসে এই স্থানে তাঁর প্রথম ও পঞ্চম শিষ্যের সহিত মিলিত হন। এই চৌখণ্ডীস্তূপ সেই স্বাক্ষর বক্ষে ধরে বিদ্যমান।

অশোকস্তম্ভ-শীর্ষের ধর্মচক্র—সারনাথ

ধর্মপাল রোডের এক স্থানে এসে আমরা গাড়ী থেকে অবতরণ করে হাঁটতে সুরু করলাম। পথের উভয় পার্শ্ব থেকে মূক ইতিহাস আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে; আমরা ভাবছি, কার আমন্ত্রণ আগে গ্রহণ করি? এমন সময় ভাদুড়ী বললেন, আমরা একেবারে শেষ থেকে দেখতে সুরু করব। কাজেই আমাদের গতি রুদ্ধ হ'ল না। হেমন্তের মধ্যাহ্নবেলা; রৌদ্রের তেজ অতি প্রচণ্ড। হাঁটতে

হাটতে একটা ছায়াময় স্থানে এসে আমরা উপবেশন করলাম। এই স্থানটি বন্য কুল আর বেলগাছের জঙ্গলে বেশ ছায়াচ্ছন্ন। অদূরে একটি বৃহৎ জনশূন্য প্রাসাদ পড়ে আছে। কোনও রাজা কিংবা জমিদারের হবে হয়ত। কুলগাছগুলি শ্বেত পুষ্প-মঞ্জরীতে ছেয়ে আছে; কোথাও বা দুই-একটা অপক্ক ফলও ধরেছে। ছন্দা-পাপড়ী এখন আশা করছে কোনও মন্ত্রবলে যদি এই মঞ্জরীগুলি রসাল কুলে পরিণত হয়ে যায় এই মুহূর্তে, তা হলে ওরা মনের সুখে রসনা পরিতৃপ্ত করে। ঠিক সেই সময় সেই স্থান দিয়ে মাথায় পসরা নিয়ে একটি স্থানীয় বৃদ্ধা যাচ্ছিল। কুলের আশায় পাপড়ী তাকে "বুড়িয়া এ বুড়িয়া" বলে ডাকতেই, বৃদ্ধা একেবারে রেগে আগুন। সে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে রাষ্ট্রভাষায় বলতে লাগল,

চৌখণ্ডীস্তূপ—সারনাথ

"তোমরা আমায় কেন বুড়ী বুড়ী বলে বিরক্ত করছ; আমি কি বুড়ী? ইত্যাদি?" তার রাগ দেখে ভাদুড়ী আবার ব্যস্ত হয়ে অদ্ভুত ভাঙা হিন্দীতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন—এরা ছেলেমানুষ, তুমি ওদের কথায় রাগ করো না।" ব্যাপারটা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। বুড়ীর বিচিত্র মুখভঙ্গী, ভাদুড়ীর অদ্ভুত ভাষা—এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা তো হেসে আকুল। অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে বৃদ্ধা প্রস্থান করলে আমরা উঠে পড়লাম। খানিকটা বন্য পথ অতিক্রম করে একটা টিলার উপর সারনাথের মন্দিরে প্রথমে আসা গেল। এই মন্দিরে সারনাথ ও সোমনাথ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। সোমনাথ শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শঙ্করাচার্য; আর সারনাথ নাকি আপনিই মৃত্তিকা-গর্ভ হতে উত্থিত হয়েছেন। মন্দিরের পরিবেশটি ভারি সুন্দর। চতুর্দিকে বনানীর নিবিড় শ্যামলিমায় কি গভীর প্রশান্তি! টিলার পাদদেশে একটি পুষ্করিণী, কানায় কানায় তার জল টলমল করছে। তীরে শোভা পাচ্ছে পুষ্পিত করবী, টগর, জবা আর চাঁপা ফুলের বৃক্ষ। তাদের অঙ্গে অঙ্গে বয়ে চলেছে বিচিত্র বর্ণ আর রূপের হিল্লোল। স্থানটি অতি নির্জন, বনভূমিতে বিল্লীর আওয়াজ মধ্যাহ্নবেলাকে মুখরিত করে রেখেছে। বাস্তবিক তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে। একদা এই স্থানে বহু মুনি-ঋষি বাস করতেন; সেই কারণে এর প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন বা ইসিপত্তন। পরে এই স্থান হরিণের বিচরণক্ষেত্র ছিল বলে এর অপর নাম হয় সারঙ্গনাথ বা মৃগদাব।

সারনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা চীনাভবনে এলাম। এই সুবৃহৎ পীতবর্ণযুক্ত মন্দিরটি ১৯৩৯ সনে লী চুন সিঙ্ নামক জনৈক চীনা বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করিয়ে দেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে শুভ্র পাষাণ-বেদিকায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রার ভঙ্গীতে বুদ্ধদেবের বৃহৎ মর্মরমূর্তি স্থাপিত। নানা বর্ণযুক্ত হর্ম্যতলে নানা বর্ণের পদ্মপুষ্প খোদিত। এই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান অতি মনোরম। চীনাভবন দেখে আমরা জৈন মন্দিরে গেলাম। এই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের চিত্রাবলী এবং কারুকার্য অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মন্দিরের মধ্যভাগে প্রস্তরবেদিকায় কষ্টিপাথরে নির্মিত শ্রেয়াংশনাথের মূর্তি স্থাপিত আছে। ১৮২৪ সনে জনৈক জৈন শেঠ কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

জৈন মন্দির দেখে আমরা এলাম প্রধান মন্দির মূলগন্ধ-কুটি বিহারে। বর্তমানে এইটিই সারনাথে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। এরই অদূরে দক্ষিণপ্রান্তে ধামেক স্তূপ। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে একদা এইস্থানে বসে বুদ্ধদেব প্রথম তাঁর পাঁচ জন শিষ্যকে (কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিত) উপদেশ প্রদান করেছিলেন। উত্তরকালে সম্রাট অশোক কর্তৃক এই পুণ্যস্থানে এই ধামেক স্তূপ নির্মিত হয়। পরে এই স্থান হইতেই ষাট জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মপ্রচারের জন্য যাত্রা করেন এশিয়া মহাদেশের নানা প্রান্তে। আর মূলগন্ধ-কুটি বিহার যে স্থানে নির্মিত হয়েছে, সেই স্থানে সদ্য বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব তিন মাসকাল বিশ্রাম করেছিলেন।

প্রাচীন মন্দিরের ঐতিহ্য স্মরণে ১৯২২ সনে পরোলোক-গত অনাগারিক দেবমিত্র ধর্মপাল কর্তৃক এই মূলগন্ধকুটি বিহারটির নির্মাণকার্য সুরু হয় এবং ১৯৩১ সনে শেষ হয়। এই গগনচুম্বী বিহারটি শুভ্র চুনার প্রস্তরে নির্মিত। ভিতর এবং বাহিরের মর্মর শুভ্রতা থেকে একটা দিব্য জ্যোতি সর্বত্র বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে সু-উচ্চ শুভ্র বেদিকায়, ধর্মচক্রমুদ্রা ভঙ্গীতে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র মূর্তিটি অতি চমৎকার। এই মূর্তিটি প্রাচীন মূলগন্ধকুটি বিহারে স্থাপিত মূর্তির অনুকরণে গঠিত। প্রাচীন মূর্তিটি বর্তমানে স্থানীয় মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে। এই বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠে সুদৃশ্য ধর্মচক্র খোদিত। তার উভয় পার্শ্বে পঞ্চশিষ্যের ভিক্ষুমূর্তি; এবং মৃগযুগল স্থাপিত। এই

ধ্যানী মূর্তিটির মুখমণ্ডল হতে যেন একটি অপার্থিব দ্যুতি নিঃসৃত হচ্ছে। প্রস্তরের মধ্যে এমন অপূর্ব ভাব ফোটানো সাধারণ শিল্পীর কার্য নহে। বেদিকার একধারে সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে তক্ষশিলার ধর্মচক্রস্তূপের পার্শ্ব থেকে এবং

ধামেক স্তূপ—সারনাথ

মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলার মহাচেতীয় নামক স্তূপ থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের ধাতুমূর্তি সুরক্ষিত আছে। এই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত বুদ্ধজীবনের চিত্রাবলী যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি অপূর্ব ভাবব্যঞ্জক। চমৎকার বর্ণবিন্যাসে ভগবান তথাগতের জীবনের ঘটনাবলী জাপানী শিল্পী কসিটু নোসু কর্তৃক চিত্রিত হয়েছে। শিল্পীর অন্তরে কি পরিমাণ ভক্তি-একাগ্রতা, আন্তরিক নিষ্ঠা, প্রবল সৌন্দর্যতৃষ্ণা থাকলে এই প্রকার আনন্দ-বেদনা-অভিষিক্ত সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, তা এই শিল্পীর কলানৈপুণ্য প্রত্যক্ষ না করলে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। এর মধ্যে একটি অন্ত্যজ-জাতীয়া স্ত্রীলোকের কাছ থেকে আনন্দের জলপান ও গভীর রাত্রে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের চিত্র দুটি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল।

এই বিহারের প্রাঙ্গণটিও নানাপ্রকার মূর্তি ও পুষ্পোদ্যান দ্বারা পরিশোভিত। প্রাঙ্গণের বামপ্রান্তে বোধিবৃক্ষ অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহাতপস্বীর মত দণ্ডায়মান। থেকে থেকে মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয়ে যেন দর্শকবৃন্দকে অন্তরের আশীর্বাদ জানাচ্ছে। উরুবিল্বের যে অশ্বত্থ তরুমূলে বসে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বলাভ করেছিলেন সেই মহাবোধির একটি শাখা একদা সম্রাট্ অশোকের দুহিতা সংঘমিত্রা সিংহলে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধের বাণী প্রচারকালে সিংহলবাসীকে উপহার দিয়ে-ছিলেন। পুনরায় সেই বোধিদ্রুমের শাখা দেবমিত্র ধর্মপাল কর্তৃক ভারতে আনীত হয়ে ১৯৩২ সনে এই স্থানে রোপিত হয়। আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই প্রাচীন বোধিদ্রুমের শাখা-সম্ভূত বৃক্ষের ছায়ায়। ভাবতে গেলে মনে অদ্ভুত বিস্ময় জাগে; সত্যিই কি এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে সেই আড়াই হাজার বৎসর

বোধিদ্রুম—সারনাথ

পূর্বেকার প্রাণরস সঞ্চিত আছে? এই শাখাকাণ্ডে ওতপ্রোত আছে সেই মহা সন্ন্যাসীর অঙ্গস্পর্শ? বোধিবৃক্ষমূলে বসে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা গেলাম ধামেক স্তূপ দেখতে।

বৌদ্ধযুগের অবিস্মরণীয় কীর্তি, স্থাপত্যশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ এই স্তূপ আজও বিদ্যমান। ভূপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা ১২৮ ফুট; মৃত্তিকা-নিম্নে আরও ২৮ ফুট ভিত্তি প্রোথিত আছে। স্তূপগাত্রে বহু কুলুঙ্গী বিদ্যমান; একদা এই সকল কুলুঙ্গীতে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত ছিল এবং মসৃণ পাষাণগাত্রে বুদ্ধের বাণীসকল উৎকীর্ণ ছিল, কিন্তু কালের অমোঘ বিধানে আজ সে সকলই লুপ্তপ্রায়। স্তূপের নিম্নাংশের পাষাণগাত্রে বহু কারুশিল্প খোদিত। ধামেক স্তূপের পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে আমরা গেলাম প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখতে। বিখ্যাত অশোক-বেদিকা এখন ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে এবং স্তম্ভগুলি এখনও গঠননৈপুণ্যে দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই বেদিকা সম্রাট অশোকের এক উল্লেখ-যোগ্য কীর্তি। এই বেদিকার চতুর্দিকস্থ বনময় ভূমি শুধু অতীত ঐতিহ্যের কঙ্কালস্তূপে পরিপূর্ণ। আমরা সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে নিঃশব্দ চরণে বহুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম।

এখানকার জাতীয় সংগ্রহশালাটি ভারতবর্ষের একটি মহা

মূল্যবান সম্পত্তিবিশেষ। এই ভবনে প্রবেশ করলে একসঙ্গে বৌদ্ধযুগ, মৌর্যযুগ, গুপ্ত ও পালযুগের মূক ইতিহাস যেন যুগপৎ মুখর হয়ে ওঠে। সুদৃশ্য কাষ্ঠাধার এবং স্ফটিকাধারে বহু ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন, অভগ্ন বুদ্ধমূর্তি এবং বহুপ্রকার শিল্পকার্য-সমন্বিত

প্রধান মন্দির—বুদ্ধগয়া

প্রস্তর ও ভগ্নাবশেষসমূহ সুন্দররূপে সুসজ্জিত আছে। বহু পুরনো ঘর-গৃহস্থালির দ্রব্যাদিও সযত্নে রক্ষিত আছে। যেমন —প্রকাণ্ড দুইটি মৃন্ময় জলাধার, হাঁড়ি গামলা, বাটি, প্রদীপ ইত্যাদি। এর মধ্যে অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশ চতুঃসিংহ-সমন্বিত ধর্মচক্রটি ভারতের অতীত গৌরবের অন্যতম প্রতীক-রূপে বিদ্যমান। এই ধর্মচক্রটি চুনার পাথরে নির্মিত এবং ইহার গাত্রে পীতবর্ণের প্রলেপ দেওয়া। যদিও এর বহু অংশ ভগ্নপ্রায় তথাপি এর ভাস্কর্য অতি চমৎকার এবং আজও এটি অটুট রয়েছে। বিখ্যাত অশোকস্তম্ভের চূড়াস্থিত এই ধর্মচক্রটি ১৯০৫ সনে মৃত্তিকা খনন কালে আবিষ্কৃত হয়। এই ধর্মচক্রই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। অশোকস্তম্ভশীর্ষের বামপার্শ্বে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত বুদ্ধদেবের একটি দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। বৌদ্ধযুগে এটি প্রাচীন মূলগন্ধকুটি মন্দিরে স্থাপিত ছিল। এই মূর্তির মস্তকদেশে একটি প্রকাণ্ড লাল প্রস্তরের সুদৃশ্য ছত্র রক্ষিত ছিল। মৃত্তিকা খনন কালে তা মূর্তিসহ ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই ছত্রটি সংগ্রহশালার আর একটি কক্ষে রক্ষিত। এই বৃহৎ ছত্রটির শিল্পনৈপুণ্য সত্যই অপূর্ব। এখানে হিন্দু দেব-দেবীরও কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি আছে। সংগ্রহশালার উদ্যানটি ভারি সুন্দর।

সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে আমরা লাইব্রেরি দেখতে গেলাম। এই লাইব্রেরিতে ত্রিপিটকের সিংহলী বর্মী, শ্যামদেশীয়, চীনা সংস্করণ ও বহু পুরাতন পুঁথি সযত্নে রক্ষিত আছে। এখানে সারনাথ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক ভিক্ষু সঙ্ঘরত্ন স্বামিজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী ও অমায়িক। সারনাথের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে তিনি আমাদের সাহায্য করলেন। প্রত্যেক বৎসর কার্তিক মাসে সারনাথে মহাসমারোহে উৎসবাদি হয়ে থাকে। তার ব্যবস্থাদি নিয়ে তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, "এবারে কলকাতা থেকে শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে নিয়ে আসা হবে উৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন করার জন্য।" কিন্তু নির্বাচনী শফরের জন্য ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এবারে সারনাথে উপস্থিত হতে পারেন নি। সঙ্ঘরত্নজীর পরিবেশিত চা পান করে আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম। অপরাহ্ণের ছায়া মেদুর হয়ে আসছে বনানীর শীর্ষে আর মন্দিরের চূড়ায়। সূর্যাস্তের গৈরিক আভা ছড়িয়ে পড়েছে বোধিদ্রুমের শ্যামল শাখা-পল্লবে। চতুর্দিকে কি অনাবিল প্রশান্তি, কি মহান ঔদার্য! সেই মহাতীর্থের মৃত্তিকা থেকে অন্তরে মহাজীবনের বাণী বহন করে আমরা ফিরে চললাম। আজ রাত্রেই আমাদের গয়ায় পৌঁছাতে হবে। কাজেই বিলম্ব করা চলল না।

গয়া ষ্টেশন থেকে বুদ্ধগয়া প্রায় সাত মাইল পথ। পরের দিন ভোরবেলা আমরা ষ্টেশন থেকেই বুদ্ধগয়ার পথে রওনা হলাম। অপরিচ্ছন্ন ঘিঞ্জি শহর অতিক্রম করেই পেলাম সুন্দর নিরিবিলি পথ। তার এক প্রান্তে দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে শৈলশ্রেণী; অপর প্রান্তে বালুকাশায়িনী ক্ষীণাঙ্গী ফল্গুনদী। নদীতে জল অত্যন্ত অল্প হলেও, সে জল অতি স্বচ্ছ ও স্ফটিকশুভ্র—ঠিক ঝরণাধারার মত। এই পথ অতিক্রম করে অবশেষে আমরা উরুবিল্বে পৌঁছলাম। বর্তমান বুদ্ধগয়ার প্রাচীন নাম উরুবিল্ব এবং এই ফল্গুর প্রাচীন নাম নিরঞ্জনা। দূর থেকে দেখা গেল মন্দিরের উন্নত চূড়া। গাড়ী থেকে নেমে অনেকখানি পথ পদব্রজে গিয়ে তবে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। পথের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পুরাতন মন্দির দেখা গেল। তার নাম বজ্রশিলা। একদা এই স্থানে বুদ্ধদেব সুজাতার নিকট হতে পায়সান্ন গ্রহণ করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে একটি প্রস্তরনির্মিত কক্ষে সেই স্থানটি চিহ্নিত করা আছে। মন্দিরে সমস্ত কক্ষে এবং প্রাঙ্গণে শুধু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শঙ্করাচার্য নাকি এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন তা এর প্রস্তর ও ইষ্টকাদি দেখলে সহজেই অনুমিত হয়। বজ্রাসন দেখে আমরা প্রধান মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলাম। এক জায়গায় দেখলাম প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। তার অদূরেই উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে নবনির্মিত মন্দির। প্রকাণ্ড সিংহদ্বার অতিক্রম করে আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। একদা ভগবান বুদ্ধ মহাবোধি লাভ করে

গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে এই স্থানে পদচারণা করেছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের একটি সুবৃহৎ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা আকারের বহু বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরে ও প্রাচীরগাত্রের কুলুঙ্গীতে সুরক্ষিত আছে। এর মধ্যে

মহাবোধি বৃক্ষ, বুদ্ধগয়া

ব্রাহ্মণ শাস্তি ও চতুরঙ্গচালিত সূর্যমূর্তিটি শিল্পনৈপুণ্যে অনুপম। পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা করধৃতপদ্ম দেবীমূর্তিটির গঠনকৌশল অতি চমৎকার। দেবীর মস্তকের উভয় পার্শ্ব থেকে দুটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা পাত্র হতে জল নিক্ষেপ করছে; এই মূর্তি গজলক্ষ্মী নামে খ্যাত। দ্বিতলের মুক্ত ছাদের প্রাচীরগাত্রে নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্তি, জাতক-কাহিনী, আলঙ্কারিক ও নির্দেশক মূর্তিচিহ্ন, সুন্দর বৃক্ষলতার চিত্র প্রস্তরে খোদিত। এই স্থাপত্যশিল্প এত সূক্ষ্ম, ভাবব্যঞ্জক ও রূপময় যে সেগুলি সহসা দেখলে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। মন্দিরের বহিরঙ্গণে বুদ্ধদেবের দুটি হাসি ও কান্নার মূর্তি আছে। পাষাণগাত্রে, আনন্দ এবং বেদনার অভিব্যক্তি অতি নিপুণ ভাবে রূপায়িত। ধন্য শিল্পী, অপূর্ব তাঁর প্রতিভা। এই মূর্তি দুটি, চত্বরে বিলম্বিত সুবৃহৎ চারিটি ঘণ্টা এবং ধ্বজা দুটি নাকি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্রহ্মদেশের রাজা থিবো এই মন্দিরে দান করেছিলেন।

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে উরুবিল্বের চিরস্মরণীয় বোধিবৃক্ষ অবস্থিত। সেদিন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উরুবিল্ব দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর চতুর্দিকে বিরাট জনমণ্ডলী চক্রাকারে ঘুরছিল। একটি রৌপ্যনির্মিত কলসে বোধিমূলের মৃত্তিকা ভরে নিয়ে তাঁরা প্রস্থান করলে পরে, আমরা সেস্থানে গেলাম। এই প্রাচীন বৃক্ষের অসংখ্য ঝুড়ি ও শ্যামল শাখাপল্লবে এক সর্বত্যাগী মহাপুরুষের স্মরণীয় ইতিহাস গ্রথিত রয়েছে। বর্তমান বোধিদ্রুমের বয়স এখন এক শত দশ বৎসর। বুদ্ধদেব যে বৃক্ষমূলে বসে বোধিলাভ করেছিলেন, এটি তার তৃতীয় বংশধর। সে কতদিন আগে একদা এই স্থানে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিলেন ভারতের এক নবীন তপস্বী; এই তরুচ্ছায়াতলেই তাঁর কঠোর সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটে—তিনি প্রবুদ্ধ হন। এই স্থান সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অক্ষয় পাদপীঠ। সেই বোধিদ্রুম-মূলে আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলাম। আমরা সেই মৃত্তিকা স্পর্শ করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান

পদ্মকুণ্ড, বুদ্ধগয়া

থেকে ফিরে এলাম। মৃত্তিকা ত সেই একই; মনে হ'ল এই মাটির কোনও স্তরে হয়ত আজও মিশে আছে সেই মহামানবের পদধূলি।

মন্দিরের অনতিদূরে, একটি পাষাণ-বেদিকার নিম্নে একটি পদ্মকুণ্ড। শোনা যায়, উরুবিল্বে অবস্থানকালে বুদ্ধদেব নাকি এই কুণ্ডে স্নান করতেন। লোকে বলে, সেই জন্য অদ্যাপি এই কুণ্ডে থরে থরে পদ্মফুল ফোটে। এখানে একটি প্রাচীন মন্দিরে পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তি দেখলাম। এর পর চীনা ভবন, তিব্বতী মন্দির, বিড়লার বৃহৎ ও মনোরম ধর্মশালা দেখে আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম। উরুবিল্বের এই সকল প্রাচীন মন্দিরাদি একদা বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, কিন্তু এখন মোহান্তদের অধিকারভুক্ত। এই নিয়ে বহুদিন যাবৎ মামলা-মোকদ্দমা চলছে, কিন্তু আজও এর কোনও নিষ্পত্তি হয় নি।

উরুবিল্বের অনতিদূরে ফল্গু নদীর তীরে বিষ্ণুপদ মন্দির। আত্মার মুক্তিকল্পে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার জন্য এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম। প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে। দূর থেকে মসৃণ রূপালি অঞ্চল দুলিয়ে ফল্গু আমাদের ডাকছে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে প্রথমে স্নান করতে গেলাম। বাইরে জল বেশী না থাকলেও বালুকার নীচে বেশ শীতল জল আছে। ফল্গুর পবিত্র বারি স্পর্শ করে মনে হ'ল, সুদূর ত্রেতাযুগে সীতাদেবী একদা এই নদীতে স্নান করে ওই বিষ্ণুপদ মন্দিরে শ্বশুর দশরথের শ্রাদ্ধ করেছিলেন। সেকথা স্মরণে জল-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মনে দোলা লাগল।

পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বুদ্ধগয়া

স্নানান্তে আমরা মন্দিরে গেলাম। শ্বেত মর্মর হর্ম্যতলে, একটি গোলাকৃতি স্থানে, এক সুবৃহৎ শতদলযুক্ত রৌপ্য-পদ্মের মধ্যে কষ্টিপাথরের বক্ষে সুন্দর দুটি চরণচিহ্ন পরিস্ফুট। এ দুটি ভগবান বিষ্ণুর পদচিহ্ন। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে বহু দেবদেবীর মূর্তি বিদ্যমান। তার মধ্যে গয়াসুর নারায়ণের মূর্তিটি ভারি চমৎকার। মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়ায় একটি সুদৃশ্য সুবর্ণ-কলস প্রোথিত আছে; শোনা যায় এটি নাকি রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দির প্রদক্ষিণ করে আমরা ফিরে এলাম।

টাঙ্গায় উঠে আমরা বললাম প্রেতশিলায় যাব। বুদ্ধগয়া থেকে বহুদূরে পাহাড়ের উপর দুর্গম স্থানে প্রেতশিলা অবস্থিত। যাদের অপঘাতে মৃত্যু হয়, প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করলে নাকি তাদের আত্মা মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অনিবার্য কারণে আমাদের প্রেতশিলায় যাওয়া হ'ল না আমরা আবার ফিরে চললাম। আজই রাত্রের গাড়ী ধরে কলকাতা রওনা হতে হবে। পিছনে পড়ে থাকবে ঋষি-পত্তন, পড়ে থাকবে উরুবিল্ব—তাদের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাব সম্মুখপানে।

চির রহস্য

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বনমর্ম্মরে শোনো ফাগুন-যামিনী
আনাচে-কানাচে কি কথা কয়;—
যেন বহু দূরাগত বিরহী-মনের
বিধবা-স্মৃতির ব্যথার গান
সেতারের তারে বাজিয়া বাজিয়া শুধু
লয় হ'য়ে তবু হয় না লয়।
জোছনা-চাদরে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে তাই
শিশির ঝরায়ে কাঁদে বিমান।
পাকা পাতা যত উড়িয়া ঝরিয়া পড়ে
বনে বনান্তে; ভুবনময়
কচি কিশলয়ে জীবনোল্লাস তবু
হিল্লোল তোলে, শুনিছো ওই।

নব-জাতকের প্রাণ-বন্যার বাণী
ব্যথা-মর্ম্মরে করিছে জয়।
পুরাতন যায়; নোতুনেরে পুনরায়
আগ্রহ সুখে বরিয়া লই।
এই মতো শুধু হিন্দোল-দোল চলে—
চিতার আগুনে, প্রসূতি-কোলে;
আলোকে-আঁধারে রহস্য-রেখা তা'র
দিগন্ত সম চির-নবীন।
সতী-শবাগত উমারে বক্ষে ধরি'
শ্মশানেশ্বর শ্মশান ভোলে;
আমরাও ভুলি; নভ-কোলে দোলে চাঁদ;
রাত্রি বুঝি তাই ভোলে গো দিন।

জাতিগঠনে দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গানের দ্বিজেন্দ্রলাল যুগমানব সন্দেহ নেই। জাতির জীবনকে গৌরবের আলো-ঝলমল শিখরের পানে পরিচালিত করবার জন্ম সাহিত্যের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ সাহিত্যের সর্ব্বোত্তম কাজই হ'ল আলো ধরে সমাজ-জীবনকে পথ দেখানো—যে পথ তাকে নিয়ে যাবে মহত্ত্বের শিখর থেকে শিখরদেশে। আমরা যদি বলি সাহিত্যের এই প্রয়োজনীয় কাজটি দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেছে, তবে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই।

প্রবন্ধের গোড়াতেই বলি সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন, জনসাধারণের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই সাহিত্য জীবন্ত সাহিত্যের গৌরব লাভ করতে পারে। যাঁরা কেবলমাত্র নিজেদেরই প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যেও বড় সাহিত্যিকের অভাব নেই। কিন্তু শিল্পের রাজ্যে চিরকালের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ তাঁরাই যাঁরা সমস্ত মানুষের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা মর্ম্মের গভীরে উপলব্ধি করেছেন। রমঁ্যা রলঁ্যা ঠিকই বলেছেন:

"There are, indeed, great artists who express only themselves. But the greatest of all are those whose hearts beat for all men."

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে জনসাধারণের সঙ্গে এই আত্মীয়তাবোধের প্রকাশ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই আত্মীয়তা-উপলব্ধির গভীরতার ভিতর দিয়েই প্রত্যেক খাঁটি সাহিত্যিক চেষ্টা করেন জনসাধারণের মনে একটা বিশ্বাস জাগাতে, তাদের স্বপ্ন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং মোটেই আকাশকুসুম নয়—এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে জনসাধারণ খুঁজে পেয়েছে তাদেরই অন্তরের গভীরতম অনুভূতির প্রাঞ্জল প্রকাশ। তাঁর রচনাগুলি পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকার মনে স্বতঃই এই কথাটি জেগে উঠে: 'এ তো আমারই অন্তরের চিরদিনের কথা। কিন্তু এমন অপরূপ ভাবায় কোন দিনই মনের কথাকে এমন করে প্রকাশ করতে পারতাম না।' শিল্পী যা অনুভব করে থাকেন জনসাধারণও অল্পবিস্তর তাই অনুভব করে থাকে। শিল্পীর অনুভূতির তীব্রতায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য। আর তাঁর স্বাতন্ত্র্য পাঠক-পাঠিকার মর্ম্মের গভীরে নিজের অনুভূতিকে সঞ্চারিত করে দেবার বিশেষ একটা ঐশী ক্ষমতায়। এই দিক থেকেই অলডাস্ হাক্স্লি বলেছেন:

"Artists are eminently teachable and also eminently teachers."

অনুভূতিপ্রবণ কবিহৃদয় নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। বৈদেশিক শাসনের অভিশাপকে সহ্য করার মধ্যে যে অসম্মান রয়েছে সেই অসম্মানকে স্বীকার করা মানুষের স্বভাবের অনুকূল নয়। বার্নার্ড শ' *John Bull's Other Island* নাটকের উপক্রমণিকায় ঠিকই বলেছেন:

"Like Democracy, national self-government is not for the good of the people: it is for the satisfaction of the people."

জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্ম যে আকাঙ্ক্ষা—তার মূলে জনসাধারণের কল্যাণ নয়, তাদের তৃপ্তি। বিদেশীর সঙ্গীনের ছায়ায় বাস করার মধ্যে যতই নিরাপত্তা, যতই মঙ্গল থাকুক না কেন—তার মধ্যে জনসাধারণের আত্মার কোন তৃপ্তিই থাকতে পারে না। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আসলে লজিকের ব্যাপারই নয়, ওটা মানুষের সহজ, স্বাভাবিক অধিকারের ব্যাপার। যেখানে সহজ অধিকারের প্রশ্ন সেখানে স্বাধীনতার মধ্যে মঙ্গল আছে কি নেই—একথা অবান্তর। জীবন পদ্মপত্রের জলের মতই চঞ্চল, বেঁচে থাকার মধ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই—এই সত্য অকাট্য যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে শঙ্করাচার্য্য থেকে আরম্ভ করে শোপেনহাওয়ার পর্য্যন্ত কত জ্ঞানী ও মনীষীর রচনায়। তবুও কবি যখন বললেন:

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—"

তখন তাঁর এই চাওয়ার মধ্যে মানুষের বাঁচার সহজ অধিকারের দাবিই ঘোষিত হয়েছে। গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' রব তুললে ইংরেজ প্রশ্ন করলে: 'কার হাতে আমরা ভারতকে সঁপে যাব?' জাতির জনক উত্তরে বললেন, অরাজকতার হাতে। স্বাধীনতা এলে তার সঙ্গে অরাজকতা আসতে পারে, আর অরাজকতার মধ্যে মঙ্গল নেই—একথা গান্ধীজী জানতেন। তবুও ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতে বলতে তাঁর একটুও বাধল না—কারণ স্বাধীনতার মধ্যেই যে জনসাধারণের পিপাসার অমৃত ছিল।

আমাদের দেশের এক দল নরমপন্থী সুবিধাবাদী নেতা শাসকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্ন তুলে

মানুষের সহজ অধিকারের প্রশ্নকে যখন অত্যন্ত ঘোলাটে করবার চেষ্টা করেছিলেন তখন জোরাল কণ্ঠে স্বাধীনতার বন্দনাগান গাইবার জন্ত প্রয়োজন ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের মত একজন অসামান্ত কবির।

যারা শৃঙ্খলিত, যারা ক্রীতদাস তাদের কানে বাঁধন-ছেঁড়ার মাভৈঃ রব শোনাবার জন্তই ত যুগে যুগে কবিরা চলেছে রুদ্রবীণা বাজিয়ে। সেই রুদ্রবীণার অগ্নিবর্ষী সুরে উৎপীড়িত যারা তাদের মন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে নূতন প্রভাতের আশায়, যারা বিদেশী উৎপীড়ক তাদের চিত্ত ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের রুদ্রবীণায় যেদিন বাজল :

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহিতো মেষ ;
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"—

সেদিন সেই বীণার পাগল-করা সুর তাঁর শৃঙ্খলিত স্বদেশের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চার করে দিয়েছিল একটা নূতন আশা, একটা নূতন উদ্দীপনা। কবির বজ্রকণ্ঠের সেই অগ্নিবাণী শুনে অত্যাচারী রাজশক্তিও কি সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে নি ?

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল। কোন আইডিয়া—তা সে যতই বিরাট এবং গগনস্পর্শী হোক্ না কেন—কেবল নিজের জোরে কখনও দুনিয়া জয় করতে পারে না। দুনিয়া জয়ের শক্তি সে অর্জ্জন করে যখন তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় বীরের রক্তধারা। তখন বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম' শুধু সুখপাঠ্য উপন্যাসের কোলে আর ঘুমিয়ে থাকে না। জনসাধারণের প্রাণের স্পর্শে সেই গান হয়ে ওঠে জীবন্ত এবং জ্যোতির্ময়। সেই গানের বিজয়-বৈজয়ন্তীর ছায়ায় একটা জাগ্রত জাতির বৈপ্লবিক অভিযান সুরু হয় বিদেশীর শাসনদুর্গকে ধূলিসাৎ করবার জন্য। সেই গান হয়ে যায় জাতির জীবনের অঙ্গীভূত। দ্বিজেন্দ্রলাল মর্ম্মের শোণিত দিয়ে যা লিখলেন, বাংলার জাগ্রত যৌবন তার মধ্যে খুঁজে পেলে নবজীবনের মন্ত্র, নবপ্রভাতের আলো। দ্বিজেন্দ্রলালের গানকে বাঙালী প্রাণের মধ্যে বরণ করে নিল। জাতির জীবনধারার সঙ্গে সেই গানগুলি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল। কতকগুলো জীবন্ত মানুষের জাগ্রত প্রাণের বহ্নিশিখার স্পর্শ পেলে তবেই কবিদের আইডিয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি লাভ করতে পারে। যাঁরা বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবীর তাঁদের দানকে স্বীকার করতে গিয়ে যেন উপেক্ষা না করি দেশের জাগ্রত জনসাধারণকে যারা রক্ত দিয়ে ভাবুকের বাণীকে মূর্ত্ত করে তোলে জাতির জীবনে, আশা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে আইডিয়ার মধ্যে করে প্রাণসঞ্চার।

ইংরেজশাসনের স্বৈরাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার সুতীব্র কামনায় জাতির প্রাণ যখন আকুল তখন সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর কর্ত্তব্য বেছে নিতে দ্বিজেন্দ্রলালকে সংশয়-দোলায় একটুও দুলতে হয় নি। তিনি দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়ে লেখনী-হস্তে স্থান নিলেন দুর্ভাগা জনসাধারণের পাশে। লেখনীকে ব্যবহার করতে লাগলেন সুশাণিত তরবারির মত দেশমাতৃকার বন্ধনরজ্জুকে ছেদন করবার জন্য। মোটা মাইনের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন তিনি। ভাল করেই তিনি জানতেন, তাঁর লেখায় মনিবেরা আদৌ খুশী হবেন না। তবু মনিবের ভ্রূকুটির সম্মুখীন হতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ করেন নি। দেশকে তিনি ভালবেসেছিলেন হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে। সেই ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরের মণিকোঠায় দেদীপ্যমান ছিল তাঁর স্বপ্নের স্বদেশের জ্যোতির্ম্ময়ী ধ্যানমূর্ত্তি। যে ভারতবর্ষের শান্তরসাস্পদ তপোবনের ছায়ায় মানবসংস্কৃতির প্রথম উন্মেষ হয়েছিল, বেদের স্তোত্র উৎসারিত হয়েছিল আর্য্যঋষিদের কণ্ঠ থেকে, ভগবদ্গীতার মত অতুলনীয় ধর্ম্মগ্রন্থের উৎপত্তি যে ভারতবর্ষে—শঙ্করের ভারতবর্ষ, শ্রীচৈতন্যের ভারতবর্ষ, বুদ্ধের ভারতবর্ষ—এই নয়া ভারতবর্ষকে রচনা করবার স্বপ্ন ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সারা মনকে জুড়ে।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ—

এই স্বপ্নই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরলোকের স্বপ্ন, এই বাণীই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরতম বাণী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের চিতাভস্মের উপরে গড়ে উঠছে ভবিষ্যতের একটা নূতনতর মহিমময় ভারতবর্ষ—কত রাতের পর রাত এবং কত দিনের পর দিন দ্বিজেন্দ্রলাল এই সোনার স্বপ্ন দেখে-ছিলেন ভাবে বিভোর হয়ে। এই স্বপ্নের ভারতবর্ষকেই সম্বোধন করে দ্বিজেন্দ্রলাল একদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গেয়েছিলেন :

জননী তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।

যে অতীত তার অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতা নিয়ে আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে খাবি খাচ্ছিল তাকে দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ম্মম হস্তে আঘাতই করেছেন। তিনি ছিলেন ভবিষ্যতের—যে ভবিষ্যৎ নানা প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে আজ প্রাণপণে সংগ্রাম করছে দেশের মাটিতে জন্মলাভ করবার জন্য। দ্বিজেন্দ্রলাল জানতেন জাতির ভবিষ্যৎকে জ্যোতির্ম্ময় করতে হলে অন্ধ পরানুকরণের পথে কখনও তা সম্ভব হবে না। প্রত্যেক জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে কোন জাতিই উন্নতির পথে

এগিয়ে যেতে পারে না। আর প্রত্যেক জাতির প্রাচীন ইতিহাসের এবং সাহিত্যের পরম সার্থকতা হচ্ছে—তারা আমাদিগকে সন্ধান দেয় জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের। জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতার দিকে দৃকপাত না করে 'সাহেব সাজবার' যে অন্ধ পরানুকরণপ্রিয়তা একদা আমাদিগকে পেয়ে বসেছিল তাকে কটাক্ষ করেই দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে লিখেছিলেন :

আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা সেজেছি বিলাতী বাঁদর।

সাহেব সাজবার উৎকট চেষ্টাকে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।

সেদিন জাতির মুক্তিসাধনাকে জয়যুক্ত করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল যদি অকুতোভয়ে লেখনী পরিচালনা না করতেন, রাণা 'প্রতাপ সিংহ' ও 'মেবার পতন'-এর মত জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক না লিখতেন, গানে গানে আমাদের রক্তে আগুন না জ্বালাতেন, আমাদের হতাশাময়, কালিমাময় অচলায়তন আমাদের স্কন্ধে সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ে সেই বুড়োটার মত আজও চেপে থাকত। আজ যে আমরা সেই অচলায়তনের কবন্ধটাকে কাঁধ থেকে খানিকটা সরাতে পেরেছি এর জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের, বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের কাছে কি আমরা কম ঋণী! ইতিহাসকে নিয়ে আমরা কখনো ছেলেখেলা করতে পারি নে। ইটালীর লেখকেরা সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কল্পনা এবং অন্তর্দৃষ্টিকে যদি ব্যবহার করতেন গণতন্ত্রের সেবায়, স্বাধীনতার পরিচর্য্যায় তা হলে মুসোলিনীর অভ্যুদয় সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। হিটলারের নাৎসীবাদ প্রসারের মূলেও জার্ম্মান লেখকদের 'নিরাপদ নীরব নম্রতা'। আজ ভাবি ইংরেজের শাসনদণ্ডের নিকট সসম্ভ্রমে নতি স্বীকার করে দ্বিজেন্দ্রলাল যদি তাঁর কণ্ঠকে নীরব রাখতেন তো আমাদের পরাধীনতার রাত্রি হয়ত আরও দীর্ঘায়িত হ'ত! আমাদের কত সৌভাগ্য যে দুর্য্যোগের তিমির রাত্রিতে আলো ধরে পথ দেখাবার জন্য সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম।

খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম ম্যাকডুগাল তাঁর *The Group Mind*-এ লিখেছেন :

"If a people is to become a nation, it must be capable of producing personalities of exceptional powers; . . . such personalities, more effectively perhaps than any other factors, engender national unity and bring it to a high pitch."

একটা ভূখণ্ডের জনসাধারণ তখনই অখণ্ড জাতিতে পরিণত হতে পারে যখন তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নরনারী। ম্যাকডুগালের মতে আফ্রিকার নিগ্রোরা যে আজ পর্য্যন্ত জাতিগঠন করতে পারল না তার কারণ তাদের মধ্যে সেরা সেরা মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল না। পক্ষান্তরে ইহুদীরা বিচিত্র প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে থেকেও পুরুষপরম্পরায় জাতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে যে সমর্থ হয়েছে—ম্যাকডুগালের মতে তার কারণ ইহুদীদের মধ্যে যুগে যুগে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেদের আবির্ভাব।

ম্যাকডুগালের এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে হয়। তিনি মহম্মদের উল্লেখ করেছেন। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্যন্ত আরবের অধিবাসীরা ছিল শতধাবিচ্ছিন্ন এবং আত্মকলহে নিমগ্ন। বিবদমান নানা দলের মধ্যে কোনই যোগসূত্র ছিল না। মহম্মদ নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তাকে আশ্রয় করে শতধাবিচ্ছিন্ন আরবকে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ আরব জাতির উদ্ভব একটিমাত্র মানুষের অসামান্য প্রতিভা থেকে। চীনা সংস্কৃতির ঐক্যের মূলেও কনফিউসিয়াস এবং লাওৎ-সের মত বিরাট পুরুষদের চিন্তাধারার বিপুল প্রভাব। ফ্রেডারিক দি গ্রেট এবং বিসমার্কের মত পুরুষসিংহ না জন্মালে জার্ম্মানীতে জাতিগঠন সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। ওয়াশিংটন, হ্যামিল্টন এবং লিঙ্কন আবির্ভূত না হলে আমেরিকাকে একজাতিতে পরিণত করত কে? গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি আর কাভুর না এলে ইটালীর দশা কি হ'ত? আমরা এক জাতি, আমাদের সংস্কৃতি এক, ঐতিহ্য এক—নিজেদের মধ্যে এই ঐক্যবোধ ইংরেজমাত্রই অনুভব করে। ইংরেজ লেখকেরা জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, ইংরেজ সৈনিকেরা আর নাবিকেরা দুনিয়ার দরবারে তাদের দেশকে গৌরবের আসনে বসিয়েছে, ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কদের দানও এ বিষয়ে বড় কম নয়। এঁদের জন্যই ইংরেজদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের এই উন্মেষ। ম্যাকডুগাল ঠিকই লিখেছেন :

"What would England be now if Shakespeare, Newton and Darwin, Cromwell and Chatham, Marlborough and Nelson and Wellington had never been born?"

এই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও জিজ্ঞাসা করতে পারি—ভারতবর্ষের দশা আজ কি হ'ত যদি এ যুগে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দ না জন্মাতেন? যদি বঙ্কিমচন্দ্র জাতির কর্ণকুহরে বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ না করতেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশবাসীদের না শোনাতেন 'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ'। ভারতবর্ষের রূপ আজ কি হ'ত যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের এবং তিলকের মত রাষ্ট্রগুরুরা আবির্ভূত না হতেন?

একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান পুরুষেরাই যে জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেবার পক্ষে অপরিহার্য্য—একথা ঠিক নয়। যাঁরা সর্ব্বোচ্চ শক্তির অধিকারী নন অথচ ঠিক সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে পড়েন না তাঁদেরও বিরাট প্রয়োজন আছে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। কার্লাইল, ম্যাথু আর্নল্ড, রাস্কিন—এঁদের প্রতিভা সেক্সপীয়রের অথবা নিউটনের প্রতিভার মত গগনস্পর্শী নয়। কিন্তু ইংরেজ জাতির চিত্তভূমিকে এঁদের লেখা যে বহুল পরিমাণে উর্ব্বর করেছে এতে কোন সংশয় নেই। জাতীয় জীবনের ঐক্য, প্রাণশক্তি এবং সমৃদ্ধি যে অব্যাহত থাকবে, জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং চিত্তের ঐশ্বর্য্য যে কোনমতেই ক্ষুণ্ণ হবে না—এ নির্ভর করছে জাতির অসাধারণ মানুষ সৃষ্টি করবার ক্ষমতার উপরে। যাঁদের প্রতিভা গগনস্পর্শী নয় অথচ যাঁদের ক্ষমতা সাধারণের ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী—এমন সব মানুষই জনসাধারণের চিত্তে জ্বালিয়ে রাখেন জাতীয় সংস্কৃতির হোমানল শিখাকে। জনসাধারণের পক্ষে কোন্ আদর্শ শুভ এবং কোন্ আদর্শ অশুভ, কোন্ আইডিয়াকে গ্রহণ করলে জাতির মঙ্গল হবে এবং কোন্ আইডিয়া জাতিকে নিয়ে যাবে অকল্যাণের পথে—এ বাতলে দেবার জন্য জাতির শিয়রে প্রহরীর মত যুগে যুগে জেগে আছেন এঁরাই। এঁরা যা কল্যাণময় বলে বিশ্বাস করেন তার প্রশংসা করে থাকেন, যা অমঙ্গল বলে মনে হয় তার নিন্দা করেন। জনসাধারণের কাছে এঁদের নিন্দা-প্রশংসার মূল্য অনেকখানি। তাই এঁদের রায় জনসাধারণের মতামত গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে, তার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কম সাহায্য করে নি। রাণা প্রতাপে যোশী বলছে স্বামী পৃথ্বীরাজকে :

"চারটি চারটি করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে তো ইতর জন্তুও করে! যদি কারও জন্য কিছু উৎসর্গ করতে না পার, যদি মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য একটা আঙুলও ওঠাতে না পার তবে ইতরপ্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি?"

যোশীর মুখ দিয়ে নাট্যকার আর এক জায়গায় বলিয়েছেন :

"ঐ বোকামীই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু! মহৎ হতে হলে ত্যাগ চাই।"

রাণা প্রতাপ এই ত্যাগেরই প্রতিমূর্ত্তি। জীবন আসে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে। দেশে নবজীবনের বন্যা আনবার জন্য তাই দ্বিজেন্দ্রলাল মরণের জয়গান গেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের চরম কথা "আবার তোরা মানুষ হ"।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বন্দনাগান। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—এই তো ভারতের যুগযুগান্তের মর্ম্মবাণী। দ্বিজেন্দ্রলাল ভোগবাদের কোথাও স্তবগান করেন নি। তিনি বলে গেছেন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে, তিনি বলেছেন সাম্প্রদায়িকতাকে বিষবৎ পরিহার করতে, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ করতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার ত্যাগ করে সকলের সঙ্গে মনে প্রাণে এক হয়ে যেতে। তিনি বলেছেন পাপের সেনাকে পর করে দিয়ে পুণ্য-সেনাকে আপন করতে। তিনি বলেছেন ভয় এবং ক্রোধের অতীত হয়ে সত্যাশ্রয়ী হতে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীমূর্ত্তি। তাঁর কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই।

ছেড়ে-আসা গ্রাম

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বহু দিন ছেড়ে-আসা শান্ত, স্নিগ্ধ একখানি গ্রাম—
সে যে মোর বড় প্রিয়—সে যে মোর স্বপ্ন-স্বর্গধাম!
মনে পড়ে পাখী-ডাকা
বীথি তার ছায়া-ঢাকা
বনপুষ্পগন্ধমাখা আঁকাবাঁকা নয়নাভিরাম।
তারি লাগি দুই চোখে ভরি' মোর আসে অশ্রুজল,
কত নিদ্রাহীন রাতে হৃদিতল উদাস উতল!
জাতিস্মর চিত্তে যথা
পূর্ব্বজনমের কথা—
স্মৃতি তার ঐ মতো জাগে ভেদি' মোর মর্ম্মতল।

কত দিন দেখি নাই শ্যামলিমা তার বনশ্রীর,
কত দিন শুনি নাই মৃদু বায় যে মঞ্জু মঞ্জীর
মুঞ্জরিত কুঞ্জ মাঝে
পুঞ্জ অলিগুঞ্জে বাজে;
সবি যেন অবাস্তব সুখস্বপ্ন মধু যামিনীর!
জানি না এ যাত্রাশেষে আছে কি-না আছে জন্মান্তর,
যদি থাকে, ঘুরে ফিরে আসিব কি কভু অতঃপর—
রূপালি নদীর তীরে
সে আমার হারা নীড়ে?
নিরজন পল্লীগেহে শুনিব কি ঝিল্লী-কলস্বর?

মধ্যযুগে ইউরোপে কিমিয়ার গবেষণা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এস্‌সি

মধ্যযুগে ইউরোপে কিমিয়া (alchemy) সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তি গ্রেকো-মিশরীয় ও আরব্য কিমিয়া। আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে পরিচিত হইবার ফলে গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লাটিন ইউরোপীয় জাতিরা যেমন উৎসাহিত হইয়াছিল, কিমিয়া-শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং গবেষণার প্রতিও তাহারা সেইরূপ আকৃষ্ট হয়। একাদশ শতাব্দী হইতেই আরব্য কিমিয়ার চর্চা ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। জার্মানীতে এডেল্‌বার্ট ফন্ ব্রেমেনের সভায় (১০৬৩ খ্রীঃ) কয়েক জন কিমিয়া-বিশারদের তৎপরতার উল্লেখ আছে। পল নামে এক ইহুদী (পরে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন) কিমিয়া-বিশারদ তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিবার এক পদ্ধতির উল্লেখ করেন; তিনি নাকি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন গ্রীসে। এই সময়ে মাইকেল সেল্লাস্ (Michael Psellus) নামে আর এক জন বাইজান্-টাইন পণ্ডিত ইউরোপে প্রাচ্য কিমিয়াবিদ্যা প্রসারে যত্নবান হন। কিন্তু এই সমস্ত তৎপরতা নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ইউরোপে মধ্যযুগে কিমিয়া-চর্চার প্রধান অনুপ্রেরণা আসে কিমিয়া-সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থের অনুবাদ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। রবার্ট অব চেষ্টার একখানি আরবী কিমিয়ার গ্রন্থ অনুবাদ করেন ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে। সিসিলিতে প্রাপ্ত *Liber luminis luminum* ও অক্সফোর্ডে প্রাপ্ত *De alchemia* গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদক মাইকেল স্কট; এই গ্রন্থদ্বয়ে নানা ধাতু ও লবণ-প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনা আছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতীয় যুগে (scholastic age) ইউরোপে কিমিয়া-চর্চা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রধান কারণ—এই বিদ্যার প্রতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত-দের ক্রমবর্ধমান কৌতূহল এবং অনুরাগ। অ্যাল্‌বার্টাস্ ম্যাগ্‌নাস্, রজার বেকন ও সেণ্ট টমাস্ একুইনাস্ কিমিয়াবিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন এবং প্রথমোক্ত দুই জন এই সম্বন্ধে নানা গবেষণা ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ভিন্‌সেণ্ট অব বোভে, আর্নল্ড অব ভিলানোভা ও রেমণ্ড লুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কিমিয়া-বিশারদ। ইউরোপে কিমিয়ার চর্চা ও অগ্র-গতির জন্য ইঁহাদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভিন্‌সেণ্ট অব বোভের (১১৯০-১২৬৪) খ্যাতি তাঁহার বিরাট বিশ্বকোষ *Speculum Maius*-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব সব কিছুই আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে *Speculum naturale* শীর্ষক খণ্ডে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সঙ্গে মণিকবিদ্যা (mineralogy) ও কিমিয়ার অনেক আলোচনা আছে। তিনি কিমিয়াকে মণিকবিদ্যারই এক বিশেষ শাখারূপে মনে করিতেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসা ও লৌহ এই ছয়টি ধাতুর এবং পারদ, গন্ধক, আর্সেনিক ও নিশাদল এই চারি প্রকার স্পিরিটের উৎপত্তি মৃত্তিকাগর্ভে। পারদ ও গন্ধকের যৌগিক মিশ্রণের ফলে নানাপ্রকার ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধাতুর রূপান্তরে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। স্পর্শমণির সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতুগুলিকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টাই যে কিমিয়ার একমাত্র লক্ষ্য এই মত তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আর্নল্ড অব ভিলানোভা (১২৪০-১৩১১) ছিলেন প্রধানতঃ চিকিৎসক; মঁপেলিয়েরে ও বার্সেলোনায় তিনি চিকিৎসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। উপযুক্ত ঔষধের আবিষ্কার দ্বারা চিকিৎসার উন্নতিসাধনকল্পে তিনি কিমিয়া-চর্চায় উৎসাহিত হন। কথিত আছে, আভিনোর অষ্টম পোপ বোনিফেসের জন্য তিনি নাকি কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চিকিৎসার্থে রাসায়নিক দ্রব্যের অধিকতর ব্যবহারের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। *Rosarium philosophorum*, *De Vinis*, *De Venenis* প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি কিমিয়া-সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে রেমণ্ড লুলি (১২৩০-১৩১৬) ছিলেন ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর, তথা সমগ্র মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় কিমিয়াবিদ্। তাঁহার গ্রন্থাদির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক, অনেক মতভেদ আছে। তারপর এই সময়ে রেমণ্ড লুলি নামে এক জন বিচক্ষণ বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকেরও কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুণগ্রাহীরা এই নৈয়ায়িককে 'Doctor Illuminatissimus' নামে অভিহিত করিতেন। কিমিয়া-বিশারদ ও নৈয়ায়িক দুই লুলিই এক ব্যক্তি ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। কিমিয়া সম্বন্ধে নৈয়ায়িক লুলির স্থানে স্থানে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলেন ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

যাহা হউক, লুলি কর্তৃক লিখিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে কিমিয়াশাস্ত্রে এই বিজ্ঞানীর অনু-শীলন ও দান সুপরিস্ফুট। এই সকল গ্রন্থে অনার্দ্র কোহল (anhydrous alcohol) ও নাইট্রিক এসিড, অম্লরাজ (aqua regia) প্রভৃতি ধাতব অম্লের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত

হইয়াছে। ধাতব অম্লের প্রথম আবিষ্কৃত প্রস্তুত-প্রণালী অবশ্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহা সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষে কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। এই কৃতিত্ব আরব্য কিমিয়াবিদ্‌দের অথবা ইউরোপীয় কিমিয়াবিদ্‌দের প্রাপ্য তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। গেবেরের গ্রন্থাবলীর এক জায়গায় ধাতব অম্লের প্রস্তুত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে:

"এক পাউণ্ড ভিরাকস (সাইপ্রাসের) অর্ধ পাউণ্ড সোরা ও এক পাউণ্ডের এক-চতুর্থ ভাগ ফট্‌কিরি (জামেনির) লও, বক-যন্ত্রের মধ্যে ইহা জলে দ্রবীভূত কর; এইবার ইহাতে এক-চতুর্থ ভাগ নিশাদল দ্রবীভূত করিলে দেখিবে যে দ্রবণটি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ হইয়াছে।"

লুলির কিছু পূর্বে গেবেরের প্রতি আরোপিত কিমিয়ার এক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ হইতে লুলি ধাতব অম্লের প্রস্তুত প্রণালীর কথা জানিয়া থাকিবেন।

স্পর্শমণির গুণাগুণ সম্বন্ধে লুলি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি অতি গর্বের সহিত জাহির করেন যে, সমুদ্র যদি পারদ হইত, তিনি পৃথিবীর সমগ্র সমুদ্র ভাগকেই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারিতেন। শুধু স্বর্ণ প্রস্তুত নহে, স্পর্শমণির সাহায্যে মূল্যবান পাথর, অক্ষয় স্বাস্থ্য ও যৌবন, দীর্ঘজীবন ইত্যাদি সম্ভবপর করা আদৌ দুঃসাধ্য নহে।

বিখ্যাত রাসায়নিক জাবির ইবন্ হাইয়ান আরব্য কিমিয়ার স্থাপয়িতা। জাবিরের রচনার সহিত লাটিন গেবের নামে আর এক জন কিমিয়াবিদের রচনার নিকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় অনেকে এই দুই ব্যক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ অর রসিদের সময়ে জাবিরের কর্মতৎপরতা নিবদ্ধ। গেবের কর্তৃক রচিত বলিয়া লাটিন ভাষায় কিমিয়ার যে সকল গ্রন্থের কথা জানা যায় তাহার একটিরও রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের পূর্বে বলিয়া মনে হয় না। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস্ বা রজার বেকনের কেহই গেবেরের রচনার কোন উল্লেখ করেন নাই। জাবির ও আল্‌রাজি প্রমুখ বিখ্যাত মুসলমান কিমিয়াবিদ্‌দের রচনা, বর্ণনা ও মতবাদের সহিত তথাকথিত গেবেরের রচনাবলীর নিকট সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া অনেকের মনে এই সন্দেহই জাগিয়াছে যে, এই শেষোক্ত রচনাবলী খুব সম্ভব জাবির বা অন্য কোন মুসলমান কিমিয়া-বিশারদদের গ্রন্থরাজির তর্জমা বা সম্প্রসারণ মাত্র। অধ্যাপক সাটন এই সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছেন:

"Were the Summa and the other Latin treatises translations from the Arabic or elaborations from such translation? It is difficult to say and it does not matter much. Was Geber, as the name would imply, the Persian alchemist jubir ibn Haiyan? That is, are these Latin treatises translations of the Arabic ones written in the second half of the eighth century by that Jubir?" (*Introduction to the History of Science.*)

এই প্রশ্ন এখন পর্য্যন্ত প্রশ্নই রহিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, গেবেরের নামে প্রচলিত ল্যাটিন গ্রন্থগুলি তৎকালীন কিমিয়া সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই বিজ্ঞানে মধ্যযুগে আরবদের ও খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয়দের জ্ঞানের পরিধি কত দূর বিস্তৃত ছিল তাহা জানিবার পক্ষে এই গ্রন্থগুলি অপরিহার্য। গ্রন্থগুলির নাম:

Summa perfectionis, Liber de investigatione perfectionis, Liber de inventione veritatis sive perfectionis, Liber fornacum, Testamentus Geberis.

ইহাদের মধ্যে *Summa*-র প্রসিদ্ধিই সর্বাপেক্ষা বেশী। *Summa*-র কয়েকটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল:

(১) রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণার পথে কয়েকটি বাস্তব ও মানসিক অন্তরায়;

(২) কিমিয়ার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ধাতু রূপান্তর সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুক্তি ও তাহার খণ্ডন;

(৩) ধাতব পদার্থের অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক কথা; যেমন সমস্ত ধাতু গন্ধক ও পারদের দ্বারা নির্মিত; মাত্র ছয় প্রকার ধাতুর— স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, টিন, তাম্র ও লৌহের—অবস্থান সম্ভবপর;

(৪) কয়েকটি রাসায়নিক পদ্ধতির বর্ণনা—পাতন, ঊর্দ্ধ-পাতন, নিম্নপাতন, ভস্মীকরণ, দ্রবণ, তঞ্চন (congulation), বন্ধন (fixation) ইত্যাদি;

(৫) বিভিন্ন পদার্থের প্রকৃতি; এবং

(৬) পদার্থের রূপান্তরের উদ্দেশ্যে তাহার প্রস্তুতি এবং এই রূপান্তর যথার্থই সাধিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির আলোচনা, যেমন, জ্বলন, গলন, ভস্মীকরণ, বিজারণ (reduction), বাষ্পী-ভবন ইত্যাদি।

লাটিন ভাষায় লিখিত কিমিয়া শাস্ত্রের ইহা এক অতি বিশদ আলোচনা সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও তথ্যের দিক হইতে আরবী ভাষায় লিখিত প্রচলিত সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে ইহা নিকৃষ্ট।

ধাতুরূপান্তর ও কিমিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি: কিমিয়াযুগে ধাতুর রূপান্তর ও নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিবার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ বদ্ধমূল ও ব্যাপক ছিল যে, সমগ্রভাবে ধরিতে গেলে রসায়ন বলিতে আধুনিক কালে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোন প্রকৃত উন্নতি সাধন এই

* *A Short History of Chemistry*—Partington

যুগে হয় নাই। বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে রসায়ন বলিতে আমরা বস্তুর সংযুতি, তাহার গঠনবৈচিত্র্য ইত্যাদির অধ্যয়ন ও গবেষণা বুঝিয়া থাকি। রাসায়নিক গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হইল একদিকে বস্তুর সংযুতি পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মৌলিক উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা, অন্যদিকে এই মৌলিক উপাদানগুলির নানা যৌগিক মিশ্রণ-সংমিশ্রণের দ্বারা নূতন নূতন বস্তু প্রস্তুত করা। এই বিশ্লেষণ ও সংযোজনার অন্তর্নিহিত নীতিগুলির স্বরূপ আবিষ্কার করাও রাসায়নিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্যারাসেল্‌সাস্‌, ভ্যান্‌ হেল্‌মণ্ট, এগ্রিকোলা প্রভৃতি রেঁনেশীয় যুগের রাসায়নিকদের গবেষণার পূর্বে রাসায়নিক গবেষণার এই আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত ধারণায় দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি সমাচ্ছন্ন থাকায় বহুশত বর্ষব্যাপী নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যযুগের কিমিয়া-বিশারদরা রসায়নের রাজ-পথটি খুঁজিয়া পায় নাই। স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া গোটা পৃথিবীটাকেই এক দিন সোনার তালে রূপান্তরিত দেখিবার অন্ধ বিশ্বাস তাঁহাদের এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, বস্তুর বৈচিত্র্য ও তাহার রহস্যজনক সংযুতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। সকলেই এই অলৌকিক গুণসম্পন্ন স্পর্শমণির সন্ধানে ছুটিয়া হয়রাণ হইয়াছেন।

এই বিশ্বাসের ভিত্তি অবশ্য সুপ্রাচীন এবং ইহার বিবর্তনে কতকগুলি কারণও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন মিশরীয়দের সময় হইতে কিমিয়াবিদ্‌রা লক্ষ্য করে যে, ধাতুমাত্রেই বিভিন্ন সংযুতির সংকর ধাতু (alloy); অর্থাৎ কয়েকটি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ। অতএব এই সব উপাদানের পরিমাণে তারতম্য ঘটাইয়া ধাতুবিশেষকে অপর একটি ধাতুতে পর্যবসিত করিবার সম্ভাব্যতা সাধারণ যুক্তি। এজন্য আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া যুগ হইতেই দার্শনিকদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়, সঙ্কর ধাতুর বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা ধাতুর রূপান্তর সাধন সর্বতোভাবে সম্ভবপর। প্লেটো ও এরিস্টটল দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সমর্থন করেন। ধাতুর আপাতগঠন সংক্রান্ত উপরি-উক্ত ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রথিতযশা দার্শনিকদের এইরূপ উচ্চ সমর্থন ধাতু-রূপান্তর মতবাদের প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। ইহার পর ধাতুর বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ কিমিয়াবিদ্‌দের জল্পনার বিষয় হইল। অ্যাল্‌বার্টাস্‌ ম্যাগনাসের মতে, আর্সেনিক, গন্ধক ও জলের সংমিশ্রণে ধাতুর উদ্ভব হইয়া থাকে। ভিলানোভা ও লুলি বলেন, পারদ ও গন্ধক ধাতুর সাধারণ উপাদান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরিকল্পিত আর একটি মতবাদ অনুসারে পারদ, গন্ধক ও লবণ এই পদার্থ-ত্রয়ের যোগে ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই মতবাদে ধাতুর অন্যতম উপাদান লবণ বলিতে কোন এক যৌগিক পদার্থ বিশেষকে বুঝাইতেছে না। ঘনীভবন, অগ্নিপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রভৃতি যেসব ধর্ম লবণে বর্তমান এবং যাহা আমরা কোন কোন ধাতুর মধ্যেও লক্ষ্য করি, ধাতুর সেই সব ধর্মের ব্যাখ্যা কল্পে লবণ এক অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিল। গেবের ধাতুর উপাদান পারদ ও গন্ধকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ভিলানোভা, লুলি ও গেবেরের খ্যাতি এইরূপ প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল যে, অতি সহজেই ধাতু সম্বন্ধে তাঁহাদের এই 'পারদ-গন্ধক' মতবাদ সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে।

এই মতবাদ অনুসারে পারদ ও গন্ধকের আপেক্ষিক ভাগের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন একটি ধাতুকে অপর একটি ধাতুতে পরিণত করিতে হইলে এই আপেক্ষিক ভাগের যথাযথ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। জনৈক নকল গেবের লিখিয়াছেন, 'যেহেতু সমস্ত ধাতুর উপাদান গন্ধক ও পারদ, ইহার কোন একটি উপাদান কম থাকিলে আমরা তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারি, অথবা বেশী থাকিলে কতকটা বাহির করিয়া লইতে পারি। এইরূপ ক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলটি প্রয়োগ কর: ভস্মীকরণ, ঊর্ধ্বপাতন, আস্রাবণ, দ্রবণ, পাতন, তঞ্চন, কেলাসন ও বন্ধন। লবণ, ফটকিরি, হিরাকস, তুঁতিয়া, সোহাগা, তীব্রতম সির্কা ও অগ্নি (এইরূপ ক্রিয়ার) সক্রিয় কারক।'*

ধাতুর রূপান্তর সম্ভবপর করিবার জন্য বিভিন্ন মাত্রার 'ঔষধ' প্রয়োজন। প্রথম মাত্রার ঔষধ প্রয়োগে নিকৃষ্ট ধাতুর মধ্যে নানা পরিবর্তন সাধন করা যায়, তবে এই পরিবর্তনের কোন স্থায়িত্ব হয় না। দ্বিতীয় মাত্রার ঔষধ প্রয়োগে নিকৃষ্ট ধাতুগুলির উৎকৃষ্ট বা অভিজাত ধাতুর গুণ অর্পণ করা যায়। কিন্তু ধাতুর সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব করিতে হইলে তৃতীয় মাত্রার ঔষধের প্রয়োগ অপরিহার্য। এই তৃতীয় মাত্রার ঔষধকেই স্পর্শমণি বা 'পরশ-পাথর', 'Philosopher's stone', 'Grand Elixir', 'Elixir Vitae', 'Magisterium' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। এই সব ঔষধের, বিশেষতঃ তৃতীয় মাত্রার ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী অতীব যত্নের সহিত গোপন রাখা হইত এবং এই গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নানারূপ রহস্যজনক ও মরমীভাবাত্মক অঙ্কন, যেমন ড্রাগন, লাল বা সবুজ রঙের সিংহ, পদ্মফুল, সাদা রাজহাঁস ইত্যাদি ও

* *A History of Chemistry*—Ernst Von Meyer.

ততোধিক রহস্যজনক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। বেকন, ভিলানোভা ও লুলি নাকি এই পরশপাথর প্রস্তুত বিদ্যা জানিতেন। বেকন নিঃসঙ্কোচে বলেন, সামান্য কিছু পরশপাথরের সাহায্যে তাহার অপেক্ষা এক মিলিয়ন গুণ বেশী ওজনের পারদকে তিনি স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারেন। লুলি এ সম্বন্ধে আরও অদ্ভুত উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার লেখা বলিয়া প্রচলিত *Testamentum Novissimum*-এর এক জায়গায় আছে:

"ক্ষুদ্র একটি মটরশুঁটির পরিমাণ এই মহার্ঘ ঔষধের কতকটা সহস্র আউন্স ওজনের পারদের মধ্যে নিক্ষেপ কর; সমগ্র পারদ একটি লাল বর্ণের ভস্মে পরিণত হইবে। এই ভস্মের এক আউন্স আবার সহস্র আউন্স পারদে নিক্ষেপ করিলে তাহা আর একটি লাল ভস্মে পরিণত হইবে। ইহার আর এক আউন্স সহস্র আউন্স পারদে আবার নিক্ষেপ করিলে পারদটি সম্পূর্ণরূপে 'ঔষধে' পরিণত হইয়া যাইবে। ইহার (ঔষধের) এক আউন্স আর এক সহস্র আউন্স বিশুদ্ধ পারদে নিক্ষেপ করিলে ইহাও আগের মত ঔষধে পর্য্যবসিত হইবে। এই শেষোক্ত ঔষধের এক আউন্স এক হাজার আউন্স পারদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সমগ্র পারদ স্বর্ণে রূপান্তরিত হইবে; খনিতে প্রাপ্ত স্বর্ণ অপেক্ষা ইহা অধিকতর উৎকৃষ্ট।"

মটর-শুঁটির পরিমাণ যে মহার্ঘ্য ঔষধটি প্রথমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার পরিচয় ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে লেখক সম্পূর্ণ নির্বাক রহিয়া গিয়াছেন।

পরশপাথরের অলৌকিক গুণ শুধু ধাতুরূপান্তরের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। ইহাকে একটি সার্বজনীন ও সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহার কল্যাণে দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য যে সম্ভবপর এইরূপ ধারণা ব্যাপক ছিল। সাধারণতঃ ধর্মযাজক ও আশ্রমবাসীদের দীর্ঘজীবী হইতে দেখায় অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা সর্বরোগহর অমৃতস্বরূপ এই Elixir Vitae-র সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন।

কিমিয়াবিদ্‌দের এই সব উদ্ভট ধারণা, নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, যাদুবিদ্যা, ভেল্কি ও মরমীবাদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় মনে হয় ইহা যেন মানুষের বুদ্ধি ও ধীশক্তির এক বিরাট অবমাননা। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কেন এইরূপ আচ্ছন্ন ছিল, স্বাভাবিক ও সহজ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া রসায়নের সত্যকারের পরিচয় পাইতে তাহার কেন এত বিলম্ব হইয়াছিল সে জটিল প্রশ্নের অবশ্য কোন সদুত্তর নাই। তবে এই ভাবে অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে যে প্রকৃত রসায়ন বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? ষোড়শ শতাব্দী হইতে আধুনিক রসায়নের গোড়াপত্তনের প্রথম লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। কিন্তু কিমিয়ার প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। এই প্রভাবের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রধান কারণ রেনেশাঁর ও তৎপরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকরাও নিঃসংশয়ে কিমিয়াকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। প্যারাসেলসাস্ নিজেই বলিতেন, কিমিয়া সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। ভ্যান হেলমণ্টের মত বিশিষ্ট রাসায়নিক পারদ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতু প্রস্তুত করিবার দীর্ঘ ও বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং এই রূপান্তর যে পরশ-পাথরের সাহায্যে সম্ভবপর এইরূপ মত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। এগ্রিকোলা কিমিয়ার সমর্থন করেন নাই বটে, কিন্তু ধাতুরূপান্তর সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া কোন দৃঢ় মতও কদাপি প্রকাশ করেন নাই। বয়েল, গ্লাউবের, কুন্‌কেল্, ষ্টাহ্‌ল, বোয়েরহাভে প্রমুখ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাসায়নিকগণ আংশিকভাবে কিমিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজ-অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা কিমিয়ার প্রতিপত্তির আর এক অন্যতম কারণ। এই ব্যাপারে জার্মান রাজন্যবর্গ কিমিয়াবিদ্‌দের এক সময়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া রাতারাতি প্রচুর ঐশ্বর্য-লাভের লোভ এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার মূলে বিদ্যমান। সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ্, স্যাক্‌সনির ইলেকটর অগাস্টাস্, ব্র্যান্ডেন্‌বুর্গের ইলেক্‌টর জন জর্জ কিমিয়ার পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্বর্ণ-প্রস্তুতের আশায় বা দুরাশায় ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজকোষ প্রায় উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে কিমিয়াবিদ্‌দের ব্যর্থতা ও বুজরুকি লোকে বুঝিতে পারিল। কিমিয়াবিদ্ বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক ধুরন্ধর জুয়াচোর বহু লোকের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, বহু লোককে সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িয়াছিল। এই সব প্রবঞ্চককে শায়েস্তা করিবার জন্য কিমিয়া সম্বন্ধে নানা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ সময় পোপ জন (Pope Jone, XXII) কিমিয়ার চর্চা নিষিদ্ধ করিয়া এবং এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের কঠিন শাস্তিবিধান করিয়া কতকগুলি আদেশ জারি করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, এইরূপ আদেশজারির ফলে কিমিয়ার চর্চা ব্যাহত হইয়া রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির পথ বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক সার্টন দেখাইয়াছেন (*Introduction to the History of Science*, Vol. III), সমগ্রভাবে কিমিয়ার চর্চা ও গবেষণা বন্ধ করা এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি শুধু প্রবঞ্চক স্বর্ণ-প্রস্তুতকারকদের শায়েস্তা করিতে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শুধু কিমিয়া বিদ্যা নহে,

যাদুবিদ্যা, যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকপাঠ প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের উপরেও এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়া ছিল।

কিমিয়াযুগের স্বপ্ন একেবারে বৃথা হয় নাই। বিংশ-শতাব্দীতে রাদারফোর্ড, কুরি-জোলিও, সিবোর্গ প্রভৃতি আণবিক গবেষকদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে ধাতুরূপান্তর সম্ভবপর হইয়াছে, এমন কি পৃথিবী-বহির্ভূত ইউরেনিয়াম পারের কয়েকটি সম্পূর্ণ নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইহা মধ্যযুগীয় কিমিয়া-পদ্ধতিতে নহে।

"শূন্য যে ঘর !"

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

আশুতোষ যখন বি-এ পাস করিল, তখন গ্রামসুদ্ধ সকলেই একবাক্যে বলিল "বাঃ, বাহাদুর ছেলে বটে—যাকে বলে রত্ন। এই ছেলে দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করবে, আর বংশের গৌরব তো বটেই।" পিতা গোকুলদাস গ্রামে একখানি মুদীখানা দোকান করিয়া এবং ধানের সময় ধান, পাটের সময় পাট মাপিয়া, অসময়ে কৃষকদের টাকা ধার ও দাদন দিয়া, যাহা হোক-কিছু পয়সা করিয়াছেন। শত্রুপক্ষ বলিয়া বেড়ায়, "বেটা বুড়োর কমসে কম হাজার পঞ্চাশেক টাকা আছে। তা হবে না—মুখ্যু চাষা-ভুষোদের তাহা ফাঁকি দিয়ে ঐ টাকা হয়েছে।" অবশ্য লোকে সব সময় অন্যের টাকার পরিমাণ বেশী করিয়াই দেখে। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা সত্য নয়, তবে পাঁচ-সাত হাজার টাকা যে গোকুলদাস এ পর্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার একমাত্র পুত্র বি-এ পাস করিবার পর, গ্রামের লোক উপদেশ দিল, "দে-মশায় আর কেন। ছেলে যখন উপযুক্ত হয়েছে, তখন এইবার আপনি বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলের বৌ নিয়ে আসুন। আপনার সাধ-আহ্লাদ মিটুক, নাতি-নাতনীর মুখ দেখুন, আর আমরা দিনকতক লুচিমণ্ডা পাই।" গোকুলদাস বহুক্ষণ হুঁকা টানিয়া, এক সময় হুঁকাটি হস্তান্তরিত করিয়া বলিলেন, আরে আমার কি অসাধ। কিন্তু ছেলের যে মত হয় না। বলে বিলেত যাবে—সেখানে পাস দিয়ে ও নাকি বালিশটর হয়ে আসবে।—প্রতিবেশী হুঁকা হাতে করিয়া কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, বিলেত? মানে সেই সায়েব মেমদের দেশে। আরে ওরা তো ম্লেচ্ছ অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। অমন কাজটি করো না গোকুল। আর বালিশটর পাস সেটা কি গোকুল?

—কি জানি। ওসব ইংরেজী-মেংরেজী কথা। ছেলেই জানে কি হবে বালিশটর হয়ে।

গোকুলদাস ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁহার ঐ একটি-মাত্র সন্তান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন; এখন চোখের আড়াল করিয়া, সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে পাস করিবার জন্য পাঠাইতে তাঁহার মন সরিল না—যুক্তিযুক্তও মনে করিলেন না। ইতিমধ্যে যদি তিনি হঠাৎ চক্ষু বোজেন, তবে এই সমস্ত ব্যবসা, দোকানপাট সবই মাটি হইয়া যাইবে। অথচ আশু যে এতগুলো পাস করিয়া, ইংরেজী শিখিয়া, মুদীখানার দোকানে বসিবে বা হাটের উপর কাপড় তুলিয়া, কাদাজল ভাঙিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ধানপাট মাপিতে যাইবে ইহাও অসম্ভব মনে হইল। গোকুলদাস আশুতোষকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। আর সকল পিতার নিকটই ত সন্তান আদরের ও প্রিয়পাত্র। কিন্তু তবুও ব্যবসায়ীদের হৃদয় নামক পদার্থটি বুঝি ভগবান অন্য কোন ধাতু দিয়া, উহারই মধ্যে একটু রকমফের করিয়া, একটু ভিন্ন ধরণে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই ব্যবসায়ী গোকুলদাসের নিকট সন্তানের চেয়েও তাহার ব্যবসা, তাহার দোকান, সঞ্চিত অর্থ অধিকতর প্রিয়। গোকুলদাস সন্তানের পিতা, কিন্তু ইহা ছাড়া সে খাঁটি ব্যবসাদার। খাঁটি ব্যবসাদার চায় তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়সম্পত্তি এইগুলি যাহাতে আরও বিস্তৃত হয়—আরও উন্নতিশীল হয়। কিন্তু আশুর হাতে এই ব্যবসা গেলে তাহার যে কি গতি হইবে, তাহা যেন গোকুলদাস ইহার মধ্যেই মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন। মনশ্চক্ষে যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সুখ হইল না, বরং ভাবনা-চিন্তায় সমস্ত রাত দুই চোখের পাতা এক করিতে পারিলেন না।

সেদিন ভোরবেলায় উঠিয়াই গোকুলদাস পুত্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আশুতোষ অবাক হইয়া গেল। গোকুলদাস কোন দিনই পূজা-আহ্নিক না করিয়া কাহারও সহিত কোন কথা বলেন না। আর অত ভোরে আশুতোষ কোনদিনই ওঠে না। বেশ বেলা হইলে উঠিয়া, দাঁতন করিতে করিতে ঘাটে গিয়া বসে। তারপর আরও কিছু বেলা হইলে মুখ-হাত ধুইয়া, জলযোগ সারিয়া ছিপ হাতে করিয়া পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসে। পিতা ডাকিয়াছেন শুনিয়া, কোঁচার একাংশ গায়ে জড়াইয়া সে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। গোকুলদাস তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, দেখ, আমার বয়েস হয়েছে, শরীরটা ভাল বুঝছি নে। এইবার সময় থাকতে থাকতে বিষয়-আশয় দোকানপাট বুঝে নাও। তুমি লেখাপড়া শিখেছ তোমাকে বেশী আর কি বলব। এই বুড়ো বয়সে, আর খাটাখাটুনি সহ্য হয় না। তোমার হাতে সব ভার

দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই—হাঁ, আর এক কথা··· এই বলিয়া গোকুলদাস আড়চোখে পুত্রের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন। পুত্রের নিকট হইতে কোনরূপ প্রত্যুত্তর না পাইয়া একবার কাশিয়া গলা সাফ্ করিয়া গোকুলদাস বলিলেন, আর তুমিই আমার একমাত্র সন্তান। আমার ইচ্ছে, এই মাসেই তোমার বিবাহ দিই। চন্দননগরের ওঁরা কাল পত্র দিয়েছেন। ওঁরা খুব সম্মানিত ঘর, উচ্চ বংশ আর মেয়েটিও খুব ভাল। তোমার উপযুক্তই পাওনা হবে। আর তোমার বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে আমার মত নেই। আমার এই বৃদ্ধবয়সে আর ওকথা মুখে এনো না—আচ্ছা এখন যাও।—আশুতোষ নীরবে চলিয়া আসিল। গোকুলদাস পুত্রের গমনপথের দিকে তাকাইয়া, একটু মৃদু হাসিয়া তামাক টানিতে টানিতে হাসিলেন।

আশুতোষ বি-এ পাস করিয়াছে, ভাল ইংরেজী শিখিয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বলিয়া কোন অহঙ্কার তাহার মধ্যে নাই। স্বভাবচরিত্র সুন্দর ও শান্ত—অহঙ্কার বা অভিমানের উত্তাপ নাই। প্রত্যহ বেলা ন'টার সময় বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, দাঁতন করিতে করিতে নিজেদের বাঁধান পুষ্করিণীর ঘাটে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটাইয়া তার পর ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে বসে। বেলা হইয়া যায়, পুরাতন দাসী বিনোদা বারংবার আহারের তাগিদ দিয়া যায়, কিন্তু আশুতোষ সেদিকে কান না দিয়া, নিবিষ্টমনে একাগ্রদৃষ্টি লইয়া ছিপের ফাতনার দিকে তাকাইয়া থাকে। মনে হয়, সমস্ত বিশ্বসংসারের—সমস্ত জগদ্বাসীর ভালমন্দ শুভাশুভ সবই বুঝি ঐ সরু সুতায় সংলগ্ন ফাৎনাটির মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বুঝি ছিপের ফাৎনাটি জলমধ্যে ডুবিয়া গেলেই, জগৎশুদ্ধ সকলেরই মঙ্গল হইবে। ইহার পর বেশ বেলা হইলে, ছিপ গুটাইয়া আশুতোষ বাড়ী চলিয়া যায়। মাছ কোনদিন হয়, কোনদিন বা হয় না। স্নান আহার সারিয়া গোটা দুই পান মুখে পুরিয়া, দোতলার দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের জানালা খুলিয়া খাটে শুইয়া পড়ে। খোলা জানালা দিয়া, হু হু শব্দে বাতাস আসিতে থাকে। আমবাগানের ঘুঘু-পাখীর ডাক—ছাদের কার্নিসের পায়রাগুলির বক বকম আলাপ নিস্তব্ধ দুপুরের বাতাসে ভাসিয়া আসিতে থাকে। গৃহে আর কোথাও কোন শব্দ নাই, এক্ষণে সকলেই একটু দিবানিদ্রা দিতেছে। আশুতোষ কোন কোনদিন একখানি বই লইয়া দুই-একটি পাতা পড়ে, কিন্তু কোন্ সময় যে বইখানি হাত হইতে পড়িয়া যায় ও সে পাশ-বালিশ জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা তাহার নিজের নিকটেই অজ্ঞাত থাকে। ইহার পর রাত্রি দশটা অবধি ননী ময়রার দোকানে কয়জনে মিলিয়া তাস পিটাইয়া বাড়ী ফেরে। এমনি ভাবে আশুতোষের দিনগুলি বেশ নিরুদ্বেগেই চলিতে থাকে। যেন একখানি নৌকা পাল তুলিয়া, তরঙ্গহীন নদীপথে তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। সেখানে কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, কোন ঝড়ঝঞ্ঝা নাই—বেশ নির্ভাবনায় হেলিয়া-দুলিয়া নৌকা চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু আশুতোষের এই নিরুদ্বিগ্ন জীবন একজনের ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বিরাজ ঘটক। ঘটক মহাশয় ওৎ পাতিয়াই ছিলেন। এমন ছেলে—যে এতগুলি পাস করিয়াছে—স্বাস্থ্য ভাল, বাপের পয়সা আছে, সে এতদিন কুমার কার্ত্তিক হইয়া থাকিবে এ কোন্ দেশী কথা। বুঝি আশুতোষের ঘাড়ে একটি প্রাপ্তবয়স্কা সালঙ্কারা কন্যা না চাপাইয়া দিলে বিরাজ ঘটকের পেটের ভাত হজম হইতেছিল না। বিরাজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। এদিকে পাত্রীপক্ষেরও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। এমন পাত্র পাছে হাতছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে চন্দননগরের কন্যাপক্ষ বার বার তাগিদ পাঠাইতে লাগিল। শীঘ্রই দিনস্থির হইল। তার পর এক দিন শুভদিনে বহু আলো বহু লোকজন ও বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে, উলুধ্বনি শঙ্খের আওয়াজের মাঝে আশুতোষের বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ কনকলতা বড়লোকের মেয়ে। নববধূ দুই দাসীসহ, বহু দানসামগ্রী দামী দামী বসন-ভূষণ, দামী দামী অলঙ্কার লইয়া শ্বশুরগৃহে আসিল।

কনকলতা সুন্দরী ও ধনীর কন্যা এবং সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছে। গানবাজনাও জানে, অন্যান্য শিল্পকাজও ভাল জানে। একে সুন্দরী তাহাতে শিক্ষিতা, তদুপরি ধনী পিতার একান্ত আদরিণী দুহিতা। অতএব শ্বশুর গোকুলদাস বধূমাতাকে কোথায় রাখিবেন, কি খাওয়াইবেন, এই সব ভাবিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন, তেমনি বাড়ীর দাসদাসীরাও বেশ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, আশুতোষ নির্ব্বিকার। তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে নাকি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চকৎকার চমৎকার দামী দামী ভালবাসার কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। ইহার জন্য নববধূর শয়নঘরে আড়ি পাতিতে পাড়ার মেয়েরা দিব্যি সাজিয়া-গুজিয়া, ঘরের আশেপাশে দরজা-জানালার নিকট ভিড় জমাইল। অধিক রাত্রে লোকজন বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে, আশুতোষ ঘরে আসিল। বধূ দামী কাপড়জামা এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, একরূপ রাজরাণীর মতই খাটে বিরাজ করিতেছে। ঘরটি ফুলে ফুলময়। ফুলের গন্ধের সহিত নানাজাতীয় দেশী বিলাতী আতর এসেন্সের সংমিশ্রণে, ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। জানালা খোলাই আছে, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রির বহু মধুভরা আনন্দ মুহূর্ত্তগুলির যে প্রধান ও নির্ব্বাক সাক্ষী সেই চন্দ্রদেব আজ অনুপস্থিত। আকাশে কালো কালো মেঘ রহিয়াছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—গুরু গুরু করিয়া এক-আধবার মেঘ ডাকিতেছে। কখনও-বা ঝিম ঝিম ফিস ফিস করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে—আবার এক সময় থামিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার হু হু শব্দে জোলো ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া, জিনিসপত্র এলোমেলো করিয়া দিতেছে। আশুতোষ ঘরে ঢুকিয়া, একবার নববধূর দিকে তাকাইয়া, দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাইল। নিজের গায়ের জামা—হাতের ঘড়ি প্রভৃতি খুলিয়া নিঃশব্দে হাই তুলিয়া দরজার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাহিরে দিব্য মেঘ ডাকিতেছে, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া আসিতেছে। রাত্রিও অধিক হইয়াছে—ঘুমেও চোখ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। আশুতোষ সকরুণ ভাবে খাটের সুন্দর শুভ্র নরম বিছানার দিকে তাকাইল। কেমন যেন একটা গভীর অবসাদে তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। এমন মেঘডাকা বাদলা রাত্রি যেসব সুখী লোকের মনকেও ব্যাকুল করিয়া তোলে আশুতোষ তাহাদের দলের নয়। তাহার চোখ দুটি ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উপায় নাই। এক অচেনা অজানা মেয়ে আসিয়া সেই বিছানা দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এক সময় নববধূ নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। তাহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি গহনার মধুর ঝঙ্কার উঠিল। দামী রেশমী কাপড়ের মৃদু খসখসানি শব্দ হইল, ফুলের ও দামী এসেন্সের মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ যেন আরও মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করিল। বাহিরে শ্রাবণ আকাশের মেঘ গুরু গুরু রবে ডাকিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে, নববধূ বেশ অপরূপ ভঙ্গীতে মাথার অবগুণ্ঠনটি নধর শুভ্র ও বহু-অলঙ্কার-শোভিত বাহু দিয়া, কতকটা সরাইয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল। আশুতোষ দেখিল, নববধূর অপরূপ সুন্দর মুখ—দুই দীর্ঘায়ত কালো চক্ষু তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, কি বলিয়া এক প্রাপ্তযৌবনা সুন্দরী অজানা মেয়ের সহিত আলাপ সুরু করিবে। এযাবৎ এই রকম অবস্থায় কোন দিনই পড়িতে হয় নাই। অত্যন্ত বিব্রত হইয়া, আশুতোষ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া—শেষে হঠাৎ উঠিয়া, কুঁজো হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া বলিল, ইয়ে জল-তেষ্টা লেগেছে নাকি ?—নববধূ দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িল—কোন কথা বলিল না। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টিই সর্ব্বদিক রক্ষা করিল। হঠাৎ ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিতেই, আশুতোষ ব্যস্ত হইয়া বলিল, জানালা বন্ধ করে দাও। সব ভিজে গেল যে··· জানালাগুলি বন্ধ হইতেই আশুতোষ বলিল, অনেক রাত হয়েছে—এবার ঘুমিয়ে পড়—এই বলিয়া বধূর দিকে একবার তাকাইয়া, নিজের স্থানে শুইয়া পড়িল। এই প্রথম অনুভব হইল, আজ হইতে খাটের মালিক সে একা নয়। আর একজন আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে। অভ্যাসমত বড় পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া, সেই শ্রাবণ রাত্রির জোলো হাওয়া, আর ঘন বর্ষণের শব্দ শুনিতে শুনিতে আশুতোষ ঘুমাইয়া পড়িল। নববধূ বহুক্ষণ বিছানার একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে বারকয়েক চাহিয়া হাতের অলঙ্কারগুলি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। ঘরের বাহিরে জানালা-দরজার আড়ালে যাহারা আড়ি পাতিয়া বর-বধূর প্রেমালাপ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ক্রমশঃ অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। বহুক্ষণ অতীত হইবার পর যখন কোন কথাবার্ত্তা শোনা গেল না, তখন তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও নিরুৎসাহ হইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে। আকাশে মেঘও ভাল ভাবে জমিয়া উঠে—দুর্যোগও সমান ভাবে চলিতে থাকে। নববধূ অবশেষে বিছানা ছাড়িয়া, বেশভূষা ত্যাগ করিয়া, একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া গিয়া বসিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রেই—এ কি নিদারুণ অভিজ্ঞতা! দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি তাহার জীবনকে যাহার সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিল সে কি পাথরের দেবতা, না হৃদয়হীন অমানুষ। তার এই অস্বাভাবিক আচরণের হেতু কি? কনকলতা বালিকা নহে—ধনী-গৃহে সুখে প্রতিপালিতা তরুণী—রীতিমত গানে, বাজনায়, শিল্পে শিক্ষিতা এবং একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। কোন্ দিক দিয়া সে আশুতোষের অযোগ্যা। রাগে দুঃখে অভিমানে তাহার সমস্ত শরীর যেন জ্বালা করিতে লাগিল।

ধনী-কন্যা বিবাহ করিয়া আশুতোষের কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তাহার শুভানুধ্যায়ীরা বার বার তাহাকে বলিল, আশু, তোমার শ্বশুরমশায় একজন গণ্যমান্য লোক। এখন সময় থাকতে ওঁকে ধরে একটা মোটা রকমের সরকারী চাকরী যোগাড় করে নাও। ওঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন—চাকরির ব্যাপারে তাঁদের হাতও আছে। তাই এমন সুযোগ থাকতে অবহেলা করাটা ঠিক নয়।—আশুতোষ ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে সমস্ত শুনিয়া গেল। কিন্তু হিতৈষীগণের সৎপরামর্শ যে বেশ মন দিয়া শুনিয়াছে, তাহার লক্ষণ দেখা গেল না। নতুবা ঠিক পূর্ব্বের মতই, সেই বেলা করিয়া উঠিয়া মাছ ধরিয়া—তাস পিটাইয়া সময় নষ্ট করিবে কেন? সেই রকম চালাক-চতুর জামাই হইলে নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বার-কয়েক শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিত। মোটা মাহিনার চাকুরির চেষ্টার সহিত শ্বশুর মহাশয়ের বিষয়সম্পত্তির একটা মোটামুটি খবরও লইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু আশুতোষ সেদিক দিয়াও গেল না বা হিতৈষীদের অজস্র সৎপরামর্শের মধ্যে একটিও শুনিল না। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই বলিল, নাঃ ওটা অনর্থক বি-এ পাস করেছে। একেবারে অপদার্থ।—গোকুলদাস পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অস্থির হইয়া বলিলেন, বেশ চাকরি যদি না করে, তবে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি—দোকানপাটই দেখাশুনো করুক। আমি চোখ বুজলে যে অথৈ জলে পড়বে।

কিন্তু সংসারে এমন এক একটি লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সংসারে বাস করিয়াও যেন সংসারী নহে। বিষয়ের উপর আকর্ষণ নাই—সব সময়ে যেন উদাসীন ও সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ। আশুতোষও ঠিক সেই প্রকৃতির। ও যেন পদ্মপাতার উপর জল। জল পড়িলেও যেমন পদ্মপাতা ভিজিয়া যায় না—পাতার উপর শুধু জল টল্ টল্ করে, আর জল পড়িয়া গেলেই দেখা যায়, সেখানে জলের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই, দাগ নাই। আশুতোষের মনও তেমনি ধরণের। বিষয়ের কোন চিহ্ন সেখানে রেখাপাত করিতে পারে না।

কিছু দিন হইতে আশুতোষের একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে পরিবর্ত্তন কাহারও ভাল লাগিল না। আশুতোষ এখন আর ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে বসে না বা অধিক রাত্র পর্য্যন্ত তাস পিটাইয়া সময়

নষ্ট করে না। সেদিন কলিকাতা হইতে মস্ত বড় কাঠের বাক্স ভর্তি দুই বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও কতকগুলি ইংরেজী-বাংলা মোটা মোটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বই আসিয়া পৌঁছিল। আশুতোষ ঔষধগুলি আলমারিতে সাজাইয়া রাখিয়া বইগুলি খুলিয়া দেখিতেছিল। কনকলতা এক সময় ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, এসব কি? স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া আশু উত্তর করিল, দেখতেই ত পাচ্ছ কি।

কনকলতা বলিল, তা পাচ্ছি। কিন্তু কি হবে? বাজারে বুঝি ওষুধের দোকান খুলবে?

হাসিয়া আশু কহিল, প্রায় তাই। তবে বাজারে নয় বাড়ীতেই। আর বিক্রী নয়—এ সব দাতব্য হবে।—কনকলতা দুই ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, পরিষ্কার ক'রে বললে বুঝতে পারি। মাত্র ত একটা পাস করেছি তাই চট্ ক'রে সব বুঝতে পারি নে—

আশুতোষ পুস্তকের পাতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, তা বটে। কিন্তু বুদ্ধি যে তোমার কম, তা মনে হয় না। আর একটা পাসও যে করেছ, তাও বেশ লোককে জানাতে পার বটে। এসব ওষুধ, গাঁয়ের গরীব-দুঃখীদের বিনি পয়সায় দেব। ওদের চিকিৎসা করব। ওদের আমিই ডাক্তার। এতে ঝক্কি কম। শুনেছি হোমিওপ্যাথিক ওষুধে লোক মরে না। যদি ভাল হয়, আমার নাম হবে, অভিজ্ঞতা বাড়বে—শেখা হবে—। একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল, তাই এই সব বই পড়ছি। শীগগিরই আশু-ডাক্তারের শুভাগমন রোগীরা দেখতে পাবে। এতে টাকা আসবে না—তবে রোগীতে যে ডাক্তারের চেম্বার ভর্তি হয়ে যাবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কনকলতা একটু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, বাঃ, ভাল—

হাসিয়া আশু বলিল, আরও আছে। শুধু ডাক্তার নই—রাত্রে আবার মাষ্টার। সন্ধ্যের পর চাষীপাড়ায় নাইট-স্কুল খুলছি—সেখানে পড়াব।

গম্ভীর হইয়া কনকলতা বলিল, আরও ভাল। দিনে ডাক্তার—সন্ধ্যের পর মাষ্টার। আর বাকী রাতটুকু আর একটা কিছু কাজ নিলে ভাল হয় নাকি?

আশুতোষ উত্তর করিল, সেটাও ভেবেছি। সারারাত শুধু শুধু ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করাটা কাজের কথা নয়। কিন্তু ভাবছি কি করি---

আমি বলতে পারি। বলব? সেটা হচ্ছে রাতে না ঘুমিয়ে, নাক টিপে ধ্যান-ধারণা যোগ-তপ এই সব করলে সময় নষ্ট হয় না—এই বলিয়া, কনকলতা দুমদাম শব্দ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া, আশুতোষের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই আবার মিলাইয়া গেল। দিনকয়েক পর হইতেই আশুতোষ ডাক্তারি সুরু করিল। বিনা পয়সায় ঔষধ পাইবার কথা শুনিয়া, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে নানা রকম রোগীর দল আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আশুতোষ রোগ ও রোগীর ভিড় দেখিয়া হকচকিয়া গেল। বহু প্রকার রোগীর হরেক রকম রোগের বর্ণনা শুনিয়া বার বার বইয়ের পাতা ঘাঁটিয়াও কোন কূলকিনারা করিতে পারে না। কিন্তু ঔষধ ত দিতেই হইবে। কাহাকেও বিমুখ করিলে চলিবে না। তাই চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিবার জন্য সে আহারনিদ্রা ভুলিয়া দিনরাত্রি রাশি রাশি ডাক্তারি বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া রহিল—ফলে স্ত্রী এবং সংসারের প্রতি তার ঔদাসীন্য আরও বাড়িয়া চলিল। আশুতোষের ডাক্তারি ও মাষ্টারি দুই-ই সমান তালে চলিতে লাগিল।

এমনি ভাবে এক বৎসর চলিয়া যাইবার পর, তাহাদের সংসারে দুটি ঘটনা ঘটিল। একটি বৃদ্ধ গোকুলদাস নাতির মুখ দেখিলেন। ঘটা করিয়া নাতির অন্নপ্রাশন দিলেন। তাহারই দুই মাস পর হঠাৎ এক দিন গোকুলদাস সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইলে, আত্মীয়-স্বজনরা ও স্বয়ং আশুতোষের শ্বশুরমশায় বলিলেন, "এখন আর এই সব পাগলামি ভাল নয়। বরং ভাল চাকরি যোগাড় করে দিই। তাতে সম্মানও হবে আর সংসারে সচ্ছলতাও বাড়বে।" অন্যে হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ বলিল, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

কনকলতা বলিল, "এ আর ভাবাভাবি কি? বাবা যখন বলছেন, তখন এতে ভাববার কি আছে। এখানে ঐ সব চাষাভূষার ছেলে পড়িয়ে, দু' ফোঁটা ওষুধ দিয়ে কি চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। ব্যবসা দোকান-পাট দেখাও তুমি পারবে না। নিজে না হয় সন্ন্যাসী ফকির হয়েছ—কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তাও ত করতে হবে।" সকলেই কনকলতাকে সমর্থন করিল। আশুতোষের শ্বশুরমশায় ফণিভূষণ বাবু সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বহু তর্ক, যুক্তি, উপদেশ দেওয়া হইল—সে ব্যক্তি নীরব রহিল। হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতে দেখিয়া, আশুতোষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, সকলেই একবাক্যে তাহাকে অপদার্থ ও বোকা বলিয়াই রায় দিল।

পিতার মৃত্যুর পরও আশুতোষের কোন ভাবান্তর বা বিষয়াসক্তির কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। গোকুলদাস বহু কৌশলে, চাষীদের ঠকাইয়া, মিঠেকড়া কথা বলিয়া, ওজনে কম দিয়া, হিসাবে গোলমাল করিয়া যে ভাবে ব্যবসা চালাইতেন, আশুতোষ ঐ সব বিদ্যার কিছুই আয়ত্ত করে নাই। তাই এমন লাভজনক ব্যবসাটি গোকুলদাসের অবর্তমানে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। চাষীরা অন্য এক মহাজনের হাতে পড়িল। দোকানখানির অবস্থাও বিশেষ ভাল নহে। কনকলতা লোক নিযুক্ত করিয়া দোকান খোলা রাখিল বটে, কিন্তু দেখা গেল ক্রমশঃ লোকসান চলিতেছে। কনকলতা বুঝিল—এই ভাবে দোকান চলিতে থাকিলে, লাভ ত দূরের কথা—বরং বিরাট দেনা ঘাড়ে চাপিবে। শেষে সঞ্চিত যা দু' পাঁচ হাজার টাকা আছে, তাহাও শেষ হইয়া যাইবে। তাই শেষ পর্যন্ত দোকান বন্ধ করিতে হইল। আশুতোষ সবই শুনিল, কিন্তু হাঁ না কোন কথাই বলিল না।

বাহিরে বিষয়-সম্পত্তিতে যেমন মারা গোলযোগ দেখা গেল,

অমনি স্বামী-স্ত্রীর ভিতরেও চব্বিশ ঘণ্টা খিটিমিটি সুরু হইল। কনকলতা দিন দিন এমন রুক্ষমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল যে, আশুতোষের মনটা বিষাইয়া উঠিতে লাগিল। ইহাতে পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে যে সামান্য একটু-আধটু যোগসূত্র ছিল, তাহাও যেন পুরাপুরি ভাবে ছিন্ন হইয়া গেল। আশুতোষ এখন সব সময়ই বাহিরের ঘরে থাকে। একমাত্র খাইবার সময় অন্দরে গিয়া খাইয়া আসে—তার পর সমস্ত দিন-রাত্রের মধ্যে অন্দরের সহিত আর কোন সম্বন্ধই থাকে না। রাত্রে বাহিরের ঘরে শুইয়া থাকে। শুধু শিশু পুত্রটির জন্য আশুতোষের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। অনেক রাত্রে হয় ত ছেলে কাঁদিয়া উঠিয়াছে অমনি বিছানা ছাড়িয়া, অন্দরের দরজার নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, কান পাতিয়া থাকে। কান্না না থামিলে, একটু চীৎকার করিয়া বলে, ও ঝি, ছেলেটা যে কেঁদে সারা হ'ল। কোলে নিয়ে ভোলাতে বল না—। সহজাপ্রতা কনকলতা, কোন দিন কথা বলে, কোন দিন কোন কথা না বলিয়াই পুত্রের উদ্দেশে তাড়া দিয়া বলে, হতভাগা ছেলে—রাতটুকু যে চোখ বুজব তারও উপায় নেই। এতই যদি দরদ, তবে ছেলেকে কাছে নিয়ে শুতে হয়।—আশুতোষ কোন উত্তর দেয় না। নীরবে বিছানায় শুইয়া পড়ে। কিন্তু সারা রাত্রের ভিতর দুটি চোখের পাতা বুজিতে পারে না—উৎকর্ণ হইয়া থাকে। কান্নার কোন শব্দ আসিতেছে কিনা—তাহাই শুনিবার চেষ্টা করে।

ভগবান পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। স্ত্রী এবং পুরুষের আকৃতির যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি মানসিক চিন্তাধারারও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বাহিরের পোশাক ও দৈহিক আকৃতির যেমন পার্থক্য, তেমনি এই অস্থি মাংস মেদ মজ্জার অন্তরালে মন বলিয়া যে অদৃশ্য বস্তুটি রহিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোক সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, উত্তম বসন-ভূষণ পরিতে ভালবাসে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভারী ভারী সোনার গহনা পরিয়া, দামী কাপড় পরিয়া থাকিতে ভালবাসে। সাজসজ্জা, অঙ্গরাগ, দিবানিদ্রা, কাল-টক, মান-অভিমান, কলহ-পরচর্চ্চা এগুলি যেমন ভালবাসে বা এই সব উহাদের স্বভাবের অঙ্গ, তেমনই অন্য দিকে স্বামী নামক জীবটির ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, উচ্চ পদ, মোটা সরকারী চাকুরী প্রভৃতি সহ স্বামীর সমস্ত ভালবাসার একচ্ছত্র অধিকারিণী হইয়া সম্রাজ্ঞীর মত থাকিতে ভালবাসে। সেই ভালবাসার ভিতর যেমন কোনরূপ ভাগ-বাঁটোয়ারা সহ্য করিতে পারে না, তেমনি স্বামীর অনাদর অবহেলাও বরদাস্ত করিতে পারে না। আশুতোষের অবহেলা ও অনাদর কনকলতার নিকট পরিষ্কার ধরা পড়িয়াছে। এই অবহেলা ও অনাদরের মাঝে, অন্য কোন রমণীর সংস্রব নাই। চরিত্রের দিক হইতে যে আশুতোষ অত্যন্ত নিষ্কলুষ এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না এবং কনকলতাও তাহা ভালভাবেই জানে। তবুও শিক্ষিতা সুন্দরী ও অভিমানিনী স্ত্রীর প্রতি এই অবহেলা, এই উপেক্ষা—ইহা কনকলতার পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। কনকলতা পুত্রকে কোলে করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু সম্মুখে ত কোন আশার উজ্জ্বল আলো নাই, সবই যেন ছায়াময় —সবই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে নারীর জীবনে স্বামীর ভালবাসা আদর স্নেহ নাই, সে নারীর জীবন ত মরুভূমির মত। কনকলতা পলকহীন নয়নে জ্বালাময়ী দীপ্তি লইয়া তাকাইয়া থাকে। ক্রমশঃ উহা ম্লান হইয়া আসিতে থাকে—তার পর সেই তৃষাতুর জ্বালাময়ী খরদৃষ্টি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে কনকলতার ছোট বোন আশালতার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের সময় কনকলতা গিয়াছিল, কিন্তু সকলের বহু অনুরোধেও আশুতোষ যায় নাই। অজুহাত এই—এই কয়দিনের অনুপস্থিতিতে কোন এক কঠিন রোগীর জীবনসংশয় হইতে পারে। তা ছাড়া তাহার পাঠশালার ছাত্রদের পড়ার ক্ষতি হইবে। ইহাতে কনকলতা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়াছিল, আশুতোষের শ্বশুরবাড়ীর সকলেই বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। আজ কনকলতা ছোট বোনের একখানি পত্র পড়িতেছিল। আশার স্বামী মস্ত বড়লোক—একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। কনকলতা ছোট বোনের সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাস-পূর্ণ পত্রখানি পড়িতে পড়িতে এক-একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। চিঠি পড়া শেষ হইলে তাহার মনে হইল সেও বা কম কিসে? আজ একটু চেষ্টা করিলেই তাহার স্বামীও পদস্থ কর্ম্মচারী হইতে পারে। সেও অমনি ছোট বোনের মত স্বামিগর্ব্বে স্বামীর সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইয়া দশ জনের এক জন হইতে পারে। কনকলতা পত্রখানি হাতে করিয়া, কি মনে ভাবিয়া বাহিরের ঘরে উপস্থিত হইল। ঘরে তখন অন্য কেহ নাই। আশুতোষ একমনে একখানি মোটা ইংরেজী চিকিৎসাশাস্ত্রের বই লইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে পড়িতেছিল। হঠাৎ মৃদু শব্দে চমকাইয়া দেখিল—কনকলতা। কনকলতা হাতের পত্রখানি স্বামীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখ চিঠিখানা—

নিস্পৃহ কণ্ঠে আশুতোষ বলিল, কার চিঠি?

—আশার। দেখ, চিঠিখানা পড়ে দেখ। আশার কত সুখ কত আনন্দ। আর তুমি কি চিরকাল এই পাড়াগাঁয়ে এমনিভাবে পড়ে থাকবে। তোমার কি জীবনে কোন উচ্চ আশা নেই। মানুষের মত বাঁচতে চাও না? তুমি কি?

হাসিয়া আশুতোষ বলিল, মানুষের মত বাঁচবার চেষ্টাই তো করছি। মোটা চাকরি করলেই কি মানুষের মত বাঁচা হয়? আমার তা মনে হয় না—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কনকলতা বলিল, তবে চিরকাল এইখানে এই সব চাষাদের ছোটলোকদের নিয়ে তুমি থাক। এই বুঝি তোমার উচ্চ আশা—এই বুঝি মানুষের মত বাঁচার পথ?—আশুতোষ শান্তভাবে বলিল—হাঁ। এতদিন বুঝিনি, এখন বুঝেছি। এদের মানুষ করতে না পারলে, কেউ বড় হতে পারবে না। কোটি কোটি অজ্ঞ মূর্খ লোকের চাপে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। কনকলতা তীক্ষ্ণ ও কঠিন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া চলিয়া গেল।

দিনকতক পরে আশুতোষের কিছু টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অনেকগুলি দরকারী ঔষধ ফুরাইয়াছে—আর কিছু কিছু চিকিৎসার বইও কিনিতে হইবে। আশুতোষের সঙ্কল্প ছিল, গ্রামে একটি ছোটখাটো হাসপাতাল গড়িয়া তুলিবে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে রাখিয়া, তাহার অধীনে নূতন নূতন ছাত্র তৈয়ারি করিবে। কিন্তু সঙ্কল্প মনেই থাকিয়া যায়। সে টাকা কোথায়? নিজের হাত শূন্য। কিন্তু উপস্থিত ঔষধ না কিনিলেই নয়। কাহারও নিকট হইতে টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। মাত্র জমি-জমা হইতে সংসারের আয় যাহা সামান্য হয়, তাহা কনকলতার হাতেই আসে। ঝানু সংসারী তাহার শ্বশুর মহাশয় সে ব্যবস্থাই পাকাপাকি করিয়া দিয়াছেন। স্বামীকর্তৃক উপেক্ষিতা কনকলতা দু'হাতে বিষয় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় আশুতোষের একমাত্র উপায় স্ত্রীর নিকট হাত পাতা। কিন্তু কনক কি টাকা দিবে? একেই তো সে রাগিয়া শতখান হইয়া আছে, তাহার উপর টাকা চাহিলে সে রাগ কোথায় গিয়া যে দাঁড়াইবে তাহা ভগবানই জানেন। তবুও আশুতোষ একবার স্ত্রীর নিকট হাত পাতিবার মনস্থ করিল।

সেদিন দুপুরবেলা সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ—কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ তপ্ত বাতাস বহিতেছিল। আকাশ পরিষ্কার—রৌদ্রের আলোয় চরাচর উজ্জ্বল ও ঝকমক করিতেছে। জানালার নিকটস্থ আমগাছটির ডালপাতাগুলি দুলিতেছে—আম্রশাখান্তরালে বসিয়া একজোড়া ঘুঘুপাখী বেশ উদাস স্বরে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে। জনহীন তরুচ্ছায়া-নিমগ্ন মধ্যাহ্নের এই পল্লব-মর্ম্মর ও ঘুঘুপাখীর উদাস একটানা সুরের ভিতর যে মধুরতা ও কোমলতা রহিয়াছে, তাহা জীবজগতেও সঞ্চারিত হইয়া, সবাইকে যেন এক মধুর অলসতায় সম্মোহিত করিয়া দিয়াছিল—মধ্যাহ্নের এই অপূর্ব্ব স্তব্ধতাপূর্ণ শান্ত রূপখানি চরাচর ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছিল। এমনি সময়ে আশুতোষ আজ কয় মাস পর উপরে আপন শয়নঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কনকলতা তখন ঘুমাইতেছিল। নিবিড় কুঞ্চিত কেশরাজি শুভ্র বালিশের উপর হইতে মাদুরের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে। গভীর নিশ্বাসে কনকলতার বক্ষবাস দুলিতেছে কাঁপিতেছে। পাশে খোকা ঘুমাইতেছে। আশুতোষ একটু অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিল, এখন ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। অবশ্য এমন সময়ে স্ত্রীর শয়নকক্ষে ঢোকা স্বামীর পক্ষে নিশ্চয়ই নিন্দনীয় বা নিষিদ্ধ নহে, বরং রসিকজনের নিকট নারীরূপের ঘুমন্ত শ্রী নাকি জাগ্রত অবস্থা হইতে মধুরতর। কিন্তু আশুতোষের নিকট স্ত্রীর জাগ্রত বা ঘুমন্ত কোন সৌন্দর্য্যেরই আকর্ষণ নাই—তার প্রয়োজন সেবাব্রত উদযাপনের জন্য কিছু অর্থের। বোধ হয় একটুখানি পায়ের শব্দ হইয়াছিল, তাহাতেই কনকলতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সুপ্ত ইন্দ্রিয়সকল কার্য্যকরী হইয়া উঠে না। কিছু সময় জড়তা আলস্য ও নিদ্রার মোহ কাটিতেই চলিয়া গেল—দ্বিতীয় বার ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া, কনকলতা গায়ের মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল—কি? কিছু দরকার আছে নাকি? আশুতোষ বলিল, দরকার ছিল। তবে তাড়া নেই। তুমি ঘুমুচ্ছ দেখে চলে যাচ্ছিলাম—আচ্ছা পরেই হবে'খন। আশ্চর্য্য হইয়া কনকলতা বলিল, পরে কেন? কি দরকার বল না। আশুতোষ সংক্ষেপে যাহা বলিল, তাহাতে কনকলতার সুন্দর মুখখানি কঠিন হইয়া গেল—কোমল দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। কনকলতা বলিল—টাকা? আমি কোথায় টাকা পাব? না—এক পয়সাও নেই আমার কাছে।—আশুতোষ নীরবেই ফিরিয়া গেল।

কিন্তু আশুতোষ নিরুৎসাহ হইল না। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ যে গোটাকয় আংটি, ঘড়ি, সোনার বোতাম পাইয়াছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া দেওয়াতে আপাততঃ ঔষধ কেনার সমস্যা ঘুচিল। এ সংবাদ কিন্তু কনকলতার নিকট গোপন রহিল না। রোষে, ক্ষোভে, কোন কথা না বলিয়া সে পিতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। তাহার মনে হইল, এইভাবে আর কিছুদিন চলিলে, ভবিষ্যতে পুত্রের হাত ধরিয়া তাহাকে গাছতলায় বসিতে হইবে। ঔষধ ক্রয় করিবার ব্যাপার লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য যেন আরও জমাট বাঁধিয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে রচিত হইল এক দুর্লঙ্ঘ্য, দুস্তর ব্যবধান। কনকলতা স্বামীর মন বুঝিবার চেষ্টা করিল না, সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া, অভিমানে ক্রোধে আশুতোষের সহিত একরূপ সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া একই বাড়ীতে পৃথক হইয়া বাস করিতে লাগিল। কনকলতা পুত্র সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক রহিল। পারতপক্ষে স্বামীর নিকট ছেলেকে যাইতে দিত না। আর কেহ লইয়া গেলে বিরক্ত হইয়া বলিত—"কেন ছেলেকে আবার আদর করা কেন।" কিন্তু আশুতোষ সমস্ত দিনরাতের মধ্যে কিছুক্ষণ পুত্রকে কাছে না পাইলে থাকিতে পারে না। তাই কনকলতার অলক্ষিতে, বাড়ীর ঝিকে নিভৃতে বলিয়া, ছেলেকে বাহিরের ঘরে লইয়া যাইয়া, কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বলে, "বেটা বড় হয়ে মস্ত ডাক্তার হবে। লোকের দুঃখ ঘোচাবে। ছেলে কচি কচি হাত পা নাড়িয়া, আধো আধো স্বরে অস্ফুট কাকলি করিতে থাকে। আশুতোষ ছেলের নরম তুলতুলে মুখখানি মুখের উপর অনেকক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া, আদরে ও চুম্বনে চুম্বনে ভাসাইয়া দেয়।

কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে অর্থ ছাড়া চলে না। আশুতোষেরও টাকাকড়ি প্রয়োজন হয় কিন্তু প্রয়োজন হইলেই তো, টাকাকড়ি উড়িয়া আসিবে না। পূর্ব্বে গোকুলদাস ছিলেন, তখন আশুতোষ একদিনের জন্যও অর্থের অভাব টের পায় নাই। কিন্তু এখন সে পথ রুদ্ধ। পিতার সঞ্চিত অর্থগুলি তাহার হাতে আসে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে গোকুলদাস বুঝিয়াছিলেন, পুত্র তাঁহার বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই সমুদয় সঞ্চিত অর্থ পুত্রবধূর হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। সম্পত্তির আয়ে সংসার চলে, কিন্তু তাহাতে তাহার হাত নাই। স্ত্রীর নিকট হাত পাতিয়া যে

আঘাত আশুতোষ পাইয়াছে, তারপর আবার সেখানে অর্থের জন্য হাত পাতিতে লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। কাজেই অর্থের অভাবে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিল। যে বিরাট কাজ সে হাতে লইয়াছে অর্থের অভাবে তা পণ্ড হইতে বসিয়াছে। আশুতোষ তাই নীরবে ভাবিতে থাকে। এদিকে নিজের জামা ছিঁড়িয়াছে, ছাতা ভাঙ্গিয়াছে, জুতাজোড়ায় তালির উপর তালি পড়ায় পূর্ব্বের আসল দেহ হারাইয়া যেন শত চামড়ার নামাবলী গায়ে জড়াইয়াছে। ইহাতেও আশুতোষের দৃকপাত নাই—নিজের অভাব পূরণের চেষ্টা নাই। মানবসমাজকে সুস্থ সবল সুন্দর করিবার স্বপ্নে সে বিভোর। আত্মীয়-স্বজন তাহাকে এড়াইয়া চলে, স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে সে বঞ্চিত। কোন্ দুর্লভ বস্তুর আশায় নিজেকে সে এমন ভাবে রিক্ত করিয়া উজাড় করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। পাড়ায় বারোয়ারীতলায় মহা ধুমধামে দুর্গোৎসব হইবে। বাজী, বাজনা, লোকজন খাওয়ানো ও যাত্রাগান হইবে। সেই আসন্ন উৎসবের জন্য গ্রামবাসীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ ষষ্ঠী। পূজার ছুটি হইয়া গিয়াছে। দূরদেশ হইতে প্রবাসীরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়দের জন্য কাপড়-চোপড় কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। ছেলেরা নূতন কাপড় জামা পরিয়া, হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে। পূজাবাড়ীতে মধুর সুরে সানাইয়ে আগমনীর সুর বাজিতেছে। আশুতোষের মনে পড়িল, ছেলের জন্য ত পূজার জামা আনা হয় নাই। কিন্তু সে যে একেবারে ফতুর! উপায় কি? ভাবিতে ভাবিতে একটা মতলব তাহার মাথায় আসিল। সে দামী ব্যাগের মধ্যে কিছু ঔষধ ভর্ত্তি করিয়া ছয় মাইল দূরবর্ত্তী শহরের পথে রওনা হইল এবং সেখানে এক ডাক্তারের নিকট নামমাত্র মূল্যে সেটি বিক্রী করিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। গ্রামে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছিবার জন্য, আশুতোষ গঙ্গার ধার দিয়া ফিরিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—আকাশ পরিষ্কার। শরৎকালের জ্যোৎস্নায় সমস্ত চরাচর ভরিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে, গঙ্গা, গঙ্গা-তীর, ওপারের বালুচর, বাবলাবন, সব যেন শুভ্র গলিত রজতধারায় ঝকমক্ করিতেছে। এই মায়াময় শুভ্র জ্যোৎস্না, মর্ত্ত্যের সমস্ত বন্ধনকে যেন ছিন্ন করিয়া দিয়া আকাশ ও পৃথিবীকে একত্রে মিশাইয়া দিয়াছে। দূর গ্রাম হইতে ঘণ্টা ও বাদ্যের শব্দ স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। সম্মুখে কল কল করিয়া গঙ্গার জল প্রবাহিত হইতেছে, উপরে সুনীল আকাশে চন্দ্রদেব তেমনই শুভ্র হাসি-মুখ লইয়া যেন অনন্ত সুধাসমুদ্রে হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আশুতোষ দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। বাজারে দোকানে দোকানে ক্রেতাদের ভিড়—আলো জ্বলিতেছে—লোকে হাসিতেছে—ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। আশুতোষ একটি জামা, টুপী আর প্যান্ট কিনিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিল। বাহিরের ঘরে টিম টিম করিয়া আলো জ্বলিতেছে। আশুতোষ পুরাতন চাকরটিকে ডাকিল। আজ সমস্ত দিন একরূপ আহার হয় নাই—স্নান হয় নাই। মন স্বভাবতঃ একটু বিশ্রাম চায়। কিন্তু সে-দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, পুত্রের কচি হাতে বহু আয়াসে সংগৃহীত এই উপহার দিবার জন্য মন লালায়িত হইয়া উঠিল। চাকরটি আসিতেই আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিল—কি রে সব নিঝুম কেন? কোথায় সব। চাকরটি বলিল, ঝি বাড়ী গেছে। আর বউমা, খোকাবাবুকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছেন।

আশুতোষ বিস্ময়ে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাপের বাড়ী—কখন রে?

—দুপুরের গাড়ীতে বউমার ভাই এসেছিলেন। তার পর গাড়ী ঠিক করে দিলাম। আমি বউমাকে কত বারণ করলাম, কথায় কানই দিলেন না। বললাম, বাবু আসুন—তার পর না হয় কাল যাবেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

আশুতোষ ধীরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উপরে কনকলতার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। খাটের উপর খোকার প্যান্ট কোট টুপী রাখিয়া দিয়া, ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। জানালা দিয়া সিন্ সিন্ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। শুভ্র জ্যোৎস্না ও শিউলি ফুলের সুন্দর সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। পূজাবাড়ী হইতে সানাই এবং ঢোলের বাদ্য শোনা যাইতেছে। আজ ষষ্ঠী। আজ অতি দরিদ্র—নিতান্ত অক্ষম লোকও নিজ নিজ সন্তানের হাতে, প্রিয়জনের হাতে, যাহার যতটুকু সাধ্য তাই দিয়া তৃপ্তি পায়—আনন্দ লাভ করে। ঘরের ভিতর আলনায় কনকলতার ব্যবহার্য্য কাপড় জামা সাজান রহিয়াছে। ছোট্ট টেবিলটির উপর আয়না, চিরুণী, সিঁদুরের কৌটা, চুল-বাঁধা-ফিতা ঠিক পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। বড় ট্রাঙ্কটির উপর খোকার কতকগুলি কাঁথা, অয়েল-ক্লথ, দুটি ছোট বালিশ রহিয়াছে। টেবিল-ক্লথটিতে সিঁদুরের দাগ কাজলের দাগ, দেখা যাইতেছে। খোকার ছোট দুধ খাওয়ার বাটি, একটি ছোট গেলাস, খাটের তলায় উপুড় করা রহিয়াছে। আশুতোষ ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত জিনিষ দেখিয়া খাটের উপর বসিল। বাহিরে আকাশে, বাতাসে, উৎসবের সমারোহ দেখা দিয়াছে। অকৃপণ ভাবে জ্যোৎস্না-রাশি আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে—অজস্র স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাস, ফুলের সুগন্ধ লইয়া জলে স্থলে, লতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষ আজ সবকিছু ভুলিয়া, সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, বিচ্ছেদ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আসন্ন উৎসবের সমারোহের মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে। শুধু আশুতোষ দূর হইতে এই অফুরন্ত আনন্দ-প্রবাহের পানে নীরব নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছে। সম্মুখে যে অনন্ত সুধাসমুদ্র বহিয়া যাইতেছে তাহা হইতে এক গণ্ডুষ পান করিবারও অধিকার তাহার নাই। স্ত্রী পুত্র থাকা সত্ত্বেও সে যে কত একাকী একথা আজ এই শুভদিনে শূন্যগৃহে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আশুতোষের অন্তর হাহাকার

করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার জীবন ব্যর্থ, সংসার উদ্দেশ্যহীন, স্ত্রী পুত্র কাহারও উপর তার কোন দাবি নাই। এই গৃহ যেন পাখীহারা, শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতই। আজ বহুদিন পরে, আশুতোষের হৃদয় তোলপাড় করিয়া দিয়া, এক ঝলক উষ্ণ অশ্রু তাহার দুই চোখের পাশ দিয়া ঝরিয়া, খোকার জন্য সদ্যক্রীত নূতন প্যাণ্ট, জামা, সিল্কের টুপীর উপর টপ টপ করিয়া পড়িতে লাগিল।

মহাভারতের সৈনিক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গেল হেথা হতে সৈনিক এক—কুরুক্ষেত্র-রণে।
বাঙালী সে, তারে ডাক দিল বীর গণি'—
পাণ্ডবদের প্রথম অক্ষৌহিণী,
নমি' অভিজিৎ নক্ষত্রকে—গেল অনুচর সনে।

২

স্থান হ'ল তার সব্যসাচীর শিবিরের অতি কাছে,
রণসাজে প্রতি ভোরে শঙ্খের ডাকে
সামরিক অভিবাদন দিয়েছে তাঁকে
তাঁর সম বীর কোনো যুগে, আর কোনো দেশে নাহি আছে।

৩

কি সৌভাগ্য! নিত্য করেছে শ্রীকৃষ্ণে দর্শন—
শ্যাম তনু আহা কিবা লাবণ্যময়,
না দেখেও দেখা, বুকে আঁকা পরিচয়,
করেছিল, মনে ভালবেসে তাঁরে সর্ব্ব সমর্পণ।

বীতরাগ নিজ প্রশংসা-গানে, বঙ্গের সেই বীর,
দুর্য্যোধনের উরুতে মেরেছে বাণ,
দুঃশাসনকে করিয়াছে হতমান,
করেছে সমরে নিশিত সায়কে শকুনিকে অস্থির।

ভীষ্ম দ্রোণের পাদবন্দনা করেছে তাহার শর,
অর্জ্জুন বীরে কবে শ্রীকৃষ্ণ ভুলে,
ফুল ও তুলসী দিল আহা পাদমূলে,
স্মরিত তাঁহার নিষেধ-বাণীও হাস্য সে মনোহর।

৬

প্রতি সন্ধ্যায় বাঙলার গান শুনাইত সেনাদলে,
আপনার মনে করিত সে গুন্ গুন,
গিয়াছেন শুনি' হাসি কৃষ্ণার্জ্জুন,
বংশীধারীকে বাঁশী শুনায়েছে অশেষ পুণ্যফলে।

৭

সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ তরে করিয়াছে সংগ্রাম।
খড়্গ হানিয়া জয়দ্রথের মাথে
মূচ্ছিত হয়ে পড়ে তার পদাঘাতে,
দয়াবতী কে যে সরালো তাহারে? জানে না তাঁহার নাম।

৮

বাঙালীর ছেলে জীবন ত্যজেছে দ্বৈপায়নের তীরে।
ঘেরিয়া তাহারে ছিল সাথী সেনাদল,
পঞ্চ ভ্রাতার চক্ষে দেখেছে জল,
পার্থ-সারথি মূরতি হেরিয়া নয়ন মুদেছে ধীরে।

৯

চিনিত তাহাকে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব কৌরব।
লভেছিল রণে সুকৌশলী সে বীর
প্রশংসমান দৃষ্টি গাণ্ডীবীর,
অখ্যাত হোক, তবু যুগ জাতি দেশের সে গৌরব

১০

তার সংবাদ পাবে নাকো কেউ খুঁজি শত পাঁজিপুঁথি—
উল্লেখ নাই বেদব্যাসের শ্লোকে,
সঞ্জয়ের সে পড়েনি দিব্য চোখে,
তবুও সত্য—'পঞ্চকোটের' এই যে জনশ্রুতি।

বিভিন্ন দেশে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মৌলিক অধিকার

নারী পুরুষের মতই যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অধিকারের ন্যায়তঃ দাবি করিতে পারে। অনেক রাষ্ট্রে এই অধিকার স্বীকৃতি পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম মূলনীতিও হইতেছে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার।

জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় 'নারী-পুরুষের সম অধিকার' এই বিশ্বাস বিবৃত হইয়াছে এবং ইহার প্রথম ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যই হইতেছে স্ত্রী-পুরুষ জাতি, ভাষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে যাহাতে মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার কায়েম হয় সেই জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উৎসাহের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এই আদর্শ কার্য্যকর করিবার জন্য জাতিসমূহের কর্মপদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান করা।

জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর সার্ব্বজনীন মানবাধিকারের সনদ গ্রহণপূর্ব্বক ঘোষণা করে যে, 'মানুষমাত্রেই গৌরবে, সমতায় এবং অধিকারে সমপর্য্যায়ভুক্ত—এই মহান্ আদর্শের স্বীকৃতিই জগতে স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির ভিত্তি।' শুধু তাহাই নহে, "মানুষমাত্রেই স্বাধীন এবং সমান হইয়া জন্মলাভ করিয়াছে এবং মর্য্যাদা ও অধিকারে প্রত্যেক মানুষই সমান।"

কিন্তু এই মহান্ আদর্শ জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। কোন কোন রাষ্ট্রে এখন পর্য্যন্ত নারী পুরুষের সমান অধিকার নাই। ১৯৪৬ সনের ১১শে নবেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এইরূপ বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, নারী যাহাতে পুরুষের সমান অধিকার পায় সেরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রকে সুপারিশ করে। ইহার পরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 'নারীর পদমর্য্যাদা' সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। কি উপায়ে নারীর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসম্পর্কীয় বিষয়ে অধিকার রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে সেই বিষয়ে কমিশন অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং এ পর্য্যন্ত নারীর ভোটাধিকার ও রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচনের অধিকার সম্পর্কে একাত্তরটি রাষ্ট্রের সরকারী, বহু বেসরকারী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জানিতে পারা গিয়াছে যে, পঞ্চাশটি স্বাধীন রাষ্ট্রে নারী পুরুষের মতই ভোটদানে ও রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারিণী। আটটি রাষ্ট্রে নারীর অধিকার আংশিক মাত্র এবং তেরটি রাষ্ট্রে নারী ভোটদান কিংবা রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচনের অধিকারিণী নহে।

বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবল আন্দোলন দ্বারা নারীসমাজ এই সকল কুসংস্কার, কায়েমী প্রথা ও রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। এই সংগ্রাম সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এবং ক্রমে ইহা শক্তি সঞ্চয় করিয়া ও বাড়িয়া চলিয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫) নারী যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহার দরুন কতকগুলি দেশে নারী ভোটাধিকার ও রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুই যুদ্ধকালীন সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯১৮-৩৯ মধ্যে) নারীর অধিকারের সম্প্রসারণ কতকটা হইলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে হয় নাই।

১৯১৪ সনের পূর্ব্বে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে কেবলমাত্র তিনটি দেশে নারী ভোটদানের এবং রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারিণী ছিল—এই তিনটি দেশ হইতেছে নিউজিল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড এবং নরওয়ে।

নিউজিল্যাণ্ডে পুরুষমাত্রেই ভোটাধিকার লাভ করে ১৮৮৯ সনে এবং ইহার মাত্র চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৩ সনে সেখানকার নারীও এই অধিকার লাভ করে। মাওয়ারী নারীও এই অধিকার পায় তবে তাহার পক্ষে এই অধিকার সম্পত্তির মালিক হইলেই শুধু কার্য্যকর হইত। মাওয়ারী নারীর পক্ষে এই বিশেষ ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান, তবে ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ সংরক্ষিত মাওয়ারী আসনের নির্ব্বাচনে মাওয়ারী নারীর ভোটদানে ও নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা বা সর্ত্ত নাই। বয়স একুশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেই নিউজিল্যাণ্ডে যে-কোন নারী ভোটদানের অধিকারিণী হয় এবং শাসন, ব্যবস্থাপক সভা ও বিচার-বিভাগের যে-কোন পদে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইবার অধিকার অর্জ্জন করে।

ইহার তের বৎসর পরে (১৯০৬) ফিনল্যাণ্ডে (ফিনল্যাণ্ড তখন জারের অধীন রুশ-সাম্রাজ্যের প্রদেশ মাত্র) ২৪ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্কা নারীকে পুরুষের সমপর্য্যায়ে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই বিধান ১৯৪৪ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে এবং ঐ বৎসর হইতে ভোটাধিকারের বয়স কমাইয়া ২১ বৎসর করা হয়। বর্ত্তমানে ফিনল্যাণ্ডে সামাজিক দপ্তরের মন্ত্রিত্বভার একজন নারীর উপর ন্যস্ত।

নরওয়ে দেশে ১৯১৩ সনে নারী ভোটাধিকার লাভ করে। পরে ১৯২৮ সনে উক্ত অধিকার ঐ দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার নানা উপ-রাষ্ট্রে ১৯১৪ সনের পূর্ব্বেই নারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়—দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়া ১৮৯৪ সনে, পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া ১৮৯৯ সনে, নিউ সাউথওয়েল্‌স্ ১৯০২ সনে, টাসমেনিয়া ১৯০৩ সনে, কুইনসল্যাণ্ড ১৯০৫ সনে এবং ভিক্টোরিয়া ১৯০৮ সনে এই অধিকার প্রদান করে। ১৯১৮ সনে কমন্‌ওয়েলথ্ সরকার এই অধিকার জাতীয় ভিত্তিতে সকল উপরাষ্ট্রে সম্প্রসারিত করেন।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮

এই সময়ের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে বিশেষভাবে নারীর অধিকার বিবৃত হয়।

১৯০৬ সন হইতে ইংলণ্ডে সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই আন্দোলনে পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, হোর্ডিং এমন কি অনশন ধর্ম্মঘট সবকিছু ব্যবহৃত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪৮ সনে নারীর অধিকার সম্পর্কে নিউ-ইয়র্কে, সেনেকাফলস্ নামক স্থানে এক সম্মেলন হয়। তখন হইতেই সেদেশে নারী আন্দোলন এবং ইংলণ্ডের অনুরূপ প্রচার চলিতে থাকে। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা হওয়ার কোটি কোটি নারী ভোটাধিকার লাভ করে।

ডেনমার্কে নারী ১৯১৫ সনে ভোটাধিকার লাভ করে, সেই সময় আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীন ছিল, সেজন্য সেদেশেও নারী ভোটাধিকারিণী হয়। ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ডেনমার্কের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন একজন নারী। ১৯৪৪ সনে যখন আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখনও এই নূতন সাধারণতন্ত্রে নারীর পূর্ব্বের অধিকারই বজায় থাকে।

১৯১৭ সনের রুশ-বিপ্লবের পর অস্থায়ী সরকার রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িবার জন্য যে জাতীয় পরিষদ গঠনের নির্দ্দেশ দেন তাহাতে আইনতঃ নারীর ভোট দিবার ও নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯১৮ সনের জুলাই মাসে পঞ্চম নিখিল-রুশীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় তাহাতে ১৮ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্কা নারীকে ভোট দিবার এবং যে-কোন রাষ্ট্রীয় পদে পুরুষের মতই নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২৩ সনে যে নূতন গঠনতন্ত্র কায়েম হয় তাহাতে এবং ১৯২৫ সনের সংশোধিত গঠনতন্ত্রে সাম্যবাদী রাশিয়ার নারীর অধিকার কোনরূপেই ক্ষুণ্ন হয় নাই। এই গঠনতন্ত্রই সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হয়। সোভিয়েটের ১৯২৩ সনের গঠনতন্ত্রে 'স্বাধীন জাতিসমূহের সম-অধিকারের ভিত্তিতে মিলনের' কথা উল্লিখিত আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র অবশ্য ভোটাধিকার সম্পর্কে পৃথক আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। ১৯৩৬ সনের সোভিয়েট গঠনতন্ত্র সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সর্ব্ব-বিষয়ে সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সনের ৩১ মে তারিখের সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সনের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট পরিষদের ১৩৩৯ জন সদস্যের (ডেপুটি) মধ্যে ২৭৭ জন নারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কানাডায় ১৯১৭ সনের যুদ্ধকালীন নির্ব্বাচন আইনে মহাযুদ্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট-আত্মীয়াগণকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ণ ভোটাধিকার কানাডায় ১৯২০ সনে জাতীয় নির্ব্বাচনের সময় প্রবর্ত্তন করা হয় এবং ঐ বৎসর হইতেই নারীগণ ভোটাধিকারিণী হইয়াছে। প্রদেশগুলির মধ্যে আলবার্টা, সাসকেট-চুয়ান এবং ম্যানিটোবা ১৯১৬ সনে নারীকে পূর্ণ ভোটাধিকার প্রদান করে; নোভাস্কোটিয়ায় ১৯১৮, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ওন্টারিও এবং নিউ ব্রান্সউইকে ১৯১৯ এবং প্রিন্স এডওয়ার্ড আয়র্লণ্ডে ১৯২০ সনে নারী ভোটাধিকার পায়। কুইবেক প্রদেশে অবশ্য এই অধিকার ইহার বহু পরে—১৯৪০ সনের প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের সময় দেওয়া হয়।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে ১৮৫৫ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান ছিল। এখানে আইন দ্বারা ১৯২৫ সনে নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সনে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসন লোপ করিয়া ইহাকে খাস ব্রিটেনের অধীন করা হয়। ১৯৪৮ সনে অবশ্য গণভোট গ্রহণের ফলে ইহা কানাডার একটি প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নারীর ১৯২৫ সন হইতেই যে ভোটাধিকার আছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ইংলণ্ডে ১৯১৮ সনে আইন দ্বারা ৩০ ও তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্কা নারীকে ভোটদানের এবং সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২৮ সনের আইনে ২১ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্কা ইংরেজ-নারী ভোটাধিকার লাভ করে এবং পুরুষের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার পায়। ১৯১৮ সনে আয়র্লণ্ডেও ৩০ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্কা নারী ভোটাধিকারিণী হয়। ১৯২২ সনে ঐ দেশ যখন স্বাধীন হয় তখনও নারীর এই অধিকার বজায় থাকে এবং ইহার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৩ সনে জাতীয় পরিষদে ও স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। আয়র্লণ্ডে ১৯৩৭ সনের নূতন গঠনতন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার আবার স্বীকৃত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে ১৯৪৯ সনে ঐ দেশ যখন গণতন্ত্রে (রিপাবলিক) পরিণত হয়, তখনও নারীর অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে।

আমেরিকায় অনেক পূর্ব্বে নারী-আন্দোলন সুরু হইয়া থাকিলেও সেখানে ১৯২০ সনের পূর্ব্বে নারী জাতীয় নির্ব্বাচনে (ফেডারেল) ভোটের অধিকার পায় নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রের উনবিংশ সংশোধনে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে-কোন ষ্টেট বা রাজ্যই স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ভোটাধিকারের কোন তারতম্য করিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৮৬৯ সনে খাস ফেডারেল এলাকা ওয়িং-এ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ভোটাধিকার ছিল। কোলোরেডো, উটা এবং ইডেহো রাজ্য ১৮৯০ সনে নারীকে ভোটাধিকার দেয় এবং ১৯১৮ সনের মধ্যে ৩০টি রাজ্যে নারী ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৯২০ সনে সামগ্রিক ভাবে জাতীয় ভিত্তিতে নারী ভোটদানের অধিকার লাভ করে। সেই বৎসর হইতেই যে-কোন নির্ব্বাচন-লভ্য পদে নারীর অধিকার কায়েম হইয়াছে—কেবল জাতীয় কংগ্রেস নহে, রাজ্যের গবর্ণরের পদেও। একজন নারী রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভায় শ্রমিক-সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিন জন বিদেশের কূটনৈতিক মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন।

১৯১৮ হইতে ১৯৪৫

জার্ম্মানীতে বিশেষ সরকারী ঘোষণা দ্বারা ১৯১৮ সনে নারীকে ভোটের এবং যে-কোন পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। ওয়েমার গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় ইহা কায়েমী হয়। যখন নাৎসীদল ক্ষমতা লাভ করিল (১৯৩৩ সনে) তখন তাহাদের এই অধিকার হরণ

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীদের অভিযান

ডারবানের বেরিয়া স্টেশনে বে-আইনী আইন অমান্যকারী আফ্রিকাবাসী এবং ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল
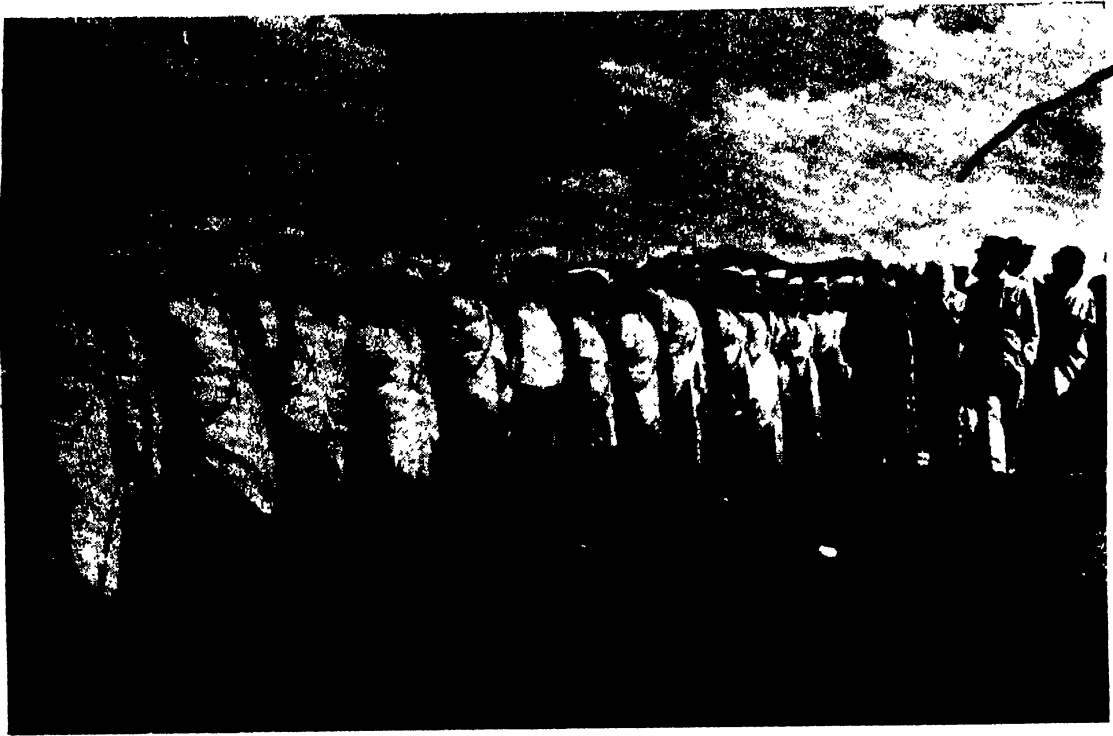
ইম্‌ফলে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ কর্তৃক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রুর সংবর্দ্ধনা
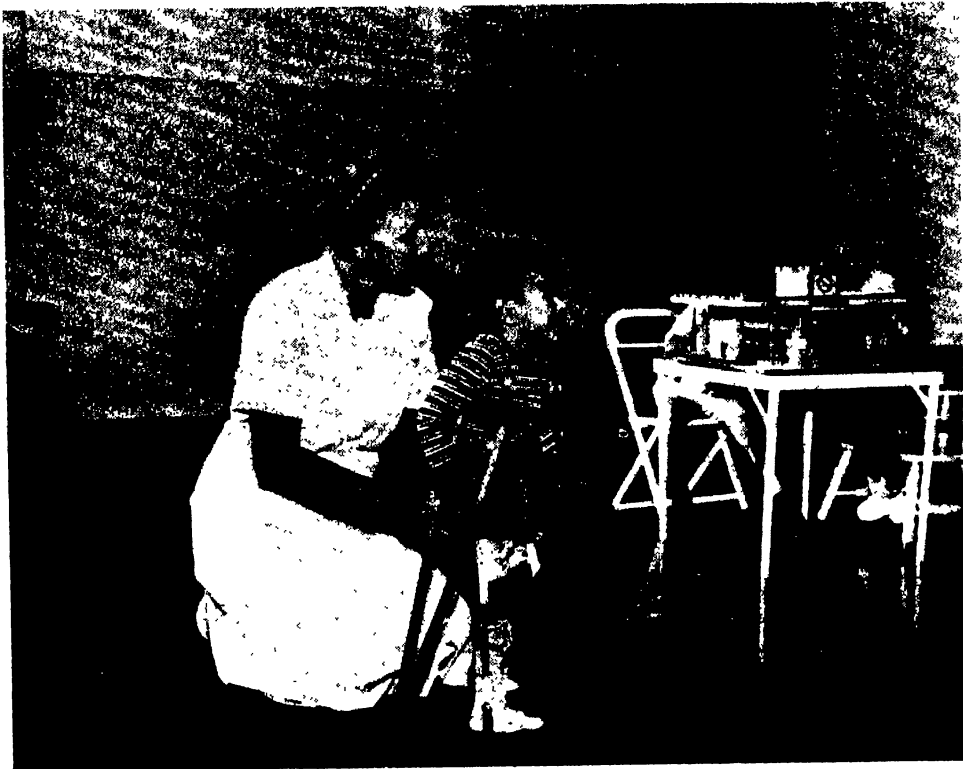
আমেরিকার টাকসন, আরিজোনা বিকলাঙ্গ শিশু-চিকিৎসালয়ে একটি পঙ্গু বালকের চলাফেরা শিক্ষা

করা হইল। বর্ত্তমানে অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীতে এবং ১৯৪৯ সনের বন শাসনতন্ত্রের বিধানমতে পুরুষের মতই নারী সকল অধিকার ভোগ করিতেছে।

১৯১৯ সনে অষ্ট্রিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্, লুক্সেমবুর্গ, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়ায় ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে রাষ্ট্রতন্ত্র-গঠন-পরিষদের বিধানমতে নারীকে পুরুষের ন্যায় নির্ব্বাচন করিবার ও সকল পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২০ সনে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় তাহাতে নারীর অধিকার পুনরায় স্বীকৃত হইয়াছে।

নেদারল্যাণ্ডসে আইন দ্বারা ১৯১৫ সন হইতেই নারীকে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু ১৯১৯ সনের পূর্ব্বে নারীর ভোটাধিকার হয় নাই। বর্ত্তমানে নারী সেখানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করিতেছে এবং সে যে-কোন শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত হইবার অধিকারিণী।

লুক্সেমবুর্গে ১৯১৮ সনে নারী ভোটদানের অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু আইনসভায় নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে ১৯১৯ সনে। বর্ত্তমানেও বিচার ও শাসন বিভাগীয় কয়েকটি পদে নারীর নির্ব্বাচিত হইবার পক্ষে বাধা রহিয়াছে।

চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সনে, পরবর্ত্তী বৎসরে মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচনে নারী ভোট দিতে পারিয়াছিল। ১৯২০ সনে যে রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় তাহাতে এরূপ বিধান আছে—"জন্মগত, পেশাগত এবং স্ত্রী ও পুরুষের বিচারে কেহ বিশেষ অধিকার দাবি করিতে পারিবে না"। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে 'জাতীয় মহাসভার (পার্লামেণ্ট) সংগঠনে ভোট দিবার ও নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক চেক্ নাগরিকের আছে।'

পোল্যাণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় ১৯১৮ সনে এবং ১৯১৯ সনে যে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনকারী পরিষদ নির্ব্বাচিত হয় তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই ভোট দেয়। ১৯২১ সনে যে নূতন গঠনতন্ত্র কায়েম হয় তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ২১ ও তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্ক সকলেই ভোট দিবার অধিকারী এবং ২৫ বৎসর বয়স্ক হইলেই যে-কোন জাতীয় কিংবা স্থানীয় পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবার বা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইবার অধিকারী হইয়া থাকে।

সুইডেনে ১৯২১ সনে গঠনতন্ত্র সংশোধিত হইলে উহাতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে ভোটদানের এবং যে-কোন রাষ্ট্রীয় পরিষদে বা পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। তখন হইতেই সুইডিস নারী জাতীয় জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে তৎপরতা দেখাইয়াছে। ১৯৪৮ সনে রিক্সড্যাগের (পার্লামেণ্ট) নিম্ন পরিষদে ২৩০ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জন নারীসদস্য নির্ব্বাচিত হয়, উচ্চ পরিষদে ১৫০ জন সভ্যের মধ্যে নির্ব্বাচিত নারী-সভ্যের সংখ্যা ৬ জন।

হাঙ্গেরীর নারী ১৯২৫ সনের জাতীয় নির্ব্বাচনসমূহে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার পায়। ২৪ বৎসর বয়সের পুরুষের ভোটাধিকার থাকিলেও নারী ভোটাধিকারিণীর সর্ব্বনিম্ন বয়স ৩০ বৎসর ধার্য্য করা হয়। নারীদের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা হয় যে, সেই নারীই ভোটাধিকারিণী হইবে যে অন্ততঃ তিন বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছে, তিনটি সন্তানের জননী এবং নিজে নিজের ভরণপোষণে সক্ষম। ১৯৩৮ সনে আইন সংশোধন হয় এরূপ—নারীকে ভোটাধিকারিণী হইতে হইলে দশ বৎসরের নাগরিক, ন্যূনপক্ষে ছয় বৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারিণী, স্বয়ং ভরণপোষণে সক্ষম অথবা পুরুষ ভোটাধিকারীর স্ত্রী কিংবা বিধবা হওয়া প্রয়োজন হইবে। ১৯৩৮ সনেই আবার প্রত্যেক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তিন সন্তানের জননী এবং যাহারা পুরুষ ভোটাদাতার স্ত্রী কিংবা বিধবা এরূপ নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ইহাতে এই ব্যবস্থা থাকে যে, কোন সন্তানের বা স্বামীর মৃত্যু হওয়ার দরুন কোন নারী একবার ভোটাধিকার পাইয়া থাকিলে সে অধিকার নষ্ট হইবে না। এই আইনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েট চব্বিশ বৎসরবয়স্ক নারীকে এবং বয়সনিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত নারীকে ভোটদানের অধিকারী করা হয়। হাঙ্গেরীর বর্ত্তমান আইনে—যাহা ১৯৪৫ হইতে বলবৎ হইয়াছে, প্রত্যেক নাগরিক একুশ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক হইলেই কেবল ভোটদানের অধিকারী নহে, যে-কোন রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারে।

লাটিন-আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে ইকোয়েডর নানা বিষয়ে সকলের অগ্রণী, কিন্তু এখানেও ১৯৪৬ সনের পূর্ব্বে নারী সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পায় নাই। ১৯২৯ সনে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নারীরা ভোটাধিকার পায়; ইহার এক বৎসর পরে কতকগুলি যোগ্যতা থাকিলে নারী রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার অর্জ্জন করে। ১৯৪৬ সনের গঠনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়—স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে "সমস্ত ইকোয়েডরবাসী ১৮ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্ক হইলেই এবং লিখিতে পড়িতে জানিলে নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচন করিবার এবং নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী হইবে।" আইনে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—পুরুষের পক্ষে ভোটদান বাধ্যতামূলক, কিন্তু নারীর ভোটদান ইচ্ছানুযায়ী।

দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়নে ২১ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্কা "ইউরোপীয়" নারী ১৯৩০ হইতে ভোটাধিকার পাইয়াছে এবং যে-কোন রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় পদে নারীর নির্ব্বাচনে বাধা নাই। অবশ্য এই নারীকে "ইউরোপীয়" বংশজাতা হইতে হইবে। এড্‌ভোকেট-গণের মধ্য হইতেই বিচারক নিযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ওদেশে কোন নারী এড্‌ভোকেট হয় নাই। অবশ্য পৌরসভায় বহু নারী-প্রতিনিধি দেখা যায় এবং বড় বড় শহরে নারী মেয়রের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

সিংহল দ্বীপে ১৯৩১ সনে ৩০ বা তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্কা নারী ভোটাধিকার পায়, যদিও পুরুষের ভোটাধিকারের বয়স ছিল ২১ বৎসর। ১৯৩৪-৩৫ সনে এই বৈষম্য দূর করা হয়। সিংহল উপ-নিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করে ১৯৪৮ সনে, ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৪৬ সনে নারী পুরুষের মতই ভোটাধিকারিণী হয় এবং যে-কোন পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার লাভ করে।

স্পেন গণতন্ত্র ১৯৩১-১৯৩৯ মধ্যে পুরুষের মতই নারীকে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার দান করে। অবশ্য ১৯২৬ সন হইতেই পৌর-প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচনে নারীর ভোটাধিকার ছিল।

ব্রেজিল দেশের নারীগণ ১৯৩২ সন হইতেই ভোট দিবার এবং নির্ব্বাচিত হইবার সকল অধিকার ভোগ করিতেছে। রায়ো গ্রাণ্ডো ডো নর্টি রাজ্যে ইহারও পূর্ব্ব হইতে নারীর এই সকল অধিকার ছিল। ১৯৪৬ সনের ফেডারেল রাষ্ট্রতন্ত্র নারীকে সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বর্ত্তমানে নারী যে-কোন শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগীয় পদে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইবার অধিকারী।

তুর্কী নারী ১৯৩৫ সনে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে ভোট দেয় এবং এই সময় পার্লামেন্টে ১৭ জন নারী সদস্য নির্ব্বাচিত হন। অবশ্য ১৯৩০ সন হইতেই নারীর ভোটাধিকার ছিল, তবে তাহা কেবল পৌর নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে। সর্ব্বক্ষেত্রে নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯৩৪ সনের রাষ্ট্রতন্ত্রের সংশোধন দ্বারা।

থাইল্যাণ্ডে ১৯৩২ সনের বিদ্রোহের ফলে নিরঙ্কুশ রাজশাসনের অবসান হয়। তখন রাষ্ট্রতন্ত্রসম্মত শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গেই নারীও ভোটাধিকার লাভ করে। পরে ভোট সম্পর্কিত আইনে এই ব্যবস্থা আরও পরিষ্কার করা হয়।

কিউবার ১৯৩৪ সনে রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশে নারীকে পুরুষের অনুরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪০ সনের রাষ্ট্রতন্ত্রে সকল নির্ব্বাচনেই নারী ভোটাধিকার পায় এবং যে-কোন স্থানীয়, প্রাদেশিক বা জাতীয় পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করে।

উরুগুয়েতে ১৯৩৪ সনের মে মাস হইতেই নারী ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে। সেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে নির্ব্বাচনে কিংবা পদলাভ করিবার বিষয়ে কোনই তারতম্য নাই। ১৯৪২ সনের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে সেদেশের নারী পুরুষের এই সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ১৯২০ হইতে নারী ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। ১৯১৯ সনের ভারতশাসন আইনে নারী ভোটাধিকার না পাইলেও ইহার বিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নিজ নিজ প্রদেশে নারীকে ভোটাধিকারিণী করিবার ক্ষমতা লাভ করে। দশ বৎসরের মধ্যে মোট নয়টি প্রদেশের সাতটি প্রদেশেই নারী ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইনের বলে ছয় কোটিরও অধিকসংখ্যক নারী ভোটাধিকার পায়। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে নাগরিকের অধিকারে নারী-পুরুষের পার্থক্য ...প করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্য মন্ত্রী, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত, ইহারা সকলেই নারী। ইহা ব্যতীত রাজ্যপরিষদে ও কেন্দ্রীয় লোকসভা প্রভৃতিতে বহু নারী যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। স্বাধীন ভারতে আইন দ্বারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের নারী ১৯২২ হইতে খুবই সীমাবদ্ধ ভাবে ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯৩৫ সনের ব্রহ্ম-শাসন আইনে নারীকে পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সনে যখন ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয় তখন ১৮ ও তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্কা প্রত্যেক নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

রুমানিয়ায়ও ১৯৩৫ সনে নারীকে ভোটের ও রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধানে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। এই দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী একজন নারী।

ফিলিপাইনের ১৯৩৫ সনের রাষ্ট্রতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, নারীরা নিজেরাই তাহাদের ভোটাধিকারের বিষয় নির্দ্ধারণ করিবে। ১৯৩৭ সনে নারীসমাজের গণভোট দ্বারা নারীর ভোটাধিকার লব্ধ হয়। প্রত্যেক দশ জন ফিলিপিনো নারীর মধ্যে নয় জনই নারীর ভোটাধিকারের সপক্ষে ভোট দিয়াছিল। ফিলিপাইনের বর্ত্তমান আইনে ভোটের ব্যাপারে কিংবা কোন পদলাভের ব্যাপারে নারী-পুরুষের কোনই পার্থক্য নাই।

১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত তিনটি দেশ—মোঙ্গোলিয়া গণতন্ত্র, ডোমিনিকান রিপাব্লিক এবং ফ্রান্স—নারীর ভোটাধিকার বিষয়ে মনোযোগী হয়।

মোঙ্গোলিয়ান রাষ্ট্রের মূল গঠনতন্ত্র—যাহা ১৯২৪ সনে কায়েম হয় তাহাতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাতে ভোটাধিকারের কথা অনুল্লিখিত থাকে। ১৯৪০ সনের নূতন গঠনতন্ত্রে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া নারী-পুরুষকে নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ও নির্ব্বাচিত হইবার সমান অধিকার দেওয়া হয়। এখানে ১৮ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকলেই ভোটাধিকারী।

ডোমিনিকান রিপাব্লিকে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ১৮ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকলকেই ১৯৪২ সনের গঠনতন্ত্রে ভোটাধিকারী করা হয়। নারী যে-কোন পদে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইতে পারে এবং বিবাহিতা নারীরও তাহার স্বামীর অধিকার হইতে স্বতন্ত্র অধিকার আছে।

ফ্রান্সে ১৭৮৯ সনের বিপ্লবে 'সম-অধিকারের' বাণী প্রচারিত হইলেও, ইহার বহু পরে ১৯৪৭ সনে নারী আইনতঃ ভোটাধিকার পাইয়াছে। ১৯৪৪ সনে আলজিয়ার্সের স্বাধীন ফরাসী অস্থায়ী সরকার অবশ্য বিশেষ ঘোষণা দ্বারা নারীকে পুরুষের সমানতি ভিত্তে

ভোটাধিকার দিয়াছিল। ১৯৪৬ সনের ফরাসী গঠনতন্ত্র নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'সম-অধিকার' দিয়াছে।

১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯

ইটালীতে নারী প্রথম ভোট দিবার অধিকার পায় ১৯৪৫ সনে। ১৯৪৬ সনের ২রা জুন নারী প্রথম গণ-নির্ব্বাচনে ভোট দেয়। ১৯৪৭ সনের গঠনতন্ত্রে নারীর এই ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৪৫ সনের সংশোধিত গঠনতন্ত্রে সেদেশে নারী-পুরুষ সকলকে ভোট দিবার এবং নির্ব্বাচিত হইবার অবাধ অধিকার দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সনে আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পানামা এবং জাপানে নারী ভোটাধিকার লাভ করে। আলবেনিয়ার গঠনতন্ত্র মতে ১৮ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্ক প্রত্যেক নরনারী তুল্য অধিকারসম্পন্ন নাগরিক। যুগোস্লাভ গঠনতন্ত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

পানামার গঠনতন্ত্র (১৯৪৬) সেই দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ভোট দিবার ও যে-কোন পদ লাভ করিবার অধিকার দিয়াছে।

জাপানী নারী সবেমাত্র ১৯৪৬ সনে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। নূতন রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে নারী সকল বিষয়ে পুরুষের তুল্য অধিকারী।

১৯৪৭ সনে—আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, চীন এবং ভেনিজুইলা—এই চারিটি দেশে নারী পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছে। ১৯২৭ সনেও আর্জেন্টিনার স্যানজুয়ান প্রদেশের নারীর প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে ভোটদানের অধিকার ছিল। কিন্তু ইহার কুড়ি বৎসর পরে নারী সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে।

বুলগেরিয়ার ১৯৪৭ সনের গঠনতন্ত্রে নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এদেশের নারী জনসাধারণের কল্যাণ-কার্য্যে খুবই তৎপরতা দেখাইয়াছে। বর্ত্তমানে ডাক ও তারবার্ত্তা বিভাগের মন্ত্রী একজন নারী।

চীনদেশে ১৯৩১ সনের অস্থায়ী গঠনতন্ত্রে এবং ১৯৩৭ সনের খসড়া গঠনতন্ত্রে নারীকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দানের কথা ছিল। কিন্তু জাপানী আক্রমণের ফলে দূরপ্রাচ্যে সংগ্রাম বাধিয়া যাওয়ায় এই গঠনতন্ত্র কার্য্যকর হইতে বিলম্ব হয়। ১৯৪৬ সনের নূতন গঠনতন্ত্রে নারীর পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং জাতীয় পরিষদে কতকগুলি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত আছে।

১৯৪৫ সনের অক্টোবর বিপ্লবের ফলেই ভেনিজুয়েলায় নারী সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনকারী পরিষদে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪৬ সনে, সেই দেশের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম কয়েকজন নারী নির্ব্বাচিত হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৪৮ সনের মে মাসের নির্ব্বাচনে নারী প্রথম ভোট দেয়। ঐ নির্ব্বাচন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যবস্থানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-কোরিয়ায় ২১ বা তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্ক সকলেরই ভোটাধিকার আছে এবং ২৫ ও তদূর্দ্ধ বৎসরবয়স্ক যে-কোন নাগরিক জাতীয় পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য।

বেলজিয়ামে নানা বিষয়ে অগ্রগতি হইলেও সেখানকার নারী ভোটাধিকারিণী হইয়াছে মাত্র কিছুকাল আগে—১৯৪৮ সনের আইনে। ১৯৪৯ সনে এই আইন কার্য্যকর হয় এবং ঐ বৎসরই জুন মাসে জাতীয় নির্ব্বাচনে বেলজিয়ান নারী পুরুষের সহিত সম-অধিকারে ভোটদান করে। অবশ্য ১৯২১ হইতেই পৌর নির্ব্বাচনে নারীর ভোটাধিকার ছিল। আর ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের পরে যুদ্ধে নিহত বা বন্দী হইয়াছে এরূপ কোন সৈন্যের মাতা বিধবা হইলেই ভোটাধিকারী হইত। ১৯২৮ সনে নারী রাষ্ট্রীয় পদে নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করে তবে কেহ বিচারক হইতে পারিত না এবং কেহ বা পৌর-প্রধান নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহার 'পুলিসী' কার্য্যের ভার একজন পুরুষের উপর দেওয়ার বিধি ছিল।

১৯৪৮ সনে যখন ইস্‌রাইল রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তখন হইতেই নারী পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াছে। বর্ত্তমানে একজন নারী শ্রমিক ও সামাজিক বীমাবিভাগের মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন।

চিলিদেশে স্থানীয় নির্ব্বাচনে ১৯৩৪ সন হইতেই নারীর ভোটাধিকার ছিল। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী হইতে সেখানে নারী পূর্ণ ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে একজন নারী নেদারল্যাণ্ডসে রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত আছেন।

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার

আটটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে—ইহার মধ্যে ছয়টি লাটিন আমেরিকায়, নারীর সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার আছে—এই সকল দেশের আবার অনেক অঞ্চলেই নারীর ভোটাধিকার লাভের যোগ্যতা পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে।

গায়েটেমালায় রাষ্ট্রতন্ত্র নারীকে ভোটাধিকার দিয়াছে, কিন্তু পুরুষের সমান পর্য্যায়ে নহে। সেখানে পুরুষ নিরক্ষর হইলেও ভোটাধিকারী—অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক, নিরক্ষর পুরুষের ভোটের অধিকার ইচ্ছানুযায়ী। অথচ নিরক্ষর নারীর ভোটাধিকার একেবারে নাই, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নারীর ভোটাধিকার ইচ্ছামূলক। শিক্ষিতা নারী অবশ্য জাতীয় যে-কোন শাসন, আইন কিংবা বিচারবিভাগের পদে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইতে পারে।

পেরুর আইনের বিধান এই—"নাগরিক বলিতে প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বিবাহিত পুরুষকে এবং যাহাদিগকে নাগরিক অধিকারে উন্নীত করা হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিদের বুঝাইবে। যাহারা লেখাপড়া জানে তাহারাই ভোটাধিকারী। কেবলমাত্র পৌরসভার নির্ব্বাচনে বিবাহিত বা বিধবা পেরুভিয়ান নারী ভোট দিতে পারিবে। সন্তানের জননী প্রাপ্তবয়স্কা না হইলেও ভোটাধিকারিণী হইবে।" উপরোক্ত অধিকার ১৯৪৬ সনের গৃহীত আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মেক্সিকো এবং বলিভিয়ায় কেবল পৌরসভার নির্ব্বাচনে নারীর ভোটাধিকার আছে। মেক্সিকোর কোন কোন রাজ্যে ১৯২৬ সনে নারী পৌর-নির্ব্বাচনে ভোটাধিকারিণী হইয়াছে; কিন্তু সকল ষ্টেটে বা

রাজ্যে নারীর ভোটাধিকার পাইতে আরও কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। মেক্সিকোর বর্ত্তমান আইনে, বিবাহিত পুরুষের ১৮ বৎসরে এবং অবিবাহিতের ২১ বৎসরে ভোটাধিকার লাভ হয়, যদি তাহার সদুপায়ে রুজি-রোজগার থাকে। দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে অনুল্লিখিত কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার নারীর হইতে পারে না। এজন্য মেক্সিকো নারীর জাতীয় নির্ব্বাচনে কোন ভোটাধিকার নাই; তবে পৌর-নির্ব্বাচনের ভোট আছে। ১৯৪৫ সনে বলিভিয়ার পৌর-নির্ব্বাচনে নারীকে ভোট-দানের ক্ষমতা এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।

এল স্যালভেডরে পুরুষের পক্ষে কোন সর্ত্ত না থাকিলেও কোন নারীর ভোটাধিকারিণী হইতে হইলে সে তৃতীয় গ্রেড পরীক্ষা যে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার বয়স ২৫ বৎসরের উপর ইহা প্রমাণ করিতে হইবে।

নিকারাগুয়ার ১৯৪৮ সনের গঠনতন্ত্রে নারীকে ভোটদানের ও কতকগুলি পদে নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল অধিকার দেশের কংগ্রেস কর্ত্তৃক একটি আইন গ্রহণের (যাহা ত্রি-চতুর্থাংশ ভোট ব্যতীত গৃহীত হইতে পারে না) উপর নির্ভর করে। এরূপ আইন এখন পর্য্যন্ত পাস হয় নাই। দেশের গঠন-তন্ত্রই আবার বিচারবিভাগের কতকগুলি পদের জন্য নারীকে অনধিকারী করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রীসদেশের ১৯১১ সনের গঠনতন্ত্রের বিধানে প্রত্যেক গ্রীকই আইনের চক্ষে সমান এবং সকল পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী। সুতরাং নারী-পুরুষে আইনগত কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ নারী কেবল পৌর-নির্ব্বাচনেই ভোট দিতে পারে। এই অধিকারও নারী ১৯২৫ সন হইতে ভোগ করিতেছে, তাহাও আবার কতকগুলি সর্ত্তে। যথা—বয়স ৩০ বৎসর হইবে (পুরুষের পক্ষে ২১ বৎসর) এবং লেখাপড়া জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ১৯৪৯ সনের আইনে অবশ্য নারীর ভোটদানের যোগ্যতার বয়স কমাইয়া ২৫ বৎসর করা হয় এবং ১৯৫২ সন হইতে নারী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে এরূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১৯১১ সনের গঠনতন্ত্র সংশোধিত হইতেছে। সংশোধিত রাষ্ট্রতন্ত্রে নারী পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিবে।

পর্তুগালে বিশেষ শিক্ষা ও কর দেওয়ার যোগ্যতা থাকিলেই নারী ভোটাধিকারিণী হয়। পরিবারের কর্ত্রী বৎসরে ১০০ এসকুডো কর দিলেই ভোটাধিকারিণী হইতে পারে। অন্যথা নারী সেকেণ্ডারী স্কুল, শিক্ষণ-শিক্ষায়, অথবা শিল্প বা বাণিজ্যিক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ কিংবা শিল্পকলা ও সঙ্গীতশিক্ষার্থী হইলেই ভোটাধিকারিণী হইতে পারে।

তেরটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে নারীর কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই। ইহাদের মধ্যে আবার সৌদি আরব এবং ইথিওপিয়ার নির্ব্বাচনের কোন বালাই নাই।

সৌদি-আরবের রাষ্ট্র-গঠনতন্ত্র এরূপ—"রাজধানীতে বিধান-পরিষদ নামে একটি কাউন্সিল থাকিবে। ইহাতে একজন এজেণ্ট-জেনারেল ও তাহার উপদেষ্টামণ্ডলী এবং ছয় জন অভিজাত সদস্য থাকিবেন। এই সকল সদস্য অবশ্যই উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তি হইবেন এবং মহামান্য রাজেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

ইথিওপীয়ার গঠনতন্ত্রের ত্রিংশ ধারায় এরূপ আছে—"সেনেট-সভায় সদস্যগণকে সম্রাট মেকুয়ানেট অভিজাত-বংশ হইতে নির্ব্বাচিত করিবেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকেই বহুকাল ধরিয়া রাজসেবা করিয়াছেন এরূপ রাজকুমার, বিচারপতি অথবা সমরবিভাগের অধিনায়ক হইতে হইবে।"

আফগানিস্থান, কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, মিশর, হেইতি, হাশেমীর জর্ডনরাজ্য (ট্রান্সজর্ডন), হণ্ডুরাস, ইরাক, লেবানন, সুইজার‍্ল্যাণ্ড এবং সিরিয়ায় কেবলমাত্র পুরুষের ভোটাধিকার এবং ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার আছে। কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, মিশর এবং লেবাননে নারীকে ভোটের অধিকার দেওয়ার বিষয়টি ঐ সকল দেশের বিধান-পরিষদ বর্ত্তমানে পর্য্যালোচনা করিতেছে। এই সকল দেশেই নাগরিক অধিকার বলিতে কেবল পুরুষের অধিকারই বুঝায়।*

* সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে তথ্যাদি সংগৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাংলাদেশে আমাদের ঘরের পাশে যে সকল আদিম জাতীয় লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা বড় একটা খোঁজখবর রাখি না। কেবলমাত্র সাঁওতাল ছাড়া বাংলার অন্যান্য আদিবাসী-সমাজ সম্বন্ধে বাংলা-সাহিত্যে আলোচনা এক প্রকার হয় নাই বলিলেই চলে। শ্রীসুবোধ ঘোষের 'ভারতের আদিবাসী' এবং শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত 'শাসনতন্ত্রে আদিম অধিবাসী ও উপজাতির স্থান' নামক পুস্তকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং পরিসংখ্যানাদি পাওয়া যায়। বর্তমান লেখকের 'আদিবাসীদের বিচিত্র কথা' নামক গ্রন্থেও বাংলার আদিবাসীদের রীতিনীতি ইত্যাদির কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

আসামের ন্যায় বাংলাদেশেও অতীতে বাহির হইতে বিভিন্ন আদিম জাতির লোকেরা আসিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চল ও সমতলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই সমস্ত উপজাতির মধ্যে অনেকে বাঙালী হিন্দুর ধর্ম্ম, ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া বাঙালী হিন্দু-সমাজের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভুমিজ, কুর্মি, শবর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি এই হিন্দুত্বপ্রাপ্ত উপজাতি।

কিন্তু যে সকল আদিম জাতির লোক বাঙালী হিন্দু-সমাজ হইতে পৃথক হইয়া নিজেদের জাতীয় আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস ইত্যাদি লইয়া আমাদের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেছে, বাংলার আদিবাসী বলিতে প্রধানতঃ তাহাদেরই বুঝায়। বাংলাদেশের এই সমস্ত আদিবাসীর মধ্যে সাঁওতালরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪১-এর আদমশুমারি মতে বাংলাদেশে সাঁওতালদের সংখ্যা ৮,২৯,০২৫ জন। সাঁওতাল ছাড়া বাংলাদেশে (১৯৪১ সনের আদমশুমারি মতে) ভুটিয়া, চাকমা, দামাই, গুরুঙ্গ, হাড়ী, কামী, খারিয়া, খাস, কুকি, লেপচা, লিম্বু, মঙ্গের, মেচ, মিরু, মুণ্ডা, নেওয়ার, ওরাওঁ, সড়কি, সুহুওয়ার, টিপরা প্রভৃতি আরও কুড়িটি আদিম জাতি রহিয়াছে।

কিন্তু বাংলার উপজাতীয় সমাজ এই কুড়িটি গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। "১৯৪১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের... অন্য অধ্যায়ে (সমগ্র ভারতের আদিবাসী সমাজের তালিকা) বিস্তৃতভাবে সমগ্র ভারতের ১৭৬টি উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়, যারা বাংলাদেশে অল্পবিস্তর আছে, অথচ প্রাদেশিক তালিকায় তাদের নাম উল্লিখিত হয় নি। যেমন: বেদিয়া, বাহেলিয়া, ভুইয়া (ভুঁইহার), ঝিঁঝিয়া পান, পাসি, দোসাদ, রাভা, নাট, ঘাসি, কাছাড়ী, নাগেসিয়া, ভূমিজ, কোয়া, খাড়ু, মালপাহাড়িয়া, গারো, হাজং, খন্দ, লুসাই, হো, মাহ্‌লি, তুরী।" (ভারতের আদিবাসী) কিন্তু এই তালিকাও সম্পূর্ণ নহে। ১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের তালিকায় দলু, বেরুরা, বিন্দ, কুর্মি, টোটো প্রভৃতি এমন ১৫টি আদিম জাতির নাম পাওয়া যায়, ১৯৪১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে যাহাদের উল্লেখ নাই।*
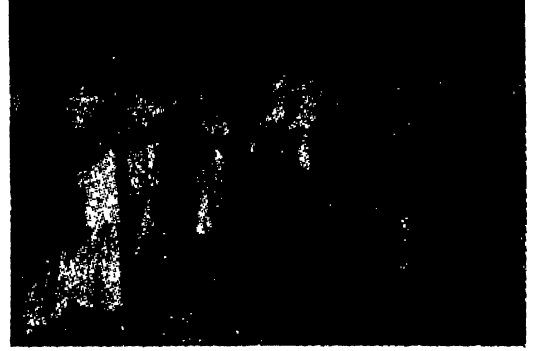
ত্রিপুরারাজ্যের চিফ কমিশনার শ্রীনানজাপ্পা (বাম দিক হইতে চতুর্থ) কর্তৃক ধামুয়া, সাধনাশ্রমস্থ একদল আদিবাসী শিক্ষার্থীকে উপদেশ প্রদান

বাংলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ার দরুন বর্ত্তমানে বহু আদিবাসী এখন পূর্ব্ব-পাকিস্থান রাষ্ট্রের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী এবং উপজাতীয় লোকদের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ, আর পূর্ব্ববঙ্গে পাঁচ লক্ষের কিছু বেশী।

পূর্ব্ববঙ্গের উপজাতিসমূহের মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী চাকমারা অন্যান্য বহু আদিম জাতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। ইহাদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাবর্গের অন্তর্গত এবং প্রায় বাংলাভাষারই অনুরূপ। আসামের মণিপুরীদের ন্যায় ইহাদেরও নিজস্ব লিপি আছে এবং চাকমা অক্ষর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। চাকমা জাতির ইতিহাস পাঠে অনেক চাকমা রাজা ও রাণীর কীর্ত্তিকথা জানিতে পারা যায়। ত্রিপুরা দরবারের 'রাজমালা'য়ও রাজা ত্রিলোচনের সঙ্গে চাকমাদের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়।

* *Thakkar Bapa Commemoration*, Vol. I. Edited by T. N. Jagadisan and Shyamlal, p. 373.

চাকমারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদের সঙ্গে ইহাদের রীতিনীতিগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। হিন্দুসমাজ অপেক্ষা ইহাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করে।...প্রায় সকল চাকমা মেয়েই সূতা কাটিতে এবং

সাধনাশ্রমের প্রাঙ্গণে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা

কাপড় বুনিতে জানে। চাকমা স্ত্রী বাস্তবিকই গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া থাকে।*

১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম ভাগে জে. পি. মিল্‌স বলিয়াছেন যে, আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত জুম-কৃষির পরিবর্ত্তে চাকমারা লাঙ্গলের সাহায্যে চাষবাসের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে।†

২

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের আদিবাসীদের সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া আমরা আমাদের আলোচনাকে পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি এবং আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিব।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে এই সকল আদিম মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে চারিটি মূলধারা বাংলাদেশে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। (১) হিমালয় অঞ্চল হইতে আগত যে সকল উপজাতি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বসতিস্থাপন করে তন্মধ্যে ভুটিয়া, নেওয়ার, লেপচা প্রভৃতি প্রধান। (২) অষ্ট্রেলয়েড বংশের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আসে ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে। (৩) টিপরা, লুসাই, চাকমা প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের আরাকানের চিনপাহাড় হইতে আগত উপজাতি। (৪) ভোট-ব্রহ্ম শাখার (Tibeto-Burman) গারো, কাছাড়ী, মেচ, রাভা, হাজং প্রভৃতিও বাংলাদেশে বহিরাগত উপজাতি। "ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর ও সুসাং (সুসঙ্গ ?) পরগণায় প্রায় ৩৪০০০ গারো উপজাতি পাহাড় হইতে আসিয়া স্থান করিয়া লইয়াছে।...গারো উপজাতি প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গারো পাহাড়স্থিত জঙ্গল-পথ ভেদ করিয়া ময়মনসিংহে আসিয়াছিল।"* রাজবংশীদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। ইহাদের দেহে আদিম কছাড়ী এবং মধ্যভারতের ক্ষত্রিয় রক্ত বহমান। ইহারা পুরাপুরি ভাবে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। "ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনের ফলে রাজবংশী সমাজের অনেকে উপবীত গ্রহণ করেন এবং কাশ্যপ গোত্রও গ্রহণ করেন।"†

শুধু রাজবংশী নয় বাংলাদেশের আরো অনেকগুলি আদিম জাতির বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, নিজেদের জাতীয় প্রথাসমূহ কিছু কিছু বজায় রাখিয়াও হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হইবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহাদের মধ্যে কি আন্তরিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহারা আমাদের সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে, কিন্তু আমরা অকারণে ঘৃণা করিয়া ইহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি—যদিও ইহাদের অনেকের সহিত আমরা জ্ঞাতিত্বের সূত্রে আবদ্ধ। ইহাদের নিকট মিলন মন্ত্র প্রচার তো দূরের কথা, কি অপরিসীম দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে যে ইহারা ডুবিয়া আছে তাহার সন্ধান লওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ করি নাই। বাংলাদেশে যে এতগুলি আদিম জাতির বাস, কয়জন শিক্ষিত বাঙালী সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ? বাংলার কোন কোন পথে ঘাটে নিত্য দেখিতে পাই বলিয়া সাঁওতালদের হাঁড়ির খবর কিছু কিছু আমরা রাখি। হাড়িয়া মহুয়া এবং সাঁওতালী মাদলের কথাও গল্প-উপন্যাসে পড়িয়া থাকি। কিন্তু সাঁওতালরাই তো বাংলাদেশের একমাত্র আদিম জাতি নয়। বাংলার চৌদ্দ লক্ষ আদিবাসী সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য যে অপারসীম !

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের (Anthropology) অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়, এম-এস্‌সি (ক্যান্টাব) ১৯৪৫-এর ৩রা অক্টোবর হইতে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই কয় মাসের মধ্যে উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশিত করেন তাহাতে বলিয়াছেন :

"It is clear from the survey of Santal areas in

* इनके रीति रिवाज हिन्दुओं से बहुत मिलते जुलते हैं। इनमें हिन्दुओं की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता है। प्रायः सभी स्त्रियाँ कातना बुनना जानती हैं। वरे वस्तुतः गृहलक्ष्मी होती हैं।

—हमारी आदिम जातियाँ—श्रीअखिल विनय, पृ. १६६

† *Thakkar Bapa Commemoration* Vol. Edited by T. N. Jagadisan & Shymlal, p. 373

* শাসনতন্ত্রে আদিম অধিবাসী ও উপজাতির স্থান—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পৃ ১৫।

† ভারতের আদিবাসী—শ্রীসুবোধ ঘোষ, পৃ. ৩৫৭।

Northern Bengal and Western Bengal that the economic condition of the tribe is not satisfactory. Everywhere the Santals live by agriculture and by labour connected with it. But the returns are insufficient."*

অর্থাৎ, উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল অঞ্চলে তথ্যানুসন্ধানের ফলে ইহা সুস্পষ্ট হইল যে, এই উপজাতির আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। প্রত্যেক জায়গাতেই সাঁওতালরা কৃষিকার্য্য এবং তদানুষঙ্গিক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ইহার বিনিময়ে তাহারা যাহা পায় তাহা যথেষ্ট নহে।

দারিদ্র্য যে ইহাদের শিক্ষালাভের পরিপন্থী তাহারও আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায়।† কিন্তু শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়া বাংলার অন্যান্য আদিম জাতির অবস্থা যে সাঁওতালদের চেয়ে কত বেশী শোচনীয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আদিবাসাদের উন্নয়ন যে ভারতের জাতিগঠনকার্য্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ একথা প্রথম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন ঠক্কর বাপা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের ভীল-অধ্যুষিত দুর্ভিক্ষপীড়িত পাঁচমহল অঞ্চল পরিভ্রমণকালে। ভীলদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নকল্পে তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ভীল সেবামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন।‡ ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘ নামক সংস্থাটি গঠিত হইল ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তার পর দেখিতে দেখিতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত সঙ্ঘের শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মধ্যে বিবিধ কল্যাণকর্ম্মের সূচনা হইল। তাহাদের উন্নয়নের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের আদিম জাতিদের দুরবস্থার প্রতি এই সঙ্ঘের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজে রহিয়া গেল 'যে তিমিরে সে তিমিরেই।'

অবশেষে বাংলাদেশেরও ঘুম ভাঙ্গিল। ১৩৫৮ সালের ১লা বৈশাখ তারিখটি বাংলাদেশের আদিবাসী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। উক্ত দিবসে প্রধানতঃ বাংলার আদিবাসীদের দুর্গতিমোচন ও কল্যাণসাধনকল্পে কলিকাতায় 'ভারত মহাজাতি মণ্ডলী' নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হইল—ইহাই বাংলাদেশে আদিবাসী-কল্যাণমূলক সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানও এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইল। বাংলাদেশের তদানীন্তন আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৯৫১ সালের

এক দল আদিবাসী শিক্ষার্থীসহ ভারত মহাজাতি মণ্ডলীর কর্ম্মিগণ : (বামদিক হইতে ৭ম) শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (সভাপতি)

৩রা জুন, ৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে মণ্ডলীর প্রথম সভার অধিবেশন হয়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করেন।

ইহার পর বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড় প্রভৃতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মণ্ডলীর কর্ম্মীদের উদ্যোগে গঠনমূলক কার্য্য চলিতে থাকে। মণ্ডলীর বিভিন্ন কেন্দ্রে উহার নিজস্ব গৃহনির্ম্মাণের জন্য কেহ কেহ ভূমিখণ্ডও দান করেন।

মণ্ডলীর প্রথম সম্মেলনের অধিবেশন হয় কলিকাতায় রাজ্যপাল-ভবনে ১৯৫১ সালের ২২শে জুলাই তারিখে। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। একটি সাঁওতালী মেয়ে নিজেদের জাতীয় 'দরম ডাক' প্রথায় তাঁহাকে অভ্যর্থিত করে। সভাপতির অভিভাষণে ডঃ কাটজু আদিবাসীদের স্বাধীনতা-প্রীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন —এই আদিবাসীরাই ভারতের মৌলিক অধিবাসী। যেমন তাহাদিগকে আমাদের কিছু কিছু দিবার আছে তেমনি যাহারা আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক-কিছু শিখিবারও আছে। আদিবাসীদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন :

"Be one with us—days of subjection are gone—this is the age of equality. It is the Bharat-Mata—you are one of her children. Take part in the government

* K. P. Chattopadhyay : *Report on Santals in Bengal*, p. 47.

† *Ibid*, p. 48.

‡ *Thakkar Bapa Commemoration Volume*, p. 29

of the country, take active part in the government of the whole of India."

অর্থাৎ, তোমরা আমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাও। পরবশ্যতার দিনের অবসান হইয়াছে—ইহা সাম্যের যুগ। তোমরাও যে ভারতমাতার সন্তান—দেশের শাসনব্যাপারে তোমরাও অংশ গ্রহণ কর। সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে তোমরা যোগদান কর সক্রিয়ভাবে।

ধামুয়া সাধনাশ্রমের ভুটিয়া এবং লেপচা শিক্ষার্থীদের বিদায়-সংবর্দ্ধনা

এই সম্মেলনে বাংলা ও বাংলার বাহিরের বহু আদিবাসী-কল্যাণকামী সুধী ব্যক্তি যোগদান করেন। ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের ওয়ার্কিং সেক্রেটারি ডি. রঙ্গাইয়া তাঁর বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের এই অভিনব মানবকল্যাণ-প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের জন্মকথা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন:

"There are some provinces still where we have not yet got any branches. West Bengal is one where there are aboriginals for whom there is no association and it is proper that the Bharat Mahajati Mandali should take up this work."

অর্থাৎ, এখনও এমন কতকগুলি প্রদেশ আছে যেখানে আমাদের (ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের) কোন শাখা খোলা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ তাহাদের অন্যতম। এখানকার আদিবাসীদের জন্য কোন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ভারত মহাজাতি মণ্ডলীর এই কাজে হাত দেওয়া খুবই সমীচীন হইয়াছে।

বহু আদিবাসী নর-নারীও এই সভায় যোগদান করেন। সাঁওতাল-নেতা শ্রীপদ্মলোচন মাঝি সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বাংলায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন: "স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম দেশবাসীকে অনুন্নত জাতিসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তখন হইতে আজও পর্য্যন্ত ইহাদের উন্নয়নের জন্য আশানুরূপ চেষ্টা হয় নাই।"

পদ্মলোচন মাঝি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে সমবেত সমাজ-কর্ম্মীদিগকে আদিবাসীদের এলাকায় গিয়া কাজ করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এই সম্মেলনের পর মণ্ডলী বাংলাদেশের বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। প্রথমেই টোটো নামক বাংলার একটি বিস্মৃত এবং ধ্বংসোন্মুখ আদিম জাতির শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি ইহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তসীমাস্থ ভুটান পাহাড়-সংলগ্ন পশ্চিম ডুয়ার্সের ২০০ একর পরিমিত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে একজন 'মণ্ডল' বা গ্রাম-প্রধানের অধীনে মোটে একাত্তর ঘর টোটোর বাস—লোকসংখ্যা মাত্র ৩১৪ জন। যুগ যুগ ধরিয়া ইহারা পূর্ব্বপুরুষদের চিরাচরিত জীবনধারার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে—বহির্জগতের সঙ্গে ইহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। কেবলমাত্র প্রতি বৎসর ইহাদের এলাকার সন্নিহিত সমতল অঞ্চল হইতে মুষ্টিমেয় যে কয়জন ব্যবসায়ী শীতকালে ইহাদের দেশে কমলা কিনিতে যায় তাহারা ছাড়া বাহিরের আর কেহ ইহাদের অস্তিত্বের কথা অবগত নহে। ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্টে ইহাদিগকে ধরা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৪১-এর আদমশুমারিতে ইহাদের উল্লেখমাত্র নাই। ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এদের লোকসংখ্যা ছিল ৩৩৪ জন।

ইহারা কোথা হইতে ইহাদের বর্ত্তমান বাসভূমিতে আসিয়াছে সেকথা বলিতে পারে না। ইহাদের গোত্র-পরিচয় আজও খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই, পৃথিবীর আর কোথাও ইহাদের আর কোনো স্বজাতি আছে কিনা তাহাও তাহারা জানে না। এই স্বজনবিহীন দুর্গত আদিম জাতির দুরবস্থার কথা ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। নানা প্রকার চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠব্যাধির কবলে পড়িয়া ইহারা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে।*

একটা গোটা জাতিকে 'মহতী বিনষ্টি'র হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত মহাজাতি মণ্ডলী কর্ত্তৃক টোটোদের বাসস্থান টোটো পাড়ায় একটি কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মণ্ডলীর কর্ম্মী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার টোটোদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের উন্নয়ন কার্য্যে নিয়োজিত আছেন।

গত বৎসর ই. আই. আর.-এর ডায়মণ্ড হারবার সেক্সনের ধামুয়া রেল-ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরবর্ত্তী বিহারী গ্রামে মণ্ডলীর উদ্যোগে স্থানীয় সাধনাশ্রমে সমাজ-কর্ম্মী সৃষ্টি

* *Tribes of India*, Part II, published by Bharatiya Adim Jati Sevak Sangha, p. 204.

এবং আদিবাসীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি 'কর্ম্মী-শিক্ষা-শিবির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শহরের কোলাহল হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের বুকে সাধনাশ্রম অবস্থিত। এখানকার সবুজ শস্যাবৃত প্রান্তরে, শস্যশ্যামল ধানের ক্ষেতে এবং পাঁচাকা ঝোপঝাড়ে প্রকৃতির শ্যামল হস্তের স্পর্শ টুকু যেন মাখানো। প্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে আজন্ম যাহারা প্রতিপালিত সেই সকল আদিবাসী শিক্ষার্থীর পক্ষে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বড়ই প্রীতিকর। এই সাধনাশ্রম ছিল শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পত্তি। তিনি তাঁতশালা, গোশালা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি সমেত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 'মণ্ডলী'কে দান করিয়াছেন।

যে সকল সমাজকর্ম্মী গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ ভাবে আদিবাসীদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে (স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর কর্ম্মীকেই) কর্ম্মী-শিক্ষা-শিবিরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দরিদ্র আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ছাত্রাবাস এবং অনুন্নত ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি অনাথ আশ্রম এই সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী-শিক্ষার্থীদের সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া হাতে-কলমে কৃষিকার্য্য, সুতাকাটা, তাঁতবোনা, কাঠের কাজ, দর্জ্জির কাজ ইত্যাদি শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

গত বৎসর দার্জ্জিলিং জেলার লেপচা প্রভৃতি বিভিন্ন আদিম জাতির কয়েক জন শিক্ষিত যুবক সাধনাশ্রমে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কর্ম্মী-শিক্ষা-শিবিরে কোনো কোনো ব্যবহারিক বিদ্যা বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভান্তে দেশে ফিরিয়া গিয়া স্বজাতির কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি ষোল-সতের জন সাঁওতাল ছেলে এই শিক্ষাশিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। তন্মধ্যে দুইটি ছেলে মণ্ডলীর ব্যয়ে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী মূলটি গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে রত।

পশ্চিমবঙ্গের আরও নানা আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে মণ্ডলীর শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলিতেছে। বর্ত্তমানে এই সংস্থাটি ভারতীয় আদিম জাতি সেবক-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। মণ্ডলীর বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী প্রয়োজন একদল যুবক-কর্ম্মীর যাঁহারা আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ সেবক ঠক্কর বাপা কর্ত্তৃক আচরিত সেবাধর্ম্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার আদিমজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে গিয়া নূতন নূতন কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। অবহেলিত, অনাদৃত আদিবাসীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই হইবে তাহাদের ভাবনা ও সাধনা। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরাও ভারতীয় মহাজাতির অন্তর্গত এবং তাহারা যে আমাদের পরম আত্মীয় এ বোধ তাহাদের মনে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করা দেশের কল্যাণকামী বাঙালীমাত্রেরই আজিকার দিনে অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। এই প্রদেশের চৌদ্দ লক্ষ আদিবাসীর অধিকাংশই যে আজ শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক হইতে বঞ্চিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইহাদের উদ্ধারসাধনের ব্রত আজ বাঙালী জাতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে—পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আজ বুঝি জাগলো

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

হৃদয়ের কূলে কূলে মধু মাস
বুঝি আজ জাগলো,
চঞ্চল তনু-মনে পুলকের
শিহরণ লাগলো।
অন্তরে অরুণিমা নৃত্যের ছন্দে
ব্যাকুল হলো যে আজ অজানা আনন্দে,
রক্তিম উষালোকে হিয়াখানি
রঙে রঙে রাঙলো।

ফাগুনের হিল্লোলে মধুপের গুঞ্জনে
দোলা দেয় অন্তরে বারে বার,
কুসুমিত বনতল সৌরভ-চঞ্চল
প্রজারতি উদ্দেশে যচে কার ?
কা'র কথা জাগে মনে
ভরে দেয় হিয়াতল,
আনন্দে ভরে ওঠে
বেদনায় আঁখিজল।
মিলনের বাঁশীখানি
বাজে বাজে অন্তরে বাজলো।

একটি নূতন অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

মুঙ্গেরের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল পরলোকগত হেমচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল্ প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার অনুরাগী ছিলেন। তিনি মুঙ্গেরের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান হইতে অনেকগুলি মূর্ত্তি, ফলক ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ১৯৩৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে তাঁহার বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহার সংগৃহীত বহু মূর্ত্তি নষ্ট হয়। যে দুই-একটি মূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় ছিল তাহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি অন্যতম। এক্ষণে এই মূর্ত্তিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে আছে। উহা দেখিতে চাহিলে উক্ত সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ সযত্নে দেখাইয়া দেন ও উহার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। এই মূর্ত্তিটি কালো পাথরের; ক্লোরাইটের বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। উচ্চতায় ইহা সাত ইঞ্চি, প্রস্থে সোয়া চার ইঞ্চি, এবং ইহার বেধ সোয়া এক ইঞ্চ। ইহার পাদপীঠে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। মূর্ত্তিটি হেমবাবু লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকট কিউল নদীতীরে প্রাপ্ত হন; মূর্ত্তিটি পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের; হাতের তালুতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় একটি পদ্মফুল খোদাই করা আছে। পাদপীঠের নিম্নে করজোড়ে অবস্থিত এক ভক্তের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা প্রতিষ্ঠাতার মূর্ত্তি! মস্তকের উপরিভাগে ধ্যানী বুদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাদপীঠের মূর্ত্তিটি যদি প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের হয় তাহা হইলে ইহা একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্ত্তি বা miniature statue। এইরূপ খোদিত মনুষ্যমূর্ত্তি খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। বেশীর ভাগ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে 'ikon'।

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের সর্ব্বকরুণাময় ভাব। উত্তর ভারতে এককালে মহাযান বৌদ্ধমতের বেশ প্রচলন ছিল। এই মত অনুযায়ী বোধিসত্ত্বের একত্রিশ প্রকার সাধনা প্রচলিত ছিল। মূর্ত্তিশিল্পের দিক্ দিয়া বিচার করিলে আলোচ্য মূর্ত্তিটির বিশেষ গুরুত্ব আছে—ইহা একমুখ ও উপবিষ্ট। মূর্ত্তিশিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেহ কেহ ইহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন, আশুতোষ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিককার বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মূর্ত্তির গঠন অতি পরিপাটি।

এইবার আমরা মূর্ত্তিটির পাদপীঠে খোদিত লিপিটির সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। লিপিটির অক্ষরগুলির আকার-প্রকার দেখিয়া কোন কোন অক্ষরতত্ত্ববিদ্ ইহা খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর কিংবা 'proto-Bengali' (প্রায় বঙ্গাক্ষর) বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন—অক্ষরগুলি বঙ্গাক্ষর হইবার পূর্ব্বেকার 'আধা' বঙ্গাক্ষর। লিপিটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। যেটুকু নিঃসন্দিগ্ধরূপে পড়িতে পারা যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম লাইনে আছে: ওঁ * * * গোপালে * * *; দ্বিতীয় লাইনে আছে * * * স্কন্ধধারিণী।

লিপি হইতে ইহা জানা যায় না যে, এই গোপাল পালরাজবংশের কোন্ গোপাল। পালরাজবংশে একই নামের দুই-তিন জন করিয়া রাজা যখনই পাওয়া যায় তখনই এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হয়—ইহা কোন্ গোপালের বা কোন্ বিগ্রহপালের। পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গোপাল ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। পালরাজবংশ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহার বিজিত হওয়া পর্য্যন্ত বাংলা বা বিহারের কোন-না-কোন অংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের দেবপাল উত্তর-ভারতের বহু অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে অপর একজনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপাল প্রথম গোপালের অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র। দ্বিতীয় গোপালের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ভাঙিতে থাকে। মহীপাল, যাঁহার নাম লোকমুখে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—"ধান ভানিতে মহীপালের গীত", এই দ্বিতীয় গোপালের পৌত্র। তিনি ৯৭৮ হইতে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নয়পালের আমলে ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অতীশ তিব্বতে যান। তৃতীয় গোপাল এই নয়পালের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। বুঝিবার সুবিধার জন্য পালরাজগণের ধারাবাহিক বংশানুক্রম নিম্নে দিলাম:

১। গোপাল (১ম)
২। বাক্‌পাল
৩। জয়পাল
৪। নারায়ণপাল
৫। রাজ্যপাল

৬। গোপাল (২য়)
|
৭। বিগ্রহপাল (২য়)
|
৮। মহীপাল
|
৯। নয়পাল
|
১০। বিগ্রহপাল (৩য়)
|
১১। রামপাল
|
১২। কুমারপাল
|
১৩। গোপাল (৩য়)

এই রাজবংশের অন্যান্য শাখার রাজাদের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় গোপাল ১১২৫ হইতে ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন। তৃতীয় গোপালের পর পালরাজবংশের আর এক জন মাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। বাংলায় সেন রাজবংশের অভ্যুত্থান হইলে পালবংশ বিহারের অংশ-বিশেষে রাজত্ব করিতেন।

এই পালবংশের সকলেই মহাযান বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। বিখ্যাত বিক্রমশিলা ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিহার প্রতিষ্ঠা এই পালবংশেরই কীর্ত্তি। এগুলি ছাড়া তাঁহাদের দ্বারা আরও বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নওলাগড় লিপিপাঠে জানা যায়, মুঙ্গেরের আশে পাশে বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল।

আলোচ্য মূর্ত্তিটি কোন্ গোপালের তাহা মোটামুটি স্থির করিবার জন্য আমরা এত কথা বলিলাম। প্রথম গোপালকে আমরা সহজেই বাদ দিতে পারি। দ্বিতীয় গোপাল মহী-পালের পিতামহ—তিনি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ধরিলে অসমীচীন হয় না। এইজন্য আমরা তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের লোক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। প্রথম গোপাল হইতে মহীপাল পর্য্যন্ত সাত-পুরুষ, সাত পুরুষে (৯৭৮—৭৫০)=২২৮ বৎসর হইতেছে—গড়ে এক পুরুষে হইতেছে ৩২ বৎসর। এই হিসাবেও দ্বিতীয় গোপাল ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার লোক হইতেছেন। সুতরাং আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত মোটামুটি কাজ চালানো সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়ত আপত্তি হইবে না। এ মতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় গোপাল হইতে তৃতীয় গোপালের সময়ের পার্থক্য প্রায় দুই শত বৎসর। দুই শত বৎসরের ব্যবধানে পূর্ব্ব-ভারতে মূর্ত্তিশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি

অবলোকিতেশ্বর, লক্ষীসরাই

হইয়াছিল এবং অক্ষরের গঠনেরও যথেষ্ট পার্থক্য হইয়াছিল। সুতরাং মূর্ত্তির গঠন-কৌশল ও লিপিটির অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া আশুতোষ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ যে ইহা তৃতীয় গোপালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

গাহড়বাল রাজবংশ ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা জেলা অবধি দখল করেন; এবং ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের জয় করেন। পরে পালরাজবংশের মদনপাল ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের পুনরায় পাল-রাজ্যভুক্ত করেন। ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঙ্গের পালরাজ্যভুক্ত ছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং তৃতীয় গোপাল লক্ষীসরাই অবধি রাজত্ব করিয়াছিলেন এই অনুমান অসঙ্গত নহে। নওলাগড় লিপি হইতে জানা যায় যে, এককালে (তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে) গঙ্গার উত্তরেও পালরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

খাতা

শ্রীজাহ্নবী রায়

রাঁচির পাগলা গারদ…।

বেড়াতে গিয়েছিলাম সেবার কলেজের ছুটিতে। সঙ্গে ছোট বোন সুমিতা। সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ে সুমিতা। সহপাঠী বন্ধুদের কার কাছে সে শুনেছিল রাঁচির পাগলা গারদের অনেক চমকপ্রদ কাহিনী। তাই আমার যাবার কথা শুনে কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গ নিলে। পাগল দেখা নাকি তার সখ!

শহরের মধ্যেই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে আস্তানা ঠিক হয়ে ছিল। গোটা ছুটিটাই সেখানে কাটানোর ইচ্ছে; তাই বেশ কিছু প্রয়োজনীয় লটবহরও সঙ্গে নিলাম।

সুমির তাড়ায় পৌঁছানোর এক দিন পরেই যেতে হ'ল পাগলা গারদ দেখতে। বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন মেনে গেলাম ভেতরে।

অনেক রকমের পাগল দেখলাম। প্রত্যেকেরই যেন এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পাশাপাশি অনেক গারদ, কিন্তু তবুও যেন কারুর দিকে তাকাবার অবসর নেই কারও। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়, এখানে সৃষ্ট হয়েছে যেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগৎ। এ জগতের কেউ ভাবুক আবার কেউ বাচাল।

এক জায়গায় বছর দশেকের একটি ছেলেকে দেখলাম একটি ঘরের মধ্যে। সামনে একটি বড় তুলোর পুতুল রেখে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছিল একমনে। আমাদের দেখেই সে মুখে আঙুল ঠেকিয়ে চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল—'এই চুপ! বাবা আসছে! এখনই জানতে পারবে হয়তো। তখন যা মার লাগাবে!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম তার কথার ভঙ্গীতে। ভাবছিলাম—এতটুকু ছেলের মাথা খারাপ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

এর পরে একটু চুপচাপ কেটে গেল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল ছেলেটি। 'আমাকে মেরো না বাবা, আমাকে মেরো না? আমি…আমি মারি নি খোকনকে, ও আমার কোল থেকে পড়েই চুপ করে গেছে। আমি মা-রি…নি। মারি…নি…ই…ই!' ওঃ, সে কি আকুতিভরা কান্না!

দাঁড়াতে পারলাম না সেখানে। এগিয়ে গেলাম সুমির হাতে একটা টান দিয়ে। পরে জেনেছি, ছেলেটি তার ছোট ভাইকে কোল থেকে আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ভাইটি নাকি মারা যায়। বড় ভালবাসত ভাইটিকে, তাই সহ্য করতে পারলে না সে ব্যথা। পাগল হয়ে গেছে শেষে।

বললাম 'পা চালিয়ে চল্ সুমি। আমি আর সইতে পারি না।' ছেলেটির মস্তিষ্কবিকৃতি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিলাম।…

'কে? কে ওখানে?' অপর একটি কক্ষ থেকে বিস্ময়ভরা চাপা কণ্ঠে কথা বলতে বলতে গরাদের সামনে এগিয়ে এল একটি পাগল।

'মিনতি? মিনতি? তুমি এসেছ মিনতি? এ্যা, তুমি তা হলে এসেছ আমার দুর্দশা দেখতে? হাঃ-হাঃ-হাঃ!' বিকট সে হাসির তরঙ্গ।

'আমি জানতাম!' হাসির রেশ মিশিয়ে বলতে লাগল লোকটি, 'আমি জানতাম তুমি আসবে আমার নিতে।'

তেইশ কিংবা চব্বিশ বছরের এক যুবক। একমুখ দাড়িগোঁফ। মলিন খাটো একটি শার্ট ও ধুতি পরনে। চোখ দুটি টক্‌টকে লাল। মাথার একরাশ চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে।

এক হাতে একটা গরাদে ধরে স্থির দৃষ্টিতে কট্‌মট্ করে সুমির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল সে। অন্য হাতে নীল মলাটে বাঁধানো খাতা একখানা।

'ওঃ, তুমি নও!' হঠাৎ যেন চমক ভাঙে লোকটির। 'তুমি মিনতি নও? তবে যাও!' বেদনার্ত-স্বরে কথা কয়টি বলে সজল চোখ দুটি ফিরিয়ে নিলে সে।

'এ আবার আর এক ধরণের পাগল',—কথাটা মনে মনে বলে এগোলাম।

'শুনছেন! ও মশায়! শুনে যান!' কয়েক পা যেতেই সেই লোকটির গলা ভেসে এল। পেছনে তাকাতে হাতের ইসারায় ডাক দিলে আমাদের। এগিয়ে গেলাম দু'জনে।

কিছুক্ষণ এক ভাবে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইলে লোকটি—'আচ্ছা, বলতে পারেন, আকাশ কেন মাথার উপর?'

বিব্রত বোধ করলাম একটু। উত্তর দেওয়া সোজা নয়। বড় শক্ত প্রশ্ন! তবুও সহজ সুরেই বললাম, 'মানে—আকাশ, আকাশ বলেই মাথার উপর। এর আর কি…'

কথা শেষ করতে হ'ল না আমায়। 'দূর—দূর।' উত্তর শুনে যেন ক্ষেপে উঠল লোকটি। 'হ'ল না—হ'ল না,' বলেই রাগের মাথায় খাতাটা ছুঁড়ে মারল আমাদের দিকে।

একটু ইতস্ততঃ করে কুড়িয়ে নিলাম সেটা। পাতা উল্টাতেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'আমার কথা।' তলায় নাম—'বরেন রায়, বি-এ।'

কৌতূহল জাগল মনে। বসে পড়লাম ঘাসের উপর। লোকটি ততক্ষণে আবার আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। বসতে দেখে একটু হেসে ফেললে। বললে, 'পড়বেন? তা পড়ুন!' শেষের কথাটি বলার সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। আবার উদাস চোখে চেয়ে রইল সে আমাদের দিকে।

দু'এক পাতা উল্টাতেই মন বসে গেল। পড়তে লাগলাম—

"আজকের দিনে একটা জরুরি কথা বলে রাখা দরকার মনে

করছি। তাই লিখে রাখি ডায়েরির পাতায় পাতায়। নচেৎ হয়ত আমার মৃত্যুর পরে সকলে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হতে পারে। আসল কারণ ডাক্তারেও ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা ইত্যাদি যা হোক একটা কিছু রিপোর্ট দিয়ে নশ্বর দেহটাকে ভস্মীভূত করার ব্যবস্থা হবে। পথ চলতে পায়ে ধুলো লাগার প্রতিকার হিসাবে চরণযুগল ঢেকে রাখার বদলে রাস্তা আবৃত করার যুক্তির মত শোনাবে সেটা। তাই···।

আমার বয়স যখন ষোল কিংবা সতের, ঠিক সেই সময় থেকে বাঁ-দিকের বুকের একটু নীচে একটা সূচ ফোটানো বেদনা সময় সময় অনুভব করে থাকি। এর জন্যে আগে আগে দু'এক মিনিট শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হ'ত। কিন্তু আজ শহর-বাসের পঞ্চম বৎসরে সেই বেদনা সাময়িকতার সীমানা ছাড়িয়ে যেন স্থায়িত্বের ভিত্তি-রচনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দিন ধরে সেটা বেশ তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করছি। অনেক সময় বুকটা দু'হাতে চেপে ধরেও আরাম পাই না।

আশঙ্কা হয়। হয়ত হঠাৎ শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হয়ে এ পারের খেয়া ভাসাতে হবে ওপারের পানে। মন্দ কি? সেই ভাল! সংসারের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতালাভের আগেই উপভোগ্য (?) জীবন শেষ করে সরে পড়া! অন্ততঃ পাগল আখ্যালাভের থেকে ত রেহাই পাওয়া যাবে?

কে যেন বলেছেন, 'প্রতি নারী ও পুরুষের ষোল থেকে কুড়ি বছর বয়সের কোঠায় আসার সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়া উচিত। তবেই হবে তাদের জীবন হয়ে উঠে আনন্দপূর্ণ, সার্থক!' কথাটা হয়ত সত্যি কথা।

আজ ভাবতেও ভাল লাগে সেদিনকার মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্তটির কথা। আর বেশী দেরি নেই বুকের স্পন্দন শেষ হতে। হাত পা, এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এসেছে। কণ্ঠস্বরে পূর্ণ জড়তা। শয্যাপার্শ্বে আত্মীয়স্বজন আসন্ন শোকের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, নিশ্চুপ। এমন সময় আমি দেখতে চাইলাম একজনকে। সে আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ নয়। কেবল মনের বিনিময় হয়েছিল সহজ সরল স্বচ্ছন্দভাবে। শুধু শেষ ইচ্ছে, পরিপূর্ণতায় তার বিকাশ লাভ ঘটে না। অসমাপ্তির বারিধিতেই হ'ল তার সমাধি?

মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। নামটা যেন বললাম কাকে। চমকে উঠল সে!

—'বলিস কিরে?'

তবুও আমার শেষ ইচ্ছে ভেবে আত্মীয়দের কেউ সংবাদ দিয়ে ডাকলেন ওদের বাড়ীতে। সেখানেও নাকি সকলে চমকে উঠেছিল। এমনই গোপনে ফুটেছিল আমাদের প্রণয়-পুষ্প।

সহানুভূতি মানুষ মাত্রেরই আছে। তাই বুঝি আমার মৃত্যু নিশ্চিত ও কোন প্রকার ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা নেই দেখে অনেকেই এল ও-বাড়ীর। এই ওদের প্রথম এ-বাড়ীতে পদার্পণ। সকলে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিলে শুধু ওকে—ত্রস্ত পদে একটু এগিয়ে এসে ক্ষণেক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মুখে শুধু একটু আর্ত্ত শব্দ উচ্চারিত হ'ল—'উঃ!'

অতি কষ্টে পাশ ফিরে তাকাতেই ওর ব্যথাম্লান পাণ্ডুর মুখে অজস্র অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লক্ষ্য করলাম। আমার অবাধ্য চোখ দুটোও জলে ভারী হয়ে এল। বুঝিবা উপচে পড়েও থাকবে দু'এক বিন্দু। সঙ্গে সঙ্গে ও ঝাপিয়ে পড়ল আমার রোগশয্যার উপর। আর বুঝি সহ্য করতে পারলে না! ভুলে গেল প্রতিকূল পরিবেশকে!

'বরুনদা এ আপনি কি হয়ে গেছেন···?'

একটু স্পর্শ! একটু অনুভূতি! আঃ! আর আমি কিছু চাই না! এই ত সুখ! এই ত স্বর্গ! ব্যস, শেষ হোক আমার তেইশ বছরের পরিপূর্ণ জীবন!"

কাঁধে হাত পড়ল। চমকে তাকালাম ফিরে। স্মৃমি এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। আবার পড়তে লাগলাম—

"কিন্তু হায়, মরা আমার হ'ল না। মৃত্যুর হিমশীতল নীড়ের কাছটিতে গিয়েও আবার ফিরে আসতে হ'ল। হয়ত চিত্রগুপ্তের পাতায় আমার নামের পাশে লাল কালির দাগ পড়তে অনেক বাকি ছিল কিংবা ভুল করে পড়ে গিয়েছিল দাগ, পরে তা 'ইরেজ' করে সংশোধন করা হ'ল হয়ত।

শুনলাম খুব বড় ডাক্তার এসেছিলেন এর পর। তাঁরই চিকিৎসায় আমি বেঁচে উঠেছি প্লুরিসি থেকে। সেইজন্য নাকি তার কাছে আমার ঋণী থাকা উচিত। কিন্তু আর কারু কাছে নয়? ওর কাছে? ডাক্তার তো বৃত্তিজীবী। চিকিৎসা তার ব্যবসা। আর ও?

নার্সের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল রোগীর যত্ন নেবার জন্য। ডাক্তার বলেছিল—'আমি কেবল চিকিৎসাই করতে পারি। প্রাণ দিতে পারি না। তা নির্ভর করে আপনাদের উপর। বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে রোগীর। নচেৎ···আমি কোন আশা দিতে পারি না।'

কিন্তু কে নেবে সে দায়িত্ব? নার্স? না। দেশ থেকে মা-বাবা এসে হাজির হলেন। সাগ্রহে সে ভার নিতে চাইলেন তাঁরা আহারনিদ্রা ত্যাগ করে। কিন্তু এ সুযোগ সেও ছাড়লে না। সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবার প্রাচীর ভাঙবার এ সুবর্ণ-সুযোগ কখনও ছাড়া যায়? গোপন প্রেমের যে অঙ্কুর এতদিন ছিল মৃত্তিকার অন্তরালে, এবার তা প্রকাশের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পরিপূর্ণতার সিংহদ্বার-সকাশে এসে।

সকলকে বাধা দিয়ে ও এগিয়ে এল আমার বিছানার পাশে।

'এ কাজটির ভার আপনারা আমাকেই ছেড়ে দিন!' আকুতিভরা আবেদন ওর।

'হাঁ মা, তাই ভাল। ঠিকই বলেছ?' মা-বাবা উত্তরেই উচ্ছ্বসিত কান্নার ভেতর থেকে সায় দিয়ে ওঠেন। 'তোমার

বরেনদাকে তুমি বাঁচিয়ে তোল মা—বাঁচিয়ে তোল! আমাদিকে শুধু ওর প্রাণটুকু ফিরিয়ে দাও! আর কিছু চাই না!'

একবার শুধু ক্ষণিকের জন্যে ওর লজ্জারক্তিম মুখখানি লক্ষ্য করলাম। তারপর···।

কতদিন দেখেছি ওকে আমার বিছানার পাশে পাণ্ডুর চিন্তাকুল মুখে রাত্রিজাগরণ করতে। উঃ, সে সব ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না কিছুতেই।

গভীর রাত্রি, ঘরে গোলমাল নিষেধ। তবুও যারা নিস্তব্ধভাবে আমার শয্যাপার্শ্বে বসেছিল এতক্ষণ, সব উঠে গেছে বিশ্রাম নিতে। ওকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন মা, একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'ল না সে।

সকলে চলে যাবার পর ঘড়ি দেখে আমায় ওষুধ একটা খাওয়ালে। অতি কষ্টে বললাম আমি—'মিনু, তুমি একটু বিশ্রাম নেবে না? কেবলই একটানা আমার সেবা করে যাবে? লক্ষীটি, মাকে একটু বসতে দিয়ে তুমি খানিক জিরিয়ে নাও!'

উত্তরে ও আমার কাছটিতে সরে এসে আরো একটু ঘন হয়ে বসল। তারপর মিনতিভরা কাতর কণ্ঠে বলল—'বরেনদা, আপনি তো জানেন, এটা আমার কত আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত! এ মধুক্ষণের এতটুকু হারাতেও আমার মন ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। সুতরাং আপনি আমার এ অন্যায় অনুরোধ করবেন না! রাখতে পারবো না?'

আমি ওর শরীরের অজুহাত দেখাতে গেলাম। কিন্তু ফল হ'ল না, ও আমার কথা বলতেই দিলে না! ডাক্তারের নিষেধ।

এর পর আবার সেই গভীর নিস্তব্ধতা। চোখ খুললে কেবল ক্ষণিক দৃষ্টিবিনিময়, কপোলদেশে ওর করস্পর্শের শীতল অনুভূতি আর ঘড়ির অবিরাম টিক্ টিক্ শব্দ। চোখ বুজে পড়ে আছি, ঘুম আর আসে না। ভাবছি কেবল ওরই কথা। বড় ভাল লাগছিল ভাবতে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনগুলির কথা।

পাশাপাশি বাড়ী না হলেও খুব বেশী ব্যবধান ছিল না। মাঝে দু'তিনটে বাড়ী মাত্র। বছর দুই হবে আছি এ জায়গাটায়। গোড়া থেকেই দেখতাম ওকে বিকেলে ছাদে বই হাতে ঘুরে বেড়াতে। আমিও ঐ সময়টা থাকতাম ছাদে। বেশ কিছুদিন কাটল এইভাবে। কোন পরিবর্তন নেই। হঠাৎ এক দিন কলেজ-ফেরার পথে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। স্কুল থেকে ফিরছিল ও। আমার হাতে বই দেখে ওর কপালটা যেন কুঁচকে উঠতে দেখলাম একটু। সেটা আবার লক্ষ্য করলাম বিকেলের ছাদে। এর পর ক্রমাগত কয়েক দিন দেখেছি ওকে আমার দিকে নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে থাকতে।

ক্রমে গাম্ভীর্য্য কেটে গেল। চারি চক্ষুতে চাওয়ার মাঝে দেখা দিল মিষ্টি হাসির ঝলক। ভাবতে লাগলাম। কারণ কি এ হাসির? দু'এক দিন চুপচাপ কাটালাম। নাঃ, আর নয়। বুকে আমার দোলা লাগল। আমার ভাবলাম অনেক কিছু—মাথামুণ্ডু নেই সে চিন্তার।

আবার এক দিন পথে দেখা হয়ে গেল আচমকা। কিন্তু··· কথা বলতে কিংবা আলাপ করতে পারলাম না। ভাবলাম, যদি কিছু মনে করে? যদি জিভে আঙুল দিয়ে শিষ দেওয়া ছেলেদের দলে ফেলে দেয় আমাকে? যদি ভাবে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার জন্যে আমি লালায়িত? তবে?

আবার ভাবলাম, না, মনে কিছুই করবে না, বলেই ফেলি কিছু। কিন্তু হায়, কথা বলতে গিয়ে দেখি আমার বাক্‌শক্তি কখন লোপ পেয়ে গেছে! গলাটা কে যেন চেপে ধরে আছে কঠোর হস্তে! কোনমতেই একটু টু-শব্দও বের করতে পারলাম না। শুধু অনুভব করলাম দ্রুত বক্ষস্পন্দন আর লক্ষ্য করলাম ওর সেই মিষ্টি চাপা হাসি।

সুযোগের অপঘাত মৃত্যু ঘটল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এবার সুযোগ এলে ঠিকই কথা বলব! সুযোগও এল, কিন্তু হায় রে, মনের হাজার কথার একটিও ঠোঁট ছাড়িয়ে বের হবার আগেই স্কুলের পথ শেষ হয়ে গেল, ওকে স্কুল-গেটে মোড় নিতে হ'ল।

আবার সময় চলতে লাগল গতানুগতিক ভাবে। ঠিক করলাম, নাঃ, এমন করে আর চলে না। মুখে যখন কথা ফুটছে না, তখন দেখা যাক কালি-কলম কি বলে? আর দেরি নয়! লিখতে বসে গেলাম কবিতা আর তার সঙ্গে ক্ষুদ্র এক লিপি। সুযোগ করে ওরই সামনে ফেলে দিলাম সেটি এক দিন ওদের দু' হাত উঁচু প্রাচীর-ঘেরা এলাকার মধ্যে।

এক দিন বাদে উত্তর পেলাম! ও লিখেছে—

"বরেনদা,

মানবমনের চিরন্তন মুখপত্র চিঠি। এই চিঠিতেই মিলনের আনন্দ, বিচ্ছেদের বেদনা যুগ যুগ ধরে প্রকটিত। এতেই সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম রসানুভূতি আর কবির অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। আপনার উত্তরের আকুতি শুধু দুটি কথা 'ভালো লাগার' রূপান্তরিত হয়ে আমার মনে দোলা লাগিয়েছে।

"হায়রে রাজধানী পাষাণ কারা—পাষাণগাথা অট্টালিকাগুলো যেখানে প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য্যকে ঢেকে রেখেছে, প্রকৃতি যেখানে আপনার পাখা মেলা দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেখানেও অপরিসর গলিপথে বিকীর্ণ ক্ষীণ সূর্য্যালোক আর ক্ষুদ্র একটা ছাদে গুটিকতক রজনীগন্ধার সুরভি আপনার মনকে নিয়ে গেছে মুক্ত কাব্যলোকে। আপনি কবি! কিন্তু নিতান্ত বাঙ্গালীঘরের সাধারণ মেয়ে আমার পক্ষে আপনার মত ভাবজগতে প্রবেশাধিকারের পরোয়ানা লাভ করা দুঃসাধ্য!

সুতরাং আমার মনের অসংবদ্ধ প্রলাপ, আমার বয়ঃ-সুলভ চপলতা মনে করেই আপনাকে শুনতে হবে। অনুগ্রহ করে আমার এই বাজে কথাগুলো আপনার কাজের আর অমূল্য সময়ের একটু ক্ষতি করেই শুনুন। হয়তো আমার এই অনুরোধ আপনাকে—'অতিথির অসময়ে অযাচিত অনুগ্রহ -অভাজন 'পরে',

এই বৈষম্য বিনয় প্রকাশের পর্য্যায়ে টেনে নিয়ে যাবে। তবুও আমায় ক্ষমা করুন।

শুনেছি আপনি চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষার্থী। আপনি কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দেবেন তা জানাবেন?

বিকেলের পড়ন্ত রোদ যখন অবসন্ন সন্ধ্যার ধূসর-ছায়ামণ্ডিত হয়ে বাঁকাভাবে ছাদের উপর পড়ে, তখন দেখেছি আপনার পাঠে নিমগ্ন শান্ত মূর্ত্তি। মন চলে যায় প্রাচীন ভারতের তপোবনে তপস্যানিরত তাপসদের মাঝে। মনে হয় না মেনকার মত আপনার ধ্যান ভঙ্গ করি। তাই কৌতুকোচ্ছল মনকে সংযত করবার জন্য ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পায়চারি করি।

কিন্তু আপনার বাঁকানো দৃষ্টি, মৃদু হাসি যখন আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাসকে আমার কাছে ধরা পড়িয়ে দেয়, তখন আমার ভালবাসাও আমার কাছে অপরাধ বলে মনে হয় না। তাই সন্ধ্যায় পড়ার ঘরের দরজা উন্মুক্ত করে রাখি শুধু ক্ষণিক দৃষ্টিবিনিময়ের জন্যে।

দেশকালপাত্রের গণ্ডী পেরিয়ে যে 'ভাললাগা' প্রেমিকের প্রেমে জুগিয়েছে ইন্ধন, নারীপুরুষের চিরন্তন সম্বন্ধকে বেঁধে দিয়েছে একই বন্ধনের ডোরে, আমাদের মাঝেও সেই ভাললাগার সেতু রচিত হয়েছে। আপনার ভাললাগার আনন্দের আস্বাদ আমিও পেয়েছি। তাই সুগভীর ভালবাসায় আমার ভাললাগার তরী বোঝাই করে আপনার কাছে পাঠালাম। আশা করি গ্রহণ করবেন।

—মিনতি"

এর পর আমার ভাষার বাঁধ ভেঙে গেল। হরেক রকম প্রশ্নের অবতারণা করে ছ'পাতা উত্তর লিখলাম। উঃ, সে-কি তীব্র আনন্দ! চিঠি লেখার মধ্যে যে এত আনন্দ নিহিত আছে তা প্রথম বুঝতে পারলাম সেদিন। অত্যুগ্র আনন্দে ছেলেমানুষের মত হাজার বাজে কথা লিখে গেছি। মনে হতে লাগল আমার জীবনের সবকিছু খুঁটিনাটি জানিয়ে ফেলি একটি মুহূর্ত্তে এই মনের মানুষটিকে।

আবার আগের মত উত্তর পেলাম।

ঠিক এই সময়ে কলেজের ছুটি হ'ল, গ্রীষ্মের ছুটি। স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ। ওর দুই ভাইও পড়ে কলেজে। ছুটির দরুন সকলেই বাড়ীতে থাকায় ওর বিশেষ অসুবিধে হতে লাগল—লুকিয়ে চিঠি লেখবার অসুবিধে। আমিও এই সময় দেশে চলে যাই বেড়াতে। কিন্তু থাকতে পারলাম না বেশী দিন। চলে এলাম কয়েকদিন বাদেই।

এই সময় বাসার কেউবা আমায় খানিক সন্দেহের চোখে দেখে থাকবে। তাই তা মুছে ফেলতে আমি কৃত্রিম উদাসীনতার ভাব নিয়ে দিনকয়েক ছাদে উঠা বন্ধ করে দিলাম। এতে কিন্তু ও আবার আমায় ভুল বুঝে বসল। অভিমানভরা এক বিরাট চিঠি পেলাম দু'এক দিনের মধ্যেই। এক জায়গায় লিখেছে—'অভিমান আর বিরহেই প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। তাই আমাদের প্রেম যোবনের কোঠায় পৌঁছেছে দেখে আমি পুলকিত।'

আর এক জায়গায়—'আমার সম্বন্ধে আপনি যে ভুল ধারণা পোষণ করেছেন তা নিতান্ত অমূলক। আমি আপনাকে ভুলে যেতে পারি না। কারণ যে সুর আমার হৃদয়-বীণায় একবার ঝঙ্কার তুলেছে তার মধুর রেশ এখনও আমার প্রতিটি তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে উঠছে।

আপনার অদর্শনে কত উৎসবমুখর সন্ধ্যা আমার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। সে উজ্জ্বল আনন্দময় চোখের বদলে সর্ব্বত্রই যেন এক পাণ্ডুর বিবর্ণতার ছায়া আমার পরিবেশকে আনন্দহীন ও মূক করে দিয়েছে। শুধু পথ চেয়ে বসে থাকা। প্রাঙ্গণে যদি কোন শিরীষ-গাছ থাকত তা হলে হয়ত তার মর্ম্মরধ্বনি আমার মনে "সে কি আসে?" এই প্রশ্নই জাগিয়ে তুলত।'

ছাদে গত ক'দিনের অনুপস্থিতির প্রকৃত কারণ জানিয়ে আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম। আরও অনেক কি সব লিখেছিলাম, মনে নেই। শেষে জানালাম—"মিনতি, মনকে যদি কাঁচের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তাতে একবার কোন রেখা কাটলে নষ্ট হবার আগে তা মোছা সম্ভবে না। সুতরাং··· তোমার সুকুমার মনের যে ছবি আজ আমার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে তা মুছে যাবার কথা নয়।"

মিটে গেল ভুল বোঝার পালা। আবার হাসি ফুটল ওর সুন্দর মুখমণ্ডলে। আবার আমি ছাদের যাত্রী হলাম আগের মতই।

কালের প্রহর-গণনায় তালে তালে এই ভাবে এগিয়ে গেছে সময়—দিন—মাস। অবশেষে কঠিন রোগের কবলে পড়ে শয্যা নিতে হ'ল আমায়। সেই প্রসঙ্গই আবার সুরু করি।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং···!···ঘড়ির এলার্মটা বেজে উঠল। টপ করে সেটাকে চেপে দিয়ে ও আমায় ডাকল—'বরেনদা, ওষুধটা খেয়ে নিন।'

—ওষুধ খেলাম।

আবার সব চুপচাপ। এমনি করে কাটতে লাগল রাত—দিন। আবার রাত—কত দিন। শেষে এক সময় সেরে উঠলাম আমি।

এই ঘটনার পরে আমার বাড়ীর অনেকেই ওকে খুব স্নেহের চোখে দেখতে লাগল। প্রকাশ্যেও অনেক কথা আলোচনা করতে শুনেছি। যেমন—'ক্ষতি কি? মেয়েটি একটু ময়লা সত্যি কথা। কিন্তু যেন সৌন্দর্য্যের ডালি! কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেহের গঠন! ওদের ছুটিতে মিলন হলে···আর ওকে ছাড়া ত আমরা এক রকম 'নবু'কে ফিরেই পেতাম না!' ইত্যাদি।

'নবু' আমার ডাকনাম।

কিন্তু ওর বাড়ীর দিক থেকে ওকে একটা চাপা ক্রোধের সম্মুখীন হতে হ'ল। বিশেষ করে আমরা একই জাত ছিলাম না। ওরা উঁচু ঘর।

বিধাতা বলে যদি কেউ থাকেন তবে নিশ্চয় তিনি অট্টহাস্য করেছিলেন সেদিন অন্তরাল থেকে। তাঁর সেই কল্পিত হাসির রেশ আজ আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে প্রত্যক্ষ করছি। হৃদয়ের

কোমলতম অনুভূতিতে তার তীব্রতা ধাক্কা লেগে বহ্নিদাহে ফেটে পড়েছে আমার চারিদিকে—ভারী করে তুলেছে আমার চারিপাশের বাতাসকে—নির্জীব, বিষাক্ত করে দিয়েছে আমার পরিবেশকে—গাছের সুন্দর ফোটা ফুল আজ জলন্ত আগুনের ফুলকি বলে মনে হয়। তাই চোখ ফিরিয়ে নিই সেদিক থেকে।

পরের দিন ঘুরল না, ওকেও শয্যা নিতে হ'ল। ডাক্তার বললে, 'অতিরিক্ত চিন্তা ও রাতজাগার ফলেই এ রোগের উৎপত্তি। স্নায়ুর দুর্বলতা বড় বেশী। গোড়া থেকে যত্ন না নিলে ভবিষ্যৎ ফল খুব খারাপ হতে পারে হয়ত।

আর হয়ত নয়! পাঁচ ছ'দিন বাদে 'কেস সিরিয়াস' বলে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লে ডাক্তার।

আমার মা-বাবা সকলেই চলে গেছেন দেশে। আমারও যাবার কথা। কিন্তু অত্যধিক দুর্বলতার জন্যে কয়েকটা দিন আটকে গেলাম। ইতিমধ্যে ওদের বাড়ীতে ডাক্তারের গতায়াত লক্ষ্য করলাম এক দিন। মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু কখনও ওদের বাড়ীতে প্রবেশ করি নি আমি। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়।

ওর মা আমাকে ডাকার কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও নিষেধ করেছে। কেন জানি না! হয়ত জানি।

ও হয়ত ভেবেছিল, আমি ওর সেবা করতে গিয়ে আবার পাল্টে পড়ব? কিংবা এটা ভেবে থাকবে আমি লজ্জায় যাব না? অথবা মা কথাটা মুখে বললেও অন্তরে সায় নেই? আবার হয়ত লজ্জার আবরণে নিজেকে ঢাকতে চেয়ে থাকবে বা?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুঝি আর পারলে না মনের কথা চেপে রাখতে! রোগ তার উপসর্গ সহ ক্রমেই এগিয়ে পা দিলে বিকারের কোঠায়। সেই ঝোঁকে ও নাকি কেবলই আমার নাম করেছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত আমার ডাক পড়ল ওদের অন্দরে! মিনতির মা নাকি, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

আমাকে দেখে ওর মা বললেন, 'ওরে মিনু, দেখ, কে এসেছে দেখ তোকে দেখতে! তোর বরেনদা এসেছে রে! মিনু। মিনু! ও মিনু! দেখ মা, চোখ মেলে দেখ—হাঁ—তোর বরেনদা, তোকে দেখতে এসেছে।' অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর তাঁর। খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে মিনতি বিকারের ঘোরে বলতে লাগল—'বরেনদা, আমাদের স্বপ্ন কি সার্থক হবে না? মিটবে না আমাদের অপূরন্ত তৃষ্ণা? মিলবে না জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর?'

আবার নিজেই উত্তর দিল—'কে বলেছে হবে না?' নিশ্চয় মিটবে! সমস্ত পৃথিবীও যদি দাঁড়ায় আমার বিরুদ্ধে তবু হাঁ, তবুও চাইব আমি আপনাকে।'

উৎকর্ণ হয়ে তার কথাগুলি শুনতে লাগলাম। অসম্বদ্ধ প্রলাপ ত নয়। তার মর্মচৈতন্য থেকে যেন বেরিয়ে এল অন্তরের সত্যবাণী।

হঠাৎ এক বার চীৎকার করে ছুটতে চাইল মিনতি। ওর মা ধরে ফেললেন খপ্ করে। বললেন, 'এই রকম করে সোজা উঠে পড়তে চায় বাবা, মাঝে মাঝে। ডাক্তারে বলে বিকার।' এই বলে তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।—'কি হবে বাবা! আমার মিনুকে তুমি বাঁচাও বাবা, বাঁচাও?'

কান্নায় আমারও কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিল। তবুও কোনমতে তা চেপে রেখে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা।

ও আবার অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থাতেই বিড়বিড় করে বকতে আরম্ভ করলে!

বিছানার এক পাশে বসে ডাকলাম—'মিনতি! মিনতি!'

পেছনে তাকাতেই সকলের উৎসুক চোখের দৃষ্টি দেখলাম আমার উপরেই স্থির হয়ে নিবদ্ধ! সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলাম! তবুও যেন উৎসাহ পেলাম তাঁদের ঐ চাউনিতে! আবার ডাকলাম 'মিনতি! মিনু! কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

আর কিছু বলতে পারলাম না! যেন আর কিছু বলার নেই! এর বেশী যেন আর কিছু বলা যায় না।

হঠাৎ ও জোরে জোরে বলতে লাগল—'দেখ মা, তোমরা আমার জীবনকে আর কারুর সঙ্গেই বেঁধে দিয়ো না। হাঁ, বরেনদা বলেছে, মন একটা কাঁচ! তাতে কোন আঁচড় লাগলে ভাঙার আগে তা মোছা সম্ভবে না!'

অঘোর অবস্থাতেই হাঁপিয়ে ঘেমে উঠল মিনতি। তারপর আবার চীৎকার করে বলতে লাগল—"আর একটা কথা বলে রাখি, তাই বলে তোমরা আবার যেন তোমাদের অবাঞ্ছিত বরেনদার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তুলো না! তাতেও আমি মত দিতে পারবো না।'—ঘরের আর সবাই তার এই এলোমেলো কথাগুলোকে প্রলাপ ভেবে অবাক হলেন, কিন্তু এর অর্থ আমার কাছে যেন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মিনতির অভিভাবকেরা অগত্যা আমার সঙ্গে তার বিয়ে যদিই বা দেয় তা হলেও আমি চির-কাল থাকব তাদের অপ্রিয় হয়ে। সেটা তাদের আচরণে প্রকাশ না পেলেও প্রেমের এত বড় অসম্মান মিনুর পক্ষে অসহনীয়। তাই সে মিলনে তার প্রেমকে সার্থক না করে বিরহে পরিশুদ্ধ করে তুলতে চায়।

আবার জ্ঞান হারাল মিনতি।

এই সময় একজন নার্স সঙ্গে করে ওর এক ভাই ঢুকল ঘরে। রোগীর সেবার ভার নিয়ে সকলকে ভিড় ছেড়ে দেবার কড়া অনুরোধ করলে নার্স। চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল সকলেই। আমিও কোনরকমে টলতে টলতে বাড়ী ফিরেছিলাম।"

এর পর থেকে অক্ষরগুলো অস্পষ্ট। গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে হিজি-বিজি লেখা—মাঝে মাঝে এক একটি অসম্বদ্ধ বাক্য যার কোনো অর্থপরিগ্রহ হয় না। পাতা উল্টাতে লাগলাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে অসংখ্য বার লেখা শুধু তিন অক্ষরে একটি নাম—মিনতি। তবে

যেন অন্তরের সবটুকু প্রীতি উজাড় করে দিয়ে লিখে রেখেছে ইষ্টদেবীর নাম।

মন ডুবে গিয়েছিল এক মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডির মধ্যে, সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল টের পাই নি। মুখ তুলে দেখি লোহার গরাদে দেওয়া দরজার ভেতর থেকে যুবকটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে খাতাখানির দিকে। এক অমূল্য সম্পদ হস্তান্তরিত করে দিয়ে সে যেন তা ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে।

এই হতভাগ্যের প্রতি করুণায় আমার চোখ দুটি আর্দ্র হয়ে এল। নিজের অজ্ঞাতে মর্ম্মস্থল মথিত করে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। সুমির চোখেও অশ্রুর বন্যা! আমার কাঁধের উপর তপ্ত অশ্রুকণার স্পষ্ট ভিজে দাগ!

খাতাটা ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, পাগল সেটা হাত পেতে নিলে, কি মেঝের পড়ে গেল লক্ষ্য করি নি।

খানিকদূরে এগিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। দেখি যুবকটি খাতাখানি বুকে জড়িয়ে ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, দুই চোখে তার অশ্রুর প্লাবন।

জন ডিউয়ি

শ্রীক্ষেত্রপাল দাসঘোষ

গত ১লা জুন দ্বিনবতিতম বর্ষে বিশ্ববিশ্রুত মার্কিন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউয়ির তিরোধান ঘটেছে। শিক্ষা-জগতে যে নূতন ভাবসম্পদ ও বহুদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর যে প্রভাব তিনি রেখে গেছেন তাতে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা আজ শিশুকেন্দ্রিক ও আনন্দময় কর্ম্মকেন্দ্রিক; ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠ্যভারাক্রান্ত বাস্তব-বর্জ্জিত বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার মোড় যেসব যুগপ্রবর্ত্তক ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জন ডিউয়িই বোধ হয় কালানুসারে সর্ব্বপ্রথম। এটাই তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয় ও গৌরব।

ডিউয়িকে মার্কিন দেশীয় ধীশক্তির প্রকৃত প্রতীক ও অভিব্যক্তি বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। কথাটা মূলতঃ ঠিক, কারণ কর্ম্মপ্রবণ মার্কিন দেশের চিন্তাধারা সত্যিকারের প্রকাশ পেয়েছে ডিউয়ির দর্শন ও শিক্ষানীতিতে, তাই মার্কিন দেশ অতি সহজভাবে গ্রহণ করেছে তাঁর শিক্ষাদর্শনকে, অনুপ্রাণিত করে তুলেছে তার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সেই মন্ত্রে। ফলে ডিউয়ির "পরীক্ষাগার বিদ্যালয়ে" নিরূপিত সত্য আজ শুধু মার্কিন দেশেই নয়, সমস্ত শিক্ষা-জগতের অন্যতম আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চীন, জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ-আমেরিকা ও আফ্রিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। ডিউয়ি সমস্ত শিক্ষা ও দর্শন-জগতের চিন্তাধারাকেই শুধু প্রভাবান্বিত করেছেন তা নয়, প্রত্যেকটি প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রতীক হিসাবে তিনি গ্রাহ্য হয়েছেন জগতের বিদ্বৎসমাজে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন বার্লিংটনে সাধারণ পরিবারে ডিউয়ির জন্ম হয়। ছোট বেলা থেকেই ডিউয়ি চিন্তাশীলতা ও ধীশক্তির পরিচয় দিতে লাগলেন। পনর বৎসর বয়সে ভেরমণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে উনিশ বৎসর বয়সে অপ্রাপ্তপূর্ব্ব নম্বর পেয়ে সসম্মানে স্নাতকপদে বৃত হন। অল্প কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি দর্শন চর্চ্চা করবেন স্থির করলেন এবং মাসীর কাছ থেকে ৫০০ ডলার ধার করে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়তে লাগলেন। শীঘ্রই তিনি শুধু সেখানে স্কলারশিপই পেলেন না, একটি শিক্ষকের পদও জুটল দর্শনের ইতিহাস শিক্ষা দেবার জন্য। পরে তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শিক্ষকের পদ পেয়ে ১৮৮৮ সন পর্য্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করেন এবং তাঁর এক প্রিয় ছাত্রীকে বিবাহ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আসে শিক্ষা-জগতে তাঁর শাশ্বত অবদান রেখে যাবার সুযোগ, সেই বৎসর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা যুক্ত এই বিভাগের অধিনায়ক পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। এইখানেই তিনি তাঁর ডিউয়ি পরীক্ষাগার বিদ্যালয় (Dewey Laboratory School) স্থাপন করেন এবং তাঁর পরিকল্পিত হাতে-কলমে শিক্ষা বা কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। ১৯০৪ থেকে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর, মার্কিন দেশের বিদ্বৎসমাজ তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক বিজ্ঞানের নানা পরিষদের সভাপতি-পদেও বৃত হন। মেক্সিকো, চীন, জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এল তাঁর আমন্ত্রণ তাঁদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করে দেবার জন্য, সোৎসাহে তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেসব দেশ নিজের দেশ মনে করেই শিক্ষার নূতন নীতি প্রবর্ত্তনের খসড়া তৈরি করলেন সেই সেই দেশোপযোগী—সংস্কারের একটা আলোড়ন পড়ে গেল চারিদিকে এবং আজ সে

সব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রগতিশীল বলে জগতে পরিচিত হয়েছে।

এই তো গেল ডিউয়ির বাইরের পরিচয়, কিন্তু এই বিশ্ব-বিশ্রুত দার্শনিক কি করে দর্শনের সূক্ষ্ম বিচারের ভিতর শিক্ষাসমস্যা বা শিশু-চরিত্রের চিরন্তন রহস্যগুলো নিজের উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতেন তার একটি সুন্দর গল্প আছে। অন্যান্য দার্শনিকের মতই তিনি ছিলেন আত্মভোলা মানুষ। অনেক জিনিষ অনেক সময় তাঁর খেয়ালে আসত না কিন্তু কোন কোন দার্শনিক যেমন নিজের ছোট ছেলে-মেয়েকেই চিনতে পারেন না ডিউয়ির কোন দিনই সে অবস্থা হয় নি, হতেও পারত না। কারণ তাঁর ছিল শিশুগত প্রাণ, যে-কোন শিশু দেখলে তাঁর হৃদয়ে স্নেহরস স্বতঃউৎসারিত হয়ে উঠত। তিনি দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করছেন বা কিছু লিখছেন, এমন সময় দেখা গেল তাঁর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁর কাঁধের উপর ঝুলে পড়ছে বা তাঁর কোলে বুকে পাহাড়ের মত বেয়ে উঠছে—খেলা ভুলে চিন্তা ভুলে, দার্শনিক তাদের আদর করে পাশে বসালেন, গল্পসল্প করলেন বা তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিলেন। শত কাজের মধ্যেও শিশুর প্রতি সস্নেহ ব্যবহারের ভেতর দিয়েই সংসাধিত হয়েছিল শিক্ষার সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য যোগাযোগ, তা থেকেই এসেছিল শিশু-চরিত্রের অনুদ্ঘাটিত রহস্যের ভেতর অন্তর্দৃষ্টি।

শিক্ষকের প্রতিও তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। মার্কিন দেশে আজও বহু স্থানে শিক্ষকের সাম্মন বা বেতন অরুন্তুদ অবস্থার সৃষ্টি করছে। তিনি অসঙ্কোচে তাই ঘোষণা করেছিলেন—"শিক্ষার প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর অভাব—এমন শিক্ষক যাঁরা শিক্ষাকে ব্রতহিসাবে গ্রহণ করে একটা মহাপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন। কাজেই প্রয়োজন—যেসব ছাত্রছাত্রী মেধাবী যাঁদের ধীশক্তি ক্ষুরধার তাঁদের ব্রতে দীক্ষিত করা, তাঁদের সম্মান দেওয়া, তাঁদের উপযুক্ত আর্থিক পুরস্কার দেওয়া।" শিক্ষায় তিনটি জিনিষ প্রধান—শিশু, শিক্ষক ও সমাজ। শিক্ষক, শিক্ষকের চরিত্র, তাঁর শিক্ষা-প্রণালী, তাঁর কর্ম্মকুশলতা—এ বিষয়ে তিনি বার বার তাঁর বইয়ে ও বক্তৃতায় জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; তাই পাঠ্য-বিষয়-বস্তুর চেয়ে শিক্ষকের স্থান যে অনেক উপরে, তাঁর গুরুত্ব যে অনেক বেশী সে চেতনা বহু প্রগতিশীল দেশে আজ এসেছে, অনুন্নত দেশেও আস্তে আস্তে আসছে।

এখন ডিউয়ির শিক্ষাদর্শন ও মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন, নচেৎ তাঁর শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক জিনিষই হয়ত দুর্ব্বোধ্য বা অস্পষ্ট থেকে যাবে। একটা কথা প্রথম থেকেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষা ও দর্শনের ভিতর কোন প্রভেদ তিনি কোন দিনই মেনে নেন নি, এরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শন চিন্তাপ্রসূত পথ দেখিয়ে দেয়, শিক্ষা জুগিয়ে দেয় সে পথে চলবার শক্তি, নানা উপায় উদ্ভাবন করে সে পথে চলে লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হবার। কাজেই দর্শন ও শিক্ষা একই সত্যের বিভিন্ন রূপ—একটি চিন্তার রূপ, অন্যটি কর্ম্মের। এরা সমান্তরাল রেখায় চলে না, এরা প্রতিস্পর্দ্ধী নয়, চিরদিনই পরস্পরচুম্বী। এই চিন্তা, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের একত্র সমাবেশেই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে ডিউয়ির শিক্ষাদর্শন।

ডিউয়ি মূল্যবাদী বা ফলবাদী দার্শনিক, আদর্শবাদী নন্। তাঁর কাছে কোন জিনিষের তাৎপর্য্য বা মূল্য চিরন্তন কিংবা শাশ্বত সত্যের দোহাই দিয়ে নিরূপিত হয় না, মানুষের জীবনে তার কর্ম্মনিচয়ের উপর কোন্ জিনিষের কি ফলাফল তার উপর নির্ভর করে তার মূল্য। কাজেই সমস্ত জোরটাই গিয়ে পড়ে অভিজ্ঞতার উপরে: শিশু সামাজিক পরিবেশে কাজ করতে করতে অপর পাঁচ জন শিশুর সংস্পর্শে এসে যে সত্যের সম্মুখীন হয়—যে সামাজিক নৈতিক চারিত্রিক বোধ তার জেগে উঠে, তাতেই বুঝে যায় কোন্ কাজটির বা কোন্ ভাবটির কি মূল্য। সততা, দয়া, সত্য কথা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণনিচয় মানব-জীবনের শাশ্বত সম্পদ বলে উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দিলে চলবে না, কারণ সেটা গ্রাহ্য হবে না অন্তরে—তার মূল্যের ঘরে পড়বে শূন্য, কিন্তু শিশু যখন তার সামাজিক পরিবেশে বাস করে দিনের পর দিন দৈনন্দিন কাজের ভেতর দিয়ে এই গুণনিচয়ের সত্যিকার তাৎপর্য্য বুঝতে পারবে, সেদিনই হবে তার সত্যের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার নিকষে প্রকৃত মূল্য দিতে শিখবে এই সব আদর্শকে। ডিউয়ির মতে যে আদর্শকে জীবনের ভিতর দিয়ে সুফলপ্রসূ হিসাবে শিশু গ্রহণ করতে পারে নি, তাকে তার আদর্শ বলে মানা সুকঠিন, হয়ত অন্যায়। জীবনে যে জিনিষের মূল্য বা প্রয়োজন আছে তাই সত্য, তাকেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, সুতরাং শিশুর জীবনে যার প্রয়োজন নেই, তা জোর করে শিশুর ঘাড়ে চাপানোর কোন অর্থ হয় না, তাতে শিক্ষা হয় বিফল। ডিউয়ির এই মতবাদ বা মূল্যবাদ অবশ্য প্লেটো বা এরিষ্টটলের আদর্শবাদ থেকে একেবারে ভিন্ন এবং দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে এর বিরোধীও আছেন। যথা: বার্ট্রাণ্ড রাসেল; তিনি বলেন মূল্যবাদের মাধ্যমে মানবসংস্কৃতি স্থায়ীভাবে গড়ে উঠতে পারে না, শাশ্বত আদর্শ ছাড়া জীবনপথে চলা সুকঠিন।

ডিউয়ির যে দর্শন তাতে বিবর্ত্তনবাদের যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। তাঁর মতে মন জিনিষটা এক দিনেই হঠাৎ জন্মে নি; বিবর্ত্তনের পথে স্বাভাবিক ভাবেই জৈবিক প্রয়োজনের

আগিদে এসেছে সচেতন মন। জ্ঞান বস্তু-নিরপেক্ষ জিনিষ নয়; বস্তুর সংস্পর্শে এসে আমাদের যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় তাই হ'ল জ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা চিন্তা দ্বারা মার্জ্জিত না হলে জীবনের ইমারত এর উপরে গড়া যায় না। সুতরাং এই সমস্যাসঙ্কুল জীবনে (শিশুরই হোক বা বয়স্কেরই হোক) চিন্তা ব্যতীত সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই; এই চিন্তা থেকেই মনের উৎপত্তি, মন আছে বলেই কিছু চিন্তা আসে না। কাজ করতে করতেই নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, চিন্তানিয়ন্ত্রিত কর্ম্মে সে সমস্যার সমাধান হয়; কাজেই কর্ম্মের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা হয়, মনের বিবর্ত্তন হয়, নৈতিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের ক্রমবিবর্ত্তনের এই সত্যটি শিশুমন সম্বন্ধে প্রয়োগ করে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জন ডিউয়ি। মনের চাহিদা হিসাবেই আনন্দ, স্বাধীনতা ও কর্ম্মকুশলতাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন তিনি তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এর পূর্ণতর রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তাঁর কার্য্য ও পাঠ্যসূচীর ভেতর দিয়ে।

ডিউয়ির শিক্ষাদর্শনের আর একটি প্রধান সূত্র হচ্ছে তাঁর সমাজবাদ ও গণতান্ত্রিকতা। সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না; ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজগঠন অসম্ভব, তেমনি সমাজকে বাদ দিয়েও ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব নয়, কারণ আমাদের নৈতিক ও সামাজিক বোধ সমাজ-জীবন থেকেই গড়ে ওঠে। শিক্ষায় দুটি মুখ্য জিনিষ আছে— একটি শিশু ও অপরটি সমাজ (শিক্ষক, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই সমাজের অন্তর্ভুক্ত); এক দিকে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, সংস্কার ও শক্তি, অপর দিকে সমাজের নিত্যপরিবর্তনশীল আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও রীতিনীতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও শক্তির সম্যক্ বিকাশ সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বা তালে তালে পা ফেলে—কাজেই শিশুর বিকাশ সমাজের মাধ্যমেই হতে হবে। ডিউয়ি বলেন, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই এক একটি ক্ষুদ্র সমাজ, এই ক্ষুদ্র সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানই হবে শিশুর কাজ, সমস্যা-সমাধানের ভিতর দিয়েই আসবে কর্ম্ম-কুশলতা ও অভিজ্ঞতা, তাই শিক্ষা হবে শুধু কর্ম্মকেন্দ্রিক নয়, জীবন-কেন্দ্রিক—এক কথায় শিক্ষাই হবে জীবন, শুধু জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়।

ডিউয়ির মতে মানুষমাত্রেই সমাজের সক্রিয় অংশ। সুতরাং গণতান্ত্রিক যুগে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই গণদেবতার অঙ্গবিভূতি। কিন্তু সে সম্পদ, সে সমৃদ্ধি আসে রাষ্ট্রের প্রতি, সমাজের প্রতি তার যে কর্ত্তব্য তার সুষ্ঠু সম্পাদন থেকে—সে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের গোড়াপত্তন হয় বিদ্যালয়-সমাজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে; সুতরাং ইতিকর্ত্তব্যের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন সুরু হবে সমাজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিদ্যালয় থেকেই। বিদ্যালয়ের আনন্দময় প্রাণখোলা মিলনের মধ্য দিয়ে, সমবায়নীতিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার ভেতর দিয়ে, মিলিত শক্তিতে শত সমস্যা সমাধানের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ তার পথচলার শিক্ষা গ্রহণ করবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক কর্ম্মকুশলতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর মানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আদর্শ গৃহের ভিতরেই ডিউয়ি তাঁর স্কুলের আদর্শ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন, স্কুল হবে একটি আদর্শ গৃহের মত যেখানে স্নেহপূর্ণ সুপরিচালনায় এক বৃহত্তর জীবন গড়ে উঠবে। বাড়ীর তিনটি প্রধান চাহিদা—রান্নার কাজ, কাঠ ও লোহার যন্ত্রপাতি, কাঠের কাজ ও সুতোর কাজ এগুলোকে ভিত্তি করেই তিনি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন তাঁর শিকাগোর পরীক্ষাগার স্কুলে।

এর আর একটি বিশেষ কারণও ছিল। তিনি দেখেছিলেন শিল্পবিপ্লবোত্তর জীবন অত্যন্ত জটিল ও কৃত্রিম হয়ে গেছে। আগেকার দিনে শিশু গৃহ ও সমাজ থেকেই রান্না করা, টেবিল-চেয়ার তৈরি করা, শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন করা, জামা কাপড় তৈরি করা ইত্যাদি নানাবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করত এ সকলের প্রস্তুত-প্রণালী দেখে; এক কথায় তার ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষাপরিধির সঙ্গে জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল যা আজ নেই। এখন শিশু তার আসবাবপত্র, তার জামাকাপড়, তার ক্ষুধার অন্ন সবই একেবারে তৈরি অবস্থায় পায়। এই অন্ন-বস্ত্র আসবাবপত্র কোথা থেকে আসে, কি ভাবে উৎপন্ন হয় এসব ব্যবহারিক জ্ঞান তার আদৌ নেই। আধুনিক বিদ্যালয়ের আক্ষরিক ও সাহিত্যিক শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন যোগাযোগ নেই, তাই শিশু হারিয়েছে আজ তার কর্ম্মকুশলতা, তাই তার জ্ঞানের ভিত্তি এত শিথিল, তাই সে এত অপটু, এত অকেজো। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পুস্তকভারগ্রস্ত, বহু শক্ত জিনিষের চাপে শিশু-চিত্ত হয় বিভ্রান্ত, মুখস্থের নিষ্পেষণে হাঁপিয়ে উঠে সে হাতে-কলমে কিছু করবার জন্য, জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের নিমিত্ত। বিদ্যালয়ের এসকল দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্যই ডিউয়ি রান্নার কাজ, কাঠ ও লোহার কাজ, ছুতোরের কাজ, জীবনের এই তিনটি প্রধান চাহিদাকে কেন্দ্র করে প্রবর্ত্তন করলেন তাঁর অভিনব শিক্ষা-ব্যবস্থা। এতে সমাজের সঙ্গে, সামাজিক জীবনের সঙ্গে, হ'ল শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আজ এ ব্যবস্থা পুরানো না হলেও পরিচিত বলে মনে হয়, কিন্তু সেদিন (১৮৯৪ খ্রীঃ) ছিল এ একেবারে নূতন, শিক্ষা-জগতে প্রায় যুগান্তকারী বিপ্লব।

ডিউয়ির মতে মামুলি বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য বিষয়সকল নানা সূক্ষ্ম বিভাগে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে জ্ঞান ও সমাজের অখণ্ডত্ব ব্যাহত হয় ; কিন্তু সমাজের মধ্যে খণ্ডের স্থান নেই, খণ্ড সেখানে লয় পাবে। এজন্য বিষয়গুলো পরস্পরসম্পর্কিত হওয়া উচিত এবং এমন ভাবে পড়তে হবে যাতে ঐ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শিশুর জ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণা যথাসম্ভব পূর্ণ অখণ্ড বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে। এইজন্য তিনি অনুবন্ধ-মূলক শিক্ষার (correlations) পক্ষপাতী। ভাগ করে শিক্ষা দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না, বিচ্ছিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের পর্য্যায়ে পড়বে।

তাই তাঁর প্রণালীতে বস্ত্রবয়ন ও শিল্পকার্য্য থেকে শিশু শুধু তুলোর সম্বন্ধেই জ্ঞান আহরণ করবে না, নানা ভৌগোলিক তথ্যও আবিষ্কার করবে। শিল্প থেকে আবার ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখতে পারবে, রন্ধনের সাহায্যে রসায়ন এবং কাঠ ও লোহার কাজের ভিতর দিয়ে জ্যামিতি ও পাটীগণিত ইত্যাদি শিখতে পারবে। এই যে হাতের কাজের সঙ্গে তাত্ত্বিক শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এটি ডিউয়ির শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি প্রধান উপচার এবং পরবর্ত্তী কালে আমরা গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায়ও এ ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন দেখতে পাই। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মিলনই ডিউয়ির শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল কথা এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের মতই সুফলপ্রসূ।

অনুবন্ধ প্রণালীর পক্ষপাতী বলে ডিউয়ি একথা কোন দিন বলেন নি যে, এ প্রণালীতে জ্ঞানের যে ফাঁক থেকে যাবে তা স্বাধীন ভাবে শিক্ষা দিয়ে পূরণ করা হবে না—বরং জ্ঞানের অখণ্ডত্ব যাতে শিশুর কাছে প্রকট হয় তাতে আলাদা ভাবে (ঐ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করা ছাড়াও) শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন তিনি, তবে যথাসম্ভব অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

এবার ডিউয়ির শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনের বিবর্ত্তনের সঙ্গে পাঠ্যসূচীর খাপ খাওয়ানো সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি বয়স অনুপাতে সময়োপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাই তিনি শিক্ষা-কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন :—(ক) খেলা ও পরিবেশ পরিচিতি (play and environment), ৩ থেকে ৮ বৎসর ; (খ) স্বতঃ-মনোযোগের কাল (spontaneous attention), ৮ থেকে ১২ বৎসর ; (গ) চিন্তামূলক মনোযোগের কাল (reflective atention), ১২ বৎসর ও তদূর্দ্ধ।

তিন থেকে আট বৎসর পর্য্যন্ত কোন পাঠ্য পুস্তক থাকবে না, ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে ও স্কুলে খেলার ভেতর দিয়েই শিক্ষা করবে। এই সময়ে শিশুজীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করবে গৃহ ও গৃহের পরিবেশ থেকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাগান করা, দোকানে যাওয়া, ঘর সাজানো ইত্যাদি নানা কাজের মাধ্যমেই শিশু তার নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা লাভ করবে। খুব স্বাভাবিক ও সহজভাবে পরিপার্শ্বিক হতে ক্ষেতখামার, গোলাবাড়ী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী এদের কাজ, বাড়ীঘর ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবে। এ সময়ের শেষের দিকে কিছু লেখাপড়া ও গৃহের চতুষ্পার্শ্বের ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অতি সহজেই করা চলবে।

দ্বিতীয় স্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে নানাবিষয়ে কৌতূহল জেগে উঠে এবং সে আপনা থেকেই আগ্রহাতিশয্যে সবকিছুতেই মন দিতে ভালবাসে। তাই এ সময়ে তাদের নানারূপ জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে শেখাতে হবে তা সাহিত্যিকই হোক, গাণিতিকই হোক, বা কায়িকই হোক। আর কাজের ভিতর দিয়েই এই জ্ঞান প্রবেশ করবে শিশুর মস্তিষ্কে। সেজন্য প্রত্যেকটি প্রণালীর অনুসরণ করতে হবে— শিশুরা একটা কিছু করবে বলে স্থির করে নেবে এবং সে কার্য্য সমাধানের জন্য তারা যতটুকু অঙ্ক সাহিত্য ভূগোল ইতিহাস ও হাতের কাজ ইত্যাদির প্রয়োজন সবই আয়ত্ত করবে। যদিও অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিকের নাম প্রজেক্ট প্রণালীর সঙ্গে বিজড়িত, তথাপি প্রজেক্ট প্রণালীর প্রকৃত প্রবর্ত্তক হচ্ছেন জন ডিউয়ি।

তৃতীয় স্তরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির পূর্ণতর স্ফুরণ হবে। এ সময়ে সব জিনিষই বিস্তৃততর ভাবে শেখানো সম্ভব এবং পাঠ্যতালিকায় অনেকগুলো বিষয়বস্তুর সমাবেশ হতে পারবে। এ স্তরে প্রজেক্ট প্রণালী ও হাতের কাজ ত চলবেই, তা ছাড়া আরও উন্নততর উদ্ভাবনী প্রণালীর আশ্রয় নেওয়া হবে—যেমন ডাল্টন প্ল্যান, হিউরিষ্টিক প্রণালী (Hewristic method), উইনেটকা প্ল্যান ইত্যাদি। ক্রমবর্দ্ধমান চিন্তাশক্তির ফলে এ সব প্রণালীতে কাজ করা সম্ভব হবে এবং কিশোর-কিশোরীর ধীশক্তির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হওয়াও স্বাভাবিক।

আর একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। চিন্তাশক্তির স্ফুরণের উপরেই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে একথা ডিউয়ি ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি এটা তাঁর প্রণালীর একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রতি স্তরে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিশুর সামনে সমস্যা রূপে তুলে ধরতে হবে, সমস্যাটি সমাধান করতে তাকে যে সহজ চিন্তা করতে হবে তা থেকেই হবে তার সত্যিকারের ধীশক্তির বিকাশ। একটি উদাহরণ দিলেই

জিনিষটি পরিষ্কার বোধগম্য হবে। উজ্জ্বল প্রভাতে ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু ঝলমল করতে দেখে শিশুর মনে কৌতূহল হ'ল—এ শিশির এল কোথা থেকে? এ সমস্যা তাকে সমাধান করতে হবে, শিক্ষক বা অভিভাবক বলে দিলে চলবে না, তাতে জ্ঞানের উৎস—চিন্তাশক্তির মূল যাবে শুকিয়ে—ক্ষণিকের উচ্ছিষ্ট জ্ঞান মন থেকে পড়ে যাবে ঠিকরে। তাই চিন্তামূলক পরীক্ষাপ্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে শিশুকে। শিশু চিন্তা করল—এই শিশির বৃষ্টি থেকে এসেছে না এই ঘাসে কেউ জল ফেলেছে। সে খোঁজ নিয়ে দেখল রাতে বৃষ্টি হয় নি, রাস্তাঘাটও ভেজে নি, ঘাসের উপর কেউ জলও ফেলে নি, আর জল ফেললেও ঘাসের সে ঝলমলানি থাকে না। এই সমস্যা তার কাছে আরও বিস্ময়াবহ হয়ে উঠল। অনেক চিন্তা, প্রশ্ন ও অনুসন্ধানের ফলে সে জানতে পারল, বায়ুমধ্যস্থ জলকণা শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে জলবিন্দু বা শিশিরে পরিণত হয়েছে, সেই শিশির ঘাসের উপর পড়ে সূর্য্যের কিরণে ঝলমল করছে। এর প্রমাণ হিসাবে তার মনে পড়ল ভেতরে বরফ দেওয়া গ্লাসের বাইরের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সৃষ্টি—আবার বরফ নিয়ে পরীক্ষা করেও দেখল এটা ঠিক। এবার তার পূর্ণ সমাধান হ'ল ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুর ঝলমলানির সমস্যার। সমস্যা সূত্রে ধরে হার্বার্টের মত ডিউয়িও শিক্ষাদান-প্রণালীকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন: (১) সমস্যার উত্থাপন; (২) সমস্যার চিন্তন; (৩) সমাধান চেষ্টা ও সাফল্য; (৪) সূত্রগঠন; (৫) সূত্রের পরীক্ষা।

এই সমস্যা-প্রণালীর স্রোতা হিসাবে জন ডিউয়ি সকল শিক্ষাবিদের নমস্য। ডিউয়ি জানতেন সমাজের সক্রিয় অংশীদার রূপে ভবিষ্যতে শিশুকে নানা সমস্যার ভিতরে পড়তে হবে জীবন-সংগ্রামে। সে সব সমস্যার সমাধান করে সুস্থ সবল সমাজ গঠন করে তাকে পথ চলতে হবে। কাজেই সে সব সমস্যা সমাধানের শিক্ষা শিশুকে বিদ্যালয়েই পেতে হবে। তাই নানাদিক থেকে সমস্যা সমাধানের সুযোগ শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। ডিউয়ির এই নবদর্শনের ভেতর দিয়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা নূতন আলোর সন্ধান পেলেন। তাই জন্ম হ'ল প্রজেক্ট পদ্ধতির, ডাল্টন প্রণালী, হিউরিষ্টিক প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যা ও কর্ম্মমূলক পদ্ধতির।

সমাজের সুস্থ মানুষ রূপেই শিশুকে বাড়তে দিতে হবে। কাজ ও চিন্তার মধ্যে দিয়েই সে স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়ের দীক্ষালাভ করবে। কোন কর্ম্মের মাধ্যমে চিন্তার স্ফুরণ করে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার প্রথম ইঙ্গিত করেন ডিউয়ি-ই।

আমাদের দেশে প্রায় সমসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে এই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেছিলেন শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ করে। শিল্পিক সাধনার ভেতর দিয়েই ছেলেরা ভবিষ্যতে চলবার সাহস ও শক্তি অর্জ্জন করুক এ তাঁরও কাম্য এবং লক্ষ্য ছিল। আজ শ্রীনিকেতনের কুটীরশিল্প কবির সে সাধনারই সিদ্ধিরূপে দেখা দিয়েছে। ডিউয়ির কাছে এ বিষয়ে তিনি ঋণী কিনা সেকথা বলা সুকঠিন, কারণ প্রায় একই সময়ে ডিউয়ি ও রবীন্দ্রনাথ (ডিউয়ির ছয় বছর পরে) তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন; অবশ্য শিক্ষার ইতিহাসে বহু বার দেখা গেছে দু'জন বা ততোধিক মনস্বী একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন স্বাধীন চিন্তার ফলে বা স্বাধীনভাবে কাজ করে।

পরবর্ত্তীকালে গান্ধীজী তাঁর ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় কর্ম্মকেন্দ্রিক ও অনুবন্ধ প্রণালীমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেছেন। ডিউয়ির শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কাজের মধ্যে সমস্যা পূরণ করতে করতেই শিশু শিক্ষালাভ করবে ডিউয়ি ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায়—গান্ধীজীরও এই মত ছিল। তবে এক হিসাবে গান্ধীজী ডিউয়িকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি হস্তশিল্প প্রবর্ত্তনের কথা বলেছেন প্রাথমিক স্তর থেকেই এবং শিক্ষার ব্যয়ভারও বহুলাংশে মেটানো যাবে ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ থেকে এ বিশ্বাসও নঈ-তালিমের ভিত্তিস্বরূপ। নঈ-তালিমের অর্থকরী দিকটা অবশ্য আজও শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মেনে নেন নি। কার্য্যতঃ এ-জিনিষটি পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় কিনা তাও বিচার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক একথা ঠিক, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের যে সমন্বয় ডিউয়ি সাধন করেছেন তা অভূতপূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী শিক্ষাবিজ্ঞানীরা এতে তাঁদের পথ খুঁজে পেয়েছেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। শিক্ষাবিজ্ঞানে আজ ডিউয়ির দান অবিস্মরণীয়। তবে গতানুগতিকের গণ্ডীর বাইরে যা-কিছু পড়ে তারই সমালোচনা হয় তীব্র, কাজেই কর্ম্মের ভেতর দিয়ে, স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে, আনন্দের ভেতর দিয়ে, ডিউয়ির বাঁধাধরা নিয়মের বহির্ভূত শিক্ষার সমালোচনাও হয়েছে যথেষ্ট—এই নূতন মন্ত্র শিক্ষাকে বিপথে নিয়ে যাবে, আয়াসলব্ধ জ্ঞানের প্রতি আসবে বিতৃষ্ণা, কেবল আমোদ ও আরামই হবে কাম্য, উগ্র স্বাধীনতার ফলে আসবে নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের আদর্শ—শাশ্বত আদর্শকে করবে ক্ষুণ্ণ, নৈতিক অবনতি বিশৃঙ্খলা ঘটবেই, আরও কত কি। কিন্তু এর উত্তর জীবনের শেষের দিকে ডিউয়ি নিজেই দিয়েছেন তাঁর মতবাদের ফল নির্দ্দেশ করে:

"পঞ্চাশ বৎসর আগেকার তুলনায় আজ আমাদের সাধারণ

বিদ্যালয়গুলি অনেক বেশী গণতান্ত্রিক।···ছেলেমেয়েরা আজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে যথেষ্ট স্বাধীনতার আস্বাদন পেয়েছে এবং স্কুলের কৃত্যাদিতে পূর্ণ ভাবে যোগ দেবার সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে; আগেকার মত স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে আর কোন আপত্তি তোলা হয় না। কাজেই প্রগতিশীল ও পরিবর্ত্তনমূলক শিক্ষা এবং মামুলি শিক্ষার মধ্যে যে ফাঁক পূর্ব্বে ছিল তা সম্প্রতি অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে।"

মামুলি শিক্ষার রূপ যে আজ পরিবর্ত্তিত হয়েছে বা হতে চলেছে এবং তাতে সুফল ছাড়া কুফল হয় নি এই হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউয়ির শাশ্বত অবদান; তাই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর হৃদয়ে তাঁর আসন রয়েছে বিস্তৃত, স্মরণ করছে তাঁকে সমস্ত জগৎ তাঁর জীবনব্যাপী সুদীর্ঘ শিক্ষাসাধনার জন্য শ্রদ্ধাভরে কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে নূতন আলোকসম্পাতের জন্য।

আমেরিকার মিনেসোটা রাষ্ট্রে

শ্রীশান্তা দেবী

আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে যাঁরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তাঁরা বেশীর ভাগ নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন বা কালিফোর্ণিয়া, শিকাগো, বোষ্টন ইত্যাদি স্থানেই আসেন। মিনেসোটা নামক রাষ্ট্রে বাঙালী কমই দেখা যায়। আমরা এখানে আসবার আগে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এখানে অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন; তিনি আমরা আসবার আগেই ফিরে যান, কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। এখানে এসে একজন মাত্র বাঙালীকে দেখেছি—শ্রীঅশোক গুপ্ত। মুসলমান বাঙালীও দু'তিন জন দেখেছি, কিন্তু তাঁরা এখন পাকিস্থানের প্রজা।

এ দেশটা কি রকম আমাদের বাঙালীদের হয়ত জানতে কৌতূহল হতে পারে। আমেরিকান একজন লেখক রসিকতা করে লিখেছিলেন, 'এদেশের সব শহর এবং রাস্তাঘাটই এক রকম, প্রভেদের মধ্যে কোনো রাস্তায় কাঠের বাড়ী বেশী, কোথাও ইটের বাড়ী বেশী।' কথাটা হয়ত ঠিক, তবে আমি এদেশের শহর বেশী দেখি নি বলে ধ্রুব সত্য কিনা বলতে পারলাম না। একবার মোটরগাড়ীতে ২৫০ মাইল আন্দাজ গিয়েছিলাম, অনেকগুলি শহর পার হতে হ'ল। তাতে মনে হ'ল সব শহরেরই পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য খুব বেশী। আমাদের দেশে ২৫০ মাইল গেলে ঘরবাড়ী রাস্তা মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ চেহারা এবং ধরণ-ধারণের যতটা প্রভেদ চোখে পড়ে, এখানে আমাদের মত নবাগতদের চোখে তা পড়ল না। সর্ব্বত্রই গৃহস্থ পাড়ায় চৌকো চৌকো জমিতে চিমনীওয়ালা দোতলা ছোট ছোট বাড়ী কাঠ বা ইটের, দোকান পাড়ায় বড় বড় চার পাঁচ থেকে বার চৌদ্দতলা উঁচু-উঁচু বাড়ীর জানালায় ক্রেতার মন ভোলাবার জন্য জিনিষ সাজানো। দর্শক বা শিকারা একই রকম দর্জাজছ্ঁটাই পোশাক পরে এবং স্বচ্ছ মোজা পায়ে দিয়ে ঘুরছেন। মেয়েদের চুল কারুর বড় নয় বা খোঁপা বাঁধা নয়, সকলেরই ঘাড়ের কাছে ঢেউ-খেলানো চুল, দু-চার জনের আট দশ আঙুল লম্বা চুল আছে, সজোরে ফিতে দিয়ে গোড়া বাঁধা হয়ে ঝুলছে। এই রকম স্বল্পদীর্ঘ চুল বার-চৌদ্দ বছরের মেয়েদেরই বেশী, কখনও বিশ-বাইশ বছরের মেয়েদেরও দেখা যায়। তার চেয়ে বয়স্কাদের চুল নানাভাবে ঢেউ-খেলানো এবং সাজানো, কিন্তু ঘাড়ের নীচে নয়। শীত একটু পড়তেই ছোট বড় সব মেয়ে সর্ব্বত্রই পথে মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধে এবং ঘরে ঢুকলেই খুলে নেয়।

আর একটা পোশাকের বিশেষত্ব ২৫০ মাইলে সর্ব্বত্রই দেখলাম—সব ছোট ছেলেমেয়েই প্রায় ১৫।১৬ বছর পর্য্যন্ত নীলরঙের জিনের প্যাণ্ট পরে বেড়ায়। আশ্চর্য্য যে, সকলের প্যাণ্টেরই রং অসমান চটা চটা। বয়স্কা মহিলারাও সংসারের কাজ করবার সময় এই পরিচ্ছদটি পরেন এবং মাঝে মাঝে এই ভাবেই পথে বেরিয়ে পড়েন। তবে এটা ওঁদের ঘরোয়া আটপৌরে পোশাক বলে পরিচিত। খাটিয়ে পুরুষ মিস্ত্রী প্রভৃতিকেও এটা পরতে দেখি।

যে ক'টা শহর চোখে পড়েছে সর্ব্বত্র রাত্রে লাল নীল সবুজ আলোর ঘটা এবং এক জাতীয় মদ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। আর একটা সাদৃশ্য এখন এই যে, সর্ব্বত্র পথে সারি সারি পত্রহীন দীর্ঘ গাছ দাঁড়িয়ে।

আমাদের এই শহরটার নাম সেণ্টপল এবং এর গায়েই আর একটা শহর জোড়া আছে তার নাম মিনিয়াপলিস। এই দুটিকে Twin cities অর্থাৎ যমজ শহর বলে। শহরের বড় রাস্তার পিছনের সারির রাস্তাগুলিতে মানুষের বাসাবাড়ী। বড় রাস্তায় দোকানপাট হোটেল ইত্যাদি। শহরশুদ্ধ সবাই

বরফ পড়া আমি কখনও দেখি নি বলা যেতে পারে। পনেরো-ষোল বছর আগে যখন জাপান যাই তখন ছিল মার্চ মাস, শীত শেষ হয়ে আসছে। তখন পাহাড়ের উপর বেড়াতে গিয়ে এক দিন পথের পাশে স্তূপাকার বরফের একটা লাইন দেখেছিলাম, বাকি সবই গুঁড়ো বরফ, একটু-আধটু ঝরে পড়ছে। কিন্তু এখানে এসে তিন মাস কাটাবার পরও কোথাও বরফ জমতে দেখি নি। দুই তিন দিন গুঁড়ো গুঁড়ো তুলোর মত বরফ পড়ত, আবার আপনি মিলিয়ে যেত। পরশু রাত্রি একটু বেশী বরফ পড়ছিল, তাই সকলে বললেন সকালে হয়ত জমা বরফ দেখা যাবে। কি রকম দেখব না ভেবেই ঘুমোতে গেলাম।

সকালে উঠে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাদা হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যতটা দেখতে পাচ্ছি সবই সাদা। বাড়ীর সিঁড়ি, ফুটপাথ, রাস্তা, উঠান, বাগান, ঘরের ঢালু ছাদ, মোটর-গাড়ীর মাথা সব সাদা হয়ে গিয়েছে। শুনেছিলাম এখানে বরফ পড়লে নিজের বাড়ীর সিঁড়ি এবং বাড়ীর সামনের ফুটপাথ সব নিজে পরিষ্কার করতে হয়। কাজেই একটা লম্বা ঝাঁটা নিয়ে বার হলাম রাস্তা পরিষ্কার করতে। সিঁড়ি ফুটপাথ সব ঝাঁট দিয়ে মনে হ'ল, এমন আর কি শক্ত কাজ? কিন্তু দেখলাম বরফ পড়া আবার সুরু হ'ল। ঝাঁট দেওয়া জায়গাগুলো আবার সাদা হতে লাগল। সজোরে হাওয়া বওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ উড়তে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঐরকম চলল। সকালে সকলে কলেজ যাবে, তখন আবার বরফ ঝাঁট দিতে হবে মনে করে মনটা খারাপ লাগল। যা হোক পরিশ্রমের পরে ঘুম ভালই হ'ল।

পরের দিন যখন উঠলাম তখনও সজোরে জোড়ে হাওয়া দিচ্ছে এবং বরফ পড়ছে। দরজার কাছে গিয়ে দেখি দরজা পর্যন্ত বরফ খাড়া হয়ে উঠেছে। আজ ঝাঁটার সাধ্য নয় বরফ সরানো। অগত্যা কোদাল আনতে হ'ল। কিন্তু বরফের মধ্যে পা দিয়ে না নামলে সরাতে পারব মনে হ'ল না। বরফে নামবার মত জুতো আমার তখনও কেনা হয় নি, কাজেই উপর থেকে যেটুকু ঠেলে ফেলা যায় ফেলে চলে এলাম।

অবশেষে আমার কন্যারা রবারের বুট পরে কোদাল হাতে বরফ পরিষ্কার করতে নামল। পাড়ার লোকেরা ডেকে ডেকে বলতে লাগল, 'কি কেমন লাগছে?' এক জন খবরের কাগজে ফোন করে দিল। অমনি এক জন ফোটোগ্রাফার এসে ওদের ছবি তুলতে আরম্ভ করল। ছবিটা সত্যি সত্যিই খবরের কাগজে ছাপা হ'ল: ভারতীয় ছাত্রীরা কোদাল করে বরফ সরাচ্ছে। ভারতে দেশে ত কষ্ট এমন কখন হয় না।

ভৃত্যহীন এ দেশে মেয়েরা রান্না, বাসনমাজা, ছেলে মানুষ করা ত করেই, ধোপার এবং মেথরের কাজও করে। ধোলাইখানা অবশ্য আছে, সেখানে ছয় টাকা আন্দাজ খরচ করলে একটা গরম সুট পরিষ্কার করে দেয়। পুরুষরা কেউ কেউ কামায়, কেউ বা সস্তা হবে বলে ওদের ঘরে ওদের কলের জন্য একটু ভাড়া দিয়ে নিজেরাই সেখানে বসে কাজটা করে নেয়। কোন দোকানের সামনে মুটে দাঁড়িয়ে থাকে না, নিজের জিনিষ নিজের গাড়ীতে অথবা নিজের হাতে বয়ে আনতে হয়, যত ভারীই হোক না কেন। অবশ্য ঘণ্টায় আড়াই টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত মজুরী দিলে কাজ করবার লোক পাওয়া যায়; কিন্তু কম লোকেই তা রাখে। খবরের কাগজে দেখা যায় দোকানপাটেই লোক কাজ পায় বেশী। গৃহস্থ বাড়ীতে দায়ে ঠেকলে কেউ কেউ লোক রাখে, না হয়ত প্রচণ্ড টাকাওয়ালারা রাখে।
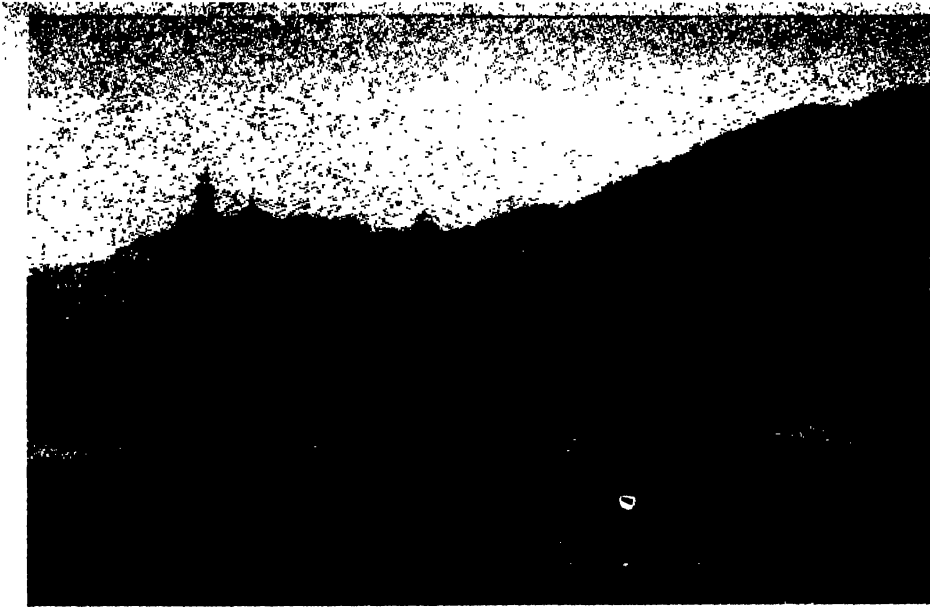
সিকিম মহারাজার প্রাসাদ

চিরতুষারের পারে তিব্বত

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের পরিবেশ ও কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও বিষয় বিশেষে তাদের মনের নিবিড় ঐক্য থাকতে পারে। পাহাড়ের তুষারধবল গিরিশৃঙ্গের দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। যাকে একবার এই আকর্ষণ পেয়ে বসে তার আর নিস্তার নাই। আমার সঙ্গে সরকারী চাকুরে বন্ধুর এই মনের মিল প্রথম ধরা পড়ে তিনি যখন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ, আর আমি সেই জেলের বন্দী। তার পর ইংরেজ আমল গিয়েছে। তিনি তখন দার্জ্জিলিং জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমরা একসঙ্গে ফালুট, সন্দিকপু প্রভৃতি ঘুরেছি। এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার শৈলমালা এক হয়ে মিশে যে অনন্ত তুষাররাজ্য সৃষ্টি করেছে, পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে, নির্ম্মল প্রভাতে তা একসঙ্গে অনিমেষে চেয়ে দেখেছি। মেলোরী, আরভিন্ মরে নি, অমর অশ্বত্থামা তাঁদের এভারেষ্টের শৃঙ্গে তুলে নিয়ে গিয়েছেন, একথা একসঙ্গে আলোচনা করেছি। কোথায় এভারেষ্টের নর্থ কোল একসঙ্গে টেলিস্কোপে খুঁজেছি।

অবশেষে একদিন আমরা দু'জনে রওনা হলাম। ১৩.৫.৫১ থেকে ১৯.৫.৫১ পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং পাহাড়ের এখানে-ওখানে কাটিয়ে ২০.৫.৫১ তারিখে তিস্তার ধারে ধারে শাল, পাকাসাজ, টিলাউনির [illegible] রংপো যাই এবং সেখান থেকে সেই দিনই এক-[illegible] উপস্থিত হই। সিকিম রাজ্যের পরিমাপ ২৮০০ বর্গ মাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে ৭০ মাইল এবং পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে ৪০ মাইল। একে ঘিরে রেখেছে উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে পশ্চিম বাংলা, পূর্ব্বে ভুটান এবং পশ্চিমে নেপাল। সিকিমের উত্তরাংশ ১৩,০০০ ফুটের উপর উচ্চ অসংখ্য তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে সমাচ্ছন্ন। এই অংশটুকু ছাড়া সমস্ত সিকিম গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত। সিকিমে সমতল ভূমি নাই। খাড়া পাহাড় আর গভীর উপত্যকা। এই সুবিশাল বিস্তৃত খাড়াইয়ের কথা চিন্তা করতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়। সিকিমের উচ্চতা ২৮,১০০ ফুট (কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরদেশ) হতে ৬০০ ফুট (সিকিম হতে তিস্তা নদীর নির্গমনের স্থান) পর্য্যন্ত। সমগ্র হিমালয়ের মধ্যে সিকিমেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপাত হয়। বারিপাতের সঠিক রিপোর্ট পাওয়া যায় না। যেটুকু জানা আছে তাতে ধরা যায়, এই বারিপাতের পরিমাণ উত্তরাংশে ৫০ ইঞ্চি, পশ্চিমাংশে ৮০ ইঞ্চি এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও গভীর উপত্যকাগুলির মধ্যে ১২০ ইঞ্চি হইতে ২০০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। সিকিমের ভয়ঙ্কর খাড়াই গভীর খাদ ও গিরিশৃঙ্গময় আর এই গগনস্পর্শী খাড়াই বেয়ে গভীর গর্জ্জনে নামে শত [illegible] জলস্রোত। তুষারবিগলিত হিমপ্রবাহী জলস্রোত এবং [illegible] জলস্রোত মিশে সৃষ্টি করেছে সিকিমের প্রধান দুটি নদী—তিস্তা [illegible] রঙ্গিত।

সিকিম প্রায় ৪ হাজার প্রকারের উদ্ভিদ দ্বারা আচ্ছাদিত। গ্রীষ্মমণ্ডল (ট্রপিক্যাল রিজিয়ন), নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (টেম্পারেট জোন) এবং হিমমণ্ডল (অ্যালপাইন রিজিয়ন)—এই তিন মণ্ডলের বনভূমিই সিকিমে বর্তমান।

সিকিমের রূপশ্রী সব নিতুই। পাহাড় পাহাড়ে মিশেছে, কখনও উপত্যকায় হারিয়েছে, কখনও অন্ধকার গভীর জঙ্গল ভেদ করে খুঁড়ে খাড়া নীল আকাশে মাথা তুলেছে। কখনও তার শ্যামল গা বেয়ে নামতে দেখা যায় শাদা ফেনায় ভরা কলনাদিনী পাহাড়ে নদী। কখনও, বৃষ্টি, রৌদ্র মেঘের নিত্য মেলামেশা খেলা বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ বনের শ্যামলিমা, নানা পুষ্পিত বর্ণ রঙিন লাবণ্য। কখনও রৌদ্র লেগে ঝলমল করে, কখনও মেঘেরা দল বেঁধে এসে বুকের মধ্যে তাদের লুকিয়ে ফেলে। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে মানুষের পদচিহ্ন যেখানে কোন দিন পড়েনি সেই চির-অবিজিত কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমরেখায় মিলিয়ে গিয়েছে। কুয়াসার ঘোমটা খুলে প্রথম সৌরকিরণে রাঙা হয়ে দেখা দেয় নীল আকাশের মাঝে তার চিকচিকে ঢাকা গিরিশিখর। তার চূড়া ঘিরে থাকে মেঘের স্তবক।

আমরা ঠিক করলাম, সিকিমের বনভূমি পার হয়ে, নাথুলা অতিক্রম করে তিব্বতে যাব। চুম্বি-উপত্যকার মধ্যে যেখানে দালাই লামা সম্প্রতি বাস করছেন সেই ইয়াটুংএ উপস্থিত হব। তার পর আবার জেলাপলা অতিক্রম করে কালিম্পং। সেখান থেকে নব পথে সিকিমের বনভূমির মধ্য দিয়ে পুরাতন লাসা কলিং রাস্তায় পেডং আলগোরাই হয়ে কালিম্পং ফিরব।

গ্যাংটকে আমরা ডাক বাংলায় স্থান নিলাম। পাহাড়ের একটি মাথা কেটে তিন প্রস্থ বাংলো তৈরি হয়েছে। প্রথমটিতে ছিলেন একজন মিলিটারী অফিসার, মধ্যেরটিতে ছিলেন সিকিমের কনেষ্ট এক্সাইজার শ্রীকে সি রায় চৌধুরী, বি এস সি। আমরা শেষেরটিতে উঠলাম। রায় চৌধুরী গ্যাংটকে কোন ভাল বাড়ী না পাওয়ায় ডাক বাংলোতেই থাকেন। ইনি আমাদের পূর্বপরিচিত কিছুতেই আমাদের আলাদা রান্না করতে দিলেন না, অতএব তাঁরই অতিথি হতে হ'ল। গ্যাংটকে থাকাকালে রায় চৌধুরী আমাদের সমস্ত কিছুরই ভার নিলেন। বাংলোর নীচে চেরীগাছের সারি থেকে দূরের তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ এবং তার মধ্যে আবার কোনটি সিনিওলচুম (২২,৫২০ ফুট) সব কিছু দেখাতে লাগলেন। আমাদের তিব্বত যাবার পাসপোর্টের জন্য দার্জিলিংয়ের ডি, সি ইতি-পূর্বে গ্যাংটকে তার করেছিলেন। পাসপোর্ট পেলে আমরা ২১ শে তারিখেই রওনা দেব ঠিক করলাম। রায় চৌধুরী পাসপোর্টের জন্য পোলিটিক্যাল অফিসার শ্রীদয়াল, আই সি এস এর নিকট গেলেন। শ্রীদয়ালের সজ্জন বলে খ্যাতি আছে। শ্রীদয়াল ওখানে ছিলেন না, মফস্বলে গিয়েছিলেন। তাঁর সহকারী লবজং (তিব্বতী) ইতি-পূর্বেই ইয়াটুংএ ভারতীয় ট্রেড এজেন্টের নিকট তিব্বত সরকারের অনুমতির জন্য বেতারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তিনি পুনরায় বেতারবার্তা পাঠালেন। ২১শে গেল, ২২শে গেল তথাপি বেতারবার্তার জবাব এল না। বাইশে আবার একটি স্মারক বেতার-বার্তা পাঠিয়ে লবজং আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে বললাম খবর না পেলে পাসপোর্ট দেওয়া যদি সম্ভব না হয় তা হলে আপনি নিজেই ইয়াটুংএ ভারতীয় ট্রেড এজেন্টের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিন। শুদ্ধ সকলে বললেন, তিব্বতে ওঁরা ঘড়ি ও তারিখের ধার ধারেন না কবে পাসপোর্টের খবর আসবে তা কেউ বলতে পারে না। কলিকাতায় দুইটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের দু'জন সম্পাদক নাকি এক মাস বসে থেকেও পাসপোর্টের কোন কিনারা করতে পারেন নি। অবশেষে তারা রওনা দেন, কিন্তু তিব্বতে পা না দিয়েই তাদের ফিরে আসতে হয়। পাসপোর্ট নেই বলে তিব্বতের সীমানা থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি শ্রীলবজংকে বললাম, "বড় অন্যায় কথা। প্রতিদিন শত শত তিব্বতী এখানে আসছে তাদের কোন পাসপোর্টই লাগছে না আর আমরা দু'দিনের জন্য তিব্বত গেলেই পাসপোর্ট লাগবে এ কেমন কথা। এ নিয়ে একটা আন্দোলন হওয়া দরকার। আর আমাদের যদি না যেতে দেওয়া হয় তবে ফিরে একটা তুমুল আন্দোলন করব।" লবজং বললেন আজ সন্ধ্যা বেলায় শ্রীদয়াল আসবেন, তখন তার সঙ্গে কথা বলে একটা চূড়ান্ত কিছু করা হবে।" আমি বললাম, 'পাসপোর্ট পাই আর না পাই কাল সকালে আমরা রওনা দিচ্ছি। রওনা দেবার পথে শ্রীদয়ালের সঙ্গে দেখা করছি। ইতি-মধ্যে সম্মতিসূচক খবর আসে ভাল নতুবা পরে খবর এলে স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে আমাদের কাছে পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন।"

২০শে ও ২১শে এই দুটি দিন আমরা গ্যাংটকের নানা স্থান দেখলাম। তার মধ্যে রাজপ্রাসাদস্থ গোম্ফাটি খুব ভাল লাগল। ২০শে মে ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা, ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন, বোধি-লাভের দিন ও নির্বাণের দিন। ঐ দিন ভিক্ষুগণ গোম্ফার মধ্যে সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। অর্থ না বুঝতে পারলেও তার ছন্দ ও তাল আমাদের বড় ভাল লাগল। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কাঠে তাল ঠোকা হচ্ছিল। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ কে তিব্বতীরা উচ্চারণ করেন, 'মণিপমে হুঁ' বলে। উচ্চারণ হচ্ছিল, মণিপমে, মণিপমে, মণিপমে, হুঁ। তাল হচ্ছিল খুট খুট খুট—খট (সজোরে)। মণিপমে বলতেই খুট। তিন বার এই রকম খুট খুট করে হুঁ-র সময়ে জোরে খট। ভারি সুন্দর শোনাচ্ছিল। গোম্ফার মধ্যে ছোট ভিক্ষু বড় ভিক্ষু সব সারি বেঁধে বসে। পীত বসন পরিহিত মুণ্ডিত শির ঋজু মেরুদণ্ড, শত শত ভিক্ষুদের একসঙ্গে ছন্দ ও তাল সহ মন্ত্র উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে আমরাও সামনে পুথি নিয়ে বসে ঐ রকম করি।

মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী সেক্তেন তাসি আমাদের সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত তিব্বতী। ফটোগ্রাফী খুব ভাল জানেন। রায়চৌধুরী ও ঘোষের সঙ্গে খুব আলাপ জমালেন। ভিক্ষুদের নিয়ে একসঙ্গে [illegible]।
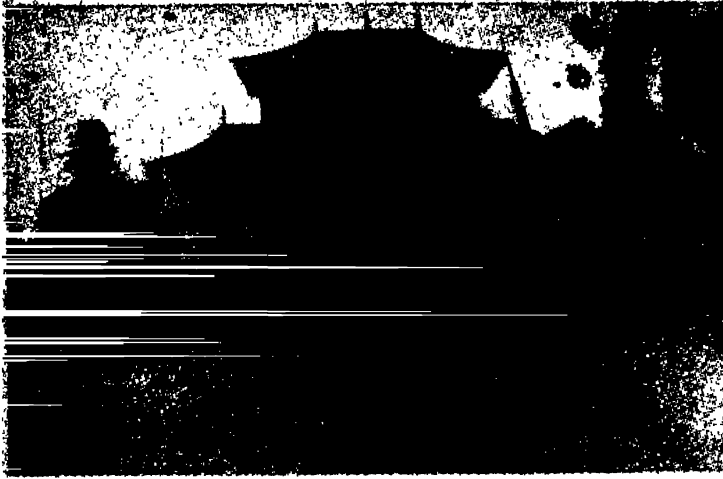
সিকিম মহারাজার প্রাসাদের প্রবেশ পথ

জাতি, গণ্ডার শিকার করতেন। কখনও-বা উদ্ভিদ-বলয় পার হয়ে তুষাররেখার মধ্যে চলে যেতেন। ফিরে এসে সেখানকার ভয়ানক অতিকায় 'চুমুঙ' বা তুষারদৈত্যের সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট কথা বলতেন। লেপচারা এই দৈত্যকে পূজা করতেন, কেননা ইনিই নাকি লেপচাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী এবং সকল শিকারের রক্ষাকর্ত্তা। বর্তমানে লেপচারা শিকার ভুলে গিয়ে চাষবাসে মন দিয়েছেন। প্রায়াধিক ৮০০ লেপচা পরিবারের একটি শক্তিশালী দল পূর্ব্ব-নেপালের ইলাম জেলায় বাস করেন। এদের দলপতি সিকিমের তদানীন্তন মহারাজের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়ে সদলবলে ইলামে পালিয়ে যান।

পাশ্চাত্যের মোহে পড়ে লেপচারা নিজেদের নাচ, গান, ধর্ম্মীয় রীতি-নীতি হারাতে বসেছেন। তাঁরা কেউ বা নেপালী বেশভূষা, কেউ বা পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করছেন। তাঁদের সেকালের দিনের রঙচঙে বেশভূষা, রূপা ও মণির গহনা, নিজেদের তৈরী সাদাসিধা অথচ কাজের উপযোগী বাসনপত্র ফেলে এখন তাঁরা বাজারের বিদেশী ঠুনকো জিনিষ ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। তবে অধুনা শিক্ষিত লেপচাদের এক অংশের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে; তাঁরা তাঁদের পুরাতন নিজস্ব রীতি-নীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি জাগাবার চেষ্টা করছেন।

মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী সেতেন তাসির সঙ্গে আমরা তাঁর বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। ইনি একজন সুনিপুণ ফটোগ্রাফার, এঁর এলবামগুলি দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। তিব্বতী ও লেপচাদের সম্বন্ধে তিনি অনেক গল্প করলেন। বর্ত্তমানে সিকিমের প্রায় লক্ষাধিক অধিবাসীর মধ্যে আদিম অধিবাসী লেপচাদের সংখ্যা দশ হাজারের বেশী হবে না। নেপালী, ভোটানী এবং হিমালয়ের অধিবাসী অন্যান্য জাতিদের দ্বারা লেপচারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। লেপচারা প্রকৃতির আসল সন্তান। বনভূমি এঁদের বড় প্রিয়। পশু-পক্ষী ফুল এঁরা বড় ভালবাসেন, এ সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞানও যথেষ্ট। কৃষিজীবীদের সঙ্গে কিন্তু এই আদিম অধিবাসীরা পেরে উঠছেন না।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম বা লামাধর্ম্ম লেপচাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হলেও এদের ভূত-প্রেতে অগাধ বিশ্বাস; এঁরা প্রত্যেক জড় পদার্থের আত্মার কল্পনা করেন। শুধু তাই নয়, এদের জীবনটাই যেন নিয়ন্ত্রিত হয় হাঁচি, টিকটিকি প্রভৃতি নানা রকমারি গূঢ় ইঙ্গিত ও রহস্যময় লক্ষণ ও সঙ্কেতের দ্বারা।

সেতেন তাসি দালাই লামার ছবি আমাদের দেখালেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও মোগ্‌গলায়নের পূত অস্থি নিয়ে নাথুলা পার হয়ে দালাই লামার কাছে যে দল গিয়েছিলেন, তাঁদের ফটো তিনি তুলেছেন, সেগুলিও আমরা দেখলাম।

গোম্ফা বা মঠ সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। সিকিমে ৪৪টি মঠে প্রায় ১৫০০ হাজার লামা সাধু আছেন। গোম্ফার ভূত-নৃত্য ও জঙ্গী-নৃত্য দেখবার মত জিনিষ। চীন দেশের নানা কাজ-করা পোষাক ও বিকট মুখোস পরে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ঘুরে ঘুরে এই ভূত-নৃত্য করা হয়। জঙ্গীনৃত্য চালু করেন মহারাজ চাসদোর নামগিল। সমর-দেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘার আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এই নৃত্য দ্বারা। অন্যায় ও মিথ্যাকে সত্য কিরূপে পরাভূত করে তাই নাটকাকারে এই নৃত্যে বোঝান হয়। তরোয়াল নিয়ে খুব লম্ফ-ঝম্ফ, খুব হাঁকডাক করে কি-কি-হু-হু ও ই-হু-হু-হু বলে চিৎকার দ্বারা মহাকালের বন্দনা করা হয়। লামারা এবং উচ্চ বংশীয়েরা নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এই নাচে যোগ দেন। বহুক্ষণ ধরে এই তাণ্ডব নৃত্য চলে। নাচের শেষে সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে একেবারে এলিয়ে পড়েন।

বর্ত্তমানে সিকিমে প্রায় পাঁচ শ' গ্রাম আছে। রৌদ্রকিরণে ঝলমল শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্রোড়ে অবস্থিত এই দেশটিতে রয়েছে প্রায় পনের হাজার বাসগৃহ এবং তাদের আশেপাশে অসংখ্য পাহাড়। সিকিমে যেরূপ নানাপ্রকারের উদ্ভিদ দেখা যায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও এত রকমের গাছপালা আছে কিনা সন্দেহ। গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে হিমমণ্ডলের সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদ এখানে বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই গাছপালার সংখ্যা চার হাজারের কম নয়। সাধারণ যে বাঁশ, তাও আছে প্রায় তেইশ রকমের। ছয় ফুট লম্বা বিরাট মোটা বাঁশ গরম জল ভর্ত্তি করে স্নানের ঘরে হাজির করতে দেখা যাবে। আবার লিখবার কলম তৈরি করা যায় এমন অতি সরু বাঁশও পাওয়া যাবে। সিকিমে বহুপ্রকারের [illegible]

এর মধ্যে রোডোডেণ্ড্রন বোধ করি সর্বপ্রধান। এই দেশে ত্রিশ রকমের রোডোডেণ্ড্রন দেখা যায়। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ফুট বেড়ের গাছ থেকে দু'ইঞ্চি উচু রোডোডেণ্ড্রন গাছ পর্যন্ত আছে। সিকিমে ২৫০ রকমের ফার্ণ, ৬৬০ রকমের অর্কিড, ৬৮০ রকমের রংবেরংএর প্রজাপতি, ১০০০ প্রকারের পোকামাকড়, ৫০০ থেকে ৬০০ প্রকারের নানারংএর ছোটবড় পাখী আছে। এক কথায় সিকিমের বৈচিত্র্যের তুলনা নেই।

মহারাজার দরবার, সিকিম

দুপুরে সিকিমের কর্তৃষ্ট ম্যানেজার মিঃ প্রধানের ভবনে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। রায় চৌধুরী ও ঘোষের সঙ্গে সেখানে গেলাম। মিঃ প্রধানের বাড়ীটি তকতকে ঝকঝকে। বাড়ীর সামনে একটি মনোরম উদ্যান। উদ্যানের সংগ্রহ খুবই তারিফ করার মত। ঘোষ একটি সুবৃহৎ লাল অর্কিডের ফটো তুললেন। মিঃ প্রধানের পুত্র একজন বড় এথলেট; তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েন। চমৎকার স্বাস্থ্য; স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ান হয়ে বহু বড় বড় কাপ পেয়েছেন। এগুলি একটি টেবিলে সাজান ছিল। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম। তার হাত, পা ও বুকের পেশীগুলি দেখবার মত। সমস্ত দেহখানি যেন পেশীর স্প্রিং দিয়ে তৈরি। অতি সরল স্ফূর্তিবাজ ছেলে। কলেজ খুললে, কলকাতায় গেলে তাঁকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বললাম।

ঘোষের কাপালিক বলে খ্যাতি আছে। গুণে যা বলে দেন প্রায়ই তা ফলে। বিশেষ পদস্থ সরকারী মহলে পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বদলী হবেন কি হবেন না, প্রমোশন হবে কি হবে না—এ সম্বন্ধে তার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই সফল হয়। তাঁর গণনা এক প্রকার অভ্রান্ত বললেই হয়। এসব আমি তেমন বিশ্বাস করি নি। তবে যে ভাবেই হোক, দেখছি ঘোষ যা বলেছেন তা ঠিক ফলছে। সেবার কালুটের পথে যখন পালমুজোয়ায় পৌঁছলাম তখন মেঘের এমন ঘনঘটা যে দু'হাত দূরে পর্যন্ত কিছু দেখা যায় না। হিমালয়ের কোলে নিভৃত ডাক-বাংলোয় আমরা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। ঘোষ বললেন, "কিছু চিন্তা করবেন না। আমি চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণ করছি (thought vibration দিচ্ছি)। কালুট ও মল্লিকপু যখন যাবেন তখন মেঘের চিহ্নমাত্র থাকবে না, তুষারের দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন।" প্রত্যেকটি কথা তাঁর বর্ণে বর্ণে ফলেছিল। দিনে রাতে স্নো-ভিউ আমরা সমানে পেয়েছি। কি পূর্ণিমার রাতে, কি প্রভাতে, কি দ্বিপ্রহরে, কি সূর্যাস্তকালে সব সময় তুষারাবৃত এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং সমস্ত ঝলমল করছে। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে।

ঘোষের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে ঘটনার এই যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য—

কমলালেবুর বাগান, সিকিম

এটা অনেকটা কাকতালীয়বৎ বলেই আমি মনে করেছি। ঐ দিন বিকালের দিকে আমার মনটা একটু দমে গেল; ভাবলাম, বিরুদ্ধবাদী সদস্য বলে আমাদের স্বদেশী গবর্ণমেন্ট হয়ত আমাকে তিব্বতে যেতে দেবেন না। বেতারবার্তার সম্বন্ধে যা বলেছেন ওসব হয়ত ভাঁওতা। ঘোষ যেন আমার মনের কথা ধরে ফেললেন, বললেন, আপনি উল্টো চিন্তাতরঙ্গ পাঠিয়ে সব মাটি করে দেবেন। তিব্বতে যাওয়া নিশ্চয়ই হবে, ঘাবড়াবার কারণ নেই।

সন্ধ্যায় সময় সিকিমের আই-বি বিভাগের ডি-এস-পি মিঃ এটক এলেন। আমার মনের সন্দেহ যেন আরও ঘনীভূত হতে চায়। ঘোষ ভ্রূ-কুঞ্চিত করে আমায় বললেন, যাওয়া যে হবে এ সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র সংশয় যেন নেই। এটক এঁর পূর্ব্ব-পরিচিত। ঘোষ একবার গুণে এটকের বদলী ও প্রোমোশন সম্বন্ধে যা বলে দিয়েছিলেন, তা নাকি অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। তাই ঘোষ এসেছেন শুনে এটক দৌড়ে এসেছেন এবং এসেই হাত দেখাতে আরম্ভ করেছেন। শুধু যে এটক এই রকম করছেন তা নয়, দার্জিলিং মেলে ঘোষের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েও দেখেছি এই অবস্থা। ঘোষকে অনেক দিন পরে দেখে সকলে তাঁকে ঘিরে ভাগ্য গণনা আরম্ভ করে দেন। রায় চৌধুরীও এটকের সঙ্গে যোগ দিলেন; সন্ধ্যাটা কাপালিক সাধনার নানা রকম গূঢ় তত্ত্বের প্রসঙ্গে ভাল মন্দ নয়। শ্মশানে মড়ার মাথা নিয়ে সাধনা, বৃক্ষের উপর উলঙ্গ হয়ে কাটান, ঘোষ অনেক কিছু করেছেন, কথা প্রসঙ্গে সে সব উঠল। যদি একবার আমি একটু অবিশ্বাসের সুর তুলি ত রায় চৌধুরীও ঘোষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করিয়েই যেন ছাড়বেন।

[illegible]

কাপুপ থেকে সোজা পথ চালু আছে। তাঁর সঙ্গে গাইড ছিল তথাপি চার মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁর ১১ ঘণ্টা সময় লাগে। অনেক সময় কোমর পর্য্যন্ত তুষারে ডুবে গিয়েছিল। পথ খুব বিপজ্জনক, ভাল গাইড না থাকলে প্রাণ চলে যেত। বর্ত্তমানেও ও পথে চলা একেবারে অসম্ভব।

এই সময় বন-বিভাগের কর্ম্মচারী একজন যুবক নেপালী এসে উপস্থিত হলেন। রায় চৌধুরী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে রায় চৌধুরী বললেন, এই ফরেষ্টারই আমেরিকানটির গাইড ছিল, এঁর কথাই এঁকে বলছিলেন। এঁকে আপনাদেরও গাইড করে দেব। নাথুলা পর্য্যন্ত ইনি আপনাদের সঙ্গে যাবেন।
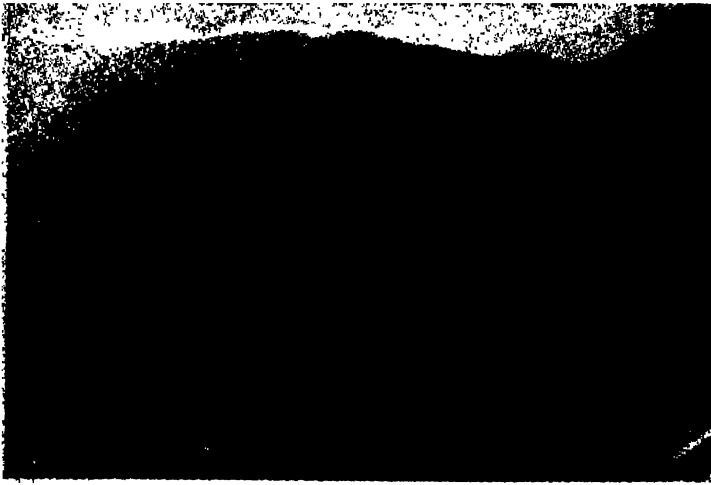
গ্যাংটক বাজার

তিব্বত যাওয়ার প্রসঙ্গে আমি বললাম, পাসপোর্ট পাই আর নাই পাই—কাল সকালে আমরা রওনা দিচ্ছি। এটক বললেন, "তাতে বিপদের সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশী থাকবে, হয়ত ওরা তিব্বতের জমিতে পা-ই দিতে দেবে না। কয়েকজন ইংরেজের বেলায় এই রকম হয়েছিল। তাঁরা তিব্বতের জমিতে পা দিয়ে এসেছি এই গল্পটা করবার জন্য সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু তবু তিব্বতের জমিতে পা না দিয়েই তাঁদের ফিরতে হয়। সীমানার কাছ থেকে ফেরা সে বড় মর্ম্মান্তিক।" আমি বললাম, "আমার বেলায় তা হবে না। আমি কোন বাধা না মেনে যেমন করে হোক তিব্বতে ঢুকে পড়ব, তা শেষ পর্যন্ত লামার জেলখানা দেখে আসতে হয়, সো ভি আচ্ছা।"

এটক বললেন, "ইউরোপীয়ানদের জন্য পাসপোর্ট বরাবর লাগত, কিন্তু ভারতবাসীর জন্য কোন দিন লাগত না। তিব্বতীরাও যেমন অবাধে ভারতবর্ষে আসতে পারে, ভারতবাসীরাও তেমনি বরাবর অবাধে তিব্বতে যেত। কিছুদিন হ'ল ভারত সরকারই যেন এই নিয়মটা করেছেন। কমিউনিষ্টরা তিব্বতে এসে পড়েছে কিনা তাই একটু সতর্ক থাকতে হয়। তবে আপনারা দু'দিনের জন্য বেড়াতে যাবেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া আপনাদের চঙ্গু থেকে কাপুপ যেতে হলে এখন চুম্বিথানের ঐ দিক দিয়ে না গেলে আপনারা যেতেই পারবেন না। কেননা চঙ্গু হতে কাপুপ যাবার ভারতভূমি দিয়ে সোজা পথ এখন সম্পূর্ণ অচল। তুষার পড়ে সব পথেই যাত্রী চলাচল বন্ধ আছে। খচ্চর ত যেতেই পারবে না, পায়ে হেঁটে কোন রকমে বরং পাবুলা অতিক্রম করতে পারবেন। আজ দু'দিন হ'ল খুব কষ্ট করে পায়ে হেঁটে কোন রকমে যাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চঙ্গু থেকে কাপুপ যাওয়ার সোজা পথ একদম বন্ধ। সে পথে যাত্রী আদৌ চলে না এবং যে পথে যাত্রী চলে না সে পথে কারুর যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েক দিন পূর্ব্বে জনৈক এক বেশী

কর্ম্মচারীটি জানালেন যে, তাঁর পায়ের বুট জুতা ও পটি একদম ছিঁড়ে গিয়েছে। চঙ্গুর পর থেকে নাথুলার মাথা পর্যন্ত ক্রমাগত বরফ ভেঙে যেতে হবে; সু' চলবে না। অতএব নূতন জুতা পটির ব্যবস্থা না হলে চঙ্গুর পরে যাওয়া তাঁর কি করে সম্ভব হবে? আমরা বললাম, চঙ্গু পর্য্যন্ত গেলেই যথেষ্ট হবে, কুলিদের নিয়ে আমরা নিজেরাই নাথুলা পার হয়ে যাব।

২৩. ৫. ৫১। দ্বিতীয়ার শুভদিনে আমরা তিব্বত রওনা হলাম। রওনা দেবার সময় দেখি, যে খচ্চরওয়ালা আমাদের রসদ ও বিছানা নিয়ে যাবে বলে ঠিক ছিল, সে অনুপস্থিত। তার মালিক বাঁধা ভাড়া দৈনিক ৫।০ টাকার স্থলে ১০৲ টাকা করে দিতে হবে বলে দাবি করে। দুটি খচ্চরের জন্য প্রতিদিন ২০৲ টাকা করে দেবার অবস্থা আমাদের ছিল না; আমরা রাজী হলাম না। তার পরিবর্ত্তে মাল আরও অনেক কমিয়ে—অগত্যা জনপ্রতি দুটি তিব্বতী কুলিসহ, দৈনিক ৫৲ টাকা করে ঠিক করে, আমরা পায়ে হেঁটে রওনা দিই।

ঐ দিন আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল কারপোনাঙ্গ। কারপোনাঙ্গ বা পুশুমের উচ্চতা ১০,০০০ হাজার ফুট। গ্যাংটকের উচ্চতা ৫৮০০ ফুট। গ্যাংটক থেকে কারপোনাঙ্গ ১০ মাইল দূরে; রাস্তা উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সমানে উপরে উঠে গিয়েছে। পথে পলিটিক্যাল এজেন্ট দয়ালের বাড়ী পড়ে। কথা ছিল, লবজং তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সময় ঠিক করে রাখবেন। পলিটিক্যাল এজেন্টের বাড়ীখানি গ্যাংটকের একখানা শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ। বৃহৎ প্রাঙ্গণের মাঝে পতাকা-দণ্ড, তার উপর রাষ্ট্রীয় পতাকা পত্ পত্ করে উড্ডীন। তাঁর বাড়ীর ঠিক নীচে দিয়ে লাচেন ও লুচুল যাওয়ার পথ নেমে গিয়েছে। অপর দিকে তিব্বতে যাওয়ার পথ উঠে গিয়েছে। পলিটিক্যাল এজেন্ট দীনদয়াল তাঁর বৈঠকখানায় কাজ করছিলেন। আমাদের উপস্থিত হওয়া মাত্র আমাদের [illegible]

[illegible] বললেন, আপনারা যখন [illegible] পাচ্ছেন, তখন আর আপনাদের বাধা দেব না, তবে পথ এখন বড়ই বিপৎসঙ্কুল। চম্বু থেকে নাথুলায় মাথা পর্যন্ত সমানে বরফ ভাঙ্গতে হবে। যাত্রী চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, আজ ২।১ দিন মাত্র কোন মতে পায়ে হেঁটে চলাচল আরম্ভ হয়েছে। আপনাদের পাসপোর্টের খবর এখনও আসে নি। ভারতীয় ট্রেড এজেন্ট রায় বাহাদুর লোনেন টোভেন কাজীর কাছে আমি একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে দিচ্ছি এবং আবার একটি বেতারবার্তা আজ পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। রায়বাহাদুর লোনেন টোভেন কাজীকে লেখা চিঠিখানি আমাদের দিলেন এবং বললেন, চুম্বিথান বাংলো তিব্বতের মধ্যে, ইয়াটুং যেতে পথে পড়বে। সেখানে যাতে বিনা পাসে আপনারা থাকতে পারেন তার জন্য বেতারে খবর পাঠাচ্ছি। তবে বিপদ এই যে, আমরা ত বেতারবার্তার কোন জবাব পেলাম না, কাজেই এসব ব্যবস্থাও বেতারবার্তার মারফতে করা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে? আমরা তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম এবং তিনিও আমাদের সৌভাগ্য কামনা করে বিদায় দিলেন।

গ্যাংটক গোম্ফা

প্রথম পাঁচ মাইল পথ বেশ প্রশস্ত। শ্রীরায় চৌধুরী ও ডি-এস-পি এটক এই ৫ মাইল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চললেন। বনভূমির মধ্য দিয়ে পথ, অপূর্ব্ব তার শোভা। কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই, প্রকৃতির নিজস্ব শোভা। পথ যত চলা যায়, সৌন্দর্য্যও যেন তত বেড়ে যায়। পাঁচ মাইল যাওয়ার পর রায় চৌধুরী ও এটক করমর্দ্দন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। এখান হতে পথের প্রশস্ততা কমে গেল। খাড়াইও বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হ'ল। পাহাড়ের গা কেটে পথ। অনেক সময় পাহাড় একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে হয়, এই খাড়াই কেটে কি করে পথ তৈরি হয়েছে। সরু পথ, নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। কিনারা থেকে পা একবার পিছলে গেলে শত শত নয় সহস্র সহস্র ফুট নীচে গভীর পাহাড়ের খাদে পড়ে যেতে হবে। তাই অতি সাবধানে পথ চলতে হয়। উল্টো দিক থেকে যখন যাত্রী দল আসে তখন পাহাড় ঘেঁসে দাঁড়াতে হয়। নইলে খচ্চরের বোঝার ধাক্কা লেগে সহস্র সহস্র ফুট নীচে পড়ে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। বর্ত্তমানে নাথুলায় অত্যধিক তুষারপাতের দরুন স্বাভাবিক যাত্রী চলাচল কিছুদিন স্থগিত আছে। কাজেই পথে উল্টোদিক হতে আগত কোন যাত্রীদলের সন্ধান মেলে নি। আমাদের গাইড ও কুলি [illegible] সহ আমরা পাহাড়ের নিভৃত হতে নিভৃততর প্রদেশে [illegible] হতে লাগলাম। ভারতভূমি হতে তিব্বতে প্রবেশ করবার [illegible] অতিক্রম করে চলেছি, মনের মধ্যে কেবল এই [illegible] বিভিন্ন [illegible] দিলাম, এবং পথ চলায় মন দিলাম। পথের খাড়াই ও বন্ধুরতা ক্রমশঃ যেন বেড়ে গেল। বেশ খানিকক্ষণ চলার পর যখন আমরা ন' মাইল পথ অতিক্রম করেছি, এবং কারপোনাঙ্গ বাংলো যখন মাত্র আর এক মাইল দূরে আছে, তখন অকস্মাৎ দারুণ শিলাবৃষ্টির মধ্যে পড়লাম। যেমন শিলা বর্ষণ তেমনি মুষলধারায় বৃষ্টি; আমাদের বর্ষাতিতে ঠেকাতে পারল না। আমরা কাকভেজা হয়ে গেলাম। কুলিরা খুবই ভাল; তারা নিজেদের সামান্য পরিধেয় খুলে আমাদের বিছানা বাঁচাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; সব কিছু ভিজে গেল। প্রায় ১০ হাজার ফুট উপরে অবিশ্রান্ত শিলা ও বৃষ্টির মধ্যে পড়ে কোনরকমে প্রাণে বাঁচা যে কি ব্যাপার তা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম। আমরা যখন বাংলোয় ঢুকলাম তখন বাংলোর পথে ও বাংলোর আশেপাশে তুষারের স্তূপ জমে উঠেছে। বাংলোর ভেতর জনপ্রাণী নেই। কুলীরা ভিজে মোট নামিয়ে অদূরের কুটীর থেকে চৌকিদারকে খুঁজে নিয়ে এল। চৌকিদার এসে দুটি চিমনীই জ্বালিয়ে দিল। আমরা পরিধেয় পরিচ্ছদ ও বিছানাপত্র সব শুকানোর কাজে লেগে গেলাম। হাত-পা সেঁকে বিছানা ও পোষাক পরিচ্ছদ সব শুকিয়ে যখন আমরা চিমনীর কাছ থেকে উঠলাম তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। ইতিমধ্যে চৌকিদার আমাদের গরম কফি খাইয়েছে। এইবার গরম খিচুড়ী, আলু ও ডিমের ডালনা তৈরি করে এনে হাজির করল। তখনও বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামে নি। আমরা রান্নাঘরের দিকে যাবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে টেবিলের উপর খেতে বসে গেলাম। সঙ্গে ভাল ঘি ছিল, তার বেশ কিছু সদ্ব্যবহার করলাম।
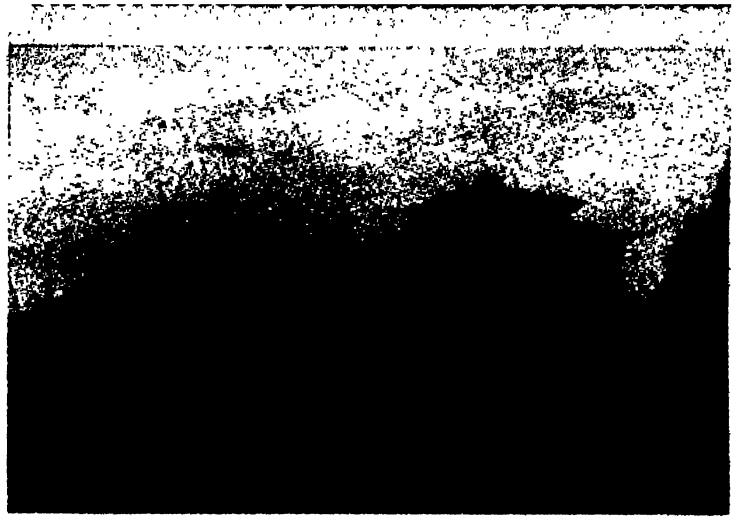
সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃষ্টি থেমে গেল; আকাশ বেশ নির্ম্মল ঝরঝরে হয়ে উঠল। সদ্যস্নাত গাছ-পালা অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করে উঠল। আমরা ভিজে জুতোগুলি আগুনের [illegible]
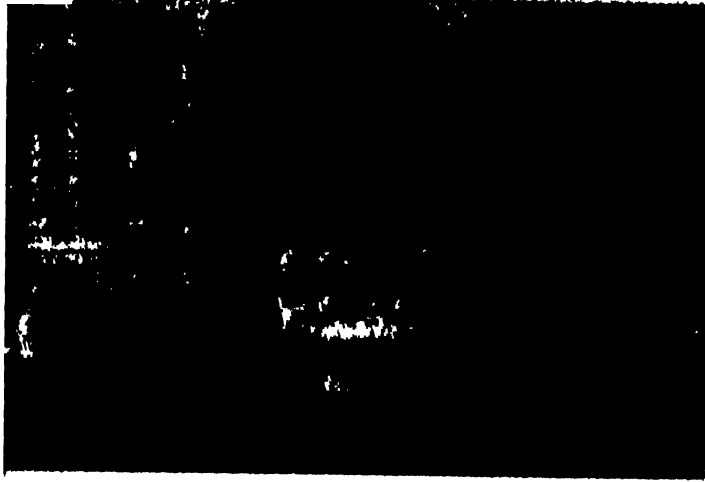
গোম্ফার অভ্যন্তর

...কোতে দিয়েছিলাম, তাই বুট ও পট্টি এঁটে রাস্তায় বার হলাম। কারপোনাঙ বাংলোটি পাহাড়ের বুকের মধ্যে। পথ এখানে অর্দ্ধ-চক্রাকারে ঘুরে উপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের বড় বড় গাছের অন্তরালে এই পথ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। আগামী দিনের চলার পথ নজরে পড়ে না, নজরে পড়ে কেবল বড় বড় গাছের বিরাট বন। আমরা এই বনের ধার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে ফিরে এলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। আমাদের নির্জ্জন বাংলোটি ছোট হলেও খুব সুন্দর। প্রত্যেক বাংলোয় গদি ও তোষক থাকে, তা আর সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। তার উপর আমাদের চাদর পেতে সদ্য আগুনে সেঁকা গরম লেপ চাপিয়ে চৌকিদার দেখি পরিপাটি বিছানা করে রেখেছে। আমরা প্রথম দিনের পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, অতএব ঘুমুতে আমাদের বিশেষ দেরি হ'ল না।

২৪-৫-৫১ তারিখে অতি প্রত্যুষে আমরা চম্বু যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ফেন ভাত, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, ঘি সহযোগে খেয়ে নিলাম। সকাল ঠিক ছ'টায় রওনা দেবার কথা ছিল, তার বরং দশ মিনিট পূর্ব্বেই কুলিদের নিয়ে আমরা বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম। চম্বু উচ্চতায় ১২৬০০ ফুট, কারপোনাঙ থেকে দশ মাইল। পথের বন্ধুরতা ও খাড়াই ক্রমশঃ বেড়ে চলল। প্রকৃতির শোভাও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হ'ল। পথে অনেকগুলি ঝরণা ও জলপ্রপাত পড়ে, সবগুলি জমে বরফ হয়ে ছিল। স্থানে স্থানে ধসও নেমেছিল। একবার কোনরকমে পা পিছলে পড়ে গেলে হাজার হাজার ফুট নীচে পড়ে যেতে হবে। এই পাহাড়ের মাঝের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে বহু নিয়ে, বহুদূরে বহুক্ষণ ধরে গ্যাংটক নজরে পড়ছিল। দু'ধারে পাহাড়ের গায়ে নানা রঙের রডোডেনড্রন ফুটে আছে; তার উপর পড়েছে প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ। আমরা ...

করে সিকিম থেকে তিব্বতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। নীচে বহুদূরে পাহাড়ের মাথায় গ্যাংটক রাজপ্রাসাদের লাল বাড়ীটি বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হচ্ছে। ঘোষ এই দৃশ্যের কয়েকটি ফটো তুললেন। সব মিলে যেন এক রহস্যলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

ধীরে ধীরে গ্যাংটক চোখের আড়ালে চলে গেল, পথও হঠাৎ খুব উপরে উঠে গেল। খুব খানিকটা চড়াই করেছি এমন সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। চেয়ে দেখি আমাদের সম্মুখে পাহাড়ের উপর এক মাইল দীর্ঘ এক বিশাল হ্রদ। হ্রদটির তিন চতুর্থাংশ বরফ হয়ে জমে আছে। দুধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিরাট প্রস্তরখণ্ডে শোভিত পাহাড়ের মাথাগুলি তুষারে আবৃত হয়ে যেন ঝুঁকে পড়ে হ্রদের মধ্যে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখছে। নিস্তব্ধ, নিঝুম বিশাল জলরাশি এমন কি তার বুকের উপর ছোট ছোট ঢেউগুলিতে পর্য্যন্ত সাড়া নেই, সব জমে বরফ হয়ে একখানি ঝাঁককরা সাদা চাদরের মত বিছিয়ে পড়ে আছে। হ্রদের বাঁ-দিক দিয়ে পথ চলে গিয়েছে, পথের বহুস্থান তুষারাবৃত। দূরে পাহাড়ের মাথায় হ্রদের উপর চম্বু ডাকবাংলো। ডাকবাংলোটি বরফে চাপা পড়েছে। তার লালরং করা তক্তাগুলি স্থানে স্থানে একটু একটু ফুটে উঠে বাংলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করছিল। হ্রদের তীর ধরে এই অপরূপ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক মাইল পথ অতিক্রম করে যখন আমরা ডাক-বাংলোয় প্রবেশ করছি, তখন মনে হ'ল যেন এস্কিমো দেশের বরফের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছি। বাংলোর চাল বরফে সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে। চারিপাশের স্তূপীকৃত বরফ প্রায় স্থানেই উপরের বরফের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। শুনলাম ঘরে প্রবেশের দরজাও ঢাকা পড়েছিল, চৌকিদার বরফ কেটে ঢোকার পথ কোনরকমে পরিষ্কার করেছে। আমরা বরফের উপর দিয়েই হেঁটে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। নীচের বরফ তখনও শক্ত আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, চালের মাথার বরফ মধ্যাহ্নের সৌরকিরণে একটু একটু করে গলতে আরম্ভ করেছে, এবং চালের কার্নিশ বেয়ে একপাশে একটি ক্ষীণ জলস্রোত নেমে আসছে। ১২,৬০০ ফুট উঁচুতে এই চম্বু বাংলোটি। ছোট্ট বাংলোটি হ্রদের উপর মনোরম স্থানে নির্ম্মিত। বাংলোর মধ্যে বসেই সমস্ত হ্রদটি দেখা যায়। কিন্তু অত্যধিক তুষারপাতের দরুন আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকে হ্রদমুখী যে বড় বড় কাচের জানালাগুলি ছিল তার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখি বাহিরের তুষারের স্তূপ সম্পূর্ণ আবৃত করে চালের উপরকার তুষারে প্রায় ঠেকেছে। বাইরে কিছুই দেখবার উপায় নেই। ...

উপায় এসে না দাঁড়ালে আর উপায় ছিল না। এস্কিমো দেশের লোকেরা যে বরফের ঘরে আরামে থাকে, তা আমরা ঘরে ঢুকে বুঝতে পারছিলাম। চারিদিকে বরফের মধ্যে যে রকম অসহনীয় শীত হবে বলে ভেবেছিলাম সে রকম কিছু হ'ল না। চৌকিদার এসে চিমনীতে আগুন জ্বালিয়ে দিলে আমরা বেশ আরাম করে আগুনের পাশে বসলাম।

আমাদের সঙ্গে আর্জেন্টিনার সাত পাউণ্ড রান্না করা মাংস ছিল। একটু টিনের মধ্যে আমরা সেই টিনটি খুলব ঠিক করেছিলাম। কারণ তা হলে অতখানি মাংস রেখে খুয়ে কয়েক দিন খেতে পারব। সেই টিনটি আজ আমরা খুললাম। খেতে গিয়ে দেখি মাংসে বোকা পাঁঠার গন্ধ। আমরা একটু খেয়েই আর খেতে পারলাম না। মাংসের টিনটা সুদ্ধ কুলিদের দিয়ে দিলাম। আমার বেশ ভাল ঘুম হলেও, ঘোষের রাত্রে ঘুম ভাল হ'ল না। তার নাড়ীর গতি খুব বেশী হয়েছিল।

চাঙ্গু পাহাড়ে তুষার ও হ্রদ (১২,৩০০ ফুট)

পরদিন ২৫-৫-৫১ তারিখ সকালে বরফ চড়াই করতে হবে বলে আমরা পোষাক-পরিচ্ছদ উপযুক্ত মত পরলাম। হাফ-প্যান্ট ও সু'র বদলে উলেন ট্রাউজারের উপর ফুল-প্যান্ট চাপালাম। বুটের উপর পটি জড়িয়ে মোজা ও প্যান্ট একসঙ্গে ভাল করে বাঁধলাম। কোমর পর্য্যন্ত বরফে ডুবলেও যাতে অসুবিধা না হয়, গোড়া থেকে সেই ব্যবস্থা করলাম। চোখে রঙিন কাঁচের গগল্‌স্ পরলাম। গগল্‌স্ ছাড়া বরফ চড়াই অসম্ভব। চারিদিকে বরফের উপর যখন রৌদ্র পড়ে ঝলমল্ করে উঠে, তখন খালি চোখে তার দিকে চাইবার সাধ্য বেশীক্ষণ কারোরই থাকে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধ হয়ে যেতে হয়। তাই রঙীন কাঁচের গগল্‌স্ একান্ত প্রয়োজন। কুলিরাও গগল্‌স্ পরল। কারপোনাঙ্গ থেকেই আমাদের গাইডকে বিদায় দিয়েছিলাম। বেচারীকে চঙ্গু পর্য্যন্তও আনি নি। কুলিদের সঙ্গে খুব ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাংলো থেকে বেরিয়েই বরফে পা দিতে হ'ল। সমস্ত পথই বরফে ঢাকা, একটুখানি চলার পর পথের চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে বরফের উপর দু' একটি পায়ের দাগ পথের পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানে পথ ভুল করলে সমূহ বিপদ। কুলিরাই আমাদের সঙ্গী ও গাইড হ'ল। এদের এ পথ পরিচিত। আমরা এই নির্জ্জনতার মধ্যে চারটি প্রাণী এক সঙ্গে চললাম। প্রথমে হ্রদটিকে ডাইনে রেখে তার পূর্ব পাড়ের উপর দিয়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে, তার প্রান্ত অতিক্রম করলাম। তারপর পথ চঙ্গু পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করে পূর্ব্ব-উত্তরে চলে গেল। প্রথম দু' মাইল এঁকে-বেঁকে সমতল পথেই চললাম। বরফের উপর দিয়ে মস্ মস্ করে জোরে হেঁটে চললাম। আমাদের ডান-ধারে [illegible] আবহমান হিমালয়ের বক্ষে প্রবাহিত স্রোতস্বতী।

আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। মাইল দুই যাওয়ার পর নাথুলার উপর যে পথ এঁকে-বেঁকে খাড়া উপরে উঠেছে তা নজরে পড়ল। এই সময় পথ বেশ খানিকটা নীচে নেমে বড় বড় পাথরের মাঝে জমা এক সুবিশাল সরোবরের কাছে এসে পড়ল। অত্যধিক তুষারপাতের জন্য আমাদের আশেপাশে কেবলই দেখছি তুষারস্তূপ। চঙ্গু থেকে নাথুলার পাদদেশ ছয় মাইল, নাথুলার মাথা আরও এক মাইল। শেষের দু' মাইল খুবই খাড়াই, পথ এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে গিয়েছে। সব বরফে একাকার হয়েছিল। বহু স্থানে পথের চিহ্নমাত্র ছিল না। কুলিদের পিছনে পিছনে আমরা চলছিলাম। এরা "চোরা বাটো" (short-cut) ছাড়া চলে না। কখন কখন বরফের উপর দিয়ে খাড়া উপরে উঠে যায়। চোরা বাটোতে এদের সঙ্গে চলতে গিয়ে মারা পড়ার উপক্রম। খাড়া বরফের উপর দিয়ে উঠার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। ঘোষের বুক ধড়ফড় করে হার্টফেল করার মত অবস্থা। আমি ত একবার পিছনে পড়ে তাল সামলালাম। তাল সামলাতে না পারলে কয়েক হাজার ফুট নীচে পড়ে যেতাম। খুব চড়াই করে যখন নাথুলার উপর উঠলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা। প্রখর সূর্য্য-কিরণ, মেঘশূন্য আকাশ; অদূরে চমলহরি ঝক্‌ঝক্ করছে। গগল্‌স্ খুলবার উপায় নেই। গগল্‌সের মধ্য দিয়েই চমলহরির তুষার ধবল-কান্তি দেখতে পেলাম। নাথুলার সুগভীর নির্জ্জনতা মনকে অভিভূত করে। দুই বিশাল ভূ-খণ্ডের সংযোগ-স্থলে নাথুলা। একদিকে চির-পরিচিত, সুবিশাল ভারত-ভূমি, অপর দিকে সুবিস্তৃত তিব্বতের রহস্যাবৃত নিষিদ্ধ ভূমি। পথ বিভীষিকাময় নির্জ্জনতার মধ্য দিয়ে সোজা তিব্বতের আলো আঁধারময় উপত্যকাভূমিতে নেমে গিয়েছে। ঘোষ নাথুলার উপর কয়েকখানি ছবি তুললেন। বোঝা-পিঠে কুলিদের সঙ্গে আমার ছবি তুললেন। আশ্চর্য্য এই ভারবাহী সরল লোক দুটি, এরা [illegible]

যেখানে খালি হাতে উঠতে আমরা হাঁপিয়ে পড়ি, সেখানে অবলীলাক্রমে গুরুভার বোঝা নিয়ে এরা উঠে যায়। বিরক্তি বা ক্লান্তি এদের নেই; মুখে সর্ব্বদা শিশুর মত সরল হাসি। নির্জ্জন নাথুলার উপর একটু বসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ বসা সম্ভব হ'ল না। প্রবল

নাথুলা গিরিসঙ্কট (১৪,৫০০ ফুট)

ঠাণ্ডা বাতাসের গতিবেগ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। যেন ঠেলে নীচে ফেলে দিতে চায়। আমরা নামা সুরু করলাম। বরফের উপর দিয়ে নীচে নামা আরও কঠিন। কয়েকবার সবাই আছাড় খেলাম। নির্দ্দিষ্ট পথ কোন্ দিক দিয়ে ঘুরে-ফিরে গিয়েছে, কে জানে। পথের চিহ্নমাত্র নজরে পড়ল না। আমরা নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে দিয়ে কুলিদের পেছনে পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে খাড়া নীচে নামতে লাগলাম। দু' হাজার ফুট নীচে কলনাদিনী পাহাড়ে নদীর পাশে উপত্যকার পথ দেখা যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছবার জন্য আমরা রীতিমত দৌড় দিলাম। কুলিরা সহজাত প্রবৃত্তিবশে নরম ও শক্ত বরফ ঠিক করে ঠিক পথে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আর আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি। দৌড়াদৌড়িতেই গায়ে ঘাম ছুটে যাবার মত হ'ল। অবশেষে নাথুলার হিমরাজ্য পেছনে ফেলে উপত্যকার পথে এসে আমরা পৌঁছলাম। এখন আমরা খাস তিব্বতের জমিতে। এখানে হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইলেও, আর তুষার নাই। উপত্যকার মাঝ দিয়ে পাহাড়ে নদী গর্জ্জন করে বয়ে চলেছে। কুলিরা বোঝা নামিয়ে রাস্তার উপর একটা বড় পাথরে বসে কাঁচা আটা, ছাতু, অল্প কড়কড়ে ভাত সব একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে আরম্ভ করল। ঘোষের খুব পিপাসা লেগেছিল। পাহাড়ে চলতে কখনও রাস্তায় ঠাণ্ডা জল খেতে নেই, তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা; নিউমোনিয়া, আমাশয় সব কিছু হতে পারে। ঘোষ কোন বারণই মানলেন না, ঠাণ্ডা জল খেয়ে তবে ছাড়লেন। এর জন্য পরে তাঁকে সামান্য আমাশয়ে ভুগতে হয়েছে। খুব অল্পের উপর দিয়ে অবশ্য গিয়েছে।

এখান থেকে চুম্বিথান সাত মাইল দূরে। চুম্বিথানে তিব্বতের প্রথম ডাক-বাংলো। কুলিদের খাওয়া শেষ হতে না হতে ঘোষ প্রথম রওয়ানা দিলেন। একাই চললেন। আমি নদীর ধারে সুন্দর একটি জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে রইলাম। অদূরে একজন যাত্রী প্রায় দুই শত খচ্চরের পিঠে পশম ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে অপেক্ষা করছে। তারা নাথুলা অতিক্রম করবে। অত্যধিক তুষারপাতের জন্য আটকে পড়েছিল। কুলিরা তখনও বিশ্রাম করছে। আমিও একাকী রওয়ানা দিলাম। পথ ভুল করার নয়, এক পথ, চড়াই-উৎরাই তেমন নেই—সমানে চলেছে। কাশ্মীর অঞ্চলে যে রকম পাইন গাছ এখানেও সেই রকম পাইন গাছ। একে ব্লু পাইন বলে। দু'পাশের গিরিসানু এই পাইন গাছে আচ্ছন্ন, পাইন বনের ভিতর দিয়ে পথ। পাহাড়ের গায়ে নানা রকম ফুল ফুটে আছে। উপত্যকার মাথায় তুষারধবল পাহাড়গুলির চূড়া দেখা যাচ্ছে। সবে মিলে সে এক অপূর্ব্ব শোভা। সিকিমের মত এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না। বারিপাতের কোন রেকর্ড নেই। তবে বারিপাত যে কম হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিমালয় ডিঙিয়ে মেঘের দল আসবে কি করে? ব্লু পাইনগুলি যেমন সতেজ ও সুন্দর সব গাছ তেমন নয়। তাদের আকারের ক্ষুদ্রতা দেখলেই বারিপাতের অল্পতার কথা বুঝা যায়। পাহাড়ে তেমন আর্দ্রতা নেই। বাতাস যেমন জোরে বয় তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা। অনাবৃত গায়ে লাগলে গা চৌচির হয়ে ফেটে যায়। এখানে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য না থাকলেও, বৃষ্টি যা হয় তাতেই দেখলাম রাস্তার স্থানে স্থানে ধ্বস নেমেছে। বড় বড় পাইন গাছের আস্ত গুঁড়ি ফেলে যে-সব জায়গায় ধ্বস নেমেছে, সেখানে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব গুঁড়ির উপর দিয়ে ভারবাহী খচ্চরেরা পার হয়। একটি ঝরনার ধারে ধ্বস এত বেশী যে, মনে হ'ল পথ ভাল করে মেরামত না হলে এর পরে পার হওয়াই কঠিন হবে। এতদিন মাছি বা ইঁদুর নজরে পড়ে নি। এই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও এক স্থানে দু'একটি মাছি নজরে পড়ল এবং আর এক স্থানে একটি ইঁদুর নজরে পড়ল। মাছি ও ইঁদুর উভয়েরই রং মিশ্-কালো।

কতক্ষণ হেঁটেছি জানি না, তবে নাথুলার নীচে থেকে চুম্বিথান পর্য্যন্ত পথ যেন সাত মাইল থেকে বেশী বলেই মনে হ'ল। পথ যেন আর ফুরোয় না। একা একা চলতে মনে এ রকম হয়। ভাবছিলাম ডাক-বাংলো বোধ হয় ছেড়ে এসেছি। হয়ত পাহাড়ের মাথার উপরে কোথাও ছিল। উঠবার পথটা ধরতে পারি নি; পেছনে ফেলে এসেছি। এখন উপায়। জন-প্রাণী নেই যে, কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব। নীচে বহুদূরে একটি গোম্ফার মত কি দেখা যাচ্ছিল। চুম্বিথান ত নীচে হবার কথা নয়। তবে কি পেছনে আবার ফিরব? এমন সময় দেখি আধ মাইল পেছনে পাহাড়ের বাঁকে কুলিরা মোড় ঘুরছে। তখন সাহস পেয়ে আবার অগ্রসর হতে আরম্ভ করলাম। একটু পরেই ডাক-বাংলো পেলাম। ডাক-বাংলোয় উঠে দেখি, ঘোষ কেবলমাত্র এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "এই মাত্র এলেন নাকি?" ঘোষ বললেন, এক ঘণ্টা আগে এসেছি। ওই যে একটা কুকুর খুব জোরে জোরে ডাকছে,

শুনছেন না? ওটা আমায় এক ঘণ্টা ধরে ডাক-বাংলোয় ঢুকতে দেয় নি। ঝাকড়া লোম এক বিরাট কালো কুকুর পায়ে ত আমার ছিঁড়ে খায়। ওটাকে লোক এসে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে বেঁধেছে তবে আমি ডাক-বাংলোয় ঢুকতে পেরেছি। শুনুন, এখনও কেমন গোংরাচ্ছে। ওর রাগ এখনও থামে নি। চৌকিদারকে ভাল করে বলে দিয়েছি, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে যেন কষে বেঁধে রাখে। তিব্বতে এসে কুকুরের কামড় খাব নাকি?

চুম্বিখানের উচ্চতা ১২,৫০০ ফুট অর্থাৎ চঙ্গুর মত, অথচ এখানে তুষার নেই। কিন্তু তা হলেও শীত এখানে চঙ্গু থেকে অনেক বেশী বলে মনে হ'ল। তার কারণ এখানে প্রবল ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস। বাইরে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় চারটে। বাংলোর নিকটে দু'এক ঘর বস্তি এবং যাত্রী দল ও খচ্চরদের থাকিবার আস্তানা। তা ছাড়া চুম্বিখানে আর কোন বসতি নেই। চৌকিদার তার পরিবার নিয়ে বাংলোর পাশেই থাকে। আমাদের আসার খবর ইতিপূর্ব্বেই চৌকিদারের কাছে পৌঁছে গেছে। বুঝলাম, শ্রী দয়ালের বেতার-বার্ত্তা পাঠানোর ফল ফলেছে। আমাদের পাসপোর্ট বা বাংলোর পাস কোন কথাই চৌকিদার উত্থাপন করল না। চৌকিদার চিমনীতে আগুন জ্বালল, কুলিরা এসে পড়লে জিনিষপত্র টেবিলে গুছিয়ে রাখল। তারপর বিছানা করে কফি খাওয়ার জন্ম ফুটন্ত গরম জল এনে দিল। লোকটি বেশ ভাল। বস্তি থেকে আমাদের ছ'টা বড় বড় মুরগীর ডিম এনে দিল, প্রতিটি চার আনা করে। বললে, আর কোন জিনিষ এখানে কিনতে পাওয়া যায় না। ডিমও আর নেই। এখনে যে কিছু কিনতে পাব, তা আমরাও আশা করি নি, কাজেই ডিম ক'টা পেয়েই আমরা খুব খুশী। সন্ধ্যা হতে না হতেই গরম খিচুড়ী, ডিমের তরকারী ঘি দিয়ে বেশ খাওয়া গেল। খিদেও লেগেছিল বটে, যাকে বলে পাহাড়ে খিদে।

২৮-৫-৫১ তারিখে সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আমরা ইয়াটুঙ্গ যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। ইয়াটুঙ্গ চুম্বি-ভ্যালির মধ্যে, এখান থেকে দশ মাইল দূরে। আমাদের পিছনে নাথুলা পড়ে থাকল, ডাইনে জেলাপলা। জেলাপের তুষারধবল শৃঙ্গটি যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। সোজাসুজি উড়ে যেতে পারলে বোধ করি তিন মাইলের বেশী নয়। সামনে বিরাটাকার চমলহরি—তার তুষার-ধবল কান্তি সৌরকিরণে ঝক্ ঝক্ করছে। জেলাপের পথটি নীচু থেকে খাড়া উপরে উঠে গিয়েছে। সে কি খাড়াই, দেখলে ভয় হয়। নীচে বড় বড় গাছ তার মধ্য দিয়ে প্রবহমাণ পাহাড়ে নদী, আর উপরে উদ্ভিদ বলয়ের পারে তুষারাবৃত নগ্ন গিরি শিখর। চুম্বি-ভ্যালিতে পৌঁছাতে আমাদের খুব খানিকটা উৎরাই করতে হ'ল। চুম্বি-ভ্যালি নয় হাজার তিন শত ফুট অর্থাৎ আমরা তিন হাজার দুই শত ফুট উৎরাই করে চুম্বি-ভ্যালিতে পৌঁছলাম। এই পথটি চলতে আমাদের এত ভাল লাগছিল যে, সে কথা ভাষায় বুঝান যায় না। কখনও আমরা দৌড়াচ্ছিলাম, কখনও কখনও ধীরে ধীরে চলছিলাম। নির্জ্জন পথে তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপত্যকা চুম্বি-ভ্যালিতে চলেছি, প্রকৃতির সেই অতুলনীয় রূপ যেন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে আমাদের মনকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ক্লান্তি, অবসাদ কিছুই যেন আমাদের নেই। তুরসা ও আমচু নদী একসঙ্গে মিলে চুম্বি-ভ্যালি দিয়ে বয়ে চলেছে। ক্রমশঃ

মৃগতৃষ্ণিকা ডাকে

শ্রীদেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার হরিণ উধাও সুদূর অরণ্য-পথ-বাঁকে,
মরমের ভীরু আশার তিয়াসে কাঁদে কল্পনা-সীতা;
শুকালো পূজার নির্মাল্য কি শবরীর আঁখিপাতে?
ঝরে বনানীর বেদনা-মলিন অশোকের মঞ্জরী!
মাঝপথে আমি পথ ভুলি, মোরে মৃগতৃষ্ণিকা ডাকে,
অশ্রু-কাজলে লিখি তাই স্মৃতি-সজল স্বপ্ন-গীতা;
অর্ঘ্যের সাজি ভরা যে আমার অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে,
অনিশ্চিতের ঘূর্ণতে মোর দীর্ণ মানস-তরী!

অতীতের ঝরা পাতার অঙ্গনে কান পেতে আমি শুনি
বনহরিণীর চকিত চপল চরণের পথচলা।
আকাশ অসীম শূন্যের বুকে ছায়াপথ যায় আঁকি
ক্ষণপুলকের পলাতক নভ-বলাকারা ঝাঁকে ঝাঁকে।
স্মৃতির সূতায় উর্ণনাভের মায়াজাল আমি বুনি,
মন-মর্ম্মরে শোনাই সেকথা, যেকথা হয় নি বলা;
নিদাঘের দীন রিক্ততা মেঘ-অবগুণ্ঠনে ঢাকি
আলো-আঁধারিয়া ছায়া ঘেরে মোর চেতনার সীমানাকে।

কি ছিল, কি হ'ল?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

২২

গোপী-যন্ত্রে ঝঙ্কার তুলে সখিচরণ গান ধরেছে—

প্রেমের হাওয়া লাগল আমার পালে।
নেচে নেচে নাও চলে মোর—
ঢেউয়ের তালে তালে।
আমি, মানবো না এ কাল বোশেখী
সামনে যদি তোমায় দেখি!
হও যদি মোর সঙ্গী তুমি—
ভয় কি আমার মরণ-কালে?
ভয় থাকে না, প্রেম যেথা রয়—
খুব সোজা হয় ছয়-রিপু জয়!
খায় চুমু সে—হেসে হেসে—
খল্ বিষধর সাপের গালে।

—কে? কে? কে ওখানে?

সন্ধ্যার অন্ধকারে, বারান্দার এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক নিস্পন্দ ছায়ামূর্ত্তি! কে সে? সখিচরণ চিনতে পারছে না। ছিন্ন মলিন-বেশ—আলুথালু কেশ! পাগলী নাকি? কোনও কথা বলছে না। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। ওর মতলব কি?

—সেজবৌ! বাতিটা নিয়ে এস ত…

একটা হারিকেন হাতে সুহাসিনী ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

—দেখত ও মেয়েটা কে? কি চায়?

এগিয়ে গিয়ে, মুখের উপর আলোটা ধরে সুহাসিনী চমকে উঠল—ওমা! ছোটবৌ যে…

—ছোটবৌ? সখিচরণ চীৎকার করে বলে উঠল—তাড়িয়ে দাও। তাড়িয়ে দাও। দূর করে তাড়িয়ে দাও…

সখিচরণের চীৎকার শুনে, নরোত্তম ছুটে এল সেখানে।

—কি রে? কি হয়েছে, চেঁচাচ্ছিস কেন?

—সেই জাতনাশা হারামজাদী এসে হাজির হয়েছে বড়দা!

নরোত্তম ধমক দিয়ে বলল, চুপ চুপ, চেঁচাস নে। কে এসেছে? আমার কাদু নাকি?

—না, না,—মনোহরের বৌ! কুলে কালি দিয়ে যিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। পরের বৌ সেজে—মনোহরকে একটা কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভাগিস সে এখন বাড়ীতে নেই। থাকলে এখুনি হেঁসো দিয়ে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দিত…

বিরক্তভাবে নরোত্তম বলল, আঃ, বলছি—চেঁচামেচি করিস নে। যাও বৌমা! ঘরে যাও…

—ঘরে যাবে? সখিচরণ বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল নরোত্তমের মুখের দিকে।

নরোত্তম বলল, তবে কি সারা রাত এই উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকবে? বলি, কাদুকে কি ফেলে দিতে পেরেছি? অনুতাপে জ্বলে-পুড়ে মানুষ যখন ছাই হয়ে যায়, তখন কি আর তার ভিতর কোনও পাপ থাকে? কাদুকে ত দেখিস নি? সে চোখে দেখতে পায় না। 'দাদা' 'দাদা' বলে হাত দুখানা বাড়িয়ে সে যখন আমাকে ডাকে, আমি কি পারি তার কাছে না গিয়ে? যাও বৌমা, ঘরে যাও…আমি বুঝতে পেরেছি—তোমার বুকটাও আমার কাদুর মত জ্বলছে…

নীহারিকার হাতখানা ধরে টানতে টানতে নরোত্তম তাকে পৌঁছে দিয়ে এল মনোহরের ঘরে।

গত এক বছর ধম্মদা নীহারিকাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সিনেমা দেখিয়েছেন। তাঁর কৌমার্য্য-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল, সুযোগ ও সুবিধা জুটলেই অসহায় নারীর সর্ব্বনাশ করা। 'পরিবার-পাহারোলা' না থাকাই এরূপ মহাপুরুষদের ব্রত-উদ্‌যাপনের সহায়ক হয়। নীহারিকার চেয়েও সুন্দরী আর একটি সহায়-সম্বলহীনা উদ্বাস্তু-বালিকা এসে আশ্রয়-প্রার্থিনী হয়েছে, এই বকধার্ম্মিক সার্ব্বজনীন দাদাটির কাছে। নীহারিকা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে। নির্ব্বোধ বালিকা জানে না যে বিয়ের বাঁধন ছাড়া, চোরাবালির উপর ঘর বেঁধে সুখে সংসার পাতা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত নীহারিকাই বিতাড়িত হয়েছে।

এক দিকে ধম্মদার উপর ঘৃণা ও অভিমান, অন্য দিকে মনোহরের জন্যে অনুতাপ, নীহারিকাকে পাগল করে তুলেছিল। আত্মহত্যার সঙ্কল্পও সে করেছিল। কিন্তু তার আগে মনোহরের সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চায়। তাকে অনুরোধ জানিয়ে যেতে চায়—সেও যেন শিবুর মত ধম্মদাকে খুন করে ফাঁসিকাঠে ঝোলে।

মনোহরের ঘরে ঢুকে নীহারিকার মনে পড়লো তাদের ফুলশয্যার কথা। নীহারিকা শিক্ষিতা মেয়ে, ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছে। সেকথা জেনে, নিরক্ষর চাষা মনোহর সারা রাত তার শয্যাপার্শ্বে বসেছিল। কত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে নীহারিকার সহিত কথা বলত সে। কোন দলিল বা চিঠিপত্রের পাঠোদ্ধারের প্রয়োজন হলে, ভাসুরদের নিকটও তার ডাক পড়ত। সাবান মেখে কলকাতার কলের জলে স্নান করে ও স্নো-পাউডার মেখে নীহারিকা মনে করেছিল, তার বোধোদয়-পাঠ সার্থক হয়েছে। হাইহিল জুতো পরে ট্রাম-বাসে উঠে সে ভাবত চাষার বৌ মেজদি ও সেজদির কি দুর্ভাগ্য! আর আজ? চোখভরা জল নিয়ে নীহারিকা ভাবছে—তার মত অশিক্ষিতা মূর্খ-মেয়ে এই দুনিয়ায় আর একটিও নেই।

কলকাতার কলের জলে যে ধম্মদার মত কত হাঙ্গর কুমীর আছে, পুকুর-ডোবার জলে মানুষ নীহারিকা তা কি করে জানবে ?

নীহারিকা যখন এই ঘরে থাকত, তখন ঘরখানা কত সুন্দর সাজানো-গোছানো ছিল। তার সুরুচির কত পরিচয় সে দিত। কাঁচা-মাটির দেয়ালে আঠা দিয়ে এটে কত ঠাকুর-দেবতার ছবি সে টাঙিয়েছিল। কালী বাড়ীর বাগান থেকে বোঁটা-সমেত ফুল এনে কাঁচের বোতলকে করত ফুলদানী।

ঘরের এক দিকে ছিল একখানা ডবল বিছানার খাট; নিজের হাতে বোনা ফুল-তোলা বালিশ ঢাক্‌না আর চাদর দিয়ে কি সুন্দর করে সে বিছানা পাতত! কলার বাস্‌না পুড়িয়ে মাসে অন্ততঃ দু'বার সে জামা কাপড় কাচত। মেজদি ও সেজদির ময়লা ও নোংরা বিছানা দেখে তার বেজায় ঘেন্না হ'ত। আজ মনোহরের একলা-শোয়া বিছানার দিকে সে চাইতে পারছে না। ঘৃণার চেয়েও বেশী হচ্ছে লজ্জা ও অনুতাপ! চাষা বলে এক দিন সে যে মনোহরকে ধমকাত, সে যদি আজ নীহারিকাকে পতিতা বলে গলাধাক্কা দেয়—তার প্রতিবাদ করবে কে ?

ধম্মদার পরামর্শে নীহারিকা সিঁথির সিঁদুর মুছে কুমারী সেজেছিল। কিন্তু খোঁপা লম্বা বেণী দুলিয়ে দিত পিঠের উপর। আজ এক মাস তার মাথায়ও তেল নেই, চুলেও পারিপাট্য নেই। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে ধম্মদার বুকের রক্তে তার সেই এলো চুল বাঁধবে। এ জন্মে সম্ভব না হলে পরজন্মের জন্যও অপেক্ষা করবে।

নীহারিকা জানে—মনোহরের সঙ্গে দেখা হলেই সে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে ঘর থেকে। তা দিক। তবু সে ধম্মদার বিরুদ্ধে তার অভিযোগটা মনোহরকে জানিয়ে যাবে। তারপর চন্দ্রকলা যে আমগাছের ডালে ঝুলেছিল—সেও ঝুলবে সেই গাছের ডালে।

ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিল একখানা ভাঙা ও ময়লা হাত-আয়না। আয়নাখানা কুড়িয়ে নিয়ে নীহারিকা তার আঁচল দিয়ে মুছল। মুখখানা দেখতে যাবে, এমন সময় সুহাসিনী ঘরে ঢুকে বলল, ও মুখ আর নিজেও দেখিস নে—অপরকেও দেখাসনে ছোটবৌ! গলায় দড়ি! ছিঃ!

উত্তেজিতভাবে কেঁদে ফেলে নীহারিকা বলল, এ মুখ আমি তোমাদের দেখাতে আসি নি সেজদি! যাকে দেখাতে এসেছি, তার সঙ্গে দেখা হলেই এখান থেকে চলে যাব! তোমাদের পায়ে পড়ি, এইটুকু সময় সহ্য কর আমাকে।

নীহারিকার চোখের জল দেখে সুহাসিনীর চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠল। চোখ মুছে সে বলল, নীহার! কেন তোর এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছিল? ছি ছি ছি—কি লজ্জা, কি ঘেন্না! লেখাপড়া জানা মেয়ে তুই! কি করে পারলি—এ ভাবে সোয়ামীর মুখে চুনকালি দিতে?

হাতের আয়নাখানা দিয়ে কপালে একটা আঘাত করে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য পাগলিনীর মত নীহারিকা আর্তনাদ করে উঠল। চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলল, না, না, আমি কিছু জানি নে। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করো না। আমি কিছু বলতে পারব না…

মনোহর গিয়েছিল হাটে। বারান্দায় বসে গালে হাত রেখে নরোত্তম ভাবছে—কেন তার ফিরতে এত দেরি হচ্ছে? আনবে ত শুধু তেল নুন আর লঙ্কা? ওৎ পেতে বসে আছে নরোত্তম—মূর্খটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বৌমাকে কিছু না বলে বসে। তার মনে পড়ছে—সে এক দিন দা উঁচু করে দেখিয়ে চন্দ্রকলাকে বলেছিল, 'বেড়ার এদিকে এলে কেটে দু'খণ্ড করব।' অভিমানিনী গলায় দড়ি দিয়ে মরল। মেয়েদের প্রাণ যে কত কোমল, নরোত্তম তা জানে।

সখিচরণ এসে বলল, আচ্ছা বড়দা! তুমি কি বলতে চাও—ওই বৌ নিয়ে মনোহর ঘর সংসার করবে?

—কেন করবে না? এক বছরের বেশী বৌমা কোথায় ছিল, সে খবর কি আমরা রাখতাম? ছেলেমানুষ ছোটবৌমা, যদি কোন কুলোকের ফুসলানিতে ভুল পথে পা বাড়িয়ে থাকে, তা হলে কি আমরাও দায়ী নই? সবচেয়ে বড় কথা কি জানিস? বৌমা নিজেই ফিরে এসেছে। আমরা আনতে যাই নি। তার চেহারা দেখেও কি বুঝতে পারছিস নে—তার বুকটা কতখানি জলছে? ভুল করে সে-ভুল যে স্বীকার করে—অনুতাপে জ্বলে পুড়ে যে তার খেসারত দেয়—তাকে আর নির্যাতন করতে নেই…

—কিন্তু সমাজ?

—কার সমাজ? কোথায় সমাজ? কাদের নিয়ে সমাজ? যে সমাজে শয়তান আছে, সে সমাজে শয়তান যে মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার ঠাঁই থাকবে না কেন? যে শয়তান আমার বোকা বৌমাকে ভুল বুঝিয়েছিল, সমাজ কি তাকে ত্যাগ করবে? ঠগ বাছলে গাঁ যে উজোড় হয়ে যাবে…

এমন সময় হঠাৎ নীহারিকার আর্তনাদ শুনে নরোত্তম ছুটে গেল সেই দিকে। নীহারিকাকে কাছে নিয়ে, জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে মা! কি হয়েছে? সেজ বৌমা তোমাকে কিছু বলেছে বুঝি?

লজ্জিতা নীহারিকা মাথা হেঁট ক'রে বলল—না, কিছু হয় নি…

—তবে তুমি কেঁদে কেঁদে আমার মনোহরের অকল্যাণ করছ কেন? মুখ মুছে ফেল…

নরোত্তমের পায়ের উপর পড়ে নীহারিকা ডুকরে কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদে বলল—না, না, আপনি আমাকে এতখানি ক্ষমা করবেন না। দু'পায়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলুন। আমি বাঁচতে চাই না…

সুহাসিনীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে নরোত্তম বলল,—শোন সেজবৌমা! এই ছোটবৌমা আমার মা। সখিচরণ আর মনোহর যদি ওঁকে ত্যাগ করে, করবে। আমার মাকে আমি কখখনো ত্যাগ করব না। তুমি কেঁদ না মা! শান্ত হও। আমি দেখি মনোহর এল কি না…

নরোত্তম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেজবৌ ছুটে গেল সখি-

চরণের কাছে। চোখদুটো বড় করে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমার দাদার কি মাথা খারাপ হ'ল?

সখিচরণ একটু হেসে বলল—বড়দা ওই হারামজাদীর মুখে মা-কালীর মুখ দেখছে। আমাদের ত চোখ নেই, তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

নীহারিকা ভাবল—সত্যিই কি তার চোখের জলে মনোহরের অকল্যাণ হবে? সে দাবি কি তার আছে? হঠাৎ মনে পড়ল—কপালে ত সিঁদুর নেই! স্বামীর ঘরে যতক্ষণ সে আছে, ততক্ষণ কেন সে সিঁদুর পরবে না? মরতে যদি হয়, চন্দ্রকলার মত সিঁথিভরা সিঁদুর নিয়েই সে মরবে।

হঠাৎ নীহারিকার মনে পড়ল—ওই মাচানের উপর যে বড় হাঁড়িটা রয়েছে, তার ভিতর আছে এক থান্ সিঁদুর! উঠে গিয়ে হাঁড়িটার ভিতরে সে হাত দিল।

—উঃ! কিসে কামড়ালে আমাকে? নীহারিকা হাঁড়িটা নামিয়ে দেখল—প্রকাণ্ড একটি বিষধর কুণ্ডলী পাকিয়ে ডিম তা দিচ্ছে—আর বেশীক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকতে হ'ল না। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। সর্ব্বাঙ্গ নীলাভ হয়ে উঠল। টলতে টলতে নীহারিকা শুয়ে পড়ল মনোহরের বিছানায়।

২৩

নীহারিকাকে সাপে কেটেছে, এ খবর কেউ জানল না। সুহাসিনী একবার উঁকি দিয়েছে। দেখেছে—নীহারিকা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। অস্ফুট স্বরে মন্তব্য করেছে—বেহায়া মাগী! কি করে পারলি সোয়ামীর বিছানায় গতর ছোঁয়াতে? ছি ছি ছি!

বাইরের ঘরে সখিচরণের সঙ্গে নরোত্তমের ভয়ানক তর্ক বেধে গেছে নীহারিকাকে নিয়ে। মনোহর দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে শুনছে। কারও কোন কথার জবাব দিচ্ছে না। তার দু'চোখ দিয়ে শুধুই জল গড়াচ্ছে।

সখিচরণ বলল—যতই যা বল বড়দা! মনোহরের যদি ঘেন্না-পিত্তি থাকে, ত' হলে ও-বৌ নিয়ে আর ঘর করতে পারবে না সে···

নরোত্তম বলল—মনোহর যদি মানুষ হয়, তার যদি একটুও বিচারবুদ্ধি থাকে, তা হলেই পারবে!

—কিন্তু সমাজের কথা ত তুমি একটুও ভাবছ না?

—আবার সমাজের কথা তুলছিস? বলি, কোন্ পাপে তোদের দেশটা আজ উচ্ছন্নে গেল, তা জানিস? টিকি আর নামাবলী দেখেই তোরা পায়ের ধুলো নিস—কোট পেন্ট্‌লান্ দেখেই সেলাম ঠুকিস। ঘেন্না করিস নিরপরাধ শিবুর বৌ আর মনোহরের বৌকে। প্রাণের বোন্ অবুঝ কানুকেও তোরা সহ্য করতে পারিস না। সমাজের বাইরের খোলসটাই মাজাঘষা করিস, ভিতরটা যে পচে গলে দুর্গন্ধ হয়ে উঠল—সে খবর রাখিস না। ওরে! তোদের প্রাণ নেই, প্রাণ নেই···

অবুঝ বালকের মত নরোত্তম কেঁদে উঠল। হঠাৎ চোখ মুছে, সোজা হয়ে বসে, মাথার পাকা বাব্‌রিটা ঝেঁকে বলল—তোরা সমাজ নিয়েই থাক। আমি চলে যাচ্ছি আমার মাকে নিয়ে। আর যে-ক'টা দিন বাঁচি, কানু আর ছোট বৌমার হাত ধরে পথে পথে কেঁদে বেড়াব, তবু তোদের এ প্রাণহীন সমাজে আর একটা দিনও থাকব না···

মনোহরের তিক্ত-মনের ভারকেন্দ্র নরোত্তম আর সখিচরণের যুক্তিতর্কের দোলায় দু'দিকেই দোল খাচ্ছিল। সে একবার ভাবছে—কানুর আর নীহারিকার অপরাধ কি? তারা ভুল করেছে। ভুল ত সবাই করে। মনের অগোচর পাপ নেই। এমন অনেক গোপন পাপ সেও করেছে, যা লোকে জানে না। লোক-জানাজানিটাই কি বড় কথা? আবার ভাবছে—নাঃ! নীহারিকাকে নিয়ে ঘর-করা আর সম্ভব নয়। লোকে কি বলবে? কে ক্ষুধার্ত্ত মনোহরের সামনে একটা টাকা ছুঁড়ে ফেলে হোটেল দেখিয়ে দিয়েছিল? সে অপমানের কথা কি মনোহর ভুলতে পারে?

কিন্তু নীহারিকা এল কি করে? লজ্জা করল না? তার পাউডার-মাখা ঠোঁট-রাঙান মুখখানা এখনও মনোহরের চোখের উপর ভাসছে। তেমনি রূপসজ্জা করেই কি সে এসেছে এ বাড়ীতে? মনোহর ভাবছে—একবার তার চেহারাটা দেখে আসি। শুনে আসি সে কি বলতে চায়? ধম্মদা তাকে তাড়িয়ে দিল কেন?

এমন সময় শ্যামাচরণ এসে হাজির হ'ল সেখানে। মেজবৌ সৌরভিনী আর তার ছেলেমেয়েগুলোকে খিড়কির পথে ভিতর-বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, একটা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনের মত মোট মাথায় নিয়ে সে এসেছে সামনের রাস্তায়।

ধপাস করে মোটটা বারান্দার উপর ফেলে, শ্যামাচরণ গিয়ে প্রণাম করল নরোত্তমকে। নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—কি রে শ্যামা! হঠাৎ এভাবে কলকাতা ছেড়ে চলে এলি যে···

—সে ঝকমারির কথা কি আর বলব বড়দা! প্রাণটা নিয়ে যে আসতে পেরেছি, সেই ভাগ্যি। গুড়োকে রেখে এসেছি। আর দু'চার দিন থাকলে, বাকি ক'টাকেও রেখে আসতে হ'ত···

—গুড়োকে কোথায় রেখে এলি?

—নিমতলায়। খিচুড়ি খেতে খেতে সবারই পেট ছেড়ে দিয়েছিল। পাকিস্থানে মোছলমান হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু আর হিন্দুস্থানে যাব না।

গুড়োর কথা মনে পড়ে নরোত্তমের চোখ দুটা সজল হয়ে উঠল। এই গুড়োকে চন্দ্রকলা কত ভালই না বাসত! মনে মনে বলল—গুড়োকে নিয়ে গেলে আমাকে কেন নিচ্ছ না? বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরোত্তম চোখ মুছল।

বিরক্তির সঙ্গে সখিচরণ বলল—বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে কেন মরতে গিয়েছিলে সেখানে?

—বৌয়ের বুদ্ধি! পাঁচ জনের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হয়ে এসেছেন। সোনার অঙ্গ একেবারে কালি হয়ে গেছে। দেখে আর

'চিনতে পারবি নে। দেহখানা—হাড়ের উপর চামড়া দিয়ে ঢাকা! সে মেজবৌ আর নেই···

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—সেখানে কি খেতে দিত না?

—কি খেতে দেবে? ধান-চালের দেশটাকে পাকিস্থান করে দিয়ে, লাখ-লাখ লোক গিয়ে মরেছে সেখানে। কোথায় এত চাল আছে? কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে ধারকর্জ্জ করে, খোট্টাই-খাবার এনে হাজির করছে। ভেতো-বাঙালী কি গম হজম করতে পারে? বাবুভায়ারাও পেট ছেড়ে দিচ্ছেন। ওরা ভুল করছে বড়দা! যে ক'জনকে বাঁচাতে পারবে তাদের রেখে বাকিগুলোকে তাড়িয়ে দিলেই ভাল করত, সবাইকে বাঁচাতে গিয়ে সবাইকে মেরে ফেলছে। কতকগুলো মতলববাজ লোকের হাতে পড়েছে দেশ-শাসনের ভার। মানুষ মেরে যে যার বড়লোক হবার তালে আছে। গরীবদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না···

মনোহর ভাবছিল—সদর দিয়ে ঘুরে খিড়কির পথে গিয়ে দেখে আসি—নীহার কি করছে? সে বাইরের দিকে যেতেই নরোত্তম ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছিস? আমার কাছে এখানে এসে বসে থাক···নরোত্তমের ধারণা মনোহর বুঝি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মনোহরের উদ্দেশ্য নরোত্তম ঠিক বুঝল না, সেও লজ্জায় বোঝাতে পারল না। ধমক পাওয়া অপরাধীর মত দাদার পাশে গিয়ে চুপ করে বসে রইল।

রাত তখন এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হারিকেন হাতে নিয়ে প্রায় আট-দশ জন লোকসহ কেরামত সর্দ্দার এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজনের হাতে ও গলায় দড়ি-বাঁধা। গলার দড়িটা কেরামতের হাতে-ধরা।

—ব্যাপার কি সর্দ্দার? নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

—তোয়াজকে বেঁধে এনেছি···

—কেন?

—তুমি বুঝি কিছু শোন নি?

—না তো?

তোয়াজকে দেখিয়ে কেরামত বলল, এই শালা কাল এসেছিল তোমাদের পুকুরে গরু নাওয়াতে। সেই সময় সখিচরণের বৌকে বলেছে সে—পাকিস্থান হয়ে গেছে। মোড়লরা কেউ আর এদেশে থাকবে না। তুমি যদি রাজী হও—আমি তোমাকে নিকে করব। খুব সুখে রাখব···

—তুমি তা জানলে কি করে?

—সখিচরণই বলেছে আমাকে···

নরোত্তম সখিচরণের দিকে চাইতেই সে বলল, তোমাকে বলাও যা, ওই সর্দ্দারকে বলাও ত তাই···

—নিশ্চয়ই! বৌমাকে একবার ডাক সখিচরণ! কেরামত আদেশের সুরে বলল, বৌমা এসে এই বারান্দায় একবার দাঁড়াক। তাঁর সামনেই শালার মুখে আমি পঁচিশ-ঘা জুতো মারব।

নরোত্তম বলল, থাক। গলায় দড়ি-বেঁধে টেনে এনে 'জুতো মারব' বলছ, তাতেই মারা হয়ে গেছে। আর কেন?

—না, না, তা হতে পারে না মোড়ল! এই শালাদের জন্যই আমাদের পাকিস্থানের দুর্নাম রটছে।

নরোত্তম একটু হেসে বলল, 'তোমাদের পাকিস্থান! আমাদের ত নয় সর্দ্দার? তোয়াজের মত দুশমনকে শাসন করার অধিকার আজ আর নরোত্তম-মোড়লের নেই কেন? কেন সখিচরণ গেছে তোমার কাছে নালিশ করতে? নরোত্তম কি মরে গেছে?' ঘাড় ফুলিয়ে নরোত্তম গর্জ্জে উঠল—এক দিন তোয়াজকে আমিই পারতাম একটা পায়রার মত ছিঁড়ে ফেলতে। এখন আর সে ভয় তোয়াজ করে না। তাই নয় কি তোয়াজ?

তোয়াজ বলল, আমাকে মাপ কর মোড়ল! এমন বেয়াদপি আর কখনও করব না আমি···

নরোত্তম বলল, তোমাকে শাসন করছে যে, মাপ করবে সে। আমি পারি তোমার পক্ষে ওকালতি করতে। তাই ত করছি। কি বল সর্দ্দার?

কেরামত দুঃখিতভাবে বলল, তুমি একটু বাঁকা বলছ মোড়ল!

—মোটেই বাঁকা বলছি না সর্দ্দার! খুব সোজা বলছি। আমার বাড়ীর পাশেই একটা বাগানের ওধারে তোয়াজের বাড়ী। তুমি একজন ভিন্ গাঁয়ের মাতব্বর! তুমি কেন এসেছ তাকে শাসন করতে? কারণ সে মুসলমান। তোমার গাঁয়ের কোন হিন্দু যদি কোন অপরাধ করে—তুমি কি আসবে আমার কাছে নালিশ করতে? আসবে না। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে তোয়াজকে চাল-ডাল জুগিয়েছি, সে আজ বাদশা বনে গেছে। তার সংসারের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। একটা বৌকেই খেতে দিতে পারছে না। তবু আর একটা নিকে করবার সাধ জেগেছে তার মনে। তার কারণ সে বুঝেছে—পাকিস্থান মুসলমানের দেশ। হিন্দুর নয়। 'আমার পাকিস্থান' বা 'পবিত্তির স্থান' বলে গর্ব্ব-বোধ করতে তোমরা পার, আমরা পারি না। সে অধিকার নেই আমাদের। তাই নয় কি সর্দ্দার? সত্যি বল ত?

—তোমার কথা বুঝলাম মোড়ল! সেদিন তুমি আমার কাছে হার মেনেছিলে। আজ আমি মানলাম তোমার কাছে। তোয়াজকে তুমিই শাসন কর—আমরা চললাম···

—আরে, রাগ করে চলে যেও না ভাই! পান-তামাক খাও। আর একটা কথাও শুনে যাও···

—কি?

—নরোত্তম আর এদেশে থাকবে না। থাকবে ওই মুখ্যুর দল—শ্যামাচরণ, সখিচরণ, আর মনোহর। ওদের একটু দেখ···বলেই নরোত্তম কাঁদতে কাঁদতে কেরামতের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরল।

—হাঁ, তুমি যাবে? এই কেরামত তোমাকে যেতে দেবে? তোমার চিতে আর আমার কবর এই পাকিস্থানেই হবে···বলেই কেরামত তার দলবল নিয়ে চলে গেল।

চোখ ঘাড়িয়ে মনোহর বলল সখিচরণকে—দে এখন তোয়াজের হাতের বাঁধন আর গলার দড়ি খুলে দে! কেন নালিশ করতে গিয়েছিলি কেরামতের কাছে? আমি ত এখনও যমের বাড়ী যাই নি?

সখিচরণ অত্যন্ত অপরাধীর মত বলল, আমার ভয় হয়েছিল···

—ভয় হয়েছিল যে, আমি তোয়াজকে মারপিট করব, আর একটা অনর্থ ঘটবে। এই ত? বলি, তোয়াজ কি অন্যায়টা করছে শুনি? সে যদি এখন ছোট-বৌমাকে নিকে করতে চায়? বৌমাও যদি রাজী হয়ে যায়? কে বাধা দিচ্ছে? তোরা ত তাঁকে তাড়িয়েই দিচ্ছিস। ওরে মুখ্যু, আগে ঘর সামলা! তারপর পরকে শাসন করিস···

নীহারিকাকে দেখবার অদম্য আগ্রহ নিয়ে মনোহর সরে পড়েছিল। কেউ তা লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ মনোহরকে পাশে না দেখে নরোত্তম চঞ্চল হয়ে উঠল। চারিদিকে সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলে ব্যস্ত ভাবে বলল, খুঁজে দেখ—খুঁজে দেখ—সে মুখ্যুটা আবার গেল কোন্ দিকে। আমার ভয়ে নিশ্চয়ই দেশ ছেড়ে পালাবে···

সখিচরণ ও শ্যামাচরণ দু'জনাই ছুটল বাইরের দিকে।

মনোহর যখন চোরের মত তার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, তখন পথে দেখা হ'ল সুহাসিনীর সঙ্গে। সে একটু বিদ্রূপ করে বলল, সতী-সাবিত্রীর পদসেবা করতে যাচ্ছ ঠাকুরপো? যাও। অন্ধকারে ঘরে ঘুমুচ্ছেন তিনি—এই বাতিটা নিয়ে যাও···

মুখের কাছে হারিকেনটা ধরে মনোহর দেখল—সে ত নীহারিকা নয়! কে এত কালো মেয়েটা? গৌরাঙ্গী না হলেও, সে ত এত কালো নয়? এ যেন পাথরের কালীমূর্ত্তি! নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করে বলে উঠল—হাঁ, হাঁ, নীহার বলেই ত মনে হচ্ছে! নীহার! নীহার!

নীহারিকা কোন সাড়া দিল না।

গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে মনোহর আবার ডাকল—নীহার! নীহার! নীহার!

কোন সাড়া নেই।

—বৌদি! এদিকে এস ত···

সুহাসিনী ঘরে ঢুকে দেখল—নীহারিকা মরে যেন শক্ত কাঠ হয়ে আছে।

রাত তখন দ্বিপ্রহর। নীহারিকা মরেছে সাঁঝের আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে। কেউ তার খোঁজ রাখে না। মনোহর চিৎকার করে ডাকল—বড়দা! বড়দা! শীগ্‌গির এদিকে এসো···

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে নীহারিকার সেই মসীলিপ্ত কালীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল নরোত্তম। একেবারেই নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ!

ক্রমশঃ

এই পথ

শ্রীকরুণাময় বসু

বকুলতলার পথ, অন্ধকারে পথ যায় চলে,
নিঃসীম দিগন্ত পারে যার কথা জানে না সকলে,
সেই দেশে পথ যায় চলে।
পার হয়ে চলে যায় কতো গ্রাম, কতো নদী, সমুদ্র পর্ব্বত,
যে দেশে অচেনা ফুল, অজানা নক্ষত্রলোক, সেই দেশে প্রসারিত পথ।
উদয়-দিগন্ত হ'তে মেঘ-আঁকা রক্ত গোধূলিতে
পথের ধূসর চিহ্ন; ভোরে ওঠা পাখীদের কলকাকলিতে
মুখর পথের স্মৃতি;—
এখানে শিশিরভেজা বুনোঘাসে নীল ফুল রেখে দেয় নিশান্তের প্রীতি।
কতো দেশ, কতো কাল পার হয়ে চলে যায় আঁকাবাঁকা পথ,
দু'ধারে চামেলি ফুল, ভেজা জুঁই ঢেলে দেয় বসন্ত শরৎ।
কতো হাসি, কতো গান, কতো ছবি বিচিত্রিতা রেখায় রেখায়
সুদূর দিগন্তপটে উদ্ভাসিছে কালান্তরে ফের মুছে যায়।
কতো স্মৃতি বুকে করে চলে যায় দূর হতে দূরান্তরে যেথা পুণ্যপীঠ,
কতো না সভ্যতা আনে, কতো না মানুষ, কতো মমী, কতো পিরামিড
পার হয়ে চলে যায় কতো স্বপ্ন, কতো অশ্রু, পাতাঝরা, ফুলঢাকা
বিস্মৃত কবর—
যেখানে তরঙ্গ ছিল জীবন-নদীতে, বনে ছিল অশ্রান্ত মর্ম্মর;
মানুষের প্রেম ছিল, হাসি ছিল, কানে কানে কতো কথা বলা,
হঠাৎ ফুরায়ে গেল সব কিছু, সুরু হ'ল ফের পথ চলা।
কোথায় চলেছে পথ খড়ি বনে, উলুঘাসে কতো দূর উদ্যানতলীতে,—
যেখানে গহিন জলে মেঘ নামে, চাঁদ ডোবে ভোর দেখা দিতে।
পথ যায় চলে যায় জ্যোৎস্নারাতে, ভোরবেলা, ফাকা মাঠে, দুপুর
রোদ্দুরে,
ময়ূর-বেড়ানো বনে, বেতসকুঞ্জের নীচে, আরো দূরে ধু ধু করা নীল
সমুদ্দুরে।
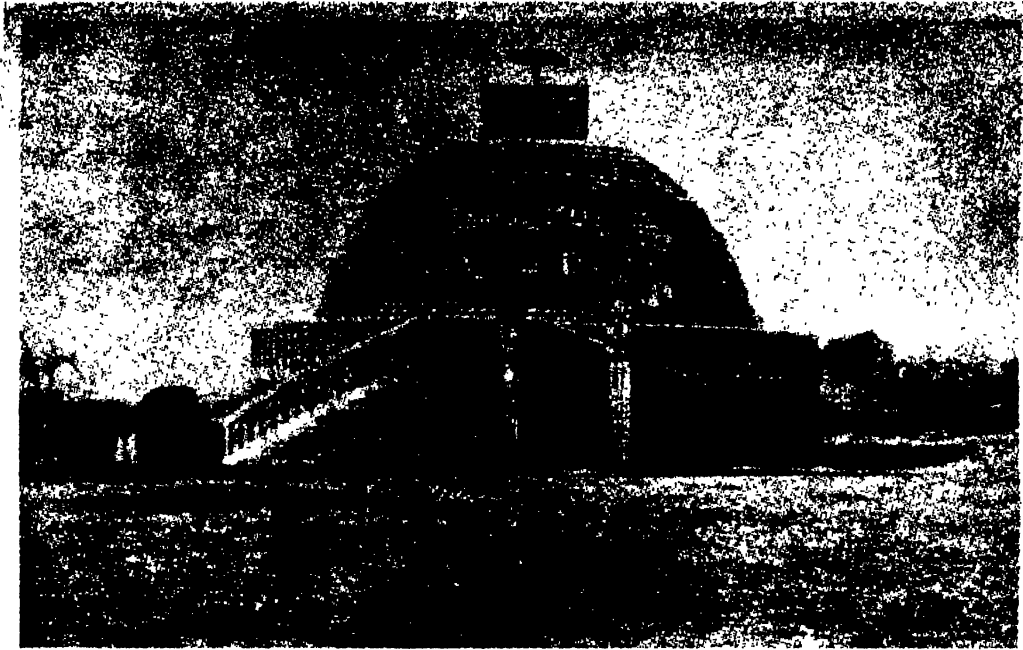
সাঁচির স্তূপ—ইহারই মধ্য হইতে সারিপুত্র এবং মোগ্গল্লানের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে

সাঁচিতে পূতাস্থি পুনঃস্থাপন অনুষ্ঠান

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৩০শে নবেম্বর অপরাহ্নে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মৌগ্গল্লানের পূতাস্থি স্বক্ষেত্র সাঁচিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সাঁচি আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল ; সাঁচির প্রাচীন নাম ছিল বৈশালী। বোম্বাই-দিল্লী রেলপথের ভূপালের ৪০ মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেলে-পাহাড়ের পাদদেশে পৃথিবীর নানা স্থানের পাঁচ হাজার দর্শকের থাকবার উপযোগী শিবিরশ্রেণী তৈরি করা হয়েছিল। এই দিন জাপান প্রভৃতি এশিয়ার বহু স্থান হতে দলে দলে বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারিণী এসে সমবেত হয়েছিলেন। ৩০শে নবেম্বর এখানে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্মেলন আরম্ভ হয়। পরদিন বুদ্ধের শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি নবনির্মিত বিহারে স্থাপিত হয়েছে। পঞ্চাশ হাজার লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাঁচি স্তূপের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই নূতন বিহার নির্মিত হয়েছে। এর কারুকার্য আধুনিক ধরণের হলেও এতে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের প্রায় সমস্ত কলাশিল্পের পরিচয় বিদ্যমান আছে। এর গম্বুজটি নিকটবর্তী স্তূপের আকারেই প্রস্তুত হয়েছে। সন্নিহিত উদয়গিরি, নাগৌরী ও জোখা থেকে সংগৃহীত পাথর দিয়ে এই বিহারটি তৈরি। পাহাড়ের ৩০০ ফুট উচ্চে [illegible] দু'হাজার বছর পূর্বে নির্মিত শিলাফলকগুলি বর্ত্তমান আছে। কোন কোন শিলায় পালিভাষায় ভগবান বুদ্ধের অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। বহু শতাব্দীর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারে নি।

সমস্ত সাঁচি এলাকায় মধ্যে অন্ততঃ বাটটি স্তূপ আছে। স্তূপ-ঘেরা পাথরের প্রাচীর পরিকল্পনায় পল্লীবাসীর গৃহস্থালির সব চিত্র ফুটে আছে। তার গায়ে খোদিত জাতক কাহিনী সুন্দর পুষ্প বা হস্তী, হরিণ, গাভী প্রভৃতি জন্মজন্মান্তরের অখণ্ড একতার আভাস সূচনা করে। প্রাচীন কালে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ, ফা হিয়েন প্রভৃতি এদের কারুকার্যে বিস্মিত হয়েছিলেন। আজও রসজ্ঞের চিত্তে সাঁচির ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলা, প্রীতি উৎপাদন করে।

সাঁচি বৌদ্ধদের চৈত্যগিরি। এর সঙ্গে মহেন্দ্রের স্মৃতি জড়িত। তিনি এই চৈত্যগিরি থেকে লঙ্কার চৈত্যগিরি মিহিনতালে শুভযাত্রা করেছিলেন। এই ভিলসা প্রদেশের সঙ্গে সঙ্ঘমিত্রার পুণ্যস্মৃতি জড়িত।

১৮৫১ সনে জেনারেল ক্যানিংহামের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সাঁচির এই তৃতীয় স্তূপটির দিকে। তিনি উপর থেকে [illegible] শলাকা চালালেন। অনুমান করলেন নীচে দুটি সিন্দুক [illegible] খোঁড়া সুরু হ'ল, বেরুল দুটি পাথরের সিন্দুক। সারিপুত্ত-মৌগ্গল্লানের

প্রস্তাবিত চৈত্যগিরি বিহার—যেখানে ভস্মাবশেষ রক্ষিত হবে

থেকে আনীত বোধিদ্রুমের চারা রোপণ করলেন আর সিকিমের মহারাজা রোপণ করলেন সিংহলের অনুরাধাপুর থেকে আনীত বোধদ্রুমের চারা।

সে আজ আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। তখন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। আর সেই মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় মহলে এক দিন একখানি পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হচ্ছে। যেমন সুন্দর দৃশ্য, তেমনি সুনিপুণ অভিনেতা, তেমনি সুললিত ছন্দের মাধুর্য—দর্শকদের মন বিভিন্ন রসের অভিনয়ে আলোড়িত হতে লাগল। অভিনয় শেষে নালক গ্রামবাসী দুটি ব্রাহ্মণ-যুবক বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এক দিনে, এক লগ্নে তাঁদের জন্ম। একজনের নাম উপতিসম, আর অপরটির নাম কোলিত। অভিনয় দেখে তাঁরা বুঝলেন এ পৃথিবীতে সব অনিত্য, সবই মায়া। অস্থির-চঞ্চল চিত্তে তাঁরা পরম জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সঞ্জয়ের নিকট তাঁরা শিক্ষালাভ করলেন। কিন্তু সে শিক্ষায় তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এক দিন বৌদ্ধ ভিক্ষু অশ্বজিতের সঙ্গে তাঁদের রাজগীরের পথে দেখা হ'ল। তাঁর কাছে শুনলেন কামনাই সংসারে সব অশান্তির মূল। তাঁর গুরু হলেন শাক্যবংশের সন্তান ভগবান তথাগত।

তখন উভয় বন্ধু রাজগৃহের বেণুবনে ভগবান বুদ্ধের চরণ দর্শনে চললেন। সেখানে দেখলেন বসন্তের মায়ামন্ত্রে নবজীবনের সাড়া জেগেছে। বনানীর শ্যামশোভা, বিহগের মিষ্ট কলতান, মলয়-মারুতের মৃদু হিল্লোলে চারিদিক উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন ভগবান তথাগতের দিকে। তাঁদের দেখতে পেয়ে বুদ্ধদেব বললেন—এরা আমার প্রধান শিষ্য হবে।

দুই বন্ধু দেখলেন—তথাগতের মুখে স্বর্গের জ্যোতি। তাঁর মন শান্ত ও নির্মল। তিনি বলছেন—"সংসারীর জীবনে অনেক বাধাবিঘ্ন। যে ভিক্ষুর মত সব ব্রত নিয়ম পালন করে, যখন আত্মস্থ হয়ে আত্মসংযম লাভ করে তখন সে ছয় রিপু দমনপূর্ব্বক কামনা-বাসনা মন থেকে দূর করে উঠে ধ্যানের প্রথম স্তরে। তারপর সে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে উঠে সন্ন্যাস-জীবনের প্রত্যক্ষ ফল পায়। এর উপরের স্তরে উঠলে সে দূর ও নিকট, মানবীয় ও অতিমানবীয় সকল শব্দ শুনতে পায়। সে পরের মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারে, নিজের জন্ম-জন্মান্তর এবং অন্যান্য প্রাণীগণের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যও প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই স্তরে এলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না।"

এই অমৃতময় বাণী শুনে বন্ধুরা ...

সিন্দুকের ভিতর হতে বের হ'ল তাঁর চিতা হতে সংগৃহীত দু' টুকরো চন্দন-কাঠ। আর পাওয়া গেল—সারিপুত্তের এক টুকরো অস্থি এক ইঞ্চির কম, আর সাত রকমের সাতটি পাথরের টুকরো।

মোগ্‌গল্লানের ভস্মাধার থেকে বের হ'ল দুটি ছোট ছোট অস্থির টুকরো। স্মৃতিকোষের ডালার ভিতরে কালি দিয়ে একটিতে লেখা ছিল 'স' আর একটিতে 'ম'।

কানিংহাম এই দুটি স্মৃতিকোষ পাঠিয়ে দিলেন ইংলণ্ডে। তারা ছিল কেনসিংটনে ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়মের সংগ্রহশালায়। মহাবোধি সোসাইটির কর্ম্মসচিব শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ মহাশয়ের চেষ্টায় ১৯৪৭ সনের মার্চ্চ মাসে এই আধার দুটি সিংহলে আনয়ন করেন। এগুলি সেখান হতে বর্ম্মায় এবং বর্ম্মা হতে ১৯৪৯ সনে ১৩ই জানুয়ারি মাঘী-পূর্ণিমায় কলকাতায় আনা হয়েছিল। তখনও নূতন বিহার নির্ম্মিত হয় নি। গত ৩০শে নবেম্বর সাঁচির এই নবনির্ম্মিত বিহারে পূতাস্থি পুনঃস্থাপিত হ'ল।

এই উপলক্ষে মহাবোধি সোসাইটির ট্রাষ্টি ভিক্ষু শ্রীনিবাস নায়ক থের এবং সিংহলী মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি ভিক্ষু ডাঃ পি, প্রান্নীরত্ন মহাথের যখন বেদীতে পূতাস্থি পুনঃসংস্থাপিত করলেন তখন সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণী ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হতে লাগল। দু'হাজার গৈরিক ও পীত উত্তরীয়ধারী ভিক্ষু তখন আভূমি প্রণাম করে তাঁদের ভক্তি শ্রদ্ধা-নিবেদন করলেন। শোভাযাত্রা করে এক স্বর্ণাধারে যখন পূতাস্থি পর্ব্বতচূড়ায় আনীত হ'ল তখন ঘণ্টা কাঁসরের ধ্বনির সঙ্গে অবিরাম স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত হতে লাগল। প্রত্যেকের হৃদয়ে ভক্তির উৎস উথলে উঠল। ভিক্ষুরা যখন ভগবান বুদ্ধের বাণী আবৃত্তি করছিলেন তখন সিংহলের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ এ. রত্নায়ক সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লানের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিহারের অভ্যন্তরে প্রদীপ-পূজার উদ্বোধন করলেন। বিহারের

দিয়ে ধর্মের অমৃত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা বুদ্ধদেবের চরণে আশ্রয় নিলেন। সেই দিন থেকে তাঁদের নাম হ'ল—সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানি। তাঁদের মায়ের নাম ছিল—সারী ও মুগ্গল। মায়ের নামানুসারে তাঁদের এই নাম হ'ল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, সারিপুত্ত নিজের জীবন অবসানের এক পক্ষকাল আগে নালন্দায় তাঁর নিজগৃহে গেলেন। সেখানে তাঁর বৃদ্ধা মাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করে ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং এই রোগেই কার্ত্তিকী তিথি দিবসে তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন ভগবান তথাগত কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্য ও জ্ঞাতিভ্রাতা অনুরুদ্ধ চন্দনকাষ্ঠের চিতায় তাঁর শেষকৃত্য সমাপন করে সুগন্ধি জলে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করলেন। তখন সারিপুত্তের সহোদর ভ্রাতা তাঁর ভস্মাবশেষ একটি কৌটায় করে শ্রাবস্তীতে নিয়ে গেলেন। ভগবান তথাগত একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়ে সেই দেহাস্থি তার ভিতর সমাহিত করবার ব্যবস্থা করলেন।

উত্তর দিক্‌কার ফটকের খোদাইকরা চিত্র, সাঁচি

মোগ্গল্লায়ন ঋদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ করতে পারতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তা করতে দিতেন না। একবার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যোগবলে খাদ্যসংগ্রহের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁকে বিরত করেন। ভিক্ষুরা অন্য দেশ হতে ভিক্ষা করে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন।
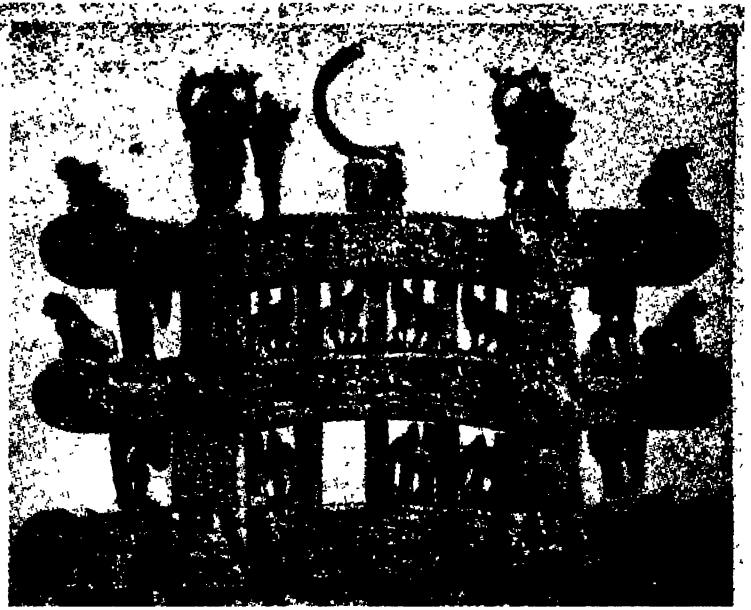
এক দিন মোগ্গল্লান ধ্যানমগ্ন আছেন, তাঁর চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর মাথায় লাঠির আঘাত করে। যখন ধ্যান ভঙ্গ হ'ল তখন ঋষি দেখলেন তাঁর শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তাঁর অন্তরাত্মা বুদ্ধের সমীপে উপনীত হ'ল যাতে বুদ্ধের চরণে প্রণাম করে তাঁর আত্মা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। এইরূপে সারিপুত্তের দেহান্তের মাত্র একপক্ষকাল পরে কার্ত্তিক অমাবস্যায় রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কালশীলা গ্রামে নিগণ্ঠদের চক্রান্তের ফলে মোগ্গল্লানের দেহান্ত ঘটে। সাঁচিতে একই স্তূপের মধ্যে তাঁদের উভয়ের ভস্মাধার রক্ষিত ছিল। যাঁরা জীবনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, মৃত্যুও তাঁদের পৃথক করতে পারে নি।

দুইটি সুইডিশ কবিতা

(ফন্ হাইডেনষ্টাম ; জন্ম ১৮৯১)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১। সুন্দরতম দেশ

কোথা পৃথিবীর সুন্দরতম দেশ ?
ধরণী ভরিয়া খুঁজে খুঁজে পথ চলি।
যে দেশেই যাই, রূপের নাহিক শেষ,
কাহারে শ্রেষ্ঠ বলি ?
আমি, যাহা আছে লভিবার—
সব লও, শুধু নিওনাকো ভগবান্,
রূপ-রেখা আঁখি—হৃদয়ের উৎসার—
তোমার শ্রেষ্ঠ দান।

২। হাজার বছর পরে

সুন্দরতম আকাশ পারে একটুকু কম্পন,
দীর্ঘ তরু ছায়ায় ঘেরা কুঞ্জ বন-আভা,
পড়ে না মনে কে ছিনু আমি, কি ছিল মোর নাম,
অশ্রু রেখা আঁখির কোণে জাগিল কি কারণ ?
মুছিয়া গেছে পুরাণো স্মৃতি। ঝড়ের গান যেন
মিলায়ে গেল ঘূর্ণ্যমান গ্রহ তারার গানে,
কোথায় গেল, কি হ'ল তার ? চিহ্ন নাহি কোন।
হারায়ে গেল অসীম-মাঝে কে জানে কোন্ খানে

পঙ্গু ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োগ

শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার

[illegible] নূতন নূতন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের আবশ্যকতা উপলব্ধ [illegible] মানুষের শ্রম-শক্তিকে কি ভাবে কাজে লাগাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, পাশ্চাত্যে তাহা এক বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। [illegible] স্বাস্থ্যবান সকল লোকদের ফ্রণ্টে লড়িবার জন্য পাঠাইয়া [illegible] হইত। যখন লড়াইয়ের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে [illegible], পুরুষের সংখ্যা কমিতে লাগিল, তখন বিবিধ পণ্যদ্রব্য

একটি আমেরিকান ফ্যাক্টরীতে সেলাইয়ের কলে কর্মরত একজন বিকলাঙ্গ লোক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লোকটি অঙ্গহীন হয়

[illegible] প্রয়োজনীয়তাও বাড়িতে লাগিল। তখন একটা প্রশ্ন [illegible] মানুষ এই চাহিদা কেমন ভাবে মিটাইবে। এই প্রশ্নের [illegible] আমেরিকানরা সুষ্ঠুভাবেই দিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি সমাজের [illegible] হইয়া ছিল তাহাদের কি ভাবে কার্যক্ষম করিয়া তোলা [illegible]। তাহাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। আমেরিকার ৩৫ লক্ষ লোক [illegible], তাহার মধ্যে পঙ্গু ব্যক্তির সংখ্যা দশ লক্ষ। ইহারা কোন-না-[illegible] অঙ্গহীন এবং তাহাদের মধ্যে অন্ধও আছে—কিছু জন্ম থেকে, [illegible] বা আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত। কেহ কেহ কল-কারখানায় [illegible] দুর্ঘটনায় কলেও অকর্মণ্য হয়। [illegible]

আমেরিকাবাসীরাও ইহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিত। তাহারা মনে করিত যে, ইহাদের দ্বারা কোন কল্যাণকর কাজ হওয়া সম্ভব নয়। লোকের দয়া, দান এবং ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া চলাই ইহাদের অদৃষ্টলিপি। আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ই. পি. চেষ্টার পঙ্গুদের সম্বন্ধে এই সকল ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত শিক্ষাদান দ্বারা পঙ্গুদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধন সম্ভবপর এবং শারীরিক ক্ষমতা অনুসারে কাজ দিয়া তাহাদিগকে সমাজের কল্যাণ বিধানে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। লোকেরা তাঁহার এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু চেষ্টার ইহাদের কথায় এতটুকুও নিরুদ্যম হন নাই, তবে এখন পঙ্গুদের বেশী কাজ দিতে তিনি সমর্থও হন নাই।

যখন যুদ্ধ সুরু হয়, বিশেষ করিয়া আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, তখন কর্মক্ষম লোক ও যুদ্ধোপকরণের আবশ্যকতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের কাজের জন্য নূতন নূতন কারখানা খোলা হইল, কিন্তু এত কাজ সম্পন্ন করিবার মত লোক আসিবে কোথা হইতে? চেষ্টার এই সুযোগে নিজের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন এবং রাষ্ট্রের অধিকারীবর্গ, কারখানার মালিক, চিকিৎসক আর মনোবিজ্ঞানবিদ প্রভৃতির সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিলেন। সাধারণ লোকেরা কিন্তু তাঁহার কথার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করে নাই। তবে পঙ্গুদের কাজ দেওয়া যে প্রয়োজন এই কথাটা সকলে মানিয়া লয়। অবশেষে যুদ্ধের বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রতি মাসে ২০০ শত পঙ্গু টুকিটাকি কাজ পাইতে লাগিল। চেষ্টার হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন।

পঙ্গু মানব-শক্তিকে কার্যে নিয়োগ করিবার বিবরণ উপন্যাসের কাহিনী হইতে কম চিত্তাকর্ষক নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। হার্টফোর্ড ট্রিনিটি-কলেজের একটি কক্ষে একটি বড় টেবিলের চারি ধারে বিভিন্ন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিক ২০।২৫ জন বসিয়াছিলেন। ইহাদের সামনে পঙ্গুদের নামের তালিকা টাইপ-করা একটি কাগজ টেবিলের উপর রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে এক এক জনের নামের উপর প্রতীকচিহ্ন লাগানো এবং নাম পড়িয়া শুনানো হইতে লাগিল।

সম্মুখে দুইটি চেয়ারে একজন ডাক্তার আর একজন মনোবিজ্ঞানবিদ বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছেও এই তালিকা [illegible] ছিল, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির নিরীক্ষা-পরীক্ষা সম্পর্কিত [illegible] নিজ মতামত [illegible] [illegible] একটা [illegible]

একবার তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। সে [illegible] সময় উড়োজাহাজের এঞ্জিনের যাবতীয় কার্য্যে অভিজ্ঞ ছিল; কিন্তু রোগে আক্রান্ত হওয়ায় দরুন তাহার কার্য্যকুশলতা অক্ষুণ্ণ থাকে নাই, সেইজন্য সে বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্ত্রী ও নয়টি সন্তান। মনোবিজ্ঞানবিদেরা তাহাকে দেখিয়া বলেন—সাধারণ ব্যক্তিদের চেয়ে সে অধিকতর বুদ্ধিমান এবং যান্ত্রিক কার্য্যে তাহার [illegible] রুচি আছে। ডাক্তাররা বলেন—তাহার শরীরে আর কোন খারাপ লক্ষণ নাই, অপারেশন সফল হইলে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হইতে পারে। চেষ্টার একটি কারখানার কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন এবং বলেন—সাহায্যকারী খরচে তাহার অপারেশনের ভার আমি লইতেছি। কারখানার মালিক বলেন—সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমি তাকে নিজের উড়োজাহাজের এঞ্জিন পরীক্ষণের জন্য রাখিয়া দিব। যথাসময়ে তাহাকে অপারেশন করানো হয় এবং তাহা সফল হয়। বর্তমানে সে নৈপুণ্যসহকারে নিজের কার্য্য করিতেছে। নিজের বেতন হইতে অপারেশনের খরচ কিস্তীতে কিস্তীতে শোধ করিয়াছে।

আজ আমেরিকার শতকরা ৫০ জন পঙ্গুকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। শতকরা ২৫ জনকে শ্রবণ যন্ত্র, নকল হাত-পা দিয়া কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য করিয়া তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইতেছে। কোন এক-পাওয়ালা লোককে কাঠের পা লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করা হয়। যাহারা চলিতে-ফিরিতে পারে না, সেইসব স্ত্রীলোককে টাইপিষ্ট এবং টেলিফোন-অপারেটার, কেশিয়ার ও বিভিন্ন আয়-ব্যয় পরীক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এক-চক্ষুওয়ালা জনৈক লোককে এক রেডিও কোম্পানীর ইনস্পেক্টার করা হয়, সে অন্য ২৫ জন ইন্সপেক্টরের সহিত কাজ করিতেছে। [illegible] লোকের হাত নাই, তাহাদের নকল হাত লাগাইয়া হাসপাতালের মেট্রন কিংবা রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়িকার কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার এক কারখানায় এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল যে, বড় এবং ভারী জিনিষ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রাখিতে পারে এবং সেই সঙ্গে এসিটিলিন-গ্যাস, টর্চ-অপেরেটারের কার্য্যও করিতে পারে। কোন স্বাস্থ্যবান-সবল ব্যক্তিকে এই সময় পাওয়া যায় নাই এবং পঙ্গুদের ভিতরেও তেমন কোন ব্যক্তির সন্ধান মিলে নাই। বহু অনুসন্ধানের পর একজন সবল-স্বাস্থ্যবান অন্ধ আর একটি বোবা পঙ্গুকে পাওয়া যায়। তাহাদের দ্বারা কার্য্যটি সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থায় গোড়ায় সকলেই পরিহাস করে; পরে কিন্তু ইহাদের নিয়োগে সুফল লাভ হয়। গোড়াতেই ইহাদের দুই জনকে আলাদা আলাদা পুরা বেতন দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপ কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা বেশ কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে পারিয়াছে।

পঙ্গুদের কাজে লাগাইয়া আমেরিকানরা তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে পঙ্গুদের আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বনস্পৃহা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বাড়িয়াছে—তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। যুদ্ধের পর পঙ্গু সৈনিকদের সমস্যা বহু দেশেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা কোন এক বিশেষ দেশের সমস্যা নহে। প্রত্যেক দেশেই দেখা দিয়াছে প্রত্যেক দেশেই ভবিষ্যতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে। তখন আমেরিকার এই দৃষ্টান্ত ব্যাপক সমস্যার সমাধানে বিশেষ সহায়ক হইবে।

প্রতীক্ষা

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

জানি, জানি, হবে একদা কৃষ্ণ রজনীর অবসান,
লাল সূর্য্যের স্বর্ণ-আলোকে ভরিবে দিগন্তর।
বন-বিহগের কণ্ঠে ধ্বনিবে অতি সুমধুর গান,
শুষ্ক বক্ষে আঁকা হবে নব চেতনার স্বাক্ষর।
আঁধার-গর্ভে মিলাবে আজের মিথ্যার যবনিকা,
চোখের নিমেষে দূরে সরে যাবে ছলনা ও প্রতারণা।
আগামী কালের ললাটে জ্বলিছে সাম্যের জয়টীকা—
বিলুপ্ত হবে চিরতরে মরণান্তের বঞ্চনা।

মানুষের মন বাঁধা হবে জানি, মৈত্রীর বন্ধনে,
আনন্দ-জ্যোতি খেলিয়া উঠিবে আর্ত্তের আঁখি-তটে।
স্বর্গ আসিয়া নামিবে ধূলার ধরণীর অঙ্গনে,
যাত্রার পথে নির্ভয়-বাণী ফুটিবে যে সঙ্কটে।
উদিবে সূর্য্য সূর্য্যমুখীর নীরব তপস্যায়,
শবরীর মতো আজো আছি সেই পরম প্রতীক্ষায়।

বুদ্ধদেব ও হিন্দুধর্ম্ম

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যিশুখ্রীষ্ট এমন কথা বলেন নাই যে, য়িহুদীদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ভুল। খ্রীষ্টানগণ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্ট উভয়কেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (হোলী বাইবেল) বলে। যিশু বলিয়াছিলেন, "আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" এই পূর্ণ করিবার চেষ্টাকে য়িহুদী ধর্মযাজকগণ উদারভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, যিশুর কতকগুলি উক্তি প্রাচীন বাইবেলের বিরোধী। তাঁহারা যিশুকে প্যালেষ্টাইনের রোমান বিচারক পাইলেটের নিকট উপস্থিত করিলেন। পাইলেট দেখিলেন যিশু নির্দোষ। যিশুকে মুক্ত করাই তাঁহার ইচ্ছা হইল। ইহা তিনি য়িহুদী ধর্মযাজকদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন। কিন্তু ধর্মযাজকগণ তাহাতে নিবৃত্ত হইল না। তাহারা বারংবার বলিতে লাগিল, "উহাকে ক্রুশবিদ্ধ করুন, উহাকে ক্রুশবিদ্ধ করুন।" তাহারা পাইলেটকে বলিল—যিশু নিজেকে য়িহুদীদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সুতরাং যিশু রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। পাইলেট দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি। বোধ হয়, রাজদ্রোহের অপরাধ শুনিয়া তিনি ভয় পাইলেন। যিশুকে জল্লাদগণের হাতে সমর্পণ করিলেন। একজন শ্রেষ্ঠ, পবিত্রচরিত্র ও নিরীহ ব্যক্তি অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইলেন।

য়িহুদী ধর্মযাজকগণের আচরণের সহিত হিন্দুধর্মের নেতৃবৃন্দের আচরণ তুলনা করিবার যোগ্য। বুদ্ধ বলিলেন যে, বেদ ভ্রান্ত। যজ্ঞে পশুবধের বিধান আছে। বুদ্ধ বলিলেন, ইহা পাপ। সুতরাং যে যজ্ঞকে বেদ শুধু শ্রেষ্ঠ নহে, "শ্রেষ্ঠতম" কর্ম বলিয়াছেন,* বুদ্ধ প্রচার করিলেন ইহা পাপ-কর্ম। হিন্দুর প্রধানতম তীর্থস্থান কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থলে বুদ্ধদেব তাঁহার মত প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। হিন্দুধর্মের নেতৃবৃন্দ রাজদরবারে অভিযোগ করিলেন না, অপর কোনও উপায়ে বুদ্ধকে হত্যা বা নির্যাতন করিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা প্রচার করিলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। বুদ্ধের সহিত প্রবল মতভেদ সত্ত্বেও বুদ্ধের ব্যক্তিগত চরিত্রের উদ্দেশ্যে এইভাবে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে হিন্দুধর্মের নেতৃবৃন্দ কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। য়িহুদী ধর্মযাজকদের নিষ্ঠুর অনুদারতার তুলনায় হিন্দুধর্মের নেতৃবৃন্দের আচরণ কত দূর মহৎ! ধর্ম-বিষয়ে অনুদারতা কেবল যে য়িহুদী ধর্মযাজকদেরই ছিল তাহা নহে। প্রোটেষ্টাণ্ট মত প্রচারের সময় রোমান কাথলিক ধর্মযাজক ও রাজন্যবৃন্দ অনেক স্থলে নবীন মতের প্রচারকদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। মুসলমান ধর্মের ইতিহাসেও মতভেদের জন্য নির্যাতন ও হত্যার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হিন্দুধর্মে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি।"† সুতরাং হিন্দুর পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হয় না যে, অন্য ধর্মাবলম্বীও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে। এজন্য হিন্দু অন্য ধর্মের লোকদিগকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া দল বাড়াইবার চেষ্টা করে নাই। প্রায় অন্য সকল ধর্মেই তাহা করিয়াছে। উদারতা বিষয়ে সকল ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "বৃহৎ বঙ্গ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন (৯ পৃঃ) যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদের কুঠার দ্বারা খণ্ডন করিয়া উদূখলে চূর্ণ করিয়াছিলেন, ইহা শঙ্করাচার্য্যের জীবনীগ্রন্থে লেখা আছে। ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে হিন্দুদের অনুদারতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত বিচার করিয়া তাঁহার শাণিত যুক্তির দ্বারা সে সকল মত খণ্ডন করিয়াছিলেন এই কথাই শঙ্করাচার্য্যের জীবনীগ্রন্থে রূপকচ্ছলে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান মতগুলি বৌদ্ধদের মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্যের শাণিত যুক্তিগুলি খড়্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বৈদিক ধর্মমতগুলিকে উদূখলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দীনেশবাবুর ন্যায় গ্রন্থকার এই রূপকের বর্ণনা সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অবশ্য একথা বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের কতকগুলি মত ভ্রান্ত। তাঁহারা বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি ন্যায্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াও সত্যের অনুরোধে তাঁহার মতগুলির ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। গীতায় যে "রাগদ্বেষ" হীন আচরণের উল্লেখ আছে, হিন্দুশাস্ত্রকারদের আচরণ

---

* "দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে" শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা ১।১ "যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম" পূর্বোক্ত বাক্যের ভাষ্যে উবট ও মহীধর উক্তি

† যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা ৪।১১

তাঁহার সম্পূর্ণ অনুযায়ী। বুদ্ধদেব বেদ-বিরোধী মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া "বিদ্বেষ" বশতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের মহত্ত্ব খর্ব করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। অপর পক্ষে তাঁহার চরিত্র ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার প্রচারিত মতের ত্রুটিগুলি মানিয়া লওয়া হয় নাই।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত কোন্ কোন্ মত হিন্দুশাস্ত্রে খণ্ডন করা হইয়াছে যাঁহারা ইহা দেখিতে চাহেন তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রে ২য় অধ্যায় ২য় পাদ ১৮—৩২ সূত্র দেখিবেন। সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের নিরীশ্বরবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ প্রভৃতি মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিলে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, এজন্য এইখানেই নিরস্ত হইলাম।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, অথচ বুদ্ধদেবের কতকগুলি মত ভ্রান্ত, হিন্দুশাস্ত্রের এই দুইটি উক্তি পরস্পরবিরোধী নহে কি? হিন্দুধর্মে এই দুইটি মত এই ভাবে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। যজ্ঞের একরূপ শক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে সে স্বর্গে যায়। অনেক অসুর প্রকৃতির লোক যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল। তাহারা যাহাতে যজ্ঞ না করে তাহার জন্য ভগবান বুদ্ধ অবতার গ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেন যে যজ্ঞে পশুবধ করিলে পাপ হইবে।* যাহার দুর্বুদ্ধি হয় ঈশ্বরই তাঁহার মনে দুর্বুদ্ধি উৎপাদন করেন। যে ভাল কাজ করে তাহার মনে ভাল বুদ্ধি উৎপাদন হয়, যে মন্দ কাজ করে তাহার মনে মন্দ বুদ্ধি উৎপাদন করেন।*

খ্রীষ্টের প্রতি য়িহুদী ধর্মযাজকদের আচরণ এবং বুদ্ধের প্রতি হিন্দুশাস্ত্রকারদের আচরণের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দেখা গিয়াছে উভয়ের ফলের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। য়িহুদী ধর্মযাজকগণ চাহিয়াছিল খ্রীষ্টের ধর্মপ্রচার বন্ধ করিয়া দিতে। কিন্তু ফলে সমগ্র পৃথিবীময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হইল। অপরপক্ষে হিন্দুধর্মের নেতৃবৃন্দ বুদ্ধকে নির্যাতন করিতে চাহেন নাই, তাঁহার ধর্মপ্রচারে কোনও বাধা দেন নাই, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবলমাত্র বিচার ও যুক্তির দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন, ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও পরে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত হইল। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ সকল দেশে পূর্বে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল বৌদ্ধধর্ম তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম সেই সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

* ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। ভাগবত ১।৩।২৪

* ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। গীতা ১৮।৬১

পিঁপড়ে-ফড়িং-কাহিনী

সমারসেট্ মম্

অনুবাদক—শ্রীসব্যসাচী রায়

ছেলেবেলায় শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অনেকগুলি নীতিশিক্ষামূলক গল্প আমাকে প্রায় মুখস্থ করিয়ে পড়ানো হয়েছিল। সেগুলির প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত নীতিকথাটিও খুব ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হত। তার মধ্যে 'পিঁপড়ে ও ফড়িঙে'র গল্পটি বোধ হয় উদ্ভাবিত হয়েছিল শিশুদের এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাটি দেওয়ার জন্য যে, এই অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন পৃথিবীতে পরিশ্রমী যারা তারাই পুরস্কৃত হয়ে থাকে এবং যারা আলস্যে কালক্ষেপ করে তাদের দুরবস্থার একশেষ হয়। এই চমৎকার গল্পে বর্ণিত কাহিনীটি সম্ভবতঃ সকলেই জানেন, এবং জানা গল্পের পুনরাবৃত্তি করছি বলে আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি—একটি পিঁপড়ে সারা বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেছিল খুঁটে-খুঁটে শীতকালের রসদ সঞ্চয়ের কাজে এবং একটি ফড়িং সেই-সময়টুকু শুধু সবুজ ঘাসের দলে অথবা ধানের শীষে বসে বসে গান গেয়েই কাটিয়েছিল। শীতকাল এলো [illegible] পিঁপড়েটির পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংগৃহীত হয়ে আছে, কিন্তু ফড়িংটির ভাণ্ডার শূন্য। সে তখন পিঁপড়ের কাছে গেল কিছু খাদ্য ভিক্ষা করতে। পিঁপড়েটি তাকে এই বহু-বিজ্ঞাপিত প্রশ্নটি করল:

"সারা গ্রীষ্মকালটা তুমি কি ভাবে কাটিয়েছিলে হে?"

"গান গেয়ে, শুধু গান গেয়েই—আমি দিন-রাত কাটিয়েছিলাম"—ফড়িং উত্তর দিলে।

"বটে, গান গেয়ে কাটিয়েছিলে? তা হলে যাও, এখন নেচে নেচেই কাটাও গে।"

কোন রকম মানসিক বিকৃতির জন্য নয়, বোধ হয় [illegible] বোধশক্তির অভাববশতঃই আমি এই গল্পের নীতিকথাটি [illegible] স্বীকার করে নিতে পারি নি। [illegible]

[illegible] ? এবং তাদের অলসতা ও দায়িত্বহীনতার প্রতি আমি তাদের স্বাভাবিক মনুষ্য-সুলভ বীতরাগ প্রকাশ করতাম।

সেদিন একটা রেস্তোরাঁয় জর্জ র‍্যাম্‌সেকে একলা লাঞ্চ খেতে দেখে এই গল্পটি আমার মনে পড়ে গেল। যে রকম বিরস বদনে সে বসেছিল তা সচরাচর চোখে পড়ে না। চুপ্‌চাপ সে তাকিয়ে ছিল—বোধ হয় সীমাহীন অনন্তের দিকেই। দেখে মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় বোঝা বোধ হয় তার কাঁধেই চাপানো রয়েছে। দেখে দুঃখ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল বোধ হয় তার হতভাগা ভাইটাই আবার কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম।

"কেমন আছ জর্জ ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"দেখতেই পাচ্ছ আমি মোটেই আনন্দে ভরপুর নেই'

"টম আবার কিছু করেছে বুঝি ?"

জর্জ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "হু, টমেরই ব্যাপার বটে।"

"তুমি ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দাও না কেন ? তার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই ত তুমি করেছ। এত দিনে তোমার বোঝা উচিত সেও একেবারেই হাতের বাইরে।"

প্রত্যেক পরিবারেই বোধ হয় এমন একজন-না-একজন থাকে যাকে বলা চলে কুলের কলঙ্ক। জর্জের পরিবারে টম বিশ বছর ধরে সেই রকম এক আপদ হয়ে আছে। অথচ প্রথমে সে বেশ ভাল ভাবেই জীবন শুরু করেছিল। ব্যবসায় নেমেছিল, বিয়ে করেছিল এবং ছুটি সন্তানও হয়েছিল তার। ভদ্র ও মার্জিত বলে সমাজে র‍্যামসে-পরিবারের রীতিমত সুনাম ছিল এবং সকলেই মনে করেছিল টম র‍্যামসেও যথারীতি কাজকর্ম করে সভ্য ও শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করবে। কিন্তু হঠাৎ এক দিন কাউকে কোন রকম ভাববার সোনবার অবকাশ না দিয়েই, টম জানিয়ে দিলে যে, কাজকর্ম করতে তার মোটেই ভাল লাগে না এবং বিবাহরূপ বন্ধনও তার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। জীবনটাকে সে উপভোগ করতে চায়। কোন রকম অনুরোধ-উপরোধ অথবা উপদেশই সে কানে তুলল না--স্ত্রী-পুত্র ও কাজকর্ম সে সত্যি সত্যিই ছাড়ল। কিছু টাকা সে জমিয়ে ছিল, তাই দিয়ে বছর দু'য়েক সে ইউরোপের বিভিন্ন বড় বড় শহরে ঘুরে ফুর্তি করে কাটাল। তার নানাবিধ কীর্তি-কাহিনীর কথা মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের কানে পৌঁছে তাঁদের বিশেষ মর্মাহত করে তুলত, কারণ সে যে খুবই মজায় দিন কাটাচ্ছিল সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ ছিল না। সকলেই অবশ্য মাথা নেড়ে টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাবার পর টমের কি অবস্থা হবে সেই ভাবনা প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁরা শীঘ্রই টের পেলেন। টম নির্বিচারে টাকা ধার করতে শুরু করলে।

আচরণে টম ছিল অত্যন্ত আমুদে ও নিন্দনীয় কার্যে দ্বিধাসঙ্কোচ-হীন। সে টাকা ধার চাইলে প্রত্যাখ্যান করা শক্ত হ'ত। [illegible] করতে তার জুড়ি ছিল না এবং বন্ধুদের কাছ থেকে [illegible] নিয়ে সে একটি সুনির্দিষ্ট আয়ের পথও তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু বরাবরই সে বলত যে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে অর্থ ব্যয় করে মোটেই সুখ নেই—বিলাসব্যসনে টাকা উড়িয়েই সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। এই শেষের কাজটির জন্য সে বড় ভাই জর্জের উপর নির্ভর করত। অবশ্য তার কাছে টম নিজের আমুদেপনার অপব্যবহার করত না, কারণ জর্জ ছিল অত্যন্ত ভারিক্কী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ওসবের কোন মূল্যই সে দিত না। জর্জ রীতিমত ভদ্রলোক। টমের ধাপ্পায় ভুলে তাকে সে কয়েকবার বেশ মোটা রকম টাকা ধার দিয়েছিল, যাতে টম আবার নূতন ভাবে জীবন শুরু করতে পারে। সে সব টাকা দিয়ে টম একটা মোটরকার ও কিছু মূল্যবান অলঙ্কার কিনেছিল। শেষকালে জর্জ যখন ভাইয়ের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিলে, তখন টম তাকে অপদস্থ করে টাকা আদায় করতে আরম্ভ করল। নিজের ভাইকে নিজেরই প্রিয় রেস্তোরাঁয় মদ পরিবেশন করতে অথবা ক্লাব থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি ড্রাইভারের সিটে বসে থাকতে দেখাটা জর্জের মত একজন ভদ্র ও প্রতিষ্ঠাবান উকিলের কাছে বিশেষ প্রীতিকর মনে হ'ত না। অথচ টম খোলাখুলি ভাবে বলে বেড়াত, হোটেলে পরিবেশন করা বা ট্যাক্সি চালানোটাকে সে নিজে মোটেই মর্যাদাহানিকর মনে করে না। তবে হাঁ, জর্জ যদি শ'দুয়েক পাউণ্ড দিয়ে তাকে বাধিত করে, তা হলে পরিবারের মর্যাদার কথা মনে করে ও ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকতে সে রাজী আছে। বলা বাহুল্য, জর্জকে টাকা দিতে হ'ত।

একবার টম প্রায় জেলে যেতে বসেছিল। জর্জ ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল। সমস্ত বিশ্রী ব্যাপারটাকে সে-ই সামাল দিলে। টম এবার সত্যিই বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। সে উচ্ছৃঙ্খল, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও স্বার্থপর ছিল বটে, কিন্তু এর আগে পর্যন্ত সে কখনও কোন অসৎ কাজ করে নি। অবশ্য অসৎ বলতে জর্জ বেআইনী কাজকেই বুঝত। এবারে কিন্তু একটা মামলা-মোকদ্দমা হলে টমের নিস্তার ছিল না। কিন্তু তোমার একমাত্র ভাইকে তুমি জেলে যেতে দিতে পার না। ক্রন্‌শ বলে যে, লোকটিকে টম ঠকায় সে ছাড়বার পাত্র ছিল না। সে ব্যাপারটাকে আদালতে টেনে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। তার মতে টমের মত জোচ্চোরদের শিক্ষা হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ৫০০ পাউণ্ড খরচ করে জর্জ সমস্ত ঘটনাটার উপর যবনিকাপাত করাতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ চেক্‌টি ভাঙ্গানোর পরই শোনা গেল টম আর ক্রন্‌শ দু'জনে মিলে মন্টিকার্লো'র দিকে রওনা হয়েছে। জর্জকে সেবার যে রকম অগ্নি-মূর্তি হতে দেখেছিলাম সে রকম আর কখনও দেখিনি। ওদিকে টম, আর ক্রন্‌শ কিন্তু মাসখানেক ধরে মন্টিকার্লোতে খুব মজা লুটল।

একাদিক্রমে বিশ বছর ধরে টম এই ভাবে রেস্ খেলে, জুয়া খেলে, নানা ধরের রূপসী মেয়েদের নিয়ে মেতে, ফুর্তি করে, সবচেয়ে দামী হোটেল রেস্তোরাঁয় খেয়ে এবং [illegible]

[illegible] ইহাই আমার [illegible] অভিজ্ঞতা। সুতরাং [illegible] [illegible] হইয়াই পড়াশুনা এক প্রকার পরিত্যাগ করে এবং ফলে পথে, [illegible], রক-যজলিংগে তাহারা দেখা দেয় সামাজিক উপদ্রবরূপে। এই কথাটা যেন আমরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখি—বিশেষ করিয়া পাঠ্য নির্বাচনের ব্যাপারে—যে "ইহা আমি শিখিয়া ফেলিতে [illegible]" এই উৎসাহপূর্ণ ধারণা না জন্মিয়া পাঠ বস্তু সম্বন্ধে যদি ইহা "[illegible] না" এই হতাশার ভাব জন্মায়, তবে পাঠ্যকে ত ভীতিকর [illegible] হইবেই এবং ভীতিকর এমন কি অরুচিকর বস্তুও জোর করিয়া [illegible] দিন পর্য্যন্ত গিলানো যায় না, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

পণ্ডিত করিয়া দিবার অদম্য উৎসাহে, একগাদি করিয়া দুষ্পাচ্য [illegible] গিলাইবার চেষ্টায় শতকরা ৭০ জন ছেলের মধ্যে ঐ হতাশাপূর্ণ মনোভাব আমরা সৃজন করিয়া থাকি। প্রথমতঃ ভারসাম্যহীন, [illegible] ও নির্বিচার পাঠ্য নির্বাচনের দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ সহজ সরল [illegible]কণ্টক ভাষায় আকর্ষণীয় করিয়া শিশুদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় [illegible] জানি না বলিয়া। ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির যে কোনও শিশুপাঠ্য পুস্তক বিচার করিয়া দেখিলেই আমার [illegible] বুঝিতে পারিবেন। মনে হইবে যেন গ্রন্থকার বিষয়জ্ঞান কি ভাবে সহজে দান করা যায় তাহা অপেক্ষা কি করিয়া ভাষার পাণ্ডিত্যে শিশুকে ঘায়েল করা যায় তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। বিষয়বস্তু শিখিতে যাইয়া শিশুকে যদি পদে পদে ভাষার কণ্টকে বিদ্ধ হইতে হয় (অর্থাৎ শক্ত কথার মানে মুখস্থ করিয়া করিয়া, এবং [illegible] দুরূহ পদের অর্থ বুঝাইয়া লইতে লইতে অগ্রসর হইতে হয়) তবে বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাহার আপনি ঘুচিয়া যায়, সুতরাং [illegible] বাধাও শক্ত হয়। সাহিত্য শিক্ষার সময় তাহাকে যত খুশী [illegible] শিখাও, কিন্তু নানা বিষয়বস্তু শিখাইবার সময় কেন আমরা [illegible] আপিস হইতে সেই সব গ্রন্থ সম্পূর্ণ বর্জন করিব না, যাহাতে ভাষা কিছুমাত্র কণ্টকাকীর্ণ ও বাধাস্বরূপ হইয়াছে?

একটু খাটিয়া ও চেষ্টা করিয়া একটা নিয়ন্ত্রিত সরল ও রুচি-রোচক সহজ ভাষা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাতে শিশুপাঠ্যগুলি লিখিলে [illegible] সমস্যা চুকিয়া যায়। সে চেষ্টা আমাদের নাই অথচ যাহাদের [illegible] আমরা শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিতেছি তাহাদের দেশে তাহা আছে। কথাটার সোজা মানে এই দাঁড়ায় যে, লোকশিক্ষাকে [illegible] লভ্য করিয়া জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে আমরা [illegible] নই। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে বাছাই [illegible] উপযুক্ত লোকের একটা কমিটি গঠন করিয়া একটা নির্দিষ্ট [illegible] সীমাবদ্ধ (standardised) সর্ব্বজনবোধ্য এবং শিশুর পক্ষে [illegible] ভাষা প্রস্তুত করা হউক এবং সেই ভাষায় পঞ্চম শ্রেণী [illegible] পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার জন্য লেখকদিগকে বাধ্য করা হউক। [illegible] ছেলেমেয়েরা সহজেই শিখিতে পারিবে এবং শিখিবার [illegible] তাহাদের পাঠ্যে মন বসিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপাত [illegible] কমিয়া যাইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সুস্থ সবল শক্তিশীল ও [illegible] হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। আর একটা উপকার [illegible]

[illegible] কাড়িয়া লইয়া এবং ছেলের উপর [illegible] [illegible] বোঝা চাপাইয়া, গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য হইবেন [illegible] নিজেরাই সহজে বুঝিতে পারিতেছে এবং নানা জিনিষ পরের সাহায্য না লইয়াও জানিতে পারিতেছে—এই আনন্দেই ছেলে পাঠ্য পুস্তকে মন দিবে ইহাই আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা। সুতরাং [illegible] বিষয়গুলিকে সহজ ও সরল ভাষায় পরিবেশন করিলে শিক্ষাব্যপদেশে অকারণে যে জাতীয় অর্থের অপচয় হয় তাহা সহজেই বাঁচিয়া যাইবে। নির্দিষ্ট-মানে-সীমাবদ্ধ সরল ভাষা প্রণয়ন করিয়া পাঠ্য পুস্তক পরিবেশন কার্য্যে বাধা থাকিবার কোন সংগত কারণ নাই।

শিশু ও অনক্ষর জনসাধারণের শিক্ষায় তথ্রগতির জন্য সহজ ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের কথার পর বর্ত্তমান স্কুল ফাইনালের পাঠ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই। পাঠ্য নির্ব্বাচনের ব্যাপার দেখিয়া সহজেই লোকের মনে সন্দেহ জন্মিবে যে, উক্ত পরীক্ষা পাসের বা স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত পড়ানোর উদ্দেশ্য—পাঠ্য মান, পাঠ্য-পরিমাণ ও আবশ্যক পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার নয়। আমাদের পূর্ব্ব-প্রভুগণ আমাদের মাথায় যে পাঠ্য মানের ধারণা ঢুকাইয়া দিয়া গিয়াছে আমরা বিবেচনা ও আক্কেল শূন্য হইয়া তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া চলিয়াছি মাত্র। পরিবর্ত্তিত ও গুরুতর বিপজ্জনক যে অবস্থা দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে খেয়াল সজাগ রাখিয়া ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের ও স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া আমরা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করি নাই। উক্ত দুইটি কথা যে আমাদের মনে আছে তাহাও পাঠ্য বিষয়গুলির দ্বারা সূচিত হয় না। বাঁচিবার নব নব পন্থা খুঁজিয়া পথ চলিবার সাহস আমাদের কই? জাতিকে ঢালিয়া সাজিতে হইলে বুকের পাটার দরকার। রাশিয়ায় যাইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—'এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভাল-মন্দ বিচার করবার পূর্বে সব প্রথমেই মনে হয়, কি অসম্ভব সাহস।" সত্যই ত জাতিকে প্রকৃতই যাহারা গড়িয়া তুলিতে চাহিবে তাহাদের এই অসম্ভব সাহস না হইলে কি চলে? সোভিয়েট রাশিয়ার শিশু-শিক্ষার সুরু হইতেই একটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শিশুর মানসিক সংগঠন নিয়ন্ত্রিত [illegible] হয়—উদ্দেশ্য এই যে শিশু আপন পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের [illegible] সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হইতে শিখিবে। দেশকে শক্তিশালী ও শত্রুদেশের বিরুদ্ধে নিরাপদ রাখিতে হইলে যে শিক্ষার স্তরে স্তরে শিশুকাল হইতে দেশপ্রেমের বীজ বপন করিয়া ও দেশরক্ষা-ঘটিত [illegible] শিক্ষা দিয়া দেশের প্রকৃত রক্ষক করিয়া তুলিতে হইবে, আমাদের [illegible] দিকে খেয়াল আছে বলিয়া ত উপলব্ধি হয় না। সকলেই [illegible] যেন বিষজ্জনীন হইয়া এই হৃদয়াবেগের ঊর্দ্ধে উঠিয়া বসিয়া [illegible] এই ভাব। তাই নিশ্চিন্ত নিরাময় চিত্তে বাকাযা স্বাধীনতার [illegible] খাতক দেশের মানুষ তাহাদের নকলনবীশির কাবন [illegible] স্বাধীনতার স্বরূপ বা তাহা যে পাইয়াছি সে বোধ [illegible] উপলব্ধি করিতে পারি নাই। [illegible]

[illegible] তাহাই
[illegible] সুরক্ত জাতিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া, স্বাধীনতার সত্য উপলব্ধি জনসাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দেওয়া হয় নাই। অথচ এই দেশ-বোধের তীব্রতাই দেশের প্রতি মানুষকে আসক্ত করিয়া দেশ গঠনে সাহায্য করে এবং দেশের জন্য সকলকে প্রাণ দিতে প্রস্তুত করে। অতএব আধুনিক ভারতের শিক্ষাদানের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, আমরা দেশের প্রতি তীব্র দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিক গড়িয়া তুলিব। শিশু-শিক্ষা হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত কিভাবে বর্তমান অবস্থার পক্ষে এই অন্তর্বিপ্লব মনোভাব গঠন করিয়া তোলা যায় তাহা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে এবং পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নানাভাবে তাহাকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। চীন, রাশিয়া প্রভৃতি নব স্বাধীনতা লব্ধ দেশগুলিতে এই গুরুতর কার্য কি উপায়ে সম্পন্ন করিয়া চলিতেছে তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে এবং তাহার নকল করিতে চেষ্টা না করিয়া, আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রতিভার অনুকূল করিয়া কি ভাবে তাহা প্রয়োগ করা যায় তাহা ভাবিয়া সেই ভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। গত পাঁচ বৎসর বারংবার এই দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো সত্ত্বেও ইহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। দেশের শক্তিকে ঘনীভূত করিয়া দেশের ক্রমোন্নতি ও স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে এই জিনিষটি যে অপরিহার্য্য সে কথা আমরা কার্য্যতঃ স্বীকার করি নাই। ফলে দেশের সমস্ত বিপদ সংকট অনাসৃষ্টি, অভাব ও নৈতিকজ্ঞানশূন্য তাণ্ডব ব্যাপারকে ঠিক পূর্ব্বেরই ন্যায় সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দেশের জনসাধারণই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধচারী হইয়া পড়িতেছে, অন্তত যাহা স্বাভাবিক ভাবে গত দিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতেছে না অর্থাৎ জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের অনুকূল ও সহায় হইতেছে না এবং স্বার্থান্বেষী দল সকল এই সুযোগকে সানন্দে আপনাদের কাজে লাগাইয়া দেশগঠনে বাধা দিতেছে, প্রজাসাধারণের সহানুভূতি হরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করিবার চেষ্টায় বহুল পরিমাণে সফল হইতেছে। আজ যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কাহারও হাতে চলিয়া যায় তবে হলফ করিয়া বলিব, যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্রিটিশের নকলনবীশি হঠাৎ মাতব্বরগণই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সুতরাং অগৌণে শিক্ষার স্তরে স্তরে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সর্ব্বাগ্রে এই দেশপ্রাণতার শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষার শিক্ষা আমাদের পাঠ্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এ বিষয়ে আর অবহেলা করিতে থাকিলে দেশের সর্ব্বনাশ অবধারিত।

পাঠ্য তালিকা গঠনে আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, ছেলেদের স্বভাবজাত বিদ্যার্জ্জন শক্তির যাহাতে কোনমতে অপব্যয় [illegible] সজাগ দৃষ্টি রাখা। অর্থাৎ দেশ, সমাজ ও জাতি-
[illegible]

[illegible] অনুযায়ী [illegible] শিক্ষার বোঝা চাপাইয়া [illegible] পরিমাণ শক্তির অপব্যয় সাধন আমরা না করি। সুতরাং পাঠ্য বিষয় এবং তাহা কতখানি শেখা দরকার তাহা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দ্ধারণ করিবার ব্যাপারে আমাদের কোন প্রকারে শিথিল-চিন্তা বা চিন্তাহীনতার কাজ করা চলিবে না।

বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস বা ততদূর পড়ানোর উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। মোটামুটি ১৫।১৬ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই পরীক্ষার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাণক্যের মতে ছেলেকে বন্ধুর মত মর্য্যাদা দিবার অর্থাৎ সাংসারিক, সামাজিক বা নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগানোর বয়স। অর্থাৎ, এই ছুই দায়িত্ব সম্বন্ধে বুঝিবার মত (দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত নয়) শিক্ষা ইতিমধ্যে তাহাকে দিয়া দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং শুধু 'পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা'র উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। তাহাকে হাতেকলমে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ দেশের সংগঠন, দেশরক্ষা ও দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যে বিদ্যা ভবিষ্যতে তাহারা কাজে লাগাইতে পারিবে না সে বিদ্যা শিখাইবার জন্য মস্তিষ্কের শক্তি তাহাদের উদ্বৃত্ত নহে। এ ধারণা শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের মনে খুব স্পষ্ট করিয়া থাকা দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ৩৫ কোটি লোকের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই ভবিষ্যতে বাংলা দেশে তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা কার্য্যক্ষেত্রে কোন কাজে লাগিবে না। সুতরাং অবশ্যপাঠ্যের মধ্যে আবশ্যকের বেশী ইংরেজী রাখিয়া অকারণে ছেলেমেয়েদের শিখিবার ক্ষমতার উপর অত্যাচার করার দরকার নাই। যাহারা আরও বেশী ইংরেজী শিখিতে চায় তাহারা স্বেচ্ছা নির্বাচিত (optional) বিষয় হিসাবে তাহা যত ইচ্ছা শিখুক। ঐ ইংরেজীটুকু শেখার দুরূহ পরিশ্রমটুকু বাদ পড়িলেই এত শক্তি উদ্বৃত্ত হইবে যে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি আরও অনেক বেশী ও দ্রুত শিখিবে এবং ঐ বয়সেই তাহাদের মোটামুটি কার্য্যকরী ভাবে সাধারণ জ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা যাইবে। ইংরেজী তাহাকে শেখান হোক, কিন্তু ইংরেজীতে পণ্ডিত করিয়া ছাড়িবার চেষ্টায় তাহার প্রাণান্ত করিয়া ফেলার দরকার কি? সহজ ইংরেজী পড়িয়া বুঝিতে ও লিখিতে পারিলেই যাহার বাজার চলতি কাজ চলিয়া যাইবে তাহাকে অপূর্ব্ব selection এর বাইবেল হইতে শুরু করিয়া ব্রাউনিং অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যের জগাখিচুড়ী পড়াইয়া তাহার মাথা ঘুলাইয়া দিয়া ইংরেজী শিখিবার দফারফা করা হইবে কেন? ধরা যাক একজন বিদেশী ইউরোপীয়কে আমরা মোটামুটি বাংলা লিখিতে পড়িতে শিখাইতে চাই। যে আদর্শের বাংলা সে শিখিবে তাহা পড়িতে না দিয়া চর্য্যা-পদ হইতে বিষ্ণু দে পর্যন্ত বিচিত্র ভাষার একটা সঙ্কলন। তাহাকে গিলাইবার চেষ্টা করা হয় তবে কি সে বাংলা শিখিতে পারিবে? [illegible]
[illegible] ইংরেজী আমরা শিখাইব [illegible] সেই আদর্শ ও [illegible]

[illegible] তাহার পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া দিলে সে সেই একটিমাত্র [illegible] অবলম্বন করিয়া দ্রুত ও সহজেই ইংরেজী শিখিতে পারিবে। তা নই জগাখিচুড়ী সঙ্কলন পড়িয়া, ইংরেজী শেখার চেষ্টায় [illegible] হইয়া, অকারণে সে তাহার সময় ও শক্তি ক্ষয় করিবে, ইংরেজী শিখিবে না। অতএব ইংরেজীতে পণ্ডিত করিবার দুশ্চেষ্টায় [illegible] জগাখিচুড়ী সঙ্কলন পড়াইবার প্রথা একেবারে দূর করা হউক। যে ইংরেজী তাহাকে শেখান দরকার হইবে সেই আধুনিক ইংরেজী [illegible] সবটা পাঠ্য লিখিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সে সেই আদর্শ [illegible] অনুকরণ করিতে পারে। আবৃত্তি করিবার জন্ম কয়েকটি [illegible] ও বিখ্যাত কবিতা দেওয়া যাইতে পারে মাত্র ; বাংলায় মোটা-[illegible] যাহার ভাবার্থ জানিলেই চলিবে। প্রশ্নপত্র সব বাংলায় দেওয়া হইবে এবং বাংলা হইতে ইংরেজী করা বা চিঠিপত্র লেখা ছাড়া আর [illegible] সে বাংলায় উত্তর করিবে। ইহাতেই এখনকার গড়পড়তা ম্যাট্রিক পাস ছাত্র অপেক্ষা সে বেশী ও নির্দোষ ইংরেজী শিখিবে।

আমাদের কর্তাদের অনেকের ধারণা এই যে, ইংরেজী ছাড়া [illegible] আমাদের মনের ভাব নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারি না এবং [illegible] ইংরেজিনবীশ না হইলে আমরা জাতে পতিত হইব। ইহা [illegible] অজ্ঞের কথা। ইংরেজী ছাড়া মনের ভাব নিঃশেষে প্রকাশ যাঁহারা করিতে পারি না তাহারা ইংরেজী করিয়া চিন্তা করিয়া তাহার বাংলা তর্জমা করিতে চাই। কি হাস্যকর অবস্থা! বাংলা [illegible] ভাবিতে আমরা যেন ভুলিয়া গিয়াছি, তাই এত মুশকিল বোধ করিতেছি। আবার সেই বিপদকে কায়েমী করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। মাতৃভাষায় চিন্তা করিতে শিখিলে এবং প্রকাশ করিতে শিখাইলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়। যাঁহারা এ লইয়া কুতর্ক করেন তাঁহারা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ইংরেজী শব্দের কি বাংলা হইবে এই [illegible] করিয়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিতে চেষ্টা করেন। মাতৃভাষার [illegible] লইয়া চিন্তা করিতে থাকিলে তর্জমা খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে মাথা কোটাকুটি করিতে হইবে না—সহজেই [illegible] প্রকাশ করা যাইবে। নিতান্তই যদি না যায় তবে সেই [illegible] শব্দটিকে আমরা আত্মসাৎ করিয়া ভাষাকে পুষ্ট করিব যেমন [illegible] করিব ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি এমন ত কত ভাষা হইতে [illegible] শব্দই লওয়া হইয়াছে। এই সূত্রে আমার বিশেষ বলিবার [illegible] এই যে, বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলিকে প্রথমাবধিই যদি ইংরেজী [illegible] যায় তবে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন অসুবিধাও হয় না [illegible] তাহার পক্ষে হাইড্রোজেন ও উদজান দুইই সমান) অথচ [illegible] বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে তাহার অন্তের সহিত যোগাযোগের পক্ষে [illegible] সুবিধা হয়। কারণ বিজ্ঞান পৃথিবীময় এক, পৃথক নয়। [illegible] হউক, মোটকথা ইংরেজী ভাষা (ইরেজী আবশ্যক শব্দ নয়) [illegible] করিলে আমরা মরিয়া যাইব না বরং আমাদের মাতৃভাষা [illegible] তাড়নায় দ্রুততর ভাবে পুষ্টিলাভ এবং সাধারণ জ্ঞান ও [illegible] দ্রুততর ও ব্যাপকতর ভাবে প্রসার লাভ করিবে। নিজেদের [illegible] নিরীহ নিরক্ষর অজ্ঞাতে প্রপীড়িত জনসাধারণের [illegible] ইংরেজীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবার বোঝা চাপাইয়া দিয়া জনশিক্ষার [illegible] বাধা দিবার এই অপচেষ্টা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, নহিলে "উলটে কচু গলায় বাধবে"—তাহারা অশিক্ষিত থাকিয়া স্বাধীন ভাবে পাঠ চিন্তা ও বিচার করিতে না শিখিলে সহজেই চতুর শত্রু দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে। প্রচুরতম দেশবাসীকে স্বল্পতম কালের মধ্যে আবশ্যক শিক্ষা দান করাই আমাদের বর্তমানে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—"নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ"—নহিলে অশিক্ষিত প্রজার গণতন্ত্র দেশকে হত্যাই করিবে। অতএব আগাগোড়া শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপে মাতৃভাষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করাই তাহা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। আবার স্মরণ রাখিতে বলিতেছি যে, একটি বৈদেশিক ভাষাকে আয়ত্ত করিবার জন্ম জনসাধারণের প্রচুর শিক্ষাশক্তিকে অপব্যয় করিবার মত মূলধন আমাদের নাই ; ৩৫ কোটির মধ্যে ৩২ কোটিরই ভবিষ্যতে ইংরেজী বুকনি ঝাড়িবার কোন দরকার হইবে না। তাহাতে দ্রুত ও ব্যাপক শিক্ষাকে বাধাই দেওয়া হইবে।

হাবভাব কাজকর্ম দেখিয়া লোকের মনে এ সন্দেহ সহজেই আসে যে, শিক্ষাব্যাপারে বোধ হয় জনসাধারণের কথা মনে আমরা চিন্তাও করি না, তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথা মনে রাখিয়া পাঠ্য তালিকার এবং শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তাই আমাদের দেশের এমন বিপজ্জনক নিরক্ষরতার অবস্থাতেও পাঠ্য-ব্যবস্থায় ইংরেজের বাঁচের নকলের অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছি না। বিপুল জনসাধারণ জোয়ারের টানে, স্বতঃই যে শিক্ষার মুখে অগ্রসর হইতে পারিবে না, ইংরেজের ব্যবস্থাপথে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী সেইরূপ একটা বিচ্ছিন্ন মধ্য শিক্ষার আয়োজন চালাইয়া গেলে ইংরেজের ব্যবস্থায় দেশশিক্ষা যেমন পিছাইয়াছিল তেমনি পিছাইয়াই থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাক্য আমাদের ভুলিলে চলিবে না—

> "যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
> অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
> তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
> অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

শিশুশিক্ষা হইতে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত ব্যবস্থা এমনি করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণ শিক্ষার পথে অবাধে চলিয়া যাইতে পারে। অতএব স্কুল ফাইনালের পাঠ্য তালিকা নির্ণয় করায় তৃতীয় উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যাহাতে জনগণের পক্ষে তাহা দুর্গম না হয়—সহজ, সরল, আকর্ষণীয় পথে অবাধে যেন তাহারা স্কুল ফাইনালে পৌঁছিতে পারে। [illegible]

অতিরিক্ত ইংরেজী যাহারা শিখিবে তাহারা স্বেচ্ছানির্বাচিত অতিরিক্ত বিষয়রূপে তাহা শিখিবে।

শিক্ষাব্যাপারটাকে আমরা, মধ্যবিত্তের তরফ হইতে, তাহাদের সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দিক হইতে ভাবিতে শিখিয়াছি, জনসাধারণের কথা মনেই রাখি না। উচ্চ ইংরেজী বর্জ্জিত মাধ্যমিক শিক্ষার কথা আমরা যেন স্থির শান্ত মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখি। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অতুলনীয় শক্তি ও সৌন্দর্য্য এবং ইংরেজের গুণগুলি সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা অন্যের চেয়ে কম নয়। তৎসত্ত্বেও বর্তমানে দেশের এই অগাধ জ্ঞানহীনতা ও বিপজ্জনক নিরক্ষরতার কথা বিচার করিয়া শিক্ষায় ও নাগরিক কর্ত্তব্যসাধনে দ্রুত উপযুক্ত হইয়া উঠিবার উদ্দেশে এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষাবিভাগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। উচ্চ ইংরেজীও থাকুক, কিন্তু স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত (optional) বিষয় হইয়া থাকুক। যাহার ইচ্ছা সে-ই শিখুক, যত খুশী তত শিখুক তাহাতে কোনই বাধা থাকিবে না। তবে শিক্ষার ঘাড়ে একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিয়া, হোক না সে সোনার পাথর, যখন প্রাণের দায়ে আমাদের ছুটিয়া অগ্রসর হইতে হইবে তখন তাহার দ্রুত অগ্রগতিকে আমরা কেন বাধা দিব ?

কাজেই পারিলে যতটুকু ইংরেজী আমাদের শিখিতে হইবে ততটুকুই আমাদের পক্ষে বেশী। তাহা শিখিতে গিয়া ইংরেজী ভাষাতেই ইংরেজের নাড়ীনক্ষত্র জানিবার ও পড়িতে সাধ্য করার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তাহাতে তর্জ্জমা-অর্থকরী ও নানা অত্যাবশ্যক জ্ঞানলাভের পথে বাধাই জন্মিবে—অন্য কিছু লাভ হইবে না, আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমাদের জনগণের গড়পড়তা বিদ্যাগ্রহণ-শক্তি এখনও অপরিপুষ্ট এবং দুর্ব্বল। তাহার পরিপাক শক্তির উপর অতিরিক্ত কোন চাপ সহিবে না। গোড়ায় বাঁচা স্বল্পমেধা-সম্পন্ন বালককে জোর করিয়া অতি পণ্ডিত করিতে গেলে যেমন তাহার পড়াশুনার দফা রফা হইয়া যায় এও তেমনি হইবে। তাহা ছাড়া সর্ব্বপ্রকারের নমুনার একটা জগাখিচুড়ী সিলেকশন পড়াইয়া, ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞকে ইংরেজী শিখাইবার যে কি করিয়া সুবিধা হইতে পারে, তাহা বুঝা কাহারও সম্ভব নয়। ছেলেদের যে সহজ ইংরেজী ভাষাও আয়ত্ত করিতে এত বেগ পাইতে হয় এবং যাহারা পাস করে তাহারাও যে তাহা শেখে না, এই জগাখিচুড়ি সিলেকশন তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। যাঁহারা হাতেকলমে শিখাইয়া থাকেন তাঁহারা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন এবং যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পড়ান না অথচ উচ্চাসনে বসিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন করেন, সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলে হয়ত তাঁহারাও তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তারপর দেখিতেছি পরীক্ষকেরা যেন কলে পাতা ঢুকাইয়া দিয়া মার্ক দেন। বিচারকের মস্তিষ্ক যেতসারবিহীন যন্ত্রকল না হইলে এমন মিগ্‌ৎ মিয়েট বিচার সম্ভব নয়। আশুতোষ বিচার করিতেন এবং মনুষ্যোচিত হৃদয়বত্তার সংযোগে তাহাকে মানবতার পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবশ্যক। যাহাই হউক, ইহাতে যে জাতীয় অর্থ ও শক্তি অকারণে অযথা অপচয় হয় তাহা যখন আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে না এবং পরীক্ষাতেও নির্ব্বিঘ্ন হইবই তখন একটা বিদেশী ভাষা শিখিতে যে পরিমাণ সময়- (প্রথম শিক্ষার্থীর) যুক্তিসঙ্গত ভাবে লাগে তাহাকে এত সংক্ষেপ করিলে চলিবে কেন ? দেখা যাইতেছে, আমরা আমাদের জাতিকে ত্রৈভাষিক তৈয়ারি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার মধ্যে একমাত্র ইংরেজীই শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী অর্থাৎ যে ভাষা সে কখনও শুনিতে পায় না, ইংরেজের সঙ্গে তাহাকে মিশিতে খেলিতে কথা বলিতে হয় না সুতরাং তাহার পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে শেখার কোন সুযোগ হয় না। অথচ এই ভাষা পরোক্ষ কৃত্রিম উপায়ে শিখিবার জন্য তাহাকে সবচেয়ে কম সময় দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে হয় ইংরেজীর মান কমাইয়া, পরীক্ষার পাসের মান নিচু করিয়া (যাহা উচিত নয়), ইংরেজীতে সহজে পাশ করার সুযোগ দেওয়া হউক, আর তা না হইলে সর্ব্বনিম্নশ্রেণী হইতে অল্পে অল্পে শব্দসংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়া করিয়া শ্রেণীর পর শ্রেণীর পাঠ্য রচনা করিয়া পড়ান হউক। মাইকেল ওয়েষ্ট প্রভৃতি অকপট শিক্ষাবিদেরা বিদেশী হইয়াও যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার মত কিছু চেষ্টাও যদি আমরা না করি তবে দেশকে আমরা ডাহামমেই দিব সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। পূর্ব্বসূরিগণের সাহায্য লইয়া আমাদিগকে নূতন উদ্যমে চেষ্টা করিয়া প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট শব্দ সীমাবদ্ধ নূতন নূতন পুস্তক রচনা করিতে হইবে। মাইকেল ওয়েষ্ট অনুসন্ধান করিয়া শিশুশ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ১২০০ শব্দকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বই লিখিয়াছিলেন। সেই সকল অনুসন্ধান, বিচার ও বিন্যাস করিয়া আমাদের আবশ্যক এবং আমাদের বর্তমান আবশ্যকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন করিয়া শিশুশ্রেণী হইতে স্কুল ফাইনাল অবধি বই লেখার দরকার। ইহার জন্য ফাঁকি বিহীন প্রভূত পরিশ্রম, দেশের আবশ্যকের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং তাহাতে বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন।

স্কুল ফাইনালের অতি অবশ্য পাঠ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। স্কুল ফাইনালের অতি অবশ্য ও দেশের গ্রহণ ক্ষমতার উপযুক্ত পাঠ্য হওয়া উচিত (১) বাংলা (২) অঙ্ক— (যতটুকু পাটীগণিত কাজে লাগিবে ততটুকু + mensuration + foctor অবধি বীজগণিত। জ্যামিতি যতটুকুতে সাধারণ জ্ঞান জন্মে, (৩) ভূগোল (৪) সংবাদপত্র (৫) সরল ইংরেজী এইগুলি হইবে তাহার মানসিক উৎকর্ষের জন্য বিষয়। শিক্ষার্থীদের নিমিত্ত এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায়, বালক বালিকাকে শিক্ষিত এবং দেশসেবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার যোগ্য করিয়া একটি প্রাদেশিক ভাষার সংবাদপত্র বহুবিধ বিষয় লইয়া, রুচিপূর্ণ সহজ ও সুবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। দুই পাতা বিজ্ঞাপন

একটি নীড়

শ্রীইলা দত্ত

"ওগো শুনছ, না চলে গেলে? ছুটি খেয়ে যাও। আসবে তো সেই ছ'টায়।" সম্পা ছেঁড়া শাড়ীটার ছেঁড়াগুলো ঢেকে পরবার অযথা চেষ্টা করতে করতে ঘরে ঢোকে। যেন কথাটা শোনেই নি, এমনি নির্লিপ্তমুখে মুখস্থের মত বলে যায়, "তোমার কমলালেবু দুটো ঐ তাকের উপর রইল। ছুটোর সময় খেও। দুধ আর পাঁউরুটি চারটের সময়, ঐ যে লেবুর পাশেই রেখে গেলাম। সাড়ে পাঁচটায় ওষুধ খেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে একটু ছাদে বসবে। আর খাবার পরের ওষুধটি খেতে ভুলো না যেন। জল ঢাকা রইল, তোমার মাথার দিকে জানলার কাছে। আমি চললাম।" সুজিত স্নেহমাখা কণ্ঠে বলে, "তুমি না খেয়ে সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করবে, আর আমি ঘরে বসে রাজভোগ খাব। না, তা হতে পারে না। তুমি না খেয়ে গেলে, আমি ওষুধ খাব না।" সম্পা সুজিতের তক্তপোষের কাছে সরে গিয়ে তার চুলগুলো দু' হাত দিয়ে নেড়ে দিতে দিতে বলে, "ছিঃ দুষ্টুমি করো না। আমার আবার ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক্সরের খবরটা নিতে হবে। দেরী করলে তার দেখা পাব না। আমার কষ্ট হবে না। আর যদি কষ্ট হয় খেয়ে নেব'খন একটা রেস্তোরাঁয়। লক্ষ্মীটি, আর এক ঘণ্টা পরে ভাতটা খেয়ে নিও। বীরুর মার কাছে চাল দিয়ে গেলাম। তাকের উপর মাখনের কৌটো আছে। আমি তা হলে যাই। এই বলে সম্পা সুজিতের মুখের কাছে মুখ এনে বলে, "রাগ করো নি তো?" সুজিতের চোখে জল আসতে চায়। সম্পার চটির শব্দ ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে।

গরম ভাত পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খেতে খেতে সুজিতের আবার সম্পার কথা মনে পড়ে। ভাত যেন হঠাৎ বুকে বাধতে চায়। "সরস্বতী মাইকি জয়", রাস্তা দিয়ে কারা যেন সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছে। আসছে কাল পূজা। সুজিতের মনে পড়ে পাঁচ বৎসর আগেকার কথা।...

সুজিত তখন চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র। সরস্বতী পূজার আগের দিন। মেয়েরা বলে, "আমরা ঠাকুর নিয়ে যাব।" ছেলেদের মনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "বেশ তো?" হঠাৎ মেয়েদের মধ্য থেকে এক জন আপত্তি তোলে, "তা হয় না। মেয়েরা যতই বলুক না কেন এই পাঁচ মাইল গাড়ীর ছাদে ঠাকুর ধরে বসে থাকা তাদের কাজ নয়।" মেয়েদের নেত্রী ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, "সম্পা, [illegible] কথা বলবার স্বভাব কেন? দেখই না, কি হয়।" সম্পা বলে, "মেয়েরা যখন অর্দ্ধেক রাস্তায় গিয়ে বলবে, আর পারছিনে, তখন চোখ মেলে দেখলেও কিছু আসবে যাবে না।" মেয়েরা যুক্তিতর্ক দিয়ে মেয়েদের প্রাধান্য দেখিয়ে অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত প্রতিমা নিয়ে বলে আর পারছি না। ততক্ষণে প্রতিমার হাত প্রায় দেহ থেকে আলগা হয়ে পড়েছে। ছেলেরা মনে মনে গজ গজ করতে করতে এ গাড়ীতে এসে বসে। গাড়ী বদলাবার সময় ক্যাশিয়ার সুজিত ঘোষের চোখ উচিত বক্তা মেয়েটির মুখের ওপর এসে থেমে যায়। লজ্জায়, রাগে কালো মেয়েটির মুখ বেগুনী হয়ে উঠেছে।

সরস্বতী পূজার দিন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সুজিত মেয়েটির দেখা পায় না। তার পরের দিন জলসায় দেখা। সুজিত বলে, "আপনি কাল কলেজে এলেন না যে?" সময় হয় নি কেন বলুন তো? সম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুজিতের দিকে তাকায়। অসাবধানতা বশতঃ সুজিতের মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায়। "কাল সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করেছি।" সম্পা বলে, কোন দরকার ছিল নাকি? সুজিতের হঠাৎ যেন খেয়াল হয়, মাথা চুলকে বলে, "না ঐ এমনি।" সম্পার হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে যায়। ও মুখে কিছু না বলে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো একটু তুলে মেয়েদের ভীড়ে মিলিয়ে যায়। সুজিত মনে মনে লজ্জিত হয়। "নাঃ, মুখ থেকে একটি বেফাঁস কথাই বেরিয়ে গেছে। যে কোন ভদ্র শিক্ষিত মেয়েরই একথা শুনলে রাগ হ'ত।"

এর পর প্রায়ই ওদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনে ও লেকে দেখা গেছে, যেমন অন্য সকলকে দেখা যায়। বি-এ পরীক্ষার পর সম্পা স্কুল মিস্ট্রেসি আরম্ভ করে। সুজিত এম এ পড়ার ব্যর্থ প্রয়াসে কিছুদিন ঘুরে সাপ্লাই-তে ঢোকে। বিয়ের পরে ওরা গিয়েছিল আগ্রায় 'সম্রাট্ কবি'র প্রেমের নিদর্শন তাজমহল দেখতে। ফিরে এসে কিছুদিন পরে সুজিত সম্পাকে চাকরী ছাড়তে বলেছিল। উত্তরে সম্পা জানিয়েছিল, "থাক্ না কয়েকটা টাকা বেশী এলে তো আমাদেরই সুবিধা। তা ছাড়া..." একটু ইতস্ততঃ করে মুখটা নামিয়ে একটু হেসে বলেছিল, "আমরা বেশী দিন আর একা থাকছি নে।" নূতন অনুভূতিতে সুজিতের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। একটি ফুলের মত নরম নিষ্পাপ শিশু তাদের ঘর আলোও করেছিল, কিন্তু ওষুধপত্রের অভাবে সে মারা গিয়েছে মাস চারেক পরেই

[illegible] ফিরিয়ে [illegible] কথা, সুজিতের [illegible] [illegible]। কিন্তু মেয়েটা মরবার পরে সম্পার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ে নি। পরের দিন সুজিতকে সময়মতো পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে স্কুলে গিয়েছে। যেন কিছুই ঘটে নি সম্পার জীবনে। হেসে আদর করেছে সুজিতকে। সুজিতের মনে হয়েছিল এর চেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদলেও সহ্য করা যেত, সম্পার এ হাসি শুনলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করে।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে সুজিতের। অসুখটা তখন সবে ধরা পড়েছে। এক দিন অভ্যাসবশতঃ সম্পা খাবার সময়ে সুজিতের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মুখ নীচু করে আদর করতে গেছে, অমনি সুজিত মুখ সরিয়ে রেগে গিয়ে বলেছিল, "আমার খাবার টাবার দরজার কাছে দিয়ে যেও। এ ঘরে কখনও ঢুকো না।" কোন কথা না বলে হঠাৎ ছিটকে চলে গিয়েছিল সম্পা পাশের ঘরে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সম্পাকে ফিরতে না দেখে সুজিত পাশের ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে জানলায় মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সম্পা। সুজিত ভুলে গেল যে, সে যক্ষ্মাক্রান্ত। আবেগ শান্ত হওয়ার পরে শ্রান্ত সুজিত সম্পাকে জিজ্ঞেস [illegible] [illegible] সম্পা ?" উত্তরে সম্পা একটু হেসেছিল শুধু। [illegible] যেন সুজিতের কপোল বেয়ে দুটো [illegible] অশ্রুধারা নেমে আসছিল।

প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকল সম্পা। সুজিতের মনে হ'ল যেন পাঁচ বছর আগেকার সম্পা ফিরে এসেছে আবার। সম্পা ছোট্ট খুকিটির মত মাথা দুলিয়ে তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগল, "জান, তুমি একদম ভাল হয়ে গেছ। আমরা পরশু হাওয়া পরিবর্তন করতে যাচ্ছি।" কি করে এ ব্যবস্থা হ'ল জানতে চোখ তুলতেই সুজিত দেখতে পেল সম্পার দু' হাতে শাঁখা ছাড়া আর কোন গহনাই নেই। বুদ্ধিমতী সম্পার চোখ পড়ল সুজিতের সন্ধানী দৃষ্টির উপর। হঠাৎ যেন একটা বড় কথা ভুলে গিয়েছে এমনি ভাবে লাফিয়ে উঠে বলল, "এই যা! দেখছ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার চা খাবার সময় হয়েছে। দাঁড়াও, কাপড়টা ছেড়ে স্টোভ জ্বালি আগে।" সুজিতের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই যেন সম্পা দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকল। কিন্তু অতি দুঃখেও সুজিতের মনে এত আনন্দ এল কোথা হতে ?

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পাড়াগাঁ যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই আছে, পাড়াগাঁয়ের জনসাধারণ এখনও কোন আলোর সন্ধান পাইতেছে না। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, অন্ন, বস্ত্র গৃহ প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহারা যথাপূর্ব্বং তথা পরং। কোন দিকেই তেমন কোন উন্নতির আভাসও দেখা যাইতেছে না। টিন, সিমেন্ট, লোহা প্রভৃতির অভাবে সকলেই প্রপীড়িত।

পাড়াগাঁয়ের প্রধান ও প্রথম বিষয় হইতেছে কৃষি, সেই কৃষির অবস্থাও শোচনীয়, কৃষি বিভাগের উন্নত শ্রেণীর বীজের ব্যবহার ও প্রচলন খুবই সীমাবদ্ধ, নূতন বা উন্নত প্রণালীর কৃষির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। জল সেচনের জন্য জলাভাব পূর্ব্বের মতই বিদ্যমান, এই সম্পর্কে এক-একটি সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত হয়; আমার অঞ্চলের দুইটি পরিকল্পনা [illegible] কার্যকরী হয় নাই। এই দুইটি পরিকল্পনার নাম (১) খুবিগাছি খাল সংস্কার এবং (২) রণের খাল সংস্কার। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এল-এ (কংগ্রেস) এই দুইটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর. আমেদ মহোদয়কে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।

এই বৎসর বর্ত্তমান সময়ে আমার অঞ্চলে পাটের মূল্য মণ-প্রতি ১৫।১৬ টাকা। কৃষকদিগের হস্তে মোটেই অর্থ নাই। ইহার ফলে আলুর চাষের পরিমাণ খুবই কম হইবে। এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত কৃষিবিভাগ আলুর সার, বাদামের খইল, সরিষার খইল প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার অঞ্চলের একজন ব্যবসায়ী গত বৎসর ৮২৫ মণ আলুর সার বিক্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহার [illegible] বৎসরের বিক্রয়ের পরিমাণ তিন [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible]

[illegible] জন্য। আলুর সারের মূল্য মণপ্রতি ১০ টাকা, বাদাম এবং সরিষার খইলের সরকারী মূল্য অনেক উঠা-নামার পর বর্তমানে যথাক্রমে মণপ্রতি ৭৷৹ এবং ৮৷৹ আনা। বাজারে বাদাম খইলের মূল্য প্রতি মণ ৮ টাকা। কিন্তু বাজারের বাদাম খইলের চাহিদা খুব বেশী। উপরোক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত বিক্রীত বাদাম ও সরিষার খইল বাজারে বিক্রীত খইল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। উহাদের নমুনা আমি দেখিয়াছি, কৃষকদিগের মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে আলুর সারে আলুরই উপকার হয়, কিন্তু খইল প্রয়োগ করিলে পরবর্তী ফসলও উপকৃত হয়।

গত ১লা নবেম্বর আমি কৃষি বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ এইচ. কে. নন্দী মহোদয়কে কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বীজ, সার প্রভৃতি সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এল, এ, মহাশয়কে সেই পত্রের এক নকল পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার পত্রের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

I subscribe to all whatever you have said I had several correspondence with the Hon'ble Dr R Ahmed, drawing his attention but so far it seems that I have not been able to make much move in this connection

The difficulties of getting permit are considerable and also the people have no option of selection of goods when they are issued under permit and naturally the people would prefer to buy from merchants as the difference in price is barely four annas Further, I am told that the officers issuing permits are harassing the people in various ways and in some cases forcibly taking Rs. 2 for entry into Potato Competition even though they do not want to join the same

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর উপরোক্ত লেখার উপর আমার কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই লেখা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে—all that glitters is not gold অর্থাৎ চকচকে জিনিষ হইলেই তাহাকে সোনা বলা যায় না।

গ্রামের চৌকিদারের মুখে শুনিলাম সাধারণতঃ জ্যোৎস্না-রাতে তাহারা বাহির হয় না তাহাদের মাসিক বেতন ৮ টাকা। গত শ্রাবণ মাস হইতে তাহারা বেতন পায় নাই। দুই বৎসর হইল তাহারা জামাও পায় নাই।

আমার গ্রাম (আঁটপুর, জাঙ্গিপাড়া থানা, জেলা হুগলী) বহু পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। স্বামী প্রেমানন্দ বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন—পরমহংসদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি আঁটপুরের ঘোষ-পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাঁহার মাতুলালয়ে আঁটপুরের মিত্রবাড়ীতে। গত ২৫শে নবেম্বর তাঁহার জন্মস্থানে তাঁহার জন্মতিথি উৎসব পালিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠের চারি জন সন্ন্যাসী এবং বহু ভক্ত আঁটপুরে আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে পূজা, হোম ইত্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশান্তিরাম ঘোষ বার্দ্ধক্য ও দৃষ্টিহীনতার জন্য এই উপলক্ষে আঁটপুরে গমন করিতে পারেন নাই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুলসীরাম ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীহরেরাম ঘোষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদেরই গৃহে কলিকাতা হইতে আগত সন্ন্যাসিগণের ও ভক্তবৃন্দের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে লেখকের আমন্ত্রণে ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের মিষ্টার কেনেথ. জে. করম্যান্ আঁটপুরে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি স্বামী প্রেমানন্দের জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করেন এবং তাহার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আঁটপুর মিত্রবাটীর দেবালয়সমূহ ও আঁটপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে 'আমেরিকার ছাত্রজীবন' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, আঁটপুর মিত্রবাটীর দেবালয়সমূহের কারুকার্য্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন—এইরূপ পরিবেশ তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ) স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। গত ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) আট জন সঙ্গীসহ ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের শপথ গ্রহণ করেন। আঁটপুর গ্রামে এই পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য অদ্যাপি কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই, কেবল শ্রীশান্তিরাম ঘোষ কর্তৃক উক্ত স্থানে একটি প্রস্তর-ফলক প্রোথিত হইয়াছে। আঁটপুরে এই স্মৃতিরক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এবং সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরমহংস যোগানন্দ

শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ

[illegible]গুরু শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সাধুসভার সভাপতি ও ভারতবর্ষের যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি এবং আমেরিকার সেল্ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস যোগানন্দ গত ৭ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ লস্ এঞ্জেলস্ শহরে দেহরক্ষা করেন। আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী বি. আর সেনের সম্বর্দ্ধনা-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবার সময় অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সভায় উপস্থিত শিষ্যবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দজীর পূণ্যদেহ লস এঞ্জেলসে সেল্ফ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র মাউন্ট-ওয়াশিংটন এষ্টেটস্-এর আশ্রমভবনে লইয়া আসেন। পরে ১১ই মার্চ, ১৯৫২ তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য ও উপাসনাদি সমাপনান্তে তত্রত্য ফরেষ্ট লস্ এসোসিয়েশনের শবাগারের একটি গৃহে তাঁহার দেহ রাখা হয়। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার জনৈক প্রধান শিষ্যের আগমন-প্রতীক্ষায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থগিত থাকে। গত ২৭শে মার্চ, ১৯৫২ তারিখে তাঁহার শবাধার সীল করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শবাগারের কর্ত্তৃপক্ষ দেখিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, গত ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ২৭শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত এই বিশ দিন ধরিয়া যোগানন্দজীর পূণ্যদেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ ফরেষ্ট লস্ এসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর মিঃ হ্যারি টি রো একটি পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। নিম্নে তাহা হইতে অংশবিশেষের মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল :

"আমাদের অভিজ্ঞতায় পরমহংস যোগানন্দজীর শবদেহে পচন-ক্রিয়ার কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।...পরমহংস যোগানন্দজীর মৃত্যুর বিশ দিন পরেও তাঁর দেহে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

আমাদের জ্ঞানে শবাগারের ইতিহাসে শরীরের এরূপ সম্পূর্ণ সংরক্ষণ ও অবিকৃতি একেবারে অদ্বিতীয়।"

পরমহংস যোগানন্দকে যোগের ক্ষেত্রে নবযুগপ্রবর্ত্তক বলা যায়। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল যোগের পথে আত্মজ্ঞান লাভে বর্ত্তমান জগতের নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করা। ত্রিশ বৎসরাধিক কাল পাশ্চাত্ত্যে অবস্থানকালে তিনি স্বয়ং শত সহস্র ধর্ম্মপিপাসু নরনারীকে ক্রিয়া-যোগে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র নরনারীকে তিনি যোগের মূল প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন।

পরমহংস যোগানন্দজী বাল্যকাল হইতেই অতিশয় ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। সদ্গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষায় অল্প বয়সেই তিনি হিমালয় যাত্রা করেন। অবশেষে গুরুর সন্ধান মিলিল কলিকাতা হইতে মাত্র ১২ মাইল দূরে শ্রীরামপুর শহরে। পরমহংস যোগানন্দ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজ ধর্ম্ম-জীবন গঠনে তৎপর হইলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজ ছিলেন কাশীর সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীশ্যামা-চরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য। তাঁহার গুরু বাবাজী মহারাজ "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষিত করিয়া তাঁহার সাধন-প্রণালী প্রচারে তাঁকে প্রোৎসাহিত করেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তদীয় গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট উক্ত ক্রিয়াযোগের পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া পরমহংস যোগানন্দজীকে তাহা দান করেন। গুরুর আশ্রমে অবস্থানকালে যোগানন্দজী শ্রীরামপুর কলেজ হইতে বি এ উপাধি লাভ করেন। পরমহংস যোগানন্দ "যোগদা"-প্রণালীর প্রবর্ত্তক। "যোগদা" মানবের দেহ, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যমূলক উন্নতিবিধানের সুপরীক্ষিত প্রণালী এবং ইহার যোগসাধনের অংশই উপরিউক্ত "ক্রিয়াযোগ"। "যোগদা"-প্রণালীর প্রথম পরীক্ষা সুরু হয় রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে। রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় কাশিমবাজারের পরলোক-গত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে পরমহংস যোগানন্দজী কর্ত্তৃক ১৯১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির উদ্যোগে ভারতের নানাস্থানে আশ্রম, মঠ, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। বহু স্থলেই আশ্রম বা বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক একটি দাতব্য চিকিৎসা-লয় অথবা ঔষধ-বিতরণ-কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট।

১৯২০ সনে রাঁচি শহরে অবস্থানকালে পরমহংসজী বোষ্টন শহর হইতে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব্ রিলিজিয়াস লিবারেলস্-এর ধর্ম্ম-মহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য আহূত হইয়া আমেরিকায় গমন করেন। বোষ্টন শহরবাসীরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার সভাপতিত্বে শহরের মধ্যে যোগদা সৎসঙ্গ কেন্দ্র স্থাপন করেন। আমেরিকায় ইহাই প্রথম যোগদা সৎসঙ্গ কেন্দ্র। পরে যোগদার প্রভাব এতদূর সম্প্রসারিত হয় যে, আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক, ডেনভার, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে সেল্ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ নামে বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে ১৯২৫ সনে পরমহংসজী তাঁর আমেরিকান ভক্তবৃন্দের সাহায্যে লস এঞ্জেলসে মাউন্ট-ওয়াশিংটন নামক স্থানে হেডকোয়ার্টার স্থাপিত করেন। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহও যোগদার বাণী প্রচারে সহযোগিতা করে। ১৯২৭ সনে যোগানন্দজী প্রেসিডেন্ট কুলিজ কর্ত্তৃক হোয়াইট হাউসে সংবর্দ্ধিত হন। ওয়াশিংটনে যোগদার কেন্দ্র স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মচারী যতীন তাহার ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরিত হন। হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, দক্ষিণ-ক্যালি-ফোর্নিয়া, মিনেসোটা প্রভৃতি স্থানের [illegible]

*[illegible] বিদ্যালয়, [illegible] সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁহাদের নানা সভায় বক্তৃতাপ্রদানের জন্য পরমহংসজীকে আমন্ত্রণ করেন। আমেরিকায় এস্-আর-এফ্-এর ৩৪টি কেন্দ্র আছে, তা ছাড়া ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ফিন্‌লণ্ড, নরওয়ে সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, হাওয়াই ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সর্ব্বসমেত চুরাশীটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরমহংস যোগানন্দজী তদীয় গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের যাত্রা করেন। পরমহংসজীর জীবনব্যাপী সাধনা ও নিরলস কর্ম্ম। চেষ্টা পাশ্চাত্যবাসীর যে কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। [illegible] নিক আমেরিকান শিষ্য যোগানন্দজীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে প্রবর্ত্তশীল হইয়াছেন।

অন্তিম শয়নে পরমহংস যোগানন্দ

পরমহংস যোগানন্দজী ১৯৩৫ সনে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি এখানকার সাধন-কেন্দ্রগুলির উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। ১৯৩৬ সনে তিনি পুনরায় আমেরিকায় ফিরিয়া যান। আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তিনি ১৯৪২ সনে হলিউডে, ১৯৪৩ সনে সান্ দিয়েগোতে, ১৯৪৭ সনে লঙ বীচ প্রভৃতি শহরে চার্চ অব অল রিলিজিয়ন্স স্থাপন করেন। ১৯৫০ সনে তিনি একটি হ্রদতীর্থ" প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে একটি ছাদবিহীন বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দিবসেই 'গান্ধী-স্মৃতিমন্দির" প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তথায় মহাত্মা গান্ধীর ভস্মাবশেষ রক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়া হল" নামক সংস্কৃতিভবন পরমহংস যোগানন্দ কর্ত্তৃক ১৯৫১ সনে ৮ই এপ্রিল তারিখে হলিউডে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার গবর্ণর রাইট অনারেবল্ গুডউইন নাইট এবং কন্সাল জেনারেল এম. আর আহুজা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পরমহংস যোগানন্দ গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ বহু প্রবন্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকগুলি লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীর অন্তরে প্রেরণা যোগাইয়াছে। 'হুইস্পার্স ফ্রম ইটার্নিটি" "সায়েন্স অফ রিলিজিয়ন" প্রভৃতি পুস্তকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার "অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী" সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উক্ত আত্মজীবনী পৃথিবীর বিভিন্ন দশটি প্রধান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সম্প্রতি বাংলা ভাষায়ও উক্ত পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে এবং 'যোগিকথামৃত" নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
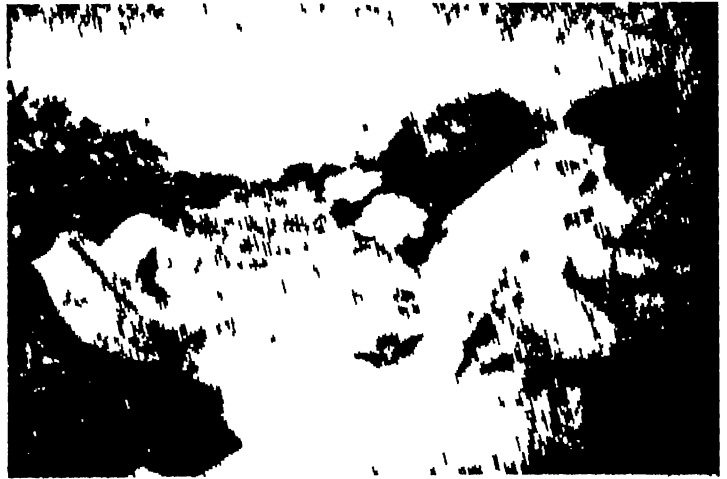
এই সরল অনাড়ম্বর সন্ন্যাসী কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়া সেখানে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। পরমহংস যোগানন্দজীর আন্তরিক অভিলাষ ছিল পরমার্থচিন্তায় রত হইয়া গঙ্গাতীরে অথবা হিমালয়-প্রদেশে সরল অনাড়ম্বর ও শান্তিময় জীবনযাপন, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশে প্রতীচ্যে ভারতের যোগবিদ্যা শিক্ষাদানের গুরুভার বহন করিয়া কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহার নিরলস কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ।

জীবনের সুদীর্ঘকাল বিদেশে অতিবাহিত হইলেও নিজ জন্মভূমি তথা ভারতবর্ষকে তিনি কখনও ভুলেন নাই। তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম তার রচিত বহু ইংরেজী কবিতায় ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "আমি ধন্য যে আমার দেহ ভারতের মৃত্তিকার পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়াছে।" মহাপ্রয়াণের সময় তাঁর মুখে উচ্চারিত শেষ বাণী,—"আমার আমেরিকা, আমার ভারত।"
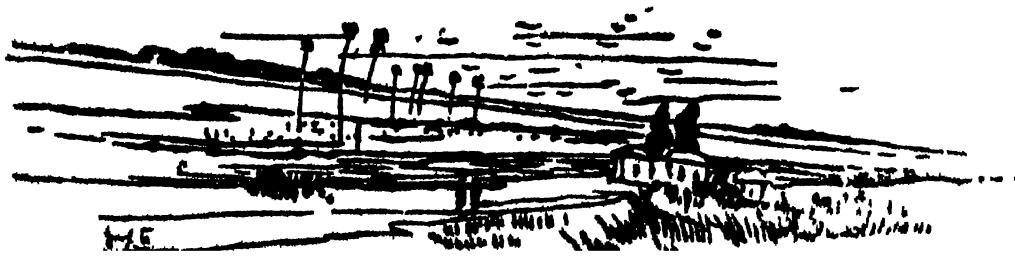
পত্র বা "চিঠি"

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

প্রাদেশিক ; অথচ শব্দটি বাঙ্গালা নহে। বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়া বাঙ্গালাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যুৎপত্তি—ভাষান্তর হইতে —হিন্দী 'চিট্‌ঠী,' 'চিট্‌ঠী' হইতে 'চিট্‌ঠি', তাহা হইতে 'চিঠি,'—

(Chiti—Chiti (H.), Chithi (Ben), Chiththi (Mar), (Kan)—See H. H. Wilson's, 'Glossary," Enlarged Ed., Calcutta, 1940, p 175, Chitthi—H Rev T ..., "New Royal Dictionary." Part Two Lucknow, ..., p. 61).

চিঠি শব্দের সমপর্যায় 'পত্র' শব্দ। শব্দটি সংস্কৃত। বৈদিক অভিধান হইতে আরম্ভ করিয়া লৌকিক সাহিত্যের সর্বত্র উহার প্রচলন দেখা যায়। 'লেখন' শব্দটিও 'পত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে আছে—"অসন্নিহিতানি পুনর্লেখন সাধনানি"—(Ed. with the com. of Raghavabhatta. Ninth ed., N. S. Press, Bombay, 1926, p 100)

প্রাচীন ভারতে অক্ষর বিন্যাসের, অঙ্ক-চিহ্ন করণের কথা পাণিনীর সূত্রপাঠে 'লিখ্' ধাতু হইতে পাই। পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ... (Vide Dr O. Bochtlingk's Panini, Vol. I, p. iii-v) 'লিপি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ" অথবা "অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্" ৩।২।২১ সূত্রে 'লিপি', 'লিবি' শব্দ একই পর্যায়ের। তাঁহার সময়ে লিখিত পুস্তকের কথাও বিদিত ছিল, তাহাও তাঁহার ...৫৭ ; ৪।৩।৮৭, ৪।৩।১১৬ সূত্রের দ্বারাই জ্ঞাত হই। ... ভাষার 'পিটক', 'নিকায়', 'জাতক' শব্দের দ্বারা 'লেখনী', ... এবং 'অক্ষর' প্রাচীনকালে যে বিদ্যমান ছিল, তাহাও বুঝা যায়। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যে 'অক্ষর' অর্থে ... বাক্য' বা 'বর্ণের' কথাই প্রতীতি হয়। পণিদের কর্তৃক ... অপহরণ এবং ব্রাহ্মণবর্গের দ্বারা তাহার সম্যক্ উদ্ধার—ইহার দ্বারা পরিতঃ বোধগম্য হয় যে, আর্যদের নিকটে লিপি অজ্ঞাত ছিল না। আর্যদের নিকট লিপি যদি অপরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে পণিদের কর্তৃক "বেদ" অপহরণ কখনই সম্ভব হইত না। পরবর্তীকালেও যে লেখার প্রচলন ছিল, তাহার আভাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যায়—"অস্মিন্ শুকোদরস্নিগ্ধে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু"। এখানে 'পত্র' শব্দের প্রয়োগ অতি রমণীয়, সন্দেহ নাই। 'লেখ' শব্দের অর্থও 'পত্র', কিন্তু প্রয়োগ বিরল। 'লেখ' অর্থে 'পত্র' এই পর্যায়যুক্ত। লৌকিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অভিধান (কোশ) বৌদ্ধ অমরসিংহের "নামলিঙ্গানুশাসন" গ্রন্থে 'লেখ' অর্থে 'পত্র' পাওয়া যায় না। আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীর "শাশ্বতকোশে"—"লেখ্যদেবতয়োর্লেখো-লেখরাজিকলাস্থতা", বৌদ্ধ অজয়পালের "নানার্থসংগ্রহে"—"লেখঃ স্যাদ্দেবতে লেখ্যে লেখা স্যাদ্রাজিরেখয়োঃ", কেশবের "কল্পদ্রুকোশে"—"ত্রিষু প্রবোধস্থ লিখনং লেখনং লেখ ইত্যপি"। A letter an epistle (H. H. Wilson's '*A Dictionary in Sanskrit & English*') 'লেখ' শব্দের অর্থে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Th. Zachariae's "*Die Indischen Worterbucher*" (Strassburg, 1897) গ্রন্থে এই সম্বন্ধে অনেক হদিস পাওয়া যায়।

কোশে অর্থ মিলে, কিন্তু প্রয়োগ বাহির করা কষ্টসাধ্য। অথচ প্রয়োগ না থাকিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয় না। 'পত্র' অর্থে 'লেখ' শব্দের প্রয়োগ এরূপ—"উত্তরোঽয়ং লেখার্থঃ পূর্বঃ কথয়ত"—(মুদ্রারাক্ষস), অথবা "লেখব্যাপৃতার্থং"। অর্থ প্রকাশনে ব্যুৎপত্তি বিশেষ সহায়ক। 'লেখ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—লিখ্যতে লিখ্ ভাবে ঘঞ্ লেখনে। কর্মণি ঘঞ্। লেখ্য। আধারে ঘঞ্, লেখনাধারে পত্রে "নির্দ্ধারিতেঽর্থে লেখেন।" Epistle Letters বস্তার্থে 'লেখ'—'লিপি', 'পত্র', 'লেখ্য', 'লেখন্' অপেক্ষা স্পষ্ট এবং ভাবদ্যোতক। বর্ণবিন্যাসে আয়াসহীন, সুখোচ্চার্য লঘু শব্দে বহুল প্রচারে ক্ষতি কি ?

রামানন্দ-স্মৃতি-সমিতি

পাটনায় ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের (পরিবর্ত্তিত নাম—নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন) বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সম্মেলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাবধি ইহার পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক রামানন্দ-স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রাথমিক পরিকল্পনাটি গৃহীত হইয়াছে :

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে প্রতি বৎসর একটি রৌপ্যপদক ও ৫০ টাকার পুস্তক নিম্নলিখিতদের প্রত্যেককে প্রদান করা হইবে,—

(১) নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক গৃহীত বাংলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রী, (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত বি-এ পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে ১ম ছাত্র-ছাত্রী এবং ৬) রামানন্দ-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি বার্ষিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী। উপরি-উক্ত পুরস্কারগুলি বিতরণ করার জন্য বার্ষিক প্রায় ৫০০ টাকা দরকার। ইহার জন্য একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার গঠন করা প্রয়োজন। তজ্জন্য আনুমানিক ১৫ হাজার টাকা লাগিবে। এই টাকা কোম্পানীর কাগজে (Government Bond) লগ্নীকৃত করিলে ইহার সুদ হইতে এই সকল পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হইবে।

উপস্থিত যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ১, ২ ও ৩নং পুরস্কার বিতরণ করা হইবে। সম্পূর্ণ অর্থ সংগৃহীত হইলে স্থায়ী অর্থভাণ্ডার গঠন করিয়া আগামী বৎসর হইতে সকল পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে।

এই মহৎ কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করা দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। টাকাকড়ি—সম্পাদক রামানন্দ-স্মৃতি-সমিতি, বার্ণপুর, জেলা বর্দ্ধমান, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বেনিদেত্তো ক্রোচে

বিখ্যাত ইটালীয় দার্শনিক বেনিদেত্তো ক্রোচের মৃত্যুতে বিশ্বের দার্শনিক ক্ষেত্র হইতে আর একজন বিশিষ্ট মনীষীর আসন শূন্য হইল। সাধারণভাবে ক্রোচে তাঁহার Aesthetics বা অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইতিহাস, দর্শন ও জীবনতত্ত্বের ব্যাখ্যাতারূপেই স্মরণীয়। বার্গসোঁর ন্যায় ক্রোচেও 'ইন্‌টুইশন' বা সহজাত প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস রাখিতেন এবং তার উপর নির্ভর করিয়া তিনি শিল্পের মর্মবস্তু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইতিহাসের ব্যাখ্যানে তিনি কতকটা জার্মান দার্শনিক স্পেংলারের কিছুটা বা মার্কস-এঙ্গেলসের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। তাই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার পরিবর্তে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিশীলতার কথাই তাঁহার ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রধান স্থান লইয়াছে। ঠিক বস্তুবাদ না হইলেও, তাঁহার এই মত অনেকটা বস্তুবাদেরই সমপর্যায়ের। এই শেষোক্ত মতের জন্য ক্রোচে মুসোলিনীর বিষ নজরে পড়িয়াছিলেন, পোপ মহোদয় তাঁহার রচনাবলীকে ভ্যাটিকানে প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। আমাদের দেশেও বিদ্বৎসমাজে ক্রোচের চর্চা নিতান্ত কম হয় নাই। ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ক্রোচে একান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তিতে তাই ভারতের পণ্ডিতসমাজ ব্যথিত হইবেন।

স্বেন হেডিন

এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক তত্ত্বের আবিষ্কারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদিগের অন্যতম সুইডিস পর্যটক মিঃ স্বেন হেডিন গত ২৬শে নবেম্বর ষ্টকহোম শহরে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার ও চীনের বিরাট মরুদেশসমূহ তিনি পর্যটন করিয়া যেমন ভৌগোলিক তথ্য তেমনি বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁর রচিত মরুভূমির বালুস্তরের নীচে খোটানের ইতিহাস *Sand Buried Ruins of Khotan* নামক পুস্তক অতীতের অনেক তথ্যের সন্ধান দেয়।

হিমালয়ের রহস্যও এই কৃতী পর্য্যটকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর উৎস তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি আবিষ্কারকের সম্মান লাভ করিয়াছেন। মধ্য-এশিয়ায় কতিপয় প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া তিনি বস্তুতঃ বৌদ্ধ ভারতেরই সাংস্কৃতির পরিব্যাপ্তির নূতন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্য-এশিয়া, মরুচীন এবং হিমালয়ের ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্বেন হেডিনেরই সমকক্ষ বিশেষজ্ঞ স্যার অরেল ষ্টাইন আট বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। এক্ষণে হেডিনও তিরোহিত হইলেন।

এই দুই মনীষীর আবিষ্কারকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় ভৌগোলিক নূতন অনুসন্ধানের ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন।

হেমন্তকুমার সরকার

হেমন্তকুমার সরকারের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। প্রায় ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতী ছাত্র হেমন্তকুমার কর্ম্মজীবনের প্রথমেই রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর অনুগামী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠি ও সহকর্ম্মীরূপে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার রাজনীতি নানা কারণে গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল সমাজনীতি, সাহিত্য এবং বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক উদ্যম। কিছুকাল তিনি সংবাদপত্রের সেবায়ও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার যাহা দান তাহা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। বঙ্গজননীর এই সন্তানের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। তাঁহার পরলোকগমনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামীদের অন্যতম চিহ্ন তিরোহিত হইল।

জন জেকব বার্জেলিয়াস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় বছরগুলি যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকের অমূল্য গবেষণায় মহিমান্বিত হয়েছে জন জেকব বার্জেলিয়াস তাঁদের অন্যতম। বাস্তবিকপক্ষে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকাল মধ্যে, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

আজ বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রই টেষ্টটিউব, ওয়াশ বটল, ডেসিকেটার, স্পিরিটল্যাম্প প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষভাবেই পরিচিত। আবার রসায়নে কিঞ্চিৎ লব্ধজ্ঞান ব্যক্তিও আজ হেলোজেন, ক্যাটালিটিক এজেন্ট, এলোট্রপি প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার করে থাকেন। অথচ এ সবই যে বার্জেলিয়াসের দান তা বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। শুধু তাই-ই নয়, একই ব্যক্তির জীবনে কত বেশী প্রকারের বিজ্ঞান-গবেষণা এবং নূতন আবিষ্কার করা যে সম্ভব তা বার্জেলিয়াসের জীবন থেকে ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। রসায়নশাস্ত্রের যে কোন শাখায়ই তাঁর দান অসামান্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বহুমুখী গবেষণাকার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যে কত দুরূহ তা রাসায়নিক মাত্রই অবগত আছেন।

সুইডেনের অন্তর্গত ভাফেরসুন্ডা (Vafversunda) নামক স্থানে ১৭৭৯ সালের ২০শে আগষ্ট বার্জেলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সামুয়েল বার্জেলিয়াস গথল্যাণ্ডের একটি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাল্যকালে পিতৃহীন হলেও তাঁর মাতার দ্বিতীয় স্বামীর তত্ত্বাবধানে বার্জেলিয়াসের ছোটবেলা বেশ সুখেই অতিবাহিত হয়েছে। জেকবের বয়স যখন এগার বছর তখন নানা কারণে তিনি এবং তাঁর এক বোন তাদের কাকার কাছে চলে আসতে বাধ্য হলেন। বার্জেলিয়াসের শিক্ষার হাতেখড়ি গৃহেই হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে কাকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁকে লিংকোপিং জিমনেসিয়াম নামক একটি স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় এক বছরের মধ্যেই তাঁকে এ বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে হয়েছিল। উপায়ান্তর না দেখে জেকব এক কৃষকের দুটি ছেলেমেয়ের গৃহশিক্ষকতাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে অবসর সময় তাঁকে খামারে কাজ করতে হ'ত। বিশেষ দুরবস্থার মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হ'ত; শীতের দিনে তাঁর ছোট্ট ঘরখানাতে কোনরূপ উত্তাপের ব্যবস্থা ছিল না। তবে খোলা মাঠে কাজ করা এবং দুঃখকষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে একদিক দিয়ে তাঁর ভালই হ'ল। ১৭৯৫ সালে যখন তিনি তাঁর পূর্ব্বতন বিদ্যালয়ে ফিরে এলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হয়েছিল।

১৭৯৬ সালে তিনি আপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভেতর দিয়ে দু'বছর পর তিনি এখান থেকে একটা ডাক্তারী-পরীক্ষা পাশ করতে সমর্থ হলেন। এ সময় তাঁর রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান এত কম ছিল যে, পদার্থবিদ্যায় ভাল নম্বর না পেলে এ পরীক্ষা পাস করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। যাই হোক, ১৮০২ সালে তিনি এখান থেকেই ভেষজবিদ্যায় 'ডক্টর' উপাধি লাভ করলেন। ইত্যবসরে তিনি নানাভাবে রসায়নে জ্ঞান অর্জ্জন করতে লাগলেন। এজন্যে তাঁকে এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হ'ত যে, পরীক্ষার অব্যবহিত পরের গ্রীষ্মকালে তিনি রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। রোগমুক্ত হয়ে তিনি ১৮০৩ সালে হিসিংগার নামে এক খনিজ রাসায়নিকের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব খনিতে কাজ করতে লাগলেন। এখান থেকেই বার্জেলিয়াস 'সেরিয়া' আবিষ্কার করতে সমর্থ হন, যদিও তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ক্লাপ্রোথ স্বাধীনভাবে কাজ করে সেরিয়া আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

১৮০৬ সালে বার্জেলিয়াস কালবের্গ মিলিটারী একাডেমিতে

রীডার নিযুক্ত হন। পরের বছর ষ্টকহোম স্কুল অব সার্জারীতে অধ্যাপকপদ পান। তারপর ১৮১৫ সালে ষ্টকহোম মেডিকো-সার্জিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হলে বার্জেলিয়াসকে রসায়ন ও ভেষজবিদ্যার অধ্যাপকপদ দেওয়া হয়। চাকুরীক্ষেত্রে এই পরিবর্তন তাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল। ১৮০৮ সালে তিনি ষ্টকহোম একাডেমি অব সায়ান্সের সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৮১৮ সালে এর স্থায়ী সম্পাদকপদ অলঙ্কৃত করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কাল তিনি এ পদে কাজ করেছেন। ১৮৩৫ সালে যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে তখন বার্জেলিয়াস বিবাহ করেন। সে এক মজার ব্যাপার। এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে বিয়ের সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞেস করলে বন্ধু তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। তখন বার্জেলিয়াস সরাসরি তাঁরই এক পুরাতন বন্ধু প্রেসিডেন্ট পপিয়াসের নিকট গিয়ে তাঁর ছাব্বিশ বৎসরবয়স্কা প্রথমা কন্যাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেন। বন্ধু তাঁকে বিমুখ করলেন না এবং ১৮৩৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বিনা আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন সুইডেনের সম্রাট তাঁকে 'ব্যারন' উপাধি দান করেন। তাঁর বিবাহিত জীবন বাস্তবিকই সুখের ছিল। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা দেখে তাঁদের মধ্যে যে, বয়সের ত্রিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে তা কোনদিন বোঝাই যায় নি। বিয়ের পর তিনি তাঁর ছাত্র এবং বন্ধু হোয়েলারের কাছে লিখেছিলেন :

"Yes, my dear Wohler, I have now been a benedict for six weeks. I have learned to know a side of life of which I formerly had a false conception or none at all."

বার্জেলিয়াসের আবিষ্কার এবং গবেষণার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এক কথায় বলা যেতে পারে যে, রসায়নশাস্ত্রের এমন কোন শাখা ছিল না যেখানে বার্জেলিয়াসের দান নেই। ১৮১১ সালে তিনি ডুয়ালিষ্টিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যদিও নানা কারণে উক্ত মতবাদ বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রসায়নশাস্ত্রের একটি প্রধান অংশ (raw reciprocal) উক্ত ডুয়ালিষ্টিক মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত, প্রতীক এবং সূত্র সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিবদ্ধ করবার বর্তমানে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাও বার্জেলিয়াসের দান। যদিও লেভসিয়ে, বারথোলে এবং ফুরক্রোরা ১৭৮৭ সালেই এই প্রথার প্রবর্তন করেন, কিন্তু তা ছিল অতিশয় জটিল। ১৮১০ সাল থেকে সঠিক এবং কষ্টসাধ্য বিশ্লেষণকার্য্য করে তিনি ডলটন-আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের মিলনসূত্রের একটি নিয়ম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করেন এবং নিজেও অন্য আর একটি নিয়ম (Law of reciprocal) আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। এর পর তিনি মৌলিক পদার্থের সঠিকভাবে পরমানবিক ওজন নির্দ্ধারণ করতে সচেষ্ট হন। এ সমস্ত কঠিন বিশ্লেষণকার্য্য করতে গিয়ে তাঁকে নিত্য নূতন পদ্ধতি এবং নানা প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে হত। এ সময়ই তিনি টেষ্ট টিউব, ডেসিকেটর, ওয়াস বটল, স্পিরিট ল্যাম্প, ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া, তিনি এবং তাঁর এক ছাত্র হাইনরিক রোজ ধাতুগুলিকে গুণানুসারে তাদের নানারকম ভাগে বিভক্ত করেছিলেন যা এখন গ্রুপ বিশ্লেষণ নামে পরিচিত।

১৮১৪ সালে খনিজ পদার্থের গুণানুসারে বিভাগ বার্জেলিয়াসের আর একটি প্রধান কাজ। ১৮২৩ সালে তিনি সিলিকোন আবিষ্কার করেন এবং উহার প্রধান গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করেন। এরূপ ১৮২৫ সালে জিরকোনিয়াম টাইটানিয়াম এবং ১৮২৮ সালের থোরিয়াম আবিষ্কার করেন। সেলেনিয়াম আবিষ্কৃত হয় ১৮১৮ সালে। এ ছাড়া টেলুরিয়াম, ভেনেডিয়াম, মোলিবডেনাম, টাংষ্টেন এবং ইউরেনিয়াম ধাতুর যৌগিক পদার্থগুলি নিয়ে তিনি বহু গবেষণাকার্য্য করেছেন।

জৈবরসায়ন শাখায়ও বার্জেলিয়াসের দান নিতান্ত নগণ্য নয়। ল্যাকৃটিক এসিড এবং পাইরুভিক্ এসিড তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং এসেটিক এসিডের গঠনবিধি নির্দ্ধারণ করেছেন ১৮১৪ সালে। জৈব রাসায়নিক পদার্থের গঠনবিধি ব্যাখ্যা করবার জন্যে 'রেডিকালতত্ত্ব' নামে একটি তত্ত্বের আবিষ্কারকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তবে এই তত্ত্বটি মাত্র কয়েক বছর পরেই নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময় তিনি হেলোজেনস (১৮২৫ সাল) আইসোমেরিজম্ (১৮৩০ সন), ক্যাটালিটিক এজেন্ট (১৮৩৫ সন) এবং এলোট্রপি (১৮৪১ সন) কথাগুলির অবতারণা করেছেন।

রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার মূল্যবান আবিষ্কার ছাড়াও বার্জেলিয়াস বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন এবং নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু এবং ফলাফল এ সমস্ত পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কোনরূপ অসাধুতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং কোন বিজ্ঞানীকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দেখলে তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অমায়িক প্রকৃতির লোক। যে সমস্ত বিজ্ঞানীর বার্জেলিয়াসের সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা তাঁর অমায়িকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। ইউরিয়া প্রস্তুতকারক সুবিখ্যাত হোয়েলার ১৮২৩ সনে বার্জেলিয়াসের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে ষ্টকহোমে যান। বার্জেলিয়াসের গবেষণাগার যে কত সাদাসিধে ধরণের ছিল তা তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। হোয়েলার কোন পরীক্ষাকার্য্য তাড়াতাড়ি সমাধা করে বার্জেলিয়াসকে দেখাতে গেলে তিনি বলতেন, ডক্টর, কাজটা তাড়াতাড়ি হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু বড্ড খারাপ হয়েছে।

তিনি ছিলেন সৎ এবং মহান্ প্রকৃতির লোক। স্বার্থপরতা তাঁর চরিত্রে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। বিবাহের তের বছর পর অর্থাৎ ১৮৪৮ সনের ৭ই আগষ্ট তিনি দেহত্যাগ করেছেন। বার্জেলিয়াসের বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে হাইনরিক রোজ, মিটশেরলিক, হোয়েলার, ভেনেডিয়াম আবিষ্কারক জেফসষ্ট্রোয়েম এবং লিথিয়াম আবিষ্কারক আর্ফভেডজন্-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরানো কথা: উপসংহার—চারুচন্দ্র দত্ত। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা—২৯। মূল্য তিন টাকা।

যে যুগে এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল সেটি এখনো বিশেষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এটা খুবই স্বাভাবিক কেননা সে সময়ের কাজ যা কিছু হয়েছিল সবই আড়ালে, আলোর পিছনে। চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই উপসংহার তার একটা অংশের উপর আলোকপাত করেছে। বইয়ের বিষয়বস্তুর সার্থকতা সেইখানে।

কিন্তু এই বই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সম্ভার দিয়েছে। ভাষার নিপুণ চিত্রণে লেখকের রচিত আলেখ্য সুন্দর হয়েছে, যাহা লেখকের রচনার বিশেষত্ব। সেই লেখনী এখন আড়ষ্ট, অচল, লেখকের চিরবিদায় নেওয়ার ফলে।

ক. চ.

চর-ভাঙা চর—কাজি আফসারউদ্দিন আহম্মদ। ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার, ঢাকা। দাম সাড়ে তিন টাকা।

উপন্যাস। এই কাহিনীর পটভূমিতে আছে নদী ধলেশ্বরী। তাহার চারিপাশের বহু গ্রামের সমৃদ্ধি-বিনাশের কথা এবং সেই সব গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখেভরা দিনগুলির কথা লইয়া কাহিনী লেখক জমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নদী ধলেশ্বরী তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে, ঘটনাপ্রবাহে বা মানুষের মানসিক সংঘাতের ক্রিয়ায় কিভাবে গল্প গড়িয়া উঠিবে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ফলে কাহিনী পরিণত হইয়াছে নদী-প্রশস্তিতে এবং মানুষগুলি হইয়াছে অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতার মধ্যে দুই-একটি চেনা মুখ, দুই-একটি নিষ্ঠুর ঘটনা ভাঙা চরের কোলে তরঙ্গধ্বনির মতই কোমল ও তট-ভাঙার মতই মর্ম্মবিদারী হইয়া কানে বাজে। সমস্ত মিশাইয়া সুসমঞ্জস একটি গল্প গড়িয়া উঠিলে পাঠকের মন খুশী হইয়া উঠিত। এই অপ্রাপ্তির বেদনাটি লেখকের কল্পনা-শক্তির প্রসার ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য খানিকটা দূর করিয়া দিয়াছে।

মেঘ ডাকে—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। নমামি প্রকাশ মন্দির, ৮।২, গোপ লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

এই উপন্যাসের পিছনে আছে কারাবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পের নায়ক-নায়িকারা মধ্যবিত্ত সমাজের এবং বিপ্লবপন্থী। তাহারা সহিংস উপায়ে ভারতের মুক্তি কামনা করে। ইহাদের ভাব ও ভাবনা, কর্ম ও কল্পনা, ত্যাগ ও

ক্লেশস্বীকারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আলোচ্য গল্পের বহু স্থানেই মেলে। কিন্তু রস-সাহিত্যের জগৎ শুধু বাস্তব ঘটনা বা ভাবপ্রবণতা দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহাতে বাস্তবকে যেমন স্বীকার করিতে হয় তেমনি কল্পনাকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। এই দুইয়ের মিশ্রণ সুষ্ঠুভাবে না হইলে গল্প জমে না। কিন্তু এ সকলের উপরেও আছে ভাষা অর্থাৎ রচনাভঙ্গী। ইহাকে বাহন করিয়া গল্পটি অনায়াসে পাঠক-মনে পৌঁছিয়া যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার পুঁজি থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য উপন্যাসটি ভাষার দৈন্যে সুসংবদ্ধ ও চিত্তগ্রাহ্য হয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইচ্ছামতী—শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল। প্রকাশক: শ্রীসুধীনকুমার দাস। ১৭-এ, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছত্রিশটি মনোরম কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি ইচ্ছামতীর মতই স্নিগ্ধ পল্লীচ্ছায়া বুকে বহিয়া চলিয়াছে।

"জোয়ার-ভাটায়
জীবনের দিনগুলি ফিরে ফিরে আসে আর যায়।
ছায়াচ্ছন্ন মৌনগ্রাম জেগে উঠে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
প্রশান্তির কোলাহল মৃদু বায়ুস্তরে চলে' আসে।
কূলে কূলে দুলে আলো, ঝিকিমিকি কাঁপে আলোছায়া
আগ্রহে জড়ায় বুকে কোথা শ্যামলতিকার মায়া।"

প্রকৃতির অজস্র শোভাসম্পদ, তাহার সরল কোমল মাধুর্য্য কবির হৃদয় ভরিয়া দিয়াছে, তাহারই আবেগ উপচাইয়া পড়িয়াছে কবিতাগুলিতে। 'মাটির ধরণী'কে ভালবাসিয়াছেন তিনি:

"এ যে রূপে, রসোচ্ছ্বাসে পড়িতেছে ফাটি'
কুসুমে পল্লবে নিত্য,—দিগন্তবিস্তার
তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝার।"

কবির দিগন্তপ্রসারিত উদার দৃষ্টি আছে বলিয়াই কাব্যখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। প্রতিদিনের দুঃখকষ্ট-অনশনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যদি কবিরাও আমাদের বাঁধিয়া রাখেন, তবে মুক্তিপিপাসু মন-বেচারীর উপায় হইবে কি? 'নবমেঘদূতে' কবি সুকৌশলে বাস্তবতা ও রোমান্সের গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন; সে মিলন উপভোগ্য হইয়াছে।

দেবমতি—স্বামী উত্তমানন্দ। উত্তমাশ্রম, গাঙ্গিনগর, পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী। মূল্য তিন টাকা।

পঞ্চাঙ্ক নাটক। গ্রন্থকার পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব এবং পুণ্যের গৌরব দেখাইয়াছেন। প্যারীমোহন সাধক, দেবমতি তাঁহার স্ত্রী। প্রেম সাধনার পরিপন্থী নহে, কাহিনীর মধ্য দিয়া আমরা তাহা উপলব্ধি করি। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে কিছু তত্ত্বালোচনা গ্রন্থমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মোটের উপর, নাটকখানি নীরস হয় নাই। দেবমতি কল্যাণময়ী নারীর আদর্শ। সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার চরিত্র অঙ্কনেই লেখকের দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। গানগুলি সুরচিত। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যায়, পাঠক-সমাজ ইহার সমাদর করিয়াছেন।

সাইকেলে বল্কান ভ্রমণ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

লেখক উৎসাহী ভূপর্য্যটক। তাঁহার কয়েকখানি ভ্রমণকাহিনী ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সব কয়খানিরই রচনার প্রধান গুণ সারল্য। পাণ্ডিত্য-প্রকাশের অথবা আত্মপ্রচারের চেষ্টা না করিয়া গ্রন্থকার যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, তাহা সহজভাবে বলিয়া গিয়াছেন। বল্কান অঞ্চল সম্প্রতি রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। যদিও লেখক রাজনীতি লইয়া

বেশী আলোচনা করেন নাই তথাপি উক্ত অঞ্চলের পরিচয় পাওয়ার জন্য হয়ত অনেকে এই গ্রন্থপাঠে কৌতূহলী হইবেন।

বাংলা-সাহিত্যের নবযুগ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

গ্রন্থখানির চারিটি সংস্করণ হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, পাঠক-সমাজ ইহার সমাদর করিয়াছেন। নবযুগের লক্ষণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব কবিতা, ট্র্যাজেডি ও তাহার বিবর্তন, মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী, কবি হেমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন পটভূমি, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা, শরৎ-সাহিত্যের শাশ্বত নারী ও পুরুষ—এই এগারটি প্রবন্ধ সমালোচ্য গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা না থাকিলেও মোটের উপর সবগুলির মধ্য দিয়া পাঠক নবযুগের বাংলাসাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলির পরিচয় পাইবেন। গ্রন্থকার সাহিত্য-সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু কেবলমাত্র তথ্য জড়ো করেন নাই; সযত্নে বক্তব্যবিষয় গুছাইয়া বলিয়াছেন এবং বিচারে স্বকীয় রসবোধের প্রমাণ দিয়াছেন। পুস্তকের বহিঃসজ্জাও মনোরম।

ছন্দে শকুন্তলা—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য। সাহিত্য-কোণ প্রতিষ্ঠান, ৪৪-সি, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য তিন টাকা।

পুরাতন-পন্থী কাব্য। কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধ অপেক্ষা নৈতিক বিচার কবি-মনে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। তাই তিনি লিখিতে পারিয়াছেন:

"ঘটিত যদ্যপি এই ঘটনা জাপানে
(নবসভ্যতার দীপ জ্বলেছে যেথায়
হুঙ্কারে বাণিজ্য-লক্ষ্মী টঙ্কারে যেখানে!)
যেতো চলি' ক্ষাপ নারী পতির মাথায়
চালি' যত অভিশাপ, প্রবাসভ্রমণে।"

গ্রন্থে রসসৃষ্টির নিদর্শন বিরল, কিন্তু ভাষা পরিচ্ছন্ন। অবান্তর মন্তব্য বাদ দিয়া শুধু আখ্যান-বর্ণনায় মনোনিবেশ করিলে লেখক ভাল করিতেন।

স্বপ্ন ও সংগ্রাম—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা-মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, বড়িশা, কলিকাতা-৮। মূল্য দুই টাকা।

কবির পূর্ব্ববর্তী কবিতা-গ্রন্থ 'পূর্ব্ববঙ্গে' কবিত্বের পরিচয় পাইলেও ভাবে ও ভাষায় শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এ গ্রন্থে সে ত্রুটি নাই। অনুভবে ও রচনায় গাঢ়তা আসিয়াছে। নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখস্বপ্নে কবি বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন নাই:

"অন্তরের কথা থাক্
অন্তরে গোপনে, আজ বাহিরে কালের ডাক শোনো।"

এই 'কালের ডাক' কোনও রাজনৈতিক বুলি নয়। কবি আহ্বান করিয়াছেন সত্য ও সুন্দরের পূজারীদের; উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায় যাহারা সুন্দরকে আঘাত করে, তিনি তাহাদের সমর্থন করেন নাই:

"তা'রা গণ্ডুষে শুষে নেয় প্রাণযৌবনের স্বপ্নসমুদ্র
তা'রা মরুভূমি জাগায় কল্পনার শ্যাম অরণ্যে,
তা'রা সত্যের মন্দির ভাঙে নাস্তিক্যের আণবিক বজ্রপ্রহারে,
তা'রা সুন্দরের কুঞ্জ পোড়ায় কটনীতির লেলিহান জঠরাগুনে,
সৈনিক, তুমি কি যুদ্ধে যাবে না?"

পূর্ণ মানবতার আদর্শই কবির আদর্শ। তাঁহার ভাব মনোরম কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

একলা চলরে—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী। বিমলারঞ্জন পাবলিশিং হাউস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানকল্পে মহাত্মাজীর মহৎ প্রয়াস অবলম্বনে রচিত ক্ষুদ্র কাব্য। ক্ষুদ্র হইলেও ভাবে ও রচনাসৌন্দর্য্যে কাব্যখানি সমৃদ্ধ। মলাটে লেখা আছে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কংগ্রেস জাতীয় তহবিলে দেওয়া হইবে, কিন্তু মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিষ ও প্রশ্নবিজ্ঞান—শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কোষ্ঠী প্রস্তুত করণ—কোষ্ঠী বিচার—স্ত্রীজাতক ও প্রশ্নগণনার সঙ্কেত এবং তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তক। গ্রহ এবং রাশির কারকতা বিচারে অধিকার না জন্মিলে নির্ভুলভাবে কোষ্ঠীর ফলাদেশ করা সম্ভবপর হয় না। এই পুস্তকে গ্রন্থকার কারকতাসমূহ বহু শাস্ত্র হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক একস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র-শিক্ষার্থীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তা ছাড়া ইহাতে লগ্ননির্ণয় প্রণালী, ভাবস্ফুট, গ্রহস্ফুট, দশানির্ণয় ইত্যাদিও সহজ সরলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং লাগ্নিক প্রশ্নগণনার পদ্ধতিও প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক যথাসাধ্য বর্জ্জনপূর্ব্বক সহজ সরল বাংলায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা অকুণ্ঠচিত্তে একথা বলিতে পারি যে, বইখানি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ত হইয়াছেই, উপরন্তু অভিজ্ঞ জ্যোতিষী পণ্ডিতদের নিকটও ইহা সমাদৃত হইবে। শ্রীনারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পুস্তকের জন্য একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের আত্মচরিত—(১ম খণ্ড)। ১২।১নং, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার দে এবং শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ।।৶০+২৪১ পৃঃ, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সাধু নৃপেন্দ্রনাথ যেমন নিষ্ঠাবান সাধক তেমনি শক্তিমান লেখক। তাঁহার এই আত্মচরিতও পাঠকের হৃদয়ে তৃপ্তিদান করিবে। ইহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনের নানা ঘটনার সমাবেশ আছে। সেগুলি একদিকে যেমন অলৌকিক কাহিনীতে যেমন ভরপুর, অন্যদিকে তেমনি সাধনভজনের কল্যাণপ্রদ সত্য-নির্দ্দেশও সার্থক। ঘটনাবলীকে সুবিন্যস্ত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনচরিতে পৌর্ব্বাপৌর্য্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নাই। নৃপেন্দ্রনাথের জীবন বাস্তবিকই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক নানা সমস্যায় দিশাহারা নরনারী এই সাধু ব্যক্তির জীবনী হইতে সংসারের জটিল পথে অভিযানের প্রচুর পাথেয় সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

ওপারের কথা—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বিরচিত এবং ১২।১নং, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ।।৶০+২০৯ পৃঃ। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার জিজ্ঞাসু নরনারীর প্রতি যাটটি উপদেশলিপিতে মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনের সহায়ক প্রায় ২৪০টি বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। পুরীর জগন্নাথ-মূর্ত্তির ব্যাখ্যায় ন্যায় (৯৯ পৃঃ) কালীঘাটের মাতৃমূর্ত্তির ব্যাখ্যা (৩৪।৫৯ পৃঃ) তেমন সুচিন্তিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ (১১৭ পৃঃ) শীর্ষক আলোচনা সার্থক হইয়াছে। ঘটস্থাপন (১০২ পৃঃ), আত্মদর্শন (১৮৮ পৃঃ) প্রভৃতি কবিতাগুলি যেমন সরস তেমনি শিক্ষাপ্রদ। আদর্শ-শিক্ষাপ্রণালীর (২০১ পৃঃ) পঙ্ক্তিকাটি দৈহিক ও মানসিক উন্নতিসাধনে যত্নশীল নরনারীর প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
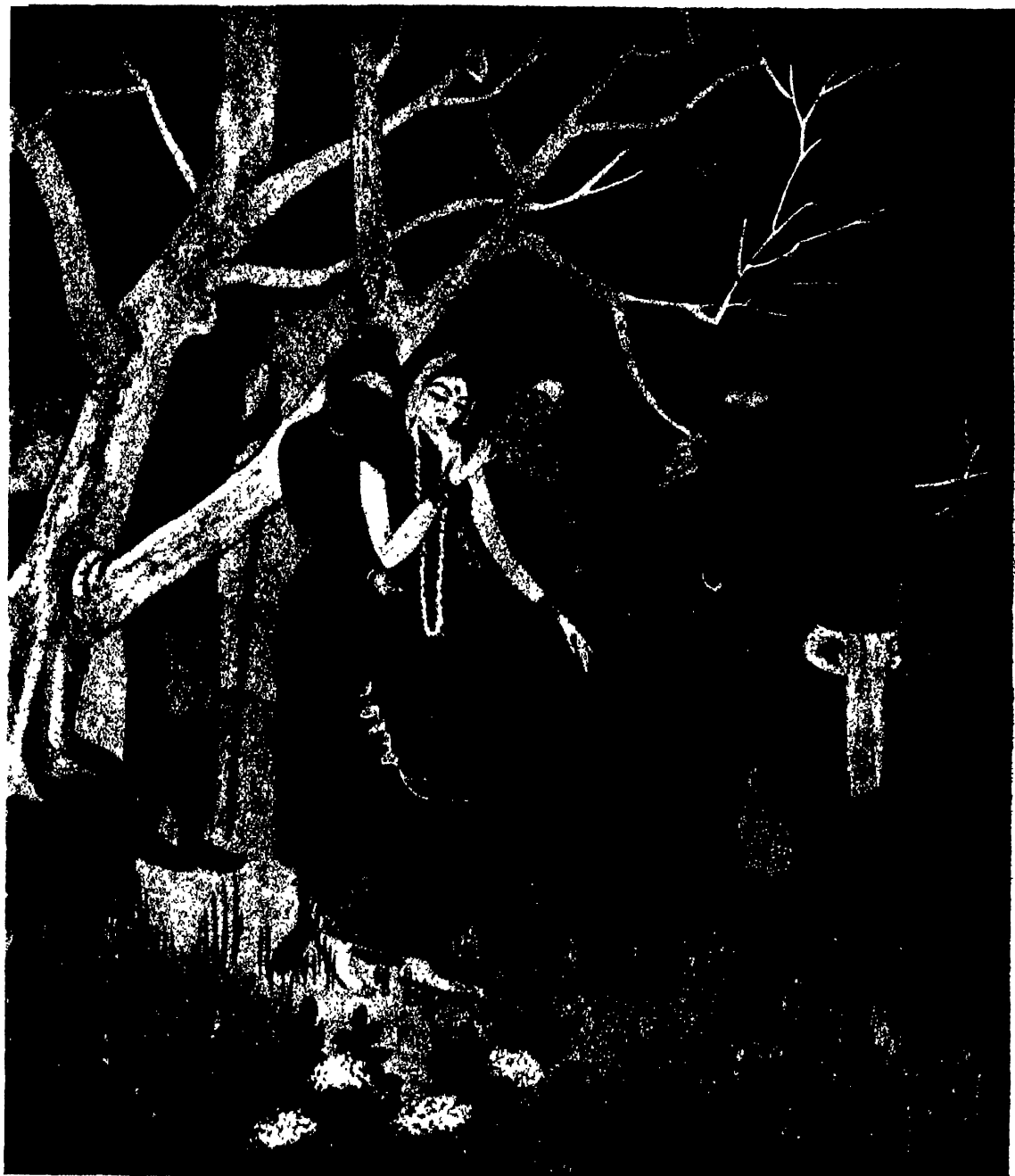
শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা
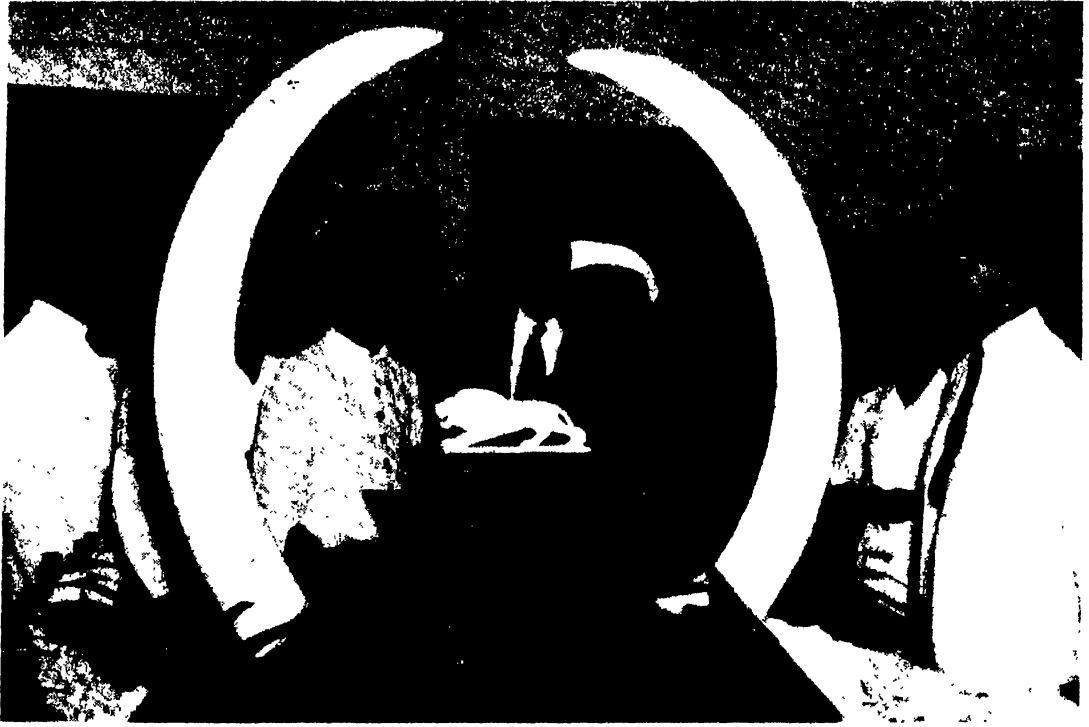
ত্রিপুরারাজ্য, আগরতলায় উপজাতি কুটির-শিল্প প্রদর্শনীতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু

শিলং রাজভবনে লুসাই সর্দারদের সহিত আলোচনায় রত পণ্ডিত নেহ্রু

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ
২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৫৯ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সত্যমেব জয়তে ?

হায়দরাবাদে মহাসমারোহের সহিত কংগ্রেসের অষ্ট-পঞ্চাশত্তম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সর্বোদয়, পরিচালক-সমিতির বৈঠক, বিষয় বিচার সমিতি ও সাধারণ অধিবেশন সকলেরই পূর্ণ উদ্যোগ ও আয়োজন চলিতেছে। ঐ সকল সমিতির ও মূল অধিবেশনের পূর্ণ কার্যকলাপের বিচার আমরা এ সংখ্যায় করিতে পারিব না বলা বাহুল্য, কেননা সে সকল বৃত্তান্ত আমরা পাইব এই সংখ্যা প্রকাশের পর। সুতরাং আমরা অদ্যাবধি যে সকল তথ্য ও বিষয়বস্তুর আভাস পাইয়াছি তাহারই বিচার এইখানে কিছু করিব।

প্রথমেই বলি, ঐ বিরাট আয়োজনের কথা। প্রতিনিধিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য অকাতরে অর্থ ঢালা হইয়াছে ইহা আমরা প্রতি সংবাদপত্রেই দেখিতেছি। শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহ ও লাইন সম্প্রসারণের বাবদই লক্ষাধিক টাকা খরচ করা হইয়াছে, প্রতি রাজ্যের প্রতিনিধিদিগের জন্য পৃথক ঘরবাড়ী ও টেলিফোন দেওয়া হইয়াছে, "কার্যাবসানে সুখনিদ্রার জন্য স্প্রিংয়ের খাটের ব্যবস্থা হইয়াছে, ফ্লুরোসেণ্ট নীলাভ আলোকে অধিবেশনপুরী ঝলমল" করিতেছে। "যুগান্তরে"র ষ্টাফ রিপোর্টার বলিয়াছেন, 'গান্ধীজী-প্রবর্তিত 'গাঁওমে কংগ্রেস' নীতি লঙ্ঘন করিয়া সম্ভবতঃ কংগ্রেস অধিবেশন ক্ষেত্রে একটি ছোটখাটো অত্যাধুনিক সর্ব্ব-সুবিধা-সমন্বিত শহর গড়িয়া তোলায় নূতন রীতির সূত্রপাত হইল।" রিপোর্টার আরও বলিয়াছেন, "এই কংগ্রেস নগরে কোন সুখ-সুবিধা বা আয়োজনের অভাব নাই—শুধু অভাব আগ্রহান্বিত সাধারণ মানুষের। কংগ্রেসের মহাধিবেশনের উৎসবে এই যে তোড়জোড় তাহা সবই যেন জনসাধারণ হইতে অনেক দূরে, অনাত্মীয় হইয়া পড়িয়া আছে।"

সুতরাং এত যে জাঁকজমক, "নূতন যোগী" হায়দরাবাদ সরকারের এত যে অকাতরে টাকার শ্রাদ্ধ, সে সব কিছুই এখনও লোকের মনে সাড়া দেয় নাই দেখা যায়। অবশ্য কর্তারা আশা করেন যে, জনসাধারণ অচিরেই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে আর বুধবার পণ্ডিত জবাহরলালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কাতারে কাতারে নানালনগরে ভাঙিয়া পড়িবে।" হয়ত পড়িবেও, কেননা এত হৈচৈ তামাশা ও সেই সঙ্গে কংগ্রেসের প্রধান বাজীকরের আগমন, তাহাতে আমোদ ও হুজুক-পিপাসী জনসাধারণ তো সাময়িকভাবে মাতিতেই পারে। তবে ঐ উৎসাহ মাতালের উত্তেজনার তুল্য, তাহাতে আন্তরিক "অনুপ্রেরণা"র বা "উদ্বুদ্ধ" হওয়ার চিহ্নমাত্রও থাকে না, থাকে ক্ষণিক উদ্দাম স্ফূর্তি ও তাহার পর গভীর অবসাদ।

সর্বোদয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে ঐখানেই। চারিদিকে কংগ্রেসী বিলাস-ব্যসনের লেলিহান শিখা, তাহার মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শবাদের ঝাড়ুদরোয়া মূর্তি। ইহা যেন নেহরু-আজাদের মুখে রামধুন গীতি। সেইজন্যই আনন্দবাজারের ষ্টাফ রিপোর্টার বিভ্রান্ত হইয়া বেদনা ও পীড়া অনুভব করিয়াছেন অনপ্রসব দেশের রূপ দেখিয়া, এবং সর্বোদয়ের সেবকদিগের দ্বারা নূতন সম্প্রদায় ও অভিনব মঠধারী গঠনের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের চলন পরণ ও ভোজনে রকমফেরের অভাব দেখিয়া। সত্যসত্যই চতুর্দ্দিকে ঝুটায় ঘেরা সাচ্চার চেহারা কৃত্রিমই দেখায়, সুতরাং রিপোর্টারের আর দোষ কি? লিপষ্টিক্ কিউটেক্স-রঞ্জিতা, "পার্ম" কেশবিন্যাসযুক্তা, ক্রেপ-ম্যারোকেন জর্জেট নাইলন-সজ্জিতা নব্যাদের মণ্ডলীতে যেমন তসরপরিহিতা গ্রাম্যবধূকেই অভিনেত্রী মনে হয় তেমনই কংগ্রেসী মিথ্যাবাদের মোহন্ত-মৌলানাদের সম্মেলনে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকেও রিপোর্টার মহাশয় মঠধারী ঠাওরাইয়াছেন।

কংগ্রেসী মিথ্যাবাদ? কথাটা কঠোর সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ তো এই বৈশ্যযুগ মিথ্যাবাদেরই জয়। সেইজন্যই যাবতীয় রাজনৈতিক দল নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যার উপরই ভরসা রাখিয়া দেশের শাসনতন্ত্র অধিকারের চেষ্টায় আসরে নামিয়াছেন। যাহারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন দেশবাসীদের ঠকাইয়া, তাঁহারা ছল চাতুরি প্রতারণা ছাড়িতে অসমর্থ, কেননা তাঁহাদের চর-অনুচর এবং অতি আদরের চাটুকারবর্গের প্রায় সকলেরই মূলধন তাহাই এবং যাহারা দ্রাক্ষাফল আস্বাদনে অসমর্থ তাঁহারাও "দ্রাক্ষাফল তীব্র অম্ল" বলিয়া অর্দ্ধ-সত্য, কল্পিত-সত্য ও নিছক অসত্যের প্রচারে পঞ্চমুখ হইয়াছেন। দেশের ও দশের উন্নতির কথা ভাবিয়া দুই পক্ষেরই প্রায় নাভিশ্বাস উপস্থিত।

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীত্রয় ৭৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এক রিপোর্ট এই হায়দরাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস কমিটিতে দাখিল করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "গান্ধীজীর আদর্শ রূপায়ণই জনসেবার শ্রেষ্ঠ-পন্থা।" তাঁহারা বলেন নাই অনাবিল মিথ্যা কলুষ ও দুর্নীতির প্রলয়-প্রবাহের মধ্যে গান্ধীবাদের শাশ্বত সত্যের প্রতিষ্ঠা কি করিয়া হওয়া সম্ভব। তাঁহারা বলিতে সাহস করেন নাই যে, কংগ্রেসের কর্ণধার ও অধিকারীবর্গ গান্ধীজীর আদর্শ হইতে কতদূর অধঃপতিত।

সুতরাং এই অধিবেশনে সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব যে হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ভারতের জাতীয় আয়

বর্ত্তমানে প্রত্যেক বড় বড় দেশেই তাহাদের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের হিসাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারতে এ ধরণের কিছু হয় না। জাতীয় জীবনমান নির্দ্ধারণে জাতীয় আয়ের হিসাব অত্যাবশ্যক। জাতীয় আয় নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৪৯ সনে ভারতে একটি কমিটি নিয়োজিত হয়। এই কমিটির হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সনের ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে—যথা, ৮,৭৩০ কোটি। তখন ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৪ কোটি ২১ লক্ষ এবং গড়পড়তা মাথাপিছু আয় ছিল ২৫৫ টাকা। ১৯৫১ সনের আদমসুমারীতে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ, কিন্তু মাথাপিছু গড়পড়তা আয় কমিয়াছে না বাড়িয়াছে? ১৯৪৮ সনের পর ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব সরকারী তরফ হইতে আর প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে যে, ১৯৫৫-৫৬ সনে ভারতের জাতীয় আয় হইবে ১০,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। এই বৃদ্ধির হিসাব রাখিতে হইলে বাৎসরিক জাতীয় আয়ের হিসাব বাহির করা অতীব প্রয়োজনীয়।

১৯৫২ সনের মার্চ্চ মাসে করাচীতে যে কলোম্বো পরিকল্পনার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয় তাহাতে ১৯৫০-৫১ সনে ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে—১০,৪০০ কোটি টাকা। এই বিষয়ে দেখা যায় যে, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং অবাস্তব। "কমার্স" পত্রিকা তাহার ১৯৫২ সনের বাৎসরিক সংখ্যায় ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছে:

কৃষি ও গৃহপালিত পশু হইতে	আয়		৫,০৯০	কোটি	টাকা
বন	,,	,,	৬৪	,,	,,
মৎস্য চাষ	,,	,,	২২	,,	,,
খনি	,,	,,	৬৩	,,	,,
শিল্প	,,	,,	৭৫০	,,	,,
ছোট ব্যবসায়	,,	,,	১,০৬২	,,	,,
যানবাহন	,,	,,	৩২	,,	,,
রেলপথ	,,	,,	২৪০	,,	,,
ব্যাঙ্ক ও বীমা	,,	,,	৫৪	,,	,,
অন্যান্য যানবাহন	,,	,,	১,৬৭০	,,	,
ব্যবসা (ব্যক্তিগত)	,,	,,	৩১৫	,,	,,
গবর্মেণ্ট চাকুরী	,,	,,	১৬০	,,	,,
ঘরোয়া ভৃত্য প্রভৃতি আয়	,,	,,	১৮০	,,	,,
অস্থাবর সম্পত্তি	,,	,,	৫৩৭	,,	,,
			১০,২৩৯	কোটি	টাকা

ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইতেছে বৎসরে শতকরা ১'২। ১৯৫২ সনে ভারতের জনসংখ্যা আনুমানিক হিসাবে হয় ৩৯ কোটি ২০ লক্ষ। মাথাপিছু গড়পড়তা আয় দাঁড়ায় বৎসরে ২৬০ টাকায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বৎসরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মত খরচ হইবে, অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের শতকরা চারি ভাগ মাত্র। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাবে ১৯৫৬ সন হইতে ভারতবর্ষ নাকি জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ জমাইবে, অর্থাৎ এই হারে বৎসরে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? হিসাবমত দেখা যায় যে, পাঁচ বছর পরেও ভারতবর্ষ জাতীয় আয়ের শতকরা চার-পাঁচ ভাগের বেশী জমাইতে পারিতেছে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে যে, ১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে বছরে ১০,০০০ কোটি টাকার উপরে। কিন্তু বর্ত্তমানেই ত ভারতের জাতীয় আয় বৎসরে ১০,০০০ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে কি জনসাধারণের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে? ভারতের জাতীয় আয় বৎসরে বর্ত্তমানে ১০,০০০ কোটি টাকার অধিক, আর ১৯৫৬-৫৭ সনেও তাহাই থাকিবে? তাহা হইলে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাস্য যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি কেমন করিয়া হইতেছে?

পৃথিবীর পেট্রোল উৎপাদন

সম্প্রতি এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, পশ্চিম বাংলায় খনিজ তৈলের আকর পাওয়া সম্ভব। উহার জন্য এক মার্কিনী কোম্পনী গভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থা করিতেছে এ কথাও প্রচারিত হইয়াছে।

যান্ত্রিক সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খনিজ তৈলের ব্যবহারও বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু মাটির নীচে যে পুঁজি থাকে তাহা খরচ হইলে পরে নূতন খনির আবিষ্কার ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় থাকে না। কৃত্রিম খনিজ তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে আর এক প্রাকৃতিক সম্পদ পাথুরে কয়লা খরচ করিতে হয় এবং উহা তৈরী করার কাজ ভীষণ ব্যয়সাধ্য। সুতরাং খনিজ তৈলের খোঁজ সারা জগৎময় চলিতেছে এবং দেশ যতই দুর্গম যতই আদিম নগ্নতাপূর্ণই হউক খনিজ তৈলের সন্ধান পাইলে সেখানে চতুর্দ্দিক হইতে খননকারী ও সন্ধানীর দল আসিয়া জুটে। বর্ত্তমানে খনিজ তৈলের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে।

১৯৫১ সন হইতে ১৯৫২ সনে পৃথিবীর খনিজ তৈল উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২ সনে পেট্রোল উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক হিসাবে হইবে ৬৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন; ১৯৫১ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। নিম্নলিখিত তালিকায় প্রধান প্রধান দেশগুলির পেট্রোল উৎপাদনের হিসাব মিলিবে:— (মিলিয়ন মেট্রিক টন)

	১৯৪৬	১৯৫১	১৯৫২
আমেরিকার যুক্তরাজ্য···	২৪৮.২	৩২৪.২	৩৩১.০
ভেনেজুয়েলা ···	৫৬.৭	৯০.৯	৯৫.০
সৌদি আরব ···	৮.১	৩৭.২	৪১.০
কোওয়াইট ···	০.৮	২৮.২	৩৭.৭
ইরাক ···	৪.৭	৮.৭	১৯.০
মেক্সিকো ···	৭.১	১১.০	১১.০
কানাডা ···	১.০	৬.৪	৮.০
পারস্য ···	১৯.৫	১৬.৪*	···
পৃথিবীর মোট—	৩৯০.৮	৬১০.০	৬৪০.০

* শুধু জানুয়ারী-আগষ্টের হিসাব। ১৯৫০ সনে পারস্যের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন

পারস্যকে বাদ দিয়াও দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর পেট্রোল উৎপাদন হ্রাস পায় নাই, অধিকন্তু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভাগে পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে এই উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রাশিয়া তাহার তৈল উৎপাদন ইদানীং বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৯২৯ সনে মধ্যপ্রাচ্যের (ইরাক, ইরাণ, আরব দেশ ও মিশর) খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা তিনভাগ মাত্র ; সেই বৎসর উত্তর-আমেরিকার (আমেরিকার যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং মেক্সিকো) উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭১ ভাগ। বাকী ২৬ ভাগ রাশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলি উৎপাদন করিত। ১৯৫০ সনে মধ্যপ্রাচ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ১৭ ভাগে দাঁড়ায়। উত্তর-আমেরিকার উৎপাদন যদিও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু ১৯৫০ সনে শতকরা মাত্র ৫৫ ভাগ উৎপাদন করিয়াছে। ১৯৫০ সনে পৃথিবীর মোট জমা খনিজ তৈল-সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৫,০০০,০০০,০০০ ব্যারেল। ইহার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের পুঁজিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—তাহার পুঁজিই পৃথিবীর পুঁজির মোট ৫০'৬ ভাগ। উত্তর-আমেরিকার পুঁজি ছিল ৩০'২ ভাগ এবং দক্ষিণ-আমেরিকার ১১'২ ভাগ ; বাকী অংশের অধিকাংশ ছিল সোভিয়েট রাশিয়ায়। ১৯২৯ সনে উত্তর-আমেরিকা পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ৭২'৫ ভাগ ব্যবহার করিত। ১৯৫০ সনে আমেরিকার খরচ হইয়াছিল মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৬'২ ভাগ। নিম্নলিখিত তালিকায় পৃথিবীর তৈলসম্পদ ও উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল ঃ

(হাজার ব্যারেল হিসাবে)

	১৯২৯		১৯৫০		১৯৫০	
	উৎপাদন	পৃথিবীর শতকরা	উৎপাদন	পৃথিবীর শতকরা	মোট জমা	পৃথিবী শতকরা
উত্তর-আমেরিকা	১০৫৩,১৩৮	৭০'৯	২,০৭৩,৫৯০	৫৪'৬	২৮,৭২২,২০০	৩০'২
দক্ষিণ-আমেরিকা	১৯০,৭৭০	১২'৮	৬৪৪,০৬০	১৭'০	১০,৬৫০,০০০	১১'২
পশ্চিম ইউরোপ	১,২৮০	০'১	১৪,১০০	০'৪	২৮৩,০০০	০'২
পূর্ব্ব ইউরোপ ও রাশিয়া	১৪০,৪৮০	৯'৫	৩২০,১৬০	৮'৪	৬,০৯৩,৭০০	৬'৪
মধ্যপ্রাচ্য ও মিশর	৪৪,৮১০	৩'০	৬৫৭,৩৭০	১৭'৩	৪৮,১৯০,০০০	৫০'৬
দূরপ্রাচ্য, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	৫৫,৩৮০	৩'৭	৮৭,০৩০	২'৩	১,৩৬৬,০০০	১'৪
অবশিষ্ট আফ্রিকা	২০	...	৩৩০	...	৩,২০০	...
পৃথিবীর মোট	১,৪৮৫,৪৭০	১০০.০	৩,৭৯৬,৬৪০	১০০'০	৯৫,২০৮,১০০	

উত্তর-আমেরিকার উৎপাদন হার সবচেয়ে বেশী, কিন্তু তাহার পুঁজির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ভারতের পেট্রোল উৎপাদন অতি নগণ্য, বৎসরে মাত্র ৬৬ মিলিয়ন গ্যালন।

আণবিক শক্তিসম্পন্ন খনিজ কারখানা

ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের আলওয়ে শহরে আণবিক শক্তিসম্পন্ন খনিজের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৪শে ডিসেম্বর ইহার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ভারত-সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেন কয়েকটি বিশিষ্ট খনিজ উৎপাদন সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্য। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানীর মূলধন প্রথমে ছিল ৫০ লক্ষ টাকা, পরে তাহা ৮০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। এই মূলধনের শতকরা ৫৫ ভাগ দিবেন ভারত-সরকার এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বাকি ৪৫ ভাগ দিবেন। এই খাতে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ২৬ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিন অঞ্চলে সমুদ্রের উপকূলের নিকট এক প্রকার বালুকার স্তর পাওয়া যায় যাহার বৈজ্ঞানিক নাম 'মোনাজাইট বালুকা স্তর'। ঐ বালুকায় কতকগুলি অতি দুষ্প্রাপ্য খনিজ পাওয়া যায় যেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় "দুষ্প্রাপ্য মাটি" (Rare Earths) বলা হয়। এত দিন এক বিলাতী কোম্পানী ঐ বালুকা বিলাতে লইয়া যাইত। এখন এই নূতন ব্যবস্থা হইতেছে।

এই কোম্পানীর কারখানায় বছরে প্রায় ১৫০০ টন মোনাজাইট বালুকা কাজে লাগানো হইবে। এই কারখানা বৎসরে ১৬৫০ টন ক্লোরাইড্ এবং ১,১৫০ টন কার্ব্বোনেট উৎপাদন করিতে পারে। এই কারখানায় বহু প্রকারের অতি প্রয়োজনীয় ধাতু উৎপাদন হইবে। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম যাহা আণবিক শক্তি উৎপাদনের কার্য্যে সহায়ক হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন একটি কারখানা স্থাপন করিবে যেখানে মোনাজাইট বালুকার ধাতু উৎপাদন হইতে থোরিয়াম

সংগৃহীত হইবে। এই কারখানা বছরে ২০৫ টন হইতে ২২৮ টন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারিবে।

লৌহশিল্পে মোনাজাইট বালুকার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। চকমকি কিংবা ষ্টীল-এল্যুমিনিয়াম সংমিশ্রিত ধাতু উৎপাদনে উক্ত খনিজের ক্লোরাইড এবং কার্ব্বোনেট উভয়েরই প্রয়োজন, আবার বস্ত্রশিল্পে সুতা ভিজানোর জন্য সোডিয়াম ফসফেট প্রয়োজন। গ্যাস-বাতির ম্যান্টল প্রস্তুত করণে থোরিয়াম নাইট্রেট অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারত বিদেশ হইতে, প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে, থোরিয়াম নাইট্রেট আমদানী করে। এই কারখানার অন্যান্য উপাদান ষ্টীল এনামেল করার জন্য এবং চশমা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচ ইত্যাদির উৎপাদনে প্রয়োজন হইবে।

ভারতের ভূমি ও কৃষি

সম্প্রতি ভারতের প্রাকৃতিক ভূমি ও কৃষি সমাবেশ সম্বন্ধে একটি হিসাব রেজিষ্টার জেনারেল ও সেনসাস কমিশনার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, ভূমিপ্রকৃতি, ফসল ও শস্য বপন ও রোপণের ধারা অনুসারে ভারতবর্ষকে পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা হিমালয় পার্ব্বত্য অঞ্চল, উত্তর মালভূমি, কুমারিকার পার্ব্বত্য ও উপত্যকা ভূমি, পশ্চিমী পর্ব্বতমালা ও তটভূমি এবং পূর্ব্ব পর্ব্বতমালা ও তটভূমি। এইরূপ এক একটি প্রাকৃতিক প্রদেশকে ১৫টি অণুবিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং একটি অণুবিভাগকে আবার ৫২ প্রকার প্রাকৃতিক সংস্থান অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে একটি প্রাকৃতিক পর্য্যায় হিসাবে ধরা হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ভারতের জনসমাবেশ সম্বন্ধে অধিকতর সঠিক তথ্য আহরণ করা।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ভারতে গড়পড়তায় মাথাপিছু ০.৭৪ একর জমি আবাদ হয়। প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে দেখা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের কুমারিকা অঞ্চলে গড়পড়তায় মাথাপিছু অধিক জমি আবাদ হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য এই এলাকায় ১.২২ একর জমি চাষ হয়। হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল এই হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, এই অঞ্চলে মাথাপিছু গড়পড়তায় ০.৭৪ একর জমি চাষ হয়; পশ্চিমী পর্ব্বতমালা ও তটভূমিতে মাথাপিছু ০.৬৪ একর জমি চাষ হয়; উত্তর উপত্যকায় মাথাপিছু ০.৬২ একর জমি চাষ হয় এবং পূর্ব্ব পর্ব্বতমালা ও তটভূমিতে মাথাপিছু ০.৪৮ একর জমি চাষ হয়। ভারতের ভূমির বর্ত্তমান হিসাব এইরূপ :

ভারতের মোট ভূমির পরিমাণ	৮১২.৬২ মিলিয়ন*	একর
মোট আবাদী জমি	৩০৪.৩৭	" "
পতিত জমি	৫৯.৩৬	" "
অনাবাদী জমি	৯৯.৫৭ মিলিয়ন	একর
বনভূমি	৯৩.৩৮	" "
পতিত জমি ব্যতীত		
অন্যান্য অনাবাদী জমি	১০২.৬৬	" "

* মিলিয়ন=দশ লক্ষ

ভারতে মোট জমির মধ্যে বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ এবং আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ৩৭.৩ ভাগ। মোট আবাদী জমির শতকরা ২৬ ভাগ হইতেছে ধানজমি এবং শতকরা ১১.৯ ভাগ জমিতে গম চাষ করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ দেওয়া হইল :

ধান	৬৯.৮০ মিলিয়ন	একর
গম ও বার্লি	৩২.০২	" "
জাওয়ার, বজরা ও রাগি	৬২.২৬	" "
ভুট্টা, ছোলা ও ডাল	৭৩.১২	" "
অন্যান্য খাদ্যশস্য	১৩.৩৮	" "
তৈলবীজ	২৪.৫৪	" "
তুলা	১১.৯৪	" "
জাবালি	১১.২৬	" "
পাট ইত্যাদি	২ ০৪	" "
চা, কফি ইত্যাদি	৩.৯৭	" "

উত্তর উপত্যকায় মোট জমির পরিমাণ হইতেছে ১৮৯.১৯ মিলিয়ন একর, তার মধ্যে চাষ হয় ৮৩.৭৫ মিলিয়ন একর এবং ২৬.২৫ মিলিয়ন একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্ব তটভূমিতে জমির পরিমাণ ৬৬.৩১ মিলিয়ন একর, আবাদী জমির পরিমাণ ২৪.৭৯ মিলিয়ন একর এবং সেচজমির পরিমাণ ১০.০১ মিলিয়ন একর। দাক্ষিণাত্যের কুমারিকা প্রদেশে মোট জমির পরিমাণ হইতেছে ৩৩২.৯০ মিলিয়ন একর, আবাদী জমির পরিমাণ ১২৩.৫৯ মিলিয়ন একর এবং সেচজমির পরিমাণ ৯.৩৩ মিলিয়ন একর; পশ্চিম তটভূমিতে জমির পরিমাণ ৬৯.৫২ মিলিয়ন একর, আবাদী জমির পরিমাণ ২৪.১৯ মিলিয়ন একর এবং সেচজমির পরিমাণ ১.৬২ মিলিয়ন একর। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশের জমির পরিমাণ ১৫২.৫৭ মিলিয়ন একর, মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১২.০৮ মিলিয়ন একর এবং সেচজমির পরিমাণ ২.৬২ মিলিয়ন একর।

ভারতের খাদ্যশস্যের বর্ত্তমান অবস্থা

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে খাদ্যসচিব শ্রীকিদোয়াই ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, এ বৎসর ভারতের খাদ্য-সরবরাহ ভাল হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ১৯৫১ সনে ভারতবর্ষ ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়াছে। ১৯৫২ সনের আমদানীর পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টনের উপরে উঠিবে না বলিয়া তিনি আশা করেন। ৯ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫২ সনে উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকিবে প্রায় ১৮ লক্ষ টন, গত বছর উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টন। খুচরা ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত খাদ্যের পরিমাণ থাকিবে ৩০।৪০ লক্ষ টন। ১৯৫৩ সনে প্রায় ৩০ লক্ষ টন গম আমদানী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। গত ১লা জানুয়ারী হইতে আন্তঃজিলা চাল ব্যবসায়ে বাধানিষেধ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ফলে চালের দাম যথেষ্ট কমিয়াছে, বর্তমানে ৭।৮আনায় চালের সের পাওয়া যাইতেছে। নিয়ন্ত্রণ প্রথা এদেশে অস্বাভাবিক উপায়ে অভাব সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, বর্তমানে খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪৮ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বছরে ৭৫০ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতে ভারতের আভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ যখন অতিরিক্ত ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে তখন নিয়ন্ত্রণ-প্রথা তুলিয়া লওয়া হইবে।

জাপানী পদ্ধতিতে ধানচাষ

সাপ্তাহিক 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ভারতে বর্তমানে এক অভিনব পদ্ধতিতে ধানচাষের পরীক্ষা চলিতেছে। গত বৎসর বোম্বাইয়ের থানা জেলার কোসবাদে অবস্থিত কৃষি-বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই জাপানী পদ্ধতিতে প্রতি একরে ৬০০০ পাউণ্ডেরও বেশী ধান পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাতেও এই পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে এবং বোম্বাইয়ের সন্নিকটস্থ বরিভলিতে কোরা গ্রাম-উদ্যোগকেন্দ্রেও অনুরূপ সাফল্য দৃষ্ট হইয়াছে। যে সকল কৃষক এই পদ্ধতি অবলম্বনে চাষ করিয়াছেন তাঁহারাও অতীতে যে পরিমাণ ফসল পাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ধান পাইয়াছেন।

জাপানে জমির উর্ব্বরতা কম, কিন্তু তবুও এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সেখানকার কৃষকরা আমাদের দেশের কৃষক অপেক্ষা দুই-তিন গুণ ফসল বেশী পান। জৈবিক সার প্রয়োগ, যথাসময়ে শস্য ক্ষেত্রে সার প্রদান, যথাকালে আগাছা উত্তোলন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন বলিয়াই জাপানী কৃষকরা বেশী ফসল ফলাইতে পারেন। উক্ত পদ্ধতিতে সাধারণ হিসাবে চাষ করিতে যে পরিমাণ মূলধন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তদপেক্ষা অধিকতর মূলধন ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। ফলে আমাদের দেশে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণের অনেক সুবিধা আছে। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ :

ধান কাটার পর জমির আর্দ্রতা দূর হইবার পূর্ব্বেই ধানচারার জমিতে লাঙ্গল দিতে হইবে। লাঙ্গল চালান সম্ভব না হইলে জমি খুঁড়িয়া মাটির চাপগুলিকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া করিতে হইবে। জমি হইতে সকল প্রকার আগাছা দূর করিতে হইবে এবং প্রতি দেড় কাঠা জমিতে একগাড়ী গোবরের সার মাটির সহিত ভালভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। চার ফুট প্রশস্ত এবং উপযুক্ত দৈর্ঘ্যসমন্বিত স্থানে বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ বপনের স্থানটি ভূমিপৃষ্ঠ হইতে ২"-৩" ইঞ্চি উচ্চ থাকিবে। আগাছা তুলিবার জন্য এবং জলনিষ্কাশনের সুব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত ফাঁক রাখিয়া বীজ বুনিতে হইবে। যেখানে বীজ বপন করা হইবে সেখানকার মাটি আলগা এবং গুঁড়া থাকিলে অঙ্কুরোদ্গমের সাহায্য হয়।

বীজ বপনের পর ½" ইঞ্চি পুরু করিয়া কম্পোষ্ট সার দেওয়া হয়। দিবার আগে কম্পোষ্ট যদি ছাঁকিয়া লওয়া যায় তবে আরও ভাল হয়। কম্পোষ্ট দেওয়ার ফলে চারাগাছের শিকড়গুলি মৃত্তিকার উপরের স্তরে থাকায় ঐগুলিকে রোপণের জন্য টানিয়া তুলিতে অসুবিধা হয় না। কম্পোষ্টের উপর ছাইয়ের এক পাতলা আস্তরণ দেওয়া হয়। চারাগাছের বৃদ্ধির সাহায্যের জন্য ছাই প্রয়োজন। বুনিবার সময় বীজের সহিত দ্বিগুণ মিশ্রিত সার দেওয়া হয়।

জাপানে প্রায় তিন কাঠা জমিতে বুনিবার জন্য ৫ হইতে ৬ পাউণ্ড বীজ লাগে। তাহাতে এক একর জমিতে রোপণ করা যায়। ভারতে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ৪০ হইতে ৯০ পাউণ্ড। কোসবাদ কৃষিক্ষেত্রে তিন কাঠা হইতে পাঁচ কাঠা জমিতে বপনের জন্য ১০ হইতে ২০ পাউণ্ড বীজ ব্যবহার হয়। তাহাতে এক একর জমিতে রোপণ করিবার উপযুক্ত চারা পাওয়া যায়। কোরা কৃষিক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে কম বীজ ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

বর্ষা আরম্ভ হইবার দুই-তিন দিন পূর্ব্বে বীজ বপন করিয়া তাহার উপর পাতলা করিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। জাপানে বীজের নির্ব্বাচনে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এক বালতি লবণাক্ত জলে বাছাই-করা বীজ ফেলা হয় এবং যে সকল বীজ বালতির তলায় পড়ে তাহাই শুধু ব্যবহার করা হয়।

যাহাতে বীজ ব্যধি দ্বারা আক্রান্ত না হয় তজ্জন্য বপনের কয়েক-দিন পূর্ব্বে ০'২% প্যারানক্স সলিউশনে (paranox solution) বীজগুলি ধোয়া হয়। যদিও জমিতে আগাছা জন্মাইবার সম্ভাবনা কম থাকে তবুও আগাছা পরিষ্কার করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথম কিস্তি আগাছা পরিষ্কার করিবার পর বপনের সময় যে পরিমাণ সার দেওয়া হইয়াছিল পুনরায় সেই পরিমাণ সার দেওয়া দরকার। বৃষ্টির সময় সার দিলে চারাগুলির কোনই ক্ষতি হইবে না। মিশ্রিত সার না পাওয়া গেলে তিন ভাগ খইলের সহিত এক ভাগ এমোনিয়ম সালফেট মিশাইয়া দিলেও চলিতে পারে। গাছগুলির বৃদ্ধি যদি সেরূপ সতেজ না হয় তবে আরও একবার সার দেওয়া যাইতে পারে।

জমিতে যাহাতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য না হয় সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন এবং রোপণের পূর্ব্বে চারাগুলি তুলিবার সময় দৃষ্টি রাখা দরকার যেন শিকড়ের কোন ক্ষতি না হয়। রোপণের পূর্ব্বে ১০ ইঞ্চি অন্তর লাল সূতা বাঁধা একটি লম্বা দড়ির সাহায্যে রোপণের সারি ঠিক করিবার কাজ করা যাইতে পারে। অনুরূপ চার হইতে ছয় ইঞ্চি পর পর চিহ্ন যুক্ত আর একটি দড়ির সাহায্যে বিভিন্ন সারির মধ্যে উপযুক্ত ফাঁক রাখার কাজ করা যাইতে পারে। রোপণের সারি ঠিক রাখিলে কৃষকের অনেক সুবিধা হয়—যেমন মাঠের মধ্যে চলাফেরা করার কাজ অনেক সহজ হয় এবং জমির অধিকতর যত্ন লওয়া যায়। তাহা ছাড়া আগাছা পরিষ্কার করিবার সময় এবং

গাছের গুঁড়ির মাটি শিথিল করিবার ও সার দিবার সময়ও অনেক সাহায্য হয়।

কোসবাদে ৩ হইতে ৪টি চারা একসঙ্গে রোপণ করা হয়—আমাদের কৃষকরা সাধারণতঃ গোছা গোছা চারা একত্র রোপণ করেন। এক সঙ্গে অল্পসংখ্যক চারা রোপণ করার ফলে কেবল যে শুধু চারা কম লাগে তাহাই নহে, উহাতে গাছের বৃদ্ধি সতেজ হয়।

জমিতে প্রতি একরে মিশ্রিত সার ৪৮০ পাউণ্ড বা হাড়ের গুঁড়া ১১০ পাউণ্ড সার হিসাবে দেওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে, জমিতে গোবর বা কম্পোষ্টের সার দিবার পর ঘনীভূত (concentrated) সার প্রয়োগ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। রোপণ করার পর আগাছা পরিষ্কার করা এবং গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে আলগা করিয়া দেওয়া দরকার। রোপণের ১৫ দিন পর প্রথম বার এবং তাহার পর ১৫ দিন অন্তর তাহা করা প্রয়োজন। গাছ বড় হইয়া গেলে আর তাহা না করিলেও চলিবে।

জাপানী কৃষকরা সব সময় হাতের কাছে কিছু চারা রাখেন যাহাতে প্রয়োজনমত রোপণ করা যায়। যাহাতে চারাগাছগুলি জলের তলায় ডুবিয়া না যায় তজ্জন্য জাপানী কৃষকরা মাঠের মধ্যে ৫ ইঞ্চি অন্তর ২ ইঞ্চি উচ্চ খুঁটি পুঁতিয়া খুঁটিগুলিতে দড়ি বাঁধিয়া দেন। কোসবাদ এবং কোরা কেন্দ্রেও এই পদ্ধতি সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে। অনিয়মিত এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময়ও এই পদ্ধতিতে অনেক উপকার হয়।

মাঠ হইতে ধান তুলিবার পর অড়হর, কলাই, ছোলা প্রভৃতি শীতকালীন শস্য বপন করিলে বেশ ভাল হয়। তাহাতে মৃত্তিকার উন্নতি ঘটে এবং সারের জন্য সব্জী (গ্রীণ মেটিরিয়াল) পাওয়া যায়।

জানা গিয়াছে যে, প্রায় ১৫০০ কৃষক এই পদ্ধতিতে গত বৎসর চাষ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফলে এই পদ্ধতির সম্পর্কে সংশয় দূর হইতেছে।

পশ্চিম বাংলার যে সকল অঞ্চলে সেচকার্য্যের প্রসারের দরুন নূতন জমি আবাদ হইতেছে সেই সকল স্থলে সমবায় পদ্ধতিতে এই জাপানী প্রথার পরীক্ষা হওয়া উচিত। যদি এই প্রথায় ফসল ঐরূপ বৃদ্ধি হয় তবে চাষী মাত্রেই পরে উহা গ্রহণ করিবে, বলা বাহুল্য।

লেভীপ্রথা ও পশ্চিমবঙ্গ

বিভিন্ন সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, বহু স্থানেই লেভী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নানা গোলযোগের ফলে লেভীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদে প্রকাশ '২৪-পরগণা জেলায় "গোসাবা ইউনিয়নের যাহাদের লেভীর ধান দিতে আদেশ করা হইয়াছে, মনে হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৯৫ জন উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিবে। অনেকেরই অভিযোগ, সরকারী বরাদ্দ অনুযায়ী তাহাদের ধান হয় নাই, লেভীর আইন অনুযায়ী চাষের জন্য তাহাদের বিঘাপ্রতি এক মণ ধান দেওয়া হয় নাই এবং কৃষকদের ধানের দেনা বাদ দেওয়া হয় নাই।..."

৩০শে ডিসেম্বর তারিখের 'মুর্শিদাবাদ সমাচার' লিখিতেছেন যে, লেভী প্রথায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ কান্দী অঞ্চলে যেরূপ ধান্যের উৎপাদন স্থির করিয়াছেন তদনুযায়ী ধান্য জন্মে নাই। উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতার মতে "কোনও কোনও লোককে যে পরিমাণ ধান্য দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেই পরিমাণ ধান্য দিতে হইলে তাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান থাকিবে না। পরন্তু কাহাকেও কাহাকেও ধান্য কিনিয়াও দিতে হইবে। অনেককে ৭ই জানুয়ারী ১৯৫৩ সনের মধ্যে ধান্য দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে ধানকাটা আছড়ানো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।" বর্দ্ধমানের "আর্য্য" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, বর্দ্ধমান জেলায় ধান্যের উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। ফলে লেভীর বিরুদ্ধে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় এগার শত আবেদন জেলা-শাসকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ঐ পত্রিকায় অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে, পৌষ মাসে বর্দ্ধমান শহরে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'মুর্শিদাবাদ সমাচার' (৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫২) মুর্শিদাবাদ জেলায় লেভীপ্রথার ত্রুটিগুলির উল্লেখ করিয়া লিখিতেছে যে,

"(১) সরকারী কর্ম্মচারীদের ত্রুটির জন্য সত্যই যাহাদের ত্রিশ বিঘার কম চাষযোগ্য জমি আছে, তাহাদের উপরও শস্য আদায়ের নোটীশ দেওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

"(২) যাহাদের শতাধিক বিঘা জমি বিভিন্ন মৌজায় ছড়াইয়া আছে তাহারা বিভিন্ন নামে ২৫ বিঘা করিয়া জমি দেখাইয়া রিটার্ন দিয়া খাদ্যশস্য-সংগ্রহ বিভাগকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে।

"(৩) যাহাদের লেভীপ্রথায় দিবার জন্য ধান্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহারা নিজের জমির ধান্য গোলাজাত করিয়া বাজার হইতে ধান্য কিনিয়া সরকারী গুদামে দিতেছে এবং সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্য বাজার অপেক্ষা অধিক হওয়ায় লেভীপ্রথা তাহাদের পক্ষে মুনাফাদায়ক হইয়াছে।"

এই সম্পর্কে আমাদের মনে এক প্রশ্ন জাগিয়াছে। সত্যসত্যই যেখানে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ত্রুটি আছে সেখানে প্রতিকার এবং কর্ম্মচারীর সাজা হওয়া উচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী ও চাষীর লোভই এইরূপ সংবাদের আকর সেখানে কি করা কর্ত্তব্য? দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণের প্রশ্ন তো ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। সুতরাং উপায় কি?

ভারতে ৫০ হাজার একর পতিত জমি উদ্ধার

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত ১৭ কোটি ১০ লক্ষ একর চাষের জমি আছে। আর আছে প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ একর চাষযোগ্য পতিত জমি। ভারতের উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে ৫০ হাজার একর পতিত জমি উদ্ধার কার্য্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ ভারত-সরকারকে সাহায্য করিতেছেন।

ইহা ব্যতীত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা করিয়াছেন তাহারও গবেষণা-কেন্দ্র কটকে স্থাপিত হইয়াছে। এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের কৃষি-বিভাগের ছাত্রগণ এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় রত রহিয়াছেন এবং পৃথিবীর নয়টি জাতি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় যোগদান করিয়াছেন।

কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কে মিশরের নেতৃত্বে কতিপয় দেশ যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পল্লী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসমঞ্জস অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যবসায়ে অভিজ্ঞদের সাহায্যার্থ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ পর্য্যন্ত কৃষি-ব্যবসায়ীর যে সকল সমস্যা সমাধান হয় নাই, ঐ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হইয়া তাহা সমাধানে সাহায্য করিবেন।

"ওয়াশিংটন, ৪ঠা জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিদপ্তরের মতে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাউল রপ্তানীকারকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী।

থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশ প্রথম দুইটি স্থানের অধিকারী।

পৃথিবীর শস্যোৎপাদনের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে আনুমানিক ৩২২০০ কোটি পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাউল উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ৪৮০০ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইত ইহা তাহার দ্বিগুণ। হিসাব পরীক্ষায় অনুমান করা হয় যে, আগামী বৎসর যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৭৫০ কোটি পাউণ্ড চাউল রপ্তানী করা যাইবে।

পরীক্ষায় আরও দেখা গিয়াছে যে, বিশ্বের মোট চাউল রপ্তানীর পরিমাণের শতকরা ৭০ ভাগের অধিক আসে থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্ম ও ইন্দোচীন হইতে। ইহারা এশিয়ার "চাউলাগার" নামে খ্যাত।

অন্যান্যদের মধ্যে মিশর, ব্রেজিল, ইটালী ও অষ্ট্রেলিয়াও এশিয়ায় চাউল প্রেরণ করিতেছে।

হিসাবে বলা হইয়াছে যে, জাপান ও ভারত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধিক চাউল আমদানীকারক।"

'আমেরিকান রিপোর্টারে' প্রকাশিত উক্ত সংবাদদ্বয়ে আমরা বুঝি যে, এদেশের খাদ্য-উৎপাদন সমস্যা—বিশেষতঃ চাউল উৎপাদন এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ফলে কি হইবে বলা যায় না, কিন্তু চাউল-উৎপাদন-বৃদ্ধি যে অসম্ভব নয় তাহা ওয়াশিংটনের সংবাদই প্রমাণ করিতেছে।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে শিক্ষার স্থান

বোলপুর শান্তিনিকেতন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, এই ত্রুটির জন্য সমাজের যুব-শক্তির শোচনীয় ব্যর্থতা ও উপায়হীনতা, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শিক্ষা কিভাবে মানুষের আসুর ভাবকে বর্দ্ধিত ও উৎসাহিত করিতেছে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্ত্তন কোন্ পথে প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিভাষণে বলিয়াছেন :

"শিক্ষা-প্রচার এবং প্রসার দ্রুতবেগে হইতেছে, কিন্তু ইহার পদ্ধতির কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহার জন্য এই এক বিচারণীয় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, এই প্রসার যে বহুসংখ্যক অসন্তুষ্ট শ্রেণী গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহার দ্বারা তাহাদের জীবনবৃত্তিপ্রাপ্ত হইবার কোনও পথ পাওয়া যাইতেছে না। যখন আমরা দেখি এই প্রসারের ফলস্বরূপ যে জ্ঞান পাওয়া যাইত, তাহারও হ্রাস হইতেছে, আর জাতীয় চরিত্রগঠনের বিশেষ কিছুই লাভ হইতেছে না—তখন আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই এই পদ্ধতির মৌলিক বিচার প্রয়োজন। ইহা বাংলার প্রশ্ন নহে, ভারতের প্রশ্ন—ইহার সমাধান করিতে আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "আমি মনে করি যে, মানব-শরীরে পোষক রক্ত সঞ্চার করিবার শক্তি হৃদয়ে থাকে, মস্তিষ্কে নহে। আর নিজের ভরণপোষণের জন্য মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা সেই হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল মস্তিষ্কের দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্য কাহাকেও সুখী করিতে পারি না।

"মানুষ-সমাজের কাজে আজ এক বিরাট প্রশ্ন এই যে, হৃদয়কে কি প্রকারে বলবান ও মহান্ করা যায়। আমি মস্তিষ্কের উন্নতির নিন্দা করি না। আমি তাহার প্রগতির অবরোধ করিতে চাহি না ; বিজ্ঞানকে অবাধরূপে নিজের কাজ করিতে দেওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কে বল দিবার জন্য কি করা দরকার, তাহা আমাদেরই স্থির করিতে হইবে। উপনিষদে এই বিষয়ে গভীর বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভব এবং সাক্ষাৎ দেখা যায়, অনেক জায়গায় আমরা তাহার ভাবাও ঠিক বুঝিতে পারি না, কেননা বুঝিবার প্রয়োজন আমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা করি, আর যাহা কিছু অনুভবসিদ্ধ, স্পষ্ট কথা তাহাকে আমরা বুদ্ধির ঘরে ছোট দরজা দিয়া না আনিতে পারিলে তাহার সত্যতা এবং প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করি। মানব-সমাজের আজ অবিদ্যা পার হইয়া ঘোর অন্ধকারের বাহিরে যাইবার প্রযত্ন কিছু সফল হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যায় রত থাকিয়া আরও ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। সেই মানব-সমাজ আজ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যে অবিদ্যা এবং বিদ্যা, উভয় হইতে ভিন্ন প্রযত্ন করে নাই। যদি সেই আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়, হৃদয় শুদ্ধ হইবে, আর মানুষ মানুষের সহিত বৈষম্য না করিয়া ঐক্য অনুভব করিতে থাকিবে ; আর কেবল মানুষের সঙ্গে নহে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে, যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তাহার সঙ্গে, আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

উপরোক্ত অংশ আসানসোলের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা

জামসেদপুরের "নবজাগরণ" ২০শে পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন :

"মর্য্যাদার নামে মাঝে মাঝে আমরা যে কিরূপ বিবেকবুদ্ধি

রহিত হইয়া পড়ি তাহার একটি জলন্ত উদাহরণ গত ২১শে ডিসেম্বর পাওয়া গেল। চাণ্ডিলে অসুস্থ আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে দেখিবার জন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ দিন বিমানযোগে জামসেদপুরে আসেন ও বিমান ঘাঁটি হইতে মোটরযোগে চাণ্ডিলে গমন করেন। রাষ্ট্রপতিকে সামরিক কায়দায় সেলাম দিবার জন্ত রাঁচী হইতে এক দল বিশেষ সৈন্তকে আনা হয়। সর্ব্বসাকুল্যে দুই কি আড়াই মিনিটের অনুষ্ঠানের জন্ত প্রায় ত্রিশ জন সৈন্তকে ভাড়া ও রাহাখরচ দিয়া জামসেদপুরে আনা ও তাহাদের বিমান-ঘাঁটিতে লইয়া যাওয়া ও লইয়া আসার জন্ত পেট্রোল পোড়ান যে নিতান্তই বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ একথা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। অতঃপর রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা ও নিরাপত্তার জন্ত জামসেদপুর হইতে চাণ্ডিল পর্য্যন্ত প্রায় ২২ মাইল রাস্তার দুই দিকে সামান্ত ব্যবধানে এক একজন সশস্ত্র পুলিস দাঁড় করান হয়। এই সকল হতভাগ্য পুলিসকে সকাল ৮টার মধ্যে নিজ নিজ যায়গায় হাজির হইবার জন্ত ভোর চারটার মধ্যে উঠিয়া একরকম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহাদের সদর কেন্দ্রে হাজির হইতে হয়। সারাদিন ঠায় দাঁড়াইয়া তাহাদের কাটিয়া গেল। বৈকাল ৪ টায় রাষ্ট্রপতি চলিয়া গেলে তাহাদের অবকাশ হইল। সারাদিন অস্নাত এবং অভুক্ত অবস্থায় এই সিপাহী আখ্যাধারী শত শত ব্যক্তিকে জেব্বা জোব্বা পরিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অপরিসীম বিরক্তি ও যন্ত্রণায় এই সকল হতভাগ্যের অনেকে যে রাষ্ট্রপতি হইতে সুরু করিয়া কংগ্রেসী সরকার প্রত্যেকের মুণ্ডপাত করিয়াছে ইহা আমাদের অনেকে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। এই সকল নিরাপত্তা পুলিস এবং আরও অর্দ্ধশত সাদা পোশাকধারী পুলিসের জন্ত দেশের যে কয় সহস্র মুদ্রা খরচ হইল, তাহাও ভাবিবার কথা।

"রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অজাতশত্রু জননায়ক বলা চলে। ইহা ছাড়া একথা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে, ভারতরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সাধারণ অবস্থায় কোন ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। এমতাবস্থায় কোন চরম হিংসাপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্তও যে তাঁহাকে হত্যা করিবেন একথা চিন্তা করাও বাতুলতা মাত্র। সুতরাং এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে অহেতুক দরিদ্র দেশের অর্থ ব্যয় ও সরকারী কর্ম্মচারীদের হয়রানীর তাৎপর্য্য কি? অবোধ শিশুর রাজা রাজা খেলার সহিত এ সকল কার্য্যের পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, শিশু খেলা-প্রসঙ্গে নিজের অজ্ঞানতার চক্রে আবর্ত্তন করিতে থাকে, কাহারও ক্ষতি করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার এই সব প্রবীণ শিশুদের আত্মপ্রসাদ লাভের মাশুল যোগাইতে হয় দরিদ্র প্রজাদের।"

বাস্তবিকই আমরা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সকল ঘৃণ্য অংশ কায়েম রাখিয়া চলিতেছি। কলিকাতাতেও রাজেন্দ্রবাবুর থাকাকালীন বড় বড় পথে যখন-তখন লোক চলাচল বন্ধ করিয়া লোকের মনে অযথা আক্রোশ ও ঘৃণার বিস্তার করা হইয়াছে। তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই, যে স্থবিরটিকে মুখ্যমন্ত্রী করিয়া এখানকার অতি অপরূপ মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে তাহার মূলে তো আমরাই!

বিহার কংগ্রেসের স্বরূপ

বিহারের কংগ্রেসী সরকার যাঁহারা চালনা করেন তাঁহারা কিরূপ জীব এবং তাঁহাদের ন্যায়নীতি জ্ঞান কিরূপ তাহা কংগ্রেসের উচ্চতম প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশে, শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পুরুলিয়ার "মুক্তি" লিখিতেছেন:

"শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্তের রিপোর্টটি দীর্ঘ রিপোর্ট। আমরা তাহার প্রধান প্রধান অংশগুলির মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি এবং সেই গুলিই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। তিনি রিপোর্টে বলিয়াছেন, আমি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীমন নারায়ণ অগ্রবালের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া ১লা নবেম্বর হইতে ২৭শে নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় এক মাস বিহার প্রদেশে অবস্থান করি। আমি যখন পাটনা পৌঁছিলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে, সেখানকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা ব্যাপক অবিশ্বাস ও অভিযোগ বর্ত্তমান। কোন অভিযোগের কোন প্রতীকার না দেখিয়া সকলেই অসহায় বোধ করিতেছে।

"বিহারের কংগ্রেসে দুইটি প্রধান দল আছে। একটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহের আর একটি শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহের। তাহাদের মতবিরোধ কোন রাজনৈতিক নীতি অথবা কার্য্যধারা লইয়া নহে—ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং যাহারা ইহাদিগের অনুবর্ত্তী বলিয়া বলে তাহাদের মধ্যে এই বিষক্রিয়া আরও বেশী। ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া এই দলাদলীর ব্যাপার গ্রামদেশে পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এই দলাদলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল গবর্ণমেণ্ট এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায় করা। ফলে এক দলকে হটাইয়া অন্য দলের প্রভুত্ব কায়েম করিবার জন্ত এমন কোন অবাঞ্ছনীয় কাজ নাই যাহা করা হয় না। উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে এক দলকে হটাইয়া অন্য দলের প্রভুত্ব কায়েম করিবার জন্ত লড়াই চলিয়াছে।

"যদিও শ্রীঅনুগ্রহ বাবু আইন-সভায় কংগ্রেসী দলের ডেপুটি লিডার কিন্তু তাহা নামে মাত্র। কার্য্যতঃ ডেপুটি লিডার হইলেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়। আর একজন মন্ত্রী শ্রীমহেশ্বর প্রসাদ সিংহ—তাঁহাকেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বলিয়া বলা হয়।

"এই দলাদলির রেষারেষিকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্ত এক জাতের উপর অন্য জাতের বিদ্বেষ মনোভাবকে সৃষ্টি করা, উত্তেজিত করা এবং প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই নয়, সমগ্র দেশের পক্ষেই ভয়ানক বিপদের সৃষ্টি হইতে পারে।

"ভুয়া কংগ্রেস সদস্তের সংগ্রহের ব্যাপারটা সমস্ত খেলার মধ্যে একটা খেলামাত্র। যে বেশী মেম্বার করিতে পারিবে সে-ই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে ইহাই হইল জাল মেম্বার করিবার মূল কারণ। অবশ্য বিহারেই যাহা হইতেছে সে সম্বন্ধে আমার ঘনিষ্ঠভাবে

জানিবার সুযোগ হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই রোগ সমস্ত ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত। তবে বিহারে ইহা মহামারীর মত দেখা দিয়াছে।

"'জাল কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করার ব্যাপারটা কেবল একটা কি দু'চারটা জেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহা সমস্ত জেলাতেই হইয়াছে। খুব কম করিয়া ধরিয়া কেহ কেহ জাল কংগ্রেস মেম্বারের সংখ্যা শতকরা ৭৫ ও ৮০-র উপরেও হিসাব করেন। আমার নিজের বিশ্বাস ইহা শতকরা ৮০-এর উপরে হইবেই। একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, জাল কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা খুবই বেশী এবং এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই।

"'জাল মেম্বার করার ব্যাপারে অনেক রকমের কারসাজি করা হইয়াছে। খাতাপত্র দেখিয়াই কতকগুলি বেশ বুঝিতে পারা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান যাইতেছে—(১) চেকের মুড়িসহ মেম্বারের তালিকায় চেকের মুড়ি সব সাদা এবং কোন স্বাক্ষর নাই। (২) একই হাতের লেখায় বহু নামের স্বাক্ষর করা হইয়াছে। (৩) সমস্ত রকম সম্ভবপর আঙ্গুলের টিপসহি এবং বিনা আঙ্গুলেরও টিপসহি আছে। (৪) সরকারী কোন কোন ছাপান লিষ্ট হইতে বর্ণানুক্রমিক নাম কপি করিয়া লিষ্ট করা হইয়াছে ইত্যাদি।'

"শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে যে সমস্ত ব্যক্তির নামে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন তাহার মধ্যে সাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী, এম-এল-এ এবং কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টির অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীকামতাপ্রসাদ গুপ্ত একজন। তিনি বলেন—এ রকম বহু ব্যাপারই আছে তবে ইহা একেবারে অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই রকম একটি লোক কত দূর হীন কাজ করিতে পারে। তিনি ইহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আইন-সভার সদস্য পদ হইতে পদত্যাগ করাইয়া পাঁচ বৎসরের জন্য একেবারে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।

"শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্ত এই জাল মেম্বারের ব্যাপার ছাড়া জালিয়াতী, জুয়াচুরী, ভয় দেখান, নিজেদের সুবিধামত ভোটকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি আরও বহু প্রকার উপায় ও কারসাজির কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

"তিনি কংগ্রেসের মধ্যে এই সমস্ত দুর্নীতি ও অনাচারের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "কংগ্রেস জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভালবাসা হারাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কংগ্রেসের লোকের একমাত্র কাজ ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি করা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করা। এবং এজন্য এমন কোন কদর্য্য কাজ নাই যাহা তাঁহারা করেন না।' শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্ত বিহারের আগামী জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে কংগ্রেস হইতে প্রার্থী দাঁড় করাইবার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, বিহারে (যদি সমস্ত ভারতে হয় ত ভালই) আগামী জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে যেন কংগ্রেস হইতে কোনও অংশ গ্রহণ করা বা প্রার্থী দাঁড় করান না হয়, এবং এ ব্যাপারটা বেশ ভাল করিয়া ব্যাপকভাবে লোককে জানাইয়া দিতে হইবে। বিহারের এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারটাতে ঐ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটিতে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করাইবার লক্ষ্যে ও কংগ্রেস সংগঠন দখল করিবার জন্যই যাহা খুসী করা হইয়াছে।

"সর্ব্বশেষে তিনি প্রতিষ্ঠানগত কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে নিজের অভিমত দিয়াছেন।

"বিহার প্রদেশ সম্বন্ধে শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্তের এই রিপোর্টের গুরুত্ব খুব বেশী। অন্য কেহ হইলে এই সমস্ত কথা বিহারের কংগ্রেসীরা কতকগুলি মিথ্যা দোষারোপ ও উল্টা মিথ্যা প্রচার করিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিশেষ প্রতিনিধির এই সমস্ত জাজ্বল্যমান সত্যকে ওরকম ভাবে অস্বীকার করার ভরসা তাহাদের হয় নাই। বিহারের নেতৃবৃন্দ অনেকে ব্যথিত হইয়াছেন, অনেকে ইহা আংশিক স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কামান দাগিয়া শ্রীঘনশ্যাম সিং গুপ্তকে উড়াইয়া দিবার বজ্রনাদ এখনও কাহারও কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় নাই।"

বহরমপুর হাসপাতাল

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" ২২শে পৌষ সংখ্যায় লিখিতেছেন :

"১৮৫৫ সনে বহরমপুরে প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তাহার পর হইতে এই ৯৭ বৎসরে উক্ত হাসপাতাল সব দিক দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যতীত নিকটবর্ত্তী নদীয়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলা হইতেও নানা শ্রেণীর রোগী বহরমপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যাধিক্য বশতঃ হাসপাতালে স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থার অপ্রতুলতা স্বীকার করিতেই হয়। রোগীদের প্রয়োজনের উপযুক্ত ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার বা নার্স যে হাসপাতালে নাই, তাহাও অস্বীকারের উপায় নাই। আমরা জানিলাম, ষ্টাফের স্বল্পতা সম্বন্ধে হাসপাতালের পরামর্শদাতা কমিটি পুনঃ পুনঃ কলিকাতার সরকারী কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও তাঁহারা কোনও ব্যবস্থা এযাবৎ গ্রহণ করেন নাই। প্রায় সময়েই পরে বিবেচনা করিবার স্তোকবাক্য দিয়া প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ ষ্টাফ বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা সরেজমিনে হাসপাতালে আসিয়া তদন্ত করিলেই ষ্টাফ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিতেন এবং পরিচালক সমিতির প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারিতেন। ষ্টাফের স্বল্পতার জন্য হাসপাতালের কর্ম্মচারীবৃন্দকে সময় সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমঘটিত বিরক্তির জের রোগীদের উপর আসিয়া পড়ে।

"তত্রাচ আমরা বিশ্বাস করি, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও অপরাপর কর্ম্মিগণ যদি রোগী বা রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করেন, তাহাদের ক্লান্তিগত রূঢ়তা রোগীদের উপর না চাপাইয়া কিছু ভদ্রতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন, তবে বহরমপুর সদর হাসপাতালের বিরুদ্ধে জনগণের, বিশেষ করিয়া দরিদ্র লোকের যে অভিযোগ তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। চিকিৎসা ও

রোগ আরোগ্যের মহৎ ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভদ্রভাবে বা বিচারমত অর্থাগমের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অর্থলাভকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া যদি তাঁহারা সেবাধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে মানবতার প্রতি তাঁহাদের যে ঘোর অবজ্ঞাই ঘোষিত হয় তাহা সুশিক্ষিত আয়ুর্বিজ্ঞানীদের না বলিলেও চলে।"

হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্স সম্পর্কে অনুযোগ অভিযোগ ত চতুর্দ্দিকেই শুনা যায়। অন্য দিকে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়াই যাইতেছে, কিন্তু হাসপাতালের ব্যবস্থা ক্রমেই সদাশয় সরকারের যোগ্য মন্ত্রীদের কৃপায় কমিয়াই যাইতেছে—বিশেষতঃ মফঃস্বলে। সুতরাং প্রতিকার হইবে কিরূপে? ডাক্তার, নার্স ইঁহারা ত সাধারণ মানুষই।

ভারতে ফৌজদারী বিচার

২৭শে ডিসেম্বরের "হরিজন পত্রিকা"য় শ্রী এ. ভি. বার্ভের লিখিত এই প্রবন্ধের অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে বিচার ব্যবস্থায় আমরা যেরূপ ফলাফল দেখিতেছি তাহাতে চিন্তাশীল লোকমাত্রেরই মনে হতাশার সৃষ্টি হইতেছে। দেখা যাইতেছে, আইন পরোক্ষভাবে টাকার বশ এবং সেইজন্য দুষ্ট লোক বিত্তশালী হইলে শাস্তির অতীত। এই অবস্থায় শ্রীযুত বার্ভের লেখা অনুধাবন যোগ্য:

"প্রধানতঃ ফৌজদারী আদালতে কয়েক বৎসর আইনব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতে ভারতের ফৌজদারী বিচারালয়গুলির বিচার-পদ্ধতি ও কার্য্যধারার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। সেই হেতু রাজসরকার ও উহার মালিক জনসাধারণের নিকট ফৌজদারী আইন ও বিচারের ত্রুটিবিচ্যুতি জানাইতে চাই।

"ব্রিটিশ আগমনের পূর্ব্বে মুঘল ও মরাঠা রাজ্যে যে আইন চলিত ছিল তাহা কেতাদুরস্ত লিপিবদ্ধ ছিল না। কাজী ও ন্যায়াধীশগণের অধীনে যে বিচারধারা চলিত তাহাতে বিচারকের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর নির্ভর করিতে হইত। পল্লীগ্রামে গ্রামপঞ্চায়েৎগুলি ছোট মামলাগুলির বিচার করিয়া দিত। আইনজীবী কোন শ্রেণীবিশেষ ছিল না, সাক্ষ্য প্রমাণাদি সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ ধারাবলী ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সময় সময় কষ্টকর পরীক্ষা দিয়া নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে বলা হইত।

"কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রথা পরিবর্ত্তিত হইল। ফৌজদারী আইন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণাদির আইন ধারামত লিপিবদ্ধ হইল। একান্ত কেতাদুরস্ত কিন্তু এদেশে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক আইনকানুন আদালতগুলির মাধ্যমে প্রচলিত হইতে লাগিল। সুচতুর বুদ্ধিযুক্ত কিন্তু বিবেকরহিত এক উকিলশ্রেণীর উদ্ভব হইল। আইনের বেড়াজাল হইতে নিষ্কৃতিলাভে এই শ্রেণী লোককে সাহায্য করিতে লাগিল। বিচার পরিচালনার ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ইংরেজ জাতির চরিত্রগত লক্ষণগুলির ছাপ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা ব্যক্তিস্বাধীনতার একান্ত পূজারী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রবিন হুডের মত অত্যাচারীকে সায়েস্তা করিবার প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত। সেইজন্য ব্রিটিশ বিচারপদ্ধতির মধ্যে একটি দুর্ব্বল দিক এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেশী সুবিধা দেয় এবং অভিযোগকারী-পক্ষ ব্যক্তি বা রাজসরকার যেই হউক তাহাকে অসুবিধায় ফেলে। তদুপরি সাক্ষ্যপ্রমাণের আইন অনুসারে প্রত্যেক অপরাধের সত্যতা পারতপক্ষে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়। হত্যাকারী চোর বা ডাকাতেরা তাহাদের জঘন্য অপরাধগুলি লুকাইয়া করা সম্ভব হইলে লোকজনের সামনে অনুষ্ঠান করিবে, অপরাধীদের এত বোকা মনে করা যায় কি? কিন্তু বিচার-পদ্ধতিতে অপরাধ অনুষ্ঠানের চাক্ষুষ প্রমাণ চাই এই অদ্ভুত চাহিদা রাখায় পুলিসের পক্ষে মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টির প্রলোভন আসে। অথচ সেইরূপ সাজানো সাক্ষ্যপ্রমাণ জেরায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে অনেক চোর ডাকাত বেকসুর খালাস পাইয়া যায়। সম্প্রতি একটি মেয়ে ধর্ষিত ও পরে নিহত হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিটি হাইকোর্টে আইনের খুঁটিনাটির দরুন সন্দেহের সুবিধা পাইয়া ন্যায়বিচারের দণ্ড এড়াইয়া যাইতে সমর্থ হয়। দশ জন অপরাধী ছাড়া পাইয়া যাক, তথাপি এক জন নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা না পায়, এরূপ গালভরা কথা শুনিতে ভাল। কিন্তু ইহার যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচারে বহু খাঁটি অপরাধীকে ন্যায্য দণ্ড এড়াইয়া যাইতে সাহায্য করা হইয়াছে।

"দেশের বর্ত্তমান স্বাধীন আমলেও পুরানো অস্বাভাবিক বিচার-পদ্ধতি চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। ইহার ফলে এক পক্ষ অর্থাৎ আসামী পক্ষ সর্ব্ববিধ সুবিধা লাভ করিতেছে, আর অপর পক্ষ অর্থাৎ ফরিয়াদী পক্ষ সর্ব্ববিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। অভিযুক্ত আসামীকে শপথ গ্রহণ করাইয়া প্রশ্ন করা হয় না, তাহাকে কোন রূপ জেরারও সম্মুখীন হইতে হয় না। সে স্বচ্ছন্দে মিথ্যা ও কল্পিত সাফাইয়ের আশ্রয় লইতে পারে এবং এই মিথ্যাচারের জন্য তাহাকে কোনরূপ কুফল ভোগ করিতে হয় না। আমার ধারণা, ফরাসী এবং মার্কিন বিচারপদ্ধতিতে অভিযুক্ত আসামীকে শপথ গ্রহণ করান হয় ও তাহাকে জেরা করাও চলে এবং তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে আদালতে মিথ্যাভাষণের জন্য সে দণ্ডনীয় হয়। ভারতে বর্ত্তমান প্রচলিত বিচার-পদ্ধতিতে অভিযুক্ত আসামী আদালতে তথা রাজসরকারের জামাতাসদৃশ হইয়া যায়। তাহারা উকিলের চতুর ও প্রায়ই বিবেকহীন বুদ্ধির পরামর্শে আইনের খুঁটিনাটি ফাঁকের পুরা সুযোগ গ্রহণ করিয়া ন্যায্য দণ্ড এড়াইয়া খালাস পাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে কোর্টের বাহিরে সকলেই আসামীকে দোষী বলিয়া বুঝিয়া থাকে, কিন্তু আদালতের বিচারে সে নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পায়। ইহার মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, অপরাধীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, রাহাজানি, নারীধর্ষণ, নরহত্যা এই সকল গুরু অপরাধ প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠান করিলেও আদালতের সাজা প্রায়ই এড়াইতে পারা যায়, যদি আসামী মোটা ফি দিয়া দক্ষ উকিল লাগাইতে পারে। আদালতের বিচারের বাস্তব পরিস্থিতি হইতেই আসামীদের এইরূপ

বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এইরূপ সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। অচিরে ঠেকাইতে না পারিলে ইহাতে অরাজকতা দেখা দিবে।

"এইরূপ দুঃখজনক পরিস্থিতির প্রতিকার কি? স্বাধীনতার যুগে প্রাক্তন ইংরেজ প্রভুদের হস্তস্থিত রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া চালিত হইবার আমাদের কোন আইনগত বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা নাই। আমাদের স্বকীয় নূতন বিচারপদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। উহা এত অস্বাভাবিক নিয়মাধীন থাকিবে না, এদেশীয় মানুষের স্বভাবের অনুকূল ও নিয়মানুগ হইবে। আইনগত ও নীতিগত অপরাধীদের যদি দণ্ডবিধান করিতে হয় তবে তাহাদের পাপমনে আইন আদালত সম্বন্ধে সম্ভ্রম ও সশঙ্ক শ্রদ্ধার ভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইতে হইবে। অপরাধী আসামীকে শপথ করাইয়া জবানবন্দী লওয়া হউক এবং তাহার নির্দোষিতা সাফাই সম্পর্কে জেরা করা হউক। যে সকল অপরাধ জামিনযোগ্য নহে তাহাতে জামিন রদ করিয়া দিতে হইবে। যেখানে গ্রামপঞ্চায়েৎ আছে সেখানে নরহত্যার ন্যায় গুরু অপরাধ ছাড়া অন্য সকল অপরাধের বিচারের ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দিতে হইবে। পঞ্চায়েত ও তালুক বা জেলা আদালতে মামলার শুনানী দিনের পর দিন চালাইয়া সাধারণতঃ মামলার বিচার এক পক্ষকালের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। ইহার অধিক বিলম্ব হইলে আদালতের নিকট রাজসরকার বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চাহিবেন। দশ জন অপরাধীর মুক্তিলাভের ধুয়া পাল্টাইয়া নূতন ধুয়া চালাইতে হইবে যে, কোন দোষী ব্যক্তি ন্যায্য দণ্ড এড়াইয়া যাইতে পারিবে না, আইনের খুঁটিনাটি বা ছিদ্র ধরিয়া কোন দোষীর কোন চালাকি আদালতে চলিবে না। রামশাস্ত্রী প্রভুনে'র চিত্র আমাদের আদালতে টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে। তিনি আদর্শ বিচারক ছিলেন, পুণার শাসনকর্তা রঘুনাথরাও পেশওয়াকে তিনি নৈতিক সংসাহস বলে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিলেন—নরহত্যার অপরাধে দোষী হইলে রাজা হইলেও তাহার প্রাপ্য দণ্ড মৃত্যুদণ্ডের কম কিছু নয়।"

পাকিস্থানে মোল্লাতন্ত্র

গত ২২শে ডিসেম্বর পাকিস্থান গণপরিষদে খাজা নাজিমুদ্দীন মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটির রিপোর্ট দাখিল করিয়া বলেন যে, কোন আইন-সভাই যাহাতে কোরাণ ও সুন্নাবিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে না পারেন, রিপোর্ট প্রণয়নকালে সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই কোন রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত হইবেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, "রাজ্য-প্রধান ইসলামিক আইন-বিশেষজ্ঞ পাঁচ ব্যক্তিকে লইয়া একটি বোর্ড নিয়োগ করিবেন। উক্ত বোর্ড রাজ্যপ্রধানকে কোরাণ ও সুন্নার সহিত আইনের অসঙ্গতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন এবং এই সকল প্রশ্ন আইন-সভার পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইতে পারে। কিন্তু আইন-সভার অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ীই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। এই সিদ্ধান্তও আবার সভার অধিকাংশ মুসলমান সদস্যের সমর্থনপুষ্ট হওয়া চাই।"

দিল্লীর 'পিপল্' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়া লিখিতেছেন: "রিপোর্টে আস্ফালন করা হইয়াছে যে, কমিটির প্রস্তাবমত পাকিস্থান সর্ব্বাধুনিক গণতন্ত্র অপেক্ষাও অধিকতর গণতান্ত্রিক হইবে! কিন্তু পার্লামেণ্টের উপরেও যখন মোল্লারা মসজিদে বসিয়া যে কোন আইনকে কোরাণবিরুদ্ধ বলিয়া নাকচ করিবার অধিকার পায় তখন সমস্ত জিনিসটাই হাস্যকরভাবে অগণতান্ত্রিক হইয়া পড়ে। প্রশ্ন হয় কি করিয়া আধুনিক গণতন্ত্র মধ্যযুগীয় ধর্ম্মতন্ত্রের সহিত সুসমঞ্জস হইতে পারে? একমাত্র ভাল কথা এই যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিয়াছে—সাম্প্রদায়িকতা হইতে পাকিস্থান, পাকিস্থান হইতে ইস্‌লামিক রাষ্ট্র এবং এক লম্ফে ইস্‌লামিক রাষ্ট্র হইতে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায়।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, "কমিটি কেন্দ্রে দুই পরিষদযুক্ত আইন-সভার সুপারিশ করিয়াছেন। ঊর্দ্ধতন পরিষদে ১২০ জন সদস্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে ৬০ জন পূর্ব্ববঙ্গের এবং অবশিষ্ট ৬০ জন পশ্চিম-পাকিস্থানের সমস্ত প্রদেশগুলি হইতে আসিবেন।" নিম্নতন পরিষদে ৪০০ সদস্য থাকিবেন এবং সেখানেও আসন বণ্টনে উপরোক্ত নীতিই অনুসৃত হইবে। কমিটির রিপোর্টে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সমস্যাটি সযত্নে পরিহার করা হইয়াছে। প্রদেশগুলিতে এক পরিষদযুক্ত আইন-সভা থাকিবে।

মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, লোক-সভা এবং একক-সভায় (house of units) কাশ্মীর এবং জুনাগড়ের কত জন প্রতিনিধি থাকিবে তাহা ফেডারেল আইন-সভার এক আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। অবশ্য তাহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধি সংখ্যার সাম্যের কোন তারতম্য হইবে না। কিন্তু জুনাগড় এবং কাশ্মীর উভয়ই ভারতের অংশ। 'পিপল্' পত্রিকা লিখিতেছেন যে, এই দুইটি দেশের নাম উল্লেখ করিয়া ভারতকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করা হইয়াছে।

পি-টি-আই'র সংবাদে প্রকাশ, মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘু কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রেমহরি বর্ম্মা এবং শ্রীবিরাটচন্দ্র মণ্ডল এই তিন জন সংখ্যালঘু সদস্য প্রতিবাদ জানাইয়া পৃথকভাবে এক লিপি দাখিল করিয়াছেন এবং সংযুক্ত নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদ অনুযায়ী "বর্ত্তমান রিপোর্ট পূর্ব্ববঙ্গ সদস্যদের বিপুল সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও পশ্চিম পাকিস্থানে, বিশেষতঃ পাঞ্জাবে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিবে। ইহা পাকিস্থানীদের চিরস্থায়ী বাঙালী অধীনতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলিতে বাঙালীদের নিকট এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তুমুল সোরগোল আরম্ভ হইয়াছে।"

অন্য দিকে পাকিস্থানের মধ্যেও দুই-একটি স্বাধীন সাংবাদিক এই মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখায় তাঁহাদের মধ্যে করাচীর "ইভনিং-

টাইম্‌সের' সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত সংবাদপত্র এক দিনের জন্ত বন্ধ রাখিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর এইরূপ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্পাদকের নাম মিঃ জেড. এ. সুলেরি।

পাক-মিলিটারী কর্ত্তৃক গুলী চালনায় দুই জন নিহত

আমরা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হিন্দুর অবস্থার উন্নতির কথা পাকিস্থানী অধিকারীবর্গের মুখে প্রায়ই শুনি। কিন্তু নিম্নোক্ত সংবাদ (যুগশক্তি, করিমগঞ্জ ২রা জানুয়ারী) তাহার অন্য রূপ দেখায়। কবে এইরূপ অবস্থার প্রতিকার হইবে?

"গত ৩০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টার পর জকিগঞ্জ (শ্রীহট্ট) থানার অন্তর্গত ফেউয়া (গঙ্গাজল) নিবাসী শ্রীরামদয়াল নাগের গৃহে বলপূর্ব্বক পাকিস্থানী মিলিটারী প্রবেশ করিয়া একটি যুবতী মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। বাড়ীর অন্যান্ত মেয়ে ও ছেলেরা চীৎকার করিলে পর প্রতিবেশীরা দৌড়িয়া আসে। তখন তাহারা চারি জন মিলিটারীকে ঘরের ভিতর দেখিতে পায়। এই সময় তাহারা সাহায্যার্থ বাড়ীতে ঢুকিতে চেষ্টা করিলে তিন জনকে গুলি করে। এর মধ্যে একজন এখনও জীবিত। বাকী দুই জন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত দুই জনের নাম (১) মণীন্দ্রচন্দ্র সেন, পিতা ৺মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, (২) রবীন্দ্রচন্দ্র শুক্লবৈদ্য, পিতা অশ্বিনী শুক্লবৈদ্য। আহত শ্রীঅক্ষয়কুমার নাগের অবস্থা সঙ্কটজনক। এই অবস্থায় প্রতিবেশী অনেকেই আহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাক-মিলিটারীরা ঐ ব্যাপারটি চাউলের বেআইনী চালানের ধারায় ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এই অজুহাতে কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেপ্তারও করিয়াছে।

"জানা গিয়াছে যে, ঐ ব্যাপারের মূল উত্থানিদাতা তারা মিয়া (আনসার কমাণ্ডার)। তাহার বাড়ী জকিগঞ্জ থানার লালগ্রামে।

বনভোজনে বিপত্তি

স্ত্রীজাতি সম্পর্কে পশু অপেক্ষা ইতর মনোবৃত্তি যে সীমান্তের এপারেও আছে তাহার নিদর্শন নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমরা পথে-ঘাটে আজকাল যাহা দেখি ও শুনি তাহাতে মনে হয় ঐরূপ ঘটনা আশ্চর্য্য নয়। অথচ বাচালের বক্তৃতায় আমরা শুনি মধুর বচন। এ সংবাদও দিয়াছেন "যুগশক্তি" আর একটি সংখ্যায়:

"বিগত ১৪ই ডিসেম্বর স্থানীয় নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীরা শিলচর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে ঘাগরা নামক স্থানে বনভোজনে শিক্ষয়িত্রীসহ গমন করেন। প্রকাশ যে, কয়েকজন যুবক বনভোজনের স্থানে গমন করিয়া ছাত্রীদের নানাভাবে অপমান করিবার চেষ্টা করিলে জনৈক শিক্ষয়িত্রী উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। উক্ত যুবকরা জনৈক ছাত্রীর হাত ধরিয়া টান দিলে উক্ত শিক্ষয়িত্রী উক্ত দুই যুবককে হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। তখন যুবকটি ছাত্রীকে ছাড়িয়া দেয়। ছাত্রীরা সন্ধ্যায় শহরে ফিরিলে ঘটনার সংবাদে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঐ রাত্রিতেই শিক্ষয়িত্রী পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এজাহার দেন এবং উক্ত যুবকদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। উক্ত যুবকদের মধ্যে একজন স্থানীয় জনৈক ধনী ব্যবসায়ী এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের ভ্রাতা। যুবকরা আত্মগোপন করিলে পুলিস কয়েক স্থানে হানা দেয়। অবশেষে যুবকরা বিগত ২০শে ডিসেম্বর জেলার ডেপুটি কমিশনারের আপিসে আত্মসমর্পণ করে এবং জেলা-কর্ত্তা তাহাদের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেন।

"প্রকাশ যে, স্থানীয় মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃপক্ষকে কঠোর হস্তে এই গুণ্ডামি দমন করিবার জন্ত দাবি করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।"

ইরাণের তৈলবিরোধ

অক্সফোর্ডের ঔপনিবেশিক গবেষণা-ভবনের অধ্যক্ষ স্যর রিডার বুলার্ড এক প্রবন্ধে ইরাণের তৈলশিল্পের বিরোধের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, গত দুই শতাব্দী ধরিয়া মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমীদের প্রাধান্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলের সরকারী কার্যে এবং শুল্ক-কর প্রভৃতির ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিগুলিরই আধিপত্য ছিল। বহু শিল্পেরই মূলধন এবং কারিগরি বিদ্যা পশ্চিমের একক করায়ত্ত ছিল। তুরস্কের রেল-লাইন, সুয়েজখাল এবং ইরাণের তৈলশিল্প বিদেশীর অর্থ এবং উদ্যমে গড়িয়া উঠে। জনসাধারণের সম্মুখে তাই এইগুলি পশ্চিমী-প্রভাবের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়।

স্যর রীডার বুলার্ড বলেন, "পারস্যের বর্ত্তমান তৈলবিরোধের স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ করা প্রয়োজন। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-ফ্রান্সে পয়টিয়ারের সন্নিকটবর্ত্তী যুদ্ধে চার্লস্ মার্টেলের নেতৃত্বে ফরাসীরা যখন অগ্রগামী সারাসেনদের বাধা দেয় তখনই প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে আরব হইতে যে মানবপ্রবাহ বিস্তৃত হয় তাহার মোড় ঘুরিয়া যায়। অতীতে মুসলমানরা যে বহুসংখ্যক অমুসলমান জনসংখ্যার উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণ তাহা বিস্মৃত হয় নাই। গত বৎসর ডাঃ মোসাদেকের দক্ষিণহস্ত মোল্লা কাশানি মুসলিম জগতের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তীরাই তেহরানে দুইটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছিল। সেই আবেদনে তিনি অতীতকালের 'চীন হইতে পয়টিয়ার পর্য্যন্ত' মুসলমানদের গুণের প্রশংসা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে ক্ষমতা বর্ত্তমানে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।

"মধ্যপ্রাচ্যে গোলযোগের মূলসূত্র বুঝিতে হইলে এই বিশিষ্ট হৃদয়াবেগের পরিচয় জানিতে হইবে। তৈলবিরোধের ক্ষেত্রে সেলামী (royalty) অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ডাঃ মোসাদেকের নিরপেক্ষতার আকাঙ্ক্ষা। ডাঃ মোসাদেকের মত জাতীয়তাবাদীদের ধারণা যে পারস্যে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্ত রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সতত্তই কলহ

চলিতেছে এবং এই কলহে অন্য শক্তিগুলি 'নিরপেক্ষ'। রাশিয়া, পারস্যের মধ্য দিয়া পারস্য উপসাগরে পৌঁছাইতে চায়।" স্যর রিডার লিখিতেছেন যে, অবশ্য ইহা সত্য যে ব্রিটেনের নীতি রাশিয়ার এই নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী; কিন্তু ব্রিটেনের নীতি যদি কেবলমাত্র তাহার আত্মরক্ষার স্বার্থেও নির্দ্ধারিত হয় তবুও তাহা পারস্যের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। ডাঃ মোসাদেক এই বিভিন্নতা যতটা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহাতে তিনি ব্রিটেনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে আরও তৎপর হন, কারণ তিনি জানেন যে, বিপদের সময় ব্রিটেন তাঁহাকে সাহায্য করিবেই।

নিরপেক্ষতার উপর তৈলের প্রভাবের কথা বিবেচনা করিয়াই ১৯৪৪ সন হইতে ডাঃ মোসাদেকের নীতি নির্দ্ধারিত হইতেছে। রাশিয়া উত্তর-পারস্যের তৈলশিল্পগুলি হস্তগত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ডাঃ মোসাদেকের প্রেরণায় পারস্যের পার্লামেন্ট তখন চিরকালের মত বিদেশীদের তৈলশিল্পের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন পাস করে। ১৯৪৭ সনে পুনরায় রাশিয়া ব্যর্থকাম হয় এবং সোভিয়েট প্রেস ও রেডিও পারস্য-সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহাদের যুক্তি হইল যেহেতু দক্ষিণ-পারস্যে তৈলশিল্পের উপর ব্রিটেনের আধিপত্য আছে সেহেতু উত্তর-পারস্যে সোভিয়েটকে সুবিধা প্রদান করা কর্ত্তব্য। ডাঃ মোসাদেক তাহার উত্তর দিলেন ব্রিটিশকে বিতাড়িত করিয়া।

লেখকের অভিমতে পারস্যের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার স্পৃহা যতই অযৌক্তিক মনে হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য নিন্দনীয় নহে এবং তৈলবিরোধের মীমাংসার জন্য তাহা বিবেচনা করা যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাতীয়করণ সমর্থন করিবার জন্য পারস্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিল যে, তাহাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ডাঃ মোসাদেক এমনও অভিযোগ করিলেন যে, কোম্পানী তাহার কর্ম্মচারীদিগকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় মনে করে। মনে হয়, তিনি তৈল অঞ্চলে যান নাই, কারণ ১৯৫০ সনে আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তর-প্রদত্ত রিপোর্টের সহিত তাঁহার অভিমতের কোন সাদৃশ্য নাই। লেখকের মতে কোম্পানীর শ্রমিকদিগের প্রতি ব্যবহার পারস্যের অন্যান্য শিল্প হইতে অনেক দিক হইতেই উন্নত হওয়ায় পারস্যের ধনী ব্যক্তিরা কোম্পানীর শ্রমিকদিগের প্রতি আচরণ সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। অপর দিকে সকল শ্রমিক এবং কৃষককে বুঝান হইত যে, বিদেশীদের অপরিমিত লোভই তাহাদের দুরবস্থার মূল কারণ।

লেখক বলিতেছেন, "অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে অন্যান্য কোম্পানী, বিশেষতঃ মার্কিন কোম্পানী অপেক্ষা ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী বেশী স্বার্থপর। নীট মুনাফা সমভাগে বণ্টনের জন্য ১৯৪৮ সনেই কোম্পানী এবং পারস্য সরকারের মধ্যে আলোচনা সুরু হয়; কিন্তু পারস্য কোম্পানীর সকল কাজের মুনাফার অর্দ্ধাংশ দাবি করে অর্থাৎ পারস্যের বাহিরে ইরাক একুওয়াইট প্রভৃতি স্থানের তৈলশিল্প হইতে যে লাভ হয় পারস্য তাহাও দাবি করে। ফলে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় এবং অপর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু পার্লামেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করে। ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কোম্পানী পারস্যের তৈল হইতে নীট মুনাফার অর্দ্ধাংশ দিবার প্রস্তাব করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজমারা উহা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বেই নিহত হওয়ায় জনসাধারণের নিকট উহা অজ্ঞাত থাকে। ইহা খুবই তাৎপর্য্য পূর্ণ যে, রাজমারার হত্যার পরদিনই পারস্যের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ তৈলশিল্পের জাতীয়করণের নিমিত্ত ডাঃ মোসাদেকের তৈল কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং শিক্ষা-মন্ত্রীকে গুলি করার পরদিন জাতীয়করণ বিল সিনেট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হয়।

"ব্রিটিশ-সরকার নিজ দেশে কয়েকটি শিল্প জাতীয়করণ করিয়াছেন; অতএব পারস্যের তৈলশিল্প জাতীয়করণ মানিয়া লইতে তাহাদের আপত্তি থাকা উচিত নয় বলিয়া অনেক সময় বলা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সনের চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হন। জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) মধ্যস্থতায় সম্পাদিত সেই চুক্তিতে পারস্য-সরকার তৈলশিল্পের সুযোগ-সুবিধা নাকচ করিয়া একতরফা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশি-ব্যবস্থা মানিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ মোসাদেক উভয় সর্ত্তই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি অ্যাভেরেল হ্যারিমান, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, ট্রুম্যান এবং চার্চ্চিলের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠাইলে ব্রিটিশ সরকার জাতীয়করণ স্বীকার করিবেন। ডাঃ মোসাদেক সালিশী মানিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁহার নিজের সর্ত্তে এবং কোম্পানীর নিকট হইতে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে।

"ব্রিটিশ-সরকার সালিশী-ব্যবস্থা সমর্থন করেন এবং ইহাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়। কিন্তু পারস্য-সরকার তাহাতে সম্মত নহেন। ইতিমধ্যে পারস্যের অবস্থা এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, ডাঃ মোসাদেক ঘোষণা করিয়াছেন, ব্রিটিশ-সরকার এবং তৈল কোম্পানী অবিলম্বে তাঁহার সর্ত্ত মানিয়া না লইলে পারস্য কম্যুনিষ্টদের কুক্ষিগত হইবে। কথাটা একটু অদ্ভুত শুনাইবে। কারণ এই সরকার কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত তুদে পার্টিকে উৎসাহ দিতেছেন এবং পারস্যের জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন যে, ব্রিটিশ-সরকার তাহাদের শত্রু। ফলে তাঁহারা পারস্যের স্বাধীনতার চিরশত্রু রাশিয়ার হাতের ক্রীড়নক হইয়াছে।"

মূল প্রশ্ন কিন্তু আরও জটিল। ব্রিটেন এতাবৎ পারস্য-সরকারকে ঠকাইয়াই আসিতেছিল। ১৯৩৩ সনের চুক্তি রেজা শাহের সকল প্রতিবাদের ফলে সম্পাদিত হয়। রেজা শাহ সেই কারণেই যুদ্ধের অজুহাতে পারস্য হইতে বিতাড়িত এবং অতি নীচ ব্যবস্থার ফলে বিষম অসহায় ও নির্ব্বাসিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। সে সকল কথা চাপিলে চলে না।

স্টালিন শান্তি পুরস্কার লাভে ডাঃ কিচলুর বিবৃতি

"সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের "সংবাদ ও অভিমত" নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন :

"বুদাপেস্তের দৈনিক পত্রিকা "সাবাও নেপ"-এর রিপোর্টারের কাছে ডাঃ এস ডি. কিচলু নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন,—

"জাতিসমূহের মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা প্রসারের জন্ত আন্তর্জাতিক স্তালিন পুরস্কার দিয়ে যে উচ্চ সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে তার জন্ত অত্যন্ত গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছি। আমাদের সমগ্র শান্তি আন্দোলন, ভারতের লক্ষ কোটি নরনারী যাঁরা সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেন তাঁদের সকলের প্রতিই অর্পিত হয়েছে এই সুমহান্ সম্মান।

"যে ক'জন আন্তর্জাতিক স্তালিন পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের অন্ততম হবার সৌভাগ্যে আমি গর্ব্ব বোধ করছি। অন্ত যাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁদের সবাইকার মত আমিও শপথ নিচ্ছি শান্তির সংগ্রামে আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করবার। এই শান্তি পুরস্কার সোবিয়েৎ জনগণের মহান্ নেতা জে. ভি. স্তালিনের নামাঙ্কিত—তাই এ পুরস্কার পাওয়ায় আমার ওপর প্রভূত দায় ও দায়িত্ব বর্ত্তেছে। সমগ্র সোবিয়েৎ জনগণ ও সোবিয়েৎ-ভূমির বাইরের লক্ষ কোটি নরনারীর কাছে স্তালিন নামের অর্থ—শান্তি। শান্তির মূর্ত্ত রূপায়ন যিনি সেই মানুষটির নামাঙ্কিত এই পুরস্কারের যোগ্য আমরা হয়ে উঠব—এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

"সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও ভারতের জনগণ শান্তি-পূজারী, এই সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তাই সোবিয়েৎ জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্ত, তাঁদের সঙ্গে মিলে একত্রে কাজ করবার জন্ত সম্ভাব্য সব কিছুই করব। সোবিয়েৎ ও ভারতের জনগণকে প্রীতি ও সংহতির নতুন রাখিবন্ধনে বেঁধে দিল আন্তর্জাতিক স্তালিন পুরস্কার।"

ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলুর সম্বন্ধে ভাল মন্দ সবই আমরা জানি। তাঁহার বিবৃতি বা মতামতের মূল্যও আমরা জানি। কিন্তু এইরূপ প্রচার যে শ্রেণীর মধ্যে হইতেছে তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন তাহা জানেন না। সুতরাং এই "শান্তিবাদের" সম্পর্কে অন্ত দিক আমরা "এশিয়া" পত্রিকা হইতে দিলাম :

"যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। যুগধর্ম্ম অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদও আপনার ভোল পরিবর্ত্তন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও অবসানের পর পৃথিবীতে আর এক নয়া সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু মজার কথা এই সাম্রাজ্যবাদ যুগধর্ম্ম অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জিগির তুলেই বিশ্বের সাধারণ মানুষের উপর আপনার সাম্রাজ্যজাল বিস্তার করতে চাইছে।

"সে হ'ল রুশ সাম্রাজ্যবাদ। দেশে দেশে এই সাম্রাজ্যবাদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এক পঞ্চমবাহিনী গড়ে তুলেছে। সে পঞ্চমবাহিনী হ'ল কম্যুনিষ্ট পার্টি।

"দেশের এক শ্রেণীর জনসাধারণ অজ্ঞতাবশতঃ এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসাবে সমর্থন জানিয়ে থাকে। আজ তাদের কাছেই আমরা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও কার্য্যকলাপের খানিকটা পরিচয় দিতে ইচ্ছা করব।

"১৯৪০ সনের জুন মাসে সোভিয়েট রাশিয়া রুমানিয়াকে চরমপত্র দিয়ে বলল, চার দিনের মধ্যে সোভিয়েট সৈন্তবাহিনী বেসারাবিয়া ও বুকেভিনা অধিকার করবে। বেচারা রুমানিয়া বাধ্য হয়েই সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতি স্বীকার করল। রুমানিয়ার এই দুইটি প্রদেশই ১৯৪০ সনের ২রা আগষ্ট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ৫০২০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এই বিরাট ভূখণ্ড ৩৭০০০০০ অধিবাসীসহ রুশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ হ'ল। এই অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের আয়তন ডেনমার্কের চেয়েও বড়।

"১৯৩৯ সনে নাৎসি জার্ম্মানীর সম্মতি নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া ও ল্যাটভিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এই রাজ্যগুলি সমবেত ভাবে স্কটলণ্ডের তিন গুণ এবং জনসংখ্যায় ছিল ৬০৩০০০০।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া উত্তর-পূর্ব্ব প্রুশিয়া অধিকার করে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং সেখানকার নগরীগুলির নাম পরিবর্ত্তন করে রুশ নাম রাখা হয়েছে। ২৭৫০০০ অধিবাসীপূর্ণ কেনিসবার্গ শহরের নামকরণ করা হয়েছে কেলিনিনগ্রেড। ৫৭০০০ অধিবাসীপূর্ণ টিলসিট শহরের নাম রাখা হয়েছে Sovetsk। ৩৯০০০ অধিবাসীপূর্ণ Interburg শহরের নাম দেওয়া হয়েছে Chernyakhovsk.

"১৯৪৫ সনের জুন মাসে চেকোশ্লাভাকিয়ার পূর্ব্ব-প্রান্ত প্রদেশ কারপাথিয়ান রুথেনিয়াকে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১২৭০০ বর্গ মাইল ব্যাপী এই বিরাট ভূখণ্ড আয়তনে আলসাস লোরাইনেরই সমকক্ষ হবে এবং এর লোকসংখ্যা হবে ৭৩১০০০।

"সোভিয়েট নাৎসি জার্ম্মানী চুক্তির ফলে হিটলার ও ষ্টালিন ১৯৩৯ সনে যৌথভাবে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করে। ১৯৪১ সনে জার্ম্মানরা রাশিয়ানদের পোল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত করে দেয়। কিন্তু ১৯৪৪ সনে রাশিয়ানরা আবার সেই স্থান অধিকার করে এবং ১৮১০০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিরাট ভূখণ্ডকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে, ১১৮০০০০০ পোল অধিবাসী রুশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন হয়ে পড়ে।

"সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৩৯ সনে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে সেই দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ডকে রুশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করে। এর মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ভিপুরী, লাগোডা হ্রদের তীরভূমি, কুলোয়ারভি ও রায়াবিচি উপত্যকা ছিল অন্ততম, ১৯৪১ সনে ফিনরা এই সমস্ত হারান ভূখণ্ড পুনরধিকার করেছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সনে ফিনল্যাণ্ড কেবল সেই সমস্ত ভূখণ্ড রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল তা নয়, উপরন্ত পিটার্সমোও রুশ অধিকারে

চলে গেল। এবং ১৯৪৭ সনের শান্তি চুক্তি অনুযায়ী এই সমস্ত ভূখণ্ড ছাড়াও পোরকালা ভূখণ্ডকে ৫০ বৎসরের জন্ম রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ করতে হ'ল। ৪৫৬০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এই বিরাট ভূখণ্ড এবং উহার ৪৫০০০০ অধিবাসী আজ রুশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন।

"কেবল পূর্ব্ব ইউরোপের নয়, সুদূর প্রাচ্যেও রাশিয়া বহু ভূখণ্ডকে আপন কুক্ষিগত করেছে।

"১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসে ১৬৫৮০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী তান্নু তুভা প্রজাতন্ত্রকে রাশিয়ার কুক্ষিগত করা হয়। এর ৬৫৫০০ জনসংখ্যা আজ সোভিয়েট সাম্রাজ্যের অন্তরালে।

"১৯৪৫ সনের ১৪ই আগষ্টে অনুষ্ঠিত চীনা-রুশ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া, পূর্ব্ব-চীন রেলওয়ে ও পোর্ট আর্থারের উপর উভয় রাষ্ট্রের যৌথ কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত করে।

"জাপান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রাশিয়া জাপানের কিউরিল দ্বীপপুঞ্জ এবং শাখালিনের দক্ষিণাংশ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে। এই অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড আয়তনে সুইজারল্যাণ্ডের চেয়েও বড়। এর ৪৩৩০০০ অধিবাসী আজ রুশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন।

"এই সমস্ত ভূখণ্ড খাস রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া বহু দেশের উপর রাশিয়া নানাভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে। আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পূর্ব্ব-জার্মানী, চীন, বহির্মোঙ্গলিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশও আজ সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে। নানাভাবেই রাশিয়া আজ এই সমস্ত দেশের উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সমস্ত দেশে আজ প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে সেই সাম্রাজ্যবাদী লৌহ-যবনিকা ভেদ করে সেই অসন্তোষের সংবাদ আসে। কারও আজ সেখানে রক্ষা নেই।"

মার্কসীয় পন্থা

"লোকসেবক" (দৈনিক) পত্রিকার ১৯শে কার্ত্তিক সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির ষষ্ঠ অধিবেশনে মার্শাল টিটো বলিয়াছেন, রাশ্যা কাণাগলির পথে ঢুকিয়াছে। রাশ্যার শাসকেরা শেষ পর্য্যন্ত মার্ক্সের পথ ছাড়িয়াছেন।" মার্শাল টিটোর এই উক্তির মধ্যে অবশ্য অতিরঞ্জন নাই। রাশ্যায় এখন চলিতেছে একনায়ক-পূজার অধ্যায়। জীবিত নেতাকে লইয়া এই ধরণের কাণ্ডকারখানা একমাত্র একনায়কতন্ত্রের দেশেই সম্ভব।

"রাশ্যা বা উহার অঙ্গীভূত দেশসমূহের যেখানে যাও, দেখিতে পাইবে ষ্টালিনের নামে রাস্তা-ঘাট, খেলিবার মাঠ, থিয়েটার-বায়স্কোপ—সব কিছু। ষ্টালিনগ্রাড, ষ্টালিনবাড প্রভৃতি শহরের নামের মধ্যেও একই ব্যাপার। পুরস্কারের নাম ষ্টালিন পুরস্কার—ক্ষেতখামার, কলকারখানাও ষ্টালিনের নামে পরিচিত হইয়া সৌভাগ্যবান হয়। এই সব নামকরণের মধ্য হইতে লেনিন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছেন। ষ্টালিন অমর নহেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার তাঁহার নাম মুছিয়া নূতন এক নায়কের নাম লেখা সুরু হইবে। অবশ্য চুনোপুঁটিদের সন্তুষ্ট রাখার ব্যবস্থাও আছে। সেই ব্যবস্থায় এক একটি শহরের নাম পাঁচ-সাত বার পরিবর্ত্তিত হওয়াটা আজিকার রাশ্যায় নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

"'কোমিনফর্ম্ম জার্ণাল' নামক কমিউনিষ্ট মুখপত্রে রাশ্যান কমিউনিষ্ট পার্টি লেনিন-ষ্টালিন পার্টি নামে অভিহিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা ষ্টালিন পার্টি হিসাবে হয় ত পরিচিত হইবে। ভারতে কিন্তু আমরা গান্ধী পার্টি, সুভাষ পার্টির কথা ভাবিতে পারি না। চার্চ্চিল পার্টি, ট্রুম্যান পার্টির কথাও ত শোনা যায় না!

"রাশ্যার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত। আজ যে নাট্যকার মালা পাইল, কাল তাহাকে জেলে পাঠান অথবা আজ যে সুরকার প্রশংসিত হইল, কাল তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ—ইহা বর্ত্তমানের রাশ্যায় অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং মার্শাল টিটো যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক কিছুই নাই।

"রাশ্যার বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে, আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার একজন রাশ্যানের কৃতিত্ব, রেডিও প্রথম আবিষ্কৃত হয় রাশ্যায়। সুতরাং আমেরিগো ভেস্পুচি, কলাম্বাস, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বা মার্কনির কৃতিত্বকাহিনী গাঁজাখুরি গল্প মাত্র। রবীন্দ্রনাথকে প্রতি-ক্রিয়াশীল আর শরৎ চন্দ্রকে বোগাস বিশেষণে বিশেষিত করিয়া রুশ বিশ্বকোষে কয়েকটি অপোগণ্ডকে বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলা হইয়াছে। বেচারা বাঙালী কমিউনিষ্টরা তাহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই ভাবেই রাশ্যা আগাইয়া চলিতেছে। মার্ক্স সেখানে মরিয়া ভূত হইয়াছেন।"

সহযোগীর এই মন্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে এক নূতন সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার নানা লক্ষণ ইতিমধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেছে এবং আমাদের দেশের কমিউনিষ্টরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই সাম্রাজ্যবাদ জার সাম্রাজ্যবাদের নব-সংস্করণ বা নব-অভ্যুদয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই সাম্রাজ্যবাদ ভারত-রাষ্ট্রের শত্রু নয়। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের যাঁহারা জানেন তাঁহাদের মনে কোন মোহ থাকিতে পারে না। আমাদের ভয় কিন্তু সোভিয়েট-রাষ্ট্র সম্বন্ধে নয়। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টদের আমরা জানি, কিন্তু "প্রচ্ছন্ন" কম্যুনিষ্ট যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই মারাত্মক। আমাদের একজন বন্ধু শিক্ষা-সম্পর্কিত এক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। প্রায় পনর দিন পরে সম্পাদক মহাশয় তাহা ফেরত দিয়াছেন। হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে এমন সব লোক আছেন যাঁহারা সোভিয়েট-রাষ্ট্রের বন্ধু "প্রচ্ছন্ন" বা অ-প্রচ্ছন্ন। তাঁহাদের আপত্তি আছে বা আপত্তি থাকিতে পারে।

এই মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে একটি কথা স্পষ্ট হইয়া পড়ে। পরম ধার্ম্মিক "বিভীষণ"। তিনি ধর্ম্মের জন্ম স্বজন ও স্বদেশকে

গুজরাট-বাহিনীর কোন সংবাদ তখন পর্য্যন্ত যশোবন্তের কাছে পৌঁছায় নাই ; পরে শুনিলেন শাহজাদা মোরাদ ধর্ম্মাত হইতে মাত্র এক মঞ্জিল (৫।৬ মাইল) ব্যবধানে বাদশাহী ফৌজের কান ঘেঁষিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছেন, এবং ১৪ই এপ্রিল চম্বলের উপনদী গম্ভীরার পশ্চিম তীরে আওরঙ্গজেবের সহিত একত্র হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

খোলা ময়দানে অবিলম্বে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ না করিয়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিবার জন্য মহারাজা যশোবন্ত এমন এক স্থানে সেনাব্যূহ স্থাপন করিলেন যেখানে তাঁহার প্রধান ভরসা অশ্বারোহীবাহিনীর গতিবেগ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ এবং যুদ্ধকৌশল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। ধর্ম্মাত বা বর্ত্তমানে ফতেয়াবাদের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নিম্নভূমির মধ্যভাগে একটি দ্বীপের মত অপরিসর উচ্চভূমিতে ঠাসাঠাসি ভাবে বাদশাহী তোপখানা ও অশ্বারোহী স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার প্রায় তিন দিক জলাভূমিবেষ্টিত। ব্যূহের আশেপাশে যে জায়গায় ফাঁক ছিল নৈশ আক্রমণের ভয়ে সে জায়গায় পরিখা খনন করিয়া ১৪ই এপ্রিল দিবাভাগে উহা শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল। ইহাই হইল যেন বোতলের পেটে প্রবিষ্ট যশোবন্তের স্বখাদ-সলিলে ডুবিবার ব্যবস্থা। সম্মুখে সংকীর্ণ নির্গম পথে বাদশাহী তোপখানা পথ আগলাইয়া রহিল, উহার পশ্চাতে সুসজ্জিত বাদশাহী হরাবল বা অগ্রগামী অশ্বসাদি। প্রধানতঃ তোপখানার উপর ভরসা করিয়া বোধ হয় কাসিম খাঁর পরামর্শে যশোবন্ত এইরূপ স্থানে সৈন্যসজ্জা করিয়াছিলেন; কিন্তু সিংহের নিরাপত্তা ও বিক্রম গুহার বাহিরে অন্তহীন অরণ্যানীর মধ্যে, ভিতরে পশুরাজের অসহায় অবস্থা। আওরঙ্গজেব বুঝিলেন রাজপুত বরাহ ভয়ভীত হইয়া মরণের ফাঁদে পা দিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্ব দিনেই ধীরবুদ্ধি সুচতুর যোদ্ধা আওরঙ্গজেব সম্মিলিত গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য সেনাবাহিনীকে দাবার গুটির মত যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে বিভিন্ন সেনানায়কগণের স্থান ও সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া সাজাইয়া রাখিলেন। আওরঙ্গজেবের বিরাট তোপখানা ব্যূহমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী স্থানে স্থাপিত হইয়া রাজপুতবাহিনীকে সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া মহারাজা যশোবন্তের সামন্ত-প্রধান অসকরণ ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যার পরে তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! শাহজাদাদ্বয় আমাদের মুখোমুখি তাঁহাদের তোপখানা খাড়া করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজপুত স্ত্রীপুত্রের মায়া কিংবা নিজের প্রাণের মমতা রাখে না এই কথা আপনার অজানা নয়; যদি অনুমতি হয় আমরা চারি সহস্র রাজপুত সহায় করিয়া মধ্যরাত্রে অতর্কিত আক্রমণে ঐ তোপখানা অধিকার করিব। যশোবন্ত উত্তর দিলেন, "ছলকৌশলে রাত্রির অন্ধকারে শত্রুকে বধ করা বীরধর্ম্ম নহে; উহা রাজপুত পৌরুষের অবমাননা"। পরের দিন প্রকাশ্য দিবালোকে অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া রাজপুতের অসি যে কার্য্য সাধন করিয়াও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিল না, সেই কাজ রাত্রিকালে সম্পন্ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল এবং তোপখানা ধ্বংস হইলে আওরঙ্গজেব ঐস্থানে হয়ত যুদ্ধই করিতেন না। মহারাজ যশোবন্তের প্রাচীন ক্ষত্রিয়োচিত উক্তি আর্য্যধর্ম্ম হইতে পারে; কিন্তু ইসলামের অনুশাসন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যুদ্ধে কোন কার্য্যই পাপ কিংবা বিধিবির্গর্হিত নহে। আসল কথা, রাজপুতনার ইতিহাসে ভীষ্ম ভীম অভিমন্যু পাওয়া যায়, কিন্তু পার্থসারথি নাই; এই জন্যই মধ্যযুগে হিন্দু কোন কুরুক্ষেত্র জয়ও করিতে পারে নাই।

৪

১৫ই এপ্রিল সূর্য্যোদয়ে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। নিজ বাহিনীকে নিখুঁত বাবরশাহী কায়দায় ব্যূহবদ্ধ করিয়া আওরঙ্গজেব ধর্ম্মাতের যুদ্ধক্ষেত্রে পানিপথ-খানোয়ার পুনরভিনয় করিতে চলিলেন। উভয় পক্ষে সেনাবল সমান, প্রত্যেক পক্ষে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী; কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রে যোদ্ধার মনোবল ও সেনাপতিত্বে আওরঙ্গজেবের বাহিনী বাদশাহী ফৌজ অপেক্ষা প্রবল। সমর-ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে বর্ম্মাচ্ছাদিত গজপৃষ্ঠে স্বয়ং আওরঙ্গজেব; কেন্দ্রভাগের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে রহিল যথাক্রমে সাহসী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক শেখমীর এবং সফশিকন খাঁর নেতৃত্বে পার্শ্বরক্ষক অশ্বারোহী সৈন্য। ভীমকর্ম্মা মোরাদ বক্স মূল বাহিনীর দক্ষিণ পক্ষ (right wing) এবং নামমাত্র অধিনায়ক আওরঙ্গজেবের বালক-পুত্র আজমের উপদেষ্টা স্বরূপ মুল তফাৎ খাঁ বাম পক্ষ পরিচালনা করিতেছিলেন। কেন্দ্রভাগের কিঞ্চিৎ অগ্রভাগে উহার পর্দ্দাস্বরূপ ইল্‌তিমিশ বা অগ্রগামী সহায়ক-সেনা; আওরঙ্গজেবের দেহরক্ষী সৈন্য লইয়া মুর্ত্তাজা খাঁর নেতৃত্বে এই দল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল। ইল্‌তিমিশ সেনার পুরোভাগে অষ্ট সহস্র রণকুশল বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী-পরিবৃত আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান হরাবল বা ব্যূহমুখ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। এই হরাবল অশ্বযোদ্ধা লইয়া গঠিত হইলেও হামলার প্রথম ধাক্কা সামলাইবার জন্য ইহার সঙ্গে কয়েকটি কামান ও যুদ্ধহস্তী দেওয়া হইয়াছিল। বিশাল দন্তযুগলে সুশাণিত তরবারি বদ্ধ, শুণ্ডদ্বারা ভল্লযুদ্ধে শিক্ষিত, মনুষ্য-মাংস স্বাদোন্মত্ত পৃষ্ঠে হাওদার মধ্যে বন্দুকধারী যোদ্ধা রক্ষিত, সর্ব্বাঙ্গ লোহার সাজে সুসজ্জিত রণহস্তী এযুগের অভেদ্য ট্যাঙ্কের ন্যায় সেকালের যুদ্ধে নিজপক্ষে ছত্রভঙ্গ সেনার আশ্রয় সচল দুর্গবুরুজ এবং প্রতিপক্ষের অশ্বারোহী-ব্যূহ

বিপর্য্যস্ত করিবার দুর্বার কীলক-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হরাবলের সামনে ছিল যাহাকে বলা হইত হরাবলের "মোরগ বাচ্চা" (জৌজা-ই-হরাবল); ইহা একটি দীর্ঘ পাতলা পাকা ঘোড়সোয়ারের পর্দ্দা। শত্রুর অবস্থানের সংবাদ সংগ্রহ এবং ইতস্ততঃ আক্রমণ ও পলায়নের ভান করিয়া শত্রুকে বিভ্রান্ত করাই ছিল মোরগ বাচ্চার কাজ। মোরগ বাচ্চার আড়ালে রহিল আওরঙ্গজেবের প্রধান তোপখানা এবং তোপখানা-রক্ষক বন্দুকধারী বরকন্দাজ ও অশ্বারোহী-বাহিনীর অধিনায়ক অসমসাহসী এবং স্থিরবুদ্ধি মুর্শীদকুলি খাঁ। এই ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া বেলা এক প্রহরের সময় আওরঙ্গজেবের বাহিনী অপেক্ষমাণ বাদশাহী ফৌজের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল।

যুদ্ধের জন্য মোগলাই কায়দায় প্রতিব্যূহ রচনা করিবার উপযোগী স্থান যশোবন্তের ছিল না। কাসিম খাঁর তোপখানা নামে বাদশাহী; আওরঙ্গজেবের তোপখানার তুলনায় কিন্তু আতসবাজীর বাড়া কিছুই নয়। এহেন তোপখানা সামনে রাখিয়া উহার পশ্চাতে যশোবন্ত রাজপুত মুসলমান দুই দলে বিভক্ত বাদশাহী হরাবল বা অশ্বযোদ্ধার ব্যূহমুখ স্থাপন করিলেন। হরাবলের দশ হাজার অশ্বারোহীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যায় সমান; কাসিম খাঁ মুসলমান এবং মুকুন্দ-সিংহ হাড়া রাজপুত বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত হইয়া-ছিলেন। হরাবলের সম্মুখে রহিল তাতার অশ্বারোহীর ইতস্ততঃ ধাবমান "মোরগ বাচ্চা"। দুই হাজার রাঠোর অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হইয়া বাহিনীর মধ্যভাগে যশোবন্ত সেনাপতির স্থান গ্রহণ করিলেন। স্থানাভাবে যশোবন্তের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বি (right and left-hand sides of the centre) কেন্দ্রস্থ বাহিনীর উভয় পার্শ্বে বগলদাবা হইয়া রহিল; উহার বামে দক্ষিণে ব্যূহের পক্ষবিস্তার করিবার স্থান না থাকায় বাদশাহী ফৌজ একরকম ঠুঁঠো জগন্নাথ হইয়া পড়িল। হরাবল এবং কেন্দ্রভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইলতিমিশ বা অগ্রগামী সহায়ক সেনা রাজপুত অশ্বারোহী লইয়া গঠিত হইয়াছিল। একজন রাঠোর এবং একজন গৌর রাজপুত মনসবদার এই দলের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধস্থলের পশ্চাতে রাজা দেবীসিংহ বুন্দেলার ফৌজ মূল শিবির ও অসামরিক ব্যক্তিগণের রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইল।

৫

যুদ্ধের প্রারম্ভে আওরঙ্গজেবের তোপখানা পাল্লার ভিতরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাদশাহী তোপখানা ফাঁকা মাঠে গোলা ছুঁড়িতে লাগিল। আওরঙ্গজেবের তোপখানা অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে সারিবদ্ধ হইয়া যখন অব্যর্থ লক্ষ্যে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল তখন বাদশাহী তোপখানার নাভিশ্বাস উপস্থিত। দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী গ্রহণ করিবার পর হইতে (১৬৫২ খ্রীঃ) আওরঙ্গজেবের কামানে মরিচা ধরার অবকাশ ছিল না, গোলন্দাজেরা গোলকুণ্ডা-বিজাপুরে চারি বৎসর যাবৎ হাত পাকাইয়াছে; অধিকন্তু তিনি উচ্চ বেতনে সুদক্ষ ফিরিঙ্গী, পর্ত্তুগীস ও ফরাসী কর্ম্মচারী তোপখানায় ভর্ত্তি করিয়া উহাকে ভয়াবহ মারণাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাদশাহী তোপখানার হিন্দুস্থানী গোলন্দাজ কোন কালেই রুমী ও ফিরিঙ্গীর মত কাজের লোক ছিল না; কান্দাহার অভিযানের পর (১৬৫৩ খ্রীঃ) তাহারা সেলামী তোপদাগা কিছুই করে নাই। মোট কথা, কয়েক দফা গোলা দাগিবার পর বাদশাহী তোপখানা নিস্তব্ধ হইয়া গেল, কারণ ইতিমধ্যে গোলাবারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে! পরে খবর রটিয়াছিল যে, বিশ্বাসঘাতক কাসিম খাঁর ইঙ্গিতে আওরঙ্গজেবের উৎকোচে বশীভূত বাদশাহী গোলন্দাজগণ পূর্ব্বরাত্রেই গোপনে অধিকাংশ গোলাবারুদ মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল। এই গুজব অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বাদশাহী তোপখানাকে ঠাণ্ডা করিয়া আওরঙ্গজেবের তোপখানা দ্বিগুণ তেজে বাদশাহী হরাবলের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কয়েকটা গোলা ফাটিবার পর হরাবলের তুরাণী মোরগ বাচ্চা উধাও হইয়া গেল; নিতান্ত চাকরীর দায়ে তাহারা "কাফের" দারার পক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ আওরঙ্গ-জেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তখন বাদশাহী হরাবলের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা, প্রতি মুহূর্ত্তে তোপের গোলায় সাহসী অশ্বযোদ্ধগণ অসহায় ভাবে ভূপতিত হইতে লাগিল। পরাক্রম ও সাহসে হরাবলের রাজপুত অধিনায়ক মুকুন্দসিংহ হাড়ার সমকক্ষ সে যুগে বুন্দীরাজ ছত্রসাল হাড়া ব্যতীত মোগল সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তিনি দেখিলেন শত্রু তোপখানা দখল করিতে না পারিলে কেহই বাঁচিবে না। সহসা তরঙ্গায়মান রণসমুদ্রে ঝটিকাবর্ত্ত সৃষ্টি হইল, রাজপুত অশ্বারোহীদের "রাম রাম" যুদ্ধধ্বনি তোপের গর্জ্জনকে উপহাস করিয়া দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। নিষ্কোষিত তরবারিহস্তে মহাকালের বক্ষ অসিলাঞ্ছিত করিয়া মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য মুকুন্দসিংহ হাড়া, রতনসিংহ রাঠোর, দয়ালসিংহ ঝালা, অর্জ্জুনসিংহ গৌর, সুজানসিংহ শিশোদিয়া তোপখানা লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন, পশ্চাতে বিভিন্ন কুলের পঞ্চ সহস্র রণোন্মত্ত রাজপুত অশ্বারোহী মৃত্যুর সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। তোপের গোলা ও বন্দুকের অবিশ্রান্ত অগ্নিবর্ষণকে তাহারা শিলাবৃষ্টির ন্যায় উপেক্ষা করিয়া বেপরোয়া হামলা করিল, বাঁচা-মরার কোন খতিয়ান নাই। অনেক হতাহত হইলেও রাজপুতগণ

তোপখানা অধিকার করিয়া লইল; তোপখানারক্ষী অশ্বারোহীর অধিনায়ক মুর্শীদকুলী খাঁ অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাহার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। কামানগুলিতে কীলক-প্রবিষ্ট করাইয়া নিষ্ক্রিয় করিবার মত সাজসরঞ্জাম বিজয়ী রাজপুতগণের সঙ্গে ছিল না; অন্য কোন বুদ্ধি তাহাদের মগজে আসিবার কথা নয়। তাহারা মনে করিল গোলন্দাজ মরিয়াছে, কামান কি করিবে?

এই দিকে মুখ রক্ষার খাতিরে কাসিম খাঁ হরাবলের অপরার্দ্ধ লইয়া রাজপুতের পিছনে পিছনে কিছুক্ষণ ঘোড়া দৌড়াইয়া দেখিলেন রাজপুতের মাথায় বুনো শূয়রের গোঁ চাপিয়াছে, পিছে ফিরিবার আশঙ্কা নাই। গায়ে আঁচড় লাগিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পঞ্চ সহস্র মুসলমান অশ্বারোহী সহযোদ্ধা রাজপুতগণকে মরণের মুখে ফেলিয়া নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিল। মুকুন্দসিংহ হাড়ার নেতৃত্বে জয়দৃপ্ত রাজপুতগণ বলাবল বিবেচনা না করিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার ন্যায় আওরঙ্গজেবের হরাবলের উপর আপতিত হইল। আওরঙ্গজেব সঙ্কিতচিত্তে দেখিতে লাগিলেন উন্মত্ত রাজপুত বরাহ তাহার হরাবল বিদীর্ণ করিয়া উহার মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়াছে, কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ত তাঁহার বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিবে। হরাবলকে পুনর্ব্বার ব্যূহবদ্ধ করিবার জন্য তিনি অগ্রগামী সহায়ক দলকে কুমার মহম্মদ সুলতানের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন এবং মূল বাহিনীর মধ্যভাগ সহ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া হরাবলের পশ্চাৎ হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

বাদশাহী ফৌজের রাজপুত হরাবল পূর্ণবেগে কীলকের ন্যায় শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও পশ্চাতে আগুয়ান যশোবন্তের অশ্বসেনার জন্য পথ প্রস্তুত করিতে পারিল না; দুই দিক হইতে নূতন শত্রুসৈন্য আসিয়া হরাবলের ভগ্নস্থানসমূহ পূর্ণ করিল। যশোবন্তের অগ্রগামী সহায়ক সেনার একাংশ মাত্র মুকুন্দসিংহ হাড়ার সাহায্যার্থ শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিল, উহার মুখে যশোবন্তের বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াও অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। আওরঙ্গজেবের হরাবলের পেটের মধ্যে জালবদ্ধ সিংহযূথের ন্যায় মুকুন্দসিংহ প্রমুখ রাজপুত সেনানীগণ মহামারী কাণ্ড ঘটাইলেন, কিন্তু তাহাদের অতুলনীয় শৌর্য্য নীতিনিয়ন্ত্রিত না হইয়া নিয়তির বিধানে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। একযোগে শত্রুব্যূহের এক নির্দ্দিষ্ট অংশের উপর আঘাত হানিবার পরিবর্ত্তে হাড়া, রাঠোর, গৌর, শিশোদিয়া নিজ নিজ কুলপতির নেতৃত্বে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেবের কৌশলে প্রত্যেক জঙ্গী হাতীকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধের এক একটি আবর্ত্ত সৃষ্টি হওয়ায় রাজপুত আক্রমণের বেগ স্তিমিত হইয়া গেল। তখন কোন্ যোদ্ধা কতজনকে মারিয়া মরিতে পারিবে ইহাই হইল তাহাদের শেষ প্রয়াস,—যুদ্ধ কেবল দুই হাতে কোপাকোপি, হয় মাথা না হয় তলোয়ার না খসিলে বিরাম নাই। চক্রব্যূহবদ্ধ সপ্তরথীবেষ্টিত বীর অভিমন্যুর ন্যায় মুকুন্দসিংহ হাড়াপ্রমুখ ছয় জন রাজপুত চমূপতি এইভাবে সানুচর বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন, পঞ্চ সহস্রের মধ্যে কেহ অবশিষ্ট রহিল না।

এই সময়ে যুদ্ধের সঙ্গীন অবস্থা, জয়পরাজয় অনিশ্চিত। মহারাজা যশোবন্ত স্বয়ং যুদ্ধে নামিয়াছেন, রাজপুত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আওরঙ্গজেবের নিস্তব্ধ তোপখানা পরিত্যক্ত স্থান হইতে হঠাৎ বজ্রনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। মুকুন্দসিংহ হাড়ার তলোয়ারের পাল্লার ভিতরে পড়িবার পূর্ব্বেই আওরঙ্গজেবের গোলন্দাজগণ পলাইয়া গিয়াছিল। রাজপুত হরাবল মহম্মদ সুলতানের সেনামুখের মধ্যে অদৃশ্য হইবার পর গোলন্দাজগণ ময়দান খালি দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং কামান সাজাইয়া সোজা যশোবন্তের সৈন্যবাহিনীর উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে শাহজাদা মোরাদ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণপক্ষ লইয়া যশোবন্তের বামপাক্ষিরক্ষক ইফ্‌তিখার খাঁ-র সেনাভাগকে আক্রমণ করিলেন। ইফ্‌তিখার খাঁ নিমক হালাল করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণ দিলেন। যশোবন্তের বামপার্শ্ব ছিন্নভিন্ন করিয়া মোরাদ একেবারে যশোবন্তের শিবিররক্ষক দেবীসিংহ বুন্দেলার উপর আপতিত হইলেন। দেবীসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন, বাদশাহী ফৌজের সর্ব্বস্ব লুঠ হইয়া গেল। এই বার আওরঙ্গজেব বিজয় দামামা বাজাইয়া তাঁহার সমগ্র বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন।

যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া যশোবন্তের সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ হইতে রায়সিংহ শিশোদিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব হইতে অমরসিংহ চন্দ্রাবত (শিশোদিয়া) ও সুজানসিংহ বুন্দেলা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। এই সুযোগে আওরঙ্গজেবের উভয় পাক্ষিরক্ষক সেনা লইয়া শেখমীরও সফ্-শিকন খাঁ যশোবন্তের ভগ্নাবশিষ্ট ব্যূহের কোমরে আঘাত হানিতে লাগিল। প্রারম্ভেই বাদশাহী ফৌজের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্যসহ কাসিম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে যশোবন্তের দ্রুত সদ্‌গতি কামনা করিতেছিলেন। শাহজাদা মোরাদ দেবীসিংহ বুন্দেলাকে পরাজিত করিবার পর কাসিম খাঁকে না ঘাঁটাইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে যশোবন্তের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারাজা যশোবন্ত তখনও অটুট বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন, আহত হইয়াও আঘাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু তাঁহার বাহিনীর তখন সমুদ্রে ভাঙা জাহাজের

অবস্থা। যশোবন্তের মাথার উপরে অগ্নিবৃষ্টি, সম্মুখে আওরঙ্গজেব, পশ্চাতে মোরাদ, দৃষ্টিপথে অক্ষত শরীর উদাসীন কাসিম খাঁ; চতুর্দ্দিক হইতে নবোদ্যমে শত্রুবাহিনী তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার হতাবশিষ্ট সেনাকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। জয়ের আশা না থাকিলেও সম্মুখে মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত, সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যশোবন্ত ঘোড়া ছুটাইলেন, সহসা শোণিতাপ্লুত অশ্বারোহীব্যূহে যশোবন্তের অশ্ব অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখে আওরঙ্গজেব-মোরাদ নয়, রণভূমিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন প্রভুভক্ত আসকরণ, গোবর্দ্ধন দাস, মহেশ দাস গৌর—ইঁহারা কেহই কাপুরুষ নহেন, তাঁহার জন্য ত্যক্তজীবিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। ইঁহারা সসম্ভ্রমে প্রকম্পিত-কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আপাততঃ আপনি বন্দী, সৈন্যদলের নেতৃত্ব ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মারবাড়ের রাজলক্ষ্মীকে অনাথা করিয়া আত্মঘাতী হইবার অধিকার আপনার নাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত যশোবন্তের অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। পাওযোধার বংশধর অজাতসন্তান যশোবন্তের নিকট প্রজার অধিকার দাবি করিয়াই সেনাধ্যক্ষগণ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার জন্য অসাধ্যসাধন করিয়া প্রাণ দিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া না থাকিলে তাহাদের অনাথ স্ত্রী-পুত্রগণকে ভরণপোষণ করিবে কে? আওরঙ্গজেবের যে রোষাগ্নি তিনি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন উহার লেলিহান প্রতিহিংসা-শিখা হইতে রাঠোরকুলকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? নিজের বিশ্বস্ত সামন্তগণের হস্তে অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যের দায়ে বন্দীদশা স্বীকার করিয়া অন্তঃরুদ্ধবীর্য্য হতমান নাগরাজের ন্যায় মহারাজা যশোবন্ত গৃহাভিমুখে চলিলেন; আওরঙ্গজেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিলেন—হার-জিত আল্লার মর্জ্জি।

৬

ধর্ম্মাতের আট ঘণ্টাব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হিন্দু মুসলমানের শক্তিপরীক্ষা নহে, আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলে রাঠোর, বুন্দেলা, কচ্ছীরাজপুত ও মারাঠা সমান উৎসাহে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। হিন্দুর সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ না হইলেও তাঁহার পক্ষে নিহত চারি জন খ্যাতনামা সেনাধ্যক্ষের মধ্যে একজন ছিলেন হিন্দু। বাদশাহী ফৌজে মুসলমান রাজপুত অপেক্ষা অর্দ্ধেকের বেশী হইলেও ধর্ম্মাতের যুদ্ধে নিহত পঁচিশ জন প্রসিদ্ধ সেনানায়কের মধ্যে চব্বিশ জন রাজপুত, একজন মাত্র মুসলমান; সাধারণ যোদ্ধার মধ্যে মুসলমানের মৃত্যুর অনুপাত ইহা অপেক্ষাও কম। রাজপুত শুভ বিশ্বাসের অবমাননা করে নাই. স্বামী-ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিয়া ছয় হাজার মরিয়াছে, অস্ত্রাঘাতে অর্দ্ধমৃত হইয়াছে ইহার অনেক বেশী। ছোটবড় প্রত্যেক রাজপুতকুলের বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের সকলের স্মৃতি বহন করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে মুকুন্দসিংহ হাড়ার মৃত্যুর সহযাত্রী রাজা রতনসিংহ রাঠোরের রণশয্যায় পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত এক স্মারকচিহ্ন।

৭

মহারাজা যশোবন্ত তাঁহার হতাবশিষ্ট সামন্তবর্গের সহিত যোধপুরে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তাঁহার কি দশা হইল? যশোবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন এই কথা যোধপুর দূরে থাকুক হিন্দুস্থানে কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মুখে মুখে বিবিধ জনরব আগ্রার বাজার পর্য্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছিল, সমসাময়িক বেসরকারী বৃত্তান্তে উহা ইতিহাসের স্থান দখল করিয়াছে; অথচ এইরূপ কোন কাহিনীর অস্তিত্ব এবং ঐতিহাসিকতা রাজস্থানের আধুনিক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। ধর্ম্মাতের যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন শিশোদীয় রাজকুমারীকে যশোবন্ত বিবাহই করেন নাই; তিনি সমসাময়িক মহারাণা রাজসিংহের ভায়রাভাই, বুন্দীরাজ ছত্রসাল হাড়ার জামাতা, যশোবন্তের শাশুড়ী শিশোদিয়া বংশ-জাতা ছিলেন। এক শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে বুন্দীরাজ ছত্রসাল হাড়া দেবলিয়ার শিশোদীয় রাবত সিনহা-র রাজকুমারী নামক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যা করমতী বাঈর সঙ্গে যশোবন্তের বিবাহ হইয়াছিল।*

টড সাহেবের ইতিহাসে শিশোদীয় রাণী কর্ত্তৃক যোধপুর দুর্গে যশোবন্তের প্রবেশ নিষেধ; কন্যাকে বুঝাইবার জন্য মেবাড় হইতে মাতার আগমন ইত্যাদি কাহিনীর পুনরুল্লেখ অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, ইহাতে নাটক-উপন্যাসের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

---

* গৌরীশঙ্কর ওঝা-কৃত যোধপুর রাজ্যকা ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কবিরাজ শ্যামল দাস (বীর-বিনোদ) গল্পটা একেবারে উড়াইয়া না দিয়া লিখিয়াছেন ছত্রসাল হাড়ার কন্যাই যোধপুর দুর্গে পলাতক পতিকে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিলেন, অথচ কুত্রাপি এই গল্পের সহিত ছত্রসালের কন্যার সম্বন্ধ দেখা যায় না। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটি কাহিনীর ঐতিহাসিক "শুদ্ধি" করিয়াছেন; আসলে কিন্তু ইহা এইরূপ গল্পের শুদ্ধি বা বিচার নয়, অভিনব "সৃষ্টি" —যাহার অধিকার ঐতিহাসিকের নাই। পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরনাথ রেউ (মারবাড় রাজ্যবর্গ ইতিহাস, প্রথম খণ্ড) ইহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছেন।

ইতিহাস শুধু কান্না নহে, ছায়াও ইতিহাস হইতে পারে যদি উহাতে কোন জাতি বা সমাজের সুপরিজ্ঞাত মনোবৃত্তির যথার্থ প্রতিচ্ছায়া আমরা দেখিতে পাই। এই কাহিনীর উপর মানিনী রাজপুত বীরনারীর মনোভাবের একটা ছাপ নিশ্চয়ই আছে, প্রাচীন রাজস্থানী কবির এক নায়িকা সখীকে বলিতেছেন :—

ভল্লা হুআ জু মারিয়া, বহিনি মহারা কন্ত।
লজ্জেজ্জেতু বয়ংসিঅহু জদ ভগ্‌গা ঘর এন্ত॥

অর্থাৎ, ভগ্নি! আমার পতি মারা গিয়াছেন ভালই হইয়াছে। যদি তিনি পলায়ন করিয়া ঘরে ফিরিতেন তাহা হইলে আমি সমবয়সী সখিগণের কাছে লজ্জা পাইতাম।

পুরুষের বীরত্ব নারীর দেশ ও কুলাভিমান এবং ত্যাগ-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; যে সমাজে নিত্য শাঁখা সিন্দুরের ভাবনা সে সমাজে নিরাপত্তাই মুখ্য, বাঁচিয়া থাকিলেই বাহাদুরী।

মহাকাল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তুমি চলিয়াছ অনন্ত পথে নীরব পদক্ষেপে,
হে অতন্দ্রিত, যুগ-যুগান্ত ব্যেপে।
কণ্ঠ তোমার বেষ্টিত হাড়মালে,
ধক্ ধক্ করে বহ্নি তোমার ভালে,
বাজে ডম্বরু, ভুজগ গরজে, ধরা উঠে কেঁপে কেঁপে।

২

শিলা মর্ম্মরে মানুষ মাটিকে আকাশে তুলিছে বটে,
ফিরে আসে মাটি মাটির সন্নিকটে।
কত প্রতিমার হেরিছ নিরঞ্জন,
কত রাজ্যের উত্থান আর পতন,
তুমি কোন রঙ স্থায়ী রাখনাকো মৃত্তিকার এই পটে।

৩

কাল ব্যাবিলন, আজ লণ্ডন কোথায় পরশ্ব?
কে বুঝিবে তব গতির রহস্য?
এই প্রচণ্ড আণবিক সভ্যতা
দেখিতে দেখিতে হয়ে যাবে উপকথা,
ক্ষয়ে খসে গেল কত রবি শশী রেখে শুধু ভস্ম।

৪

যেখানে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকীয় দপ্তর,
হয়ত সেখানে ফেলাবে তুষার-স্তর।
শ্বেত ভালুকেরা আসিয়া বাঁধিবে ডেরা,
বল্গা হরিণ সহ সীল মৎস্যেরা,
পেন্‌গুইনের ঝাঁক ডেকে আনি বাঁধাবে সেখানে ঘর।

৫

অভ্রংলিহ জয়-তোরণের জঙ্ ধরা ইস্পাত,
ভূমিসাৎ হবে হয়তো অকস্মাৎ।
মানুষের গুরু-গর্ব্বিত ইতিহাস,
জাগায় কেবল তোমার অট্টহাস
তব পঞ্জিতে তাহাদের আয়ু হয়তো একটা রাত।

৬

পতনের গতি কারও দ্রুত অতি কারও কিঞ্চিৎ ঢিমা,
সীমা শেষে গিয়া সব হবে 'হিরোশিমা।'
পরিণামে এক শ্মশানে সবারি ঘর,
সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হতে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

৭

তাসের দুর্গ, পাতার প্রাসাদ, কাগজের রাজধানী,
সৈকতে নর জলরেখা যায় টানি।
পঞ্চভূতেরা গায়ে রাখে নাকো ছোপ,
দগ্ধ মগ্ন করে ভেঙে করে লোপ,
মানুষ কিন্তু করিতেছে তবু অমৃতের সন্ধানই।

৮

ভঙ্গুর, ভাঙা শাণ পাত্র ও রাঙা বোতলের সার,
পরিচয় দেবে বিরাট সভ্যতার।
ক্ষয়া ইঞ্জিন, উড়োজাহাজের চাকা,
বোমার টুক্‌রা, কাঁসিকাঠ মাটি ঢাকা,
সৃষ্টিবিনাশী কৃষ্টির হবে সাক্ষী চমৎকার।

৯

তব সাথে চলে কীর্ত্তিযশের বিপুল পণ্য লয়ে,
আহা! কত জন জয়-গর্ব্বিত হয়ে।
প্রোজ্জ্বল যাহা কোথা ডুবে যায় নিভে,
নিষ্প্রভ হয় পরিণত মণিদীপে,
তোমার নিকষ কার কত দর খাঁটি কষে দেয় কয়ে।

১০

স্তব্ধ হইবে সকল শব্দ রবে শুধু ওঙ্কার,
সব রূপ এক রূপে হবে একাকার।
দুরাশা আমার—পুড়ে যবে হবো ছাই
তোমার অঙ্গে বিভূতি হইতে চাই,
হে দেব, রজতগিরি-সন্নিভ তোমারে নমস্কার।

পি. সাহা, এস্কোয়ার

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় রাস্তার পিচ্-ঢালা বুক থেকে ছাড়া পেয়ে শীর্ণ সঙ্কীর্ণ গলিটা এঁকেবেঁকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এই গলিরই মাঝ-পথে একটা কপাটহীন দরজা। দু'পাশে ভাঙন-ধরা কাটা দেয়াল চুন-সুরকির ক্ষীণ আবরণ অনেক দিনই হারিয়ে ফেলেছে। অনেকখানি মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে লাল ইটের সারি। তাদের ক্ষয়-পড়া গা থেকে হরদম ঝরছে লাল মাটির রুক্ষ আবির। দেয়ালের এই বিরাট ভগ্নাংশে ছুটো বেঁকে-পড়া পেরেক কবে থেকে যে ওই চৌকোণো কাঠটা ঝুলিয়ে রেখেছে তার ইতিহাস আমরা জানি না। পি. সাহা, এস্কোয়ার, বি-এ। দেয়ালের সবকিছু একে একে বিদায় নিলেও পুরন্দর সাহার নাম খোদাই চৌকোণো কাঠের টুকরোটা কিন্তু ঠিক টিঁকে আছে। হয়তো এই কথা প্রমাণ করবার জন্যেই ওটা ওখানে ঝুলছে যে, বাড়ীটার দৈন্যদশা হলেও এর অধীশ্বর পুরন্দর সাহার কিছু হয় নি।

সকালেই পুরন্দরের মন পিঁচিয়ে দিলে শ্রীমতী।

'দিব্যি বসে বসে আরাম করা হচ্ছে, বলি বাজার-টাজার যেতে হবে না, না কি?'

চায়ের পেয়ালাতে আর একটা আরামের চুমুক দিচ্ছিল পুরন্দর, কথাগুলো চুমুকের আরামটা মাটি করে দিলে।

'রোজ রোজ আবার বাজার কিসের?'

'ওঃ, রোজ রোজ বড় তুমি বাজার যাও! কবে কোন্ যুগে একদিন গিয়েছিলে—'

'কোন্ যুগে মানে?' চা খাওয়া মাথায় উঠল পুরন্দরের। 'এই সেদিন সবকিছু কিনে আনলাম—দিন পনের কি কুড়ি হবে।'

'হ্যাঁ, একেবারে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উজাড় করে এনেছ, এ জন্মে আর কিছু কিনতে হবে না।'

'এত খরচা হয় কিসে শুনি? দু'হপ্তায় সব উবে যায়।'

'আমি সব রাক্ষুসীর মত গিলি আর কি! বাড়ীতে তো কেউ আর নেই—সব আমার গব্বয়ে যায়।'

'আহা তা বলছি না।'

'তবে আর বলছ কি? বাড়ীতে গণ্ডা গণ্ডা পুষ্যি থাকতে তোমার বাজার চারদিনও চলে না। আমি বলেই টেনেটুনে চৌদ্দ দিন চালাই। বুঝলে?

'নেই নেই নিয়ে রোজ রোজ এই একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি ভাল লাগে না আর।'

'আমারই কি ভাল লাগে নাকি? নেই কিছু, হাঁড়িকুঁড়ি সব ঢন্‌ঢনাচ্ছে—তাই বলতে এলাম। তোমায় জানিয়ে দিলাম, জানানো আমার কর্ত্তব্য তাই।'

'জানালেই তো হ'ল না, কিনতে তো হবে। কিনবো কি করে? তোমাদের সংসারের খাঁই মেটাতে মেটাতে আমি ক্ষেপে উঠেছি। রোজই এটা নেই, ওটা নেই, আমিই কি টাকার আণ্ডিল বেঁধেছি!'

'তবে সংসারের সাতগুষ্টি লোক খাবে কি?' শ্রীমতী চেঁচিয়ে উঠল। 'হাওয়া খেয়ে থাকবে?'

'তাই থাকুক।'

'বলতে লজ্জা করে না?'

'লজ্জা আবার কিসের? টাকা নেই, সাফ কথা বলছি। কিছু লুকোচ্ছিও না, কিপ্‌টেমিও করছি না।'

'টাকা নেই তো বিয়ে করতে কে বলেছিল? একপাল ছেলে হয়েছে কেন? গণ্ডাখানেক পুষ্যি জুটিয়েছ কেন?'

'গুখুরি করেছি!' হাউ-মাউ করে উঠল পুরন্দর।

পুরন্দর সাহার কপাটহীন দরজায় যে-কোনো দিন যে-কোনো সময় কান পাতলে স্বামী-স্ত্রীর এ ধরণের বিশ্রম্ভালাপ শোনা যাবে।···

চটিটা পায়ে দিয়ে গলিতে নেমে পড়ল পুরন্দর। হাতে গলিয়ে নিল ছুটো থলি। আনতে হবে প্রায় গোটা বাজারটাই, অথচ পকেটে সম্বল মাত্র পাঁচ টাকার একটা নোট। মাস শেষ হতে এখনও বারটা দিন। পকেট-গড়ের-মাঠ মানুষদের কাছে বারটা দিনের পরমায়ু বার বছরেরও বেশী। বিয়ে করে সংসার পেতে কি আহাম্মুখিই করেছে! বউ, ছেলেপুলে আর জ্ঞাতিগুষ্টি সব আজন্মের শত্রু! সবাই চিনেছে শুধু টাকা। আর কিছু থাকুক না থাকুক, সব শ্রীমান শ্রীমতীর আছে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত পেট, আর সেই পেটে ভিড় করেছে সারা পৃথিবীর নোলা। দূর, দূর—কে কার! শ্রীপতি কুণ্ডুর দোকান আর ধার দেয় না। ব্যাটা চালাক হয়ে গেছে। আর ওরই বা দোষ কি? পুরনো ধারের তাগাদা করে করে কুণ্ড হয়রান হয়ে পড়েছে।

'কি হে পুরন্দর, চলেছ কোথায়?' বাজার-ফেরত বংকা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আর কোন্ চুলোয়—বাজার।'

'বাজার তো আজ আগুন।'

'তাই মানুষের পেটেও আগুন ধরেছে।' হাসল পুরন্দর। 'একটা বিড়ি ছাড় তো দেখি।'

বিড়িতে একটু যেন আরাম পেল পুরন্দর সাহা।···

কপাটহীন দরজা দিয়ে রোজ বেলা ন'টায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটবে পুরন্দর সাহা। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্ব্বনাশ। আপিসের হাজিরা-খাতায় লাল কালির দাগ পড়বে। লেট্। এলায়েড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির সিনিয়র টাইপিষ্ট পুরন্দর সাহা, এস্কোয়ার, বি-এ আজ লেট। হন্তদন্ত হয়ে বেরোবার আগে দেয়ালে

ঝোলানো নিজের নামের দিকে রোজ তাকাবে সে কিছুক্ষণ। তারপর খড়ি দিয়ে নামের নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেবে ইংরেজিতে—আউট।

পুরন্দর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে একপাল হাড়-জিরজিরে, চুপসে-যাওয়া-পেট কঙ্কাল চীৎকার হুল্লোড় আর অপকর্ম্মে সারা পাড়া মাথায় করবার ছাড়পত্র পেয়ে গেলো। শ্রীমতী চেঁচায়, 'হাড়হাভাতের দল, অলক্ষীর পুষ্যি সব—মর মর। মরলে হাড় জুড়োয়।' কে কার কথা শোনে! না খেয়ে, আর মার খেয়ে খেয়ে ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে সেই ছ'টা অবধি, ওদের এই অরাজকতার মেয়াদ।···

ওদিকে পুরন্দরের আপিসকক্ষে তখন সুরু হয়ে গেছে কেরাণী-কুলের প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম পর্ব্ব।···

টাইপের একঘেয়ে কান্না থামিয়ে কেষ্ট হাজরা বলল, 'দূর শালা, আর পারি না। ভাবছি সুইসাইড করব।'

'বল কি, কোন্ দুঃখে?' পুরন্দর কৌতুকে চাইল ওর দিকে।

'দুঃখে নয়, জ্বালায়। এই সংসারের জ্বালায়।'

'ও তাই বল, এই ব্যাপার। আমি ভাবলাম কি না কি। তা আর যাই কর, অমন কাজটি ভুলেও করো না।' অতি বিজ্ঞের মত উপদেশ দিলে পুরন্দর।

'রাতদিন এটা নেই, ওটা নেই লেগেই আছে। সংসারের পুষ্যিগুলোর খাঁই মেটাতে মেটাতে হয়রান হয়ে গেলাম। বিষ খাব না তো করব কি?'

'কিছু করতে হবে না। কবির অমর বাণী স্মরণ করে গ্যাট হয়ে বসে থাকো বোম ভোলা হয়ে—দারা, পুত্র, পরিবার, তুমি কার কে তোমার···যে যা কবে নির্ব্বিকার হয়ে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও। ব্যস।'

'অত নির্ব্বিকার হতে পারি কৈ?' বলে উঠল হাজরা।

'না পারলে পরিত্রাণ নেই।' বিড়ি ধরিয়ে মোক্ষম মন্তব্য করলে পুরন্দর সাহা।

'শুনেছ তোমরা, শুনেছ? টাকায় একপালি চাল।' সিনিয়ার ক্লার্ক সর্ব্বেশ্বর হাউমাউ করে এসে পড়ল।

'আর ধুতির জোড়া কুড়ি টাকা।' যোগ দিলে ভবেশ।

'গবর্ণমেণ্ট ভেবেছে কি বল তো?' সর্ব্বেশ্বর আবার বলে উঠল।

'কিছু নয়। বরং আমাদের মত বোকাদের ভাবাচ্ছে।' পুরন্দরের সেই শান্ত স্বর।

'বোকার মত মানে? ভাববারই ত কথা, আর তুমি বলছ কিনা ভাবব না!'

'কি হবে ভেবে? কার জন্য ভাবা? যতই ভাববে, ভাবনা ততই বাড়বে। ততই হাঁপিয়ে মরবে আর ভুগবে।'

'ভাববার লোকের কি অভাব হে? বউ, ছেলে-মেয়ে, মা-বাপ, ভাই-বোন, মাসী-পিসি—'

'তুমি কার, কে তোমার সর্ব্বেশ্বর! দয়া, মায়া, ভালবাসা, কর্ত্তব্য এসব ভুলে যাও। ওসব সংসার থেকে অনেক দিন সটকে পড়েছে। এখন যে যার নিজের কাজ গুছোচ্ছে।'

'যাই বল, বেশ আছ তুমি।' ভবেশ বলল।

'বেশ নেই ভায়া।' মুচকি হাসল পুরন্দর। 'বেশ করে নিয়েছি।'

'তুমি তবুও হাসতে পার, আমাদের হাসি আসে না।'

'পৃথিবীর যত অভাব, যত দুঃখ, যত কান্না আমাদের চার পাশে ভিড় করে আছে, সেগুলোর মাঝে কোথাও হাসির ছিটে-ফোঁটা পেলেই আমি সযত্নে জমিয়ে রাখি। আমার এই যে হাসি দেখ রোজ, এ হ'ল সেই জমানো হাসি থেকে খরচ করা।'

ডেস্প্যাচার শুঁটকো কানাই বলে উঠল, 'সাইণ্টিষ্টরা এত কিছু বার করছে রোজ রোজ, একটা এণ্টি-ক্ষিধে পিল বার করতে পারে না? এক বড়িতে ক্ষিধের হাত থেকে এক মাস নিশ্চিন্তি।'

'চেষ্টা করলেই পারে হয় ত।' পুরন্দর বলল।

'চেষ্টা করে না কেন?' ভবেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। 'আইন-ষ্টাইনকে একটা এপিল লিখে পাঠালে হয় না?'

'ওই রকমের কিছু একটা আবিষ্কার করলে আমি কিন্তু ওয়ার্লড ডিষ্ট্রিবিউটিং রাইট কিনে নেব। এক এই বাংলাদেশেই যা মার্কেট পাব—রোরিং বিজনেস।'

'যা বলেছ।' কেষ্ট হাজরা খুশিতে মাথা দোলাল।

টাক-মাথা হাবুল আধপোড়া বিড়িটা শেষ হতে উঠে এল।

'কি বাজে গ্যাজালি হচ্ছে তখন থেকে? কাজের কথা বল দেখি। বলি; মাইনে-টাইনে বাড়বে কিছু?'

'রামঃ, অমন কথা মুখেও এনো না।' পুরন্দর হাসল। 'বাড়বে কি গো, যা পাচ্ছ তাও কমাবার ফিকির খুঁজছে কর্ত্তারা।'

'বল কি হে?' চোখ কপালে তুলল কেষ্ট হাজরা। 'এরা ভেবেছে কি বল ত, বাঁচতে দেবে না নাকি?'

'বাঁচতে না দেবার ওরা কে! সে সাধ্যি ওদের চৌদ্দ-পুরুষেরও নেই।'

পুরন্দর বলে উঠল। 'বাঁচা মানুষের জন্মগত অধিকার।'

'তোমার কথাগুলো ঠাট্টা মনে হয় মাঝে মাঝে।' হাবুল ফস করে কথা ছাড়ল।

'তবু ভাল, সব সময় মনে হয় না।'

পুরন্দর সাহার সঙ্কীর্ণ গলিতে রাত নামে। কপাট-ভাঙা দরজা বেয়ে আবছা লণ্ঠনের আলো গলির বুকে কাঁপতে থাকে। ভাঙা-পায়া নড়বড়ে খাটের ছেঁড়া তেল-চিট্চিটে তোশকে লম্বা হয়ে পুরন্দর সাহা ভাবে কত কি। স্বপ্ন দেখে বিগত দিনের অজস্র রঙীন মুহূর্ত্তগুলি। ছোটবেলার কথা, স্কুল আর কলেজ জীবনের সেই নির্ভাবনার দুরন্ত দুর্জ্জয় মাতামাতি। সেই দিনই ছিল ভাল। বাপের হোটেলে জীবন কাটানোর মত মজা আর কোথায়? ভাবনা, চিন্তার বালাই নেই, সংসারের ঝঞ্ঝাটও ছিল না। আরামে খাও-দাও আর ডুগডুগি বাজাও।—

একটা বিড়ি ধরিয়ে পুরন্দর মেজাজ শান্ত করবার চেষ্টা করলে।

'শুনছ ?' শ্রীমতী কাছে এল।

'আবার কি ? রাতেও কি নিশ্চিন্তি নেই ? বলি, তোমরা সবাই মিলে আমার চামড়া ছিঁড়ে খাবে নাকি ?'

'গায়ে তোমার চামড়া আছে নাকি ? সবই ত হাড়ে ভর্ত্তি।' শ্রীমতীও বেশ কথা শিখেছে আজকাল।

'কি বলবে, তাড়াতাড়ি বলে ফেল। জল্‌দি।'

'গয়লাটা গেল হপ্তা থেকে আর ত দুধ দিচ্ছে না।'

'আবার সেই নেই-নেইয়ের ঘ্যানঘ্যানানি। দুত্তোর।' জানলা গলিয়ে আধ-খাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে পুরন্দর উঠে বসল।

'অভাব ছাড়া তোমার সংসারে আর কিসের সুখ আছে!' খেঁকিয়ে উঠল শ্রীমতী।

'হারামজাদা সংসারের মুখে মারি লাথি।'

'আঃ, কি অসভ্য কথা বলছ! ছেলেরা রয়েছে ?'

'রয়েছে ত করব কি ? মন, মেজাজ আর পেট তিনটের অবস্থাই এক হলে ভাল কথা বেরুবে কোত্থেকে শুনি ?' দমবার ছেলে নয় সাহা। 'তা গয়লা রাস্কেলটা দুধ দিচ্ছে না কেন ?'

'বলেছে পুরনো দেনা শোধ না দিলে দুধ আর দেবে না।'

'না দেয়, না দেবে। জলের আবার দাম কি!'

'বলেছে, শোধ না দিলে কেমন করে উসুল করতে হয় সে দেখে নেবে।'

'ওঃ, বড় দেখনেওয়ালা এসেছে! বলি ধার ত ওরই কাছে এই প্রথম নয় যে, ওসব দাবড়ানিতে ভড়কে যাব।'—সাহা-বংশের সুযোগ্য বংশধর সদর্পে ঘোষণা করল। 'আরে বাবা, সময়ে শোধই যদি করতে পারব, তো ধারের দিকে ঘেঁষবই বা কেন!'

'ধার শোধ দিতে পার না—তাই নিয়ে গর্ব্ব করতে লজ্জা করে না ?'

'কেন করবে ? আজকালকার দিনে যে যত ধার করতে পারে আর যত কম শোধ দেয়, তারই তত পোয়াবারো।'

'অমন পোয়াবারোর মুখে আগুন। আর একটা গয়লা ঠিক কর। দুধ না পেলে বাচ্চারা বাঁচবে কি করে ?'

'ভেজাল দুধের চেয়ে শুধু জলে আরও বেশী বাঁচবে।'

'তুমি গেলো না জল রোজ ঘটি ঘটি।' শ্রীমতীর সারা দেহ রাগে রি রি করে উঠল।

'আমি ত গিলছিই রোজ। জলের অভাব বাংলাদেশে ?

'জানি না। যা খুশী কর। মরুক সব, মরুক।' শ্রীমতী জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল পাশের ঘরে।

হেসে, সুর করে বলে উঠল পুরন্দর, 'অভিশাপ, আশীর্ব্বাদ তব।'

কিন্তু এরা কি এক মুহূর্ত্তও তাকে আরামে থাকতে দেবে না বাড়ীতে। সবাই মিলে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। বউ চলে যেতে না যেতেই হাজির হ'ল বড় ছেলে বলাই।

'তোর আবার কি ?' খেঁকিয়ে উঠল পুরন্দর।

'বই কিনতে হবে।' ভয়ে ভয়ে জানাল বলাই। 'স্কুল থেকে লিষ্ট দিয়েছে।'

'দেখি।' কাগজে লেখা বইয়ের লম্বা তালিকা দেখে ওর চোখ কপালে উঠল মুহূর্ত্তে। 'বাপরে, এ যে অনেক। এত বই কি হবে!'

'পড়াবে।' বলল বলাই।

'পড়াবে, না কচু! গুচ্ছের বই কেনা মানে বাপের দফা রফা করা। দিনদুপুরে ডাকাতি পেয়েছে নাকি মাষ্টারগুলো! চোর চোর, সব চোর—সবারই দু'চার পয়সা মারবার ফিকির।'

কথাগুলো কানে যেতে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল শ্রীমতী। 'ছেলের সামনে মাষ্টারকে চোর বলে গাল দিচ্ছ! বলি, আক্কেলের মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছ নাকি!'

'বলছি কি সাধে! পড়ে ত সাতের ক্লাসে, বইয়ের লিষ্টি দিয়েছে সতেরটা। এত বই কি ছেলেরা চিবিয়ে খাবে না মাষ্টাররা বেচে খাবে ?'

'দরকারে লাগবে নিশ্চয়ই, তাই কিনতে বলেছে।'

'থামো। আমরা যেন আর লেখাপড়া করিনি, ঘাস চিবিয়েই বি-এটা পাস করেছি!' পুরন্দরের মেজাজ তেতে উঠল। 'কোন দিন এক সঙ্গে চারটের বেশী বই পড়তে হয়নি।'

শুনে শ্রীমতী বললে, 'তোমাদের কাল থেকে একাল অনেক বদলে গেছে।'

'রাখ ওসব বাজে কথা। বলাই, তোর আর লেখাপড়ায় কাজ নেই, ঢের হয়েছে। মা-সরস্বতীকে একটা পেন্নাম ঠুকে, গুডবাই করে নে।'

'মানে পড়াশুনো খতম।'

'আর একটু ভাল কথায়—ইতি।'

'তার মানে, মানুষ করবে না ছেলেকে ? মুখ্যু হয়ে থাকবে ?' শ্রীমতী এতক্ষণে গলা ছাড়ল।

'চোর, ডাকাত, ছ্যাঁচড়া, বদমায়েস আর যা কিছু হোক আপত্তি নেই, মানুষ হয় না যেন ভুলেও। সেই অনাদিকাল থেকে বাপেরা তাদের ছেলেদের মানুষ করে করে এমন অবস্থায় এনেছে, যে এই মানুষ হওয়ার উপর ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে শেষ অবধি।'

'কি সব যা-তা বলছ। তোমার ভীমরতি হয়েছে নাকি।'

পুরন্দর কোনও জবাব দিলে না, চুপ করে রইল।

সকালের নরম আয়েসের ঘুম ভেঙে গেল বেয়াড়া কর্কশ কান্নায়। পুরন্দর সাহা চোখ খুলল প্রচণ্ড বিরক্তিতে।

'কি হয়েছে, কাঁদছে কেন ওরা ? মারধোর করেছ বুঝি ?'

'তোমার ছেলেমেয়েদের মারধোর করতে বয়ে গেছে আমার।' শ্রীমতী মুখ বাঁকাল।

'তবে কাঁদছে কেন ?'

'আমি তার কি জানি ? যারা কাঁদছে তাদেরই জিজ্ঞেসা কর না। ক্ষিধের পেট জ্বললে কোন্ বাড়ীর বাচ্চারা হাসে!'

'এত ক্ষিধে কোথেকে আসে ওদের? চেহারা মানুষের মত হ'লে কি হবে, পেট নিশ্চয়ই রাক্ষসের। গিলছে ত রোজই। কোন্ দিন উপোস করে থাকে শুনি?'

'তোমার সংসারের আধপেটা খাওয়াকে তো আর খাওয়া বলে না।'

'গুচ্ছের ঠেসে পেটে পুরে গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়া কি ভাল?' শান্ত কণ্ঠ পুরন্দরের। 'পেট একটু খালি রেখে খেতে হয়। স্বাস্থ্যনীতি তাই বলে, ডাক্তারেও তাই বলে।'

'নিজের ছেলেমেয়েদের পেট ভরে খাওয়াতে পার না, তার সাফাই গাইতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শোনাচ্ছ! লজ্জাসরম কিছুই কি নেই তোমার?' শ্রীমতী চেঁচিয়ে উঠল।

'এই দেখ, উলটো বুঝলে ত! না হয় আজ ওরা উপোসই করলে। স্বয়ং মহাত্মাজী পর্য্যন্ত হপ্তায় এক দিন উপোস করতেন।

এই সব লম্বাচওড়া কথা শ্রীমতী বোঝে না। সে রাগে গরগর করে উঠল। 'তবে আর কি, তোমার ছেলেগুলো এক একটি মহাত্মা হবে।'

নাঃ, সুখ নেই এই বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটেয় উপুড় হয়ে আরামে শুয়েও। রাতদিন কানের কাছে ক্রমাগত একটানা কান্না। দূর ছাই, বাড়ীতে আবার মানুষে থাকে! হন্ হন্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল পুরন্দর। কিন্তু বাইরেও কি শান্তি আছে?

কোণে কোথাও হয়ত ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে ছিল লোকটা। পুরন্দর গলি পেরিয়ে দু'পা এগুতেই সে সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। পুরন্দরের ভাঙা-কপাট বাড়ীটার সামনে লোকের আনাগোনার কোন দিনই কমতি হয় না। পুরন্দরের এত সুহৃদ আছে মনে করে পুলকিত হবেন না যেন! এরা জ্ঞাতি, বন্ধু বা প্রতিবেশী—কোনটাই নয়। পাওনাদার।

বাপ বাড়ীতে থাক বা না থাক, ছেলেমেয়েরা জানে বলে দিতে হবে,বাড়ী নেই। কাদের বলতে হবে আছে আর কাদের বলতে হবে নেই, সবই ওদের রপ্ত—পাওনাদার দেখে দেখে ওরা পাকা-পোক্ত হয়ে গেছে।

'যখনই আসি নেই। এর মানে কি?'

'এর মানে, বাবা যখন থাকেন না, ঠিক তখনই আপনি আসেন।'

'বাজে কথা। বিশ্বাস করি না।'

'তাতে আমাদের ভারি বয়ে গেল।'

'যেমন বাপ ধড়িবাজ, ছেলেগুলোও তেমনি বজ্জাত হয়েছে।'

'বাপের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বাপ তুলবেন না বলে দিচ্ছি।'

পাওনাদারের অবিরাম আক্রমণের হাত থেকে পুরন্দর সাহার সুযোগ্য সন্তানের দল এ বংশের মান-সম্মান যে অতি যোগ্যতার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাঁ, কি বলছিলাম—লোকটা সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

'এই যে, টাকাটার জন্তে ক'দিন থেকে খুঁজছি।' কোন রকম ভূমিকার ধার দিয়েও সে গেল না।

'হবে। পয়লা আসুক।'

'কত পয়লা তো এলো-গেলো।'

'আরো কয়েকটা আসুক, যাক। আরে মশাই, পালাচ্ছি না আমিও আর টাকাও পালাচ্ছে না।'

'কিন্তু সময় যে পালিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি তার কি করব? সময়ের উপর হাত নেই আমার। পারেন তো ধরে রাখুন।'

'তার চেয়ে স্পষ্ট বলে দিন না, দোব না।'

'টাকা নেবার সময় স্পষ্টভাবে চেয়ে, দেবার বেলায় অস্পষ্টতা আর যেই করুক, সাহা-বংশের ছেলে করবে না।'

কথাটা শেষ করে পুরন্দর সদর্পে একটা লোক ভর্ত্তি চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠল। পাওনাদার এড়ানোয় অভিজ্ঞ পুরন্দর সাহার কাছ থেকে লোকটি কি আদায় করবে!

সেইদিনই সন্ধ্যায় আপিস-ফেরত পুরন্দর সাহা বাড়ী ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুনবালি খসা ভাঙা দেয়ালের ইটের পাঁজরে পুরন্দরের নাম লেখা সেই চৌকো কাঠের টুকরোটা নেই। জীবনে এই প্রথম সাহা-বংশের বর্ত্তমান কুলতিলক পুরন্দর সাহা এক্তোয়ার সত্যিকারের ক্ষেপে উঠল।

'এখানকার বোর্ডটা আবার কে কোথায় ফেলল?' পুরন্দর বাড়ীতে পা দিয়েই গর্জ্জন করে উঠল।

'ফেলি নি, উনুনে দিয়েছি।'

'কেন?'

'বাড়ীতে কাঠের টুকরো নেই কোথাও, একরত্তি কয়লা নেই; উনুন জ্বলবে কি করে!'

'তাই বলে ওটা পোড়াতে গেলে কোন আক্কেলে?' পুরন্দর যেন ওকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

'আমাকে আর আক্কেল শিখিও না। বাইরের হাড়-জিরজিরে দেয়ালে ওটা ঝুলে থেকে কিসের ধ্বজা ওড়াচ্ছিল শুনি?'

'কিসের আবার—বংশের।'

'থাক বংশের গর্ব্ব আর করতে হবে না। যবে থেকে তুমি এ বাড়ীর কর্ত্তা হয়েছ, সেই থেকে বংশের জৌলুসও খতম হয়েছে। ভাগ্যিস বাপঠাকুরদা বাড়ীটা করে গিয়েছিল, তাই মাথা গুঁজে আছি কোনরকমে—নইলে তো রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ত। পূর্ব্বপুরুষেরা কিছু রেখে গিয়েছিল, তাই বেঁচে গেছ। তুমি করেছ কি শুনি বংশের জন্তে? আনবার তো নাম নেই, বরং যা আছে তাও শেষ করছ। বাড়ীটা ভেঙে শেষ হয়ে এল, মেরামত করবারও সামর্থ্য নেই!'

'বাপঠাকুরদার কালে টাকায় ছিল এক মণ চাল, ধুতির জোড়া ছিল দেড় টাকা। একালে জন্মে বাড়ী করুক, টাকা জমাক দিকি,

বুঝব কেমন সব বাহাদুর।' পুরন্দর দমবার পাত্র নয়। 'মুখ আছে বলতে আর কি! এত দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, দুর্ভিক্ষের মাঝেও আমরা তবু এত দিন টিকে থাকতে পেরেছি, ওরা হলে দু'দিনেই খতম হয়ে যেত, বুঝলে? তখন না ছিল খাওয়া-পরার কষ্ট, বাজারেও তখন এমনভাবে আগুন লাগে নি, মানুষের পেটেও তখন এমন খিদের দাবানল জলত না, আর বউ ছেলে আর সংসারের চৌদ্দ গুষ্টি দিনরাত নেই নেই করে কাঁদুনি গেয়ে তোমাদের মত এ ভাবে মগজ চটকে খেত না। বাড়ী করেছে, দু'দশ টাকা রেখে গেছে—বড় কাজই করে গেছে! লাখ দু'তিন রাখলেও তবু বাহবা দেওয়া যেতে পারত।'

'ইচ্ছে করেই রাখে নি। জানত, সুযোগ্য বংশধরেরা তা হলে উপার্জ্জনের ধার দিয়ে ঘেঁষবে না, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে।'

নাঃ, কালই একটা নতুন বোর্ড তৈরি করে নামটা ওখানে ঝোলাতে হবে দেখছি। আর বাড়ীটাও মেরামতের দরকার। শ্রীমতীর যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! বলা নেই, কওয়া নেই, ফট করে ওটা উনুনে ছুঁড়ে দিল। নামটা ওখানে ঝোলানো ছিল, তাতে কি এমন ওর অস্বস্তি হচ্ছিল শুনি? এ বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট সে, বাইরের দেয়ালে তার নাম ঝোলবার অধিকার আছে বৈকি। এতদিন এ বংশের কোনো পুরুষে কেউ নাম টাঙ্গায় নি বলে, আজও যে টাঙ্গানো হবে না তার তো কোনো মানে নেই। তখন বংশের হাঁকডাক ছিল, জৌলুস ছিল, টাকা ছিল—ও সবেতেই সাহাদের সবাই চিনত। কিন্তু এখন তো নামের পেছনে ওই সাহা পদবীটা ছাড়া সাহা বংশের বর্ত্তমান বংশধরকে চেনবার আর কোন উপায় নেই। নাম না জাহির করলে কি চলে? শ্রীমতী বলে, 'অসার নামটি ছাড়া জানাবার মত আর কিছুই যার নেই, তার এ বেহায়াপনা কেন!'—এর মধ্যে বেহায়াপনা আবার কোথায়? এখন জানাবার কিছু যে নেই, তার জন্যে আমার বাপ-ঠাকুরদা মোটেই প্রশংসার দাবি করতে পারে না। আর, জানাবার কিছুই কি নেই? তখন সাহা-বংশে ছিল মা লক্ষীর একাধিপত্য, এখন সুরস্বতীর পদচিহ্ন পড়েছে। বংশের কেউ ম্যাট্রিকটার কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারে নি, আর আমি বি-এর বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেলাম।'—'বি-এ পাশ করেছ ত হয়েছে কি। বিশ্বজয় করেছ নাকি?—কয় না বি-এ পাশ।' 'ঘাস খেয়ে পাশ করা যায় না, তবে সকলেই করত, হুঃ। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয় চার বছর ধরে।'…

ময়লা বিছানায় চিং হয়ে শুয়ে সেই তখন থেকে পুরন্দর এই সব ভেবে চলে। তারপর ভাবনার স্রোত অনেক মোড় ঘোরে।—নাঃ, ভাল রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে কোথাও, এই মাইনেতে আর চলে না। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে আর একটু বেশী এবং ভাল জিনিষের। ধারের পরিমাণ আর না বাড়িয়ে, এদিক-ওদিক যত দেনা আছে, সেগুলিকে ধীরে ধীরে মিটিয়ে ফেলতে হবে। ছেলে মেয়ে সবগুলিকেই ইস্কুলে পাঠাবে, মুখ্যু করে রেখে লাভ নেই কোনও। শ্রীমতীর জন্যে ভাল একটা শাড়ী কিনতে হবে। নিজের জন্যে কোনও কিছু ও কি মুখ ফুটে বলবে কোন দিন!…

রাতগুলি বেশ লাগে পুরন্দরের। বিছানায় লম্বা হলে অনেক ভাল ভাল কথা মনে আসে। এই করব, সেই করব—প্রচুর টাকা জমাব—এই বাড়ী ভেঙ্গে নূতন করে করব—যা ইচ্ছা ভাব, ভেবে ঠিক কর। এই ভাবনার সামনে কোন প্রতিবন্ধক নেই, পরিশ্রম নেই, কারুর ঘ্যানঘ্যানানি নেই। আরামে শুয়ে ভাব। ভাব আর ভাব। বাস্তবে যে এই কল্পনাগুলিকে রূপায়িত করতে হবে, তারও প্রয়োজন নেই। বেশ লাগে এভাবে শুয়ে ভাবতে—আর মনটাও বেশ ঝরঝরে হয়ে পড়ে।

আচ্ছা পৃথিবীতে শুধু যদি থাকত রাত—রাতই, বেশ হ'ত তবে। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, ভরণ-পোষণের হাঙ্গামা নেই, পাওনাদারের পেছু লাগা নেই—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে মনের আরামে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখ। রাত কেন শেষ হয়?

ঘুমিয়ে পড়ল এক সময় সাহা-বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট কুলপ্রদীপ পুরন্দর সাহা, এস্কোয়ার। বাইরে আঁকা-বাঁকা ছোট্ট গলিটাও রাতের আলিঙ্গনে নেতিয়ে পড়ল।

মালঞ্চ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মালঞ্চে ফুটুক ফুল, বসন্তের লাগুক জোয়ার,
শেষ হোক হতাশার দিন।
সুন্দরের স্বপ্ন নিয়ে পায়দল আসুক আবার
দেখা দিক প্রত্যুষ নবীন।

বাংলার মন্দির (৩)

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

চেতুয়া বাসুদেবপুরের কথা

বাংলাদেশের ইতিহাস-সৃষ্টিতে চেতুয়ার দান কম নহে। কলিকাতার ইতিহাসে মহানগরীর পরোক্ষ নির্ম্মাতারূপে খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত, আর বাসুদেবপুরের অধ্যাপক-কুলের প্রভাব ইহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধীন একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। প্রবাদ—খানাকুল কৃষ্ণ-

রায়েদের প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন দুর্গামণ্ডপ
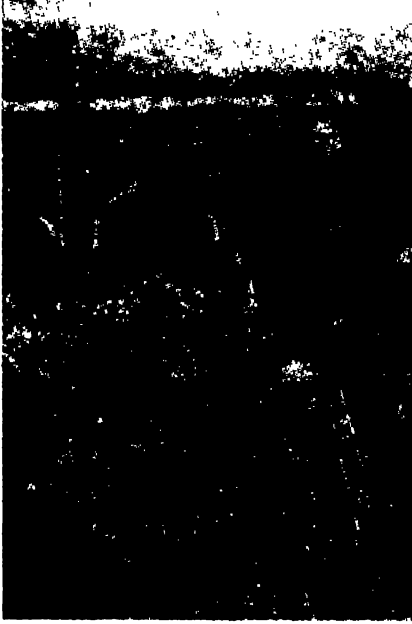
ধর্ম্মের চতুঃশাল দোলমঞ্চ প্রায় শত বৎসরের পুরাতন

নগর ও নবদ্বীপে চেতুয়ার পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার অবারিত ছিল—কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়াই উহাদিগকে ঐ সকল প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত। ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানায় শঙ্করপুর ডাকঘরের অধীন বাসুদেবপুর চেতুয়ার মুকুটমণি।

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা রঘুনাথ সিংহ এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আমল হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণ, উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ, নবশাখ, পঞ্চবণিক প্রভৃতির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পুত্র কানাই সিংহ, পৌত্র দুর্জ্জয় সিংহ ও প্রপৌত্র বাংলার শিবাজী শোভা সিংহ ও রাজা হেমন্ত সিংহ ভ্রাতৃদ্বয় পৈতৃক মর্য্যাদা বহু গুণে বর্দ্ধিত করেন। কলিকাতার ইতিহাসে ইঁহাদের সকলের নাম আছে। শোভা সিংহের উদ্যমে স্বাধীন চেতুয়া রাজ্য রাজমহল অবধি বিস্তৃত হয়। দিল্লীর বাদশাহের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া এই রাজ্য অর্দ্ধ শতাব্দীকাল স্বীয় স্বাধীন সত্তা

বাংলার শিবাজী শোভা সিংহের কৃতিত্ব কতখানি তাহা দেখানো হইয়াছে। সংস্কৃত পরীক্ষাসমূহের অন্যতম প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই চেতুয়ার নিমতলা রসিকগঞ্জ নিবাসী ঠাকুরদাস চূড়ামণির এবং বাসুদেবপুরের উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট ব্যাকরণ ও ন্যায় পড়েন। ১৮৯২ সনে তিনিই বাংলাদেশের টোলসমূহের প্রামাণ্য বিবরণী (*ARport on the Tols of Bengal*) লিখেন। উহাতে অধ্যাপক হিসাবে উপরোক্ত দুই জনের নাম আছে। আইন-ই-আকবরীতে আছে, "Chetua is a mahal lying intermediate between Bengal and Orissa"—Blochman's translation।" যেমন সকল প্রকার শস্য ও ব্যবসাদিতে তেমনই শিল্প এবং জ্ঞানের সাধনায়ও এই পরগণার খ্যাতি আছে। এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য, রেশম, গুড়, দধি, ঘৃত ও হাঁড়ির চাহিদা যেমন প্রচুর তেমনই দাসপুরের শিল্পকারদের গড়া দেউলের

অক্ষুণ্ণ রাখে। ঐ সিংহ-রাজবংশ বাসুদেবপুরের পশ্চিমপাড়ার ভট্টাচার্য্য-কুলে দীক্ষা লইয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ জলদান ও চেতুয়ার অন্নদানের অধিকার ঐ বংশকে দান করেন। রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা ভূপতির পঞ্চম ভ্রাতা

হাটগেছের রাধারমণ রায়কে রাজা রঘুনাথ সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি সনন্দ হাটগেছিয়ার রায়বংশের শ্রীপশুপতি রায়ের নিকট আছে। প্রবাদ, বলিহারপুর রায়বংশ (ঘোষ—সৌকালীন) ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে এদেশে আসেন। যাহা হউক, প্রাপ্ত

শ্রী৺মহাপ্রভুর নবরত্ন ১২৪০ সালে নির্ম্মিত

মাসাণ্ডদের গৃহদেবতার রাসমঞ্চ। নর্ত্তকীগণের স্বাভাবিক সুঠাম মূর্ত্তি দর্শনীয়

নরোত্তম হইতে চতুর্থ পুরুষ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-কুলের ধরণীধর ভট্টাচার্য্যের কন্যা দয়াময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়া সেই বাস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ ছিলেন বয়সে বিদ্যাসাগরের কিছু বড়। তিনি ছিলেন তৎ-কালীন মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। বিদ্যাসাগর ইঁহার তর্কনৈপুণ্যে মুগ্ধ হন এবং এখানে ১৮৫৫, ১লা অক্টোবর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নও ১৮৯২ জুলাই মাসে নিমতলায় সংস্কৃত সমিতি স্থাপন করেন। তাঁহার টোলের বিবরণীতে এদেশের কয়েকজন অধ্যাপকের নাম আছে।

বাসুদেবপুর, পল্লনপুর, সুন্দরপুর, মনোহরপুর, অযোধ্যাপুর, শঙ্করপুর ও বেথুয়াবাটি গ্রামের সমষ্টির নামই এখন বাসুদেবপুর। এই নামকরণের সঠিক কারণ জানা যায় না বটে, তবে অনুমান হয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন বংশের বাসুদেব নামক দেবতার নামানুসারেই গ্রামের এই নাম হইয়াছে। এখানকার ন্যায়ভূষণ-বাটীর একটি ভাগবতের পুঁথিতে প্রতিষ্ঠাকাল ১০১৩ সালে লিখিত আছে। দুইটি কসল-ছাড়ের সন ১০২২।২৩ মণিরাম, হৃদয়রাম ও সুদাম চক্রবর্ত্তীর নামযুক্ত। ঠিক ঐ সময়কার (সন ১০২১।১৫ ভাদ্র)

দলিল দৃষ্টে মনে হয়, রাজা রঘুনাথ সিংহের সময়েই বাসুদেবপুর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় হইতে আমরা ভট্টাচার্য্য-বংশের রামচন্দ্র, বীরেশ্বর প্রভৃতি সাধকগণ ছাড়া বাঞ্ছারাম বিদ্যানিধি, কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামানন্দ বৃহস্পতি, শত্রুঘ্ন ন্যায়ভূষণ, গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম পাই। বিদ্যাবাগীশ বিদ্যালঙ্কার ও ন্যায়-ভূষণের নামে পাড়া এই গ্রামে আছে।

এই বাসুদেবপুরে নানা রীতির মন্দিরের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধশত। উহাদের শ্রেণী ছয়টি—অষ্টশাল, প্রাসাদ বা চাঁদনী নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, উৎকলীয় ও ইসলামীয়। একটি প্রাচীন নক্সাতে ভট্টাচার্য্য-বংশের দুর্গামণ্ডপ, নাটমন্দির, শ্রীফল-বৃক্ষ প্রভৃতির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। উঁহাদের বাস্তর একাংশের নাম চাঁদনী, ওখানে পূর্ব্বে পাকা আটচালা ছিল। এখন পঞ্চ-মুণ্ডী, মন্দির প্রভৃতি মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন। ১২০৯ সালের পর আর দুর্গাপূজা হয় নাই—দুর্গার রুদ্রাক্ষের মালা গ্রামের দেবতা পঞ্চাননের গলে। গন্ধ-বণিক দত্তবংশের সুঠাম মন্দিরের ভিত্তিটির নির্দ্দেশমাত্র মৃত্তিকাগর্ভে পাওয়া যায়। পরিত্যক্ত মন্দিরের সংখ্যা পাঁচটি। চক্রবর্ত্তী-বংশের ৺রঘু-

রামের অষ্টশাল উহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। উহার ঊর্দ্ধস্থিত চতুঃশালে কক্ষ, বেদী ও দ্বার আছে—নিম্নস্থ চতুঃশালটির উপরিভাগ অর্দ্ধিম্বাকারে চেপ্টা। প্রধান দ্বারের সম্মুখে যুগ্ম স্তম্ভ। গায়ে কিছু নক্সা ও গণপতি মূর্ত্তি আছে। দেবতা

কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পঞ্চরত্ন শিবালয়
সন ১১৭১ সালের কাছাকাছি সময়ে নির্ম্মিত

রণরাম নাকি বর্ত্তমানে কালীঘাটে আছেন। হেদুয়া পুষ্করিণীর পাকাঘাটের দুই পাশের চারিটি অষ্টশালে কখনও শিব প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ কায়স্থ রায়বংশীয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী দেবোত্তর করিবার মত ষোল বিঘা সম্পত্তি নাকি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। শিবলিঙ্গগুলি এখানে-ওখানে মৃত্তিকা-তলে পড়িয়া আছে। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটির দ্বারের দুই পাশে দ্বারপাল-মূর্ত্তি ও চূড়া একটি করিয়া। গ্রামের অবশিষ্ট সকল মন্দিরেই দেবতা আছেন, তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা হয়। বুড়াশিবের গাজন ও চৈত্রের সঙ এখন আর হয় না।

বিদ্যাবাগীশ-পাড়ার শিবের পঞ্চরত্ন গ্রামের মধ্যে প্রাচীনতম মন্দির। উহাতে কোন লিপি নাই। পাঁচটি চূড়াই খাঁজবিশিষ্ট। ত্রিশূলের লৌহদণ্ডগুলি মাত্র আছে। সম্মুখে একটি চতুঃশাল তুলসীমঞ্চ। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা তর্কবাগীশ ও ন্যায়বাগীশ এই পাড়ার প্রধান ছিলেন। ১১৭১ সালের একটি দলিলে বিদ্যাবাগীশের সহি আছে। ইনি সাংখ্যদর্শনের পণ্ডিত, নির্লোভ ও পরম নিষ্ঠাবান ছিলেন। মলিঘাটির প্রসিদ্ধ ধনী চৌধুরী-বংশের কেহ এক বার ইঁহাকে এক রেকাব গিনি প্রণামী দিলে, ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্থানটি গোময়লিপ্ত করান। হাটের নিকটস্থ, ইসলামীয় রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত গুলাব দত্তের শিবমন্দিরটি এই মন্দিরের প্রায় সমকালীন। একই দলিলে বিদ্যাবাগীশ ও গুলাব দত্তের সহি দেখা যায়। বিদ্যাবাগীশের পুথিগুলি স্থানান্তরিত। তাঁহার পূজিতা ভুবনেশ্বরী যন্ত্রটি ভগ্ন—দুর্গামণ্ডপ ধ্বংসপ্রায়।

বিদ্যাবাগীশ-পাড়ার মুক্তারাম ভট্টাচার্য্যের দামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দির দেউলচূড়। ইহা অলঙ্কার ও পুত্তলিকাবর্জ্জিত। বাসুদেবপুরে একমাত্র এই মন্দিরে পোড়া-মাটির অক্ষরে সংস্কৃত-লিপি আছে। তাহা এই:

"দহনষগনগগ্নৌসম্মিতেশাকবর্ষেরুচিরনিলয়মেতৎশ্রীল-
দামোদরায়।
কুলকুমুদকলেশঃ শ্রীসমুক্তাস্মরামোবসুসপরমভক্তোদত্ত-
ভূমেদিমাপ॥"

কুলচন্দ্র ধনী ভক্ত মুক্তারাম ১৭২৩ শকাব্দায় এই মন্দির দামোদরকে উৎসর্গ করেন। ইহা ১২০৮ সনে স্থাপিত, মন্দির এখন ভগ্নপ্রায়—বংশের পূর্ব্বশ্রীও নাই।

বাসুদেবপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে মহাপ্রভুর নবরত্ন উচ্চতম মন্দির। ভিতরে সিঁড়ি আছে, অলঙ্কার বা পুত্তলিকা নাই। ইহার লিপি: "শকাব্দা ১৭৫৫ সন ১২৪০ সাল ২৫শে আষাঢ় শ্রীশ্রী৺গুরুরায় মহাশয়। শ্রীশ্রী৺কাশীনাথ ঠাকুর। শ্রীশ্রী৺শুকদেব ঠাকুর। শ্রীশ্রী৺সনাতন দাস ঠাকুর।" এই দেবতার পূজক-বংশ পূর্ব্বোল্লিখিত রণরামের মন্দিরের সন্নিকটস্থ চক্রবর্ত্তী-বংশের শাখা। ঐ বংশের শুকদেব স্থানান্তর হইতে আসিয়া এখানে কামারনালা নামক শ্মশানের সন্নিকটে বসতি স্থাপন করেন। দেবতা নিম্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মহাপ্রভু—ইনি জাগ্রত দেবতা। ইঁহার নিত্য-ভোগের ব্যবস্থা আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় রথযাত্রা ইঁহার প্রধান উৎসব—ঐ সময় এখানে মেলা হয়। পূজককুলের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি লুপ্ত। মন্দিরের সম্মুখে পাকা দালান ও খড়ের আটচালা মধ্যে তুলসীমঞ্চ। ইহার দক্ষিণে বহুচূড় রাসমঞ্চ—ইহার প্রত্যেক দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-বাদনরতা নর্ত্তকী-মূর্ত্তিগুলি অতি সুঠাম।

নিকটে স্বরূপনারায়ণ ও বাঁকুড়ারায়ধর্ম্মের এবং আরও চারিটি দেবতার প্রাসাদ বা চাঁদনী মন্দির। উহার সম্মুখে চতুঃশাল দোলমঞ্চ। মন্দিরের লিপি: "সন ১২৬৬ সাল ২৫শে ফাল্গুন। মিস্ত্রী—শ্রীনবীন দা (?) সাং দাসপুর।" ডোম-জাতীয় ব্যক্তি আণ্ঠি ধারণ করিয়া পণ্ডিত হইয়া ইঁহার

পূজকপদ পান। ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি এইরূপ :—"গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা' জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি অন্তে ধর্ম্মের ধ্যান —(স্বরূপ নারায়ণের) শতদল পদ্মে উৎপত্তি ধর্ম্ম। এক এক দলে ঐক এক ব্রহ্ম। নাইক ধর্ম্মের রেকরূপ নাইক ধর্ম্মের

দিকে মণ্ডপ ও ঘুরানো গোল সিঁড়ি পূর্ব্বাংশে। যজ্ঞেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্ত সাড়ম্বরে নানা উৎসবাদি উদ্‌যাপিত করিতেন। মধ্যম রাধানাথ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন।

বাজারপাড়ার শঙ্খবণিক দত্তগণের পঞ্চরত্ন সাধারণ ও
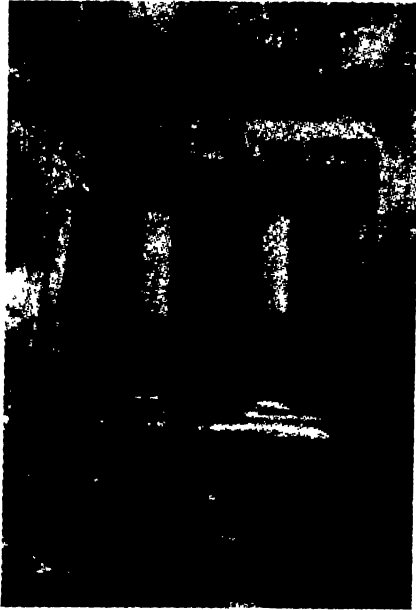
বিদ্যালঙ্কার বাটীর শ্রীজনার্দ্দন জীউর চাঁদনী মন্দির

শীতল সরকারের শ্রীভুবনেশ্বরের দেউল ও দামোদরের চাঁদনী

কায়া। আপনি সৃজন করেন আপনার কায়া। হাতে মেঘ-ডুম্বুর ছাতা গলায় গণক পৈতা। দিনে-দিনে করেন প্রভু নরলোকের চিন্তা। চিন্তা করিয়া সারশ্রীধর্ম্ম গাজনে। এতস্মৈ স্বরূপ নারায়ণ ধর্ম্মায় নমঃ।" বাঁকুড়ারায় ধর্ম্মের ধ্যান :—"বল্লুকা নদীর তটে চারি পণ্ডিত চারিপুটে পুজে নিরঞ্জন। এতস্মৈ বাঁকুড়ারায় ধর্ম্মায় নমঃ।" পূজার অবশিষ্টাংশ হিন্দু-পদ্ধতির অনুরূপ। জিতাষ্টমীর সময়ে ধর্ম্মের পূজকই গ্রামের ভিতর গিয়া গর্ত্তে রোপিত কদলীতলে গ্রামবাসিগণের জীমূতবাহন পূজা করেন। ভিজাকড়াই উহার নৈবেদ্য। পুঁইশাকের সহিত শশা ও ঘুসোমাছ দিয়া তরকারি রাঁধিয়া উহা খাওয়া হয়।

পূর্ব্ব-দক্ষিণ পাড়ায় তিলিজাতীয় মাসান্তগণের গৃহদেবতার মন্দির। ইহা প্রাসাদ বা চাঁদনী রীতির—সম্মুখে বহুচূড় রাসমঞ্চ ও পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ। রাসমঞ্চের নর্ত্তকী-মূর্ত্তিগুলি স্বাভাবিকতায় মনোরম। মন্দির-প্রাচীরবেষ্টিত ঠাকুরবাড়ী। লবণের ব্যবসা করিয়া যজ্ঞেশ্বর মাসান্ত অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষেই সব নষ্ট হইয়া যায়। বিরাট অট্টালিকা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে। ইহার পশ্চিম

দেউলচূড়। কল্পরাম দত্ত ১৭৭৯ শকাব্দা বা ১২৬৪ সনে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের দেবতা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র আগে রাণীচক গড়ের রাজার ঠাকুর ছিলেন। পুরাতন মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে ভুতা গ্রামের রাজবংশের ঠাকুর কিনিয়া আনিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পশ্চিমে বহুচূড় রাসমঞ্চ। পূর্ব্বে বিগ্রহের নিত্য ভোগ হইত। ইহার বিরাট রথ ছিল। এখন দুইই লুপ্ত। পশ্চিম দিকে দুর্গাপূজার মণ্ডপটি এখন ধ্বংসপ্রায়। উহাতেই দেবীর প্রতিমা-পূজা হয়। শ্রীশ্রীরঘুনাথ বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রাসাদরীতির দ্বিতীয় মন্দিরটি ১৩২৫ (?) সালে দক্ষিণপাড়ার শ্রীরতনমণি দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়ভূষণ-পাড়ার ব্রাহ্মণ-সরকার-বংশ এখন লুপ্ত। ইঁহাদের গৃহ-দেবতাগণের প্রাসাদ বা চাঁদনী রীতির সাধারণ মন্দিরের দুই পাশে ভুবনেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর লিঙ্গদ্বয়ের উৎকলীয় রীতির সাধারণ মন্দির শীতল সরকারের কীর্ত্তি। ইনি কলিকাতা টাঁকশালের নিকটস্থ কালীবাড়ীতে পূজা করিয়া প্রচুর উপার্জ্জন করিতেন। পরগণার ছত্রদান এই বংশের প্রাপ্য ছিল।

নন্দরাম চূড়ামণি পাকা ঘাট সহ জলাশয় উৎসর্গ করেন ও শিবের অষ্টশাল এবং শালগ্রামের পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করেন।

ভায়বাগীশপাড়ায় তাঁহার বসতবাটী ছিল। ইনি কেবল যজন-যাজনই করিতেন। বিদ্যালঙ্কারবাড়ীর ৺গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কার খনিয়ার চাটুতিবংশীয়—কাশ্যপ কৃষ্ণমিশ্র হইতে ত্রিংশ ও দক্ষ হইতে চতুর্বিংশ পুরুষ। কাশিমবাজারের

মুক্তারাম ভট্টাচার্য্যের দামোদরের পঞ্চরত্ন—সংস্কৃত লিপিযুক্ত (১৫০ বৎসরের প্রাচীন)

ব্রাহ্মণ রাজবংশ ইঁহাদের জ্ঞাতি। গৌরীকান্ত এই অঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন। মহেশ স্মায়রত্নের শিক্ষক ঠাকুরদাস চূড়ামণি ইঁহারই ছাত্র। এই বংশের শালগ্রাম জনার্দ্দনের প্রাসাদ বা চাঁদনীরীতির মন্দিরটি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সন ১৩০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মর্ম্মরফলকে উক্ত লিপি আছে। বংশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুথি ইত্যাদি অন্তর্হিত।

গ্রামীণ দেবী অষ্টভুজা জয়চণ্ডী দুর্গার সেবক-বংশ মালাকারগণ গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিয়া প্রবাদ আছে। দেবীর প্রতিমা ঠিক দুর্গাপ্রতিমার অনুরূপ। শালগ্রাম ও ধাতুময় আরও দুই-এক দেবতা মন্দিরে আছেন। দোল, নন্দোৎসব, দেশপূজা, দুর্গাপূজা ও বার্ষিক পূজার সময়ে এখানে উৎসব হয়। পুরাতন মন্দিরের উপরিস্থ খড়ের চালও এখন জীর্ণ। সম্মুখে ঝামাপাথরের খর্পর—বলিদানের রুধির ইহার উপর রাখা হয়। মন্দিরের পশ্চাতে প্রায় বিশ বিঘা-আয়তনের দীঘি—উহার ছাড়পত্র বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র প্রদান করেন। শীতলা-মন্দিরটিও প্রাসাদ-রীতির—মন্দির-মধ্যে নবকলেবর পঞ্চানন শীতলা ও মনসা ছয়টি অনুচর-সহ বিরাজমান। অন্যান্য মন্দিরগুলি প্রায়ই প্রাসাদরীতির—কোন কোনটি এখন বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত। বেথুয়াবাটীর সদ্‌গোপ পণ্ডিতবংশ পরগণার কালীমাতা প্রভৃতির সেবক। মন্দিরমধ্যস্থ দেবতাগণের নাম:—সিদ্ধেশ্বরী, বিশালাক্ষী, কালী, পার্ব্বতী, শীতলা, মনসা—ইঁহার সাত বোন, একজন নাই। ঘটে একটি মুণ্ড—মোট দেবতা তেরটি। এই মন্দিরের আটচালায় পরগণার সামাজিক সভার অধিবেশন হইবার প্রথা আছে।

গ্রামের বিবিধ আকৃতির মঞ্চগুলির উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। উহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা পাঁচ। মণ্ডপের সংখ্যাও পাঁচ। পশ্চিম দিকে অবস্থিত দুইটি মণ্ডপের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব দিকে কোন মণ্ডপ নাই। চক্রবর্ত্তী, রায় ও দত্তদিগের মণ্ডপ উত্তর দিকে। চক্রবর্ত্তীদেরটি এখন বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত। দক্ষিণবাড়ীর কায়স্থ দত্তবংশ এক সময় সরকারী-কর্ম্মের দৌলতে ধনী হন। নীলকমল নিমকির দেওয়ান ও কুমুদনাথ রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইঁহাদের প্রাসাদ মণ্ডপ ও পাকা আটচালা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। দুর্গাপূজা বহুকাল যাবৎ লুপ্ত। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ রায়বংশ বাং সন ১০৫০-এর কাছাকাছি সময়ে মুর্শিদাবাদ ঠেঙ্গাপুর হইতে আসিয়া এখানে বসবাস সুরু করেন। ইঁহারা কাশ্যপ দত্ত। এখানে মুরলীধর আদিপুরুষ। রাজা রঘুনাথ সিংহের বংশে কাজ করিয়া ইঁহারা পরগণার ছয় আনির মালিক হন। শেষ রাজা হেমন্ত সিংহ ১১১৬ সনে দামোদর রায়ের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লন। এই বংশে পূর্ব্বোক্ত গুলাব দত্ত ও দাতা কৃষ্ণকান্ত রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য দান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। বাসুদেবপুর-হাট ইঁহার স্থাপিত। এই বংশের দুর্গাপ্রতিমায় গণেশ ও কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ঊর্দ্ধে থাকিতেন বলিহারপুর রায়বংশ, দাসপুর চৌধুরী বংশ, রাধাকান্তপুর বসু-বংশ, ময়নার সিংহবংশেও এই রীতি। বরদার বিশালাক্ষীর গণেশ, কার্ত্তিকও উপরে—মনে হয় সিংহরাজবংশের সহিত যোগাযোগের সূত্রে ঐ রীতি এই সকল বংশে আসিয়াছিল। ইঁহাদের প্রাচীন মন্দির ও পূজামণ্ডপ ভগ্ন। পুরাতন সুদৃঢ় প্রাচীর কোন রকমে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। গৃহদেবতা রাধাবল্লভের পাদপীঠে শিল্পীর নাম আছে। রাধাবল্লভ একটি আধুনিক প্রাসাদ-রীতির মন্দিরে অবস্থিত, অট্টালিকাগুলি ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। তাঁবি নামক যন্ত্রের সাহায্যে সন্ধি-পূজার সময় নির্ণয় করিয়া এই বংশ পরগণার দক্ষিণাংশে যাবতীয় পূজা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বাদ্যের সঙ্কেতে দূরদূরান্তের ঐ সকল পূজা সমাধা হইত। নবমীর রাত্রে শিবাভোগও এই বংশের বিশেষ রীতি ছিল। দেশনালার উপরে অধুনা-লুপ্ত পুলটি ছিল এই বংশের কীর্ত্তি।

বৈশাখী অমাবস্যায় বাসুদেবপুরে দিবাভাগে শ্মশানকালী-পূজা হয়। ইহাতে দুই দিনে তিনটি মহিষ বলি হইয়া থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ভোজনাদির সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়।

৺শ্মশানকালীমাতা—১১৫ বার্ষিক পূজা ১৩৫৫

গ্রামে সকল উচ্চবর্ণের গৃহেই দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। নরসুন্দর-সম্প্রদায়েরও প্রাসাদ বা চাঁদনী-রীতির মন্দির আছে। বেশীর ভাগ দেবতাই এখন মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামে আগে পঁচিশটি দুর্গাপ্রতিমা হইত। এখন হয় মাত্র দুইটি। এখনও বার মাসে তের পার্ব্বণ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। চঁচর বা বহ্যুৎসবে বাদ্যের ঘটা হয়। কবি বল্লভ ঘোষ পরগণা বন্দোবস্ত করিতে আসিয়া এই গ্রামেই ১১০৪।১১৩১ সনের মধ্যে জাহ্নবীমঙ্গল মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির সহিত প্রাচীন সংস্কৃতিও গ্রাম হইতে দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে। সংস্কৃত আর কেহ বড় একটা পড়ে না। বনিয়াদী কুলের নৈষ্ঠিকগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। অরণ্যের নীরবতা গ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া কে জানে কোন্ অনিশ্চিত পথে লইয়া যাইতেছে।

প্রবন্ধের ফোটোগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত

কণ্ঠসুতা হ'ল কি চঞ্চল?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গৌরীশৃঙ্গ শিরে হেরি শিশুসূর্য্য, উষা অনুরাগে
বিছায়ে দিল কি তার স্বচ্ছ শুভ্র পুষ্পিত অঞ্চল!
সাগরের স্বর শুনি অরণ্যের অভিসার জাগে,
কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে কণ্ঠসুতা হ'ল কি চঞ্চল?
এ ধরণী চিরশ্যাম মানুষের অশ্রুজলে জানি,
জীবনসমাধিক্ষেত্রে জন্মে প্রেম তৃণসম জনারণ্য মাঝে,
সেই প্রেম রোমন্থন করে কত প্রাণী!
যে প্রেমের রসায়নে সঞ্জীবিত শস্যশীর্ষে স্বর্ণচ্ছটা রাজে।
অঙ্কুরের মাঝে সুপ্ত রহে যারা, কেন অসহায়!
কল্পনায় কামনায় ভাবগত মহাকেন্দ্র 'পরে
আশা-নৈরাশ্যের গান অন্তরের তন্ত্রী হতে ধায়
মায়াজালে লীলায়িত সুরগুলি ঝরে ঝরে পড়ে।

আত্মিক লোকের যাত্রী আমারে যে ডাকে,
সুন্দর ভুবনে মোর রেখে যাবো মৃত্যুরেখাগুলি;
নীহারের মত অশ্রু ঝরিল কি পল্লবের ফাঁকে,
কাহিনী কালের নীড়ে স্মৃতিলোকে র'বে পুচ্ছ তুলি।
কালোত্তর ক্ষণে তার কাকলী কূজন
লোকোত্তর পান্থজনে করিবে কি কভু আকর্ষণ?

জীবনের পরিক্রমা প্রবাসীর মত,
দুঃখে শোকে নির্যাতনে চিত্ত যেন ফলভারে নুয়ে-পড়া পাদপের সম,
পর্ণগৃহে দৈন্যগ্লানি বক্ষে ধরি উপেক্ষিত কাব্য লয়ে দিন যায় মম;
সত্তা মোর নহে বিশ্বগত।
অসংখ্য বৈচিত্র্য মাঝে সংখ্যাতীত শতাব্দীর বিস্মৃতির স্তূপে
চিরদিবসের বাণী সমুজ্জ্বল রয়।
ঐতিহ্যের পুষ্পগন্ধধূপে
মহাকাল অর্চনার ধ্যানমন্ত্রে এ ধরণী ঐক্যধ্বনিময়।
আমার নিখিলে আজ স্মারক চিহ্নিত হয়ে প্রেমে জ্বলে তব অঙ্গুরীয়,
তোমার নিখিলে মোর যৌবনের গানখানি সমাদরে কণ্ঠে তুলে নিও।

দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রামমোহন রায় হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেই তাঁর যা-কিছু সংস্কার-কার্য্য করেছিলেন। সংস্কারগুলি তাঁর কাছে হিন্দুসমাজের পরিচ্ছন্ন রূপ বলে গণ্য হয়েছিল। সহজ অধিকারবোধেই তিনি আপন সমাজের উন্নতি ও সেবার কাজ করতেন; সে কাজে অন্য কারো বাধা, সহযোগ, নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা রাখতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই পথই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে উঠেছিল ধর্ম্মসাধনা। সমাজে বিপ্লবের ঝড়ও তুলেছিলেন তিনি সেই একটি দিক দিয়েই।

বিপ্লব বা স্বাধীনতার ধর্ম্মই এই যে, একবার একটি দিক দিয়ে তার অঙ্কুর দেখা দিলে, তা নানা দিক দিয়ে নানা বাধা ভাঙতে থাকে। মহর্ষি বিপ্লব এনেছিলেন বটে, কিন্তু সময়ের অপেক্ষা এবং সাধ্যের বিচার করে তিনি সকলকে কাজে অগ্রসর হতে বলতেন। তিনি বলেছেন—"ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সঙ্কোচ করিতে যাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে।" এই সদুপদেশটি দিয়ে প্রগতির মূলনীতিকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "আর একবার যখন আমি আদি সমাজের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের আচার্য্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।' তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, 'বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিও।' যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি, কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে-জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্ব্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন।"

স্বাধীনতার প্রেরণা মহর্ষির মধ্যে সহজাত ছিল। তার সঙ্গেই তিনি পেয়েছিলেন হিতাহিত বিচারের দূরদর্শিতা বা ভূয়োদর্শন। এই ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আপন কার্য্যক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন; তার উপরে অপরের যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেন নি। প্রতিপক্ষের কার্য্যক্ষেত্রে তিনিও হস্তক্ষেপ করতে যান নি। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলি "আত্মজীবনী"র প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে সঙ্কলিত পত্রাবলী ও কয়েকটি ভাষণ থেকে জানা যাবে।

মহর্ষির মধ্যে গোঁড়ামির বালাই ছিল না। উপযোগিতা যাচাই না করে তিনি কোন বিষয়ে বিমুখ থাকেন নি। তাঁর মধ্যে জানবার স্পৃহা ছিল প্রবল। জানার পরে চলেছে বিচার। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান বহু ধর্ম্মের তীর্থ ও উৎসবাদির ক্ষেত্রে তিনি গিয়েছেন, তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়েছেন। নানা ধর্ম্মের নানা লোকের সঙ্গে মিশেছেন; আর, সবকিছুর মধ্যে সত্যের সঙ্গতি খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। এই করেই তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁরই ভাষায় সে কাজকে বলা যায়—"জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"-চেষ্টা। সেকালে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে মহর্ষির প্রধান চারটি বক্তৃতা সঙ্কলিত ছিল। একটি বক্তৃতার নাম ছিল "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"-চেষ্টা বিশেষভাবেই স্ফূর্ত্তিলাভ করেছে। তাঁর সর্ব্ব কর্ম্ম ও প্রেমের মূলে পিতার জ্ঞানস্পৃহা নিহিত থেকে শক্তিদান করেছে। জ্ঞানপন্থী মহর্ষির রচিত প্রথম গান—"হবে, কি হবে দিবা আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"আমি সেই সমাধিস্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইলাম।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

মহর্ষির দেশভ্রমণের অভ্যাস সঞ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। মহর্ষি বরাবর কিছুদিন পরে পরেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। লিখেছেন,—"সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না—জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়িতে থাকিতে পারিলাম না।" (আত্মজীবনী, ১৪শ পরিচ্ছেদ।) কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, সিমলা, কোথায় বোম্বাই পুরী—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সিংহল (১৭৮১ শক আশ্বিন), ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ও মুসলমান, পুরীতে বৈষ্ণব, কাশীতে শৈব, বোম্বাইয়ে জৈন আর্য্য, থিয়োসোফিষ্ট, অমৃতসরে শিখ ও সিমলার নিকটস্থ সোহিনী নামক স্থানে তান্ত্রিক সুখানন্দ স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। খ্রীষ্টধর্ম্মের 'ফরাশীস মহাত্মা' ফেনেলনের স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ তিনি তাঁর উপাসনার আবৃত্তি করেছেন। জেনারেল ওয়াকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট উপদেশ গ্রহণ করতে আসতেন, চিঠি-পত্রে তাঁকে সম্বোধন করতেন 'Reverend Father' বলে।

দেশীয় খ্রীষ্টান লালবিহারী দে প্রভৃতিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

এমন কি, চাষী-মজুর সাধারণ গৃহস্থ এবং আদিবাসীরা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে মহর্ষিকে কাছে পেয়েছিল। জলপথে ভ্রমণকালে ভোজপুরে বজরা থেকে নেমে তিনি একবার সুদূর গ্রামাভ্যন্তরে হেঁটে চলে যান। সেখানে "একটা বাগানে একটা পড়ো শুকনো আমের গাছের গুঁড়িতে ছায়ায়" বসে চক্ষু বুঁজে ভজন গান করছিলেন, "তাহা শুনিয়া গ্রামের লোকেরা" তাঁকে দেখতে একত্র হয়েছিল। তিনি তাদের হিন্দিতে উপদেশ দিতে দিতে তাদের সঙ্গেই অবশেষে বজরার অভিমুখে ফিরে আসেন। হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণের সঙ্গী ছিল অনেক পাহাড়ী, অনেক সময় আশ্রয়দাতা ছিল তারাই। আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদের "পদ্মার মাঝি"-র গল্পটি স্মরণীয়। এদের মত সাধারণ লোকের এক-একটা কথা পথে ঘাটে তাঁর মনে অনেক সময় প্রেরণার উদ্রেক করেছে।

অন্ধ দরিদ্রের সাহায্যার্থে মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর লক্ষ টাকা দান করে যান। পরবর্তীকালে "ব্যক্তিগত ব্যয়ের টাকা হইতে বাঁচাইয়া" সে পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেন্টের হাতে দিয়ে তার সুব্যবস্থা না করা অবধি মহর্ষি স্বস্তি পান নি। ১৭৮২ শকে পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। ১২ চৈত্র তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-স্থলে ভাষণে সেই ঘটনার উল্লেখ করে সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সংগৃহীত হাজার তিনেক টাকা ও জিনিসপত্রাদি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথও শিলাইদহে এবং শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেবার বিবিধ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। একমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রাজ্যেই কবি ধর্ম্মকে নিবদ্ধ রাখেন নি, ধর্ম্ম রূপ নিয়েছিল বাস্তব কর্ম্মেও। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা ছিল তার অন্যতম বিষয়। অন্ধদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তা মহর্ষির আচরণেরই অনুরূপ। অন্ধদের একটি সেবানিকেতনের উদ্বোধনও কবি সম্পন্ন করেছিলেন। একটি গানও তিনি লিখেছিলেন সেই উপলক্ষে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা ইত্যাদিতে নানা সাহায্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে দুর্গতদের দুর্গতিমোচনের চেষ্টা কবি অনেকবার করেছেন। জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার আকুলতা-মাখা তাঁর গান, কবিতা, নানা লেখা; ভাষণও আছে অজস্র।

সমাজ ও স্বদেশের হিতসাধন-উদ্দীপনা মহর্ষির মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" স্থাপনের ঘটনাটি তার আদি উদাহরণ। জাতিকে দুর্গতি থেকে বাঁচিয়েছিলেন সেদিন বিশেষ করে তিনিই। খ্রীষ্টান না হয়ে যাতে যথার্থ স্বাজাত্যবোধের দীক্ষায় ভবিষ্যৎ বংশধরেরা গড়ে উঠতে পারে সেই সৃষ্টিধর্ম্মী কাজকেই তিনি 'বিদ্যালয়' রূপে ধরেছিলেন দেশের সামনে। গড়াকেই করে নিয়েছিলেন বিরুদ্ধ শক্তিকে ভাঙার উপায়। তাঁর সেই সংগঠন-শক্তিই শেষে পরবর্তী জীবনে ধর্ম্মকে প্রধান অবলম্বন করে প্রবাহিত হয় নানা আধ্যাত্মিক কাজে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে কাশীতে রেখে উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন। কিন্তু এদিক দিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবহেলা দেখান নাই। সহজ শক্তির সঙ্গে ঐকান্তিক অনুরাগে নিজে বাংলায় নানা রচনা লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ভূমিকা তৈরির কৃতিত্বও কতকটা দেবেন্দ্রনাথের। মহর্ষির আত্মজীবনী সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। সংস্কৃতি প্রচারকল্পে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৭৬১ শক ২১ আশ্বিনে রবিবার প্রতিষ্ঠা-দিবস) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৬৫ শক) তাঁকে কর্ম্মের দিক দিয়ে স্মরণীয় করে রাখবে। কর্ম্মমার্গে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রমুখী বিপুল ও বিস্তৃততর প্রচেষ্টার দ্বারা পিতৃপ্রদর্শিত পথেরই যে আরও পূর্ণতাসাধন করেছেন, তার পরিচয় নানা ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শুধু ধর্ম্মে নয়, জ্ঞানে কর্ম্মে নানা দিক দিয়েই সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট সমাজই তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবি গড়েছেন বিশ্বভারতী। তাতে নানা দেশের শিল্প বিজ্ঞান এবং নানা ভাষা ও সাহিত্যের সমাবেশ ঘটেছে। মহর্ষির আলোচনার বিষয়ের মধ্যে একদিকে ছিল যেমন স্বদেশীয় বেদ পুরাণ উপনিষৎ গীতা ভাগবত তন্ত্র সংহিতা "বাল্মীকি-রচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ" ও জয়দেবের গীতগোবিন্দাদি কাব্য— তেমনি অন্য দিকে ছিল বিদেশীয় মুসলমান-সাধক কবি হাফেজের বয়েৎগুলি; অনর্গল তা তিনি আবৃত্তি করতেন, লেখায়ও তা ব্যবহার করতেন। এর দ্বারা সংস্কৃত ও ফারসীতে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় মেলে। হিন্দিতেও তাঁর দখল ছিল (দ্রঃ বেরিলি বক্তৃতা)। অনেক স্থলে হিন্দী ভাষণও তিনি দিয়েছেন। ইংরেজীতে ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রচার-কার্য্যের ভার দিয়ে রেখেছিলেন তিনি রাজনারায়ণ বসুর হাতে। ইংরেজীর আলোচনা তিনি নিজেও বিশেষ ভাবেই করতেন। লিখেছেন: "একদিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম।" (আত্মজীবনী ৩য় পরিঃ)

তাঁর শিল্পানুরাগী মন সর্ব্বত্রই যথোচিত সাজসজ্জা ও পারিপাট্য পছন্দ করত, কিন্তু তিনি অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি ছিলেন বিরূপ। মৌলমিনে ব্রহ্মদেশীয় নৃত্যগীত এবং সিমলার পথে পাহাড়ীদের অঙ্গভঙ্গি সহকারে সরল আমোদ তিনি উপভোগ করেছেন। সঙ্গীতের অনুরাগ ও উৎসাহ রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে যথেষ্ট পেয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে অমৃতসরের গুরুদরবারের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত।" ভগবৎ তন্ময়তার সঙ্গে পিতার এই গান বা গানের প্রতি অনুরাগও বহু স্থলেই পুত্রের মনে রেখাপাত করেছে। তিনি লিখেছেন—"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানে সম্মুখে

বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তাঁহাকে তখন ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি :

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে।'

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"

মহর্ষি নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে পরিবারের লোকদের পর্য্যন্ত কিরূপ উৎসাহিত করতেন, একটি নাট্যশালা উদ্ঘাটন সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ছোট একখানি পত্রে তা জানা যায় : "পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে।...সদ্‌ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বিজ্ঞান-শিক্ষারও কবির প্রথম দীক্ষা পিতার কাছেই।

কবি লিখেছেন, (হিমালয়-যাত্রার পূর্ব্বে) "প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় আমাকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।" এর আগে বোলপুরের মাঠে কবিকে তাঁর পিতা "সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন। ডালহৌসি পাহাড়ে "ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহ-তারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।"—(জীবন-স্মৃতি)।

২

বাল্যকালে ভাষা, গণিত এবং নানা সহবৎ ও কৃত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনের সংগঠন হয়েছে অনেকটা তাঁর পিতারই হাতে। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তন করেন, তারও মূল সূত্রগুলি সেখান থেকেই পাওয়া। এর মধ্যে বড় কথা যেটি, তার বিষয়ে নিজেই কবি বলছেন, "ভুল করিব বলিয়া তিনি [মহর্ষি] ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন ; কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।" রাশভারী স্বভাবের প্রভাবে গভীরতা এবং তারই পাশাপাশি সহজ মেলামেশা ও হাস্যকৌতুক গল্পগুজব দ্বারা চিত্তের সরসতাও মহর্ষি পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করে গিয়েছিলেন। জীবনস্মৃতিতে আছে ; "পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারও চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর কাহারও কাছ হইতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোন চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কি করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে : এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।...তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন।"

অথচ ইঁহারই সম্বন্ধে কিছু আগে লেখা আছে—"নেড়া মাথার উপরে টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, 'মাথায় পরো।' পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু, পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।...তাঁহার সঙ্কল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, এক দিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্য দিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনও কারণে কোনও বাধাই দিতেন না ; যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।"

মহর্ষি জীবনযাত্রার ধরণ ছিল বিষয়-উদাসীন সন্ন্যাসীর মত, কিন্তু তা বলে বিষয়-কর্ম্ম তিনি বর্জ্জন করেন নি। তিনি বেঁধে দিয়েছেন তাঁর বিষয়ের বাঁধুনি, কিন্তু বিষয় তাঁকে বাঁধতে পারেনি। জমিদারীর নথিপত্র, ব্যবসায়ের হিসাব—সব তিনি দেখতেন, তার সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্ম্মের নিখুঁত ব্যবস্থার নির্দ্দেশও যেত তাঁর কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখছেন ; "বড় বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইত সেই দিনের কথা আমার এইখানে মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল—তা হিসাবের অঙ্কই হোক, বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিষ তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই।" মহর্ষি এ-সব নানা কাজকর্ম্ম পরিচালনা করতেন ; আবার একই সঙ্গে মনকে ডুবিয়ে রাখতেন পরমাত্মার ধ্যানে। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একাধারে এই কর্ম্মপরায়ণতা ও বৈরাগ্যের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু এ সকলেরই মূলে ছিল ঐকান্তিক ঈশ্বরানুরক্তি।

মহর্ষির সেজ ছেলে হেমেন্দ্রনাথ মারা গেছেন। মহর্ষি আছেন চুঁচুড়াতে। সংবাদ দেওয়া হ'ল সন্তর্পণে। বৃদ্ধবয়সে বয়স্ক পুত্রের

শোক। মহর্ষি শুনে বললেন "মৃত্যু হইয়াছে"? বলিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জান যে, মৃত শরীর কি ভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হস্তপদাদি সমানভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করতঃ অভ্রমিশ্রিত ফল ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না? আর বিদ্যারত্নকে এখানে আসিতে লেখ, কি প্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত।" পত্নী সারদা দেবীর মৃত্যুদিনে মহর্ষির অবস্থার বর্ণনাটি পাই 'জীবনস্মৃতি'তে 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।"

রবীন্দ্রনাথও বিষয়কর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তাঁর 'সর্বাস্তিবাদ' ধর্ম আচরণ করেছেন। পুত্র, কন্যা, পত্নী, দৌহিত্র, জামাতা প্রভৃতির অকাল বিয়োগের নিদারুণ ক্ষণেও তাঁর সে পরম চিন্তার ধারা রুদ্ধ থাকে নি। নিজের মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘদিনব্যাপী দুঃসহ রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে চলেছেন সেই উপলব্ধিরই আনন্দে। এপার-ওপার পূর্ণ করে বিরাজিত তখন তাঁর কাছে শুধু সেই এক 'আনন্দরূপম্' সত্তার অমৃত জ্যোতি।

মৃত্যুর উপক্রম পিতার মত পুত্রেরও ঘটে—দু'বার। প্রথম বারে আশ্চর্যরূপে মহর্ষির সঙ্কট কাটে, রবীন্দ্রনাথেরও তাই হয়। 'মৃত্যুর দেহলি' থেকে তিনি ফিরে আসেন। প্রথম সঙ্কটের পর, বছর পাঁচেকের মধ্যেই পিতাপুত্র দু'জনে যথাক্রমে একই বয়সে ক্ষতযন্ত্রণায় ভুগে প্রায় একই ক্ষণে পৈতৃক আবাসে পরে-পরে দেহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুশয্যায় রবীন্দ্রনাথ পিতাকে উপনিষদ থেকে মন্ত্র আবৃত্তি করে শোনান,—দু'জনের পার্থিব যোগাযোগের শেষ ঘটনাটি এই। পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপনিষদের আত্মিক আলোই কবির সমগ্র জীবনপথকে আলোকিত করে রেখেছিল।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে, হিমালয়যাত্রার প্রারম্ভে কিছুদিন তাঁদের "বোলপুরে থাকিবার কথা হয়।" বোলপুর মানে তখন শান্তিনিকেতন। বোলপুরে এসে এখানকার মাঠের থেকে নুড়ি কুড়িয়ে এনে পুত্র রোজই পিতাকে দিতেন। পিতা উৎসাহ দিয়ে বলতেন—"কী চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে?...ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।" পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসতেন বর্তমান মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পুকুরের দক্ষিণ পাড়ির উচু ঢিপিতে। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন।"

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় ছিল মহর্ষির সূর্যাস্ত দেখার বেদী। রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমার মনে পড়ে, সকালবেলায় সূর্য্য ওঠবার পূর্ব্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্য্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিমগাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না—সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত ছিল একটানা।" (প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন, পৃঃ ৭৪১-৪২।) ছাতিমতলায় ধ্যানাসনের শীর্ষফলকে মহর্ষি তাঁর প্রিয় মন্ত্র "শান্তং শিবমদ্বৈতং" লিখিয়ে রেখেছিলেন। আত্মজীবনীতে (বিংশ পরিচ্ছেদ) মহর্ষি বলেছেন—"এতদিন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" এই দুই মহাবাক্য ছিল। ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। সমাজের উপাসনাপ্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হইবার তিন বৎসর পরে ১৭৭০ শকে আমি তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ করিয়া দিই।...যিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে, জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক—তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং"। সাধকদিগকে এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।" এই মন্ত্রটি মহর্ষির জীবনে পরম আসন অধিকার করেছিল।

মহর্ষির নোট বইয়ে নানা মন্তব্য লেখা ছিল। তার একটি এইরূপ:

"I examined, I doubted, I believed that the strength of the human mind is sufficient to solve the problems presented by the universe and man and the strength of the human will is sufficient to regulate man's life according to its law and moral end. It is my profound belief that God, Who created the universe and man, governs and preserves or modifies them, either by those general laws which we call natural laws or by special acts emanating from his perfect and free wisdom and from his infinite powers which, he has enabled us to recognise in their effects. I see him present and acting not only in the permanent Government of the universe, and in the innermost life of men's souls but in the history of human societies."

মানুষের মন জাগতিক সমস্যা সমাধানের শক্তি রাখে এবং পার্থিব যাবতীয় নিয়মতন্ত্র ও নৈতিক সিদ্ধির দিকে মানুষের জীবনকে চালিত করে নেবার পক্ষে মানুষের ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট সক্ষম।—মহর্ষির এই কথাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের মানব-মহিমাব্যঞ্জক কথাগুলির বিলক্ষণ মিল আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নয়। হিন্দুধর্ম্মেরই একটি বিশিষ্ট শাখা ব্রাহ্মধর্ম্ম। "হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মভুক্ত করিবার জন্ত ভারতবর্ষে এই আদি সমাজ সংস্থাপিত হয়"—এই কথা দ্বারা এবং আরও নানা স্থলে মহর্ষি হিন্দুসমাজের এই বিশিষ্ট 'সমাজ'টিকে তার সুনির্দ্দিষ্ট শীর্ষস্থানে সমাসীন দেখতে চেয়েছেন। এ কাজে অগ্রসর হয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কেবল আপনি উন্নত হইলে হইবে না, কিন্তু সকলকে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে বলেছেন :

চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।
(সোনার তরী)

'মুক্তি' কবিতায় বলেছেন :

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ?
(সোনার তরী)

দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিপ্লব অনেক দোষের।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পিতার জীবন ছিল বিপ্লবেরই কেন্দ্র। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে আপন হিন্দু সমাজে ও পরিবারে তিনি এই বিপ্লবেরই সূত্রপাত করেন। আবার এই পৌত্তলিকতাশ্রয়ী অথচ ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী হিন্দু-সভ্যদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে এবং অবতারবাদ-রোধের প্রবল চেষ্টা করে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও বিপ্লব এনেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দিক থেকে সমাজকে কিছু যদি দেবার থাকে তবে যাদের তা সংগ্রহ করে নেবার তারা তা আসা-যাওয়ার মেলা-মেশায় আপনি দেখে শুনে বুঝে নেবে। স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা সেই সত্যই অক্ষয় রূপে কাজ করে চলবে সকলের মধ্যে। ব্রাহ্মণদের দিয়ে বেদ পাঠ করানোতে অনেকে তাঁকে রক্ষণশীল মনে করতেন। কিন্তু সে-দিকেও তাঁর যুক্তি ছিল। কাজের ক্ষেত্রে যোগ্যতারই সমাদর করতেন। আচার্য্যের কাজে যে তাঁর জাতিগত কোন মোহ ছিল না—কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' আখ্যায় ভূষিত করে আচার্য্যত্বে বরণ করার ঘটনাই তার অন্যতম প্রমাণ। মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্র তাঁরই রচনা। তবে তিনি বরাবরই বলতেন—"শান্তভাব চাই, ভূয়োদর্শন ও ধৈর্য্য চাই।"—এসব বলতে এবং করতে গিয়ে ঘর ভেঙে গেল, বাইরেও সেদিন দেখা দিল দারুণ ঝড়। তিনি কিন্তু লক্ষ্যপথে চললেন এগিয়ে ; ক্ষয়-ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ-হীন, সংগঠনে একাগ্র, পরিশ্রমে নিরলস ; শান্ত সৌম্য দীপ্তিমান তিনি, সর্ব্বক্ষণ অদম্য এবং আত্মসমাহিত।

মহর্ষির হৃদয় ছিল অনুভূতিশীল ; কিন্তু নীতিতে ছিলেন তিনি অবিচল। নৈতিকতা বা বৈষয়িক দ্বন্দ্বের অনুকূল শুষ্ক কঠোরতা তাঁর চরিত্রের বা কাজের মধ্যে প্রাধান্য পায় নি। রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে 'হিমালয় যাত্রা' অধ্যায়ে লিখেছেন যে, তাঁর বাল্যকালে মহর্ষি তাঁকে নানা বই পড়াতেন। ছেলেকে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী পড়াতে মহর্ষির ভাল লাগত না। "ফ্র্যাঙ্কলিনের হিসাব-করা কেজো ধর্ম্মনীতির সঙ্কীর্ণতা পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।" মহর্ষির আধ্যাত্মিক আগ্রহ সর্ব্বদার তরেই জাগ্রত ছিল। এক ঈশ্বরের আচ্ছাদনে তিনি সকলকে আবৃত করে দেখতেন। এর মূলে ছিল অনুভূতির প্রভাব।

মহর্ষি ও তাঁর পুত্রের জীবনের উদ্বোধন-অধ্যায়েই মিলে দুটি অনুভূতিঘন ঘটনা। পিতার ঘটেছিল পিতামহী-বিয়োগের বেদনাতে মুহ্যমান অবস্থায় বৈরাগ্য ; তার মধ্যে এক দিন হঠাৎ উপনিষদের উড়ে-এসে-পড়া এক জীর্ণ পত্রাংশ থেকে "ঈশাবাস্য" মন্ত্রটি তিনি পড়লেন। তাঁর জীবনে প্রথম সেই পরম উপলব্ধি হ'ল। পুত্রেরও রুদ্ধ-গৃহের গণ্ডীতে-বাঁধা প্রাণের বেদনা পাক খেত গুমরে গুমরে। বাল্যে সেই বালকও এক দিন দোতালায় দাঁড়ানো অবস্থায় প্রভাতের আলোর মধ্যে পেয়ে গেল আপনার পরম লোকের উৎসবের ডাক। অনুভূতির এই বিচিত্র লীলা রয়েছে দুয়ের জীবনকেই ঘিরে। দু'জনের মহাজীবনের পথ খুলে দিয়েছে আবেগের এক একটা তীব্র সঙ্ঘাত। একজন হয়েছেন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, অন্য জন হয়েছেন কবি।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

২৪

জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুমারবাহাদুর একখানা দরখাস্ত পেশ করেছিলেন—পাকিস্থানের সর্ব্বোচ্চ বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তার মর্ম্ম—'আমার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ—প্রস্তরময়ী কালীমূর্তিটিকে, আমি ভারতরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করিতে চাই।'

পাকিস্থানের বিচার-বিভাগ নোটিশ জারি করে জানতে চেয়েছিলেন—সে বিষয়ে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের কোন আপত্তি আছে কিনা ?

কেরামৎ সর্দ্দার এসে নরোত্তমকে বললে—হিন্দুদের পক্ষ থেকে তুমিই আপত্তি করো মোড়ল।

—কি দরকার ? নির্লিপ্তভাবে নরোত্তম জবাব দিলে।

—বল কি মোড়ল ? আমাদের কালীবাড়ী। আমি জানি—আমাদের বাপ-ঠাকুরদারাও ওই জাগ্রত কালীর কাছে পাঁঠা মানত করতেন। গল্প শুনেছি—ছোটবেলায় আমি একবার বিষম জ্বরে মরতে পড়েছিলাম। তারপর পূজো পাঠিয়ে বেঁচেছি। সেই কালীকে আজ জমিদার নিয়ে যাবেন ?

—তা হলে তোমরাই আপত্তি জানাও…

—শুনলাম—মুসলমানের আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

একটু হেসে নরোত্তম বলল—তা হলেই বোঝ সর্দ্দার! এদেশের হিন্দু-মুসলমান আমরা সবাই অপদার্থ। দেগো-গোয়ালা এসে লোহা পুড়িয়ে আমাদের পিছনে 'হিন্দুর ছাপ' আর তোমাদের পিছনে 'মুসলমানের ছাপ' দাগিয়ে দিচ্ছে। আপত্তি করবার উপায় নাই। আমরাও তো তোমাদের পীরের দরগায় গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতাম ? এখন হয় তো লাঠি নিয়েই তাড়া করবে। আর দরকার কি ভাই ? হিন্দুর মাকে হিন্দুরাই নিয়ে যাক্…

তুমিও তো হিন্দু! এই পাকিস্থানের অধিবাসী। তোমার আপত্তি নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হবে।

আমিও এই পাকিস্থানে বেশী দিন থাকব না সর্দ্দার! আমার দিনও ফুরিয়ে এসেছে…

কেরামৎ চোখমুখ ঘুরিয়ে বললে—তাই নাকি ? তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে ? এই কেরামৎ যে ক'দিন আছে, তোমাকেও থাকতে হবে মোড়ল !

অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হ'ল—কেরামতের নামে নরোত্তম একখানা আম্‌মোক্তার নামা রেজেষ্ট্রি করে দেবে। স্থানীয় হিন্দুদের পক্ষ থেকে কেরামৎই করবে জমিদারের সঙ্গে লড়াই। নরোত্তমকে কিছুই করতে হবে না।

পাকিস্থান হাইকোর্টে তুমুল মামলা বেধে উঠল। দু'পক্ষেই নিযুক্ত হ'ল বড় বড় উকিল-ব্যারিষ্টার। কুমার বাহাদুর নরোত্তমের উপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই ঘটনার পর—গত এক বছর আর নরোত্তম কলকাতায় যায় নি। অন্ধ কাদম্বিনী দাদার জন্যে কাঁদে।

এদিকে গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে কলকাতার উপকণ্ঠে, কুমার-বাহাদুর এক মন্দির তৈরি করেছেন। তাঁর সর্ব্বস্বপণ—শীঘ্রই পাকিস্থান থেকে বিগ্রহটি এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করবেন। দীনবন্ধু-ঠাকুর কলকাতায় গিয়ে তাঁকে জানিয়েছেন—সেবায়েত পালিয়েছে। বিগ্রহের নিত্য-পূজা নিয়মিত হচ্ছে না।

গুরুজী বললেন—রমা! তুমি একবারটি যাও। তুমি বুঝিয়ে বললেই নরোত্তম বুঝবে। তোমার অনুরোধে নিশ্চয়ই সে মামলা প্রত্যাহার করবে…

শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক হ'ল। দু'এক দিনের মধ্যেই দীনবন্ধু ঠাকুরের সঙ্গে কাদম্বিনীকে নিয়ে রমাদেবী রওনা হলেন।

উপস্থিত নীহারিকার অপমৃত্যু নরোত্তমকে অত্যন্ত অভিভূত করে ফেলেছে। গত দু'দিন সে শয্যাশায়ী ও উপবাসী। কেরামৎ এসে কত সাধ্যসাধনা করল, কিন্তু কিছুতেই নরোত্তম জলস্পর্শ করল না। কেঁদে কেঁদে বলল—আমার মা চলে গেছে সর্দ্দার! মা-হারা নরোত্তম শীঘ্রই যাবে তার মার কাছে। কেউ বাধা দিতে পারবে না।

তৃতীয় দিন কেরামৎ এসে খবর দিল—মোড়ল! জমিদার-গিন্নী আসছেন…

শয্যাশায়ী নরোত্তম লাফিয়ে উঠে বসল। উচ্ছ্বসিতভাবে বললে—কে আসছে ? আমার মা ? ওরে শীগ্‌গির এক ঘটি জল দে—আমি বাঁচবো—আমি বাঁচবো…

নরোত্তমের উচ্ছ্বাস দেখে কেরামৎ মুষড়ে গেল। দুঃখিতভাবে বললে—তিনি তো আসছেন মা-কালীকে নিয়ে যেতে, তুমি কি তাতে রাজী হবে ?

—আরে যাও, যাও সর্দ্দার! তোমরা কিছু জানো না, কিছু বোঝো না। কে মা-কালী ? ওই রমাদেবীই তো আমার সেই মা। জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে—তোমরাই আমার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। সে যদি এখানে থাকত—তোমাদের পাকিস্থানে কারো কোনো দুঃখ থাকত না। আমার বৌমাকেও সাপে কেটে মারত না।

চোখ মুছে নরোত্তম শান্তভাবে বললে—তোমরা ত মাকে চেন না সর্দ্দার! আমরা ফুলেজলে পূজো করি বটে, কিন্তু মা কি ওই মন্দিরে বন্দিনী থাকে ? সন্ন্যাসীর বেটি—নিজেও সন্ন্যাসিনী! শুধু

বেঁচে থাকার অন্ন-জল ছাড়া আর কিছুই চায় না সে। জমিদারীর সব আয় প্রজাদের কল্যাণেই ব্যয় করত। কেন তোমরা তা বুঝলে না? এমন মাকে কেন তাড়িয়ে দিলে?

সত্যিই নরোত্তমের কথা কেরামৎ বুঝল না। অত্যন্ত দুঃখিতভাবে চলে গেল সে।

গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করে নরোত্তম চলে গেল কালীবাড়ীর দিকে। চোরের মত ঢুকল মন্দিরে। বেদীর উপর থেকে মূর্ত্তিটা তুলে মাথায় নিয়ে রওনা হ'ল নবগঙ্গার উত্তরবাহিনী বাঁক-মুখো। সেখানে মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসে, আবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন রমাদেবী এসে উঠলেন জমিদার-বাড়ীতে। বাড়ীর অবস্থা দেখে তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। বাগানের ফুলগাছগুলি শুকিয়ে মরেছে—কেউ তাদের এক ফোঁটা জল দেয় নি। যাতায়াতের পথ অত্যন্ত নোংরা-আবর্জ্জনায় অপরিষ্কার হয়ে আছে। চাবি খুলে শয়নঘরে ঢুকে দেখলেন আসবাবপত্র ধূলোবালিতে ঢাকা।

একখানা হাত ধরে দীনবন্ধুঠাকুর কাদম্বিনীকে এনে পৌঁছে দিলেন নরোত্তমের কাছে।

—কাদু এসেছিস্? নরোত্তম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। সুহাসিনী শুনেছে—কাদম্বিনী বহুদিন পতিতাবৃত্তি করেছে। সেই জাতনাশা মেয়েটা কেন এসে হাজির হ'ল গৃহস্থ-বাড়ীতে? এ বাড়ীর অমঙ্গল হবে যে!

—বৌমা! কাদুকে ঘরে নিয়ে যাও···নরোত্তমের সে আদেশ সুহাসিনী মানল না। কাদম্বিনীকে সে কেন স্পর্শ করবে? এ কি অন্যায় আদেশ? কাদম্বিনী উঠানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

— বৌমা! শুনতে পাচ্ছ না? নরোত্তম গর্জ্জে উঠল।

সখিচরণ আর মনোহর দু'দিক থেকে ছুটে এসে কাদম্বিনীর দুখানা হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। নরোত্তম রওনা হ'ল জমিদার-বাড়ীর দিকে।

রমাদেবী শুনেছেন—মন্দিরে কালীমূর্ত্তি নেই। কি সাংঘাতিক কথা! নরোত্তমকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মন্দিরের মূর্ত্তি কি হ'ল?

পায়ের ধুলো নিয়ে হাসতে হাসতে নরোত্তম বললে—মা! সে পাথুরে-কালীকে আমি নবগঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছি···

বিস্মিতভাবে রমাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

—সেদিন হিসেব করে দেখলাম—আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার আমল থেকে, তার মানে, প্রায় আড়াইশো বছর ধরে, ঐ মূর্ত্তির পুজো এখানে হচ্ছে। আমার এ দেশটা পাকিস্থান হয়ে গেল কেন? তুমি আগে এই কথাটার জবাব আমাকে দাও ত মা? তার পর তোমার 'কেন'র জবাব আমি দেব···

—ছি ছি, এ কি পাগলামি তোমার? ওদিকে মন্দির তৈরি হয়ে গেছে। কুমারবাহাদুর সঙ্কল্প করেছেন—সামনের শ্যামাপূজার রাত্রেই তিনি মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করবেন। জেলেদের সঙ্গে নিয়ে যাও। যেখানে বিসর্জ্জন দিয়েছ—সেখানে 'জালাজ' করে মূর্ত্তি তুলে আন···

নরোত্তম একটু হেসে বললে—জেলে লাগবে না মা! তোমার এই ছেলের চেয়ে বড় ডুবুরী এদেশে নেই। বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু একথা এখনও বুকে টোকা দিয়ে বলতে পারি—কোনও জোয়ান জেলে আমার সঙ্গে ডুবিয়ে পারবে না···

—তা হলে যাও, মূর্ত্তি নিয়ে এস···

—তার আগে আমার প্রশ্নের জবাবটা দাও মা?

—বুঝেছি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমিই জেলেদের খবর পাঠাচ্ছি···

তেমনি হাসতে হাসতে নরোত্তম বললে—জেলেরা এসে কি করবে? নবগঙ্গার কোন্ বাঁকে—কোথায় যে বিসর্জ্জন দিয়েছি—তা কি তারা জানে? তারা কি সারা নবগঙ্গাই জালাজ করবে?

রমাদেবীর চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল। উত্তেজিত ভাবে বললেন—নরোত্তম! আমি তোমার মা। আমার আদেশ আমার মূর্ত্তি এনে দাও আমাকে।

—কে বলেছে—সে পাথরের মূর্ত্তি তোমার? তোমার মূর্ত্তি—তুমিই! তুমিই আমার জ্যান্ত মা! কুমারবাহাদুর যদি মন্দির তৈরি করে থাকেন—তা হলে তোমাকেই সেখানে পিতিষ্ঠে করুন। দেশের মঙ্গল হবে।

—তা হলে কি তুমি বলবেও না যে, কোথায় বিসর্জ্জন দিয়েছ?

—না। তুমি যদি আমার রক্ত চাও—তাও পাবে মা! তবু আমার জবাব আমাকে না দিলে, তোমার জবাব কখনো পাবে না তুমি···

—তোমার জবাব দিতে পারেন আমার বাবা—আমাদের গুরুদেব! আমি পারি না···

খুব উৎসাহের সঙ্গে নরোত্তম বলল—বেশ ত! আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে। চারদিকে আমার জ্যান্ত মাদের এত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মাঝখানে—ও পাথরের মাকে পিতিষ্ঠে করার কি মানে হয়—তা যদি তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয়ই আমি জলে ডোবানো মূর্ত্তি এনে, তোমার হাতে তুলে দেব।

দীনবন্ধুঠাকুর এতক্ষণ নির্ব্বাক ভাবে চেয়েছিলেন নরোত্তমের মুখের দিকে। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—সত্যিই মোড়ল! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে···

—তার মানে আমি পাগল হয়ে গেছি—এই ত বলতে চাও? পাগল হয়ে এখনও যে তোমাদের মাথার টিকি কেটে নিই নি—গায়ের নামাবলী ছিঁড়ে দিই নি—সেই তোমাদের ভাগ্যি। কৈফিয়ৎ দাও—কেন আমাদের দেশ পাকিস্থান হয়ে গেল?

—সে কেন হ'ল তা কি আমরা বুঝি?

—তোমরা বোঝো শুধু আঙুলে পৈতে জড়িয়ে ফংবংহংসং করা।

ওই সব ভঙ্গী ভাবড়া দিয়েই ত আমাদের কপাল পুড়িয়েছে···

নরোত্তমকে সঙ্গে নিয়ে, রমাদেবী কলকাতায় ফিরে গেলেন। যাবার আগে নরোত্তম এসে সশিচরণকে বলে গেল—কাত্নু বাড়ীতে রইল। সেজ বৌমাকে মানা করে দিস—তাকে যেন কোন কটু কথা না বলেন, অযত্ন না করেন। সে যদি কোন কারণে মনে দুঃখ পায় বা কাঁদে, তা হলে আমি ফিরে এসে, অনর্থ ঘটাব কিন্তু···

সেকথা শুনে কাদম্বিনী বললে—বৌদি আমাকে খুব ভালবাসে বড়-দা! আমার জন্যে কিছু ভেব না তুমি···

দূরে দাঁড়িয়ে সুহাসিনী মনে মনে বলল—এ আপদ কি আমার ঘাড়েই চাপল ? হায় ভগবান্! এদের মত মহাপাপীরা বেঁচে থাকে কেন ? যম কি এদের চোখে দেখে না ?

সুহাসিনীর চোখ-মুখের ভাব দেখে সশিচরণ বুঝল কাদম্বিনীকে বরদাস্ত করতে সে মোটেই রাজী নয়। নরোত্তম চলে গেলে, সুহাসিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে সে বলল—বেশী সতীপনা দেখিও না। তোমাজের নজর এখনও আছে তোমার উপর!

সগর্বে সুহাসিনী বলল—তা যদি থাকে, ঐ কাতুর মত সেও হবে—দুটি চক্ষু কাণা!

২৫

নরোত্তমের দুটি প্রশ্ন। একটি হচ্ছে—আড়াই শ' বছর মা-কালী ছিলেন মন্দিরে। পূজো নিয়েছেন; লোকের মঙ্গল করেছেন, তবু কেন তার দেশটা পাকিস্থান হয়ে গেল ?

আর একটি প্রশ্ন—যেদেশে চারিদিকে জ্যান্ত মাদের এত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সইতে হচ্ছে, সেদেশে মন্দিরের ভিতর পাথরের মাকে প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা আছে কি না ?

অশিক্ষিত চাষী নরোত্তমের সঙ্গে হবে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গুরুদেবের বোঝাপড়া। কুমার-বাহাদুরের বন্ধুবান্ধব সবাই এসে উপস্থিত। ঔপন্যাসিক আর দীনেশবাবুও এসেছেন। বৈঠকখানা ঘরে তিল-ধারণের স্থান নাই।

গুরুদেব বসেছেন এক দিকে একটা উচ্চ বেদীর উপর—কারু-কার্য্যখচিত মূল্যবান আসনে। অন্য দিকে একটি শতরঞ্চের উপর করজোড়ে বসে আছে নরোত্তম। মাঝখানে বিস্তীর্ণ ফরাসে উৎকণ্ঠিত শ্রোতারা। সবাই চেয়ে আছেন গুরুদেবের দিকে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করছেন—নরোত্তমকে।

নরোত্তমের প্রথম প্রশ্নটি শুনে গুরুদেব একটু হাসলেন। তার পর কিছুক্ষণ রইলেন মুদিত নয়নে ধ্যানস্থ হয়ে। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—শোনো নরোত্তম! তোমার উপযুক্ত প্রশ্নই করেছ তুমি। তোমার ধারণা—মন্দিরের মা'টি শুধু তোমার—হিন্দু-জাতের মা—তোমাদের চিরকাল আদর করে দুধ মাছ খাওয়াবে। এখন দেখছ—পূর্ব্ববঙ্গের অপর্য্যাপ্ত দুধ মাছ হঠাৎ পড়ে গেল, মুসলমানদের ভাগে। স্বার্থে খুব আঘাত লেগেছে। মা ব্রহ্মময়ীর একটি দাঙ্গাবাজ দুরন্ত ছেলে তুমি। মার উপর একটু ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।···

কিন্তু তুমি কি জান নরোত্তম ? ঐ মুসলমানরাও তোমার মার ছেলে ? ইচ্ছাময়ী মা যদি আজ তাঁর এই ছেলেগুলিকে একটু মাছ দুধ খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলতে চান—তাতে কি তোমাদের আপত্তি হওয়া উচিত ? তোমরা যে ওদের বড় ভাই।

দীনেশবাবু বললেন, আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা নিজেরাই আজ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে···

—হতে পারে। তবে এ ভুল তাদের যে একদিন ভাঙবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য সে সম্বন্ধে একটা কথা আছে। পরস্পরের বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে তৃতীয় ব্যক্তির উস্কানি দানের পরিণাম অতি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। তোমাদের আত্মঘাতী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে খুব। অতএব সাবধান।

নরোত্তম বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল—আমার ওই মন্দিরের মা, মুসলমানদেরও মা ?

—নিশ্চয়ই। উদার হিন্দুধর্ম্ম কখনই সে সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। আমাদের মা-ব্রহ্মময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মা! মুসলমান কি তার বাইরে ?

ঔপন্যাসিক জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে একজন মুসলমানকে মন্দিরে ঢুকতে দিতেও কোন আপত্তি নেই আপনার ?

—নিশ্চয়ই আছে। একজন অস্নাত এবং অনাচারী হিন্দুকেও মন্দিরে ঢুকতে দিতে আপত্তি আছে আমার। সেখানে যে প্রশ্ন ওঠে, তা হচ্ছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তর শুচিতার প্রশ্ন, জাতিভেদের নয়। যে মুসলমান ভক্তপ্রবর দরাফ খাঁ গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন —"অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণী শশি-শেখর-মৌলী-মালতী-মালে!" তাঁর মন্দির প্রবেশের অধিকার কি কেউ অস্বীকার করতে পারে ?

অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে এ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কেন ?

—কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের মূর্খতা! একজন খাঁটি হিন্দু, আর একজন খাঁটি মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নেই। বহুকাল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত আমাদের অত্যদার আর্য্যধর্ম্ম আত্মরক্ষা করেছেন—ভাতের হাঁড়ির ভিতর লুকিয়ে। স্বাধীন-ভারতে আজ তাকে মুক্তি দিতে হবে। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে হবে—অয়মহং ভোঃ! সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম! সর্ব্বতঃ পাণি-পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম—সর্ব্বতো শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্ব-মাবৃত্য তিষ্ঠতি।

গুরুদেব বহুক্ষণ ধ্যানস্থভাবে বসে রইলেন। ঘর নিস্তব্ধ। সবাই যেন অন্তর্লোকে বিরাটের প্রতিবিম্ব উপলব্ধি করলেন।

ঔপন্যাসিক জিজ্ঞাসা করলেন, নরোত্তমের দ্বিতীয় প্রশ্নটা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

—দ্বিতীয় প্রশ্নটি শুধু নরোত্তমের নয়! গুরুদেব বলতে লাগলেন, শুধু তোমাদেরও নয়—যে-কোন চিন্তাশীল ভারতবাসীর।

পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজ রুদ্ধশ্বাস! সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল ও সুদূরপ্রসারী। যে দেশের শিশু-শিক্ষা আরম্ভ হয়—মাতৃবৎ পরদারেষু—সেদেশে মাতৃজাতির এই লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মূলে পুরুষের নৈতিক অধোগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেন এমন হচ্ছে? পশু-মনোবৃত্তির ঘৃণিত পরিচয় মানুষের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠছে কেন? আমার মনে হয়—যান্ত্রিক শিক্ষা ও সভ্যতা মানুষকে আজ ভয়ানক স্বার্থান্বেষী ও আত্ম-সুখপরায়ণ করে তুলছে। বুদ্ধি-কৌশলে নির্ব্বোধকে প্রতারণা করার অপচেষ্টায় মানুষ যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক সামাজিক অন্যায়ের আঘাত যে সমাজের প্রত্যেক স্তরে নির্ম্মম প্রতিঘাত সৃষ্টি করে, সেকথা আজ সবাই বিস্মৃত হচ্ছে। আমার মনে হয়—এক দিকে বুদ্ধিমানদের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করা এবং অন্য দিকে নির্ব্বোধদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তোলা ছাড়া এ সমস্যার কোনও সমাধান নাই। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'—তাদের দু'জনকেই আজ সাবধান হতে হবে।

একটু থেমে গুরুদেব বলতে লাগলেন, এ সমস্যার সঙ্গে মন্দিরের সম্বন্ধ কি? ঐ পাষাণী-মূর্ত্তি কে? যে অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের এই লীলা-চাঞ্চল্যের মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁকেই আমরা আরাধনা করি ওই মূর্ত্তির মাধ্যমে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। এ সব সামাজিক সমস্যার সঙ্গে পাষাণী-মার সম্বন্ধ কতটুকু? কেন তিনি আসবেন—আত্মঘাতী সন্তানকে বাধা দিতে?

নরোত্তম বলল, তা হলে ও পাথরের মা আমাদের সত্যি-মা নন্? তাঁর প্রাণ নেই?

—কেন থাকবে না? লক্ষ লক্ষ লোকের ভোটের জোরে যদি একজন সাধারণ মানুষ নির্ব্বাচিত হতে পারেন দেশের কর্ণধার, তা হলে লক্ষ লক্ষ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস কেন পারবে না ঐ বিগ্রহের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে?

করজোড়ে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, আমাদের জ্যান্ত-মা রমা-দেবীকেই যদি মন্দিরে পিতিষ্ঠে করা হয়, তাতে ক্ষতি কি?

গুরুদেব হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, নরোত্তম! শিশুসুলভ মাতৃ-ভক্তির এ পরিচয় তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ওই পাষাণী-মূর্ত্তি গত আড়াই শ' বছর অবিকৃত আছে। প্রতিষ্ঠিত হলে আরও বহু আড়াই শ' বছর থাকবে আশা করা যায়। কিন্তু রমা ক'দিন? পৃথিবীর মেরুদণ্ড নগরাজ হিমালয়ের অস্তিত্ব—পৃথিবী যত দিন ঠিক তত দিন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য? বহু রমা আসবে ও যাবে। বহু জমিদার-বাড়ী ধুলোয় মিশবে। কিন্তু ধ্যাননেত্রে ওই হিমাদ্রি-শিখরে যে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মহামায়ার রূপ কল্পনা করতে পার—রমা তাঁর অংশ হতে পারে, কিন্তু তিনি ত রমা নন্? জরা-মৃত্যুর বিকার রমাকে মানতেই হবে। শুধু সেই কারণেই কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা রমার নেই...

নরোত্তম একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আমার দেশ, আমার বাপ-ঠাকুরদার ভিটে—আমি কখ্‌খনো ছাড়ব না। আমার পাথরের মাকে যদি এখানে নিয়ে আসতে চান—তা হলে আমার জ্যান্ত-মাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর যে ক'দিন বেঁচে আছি—ওই মার পা দুখানাই আমি পূজো করব ওখানকার মন্দিরে।

কুমার বাহাদুর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, পাকিস্থান-সরকার আমাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেছেন। রমা সেখানে থাকবে কি করে?

নরোত্তম বলল, জমিদার-বাড়ী আর কালীমন্দির ত বাজেয়াপ্ত হয় নি? রমাদেবীকে তাঁর প্রজারা কতখানি ভালবাসে ও ভক্তি করে তা আপনি জানেন না। হিন্দু ও মুসলমান প্রজারা সবাই বলছে, সরকারকে অগ্রাহ্য করেও রমাদেবীকে তারা খাজনা দেবে। মার আমার কোন অভাব হবে না সেখানে।

কুমার বাহাদুর উত্তেজিত ভাবে বললেন, না, না, তা হতে পারে না। রমা আর কখ্‌খনো পাকিস্থানে যাবে না...

নরোত্তমও উত্তেজিত ভাবে বলল, তা হলে সে পাথরের মা-কালীকেও আর পাবেন না আপনি...

—নরোত্তম!

—চোখ রাঙিয়ে নরোত্তমকে ভয় দেখানো যায় না। সেকথা তো আপনি জানেন কুমার বাহাদুর?

—সে বিগ্রহ আমার পূর্ব্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তোমার কোন দাবি নেই তার উপর।

—সে বিচার হবে পাকিস্থানের আদালতে। এখানে নয়...

—কোন্ অধিকারে মূর্ত্তিটি বিসর্জ্জন দিয়েছ তুমি?

—কে বলে বিসর্জ্জন দিয়েছি?

—তবে কোথায় সে মূর্ত্তি?

—লুকিয়ে রেখেছি...

—কোথায়? জানতে চাই...

নিজের বুকটা দেখিয়ে নরোত্তম বলল—এইখানে। পারবেন এখান থেকে কেড়ে নিতে?—যেন কি-এক অপার্থিব উজ্জ্বল আলোকে নরোত্তমের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সকলেই বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

নরোত্তম হাসতে হাসতে বললে—কুমার বাহাদুর! এই নরোত্তমের সঙ্গে আপনি কোন দিন পারেন নি। আজও পারবেন না। মিছিমিছি কেন মাথাগরম করছেন?

কুমার বাহাদুরের চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল—এখুনি একটা মারাত্মক রকম কিছু করে বসেন। তার ফল যা হয় হোক্...তার সেই চঞ্চলতা লক্ষ্য করে গুরুদেব হাত তুলে বললেন—কুমার! শান্ত হও...

বিকেলে গুরুদেব আদেশ দিলেন গাড়ী বের করতে—নরোত্তম ও রমাদেবীকে নিয়ে তিনি যাবেন—নূতন মন্দির দেখতে।

কলকাতার উপকণ্ঠে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে তৈরি হয়েছে

অতি সুদৃশ্য মন্দিরটি। সেই অঞ্চলে ছিল জমিদারের আনুমানিক এক শত বিঘা খাসের জমি। তার মধ্য থেকে কুমার বাহাদুর পঁচিশ বিঘা দান করেছেন—একটি উদ্বাস্তু-পল্লী প্রতিষ্ঠার জন্য। দশ বিঘা নির্দিষ্ট হয়েছে মাতৃমন্দিরের উদ্দেশ্যে। বাকি জমির উপর একটা কারখানা বা অর্থাগমের জন্য সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা হবে। কুমারবাহাদুরের ধারণা অবিলম্বে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে—তাঁর অর্থকরী কোন চেষ্টাই সফল হবে না। যে উপায়ে হোক—পাকিস্থান থেকে মূর্ত্তিটি আনতেই হবে।

নরোত্তমকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদেব গিয়ে বসেছেন মন্দির-সোপানে। খোকার হাত ধরে রমাদেবী চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছেন।

অদূরেই উদ্বাস্তু-পল্লী—কুমার-কলোনী। পূর্ব্ববঙ্গের বহু বাস্তুহারা এসে ঘর বেঁধেছে সেখানে। মন্দিরের সামনেই একটা প্রকাণ্ড দীঘি খননের কাজ চলছিল। রমাদেবী ভাবছিলেন—মন্দিরের কাঁসরঘণ্টা যেদিন বেজে উঠবে সেদিন ঐ পল্লীর বালক-বালিকারা নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। কারখানাটা গড়ে উঠলে সেখানকার জনমজুররাও যোগদান করবে সে আনন্দোৎসবে। কিন্তু নরোত্তমের পাগলামি শান্ত রাখার উপায় কি ?

গুরুদেব নরোত্তমকে বললেন—আচ্ছা, নরোত্তম ! যে মাকে তুমি এত ভালবাস ও ভক্তি কর, তাকে কোন দুঃখ দেওয়া কি তোমার পক্ষে উচিত হবে ?

—মা তার ছেলের দুঃখ কেন বুঝবে না ?

—কি তোমার দুঃখ ?

—বাপঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে আমি এখানে আসব না। আসতে পারব না। আমার কোন মা-ই যদি সেখানে না থাকেন, তা হলে—আমি কি করে থাকব।

রমাদেবী এসে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—কেন পাগলামি করছ নরোত্তম ? কাদম্বিনীকে নিয়ে এখানেই চলে এস। এই মন্দিরের পাশেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেব···

নিবারণ এসে ঘর বেঁধেছিল সেই উদ্বাস্তু-পল্লীতে। নরোত্তম এসেছে শুনে সেও ছুটে এসেছিল, তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। রমাদেবীর প্রস্তাব সমর্থন করে সেও বললে—তাই কর মোড়ল। চলে এস এখানে—পাকিস্থানে কেন থাকবে ?

চোখ রাঙিয়ে নরোত্তম বলল—চুপ কর নিবারণ ! আমি তো তোমাদের মত কাপুরুষ নই ? মরতে হয় পাকিস্থানেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মরব···রমাদেবীর দিকে চেয়ে কাতরভাবে বললে—আচ্ছা, মা ! বছরে দু'চার মাসও কি তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে না ?

—না, নরোত্তম ! আমার খোকা বড় হয়ে উঠেছে। তাকে এখন লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাকে ছেড়ে দু'চার দিনের জন্তেও কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়···

নরোত্তম বহুক্ষণ মাথাটা চেপে ধরে বসে রইল। গুরুদেব তাকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু সে বুঝল না। হঠাৎ বলে উঠল—আচ্ছা, তা হলে চল মা ! তোমার কালীমূর্ত্তি তোমার হাতেই তুলে দেব···

রমাদেবী দুঃখিতভাবে বললেন—কুমার বাহাদুরের ইচ্ছা নয়—আমি আর একটি দিনের জন্তেও পাকিস্থানে যাই। আমি জানি—প্রজারা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তাদের সবার অনুরোধ এড়িয়ে আসা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হবে···

—তা হলে কালীমূর্ত্তি আনতে কে যাবে আমার সঙ্গে ?

—কুমার বাহাদুর নিজেই যাবেন···

—বেশ, তা হলে তাই হোক্···

রাত্রের ট্রেনেই নরোত্তম দেশে ফিরে গেল। কেরামতের আমমোক্তারনামা খারিজ করে—তার হাত দুখানা ধরে নরোত্তম বলল—দু'এক দিনের মধ্যে জমিদার নিজে আসবেন কালীমূর্ত্তি নিয়ে যেতে। আমার অনুরোধ—তোমরা কোন প্রতিবাদ কর' না···

কেরামত জিজ্ঞাসা করল—পাকিস্থান ছেড়ে তুমিও চলে যাবে না তো !

নরোত্তম দৃঢ় স্বরে বললে—কখ্‌নো না···

কুমার বাহাদুর এসেছেন শুনে, নরোত্তম গিয়ে হাজির হ'ল জমিদার-বাড়ীতে। গলায় একখানা গামছা জড়িয়ে করজোড়ে বললে—দয়া করে তা হলে আসুন—কালীমূর্ত্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছি, তা আপনাকে দেখাব—

—চল···

কুমার বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম গিয়ে পৌঁছল নবগঙ্গার সেই উত্তরবাহিনী বাঁকে। বহু হিন্দু-মুসলমান ছেলে-বুড়ো কৌতূহলী হয়ে গেল তাদের সঙ্গে।

কুমারবাহাদুরকে একটা নমস্কার জানিয়ে নরোত্তম বললে—জীবনে কখনো আপনার কাছে হারি নি। আজও হার মানব না···বলতে বলতে সে জলে নামল। কুল থেকে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে 'মা—মা—মা' বলে দিগন্ত-কাঁপানো স্বরে তিন বার চীৎকার করল। তার পর ডুব দিয়ে জলের নীচেয় নেমে গেল, আর তাকে দেখা গেল না।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও নরোত্তম যখন আর ভেসে উঠল না, তখন কুমার বাহাদুর একটু ভীত হয়ে পড়লেন। জেলেদের ডাকিয়ে এনে বললেন—নদীর সেই জায়গাটা জালাজ করতে। বেড়-জাল ফেলে জেলেরা টেনে তুলল নরোত্তমের মৃতদেহ। তার বুকের সঙ্গে ভারী পাথরের মূর্ত্তিটি সজোরে গামছা দিয়ে বাঁধা।

কুমার বাহাদুর বিগ্রহ নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। নরোত্তমের আত্মহত্যার কাহিনী শুনে রমাদেবী কেঁদে আকুল হলেন। লোক পাঠিয়ে দুঃখিনী কাদম্বিনীকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

মন্দিরে উৎসবের বাজনা বেজে উঠল।

অদূরে দীঘির পাড়ে বসে নিবারণ কেঁদে কেঁদে নরোত্তমের কথা ভাবছিল আর মনে মনে বলছিল—হায়, হায়, কি ছিল—কি হ'ল ? মন্দির তো হ'ল, কিন্তু নরোত্তমের মত মানুষ কই ?

সমাপ্ত
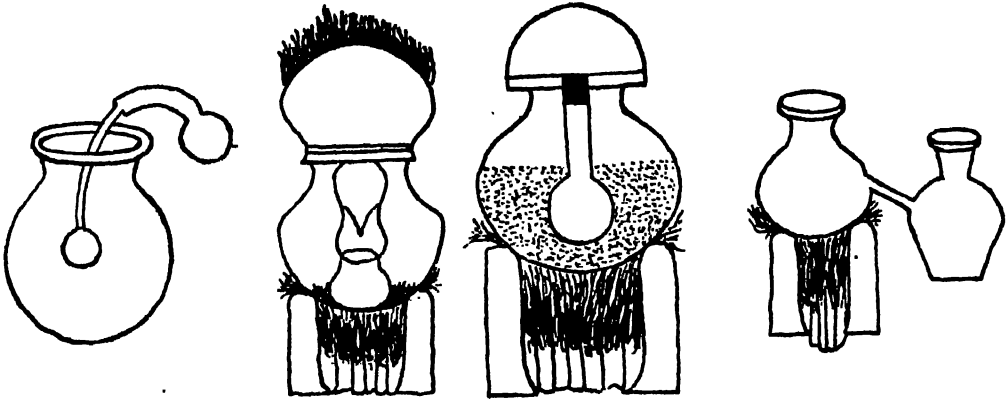
হিন্দু কিমিয়াবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির নমুনা : বাম হইতে দক্ষিণে : (১) বক যন্ত্র, (২) জারণ যন্ত্র, (৩) বালুকা যন্ত্র, (৪) তির্যক পাতন যন্ত্র। (চিত্রগুলি ভগবং সিংজীর '*A short History of Argan Medical Science*' গ্রন্থ হইতে গৃহীত ; পৃঃ ১৪৪, প্লেট ১, ৩ ও ৫।)

মধ্যযুগে ধাতু ও যৌগিক সম্বন্ধে জ্ঞান

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এস্‌সি

সম্প্রতি এক প্রবন্ধে কিমিয়ার গবেষণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম।* সেই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইবার চেষ্টা করি যে, কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করাই মধ্যযুগের কিমিয়া-বিশারদদের গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য কিমিয়া-বিশারদদের বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যম নিষ্ফল হইলেও, সমগ্রভাবে রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতির দিক দিয়া বিচার করিলে এই পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা একেবারে বৃথা হইয়াছিল, একথা বলা চলে না। ধাতু-রূপান্তর সাধন কল্পে অমোঘ কষ্টিপাথরের বা তৃতীয় মাত্রার 'ঔষধে'র সন্ধানে কিমিয়া-বিশারদরা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সর্বপ্রকার জৈব বা অজৈব পদার্থের উপর সম্ভাব্য সর্বপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপক পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার ফলে ধাতু, ধাতুনিষ্কাশন, ক্ষার, লবণ, অম্ল প্রভৃতি নানা যৌগিক (Compound) সম্বন্ধে কিমিয়া-বিশারদরা যে অনেক নূতন তথ্য সঞ্চয় ও সমগ্রভাবে রাসায়নিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ ফলিত রসায়নে মধ্যযুগের কিমিয়াবিদ্‌দের অবদান অবহেলিত হইবার নহে।

স্বর্ণ : প্রথমে ধাতু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ধাতুনিষ্কাশন-বিদ্যার কথাই ধরা যাক। স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, তাম্র, টিন, পারদ প্রভৃতি অতি প্রাচীনকাল হইতে সুপরিচিত ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন উন্নীত হইয়াছিল, দস্তা, এন্টিমনি, বিস্‌মথ প্রভৃতি কতকগুলি নূতন ধাতুও এইযুগে আবিষ্কৃত হয়। মধ্যযুগে পুরাতন 'কিউপেলেশন' (cupellation) পদ্ধতিতে স্বর্ণ শোধনের ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায় ; নকল গেবের এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শোরার ব্যবহারে এই শোধনকার্য যে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয় তাহা মধ্যযুগেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়। তারপর এই উপায়ে রৌপ্যের সহিত তাম্র ও টিনকে যে স্বর্ণ হইতে সহজে পৃথক করা যায় ইহাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এন্টিমনি সাল্‌ফাইডের (spiessglanzerz) সহিত উত্তমরূপে গলাইয়া স্বর্ণশোধনের আর এক পদ্ধতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কিমিয়াযুগের শেষভাগে।

রৌপ্য : রৌপ্যঘটিত খনিজ হইতে রৌপ্য নিষ্কাশনের কথা প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সীসকের সহিত এই খনিজকে গলাইয়া রৌপ্য নিষ্কাশিত হইত। রোমক আমলে প্রচলিত পদ্ধতির নাম ছিল "Aussaigern"। রৌপ্যঘটিত খনিজের সহিত অল্পবিস্তর স্বর্ণ প্রায়শঃই খাদ হিসাবে বর্তমান থাকে। সুতরাং রৌপ্য নিষ্কাশন পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হইল রৌপ্য হইতে স্বর্ণের পৃথকীকরণ এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধাতুবিদ্যায় নিপুণ কারিগররা এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিল। তাহাদের উদ্ভাবিত 'সিমেন্টেশন' পদ্ধতির প্রয়োগ আমরা আধুনিক কালেও দেখিতে পাই। নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করিয়া তথাকথিত 'আর্দ্র পদ্ধতিতে' (wet process) এইরূপ পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হয় এল্‌বার্টাস্‌ ম্যাগনাসের

* প্রবাসী—পৌষ, ১৩৫৭
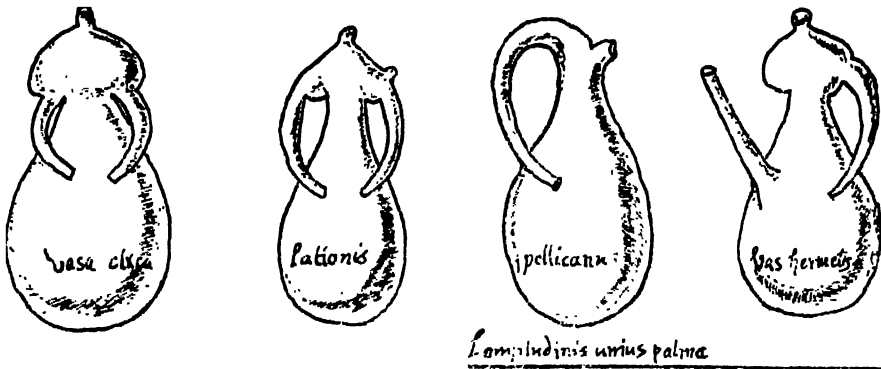
মধ্যযুগে ইউরোপীয় কিমিয়াবিদ্‌গণ কর্তৃক ব্যবহৃত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির নমুনা : নানা ধরণের পাতন যন্ত্র ও রিফ্লেক্স কনডেন্সার। বডলিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'The Alchemist' নামে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক পাণ্ডুলিপিতে এই যন্ত্রগুলির অঙ্কন ও বর্ণনা আছে। (*Discovery*, সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, পৃঃ ৩৮৬)

সময়। এগ্রিকোলা এই পদ্ধতির সহিত সম্যকরূপে পরিচিত ছিলেন।

লৌহ, সীসক, টিন ও তাম্র : কিমিয়া যুগে লৌহ, সীসক, টিন ও তাম্রের নিষ্কাশন ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই সব ধাতুর নানা বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাগুণ সম্বন্ধে অবশ্য কিছু কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীতে আরব কিমিয়াবিদ্ আবু মনসুর বিশুদ্ধতার মাত্রার সহিত লৌহের কাঠিন্যের সম্পর্ক প্রথম লক্ষ্য করেন। লৌহ যত বেশী বিশুদ্ধ হইবে তাহার কাঠিন্যও তত কম হইবে, এই তথ্য তিনি প্রথম উদ্ঘাটন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাম্র নিষ্কাশনের এক আর্দ্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে তুঁতিয়ার দ্রবণে লৌহ ফেলিয়া দিয়া অধঃক্ষেপণের (precipitation) দ্বারা তাম্র পৃথক করা যায়। ধাতু নিষ্কাশনের এই সব উন্নতি ছাড়া ইহাদের উপর উত্তাপ, নানাবিধ অম্ল ও ক্ষারের ক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিয়া অনেক নূতন জ্ঞান অর্জিত হইয়াছিল ; নিম্নে লবণের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহাদের কথা উল্লিখিত হইবে।

দস্তা, বিসমথ ও কোবাল্ট : মধ্যযুগের প্রথমভাগে ধাতব দস্তার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। যে সকল রচনায় ধাতব দস্তার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাদের প্রামাণিক নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হয় নাই। ডিরগার্টের অভিমত—মধ্যযুগের প্রারম্ভেই দস্তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সঙ্গে বিসমথ ও কোবাল্টের কথাও উল্লেখ-যোগ্য, যদিও ইহাদের নিষ্কাশন ও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বিসমথ নিষ্কাশনের এক বিবরণ প্রথম প্রদান করেন এগ্রিকোলা তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ***De re Metallica*** গ্রন্থে।

পারদ : পারদকে কেন্দ্র করিয়াই ধাতু-রূপান্তর-মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং কিমিয়াযুগে এই ধাতুটি প্রায় প্রত্যেক কিমিয়াবিদেরই প্রধান গবেষণার বিষয় ছিল। পারদঘটিত খনিজ কুইক-সিলভার উন্নত ধরণের চুল্লীতে জারিত করিয়া এই ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কাশিত হইত। কষ্টিক লাইম বা বিদাহী চূণের সঙ্গে রসকর্পূরের (corrosive sublimate) মিশ্রণ হইতে পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে পারদ উৎপাদনের আর একটি পদ্ধতিও এই সময়ে প্রযুক্ত হইত দেখা যায়। পারদ শোধনের নানা পদ্ধতির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নকল গেবের।

এই ত গেল ধাতুসমূহের কথা। রাসায়নিক যৌগিক সম্বন্ধে কিমিয়াযুগে কিরূপ ধারণা বর্তমান ছিল ? বলা বাহুল্য, রাসায়নিক যৌগিকের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলির ও তাহাদের সংযুতির স্বরূপ সম্বন্ধে কিমিয়াবিদ্‌দের নিশ্চেষ্টতা হেতু যৌগিকদের শ্রেণী-বিভাগের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। শুধু নকল গেবের যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হয় তাহাদের একশ্রেণীভুক্ত গণ্য করিয়া সেই শ্রেণীর সাধারণ নাম দেন 'sal' বা 'salt' অর্থাৎ লবণ। 'Sal' বলিতে একদিকে তুতিয়া, হিরাকস, শোরা, সোডা, ফটকিরি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন বুঝাইত, অন্যদিকে নানা জাতের ক্ষার ও অম্ল ছিল এই 'sal' জাতীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য বিভিন্ন লবণের নামকরণে আমরা নামের আদিতে 'sal' কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই ; যেমন, sal petrae, sal maris ইত্যাদি। এই দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি যে আবার উদ্বায়ী (volatile)

তাহা লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাদের এই বিশেষ গুণ যাহাতে নামকরণের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয় তদুদ্দেশ্যে আর একটি সাধারণ কথা 'spiritus'-এর ব্যবহার দেখা যায়। উদ্বায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিড অভিহিত হইত spiritus salis কথার দ্বারা, এমোনিয়ম কার্বনেট জাতীয় উদ্বায়ী ক্ষারীয় (alkaline) লবণের নাম দেওয়া হয় spiritus urenae।

যে সকল এসিডের সহিত কিমিয়াবিদ্‌দের পরিচয় ছিল তন্মধ্যে সাল্‌ফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক এসিড এবং অম্লরাজ প্রধান। এক সময়ে ধারণা ছিল, এই সকল অজৈব এসিডের প্রথম আবিষ্কর্তা আরব কিমিয়াবিদ্‌রা। *De Inventiode Veritatis* নামে যে গ্রন্থটি গেবের কর্তৃক লিখিত বলিয়া অনুমতি হয় তাহার এক স্থানে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থটির রচনাকাল এখন চতুর্দশ শতাব্দী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। তথাপি গেবেরের রচনাবলীর উপাদান আরব্য কিমিয়া হইতে প্রধানতঃ গৃহীত এইরূপ মতে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের পক্ষে আরবরাই যে প্রথম ধাতব অম্লের আবিষ্কর্তা ইহা সমর্থন করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। পক্ষান্তরে, আবু মনসুরের মত বিখ্যাত কিমিয়াবিদের রচনায় ধাতব অম্লের কোন উল্লেখ না থাকায় দশম শতাব্দীতে আরবরা সত্য সত্যই ধাতব অম্লের কথা জানিত কিনা সে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের অভিমত, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কিমিয়াযুগের শেষ ভাগে ধাতব অম্লের প্রস্তুত-প্রণালীরও গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়।

সাল্‌ফিউরিক এসিড: ফটকিরি উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে যে এক প্রকার উদ্বায়ী স্পিরিট নির্গত হয় এবং এই স্পিরিটের যে বিশেষ দ্রাবক-ক্ষমতা আছে গেবেরের সময় তাহা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী কিমিয়াবিদ্‌রা এই উদ্বায়ী স্পিরিটের ধর্ম আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। হিরাকস ও পাথরের কুচি হইতে পাতন-ক্রিয়ার দ্বারা এবং গন্ধক ও শোরার মিশ্রণে অগ্নি-সংযোগ করিয়া এই স্পিরিট উৎপাদনের আরও কতকগুলি পদ্ধতির বর্ণনা এই যুগে পাওয়া যায়। সাল্‌ফিউরিক এসিড বা তুঁতিয়ার রসকে (oil of vitriol) অনেকে Sulphur philosophorum নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের ধরণা ছিল, পরশ-পাথর উৎপাদনকল্পে যে প্রাথমিক উপাদান বা materia prima-র প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক উপাদান প্রস্তুত করিতে সাল্‌ফিউরিক এসিড অপরিহার্য্য।

হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইটিক এসিড ও অম্লরস: হাইড্রোক্লোরিক এসিড আবিষ্কৃত হইয়াছিল অনেক পরে, সম্ভবতঃ কিমিয়াযুগের শেষভাগে। সাধারণ লবণ ও হিরাকসের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিয়া spiritus salis উৎপাদনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। নানা ধাতু ও তাহাদের অক্সাইডের উপর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা হইতেই সম্ভবতঃ নাইটিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মিশ্রণের তীব্র দ্রাবক ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। নাইট্রিক এসিডে স্যাল্‌মিয়াক দ্রবীভূত করিয়া নকল গেবের উপরোক্ত এসিড দ্বয়ের মিশ্রণ বা অম্লরাজ (aqua regis বর্তমান aqua regia) প্রস্তুত করেন। ধাতুরাজ স্বর্ণকে পর্যন্ত দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া অম্লরাজের উপর কিমিয়াবিদ্‌রা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। সমস্ত ধাতু ত বটেই, এমনকি গন্ধক পর্যন্ত এই দ্রাবকে নিঃশেষিত হইয়া যায়। সবকিছু দ্রবীভূত করিতে সক্ষম এইরূপ এক সার্বভৌম দ্রাবক alkahest-এর সন্ধানে কিমিয়াবিদ্‌রা বহু পরীক্ষা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অম্লরাজের আবিষ্কারে তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়, ইহাই সেই বহু প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত সার্বভৌম দ্রাবক এল্‌কাহেষ্ট।

বিবিধ লবণ: ফটকিরি, তুঁতিয়া ও হিরাকস প্রাচীনতম লবণ। প্লিনির সময় কি তাহার পূর্ব হইতে ইহাদের উল্লেখ ও নানা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কেলাসন (crystallisation) পদ্ধতিতে বিশুদ্ধতর ফটকিরি, তুঁতিয়া ও হিরাকসের প্রস্তুত-প্রণালী কিমিয়াযুগে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহাদের পর প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে শোরা, নিশাদল ও এমোনিয়ম কার্বনেট। শোরার প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। আরবদের আমলে আল্‌-বসরায় শোরা প্রস্তুতের একটি কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে। সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে এই যৌগিকের সহিত চৈনিকদেরও অল্প বিস্তর পরিচয় ছিল। নিশাদলের প্রাচীন ইউরোপীয় নাম salmiac বা sal ammoniacum (বর্তমান salammonia)। ইহার দ্বারা এখন যে লবণটিকে বুঝায় প্রাচীনকালে বা মধ্য-যুগে অন্ততঃ ইউরোপে তাহা বুঝাইত না। গ্রেকো-রোমক-যুগে খনিজ-লবণ বা rock-salt-এর নাম ছিল স্যাল্‌-এমো-নিয়াকাম্‌। আবু মনসুর ঘুমের ঔষধ হিসাবে এই দ্রব্যের বিধান দিতেন। আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত দ্রব্যের মধ্যে প্রথম স্যালমিয়াক পাওয়া যায়। গোবর হইতে এই লবণ প্রথম প্রস্তুত করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিমিয়াবিদ্‌রা এমোনিয়ম কার্বনেটের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই লবণের প্রাচীন নাম *spiritus urinae*-উদ্বায়ী ক্ষারীয় লবণ। পচান মূত্র হইতে পাতন-ক্রিয়ার দ্বারা এই লবণটি প্রস্তুত হয়। বেসিল ভ্যালেন্টাইন স্যালমিয়াক ও সোডিয়ম

কার্বনেট হইতে এই লবণ তৈয়ারীর কথা উল্লেখ করেন।

ধাতব লবণ: ধাতব লবণ সম্বন্ধে কিমিয়াবিদ্‌রা এই সময়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করে। নকল গেবের সিল্‌ভার নাইট্রেট স্ফটিকের আলোচনা করিয়াছেন। সিল্‌ভার নাইট্রেটের দ্রবণে সাধারণ লবণের দ্রবণ মিশাইলে যে এক-প্রকার শ্বেত অদ্রাব্য বস্তু অধঃক্ষিপ্ত হয়, কিমিয়াযুগের ইহা এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। কোন অপরিচিত যৌগিকে রৌপ্য বর্তমান আছে কিনা অথবা কোন অপরিচিত বস্তু লবণ কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উপরোক্ত সিলভার নাইট্রেট পরীক্ষাটি প্রযুক্ত হইত। পারদ-ঘটিত লবণের মধ্যে মার্‌-কিউরিক অক্সাইড, মারকিউরিক ক্লোরাইড (রসকর্পূর), মারকিউরিক সাল্‌ফেট ও মারকিউরিক নাইট্রেটের প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহারের উল্লেখ এই সময়ে পাওয়া যায়। পারদ, সাধারণ লবণ, ফটকিরি ও শোরা মিশাইয়া ও এই মিশ্রণকে উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া রসকর্পূর প্রস্তুত হইত। পারদ-ঘটিত লবণাদি প্রস্তুত ব্যাপারে ভারতবর্ষ অবশ্য ইউরোপ অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রণী ছিল। নাগার্জ্জুন (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী, কাহারও কাহারও মতে সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দী) কজ্জলী বা মারকারি সাল্‌ফাইডের প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার-বিধির বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঔষধ হিসাবে পারদ-ঘটিত লবণের ব্যবহার ব্যাপারে হিন্দুরা নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের অন্যান্য জাতিদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। ইউরোপে ঔষধ হিসাবে ধাতব লবণের ব্যবহার প্রথম প্রবর্তন করেন প্যারা-সেলসাস ষোড়শ শতাব্দীতে।

দস্তা-ঘটিত অক্সাইড ও সাল্‌ফেট লবণের সহিত আরব্য কিমিয়াবিদ্‌রা পরিচিত ছিল দশম শতাব্দীতে। দস্তাকে পোড়াইলে পশমের মত সাদা একপ্রকার পদার্থ-প্রাপ্তির কথা ডিওস্কোরিডেস্ (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) প্রথম উল্লেখ করেন। জিন্‌ক্ অক্সাইডের নানা রাসায়নিক গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অবশ্য মধ্যযুগেই সুলভ হয়। লৌহ, তাম্র ও সীসকের অক্সাইড প্রাচীনকালেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু পারক্সাইড জাতীয় যৌগিকের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে মধ্যযুগে। বেসিল ভ্যালেন্টাইন লোহিত ও হরিদ্রা বর্ণের লৌহ-ঘটিত পারক্সাইডের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। গন্ধক-ঘটিত ধাতব লবণের মধ্যে মারকারি সালফাইড (কজ্জলী) এণ্টিমনি সালফাইড, জিন্‌ক্ ব্লেণ্ড, গ্যালেনা বা সীসাঞ্জন, লৌহ ও তাম্র-মাক্ষিক (iron and copper pyrites) প্রভৃতি লবণের সহিত কিমিয়াবিদ্‌দের পরিচয় ছিল। এল্‌-বার্টাস ম্যাগ্‌নাস্ গন্ধক-ঘটিত এই সব লবণকে সাধারণভাবে 'marcasitae' নামে অভিহিত করেন। আগুনে জারিত
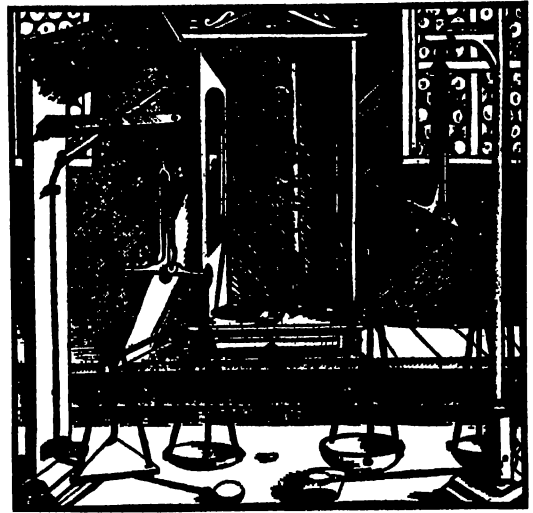
রাসায়নিক তুলাদণ্ড—এগ্রিকোলার *De re metallica* হইতে
(*Discovery*, পৃঃ ২৮৭ হইতে ব্লক তৈয়ারী করিতে হইবে।)

করিবার সময় উপরোক্ত প্রত্যেকটি লবণ হইতে বিশিষ্ট গন্ধ-যুক্ত সালফিউরাস এসিড নির্গত হইয়া থাকে। এই এসিড ও তাহার উগ্র গন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ এলবার্টাস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইহাদের সমশ্রেণীভুক্ত গণ্য করেন।

কোহল, এসেটিক এসিড: কিমিয়া যুগে জৈব পদার্থ সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল। কোহল (alcohol) ও এসেটিক এসিডের (সির্কাম্ল) প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাগুণ বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে মদ্য হইতে কোহল প্রস্তুত-প্রণালীর অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বার বার পাতনের দ্বারা অধিকতর গাঢ় কোহল প্রস্তুতের উল্লেখ এই সময়ে পাওয়া যায়। রেমণ্ড লুলি গলান পটাশ লবণের সাহায্যে কোহলকে নিরুদিত (dehydrated) করিবার এক পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কোহলের দ্রাবক ক্ষমতা ও নানা অজৈব যৌগিকের উপর ইহার ক্রিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল। সাল্‌-ফিউরিক, নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সহিত কোহলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মিষ্ট গন্ধ যুক্ত যে ইথরের উদ্ভব হইয়া থাকে ইহা কিমিয়াবিদ্‌রা লক্ষ্য করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কতকগুলি যৌগিক প্রস্তুত হইতেছে তাহা কিমিয়াবিদ্‌রা ঠিক ধরিতে পারেন নাই। কোহল শুধু মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপ বর্ণনা দিয়াই তাঁহারা এই প্রসঙ্গ-চাপা দিয়াছিলেন।

কোহল প্রস্তুতের মত সির্কাম্লের সন্ধান (acetic fermentation) হইতে উদ্ভূত নানা রাসায়নিক দ্রব্যের

গবেষণাতেও এই সময়কার কিমিয়াবিদ্দের উৎসাহ বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যযুগের শেষের দিকে পাতন-ক্রিয়ার দ্বারা সির্কা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সির্কাম্লজাত কয়েকটি জৈব লবণও এই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। আবু মনসুর ফল ও উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অংশ হইতে প্রাপ্ত ট্যানিক এসিডের উল্লেখ করেন। ইক্ষু-শর্করার কথা মধ্যযুগের অনেক পূর্ব হইতেই অবশ্য জানা ছিল। এই দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যটির ব্যবহার কেবলমাত্র ঔষধ হিসাবেই নিবদ্ধ ছিল।

মধ্যযুগে রাসায়নিক গবেষণার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে চুল্লী, রিফ্লাক্স কন্‌ডেন্সার ও পাতন-যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কোনটিই অবশ্য মধ্যযুগীয় আবিষ্কার নহে। গ্রীক, হিন্দু ও আরব্য কিমিয়াবিদ্‌রা এই সকল যন্ত্রের কথা জানিত। আমরা দেখিয়াছি, কোহল পাতন-পদ্ধতি মধ্যযুগের এক প্রধান আবিষ্কার। পাতন-পদ্ধতির অধিকতর ও ব্যাপক ব্যবহারের ফলে পাতন-যন্ত্রের ও কন্‌ডেন্সারের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থার দ্বারা উন্নত উপায়ে পাতনের পর বাষ্পকে ঘনীভূত করা সম্ভবপর হয়। বডলিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'Alchemist' নামে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক পাণ্ডু-লিপিতে বর্ণিত ও অঙ্কিত পাতন-যন্ত্র এবং কন্‌ডেন্সারের কয়েকটি চিত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।*

তুলাদণ্ডের ব্যবহারও সুপ্রাচীন। ঔষধ ব্যবসায়ী, সোনা-রূপার বিক্রেতা এবং কিমিয়াবিদ্‌রা ব্যবসায় ও গবেষণার কার্যে তুলাদণ্ডের আর সেই সঙ্গে নির্ভুল ওজনের ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী হইতে রাসায়নিক কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ ধরণের তুলা-দণ্ডের প্রচলন দেখা যায়। কলোন, নুরেম্বর্গ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ তুলাদণ্ড নির্মিত হইত। *De re metallica* (১৫৫৬) গ্রন্থে চিত্রিত রাসায়নিক তুলাদণ্ডের একটি নমুনা এখানে দেখান হইল।

* *Discovery* পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সংখ্যায় ডাঃ শেরউড টেলারের 'Mediaeval Scientific Instruments' প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্র অবলম্বনে

সূর্য্য-সেনানী

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

মহাসূর্য্যের মিতালি লভিতে যারা
যাত্রা করেছে দিগন্ত পারে-তারা কি হয়েছে হারা ?
শুকতারা মাঝে শুনেছে যাহারা প্রভাত-রবির বাণী,
দৃষ্টি তাদের ব্যর্থ হয় নি জানি।
নামহারা সেই সূর্য্য-সেনার ইতিহাস রাখ লিখে।
অভিযাত্রিক, অভ্যুদয়ের মন্ত্র নাও রে শিখে।
উদয়-অচলে জাগে অরুণিমা, কনক-কিরণ ভাতি।
তামস-তন্দ্রা ভাঙিয়া জেগেছে মুক্তি-পাগল জাতি।
কত রক্তের ঢেউ বহে গেছে, ধ্বংসের দাবানল,
জাগাতে চেতন কেতনসমেত মুছে গেছে কত দল!
তারা কি হয়েছে হারা ?
রক্তবীজের কল্প গুপ্ত, নহে ত লুপ্ত ধারা।
অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ার কাছে
শত শহীদের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া আছে।
প্লাবন এসেছে, জোয়ার এসেছে, উঠিয়াছে কালো ঢেউ।
কত তরী গেল তলিয়ে অতলে, হিসাব জানে কি কেউ ?
তবু দলে দলে চলে আজো কারা আলোর তীর্থ পানে,
না জানি সে কোন্ অমৃতের সন্ধানে ?
কাটিয়া নগর, সেচিয়া সাগর, লঙ্ঘি শৈলমালা
মরু-মেরু-পারে চলে হাসিমুখে সহিয়া অসহ জ্বালা ;
রক্তে তাদের লাল হয়ে গেল কত গিরি-দরী-মাঠ ;
রক্তের লেখা ইতিহাস মোরা করি বার বার পাঠ।
ভুলি নি তাদের দান
"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেছে যারা জীবনের জয়গান।"
বোবা মানুষের না-বলা-বুকের বাণী
তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে জানি।
সয়ে গেছে তারা কঠোর শাসন, অসহ অত্যাচার।
বরে নিল কারাগার।
তারা হয়ে আছে অস্ত্রের সব্যসাচী।
মানুষ হয়েও চলে গেছে প্রায় দেবতার কাছাকাছি।
আলোকের অভিসারে
সূর্য্য-সেনানী দলে দলে চলে যুগে যুগে বারে বারে।

ছত্রভোগ

শ্রীকালিদাস দত্ত

পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে যে সকল প্রাচীন স্থান আছে ছত্রভোগ তন্মধ্যে অন্যতম। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে সেখানে একরাত্রি কীর্ত্তনানন্দে যাপন করেন। সেকারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকটও উহা একটি তীর্থক্ষেত্রবিশেষ।

আদিগঙ্গাতীরে ছত্রভোগ ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ

অধুনা ঐ স্থানটি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার মধ্যে একটি সামান্য পল্লীরূপে অবস্থিত, কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতাদি পুরাতন বাংলা গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে উহা আয়তনে অনেক বড় ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং এখন উহার উত্তরে জলঘাটা ও দক্ষিণে কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কাটানদীঘি, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর প্রভৃতি যে সকল গ্রাম আছে সেগুলিকেও লোকে তখন ছত্রভোগ বলিত। অধুনা কাশীনগরের প্রায় তিন-চার ক্রোশ দক্ষিণে, ২২ নম্বর লটের শেষ সীমায়, ছুতরভোগ নামে একটি নদী আছে। পূর্ব্বে উহারও নাম ছিল ছত্রভোগ নদী।* উহা হইতে বোধ হয় প্রাচীনকালে দক্ষিণে ঐ নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ ছত্রভোগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

(১) ভগ্ন কুবেরমূর্ত্তি (ছত্রভোগ)

উল্লিখিতরূপ বিস্তীর্ণ ছত্রভোগ নগরের সমৃদ্ধির কারণ ছিল উহার উত্তর ও পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গা নদী। উহার শুষ্ক খাদ এখনও সেখানে মজাগঙ্গা বা গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কতকগুলি মনসার ভাসান ও চণ্ডীর গানের পুথি হইতে জানা যায়

* ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত এলিসনের সুন্দরবনের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। উহাতে ঐ নদীর নাম ছতরভোগ লিখিত আছে। উক্ত ছতরভোগ যে ছত্রভোগের নামান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহার বর্ত্তমান নাম ছুতরভোগ ঐ ছতরভোগ নামেরই অপভ্রংশ।

যে, প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর উপর ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধ বন্দর রূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লোকে তখন ভাগীরথী-পথে ঐ স্থান দিয়াই সমুদ্রে যাতায়াত করিত।

(২) গরুড়মূর্ত্তি (ছত্রভোগ)

ছত্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে আসিবার পূর্ব্বেও যে সেখানে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল তাহা জানা যায় সেখানকার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত পাল ও সেন রাজগণের আমলের অনেকগুলি কালো প্রস্তরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং কয়েকটি কারু-কার্য্যমণ্ডিত দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি হইতে। উহাদের মধ্যে একটি কুবের ও একটি গরুড় মূর্ত্তির চিত্র এখানে প্রকাশিত হইল (চিত্র ১ ও চিত্র ২)।

২২ নম্বর লট বকুলতলায় ও দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণসেন দেবের যে দুইখানি তাম্রপট্টে খোদিত ভূমিদান সনন্দ পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, সেন-রাজত্বকালে শাসন-সৌকর্য্যার্থ আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থান বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড চতুরকের অধীন ছিল (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঐ প্রদেশের তৎকালীন অন্যান্য বিবরণ অজ্ঞাত। উহার পরবর্ত্তী পাঠান সুলতানদের শাসন সময়ের তথাকার সামান্য পরিচয় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। উহাতে উল্লিখিত আছে যে, সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে) রামচন্দ্র খাঁ নামক এক ব্যক্তির উপর দক্ষিণ-বঙ্গের শাসনভার ন্যস্ত ছিল এবং তিনি ছত্রভোগে থাকিতেন।

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায় যে, তৎকালে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অধীনে অনেক হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দবির খাস বা রূপগোস্বামী, সাকার মল্লিক বা সনাতন গোস্বামী ও পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। অধুনা ছত্রভোগের প্রায় বার ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সোনারপুর থানার অধীন মাহীনগর নামে একটি গ্রাম আছে। প্রবাদ, ঐ সময় সেখানে উপরোক্ত গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর নিবাস ছিল। তিনি হোসেন শাহের উজীর ছিলেন, তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের উপাধি খাঁ ছিল।* ছত্রভোগের শাসনকর্ত্তা চৈতন্যভাগবতোক্ত রামচন্দ্র খাঁ কে ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ কোথাও নাই। তিনি উক্ত পুরন্দর খাঁর বংশের কেহ হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ছত্রভোগ নগরের স্থান এখন জলঘাটা, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর ও বড়াশী প্রভৃতি নামে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম অধিকার করিয়া আছে। ঐ সমস্ত গ্রামেই ভূগর্ভ খননকালে কিছু কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক প্রাচীন গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং কয়েকটি দেবতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছত্রভোগে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ও বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কতকগুলি

১ বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন বাংলা-পুথিতেও ঐ দেবতা দুইটির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর কিছুদিন পূর্ব্বে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দেবীর যন্ত্র-মূর্তিটি রাখিয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (চিত্র ৩)। এই নবনির্ম্মিত গৃহের পশ্চাতে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নভিত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। উহার সংলগ্ন ভূখণ্ড খননকালে একটি কালো প্রস্তরের নৃসিংহ মূর্ত্তি, একটি শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি চতুষ্কোণ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে।

(৩) ত্রিপুরাসুন্দরীর বর্ত্তমান মন্দির (ছত্রভোগ)

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে উক্ত গ্রন্থের নায়ক ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ছত্রভোগের উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর যে উল্লেখ আছে তাহা এই:

"বালীঘাটা এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥
তীরের প্রমাণ যেন চলে তরিবর।
তাহার মেলানি বহে মাইনগর॥
নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিল সদাগর॥"

ছত্রভোগে ঐ সকল দেবালয় থাকায় উহা তৎকালে একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও গণ্য হইত। সেকারণও হিন্দুগণ ভাগীরথী-পথে সমুদ্রে যাইবার সময় সেখানে নামিয়া তীর্থকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন ও বদরিকা কুণ্ডের জল নৌকায় লইতেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী তাঁহার মনসার ভাসানে উহার এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন:

"কালীঘাটে চাঁদরাজা কালীকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
* * *
ফুলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥
তীর্থকার্য চাঁদরাজা করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডজল লইল নৌকায়॥"*

ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে পূর্ব্বোল্লিখিত বড়াশী গ্রামে উক্ত বদরিকানাথ বা অম্বুলিঙ্গের বর্ত্তমান মন্দির ভাগীরথীর শুষ্ক খাদের পশ্চিমে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত (চিত্র ৪)। সেখানেও একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ উক্ত উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে নিহিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ কালো প্রস্তরের গৌরীপট্ট পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা অম্বুলিঙ্গের প্রাচীন মূর্ত্তির অঙ্গীভূত ছিল।

অম্বুলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপে উল্লিখিত আছে।

"অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হই এক চিত্ত॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মরইয়া॥

* বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান ছাপা হয় নাই। উহার দুইখানি পুরাতন নকল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় আছে। উক্ত পুথির বিশদ পরিচয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে: সন ১৩৪৩ সাল, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৭

গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা॥
* * *
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ব্বজনে।"*

ইদানীং অম্বুলিঙ্গের মন্দিরের সন্নিকটে ভাগীরথীর শুষ্ক খাদের উপর চক্রতীর্থ নামে একটি তীর্থস্থান আছে। প্রবাদ,

(৪) অম্বুলিঙ্গের বর্ত্তমান মন্দির (বড়াশী)

ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া যাইতে যাইতে সেখানে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সেকারণ গঙ্গাদেবী তথায় ভগীরথকে তাঁহার হস্তস্থিত চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দ্দেশ করেন।

প্রাচীনকালে উক্ত তীর্থ টিও প্রসিদ্ধ ছিল। বরাহ-পুরাণে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।† অধুনা ভাগীরথীর শুষ্ক খাদের উপর ঐ তীর্থস্থানটি গোপালকুণ্ড, চক্রকুণ্ড ও মণিকুণ্ড নামে তিনটি পুষ্করিণীরূপে বিদ্যমান। ঐ পুষ্করিণী কয়টিতে স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নন্দার মেলা নামে একটি বিখ্যাত মেলা হয়। প্রাচীনকাল হইতে যে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা জানা যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যের এই অংশ হইতে :

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান, নাহি যার উপমান,
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাদ্য বাজে সুমধুর, বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর,
জয়নগর করিলা পশ্চাৎ।"

চৈতন্যভাগবত পাঠে আরও জানা যায় যে ছত্রভোগের দক্ষিণে গঙ্গা বহু শাখায় বিভক্ত ছিল বলিয়া তখন শতমুখী গঙ্গা নামে অভিহিত হইত এবং উক্ত অম্বুলিঙ্গের মন্দিরের নিকটে গঙ্গার উপর অম্বুলিঙ্গ নামে একটি প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। যথা—

"সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্ব্বলোকে করে সুখী।
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ব্বজনে।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে ছত্রভোগে এক রাত্রি অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে উহার পরিচয় আছে। উহাতে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমে শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া আটিসারা গ্রামে আগমন করেন।* সেখানে অনন্ত পণ্ডিত নামে একজন বৈষ্ণব ভক্তকে কৃপাকরতঃ গঙ্গাতীর অবলম্বনে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ছত্রভোগে উপনীত হন। বৃন্দাবন দাস ঐ সময় তাঁহার ঐরূপে ছত্রভোগে আগমনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :

"নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সর্ব্বপথ আপনা পাসরি॥
কারে বলি রাত্রিদিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ওপার॥
কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে দেহ রহি চারিপাশে॥
* * *
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে।"

এইভাবে গঙ্গাতীর অবলম্বনে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সহ ছত্রভোগে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অম্বুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হন এবং তথা হইতে শতমুখী গঙ্গা দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া হরিধ্বনিতে সেই স্থান মুখরিত করেন :

* চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

† বরাহপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ), ১৩০ অধ্যায়

* বর্ত্তমান বারুইপুর বাজারের দক্ষিণে উক্ত আটিসারা পল্লী ভাগীরথী তীরে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থান সেকারণ মহাপ্রভুর বাটি নামে প্রসিদ্ধ। অনন্ত পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন দারুময় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ মূর্ত্তি এখনও সেখানে বর্ত্তমান আছে।

"ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে।
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরিধ্বনি হুঙ্কার করেন কোলাহল।"

ঐ সময়ের কিছু পরে দক্ষিণদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র খাঁ দোলা চড়িয়া অম্বুলিঙ্গ ঘাটের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিতে পান এবং দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনের আশায় অধীর হইয়া ভূমিতে পতিত ও ক্রন্দনরত ছিলেন। সেই করুণ দৃশ্য রামচন্দ্র খাঁকে এরূপ বিচলিত করিয়া তুলে যে, তিনি তাহা দেখিয়া কি উপায়ে তাঁহাকে শান্ত করিবেন এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠেন। বৃন্দাবন দাস উহা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

"আনন্দ আবেশে প্রভু সর্ব্বগণ লইয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হইয়া।

*　　*　　*

সেই গ্রামে অধিকারি রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান।
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে।
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হইলা মনে।
দোলা হইতে সত্বর নামিলা সেই ক্ষণে।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ জলে।

*　　*　　*

হাহা প্রভু জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হইল সজ্জনের প্রাণ।
কোনমতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন।"

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ অতীত হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়। তিনি রামচন্দ্র খাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তথায় সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট হইতে তাঁহাকে দক্ষিণদেশের অধিকারী বলিয়া জানিতে পারেন। তখন

(৫) নীলকুঠি, কাটানদিঘী (উত্তরদিক)

"প্রভু বলে তুমি অধিকারি বড় ভাল।
নীলাচলে যাই আমি কেমতে সকাল।
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচলচন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে।"

ঐ সময় গৌড়ের সুলতানের সহিত উৎকল-রাজের কলহ চলিতেছিল। সে কারণ গৌড়রাজ্য হইতে কাহাকেও উৎকলে যাইতে দেওয়া হইত না এবং উভয় রাজ্যে লোক যাতায়াত বন্ধ ঘোষণা করিয়া চারিদিকে ত্রিশূল প্রোথিত হইয়াছিল।* এইরূপ রাজাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তৎকালে রামচন্দ্র খাঁ শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলেন :

"যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
তবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়।
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে।
কোনদিক দিয়া বা পাঠাই লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাই প্রভু শুন মন দিয়া।
মুঞি সে নফর হেথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার।

* ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল-রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের সহিত গৌড়-সুলতান হোসেন শাহের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এখানে সম্ভবতঃ তাহারই কথা উল্লিখিত আছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তথাপিহ যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়।"

রামচন্দ্র খাঁর এই সকল বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দিত হন এবং সেই রাত্রি ছত্রভোগে এক ব্রাহ্মণগৃহে থাকিয়া রাত্রির অধিকাংশ ভাগই সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। ছত্রভোগবাসিগণ তখন সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর, তাঁহার লাবণ্যময় সুন্দর দেহে কম্প ও পুলকাদি মহাভাবের বিচিত্র বিকাশ ও পদ্মপলাশলোচনদ্বয়ে অদ্ভুত প্রেমাশ্রুপাত দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সেই কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করেন। চৈতন্যভাগবতকার ঐ সময়ের যে সুন্দর আলেখ্য রচনা করিয়াছেন তাহা এই:

"দৃষ্টিমাত্র তাঁর সর্ব্ব বন্ধক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি।

* * *

নানাযত্নে দৃঢ় ভক্তিযোগ চিত্ত হইয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া।

* * *

নিত্যানন্দ আদি সর্ব্ব প্রিয়বর্গ লইয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি।

* * *

মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে।
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী।
অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম।
কিবা সে নয়নের অদ্ভুত প্রেমধার।
ভাদ্র মাসে যে হেন গঙ্গার অবতার।

* * *

এই মত গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান।"

ঘাটে নৌকা আসিবার এই সংবাদ পাইবামাত্র শ্রীচৈতন্যদেব সপারিষদ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গার তীরে উপনীত হন এবং নৌকাতে আরোহণপূর্ব্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায়, মুসলমান রাজত্বকালের প্রথম ভাগেও ছত্রভোগে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যের ছত্রভোগ হইতে নীলাচল গমনের উক্ত বিবরণের পরবর্ত্তী অংশে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের পূর্ব্বেই ছত্রভোগের দক্ষিণাংশ প্রদেশ বনময় হইয়া গিয়াছিল। সেহেতু বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে, ছত্রভোগের দক্ষিণে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণ নৌকাতে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে মাঝি তাঁহাদের উহা বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন:

"বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়।
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পালায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়।
নিরন্তর এই পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধনপ্রাণ দুই নাশ করে।
এতেক যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাই।"

মুসলমান আমলের শেষভাগে কিজন্য ছত্রভোগের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং উহা একটি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যবসিত হয় তাহা অজ্ঞাত। প্রবাদ, ভাগীরথী নদীর অন্তর্ধান ও মগ, পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারই উহার কারণ। পরে সেখানে নীলকরেরাও ঘাঁটি স্থাপন করে। উহার নিদর্শন-স্বরূপ অনেকগুলি নীল প্রস্তুত করিবার গৃহ ও চৌবাচ্চার ধ্বংসাবশেষ এখনও ছত্রভোগ ও কাটান দীঘিতে দেখিতে পাওয়া যায় (৫ চিত্র)।

মালাবারে ওনাম উৎসব

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

মালাবার এক বিচিত্র দেশ। প্রাচীন ধরণের রকমারি পূজা-পার্বণ, উৎসবাদি আজও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। মালাবারের ওনাম উৎসব তত্রত্য জনপদবাসীর সমাজ-জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতি বৎসর এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র জনপদ আনন্দে মাতিয়া উঠে। এই উৎসব সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ :

সে আজ অনেক দিনের কথা। মহাবলী তখন মালাবারের সিংহাসনে সমাসীন। মহাবলীর রাজত্বকাল মালাবারের জাতীয় জীবনের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। প্রজাগণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করিতেছে। রাজ্যের সর্বত্র এক মহতী শান্তি বিরাজিত। প্রজাগণের ধন-প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত নয়। সমস্ত জনপদ প্রাচুর্য্য-সম্ভারে স্ফীতকায়। মহাবলী দৈত্যকুলোদ্ভব। দেবাসুরের মধ্যে সদ্ভাব কোনকালেই ছিল না। তাই দৈত্যেশ্বর মহাবলীর সুযশঃ এবং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেবগণের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল। আরম্ভ হইল দেবতামণ্ডলীর মধ্যে ষড়যন্ত্র। অবশেষে মহবলীর ক্রমবর্ধমান শক্তি খর্ব করিবার নিমিত্ত তাঁহারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করিয়া বিষ্ণুর নিকট সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। মদগর্বে স্ফীত দৈত্যাধিপকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য তাঁহারা সমবেতভাবে বিষ্ণুকে অনুরোধ জানাইলেন। ভগবান বিষ্ণু স্মিতমুখে দেবতামণ্ডলীকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

অবশেষে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম হইল বামনরূপী ভগবান বিষ্ণুর। ইহা ভগবানের পঞ্চম-অবতার। বালকের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। অদিতির স্নেহ-নীড়ে বর্ধিত হইতে থাকে নররূপী নারায়ণ।

এক দিন বামনরূপী ভগবান মহারাজাধিরাজ মহাবলীর নিকট উপনীত হইলেন। বামনের মাধুর্য্যমণ্ডিত অপরূপ সৌন্দর্যে দৈত্যরাজ মুগ্ধ হইলেন। তিনি বামনকে অতি সমাদরে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন, বামনের মধুর বাক্যালাপে তিনি সবিশেষ মোহিত হইলেন। অধিকন্তু বামনের মনোমত প্রার্থিত বস্তু প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। তখন ছদ্মবেশী স্মিতহাস্যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। মহাবলী কিছু-মাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কি আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে বামনের ক্ষুদ্রাবয়ব বিরাট আকার ধারণ করিল। বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু দুই পায়ে স্বর্গ এবং মর্ত অধিকার করিয়া বাকী তৃতীয় পদের জন্য ভূমি প্রার্থনা করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া দৈত্যেশ্বর মহাবলী স্বীয় মস্তকে বামনের তৃতীয় চরণ ধারণ করিলেন। অতঃপর ভগবান তাঁহাকে পাতালে বসবাস করিতে আদেশ করিলেন। প্রজাবর্গ পিতৃসদৃশ রাজাকে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহাদের ক্রন্দন বামনের হৃদয় স্পর্শ করিল। প্রতিবৎসর একবার করিয়া মহাবলী পাতালপুরী হইতে মর্তধামে তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবেন বলিয়া ভগবান প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহাবলীর এই প্রত্যাবর্তন সাধারণতঃ আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে হইয়া থাকে।

দৈত্যাধিপতি মহাবলীর প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট জাঁকজমক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই মালাবারের 'ওনাম উৎসব' নামে অভিহিত। এই উৎসব অল্পকাল স্থায়ী হইলেও সমস্ত জনপদবাসী এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। অল্প সময়ের জন্য যে সমারোহ সেখানে প্রদর্শিত হয় তাহা দর্শকমাত্রেরই এক পরম বিস্ময়ের বস্তু।

মালাবারের উক্ত উৎসবকাল সর্বত্র সমান নহে। স্থান-বিশেষে এই উৎসব চার-পাঁচ দিন, এমন কি ছয় দিন পর্যন্তও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে 'তিরুবনম্' দিবসের দশ দিন পূর্ব হইতেই ইহা সুরু হইয়া থাকে। এই দিবস প্রত্যেক গৃহস্থ স্ব-স্ব গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান হয়। এই কার্যের ভিতর দিয়া 'ওনাম উৎসবে'র আগমন সূচিত হইয়া থাকে। গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ চত্বরের কিছু অংশ এবং বসতবাটীর ভিতর গোবর জলের দ্বারা প্রতিদিন নিকানো হয়। এই পরিষ্কৃত জায়গা বিভিন্ন ধরণের পাখী এবং জীব-জন্তুর মূর্তি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এই মূর্তিগুলি ফুলের তৈয়ারী ; ইহার নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে বেশ একটা শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মালাবারের কোন কোন স্থানে 'তিরুবনম্' দিবসের তিন-চার দিন আগেই 'ওনাম উৎসব' সুরু হইয়া থাকে। তবে 'তিরুবনম্' দিবসেই সত্যিকারের উৎসব আরম্ভ হয়। প্রত্যেক ভদ্র তরবার (Tarawad) পরিবারে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এবং ভৃত্যবর্গকে পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার-স্বরূপ দেওয়া হয়। ইহা 'ওনাম উৎসবে'র আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়। ছোটবড় সমস্ত নর-নারী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদে

সুসজ্জিত হইয়া জনগণ উৎসব-আনন্দে মত্ত হয়। আঠালো মাটির দ্বারা এক অদ্ভুত ধরণের মূর্তি তৈয়ারী করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ফুলগাছের ডালপালা, বিশেষ করিয়া বাঁশ এই-সব মূর্তির মস্তকের উপর স্থাপিত হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত মূর্তিগুলি সদর জায়গায় রাখা হয়। এই সব জায়গা গোময় দিয়া লেপন এবং আলপনার দ্বারা চিত্র-বিচিত্রিত করা হয়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মূর্তিগুলির যথাবিহিত পূজা-অর্চনা হইয়া থাকে। পূজা না হওয়া পর্যন্ত কেহই জল গ্রহণ করে না। পূজার শেষে সকলে প্রসাদ পাইয়া থাকে। উৎসবের কয়দিন নিয়মিত ভাবে এই পূজা-অর্চনা চলিতে থাকে। এই সকল দেবমূর্তি 'তৃক্কক্করর অপ্পন্' নামে অভিহিত। তিরুবনম্ দিবসের আগের দিন এই সমস্ত বিগ্রহ গৃহে আনীত হয়। বিগ্রহগুলি যথাস্থানে স্থাপিত হইলে সমবেত জনতা সমস্বরে এক ধরণের উচ্চ ধ্বনি করিতে থাকে। ইহা দ্বারা 'ওনাম উৎসবে'র আগমন ঘোষিত হয়।

এই ওনাম উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন নাচ-গান, ভোজ, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি হরদম চলিতে থাকে। ভোজ্যবস্তুর মধ্যে কাঁচকলার বিশেষ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এইগুলি দুই-তিন টুকরা করিয়া জলে সিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধ করা কাঁচকলা অন্যান্য ভোজ্য সামগ্রীর সহিত অতি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ পৃথকভাবে এক জায়গায় বসিয়া আহার করে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর্ব সমাধা হইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল-খুশী অনুসারে বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করে। উদয়াস্ত ফুটবল, দ্বৈরথ, দাবা-পাশা ও তাসখেলা, নাচগান প্রভৃতি চলিতে থাকে। প্রধানতঃ মেয়েরাই নাচ-গানে প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

ওনাম উৎসবের শেষদিন সন্ধ্যার সময় পূর্বোক্ত দেবমূর্তি-গুলিকে স্থানান্তরিত করিতে হয়। কিন্তু শুভদিন দেখিয়া এই অপসারণের কাজ করা হয়। উৎসবের শেষদিন, এমন কি তাহার পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে কোন ভাল দিন না থাকিলে মূর্তিগুলিকে স্থানান্তরিত করা যায় না। ফলে উৎসব-আনন্দ বন্ধ করা হয় না। নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় পূর্ববৎ চলিতে থাকে। এই মূর্তি অপসারণের সময় যথেষ্ট জাঁক-জমকের অনুষ্ঠান হয়। তবে এই সময় হৈ-হুল্লোড়ের পরিবর্তে একটা সুমহান্ গাম্ভীর্যের পরিবেশ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আগামী বৎসরে যাহাতে দেবতার পুনরাগমন হয় তজ্জন্য জনগণ আকুল হৃদয়ে মূর্তিগুলির নিকট প্রার্থনা জানায়।

বর্ষারাতে

শ্রীকালিদাস রায়

রাত ক'টা, কেবা জানে ঘড়িটা ত বন্ধ,
অন্ধকারের মাঝে দু'জনেই অন্ধ।
বাহিরেতে ঝুপঝাপ অবিরল বৃষ্টি,
আর কোন সাড়া নেই, ভেসে গেল সৃষ্টি ?
লুপ্ত হইয়া গেছে বুঝি সারা ধরণী,
আমাদের খাটখানা হইল কি তরণী ?

তুমি আমি দুই জনে প্রলয়ের তুফানে
চলেছি ভাসিয়া যেন কোথা কেন কে জানে ?
অতীত ও অনাগত এ পাথারে লুপ্ত,
আর কভু জাগিবে কি এ ধরণী সুপ্ত ?
মহাকাল সিন্ধুতে যাই মোরা ভাসিয়া,
যুগে যুগে দেশে দেশে যেন ভালবাসিয়া।

মোদের এ তরী যেন কোনখানে ভিড়ে না,
যাক সেথা, যেথা হতে কোন তরী ফিরে না।

বাহিনীর লোকেদের বন্দুক-চালনা অভ্যাস
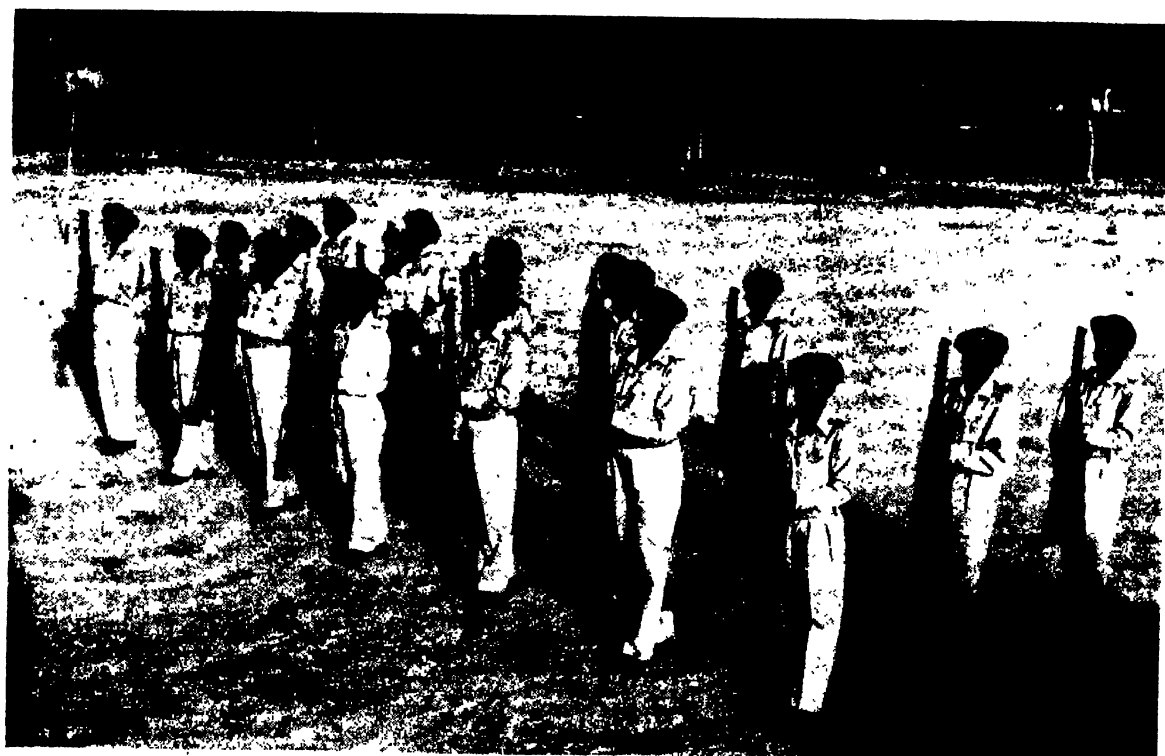
আঞ্চলিক বাহিনীর একটি বিভাগের লোকেদের হাতিয়ার সহ ড্রিল শিক্ষা

একটি মাত্র তোরণসম্বলিত ৩নং সাঁচি স্তূপ । এই স্তূপেই সারিপুত্ত এবং মহামোগ্গল্লানের ভস্মাবশেষ আবিষ্কৃত হয়

কেনিয়ার নাইরোবিতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বন্দীকৃত আফ্রিকানদের ট্রাকে আরোহণ

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

২১

পাটলডাঙ্গা হোষ্টেলের সেই পরিচিত ঘরটিতে পুরাতন দলের মধ্যে এখন শুধু মহেন্দ্র থাকে। দেবানন্দের আর কোন খবর পায় না সে। ভবেশ হোষ্টেল ছাড়িয়া তাহার বড় মামার বাড়ীতে উঠিয়াছে। ঘরজামাই হইয়া নির্ম্মল হোষ্টেল ছাড়িয়াছে। ঘরে নূতন একজন ছেলে আসিয়াছে হরিশ। হরিশ হোষ্টেলের পুরাতন ছেলে, ঘর বদল করিয়া মহেন্দ্রের ঘরে আসিয়াছে।

মাঝখানে এক দিন মহেন্দ্রের সঙ্গে বরিশালের অতুলের দেখা, সঙ্গে যতীন মাষ্টার নামে একজন লোক। অতুল পরিচয় দিয়া বলিল দেবানন্দের গ্রাম রাজনগরের স্কুলে ইনি এসিষ্টান্ট হেড মাষ্টার ছিলেন। অতুল ও মাষ্টার দুই জনেই জামালপুরে পুলিসের হাতে পড়িয়াছিল। উভয়ের মাথায় লম্বা চুল ও কাঁধে বৈরাগীদের মত ঝোলা দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করায় অতুল বলিল তাহারা ভেক লইয়াছে, কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করায় হাসিয়া বলিল—শ্রীধাম ব্রজধামে চলেছি।

ভবেশ এক দিন দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে। সে বলিল, এবার দেশ ছাড়ছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

মহেন্দ্র ভাবিল ভবেশ বড়লোক ছিল, এবার সাহেব লোক হইতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার মনটি চিরকাল নরম। সে বলিল, একে একে নিভিছে দেউটি, দেবুটা পালাল, একটা কথা জানাল না পালাবার আগে। তুমি হোষ্টেল ছেড়েছিলে, এবার দেশ ছেড়ে চললে। আমিও পালাব ঠিক করেছি।

ভবেশ বলিল, তুমি যাবে কোথায় ?

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, যাবার জায়গা ঠিক হয় নি। তাই ভাবছি পথে বেরিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাব।

তাহার কথা শুনিয়া ভবেশ হাসিল। দেবানন্দের সম্বন্ধে কথা উঠিল। ভবেশ তাহার সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাতের গল্প বলিল। তাহার দলের সম্বন্ধে কথা উঠিল। ভবেশ দুঃখ করিয়া বলিল দেবানন্দের মত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে নিজের জীবনটা মাটি করিল। এক সময়ে সে ভাবিয়াছিল তাহার ছোটমামার মেয়ে কিটির সঙ্গে দেবানন্দের বিবাহ দিয়া তাহার বিলাত যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

অন্যান্য আলাপের পর ভবেশ বিদায় লইবার আগে মহেন্দ্র বলিল, তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও। তুমি যাবার আগে একদিন দেখা করব।

স্যর ব্যামফিল্ড ফুলারের আমল হইতে স্বদেশীওয়ালা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর প্রকাশ্য সরকারী উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রকাশ্য জুলুমবাজির ফলে বাহিরে যখন নিন্দা রটিল তখন পূর্ব্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় মুসলমানরা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিবেশী হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার আরম্ভ করিল। কুমিল্লা, মৈমনসিং, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহীতে লুঠতরাজ, গৃহদাহ, হিন্দুনারী ধর্ষণ ও হরণ, হিন্দুদের ধর্ম্মান্তরকরণ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়াইয়া স্বদেশীওয়ালা ছাত্র, সম্পাদক, বক্তাদের শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হইল। এই দুইমুখো অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কোন কোন স্থানে। সরকারী পদ্ধতির আবার পরিবর্ত্তন হইল। দেখা গেল সরকারের শান্তিরক্ষক পুলিসবাহিনী আবরু সরাইয়া দিয়া প্রকাশ্যে লুঠতরাজ ও গুণ্ডাবাজি আরম্ভ করিয়াছে।

কলিকাতা বীডন স্কোয়ারের দাঙ্গার পরে মৈমনসিংহে এই ব্যাপার দেখা গেল।

ডিসেম্বর মাসে গোয়ালন্দে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনের উপর গুলি চলিয়াছিল। পুলিস আততায়ীদিগকে ধরিতে পারিল না। পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় আততায়ীদের সংবাদের জন্য ১০,০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ইস্তাহার বিলি হইল। এক দিন দেখা গেল মৈমনসিং শহরের বাড়ীর দেয়ালে ল্যাম্পপোষ্টে যে সকল ইস্তাহার লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার কয়েকখানা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ৩রা জানুয়ারী দ্বিপ্রহর রাত্রে পঞ্চাশ-ষাট জন মিলিটারী পুলিস আড্ডা ছাড়িয়া বাহির হইল ইহার প্রতিবিধানের জন্য। কয়েকটি দলে ভাগ হইয়া উচ্চতর কর্ম্মচারীদের অধীনে তাহারা একটির পর একটি করিয়া স্বদেশী জিনিসের দোকানগুলির দরজা ভাঙিয়া জিনিসপত্র লুঠপাট করিতে লাগিল। স্বর্ণকার এবং মিঠাইয়ের দোকানগুলিও তাহারা অবহেলা করিল না। দোকানের লোক কর্ম্মচারীর নিকট প্রতিবাদ করিলে উত্তর পাইল—"তোমরা কি উকিল, মোক্তার, ছাত্রদের রাজত্বে বাস কর, ভাবিয়াছ ?" লুঠনের সঙ্গে প্রহার চলিল। দোকানপাট ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের গৃহও লুণ্ঠিত হইল।

লুঠ আরম্ভ করিবার আগে বেলা ৪টার সময় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পুলিস সুহৃদ সমিতির আপিস ঘিরিয়া ফেলিয়া তল্লাসী করিল। চারুমিহির প্রেসে হামলা করিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিল। লুঠের পর দিন মিলিটারী শহরের রাস্তায় মার্চ্চ করিয়া পথচারীদের বেপরোয়া মারধর করিল। ৩রা, ৪ঠা, ৫ই, ৬ই মিলিটারী পুলিসের তাণ্ডব চলিল শহরের বুকে।

লুণ্ঠিত দোকানের মালিকরা কেহ কেহ কোতোয়ালীতে নালিশ করিতে গেল। তাহাদের হাঁকাইয়া দিয়া পুলিস কর্ম্মচারীরা বলিল, সমস্ত বাজার ও জমিদারদের বাড়ী লুঠ হবে, এখনই কি হয়েছে ?

পুকুরিয়ার জমিদারবাড়ীতে বহু লোক আশ্রয় লইয়াছিল, পুলিস সেখানে ঢুকিয়া তাহাদের পরনের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করিল। সুহৃদ সমিতি ঢাকা সাধনা সমাজ, জাশনাল স্কুল তল্লাসী হইল। ৯ই তারিখে শহরের উকিল ও মোক্তাররা মিলিয়া জেলা জজের কাছে দরখাস্ত করিলেন—আপিস আদালত বন্ধ দেওয়া হউক যাহাতে তাঁহাদের বাড়ী তল্লাসীর সময় তাঁহারা বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতে পারেন। সেশন আদালত বাদে সব আদালত বন্ধ করা হইল। শহরের অনেকে স্ত্রীপুত্র বাহিরে নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে লাগিলেন।

বন্দেমাতরম লিখিল পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নামিয়াছে। ভগবান জানেন তাহার ভাগ্যে কি আছে। লিখিল :

"The fearless march of Swadeshism in which East Bengal has taken the initiative marks her out for repression which may pass from phase to phase. If the tearing down of a police notice is punished by this sort of legalized hooliganism we do not know what is in store for East Bengal."

তারপর লিখিল :

"It is only human to retaliate undeserved and unprovoked insults and injuries."

(নির্ভীক স্বদেশী আন্দোলনের পথে পূর্ব্ববঙ্গ আগে পা বাড়াইয়াছে, তাই দমন-নীতির প্রকোপ সেখানে প্রবল। এই দমন-নীতির রূপান্তর হইতেছে। একখানি পুলিসের বিজ্ঞাপন ছিঁড়িবার শাস্তি যদি এই ধরণের পুলিসী গুণ্ডামি হয় তো পূর্ব্ববঙ্গের অদৃষ্টে কি আছে জানি না।...অযথা ও অকারণ অপমান এবং আঘাতের প্রতিশোধ লওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।)

ভূপেন্দ্রনাথ ও কর্ণেল ইউ. এন. মুখার্জ্জিকে লইয়া মৈমনসিংহে যে বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইল সেই কমিটির রিপোর্ট ও সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়িয়া লোকে বলিল, মৈমনসিংহে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

পিটুনি পুলিসের ট্যাক্সের ভারে বরিশালের বালকাঠি, উজিরপুর, বাউফল, কালাইয়া বন্দর, দাসপাড়ার স্বদেশীওয়ালা হিন্দু অধিবাসীরা নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। মৈমনসিংহে জামালপুর, বাহাদুরাবাদ, দেওয়ানগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ, নলিতাবাড়ী, বনগাঁ, কামারের চর, পেজিনা, হোসেনপুর, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া, কালিয়া বাজার, গৌরীপুর, পূর্ব্বধলা প্রভৃতি গ্রামে দুর্ব্বহ পিটুনি পুলিসের ট্যাক্সের সঙ্গে কাউ-স্বরূপ নানা প্রকারের অত্যাচার হিন্দু স্বদেশীওয়ালাদের উপর চলিতে লাগিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় পুলিস নিয়ম করিয়া প্রতি সপ্তাহে কয়েকজন করিয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোককে মহকুমা হাকিমের কোর্টে চালান দিত এই অভিযোগে যে, জোর করিয়া মুসলমানদের বিলাতী জিনিস বয়কট করাইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহারা শান্তিভঙ্গ করিতে পারেন।

সেদিন লজপত রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া গোলদীঘিতে সভা হইয়াছিল। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতায় বাংলার রাজনৈতিক প্রোগ্রাম কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য লালাজী ও পঞ্জাবী ভ্রাতাদের সাহায্য চাহিলেন। লালাজী উত্তরে বলিলেন :

"The Bengalis are the leaders of political thought in India and they have shown great courage and more great self-sacrifice in the political field."

(বাঙালীরা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তার নায়ক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা বিশেষ সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন ও প্রভূত আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।) পঞ্জাবীরা বাঙালী ভ্রাতাদের যথাশক্তি সাহায্য করিবে, তিনি আশ্বাস দিলেন।

লালাজী ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে দেখিবার জন্য সভায় অসংখ্য ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র হোষ্টেলের কয়েকজন ছেলের সঙ্গে সভায় আসিয়াছিল। ভিড়ে কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র এক জায়গায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আশেপাশের লোকের গোলমালে বিশেষ কিছু শুনিতে পাইতেছিল না। সে শুনিল একটি ছেলে বলিতেছে, বরিশালের স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাসকে পুলিসে ধরেছে শুনছি। মুকুন্দ দাসের যাত্রা শুনেছিস ? 'আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদীপ্ত মূর্ত্তিমান।' আবৃত্তি একটু জোরে হইয়াছিল। পাশের একজন বয়স্ক লোক ধমকাইয়া বলিলেন, গোড়া থেকে ছুটোতে বকবক করছ। এবার একটু থাম, লালাজী কি বলছেন শুনি। ধমক খাইয়া ছেলে দুইটি চটিয়া গেল। একজন বলিল, কি থাম থাম করছেন মশায় ? এটা কি স্কুল না কলেজ ? শ্রোতাদের কেহ এপক্ষ কেহ ওপক্ষ লইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল। গোলমাল বাধিয়া উঠিল জায়গাটাতে।

বক্তৃতা শুনিবার আশা ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া ফাঁকা জায়গায় আসিল। গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া মহেন্দ্র কি ভাবিতেছিল হঠাৎ তাহার মনে পড়িল অনুশীলন সমিতির আপিসে তাহার একটা খোঁজ লইবার জন্য যাইবার কথা ছিল।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সমিতির আপিসে পৌঁছিয়া সে দেখিল আপিস-ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েকজন যুবক আলোচনা করিতেছে। মহেন্দ্র শুনিল একজন বলিতেছে—ইষ্ট বেঙ্গলে সকল জেলায় বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল করে দিচ্ছে। কি মতলব বল দেখি।

দ্বিতীয় যুবক বলিল, ফরিদপুর আর রংপুরের ব্যাপারের পর গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের হাতে বন্দুক রাখতে ভরসা পাচ্ছে না বোধ হয়। ফরিদপুরে গুর্খা ও বাঙালী ছেলেদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। কয়েকজন গুর্খাকে নাকি হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। রংপুরে রেগুলেশন লাঠি হাতে পুলিস এক স্বদেশী মিটিঙে চড়াও করতে যায়। লাঠি হাতে ভলাণ্টিয়াররা পাহারা দিচ্ছিল। লাঠি-বাজি করতে গিয়ে মার খেয়ে পুলিসকে হটে আসতে হয়েছে।

তৃতীয় যুবক বলিল, এখানেও ঠ্যাঙানি সুরু হয়েছে। কতক-গুলো রাস্তায় মোটর হাঁকিয়ে চলতে আর সাহস পায় না টিলের

জয়ে। সেদিন বড়লাটের গাড়ীতেও নাকি ঢিল পড়েছিল। ট্রামে, পথে ঘাটেও বাছারা চড়চাপড়টা, ধাক্কাটা খাচ্ছে।

প্রথম যুবক—তা খাচ্ছে, কিন্তু উল্টে দিচ্ছে ছুররা ও বুলেট সেটা মনে রেখ। কাকিনাড়ার মিলে ইংরেজ কর্ম্মচারী ও মজুরদের মধ্যে মারামারি লাগলে সাহেবরা বন্দুক, রিভলবার বের করে গুলি চালিয়েছে।

তৃতীয় যুবক—পাল্টা বুলেটও পাবে তারা।

ঘরের মধ্য হইতে একজন ডাকিলেন—সুরেশ!

প্রথম যুবক, তাহার সঙ্গী দুই জন ও মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুরেশ নামে যে যুবকটিকে একজন ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন সে বলিল, বঙ্গবঙ্গ সমিতির সম্বন্ধে যে খবর চেয়েছিলেন সেটা পেয়েছি। এই সমিতি স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আর্বিট্রেশন কোর্ট করেছে। ইংলিশম্যান গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করেছে এই জাতীয় সিডিশাস সমিতি সম্বন্ধে।

অনুশীলন সমিতির আপিসে কাজ করিয়া বাহির হইয়া কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া মহেন্দ্র ভাবিল এখন কি করা যায়। হোষ্টেলে ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিবে স্থির করিয়া সে এসপ্লানেডগামী ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

ট্রামে উঠিয়া যে সীটে সে বসিল তাহার সম্মুখের সীটে দুই জন ভদ্রলোক উত্তেজিত স্বরে কি আলোচনা করিতেছিলেন। এই আলোচনার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল ভদ্রলোক দুই জনের একজনের পরনে দেশী পোষাক, অপরের ইংরেজী পোশাক এবং তাঁহার বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তিনি বলিলেন, বোম্বের মিলওনারদের কথা বলছেন? আপনাদের স্বদেশী আন্দোলনের যতটা ক্ষতি ওরা করছে ইংরেজও ততটা করে নি। বিলাতী কলওয়ালারা কাপড়ের দাম অনেক কমিয়ে দিয়েছে আর বোম্বে-ওয়ালারা চড়া দাম আরও চড়িয়েছে। গরীব লোকেরা ইচ্ছা না থাকলেও বিলাতী কাপড় কিনতে বাধ্য হচ্ছে দামের জন্য। বাঙালীরা পুলিসের লাঠি খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, জরিমানা দিচ্ছে, বয়কট আন্দোলন চালিয়ে আর ওঁরা বাঙালীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন। লোকে বলে গরীবের মুখ চেয়ে, স্বদেশী আন্দোলনের খাতিরে কাপড়ের দাম কমিয়ে দেওয়া উচিত ওদের। বয়ে গেছে ওদের। বাঙালীর পেট্রিয়টিজম এক্সপ্লয়েট করে ওরা পকেট ভর্ত্তি করছে।

প্রথম ভদ্রলোকটি বলিলেন, ম্যানচেষ্টারকে বাঁচাবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বোম্বে কলের কাপড়ের উপর যে চড়া ডিউটি বসিয়েছেন তার ফলে বোম্বেওয়ালারা লাল বাতি জ্বালবার যোগাড় করেছিল। 'ডিউটির' ফলে চায়নার বাজার ওদের হাতছাড়া হয়ে গেল জাপানী কাপড়ের সঙ্গে কম্পিটিশনে। বোম্বেওয়ালাদের চায়না থেকে তাড়াবার জন্য জাপানী গবর্ণমেণ্ট জাপান মার্চেন্টদের মোটা রকমের সাহায্য করতে লাগল। এই অবস্থায় বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। যারা বাঁচিয়ে দিল তোদের একটু কৃতজ্ঞতা দেখা তাদের প্রতি।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া বলিলেন, কৃতজ্ঞতা? ও সব বাজে সেন্টিমেন্ট বোম্বেওয়ালাদের ধাতে নেই।

মহেন্দ্র ইঁহাদের আলাপ শুনিতেছিল। সে লক্ষ্য করিল প্রবীণ ভদ্রলোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। একটু পরে তিনি বলিলেন—আচ্ছা সাউথ আফ্রিকায় যে গোলমাল চলছিল তার নাকি একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল? কি নিষ্পত্তি হ'ল জান?

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি তাঁহার পূর্ব্বের ব্যঙ্গ হাসি আবার মুখে ফুটাইয়া বলিলেন, যাতে কিছুই নিষ্পত্তি হয় নি এই রকম একটা নিষ্পত্তি হয়েছে শুনছি।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিছুই ত বুঝলাম না তোমার কথা থেকে। কি দাঁড়াল ব্যাপারটা বল দেখি।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—রেজিষ্ট্রেশন আইন মতে টিপসই দেবার বিরুদ্ধে আপত্তি করে মিঃ গান্ধী এত আন্দোলন করলেন, জেলে গেলেন। তিনিই আবার সকলের আগে—এই বাঁধকে কনুড়াক্তির, বাঁধকে—নমস্কার মহেশবাবু!

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন।

গাড়ী এসপ্লানেডে পৌঁছিলে মহেন্দ্র শুনিল কাগজের হকাররা চিৎকার করিতেছে—"জোর খবর, বিপিনচন্দ্র পাল খালাস!"

বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইয়াছিল। কলিকাতায়, মফস্বলের শহরে শহরে জনপ্রিয় নেতার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভা হইতে লাগিল। বাংলার বাহিরে কটকে ও রেঙ্গুনে সভা হইল। তাঁহাদের রাজনৈতিক মন্ত্রের দীক্ষাগুরু বিপিন-চন্দ্রের মুক্তি উপলক্ষে মাদ্রাজীরা বহু সভার অনুষ্ঠান করিলেন। তুতিকোরিনে এই সভা করা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সজ্ঘাত বাধিল। তিনেভেলীর ম্যাজিষ্ট্রেট মি. উইঞ্চ তুতিকোরিনে সভা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিলেন। ঐ আদেশের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট হইল। পুলিসের বাড়াবাড়ির ফলে শহরময় দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল। ক্ষিপ্ত জনতা আদালত, আপিস, ডাকঘর, থানা আক্রমণ করিয়া পোড়াইয়া দিল। বাজার লুঠ হইল। মিলিটারী পুলিশ গুলি চালাইল। ফলে কয়েকজন নিহত ও বহু লোক আহত হইল। সকলে বলিতে লাগিল মিঃ উইঞ্চের নির্বুদ্ধিতা ও ঔদ্ধত্য এত কাণ্ডের জন্য দায়ী। কিন্তু শুধু মিঃ উইঞ্চের নির্বুদ্ধিতা নহে বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর কারসাজি পিছনে না থাকিলে এই দাঙ্গা বাধিত কিনা সন্দেহ। বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে তুতিকোরিনের স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানীকে ঘায়েল করা। তুতি-কোরিনের গোলমালের ফলে জননেতা চিদাম্বর পিলের নাম চার-দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র ময়দানে কিছুক্ষণ বেড়াইল। বড় রাস্তার উপরের দোকানগুলিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোতে ময়দানের অন্ধকার যেন বাড়িয়া গেল। মহেন্দ্রের মাথায় নানা রকম চিন্তার

আলোড়ন চলিতেছিল। আপনাকে বড় নিঃসঙ্গ, কর্ম্মহীন বলিয়া মনে হইল তাহার। দেবানন্দের কথা, ভবেশের কথা মনে হইল। সে ভাবিতে লাগিল দেবানন্দ যে পথে গেল সে পথে বাস্তবিক কোন ফল পাওয়া যাইবে কি? দেবানন্দের মত বুদ্ধিমান ছেলে যখন স্বেচ্ছায় এই বিপদের পথ বাছিয়া লইয়াছে, নিশ্চয় সব দিক ভাবিয়া সে অগ্রসর হইয়াছে। শুধু আবেগের মুখে যায় নাই। কিন্তু ভবেশ ত দেবানন্দের ব্যাপার আগাগোড়া সব জানে। সে এ পথে গেল না কেন? একজন ব্যারিষ্টার হইতে বিলাতে চলিল, একজন বিপ্লবের আগুনে আপনাকে পোড়াইবার জন্ত ছুটিয়াছে। কেন ইহাদের পথ-নির্ব্বাচনে এই পার্থক্য আসিল? তাহার নিজের কথাও মনে হইল। সেও কাজ খুঁজিতেছে। ভবেশের মত বিচার-বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁক নাই তাহার, দেবানন্দের মত বিপ্লবের প্রতি তীব্র আকর্ষণ নাই তাহার। সে খুঁজিতেছে সরল, সাদাসিদে পথে।

এলোমেলো নানা রকম চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল বেশ রাত হইয়াছে। সে হোষ্টেলে ফিরিল।

সিঁড়িতে উঠিতে অভ্যাসমত লেটার বক্সে হাত দিতে সে একখানা খামের চিঠি পাইল। ঠিকানা পড়িয়া দেখিল দেবানন্দের চিঠি। বিস্মিত হইয়া ভাবিল এত দিন পরে হঠাৎ দেবানন্দকে কে চিঠি লিখিল? চিঠিখানা হাতে করিয়া সে নিজের ঘরে গেল।

ঘরে ঢুকিতে হরিশ বলিল—আপনার এত রাত হ'ল, কোথায় গিয়েছিলেন? পিয়ন একটা রেজেষ্টারী পার্শেল এনেছিল দেবানন্দবাবুর নামে। দেবানন্দবাবু এখন হোষ্টেলে থাকেন না শুনে চলে গেল।

পার্শেলের কথা শুনিয়া মহেন্দ্রের বিস্ময় বাড়িল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সে চিঠিখানা খুলিল। দেখিল মেয়েলী হাতের লেখায় কয়েক ছত্রে সংক্ষিপ্ত চিঠি।

—"সে দিন খড়্গপুর ষ্টেশনে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আমি কথা বললাম না। তুমি কি ভাবলে জানি না। আমি নিজে যে কি ভাবি জানি না। অনেক ভেবেছি, সে ভাবনার কি মূল্য, সে ভাবনা কে বোঝে?

আমি তোমাকে মনে রাখতে চাই না। আমার মনকে চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে চাই। একটা জিনিস পাঠালাম তোমাকে। জিনিসটা বিয়ের আগে আমি পরতাম, হয়ত দেখে থাকবে। যদি ইচ্ছে হয় একটি দিনের জন্ত বা এক মিনিটের জন্ত হাতে প'রো, যদি ইচ্ছা না হয় গঙ্গায় ফেলে দিও।

যদি আমার কথা মনে রেখে থাক আর রেখ না। তোমার আশীর্ব্বাদের কথা এখনও মনে আছে, ভুলে যাবার চেষ্টা করছি। —কিটি।"

পর দিন পিয়ন আসিলে মহেন্দ্র সুপারিন্টেণ্ডের মধ্যস্থতায় পার্শেলটি লইল। পার্শেল খুলিয়া দেখিল একটি চুনী বসান সোনার আংটি।

পর দিন রবিবার। সকালের দিকে সে চিঠি ও আংটি লইয়া শ্যামবাজারে ভবেশের বড়মামার বাড়ীতে গেল। সেগুলির কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে পরামর্শ করিবার জন্ত।

২২

ভবেশের বিলাতযাত্রার দিন স্থির হইয়াছে। কয়েকখানি পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিবার জন্ত সে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর গৃহে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় তাঁহার বাড়ীর একজন পিয়ন একখানি চিঠি লইয়া আসিল তাহার নামে।

চিঠি লিখিয়াছে মৃণাল। লিখিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আজ এখানে আসিবেন। দেবানন্দের সম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে। দুপুরে এখানে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য আসিবেন।

চিঠি পড়িয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভবেশ পিয়নের হাতে উত্তর পাঠাইল। তারপর স্নান শেষ করিয়া একখানি গাড়ী ডাকিয়া সে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর গৃহে রওনা হইল।

সে রওনা হইয়া যাইবার মিনিট পনের পরে মহেন্দ্র আসিল তাহার খোঁজে। ভবেশকে না পাইয়া সে ফিরিয়া গেল।

ভবেশ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর গৃহে উপস্থিত হইতে দারোয়ান সেলাম করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। ভিতরের খোলা বারান্দায় একখানা লাল রং-করা বেতের চেয়ারে বসিয়া মৃণাল কি পড়িতেছিল। ভবেশকে দেখিয়া সে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। বলিল,—বাইরে লাইব্রেরি ঘরে এর মধ্যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। ওঘরে ঢুকলে আপনাকে বের করে আনতে কষ্ট হ'ত তাই দারোয়ানকে বলে দিয়েছিলাম আপনাকে একেবারে এখানে নিয়ে আসবার জন্ত।

ভবেশ—বাইরে কারা এসেছেন?

মৃণাল হাসিয়া বলিল—আপনার ছোট মামার নবরত্ন সভার দুটি রত্ন, মিঃ গাঙ্গুলী ও মিঃ ডাটা। নেশনালিষ্ট ও মডারেট দলে তর্কের লড়াই চলছে।

মিঃ গাঙ্গুলীর এখানে আসিবার কথা শুনিয়া ভবেশ একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, ভদ্রলোক ত একজন ফ্যানাটিক মডারেট। মিঃ হিউম, ওয়েডারবার্ণ, স্যর হেনরী কটন তাঁহার চোখে ডেমিগড। ব্রিটিশ জাষ্টিস, ব্রিটিশ ফেয়ার প্লের উপর অগাধ, অটুট তাঁহার বিশ্বাস। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, লালমোহন ঘোষ, মিঃ গোখেল, স্যর ফিরোজ শা মেটা তাঁহার মতে টাইট্যানস অব ইণ্ডিয়ান পলিটিকস, আর অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লজপত রায় আপষ্টার্ট। কথা বলিতে বলিতে উত্তেজনার সময় "আওয়ার এম্পায়ার," "দি এনিমিজ অব আওয়ার এম্পায়ার" বলেন। মিঃ মিটার, মিঃ ডাটার সঙ্গে ইঁহার প্রায়ই খিটিমিটি বাধিতে দেখিয়াছে সে। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও বাধিত। তিনি মিঃ গাঙ্গুলীকে "ডেম পার্টিংটন" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। মডারেটদের সম্বন্ধে বন্দেমাতরমের "ডেম পার্টিংটন এণ্ড হার মপ" কথাটি প্রসিদ্ধিলাভ

করিয়াছিল। ভদ্রলোকটি এখানে এই এন্টি-মিষ্টিদের আড্ডায় কি মনে করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল সে ভাবিয়া পাইল না। বোধ হয় তাহার ছোট মামা মিঃ রায়ের বাড়ীর আড্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিতেছিলেন—দি মডারেটস আর অন দেয়ার হিলস (মডারেটরা পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।) তাদের হিতৈষী এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো কঁকাতে সুরু করেছে।

মিঃ ডাটা—মডারেটদের নাভিশ্বাস উঠেছে, এবার গঙ্গাযাত্রা করাতে হবে।

মিঃ গাঙ্গুলী—গঙ্গাযাত্রা করবে এবার বাল-পাল-ঘোষ কোম্পানী।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—গাঙ্গুলী, বিলাতী লিবারেল পার্টি তোমাদের বে-ইজ্জত করে দিয়েছে। ভাবছ রিফর্মসের খুদকুঁড়ো পেলে তোমরা নিজেদের রিহ্যাবিলিটেট (মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার) করতে পারবে। কিন্তু দেশ তখন এতদূর সরে যাবে যে তোমাদের পুঁজিপাটা খুইয়েও আর তার নাগাল পাবে না।

মিঃ গাঙ্গুলী—তুমি দেখছি হেঁয়ালিতে কথা কইছ।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। হাতের সিগার এশ-ট্রেতে রাখিয়া বলিলেন—ওয়েল, সোজা কথায় বলছি, শোন। মিঃ হিওম্যানের "জাষ্টিস" কাগজের জন্ম একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম, ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট "জাষ্টিস," "ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিষ্ট" "গেইলিক আমেরিকান" এদেশে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই পেপার থেকে তোমাকে কিছু কিছু শোনাব। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ও কতদূর পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক চিন্তা এগিয়েছে তার একটা এনালিসিস পাবে। যাকে হেঁয়ালি বলছ সেটা আর হেঁয়ালি থাকবে না।

লেখাটার বিষয় "কংগ্রেস এণ্ড দি নেশনালিষ্ট স্কুল অব পলিটিকস"। দু'পক্ষের কাগজ থেকে মাল-মশলা নিয়েছি। নেশনালিষ্ট স্কুলের বন্দেমাতরম, নিউ ইণ্ডিয়া, নবশক্তি, সন্ধ্যা ও যুগান্তর থেকে মেটিরিয়ালস্ নিয়েছি, বেশীর ভাগ নিয়েছি বন্দেমাতরম থেকে। মডারেট ও নেশনালিষ্ট দলের লক্ষ্য ও ট্যাকটিকসের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে প্রধান বক্তব্য বিষয়।

স্বরাজ কথার অর্থ নিয়ে যে বিবাদ বেধেছে সেখান থেকে সুরু করা যাক। দাদাভাই নৌরোজী তাঁর কলিকাতা কংগ্রেসের (১৯০৬) প্রেসিডেন্টের বক্তৃতায় বলেছিলেন স্বরাজ কংগ্রেসের লক্ষ্য। মডারেটরা বলছেন নৌরোজী যখন স্বরাজ কথা ব্যবহার করেন তখন তাঁর মনে ছিল কলোনিয়াল সেলফ-গবর্ণমেণ্ট। তাঁরা বলছেন, যারা স্বরাজের অন্যরকম ব্যাখ্যা করে তারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকতে পারবে না। কি করে স্বরাজ পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে মডারেট দলের বক্তব্য,

"Someday in the future there would be a compromise or treaty between ourselves and Englishmen and as a condition of that treaty we shall get colonial Self-Government."

(ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে একটা আপোষ বা সন্ধি হইবে ও তাহার ফলে আমরা কলোনিয়াল সেলফ-গবর্ণমেণ্ট পাইব।)

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, এই আপোষ বা চুক্তি কি করে হবে সে সম্বন্ধে মডারেটদের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। তাঁদের কথা এই যে, কংগ্রেসের পিছনে দেশের সকল লোক দাঁড়ালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হবে। এর মধ্যে দুটো কথা আছে, দেশের সকল লোককে কি উপায়ে কংগ্রেসের পিছনে আনা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা কোন নূতন প্রোগ্রাম দিচ্ছেন না। অর্থাৎ, স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন নূতন উপায় তাঁদের মাথায় নাই। তারপর ধরে নেওয়া হয়েছে যে কংগ্রেসের যখন শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকবে তখন গবর্ণমেণ্ট নিষ্ক্রিয় থেকে এই শক্তি বৃদ্ধি হতে দেখবে।

মডারেট স্কুলের এই পজিশানকে নেশনালিষ্ট স্কুল চ্যালেঞ্জ করছে। আন্দোলনের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়—এই দুটো বিষয়েই নেশনালিষ্টরা মডারেট স্কুলের মত চ্যালেঞ্জ করছে। কলোনিয়াল সেলফ-গবর্ণমেণ্ট আমাদের লক্ষ্য এই কথার উত্তরে তাঁরা বলছেন, ইংরেজ এদেশ দখল করে শাসন ও শোষণ করছে। এই হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। ইংরেজ কি আমাদের জাতভাই? ইংরেজ আমাদের পদানত করে রেখেছে এজন্য কি আমাদের লক্ষ্য হবে কলোনিয়াল সেলফ-গবর্ণমেণ্ট? নিশ্চয়ই না। আমরা চাই ইনডিপেনডেন্স, ইংরেজের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি,—

"The restoration of our country to her separate existence as a nation among nations."

(পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতি হিসাবে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পুনরুদ্ধার)।

তারপর মডারেটদের চুক্তির কথায় নেশনালিষ্টরা বলছেন—কম্প্রোমাইজ বা চুক্তি হতে পারে সমান দুই পক্ষের মধ্যে। মডারেটরা চান কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করে তাকে ব্রিটিশরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে। প্রথমতঃ, তাঁরা মনে করেন একমাত্র স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা কংগ্রেসের এই শক্তি বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইংরেজ কি মূর্ত্তি ধারণ করেছে চোখে দেখেও তাঁরা মনে করেন কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করবার চেষ্টায় ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবে না।

"But the more united and powerful our country will grow the greater will be the enmity of the Englishmen and wider will be the hurricane engendered by the collision."

(কিন্তু আমাদের দেশ যত বেশী ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে ইংরেজের শত্রুতা তত বৃদ্ধি পাইবে এবং সংঘর্ষের ফলে যে ঝড় উঠিবে তাহা তত প্রলয়ঙ্কর হইবে।)

তারপর নেশনালিষ্টরা বলছেন—সংঘর্ষ ছাড়া কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে না জেনেও মডারেটরা কংগ্রেসকে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা যা পাওয়া যায় তাঁরা তাই নেবার জন্ত লালায়িত।

তা হলে দেখা যাচ্ছে দুই দলের বিরোধ আদর্শ নিয়ে বটে এবং মেথডস নিয়েও বটে। এক দল আপোষে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চান, অন্ত দল মনে করেন সংঘর্ষ ছাড়া আমাদের পুরো দাবি আদায় হবে না, আর পুরো দাবি আদায় না করে আমরা সন্তুষ্ট হব না।

মিঃ গাঙ্গুলী—নেশনালিষ্টদের পুজি এন্টি-ইংলিশ ফিলিং। তারা মনে করে দেশময় ইংরেজ বিদ্বেষ ছড়িয়ে তারা গবর্ণমেণ্টকে কাবু করবে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—গাঙ্গুলী, তোমাদের যুক্তিগুলো তোমাদের নয়, তোমরা সেগুলো ধার করেছ এন্টি-ইণ্ডিয়ান, এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ব্রিটিশ প্রেসের কাছে। লণ্ডন টাইমস মত প্রকাশ করেছে:

"The nationalist movement in India is the pure outcome of racial hatred."

(ভারতবর্ষের নেশনালিষ্ট আন্দোলন বিশুদ্ধ জাতিবিদ্বেষের ফল)। এই অভিযোগের উত্তরে বন্দেমাতরম বলছে, জাতিবিদ্বেষের কথা কি বলছ:

"We are working as much in the interest of all humanity, including England herself, as in those of our posterity and nation."

(আমরা আমাদের বংশধরগণের ও জাতির স্বার্থে যেমন কাজ করিতেছি তেমনি করিতেছি সমস্ত মানব জাতির স্বার্থে এবং ইংরেজ জাতিও এই মানব জাতির মধ্যে বটে।)

—নেশনালিষ্টরা কি করতে চান সে কথা শোন:

"The presentation of liberty to the people is the most important work of nationalism and national education, the destruction of moderatism, the advocacy of boycott, the furtherance of forms of passive resistance are the accessories of this work. They prepare the soil on which liberty is to grow and thrive."

(স্বাধীনতার রূপ জাতির কাছে ফুটাইয়া তোলা নেশনালিষ্টদের প্রধান কর্ত্তব্য। জাতীয় শিক্ষা, মডারেটিজম ধ্বংস, বয়কট প্রচার এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থার অনুসরণ এই কর্ত্তব্যের প্রতিপূরক। এই সকলের কাজের লক্ষ্য যে মাটিতে স্বাধীনতা জন্মিবে ও পুষ্ট হইবে তাহা প্রস্তুত করা।)

—নেশনালিষ্টরা জানেন তাঁদের আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের দল ভারি করবার চেষ্টা করছে। কেমন করে? রিফর্মসের লোভ দেখিয়ে। রিফর্মসের মধ্যে শাসন-সংস্কার ছাড়া আরও জিনিস আছে।

"The reforms combine with a bid for the sympathy of the landed aristocracy an indecently showy wooing of Muhammadan allegiance."

(শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের মধ্যে জমিদার সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের চেষ্টার সঙ্গে মুসলমানদিগকে দলে টানিবার জন্য বিসদৃশ, লোক দেখান খোসামুদি দেখা যায়।) কথাটা আরও বিশদ করে বলা হয়েছে:

"The bureaucracy thinks its former position insecure and naturally directs its attention to the creation of fresh props. The wealthy classes, who are not likely to be interested in any change of government, are being approached with tempting proposals."

(আমলাতন্ত্র মনে করে সে আগে যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিল উহা আর নিরাপদ নহে, সুতরাং সে নূতন অবলম্বন পাইবার দিকে দৃষ্টি দিয়াছে। ধনী সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্ট পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহে; তাহাদের নিকট লোভজনক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।)

বিশেষ সুবিধে পাবার লোভে আকৃষ্ট হয়ে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মডারেটরা বলছেন বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে সুইসাইড্যাল (আত্মহত্যার তুল্য)। একখানা মডারেট কাগজ বলছে, ভারতবাসীরা স্বপ্নেও চায় না ইংরেজ এদেশ থেকে যাক।

—এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে একদিকে কংগ্রেস ও বুরোক্রেসী, অন্তদিকে নেশনালিষ্টরা লড়বার জন্ত তৈরি হচ্ছে।

কংগ্রেস ও বুরোক্রাসিকে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়াতে দেখে নেশনালিষ্টদের মধ্যে একদল লোক কংগ্রেসকে যে কোন উপায়ে হউক মডারেটদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জাতীয় মহামণ্ডল বা নেশনাল এসেমব্লিতে পরিণত করবার কথা ভাবছে। নবশক্তি এই মর্ম্মে বলছে—"লয়ালিষ্টদের ভাব দেখিয়া মনে হয় তাহাদের ধারণা কংগ্রেস তাহাদের খাস জমিদারী। লয়ালিষ্টদের ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র কাম্য রাজা ও রাজপুরুষদের সন্তুষ্ট করা। কংগ্রেস ভিক্ষুকের সভায় পরিণত হইতেছে, কংগ্রেসের সভাপতি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া বক্তৃতা করিতে উঠেন।"

এবার মেথডস বা ট্যাকটিসের কথায় আসছি।

নেশনালিষ্টরা ইংরেজের অনুগ্রহে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের লক্ষ্য স্বাধীনতা, তাঁদের ট্যাকটিক্স নূতন। ভারতবাসীকে ইংরেজরা নিরস্ত্র করে রেখেছে একথা মনে রেখে তাঁরা অবস্থানুযায়ী নূতন ট্যাকটিক্স রচনা করেছেন। তাঁদের প্রোগ্রামের প্রধান আইটেম প্যাসিভ রেজিষ্টান্স বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, দ্বিতীয় আইটেম মাস কনট্যাক্ট বা গণসংযোগ। মন দিয়ে শোন। কি ভাবে এই দুই আইডিয়া ডেভেলপ করেছে বলছি। গাঙ্গুলী, আই রিকোয়েষ্ট ইওর পার্টিকুলার এটেনশন (বিশেষ মন দিয়ে শোন)।

মিঃ গাঙ্গুলী একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আই এম এট ইওর সার্ভিস।

মৃণাল বলিল, আপনি বসুন, আমি এখনই আসছি।

ক্রমশঃ

পেট্রোল ও ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতি

শ্রীঅমর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

আধুনিক সভ্যতার ধারক যেমন যন্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি, এর চালক তেমনই খনিজ তৈল—পেট্রোল। পেট্রোল আজ মানুষের সভ্যতার প্রধানতম সামগ্রী। এর জন্যই বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে পেট্রোল-উৎপাদক অঞ্চলগুলির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের অনেকটা নির্দ্ধারিত হয়েছে। মোটামুটি, পৃথিবীর পেট্রোলের উপর এই কর্তৃত্ব-প্রচেষ্টাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের অবসান হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে। কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষভাগে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক অংশে পেট্রোল-উৎপাদক অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিযোগিতা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। এর ক্রমবর্দ্ধমান তীব্রতাকে অনেক সময় মার্কিন বার্ত্তাজীবীরা "Minor cold war" আখ্যা দেন।

ইঙ্গ-মার্কিন পেট্রোল প্রতিযোগিতার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মার্কিন ও ইংরেজ মূলধন পরিচালিত অ-কম্যুনিষ্ট পৃথিবীর পেট্রোল শিল্পগুলির খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে অ-কম্যুনিষ্ট পৃথিবীর সমগ্র তৈল-উৎপাদন-ব্যবস্থা সাতটি বিরাট তৈল-সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর মধ্যে পাঁচটি মার্কিন-মূলধন দ্বারা পরিচালিত। যথা :

(১) নিউ জারসীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল—মূলধন প্রায় ৩০০০ মি. ডলার।
(২) সোকোনী-ভ্যাকুম্ অয়েল — " " ২০০০ " "
(৩) ক্যালিফনিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড " — " " ১২০০ " "
(৪) গাল্ফ্ অয়েল কর্পোরেশন — " " ১৩০০ " "
(৫) ট্যাক্সাস্ অয়েল কোম্পানী — " " ১৪০০ " "

অন্য দুটি ইংরেজ-মূলধন দ্বারা পরিচালিত। যথা—

(১) এংলো-নেদারল্যাণ্ডস-রয়েল-ডাচ্ সেল মূলধন প্রায় ১৭৫ মিঃ পাউণ্ড
(২) এংলো-ইরাণিয়ান্ অয়েল কোম্পানী—(বর্ত্তমান হিসাব স্থির হয় নি)

অন্যান্য একচেটে ব্যবসার মত পেট্রোল-শিল্পেরও কতকগুলি সহকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন ক্যালটেক্স-টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ার কোম্পানীদ্বয়ের সমাহার। নিউজারসীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল এবং সোকোনী-ভ্যাকুম ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুম নামে কাজ করছে। এই দুইটি তৈল কোম্পানীই সংযুক্তভাবে আরব-মার্কিন অয়েল কোম্পানীর নিয়ন্তা। এই একচেটে প্রতিষ্ঠানটি 'আরমাকো' নামে সৌদি আরবের পেট্রোল শিল্পের মালিক।

এইভাবে মার্কিন এবং ব্রিটিশ মূলধন দ্বারাই অ-কম্যুনিষ্ট পৃথিবীর পেট্রোল-শিল্প নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। এই সঙ্গে ইন্দো-নেশিয়া, বর্ম্মা, কলম্বিয়া, মিশর, কোয়িট, ট্রিনিদাদ এবং বেহরিন ছাড়াও ভেনেজুয়েলা, পেরু এবং ইরাকের অধিকাংশ শিল্প এই মূলধনের অধীন। মোটামুটি ধনতান্ত্রিক বিশ্বের শতকরা ৯৫ ভাগ তৈল-শিল্প ইঙ্গমার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কারণে তৈল পরিশোধন পরিবহন এবং সরবরাহ-ব্যবস্থাও ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটে অধিকারভুক্ত। ধনতান্ত্রিক বিশ্বের তৈল-পরিশোধন কার্য্যের শতকরা ৯০ ভাগ—হয় ব্রিটিশ না হয় মার্কিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত। এই কারণেই, বিশ্বের তৈলবাহী জাহাজের শতকরা ৭০ ভাগ ইঙ্গ-মার্কিন মালিকানাভুক্ত। তৈলক্ষেত্র থেকে পরিশোধনাগার এবং বন্দর-সংযোগকারী পাইপ-লাইনগুলিও হয় ব্রিটিশ না হয় মার্কিন কোম্পানীসমূহের অধিকারে।

বর্ত্তমান সভ্যতার জঙ্গমত্ব বজায় রেখেছে এই খনিজ তৈল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্প, চলাচল-ব্যবস্থা, কৃষি-ব্যবস্থা, পরিবহন, আকাশচারণ ছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে পেট্রোল এবং পেট্রোলজাত পদার্থ অপরিহার্য্য। সুতরাং বিশ্বের বাজারে, সভ্যতার পরিমার্জ্জনে এই পদার্থের প্রয়োজনীয়তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আর এর দ্বারা যে পর্ব্বতপ্রমাণ মুনাফা জমা হওয়া খুবই স্বাভাবিক তাও সহজেই অনুমেয়। সুতরাং পেট্রোলের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কায়েমি রাখবার জন্যে ইঙ্গ ও মার্কিন ধনিক-সমাজ যে পরস্পরের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে তা বলাই বাহুল্য। এখন প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে, এই মুনাফার একটু হদিস রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়ম' নামক মার্কিন কাগজের হিসাব অনুসারে ১৯৫০ সালে ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণ হ'ল ৪০৮'২ মি. ডলার; সোকোনী ভ্যাকুম—১২৮·২ মি. ডলার; ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অব ক্যালিফোর্নিয়ার—১৫০'৮ মি ডলার; টেক্সাস অয়েল কো'র ১৪৯ মি. ডলার; গাল্ফ অয়েলের—১১১'১ মিঃ ডলার। এংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানির নীট মুনাফা ঐ বৎসরে ৮১ মি. পাউণ্ড।

বর্ত্তমান পৃথিবীর রাজনীতি দুভাগে বিভক্ত। একদিকে সাম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট রাশিয়া, অন্যদিকে আদর্শ-বাদসঞ্জাত তথাকথিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থা। উভয় আদর্শই আর্থিক ব্যবস্থাকে রাজনীতির ভিত্তিস্বরূপ বলে স্বীকার করে। এই আর্থিক ব্যবস্থায় ক্ষেত্রে খনিজ তৈল যে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে পূর্ব্বেই তার উল্লেখ করেছি। অথচ প্রধানতঃ এইখানেই প্রতীচ্যের গণতন্ত্রীদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হচ্ছে। পেট্রোলের কর্তৃত্ব লাভের আশায় ব্রিটিশ এবং মার্কিন ধনকুবেরগণ তথা সমগ্র সমাজ যে প্রতিযোগিতা চালিয়েছে, তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট রুশ-বিরোধী শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ফাটল ধরার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। মার্কিন নেতৃত্বে গঠিত উত্তর অতলান্তিক শক্তি-সংসদ হয়ত এই প্রতিযোগিতার ফলেই

এক দিন সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের স্বপ্ন দেখা ত্যাগ করলে।"

বর্ত্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইঙ্গ-মার্কিন "গোপন ঠাণ্ডা লড়াই" ক্রমশঃই সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজ পেট্রোলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন ধনপতিদের এই বিরোধ বিশ্বের সাধারণ মানুষের সমাজ-জীবনে যে বিষ অনুপ্রবিষ্ট করাচ্ছে তার আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ্বের তৈল উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যাপারে মার্কিনী একচেটে বাণিজ্য থাকার ফলে ওদেশের ধনিক-সমাজের হাতে বিশ্বের অন্যান্য ধনিক রাষ্ট্রগুলির উপর ইচ্ছামত চাপ দেবার প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে। এখন বর্ত্তমান সভ্য সমাজ তৈল বিনা "পাদমেকং" অগ্রসর হতে পারে না। আর এই কারণেই ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রতিযোগিতা-জনিত বিরোধ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিদ্বেষে পরিণত হচ্ছে।

যুদ্ধের আগে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ এবং দক্ষিণ আমেরিকার শতকরা ৫০ ভাগ উৎপন্ন তৈলের ওপর ব্রিটেন আধিপত্য করত। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সীমার বাইরে মার্কিন মূলধন দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ এবং মধ্য ও নিকট-প্রাচ্যের শতকরা ১৩ ভাগ তৈল উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রসারিত করেছিল। যুদ্ধের মাঝেই দক্ষিণ আমেরিকার মার্কিন মূলধন ব্রিটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সুরু করে, তার ফলে ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্বের অবসান হয়। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র ইকোয়েডর ও ট্রিনিদাদের তৈল উৎপাদনেই ব্রিটিশ মূলধন খাটছে। ১৯৪৫ সালে মার্কিন ও ব্রিটিশ মূলধন দক্ষিণ আমেরিকায় যথাক্রমে শতকরা ৭২·৩ ভাগ এবং ২৫·৩ ভাগ তৈল-উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি প্রসারিত করে। সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ অধিকৃত উপনিবেশগুলির উপর গুয়াটেমালা, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি যে দাবি জানাচ্ছে তার পিছনেও মার্কিন রাষ্ট্রীয় বিভাগের উস্কানি ও প্ররোচনা আছে। আসল কথা, দক্ষিণ আমেরিকা-তৈল-প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ মূলধন আজ মার্কিন মূলধনের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত। এখন স্বভাবতঃই মার্কিন মূলধন মধ্য ও নিকট-প্রাচ্যেও ব্রিটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

১৯৪৬-৫১ সময়ের মধ্যে মার্কিন ধনপতির মধ্যপ্রাচ্যে যে শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়েছে, তারই ভূমিকাস্বরূপ সুরু হ'ল চুক্তি ভঙ্গ এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্রে বিপ্লবী কার্য্যকলাপের পিছনেও মার্কিন ধনিক-সমাজের উস্কানির প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিনী মূলধন প্রাচ্যে কি পরিমাণ পক্ষবিস্তার করছে তার হদিস পাওয়া যাবে ১৯৪৭ থেকে মাগত মার্কিন তৈল-সংসদগুলির কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা দ্বারা। যথা, ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-ইরাণীয় কোম্পানির উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ ক্রয় করবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং এবং সোকোনী ভ্যাকুম ইঙ্গ-ইরাণীয় কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরে এই ক্রয়ের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে সৌদী আরবের "আরমাকো"র (Armaco) শতকরা ৪০ ভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করে মার্কিন মূলধন আজ কার্য্যতঃ আরবীয় তৈলের মূল-নিয়ন্তা। মার্কিন কোম্পানিগুলি সৌদী আরবের তৈলশিল্পে ২০০ মিলিয়নের অধিক ডলার খাটায়। এখানকার তৈল-উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সালে আর একটি মার্কিন কোম্পানি সৌদী আরব ও কোবিটের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করে। যুদ্ধের পর আরমাকোর অধীন ট্রান্স-আরবীয় পাইপলাইন কোম্পানি সৌদী আরব থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি পাইপলাইন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। এই লাইন নির্ম্মিত হলে আরমাকোর পক্ষে এংলো-ইরাণীয় কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা করবার সুবিধা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ওপক্ষ থেকে বাধাদান সুরু হ'ল; ফল হ'ল সিরিয়ার ধারাবাহিক বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব। কারণ সিরিয়ার মধ্য দিয়ে প্রধান পাইপলাইন নির্ম্মিত হবার কথা। কিন্তু শেষ অবধি এখানেও ব্রিটিশ মূলধন পরাজিত হ'ল। এই প্রতিযোগিতাই হয়তো ইঙ্গ-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বিরোধীবাষ্পের সৃষ্টি করত, কিন্তু এই সময় হঠাৎ ইরাণের পার্লামেণ্ট জনমতের দাবিতে বিব্রত হয়ে অবশেষে তৈল-শিল্প জাতীয়-করণের জন্য আইন প্রণয়ন করল। ফলে, ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানিকে ইরাণের জমি থেকে সমূলে উৎপাটন করার ব্যবস্থা হ'ল। প্রথম দিকে মার্কিন তৈলপতিদের উল্লাস উল্লেখযোগ্য। ইরাণই একমাত্র দেশ যেখানে তৈল-শিল্পের উপর এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ মূলধন অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে অধিকার বজায় রেখেছিল। মার্কিন সংবাদিকগণ এই তৈল-কোম্পানির নামকরণ করে—"Benevolent Octopus"। তাঁরা বারবার দেখিয়েছেন যে, এই তৈলশিল্পের মাধ্যমে ব্রিটিশ সমগ্র ইরাণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

মার্কিন তৈলপতিরা স্বভাবতঃই অনুভব করেন যে, ইরাণের তৈলশিল্পে ব্রিটেনের অধিকারের অবসান হলেই সমগ্র ধনিক রাষ্ট্রকে স্বপক্ষে আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে। কারণ অতঃপর পেট্রোলের জন্যে ধনিক রাষ্ট্রগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের সময় এই রাষ্ট্রগুলির সাহায্য সহজলভ্য হবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই কয়েকটি মার্কিন তৈল কোম্পানী একটি সংসদ বা 'pool' গড়ে তুলেছে। এই 'পুল' ব্যবস্থা দ্বারা বিশ্বের তৈলবাণিজ্যে মার্কিনী মূলধন ব্রিটিশ মূলধনকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ব্রিটিশ মূলধন আজ মার্কিনী ধনপতিদের বিরুদ্ধে যে জীবন-মরণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত তাতে তার পরাজয়ের আশঙ্কাই অধিক। ব্রিটিশ-মার্কিন তৈল-বিরোধ আজ তাই বিশ্বের কম্যুনিষ্ট এবং অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করছে। সোভিয়েট শক্তি আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ দর্শক হলেও, প্রতিবেশী ইরাণের বর্ত্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের সন্ধিক্ষণে

এই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং উদাসীন থাকবে একথা চিন্তা করাও অসঙ্গত।

এক দিকে মার্কিন তৈলপতিগণ বিশ্বের বাজার গ্রাস করবার ব্যবস্থা করছে, আর অন্য দিকে ব্রিটিশ বিশ্ব-তৈল-বাণিজ্যে স্বীয় স্থান বজায় রাখবার জন্য আমেরিকার কাছ থেকেও তৈল ক্রয় করে বিশ্বের বাজারে সরবরাহ করছে। গত ১৯৫১ সালে ব্রিটিশ মার্কিনের কাছ থেকে প্রায় ৬·৫ মিলিয়ন টন পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রী ক্রয় করেছে। এজন্যে দুর্মূল্য ডলার ব্যয় করতেও বৃটেন দ্বিধা করে নি। প্রসঙ্গতঃ একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ডলার-ষ্টার্লিং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ডলার-আয়ের অন্যতম প্রধান সামগ্রী হচ্ছে পেট্রোল, এবং বিশেষতঃ ইরাণীয় তৈল। ইরাণ এবং সন্নিহিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ করল, তখন সাময়িকভাবে মার্কিনশক্তি ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ করে। তার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ধনপতিগণ কর্তৃক ব্রিটিশ-বিতাড়ন প্রচেষ্টা আপাততঃ বন্ধ আছে। বর্ত্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন নীতি হ'ল ইরাণীয় পেট্রোল "বয়কট" করা। উভয় সরকারই ইরাণকে চাপ দিয়ে চলেছে জাতীয়করণ ব্যবস্থা বদলানোর জন্য। ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে ইরাণীয় তৈল উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য মার্কিন প্রভাবান্বিত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ ইউজিন ব্লাকও চেষ্টা করছেন। ইউজিন রকফেলার তৈল কোম্পানির সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মার্কিনী মূলধন যদি ইরাণের তৈলশিল্পে স্বীয় ক্ষমতা অনুপ্রবিষ্ট করতে পারে, তা হ'লে এখান থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হবে।

পূর্ব্ব এশিয়াতেও আজ মার্কিনী উদ্যোগ চলছে। এখানেও ব্রিটিশ তৈলশিল্প মার্কিনী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার তৈলকেন্দ্র সুমাত্রাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাকুম এবং ক্যালটেক্স কোম্পানি কায়েম হয়ে বসেছে। এখানকার উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৪৩·৪ ভাগ মার্কিনী নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দেশগুলিও মার্কিন কবল-মুক্ত নয়; কানাডার তৈলশিল্পের শতকরা ৬০ ভাগ আজ মার্কিনের কবলে। অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের তৈল-উৎপাদন-ব্যবস্থাতেও মার্কিনী মূলধন প্রবেশ করছে।

যেখানে ১৯৩৮ সালের অ-কম্যুনিষ্ট পৃথিবীর শতকরা ৩৫ ভাগ তৈল-উৎপাদন-শিল্প ছিল মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং শতকরা ৫৫ ভাগ ব্রিটিশের, আজ সে ক্ষেত্রে মার্কিনের শতকরা ৫৫ ভাগ আর ব্রিটিশের শতকরা ৩৫ ভাগ। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন ধনপতিরা বিশ্বের তৈল-বাজার থেকে ব্রিটিশকে ক্রমাগত উৎখাত করে চলেছে। মার্কিন মূলধনের আঘাত সহ্য করবার মত শক্তি আজ ব্রিটিশ মূলধনের শেষ হয়ে এসেছে। এই আঘাতের ফলে বিশ্বে ব্রিটেনের অধিকৃত "অর্থনৈতিক উপনিবেশ"—যথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য এবং "কমনওয়েলথ"-এর কোন কোন দেশ—যেমন ভারত ও পাকিস্থান প্রভৃতিও আজ মার্কিনী আঘাতের আওতায় এসে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট-মার্কিন সংঘর্ষ অনিবার্য্য—এ শুধু তারই উদ্যোগপর্ব্ব। এমন কি, আজ কোরিয়া ও ইন্দোচীনে যে সংগ্রাম চলেছে তা বৃহত্তর মহাযুদ্ধেরই প্রস্তুতি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই সম্ভাব্য বিশ্ব-সংঘর্ষে ভারত, পাকিস্থান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কর্ত্তব্য কি হবে? ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় বণিকসমাজ যেভাবে উত্তরোত্তর মার্কিন-প্রীতি প্রকাশ করে চলেছেন তাতে ভারতের পক্ষে মার্কিনের সঙ্কটে নিরপেক্ষ থাকা হয়ত কঠিন হবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান সমস্যা খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে বর্ত্তমানে ভারতকে মার্কিনী দানের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করতে হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, দেশগঠনের কাজেও ব্রিটিশ অপেক্ষা মার্কিনী সাহায্যই এখন ভারতের কাছে অধিকতর কাম্য। এই দিক থেকে বিচার করলে পণ্ডিত নেহরুর নিরপেক্ষ বা "মুক্ত পররাষ্ট্র নীতি"র কথা বাস্তব দৃষ্টিসম্মত বলে মনে হয় না।

পাকিস্থানের বর্ত্তমান ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় না যে, এই ইসলামীয় রাষ্ট্রটি মার্কিন দলে যোগ দেবে না। তবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় পাকিস্থানের অবস্থা একটু ভিন্ন রকমের, কারণ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি প্রায় অধিকাংশই ব্রিটিশ-বিরোধী। কিন্তু পাকিস্থান-রাষ্ট্র স্বীয় সৃষ্টির জন্যই ব্রিটিশ বিশেষতঃ রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। এদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় না যে, পাকিস্থান সরাসরি ব্রিটিশকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন-ব্রিটিশ-বিরোধে মার্কিনের সহযোগিতা করবে। অথচ যদি বর্ত্তমানের মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে পাকিস্থান তাল রাখতে পারে তা হলে এখানকার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উপর পাকিস্থান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা ও উপাদান পাকিস্থানের থাকা অসম্ভব নয়। সর্ব্বোপরি, পশ্চিম পাকিস্থান মধ্যপ্রাচ্যের পূর্ব্বতম অংশ। কিন্তু ব্রিটিশের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ পাকিস্থান অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এ সুযোগ নিতে সক্ষম হবে না। এমতাবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের দূর প্রতিবেশী হলেও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা স্বাধীন এবং সাবলীল পররাষ্ট্র-নীতি সৃষ্টির প্রধানতম ভিত্তি। যত দিন না ভারতবর্ষ এই ভিত্তি দৃঢ় করতে পারছে তত দিন তার পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান সংগ্রহ করা সহজ নয়।

ইঙ্গ-মার্কিন এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর চরম পরীক্ষাস্থল হয়ত এবার ইউরোপ নয়, এশিয়া; এবং এশিয়ায় দুর্ব্বলতম স্থান—মধ্য-প্রাচ্য। এখানে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলে তার উত্তাপ ভারত এবং পাকি-

স্থানেও এসে পৌঁছবে এবং এই অর্দ্ধ মহাদেশকেও জালিয়ে তুলবে। ভারতরাষ্ট্রের তাই অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, ইন্দ-মার্কিন পেট্রোল-যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসের আর এক চরম দুর্দিনের ভূমিকামাত্র। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে একমাত্র চীন ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রই বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র-নীতির কথা চিন্তা করতে সক্ষম নয়; বাস্তবের পটভূমিকায় বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর। তাই আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশী মূলধনের আবেদন ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতি গঠনের পরিপন্থী। ইন্দ-মার্কিন তৈলযুদ্ধ শেষ হলেই বিশ্বের দুই বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ধারা প্রত্যক্ষ ভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হবে। মানুষের সেই চরম সঙ্কটের দিনকে বিলম্বিত করবার প্রধান উপায় আভ্যন্তরীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর পররাষ্ট্র-নীতি গড়ে তোলা।

পদ্মিনী ও নূরজাহান

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নূরজাহান আর পদ্মিনী গো ধীশ্রীদেবীর নন্দিনী,
তোমরা আজি কোন্ স্বরগে অমৃতনিস্যন্দিনী?
স্বর্গলোকের জান্‌লা খোলো দেখব দোঁহার চাঁদবদন,
দুই শ্রীমুখে লজ্জা পেল সব নারীদের চন্দ্রানন।
এই পৃথিবীর ক্ষুধায় জ্বলে নূরজাহানের দীপ্তি গো,
পদ্মিনীর ঐ মুগ্ধচোখে সকল ক্ষুধার তৃপ্তি গো।
নূরজাহানের চিত্তে উঠে মত্তমনের প্রভঞ্জন,
পদ্মিনীর ঐ বুকের ব্রজে বংশী বাজায় নিরঞ্জন।

নূরজাহানের প্রাণধারাতে মেঘনা নদীর গান বাজে,
পদ্মিনীর ঐ জীবনধারা মন্দাকিনীর ছন্দা যে!
নূরের হৃদয় সিন্ধুসমান বিপ্লবেরি তণ্ডদোল,
পদ্মিনীর ঐ গঙ্গাতটে তাপসদেরি তৃপ্তি-কোল।
নূরজাহানের নারীত্ব যে গর্বে রহে উচ্চশির,
পদ্মিনী যে গর্বদমন বজ্রহৃদয় হিমাদ্রির।
নূরজাহানের মূর্ত্তি জাগে জগৎসুখের ভোগ নিতে,
পদ্মিনী চায় ভস্মমদন শিবললাটের অগ্নিতে।

নূরের হৃদয়-রহস্যেরি করবে পরখ কোন্ জনা?
পদ্মিনী যে সতীত্বেরি লক্ষ অসির বন্দনা।
নূরজাহানের বিপ্লবী মন বিদ্রোহেরি গাচ্ছে গান,
পদ্মিনী তার গর্বচিতোর সর্বজয়ের লাল নিশান।
আজকে আবার তোমরা নামো মর্ত্তে লাগুক চমৎকার,
পদ্মিনীর ঐ সতীত্বেরি মন্ত্রে উঠুক ঝনৎকার।
আবার তুমি মর্ত্তে এস বাদশাজাদী নূরজাহান,
পদ্মিনী দাও অগ্নিময়ী ভগ্নীদের আজ জন্মদান।

পদ্মিনী গো মূর্ত্তি তোমার করল আলার মন মাতাল,
তোমায় পাবার জন্যে পাগল উঠলো রণের রুদ্রতাল।
বাদশাহেরি কাম্য তুমি সপ্তরাজার ধনমণি,
লুটতে তোমায় লাখ মোগলের উঠলো কিরীট ঝঙ্কনি।
ভাঙলো চিতোর বাদশা রোষে তোমার লাগি ক্ষিপ্তমন,
মূর্ত্তি তোমার ভুললো প্রলয় গর্জিলে ঘোর প্রভঞ্জন।
হাজার প্রাসাদ লুটলো ধুলায় মোগল সেনার পা'র তলে,
সতীর ওই দীপ্ত অটল অঙ্গে তোমার তেজ জ্বলে?
বাদশারি পণ চূর্ণ করি ঝাঁপ দিলে গো অগ্নিতে,
তোমার সাথে মৃত্যুবরণ করলো হাজার ভগ্নীতে।
জ্বললো আগুন, পুড়লো চিতোর বইলো পথে লাল রুধির,
মৃত্যুমুখেও রাখলে অটল প্রতিজ্ঞা যে হিমাদ্রির।

আজও যে সেই অগ্নিশিখায় গর্বে তোমার দীপ জ্বলে,
চূর্ণ আলার দম্ভ তোমার প্রতিজ্ঞারি পা'র তলে।
উর্দ্ধে র'লে নারীর সেরা সতীত্বেরি রণ জিনি,
জলমেঘেরি বিদ্যুৎ ওগো বজ্রে কাটা পদ্মিনী!
পদ্মিনীর ঐ তনুর কূলে পদ্মালয়ার পদ্মাসন,
নূর-গোলাপের অঙ্গে রাজে ফুলবাণেরি মীনকেতন।

অন্তরেতে দীন্‌দেওয়ানা বাইরেতে নূর রূপরাণী,
ভোগজগতের গন্ধদানের অস্ত্র তাহার ধূপদানী।
বিশ্বনারীর কুঞ্জবনের তোমরা দুটি চন্দনা,
ত্যাগের ভোগের গঙ্গাসাগর লও গো আমার বন্দনা।
অমর হয়ে থাকবে দু'জন নারীর রূপের জয়-নিশান,
নারীর সেরা—মূর্ত্তি তফাৎ—পদ্মিনী আর নূরজাহান।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

যজুর্ব্বেদ যজ্ঞবেদ। আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা যাজ্ঞিক ছিলেন। নানা উপচারে, নানা মন্ত্রে নানাবিধ যজ্ঞ তাঁহারা করিতেন। সেই সব সুশৃঙ্খল উপাসনার বিধি ও রীতি ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আছে। কিন্তু দেশে আর যজ্ঞ নাই, যে নবীন যুগে আমরা বাস করি সে কালে আর ক্রিয়া ও পার্ব্বণ ফিরিবে না। ঔপচারিক অর্চ্চনার দিকে আমাদের আদৌ মন নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Ritualism বলে, সেই যুগ শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ কর্ম্মের যুগ, চলার যুগ। আমরা চলিবার গানই গাহিব। যজ্ঞবেদে জীবনের চিরন্তন মহিমার যে সব অমৃতবাণী আছে, এই প্রবন্ধে মাত্র তাহাই আলোচনা করিব।

চারি বেদ চারি পুরোহিতের। ঋগ্বেদ প্রশস্তিবেদ, হোতা নামক পুরোহিত স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার সন্তোষসাধন করেন—তিনি যাহা বলেন তাহা ঋক, তাই তাহার উপজীব্য বেদ ঋগ্বেদ। সামবেদ সঙ্গীতবেদ—উদ্গাতার কণ্ঠে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে তিনি যে সকল গান করেন তাহার সংগ্রহই সামবেদ। অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ। ব্রহ্মনামক পুরোহিত যিনি যজ্ঞের সম্যক পরিচালনা করেন, ইহা সেই পরিচালক পুরোহিতের বেদ, কিন্তু যজ্ঞে সবচেয়ে বড় কাজ ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকাণ্ডের মর্ম্ম যিনি জানেন তিনি অধ্বর্য্যু। অধ্বর্য্যুর প্রয়োজনীয় মন্ত্রমালার সংগ্রহই যজুর্ব্বেদ। ইহা যজ্ঞক্রিয়ার পদ্ধতিপুস্তক—তাই বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ডের দীপক যজুর্ব্বেদের স্থান অতিশয় উচ্চে।

যজুর্ব্বেদের দুইটি ভাগ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। মন্দমতি মনুষ্যের জন্য বেদব্যাস ব্রহ্মপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদকে চতুর্ধা বিভাগ করিয়া পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে উপদেশ দেন। বৈশম্পায়ন কোনও কারণে মনস্বী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অধীত বিদ্যা প্রত্যর্পণ করিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে গৃহীত বেদ উদ্গীরণ করেন। তখন বৈশম্পায়নের শিষ্যেরা তিত্তিরী পক্ষী হইয়া সেই বেদ গ্রহণ করেন—তাই সেই বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। শিষ্যেরা মলিনবুদ্ধি বলিয়া এই বেদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং ইহার এক নাম কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ।

যাজ্ঞবল্ক্য নির্ম্মল বেদবিদ্যা লাভের আশায় সূর্য্যের উপাসনা করিলেন, সূর্য্য তখন বাজি রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অমৃত বিদ্যা দান করেন তাই এই বেদের নাম বাজসনেয় সংহিতা। আর ইহা সুসংস্কৃত ও সুনির্ম্মল বলিয়া ইহার এক নাম শুক্ল যজুর্ব্বেদ। বৈশম্পায়নেরও যে তথ্য অজ্ঞাত ছিল, তাহা ইহাতে আছে বলিয়া ইহার এক নাম 'অযাত যাম'।

যাজ্ঞবল্ক্য অধিগত নির্ম্মলবেদ পঞ্চদশ শিষ্যকে শিখান। জাবাল, গৌধেয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি এই পঞ্চদশ শিষ্য এক একটি শাখার প্রবর্ত্তক। শুক্ল যজুর্ব্বেদের যে শাখা বর্ত্তমানে প্রচলিত, তাহা মাধ্যন্দিন শাখা।

বেদপাঠ ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায় নিত্য-কর্ম্ম। যে দ্বিজ বেদ পাঠ করেন না, তিনি আদৌ ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য নন। মনু বলিয়াছেন:

> "যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্ম্মময়ো মৃগ:
> যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ।

'কাঠের হাতী যেমন হাতী নয়, চামড়ার হরিণ যেমন হরিণ নয়, তেমনই যে বিপ্র বেদ পড়েন নাই তিনি ব্রাহ্মণ নন তিনি কেবলই নাম ধারণ করেন।'

বেদ মানুষের নিঃশ্রেয়স্কর শাস্ত্র। মানুষের যজ্ঞের পথ সকল, তপস্যাদি কাজের এবং সকল ভাল কাজের নিগূঢ় বাক্যই বেদে আছে; তাই বেদাধ্যয়ন না করিলে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। যিনি বেদ না পড়িয়া অন্য পাঠে আসক্ত, তিনি পাপী। বেদগণ মানুষকে নবজীবন দেয়।

> সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতং ত্রিকং দ্বিজঃ।
> মহতোঽপ্যেনসো মাসাং ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥

সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করিয়া নবদেহ লাভ করে, তেমনই বেদাধ্যয়ন করিয়া মানুষ নবজন্ম লাভ করে।

এই পরম বিদ্যা, অধ্যাত্মসম্পৎ অনুভূতির বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। অর্থ না বুঝিয়া কেবল আবৃত্তি বৃথা। যাস্কে এই বচনগুলি আছে:

> স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
> যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা।
> যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
> অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥

বেদ পড়ি অথচ অর্থ জানি না, তাহা হইলে স্থাণুর মতই ভার বহন করিয়া চলি। যে অর্থ জানে, সে কল্যাণ পায়, জ্ঞানের দ্বারা বিধূতপাপ হইয়া স্বর্গে যায়। যেখানে আগুন নাই সেখানে শুষ্ক কাঠ ফেলিলে যেমন আগুন জ্বলে না, তেমনই অর্থ না জানিয়া কট কট করিলেই বেদজ্ঞ হওয়া যায় না।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখায় ৪০ অধ্যায় এবং

১৯৭৫টি মন্ত্র। পাতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যের অনুক্রমণিকায় যজুর্ব্বেদের ১০১টি শাখার কথা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ইহার ২৭ শাখা বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ৬টি শাখা প্রসিদ্ধ ছিল—চরক, কাঠক, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়নীয়, আপস্তম্ব বা তৈত্তিরীয়, হিরণ্যকেশী। শুক্লযজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাই সমধিক পরিচিত—ইহাদের অধিক কিছু ভেদ নাই।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৪০ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম। এই মন্ত্রগুলি ও তাহার প্রয়োগবিধি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেও পাওয়া যায়। এই সব অধ্যায়ের প্রত্যেক কথাই বাজসনেয় সংহিতায় ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১৯শ অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। কাত্যায়ন অনুক্রমণিকায় ২৬ হইতে ৩৫ অধ্যায়কে খিল বলিয়াছেন। ইহারা অর্ব্বাচীন রচনা।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সম্মিলিত অবস্থায় আছে। মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ এবং ব্যাখ্যা শাস্ত্রের ভিতরই আছে। এই সংহিতাটি তাই শুক্লের চেয়ে পুরাতন। ৪০টি অধ্যায়ের প্রথমে দর্শযাগের বিধান আছে। দ্বিতীয়ের শেষে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, তৃতীয়ে অগ্নিহোত্রযাগের ও চাতুর্মাস্য যাগের কথা আছে। ৪র্থ হইতে ৮ম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোম, নবমে রাজসূয়, দশমে সৌত্রামণী যজ্ঞ, ১১ হইতে ১৮ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নের বর্ণনা আছে। ১৯ হইতে ২১ অধ্যায়ে যজ্ঞের সাধারণ বিধি দেওয়া আছে এবং ২২ হইতে ২৫ অধ্যায়ে অশ্বমেধের বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তী ১৪ অধ্যায় পূর্ব্বের বিষয়গুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যায় নিয়োজিত। শেষ অধ্যায় ঈশোপনিষৎ।

যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার মাত্র এক-চতুর্থাংশ ঋগ্বেদের, অপর মন্ত্রগুলি নূতন। আমরা এই সব মন্ত্রের দ্যোতনা এবং মাধুর্য্য যথাসম্ভব বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি। তচ্ছকেয়ম তন্মে রাধ্যতাম।
ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।

ব্রতপতি অগ্নি তোমায়, জানাই নমস্কার,
আজকে আমি নিলেম শিরে কঠোর ব্রতভার।
পারি যেন সাধতে তাহা পুরুক মনস্কাম,
এই আমারো মিথ্যা হতে মিলুক সত্যধাম।

বেদপন্থীর জীবন ব্রতজীবন। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অমোঘ আশীর্ব্বাদে সেই ব্রত যেন আমরা প্রতিপালন করিতে পারি।

যজুর্ব্বেদে মন্ত্রশক্তি বুদ্ধির নাগপাশে পরিণত হইয়াছে। যজ্ঞক্রিয়ার জটিলতা ও প্রণালীর অতি সূক্ষ্ম বিধিবিধান মানুষকে যেন আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, তথাপি মানুষের জীবনেতিহাসে এই পুস্তকের একটি অমূল্য স্থান আছে। পণ্ডিতপ্রবর ভিণ্টারনিৎস লিখিয়াছেন :

However bare and tedious, unedifying the Yajurveda samhitas are if we want to read them as literary works, so supremely important, indeed, interesting are they for the student of religion, who studies them as sources not only for the Indian, but also for the general science of religion. Whoever wishes to investigate the origin, the development and the significance of prayer in the history of religion—and this is one of the most interesting chapters of the history of religion, should in no case neglect to become acquainted with prayers of the Yajurveda.

মনস্বী পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যান আমি গ্রহণ করিতে পারি না। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞের পটভূমিকা ছাড়িয়া পড়িলেও রসজ্ঞ বিদগ্ধ পাঠকের অন্তরে আশা আলো ও আনন্দ ছড়ায়। প্রার্থনা, প্রক্রিয়া ও কর্ম্মের যে মহিমময় স্থান ধর্ম্মে আছে তাহারও অবশ্য সুন্দর এবং সুসমঞ্জস একটি গতিচিত্র ইহাতে আছে। নীচের কবিতাগুলি হৃদয় দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা যজুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যেও অনুপম কবিত্ব, অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা এবং পরিশীলিত রসসংবেদনা দেখিতে পাইব।

বৈদিক ঋষি বৈরাগ্যবাদী নহেন। তিনি জীবনকে পরমানন্দে পরিপূর্ণতার মাধুর্য্যে উপভোগ করিতে চাহেন। তাই তাঁহার প্রার্থনা জাগে :

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাদচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতম জীবেম শরদঃ শতম
শৃণুয়াম শরদঃ শতম প্রব্রবাম শরদ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম
ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ। ৩৬।২৪

'একশ শরৎ দেখব চোখে সূর্য্যদেবের অভ্যুদয়,
জগন্নেত্র দিবাকরের দেখব ওঠা জ্যোতির্ম্ময়।
বাঁচব মোরা বাঁচার মতন, একশ শরৎ হাস্য-গানে,
একশ শরৎ শুনব সকল সোনার মতন মুগ্ধ কানে।
একশ শরৎ বলব অনেক অদীন হয়ে থাকব সুখে,
শত শরৎ চেয়ে অধিক বাঁচব মোরা ধরার বুকে।'

জীবনবাদী পান্থ পথে চলিবে সূর্য্যের চক্রগতির ছন্দে। চলার সুরে তার জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে। তাই ত জ্যোতির দেবতার বন্দনা শুনি :

স্বয়ংভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি বর্চো মে দেহি
সূর্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে।

'তোমার আলো সবার ভালো হে স্বয়ম্ভূ সূর্য্য,
বীর্য্যদাতা শক্তি তুমি দাও আমারে বীর্য্য
যে পথ দিয়ে নিত্যদিবা চলহ তুমি দৃপ্ত,
সে পথ তোমার করব স্মরণ গতির গানে তৃপ্ত।'

এই জ্যোতির গানের কথাই যজ্ঞের মূল কথা। স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির যে আহ্বান সে ডাক আলোকের ও পুলকের।

অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নি স্বাহা
সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্য স্বাহা
অগ্নির্বর্চ্চো জ্যোতির্বর্চ্চো স্বাহা
সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতির্বর্চ্চো স্বাহা
জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতি স্বাহা।

'অগ্নি জ্যোতির মূল, জ্যোতিই আগুন অতুল, স্বাহা
সূর্য্য জ্যোতির মূল জ্যোতিই সূর্য্য বিপুল আহা।
অগ্নি শক্তিস্বরূপ জ্যোতি শক্তি অরূপ স্বাহা
সূর্য্য তেজের রূপ শক্তি জ্যোতির ধূপ আহা
সূর্য্য জ্যোতির ফুল জ্যোতি সূর্য্য অতুল স্বাহা।'

এই আলোকের দিশারী যারা, অমৃতপথের পথিক যারা, তারা কোথাও দেখে না অমঙ্গল। পথে পথে জাগে তাদের কল্যাণ ও বিভূতি। পৃথ্বী তাহাদের প্রতি ক্ষেমঙ্করী। শঙ্কর তাদের শান্তি বিধান করেন। তাই তাহাদের দ্যৌ হয় শান্তিময়, তাহাদের পায়ের ধূলি হয় মধুময়, তাহাদের চারিদিকে বাতাস বহে রসে ভরপুর, নদী ঢালে আনন্দধারা, পাখী গাহে রসময় গান, জগৎ তোলে সুখতম তান।

তাই তাহাদের কামনা :

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব সবিতা, যাহা কিছু অকল্যাণ,
যাহা কিছু পাপময়, কর তাহা দূর।
হে পবিত্র জ্যোতিদীপ! ভদ্র সংবিধান
আনো এ জীবনে মোর কল্যাণের সুর।'

যজুর্বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া-জটিলতা এবং অন্ধ দাসত্ব-বোধকে যে কোনও সভ্য ও ভব্য মানুষ অসহ মনে করিবেন। বিশেষ পারদর্শী অধ্বর্য্যু অধ্বরে সুদীর্ঘ জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের যে বিরাট ঘটা করিতেন তাহা মানুষকে অলৌকিকের প্রতি টানিয়া লইতেছিল। এ যজ্ঞক্রিয়ার পিছনে এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, নির্দ্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞবিধির পরিপূর্ণতায় যজমান আপন অভীষ্ট পান এবং দেবগণকে মন্ত্রবলে আয়ত্ত করিয়া মানুষের যাহা কিছু অভিলষিত তাহা পাওয়া যায়। এই বোধ এবং এই প্রতীতি আমাদের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমাদিগকে ধর্ম্মের তেজোময় কল্যাণময় পথ হইতে যাদু ও ভোজবাজীর লঘুতায় কলুষিত করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও হঠাৎ যেন দুরাগত মেঘলীন সূর্য্যের আলোক আসিয়া পড়িয়া দিকদিগন্ত প্রোজ্জল করিয়া তোলে।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃসন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো ন বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

'মধুর বাতাস বহে যজ্ঞ জীবনের লাগি
বহমান নদী যত নিত্য মধু অনুরাগী
ওষধী মধুর ভাগী।
মধু রাত্রি মধু দিবা মধুময় গতি
পার্থিব পথের ধূলি, সেও রসবতী
দ্যৌপিতা মধুর অতি।
মধুময় বনস্পতি মধুভরা নিত্য হাসে
নিঃসীম আকাশবক্ষে মধুতে আদিত্য ভাসে
দিগন্ত মধুতে হাসে।'

এই মধুর আনন্দরসে উজ্জীবিত সাধক ব্রহ্মবিহার করিবেন—সর্ব্বজনের কল্যাণ কামনায় সর্ব্বমেধ করিবেন। দেবজীবনই যজ্ঞজীবন। মানুষের মন যখন আপন স্বার্থের পরিমণ্ডলে ঘুরিয়া আকুল হয় তখন তাহার জাগে বন্ধন। আর্ত্ত ও ব্যথিত হইয়া চিত্ত তখন হাহাকার করে। সেই দুর্দ্দিনে জীবনে পদ্ম-কলিকা ফোটে এবং জ্ঞান-জ্যোতির উদ্ভাবনে সাধক গাহেন :

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ। ৩২।১

'তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য্য, তিনি বায়ু, চন্দ্রমাও তিনি,
জ্যোতি তিনি ব্রহ্ম তিনি, প্রজাপতি ভাতি সর্ব্ব জিনি'

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ৩২।২

'যে এক পুরুষ হতে জেগেছে নিমেষ সর্ব্ব বিদ্যুতের সম
উচ্চে নীচে মধ্যভাগে কেহ না বুঝিল তারে চির অনুপম।'

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ
হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্নজাত ইত্যেষঃ। ৩২।৩

'কেহ নহে প্রতিমা তাহার, নাম তার মহতী মহিমা।
না করেন হিংসা যেন সে হিরণ্যগর্ভ জাত কেহ
নাহি জানে তার সীমা।'

এই সমস্ত উচ্চ আধ্যাত্মিকতার পাশেই আবার প্রহেলিকার কুহেলিকা বর্ত্তমান। অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাবিধ পুরোহিতগণ যেসব ধাঁধাঁ রচনা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত তেইশ অধ্যায়ে আছে। নীচে তাহার কৌতুক তুলিতেছি :

হোতা। কা স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ হিমস্য ভেষজং কিংবা বপনং মহৎ।

'কে চরে একাকী পথে ? বার বার কার জনম ভুবনে ?
হিমের ভেষজ কিবা ? মহং আধার বল না সুজনে।'

অধ্বর্য্য। সূর্য্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ।

'বিচরে আদিত্য একা চির অসহায়,
বার বার চন্দ্রমার জন্ম দেখা যায়।
হিমের ভেষজ অগ্নি জানি সর্ব্বজন
পৃথিবী মহৎ ভূমি মহা আবপন।'

অধ্বর্য্য। কিং স্বিৎ সূর্য্যসমং জ্যোতি, কিম্ সমুদ্রসমং সরঃ।
কিং স্বিৎ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ঃ কস্যমাত্রা ন বিদ্যতে।

'সূর্য্যসম জ্যোতি কার ঝলসে জগতে ?
সরসী সমুদ্রসম কোথায় মরতে ?
পৃথিবীর চেয়ে বড় কিবা আছে ভাই
বল দেখি কিবা তাহা মাত্রা যার নাই।'

হোতা। ব্রহ্ম সূর্য্য সমং জ্যোতি দ্যৌ সমুদ্রসমং সরঃ
ইন্দ্র পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ান্ গোস্ত মাত্রা ন বিদ্যতে।

'ব্রহ্ম জ্যোতি সূর্য্য সম অপার অনন্ত,
দ্যুলোক সমুদ্র সম নাহি তার অন্ত।
পৃথিবীর চেয়ে বড় ইন্দ্র মঘবন্
গোমাতার মাত্রা বল জানে কোন জন ?'

ব্রহ্মা। পৃচ্ছামি ত্বা চিতয়ে দেবসখ যদি ত্বমত্র মনসা জগন্থ।
যেষু বিষ্ণু স্ত্রিষু পদেষ্বেষ্টস্তেষু বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

'দেবজনের সখা তুমি তোমায় জানাই প্রশ্ন আজি ;
জেনেছ কি অন্তরেতে পরম বিদ্যাখানি ?
বিশ্ব-ভুবন বিরাজিত বিষ্ণু পদে নিত্য সাজি
ত্রিপাদ দিয়ে ব্যাপ্ত কিবা বিরাট বিশ্বখানি ?'

উদ্গাতা। অপি তেষু ত্রিষু পদেষ্বস্মি যেষু বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
সদ্যঃ পর্য্যেমি পৃথিবীমুত দ্যামেকেনাঙ্গেন দিবো অস্য পৃষ্ঠম্।

'তাঁরি ত্রিপাদ আমার ব্যাপি, ব্যাপ্ত ভুবন মাঝে,
সেই পায়েরি গতি ফোটে বিরাট বিশ্বকাজে।
এক নিমেষে একটি অঙ্গে ভ্রমি সারা বিশ্ব,
দ্যুলোকপৃষ্ঠ স্পর্শ করি—একি মহৎ দৃশ্য।'

এই প্রশ্নোত্তর মন্দ নয়। শুধু কৌতুকরস নয়, কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে আছে দৃঢ় সুগভীর ধর্ম্মোপলব্ধির পরিশীলন। যজুর্ব্বেদের মধ্যে জীবনে আচরণের অমৃত মিলিবে না অনেকে এই সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু আমি বলিব—যজুর্ব্বেদ ভাল করিয়া পড়িলে আমরা এক প্রাণবন্ত চরিত্র-নীতির দর্শন পাইব। যজুর্ব্বেদ কর্ম্মী গড়িতে চায় :

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

'কর্ম্ম কর রাত্রি দিবা—কর্ম্ম করি চাহ সুদীর্ঘ জীবন,
এই পথ সত্য পথ নাহি অন্য যান—কর্ম্ম দেয় প্রাণশক্তি,
নাহি আনে আলিম্পন।'

এই কর্ম্মের জন্য বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ হইতে হইবে।

দীর্ঘজীবনের পন্থা ব্রতী-জীবন—নিবেদিত ভাগবত জীবন যাহাকে প্রাচীনেরা যজ্ঞজীবন বলিতেন—তাই তাঁহারা বলিতেন :

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্ যজ্ঞ যজ্ঞেন কল্পতাম্।
প্রজাপতে প্রজা অভূম স্বর্দেব অগন্মামৃতা অভূম। ৯।২১

'যজ্ঞের পরশে আয়ু পাক সফলতা
যজ্ঞের মধুর ধূমে প্রাণের পূর্ণতা।
চক্ষু হোক জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধিতে উজ্জ্বল,
কর্ণ দুটি যজ্ঞসুরে হউক চঞ্চল।
পৃষ্ঠ হোক বলবান যজ্ঞশক্তি লাভে,
যজ্ঞের সমৃদ্ধি হোক যজ্ঞের আরাবে।
প্রজাপতি পুত্র মোরা, অমৃত সন্তান
মর্ত্ত্যেতে লয়েছি আজ অমর্ত্ত্য সন্ধান।'

জীবনে এই কথাটি নানা ভাবে জাগরিত করাই বেদবিদ্যার উদ্দেশ্য। যে নিঃশ্রেয়স আমাদের কাম্য, তাহা পার্থিব সমৃদ্ধি নয়, তাহা হৃদয়ের প্রসারতা, আমিত্বের বিস্তৃতি, বৃহত্তের পরিচয় এবং ভূমার আবির্ভাব। এই জন্যই দ্বিক আকূতি :

ওজশ্চ মে সহশ্চ মে আত্মা চ মে তনূশ্চ মে
শর্ম্ম চ মে বর্ম্ম চ মেঽঙ্গানি চ মেঽস্থীনি চ মে
পরূংষি চ মে শরীরাণি চ মে আয়ুশ্চ মে
জরা চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।

আমার ওজস্বিতা, আমার শক্তি, আমার আত্মা, আমার দেহ, আমার শর্ম্ম, আমার কল্যাণ, আমার বর্ম্ম, আমার রক্ষাকবচ, আমার অঙ্গ ও আমার অস্থি, আমার সন্ধিগুলি, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার আয়ু, আমার বার্দ্ধক্য যজ্ঞের পরমানন্দে আনন্দিত হউক, সফলতায় সমৃদ্ধ হউক, সিদ্ধির পরম পরিপূর্ণতায় পূর্ণ হউক।

সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে
বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ
মে জনিষ্যমানং চ মে সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে যজ্ঞেন
কল্পন্তাম্।

আমার জীবনের গভীর সত্য, আমার অন্তরের নিগূঢ় শ্রদ্ধা, আমার সচল গবাদি ধন, আমার অচল ধন, আমার দ্রব্যাদি, আমার আনন্দ, আমার ক্রীড়া ও আমোদ, আমার

জাতবংশ এবং ভাবী সন্তানেরা—আমার সুভাবিত এবং সুকৃত কর্ম্ম সকলই পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হউক, যজ্ঞের শান্তিজলে অমৃতময় হউক।

অতীতের ধর্ম্মগুরু ভারতবর্ষ। সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পথিকৃৎ ভারতবর্ষ নূতনকালের পরিবেশে নূতন সর্ব্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করুক। বিশ্ব আজ একান্ত সন্নিকট, আজ বিশ্ব-সম্মেলন ভাবালুতা নয়, প্রাত্যহিক কর্ম্মসাধনার অঙ্গ। যজুর্ব্বেদ তাহার যজ্ঞজীবনের প্রদীপালোকে তিমিরভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে পথ দেখাইতে পারিবে এবং বিশ্বজগৎ শান্তিময় হইবে।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয় শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃশান্তি বিশ্বেদেবা শান্তির্ব্রহ্ম শান্তি সর্ব্বং শান্তি শান্তিরেব
চ সা মা শান্তিরেধি।

দ্যুলোক, ভূলোক শান্তিতে ভরুক, ওষধী, বনস্পতি, আপ শান্তিময় হউক, বিশ্বশান্তি হউক, যে শান্তি পরম শান্তি, সেই শান্তি আমাতে আসুক।

প্রাচীন ভারতে মাংসাহার

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সুবিখ্যাত কোষগ্রন্থ *Encyclopædia Britannica*-তে মহাভারত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "In it everyone eats beef"—অর্থাৎ, মহাভারতে প্রত্যেকেই গোমাংস ভক্ষণ করে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, রামায়ণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ইহার "author was a man of low caste"। বাল্মীকি ও মহাভারত সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান এরূপ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তাঁহারা কৃপার পাত্র। (*Encyclopædia*-র 'India' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন ভারতে যে কোন সময়ে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মহাভারতের যুগে "Every one eats beef" বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বৈদিক ও উপনিষদের যুগে উহা অবশ্য প্রচলিত ছিল। উপনিষদে গোমাংসের প্রকার-বিশেষের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। ভবভূতির উত্তররামচরিতে পূর্ব্বস্মৃতির অনুসরণ করিয়া বশিষ্ঠের সংকারের জন্য গোবৎস বধের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতিথির একটি সংজ্ঞাই ছিল "গোঘ্ন"। অতিথিকে গোমাংস দ্বারা সৎকার করা ছিল একটি সনাতন রীতি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রন্তিদেবের উপাখ্যান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"অতিথিরা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রি বাস করিত সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকেরা 'অদ্য সুপপ্রচুর অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব্ববৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না' বলিয়া চীৎকার করিত (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)। ইহা অবশ্য মহাভারতের সময়ে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল, সমকালবর্ত্তী অবস্থার বর্ণনা নহে।

কিন্তু মহাভারতের সমকালবর্ত্তী অবস্থারও পরিচয় পাই কর্ণপর্ব্বে। কর্ণ ও তাঁহার সারথী মদ্ররাজ শল্যের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা উপলক্ষে কর্ণ শল্যরাজের দেশ মদ্র ও তাহার সমীপবর্ত্তী অঞ্চলের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন :

যেষাং গৃহেষশিষ্টানাং সক্তুমৎস্যাশিনাং তথা
পীত্বা সীধু সগোমাংসং ক্রন্দন্তি চ হসন্তি চ।

'যে অশিষ্ট সক্তুমৎস্যাশীদিগের গৃহে গোমাংসের সহিত মদ্যপান করিয়া হাসে ও কাঁদে (পিতা, পুত্র, মাতা প্রভৃতি একত্র হইয়া)'।

আরও পাই :

শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নগা।
জর্ত্তিকানাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্॥
ধীপা গৌড়াসবং পীত্বা গোমাংসং লশুনৈঃ সহ।
অনূপমাংসবাট্যানামাশিনো শীলবর্জ্জিতাঃ॥

শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী, জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অনূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে।

কোন রাক্ষসীর সাভিলাষ উক্তিস্বরূপ লিখিত হইয়াছে :

কদা বাহেয়িকা গাথাঃ পুনর্গাস্যামি শাকলে।
গব্যস্য তৃপ্তা মাংসস্য পীত্বা গৌড়ং সুরাসবং॥
গৌরীভিঃ সহ নারীভির্বৃহতীভিরল ধৃতা।
পলাণ্ড সগু্বকুতান্ খাদন্তী চৈড়কান্ বহূন্॥
বারাহং কৌককুটং মাংসং গব্যং গার্দ্দভ মৌষ্ট্রিকং।
ঐড়ঞ্চ যে না খাদন্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকম্॥

কতদিনে পুনরায় (এই শাকল নগরে) সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়সুধাপান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহয়িক সঙ্গীত করিব? যাহারা

বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে তাহাদের জন্ম নিরর্থক।

আবার পাই :

> কৃতঘ্নতা পরবিত্তাপহারো মদ্যপানং গুরুদারাবমর্দঃ।
> বাক্‌পারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্য্যা বহির্গেহং পরবস্ত্রোপভোগঃ।
> যেষাং ধর্ম্মস্তান্ প্রতিনাস্ত্যধর্ম্মো হারট্টকান্ পাঞ্চনদান্ ধিগস্তু॥

এখানে পাঞ্চনদদিগের দুষ্কার্য্যের মধ্যে একটি গোবধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শল্য এই সকল অভিযোগ খণ্ডন করিতে পারিলেন না, তবে বলিলেন সকল লোকই যে এইরূপ দুষ্কর্ম্মান্বিত তাহা নহে, অনেক স্থলে অনেক লোক স্বীয় চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি কর্ণের নিজের দেশ অঙ্গের কথা তুলিয়া বলিলেন, সেখানে আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্রকলত্রদিগকে বিক্রয় সবিশেষ প্রচলিত।

স্পষ্টই দেখা যায়, এই সময়ে গোমাংস ভক্ষণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য সভ্য প্রদেশে নিন্দিত ছিল। ভারতীয় আর্য্যেরা বাহির হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্চনদ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনিবিষ্ট হন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাহা হইলে এই সব স্থানে তাঁহাদের পূর্ব্ব অভ্যাস অধিক দিন- পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। ক্রমশঃ তাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। মোটের উপর মহাভারতের অনেক স্থলেই গোহত্যার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণ-শল্যের কথোপকথন হইতে বুঝা যায় এই যুগে গোমাংস ভক্ষণ নিন্দনীয় ও প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিলেও গোমাংসভোজী লোকসমাজে অপাংক্তেয় ছিল না। স্বয়ং শল্য নকুল-সহদেবের মাতুল ছিলেন।

অশ্বমেধপর্ব্বে যে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহাতে উল্লেখযোগ্য—অন্নের পর্ব্বত, ঘৃত ও দধির নদী এবং রাশি রাশি অন্যান্য রাজভোগ্য সামগ্রী। এই অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে মাংসের বিশেষভাবে উল্লেখ নাই, গোমাংস ত দূরের কথা।

এইবার রামায়ণে আসা যাক। এখানে আমরা খাদ্যের বিশেষ পরিচয় পাই প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনি কর্ত্তৃক ভরত ও তাঁহার সৈন্যের আতিথেয়তায়। এখানে মদ্য, ছাগ, মেষ, বরাহ ও মৃগমাংস এবং ময়ূরকুক্কুটাদি "পবিত্র" মাংসের উল্লেখ আছে, গোমাংসের কোন কথা নাই।

বাস্তবিক কাব্য হিসাবে রামায়ণ কি মহাভারত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা একটি কঠিন সমস্যা। রামায়ণে বানরাদি অনেক অনার্য্য জাতির কথা আছে যাহা মহাভারতে নাই। আর্য্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে রাক্ষসজাতির অবস্থান উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মহাভারতে আর্য্যজাতির মধ্যে এমন সব আচার-ব্যবহারের উল্লেখ পাই যাহা রামায়ণে পাই না। রামায়ণে আর্য্যদিগের আচার-ব্যবহার অনেকটা পরবর্ত্তী যুগের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রামায়ণে বহুভর্ত্তৃকা নারীর উল্লেখ পাই, গোমাংস ভক্ষণের উল্লেখ নাই, রাজাদিগের গোধন সমৃদ্ধির উল্লেখ নাই। হইতে পারে—মহাভারতে ব্যাপকভাবে আর্য্যসভ্যতার নানাদিকের উল্লেখ পাই, রামায়ণে তাহা নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে।

বলা বাহুল্য, রামায়ণ বা মহাভারত ইহার কোনটারই মূলগ্রন্থ আমরা পাই নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা পরবর্ত্তী যুগের অনেক পরিবর্ত্তন ও শাখা-প্রশাখা সমন্বিত। তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই উভয় গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের বিচার করিতে হইবে।

স্মৃতিশাস্ত্রেও মধুপর্ক সম্পর্কে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে বৃহৎ বৃষ ভক্ষণের জন্য অর্পণের ব্যবস্থা আছে। গোমেধ যজ্ঞের কথাও আছে। কলিকালে এইসব নিষিদ্ধ। আদিত্য পুরাণ কোন সময়ের গ্রন্থ তাহা জানি না। উহাতে ও বৃহন্নারদীয় পুরাণে গোবধ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন। তাঁহারা যে যে কার্য্য দোষাবহ মনে করিতেন তাহা নিষেধ করিয়া দিয়া পূর্ব্বেকার বিধির পরিবর্ত্তন সাধন করিতেন। এখন সমাজের উপর প্রভাবযুক্ত কোন ঋষি নাই। সমাজ-সংস্কারের জন্য বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বেশী মাথা ঘামাইতেন না। দুই-একটি স্থলে নিতান্ত মানবীয়তা বিরুদ্ধ কয়েকটি ব্যাপারে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এখন আবার স্বদেশী গবর্ণমেণ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনেক সমাজ-ব্যবস্থায় হাত দিতেছেন, তবে খাদ্যাখাদ্যের বাধানিষেধ ইহার অন্তর্গত নহে। লোকমতের চাপে সমাজ-ব্যবস্থা আপনা হইতেই পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়।
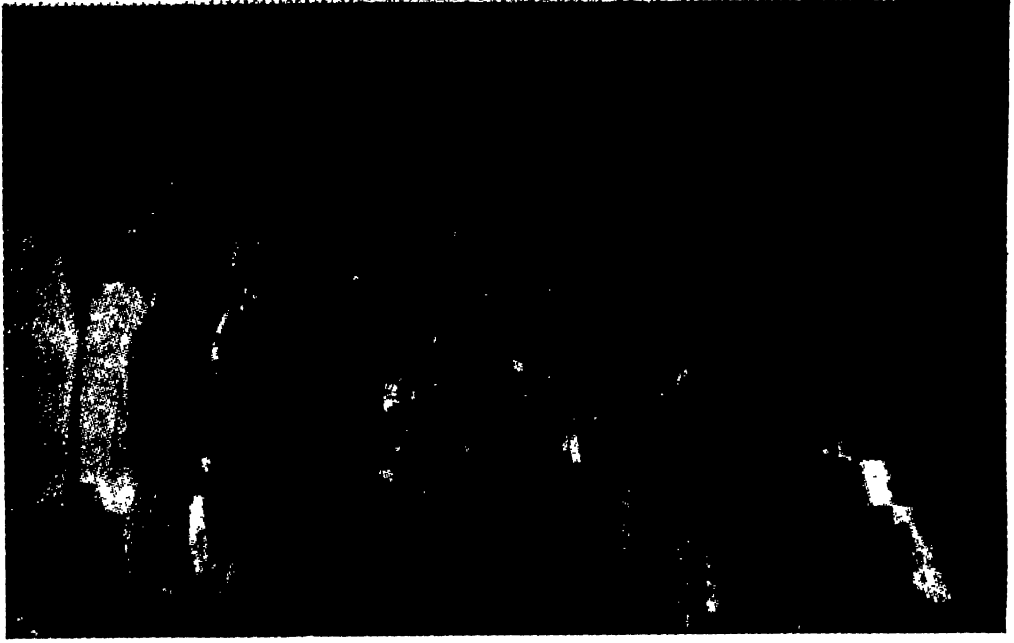
ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে পূর্ব্ব-আফ্রিকার টাঙ্গানাইকার অন্তর্গত মাউণ্ডা শহরে দুর্গোৎসব
(সঙ্ঘ-সন্ন্যাসিগণের স্বহস্ত-নির্ম্মিত প্রতিমা)

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি

ব্রহ্মচারী রমেশ

এই পৃথিবীর সকল নরনারীকে যিনি ভালবাসিতে পারেন, তাহাদের দুঃখ, দৈন্য দূর করিয়া সুখ-শান্তি দান করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে ভগবানের সেবা ও পূজা করেন—ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা।

ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপন করা—জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি সুগতি-দুর্গতির মধ্যে ভারতবর্ষ তাহাই করিতেছে। ভারতের ইহাই নিজস্ব প্রতিভা। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনা।" এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশন বহির্ভারতে প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে এই বিষয়ে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সঙ্ঘের দ্বারা সংগঠিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের অন্য একটি তথ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক অভিযানের কাহিনী আমরা বিবৃত করিতেছি।

সঙ্ঘকর্ত্তৃক বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। বহির্ভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রশ্ন এখানে

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণ

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বহির্ভারতে নানাসূত্রে অবস্থানকারী প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা যে নগণ্য নহে নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে তাহা বুঝা যাইবে :

পূর্ব্ব-আফ্রিকার আদিবাসীদের ভিতর ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচার

ব্রহ্মদেশ—৩ লক্ষ
সিংহল—৭৩২২৫৮
দক্ষিণ আফ্রিকা—২৮২৪০৭
কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, জাঞ্জিবার প্রভৃতি পূর্ব্ব-আফ্রিকার দ্বীপপুঞ্জ—১৮৪৮০০
মরিশাস—২৭১৬৩৬ (সমগ্র জনসংখ্যার ৬৩·৪ ভাগ)
ফিজি—১২৫৬৭৪ (সমগ্র জনসংখ্যার ৪৭ ভাগ)
ব্রিটিশ গিনি—১৬৮৯২১ (সমগ্র জনসংখ্যার ৪৪·৩ ভাগ)
ত্রিনিদাদ—১৯৫৭৪৭ (সমগ্র জনসংখ্যার ৩৫·১ ভাগ)
জ্যামাইকা—৪১৪৯২
মালয়—৩ লক্ষ (সমগ্র অধিবাসীর ১৫ ভাগ)
ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত—জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, পশ্চিম নিউগিনি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ—৩০,০০০
বহরেন, কুয়েত, এবং মস্কট—৪০০
ইরাণ—২৫০০
মিশর—৬০০০
আফগানিস্থান—২০০
প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন এবং য়মন—১০০
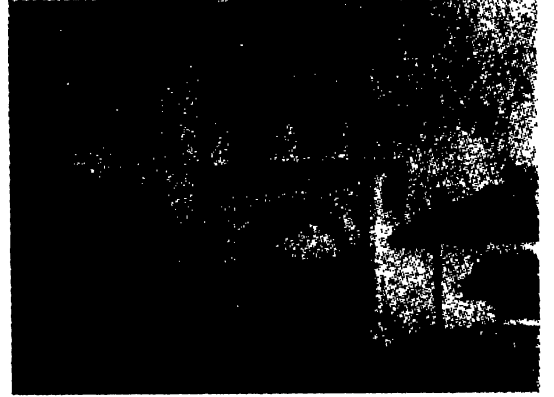
পূর্ব্ব-আফ্রিকার শ্রীশ্রদ্ধানন্দ আশ্রম—হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়

এই সকল প্রবাসী ভারতীয়ের অধিকার কি ভাবে ক্রমশঃ অবহেলিত হইতেছে তাহা সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত দৈনন্দিন বহু ঘটনা হইতে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। এতদ্ব্যতীত সকল প্রবাসী ভারতীয় পুরুষানুক্রমে বৈদেশিক শাসন, শোষণ ও বিধর্ম্মীর প্রচারের প্রভাব এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির কুক্ষিগত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই জন্য প্রবাসী ভারতীয়গণের ভিতর ভারতীয় ভাবধারার ব্যাপক প্রচারের উপযোগিতা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের পক্ষ হইতে ভারতীয় ভাবধারা—বহির্ভারতের দিকে দিকে প্রচারের আয়োজন বিশেষ আবশ্যক। তাই ভারতের পক্ষ হইতে সাংস্কৃতিক প্রচারক দলের বহির্ভারতে অভিযানের জন্য ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ অগ্রসর হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জুন ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে নয় জন সন্ন্যাসী-প্রচারক বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য এস-এস-খাণ্ডালা নামক জাহাজযোগে পূর্ব্ব-আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রচারক-বাহিনীর নামকরণ করা হয় "ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন"। যাত্রার প্রাক্কালে মিশনের সদস্যগণকে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে বিপুলভাবে বিদায়-সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সরকারীভাবে উক্ত প্রচারক-বাহিনী প্রেরিত না হইলেও সঙ্ঘের এই প্রচার-অভিযানে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও ভারত-সরকারের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ভারত-সরকারের তদানীন্তন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব সরকারী ভাবে মোম্বাসার

(ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা) ট্রেড কমিশনারের নিকট যে পত্রখানি দিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :

"... We are not officially sponsoring the members of the Indian Cultural Mission deputed by the Bharat-Sevasram Sangha, but the Government of India feel that much work of a religious and cultural nature requires to be done amongst the Indians in East Africa. We would be very glad if you give them such reasonable assistance and facilities as they may require ...."

এতদ্ব্যতীত বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল এম. এস. আনে, রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভারত-সরকারের তদানীন্তন সরবরাহ-সচিব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পার্লামেন্টের স্পীকার জি. ভি. মভলঙ্কর, ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভারতীয় হাই কমিশনার সত্যচরণ শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী বি. জি. খের, বঙ্গীয় আইন পরিষদের স্পীকার ঈশ্বরদাস জালান প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সঙ্ঘের এই প্রচার-অভিযানকে অভিনন্দিত করেন এবং উৎসাহপূর্ণ বাণী প্রেরণ করিয়া সাফল্য কামনা করেন।

আর্য্যসমাজ হল—কিসুমু (পূর্ব্ব-আফ্রিকা)

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে যজ্ঞানুষ্ঠান
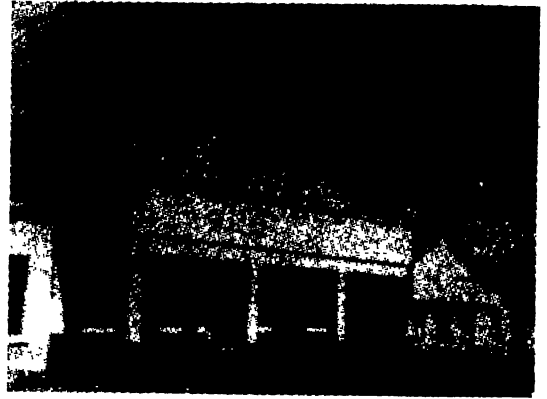
সঙ্ঘ-প্রেরিত এই সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় এক বৎসর দুই মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বৎসরাধিককাল তাঁহারা পূর্ব্ব-আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা টেরিটরী, উগাণ্ডা প্রোটেক্টরেট ও কেনিয়া কলোনী এই তিনটি প্রদেশের ভারতীয় অধ্যুষিত বহু শহর ও গ্রামে ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার এবং গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতিকারার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। সাংস্কৃতিক মিশনের পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রচারের যে কার্য্য-বিবরণী প্রচারিত হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। মিশনের সদস্যগণ কখনও সমবেত ভাবে কখনও বা দুই তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন শহর, গ্রাম, শিক্ষায়তন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহাদের দ্বারা সাংস্কৃতিক, সামাজিক, দার্শনিক, ধর্ম্মীয়, নৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রদর্শনী, শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা, সমবেত প্রার্থনা-সভা, সার্ব্বজনীন যজ্ঞানুষ্ঠান, ভজনাবলী, যৌগিক আসন প্রদর্শন, ছাত্র ও শিক্ষক সম্মেলন, মহিলা সম্মেলন প্রভৃতির ভিতর দিয়াও প্রচারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী ভারতীয়গণকে একই সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নগর ও পল্লীতে মিলন-মন্দির নামক সংগঠন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রচারকগণের প্রচেষ্টায় নাইরোবি ও মোম্বাসায় "ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন" নামে দুইটি স্থায়ী কর্ম্মকেন্দ্র এবং প্রবাসী বাঙালী বালকবালিকাগণের ভিতর বাংলা ভাষা প্রসারের জন্য পূর্ব্ব-আফ্রিকার রাজধানী নাইরোবিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উগাণ্ডার কামুলী শহরে এবং কেনিয়ার কিটালে স্থানীয় জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে মিশনের প্রচেষ্টায় প্রার্থনা ও সভামণ্ডপ সমন্বিত দুইটি বিরাট মন্দির নির্ম্মিত হয়। স্থানে স্থানে শরীরচর্চ্চার জন্য বহু ব্যায়ামাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। টাঙ্গানাইকার অন্তর্গত মাউয়া শহরে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। শোভাযাত্রা সহকারে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আষাঢ় মাসে

রথোৎসবও মিশনের সদস্যগণ টাঙ্গানাইকার মসী শহরে যথারীতি পালন করেন। এই দুইটি উৎসব ঐ দূর দেশে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। পূর্ব্ব-আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পি. ডি. মাষ্টার ভারত-সরকারের নিকট সাংস্কৃতিক মিশনের যে কার্য্যবিবরণী প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :

পূর্ব্ব-আফ্রিকাস্থিত নাইরোবিতে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এ. বি. প্যাটেল, এম-এল-সি বক্তৃতা করিতেছেন

". . . While in Tanganyka the members of the Indian Cultural Mission deputed by the Bharat-Sevasram Sangha, organised Durgapuja and Nairobi Hindu Conference on a scale never witnessed by the people before. Swami Advaitanandaji leader of the Mission addressed numerous crowded meetings and delivered a series of lectures all over Tanganyka on various subjects and impressed on the minds of the people what Indian Culture was, what was the true Hindusim and what the people of India aimed at."

সঙ্ঘের উদ্যোগে মোম্বাসায় ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল প্রেরিত একটি বাণী উক্ত সভায় পঠিত হয়। তিনি প্রবাসী ভারতীয়গণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "প্রবাসী ভারতীয়গণ স্বাধীন ভারতের সুনাম অম্লান ও নিষ্কণ্টক রাখিবেন। অতীতে যে প্রেরণা তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, বর্ত্তমানে তাঁহারা যেন আচরণের দ্বারা তাহা দূর প্রবাসে অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং তাঁহারা যেন তাঁহাদের সনাতন আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হন।"

এই প্রকারের সাংস্কৃতিক মিশনের গঠনমূলক প্রচার-অভিযানের ফলে প্রবাসী ভারতীয় তথা জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়াছিল।

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ পূর্ব্ব-আফ্রিকার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ আদর্শ ও উচ্চতম ভাবধারা প্রচার করিয়া প্রবাসী ভারতীয় এবং স্থানীয় আফ্রিকান ও জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ এস. জি. আসিন যথার্থই
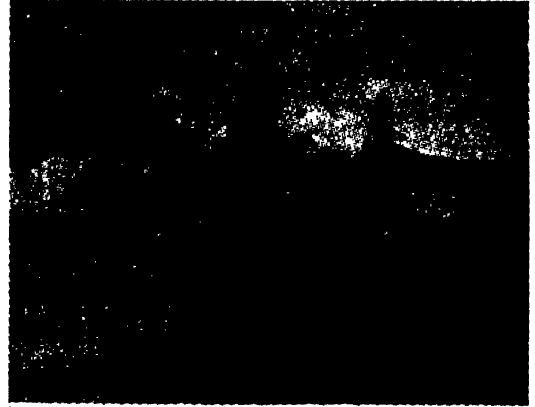
শিখ-গুরুদ্বার—নাইরোবি

বলিয়াছেন—"ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের এই প্রচার-অভিযানের ফলে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার ভূমিকার উপর বহুধা-বিভক্ত এদেশের প্রবাসী ভারতীয়গণের আজ একযোগে নিজেদের ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা গ্রহণ করিবার যে সুযোগলাভ হইয়াছে তাহাকে স্থায়ী রূপ দিতে পারিলে উহার ভবিষ্যৎ ফল সুদূরপ্রসারী হইবে।"

আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ এ. প্রীতম একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে প্রবাসী ভারতীয়গণের যে চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রীতম বলেন, "সুদীর্ঘকাল আমরা এদেশে কোন ভারতীয় প্রচারক বা সন্ন্যাসীকে পদার্পণ করিতে দেখি নাই। ফলে এই দেশে জাত নর-নারী—যাহারা অদ্যাপি ভারতের পবিত্র মাটি স্পর্শ করিবার সুযোগ লাভ করে নাই, তাহারা ভারতের বাহিরে ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীদের প্রচারের ভিতর দিয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছে। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের অভাবে অনেকেই আমরা আমাদের পিতৃভূমির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। ফলে কেহ ভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছি, কেহ বা নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া আহারে বিহারে পোশাকে পরিচ্ছদে কথাবার্ত্তায় বিজাতীয় আদর্শের ছাঁচে গঠিত হইতেছি; ভারতের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ আমাদের বংশধরদের প্রাণে নূতন আলোক দান করিবার সুযোগ পাইতেছে না। আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ এই সঙ্ঘের গৈরিকধারী সন্ন্যাসিগণ এদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ও প্রচার করিয়া

আমাদিগকে স্বকীয় পথে ও স্বীয় আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।"

সাংস্কৃতিক মিশনের অন্ততম প্রচারক স্বামী পরমানন্দজী আমাদের নিকট পূর্ব্ব-আফ্রিকার ভারতীয়গণের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া দিলে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে: "আমরা বৎসরাধিককাল প্রচারের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় আদর্শকে প্রবাস জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার অনেক শহরে হিন্দুদের মন্দির বা ধর্ম্মস্থান নাই। হিন্দু জনসাধারণ ভারতীয় ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে অচেতন। এই অবস্থায় বিজাতীয় প্রভাবে তাহারা উদ্বুদ্ধ হইবে না কেন? খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকেরা আফ্রিকার আদিবাসিগণকেও নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে।

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের দ্বারা অনুষ্ঠিত—
নাইরোবিতে মহিলা-সম্মেলনের একাংশ

আফ্রিকার অধিবাসী সোরেলী

এক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয়গণের নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতির বিদেশে প্রসারের বিষয়ে হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষে যেমন উদাসীন এই দূর প্রবাসেও সেইরূপ তাঁহারা ইহার প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর দেখাইয়া চলিতেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। জাঞ্জিবার প্রদেশে কয়েক সহস্র হিন্দু প্রলোভনে ও শাসন-শোষণের চাপে ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছিল। শেষে তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়া স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচীনপন্থী হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিরোধিতায় উহা সম্ভব হয় নাই। তাহাদের অনমনীয় মনোভাব এবং অদূরদর্শিতার ফলে তাহারা আর হিন্দু সমাজে স্থান পাইল না। ফলে দুই শত বৎসরের মধ্যে এই সামাজিক বিশৃঙ্খলার সঙ্ঘাতে বহু পরিবার সদলে ভিন্ন সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছে। আবার অধিকাংশ আদিবাসী নিগ্রোর ধারণা যে প্রবাসী ভারতীয়গণ শোষণকারী ব্রিটিশের পর্য্যায়ভুক্ত। এখন আমাদের ওখানে খোলাখুলি ভাবে হিন্দুত্বের মহান্ আদর্শ প্রচারের ইহা একটি মারাত্মক অন্তরায়। কারণ ইহাতে মিশনরী সমাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে। এই প্রকারে আফ্রিকার ভারতীয় ঔপনিবেশিক সত্তা উপেক্ষিত হইয়া চলিতেছে। দূর প্রবাসে ভারতীয়গণের পরস্পর ঐক্য ও সংহতি রচনায় তাই বাধার সৃষ্টি হইতেছে। স্বাধীন ভারতের উপনিবেশ প্রসার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এই উদাসীনতার মারাত্মক ফল আমরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রত্যক্ষ করিতেছি।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ন্যায় এখানেও বর্ণবৈষম্যনীতির কুফল দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। মোম্বাসায় রেক্স নামে একটি প্রকাণ্ড হোটেল আছে, সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নাই। আবার, রেল-ষ্টেশন, পাঠাগার, বাজার প্রভৃতিতেও অ-শ্বেতকায়গণ একঘরে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয়গণের সহিত আফ্রিকানদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান প্রবাসী ভারতীয়গণের পূর্ব্বপুরুষেরা আড়াই শত

বৎসর পূর্ব্বে শ্রমিক হিসাবে এদেশে পদার্পণ করে। কিন্তু বৈদেশিক শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের আত্মপ্রসারের সুযোগ-সুবিধা আজ বিলুপ্ত হইতেছে।

আফ্রিকার আদিবাসী গোগো

ভারত বিভক্ত হইবার পর আর একটি নূতন সমস্যা এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতের ন্যায় এখানেও এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব উদগ্র হইয়া উঠিতেছে। ফলে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ ও সংরক্ষণের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। সম্প্রতি এখানে একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহার ফল যে বিষময় হইবে তাহা বলা বাহুল্য।"

এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিষয়ে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত গত নবেম্বর (১৯৫২)-এর *The Indian* নামক একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :

"As a result of partition of India, there is the unfortunate tendency of division amongst the Muslim and non-Muslim Indians overseas. This was brought to its tragic climax in Kenya when the Indian community was permanently split up between Hindus and Muslims from electoral and legislative point of view, thus weakening the weak position of our people in Africa."

ভারতীয়গণ যাহাতে রাজনৈতিক ক্রীড়নক না হইয়া ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বহির্ভারতে ভারতীয় ঔপনিবেশিক সত্তাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন সেই বিষয় আজ প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজন। পাকিস্থানের পক্ষ হইতে নাগপুরের বিখ্যাত নবাব-বংশের

জাঞ্জিবারের সুলতান

সিদ্দিক আলি খাঁ রাষ্ট্রদূত নির্ব্বাচিত হইয়া সম্প্রতি ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন সভার অন্যতম সদস্য হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে তিনি পাকিস্থানের একজন শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আশা করা যায়, তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় এবং সদিচ্ছার প্রভাবে পূর্ব্ব-আফ্রিকার উপরি-লিখিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রশমিত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সখ্য-প্রীতি ও সাম্যভাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে তাঁহার অনুবর্তী সন্ন্যাসিগণ তাঁহারই মহান্ বাণী দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়া শান্তি আনয়নের জন্য ব্রতী হইয়াছেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকায়ও তাঁহারা স্বামীজীর প্রবর্ত্তিত সঙ্ঘের আদর্শ সকলের মধ্যে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতে এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দির নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুখোশ

শ্রীরেণুকা দেবী

সুরেশের মনটা আজ ভারি খুশী, মহা আনন্দে পাম্পশু জোড়া পালিশ করতে বসে যায়। তালিমারা কাবলীটা দিয়েই সে কাজ চালায়; আজ একটা নেমতন্ন পেয়েই পাম্পশুর আদর। জোরে জোরে ঘষতে থাকে সে, আর মনের আনন্দে একটু বুঝি গানও করে গুন গুন করে। নেমতন্ন পেয়ে আনন্দিত হওয়া আজকালকার দিনে দুর্ঘটনারই সামিল। নেমতন্ন পাওয়া মানে. মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, এমন অবস্থায় সুরেশের এত আনন্দ কেন? এ কোন সামাজিক নিমন্ত্রণ নয়, তবে কি পাসের খাওয়া, মামলা জেতা, লটারির টিকিটে টাকা পাওয়া? না তাও নয়, নেমতন্নটা হচ্ছে বাড়ীভাড়া পাওয়ার আনন্দোৎসব আর সে বাড়ী সুরেশ ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে খুঁজে দেয় নি—এ বন্ধু এবং সহকর্ম্মী মোহিতের বাড়ীভাড়া পাওয়ার নেমতন্ন। বাসা করে বৌ নিয়ে বাস করবার বাসনা বেচারীর বহুকালকার, তারপর স্বপ্ন দেখার সময় পার হয়ে যখন প্রয়োজনে দাঁড়াল তখনও বাসা করা হ'ল না। প্রথম দিকে যখন বাড়ী পাওয়া সহজ ছিল, তখন প্রতিবন্ধক ছিলেন মা এবং তার নিজের প্রতিজ্ঞা। বড় ছেলেরা সব বিয়ে করে যেখানে থাকে সেখানে বৌ নিয়ে যাওয়ায় মোহিতের মাকে একলাই দেশের বাড়ীতে থাকতে হ'ত। চিরকাল তো আর পাড়াগাঁয়ে কাটানো যায় না, আর বিধবা মাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি। দাদাদের বিয়ের পর বেশ কিছুদিন অবিবাহিত থাকায় মোহিত মায়ের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল। তার উপর মায়ের একটা কথায় মায়ের উপর তার একটা গভীর শ্রদ্ধা হয়, তখনই সে প্রতিজ্ঞা করে, তার বিবাহ হলে সে কখনও মাকে একলা এমন অসহায় অবস্থায় রাখবে না। ঘটনাটা এই—হঠাৎ এক দিন কিসের ছুটি হওয়ায় মোহিত বাড়ী গিয়েছে। মোহিতের মাকে বিকেলে রান্নাঘরে দেখে এক প্রতিবাসিনী ব্যঙ্গ করে বলেন, কি দিদি, বিকেলে হঠাৎ উনুনে আগুন প'ল যে, সুজিত, অজিত কেউ এল নাকি।

মা বলেন—না তারা কেউ আসে নি মোহিতের আপিসে আজ হঠাৎ কিসের ছুটি তাই এসেছে।

—ও, ওর যে এখনও গুরুরূপে আসেন নি।

—গুরুরূপেদের আর দোষ কি বল, নিজের পেটের ছেলেরাই যখন মায়ের দুঃখ বোঝে না তখন তারা বুঝবে কেন, ছেলে টানলে তবে তো তারা টানবে।

মায়ের কথায় মোহিত মুগ্ধ হয়ে যায়। লোকে বৌদের দোষ দেয়, মায়ের কষ্ট দেখে তার নিজেরই কত সময় বৌদিদের উপর রাগ হয়েছে, কিন্তু সত্যিই তো ছেলেরা যদি মাকে দেখে তো বৌদের সাধ্য কি তাতে বাধা দেয়। মোহিত প্রতিজ্ঞা করে, মা বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত বৌকে মার কাছ ছাড়া করবে না. কিন্তু মোহিতের যখন বিয়ে হয় মা তখন অতি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। বড় বড় তিন ছেলের বিয়ে দিয়ে, তাদের বৌদের নিয়ে ছেলেদের বাসায় বাস করবার ইচ্ছায় হতাশ হতে হতে মোহিতের বেলায় তাঁর আর সে আশা ছিল না। শ্বশুরের ভিটাতে মরবার বাসনাই তখন তার প্রবল। তারপর মোহিতের বৌকে নিয়ে কিছুদিন ঘর-সংসার করে মা মারা গিয়েছেন আজ তিন-চার বছর হ'ল কিন্তু কলকাতায় বাড়ী তখন ওর পক্ষে কোহিনুরের মত দুষ্প্রাপ্য। তখন সে যা মাইনে পেত সেই তাতে সময়কার ভাড়া ও সেলামী দেওয়া অসম্ভব। মোহিতের স্ত্রী বেলার আবার একটা মত ছিল, বাসা করবে একেবারে খাস কলকাতায়, বেহালা বরানগর ঢাকুরেয় বাসা করে কলকাতা বলবার মধ্যে সে নেই, তার চেয়ে পুর্ব্বস্থলীই ভাল। কিন্তু এখন প্রয়োজন খুব বেশী, দশ বছরের ছেলেটা গাঁয়ের মাইনর স্কুল শেষ করেছে, তাকে বসিয়ে রাখা যায় না। আট বছরের মেয়েটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করা দরকার ইত্যাদি…

যাই হোক, আজ পদোন্নতি হয়ে মাইনেটা বেড়েছে, আর এ পোষ্টে একটা বাড়ীভাড়ার টাকাও পাওয়া যায়, কিন্তু বাড়ী কোথায়? দুখানা ঘরও মিলছে না। আপিসেই সেদিন সুরেশ বলল হাসতে হাসতে "শিব বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিজমুখে।" বাবা বামুন-ভোজন করিয়ে দাও নির্ঘাত বাসা পেয়ে যাবে। মোহিত বললে, শিব বাড়ী পাইয়ে দিন, একটি কেন দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে দেব। আশুতোষ অল্পেই সন্তুষ্ট, তাই বোধ হয় প্রতি-শ্রুতিতেই রাজী হয়ে যান—ভবানীপুরে মাঝারি দুখানা ঘর একটু দালানমত রান্নার যায়গা, আলাদা কলপায়খানা সমেত একটা অংশ মোহিত আশী টাকাতেই পেয়ে যায়। আর সেই বাসাপ্রাপ্তির নেমতন্নেই সুরেশ যাচ্ছে আজ। সামান্য তারতম্য বা সমান মাহিনার দল ছাড়াও আগেকার সহকর্ম্মীর দলও ছিল, সুরেশ ও অবনীশ সেই দলের হলেও এরা সকলেই বেশ ঘনিষ্ঠ। দুটি ঘরের সামনে যে দালানমত জায়গা, সেইখানেই ছোট সংসারের বাড়তি জিনিস-পত্র রেখে ঘর দুটিকে বেশ ছিমছাম রাখা চলে। একতলার পেছনের অংশ হলেও ঘর দুটিতে বেশ আলো-বাতাস আছে, আর সস্তার সময়ে তৈরি বলেই ঘর এবং দালানে বেশ ভালো মোজাইকের মেঝে, ক্রীম কালোর নক্সাকাটা, সদ্য হোয়াইটওয়াশ বলে বেশ আলো-আলো লাগছিল। সুরেশ নগেন—কলকাতায় যারা পুরাতন বাসিন্দা, তাদের পাঁচ সরিকে ভাগে পাওয়া দুখানি ঘরেই সংসার সামলে রাখতে হয়। তাদের চোখে বাসাটা খুব ভাল লাগল। বললে, না বাসা বাড়ী পেয়েছ মোহিত, কষ্টের পর কেষ্ট মিলেছে। মোহিতের স্ত্রী বেলা এসে সকলকে নমস্কার করে বসতে বললে,

শান্তি-তৃপ্তি মিশ্রিত একটা পুলকের ভাব তার সর্বাঙ্গে, কাজে ও কথায় জড়িত।

—নগেন বললে, বেচারি বাসাটা পেয়ে বেঁচেছে।

অবনীশ বললে, হ্যাঁ বাড়ীটার সব ভাল তবে দক্ষিণটা চাপা, তবুও মোহিতের স্ত্রীর কোন আপত্তি নেই। আর আমার স্ত্রী—তার আবার আর যাই হোক দক্ষিণটা খোলা থাকাই চাই। দখিন হাওয়া না খেলে তার নাকি গান বেরোয় না।—এমন স্বরে বলল যেন সেটা কত বড় গুণ। থাকি দুখানা ঘরের ফ্লাটে—তার দক্ষিণটা খোলা, আর পূবদিকে একটু বারান্দা আছে। আসল কথা হচ্ছে, গান না করলে ও থাকতে পারে না, চলতে ফিরতে কাজে কর্মে গলাটি গুন্ গুন্ করছেই, তা নাকি ওই দখিন হাওয়ার গুণে। আরে ভাই সেবার আমার মামাতো ভাই বেহালা না ব্যাটরা কোথায় বাড়ী করে উঠে গেল; রান্না, খাওয়ার ঘর ছাড়া চারখানা ঘর—মানে, একটা বড় বাড়ীর দোতলার একটা অংশ, সব ঠিক করে এলাম সাবেক ভাড়ায়। কিছুতেই গেল না, কিনা দক্ষিণ চাপা।—অবনীশের মুখে তার স্ত্রীর কথা সবাই বহু বার শুনেছে, ভদ্রমহিলা বি-এ পাস, বেশ সুরুচিসম্পন্না, আরও বহু গুণ, কিন্তু গানের কথা এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।

সুরেশ বলে, আপনার স্ত্রী গাইতে পারেন নাকি?

পারে মানে, সারা শান্তিনিকেতনে ওর জুড়ী ছিল না। কত জলসা-উৎসবে গান করেছে, তখনকার দিনে পর্ণা চৌধুরীর নাম শোনেন নি? এখন কিন্তু কিছুতেই বাইরে গায় না। মাসিক সুরবিজ্ঞানে পর্ণা ঘোষের আর্টিকেল পড়েন নি।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকে তাকায় ভাগ্যবানের দিকে। অবনীশের কথা মোটামুটি বলতে গেলে ছাত্রজীবনে ও খুব ভালো ছিল। ম্যাট্রিকে থার্ড হয়েছিল, আই-এতেও স্কলারশিপ পেয়েছিল, কিন্তু বি-এ পাস করল সাধারণ ভাবে, তারপর বহুকাল কি কি নানারকম করেছিল। বছর পাঁচ-ছয় আগে, মোহিতের কাছে আসে চাকরির জন্তে। পোষ্টও একটা ছিল, মোহিতই চেষ্টাচরিত্র করে চাকরিটি করে দেয়, কারণ অবনীশ মোহিতের ছাত্রজীবনের বন্ধু। তখন শোনা গিয়েছিল একটি ছেলে আছে, আর বিশেষ কেউ কিছু জানত না। কিছু দিন পরে অবশ্য মাঝে মাঝে গল্প উঠলে,—বিশেষ করে মেয়েদের—ওর স্ত্রীর মতামত তার পছন্দ, সৌখিন বাজার করায় নৈপুণ্য ইত্যাদি শুনে শুনে সকলের ধারণা হয়েছিল, অবনীশ-পত্নী একটি স্ত্রী স্মার্ট মহিলা। বাসাটা হয়ে মোহিতের সুবিধা হোক আর না হোক, এই দলটির বেশ সুবিধা হ'ল। মোহিতের অন্তরঙ্গ দলের একটা জমাট তাসের আড্ডা জমে উঠল,—রোজ না হলেও অবনীশ প্রায়ই আসত এই আড্ডায়। খাস কলকাতায় বাসা বাঁধবার প্রগাঢ় বাসনায় ও নিজের সংসার সুচারু ভাবে সাজাবার নারীসুলভ ইচ্ছায়, মোহিতের স্ত্রী বেলা, এত দিন ধরে যে-সকল গৃহস্থালির দ্রব্য ধীরে ধীরে সংগ্রহ করেছিল তা দিয়ে সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে রাখে, ছোটো-খাটো খুঁটিনাটি জিনিষও এমন ভাবে গুছান যা পুরুষ মানুষেরও চোখে পড়ে। দালানটির এক দিকে একটি র‍্যাক তাতে ছোট বড় সব এলুমিনিয়ামের কৌটো, কাচের জারে রকমারি আচার, চিনি বাতাসা, সবুজ রঙের রং-করা কয়েকটা টিন, তাতে বোধ হয় চাল আটা থাকে। দুটি ছোট আলমারী, একটি চায়ের সরঞ্জাম, একটিতে রান্না-করা খাবার থাকে, আর মাঝখানে ছোট নীচু একটি টেবিল, তার পাশে চারটি ছোট বেতের মোড়া, সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার কাজ সারা হয়। অল্প জায়গায় সর্ব্বদা দেখাশুনার ফলে কোন বিশৃঙ্খলা হয় না। সুরেশ বলে, কাকা, দাদা সবাই ভাগ করে ভাগে ত পড়েছে মাত্র দুখানি ঘর, তার একখানি ত লাগে গিন্নির ভাঁড়ারে, বাড়ীতে বসি এমন একটু জায়গা নেই, ছেলেগুলো পড়ে সেই শোবার ঘরে, তাও কি জায়গা আছে—এদিকে বাক্স, ওদিকে ডেস্ক, আর বৌদি কেমন একটা র‍্যাকেই ভাঁড়ারের কাজ সেরেছেন, অথচ কেমন পরিষ্কার। অবনীশ তাড়াতাড়ি একবার দালানে উঁকি মেরে, বেলাকে উদ্দেশ করে বলে, বেশ করেছেন। সংসার ছবির মতন সাজিয়ে রেখেছে বটে পর্ণা। একটা বড় গ্লাসকেস করিয়েছে ভাঁড়ার রাখার জন্তে—তার মধ্যে রেখেছে সব কাচের জার, ছোট বড় অসংখ্য। কিছু মনে করবেন না বৌদি, পর্ণা হলে ঐ টিনগুলো কিছুতেই বরদাস্ত করত না।

—তবে চাল ময়দা রাখে কিসে, কাচের জারে?

—নিশ্চয়ই আমারই ভোগান্তি আর কি, ছুটি সেই মুর্গীহাটায়, তবে কি জানেন, আমরা তিন জন আর বাচ্চা চাকর, বেশী বড়র ত দরকার হয় না।

—রান্না নিজেই করেন বুঝি?

—রান্না ও আর কারও হাতে দেবে? সব কাজ নিজে করবে, এই ত খাবার প্লেটগুলো চাকর একবার সাবান দিয়ে ধোবে, নিজে আবার ভীম পাউডার দিয়ে মাজবে।

বেলা বলে, খুব পরিষ্কার আর সৌখিন বুঝি!

—ঐ সৌখিন, আর মনটা একটু আর্টিষ্টিক কিনা, হাজার হোক শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ত, ওরা সবের মধ্যে আর্ট খুঁজে পায়, বলে সব জিনিষ সুন্দর করে তোলা যায় নিজের সৌন্দর্য্যবোধ দিয়ে।

আবার সকলে তাকায় ভাগ্যবানের দিকে। সত্যি তাদের মধ্যে অবনীশই পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ কায়দাদুরস্ত, সুটই পরুক আর ভাল সূতী ধুতি—মটকার পাঞ্জাবী পরুক সবসময়ে ধোপ-দোস্ত ইস্ত্রি-করা। এর অন্তরালে, সেই চারুকলাপটীয়সীর, কলাকৌশল লুকান আছে, হয়ত নিজের হাতে ইস্ত্রি করেই প্রত্যহ এগুলিকে সুচারু করে রাখেন, না হলে কি আর সম্ভব হ'ত।

কয়েক দিন পর অবনীশ হাজির হ'ল, হাতে মাসিক 'সুরবিজ্ঞান'—থার্ড আর্টিকেল পর্ণা ঘোষ, বি-এ, সঙ্গীত-বীণাপাণি।

বেলা বৌদি বললেন আমাদের মত লোকদের ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার যোগ্যতা নেই, তবু এক দিন যদি আনেন, খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আপনি তাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন ভারি সিম্পল। বুঝুন্‌ না, তা-না হলে আমার মত লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে। ও ত মস্ত বড়লোকের মেয়ে, বাপ এলাহাবাদের বড় ডাক্তার, কাকা ব্যারিষ্টার, বলতে গেলে ত তাদের অমতেই আমাকে পছন্দ করেছিল।

মোহিত বলে, তোদের তা হলে লভ ম্যারেজ, তাই বিয়েতে খবর পাই নি।

আবার সকলে তাকায় ভাগ্যবানের দিকে।

সেদিন উঠবার সময় অবনীশ বলে, পর্ণা এখানে নেই, দেরাদুন গিয়েছে মামার কাছে, এলেই নিয়ে আসব।

বেলাবৌদির নূতন সংসার, সাজাবার সখটা তাই খুব বেশী। কয়েকটা ছিটের পর্দা করে টাঙান, সাধারণ ছিটের পর্দা, তবুও নূতনের সব ভাল তাই খারাপ লাগছিল না।

ভূপতি বলে, পর্দাগুলো বেশ হয়েছে, না—মোহিতের স্ত্রীর পছন্দ আছে, আবার কয়েকটি ছবিও দেখছি, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আনমনা, মায়ের হাসি, বাঃ বেশ হয়েছে, আপনার সবদিকে দৃষ্টি আছে।

বেলা দেবী তাকান অবনীশের দিকে, সে কি বলে। বুঝতে পেরে অবনীশ বলে—হ্যাঁ বেশ হয়েছে, তবে ঐ কি জানেন, সঙ্গদোষে রুচিটা একটু বদলেছে, তাই, বেলাবৌদি আপনি কিছু মনে করবেন না, তবে পর্ণা বলে, পর্দা হবে একরঙা আর ঘরের দেয়ালের সঙ্গে রং মিলিয়ে। এই তো সাদা পর্দা একদিনে ময়লা হয় বলে, শোবার ঘর, আরে ভাই সেই তো পরের ঘর, তা-ই 'সি-গ্রীন' রং করিয়ে, তবে সেই রঙের পর্দা টাঙায়। আর ছবি, ও তো বলে ডাবল সিনারি ছাড়া নাকি আর কিছু মানায় না ঘরে, মানুষের আকৃতি থাকবে এলবামে।

এমনি ভাবে কোন উপলক্ষ হলেই অবনীশ তার স্ত্রীর সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় দেয়। বারান্দায় টবে সে নাকি কোটায় গোলাপ রজনীগন্ধা, স্নো পাউডার সে ব্যবহার করে না, কিন্তু ফুল তার রোজ চাই। সকলেই শোনে, আর মুগ্ধ হয় দেখে ভাগ্যবানকে।

এদিকে ক্রমে ক্রমে নগেন, সুরেশ, ভূপতি এদের স্ত্রীর সঙ্গে বেলা-বৌদির আলাপ হয়। মেয়েরা বলেন ঠাট্টা করে—সে কি! বাসা হ'ল মেয়েলোকের, আর নেমন্তন্ন খেল পুরুষরা, তারাও খাবে এক দিন নেমন্তন্ন। সুরেশের স্ত্রী বলে, এ হবে একেবারে খাটী মেয়েলি নেমন্তন্ন, পুরুষদের আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে আসব, আর খাব শুধু মাছের ঝোল ভাত, আর কিছু না। ভূপতির স্ত্রী বলে, আর সারা দুপুর পান চিবিয়ে গল্প করে, বিকেলের আগেই ফিরে যাব। সকলকেই বলা হয়, বেলা একটু ইতস্ততঃ করে অবনীশের বৌকে বলতে। সুরেশ প্রভৃতির স্ত্রীরা যাই হোক কলকাতার বাসিন্দা—গাইয়ে বাজিয়ে পাস-করা শুনলে অত ভড়কে যায় না। তাই বলে বলবেন তাতে কি হয়েছে, তবে যা শুনছি তাতে আপনি নিজে গিয়ে বললেই ভালো হয়। এরা দু'জনেই বেলার সঙ্গে যেতে রাজী হন। বেলা যেদিন নিমন্ত্রণের আয়োজন করে তার দুদিন আগে থেকেই অবনীশ আড্ডায় গরহাজির। মোহিত আপিসে গিয়ে খোঁজ করে জানল, সে নেই দেশে গেছে। এরা বলাবলি করছিল—তাই তো, একা গেছে না সপরিবারে গেছে কে জানে। যে ছোকরা চাকরটা এদের চা সিগরেট আনে, সে বলল না অবনীশবাবু একাই গিয়েছেন।

তুই কি করে জানলি।

বাবু যে ছুটির শেষে আমাকে ডেকে নিয়ে শিয়ালদা থেকে এক-থলি বাজার করে বাড়ী পৌঁছে দিতে বলতেন।

ও তুই তা হলে বাড়ীটা চিনিস, তবে চল আমার সঙ্গে, বাড়ী চিনিয়ে দিবি।—আপিসের শেষে, বেয়ারাটাকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ী আসে মোহিত, তারপর স্ত্রী আর দুই বন্ধুর পত্নীকে নিয়ে অবনীশের বাড়ীর দিকে রওনা হয়। বৌবাজারের এক অন্ধ গলির মধ্যে কোণা-চাপা বাড়ীর দোতলার অংশ, হাওয়া তো দূরের কথা, আলোও আসে কি না সন্দেহ। পার্টিশান-করে-দেওয়া কাঠের দেয়ালেই ঢোকবার দরজা। কড়া নাড়তেই, খালি-গা, প্যাণ্টপরা, রোগা চেহারার বছর দশেকের একটি ছেলে দরজা খুলে দিলে। পুরানো আমলের বাড়ী বলে ঘরখানা বেশ বড়, আর ঘরটার চতুর্দ্দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। এক কোণ থেকে একটা দড়ি জানলা পর্য্যন্ত, তার উপর আধ-ময়লা জামা কাপড় ঝুলছে, একপাশে একটা চৌকির উপর বিছানা স্তূপাকার করে রাখা, ওয়াড়হীন বালিশ ছড়ানো। আর এক পাশে ছেঁড়া মাদুরে ছেলেমেয়েদের বই খাতা ছড়ানো, একটি মেয়ে ফ্রকপরা—স্লেট লিখছে, তার পাশেই, মেঝেয় দুটি মুড়ি ছড়ানো—বছর দেড়েকের একটি শিশু, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, ঘরের ঠিক মাঝখানে, আরও দুটি ছেলে ভাঙা কলাই করা থালার গুড় দিয়ে রুটি খাচ্ছে, সেখানেই ফালি করা রুটি ও গুড় রয়েছে—ভাগ করে দিচ্ছে, সবুজ-লালে, ডোরা-কাটা, মোটা তাঁতের শাড়ীপরা একটি স্ত্রীলোক। সহসা এদের দেখে চমকে উঠে দাঁড়াল—এক মাথা রুক্ষ চুল, কালো, অতি সাধারণ চেহারা, গায়ে একটা শেমিজ পর্য্যন্ত নেই। অভ্যাগতদের দেখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারল না। মায়ের এই বিমূঢ় ভাব দেখে বছর আটেকের মেয়েটি স্লেট ফেলে, উঠে এসে বললে, বাবার ঘরটা খুলে বসতে দাও না, বলে নিজেই দেয়ালের গা থেকে চাবি পেড়ে পাশের ঘরটা খুলে দিলে, বলল—বসুন। সকলেই দেখল এই ঘরটার চেহারা একেবারে বিপরীত। এক পাশে একটি ছোট খাটে পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। কাঠের আলনায় অবনীশের জামা-কাপড় থাকে থাকে গোছান, একটি খোলা-গা আলমারীতে রয়েছে একটি ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ছোট টেবিলের উপর ফুলদানিতে, কয়েকটি শুকিয়ে-যাওয়া গোলাপ ও রজনীগন্ধা। বসা এদের হ'ল না, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে আসতে চায় সবাই। নেমন্তন্নের কথার উত্তরে স্ত্রীলোকটি বললেন, আমার কি যাওয়া চলে এই সব নিয়ে, তারপর একটু বিষাদের হাসি হেসে

বললেন, 'পাড়াগেঁয়ে ভূত আমি, আমার কি আপনাদের মধ্যে মানায় ?'

ফেরবার পথে মেয়েরা এ নিয়ে অনেক কথাই বলাবলি করছিল কিন্তু মোহিতের, চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল অবনীশের অন্তঃপুরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ আর তার মধ্যে একপাল কাচ্চা-বাচ্চা পরিবৃত তার স্ত্রীর অসহায় করুণ মুখচ্ছবি। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়তে লাগল অবনীশের মুখের লম্বা চওড়া বুলিগুলো।...বাস্তবিক কত বিচিত্র উপায়েই না মানুষ খোঁজে ব্যর্থতার মধ্যে সান্ত্বনা—কি অদ্ভুত আত্মপ্রতারণা !

বাঙালীর হিন্দী-শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়া

শিখবার পথে কয়েকটি বাধা

স্বেচ্ছায় এবং সোৎসাহে না হলেও অন্ততঃ প্রয়োজনের তাগিদে এখন আমাদের হিন্দী শিখতে হবে। হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের পক্ষে হিন্দী-শিক্ষার পথে অনেকগুলি বাধা আছে, যেমন কর্তা বা কর্মের লিঙ্গানুযায়ী ক্রিয়ারও লিঙ্গ-পরিবর্তন। এ ধরণের বাধা অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং বিস্তর সময় ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। কিন্তু এই সব বাধা সর্ব্বত্র সর্বসাধারণের। বাঙালীদের পক্ষে যে দু'একটা বিশেষ ধরণের অসুবিধা আছে তাই এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকের আলোচ্য বিষয়।

বাঙালীর হিন্দী-শিক্ষার পথে একটা অন্তরায় হচ্ছে বাংলা ও হিন্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। কথাটার মধ্যে আপাত-বিরোধ রয়েছে, সুতরাং কিছু স্পষ্টীকরণ দরকার। দুটি ভাষা আমূল পৃথক হলে এক ভাষা-ভাষীর পক্ষে অন্য ভাষা শিক্ষা করা যতই কঠিন হোক না কেন, পদে পদে দুই ভাষার খিচুড়ি পাকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি দুটি ভাষার মধ্যে নৈকট্য থাকে, কিছু মিল আর কিছু গরমিল থাকে, তবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাষা-আয়ত্তের পথ অনেক দিকে সুগম হলেও নানা রকমের দ্বিধা ও সংশয় উপস্থিত হয়ে দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে। এই অসুবিধা একেবারে অবহেলার যোগ্য নয়।

হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাই বহুলাংশে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। শব্দ-ভাণ্ডারের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দুই ভাষারই সাধারণ সম্পত্তি। তৎসম, তদ্ভব শব্দ ছাড়াও উর্দু-ফারসী প্রভৃতি অনেক বিদেশী শব্দ দুই ভাষাতেই বর্তমান। কিন্তু এই সব শব্দের বানান, উচ্চারণ, প্রয়োগ এবং অর্থ দুই ভাষায় সর্বথা এক নয়। যা মনে-আসে-দু'চারটা উদাহরণ নেওয়া যাক—আদর, সাধন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি শব্দ বাঙালী মাত্রেরই সুপরিচিত; আবার হিন্দী ভাষায়ও এদের সম্মানজনক স্থান আছে, অর্থাৎ উঁচুদরের সাহিত্যিক হিন্দীতে এদের ব্যবহার হয়। কিন্তু শব্দগুলির হিন্দী অর্থ আর বাংলা অর্থ এক নয়। হিন্দীতে যে অর্থে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় সে অর্থ বাংলা অভিধানে পাওয়াও যেতে পারে, অথচ কদাচিৎ সে অর্থে বাংলা শব্দগুলির প্রয়োগ হয়। হিন্দীতে প্রচলিত অর্থে, আদর=regard, সাধন=means এবং সিদ্ধান্ত=principle; পক্ষান্তরে বাংলাতে, আদর=caress, সাধন=performance এবং সিদ্ধান্ত=conclusion। আর একটা দৃষ্টান্ত—বর্তমানে হিন্দীতে বহু-ব্যবহৃত 'তটস্থ' শব্দ। বাংলা ভাষায় 'তটস্থ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'উৎকণ্ঠিত' বা 'ব্যস্ত-সমস্ত' হওয়া। কিন্তু হিন্দী ভাষায় ভারত-সরকারের "তটস্থ নীতি" আজকাল সকলের মুখে মুখে। 'তটস্থ' শব্দ হিন্দীতে প্রযুক্ত হয় নিরপেক্ষ বা neutral অর্থে। ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, 'তটে' বা 'তীরে' বসে থাকা; অর্থাৎ, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"র মতই অনেকটা। 'নিরপেক্ষ' শব্দটা আবার হিন্দীতে secular অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলে এ জাতীয় বহু উদাহরণ সংগ্রহ করা যাবে। দুই ভাষায় একই শব্দ, অথচ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ; এতে যে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই।

আর এক রকমের অসুবিধা এই—অনেক শব্দ আছে যা বাংলাতে বিশেষ্য, কিন্তু হিন্দীতে বিশেষণ, কিংবা এর বিপরীত। যেমন, বাংলাতে 'তেজ' হচ্ছে বিশেষ্য, আর 'তেজী' (তেজস্বী) বিশেষণ। হিন্দীতে 'তেজ' হ'ল বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ, এবং 'তেজী' হ'ল বিশেষ্য। বাংলাতে 'গলদ' শব্দ (মূলতঃ আরবী শব্দ 'গলত্') ব্যবহৃত হয় বিশেষ্যরূপে। হিন্দীতে 'গলত' হ'ল বিশেষণ আর বিশেষ্য হচ্ছে 'গলতী'। 'গরম' শব্দটা বাংলাতে বিশেষ্য বিশেষণ দুই-ই রূপে চলে; কিন্তু হিন্দীতে 'গর্ম' বিশেষণ আর 'গর্মী' বিশেষ্য। তদ্রূপ হিন্দী 'বীমার' ও 'বীমারী'র মধ্যে পার্থক্য বাঙালী সহজে মনে রাখতে পারে না।

এ সব ছাড়া আরও একটা মুশকিল এই যে, বাংলায় প্রচলিত কোনও কোনও সংস্কৃত শব্দ হিন্দীতে আজ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। অতএব বহু নজির বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনও বিশেষ শব্দ হিন্দীতে সচল কি অচল হবে এ নিয়ে প্রায়ই বাঙালী হিন্দী-শিক্ষার্থীর মাথা ঘুরে যায়।

কিন্তু এই সমুদয় বাধা হয়তো ধীরে ধীরে প্রয়োগ-বাহুল্য এক দিন অপসারিত হবে। বর্তমানে বাঙালী হিন্দী-শিক্ষার্থীদের পক্ষে সব চেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে দুই ভাষার বানান

ও উচ্চারণের বিশেষতঃ উচ্চারণের, বৈসাদৃশ্য। এ বিষয় "বাংলা বানান ও উচ্চারণ" সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আমি মোটামুটি আলোচনা করেছি। বাংলা ভাষার বানান ও উচ্চারণের অসঙ্গতি কেবল বাঙালীর বাংলা শিক্ষার পথই দুর্গম করে নি, বাঙালীর হিন্দী শিখবার এবং অবাঙালীর বাংলা শিখবার পথও কণ্টকময় করে তুলেছে। এই জন্যই এখন যথাসম্ভব বাংলা বানান ও উচ্চারণের সংস্কার-সাধন প্রয়োজনীয় মনে করি। এ কথা বলছি না যে, হিন্দী এক সর্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা, এবং হিন্দী ভাষার সংস্কার নিষ্প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, মার্জিত ভাষা হিসাবে বাংলার তুলনায় হিন্দীর স্থান অনেক নীচ এবং হিন্দী ভাষায় অনেক দোষ বিদ্যমান। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মত অনিয়ম আর কোনও ভারতীয় ভাষায় ততটা নেই। হিন্দীতে অন্ততঃ শব্দ যেরূপ লিখিত হয় সেরূপই উচ্চারিত হয়। বাংলায় অনেক স্থলে তা হয় না। অধিকাংশ বাঙালীর মুখ দিয়ে 'সাপ' এবং 'শাপ' একই আকারে নির্গত হয়; কিন্তু হিন্দীতে 'সাঁপ' এবং 'শাপ' এর মধ্যে গোল বাধবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। হিন্দী 'জায়গা' আর বাংলা 'জায়গা'র মধ্যে ব্যবধান অপরিমেয় বললেই চলে; কিন্তু বাংলা 'যাওয়া' শব্দের অভ্যস্ত বানান ও উচ্চারণের নজিরে বাঙালীরা হিন্দীতেও 'যায়গা' বা 'জায়েগী' লিখবে এটা খুবই স্বাভাবিক। এমন কি "সরল হিন্দী-শিক্ষা"র পুস্তকে ছাপার অক্ষরে এ ভুল দেখা গেছে! সবচেয়ে বেশী গোলযোগ সৃষ্টি হয় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব' নিয়ে; হিন্দীতে কোথায় ব আর কোথায় ব ব্যবহৃত হবে এ প্রশ্নের সমাধান বাঙালী করে উঠতে পারে না। আবার অবাঙালীরা বাংলা ভাষায় সর্বত্রই 'ব' দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় হয় না তা মোটেই বলা চলে না।

জ্ঞান গবেষণা এবং জীবনের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী যতই কেননা শ্রেষ্ঠ হউক, সাহিত্য ও কাব্যে, ভাব ও রস-সম্পদে বাংলা ভাষা যতই কেন না সমৃদ্ধ হউক, বর্ণোচ্চারণের বেলায় বাঙালী নিজের দোষ অস্বীকার করতে পারবে না। কেউ যেন মনে না করেন, কেবল হিন্দীর সঙ্গে তুলনা করেই আমি এ ব্যাপারে বাঙালী ও বাংলা ভাষাকে অযৌক্তিকভাবে আক্রমণ করছি। উভয় ভাষারই মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা; এবং ধ্বনি-শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সংস্কৃত পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ ভাষাসমূহের অন্যতম। মনুষ্যকণ্ঠ-নিঃসৃত যাবতীয় স্বাভাবিক ধ্বনির প্রতীক বর্ণ সংস্কৃতে পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার বর্ণপ্রয়োগ এবং বর্ণোচ্চারণের রীতিকেই যথার্থ মান হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। নিজেদের ভাষা ছাড়াও, সংস্কৃতও যে আমরা সঠিক উচ্চারণ করি না একথা সর্বজনবিদিত। সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য বা দর্শনের সহিত বাঙালীর গভীর পরিচয় যেমন সর্বস্বীকৃত, তেমনি সর্বস্বীকৃত বাঙালীর উদ্ভট সংস্কৃত-উচ্চারণ। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণও আবার বাঙালীর কানে অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালীই মনে মনে জানেন যে, এ বিষয়ে তাঁরাই বিপথগামী, অন্যেরা ঠিক পথের পথিক। এই সংক্ষিপ্ত যুক্তিধারা থেকেই অনিবার্য সিদ্ধান্ত হয় যে, বর্তমানে হিন্দী-শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে বলেও বটে এবং তা নাও যদি হ'ত তবুও, বাঙালীর বানান ও উচ্চারণ সংস্কারে মনোযোগী হওয়া অবশ্যকর্তব্য এবং হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করতে হলে এ কর্তব্য সম্পাদনের সময় আসন্ন।

না শিখবার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি

ব্রিটিশ আধিপত্যের কবলমুক্ত হয়ে এখন বিলিতী ভাষাকেও লম্বা সেলাম জানাবার পরিকল্পনা আমরা করেছি। পনের বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে ইংরেজী বর্জন করে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব হয়েছে ভারতের সংবিধান সভায়। ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকলেই শেষ পর্যন্ত এক-মত হয়েছিলাম, তাই আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে; কিন্তু এই সঙ্গে ইংরেজীকেও আমাদের দেশ থেকে এবং মন থেকে সমূল উচ্ছিন্ন করা কতটা আমাদের স্বার্থের অনুকূল তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কল্পনা ও চিন্তাধারার প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা। সুতরাং সকলের পক্ষেই সকল ভাষা শিক্ষা করা যদিও সম্ভব নয়, ভাষা সম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব পোষণ করা দারুণ ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি বা জাতি বিশ্বের ভাণ্ডার থেকে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভাব-সম্পদ আহরণ করবে এবং মানসিক উৎকর্ষ লাভ করবে তার সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি ততই দ্রুততর হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়ায় এ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অভূতপূর্ব প্রসারলাভ করেছে। মানব সভ্যতা-সৌধ এখন জাতীয় ভিত্তি ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতে এক দিন পৃথিবীময় "বহু জীবনের ধারা" এক মহা-মানবের সাগরজলে মিশে যাওয়ার স্বপ্নকে আজকাল আর স্বপ্ন মনে হয় না। এই অবস্থায়—এবং প্রায় দু'শ বছরের পরিচয়ের পর—ইংরেজীর মত সর্ব-ঐশ্বর্যশালী শীর্ষস্থানীয় এক আন্তর্জাতিক ভাষাকে জীবনক্ষেত্র থেকে অপসারিত করা আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল নয় কি? হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলেও ইংরেজীকে তার পাশে সমান আসন দেওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। উগ্রপন্থীদের ইংরেজী-বর্জন আন্দোলন অন্ধ গোঁড়ামির পরিচায়ক। তাতে কেবল উদারতার অভাব নয়, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধেও কল্পনা ও দূরদৃষ্টির অভাব সূচিত হয়।

তা ছাড়া হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ, হিন্দী অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, অনুন্নত; অমার্জিত ও অসমৃদ্ধ ভাষা, তার প্রকাশ-ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ ভারতীয়দের এবং বাঙালী ও অসমীয়াদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষার চেয়ে হিন্দী শিক্ষা কঠিন বৈ সহজ নয়। তৃতীয়তঃ, হিন্দী-ভাষী অঞ্চলেও সর্বত্র "হিন্দী"র এক রূপ নয়। কেবল যে কথ্য হিন্দীই বহুরূপী তা নয়, প্রামাণ্য লিখিত হিন্দীরও দুইটা মুখ্য রূপ আছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উর্দু-প্রধান হিন্দী "হিন্দুস্থানী" নামে

আজকাল অভিহিত হচ্ছে ; পক্ষান্তরে মধ্য-পূর্বভারতের সংস্কৃত-প্রধান হিন্দীকেই খাঁটি হিন্দী বা আসলী হিন্দী বলে মান্য হয়। প্রথমোক্ত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমানভাবে উর্দু ভাষা ব্যবহার করেন। প্রত্যেক মুসলমান দেবনাগরী অক্ষর না জানলেও, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুই উর্দু হরফ শিখে থাকেন। এই জন্যই 'হিন্দী'র পরিবর্তে 'হিন্দুস্থানী'কে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য স্বয়ং জবাহরলাল পর্যন্ত এত চেষ্টা করছেন ; এবং উর্দু হরফকে সরকারী স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। 'হিন্দুস্থানী'ওয়ালাদের কাছে হিন্দী এবং হিন্দীওয়ালাদের কাছে হিন্দুস্থানী প্রায় সমান দুর্বোধ্য। হিন্দী-হিন্দুস্থানীর এই দোটানায় পড়ে সমগ্র ব্যাপারটা কিছু জটিল হয়ে উঠেছে, এবং তাতে সর্বসম্মতি-লাভের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

তবু যদি শিখতে হয় ?

কিন্তু এত সব বিরুদ্ধ যুক্তি এবং বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, অবস্থা দেখে মনে হয়, কিছুদিন আগে *Shankar's Weekly*তে প্রকাশিত উগ্র হিন্দীওয়ালাদের দ্বারা হাতুড়ীপেটা করে অ-হিন্দীভাষীদের গলা দিয়ে জবরদস্তীর সঙ্গে হিন্দী ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টার ব্যঙ্গচিত্র হয়ত এক দিন সত্যে পরিণত হবে ; শীঘ্র না হউক বিলম্বে. পনের বছরে না হউক পঁচিশ বছরে, এটা হবার সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় বিধান সভায় হিন্দীওয়ালাদের জেদের সহিত হিন্দীভাষার ব্যবহার, এবং অন্যান্যদের, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের জোরগলায় আপত্তি জানাবার কাহিনী ত প্রায় দৈনিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। অনেক প্রদেশে এমন কি বাংলাদেশেও সরকারী কর্মক্ষেত্রে হিন্দীর নাসিকা-প্রবেশ শুরু হয়ে গেছে, এবং একবার বসতে পেলেই সে শুয়ে পড়বে। সরকারী কর্মচারীরা নিজ নিজ বিভাগীয় পরীক্ষায় হিন্দীর ঠেলা ছাড়াতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকা সকলেরই উচিত। যারা সময়ে প্রস্তুত না হবে তারা ঠকবে। ইংরেজ-শাসনকালে ভারতবর্ষে প্রায় সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রণী হবার অন্যতম কারণ ছিল সকলের আগে আগে বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষা। বাঙালী উচিত কাজ করেছিল কি অনুচিত কাজ করেছিল সে তর্ক এখানে অবান্তর। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কর্মক্ষেত্রে বাঙালী সুফল পেয়েছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীর নেতৃত্ব করার গোড়াতেও পরোক্ষভাবে ছিল ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে বাঙালীর প্রথম পরিচয়। ইংরেজ আমলের আগে মুসলমান আমলেও যারা আরবী ফারসী শিখত তারা সব রকমের সুবিধা পেত, সহজে উন্নতি করত এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদের পেছনে পেছনে ছায়ার মত ঘুরত। বাংলাদেশেও সেযুগে যে সব পরিবারে আরবী ফারসীর চর্চা হ'ত তারাই সর্বত্র প্রাধান্যলাভ করেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের আরবী ফারসী ইংরেজী আদি "ম্লেচ্ছভাষা" অধিগত করা বাংলার সমাজ ও ধর্ম-জীবনে প্রগতির বন্যা আনতে সহায়ক হয়েছিল। ফারসীযুগ ইংরেজী যুগের পরে আজ যদি হিন্দীযুগ এসেই থাকে তাতে বাঙালীর ঘাবড়াবার কি আছে ? যারা এক দিন সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিল, স্বদেশীয় একটা ভাষাকে আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে এমন কি কঠিন হবে ? বাঙালীর যা করতে হবে তা শুধু এই : যদি আখেরে হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হয় তবে ঐ ভাষা আজ অমার্জিত অনুন্নত বলে তাকে তাচ্ছিল্য না করে, অথবা হিন্দী কখনও রাষ্ট্রভাষা হবে না বলে 'বেকুবের বেহেস্তে' (fool's paradise) চুপ করে পড়ে না থেকে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য আজ থেকেই বাঙালী কোমর বেঁধে তৈরি হতে শুরু করুক।

হিন্দী শিখলে রাষ্ট্রদ্বারে যে সম্মান-প্রতিপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা সেকথার উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে একদিন হিন্দীর মর্যাদা বাড়বে তা ভুললে আমাদের চলবে না। এত দিন পর্যন্ত কেবল বাইরের জগতের সঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে কাজ-কারবার এবং ভাবের আদান-প্রদানের মুখ্য উপায় ছিল ইংরেজী। ইংরেজী ভাষা যে আধুনিক ভারতের ঐক্য-সাধনে সহায়ক হয়েছে একথা শুনে অনেকের যতই গাত্রদাহ হউক না কেন, কথাটা সত্য। এখন ইংরেজীর এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে হিন্দী। হয়ত বাইরের জগৎ ভারতীয় ভাষা বলতে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন বলতে, হিন্দীকেই বুঝবে। এদেশের রাজনৈতিক জীবন এবং সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক যাবতীয় উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীদের জ্ঞানস্পৃহা তৃপ্ত হবে হয়ত হিন্দীর মাধ্যমেই। আবার ভারতের সীমার ভিতরেও ঐ একই নীতি প্রবল হবে। প্রত্যেক তামিল তেলুগু বা মরাঠিভাষী বাংলা শিখবে না ; প্রত্যেক বাঙালীও ভারতের ছত্রিশ ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে না। কাজেই সর্বভারতের সঙ্গে সংস্পর্শ বজায় রাখতে হলে, বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে আবার বাঙালীকে সর্বভারতের নেতৃত্ব অর্জন করতে হলে, হিন্দী অধিগত করতেই হবে। এই সেদিনও নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের অপরাহ্নেও হিন্দী শিক্ষা করেছিলেন, এবং সর্বভারতীয় নেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, একথা বাঙালী কি সহজে ভুলে যাবে ? রাষ্ট্র এবং রাজনীতি ছাড়াও, বাঙালী এবং হিন্দীভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আদান-প্রদান যাতে সহজ ও ব্যাপক হয় তার জন্যও হিন্দী শিক্ষা আমাদের অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুত বরদাচরণ গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিছুকাল হতে এই সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা বা কমিউনিটি প্রোজেক্ট নিয়ে দেশে খুব আলোচনা হচ্ছে। এর উদ্ভব পশ্চিমবঙ্গে, তার পর সারা ভারতবর্ষে পরিকল্পনাটি ছড়িয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত নেহরু এ বিষয়ে খুব উৎসাহিত হয়েছেন। এটি এখন চূড়ান্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; গত ২রা অক্টোবর সারা ভারতবর্ষে এই পরিকল্পনাগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু হতে অনেকেই মনে করছেন এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতির সিংহদ্বার উন্মোচিত হবে। তার কারণ, এর সাহায্যে পরিকল্পনাধীন এলাকাগুলিতে শুধু যে চরম উন্নতির (intensive development) পরম চেষ্টা করা হবে তাই নয়, তার চেয়েও এর বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এলাকাগুলির সকল সমস্যার উপর সর্ব্বাঙ্গীণ আক্রমণ, যাকে গুপ্ত মহাশয় বলেছেন টোটাল্ ওয়ার। তার সঙ্গে আছে দেশবাসীকে কর্ম্মযজ্ঞে ব্যাপক আহ্বান। এই সবের সমন্বয়ে এই প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব্ব। সেই কারণেই অনেকে এ বিষয়ে খুব উৎসাহিত হয়েছেন, এবং গুপ্ত মহাশয়ও তা হতে বাদ যান নি। তাঁর বক্তব্য হ'ল মোটামুটি এই: (১) অন্যান্য দেশে সমবেত কর্ম্মের অক্লান্ত সাধনার ভিতর দিয়েই সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতরে জানাশোনা, সহানুভূতি এবং প্রাণের পরিচয় ঘটে। দেশের সবাই উৎসবে আনন্দে হাত মেলায়, আপদে বিপদে কাঁধ মেলায়। আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াটা সঙ্গত নয়। কর্ম্মের দ্বারাই আমাদেরও সংসিদ্ধি অর্জ্জন করতে হবে। জাতীয়তার আহ্বানে জবাব আমরা যে সুরেই দিই না, তাতে আন্তরিকতা থাকলে তা যথাস্থানে পৌঁছবেই। আদর্শপ্রীতি আমাদের মধ্যে আবার উদ্দীপিত করতে হবে। (২) এই কর্ম্মেরই আহ্বান রূপায়িত হতে চলেছে আমাদের সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায়। নিষ্ঠা আর ত্যাগে পূত কর্ম্মের উদ্দীপনায় যদি সিদ্ধির আলো এই কয়টি পাদপীঠে এক বার জ্বলে ওঠে, তা হলে তা হবে অনির্ব্বাণ, আর তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে সমস্ত ভারত—এ সুনিশ্চিত। জন-কল্যাণের এমন ব্যাপক প্রয়াস এদেশে এর আগে কখনই হয় নি। (৩) গ্রামোন্নয়নে সেবা হবে সর্ব্বাত্মক। গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প, আর্থিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হবে তার লক্ষ্য। পল্লী-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করলে জমির উপকার চাপও কতকটা অপসারিত হবে। কম্পোস্ট ও অন্যান্য সার, কৃষি এবং গো-পালনে সমবায় সমিতির সংস্থাপন, চরকা, পুতুল তৈরি ইত্যাদি কুটির-শিল্প এবং অন্য ছোট ছোট শিল্পাগারের প্রচলন সহজেই হতে পারবে। বুনিয়াদী শিক্ষার অনুশীলন হবে গ্রামে গ্রামে। এইভাবে গ্রামগুলির চেহারা ফিরে যাবে এবং ভারতবর্ষে নূতন যুগের সূচনা হবে। "দেশের সর্ব্বাত্মক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আজ গণদেবতার উদ্বোধন সুরু হয়েছে।...ভারতবাসী মাত্রেই এ যজ্ঞের ঋত্বিক্।"

২

দেশে এই সর্ব্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে প্রিয়-অপ্রিয় নানারকম আলোচনা চলছে। তার মধ্যে কিছু সমালোচনা বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত। এই দলের প্রধান আপত্তি হ'ল এর সাহায্যে আমেরিকার মূলধন আমাদের দেশে জাল বিস্তার করছে। একথা অবশ্য সত্য যে, এই পরিকল্পনার অধিকাংশ অর্থই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমেরিকার। প্রত্যক্ষ সাহায্য যেটুকু দেওয়া হচ্ছে এবং প্রথম তহবিলে (Fund 'A') যা জমা হচ্ছে তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। তার হিসেব মধ্যে মধ্যে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় তহবিল (Fund 'B'), যা হতে ভারত-সরকার তাঁদের অংশ খরচ করছেন, সেটাও প্রকারান্তরে আমেরিকারই টাকা। আমেরিকা ধারে ভারতবর্ষকে যে গম সরবরাহ করেছিল এবং যে গম ভারত-সরকার এখানে নগদ দামেই বেচেছিলেন, সেই ধার ত্রিশ বছর পরে শোধ করতে হবে এই রকম সর্ত্ত আছে। এখন সেই গম-বিক্রয়লব্ধ টাকাটা নগদ শোধ দেবার দরকার না হওয়ায় শোনা যায় সেটাই এই দ্বিতীয় তহবিলে রাখা হয়েছে এবং আমেরিকার সম্মতিক্রমেই এখন ভারত-সরকারের অংশ হিসেবে এই পরিকল্পনায় খরচ করা হচ্ছে। এ ছাড়া রাজ্য-সরকারগুলির খরচ আছে—তার মধ্যে অবশ্য আমেরিকার কোনও টাকা নেই। যাই হোক্, সমস্ত পরিকল্পনাটিতে আমেরিকার অর্থসাহায্য প্রচুর আছে একথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করে নিতে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু আমরা রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এবং কার্যক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধন আসার দরজা বন্ধ করি নি। তা ছাড়া পণ্ডিত নেহরু বার বার বলেছেন, যে মূলধন আসার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হলে

সে মূলধন তাঁরা কখনও দেবেন না। সোভিয়েট রুশিয়াতেও বৈদেশিক মূলধন যায় নি এমন নয়। অতএব এ দিক দিয়ে কমিউনিটি প্রোজেক্টগুলির যে সমালোচনা হচ্ছে তা রাজনৈতিক এবং আমার মতে মৌলিক নয়। রাজনৈতিক দলগুলি বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা সম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণকে সর্ব্বদা সচেতন করতে চান করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, সেইটেই এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভাববার প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হ'ল স্বদেশেরই মূলধন হোক্ আর বিদেশী মূলধনই হোক্, আমাদের সত্যকারের যে সমস্যা এই পরিকল্পনার সাহায্যে তার কতখানি সমাধান হবে।

৩

এই দিক দিয়ে যখন ভাবি তখন স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এ বিষয়ে বহু লোক যেমন অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছেন এবং নতুন কর্ম্মযজ্ঞ উদ্বোধনের আশা করছেন, আমি সে রকম উৎসাহ বোধ কখনই করতে পারি নি। তার অনেকগুলি কারণ আছে। আমাদের দেশে বহু পরিকল্পনা হয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা শিশুমৃত্যু বা অপমৃত্যুর শোচনীয় পরিণতি এড়াতে পারে নি। বিদেশী হৃদয়হীন শাসন তার একটা খুব বড় কারণ বটে, কিন্তু দু-চারটি ক্ষেত্রেও যে কোথাও কোথাও আন্তরিক সদিচ্ছা ও উৎসাহের অভাব ছিল এমন কথা বলা চলে না। যেমন সমবায় আন্দোলনের কথা। যদি দেশে সত্যই সমবায়ের উৎসাহ বান ডেকে আসত তা হলে সে তার নিজের গতিবেগেই সমস্ত বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত বিদেশী শাসনের আমলেও। কিন্তু সেরকম উৎসাহের জোয়ার তো আসেই নি, উপরন্তু ভাটার টানও নিঃশেষ হয়ে এখন পড়ে আছে শুধু পঙ্কশয্যা। স্বাধীনতার পর প্রথম উৎসাহের মুখে বহু পরিকল্পনার জন্য দেশনেতারা দেশের লোককে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন—১৯৫১ সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করা তার মধ্যে অন্যতম—কিন্তু সে সবও সফল হয় নি। এমন কি কুটির-শিল্প (যেমন খাদি, তুলট কাগজ, তালগুড় ইত্যাদি) পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও সফল হয় নি, যে কিছু ক্রমক্ষীয়মাণ চেষ্টা এখনও বিভিন্ন রাজ্যে চলছে তার জীবনীরস প্রায় সমস্তই সরকারী তহবিল থেকে আহরিত হচ্ছে। সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি আদর্শ হিসেবে খুবই বড়। কিন্তু ইদানীং কার্য্যক্ষেত্রে তার রুচিকর ও সার্থক পরিচয় অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায় নি। এর পিছনে যে সমস্ত গভীর এবং মৌলিক কারণ আছে সেগুলি দূর করবার কোনও ব্যবস্থা না থাকলে শুধু উৎসাহ আর সদিচ্ছায় কোনও ফল কখনও হতে পারে না। বাইরের কথায় পোড়ার বদলে চাপা পড়েছে এরকম নজির জগতের ইতিহাসে নেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। সুতরাং আজ যখন আন্তরিক চেষ্টা ও অসাধারণ আগ্রহের প্রবল জোয়ার দেখা যাচ্ছে তখন আরও বেশী করে চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়েছে মৌলিক বাধাগুলির গভীর বিশ্লেষণ করে সেগুলি দূর করবার সত্য সত্য ব্যবস্থা করে এই পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়েছে কিনা। কেননা তা যদি না হয়ে থাকে তা হলে হাজারো সদিচ্ছা হাজারো উৎসাহ ও হাজারবার কর্ম্মযজ্ঞে উদ্দীপ্ত আহ্বান সত্ত্বেও পরিকল্পনা সফল হবে না এবং তাতে যে রকম বিরাট্ পরিমাণ আশা ভঙ্গ হবে তার ফল দেশের পক্ষে মারাত্মক হবে।

৪

আমাদের দেশে এই ধরণের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সার্থক হয় না তার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথম, দেশের মানুষকে আমরা ঠিকমত আহ্বান জানাতে পারি না এবং কাজের মানুষও ঠিকমত গড়ে ওঠে নি। জনসাধারণের সঙ্গে সত্যকারের একাত্ম হয়ে ডাক ডাকা অনেক সময়ই শক্ত; বিশেষতঃ আমাদের অধিকাংশ কাজের পদ্ধতিই এমন যে, সেখানে কর্ম্মকর্তা হলেন সরকারী প্রতিনিধি এবং জনসাধারণ হ'ল নীরব দর্শক তথা পরোক্ষ ফলভোক্তা। আমি বহুকাল থেকেই বলে আসছি যে, এতে আর যাই হোক্ জনসাধারণের কাজে আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ কোনোটাই বাড়ে না। একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, শিক্ষার অভাবে, বাইরের জ্ঞানের অভাবে অনেক সময়ই আমাদের দেশের লোকের মন খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ, বড় কাজেও তারা দ্বন্দ্বকলহ সংকীর্ণতা ত্যাগ করে একযোগে কাজে নামতে পারে না। কিন্তু সে দোষ শুধু তাদের নয়। এই তো আমাদের দেশ, বহুকালকার অবিদ্যা অবুদ্ধি অশিক্ষায় তারা জীর্ণ। এখন তবুও তাদেরই তো কাজ শিখতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে—তারাই কাজ করবে। তাদের উপর থেকে কোনও সরকার—হোক্ তা স্বদেশী সরকার—সুধাবৃষ্টি করলেও স্বাধীনতার মূল্য যায় ব্যর্থ হয়ে। সুতরাং শাসন-পদ্ধতি বদলে চার পাশের আবহাওয়া মালিন্য-মুক্ত নিষ্কলুষ করে কি উপায়ে নূতন মানুষ গড়া যায়, সেইটেই হ'ল জাতীয় নেতাদের প্রথম দায়িত্ব। বলা বাহুল্য, এটা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার নয়, এর বিস্তারিত আলোচনাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি কারণ আছে। সেটি নৈতিক কারণ নয়, বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণ। দেশে যেসব অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত চলছে তার দিকে প্রকৃত নজর না দিয়ে যদি কোন পরিকল্পনা রচিত হয় তা হলে তা সফল হবে না, ঐ ঘাত-প্রতিঘাতের আবর্ত্তে ডুবে যাবে। কমিউনিটি প্রোজেক্টের বেলাও এরকম

বিপদের আশঙ্কা অমূলক নয়। এ প্রবন্ধে সেই কথাটাই একটু বিস্তারিতভাবে আলোচ্য।

৫

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের আসল সমস্যাটা কি এবং সর্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা তার সমাধান করবে কি করে? একথা এখন সকলেই বোঝেন যে, আমাদের আসল অর্থনৈতিক সমস্যা হ'ল নিদারুণ দারিদ্র্যের সমস্যা। এর জন্ত অবশ্য প্রায় সবটাই দায়ী বিদেশী শাসন। তার ছায়ায় আমাদের শিল্প-বাণিজ্য গড়ে উঠতে পারে নি, উপরন্তু কৃষি হয়েছে শোষিত। কৃষির উন্নতির বদলে প্রয়োজনমত কাঁচামালের জোগানের দিকেই নজর ছিল। কিন্তু এখন এ সবই তো ইতিহাসের ঘটনা, এখন প্রয়োজন হয়েছে আমাদেরই সমস্যাটার সমাধান করা। বলা বাহুল্য, সব দিকে ভাঙতে ভাঙতে আমরা ক্ষয়িষ্ণুতার শেষ পর্য্যায়ে পৌঁছেছি। জাতীয় আর্থিক কাঠামোর এমন কোনও দিক্ নেই যেখানে নতুন করে গড়ে ওঠার বা সুস্থ প্রসারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একথাও এখন সকলেই বুঝেছেন যে, বর্ত্তমান কাঠামোর চতুঃসীমার মধ্যে এ সমস্যার সমাধান হবে না। পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন কমিশনার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের উক্তিই উদ্ধৃত করছি:

"The discerning among us have begun to realise that there is no hope of progress within the limits of the current social order. . . . Piecemeal and partial remedies are at a discount. We are too tightly bound to be able to make headway in any one direction, be it food or clothing, health or housing, cultural or moral behaviour. These have ceased to partake of the nature of loose and separate problems, capable of being tackled singly. Packed close into a solid mass, they can be solved only in the whole. The forces of growth must be helped to burst out of their present shell and find new modes of expression on an altogether higher plane, within a larger framework. The projects of community development which are being launched in the country can meet this revolutionary challenge. They provide a new pattern of social living in which creative potentiality can find a fresh release through the joint endeavour of free human beings."—S. K. Dey : *Building A New Society*, p. 1.

এ সম্বন্ধে প্রথমেই ভাবতে হবে, যে পারিপার্শ্বিকে আমরা এই উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালু করেছি তাতে এই আশা পূরণ সম্ভব কিনা। রুশিয়ার মত, কিংবা আরও অন্তান্ত দেশের মত আমরা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাঁধি নি। অর্থাৎ, বিশ্বজগতে যে সব তরঙ্গ ওঠে তার ঢেউ আমাদের উপরও এসে পড়ে। বিশেষতঃ আমরা এখনও বহু পরিমাণেই স্টার্লিং এবং ডলারের উপর নির্ভরশীল, ব্যবসা-বাণিজ্যও সে সব দেশের উপর অনেক নির্ভর করে। বিলেতে চায়ের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চা-বাগানের সঙ্কট অথবা বাইরে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমলে এখানে পাটশিল্পের সঙ্কট এর অন্যতম উদাহরণ। বহির্বিশ্বের প্রভাব সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে না বন্ধ করলে এ জিনিষ হবেই। কিন্তু বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন জোর করে বন্ধ করে একেবারে বাইরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়, আদর্শও নয়। বিশেষতঃ চূড়ান্ত পরিকল্পনার এক দিকে যেমন আরও বৈদেশিক মূলধন আমদানির উপর নির্ভর করা হয়েছে তেমনই অন্ত দিকে আরও আন্তর্জাতিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষতঃ রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এক কথায় আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর দরজা খোলা, তা বন্ধ নয়। সেটার অন্ত প্রয়োজন যতই হোক্, সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, তার ফলে দাম ও চাহিদার আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ হ্রাসবৃদ্ধি, মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন, এমন কি বিভিন্ন দেশের বা এদেশেরই বিভিন্ন অংশে ক্রয়ক্ষমতা বা মজুরীর হারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঢেউ আমাদের দেশের প্রত্যেক কোণ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। সুতরাং বিদেশে বা স্বদেশে কোথাও একটা ঢেউ উঠলে তা ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে যায়; এই ধরণের ঢেউগুলি হতে পরিকল্পনার এলাকাও বাঁচবে না। সুতরাং সে সব ঢেউ যদি পরিকল্পনার বিকাশের পরিপন্থী হয়, যেমন এখন হচ্ছে, তা হলে পরিকল্পনা সফল হবে কেমন করে?

একটা ছোট উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। ফুলিয়ায় কেন্দ্রটি উল্লেখ করছি। এখানে এত দিন পর্য্যন্ত কেবল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চলছিল। এখন সেটিকে প্রসারিত করে আশপাশের গ্রামাঞ্চল সংযুক্ত করে সর্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে যে সব বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টা গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার মধ্যে লোহার বালতি তৈরি প্রধান। এই বালতি তৈরির প্রধান উপকরণ লোহার চাদর কলিকাতা থেকে নিয়ে যেতে হয়। আপাততঃ সেখানে গ্যাল্‌ভানাইজিং যন্ত্রপাতি না থাকায় গ্যাল্‌ভানাইজিং কলিকাতায় করতে হয় সেই আধা তৈরি বালতিগুলিকে এনে। উদ্বাস্তুদের যে ঋণ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে তা পরিশোধ করে তাদের যদি সংসার চালাতে হয় তা হলে তাদের বেশী মজুরী পাওয়া দরকার। সেইজন্ত মজুরী সেখানে বেশী। তার উপর সেখানে ইলেক্‌ট্রিক চালালে তার ইউনিট্ প্রতি দর কলিকাতার চেয়ে বেশী পড়েই। এই সব কারণে উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে, তৈরি জিনিষের দাম বেশী। পক্ষান্তরে কলিকাতার বা

হাওড়ার লোহার কড়াই বা বালতি তৈরির যে সব কারখানা আছে সেগুলো ঐ সব কারণেই অপেক্ষাকৃত সস্তায় জিনিষ দিতে পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল গ্রামের লোক কোন্ জিনিষ কিনবে? ফুলিয়ায় তৈরি বলে আক্রা কড়াই কিনবে কি? অবশ্যই নয়। তার উপর আরও কথা আছে। ধরা যাক্, কোনও অর্থনৈতিক কারণে লোহার চাদরের দর বেড়ে গেল। তার ধাক্কা কি ফুলিয়ার উৎপাদন কেন্দ্রের উপর গিয়ে পড়বে না? বরং সে অবস্থায় পুরানো এবং প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরীগুলি লাভের পরিমাণ কমিয়ে অথবা কতকটা লোকসান সহ্য করেও দাম যতখানি কম রাখতে পারবে, ফুলিয়ার এই কেন্দ্রটুকু কি তার অল্প সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে দাম ততখানি নীচু রাখতে পারবে? তা পারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথবা তুলোর দরের হেরফেরের জন্য সুতোর দর চড়ে গেল। সে অবস্থায় তার ধাক্কা বেশি অনুভূত হবে বৃহৎ মিলে, অথবা এখানকার ছোট প্রতিষ্ঠানে? অথবা পাটের দাম পড়ে যাওয়ায় আশপাশের গ্রামাঞ্চলের লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেল। সে অবস্থায় ফুলিয়ার বালতির দাম যদি ঠিকই থাকে তা হলেও কি লোকে সে বালতি কিনতে পারবে? অথবা এখানে তৈরি জামাকাপড়?

এই পরিকল্পনার অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে প্রথম ভাববার কথা হ'ল এইটি। অর্থাৎ চার পাশে দামের কমাবাড়ার ওপর লেনদেন নির্ভর করবে, মূল্য-মানই হবে অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক্-নির্দেশ, সেই অনুসারে চলবে পারস্পরিক অভিঘাত, এক কথায় pricing process-এর প্রচণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়বে সারা দেশে—অথচ তার মধ্যে এই ছোট ছোট আণুবীক্ষণিক দ্বীপগুলি তা হতে নিশ্চিন্তে থাকবে বেঁচে এবং আলাদা ধরণে নির্ব্বাহ করবে জীবনযাত্রা, একথা কি সম্ভব?

এর একটা প্রতিকার হ'ল, যে কিছু লোকসান সে সব সরকারী তহবিল থেকে পুষিয়ে দেওয়া। যা এখন অনেক পরিমাণে হচ্ছেও। খানিকটা ঐ কুটির-শিল্প গড়বার চেষ্টার মত। কিন্তু তা হলে ওগুলো যাদুঘরের নিদর্শন হয়েই থাকবে, নতুন আর্থিক ও সামাজিক জীবনের সূচনা করতেও পারবে না এবং ক্রমে বাড়বেও না। কারণ সাবসিডি দেওয়া যায় অল্প পরিমাণে—গোটা দেশ গোটা দেশকেই সাবসিডি দিতে পারে না। আর একটা উপায় হ'ল এই দ্বীপগুলোর চার পাশে পাহাড়ের মত দেওয়াল তুলে এগুলোকে বাইরের ঢেউ হতে বাঁচান। কিন্তু তা হলেও এগুলো ঐ পাহাড়ের আড়ালে যাদুঘরের নিদর্শন হয়েই থাকবে, সমাজে কোনও নবশক্তির সূচনা করবে না। সুতরাং আসল দরকার হ'ল বাইরের ধাক্কা হতে এগুলোকে বাঁচানো নয়, সারা দেশটাকেই এমন বদলে দেওয়া যাতে ওরকম বিপরীত ধাক্কাই সঞ্জাত না হয়। তা না হলে এই রকম ছোট ছোট দ্বীপ আকারে বাড়তে তো পারবেই না, উপরন্তু যেটুকুর পত্তন অনেক চেষ্টাচরিত্র করে হচ্ছে সেটুকুও টিকে থাকবে না।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাববার দ্বিতীয় কথাটি এইবার বলি। এদেশে মূলধন যেখানে আছে সেখানেও শিল্পের প্রসার হয় না, তার প্রধানতম কারণ দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব। মাথাপিছু একশো গজ কাপড়, প্রয়োজন-মত বৈদ্যুতিক ইউনিট বা প্রতি তিন জনে একখানি মোটর-গাড়ী উৎপাদন করলেও এদেশে তা বিক্রি হবে না। কারণ ক্রয়ক্ষমতা নেই। বাটা ছাড়া ফ্লেক্সের জুতো বা কে-জুতো কেউ কিনতে পারবে না। উৎপাদনের দিক থেকে যে সব সমস্যার কথা পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যদি সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবও হয় তা হলেও এদিককার সমস্যা থেকে যাবে। ধরা গেল, ফুলিয়ার কড়াই হাওড়ার কড়াইগুলির চেয়ে সামান্য কিছু সস্তায় দেওয়া সম্ভব হ'ল, কিন্তু তখনও প্রশ্ন থেকে যাবে দেশের লোকে সেই দামেও লোহার কড়াই কিনতে পারবে অথবা মাটির হাঁড়ি ও মাটির বাসনেই কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হবে? যে আর্থিক দুর্দ্দশার জন্য আজ অপেক্ষাকৃত সস্তা এলুমিনিয়মের বাসন আমাদের প্রাচীন লোহা-কাঁসা-পিতলের শিল্পকে উৎখাত করতে চলেছে সে দুর্দ্দশার ফল কি তখনও ফলতে থাকবে না?

পরিকল্পনা-রচয়িতারা যে এ বিষয়ে ভাবেন নি তা নয়। তাঁদের আশা হ'ল এই যে, সর্ব্বাত্মক গ্রাম-পরিকল্পনায় গ্রামের যে অসাধারণ উন্নতি হবে তা হতে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়েও হাতে যথেষ্ট টাকা থাকবে। সেই উদ্বৃত্ত টাকা থেকে তারা এই সব শিল্পজ দ্রব্য তো কিনতে পারবেই, উপরন্তু ছোটখাট ব্যবসায়ে মূলধন লগ্নীও করতে পারবে। অর্থাৎ শুধু যে চলতি জিনিষ কিনবার ক্ষমতা বাড়বে তাই নয়, উপরন্তু হাতে মূলধন জমবে। যদি এ আশা সফল হয় তা হলে তার চেয়ে সুখের কথা কিছুই নেই। কিন্তু যেরকম হিসেব ধরা হয়েছে তাতে সে আশা সফল হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিছুকাল পূর্ব্বে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলজ্ যে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (Asia challenges America through India) তাতে তিনি বলেছেন যে, এই সব চেষ্টার ফলে শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বাড়তে পারে। অর্থাৎ একশো মণ গমের জায়গায় একশো পঁচাত্তর মণ গম পর্য্যন্ত হতে পারে। তার সঙ্গে কুটির-শিল্প থেকে কিছু আয় হতে পারে। তাঁর মতে আয় বৃদ্ধির শেষসীমানা ঐ পর্য্যন্ত।

এই কথাটি বিবেচনা করা দরকার। কুটির-শিল্প বর্তমান আর্থিক কাঠামোর মধ্যে সরকারী তহবিল হতে পুষ্ট না হয়ে কতদূর কার্য্যকরী হতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করেছি। আপাততঃ ঐ সূত্র হতে লাভের আশা পোষণ না করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ যেখানে পরিকল্পনায় ছোট শহর স্থাপনার কথা আছে—যেমন পশ্চিমবঙ্গে আছে—সেখানে সেই শহরে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে তার ওপর আবার আশেপাশে গ্রামাঞ্চলে আলাদা কুটির-শিল্প চালানো সম্ভব হবে কিনা তা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। শুধু গ্রামাঞ্চলের আয় বৃদ্ধির কথাই সেইজন্য বলছি। আপাততঃ পশ্চিম বাংলায় যতগুলি এলাকা এবং মোট জনসংখ্যা নেওয়া হয়েছে সেই হারে সারা পশ্চিম বাংলা শেষ করতে আনুমানিক ৬৫ বছর লাগবে। অবশ্য বলা যায় যে, ক্রমে এখনকার চেয়ে আরও বেশী বেশী এলাকা নেওয়া হবে। কিন্তু ত' সম্ভব হবে কিনা নির্ভর করবে টাকার সাচ্ছল্যের উপর। অন্য সমস্ত পরিকল্পনা বন্ধ রেখে শুধু এই পরিকল্পনাটিই চালু থাকবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। যদি সে হিসেবে ৬০ বা ৬৫ বছর লাগে সে সময় আমাদের জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বাড়লেও প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বাড়বে। আর বোলজ্ সাহেবের হিসেবে আয় বাড়বে শতকরা ৭৫ ভাগ। অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রারম্ভে আমরা যে অবস্থা থেকে সুরু করেছিলাম পরিকল্পনার শেষেও আমরা প্রায় সেই অবস্থাতেই থাকব। এর মধ্য থেকে এত উদ্বৃত্ত মূলধন তা হলে আসবে কি করে? আর তা ছাড়া যারা অন্ততঃ চলতি প্রয়োজনটা মিটিয়ে যেতে পারছে তাদের হাতে টাকা এলে তবু কিছুটা বাঁচবার সম্ভাবনা। কিন্তু যারা আরও নীচে (submarginal অবস্থায়) আছে, যা আমাদের অধিকাংশ লোকই আছে, তাদের হাতে অল্প কিছু বাড়তি টাকা এলে (শতকরা ৭৫ টাকা আয় বাড়াও তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের পক্ষে অল্পই) তারা সে টাকায় ন্যূনতম প্রয়োজনের দাবি মেটাতেই বাধ্য হবে, উদ্বৃত্ত মূলধন জমবে না। যে ঋণভারে জর্জ্জরিত সে কিছু টাকা পেলে প্রথমে ধার শোধ করে বাস্তু ও জমি রক্ষা করবার চেষ্টা করবে, অথবা তার বদলে ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করতে যাবে?

৭

আসলে এই সব আশার পিছনে একটা ভুল ধারণা আছে। জগতের বিভিন্ন দেশে দেখা গিয়েছে, যখন সবদিকে পড়তি দশা হয় তখন সরকার কর্ম্মোদ্যম করে বহু কাজ আরম্ভ করে দিলে ক্রমশঃ চারপাশে আবার পুনরুজ্জীবন ঘটতে থাকে। অচল টাকাটাকে প্রথমে চালিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। চলতি কথায় এই নীতিকে বলা হয়ে থাকে pump priming method নূতন পাম্প বসাবার পর যেমন প্রথমে উপর থেকে জল না ঢাললে নীচের জল উঠতে আরম্ভ করে না এটিও তাই। আমেরিকার নিউ ডীল প্রোগ্রাম এর প্রকৃষ্টতম এবং প্রথম উদাহরণ। তার পর এই পাবলিক ওয়ার্কস পলিসি দেশে দেশে নূতন রূপ ধরেছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেন্‌সের এখনকার থিয়োরিগুলোও এই ব্যাপারেরই একটা দিক্। প্রথম ধাক্কাটা সরকার দিলে তার পর আপন ক্রমবর্ধমান গতিবেগেই সে ক্রমেই দ্রুততর ও ব্যাপকতর পুনরুজ্জীবন সৃষ্টি করতে থাকবে। কিন্তু এ জিনিষের সফলতার জন্য অনেক উপকরণ চাই। তার সব প্রথম উপকরণ হ'ল, সুযোগের অভাবে অলস হয়ে পড়ে আছে এমন যথেষ্ট মূলধন ও অন্যান্য উপকরণ থাকা চাই; সুযোগ পাবামাত্র সেগুলো চালু হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপন্ন জিনিষ বিক্রি হবার মত বাজারের সম্ভাবনা থাকা চাই, স্বদেশে কিংবা বিদেশে। তৃতীয়তঃ, এই প্রথম ধাক্কার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বেশী ট্যাক্স করে নিলে ভাল হয় না, কারণ তা হলে আর্থিক লেনদেনে অতিরিক্ত টাকা তো আমদানি হ'ল না, কিছু হাতফের হ'ল এইমাত্র। নিউ ডীলের সময় জমানো টাকা থেকে সরকার প্রাথমিক খরচ চালিয়েছিলেন—অন্যান্য দেশে অবশ্য ট্যাক্স ও ঋণের উপরই অনেক বেশী নির্ভর করা হয়েছে। চতুর্থতঃ, সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশ ঘনসংবদ্ধ ও অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়া চাই, তারই ওপর ক্রমবর্ধমান দ্রুততা ও ব্যাপকতার গতি (multiplier) নির্ভর করে। যেমন আমেরিকায় চাষের ক্ষেত্রে বিরাট সরকারী সাহায্য পাওয়ামাত্র চাষীরা দিল ট্রাক্টরের অর্ডার, ট্র্যাক্টর কোম্পানীগুলো করল ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন,—এই ভাবে চারপাশে ব্যবসা-বাণিজ্য আবার চালু হয়ে গেল। আমাদের দেশে প্রায় সব ক'টি উপকরণেরই অভাব। অলস মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য; বাজার নেই, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশও সংবেদনশীল নয়। শেয়ার-বাজারের দৈনন্দিন মামুলি ওঠাপড়ার সঙ্গে দূরপল্লীর চাষীর সম্পর্ক কতটুকু? এ অবস্থায় ঐ পাম্প চালানো উপায় সফল হওয়া স্বতঃই দুঃসাধ্য—এই কারণে এই পারিপার্শ্বিকে ঐ উপায়ের উপর এত বেশী নির্ভর চলে না। অথচ কমিউনিটি প্রোজেক্টের ছোট ছোট ইন্‌জেকশনের ফলে আমাদের সমস্ত অর্থ নৈতিক শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে, এ আশা ঐ পাম্প চালানো পদ্ধতিরই নামান্তর। দ্বিতীয়তঃ, এই আইডিয়ার উপর আরও একটি আইডিয়া—যা খানিকটা বিরোধী আইডিয়া—চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটি হ'ল, সমাজের কাঠামোর মৌলিক বদল। পণ্ডিত নেহরু থেকে ছোট বড় সকলেরই বক্তৃতায় তার আভাস আছে—এমন কি শ্রীযুক্ত দে'র উপরোক্ত উক্তিতেও। বলা বাহুল্য, এর

মারফত সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। এতে চলতি কাঠামো কতকটা মেরামত পর্যন্ত হয়, মৌলিক বদল হয় না। বাস্তবিক এই ধরণের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে সে রকম ব্যাপক ও মৌলিক বদলের আকাঙ্ক্ষা কোথায়ও দেখা যায় নি, আর তা হতেও পাবে না। তার জন্ত চাই ব্যাপক, সবল, দৃঢ় ও মৌলিক অভিযান। যেমন, ভূমিব্যবস্থার আমূল বদল না হলে শুধু কৃষকদের আয় সামান্ত কিছু বাড়ালেই সমাজের কাঠামোর ওদিকটার মৌলিক বদল হয়ে যেতে পারে কি? সেই কারণে এর জন্ত একদিকে যেমন প্রয়োজন আর্থিক নীতি, শিল্পের নীতি, শুল্ক নীতি, ট্যাক্সনীতি ও পাবলিক ওয়ার্কস পলিসির একটি লক্ষ্য সামনে রেখে একযোগে চলা অন্ত দিকে তেমনি চাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বদ্‌লাবার জন্ত সজ্ঞান, সচেতন এবং সবল প্রয়াস। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সব কথা নিয়ে যা নাড়াচাড়া হয়েছে তা প্রবন্ধান্তরে বিবেচ্য। সংক্ষেপে বলতে পারা যায় তার মধ্যেও নানা আদর্শের সংঘাত আছে, তার বিভিন্ন অংশের লক্ষ্য একমুখীন নয়, সে হিসেবে তারও সফলতা বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু আর যাই হোক্ ঐ দুইটি আইডিয়া কমিউনিটি প্রোজেক্টের পিছনে থাকলে—এবং সে আইডিয়া আছে তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে—এই পরিকল্পনার সাফল্য বিঘ্নিত হবারই সমূহ সম্ভাবনা।

৮

পরিশেষে আর একটা কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করব। অন্ত প্রদেশগুলো থেকে পশ্চিম বাংলার পরিকল্পনার একটা তফাৎ আছে। অন্তত্র পরিকল্পনাগুলি কেবল গ্রাম নিয়ে অথবা কেবল শহর নিয়ে। পশ্চিম বাংলার পরিকল্পনা হ'ল মিশ্র পরিকল্পনা। এক একটি ছোট ছোট শহরের চারপাশে কতকগুলো গ্রামকে নিয়ে এই মিশ্র পরিকল্পনা। এই শহরগুলো গ্রামে নবজীবনের সঞ্চারে সহায়তা করবে এই আশা পোষণ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত দে উক্ত পুস্তিকাতেই বলেছেন:

"The new townships draw their sustenance from their own environment by entering into mutually beneficial productive relations with their adjoining rural area, not as adjuncts of a remote and larger production and marketing centre."

(কিন্তু বিধিনিষেধের সম্পূর্ণ আকাশচুম্বী দেওয়াল না তুলে দিলে এই ছোট শহরগুলোও কি করে বাইরের ঢেউ এড়াবে তা বোঝা মুশকিল)।

শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় সমাজশাস্ত্রের ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক সুবিস্তীর্ণ অধ্যায়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় এ সমস্যা বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। এমন কি সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ-কণ্টকিত সোভিয়েট রুশিয়াতেও এই দ্বন্দ্বের অবসান এখনও হয় নি সেকথা স্টালিনের নবতম বক্তৃতা "Economic Problems of Socialism in the U.S.S.R" পড়লে বোঝা যায়। এদেশে, বিশেষতঃ বাংলায়, এর ইতিহাস সুদীর্ঘ ও বিচিত্র। তার আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করব।

কিন্তু তবু একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। শহর গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে। গ্রামের কারবারের প্রথম ক্ষেত্র হাট ও গঞ্জ, সেগুলো ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে শেষকালে তাদের মধ্যে এক জায়গায় শহর গড়ে ওঠে। যেমন বন্দরের সুবিধা ও ঐ সব কারণে সপ্তগ্রাম বা কলিকাতা; তাঁতের ব্যবসায়ে শান্তিপুর; চালের কারবারে হিলি। অর্থাৎ প্রক্রিয়া সুরু হয় ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে,—ক্রমে তা কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি শহর গড়ে ওঠে। যেখানে চার পাশে সেই অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়া নেই সেখানে প্রথমে শহর গড়ে তাকে চালু করবার চেষ্টা হ'ল উল্টো ব্যবস্থা। যেন যেখানে হার্টই ফেল করেছে সেখানে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে জীবন আনবার চেষ্টা। সে চেষ্টার ভবিষ্যৎ সহজেই বোঝা যায়। আমাদের অধিকাংশ জেলা-শহরগুলোরই পড়তি দশা। যেমন কৃষ্ণনগর। বাড়ীঘর আর মেরামত হয় না, নতুন বাড়ী তৈরি হয় না, পুরনো ব্যবসা বাণিজ্য মরে যাচ্ছে। যদি অর্থনৈতিক তাগিদ ও প্রসার থাকত তা হলে এগুলোই তো বাড়তে থাকত। কিন্তু সেগুলোর ক্রমশঃ পড়তি দশা হচ্ছে তার কারণ যে অর্থনৈতিক প্রসার তাদের বৃদ্ধির কারণ ছিল আজ সে প্রসার তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত—উপরন্তু চারপাশে ক্ষয়িষ্ণুতার ধারা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলোও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক রোগের প্রতিবিধান না হলে শুধু শহর গড়ে কি করে চারপাশে সমৃদ্ধি আসবে? এমন কি শহরগুলো টিকেই বা থাকবে কেমন করে? হাবড়ায় তো একটা বড় শহর হয়েছে—যদিচ তা এরকম পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে তোলা হয়নি তবুও তার কোন প্রভাব কি আশে-পাশের গ্রামগুলোর ওপর অপরিকল্পিত ভাবেও পড়েছে? কিছু পরিমাণেও কি অর্থনৈতিক সঞ্জীবনের আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে?

৯

আসল কথা, আমরা অর্থনৈতিক দিকে একটা অত্যন্ত গভীর এবং মৌলিক সংকটে পৌঁছেছি। শিল্প-বিপ্লবের পর পাশ্চাত্যের নবজাগ্রত শক্তি বিশ্ববিজয় করে ইম্পীরিয়লিজমের আওতায় বিশ্ববাণিজ্যের যে ধারা গড়ে তুলেছিল এবং তার

ফলে তাদের দেশেও যে সমৃদ্ধি হয়েছিল, আজ সে যুগ এবং সে ধারা প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হতে চলেছে। সেইজন্য অটোয়া কনফারেন্স হতে সেদিনের কমনওয়েলথ-সম্মেলন পর্যন্ত অবিরতই চেষ্টা চলছে কতকগুলো দেশের নিজেদের মধ্যে একটা ঘরোয়া বন্দোবস্ত করে বাইরের আঘাত সামলানোর। অবশ্য সঙ্কট এত মৌলিক যে এই উপায়েও তা ঠেকানো যাবে না। কিন্তু এই সঙ্কটের প্রতিফলন প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাতেও কিছু-না-কিছু পড়েছে। ভারতবর্ষের মত ক্ষীয়মান দেশে তো সে সঙ্কট তীব্রতম। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান ঠুকঠাক মেরামতিতে হবে না, গভীর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন চাই। সেই পরিবেশে যখন নূতন অর্থনৈতিক প্রসারের সূচনা দেখা দেবে তখন সেই সূচনাকে সর্বাঙ্গীণভাবে সার্থক করে তোলবার প্রকৃষ্ট উপায় কমিউনিটি প্রোজেক্ট নিশ্চয়ই। বস্তুতঃ সেটা খুবই ভাল উপায়। কিন্তু সে পরিবেশ যতক্ষণ না সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ এই পরিকল্পনার কণ্ঠরোধ করে যে দুর্লঙ্ঘ্য মৌলিক বাধা পাহাড়ের মত এখনও দাঁড়িয়ে আছে (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তার বিশেষ কিছু ক্ষয় হবে না), কেবল কর্মযজ্ঞে আহ্বান ও আন্তরিক সদিচ্ছার নরুণ-আঁচড়ে সে পাহাড়ের গায়ে দাগও পড়বে না। পূর্বেও এই কারণে কেবল সদিচ্ছাতে কোনও কাজ হয় নি। উপরন্তু পূর্বকালের পরিকল্পনাগুলি ছিল ছোট, এখন তা অনেক বড় —কাজেই এবার আশাভঙ্গ হলে তা আরও অনেক বৃহৎ পরিমাণে হবে। তা ছাড়া তখন দোষ দেবার জন্য হাতের কাছেই ইংরেজ ছিল, এখন আবার তা-ও নেই।

আদর্শ খাদ্য এবং পথ্য মধু

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আমাদের দেশে মধুর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এমন কি মানুষ যখন ধান বা গমের ব্যবহার জানিত না, তখনও মধু তাহারা ব্যবহার করিত।

মধুকে একাধারে আদর্শ খাদ্য, পথ্য ও ঔষধ বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে খাদ্যসমস্যা যে ভাবে দেখা দিয়াছে তাহাতে মধুকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিলে দুর্ভাবনার হাত হইতে কতকটা রেহাই পাইবার আশা করা যাইত। আমরা ছোট বালক-বালিকাদের মধু ব্যবহার করাই এবং পূজাপার্বণে খুব ব্যবহার করি। খাদ্য হিসাবেও ইহা আমরা আদর্শ খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারি।

খাদ্যবিশেষজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, কেহ যদি এক পাউণ্ড মধু পান করে তাহা হইলে কুড়িটা ডিম ও চারি পাঁইট খাঁটি দুধের শক্তি সে লাভ করিতে পারিবে। শিশুদের এবং খেলোয়াড়দের মধু এক পরম উপকারী খাদ্য।

মধু সহজেই হজম হয় এবং ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। মধুর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে চুণ ও লৌহ জাতীয় পদার্থ আছে, সে কারণে মধু সেবনে শিশুদের দেহসৌষ্ঠব বাড়ে এবং দেহে রক্তকণিকার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে মধুর উৎপাদন খুব কম। কবিরাজী ঔষধ ইত্যাদি সেবনের জন্য যেটুকু মধুর দরকার তাহাও আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং আমাদের দেশে যেমন 'ফসল বাড়াও', 'ফসল বাড়াও' রব উঠিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট। সেই রকম পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি মধুর চাষে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন তাহা হইলে আর একটি আদর্শ খাদ্য বনে-জঙ্গলে অল্প পরিশ্রমেই পাওয়া যাইবে এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে।

ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মোম উৎপাদনের জন্য মধুমক্ষিকা পালন করা হয়। আমাদের দেশে মধু বা মোম উৎপাদনে কোনরূপ তৎপরতা দেখা যায় না। বনে-জঙ্গলে যেটুকু মধু বা মোম পাওয়া যায় তাহাই স্থানীয় লোকেরা ভাঙিয়া বিক্রয় করে। সুতরাং বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ব্যতীত আমাদের দেশে মধু দোকান ছাড়া পাওয়া যায় না।

মধু খাঁটি হইলেই তাহাতে সবরকম গুণ বজায় থাকে। গুড়ের ঘোল বা জল মিশান মধু উপকারের চেয়ে অপকার করে বেশী।

কুর্গের অধিবাসীরা এক বিচিত্র উপায়ে মৌমাছিদের প্রলোভিত করিয়া ধরে। তাহারা মাটির হাঁড়ি বা কলসীর গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ছিদ্র করে এবং ভিতরে মধু ও মোম মাখাইয়া কোন কাষ্ঠখণ্ডের উপর উপুড় করিয়া রাখে। মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছি ঐ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মৌচাক তৈয়ারী করে। পরে গ্রামবাসী ঐ পাত্র ঢাকা দিয়া গ্রাম হইতে দূরে বাগানে রাখে, সেখানেই মৌমাছিরা তখন মধু সংগ্রহ করে। অল্পদিনের মধ্যেই মধু পাওয়া যায়। মধুচক্র ভাঙিয়া কাঁচা মধু শিশিতে বা কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। কারণ উহার সহিত যে জলীয় অংশ থাকে তাহা মধু এবং মধুর গুণকে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য কাঁচা মধুকে অগ্নিতাপে কিছুকাল জ্বাল দিয়া কোন পাত্রে ভরিয়া রাখিলে মধু ভাল থাকিবে। কয়েক বৎসর এইভাবে মধু রক্ষা করাও যায়।

আশ্রমবাসীদের জন্ত দুধ পাওয়া যায়। এখানে ধান-ভানার জন্ত একটি ঢেঁকি আছে। অত্র আশ্রমে দুইখানা তাঁত আছে। একখানা ছাত্রদের শিক্ষার জন্ত, অপর খানাতে এক জন তন্তুবায় আশ্রমবাসীদের কাটা সুতোর কাপড় বুনিয়া দেন। এই তন্তুবায় সমস্ত সুতার কাপড় তৈয়ার করিতে না পারায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের আর এক জন তন্তুবায় অবশিষ্ট সুতার দ্বারা কাপড় বুনিয়া দেন। উত্তর-বুনিয়াদি ছাত্রদিগকে মুর্গী-পালন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এখানে আছে।

চিকিৎসার জন্ত একটি ডাক্তারখানা আছে। গ্রামের লোকেরাও ডাক্তারখানা হইতে চিকিৎসার সুযোগ পান।

সজী চাষে সাহায্যের জন্ত মাসিক ৪৫৲ টাকা বেতনের একজন মজুর আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে মেথর, ভৃত্য, ঝি, ভানাবী বা পাচক নাই। পায়খানা পরিষ্কার, ঘর-দুয়ার ঝাট দেওয়া, কাপড় কাচা, ধানভানা, রান্না প্রভৃতি যাবতীয় কাজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরাই করিয়া থাকেন।

অত্র আশ্রমে আশ্রমের অধ্যক্ষ সপরিবারে বাস করেন। আরও তিন জন শিক্ষক ও উত্তর-বুনিয়াদি ছাত্রদের থাকিবার ব্যবস্থাও এখানেই। সবশুদ্ধ এখানে এখন ২৭ জন অবস্থান করিতেছেন।

আশ্রমের একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী শ্রীনিবারণচন্দ্র সরকার ও কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের প্রাদেশিক শাখার ভারপ্রাপ্তা অধিনেত্রী আজীবন সেবাপরায়ণা শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দের তত্ত্বাবধানে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রের দশ জন গ্রাম-সেবিকা শিক্ষার্থিনী বিদ্যালয়ের বাড়ীতে বাস করেন।

কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের শিক্ষালয়ে ১০ জন গ্রাম-সেবিকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাগ্রহণের কাল ২ বৎসর। শিক্ষার সময়ে সেবিকাদিগকে ২৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ম্যাট্রিক পাস মেয়েদিগকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সেবিকাদিগকে অন্ততঃ ৩ বৎসর মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ট্রাষ্টের কোন কেন্দ্রে কাজ করিতে হয়। প্রতি কেন্দ্রের কার্য্যে দুই জন সেবিকাকে নিযুক্ত করা হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রে আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের নিকট বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ও এই আদর্শকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্ত বলরামপুর বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। শিক্ষাচর্চ্চার ছাত্রগণ ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত আলোচনায় যোগ দেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের বক্তব্য বুঝিয়া লইবার জন্ত চেষ্টা করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ধীরতার সহিত শিক্ষাচর্চ্চার ছাত্রদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেন। বুনিয়াদি শিক্ষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ক্রমশঃ শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্ষিতীশবাবুর যুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল আলোচনা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছে।

২০শে তারিখ সকাল বেলা অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র সরকার আমাদিগকে প্রাক্-বুনিয়াদি শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি শ্রেণী ঘুরিয়া দেখাইলেন। শিশু-শ্রেণীতে সহজপাঠ্য বই, স্লেট ও বোর্ড ব্যবহার করা হয়। ২ জন শিক্ষয়িত্রী শিশুদিগের ক্লাস লইতেছিলেন। শিশুরা কেহ পড়িতেছিল, কেহ লিখিতেছিল কেহ বা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শিশুদের প্রতি শিক্ষয়িত্রীদের আদর ও যত্ন লক্ষ্য করিয়াছি।

আমরা যখন চতুর্থ শ্রেণীতে গেলাম তখনই ঐ শ্রেণীর একটি ছাত্রী ধানভানার পিরিয়ড শেষ করিয়া ক্লাসে আসিল। ছেলে-মেয়েরা রচনা লিখিতেছিল। বিষয় ছিল তাহাদের পূর্ব্বদিনের পড়াশুনা, কাজ ও আশ্রমে অনুষ্ঠিত সূত্রযজ্ঞ। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে রচনা পড়িয়া শুনাইল। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিকট রচনায় যতখানি পটুত্ব আশা করা যায়, এই শ্রেণীর একটি ছেলেমেয়ে তদপেক্ষা অধিক পটুত্ব লাভ করিয়াছে।

অপর একটি শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা সুতাকাটার সরঞ্জাম নিকটে রাখিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। শুনিলাম সুতাকাটার প্রসঙ্গ হইতে কার্পাস-চাষ, কার্পাস উৎপাদনোপযোগী মাটির বিবরণ, ভারতের কোন্ প্রদেশে ও পৃথিবীর কোন দেশে কিরূপ কার্পাস জন্মে, ভারতে বস্ত্রশিল্পের অতীত ও বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা ছেলেমেয়েদিগকে কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের নিকট হইতেই বেশ ভাল উত্তর পাইয়াছি।

ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষক মহাশয়দের পরিচালনায় দুইখানি হাতের লেখা পত্রিকা বাহির করে। আমি পত্রিকা দু'খানির কয়েক খণ্ড দেখিয়াছি। পত্রিকা পড়িয়া দেখিবার মত সময় আমার ছিল না। কিন্তু পত্রিকার পারিপাট্য ও হাতের লেখার যত্ন দেখিয়া আমার ভাল লাগিয়াছে।

সুতাকাটা ও বস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রছাত্রীগণ সুতা কাটিয়া বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইয়াছেন। সজীর সম্বন্ধে শুনিয়াছি, এখানকার মাটিতে আলু ভাল না হওয়ার জন্ত তাঁহাদিগকে কিছু আলু কিনিতে হয়। ইহা ছাড়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অন্তান্ত সমস্ত সজীই এখন উৎপাদন করিতেছেন। ছাত্রছাত্রীদের কাটা সুতা, ঐ সুতা হইতে প্রস্তুত বস্ত্র ও বিদ্যালয়ে সজীর চাষ সম্বন্ধে নিবারণবাবুর নিকট হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম :

ছাত্রছাত্রীদের কাটা সুতা ও ঐ সুতায় প্রস্তুত বস্ত্রের হিসাব

সাল	কেটি (Hank)	ওজন	প্রস্তুত বস্ত্র (বর্গগজ)	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
১৯৪৮	১৬১৬¾	১।০ মণ	৪০৪	৩২
১৯৪৯	১৮৫৫	১।০ মণ	৪৬৪	৩৬
১৯৫০	২৮৫৬	২/৭।/০ ছটাক	৭১৬¾	৭০
১৯৫১	৪৮৮৪	৪/০ মণ	১২২১	৭২

সূতার নম্বর ১৪—১৭

একজন ছাত্রীর কাটা সূতা ও তাহার সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র : ৬ষ্ঠ বর্গের ছাত্রী ভানুমতী (১৫) ১৯৫১ সালে ১৪১ ফেটি সূতা কাটিয়াছিল। এই সূতায় ৩৫½ বর্গগজ কাপড় হইয়াছে। ভানু ফ্রক ও শাড়ী ব্যবহার করে। তাহার জন্ত এই বৎসর ২৫ বর্গগজ কাপড় লাগিয়াছে।

বিদ্যালয়ের জমিতে কাপাস ভাল হয় না। সূতাকাটার জন্ত সমস্ত তুলাই কিনিতে হইতেছে।

সজীর চাষ

১৯৪৬ সনে নিবারণবাবু বিদ্যালয়ের জঙ্গলাকীর্ণ কিছু পতিত জমি আবাদযোগ্য করিয়া তাহাতে সজীর চাষ আরম্ভ করেন। প্রথম দুই বৎসর উৎপন্ন সজী হইতে চাষের খরচ উঠে নাই। তৃতীয় বৎসর হইতে সজীর চাষ লাভজনক হইযাছে। সজীচাষের জন্ত নিযুক্ত মজুর চাষের কঠিন কাজগুলি করিয়া দেন। আর সমস্ত কাজ শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রীগণ করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে গোবর, ছাগল ও মুর্গীর বিষ্ঠা, মনুষ্যসার ও আবর্জনা দ্বারা মিশ্রসার তৈয়ার করা হয়। ১৯৫১ সনে বিদ্যালয়ে সাড়ে তিন বিঘা ও অভয় আশ্রমে তিন বিঘা মোট সাড়ে ছয় বিঘা জমিতে সজীর চাষ করা হইয়াছিল। এই জমিতে হাড়ের গুড়া ১৯/০, খৈল ২০/০, চূণ ২/০ ও বিদ্যালয়ে প্রস্তুত ১৭২৬/ মণ মিশ্রসার ব্যবহার করা হইযাছিল। এখন বিদ্যালয় ও আশ্রমের জমিতে প্রচুর পরিমাণে সজী উৎপন্ন হইতেছে। বিদ্যালয় ও আশ্রমে অতিথিসহ প্রতিদিন ১২৫ জন লোক আহার করেন। তাঁহাদের জন্ত একমাত্র আলু ছাড়া আর কোন সজী কিনিতে হয় না। বৎসরের কোনও কোনও সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন সজী বিক্রয়ও করা হইয়া থাকে।

নিম্নে ১৯৪৬-১৯৫১ সন পর্যন্ত সজীচাষের বিবরণ দিলাম :

সন	উৎপন্ন	মূল্য	খরচ
১৯৪৬	১২/ মণ	৮২৷৵০	২৩৯৮/১০
১৯৪৭	৮৩/৭৷৵	৫৫৭৵৫	৫৭০৷১০
১৯৪৮	১১৭/৯৷৶	৭০১৷৵৫	৫৯০৷৶১০
১৯৪৯	১৪৪৷/৷৵	১০৬৫৷/০	৬৯৭৷৵১০
১৯৫০	১৯০৷/৷৶	১৪৫৫৷৵০	১২৫২৶৫
১৯৫১	৩৪২৸৮/	২৬৮৫৷৶১০	১৪৬৩৷৶৫

১৯৫২ সনের জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসে ৩০০/০ মণ সজী হইয়াছে।

নিবারণবাবু ১৯৪৬ সনে আশ্রমের তহবিল হইতে ২১৯৮/১০ আনা লইয়া সজীর চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সজীর হিসাবে তাঁহার নিকট ২৬৪৫।৫ মজুত ছিল।

বিদ্যালয়ে স্থানীয়, বিক্রমপুরী ও হরিয়ানা তিন রকমের ১০টি গাভী আছে। স্থানীয় গাভী গ্রামে /। সের হইতে /১ সের দুধ দেয়। যত্ন লওয়ায় এই গাভীই আশ্রমে /২। করিয়া দুধ দিতেছে। বিক্রমপুরী গাভী /৮। সের, হরিয়ানা ।৪ সের পর্যন্ত দুধ দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে ৬টি গাভী দৈনিক ১/ মণ দুধ দিত।

এখন বলরামপুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার অভিমত জানাইতেছি :

আমরা দেখিয়াছি—বলরামপুর বিদ্যালয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্ত আন্তরিক প্রযত্ন করা হইতেছে এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সুযোগ্য শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-ব্যবস্থায় বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বুনিয়াদি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত একটি সমালোচনা এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বিত হইলে সাধারণ শিক্ষার মান ক্ষুণ্ণ হইবে। বুনিয়াদি শিক্ষার সফল প্রচেষ্টা দেখিবার সুযোগ না হওয়ায় দেশে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইযাছে। যাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন তাঁহারা বলরামপুর বিদ্যালয় ভাল ভাবে পরিদর্শন করিলে তাঁহাদের মত পরিবর্তন হইবে বলিয়া আমি মনে করি। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার পরিষ্কার ধারণা হইয়াছে, উপযুক্ত শিক্ষক পাইলে বুনিয়াদি পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষার মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরিবর্তে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনায় শিশুদিগকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বী ও পল্লীসমস্যা-সমূহের সমাধানে ব্রতী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বলরামপুরে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইহাও দেখিয়াছি—নীরব কর্ম সাধনার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের তপশ্চর্য্যা সেখানে সার্থক হইয়া উঠিতেছে। আদর্শকে মূর্তিদান করিতে হইলে আদর্শের প্রতি যে নিষ্ঠার প্রয়োজন তাহা বলরামপুরে শিক্ষকদিগের নিকট হইতে ছাত্রদের মধ্যে নিশ্চিতরূপে সঞ্চারিত হইতেছে।

আশ্রমের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার উদ্যম প্রশংসনীয়। আশ্রমে আমরা দুই রাত্রি যাপন করিয়াছি কিন্তু মশা পাই নাই। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই দেখিয়াছি।

কায়িক শ্রমের কর্মসূচী ছেলেমেয়েরা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্ত কয়েকটি ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছি, প্রথম প্রথম তাহাদের নিকট এই সকল কাজ কঠিন বলিয়া মনে হইত, কিন্তু দুই-এক মাসের মধ্যেই তাহারা সকলের সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্যে আশ্রমের সকল কাজে অভ্যস্ত হইয়া উঠে এবং আনন্দের সহিত সকল কাজ করিয়া থাকে।

বলরামপুরে দৈনন্দিন কাজ ও শিক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে যে দায়িত্ববোধ জাগিতেছে, তাহা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নহে। সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধে যে দৃঢ় প্রত্যয় ছেলেমেয়েরা পাইতেছে তাহা উত্তর জীবনে জাতীয় শক্তিরূপে প্রকাশ পাইবেই।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতিকে যদি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক অর্থ-

বৈষয়িক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া সহযোগিতামূলক অর্থনীতি প্রবর্তনের পরিকল্পনা সহজসাধ্য হইবে।

বলরামপুরে অনিবার্য কারণে আবাসিক ছাত্র ও গ্রামের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটিতেছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এক বেলা বিদ্যালয়ে [illegible]। এই জন্য তাহাদের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না। গ্রামের সকল ছেলেমেয়েকে বৎসরের পর বৎসর আশ্রমে রাখিয়া শিক্ষাদান করা কখনও সম্ভব হইবে না। এই সকল ছেলেমেয়ের জন্য বুনিয়াদি পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আদর্শকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে।

বলরামপুরের আবাসিক বিদ্যালয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষ যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, আশা করি পল্লীবাসী বালক বালিকাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তাঁহারা অনুরূপ সাফল্য অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

সরু পথ অরণ্যে হারায়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি থাক আমি চলে যাই
যেদিকে দু'চোখ যায়,
যেখানে দু'দণ্ড বসে' নিতে পারি স্বস্তির নিশ্বাস
যেখানে চেনে না কেহ
নিতান্ত অচেনা মুখগুলি—
নামধাম যেথা অবান্তর
যেখানে খুঁজিয়া পাব ফেলে আসা সম্পদ আবার
যেথা আছে পল্লী-ঢাকা উজ্জ্বল সকাল
ঘুম-পাড়ানিয়া গানে ঘুমন্ত দুপুর
স্তব্ধবাক রাত্রির আঁধার
ঢেকে দেয় মুছে দেয় বিফল আশ্বাস।

[illegible] বাতুল [illegible]
পরিবার [illegible],
[illegible]।
আমার সম্মুখে পথ
অজানা দেশের দিকে চলে
আমি চাই নিরুদ্দেশে তাই
[illegible]
[illegible]।

যাই তবে আমি চলে যাই,
তরু শাখাসমাচ্ছন্ন যেথায় [কাঁটা]
সরু পথ অরণ্যে হারায়।
গ্রামশেষে প্রান্তর ছাড়ায়ে
আকাশ যেথায় নীল দিগন্তে বিলীন
বোবা চোখে নির্ভয়ে তাকায়
যাই আমি সেথা চলে যাই।
থাক তুমি তোমার সংসারে
আমার সংসার বলে'
এ জগতে আর কিছু নাই।

কিছুতে ভরে না মন
শূন্যতায় ভরে গেছে আমার ভুবন।
গৃহ হতে পথ ভালো
রক্তের সম্পর্ক হতে
আরও ভাল নিষ্পর যে জন।
তাই দূরে চলে যেতে চাই
ভুলে যেতে চাই এ সংসারে
চাই মোর আমিত্বের চির নির্বাসন
লোকলোচনের অন্তরালে
তোমার সংসার হতে আমার বিরলে।

স্পার চম্বের ভিক্ষুদল

চিরতুষারের পারে তিব্বত

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

২

চুম্বিভ্যালিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নদীটিকে উপর থেকে আমরা দেখতে পেলাম। এই নদীর পারে পারে সমতল ভূমির উপর চুম্বিভ্যালি। ছ' পারে সু-উচ্চ পাহাড়, পাইন গাছ ও নানা রকম ফুলের গাছে ঢাকা অসংখ্য পাখীর বিচিত্র কাকলী। নদীর নীল জল প্রবল গর্জ্জন করে বড় বড় পাথরে আছড়ে পড়ে শুভ্র ফেনা তুলে ছুটে চলেছে। অনেক লোকের বসতি গ্রাম দোলিংকে ডাইনে রেখে আমরা নদীর পাড় ধরে অগ্রসর হয়ে ফাংগ্রামের ভিতর দিয়ে চুম্বি গ্রামে এসে পৌঁছলাম।

গ্রামের বাড়ীগুলি পাইন গাছের তক্তায় তৈয়ারী। দরজা ও জানালা খুব বড় বড়। নদীর ধারে ধারে গ্রামবাসীদের ক্ষেত। আলু ও যবের ক্ষেতই বেশী; কিছু কিছু গমও আছে। চুম্বি গ্রামের সামনেই এমন একটি ফটক যে সেই ফটকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হয়ে আর ইয়াটুঙ্গ পাওয়া যায় না। ইয়াটুঙ্গ এখান থেকে দু' মাইল। তিব্বত প্রবেশের একমাত্র পথ এই ফটকে বড় বড় বেণী মাথায় কয়েকজন লোক আমাদের পথ আটক করল। বলল, নদী পার হয়ে ঐখানে আপিসে পাসপোর্ট দেখাতে হবে। নদী পার হওয়া কঠিন নয়, ওপরে ব্রীজ আছে। আমরা ওপারে গেলাম। তারা সঙ্গে গেল, পাসপোর্ট চাইল। আমরা বললাম, "অফিসারের কাছে নিয়ে চল, তাঁর হাতে দেব"। সহসা তারা আমাদের অফিসারের কাছে নিয়ে যাবে না, বোধ করি, তাতে তাঁর মানহানি হতে পারে; তাই খুব ইতস্ততঃ করে অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভিতরে ঢুকল। পরামর্শ করে বেরিয়ে এসে আমাদের অফিসারের ঘরে নিয়ে গেল।

অফিসারের ঘরটি মন্দ বড় নয়। আন্দাজ ২০ হাত ২৫ হাত হবে। একটিমাত্র প্রবেশ করবার দরজা। তা দিয়েই আমরা ঢুকলাম। এইটি একাধারে অফিসারের শোবার ঘর, আপিস ঘর, অস্ত্রাগার সবকিছু। ঘরে টেবিল চেয়ারের বালাই নেই। তিব্বতী কায়দায় কয়েকটি গদি মোড়া বসবার থাক। বোধ করি, শোয়াও এরই ওপর চলে। একটিতে আমাদের বসতে বলায় আমরা বসলাম। প্রথমেই আমাদের নজর পড়ল সম্মুখে এক পাশে বসা অফিসারের গৃহিনীর প্রতি। তিনি একটি বড় টবে তাঁর শিশু ছেলে বা মেয়েকে গরম জলে স্নান করাচ্ছিলেন। একটি মগ থেকে গরম জল নিজের মুখে নিয়ে কুলকুচা করে শিশুর গায়ে দিচ্ছিলেন। মা ও শিশু উভয়েরই ডালিম ফুলের মত টুকটুকে লাল রঙ। ঘরের মধ্যে থাকে থাকে একেবারে আড়া পর্য্যন্ত ৩০৩ রাইফেল সাজান। অফিসারটি আমাদের ডানদিকের থাকে বা সোফায় বসেছিলেন; মাথায় লম্বা বেণী, এক কানে ফুটো করা লম্বা নীল পাথরের দণ্ড (আভিজাত্যের চিহ্ন) ইয়ারিঙের মত লাগান। অপর কানে একটা নীল পাথর বসান। পলিটিক্যাল অফিসারের চিঠিখানি ইঁহার হাতে দিলাম। ইনি চিঠিখানি উল্টো করে ধরলেন, বুঝলাম ইনি ইংরেজী জানেন না। আমরা ভীত হলাম, কেননা পাসপোর্ট

যাই এই মুহূর্তে আবার মাথুলা অতিক্রম করে ভারতে ফিরে যেতে আদিষ্ট না হই। অফিসার আমাদের তিব্বতী ভাষায় কি

লেখক

জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা কিছুই বুঝলাম না। অপর একজন তিব্বতী কর্ম্মচারী ঈষৎ বক্র হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর কানে মাকড়ী তাতে নীল পাথর বসান (নোকরের চিহ্ন)। তিনি জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে টেনে ধরে ঘন ঘন জিভটিকে নাড়ছিলেন (তিব্বতী অভিবাদনের কায়দায়)। তিনি আমাদের ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি সেই দু'জন উচ্চ-পদস্থ সরকারী লোক, যাদের আসার কথা ছিল?" বলেই আবার জিভটাকে পূর্ব্ববৎ নাড়তে লাগলেন। বুঝলাম, কর্ম্মচারীটি দোভাষীর কাজ করছেন। তখন বুদ্ধির লড়াই আরম্ভ হ'ল। আমরা গম্ভীর হয়ে হিন্দিতে বললাম, "হ্যাঁ আমরাই সেই দু'জন।" কর্ম্মচারীটি আরও একটু বক্র হয়ে তিব্বতী ভাষায় কথা দুটি তর্জ্জমা করে বলে আবার জিভ নাড়তে লাগল। অফিসারটি 'হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ করে অভিজাতের হাসি হেসে উঠলেন। চোখের সামনে এক নিমেষে সমস্ত তিব্বত যেন আমরা দেখতে পেলাম। এক কানে লম্বা নীল দণ্ড পরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত, আর কুলী, খচ্চরওয়ালা, চাষী, লম্বা বেণী গোল মাকড়ী পরা জিবনাড়া নোকর শ্রেণীর লোক। অভিজাত অফিসারটি উচ্চ মাত্রার শিষ্টাচারের ... দিয়ে আমাদের

দিকে নামিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে, আমরা সিগারেট খাইনে। আমরা নির্নিমেষে হাতের উল্টো করে ধরা চিঠিখানির দিকে তাকিয়ে ছিলাম; ভাবছিলাম, কখন ফেরৎ পাব এবং ইয়াটুঙ্গ যাবার ছাড় পাব।

অফিসারটি দোভাষীর দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন। দোভাষী হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, লড়াইয়ের কি হচ্ছে, এবং জিভ নাড়তে লাগল। বড় ফ্যাসাদে পড়লাম; পাসপোর্ট নেই তার উপর আবার কি বলতে কি বলি। বললাম, "কোরিয়ায় বাটনা বাটা হচ্ছে, একবার চীন এগুচ্ছে, আর একবার আমেরিকা এগুচ্ছে। তিব্বতী তর্জ্জমা হ'ল, বেঁকে দাঁড়িয়ে জিভ নাড়া আরম্ভ হ'ল, অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্যের হাসি হেসে উঠলেন, "হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ।" চলল এ প্রশ্নের পর ও প্রশ্ন, আর আমাদের উত্তর। তারপর জিব নাড়া আর হেঁ, হেঁ, হেঁ হেঁ। হাতের চিঠি আর ফেরত পাই নে। অবশেষে জিজ্ঞাসিত হলাম, তিব্বতে চীনের ব্যাপার কি? উত্তরে বললাম, তিব্বতের ডেপুটেশন চীনে গিয়েছে, কথাবার্ত্তা চলছে। কথা বাড়তে না দিয়েই জিবনাড়া আর হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ—র মধ্যে হাতের চিঠিখানি ফেরত চাইলাম। বললাম, ওটা হচ্ছে রায় বাহাদুর সোনেন টোপ্‌ডেন কাজী আই-টি-এ'র চিঠি, তাঁকে ত আমাদের ওটা দিতে হবে।

উত্তর হ'ল, চিঠি এখন ফেরত পাওয়া যাবে না।

বলে কি! সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

দোভাষী উত্তর দিল, "তিব্বতের নিয়ম হচ্ছে, অতিথিকে চা না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আগে চা খাওয়া হউক, তারপর চিঠি ফেরত দেওয়া হবে।"—হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ—কর্ত্তা হাসলেন। আমরা পুলকিত হলাম।

নোকরের অভাব নেই। ইতিমধ্যে দু'জন নোকরের আবির্ভাব হ'ল; একজনের হাতে কেটলী ও আর একজনের হাতে কাচের গ্লাস। আর দু'জন একটি নূতন ব্রিটানিয়া বিস্কুটের টিন খোলায় ব্যস্ত হ'ল। আমরা বললাম, চা পান করছি, কিন্তু আমরা সকালে খেয়ে বেরিয়েছি, বিস্কুটের দরকার নেই। উত্তর হ'ল, তিব্বতের নিয়ম হচ্ছে চা'র সঙ্গে টা খেতেই হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা শুনে-ছিলাম, তিব্বতে চা খেতে দিলে তা যত কদর্য্যই হোক, প্রশান্ত মুখে খেতে হবে। মুখ বিকৃতি করা নাকি ভয়ঙ্কর অপরাধ। একজনের হাতে এক একটি গ্লাস দিয়ে তাতে পুরো এক গ্লাস করে চা ঢেলে দেওয়া হ'ল। ঈষৎ উষ্ণ চা। আমরা ঢক্ ঢক্ করে খেলাম। একখানির বেশী বিস্কুট নিলাম না। বিস্কুটের জন্য আর সাধাসাধি হ'ল না, কিন্তু চা ফুরুতে না ফুরুতে আবার গ্লাসে ঢেলে দেওয়া হ'ল। চা-টা খুব বিস্বাদ ছিল না, এবং তাতে বেশী পরিমাণে দুধ ছিল। পথ হাঁটায় শ্রান্তিও আমাদের কম ছিল না, অতএব অভ্যাস না থাকলেও অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আবার অত বড় গ্লাসের এক গ্লাস! সেটা খেতে না খেতে আবার এক গ্লাস ঢেলে দিল। এবার রীতিমত ভয় পেয়ে পাশে ... আস্তে আস্তে রাখলাম

চুম্বী ভ্যালির ফাং গ্রামের ঘরবাড়ী

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক' গ্লাস এরকম প্রশান্ত মুখে খেতে হবে?' ইমার্সনের কথায় অব্যক্ত কথা বেশী ব্যক্ত হয়। কর্তা উত্তর দিলেন, "তিব্বতের নিয়ম হচ্ছে, যতক্ষণ অতিথি চা খেতে চাইবেন, ততক্ষণ তাঁকে চা দিতে হবে।"—হেঁ, হেঁ হেঁ, হেঁ।

অতিথিরা পাকা তিন গ্লাস খাওয়ার পরে আর চা খেতে চাইলেন না। অতএব চা খাওয়ার পালা এখানেই শেষ হ'ল। এতক্ষণে তরুণী ভার্যা বাচ্চাকে স্নান করিয়ে, মুছিয়ে ফিটফাট কাপড়-চোপড় পরিয়ে, নিজে একখানি রঙচঙে কাপড় সামনে ঝুলিয়ে, লাল টুকটুকে জুতো পায়ে দিয়ে বাচ্চাকে কোলে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। কর্তা আমাদের হাতে চিঠিখানি ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষের ক্যামেরার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন, তাঁদের ছবি তুলে দিতে হবে। আবার এও বললেন, ছবি অনেকে তোলে, কিন্তু পাঠাব বলে আর পাঠায় না। তা হলে হবে না। ছবি তুলতেও হবে আবার সেই ছবি পাঠাতেও হবে।—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

চুম্বিভ্যালিতে ছবি তুলবেন বলে ঘোষ তখন ক্যামেরায় 'কালার্ড ফিল্ম' চাপিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সে কথা বলার সাহস হ'ল না। আশ্বাস দিলেন, নিশ্চয়ই ছবি তুলবেন, এবং নিশ্চয়ই পাঠাবেন। বললেন, ছবি তোলার সময় ঐ নোকরটিকে রাখলে মন্দ হয় না; ওর জুতো খুব রঙচঙে, আর পরিচ্ছদটিও বেশ। কিন্তু ছবি তোলার সময় কর্তা কিছুতেই নোকরটিকে পাশে দাঁড়াতে দিলেন না। তিনি, স্ত্রী, বাচ্চা ও পরিবারের আর একজন দাঁড়ালেন। পরিবারের গ্রুপে নোকর থাকে কি করে? ছবি তোলা হলে অনেক অভিবাদন করে আমরা বিদায় নিচ্ছি এমন সময় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ঐ রঙচঙে জুতোর ছবি তোল। রঙীন ফিল্ম ঘোষের খুব বেশী ছিল না, কাজেই ওজর দিয়ে ঘোষ অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তুরসা ও আমচুর ধারে ধারে দু'মাইল হেঁটে আমরা ইয়াটুঙ্গ পৌঁছলাম। লাসা থেকে পালিয়ে এসে দালাই লামা এইখানে আছেন। বর্তমানে তিনি এরই পাঁচ মাইল দূরে এক গোম্ফায় নিভৃতে তপস্যা করছেন; কারুর সঙ্গে কিছুদিন দেখা করবেন না।

বহতা নদীটি আমাদের ডানদিকে ছিল, আমরা নদীর উজানে হেঁটে যাচ্ছিলাম। নদীর ধারে ধারে আলু ও যবের ক্ষেত, তারপরে উভয় পাশে গগনচুম্বী পাহাড়; সেগুলি এত খাড়া যে এর উপরে উঠা যেন এক প্রকার অসম্ভব। দু'ধারে পাহাড়ে ফুলে ভরা নানা-প্রকারের গাছ। পাহাড়ের গায়ে ঘাসের মধ্যে কত বর্ণের বিচিত্র ফুল। মাঝে মাঝে ব্লু পাইনের সারি। কত রকমের পাখীর কলরব। এটা নাকি এখানকার বসন্তকাল, তাই এত ফুল, এত পাখী। হিমালয়ের পথে এই স্বল্পপরিসর উপত্যকাটি যেন কোন স্বপ্নলোকের পথ। এত চড়াই-উৎরাই পার হয়েছি, এত বরফ পার হয়েছি, এত পথ হেঁটেছি, তবুও যেন আমাদের দেহে শ্রান্তি ছিল না। মনে হচ্ছিল, এই পথ ধরে কেবল অজানার দিকে হেঁটেই যাই। ইয়াটুঙ্গ এই গিরিনদীর বাম তীরে। আমাদের ডানদিকে নদীর এপার থেকে ওপার যাবার একটি সেতু। ও পারে ইয়াটুঙ্গ। সেতুটি বেশ মজবুত। আমরা কিন্তু সেতু পার হয়ে ইয়াটুঙ্গে প্রবেশ করলাম না। কেননা ডাক-বাংলোটি ইয়াটুঙ্গের এই পারে পাহাড়ের

চুম্বী ভ্যালিতে আমচু

আছে কি না। অন্যান্য ডাক-বাংলোয় এ রকম ব্যবস্থা আছে। চৌকিদার জানাল, এখানে বাইরে পায়খানা নেই, তবে পাহাড়ে যাওয়া যায়। বললাম তাই হবে, মেথরকে খবর দেবার দরকার নেই। পরে অবশ্য পাহাড়ে যাওয়া কি ব্যাপার তা বুঝেছিলাম। ঐ খাড়া পাহাড়ে কি চড়া যায়! তারপর যেখানেই বসি মনে হয় যেন নীচের ইয়াটুঙ্গ থেকে সবাই দেখতে পাচ্ছে!

আমরা ইয়াটুঙ্গ যাত্রা করব বলে উঠানে নেমেছি, এমন সময় একজন তিব্বতী কর্মচারী হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে আগাগোড়া পথ দৌড়ে পাহাড় চড়াই করে বাংলোয় এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইনি হলেন আই-টি-এ'র হেডক্লার্ক, ইংরেজী জানেন।

গায়ে। অতএব আমরা বাঁ-দিকের পাহাড় বেয়ে ডাক-বাংলোয় উঠলাম। সু-উচ্চ পাহাড়ের গায়ে খাপকাটা এই মনোরম ডাক-বাংলোটি ছাড়া ইয়াটুঙ্গের এ পারে কোন গৃহ বা বস্তি নাই।

এর প্রাঙ্গণে ঢুকতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে অজস্র সাদা ফুলে ভরা কয়েকটি গাছ। ঝাঁকড়া গাছগুলি যেন সাদা ফুলে ফেটে পড়েছে। ঝরা ফুলে গাছের তলাটা পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। প্রাঙ্গণের ওপরেই আমরা দুখানা চেয়ার নিয়ে ইয়াটুঙ্গ শহরকে সামনে করে বসলাম। মাথার ওপরে কয়েকটি বড় বড় গাছ, এ গুলিও ফুলে ভরা। পায়ের নীচে প্রাঙ্গণের ঘাসের মধ্যে কত রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। ছোট্ট একটি পাহাড়ে লতা, তাতে এত বড় একটি সুন্দর ফুল! ফুলের এখন মরশুম। যেখানে সেখানে ফুটে রয়েছে স্বচ্ছন্দজাত অসংখ্য ফুল। ইয়াটুঙ্গ শহরের ঠিক ওপরে আমচু ও তুরসা সম্মিলিত হয়ে একটি নদীতে পরিণত হয়েছে। বাংলো থেকে সেই সঙ্গমস্থল দেখা যাচ্ছে। নদীর জল যে এত নীল হয়, তা না দেখলে প্রত্যয় হ'ত না। খরস্রোতা নদী কলরোল তুলে বয়ে চলেছে। নীল জলের ধারা বড় বড় পাথরে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনায় ভেঙে পড়ছে। যেন ছবিতে আঁকা। দিবারাত্র নদীর সেই গর্জ্জনের বিরাম নেই। নিশীথ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে এর গুরুগম্ভীর গর্জ্জন আমরা শুনেছি। ইয়াটুঙ্গ শহরটি যে বড় তা নয়। কালিম্পঙের এক-পঞ্চমাংশ হবে কি না সন্দেহ। আমরা বাইনোকুলার দিয়ে আই-টি-এ'র বাড়ী আবিষ্কার করলাম। তাঁর বাড়ীর প্রাঙ্গণে অশোকচিহ্ন-লাঞ্ছিত পতাকা উড়ছিল।

ডাক-বাংলোয় ঢুকে দেখি, সমস্ত ডাক-বাংলোটি ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে। বাথরুমে কমোড পর্যন্ত ফিটফাট রয়েছে। চৌকিদার বলল, ইয়াটুঙ্গে মেথর আছে খবর দিলেই আসে, দু'টাইম এক টাকা করে নেয়। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, বাইরে যাবার ব্যবস্থা

আমরা আই-টি এ'র সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বললেন, আই-টি-এ একটু বাইরে গেছেন, এলেই খবর দেবেন। ভদ্রলোক চলে গেলে আমরা নদীর উপরের পুল পার হয়ে ইয়াটুঙ্গ যাত্রা করলাম।

ইয়াটুঙ্গের বাজারে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে চা, টিনের ক্রিম, পনির, মাখন ইত্যাদি জিনিষও পাওয়া যায়,—দাম যদিও অনেক বেশী। স্থানীয় মাখনের দামও পাঁচ টাকা সেরের কম নয়। চিনির দাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম সাড়ে তিন টাকা সের। এখানে ভারতীয় টাকাই চলে। তবে তিব্বতী রেজ্কিও বদল করে নেওয়া যায়। তিব্বতে রূপার টাকা নেই, পয়সা ইত্যাদি ছোট তামার রেজ্কি আছে। ইয়াটুঙ্গের বাসিন্দা সবাই তিব্বতী, তন্মধ্যে তিন জন মাড়োয়াড়ীও আছেন। ব্যবসা উপলক্ষে এঁরা সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন। বড়বাজারের শ্রীরামানন্দ রামকে কালিম্পং ও গ্যাংটকে দেখেছি, তাঁকে এখানেও দেখলাম। এঁদের সব রকমের ব্যবসাই আছে, তা ছাড়া তিব্বতী মুদ্রা বদলের কাজটাও এঁরাই করেন।

ইয়াটুঙ্গে যে পোষ্ট আপিস ও টেলিগ্রাফ আপিস আছে তা ভারতীয়। তবে তিব্বতের হাওয়া এখানকার পোষ্ট মাষ্টারের গায়ে লেগেছে। সকাল তখন এগারটা, পোষ্ট আপিসে তার করতে গিয়ে শুনলাম, পোষ্টমাষ্টার বনভোজন করতে গিয়েছেন, না ফিরলে তার করা যাবে না। খাম, পোষ্টকার্ড কিনতে গিয়ে শুনলাম, তিনি না ফিরলে ও সব কিছুই পাওয়া যাবে না। একজন নেপালী এই পোষ্ট আপিসের কর্ত্তা। তার দায়িত্বজ্ঞানের নমুনা এই! শুনলাম প্রায়ই তিনি এই রকম করেন। ঐ দিন সন্ধ্যারাত্রি পর্য্যন্ত ভদ্রলোক ফেরেন নি। ফলে আমাদের তার করা হয় নি, খাম পোষ্টকার্ডও পাই নি। নিজেদের কাছে যে ক'খানি ছিল এবং শ্রীরামানন্দ রামের কাছে যে ক'খানি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই নানা স্থানে লিখেছি। গিয়াংসী পর্য্যন্ত ডাকের ব্যবস্থা সবই ভারতীয়। ঐ পর্য্যন্ত রীতিমত ডাক চলাচল করে। এ পর্য্যন্ত

গ্রহণ করলাম। আমরাও কিঞ্চিৎ উপহার পাঠাচ্ছি, গ্রহণ করে বাধিত করবেন। আমাদের নিজের দেশের জিনিস দিতে পারলে খুব খুসী হতাম, কিন্তু তা ত এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

গ্যাংটকের পথে তিস্তার বনভূমি

আই-টি-এ জানালেন, তাঁর স্ত্রী দালাই লামার ওখানে গিয়েছেন, বাড়ীতে মেয়েরা কেউ নেই, অতএব তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারছেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের খাওয়ার জন্য আর কি প্রয়োজন? আমরা বললাম, কিছুই প্রয়োজন নেই, খাবার জিনিস সবই আমাদের সঙ্গে আছে। যদি পারেন কিছু রাই শাক পাঠাবেন। সেই টিনের বোকা পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর থেকে শাকসব্জী খাবার একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিলাম।

তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সব জিনিষই অতি উৎকৃষ্ট, চমরী গাইয়ের মাখনের ত তুলনাই নেই।

প্রতিনিধিটি ইংরেজী জানেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের দেশ ও আমাদের আপনার কেমন লাগছে।" আমি বললাম, "এ রকম সুন্দর দেশ কল্পনা করা যায় না। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড সত্যই লিখেছেন, চম্বুভ্যালি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য। আর আপনারা ত আধ্যাত্মিক জাতি। আপনারা প্রার্থনা করছেন বলেই বোধ হয় আজও পৃথিবীতে সামান্য কিছু সুখশান্তি আছে। যাঁরা সভ্য মানুষ বলে পৃথিবীতে বড়াই করেন, তাঁদের সভ্যতায় ধিক্। তাঁদের বিজ্ঞান শিক্ষায় ধিক্। এটম্ বম্ নিয়ে অরক্ষিত শহরকে ধ্বংস করতে এই সব সুসভ্য মানুষ ইতস্ততঃ করেন না।

প্রতিনিধিটি আমার কথা শুনে খুব খুসী হলেন। আই-টি-এ রায় বাহাদুর সোনেন টোডেন কাজির কাণে যেমন লম্বা নীল পাথরের দণ্ড এঁর কানেও তেমনি। অর্থাৎ ইঁহারা উভয়েই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। লম্বা বেণী ঝুলিয়ে আমার পাশেই এঁরা বসেছিলেন, ঘোষ সেই অবস্থায় এঁদের ফটো তুললেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর দালাই লামার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে বলে সরকারী প্রতিনিধি বিদায় নিলেন।

আমি আই-টি-একে বললাম, ও সব উপহারে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট রসদ আছে। আপনি এগুলো এখানে গরীবদের দিয়ে দিন। আই-টি-এ সে কথায় সায় দিলেন না। তিনি প্রস্তাব করলেন, এই জিনিষগুলি এখানে বিক্রী করে সেই অর্থে এঁরা যে সব জিনিষ পছন্দ করেন তাই কিনে দালাই-লামাকে উপহার পাঠান হোক। একথায় আমরা রাজী হলাম। তা ছাড়া আমাদের রসদ থেকে দু' টিন ক্রিম ও দু' টিন পনিরও দিলাম। আই-টি-এ বললেন, এসব টিনের জিনিস ওঁরা খুব পছন্দ করেন। উপহারের সঙ্গে পাঠান হবে বলে আমি এই মর্মে একখানি চিঠি লিখে দিলাম, আপনাদের উপহার সাদরে

একজন খচ্চরওয়ালা এসে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু কালো বাজারের দর চায়, এক একটি খচ্চর কাপুপ যেতে ৩০৲ টাকা দাবি করে। অথচ ডাক বাংলোয় যে নির্দিষ্ট ভাড়ার হার টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, তা হচ্ছে গ্যাংটক পর্য্যন্ত ৪৪ মাইলে মাত্র ১৭৲ টাকা। আর ও চায় মাত্র ১৯ মাইলে ৩০৲ টাকা। আমরা এত বেশী টাকা দিতে রাজী হলাম না। আর একজন খচ্চরওয়ালা এল, সে খচ্চর প্রতি ২৪ টাকা চাইল। আমরা তাতেই রাজী হলাম। রাজী না হয়েই বা উপায় কি? শুনলাম, পোষ্ট আপিসের একজন ইন্‌স্পেক্টরকে স্বয়ং আই-টি-এ গ্যাংটক পর্য্যন্ত ৪০৲ টাকায় একটি খচ্চর ঠিক করে দেন। কিন্তু ঐ ইন্‌স্পেক্টর বিল দাখিল করলে উপর থেকে যখন আই-টি-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়, ইয়াটুঙ্গ থেকে গ্যাংটক পর্য্যন্ত খচ্চরের ভাড়া কত, তখন আই-টি-এ নাকি উত্তর দেন যে, ভাড়া সবলগ সত্তর টাকা। ঘোষ পোষ্ট আপিসে গেলে সেখানে ঐ বাঙালী পোষ্টাল ইনস্পেক্টরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জিনিসগুলি আই-টি-এ নিজেই আত্মসাৎ করবেন এ রকম একটু সন্দেহ আমাদের হচ্ছিল। উপহারগুলি ওঁর হাতে তুলে দেওয়ায় শেয়ালের কাছে কুমীরের বাচ্চা পড়তে দেওয়ার ব্যাপার হ'ল কি না, কে জানে? অমন সুন্দর মাখনটা অমন ভাবে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় যাওয়ায় আমাকে অনেকে অনুযোগও করেছেন। কিন্তু দুই গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক নিয়ে যখন ব্যাপার, তখন ভুল যদি করেই থাকি তবে সে ভুল যে আমাদের লোভের দরুন হয় নি, এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

আই-টি এ সম্বন্ধে আরও যে সব কাহিনী শুনলাম তাতে মনে হ'ল ইনি একটি আসল বাস্তুঘুঘু। ওঁকে ইয়াটুঙ্গের রাজা বললেই হয়। এঁর বিদ্যা সামান্য বটে, কিন্তু ইনি প্রচুর পয়সা রোজগার করেন। দালাই লামার দেওয়া উপহারের জিনিসগুলি ইচ্ছা করলে আমরা সঙ্গেও আনতে পারতাম। কেননা পঞ্চাশ টাকা দিলে খচ্চরওয়ালা ওগুলি কালিম্পং পৌঁছে দেবে বলেছিল। আই-টি-এর কথায় তাঁর জিম্মায়ই ওগুলি রেখে আসতে হ'ল।

উনি সকলে চলে গেলে ঘোষ ত হেসেই কুটিপাটি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত হাসছেন কেন ?' উনি বললেন, 'মাননীয় মন্ত্রীর কথা ভেবে ; তিনি পয়সা লাগবে বলে মেথর ডাকেন না, প্রয়োজন হলে পাহাড়ে যান।'

'আরে মশায়, সে কি বিপদ ! মনে হ'ল যেন সমস্ত ইয়াটুঙ্গ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।' বলে আমিও হাসতে লাগলাম। ঘোষের হাসি থামেই না। আমি বললাম, "এত যে হাসছেন, কাবলা মন্ত্রীগুলো কি আমাদের চেয়ে উচ্চ স্তরের ?" কিন্তু আই-টি-এ বোধ করি চোরের উপর বাটপারি করল। বলে কিনা, মাখনটা খুবই নিরেস, সঙ্গে নিয়ে গেলে দু'দিনেই খারাপ হয়ে যাবে ; তখন মন্দিরের প্রদীপে পোড়ান ছাড়া আর কোন কাজেই লাগবে না। মাখন জ্বালিয়ে যে আমরা ঘি করতে জানি, এ খবরটা বোধ করি উনি জানেন না।

গেলিংয়ের পথে আমুচু

২৭।৫।৫২ তারিখ সকাল পাঁচটায় আমাদের কুলি দু'জন এসে উপস্থিত। উনিশ মাইল পথ যেতে হবে, জেলাপ পাস অতিক্রম করতে হবে, অতএব এই কর্তব্যপরায়ণ লোক দুটি এত সকালেই এসেছে। এদের মত কর্তব্যপরায়ণ সাধু লোক যে থাকতে পারে তা এদের সংস্রবে না এলে বুঝতে পারতাম না। আমরা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ওদের রওনা করে দিলাম। নিজেরা কেনা ভাত, ঘি, রাই শাকের তরকারি খেয়ে ছ'টার মধ্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। চব্বিশ টাকা করে এক একজনের খচ্চরের জন্য ব্যয় হবে—এটা আমাদের খুব ভাল লাগছিল না। বলাবলি করছিলাম, হেঁটে পাড়ি দিলেই হ'ত। অবশ্য জেলাপ অতিক্রম করতে পুনরায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট চড়াই করতে হবে ভেবে একটু ভয়ও পাচ্ছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, ডাক বাংলো থেকে নীচে নেমে রাস্তায় যদি খচ্চরওয়ালাকে পাই ভালই, নতুবা আমরা হেঁটেই রওনা দেব।

রাস্তায় নেমে দেখি, খচ্চরওয়ালা তিনটি খচ্চর নিয়ে সহাস্য বদনে অপেক্ষা করছে ; এর দুটি আমাদের জন্য, আর একটি তার নিজের জন্য। পরে অবশ্য জেলাপের দুর্গম পথ চড়াই করবার সময় বুঝেছিলাম খচ্চর না নিলে কি মারাত্মক ভুলই হ'ত। মরুভূমিতে যেমন উট, পাহাড়ের দুর্গম পথে তেমনি এই খচ্চর। ঘোড়া যেখানে অচল, খচ্চর সেখানে অক্লেশে চলে। এরা গাধার ভার বহনের ক্ষমতা ও ঘোড়ার গতিবেগ দুটাই পেয়েছে। এরা পার্বত্য পথের কত বড় বন্ধু তা আমরা আপন অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝছি।

জেলাপের পথ নাথুলার পথ অপেক্ষাও রমণীয়। প্রথম [illegible] মাইল একই পথ। খরস্রোতা কলনাদিনী তুরসা নদীকে বাঁয়ে রেখে, তারই পারে পারে চুম্বিভ্যালির মধ্য দি আঁকা-বাঁকা পথে কিছু গিয়েই আমরা গেলিং গ্রামে ঢু পড়লাম। অনেকগুলি আলুর ক্ষেত, যবের ক্ষেত পার হয়ে, গ্রামে মধ্যে যেখানে ছোট বাজার বসেছে তার ভিতর দিয়ে উপরে উ একেবারে গ্রামের বাইরে গিয়ে পড়লাম। তার পর চোখে পড় সেই নির্জন পাহাড়-পথের অপূর্ব শোভা। কত বিচিত্র বর্ণের ফুল না ফুটে আছে। পথের দু'ধারে পাইন গাছের সারি, ফুলের সৌন্দ ও পাখীর কলকণ্ঠ ; হিমালয়ের বুকে যেন কোন্ স্বপ্নপুরীর ভিত দিয়ে চলেছি। পথ কখনও নদীর এপারে, কখনও ওপারে। কাঠে তক্তার উপর দিয়ে নদী পারাপার করতে ভয় হয়। কিন্তু খচ্চরগু বড় হুসিয়ার, তাদের পদস্খলন বড় হয় না। মাঝে মাঝে শুনা যা ঢং, ঢং, ঢং গুরুগম্ভীর ঘণ্টার আওয়াজ। দূর থেকে এ শব্দ কা গেলেই বুঝতে হ'বে যাত্রী দল আসছে। খচ্চরের গলায় বাঁধা ঘণ্টা এ শব্দ দূরদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে। এ ঘণ্টার ধ্বনি মনকে দোলা দিয়ে কত কথাই না বলে যায়। এ সেই কালিম্পং লাসার মান্ধাতার আমলের পথ। কত যুগ যুগ ধ কত যাত্রীই না এই পথ বেয়ে চলেছে। ঢং-ঢং-ঢং শব্দ করে যাত্রী দল অজানার পথে চলে গেল, আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়ি রইলাম। হাজার হাজার বছর ধরে যাত্রীরা এই রকম নীরবে মুখো মুখি হয়ে পরস্পরকে দেখেছে।
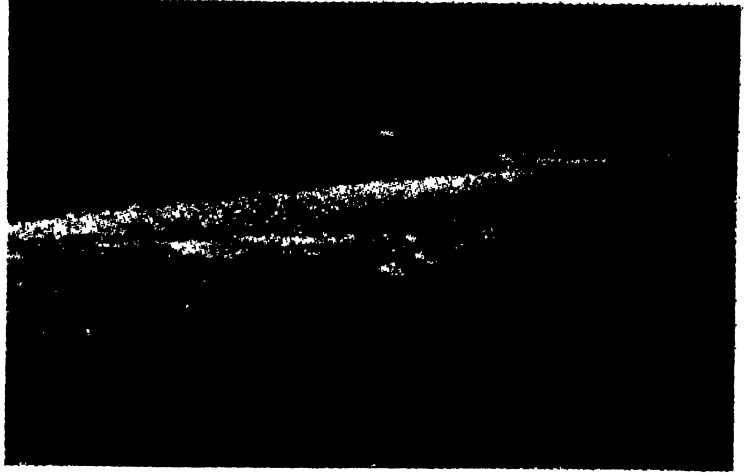
জেলাপের উপর ওঠার শেষ দুই মাইল অত্যন্ত চড়াই। পাহাড় পথে ঘুরে ঘুরে খাড়া উপরে উঠতে হয়, ঠিক যেন কোন মিনারে উপর উঠছি। এই ঘোরা পথে বাইরের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে দু দুরান্তরে চেয়ে দেখলে কেবল পাহাড়ের তরঙ্গ দেখা যায়। তাদে স্নিগ্ধ শ্যামল কান্তি মনকে মুগ্ধ করে। দূরে নাথুলার পথ ; ঐ পথে যাবার সময় আমরা জেলাপের এই পথটিকেই সর্পিল আকারে পাহাড়ের গা বেয়ে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে উঠে যেতে দেখেছি। আমাদের

মনে হচ্ছিল, আমরা এখন নাথুলার পথের অনেক উপরে। যেন আকাশ ভেদ করে চারদিকের সহস্র সহস্র পাহাড়ের ঢেউকে নীচে ফেলে আমরা কোন মেঘলোকে চ'লে যাচ্ছি। খচ্চর যে কঠিন পাহাড়পথের কত বড় বন্ধু এই সময় আমরা তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে

জেলাপ অভিমুখে

পারছিলাম। খাড়াই এত বেশী যে, খচ্চরও কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। আর সেই অবসরে আমরা দিগন্তের অপরূপ শোভা নির্নিমেষে দেখি। হেঁটে এ পথে উঠতে হ'লে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ নিশ্চয়ই হ'ত। শেষের কয়েক শ' গজ বরফে একেবারে আচ্ছন্ন। খচ্চর থেকে বাধ্য হয়ে নামতে হ'ল। এত পথ চলে আসতে হার্টের উপর কিছুমাত্র চাপ পড়ে নি। হঠাৎ অতিশয় লঘুবাতাসে (rarefied air-এ) পাহাড় চড়াই এক প্রকার যেন অসম্ভব মনে হতে লাগল। হার্ট বায়ুর এই লঘুতায় অভ্যস্ত ছিল না। দু'পা যেতেই আমাদের মাথা ঘুরে পড়ার মত হয়। অবশ্য একটু দাঁড়ালেই সব ঠিক হয়ে যায়। আবার দু'পা চললে এইরকম হয়। আবার দাঁড়ালে ঠিক হয়ে যায়। এইরকম করেও সমস্ত চড়াইটুকু পায়ে হেঁটে উঠতে পারা অসম্ভব মনে হ'ল। অবশেষে খচ্চরওয়ালা কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের খচ্চরের পিঠে তুলে নিয়ে, ঘোরাফেরা করে একটু ভাল পথ ধরে উপরে তুলল।

উপরে উঠে পায়ে হেঁটে চলা ছাড়া আর উপায় ছিল না; কিন্তু আর চড়াই ছিল না বলে হার্টের কোন কষ্ট হ'ল না। প্রথম এক মাইল খুব উৎরাই, মাঝে মাঝে একদম সমতল। সব পথটাই বরফের উপর দিয়ে। ডাইনে, বাঁয়ে, সর্ব্বত্র বরফ। বরফের স্তূপ, বরফের হ্রদ, বরফ ঢাকা গিরিশৃঙ্গ—যেদিকে তাকাই সেদিকেই বরফের রাজ্য। এই সময় আবার একদল যাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। ঘণ্টার গুরুগম্ভীর ঢং ঢং-ঢং শব্দ করে গলায় লাল চামর ঝুলান প্রায় এক শত খচ্চর সহ আট-দশ জন লোক লোকালয় হতে বহুদূরে নিভৃত নীরব পাহাড়পথ বেয়ে, নানা বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে তিব্বত চলেছে। আমরা তাদের মুখোমুখি হয়ে বিপরীত দিকে তিব্বত পিছনে ফেলে ভারতভূমিতে প্রবেশ করতে চলেছি। মনের গুপ্তস্থলে কত কথাই না জেগে ওঠে!

এক মাইল, দু' মাইল, তিন মাইল—শেষের দু' মাইল খাড়া উৎরাই—অতিক্রম করে আমরা কাপুপ পৌঁছলাম। কাপুপ থেকে আবার সিকিম আরম্ভ হ'ল। কাপুপের উচ্চতা ১৩,১০০ ফুট। বাংলোর সামনে বরফের স্তূপ।

কাপুপ ডাক বাংলোর চৌকিদারটি বড় ভাল লোক। এ একজন তিব্বতী; এত উচ্চে জনশূন্য স্থানে সাধারণতঃ তিব্বতীরা ছাড়া আর কেউ বাস করতে পারে না। অধিকাংশ বাংলোর চৌকিদারই ভাল, তবে কাপুপ বাংলোর চৌকিদারটিকে আমাদের সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়েছে। পক্ষান্তরে ইয়াটুঙ্গ বাংলোর চৌকিদারটি ডাহা চোর এবং নিতান্ত অসৎ লোক। চৌকিদারদের মধ্যে এই ব্যক্তি একটি ব্যতিক্রম; এ আমাদের খাবার জিনিষপত্র পর্য্যন্ত চুরি করেছে। লোভনীয় রাই শাক যা রান্না করেছিল, তা পর্য্যন্ত আমাদের ভাল করে খেতে দেয় নি। সব স্থানেই চৌকিদাররা আমাদের রান্না করে খাইয়েছে। এর জন্য তাদের আমরা বকশিশ দিতাম। দু'টাকা দিলেই এরা মহা খুশী। আমরা খাবার জিনিষপত্রও কিছু কিছু তাদের দিতাম। তারা অপ্রত্যাশিত সেই সব জিনিষ পেয়ে চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা জানাত। ইয়াটুঙ্গের চৌকিদারটির ব্যবহারে আমরা এতদূর বিরক্ত হয়েছিলাম যে, তার নামে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করব ভেবেছিলাম। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তা করি নি। এই লোকটি তিব্বতী হলেও অনর্গল হিন্দী বলতে পারে; এ অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং বহু ঘাটের জল খেয়েছে বলে মনে হয়।

কাপুপের চৌকিদারটি যে কত নির্লোভ তা আর কি বলব! আমরা বেলা সাড়ে বারটা আন্দাজ কাপুপ পৌঁছলাম। আমরা একটু ভিজে গিয়েছিলাম, কেননা ঘনায়মান মেঘের প্রথম ছিটে-ফোঁটা আমাদের উপর দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। কুলিরা অনেক পিছনে। চৌকিদার আমরা পৌঁছিবামাত্র চিমনীতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আমরা সব আগুনের তাতে আমাদের ভিজা পরিচ্ছদ শুকোতে লাগলাম। দুপুরের রসদ—মায় ইয়াটুঙ্গের চৌকিদার পুঙ্গবের ভয়ঙ্কর কবল হতে আই-টি-এ'র দেওয়া আলু ও রাই শাক যেটুকু বাঁচাতে পেরেছিলাম সেইটুকু সহ

খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কাপুনের চৌকিদার অতি অল্প সময়ের মধ্যে গরম ফেনাভাত, রাই শাক, আলুর তরকারি, ডাল এবং তার নিজের গরুর সামান্ত আধসের যে দুধ ছিল তা এনে হাজির করল। আমরা বেশ খানিকটা ঘি দিয়ে এগুলির সদ্ব্যবহার করলাম। তরকারি অনেকটা বেশী হ'ল। আমরা চৌকিদারকে সেগুলি নিয়ে যাবার জন্ত বললাম। চৌকিদার কিছুতেই রাজী হ'ল না, বলল, কাল সকালে যখন যাবেন তখন এ তরকারি গরম করে দেব, খেয়ে যাবেন।' আমরা বললাম, 'না তার দরকার নেই, [illegible] নিয়ে [illegible] যাও নিয়ে। সকালে যাবার সময় [illegible] সঙ্গে [illegible] জিনিস [illegible]।' লোকটি [illegible] শুনল [illegible]। '[illegible] জিনিস তো [illegible] [illegible] পারেন না [illegible] তাকে [illegible] পরদিন সকালে [illegible], একটি [illegible] পেঁয়াজ রসুন দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] উপর খাওয়ার [illegible] কটিও তেমনি আমাদের উপর খাওয়ার জুলুম করল। মুহূর্তের জন্ত এর সঙ্গে দেখা, তবু মনে হ'ল মেঘলোকে এই নির্জন তুষারের দেশে এ যেন কত দিনের পরিচিত আপনার জন। এর মন, প্রাণ, হৃদয় সবই আমাদের চেনা।

বাইরে তখন ধারায় বৃষ্টি নামছিল। হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল। আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে চিমনির আগুনের সামনে বসে [illegible], আর বলাবলি করছিলাম, [illegible] কাকভেজা হয়ে [illegible]। [illegible] সিঙ্গি ও বড় [illegible] ছিল। [illegible] যে রাস্তায় আমরা [illegible] সেই রাস্তায় এরা [illegible] ধরে [illegible] উপর দিয়ে [illegible] পাহাড় অতিক্রম [illegible]। উনিশ মাইল পথ [illegible] নিয়ে আসা কি সহজ কথা? [illegible] তিনটা [illegible] নেই। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে [illegible] আসতে পারবে তো? ঘোষ বললেন, ওদের জন্ত [illegible] (পচাই) কিনে রেখেছি। চৌকিদারের কাছে পেলাম, [illegible] এক বোতল।

ভিক্ষার্থী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

কোন কথা না বলে দুটি শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হাত শুধু বাড়িয়ে দিল। মুখের দিকে এক বার চাইতে কিন্তু মনে বিতৃষ্ণা এল। এক পলিতকেশ নখদন্তহীন বৃদ্ধকে দয়া করবার মত সময় আমার তখন ছিল না। এইমাত্র হাউসে "ওয়ে অব অল ফ্লেশ" দেখে বেরুচ্ছি। এমিল জেনিংসের করুণ ও মর্মন্তুদ অভিনয়ে মন এখনও অভিভূত। আর ফুটপাথে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধটি সামনে এসে দাঁড়াল।

তার মুখে কিন্তু মনকে করুণ করে তোলার মত কোন অভিব্যক্তি নেই। রূঢ় পরুষ মুখ। পকেট থেকে হাতে যে দু'আনিটা উঠে এসেছিল সেটাকে পকেটেই ধরে রেখে এগিয়ে গেলাম। তিন পা এগিয়ে এসে ফুটপাথের কোণে এক বার থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু না, সে সঙ্গে আসে নি। প্রসারিত হাতকে সঙ্কুচিত করে ভিড়ের মধ্যেই থেকে গেছে।

দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ট্রামে এসে উঠলাম। একেবারে খালি একটা গাড়ীর কোণে বসে পড়ে সিগারেট ধরালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ধূম্রকুণ্ডলীর আবরণের মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট ধূসর একটি মুখ ভেসে উঠল। এবারে সেই গলিত পরুষ মুখকে বড় করুণ বলে মনে হ'ল। অগ্নিদগ্ধ অরণির মত অসহায় মুখ; যে ভিক্ষুকের আত্ম-মর্য্যাদা এখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি অবমাননার অবহেলায় তার কাঠিন্যকে যেন ভেঙে পড়তে দেখলাম। হঠাৎ চৌরঙ্গীর অন্ধকার থেকে কে যেন বলে উঠল—চেন না, তুমি ওকে চেন না?

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম—হাঁ, চিনি বৈ কি।...

তখন ইস্কুলের পাঠ শেষ করার সময়। আমাদের এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউটের নতুন হেডমাষ্টার ললিত চক্রবর্ত্তীর কথাই ইস্কুলের সবচেয়ে বড় কথা। ভদ্রলোক তরুণ ও এম-এ পাস করা। শোনা গেল মস্ত পণ্ডিত লোক। এই বয়সেই নাকি তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়েছে। হেডমাষ্টার নামের সঙ্গে মিলিয়েই তাঁর চেহারার কাঠিন্য; চরিত্রেরও।

প্রথম দিনে ক্লাস নিয়েই তাঁর স্বভাবের পরিচয় দিয়ে গেলেন। ইতিহাসের ক্লাসে কে যেন হঠাৎ বলে উঠল—স্যর, সিরাজ কি চরিত্রহীন ছিলেন?

প্রশ্নটা যে করল তার নাম যতীন। ফাজিল ও দুষ্টু

ছেলে বলে তার দুর্নাম আছে। মাষ্টাররা তাকে ভয় করে চলেন। সেই যতীন হঠাৎ কথার মাঝখানে এমনি একটা প্রশ্ন তুলে বসল।

হেডমাষ্টার বই বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন—চরিত্রহীন বলতে কি বোঝ তুমি ?

যতীন ঘাবড়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায়। মাষ্টারমশাইরা ত চিরদিনই বলে আসছেন—সিরাজউদ্দৌলা খুব খারাপ লোক ছিলেন। ক্লাইভের মত দুর্জ্জয় সাহসী পুরুষের হাতে তাঁর জীবনান্ত ঘটে। যতীন ভেবেছিল, কথাটা আগেই বলে সে হেডমাষ্টারকে খুশী করবে। কিন্তু নতুন হেডমাষ্টার কঠিন কণ্ঠে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—চরিত্রহীন মানে কি বল ত ?

যতীন আমৃতা আমৃতা করে বলল—স্যর, আমাদের আগের হেডমাষ্টার বলেছিলেন···

ঠাশ করে একটা চড় এসে পড়ল তার গালে।

—না জেনে শুনে কখনও ওরকম কথা বলবে না আর।

বাংলার মাষ্টার অবনী ভট্চায ক্লাস নিচ্ছেন। পড়াতে পড়াতে তিনি বলছিলেন—রাণী ভিক্টোরিয়ার মত দয়াবতী ও মহিমময়ী মহিলা মানুষের মধ্যে বিরল। নইলে এই গরীব অশিক্ষিত দেশের জন্য তিনি···

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হেডমাষ্টার বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাটা কানে যেতেই তিনি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন—গরীব, অশিক্ষিত কারা অবনীবাবু ?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে···অবনীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—আমি আমাদের ভারতবর্ষের কথাই বলছি।

—আপনি কতদূর পর্য্যন্ত পড়েছেন ? ঠিক মনে নেই আমার। কতদূর ?

সমস্ত ক্লাসের সামনে এ ধরণের প্রশ্নে নার্ভাস হয়ে গেলেন অবনীবাবু—আজ্ঞে, আই-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকি।

—আপনি আমার ঘরে গিয়ে বসুন। এ ক্লাসটা আমিই নিচ্ছি।

বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠ হেডমাষ্টারের। ক্লাসের দিকে ফিরে বললেন—ভারতবর্ষকে গরীব ও অসভ্য বলে যারা প্রচার করেছে তারা স্বার্থপর পাজী লোক। কেন করেছে সেকথা বলছি—শোন···

হেডমাষ্টারর কর্কশ কণ্ঠে বক্তৃতা সুরু করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্র ও মাষ্টারমহলে ত্রাসের সঞ্চার হ'ল। এমন কি এই আতঙ্কটা বাইরে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু কোথায় যেন একটা সম-অনুভূতি ছিল আমার মনে। তাই বাইরে যতই খারাপ লাগত, মনের মধ্যে ততই প্রবল হয়ে উঠত আর একটা অনুভূতি; লোকটা অসাধারণ। আর পাঁচ জনের মত নয়। কিন্তু এ চিন্তা আমার একেবারে নিজস্ব। বাইরে কারো কাছে এর কোনও সায় পাই নি।

তখন উনিশ শো তিরিশ সালের কথা। এক দিন সকালে যতীন দলবল নিয়ে এসে ঘুম ভাঙাল। তার কাছেই শুনলাম—কাল রাত্রে নাকি পুলিস এসে বাড়ী ঘেরাও করে সমস্ত বাড়ী তছনছ করে খুঁজে হেডমাষ্টারকে ধরে নিয়ে গেছে। যতীন খবর রাখে বেশী। তার বাবা সরকারী উকীল। সে-ই বলল—ব্যাটা ডাকাত এক নম্বরের। বাড়ীতে রিভলবার পাওয়া গিয়েছে। আর···কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে চুপিচুপি বলল—জানিস ? ব্যাটা চরিত্রহীন। একটা বিধবাকে নাকি আবার বিয়ে করেছে। সেইজন্যই ত সেদিন চরিত্রহীন কথাটা শুনেই চটে আগুন। এখন ?

আবার দশ বছর পরের কথা। এক দিন হঠাৎ দেখলাম ললিত চক্রবর্ত্তীকে।

আমি তখন স্কুল ইন্স্পেক্টর। বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বরিশালের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। একটি নগণ্যতম গ্রাম্য বিদ্যালয় গ্রাণ্ট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছে না। আগেকার রিপোর্টগুলো হাতড়ে দেখলাম। তার পর এক দিন সেই গ্রামেরই জমিদার সত্যচরণ মুখুজ্যের আগ্রহে তাঁর বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

সত্যবাবু বিশিষ্ট ধনী লোক। তিনি অতিথিসেবার জন্য প্রচুর আয়োজন করেছেন। তাঁর সেবায় ও বিনয়ে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর দক্ষিণা মিলল। জমিদারবাবু তাঁর গোমস্তাকে ডেকে সামনেই হুকুম দিলেন—যা, নতুন পেতলের হাঁড়িতে ওই সন্দেশ পাঁচ সের কলকাতায় যাবে। একজন কেউ ইন্স্পেক্টরবাবুর সঙ্গে যাবি। টিকিট কিনে দিবি আর কোন অসুবিধে যেন না হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। তার পর গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষিত লোক দু'এক জনের সঙ্গে আলাপ। অবশেষে বলে ফেললাম—দেখুন, ইস্কুল ভিজিট করবার কোন দরকার নেই। তবে নিয়মরক্ষার জন্যে এক বার দেখব অবশ্য। কিন্তু আপনি ইস্কুলের জন্য গ্রাণ্ট কিছুতেই পাবেন না যতক্ষণ না আপনাদের কে যেন হেডমাষ্টার আছেন—তাঁকে সরাবেন। আগেকার রিপোর্টে সেই রকমই লেখা আছে।

আরও কি বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ল। আর হঠাৎ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে দেখলাম—দরজার ঠিক মুখেই এক বিরাটদেহ শুকনো ও

রুক্ষ চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে এগিয়ে গেলাম। তার পর নত হয়ে প্রণাম করে বললাম—আপনি এখানে ?

—হ্যাঁ, আমিই এখানকার হেডমাষ্টার ললিত চক্রবর্ত্তী। আপনি যা বললেন শুনেছি। আমি না থাকলে স্কুল গ্রাণ্ট পাবে—একথা ঠিক ত ?

বিব্রত হয়ে উঠলাম। সত্যকে অস্বীকার করি, না অন্যভাবে ··কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন ললিত চক্রবর্তী—। বেশ ত, তার জন্যে কি হয়েছে ? আপনাকে এখনই আমি রেজিগনেশন লেটার দিচ্ছি।

হেডমাষ্টার বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমিদার সত্য মুখুজ্যে এগিয়ে এসে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—একি করলেন, আপনি ? ললিতবাবু তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যে পথে বসবেন তা হ'ল ? আর যে ধরণের লোক উনি

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে একটি ছেলে এসে আমার হাতেই দিয়ে গেল একখানি চিঠি—হেডমাষ্টারের পদত্যাগ পত্র।

আরও দশ বছর। কলকাতার কোন একটি বিশিষ্ট বিদ্যায়তনের ইতিহাসের শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। আমি স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট। সেদিনই রাত্রে দিল্লী চলেছি জরুরী দরকারে। রাত্রে সেক্রেটারী সাধন দাস এলেন।—অনেক দরখাস্ত ছাঁটাই করে গোটাচারেক বেছে রেখেছি। একটি যদি এর মধ্যে থেকে ঠিক করে রাখা যায়···

হেসে বললাম—আপনি থাকতে আমার বৃথা মাথা ঘামানো। ওসব আপনিই করবেন।

কথাটা বলেও একবার একান্ত অবহেলাভরে আবেদন পত্রগুলির দিকে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন কাগজের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বললাম—এটা আবার কি ?

ওটাও একটা আবেদনপত্র। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, সিক্সিউজি। অত্যন্ত দরিদ্র। নাম ললিত চক্রবর্তী। এক সময়ে নাকি টেররিষ্টদের দলে ছিলেন। আমারও কিছুটা চেনা—

হাতে সময় ছিল না। দেরি করলে ট্রেন ফেল করব হয়তো। শুধু বললাম—তবে আর কি ? ললিতবাবুকেই এপয়েণ্টমেণ্ট দেবেন।

কিছুদিন পরে ফিরে এসেই দেখা করলাম স্কুলকমিটির সঙ্গে। কথায় কথায় বললাম—ললিতবাবু কেমন কাজ করছেন ?

ললিতবাবু, কোন্ ললিতবাবু ? সেক্রেটারী বিস্মিতভাবে চাইলেন।

বললাম—যেন আমি দিল্লী যাওয়ার সময় যাঁকে নতুন এপয়েণ্টমেণ্ট দিলাম।

সেক্রেটারী মাথা নাড়লেন—না, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর দিই নি। দেখলাম, ভদ্রলোক একেবারেই বুড়ো আর পাগলাটে ধরণের। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর একটা খবরও শুনলাম,—ভদ্রলোক নাকি এক বিধবা মেয়েকে নিয়ে···

আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন তিনি। বোধ হয় বুঝতে পারলেন আর এগনো ঠিক হবে না।

আমার সমস্ত মন তখন ধিক্কারে ভরে উঠেছে—ছিঃ! নিজের হাতে সই করে তাঁর নিয়োগ-পত্রটাকে অনায়াসে পাকা করে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন কি করে পাই তাঁকে ?

মিটিং শেষ হলে টিচিং ষ্টাফের একজন এগিয়ে এলেন। দ্বিধার সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন—আমার মনে হচ্ছে আপনি ললিতবাবুকে চেনেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—হ্যাঁ, চিনি বৈ কি। আপনি ?

তিনি আমার বিশেষ আত্মীয়। আমিই সাধনবাবুকে অনুরোধ করেছিলাম তাঁর চাকরিটা করে দিতে। কিন্তু কোথা থেকে কি একটা খবর পেলেন উনি ··

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম এবার—বলুন ত, ওঁর বিয়ের কিছু ইতিহাস আছে কি ?

—হ্যাঁ আছে। একটি বালিকা-বিধবাকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে তাঁকে পরম সম্মানে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যার জন্য তাঁর বাপ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। নইলে ভাবনার কি ছিল। বড়লোক বাপ ত ছেলেকে বিলেত পাঠাবেন বলে ঠিক করেই রেখেছিলেন।

শিক্ষক হরিচরণবাবুর হাত ধরে বললাম—একবার ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করব। নিয়ে যাবেন আমাকে ?

কতকটা কৌতূহল, কিছুটা বিস্ময়ে হরিবাবু আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—না পারবো না। আমি যখন শেষ দেখেছি ললিতবাবুকে তখন তিনি মাবাপ মরা তাঁর একটি নাতনীকে বাঁচাবার জন্যে সবরকম চেষ্টা করছেন। এক দিন শুনতে পেলাম বাড়ীভাড়া বাকী পড়ার জন্যে বাড়ীওয়ালা নাকি তাঁকে বার করে দিয়েছে। খবরটা শুনে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু খুঁজে পাই নি। জানি না এখন কোথায় কিভাবে আছেন ?

অনেক দিন আগের স্মৃতি মনকে বিপর্য্যস্ত করে তুললো।

কিন্তু কিই-বা দরকার এত খোঁজে? একটি লোক—এক সময়ে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ মন দিয়ে অনুভব করেছি। কিন্তু তার জন্যে এত বেদনা কেন? মনকে শাসন করতে চাইলাম। কিন্তু তবু এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে কল্পনার রাশ ঢিল হয়ে পড়ল। চৌরঙ্গীর ফাঁকা মাঠের হাওয়া আর রাজপথের রাত্রি মনের ওপর আর এক স্বপ্নময় জগতের সৃষ্টি করল।...

আর একবার মাত্র তাঁর খবর পেয়েছিলাম। ললিত-বাবুকে আর এক দিন দেখা গিয়েছিল। কলকাতার কোন অজ্ঞাত বস্তিতে মাটির নোংরা মেঝেয় শুয়ে যেদিন তাঁর শেষ অবলম্বন একমাত্র নাতনীটি মরে যাচ্ছে সেই দিন। তাকে একটুমাত্র দুধ দিতে না পারায় পাগলের মত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আর রাত ন'টার সময় সেই বিকৃত দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ সর্বশেষ উপায় অবলম্বন করলেন। শহরের জনবহুল পথে সিনেমা হাউসের সামনে হাতখানি নীরবে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু কর্কশ ও কুৎসিত মুখকে করুণ করে তোলার পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না। কে প্রশ্রয় দেবে তাঁর ভিক্ষাবৃত্তির ঔদ্ধত্যকে?

কিন্তু এ শুধু কল্পনার সাময়িক বিলাস মাত্র। এক নখ-দন্তহীন বৃদ্ধের মধ্যে সে যুগের সন্ত্রাসবাদী কঠিন চিত্তকে খুঁজে বার করার চেষ্টা শুধু মিথ্যাই নয়, অর্থহীন। তবুও এই মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে যেন অসহায়তা বোধ করলাম। মনে হ'ল এই মুহূর্ত্তে কে আমার বাইরের চেহারাটাকে যাদুমন্ত্রের শক্তিতে বদলে দিয়েছে আর অসহায় অশক্ত চরণে ঘুরতে ঘুরতে আমারই ঘরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি। আর রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে মৌন হৃদয়ের সবটুকু রক্তকে অশ্রু করে ঝরিয়ে নিঃশব্দে হাতটি বাড়িয়ে রেখেছি।

—তোমরা কেউ দয়া করবে আমাকে!

বিচিত্র তোমার সৃষ্টি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র তোমার সৃষ্টি। ফুলে ফুলে তাই
নানা গন্ধ: কারও সাথে কারও মিল নাই।
আমের আস্বাদ কোথা পাইব খর্জ্জুরে?
কোকিল দোয়েল কি রে ডাকে এক সুরে?
চেহারায় চেহারায় দেখিয়াছ মিল?
ধরণী সবুজ, উর্দ্ধে আকাশ সুনীল।
রুচিরও বৈচিত্র্য কত! তুলি কেহ ধরে;
কেহ কবি; সুরে কেহ স্বর্গ সৃষ্টি করে
মর্ত্ত্যের ধূলায়; কেহ হইয়া ভাস্কর
পাষাণে গড়িছে মূর্ত্তি অপূর্ব্ব সুন্দর।
সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি কত ভঙ্গিমায়!
কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ কর্ম্ম চায়।
বৈচিত্র্য পরম সত্য। তাই জানি যারা
স্বতন্ত্র আমার থেকে—সম্মানার্হ তারা।

বেলাশেষের ক্ষণ

শ্রীনীলিমা দত্ত

বেলাশেষের ক্ষণটিতে মোর মগ্ন হ'ল মন—
রূপের মায়ায় অপরূপের লীলার আলিম্পন।
ফুটল কখন ফাগুন মাসে
কল্পকুসুম রাশে রাশে;
চৈতি দিনের উদাস হাওয়ায় ঝরছে সারাক্ষণ।
সেদিন আমি চাই নি পিছে আর
রাখি নাই ত গাঁথি' ফুলহার।
আজ দেখি তার স্বপন মোরে,
বাঁধল কখন মায়ার ডোরে;
ভ'রে দিল অরূপ রঙে যাত্রা-সুলগন
স্বপ্ন-স্মৃতি খেয়ার 'পরে ভাসল বিভোর মন।

পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের ইতিহাসে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল যাহার ফলে ভারতের রাজনৈতিক রূপ বদলাইয়া গিয়াছিল এবং যে উলট-পালটের স্রোত ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকদের নিকট অবিদিত নাই। এই উলট-পালটের পরিণামস্বরূপ ভারত পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বিদেশী জাতি দ্বারা শাসিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলেই ভারতের গৌরবময় হিন্দু-রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। এই যে বিরাট উলট-পালট হইয়া গেল, ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যায়, আত্ম-কলহ, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থসিদ্ধির বিরাট্ বিভীষিকা। আর এই বিভীষিকা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল সম্রাট পৃথ্বীরাজের একাদশ ও শেষ মহিষী সংযুক্তাকে কেন্দ্র করিয়া। এই সংযুক্তার জন্য পরোক্ষভাবে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে মহারাজ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

মাতামহ মহারাজ অনঙ্গপালের সিংহাসন না পাইয়া জয়চন্দ্র মহারাজ পৃথ্বীরাজের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ—মহারাজ পৃথ্বীরাজ ও মেবারের রাণা, অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি রাবল সমর সিংহ গ্রহণ না করায় জয়চন্দ্রের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। মহারাজ পৃথ্বীরাজের পাটরাণী মহারাণী ইচ্ছনীকে বিবাহ করিতে না পারিয়া গুজরাটের রাজা ভোলাভীম পৃথ্বীরাজকে দমন করিবার জন্য তাঁর সর্দ্দার মকবানকে ঘোরীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। রণথম্বরের রাজার কন্যাকে চান্দেরীর হিন্দুরাজ পঞ্চাইন বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু রণথম্বরের রাজকন্যার বিবাহ হয় মহারাজ পৃথ্বীরাজের সহিত। এই জন্য দুঃখিত হইয়া পঞ্চাইন রণথম্বরের রাজাও পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজের সভা-কবি চন্দ লিখিত "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক বিরাট কাব্য-গ্রন্থে দেখা যায় যে, দিল্লীশ্বর মহারাজ অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যান। পরে এমন কতকগুলি কারণ দেখা দেয়, যাহার জন্য তিনি পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন পাইবার নিমিত্ত পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি নাকি মহম্মদ ঘোরীর আংশিক সহায়তা চাহিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথার সমর্থন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

মহম্মদ ঘোরী বহু দিন হইতেই দিল্লীর সিংহাসন দখল করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সুযোগ খুঁজিবার জন্য সারা ভারতবর্ষে এক গুপ্তচর বিভাগের জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। যখন মহম্মদ ঘোরী সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তখন এই কূটনৈতিক অবস্থার মধ্যে সংযুক্তা আসিয়া পড়িলেন এক ধূমকেতুর মত।

জয়চন্দ্র-দুহিতা সংযুক্তা যখন তাঁহার পিতার চিরশত্রু মহারাজ পৃথ্বীরাজের স্বর্ণ-মূর্ত্তির গলায় স্বয়ম্বরের জয়মাল্য পরাইলেন এবং গুপ্তভাবে অবস্থিত পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে রওনা হইলেন, তখন এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়চন্দ্র বহু সৈন্য লইয়া পৃথ্বীরাজের পথ অবরোধ করিলেন। যুদ্ধ হইল দুই পক্ষে। পৃথ্বীরাজের সহিত ছিল তাঁহার বাছাই-করা ৬৪ জন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এই যোদ্ধারাই ছিল পৃথ্বীরাজের শক্তি। ইহাদের বীরত্ব তখনকার দিনে সমগ্র ভারতে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই ৬৪ জন যোদ্ধার আত্মবলিদানের বদলে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জীবনে তিনি এই যোদ্ধাদের স্থান পূরণ করিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া তিনি হইয়া পড়িয়াছিলেন পঙ্গু। ইহার পরিণামে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে ঘোরীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ অতিরিক্ত কামিনী-বিলাসী ছিলেন। এই কামিনী-বিলাসই হইয়াছিল পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। সংযুক্তাকে লইয়া আসিয়া তিনি সংযুক্তার রূপ-যৌবনে এমন-ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং ভোগে লিপ্ত হন, যাহার ফলে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা অতিরিক্তভাবে শিথিল ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। গুপ্তভাবে পৃথ্বীরাজের এই ভোগ-বিলাসের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ঘোরী দিল্লীরাজ্য আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ সামলাইয়া লইবার সময় পান নাই; তিনি পরাজিত হন এবং বন্দী হইয়া ঘাতকের হস্তে নির্ম্মমভাবে নিহত হন।

ভারত-ইতিহাসের উলট-পালটের দিক দিয়া সংযুক্তা ছিলেন একটা ধূমকেতুর ন্যায় বিপর্য্যয় সৃষ্টিকারী। ইতিহাসে আমরা জয়চন্দ্র-দুহিতাকে সংযুক্তা নামেই দেখিতে পাই; কিন্তু কবি চন্দ তাঁহার কাব্যগ্রন্থে সংযুক্তাকে "সংযোগিতা" নামে পরিচয় করাইয়াছেন।

সংযুক্তার পিতৃকুল

কান্তকুব্জ বা কানৌজ অথবা কনৌজের রাঠোর রাজবংশ ইতিহাসে এক মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বংশে অনেক প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা জয়চন্দ্রের দুহিতাই হইলেন পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তা। জয়চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার পিতা বিজয়পাল মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। এক বার তিনি দিল্লী জয় করিবার জন্য দিল্লীর তত্বর বা তমোর বংশের শেষ রাজা মহারাজ অনঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বিজয়পাল যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া অনঙ্গপাল আজমীঢ়ের চৌহান রাজা মহারাজ পৃথ্বীরাজের পিতা মহারাজ সোমেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজ অনঙ্গপাল ও মহারাজ সোমেশ্বরের সমবেত শক্তির নিকট রাঠোর রাজা বিজয়পাল পরাজিত হন। অবশেষে সন্ধি স্থাপিত হয়।

মহারাজ অনঙ্গপালের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ছিল দুই কন্যা,—সুরসুন্দরী ও কমলা। সন্ধি হইবার পর মহারাজ অনঙ্গপাল তাঁহার প্রথম কন্যা সুরসুন্দরীকে রাঠোর রাজা বিজয়পালের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্যা কমলারূপী কমলাকে আজমীঢ়-নরেশ সোমেশ্বরের সহিত বিবাহ দেন। "পৃথ্বীরাজ রাসো"তে লিখিত আছে :

"এক নাম সুরসুন্দরী অনিবর কমলা নাম।
দরশন সুর নর দুল্লহী মনোঁ সু কলিকা কাম ॥
অনঙ্গপাল পুত্রী উভয়, ইক দীনী বিজৈপাল।
ইক দীনী সোমেশ কো বীজ বচন কলিকাল ॥"

অনঙ্গপালের দুহিতা সুরসুন্দরীর গর্ভে কনৌজ-রাজা জয়চন্দ্রের জন্ম হয়। ইতিহাসে জয়চন্দ্র পঙ্গরাজ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। অন্য দিকে কমলার গর্ভে চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। জয়চন্দ্র ছিলেন বড় কন্যার প্রথম সন্তান এবং পৃথ্বীরাজ অপেক্ষা বয়সে বড়। আর পৃথ্বীরাজ হইলেন ছোট কন্যার পুত্র। অনঙ্গপালের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; কাজেই জয়চন্দ্র ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী ওয়ারিশ। বাল্যকাল হইতেই জয়চন্দ্র দিল্লীর ভাবী রাজা বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তিনি মাতামহের সিংহাসনের মালিক হইতে পারিলেন না; মালিক হইলেন তাঁহার মাসতুত ভাই চৌহান-রাজা সোমেশ্বরের ঔরসে কমলার গর্ভজাত পৃথ্বীরাজ। আরম্ভ হইল ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা, ফলে উত্তর-ভারতের স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের হইল অবসান।

সংযুক্তার মাতৃকুল

কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্রের পিতা বিজয়পাল প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। উত্তর-ভারতের কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া সেনাবাহিনী লইয়া গিয়া সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হন। এই সমুদ্রতীর ছিল রাজা মুকুন্দ রায়ের রাজ্যের অন্তর্গত। বর্তমান উৎকলদেশই ছিল তখন মুকুন্দ রায়ের রাজ্য। মুকুন্দ রায় বিজয়পালকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বিজয়পালের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া পরোক্ষে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সময় বিজয়পালের সহিত যুবরাজ জয়চন্দ্রও দিগ্বিজয়ে গিয়াছিলেন।

রাজা মুকুন্দ রায়ের অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যা জুহ্নাই দেবী তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। দুই রাজ-পরিবারের সখ্যের ভিতর দিয়া রাজপুত্র জয়চন্দ্র ও রাজকন্যা জুহ্নাই দেবীর পরিচয় হয়। জয়চন্দ্র যেমন সুন্দর পুরুষ ছিলেন তেমনই ছিলেন শৌর্যবীর্যের আধার। জয়চন্দ্রকে দেখিয়া রাজা মুকুন্দ রায়ের মনে এক নূতন ভাবনার উদয় হইল। তিনি বিজয়পালের সহিত সখ্য আরও মধুময় করিয়া তুলিবার জন্য নিজ কন্যা জুহ্নাই দেবীর সহিত জয়চন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাজা বিজয়পাল জুহ্নাই দেবীর রূপলাবণ্য দেখিয়া পূর্ব্বেই মোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে জুহ্নাই দেবীকে পুত্রবধূরূপে পাইবার প্রস্তাবে তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মুকুন্দ রায়ের প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিয়া লইলেন। মহা মিলনক্ষেত্র ভারতের মহাসাগর তীরে মহাসমারোহে এই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দুইটি দূরবর্ত্তী রাজবংশ মধুর মিলনের ভিতর দিয়া নিকটতম আত্মীয়তাসূত্রে গ্রথিত হইল। জুহ্নাই দেবী ছিলেন জয়চন্দ্রের প্রথম এবং পাটরাণী। জয়চন্দ্রের জীবনে জুহ্নাই দেবী এক বিচক্ষণ মন্ত্রীর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। জীবনের নানা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য জয়চন্দ্র জুহ্নাই দেবীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই জুহ্নাই দেবীর গর্ভেই ইতিহাস বিখ্যাত রাজকুমারী সংযুক্তার জন্ম।

বাল্যজীবন

কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র নবজাত কন্যার মুখ দেখিয়া আশাতিরিক্ত প্রীত হইলেন। কন্যার মুখের প্রথম ফিক্‌কি হাসি তাঁহাকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। কন্যার জন্ম জয়চন্দ্র জীবনের এক শুভলক্ষণ বলিয়া মানিয়া লইলেন। সেই হইতে জয়চন্দ্র কন্যাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। রাজদরবারে, অন্দরে, ভ্রমণে যদি কন্যা সংযুক্তা সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে, সকল প্রকার আনন্দের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করিতেন। সংযুক্তার রূপ-লাবণ্য কেবল জয়চন্দ্রকেই মুগ্ধ

আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইতেন। এই ভাবে সংযুক্তার শৈশবকাল লোকের কোলে কোলে কাটিল।

সংযুক্তা ছিলেন আবার তোতলা। তাঁহার আধফোটা তোতলা কথা ছিল বড় মধুর। তাঁহার এই তোতলা কথাই তাঁহাকে লোকের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিল। তাঁর এই আধফোটা মধুর তোতলা কথা শুনিবার জন্য সকলেই তাঁহাকে আরও অধিক স্নেহ করিতে লাগিল। জয়চন্দ্রের কাছে সংযুক্তার তোতলা বুলি আনন্দ-স্নানের মত মনে হইত।

এইভাবে লোকের কোলে কোলে কিছুদিন কাটিবার পর সংযুক্তা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী তারার সাহচর্য্য লাভ করিলেন। দুই বোন যখন হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া, গাহিয়া একটু বড় হইয়া উঠিলেন তখন তাঁহাদের পিতামাতা তাঁহাদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় কনৌজে এক বিদুষী ব্রাহ্মণ-মহিলা বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল মদন-ব্রাহ্মণী। তিনি তখনকার দিনের ভারতীয় ছয়টি প্রধান ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এই ছয়টি ভাষা হইল—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পিশাচী, মাগধী ও শৌরসেনী। আরও অনেক ভাষা পৃথ্বীরাজের যুগে ভারতের প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই ছয়টিই ছিল প্রধান। কবি চন্দ লিখিয়াছেন:

সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা ও বিদুষী মদন-ব্রাহ্মণীর হস্তে সংযুক্তা এবং তারার চরিত্রগঠন ও বিদ্যা-শিক্ষার ভার দিয়া পিতা জয়চন্দ ও মাতা জুহ্নাই দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন।

পুণ্যপ্রবাহিণী জাহ্নবীর তীরে মহারাজ জয়চন্দের রাজধানী কনৌজ-পুরী অলকানন্দাতীরে অলকাপুরীর ন্যায় শোভা পাইত। 'পৃথ্বীরাজ রাসো'তে দেখা যায় যে, এই গঙ্গার তীরে কনৌজ-পুরীর উপকণ্ঠে এক মনোহর উপবনে মহারাজ জয়চন্দ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। সেই উপবন-ভবনে মদন-ব্রাহ্মণী বাস করিতেন এবং এখানেই সংযুক্তা ও তারা বিদ্যাভ্যাস করিতেন। মদন-ব্রাহ্মণীর রক্ষণাধীনে তাঁহারা সর্ব্ব-গুণে ও রমণীজনপ্রিয় সর্ব্ববিদ্যায় বিভূষিতা হইয়া উঠিলেন। এই শিক্ষার ভিতর দিয়া সংযুক্তার কৈশোর উত্তীর্ণ হইল।

যৌবনারম্ভে

ক্রমে ক্রমে সংযুক্তা কৈশোর ও যৌবনাবস্থার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইলেন। এই সময় মানুষের বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের শরীরে, মনে চিন্তায় এবং চাল-চলনে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্যকর পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বালিকাদের এই পরিবর্ত্তনের যুগে পূর্ব্বে "বিনয় মঙ্গল" শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অনেক শাস্ত্রের মধ্যে বালিকাদের শিক্ষণীয় "বিনয় মঙ্গল"ও একটি শাস্ত্র। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া মদন-ব্রাহ্মণী সংযুক্তাকে "বিনয় মঙ্গল" শিক্ষা দিতে লাগিলেন। "বিনয় মঙ্গলে" বিনয় শিক্ষা দেওয়ার এবং বিনয়ের উপযোগিতার কথা আছে। বিনয়ই জগতের সার। জগৎ বিনয়ে বদ্ধ। যে জীবনে বিনয় নাই, সে জীবনে সুখ ও শান্তি নাই। যে সংসারে বিনয়হীন নারী আছে সে সংসারে কেবল অশান্তির কুজ্ঝটিকা। বিলাসিতা, শৃঙ্গার প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে না, বরং উহা লোকের কটূক্তিরই কারণ হয়। বিনয়ই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও শোভা। যে স্ত্রীলোক বিনয়গুণে বিভূষিতা সে বালিকা-বস্থায়, কুলবধূরূপে, গৃহিণীরূপে এবং বৃদ্ধাবস্থায় সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে, সকলেই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং অলক্ষ্যে তাহার প্রতি প্রাণের দরদ দিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে।

সংযুক্তা মদন-ব্রাহ্মণীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া "বিনয় মঙ্গল" শাস্ত্রে বিদুষী হইয়া উঠিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে ইহা তাঁহার ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সংযুক্তা ক্রমে ষোড়শী হইয়া উঠিলেন। তিনি ও তাঁহার ভগ্নী তারা মদন-ব্রাহ্মণীর তত্ত্বাবধানে সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রকলার ন্যায় প্রস্ফুটিত মধুময় যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলেন। এমন সময় একদিন মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্য হইতে এক বিখ্যাত গায়ক এবং তাঁহার স্ত্রী কনৌজে আসিলেন। তাঁহার মধুর গানের প্রশংসার কথা শুনিয়া রাজকুমারীদ্বয়কে তাঁহার গান শুনাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠান হইল। গায়ক ও তাঁহার স্ত্রী সংযুক্তাকে দেখিলেন, সংযুক্তার রূপ, লাবণ্য ও বিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। অসীম রূপ ও গুণের সমন্বয়ের এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি দেবীরূপে তাঁহাদের মন-প্রাণকে তন্ময় করিয়া দিল। গায়ক বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। গান করিবার অবসরে কত অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখিয়াছেন; কিন্তু সংযুক্তাকে না দেখা পর্য্যন্ত তিনি ধারণাই করিতে পারেন নাই যে, পৃথিবীতে এমন সৌন্দর্য্য সম্ভব হইতে পারে।

মদন-ব্রাহ্মণীর সহিত সংযুক্তাকে দেখিয়া গায়ক চিনিতে পারেন নাই যে, এই বালিকা কে? পরে জানিতে পারিলেন যে ইনি জয়চন্দ-দুহিতা সংযুক্তা সুন্দরী। সংযুক্তা যেন মর্ত্ত্য-লোকের নারী নয়; সংযুক্তা অপ্সরা বা দেবকন্যা। কোন অভীষ্ট সাধনের জন্য তিনি নামিয়া আসিয়াছেন মর্ত্ত্যধামে। তখন তাঁহার প্রথমেই মনে পড়িল যে, সংযুক্তা সুন্দরী তাঁহাদের মহারাজ পৃথ্বীরাজ ভিন্ন অন্য কাহারও অঙ্কশায়িনী হইবার উপযুক্ত নহেন। মহারাজ পৃথ্বীরাজই কেবল এই সৌন্দর্য্যের উপাসক হইতে পারেন। তাঁহার পাশেই কেবল ইনি শোভা পাইতে পারেন।

এই গায়ক পৃথ্বীরাজ-দরবারেও সুপরিচিত ছিলেন; অনেক বার তিনি পৃথ্বীরাজকে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া

দিয়াছেন। তিনি সংযুক্তার অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা পৃথ্বীরাজের নিকট বর্ণনা করিবার জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। গায়ক স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীকে কনৌজে রাখিয়া দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন।

কনৌজ হইতে দিল্লী আড়াই শত মাইল দূরে। পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয়। রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে হয়। রাস্তায় আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবু তিনি এক পক্ষের মধ্যে দিল্লী গিয়া পৌঁছিলেন। রাজার দর্শন প্রার্থনা করিলেন। রাজ-আজ্ঞা পাইয়া দরবারে হাজির হইলেন এবং রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি সারা ছনিয়ায় গান গাহিয়া ভ্রমণ করেন এবং অনেক অনিন্দ্য-সুন্দরী রমণীর কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার ন্যায় দ্বিতীয় সুন্দরী তিনি আজ পর্যন্ত দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। আরও বলিলেন যে, এই সুন্দরী কেবল মহারাজ পৃথ্বীরাজের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, অন্যের জন্য নহে। অন্যের অঙ্কে এই সুন্দরী স্থান পাইলে সৌন্দর্যের অপমান ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। গায়কের মুখে সংযুক্তার রূপ, লাবণ্য ও মুখচ্ছবির বর্ণনা শুনিয়া বিলাসপ্রিয় ও সৌন্দর্যের উপাসক পৃথ্বীরাজ তন্ময় হইয়া পড়িলেন এবং বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়া গায়ককে বলিলেন যে, তিনি যদি সংযুক্তার মন পৃথ্বীরাজের প্রতি আসক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি গায়ককে বহু উপহার দিয়া পুরস্কৃত করিবেন।

গায়ক রাজ-আজ্ঞা পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং অনতিবিলম্বে কনৌজের দিকে রওনা হইলেন। কনৌজে গিয়া স্ত্রীর ব্যবস্থায় আবার এক দিন সংযুক্তাকে গান শুনাইলেন। গায়ক এই গানের ভিতর দিয়া পৃথ্বীরাজের রূপ, গুণ, বৈভব, পরাক্রম, বীরত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। পৃথ্বীরাজের এই গুণগরিমা শুনিয়া সংযুক্তা মনে মনে পৃথ্বীরাজের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সংযুক্তার মনে গানের ভিতর দিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতি প্রথম অনুরাগ সৃষ্টি হইল। তারপর সময়ে অসময়ে এই গায়কের স্ত্রী সংযুক্তার উদ্যান ভবনে আসিলে সংযুক্তা নানা অবসরে পৃথ্বীরাজের কথা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তন্ময় হইয়া শুনিতেন। তারপর হইতে তিনি পৃথ্বীরাজের বীরত্ব পরাক্রম প্রভৃতির কথা ভাবিতে ভালবাসিতেন। এইভাবে পৃথ্বীরাজের কথা শুনিতে শুনিতে, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনের প্রথম অনুরাগ প্রেম ও আসক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে দোলা দিল। তিনি মনে মনে এক মধুময় দিনের কল্পনা করিয়া বসিলেন পৃথ্বীরাজকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি পৃথ্বীরাজকে মনের একান্ত কোণে বসাইয়া বীরপুরুষ ও স্বামীরূপে পূজা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে পৃথ্বীরাজের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সংযুক্তা ষোড়শী হইতে সপ্তদশী এবং সপ্তদশী হইতে অষ্টাদশী হইয়া উঠিলেন। এই অষ্টাদশী সংযুক্তাই স্বয়ম্বর-সভায় পৃথ্বীরাজের স্বর্ণ-মূর্তির গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন।

দেখুন ! ডালডা বনস্পতি কিন্‌লে কত দিক দিয়ে আপনার লাভ হবে

"ডাল্‌ডা দিয়ে রাঁধা খাবার পরিবারের সকলেই কতো ভালবাসে !"

"ডাল্‌ডা ছেলে-মেয়েদের সুস্থ-সবল রাখে।"

"এই শীল-করা টিনে ডাল্‌ডা তাজা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর থাকে।"

রান্নার পক্ষে সবের সেরা
শক্তি দিতে সবের সেরা
শীল-করা টিনে সর্ব্বদা তাজা পাবেন

আদর্শ গৃহিণী কাকে বলে ?
জানতে হ'লে আজই নিচের ঠিকানায় লিখুনঃ-
দি ডাল্‌ডা এ্যাড্‌ভিসারি সারভিস্‌
পোঃ, আঃ, বক্স্‌ নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা খাবারকে আরও মুখরোচক করে, আর চিকিৎসকদের মতে আপনার শরীরে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ দরকার, ডাল্‌ডা তাও যোগায়। বিশেষভাবে শীল-করা টিনে ডাল্‌ডা সর্ব্বদা তাজা ও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবেন। তৈরীর সময় ডাল্‌ডা হাত দিয়ে ছোঁয়া হয় না।

নানান্‌ সাইজের টিনে পাবেন

HVM. 185-X52 BG

বাঙালীর ব্যায়ামচর্চ্চা

শ্রীশান্তি পাল

বর্ত্তমানে আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের অসাধারণ গৌরবময় বীরত্বের কথা ভুলিতে বসিয়াছি। পৃথিবীর অন্যান্য বীর জাতি অপেক্ষা বাঙালী কোন অংশে হীন ছিল না। শৌর্য্যে-বীর্য্যে, সাহসে-বীরত্বে, কিংবা খেলা-ধূলা এবং ব্যায়ামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালী অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিত। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে ভাগীরথীর উভয় তীরে অনেক কুস্তির আখড়া ছিল। সেই সকল আখড়ায় গ্রামের শিক্ষিত যুবকগণ নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। বাঙালী ব্যায়ামবিদ্‌গণ কিরূপ শক্তিশালী ছিলেন তাহার একটি উদাহরণ আমরা চন্দননগর-নিবাসী শ্রীযুত হরিহর শেঠের উক্তি হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হারাণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথেষ্ট বলশালী ছিলেন। তিনি উদয়চাঁদ নন্দীর বাগানে একটি বড় লিচু গাছ বিনা অস্ত্র সাহায্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দুই জনে সজোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেও তিনি একটি রম্ভা গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন। গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত ঘোড়াকে ভূমি হইতে শূন্যে তুলিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পালপাড়ার ৺বীরচাঁদ বড়ালের বাটীতে পালপাড়ার দলের উদ্যোগে ফরাসী গবর্ণর বাহাদুরকে দেখাইবার জন্য ব্যায়াম-ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লাটসাহেব তাহা দেখিয়া বাঙালীর ছেলের বল ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।"—ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩১।

হিন্দুমেলা প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের চতুর্দ্দিকে ব্যায়ামশালা ও জিমন্যাষ্টিকের আখড়ার আবার পত্তন হয়। তখনকার দিনে ঐ সকল আখড়ায় প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাইত। বাঙালী যুবকেরা সেখানে নানারূপ সাহসের খেলা দেখাইয়া সকলকে ব্যায়ামে উৎসাহিত করিতেন। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য যোগীন্দ্রনাথ পাল এবং রাজেন্দ্রলাল সিংহ, যোগেন্দ্রলাল সিংহ ও শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যায়ামবিশারদদিগের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাঙালী সন্তানরা ব্যায়াম সম্বন্ধে সচেতন হন। এতৎসম্পর্কে তৎকালীন পত্রিকাগুলি হইতে এ স্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"মহা ব্যায়াম প্রদর্শন—মৃত মহামান্য বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের ভবনে বিগত শুক্রবার কলিকাতার বহু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সমবেত ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শন হইয়াছিল। তথায় ন্যাশনাল স্কুল, মির্জ্জাপুর স্কুল এবং শুঁড়িপাড়ার ব্যায়াম বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ও শিক্ষকগণ একত্র হইয়া বিবিধ ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়াছিলেন।··· উক্ত দিবসে আহিরীটোলা ও বেনিয়াটোলার ছাত্রগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।···হুগলীর শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ ঘোষই সমুদয় ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু দীননাথ ঘোষ এবং যোগীন্দ্রচন্দ্র পাল ও রাজেন্দ্রলাল সিংহ ইঁহারাও সামান্য গুণপনা প্রদর্শন করেন নাই। শুঁড়িপাড়ার সুরথচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং বিপিনবিহারী মণ্ডলের কৌশল দর্শনে দর্শকগণ মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।···আটটার সময় ব্যায়াম সমাধা হইলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া ব্যায়াম শিক্ষক ও শিক্ষিতগণকে বিস্তর প্রতিষ্ঠা ও উৎসাহদান পূর্ব্বক যুবা প্যারী বাবুর নিকট জাতীয় সভার নামে বিস্তর বাধ্যতা স্বীকার করিলেন।···তৎপরে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন কবিরত্ন ব্যায়াম সম্বন্ধে স্বরচিত একটি অভিনব গান গাইয়া আমোদের আরও বৃদ্ধি করিলেন।···পরে রাজেন্দ্র নামক ছাত্র বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত একটি সুন্দর কবিতা বিবৃত করিলেন।" - মধ্যস্থ, ৭ই বৈশাখ, ১২৮০, এবং শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগলের "জাতীয়তার নবমন্ত্র" দ্রষ্টব্য।

সেকালে বাংলার কবি ও সাহিত্যিকেরাও ব্যায়ামের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। খেলাধূলা বা ব্যায়ামচর্চ্চা করিলে ভাল ছেলে হওয়া যায় না, এই ধারণা সেকালে ছিল না। হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজনারায়ণ, প্যারীমোহন প্রভৃতি স্মরণীয় সাহিত্যিক ও পদস্থ ব্যক্তিরাও খেলাধূলায় যোগ দিতেন এবং বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীদের ব্যায়ামচর্চ্চা বিষয়ে নানা ভাবে উৎসাহিত করিতেন। উচ্চশ্রেণীর মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি আগ্রহের সহিত ব্যায়ামচর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন এবং এই সম্বন্ধে ফলাও করিয়া বিবৃতিও প্রকাশ করিতেন। 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' বলিতেছেন :

"রামগ্রাম সংক্রান্তি মেলা ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত সাত দিবস ছিল।···মেলার সাত দিবসে যে সকল হিতকর বিষয় দেখিলাম ও শুনিলাম নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে—(১) লাঠি খেলা, সাধারণ লোকের কুস্তি এবং স্কুলের বালকদিগের ব্যায়াম ···এই সকল বিষয়ের পরীক্ষায় বিস্তর হিন্দু ও মুসলমান উপস্থিত হইয়াছিলেন। কয়েকটি হিন্দু ভদ্র যুবক বিশেষ উৎসাহের সহিত যেরূপ কুস্তি করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া দর্শক মাত্রের মনেই যারপর নাই আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অপরাপর লোকদিগের লাঠিখেলা এবং কুস্তিও এমত আনন্দদায়ক হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া প্রায় দুই সহস্র দর্শক অবাক রহিলেন। এই সমস্ত খেলায় যাহারা বিশেষ নৈপুণ্য ও বিক্রম দেখাইয়াছিল তাহাদিগকে মেলার শেষ দিবসে গুণাগুণ অনুসারে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল।"

ব্যায়ামচর্চ্চা যে কেবলমাত্র কলিকাতা শহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। সেকালে বাংলার সর্ব্বত্রই ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত পত্রিকা আরও বলিতেছেন :—"মহাশয়! বিগত ১লা জানুয়ারীতে শ্রীমতী মহারাণী শ্যামমোহিনীর অর্থানুকূল্যে দিনাজ-

রোজকার ধুলোময়লার

রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
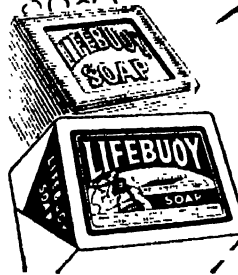
লাইফ্‌বয়ের

যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেও আপনি ধুলো ময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয়ের ফেনার আবরণে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন। লাইফ্‌বয়ের তাজা-গন্ধের ফেনা রোগবীজাণুদের হটিয়ে দিয়ে আপ[illegible] সের মতোই ঝরঝরে ক'রে তোলে—নিরাপদ ক'রে দেয় স্বাস্থ্যকে। রোজই নিজেকে লাইফ-বয়ের পন্থায় বাঁচিয়ে চলুন—এটির সত্যে [illegible]

দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

L 227-50 BG

সমিতিতে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া অতি যত্নের সহিত নানারূপ ব্যায়ামকৌশল শিক্ষা দিয়া আসিতেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণচন্দ্র প্রোঃ বোসের সার্কাসে তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করেন। এ সম্পর্কে ষ্টেটসম্যান বলিতেছেন :

"The Indian Circus opened in Cornwallis Street, Calcutta, well-conducted by a native company and the various feats were cleverly executed and the wonderful Japanese ladder-tricks were first invented in India and performed by Prof. N. C. Bysack and his troupe." —*The Statesman*, March 9, 1898.

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণচন্দ্র কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম 'লণ্ডন বায়োস্কোপ কো' নামক একটি কোম্পানী খুলেন। এবং ঐ বায়োস্কোপ ও সার্কাস দল লইয়া তিনি আবার ভারত ও ভারতের বাহিরে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। দেশভ্রমণকালেও নারায়ণচন্দ্র নিয়মিত শক্তিচর্চ্চা করিতে ভুলিতেন না। তাঁহার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে পাই :

"A massive stone weighing 1026 lbs, to be battered with heavy iron hammers in the chest when resting on Prof. Bysack's herculean frame, suspended on two chairs. Anybody allowed to come forward and take up the arduous task of hammering."—*The Indian Daily News*, 24th December, 1907.

অর্থাৎ, বসাক মহাশয় একখানি চেয়ারে মাথা ও আর একখানি চেয়ারে পা রাখিয়া শুইতেন। তাঁহার বুকের উপর ১০২৬ পাউণ্ড ওজনের একখানি পাথর রাখিয়া লোহার হাতুড়ির সাহায্যে ভাঙ্গা হইত।

বাঙালী মেয়েরাও সার্কাসে যোগদান করিতে বিমুখ ছিলেন না। বেণী ঘোষের দলে টুকুরাণী ও জ্ঞানদাসুন্দরী নাম্নী দুই জন মহিলা ব্যায়ামকুশলী ছিলেন। টুকুরাণী 'বারবেল'-এর খেলা ও বুকের উপর ত্রিশ জন যাত্রীসহ গরুর গাড়ী-চালনার খেলা দেখাইতেন। জ্ঞানদাসুন্দরী মাটির উপর নানারূপ কসরৎ, 'ডার্গাল' ও 'ইলিসিয়ম বক্সের খেলা দেখাইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। ইহা ছাড়াও কত রকম অসম-সাহসের খেলা দেখাইতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মোট কথা, বাঙালীর মেয়েরাও বীরোচিত কার্য্যে কোন দিনই পিছাইয়া পড়েন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তৎকালে জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়ায় সার্কাসের খেলা ছাড়াও লাঠি, ছুরি, অসি, বল্লম, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি খেলা সার্কাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অনুশীলন করা হইত। বাঙালী ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আখড়ায় গিয়া নানাবিধ কসরতের নিয়মিত তালিম লইতেন। যোগীন্দ্রচন্দ্র, হরিমোহন, কৃষ্ণলাল, নারায়ণচন্দ্র, মতিলাল ও প্রিয়লাল বসু প্রভৃতির আখড়া ছাড়া মুটবিহারী দাস, গোপালচন্দ্র প্রামাণিক, পাঁপড়ি আবদুল, ডেডো খলিফা, পচা খলিফা প্রভৃতি লাঠিয়ালদের আখড়ায় অনেক বাঙালী হিন্দুসন্তান লাঠিতে রডের খেলার তালিম লইতে যাইতেন। মুসলমান-সন্তানেরাও বাঙালী হিন্দুদের আখড়ায় গিয়া নিয়মিত তালিম লইতেন। সে সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিও এক-প্রকার ছিলই না এবং উভয় সম্প্রদায়ের পাল-পার্ব্বণে সকলেই সানন্দচিত্তে যোগদান করিতেন।

এই সকল বিশিষ্ট ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে নানাবিধ দেশীয় ও বিদেশী ব্যায়াম-কৌশলের সহিত সার্কাসের চিত্ত-বিমুগ্ধকর ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষার প্রতি বাঙালী যুবকদের বিশেষ প্রবণতাও জন্মিয়াছিল। তাহারা জ্ঞানচর্চ্চার ন্যায় শরীর-চর্চ্চাকেও একটা শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে। তবে মধ্যে মধ্যে পুলিসের তাড়া খাইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও প্রকাশ্যে শরীর-চর্চ্চা বন্ধ রাখিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। বিপ্লবী আন্দোলন যাহারা চালাইয়াছিলেন তাঁহারাও রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চা ও আত্মরক্ষার নানারূপ কৌশলে তরুণ দলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভাবপ্রবণ বাঙালী শুধু ভাব-প্রবণতার বশেই হাসিতে হাসিতে ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেয় নাই, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে তিলে তিলে প্রস্তুত হইয়াছিল ও অসাধারণ মনোবল অর্জ্জন করিয়াছিল।

আর একটি নবদল দেশমাতৃকার সেবায় সাহসী সৈনিক তৈয়ারির কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা পূর্ব্বগামীদের ন্যায় নানাভাবে বাঙালী-সন্তানদের শক্তি-চর্চ্চায় প্রেরণা জোগাইয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে যতীন্দ্রনাথ গুহ, রাজেন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা, বনমালী ঘোষ, শশিপ্রকাশ ঘোষ, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, ভবনাথ রায়, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যপদ ভট্টাচার্য্য, সুকুমার বসু, চিত্তরঞ্জন দত্ত, সতীশচন্দ্র কুণ্ডু, ভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার, কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত, বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগৎ চন্দ্র শীল, বিজয়-কুমার মল্লিক, নীলমণি দাস, উমেশচন্দ্র মল্লিক, রবীনচন্দ্র সরকার, মনতোষ রায়, বলাইকৃষ্ণ গোল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা বাংলাদেশে শক্তিচর্চ্চা প্রসারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

বিগত ইউরোপীয় প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙালী সৈন্যদল জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কিরূপ বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে চন্দননগরের বাঙালী পল্টনের কীর্ত্তিকাহিনীর কথা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন কে. কে. মুখার্জ্জী, ইন্দ্র রায় প্রমুখ বাঙালী বীরসন্তানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' নামক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও বাঙালী ছেলে-মেয়েরা কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। বাঙালীর মেয়েরাও শত্রুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে পারেন তাহার নজির আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবিভাগেও পাওয়া গিয়াছে। ঝান্সী-বাহিনীর বীরত্বের কথা ভারতের ঘরে ঘরে রোমাঞ্চ জাগাইয়া রাখিয়াছে। সেই বাহিনীতে বহু বাঙালী মেয়ে-সৈনিক ছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার

আমেরিকার বিশিষ্ট নিগ্রো বৈজ্ঞানিকের জন্মদিবস পালন

৫ঠা জানুয়ারী সাধারণতঃ আমেরিকাবাসী ও বিশেষ করে নিগ্রোদের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনটিতে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন কি কেউ জানত, ক্রীতদাসের ঘরে যার জন্ম, তিনিই উত্তরকালে আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী হবেন।

কার্ভারের জীবন ও সাধনা সত্যই যে উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর, এই কথাই প্রমাণ করে। বুকার টি. ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাঁর জাতির উন্নতির জন্য তিনি অনেক কিছু করে গেছেন, কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। আর শিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা নেহাত কম নয়। চীনাবাদাম থেকে ১০ রকমের রং, কাদা থেকে মুখে মাখবার পাউডার, আলু থেকে জুতা পালিশের রং, তুলো থেকে মেঝে তৈরির পাথর এবং বনজ লতা ও টমেটো থেকে রং প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য তিনি আজ বিশ্ববিশ্রুত। তা ছাড়া শিশুদের পক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধক সজ্জা থেকে তিনি যে একটি তেল আবিষ্কার করে গেছেন তার তুলনা নেই। এই সব আবিষ্কারের জন্য তাঁকে বলা হত 'রসায়নের যাদুকর', 'মাটির কলম্বস' ইত্যাদি।

তাঁর এই সকল কাজের জন্যেই তো যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহে অর্থনৈতিক প্রসার সম্ভব হয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই কার্ভারের জীবনে গাছপালাপরিচর্য্যার একটি বিশিষ্ট ধরণ দেখা যেত। যদি দেখা যেত যে কোন চারা মিইয়ে গেছে খররৌদ্রের তাপে কিংবা অন্য কোন কারণে, তখন তাঁর চিন্তার অবধি থাকত না কি করে তাকে জীইয়ে তুলবেন। সত্যি সত্যি মরা গাছকে তিনি জীইয়ে তুলতেনও। তাই পড়শীরা অবাক হয়ে তাকে নাম দিয়েছিল চারাগাছের ডাক্তার।

কার্ভারের অভিভাবকেরা ছিলেন গরীব। তাই তাঁকে লেখাপড়া শেখাবার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইস্কুলে দিতে পারেন নি। দশ বছর যখন তাঁর বয়েস তখন তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান এবং নিজের চেষ্টায় সতর বছর নানা জায়গায় থেকে অতি কষ্টে ইস্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করেন। আইওয়ার ইণ্ডিয়ানোলার সিমসন কলেজ হতে তিনি গ্রাজুয়েট হন।

এই সুদীর্ঘ সতর বছর নিজের খাইখরচ ইত্যাদি চালিয়ে ইস্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে ধোপার কাজ, সেলাইয়ের কাজ এবং আরও কত কাজই না করতে হয়েছে! ১৮৯১ সালে তিনি

আইওয়ার স্টেট কলেজ অব এগ্রিকালচারাল মেকানিক্যাল আর্টস-এ ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে পাঁচ বছরেই দুটি ডিগ্রী লাভ করেন—একটি ব্যাচেলার অব সায়ান্স আর একটি মাস্টার অব সায়ান্স। ২৮ বছর যাঁরা যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-বিভাগের কর্ণধার ছিলেন তাঁরা সকলেই এসেছেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে। কার্ভার ছাড়া, জেমস জি. উইলসন ও হেনরি ওয়ালেসও এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র।

পরীক্ষা পাসের পর আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য কার্ভারকে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় দু'বছর সেখানে তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যা, জীবাণু-গবেষণাগার এবং গ্রীণ হাউসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। সেখানে থাকাকালীন তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ সালে কার্ভারের সঙ্গে বুকার টি. ওয়াশিংটনের সাক্ষাৎ হয়। বুকার ওয়াশিংটন তাঁকে আলাবামার টাস্‌কিগী ইনষ্টিটিউটে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

টাস্‌কিগী ইনষ্টিটিউট

টাস্‌কিগী ইনষ্টিটিউট কয়েক জন উদারনৈতিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমেরিকাবাসী ও নিগ্রোর কীর্তি এক অপূর্ব প্রতিষ্ঠান। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে যারা সবেমাত্র মুক্ত হয়েছে তাদের সাহায্য করার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। দিনমজুরি করে কি ভাবে লেখাপড়া করা যায় তাই ছিল সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠান সেই সমস্যার সমাধান করে দেয়, আর বুকার টি ওয়াশিংটন তাঁর নূতন চিন্তাধারা দ্বারা সেই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন।

কার্ভার যখন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, তখন দক্ষিণদেশে হ'ত একটিমাত্র ফসল। আর তুলাই ছিল তথাকার একমাত্র ফসল। এক-ফসলের ফলে জমির উর্বরতা গেল নষ্ট হয়ে। কার্ভারের চেষ্টায় সেই রীতির বদল হ'ল, এল ফসলের আবর্তন, জমি হ'ল দো-তিন ফসলা। ফলে জমি ফিরে পেল উর্বরতা।

তা ছাড়া কার্ভার যখনই সময় পেতেন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। দরিদ্র কৃষকেরা যাতে তাদের খাবার নষ্ট না করে তা বোঝাতেন, দেখিয়ে দিতেন, কি করে তার অপচয় নিবারণ করা যায়। বাদাম যে আজ আমেরিকার এক প্রধান শস্য, তাও তাঁরই উদ্যমের ফলে।

মূল্যবান আবিষ্কার

আলাবামার লাল মাটি থেকে, নূতন রং, তুলার গাছ হতে খেতসার, রজনগাছের আঠা, গাছের শেকড় থেকে পাতলা কাঠের পাত এবং নানা জাতীয় কাঠ থেকে নকল মার্বেল পাথর এবং খড় দিয়ে দড়ি তৈরি প্রভৃতি, তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের অন্যতম।

কোন আবিষ্কারই কার্ভার পেটেন্ট করে যান নি। পক্ষাঘাত রোগীদের জন্য যে তেলটি তিনি আবিষ্কার করে গেছেন তা দিয়ে গেছেন সকল চিকিৎসককে। একবার বাদামক্ষেতে এক রকমের জীবাণু দেখা দেয় ও সব ফসল নষ্ট হবার যোগাড় হয়। চাষারা একটি চেক নিয়ে কার্ভারের সঙ্গে দেখা করে এই বাদামগাছের রোগটি সারিয়ে দেবার জন্যে। তিনি চেকটি তৎক্ষণাৎ তাদের ফিরিয়ে দেন।

তিনি জীবনে যে সকল পুরস্কার পেয়েছেন তার তালিকা দিতে গেলে অনেক জায়গা লাগবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ১৯৩৯ সালে যে তিন জন রুজভেল্ট পদক পেয়েছিলেন তাঁদের মাঝে তিনিও একজন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতেও তাঁকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করে লওয়া হয়। ১৯৪০ সালে স্থাপত্যশিল্পী ইঞ্জিনীয়ার ও রসায়নবিদ্ প্রভৃতির আন্তর্জাতিক ফেডারেশন একটি ব্রোঞ্জ-পদক দ্বারা তাঁকে পুরস্কৃত করেন। তা ছাড়া ১৯২৩ সালেও বিজ্ঞানীর প্রাপ্য বিশেষ পুরস্কার স্পিনগার্ন পদকও তাঁকে দেওয়া হয়। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় তিনি টাস্‌কিগী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। তাঁর দেওয়া সেই ৩০ হাজার ডলার দিয়ে কৃষি-রসায়ন গবেষণার জন্য জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ফাউণ্ডেশন স্থাপিত হয়েছে।

১৯৪৩ সালের ৫ই জানুয়ারী তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয় এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু বুকার টি. ওয়াশিংটনের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মানবতার বেদীমূলে পৃথিবীর যে সব বরপুত্র ও নেতৃবৃন্দ জীবন উৎসর্গ করেছেন, জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁদের মাঝে নিজের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছেন।

আজ এই পরম দিনটিতে কেবল তাঁরই কথায় তাঁর কাজের দিগ্‌দর্শন পাওয়া যেতে পারে :

"প্রকৃতি আমাদের যে শিক্ষা দেবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষমাণ সেই মহান্ শিক্ষালাভের জন্যে আমি বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়াই, আর কুড়িয়ে বেড়াই কত প্রকৃতির নিদর্শন। কেবল বিজন বনের সেই নিরালায় প্রভাতের আলোয় আমি শুনি ও উপলব্ধি করি আমার জীবনে ভগবানের লীলা।" —মা: কনবার্তা

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
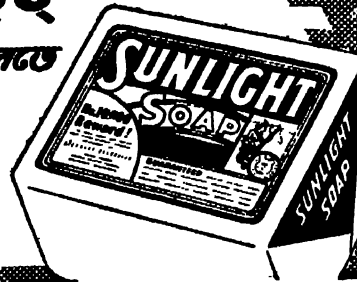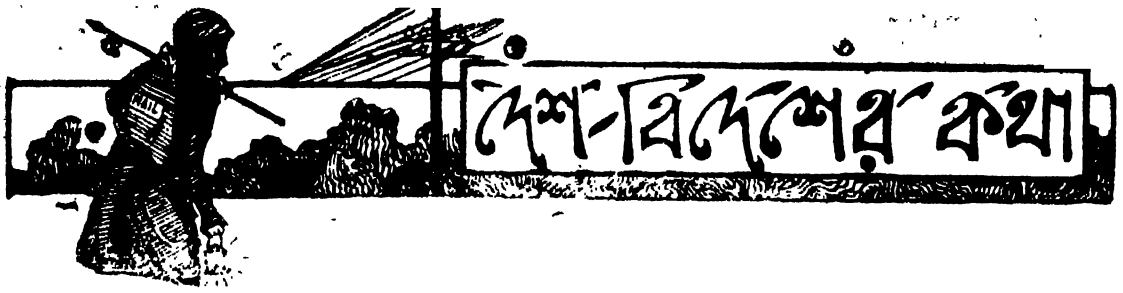
ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী

ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী গঠিত হইবার এক বৎসরের কিছুকাল পরে, ১৯৫১ সনের জানুয়ারি মাসে প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। নিয়োগ, পরিচালনা ও শিক্ষাদানের সুবিধার্থে আঞ্চলিক বাহিনীকে প্রাদেশিক ও নাগরিক শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত শাখা পল্লী অঞ্চলের এবং শেষোক্ত শাখা শহর অঞ্চলের লোকেদের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। প্রাদেশিক শাখার লোকদিগকে ভর্তির সময়ে ত্রিশ দিন শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে তাহাদের চাষ আবাদের অবকাশ অনুসারে বৎসরে দুই মাসকাল শিবিরে রাখিয়া সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সামরিক শিক্ষাগ্রহণান্তে আঞ্চলিক বাহিনীর কর্মীরা বিভিন্ন কারিগরী বিষয়েও বিদ্যা অর্জনের সুযোগ পায়।

নিয়মিত সামরিক শিক্ষা ও আঞ্চলিক বাহিনীর শিক্ষার মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। শেষোক্ত বাহিনীতে বেসামরিক লোক স্বেচ্ছায় শিক্ষা গ্রহণ করে। ঐ শিক্ষাকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য উহার সহিত খেলাধুলা, সামাজিক উৎসব, নকল যুদ্ধ প্রভৃতির আয়োজন রাখিতে হয়।

শিবিরে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদিগকে পুরাপুরিভাবে সামরিক আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। তখন তাহারা সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ এবং আমোদ ও অবকাশ ভোগ করিবার সুযোগ পায়।

আঞ্চলিক বাহিনীর রেলওয়ে শাখার সদস্য-তালিকাভুক্ত চল্লিশ জন রেলওয়ে অফিসার সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং কেন্দ্রে তিন সপ্তাহকাল শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে আঞ্চলিক বাহিনীর ১৮০ জন কর্মীকে সামরিক বিদ্যালয়ে এবং ১১০ জন অফিসার, জুনিয়ার কমিশনড্ অফিসার ও নন-কমিশনড্ অফিসারকে দ্বিমাসিক শিক্ষাগারে এবং ৮৭০ জনকে নিয়মিত বাহিনীতে লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আজ আঞ্চলিক বাহিনীর বিশেষ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার অনেকগুলি বিভাগ, যেমন—পদাতিক বাহিনী, সাঁজোয়া বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, সিগন্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি। সামরিক বাহিনীর মতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথম দিকে আঞ্চলিক বাহিনীর উন্নতি খুব ধীর গতিতেই হইয়াছে। সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্পন্ন লোক সংগ্রহ করা বিশেষ করিয়া শহর অঞ্চলে, এক কঠিন সমস্যা হইয়া দেখা
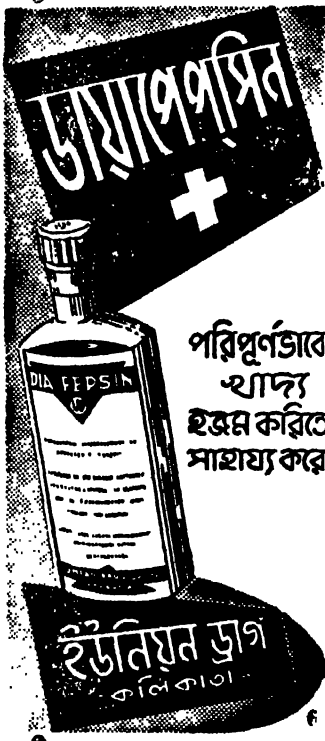
দেয়। যাঁহারা আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিতে আসিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই আপিস-আদালতে কাজ করিতেন। তাঁহারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য সামরিক বাহিনীর নির্দ্দিষ্ট মানের অনেক নীচে ছিল। বিশেষ বিবেচনার পর এই মান কতকটা হ্রাস করা হয়।

রাজ্য-বাহিনীগুলির জন্য লোকাভাব হয় নাই। আঞ্চলিক বাহিনীর কথা শুনিয়াই পল্লীর তরুণেরা উদ্যোগী হইয়া যোগদান করে।

আঞ্চলিক বাহিনীর দ্বারা দেশের শ্রমিক ও মালিক উভয়েই লাভবান হইবে। আঞ্চলিক বাহিনীর শিক্ষাগ্রহণান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মালিকগণ তাহাদের কর্ম্মীদিগকে অধিকতর নিয়মনিষ্ঠ ও দক্ষ কর্ম্মী হিসাবেই ফিরিয়া পাইবেন। কর্ম্মিগণও অধিকতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এবং যোগ্যতর নাগরিক হইয়া আসিবেন।

সম্প্রতি ভারত-সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষালয়ের শতকরা আড়াইটি আসন আঞ্চলিক বাহিনীর কর্ম্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। ইহার ফলে সামরিক বাহিনীতে কমিশন লাভ করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ভাবে অবসরকালীন বৃত্তিকে পর্ণাঙ্গ সামরিক বৃত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া লইবার পথ সহজ হইয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি আঞ্চলিক বাহিনীর কর্ম্মীদের জন্য দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৫২ সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী হইবে। আঞ্চলিক বাহিনীর কোনও কমিশন-প্রাপ্ত অফিসার বিশ বৎসরকাল যোগ্যতা সহকারে কাজ করিয়া গেলে তাহাকে রাষ্ট্রপতির 'ডেকরেশন' প্রদান করা হইবে। আবার আঞ্চলিক বাহিনীর কোনও অফিসার বা কর্ম্মী অন্যূন ১২টি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বার বৎসর কাজ করিয়া গেলে তিনি রাষ্ট্রপতির পদক লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

ব্রিটেনে আঞ্চলিক বাহিনী যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে সমান খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে উহাই একমাত্র কর্ম্মকুশল জাতীয় বাহিনী। উপযুক্ত কর্ম্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান দ্বারা ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীকে বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত করিতে পারিলে উহাও দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর মত সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৫১ সালের কার্য্যবিবরণী

আলোচ্য বর্ষে মঠবিভাগে নিত্য-নিয়মিতভাবে সেবা-পূজাদি সম্পন্ন হইয়াছে। মঠপ্রাঙ্গণে ১২২টি ধর্ম্মালোচনা-সভার অধিবেশন হইয়াছে। ৮টি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইয়াছে।

মঠের পুস্তকাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ১৭৪৪ খানি। পাঠাগারে ৩০ খানি মাসিক পত্রিকা ও তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়।

ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বের মতই ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

আর্থিক পরিচয়

মোট চলতি বীমা	...	৮১,০২,৩৬,১৬৪৲
মোট সম্পত্তি	...	১৯,৯৮,১৩,৮৫৩৲
বীমা তহবিল	...	১৭,৬৬,১৯,৬২৮৲
প্রিমিয়ামের আয়	...	৩,৭২,২৭,৫২৮৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ	...	৮৩,৫৭,৯৭৮৲

নূতন বীমা

১৬,২৮,৮৫,৮০০৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

মিশনের তত্ত্বাবধানে তিনটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৬৯৬২৪ জন এবং মোট ৩৬৪ জনের উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

১৯৫১ সালে বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল আট জন। মিশনে অবস্থানকারী চার জন ছাত্রের মধ্যে দুই জনের যাবতীয় ব্যয় মিশন হইতেই নির্ব্বাহ করা হয়। উক্ত বর্ষে সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল বার জন। তন্মধ্যে তিন জনের আংশিক ব্যয়ভার মিশন বহন করিয়াছে। দুই জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত রামচন্দ্রপুর পরিবর্দ্ধিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে এবং উহাকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত মিশনের উদ্যোগে দরিদ্র রোগীদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ এবং আরও নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উচ্চাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচার

বাংলা ভাষায় যে সকল গান প্রচলিত আছে তন্মধ্যে উচ্চাঙ্গ স্বরতালসমন্বিত ব্রহ্মসঙ্গীত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এগুলির সংখ্যাও বিপুল। উক্ত গানের অনেকগুলি যে ক্লাসিকাল অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ গুণিগণ এই শ্রেণীর বাংলা গানকে উচ্চস্তরের হিন্দুস্থানী গানের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কয়েকজন এইরূপ ধারার বহু গান লিখিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত গানগুলির ঢং এবং গায়েকী পদ্ধতি অবিকল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ন্যায়। তখনকার দিনে সঙ্গীতের আসরে এই সকল গান বিখ্যাত গুণিগণ কর্ত্তৃক গীত হইত। ইদানীন্তন কালে এই ধরণের গান প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সহজসাধ্য এবং নানাবিধ মিশ্র গানের সাময়িক প্রলোভন, বাংলা গানের আভিজাত্য-গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সুখের বিষয়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন যাবৎ রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ ধর্ম্ম-সঙ্গীতগুলির প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের রচিত বিভিন্ন ধারায় সঙ্গীত আলোচনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (নবপর্য্যায়) তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই পুস্তকে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের রচিত অপ্রকাশিত গানসমূহ স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গানের উন্নতির জন্য রমেশবাবুর উৎসাহ এবং উদ্যম প্রশংসনীয়।

বাংলার পালপার্ব্বণ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৮৬ সংখ্যক গ্রন্থ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আট আনা।

একচল্লিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তিকাটি পড়িয়া অনেক নূতন তত্ত্ব শিখিলাম, তজ্জন্য রচয়িতার কল্যাণ কামনা করিতেছি। ইংরেজী শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা এই গ্রন্থে অনেক চিন্তার বিষয় পাইবেন। কেন এবং কি সঙ্কল্প লইয়া বাঙালী গৃহস্থ বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতেন, ইহাদের দ্বারা সমাজের কি কল্যাণ হইত, কিরূপে ধনী-দরিদ্রের, উচ্চজাতি-নিম্নজাতির মধ্যে উৎসবের মারফতে মেলামেশা সম্ভব হইত, কিরূপে বাঙালী স্ত্রীলোকেরা ব্রত নিয়মের দ্বারা পরার্থপরতা, সংযম ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতেন এ সকল কথা বর্ত্তমান সমাজের জানা ও ভাবা আবশ্যক। "নানা কারণে লোকের আমোদ-উৎসব কমিয়া আসিতেছে।" আনন্দ ভিন্ন জীবন নাই, উন্নতি নাই। আনন্দের জন্য সেকালে লোকজন খাওয়ান হইত, দরিদ্র-দিগকে অন্নবস্ত্র দান উৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। এই সে দিনও কালীঘাটের শীতলাতলা অঞ্চলে দুর্গাপূজার সময় দরিদ্রের সেবা হইত, তাতে লোকের প্রচুর আনন্দ হইত। এখন বিদেশী ইলেকট্রিক কোম্পানীকে অর্থদান উৎসবের প্রধান দান, এবং আলো ও সাজসজ্জা প্রধান আনন্দদাতা। গৌণ যেন মুখ্যকে ছাপাইয়া যাইতে চায়।

শ্রীযুত চিন্তাহরণবাবু দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক হইতে ষোড়শ শতক পর্য্যন্তের নিবন্ধ গ্রন্থে জীমূতবাহন, রায় মুকুট, রঘুনন্দন প্রভৃতি নানা উৎসবের শাস্ত্রীয় বিধান দর্শাইয়াছেন, কিন্তু 'চড়ক', 'বারভাইয়া' ও 'জয়দুর্গার উল্লেখ করেন নাই। 'ঝুলনযাত্রা ও 'রাস' দুই-ই খুব প্রসিদ্ধ ব্যাপার, কিন্তু "এই দুইটির কোনও প্রসঙ্গ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না"; "জীমূতবাহন, বৃহস্পতি, শ্রীকণ্ঠ ও রঘুনন্দনের গ্রন্থে" "জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমীতে দশহরায় গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গাপূজার কোন উল্লেখ করা হয় নাই।" শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজাকে গোবিন্দানন্দ (১৬শ শতক) "গৌড়াচার বলিয়া ইহার শাস্ত্রীয় গৌরব অস্বীকার করিয়াছেন"। পূর্ব্বে মাঘের রটন্তী কালীপূজা প্রসিদ্ধতর ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক হইতে দীপান্বিতা কালীপূজাই মুখ্য কালীপূজা। এই সকল এবং অন্যান্য বহু চিত্তাকর্ষক কথা এ গ্রন্থে আছে। পড়িলে সকলেই আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবেন।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলিতে হয়। প্রত্যেক জেলা বা অঞ্চলের ব্রত-উৎসবাদির যথাযথ বিবরণ এখনও সংকলিত হয় নাই, কিন্তু উহা চাই। তত্তৎ স্থানীয় মহিলারা ব্রতকথাগুলি যে ভাষায় বলেন, অবিকল সেই ভাষায় কথাগুলি প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু ব্রতের সংস্কৃত মূল দুর্লভ, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা আধুনিক বা উপেক্ষিতব্য নহে। দেশের দশ জনের মধ্যে যাহাদের জন্ম ও বিস্তৃতি তাহাদেরই কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থে প্রবেশ করিয়াছে; এই কথা কেবল ব্রতাদি সম্বন্ধেই সত্য নহে, ইহা গৃহকর্ম্মাদি সম্বন্ধেও সত্য।

শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী, বেদান্ততীর্থ

একতারা—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। চলতি নাটক-নভেল এজেন্সি, ১১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ছেলেবেলায় একটি মাত্র তারের যন্ত্র (গোপীযন্ত্র) বাজাইয়া বৈরাগীকে গান গাহিতে শুনিয়াছি। সেই যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠের যে সঙ্গীত তাহার সুরটিও কেমন মন-উদাস করা। গানের অর্থ না বুঝিলেও শিশু-মনে কেমন একটি উদাস বৈরাগ্যের ছাপ রাখিয়া দেয়—যাহার স্মৃতি উত্তর বয়সেও সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় না। সুর ওখানে ভাবমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আজকাল গোপীযন্ত্র লইয়া কোন বৈরাগী গৃহস্থের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় কিনা জানি না; দাঁড়াইলেও তাহারা যে মনের আনন্দে গান গায় না এটি সুনিশ্চিত। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের কালস্রোত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভাবের ভিত্তিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া আনিয়াছে। ভাবলোক হইতে নামিয়া কঠিন কর্ম্মলোকের কঙ্করময় পথে আমাদের ভ্রমণ শুরু হইয়াছে। এখন বৈরাগী যদিও আপন আনন্দে গান গায় তাহার সুরটি আমাদের অন্তরে ঠিকমত পৌঁছায় না।

কাহিনী আর রূপকের সম্পর্ক অনেকটা এই ধরণের: বাস্তবলোকের মাধ্যমে ভাবলোককে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপার। অধিকাংশ পাঠকই কিন্তু কাহিনীর মধ্যে রূপক অংশটি খুঁজিয়া লইবার পরিশ্রম করেন না। সে কারণে কাহিনীর রস বা রূপকের চমৎকারিত্ব তাহাদের মুগ্ধ করে না। এই কারণেই হয়তো রূপক-রচনা তেমন চোখে পড়ে না।

আলোচ্য 'একতারা'য় লেখক একটি সাধারণ কাহিনীর আশ্রয় লইয়াছেন। কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে মূল বক্তব্যটি সরলভাবেই গুছাইয়া বলিয়াছেন। বিশ্ব ও প্রাণীসমূহের আনন্দময় সত্তায় বিশ্বাসী জীবন-কবি, তাঁর প্রিয় শিষ্য দার্শনিক, ঐশ্বর্য্যময়ী রাণী বসুন্ধরা, তাঁর কন্যা শোভা, পৌত্র নরেশ ও বৈজ্ঞানিক এই কয়টি চরিত্রের মতদ্বন্দ্বিতায় জীবন-সত্যকে লেখক স্পষ্টতর করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, দর্শন ও বিজ্ঞান যথাক্রমে মন ও

দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও গোটা মানুষের কোনটিকেই বাদ দিলে চলে না। মনোময়ী রাজকন্যার জন্য যেমন চাই দার্শনিকের আশ্বাস, বস্তুময়ী বসুন্ধরার জন্য তেমনি বৈজ্ঞানিকের সেবা। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যসাধনেই জীবনলীলার প্রকাশ।

ঘটনাসংস্থান ও সংলাপে নাটকীয় ভঙ্গী থাকায় সহজেই একটানা যে সুবর্ণ বাজিয়াছে—তাহা অকৃত্রিম। প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শয়তানের সভা—শেখ হবিবর রহমান। প্রিমিয়ার বুক কোম্পানী, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও মহম্মদ পাবলিশার্স, খুলনা, পূর্ব্ব-পাকিস্তান। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গল্প-উপন্যাস জাতীয় অথবা প্রবন্ধসমষ্টি নহে। বর্ত্তমান সমাজে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, যে অপরাধ জ্ঞানে-অজ্ঞানে দিন রাত্রির বহু সময় ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা রাজনীতির ক্ষেত্রে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার প্রতি লেখক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সব কলহ ও দুষ্কৃত শয়তানী-কৌশলের অর্থ বলিয়া শয়তান ও তাহার অনুচরবর্গের কথোপকথনের মারফত প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি গল্পের মাধ্যমে পাইলে অধিকতর উপভোগ্য হইত সন্দেহ নাই, তথাপি লেখকের উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ কম।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইসিপতন [সারনাথ]—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী। মহাবোধি সোসাইটি, ৪-এ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ তীর্থ বারাণসীর সন্নিকটবর্ত্তী সারনাথ বা ইসিপতনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সারনাথের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনসমূহ উদ্ধারের কাহিনী ও তাহাদের পরিচয় এবং মহাবোধি সোসাইটির ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বর্ত্তমান যুগে এই স্থানে নির্ম্মিত মূলগন্ধকুটী ও বিবিধ মন্দিরাদির কথা এই পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দুই পরিচ্ছেদে এই তীর্থের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন সময়ে সারনাথ ও অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থ কিভাবে ধ্বংস হইয়াছে প্রসঙ্গক্রমে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, এই উপলক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার সর্ব্বজনমান্য প্রামাণিক গ্রন্থের তেমন আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক সারনাথ বিহার ধ্বংস হওয়ার উল্লেখ থাকিতে পারে। কিন্তু সেই উল্লেখমাত্রকেই এ বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা চলে কি? প্রামাণগ্রন্থের নামনির্দ্দেশে ও তাহা হইতে উদ্ধৃত অংশেও ভ্রমপ্রমাদ আছে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বৌদ্ধভিক্ষু-ধ্বংসের কথা কোথায় আছে বুঝিলাম না। গৌড়রাজমালা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ (পৃ. ১৫) মূলের সহিত ঠিক মেলে না। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জগৎসিংহ ইসিপতন ধ্বংসের শেষ অঙ্কের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই অভিনয়ের কোনরূপ বিবরণ বা প্রমাণ আদৌ উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

প্রবাহ—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

লেখক ছোট গল্প লিখিয়া বাংলা-সাহিত্যে পরিচিতিলাভ করিয়াছেন। উপন্যাস রচনায়ও যে তিনি কৃতী সমালোচ্য গ্রন্থখানি তাহার প্রমাণ।

"ওদের দুটিতে জন্মের সম্বন্ধ—মৃন্ময় এবং মঞ্জুলা। মৃন্ময়ের বয়স নয়, মঞ্জুলার ছয়।" এই বলিয়া লেখক কাহিনীর সূচনা করিয়াছেন। মৃন্ময়ের পিতা পতুল ভট্টাচার্য্য এবং মঞ্জুলার পিতা জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাল্যবন্ধু—পরস্পরের প্রতিবেশী। পরলোকিকা স্ত্রীলোকের পর জীবানন্দের পিতা তাঁহাকে 'জমিদারিতে টানিয়া লইলেন, আর পতুল চলিয়া গেলেন দূর-প্রবাসে জীবিকার সন্ধানে। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে পতুল যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন দুই বাল্যবন্ধুতে যে পুনর্মিলন হইল তাহা নহে, পল্লী-প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে দুটি বালক-বালিকার বাল্য-প্রণয়েরও সূচনা হইল। মৃন্ময় এক দিন তাহাদের বাগের মন্দির ভাঙিয়া নাক্কে মঞ্জুলাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। মঞ্জুলা-মৃন্ময়ের দিনগুলি হইয়া উঠিল আনন্দময়। এমনিভাবে কাটিতে লাগিল বছরের পর বছর। পরিবেশে অনাস্থিতর ভবিষ্যতে মঞ্জুলা-মৃন্ময়ের জীবনকে লইয়া তাহাদের ভাগ্যবিধাতার যে ভাঙাগড়ার খেলা শুরু হইবে, অলক্ষ্যে রচিত হইতে লাগিল তাহার পটভূমিকা। উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য কলিকাতায় গিয়া বড়লোক বন্ধু সুনির্ম্মল এবং তাহার বোন লিলির সঙ্গে মৃন্ময়ের সুনির্ম্মলের পরিচিতা পত্নী লিলির এবং সঙ্গে সঙ্গে সুনির্ম্মল-এর দুষ্কৃতির বোঝা কাঁধে তুলিয়া লইতে হইল, তাহার নামে রটিল অপবাদ। ইহার পর হইতে কাহিনীর গতি আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে নাটকীয় দ্রুততায়। লিলিকে লইয়া মৃন্ময়ের পাবনা অঞ্চলে গিয়া অবস্থান, রাজাবাবু এবং তাঁহার পুত্রের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কাহিনীর রস বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সবাই, এমন কি মঞ্জুলা পর্য্যন্ত মৃন্ময়কে ভুল বুঝিল। গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মৃন্ময় দেখিল আত্মীয়-পর সকলের দ্বারই তাহার নিকট রুদ্ধ। সর্ব্বত্র বিমুখ হইয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল লিলির নিকটে। এই ভুল বুঝার মারাত্মক পরিণতি দেখা দিল মঞ্জুলার জীবনে। অভিমান তাহার বিচারবুদ্ধি লোপ করিয়া দিল। মৃন্ময়ের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য মরিয়া হইয়া সে বিবাহ করিল ভবঘুরে নাক্কে। ওদিকে মৃন্ময়ের জীবন জড়িত হইয়া পড়িল লিলির সঙ্গে; লিলির মনে মৃন্ময়ের প্রতি গোপন অনুরাগের সঞ্চার হইল। সুনির্ম্মলের ঔরসজাত শিশুপুত্র পঙ্কজ মৃন্ময়কে স্নেহের ডোরে শতপাকে বেষ্টন করিল। মৃন্ময় কিন্তু লিলির 'অন্তরের প্রকৃত সত্য জানিতে পারিল না'। এক দিন লিলি-পঙ্কজের স্নেহবন্ধন এবং স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মৃন্ময় পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার সুরু হইল তাহার জীবনের নূতন অধ্যায়। এমন সময় নাক্কুর সঙ্গে তাহার দেখা। নাক্কু তাহাকে জানাইল মঞ্জুলার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু কুশণ্ডিকা হয় নাই, সিন্দূরদান অসমাপ্ত আছে। এইখানেই লেখক কাহিনীর উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পাঠকের কৌতূহলকে পরিপূর্ণভাবে উদ্রিক্ত করিয়া এমন এক জায়গায় থামিয়াছেন যেখানে তাহার মনে শুধু এই প্রশ্নটিই জাগে যে, "ততঃ কিম"।

সুন্দর
কেশগুচ্ছ..
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রী বৃদ্ধি করে
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

বিশ্রাম

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গান্ধীজী, সোদপুর
সঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী প্রভৃতি
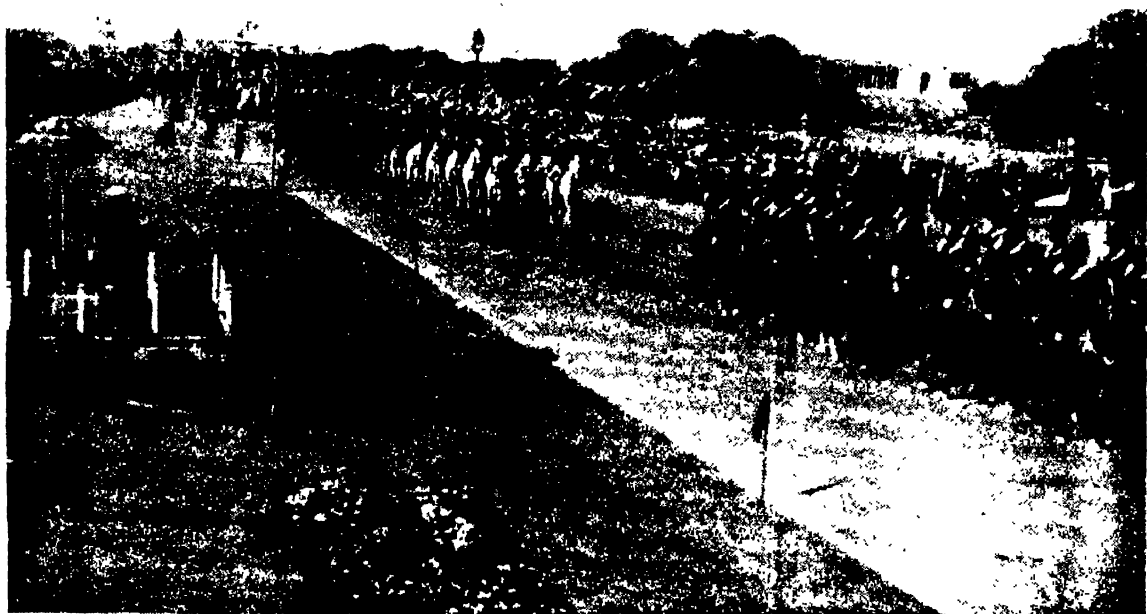
"সত্যম্ শিবম সুন্দরম
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ ২য় খণ্ড } ফাল্গুন, ১৩৫৯ { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

তর্কের হাট-বাজার

কলিকাতায় "বাজেট সেসনের" মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মহোৎসবের ক্ষেত্র বিধানসভা ও বিধান-পরিষদ। মহোৎসবের উদ্ঘাটন ব্যবস্থা করেন স্বয়ং রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। নলিনীরঞ্জন সরকারের জন্য শোক প্রকাশ করিবার পর আসল পালাগান আরম্ভ হয় বুধবার হইতে। আমাদের পক্ষে সেখানকার সকল কথার উল্লেখ বা বিচার করা অবাস্তর এবং অসম্ভব। অবান্তর কেননা বৃথা তর্কজালের বিশদ বিবরণ দেওয়া বা "কবির লড়াই" জাতীয় বিতর্কের বিশ্লেষণ করা এ দুই-ই আমাদের কাছে গৌণ ব্যাপার। অসম্ভব কেননা মাসিক পত্রের কলেবরে উহার স্থান সঙ্কুলানও হয় না। আমরা উচিত মনে করি কার্য্যকরী যাহা তাহার উল্লেখ ও বিচার করা এবং যে বিষয়ে বিধানমণ্ডলীর সদস্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা। বিধানমণ্ডলীর সবে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আমাদের সকল বিষয় বিচার করিবার সময় ইহা নহে; তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় সবিশেষ বিচার করিবার চেষ্টা করা হইবে। বর্ত্তমানে মোটামুটিভাবে কিছু আলোচনা করিব।

রাজ্যপালের ভাষণের চুম্বক "আনন্দবাজার পত্রিকা" এইরূপ দিয়াছেন :

"পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি গত ২রা ফেব্রুয়ারী রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া রাজ্য বিধানসভা ও বিধান-পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেন। রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে রাজ্য সরকারের নীতি ও কর্ম্মপরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অথর্ব্ববেদের একটি বাণী উদ্ধৃত করিয়া সরকার ও বিরোধী দল—উভয় পক্ষকেই সত্য, ন্যায়নিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও ত্যাগব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অধিবেশনের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিতে আহ্বান জানান।

রাজ্যপাল তাঁহার বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন খাদ্যনীতি, ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনা ও উহার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতি এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করেন। রাজ্যপাল জানান যে, ফরাক্কা গঙ্গা বাঁধ নির্ম্মাণ পরিকল্পনাটি যাহাতে পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়, সেজন্য তাঁহার গবর্ণমেণ্ট এখনও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। পাঁচসালা পরিকল্পনার বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া রাজ্যপাল সকলকে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করেন, "অতি উচ্চাশা অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনা—কোনটিতেই ঐ বিরাট কার্য্য আগাইবে না। একমাত্র ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, কঠোর কর্ম্মনিষ্ঠা ও সততা দ্বারাই তাঁহারা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন।"

রাজ্য সরকারের নূতন খাদ্যনীতি বিবৃতি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, "আমরা কাহাকেও মুনাফার লোভে খাদ্য মজুত করিতে দিব না।" রাজ্যপাল জানান যে, পাসপোর্ট চালু হইবার সময় পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নূতন ১ লক্ষ ৯৩ হাজার উদ্বাস্তুর সমাগম হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৪ হাজার উদ্বাস্তু সরকারী শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। রাজ্যপাল কলিকাতা শহরে একটি নগর দেওয়ানী আদালত এবং একটি নগর দায়রা আদালত স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন।

রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে খাদ্যপরিস্থিতি, উন্নয়ন-পরিকল্পনা, গঙ্গার বাঁধ, কলিকাতার উন্নয়ন, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, তপশীলী উপজাতির উন্নয়ন, উদ্বাস্তু-সমস্যা, রাজ্যবীমা, আদালত, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবৃতি ও মত প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, বিবৃতি সরকারী দৃষ্টিকোণ হইতে দেওয়া হইয়াছে। সে সকল বিষয়ে আমাদের মতামত আমরা প্রতি মাসেই বিশদভাবে দিয়া থাকি এবং সরকারী দপ্তরের বিবরণের ও মতামতের সহিত আমাদের মতানৈক্য যথেষ্টই আছে। তাহার কিছু আমরা এই সংখ্যায়ও জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজ্যপালের ভাষণের পর তাহার সমালোচনা আরম্ভ হয় বুধবার হইতে। সমালোচনার অধিকাংশই দলগত বিরোধের অভিব্যক্তি, অল্প কিছুমাত্রায় বাস্তবের নির্দ্দেশ কোন কোনও স্থলে আছে।

শ্রীযুক্ত হরিপদ চ্যাটার্জ্জি বিতর্কের সূচনা করেন সরকারী উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতি লইয়া সুদীর্ঘ ও তীব্র সমালোচনা দ্বারা। উদ্বাস্তু

পুনর্ব্বাসনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ১৮ই মাঘের "যুগান্তরের" ষ্টাফ রিপোর্টারের বিবৃতি এইরূপ :

"উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সর্ব্বশেষ তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও এই সমস্যার কিনারায় আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই। সরকারী তথ্যেই দেখা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের মধ্যে যে ২৫,৮০,৬৩৯ জন উদ্বাস্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে এখনও ১১,৬৯,০১৪ জন পুনর্বাসিত হয় নাই।

উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার এ পর্যান্ত ১৬,০৯,০৭,৩৯১ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং যত জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ মোট ২৯,১৬১,৭১ একর।

পাক-ভারত পাসপোর্ট ও ভিসা প্রবর্ত্তনের আলোচনার সময় মোট ১,৯৩,৬৬৮ জন উদ্বাস্তু পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিয়াছে। সরকারী তথ্য হইতে জানা যায় যে, এ পর্য্যন্ত ২,৪৮,৩২৫টি উদ্বাস্তু পুনর্বাসিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪৬,৬৯৯টি পরিবারকে সরকারী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্রে বসান হইয়াছে। ৪৯,০০০টি পরিবার খাস জমিতে, ১,৩১,০০৮টি পরিবার ব্যক্তিগত জমিতে, ১৪,৭৯৮টি পরিবার শহর পরিকল্পনায় এবং ৮,৮৬৫টি পরিবার গ্রাম পরিকল্পনায় পুনর্বাসন লাভ করিয়াছে।"

হরিপদ বাবু তাঁহার সমালোচনায় কোটি কোটি টাকার অপব্যয়, "গ্যাড়াকল", তথাকথিত উদ্বাস্তুদরদী ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন নহে, কিন্তু ঐরূপ অপব্যবস্থার মূল কারণ যে দলীয় স্বার্থে অভাগা উদ্বাস্তুদিগকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা ইহা বলেন নাই। অন্য সমালোচনা অনেক প্রকার হইয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রীবীরেন রায় পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, সরকারী মনোভাবের কৃপায় তাহাদের অবস্থা "নিজবাসভূমে পরবাসী"র ন্যায়। ইহা খুবই ঠিক। যাহাই হউক, নানা তর্কের পরে রাজ্যপালের ভাষণের সমালোচনা শেষ হয়; সে সকলের শেষে ডাঃ বিধান রায় এ পালা সাঙ্গ করেন এইরূপে :

সংশোধন প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনার অবাস্তবতা তাঁহার মনকে পীড়িত করিয়াছে। সরকার যে সকল কাজ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহেন রাজ্যপাল তাঁহার বক্তৃতায় সে সকল উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রত্যেক কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া বা প্রত্যেকটি ত্রুটিবিচ্যুতির কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব নহে। তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতে আলোচনার সময় অধিক তাপের সৃষ্টি না হইয়া অধিক আলোকেরই বিকীরণ হইবে। যে সকল সমস্যা রহিয়াছে সেগুলি কেবল মন্ত্রীদের বা কংগ্রেস সদস্যদের সমস্যা নহে, সেগুলি সমগ্র দেশের সমস্যা। সেগুলির সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। বহু সদস্যকে তিনি তাঁহাদের বক্তৃতার উপসংহারে বলিতে শুনিয়াছেন, 'জনতা আপনাদের পিছনে নাই' ইত্যাদি। এইরূপ ভয় দেখান নিরর্থক। চিকিৎসক হিসাবে বহুবার মৃত্যুর সহিত তাঁহার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়াছে, বহু লোকের মৃত্যু তিনি দেখিয়াছেন। আবার যদি মৃত্যু আসে তাহার সম্মুখীন হইতে তিনি বিরত হইবেন না। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা, বাস্তুহারা সমস্যা, খাদ্যঘটিত সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা রহিয়াছে। বাংলাদেশ আজ সমগ্র দেশের মধ্যে পিছাইয়া রহিয়াছে। তথাপি তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের ঈপ্সিত পথে উন্নতি হওয়া সম্ভব।

১৯৪৮ সন হইতে এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব দিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যে, লোকে মনে করে যেন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা যখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তখন হইতে রাজ্যের উন্নয়নকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনাগুলির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, গত বৎসর যখন খাদ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, সেই সময়ে ১৯৪৩ সনের ন্যায় দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে কি করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হইল তাহা চিন্তা করিয়া তিনি সময় সময় বিস্ময় বোধ করেন। তাঁহার এই নিশ্চিত ধারণা আছে যে, ভবিষ্যৎ একথা স্বীকার করিয়া লইবে, ছোট ছোট পরিকল্পনার সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা মানুষের খাদ্য যোগাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা স্থির হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে, সরকার যখন এইরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন তখন মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা দেখা দেয় ও জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িতে থাকে। অন্যান্য কারণ ব্যতীত এই দিক হইতেও নিয়ন্ত্রণ বনাম বিনিয়ন্ত্রণ প্রশ্নটি বিশেষ সতর্ক ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের হাতে কিছু খাদ্য না থাকিলে যাঁহাদের ক্রয় করিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই প্রয়োজনের সময় তাঁহাদের জন্য খাদ্য সংস্থান করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

জীবিকাহীনতার সমস্যা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আজ যে এই সমস্যা রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা কতকটা হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ চায়ের দাম কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চা-বাগানগুলিও তাহাদের প্রয়োজনীয় ঋণ পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা-বাগানগুলিকে শিলিগুড়িতে ১৭।০ টাকা মণ দরে খাদ্য সরবরাহ করিতেছেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, বেকার সমস্যার প্রশ্নটি এত বিরাট যে, এখানে-সেখানে জোড়াতালি দিয়া উহার মীমাংসা হইবে না। বলা হইয়াছে

দূর হইয়া যাইবে। তিনি এই মত সমর্থন করেন না। তিনি খুব ভালভাবে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের বাদ দিলেও প্রত্যেক চাষী পরিবারকে পাঁচ একর করিয়া জমি দিবার মতও যথেষ্ট আমাদের জমি নাই। এই জন্য তাঁহারা অন্য ভাবে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করিতেছেন। চাষীদের জন্য কোন কাজ, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্প জাতীয় কোন কাজ দেওয়া যায় কিনা সরকার তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন। এই চেষ্টায় তাঁহারা কতদূর সফল হইবেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে তাঁহাদের এই চেষ্টা ঐকান্তিক। কারণ তিনি মনে করেন, জীবিকাহীনতা থাকিলে উন্নয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। সরকারপক্ষ হইতে কলিকাতা ও উহার আশেপাশে কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে উহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোকের কর্ম্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, এইরূপ পরিকল্পনায় খুব অধিক সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কাজ করিতে আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহাই হউক, তিনি এইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়া রাখিতেছেন। তিনি শুধু এইটুকু বলিতে পারেন যে, লোকের, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আয়বৃদ্ধির পথ বাহির করিবার জন্য তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। বাজেট আলোচনাকালে সদস্যগণ ইহার পরিচয় পাইবেন।

পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন

নিরাপত্তা আইন একদিকে সরকারের সহজ পথে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সামর্থ্যের অভাব জ্ঞাপক, অন্যদিকে দেশের লোকের ও দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারিবর্গের মধ্যে বিষম অসহযোগিতার নিদর্শন। প্রথম অবস্থার কারণ হয়ত শাসনতন্ত্রের অধিকারিবর্গের আয়ত্তের বাহিরে আছে এমন অনেক কিছু হইতে পারে, যথা বহিঃশত্রুর উস্কানি, উমিচাদি জনবিক্ষোভ, শাসনতন্ত্রের সংবিধানে গলদ, ধর্ম্মাধিকরণের অধিকারীদিগের অপারগতা বা অযোগ্যতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ব্যাপারে সরকারী অবহেলা ও বুদ্ধি বিবেচনার অভাবই বিশেষ দৃষ্ট হয়। দেশের উচ্চতম অধিকারীবর্গ যদি নিজেদের চতুর্দ্দিকে লোহার আগড় দিয়া তাহার ভিতর চাটুকার, ভাগ্যান্বেষী ও স্বদলীয় ফেউ ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ করেন তবে অবস্থা ঐরূপ হইবেই। যাহা হউক ঐ বিল আবার আসিয়াছে।

"বিলটি উত্থাপন করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, এই বিলের একটি উদ্দেশ্য হইল ১৯৫০ সনের পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ আরও তিন বৎসর বৃদ্ধি করা। এই বৎসরই আইনটির মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার কথা। দ্বিতীয় আর একটি উদ্দেশ্য হইল ২১ক ধারা সংশোধন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উহার অসুবিধা দূর করা। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণাদেশ দেওয়া হইবে তাঁহাকে পরামর্শদাতা বোর্ডের নিকট আবেদন করিবার নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ এক সপ্তাহ কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে পরামর্শ-

ডাঃ রায় বলেন যে, আজ যখন শহরে ও রাজ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা দেখা যাইতেছে তখন এইরূপ একটি আইনের প্রয়োজন কি আছে, এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। সদস্যদিগকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন যে, এই সম্পর্কে রাজ্যের অবস্থাই একমাত্র বিবেচ্য নহে। দেশের ভিতরে বা বাহিরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতে পারে। এমন একটা বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে যাহা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি কেবল ইহাই চাহেন যে, এই সকল অবস্থা যাহাতে নিবারণ করা যায়, সরকারের হাতে সেই রকম ক্ষমতা দেওয়া হউক। বাংলাদেশের বাহির হইতে লোক আসিয়া এখানে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। পাকিস্থান হইতে লোক আসিয়া এখানে গোলযোগ বাধাইতেছে। এই সকল ক্ষেত্রের জন্যই এই আইন করা হইয়াছে। প্রচলিত আইনের দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে না।

তিনি বলেন যে, আইনের মূল্য ও ন্যায্যতা তাহার ফলাফলের দ্বারাই বিচার হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত এই আইনে ১২ জন লোকের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক জনের প্রতি এই আদেশ উপদেষ্টা বোর্ড অনুমোদন করেন নাই এবং তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকিলেও তাহা সুবিবেচনার সহিত ও সংযতভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, নিবারণমূলক আটক আইনে গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে মোট ৩৮১ জনকে আটক রাখা হইয়াছিল। আর আজ ৮ জন আটক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে ভারতরাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যের জন্য, তিন জনকে রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যের জন্য ও দুই জনকে চোরাকারবারের জন্য আটক রাখা হইয়াছে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলি নিয়মতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করিতে সম্মত করায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।"

লিখিবার কালে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক শেষ হয় নাই।

জমিদারী প্রথা বিলোপ

আমরা জমিদার নহি, মধ্যস্বত্বের অধিকারীও নহি। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা অদ্ভুত একতরফা বিচার ও রায়দানের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। হয়ত পশ্চিমবঙ্গের জমিদারবর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু চেষ্টা করিতে অক্ষম, অথবা হয়ত তাঁহাদের এ বিষয়ে সম্যক সমর্থন আছে, প্রতিবাদের কিছুই নাই। জমিদারী প্রথায় অন্যায় অনেক কিছু হইয়াছে, অত্যাচারেরও তালিকা বৃহৎ। কিন্তু উপকার কি কিছুই হয় নাই?

স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রগতি এই সকলে জমিদারবর্গের দান. কি নগণ্য? জমিদারের উচ্ছেদ তো হইবে, কিন্তু তাহাদের সাহায্যে যে সকল প্রগতি ও শিক্ষাবিস্তারের পথ সরল হইত তাহাদের কি উপায় হইবে? জমিদারী লোপ হইলে খাস-খামার জমির কি ব্যবস্থা হইবে? ভূদান যজ্ঞের মতে না জনতন্ত্রের মতে? "আনন্দবাজার" পত্রিকা বলেন,

"লবী মহলের আলোচনায় প্রকাশ যে, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ জমিদারী প্রথা ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ সাধন সম্পর্কিত সরকারী বিলটি বিধানমণ্ডলীতে উত্থাপিত হইতে পারে। রাজ্যপালের উদ্বোধন ভাষণে এই সম্পর্কে কিছু উল্লেখও রহিয়াছে।

প্রস্তাবিত বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তবে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ সহ ঐ বিলটি পুনরায় বিধানমণ্ডীর এই অধিবেশনেই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা এখনও সঠিক করিয়া বলা যায় না।

ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্ম গঠিত কংগ্রেস দলের একটি কমিটি তাঁহাদের বিচার-বিবেচনা প্রায় সমাপ্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, ঐ কমিটি যে কয়েকটি বিষয়ে আপাততঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেগুলি নিম্নোক্ত রূপ—

(১) জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের পর খাস সরকারের প্রজারূপে একজন কৃষককে সর্বাধিক কত বিঘা জমি রাখিতে দেওয়া হইবে প্রস্তাবিত আইনে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।

লবী মহলের আলোচনায় প্রকাশ যে, কমিটির কোন কোন সদস্য সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০০ বিঘা হইতে ৭৫ বিঘা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার পক্ষপাতী, এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

(২) একটা ক্রমোচ্চ হারে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মোট জমির নীট আয় যত অধিক হইবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ততই কম হইবে।

(৩) দেয় ক্ষতিপূরণ দীর্ঘমেয়াদী বণ্ডে অথবা নগদ দিতে হইবে। যাঁহারা ছোট ছোট জমিদার বা জোতদার, তাঁহাদিগকে নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রায়তী স্বত্ব করা হইবে কিনা, সে সম্পর্কে আইনগত বাধা আছে বলিয়া এই বিষয়ে কমিটি এখনও কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ।"

ভারতের বস্ত্রশিল্প

ভারতের বস্ত্রশিল্প একটি প্রধান শিল্প। ১৯৫২ সালে ভারতীয় মিলগুলিতে রেকর্ড বস্ত্র উৎপাদন হয়—৪৬০ কোটি ৯০ লক্ষ গজ। এই বছর ১,৮৬,৩৯৯ তকলী বসানো হয় এবং ২,৩০২ তাঁত কাজে লাগানো হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বর্তমান অবস্থা বুঝা যাইবে।

	১৯৫২	১৯৫১	১৯৫০
মিল সংখ্যা	৪৫৩	৪৪৫	৪২৫
প্রদত্ত টাকা (কোটি হিঃ)	১০৭	১০৪	৯৭
মোট তকলী	১১,৪২৭,০৩৪	১১,২৪০,৬৩৫	১০,৮৪৯,০২৬
কার্যকরী তকলী	১০,১০৪,৭১৯	৯,৭৯৮,২৬০	৯,৫১৭,৯৪০
মোট তাঁত	২০৩,৭৮৬	২০১,৪৮৪	১৯৯,৭৭৫
কার্যকরী তাঁত	১৮৭,২৮২	১৮৩,০৪৫	১৮১,১৯৬
মোট তুলার খরচ	৪,১৩২,৬৩২	৩,৬৮৭,১৫৪	৩,৭৮৯,৪৯৪

পৃথিবীতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারতের তকলীর সংখ্যা। ইংল্যাণ্ডের ২ কোটি ৮০ লক্ষ তকলী, আমেরিকার ২ কোটি ৩০ লক্ষ তকলী এবং ভারতের এক কোটি পনের লক্ষ। ১৯৫২ সালে ভারতে ১২৯ কোটি পাউণ্ড মিলের সূতা এবং ৪৬০ কোটি ৯০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। বোম্বাই মিল-মালিকদের হাতে ১,৩০,০০০ গাঁইট বস্ত্র উদ্বৃত্ত আছে, এবং সারা ভারতবর্ষে প্রায় ২,৫০,০০০ গাঁইট বস্ত্র মিল মালিকদের হাতে আছে। কিন্তু সেই অনুপাতে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইতেছে না কেন? পাকিস্থানে নাকি বর্তমানে প্রচুর বস্ত্র চোরা রপ্তানী হইতেছে। ১৯৫২ সালে ১০০ কোটি গজ তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়; ১৯৫১ সালে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ছিল ৪,৯০০ কোটি গজ। ১৯৫১ সালে মাথাপিছু গড়পড়তায় সাড়ে এগার গজ করিয়া বস্ত্র উৎপাদন ছিল এবং ১৯৫২ সালে মাথাপিছু উৎপাদন ছিল ১৩.৮ গজ। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজে মিলের দ্রুত প্রসার হইতেছে। মাদ্রাজের মিলসংখ্যা বর্তমানে ৮৫ থেকে ৯০তে দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৩৬টি মিল আছে, ৪,৬৯,৮৩০ তকলী ও ৯,৮৬২টি তাঁত আছে। মাদ্রাজের প্রসার হইয়াছে সূতা প্রস্তুতের দিকে, আর বাংলার প্রসার হইয়াছে বয়নের দিকে। বোম্বাই রাষ্ট্রে ২১২টি মিল আছে, তাহার মধ্যে বোম্বাই নগরে আছে ৬৫টি মিল ও আমেদাবাদে আছে ৭৪। ভারতবর্ষ বর্তমানে ১০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা তুলা ও ৩০ লক্ষ গজ বস্ত্র আমদানী করে।

পাটের মূল্যহ্রাস

সম্প্রতি পাটের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫২ সনের নবেম্বর মাস হইতে বাজার মন্দা যাইতেছে এবং গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিতেছেন যে পাটের মূল্য কমিলে উৎপাদনও হ্রাস পাইবে। পাটের মূল্যহ্রাস বন্ধ করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গত নবেম্বর মাসে দ্বারভাঙ্গা পাটের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল গাঁইট প্রতি সাড়ে পনের টাকা এবং সরষ পাটের মূল্য ছিল সাড়ে তের টাকা। ফাটকা বাজার বন্ধের পর বর্তমানে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—গাঁইট প্রতি চল্লিশ টাকা উঠিয়াছে। হেসিয়ার মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্ম ফাটকা বাজার বন্ধের সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জুট মিলস এসোসিয়েশানকে ভারতীয় পাট অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবার কথা বলিয়াছেন। বাজারে ধারণা ছিল যে, পাকিস্থানী পাটের অধিকতর আমদানীর ফলে ভারতীয় পাটের চাহিদা হ্রাস পায় এবং মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণমাচারী তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এ কথা সত্য নহে। তিনি বলেন, ১৯৫১ সনের জুলাই-নবেম্বর মাসে ভারতীয় মিলগুলি ১৪ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করে, তাহার মধ্যে পাকিস্থানী পাট ছিল ১১ লক্ষ গাঁইট। ১৯৫২ সনের ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় মিলগুলি ১৭ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করে,

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, যদিও পাকিস্থানী পাটের আমদানী কমিয়াছে, তথাপি আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মিটাইতে হইলে ভারতবর্ষকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্টতর পাকিস্থানী পাট আমদানী করিতে হইবে। ইউরোপের মিলগুলি উচ্চ শ্রেণীর পাকিস্থানী পাট আমদানী করিতেছে এবং তাহাদের উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ভারতের মিলগুলির পক্ষে উৎকৃষ্টতর পাট ব্যবহার করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট গত ডিসেম্বর মাসে পাটের ফাটকা বন্ধ করিয়া যে অর্ডিনান্স জারী করেন, তাহাতে "ফরোয়ার্ড" ও "ফিউচার" সম্বন্ধে কোন তফাৎ করেন নাই। মিলগুলি ফরোয়ার্ড ব্যবসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং রপ্তানী হ্রাসে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর একটি অর্ডিনান্স জারী করেন এবং তাহার দ্বারা ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, ফরোয়ার্ড চুক্তি ব্যাহত হইবে না এবং ফরোয়ার্ড ব্যবসা যথাযথভাবে চলিতে থাকিবে।

১৯৫২ সালে ৪৬ ৭৭ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১৯৫৩ সালের হিসাব অনুসারে ৪৬ লক্ষ ৯৪ হাজার গাঁইট উৎপন্ন হইবে। গত বছরের তুলনায় যদিও বর্তমান বৎসরে পাটের জমি শতকরা ৮ ভাগ হিসাবে হ্রাস পাইবে, তবুও উৎপাদন-হার শতকরা ০.৪ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫২ সালে ১৯,৫১,১৪৮ একর জমিতে পাটচাষ হইয়াছিল এবং ১৯৫৩ সালে ১৮,৩৪,৯৭৯ একর জমিতে পাটচাষ হইবে।

কলিকাতায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবস্থা

বিগত এক সপ্তাহে এই তিনটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :

১। সোমবার ২রা ফেব্রুয়ারী কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটস্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় ৬৫ হাজার টাকার একটি ব্যাগ রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে।

প্রকাশ, ফোর্ট উইলিয়মের এক জন কর্ম্মচারী ব্যাঙ্ক হইতে উক্ত টাকা তোলে এবং একটি ব্যাগে পুরিয়া তিন জন সশস্ত্র মিলিটারী ও এক জন পিয়নের পাহারায় ব্যাগটি রাখিয়া ব্যাঙ্কের অন্য বিভাগে যায়।

পিয়ন ব্যাগের উপর বসে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পকেটে একটা কাগজ রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়। ব্যাগের উপর সে আর বসে নাই। প্রায় কুড়ি মিনিট পর কর্ম্মচারীটি ফিরিয়া আসে, কিন্তু ব্যাগ দেখিতে পায় না। কিভাবে ব্যাগটি অদৃশ্য হইল, মিলিটারী পাহারাওয়ালারা বা পিয়ন কেহই তাহা বলিতে পারে না।

২। শুক্রবার ৬ই ফেব্রুয়ারী ডালহৌসী স্কোয়ারে সরকারী দপ্তর ভবনের কোষাগারে এক বিস্ময়কর ও মারাত্মক ঘটনা ঘটে—সরকারের ২১,৫৭০।/০ আনা খোয়া যায়। কোষাধ্যক্ষকে অচেতন অবস্থায় শৌচাগারে পাওয়া যায়। সেখানে ক্লোরোফর্মের একটি

যতটা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মূল সরকারী দপ্তরের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন এবং সংরক্ষিত অংশের বাহিরে নূতন ভবনের চারতলায় অবস্থিত কোষাগারে ৪২ বৎসর বয়স্ক কোষাধ্যক্ষ শ্রীগোবর্দ্ধন মুখার্জ্জি অনুমান ১২।টা নাগাদ প্রস্রাবাগারে যান। এই সময় অন্ততঃ দুই ব্যক্তি তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগ করে এবং শৌচাগারে লইয়া গিয়া নাক-মুখ বাঁধিয়া রাখে। অতঃপর নিরুপায় কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে চাবির গোছা লইয়া উহাদের মধ্যে একজন সশস্ত্র প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া কোষাগারে প্রবেশ করে ও লৌহসিন্দুক হইতে উপরোক্ত পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করে।

অনুমান অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ঘটনা ঘটিয়া যায়। মিনিট পঁচিশ পর এক ধাঙ্গর শৌচাগার পরিষ্কার করিতে আসিয়া কোষাধ্যক্ষকে সেখানে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পায় এবং এতক্ষণে রাহাজানির ঘটনা প্রকাশ পাইতে থাকে।

সংবাদ পাইয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

৩। রবিবার রাত্রি ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রায় নয় ঘটিকার সময় বিবেকানন্দ রোড ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের নিকটে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ একটি অলঙ্কারের দোকানে এক দুঃসাহসিক ও চাঞ্চল্যকর সশস্ত্র ডাকাতিতে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার লুণ্ঠিত হয়।

ষ্টেনগান ও রিভলবার সজ্জিত দস্যুদল ঘটনাস্থলে গুলীবর্ষণ করে এবং উহার ফলে চার ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুই জন দোকানের মালিক এবং দুই জন পথচারী বলিয়া জানা যায়। আহতগণকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে তথায় তিন জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট আহত ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়াপ্রকাশ।

রাত্রি প্রায় ৮-৫০ মিনিটের সময় আট-নয় জন সশস্ত্র যুবক অকস্মাৎ দোকানটিতে প্রবেশ করিয়া প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই লুণ্ঠনকার্য্য সমাপ্ত করে। দোকান হইতে নিষ্ক্রমণকালে দোকানের লোকজন চীৎকার করিতে থাকিলে তাহারা ষ্টেনগান ও রিভলবার হইতে মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ করিতে করিতে নিকটে অপেক্ষমাণ একখানি মোটরগাড়ীতে আরোহণ করিয়া চম্পট দেয়।

ইহা ভিন্ন সাধারণ ভাবে চুরি ডাকাতি ত চলিতেছেই। লেক অঞ্চলের শরৎ এভিনিউতে এক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর ঘরে রাত্রে সশস্ত্র লোক ঢুকিয়া লক্ষাধিক টাকা মূল্যের অলঙ্কার লইয়া যায়। তাহাও দশ-বার দিন আগেকার কথা।

ইহা ছাড়া স্কুল হইতে বাড়ী যাইবার পথে অল্পবয়স্কা বালিকা অপহরণ এবং পরে ফেরত দিবার পূর্ব্বে বন্দী ছোড়াই টাকার দাবির কথাও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় এক মারোয়াড়ী সদস্য কর্তৃক বিবৃত হয়।

দেখা যাইতেছে লুণ্ঠতরাজ ও দুর্বৃত্তির এক ঢেউ আসিয়াছে,

সাধারণভাবে আইন-কানুন অগ্রাহ্য করার প্রবৃত্তি ত চতুর্দিকেই দেখা যায়। পথে-ঘাটে দেখা যায় বাস চালকগণ রাস্তার মাঝে বাস থামাইয়া যাত্রী উঠান-নামান করে। পথচারী পথিকদের চলিবার ফুটপাথে হাট বসান ত রীতিই দাঁড়াইয়াছে।

প্রকাশ্য রাজপথে মলমূত্র ত্যাগ পূর্ব্বে কলিকাতায় দেখা যাইত না। এখন উহা অতি সাধারণ ব্যাপার। গলিগুলি ত নরকে পরিণত হইয়াছে। "পাঁচ-আইন" বাতিল হইয়া গিয়াছে মনে হয়।

ট্রামে উঠা-নামা দুরূহ ব্যাপার। উহা থামে চলে যাত্রীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি কোনও নজর না রাখিয়া; চালক ও কণ্ডাক্টার দুই জনেই ইচ্ছামত কাজ করে।

লোকের মুখে যাহা শুনা যায় তাহাতে মনে হয় শাসন শৃঙ্খলার ব্যাপার এখন অগ্রাহ্য প্রায়। যদি-বা পুলিস কদাচিৎ কিছু কার্য্য-তৎপর হয়, আদালতে দোষীর বিচার ছেলে-খেলায় পরিণত হওয়ায় কিছুদিন একটু ধরপাকড়ের মধ্যে থাকিয়া পরে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৭৫ ভাগ। যদিই-বা নিম্ন আদালতে দণ্ড হইল, তাহাও হাইকোর্টের "ঠানদি"গণের মায়া-মমতায় বহাল থাকা প্রায় অসম্ভব ইহাও লোকের বিশ্বাস।

জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রশ্ন করিলে শুনি আমাদের নয়া সংবিধান ষোল আনা দোষী-দুর্বৃত্তের সপক্ষে সুতরাং তাঁহারা করিবেন কি? আবার রায়গুলি নিরীক্ষণ করিলে বুঝি ধর্ম্মাধিকরণে যাঁহারা আসন পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কুটতর্ক ও অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনই হইল মুখ্য কার্য্য, ন্যায় বিচার—যাহাতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়, তাহা একান্তই গৌন ব্যাপার।

কলিকাতা উন্নয়ন

সম্প্রতি এই সংবাদগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে:

"কলিকাতার পূর্ব্ব উপকণ্ঠে ৩৮ বর্গমাইল পরিমিত লবণ হ্রদ উদ্ধারের সম্ভাবনা সম্পর্কে ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ মিঃ জে. বি. সিক এবং মিঃ পি. ওয়েষ্টব্রোক ২রা ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডেপুটি মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জীর নিকট তাঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেন। ডাঃ রায়ের আমন্ত্রণে এই বিশেষজ্ঞদ্বয় কলিকাতায় আসেন এবং গত চার সপ্তাহকাল এতৎসম্পর্কে অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালনা করেন।

বিশেষজ্ঞদ্বয় হ্রদ এলাকার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জন্য যে দুইটি পৃথক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ এলাকাকে নগরীর কলেবর বৃদ্ধি, কৃষিকার্য্য এবং দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলে পরিস্রুত জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি লেক খননের জন্য ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কলিকাতা সার্কুলার রেলওয়ে তদন্ত কমিটি মহানগরীর বেষ্টনী রেলওয়ে-ব্যবস্থার সমগ্র পরিকল্পনাটি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য এক্ষণে কলিকাতায় মিলিত হইয়াছেন। এই পরিকল্পনাটিকে তিনটি পৃথক স্তরে ভাগ করিয়া সর্ব্বশেষ স্তরে বালীগঞ্জ, মাঝেরহাট, ফেয়ারলী প্লেস, চিৎপুর ও কাঁকুড়গাছি দিয়া সমগ্র মহানগরী বেষ্টন করিয়া বৈদ্যুতিক সার্কুলার ট্রেন চলাচল-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে ঐ সার্কুলার রেলপথে ষ্টীম ইঞ্জিনচালিত ট্রেন চলাচলের পরিকল্পনা হইয়াছে।

প্রকাশ, কমিটি ঐ পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আগামী মার্চ্চ মাসের শেষভাগে ভারত-সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন। ইতিমধ্যে কমিটির তদন্তকার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ সার্কুলার রেলওয়ে পরিকল্পনাটির মোটামুটি যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে সমগ্র পরিকল্পনায় শহরের উপকণ্ঠে বালীগঞ্জ ষ্টেশনটি স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হইবে, আর শহরের অভ্যন্তরে ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকটে ফেয়ারলী প্লেসে প্রধান নগর ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবে। ইহা ছাড়া চিৎপুর ইয়ার্ড, মাঝেরহাট ও অন্যান্য কতকগুলি স্থানে যাত্রীদের ট্রেনে উঠা-নামা করিবার সুবিধার্থেও কতকগুলি ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবে। বালীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে মাঝেরহাট, ফেয়ারলী প্লেস, চিৎপুর ইয়ার্ড, কাঁকুড়গাছি হইয়া পুনরায় বালীগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত মহানগরীকে পরিবেষ্টন করিয়া এই সমগ্র সার্কুলার রেলপথ একখানি ট্রেনের ঘুরিয়া আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিবে বলিয়া আপাততঃ অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে যে সময় কলিকাতা মহানগরীতে যাতায়াতকারী দৈনিক যাত্রীদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীড় হয়, সেই সব সময়ে ঐ সার্কুলার রেলপথে মহানগরীকে বেষ্টন করিয়া ৮।১০ খানি ট্রেন চলাচল করিবে বলিয়া আশা করা যায়।"

দেখা যাইতেছে আমাদের কর্ত্তাব্যক্তিরা—অর্থাৎ কর্ত্তাব্যক্তি স্বয়ং—কলিকাতার উন্নয়ন লইয়া পুনরায় ব্যস্ত হইয়াছেন।

যাই হউক, শহর বাড়াইতে হইবে ও চলাফেরার পথও সুগম ও দ্রুত পরিক্রাম্য করা প্রয়োজন। সুতরাং নোনাজল ছেঁচিয়া ভরাট করিয়া ডাঙ্গা জমি করিতে হইবে ও সার্কুলার রেলওয়ে বসাইয়া শহরবাসীর চলাফেরার ব্যবস্থার উন্নতি করা হইবে।

শহর বাড়াইলে যে জমি আসিবে তাহার কেনাবেচার ব্যবস্থা বোধ হয় পূর্ব্বাহ্নেই হইবে। আগে তো কলিকাতা চোরপোরেশনের মোটা মোটা দাগীর দল অগ্রিম উন্নয়নের খবর লইয়া সস্তায় জমি বায়না বা দখল করিয়া পরে অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিয়া বিস্তর লুটিয়াছেন। ধাপার চাষের জমি লইয়াও অনেক খেলা খেলা হইয়াছে। এবারের প্রোগ্রাম কি? লুঠের হাট, না ন্যায্য ব্যবস্থা? গোড়ায় তো অজস্র কন্‌ট্রাক্ট ও জমি গ্রহণের (সরকারী) পালা আছেই।

রেলের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আছে। কিন্তু গোড়ায় ষ্টীম ইঞ্জিনের কথা আসে কেন? যে ধরণের রেলের কথা পরিকল্পিত হইতেছে, তাহাতে অল্প অল্প তফাতে ষ্টেশন রাখিতে হইবে, না হইলে উহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। ঐরূপ ক্ষণে ক্ষণে

থামিয়াও দ্রুত চলা সম্ভব একমাত্র বৈদ্যুতিক বা ডিজেলচালিত ইঞ্জিনের। ঐরূপ ইঞ্জিন অতি অল্প সময়েই গতিবেগ বৃদ্ধি (acceleration) করিতে পারে। উপরন্তু ষ্টীমে চালনার জন্য ও বৈদ্যুতিক চালনার জন্য পৃথক আয়োজন। টাকা নষ্ট করিবার ইচ্ছা না থাকিলে শেষে যাহা লাগিবে সেইরূপ আয়োজন করিলেই ঠিক হয়। তবে যদি রদ্দি ইঞ্জিন ও গাড়ী জুড়িয়া ষ্টীম ট্রামের নূতন সংস্করণ করা হয় ত আলাদা কথা।

ছাড়া গরু

২৩শে মাঘের 'যুগান্তর' লিখিতেছেন :

"কলিকাতা শহরের পথ, পার্ক, অলিগলি, গৃহপল্লী সর্বত্র ছাড়া গরু-ও মহিষ ঘুরিয়া বেড়ানো মহানগরীর এমনি একটা সুবিদিত দৃশ্য যে, ইহার আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ইদানীং কড়া ধর-পাকড়ের ফলে এই গো-মহিষ সঙ্কট কিছুটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো রাজপথের উপর যানবাহনের গতিরোধ করিয়া স্ফীতকায় ষাঁড়কে নির্লিপ্ত চিত্তে শালপাতা চর্বণ করিতে দেখা যায়—গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যস্থলেই যত্রতত্র গোময় পরিকীর্ণ খাটালে বহুসংখ্যক গরু-মহিষ বাঁধা থাকিতে অথবা ছাড়া পাইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখা যায়। শহরের স্বাস্থ্য ও নাগরিক যানবাহন চলাচলের দিক হইতে যেমন ইহা প্রভূত ক্ষতিকর, তেমনই মহা-নগরীর শোভা-সৌন্দর্যের দিক হইতেও ইহা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। এই সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাইসেন্সহীন খাটাল নিয়ন্ত্রণ এবং ছাড়া গরু-মহিষ গ্রেপ্তারের যে উদ্যম সুরু হইয়াছে, তাহাতে শহরবাসীমাত্রেই আন্তরিক খুশী হইয়াছেন। এই উদ্যমের ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছে, কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীযুক্ত বি. কে. সেন সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবরণীর সে অংশ অপেক্ষা ইহাতে অন্যান্য তথ্য আর যাহা স্থান পাইয়াছে, তাহাই বেশী মূল্যবান। তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতা নগরীতে মোট ৭৮৬টি খাটাল আছে—তন্মধ্যে মাত্র দশটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত, বাকী সবই বে-আইনী। এই সকল খাটালে ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের রক্ষণাধীনে মোট ৩৩ হাজার গরু-মহিষ আছে—কলিকাতা শহরে প্রাত্যহিক দুধের চাহিদা ১৬ হাজার মণ, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ, অর্থাৎ মাত্র ৫ হাজার ২ শত মণ দুধ সারা শহরে সরবরাহ হয়। এই দুধেরও বড়জোর ৮৩ ভাগ খাস কলিকাতায় সংগৃহীত হয়, বাকীটা আসে বাহির হইতে।"

বিদেশে এই শহরের দুগ্ধ সমস্যা পূরণ করিয়াছে গ্রামের পশু-পালক। সেখানে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য স্পেশাল ট্রেন, গ্রীষ্মকালে দুধ ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য রেফ্রিজারেটারযুক্ত রেলগাড়ী এবং কো-অপারেটিভ ডেয়ারীতে দুধ শোধন ও রক্ষা (পাষ্টুরাইজ করিয়া) ব্যবস্থা এই সবই আছে। সুতরাং দুধের কারবার লাভের হওয়ায় গো-পালন ও গোজাতির উন্নতি হইয়াছে। আমাদের পক্ষে উহা এখন স্বপ্নের অতীত, অন্ততঃপক্ষে নূতন ধরণে দেশ পরিচালনা ব্যবস্থা না হইলে। বিদেশের মত ব্যবস্থা এখানে হইলে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও উত্তর বর্দ্ধমানে, যেখানে গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা এখনও করা যায়, দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যের উন্নতি ও সুপ্রজননের ব্যবস্থা হইত এবং সেখান হইতে দ্রুতগামী ট্রেনে বৃহত্তর কলিকাতায় ও আসানসোলে দুধ চালান যাইত। লণ্ডনে দুধ আসে হলাণ্ড হইতে, ষাট মাইল জাহাজে ও প্রায় নব্বই মাইল ট্রেনে। লণ্ডনে কিছুদিন পূর্ব্বেও দুধের দাম কলিকাতা দরের অর্দ্ধেকেরও কম ছিল।

কলিকাতার ময়লা হইতে জ্বালানী গ্যাস প্রস্তুত

কলিকাতার নর্দ্দমা-নিঃসৃত ময়লা হইতে জ্বালানী গ্যাস প্রস্তুত করার ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণক্রমে জার্ম্মানীর ষ্টাটগার্ট হইতে ডাঃ ফ্রান্‌ৎস্ পোয়েপেল কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। কলিকাতার ময়লা নিঃসরণের পদ্ধতি পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া তিনি বলেন যে, একটি সংযুক্ত কারখানা করিতে কি পরিমাণ ব্যয় হইবে তাহা পরীক্ষাধীন।

উপরোক্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়া সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকা লিখিতেছে, ডাঃ পোয়েপেল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে নর্দ্দমা-নিঃসৃত ময়লা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা যদি জ্বালানী গ্যাস তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয় তবে প্রকৃতপক্ষে বিনা ব্যয়েই অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে, কারণ প্রারম্ভিক ব্যয়ভার মিটাইতে পারিলে আর কোন খরচই লাগিবে না—সমগ্র ব্যবস্থাটি আপনা হইতেই তাহার ব্যয় বহন করিতে সক্ষম হইবে এবং কিছু উদ্বৃত্তও থাকিবে।

ডাঃ পোয়েপেল বলেন, শহর হইতে নিঃসৃত ময়লার পরিমাণ দৈনিক ১২ কোটি গ্যালন—তাহার মধ্যে অনেক কঠিন পদার্থও আছে। নিঃসৃত জল হইতে এই কঠিন পদার্থগুলিকে পৃথক করিতে না পারিলে শুধু যে কুলটি খালই ভরাট হইয়া যাইবে তাহা নয়—কুলটি নদীও বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহার মতে জল হইতে কঠিন পদার্থসমূহ পৃথক করিবার জন্য তপসিয়াতে যন্ত্রস্থাপন করা যাইতে পারে।

তিনি বলেন যে, ময়লার মধ্যে অনেক জৈবিক পদার্থ আছে এবং বেশ ভাল ছাই আছে—কারণ শহরে কাঠ ও গোবর প্রচুর পরিমাণে পোড়ান হয়। এইগুলি পৃথক করিয়া জমিতে দিলে চমৎকার সার হইবে। অবশিষ্ট ময়লা ও আবর্জ্জনা হইতে মিথেন এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করা যাইতে পারে। মিথেন দ্বারা আলো জ্বালানোর কাজ চলিতে পারে। ডাঃ পোয়েপেল হিসাব করিয়া দেখান যে, বৎসরে এইভাবে প্রায় ৮৩,৫৫,০০,০০০ ঘন ফুট মিথেন পাওয়া যাইতে পারে (টালিগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকা ধরিলে ১১৯ কোটি ঘনফুট পরিমাণ মিথেন উৎপন্ন হইবে)। বর্ত্তমানে রাস্তায় আলো দিবার জন্য যে পরিমাণ গ্যাস ব্যবহৃত হয় ইহা

তাহার প্রায় তিনগুণ। উৎপন্ন কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড হইতে প্রায় ৩০,০০০ টন শুধু বরফ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা ছাড়া যে পরিমাণ সার পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে তাহার দ্বারা প্রতি বৎসর ৩১,০০০ একর জমিতে সার দেওয়া যাইবে।

ময়ূরাক্ষীর বাঁধ

২৪শে মাঘ সংখ্যায় "এশিয়া" লিখিতেছেন :

"এই পরিকল্পনার অন্তর্গত হইতেছে বীরভূম জেলার ১৪০০ বর্গমাইল বিস্তৃত ক্ষয়িষ্ণু, পতিত, জলা ও অস্বাস্থ্যকর জমি। ময়ূরাক্ষীর ১৫০ মাইল দীর্ঘ অববাহিকায় কোপাই, চন্দ্রভাগা, বক্রেশ্বর ও দ্বারক নামক আরও যে চারিটি নদী আসিয়া মিশিয়াছে তাহাদের মধ্যে বাঁধ দিয়া, জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাদের অন্তর্গত বিস্তৃত ভূমিতে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। ম্যাসাঞ্জোরে একটা বাঁধ নির্ম্মাণ হইতেছে। ঐ স্থানে দুই পার্শ্বে পাহাড় রাখিয়া ময়ূরাক্ষী ছুটিয়া চলিয়াছিল উদ্দাম গতিতে, সে গতি রুদ্ধপ্রায়। সেখানে এক জল-সংরক্ষণাগার স্থাপিত হইবে এবং ইহা আবার ২৭ বর্গমাইল হইবে। এই সংরক্ষণাগার হইতে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য ১০৫টি খাল খনন করা হইবে। ঐ স্থানে কুটিরশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এই জন্য যে, ঐ বাঁধ হইতে নাকি ২০০০ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে এবং তাহার উৎপাদন-মূল্যও হইবে অত্যন্ত অল্প। এই পরিকল্পনার ফলে ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। বর্ত্তমানে ইহার কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এবং এই পরিকল্পনার সুফলও আমরা পাইতে সুরু করিয়াছি জানিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী দলমতনির্বিশেষে সকলে যে আনন্দ লাভ করিবেন ঐ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। পরিকল্পিত ১০৫৯ মাইল খাল খননের ৪০ ভাগ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আংশিক কার্য্য সমাপ্তির ফলস্বরূপ আমরা গত মরশুমেই ৫০ হাজার টন ধান পাইয়াছি।"

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন প্রথমাংশ সবে শেষ হইয়াছিল। এখন শেষ অংশও অনেক অগ্রসর হইয়াছে ইহা আশার কথা।

জাপানী ধান্য চাষ

ভারতের কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের ২ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামে ধান্য আবাদে জাপানী পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবার আয়োজন করা হইতেছে। এই পদ্ধতিতে চাষ হইলে ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ আরও ৪ লক্ষ টন বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আগামী ১৫ই মার্চ্চ হইতে ব্যাপক প্রচারকার্য্য চালান হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই হাজার প্রদর্শনী ক্ষেত্র খুলিয়া চাষীদিগকে প্রত্যক্ষ কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

এই জাপানী পদ্ধতির বিবরণ আমরা গত মাসে দিয়াছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিতেছি। কিন্তু উদ্যোগ এক এবং কার্য্যসিদ্ধি অন্য। পশ্চিম বাংলায় কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় কৃষি-বিভাগ। ইহার উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে অযোগ্য লোকে ভর্ত্তি। পশ্চিম বাংলা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাও যাহাদের নাই, যাহারা পশ্চিম বাংলা বলিতে বুঝে কলিকাতা—বিশেষে লালদীঘি—তাহারা পশ্চিম বাংলার অভাগা চাষীর উন্নতির ব্যবস্থা করিবে কিরূপে?

এই প্রদেশেই কোথাও চাষী পাইতেছে বিঘায় ১২ মণ ধান, কোথাও পাইতেছে ৪ মণ। আবার এমন জায়গাও আছে যেখানে বিঘায় ১৫ মণ ধান জন্মাইত, আজ সেখানে জলা, জঙ্গল ও পতিত জমি। এখানে নূতন প্রথায় চাষের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে যেরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের বিবেচনার অতীত।

অতি অল্প পরিসর জমিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের অনুরূপ আয়াস-প্রয়াস ও খরচে অনেক কিছুই হইতে পারে তাহার প্রমাণ-রূপে আমরা ১৬ই পৌষের "খাদ্য-উৎপাদন" হইতে, নিম্নলিখিত বিবরণে পাইতেছি :

"যে সকল কৃষক নিজেদের পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ের ফলে ভারতের কৃষির উৎকর্ষ বিধানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর ভারতীয় কৃষি-গবেষণা-পরিষদ হইতে এই "কৃষি পণ্ডিত" সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই বৎসরে যে ছয় জন কৃষক এই বিশেষ সম্মান পাইতেছেন তাঁহাদের নাম ও কৃতিত্বের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) শ্রীজয়পাল চন্দ্র (বুলান্দ শহর, উত্তর প্রদেশ)

এক একর জমিতে ৭৩৫ মণ ২৪ সের আলু ফলাইয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতে প্রতি একরে গড়ে ৭৫'৪২ মণ আলু হয়।

(২) সর্দ্দার গুরুদেব সিং (গ্রাম—কালাল মাজরা, জেলা লুধিয়ানা, পঞ্জাব)—

একর প্রতি ৭১ মণ ২৩ সের ১০ ছটাক গম ফলাইয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতে গড় ফলনের পরিমাণ ৬'৭৬ মণ।

(৩) লম্বরদার ওয়ালিয়াতি রাম (গ্রাম অগওয়ার খাজা, জেলা লুধিয়ানা, পঞ্জাব)—

ইনি এক একর জমিতে ৪৬ মণ ২ সের ৫' ছটাক ছোলা ফলাইয়াছেন। ভারতের একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৫'১৪ মণ।

(৪) শ্রীজম্মা সিং সাঙ্গাইয়া (গ্রাম আলুর, কুর্গ)—

ইনি প্রতি একর জমিতে ১৩৬ মণ ৫ সের ১৪ ছটাক ধান উৎপাদন করিয়াছেন। ভারতে ধানের গড় উৎপাদনের পরিমাণ একর প্রতি ৭'৬৬ মণ।

(৫) শ্রীভীমগোণ্ডা দাদা প্যাটেল (গ্রাম তামাওালগা, জেলা কোলাহ্‌পুর, বোম্বাই)—

প্রতি একর জমিতে ইনি ৮৪ মণ ২৩ সের ৫ ছটাক জোয়ার উৎপাদন করিয়াছেন। অথচ ভারতে জোয়ারের গড় উৎপাদনের পরিমাণ একর প্রতি মাত্র ৩·৯১ মণ।

(৬) শ্রীবামন রামচন্দ্র মারাঠে (গ্রাম আর্থে, জেলা পশ্চিম খান্দেশ, বোম্বাই)—

ইনি এক একর জমিতে ২৯ মণ ১১ সের ১০ ছটাক বজ্‌রা উৎপাদন করিয়াছেন। ভারতে বজ্‌রার গড় উৎপাদনের পরিমাণ হইল একর প্রতি মাত্র ২·৬৯ মণ।

পর পর চার বৎসর যাবৎ উত্তর প্রদেশের কৃষকেরাই আলু প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরের কৃতী কৃষক শ্রীজয়পাল চন্দ্রের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। শস্য প্রতিযোগিতার জন্য তিনি যে জমি খণ্ড বাছিয়া নেন তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ একরের সামান্য বেশী। জমিটি কয়েক সপ্তাহ পতিত অবস্থায় ছিল। পরে ইহাতে ২৪ সের শন লাগান হয়। ১৯৫১ সালে জুন মাসে ইহা চষিয়া ফেলা হয়। তখন প্রায় ২০ মণ হাড়ের গুঁড়া জমিতে দেওয়া হয়। পরে আরও ৭৫০ মণ পচাই সার দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত সারগুলির অর্দ্ধেক পরিমাণ বীজ বপনের পূর্ব্বেই দেওয়া হয়—এবং বাকি অর্দ্ধেক দেওয়া হয় মাটি তুলিয়া সারি বাঁধিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে :

সুপার ফসফেট পৌণে তিন মণ; রেড়ির খইল কুড়ি মণ; এমোনিয়াম সালফেট দুই মণ; ডি. সি. এম. মিকচার ছয় মণ; এবং এক মণ তরল পটেসিয়াম সালফেট। পাটনাই লাল আলুর বীজ এখানে বপন করা হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একর প্রতি পঁয়ত্রিশ মণ হিসাবে ইহা বপন করা হয়। বীজ বপনের এক সপ্তাহ পরে প্রথমে ক্ষেতে জল দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় বার জল দেওয়া হয়। নবেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আরও ছয় বার জল দেওয়া হয়। শেষের তিন বার জলের সহিত পচাই সার মিশাইয়া দেওয়া হয়। শ্রীজয়পাল চন্দ্র একর প্রতি সাত শত টাকা হিসাবে ব্যয় করিয়াছেন। প্রতি একরে প্রায় দুই হাজার টাকা তাঁহার নীট লাভ হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, উৎপাদন সম্পর্কে সন্দেহ না থাকিলেও ব্যয় সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যদি খরচের হিসাব ঠিকও হয় ত আমাদের দেশে কয় জন চাষী বিঘা প্রতি ২৫০ টাকা খরচ করিতে সমর্থ?

সরকারী পক্ষপাতিত্ব

২০শে জানুয়ারীর "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে :

"কংগ্রেস সরকার ভোটের সময় যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য পুরস্কার হিসাবে তিন মাসের চাকুরী দিতেছেন। কাজ হল, লেভী প্রথাকে জনপ্রিয় করার জন্য গ্রাম, থানা ও জেলায় সভা বক্তৃতা মজলিস করিয়া লোকের মনকে লেভীপ্রথার দিকে আকৃষ্ট করা। সময় তিন মাস, বেতন মাসিক দেড় বা আড়াই শত। মুর্শিদাবাদের বিশ থানায় জন্য বার জন থানাদার ও এক জন জেলা অফিসার চাকুরীতে বহাল হইয়াছেন। শুনিয়াছি জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ সিংহ বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে যে তালিকা দিয়াছিলেন তদনুসারে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। এই প্রথা বাংলার সমস্ত জেলাতেই সম্ভবতঃ চলিয়াছে। জেলার বাহিরের লোকও থানাদার হইয়াছেন এবং থানা চিনিতে তাঁহাদের অন্ততঃ দেড় মাস লাগিবে, বাকি দেড় মাসে তাঁহারা অবশ্যই লেভী-প্রথাকে জনপ্রিয় করিবেন এবং সাম্যবাদী বিরুদ্ধ দল ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। আমাদের মতে পশ্চিম বাংলার খাদ্যবিভাগ এই টাকাগুলির খরচ বহন করিবেনই, তখন ভদ্রসন্তানদের অনায়াসে তিন মাসের হয়রানী হইতে রক্ষা করিয়া অন্য কোন উপায় করিতে পারিতেন। পুরস্কার দেবার অনেক উপায় আছে।"

মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ড

মেদিনীপুরবাসীর নূতন মুখপত্র "মেদিনীপুর পত্রিকা"র ১৬ই মাঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যে জেলা স্কুলবোর্ড সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে :

"মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ড সম্পর্কে অভিযোগের অন্ত নাই এবং স্কুলবোর্ড-কর্তৃপক্ষের অস্বাভাবিক নীরবতা অভিযোগগুলিকেই সমর্থন করে।

"বর্ত্তমান অভিযোগ নূতন সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে এবং এই অভিযোগটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

"জেলা স্কুলবোর্ডের সদস্যসংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১০টি এবং জেলাবোর্ডের পক্ষ হইতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদিগকে ধরিলেও মাত্র ১৫টি অর্থাৎ পদাধিকারবলে ও মনোনীত সদস্য একত্রে—নির্ব্বাচিত ও অর্দ্ধ-নির্ব্বাচিত সমবেত সদস্য সংখ্যার অপেক্ষা অধিক। এরূপ অবস্থায় যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির নির্ব্বাচন সবে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সব নির্ব্বাচিত সদস্যকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই যেন তাড়াহুড়া করিয়া ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে সদস্য হইবার আবেদনপত্র দাখিলের শেষ দিন ধার্য্য ও পুরাতন সদস্য-দিগের ভোট দিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার অপচেষ্টা কর্তৃপক্ষের গদী আঁকড়াইয়া রাখিবার উদগ্র লোভেরই একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়।

"আমরা চাই বর্ত্তমান স্কুলবোর্ড পুনর্গঠিত হোক এবং সর্ব্বপ্রকার অব্যবস্থার অবসান ঘটুক। একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হোক।

"নবগঠিত জেলা স্কুলবোর্ডে দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত প্রকৃত জ্ঞানী গুণী ও নির্লোভ শিক্ষাবিদ্‌দের প্রাধান্য হোক ইহাই আমরা দেখিতে চাই।"

জোতকমলের শিল্প-কাহিনী

রঘুনাথগঞ্জ হইতে নব-প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "ভারতী"তে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার জোতকমলের শিল্প-কাহিনীর এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহার সারাংশ আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম :

"জোতকমল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহকুমার একটি গ্রাম। শ্রী সরকারের কথায় "রেশম শিল্পের একটি ছোটখাট কেন্দ্রই ছিল জোতকমল। এখানে কোয়া তৈয়ারী এবং কোয়া কাটা হইত। তারপর গ্রামের রেশম হইতে সুন্দর সুন্দর শাড়ী, গাউনপিস, চাদর, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এখন গ্রামে রেশম উৎপন্ন হয় না, কাজেই বাহির হইতে রেশম আমদানী করিয়া তন্তুবায়গণ কাপড় বুনিয়া থাকে। মির্জ্জাপুর অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা অগ্রিম রেশম দিয়া জোতকমলের তাঁতিদিগকে দিয়া কাপড় বুনাইয়া লয়। ঐ সব মাল কলিকাতা ও বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

"এই গ্রামের কাঁসারীরা নানা রকম কাঁসার বাসন তৈয়ারী করে। সাধারণতঃ ইহারা পুরাতন কাঁসা ক্রয় করিয়া তাহা গলাইয়া নূতন জিনিষ তৈয়ারী করে। নূতন রাঙ, দস্তা, তামা যথেষ্ট পরিমাণে পাইলে ইহাদের হাতে এই শিল্পের সমধিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নির্মিত দ্রব্য-সমূহ মেসিনে পালিস করার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বাজারে উহাদের চাহিদা আপনি বাড়িবে।

"এখানে সোনার মাদুলী তৈয়ারী করে প্রায় সত্তর ঘর কারিগর। তাহারা মাদুলী তৈয়ারী ভিন্ন অন্য কাজ জানে না। ফলে ইহার বাজার পড়িয়া যাওয়ায় এই শ্রেণীর লোকদের ভয়ানক অসুবিধা হইয়াছে।

"এই গ্রামে বীরবংশ বলিয়া এক জাতীয় লোকের বাস আছে। সামাজিক সকল প্রথায় সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত। জাত-শিল্পী এই বীরবংশীয়েরা চমৎকার বাঁশের চাটাই, খাঁজুরী, ঝুড়ি, কুলা ও চালুনি ইত্যাদি তৈয়ারী করে।

"জোতকমলের মাটির হাঁড়ি এবং অন্যান্য জিনিষের নাম আছে এ অঞ্চলে বেশ। হাঁড়ি ক্রয় করে মুসলমানেরা বেশী, কাজেই হাঁড়ির বাজারও মন্দ নয়। অসুবিধা—এই গ্রামের কুম্ভকারদের নিজস্ব মাটি নাই। মেদিনীপুর জমিদারী কোং এর একটি উহর রাস্তা ছিল তাহা হইতে এতকাল ইহারা মাটি সংগ্রহ করিত। কয়েক বৎসর ঐ উহর প্রজা-বন্দোবস্ত হওয়ায় ইহাদের কাজের বিঘ্ন হইয়াছে। সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিভাগের এই ধরণের শিল্পের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

"এই গ্রামের ছুতারেরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ীর চাকা, কপাট, চৌকাঠ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। বর্ত্তমানে বাবলা কাঠ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইহারা খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

"জোতকমলের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিছু লোক বেতের মোড়া, ধামা, আড়ি, পাল্লাতাড়াজু প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া থাকে। রাজবংশীদের মত ইহাদের মেয়েরাও পুরুষদিগের এই সব কাজে যথারীতি সাহায্য করিয়া থাকে।

"জোতকমলের রাজমজুর শুধু মুর্শিদাবাদ নহে, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ব্যাপকভাবে ইমারত শিল্পের কাজ করিয়া থাকে।

"সম্প্রতি যে সব রিফিউজী এখানে আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ জেলে. জাল বুনিয়া মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পূর্ব্ববঙ্গের এই সব জেলে, মনে হয় আমাদের দিকের মৎস্য ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা দক্ষ ও পরিশ্রমী। নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ইহারা যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে আর যাহাই হউক জোতকমলের শিল্পগৌরব বাড়িয়াছে বলিতে পারা যায়।"

পশ্চিমবঙ্গে এরূপ আরও অনেক জোতকমল রহিয়াছে। অবহেলা ও অনাদরে সেখানের কুটীরশিল্প ধ্বংস হইতেছে। সেকথা বলে কে, শোনেই-বা কে?

বাঙালী কোথায়

আসানসোল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" ১৩ই মাঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন :

"নিখিল-ভারত কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনে বাঙালীর অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগাইতে হয়।...প্রকৃতপক্ষে যে বাঙালী কংগ্রেস গড়িয়াছে এবং এই সেদিন অবধি যে বাঙালীর পরামর্শ লইবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিক হইতে দিক্‌পালগণ বাংলায় ছুটিয়া আসিতেন—এলাহাবাদ হইতে মালবীয় ও মতিলাল আসিতেন, মহারাষ্ট্র হইতে লোকমান্য তিলক ও খাপার্দ্দে আসিতেন, সুদূর পঞ্জাব হইতে আসিতেন বৃদ্ধ লাজপৎ রায় এবং সবরমতীর আশ্রম ছাড়িয়া মহাত্মা গান্ধী, সেই বাঙালী আজ কংগ্রেসে নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার যেন কোন বক্তব্যই নাই...।

"বর্ত্তমানে বাঙালীর যাহা জীবনমরণ সমস্যা, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন বা বাংলার আয়তন বৃদ্ধি সেই সম্পর্কে যখন কংগ্রেসে আলোচনা চলিয়াছে তখনও বাঙালী প্রতিনিধিবর্গের মুখে 'টু' শব্দটি শোনা যায় নাই। অথচ বাংলার বিধান পরিষদ হইতেই এ বিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে...।"

"বঙ্গবাণী"র অভিমতে এই আচরণের একমাত্র কারণ এই যে, বাংলার প্রতিভায় দৈন্য দেখা দিয়াছে। আজ সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী যে ক্রমশঃই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে তাহার জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। কারণ "জাতি বড় হয় আপন তপস্যায়, অধ্যবসায় ও শ্রমে এবং ছোট হয় তাহার অভাবে। আমাদিগের মধ্যে বড় হইবার যে সাধনা, সে তপস্যার নিশ্চয়ই অভাব ঘটিয়াছে। না হইলে এ শোচনীয় অধঃপতন হইত না।"

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টার বর্ণনা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" লিখিতেছেন যে, দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি প্রায় ভাঙনের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। অবিভক্ত বাংলায় যদিও সকল পাটই উৎপন্ন হইত পূর্ব্ববঙ্গে, ১০৮টি চটকলের প্রত্যেকটিই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত; যদিও অবিভক্ত বাংলায় শতকরা ৬৫ ভাগ ধান উৎপন্ন হইত পূর্ব্ববঙ্গে তথাপি মোট ৪৯৭টি চাউলকলের মধ্যে ৪১৮টিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এইভাবে দেখা যায় যে, তামাক, তূলা প্রভৃতি পণ্য পূর্ব্ববঙ্গেই অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও তামাক তৈয়ারীর সকল আধুনিক কারখানাই এবং অধিকাংশ কাপড়ের কলই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভারসাম্য দেশ-বিভাগের ফলে কতদূর বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। তাহার উপর আবার দেখা দেয় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সমস্যা

গত বৎসরে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, ১৯৫২ সনের জানুয়ারী মাসে বিবর্তনমূলক আটক আইনে ৩০৮ জন বন্দী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ২৭১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত। সকল বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ছয় জন এখনও পর্য্যন্ত আটক আছেন।

১৯৫২-৫৩ সনে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বখাতে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪৬-৪৭ সনে অবিভক্ত বাংলায় উক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। কোনপ্রকার করভার বৃদ্ধি বা নূতন কোন কর ধার্য্য না করিয়াই আয়বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। অনুৎপাদিকা উন্নতিমূলক পরিকল্পনাখাতে দেশ-বিভাগের পর হইতে ১৯৫২-৫৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে পাওয়া গিয়াছে মাত্র ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। উৎপাদক উন্নতিমূলক পরিকল্পনাগুলির জন্ত ঐ সময়ে ৫০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৩৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫২।৫৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্ত ২০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যতীত বাকী টাকা কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য বা ঋণ হিসাবে দিয়াছেন।

আয়-বৃদ্ধির সকল সম্ভাব্য চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫২-৫৩ সনের শেষে ৩৭৪ লক্ষ টাকার ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে রাজ্য সরকার মোট ৬১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৫২ সনের ২রা অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এলাকার আয়তন ৬৮১.৫ বর্গমাইল। ৪৩২,৫০৭ জন লোক (৯৯,০৭৯টি পরিবার) এই স্থানে বাস করেন। পরিকল্পনাটি আটটি ব্লকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্লকের অধীনে ১৫০টি গ্রাম থাকিবে এবং সেখানে একটি গ্রাম্য-শহর (village township) নির্ম্মাণের কথা আছে। স্থির হইয়াছে যে, এইরূপ প্রত্যেকটি শহরে ১৫০০ হইতে ২০০০ হাজার মধ্যবিত্ত পরিবার বাস করিতে পারিবে। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তাহারা গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে নিযুক্ত হইবে। শহরে সস্তায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা হইবে এবং রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয়, পাঠাগার ও হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যয় হইবে ৩.৩৩ কোটি টাকা; তন্মধ্যে শতকরা দশ টাকা ডলারের জন্ত ব্যয় হইবে এবং এই টাকা ভারত-মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সাহায্য হইতে পাওয়া যাইবে

আচার্য্য শিবনাথ স্মরণে

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর ১০৭তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চব্বিশ-পরগণার জয়নগর-মজিলপুর হইতে প্রকাশিত "বন্ধু" পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত সাধক শিবনাথ "আজীবন দীপ্তিময় নব-সূর্য্যের ন্যায় দুঃসাহস ও জলন্ত কর্ম্মশক্তি লইয়া চিরদিন আপন আদর্শের পথে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন। মায়ার বন্ধন, জননীর মর্ম্মভেদী আর্তনাদ, আত্মীয়স্বজনের নিন্দা, দারিদ্র্যের কশাঘাত কিছুতেই তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই।" তাঁহার গ্রাম এবং তখনকার সমাজ তাঁহার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তবুও তিনি তাঁহার গ্রামবাসীকে ত্যাগ করেন নাই। এই সত্যব্রতী সাধক সারা ভারতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে ব্রতী থাকিয়াও গ্রামে দলাদলি বলিয়া সরিয়া পড়েন নাই। তিনি ছিলেন হিতৈষিণী সভার জাগরক্ষক, গ্রন্থাগারের কর্ণধার। 'বন্ধু' লিখিতেছেন যে, "ইহাই তাঁহার হৃদয়শীলতার পরিচয়—উদ্যোগী অক্লান্ত কর্ম্মী পুরুষের ইহাই বিশেষত্ব।"

আচার্য্য শিবনাথের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কিন্তু বাংলার এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার সেবাধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ—যাহার ফলে সুদূর মাদ্রাজ ও লাহোর পর্য্যন্ত তিনি প্লেগ, বসন্ত, কলেরা রোগীর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহার বাংলা-সাহিত্যে দান এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেম, এ সকলের কথাই এখন আমরা ভুলিয়াছি।

বরিশাল কনফারেন্সে নেতৃবর্গ প্রহৃত লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তার হইবার পর দেশে একটা ভয়ের ঢেউ ছুটে। কলিকাতায় সভা বন্ধ হয়, জেলায় জেলায় প্রচারও বন্ধ হয়। শিবনাথ ব্যাকুল হইয়া স্বাধীনতার শিখা জ্বালাইয়া রাখিবার জন্ত সহকর্ম্মীদিগকে লইয়া এই কার্য্যে

নামিয়া পড়েন। বস্তুতঃ তাহার পর কয়েক মাস উঁহাদের এই দেশ-সেবা ও প্রচারের ফলেই লোকের মনে সাহস ফিরিয়া আসে। সে কথা আজ জানে কে? মিথ্যারই ত আজ জয় জয়কার!

প্রজা-পরিষদ আন্দোলন

জম্মুতে প্রজা-পরিষদ আন্দোলনের যেরূপ গতি চলিতেছে তাহাতে দুশ্চিন্তার কারণ রহিয়াছে। ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের মুখপাত্রগণ এবং শেখ আবদুল্লা বহুবিধ অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাহা দেশের সংবাদপত্রসমূহে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আন্দোলন পরিচালনাকারীদিগের বিবৃতি অতি সামান্যই উহাতে স্থান পাইয়াছে। ইহা সমুচিত নহে।

সম্প্রতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জনসঙ্ঘদল এ বিষয়ে প্রজা-পরিষদকে সমর্থন করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তব্যও এতদিনে স্পষ্ট হইতেছে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জম্মুর প্রজাপরিষদ আন্দোলনের নেতাদের লইয়া এক সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রজা-পরিষদের নেতৃবৃন্দ যাহাতে প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। এই সম্মেলনে জম্মুর আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে খোলা মনে আলোচনা হইবে।

দিল্লীর গান্ধী ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ডঃ মুখার্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যে সব গালাগালি ও কুৎসা প্রচার করা হইয়াছে, তিনি সেগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ জম্মুর আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই তাঁহার কাম্য। আলোচনার সময় আন্দোলন বন্ধ থাকিবে এবং এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইবে, যাহাতে ভারত, জম্মু ও কাশ্মীরের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলির বিবেচনা চলিতে পারে।

সম্প্রতি যে কমিশন গঠন করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ডঃ মুখার্জি বলেন যে, ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ কোন স্থানীয় কমিশনের পক্ষে মূল বিতর্কমূলক প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা সম্ভব নয়। আর্থিক বিষয়ে অভিযোগ, বৈষম্য, পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে মূল অভিযোগকারীদের অনুপস্থিতিতে কমিশনের পক্ষে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বার বার জম্মুর সমস্যা ধামা-চাপা দেওয়া হইয়াছে এবং শেখ আবদুল্লা জম্মুর অধিবাসীদের মনোভাব পুরাপুরি বুঝিতে পারেন নাই।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে, জম্মুর প্রজা-পরিষদ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবিরোধী বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। তিনি বলেন, প্রজা-পরিষদ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুই প্রকার। প্রজা-পরিষদ চূড়ান্ত ভাবে কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি চায়, যাহাতে উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। ভারত অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হয় নাই, কাশ্মীর ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত বলিয়া কাশ্মীরে পাকিস্থানের আক্রমণের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারত অভিযোগ আনিয়াছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে সকল বিষয়ে কাশ্মীরের ভারতে যোগদান। জম্মুর অধিবাসীরা চায়, তাহাদের রাজ্য অপরাপর 'খ' রাজ্যগুলির ন্যায় শাসিত হউক। এই দাবি কি ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইল, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

ভূদান আন্দোলন ও ভূমিসমস্যা

ভূদান আন্দোলনের সমালোচকেরা বলেন যে, ভূদান আন্দোলনের ফলে জমি ভাগ হইয়া আরও ছোট ছোট ক্ষেতে পরিণত হইবে।

শ্রী ইউ. কেশব রাও ১৭ই জানুয়ারীর "হরিজন" পত্রিকায় এই বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়া সমালোচনার জবাবে লিখিতেছেন যে, প্রকৃত তথ্য বুঝিতে হইলে ভূদান যজ্ঞ সমিতির ভূমিবণ্টন পদ্ধতিটি জানা দরকার। হায়দরাবাদে ভূদানে প্রাপ্ত ভূমি বণ্টন করিবার পদ্ধতি নিম্নরূপ: "(১) পরিবার প্রতি এক একর সিক্ত জমি অথবা মাথাপ্রতি এক একর শুষ্ক জমি বণ্টন করা হইবে। তবে স্থানীয় অবস্থা মত সমিতি ভাল বুঝিলে ইহার কম-বেশি করিতে পারিবেন।

"(২) ভূদানে প্রাপ্ত জমি যদি কোন ভূমিহীন কৃষকের দখলে থাকে তবে মাত্র সেই কৃষককেই ঐ ভূমি দেওয়া হইবে। যজ্ঞ-প্রাপ্ত ভূমি দখলে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সমিতি যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।"

সংগৃহীত ৩৩,০০০ একর ভূমির মধ্যে সমিতি এ পর্য্যন্ত ৮,১১৯.২৫ একর ভূমি বণ্টন করিয়াছেন। শ্রী রাও একটি তালিকার সাহায্যে কোন্ শ্রেণীর জমি কি ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেখান যে, কয়েকটি পরিবার ২৫ হইতে ৫০ একর জমি পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া সম্মিলিত কৃষিকার্য্যের জন্যও ১,৩৩৯.২ একর শুষ্ক জমি ৯০টি সমিতির হাতে এবং ৬৫.১৭ একর সিক্ত ভূমি ২৩টি সমিতির হাতে সম্মিলিত ভাবে চাষ করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই সম্মিলিত চাষের জমিগুলি আর খণ্ডিত হইবার ভয় নাই। উপরন্তু ভূদানপ্রাপ্ত ভাগচাষে দেওয়া জমি ঐ ভাগচাষীদের মধ্যেই বণ্টন করা হইয়াছে। "অতএব", শ্রী রাও বলেন, "জমি খণ্ডিত হইবার কথা উঠে নাই" এবং "ভূমি খণ্ডন খুব কম হইয়াছে। খণ্ডিত করিবার প্রয়োজন হইলে চাষের সুবিধা রাখিয়া বণ্টন করা হইয়াছে, নচেৎ চাষের অযোগ্য দেখিলে গ্রহীতা উহা লয় না।"

"বন্ধনমুক্ত তিব্বতে"

"সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ ও অভিমত" পত্রিকায় শ্রী ওয়াই. বেরোজিনা লিখিতেছেন যে, যদিও তিব্বত খনিজ সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী তথাপি হাল আমল পর্য্যন্ত তিব্বত ছিল চীনের সবচেয়ে অনগ্রসর প্রত্যন্ত প্রদেশ। তিব্বতের অধিবাসীদের প্রধান পেশা এবং

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমাত্র পেশা ছিল পশুপালন। কৃষিপদ্ধতি ছিল অতিপ্রাচীন এবং অনুন্নত। তিব্বতের বেশির ভাগ কৃষকই ছিল ভূমিহীন চাষী। তাহারা কাজ করিত ভূস্বামী ও মঠ-বিহার-গুলির জোত জমিতে। বৃহৎ শিল্পের কোন অস্তিত্বই সেখানে ছিল না। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ছিল একমাত্র কুটিরশিল্প। তিব্বতের রাজধানী লাসায় ছিল মাত্র গুটিকয়েক মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, একটি গালিচার কারখানা, টাঁকশাল ও একটি ছোট জলবিদ্যুৎ পাওয়ার ষ্টেশন।

"১৯৫১ সালের ২৩শে মে চীনের লোকায়ত্ত সরকারের সহিত তিব্বত সরকারের এক চুক্তি হয় এবং চীনের জনগণের মুক্তি ফৌজ তিব্বতে প্রবেশ করে। এই মুক্তি ফৌজ সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের (গিরিসঙ্কট) উপর দিয়া তৈয়ারী করিল সিকাং-তিব্বত রাস্তা। চীনের প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে এই সিকাং-তিব্বত রাস্তা যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং চীন দেশের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তিব্বতের যোগসূত্র আরও দৃঢ়তর করিবে।

"চীনের মুক্তি ফৌজ তিব্বতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ প্রদেশের বেকার ও গরীবদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অভাবগ্রস্ত কৃষকরা ও কুটিরশিল্পের কারিগররাও লোকায়ত্ত চীনের কেন্দ্রীয় সরকার ও পিপলস ব্যাঙ্ক অব চায়নার নিকট হইতে ঋণ সাহায্য পায়। বিগত দুই বৎসরে সঞ্চিত প্রচুর পরিমাণ পশমের রপ্তানীর জন্য বিবিধ চুক্তি সম্পাদন করিয়া তিব্বতের ষ্টেট ট্রেডিং কোম্পানী হাজার হাজার মেষপালককে ধ্বংস ও বুভুক্ষার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। সমগ্র তিব্বতে গঠিত হইয়াছে উৎপাদন কমিটি। চীনা সৈনিকেরা ভূমি কর্ষণের কাজে কৃষকদের সাহায্য করিতেছে, তাহাদের জন্য চাষবাসের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতেছে এবং কয়লা সম্পদ ব্যবহারের কাজ আরম্ভ করিয়াছে।"

মস্কোর সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদল

'টাসে'র সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে জানুয়ারী সোভিয়েট শান্তি কমিটির দপ্তরে ভিয়েনা শান্তি সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি-দল (সোভিয়েট দেশ সফরকারী) এক সাংবাদিক সভায় যোগদান করেন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সকল সভ্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি পাঠ করেন নিখিল-ভারত শান্তি পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডঃ কুমারাপ্পা। ঐ বিবৃতিতে বলা হয় যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদল সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশ করিবার পর সোভিয়েট শান্তি কমিটি তাঁহাদের প্রতিটি অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। সেখানে ২৫ দিনের সফরের কর্মসূচী প্রতিনিধিদল নিজেরাই প্রস্তুত করেন। তাঁহারা মস্কো, লেনিনগ্রাড, ষ্টালিনগ্রাড এবং জর্জিয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করেন এবং সোভিয়েট সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও বিশিষ্ট পদস্থ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি-দল, বলেন "আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই পেয়েছি অগাধ প্রীতি। ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সোভিয়েট জনগণ বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে।"

শ্রেণীসংগ্রাম ও কম্যুনিজম্

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "শ্রেণীসংগ্রাম ভারতের প্রকৃত সত্তার বিরোধী।...আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, শ্রেণীসংগ্রাম রোধ করিবার জন্য আমি আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিব...

"পাশ্চাত্য দেশে সোস্যালিজম্ ও কম্যুনিজমের আদিতে কয়েকটা ভাব আছে—তাহা আমাদের হইতে মূলতঃ ভিন্ন। এইরূপ একটা ভাব হইল, মানব প্রকৃতির মূলগত স্বার্থপরতায় তাহাদের বিশ্বাস। আমি কিন্তু ইহা সমর্থন করি না—কারণ আমি জানি, মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ হইল এই যে, মানুষ তাহার অন্তর-বাসী আত্মার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে, যে সকল প্রবৃত্তি মানুষ ও পশুতে সমভাবে বিদ্যমান মানুষ সেই সকলের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে এবং সেইজন্য তাহার স্থান পশুপ্রকৃতিসুলভ স্বার্থপরতা ও হিংসার ঊর্দ্ধে।...

"পাশ্চাত্য হইতে আমদানি করা লাগসই কথা বা মনভোলানো ধ্বনি দিয়া আগে হইতে আমাদের মাথা ভর্ত্তি করিয়া রাখিলে চলিবে না। আমাদের প্রাচ্যের বিশেষ ঐতিহ্য কি নাই? মূলধন ও শ্রম-সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান আমরা স্বকীয় পন্থায় করিতে পারি না কি?...পাশ্চাত্য পন্থায় আমি আপত্তি করি, কারণ সেই পথের শেষে রহিয়াছে সর্ব্বনাশ—আমি তাহা দেখিয়াছি। পাশ্চাত্য দেশেও আজ চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহাদের সমাজ-ব্যবস্থা যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া ভয়ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।...জন-সাধারণের দারিদ্র্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য সোস্যালিজম্ বা কম্যুনিজম্ যাহা বলিয়াছে তাহাই সমস্যা সম্পর্কে শেষ কথা এরূপ মনে করা নিশ্চয়ই ভুল।" (হরিজন ২৪।১।৫৩)

শ্রীমগনভাই দেশাই ৩রা জানুয়ারি 'হরিজন' পত্রিকায় উক্ত বিষয় সম্পর্কে লিখিতেছেন, "গণতন্ত্র মুক্তির পথ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া কম্যুনিজম্ বা বলশেভিজমের একনায়কত্বের বিধান ইহাতে নাই। অতএব গণতন্ত্রের আদর্শ কম্যুনিজমের মত বস্তু-তান্ত্রিক নহে। সামাজিক মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যেই গণতন্ত্রের আশ্রয়। অতএব গণতন্ত্র আধ্যাত্মিক সূত্রবিশেষ। কম্যুনিজম্ ও গণতন্ত্রের মধ্যে ইহাই মৌলিক পার্থক্য।"

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অবাঞ্ছনীয় হইলেও অগত্যা স্বীকার্য্য মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে সমাজ পরিচালন অবিমিশ্র শুভদায়ক নহে। সহযোগিতাকে স্বধর্ম্ম রূপে গ্রহণ করিবার শিক্ষাই গণতন্ত্রের প্রকৃত আশ্রয় হইতে পারে, রাষ্ট্র কর্তৃক বলপ্রয়োগের শক্তি গণতন্ত্রের প্রকৃত আশ্রয় হইতে পারে না।

শ্রী দেশাই এই প্রসঙ্গে রাজাজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। রাজাজী বলিতেছেন, "আমাদের একটি সংস্কৃতি চাই এবং ভাল-মন্দের একটি সর্ব্বস্বীকৃত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকা চাই। এই মূল্যবোধ

মানুষের অন্তরে নিয়মানুগত্য জাগ্রত রাখিবে। এই আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুগত্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বস্তুগত পরিকল্পনা চালু করিলে মানুষের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতি ও মিথ্যাচার দেখা দেয়।"

আজ পৃথিবীর জনসাধারণের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দিয়া শ্রী দেশাই বলিতেছেন: "ব্যক্তিগত মুনাফা সংগ্রহ করিবার অধিকার ঈশ্বরদত্ত এই কথা শোনাইবার যুগ ফুরাইয়াছে। সমাজ যদি সমূহের কল্যাণদৃষ্টিতে ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহে তবে তজ্জন্য গুপ্তচর এবং পুলিশের লোক প্রজার কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখিবে এই ব্যবস্থার উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি না। তজ্জন্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে আনন্দের অনুভূতিলাভ হইবে এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবন আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

পৌরপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সতর্কবাণী

২৬শে জানুয়ারী তারিখের "পিপল" পত্রিকায় প্রকাশ যে, উত্তর প্রদেশ সরকার স্থানীয় ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি এক কঠোর সতর্কবাণীতে বলিয়াছেন—ভবিষ্যতে তাঁহারা আর এই প্রতিষ্ঠান-গুলিকে পোষণ করিবেন না, যদি না তাহারা নিজেদের উন্নতিবিধানে সমর্থ হয়। সাবধানবাণীতে বলা হইয়াছে যে, আইন অমান্য করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাহাদের কার্য্যকরী সভ্যদের নিকট হইতে অতিরিক্ত খরচ আদায় করা হইবে। তাহাতেও উন্নতির লক্ষণ না দেখা দিলে সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাতিল করিয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

রাজ্যের অধিকাংশ পৌরপ্রতিষ্ঠানেই কর যথারীতি আদায় হয় না; ফলে আয়ের পরিমাণও অযথা হ্রাস পায়। তাহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন পেশার উপর এবং বাড়ীর উপর যে হারে কর ধার্য্য করা হয় উত্তর প্রদেশে সেই করের হার অত্যন্ত কম।

কিছুদিন পূর্ব্বেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন—কিন্তু আয়বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই করা হয় নাই, যদিও সরকার এ দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ত্তমানে করবৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত নহে। কারণ সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা স্মরণ রাখিয়া করভার বৃদ্ধি করিয়া কেহই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে চাহে না। অবশ্য যে দলের হাতেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির শাসনভার থাকুক না কেন করের হার বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আর বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিবিধানের পথ নাই।

সরকার পক্ষের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা অনেক সহ্য করিয়াছেন কিন্তু আর তাঁহারা এই বৈষয়িক অব্যবস্থা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। পৌরপ্রতিষ্ঠানসমূহ জনসাধারণের নিকট তাহাদের দুরবস্থা বিবৃত করুক সরকার তাহাই চাহেন। নাগরিকগণ যদি অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দাবী করেন তবে তাঁহাদিগকে অধিকতর ত্যাগ-স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, না হইলে তাঁহারা সেই সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই সতর্কবাণী যথাসময়ে দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, ইহার ফলে নাগরিকগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যেন তাঁহারা সেই সকল লোকের কথায় বিভ্রান্ত না হন যাহারা জনসাধারণকে কোনপ্রকার ক্লেশস্বীকার ব্যতীতই সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেয়।

নূতন কর না বসাইলে খরচ কমাইতে হইবে। তাহাতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অনেক হ্রাস পাইবে।

বাংলা দেশের পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও কোন দিক হইতেই উত্তর-প্রদেশ অপেক্ষা ভাল নহে। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিই ঋণের দায়ে জর্জ্জরিত। প্রায় সবগুলিরই আদায়ের কাজে বহু জের পড়িয়া আছে এবং প্রতি বৎসর অজস্র ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও কোন মিউনিসিপ্যালিটিই করের হার বৃদ্ধি করিতে সম্মত নহে। রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ এবং তাহাতে আলোর ব্যবস্থা করা, শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের অকর্ম্মণ্যতা আজ সর্ব্বজনবিদিত।

উত্তর-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে নলকূপ স্থাপন

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর "লীডার" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উত্তর প্রদেশে ২০০০ নলকূপ স্থাপনের যে পরিকল্পনা আছে তাহার অধিকাংশই স্থাপিত হইবে বাহ্‌রাইচ, গোণ্ডা, বস্তি, গোরখপুর, দেওরিয়া, ঘাঘ্‌রা, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, বানারস এবং গাজীপুর প্রভৃতি উত্তর-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে। এই সকল স্থানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে এবং জলের জন্য চাষীদের বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। জলসেচের যে সামান্য ব্যবস্থা আছে তাহাতে পুষ্করিণী, ঝিল, নদী এবং উন্মুক্ত কূপ হইতে জল তুলিয়া জমিতে দিতে হয়। এই অঞ্চলে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহা পরিমিত ও উপযুক্ত সময়ে হইলে চাষের জন্য অন্য উপায়ে জল সরবরাহের কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না। সেই কারণেই অতীতে জলসেচের অনেক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নাই।

যখন সারদা খাল খনন করা হয় তখন বানারস এবং বালিয়া পর্য্যন্ত গঙ্গা-ঘাঘ্‌রা-দোয়াব অঞ্চলেও জল সরবরাহের কথা হইয়াছিল। কিন্তু প্রাপ্ত জলের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হওয়ায় সে অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩৭ সালে ফৈজাবাদ জেলাতে ঘাঘ্‌রা নদী হইতে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া ঘাঘ্‌রা খাল খনন করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, তাহাতে অতিরিক্ত কর ধার্য না করিয়া ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উত্তর-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের এই জেলাগুলিতে গভীর খাল খনন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া খালে জল সরবরাহের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের অসাফল্য

প্রমাণিত হওয়ায় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই অঞ্চলে নলকূপ প্রতিষ্ঠার জন্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন।

নলকূপগুলি প্রায় ৩০০ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হইবে। আজমগড়, বালিয়া, ঘাজীপুর, জৌনপুর এবং বানারসে নলকূপগুলির গভীরতা হইবে ৫০০ ফুট, কারণ সেখানকার মাটিতে কর্দ্দমের স্তর বেশি। এজন্ত বিদেশ হইতে বিশেষভাবে প্রস্তুত খননযন্ত্র আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি কূপ হইতে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ হাজার গ্যালন জল পাওয়া যাইবে এবং এই জলের সাহায্যে ২৪ ঘণ্টায় ৫ একর জমিতে চার ইঞ্চি পরিমাণ জল সরবরাহ করা যাইবে। একটি নলকূপের জল দ্বারা প্রায় এক হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ করা যায়। নলকূপের জল বিভিন্ন স্থানে বহন করিবার জন্ত কতকগুলি খাল কাটা হইবে। প্রস্তাবিত নলকূপগুলির সাহায্যে অতিরিক্ত ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে।

সিংভূম জেলার খাদ্যপরিস্থিতি

১৮ই মাঘ তারিখের "নবজাগরণ" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"আমরা বহুবার আশঙ্কাজনক খাদ্যপরিস্থিতির সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছি। সরকারী হিসাব মতে গড়ে মাত্র শতকরা পনের ভাগ ধান রোগে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া গত নভেম্বর মাসের সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের বলা হয়। কিন্তু আমরা দাবী করি যে, শস্যহানির পরিমাণ শতকরা ষাট ভাগের কম নয়। অতঃপর আমাদের দাবী অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার মহাশয় পটকা থানায় পিছলী গ্রামে এ সম্বন্ধে তদন্তের আদেশ দেন। বর্ত্তমানে সরকারী মুখপাত্রগণই স্বীকার করিতেছেন যে, ঐ গ্রামে শতকরা ৫০ ভাগ আমন ধান নষ্ট হইয়াছে। শুধু ঐ গ্রামই নয়, আমরা দাবী করিতেছি যে বিশেষতঃ ধলভূম এবং সাধারণতঃ সারা জেলায় ধানের অবস্থাই এইরূপ শোচনীয়। পটকা, জুগশলাই, ঘাটশীলা ও চক্রধরপুর থানার অবস্থা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এবং চাকুলিয়া ও বহড়াগোড়া হইতেও যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা উৎসাহব্যঞ্জক নহে। এ মাসের সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য বোঝা যায় যে, পিছলীর অবস্থাদৃষ্টে ডেপুটি কমিশনার মহাশয় হয়ত অবস্থার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার জেলার খাদ্যপরিস্থিতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং প্রতিটি সরকারী কর্ম্মচারীকে খাদ্যের অবস্থার অবনতি দেখিলে তাঁহাকে জানাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিহার সরকার এ অবস্থা সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। পাটনা হইতে ১০ই জানুয়ারী এক প্রেসনোট প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিহারের কৃষির অবস্থা মোটামুটি ভালই এবং এই জন্ত অভাবগ্রস্ত এলাকায় সাহায্যদান বন্ধ করা হইয়াছে। গত ২৮শে জানুয়ারী বিহারের রাজ্যপাল পরিষদের উদ্বোধনকালে মন্তব্য করিয়াছেন যে, সারা প্রদেশের শস্যের অবস্থা পূর্ব্বতন কয়েক বৎসর হইতে ভাল এবং এই জন্য তিনি প্রদেশের খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে স্বস্তির আশা প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী বিবৃতি এবং রাজ্যপালের আশা যে অন্ততঃ সিংভূমের ক্ষেত্রে যথার্থ নহে, তাহা আমরা জানি।"

ভারতে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ

বিশাখাপত্তনে অবস্থিত ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের একমাত্র কারখানাটির পরিচালনার ভার হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ কোম্পানীর হাতে। অবশ্য ভারত-সরকারের হাতেই নিয়ন্ত্রণের অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। এই কারখানা হইতে ভারবাহী, যাত্রীবাহী, ট্যাঙ্কার এবং নৌবাহিনীর ছোটখাট জাহাজও তৈয়ারী হইতে পারে। মূল শিল্প হিসাবে ইহার জাতীয় গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ১৯৫২ সালের ১লা মার্চ ভারত-সরকার এই কারখানার কর্ত্তৃত্বভার বোম্বাইস্থিত সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

জাহাজ নির্ম্মাণের জন্ত বিশাখাপত্তনকে নির্ব্বাচিত করিবার কারণ এই, সেখানে কারখানা নির্ম্মাণোপযোগী বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে, তাহা ব্যতীত সমুদ্রজলের গভীরতা সেখানে বৎসরের সকল সময়েই জাহাজ ভাসাইবার অনুকূল থাকে। কারখানার নিকটেই ইস্পাতের কারখানা থাকায় এবং ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের প্রয়োজন হইলে তদুপযোগী বিস্তৃত জমি থাকার জন্ত বিশেষজ্ঞগণ সহজেই এই স্থানটিকে বাছিয়া লন। ১৯৪৯ সনে ভারত-সরকার একদল ফরাসী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন এবং তাঁহারাই এখানে কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দান করেন।

সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সন হইতে ৮০০০ টনের দশখানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। জাহাজগুলির প্রত্যেকটির গতিবেগ প্রায় ১১ নট (১ নট=১$\frac{১}{৬}$ মাইলের কিছু বেশী)। প্রত্যেকটি জাহাজেই তিনটি করিয়া বয়লার আছে, তাহা হইতে ২,৬৫০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট বাষ্প পাওয়া যায়। এই জাহাজগুলির সবগুলিকেই লয়েডস এই শ্রেণীর জাহাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। গড়ে প্রত্যেকটি জাহাজের জন্ত ১১ মাস সময় লাগিয়াছিল—ব্রিটেনে লাগে ১০। হইতে ১১ মাস।

পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি

৭ই মাঘ তারিখের "বরিশাল হিতৈষী" সম্পাদকীয় মন্তব্যে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, "মূলনীতি ঠিক করিবার মূলনীতিই ঠিক করা হয় নাই। মূলনীতি ঠিক করিতে যে নিঃশঙ্ক, নির্ব্বাধ, অতোষণ দৃষ্টি লইয়া অচঞ্চল ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল, মূলনীতিগুলি এবং উহার প্রস্তাবকারী কমিটি তাহা হইতে যেন বহুদূরে রহিয়া গিয়াছেন।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন : "আমরা কাহার বা কাহাদের মত

প্রতিফলিত করিতেছি জানি না, তবে এটুকু জানি যে বর্ত্তমান জগৎ সভ্যতা ও কৃষ্টির, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার যে পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে পরিষ্কার নির্দ্দেশ না থাকাতে লোকের মনে খটকা আসা স্বাভাবিক। প্রতি-নিধিত্বে সংখ্যাসমতার মধ্যে রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ক্ষমতা হাতে রাখা না রাখা প্রভৃতি প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ানোও অস্বাভাবিক নয়। তারপর, শাসনতন্ত্রের মূলনীতিতে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা তো মনুষ্য-জীবনের মূলনীতির অস্বীকৃতি; বিশ্বভ্রাতৃত্বের, এমন কি যে ইসলামের প্রতি এত জোর দেওয়া হইতেছে তাহারই অস্বীকৃতি।"

সংযুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিলে সংখ্যালঘুরা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া পত্রিকা বলিতেছেন যে, পাকিস্থানের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে সংখ্যালঘুদের পক্ষে জয় লাভ করা সুকঠিন। কিন্তু অস্থায়ী ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্দ্ধারণের নীতি সমর্থন করা যায় না।

"কেবলমাত্র মুসলমানই রাষ্ট্রপ্রধান হইতে পারিবেন ইহাও গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি। ইহাতে অমুসলমানদের পরিপূর্ণ অস্তিত্বের বদলে তাহার দেহমনকে খণ্ডিত, সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে টানিয়া আনা হইয়াছে, তাহার বিকাশের পথকে মুসলমানের মত অবারিত করা হয় নাই।"

১৯৪১ সালে তিনি বড়লাটের সভায় সদস্যরূপে দিল্লী গিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রতের ব্যাপারে ঐ পদে তিনি ইস্তফা দিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় তিনি ডাঃ রায়ের অধীনে ১৯৪৮ সালে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু নির্ব্বাচনে না দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার ঐ মন্ত্রিত্বও জুন ১৯৫২ সালে ছাড়িয়া দেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা সমিতির প্রধান রূপে তিনি ১৯৪৭ পর্য্যন্ত ছিলেন। ঐ সমিতিতেই তিনি যৌবনে সামান্য কেরাণী রূপে কার্য্যারম্ভ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উহা সতেজ ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ১৯৩৪ সালে ভারতের সমবেত "ফেডেরেল চেম্বার্স অফ কমার্স" তাঁহাকে সভাপতির পদে বসায়। অসীম অধ্যবসায় এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োগে জীবনের প্রারম্ভের অশেষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি জীবনে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজের হাতে নিজের জীবনের প্রত্যেকটি সোপান গঠন করিয়া তিনি যে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ ছিল প্রাণপণ প্রয়াস এবং প্রখর জ্ঞানপিপাসা। নিজের শিক্ষার ত্রুটী সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সজাগ ছিলেন এবং সর্ব্বদাই জ্ঞানী বা বিচক্ষণ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রের "সবজান্তা" কর্ণধারবর্গ হইতে তাঁহার বিশেষ প্রভেদ ছিল।

নলিনীরঞ্জন সরকার

বাংলার আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি বিগত ২৫শে জানুয়ারী বিদায় লইয়াছেন।

আর্থিক জগতে নলিনীবাবুর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা প্রতিষ্ঠান। নলিনীবাবুর পরিণত জীবনের পূর্ণ পরিশ্রম ও যত্নের ফলে বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বীমা-জগতে অন্যতম স্থান লাভ করিয়াছে। পরে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, কিন্তু ব্যবসায় ও ব্যবহারিক শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের আকর উহাই।

রাষ্ট্রনৈতিক আসরে দেশবন্ধু দাশের প্রভাবে প্রথমে তিনি আসেন। তাহার পর কংগ্রেসে কর্ম্মিষ্ঠ সহকারীরূপে তাঁহার স্থান বহুদিন ছিল এবং তাহাতে প্রধান "হুইপ্" রূপে তিনি কাজ চালাইতেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক জন প্রধান কর্ণধাররূপে তিনি বহুদিন ছিলেন।

১৯৩৭ সালে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করার সময় তাঁহার সহিত কংগ্রেসীদলের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধসংক্রান্ত প্রস্তাব আনিয়া তিনি ঐ মন্ত্রীসভা ত্যাগ করেন। তাহার পর

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার

গত ১০ই ফেব্রুয়ারীর প্রত্যূষে মাদ্রাজে শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভার "সজাগ" মন্ত্রণাদাতা তিন জনের ইনি অন্যতম ছিলেন।

১৯৩৭ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত ইনি কাশ্মীরের দেওয়ান ছিলেন এবং সেই কারণে কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপার সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে গেলে উঁহাকেই সে বিষয়ে ওকালতি করিতে পাঠানো হয়।

তাহার পর তিনি প্রথমে "দফ্তর বিহীন" মন্ত্রী, পরে রেলওয়ে মন্ত্রী এবং সর্ব্বশেষে রক্ষণ-মন্ত্রীরূপে পণ্ডিত নেহরুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভায় ছিলেন। কিন্তু পদ যাহাই হউক তাঁহার প্রধান কাজ ছিল পণ্ডিত নেহরুকে মন্ত্রণা ও পরামর্শ দান এবং সেই হিসাবেই তিনি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।

তাঁহার উপর পণ্ডিত নেহরুর বিশ্বাস অগাধ ছিল এবং সেই হিসাবে সকল বিষয়েই তিনি মন্ত্রণা ও যুক্তি দানের জন্য পণ্ডিতজীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। কূটতর্কে তাঁহার অধিকার ছিল অসামান্য এবং সেই কারণে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদে তিনি পণ্ডিতজীকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন।

শহর-গ্রামের দ্বন্দ্ব ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রবন্ধান্তরে* বাংলার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে কেবলমাত্র উল্লেখ করেছিলাম যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মিশ্র পরিকল্পনাগুলির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে সেই দ্বন্দ্ব সমাধানের উপর। সেই দ্বন্দ্বের স্বরূপ এবং সেই দ্বন্দ্বের নিরসনে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কতটা সফল হবার সম্ভাবনা, এই প্রশ্নটাই বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচ্য। আমাদের রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট খুব গভীর। তার ছায়া থেকে চাষী মজুর বা মধ্যবিত্তসম্প্রদায় কেউ-ই আর মুক্ত নেই। এই সংকটের ফলে শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্বের তীব্রতাও পশ্চিম বাংলায় অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশে কেবল গ্রাম নিয়েই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু এখানকার পরিকল্পনাগুলি মিশ্র পরিকল্পনা হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের মূল কথা হ'ল, একটি ছোট শহরকে কেন্দ্র করে তার চার পাশের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নিয়ে গড়ে উঠবে। তা হলেই বর্তমানে শহর ও গ্রামের যে দ্বন্দ্ব চলছে তার অবসান ঘটে এক নতুন আর্থিক ও সামাজিক বিন্যাস গড়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক নতুন সুস্থ ও প্রসরণশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হবে। এইটাই হ'ল মিশ্র পরিকল্পনার একেবারে গোড়ার কথা,—যাকে কর্তৃপক্ষ বলেছেন interlocking of the rural and urban economies। বর্তমানে কি ধরণের দ্বন্দ্ব চলছে, সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাস কি ধরণের হওয়ার ফলে সংঘাত ঘটছে, এবং সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ সেগুলির কতকটা বদল ঘটাতে পারবে, সে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমন্বয় স্থাপন করতে পারবে কিনা, এই কথাগুলিই এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচ্য।

২

পশ্চিম বাংলায় শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্বের স্বরূপ আলোচনা করবার আগে শহর ও গ্রামের চিরন্তন দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে দু-একটা কথা সাধারণভাবে জানবার প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্ব কেন হয়? কেন আমরা বলি, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'? স্পেঙ্লার প্রভৃতি মনীষীরা তো শহরের আত্মা ও গ্রামের আত্মার পার্থক্য নিয়ে বহু কথাই বলে গিয়েছেন। এরকম দ্বন্দ্ব ঘটে কেন?

* প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫৯

বস্তুতঃ এরকম দ্বন্দ্ব ঘটবার বহু কারণ আছে। সমাজের বিবর্তনের একটা যুগ এমনি ছিল যে সময় এরকম দ্বন্দ্বের বিশেষ কোনও কারণ হ'ত না। আমাদের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র মানসারে এরকম ইঙ্গিত আছে যে, অন্ততঃ কতকগুলি শহর (যেমন খেট বা খর্বট) গ্রামের থেকে কিছুই বিশেষ তফাৎ নয় জনসংখ্যার সামান্য আধিক্য ছাড়া। কিন্তু সে সব শহর হ'ল সাধারণতঃ "নদী পর্বতপ্রান্তে" বনের মধ্যে "শূদ্রাধিষ্ঠিত" ছোট ছোট শহর—তারা প্রায় গ্রামই। অথচ সেই প্রাচীন যুগেই দেখতে পাওয়া যায়, বড় শহরগুলির চেহারা আর গ্রামের চেহারার মধ্যে একেবারে মৌলিক তফাৎ দেখা দিতে সুরু করেছে। যেমন পুর বা পত্তন। মানসার বলছেন, পুর হ'ল সেইরকম নগর যেখানে বাগান আছে, বহু বাড়ী আছে, খুব কেনাবেচা চলে, ব্যবসাদারদের কলরবে সে সর্বদা মুখরিত।* অথবা পত্তন বা বন্দর। ময়মতম্ নামক বাস্তুশাস্ত্রে পাই, পত্তন গড়ে ওঠে সমুদ্রের তীরে, সেখানে কেনাবেচা খুব চলে, নানারকম লোকজন আসে, দ্বীপান্তর হতে জিনিষপত্র আমদানী হয়, রত্ন ধন রেশমজাত জিনিষ ইত্যাদির ব্যবসা চলে।† সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রকম শহর তখনই গড়ে উঠতে শুরু হয়েছিল, যার চেহারা গ্রাম হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ তাগিদ নানাবিধ। বাণিজ্যের তাগিদ, বন্দরের সুবিধা। শিবির বা ক্যান্টনমেণ্টগুলি গড়ে উঠত সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে সেনানিবাসের চারপাশে।

শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্বের মূল কথাটাই এইখানে। যে তাগিদে গ্রাম গড়ে সে তাগিদে শহর গড়ে না, তার তাগিদ বিভিন্ন। দুই তাগিদ বহু সময়েই মিল খায় না, বরং সংঘর্ষ বাধে। এইখান হতেই দ্বন্দ্বের সুরু। পূর্ব্বেই বলেছি, শহর গড়বার কারণ নানাবিধ। একালের শহরগুলির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, শহর গড়বার একটা

* কাননোদ্যানসংযুক্তং নানাজনগৃহান্বিতম্।
ক্রয়বিক্রয়বিস্তিশ্চ বৈশ্যরবেন সংযুতম্।
দেবসপ্তসমাযুতং পুরমেতৎ প্রকথ্যতে। মানসার, ১০ম অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক

† দ্বীপান্তরগতবস্তুভিরভিযুক্তং সর্বজনসহিতম্।
ক্রয়বিক্রয়কৈর্যুক্তং রত্নধনক্ষৌমবস্ত্রাদ্যম্।
সাগরবেলাভ্যালে তদ্দীর্ঘতায়ামে পত্তনং প্রোক্তম্। ময়মতম্, ১০ম অধ্যায় ২৮ শ্লোক।

কারণ বাণিজ্যিক প্রয়োজন। প্রাচীনকালের তুলনায় একালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অতি বিরাট ও অতি বিচিত্র। কাজেই যে তাগিদে সেকালে পত্তন গড়ে উঠত আজ সে তাগিদ লক্ষ গুণ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তার চেহারাও বদলেছে। দেশের যাতায়াত-ব্যবস্থা এবং রেল ও রাস্তার সংযোগস্থল শহর গড়বার আর একটা কারণ। যেমন আমাদের জংশন ষ্টেশনগুলি। গত শতাব্দীতে আরামবাগ ছিল জলপথ ও স্থলপথের কেন্দ্রস্থলে, সেইজন্য তার সমৃদ্ধি। আজও হুগলী জেলার আলু শেওড়াফুলি রেল ষ্টেশন হয়েই চালান যায় বলে শেওড়াফুলি হাট প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া শহর গড়বার পিছনে ঐতিহাসিক কারণও থাকে। যেমন তীর্থক্ষেত্র। অথবা রাজধানী স্থাপনা হওয়ায় মুর্শিদাবাদ। এ ছাড়া দেখা যায় শহরের আকৃতি ও বিস্তার অনেক সময় নির্ভর করে দেশের ভূগোল ও জনসংখ্যার উপর। পাহাড়ে দেশে বেশির ভাগই ছোট ছোট অনেকগুলি শহর গড়ে ওঠে, সমতলভূমিতে বড় শহর। যে সব দেশে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম সে সব দেশে প্রায় ছোট্ট ও মাঝারি শহরই গড়ে উঠতে দেখা যায়। কারণ সে সব দেশে বেশির ভাগ লোক দু-একটি শহরে জড় হবে আর বাকী সারা দেশটা খাঁ খাঁ করতে থাকবে, এমন ব্যাপার সাধারণতঃ ঘটে না। তেমনই যে সব দেশে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী সে সব দেশে শহরগুলির আয়তন খুব বড় হয়। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এই ধরণের বিকাশই দেখা যায়।

কিন্তু এই যে সব কারণ উল্লেখ করলাম সে কারণগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে শহর গঠনের জন্য দায়ী হলেও সেগুলি মুখ্য কারণ নয়। যেগুলি কেবলমাত্র খেট বা খর্বট নয়, অর্থাৎ যেগুলিকে পাকারকম 'শহুরে' শহর বলতে পারা যায়, সেগুলির সঙ্গে গ্রামের তফাৎ একেবারে মৌলিক। সাধারণ গ্রাম এবং এই ধরণের 'শহুরে' শহর দুটি বিভিন্ন—এবং বহুলাংশে বিরোধী—সমাজবিন্যাস ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক। কৃষি, গ্রাম, ঘনসম্বদ্ধ পরিবার, আদিম পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনের চেষ্টা, সামাজিক শ্রেণীবিভেদ সত্ত্বেও অর্থনৈতিক শ্রেণী-বৈষম্যের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা—এই সমস্ত মিলিয়ে আমাদের মনে যে চিত্র উদয় হয় শহরের বেলায় ঠিক তার বিপরীত চিত্র। সেখানে কৃষি নেই, আছে শিল্প, কৃষি তার কাঁচামালের জোগানদার মাত্র, যত সস্তায় কাঁচামাল পাওয়া যায় ততই তার লাভ। সেখানে ভক্ষক আছে অথচ ভোজ্য নেই—গ্রাম ও কৃষি যত সস্তায় তার আহার জোগান দেবে ততই তার লাভ। সেখানে পরিবার নেই, আছে শ্রমিক; সেখানে শ্রমের ইউনিট পরিবার নয়, ব্যক্তি। সেখানে আদিম পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনের চেষ্টাকে অবিরত অতিক্রম করে নবতম যন্ত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ লাভ আদায়ের চেষ্টা। সেখানে সামাজিক শ্রেণীবিভেদ কাঞ্চনকৌলীন্যে ধুয়ে যায় কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমেই গগনস্পর্শী হতে থাকে। বলা বাহুল্য, যন্ত্রে সুসজ্জিত অর্থে বলীয়ান রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এই শিল্প-ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে প্রাচীন জরাজীর্ণ হৃতবল আদিম কৃষি-ব্যবস্থা, এমন কি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও টিকতে পারে না। সেইজন্য শহরে শহরে শিবির স্থাপনা করে দৃপ্ত ধনতন্ত্র কৃষি ও গ্রামকে ধ্বস্ত করতে থাকে। এ অবস্থায় যদি কৃষিকে টিকে থাকতে হয় তা হলে তারও চেহারা বদলিয়ে ধনতান্ত্রিক চেহারা করতে হয়। ট্র্যাক্টর, বিরাট জমি, বিরাট মূলধন, দেশ-বিদেশে পণ্য চালান দেওয়া—এই সব লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকে। এই চেহারা বদলের ফলে কৃষি টিকতে পারে বটে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজ বলতে আমরা যা যা বুঝে থাকি সেগুলি টেকে না। অর্থাৎ, সমাজের চেহারা বদলে যায়, অর্থনৈতিক বিন্যাস বদলে যায়, বিবর্তনের যুগ বদলে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হয় ততক্ষণ ধনতন্ত্রের বিপুল ও বিরাট সংগ্রাম চলতে থাকে। আসল 'গেঁয়ো' গ্রাম ও 'শহুরে' শহরের দ্বন্দ্বের মূল কথা এইখানে। সেইজন্য মার্ক্স বলেছিলেন, The entire economic history of society (*i.e.*, modern nations) is summarised in the movement of antithesis between town and country। এই দ্বন্দ্বের মূল এত দৃঢ় ও গভীর যে রুশিয়ায় যখন সমাজতন্ত্রবাদের নিগড়ে ফেলে ধনতন্ত্রের সর্ববিধ দ্বন্দ্ব লোপ করে দেবার চেষ্টা চলেছে সেখানে পর্যন্ত এখনও শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ নিরাকরণ করা সম্ভব হয় নি। ষ্টালিনের নবতম থীসিস "The Economic Problems of Socialism in the USSR"-এর মধ্যে তার স্বীকৃতি রয়েছে সে কথা পূর্বের প্রবন্ধেই উল্লেখ করেছি।*

* ষ্টালিনের বক্তব্য হ'ল মোটামুটি এই :—শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হ'ল শহর কর্তৃক গ্রামকে শোষণ। আবার এই শোষণের মূল কারণ হ'ল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক শিল্প ও ব্যবসা গ্রামের কাঁচা মাল বা অন্যান্য সম্পদ শোষণের ভিত্তিতে আহরণ করে। ষ্টালিনের কথা হ'ল, রুশিয়ায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের মূল কারণেরও অবসান ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। প্রথমতঃ, ওদেশে শিল্প যেমন জাতীয়কৃত হয়েছে, কৃষি তেমন হয় নি। এখনও তা যৌথ ফার্মের হাতে আছে। ষ্টালিনের ভাষায় এটি state-owned, ওটি group owned। এইজন্য এখনও সেখানকার অর্থনীতিতে দ্বিধারা চলে আসছে। বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ থেকে পুরোপুরি সাম্যবাদে না পৌঁছলে, অর্থাৎ কৃষিও state-

৩

এখন এই পটভূমিকায় পশ্চিম বাংলার কথা আলোচ্য। বলা বাহুল্য কোনও দেশেই বিবর্তনের ক্ষেত্রে দুটি যুগের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদরেখা টানা যায় না, বলা যায় না যে এইখানে গ্রামের যুগ একেবারে পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়ে শতকরা একশ' ভাগ শহরের যুগ সুরু হয়ে গেল। বিশেষতঃ আমাদের মত পিছিয়ে থাকা দেশে ওরকম ঘটনা তো ঘটতেই পারে না। সেইজন্য এখনও আমাদের দেশে অনেক শহর পাওয়া যাবে যা নামে শহর হলেও আসলে গ্রামেরই রীতি-নীতি আকার-প্রকার ও বিন্যাস মোটামুটি বজায় রেখে চলেছে। সাইমন কমিশনের কাছে বাংলা-সরকার বলেছিলেন, বাংলায় বহু শহরই গ্রামের পরিবর্ধিত সংস্করণ—overgrown villages। আবার এমন শহরও দেখতে পাওয়া যাবে যা একেবারে খাঁটি 'শহুরে' শহর। এখন এই সব বিভিন্ন দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলার সমস্যা আলোচনা করা যেতে পারে।

একথা সকলেই জানেন যে, পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যার চাপ যেমন খুব বেশী, শহরও তেমনই অন্যত্র প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। জীবিকার হিসেব নিলে দেখা যায়, ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭·২১ ভাগ কৃষি হতে জীবিকা আহরণ করে, শিল্প হতে শতকরা ১৫ ভাগ। বোম্বাইয়ে কৃষি-নির্ভর লোকের অনুপাত ৬১·৪°/ₒ, শিল্পনির্ভর লোকের অনুপাত ১৩·৮°/ₒ। উত্তর-প্রদেশের অনুরূপ হিসাব ৭৪·১°/ₒ এবং ৮·৪°/ₒ। মাদ্রাজের অনুরূপ হিসাব ৬৬·৬°/ₒ এবং ১২·৩°/ₒ। বিহারে ৮৬°/ₒ এবং ৩·৯°/ₒ। সে হিসেবে শিল্পনির্ভর লোকের অনুপাত পশ্চিম বাংলায় খুবই বেশী,এমন কি বোম্বাইয়ের চেয়েও বেশী।

তেমনই শহরবাসীর অনুপাতও পশ্চিম বাংলায় খুব বেশী। ১৯২১ সনে পশ্চিম বাংলায় শহর ছিল ৮৫টি। ১৯৩১ সনে তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে হয় ৯০টি, ১৯৪১ সনে ৯৯টি এবং এবার ১৯৫১ সনে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪টি। ১৯২১ সনে পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ ভাগ ছিল শহরবাসী। ১৯৩১ সনে সেটি বেড়ে শতকরা ১৬ ভাগ হয়; ১৯৫১ সনে তা আরও বেড়ে শতকরা ২৫ ভাগ হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এ অনুপাত খুবই উঁচু। বোম্বাইয়ে অবশ্য শহরবাসীর অনুপাত মোট জনসংখ্যার ৩১·০°/ₒ, কিন্তু উত্তর-প্রদেশে সে অনুপাত ১৩·৬°/ₒ, মাদ্রাজে ১৯·৬°/ₒ, বিহারে ৬·৭°/ₒ, উড়িষ্যায় ৪·০৪°/ₒ। বোম্বাই ছেড়ে দিলে পশ্চিম-বঙ্গই বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বোচ্চ অনুপাতের অধিকারী।

শহরবাসীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে খুব দ্রুত বেড়েছে। ১৯৫১ সনে পশ্চিমবঙ্গের শহরবাসীর সংখ্যা ছিল ৬১ লক্ষ, অর্থাৎ ১৯৩১ সনের ২½ গুণ। নীচের হিসেব থেকে আন্দাজ পাওয়া যাবে, পশ্চিম বাংলায় গত পঞ্চাশ বছরে শহর ও গ্রামাঞ্চলের লোক কি রকম বেড়েছে:

গ্রামবাসী, শহরবাসী ও মোট জনসংখ্যার শতকরা পরিবর্তন, ১৯০১-১৯৫১

	১৯০১-১৯৫১	১৯০১-১৯৫১	১৯৩১-১৯৫১	১৯৪১-১৯৫১	১৯৪১-১৯৫১	১৯৩১-১৯৪১	১৯২১-১৯৩১	১৯১১-১৯২১	১৯০১-১৯১১
		(উদ্বাস্তু ছাড়া)	(উদ্বাস্তু ছাড়া)	(উদ্বাস্তু ছাড়া)					
বর্দ্ধমান বিভাগ :									
মোট	+৩৪·৭	+৩১·৭	+২৫·৪	+৫·৪	+৭·৯	+১৯·০	+৭·৪	—৪·৯	+২·৮
গ্রামবাসী	+২৩·৪	+২১·৭	+১৯·৫	+৩·৯	+৫·৪	+১৫·১	+৬·২	—৬·১	+২·১
শহরবাসী	+১৯৩·০	+১৬৯·৪	+৮১·৩	+১৫·৯	+২৬·০	+৫৬·৫	+২০·৯	+৯·৬	+১২·১
(বর্ত্তমান) প্রেসিডেন্সি বিভাগ :									
মোট	+৮০·৫	+৫৬·৩	+৩১·৭	+২·৮	+১৮·৭	+২৮·১	+৮·০	+০·৩	+৯·৬
গ্রামবাসী	+৪৯·৭	+৩৪·৫	+১৭·৮	+০·৭	+১১·৯	+১৬·৯	+৬·৬	—১·২	+৮·৪
শহরবাসী	+২১০·৪	+১৪৭·৫	+৮০·১	+৭·৮	+৩৫·১	+৬৭·১	+১২·৯	+৬·৩	+১৪·৬
পশ্চিম বাংলা :									
মোট	+৫৬·৭	+৪৩·৪	+২৮·৬	+৪·০	+১৫·৬	+২৩·৬	+৭·৭	—২·৩	+৬·১
গ্রামবাসী	+৩৫·০	+২৭·৪	+১৮·৬	+২·৪	+৮·৫	+১৫·৯	+৬·৪	—৩·৮	+৪·৯
শহরবাসী	+২০৫·৬	+১৫৩·৫	+৮০·৪	+১০·০	+৩২·৬	+৬৪·১	+১৫·১	+৭·২	+১৩·৯

owned না হলে, এই দ্বিধারার অবসান ঘটবে না। দ্বিতীয়ত: ষ্টালিন একথাও স্বীকার করেছেন যে দ্বিধারার অবসান ঘটলেও কিছু কিছু পার্থক্য থেকে যাবেই। তাঁর নিজের কথা হ'ল:

Abolition of the essential distinctions between industry and agriculture cannot lead to the abolition of all distinction between them. Some distinction, even if inessential, will certainly remain, owing to the difference between the conditions of work in industry and in agriculture.

দেখা যাচ্ছে, গত পঞ্চাশ বৎসরে গ্রামবাসীদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৫·০ ভাগ—উদ্বাস্তুদের বাদ দিলে শতকরা ২৭·৪ ভাগ। অথচ সে সময় শহরবাসীদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২০৫·৬ ভাগ—উদ্বাস্তুদের বাদ দিলেও শতকরা ১৫৩·৫ ভাগ। অসাধারণ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই।

৪

এই সব পরিসংখ্যান হতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অর্থনৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা অনেকখানি এগিয়েছে। আমাদের দুর্দশার মূল কারণই হ'ল ক্ষয়িষ্ণু কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং শিল্পবাণিজ্যের অভাব। এই দুর্দশা দূর করতে হলে কৃষির যথাসম্ভব উন্নতি তো করতে হবেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বেশী প্রয়োজন শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার—এসম্বন্ধে কেউ দ্বিমত করবেন না। সুতরাং ভারতবর্ষে আমরা যা চাইছি পশ্চিম বাংলায় সেই সব লক্ষণ দেখতে পেলে উল্লাসের কারণ ঘটে বই কি। কিন্তু ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই লক্ষণগুলি আমাদের উন্নতির লক্ষণ তো নয়ই, বরং আমাদের দুর্দশার চিহ্নমাত্র।

১৯৫১ সনের সেন্‌সাসে দেখা গিয়েছে, বসতিসম্পন্ন গ্রামের সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় ক্রমশঃ কমছে। ১৯০১ সনে বসতিসম্পন্ন গ্রামের সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় ছিল ৪৩,৩৯০। ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ সনে যথাক্রমে সেই সংখ্যা হয় ৪১০২৫, ৩৫৬০৪, ৩৫৬২৫ এবং ৩৫৬০৩। ১৯৫১ সনে সে সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫০৬৩। পঞ্চাশ বৎসরে সংখ্যা কমেছে আট হাজার তিনশ'র বেশী। এই পরিবর্তনের অবশ্য অনেকগুলি কারণ হতে পারে। সেটেলমেণ্টের সময় মৌজার সীমানা বা এলাকা অদলবদল হওয়ায় সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। অথবা শহর বেড়ে গ্রামগুলিকে গ্রাস করায় মৌজার সংখ্যা হ্রাস হতে পারে। তৃতীয়তঃ, এক জেলা হতে অন্য জেলায় বা এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে বদল হলে মৌজার সংখ্যা কমতে বাড়তে পারে। চতুর্থতঃ, মৌজা বসতিহীন হয়ে গেলে সংখ্যার হ্রাস হতে পারে। ১৯৫১ সনের সেন্‌সাস হতে পাওয়া যায়, ১৯৫১ সনে জে. এল. লিষ্টে পশ্চিম বাংলায় মোট মৌজা ছিল ৩৯,১৫১। তার মধ্যে বসতিসম্পন্ন মৌজা ৩৫০৬৩টি; শহরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এমন মৌজার সংখ্যা ৫১৮টি; সেটেলমেণ্টের হেরফের ঐ দুটি ধরণের মৌজার মধ্যে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া দেখা যায় বসতিহীন মৌজার সংখ্যা ৩৫৬৯। অবশ্য এই বসতিহীনতার আরও অনেক কারণ সম্ভবতঃ আছে।* কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতা তার অন্যতম কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতগুলি বসতিবিহীন মৌজার মধ্যে অন্ততঃ বেশ কিছু গ্রামের অবনতির কারণ অর্থনৈতিক ক্ষয় একথা ধরে নেওয়া অসমীচীন হবে না।

তা ছাড়া এই সেন্‌সাস হতে আরও একটি তথ্য প্রকট পেয়েছে। দেখা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ যেমন বাড়তে থাকে তেমনি প্রথম প্রথম কৃষিনির্ভর লোকসংখ্যার অনুপাতও বাড়তে থাকে। কিন্তু তার পর একটা সীমা ছাড়িয়ে জনসংখ্যার চাপ আরও বাড়তে থাকলে তখন আর কৃষিনির্ভর লোকসংখ্যার অনুপাত বাড়ে না, বরং কমে। কারণ সহজ। সেই সীমা ছাড়ালে কৃষি আরও বেশী লোককে জীবিকা দিতে পারে না। সেইজন্য কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাত আর বাড়ে না, বরং ওদিকে জনসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকায় মোট জনসংখ্যার তুলনায় তা কমে। দেখা গেছে, সেই সীমা হ'ল প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ লোকের কাছাকাছি। নীচের হিসেব হতে কথাটি পরিস্ফুট হবে :

প্রতি বর্গমাইলে শুধু গ্রামাঞ্চলের লোকের ঘনত্ব এবং হাজার করা কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাত

	১৯৫১		১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	প্রতি বর্গমাইলের শুধু গ্রামাঞ্চলের লোকের সংখ্যা	প্রতি হাজার লোকে কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাত	ঐ সংখ্যা	ঐ অনুপাত	ঐ সংখ্যা	ঐ অনুপাত	ঐ সংখ্যা	ঐ অনুপাত
বর্ধমান বিভাগ	৬৮১	৬৭৪	৫২৯	৭২০	৫৬৩	৭১৪	৫৫২	৬৪১
বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৫০	৪৯০	৩০৪	৭০৯	৩৯৯	৬৮৫	৩৬৮	৬৪০
মোট পশ্চিমবাংলা	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৭১৪	৪৭৪	৬৯৮	৪৫২	৬৪০

* অবশ্য এই বসতিহীন মৌজা কতখানি ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। উপরে যে কারণগুলি উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও আরও কারণ আছে। যেমন নদীগর্ভে কিছু মৌজা বিলীন হয়েছে; কিছু মৌজা অন্য মৌজার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তা ছাড়া সন্দেহ করার কারণ আছে, কিছু মৌজা কোনোকালেই বসতিসম্পন্ন ছিল না। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কাগজপত্র ঠিকমত না থাকার ফলে সরকারী খাতায় এরকম কতকগুলি মৌজার নাম (বসতিসম্পন্ন মনে করেই) উঠে গিয়েছিল এবং এখন সার্ভে করে দেখা যাচ্ছে সে মৌজায় কোনও লোক নেই, তার নামটিই আছে মাত্র। কিন্তু সেখানে গোড়া হতেই ভুল চলে

দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় প্রতি বর্গমাইলে গ্রামাঞ্চলের লোকের সংখ্যা যখন ৪৫২ ছিল তখন মোট জনসংখ্যার হাজারকরা ৬৪০ জন লোক কৃষি হতে জীবিকা আহরণ করত। লোকের চাপ বেড়ে যখন ৪৭৪ হ'ল তখন পর্যন্ত কৃষি সে বর্ধিত চাপ গ্রহণ করে নিল, অনুপাত দাঁড়াল ৬৯৮। চাপ যখন একটু কমে ৪৫৬ হ'ল তখন অনুপাত হ'ল আরও বেশী, অর্থাৎ ৭১৪। কিন্তু চাপ যখন বেড়ে ৬১০ হয়ে দাঁড়াল তখন তা কৃষির সাধ্যের বাইরে চলে গেল, সে বর্ধিত চাপের অংশ কৃষি আর বহন করতে পারল না। ফলে অনুপাত কমে ৫৭২ হয়ে দাঁড়াল।

পশ্চিম বাংলায় ২৬টি থানা আছে যা একেবারেই গ্রাম-প্রধান। সেগুলির হিসাব আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রতি বর্গমাইলে মোট জনসংখ্যা ১০৫০ বা তার কাছাকাছি যখন থাকছে তখন পর্যন্ত কৃষির উপর নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃত ততই বেশী। এই জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ১০৫০ অপেক্ষা যতই বেশী হচ্ছে ততই অন্যান্য জীবিকার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বাড়ছে। জনসংখ্যার চাপ যখন ১৫০০ হতে ২৫০০, তখন কৃষি ও কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকার মধ্যে বেশ সন্তোষজনক অনুপাত দেখা যায়। তার চেয়েও বেশী চাপ হলে দেখা যায় তখন সে চাপ গ্রামের কৃষি ও কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকা সম্মিলিত হয়েও সহ্য করতে পারে না।

সুতরাং এই সব পরিসংখ্যান হতে গ্রামীন বাংলার একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। যে চাপ গ্রাম ও গ্রাম্যজীবিকা (কৃষি এবং কৃষিব্যতিরিক্ত) সহ্য করতে পারছে না শহর তার কতখানি ক্ষতিপূরণ করছে, নতুন নতুন জীবিকা ও নতুন নতুন আয়ের পথ কতখানি উন্মোচন করেছে এবং তার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রসার হয়েছে কিনা, হলেও কতখানি হয়েছে এবং কি ধরণে হয়েছে—এই প্রশ্নগুলি আলোচ্য।

৫

গ্রামাঞ্চলের ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ শহর থেকে হয় কিনা এই আলোচনা করবার আগেই আমাদের শহরগুলির আসল রূপটি বোঝা দরকার। পূর্বেই বলেছি, আমাদের সব শহরই পাকারকম 'শহুরে' শহর নয়। অর্থাৎ শহর বলতে আমরা যে ধরণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রভাব আশা করি, সব শহরে তার চিহ্ন ফোটে নি। অনেকগুলিই এখনও গ্রামের চালচলনেই মোটামুটি আছে। বাংলায় শহরবাসীর অনুপাত মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ কিন্তু শিল্পে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ ছোট-শিল্প বড়-শিল্প গ্রাম্য-শিল্প শহুরে-শিল্প সব কিছু জড়িয়েও যত লোক শিল্পে আছে তার চেয়ে আরও অনেক বেশী শহরে আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে শিল্পই শহর গড়ার একমাত্র কারণ নয়। বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্প। ১৯৪৭ সনে ফ্যাক্টরী-আইনে পরিচালিত ফ্যাক্টরীগুলিতে কাজ করত মোট ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার শ্রমিক। যদি মোটামুটি গত সেন্সাসের হিসেবে শিল্পে কর্মী ও নির্ভরশীলদের অনুপাত অনুসারে কেবল ফ্যাক্টরী-শিল্পে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হিসাব করা যায় তা হলে সেখানে কর্মী ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ও তার উপর নির্ভরশীল লোক আরও ৮ লক্ষ ২১ হাজার ধরে মোট সংখ্যা হয় ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাৎ, পশ্চিম বাংলায় শিল্পনির্ভর লোক মোট ৩৮ লক্ষ ২১ হাজারের মধ্যে শুধু ফ্যাক্টরী-শিল্পাশ্রয়ী মোট জনসংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ লাখ মাত্র। অতএব শিল্পবিস্তার—বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্পবিস্তারই যে এখানে শহর-বৃদ্ধির একমাত্র তাগিদ নয় একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমাদের শহরগুলির চেহারা ও বিন্যাস এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রথমে মোট জনসংখ্যার হিসেবে শহরগুলি বিচার্য। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের শহরগুলির জনসংখ্যার যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে নীচের হিসাব হতে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে :

বিভিন্ন শ্রেণীর শহরের সংখ্যা, ১৯০১-১৯৫১

শ্রেণী	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
(ক) এক লাখের বেশী জনসংখ্যা	৭	৩	২	২	২	২
(খ) পঞ্চাশ হাজার হতে এক লাখ জনসংখ্যা	১৪	১০	২	৪	২	—
(গ) কুড়ি হাজার হতে পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা	২৭	২৮	২১	২৩	১৯	১৫
(ঘ) দশ হাজার হতে কুড়ি হাজার জনসংখ্যা	৪০	২৭	২৭	২১	২৫	২৮
(ঙ) পাঁচ হাজার হতে দশ হাজার জনসংখ্যা	১৫	২০	২৪	২৭	২১	২১
(চ) পাঁচ হাজারের কম জনসংখ্যা	১১	১১	১৪	৮	৮	৮
মোট	১১৪	৯৯	৯০	৮৫	৭৭	৭৪

আসছে। রেভিনিউ সার্ভের সময় হতে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রামের ঠিক মিলিয়ে হিসেব করা সম্ভব হলে হয় তো এর একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া সরকারী পরিসংখ্যানে গ্রাম ও মৌজার সংখ্যার পার্থক্য সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে সরকারী পুরনো কাগজের গহন অরণ্যে প্রবেশ করলেও এই পার্থক্য গোড়া থেকেই কেন রয়ে গিয়েছে তা স্পষ্ট জানা যায় না। এ ছাড়া শুধু চাষের জমি নিয়ে মৌজাও কতকগুলি আছে, যেখানে কোনও বসতিই নেই। সেইজন্য প্রত্যেকটি বসতি-বিহীন মৌজাই যে অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতার নিদর্শন একথা মোটেই সত্য নয়। এমন কি ম্যালেরিয়াতেও কিছু গ্রাম জনহীন হতে পারে। তবু এর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ যে হয়তো কতকটা বিদ্যমান এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হবে না।

দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় শহরের সংখ্যা যেমন কম, একেবারে তলার দিকের শহরের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম এবং তারা সংখ্যায় কমছে। দেখা যায় পশ্চিম বাংলায় কালনা, সোনামুখী, পাত্রশায়র, খড়ার, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, আরামবাগ, গোবরডাঙ্গা, বীরনগর, মুর্শিদাবাদ ও পুরনো মালদহ এই বারটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ১৮৭২ সনের জনসংখ্যার চেয়ে কম। আর কাটোয়া, দাঁইহাট, সিউড়ি, ঘাটাল, হুগলী-চুঁচুড়া, বারাসত, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর, বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ ও জঙ্গীপুর এই তেরটি শহরের জনসংখ্যা কমতে কমতে সম্প্রতি কিছু বেড়েছে। এই শহরগুলি তো নিজেই ক্ষয়িষ্ণু। অর্থাৎ এককালে যে অর্থনৈতিক তাগিদে তাদের জন্ম ও প্রসার আজ সে তাগিদ অনুপস্থিত। সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায় পূর্বে যখন গঙ্গা বহতা ছিল তখন কালনা বড় বন্দর ছিল। কিন্তু এক দিকে নদীতে চড়া পড়ল এবং অন্য দিকে ই-আই-আর লাইন হওয়ায় (তখন ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইন হয় নি) ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ গেল ঘুরে। এই দুই কারণে কালনার পতন হ'ল। কাটোয়ার অবস্থাও তাই। দাঁইহাটে পিতল-কাঁসার জিনিষ উৎপাদনের কেন্দ্র এবং লুন, পাট, শস্য, তামাক, কার্পাস প্রভৃতির বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ক্রমে নদী দূরে সরে যাওয়ায় এবং শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি ঘটায় শহরটির অবনতি ঘটে। জেলার গেজেটিয়ার-গুলিতে এই রকম নানা কারণ লিপিবদ্ধ করা আছে।

শহরগুলির প্রকৃতি দেখলে এ কথাটা আরও পরিস্ফুট হয়। আমাদের শহরগুলির কতকগুলি আবাসিক শহর। তার মধ্যে সরকারী হেড কোয়াটার্সগুলিও আছে। যেমন মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, বাদুড়িয়া, বারুইপুর। আর কতকগুলি হ'ল শিল্পপ্রধান শহর—যেমন চাঁপদানি, বজবজ, কোন্নগর, বরাকর, হিলি। আর কতকগুলি রেলওয়ে কলোনীর চারপাশে গড়ে ওঠা শহর—যেমন আসানসোল, খড়্গপুর, কাঁচড়াপাড়া। এখন এই বিভিন্ন ধরণের শহরগুলির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, শিল্পপ্রধান শহরগুলিই বেশী বেড়েছে, যদিচ তাদের মোট সংখ্যা ১১৪টির মধ্যে ৪৩টির বেশী নয়।

বিভিন্ন ধরণের শহরগুলির জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, ১৮৭২-১৯৫১ (প্রতি দশকের শতকরা পরিবর্তন ব্র্যাকেটে দেওয়া হ'ল)

হিসাব লক্ষে

	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭১
আবাসিক শহর (সরকারী হেড কোয়ার্টার, সাধারণ আবাসিক শহর, চালকল-প্রধান শহর ও বাণিজ্য ও জলপথে আদান-প্রদানের কেন্দ্রগুলি ইহার অন্তর্গত)	১৪·৩৫	১০·০৩	৭·১১	৬·৪৬	৬·৩৪	৬·১২	৫·৮৪	৫·৫৯	৫·৬২
	(+৪৩·১%)	(+৪১.০%)	(+১০·০%)	(+২·০%)	(+৩·৬%)	(+৪·৭%)	(+৪.৪%)	(—০.৫%)	—
শিল্প-প্রধান শহর	৪৪·৭০	৩৪·৮৮	২০·৩০	১৭·৭৪	১৬·৪৩	১৪·১৩	১১·৪৭	৯·৬৮	৯·৭৬
	(+২৮·২%)	(+৭১·৮%)	(+১৪·০%)	(+৮·০%)	(+১৬·৩%)	(+২৩·১)	(+১৮·৪%)	(—০·৮%)	—
রেলওয়ে শহর	২·৯৯	১·৮৭	১·১৩	০·৬২	০·৪২	০·১৪	—	—	—
	(—৫৯·৮%)	(+৬৪·৯%)	(+৮২·৯%)	(+৫১·৯%)	(+১৭৪·২%)				

আবাসিক শহরগুলির তেমন উন্নতি হয় নি। পূর্বে উল্লেখ করেছি, কতকগুলির তো অবনতিই ঘটেছে। শিল্প-প্রধান শহরগুলির অবশ্য যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। তা হলে অন্ততঃ এক ধরণের শহর থেকে কি বাংলার গ্রামাঞ্চলের ক্ষতিপূরণ হয়েছে?

৬

আমাদের শিল্প-প্রধান এবং অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলির ভৌগোলিক বিন্যাস বড় বিচিত্র। যে কোনও কারণেই হোক্, কলিকাতার শিল্পাঞ্চল এবং আসানসোলের খনি অঞ্চলের মধ্যেই সেগুলি সীমাবদ্ধ। এ দুটি জায়গার মোট এলাকা হ'ল ১৮১·১ বর্গমাইল, মোট জনসংখ্যা হ'ল ৪৭,৮০,০০০। পশ্চিম বাংলা হতে যদি এই এলাকা বাদ দেওয়া যায় তা হলে পশ্চিমবঙ্গে শহরের এলাকা থাকে মাত্র ২৭০·৩ বর্গমাইল এবং শহুরে জনসংখ্যা মাত্র ১৩,৭২,০০০ অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৫০৭৬ জন লোক মাত্র। সুতরাং আমাদের জনসংখ্যার মোট ২৫ ভাগ অংশ শহরবাসী বলে আমাদের আশ্বস্ত হবার কিছুই নেই। এই শিল্পাঞ্চলের প্রভাব অন্য অঞ্চলে ছড়ায় নি। হাওড়া, হুগলী, চব্বিশপরগণা, দার্জিলিং ছেড়ে দিলে কেবলমাত্র নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় দেখা যায় মোট জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগের বেশী শহরবাসী।

বর্ধমানে শতকরা ১৪·৮, নদীয়ায় ১৮·২। বাকী সমস্ত জেলায় শহরবাসীর অনুপাত শতকরা ১০ ভাগেরও কম। মালদহে সেই অনুপাত শতকরা ৫°/০ ভাগেরও কম (৩৮°/০); বীরভূমে ৬৫°/০, পশ্চিম দিনাজপুরে ৫৮°/০। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি বা কুচবিহারে সে অনুপাত ৭°/০ হতে ৮°/০ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ যদি ঐ দুটি শিল্পাঞ্চল সরিয়ে নেওয়া হয় তা হলে পশ্চিম বাংলা উড়িষ্যার সঙ্গে তুলনীয় হবে, যদিচ উড়িষ্যায় জমি আরও অনেক বেশী এবং জনসংখ্যার চাপ সেইজন্যই কম। অর্থাৎ আমাদের প্রদেশে এই বিরাট্ একটা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব সারা প্রদেশে ছড়ায় নি। অন্য জেলাগুলিতে শহর বাড়ছে না। কারণ সেখানে নতুন নতুন আধুনিক শিল্প না গড়ে ওঠার ফলে নতুন শিল্প-প্রধান শহরও গড়ে নি। আর প্রাচীন আবাসিক শহর যেগুলি আছে আশপাশের গ্রামীণ শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবেই তারা এককালে বৃদ্ধি পেয়েছিল—এখন আশপাশের সেই সব শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেনের অবনতি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিরও অবনতি ঘটছে। এই বৃহৎ শিল্পাঞ্চলের কোনও প্রভাবই সেখানে পৌঁছয় না।

কিন্তু দূরের কথা ছেড়ে দিলাম। শুধু শিল্পাঞ্চলটুকুর কথাই চিন্তনীয়। অন্ততঃ এই জায়গাটুকুতেও কি বৃহৎ-শিল্প বাংলার সমাজে নব রস জোগাতে পেরেছে? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, এখানেও সেরকম কিছু ঘটে নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছুকাল পূর্বে এদেশে লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের যে সেন্‌সাস করেছিলেন তা হতে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের শিল্পগুলির মধ্যে বিদেশী মূলধন খুব বেশী। তার লভ্যাংশ এদেশবাসীর নয়—সুতরাং সে লভ্যাংশ হতে আমাদের কোনও উপকার নেই। কিন্তু লভ্যাংশই একমাত্র কথা নয়, কর্ম ও নিয়োগের মধ্য দিয়েও তো আমাদের উপকার হতে পারে। দুঃখের বিষয়, সেখানেও আমাদের উপকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পশ্চিম বাঙ্গলার শহরবাসীদের কত অংশ পশ্চিম বাংলার লোক এবং কত অংশ পশ্চিম বাংলার বাইরের লোক নীচের হিসেব হতে তা পরিস্ফুট হবে:

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শহরবাসীর হিসাব—তার মধ্যে কতজন পশ্চিমবঙ্গের লোক

	জেলার মোট জনসংখ্যার কত অংশ (শতকরা) শহরবাসী	উদ্বাস্তুদের বাদ দিয়ে শহরবাসীর সংখ্যা উদ্বাস্তু বাদে মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ	পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে এমন শহরবাসী ঐ জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ
বর্ধমান	১৪·৮	১৩·৮	৮·৬
বীরভূম	৬·৫	৬·১	৫·৪
বাঁকুড়া	৭·২	৭·০	৬·৭
মেদিনীপুর	৭·৫	৭·২	৫·৩
হাওড়া	৩২·৪	৩০·৭	২৩·৪
২৪ পরগণা	২৯·৬	২৬·০	১৫·০
কলিকাতা	১০০	১০০	৪৫·৭
নদীয়া	১৮·২	১৭·৫	৯·৫
মুর্শিদাবাদ	৭·৯	১৭·৬	৬·৩
মালদহ	৩·৮	৩·২	২·৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৫·৮	৩·৫	২·১
জলপাইগুড়ি	৭·২	৪·৮	২·১
দার্জিলিং	১৫·৫	১৫·৫	১২·৫
কুচবিহার	৭·৫	৬·০	৩·৩
মোট পশ্চিম বাংলা	২৪·৮	২২·৫	১৩·৪

অর্থাৎ, পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪·৮ ভাগ শহরবাসী, কিন্তু তার মধ্যে পশ্চিম বাংলার লোক মাত্র ১৩·৪°/০; অর্থাৎ, মোট শহরবাসীর অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশী। বাকী লোক বাইরের। এমন কি কলিকাতাতেও অর্ধেকের বেশী শহরবাসী (৫২·৭%) পশ্চিমবঙ্গের লোক নয়। বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ শহরবাসীর সংখ্যা মোট শহরবাসী সংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশী। চব্বিশ পরগণাতেও সেই অবস্থা। হাওড়ায় পশ্চিমবঙ্গীয়দের অনুপাত মোট শহরবাসীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। হুগলীতেও তাই। এই তো গেল শিল্পাঞ্চলের অবস্থা। মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি যে সব জেলায় শহরবাসীর অনুপাত এমনই কম সেখানেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অধিবাসীরা কম অংশ নিয়ে নেয় নি। কথাটা অপ্রিয় হলেও দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেখানে বৃহৎ শিল্প নতুন অর্থনৈতিক পদ্ধতির সূচীমুখ হিসেবে তার আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানেও তার সুফল পশ্চিমবঙ্গবাসী পায় না। শহর যতটুকু বেড়েছে সেখানে নতুন নতুন জীবিকার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গবাসী কমই পেয়েছে, তারা তো এ প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩·৪ ভাগ মাত্র। সুতরাং যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ কৃষির উপরেই চাপ পড়তে থাকবে, যখন কৃষি আর চাপ নিতে পারবে না তখন বৃত্তিহীন বেকার অবস্থা—এ ছাড়া তাদের উপায় কি?

সুতরাং এ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছি:

১। গ্রামাঞ্চলে ক্ষয় হচ্ছে। বসতিবিহীন মৌজা এবং জনসংখ্যার চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি আর সে চাপ নিতে না পারা এইরকম ক্ষয়ের অন্যতম লক্ষণ।

২। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্প-বাণিজ্যের তাগিদই শহর গড়বার প্রধান তাগিদ নয়। ফ্যাক্টরীতে নির্ভরশীল

যত লোক আছে পশ্চিম বাংলায় শহরবাসী তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং শহর বাড়া মানেই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, এ কথা ঠিক নয়।

৩। একথা অবশ্য সত্য যে, আমাদের প্রদেশে শহরের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু ভাল করে দেখলে দেখা যাবে যে, সব শহরের প্রসার ঘটে নি। বিশেষতঃ আবাসিক শহরগুলি, যে শহরগুলি গ্রামেরই ঘনীভূত সংস্করণ এবং চারপাশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক লেনদেনের কেন্দ্রস্থল—সেগুলির অবস্থা ভাল নয়। কতকগুলি তো এখনও ক্ষয়িষ্ণু, আর কতকগুলি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণুদশা ভোগ করছিল। বস্তুতঃ এ জিনিষ অপ্রত্যাশিত তো নয়ই, বরং স্বাভাবিক। যে জীবনরস আহরণ করে এই সব শহর গড়ে উঠেছিল এখন সে রস শুকিয়ে যাওয়ায় এগুলির হীনাবস্থা হওয়া স্বাভাবিক।

৪। বাকী থাকে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। নতুন জীবনরস যদি সঞ্চার করবার সম্ভাবনা কারও থাকে তা হলে এই অঞ্চলেরই আছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখি, এই শিল্পাঞ্চলের ভৌগোলিক বিন্যাস এমনই যে, এ অঞ্চলের প্রভাব কিছুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে নি। ঐ কয়টি জেলা ছেড়ে দিলে বাকী জেলাগুলি অত্যন্ত আদিম তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যেটুকু অঞ্চলে এর বিকাশ হয়েছে সেখানে শিল্পের লভ্যাংশ পশ্চিম বাংলার সম্পদ বাড়ায় না—কাজের সুযোগ ও নিয়োগও পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাগ্যে পড়ে না।

এইখানে একটা অপ্রিয় তর্কের উল্লেখ না করলে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের তো কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে মানা করে নি। তারা যায় না বলেই অন্য প্রদেশের লোক সুবিধা পায়। কথাটা সত্য। কিন্তু তার কারণ কি? ১৯২১ সনের বাংলার সেন্‌সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হাজারকরা স্ত্রীলোকের অনুপাত দেখে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বাঙালীরা বোধ হয় শহরে থাকতে ভালবাসে না। কিন্তু এবার স্ত্রীলোকের অনুপাত দেখলে সে অনুমান করা যায় না। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, বাঙালীরা শ্রমসাধ্য কাজ থেকে ক্রমশঃ হটে আসছে, তার কারণ তাদের আলস্য বা ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নয়—তার একমাত্র কারণ দীর্ঘকাল ধরে খাদ্যাভাব, অনটন, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্য। তা না হলে আজকের দিনে কিষাণেরা আগের মত খাটতে পারে না কেন? নতুন জমি ভাঙবার জন্য সাঁওতালের দরকার হয় কেন? অন্ততঃ চাষের কাজে বাঙালীর পরাঙ্মুখতা আছে এমন কথা তো কেউ বলবেন না; তবুও এ সব জিনিষ ঘটছে কেন? সুন্দরবন বা আরও কিছু এলাকায় পুরুষানুক্রমে মাঝির কাজ বাঙালীরাই করত—আজ তারা তা করে উঠতে পারে না কেন? শিল্পে না হয় বিতৃষ্ণা আছে তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম; কিন্তু রাস্তা তৈরির মাটির কাজে মুর্শিদাবাদের কয়েকটি গ্রাম হতে কিছু মুসলমান ছাড়া কোনও বাঙালীই পাওয়া যায় না কেন? কেন সেজন্য অন্য প্রদেশ—বিশেষতঃ উড়িষ্যা হতে লোক আনতে হয়? এর মূলে আমার মতে অন্য কোনও কারণ নেই—আছে অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্য। দীর্ঘদিনের অত্যাচারের ও ম্যালেরিয়ার ফল ফলছে। যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের সস্তাদরে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, অথচ যুদ্ধের সময়ই গ্রামাঞ্চলে ঘটেছে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। তারপর হতে খাদ্যের অনটন লেগেই আছে। গত বছর তো ৭২ লক্ষ লোককে আংশিক রেশন দিতে হয়েছিল। গোড়া হতেই বাঙালীর খাদ্য অত্যন্ত অপুষ্টিকর একথা বিশেষজ্ঞেরা বার বার বলেছেন। তার উপর যদি এই সব আঘাত আসতে থাকে তা হলে তার ফল কি হবে সহজেই অনুমেয়। মফস্বলের লোক কি রকম দুর্দশায় আছে তার অন্যতম প্রমাণ সরকার সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে ঋণের যে অনুসন্ধান করেছেন তা হতেই পাওয়া যায়। চাষীরা মোট যে টাকা ধার করতে বাধ্য হয় তার অর্ধেকেরও বেশী (কোনও কোনও ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী) সামান্য খাবার জোটাবার জন্য। সম্প্রতি বাংলার সেন্‌সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত অশোক মিত্র *Vital Statistics, West Bengal 1941-1950* নামে যে মূল্যবান পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন তা হতে জানা যায় যে, ১৯৪১-৫০ এই দশ বছরের গড়পড়তা বার্ষিক মৃত্যুহার পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে হাজার-করা যথাক্রমে বর্ধমানে ১৯'৩ এবং ২০'২, বীরভূমে ২৭'৫ ও ২৭'৩, বাঁকুড়ায় ২১'৩ ও ২০'৪, মেদিনীপুরে ২০'৪ ও ২০'৩, হুগলীতে ১৬'৪ ও ১৭'৩, হাওড়ায় ১৬'২ এবং ১৮'৬, ২৪-পরগণায় ১৫'১ ও ১৬'১, কলিকাতায় ১৬'১ ও ২৯'৫, নদীয়ায় ২৮'২ ও ২৮'৪, মুর্শিদাবাদে ২৪'৯ ও ২৩'৭, মালদহে ১৭'৬ ও ১৫'৭, পশ্চিম দিনাজপুরে ২৪'২ এবং ২৭'১, জলপাইগুড়িতে ২৪'২ ও ২৭'১ এবং দার্জিলিঙে ২৫'৫ ও ২৬'৭। যেগুলি একেবারে গ্রাম-প্রধান জেলা, যেমন বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম-দিনাজপুর বা মেদিনীপুর—সেখানকার মৃত্যুহার কলিকাতা হাওড়া হুগলী চব্বিশ-পরগণার মত শিল্প-প্রধান অঞ্চলের মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশী। এর কি কোনও তাৎপর্য নেই? সুতরাং বাঙালী শ্রমবিমুখ এই অপবাদ দেওয়া (বিশেষতঃ যে সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাও স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে মিস্ত্রি-গিরি ও কলকারখানার কাজ করছে) বাঙালীর প্রতি আঘাতের উপর অপমান।

৭

পূর্বের আলোচনা হতে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, অন্য দেশের শহর গড়ার সঙ্গে আমাদের দেশের শহর গড়ার কোনও মিলই নেই। অন্য দেশে —বিশেষতঃ অগ্রসর দেশগুলিতে—শহর গড়ে আর্থিক সমৃদ্ধির কারণে। নতুন শিল্প ও বাণিজ্য, নতুন সমৃদ্ধি, নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাস প্রকাশ চায় শহরের মাধ্যমে। এখানে এই নিয়ম অচল। এখানে বরং উল্টো পথে আমরা চলতে চাচ্ছি, শহর গড়ে সমৃদ্ধি বাড়াতে চাচ্ছি। কিন্তু শহর গড়লেই যে সমৃদ্ধি বাড়বে এমন কোনও কথা নেই। বরং সমৃদ্ধি বাড়বার পথে যে সব মৌলিক বাধা আছে সেগুলিকে দূর না করে শহর গড়লে দ্বন্দ্বের তীব্রতা আরও বাড়বারই সম্ভাবনা। যেমন, খাদ্য-দ্রব্যের উপর আরও টান পড়বে, শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আরও খরচ হবে। দ্বিতীয়তঃ, শহর গড়াকে যদি আমরা পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসির অন্যতম দিক বলেই মনে করি তা হলে এখানে ওরকম পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসির পথে বাধাগুলির কথা আমাদের স্মরণ করতে হবে। এ ইধরণের পাম্প চালানো রীতির পথে সাফল্য অর্জনের কি বাধা সেকথা পূর্বের প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। সেজন্য, পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসি করতে হলে এ রকম অপ্রত্যক্ষ পথে না গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামের উন্নতির বাধা দুরীকরণে তা প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। তৃতীয়তঃ, দেখা গিয়েছে যে, যদি জীবিকার প্রসারের ব্যবস্থা না করে শুধুই শহর গড়া হয় তা হলে যে সব গ্রামের লোক শহরে আসে তাদের বেশীর ভাগই উন্নততর জীবিকা পায় না, গ্রামে বেকার হয়ে বসে না থেকে শহরে বেকার হয়ে বসে থাকে। আসল সমস্যাটা সেইজন্য দেশজোড়া অর্থনৈতিক সমস্যা। সেটার দেশজোড়া ও মৌলিক সমাধানের যখন ব্যবস্থা হবে, অর্থাৎ মৌলিক ও ব্যাপকভাবে গ্রামের ক্ষয়িষ্ণুতা নিবারণের ব্যবস্থা হবে, নতুন অর্থনৈতিক প্রসারের সূচনা হবে, নতুন নতুন জীবিকার পথ উন্মোচিত হবে, তখন সেই পরিবেশে কমিউনিটি প্রোজেক্ট খুব ভাল কাজ করতে পারবে। বর্তমানে শহর গ্রামের বিরোধিতা করে বাড়ে। তখন যাতে আর তা না হয়, দু'য়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ গোড়া হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়—কমিউনিটি প্রোজেক্টের সহায়তায় সে চেষ্টা সেই সময় করা যেতে পারে। একটা নতুন অর্থনৈতিক প্রসারকে নতুনতর রূপ দেবার উপায় হবে কমিউনিটি প্রোজেক্ট। কিন্তু যতক্ষণ সেই প্রসার না দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ কেবল কমিউনিটি প্রোজেক্টের দ্বারা কোনও কাজ হবে না। বরং যে মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে সেই দ্বন্দ্বের ধাক্কায় তারা তলিয়ে যাবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। সেইজন্য আবার সেই পুরনো উপমায় ফিরে আসতে হয়। আগে হার্ট চাই, তখন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালালে আবার ধুক্ ধুক্ করে প্রাণ জেগে উঠতে পারে। কিন্তু হার্ট ফেল করে গেলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস কিছু করতে পারবে না।

পরিশেষে আর একটা কথা। শিল্প ছাড়াও অন্যান্য কারণও কিছু পরিমাণে শহরবৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে জীবিকা প্রসারের সহায়তা করে এ কথার উল্লেখ করেছি। যেমন রেলপথের সংযোগ বা বন্দর। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, পূর্ব-পাকিস্থানে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর গড়ে উঠছে। বিশাখা-পত্তনের গুরুত্ব যে পরিমাণে বাড়বে কলিকাতা বন্দরের কাজও সে পরিমাণে কমবে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যদি পাট ও চা রপ্তানীতে সংকট হয় তা হলেও কলিকাতা বন্দরের কাজ কমবে। তার উপরে যদি ফরাক্কায় গঙ্গার বাঁধ না হবার ফলে কলিকাতা বন্দর নষ্ট হয় তা হলে কয়েকটি ছোট ছোট শহর গড়ে ও তার চারপাশের কিছু গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করে সে ক্ষতির পূরণ কি সম্ভব হবে?*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ১৯৫১ সনের সেন্সাসের কয়েকটি পরিসংখ্যানের জন্য পশ্চিম বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত অশোক মিত্র মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ ঋণী। অবশ্য এই প্রবন্ধের যুক্তি বা মতামতের জন্য দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

সবুজ-সন্ধ্যা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

হেমন্তের মাঝামাঝি, বর্ষা শেষ হইয়াছে কিন্তু শীত আসে নাই। ছোটনাগপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে ছোট ছোট পাহাড় ও বিস্তীর্ণ শাল-অরণ্যের মাঝখানে সাঁওতাল পল্লীখানি যেন সবুজের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া আছে। সাঁওতাল পল্লী বলিলে যাহা বুঝায় ইহাও তাহাই, আট-দশটি পরিবারের বাসোপযোগী আট-দশখানি ঘর—ঠিক ঘরও নহে, অনুচ্চ মাটির দেয়ালের উপরে খড়ের চাল চাপান কুঁড়ে।

পল্লীর কাছাকাছি পাঁচ-ছয় ক্রোশের মধ্যে আর কোন পল্লী নাই—এই অরণ্য-সাম্রাজ্যের ইহাই যেন রাজধানী।

সকালবেলা বড়কু মাঝি তার ঘরের সামনে ছোট আঙিনাতে বসিয়া একখানা টাঙ্গীর সাহায্যে একটা শক্ত পাহাড়ী বাঁশ চাঁচিয়া ধনুক তৈরি করিতেছিল। সাঁওতাল বড়কু মাঝির বয়স ষাট পার হইয়াছে। চুল পাকিয়া সাদা হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি তাহার ঝাপসা হয় নাই এবং এক কালের দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ একটু বাঁকিয়া গেলেও চলিবার-ফিরিবার মত মজবুত রহিয়াছে।

আজকাল সে আর শিকারে বাহির হয় না—তাই বসিয়া বসিয়া খরগোশ ধরিবার জাল বোনে, ধনুক তৈরি করে। আঙিনার প্রান্ত হইতেই বন আরম্ভ হইয়াছে। তাই সাঁওতাল গৃহের প্রাঙ্গণগুলি শালের উঁচু খুঁটি ও বাঁশ দিয়া মজবুত করিয়া ঘেরা। দীর্ঘ শাল গাছের ফাঁক দিয়া যে রোদটকু আঙিনায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বসিয়া বড়কু মাঝি মনোযোগ দিয়া ধনুক তৈরি করিতেছে। আজ সকাল হইতে একটা খট খট্ আওয়াজ যেন বহুদূর হইতে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল। এক-আধবার বড়কুর কানেও সে আওয়াজ ঢুকিয়াছে, কিন্তু এতক্ষণ বিষয়টা সে তেমন খেয়াল করে নাই। এইবার হঠাৎ সে হাতের কাজ বন্ধ রাখিয়া আওয়াজটা মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করে এবং পরিষ্কার শুনিতে পায়। ব্যাপার সে বুঝিতে পারে না আবার হাতের কাজ তুলিয়া লয়।

খানিক পরে ঝাঁপের দরজা ঠেলিয়া আঙিনায় ঢোকে লালধন, কাঁধে এক বোঝা খরগোশ ধরিবার জাল, এক হাতে তীর-ধনুক আর এক হাতে একটা আধমরা খরগোশ। ঝুপ করিয়া জালের বোঝা ফেলিয়া মাথাটায় একটা ঝাঁকানি দিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়ায়। লালধনের বলিষ্ঠ চেহারাটা তার বাপের মতই দীঘল, তার উপরে যৌবনের লালিত্যের পোঁচটানা।

লালধন বিশ বছরের যুবক, অরণ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা ছেলে, ধনুক তীর দিয়া বাঘ হইতে হরিণ পর্য্যন্ত শিকার করিতে পারে, জাল দিয়া খরগোশ ধরিতে পারে, অন্ধকারে অনায়াসে জঙ্গলের পথ চিনিতে পারে। পায়ের দাগ দেখিয়া জানোয়ারের কোষ্ঠী গণনা করিতে পারে আর পারে মাদল বাজাইতে, বাঁশী বাজাইতে এবং সারারাত নাচিতে।

বাপের সামনে আধমরা খরগোশটা ধরিয়া দিয়া কুণ্ঠিতভাবে লালধন বলে, "আজ একটা কুলাই (খরগোশ) ছাড়া আর কিছু পেলাম না বাবা, ক'দিন থেকেই এই রকম হচ্ছে।" বড়কু চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ে, আজকাল এমন হইলে তো চলিবে না, সামনে ছেলের বিয়ে, বহু খরচপত্তর আছে, দিন গুজরান করিয়াও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে। ছেলেকে সাহস দিয়া বলে, "রোজ ভাল শিকার জোটে না রে বেটা, তবু দেওতার স্থানে একটা পূজো দিয়ে আসিস। কুলাইটা ঘরে রাখ, কাল হাটে নিয়ে বেচবি, এখন পয়সার দরকার।" খরগোশটা তুলিয়া লইয়া লালধন বলে. "ওবেলা আর একবার বেরুবো দেখি যদি কিছু পাই।"

খরগোশ, জালের বোঝা, তীর ধনুক একে-একে ঘরের ভিতরে রাখিয়া লালধন বাপের পাশে আসিয়া বসে।

বেলা প্রায় দুপুর। বড়কু হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া পড়ে, বলে, "খিদে পেয়েছে খেয়ে নে।" লালধন বলে, "কাণ্ডাতে (কলসীতে) জল আছে তো? না থাকে তো নালা থেকে নিয়ে আসি।"

বড়কু বলে, বস জল আছে, ফুলি সকাল বেলা এনে দিয়েছে। শুনিয়া লালধনের মুখখানা খুশীতে ভরিয়া উঠে।

২

সাঁওতাল পল্লীর গা ঘেঁসিয়া একজোড়া প্রাচীন ধাম্কমদারে (মহুয়া গাছ)। বনে মহুয়া গাছের অভাব নাই, তবুও মনে হয় সাঁওতাল পল্লীর এই জোড়া মহুয়ার একটা বিশেষত্ব আছে।

ইহার তলাটা যেন পল্লীর বৈঠকখানা, সকাল বিকাল পল্লীর কেহ না কেহ এখানে আসিয়া বসে, সলা-পরামর্শ করে, সুখ-দুঃখের কথা কয়।

পল্লীটির অবস্থান একটি অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায়, পিছনে আর একটা উচ্চতর পাহাড়, মাঝখানে ছোট নদী। সূর্য পশ্চিম আকাশে কিছুটা হেলিতেই পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ছায়া আসিয়া পল্লী জুড়িয়া পড়ে।

বেলা অপরাহ্ণ বড়কু মাঝিমস্ত বড়এক টা টেকোয় শণের সুতা কাটিতে কাটিতে মহুয়া তলায় আসিয়া বসে, একটু পরে টাঙ্গী হাতে প্রতিবেশী উতুম মাঝি আসে, বড়কু মাঝির সামনে উবু হইয়া বসিয়া সুতা কাটা সমালোচনার চক্ষে দেখিতে থাকে। হঠাৎ হাতের কাজ বন্ধ করিয়া বড়কু উতুমকে প্রশ্ন করে, ক'দিন থেকে দিনের বেলা যে খট খট আওয়াজ শুনতে পাই সেটা কি বলতে পারিস? উতুম জবাব দেয় না, খানিকটা যেন ভাবিয়া নেয়, তার পরে বলে, হুঁ আমিও শুনেছি, ঢোই পূবের দিকে! সুতা পাকাইতে পাকাইতে বড়কু আবার প্রশ্ন করে কিসের আওয়াজ তা জানিস? উতুম জানে

না, সে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে। সবজান্তা উতুম এ বিষয়টা জানে না ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। যৌবনে উতুম কিছুদিন কাতরাসের কয়লাখাদে কাজ করিয়াছিল, অতএব পৃথিবীর যাবতীয় দ্রষ্টব্য দেখিয়াছে এবং জ্ঞাতব্য তাহার জানা।

বিজলী বাতি ও হাওয়াগাড়ীর সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে। এমন কি সভ্য জগতের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা এত গভীর হইয়াছিল যে, সে তাহার মেয়ের একটা পূর্ববদেশের নাম পর্যান্ত রাখিয়াছিল। উতুম মাঝির মেয়ের নাম ফুলি, নামটায় যে বাংলাদেশের গন্ধ তাহাতে সত্যই সন্দেহ নাই। বোধ হয় কোন প্রতিবেশিনীর নাম শুনিয়া রাখা। অবশ্য সে বহুদিনের কথা। কয়লাখাদের কুলিসমাজ ছাড়িয়া উতুম প্রায় পনর বছর এই পল্লীতে স্বাধীন সাঁওতাল জীবন যাপন করিতেছে।

পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘতর হইয়া পড়ে, ধনুক আর তীর লইয়া লালধন বনের দিকে রওনা হয়। দেখিতে পাইয়া বড়কু ডাকিয়া বলে, "অরে বেটা, বেশী দূর যাসনে, বেলা নাই, জলদি ঘুরে আসিস।" লালধন বলে নালার ওপারে যাব, বেশী দূর যাব না নিদেইইনার (সন্ধ্যার) আগেই ফিরে আসব।"

লালধন বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়। বড়কু সুতা কাটা বন্ধ করিয়া উতুমকে বলে, ক'দিন থেকে তেমন শিকার মিলছে না। সারা সকাল ঘুরে ছোঁড়া একটা খরগোশ ধরে এনেছে।"

উতুম ঘাড় নাড়িয়া বলে, না, সেদিন আর নাই, আগে ঘর থেকে দু'পা বেরিয়েই কত শিকার পেয়েছি—খরগোস তো ঝোপে-ঝাড়ে।

বড়কু বলে, নালার এপারে পালে পালে সারাম (হরিণ), এখন ক'টা দেখতে পাস্?"

উতুম জবাব দেয়, "না—কই আর আগের মত। হরিণের পাল—মারাং বুড়োর (বড় পাহাড়ের) দিকে চলে গেছে।"

কাসিতে কাসিতে মিতান মাঝি আসিয়া বসে, বড়কু বলে, "দে একটু খৈনি দে, তোর খৈনি বড় মিঠা।" পরিধানে ভাগোয়া (কৌপীন) মাত্র, তাহারই এক কোণ হইতে একটি শালপাতার মোড়ক খুলিয়া মিতান বড়কুকে এক টিপ খৈনি দেয়. নিজের মুখেও এক টিপ ফেলিয়া দেয়। উতুমের পিনি তামাকের নেশা, সন্ধ্যা-সকাল হুঁকায় কলকে চড়াইয়া টানে—এটাও সভ্যসমাজের দান।

পাহাড়ের কোলে বলিয়া সাঁওতাল পল্লীতে সন্ধ্যা একটু আগেই ঘনাইয়া আসে। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বনমোরগ ও ময়ূর ডাকিতে সুরু করে—ইহাই তাহাদের নদীতে নামিয়া জল খাইবার সময়। সাঁওতাল মেয়েরাও জলকে বাহির হয়, মাথায় মাটির কলসী লইয়া ছোট-বড় দশ-বারটি মেয়ে মহুয়াতলা দিয়া পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নীচে নামিয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে ফুলিকেও দেখা যায়—ষোল-সতর বছরের তন্বী যুবতী, মাথাভরা একরাশ কোঁকড়া চুল, গায়ের রং কুচকুচে কালো। চিন্তাভাবনাহীন কলরবমুখর এক ঝাঁক পাখীর মতই ইহারা আনন্দময়; ক্ষণেকের জন্য বনপথটা সরগরম করিয়া তোলে।

পাহাড়ে নদী, বুক জুড়িয়া বালুর চড়া, এক পাশ দিয়া একটি ক্ষীণ স্বচ্ছ জলধারা ধীর গতিতে বহিয়া চলে। এখানে কলসী ডুবাইয়া জল ভরা চলে না, আঁজলা করিয়া জল ভরিতে হয়। মেয়েরা জল ভরিয়া কলসীগুলি বালির উপর বসাইয়া রাখে, প্রবীণারা স্রোতের ধারে বসিয়া হাত-পা মাজে, ছোটর দল নদীর ওপারে গিয়া জংলী ফুল সংগ্রহ করে। অরণ্য-লোকের মজাই এইখানে, নদীর এ বাঁকে যখন সাঁওতালী মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে গালগল্প করিতেছে ও বাঁকে তখন হয়তো ডোরাকাটা বড় বাঘ জল খাইতে নামিয়াছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে পাশ কাটাইয়া চলে, প্রতিবেশীর মত কেহ কাহারও অনিষ্ট করে না।

মাথায় ফুল গুঁজিয়া জল লইয়া মেয়ের দল ঘরমুখো বনপথ ধরে। মস্ত বড় একটা মোরগ হাতে ঝুলাইয়া লালধন হঠাৎ বন হইতে বাহির হইয়া আসে। হাতের মোরগটার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মিতান মাঝির স্ত্রী বলে, "অতবড় মোরগ তু' বাপ-বেটায় খেতে পারবি নে আধখানা আমাকে দিস্ লালধন।" কে একজন জবাব দেয়, "সে আশা করিসনে গো মা, ওর আধখানা তো ফুলির। শুনিয়া যাহারা উচ্চরবে হাসিয়া ওঠে ফুলিও তাহাদের একজন।

৩

পল্লী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে প্রত্যেক রবিবারে একটা হাট বসে। সেইখানে আশপাশের লোকেরা কেনাবেচা করে। বহু দূর হইতে বহু সাঁওতাল ও তাহাদের অরণ্যলব্ধ বেসাতি লইয়া ঐ হাটে আসে এবং যে যাহার বেসাতি বেচিয়া অতি প্রয়োজনীয় চাল, নুন, তামাক ও কখনও কখনও তাঁতে বোনা মোটা কাপড় কিনিয়া ঘরে ফেরে।

আজ শনিবার, সকাল হইতে পল্লীবাসীরা হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। মেয়েরা বেশ-বিন্যাস সুরু করে, নদী হইতে সাপ্তাহিক স্নান সারিয়া ও কাপড় কাচিয়া আসে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে খাটো শাড়ীখানি আঁটিয়া পরে, চুলে ফুল গোঁজে। দেহের ছন্দ এবং চলনের ভঙ্গী এতই মনোরম ও মনের আনন্দ এতই বেশী যে চরম দারিদ্র্যের ছাপও যেন ইহাদের গায়ে লাগে না। পুরুষ-মেয়েরা যে যাহার বেসাতি লইয়া পথে বাহির হয়, কাহারও মাথায় ঝুড়িভরা বনের ফলমূল, কাহারও মাথায় জংলী গাছের শক্ত আঁশের তৈরি দড়ি। কাহারও হাতে চাকভাঙ্গা টাটকা মধু।

লালধন তাহার খরগোশটি লইয়া ইহাদের সঙ্গ নেয়।

বিরহর (বনপথ) ধরিয়া ইহারা চলিতে থাকে। বিস্তীর্ণ শালবনের মধ্যে দিয়া সরু পায়ে চলার পথ, কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও চিহ্নমাত্র নাই অথচ ইহারা নিশ্চিন্ত মনে ঠিক পথে চলিয়া যায়।

পশুপক্ষীর মত অরণ্যেরই সন্তান, রাত্রি হোক, দিন হোক বনে ইহারা পথ হারায় না। বনসঙ্কুল ছোট-বড় পাহাড় পার হইয়া উপলময় ছোট-বড় নদী পার হইয়া কোথাও সাবধানে নিঃশব্দে কোন

বড় জানোয়ারকে পাশ কাটাইয়া, কোথাও কোনটাকে হল্লা করিয়া খেদাইয়া ইহারা বনের শেষে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখান হইতে সুরু হয় তরঙ্গায়িত বন্ধুর কঙ্করময় মাঠ, কুল ও পলাশের ঝোপ-ঝাড় আর এখানে-ওখানে আম ও মহুয়া গাছ। এইবার পথ পথেরই মত, চলার বেগ তাই বাড়িয়া যায়, অনুচ্চ কণ্ঠে মেয়ে-পুরুষে মিলিত কণ্ঠে একটা গান ধরে।

বিকেলের দিকে মহুয়াতলায় বড়কু আর উতুমকে দেখা যায়, পল্লীটা নীরব, অনেকেই আজ হাটে চলিয়া গিয়াছে। বড়কুর হাতের টেকো চলিতেছে না, উতুম আরও ঝুঁকিয়া বসিয়াছে একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। বড়কু বলে, "যা সবাই দেয় আমিও তাই দেব, আমি বড়কু মাঝি ছেলের বিয়েতে কারুর চেয়ে কম খরচ করব না—তবে নেয্য পাওনা চুকিয়ে দেব।" উতুম জবাব দেয়, "অনেয্য আমিও চাই নি বড়কু, চারখানা লুগড়ি (কাপড়), দুটো ঝলা (মেয়েদের জামা), একখানা থারি—এ তো দিতেই হবে, এ ছাড়া একটা মেরম (পাঁঠা) আর পউরা (মদ) এ আর বেশী কি?" বড়কু আশ্চর্য হইয়া বলে, "বেশী নয়, চারখানা কাপড়, বেশী নয়? কার ছেলের বিয়েতে কে চারখানা শাড়ী দিয়েছে বল তো?" উতুম হাসিয়া জবাব দেয়, "চারখানা শাড়ী তো আমি কম করে বলেছি, চারখানার কমে বিয়েই হয় না—তুই নিজেই হিসেব কর কনে'কে একখানা শাড়ী দিবি কিনা, কনে'র মাকে একখানা শাড়ী দিবি কিনা, মাসীকে একখানা দিবি কিনা।" বাধা দিয়া বড়কু বলে, "তা দেব বইকি, দুনিয়াশুদ্ধ লোককে শাড়ী দেব! বলি উতুম মাঝি, কনে'র যে মাসী আছে তা ত জানতাম না।" উতুম উষ্ণ হইয়া বলে, "না থাকলে কি আর বলছি তোকে। তুই আমার কথা মানবি নে, না মানলি পাঁচ জনের কথা ত মানবি?" "তা মানব বইকি জরুর মানব; আমি কি পাঁচ জনের বাইরে?" তর্কের একটা মীমাংসা দেখা যায়, বড়কু আবার সুতা কাটিতে আরম্ভ করে, উতুম সমালোচনার দৃষ্টিতে তা দেখিতে থাকে, সায়াহ্নের ছায়া ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বনের অন্তরাল হইতে দু'একটি কথা ও হাসির টুকরা ভাসিয়া আসে, বড়কুর হাতের টেকো আবার থামিয়া যায়, বলে, "হাট ফেরতা ওরা আসছে।" একটু পরে হাট-ফেরত দলটি আসিয়া উপস্থিত হয়—মহুয়াতলা দিয়া একে একে যে যাহার ঘরের দিকে আগাইয়া যায়, লালধন আর মিতান দাঁড়ায়। বড়কু ছেলেকে প্রশ্ন করে তামকুর (তামাক) এনেছিস তো?" লালধন ঘাড় নাড়িয়া বলে, "এনেছি—বড় দাম, তবে জিনিষ ভাল।" উতুম বলে, "চালের দাম বেড়ে গেছে; বুলুং-এর (লবণের) দাম বেড়ে গেছে, সুনুমের (তেলের) দাম বেড়ে গেছে—আর কিছু কেনা চলবে না।" ভাবনার কথা বটে, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়।

মিতান ঘরের দিকে যায় কিন্তু দু'পা গিয়াই আবার ফিরিয়া আসে, বড়কুকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "একটা খবর শুনে এলাম, ছটু সাও বলছিল।"

বড়কু জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া চায়। মিতান বলে, "ছটু সাও বলছিল সরকারী ঠিকাদার এসে বন কাটতে সুরু করেছে।" সবক'টি শ্রোতাই এ কথা শুনিয়া সজাগ হইয়া উঠে, উতুম প্রশ্ন করে, "কোন্ বন কাটতে সুরু করেছে?" মিতান জবাব দেয়, "আমাদের এই মারাংবির (বড় বন) হোই পূব থেকে সুরু করেছে—বাঘা পাহাড়িতে আড্ডা গেড়েছে।" শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠে, একেবারে অসম্ভব কথা—সরকার বন কাটিবে কেন এবং কাটিবেই যদি তাহা হইলে তাহাদের এই বড় বন কেন? মিতান মাঝি মাথা নাড়িয়া বলে, "ছটুর কথা শুনে প্রথমে আমিও হেসেছিলাম, কিন্তু ছটু বলল সে নিজে দেখে এসেছে—তারই আড়ত থেকে ঠিকাদারের সওদাপত্তর যায়।" কথাটা তাহা হইলে সত্য! হঠাৎ বড়কু মাঝি চাপা গলায় বলে 'উতুম, হোই পূব থেকে না এক একদিন খট্ খট্ আওয়াজ শুনতে পাই?" উতুম উত্তেজনায় সোজা হইয়া বসিয়া বলে, "হোই পূব থেকে হোই বাঘা পাহাড়ির তরফ থেকে।" আর সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না—গাছ কাটার শব্দ পর্যন্ত তাহারা শুনিয়াছে। এই নিস্তব্ধতার দেশে হাওয়া বহিলে চার-পাঁচ মাইল দূরের শব্দ মাঝে মাঝে পরিষ্কার শোনা যায়। একটা অপ্রত্যাশিত আশঙ্কার ছায়া সকলের মুখেই পড়ে।

হঠাৎ বড়কু হাসিয়া উঠে, মিতানকে বলে, "বন কাটতে এসেছে বলেই বন কাটতে পারবে? মারাংবির কাটবে এমন মানুষ জন্মায় নি, টেঙ্গই নিয়ে যারা বন কাটতে এসেছে তাদের একটাও ঘরে ফিরে যাবে না, মারাংবিরের দেবতা যে-সে দেবতা নয়!" তাই তো কথাটা এতক্ষণ কাহারও খেয়াল হয় নাই। মারাংবিরের জাগ্রত-দেবতা যাহার আশ্রয়ে তাহারা এতকাল নিরাপদে বসবাস করিয়াছে, তিনি থাকিতে তাহাদের ভাবনা কি? বন কাটিয়েদের একজনও বাঁচিবে না, এমন কি তাহাদের বংশে বাতি দিবার লোকও থাকিবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সকলেই আবার নিশ্চিন্ত হয়—মিতান মাঝি যাহা কোনদিন করে নাই আজ তাহাই করিয়া বসে, নিজের একটিপ খৈনি বড়কুর দিকে আগাইয়া ধরে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, মহুয়াতলার আসর ভাঙ্গিয়া যায়—যে যাহার ঘরের দিকে চলে।

৪

সকালবেলা খরগোশ ধরার জাল ও তীর-ধনুক লইয়া লালধন, উতুম আর মিতান শিকারে বাহির হয়। ভোরের আলো ঘন শাল-পল্লবের ভিতর দিয়া এখানে-ওখানে বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—নিবিড় ছায়ার মধ্যে ইতস্ততঃ সেই আলোর ঝরণা রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

তিন শিকারী নিঃশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, সকলের শেষে লালধন প্রাণবন্ত তরুণ, হরিণের মতই সে এই অরণ্যলোককে ভালবাসে। কিছুদিন হইতে তাহার মনে একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, একটা আনন্দ তাহার চলায় বলায়, তাহার সকল কাজে

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যে ফুল যে ফলকে সে ভালবাসে, যে নদী অরণ্য পাহাড়কে সে ভালবাসে, যে আত্মীয়-স্বজন তাহার প্রিয়, আজ যেন তাহাদের প্রত্যেককে সে আরও বেশী করিয়া ভালবাসে।

একটি কালো মেয়ে লালধনের মনে এই আশ্চর্য্য অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ফুলিকে যেদিন হইতে লালধন ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে সেদিন হইতে তাহার পৃথিবী আর এক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। লালধনের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র আজকাল ফুলি। ফুলির সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে, ফুলি ও একটি ছোট ঘর লইয়া লালধনের কল্পনা লতাইয়া চলে।

হঠাৎ শিকারীর দল থামিয়া যায়, লালধনও থামে—তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা বনের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে—সেখানে কুল ও পলাশের ছোট ছোট ঝোপ। জায়গাটার এখানে-ওখানে কিছু কিছু ঘাস গজাইয়াছে—উতুম হেঁট হইয়া দেখে তারপরে বলে "এখানে আছে, জাল পাত।" ছোট মাঠটার মাঝখান দিয়া লম্বা জাল গোটা কয়েক খুঁটার উপর টানাইয়া দেয়। খরগোশ ধরা এই জালগুলি বহরে মাত্র দু'হাত কিন্তু লম্বা খুব। জাল টানাইয়া দুই প্রান্তে লালধন আর মিতান লুকাইয়া বসে, উতুম আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়গুলির উপর পাথর ছুড়িয়া মারে এবং মুখ দিয়া একরকম অদ্ভুত আওয়াজ করিতে থাকে। হঠাৎ একটা ঝোপ হইতে একজোড়া খরগোশ বাহির হইয়া সোজা ছুটিয়া গিয়া জালে পড়ে, মুহূর্ত্তে জাল খুঁটা হইতে খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়—খরগোশ দুটি লাফালাফি করিয়া বেশ ভাল ভাবেই জড়াইয়া পড়ে। দুই দিক হইতে লালধন আর মিতান ছুটিয়া আসে, ক্ষিপ্র দক্ষতার সঙ্গে খরগোশ দুটিকে ধরিয়া ফেলে এবং লতা দিয়া পা বাঁধিয়া ছোট জালের থলিতে রাখিয়া দেয়। জাল গুটাইয়া লইয়া আবার তাহারা আর এক জায়গায় আসিয়া জাল পাতে, আবার উতুম ঝোপের ভিতর পাথর ফেলে এবং খরগোশ বহিষ্করণ মন্ত্র আওড়ায়। এবারেও একজোড়া খরগোশ বাহির হয় কিন্তু কি মনে করিয়া তাহারা সামনে লাফ না মারিয়া দুই পাশ দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যায়। উতুম একটা অকথ্য গালাগালি দিয়া উঠে। আরও দুই-এক জায়গায় জাল পাতিয়া তাহারা আরও কয়েকটা খরগোশ ধরে। ইতিমধ্যে বেলা অনেক হইয়া যায়, জাল গুটাইয়া শিকারীরা ঘরে ফিরিবার আয়োজন করে। হঠাৎ তাহারা পরিষ্কার শুনিতে পায় দূর হইতে আওয়াজ আসিতেছে খট্ খট্। তিন জনে কান পাতিয়া শুনে, বাঘাপাহাড়ী বেশী দূর নয়, গাছ কাটার আওয়াজ তাহারা শুনিতে পায়। মিতান ঘাড় নাড়িয়া বলে, "ছটু সাও ঠিক বলেছে, শুনলি ত বাঘাপাহাড়ীতে বন কাটছে।" তিন জনের মনেই আবার একটা আশঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসে, বোধ হয় যেন একটা অজ্ঞাত বিপদ ধীরে ধীরে, আগাইয়া আসিতেছে।

জালের বোঝা কাঁধে তুলিতে তুলিতে উতুম বলে, "এত বড় জঙ্গলের কাঠ কেটে সরকার করবে কি?" মিতান জবাব দেয়, "লড়াই লেগেছে, তাই কাঠের দরকার, ছটু সাও বলছিল সরকার আরও অনেক বন কেটেছে।" লড়াই যে বাধিয়াছে তাহা উতুম জানে, কিন্তু সে লড়াই কোথায় এবং কাহার সঙ্গে তাহা সে জানে না—আর লড়াইয়ের সঙ্গে কাঠের কি সম্বন্ধ তাহাও সে বোঝে না। সে ভাবে দুনিয়াটা দিনে দিনে যেন কেমন অদ্ভুত হইয়া যাইতেছে।

শিকারীরা ঘরমুখো পথ ধরে। হঠাৎ লালধন থামিয়া গিয়া বলে, "মিতান খুড়ো, আমার জালের বোঝাটা ঘরে পৌঁছে দিবি?" তার মানে? মিতান অবাক হইয়া বলে, "কি হ'ল তোর? ঘর যাবি নে?" লালধন বলে, "না, আমি বাঘাপাহাড়ী ঠিকাদারের ছাউনি দেখতে যাব—যদি পারি ভাগের খরগোশ দুটো বেচে আসব।" উতুম আপত্তি করে, বলে, "বেলা হয়েছে ঘর চল। ছাউনী দেখে ঘরে ফিরতে তোর সন্ধ্যা হবে—সারাদিন না খেয়ে থাকবি নাকি?" লালধন সে আপত্তি কানে তোলে না, জালের বোঝা মিতানের ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া ঝুলিতে একজোড়া খরগোশ লইয়া পূবের দিকে রওনা হয়।

"

লালধন বাঘাপাহাড়ীর দিকে চলিতে থাকে, গভীর বনের মধ্য দিয়া প্রায় দু' ক্রোশ পথ। মারাংবির (বড় বন) তাহার নখ-দর্পণে. কোথায় কোন্ নদী, কোথায় কোন্ নালা, কোথায় কোন্ ছোট-বড় পাহাড়, কোথায় বিপদ আছে, কোথায় নাই তাহা সে জানে। পথ নাই, অথচ তাহার চলা বাধা পায় না, আপনার লক্ষ্যের দিকে সে ঠিক চলিয়া যায়। ছোট ছোট গোটা দুই নদী পার হইয়া লালধন জঙ্গলময় একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিতে থাকে। পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া পূবের দিকে চাহিয়া সে একেবারে থামিয়া যায়, সামনের বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে। তাহার সামনে যেন এক নূতন দেশ সম্পূর্ণ অচেনা। সে কি পূবে আসিতে উত্তরে বা দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছে? কিন্তু এমন দিকভুল সে কোন দিন করে নাই—আজও করিবে না। ঐ ত বাঘাপাহাড়ীর উঁচু টিলা—ঐ ত নদীর বাঁক, কিন্তু সে অগণ্য পশুপক্ষীর আশ্রয়দাতা গভীর অরণ্য কোথায়—শাল তরুশ্রেণী যাহারা এতকাল আকাশে মাথা তুলিয়া মূর্ত্তিমান আনন্দের মত দাঁড়াইয়াছিল তাহারা কোথায়? তাহার সামনে একটা অসমতল গুল্মময় মাঠ পড়িয়া আছে। লালধনের মনে বিস্ময়ের স্থানে ক্রমে ক্রমে একটা অস্পষ্ট বেদনা বোধ জাগিয়া উঠে! কতবার সে বাঘাপাহাড়ীর বনে শিকার করিতে আসিয়াছে, কতবার বিপদে পড়িয়াছে, কতবার আশাতীত শিকার মিলিয়াছে—আজ সে বনের চিহ্নমাত্র নাই!

লালধন হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, তারপরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নীচে নামিতে থাকে। ছোট একটা নদী পার হইয়া সে তরুহীন মাঠটায় গিয়া উপস্থিত হয়, চারিদিকে তাকাইয়া দেখে কোথাও দৃষ্টি ব্যাহত হয় না।

নিঃশব্দে পা ফেলিয়া সে আগাইয়া চলে, কেমন যেন একটা ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়—মনে হয় যেন অরণ্যের অশরীরী আহত আত্মা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। গোটা দুই টিলা পার হইয়া গেলেই তাহার চোখে পড়ে কাঠের স্তূপ, শাল গাছ কাটিয়া ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিয়া বাকলা তুলিয়া—এখানে-ওখানে গাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। একটু পরে সে দূরে কুলিদের কোলাহল শুনিতে পায় এবং আর একটা টিলা পার হইলে ঠিকাদারের ছাউনী তাহার চোখে পড়ে।

দুপুর পার হইয়া গিয়াছে, কুলির দল কাজ ছাড়িয়া কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ খাবার জোগাড় করিতেছে। গোটাকয়েক বড় আম গাছের নীচে কুলিদের আড্ডা, শালের খুঁটার উপর বড় ত্রিপল ঢাকা দিয়া চার-পাঁচটা তাঁবু ফেলা হইয়াছে। আশেপাশে অনেকগুলি গরুর গাড়ী দাড়াইয়া আছে, তাহাদের কোনটা কাঠ বোঝাই, কোনটা খালি। একটু দূরে প্রকাণ্ড আম গাছের নীচে একটি ভদ্রগোছের তাঁবু, সেটি ঠিকাদার সাহেবের।

এতগুলি কর্ম্মব্যস্ত লোকের মধ্যে আসিয়া পড়ায় লালধনের মনের অশান্ত ভাবটা কাটিয়া যায়। নিজের খরগোশ বেসাতি লইয়া সে কুলিদের তাঁবুর সামনে আসিয়া দাড়ায়। খরগোশের লোভে তাহাকে ঘিরিয়া দুই-চার জন লোক জমা হয়—দরদস্তুর হইতে থাকে। কুলিরা অধিকাংশই স্থানীয় লোক, সাঁওতাল চরিত্রের সহিত তাহাদের পরিচয় আছে। একজন প্রশ্ন করে, "কুলাইটা কত নিবি মাঝি?"

লালধন জবাব দেয়, "এক জোড়া দু'টাকা নেব।"

"দেড় টাকা দেব দিয়ে দে।"

লালধন ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানায়।

পাশের আর একজন কুলি বলে—"সাঁওতাল মাঝির একবাত, দু'টাকা বলেছে ত দুই টাকাই নেবে।"

কুলি বলে, "জঙ্গলের চিজ, টেক্স ত লাগে না কেন দিবি নে?"

লালধন সরল হইলেও বোকা নয়—জবাব দেয়, "ধরতে যে মেহনত লেগেছে—তার মজুরী, তা ছাড়া জঙ্গল ত কেটে ফেললি—আর খরগোশ পাবি কোথায়?"

অরণ্যপালিত সাঁওতালের দুঃখটা কুলিরা অনুভব করিতে পারে, সহানুভূতির সঙ্গে বলে, "আমরা করব কি বল, মজুরী পাই গাছ কাটি, সরকারের বন, সরকারের হুকুমে কাটাই হচ্ছে।" কথাটা তীরের মত লালধনের বুকের মধ্যে গিয়া বিঁধে—বন তাহার নয় আর একজনের, সে ইচ্ছামত ইহাকে রাখিতে পারে আবার কাটিতেও পারে। এই বনে তাহার জন্ম, এই বনে তাহার শৈশব কৈশোর কাটিয়াছে—এই বন তাহার আহার জোগায়, বসন জোগায়—তরুলতার মত, পাহাড় নদীর মত, পশুপক্ষীর মত এই অরণ্যের সে একটা অংশ অথচ ইহা তাহার নহে! কথাটা সে সম্যক্ বুঝিতে পারে না, ভিতরটা কেমন যেন ঝাপসা হইয়া আসে, একটা তীব্র ব্যথা বোধ করে।

শেষ পর্য্যন্ত কুলিদের সঙ্গে যখন দামে পটিল না তখন তাহারা ঠিকাদার সাহেবের তাঁবু দেখাইয়া কহিল, "সাহেবের কাছে নিয়ে যা মাঝি—দু'টাকা দিয়েই খরগোশ জোড়া কিনে নেবে—যা চলে যা।"

লালধন তাহাই করিল—সাহেবের তাঁবুর সামনে গিয়া উপস্থিত হইল। খরগোশ দেখিয়া সাহেবের চাকর ভিতরে খবর দিল এবং একটু পরে সাহেব তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্রীচেজ, হাফশার্ট ও টুপির দৌলতে বাঙালী প্রভাত রায় সাহেব আখ্যা পাইয়াছে।

বি-এ পাস করিয়া যখন বাংলাদেশে কোন কর্ম্মই জুটিল না তখন ছোটনাগপুরে জঙ্গল কাটার ঠিকাদারী লইয়া সে এখানে আসিল। স্বাস্থ্য ভাল—বয়স কম, ফুর্ত্তিবাজ প্রভাতের এ কাজটা ভালই লাগে। যথেষ্ট হৈ চৈ আছে, আমোদ আছে, অর্থও আছে। সিগারেট টানিতে টানিতে তাঁবু হইতে বাহিরে আসিয়া প্রভাত দেখে একটি সাঁওতাল তরুণ ঝুলির মধ্যে একজোড়া খরগোশ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভাঙা হিন্দীতে সে বলে, "কিরে তুই খরগোশ বেচবি?"

লালধন এ হেন হিন্দীর সহিত পরিচিত নয়, তবুও কথাটা বুঝিতে পারে—বলে "তুই যদি নিস সাহেব তা হলে বেচি।" কথা শুনিয়া সাহেবের ভিতরটা উষ্ণ হইয়া উঠে—তাহার মত সম্ভ্রান্ত লোককে তুই বলিয়া সম্বোধন করাটা সে মোটেই পছন্দ করে না—তা ছাড়া গোড়াতে তাহার প্রাপ্য সেলামটাও পায় নাই। একটু বিরক্তির সঙ্গেই সে প্রশ্ন করে, "কত দাম নিবি বল?"

লালধন বলে, "দু'টাকা।"

প্রভাত ধমকাইয়া উঠে, "দো রুপেয়া, ঠকানে কো আয়া—উল্লু।"

লালধন অবাক হইয়া সাহেবের মুখের দিকে তাকায়, রাগের কারণটা সে বুঝিতে পারে না। পরিশ্রমলব্ধ জিনিষের উচিত দামই সে চাহিয়াছে। কেমন করিয়া মানুষ ঠকাইতে হয় তাহা সে জানে না, সাহেবের প্রতি তাহার মন হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে।

প্রভাত পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বলে, "লে ওর দাম এক রুপিয়া সে বেশী তো নেহি সেকতা।"

লালধন ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানায় এবং খরগোশের থলিটি কাঁধে ফেলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করে। পাশেই সাহেবের চাকর দাঁড়াইয়া ছিল, লোকটি স্থানীয়, সরল সাঁওতালদের স্বভাব তাহার জানা—সে বলে, "হুজুর, এরা জঙ্গলের প্রাণী, এরা দরদস্তুর জানে না—জিনিষের দাম যা চায় তাই নেয়।"

খরগোশ দেখিয়া সাহেবের বেশ লোভ হইয়াছিল তাই তা হাত ছাড়া হইতেছে দেখিয়া রাগটা দ্রুত কমিয়া আসে, ভাল ভাবেই বলে, "আচ্ছা যা দু' টাকাই দিচ্ছি—ফের যখন পাকড়াবি তখন এখানেই নিয়ে আসিস।"

লালধন ঝুলি হইতে খরগোশ দুটি বাহির করিয়া দিয়া বলে, "নিয়ে আসব সাহেব।"

এইবার প্রভাত ইহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে—প্রায় উলঙ্গ হইলেও, গায়ের রং কষ্টিপাথরের মত নিকষ কাল হইলেও এই তরুণটির একটা শ্রী আছে, ধনুক তীর লইয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গীটিও বেশ। প্রভাত ধনুক তীর দেখাইয়া প্রশ্ন করে, "এই দিয়ে খরগোশ শিকার করিস?"

লালধন বলে, "না সাহেব, খরগোশ ধরেছি জাল পেতে। তীর ধনুক দিয়ে হরিণ মারি, বনশুয়োর মারি। দরকার হলে বাঘ ভালুকও মারি।'

শুনিয়া প্রভাত হো হো করিয়া হাসিয়াও ওঠে, বলে, "আস্ফালন ত বেশ আছে দেখছি—কটা বাঘ মেরেছ বাপু তোমার ঐ বাঁশের ধনুক দিয়ে?"

লালধন ঠাট্টাটা বুঝিতে পারে, সাহেবের প্রতি মনটা আবার তাহার বিরূপ হইয়া উঠে, জবাব দেয়, "আমি মেরেছি একটা, আমার বাবা মেরেছে এই এতটা।" লালধন প্রভাতের সামনে হাতের পাঁচটা আঙুল বিস্তার করিয়া ধরে।

"পাঁচটা?" প্রভাত বলে, "অসভ্য হলে কি হয়—লম্বা চওড়া ত বলতে শিখেছে।" বন্দুক নিয়ে এ দেশের বনে ঢুকতে ভয় পাই—এঁরা ধনুক দিয়েই পাঁচটা বাঘ মেরে ফেললেন—সে কেমন বাঘ বাপু দাঁত নখ আছে ত?

লালধন ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে, সাহেবকে বলে, "আমরা বাঘ দেখে ভয় পাইনে, বাঘ আমাদের পড়শী।" শুনিয়া প্রভাত হাসিয়া উঠে।

ফিরিবার পথে কুলিদের আড্ডা ছাড়াইয়া লালধন আবার সেই তরুহীন মাঠে আসিয়া পড়ে। সে পিছন দিকে তাকাইতে চায় না, দ্রুত পদে চলিতে থাকে, ঐ কুলী-সমাজ ও বিশেষ করিয়া ঠিকাদার সাহেবের প্রতি একটা ক্রোধ তাহার বুকের মধ্যে জমিয়া উঠিতে থাকে।

৬

বাঘাপাহাড়ীর জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে?

হুঁ।

একটা গাছও নাই, আছে কুল আর পলাশের ঝোপ।

হুঁ।

এইবার সোনাস্থতির জঙ্গল কাটতে সুরু করবে।

হুঁ।

এইভাবে চললে মারাংবির (বড় বন) আর ক'দিন থাকবে? অন্ধকারে বাপ-বেটায় কথা হয়। বড়কু শুইয়াছিল—লালধন বসিয়াছিল, তাদের কাহারো চোখে ঘুম ছিল না। লালধন আজ যা দেখিয়া আসিয়াছে বাপকে তাহাই শুনায়—বড়কু একটানা 'হুঁ' করিয়া যায়। তাহার মনটা ক্রমে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, বিষয়টা শুনিতেও ইচ্ছা করে না অথচ শুনিতেই হইবে—আজ না হোক কাল, কাল না হোক আর এক দিন। ভাবিতেও যেন কষ্ট হয়, এ যেন এমন একটা দুর্বোধ্য বিষয়—যার মীমাংসা হয় না।

তাহাদের আদি-অন্তহীন মারাংবির মানুষের হাতে একটু একটু করিয়া ধ্বংস হইতেছে, হয়ত একেকালে তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা কি সম্ভব? অথচ আজ তাহার চোখের সামনেই তাহা ঘটিতেছে। বড়কু উঠিয়া পড়ে আর শুইয়া থাকিতে পারে না, অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বসিয়া থাকে।

বাঘাপাহাড়ীর জঙ্গল সাফ হইয়া গিয়াছে—আশ্চর্য্য ব্যাপার, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বড়কু বলে, "বেটা ও জঙ্গলের নাম বাঘাপাহাড়ী কেন হয়েছিল জানিস?" লালধন জানে, কিন্তু উত্তর দেয় না, অতীতের সেই শোকাবহ ও বীরত্বময় কাহিনীটি বাপ বলিতে বড় ভালবাসে, বাপের মুখে সে আর একবার তাহা শুনিতে চায়। বড়কু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া অতীতের ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়, তারপর বলে, আমার ঠাকুরদার দুই ছেলে, বড় ছেলে আমার বাবা, ছোট ছেলে খুড়ো সাহান মাঝি। তুই তোর ঠাকুরদাকে তো দেখেছিস, সে যখন মারা গেল তোর বয়স তখন খুবই কম, তা হলেও তুই দেখেছিস। বুড়ো হয়েছিল তবু কাঠামোখানা ছিল মস্ত বড়, বয়সের আমলে সবাই তাকে বলতো 'সারজমদারে' (শাল গাছ), আর সত্যিই সে ছিল তেমনি লম্বা আর মজবুত। এ হ'ল সেই সময়ের কথা আমার বাবা তখন পুরো যোয়ান। বিয়ে হয়েছে—আমি মায়ের কোলে। কাকা সাহান মাঝি তখন কাঁচি যোয়ান, ষোল-সতর বয়েস।

এক দিন সকালে তিন বাপ-বেটায় তীর ধনুক আর টেঙ্গা নিয়ে শিকারে বেরোয়। কি গহন জঙ্গলই যে ছিল তখন, এখন তোরা যা দেখেছিস এ ত কিছু না। জঙ্গলের মধ্যে একটু যেখানে ময়দান, একটু যেখানে ঘাস সেখানে দিনে দুপুরে হরিণ চরত, একটু যেখানে গাড়া সেখানে পালে পালে শুয়োর থাকত, আর বাঘ ভালুকও থাকত আনাচে-কানাচে। হায় রে সেদিন! বড়কু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অতীতের বনাকীর্ণ জগৎটাকে স্মরণ করিয়া লয়, তারপরে সুরু করে, "তিন বাপ-বেটায় চলে যায় বাঘাপাহাড়ীর জঙ্গলে হরিণ মারতে। সেখানে বনের মধ্যে ছোট একটু খোলা জায়গা—তারা হরিণের ডাঁজ (চিহ্ন) দেখিতে পায়। তিন জন এক সঙ্গে না থেকে দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে যায়, বাবা আর কাকা যায় বাঁদিকে আর ঠাকুরদা একা যায় ডানদিকে। গাছের আড়ালে আবডালে তারা নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। এগোতে এগোতে বাবা আর কাকা হরিণ দেখতে পায়—চিতরা হরিণ এক পাল। হরিণের পাল কিন্তু চরে না, কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে, একটু একটু এগোয় আর থমকে দাঁড়ায়, মুখ উঁচু করে কান খাড়া করে কিসের যেন গন্ধ আর আওয়াজ পাবার চেষ্টা করে। সাঁওতালের ছেলে দেখেই বুঝতে পারে, আশেপাশে বড় জানোয়ার

গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, ছুই ভাই ঝুপ করে বসে পড়ে হরিণের মতই সজাগ হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ কেটে যায়, সন্দিগ্ধ হরিণের পাল খোলা জায়গা পার হয়ে বনে ঢুকে পড়ে--হঠাৎ দু'ভাই শুনতে পায় একটা চীৎকার, কুল (বড় বাঘ) রে বেটা কুল। ছুই ভাই চমকে লাফিয়ে ওঠে, তাদের বাপ বড় বাঘের সামনে পড়েছে। ছুই জনে আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে আর ডাকতে থাকে 'বাবা গোঁ, বাবা,' কিন্তু সে ডাকের কোন সাড়া আসে না। একটা সন্দেহ করে দু'জনের বুক কেঁপে ওঠে। তারা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে—হঠাৎ তাদের বাজের মত দৃষ্টি পড়ে একটা জায়গায়। এগিয়ে গিয়ে তারা সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে। াওতালের ছেলে, বাঘের পেছনের পায়ের ধারাল নখের গভীর দাগ দেখে সব বুঝতে পারে, এপাশে ওপাশে খুঁজতে খুঁজতে রক্তের দাগও দেখতে পায়, ছুই জনে দু'জনের দিকে তাকায়।

এইবার আর তারা চেঁচায় না, নিঃশব্দে দাগ দেখে দেখে এগিয়ে চলে, রাগে দুঃখে তারা বাঘের মতই হিংস্র আর মরিয়া হয়ে ওঠে, বেশীদূর যেতে হয় না, একটা সরু নালার ধারে তারা দেখতে পায় বিরাট বাঘ তাদের মরা বাপকে সামনে রেখে বসে আছে। ছুই ভাই গর্জে ওঠে। বড় বলে, 'ভাই তুই পেছনে থাক, আমি টাঙ্গী দিয়ে ওটার মাথা দু'আধখানা করে দিই।' ছোট বড়কে ঠেলে দিয়ে বলে, 'না না দাদা, তোর বউ ছেলে আছে, তুই পিছনে থাক আমিই ওটাকে ঠাণ্ডা করতে পারব।' ছোট ভাই টাঙ্গী তুলে এগিয়ে যায়, বাঘটা মুখ তুলে চায়—বুঝে দেখ বেটা বুঝে দেখ! হাঁক দিয়ে বাঘটা খুড়োকে নিশানা করে লাফ মারে, খুড়ো মাথার উপরে টাঙ্গী তুলে দু'পা সরে যায়, চোখের সামনে দেখে বাঘের মাথাটা—সেই মাথা তাক করে খুড়ো টাঙ্গী চালায়—লাগেও ঠিক, কিন্তু ধাক্কা সামলাতে না পেরে খুড়ো ছিটকে পড়ে যায়। বাঘও হুমড়ি খেয়ে পড়ে কিন্তু চোখের পলক পড়তে না পড়তে দুষমন উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ পিছন থেকে পড়ে টাঙ্গীর ঘা, বাঘ হাঁ করে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার শের-এর সঙ্গে শেরের লড়াই। বাঘ লাফ মারে, বাবা টাঙ্গী চালায়, ঘা খেয়েও বাঘ বাবার বাঁ কাধ কামড়ে ধরে। তবু বাবা এক হাতে টাঙ্গী চালায়। এমন সময় খুড়ো গর্জে এসে পড়ে— তার পরে দু' ভায়ের টাঙ্গীর কোপ পড়ে বাঘের মাথায়। বাঘ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বাঘ মরে গেলে বাবার হুঁস হয়, বাঁ হাত-পা তার অসাড় হয়ে গেছে, চেয়ে দেখে বাঁ কাঁধের মাংস উড়ে গেছে। অনেক দিন ভুগে প্রায় মরতে মরতে বাবা বেঁচে ওঠে। পাহাড়ের নাম সেই থেকে হল বাঘাপাহাড়ী—গল্পটা লালধন বহু দিন বহু বার শুনিয়াছে, আজ যেন এই গল্পের একটা নতুন অর্থ সে বুঝিতে পারে। শুনিতে শুনিতে আজ সে বারংবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

অন্ধকারে মাথা নাড়ে বড়কু। এইখানে তাহার পূর্ব্বপুরুষের জীবন আনন্দে কাটিয়াছে, তাহার ও তাহার বংশধরের কাটিবে না? কাটিবে—নিশ্চয় কাটিবে। বড়কুর ভিতরে কে যেন অভয় দিয়া জোর দিয়া বলে—মারাংবিরু অক্ষয় অমর। ইহাকে কেহ ক্ষয় করিতে পারিবে না। কবে কোথায় তাহারা যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন। তাই এই গুরুদণ্ড। রুষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে—পূজা দিতে হইবে, বড়কু রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলে, "দেওতা রাগ করেছে রে বেটা—দেওতা রাগ করেছে, পূজো দিতে হবে, কালই পূজোর যোগাড় কর।"

৭

সকাল হইতে সাঁওতাল পল্লী কর্ম্মব্যস্ত হইয়া উঠে, বন-দেবতার বিশেষ পূজা দেওয়া হইবে। বন-দেবতার পূজা প্রত্যেক বছরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কোন এক কারণে দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন তাই তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য এই বিশেষ পূজার আয়োজন। পল্লীর পিছনে একটা ছোট পাহাড়, তাহার মাথায় একটুখানি সমতল স্থানে শিবলিঙ্গের মত খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া আছে এক বিরাট পাথর। এই পাথর বন-দেবতার আসন, ইহাকে সাঁওতালেরা বংশপরম্পরায় বিপদে-আপদে, যখন শিকারের অভাব ঘটিয়াছে তখন এখানে পূজা দিয়া প্রচুর শিকার মিলিয়াছে, যখন বাঘের উৎপাত হইয়াছে তখন এখানে পূজা দিয়া আপদের শান্তি ঘটিয়াছে, যখন রোগব্যাধি দেখা দিয়াছে তখন এখানে পূজা দিয়া পল্লী রোগমুক্ত হইয়াছে। ইহার গায়ে কতকাল ধরিয়া কত নাইকে (পূজারী) যে সিঁদুর লেপিয়াছে তাহার খবর জানা নাই। ইহার সামনে কত মুরগী যে বলি পড়িয়াছে তাহার হিসাব নাই।

দুপুর পার হইয়া যাইতেই সাজগোজের জন্য ব্যস্ততা বাড়িয়া যায়, মেয়েরা প্রসাধন শেষ করে, চুল আঁচড়াইয়া বাঁধে, তাহাতে কত রকমের ফুল গোঁজে, সধবারা সিঁথেয় সিঁদুর পরে, তারপর দল বাঁধিয়া বন-দেবতার আসনের দিকে রওনা হয়। সকলের আগে চলে নাইকে বুড়ো চিংমন মাঝি, তার হাতে থালায় পূজার উপকরণ, সিঁদুর, আতপ চাল, ঘি। চিংমনের পিছনে হাতে একটা বড় সাদা মোরগ লইয়া চলে মিতান, তার পিছনে চলে উতুম, বড়কু, লালধন আরো অনেকে ও ছেলে-মেয়ের দল। পল্লীর পিছনের নদীটা পার হইয়া ইহারা কলরব করিতে করিতে ও পাড়ের ছোট পাহাড়টায় গিয়া উঠে। দেওতার আসনের সামনে কতকটা জায়গা আজ পরিষ্কার করা হইয়াছে, সেইখানে লালধন পূজার উপকরণ সমেত থালাটা রাখে, অন্যান্য সকলে চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। এইবার পূজা আরম্ভ হয়—চিংমন সিঁদুর তেলে গুলিয়া পাথরের গায়ে মাখাইয়া দেয় তার পরে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আলোচাল ছড়াইয়া সাদা মোরগটাকে সেইখানে ছাড়িয়া দেয়। মোরগ যদি সেই মন্ত্রপূত চাল খুঁটিয়া খাইল তাহা হইলে পূজা সিদ্ধ হইল, দেবতা প্রসন্ন হইলেন নচেৎ নহে, সকলে উদ্গ্রীব হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে কিন্তু মোরগ প্রথমে খাইতে চায় না, এতগুলি লোক দেখিয়া ভড়কাইয়া যায়। পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পলাইবার উপায় নাই। এই ভাবে কিছুক্ষণ লাফালাফি

করিয়া মোরগ হঠাৎ একটা চালের দানা খুঁটিয়া খায়—অমনি চারিদিক হইতে সকলে আনন্দে উৎসাহে হৈ চৈ করিয়া উঠে—চিৎমম মোরগটিকে পাকড়াও করে। এইবার পূজার শেষ পর্ব্ব, দেওতার আসনের সামনে ধারালো একখানা ফরসা (চওড়া টাঙ্গী) দিয়া মোরগটিকে বলি দেয়—পূজা শেষ হয়। আবার দল বাঁধিয়া সকলে পাহাড় হইতে নামিয়া আসে।

ফিরিবার পথে লালধন ফুলির পাশে পাশেই চলে। ফুলি আজ যত্ন করিয়াই সাজিয়াছে, কুসমী (হলুদ) রঙের শাড়ী পরিয়াছে, দু'হাতে সবুজ রঙের কাঁচের চুড়ি পরিয়াছে, কোঁকড়া কোঁকড়া খাটো চুলের গোছা টানিয়া ছোট একটি খোঁপা বাঁধিয়াছে আর সেই খোঁপার চার পাশে গুঁজিয়া দিয়াছে অনেক জংলী ফুল। ফুলির চলনের সঙ্কোচহীন ভঙ্গীটি ভারি সুন্দর। নিটোল ও সুঠাম দেহখানিতে যৌবনের শ্রী যেন ধরিতে চায় না, স্বল্প আঁচলে তা ঢাকা পড়ে নাই। দেখিয়া দেখিয়া লালধনের মনে একটা অপূর্ব্ব নেশা লাগে।

বর্ষান্তে পাহাড়ী নদীর জল এক হাঁটুর কম। সকলে পার হইয়া যায়—ফুলি নদীর মাঝখানে আসিয়া থামে—হেঁট হইয়া এক আঁজলা জল লইয়া চোখে মুখে দেয়। স্বচ্ছ জলে তাহার ছায়া পড়ে—তাহা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখে। ওপারের সরু বনপথ ধরিয়া সকলে ততক্ষণ অদৃশ্য হইয়া যায়, একটা আমলকী গাছের আড়ালে লালধন দাঁড়াইয়া থাকে। এইবার ফুলি জল হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি পথ ধরিয়া চলে। হঠাৎ লালধনকে দেখিয়া আরও একটু তাড়াতাড়ি চলে। পিছন হইতে লালধন ডাকে "এগে ফুলি, এগে একটু দাঁড়া।"

ফুলি চলিতে চলিতে বলে, "দাঁড়াতে পারব না।

লালধন এক লাফে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, পথ আটকাইয়া বলে, "আহা দাঁড়া না—একটা কথা বলব।"

ফুলি দাঁড়াইতে বাধ্য হয়—ভুরু কুঁচকাইয়া বলে 'কি বলবি?'

লালধন হাসিয়া ফেলে। ফুলিও হাসে। লালধন বলে আজ তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফুলি আবার ভ্রূ বাঁকাইয়া বলে, "এই কথা। পউর‍্যা খেয়ে ত মাতাল হয়েছিস—পথ ছাড় আমাকে যেতে দে।"

শুনিয়া লালধন হাসিয়া উঠে, বলে, "ঝুটা, কে বলেছে মদ খেয়েছি? এই দেখ মদ খাই নি।" লালধন ফুলির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়, নিজের মুখখানা ফুলির মুখের কাছে লইয়া যায়। উদ্দেশ্যটা ফুলি বুঝিতে পারে, হাসিয়া মুহূর্ত্তে মুখ ঘুরাইয়া লয়—লালধনকে ঠেলিয়া দিয়া বলে, 'আমাকে যেতে দে, আমাকে যেতে দে বলছি।'

লালধন নড়ে না, বলে, 'যাবি ত আমাকে ঠেলে যা।'

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত ফুলি ঘুরিয়া পাশের জঙ্গলের ভিতর ছুটিয়া প্রবেশ করে। লালধন বোকার মত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকে, তারপর সেও ফুলির পিছনে ছোটে। হরিণীর মতই ফুলি গাছগুলিকে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়া ছুটিয়া চলে—পিছনে আসে লালধন। একটা মস্ত পাথরের স্তূপকে পাশ কাটাইবে এমন সময় লালধন এক লাফে আসিয়া ফুলির একটা হাত ধরিয়া ফেলে। ফুলি থামিয়া যায়—খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। পরিশ্রমে তাহার চোখ দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠে, বুকখানি দুলিতে থাকে। কিছুক্ষণ ফুলির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া লালধন বলিয়া উঠে, 'এই দেখ তোর খোঁপার ফুল সব পড়ে গেছে।'

মুক্ত হাতখানা তাড়াতাড়ি খোঁপার উপর রাখিয়া ফুলি বলে, 'বড় ঝুটা, কোথায় পড়ে গেছে? সব ত আছে।'

লালধন হাসিয়া বলে, 'পড়ে নি তবে গোলমাল হয়ে গেছে দেখ, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

লালধন ফুলগুলি একটা একটা করিয়া তুলিয়া ফুলির খোঁপায় আবার গুঁজিয়া দেয়—ফুলি ঘাড় একটু হেলাইয়া চুপ করিয়া থাকে।

হঠাৎ মাদলের আওয়াজ ভাসিয়া আসে—'ধা, ধিং, ধা ধিং।' ফুলি আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে, বলে, 'ঐ শোন মহুয়াতলায় নাচ লেগেছে। আমি আর থাকব না, যেতে দে।'

বারে বারে অবহেলার ঘা পাইয়া লালধন এবার রাগিয়া উঠে, ফুলির পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'যা যেখানে খুসী যা এই তোকে ছেড়ে দিলাম।'

মুক্তি পাইয়াও ফুলি পলায় না, লালধনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তারপর হাসিয়া বলে, 'তুই যাবি নে?'

—না, আমি যাব না।

—তবে বাঁশী বাজাবে কে?

—যার খুশী সে বাজাবে—

—তুই রাগ করেছিস?

—না।

—তুই বাঁশী না বাজালে যে নাচই হবে না—চল।

—আমি যাব না—তুই যা।

ফুলি লালধনের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকাইয়া দেখে, তারপর এক পা আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানে, বলে 'চল।'

লালধনের গাম্ভীর্য্য অটল, জবাব দেয়, 'আমি যাব না।'

—তুই বাঁশী না বাজালে আমি নাচব না।

দুই জনের দিকে তাকাইয়া দুই জনই হাসিয়া উঠে।

ফুলি লালধনের হাত ধরিয়া আবার টানে, বলে, 'চল।'

লালধন জবাব দেয় না, ফুলিকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দুটি সবল বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে। ফুলি ছাড়াইবার চেষ্টা করে না, আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে। অস্ফুট স্বরে একবার বলে, 'ছেড়ে দে।'

মহুয়াতলায় মাদল বাজিয়া চলে 'ধা ধিং, ধা ধিং।'

ক্রমশঃ

ভেনিস নগরী

রূপসী ভেনিস

শ্রীশেফালী নন্দী, এম-এ, মণ্ট, ডিপ্ (লণ্ডন)

প্রকৃতি ও মানুষে মিলে তৈরি করেছে আদ্রিয়াতিক উপসাগরে পা-ভেজান ভেনিস নগরী। দু'ধারে নদীর মোহানা আর তার উপর দিয়ে মানুষের তৈরি চমৎকার সেতু, তারই উপর দিয়ে যখন প্রবেশ করছিল আমাদের বাষ্পীয়-যান—চোখের সামনে ভেসে উঠল চিরযৌবনা কুমারী ভেনিসের প্রতিমূর্তি। বৎসরান্তে একবার আদ্রিয়াতিককে একটি করে অঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার অপরাজেয় কৌমার্য, কিন্তু বাণিজ্য ব্যপদেশে 'শক, হুণদল, পাঠান, মোগল' সবাই এসেছে এর পদপ্রান্তে—আর সে অকৃপণ উদারতায় সবাইকে জুগিয়েছে রসদ, পানীয়। উপকারীরা রেখে গেছে তাদের চিহ্ন—মসজিদ-গীর্জা আর শিল্পকলায়।

এখানকার সেন্টমার্কস্ গীর্জা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় মসজিদের কথা। তাই প্রথম দর্শনেই যখন বললাম, 'এ ত মুসলমান প্রভাবের ফল', গাইড অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি করে জানলে?' "আরে, ঐ যে উটের ছবি মোজাইক করে দেয়ালে বসানো আর ঐ যে দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ একজনের হাতে কি যেন দিচ্ছে এই ত প্রমাণ।" যুগে যুগে এই মূর্তি আর আশপাশের কারুকার্যের অদলবদল হয়েছে, কিন্তু তার 'আর্চ'ভূষিত স্থাপত্যের পরিবর্তনে কেউই করে নি, আর করতে পারবে বলেও মনে হয় না। সর্বশেষ পরিবর্তন হয় ১০৯৪ সনে। ভিতরটা তার আর পাঁচটা গীর্জারই মত, হয়ত বা উনিশ-বিশ হবে। বাইরেটা খুব অভিভূত না করলেও বাইজেন্টিয়ান স্থাপত্যের প্রশংসা করতে হয়, তবে যারা তাজমহল দেখেছেন তাদের কাছে এ একেবারে অসাধারণ নয়।

এই সেন্টমার্কস গীর্জাকে কেন্দ্র করে রয়েছে ভেনিসের ব্যাঙ্ক, বাজার, আপিস ইত্যাদি। সেন্টমার্কস স্কোয়ারের চারপাশে এগুলি অবস্থিত। একপাশে আছে ক্লক টাওয়ার—যার উচ্চতা তিনশ' মিটার। উপরে উঠবার জন্য আছে লিফট আর সিঁড়ি। লিফটে উঠলে পয়সা বেশী লাগে আর সিঁড়িতে উঠতে গেলে প্রাণান্ত।

ক্যানেলের দুই তীরে ভেনিসের সৌধ, দূরে গণ্ডোলা

প্রতি ঘণ্টায় এর উপরিস্থিত পেটা ঘণ্টায় হাতুড়ির শব্দ হয় আপনা হতে, অর্থাৎ টাওয়ারের ভিতরকার বিরাট ঘড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। ঘণ্টাটির ওজনটা কত বলেছিল ঠিক মনে নেই তবে সে যে নেহাত কম নয় তা তার গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনলেই বুঝা যায়। উপর থেকে নীচের মানুষের চেহারা পাশিভাস

ট্রাভেল্‌সের কথাই মনে করিয়ে দেয়। চারপাশে ভেনিসের দৃশ্য অপরূপ। গোটা আড্রিয়াতিক উপসাগরের সবটাই যেন ধরা পড়েছে ঐ ভেনিসের আশেপাশে। সাতটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি গগনবিহারীর কাছে তুলে ধরল তার রূপ।

সেন্ট মার্কস্‌-এর সম্মুখভাগ

সাগরের জল কেটে খাল তৈরি করে নির্ম্মিত হয়েছে ভেনিসের "রাজপথ", নাম তার "ক্যানেল গ্রাণ্ড"। এই রাজপথের সুনীল নীরে ভাসিয়ে যাত্রী পারাপার করে ধূম-উদ্গীরণকারী ষ্টীমারসমূহ—এরা ভেনিসের ষ্টেট বাস—এই পরিবাহকগুলি মিনিট ঘণ্টা মেপে প্রতিটি ষ্টেশনে—যার দূরত্ব কুড়ি মিটারের বেশী নয়, যাত্রীর পায়ে চলার ভার অনেকটা লাঘব করে দেয়। খালটি নগরীর বুক চিরে এঁকে-বেঁকে যাওয়ার দরুন সর্ব্বত্রই এর সাহায্যে যাওয়া-আসা চলে। এরই দু'পাশের ভাল ভাল বাড়ীগুলিতে বাস করে গেছেন শেলী, ব্রাউনিং, কীটস্‌। একটি বাড়ীর গায়ে, বড় বড় করে লেখা আছে ব্রাউনিঙের দুটো পংক্তি—যার মর্ম্ম :

"আমার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করে দেখবে
একটি নাম—ভেনিস।"

লাবণ্যময়ী ভেনাসের মতই এই ভেনিস নগরী মুগ্ধ করেছিল ব্রাউনিংকে। শুধু তিনিই বা কেন, ইংলণ্ডের কোন কবিই এর সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, তাই অন্ততঃ একবারও এখানে এসে বাস করে গেছেন প্রায় সবাই।

এই সেদিন বেলজিয়ামের রাজাকে তাঁর হবু কনে' দেখান হয়েছিল এই ভেনিসের উপকূলে। ইউরোপীয়দের কাছে মধুচন্দ্রিমা যাপন করার পক্ষে এমন একটি স্থান নাকি আর নাই। "গণ্ডোলা" বা ছোট ছোট নৌকায় ক্যানেলের তীরে তীরে বেড়িয়ে বেড়ানো আর দিনান্তে হোটেল বা রেস্তোরাঁয় পানাহারের পর তৈরি শয্যায় দেহ এলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আছে মাধুর্য্য। দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধকে এড়িয়ে কেবল "দোঁহে দোঁহা পানে" চেয়ে কাটাবার পক্ষে লোভনীয় জায়গা এটি। তবে যখন বিশ্ব-সংসারের দিকে তাকাবার সময় আসে তখনই দেখা যায় ক্যানেলের শাখাগুলির দুর্গন্ধবাহী জলের উপরকার সবুজ শ্যাওলা—দায়িত্বজ্ঞানহীন নর-নারীর নিক্ষিপ্ত সংসারের আবর্জ্জনাবাহী সে সরু খালগুলিতে

ডুগাল প্রাসাদ

একমাত্র গণ্ডোলা ছাড়া অন্য কোন যান নেই। জোয়ারের সময় ছাড়া তাদের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া একমাত্র আত্মভোলার পক্ষেই সম্ভব। তবে সাধারণ ভ্রাম্যমাণেরা এদের লক্ষ্য করাটা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তাই একদিন পথপ্রদর্শক অর্থাৎ 'কুক্‌স' কোম্পানির সাহায্যে একখানি গণ্ডোলায় চড়ে রওনা হলাম—একটি গীর্জ্জা আর বিশ্ববিখ্যাত "ভেনিসিয়ান গ্লাস"-এর কারখানা দেখতে।

গীর্জ্জাটি দেখতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল তার জরাজীর্ণ অবস্থা, কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অপরূপ সম্পদ। চিত্রকর টিসিয়ানের সমাধি এই গীর্জ্জার অভ্যন্তরে। শিল্পীর নিজের হাতে আঁকা ছবির অনুকরণে নিপুণ ভাস্করের হাতে ইটালিয়ান মার্ব্বেলের পা কেটে করা হয়েছে এই বেদীটি। কবরটি অনেকটা পিরামিডের ভঙ্গীতে। কবরের উপরকার আবরণ আর তার সামনে তাঁর রোরুদ্যমানা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের প্রতিমূর্ত্তি। ভেবে পেলাম না প্রশংসা করব কার—চিত্রকরের না ভাস্করের? টিসিয়ানের মত নিপুণ চিত্রকরের কাছে এর নক্সাটা খুব অসাধারণ নয় কিন্তু যে ভাস্কর মসৃণ ইটালিয়ান শ্বেত মর্ম্মরে একে এমন শোকাবহ রূপ

দিয়েছেন তাঁর প্রতিভা ম্লান করে দিয়েছে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর কামনাকে। অবশ্য ইটালীয় সমাধির বিশেষত্বই হ'ল শোকাকুল প্রিয় ও প্রিয়াকে মর্ম্মররূপে সমাধিস্থলে বসিয়ে রাখা—মিলান নগরীর সমাধিস্থলে এমন অনেক মূর্ত্তি অথবা দৃশ্যাবলী তৈরি করে রাখা হয়েছে, কিন্তু টিসির'নের বিশ্রামাধারটি যেন একেবারেই প্রাণবন্ত, মনে হয় আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে এরা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।

সেন্ট মার্কস্ গীর্জ্জা

গীর্জ্জাটি গথিক ভাস্কর্য্যের অনুকরণে গঠিত, বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে আছেন ডোনাটেলোর তৈরি কাঠের যীশু, সজীব সরলতায় আহ্বান করছেন জগতের যত পাপী-তাপীকে, ধর্ম্মের আড়ালে আত্মপ্রকাশ করেছে শিল্পীর নিপুণতা। আর দেয়ালের আর একদিকে আছে বাবলাগাছের গুঁড়িতে আঁকা বেলিনীর "এসাম্পশন"। শোনা যায় ১৯০৫ সনে জনৈক আমেরিকান ভদ্রলোক ১০,০০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত দিতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু গীর্জ্জার কর্ত্তৃপক্ষ বিক্রয় করেন নি। এর থেকেই খানিকটা আঁচ করা যেতে পারে ছবিটির মর্য্যাদা। বেলিনীকে বলা হয়ে থাকে—"master of the masters" অর্থাৎ জগতের সেরা নিপুণ চিত্রকরদেরও তিনি গুরু। তাঁরই আঁকা এ ছবিটি চিত্রবিলাসীদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। উপাসনার জায়গাটির গা ঘেঁসে আছে কারুকার্য্য-করা কাঠের রেলিং। গাইড পরম কৌতুকের সঙ্গে বলল, 'জান—এই রেলিংটি তৈরি হয়েছিল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ২৫ বৎসর পূর্ব্বে'। অর্থাৎ, দেখ, আমরা আমেরিকা হতে কত উন্নত। হঠাৎ সে ছুটে গিয়ে একটি পাথরের মূর্ত্তির কোন একটি জায়গায় হাত চাপা দিয়ে বলল, "তোমরা আগে দেখে নাও তারপর আমার হাত তুলব।" আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম একটি অপূর্ব্ব ইটালীয় নারীমূর্ত্তি। প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত, নাক-মুখ চোখের গঠন, দেহের লাবণ্য ইটালীয় ভাস্কর্য্যের গৌরবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবার ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন, এবার দেখ দেখি মেয়েটির হাত দুখানা'। সত্যিই দেখে অবাক হতে হয়। অমন সুন্দরী নারীর হাত দুখানা যে এরূপ কর্কশ আর কদাকার হতে পারে তা কল্পনা করাই যায় না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তার মুখের দিকে। কৌতুকচঞ্চল চোখে সে বলল, "দেখছ কি? ইটালীয় রমণীরা খেটে খায়, তাই ভূমধ্যসাগরের আকাশ আর জল তাকে যত রূপই দিক না কেন শ্রমিক রমণীর হাতে কাঠিন্যের ছাপ পড়বেই। খবরদার ওদের সঙ্গে লাগতে যেও না বেশী সুবিধা হবে না।" বলে তাকাল মার্কিন আর নিউজীলণ্ডীয় যুবক দুটির দিকে—আমরা সশব্দে হেসে উঠলাম।

এবার আমরা যাচ্ছি কাঁচের কারখানার উদ্দেশে। নদীর গলি-ঘুজি পার হয়ে আবার কানেলে এসে হাঁপ ছাড়লাম। হঠাৎ মাথার উপরকার সেতুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সুরসিক পথ-প্রদর্শক বলল, "এটি কিন্তু একটি দেড়শ' বছরের সাময়িক ব্যবস্থা—শীগগিরই আমরা একটি পাকাপাকি সেতু করে ফেলব—আমার প্রপিতামহের আমল থেকে আমরা ভেবে আসছি। কিন্তু আমরা বড় গরীব, তার উপর যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারেই ধ্বসে পড়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্ঘট হয়ে উঠছে। যা হোক ওসব আমরা ভাবি না।" ওরা ভাবে না বলল, কিন্তু আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম—এমন সুন্দর ছোট শহরটি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে কত না সুন্দর দেখাত! এ অপরিচ্ছন্নতার কল্পনা করাটাও একটু শক্ত। সরু গলি অর্থাৎ পায়ে-চলা পথগুলি বাড়ীর গা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, যত রাজ্যের আবর্জ্জনা তার উপর। বিপরীতমুখী দুই পথিকের সংঘর্ষ না হওয়াটাই আশ্চর্য্য। তারই মধ্যে যখন এদেশীয় পথিকেরা থমকে দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, "সিনরিটা তুমি কোথা হতে আসছ?" অর্থাৎ, অদ্ভুত তোমার পোশাক এদেশে ত দেখি নি—ব্যাপারটা মোটেই প্রীতিকর ঠেকে না। তবু হাসিমুখে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে এগিয়ে যাই। ছোট ছেলের দল চারপাশে ভিড় করে—"সিনরিটা" "সিনরিটা"! অর্থাৎ—ও মেয়ে, তুমি একটু দাঁড়াও। আবার থেমে আবার এগিয়ে চলি সন্ত্রস্ত-মুখে প্রশ্ন করতে করতে "লা পোষ্টা" অর্থাৎ পোষ্ট আপিসটা কোথায়?

টাকা ভাঙাবার প্রয়োজনে ব্যবসাকেন্দ্রে যেতে হয়েছিল এক দিন। বাড়ীটি খুঁজে বার করতে দেরি হওয়ায় রাস্তায় দু'একটি দারোয়ান বা বেয়ারাগোছের লোকের সাহায্য নি'। অবাক্ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তাদের পারিশ্রমিক আমাকে দিতে হ'ল ২০০ লীরা (১৫০ লীরা = ১ টাকা) এর পর যে দু'এক দিন ছিলাম, সাহায্য নিয়েছি শ্রমিক রমণীদের। ওরা হাসিমুখে সাহায্য করেছে, যে বাড়ীটি খুঁজে পাই নি তাতে এনে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে।

এক দিন প্রয়োজন হয়েছিল কিছু টাকার, বিদেশে টাকার অভাবে বড় মুশকিলে পড়তে হবে মনে করে ভারতীয় দূতাবাসের অভাবে ব্রিটিশ কনস্যুলেটের শরণাপন্ন হই। ব্রিটিশ রাজদূত আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন সরাসরি।

তবে সৌজন্যের মধ্যে এটুকু করেছেন—রোমে ভারতীয় দূতাবাসের ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বলেছেন। তৎক্ষণাৎ পাসপোর্টের নম্বর, নাম, ঠিকানা, ভেনিসের বর্তমান ঠিকানা প্রভৃতি দিয়ে এক্সপ্রেস ডেলিভারি একটি চিঠি দিলাম। ভেনিস থেকে রোম বার ঘণ্টার পথ। প্লেনে চিঠি যেতে এক ঘণ্টারও বেশী লাগে না। তারপর আমি আরও তিন দিন ভেনিসে ছিলাম। ভারতীয় দূতাবাসের চিঠি পৌঁছয় নি এ ক'দিনে, তারপর অবশ্য এ পর্য্যন্ত আর কোন খবর পাই নি। বিদেশে বিপদে পড়লে আমরা যে কার সাহায্য নেব, তার সন্ধান এখনও পাই নি।

ভেনিসের কাঁচের কারখানা অর্থাৎ কাঁচের বাসন তৈরি ও তার উপর কারুকার্য্য করা ইত্যাদি দেখতে সত্যিই সুন্দর। প্রথমে দেখলাম কি করে বিরাট চুল্লীর ভিতরে কাঁচকে গরম করে তাকে ইচ্ছামত বেঁকিয়ে তৈরি হয় বাসনপত্রগুলি। কাঁচামাল আসে

সেণ্ট মার্কস স্কোয়ার

অদূরবর্ত্তী "মুরানো" বন্দর হতে। চুল্লীগুলোর তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইচ্ছামত। আট বৎসর বয়স হতে সুরু হয় শিক্ষানবিশী, তারপর ক্রমশঃ গুণানুযায়ী শিক্ষাদাতার পদেও উন্নীত হতে পারে। বর্ত্তমানে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ আইনের দরুন ছোট ছেলেরা লুকিয়ে কাজ করে, বড়রাও আট ঘণ্টার বেশী খাটতে পারে না। ঘরে উত্তাপ অসহ্য, এ ঘর থেকে আর একটি ঘরে গেলাম সেখানে গ্যাস বার্ণার জ্বালিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করছে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর কারিগরের দল। কাঁচের চুড়ি মালার উপর সোনার পাত গলিয়ে করছে নানারকম নক্সা। চুনি এবং পান্না রঙের জমির উপর এই সোনার কাজের খোলতাই হয় বেশী। তার ফলে অতি সাধারণ একছড়া মালার দাম ১৫০৲-২০০৲ টাকা, বিশেষ ধরণের জিনিষগুলি নাগালের বাইরে।

এবার কাঁচের কারখানার "শো-রুম"। কর্ম্মচারী এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, হঠাৎ চারদিক থেকে রাশি রাশি ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় যেন রাঙা হয়ে গেল পরীর দেশ। চারদিকে হীরা, মতি, পান্না, চুনীর ছড়াছড়ি, যেদিকে তাকাই চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছা করে না, এ যেন রূপকথার রাজ্য। রাশি রাশি ফুলদানি, মদের পাত্র, টী-সেট অপরূপ কারুকার্য্যে শোভিত, আর রং ও গুণ অনুযায়ী তাদের সাজানো হয়েছে, তারা ক্রেতাকে আহ্বান করছে সাদরে। এখান থেকে চলে এলাম পাশের ঘরে যেখানে আছে একটি কাঁচের অ্যাকোয়েরিয়াম ... অবশ্য কাঁচের যে সেটা বুঝেছিলাম অনেক পরে। তার পাশের ঘরটি কেবলমাত্র ঝাড়-লণ্ঠনের রাজ্য। তার আলোতে সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্নের মায়াপুরী। চারদিকে দেয়ালে বিলম্বিত নানা ঢং ও নানা আকারের ভেনিসীয় মুকুরে তার প্রতিফলন সে স্বপ্নকে করে তুলেছিল অপরূপ। পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ভারতীয় সিল্ক আর ভেনিসীয় কাঁচ, দুয়ে মিলে কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে"—চমকে ফিরে দেখি কারখানার মালিক সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করছেন। বললাম, "ধন্যবাদ, তোমার কারখানাটি দেখে সত্যিই তৃপ্তি পেলাম, ভেনিসীয় কাঁচের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী কেন তার অর্থ এবার বোধগম্য হ'ল।" ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

ক্যানেল গ্রাণ্ড

—'তোমার তা হলে ভাল লেগেছে, কিছু কেনো না কেন?' বললাম, —'কেনবার জন্য ত রাখ নি, রেখেছ দেখবার জন্য।' তিনি হেসে বললেন, "তোমার কাছে বড় বেশী দাম লাগছে বুঝি?" সঙ্গীরা তাড়া দিচ্ছিল। পা বাড়ালাম দরজার দিকে, সঙ্গে চলতে চলতে বললেন আবার—আচ্ছা এত সুন্দর ইংরেজী শিখলে কোথায়? বাধা দিয়ে বললাম, "এতকাল ব্রিটিশ-প্রজা ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করাই ত বাহুল্যমাত্র। তুমি শিখলে কোথায়?" "তোমাদের দেশে।" মৃদু হেসে বলল। বিস্মিত হয়ে বললাম—"আমাদের দেশে গিয়েছিলে ইংরেজী শিখতে?" বলল—"না, তোমাদের দেশে ভুপাল বলে একটি রাজ্য আছে জান?" বললাম, "তা আর জানি না?" সেখানকার নবাব দুটো 'স্যাণ্ডেলিয়ার' কিনেছিলেন এই কারখানা থেকে। আমি তখন এই কারখানায় সামান্য বেতনে কাজ করি। মনিবের আদেশে ঐ বাতি দুটো নবাবের দরবারে ফিট করার জন্য আর একজন সহকর্ম্মীর সঙ্গে যাত্রা

করি বিশেষ একটি জাহাজে করে। এক মাসে গিয়ে ভূপাল পৌঁছই আর রাজ-অতিথিরূপে বাস করি দু'বছর। সে দু'বছরের স্মৃতি কোনদিন মুছবে না মন থেকে। ভারতীয় মেয়ে দেখামাত্রই ইচ্ছা হ'ল একটু আলাপ করার, পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল মনে। আশা করি কিছু মনে করবে না।" বললাম, "তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম, আমার দেশের কথা বিদেশে এমন ভাবে শুনব ভাবি নি।" বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম, মুগ্ধতার রেশটুকু কেটে গেল ভেনিসের সঙ্কীর্ণ ধূলিবহুল অপরিচ্ছন্ন গলিতে পা দিয়ে। ভাবলাম যে দেশের শিল্পী এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করতে পারে সে দেশবাসীরা কি চেয়ে দেখে না এ পথের মালিন্য ?

সব তিক্ততার রেশ আবার ক্ষীণ হয়ে যায় শিল্পাগারে ('Academy of Fine Arts') প্রবেশ করে। চিত্র-রসিকদের কাছে ভেনিসনগরী চিরকাল কল্পনা আর সংস্কৃতির খোরাক জুগিয়েছে, আর জোগাবে যুগ যুগ ধরে। বিশ্ববিখ্যাত ভেনিসিয়ান তথা ইটালীয় চিত্রকরদের সেরা চিত্র দিয়ে সাজান হয়েছে এই মিউজিয়ামটি। টিসিয়ান, টিণ্টরেটো, ভেরোনিজ প্রভৃতির লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় মেলে এখানে। তা অনুভবের বস্তু, বিশ্লেষণের নয়। আমি শিল্পী নই, শিল্পরসিকও নই তবে সেদিন এই একাডেমিতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিকৃতির পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে নির্যাতিতের বেদনা ভুলে গেলাম মুহূর্তের জন্য, চকিতে ভেসে উঠল চোখের সামনে শিল্পীদের অপূর্ব্ব নিষ্ঠাভরে এঁকে যাওয়ার দিনগুলি। প্রগাঢ় নিষ্ঠা—অতুলনীয় অধ্যবসায়কে করেছিল সাফল্য-মণ্ডিত। তাই "ডুগাল" প্রাসাদের—যেখানে দাঁড়িয়ে "নিঃশ্বাস-সেতু" (Bridge of Sighs) সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীতের বন্দীদের নীরব অশ্রু আর বিষাদপূর্ণ শেষ-নিঃশ্বাসের, কারুকার্য্যখচিত শিল্প-ভবনের চেয়েও অধিক আকর্ষণীশক্তি এই একাডেমি অব ফাইন আর্টসের। বহু দরিদ্রের বুকের রক্তে গড়া ডুগাল প্রাসাদের কুখ্যাতি আর সুখ্যাতি মিলিয়ে যাবে একদিন কালের বুকে, কিন্তু চিরজয়ী হবে ক্ষণভঙ্গুর স্ফটিক আর বেলিনী, টিণ্টরেটো, বোকাসিও। এরা ভেনিসের গৌরব অতীত সম্রাজ্ঞীর মুকুটের কোহিনুর—সম্রাজ্ঞী হারিয়েছেন তাঁর রাজ্য, কিন্তু কোহিনুর দ্বিধাবিভক্ত হয়েও বিতরণ করছে সপ্তরশ্মি দর্শনার্থীকে।

শিল্পভবন থেকে বেরিয়ে এলাম সাঁঝের রঙীন আলোয়। ক্যানেলের তীরে তীরে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা। তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে সুনীল ক্যানেলের নীরে। গণ্ডোলার মাঝি তাকে ভেঙে দিচ্ছে খান খান করে। দিনান্তের মৃদু বাতাস ক্লান্ত পথিককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল পিছনে ফেলে আসা গৃহকোণটির কথা। সব আবিলতা ভেসে গেল কলকল করে ছুটে-আসা আড্রিয়াটিকের জোয়ারে, মনের মধ্যে ভিড় করে এলেন শেলী, ব্রাউনিং, কীটস, গেটে—গোধূলির ভেনিস রহস্যময়ী। সত্যিই এর তুলনা নেই।

মুমুক্ষু

শ্রীকালিদাস রায়

এই ধরণীর সনে
নিজেরে বাঁধিতে দৃঢ়তর বন্ধনে,
শৃঙ্খল শুধু গড়িয়াছি নিশিদিন
শতেকের কাছে করিয়া কত না ঋণ।
ভূষণ বলিয়া পরেছিনু শৃঙ্খল,
দিনে দিনে ঐ শৃঙ্খলই মোর হরিল সকল বল।
ভূষণ বলিয়া পরেছিনু যাহা আজি তা দূষণ-ভার,
জীবনের পথে আগাতে পারি না আর।
এই শৃঙ্খল পাঁজরে পাঁজরে বাঁধা
এই শৃঙ্খল কোলে ক'রে আজ সার হইয়াছে কাঁদা।

আসিতেছে অই সুদূরের আহ্বান,
ছেড়ে যেতে চাই, ছিঁড়ে যেতে চাই, পঞ্জরে পড়ে টান,
জানি তুমি দেবে কঠোর আঘাত হানি'
ছিন্ন করিয়া সব বন্ধন একদা, বজ্রপাণি!
এই জীবনেই তার আগে প্রভু মুক্ত হইতে চাই,
ধন্য হইব দুই দিনও যদি মুক্তির স্বাদ পাই।
শিথিল করিয়া দাও বন্ধন, দূর কর মায়ামোহ,
করিতে শিখাও পরাধীনে বিদ্রোহ,
সব শৃঙ্খল আপনার হাতে ছিঁড়ে,
সম্মুখে তব যেন খাড়া হই বৈতরণীর তীরে।

শাহজাদা দারাশুকো

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

নবম অধ্যায়—গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায় ঃ

সামুগড়ের যুদ্ধ (২৯শে মে, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)

আগ্রায় দুর্য্যোগের ঘনঘটার বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাহানের ভগ্ন স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে আগ্রা হইতে সম্রাট্ দিল্লী যাওয়াই স্থির করিলেন (এপ্রিল ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোরাদ ও আওরঙ্গজেবের কোন সংবাদ দরবারে পৌঁছে নাই, বিদ্রোহী শুজা বাহাদুরপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুঙ্গের-দুর্গে অবরুদ্ধ ; সুতরাং সম্রাট্ ভাবিলেন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে সম্রাটের সহিত শাহজাদা দারা দিল্লীর দিকে যাত্রা করিয়া দিল্লীর কাছাকাছি বেলোচপুরে পৌঁছিলেন। এইখানেই পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এপ্রিল মাসে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শাহজাদা খুরম (শাহজাহান) জীবনে প্রথম পরাজয় স্বীকার করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন। এই বেলোচপুরেই ধর্ম্মাতের যুদ্ধের দশ দিন পরে মালব-বাহিনীর ভগ্নদূত সংবাদ লইয়া আসিল মহারাজা যশোবন্তের রাজপুত-বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, কাসিম খাঁ বিশ্বাসঘাতক, যোধপুররাজ আহত অবস্থায় যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়াছেন। সম্রাট্-শিবিরে হাহাকার পড়িয়া গেল, সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ; শাহান্‌শাহর মন তখনও কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত, দোটানা স্রোতে পড়িয়া বিচার-বুদ্ধির খেই হারাইয়াছে। তিনি দারাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ, দিল্লী পৌঁছিয়াই তিনি মোরাদ ও আওরঙ্গজেবকে শান্ত করিবেন ; কিন্তু দারার কাকুতিমিনতি ও পীড়াপীড়িতে তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন (২রা মে, ১৬৫৮)।

২

দারা যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া দ্রুত সমরায়োজনে ব্যাপৃত হইলেন ; কিন্তু সৈন্য কোথায় ? তিনি আশা করিয়াছিলেন, কুমার সুলেমানের বাহাদুরপুর-যুদ্ধজয়ী বাহিনী শাহশুজাকে মুঙ্গের দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া সহসা আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে। মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ বাহাদুরপুর হইতে শুজাকে শুধু পলায়নের সুযোগ দেন নাই ; ছত্রভঙ্গ শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবনেও সন্দেহজনক শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাদশাহী ফৌজ ধীরেসুস্থে মুঙ্গের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুজা কিউল-নদীর তীরে মুঙ্গের হইতে পনর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম সুরজগড় উপদুর্গকে কেন্দ্র করিয়া রক্ষাব্যূহ স্থাপিত করিলেন। সম্মুখে অপ্রশস্ত খরস্রোতা নদী, নদীর তীর ধরিয়া উত্তরে গঙ্গার পার হইতে দক্ষিণে খড়্গপুর-পর্ব্বতমালার পাদদেশে গভীর অরণ্যানী পর্য্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ মাটির দেয়াল ; উহার উপর কামানশ্রেণী এবং বাংলার পদাতিক সৈন্যের ঘাঁটি। এই স্থানে বাদশাহী ফৌজের অগ্রগতি প্রায় এক মাস ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল ; বাহাদুরপুরের মত এই স্থানে জঙ্গল না কাটিয়া শত্রুর নাগাল পাওয়ার উপায় ছিল না। মীর্জ্জা রাজার ঠিক এক বৎসর পরে এই স্থানে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা শুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া এইভাবে আটক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মীর জুমলা কিন্তু এই স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ না করিয়া খড়্গপুর পর্ব্বত-মালার মধ্য দিয়া সোজা রাজমহলের দিকে বাহির হইয়া গিয়া শুজাকে মুঙ্গের ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-বিদ্যায় ও বিক্রমে মীর্জ্জা রাজা মীর জুমলা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, এবং আওরঙ্গজেবের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিলে এই কৌশল তাঁহাকে কেহ বলিয়া দেওয়ার অপেক্ষাও তিনি করিতেন না। আসল কথা, দারার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া লড়াই করিবার গরজ তাঁহার ছিল না। মুঙ্গের হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিবার এগার মাস পরে আওরঙ্গজেবের হুকুমে আজমীর হইতে পলায়মান হতভাগ্য দারাকে বন্দী করিবার জন্য মীর্জ্জা রাজা যেমন রাতকে দিন করিয়াছিলেন উহার শতাংশের একাংশ উৎসাহ, বুদ্ধিমত্তা এবং রণ-কৌশল যদি তিনি শুজার বিরুদ্ধে প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে এই গৃহযুদ্ধের পরিণাম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ হয়ত অন্য রকম হইত।

যাহা হউক, আওরঙ্গজেবের জন্য কালহরণ করাই ছিল শুজার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মীর্জ্জা রাজার গৌণ অভিপ্রায়। কুমার সুলেমান এইভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মীর্জ্জা রাজার অমতে কিছু করিবার ভরসা পাইলেন না। কিছু দিন জঙ্গল কাটিবার পর বাদশাহী ফৌজ অবশেষে জিৎপুর হইয়া গুপ্তপথে সুরজগড় রক্ষা-ব্যূহের পার্শ্বভাগ বিপর্য্যস্ত করিল ; কিন্তু ইহাতে কোন সুবিধা হইল না। ইতিমধ্যে শুজা পশ্চিমে গঙ্গার বাঁক হইতে পূর্ব্বে খড়্গপুরের পাহাড় পর্য্যন্ত এক নূতন দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং বাদশাহী ফৌজের আবার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। এই

সময়ে ধর্ম্মাতের যুদ্ধে যশোবন্তের শোচনীয় পরাজয়ের পর দরবার হইতে জরুরী হুকুম আসিল শুজার সহিত অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন করিয়া কুমার সুলেমান ও মীর্জ্জা রাজা যেন দ্রুত কুচ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসেন। মে মাসের ৭ তারিখে উভয়পক্ষে স্থিতাবস্থা সর্ত্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পরাজিতের ন্যায় দারার প্রাচ্য-বাহিনী অর্দ্ধবিজিত শত্রুর নিকট পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

৩

শাহজাদা দারা আগ্রায় নূতন সেনাবাহিনী গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী মনসবদারগণের মধ্যে অধিকাংশই লাহোর, মুলতান ও কাবুল সুবায় শাসন ও সামরিক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং নূতন অনভিজ্ঞ ও অর্দ্ধ-বিশ্বাসী সেনাধ্যক্ষগণের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইল। সুবা দিল্লী আগ্রা ও সরকার সম্ভল (মোরাদাবাদ) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থানের ফৌজদারগণকে সেনা সংগ্রহ করিয়া আগ্রায় আসিবার জন্য সম্রাট্ হুকুম জারি করিলেন, রাজকোষ দারার সৈন্য-সজ্জার জন্য উন্মুক্ত হইল। এই সময়ে বাছ-বিচারের সময় ছিল না, ঠগবাজ নূতন মনসবদারগণ আগ্রা শহরের ভবঘুরে মুসলমান, ধোপা, নাপিত, সইস, বাসার চাকর সকলকেই সিপাহীগিরিতে ভর্ত্তি করিয়া দল ভারী করিল। তোপখানার জন্য দারা মোটা বেতনে ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন, উহাদের মধ্যে একজন ছিলেন তরুণ ইটালীয় চিকিৎসক ম্যানুসী। আগ্রা ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দুর্গ হইতে বড় বড় শাহী তোপ দারার তোপখানার সামিল করা হইল; কিন্তু তাঁহার তোপখানার মীর-আতস ছিলেন কাশিম খাঁর প্রতিস্পর্দ্ধী চাটুকার বাক্যবাগীশ বরকান্দাজ খাঁ ওরফে মিঞা জাফর। জাফর জাতিতে ইরাণী, তোপের নিশানা ঠিক না থাকিলেও কথায় মানুষকে ঘায়েল করিতে ওস্তাদ, তুরাণী তাঁহার দুই চোখের দুষ্মন। দারা মনে করিতেন, জাফর বড় কাজের লোক, রুস্তম-আফ্রাসিয়াবের মত বেনজীর বাহাদুর; তাঁহার আস্কারা পাইয়াই জাফর উচ্চপদস্থ আমীরদিগকে সমীহ করিত না। ইহার ফলে তুরাণী যোদ্ধারা অধিকাংশই দারার প্রতি ক্রমশঃ বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, আওরঙ্গজেব ইসলামের দোহাই দিয়া ইহাদিগকে হাত করিবার সুযোগ পাইলেন। ভাবী ভ্রাতৃবিগ্রহে দারার প্রধান ভরসাস্থল ছিল রাজপুতের শৌর্য্য ও প্রভুভক্তি। দারার মুখে সর্ব্বদা রাজপুতের প্রশংসা এবং তাহাদের প্রতি প্রকাশ্য পক্ষপাতিত্ব তুরাণীগণের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের অন্যতম কারণ।

দারার আবেদন ও বিভিন্ন রাজপুত-কুলপতিগণের আহ্বানে রাজপুতানায় সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। কিন্তু ধর্ম্মাতের যুদ্ধে রাজপুত ক্ষাত্রশক্তি অর্দ্ধেক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; অপর অর্দ্ধাংশ বিক্ষিপ্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গৃহ-কলহ ভুলিয়া হিন্দুজাতি কোন দিন জাতি ও ধর্ম্মের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই, রাজনৈতিক চেতনার অভাবে বিধর্ম্মী ও বিজাতীয়গণের মধ্যে জাতির শত্রু-মিত্র চিনিয়া লইতে পারে নাই; এই জন্য আওরঙ্গজেব ও দারার পক্ষ হইয়া রাঠোরের বিরুদ্ধে রাঠোর, চৌহানের বিরুদ্ধে চৌহান, হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু প্রাণ খুলিয়া লড়াই করিয়াছিল। হয়ত ইচ্ছা থাকিলেও দ্বিতীয় বার দারার জন্য যুদ্ধ করিবার সময় ও সামর্থ্য মহারাজা যশোবন্তের ছিল না, তাঁহার দুই হাজার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ধর্ম্মাতের যুদ্ধে মৃত্যু-বরণ করিয়াছে। যাঁহারা লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয় বিবেচনা না করিয়া আর্য্য-যোদ্ধার "যুদ্ধায় যুধ্যস্ব" আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দারার সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোটা-বুন্দীর হাড়া, বিকানীরের রাঠোর এবং চম্বল উপত্যকার গৌর রাজপুত সংখ্যায় প্রধান ছিলেন।

"হিন্দুকুলসূর্য্য" মহারাণা রাজসিংহ হিন্দুর ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া তাঁহার বিদ্রোহের দণ্ডস্বরূপ সম্রাট্ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত পুর-মণ্ডল ইত্যাদি কয়েকটি পরগণা আওরঙ্গজেবের কৃপায় ফিরিয়া পাইবার কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করিতে পারিলেন না যে, ঐ ব্যাপারে শাহজাদা দারা মাঝখানে না পড়িলে তিনি চিতোর-উদয়পুরও হারাইয়া বসিতেন। আসন্ন যুদ্ধে মহারাণা নির্লিপ্ত থাকিলেও শিশোদিয়া দারার বিপক্ষেই যুদ্ধ করিয়াছিল। মোগল-সংসর্গে রাজপুত আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছিল, পরার্থ অপেক্ষা স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিত—ইহার প্রমাণ কচ্ছবাহপতি মীর্জা রাজা জয়সিংহ। তাঁহার পুত্র কুমার রামসিংহ বাদশাহী মনসবদার হিসাবে দারার পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন; কিন্তু কচ্ছবাহগণ রাঠোর-চৌহানের মত জান কবুল করিয়া লড়াই করে নাই। বুন্দেলাগণ রাজপুত হইলেও তাহারা রাজপুত-চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণসমূহ হারাইয়াছিল; পৃথ্বীরাজের যশঃস্পর্দ্ধী "আল্হা-উদন্" মহোবাওয়ালের বীর-গাথা বুন্দেলা-চরিত্রকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই; মোগল আমলে বুন্দেলাগণ নিকৃষ্টশ্রেণীর রাজপুত বলিয়া গণ্য হইত; দস্যুবৃত্তি, বিদ্রোহ, কৃতঘ্নতা বুন্দেলার চরিত্রে সমধিক প্রকট, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া অর্থ ও জাগীরের লোভে জঘন্যতম গুপ্তহত্যায় বুন্দেলার জুড়ি ছিল না। সম্রাট্ শাহজাহান বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া বুন্দেলা সামন্ত রাজগণকে প্রায় ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, যাঁহারা শাহজাদা দারার আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সম্রাটের কোপ হইতে রক্ষা পাইয়া-

ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন সরকারী নজরে কুখ্যাত দস্যু ও বিদ্রোহী ; কিংবা মতান্তরে স্বাধীনতার পূজারী অদম্য দেশপ্রেমিক চম্পৎরায় বুন্দেলা। চম্পৎরায় দারার অধীনে কান্দাহারে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু আশানুরূপ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও ফিরিয়া আসিয়া মোটা-রকম জায়গীর মনসবের দাবি করিয়া বসিলেন। কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া চম্পৎরায় মোগল সরকারে চাকুরী অপেক্ষা পূর্ব্বপুরুষের পেশা ডাকাতি অধিক লাভজনক বিবেচনা করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাতের যুদ্ধের পর নীতিনিপুণ আওরঙ্গজেব যে সমস্ত কাজের লোককে হাত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে চম্পৎরায় বুন্দেলা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত সম্বন্ধে শত্রু মিত্র নিরপেক্ষ কেহই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিত না ; সুযোগ পাইলে নির্ব্বিচারে সকলের অনিষ্ট করাই ছিল তাহাদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি।

শৌর্য্য ও নির্ভরযোগ্যতায় মধ্যযুগে হিন্দুস্থানের মুসলমান সেনানায়কগণের মধ্যে রাজপুতের সমকক্ষ ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার বারহা-বাসী সৈয়দ ; ইঁহাদের পরেই পাঠান। সৈয়দ ও পাঠান পাকা মুসলমান হইলেও, দারাকে ইসলামের শত্রু বলিয়া আওরঙ্গজেবের প্রচারকার্য্য ইঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। দারার এই সঙ্কটে বারহাবাসী সৈয়দ এবং সম্ভল-মোরাদাবাদের পাঠান উপনিবেশ হইতে দলে দলে যোদ্ধা রাজপুতের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। দারার নূতন বাহিনীতে রাজপুতের তুলনায় মুসলমান সংখ্যায় প্রায় চারি গুণ ছিল, বিশ্বাস-ঘাতকের অনুপাত কিন্তু মালববাহিনীর অনুপাত অপেক্ষা অনেক কম।

৪

রাজপুত রাজন্যবর্গের মধ্যে বুন্দীরাজ ছত্রসাল বাড়া বয়সে ও শৌর্য্যে ভীষ্মপ্রতিম ছিলেন। তিনি দশ বৎসর বয়স হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত কেবল যুদ্ধই করিয়াছেন, স্বয়ং সম্রাটের নিকটও কোনদিন অনুগ্রহ যাচ্ঞা করেন নাই। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বে বিদ্রোহী কুমার খুরমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; খুরমের (সম্রাট শাহজাহান) রাজ্যারোহণের পর বুন্দীরাজ ত্রিশ বৎসর মোগলসম্রাটের সেবা করিয়াও প্রথম শ্রেণীর মনসব লাভ করিতে পারেন নাই, বরং ইহার প্রতিদানে পাইয়াছিলেন মনস্তাপ ও অপমান ; অখণ্ড বুন্দীরাজ্যের অঙ্গহানি করিয়া সম্রাট্ শাহজাহান কোটারাজ্য সৃষ্টি এবং নূতন রাজ্যের কনিষ্ঠ শাখাকে বুন্দী হইতে স্বাধীন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ বুন্দীরাজ ছত্রসালের উদ্ধত আত্মাভিমান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাও সুর্জনের সঙ্গে আকবরের যে সন্ধি হইয়াছিল উহার মধ্যে সর্ত্ত ছিল, মোগল-সম্রাট্ কোনদিন বুন্দীর রাজকন্যাকে বধূরূপে প্রার্থনা করিবেন না, বুন্দীর সেনা স্বয়ং সম্রাট্ কিংবা শাহজাদাগণের সেনাপতিত্ব ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুরাজা কিংবা মুসলমান সেনাধ্যক্ষের অধীনে যুদ্ধ করিবে না, বুন্দীসওয়ারের ঘোড়ার গায়ে মনসব-দারী দাগ দেওয়া হইবে না, চৌহান-নারী নওরোজের উৎসবে মোগল অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, বুন্দীর রাও সিন্ধুনদী পার হইয়া কোথাও যুদ্ধ করিবে না ; বুন্দীর নজরানা কোষমুক্ত তরবারি ও যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রপূত শবদেহ।

প্রাচীনপন্থী ছত্রসাল সিন্ধুনদী সম্বন্ধে কুসংস্কারমুক্ত হইতে পারেন নাই। সিন্ধুর পশ্চিম তীর রাক্ষসভূমি, ঐখানে শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকর্ম্ম নিষিদ্ধ, মরিলে মুক্তি নাই। এই জন্য বুন্দীসেনা সম্রাটের ইচ্ছা সত্ত্বেও বল্‌খ-কান্দাহার অভিযানে অংশ গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছিল ; কিন্তু কোটা শাখার রাও মাধবসিংহ, মুকুন্দসিংহ হাড়া প্রভৃতি হাড়া চৌহানগণ যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এই অপরাধে সম্রাট বুন্দীর গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য ছত্রসালের জায়গীর বারা ও মৌ পরগণা বাজেয়াপ্ত এবং উহা কোটাপতিকে প্রদান করিয়া ছত্রসালের বুকে শল্য প্রবিষ্ট করাইলেন। দিল্লীশ্বরের এই অবিচার বুন্দীপতিকে স্বামিধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করে নাই ; তিনি সম্রাটের আদেশে আওরঙ্গজেবের অধীনে আবার দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার হুকুমে আওরঙ্গজেবের অনুমতি না লইয়াই হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ছত্রসালের তৃতীয় পুত্র কুমার ভগবন্ত সিংহ, বুন্দীর অঙ্গহানির নিমিত্ত দারা ও শাহজাহানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র ভীম সিংহ শাহজাদা দারার অধীনে মনসবদার হিসাবে শাহশুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া ছিলেন। ধর্ম্মাতের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে ভীম সিংহের মৃত্যুসংবাদে বুন্দীরাজ্যে হাহাকার পড়িল ; ইহার অব্যবহিত পরে আসিল সাহায্যের জন্য হতপ্রভ শাহজাদা দারার করুণ আবেদন ও দিল্লীশ্বরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—গতানুগতিক চাকরীর ডাক নহে।

৫

বুন্দীর রণদামামা আবার বাজিয়া উঠিল, বৃদ্ধ রাও পুত্র-শোক ভুলিয়া রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রতি কোন আক্রোশ কিংবা দারার নিকট বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও সঙ্কট হইতে দিল্লীশ্বরকে উদ্ধার এবং ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বুন্দীরাজ শেষ যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয়ের আশা ও আশঙ্কার আলোচনায় তাঁহাকে কোন দিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত কিংবা নিবৃত্ত

করিতে পারে নাই। দান, পৌরুষ, ত্যাগ ও ভোগে সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ বুন্দীশ্বরকে* অতিক্রম করে নাই, বুন্দীর দরবারে কাব্যলক্ষ্মীর সাবলীল ছন্দ চারণের অগ্নিবীণা ও গুণীজনের কণ্ঠে সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা অসির ঝন্‌ঝনার সহিত তাল মিলাইয়াছে, এইবার দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ হিসাব-নিকাশের পালা।

দশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতে যে পিতৃহীন বালক পিতামহ রতন সিংহের জীবদ্দশায় বুন্দীর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল পরে সেই গুরুভার পুত্র ভাও সিংহকে যথাবিধি সমর্পণ করিয়া যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে বৃদ্ধ রাও ছত্রসাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলেন; পুত্রের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ ছিল,—শত্রুর নিকট কখনও বিনম্র হইয়া নতিস্বীকার করিবে না। ইহার পর তিনি নিকট ও দূর-সম্পর্কীয় সগোত্র অসগোত্র আত্মীয়-বান্ধবগণকে যুদ্ধার্থ আমন্ত্রণ করিলেন; বুন্দী হাড়াবংশের জননী; কোটার চারিজন রাজপুত্র ধর্ম্মাতের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে; পঞ্চম কুমার দেহে অস্ত্রচিহ্ন ধারণ করিয়া অপার যশের অধিকারী হইয়াছে; ইহার দ্বিগুণ ত্যাগ ও বিক্রম দেখাইতে না পারিলে বুন্দীর নাক কাটা যাইবে। খুড়া,* খুড়তুতো ভাই, ভাইপো-ঘরের নাতি, আপন ভাই ও পুত্র—বুন্দীরাজ-বংশের এই চারি পুরুষ যুদ্ধে ছত্রসালের অনুগামী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কুমার ভগবন্ত সিংহ পিতার আদেশে আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বুন্দী চলিয়া আসিলেন।

কাকা হরি সিংহ, কাকা মহাসিংহ প্রমুখ অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত বিবাহের সাজে সজ্জিত হইয়া রাও ছত্রসাল আবার যেন নবযৌবনের উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের হাতে বিবাহের মঙ্গলসূত্র; পরিধানে কেসর-বস্ত্র, গায়ে মলমল জড়োয়া পোশাক, মাথায় টোপর; টোপরের নীচে কাঁধ পর্য্যন্ত সাদা চুলের বাহার! বিবাহের বরসজ্জায় সে যুগেও বৃদ্ধেরা নীলের রঙে প্রস্তুত চুলের কলপ লাগাইয়া বয়স চুরি করিত; কিন্তু এইবার কেহ কলপ মাখেন নাই; কারণ উহা অপবিত্র, মরণের সময় নীলের রঙ স্পর্শ করিতে নাই। বিবাহ-সজ্জার দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হইল যোদ্ধগণের পায়ে সোনার কড়া বা রাজপুতের "রণলংগর"; ইহা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পিছপা না হইবার প্রতিজ্ঞাসূচক চিহ্ন—আভরণ নহে। বালক, বৃদ্ধ, তরুণ সকলের গায়ে বরের পোশাক, আতরের সুগন্ধ, সর্ব্বত্র আনন্দের হিল্লোল, কোথায়ও ভয় কিংবা বিষাদের চিহ্ন নাই, পুরনারীগণ মঙ্গল-উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে। যাত্রার পূর্ব্বরাত্রিতে প্রিয়তমা রাণী সুরজকুমারী স্বর্গে পতিকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য পূর্ব্বেই চিতারোহণের- অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—ইহা শোক বা অভিমান নহে, অতি বাস্তব জলন্ত বিশ্বাস, নচেৎ হিন্দু নারী সজ্ঞানে হাসিমুখে চিতায় পুড়িয়া মরিবার শক্তি পাইবে কোথায়? রাও ছত্রসাল রাণীকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আগে আমি, পশ্চাতে তুমি; ইহার ব্যতিক্রম হইলে অপযশ হইবে।"

বুন্দীর জনবল এবং রাজভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ করিয়া রাও ছত্রসাল যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের তালিকায় দেখা যায় এই অভিযানে রাজপুত, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, পাঠান, সকল জাতি ও বর্ণ অংশ গ্রহণ

---

* ছত্রসালের বিভিন্ন রাজপুত-বংশীয়া বারজন বিবাহিতা রাণী ব্যতীত শতাধিক উপপত্নী ও অনুগৃহীতা দাসী ছিল। ইঁহাদের মধ্যে নয় জন রাণী এবং ৪৪ জন উপপত্নী ও দাসী তাঁহার মৃত্যুর পর "সতী" হইয়াছিল। তিনি কবি চারণ ও গুণিগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁহার দরবারী কবি বিশ্বনাথ সংস্কৃত ভাষায় শত্রুশল্য-চরিতম্ নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই কাব্যের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি কবিকে চারিখানা গ্রাম এবং নগদ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বুন্দীর "মহিয়ারিয়া" শাখার চারণ-কবি "দেবাকে তিনি একটি হাতী ও এক কোটি দাম (৪০ দাম=এক টাকা) দান করিয়াছিলেন। দাতার ন্যায় দানগ্রহীতারও বুকের পাটা এবং দরাজ হাত ছিল। চারণ দেবা ঐ হাতী ও সম্পূর্ণ মুদ্রা তাঁহার দ্বারস্থ যাচকগণকে দান দিয়াছিলেন। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত দেবার বংশধরগণকে "হস্তী-বরীস" ও "কোড়-বরীস" [ক্রোর-বখ্শ] আখ্যায় অভিনন্দিত করা হয়। এক দিন কবিতার আসর ভাঙিবার পর রাও-ছত্রসাল চারণ দেবার দুই পাটি জুতা নিজে উঠাইয়া কবির সামনে রাখিয়াছিলেন। চারণ আবার গাহিলেন:

পাণা গহ পৈজার, সুকবি অগ্র ধরীঁা সতা।
হিক হিক বার হাজার, পহ সুমঁা মাথৈ পড়ী।

অর্থাৎ, ছত্রসাল হস্তদ্বারা উপানৎ গ্রহণ করিয়া সুকবির সম্মুখে রাখিলেন; এক একবার প্রভু ছত্রসালের মস্তকে দ্বাদশ সহস্র পুষ্প (দেবতাগণ কর্ত্তৃক) বর্ষিত হইল।

এই দোহা রাজস্থানে আজ পর্য্যন্ত লোকের মুখে শুনা যায়। শৌর্য্য, গুণানুরাগ, ভাবপ্রবণতা ও দাক্ষিণ্যের এই সমাবেশ ছত্রসাল ব্যতীত অন্য রাজপুত নৃপতির চরিত্রে কদাচিৎ দেখা যায় [সুরজমল কৃত "বংশভাস্কর, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৬২২-২৩ ও পাদটীকা]

* অব তুনাঁ রণ আপনাঁ, পড়িয়াঁ সুজস প্রকাশ।
প্রকটে বুন্দী পট্ট পণ, ন কটে নাস বিনাস।
(বংশভাস্কর, খণ্ড ৩ : পৃঃ ২৬৭৪)।

অক্ষত শরীরে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া যে যোদ্ধা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করে রাজপুতানায় তাহাকে "নকাটা" [নাক-কাটা] বলা হইত।

করিয়াছিল। তাঁহার দ্বাদশ শ্বশুরকুলের কুটুম্বগণ, রাঠোর, শিশোদিয়া, গৌর, বড়গুজর, সোনিগরা, ভাটী কচ্ছবাহ অখণ্ড যশ ও স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় বুন্দী-বাহিনীর সহিত সোৎসাহে যোগদান করিলেন। সোলাঙ্কী সুরজমল (ছত্রসালের শ্যালক), খিচী গোবর্দ্ধন দাস, ভাটী জৈত সিংহ ও মালদেব চন্দ্রাবত (শিশোদিয়া) মুহকম সিংহ, রাঠোর চন্দ্রসিংহ ও রূপসিংহ, চালুক্য লালসিংহ, ঝালা শ্যামসিংহ ও বিহারী দাস, মোহি-মুকুন্দসিংহ, পুরীহর (প্রতিহার) পরশুরাম, বড়গুজর কনক সিংহ, কচ্ছবাহ কিশনসিংহ ও আজবসিংহ, তোমর প্রতাপ-সিংহ, পরমার জয়সিংহ, বাঘেলা ভীমসেন, দেবরা দলেলসিংহ, গৌর সদানন্দ শিবরাম ও ভীমসিংহ, দহিয়া বিজয়সিংহ ও রামসিংহ, ছত্রসাল-মুকুন্দ প্রমুখ তের জন ভাদোরিয়া, সোনিগরা হরিসিংহ, জাদব বিজয়পাল প্রভৃতি বীরগণ সানুচর বুন্দীর পতাকাতলে সমবেত হইলেন; ইঁহারা শুধু নাম নহেন, চারণ-গীতির উল্কাপুঞ্জ নির্ব্বাণের পথে চলিয়াছেন। পাঠান সামন্ত দলেল খাঁ, আলী খাঁ, দায়ুদ খাঁ, মীর খাঁ, করীম খাঁ, তুর্কী রহিমবেগ, পালোয়ান শেখ কাদের প্রভৃতি তের জন খ্যাতনামা মুসলমান জায়গীরদার বুন্দীর মান রক্ষার জন্য শয়তানের সহিত লড়াইয়ে হটিবার পাত্র নয়—ইহাদের মধ্যে কেহই ফিরিয়া আসে নাই।

বুন্দীর পুরোহিত, ভাট, কায়স্থ, শূদ্র অসি চালনায় অপটু নহে, মরণকে তাহারাও রাজপুতের মত তুচ্ছ করে; আজীবন যাহারা বিশ্বস্তভাবে বুন্দীর সেবা করিয়াছে তাহারা রণক্ষেত্রে প্রভুর সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া মৃত্যুর পরপারেও বুন্দীপতির অনুগমন করিবার জন্য উৎসাহী হইল। ব্রাহ্মণ যোগীরাম ও বলরাম; বৈশ্যলাল, হরি, রত্ন ও ক্ষেম; জলধারী (পানীয় রক্ষক) ব্রাহ্মণ সদানন্দ, উদাগুজর (চৌকিদার?), খেমা মালী, নাথু ইত্যাদি পাঁচ জন শূদ্র পরিচারক, সাত শত দরবারী খিদ্‌মতগার (আঁটা-সোটা ধারী, চামর ছত্রবাহক ইত্যাদি) সঙ্গে চলিল—ইহারাও ক্ষত্রিয় বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া স্বামিঋণ মুক্ত হইয়াছিল, বুন্দীর চারণ কবি শ্রদ্ধার সহিত ইহাদের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুজাতি তখনও আত্মার অমরত্ব ও স্বর্গলাভে বিশ্বাস হারায় নাই, গীতার "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—বাণী ভুলিয়া দেহ-সর্ব্বস্ববাদী হয় নাই।

যাত্রার দিন সমুপস্থিত। ঐদিন অস্ত্রশস্ত্র ও বাহনসমূহ যথারীতি পূজিত হইল, যোদ্ধগণ পুরস্কৃত হইয়া সৎকারলাভ করিল। প্রথমেই তোপখানার প্রত্যেকটি কামানের সম্মুখে ছাগ বলি দিয়া ও তোপের মুখে শরাব ঢালিয়া* সুরা-মাংস-বলিপ্রিয়া চণ্ডিকারূপিণী কালানলবর্ষী নালিকাস্ত্রের বিশ্রাম-জনিত ক্রোধ শান্ত করা হইল। পতাকাসজ্জিত কামানের গাড়ীর বলদ ও হাতীর কপালে ও গায়ে তেল-সিঁদুরে সিদ্ধি-দাতা গণেশের ছাপ, গলায় মাল্যঘণ্টা। তোপখানার পশ্চাতে ছোট কামান (সোতর-নাল)-বাহী কাতারে কাতারে উটের সারি। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে তোপখানারক্ষী বন্দুকধারী যোদ্ধা ও পদাতিক সেনা রক্ষিত তাঁবু ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম। বাহিনীর মধ্যভাগে চলমান পর্ব্বতসদৃশ বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত বর্ম্মাবৃত রণহস্তী; ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে তৈলচিক্কণ, মাথায় সিঁদুর, গলায় লাল শালুর সাজ ও বীরঘণ্টা, পৃষ্ঠে ঝালরদার আস্তরণের উপর মনোরম হাওদা; কোন কোন হাওদার মধ্যে রণ-দামামা ও বিবিধ বাদ্যভাণ্ড, সমস্তগুলিতে যোদ্ধার আসন ও ঝোলা।

বাহিনীর প্রধান অংশ অশ্বারোহী সেনা লইয়া গঠিত, জীবনে-মরণে প্রিয়তমা অপেক্ষাও প্রিয়তর রাজপুত যোদ্ধার যুদ্ধাশ্ব—যাহার সেবায় তাহার অপমান নাই, ক্লান্তি নাই, সজ্জায় কার্পণ্য নাই। পদস্থ যোদ্ধৃবৃন্দের অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়ই লৌহকবচাবৃত, ঘোড়ার পায়ে ঘুঙ্গুর, কোমরে কিঙ্কিণী, গায়ে ঝালরদার বিচিত্রবর্ণের সাজ, সোনালী মীনার জিন-রেকাব, মুখে রেশমী লাগাম। শাপভ্রষ্টা অপ্সরাগণ অশ্বিনী রূপ পরিগ্রহ করিয়া চঞ্চল পদক্ষেপে যেন স্বর্গের পথে চলিয়াছেন। বিভিন্ন কুলের অশ্বারোহী যোদ্ধগণ নিজ নিজ বংশের পতাকার নীচে কুলপতিকে মধ্যে রাখিয়া যাত্রার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইল; চারণগণের যশোগান, স্বস্তিবাচন ও জয়ধ্বনিতে চলমান রঙ্গভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল; স্বয়ম্বরাভিলাষিণী মোগল রাজলক্ষ্মীর চরণসঞ্চার সহসা অর্দ্ধ-পথে স্তব্ধ হইয়া গেল।

যাত্রার প্রাথমিক কৃত্যস্বরূপ রাও ছত্রসাল চৌহানের কুলদেবী আশাপূর্ণা এবং নারায়ণের পূজা করিয়া উভয় দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের বাজনা বাজিয়া উঠিতেই বয়োবৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বুন্দীপতি রেকাবে পা রাখিলেন, তরঙ্গায়িত চতুরঙ্গবাহিনী নগরীর উপকণ্ঠ প্লাবিত করিয়া আগ্রার পথে অগ্রসর হইল। তিন দিন পরে বুন্দীর সীমান্ত হইতে রাও ছত্রসাল যুবরাজ ভাওসিংহকে বিদায় দিলেন; কনিষ্ঠ অপ্রাপ্তবয়স্ক ভারু সিংহ কিছুতেই পিতার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। পথিমধ্যে উদয়পুরের চারণ হরিদাস এবং ছত্রসালের প্রিয় চারণ-কবি দোলা বুন্দী-

* বংশভাস্কর, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৬৭৯, সেকালের বিশ্বাস এইরূপ না হইলে কামানের স্তব্ধতাজনিত ক্ষোভ দূর হয় না, কামানের গাড়ী রাস্তায় অচল হইয়া পড়ে।

শিবিরে উপস্থিত হইয়া যোদ্ধগণের মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করিলেন। এই মহাযাত্রায় শেষ গীত গাহিতে গাহিতে চারণদ্বয় ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাও ছত্রসাল মথুরার পথে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। মথুরায় তিনি মুণ্ডন, স্নান, তুলাদান ও শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন এবং অষ্টোত্তর শতসংখ্যক গাভীর শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণে এবং ক্ষুর-চতুষ্টয় রৌপ্যে ভূষিত করিয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

রাও ছত্রসালের আগমনে দারা ধর্ম্মাতের যুদ্ধে যশোবন্তের পরাজয়-গ্লানি ভুলিয়া গেলেন, দিল্লীশ্বর নিরাশার আঁধারের কোলে কুহকিনী আশার মুহূর্ত্তরাগ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন; আওরঙ্গজেব আশঙ্কামুক্ত হইয়া মালবে সম্রাটের শেষ অধিকার গোয়ালিয়র দুর্গের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

৭

শুধু মালব-বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, শত্রুর হস্তে পতিত বিপুল রণ-সম্ভার, বাদশাহী তোপখানা এবং সিন্দুক-ভরা টাকা ও আশরফীর দ্বারা ধর্ম্মাতের যুদ্ধে দারার ক্ষয়-ক্ষতির সম্যক পরিমাপ হয় না। এই পরাজয়ের সামরিক অপেক্ষা নৈতিক প্রতিক্রিয়া দিল্লী-সাম্রাজ্যে দারা ও আওরঙ্গজেবের স্থান সম্পূর্ণ অদল বদল করিয়া দিয়াছিল। আওরঙ্গজেব আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সংশয়াকুল বিদ্রোহী নহেন। বাহাদুরপুরে সুলেমান শুকোর জয়লাভ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত; ভারতের ভাগ্যাকাশে আওরঙ্গজেবের তেজোদ্ভাসিত সৌভাগ্যসূর্য্যের অরুণোদয়ে লোকচক্ষে ব্যসনগ্রস্ত দারা পূর্ণিমা-প্রভাতে অস্তমান ওষধিপতি।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও মোরাদ বিজিত যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লাসমুখর নিশাযাপন করিয়া পরের দিন (১৬ই এপ্রিল ১৬৫৮) মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরী বিনা বাধায় অধিকার করিলেন। এইখানে তাঁহার রণক্লান্ত সেনা তিন দিন পূর্ণ বিশ্রাম করিল। বুদ্ধি ও বাহুবলে অর্দ্ধসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া নীতিপ্রয়োগে অপরার্দ্ধ জয় করিবার উদ্যোগ-পর্ব্ব এইখানেই আওরঙ্গজেব সুসম্পন্ন করিলেন। এই বিরাট্ রাষ্ট্রবিপ্লবের আনুষঙ্গিক অরাজকতা ও অত্যাচার আওরঙ্গজেবের দৃঢ়তায় মালবসুবার কোথায়ও মাথা তুলিতে পারে নাই, শাসনব্যবস্থা পূর্ব্বের শৈথিল্যমুক্ত হইয়া বরং অধিকতর সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল, সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাগণ ভয়মুক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। তিনি কাহারও অধিকার হরণ করিয়া নিজের অনুচরবর্গকে পুরস্কৃত করিলেন না, যাহারা দারার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দানের দ্বারা বশীভূত করিলেন এবং ধর্ম্মাতের যুদ্ধে দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতক সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণকে পুরস্কার ও পদোন্নতি দ্বারা বিনা দ্বিধায় নিজবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার ক্ষমায় দুর্ব্বলতা, অনুগ্রহবিতরণে পক্ষপাতিত্ব ও দানে অহমিকার ছায়া পড়ে নাই; বস্তুতঃপক্ষে এই ক্ষেত্রে রাজোচিত গুণের উচ্চতম প্রশংসা সর্ব্বাংশে আওরঙ্গজেবের প্রাপ্য—ইতিহাসের এই অধ্যায়ে আওরঙ্গজেব চরিত্রকে কবি ভারবির বনেচর-বর্ণিত সুযোধনের প্রতিচ্ছায়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না; দুই জনই কপটাচারী "জিহ্ম"; কিন্তু যে সমস্ত গুণ* না থাকিলে দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রে ন্যায় এবং ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করিতে পারিতেন না সেই সমস্ত গুণ ব্যতীত দেড় মাসের মধ্যে ধর্ম্মাতের যুদ্ধে নিজ বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা পূরণ করিয়া আওরঙ্গজেবও তাঁহার সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণিত করিতে পারিতেন না।

চর নিয়োগ, মন্ত্রগুপ্তি, প্রয়োজনানুসারে দান সৎকার ও আচরণে অমায়িকতার মুখোশধারণে আওরঙ্গজেব নীতিশাস্ত্র-কারগণের আদর্শ রাজপুত্র ছিলেন; ভ্রাতা মোরাদের নিকটও তিনি একটা হেঁয়ালী, তাঁর কার্য্যের আদি-অন্ত কাহারও অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না। গোপনে দুই জনের কাছে এক কথা তিনি কদাচিৎ বলিতেন, অধীন হিন্দুসামন্তগণের নিকট এই সময়ে দারা অপেক্ষাও তিনি অধিক উদার ন্যায়নিষ্ঠ এবং অনুগ্রহ বিতরণে মুক্তহস্ত, অথচ মুসলমানের নিকট আদর্শ মুসলমান, কেবল ইসলামের স্বার্থে কিছুদিন কাফেরের খাতির-তোয়াজ, আখেরে তাহাদের কি গতি হইবে সে বিষয়ে মোল্লাদল নিশ্চিন্ত; সুতরাং তাঁহার সজাগ দৃষ্টির নীচে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য ও রেষারেষির অবকাশ ছিল না। আওরঙ্গজেবের নীতিপ্রয়োগ এবং হিন্দুসমাজে রাজনৈতিক চেতনার অভাবে সঙ্কটের সময় রাজপুতশক্তি দারার পক্ষে সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। রাজপুত-চরিত্রের দুর্ব্বলতাসমূহ এবং অর্থনৈতিক অসহায়

* আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির ঐতিহাসিক সার্থকতা আছে: দারা কিন্তু "যুধিষ্ঠির" ছিলেন না, কোন "চক্রধারী"ও তাঁহাকে চালিত করেন নাই; সুতরাং আওরঙ্গজেবের গুণের কাছেই দারাকে চনিয়াদারীর মামলায় হার মানিতেও হইয়াছিল।

১। "উপায়-কৌশল"

"নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জ্জিতং, ন ভূরি দানং বিরহয্য সৎক্রিয়াম্।
প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষশালিনী গুণানুরোধেন বিনা ন সৎক্রিয়া॥"

২। "মিত্রবল"

"মহৌজসো মানধনা ধনার্চ্চিতা ধনুর্ভৃতঃ সংযতি লব্ধকীর্ত্তয়ঃ।
ন সংহতাস্তস্য নভিন্নবৃত্তয়ঃ প্রিয়াণি বাঞ্ছন্ত্যসুভিঃ সমীহিতুম্॥"

৩। "স্বপক্ষ-পরপক্ষ বৃত্তান্ত জ্ঞান"

"মহীভৃতাং সচ্চরিতৈশ্চরৈঃ ক্রিয়া স বেদ নিঃশেষমশেষিত ক্রিয়ঃ।
মহোদয়ৈস্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতং ফলৈঃ॥"

অবস্থার সুযোগ আওরঙ্গজেব পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুবা মালব বৃহত্তর রাজপুতানার অংশবিশেষ; উহার অভিজাত সম্প্রদায় রাজপুত, অধিকাংশ খিচী চৌহান; রাজপুতানার শিশোদীয়, রাঠোর ও হাড়া বংশের কনিষ্ঠ রাজপুতগণও মোগল সরকারে চাকরী করিয়া এইখানে নূতন জায়গীর লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধই রাজপুতের উপজীবিকা; হয় সৈনিকবৃত্তি, না হয় ডাকাতি ছাড়া সেকালে রাজপুতের ধাতে কিছুই সহ্য হইত না, দোয়াত-কলম লাঙ্গল দাঁড়িপাল্লা কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রাদির হীনবৃত্তি অবলম্বন তাহার পক্ষে নিন্দনীয় সামাজিক মৃত্যু। এই অর্থনৈতিক অবস্থার সংঘাতে রাজপুতের কুলাভিমান, দেশাত্মবোধ ও স্বধর্ম্মপ্রীতি সপ্তদশ শতাব্দীতে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে "পেটকে ওয়াস্তে" তাহারা সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির উত্তম শিকার হইয়া শাহজাহানের রাজত্বে হিন্দুবিদ্রোহ দমনে, হিন্দুমন্দির-বিগ্রহ ধ্বংসে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। কুলক্রমাগত বৈর ও স্পর্দ্ধা রাজপুতানার ঐক্যের পথে ছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা; রাঠোর চৌহান শিশোদিয়া গৌর কচ্ছবাহের মধ্যে আপোষ নাই, কেবল বিবাহ-ব্যাপারে কোলাকুলি, অন্য সময় সুযোগ পাইলেই গলা কাটাকাটি। বিবেকবুদ্ধিবর্জ্জিত, জীবিকার জন্য পরাশ্রয়ী, রাজনৈতিক মহানিদ্রায় অভিভূত ভৃতিভুক্ ক্ষাত্রশক্তি দেশ ও জাতির পক্ষে বিপজ্জনক, পরাধীনতার লৌহনিগড়; শস্ত্রজীবীর "স্বামিধর্ম্ম" বা নিমকহালালী এইরূপ অধর্ম্মের সেবায় পর্য্যবসিত হয়। মালবের রাজপুতগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বার্থ বিপন্ন হইবার ভয়ে এবং অধিকাংশই মোটা জায়গীরের লোভে আওরঙ্গজেবের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল, মোরাদের সৈন্যদলেও রাজপুত ছিল। এইভাবে বিভিন্ন কুলের রাজপুতগণ যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে পুত্র—(যথা রাওছত্রসাল ও তৎপুত্র ভগবন্ত সিংহ), জ্ঞাতির বিরুদ্ধে জ্ঞাতি যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। বিজয়ী আওরঙ্গজেব বেতোয়া তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এক দল সৈন্যসহ বাহাদুর খাঁকে বুন্দেলখণ্ডের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; ইহা সামরিক অভিযান নহে, কূটনৈতিক পরিক্রমা। কে সর্ব্বাগ্রে আওরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতিবেশীর উপর টেক্কা দিবে—ইহা লইয়া বুন্দেলখণ্ডের সামন্ত রাজার মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল; বিদ্রোহী চম্পৎরায় বুন্দেলাকে হাত করিবার জন্য বাহাদুর খাঁ বন্ধুভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দারা চম্পৎরায়ের দাবি মিটাইতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি এককালে তাঁহাকে সম্রাটের কোপ হইতে রক্ষা করিলেও এখন শত্রু এই বিবেচনায় চম্পৎরায় কয়েক হাজার সেনা লইয়া আওরঙ্গজেবের দরবারে কুর্নিশ করিতে চলিলেন।

৮

২০শে এপ্রিল (১৬৫৮) উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে দোরাহা (ভুপালের কয়েক মাইল উত্তরে) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উত্তরমুখী গোয়ালিয়রের রাস্তা ধরিয়া ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং এক মাস পরে (২১ মে) গোয়ালিয়রে পৌঁছিলেন। আওরঙ্গজেবের এই মন্থর গতির কূটনৈতিক কারণ ছিল। গোয়ালিয়র অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বাদশাহী দুর্গ, দুর্গরক্ষক নাসিরী খাঁ বিখ্যাত যোদ্ধা এবং সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত আমীর; অথচ অবিজিত গোয়ালিয়র পশ্চাতে রাখিয়া আগ্রার পথে ধোলপুর ঘাটে চম্বল নদী পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং প্রায় অসম্ভব। দারা আশা করিয়াছিলেন গোয়ালিয়র অবরোধ করিয়া হস্তগত করিতেই বিদ্রোহী ভ্রাতাদ্বয়ের কয়েক মাস লাগিয়া যাইবে, ইতিমধ্যে বর্ষা নামিবে এবং পুত্র সুলেমান মুঙ্গের হইতে আগ্রায় ফিরিবার অবকাশ পাইবে; কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূটনীতি নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাদশাহী হিসাব বানচাল করিয়া দিল, গোয়ালিয়র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়া রহিল। পথে আওরঙ্গজেব নাসিরী খাঁর কাছে বিশ্বাসী দূত মারফত চিঠি লিখিয়া জানাইলেন তাঁহার পরলোকগত পিতার "খান্-দৌরাঁ" খেতাবসহ পাঁচ হাজারী মনসব তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। উভয়পক্ষে সংবাদ বিনিময় ও কথাবার্ত্তা পাকা হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল, না হয় ইচ্ছা করিলে তিনি দশ দিনেই উজ্জয়িনী হইতে রেলের বেগে গোয়ালিয়র পৌঁছিতে পারিতেন। নাসিরী খাঁ গোঁড়া মুসলমান, শাহজাহানের প্রতি অনুরক্ত হইলেও দারাকে তিনি আওরঙ্গজেবের নজরেই দেখিতেন। আওরঙ্গজেব উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁহার হাতে দুর্গ সমর্পণ করিয়া নাসিরী খাঁ বাদশাহী-ফৌজ লইয়া দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

অন্য কারণ, সম্রাটের মনের উপর ধর্ম্মাত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া অবগত হওয়ার জন্য আওরঙ্গজেব ধীর-গতিতে সৈন্য চালনা করিতেছিলেন। তাঁহার "পঞ্চমবাহিনী" পূর্ব্ব হইতেই সম্রাটের দরবারে অনুপ্রবিষ্ট ছিল; উহার মারফত যুদ্ধের পর শাহজাহানের সংশয়াচ্ছন্ন দ্বৈধীভাব এবং কোন কোন সময় দারার যুদ্ধচেষ্টার বিরক্তি ও স্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ ইত্যাদি সংবাদ তিনি অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, পিতার নাড়ীর গতি লক্ষ্য করিয়া ভ্রাতার যুদ্ধায়োজন শিথিল করিবার জন্য আওরঙ্গজেব পিতার কাছে লিখিলেন, দারাই শান্তির বিরোধী, তাঁহার

কোন দোষ নাই। ধর্ম্মাতের যুদ্ধের পর ভগ্নী জাহানারা আওরঙ্গজেবকে লিখিলেন, "আর অগ্রসর হইও না, দরবারে তোমার দাবী পেশ কর"; শাহজাহান নিজের হাতে ফরমান লিখিয়া পাঠাইলেন, "দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাও, উহার পাঁচ-সুবা তোমার।" আওরঙ্গজেব পিতার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, "কদমবোসী করিবার জন্য এত কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; দাদা-ভাই দীর্ঘকাল দরবারে খেদমত করিয়াছেন, তাঁহাকে নিজ-সুবা লাহোরে পাঠাইয়া আমাকে ও ভাই মোরাদকে কিছুকাল আপনার সেবার অধিকার দিলেই বিরোধ চুকিয়া যায়।"

ছন্নমতি সম্রাট ইহাতে আরও বিভ্রান্ত হইয়া আপোষ-মীমাংসার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন; একবার ভাবিলেন, উত্তম প্রস্তাব—পুত্রদ্বয়কে আগ্রার রাস্তা ছাড়িয়া দিলে ক্ষতি কি? ছেলেরা আমার অবাধ্য হইবে না, আমি হুকুম করিলে দারাকে পূর্ব্ববৎ আমার কাছে রাখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই কয়েক দিন পরে নিজ নিজ সুবায় চলিয়া যাইবে; কখনও বলিতে-ছিলেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া পুত্রগণকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে তিনি বিনা যুদ্ধেই মহাবত খাঁর হস্তে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দশাই প্রাপ্ত হইতেন; আওরঙ্গ-জেব মহাবত খাঁ নহেন, কোহিনূরের বদলে তিনি পিতার পদধূলি লইয়া নিশ্চয়ই দৌলতাবাদে ফিরিয়া যাইতেন না। দরবারে বসিয়া দিল্লীশ্বর যখন এইরূপ প্রলাপ বকিতেছিলেন তখন দারার অগ্রগামী সেনা বড় বড় শাহীতোপ লইয়া আগ্রা হইতে আনুমানিক ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, গোয়ালিয়র হইতে চল্লিশ মাইল উত্তরে ধোলপুরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, দারা পিতার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য অস্থির। অবশেষে সম্রাট এক দিন মন্ত্রণাকক্ষে তাঁহার মাণিকজোড় ভায়রা-ভাই খলিলুল্লা খাঁ ও জাফর খাঁ, রাজশ্যালক শায়েস্তা খাঁ এবং উচ্চপদস্থ ইরাণী ও তুরাণী আমীরগণকে তলব করিলেন, রাও ছত্রসাল তখনও সম্ভবতঃ আগ্রা পৌঁছেন নাই। বিরুদ্ধমুখী চিন্তাধারার সংঘাতে সম্রাটের বুদ্ধি প্রায় লোপ পাইয়াছিল; আসন্ন যুদ্ধের মুখে তিনি আওরঙ্গজেবের চিঠির দ্বারা প্রতারিত হইয়া এই সমস্ত নিমকহারামের সহিত যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; তাঁহারা আলাহজরতের মুখে এই শান্তির বাণী শুনিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন, এই সর্ব্বনাশা জল্পনা যাঁহাদের মনঃপূত হইল না তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন; মুখের উপর বাদশাহী মর্জ্জির খেলাপ কিছু বলিবার সাহস কাহারও হইল না। কিছুক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর কথার মার-প্যাঁচে দারার মাথা গরম হইয়া উঠিল; মেজাজ ও জিহ্বার উপর রাশ টানিয়া ধরিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না; রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া দারা বলিয়া ফেলিলেন, লড়াই করিবার যদি কাহারও হিম্মত না হয়, রাও ছত্রশাল হাড়া ও মীর আতস জাফর আওরঙ্গজেব মোরাদকে এক জোড়া খরগোসের মত নর্ম্মদা নদীর অপর পারে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে! ইরাণী-তুরাণীর বুকে এই শ্লেষ তীরের ন্যায় বিঁধিয়া রহিল, আওরঙ্গ-জেবের কূটনীতি দারাকে পঙ্কে পাতিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

ফাল্গুনে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ফাল্গুনে এস গো ফিরে জীবনের বসন্ত আমার,
প্রাণের নিভৃত প্রান্তে দক্ষিণা সে দিয়ে যাক্ দোল,
ঝঙ্কৃত অন্তরখানি ছন্দে ছন্দে হোক্ উতরোল,
মায়াস্পর্শে অকস্মাৎ খুলে যাক্ অজানার দ্বার;
এ অপূর্ব্ব পৃথিবীর নব রূপ করি আবিষ্কার,
জগতের তীরে বসি শুনি নব-জীবনকল্লোল,
উচ্ছ্বসিত চিত্ত হোক অকারণ উল্লাসে উল্লোল,
আহরণ করি সেথা নব নব সৌন্দর্য্য-সম্ভার।

পুষ্পে পুষ্পে সমাকীর্ণ বর্ণে গন্ধে বিচিত্র-মধুর—
বিহঙ্গ-ঝঙ্কারে পুন ভ'রে যাবে সারা বনভূমি।
যে সুর যায় নি শোনা ধ্বনিয়া উঠিবে সেই সুর,
সহসা আরক্ত করি' গোলাপে মলয় যাবে চুমি।
হে মোর নিকটতম, এখনো কি রয়ে যাবে দূর?
ফাল্গুন এসেছে ফিরে, কোথা তুমি? ফিরে এস তুমি!

গৌড়ের রাজমন্ত্রী ভীমদেব

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

অনেক কাল ধরিয়া নানাসূত্র হইতে বহুসংখ্যক তাম্রশাসন ও শিলালেখের প্রতিলিপি আসিয়া ভারত-সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের অন্তর্গত উতকামণ্ডস্থিত প্রত্নলিপিবিদের কার্য্যালয়ে জমা হইয়াছে। কিছুকাল হইতে এইগুলির কিয়দংশ পরীক্ষা করিতে করিতে আমি কতিপয় অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রাচীন লিপির সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যে পশ্চিম-ভারতের বিষ্ণুসেন নামক জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক্ হইতে বিশেষ মূল্যবান। এই লিপি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ আর একখানি মূল্যবান্ প্রাচীন লেখের সন্ধান পাইয়াছিলাম। ইহা একখানি শিলালিপি এবং সম্ভবতঃ পশ্চিম-ভারতেরই কোন স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই লিপি অনুসারে শৌরি নামক জনৈক মহারাজ ৫৪৭ বিক্রম-সংবৎসরে অর্থাৎ ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে জগন্মাতার এক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি ঐ বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে রচিত প্রশস্তিই বর্ত্তমান লিপিতে উৎকীর্ণ হয়। প্রশস্তি-রচয়িতা কবি ছিলেন জীবদ্ধারণের পৌত্র এবং মিত্র সোমের পুত্র ভ্রমরসোম। ইহা শিলাপট্টে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন রাজপুত্র গোভটের অনুগৃহীত অপরাজিত নামক শিল্পী। মহারাজ শৌরি এবং রাজপুত্র গোভিটের সম্পর্কে অপর কোন সূত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, এই অনুসন্ধানের সূত্রে আমি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত একখানি অধুনালুপ্ত শিলালিপিও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

জার্ম্মান পণ্ডিত ল্যডার্স ও কীলহর্নের নিকট বহুসংখ্যক ভারতীয় তাম্রশাসন ও শিলালেখের প্রতিলিপি ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঐগুলি ভারতে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা হয় এবং কিছুকাল পূর্ব্বে ৫২৭ খানি প্রাচীন লেখের প্রতিলিপি প্রত্নলিপিবিদের কার্য্যালয়ে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়। এইগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে আমি একটি শিলালেখের দুইখানি অস্পষ্ট প্রতিলিপি দেখিতে পাই। প্রতিলিপিদ্বয়ের সহিত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত একখানি চিঠি আলপিন্ দিয়া আঁটা ছিল। এই চিঠিখানি হংসচন্দ্রনামক বারাণসীর জনৈক স্থানীয় কর্ম্মচারী বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানি হইতে জানা যায় যে, বারাণসীর অন্তর্গত রাজঘাটের নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময় যে সকল গৃহ ভাঙিতে হইয়াছিল, উহার একখানি হইতে লেখযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়। পাথরখানি ঐ গৃহের অধিবাসীরা চবুতরারূপে ব্যবহার করিতেন। হংসচন্দ্র শিলালেখটির দুইটি ছাপ এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া লিপিটির পাঠোদ্ধারের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করিলে, তিনি শিলাখণ্ডটিও সোসাইটিতে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। হংসচন্দ্রের চিঠি পাইয়া এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ কি করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এই সম্পর্কে সোসাইটিতে পত্র লিখিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। মূল প্রস্তরখণ্ড এখন আর পাওয়া যাইবে কিনা বলিতে পারি না। তবে ঘটনাক্রমে শিলালেখটির দুইখানি প্রতিলিপি যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ইহা মন্দের ভাল। কারণ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের পক্ষে লিপিটির অনেকখানি মূল্য আছে।

শিলালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে লিখিত। প্রত্নলিপি-তত্ত্বানুসারে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার কাল নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। লিপির প্রথম শ্লোকে গৌড়রাজের জনৈক মহাসান্ধিবিগ্রহিক সংজ্ঞক মন্ত্রীর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাঁহার নাম ছিল যশোদেব। যশোদেবের পুত্র ছিলেন বঙ্গদেব। তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি গৌড়রাজ্যের রাণক পদবী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাণক বঙ্গদেবের পুত্র ছিলেন ভীমদেব। তিনি পিতামহের ন্যায় গৌড়েশ্বরের মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গৌড়ের রাজমন্ত্রী ভীমদেব অবিমুক্ত নদীতটে অর্থাৎ বারাণসীতে গঙ্গাতীরে একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখই বর্ত্তমান লিপির প্রকৃত বিষয়বস্তু। দুঃখের বিষয়, ভীমদেব ও তাঁহার পিতামহ যে গৌড়রাজগণের অমাত্য ছিলেন, লিপিতে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ভীমদেব তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে বারাণসীতে গিয়াছিলেন, কি তৎকালে উত্তরপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল তদীয় প্রভুর শাসনাধীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, লিপি হইতে এই প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। যশোদেব, বঙ্গদেব এবং ভীমদেব সম্পর্কে অন্য কোন সূত্র হইতে কিছু জানা যায় নাই।

গৌড়ামাত্য ভীমদেবের কৃতিত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে আলোচ্য

শিলালিপিতে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক দেখা যায়। শ্লোকটি এইরূপ :-

রায়ারিবংশ নরনাথ কলিঙ্গরাজ
মুখ্যারিবীরবল বারিধিমধ্যগুপ্তম্।
যেনোদধারি গুরু গৌড় বরেন্দ্ররাজ্যং
মজ্জৎ পুরাতনবহিত্র চরিত্র চারি॥

অর্থাৎ, গৌড়রাজের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব রায়ারী-বংশীয় জনৈক নরপতি এবং এক জন কলিঙ্গরাজের আক্রমণ-জনিত (সম্ভবতঃ তাঁহাদের যুক্ত-আক্রমণজনিত) আসন্ন ধ্বংস হইতে গৌড়বরেন্দ্র রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। লিপির অন্তত্র যাহাকে গৌড়রাজ্য বলা হইয়াছে, এস্থলে উহার গৌড়বরেন্দ্ররূপে উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীদেশকে গৌড়ের অন্তর্গত মনে করা হইত, কুল্লুকভট্ট-কৃত মনুসংহিতা-টীকার প্রস্তাবনা হইতে উহা বুঝা যায়। কিন্তু গৌড়বরেন্দ্ররূপে গৌড়রাজ্যের উল্লেখ বিরল। যাহা হউক, শ্লোকটিতে সম্ভবতঃ পতনোন্মুখ পালসাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইলে, শ্লোকোল্লিখিত কলিঙ্গরাজ ছিলেন গঙ্গবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭ খ্রীঃ)।

চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারিগণের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি মন্দাররাজ্যের রাজধানী আরম্যানগরী ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং গোদাবরী হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মন্দার ও আরম্যা নাম দুইটি পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান গড়মান্দারণ এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যাহা হউক, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা বিজয় করিতে আসিয়া কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গ সম্ভবতঃ তৎকালীন পাল-সম্রাটের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। চোড়গঙ্গের সমসাময়িক সেনবংশীয় প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি বিজয় সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) বাংলাদেশ হইতে পাল অধিকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিত নামক গ্রন্থে এই বিজয়সেনকে চোড়গঙ্গের সখারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। পালসম্রাটের সহিত সংঘর্ষে বিজয়সেন কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের সাহায্য পাইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু আলোচ্য লিপির "রায়ারিবংশনরনাথ" সেনবংশীয় বিজয়সেন হইতে পারেন না। এই রায়ারিবংশীয় নরপতি কে?

পূর্ব্ব-ভারতের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত এক জন মাত্র রায়ারি-নামক নৃপতির নাম জানা গিয়াছে। ১১০৭ শকাব্দে (১১৮৫ খ্রীঃ) প্রদত্ত বল্লভদেবের আসাম তাম্রশাসনে তাঁহার পিতামহের নাম দেখা যায় রায়ারিদেব ত্রৈলোক্যসিংহ। সম্ভবতঃ এই রাজবংশ আধুনিক শ্রীহট্ট অঞ্চলে রাজত্ব করিত। যাহা হউক, "রায়ারিবংশনরনাথ" বলিতে উল্লিখিত রায়ারি-দেব ত্রৈলোক্যসিংহের পুত্র উদয়কর্ণ নিঃশঙ্ক সিংহকে বুঝাইতেছে কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। তবে এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে। নৈষধীয় (৫।১২৪), রাজতরঙ্গিণী (৮।১০৮৩) প্রভৃতি গ্রন্থে পুত্রকে বংশধররূপে উল্লিখিত দেখা যায়। এমন কি, বল্লভদেবের ঐ তাম্রশাসনেই রায়ারিদেবকে এক স্থলে ভাস্করদেবের পুত্র এবং অন্তত্র ভাস্করদেবের বংশধররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাসনটিতে রায়ারিদেবের সহিত বঙ্গেশ্বরের বিরোধের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এই বঙ্গেশ্বর কে ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।

অন্বেষণ

শ্রীকরুণাময় বসু

কবে কোন্ জন্মান্তরে জীবনের কোন্ পরিচ্ছেদ
সহসা হারায়ে গেছে, আজো তাই যুগান্ত-বিচ্ছেদ,
চিরন্তনী কাব্য হ'তে আকস্মিক স্বপ্নসম খসি
উন্মনা করেছে মোরে, দূরে রয় দূরের উর্বশী।
বনান্তের মর্ম ভেদি ওঠে যবে ফাল্গুন-বাতাস,
নতুন রক্তিম কুঁড়ি, বিচিত্রিতা সন্ধ্যার আকাশ;
আমার প্রাণের পাত্র পরিপূর্ণ করে টলমল,
হঠাৎ নিশ্বাসে কার এ জীবন করে ছলছল।
কার যেন অভিশাপ অদৃশ্য আকাশতলে রহি
ফুলে দেছে কাঁটা আর প্রেমিকেরে করেছে বিরহী;
মনে হয় অকস্মাৎ আজিকার সুখস্বপ্ন ছাড়ি
দূরের যাত্রার পথে এক দিন দিতে হবে পাড়ি।
তাই তো জ্যোৎস্না ওঠে, বনে বনে উতলা নিশ্বাস,
হেমন্তে উত্তর মুখে উড়ে যায় যাযাবর হাঁস।
জন্মান্তের স্মৃতি-চিহ্ন এ জন্মের সমুদ্র-সৈকতে
হঠাৎ হারায়ে গেছে, তার লাগি ফিরি পথে পথে।
বাণীহীন, মূর্তিহীন, আচমকা শুধু দেয় হাওয়া;
তার খোঁজে এ ভুবনে কতবার হ'ল আসা-যাওয়া।
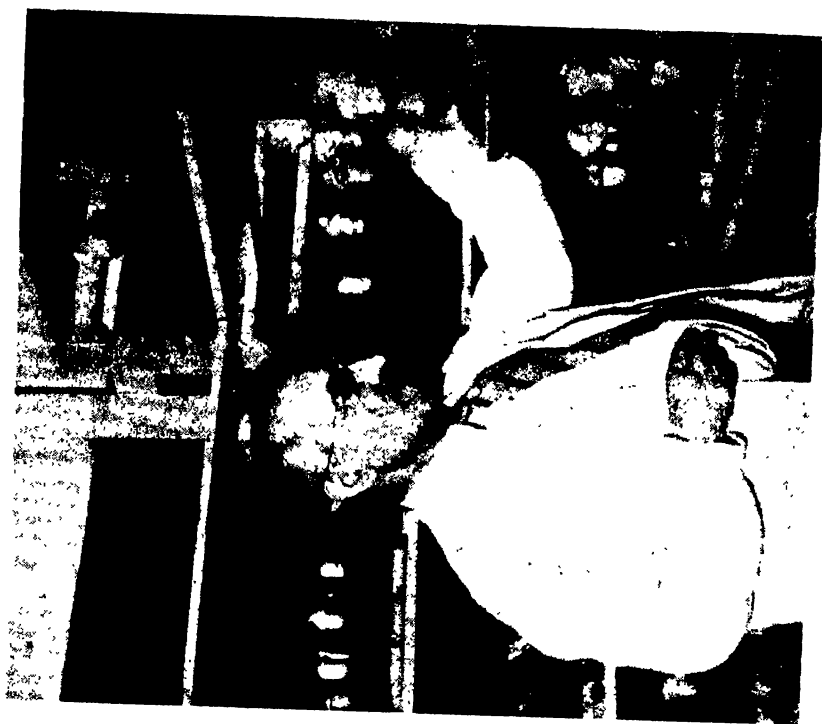
উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে জিরোতে উপজাতীয়দিগের সভায়
প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বক্তৃতা

লাক্ষা গবেষণাগার, নান্‌কুম্‌, রাঁচি
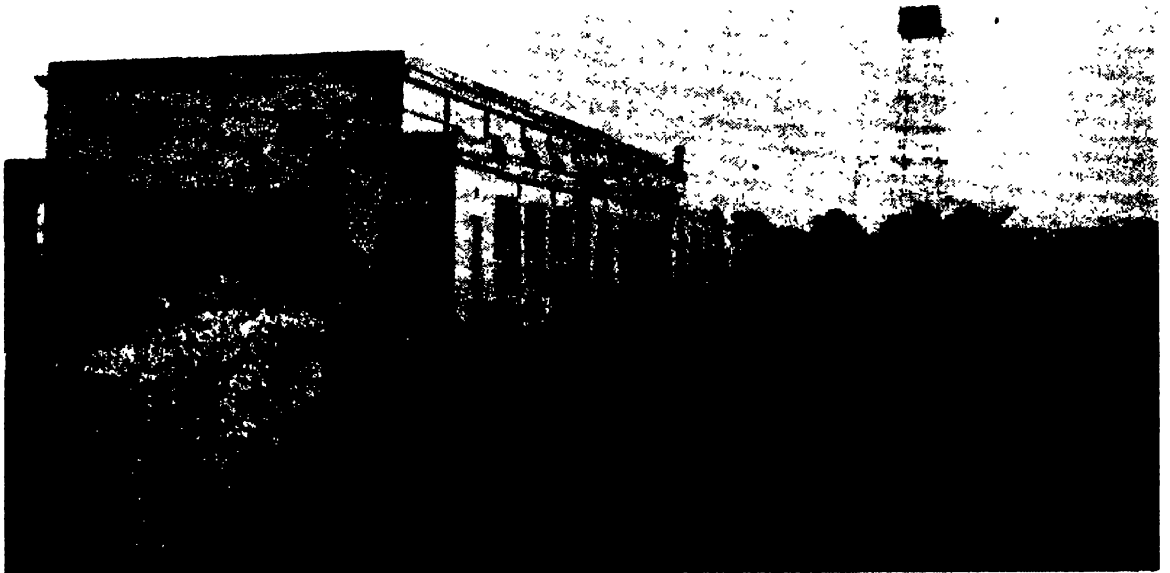
মরীচিকা

শ্রীবেলা সেন

'দেখুন আটচল্লিশ নম্বর উঠুন, টেম্পারেচার নেবার সময় হয়েছে'—গলায় স্বরে জোর দিয়ে ডাকাতে জগদীশের ঘুম আচমকা ছুটে গেল। সে হতবুদ্ধির মত নার্সের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। এতক্ষণ তা হলে সে কোথায় ছিল? তবে দিনদুপুরে স্বপ্নই সে দেখছিল। অতসী মীনুকে কোলে নিয়ে ওদের ব্যারাকপুরের বাড়ীতে ওর পাশে বসে হেসে হেসে কথা বলছিল, 'তুমি কতদিন বাড়ী ছিলে না, মীনু কত কথা শিখেছে, পাকা পাকা কথা যা বলে শুনলে তুমি থ হয়ে যাবে। বল্ তো মীনু তোর দু'চারটে বাণী, কতদিন পরে তোর বাবা বাড়ী এল।' মীনুকে গাল টিপে আদর করে চুমো খেয়ে অতসী জগদীশের কোলে এগিয়ে দিতে গেল, বহুদিন বাপের অদর্শনে মীনু মিষ্টি একটু হেসে মাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকাল—ওর মা জগদীশের দিকে চেয়ে হাসছে—'দেখ মেয়ের কাণ্ড।' বিকেলের সোনালি রোদ জানালা দিয়ে খানিকটা এসে মা ও মেয়েকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে, মুগ্ধ চোখে জগদীশ চেয়ে দেখছে—আচমকা জেগে খানিকক্ষণ সে বুঝতে পারেনি—বিকেলে টেম্পারেচার ইত্যাদি নেবার সময় হয়েছে, নার্স করুণা একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল 'অবেলায় ঘুমুলে শরীর ভার হবে।' বলেই থার্মোমিটার এগিয়ে দেয়, যন্ত্রচালিতের মত থার্মোমিটার ফিরিয়ে দেয় জগদীশ, অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেয়। শিয়রে দেয়ালে ঝোলান চার্টের মধ্যে সে সব লিখে খট্ খট্ করে জুতোর শব্দ তুলে করুণা অন্য রোগীর শয্যা-পার্শ্বে এগিয়ে যায়।

এতক্ষণে জগদীশের ঘোর সম্পূর্ণ কেটে গেছে, সে গা ঝেড়ে বিছানায় উঠে বসল। ভুল, সব ভুল তার, বর্ত্তমান অবস্থাটাই একান্ত সত্য। সে চার মাসের উপর এই হাসপাতালে আছে, দিনান্তে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়কুটুম্ব, মা ভাই যদি আসে, তো কিছুক্ষণ সে স্বাভাবিক জগতের মানুষ বলে নিজেকে অনুভব করে, নয়তো সে অনাদি অকৃত্রিম মেডিকেল কলেজের পেয়িং বেডের 'আটচল্লিশ নম্বর'। ওর যে একটা সাজান সুন্দর সংসার আছে, যেখানে ওর মা, ছোট ভাই নিমাই, স্ত্রী অতসী, টুকটুকে মীনুরাণী, বাপের আমলের চাকর রঘু, সব মিলিয়ে যেটা একান্ত তারই, সেকথা সে দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের অন্যান্য রোগী, নার্স, ওয়ার্ডবাবু এবং জমাদারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ভুলে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘ রাত্রি ও অলস দ্বিপ্রহর দুটোই যেন আর কাটে না, মনটা আর এখানে থাকে না, ব্যারাকপুরের বাড়ীতে চলে যায়, বার বার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় কখন চারটে বাজবে। ছোট ভাইটি প্রায় সর্ব্বদাই আপিস-ফেরত এসে যায়, মা সপ্তাহে দু-তিন দিন আসেন, এর বেশী আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নিমাইয়ের কাছে শুনেছে, মা ওর কল্যাণের জন্যে বাকী চার-পাঁচ দিন একটা না একটা ব্রত উপোস করেন। মা যখনই আসেন, চরণামৃত, প্রসাদ, আশীর্ব্বাদী, দেবতার দুয়ারের মাটি এনে ওকে খাইয়ে গায়ে মাথায় বুলিয়ে দেন, নিঃশব্দে ঠোঁট দুটি তাঁর নড়তে থাকে। মার ব্যাকুল অন্তরের নীরব প্রার্থনা জানেন অন্তর্যামী।

অতসীকে দেখতে এত ইচ্ছা করে, কিন্তু মুখ ফুটে বাড়ীর সবাইকে বলতে লজ্জা করে। মা মোটেই পছন্দ করেন না যে, প্রাচীন গোস্বামীবংশের বৌ হট্ হট্ করে ট্রামে বাসে লোক-জনের ভিড় ঠেলে হাসপাতালে আসা-যাওয়া করে। চার মাসের মধ্যে মাত্র দু'দিন অতসী এসেছে, তাও মীনুকে কোলে নিয়ে ওর শিয়রে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। মীনুকে ভেতরে আনা মায়ের অমত, অথচ এত লোকজন দেখে মীনু মায়ের কোল মোটেই ছাড়ে নি। নিমাই কত চেষ্টা করেছে, কত লোভ দেখিয়েছে কিছুতেই ফল হয় নি। এত ক্ষোভ হয়েছিল এ দুটো দিন জগদীশের। বাড়ীর সবাই বিদায় নেবার পর শরীরটাও বড় খারাপ লাগছিল—'ভগবান এই সুস্থ সমর্থ সবল দেহে কোথা থেকে প্লুরিসি এল, যার জন্য এই দুর্ভোগ। একটু বেশী কথা বললে, একটু বেশী মন চঞ্চল হলে শরীর এত খারাপ হয়, কতদিনে সে ভাল হবে—মনটা শিশুর মত বাড়ী ফিরে যাবার জন্য কাতর হয়ে উঠে। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, এ. পি. কোনটাই বাকী নেই, মৃত্যুর অবিশ্রান্ত ভয়াবহ দৃশ্যে সময় সময় মনে হয় 'তারও কি এখানেই শেষ।'

ঢং ঢং করে ভিজিটার্স আওয়ারের ঘণ্টা পড়ে গেল, বেশীর ভাগ ভিজিটার সিঁড়ি, বারান্দায়, নীচতলায় অপেক্ষা করছিল, এখন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ল। জগদীশের কাছে রোজ আসে ছোট ভাইটি, কমই কামাই হয়, বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে আসে। ভাই এখনও আসে নি, জগদীশ নির্লিপ্তভাবে ঘরের বাকী নয়টি বেডের দিকে চেয়ে চেয়ে জনসমাগম দেখতে লাগল। এ লাইনে এক দিকের কোণের বেডে পঞ্চাশ নম্বর, সমুদ্রম বলে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। টাইফয়েড খারাপ দিকে টার্ন নিয়েছে। ক্লোরোমাইসেটিন চলছে, দিনরাত প্রলাপ বকছে, কথার মাঝে একটি কথা বেশী কানে বাজে—গাঙ্গেয় গাঙ্গেয়। আজ জগদীশ বুঝতে পারল, ওর স্ত্রী যাকে কোলে নিয়ে ওর পাশে টুলে বসে চোখের জল ফেলছে ওটি সমুদ্রমের একমাত্র সন্তান—গাঙ্গেয়। এত যে গাঙ্গেয় গাঙ্গেয় করছে, কিন্তু চেয়ে দেখবার বুঝবার ক্ষমতা ওর নেই। দু'একটি ওয়ার্ডবাবুর সঙ্গে জগদীশের একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, ওদের কাছে শুনেছে রোগীর বাঁচবার আশা নেই। জগদীশের বাঁপাশে উনচল্লিশ নম্বর, সেখানে একজন বুড়ো ভদ্রলোক সর্ব্বদাই চুপ করে শুয়ে আছেন, কখনও উঠতে দেখে না, শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে লকার থেকে যেটুকু নিকটে পায়—কমলালেবুর এক আধ কোয়া খায়,

কারও সঙ্গে কথা বলে না, সর্ব্বদা চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। বিকেলে—বোধ হয় ওর দুটি ছেলেই হবে, মাঝে মাঝে আসে, ফিটফাট বুল-বাবু সেজে। ফল এনে লকারে রেখে যায়, খাচ্ছে কি খাচ্ছে না বিশেষ খোঁজখবর করে না, ফল রাখার সময় আগের পচা দাগধরা-গুলো রোগীর ধারের গামলায় ফেলে যায়। সাতচল্লিশ নম্বরে রামাবতার বলে অল্পবয়সী একটি ছেলে, এত রোগা দেখলে ভয় হয়। এরও প্লুরিসি, সবার নিষেধ সত্ত্বেও সারাদিন ঘোরাঘুরি করছে, এর পরের কোণের দিকের বেডে একজন নিউমোনিয়া রোগী অচেতন হয়ে আছে, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। সামনের লাইনে পাঁচটি বেডের চারটিতে নূতন রোগী এসেছে, একটি শুধু চেনা মুখ মাথায় টিউমার, তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে—কথা বলতে পারে না, সর্ব্বদাই শুয়ে আছে, ওর বাবা চব্বিশ ঘণ্টা কাছে থাকে।

আধঘণ্টা জনসমাগম দেখে জগদীশ ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসল, এখানে বসলে দু'ধারের গেট দিয়ে কেউ এলে দেখা যায়। বিকেলের দিকে যেদিন কেউ না আসে, সময় কাটাবার জন্য এখানে এসে জগদীশ বসে থাকে। নবেম্বরের মাঝামাঝি একটু শীত শীত করছে, র‍্যাপারখানা গায়ে জড়িয়ে চুপ করে চেয়ে থাকে। গেটে ঢুকতে বাঁ দিকে 'আউটডোরে'র ছাদের কোণে একটা চিল রোজ এ সময় চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। যখনই কেউ ঠোঙা করে খাবার নিয়ে ভেতরে ঢোকে, অমনি সাঁ করে এসে ঠোকর দিয়ে ফেলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মহোৎসব লেগে যায়, কোথা থেকে কা-কা-করে অসংখ্য কাক ও আশপাশের অপেক্ষমাণ জমাদারদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করে। হঠাৎ বুকফাটা কান্নার শব্দে চেয়ে দেখে একটি শব নিয়ে শববাহকেরা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এদিকে মৃতের স্ত্রীকে সব আত্মীয়-পরিজন মিলে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাবার চেষ্টা করছে, সে কিছুতে যাবে না, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে যাবে, বুকফাটা বিলাপ করে চিৎকার করছে। অল্পবয়সী সুন্দরী বৌটি, বয়স বোধ হয় অতসীর মতই হবে, ওর মেয়েটি মা মা করে কাঁদছে, দু'হাত বাড়িয়ে মার কোলে যেতে চাইছে। জগদীশের বুকটা হঠাৎ ধক্ ধক্ করে উঠল, আজ যদি সে অমনি চলে যায়, অতসীর কি হবে? শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল, উঠে ঘরে চলে যাবে হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ল, হাসিমুখে একজন অল্পবয়সী ওয়ার্ডবাবু বলছেন, 'দেখছেন কি? আমার বিশ্বাস মাছ খাবার, সাজসজ্জা করবার পথ বন্ধ হওয়াতে বৌটির এই আর্ত্তনাদ।' বলে হা হা করে হাসতে লাগল। অনবরত মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় বলে এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার ভাবে পরিহাস করে এরা কথা বলতে পারে। জগদীশের ভাল লাগল না, নিঃশব্দে উঠে গিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

ভাল লাগে না, ভাল লাগে না। এক এক সময় যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। অথচ এই চার মাসে তার অনেকটা উন্নতি হয়েছে, কাল ডাঃ তরফদার বলে গেছেন। কয়েক দিন হ'ল তার হাঁটা চলা, কথা বেশী বলার নিষেধটাও কমেছে। এখন সে সকালে বিকালে বারান্দায় কিছু সময় পায়চারি করতে পার, একটানা খানিকটা গল্প করলে ওয়ার্ডবাবুরা নিষেধ করে না। ডাঃ তরফদারের অনুগ্রহে—হাসপাতাল থেকে সচরাচর যা পাওয়া যায় তার উপর দুটো ডিম, মাখন, অতিরিক্ত দুধ পাচ্ছে, শরীর আগের চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে, তবে এই আবহাওয়ায় শরীর কারও সম্পূর্ণ সারতে পারে না। নাঃ—নিমাই এলে তাকে দিয়ে ডাক্তারকে ধরতে হবে, বাড়ী চলে যাবে, বাড়ী গিয়ে খুব নিয়মে থাকবে—আর পারে না।

পরদিন এ জগতের সকাল হ'ল, যথানিয়মে কাজের চাকা ঘুরতে লাগল, নির্লিপ্তভাবে জগদীশ রোজকার কাজ করে যায়, লকারের ফল ফুরিয়ে গেছে, বিস্কুট নেই, ভাই এলে বলতে হবে, সবার উপর যাবার কথা—সেটাই আসল কথা।

শেষরাতে সমুদ্রম মারা গেছে, খবর পেয়ে ওর আত্মীয়-স্বজন এসেছিল, ওরা ওকে নিয়ে গেল আর লকারের ওষুধপত্র, ফল ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ একটা মস্ত তোয়ালে করে বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে গেল।

কোণের দিকে কয়েক দিন অবিশ্রান্ত কাতর চীৎকারে ঘরটা মুখরিত হ'ত, আজ ওদিকটা খালি—সব নিস্তব্ধ। এমনি চারটি মাসে জগদীশ কত দেখল, কোনটা মনে বেশী দোলা দেয়, কোনটা কয়েক ঘণ্টা বাদে ভুলে যায়। প্রথম প্রথম ধাক্কাটা বেশী লাগত, এখন কতকটা সয়ে গেছে। বিছানা বদলে দেওয়ার পর ঘণ্টা দু'তিনের মধ্যে নূতন রোগী এসে ভর্ত্তি হ'ল। সুন্দর স্বাস্থ্য, দীর্ঘ শ্যামল সুন্দর চেহারা, দেখে মনে হয় না এমন শরীরে কোনদিন কোন রোগ আশ্রয় নিতে পারে। সঙ্গে কয়েকটি সমবয়সী ছেলে। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সব ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। দুটি ছেলে রয়ে গেল। দুপুর একটা পর্য্যন্ত হাসপাতাল শান্ত হয়ে যাবার পর জগদীশ ধীরে ধীরে উঠে এসে পঞ্চাশ নম্বরের নূতন রোগীর শিয়রের দিককার দেয়ালে ঝোলান চার্ট এক নজর দেখে রোগীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, নূতন রোগী এলে জগদীশ প্রথম দিকে মাঝে মাঝে এসে রোগ দাঁড়ায়। চার্টে পঞ্চাশ নম্বরের নাম দীপক রায়, বয়স চব্বিশ, পোলিও মেলাইটিস্। জগদীশ ভাবল বাপ্ রে, কত রকমেরই না 'টীস্' আছে জগতে। এসে অবধি এ ঘরে কোলাইটিস, নেফ্রাইটিস, মেনেঞ্জাইটিস, সেলুলাইটিস, সায়নোভাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস রোগী দেখেছে। কিন্তু এ আবার কেমন ধারা ব্যারাম, শুয়ে আছে নড়াচড়া নেই, শুধু সীমাহীন যন্ত্রণায় কাতর বোঝা যাচ্ছে। অনবরত মা মা করছে, দু-চোখ উপচে জল ঝরছে, মধ্যে মধ্যে শুধু বাঁ হাতখানা তুলে মাথাভরা কোঁকড়া চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরছে। হঠাৎ বুকটা কেমন ধক্ করে উঠল, জগদীশ ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বিকেলের দিকে ভিজিটার্স আওয়ারের কিছুক্ষণ আগে উনপঞ্চাশ নম্বর মারা গেল। তাকে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে কাঠের পার্টিসন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হ'ল।

ওয়ার্ডবাবুদের মধ্যে প্রবীণ চন্দ্রবাবু এ সময়টাতে পেসেণ্টদের মাথায় হাত বুলিয়ে একটু চা-টা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে নেন, তিনি আজ এসে জগদীশের কাছে বসে নানান গল্প জুড়ে দিলেন—'বুড়ো ভদ্রলোক অব্যবস্থায় মারা গেল'। নূতন রোগীর কথা বললেন, 'ও বাঁচবে না, কলকাতায় এ রোগ নতুন চালান এসেছে, দু'চার দিন জ্বর হওয়ার পর শরীরের কোন কোন অংশ অবশ হয়ে যায়। ভাল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, এ পর্যান্ত খুব কমই সম্পূর্ণ ভাল হয়েছে, নার্ভের ব্যারাম এসব। আর এর ত মাথাটা আর বাঁ হাত বাদে সবটাই নষ্ট হয়েছে, বলেছে ত দিনে রাতে দু'জন নার্সের ব্যবস্থা করবে। তা হলে কি হবে, বেড্‌সোর হয়েই গলে পচে মরবে। এই বিরাট চেহারা, নার্সের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে বারবার করে স্পিরিট পাউডার দেবে। ডাঃ সামন্তের পেসেণ্ট, বিধিব্যবস্থার চূড়ান্ত করে ছাড়েন যিনি, হলে কি হবে ওর সেবাযত্নের আরও ঢের বেশী দরকার—ও ভাল হবার নয়।' বলে মুখভঙ্গী করলেন।

ভিজিটার্স আওয়ারে আজ নিমাই এল আপিস-ফেরত, মা রথুকে নিয়ে ব্যারাকপুর থেকে এলেন। পাশের বেড উনপঞ্চাশ নম্বরের মৃতদেহ যখন ছেলেরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল, তখন কতক্ষণ ছেলেদের মধ্যে একটু বাদানুবাদ হ'ল—ইংলিশ খাটে নিলে ভাল হয়। মৃতদেহের তোশকের নীচে একগাদা দশ টাকার নোট বের হ'ল, পাশের বেড থেকে জগদীশ দেখে ভাবল—যার হাতে এত টাকা ছিল তার জন্ম কোন ব্যবস্থাই হয় নি, পথ্যের অভাবেই বোধ হয় মারা গেল। আজ আর কোন কথা নয়, মায়ের কোলে মাথা রেখে ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মত সমানে বলতে লাগল, 'আমি এখানে থাকলে বাঁচব না, আমায় বাড়ী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। মায়ের চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগল।

'গোপাল, আমিই কি খুব শান্তিতে আছি, তোমার অভাবে বাড়ী খাঁ খাঁ করছে, দিনরাত আমি রাধামাধবকে ডাকছি তোমার অসুখ সারিয়ে দিতে, ভাল হয়ে যাবে মাণিক আমার, আর কয়েকটা দিন সয়ে থাক।' মা এলেই জগদীশ ব্যাকুল হয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করে; সে যেন মাকে কাছে পেলে অবোধ শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মা চলে গেলে জগদীশের বড় কষ্ট হয়। নিমাইকে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে বলে জগদীশ যেন একটু শান্তি পায়।

পঞ্চাশ নম্বরের কাছে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এল, এসে সমানে চোখের জল ফেলতে লাগল, তাতে যেন রোগীর অস্থিরতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। নার্সের ব্যবস্থা হয়েছে, তবে পয়সার লোক, বা করে কর্তব্যের খাতিরে, দয়া-মমতার লেশও থাকে না। ছয়-সাত দিন কেটে গেছে উনপঞ্চাশ নম্বরে লোক এসেছে—গ্যাষ্ট্রিক্ আলসার। সৌম্য প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সর্ব্বদাই মুখে শান্ত হাসি লেগে আছে। বালিশে ঠেস দিয়ে বেশীর ভাগ সময় চুপ করে বসে থাকেন, কথা কমই বলেন, বাড়ী থেকে ছেলেরা দু'বেলা ভাত আনে, লোকজন আসে যায়, সবাই মজুমদার মশাই বলে ডাকে। পঞ্চাশ নম্বরের মা এসেছেন, কোথায় সুদূর আসামের এক প্রান্তে থাকেন, একটিমাত্র ছেলে দীপক, বি-এসসি পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিল, এবার ফাইন্যাল দেবার কথা, ভাল খেলোয়াড়—বালিগঞ্জ হোষ্টেলে ছিল। মা খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন, ওর বাবা আসতে পারেন নি, ছুটি মিলল না। মা আসাতে দীপক একটু শান্ত হয়েছে। এখনও সর্ব্বাঙ্গ অবশ, এর মধ্যেও সে মায়ের সঙ্গে হেসে কথা বলে। এত সুন্দর হাসিখুশী মিষ্টি স্বভাব দীপকের, ওর ব্যারামের কথা ভাবতে জগদীশের মনটা খারাপ হয়ে যায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে দীপকের মাকে। হাতে দু'গাছা শাঁখা বাদে গায়ে কোন গহনা নেই। ঠোঁটের, থুতনির ও চওড়া কপালের গড়ন দেখলে মনে হয়, দীপকের মার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এসে অবধি এক দিনের জন্ম কেউ তাঁর চোখে জল দেখে নি। সর্ব্বদা মুখে আশ্বাসের হাসি লেগে আছে। ছেলের সঙ্গে সমবয়সীর মত রাজ্যের গল্প করে যাচ্ছেন, কিন্তু ডাক্তারের নির্দ্দেশমত প্রতিটি কাজও নার্সকে সঙ্গে নিয়ে করে যাচ্ছেন, নার্সের ফাঁকি দেবার সাধ্য নেই। ডাঃ সামন্তর স্পেশাল পারমিশন নিয়েছেন দীপকের মা, যাতে বেশীর ভাগ সময় ছেলের কাছে থাকতে পারেন। নয়টা সাড়ে নয়টার ভেতরে টিফিন-ক্যারিয়ারে করে ভাত, রোগীর আবশ্যক নানা জিনিসপত্র ও কিছু ফুল রোজ আনেন। ছেলের সঙ্গে গল্প করে করে খাইয়ে আবার টিফিন-ক্যারিয়ার নিয়ে বাড়ী চলে যান। দুপুর একটার সময় টিফিন-ক্যারিয়ারে রাত্রির খাবার, গল্পের বই ও নানা টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসেন। বিকেলের দিকে ভিজিটার্স আওয়ারে প্রায় রোজই বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজন আসে, নার্সকে তখন একটু দীপকের কাছে থাকতে বলে মা বেরিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফল, ডিম, ঔষধ ইত্যাদি নিয়ে ফেরেন। ভিজিটার্স আওয়ারের পরও ভদ্রমহিলার আর এক ঘণ্টা থাকার নিয়ম আছে। এঁকে জগদীশ কেন, সমস্ত ওয়ার্ডের লোকেই সম্ভ্রমপূর্ণ বিস্ময়ের চোখে দেখে, একটিমাত্র ছেলে, জেনেছেন ভাল হবার আশা নেই। অথচ কথা-বার্তায়, চাল-চলনে মনে হয় না ওঁরই একমাত্র সন্তান পঞ্চাশ নম্বর মৃত্যুশয্যায়, তবে ভদ্রমহিলার গভীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে মাথার চুলে। ঘোমটা দেওয়া মাথার যতটুকু দেখা যায় এর মধ্যেই একদম সাদা হয়ে গেছে, সময় সময় চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ মনে হয়।

দিন গড়িয়ে যায়, জগদীশের এখনও বাড়ী যাওয়া হ'ল না। ডাঃ মজুমদারের মতে সম্পূর্ণ শীতটা হাসপাতালে কাটালে ভাল হয়, তবে বণ্ডে সই করে জগদীশ বাড়ী যেতে পারে, ডাক্তারের কোন দায়িত্ব নেই। নিমাই কিছুতেই এই দায়িত্ব নিতে রাজী হয় নি। সুতরাং জগদীশ দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। তবে শরীরের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, সমস্ত উপসর্গই কমে আসছে—এও ঠিক কথা।

একটি একটি দিন গুনতে গুনতে জগদীশের এখানে আট মাস

পূর্ণ হয়ে গেছে। ওর মা কয়দিন আসতে পারেন নি, অতসী আসন্নপ্রসবা। ওকে একা বাড়ী ফেলে আসা সম্ভব নয়। নিমাই আসে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি এবার দোলপূর্ণিমা পড়েছে, সেদিন ওদের বিয়ের তারিখ। বাড়ীতে রাধামাধবের মন্দিরে বেশ উৎসব হয় প্রতিবার। নিমাইকে বলেছে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে ওর বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করতে। ডাক্তারের এতে অমত নাই। জগদীশের আজকাল নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হয়। কাল নিমাই বলে গেছে সব গুছিয়ে রাখতে। আজ জগদীশের বাড়ী যাওয়ার দিন। ভোর হতে জগদীশ টুকিটাকি জিনিসপত্র সকারেই একত্র করে রাখছে, হাসপাতালের ডিসিপ্লিন ভেঙে একটা পাটরি পাশে নিয়ে বসে থাকলে যদি কেউ কিছু না বলত তবে সে তাও করত, মনটা শিশুর মত হয়ে গেছে ওর।

যাক্, হাসপাতালের শেষের ক'টি মাস যতটা অসহ্য লাগবার কথা তার চেয়ে বোধ হয় কমই লেগেছে ওর উনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশ নম্বরের সাহচর্য্যে। পাশাপাশি তিনটি বেডে প্রায় সমবয়সী তিনটি রোগী বেশ জমিয়েছিল। পঞ্চাশ নম্বরের দীপককে নানা বিধি-ব্যবস্থার পর ইলেকট্রিক কারেন্ট দেওয়াতে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, সমস্ত উপসর্গই কমে আসছে, আজকাল উঠে বসতে পারে, এক জনকে সঙ্গে নিয়ে লাঠি হাতে ওয়ার্ডে ডাক্তারের নির্দ্দেশমত অল্প সময় পরে পরে ঘুরে বেড়ায়। অত্যন্ত ফুর্ত্তিবাজ ছেলে, কর্ত্তৃপক্ষ আড়ালে গেলে হাসি-গল্প-গানে ওয়ার্ড গুলজার করে রাখে। উনপঞ্চাশ নম্বরের শৈবাল মিত্র এম-কমের ছাত্র। সায়নোভাইটিস হয়েছে, কবি-মানুষ, হাসিখুশী, রোগা ছোটখাটো মানুষটি। অসুখের অসহ্য যন্ত্রণা কমের দিকে যাওয়ার পর মুখে মুখে কবিতা, গান, কমিক তৈরি করে, তারপর দীপক সেগুলোতে করে সুর সৃষ্টি। কোরাসে দু'জনে গায়, জগদীশকেও দলে টানতে ছাড়ে না। শৈবাল একটু পেটুক, বোনটি ক্যাম্বেলে পড়ে, রোজ ভাইকে দেখতে আসে। বোন এলে শৈবাল কেবল খাওয়ার গল্পই করে। ওদের বাবা-মা বর্দ্ধমানে আছে। সাতচল্লিশ নম্বরের রামাবতার মারা গেছে, এর পর ক'জন এল, কেউ ভাল হয়েছে, কেউ দুনিয়া থেকে সরে গেছে। ছেচল্লিশ নম্বরের নিউমোনিয়া পেসেণ্ট সেরে চলে গেছে, অন্য একজন বুড়ো হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এসেছেন। সামনের পাঁচটি বেডে নূতন রোগী এসেছে, এর মধ্যে চারটি আলাপ-বিমুখ, কেউ চুপচাপ পড়ে আছে কেউ বা দিনরাত আর্ত্তনাদ করছে। কেবল বিয়াল্লিশ নম্বরের উদরী পেসেণ্ট বয়সে প্রৌঢ় হলেও ওদের কথাবার্ত্তায় বেশ যোগ দেয়। সবার সঙ্গে দু'চারটি কথাবার্ত্তা বলে জগদীশ ফিরে এসে নিজের বেডে চুপ করে বসে রইল, এখন শুধু নিমাই আসার অপেক্ষা। ডিসচার্জ্জ কার্ড পেয়ে গেছে। আট মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওর জীবনে কম নয়। এখানে হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত যেমন দেখেছে, সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারও যে এখানে দুর্ল্লভ নয় সে পরিচয়ও পেয়েছে।

কোন বেডের পেসেণ্ট দিব্যি সুস্থভাবে বিকেলের দিকে কথাবার্ত্তা বলেছে, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে কর্ম্মচারীদের বুঝতে দেরি হয় না যে, পেসেণ্টটির রাত কাটবে না। এদেরই মধ্যে একজন প্রৌঢ় ওয়ার্ড-বাবু গুরুজনের মত কাছে বসে পেসেণ্টের সুস্থ হওয়া সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়েছে; 'কাল বিকেলেই অবশ্য ফেরত দেব।'—বলে কয়েকটি টাকা ধার করল। 'কাল বিকেলে'র আগেই কিন্তু পেসেণ্ট ভবলীলা সাঙ্গ করল। মড়া ঢাকা দিয়ে খাটসুদ্ধ ঠেলে বাইরে রেখে এসে লকারের উপর জমাদারেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল কি কি আছে দেখতে। বেওয়ারিশ মাল, মালিক নেই, সব ওদের দখলে। হঠাৎ ওদের মধ্যে হেড জমাদার এসে দাঁড়িয়ে সব ক'টাকে ভাগিয়ে দিয়ে নিজে বেমালুম সব হাতসাফাই করে নিলে।

যেমন মানুষের নীচতার তেমনই তার সহৃদয়তার পরিচয়ও জগদীশ এখানে পেয়েছে। এটাও দেখেছে—পেসেণ্ট অসহ্য যন্ত্রণায় যখন মৃত্যু কামনা করে চীৎকার করছে, পাশে দাঁড়িয়ে একজন ওয়ার্ডবাবু তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, রোগ-যন্ত্রণা কমাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তার যত্নে আত্মীয়-স্বজনহীন হাসপাতালেও রোগী একটু শান্ত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করছে। পেসেণ্টদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এ জগতে সবই আছে। এমন অপূর্ব্ব জগৎ বাইরের লোক কল্পনাও করতে পারবে না। সত্যি যে আবার সকলের মধ্যে জগদীশ ফিরতে পারবে, হাসপাতালের গেট পার না হলে ও যেন তা বিশ্বাস করতে পারছে না।···

জগদীশ অবশেষে সত্যি সত্যিই বাড়ী ফিরেছে। সন্ধ্যের পর ব্যারাকপুরের বাড়ীতে জগদীশ মায়ের খাটে আধশোয়া অবস্থায় গল্প করছিল। নিমাই খাটের একপাশে বসে গল্পে যোগ দিয়েছে, অতসী রান্নাঘরে। এ দিনটি দীর্ঘকাল ধরে ছিল তার কল্পনায়, আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হ'ল। আট-আটটি মাস জগদীশ প্রতিনিয়ত কত রকম করে এই দিনটির মাধুর্য্যকে মনের মধ্যে লালন করেছে। মীনু ঠাকুমা'র কোলে ঠেস দিয়ে আট মাসের ব্যবধানে প্রায় অপরিচিত বাপকে দেখছে। এসে অবধি জগদীশ কতবার ওকে একটু কোলে নিতে চেয়েছে, কিন্তু মীনু কিছুতে আসে নি। মীনু ঘুমিয়ে পড়াতে জগদীশের মা অতসীকে ডাকলেন, 'বৌমা মীনুকে শুইয়ে দিয়ে যাও।' জগদীশ এই সুযোগে মীনুকে একটু বুকে নিতে পারবে ভেবে এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অতসী ঘরে ঢুকে মীনুকে নিঃশব্দে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দিন গড়িয়ে যায়। আজ দোলপূর্ণিমা, বাড়ী এসে জগদীশ যতটা আনন্দ পাবে ভেবেছিল, এ কয়দিন ততটা পায় নি। কিসের জন্য এই অস্বস্তি, এই নিরানন্দ—মুখ ফুটে বলা যায় না, ভাবতে অবধি কষ্ট হয়। ডাক্তারের মতে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও আরও কিছুদিন তার ট্রামে বাসে আপিস যাওয়া অনিয়মে খাওয়া ঘুমানো নিষেধ। সারাদিন সবাই নানা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, নিঃসঙ্গ জগদীশের একঘেয়ে শুধু বই পড়ে আর দিন কাটে না।

মা সমস্ত কাজের মধ্যেও তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন ওর নাওয়া-খাওয়ার দিকে, কিন্তু তাতে যেন মন ভরে না। দোলপূর্ণিমার দিন বাড়ীতে রাধামাধবের পূজাতে বেশ ঘটা হয়। জগদীশের মা শেষরাত থেকে কাজে লেগেছেন, এর মধ্যেও জগদীশের জন্য ঠিক সময়ে যাতে রান্না হয় আর ব্যবস্থা করে গেছেন। খেতে বসে জগদীশ প্রথম গ্রাস মুখে তুলতেই মীনু কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকল, 'আমি খাব, ক্ষিদে পেয়েছে।' জগদীশ ডাকল, 'আয় মীনু আমার সঙ্গে খাবি আয় বোস।'

বাড়ীতে উৎসবের হট্টগোলের জন্য সময়মত কেউ মীনুকে খেতে ডাকে নি। অতসীর শরীর আজ তত ভাল নেই, তবুও সে যথাসাধ্য খাটছে। মেয়ে এতক্ষণ নিজের মনে খেলা করছিল, চারিদিকের অবস্থা দেখে, 'সামনের জিনিষ ছাড়তে নেই'—এই প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করে বিনা বাক্যব্যয়ে বাপের সঙ্গে খেতে বসে গেল। জগদীশ দু'গ্রাস মেয়ের মুখে দিয়েছে, নিজেও খাচ্ছে, এমন সময় গরম দুধের বাটি হাতে নিয়ে অতসী ঘরে ঢুকল। জগদীশের পাতের কাছে ঠক্ করে দুধের বাটি নামিয়ে দিয়ে ত্রস্ত গলায় বলে উঠল, 'ওকি মীনু কখন এসে তোমার সঙ্গে বসল।' জগদীশ খুশীর হাসি হেসে বলল, 'ও নিজে নিজেই এসেছে, ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়।' 'না—না ওর বাঁদরামি, এখন ওর ক্ষিদে নিশ্চয়ই পায় নি, ওঠ্, ওঠ্ বলছি হতভাগা মেয়ে।' বলতে বলতে হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হ্যাঁচকা টানে মীনুকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল, মেয়ে প্রাণপণ চীৎকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগল, সে কিছুতেই খাওয়া ছেড়ে উঠবে না। দুম দুম করে মেয়ের পিঠে কয় ঘা বসিয়ে অতসী 'মর্—মর্ হতভাগা মেয়ে আমার হাড় জুড়োক'—বলতে বলতে জোর করে মীনুর মুখ ধুইয়ে যখন জগদীশের কাছে ফিরে এল, মেয়ে তখন মার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জগদীশ পাংশুমুখে খাওয়া বন্ধ করে, হাত গুটিয়ে আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, অতসী ফিরে আসতে হঠাৎ বলল, 'অতসী একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব, ঠিক উত্তর দেবে?'

উত্তেজনায় আরক্ত অতসীর মুখ তখন অবসাদে বিবর্ণ হয়ে এসেছে, মৃদুস্বরে বলল, 'কেন দেব না?'

'আমি আসা অবধি মীনুকে আমার কাছ ঘেঁসতে দাও নি কেন? আজই বা কেন আমার সঙ্গে খেতে বসেছিল বলে ওকে এই মারটা খেতে হ'ল, আমাকে এর মানেটা বলবে?' বলতে বলতে চাপা বেদনায় জগদীশের গলায় স্বর বন্ধ হয়ে আসে।

অতসী উঠানের ফুলে ভরা রক্তকাঞ্চন গাছটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি কি কিছু বোঝ না?'

'না—কি বুঝব?' জগদীশের গলার স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠল।

অতসী ওর দিকে না চেয়েই মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, 'তোমার যে ব্যারাম হয়েছিল তা ভাল হয়ে গেলেও কিছুদিন ডাক্তার তোমাকে সাবধানে থাকতে বলেছেন। তার মানে তোমার নিয়মমত খাওয়া ঘুমনো বিশ্রাম যেমন দরকার, অন্য দিকে একটু বুঝে-সুঝেও চলতে হয়। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান, কত জ্ঞান শোন, আমি তোমায় কি খুলে বলব, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—ও বাড়ীর জ্যেঠাইমা ওঁরা বলাবলি করছিলেন। ওগো, তোমাকে যে অবস্থায় হাসপাতালে দেখেছি ও রকম করে রাখলে আমার মীনু যে একদিনও বাঁচবে না, তার উপর আমাকেও কাছে থাকতে দেবে না। যেটা আসছে তার যে এ ব্যাধি হবে না তারই বা কি বিশ্বাস।' তুমি রাধামাধবের দয়ায় সুস্থ হয়ে বাড়ী এলেও, ওঁদের কথা শুনে অবধি আমার মনে শান্তি নেই। মীনুকে তুমি কিছুদিন কাছে টেনো নাগো ও অবোধ শিশু।' বলতে বলতে মেয়েকে বুকে চেপে ধরে ঝর্ঝর্ করে অতসী কেঁদে ফেলল।

জগদীশের অবস্থা দেখে তখন যে-কোন মানুষের করুণা হতে পারে। নিজে সে শিক্ষিত হলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে তার কোন অভিজ্ঞতা নাই। ডাক্তার যতটুকু বলে দিয়েছেন ও ততখানি জেনেছে, বুঝেছে। এদিকে অতসী—যে শুধু অতুলনীয় রূপের জন্য তার ঘরে এসেছে, শিক্ষার বিন্দুমাত্র সংস্পর্শও যার মধ্যে নাই, প্রতিবেশিনীদের কাছে শুনে যা একবার বুঝেছে, সন্তানের মঙ্গলের জন্য কথাটাকে যে রকম দৃঢ়ভাবে নিয়েছে তা থেকে তাকে টলানো অসম্ভব। অতসীর প্রকৃতির এদিকটা জগদীশের অজানা নয়। তার মত অশিক্ষিতা মেয়েরা বুকের ব্যারাম বলতেই বোঝে যক্ষা, যক্ষা আর প্লুরিসি যে এক নয় একথা এদের কিছুতেই বোঝান যাবে না। জগদীশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর জলমগ্ন মানুষ যেমন বাতাস নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার উপর দিকে ভেসে উঠবার চেষ্টা করে তেমনই করে নিজের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে মুখ দিয়ে কয়টি কথা বের করল, 'তা হলে আমি কি করব?'

অতসী কান্না-ভেজা গলায় বলল, 'যত দিন একটু সাবধানে থাকা দরকার তত দিন বই-টই পড়তে পার, সকালে বিকেলে বেড়িয়ে এসো।'

হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে জগদীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এর জন্যই কি আমি বাড়ী আসার ইচ্ছাটাকে প্রাণপণে চেপে রেখে আট-আটটি মাস হাসপাতালে কাটিয়ে এলাম? এ রকম অস্পৃশ্যের মত বাড়ী থাকার চেয়ে, আমি যত দিন না তোমাদের মত সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারব, আমার মীনুকে কোলে নিতে পারব, তত দিন দূরেই থাকব। তোমারও এত অশান্তি নিয়ে রাত্রিদিন কাটাতে হবে না।' বলতে বলতে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ফরাসী-কবি আলফ্রে দে ম্যুসে

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দী রোমান্টিসিজমের যুগ। এই শতাব্দীর মধ্যে রচিত প্রায় সর্বশ্রেণীর সাহিত্যই অলৌকিক কল্পনায় এবং কল্পলোকের স্বপ্নসুষমায় বিমণ্ডিত। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ফরাসী-কাব্যসাহিত্য সমগ্র বিশ্বের নিকট অসীম বিস্ময়ের বস্তু। আজও ফরাসী-কবিতা সারা পৃথিবীর কাব্য-রসিকমণ্ডলীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। রসবেত্তামাত্রেরই ফরাসী-কাব্য সম্পর্কে আছে উদগ্র আগ্রহ ও বিপুল কৌতূহল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স তাঁর কাব্য-সাহিত্যে গৌরবময় সুবর্ণযুগের জন্য যে সকল কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের নিকট ঋণী তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-কবি আলফ্রে দে ম্যুসে একজন।

কবি আলফ্রে দে ম্যুসে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের পারী নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ফরাসী কাব্য-সাহিত্যে কবি আলফ্রে দে ম্যুসের বিপুল-কীর্তি অবিস্মরণীয় ও অবিনশ্বর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক দুর্নীতি, নৈতিক সঙ্কীর্ণতা, বৈচিত্র্যহীন সাহিত্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন তামসিক মনোভাব ফরাসী জনসাধারণকে বিরক্ত, উদাসীন এবং সাহিত্যের প্রতি একান্তভাবে বিরূপ করে তুলেছিল। এর যে বিপুল প্রতিক্রিয়া হ'ল তার ফলে উদ্ভূত হ'ল এক নূতন বৈচিত্র্য-বাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্ণবিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ নব-আদর্শ-মণ্ডিত শিল্পে ও সাহিত্যে হ'ল তার প্রতিষ্ঠা। কবি আলফ্রে দে ম্যুসের কাব্যরচনায় এই নূতন বৈচিত্র্যবাদ স্বাভাবিক পরিণতিলাভ করেছিল। বিপুল-সম্ভাবনা নিয়ে যখন কবি আলফ্রে দে ম্যুসে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন তখন ফ্রান্সের জনসাধারণ, বিশেষ করে তরুণ-সম্প্রদায়, তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। নূতন ভাবের বন্যায় ফরাসী কাব্য-সাহিত্য প্লাবিত করে অল্পদিনের মধ্যেই কবি আলফ্রে দে ম্যুসে যশস্বী হয়ে ওঠেন।

আলফ্রে দে ম্যুসে হলেন প্রথম খাঁটি রোমান্টিক ফরাসী-কবি। কল্প-বিলাসপন্থায় বিরচিত তাঁর অপূর্ব কবিতানিচয় কেবল সুকুমার ভাবের জন্যই নয়, পরন্তু নূতন আদর্শ ও স্বাভাবিক বিস্ময়বাদের জন্য প্রসিদ্ধ। রোমান্টিক কবিতার ব্যাখ্যাতা ও স্রষ্টা হিসাবে কবি আলফ্রে দে ম্যুসে চিরস্মরণীয়। ফ্রান্সের বর্তমান সমালোচকবৃন্দের চোখে খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক ভিক্তর হিউগো হলেন 'নিতান্ত পুরাতন', কিন্তু এঁদের চিন্তায় আলফ্রে দে ম্যুসে "রোমান্টিক যুগের মস্ত বড় কবি"। আলফ্রে দে ম্যুসের কাব্যে ফরাসীরা প্রকৃত কবিচিত্ত পেয়ে থাকে; কারণ এই কবিত্ব ভাবুকতাময় রোমান্টিক স্বপ্নমাধুর্যে মণ্ডিত। ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস, স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ এবং সরস-সতেজ সঙ্গীত-তরঙ্গের জন্য আলফ্রে দে ম্যুসের কাব্যরাজি আজও সমাদৃত।

কবি আলফ্রে দে ম্যুসের প্রথম কবিতাগুলি 'প্রেমিঅ্যার্ পোয়েজী' নামক কাব্যগ্রন্থ ১৮২৯ সনে সঙ্কলিত হয়। দ্বিতীয় কাব্য 'রোলা' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সনে। তৃতীয় কবিতার বই 'লে ন্যুই' ১৮৩৫-৩৭ সনে বেরিয়েছিল। তার পরে ১৮৩৬ থেকে ১৮৫২ সনের ভিতরে লেখা কবি আলফ্রে দে ম্যুসের কবিতাগুলি ও পূর্বের কাব্যগ্রন্থত্রয়ের মধ্য থেকে বাছাই-করা উৎকৃষ্ট কবিতাসমূহ নিয়ে একত্রে শোভন সংস্করণ 'পোয়েজী ন্যুভেল্' প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সনে। এর পরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তৎকালীন সমসাময়িক কবিতাগুলিকে একসঙ্গে সাজিয়ে নিয়ে 'পোয়েজী কঁপ্লেমাঁত্যার্' ছাপা হয়। কবি আলফ্রে দে ম্যুসের মৃত্যুর তিন বছর পরে তাঁর শেষ কবিতাগুলিকে সংগ্রহ করে কবির ভ্রাতা পোল্ দে ম্যুসে ১৮৬০ সনে 'পোয়েজী পোস্ত্যুম্' প্রকাশিত করেছিলেন। বহুদিন পরে কবি আলফ্রে দে ম্যুসের সব বই থেকে চয়ন করে, কতকগুলি সুন্দর কবিতা নিয়ে, বিখ্যাত ফরাসী-সমালোচক মোরিস্ আলাঁ মূল্যবান টীকাটিপ্পনীসমেত 'পোয়েজী ন্যুভেল্' নবরূপে প্রকাশিত করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থগুলি কবি আলফ্রে দে ম্যুসেকে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত করিয়েছিল, এবং আজও এগুলি বিশ্বের কাব্য-রসিকমণ্ডলীর নিকটে অফুরন্ত রসের উৎস বলেই প্রতীয়মান হয়।

আলফ্রে দে ম্যুসে একজন বড় নাট্যকারও ছিলেন। নূতন ধরণের সংলাপ ব্যবহার করে অভিনব আঙ্গিকে তিনি নাটক রচনা করেন। নাট্যকার হিসাবে আলফ্রে দে ম্যুসের খ্যাতি তাঁর কবি-খ্যাতির চেয়ে কিছু কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে তাঁর দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'কমেদি সে প্রভ্যার্ব' গ্রন্থটিরও নাম করা যায়; বইখানি নানাদিক দিয়ে সুখপাঠ্য।

ফরাসী কাব্য-সাহিত্যে কবি আলফ্রে দে ম্যুসের যে কবিতা-গুলি অমর হয়ে আছে, তন্মধ্যে 'রোলা' 'সিল্ভিয়া' 'মালিব্রাঁর প্রতি' (A la Mal·b.an) 'একটি ফুলের প্রতি' (A Une Fleur) 'বিদায়-সম্ভাষণ' (Adieu), 'স্মরণ' (Suvenir), 'একটি স্বপ্ন' (Un reve), 'দিবা-স্বপ্ন' (Reverie),

'জান্ দার্ক'; 'মায়ের প্রতি' (A ma mire) ও 'যাদু-লণ্ঠন' (La lanterne magique) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা কয়টির গঠনকৌশল ও রচনারীতি অনবদ্য; ভাবে-ভাষায়-ছন্দে এগুলি একেবারে নিখুঁত। সদ্য-আবির্ভূত রোমান্টিকভাবে এই গীতি-কবিতাগুলি মণ্ডিত। আল্ফ্রে দে ম্যুসের 'লে ন্যুই' বা 'রাত্রিগুলি' এই নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। বিভিন্ন মাসের রাত্রির উপরে যথা: 'জুন মাসের রাত্রি' (La nuit de Juin), 'ডিসেম্বর-মাসের রাত্রি' (La nuit do Decembre), 'অক্টোবর মাসের রাত্রি' (La nuit d' Octobre) প্রভৃতি কবিতা-গুলি রচিত। সঙ্গীত, কাব্য ইত্যাদি সুকুমার কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'মিউজ'-এর সঙ্গে কবির নানা আলোচনাই কবিতা কয়টিতে রূপায়িত হয়েছে। রাত্রির উপরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে 'La nuit', 'La nuit d' Aout' ও 'La nait de Mai' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি আল্ফ্রে দে ম্যুসের গীতিকবিতাগুলি সুমিষ্ট ও শ্রুতিমধুর; এগুলিকে ফুলের পাপ্ড়ির মত কোমল, পেলব ও সুকুমার বলে মনে হয়। লঘু ভাবে, স্বচ্ছ ভাষায় ও লালিত্যপূর্ণ ছন্দে সুকোমল শব্দাবলী ব্যবহার করে স্বপন-বিলাসী কবি ম্যুসে তাঁর মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্ফ্রে দে ম্যুসের প্রত্যেক কবিতাতেই এই একরকম মধুর, মৃদুল ও স্নিগ্ধ ভাব বজায় রয়েছে। কবি আল্ফ্রে দে ম্যুসে যখন গভীর রসের কবিতা রচনা করেছেন, তখন কারুণ্যের সঙ্গে, গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে হাল্কা-ছন্দ ও লঘু-ভাষা—যা তাঁর পক্ষে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। কবি ম্যুসের প্রথম দিকের কোন কোন রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কবিতার প্রারম্ভে একটি সুন্দর পংক্তি রচনা করতেন, যা ভাববৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঝঙ্কারময়; পরে সেই বিশেষ পংক্তিটি বা তার ভগ্নাংশ তিনি বার বার সেই একই কবিতার মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন পুরাতন কাহিনী, সমসাময়িক ঘটনা, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির উল্লেখ ও আভাস তিনি অবলীলাক্রমে তাঁর কবিতার মধ্যে গ্রথিত করেছেন। আল্ফ্রে দে ম্যুসের কবিতায় প্রায়ই নানা ধরণের unison দেখতে পাওয়া যায়। এতে কবির প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই মুদ্রাদোষের জন্য অনভিজ্ঞ বিদেশী পাঠকের পক্ষে কবিতার সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে কিছু অসুবিধা হয়। আল্ফ্রে দে ম্যুসে তাঁর মধ্যম ও শেষ বয়সের কবিতাগুলির নীচে রচনাকাল, সন তারিখ প্রভৃতি ব্যবহার করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, যার ফলে সুসংবদ্ধভাবে কবির মনের অবস্থা, ভাবের ক্রমবিকাশ ও পারম্পর্য প্রভৃতির পরিচয় এবং সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ জানা যায়।

কবি আল্ফ্রে দে ম্যুসে তাঁর লেখা বড় বড় কবিতাগুলির মধ্যে প্রায়ই অনেক খ্যাতিসম্পন্ন স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকদের নামোল্লেখ করেছেন। কারণে-অকারণে এই সকল লেখকের সম্পর্কে তিনি বারংবার নানাবিধ উক্তি ও নিজস্ব বিশেষ ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সেইজন্য কবি আল্ফ্রে দে ম্যুসের বহু কবিতায় বিভিন্ন সাহিত্যিকদের ও তাঁদের রচিত গল্প-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ-উপন্যাস প্রভৃতির নাম দেখতে পাওয়া যায়। আল্ফ্রে দে ম্যুসের সমালোচনা করবার ধারাটি কেমন ছিল এতে তার কিছু আভাস মেলে। কবি ম্যুসে তাঁর কাব্যে অনর্থক ইচ্ছাপূর্বক অলঙ্করণ আদৌ পছন্দ করতেন না। যে রচনাভঙ্গী সহজ, সরল, আন্তরিক ও সোজাসুজি তাই ছিল তাঁর প্রিয়। শিল্পে কোন রকম কৃত্রিমতা অথবা অযথা কারিগরি করা তাঁর পক্ষে ছিল একান্তভাবে অসহনীয়। সাধারণ ভঙ্গীতে, সাবলীল সুরে, স্বচ্ছন্দ গতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচনা করাই ছিল তাঁর পক্ষে ঐকান্তিকরূপে স্বাভাবিক। কোন রকম বাঁধাধরা নিয়ম বা জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে তিনি ছিলেন নিতান্ত নারাজ, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রকে বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। নিজের রচনা সম্পর্কে কবি আল্ফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, এবং কোন প্রকার বিরূপ-সমালোচনা বা কটু মন্তব্য, নিজের বিরুদ্ধে কোনরূপ উক্তি তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতেন না—এমন কি ব্যক্তিগত ক্ষতি ও শত্রুবৃদ্ধির কথা ভেবেও দেখতেন না। এইজন্য আলফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন সমসাময়িক অনেক সমালোচকের নিকট বিশেষভাবে অপ্রিয়ভাজন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ম্যুসে সত্যকার কবি ছিলেন, এবং রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ-মণ্ডলীতে তাঁর খ্যাতি ও খ্যাতির, সম্মান ও মর্যাদা ছিল অসামান্য। সেইজন্য সাধারণ সমালোচকদের তিনি ঘৃণা ও ব্যঙ্গের চোখে দেখতেন, এবং মাঝে মাঝে মনঃপীড়া পেলেও তাঁদের কখনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি।

কবি আলফ্রে দে ম্যুসের কবিতাগুলি দেখলেই, নিজস্ব বিশেষ ধরণের রচনাপদ্ধতির দরুন সেগুলি যে তাঁরই রচিত তা সহজেই ধরা পড়ে যায়। আলফ্রে দে ম্যুসের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে, তাঁর রচিত অনেক কবিতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক, নানা ধরণের মহিলা, বিশিষ্ট শিল্পী, বিখ্যাত যোদ্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে লিখিত। সেই সব কবিতায় কবি আলফ্রে দে ম্যুসের নিজস্ব বিশেষ আদর্শ, মৌলিক ভাবধারা ও সুচিন্তিত অভিমত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। এই ধরণের কবিতা-

গুলিতে পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির কথা পর্যন্ত থাকত ;—এমন কি কবির নিজস্ব ধর্মব্যাখ্যা পর্যন্ত। আলফ্রে দে ম্যুসের কবিতায় আমরা বিভিন্ন সময়ের যে সকল প্রভূত খ্যাতিসম্পন্ন সর্বদেশীয় কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, যোদ্ধা ও দেশ-নেতার নাম পাই তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : ইংরেজ—সেক্সপীয়র, চ্যাটার্টন্, বায়রণ, লক্ ; ইটালিয়ান—দান্তে, বোক্কাচ্চো ; জার্মান—শিলার্, গ্যেটে, কাণ্ট ; ফরাসী—মোলিয়ের্, কর্নেই লা ফঁতেন, মেরিমে, দ্যুমা, লামার্তিন, গোতিয়ে, বালজাক্, ভলতেয়ার্, বেরাঁজ্যার্, শেনিয়ে, হিউগো, দে ভিঞি, জর্জ সাঁ, নাপোলেঅঁ বোনাপার্ৎ, রোবস্পিয়ের্ এবং আরও অনেকে।

সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের ডেস্‌ডেমোনার করুণতম মৃত্যু আলফ্রে দে ম্যুসেকে যে কতখানি আঘাত দিয়েছিল, তার প্রমাণ তাঁর দু-একটি কবিতার অংশবিশেষে পাওয়া যায়। ইংরেজ দার্শনিক লক্ মানুষকে যন্ত্রমাত্র বলাতে আলফ্রে দে ম্যুসে সখেদ উক্তি করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সমসাময়িক কবি আলফঁস্ দে লামার্তিন্‌কে উদ্দেশ করে 'লেত্র আ লামার্তিন্' শীর্ষক পত্র-কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই পত্র-কবিতাটিতে আলফ্রে দে ম্যুসে বিখ্যাত ইংরেজ কবি বায়রণকে 'Le Grand Byron' বলে অভিহিত করেছেন। আলফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন বায়রণের বিশেষ ভক্ত, বায়রণের 'ম্যান্‌ফ্রেড' ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ। আলফ্রে দে ম্যুসে বহু স্থানে বায়রণের ও তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া কবি আলফ্রে দে ম্যুসের কবিতাগুলির মধ্যে নানা স্থান, নগর, গ্রাম প্রভৃতির নাম, বহু দেশের প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির ছড়াছড়ি রয়েছে। "Une soiree", "Apres une lecture" প্রভৃতি কবিতা আলফ্রে দে ম্যুসের ব্যক্তিগত পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় দেয়। এই সকল কবিতা পাঠান্তে কবির আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির নাম ও কবির ব্যক্তিগত জীবনের দু-একটি ঘটনা জানা যায়। কবি আলফ্রে দে ম্যুসের কৃতী ভ্রাতা পোল দে ম্যুসে কবির সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মূল্যবান তথ্যাদি জানিয়েছেন। কবি আলফ্রে দে ম্যুসের জীবন-কাহিনী এবং তাঁর রচিত কবিতার সন-তারিখসহ খুঁটিনাটি ইতিহাস পোল্ দে ম্যুসে 'বিওগ্রাফি' গ্রন্থটিতে সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংবদ্ধভাবে লিখে গেছেন। আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করে, সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে বহু পরিশ্রমে তিনি এই জীবনীটি রচনা করেছেন।

কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের বন্ধুভাগ্য ছিল অসাধারণ। 'শাঁস' নামক কাব্যগ্রন্থরচয়িতা বিখ্যাত হাস্য-রসিক ফরাসী কবি বেরাঁজার্ (১৭৮০-১৮৫৭), 'কঁৎ দ্রোলাতিক্' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস-প্রণেতা ওনোরে দে বাল্‌জাক্ (১৭৯৯-১৮৫০), খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক প্রস্‌প্যার্ মেরিমে (১৮০৩-১৮৭০), 'লে ত্রোয়া মুস্‌কেতেয়ার্' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেক্‌সাঁদ্র দ্যুমা প্যার্ (১৮০৩-১৮৭০) প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীরা ছিলেন কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের হিতাকাঙ্ক্ষী ও তাঁর কাব্যের পৃষ্ঠপোষক। বয়সের ব্যবধান থাকলেও কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের সঙ্গে এঁদের আচরণ ছিল অনেকটা বন্ধু-বান্ধবের মতই। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক শার্ল ওগ্যুস্ত্যাঁ স্যাঁৎ ব্যভ্ (১৮০৪-৬৯) ছিলেন কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের সর্বাপেক্ষা শুভার্থী সুহৃদ। ম্যুসের কবিতার উপর স্যাঁৎ ব্যভ্-এর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। বিচক্ষণ বিচারে রচনাটি অতিশয় মূল্যবান। কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের সুন্দর সরস গীতিকবিতাগুলি পাঠ করে স্যাঁৎ ব্যভ্ তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের গীতিকবিতাগুলি সম্পর্কে সাঁৎ ব্যভ এই মর্মে বলেছেন :

"ভাবাবেগের, কামনা-বাসনার ফুলদল, এক নির্দিষ্ট সুমহান্ দিবাস্বপ্ন এতে বর্তমান।"

এই মন্তব্য পাঠান্তে অপরিসীম উল্লাসে আত্মহারা হয়ে কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে 'স্যাঁৎ ব্যভ্-এর প্রতি' (A Sainte-Beuve) শীর্ষক কবিতা রচনা করেন, এবং স্যাঁৎ-ব্যভ্-এর উক্তিকে অনিন্দ্য কাব্যরূপ দান করেন।

আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে একজন সত্যকারের কাব্য-পাঠক ও কাব্য-রসিক ছিলেন। বহু খ্যাতনামা ফরাসী-কবির রচিত কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। রঁসার (১৫২৪-৮৫), লা ফঁতেন্ (১৬২১-৯৫), ভল্‌তেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), আঁদ্রে শেনিয়ে (১৭৬২-৯৪), ভালমোর (১৭৬৩-১৮৫২), ভিক্তর হিউগো (১৮০২-৮৫), তেয়োফিল্ গোতিয়ে (১৮১১-৭২), প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক ফরাসী-কবির রচিত কবিতাবলী প্রায়ই তিনি তন্ময় হয়ে তদ্‌গত-চিত্তে আবৃত্তি করতেন। পরিচিত সাহিত্যিক-মহলে তিনি অনেক সময়ে দ্যু-ফ্রেনি, দে জুরি, আর্ণৎ, মাদাম্ দুদেভোৎ, লাতাঞ্চা, লেবিয়ে, রুজে-দে-লীল, মারি জোসেফ শেনিয়ে প্রভৃতি কবিদের কথা আলোচনা করতেন। দার্শনিক প্লেটোর *Symposium* ও *Phaedrus* গ্রন্থদ্বয় কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের বিশেষ প্রিয় ছিল। এই বই দুটিতে প্রেমের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী বলা হয়েছে। আখ্যানবস্তু গ্রীক-যুবকদের সম্বন্ধে কথিত নিতান্তই বৈঠকী গল্প। গ্রন্থদ্বয়ে আছে প্রচলিত কথা ও

কাহিনী, কিংবদন্তী ও প্রবচন। লেখা-হিসাবে এরা শ্লেষাত্মক নিন্দার শ্রেণীতে পড়ে। সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবেরা প্রেম-সম্পর্কে কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের অভিমত জানতে চাইলে তিনি তাঁদের ঐ গ্রন্থদ্বয় পড়তে নির্দেশ দিতেন, এবং প্রায়ই তিনি স-ব্যঙ্গে দার্শনিক-প্রবর স্পিনোজার প্রসিদ্ধ উক্তিটির ("Amor est titillatio, concomitante idea causae external"—যার ভাবার্থ: প্রেম হ'ল গাত্রদাহ, বাইরের হেতুর মত ভাবাবেগ) উল্লেখ করতেন। জ্যর্জ স'াঁ (১৮০৪-৭৬) ছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক; ছদ্ম নামে 'মোপ্রা' নামক উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জ্যর্জ স'াঁর আসল পরিচয় অনেকেই জানতেন না। এই জ্যর্জ স'াঁর উপরে কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে বিভিন্ন সময়ে ছয়টি নানা ধরণের কবিতা লিখেছিলেন। জ্যর্জ স'াঁর প্রতি প্রশংসায়, তাঁর গ্রন্থের আলোচনায় ও নানা ধরণের কথায় কবিতাগুলি পরিপূর্ণ। আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে ফরাসী-মনীষী ব্যুর্ফঁর উদ্দেশ্যেও একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই ব্যুর্ফঁই বলেছিলেন: "Le style c'est l'homme" অর্থাৎ, রচনা-রীতিতেই মানবের পরিচয়। উক্তিটি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী কাব্য-সাহিত্যে খ্যাত-নামা কবি ও ঔপন্যাসিক ভিক্তর হিউগো এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ আদর্শবাদ, বিস্ময়মণ্ডিত স্বভাববাদ শিল্পে ও সাহিত্যে আনয়ন করে হিউগো অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আল্‌ফ্রে দে ম্যুসের রচনায় এই নূতন রীতি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল। এতদ্ব্যতীত আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে বিশেষ কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের সঙ্গে রোমান্টিক্ কবিতা রচনা করেছেন। ফ্রান্সে "Les Parnassiens" নামে যে একদল বিশিষ্ট কবির আবির্ভাব হয়েছিল আলফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। আলফ্রে দে ম্যুসের সমগোত্রীয় কবিবৃন্দ বলে যাঁরা বর্ণিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 'মেদিতাসিঅঁ' (১৮২০) ও 'আর্মানি' (১৮৩০) কাব্যগ্রন্থ-দ্বয়ের রচয়িতা আলফঁস্ দে লামার্তিন্ (১৭৯০-১৮৬৯) এবং 'পোয়েম্' (১৮২৪) ও 'পোয়েম্ স'াঁতিক সে মদ্যার্ণ' (১৮২৬) কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা ল্যকোঁৎ আলফ্রে দে ভিনি (১৭৯৭-১৮৬৩) এই দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার রচয়িতা। সুবিখ্যাত কবি লেকঁৎ দে লীল (১৮১৮-৯৪) লামার্তিন, ভিনি ও ম্যুসে—পূর্ববর্তী এই কবিত্রয়ের গীতিকবিতার ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ও কাব্যে স্থানে স্থানে তাঁদের সামান্য অনুসরণ করেছিলেন। বহু পরে আভাসগ্রাহী (Impressionist) ও প্রতীকতন্ত্রী (Symbolist) দলের প্রতিনিধি-স্থানীয় বিখ্যাত কবি পোল ভেয়ার্লেন্ (১৮৪৪-৯৬) তাঁর পূর্ববর্তী যুগের ভিনি ও ম্যুসের প্রবর্তিত কাব্যের ধারা পরিবর্ধিত করেছিলেন।

ফরাসী কবিতার বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি আলফ্রে দে ম্যুসে অন্যতম। ফরাসী ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি ছন্দের নানাবিধ শক্তি, স্বাভাবিক গতি, লীলাপ্রবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ পার-দর্শিতা অর্জন করেছিলেন এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। ছন্দে তাঁর হাত ছিল নিপুণ ও দক্ষ। ছন্দের নিয়মকানুন, রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। আলফ্রে দে ম্যুসে বহু নূতন ছন্দ আবিষ্কার করে গেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল অসামান্য। ভিক্তর হিউগো-প্রদর্শিত একটি ছন্দ অবলম্বন করে নূতনভাবে আলফ্রে দে ম্যুসে তাঁর 'A une espagnol' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন; কবিতাটি পাঠান্তে প্রতীয়মান হয় যে, ছন্দে এমন জ্ঞান দুর্লভ। আলফ্রে দে ম্যুসের সনেটসমূহ অপূর্ব কারুকার্যে মণ্ডিত। তাঁর 'রঁদো' ছন্দে লিখিত কবিতাগুলি নয়নরঞ্জক ও সুপাঠ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপের প্রায় সর্বশ্রেণীর সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, দর্শনে নৈরাশ্যবাদের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কাব্যের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি আলফ্রে দে ম্যুসে, ইতালীর জনপ্রিয় কবি লেওপার্দি, ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি বায়রণ, জর্মানীর প্রসিদ্ধ কবি হাইনে, রুশিয়ার নির্বাসিত কবি লার্মন্তফ্ নৈরাশ্যবাদী। এ ছাড়া রুশ-সাহিত্যিক পুশ্‌কিন এবং খ্যাতনামা জর্মান-দার্শনিক শোপেন্-হাউয়রের জীবনে, সাহিত্যে ও দর্শনে নৈরাশ্যবাদের প্রবল প্রভাব দেখা যায়। গানের জগতে দৃষ্টিপাত করলেও লক্ষণীয় যে, ফরাসী-সুরকার শোপাঁ, জার্মান-সুরকার বেটোফেন, শুবার্ট শুমান্ প্রভৃতির সংযোজিত সুরে ব্যক্ত হয়েছে হতাশা-মিশ্রিত নৈরাশ্যবাদের বেদনার্ত ক্রন্দনধ্বনি। এর প্রধান কারণ এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈচিত্র্যবিহীন সামাজিকতা ও সঙ্কীর্ণ নীতিবাদ ইউরোপের জনসাধারণকে বিরক্ত ও জর্জরিত করে তুলেছিল। তিক্তভাবে প্রপীড়িত মানসিক অনুভূতি সাহিত্যক্ষেত্রে নৈরাশ্যের ছায়ারূপে নেমে এসেছিল। বলা বাহুল্য, কবি আলফ্রে দে ম্যুসেও এই নৈরাশ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি পান নি; কেননা যুগধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অতি-ক্রম করে আজ পর্য্যন্ত কোনও সাহিত্য গড়ে উঠে নি। কবি আলফ্রে দে ম্যুসের 'রাপেল-তোয়া' শীর্ষক কবিতাটির শেষাংশে তাঁর বিষাদাচ্ছন্ন মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও করুণ-রসাশ্রিত পংক্তি কয়টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ

মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আশাবাদী রোমান্টিক কবিরও আভাস আমরা পাই :

"Rappelle-toi, quand sous la froide terre
Mon cœur brise pour toujours dormira ;
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement s'ouvrira.
Je ne te verrai plus ; mais mon ame immortel
Reviendra pres de toi comme une soeur fidel.
Ecoute, dans la nuit,
Une voix qui gemit :
Rappelle-toi !"

"জাগিও নয়ন মেলিয়া—যখন রহিব ভূমির তলে,
আমার ভগ্ন-হৃদয় তখন শান্তি লভিবে ফের ;
মনে এনো মোরে, এনো সে বিজনে একাকী পুষ্পদলে
আমার সুচির-সমাধির 'পরে স্মরণ ক্রন্দনের।
আমি নাহি পাব তোমারে আবার ; কিন্তু আমার অমর-তৃষা
ফিরিয়া আসিবে—তোমার নিকটে আলোর মতন পাব যে দিশা।
রজনীর বুকে মন্দ-মধুর তানে
এক সুরে গান গাহিব তোমারি কানে :
জাগো, ওগো জাগো !"

আলফ্রে দে ম্যুসের মৃত্যুর পরে, কবির শেষ-ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সমাধি-প্রস্তরের উপর এই কথা কয়টি খোদিত করা হয়েছিল।

আলফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন আদর্শ কবি। প্রকৃত কবির কাজ যে কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। বিশেষ আবেগ ও ভাবপ্রবণতার সঙ্গে তিনি তাই কবির কাব্য-রচনা সম্পর্কে বলেছেন :

"ক্ষণিক স্বপ্ন ছন্দ রচিয়া রেখেছে অমর কবি',
ক্ষণ-মুহূর্তে স্পর্শ দিয়া যে মৃত্যু নিয়াছে হবি' ;
আছে, যেথা আছে চির-সুন্দর—সত্য ও শুভ-শিব,
তাদেরি খোঁজেতে মগ্ন সে রয় সারাটা জীবন ধরি'।
রয়েছে কখনো নিথর-গভীর, কভু আনন্দে ভরি' :
পথের মাঝারে চলিতে সহসা অশ্রু পড়েছে ঝরি',—
কল্পনা-লীলা স্মরি, অকারণে হেসেছে তখনি ফের !
মানস-মুকুরে যেখানে-সেখানে ভাব গেছে ধরা পড়ি'।
বিরলে বসিয়া অশ্রুধারায় মুক্তা রচনা করি',
চির মনোরম বসন্ত তার রঙিল মানস ভরি'।
অলসে-হেলায় এক-একটি দিন ক্রমশঃ কাটিয়া যায়—
খেয়াল-খেলাকে শঙ্কাবিহীন হৃদয় লয়েছে বরি' !
সঙ্গীত-সুরা পাগল করিছে, নেশায় দিবস ভ'রে—
গাহে গান, আঁকে চিত্র, কবি যে ভাবের ভাবনা করে।

কোন তরুণী বা কুমারীকে উদ্দেশ করে কবি অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর প্রতি প্রেম-নিবেদন করে, ভালবাসা জানিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। প্রেমের কবিতা-রচনায় আলফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'আদিঅ্য আ সুজ', 'শাঁস' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে এ বিষয়ে আভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর রোমান্টিক চেতনামণ্ডিত 'বঁজুর্ সুজ' শীর্ষক কবিতাটির মর্ম দেওয়া হ'ল :

"বনের কুসুম তুমি যে আমার ! সহেলি, সুপ্রভাত !
আছো কি গো তুমি এখনো তেমনি মধুরতমা ?
ইতালি হইতে বিরাট পথের করি' যবনিকাপাত
ফিরিয়া এসেছি, এসো বাহিরেতে, হে নিরুপমা !
স্বর্গ-ভুবন করিয়া ভ্রমণ এসেছি আজি ;
করিয়াছি প্রেম, রচেছি যে আমি কাব্যরাজি।
কিন্তু তোমাতে গুরুতর নয় একি ?
আসিয়াছি আমি পথেতে তোমার আজিকে অকস্মাৎ ;
তব দ্বার খোলো দেখি।
সহেলি, সুপ্রভাত !"

আলফ্রে দে ম্যুসে ইতালীতে গিয়েছিলেন। ইতালী ভ্রমণকালে বিখ্যাত ইতালীয় কবি লেওপার্দির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আলফ্রে দে ম্যুসের একটি কবিতায় এই লেওপার্দির নামোল্লেখ আছে। ইতালী-ভ্রমণ আলফ্রে দে ম্যুসের কাব্য-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'সুভেনির্ দে সাল্প' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইতালী অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে কবি এক দিন তাঁর সুজঁকে ভালবাসা জানিয়েছিলেন। প্রেয়সী নারীর মধুর প্রেম তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ইতালী হতে ফিরে এসে কবি আলফ্রে দে ম্যুসে এই কবিতাটি রচনা করেন। বহু দিন পরে আলফ্রে দে ম্যুসে ফিরে এসেছেন, ছলনাময়ী সুজঁ কি তাঁকে ভুলে গিয়েছেন ? তবুও আলফ্রে দে ম্যুসের স্মৃতিতে বিগত দিনের প্রেম লীলার স্বপ্ন-ছবি ভেসে উঠেছে :

"হিয়া যবে ছিল উল্লাসে ভরা বিকশিত সঙ্গীতে
আমি দেখেছিনু তোমারে পদ্মফুলের দিনে ;
কহেছিলে তুমি : চাহি না কো আমি,
চাহি না আমি যে নিতে
আর কারো প্রেম, এ ধরার মাঝে তোমায় চিনে।
দ্রুত চলে গিয়ে ফিরিয়া আসিনু দেখিতে হায়,—
ছিনু দূরে, তুমি আঁখির আড়ালে ভুলিলে কায় ?
মোর কাছে আজ গুরুতর নয় একি ?
তবুও এসেছি আজিকে তোমার ভবনে অকস্মাৎ ;
তব দ্বার খোলো দেখি।
সহেলি, সুপ্রভাত !"

আলফ্রে দে ম্যুসের 'আ মাদমোয়াজেল্...' বা "কুমারী '—'র প্রতি" কবিতাটি পাঠ করে কেউ কেউ আলফ্রে দে

ম্যুসেকে নারী-বিদ্বেষী কবি বলে অভিহিত করেছেন। কবি তাঁর এই কবিতাটিতে কুমারীটির নাম দেন নি, কিন্তু পরে তাঁর জীবনী Biographie : Pul de Musset) পাঠান্তে মেয়েটির নাম ও পরিচয় লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়েছে। শ্রীমতী মালিব্রাঁ নাম্নী কোন অভিজাত ভদ্রমহিলার অকালমৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশে কবি আলফ্রে দে ম্যুসে 'আ ম্যালিব্রাঁ' শীর্ষক কবিতা রচনা করেছিলেন। উক্ত কুমারীটি ছিলেন এই মালিব্রাঁর ভগিনী; এঁর নাম ছিল পোলিন্ গার্‌সিয়া; কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে আদর করে তাঁকে পোলেৎ বলে ডাকতেন। কুমারী পোলিন্ গার্সিয়া ছিলেন বিশেষ প্রতিভাসম্পন্না মহিলা-শিল্পী; চিত্রে তিনি নূতন চেতনা, প্রেরণা ও রূপ দিতে পারতেন। নূতন ধরণের আঁকা পোলেৎ-এর সুন্দর ছবিগুলি দেখে কবি আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু নিষ্ঠুরা, হৃদয়হীনা পোলিন্ গার্‌সিয়ার উপেক্ষায় ক্ষুণ্ণ হয়ে আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে এই কবিতাটি রচনা করেন। আল্‌ফ্রে দে ম্যুসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই রমণীর উদ্দেশেই তাঁর 'আদিঅ্য' বা 'বিদায়' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। 'আ মাদমোয়াজেল…' কবিতাটির মর্মানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল:

"সত্যি, নারী, এই জগতের রাজ্যখানি ভ'রে
তোমার আছে ভাগ্যে-পাওয়া অদৃষ্টেরি জোর;
ভরতে পারো—মৃদু-মদির চটুল-হাস্য ক'রে
রঙের নেশায় বা নিরাশায় হৃদয়খানি মোর!

সত্যি, তব বদন-বাণী, কিংবা নীরবতা,
নয়ন মুদে রইলে স্তব্ধ অথবা বাজেতে,—
কেমনতরো হয় অঘটন বলতে কি পারব তা।
হৃদয়খানি বিদ্ধ ক'রে আঘাত যে যায় গেঁথে!
হাঁ, আছে যে দর্প তব, গর্ব্ব সীমাহীন,
বাক্য নাহি বলো—তোমার দ্বারে প্রেমিক এলে,
কি আছে তেজ দম্ভেতে বার সবায় ভাবো দীন,
তুলনা এই আচরণের ব্যর্থতাতেই মেলে।

কিন্তু তব গর্ব্বরাজি যা আছে দেশ ভ'রে
—লুপ্ত হবেই, দম্ভ যখন উঠছে কেঁপে-ফুলে,
সইতে তোমার এই আচরণ পারত যে চুপ করে
সেও যে গেল দূরে চলে তোমায় কৃত ভুলে।

সইতে পারে উপেক্ষা যে, হেলায় যে জন নীচু,
দুখের সমাধির 'পরেতে আছে সে হায় সুখে,
আবার আমি সইব ব্যথা বলব নাকো কিছু,
তোমার রীতি থাকুক আবার তোমায় মনে-মুখে।"

আলফ্রে দে ম্যুসের কবিতায় প্রচ্ছন্ন বেদনার, সুগুপ্ত ব্যথার ও অবসাদপূর্ণ নৈরাশ্যের আভাস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কবি একেবারে হতাশ হন নি, তাই তাঁর 'Rappelle Toi' শীর্ষক কবিতাটিতে উদাত্তভাবে তিনি বলেছেন:

"জাগো ওগো জাগো, চেয়ে দেখ ওই ভাগ্য মোদের ডাকে:
তোমার আমার মিলনের বাণী ছিন্ন যদি বা হয়,
নির্ব্বাসনের চির-আড়ালেতে জীবন যদি বা থাকে,
শুষ্ক-নীরস করিয়া হৃদয় বাঁধন যদি বা রয়,—
স্বপনে স্মরিও আমার বেদনা, প্রীতি ও বিদায়-মহত্তর!
বিচ্ছেদ নয় অসময়-ঋতু, প্রেমীজন চির দুঃখহর।
ঝঙ্কার-রাগে আমার ভগ্ন-হিয়া
বার বার ওঠে তোমা পানে স্পন্দিয়া:
জাগো, ওগো জাগো!"

জার্মান-কবি লরেন্‌ৎস্ স্‌ক্লাইডার হলেন 'ফ্যর্‌গিস মাইন্ নিথট্' বা 'ভুলো না আমায়' নামক জনপ্রিয় গানের রচয়িতা। সুবিখ্যাত সুরকার মোৎসার্ট এই গানটিতে সুর-সংযোজনা করেন। কবি আলফ্রে দে ম্যুসে তাঁর শ্রেষ্ঠ-রচনা "Rappelle Toi" শীর্ষক গাথাটি ঐ জার্মান-গানটির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলেন, এবং তাঁর কবিতাটিতে মোৎসার্টের দেওয়া সুর বসিয়েছিলেন। ভাবে-ভাষায় ছন্দে এই কবিতাটি সত্যিই অপূর্ব।

কবি আলফ্রে দে ম্যুসে ছিলেন একান্তভাবে সুন্দরের উপাসক। দৃশ্যমান বিশ্বের রূপ-বর্ণনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর যাদু-লেখনীর ইন্দ্রজালে কাব্যে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য অপূর্ব মনোরম ও প্রীতিপ্রদভাবে রূপ-পরিগ্রহ করেছে। কবি আলফ্রে দে ম্যুসের মনোজগৎ ছিল স্বপ্ন-সুষমায় সমাচ্ছন্ন। তাঁর কবিমন রূপকথার রাজ্যে বহু বার উধাও হয়েছে; কল্পলোকের ছায়া-সুষমা ও নন্দন-কাননের স্বর্গীয়-প্রেম তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শব্দ-শিল্পে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। বিশেষজ্ঞ-সমালোচকদের মতে তিনি কাব্যে চিত্র অঙ্কন করতেন। নৈরাশ্যবাদ তাঁকে প্রভাবিত করলেও আসলে শেষ পর্যন্ত কবি ছিলেন আশা-বাদী। বিদায় নেবার সময়ে তাই বেদনাময় রাত্রির বিষণ্ণ মনোভাব সমূলে পরিবর্জন করে নূতন প্রভাতের জাগরণী-গান শুনিয়েছেন। আলোক-রক্তিম স্বর্ণ-উষায় কবির কিন্নর-কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে:

"খোলো আবরণ, স্বর্ণ-উষার হয়েছে আবির্ভাব
ইন্দ্রজালের মায়ার নিলয় আঁকে সে রবির আগে;
জাগো ওগো জাগো, হের, দূরে রাখি' বিষণ্ণ-মনোভাব
রজত-রজনী মিলায়ে যেতেছে আপন-অঙ্গরাগে!
প্রমোদ-আরাম করে আহ্বান সুর-কম্পনে তোমায় যবে,
তন্দ্রা-আলয়ে সন্ধ্যার ছায়া ডাকে যে তখন গভীর-রবে!
কুঞ্জ-আড়ালে গোপন-গভীর স্বর
গুঞ্জরি' উঠে এক ধ্বনি-মর্ম্মর:
জাগো, ওগো জাগো!"

বাংলায় বিপ্লবযুগের "আদিপর্ব্ব"

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত

গত ৭ই নবেম্বরে আনন্দবাজার পত্রিকায় সিনেমা পৃষ্ঠায় শ্রীবারীন্দ্র-কুমার ঘোষ আমাদের জানাইয়াছেন, এবারে তিনি অগ্নিযুগের আদিপর্ব্বের লুপ্তপ্রায় কাহিনী রূপালী পর্দায় ছবিতে জগৎকে দেখাইবার প্রচেষ্টায় রত হইয়াছেন। অগ্নিপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের এ প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই এবং তিনি যে সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন, তাহাতেও সকলেই সাড়া দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কিন্তু এই আবেদন-প্রসঙ্গে এবং ইহার পূর্ব্বেও বাংলার বিপ্লবযুগের সূচনা বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন সে সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

বারীন্দ্রকুমারের মতে অগ্নিযুগের আদিপর্ব্ব ১৯০৩ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি বলিয়াছেন, "১৯০৩ সনে স্বদেশীযুগেরও আগে শ্রীঅরবিন্দ এক চারণ ও কর্ম্মীদল পাঠাইয়া গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে বাংলার ভাবপ্রবণ মাটিতে এই অগ্নিবীজ রোপণ করিলেন।··· শ্রীঅরবিন্দের মহাসাধনার জন্য ১৯১০ সনে পণ্ডিচেরী যাত্রায় ইহার বাস্তবতঃ পরিসমাপ্তি।"

বারীন্দ্রকুমার ইতিপূর্ব্বে আরও দুই-এক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের চাপেকার সঙ্ঘের প্রভাবেই বাংলাদেশে বিপ্লবযুগের পত্তন হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ বোম্বাই অবস্থানকালে চাপেকার সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন এবং উহার গুজরাট শাখার সভাপতি হন। বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরবর্ত্তীকালে নিরালম্ব স্বামী) এখানে পাঠান। বারীন্দ্রকুমারের মতে এই-ই বাংলাদেশে বিপ্লবযুগের সূচনা।

কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবের বীজ রোপিত হইয়াছিল ইহারও বহু আগে। শিক্ষা-জীবনে এবং কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিবার পরেও বারীন্দ্রকুমারের অধিকাংশ সময় বাংলার বাহিরেই কাটিয়াছে; এবং তিনি স্বয়ং বাংলার বাহিরে বসিয়াই বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যে চারি বৎসরকাল বাংলাদেশে তিনি কারার বাহিরে ছিলেন, তখন বিপ্লবের আদিপর্ব্বের উৎস সন্ধানের সময় নয়। সেজন্য হয়ত সে ইতিহাস তাঁহার নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও বরোদা হইতে এখানে আসিয়া প্রথমে তিনি যাহাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন তাহাদের কাহাকেও কি বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষিত দেখেন নাই? তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "১৯০৩ সনের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন আমাদের নিত্যসঙ্গিনী।" বরোদা হইতে কলিকাতা আসিবার অব্যবহিত পরেই তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হইলেন কোন সূত্রে, তাঁহাকে বিপ্লবান্দোলনের মধ্যেই বা টানিয়া আনিলেন কেমন করিয়া? ১৯০৩ সনে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাংলাদেশে আসেন, বারীন্দ্রকুমার তখনও এখানে আসেন নাই। যতীন্দ্রনাথ তখন কি আসিয়া অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ আরম্ভ করেন নাই? ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই যতীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম্ম সাধনাই তাহার প্রমাণ। বর্দ্ধমান জেলার অখ্যাত চান্না গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত যতীন্দ্রনাথ সামরিক শিক্ষা-লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। সৈন্যদলে বাঙালীর প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু অস্ত্রশিক্ষা ব্যতীত দেশোদ্ধারের কোন উপায় নাই। অবাঙালী পরিচয়ে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন সম্ভব। কিন্তু এজন্য হিন্দী-ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই জন্য তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত কায়স্থ-পাঠশালায় (কলেজ) ভর্ত্তি হন। এলাহাবাদ অবস্থানকালে যতীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুর পরিবারস্থ হইয়াছিলেন। রামানন্দবাবুর পত্নীকে যতীন্দ্রনাথ মাতৃ সম্বোধন করিতেন এবং রামানন্দবাবুর পুত্রগণের তিনি ছিলেন 'যতীনদা'। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তিনি বিস্মৃত হন নাই। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার অতিবাহিত হইত এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ পল্লীতে, হিন্দী-ভাষার সহজ সরল বাচন ভঙ্গীর সঙ্গে সুপরিচিত হওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এলাহাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী আড়াই গ্রামে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় পরিবারদের বাস। যতীন্দ্রনাথ ইহার পর এই পরিবারের যতীন্দর উপাধ্যায়—এই নামে বরোদা গিয়া মহারাজার সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। যতীন্দ্রনাথ যখন যতীন্দর উপাধ্যায় নামে মহারাজার শরীররক্ষী ছিলেন সেই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে এবং সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় হয়। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় অধ্যাপক।

আড়াই গ্রামের যে উপাধ্যায় পরিবারভুক্ত বলিয়া যতীন্দ্রনাথ সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঐ পরিবারেরই এক ব্যক্তি মহারাজার সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে যান এবং এই সূত্রেই যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত বাঙালী পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহার পর তিনি সৈন্যদল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ও এই ঘটনার মধ্য দিয়াই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে এই সময়ে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল। অনুশীলন সমিতির প্রথম সভাপতি ব্যারিষ্টার পি মিত্রের জীবনেও আমরা ইহাই দেখি। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে তিনি সামরিক শিক্ষা-লাভের জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসীদেশে গিয়া ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশের জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশোদ্ধার করিতে হইবে, এবং এজন্য সামরিক

শিক্ষার প্রয়োজন। সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন স্বাধীনতা আসিবে না এই ধারণাই ছিল এই প্রচেষ্টার মূলে।

হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই শ্রাবণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেটে'। এই গানেই আমরা পাই—

দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না খোল তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
পূজা যাগ যোগ প্রতিমা অর্চনা
এ সবে এখন কিছুই হবে না
তূণীর কৃপাণে করগে পূজা।

"অবলা বান্ধব" সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের, "বীর নারী" প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। দেশের যুবকদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—

কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন।
রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন।

তিনিও বলিয়াছেন—

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্য শূদ্র আর
যে করেছ একদিন অসি ব্যবহার
সেই করে অসি ভাঙ্গ নতুবা যবন হস্তে
নাহিক নিস্তার।

এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াই বাঙালী যুবকদল মিলিত হইয়া ঠাকুরবাড়ীতে "সঞ্জীবনী সভা" গড়িয়া তুলিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতি আরম্ভ হয় প্রধানতঃ ঋষি রাজনারায়ণের নেতৃত্বে। তরুণ দল তখন দেশের স্বাধীনতা কামনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানে ইংরেজের প্রবল প্রতাপ তাহাদের অভীষ্ট লাভের অন্তরায়। তাই 'সঞ্জীবনী সভা' গোপন সমিতি রূপেই জন্মলাভ করে। গোপন ভাষায় সমিতির সভ্যদের নাম ছিল "হাঞ্চু পামু হাফ্", তরুণদলের মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাস এখান হইতেই আরম্ভ। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। কলিকাতায় এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভায় সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল।" এই পোড়ো বাড়ীটি ছিল ঠনঠনিয়া অঞ্চলে। বাড়ীর মালিক কে কেহ জানিত না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই সভা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তার মধ্যে প্রধানই ছিল মন্ত্রগুপ্তি অর্থাৎ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তা অ-সভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত। তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্। ইহার দীক্ষানুষ্ঠানে এক ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ অজ্ঞাত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।" সভার কার্য-বিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হইত।

ইটালীতে ম্যাটসিনি ও গারিবল্ডি দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্ত কারবোনারি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এই সময়ে এদেশে আসিয়া পড়ায় যুবক সমাজ দেশকে নব্য ইটালীর ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ হইল। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"আমরা অষ্ট্রীয়ার অধীন ইটালিয়ানদের অবস্থা ও ব্রিটিশ আমলে আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম। আমাদেরও মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়েরা কোনরূপ ন্যায় বিচারই পায় না। একই সিবিল সার্বিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসামে চা-বাগানের কুলীদের দুর্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা ম্যাজিষ্ট্রেট জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপার ম্যাটসিনি-পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেললে। আমরা ম্যাটসিনির লেখা ও যুব ইটালীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়া আরম্ভ করলাম। ক্রমে আমরা ইটালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষ কারবোনারি প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাটসিনি প্রথমে কারবোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ইটালীতে যে সমস্ত গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক কথায় কারবোনারি। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি সম্পর্কিত বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনরূপ প্রোগ্রাম যুবকদের ছিল না কিন্তু আদর্শে তাঁরা নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমি একটি সমিতির নাম জানি, যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্ত দিয়া অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"

এই সময়েই ১৮৭১ সালের ২২শে নবেম্বর সুরেন্দ্রনাথ এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে শ্রীহট্ট যান। কিন্তু অল্প সময় মধ্যেই শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাণ্ডের বিরাগভাজন হওয়াতে তিনি কর্মচ্যুত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিলাতে গিয়া ভারত-সচিবের নিকট দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল হইল না। এমন কি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাস করিয়াও ব্যারিষ্টার হইবার অনুমতি পাইলেন না। ফলে ১৮৭৫ সালের জুন মাসে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতা

আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ছাত্র সমাজকে তিনি ইটালীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। প্রকাশ্য সভায় তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলিতেন—"I am an avowal disciple of Mazzini and Garibaldi"

এই ভাবে ছাত্র ও যুবক সমাজ মিলিয়া গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তুলিতে লাগিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। আদর্শ শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তাধারার জন্য ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার অপরিসীম প্রভাব ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর সুকুল, তারাকিশোর রায়চৌধুরী (পরে ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতি মিলিয়া একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিও সঞ্জীবনী সভারই সমসাময়িক এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও প্রায় একপ্রকার। এই সমিতির সভ্যদের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দীক্ষা গ্রহণ সময়ে বক্ষরক্তে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর করিতে হইত তাহার মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—'আমরা অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।'

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রকাশ্য আন্দোলনের চাপে গুপ্ত আন্দোলন কতকটা মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-প্রভাবে ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী হইতে যাঁহারা অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে আইন ব্যবসায়ে সফলকাম হইতে না পারিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুরেন্দ্রনাথই তাঁহাকে বরিশাল হইতে কলিকাতায় ডাকিয়া আনেন। সে যুগের কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র ঠাকুর-বাড়ীতে পি. মিত্রের যাতায়াত ছিল এবং সেই সুত্রে সঞ্জীবনী সভার সঙ্গেও সংযোগ ছিল। জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা এই সময়ে ভারতে আসেন। ঠাকুর-বাড়ীতে তাঁহার অভ্যর্থনা সভায় প্রমথনাথ উপস্থিত ছিলেন। তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রবীণ বিপ্লবধর্মী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও সেখানে ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় যুবক সমাজকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ওকাকুরা তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনা করেন। ইহারই ফলে ১৯০০ হইতে ১৯০২ সনের মধ্যে বাংলায় প্রথম বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতি জন্মলাভ করে। প্রমথনাথ ইহার সভাপতি হন। সহ-সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) এবং কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগিনী নিবেদিতাও ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

১৮৯৩ সন হইতে ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ছিলেন। ১৮৯৭ সনে পুণাতে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড কর্তৃক রোগ-প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা হয় তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠে। সর্বজনীন গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের ভিতর দিয়া ইংরেজ-বিদ্বেষ পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইতেছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন—দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণহরি চাপেকার। তাঁহারা হিন্দু ধর্মের প্রতিবন্ধকনাশক সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া যুবক সমাজকে গোপনে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতেছিলেন। ইঁহাদের এই সমিতিই পরে চাপেকার সঙ্ঘ নামে পরিচিত হয়। ১৮৯৭ সনে ২২শে জুন ভিক্টোরিয়ার হীরকজুবিলী উৎসব-দিনে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় মিঃ র‍্যাণ্ড ও তাঁহার সহকারী আর্ণেষ্টকে হত্যা করেন। পরে ধরা পড়িয়া দুই ভ্রাতারই ফাঁসী হয়। যাহারা অর্থের লোভে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরাইয়া দেয় সঙ্ঘের সদস্যগণ তাহাদেরও হত্যা করে। শেষোক্ত হত্যাপরাধে আরও ৪ জনের ফাঁসী হয়। ভারতে বিপ্লবান্দোলনে প্রথম শহীদ এই ৬ জন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে চাপেকার সঙ্ঘের প্রভাবে আসেন এবং বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত হন।

১৯০২ সনের শেষদিকে ভগিনী নিবেদিতা বরোদা যান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে বাংলার গুপ্ত সমিতি, বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, অনুশীলন সমিতি গঠন সংক্রান্ত বৃত্তান্ত অবগত হন এবং প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে বারীন্দ্রকুমারকে কলিকাতায় পাঠান ইঁহাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য। এই সময়ে অনুশীলন সমিতির সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। যতীন্দ্রনাথ আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ সরলা দেবীর নামে পত্র দিয়াছিলেন। বোধ হয় সরলা দেবীর মাধ্যমেই পরিচয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার স্বয়ং লিখিয়াছেন :

"শ্রীঅরবিন্দ তখন গায়কোয়াড় তরুণ সায়াজীরাওয়ের রাজ-অমাত্য। তিনি পুণায় গুপ্ত বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত এবং গণতন্ত্র-ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি। কঠোর হস্তে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট চাপেকার সমিতিকে দমন করলেও সে আগুন একেবারে নিভে যায় নাই। অন্তঃসলিলা হয়েছিল মাত্র। যখন বরোদার মহারাজার শরীররক্ষকের কাজে ইস্তাফা দিয়ে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন উদ্দেশ্যে সরলা দেবীর নামে শ্রীঅরবিন্দের পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন, তখন দাক্ষিণাত্যে সে অগ্নি তুষাগ্নির মত জ্বলছে। যতীনদা ব্যারিষ্টার পি. মিত্রকে কেন্দ্র করে সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছে ১০৮ নং সারকুলার রোডের বাড়ীতে গুপ্ত সমিতির প্রথম কেন্দ্রের পত্তন করলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে আমি এই কেন্দ্রে আসি ১৯০৩ সনের গোড়ার দিকে আরও ৬ মাস পরে।" শ্রীঅরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট পত্র দিয়া পাঠান, তাহার কারণ সরলা দেবী নিজেও পূর্ব্বে এই দলভুক্ত ছিলেন।

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মিলনের বিষয়ে দলের সেক্রেটারী সতীশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—"দলের নেতা প্রমথনাথ এক দিন আসিয়া আমাদের বলেন, বরোদা হইতে এক দল আসিয়াছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক নয়। সুতরাং এক সঙ্গেই আমাদের কাজ করিতে হইবে।" ইহার

পর যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে থাকেন এবং ৬ মাস পরে বারীন্দ্রকুমারও বরোদা হইতে আসিয়া মিলিতভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করেন।

গোপন আন্দোলনের অনেক ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটিয়াছে। তাই ইহার গৌরবময় ইতিহাসও যেমন জনসাধারণের অজানা, ইহার কলঙ্কের বিষয়ও তাহারা কিছু জানে না। বারীন্দ্রকুমার এখানে আসার পরেই বাংলার বিপ্লবযুগের সেই আদিপর্ব্বেই এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলাদেশে প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলনে কর্ম্মী ও নেতাদের মধ্যে বিরোধ বহুবারই আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে। ক্ষমতা-প্রাধান্যের প্রতিযোগিতাই ইহার কারণ। বারীন্দ্রকুমারের এখানে আসার অল্পদিন পরেই তিনি অভিযোগ আনেন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। বারীন্দ্রের অভিযোগ এই ছিল যে, যতীন্দ্রনাথ দলের জন্য অশ্বক্রয়ে অধিক ব্যয় করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনাও ব্যয়বহুল। অভিযোগ ক্রমে বিরোধে পরিণত হইল এবং একযোগে কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সুতরাং অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এই কার্য্যের ভার পড়ে বিপ্লবের প্রবীণ পুরোহিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের উপর। অনুসন্ধান করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন। অভিযোগের পরেই যতীন্দ্রনাথ প্রায় দল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের ফলে অভিযোগমুক্ত হইয়া পুনরায় তিনি দলে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু দৈনন্দিন পরিচালনা ব্যাপারে আবার বিরোধ দেখা দিতে লাগিল। ফলে তিনি এবারে চিরদিনের মত দল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সনে মাণিকতলা বোমার মামলায় যখন তিনি ধৃত হন তাহার পূর্ব্বেই তিনি নিরালম্ব স্বামী হইয়াছেন। সন্ন্যাস-জীবনে তাঁহার প্রথম নাম ছিল নারায়ণানন্দ। পরে তিনি নিরালম্ব স্বামী নাম গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর বরাহনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রমথনাথ অনুশীলন সমিতির প্রেসিডেন্ট হইলেও এই সময়ে যতীন্দ্রনাথই দল পরিচালনা করিতেন। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন: "নিরালম্ব স্বামী যখন যতীন্দ্রনাথ, তখন তিনি আমাদের প্রথম কর্ম্মী নেতা, সে একেবারে গোড়ার কথা।"

ঠাকুর-বাড়ীতে যখন সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ঠিক সেই সময়েই শিবনাথ শাস্ত্রী যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। সঞ্জীবনী সভাই ক্রমে বিপ্লবের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া অনুশীলন সমিতিতে পরিণত হইল। শিবনাথের দলও তখন নীরব ছিল না। ইহাদের সমিতির নাম হইল আত্মোন্নতি সমিতি। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি ছাত্র এই দল স্থাপন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী পশ্চাতে থাকিয়া প্রেরণা যোগাইতেন। অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতি সমসাময়িক। আত্মোন্নতি সমিতিই সম্ভবতঃ দুই-এক বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, চন্দননগরের প্রভাস দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দলের সংস্পর্শে আসিয়া বিপ্লবী হন। দলের প্রবীণ সদস্য আজীবন বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী আজও দেশ-সেবায় রত আছেন। ১৯২৪ সনের শাঁখারীটোলা পোষ্টমাষ্টার হত্যা মামলার আসামী বরেন ঘোষ এবং পুলিস কমিশনার টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপ প্রচেষ্টায় ভ্রমক্রমে নিহত ডে সাহেবের হত্যার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গোপীনাথ সাহা এই দলের সদস্য ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের দলত্যাগের পরে অনুশীলন সমিতিতে ভাঙনের দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু হইল; কিন্তু সে আরও পরে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঝড় ইহার মধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিককার আন্দোলন কতকটা শিথিল হইলে পি. মিত্রের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির সভাদের লাঠি ও ছোরা খেলা পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু স্বদেশীর প্রধূমিত অগ্নি তখন জাতির অন্তরে। তাই লাঠি ও ছোরা খেলা লইয়া মাতিয়া থাকিতে যুবকদল এবার অস্বীকার করিল। বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে এক দল যুবক সভাপতি পি. মিত্রকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন, দেশকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করিতে লাঠি ও ছোরা খেলাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের নবমন্ত্র দেশময় প্রচার করিতে হইবে, ইহার বাহন চাই, প্রচারপত্র প্রয়োজন। তাঁহারা যুগান্তর নামে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন পি. মিত্রের নিকট। কিন্তু পি. মিত্র ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, জাতীয় জীবনে বিপ্লব বহিবে গোপন ধারায়, ইহার প্রস্তুতি চলিবে গোপনে। তারপর ভূমিকম্পের মত এক দিন সে চৌচির হইয়া ফাটিয়া বাহির হইবে, সমস্ত অশুভ অন্যায়, অনাচার সে আগুনে পুড়িয়া জাতীয়-জীবন নিষ্কলুষ হইবে। তিনি বারীন্দ্রের দলকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু যখন বুঝিলেন, ইহারা কোন কথাই শুনিবে না, বন্ধু-বান্ধব ও কর্ম্মীমহলে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "বারীন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করবে।" কিন্তু বারীন্দ্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জবাবে বলিলেন, "পি. মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরাইয়াই দেশ উদ্ধারের পালা সারবেন।" ক্রমে বিবাদ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। বারীন্দ্র, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে এক দল যুবক মূল অনুশীলন সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ১৯০৬ সনের মার্চ্চ মাসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এখান হইতেই এই নূতন দলের পত্তন।

মাণিকতলা বোমার মামলায় আপন স্বীকারোক্তিতে বারীন্দ্রকুমার নিজেই বলিয়াছেন, ১৯০৩ সনের গোড়ার দিকে তিনি প্রথমে বাংলাদেশে আসেন এবং দুই বৎসরকাল বাংলাদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রচারকার্য্য চালান ও ব্যায়ামশালা স্থাপন করেন। কিন্তু দেশের মধ্যে যথোপযুক্ত সাড়া না পাইয়া ক্লান্ত পরাজিত মনে বরোদায় ফিরিয়া যান এবং এক বৎসর সেখানে

কাপুপের শিখরে
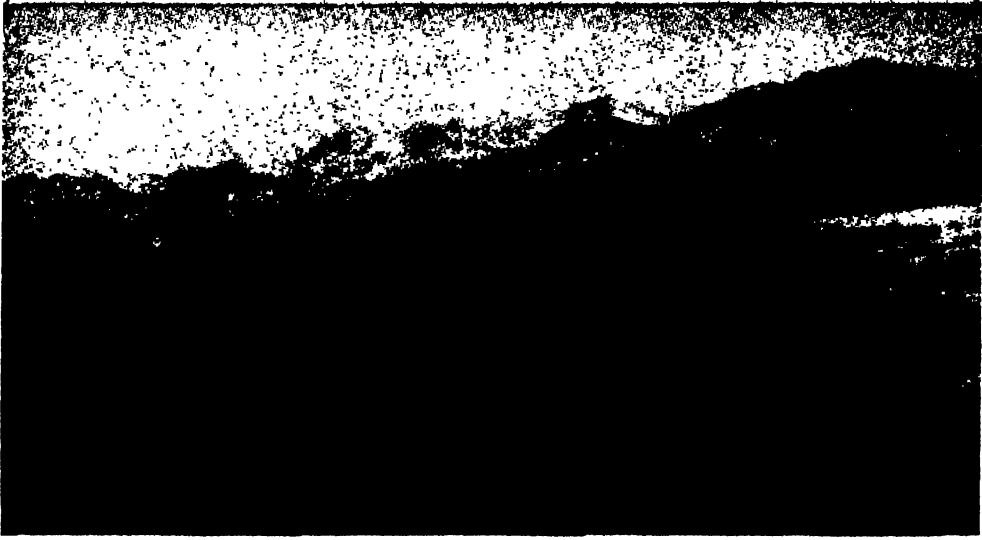
চিরতুষারের পারে তিব্বত

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ী পচাই মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী; বিলাতী স্পিরিটের মত ক্ষতিকর নয়। এই গুরুতর পরিশ্রমের পরে আমাদের বড় সিরিং ও ছোট সিরিং জিনিষটা বড়ই উপভোগ করবে।

চৌকিদারের একটি ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ে বন্ধ দরজার কাঁচের উপর মুখ থুবড়ে ভিতরের পর্দ্দার ফাঁকের মধ্য দিয়ে নির্নিমেষে আমাদের দেখছিল। নির্জ্জন পাহাড়ের উপর এরা বনবাসে থাকে; আমাদের মত সমতলের মানুষ সচরাচর দেখে না, তাই কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বৃষ্টির ঝাপটা অগ্রাহ্য করে কৌতূহল চরিতার্থ করছে। আদর করে এদের আমরা ঘরের মধ্যে আগুনের কাছে ডেকে প্রত্যেকের হাতে কয়েকটি করে লজেন্স দিলাম। আমাদের সঙ্গে আট-দশ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট লজেন্স ছিল। এগুলি দ্বারা আমাদের শুভেচ্ছা প্রচারের ('goodwill mission') কাজ চলত। পাহাড়ী ছেলে-মেয়েরা এগুলিকে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করত। তাদের মুখের হাসি তাদের বাপ-মায়ের মুখেও হাসি ফুটিয়ে তুলত। আমরা পকেট বোঝাই করে এগুলি রাখতাম, এবং পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের পেলেই দিতাম। ছেলে-মেয়ে দুটির টুকটুকে লাল মুখ, গাল, ঠোঁট, নাক সব চৌচির হয়ে ফাটা। এত ফাটা যে দেখলে ভয় হয়। মনে হয় যেন ভেতরের রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের দরুন এই রকম হয়েছে। তিব্বতে তাই মেয়েরা দুধ ধরনের প্রলেপ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে।

বেলা আন্দাজ চারটার সময় দুই দৈত্য—বড় সিরিং ও ছোট সিরিং আপাদমস্তক ভেজা অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করল। ঘোষ তাদের আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে গা ও একমাত্র পরিধেয় শুকোতে বললেন এবং সেই সঙ্গে পচাই-এর বোতলটা তাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ বোতলটি মুখে তুলে প্রত্যেকে আধ আধ বোতল গলাধঃকরণ করে নীরবে চোখমুখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। চৌকিদার এসে পাশের ঘরের চিমনীটাও জেলে দিল। বৃষ্টি ওয়াটারপ্রুফ মানে নি, তাই দুই চিমনীর সামনে আবার আমাদের লেপ, কম্বল সব-কিছু শুকিয়ে নেবার দীর্ঘ আয়োজন সুরু হ'ল।

পরদিন প্রাতে ছ'টার সময় আবার আমরা রওনা দিলাম। বাংলো ছেড়ে একটু গেলেই ডান হাতে কাপুপ থেকে চম্বু যাবার সেই বরফে ঢাকা পথ। পথটিকে ডাইনে রেখে আমরা সুমুখে এগিয়ে চললাম।

এই চারশ' ফুট ওঠার পথটি অতি মনোরম। ঘোষ এর বহু ছবি তুলেছেন। বাঁয়ে ছিল একটি বিশাল হ্রদ; হ্রদের জল শীতে আধজমাট হয়ে ছিল, এতে বুনো হাঁস চরতে দেখা গেল। এখানে নাকি ওদের বাসা। আশেপাশের পাহাড়গুলি সব বরফে ঢাকা। আমাদের পায়ের নীচেও বরফ। ডাইনে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল উচ্চ চূড়া সূর্য্যকিরণে ঝলমল করছিল। সমস্যা হ'ল, ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখব, না পথ চলব। আমি ত অনেক সময় দাঁড়িয়ে এই অপরূপ লাবণ্য উপভোগ করছিলাম। একটু [illegible]

[illegible] জ্ঞাটং দেখা যেতে লাগল। এইবার [illegible] পালা। জ্ঞাটঙের উচ্চতা আন্দাজ ১২,২০০ শত ফুট। এখানে ডাক-বাংলোর কাছে তিব্বতী যুদ্ধে যে সব ইংরেজ মারা গিয়েছিল তাদের কবর আছে। জ্ঞাটং কাপুপ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূর। জ্ঞাটং থেকে সিডেঞ্চেন আট মাইল দূর। আমরা ঠিক করলাম, জ্ঞাটঙে অপেক্ষা না করে একদম সিডেঞ্চেন যাব। তাই পথ চলতে লাগলাম। কয়েক দিক ঘিরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে গিরিসানুর সু-উচ্চ সোপানশ্রেণী উঠে গিয়েছে, তারই মধ্যস্থলে নীচে জ্ঞাটঙের লাল ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে, আর আমরা হু হু করে দৌড়ে নামছি। এমন সময় দেখি, দুই দল যাত্রী বহু খচ্চরসহ কাপুপে উঠে আসছে। আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি, আর সেই লাল ঝালর ঝোলান বোঝা পিঠে খচ্চরদল, কোমরে খোলা জামা জড়ান, খালি বুক, বেণী-দোলানো পরিশ্রমী তিব্বতী খচ্চর-পালক বুট পায়ে মস্ মস্ করে খচ্চরের পিছু পিছু উঠছিল। এই দারুণ শীতেও তাদের কপাল ও অনাবৃত বুক পিঠ ঘর্মসিক্ত বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা পাহাড় ঘেঁসে দাঁড়ালাম; যাত্রীদল নীরবে আমাদের অতিক্রম করে চলে গেল। আমরা পরস্পর নীরবে চোখচাওয়া-চাওয়ি করলাম।

খানিক নীচে নেমে গিয়ে আবার খুব একটু খাড়াই উঠে আমরা জ্ঞাটং ডাক-বাংলো পেলাম। কবরখানা ও ডাক-বাংলো বাঁ পাশে রেখে আমরা চড়াই সুরু করলাম। বাংলোর চৌকিদার ও তার স্ত্রী কোদাল নিয়ে পাহাড়ের গায়ে জড় করা খচ্চরের গলিত মলের সার বিছিয়ে আলুর ক্ষেত তৈরি করছিল। সকালবেলা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কাজ করছে; মনে হ'ল, এদের জীবন কি সুখের! আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, সিডেঞ্চেনে যেতে আবার চড়াই করতে হবে নাকি? স্ত্রীটি টুকটুকে মুখ তুলে নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল, পাহাড়ের বাঁকটা চড়াই করেই সমান পথ, তারপর কিছুদূর গিয়ে খাড়া উৎরাই। দু'তিন ফার্লং চড়াই করেই আমরা এই সমান পথ পেলাম। পথ যে ঠিক সমান তা নয়, তবে খুব ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে। ঘোষ এইবার রীতিমত দৌড়াতে আরম্ভ করলেন। আমি দৌড়াতে চাইলাম না; বললাম, অত দৌড়ালে পথ দেখব কি? ঘোষ একাই চললেন। নীচে নামার সময় সমানে দৌড়ে নামা তাঁর অভ্যাস। কুলীরা কয়েক মাইল পিছনে ছিল; অতএব আমিও একাই চললাম। পাহাড়ে একা চলা খুব সমীচীন নয়। কেননা যেখানে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই, পথের দু'ধারে কেবল বন, সেখানে বিপদ হতে কতক্ষণ? তা ছাড়া অনেক জায়গায় ভালুক এবং বন্য কুকুরের ভয়ও আছে। কিন্তু জেলাপ পার হয়ে ভারতীয় ভূমিতে নীচে নামা—সে ত এক লাফে নেমে যাব, এই রকম আমাদের মনে হচ্ছিল।

আবার সেই সমস্যা—পথ চলব, না চারিদিকের অপরূপ শোভা দেখব। মাঝে মাঝে থমকে না দাঁড়িয়ে পথ চলা যেন অসম্ভব। এই সময়ে পাহাড়ের যৌবন বিকশিত হয়। সারা বছর যেখানে কোন গাছপালা জন্মে না; কেবল বেঁটে বেঁটে রোডোডেনড্রন, যেখানে মাটির চিহ্নমাত্র নেই, গাছগুলি হাঁটুসমান বরফে ঢাকা;

রংপু নদী

যেখানে শুধু সাদা বরফের আস্তরণ ফুঁড়ে বেঁটে গাছের বাদামী ডালপালাগুলি বেরিয়ে আছে, সেইখানে এখন এইসব মরা গাছেও প্রাণের জোয়ার এসেছে। কত রকম রঙবেরঙের ফুল, কোনটি বা পূর্ণ প্রস্ফুটিত, কোনটি বা অর্দ্ধবিকশিত, আর কোনটি বা সবে কুঁড়ি—সবুজ পাতার মধ্য দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। বরফের মধ্যে গাছই বা বাঁচে কি করে, আর তাতে স্তবকে স্তবকে এত ফুলই বা ফোটে কি করে! আশ্চর্য্য! তারপর এই হিমরাজ্য ছেড়ে যত নীচে নেমে যাওয়া যায়, গাছগুলির আকারও ততই বড় হতে থাকে। এই তরুশ্রেণীর নশ্বর দেহ কত রকমারি ফুলে ভরে আছে দেখা যায়। কত রকমের রোডোডেন্ড্রন; কোনটি সাদা, কোনটি লাল, কোনটি গোলাপী, কোনটি হলদে। নানা প্রকারের লতাপাতা আর ফুল: সর্ব্বত্র ফুল; পাহাড়ের ঘাসে, পাহাড়ের শেওলায় বিচিত্র বর্ণের ফুলের খেলা। আবার এরই মধ্যে শোনা যায় নানা রঙের অজানা পাখীর কুজন। উদাস ডাক শুনে চেয়ে দেখি, সমতল ভূমির চির-পরিচিত ঘুঘুও এখানে রয়েছে।

...না। কিন্তু রূপের মাধুর্য্য সে-ই উপভোগ করতে পারে, যার মন অনাসক্ত : রূপমুগ্ধ পুরুষ পারে না ; পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে। যে জগতে কিছুই চায় না, সে সব পায়। যে সংযম ও নিয়মের বন্ধনকে সবচেয়ে বেশী মেনে নিয়েছে সে-ই সবচেয়ে বেশী স্বাধীন। গান্ধীজী ছিলেন এমনি স্বাধীন অনাসক্ত পুরুষ। স্বাধীন পুরুষ পদ্মপত্রে জলের মত। বিষয়ের মধ্যে থাকলেও বিষয় তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। দু'চোখ দিয়ে জগতের অতুলনীয় রূপরাশি দেখেও তাঁদের তৃপ্তি হয় না, তাঁরা কোটি ... কামনা করেন।

ন্যাটংয়ের পথে
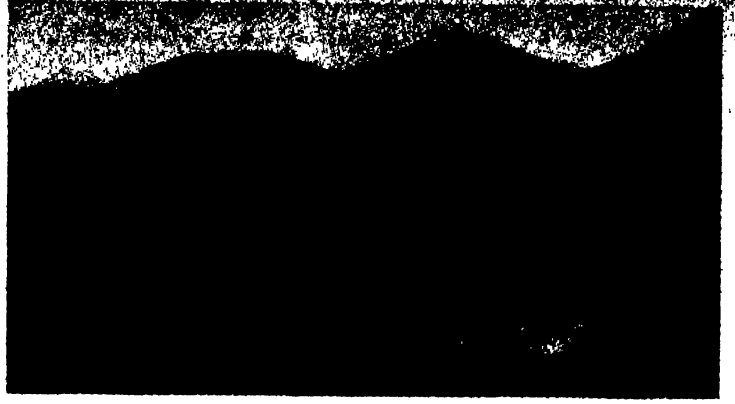
ঐ যে স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়িগুলি, ওগুলি যেমন সুন্দর, উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীও তেমনি সুন্দর। কিন্তু জীবন-শক্তির (life force-এর) মায়ার খেলা পুরুষ জয় করতে পারে না বলে সে বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই নারীর রূপ তার কাছে হয় পতঙ্গের নিকট অগ্নিশিখার মত—নরাগ্নিঃ প্রমদা নাম। মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা জগৎ থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করেন নি। যে দুর্নিবার প্রাণপ্রবাহ চিরদিন ফুলে, ফলে, বীজে, শৈবালে, শাদ্বলে, প্রতি মুহূর্তে আপনাকে অভিব্যক্ত করে বিশ্বনিখিলে ছুটে চলেছে, সেই জীবনস্রোতই সন্তান-সন্ততি রূপে মানুষের মধ্যে আপনাকে সার্থক করে তুলছে। এর মধ্যে রয়েছে সৃজনীশক্তির অপূর্ব্ব লীলা ; ... কিছুই নেই। জীবন-শক্তির সহায়ে নারী পুরুষকে আপন আত্মবিলাসের পাশে আবদ্ধ করে সৃষ্টির কাজ করিয়ে নেয়। তথাপি মানুষের মধ্যে এই জীবন-শক্তিকে জয় করার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা আছে। একে জয় করা খুবই কঠিন, এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করার চেয়েও কঠিন। কিন্তু এই জীবন-শক্তিকে জয় করা ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। গীতারও এই মহাসত্যই ঘোষিত হয়েছে—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

সেই অব্যয় পদকে পাবার অন্য কোন পথ নেই।

পাহাড়ের শিখরদেশ মেঘলোকে উঠেছে ; তারই নির্জ্জন বনভূমির ভিতর দিয়ে পথ। ক্ষিপ্রগতি ঘোষ আমার বহু পশ্চাতে ফেলে অদৃশ্য হয়েছেন। ভারবাহী কুলিরা অনেক পিছনে পড়ে আছে। আমি একাকী পথচারী। একস্থানে পথটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে গিয়েছে। জনমানবের সাড়া নেই। কোন্ পথে যাব কাকে জিজ্ঞাসা করি ? পথের সঙ্গমস্থলে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। পাহাড়ের গায়ে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল রডোডেনড্রোন বন। নানা রঙের ফুলে গিরিসানু আলো হয়ে রয়েছে। স্তবকে স্তবকে লাল, বেগুনী, হলদে শাদা ফুল সাজান। পাটকিলে ডালের উপর সবুজ পাতার গুচ্ছ, আর তার উপর সহস্র সহস্র ফুল, কোনটা স্ফুটনোন্মুখ, কোনটা প্রস্ফুটিত, কোনটা ফুটে ফেটে গাছের তলায় ঝরে পড়েছে। রৌদ্র, ছায়া, কুয়াশায় স্বপ্নের জাল বোনা হয়েছে। যত দেখি ততই চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেবেচিন্তে ডাইনের পথেই যাওয়া ঠিক করলাম। সময় বহু কাটিয়েছি, এবার একটা দৌড় দিই, ভেবে গায়ের গরম কোট, গরম প্যান্ট খুলে ফেললাম, কেবল গরম ট্রাউজার ও সোয়েটার গায়ে থাকল। অনেকক্ষণ হন্‌হন্ করে পথ চলার পর দেখি, পথ ত নীচে নামেই না বরং ক্রমশঃ উপরে উঠছে। এতক্ষণ তুষার ছিল না ; এখন দেখি, পথের পাশে তুষারের স্তূপ। প্রথমে পাহাড়ের গা ঘেঁসে বামদিকে তুষার দেখা গেল। অতঃপর দেখি উভয় দিকেই তুষার, মাঝখান দিয়ে সামান্য সরু পথ তাও আবার স্থানে স্থানে তুষারে ঢাকা। ইতিমধ্যে চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। পায়ের নীচে পাহাড়ের গায়ে যে মেঘের দল খেলা করছিল তারাও আর যেন নয়নগোচর হ'ল না। পথ একটু একটু করে ঊর্দ্ধগামী হ'ল ; তুষারও বেড়ে চলল। দু'পাশের তুষারের স্ফীতি দেখলে ভয় হয়। তবে কি গরম প্যান্ট ও কোট আবার পরব ? এত জোরে চলছি তবুও যে গায়ে শীত ধরে গেল ! দাঁড়াতে ভরসা হয় না, আর দাঁড়াবই বা কোথায় ? আর ওগুলো পরবই বা কি করে ? পথ ভুল করলাম না ত ? আবার কি উল্টো দিকে ফিরব ? অনেক পথ চলে এসেছি আর তুষার ভেঙে উল্টো দিকে চলতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এ আমি যাচ্ছি কোথায় ? মনে হ'ল যেন চারিদিকের স্তব্ধ নির্জ্জনতা আমাকে আচ্ছন্ন করে, আড়ষ্ট করে তুষারের মধ্যে ডুবিয়ে মারতে চায়। মনে পড়ল, রিসিস্থুম ডাকবাংলো থেকে এই কাপুপ পাহাড় যখন দেখি, তখন গা আমাদের ছম ছম করে উঠেছিল। রিসিস্থুমের সামনে পাহাড়-জোড়া গভীর খাদ। সেই খাদের মধ্য থেকে কাপুপ পাহাড় ...

চূড়ার সবটুকু দেখা না গেলেও হিমশৈল দেখা যায়। মেঘ তার কটি ও বুক আচ্ছন্ন করে আছে। মাঝে মাঝে ঘোমটা খুললে চূড়ার একটু-আধটু চোখে পড়ে। ঘোষ বলেছিলেন, ওর চূড়া সবটুকু দেখতে পারছেন না। মেঘের মধ্যে কাপুপ, সেখান থেকে খাড়াই নেমে ঐ গভীর খাদে নামতে হবে, তারপর আবার খাড়া চড়াই করে ছয়-সাত হাজার ফুট উঠে আলগড়াই আসতে হবে। আমি মুখে কিছু বলি নি বটে, কিন্তু গা আমার ছমছম করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, পাহাড়টা যেন আমার দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। এই কাপুপ পাহাড় দেখিয়ে ডি-এফ-ও শ্রী মণ্ডল বলেছিলেন, ওসব পাহাড় সব সময় নিরাপদ নয়। তিব্বতী ডাকাতরা অনেক সময় পথিকের যথা-

ইয়াটুং

সর্বস্ব, এমন কি রসদ ও পরনের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত কেড়ে নেয়। ওরা বড় হিংস্র। সে কথাও এখন মনে পড়ল। সেবার যখন কালুট থেকে সন্দিকপু আসি, তখন সঙ্গে যে ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন, তিনি সাবরকম পাহাড়ের এক স্থান দেখিয়ে বলেছিলেন, এখানে চারজন সুদক্ষ পাহাড়ী তুষারের মধ্যে পথ হারিয়ে মারা গিয়েছিল। সাবরকম পাহাড় ১২০০০ ফুট; তুষারপাতের পূর্ব্বে সবাই নীচে নেমে গিয়েছিল, কেবল ঐ হতভাগা পাহাড়ীরা নামতে একটু দেরি করে প্রাণ হারায়। অনুমানে বুঝলাম, আমি প্রায় ১২৫০০ ফুট উপরে আছি। তুষার ত পড়ছে। তবে কি এইখানে সাবরকমের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে? এখানে যাই ঘটুক, পৃথিবীর কেহ তা জানবে না। ঘোষকে এ রকম আগে যেতে দেওয়া ঠিক হয় নি; দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। তিব্বত ঘুরে এসে শেষকালে কি সিকিমে প্রাণ হারাব? মনে মনে ঠিক করলাম, আর পনর মিনিট চলব, পথ যদি তবুও নীচের দিকে না নামে তবে যে পথে এসেছি আবার সে পথেই ফিরব। হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। আমি আরও দ্রুত পথ চলা আরম্ভ করলাম। একটা করে পাহাড়ের মোড় ঘুরি আর ভাবি, এইবার নিশ্চয়ই পথ নীচে নামবে। কিন্তু পথ আর নীচে নামে না। অবশেষে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পুনরায় পশ্চাতে ফিরব ভাবছি, এমন সময় দেখি দু'জন তিব্বতী আমার সামনের পথ বেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা ডাকাত হউক আর যেই হউক, ওদের দেখে যে কি আনন্দ হ'ল বলবার নয়। কাছে আসতেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সিডেক্সেন কিধার হৈ? কীতনে মীল? ওরা এক হাতের পাঁচটা আঙুল আর অপর হাতের একটা আঙুল দেখিয়ে আমার সামনের দিকে যেতে ইঙ্গিত করল। বুঝলাম, সামনে আর ছ' মাইল গেলে সিডেক্সেন [illegible] একটু যেতেই দেখলাম, সেই বিস্মবিজড়িত পথটি এই

পথেই এসে আবার মিশেছে, এবং অদূরে দুই পথের সঙ্গমস্থলে [illegible] সরাইখানা। একটা বড় কাল ঝাঁকড়া লোম কুকুর আমার [illegible] পেয়ে গর্জ্জন করে উঠল। তার গুরু গম্ভীর ডাক পাহাড়ের [illegible] ভঙ্গ করে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ভাগ্যে কুকুর[illegible] বাঁধা ছিল। তবুও তার আস্ফালন ও গর্জ্জন শুনে, তার [illegible] ফেনিল কাল মুখের শুভ্র দংষ্ট্রা-পংক্তি অবলোকন করে [illegible] মনে হচ্ছিল প্রভু যদি কোনক্রমে একটিবার ছাড়া পান তবে [illegible] আমায় আস্ত রাখবেন না।

সরাইয়ের নীচে মোড় ঘুরেই একদম খাড়া উৎরাই। এ উৎরাই যে কত খাড়া তা না দেখলে বোঝানো কঠিন। [illegible] মাইলে ছ' হাজার ফুট নামতে হয়। পাথর বিছান রাস্তা; ধাপে ধাপে নামতে হয়। কিন্তু পাথরগুলি এবড়ো-খেবড়ো, সমান [illegible] পা ফেলা যায় না। কুতুব মিনারের সিঁড়ি দিয়ে ছয় মাইল [illegible] বরং সহজ, কেননা সেখানে ধাপে ধাপে পা ফেলা যায়, কিন্তু এখানকার পথে নামা তদপেক্ষা অনেক কষ্টসাধ্য। মেঘ ও কুয়াশায় রাস্তা ত্যাগ করে কোথায় কোন পাতালে নামছি বলে মনে হয়। প্রথমটা দৌড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করলাম। ভাবলাম, নীচের দিকে যাব, ছ' মাইল যেতে আর কতক্ষণ! হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এক মাইল দৌড়ে নামতে পুরো আধ ঘণ্টা লেগেছে। অনেকের ধারণা, সমতলে চলার থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামা অনেক তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যায়। এ ধারণা যে কত বড় ভুল তা আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি। সমতল ভূমিতে যেখানে ঘণ্টায় চার মাইল যাওয়া যায়, পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে দৌড়ে নামলেও সেখানে ঘণ্টায় দু' মাইলের বেশী কখনই যাওয়া যায় না। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে। আমি ঘড়ি নিয়ে মাইলষ্টোন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে

[illegible] বেয়ে এ পথ [illegible] করেছে। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের [illegible] এক খুন্তি মাটি কস্মিন্ কালেও পড়ে নি। প্রাচীন কাল থেকে [illegible] যাত্রী এই পথ বেয়ে উঠেছে, নেমেছে। কালিম্পং হতে [illegible], লাসা হতে কালিম্পং গিয়েছে, কিন্তু কেউ কোন দিন রাস্তা

তিব্বতের পথে আগত পশম-বোঝাই খচ্চর

[illegible] কিছু করে নি। পথচারীকে কসরৎ করতে করতে [illegible] হয়। মাইলখানেক যেতে না যেতে জানুর পেশীগুলি [illegible] করে কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল, পেশীগুলি ছিঁড়ে যাবে। [illegible] জুতোর ভেতর আঙুলের অগ্রভাগগুলি ত্রাহি ত্রাহি ডাক [illegible] আরম্ভ করেছে। রাস্তার এক পাশে উঁচু এক পাথরের উপর বসে পড়লাম। এমন সময় শোনা গেল, সেই ঢং ঢং ঘণ্টা-[illegible]; সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল সেই লাল চামর দোলানো খচ্চরের [illegible], সংখ্যায় এক শতের কম নয়। পিঠে বিরাট বোঝা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে; কখনও থমকে দাঁড়াচ্ছে, কখনও পড়তে পড়তে টাল সামলাচ্ছে। এদের চলাই [illegible], তা আবার মানুষের।

মেঘের দল এই সময় এক পাশে ভিড় করছিল। তারই [illegible] সূর্য্য-কিরণের ঝলক পাহাড়ের গায়ে পড়ে বর্ষণ-স্নাত [illegible] স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রীকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। [illegible] ভরা রোডোডেন্‌ড্রন গাছগুলি এখন আকারে অনেক বড় হয়েছে। তা ছাড়া পাহাড়ের নিম্নাংশে বড় বড় গাছগুলি মাথা উঁচু করে আছে দেখা যায়। মেঘ-লোক হতে নেমে এসে পাতালের নিবিড় বনভূমির মধ্যে যেন প্রবেশ করছি। সামনের পাহাড়ের [illegible] দিয়ে গভীর তলদেশে নীচে নামার পাথর-বিছান পথের এক [illegible] নজরে পড়ছিল, আর পথ চলার তাগিদ অনুভব করছিলাম। [illegible] করে বসে দূরদূরান্তরের শোভা দেখার সময় ছিল না। এই [illegible] পথ অতিক্রম করে এখনও পাঁচ মাইল চলতে হবে। [illegible] পূর্ব্বে পায়ের জুতা খুলে ফেললাম, পায়ের আঙুলের নখ-[illegible] দেখি রক্ত জমে গিয়েছে। এত পথ হাঁটাহাঁটি করে যা [illegible] নি, এই এক মাইলে তা হ'ল। খালি পা না করে আর চলার [illegible] ছিল না। ঠাণ্ডা পাথরের উপর দিয়ে আবার লাফিয়ে

[illegible] দাঁড়াতে পারলাম। পথ অনেক স্থানে [illegible] ঘুরে ঘুরে নেমেছে। বরাবরই খাড়া নামায় আমার উৎসাহ হয়, কিন্তু খাড়া নামা যে এত সু-কঠিন হতে পারে, তা এ পথে না নামলে বুঝতাম না। পরিশ্রম যতই হোক, সময়ের তাগিদ যতই থাক মাঝে মাঝে উপরে, নীচে, সামনে না তাকিয়ে পারছিলাম না। উপরে চাইলে মনে হচ্ছিল, কত উঁচু থেকেই না নেমে এলাম। নীচে তাকালে মনে হচ্ছিল, কোথায় নেমে চলেছি; আর সামনে চাইলে দেখছিলাম, কেবল পাহাড়ের তরঙ্গ। কোন্ পাহাড়ের পাদদেশে নামব, কোন্ পাহাড় পার হয়ে কোথায় যাব তা যেন আর ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর বুকের মাঝে পথ হারিয়ে কোন্ অজানা দেশে পাহাড়ের অন্তহীন ঢেউয়ের মধ্যে ওঠা-নামা করছি।

সিডেঙ্কেনের কাছাকাছি এসে পথটা কিছু ভাল। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে পায়ে হাঁটার সরু রাস্তাও পাওয়া যায়। ফুল প্যান্ট পরে জুতো মোজা পায়ে দিয়ে আবার ভদ্রলোক হয়ে নিলাম। ঠাণ্ডায় আঙুলগুলি অবশ হয়ে গিয়েছিল, অতএব নখের মধ্যে রক্ত জমায় কোন বাধা অনুভব করছিলাম না। নির্জ্জন পথের একটা বাঁক ঘুরে সমুখে অগ্রসর হব এমন সময় দেখি পথের ধারে গাছের তলায় একটি সুন্দরী পাহাড়িয়া তরুণী একাকী বসে আছেন। যৌবনের নিজস্ব একটা শ্রী আছে। ফাল্গুনদিনের মাধবীলতার মত সে নিজের লাবণ্যে নিজেই বিকশিত হয়, আভরণের অপেক্ষা রাখে না। এই রমণীর অঙ্গের বসন যেরূপই হোক, তার দেহকান্তির দীপ্তি তার মধ্য দিয়েই উপচে পড়ছিল। যে পাথরটির উপর সে বসেছিল, সেখানে যেন একটি ফুল ফুটে আছে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি এমন সময় রমণী আমায় হাত-ছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই টুকটুকে রাঙা মুখখানি তুলে প্রার্থী চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন। ভাবছি, কি এঁর প্রার্থনা? এমন সময় রমণী ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ম্যাচিস, ম্যাচিস হ্যায়?" ও, এই এঁর প্রার্থনা! আমিও আস্তে বললাম, নেহি হ্যায়, এবং বলেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হলাম।

আমার মনের মধ্যে দুটি মানুষ আছে। তখন একজন বললেন, এটা ঠিক হ'ল না। মেয়েটিকে ম্যাচিস না দিতে পারলেও সাধারণ chivalry বা নারীজাতির প্রতি সেবা ও সৌজন্যের অভাব হবে কেন? শুভ ইচ্ছা প্রচারের উদ্দেশ্যে আনীত গোটাকতক লজেঞ্জও ত এঁকে দেওয়া যেতে পারত! দাঁড়িয়ে একটু আলাপ করাও ত হ'ত। অপর জন বললেন, না করে ভালই হয়েছে। নির্জ্জনে তরুণীর সঙ্গে কোন প্রকার নৈকট্য না করাই শ্রেয়।

কেন? মনে কি এতটুকু সাহস বা পবিত্রতা নেই যে, এই পরিণত বয়সেও একজন গেঁয়ো পাহাড়ী যুবতীর সঙ্গে নির্জ্জনে একটু কথা বলতে পারি?

এঁর সঙ্গে না আছে প্রেমের সম্পর্ক, না আছে [illegible]

ভয় কিসের? আর পর যুবক হলে তার সঙ্গে আলাপে কোন দোষ হয় না, আর যুবতী হলেই যত দোষ?

যুবক-যুবতীর ভেদজ্ঞান এখনও যে মনের মধ্যে রয়েছে। ওখানে একটি যুবক বসে থাকলে কি পাথরের উপরে একটি ফুল ফুটে আছে বলে মনে হ'ত? পবিত্রতা অপবিত্রতার কথা ত নয়। মনের মধ্যে অসীম পবিত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু রক্তমাংসের দেহের ধর্ম্মও আছে। সে ধর্ম্মও যে পবিত্র নয় এমন কথাও বলছি নে। আমার কথা হচ্ছে এই, আগুন ও বারুদ যত দিন নিজেদের ধর্ম্ম না বদলাচ্ছে তত দিন তাদের নৈকট্যে সজ্ঘাতের সৃষ্টি হবেই। যেমন ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎ পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেই স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়—এও তেমনি। এই মহা আকর্ষণ প্রেম ও কৃষ্টির মিলের অপেক্ষা রাখে না।

চুখী গ্রামের মধ্য দিয়া ছোট সিরিং ও বড় সিরিং

মেয়েরা ত কন্যা হতে পারে, বোন হতে পারে। মাও হতে পারে।

নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু কন্যা, বোন বা মার রূপ সম্বন্ধে কেউ সচেতন থাকে না। তাই বলছি, যতক্ষণ নারী ও পুরুষের পার্থক্য-বোধ মনের মধ্যে আছে, ততক্ষণ নির্জ্জনে অপরিচিতা যুবতীর সান্নিধ্যে না যাওয়াই ভাল। হাজার হলেও এ কথা ভুললে চলবে না, আমরা মূষিক আর ওঁরা মূষিক-মারা কল। কে জানে, এই রূপসীর চাহনিতে কি কেবল ম্যাচিস প্রার্থনার ইঙ্গিতই ছিল? আমরা রক্তমাংসের মানুষ বলেই এত কথা, নইলে ইন্দ্রিয়জয়ী শুকদেব হলে এ সব কথা উঠত না, নশ্বর দৈহিক রূপের পিছনে চিরজাগ্রত অবিনশ্বর আত্মাকেই দেখতাম।

আর একটি বাঁক ঘুরেই সিডেক্কেন ডাক-বাংলো দেখতে পেলাম। বাংলোটি যেন পাহাড়ের গা কেটে বসান। পরিবেশের পরিবর্ত্তনে আমার মনেরও দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়। মনের মধ্যের তার্কিক মানুষ দুটি ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে বাংলোটির দোতলায় উঠতে হয়। উপরে দেখি, সহাস্য বদনে ঘোষ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এক লাফে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়লাম। ঘোষ খাঁটি দুধ জোগাড় করেছেন। চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গে বড় কাঁচের গ্লাসের এক গ্লাস করে গরম উপাদেয় কফি পরিবেশন করল। আমরা বারান্দায় বসে একটু একটু করে কফি খেতে খেতে সামনের পাতাল-স্পর্শী খাদ আর তার অপর পারে গগনচুম্বী পাহাড় চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। ঘোষ তাঁর জানু দুটি টিপতে টিপতে বললেন, উৎরাই যে কি জিনিষ তা এবার বুঝেছি। পায়ের আর কিছু নেই, পেশীগুলি সব আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আপনি ত আমার মত লম্বা নন। আপনি হলেন, "গোলা গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, তারে ধরতে পারা দায়"। পাহাড়ের উৎরাইয়ে আবার আপনার কষ্ট! এক ধাক্কা দিলেই ত নীচের গড়িয়ে পড়তে পারেন। আমার সমস্ত লম্বা দেহটারও ধাক্কা পায়ের পেশীগুলির উপর দিয়ে গিয়েছে। তা হলেই বুঝুন কি অবস্থা।

ঘোষ বললেন, আমিও ত তাই মনে করতাম। উৎরাইয়ে আমার কোন দিনই কোন কষ্ট হবে না, কিন্তু আজ বুঝিয়ে দিয়েছে উৎরাই কি!

সিডেক্কেন ডাক-বাংলোর ঠিক নীচে কয়েক ঘর পাহাড়ীর বাস। এখানে লাসাগামী যাত্রীদলের রাত্রে থাকার আস্তানাও আছে। এর মধ্যে খচ্চরগুলি গাদাগাদি হয়ে দল বেঁধে রাত্রির শীত, বৃষ্টি ও তুষারপাত থেকে আত্মরক্ষা করে। এই রকম আস্তানা আমরা অনেক স্থানেই দেখেছি। এর ভিতরে ঢুকতে হলে নাকে কাপড় চেপে ধরে ঢুকতে হয়। এর ভেতরটা বড় একটা পরিষ্কার করা হয় না। মল ও মূত্রের পচনে যে সার তৈরি হয় পাহাড়ের গায়ে আবাদে তার কিছু কিছু ব্যবহার অবশ্য দেখেছি।

সিডেক্কেনে কয়েকটি গাই দেখেছি, অবশ্য খুব চেষ্টা করেও চৌকিদার একবারে আধ সেরের বেশী দুধ আমাদের জন্য জোগাড় করতে পারে নি। এবার পাহাড়ভ্রমণে আমাদের মুরগী খাওয়া হয় নি। কেননা বাংলোর নিকটে যে দু'এক ঘর লোক বাস করে, তাদের নিকট মুরগী থাকলেও একটির দাম বার টাকার কম নয়। অত দামে মুরগী খরিদ আমরা করি নি। এখানেও ঐ রকম দাম শুনে আর কিনলাম না। ডিমের দাম সাধারণতঃ একটি চার আনা। ইয়াটুং ও চুম্বিথানেও দু'চারটি ডিম কিনতে পাওয়া যায়, তবে সব জায়গায় পাওয়া যায় না। ডিম সস্তা গ্যাংটকে; বেশ বড় বড় ডিম টাকায় আটটা। রওনা দেবার সময় গ্যাংটকে অনেকগুলি ডিম আমরা খরিদ করেছিলাম।

সিডেকেন হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সমস্ত দার্জিলিং শৈলশ্রেণী পরিষ্কার দেখা যায়। আমরা সন্দিকফু থেকে দার্জিলিং ও কার্সিয়াঙের আলোর মালা দেখেছি। সন্দিকফু ১২০০০ ফুট উঁচু। দার্জিলিং ও কার্সিয়াঙের দীপগুলি মনে হয় যেন কোন্ পাতালে ঝিকিমিকি

এবড়ো-খেবড়ো পথের নমুনা

করছে। সিডেকেন থেকে দার্জিলিং শৈলের আলোর সারি একই সমতলে। আমরা অবশ্য সন্ধ্যার পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করায় সেই আলোগুলি আমাদের দেখা হয় নি।

পর দিন (২৯-৫-৫১) অতি প্রত্যূষে আমরা দৈত্যদের মাল-পত্রসহ রওনা করিয়ে দিলাম। আমরা ফেনাভাত, মাখন, পনির, আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ এবং তার সঙ্গে যে আধ সের পরিমাণ দুধ জোগাড় হয়েছিল তা পেট ভরে খেয়ে নিয়ে সকাল ছ'টায় রোঙলি অভিমুখে অবতরণ আরম্ভ করলাম। প্রথম চার মাইল খাড়া উৎরাই। পাথরের অসমান সিঁড়ি বেয়ে চার মাইলের মধ্যে প্রায় চার হাজার ফুট নামতে হবে। রোঙলি অবশ্য সিডেকেন থেকে নয় মাইল, কিন্তু শেষের পাঁচ মাইল প্রায় সমতলে চলার মত খুব সামান্যই ঢালু। পথের সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করে। যতই নীচে নামা যায়, গাছ-পালা ততই বৃহদাকার হয়। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে আবাদও হয়েছে দেখা যায়। আলু ও ভুট্টার চাষই বেশি দেখেছি। শেষের পাঁচ মাইল আমাদের বাঁ পাশে সমানে পাহাড়ে নদী বয়ে চলেছে। এই নদীর ঢালু আমাদের রাস্তার ঢালুর মতই। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা। নীচের রাস্তায় সমান্তরালে বহতা পাহাড়ে নদী। নদীর পার হতে প্রায় রাস্তার ধার পর্যন্ত আলু ও ভুট্টার ক্ষেত। এই ক্ষেত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় বনভূমি আরম্ভ হয়েছে। রাস্তাটি বনের মধ্য দিয়ে। নীচে উপরে, ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়ের শিখর পর্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত। অরণ্যে বিরাট বিরাট বনস্পতি। নদীর অপর পারে খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। সমস্ত পাহাড়টি গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত।

ঘোষের কাছে আজ হার মানব না বলে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। একটু পরেই আমরা দৈত্যদের ধরে ফেললাম। দৈত্যরাও বোঝা নিয়ে সমানে আমাদের সঙ্গে দৌড়াতে আরম্ভ করল। আশ্চর্য্য ক্ষমতা এদের। লিমটাং গ্রাম পর্য্যন্ত প্রায় চার মাইল খাড়া উৎরাই। আমরা এক সঙ্গেই নেমে এলাম। এখানে একদল তিব্বতগামী যাত্রী তাদের খচ্চরপাল নিয়ে বিশ্রাম করছিল। দৈত্যগণ গ্রামের পানশালায় তাদের সঙ্গে বসে পড়ল।

অতঃপর শেষের পাঁচ মাইল পার হবার জন্য ঘোষ ও আমি উপত্যকার নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করলাম। স্থানে স্থানে নদী, আবাদ, অরণ্য, খাড়া পাহাড়—সব মিলে এমন সুন্দর দৃশ্য হয়েছে যে আমি না দাঁড়িয়ে পারলাম না। অতএব ঘোষ আগে চলে গেলেন। এই উপত্যকায় খুব ভাল ভুট্টা ও আলু জন্মে। গাছগুলি খুবই পুষ্ট ও সতেজ। ক্ষেতিদের দু'একটি পাতায়ছাদা নীচু ছাপরা দেখলেও বহু চেষ্টা করেও একজন ক্ষেতিকেও দেখতে পেলাম না। কোথা থেকে এসে কে যে কখন চাষ করল, কে জানে। জনহীন অরণ্যের মধ্যে জনহীন আবাদ। নদীর নীল জল শুভ্র ফেনায় ভেঙে পড়ে ছুটে চলেছে। তার কলধ্বনি যেন নিস্তব্ধ নিঝুম বনভূমির গোপন মর্ম্মকথা ; এ শোনবার যেন কেউ নেই। রাস্তার একটি বাঁকের ধারে নীচের নদীটিও বেঁকে গিয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝে উপত্যকার এই নদীটির কথা শোনবার জন্য আমি একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। অতঃপর পথ চলার তাগিদে আবার চললাম, এবং ঘোষকে ধরবার জন্য দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। খুব দৌড়েও আর ঘোষকে ধরা সম্ভব হ'ল না। উৎরাইয়ের সময় একবার আগে যেতে দিলে তাঁকে ধরা অসম্ভব।

রোঙলি নদীর ধারে রোঙলি গ্রাম। তিব্বতের পথে যাত্রীদল ও খচ্চরের বিশ্রামের স্থান। এখানে কয়েক ঘর নেপালী ও মাড়োয়ারীর আড্ডা। নেপালীরা খাবার দোকান করে, মাড়োয়ারীরা বাণিজ্য করে। এরা মনোহারী জিনিষ আমদানী করে, এবং এ অঞ্চলের আলু, ভুট্টা প্রভৃতি খরিদ করে রপ্তানী করে। এইরূপে দুই দফা লাভ করে। রোঙলি মাত্র ২৫০০ ফুট উঁচু। সকাল থেকে চার হাজার ফুট নীচে নেমেছি। বেলা তখন আটটা। বাতাসের চাপে কর্ণপটহ যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাবে।

গিয়েছে ; কানে আর শুনতে পাই না। নাক টিপে ধরে কর্ণপটহে বাতাস দিতেই পট করে পটহ যথাস্থানে সরে এল, এবং ভাল শুনতেও পেতে লাগলাম। খুব গরম বোধ করার বহু পূর্ব্বেই গায়ের কোট খুলে ফেলেছিলাম, এখন সোয়েটার পর্য্যন্ত খুলে ফেললাম।

ঘোষ খুব বেশী আগে আসতে পারেন নি, কিন্তু তবু যতটুকু পূর্ব্বে এসেছেন সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর উদ্যোগে এক নেপালীর দোকানে চা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। দোকানটি রোঙলি ঢুকবার মুখেই পড়ে। দোকানের সামনেই আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। দু'জনে এক সঙ্গেই দোকানে ঢুকলাম। ঘোষের কথামত কয়েকটি নেপালী মেয়ে ফুটন্ত জল ঢেলে কাচের গেলাসগুলো ধুচ্ছে। দোকানে ঢুকেই মাছির বহর দেখে চমকে উঠতে হয়। ঠাণ্ডা দেশে এ বালাই এত দিন চোখে পড়ে নি। টেবিলের উপর যে কাচের গ্লাসগুলি রয়েছে, বোধ করি তা নামমাত্র ধোয়া হয়েছে। গা আঁটা আঁটা ভাব, এবং তার উপর হাজার হাজার বড় বড় মাছি মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের জন্য ফুটন্ত জলে যে গ্লাস পরিষ্কার হচ্ছিল, তার উপরেও মাছি। উড়ে এসে বসতে চায়, নেহাৎ গরম বাষ্পের জন্য বসতে পারে না। ঐ রকম অবস্থাতেই নেপালী কায়দায় চা তৈরি হচ্ছিল। আমরা এক এক গ্লাস পান করলাম। গ্লাস যদি একবার টেবিলে রেখেছি ত হাত দিয়ে মাছি তাড়াই। গরম চায়ের মধ্যে এসে বসতে চায়। আচ্ছা হ্যাংলা মাছি! নেপালী মেয়েরা একা একা এই রকম বনের মধ্য দিয়ে আসার জন্য আমাদের ভর্ৎসনা করল। বললে, এই পথে হিংস্র বন্য কুকুর, ভালুক ও নেকড়ে বাঘ আছে, একা একা আসা মোটেই ঠিক নয়। দু' একজন সঙ্গী ছাড়া নাকি এই বনের মধ্যে কেউ চলে না। মনে মনে বললাম, কত বন পার হয়ে এলাম, তা এই রোঙলির বন। মাছির বহর দেখে দোকানের কোন খাবারই আমরা খেলাম না। ঘোষ উদ্যোগী পুরুষ, এরই মধ্যে বাংলোর চৌকিদারকে খুঁজে বের করে ডিম কিনে তার হাতে দিয়ে মোটা মোটা ওমলেট তৈরি করতে পাঠিয়েছেন। ঘোষের মত সঙ্গী না থাকলে পাহাড় চলা অসম্ভব হ'ত। একাধারে তিনি ম্যানেজার, সচিব, গৃহিণী সবকিছু। বোধ করি এঁর মত গোছালো মানুষ আমি দ্বিতীয় দেখি নি। ফটো তোলা, ছবি আঁকা, চিঠি লেখা সব কাজেই তিনি ওস্তাদ। এর মধ্যেই তিনি প্ল্যান করে ফেলেছেন, রোঙলিতে না থেকে আজই সাত মাইল দূরে রেন্নুকে যাবেন। এখন দৈত্যরা পারলেই হয়, তাদের দেড়া পারিশ্রমিক দেবেন। নয় মাইল উৎরাই করবার পর 'আরি' পর্য্যন্ত খাড়া চার মাইল উঠতে হবে। আরি ৪৭০০ ফুট। সেখান থেকে তিন মাইল নীচে রেন্নুক ; উচ্চতা ৩৫০০ ফুট। বোঝা নিয়ে এত চড়াই-উৎরাই করে এই ১৬ মাইল যাওয়া ত কম কথা নয়। তবে এক দিনে ত এমনি করেই ওরা উনিশ মাইল পথ এসেছে ; সেদিন অবশ্য মাঝে থাকার কোন আড্ডা ছিল না, আজ আছে। দেড়া মজুরি পেলে দৈত্যরা যেতে রাজী হবে বলে ঘোষ নিশ্চয় করে নিলেন। ওরা এত ভালমানুষ যে মজুরী বেশী না দিলেও যেতে রাজী হবে এও ঘোষ জানতেন। কেবল প্রত্যেকে এক এক মণের উপর বোঝা নিয়ে এতটা পথ চলতে পারবে কি না, এই ভাবনা।

কাপুপের পথে লাসাগামী যাত্রীদল

রোঙলি থেকে আরি চার মাইল, উঠতে হবে। অতএব হাটকে বিশ্রাম দেবার জন্য ঘোষ ঘোড়া বা খচ্চরের জোগাড়ে লাগলেন। মাড়োয়ারীদের ঘোড়া আছে, কিন্তু কালো বাজারের দর হাঁকে। প্রতি ঘোড়া ১০৲ টাকা আবার সহিসের খরচ। আরি থেকে রোঙলিতে এক নেপালী খচ্চরে করে মাল নিয়ে এসেছিল। ঘোষ নেপালী ভাষায় তার সঙ্গে অনর্গল কথাবার্ত্তা বলে প্রতিটি চার টাকা করে দুটি ভারবাহী খচ্চর ঠিক করলেন। ঠিক হ'ল তারা আরির মাথা পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেবে।

রোঙলি নদীর ঝোলান সেতু পার হয়ে আমরা রোঙলি বাংলোতে এলাম। ঘোষ এই ঝোলান সেতুর এবং এই সেতুর উপর হতে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা রোঙলি নদীর অনেকগুলি ফটো তুললেন। এক এক দিকে এক এক রকম সুন্দর দৃশ্য। সবটা যেন ছবিতে আঁকা। বাংলোটি নদীর ঠিক উপরে অবস্থিত। স্থানটি এত সুন্দর যে এখানে এ বেলা আমার কাটাতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু ঘোষ আজই রেন্নুক পৌঁছে এক দিনের পথ কমিয়ে ফেলতে ব্যগ্র ; আমি বাধা দেওয়া ঠিক মনে করলাম না। ওঁর ছুটি কম, তার উপর আবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে দার্জ্জিলিঙে ফেলে রেখে এসেছেন। এখন বাঙালীর বাড়ীমুখো রোখ ; পারলে এক দিনেই দার্জ্জিলিং ফিরতে চান।

নদীর ধারে ধারে বেড়াবার প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে আসি বলে বেরিয়ে পড়লাম। বালুকাময় নদীসৈকত, মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর। পাড় ধরে অনেকখানি

চলে গেলাম; নদীর ভেতর একটি বড় শিলাখণ্ডে চড়ে পরিষ্কার টলটলে ঠাণ্ডা জলে গা, হাত, পা, মুখ ভাল করে ধুয়ে নিলাম। এখান থেকে ঝোলান সেতুটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল। তার নীচ দিয়ে ফেনা তুলে গর্জ্জন করে রোঙলি নদী ছুটে চলেছে। সেতুর অপর ধারে দু'পাড়ের গাছগুলি পাহাড় থেকে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বন, উপরে গাঢ় নীল আকাশ, নদীর মধ্যে পাথরের আঘাতে ভাঙ্গা সাদা ফেনা। আমি চিত্রকর হলে এই পাথরে ঠেস দিয়ে বসে ছবি আঁকতে শুরু করতাম।

বাংলোতে ফিরে দেখি মধ্যাহ্ন-ভোজন প্রস্তুত। একটি প্লেটে মোটা মামলেট, অপর প্লেটে ভুট্টার ছাতু জল ও চিনি দিয়ে পাতলা করে মাখা। ভুট্টার ছাতু পাহাড়ে চলতে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা উচিত। শরীরকে ধাতস্থ রাখার সহায়ক এর মত দ্বিতীয় বন্ধু আর নাই। আমরা এটা খুব সোয়াদ করে খাই। আমাদের সিরিং ভ্রাতৃদ্বয় ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা গরমে ঘেমে গিয়েছে। রেম্বুকের কথা বলায় তারা কিছুমাত্র আপত্তি করল না। অতঃপর ঘোষ বললেন, "তোমাদের আজ দেড়া মজুরী দেওয়া হবে।" শুনে তারা বেশ খুশী হ'ল। তবে আজকে ওদের একটু বেশী পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। শীতের দেশের লোক ২৫০০ ফুটে নেমে এলে হাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে যে চিঁড়ে ও গুড় ছিল, তা ওদের সব দিয়ে দেওয়া হ'ল। ওরা খুব সন্তুষ্ট হ'ল। রেম্বুক নার্সারিতে যেতে হবে, ওদের এ কথা বলে দিলাম।

খচ্চরওয়ালা তিনটি খচ্চর নিয়ে হাজির। একটিতে সে চড়ল, অপর দুটিতে আমরা চড়লাম। ভারবাহী খচ্চরের পিঠের উপর যে কাঠ বাঁধা থাকে, তারই উপর বসতে হ'ল। কয়েক পরত ছালা দিয়ে কাঠের কাঠিন্যকে কমানোর একটা প্রয়াস হয়েছিল বটে, কিন্তু তা বিশেষ সফল হয় নি। জীনহীন খচ্চরে চড়ার সুখ এইবার ভাল করে বুঝতে পারলাম। যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য অনেকবার হাতের উপর ভর করে হাল্কা হয়ে বসবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে কুলোয় নি। শেষ পর্য্যন্ত ছাল-চামড়া অনেকখানি উঠেছিল।

আরির পথ আঁকা-বাঁকা হয়ে পাহাড়ের উপর খাড়া উঠেছে। এ পথের বিশেষত্ব এই যে, বিরাট বিরাট চিলাউনি গাছ এ পথকে ছায়া করে রেখেছে। এই বিশাল গাছগুলি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর এক একটির দিকে চেয়ে চেয়ে সারাদিন কাটান যায়। এ রকম শত শত গাছের ভেতর দিয়ে আমরা ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগলাম। বড় দুরূহ পথ, খচ্চর না থাকলে উঠা সম্ভব হ'ত না। ভাবছিলাম, আমাদের দৈত্যেরা ভারী বোঝা নিয়ে এত পরিশ্রমের পর কি করে আবার এই পথে উঠবে। লোকগুলি সত্যিই দৈত্য।

রোঙলি বাজার, রোঙলি নদী ক্রমশঃই কত নীচে পড়ে রইল। ঝোলান সেতুটি ছোট হতে ছোট হয়ে এল। নদীর স্রোতোরেখা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'ল। নীল পটভূমির উপরে সাদা ফেনার ছাপ মুছিয়ে দিচ্ছিল সচল ও কলনাদিনী নদী। দেখতে দেখতে ও সব অদৃশ্য হ'ল। আমরা আঁকা-বাঁকা পথে এক পাহাড় হতে অন্য পাহাড়ে চলে গেলাম। যেখানেই যাই সেখানেই ঐ বড় বড় চিলাউনি গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবশেষে শিখরদেশে উপস্থিত হলাম। লোকটি ভাড়া নিয়ে খচ্চরসহ ভিন্নপথে বাড়ীর দিকে চলে গেল। কয়েক পা অগ্রসর হতেই লোকটি যাবার সময় আরির ডাক-বাংলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এখানে কয়েকজন তিব্বতী মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে দেখা; তারা বহু কষ্ট করে তিব্বত থেকে কালিম্পং যাচ্ছে। একটি আধমরা খচ্চরের উপর নিজেদের বোঝাগুলি চাপিয়েছে। এরা আমাদের বহু পূর্ব্বে রওনা হয়ে আরির মাথায় উঠে এখন দম নিচ্ছে। এতক্ষণে খচ্চর থেকে নেমে বাঁচলাম। তিব্বতী যাত্রীদল রওনা দিল; তারা রেম্বুক থেকে পেডং হয়ে কালিম্পং যাবে। আমরাও তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রওনা হলাম। মেয়ে দুটির পায়ের গোছাগুলি কি মোটা! খালি পায়ে এ রকম পাহাড় চড়াই-উৎরাই করছে—ধন্য! এদের পায়ের গোড়ালির বেড় বোধ করি দু'হাতের আঙুল একত্র করেও পাবার উপায় নেই। আমাদের সঙ্গে এই শ্রান্ত ক্লান্ত যাত্রীর দল উৎরাইয়ের সময় পারবে কেন। আমরা এদের পিছনে ফেলে অগ্রসর হলাম। একটু গিয়েই বাঁ হাতে আরি ডাক বাংলো। যাঁরা এই বাংলো তৈরি করেছেন, তাঁদের সৌন্দর্য্য-বোধ আছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। পাহাড়ের গায়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের উপর এই বাংলোটি; আমরা একবার প্রবেশ না করে পারলাম না। সামনে উন্মুক্ত উপত্যকা। সামনে নীচে বহু দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। উপত্যকার ওপারে উঁচু পাহাড়, সেই রিসিসুম পাহাড়। আরি অপেক্ষাও দু'হাজার ফুট উঁচু। মেঘ সরে গেলে মাঝে মাঝে রিসিসুম ডাক-বাংলো বনের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। সময়ের তাগাদা থাকলেও আমরা মিনিট পনের বাংলোতে না বসে পারলাম না। আমরা যত বাংলোতে গিয়েছি, ভিজিটরস বুকে নাম লিখেছি; এখানেও লিখলাম।

এইবার আমরা খুব তাড়াতাড়ি রেম্বুকমুখী ছুটলাম। পথের মাঝে সেই তিব্বতী দলকেও ধরে আবার পিছনে ফেললাম। ওদের প্রায়ই রাস্তায় বসে বসে জিরোতে হচ্ছিল।

প্রায় মাইল তিন চলার পর রেম্বুক নার্সারিতে ঢোকার পথ পেলাম। এই নার্সারি খুব নাম করা। এর মালিক শ্রীপ্রধান পূর্ব্বে সিকিম রাজার প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে এই নার্সারিটি পরিচালনা করেন। এঁর ভাই বর্ত্তমানে গ্যাংটকে সিকিম ষ্টেটের ফরেষ্ট ম্যানেজার। গ্যাংটকে থাকাকালে তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন, এবং আমাদের বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন, আমরা যেন আরিতে না থেকে তাঁর দাদার কাছে রেম্বুকে থাকি। এই মর্ম্মে তিনি তাঁর দাদার কাছে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন।

নার্সারিটি নানা প্রকার গাছে সুন্দর সাজানো। পাহাড়ের এক

অংশে বিস্তৃত স্থানে এই নার্সারি। শ্রীপ্রধানের পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোকও এখানে থাকেন। আমরা ভুল করে অন্য সরিকের বাড়ীতে উপস্থিত হই, সেখান থেকে শ্রীপ্রধানের বাড়ীতে যেতে আবার বেশ খানিকটা হাঁটতে হ'ল। শ্রীপ্রধান আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে কালিম্পঙের ডিভিশনাল অফিসারকে (D. F. O কে) একটি টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। রেনুকে টেলিগ্রাম অপিস আছে। আমরা ডি-এফ-ওকে আগামী কাল (অর্থাৎ ৩০-৫-৫১ তারিখে) আলগড়ায় গাড়ী পাঠাতে তার করলাম।

শ্রীপ্রধান পূর্ব্বেই আমাদের আসার কথা জেনেছিলেন। তবে তাঁর আন্দাজমত আমরা দু'এক দিন আগে এসে পড়েছি। আমরা চা খেতে খেতে নার্সারির ইতিবৃত্ত এবং সেই সঙ্গে সিকিমের রাজারাজড়াদের অনেক কাহিনী শুনলাম। শ্রীপ্রধান তেজস্বী স্বাধীনচেতা লোক। নিজের নার্সারিতে হাতে কলমে কাজ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি সঙ্কর পুষ্প (cross-bred flowers) জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। তাঁর ছেলের নাম বিধানচন্দ্র, সেই নামে যে ডালিয়া (dahlia) তিনি তৈরি করেছেন তা দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এসেম্বলী হাউসেও তা আছে। এই ফুলের নামকরণ নিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মুখে শুনেছিলাম। তিনি খুব রসিয়ে আমাদের এ গল্প বলেছিলেন। এই ফুলের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আমাদের নিয়ে সমস্ত নার্সারিটি ঘুরলেন এবং এই ফুলের সৃষ্টিস্থলও দেখালেন। সারাদিন পথ হাঁটায় আমরা পরিশ্রান্ত ছিলাম, তথাপি নার্সারির অনেক কিছু আমরা এঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কেননা আগামী কাল ভোরেই আমরা চলে যাব, আজ যদি না দেখি তবে কাল আর নার্সারি দেখার সময় হবে না। ফুলের চাষ আসল হলেও শ্রীপ্রধান কিছু কিছু তরিতরকারীও তৈরি করেন, সেগুলিও আমাদের দেখালেন।

ভদ্রলোক বড় অমায়িক ও অতিথিবৎসল। তাঁর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হলাম। অনেক গল্প বললেন। কালিম্পং আসার রাস্তাটির উন্নতি বিধান করার কথা বার বার আমাদের বললেন, এই রাস্তাটি যদি ভাল না হয়, তা হলে এ অঞ্চলের কোন উন্নতিই সম্ভব হবে না। রাস্তার অভাবে ভাল জিনিষ তৈরী করেও তাঁরা কত অসুবিধায় পড়েন, তাও জানালেন। বললেন, কালিম্পং পর্য্যন্ত একটি মোটরের রাস্তা পাওয়া গেলে খুবই সুবিধা হ'ত। বিশ্বের সঙ্গে একটি যোগাযোগ থাকত। ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাঁদের জমিদারী কেড়ে নেওয়ায় তাঁদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে কথাও অনেক দুঃখ করে জানালেন। তাঁরা রাতারাতি সব ফকির হয়েছেন, অথচ খাস ভারত-ভূমিতে এখনও এ রকম হয় নি। তাঁদের জমিদারী ষ্টেট রাজা নিজের জন্য কেড়ে নিলেন, না প্রজার জন্য নিলেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক খুব করিতকর্ম্মা। তাঁর সাহসও যথেষ্ট, নার্সারির জন্য চাকুরি ছেড়েছেন। নার্সারিকে প্রাণাধিক ভালবাসেন এবং নিজের হাতে কাজ করেন। কি কি অসুবিধায় পড়ে এত কঠোর দ্বন্দ্ব ও পরিশ্রম করেও কিছু করতে পারছেন না, তা জানালেন। ওঁর কাজের প্রশংসাসূচক অনেক কিছু দেশ-বিদেশের মনীষীরা লিখেছেন। সেগুলি আমাদের পড়তে দিলেন। এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করলাম। আমাদের আপনার করে নিলেন, তাই খাওয়া-দাওয়ার কোন আড়ম্বর করলেন না। মোটামুটি ওঁরা যা খান তাই খেতে দিলেন। বাড়ীর তৈরি নেপালী জিলাপীর কথা ভুলব না। বোধ হয় চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি। বিরাট বিরাট আকার, খেতে নরম ও সুস্বাদু।

রংপুর বাজার

সন্ধ্যা হয় হয়।

আমরা ভাবছি আমাদের সিরিং ভ্রাতৃদ্বয় এখনও এল না! আজ এত চড়াই-উৎরাইয়ের পর যদি তারা নার্সারির পথ ঠিক ধরতে না পেরে রেণুক বাজারে চলে যায়, তা হলে বেচারীদের কষ্টের আর সীমা থাকবে না। এমন সময় দেখা গেল দৈত্যগণ বোঝা নিয়ে কুব্জদেহে বড় বড় পা ফেলে আসছে। আমাদের নিজেদের রেশন হতে আলু পেঁয়াজ, চাল, ঘি খুব দরাজ হাতে ঘোষ ওদের দিলেন। এ সব পেয়েই ওদের মুখে সেই শিশুসুলভ হাসি আর ধরে না।

ক্রমশঃ

আঁটপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

আঁটপুর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত আঁটপুর একটি গ্রাম। কলিকাতা হইতে ২৫।২৬ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। হাওড়া-ময়দান ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেলে আঁটপুর যাইতে হয়, প্রায় ২।০ ঘণ্টা লাগে। আঁটপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের নাম —তড়া, কোমর বাজার, ইচ্ছাবাটী, বোমনগর, ধরমপুর, আনরবাটী, লোহাগাছি, রাণীবাজার, রাজহাটি, বিড়ালা, তাড়াজোল প্রভৃতি। আঁটপুর এবং এই সকল গ্রামে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা তাঁহাদের বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার (*First Book*-প্রণেতা), স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ), রাজনারায়ণ মিত্র, ডাক্তার রসিকলাল দত্ত, কৃষ্ণরাম বসু, ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, কালাচাঁদ তর্কদক্ষ, শ্যামাচরণ বিদ্যাভূষণ, পরমেশ্বর দাস ঠাকুর প্রভৃতি মনীষিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুবই দুঃখের বিষয় ইঁহাদের জন্মস্থানে কাহারও কোনরূপ স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা অদ্যাপি করা হয় নাই। বর্ত্তমানে এই সকল গ্রামের কেহ কেহ ব্যবসায়ে, চাকরিতে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু দেশের প্রতি, গ্রামের প্রতি তাঁহাদের তেমন কোন দরদ এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না।

একদা আঁটপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ সকল দিকেই উন্নত ছিল। আঁটপুরের "তাঁতের কাপড়ে"র প্রসিদ্ধি এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় আঁটপুর এতই উন্নত এবং মনোরম ছিল যে, ইংরেজ শাসকগণ ইহাকে "nice little town" বলিতেন; অর্থাৎ আঁটপুরকে একটি সুন্দর ও ছোট শহরের সহিত তুলনা করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার পূর্ব্ব শ্রী ও সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই; সকল দিকেই ইহার ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অবনতি ঘটিয়াছে। আঁটপুর ও অন্যান্য গ্রামসমূহ এখন ম্যালেরিয়ার "লীলানিকেতন" হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণেও অধিবাসিবৃন্দ জর্জ্জরিত। রাস্তা, ঘাট, পুকুর প্রভৃতির যথেষ্ট অবনতি

মিত্র-বাটীর শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির

ঘটিয়াছে। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। তবে প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় এখনও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই।

মন্দির

বংশের কেহ কেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারা বংশক্রমে "কোন্নগরের মিত্র-পরিবার" বলিয়া পরিচিত হন। পরে কোন্নগরের মিত্র-পরিবারের কেহ কেহ বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। ধুইরাম মিত্র হইতে ১৯ পর্য্যায়ে কোন্নগর নিবাসী শ্রীরাম মিত্রের পঞ্চম পুত্র কন্দর্প মিত্র হুগলী জেলার ভুরসিট্ট পরগণার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এ অঞ্চল তখন ব্রাহ্মণ রাজাদের (কবিরঞ্জন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পূর্ব্বপুরুষদিগের) অধিকারভুক্ত ছিল; তৎকালে এ অঞ্চলে কুলীন কায়স্থের বাস ছিল না। সেইহেতু উক্ত ব্রাহ্মণ রাজবৃন্দ কন্দর্প মিত্রকে আঁটপুরে বাস করিবার জন্ম উৎসাহিত করেন এবং রাজ-সরকারে একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। বাসোপযোগী জায়গা- জমি প্রভৃতিও প্রদান করেন। ইঁহারই বংশধরেরা "আঁটপুরের মিত্র পরিবার" বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কন্দর্প মিত্র মহাশয়

বড় বড় অট্টালিকা, দেবমন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, বড় বড় পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতির বর্ত্তমান জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, এককালে এ অঞ্চল উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীনের সমৃদ্ধি, সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি আবার ফিরিয়া আসিবে কিনা কে জানে?

একদা আঁটপুরের মিত্র বংশের প্রসিদ্ধি খুবই ছিল; বর্ত্তমানে সে প্রসিদ্ধিও ম্লান হইয়া গিয়াছে। এখানকার মিত্র-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ: কথিত আছে যে, বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনের জন্ম কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, পথে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরে যজ্ঞরক্ষার নিমিত্ত পাঁচজন ক্ষত্রিয় কায়স্থও আনয়ন করিয়াছিলেন; ইঁহারা অসি, কবচ, ধনু প্রভৃতি ধারণ করিয়া যোদ্ধবেশে অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে আগমন করিয়াছিলেন; ইঁহাদের নাম— কালিদাস মিত্র, মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত। ইঁহাদের মধ্যে কালিদাস মিত্র বঙ্গদেশে মিত্র বংশের আদিপুরুষ। কালিদাস মিত্র হইতে নবম পুরুষে ধুইরাম ও গুইরাম নামক দুই সন্তানের যৌবনকালে (বল্লাল সেনের কৌলিন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের সময়ে) সমাজ বদ্ধ হয় এবং কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই দুই সন্তান হইতেই প্রথম পর্য্যায় আরম্ভ হয়। উক্ত দুই সন্তান ধুইরাম ও গুইরাম হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে (১৩ পর্য্যায় হইতে) কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে প্রকৃত সোপান গণনানুসারে স্ব পর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে "সর্ব্বদ্বারী বিবাহ" প্রচলিত ছিল। কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না।

ধুইরাম মিত্র চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বঁড়িষা গ্রামে বাস করেন। ইঁহার বংশধরেরা "বঁড়িষার মিত্র" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এই

মন্দিরের কারুকার্য্যের এক অংশ

পরম সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ যোগী গৃহস্থ খুব বিরল ছিল; কোন্নগর হইতে আসিবার সময় নিজের শালগ্রামশীলা শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জিউকে গলদেশে ঝুলাইয়া আনিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা আদৌ উন্নত ছিল না; তথাপি উপার্জ্জনের অধি-

কাংশই দান খয়রাত, পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেন, নিজে কুটিরে অবস্থান করিয়াও দেবদেবীর জন্ম অট্টালিকা, মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেব ও অতিথিসেবাতেও যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। শারদীয়া পূজার সময় শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত মতে সমুদয় অনুষ্ঠান বিহিত বিধানে সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ ভাবে শ্রীশ্রী৺কালী পূজাও করিতেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি প্রায় ৩০০ বৎসর হইল তাঁহার বংশে প্রতি বৎসরে শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজা ও শ্রীশ্রী৺কালী পূজা যথাবিধানে সম্পন্ন হইতেছে। কন্দর্প মিত্র মহাশয়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র ১১২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "মহাত্মা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিজ পরিবারে এবং অন্যান্য গ্রামে দেবালয়, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া যে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অতি দুর্লভ। তাঁহার নানারূপ কীর্ত্তির মধ্যে মিত্র পরিবারে প্রতিষ্ঠিত

মন্দিরের অপর অংশ

শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য; বঙ্গদেশে এইরূপ বৃহৎ এবং কারুকার্য্যমণ্ডিত মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম; এই মন্দির বহু ব্যয়ে গঙ্গা মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত; মন্দিরের গাত্রে অষ্টাদশ পুরাণোক্ত সমুদয় দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পুরাণানুযায়ী নানা প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। ইহা ছাড়া মিত্র-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালার কাঠের উপর যে কারুকার্য্য ছিল তাহা দেখিলে সেকালের শিল্পিগণের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। পুরাতন আটচালা আর নাই; চণ্ডীমণ্ডপের যে সকল অংশ এখনও বিদ্যমান আছে সেগুলির উপর কাঠের কাজ এখনও দর্শকগণকে বিস্মিত করে। মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা প্রভৃতির কারুকার্য্য দেখিবার জন্য পূর্ব্বে বহু বিদেশী ও দেশীয় ব্যক্তি আঁটপুর

মিত্রবাটীর আটচালা

গ্রামে আসিতেন এবং এখনও আসেন। বহু স্থানের শিল্পিগণ এই সকল কারুকার্য্যের ছাঁচও তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। যদিও ২০০ বৎসরের উপর হইল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যদিও এখনও উহার বিশেষ কোন ক্ষতি বা ক্ষয় হয় নাই। এই মন্দির ব্যতীত কয়েকটি শিবালয়ও কৃষ্ণরাম মিত্র মহাশয় স্থাপন করিয়াছিলেন; বাস্তবিক মন্দির, শিবালয়, চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা প্রভৃতির সমন্বয়ে মিত্র-বাটীর সদর অংশকে এখনও পর্য্যন্ত অতি মনোরম বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ সুন্দর পরিবেশ অতি বিরল।

কৃষ্ণরাম মিত্র মহাশয় তদানীন্তন বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। রাজা ও প্রজাদিগের নিকট হইতে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য, দান, অতিথিসেবা, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি

মিত্রবাটীর বড় পুকুর

সর্ব্বজনবিদিত ছিল। দরিদ্রজনের দুঃখ-দুর্দ্দশায় তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার এই সকল গুণাবলী সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত অনেক কাহিনী শুনা যায়। একদা তিনি পাল্কীযোগে

বর্দ্ধমান হইতে আঁটপুর আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে মুজপুর গ্রামে বেহারাগণ পাল্কী নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেই সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। তাহাদের

আঁটপুর মিত্রবাটীর সদরের একাংশ

কথোপকথনের মধ্যে কৃষ্ণরাম মিত্র শুনিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক অপর একজন স্ত্রীলোককে বলিতেছেন, "দিদি, তুমি যে এক কলসী জল ধার লইয়াছিলে আজ তাহা ফেরত দিতে হইবে, আজ আমাদের জলের খুবই দরকার, জামাই আসিবে।" এই কথা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা জানিবার খুবই কৌতূহল হইল। তিনি স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, উক্ত অঞ্চলে পানীয় জলের জলাশয়ের খুবই অভাব, বহুদূর হইতে পানীয় জল আনিতে হয়। এই কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় এতই বিগলিত হইয়াছিল যে, ঐ অঞ্চলে নিষ্কর জমি খরিদ করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই একটি দীঘি খনন করাইয়া দেন। এইরূপ বহু স্থানে তিনি জলাশয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কৃষ্ণরাম মিত্র মহাশয় নিজের বংশধরগণের ভরণপোষণের জন্য বিশেষ কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই, কিন্তু দেবসেবা ও অতিথিসেবার জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের সময়েও সেই সম্পত্তির আয় হইতে দেবসেবা এখনও সুচারু ভাবে চলিতেছে; কিন্তু বংশধরগণের মুখে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে বাসোপযোগী ভূম্যাদি দান করিয়া গিয়াছেন; ইহা ছাড়া নয়টি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপককে পঁচিশ বিঘা করিয়া নিষ্কর জমি প্রদান করিয়াছিলেন; ছাত্রদের আহারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে সে সকল চতুষ্পাঠী আর নাই, কিন্তু প্রদত্ত জমির আয় হইতে অধ্যাপকগণের বংশধরদিগের ভরণপোষণ চলিতেছে। গুরুবংশের জন্য গোপীনগর গ্রামে এক হাজার বিঘা নিষ্কর জমিও দান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এইরূপ দান তখনকার দিনে অতি বিরল ছিল। তাঁহার একমাত্র নীতি ছিল—"পরের জন্য জীবন যাপন কর।"

আঁটপুর গ্রামের ঘোষ বংশও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। এই ঘোষপরিবারেরই একজন স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ)। ইঁহারা তিন ভাই ছিলেন—তুলসীরাম ঘোষ, বাবুরাম ঘোষ ও শান্তিরাম ঘোষ। সর্ব্বকনিষ্ঠ শান্তিরাম ঘোষ এখনও জীবিত আছেন। বয়স

স্বামী প্রেমানন্দের জন্মতিথি পালন

৮৮ বৎসর। বাবুরাম ঘোষ তাঁহার মাতুলালয়ে (আঁটপুরের মিত্রবাটীতে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতুলালয়ের কেহ নাই, গৃহও নাই, কেবল বাস্তুভিটাটি পড়িয়া আছে। শ্রীশান্তিরাম ঘোষ কর্ত্তৃক সেই স্থানে একটি প্রস্তরফলক প্রোথিত হইয়াছে। গত ২০শে নভেম্বর উক্ত ভিটার উপর স্বামী প্রেমানন্দের জন্মতিথি উৎসব পালিত হইয়াছিল; বেলুড় মঠ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। যথারীতি পূজা, যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ভিটার উপর "প্রেমানন্দ স্মৃতি-মন্দির" স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, কিন্তু কবে উহা বাস্তবে পরিণত হইবে বিধাতাই জানেন।

স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি প্রিয় ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি অতি অন্তরঙ্গ ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ আট জন অন্তরঙ্গ বন্ধুসহ আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে গমন করেন। ইহার বর্ণনা স্বামী প্রেমানন্দের জীবনীতে মুদ্রিত তুলসীরাম ঘোষ মহাশয়ের একটি চিঠিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমাও আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ সনের ২৪শে ডিসেম্বর নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), নিত্যরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ), তারানাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামী সারদানন্দ), কালীচন্দ্র চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ) এবং সারদাচরণ মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) বাবুরাম ঘোষের বাড়ীর মন্দিরের সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত ২৪শে ডিসেম্বর এই দিনটি স্মরণ করিবার জন্ম আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে উক্ত সঙ্কল্প গ্রহণের স্থানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।
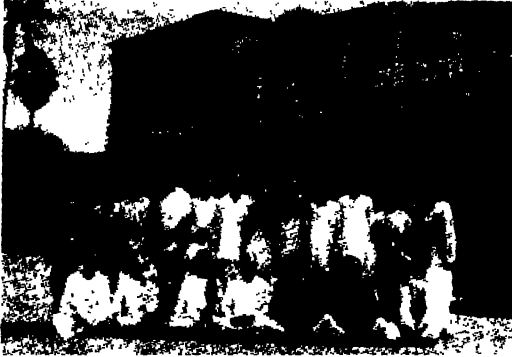
আঁটপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ

স্বামীজী মঙ্গলাচরণ করিলে পর আঁটপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষকমার চক্রবর্তী এই সঙ্কল্প-গ্রহণ উৎসবের ঐতিহাসিক দিক উল্লেখ করেন, এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখিত মনীষী রোঁমা রলাঁর গ্রন্থ এই আঁটপুর গ্রামের সন্ন্যাস গ্রহণের সম্পর্কে যে বিশদভাবে উল্লেখ আছে তাহাও পড়িয়া শুনান।

আঁটপুরেরই সন্তান ব্রহ্মচারী ভোলানাথ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আগামী বৎসর আঁটপুরের এই তীর্থস্থানে ২৪শে ডিসেম্বর নিখিল-ভারত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত সম্মেলন করিবার প্রস্তাব করেন।

ব্যাপটিষ্ট মিশনের মিস মায়ার ডেভিস এক মনোজ্ঞ বক্তৃতায় সকলের কাছে ভগবানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া মানবসেবা করিবার জন্ম আবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, সেদিন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অষ্ট সঙ্গী যে প্রেরণা লইয়া শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষ নয়, মানব-সমাজকে গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ মনুষ্যত্বের চরম দুর্যোগের দিনে সেই প্রেরণার প্রয়োজন। স্বামিজী ত্যাগ ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া দেশকে যে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছিলেন আজ সেই পথই আমাদের পথ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী পূর্ণানন্দ তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় বলেন যে, স্রষ্টা আপন প্রয়োজনেই আলো-অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্ধকার না থাকিলে আলোর মূল্য কোথায়? তাই তিনি যেমন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনি অসুরও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পৃথিবীকে নানা রঙ্গে রাঙাইয়া তোলায় মধ্যেই তাঁহার আনন্দ। স্বামিজী আগামী যুগের মানুষদিগকে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার অষ্ট সঙ্গী এবং তাঁহাদেরই গুরুর আদর্শকে গ্রহণের জন্ম আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানের ধুনি জ্বালাইয়া নর-জ্যোতিষ্ক যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন,

লেখক

সেই ধুনি যেন অনন্তকাল প্রজ্বলিত থাকিয়া মানবকে আলোর সন্ধান দান করে।

স্বামী বিবেকানন্দ অষ্টজন সঙ্গীসহ যে স্থানে সন্ন্যাস ধর্ম্মের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে যে স্থানে শ্রীশ্রীমা অবস্থান করিয়াছিলেন—এই উভয় স্থানেই শ্রীশান্তিরাম ঘোষ দুইটি প্রস্তর ফলক প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত সঙ্কল্প গ্রহণের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্ম সঙ্কল্প গ্রহণের স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। হুগলী জেলার সুসন্তান দেশবরেণ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে ইহা অচিরেই বাস্তবে পরিণত হইতে পারে।*

---

* ছবিগুলি *USIS*-এর Mr. Forman কর্ত্তৃক গৃহীত ছয়খানি এবং শ্রীযুক্ত কানাইলাল মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত পাঁচখানি ফটো হইতে—লেখক

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ভবেশ একখানা বেতের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়াছিল। চারদিকে চাহিয়া ভিতরের এই বসিবার জায়গাটি তাহার ভারি সুন্দর মনে হইল। বারান্দার লাল রংকরা থাম বাহিয়া একটি জাপানী জেসমিনের লতা উঠিয়া ছাদ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, লনের এক প্রান্তে ফিকে লাল রঙের একটা বুগেনভিলার ঝোপ দেখা যাইতেছে। বারান্দার নীচে সবুজ ঘাসে ঢাকা লনের পাশাপাশি দুইটি বড় ক্যানা ঝোপ। একটিতে গাঢ় লাল, অন্যটিতে হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়াছে। সম্মুখের শাদা পাথরের টেবিলে পিতলের ভাসে একগুচ্ছ লাল ক্যানা-ফুল। নীচু কাঠের টুলের উপর পিতলের টবে কয়েকটি চাইনীজ পামগাছ থামগুলির ফাঁকে ফাঁকে সাজানো। ভারি স্নিগ্ধ, শান্ত ঘরোয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে সব মিলিয়া।

মৃণাল আসিল, তাহার সঙ্গে আসিল বেয়ারা, হাতে একটি ট্রেতে এক প্লেট সন্দেশ ও এক গ্লাস সরবৎ।

মৃণাল বলিল—সকালে উঠে এত দূর থেকে আসছেন, খেয়ে নিন।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—আমি সকালে খেয়েছি। সন্দেশ এখন থাক, সরবৎ খাই। সরবৎ খাওয়া হইলে বেয়ারা ট্রে লইয়া চলিয়া গেল।

ভবেশ বলিল—দেবুর সম্বন্ধে কি কথা আছে লিখেছিলেন?

মৃণাল—বলছি। তার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে এর মধ্যে?

ভবেশ মাসকয়েক আগে রাস্তায় দেবানন্দের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাতের কাহিনী বলিল।

মৃণাল—যদি এ বাড়ীতে একবার তাকে ধরে নিয়ে আসতেন। বাঁকীপুর থেকে পরশু আমি এক চিঠি পেয়েছি। আমার এক আত্মীয়া লিখেছেন। শুনুন কি লিখেছেন: বছরখানেক আগে দেবানন্দ নামে একটি ছেলে আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে উঠেছিল। কয়েকদিন পরে সে কঠিন অসুখে পড়ল। অসুখের সময় তাকে আমাদের বাড়ীতে আনা হয়েছিল। আমার মেয়ে ভানা ছেলেটির খুব সেবা করেছিল। অসুখ থেকে উঠে ছেলেটি চলে গেল। তখনও তার শরীর সারে নাই। আমাদের কারো কথা না শুনে সেই শরীরে সে চলে গেল। সে ত কবে চলে গিয়েছে এখন ভানাকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। যত জায়গায় ওর বিয়ের সম্বন্ধ করা হয় মেয়ে বেঁকে বসে। কি ওর মনের কথা কাউকে বলে না। শেষটায় জানা গেল মেয়ের সঙ্কল্প আইবুড়ো থেকে দেশের কাজ করবে। ঠাট্টা, গালগালি কিছু গায়ে না মেখে সে গোঁ ধরে আছে। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে স্বীকার করেছে দেবানন্দ অনুমতি দিলে সে বিয়ে করতে পারে।

আমি বললাম—দেবানন্দ আমাদের কে যে তার অনুমতির দরকার? তুই কি তাকে বিয়ে করতে চাস?

মেয়ে জিব কেটে বলল—ছি, ছি, অমন কথা বলো না মা, তিনি আমার গুরু। আমি বললাম—এইটুকু ছেলে তোর গুরু?

মেয়ে বলল—এইটুকু ছেলে নয় মা, তোমরা তাঁকে চিনতে পার নি। তিনি বিপ্লবী সন্ন্যাসী।

মেয়ের ভাবভঙ্গী দেখে আমরা হকচকিয়ে গেছি। ছেলেটার আশ্চর্য্য আকর্ষণ-শক্তি ছিল স্বীকার করি। আমাকে সে মা বলে ডেকেছিল। অসুখের সময় ওর মুখখানা দেখে বুকের মধ্যে স্নেহ উথলে উঠত। এমনটা নিজের পেটের ছেলের জন্য কোনদিন হয়েছে কিনা মনে পড়ে না। বাপমাকে কাঁদিয়ে ঐ ছেলে সর্বনেশে দলের সঙ্গে জুটেছে, ওর বরাতে কি আছে ভাবতে ভয় হয়। বড় শক্ত, বড় কঠিন ওর প্রাণ, কিন্তু ভগবান ওর চোখের দৃষ্টিতে, ওর মুখের ভাবে মায়ার অঞ্জন ছুঁইয়ে দিয়েছেন। মানুষের মনকে জোর করে টেনে নেয় নিজের দিকে, কিন্তু নিজে কোথাও ধরা দেয় না।

চিঠি শুনিতে শুনিতে ভবেশ অন্যমনস্ক হইয়া গেল। মনে পড়িল দেবানন্দের সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাতের কথা। প্রিয়দর্শন, শ্যামবর্ণের মুখচোরা একটি ছেলে মহেন্দ্রের সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া প্রথম সাক্ষাতে তাহার দিকে এমন করিয়া চাহিল যে ভবেশের মনে হইল, ওকে চিনি না, কিন্তু ওকে বড় আপনজন বলিয়া মনে হইতেছে। দুই-তিন দিনের মধ্যে সে হইল ভবেশ-দা, দেবানন্দ হইল দেবু। তাহার বড় আশা ছিল কিটির সঙ্গে—

মৃণাল লক্ষ্য করিল ভবেশ অন্যমনস্ক হইয়াছে, চিঠির কথা বোধ হয় তাহার কানে যাইতেছে না।

সে বলিল—কি ভাবছেন ভবেশ বাবু?

ভবেশ—দেবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। আমি চিঠি শুনছি। তার পর?

মৃণাল চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—তিনি অনুরোধ করেছেন দেবানন্দের খোঁজ করবার জন্য। সে পটলডাঙ্গার এক হোষ্টেলে থেকে কলেজে পড়ত আর যুগান্তর-দলের লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—এ ছাড়া আর কিছু জানেন না তার সম্বন্ধে। লিখেছেন—তোমাদের বাড়ীতে এই ধরণের ছেলেদের আনাগোনা আছে শুনেছি, যদি কোন সন্ধান পাও। তার ঠিকানা পেলে আমি চিঠি লিখব।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—ডাঃ চক্রবর্তী চেষ্টা করলে হয় ত ঠিকানা বের করতে পারেন। দেবু এখন আমার নাগালের বাইরে।

মৃণাল—আমি সে চেষ্টা করেছি। কিছু দিন সে চাঁপাতলায় এক বাড়ীতে থাকত। সেখান থেকে কোথায় গিয়েছে কেউ

প্রকাশ করল না। চাঁপাতলায় থাকবার সময় সে এ বাড়ীতে এসেছিল।

ভবেশ—তার সন্ধান পাওয়া শক্ত। যাবার আগে দেবুকে একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল। আপনি একটি মেয়ের কথা বললেন, আমি আর একটির কথা জানি। সেও দেবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল—

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিতেছিলেন—লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ কি হবে এ নিয়ে নেশনালিষ্টদের মধ্যে দুটো দল দেখা যায়। প্রথম দলকে রাইট উইং বা ইনটেলেকচুয়ালস বলা যায়। এই দল ট্যাকটিক্‌স হিসেবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও গণ সংযোগের পক্ষপাতী। এই দল ভায়োলেন্স বা রক্তপাতের বিরোধী, "ব্লাডলেস রিভোলুশন" ও "মর্যাল কনক্লিক্টে"র কথাগুলো এঁরা বার বার ব্যবহার করেন। কেন এঁরা রক্তপাতের বিরোধী শোন—

"We are anxious to attain our ideal of Swaraj without passing through those horrors that European **revolutions have enacted."** (*New India*)

(ইউরোপে বিপ্লবের ফলে যে রক্তক্ষয়ী তাণ্ডব ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে না গিয়া আমরা আমাদের লক্ষ্য স্বরাজ লাভ করিতে চাই)। নিউ ইণ্ডিয়া রিপ্রেশন বন্ধ করবার জন্ম গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করছে। কারণ "Repression means ultimately an appeal to brute force" (দমননীতি মানে পাশবিক শক্তির উপর নির্ভর করা)। গবর্ণমেণ্ট রিপ্রেশন বন্ধ না করলে কি হবে সে সম্বন্ধে বলছে: "The repressive measures will drive the agitation underground" (দমননীতির ফলে প্রকাশ্য আন্দোলন গুপ্ত আন্দোলনে পরিণত হইবে)। নিউ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখিয়েছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশিয়ার উপদ্রবের ফলে জারতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে,—

"How can a foreign despotism like that of England ever dream of successfully grappling with an underground India ?"

(ইংরেজের মত বিদেশী স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ভারতব্যাপী গুপ্ত আন্দোলন দমন করিবার স্বপ্ন কি করিয়া দেখিতে পারে?) শেষ ক'টি লাইন ওয়ার্নিং—

"Lord Minto should stay his hand, or else in India, as elsewhere, freedom must walk to her own over the blood of her votaries."

(লর্ড মিণ্টোর কর্ত্তব্য সংযত হওয়া, নচেৎ যেমন অন্যত্র হইয়াছে সেইরূপ ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা আসিবে তাহার পূজারীদিগের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়া)।

মিঃ গাঙ্গুলী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—এণ্ড সাম পিপল থিঙ্ক বিপিন পাল ইজ এ গ্রেট পলিটিক্যাল থিঙ্কার! (লোকে আবার বলে বিপিন পাল একজন বড়দরের রাজনৈতিক চিন্তানায়ক) রক্তপাত করে করে ইংরেজ এদেশে সাম্রাজ্য গড়েছে। রক্তপাতের ভয় দেখিয়ে তোমরা তাঁদের সারেণ্ডার (আত্মসমর্পণ) করতে বলছ। ইওর নেশনালিষ্টস আর বোথ এ নেভ এণ্ড এ ফুল।

মি. ডাটা—এণ্ড ইওর মডারেটস আর ওনলি ফুলস।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—রাইট উইং (দক্ষিণপন্থী) নেশনালিষ্টদের মতে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় প্যাসিভ রেজিষ্টান্স ও মাস কন্ট্যাক্ট। প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের আইডিয়া কি ভাবে ডেভেলাপ করেছে দেখা যাক।

জামালপুরের হাঙ্গামার সময় দেখা গিয়েছে হিন্দুদের বন্দুক থানায় জমা দেবার আদেশ হলে কোন কোন কাগজ বলল—এই অর্ডার ডিফাই (অমান্য) কর। তারপর পাব্লিক মিটিংস অর্ডিনান্সের সময় এই কথা আবার উঠল। লাহোরে বিক্ষোভের সময়ে লজপত রায় ও অজিত সিংকে ভয় দেখানো হ'ল বক্তৃতা দিলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে। অজিত সিং এই ওয়ার্নিং অগ্রাহ্য করে বক্তৃতা দিলেন। বন্দেমাতরম লিখল: "আমরা দেখে আনন্দিত হয়েছি যে পঞ্জাবে প্যাসিভ রেজিষ্টান্স আরম্ভ হয়েছে। এদের মতে স্বদেশী ও বয়কট এক রকমের প্যাসিভ রেজিষ্টান্স।" বন্দেমাতরম বলছে,

"It was a singularly happy moment when Bengal hit upon this plan of passive resistance."

(অতি শুভ মুহূর্ত্তে বাংলা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই প্ল্যানটি গ্রহণ করিয়াছিল।) "এই প্ল্যান সফল হয়েছে ও এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন দরকার রিলিজিয়াস ফার্ভার দিয়ে একে সঞ্জীবিত করে তোলা।"

প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের আর একটা আইটেম ষ্ট্রাইক। ই, বি. রেলওয়ে ষ্ট্রাইককে এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো এজিটেটরদের রেস ফিলিং প্রচারের ফল বলে নিন্দা করেছে। বন্দেমাতরম বলছে, এই ষ্ট্রাইকের মধ্যে এজিটেটরদের কোন হাত নেই, রেস-ফিলিংএর কোন সম্বন্ধ নেই।

"The spirit of self-assertion is in the air and it is affecting all the various communities in India. Strikes and such other disturbances are but evidences of **India's evolution from an inorganic into an organic** state."

(আত্ম-অভিব্যক্তির ভাব বাতাসে ছড়াইয়া গিয়াছে এবং ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সংক্রমণ ঘটিয়াছে। ধর্ম্মঘট ও এই শ্রেণীর হাঙ্গামা ভারতবর্ষের অজৈব অবস্থা হইতে জৈব অবস্থা-প্রাপ্তির পরিচায়ক।

অন্য একখানা কাগজ বলছে, "ইউরোপে ষ্ট্রাইক মানে হিংসার তাণ্ডব; in India a strike is a vow in the name of religion—ভারতবর্ষে ইহা ধর্ম্মের নামে প্রতিজ্ঞা।

কাগজখানা এর পর চমৎকার কথা বলছে, "যে সকল উপায়ে ফ্রান্স ও আমেরিকায় ডিমোক্রেসির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে জন-

সাধারণ ষ্টেটের শিক্ষিত সৈন্য-বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এ যুগে সেটা আর সম্ভব নয়। এজন্য জনসাধারণ একটা নূতন অস্ত্র তৈরি করেছে। এই অস্ত্র হচ্ছে ধর্মঘট।"

এর পর দেখা যাচ্ছে ধর্মঘটকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবার কথা ক্রমশঃ বেশী লোকের মাথায় ঢুকছে।

একখানা কাগজে জেনারেল ষ্ট্রাইকের কথা পাচ্ছি।

সন্ধ্যা এই প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের একটা দিকের উপর জোর দিচ্ছে অনেকদিন ধরে। গবর্ণমেণ্টের স্কুল-কলেজ, গবর্ণমেণ্টের আদালত প্রভৃতি বর্জ্জন করে গবর্ণমেণ্টকে প্যারালাইজ করবার আইডিয়া সদা প্রচার করেছে।

সশস্ত্র বিপ্লবের ফলে যে অরাজকতা, অত্যাচার, দুঃখ-দুর্দ্দশা আসতে পারে, তার ভয় দেখিয়ে নিউ ইণ্ডিয়া রক্তপাতশূন্য বিপ্লব ও নৈতিক সংগ্রামের অর্থাৎ প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের কথা বলছে। আর বন্দেমাতরম বলছে—সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হলে বুরোক্র্যাসী যে উৎপীড়ন চালাবে দেশের লোক তা সহ্য করতে পারবে না, অত্যাচার ভেঙে পড়বে। "They may not readily expose themselves to the terrible retaliation of a highly resourceful bureaucracy by any active violence." কিন্তু প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের পথে গেলে, "in fighting the fight of faith and principle they will not stand back even with the direct consequences looking them fully in the face"—(বিশ্বাস ও নীতির জন্য সংগ্রাম করিতে নামিলে সংগ্রামের সাক্ষাৎ ফল চোখে দেখিয়াও তাহারা পশ্চাৎপদ হইবে না।)

সংক্ষেপে বলা যায়, ইনটেলেকচুয়াল দলের সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে আপত্তির মূলে রয়েছে পলিসি, প্রিনসিপল নয়।

মিঃ গাঙ্গুলী কি বলিতে যাইতেছিলেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী বাধা দিয়া বলিলেন, লেট মি ফিনিশ। নেশনালিষ্টদের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় আইটেম মাস কনট্যাক্ট বলতে তাঁরা কি বোঝেন, কেন মাস কনট্যাক্ট আবশ্যক দেখা যাক।

"The arm of an unarmed people" (নিরস্ত্র জাতির অস্ত্র) হেডিং দিয়ে বন্দেমাতরম বলছে—দেশপ্রেমিক প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রথম কর্ত্তব্য "to educate and organise the will of the people." (জাতির ইচ্ছাকে শিক্ষিত করা ও সংহত করা।) স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যত বেশী লোকের প্রাণে জাগবে, স্বাধীনতালাভ তত এগিয়ে আসবে। যে দেশে বিদেশীর সংখ্যা সমুদ্রে বিন্দুবৎ সেদেশে "the organised will of the people is a force to be reckoned with" (জাতির সংহত ইচ্ছাশক্তি উপেক্ষা করিবার জিনিষ নহে।) মাস কনট্যাক্ট সম্বন্ধে নবশক্তি এই মর্ম্মে বলছে, "এখন প্রত্যেক দেশপ্রেমিক পার্টির কর্ত্তব্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা, তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা, তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা। এই উপায়ে তাদের ভালবাসা পেতে হবে। ভারতের লোকসংখ্যা এত বেশী তবু দেশের এই দুর্দ্দশা কেন? এর কারণ দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, দেশ বা দেশপ্রেমের কোন ধারণা নেই তাদের। তাদের জাগিয়ে তুলতে না পারলে পাবার মত কিছু আমরা পাব না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত দেশপ্রেমিক লোকের চেষ্টায় দেশের স্বাধীনতালাভ করা অসম্ভব ও দুরাশা মাত্র। যে কাজের কথা বলা হ'ল একটি যথার্থ জাতীয় মহাসভা গঠন করে সেই মহাসভাকে এই কাজের ভার নিতে হবে। নেশনালিষ্টদের দাবি তারা মডারেট-ডোমিনেটেড বর্ত্তমান কংগ্রেসকে প্রকৃত জাতীয় মহামণ্ডলে পরিণত করবে।"

মিঃ গাঙ্গুলী অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন—চক্রবর্ত্তী, তোমার বক্তৃতা শেষ হ'ল?

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—ইয়েস। নেশনালিষ্ট স্কুলের প্যাসিভ রেজিষ্টান্স ও মাস কণ্টাক্টের প্রোগ্রাম এই পর্য্যন্ত এসে পৌছেছে। এই প্রোগ্রাম তাঁরা কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ওয়ার্ক আউট করতে চান। এর কারণ বাইশ বছর কাজ করে কংগ্রেসের একটা প্রেষ্টিজ ও গুডউইল হয়েছে। নেশনালিষ্টরা মডারেটদের হাত থেকে কংগ্রেসকে বের করে আনতে না পারলে প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের যে অলটারনেটিভ পন্থার কথা বলা হয়েছে—

মিঃ গাঙ্গুলী বাধা দিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, ডাঃ চক্রবর্ত্তী চেয়ারে ঠেস দিয়া বলিলেন—যুগান্তর প্যাসিভ রেজিষ্টান্সের থিওরি এ্যাটাক করেছে। এক্সট্রিমিষ্ট দলের লেফট-উইং হচ্ছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্কার দল; তাদের মতে শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও গণ-সংযোগে কিছু হবে না, সশস্ত্র বিপ্লব না হলে লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না। এদিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রচারক রাইট উইং দলের মধ্যেও কিছু চাঞ্চল্য এসেছে। বন্দেমাতরমের লাল দাগ দেওয়া অংশটুকু পড়ে দেখ।

তিনি ড্রয়ার হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া মিঃ ডাটার হাতে দিলেন। মিঃ ডাটা পড়িলেন—

"We do not affect to believe that we can discover any solution of these great problems or any sure line of policy by which the tangled issues of so immense a movement can be kept free from the possibility of anarchy in future. Anarchy will come. This peaceful and inert nature is going to be rudely awakened from a century of passivity and flung into an world-shaking turmoil out of which it will come transformed, strengthened and purified. The British peace of the last fifty years was like the quiet green grass and flowers covering the corruption of a sepulchre. There is another chaos which is the violent assertion of life and it is this chaos into which India is being hurried today. We cannot repine at the change but are rather ready to welcome the pangs which help, the storm which purifies, the destruction which renovates."

(আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করি না যে, এই সকল বৃহৎ সমস্যার আমরা এমন কোন সমাধান আবিষ্কার করিতে পারি অথবা

এমন কোন নিশ্চিত নীতি উদ্ভাবন করিতে পারি যাহার সাহায্যে এত বড় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত জটিল প্রশ্নগুলিকে ভবিষ্যতে এনার্কির সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখা যাইতে পারে। এনার্কি আসিবে। এই শান্তিপ্রিয়, জড়জাতির শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তা হইতে রূঢ় জাগরণ হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীকে কম্পিত করিবে এমন এক বিক্ষোভের আবর্ত্তে জাতি নিক্ষিপ্ত হইতে চলিয়াছে। রূপান্তরিত বলশালী ও শোধিত হইয়া জাতি এই বিক্ষোভের আবর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিবে। গত পঞ্চাশ বৎসরের ব্রিটিশ-স্থাপিত শান্তি পূতিগন্ধ কবরের আচ্ছাদন-স্বরূপ শান্ত, শ্যামল তৃণদলের মত ছিল। আর এক শ্রেণীর অশান্তি আছে যাহা জীবনের উগ্র অভিব্যক্তি; এই অশান্তির মুখে ভারতবর্ষ আজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য অযথা দুঃখ করি না, বরং যে বেদনা ফল-প্রসবিনী, যে ঝটিকা জঞ্জাল দূর করে, যে প্রলয় নবজন্মের সূচনা করে আমরা তাহা বরণ করিয়া লইব।)

মিঃ গাঙ্গুলী বলিলেন—তোমার শেষ হ'ল? এবার আমার উত্তর শুনবে?

মিঃ ডাটা—আজ মুলতুবি থাক, অনেক বেলা হয়েছে।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাধা পাইয়া মিঃ গাঙ্গুলী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনিও উঠিলেন। উভয়ে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইতে ডাঃ চক্রবর্ত্তী সিগার ধরাইয়া ভিতরের খোলা বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। ভবেশকে দেখিয়া বলিলেন—তুমি কতক্ষণ এসেছ?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—অনেকক্ষণ।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে ভবেশ চিঠির কথা বলিল।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—কৃষ্ণবর্ম্মার নামে একখানা চিঠি নিয়েছ না? ভাল কথা।

কৃষ্ণবর্ম্মা পোলিটিকাল মেশিনারী সংগ্রহ করবার জন্য কয়েক হাজার টাকার ষ্টাইপেণ্ড দেবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, দেখেছ? আমি যা খবর পেয়েছি তাতে মনে হয় লণ্ডন থেকে কৃষ্ণবর্ম্মাকে প্যারিসে পালাতে হবে শীঘ্র। ইণ্ডিয়া অফিস তার পেছনে লেগেছে।

ভবেশ—হরদয়াল নামে একটি পাঞ্জাবী ছেলে ষ্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে গিয়েছিল। কাগজে দেখলাম সে নাকি ষ্টেট স্কলার-শিপ ছেড়ে দিয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—ছোকরা কৃষ্ণবর্ম্মার সঙ্গে জুটেছে। ষ্টাটগার্টে এবার সোশিয়ালিষ্টদের কংগ্রেসে ভারতের জাতীয় পতাকা নাকি উড়ানো হয়েছিল খবর পেলাম। মাডাম কামা কংগ্রেসে যে স্পীচ দিয়েছিলেন তার কপিও পাঠিয়েছে। একখানা কপি নবশক্তি কাগজে পাঠিয়েছিলাম, অনুবাদ করে ছেপেছে।

ভবেশ—আমাকে মিঃ হিণ্ডম্যানের নামে একখানা চিঠি দিন। আর অক্সফোর্ডে যাঁদের সঙ্গে জানাশোনা আছে এমন কোন লোকের নামে একখানা চিঠি চাই।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী—আমি চিঠি লিখে রাখছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবার সময় নিয়ে যেও।

তিনি লাইব্রেরি-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে আহার প্রস্তুত হইবার খবর আসিল। আহারান্তে ভবেশ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর লিখিত পরিচয়-পত্রগুলি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বলিল—সম্ভব হলে বোম্বে রওনা হবার আগে দেখা করে যাব।

২৩

মহেন্দ্র তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া বসিয়া দেবানন্দের কথা ভাবিতেছিল।

পরশু গোলদীঘির পাশ দিয়া যাইবার সময়ে একটি লোককে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হয়। কিছুক্ষণ তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া সে লোকটিকে বলিল, মশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।

লোকটি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, আমাকে? আমি ত আপনাকে চিনি না।

গলার স্বর শুনিয়া নিঃসন্দেহ হইয়া মহেন্দ্র বলিল, খুব চেন তুমি আমাকে দেবানন্দ। আমার ত তোমার মত লম্বা দাড়ি নেই।

দেবানন্দ দাঁড়াইল। বলিল, কেমন আছ মহেন্দ্র? আমার একটু তাড়া আছে ভাই, চলি।

মহেন্দ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল তোমার একখানা চিঠি রয়েছে আমার কাছে। কত খুঁজেছি তোমাকে চিঠিখানা দেবার জন্য। আমার সঙ্গে হোষ্টেলে এস।

দেবানন্দ—কার চিঠি?

মহেন্দ্র কি মনে করিয়া এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া বলিল, কার চিঠি তুমি বলতে পারবে। তোমার খোঁজ না পেয়ে ভবেশের হাতে চিঠিখানা দিতে গিয়েছিলাম, তাকে বাড়ী পেলাম না। দিন পাঁচ ছয় আগে আবার গিয়েছিলাম। শুনলাম সে ডাঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিলেত চলে গেছে।

দেবানন্দ—ডাঃ চক্রবর্ত্তীও বিলেত গেলেন?

মহেন্দ্র—ভবেশের এক মামাতো ভাই বলল, ভবেশ একাই যাবে স্থির ছিল। রওনা হবার দিনচারেক আগে নাকি ডাঃ চক্রবর্ত্তীর এক চিঠি পেয়ে সে যাওয়া বন্ধ রাখে। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী হঠাৎ কলেরা হয়ে মারা গেলেন। ভদ্রলোক নাকি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। হপ্তাখানেক পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভবেশ অন্য একটা জাহাজে বিলাত রওনা হয়ে গিয়েছে।

দেবানন্দ বলিল, ডাঃ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী মারা গেলেন!

মহেন্দ্র—হাঁ, শুনলাম ভালমানুষ, হঠাৎ কলেরা হয়ে এক দিনের মধ্যে মারা গেলেন। ভবেশের ভাই বলল, ভবেশ খবর পেয়ে নাকি ছেলেমানুষের মত কেঁদেছিল। ভবেশকে উনি খুব স্নেহ করতেন।

দেবানন্দের মনে পড়িল সেই রাত্রের কথা যেদিন ডাঃ চক্রবর্তী তাহাকে চাঁপাতলার বাড়ী হইতে ল্যান্সডাউন রোডে নিজের গৃহে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, মনে পড়িল মৃণালের স্নিগ্ধ, সুন্দর, স্নেহ-বিগলিত মুখের চেহারা যখন অনেক রাত্রে তাহার মাথায়, কপালে সন্তর্পণে একবার হাত বুলাইয়া তিনি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সে নিজের মনে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, ডাঃ চক্রবর্তীর স্ত্রী মারা গেলেন।

মহেন্দ্র তাহার দিকে চাহিল। বলিল, তোমার চিঠিখানা আমার কাছে পড়ে রয়েছে, চল।

দেবানন্দ বলিল, আমি হোষ্টেলে যেতে পারব না।

মহেন্দ্র—আমার ঘরে কেউ নেই এখন। হরিশ বলে একটি ছেলে থাকে, কাল সে তার মামাবাড়ী গিয়েছে। তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না।

মহেন্দ্র এক রকম জোরজবরদস্তি করিয়া দেবানন্দকে তাহাদের পুরাতন ঘরে ধরিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তার পর কিটির চিঠি ও আংটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া দেবানন্দের হাতে দিল।

চিঠিখানা পড়িয়া ও আংটিটির দিকে একবার চাহিয়া দেবানন্দ সেগুলি মহেন্দ্রের বিছানার উপর রাখিল। নিজের মনে কি চিন্তা করিয়া বলিল, এতে আমার কিছু প্রয়োজন নেই মহেন্দ্র। তোমার কাছে রাখতে পার, নয়ত যেমন লিখেছে সেই রকম ব্যবস্থা কর।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এবার যাই। আমার হাতে অনেক কাজ।

মহেন্দ্র তখনই তাহাকে ছাড়িল না। খাবার আনাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া গোলদীঘি পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল, দেবানন্দ বিদায় লইবার সময়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুই এমন বদলে গেছিস দেবু, ভাল করে একটা কথা পর্যন্ত বললি না আমার সঙ্গে।

দেবানন্দ একটু হাসিল। বলিল, আচ্ছা, এবার যাই ভাই।

সে চলিয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে দেখা গেল মহেন্দ্র সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্র কোলের উপর বই খুলিয়া বসিয়া দেবানন্দের কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, কি কঠিন হইয়াছে উহার মন। কিটির চিঠি ও আংটি এখনও পড়িয়া রহিয়াছে তাহার কাছে, এগুলি লইয়া সে কি করিবে এখনও স্থির করিতে পারে নাই।

হরিশ বেড়াইয়া ঘরে ঢুকিল। জামাজুতা খুলিয়া হাতমুখ ধুইয়া সে নিজের সিটে বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে সে লক্ষ্য করিল মহেন্দ্র কোলের বই খুলিয়া কি ভাবিতেছে, পড়িতেছে না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, —আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি, শুনবেন মহেন্দ্রবাবু?

মহেন্দ্র বলিল, শুনব বৈ কি। কি কথা?

হরিশ—কোন কাজের কথা নয়। আমার নিজের মনে একটা চিন্তা ঘুরছে কিছুদিন থেকে, সেই কথা। হোষ্টেলে এত ছেলে থাকে কিন্তু কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। একদল ছেলে শুধু খেলাধুলোর কথা নিয়ে মেতে থাকে। একদল ছেলে বেথুন স্কুল ও অন্য বালিকা বিদ্যালয়গুলির গাড়ীর মেয়েদের কথা, থিয়েটারের কথা ও সাজপোশাকের কথা নিয়ে মেতে আছে। ভাল ছেলে, মানে সিরীয়াস ছেলে খুব কম। যারা স্বদেশীওয়ালা তারা কাজের চাইতে যেন অকাজে বেশী উৎসাহী। এরা রাস্তায় বেড়িয়ে হট্টগোল করে, ছেলেদের বই-খাতা কেড়ে নিয়ে ট্রামের তলায় ফেলে দেয়। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, এদের কে বড় তাই নিয়ে তর্ক, হাতাহাতি করে, পটকা মেরে ইংরেজকে দেশছাড়া করবে এই সব বড় বড় কথা বলে। আমি গরীবের ছেলে বলে অনেক সময় আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না।

মহেন্দ্র—ওদের কথা ছেড়ে দিন, আপনি কি বলতে চাই-ছিলেন?

হরিশ একটু হাসিল। বলিল,—হাঁ, বলছিলাম কি আমি গরীবের ছেলে, কষ্টে পড়াশোনা চালাচ্ছি। লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করব, মা, ভাইবোনের কষ্ট দূর করব—তারা এই চায়, আমিও চাই। কিন্তু কিছুদিন থেকে মনটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশ বুঝি আমার মত অবস্থার ছেলে এসব চিন্তা করতে নাই, কিন্তু মাথা থেকে এ সব চিন্তা দূর করতে পারছি না।

মহেন্দ্র—কি সব চিন্তা বলুন ত।

হরিশ—বললে ভারি বড় কথা বলে মনে হবে। সেদিন কাগজে পড়লাম সাণ্ডার্স বলে একটা সাহেব লাথি মেরে একটা কুলির মৃত্যু ঘটিয়েছে। বিচারে তার জরিমানা হয়েছে দশ টাকা! এদিকে মিথ্যা সিডিশানের চার্জে, মিথ্যা স্বদেশী মোকদ্দমায় জড়িয়ে আমাদের দেশের লোককে দু'চার বছরের জন্য জেলে পাঠাতে গবর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করে না। এ গেল একটা দিক। তারপর দেখছি কাউকে কোন ভাল কাজ এরা করতে দেবে না। মদ খাওয়া খারাপ জিনিস সকলেই জানে। গরীব লোকের পক্ষে আরও খারাপ। পুনায় ভলাণ্টিয়াররা গরীব লোকের মদ খাওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তাদের ধরে ধরে জেলে পুরছে।

একটু থামিয়া হরিশ বলিল—আপনি অনুশীলন সমিতির নাম শুনেছেন?

প্রশ্ন শুনিয়া মহেন্দ্র মনে মনে একটু হাসিল। প্রকাশ্যে বলিল—শুনেছি।

হরিশ—শুনেছি এই সমিতির লোকেরা লোকসেবার দ্বারা লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করতে চেষ্টা করে। দেশের উন্নতির জন্য এই সহযোগিতা দরকার। দুর্ভিক্ষের সময় যে সব ভদ্রঘরের পুরুষ ও মেয়ে গবর্ণমেণ্টের রিলিফ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন না সম্মানহানির ভয়ে, তাঁদের সাহায্যের জন্য অনুশীলন সমিতি গৌরীশঙ্কর দেকে সভাপতি করে একটা কমিটি গঠন

করেছে। উড়িষ্যায় কেমিন মিলিকের ব্যাপারে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা যে কাজ করেছে—

মহেন্দ্র—কিন্তু উড়িষ্যায় বাংলার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের সেবা নিলেও বাঙালীর বন্দেমাতরম, স্বদেশী ও বয়কটের বিরোধী; তাঁরা বলেন ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে উড়িষ্যার লোকের কোন সম্পর্ক নাই।

হরিশ—একথা কে বললে?

মহেন্দ্র—উৎকল কনফারেন্সে এই রকম রেজোলুশন পাশ হয়েছে। উৎকল দীপিকা ও সংবাদবাহিক নামে উড়িয়া দুখানা কাগজে কনফারেন্সের বিস্তারিত বিবরণ বের হয়েছে শুনেছি।

কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তারপর হরিশ বলিল—এ সব কথা যাক। আমি অনুশীলন সমিতির লোক-সেবার উল্লেখ করেছিলাম অন্য কথা ভেবে। আমি যা বলতে চাই আপনাকে ঠিকমত বোঝাতে পারছি না। আমার এক ফ্রেণ্ডের কথা বলছি। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়।

—তার বেশ-ভূষা সন্ন্যাসীর মত কিন্তু সে সাধন ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, তীর্থে তীর্থে ঘুরেও বেড়ায় না। কোথায় একটা গ্রামে, গ্রামের নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, একটা আশ্রম গড়েছে।

খানিকটা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে একটা ঘর তুলেছে। শাক-সব্জীর বাগান করেছে। গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে বড় যায় না। হিন্দু-মুসলমান চাষাভুষো শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়, রোগের চিকিৎসা করে, বিপদ-আপদে পরামর্শ দেয়, সেবাধর্ম্মের, পরস্পরকে সাহায্য করবার উপদেশ দেয়। শুনেছি ভদ্রঘরের ছেলেরা আপনা থেকে কয়েক জন এসে জুটেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার আইডিয়াটা কি? সে বলল, আইডিয়া এমন কিছু নয়। আমি শহরের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ছিলাম। শহুরে পলিটিক্সের উইকনেস আমি জানি। আমার আইডিয়া হচ্ছে সমাজের নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে পরোক্ষভাবে তাদের কিছু পলিটিক্যাল এডুকেশন দেওয়া। এদের পুরাতন চিন্তার ধারা বদলাবার ব্যবস্থা না করলে আমাদের কাগুজে আন্দোলনে স্থায়ী কোন ফল পাওয়া যাবে না।

মহেন্দ্র মনোযোগ দিয়া এই নূতন ধরণের সন্ন্যাসীর কথা শুনিতেছিল। সে বলিল—আপনি এ সব কথা চিন্তা করেন ভাবি নি। ভাল ছেলে, সারাদিন বই মুখে করে বসে থাকেন এই জানতাম।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে হরিশ পড়িতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে বরাবর ধর্ম্মভাব প্রবল। বি-এ পাস করিয়া সে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিবে এই ইচ্ছা পোষণ করিত। কিছুদিন হইতে জাতীয় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত কোনপ্রকার গঠনমূলক কাজে আপনাকে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল তাহার মনে, কিন্তু কোন পথ স্থির করিতে পারে নাই। হরিশের মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সে নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে মহেন্দ্র সন্ধ্যার দিকে বেড়াইয়া ফিরিয়া ঘরে ঢুকিতেছে হরিশ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। বলিল—আপনি কি এখনই পড়তে বসবেন?

মহেন্দ্র বলিল—কিছু কথা আছে? বসুন।

হরিশ বসিল। বলিল—ঢাকায় আমার এক ফ্রেণ্ড, ফ্রেণ্ড মানে কিছুদিন একসঙ্গে পড়েছিলাম, দুখানা বই বিক্রি করবার জন্য সিডিশানের অভিযোগে ধরা পড়েছে খবর পেলাম।

মহেন্দ্র—কি বই?

হরিশ—বর্ত্তমান রণনীতি ও মুক্তি কোন পথে।

মহেন্দ্র—কলকাতায় শুনতে পাই এই বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হচ্ছে। এখানে ত কাউকে এরেষ্ট করা হয় নাই।

হরিশ—ঢাকায় অনেক কুস্তি, লাঠিখেলার আখড়া টাখড়া আছে আবার অনুশীলন সমিতি, এ সমিতি ও সমিতির আড্ডা। পুলিসের দৃষ্টি সেখানে বেশী প্রখর। পূর্ব্ববঙ্গে সিডিশানের আইনই আলাদা।

মহেন্দ্র—কথাটা মন্দ বলেন নাই। মাণিকগঞ্জের ব্যাপারটা দেখুন না। মহকুমা-হাকিম নিমন্ত্রিত হয়ে বসে অনুশীলন সমিতির মেম্বারদের লাঠিখেলা দেখলেন, খেলোয়াড়দের বাহবা দিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হবামাত্র তাঁর মুখোস ফেলে দিয়ে খেলোয়াড়দের শান্তিভঙ্গকারী বলে চালান দিলেন। অভিযোগ হচ্ছে—মানুষের জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক বেপরোয়া ও অসতর্ক কাজ!

গলার স্বর নামাইয়া হরিশ বলিল—মশায়, একদল লোক সত্যি ক্ষেপে গেছে। পরশু সেই খবর নিয়ে আপনার সঙ্গে কত হাসাহাসি করলাম—

মহেন্দ্র—কোন্ খবর?

হরিশ—হিতবাদীতে বেরিয়েছে সেই যে খবর। আমেরিকায় যে সব ভারতবাসী আছে তারা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র কিনে দেশে পাঠাচ্ছে। দেশের লোক ও দেশীয় রাজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক প্রেসে নাকি এই গুজবটা ছাপিয়ে লিখেছে কলকাতার পুলিস কমিশনার অপরাধীদের ধরবার চেষ্টা করছে। লেসলীজ উইকলি বলে আর একখানা কাগজ নাকি লিখেছে—ভারতবর্ষে শীঘ্রই ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আরম্ভ হবে। জাপান এডভার্টাইজারও নাকি একথা লিখেছে।

মহেন্দ্র—এ সব খবর আমেরিকা ও জাপানের কাগজ এদেশ থেকেই সংগ্রহ করে। ইংলিশম্যান, পায়োনীয়ার, রয়টার, লণ্ডন টাইমস এই বিপ্লব বা বিদ্রোহের খবর ছড়াচ্ছে এদেশে গবর্ণমেণ্টের দমননীতি যাতে আরও উগ্র হয়।

হরিশ—সেদিন হিতবাদীতে এই সব খবর পড়ে আমি গাঁজাখুরি বলে খুব হেসেছিলাম মনে আছে। কিন্তু আজ আমার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে।

মহেন্দ্র—কি ব্যাপার বলুন ত।

হরিশ—বলছি। আজ সকালে ডাকে একটা প্যাকেট এল আমার কাছে। কে পাঠিয়েছে ভগবান জানেন। দেখি যুগান্তর আর ঐ জাতীয় একখানা কাগজ রয়েছে। পড়ে আমার চক্ষুস্থির।

মহেন্দ্র—কি লিখেছে যুগান্তর?

হরিশ উঠিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর পকেট হইতে খানতিনেক কাগজ বাহির করিয়া বলিল শুনুন যুগান্তর কি লিখেছে—

"আমাদের সম্মুখে তিনটি কর্তব্য রহিয়াছে। প্রথম কর্তব্য শয়তানের রসদ বন্ধ করিয়া তাহাকে শুকাইয়া মারা। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। এই রসদ আমাদের নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিতে হইবে। দ্বিতীয় কর্তব্য লোক সংগ্রহ। এই কাজ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। তৃতীয় কর্তব্য শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।" তারপর শুনুন নবশক্তি লিখছে, "মহাভারতে রাজধর্ম পর্ব্বাধ্যায়ে আছে রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাদের কর্তব্য শাসনভার আপনাদের হাতে লইয়া প্রজার শত্রু রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হত্যা করিবে। এই কাজে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না।" অন্য তারিখের ঐ কাগজে আবার লিখছে—"তোমরা প্রস্তুত হও। সেদিন আলিপুরের ট্রামে যেমন কুকুর তেমন মুগুর নীতি অনুসারে বাঙালীরা ফিরিঙ্গীকে শিক্ষা দিয়াছে। আজকাল ফিরিঙ্গীরা পকেটে রিভলবার লইয়া রাস্তায় বাহির হয়। আমাদের কর্তব্য সঙ্গে অস্ত্র লইয়া চলাফেরা করা।" সব চেয়ে সাংঘাতিক কথা লিখেছে আর একখানা যুগান্তর। বলছে—"যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য, সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে, অল্প সময়ের মধ্যে শত্রু নিপাত করিতে হইলে কামান, বন্দুক, গোলা-গুলির প্রয়োজন। একটা গোটা জাতির ভাগ্য স্থির করিতে হইলে গোলাগুলির প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে হইলে অস্ত্রশস্ত্রের সমারোহ কি তেমন প্রয়োজন? সমস্ত জাতির প্রতি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য লড়াই আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত কি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা লওয়া বন্ধ থাকিবে? অত্যাচারীকে শাস্তি দিবার জন্য নিরস্ত্র ব্যক্তিরা যে সকল আয়োজন করে তাহাই বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি। আমেরিকা, রাশিয়া, ইটালী ও ফ্রান্সে ইহা পরিষ্কার দেখা গিয়াছে। আততায়ীর প্রাণ লওয়া পবিত্র কর্তব্য। আঘাত প্রচণ্ড হইলে, রক্তের বদলে রক্তপাতের ইচ্ছা প্রবল হইলে একটি একটি করিয়া শত্রু নিপাত করা কত সহজ। প্রতিহিংসা লইবার প্রতিটি সুযোগের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও সব বাধা দূর করিবার প্রবল আগ্রহ থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। শাসকের প্রতি শত্রুতা ও দেশমাতৃকার প্রতি নিষ্ঠা এক জিনিস। সাধুতার ছদ্মবেশে গোপন শাঠ্যের তীক্ষ্ণ ছুরিকা, আতিথেয়তার অমৃত পরিবেশনের কপটতার আড়ালে তীক্ষ্ণ বিষ দিবার গোপন আয়োজন, কপট-ভক্তির আড়ালে বিশ্বাসঘাতকতা—এইগুলি নিরস্ত্রের প্রতিহিংসা লইবার উপায়।"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া হরিশ বলিল—সাহস দেখেছেন এদের?

বাহিরে দরজার সম্মুখে পায়ের শব্দ শোনা গেল। হরিশ তাড়াতাড়ি কাগজগুলি পকেটে পুরিল।

কয়েকদিন পরে সংবাদ বাহির হইল কুষ্টিয়াতে মিশনরী মিঃ হিগিন্স বোথামকে কে গুলি করিয়াছে। মিশনরিটির সরকারী গুপ্তচর বলিয়া কুখ্যাতি ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকালে হিন্দু ও মুসল-মান শ্রোতাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া বিদ্রূপ করিবার অভ্যাসটিও ছিল। গবর্ণমেণ্ট কুষ্টিয়ায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পুলিস পাঠাইলেন অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য। বহু পুলিস সন্ন্যাসী, ভিখারী, পাচকের ছদ্মবেশে স্থানীয় লোকের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল হত্যাকারীর সন্ধান পাইবার জন্য। ইহার পর শিবপুর ডাকাতির সংবাদে একটু হৈ চৈ পড়িল। শিবপুর ও হাওড়ার ডোমজুর থানার ঝাপড়দার ডাকাতির ব্যাপারে ভদ্রঘরের স্বদেশী যুবকদের লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইল।

কিছুদিন হইতে চন্দননগরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ডিটেকটিভদের ঘাঁটি বসিয়াছিল। তাহারা চন্দননগর পোষ্ট আপিসে বসিয়া চিঠিপত্র খুলিয়া পড়িত। বিলাত হইতে ডিটেকটিভের দল এদেশে আনা হইয়াছিল। দেশী ডিটেকটিভ অফিসারদের গবর্ণমেণ্ট পুরাপুরি বিশ্বাস করিতেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের পরামর্শে চন্দননগরের মেয়র মঃ তার্দিভিয়েল আর্ম্মস এক্ট জারি করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন চন্দননগর বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র-শস্ত্র আমদানির একটি ঘাঁটি। ৩রা এপ্রিল মঃ তার্দিভিয়েলের শয়ন-কক্ষে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল।

চন্দননগরে মেয়রের কক্ষে বোমা নিক্ষেপের সংবাদে চারিদিকের উত্তেজনা শান্ত হইবার আগে বাড়ীতে অসুখের অজুহাতে নিজের জিনিসপত্র লইয়া মহেন্দ্র দেশে চলিয়া গেল। তাহার পরীক্ষার সময় আসিয়া পড়িল, কিন্তু সে আর ফিরিল না। ক্রমশঃ

গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

সিন্ধু মিশ্র— একতালা

জীবনে পেয়েছি যা' তোমার আশীর্ব্বাদ
চেয়েছি পাইনি যা' তোমার আশীর্ব্বাদ !
কত তুমি দিলে
জীবন ভরিলে
রূপে রসে গানে—
তোমার আশীর্ব্বাদ !
দুঃখ ঠেলেছে দ্বার—
সেও তো তোমার দান
পরশে বারেবার
খুলেছ দু' নয়ান !
নেই কিছু বাকি
রয়েছ সব ঢাকি
হৃদয়ে জানিতে দাও
যাচি এ আশীর্ব্বাদ ॥

0			১			২´			৩			॥
সা	সা	সা	রা	ধ্া	ণ্া	রা	-া	-া	-া	-া	-া	I
জী	ব	নে	পে	য়ে	ছি	যা	০	০	০	০	০	
0			১			২´			৩			
রা	রা	-জ্ঞা	রা	রা	-া	সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
তো	মা	র্	আ	শী	র্	বা	০	০	০	দ্	০	
0			১			২´			৩			
সা	ণা	ণা	ধা	-ণা	ধা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	I
চে	য়ে	ছি	পা	ই	নি	যা	০	০	০	০	০	
0			১			২´			৩			
মা	মা	-া	জ্ঞা	রা	-া	সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
তো	মা	র্	আ	শী	র্	বা	০	০	০	দ্	০	
0			১			২´			৩			
মা	পা	পা	ধা	-নধা	না	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
ক	ত	তু	মি	০০	দি	লে	০	০	০	০	০	

0 | ১ | ২´ | ৩
র্রা র্রা র্রা | র্মর্মা -র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া | -া -া -া } I
জী ব ন | ভ০ ০ প্রি | লে ০ ০ | ০ ০ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
পা র্সা র্সা | র্সণা -া ধা | পা -া -া | -া -া -া I
রূ পে র | সে ০ গা | নে ০ ০ | ০ ০ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
মা মা -া | জ্ঞা রা -া | সা -া -া | -া -া -া II
তো মা র্ | আ শী র্ | বা ০ ০ | ০ দ্ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
II { ণ্া -া ণ্া | ধ্া ধ্া ধ্া | প্া -া -া | -া -া -া I
দুঃ ০ খ | ঠে লে ছে | ঘা ০ ০ | ০ র্ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
প্া -া ধ্া | ন্া ধন্া -সা | সা -া -া | -া -া -া I
সে ও তো | তো মা০ র্ | দা ০ ০ | ০ ন্ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
রা রা রা | রা -সা রা | মা -জ্ঞা -া | -া -া -া I
প র শে | বা ০ রে | বা ০ ০ | ০ র্ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
রা মা মা | সজ্ঞা -া রা | সা -া -া | -া -া -া } II
খু লে ছ | দু ০ ন | য়া ০ ০ | ০ ন্ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
I { পা -া পা | ধা -নধা না | সা -া -া | -া -া -া I
নে ই কি | ছু ০০ বা | কি ০ ০ | ০ ০ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
I র্রা র্রা র্রা | র্মর্মা -র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া | -া -া -া } II
র য়ে ছ | স০ ব্ টা | কি ০ ০ | ০ ০ ০

0 | ১ | ২´ | ৩
I { পা র্সা র্সা | ণা ণা ধা | পা -া -া | -া -া -া I
হৃ দ য়ে | জা নি তে | ছা ০ ০ | ০ ও ০

0 | ১ | ২´ | ৩
মা মা মা | জ্ঞা রা -া | সা -া -া | -া -া -া } II
বা চি এ | আ শী র্ | বা ০ ০ | ০ দ্ ০

আর্টের ধর্ম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের চোখের সামনে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলেছে। তাদের উপর আমাদের কোনই হাত নেই। আমাদেরই দৃষ্টির সম্মুখে কত গোবিন্দলাল কামনায় অন্ধ হয়ে ভ্রমরের সাজানো বাগানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে এবং সেই আগুনে নিজে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! কোন ক্ষমতা নেই আমাদের গোবিন্দলালকে মৃত্যুর জাল থেকে রক্ষা করবার। কুলত্যাগিনী কত এনা কেরেনিনা রেলগাড়ীর তলায় আত্মহত্যা করছে! হতভাগিনী এনা! সমাজ-বিরোধী কাজ করেছে বলে রাগ হয় না তার উপরে। তার রক্তাক্ত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস। জীবনে অহরহ যা ঘটছে উপন্যাসে তারই ছবি এঁকেছেন টলস্টয়। এনার পদস্খলন তাকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মঘাতিনী করেছে। জগৎ যদি আমাদের ইচ্ছায় চালিত হ'ত তা হলে এনাকে রেলগাড়ীর তলায় কখনই আমরা মরতে দিতাম না; টমাস হার্ডির 'টেস্'কেও নরহত্যার অভিযোগে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হ'ত না। প্রভাতের শিশির-স্নাত পুষ্পের মত নির্ম্মল কুন্দনন্দিনীকেও কি বিষপানে আত্মহত্যা করতে দিতাম? উন্মার্গগামী গোবিন্দলালকে রোহিণীর মোহ থেকে মুক্ত করে ভ্রমরের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিয়ে দিতাম। আমাদের ইচ্ছায় যদি সংসার চলত তবে 'চোখের বালি'র মোহগ্রস্ত মহেন্দ্র আশার মত মেয়েকে কখনই এত দুঃখ দিতে পারত না, প্রেমিক দেবদাসের দু'চোখের এত জল ঝরত না, পাগলিনী শৈবলিনী অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এমন নরক-যন্ত্রণা সইত না। পৃথিবীতে অহরহ যে সমস্ত ব্যাপার ঘটে চলেছে তাদের উপরে শিল্পীদের হাত কোথায়? তারা ত শিল্পীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন পরোয়া করে না। ঘটনা-প্রবাহ যেন কোন্ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির নিগূঢ় ইঙ্গিতে ঘটে চলেছে। শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সকল ঘটনাকে অসীম কৌতূহলের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করবার শক্তিতে। কেবল পর্য্যবেক্ষণ করবার শক্তিতে নয়, ঘটনার পারম্পর্য্যের মধ্যে কার্য্য-কারণের সূক্ষ্ম সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাতেও তাঁদের প্রতিভার বিশিষ্টতা।

আমাদের জীবনে কত না ঘটনা ঘটে। কামনায় অন্ধ হয়ে কত কাজ আমরা করে ফেলি। ফলে জীবন আমাদের বিষিয়ে ওঠে। কাম্যবস্তুর পিছনে ছুটে ছুটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অন্তরে অসীম শূন্যতা নিয়ে ধুলায় আমরা লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদি। কামনার পিছনে ছুটে মৃত্যুর জালে জড়িয়ে যাবার এই যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা থেকে সংসারে কয়জনেরই বা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়? হাঁসের পাখার উপর দিয়ে যেমন জল চলে যায় আমাদের অধিকাংশের জীবনের উপর দিয়েও তেমনি অভিজ্ঞতার স্রোত বয়ে যায়। তারা আমাদিগকে নূতন কিছু শেখায় না, আমাদিগকে কোন নূতন আলোর সন্ধান দেয় না। একজন টলস্টয়ের, বঙ্কিম-চন্দ্রের অথবা রোমাঁ রলাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের জীবনে যা-কিছু অভিজ্ঞতা তাঁরা সংগ্রহ করেন সেগুলি বিফলে যায় না। পুণ্য-পাপের, পতন-উত্থানের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁদের অন্তরকে সত্যের দিকে উদ্ঘাটিত করে দেয়, উন্মীলিত করে দেয় তাঁদের জ্ঞান-চক্ষু। ঘটনা-প্রবাহ থেকে সত্যকে গ্রহণ করবার যেমন তাঁরা শক্তি রাখেন তেমনই শক্তি রাখেন তাঁদের উপলব্ধিগত সত্যকে ভাষার যাদু দিয়ে পাঠক-পাঠিকার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার।

একথা চিরকালের সত্য যে, সত্য শিব এবং সুন্দরের মধ্যে সুন্দরই আমাদের মনকে বেশী করে টানে। সৌন্দর্য্যের জন্য যে পিপাসা মানুষের আত্মায় সে পিপাসা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সুন্দরকেই আমাদের প্রাণ সর্ব্বত্র খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই জন্যই বাঁশীওয়ালাদের পিছনে ছুটতে আমাদের কখনও ক্লান্তি নেই। আর্টের মধ্যে সৌন্দর্য্যেরই অভিব্যক্তি। আর্টিষ্ট সুন্দরের পূজারী। তাই আর্টের জন্য আমাদের যে ক্ষুধা সে ক্ষুধা অন্নের ক্ষুধার মতই দুর্ব্বার। যদি কেউ তর্ক করে—যেহেতু ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ চুরি করে, নরহত্যা পর্য্যন্ত করে অতএব মানুষের খাওয়ার অভ্যাস বন্ধ করে দেওয়া উচিত তবে তার উক্তিকে অযৌক্তিক বলবার উপায় নেই। কিন্তু একথা আজ সবাই স্বীকার করে যে, অলসই হউক আর পরিশ্রমীই হউক, সাধুই হউক আর অসাধুই হউক অন্ন সবাইকেই বেঁটে দিতে হবে। তেমনি চিরদিন যারা বাঁধা-ধরা পথে চলতে অভ্যস্ত তারাও আজ স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে—মানুষ আর্ট থেকে বঞ্চিত হলে জীবনের দুঃখ-আঘাতকে ভুলবার জন্য শুঁড়ির দোকানে আশ্রয় নেবে।

যেহেতু আর্টের জন্য ক্ষুধা মানুষের মনে দুর্ব্বার সেই হেতু আর্ট যেখানে কল্যাণের বাহন সেখানে আর্টিষ্টের মত সমাজের বন্ধু আর নেই। আর্টিষ্ট জাতির গুরু। গণমানসকে নূতনতর চৈতন্যের আলোয় উদ্ভাসিত করবার ক্ষমতা আর্টিষ্টের মত আর কার আছে?

যুগে যুগে ধর্ম্ম-গুরুরা এসে যে সকল বিরাট সত্যকে জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেন প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টরা সেই সব সত্যকেই সাধারণের মনের কাছে পৌঁছে দেন। উপনিষদের উদ্‌গাতা থেকে আরম্ভ করে 'ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্টে'র লেখক পর্য্যন্ত যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মনীষীরা এক বাক্যে প্রচার করে গেছেন :

Long will he be small, and will grovel in the dust, who reckons anything great but the one, Infinite, Eternal Good. (*Imitation of Christ*).

উপনিষদে আছে :

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম।

'অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কামাবস্তুর অনুসরণ করে। সেই জন্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত মৃত্যুর জালে তারা আবদ্ধ হয়।'

প্রবৃত্তির স্রোতে যেখানে আমরা ভেসে যাই, কামনা যেখানে আমাদিগকে অভিভূত করে সেখানে আমাদের সুখ নেই, শান্তি নেই—একথা পৃথিবীর প্রথম স্তরের শিল্পীরাও কি তাঁদের অননুকরণীয় ভাষায় যুগে যুগে ব্যক্ত করে যান নি? 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর রাজা সোনার তালের উপরে সোনার তাল জমিয়ে তুলছে। কিন্তু তাতে রাজার আনন্দ নেই। রাজা নন্দিনীকে কাতর-কণ্ঠে বলছে : 'হায়রে আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও রাজার মনে কি দুঃসহ ক্লান্তি! রাজার কণ্ঠ থেকে কান্নার সুরে বেরিয়ে এসেছে :

'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মত একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।'

যে পথ মানুষকে কাঞ্চনের দিকে নিয়ে যায় সেই পথকেই লক্ষ্য করে উপনিষদের ঋষি বলেছেন : যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ। সোনাতে যে মানুষের তৃপ্তি নেই, মানুষের চিত্ত যে বিত্তের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবার নয়—এই কথাই যম বলেছেন নচিকেতাকে কঠোপনিষদে, এই কথাই যক্ষপুরীর রাজা বলেছে নন্দিনীকে রক্তকরবীতে। আর্টিষ্ট যে জাতির গুরু এ বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে? কবি রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজী বলতেন গুরুদেব। সত্যাশ্রয়ী গান্ধীজীর বাক্যে অত্যুক্তির কোন কালিমা থাকত না।

আনন্দমঠে সন্ন্যাসী ভবানন্দ কল্যাণীর রূপে মুগ্ধ। কামনায় অভিভূত হয়ে শান্তি সে হারিয়েছে। কামিনীতে কাঞ্চনে আসক্ত যারা, উপনিষদ বলেছেন তারা মৃত্যুর জালে প্রবেশ করে। ভবানন্দও মৃত্যুর জালে আবদ্ধ হয়েছে। ব্রতচ্যুত সন্ন্যাসীর কাতর-কণ্ঠ থেকে আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এসেছে :

"ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না। দাহ! কল্যাণী! দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই! প্রাণ যায়! চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি। আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?"

গীতায় বারংবার বলা হয়েছে যারা অনাসক্ত তারাই শান্তি পায়; কামনার জালে যারা আবদ্ধ তারা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাসের মাধ্যমে একই সত্য প্রচার করেছেন। বাইবেল, কোরাণ অথবা উপনিষদ পড়লে অন্তরে যে সুর বাজে—টলস্টয়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রল্যাঁ এঁদের সাহিত্য পড়লেও সেই একই সুরের আমরা সন্ধান পাই। সাহিত্যিকদের লেখনী মানুষের নৈতিক কল্যাণের পথকে যে প্রশস্ত করে এতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

গীতায় বলা হয়েছে—অধ্যাত্মসাধনায় যারা ব্রতী, সমস্ত কাম্যবস্তুকে যারা পরিত্যাগ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বলবান ইন্দ্রিয়গণ কখনো কখনো তাদেরও চিত্তকে বিপথগামী করে। এ ত হ'ল সূত্রাকারে গভীর তত্ত্বের কথা। সাহিত্যিকের লেখনীমুখেও এই তত্ত্বেরই স্বীকৃতি। কিন্তু আর্টিষ্টের স্বীকৃতি প্রকাশ-ভঙ্গিমার চমৎকারিত্বে নিছক তত্ত্বকে এমন জীবন্ত করে পাঠক-পাঠিকার মনের কাছে উপস্থিত করে যে, দর্শনের সত্য সহজে তাদের উপলব্ধির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কি করে বলবান ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত শক্তিমান পুরুষেরও মনকে বিচলিত করে তার প্রজ্ঞাকে হরণ করে তার একটা চমৎকার ছবি আছে রোমাঁ রল্যাঁর জাঁ ক্রিস্তফের সেই জায়গাটিতে যেখানে ক্রিস্তফ প্যারিস থেকে পালিয়ে এসে তার ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। বন্ধুর এবং বন্ধুপত্নীর পরিচর্য্যায় ক্রিস্তফ মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছে জীবনে। বন্ধুপত্নী এনার মনে স্বামীর প্রতি কোন অনুরাগ নেই। একদম চুপচাপ থাকে। ইতিমধ্যে ক্রিস্তফ কখন ভিতরে ভিতরে এনার সুপ্ত যৌবনকে দিয়েছে নাড়া। নারীর অন্তরে উঠেছে কামনার ঝড়। ক্রিস্তফের মনেও কি তাই? কিন্তু পরস্ত্রীকে সম্ভোগ করার কথা ভাবতে ক্রিস্তফের সমস্ত মন ঘৃণায় শিউরে উঠে। বিশেষতঃ যে বন্ধু তাকে অসময়ে আশ্রয় দিয়েছে, দুর্দ্দিনে সাহায্য করেছে, মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে—তার সুখময় নীড়কে ভাঙবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। তা ছাড়া এনার মধ্যে এমন কোন্ অসামান্য নারী আছে যে, ভাল তাকে বাসতেই হবে? কিন্তু ক্রিস্তফ জানত না যে আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে বন্দী হয়ে আছে কতকগুলো বন্য প্রবৃত্তি যারা যখন-তখন বাঁধ ভেঙে ফেলে আমাদের জীবনে ভূতের নৃত্য সুরু করতে পারে। সভ্যতার কোন্ আদিম প্রভাত থেকে মানুষ চেষ্টা করে আসছে ধর্ম্মের আর যুক্তির সেতু বেঁধে অন্তরের এই কামনা-সিন্ধুর তরঙ্গবেগকে ঠেকিয়ে

রাখতে, কিন্তু আমাদের বলবান ইন্দ্রিয়গুলি আচম্বিতে আক্রমণ করে আমাদের সমস্ত সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়, ভণ্ডুল করে দেয় আমাদের সমস্ত তপস্যাকে।

ক্রিস্তফের জীবনে অকস্মাৎ এমনি একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার ঘটে গেল। সেদিন বন্ধু কোন কাজে বাইরে বেরিয়ে গেছে। বাহিরের ঘরে ক্রিস্তফ আর এনা ছাড়া কেউ নেই। ক্রিস্তফ পড়ছে। এনা সেলাই করছে। দু'জনেই নীরব। ক্রিস্তফের অন্তরের গভীর থেকে বইতে আরম্ভ করেছে একটা বাতাস। সেই বাতাসে আগুনের উত্তাপ। এনার দিকে সে পিছন করে বসল। কেন এই চিত্ত-চাঞ্চল্য? এনারও শিরায় শিরায় রক্ত-ধারার মধ্যে এ কিসের মৃদু শিহরণ! ছুঁচ বিঁধে গেল আঙুলে কয়েকবার। বেদনার কিন্তু কোন অনুভূতি নেই। ঘরের মধ্যে ছিল একটা পিয়ানো। ক্রিস্তফ গিয়ে পর্দ্দায় আঙুলের চাপ দিল। সুর কেঁপে কেঁপে উঠল। সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে লাগল এনারও ভিতরটা। হঠাৎ উঠে সে গাইতে সুরু করে দিল। এনা, ক্রিস্তফ—দু'জনেরই চিত্তকে সুরের তরঙ্গবেগ কোন্ সুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে! গান থামল। ক্রিস্তফের কাঁধে এনার একখানি করপদ্ম। দু'জনেই কাঁপছে। হঠাৎ চকিতের মধ্যে এনার মুখ নেমে এল ক্রিস্তফের মুখের কাছে। অধরে অধরে হ'ল মিলন। এনার সুগন্ধ নিশ্বাসে যেন স্বর্গের অমৃত! এমনই করে মানুষের পতন সুরু হয়। বিপদ আসছে জেনেও মানুষের পালাবার ক্ষমতা থাকে না। চঞ্চল ইন্দ্রিয় মুনিরও চিত্তকে করে বিভ্রান্ত। পাগল বাতাস যেমন করে নৌকাকে যেখানে-সেখানে ঠেলে নিয়ে যায় তেমনই করেই ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে আমাদের বুদ্ধিকে কোথায় নির্ব্বাসিত করে দেয়। আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপরে তখন আমাদের কোন জোর খাটে না।

এই জন্যই মায়াকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে দৈবীমায়া। এই মায়াকে শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে অতিক্রম করা যায় না—ক্রিস্তফ এই কঠিন সত্য জানত না। বন্ধু-পত্নীকে ভালবেসে যখন সে ব্যভিচারের পঙ্কিল-পিচ্ছিল পথে নামতে সুরু করল তখনও তার বিদ্রোহী মন আশা করছিল—কামনার ঝড়কে সে জয় করবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি ঘটল না। কতবার সে সংকল্প করল—বন্ধুর বাড়ীতে আর ফিরবে না। কিন্তু কোথায় গেল তার সেই মনের জোর? যেখানেই যায় এনার সুরভি নিঃশ্বাস, এনার অঙ্গগন্ধ তাকে ঘিরে থাকে। তার জীবন যেন পালহীন মাস্তলহীন তরণীর মত—ঝড়ের ঝাপটায় যেখানে-সেখানে ভেসে চলেছে।

কামনার মধ্যে কি দুঃখ! মিথ্যার মধ্যে জীবন কি দুঃসহ! বন্ধুর টেবিলে আহার করতে খাবার যেন গলায় বেধে যায়! কোন দিন যদি বন্ধু জানতে পারে ক্রিস্তফ তার ঘরের সুখে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—কি অসহনীয় আঘাতে সে ভেঙে পড়বে! ভাবতে ক্রিস্তফের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ক্রিস্তফের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা। এনার সঙ্গে মিলনের কথাও যেমন ভাবা যায় না—তাকে ছেড়ে থাকার মতও তো দুঃখ নেই! সে দুঃখই বা সে কেমন করে বহন করবে? দোটানার মধ্যে পড়ে ক্রিস্তফ দেখল মৃত্যু ছাড়া নিস্তার নেই। লেখক লিখেছেন:

That night when he was alone in his room Christopher thought of killing himself.

ক্রিস্তফের মনে জেগেছে আত্মহত্যার বাসনা। মৃত্যু-যাতনা সে অনুভব করতে লাগল ব্যভিচারের পঙ্কিলতার মধ্যে।

বিশ্বাসঘাতকতার এবং কামনার কালিমায় লিপ্ত ক্রিস্তফের মনের শোচনীয় চেহারা রোমাঁ রলাঁর বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাসের মুকুরে ফুটে উঠেছে রেখায় রেখায় নিখুঁত হয়ে। যুগে যুগে ধর্ম্ম-গুরুরা প্রচার করেছেন—নারীমায়ায় যেখানে আমাদের মন জড়িয়ে যায়, কাঞ্চনের মোহ আমাদের চিত্তকে যেখানে গ্রাস করে সেখানে আমরা হারিয়ে ফেলি অন্তরের শান্তি, হৃদয়ের প্রসন্নতা। আসক্তির মধ্যে আমাদের সুখ নেই—একথা আমরা অনেকেই কখনও-না-কখনও অনুভব করে থাকি। কিন্তু শিল্পী একটা অদ্ভুত শক্তি রাখেন সত্যকে আমাদের মর্ম্মের গভীরে সঞ্চারিত করে দেবার। তাঁর বলবার ভঙ্গিমার মধ্যে কি যেন একটা যাদু আছে। রোমাঁা রলাঁ অথবা টলস্টয়ের মত প্রথম স্তরের শিল্পীদের লেখা আমরা যখন পড়ি—সত্যের মধ্যে আমাদের নবজন্ম হয়, আমাদের অন্তরের দিগন্তে নূতন তোরণ-দ্বার খুলে যায়, দর্শনের নীরস সত্য প্রাণময় হয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। এই জন্যই শিল্পীদের লক্ষ্য ক'রে আল্‌ডস হাক্সলি তাঁর 'মিউজিক এট নাইট'-এ বলেছেন:

They receive from events much more than most men receive, and they can transmit what they have received with a peculiar penetrative force, which drives their communication deep into the reader's mind.

কিন্তু ঋষিরা মায়াকে কেবল দুরতিক্রম্য বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি। মায়ার পারে যাবার আশাও তাঁরা দিয়েছেন। চোখের জলে সমস্ত অহঙ্কারকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর চরণতলে তিনি যখন আমাদের মাথা নত করে দেন তখনই মায়ার দুস্তর সাগরকে আমরা অতিক্রম করি। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। জীবনে আমরা যে দুঃখ-আঘাত

পাই তাদেরও একটা পরম সার্থকতা আছে। বেদনার ভিতর দিয়ে আমাদের অন্তরে আসে চেতনা। দুঃখের হলমুখে বিদীর্ণ হয়ে যায় আমাদের হৃদয় আর বিদীর্ণ হৃদয়ের সেই রক্তপথে বেরিয়ে আসে নব-জীবনের শ্যামাঙ্কুর। মরুভূমি ভরে যায় ফুলে ফুলে।

লজ্জা, গ্লানি, দুঃখের ভিতর দিয়ে ক্রিস্তফের জীবনে এল জন্মান্তরের পালা। যে চোখ বন্ধ হয়ে ছিল—দুর্ভাগ্য ক্রিস্তফের সেই জ্ঞানের চোখ দুটি খুলে দিল। ক্রিস্তফ আগে বিশ্বাস করত, মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অন্ধ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা, আর দুর্জয় সংকল্পের দ্বারা এই সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব। নিজের উপরে তার বিশ্বাস ছিল অসীম। কিন্তু অন্তরের কামনা-সমুদ্র বাঁধ ভেঙে যখন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে যখন সে সংযত করতে পারল না তখন নিজের উপরে বিশ্বাস গেল টলে। শেষ পর্য্যন্ত ক্রিস্তফ একটা চরম চেষ্টায় পর-নারীর বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে চলে গিয়েছে রক্তাক্ত হৃদয়ে। কিন্তু এই নৈতিক বিপর্য্যয় চূর্ণ করে দিয়েছে তার অহঙ্কারকে। ক্রিস্তফ বুঝতে পারল, কোন মানুষই জোর করে বলতে পারে না—তার জীবন-তরীকে যে পথে সে চালাতে চায়, সেই পথেই চলবে। ক্রিস্তফের এই নবজাগরণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রলাঁ লিখেছেন:

"He understood now. He understood the vanity of his pride, the vanity of human pride, under the terrible hand of the Force which moves the worlds. No man is surely master of himself. A man must watch."

"এতকাল পরে তার চৈতন্য হ'ল। যে শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালাচ্ছে তার দুর্ব্বার প্রচণ্ডতার কাছে মানুষের সমস্ত শক্তি যে অতি তুচ্ছ—এই সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পারল। কোন মানুষেরই ক্ষমতা নেই নিজের জীবনকে খুশীমত চালাবার। মানুষকে অতন্দ্র হয়ে নিজেকে পাহারা দিতে হবে।"

কি বিরাট সত্যের সঙ্গে শিল্পী আমাদিগকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন! নিরহঙ্কার হবার বাণীই তো যুগে যুগে জগতের যত ধর্ম্ম-গুরুদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবাই তাঁরা একবাক্যে বলেছেন: কেবল নিজের চেষ্টায় মায়ার পারে যাওয়া কঠিন; কারণ মায়া যে দৈবীমায়া। মায়াকে জয় করতে হলে ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। ঠিক এই কথাটিই কি শিল্পী তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাসের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন নি?

বার্ণাড শ-এর একখানি নাটকে এক জন আর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছে: 'Art is an illusion' অর্থাৎ আর্ট হচ্ছে আলেয়া।

উত্তরে শিল্পী বলছে:

'That is false. The statue comes to life always. The statues of today are the men and women of the next incubation. I hold up the marble figure before the mother and say, "this is the model you must copy." We produce what we see.'

অর্থাৎ,

আর্ট আলেয়া এ কথা মিথ্যা। ভাস্করের মর্ম্মরমূর্ত্তি একদিন না একদিন জীবন পাবেই। আজকে যারা কল্পনার মর্ম্মরমূর্ত্তি কালকে তারাই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে বিচরণ করবে। মায়ের চোখের সামনে মর্ম্মরের মূর্ত্তি তুলে ধরে আমি বলি, 'এই আদর্শকে তোমার রূপ দিতে হবে।' আমরা যা দেখি তাকেই সৃষ্টি করি।

শ'য়ের কথার মধ্যে একটি বিরাট সত্য আছে। শিল্পীরা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি বিরাট বিরাট আদর্শ দিয়ে যান। সত্যানুরাগের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, মহাবীর্য্যের আদর্শ। যুগ-যুগান্তর ধরে কত মানুষের ধারা সেই আদর্শের আলোয় নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। তবে আর্টিষ্ট পাদ্রীসাহেব নয়—একথা ঠিক। রলাঁর ভাষায়:

"It is like the sun whence it is sprung. The sun is neither moral nor immoral. It is that which is. It lightens the darkness of the space. And so does art."

"আর্ট সূর্য্যের মত। সূর্য্য সুনীতি-দুর্নীতির ঊর্দ্ধে। তাকে আমরা কোন নীতির কোঠায় ফেলতে পারি নে। সূর্য্য সত্য। তার কাজ মহাশূন্যের অন্ধকারকে অরুণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করা। আর্টের কাজও তাই।"

ম্যাথু আরনল্ডের ভাষায় আর্ট হচ্ছে জীবনের ভাষ্য। জীবনে যা যা ঘটে শিল্পী তার উপরে সত্যের আলোকসম্পাত করেন। সেই আলোর আমাদের সংশয়ের অনেক অন্ধকার অপসারিত হয়। সেই আলোয় নিজেকে আমরা নতুন করে চিনি। আর্টিষ্ট, তাই দ্রষ্টা। আর্টিষ্টের ঠাঁই তাই ঋষির পর্য্যায়ে। আর্টিষ্ট তাই আমাদের প্রণম্য।

সহজবুদ্ধি ও শাস্ত্রবুদ্ধি

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় মানুষের মধ্যে আছে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct)। এই সহজাত বা সহজ প্রবৃত্তিগুলি তাহার জৈবধর্ম্মের লক্ষণ। আত্মরক্ষার্থে পলায়ন বা আক্রমণ, সমাজবদ্ধতা, সন্তানধারার রক্ষণ, খাদ্য-সংগ্রহ সবকিছুই এই সব সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত। এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে একটু বিশেষ ধরণের হইতেছে তিনটি—প্রথম, আত্ম-প্রসার বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি (assertion বা self-display); দ্বিতীয়টি হইতেছে ইহার উল্টা অর্থাৎ শরণাগতির (submission or self-abasement) প্রবৃত্তি, এবং তৃতীয়টি হইতেছে অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা (curiosity)।

পশুদের জীবনযাত্রা অনেকখানি সরল। কেননা সেখানে বুদ্ধি বা intelligence আসিয়া জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। খাদ্য-সংগ্রহ ও প্রজনন-ব্যাপারেই প্রধানতঃ তাহাদের আত্ম-প্রসার বা অভ্যুত্থানের প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ। সবলের নিকট আত্মসমর্পণেই তাহাদের শরণাগতির প্রকাশ। তাহাদের অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র হইতেছে খাদ্য ও বিপদের নির্দ্ধারণ এবং সঙ্গিনীর অনুসন্ধান।

মানুষ তাহার জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উপর বুদ্ধিকে চাপাইয়া। অথচ এই সব সহজাত প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়া বুদ্ধির এক পা-ও চলিবার উপায় নাই। বরং বলা যায়, সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করাই বুদ্ধির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা।

জীবের শত্রু নানা দিকে। এ বিষয়ে ঋষিবাক্য হইতেছে, "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্।" অদৃশ্য জীবাণু হইতে মহাকায় শৃঙ্গী নখী দন্তী প্রভৃতি সকলেই জীবের, বিশেষ করিয়া মানুষের শত্রু। তাল সামলাইতে না পারিয়া বহু অতিকায় জীব সুদূর অতীতেই সবংশে ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতি কোনও প্রকারে নগণ্য জীবনযাপন করিতেছে এবং বাসুকির বংশধরেরা মাঝে মাঝে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলেও মোটের উপর বুকে হাঁটিয়া, পলাইয়া, লুকাইয়া কোনও রকমে এখনও বংশরক্ষা করিতেছে। বন্দুকের সম্মুখে সিংহ ব্যাঘ্রের বিক্রম প্রায় বন্ধ হইয়াছে। একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেহই নিজের জীবনের উন্নতি করিতে পারে নাই।

মানুষ যে এতটা করিয়াছে তাহা শুধুই তাহার বুদ্ধির জোরে। আর কোনও জীবের ঠিক বুদ্ধি বলিয়া বস্তুটি নাই। বিপদ এড়াইবার বা সম্পদ বাড়াইবার জন্য নিত্য নূতন নূতন ফন্দি-ফিকিরের আবিষ্কার করা, পূর্ব্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো, ভুল-ভ্রান্তি ধরিতে পারা ও তাহা হইতে শিক্ষালাভ করা—এই সবই বুদ্ধির কার্য্য। প্রকৃতিতে মানুষের সুবিধা-জনক যাহা ঘটে তাহাই আত্মবশে ইচ্ছামত ঘটাইতে পারা এবং প্রকৃতিতে যাহা মানুষের পক্ষে অসুবিধাজনক তাহার নিরোধ করা বা তাহাকে এড়াইয়া চলিতে পারা এই দুই ব্যাপারেই সাধারণতঃ বুদ্ধির সার্থকতা। বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ হইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটা বোধ ও কৌতূহল। বনে আগুন লাগিলে পূর্ব্বেকার দিনে আমাদের বহু-'প্র'-যুক্ত পিতামহেরা ইঁদুর, বিড়াল ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায়ই পলায়নে তৎপর হইতেন। হঠাৎ এক দিন মাতরিশ্বা নামক এক জনের খেয়াল হইল কেন এমনধারা হঠাৎ আগুন লাগে তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। ফলে আরম্ভ হইল সমীক্ষা এবং পরীক্ষা। ক্রমে আগুন মানুষের করতলগত হইল। ছুঁড়িয়া মারাটা হয়ত মানুষের জৈব প্রকৃতির প্রেরণার ফল। তবে পাথর ভাঙিয়া ঘষিয়া তীক্ষ্ণধার ও তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে প্রথমে যে এক বা একাধিক বুদ্ধিমান মানবকে স্বীয় মহতী বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। এমনই করিয়া নানা দিকে নানা উপায়ে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া মানুষ আধুনিক সভ্য ও সমাজবদ্ধ জীব হইল।

মানুষের বুদ্ধির জয়যাত্রায় যৌবন এখনও শেষ হয় নাই। এখনও তাহা পুরাদমে চলিতেছে; এখনও তাহা নিত্যং-নবতামুপৈতি। তবে সুরু হইতেই একটা গোলমাল থাকিয়া গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, "হে আমার শিষ্যগণ! তোমরা আত্মদীপ হও, আত্মশরণ হও।" তাঁহার এক জন পিসী কি মাসী বলিলেন, "বাবা! অত সব আমি বুঝি না, আমি তোমাকেই জানি, তুমিই আমাকে উদ্ধার কর।" ভগবান তথাগত আমৃতা আমৃতা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা মা, আপনি 'তুষিত' স্বর্গে যাইবেন।" আসল কথা—সংসারে আছে দুই দল মানুষ। একদল দলে খুব ভারী এবং তাঁহাদের মধ্যে submission বা self-abasement-এর ভাবটা খুব প্রবল। তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে—যেনাস্য পিতরো গতাঃ। শরণাগতিই তাঁহাদের ধর্ম্ম। কেহ না চালাইলে তাঁহারা নিজ হইতে চলিতে পারেন না বা চাহেন না। পরের কর্তৃত্ব আদেশ বা শাস্ত্র-বচন মানাই তাঁহাদের স্বভাব। আপনা হইতে চিন্তা ভাবনা করা, বা যে চিন্তা ও ভাবনার ফলে বর্ত্তমানের

সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই অস্বস্তি ও অপ্রীতিকর ব্যাপার। দ্বিতীয় দল হইতেছেন পুরাতন হইতে নূতনের, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের পথে যাত্রী। বুদ্ধির ক্ষুরধার-অস্ত্র তাঁহাদের হাতে, জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁহাদের সম্বল, অন্যায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁহাদের কর্ম্মের উৎস।

সভ্যতার যাত্রাপথ চিরদিন রক্তাপ্লুত হইয়া আছে এই দুই দলের সঙ্ঘাতে। এক যুগের চিন্তাধারা ক্রমে সংবদ্ধ হইয়া লিখিত বা অলিখিত বহুজনমান্য শাস্ত্রের আকার ধারণ করে। লিখিত রূপ হইতে নানা আকারে ধর্ম্মগ্রন্থ, স্মৃতিগ্রন্থ ও অলিখিত রূপ হইতে নানা প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস, লোকাচার ও সমাজ-বিধান উদ্ভূত হইয়াছে। শাস্ত্র অলিখিত হইলেই কম-জোর হয় না। পৃথিবীতে এখনও অনেক অনগ্রসর জাতি আছে যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না; কিন্তু সেখানে প্রচলিত আচার বা বিশ্বাসকে অতিক্রম করিলে অপরাধীকে সক্রেটিস বা খ্রীষ্টের ন্যায় অতি কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

মানুষকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইলে চতুর্বিধ প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয়। তাহার মধ্যে চতুর্থ টি হইতেছে আপ্তবাক্য, অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত জ্ঞান। এই জ্ঞানের উপলব্ধি প্রথমে হয় যুক্তি তর্ক ও বিচারের দ্বারা। পরে অধিকাংশ স্থলেই এই জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায় সহজ বুদ্ধির পরিপন্থী।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় ব্রহ্ম কি—এই সম্বন্ধে একটা যুক্তিসহ ধারণা করিয়া লইবার জন্য বহু ঋষির মধ্যে বহু দিন ধরিয়া তুমুল তর্ক ও আলোচনা চলিয়াছিল। গোটা ঋগ্‌বেদই নানা জনের নানা অভিজ্ঞতার ফল। শেষ পর্য্যন্ত এই বেদকেই তুলিয়া ধরা হইল সমস্ত বিচারের ঊর্দ্ধে। বেদকে বিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা হনন করিবে না, যে বেদের নিন্দা করে তাহাকে সাধু-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবে—ইহাই হইল শাস্ত্রী-সমাজের ব্যবস্থা। বৌদ্ধ সূত্র-পিটকে কয়েকটি বিশিষ্ট বেদ-বিরোধী মতের পরিচয় পাওয়া যায়। চার্ব্বাক মতও খুব প্রাচীন। কিন্তু অতিরিক্ত বেদানুগত্যের ফলে এই সব মতবাদ পুষ্টি ও স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। কোনও দার্শনিক মতবাদ বেদানুগ না হইলে গ্রহণীয় হইবে না এই স্বতঃসিদ্ধির ফলে সর্ব্বত্রই উপনিষদাদি প্রস্থানত্রয়ের সহিত মিল রাখিবার একটা উৎকট চেষ্টা দেখা যায় এবং প্রয়োজনমত যথেচ্ছ ব্যাখ্যার ফলে অনেক স্থলেই সেই মিল গোঁজামিলে পরিণত হয়। এই আত্যন্তিকী বেদভক্তি আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির [illegible] অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজের এই দিক দিয়া যে বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে তাহাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীন চিন্তার ফল এই মতবাদগুলিতে ইহলোক ও ইহ-কালের একটা যথার্থ মর্য্যাদা দিবার চেষ্টা ছিল। প্রতিপক্ষ বৈদিক সমাজ ইহাদিগকে অযথা উচ্ছেদবাদী আখ্যায় কলঙ্কিত করিয়াছে এবং নিজেদের গ্রন্থে ইহাদের বিকৃত রূপ চিত্রিত করিয়া ইহাদের উপহাস করিয়াছে। প্রবলতর বৈদিক-সমাজের চাপ এড়াইয়া এই সব বিভিন্ন মতবাদ স্বাভাবিক গতিতে বিকাশলাভ করিতে পারিলে আমাদের জীবন যে আরও বৈচিত্র্য ও গভীরতা লাভ করিত তাহাতে সংশয় নাই।

খ্রীষ্টও এককালে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে ইউরোপে তাঁহারই শিষ্যগণ সমস্ত স্বাধীন চিন্তা এবং মানুষের বহুবিধ উন্নতির পথে বিরুদ্ধাচারণের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইহারা হইলেন পরিপন্থী। বাইবেল-প্রোক্ত শাস্ত্রবুদ্ধিই হইল তাঁহাদের অস্ত্র এবং সেই শাস্ত্র-বুদ্ধির অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহারা মানুষের সহজবুদ্ধিকে 'রণং-দেহি' বলিয়া আহ্বান করিলেন। শুধু বাহিরে নহে, এই শাস্ত্রবুদ্ধির আতিশয্যে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও লড়াইয়ের কসুর হইল না। অনুষ্ঠানবিশেষে প্রদত্ত মদ্য ও রুটি যীশুর রক্ত ও মাংসে পরিবর্ত্তিত হয় কিনা এই লইয়াই হানাহানির অন্ত রহিল না। পিতা ও পুত্র এক কিনা এই লইয়াই সুরু হইল মর্ম্মান্তিক দলাদলি। ইসলামে যুক্তির স্থান গৌণ, সেখানে সবকিছুই আপ্তবাক্য দ্বারা নিয়মিত। কোরাণ ও হাদিসের বিধান অনু-সারে সেখানে জীবনের 'ক' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত সমস্তই চালাইবার ব্যবস্থা। আরবে স্বাধীন চিন্তাবাদী মোতাজোলার দল কোন দিনই মাথা তুলিতে পারিল না।

ধর্ম্ম ছাড়াও মানুষের সমাজ এবং জীবনের বহু দিকে সহজ-বুদ্ধি ও শাস্ত্রবুদ্ধির বিরোধ স্মরণাতীতকাল হইতেই পরিব্যাপ্ত। বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার কোন রচনার এক স্থানে বলিয়াছেন, মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে নূতন চিন্তাকে। মনোজগতে গতানুগতিকতাই তাহার স্বভাব। আগে আমাদের দেশে একটা প্রচলিত মত ছিল যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কথা মানা উচিত নয়, কেননা বিজ্ঞানের মতিস্থিরতা নাই; আজ এক রকম কথা, কাল অন্য রকম কথা। উত্তরে সে যুগের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছিলেন যে, পণ্ডিতের সহিত মূর্খের প্রভেদই এইখানে। গ্রীসে এরিষ্টটল তাঁহার যুগের মানুষের সঞ্চিত জ্ঞানের জরিপ করিয়া গ্রন্থ লিখিলেন বহু বিচার ও অনুসন্ধানের ফলে। কিছুকাল পরে আরবদিগের মারফত মধ্যযুগের ইউরোপের পরিচয় হইল

এরিষ্টটলের সঙ্গে। ফলে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মধ্যযুগের ইউরোপে চিন্তা-ভাবনার দরজায় চাবি পড়িয়া গেল। সব সমস্যার জিজ্ঞাসা হইল, "এ বিষয়ে এরিষ্টটল কি বলেন?" দীর্ঘকাল পরে রোজার বেকন প্রভৃতি সহজবুদ্ধির উপাসকগণের চেষ্টার এবং অনেক দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়া ইউরোপ এই মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইল। বেকন বুঝাইলেন, এরিষ্টটল সবকিছুর সমাধান করিতে পারেন নাই এবং সত্য-নির্দ্ধারণের পথে আমাদের সহজবুদ্ধির সাহায্যে নানা সমীক্ষা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশে এখনও সংস্কৃত ভাষায় লেখা বচন শুনিলে অনেকেই একেবারে ভাবাতিশয্যে আকুল হইয়া পড়েন, যুক্তিবিচারের কথা ভুলিয়া যান। কিন্তু আধুনিককালে পণ্ডিতেরা বুঝিতেছেন যে, মনুপ্রোক্ত সমাজ আমাদের দেশে পুরামাত্রায় কোনকালেই ছিল না এবং বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনেকখানিই শাস্ত্র-শাসনের বাহিরে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে শুধু পুরাতনের মধ্যে তাহাকে খুঁজিলে চলিবে না, আজ সোজা-সুজি জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের জীবন-যাত্রা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সমাজ-বিধির অধ্যয়ন করিতে হইবে। কেবল পুঁথির পাতায় তাহাদের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যাইবে না।

সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে মানুষের বিষয়-বুদ্ধি। এক এক যুগে চিন্তাশীল ভয়শূন্য মনীষীর দল সে যুগের চিন্তা-ভাবনা ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায়হীনতা ও অসামঞ্জস্য দেখিয়া সহজ-বুদ্ধির সাহায্যে বিচার বিতর্ক করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণ করেন এবং পরে সেই সত্যকে রূপ দিবার জন্য সশিষ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। বহু ক্ষেত্রে অশেষ দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়া তাঁহারা উন্নততর চিন্তাধারা ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় এক যুগে যাহারাই অত্যাচরিত হয়, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও বিষয় লাভ করিবার পর তাহারাই পরবর্ত্তী যুগে অত্যাচারী হইয়া উঠে। তাহারা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদের ন্যায় নিজ নিজ সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিতে চাহে না। স্বার্থের লোভ তাহাদের সহজবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল জগতে তাহারাও যে আজ অকেজো হইয়া পড়িয়াছে একথা ঠিক আগেকার দলের মতই তাহারা ভুলিয়া যায়। কল্পনাশক্তির অভাবে তাহাদের লোভ-সম্মোহিত জ্ঞান-বুদ্ধি বর্ত্তমানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কূপমণ্ডুকত্ব প্রাপ্ত হয়। আবার সুরু হয় বিরোধ ও অত্যাচারের পালা, শাস্ত্র-বুদ্ধির সঙ্গে সহজবুদ্ধির সংঘর্ষ। পরিণামে পুনরায় সহজবুদ্ধির জয় হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মের আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—দরিদ্রের পক্ষেই ঈশ্বরলাভের পথ সুগম, আর বলিয়াছিলেন, সমস্ত বিধি-বিধান মানুষের জন্য, মানুষ বিধি-বিধানের জন্য নয়। তাঁহারই চেলারা পরে ইউরোপে রাজ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সম্পত্তি ভাগ হইবার আশঙ্কায় ধর্ম্মযাজকগণের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত যাহাদের মতের অমিল হইল তাহাদের পোড়াইয়া মারিয়া ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নব্য তুরস্কের অভ্যুদয়ের পর ভারতের বাহিরের মুসলমানেরা বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইউরোপের ন্যায় রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মকে পৃথক না করিলে কল্যাণের আশা নাই। সেমেটিক ধর্ম্মগুলির তুলনায় হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মের অত্যাচার অনেক কম হইলেও সুদূর অতীত কালে সে যুগের রীতি অনুসারে বিজিগীষু বৈদিক সমাজে দ্বিজেতর সম্প্রদায়ের জন্য যে সব অসম ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, আমাদের দেশের শাস্ত্রীরা কিছুকাল আগে পর্য্যন্তও সানুস্বার ও সবিসর্গ শাস্ত্র-বচনের আবৃত্তি করিয়া সেগুলিকে কায়েম রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আজকাল স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশে শাস্ত্র-বুদ্ধি কয়েকটি cult বা মতবাদের আকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—তথাকথিত ভারতীয় আদর্শ, অহিংসা, রামরাজ্য এবং বাপুজী-বাদ ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই সব মতবাদের ফল হইতেছে ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের একটা জট পাকানো। আজ সহজবুদ্ধির কষ্টিপাথরে এগুলির মূল্য নির্ণয় করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মানুষ যেদিন হইতে সোজা হইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতেই তাহার চিন্তাশক্তির বিকাশ হইয়াছে। কথাটা মনে রাখা উচিত।
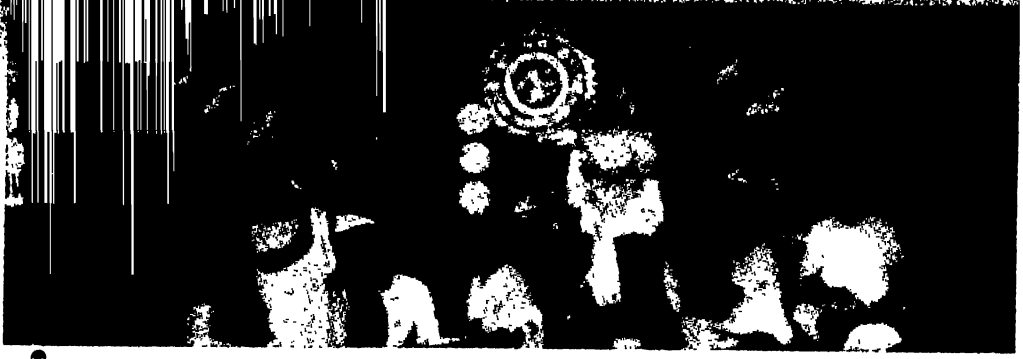
'বসন্তকুমার' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

ভারত সভার জয়ন্তী-উৎসব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিগত ২৯শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারত সভার চার দিনব্যাপী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত সভার ছিয়াত্তর বৎসর চলিতেছে। এই সময়ে ইহার জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে সন্দেহ নাই। ১৯২৬ সনে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার সময় একটি সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করাও সভার কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কলিকাতার ভীষণ দাঙ্গা হেতু তাহা তখন কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তাই এরূপ একটি উৎসবের বড়ই প্রয়োজন ছিল। এতদিনে তাহা উদ্‌যাপিত হইল।

ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে ভারত সভার দান অনন্যতুল্য। বিদেশী শাসকদের নিকট হইতে বরাবর আমাদিগকে সুবিধা-সুযোগ আদায় করিয়া লইতে হইত। আবার যেটুকু সুবিধা আমরা পাইতেছিলাম, শাসকবর্গের কূট চক্রান্তে তাহা হইতেও আমাদিগকে মাঝে মাঝে বঞ্চিত করিত। এই হেতু সমগ্র ভারতের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতিকল্পে একটি সভার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারত সভার জন্ম। ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ মিলিয়া কলিকাতায় এই সভা স্থাপন করেন। জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনই ছিল ইহার মূল মন্ত্র। উদ্দেশ্য এরূপ ব্যাপক ও গভীর হওয়ায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনও এই সভা দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

আজিকার দিনে অনেকের ধারণা, ভারত সভা একটি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানমাত্র—বাংলাদেশে কলিকাতায় ইহার জন্ম, বাঙালীরা ইহার উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার স্বার্থরক্ষা অথবা উন্নতির জন্যই ইহার যাবতীয় প্রয়াস। প্রথম দুইটি বিষয় অবশ্যই সত্য, কিন্তু তৃতীয়টি আদৌ সত্য নহে। কেন সত্য নহে, এই কথাটি আজ সকলকে ভাল করিয়া জানিয়া লইতে হইবে। কলিকাতা তখন সমগ্র ভারতের রাজধানী, সুতরাং শাসন-কেন্দ্র। যাবতীয় আইন-কানুন এখানে রচিত হইত, কর্তারা শাসন-প্রণালীও নির্ধারণ করিতেন কলিকাতায় বসিয়াই। সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে ভারতের স্বার্থরক্ষা তথা উন্নতির উদ্দেশ্যে—সরকারী আইন-কানুন, বিধি-বিধানের আলোচনা ও প্রতিবাদকল্পে শাসন-কেন্দ্র কলিকাতায় এই জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' নাম হইতেই প্রতীত হয় যে, এটি নিখিল-ভারতের জন্য প্রতিষ্ঠিত, নিছক বাংলার জন্য নহে।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন জাগে—সকলের আগে, এমন কি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও দশ বৎসর পূর্বে, একমাত্র বাংলা দেশেই এরূপ একটি নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব সম্ভব হইল কিরূপে। এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে হয়। ভারত সভা প্রতিষ্ঠার ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই কলিকাতা নগরীতেই জাতীয় আদর্শে, জাতীয় স্বার্থরক্ষাকল্পে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হইয়াছিল (২৯শে অক্টোবর, ১৮৫১)। এই সভা দৃষ্টে পর বৎসর, ১৮৫২ সনে বোম্বাই এসোসিয়েশন গঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষীয় সভার একটি শাখা মাদ্রাজ শহরে এই সনেই প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কলিকাতার ভারতবর্ষীয় সভার কর্তৃপক্ষ যখন প্রস্তাব করিলেন, 'আসুন, আমরা একযোগে পার্লামেণ্টে স্মারক-লিপি পাঠাই, কারণ সনন্দ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া আসন্ন,' তখন উঁহারা রাজী হইলেন না; আলাদা আলাদা স্মারকলিপি পাঠাইলেন। ভারতবর্ষীয় সভার স্মারকলিপিখানি আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রগতির ইতিহাসের একখানি অত্যাবশ্যক দলিল। বাংলার নেতৃবৃন্দ তখনই সমগ্র ভারতের উন্নতি-চিন্তায় যে তৎপর হইয়াছিলেন ইহা পাঠে তাহা সম্যক্ অনুভূত হয়।

বোম্বাই ও মাদ্রাজের পক্ষে কিন্তু তখন এরূপ নিখিল-ভারতীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইংরেজী শিক্ষায় বাঙালীরা অগ্রসর ছিল বলিয়া সমগ্র ভারতের উন্নতি ও স্বার্থরক্ষার চিন্তা করা, অর্থাৎ এক কথায় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ইহাও কিন্তু ষোল আনা সত্য

নহে। কেননা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বাংলার প্রায় সমসময়ে বা অল্প পরেই ইংরেজী শিক্ষার পত্তন হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ ঐ স্থানের নেতৃবৃন্দের মনে নিখিল-ভারতীয় ভাবধারার উন্মেষ হয় নাই। ইহার কারণ বোম্বাই ও মাদ্রাজ দীর্ঘকাল যাবৎ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ঐ ঐ প্রদেশের সরকার প্রায় স্বতন্ত্র থাকিয়াই কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। উভয় প্রদেশ কলিকাতার কেন্দ্রীয় শাসনের পুরাপুরি আওতায় আসে ১৮৩৩ সনের-পর হইতে। উভয় প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের স্বাতন্ত্র্যবোধ স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মনেও অনুক্রামিত হইয়াছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধকেই স্বাধীনতা জ্ঞানে তাঁহারা নিজেদের পরিচালিত করিতেছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসিবার দীর্ঘকাল পরেও তাঁহাদের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত না থাকিয়া পারে নাই। শেষে নিতান্ত কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াই তাঁহারা নিখিল-ভারতীয় জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়েন। ভারত সভার জন্মসময়েও অন্যান্য প্রদেশে উক্ত ব্যাপক আদর্শে কোন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই। পুণার সার্ব্বজনিক সভা বা মাদ্রাজের মহাজন সভা, রাজনীতি, এমন কি অগ্রসর বা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আলোচনায় লিপ্ত হইলেও নিখিল ভারতীয় আদর্শের মাপকাঠিতে উহারা 'প্রাদেশিক' প্রতিষ্ঠান মাত্রই ছিল। ভারত সভা জন্মাবধিই দস্তুরমত সমগ্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়।

ভারত সভার জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যপাল ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বামপার্শ্বে সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীসতীনাথ রায় এবং সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ভারত সভা এমন কয়েকটি বিষয়ের আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রবর্ত্তী হয় যে, ইহার জাতীয় আদর্শ ও রূপ স্বতঃই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সিবিল সার্বিস প্রশ্ন লইয়া ভারত সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথের উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন ও অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতির ফলে ভারত সভা অবিলম্বে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। ভারত সভা এই সকল প্রশ্ন লইয়া বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রতিনিধিস্বরূপ লালমোহন ঘোষকে ১৮৭৯ সনে প্রেরণ করে। বিলাতে ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ এই প্রথম। জন-শিক্ষা, স্বায়ত্ত-শাসন ভূমিতে প্রজাস্বত্ব নিরূপণ, ইলবার্ট বিল আন্দোলন, পোলা-ভাটি প্রথার উচ্ছেদ, চা-বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিকার প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভারত সভার নেতৃবৃন্দ মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি যে আন্দোলন জাতির পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহাতেও ভারত সভা অগ্রণী হইল। প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে শাসনে অনাচার অবিচার দূর হওয়া সম্ভব নয়, আবার স্বদেশের ও স্বজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থসংস্থা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিও সুদূরপরাহত। এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গত শতাব্দীর অষ্টম দশকের সূচনা হইতেই ভারত সভা এ বিষয়ক আন্দোলন সুরু করে। ব্যক্তিগত ও প্রদেশগত প্রচেষ্টাকে সংহত করিবার জন্যই ভারত সভা কর্ত্তৃক ১৮৮৩ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ আর একটি সম্মেলনের আয়োজন হয় ১৮৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। কি উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের উদ্ভব হয় তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় সম্মেলনের প্রায় সমসময়ে ১৮৮৫ সনে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইলেও, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেই ইহা ক্রমশঃ জাতীয় রূপ ধারণ করে। সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন প্রমুখ ভারত সভার নেতৃবৃন্দের ১৮৮৬ সনে কংগ্রেসে যোগদানের ফলেই ইহা দ্রুত সম্ভব হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

স্বদেশী আন্দোলন ও পরবর্ত্তী বিবিধ জাতীয় প্রচেষ্টায় ভারত সভার কৃতিত্ব স্বাধীনতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল উল্লিখিত থাকিবে। সেবা ও ত্যাগের উপর ভারত সভার ভিত্তি। যে সুরম্য অট্টালিকা বহু পরে ইহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এই সেবা ও ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জাতীয় উন্নতির সর্ব্ববিধ প্রয়াসেই ভারত সভার নেতৃবৃন্দ সেবা এবং ত্যাগ মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরাধীন জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তি তৎকালীন পরিবেশে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল। এই কর্ত্তব্য সম্মুখে রাখিয়া সভার নেতৃবৃন্দ সামাজিক উন্নতি সাধনেও সবিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। প্রাচীন

শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের উন্নতিতে সভা যে প্রেরণা জোগাইয়াছে তাহাও ভুলিবার নয়। স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমে সভার

সুরেন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি

নেতৃবৃন্দ এদিকে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেন। কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাবে হয়ত অকালে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ যে আমরা স্বদেশে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাবশ্যক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতিতে এতটা আগাইয়া গিয়াছি তাহার মূলে রহিয়াছে উক্ত প্রেরণা।

বাংলাদেশে অবস্থিত বলিয়া, ভারত সভা স্বভাবতঃই বাংলার সমস্যাই পরবর্তীকালে বিশেষ ভাবে আলোচনায় রত হইয়াছে, কিন্তু ইহার নিখিল-ভারতীয় রূপ কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। কাজেই আজিকার দিনেও ইহাকে নিছক একটি 'প্রাদেশিক' প্রতিষ্ঠান বলিলে ভুল করা হইবে। জাতির উন্নতিতে ভারত সভার কৃতিত্ব সর্ব্বথা স্মরণীয়।

ভারত সভার বর্তমান কর্তৃপক্ষ এইরূপ একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করিয়া সমগ্র জাতিরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সভার সম্মানিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ঐকান্তিক প্রয়াস ও পরিশ্রম বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। প্রথম দিনের উদ্বোধন-সভার সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারত সভার সভাপতি শ্রীসতীনাথ রায়, সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং উদ্বোধন-সভার সভাপতি ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারত সভার অতীত
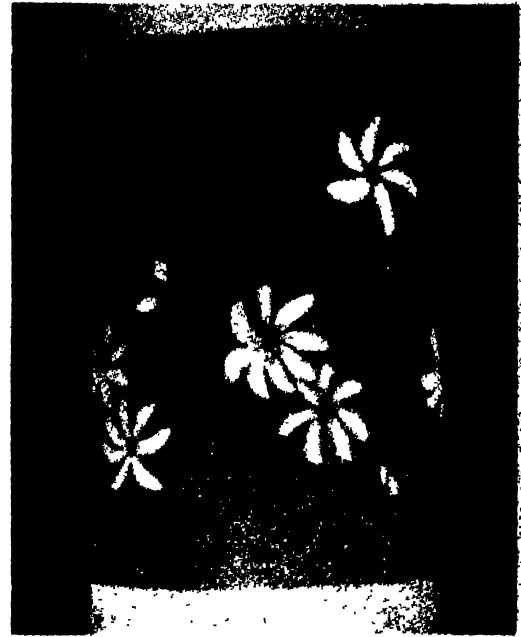
আলপনা-চিত্র, বিকশিত পুষ্প ---শ্রীঅমিতা ঘোষাল

কৃতিত্বের কথা যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর নূতন পরিবেশে রচনাত্মক কার্য্যের নির্দ্দেশ এবং সভার আত্মনিয়োগের সঙ্কল্পও এই সকল ভাষণের মধ্যে রহিয়াছে। সভাপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় জাতির পক্ষ হইতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যারাকপুর বাসভবনটি জাতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য আবেদন জানান। অন্যান্য বক্তারাও জাতির প্রাণে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষে ভারত সভার অপরিসীম দানের কথা আলোচনা করেন। শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় সভার প্রথম যুগের কৃতী, ত্যাগী ও সেবাব্রত কর্মীদের বিপুল প্রচেষ্টার বিষয় বর্ণিত হয়। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ভারত সভা এককালে যে একটি গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল, প্রভাতবাবু সে বিষয়ও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় দিনে, ৩০শে জানুয়ারী 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুদিবসে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয় অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে। মহাত্মাজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। মৃত মহাপুরুষের আত্মার প্রীত্যর্থে ভজন গানও হইয়াছিল। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে ভারত-সরকারের 'পঞ্চবার্ষিকী' 'পরিকল্পনা' সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হইয়াছিল। আলোচনায় ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ ভবতোষ দত্ত, শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত সুশীলকুমার দে, আই-সি-এস, শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, ডঃ পূর্ণেন্দু বসু প্রভৃতি যোগদান করেন। এই দিন সন্ধ্যার গম্ভীরা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

চতুর্থ দিনে কলিকাতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া "International Fellowship" বা 'আন্তর্জাতিক সখ্য' সম্পর্কে এক বিশেষ সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করেন। সভাপতি ব্যতীত ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উক্ত বিদেশীয় প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই দিনের উক্তীয় ও উৎসবের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল 'বসন্তকুমার' শীর্ষক নৃত্য-নাট্যের অভিনয়। তীর্থ-বাসরের উদ্যোগে এই অভিনয় সম্পন্ন হয়। উপস্থিত জনমণ্ডলীর বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

আল্পনা-চিত্র, পদ্মকোরক —শ্রীঅমিতা ঘোষাল

ভারত সভার এই উৎসব-আয়োজনের একটি অঙ্গ আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। ভারত সভার প্রধান হল-ঘরটির প্রাচীর, থাম, মঞ্চ প্রভৃতি আল্পনা-চিত্রে বড়ই মনোরম দৃশ্য ধারণ করে। এই সকল আল্পনা-চিত্র শিল্পী শ্রীযুক্তা অমিতা ঘোষাল কৃত। আল্পনা-চিত্রসমূহ শুধু সুদৃশ্যই নয়, এগুলি দ্বারা সমুদয় প্রকোষ্ঠটিতে একটি স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তিটিও পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করা হয়। ভারত সভার প্রধান প্রধান কার্য্য ও প্রচেষ্টার নির্দেশমূলক কতকগুলি চার্টও সিঁড়ির পাশে ঝুলিতেছিল। ইহাতে স্বল্প সময়ে অনেক বিষয় জানিবার সুবিধা হইয়াছে। সমগ্র ভবনটি চারদিন ব্যাপী আলোক-সজ্জায় সুসজ্জিত ছিল। এ কয়দিন ভারত সভায় যেরূপ জনসমাগম হয় এবং প্রতিটি অনুষ্ঠান যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহাতে মনে হইয়াছে বাঙালী জাতি স্বীয় শক্তিতে এখনও বিশ্বাস রাখে।

ভারত সভার কার্য্যকলাপ, ইহার বার্ষিক বিবরণ, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির মধ্যেই এতকাল নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু জয়ন্তী-উৎসব সাধারণের মনে ইহার বিষয় জানিবার আগ্রহ উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছে। সভার কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা এই উপলক্ষে একখানা 'সুভেনির' বা স্মরণ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্থায়ী কাজ হইয়াছে, এই সময় ইংরেজীতে ভারত সভার একখানি ইতিহাস সঙ্কলন। এই পুস্তকে জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের গত পঁচাত্তর বৎসরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে ভারত সভা উদারনৈতিক সঙ্ঘের একটি শাখায় পরিণত হইলেও, জাতীয় আদর্শ হইতে ইহা কখনও বিচ্যুত হয় নাই। ভারতের অখণ্ডত্ব রক্ষায় শেষ পর্যন্ত ইহা প্রয়াসী হইয়াছিল। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তথা পৃথক নির্ব্বাচনের দাবি, এবং জিন্নার পাকিস্থান মতবাদ—এ সকলের বিরুদ্ধে ভারত সভা যেরূপ দৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছিল, এরূপ অন্য কোন সভা বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করিয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। সরকারী অপপ্রয়াসের নিন্দাবাদেও সভা কখনও ত্রুটি করে নাই।
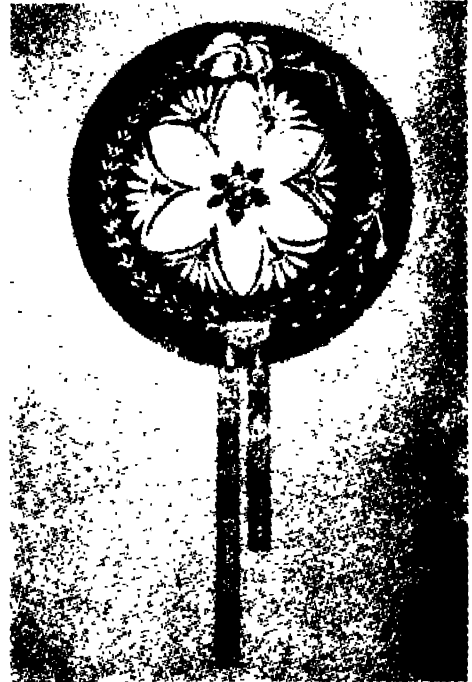
প্রাচীরগাত্রে অলঙ্করণ —শ্রীঅমিতা ঘোষাল

তবে ঘটনাচক্রে শেষ পর্য্যন্ত খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। ভারত সভার ইতিহাস সত্য-সত্যই জাতীয় ইতিহাস। এই ইতিহাস না জানিলে ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কাহিনী অত্যন্ত অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইংরেজী পুস্তকখানির একটি বাংলা সংস্করণ হওয়াও আবশ্যক।

তর্জনী

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

কুঁচিল ঠাকুরের নাম জানে না এ অঞ্চলে এমন কেউই নেই ! নানা প্রবাদ প্রচলিত হয়ে আসছে তার সম্বন্ধে, সে কাউর কামিখ্যে থেকে বাড়ী ফিরে এসেছিল রেলযোগে নয়—একদম শূন্যে ভর করে। তার সাক্ষাৎ প্রমাণ এখনও আছে। চাউলে মাঝির ডাং-এর পেল্লয় মাঠের মধ্যিখানে যে একডেলে বটগাছটা আছে সেইটাই নাকি উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল সে। রাত্রের-বেলায় হামিরহাটীর ঘন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খালি হাতে একামাত্র সে-ই আসতে পারে, সাপ তার কাছে কেঁচো, মায বনবরা, ভালুক, বাঘ পর্যন্ত তার মন্তরের চোটে মুখবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। সে তোমার হাতে একগাছি খড় দিয়ে তখনই সেটা খরিস সাপের বাচ্চায় পরিণত করে দিতে পারে। আর গুণিন ? তা একমাত্র কালে ছাড়া আর যে কোন সাপেই কাটুক না কেন—কুঁচিল ঠাকুরের নাম শুনলে বিষ একেবারে নেমে আসবে বাপের সুপুত্তুরের মত ! কুঁচিলের নাম শুনলে সকলেই কেমন একটু এড়িয়ে চলে ! কে জানে কখন কি হয়ে বসবে !

এহেন কুঁচিল ঠাকুরের কাছেই সেদিন যেতে হ'ল আমায়। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে লাল কাঁকর প্রান্তরের প্রান্তে ঘনছায়াচ্ছন্ন গ্রাম সীমার এক পাশে তার বাড়ী। গোয়ালঘরের ছাউনির জন্য কিছু বাঁশের দরকার। কুঁচিলের বাঁশ-ঝাড়ের 'গেঁড়ি-ভালকি' বাঁশ কুঁচিলের মতই নামকরা। সকাল-বেলাতেই একটা মুনিষ আর গাড়ী নিয়ে ওর বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করতেই বার হয়ে এল। গেরুয়া রঙের কাপড় পরণে, শীর্ণ লম্বা পাকানো চেহারা, চোখ দুটোতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে বার হচ্ছে। আমাকে দেখেই এগিয়ে আসে—"এস এস, ভাগ্নে যে ? হঠাৎ কি মনে করে ?"

উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করতেই কুঁচিল ঠাকুর সোৎসাহে আমাকে নিয়ে একেবারে বাঁশবনে হাজির।

"দেখে লাও বাপ—সবই একেবারে পাকা ঝুনোট। এক খানাতে কমসে কম আটখানা বাতা নির্ঘাৎ, আর ছেয়া বলছ ? তা দু' তিনটে বেওজর।" আঙুলের টোকা মেরে বাঁশগুলো বাজিয়ে পাকা প্রমাণ করে দেয়। টাকাকড়ি মিটিয়ে মুনিষটাকে বাঁশ কাটতে লাগিয়ে দিয়ে বার হয়ে আসব—কুঁচিল ঠাকুর হাতটা ধরে ফেলে গড় গড় করে আমার মাতুলবংশের ঠিকুজী-কুষ্ঠী—ঊর্দ্ধতন চার পুরুষের কুলকরণিকা বর্ণনা করে কোথা থেকে টেনে বুনে বার করল আমি নাকি তার অতি নিকট সম্পর্কের ভাগ্নে। এ খবরটা আমার কোন দিনই জানা ছিল না। মায়ের জানা ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করি নি। অবশ্য তখনও আমাকে স্বীকার করতেই হ'ল সম্পর্কটা সত্যই অতি নিবিড়। সুতরাং তার বাড়ীতে চা-মুড়ি না খেয়ে আসা হবে না। রাজী হয়েই এগিয়ে চললাম তার সঙ্গে।

[illegible] সকাল। এক ফালি সোনালী রোদ লুটিয়ে পড়েছে ঘন-বাঁশবন-নোনাগাছের মধ্য দিয়ে শিশিরভেজা ঘাসের বুকে। একটা নুইয়ে-পড়া খড়ের চাল চারদিকের পাঁচিল কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটায় ঢুকতে হলে মাথা নীচু করেই যেতে হয়। উঠানে পা দিয়েই দৃশ্যটা দেখে এত শীতের মধ্যে আমার সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। একটা অস্ফুট চীৎকার করে দরজার দিকে দৌড়তে যাব কুঁচিল ঠাকুর হেসে ফেলে। শীতের রোদে উঠানের এক কোণে একটা প্রকাণ্ড সাপ লম্বালম্বি পড়ে আছে, আমাকে দেখে তিনি এ বাড়ীর ভাগ্নে বলে মেনে নিতে পারেন নি, কুণ্ডলী-পাকিয়ে, ফণা তুলে প্রবল আন্দোলন সুরু করে দিয়েছেন হিস হিস শব্দে। মামা ছুটে গিয়ে তাকে হাঁড়িতে পুরে একটা সরা চাপা দিয়ে দেয়। এতক্ষণ অন্য কোন দিকে চাইবার মত অবস্থা আমার ছিল না। বিপদটা কেটে যেতে মুখ তুলে দেখি ওপাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে আঁটসাট গড়ন গাছকোমর করে কাপড় পরা সেও বোধ হয় ছুটে এসেছিল আমার চীৎকারে। বলে ওঠে কুঁচিল, "চায়ের জল চাপা ! ভাগ্নে ঘরে এসেছে, ভাল ব্যাভার করিস কিন্তুক ! এসো, উঠে এসো !"

চালের বাতায় গোঁজা রাজ্যের শিকড়-বাকড়, জড়ি বুটি। এক কোণে কয়েকটা সাবল টাঙানা, আলনায় কয়েকখানা গেরুয়া ছোপান কাপড় ! ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেও দেখলাম এক নজর, কোণে একটা রঙ-চটা বাক্স, ওদিকে ছোট জলচৌকির উপর গাদা-করা ময়লা রংবেরঙের শাড়ী গেরুয়ার তৈরি কাঁথা। সাঙা এবং কয়েকটা সিকেতে ঝোলান হাঁড়ি ও ঝাঁপি, ওতে যে কি সব সম্পত্তি আছে তার পরিচয় আগেই হাড়ে হাড়ে পেয়েছি।

ইতিমধ্যে মেয়েটি মাটির হাঁড়িতে চা চাপিয়ে নিপুণ হাতে জায়গা করে একটা কানাউঁচু গয়েশ্বরীতে করে একরাশ মুড়ি আর গুড় এনে হাজির করেছে। কুঁচিল ঠাকুর গল্প জুড়েছে কবে কোথায় বিয়ের নেমতন্ন খেতে গিয়ে অবলীলাক্রমে কেমন করে এক হাঁড়ি পানতুয়া সাবাড় করেছিল।

"সাপ ছেড়ে রেখে দাও ঘরে—ভয় করে না তোমার ?"

আমার কথায় বেশ একটু বিস্মিত হয়ে যায়—"ভয় ! ও বালাই ওরও নাই, আমার ত বটেই।"

মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু বিস্মিত হলাম। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মাথার চুলগুলো তেল অভাবে জট পাকিয়ে আসছে প্রায়। তবু কেমন একটা দীপ্তি আছে মুখখানা জুড়ে। প্রকট দারিদ্র্যের ছাপ ফুটেও একটা কেমন আনন্দের আভাস আছে ওর দু'চোখে।

—"সাপ ধরতে ভয় করে না ?"

খাওয়া ফেলে ওঠে আর কি কুঁচিল ঠাকুর—"দেখবি ? কাল ধরে এনেছি একটা আকামা আলকেউটে, কি বাহারের চক্র আর তেমনি তেজ।"

বাধা দিই—"না-না। আর একদিন আসব!"

—"কালই আয়। বিষ পালা দেখাব! নীল-মুক্তোর মত টলটলে ছুঁচার কোঁটা পদার্থ রক্তের সঙ্গে মিশলেই—ফর্সা।"

কোন রকমে বার হয়ে এলাম। রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল কুঁচিল ঠাকুর—"আসবি এক দিন তোর মামী বার বার করে বলেছে।"

দরজার দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে মেয়েটি, কাল ডাগর ছুটো চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

বাড়ীতে সেদিন মাকে মামার কথা বলতেই মা বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে যান। মামাবাড়ীর সঙ্গে দূরসম্পর্কের কি রকম একটা আত্মীয়তা আছে কুঁচিল ঠাকুরদের গোষ্ঠীর, কিন্তু কুঁচিল বর্তমানে সে গোষ্ঠী ছাড়া। অন্যান্য ভাইদের অবস্থা বেশ ভালই, কিন্তু কুঁচিলই বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিয়ে উঠে এসে বাস করছে মানভাঙ্গাতে। মামীর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই মায়ের কাছ থেকে শুনলাম না, তবে বুঝলাম যে মা ব্যাপারটাকে বেশ ঘৃণার চোখেই দেখেন। তাই এ সম্বন্ধে আমিও বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করি নি।

কিছুদিন পর কি একটা কাজে সদরে যেতে হবে, গ্রামের বাইরে পাকা রাস্তা দিয়ে যাত্রীবাহী বাসের অপেক্ষা করছি সকালবেলায়, অদূরে তাঁতিদের গোয়ালে কয়েকজন লোকের ভিড়, একটা বিরাট দুধেল গাই অবিশ্রান্ত হেঁচে চলেছে, মুখ দিয়ে ঝরছে লালা! জাজেহাল হয়ে পড়েছে অত বড় গরুটা। মেতন তাঁতি বলে চলেছে, "ঠাকুর, দেক দিকি। গরুটো কি অপাঘাতে মরবেক তুমি থাকতে! কাল থেকে ওই রোগ ধরেছে। চার-পাঁচ জন রোজা ডাকলাম, তুমি না দেখলে হবেক নাই।"

ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম, কুঁচিল ঠাকুর একমনে হুঁকো টানছে, পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী, কাঁধে একটা গামছা!

—"আরে ভাগ্নে যে! আর দেখা নাই তারপর থেকে! দিদি বুঝি বাড়ীতে শুনে খুব বকুনি দিয়েছিল—না?"

কথাটা মাকে উদ্দেশ করে বলা বুঝতে পারলাম। প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করি, কিন্তু সত্য ব্যাপারটাকে সহজ করেই নিয়েছে সে। মেতন তাঁতি কাঁই কাঁই করে চলেছে; এক ধমকে থামিয়ে দেয় তাকে কুঁচিল ঠাকুর।

—"থাম ব্যাটা, সাত কুড়ি টাকার গরু? কত কুড়ি টাকার মানুষ মরে যাচ্ছে—তার আবার গরু!"

গরুটা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে, এমনিভাবে কাসতে থাকলে সত্যাই ও মরে যাবে। হুঁকোটা নামিয়ে, একটু সরষের তেল হাতে লাগিয়ে বিড় বিড় করে কি খানিকটা মন্তর পড়তে লাগল কুঁচিল মামা। অতর্কিতে গরুটার নাকের উপর সজোরে কয়েকটা থাপ্পড় কসতেই গরুটার নাক থেকে বার হয়ে এল ঘাসপাতায় শির জড়ান খানিকটা গুটি! ব্যস!···হাঁচি-কাসি জলপড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। গরুটা সকালের রোদে উঠে দাঁড়িয়ে ছানি খেতে থাকে, মাঝে মাঝে দীর্ঘ জিবটা বার করে নাকের উপর চাটছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি! কুঁচিলমামা হাত ধুয়ে বলে ওঠে—"এই মেতনা দিবে আর সাত টাকা, সাত কুড়ি টাকার গরু এখুনি দম বন্ধ হয়ে ত ভাগাড়ে যেত, দে সাত টাকা।"

মেতন বিষয়ী লোক, একখানা তাঁত থেকে সাতখানা তাঁত করেছে সুতরাং এতগুলো টাকা সে সহজে দেবে না এটা জানা কথাই! আমতা আমতা করে—"ছুটো টাকা লেয় লোয়া গরলা—"

ধমক দেয় কুঁচিল—"দূর ব্যাটা, তোর গরু মরাই ভালো! গোবদ্যি আমি লই, রাখ তোর টাকা।"

বাস এসে পড়তে এগিয়ে গেলাম, দেখি পিছন দিকে কুঁচিল মামাও উঠছে। কোন কাজে সে হয়ত সদরে যাবে।

শালবনের ওপারে মাইল পাঁচেক গিয়ে ছোটমত একটা গ্রাম, রাস্তার ছু'পাশে দরমা-বেড়া দেওয়া ছু'একটা চায়ের দোকান। বাসের যাত্রীরাই প্রধান খদ্দের। গাড়ীখানা দাঁড়াতেই সকলেই চায়ের দোকানের দিকে গেল। দোখ মামা ওদিকের একটা বেঞ্চি দখল করে ইতিমধ্যেই বেশ আসর জমিয়ে বসেছে। দূর থেকে ডাকতে সুরু করেছে—"আরে এদিকে এদিকে!"

আমার বলবার আগেই ফরমাস দিতে সুরু করেছে দোকানদারকে—"ভাল কি আছে রে? মাচা? ওরে বাবা হাসাপাথর করেছিস? দে চারটে করে দে, চপ ভাজ দেখি, বেশী করে পেঁয়াজ দে, বিধবা লই আমরা।"

বেশ পুরোদস্তুর ভোজন হয়ে গেল, পয়সা দিতে যাব, বাধা দেয় মামা "আমি দিচ্ছি।" উঠেই বাসের দিকে এগিয়ে যায় পুঁটুলি থেকে পয়সা বার করে আনতে।

হঠাৎ একটা গোলমালে সচকিত হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যেই লোকজন জুটে গেছে। ছু'জন যুধ্যমান লোককে টেনে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করছে কয়েকজন যাত্রী। রাস্তার উপর একরাশ দলিল-দস্তাবেজ ছড়ান রয়েছে ছেঁড়া অবস্থায়।

কুঁচিল মামা চীৎকার করছে—"আপনারাই এর বিচার করুন, আমার দলিল-দস্তাবেজ সব ছিঁড়ে দিলে। পাঁচ বিঘে লাখেরাজ জমির দানপত্র; গায়ে না হয় একটু গা-ই লেগেছে তাই বলে রাস্তার উপর দিনে ছুপুরে রাহাজানি।"

মোটরওয়ালা মোটর থামিয়ে তাগাদা দেয়, কোর্টের দেরি হয়ে যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জাররাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষকালে ভদ্রলোককে তাঁরাই খেসারৎ দিতে বাধ্য করান।

মামা আঙুলে করে নোট ক'খানা ভাল করে দেখে নিয়ে গজ গজ করতে থাকে,—"আপনার কি, ছুখানা দশ টাকার নোট দিয়ে খালাস, ছোট এবার রেজেস্ট্রি আপিস, তেল দাও সেখানে তবে নকল বেরুবে।" পকেট থেকে দোকানদারকে খাবার দাম দিয়ে গাড়ীতে উঠল। ধুলোমাখা চেহারা—লাল গেরুয়াতে [illegible] ছোপ মানিয়েছে মন্দ নয়।

শহরে পৌঁছে যাত্রীরা কোর্টের দিকে চলে গেল। [illegible]

মরা মাছের কি ! এগিয়ে এসে চাঁদ দিক দেখে বলে ওঠে, ঝটপট কাজ সেরে ফেলো তারে, নগদ কুড়ি টাকা রোজকার, ভালো করে মাংস-টাংস খেতে হবেক বাবু।"

—"সেকি দলিলের নকল—"

এক গাল হেসে জবাব দেয়—"আরে ওকি দলিল, আমার চৌদ্দ পুরুষের আমলের ছেঁড়া পড়ে ছিল ঘরে, কি খেয়াল হ'ল ওতেই এক খেল খেলে দিলাম।"

বিস্মিত হয়ে যাই ! আমার কাঁধ চাপড়ে বলে—"মরা কড়ি চালিয়ে দিই আর ছেঁড়া দলিল চালাতে লারব ? হ্যা:"—লোকটাকে সত্যই ভুল বুঝেছিলাম এতদিন।

কিছুদিন পার হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে, বর্ষার রাত্রি। চারদিকে থমথমে নিবিড় অন্ধকার। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস জলভারাক্রান্ত মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়—একটু ক্ষণ বিরাম আসে বর্ষণের। ব্যাঙের একটানা ডাক ভেদ করে এত রাত্রে কার ব্যাকুল ডাকে চমকে উঠলাম। আবার। কে যেন ডাকছে আমাকে ! বার হয়ে এলাম। দাদা ডাকছে, হ্যারিকেন নিয়ে এসেছে আমাদেরই কৃষাণ কালোর ভাই, ব্যাপারটা শুনেই চমকে উঠি। বর্ষাকাল—পাঁড়াগাঁয়ে এ বিপদ মাঝে মাঝে হয়ই। কালোকে সাপে কামড়েছে, সাপটাকে একটা পলুই চাপা দিয়ে ফেলেছে, একেবারে বেরাহ্মণ, জাত গোখরোর ভরযোয়ান বাচ্চা। ডাক্তার-বদ্যির অসাধ্য ব্যাপার। বিপদের সময় ওদের মাথাও কেমন ঘুলিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বর্ষাতি চাপিয়ে ছাতা লাঠি নিয়ে কালোর ভাইটার সঙ্গে বার হতে যাব, মা বাধা দেয়—"তুই যাবি কোথায় ?"

—"আসছি !" কথার আর কোন জবাব না দিয়েই বার হয়ে গেলাম। ব্যাপার শুনে কালোর ভাই বলে ওঠে—"কুঁচিল ঠাকুর কি আসবেক এই রাতে ? সী মস্ত লুক, এ তল্লাটে তাকে আজ্ঞা আজড়ায় আনতে পারে না।"

তবুও গেলাম ! ঘন বাঁশবনের মাথায় ঘন কালো একখানা মেঘ বাসা বেঁধেছে, এক ঝাপটা বৃষ্টির পূর্বাভাস ; জলো বাতাসের আওয়াজ, বাঁশবনের বুকে ক্লান্ত একটা শব্দ সৃষ্টি করেছে। চারদিক জনমানবহীন, কয়েকবার হাঁক দিতেই একটা তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে আসে কুঁচিল মামা। সমস্ত কথাবার্তা শুনেই ভিতরে চলে গেল, বার হয়ে এল অল্পক্ষণের মধ্যেই বগলে একটা পুঁটলী নিয়ে।

ইতিমধ্যেই লোকজন জুটে গেছে কালোর বাড়ীতে। সাপে কাটা রোগী আমিও ইতিপূর্বে দেখি নি। প্রথমটাতে বেশ ঘাবড়ে গেলাম, গোড়ালির কাছে কামড়েছে, একেবারে শিরের উপরে। রক্ত পড়েছে অনেক, ভরযোয়ান মরদটা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। কালোর মায়ের চীৎকার আর কান্নায় ইতিপূর্বেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে তার ভবিষ্যৎ। চোখ দুটোতে কালোর নেমে এসেছে [illegible] ঘোলাটে আস্তরণ। একরাশ কাঠ এনে আগুন জ্বালা হয়েছে।

কুঁচিল মামা একেবারে বদলে গেছে, ঝুলি থেকে খানিকটা শিকড় বেটে রোগীকে খাইয়ে দিয়ে বসে পড়ে আগুনের ধারে। রোগীকে কেন্দ্র করে আগুন জ্বালা হয়েছে। ধারাল ছুরি দিয়ে কাটা জায়গাটা বেশ খানিকটা কেটে কি একটা ওষুধ দিয়ে ধুতে থাকে। লাল রক্ত পাংশু হয়ে আসছে, কালোর স্বরও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে।

সে দিনের দলিল ছেঁড়া লোকটার কোন চিহ্ন খুঁজে পাই না ওই কুঁচিলের মধ্যে। গনগনে আগুনের টকটকে রাঙা আভায় ওর চোখ দুটোতে কেমন এক অশরীরী ভাব ফুটে ওঠে। মুখখানায় একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, ওর সুরেলা গলায় মন্ত্রগুলো :

—'শাকুনিক শাকুনাল
রুধি রক্তে রুধি বনমাল।
শতেক নাগের বিষে
নাগ কালিয়া—'

চারদিকে একটা থমথমে ভাব। গ্রামের বহু লোক এসে জুটেছে, কোন দিকে নজর নাই, এক মনে মন্ত্রসিদ্ধ যোগীর মত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে কাজ করে চলেছে। ধীরে ধীরে রক্তে আবার স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরে এসেছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে রোগীকে প্রদক্ষিণ করছে, হঠাৎ বাইরে একটা কোলাহল শুনে থমকে দাঁড়াল। কয়েকজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। পায়ের হাঁটু অবধি কাদা !

কয়েক মাইল দূরের গ্রাম থেকে লোক এসেছে—নটবর ঘোষের সর্পাঘাত হয়েছে। নটবর ঘোষ এ অঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, বাড়ীতে 'ধনবোড়া' পুষেছেন তিনি, সেই বাস্তু সাপই দয়া করে স্নেহচুম্বন দিয়েছেন তাঁকে।

"রোগী ফেলে যাব না।"

লোকটা কোমরের গেঁজে থেকে বার করে আধভেজা কোঁচকানো একতাড়া নোট !

"যত লাগে দোব ঠাকুর।"

গর্জন করে লোকটার গালে এক চড় কসে দেয় আর কি ?

"ব্যাটা, লটা ঘোষের চিতের ওই লোটগুলো পুড়িয়ে দিবি। অনেক টাকা তুদের না ? ওই লোকটার প্রাণের দাম নাই ? যা—দূর হ ! বলগা তুর ঘোষকে টাকা দেখাবেক লুককে গিয়ে। টাকা লিয়ে ব্যবসা করি না !"

প্রায় শ'খানেক টাকা হবে লোকটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল মাথা নীচু করে।

সকাল হয়ে গেছে। কালো সুস্থ হয়ে উঠেছে। 'র' চায়ের লিকার খাইয়ে ঘুম তাড়াবার ব্যবস্থা করে কুঁচিল মামা হাত পা ধুয়ে বেরুল।

"সকালবেলা চা না খেয়ে যেতে পাবে না মামা।"

"চা। চল।"

আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী, সামাজিকতার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘ দিন তার কোথাও সমাদরে প্রবেশপথ রুদ্ধই ছিল। তাই হয় ত আমাদের বাড়ীর সামনে এসে ঢুকতে ইতস্ততঃ করে।

"এস!" আমার কথায় বাইরের ঘরে উঠে এল।

বাড়ীর ভিতরে চা-পর্ব্ব সুরু হয়েছে। মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম ব্যাপারটা। বাড়ীতে এসেছে একবার দেখা না করা অন্যায়।

মা চমকে ওঠে, "সে কিরে?" আমি যেন সত্যই একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছি।

বাইরের বাড়ীতে অনেক শ্রেণীর অনেক লোকই আসা-যাওয়া করে, তাদের যদি প্রবেশাধিকার থাকে কুঁচিল মামারই বা কেন থাকবে না। কি এমন অন্যায়টা সে করেছে! আর জাত! সে ত বাউরী-বাগ্দী পাড়া থেকে বিড়াল এসে রান্না ঘরে ঢুকছে, সে কি বামুনবাড়ী আসবার আগে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধস্নাত হয়ে আসে! আমার এই অকাট্য যুক্তিতে মা খানিকটা কি ভেবে রাজী হলেন দেখা করতে!

সেই সকালের কথা আজও ভুলি নি। একটু পাওয়া যেন তার কাঙাল মনকে ভরিয়ে তুলেছিল। মাকে দূর থেকে প্রণাম করে। সারা চোখ মুখে রাত্রিজাগরণের ছায়া, তবু কেমন যেন একটা তৃপ্তি!

"ছেলে তোমার রত্ন দিদি! বেঁচে থাক—কলেজে ফাষ্ট হোক।"

চলে যাবার সময় রাস্তায় গিয়ে বৌদির কাছ থেকে কয়েক দিন আগে হাতান কয়েকটা টাকা দিতে গেলাম, জিব বার করে পিছিয়ে যায় মামা।

"ছিঃ ছিঃ, ওকি রে! গুরুর নিষেধ। এ কাজ করে কপর্দ্দকও নিতে পারব না! সর্ব্বনাশ হবে আমার।"

মুখে আসে 'সর্ব্বনাশ আর নূতন করে কি হবে তোমার।' কিন্তু পারলাম না। মামা বলে—"কি জিনিষ আজ তুই দিলি—জানিস না, টাকা দিয়ে তার দাম হয় না!"

"সে আবার কি?"

"ও তুই বুঝবি না!"

বাঁধের পাড় ধরে চলে গেল লোকটা। সারা মনে যেন ওর আজ কি একটা খুশীর ফোয়ারা।

কয়েক দিন পর হাটে দেখা। একটা বস্তা নিয়ে হাটময় সোর-গোল তুলেছে, কে একজন ব্যাপারীর সঙ্গে বেগুনের দর নিয়ে হাতা-হাতির উপক্রম! আমাকে দেখে এগিয়ে আসে—সম্পূর্ণ অন্য মানুষ! এ কথা সে কথার পর আমতা আমতা করতে থাকে। চোখে মুখে কি যেন একটা আশা উঁকি মারছে, কিন্তু প্রকাশ করতে রয়েছে ওর একটা অপরিসীম লজ্জা! আশ্বাস দিই—"বল না! কিছুই মনে করব না?"

"দেখ—ভাদ্র-সংক্রান্তিতে আমার বাড়ীতে মা মনসার পূজা করি। জাত-জ্ঞোত কেউ আসে না! বামুন ভোজনও হয় না। তাই বলছিলাম তুই কি যাবি আমার বাড়ীতে? তুই ত সব জানিস না ব্যাপারটা—"

থামিয়ে দিই—"এর জন্য এত সশঙ্কিত হচ্ছ কেন? আমি যাব।"

কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারে না, সমাজ যাকে অনাদরে-অপমানে দূরে ত্যাজ্য করে রেখেছিল—তার বাড়ীতে পাত পাড়বে আর একটি সামাজিক জীব, এ কথাটা সহজে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না সে।

তার বাড়ীতে গেলাম সন্ধ্যার সময়। বাড়ীর পিছনের বাঁশবনে তালপাতার চালা করে মাটির হাতী ঘোড়া ঘট প্রতিষ্ঠা করেছে! জঙ্গল চেঁচে ছুলে সাফ করেছে। ওপাশে বর্ত্তমান রয়েছে খানিকটা ঘন বাসকগাছের ঝোঁপ। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একা আমি—আর আছে একজন ঢাকী—আর একটা ছোট ছেলে কাঁসি-দার। একটা কারবাইডের আলো জ্বলছে। খুঁটির কাছে বাঁধা একটা এতটুকু অজশিশু। কেউ বোধ হয় মানসিক শুধে গেছে। পূজোর আগেই কুঁচিল মামা ঢাকী আর কাঁসিদারকে পয়সার বদলে তুলে দিল অন্য একটা পাঁঠা, সেটাও কোন সর্পাঘাতের রোগী মানসিক বাবদ মা মনসাকে দেনা শুধে গেছে।

রাত্রি হয়ে আসে। নির্জ্জন গ্রামপ্রান্তের বনভূমি ছম ছম করছে কোন গম্ভীর শান্ত পরিবেশে। পূজা হয়ে গেছে, কুঁচিল মামা বলিদান শেষ করেছে। কপালে ইয়া সিঁদুরের টিপ—চোখ দুটো কারণ বারিতে টকটকে রাঙা, ভাঙা গলায় চীৎকার করে—"ধুনো দে—এ্যাই বাজা ঢাক।"

বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে বাজছে ঢাকটা, কারবাইডের প্রকম্প শিখায় কুঁচিলের মুখখানা কেমন এক পৈশাচিক আভায় জ্বলছে, মাথায় একটা ঘট নিয়ে খুব মাথা নাড়ছে আর উদ্দাম নাচছে। ভর হয়েছেন স্বয়ং মা-মনসা।

ঢাকের তালে তালে নাচছে—হঠাৎ উদ্দাম গতিতে মাথার কলসীটা ফেলে দিয়ে বিরাট লম্ফ সুরু করে দিল।

"নররক্ত চাই! মা নররক্ত খাবে!" সামনেই ছিল বলি-দানের খাঁড়াখানা। তাই হাতে নিয়েই রণ-চামুণ্ডার মত লাফাতে থাকে। অস্পষ্ট আলো—চারিদিকের বাঁশবনে আলোছায়ার আভাস—জনহীন চারদিক—মাঝে মাঝে কুঁচিলের মত্ত হুঙ্কার—! ঢাকী লোকটা ঢাক না ফেলে দিয়ে প্রাণভয়ে সটান ছুটতে থাকে, কাঁসিদার ছেলেটাও আর্ত্তনাদ করে ছুটছে।

আমিও 'থ' হয়ে গেছি! মুহূর্ত্তের মধ্যে জায়গাটা জনশূন্য হয়ে যায়! চারদিক ভাল করে দেখে কুঁচিল ঠাকুর খাঁড়া নামিয়ে হাসতে থাকে হা হা শব্দে! প্রচণ্ড উদার হাসি!

"দেখলি, ব্যাটাদের ভয় দেখলি! বাঁচা গেল, এইটুকু বিড়ালের ছানার মত একটা পাঁঠা, তুই বা কি খাবি আমিই বা কি খাব! দিলাম ব্যাটাদিকে তাড়িয়ে। চল বাড়ীর দিকে।" নির্বিকার চিত্তে পূজোর ফলমূল গামছায় বাঁধতে থাকে। আমি ত তাজ্জব বনে গেছি।

সে রাত্রের সংবাদটা কি করে বাড়ী পৌঁছে গেল জানি না, মা বেশ খানিকটা বকাবকি করলেন আপন মনে, বৌদিকে জানিয়ে দিলেন তাঁর অবর্তমানে এ বাড়ীতে আর বাছবিচার কিছুই থাকবে না। খুড়োঠাকুরও দেখে সেদিন আমাকে দেখে বেশ খানিকটা নাক সিঁটকোলেন।

ক্রমশঃ কাজের চাপে সবই ভুলে গেল সবাই! ছোট ভাইয়ের উপনয়ন, আত্মীয়-স্বজন, বোনেরা, মাতুল গোষ্ঠী, অনেকেই এসেছেন। বাড়ীতে হৈ, চৈ সমারোহ। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিন সকালে কি ভেবে মাকেই বলে বসি—"কুঁচিল মামাকে নেমন্তন্ন করলে হয় না, দিনে না হোক রাত্রে সে যদি আসে?"

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মা, যেন আকাশ থেকে পড়ছে। একটু সামলে নিয়ে বাক্যস্ফুর্তি হ'ল—দেখতে দেখতে বাড়ীর আত্মীয়স্বজন সকলেই এসে হাজির এবং কথাগুলোর সারমর্ম হচ্ছে এই, ফের যদি ওসব কথা—ওর নাম যদি আমি আজকের শুভ দিনে উচ্চারণ করি তিনি মাথামুড় খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হবেন।

বৌদি এসে থামিয়ে দিলে আমাকে।

—"যাও ঠাকুরপো! ওসব এখন নয়!"

মামা কথাটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যান মাত্র। সমাজে আত্মীয়বর্গ সকল থেকে যে চিরতরে নির্বাসিত তার নামও যেন কোন শুভদিনে উচ্চারিত না হয়। অথচ মানুষের সবচেয়ে বিপদের দিনে সেই-ই আসে ছুটে, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে আবার তার পিছনে ফেলে যাওয়া সমাজে ফিরিয়ে আনতে, যেখানে পুনর্বার ফিরে এসে সে-ই আবার ওই হতভাগ্যকে ফার্মান জারি করবে চিরনির্বাসনের। আমার বড় মামাবাবুকে সর্পাঘাত থেকে বাঁচায় ওই কুঁচিলঠাকুরই; তাই মামা মায়ের কথাটা নীরবে সমর্থন করে সয়ে গেলেন।

কাজকর্মের হাঙ্গামা চুকতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি হৈ চৈ-এর পর স্নান সেরে বাড়ী এসে বৌদিকে বার করলাম খুঁজে।

—"ভাঁড়ার থেকে কিছু মিষ্টি একটা হাঁড়িতে বার করে দাও দিকি!"

বৌদিও বাক্যব্যয় না করে এনে দিলে। বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্ছি বাধা দেয় বৌদি, "কোথা যাচ্ছ? সারাদিন খাও নি—"

—"ফিরে আসছি এখুনি।"

তিন মাইল পথ দেখতে দেখতে চলে আসি। বাঁশবনে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর প্রলেপ বুলিয়েছে। ফাঁকা ডাঙা থেকে গহন এক তমসাচ্ছন্ন পুরীতে এসে ঢুকলাম। কুঁচিল মামা উঠানে একটা কালিমাখা মাটির হাঁড়ীতে ধানসেদ্ধ করছে। একপাশে তালাইয়ের উপর থেকে কতকগুলো ধান তুলছে মেয়েটি; আমাকে দেখে উঠে এল। হাতে হাঁড়ি দেখেই হেসে ফেলে।

"গরীব মামাকে মিষ্টি খাওয়াতে এসেছিস বুঝি? কাজকর্ম [illegible] পার হ'ল ত?"

"হাঁ—হাঁড়িটা রইল মামা. পরে এক দিন আসব। আজ যাই।"

সামনে সাপ দেখলেও এতটা চমকে উঠতাম না।—"হাঁড়িটা তুই নিয়ে যা, ও আমরা নিতে পারি না সন্তু।"

—"কেন?" কণ্ঠস্বরে আমার হতাশা বিস্ময় দুটোই ফুটে বেরয়।

এগিয়ে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলে মামা,—"রাগ করিস না ভাগ্নে, দুঃখ তুই পাবি তাও জানি, কিন্তু আজকের এ জিনিষ আমি নিতে পারব না! যাকে সদর দরজা দিয়ে পাঁচখানা গাঁয়ের লোকের সামনে বাড়ী থেকে, সমাজ থেকে,—গাঁ থেকে ওরা বার করে দিলে, অন্ধকার রাতে তাদেরই দলের একজন এসে আমার ঘরে খাবার দিয়ে যাবে—ভালবাসবে, আমারই বাড়ীতে পাত পাড়বে এটা হলে আমার শাস্তি পুরো হ'ল কোনখানে? ওদেরই বাঁধানো ঘরে সিঁদ দিলাম না আমি? বল তুই বল?"

"তবে মিশেছিলে কেন? আমাকে ডেকেছিলেই বা কেন আগে?"

—"ভুল করেছিলাম সন্তু! মস্ত ভুল করেছিলাম! নিয়ে যা ওটা।"

হাঁড়িটা তুলে নিয়ে আমি বার হয়ে আসি রাতের অন্ধকারে। হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনলাম। এতদিন ওকে নীরবেই থাকতে দেখেছি, আজ সেও বলে উঠে—"কেন ফিরিয়ে দিলে ওকে?"

—"ওরা এলে নিজেকে খুব দুর্বল মনে করি, মাথা নীচু হয়ে আসে, দিনরাত মনে হয় জীবনে একটা খুব ভুল করেছি। তাই ওদেরকে দূরে সরিয়ে দিলাম!"

—"কিন্তু ওকে দুঃখ দিলে কেন? নিজে জলছ সেই বেশ, ওকে কষ্ট দিলে কেন? কত ভালবেসে এনেছিল!"

—"ওদের ভালবাসা নেবার অধিকার আমার নাই!" ক্লান্ত-ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর তার! সহসা গর্জন করে ওঠে সে, "কুনকথা বলবি নাই, চুপ মেরে থাক বলছি!"

একটা সুপ্ত পশু যেন গর্জন করে উঠছে ওর মধ্য থেকে। বার হয়ে এলাম বাঁশবনের সীমানা থেকে! পায়ে চলা এক ফালি রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছি। নিশুতিরাত! হাতে ঝোলান রয়েছে হাঁড়িটা। ঝাঁকড়া অশ্বত্থগাছতলায় এক পাল কুকুর রাতের অন্ধকারে তারস্বরে চীৎকার করে এগিয়ে আসে অবাঞ্ছিত কোন পথিককে দেখে। কি খেয়ালবশে হাতের হাঁড়িটাই ছুঁড়ে দিলাম ওদের দিকে। সশব্দে হাঁড়িটা কঠিন মাটিতে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ইটপাটকেল ভেবে সরে গিয়েছিল কুকুরবাহিনী যথাসময়ে, হঠাৎ তার বদলে খাদ্যবস্তু পেয়ে মনের আনন্দে যে আশীর্বাদ করে ভোজনপর্ব সুরু করল—এত রাগে দুঃখে আমিও না হেসে পারলাম না! থাক্—ওরাই থাক্।...

তারপর থেকে বেশ কিছুদিন আর কুঁচিল মামার সঙ্গে দেখা করি নাই, দূর থেকেই এড়িয়ে চলেছি তাকে দেখলে। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলতেই গ্রাম থেকে চলে এলাম! সবকিছু মন থেকে মুছে যায়, কুঁচিল মামার কথাও প্রায় গেছে! পড়ার চাপে, নানান্

জীবনের মধ্যে প্রায় মানুষটিকে ভিড়ে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি ! পুজোর ছুটিতে বাড়ী গেছি কয়েকদিনের জন্য।

ক্লান্ত দুপুর বেলায় বাড়ীতে বেশ তাসের আসর জমেছে,—মা বৌদিরা আমি। পুরোদমে খেলা চলেছে হঠাৎ কালোর ডাকে বাইরে এলাম !

দাদাবাবু, একটু বাইরে আসবে আমাদের পাড়ায়? তোমাকে ডাকছে!

এগিয়ে চললাম বাগদীপাড়ার দিকে। একটা তেঁতুলতলায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলে চেনা যায় না ! চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে—চোখের কোলে এক পোঁচ কালি, নাকটা খাঁড়ার মত খাড়া হয়ে উঠেছে, গেরুয়া কাপড়খানাও ছেঁড়া—কাঁধে একটা ময়লা চাদর। কুঁচিল মামা !

—"তুই এসেছিস, খবর পেয়ে এলাম, খুব দরকার—গোটা দশেক টাকা দিতে পারিস ?"

তার মুখের দিকে চাইলাম। ঠকাতে ও আমাকে আসবে না, এর আগে ওকে কয়েকবার যেচে টাকা দিতে গেছি—নেয় নি ! আজ এই দীন বিপদাপন্ন চেহারা নিয়ে আর যাকে পারুক—আমাকে ঠকাতে সে পারবে না।

—"আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসছি।"

টাকাগুলো হাতে পেয়ে একবার আমার দিকে চাইল ; মুখে-চোখে ওর একটা আশার আলো। বলে উঠে, "তোর এ টাকা আমি দিয়ে যাব ! নগদে না পারি বাঁশ হউক—কাঠ হউক—ধান—যাতে হউক শোধ করে যাব।"

চলে গেল ক্ষিপ্রপদে। তার গতিপথের দিকে চিন্তিত মনে চেয়ে রইলাম। নিশ্চয়ই বেশ কিছু বেগে পড়েছে নইলে আমার কাছে হাত পাততে সে কখনই আসত না।

বর্ষার শেষ। শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত শীর্ণ মেঘের স্তূপ পড়ন্ত রোদে জাফরানী রঙের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। গৈরিক মাঠ-প্রান্তরের প্রান্তসীমায় শুভ্র আকাশের গায়ে দুনিয়ার প্রহরীর মত মাথা তুলে প্রহরা দিচ্ছে কয়েকটা তালগাছ। বাঁশবনের বুকে একটানা সোঁ সোঁ শব্দ। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় দিগন্তজোড়া মাঠের বুকে সবুজ ধানক্ষেতের বিস্তার। দিগন্তের রেখায় জোছনায় নীল আকাশ আর সবুজ শালবনরেখা নব-দম্পতীর প্রথম মিলন-তিথির ব্রত উদ্‌যাপনে মগ্ন।

জনহীন বালুপথ বেয়ে কুঁচিল মামার বাড়ীতে পা দিলাম। চারিদিক নীরব। বার কতক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া নাই। এগিয়ে গেলাম। বর্ষার জলে বাড়ীর পাঁচিল ঠাই ঠাই গলে পড়েছে মেরামতি অভাবে, নেহাৎ কাঁকুরে মাটি বলেই এখনও টিকে আছে। দরজাটা খুলে পড়ছে, বাড়ীর ভিতর পা দিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। খাঁ খাঁ করছে ঘরটা। জনমানব নেই ; একটা কুকুর দাওয়ায় শুয়েছিল। আমাকে দেখে একবার মুখ তুলে চাইল মাত্র—আবার ল্যাজ-মাথায় এক হয়ে শুয়ে রইল।

বিস্মিত হয়ে গেলাম, এরা সব গেল কোথায়। বার হয়ে আসছি, হঠাৎ দূরে বাঁশবনের মধ্যে কুঁচিল মামাকে দেখে এগিয়ে গেলাম। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবছে। কাছে গিয়ে ডাকতেই ফিরে চাইল, একি ! মানুষের চেহারার মধ্যে এত শীঘ্র এত পরিবর্তন আসতে পারে কল্পনা করি নাই। এ যেন কুঁচিল ঠাকুরের প্রেতাত্মা।

—"বাড়ীতে সব গেল কোথায় ?"

নীরবে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় ঘন বাঁশবনের মধ্যে খানিকটা উঁচু ঢিবির দিকে। একটা কবরের মত। বিস্মিত হয়ে গেলাম।

—"সে কি ?"

—"অনেক চেষ্টা করলাম সন্তু, তোর কাছে টাকা নিয়ে ডাক্তারী করলাম ! কিছুতেই কিছু হ'ল না। তিন দিন বেঁহুস থেকে চলে গেল সে। ইসলামী বেদে ছিল ওর মা বাবা।"

অতীত জীবনের বিস্মৃত ইতিহাসের জীর্ণপ্রায় পাতাগুলো উলটে যায় একটার পর একটা। যে কথা এত দিন না-বলা ছিল আজ সে সবই বলে গেল, ওর জীবনের ব্যথা-বিক্ষুব্ধ দুঃখ-বিদ্রোহময় ইতিহাস। মনুষ্যত্বের পরম পরিচয়ের কাহিনী।

—ওই আমাকে বাঁচিয়েছিল সেবার হিজোলের বিলে, কালকেউটের ছোবল মেরেছিল ডান হাতে, কাটা দাগটা এখনও আছে ; একদিন পুরো বেঁহুস হয়ে পড়েছিলাম, ওই বাচায় আমাকে সেবা-যত্ন করে। নীচু জাত হলে কি হবে সন্তু, ওর মত মেয়ে আমি দেখি নি ; তাই ওরই দেওয়া জান ওর জন্যেই বিলিয়ে দিলাম।

বাড়ী-ঘর-সম্পত্তি সবকিছু ছেড়ে দিলাম ওর জন্যেই ! ও আমার জন্য তার জাত, তার ইমান ছেড়ে দিতে পেরেছিল, আমিই বা কমতি কি ! ছেড়ে দিয়ে এলাম সবকিছু। আজ সে-ই আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। কবরের উপর বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েছে কচি কচি শ্যামল দূর্বাঘাস। বাঁশের নুইয়ে-পড়া ডালগুলো দমকা বাতাসে ওর উপর কোমল পরশ বুলিয়ে যায়।

—"আজ বাধা ত ঘুচে গেছে। তুমি বাড়ী ফিরে যাবে না কেন ?"

খানিকক্ষণ আমার দিকে সে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। বাতাসের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ ! ধীরে ধীরে বলে উঠে, "ওকে অপমান করা হবে সবচেয়ে বেশী।" চলে গেল বাড়ীর দিকে। একলা দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। কখন জানি না বাঁশবনে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশের বুকে দু'একটা তারার জোনাকী নির্জনতা ভেদ করে চলেছে বাতাসের চাপা শব্দ। জনহীন সুপ্তিময় জায়গাটা থেকে বার হয়ে এলাম।

তারপর বড় বেশী আর দেখা হয় নি কুঁচিল মামার সঙ্গে। মাঝে মাঝে দেখা যায় কপিশ গৈরিক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে শীর্ণ একটা লোক ; গেরুয়া রঙের কাপড়—গেরুয়া মাটির রঙে একাকার হয়ে গেছে। লোকে তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলাবলি করে, কিন্তু আমি জানি পল্লীর রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর-পথে বিচরণশীল ঐ ক্ষয় মূর্তিখানি মানুষের তৈরি বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ—তার উদ্ধত তর্জনী যেন বিদ্রোহের জয়ধ্বজা।

[illegible]

শ্রীঅরবিন্দ

(একটি অপ্রকাশিত ইংরেজী কবিতা ও তাহার বাংলা অনুবাদ)

I walked beside the waters of a world of light
On a gold ridge guarding two seas of high-rayed night.
One was divinely topped with a pale bluish moon
And swam as in a happy deep spiritual swoon
More conscious than earth's waking; the other's wide delight
Billowed towards an ardent orb of diamond white.
But where I stood, there joined in a bright marvellous haze
The miracled moons with the ridge's golden blaze.
I knew not of two wakings or two mighty sleeps,
Mixed the great diamond fires and the pale pregnant deeps,
But all my glad expanding soul flowed satisfied
Around me and became the mystery of their tide.
As one who finds his own eternal self, content,
Needing naught else beneath the spirit's firmament,
I knew not Space, it heard no more Time's running feet,
Termless, fulfilled, lost richly in itself, complete.
And so it might have lain for ever. But there came
A dire intrusion wrapped in married cloud and flame,
Across the blue-white moon-hush of my magic seas
A sudden sweeping of immense peripheries
Of darkness ringing lambent lustres; shadowy-vast
A nameless dread, a Power incalculable passed
Whose feet were death, whose wings were immortality;
Its changing mind was time, its heart eternity.
All opposites were there, unreconciled, uneased,
Struggling for victory, by victory unappeased.
All things it bore, even that which brings undying peace,
But secret, veiled, waiting for some supreme release.
I saw the spirit of the cosmic Ignorance;
I felt its power besiege my gloried fields of trance.

—Sri Aurobindo

কোন এক জ্যোতির্ময় জগতের জলরাশিপাশে
ভ্রমিতেছিলাম আমি স্বর্ণ-গিরি 'পরে, ছিল যাহা
আগুলিয়া স্নিগ্ধোজ্জল রজনীর দুইটি সাগর।
শিরে জাগে শান্ত শশী দিব্যচ্ছটা পাণ্ডুর-নীলাভ
একটি সাগর ছিল প্লবমান, যেন সুগভীর
সুখময় সমাধিতে লীন—ধ্যানমগ্ন ; সচেতন
তবু এই পৃথিবীর জাগরণ হ'তে বহুগুণে ;
বিশাল আনন্দ সাথে অন্য সিন্ধু ধাবমান বেগে
বজ্রমণিসম শুভ্র সমুজ্জল চন্দ্রলোক পানে
উর্মিমালাকুল। কিন্তু, যেথা আমি ছিলাম দাঁড়ায়ে
শৈলটির হিরণ্ময় প্রভা সাথে ছিল আলিঙ্গিয়া
অলৌকিক চন্দ্রদ্বয়, দীপ্তোজ্জল জ্যোতির্ময় হিমায়।
দুই জাগরণ, দুই মহানিদ্রা নাহি জানিতাম,
মিশায়ে ফেলিয়াছিনু অতল নীলাভ সিন্ধু সাথে
ঝকিয়াল অগ্নিশিখা হীরক-উজ্জ্বল। কিন্তু মোর
আনন্দে প্রসার্য্যমান সারা আত্মা পরম সন্তোষে
স্বচ্ছন্দে বহিতেছিল চারিপাশে আমারে ঘিরিয়া
সেই দুই সাগরের ফেননৃত্য-রহস্যের রূপে।
শাশ্বত আত্মারে সেই যে-জন জেনেছে আপনার,
নাহি রহে বিশ্বতলে আর তার কোন প্রয়োজন,
আত্মতৃপ্ত সেই জন—সেই মত মোর মন হ'তে
গেল চলি' স্থান আর সীমার কল্পনা, ধাবমান
কালের চঞ্চল পদধ্বনি আর নাহি শুনিলাম,
অনামী, প্রশান্ত, পূর্ণ, আপনার মাঝে আত্মহারা
চিরকাল হয়ত সে রহিত এরূপ। কিন্তু সেথা
প্রবেশিল বন্যা-বেগে অনাহূত কোন্ ভয়ঙ্কর
সম্মিলিত-মেঘ-বহ্নি-সমাচ্ছন্ন ; মোর দুই মায়া-
সাগরের নীল-শুভ্র-চন্দ্রালোক-নৈঃশব্দ্যের মাঝে
উদ্দাম বন্যার মত প্রচণ্ড প্লাবনে অকস্মাৎ
দিগন্ত ব্যাপিয়া এল আঁধারের চক্রজালরাশি

যাহা হ'তে উচ্ছলিত জ্যোতিকণা ঝলকে ঝলকে;
ছায়াময় সুবৃহৎ নামহীন বিভীষিকা এক,
অমিতবিক্রম সে যে গেল চলি, চরণ তাহার
ছিল সাক্ষাৎ মরণ, পক্ষদ্বয় ছিল অমরতা,
পরিবর্ত্তময় কাল ছিল এর চিত্ত বহুরূপী,
মর্ম্মস্থল অনন্তস্বরূপ। ছিল তথা যাহা কিছু
পরস্পর বিপরীত, অশান্ত ও সামঞ্জস্যহীন,
বিজয়প্রয়াসী সদা, তবু তৃপ্ত নাহি হয় জয়ে।

বিশ্বের সমস্ত বস্তু ছিল সে যে করিয়া ধারণ,
(ছিল তাও আনে যাহা শান্তি অবিনাশী) অন্তর্গূঢ়,
গুপ্ত—কোন পরম মুক্তির তরে ছিল অপেক্ষিয়া।
দেখেছিনু বিশ্বব্যাপী অবিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ,
শক্তি যার (করেছিনু অনুভব আমি) আক্রমিছে
জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত ধ্যানের সমাধি-ভূমি মম।

অনুবাদক—শ্রীপৃথ্বীসিংহ নাহার

বন্ধু বটে!

সমারসেট মম

অনুবাদক—শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিশ বছর ধরে আমি আমার পরিচিত লোকদের দেখে আসছি। কিন্তু আজও আমি তাদের বিশেষ ভাল করে জানি না। চেহারা দেখে চাকর রাখতে আমার দ্বিধা হয়। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এই চেহারা দেখেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা মানুষকে বিচার করে থাকি। চোয়ালের আকার, চোখের চাহনি, মুখের রেখা—এসব থেকেই আমরা মত স্থির করে থাকি। আর আশ্চর্য্য, এ সবে ভুলের চেয়ে ঠিক হয় বেশী ক্ষেত্রে। নাটক উপন্যাসে জীবনকে যে গল্প মনে হয়, তার কারণ বোধ করি, লেখকেরা হয়ত প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁদের কল্পিত চরিত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করে রচনা করেন। তাঁরা মানুষের চরিত্রের আত্মবৈষম্য বা সংঘাত দেখাতে পারেন না—কারণ তা হলে তারা অবাস্তব বা অবোধগম্য হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তবুও আত্মবৈষম্য আমাদের অধিকাংশের চরিত্রেই আছে। মানুষ গরমিলের বাণ্ডিল। লজিকের বইয়ে অবশ্য বলে থাকে, হলদে রংকে নলাকৃতি বলা বা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বাতাসের তুলনা করা বাতুলতা; কিন্তু বাস্তবতার গরমিলের জগাখিচুড়িতে দেখা যায়, হলদে রঙের সঙ্গে ঘোড়া বা গাড়ীর এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সময়ের বেশ তুলনা হতে পারে। আমি শুনে অবাক হয়ে থাকি, লোকে যখন বলে যে মানুষ সম্পর্কে তাঁদের প্রথম ধারণা নির্ভুল হয়ে থাকে। আমি ভাবি হয় তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, নয় তো তাঁদের বাগাড়ম্বর অসম্ভবরকম বেশী। আমার নিজের অভিজ্ঞতা—মানুষকে যতই দেখেছি ততই সে বিভ্রান্তকারী বা অবোধগম্য মনে হয়েছে; আমার সবচেয়ে পুরানো বন্ধুদের সম্পর্কেও আমি অতি সাধারণ প্রাথমিক ব্যাপারটাও জানি না।

আজ এসব কথা মনে হবার কারণ সকালের কাগজে দেখলাম এডওয়ার্ড হাইড বার্টন কোবেতে মারা গেছেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উপলক্ষে বহু বৎসর জাপানে ছিলেন। আমি তাঁকে অতি সামান্যই জানতাম। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ঔৎসুক্যের কারণ—তিনি একবার আমাকে একটি ঘটনায় চমকে দিয়েছিলেন।

তাঁর নিজের মুখ থেকে না শুনলে আমি হয়ত বিশ্বাসই করতাম না যে, তিনি এরকম করতে পারেন। এটা অধিকতর চমকপ্রদ এই জন্য যে, চেহারায় ও ব্যবহারে তিনি ছিলেন সুনির্দ্দিষ্ট একটি 'টাইপ'। ক্ষুদ্রকায়, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশী নয়—পাতলা চিকণ চেহারা। ফরসা চুল, লালচে মুখ, কুঞ্চিত চর্ম্ম, নীল চোখ। তাঁর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, বয়স ও পদোচিত প্রশান্তি তাঁর চেহারায়।

কোবেতে আপিস হলেও বার্টন প্রায়ই ইয়াকোহামাতে আসতেন। একবার কি উপলক্ষে আমি কয়েক দিন ওখানে ছিলাম। ব্রিটিশ ক্লাবে তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করে দেওয়া হয়। এক সঙ্গে ব্রিজ খেললাম। তিনি বেশ খেলেছিলেন—দরাজ হাত। বড় একটা কথা বলতেন না—খেলার সময়ও নয়, পরে যখন একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করছিলাম তখনও নয়। কিন্তু যেটুকু বলতেন তা বেশ শাঁসালো। গম্ভীর, শান্ত প্রকৃতির লোকটি, গভীর তাঁর রসবোধ। ক্লাবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়। তিনি ক্লাব থেকে বিদায় নেওয়ার পর একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁকে ক্লাবের প্রধানদের অন্যতম বলে অভিহিত করা হ'ল। ঘটনাক্রমে আমরা দু'জনেই থাকতাম গ্রাণ্ড হোটেলে। পরের দিন তিনি আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। স্থূলাঙ্গী, বয়স্কা, সদাহাস্যময়ী মহিলা। তাঁদের দুই মেয়েও উপস্থিত ছিলেন—একটি স্নেহময় পরিবার। আমার মনে হয়, বার্টনের যে গুণটি আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল সেটি হচ্ছে তাঁর সহৃদয়তা। তাঁর নীল নরম চোখে এমন কিছু ছিল যা খুব সুন্দর লাগত। তাঁর কথা বলার সুর এত মোলায়েম যে, মনে হয় তিনি যেন [illegible]

বলার মন চালাতে পারতেন না। তাঁর হাসি মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁর মধ্যে ছিল এমন একটি সত্তা যার প্রীতি ভেজালশূন্য এবং সহজেই অনুভব করা যায়। এক কথায় তিনি ছিলেন মনোরম। কোন রকম আত্মম্ভরিতা তাঁর ছিল না। কার্ড আর ককটেল তাঁর প্রিয় ছিল। গুছিয়ে সুন্দর রসালো গল্প বলতে পারতেন। অল্প বয়সে ডন-কুস্তিরও খানিকটা অভ্যাস ছিল। তিনি অর্থশালী এবং প্রতিটি পয়সা তাঁর নিজের উপার্জ্জিত। তাঁর ঐ ছোট্ট ছিপছিপে চেহারা দেখলে মনে তাঁর প্রতি করুণা জাগে। মনে হবে, তিনি একটি মশাকেও আঘাত করতে পারেন না।

এক দিন বিকেলে গ্রাণ্ড হোটেলের বিশ্রামকক্ষে বসে আছি। সময়টা ছিল সেই বিখ্যাত ভূমিকম্পের পূর্ব্বেকার, তখনও ওখানে চামড়ার ইঞ্জিচেয়ারের চল ছিল। জানলা দিয়ে দেখা যেত সুদূর-বিস্তৃত বন্দরের দৃশ্য, অবিশ্রান্ত গাড়ীঘোড়ার চলাচল। ভেঙ্কুভার সানফ্রান্সিসকো, ইউরোপগামী বিরাট বিরাট জাহাজ সব। ইউরোপ-গামী জাহাজগুলি সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর হয়ে যেত। সমুদ্রযাত্রী দুনিয়ার ভবঘুরেদের দেখতে পাওয়া যেত এই বন্দরে। অসংখ্য সাম্পান আর চীনে নৌকার রঙীন পালেরও ভিড় জমত এই বন্দরে। ব্যস্ত-সমস্ত প্রাণচঞ্চল দৃশ্য; কিন্তু তবু, কেন জানি না, আমার মনে হ'ত, অন্তরে এদের চাঞ্চল্য নেই। এসব দৃশ্যে রোমাঞ্চ ছিল, তার স্পর্শানুভূতির জন্য যেন শুধু হাত বাড়াবার অপেক্ষা।...

কিছুক্ষণ পরে বার্‌টন এসে আমাকে দেখে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন।

'একটা ড্রিঙ্ক হলে কেমন হয়, কি বলেন?'

হাতে তুড়ি দিয়ে বয়কে ডেকে দু' গ্লাস জিনের অর্ডার দিলেন। বয় যখন গ্লাস নিয়ে আসছিল তখন বাইরের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটি লোক আমাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে অভিবাদন জানাল।

'টার্ণারকে চেনেন নাকি?' বার্‌টন আমার প্রতি-অভিবাদন লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন।

'ক্লাবে দেখেছি। শুনলাম, এর সবকিছু গেছে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। এ রকম অনেক এখানে আছে।'

'এ ভাল ব্রিজ খেলে।'

'এরা সাধারণতঃ ভালই খেলে থাকে। গত বছর এখানে এক জন ছিল—আমারই নামের। তাকে হয়ত কখনও লণ্ডনে দেখে থাকবেন। লেনি বার্‌টন বলে পরিচয় দিত। মনে হয়, সে চাল ভাল ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিল।'

'না, এ রকম নামের কাউকে ত মনে পড়ছে না।'

'সেও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত একজন খেলোয়াড় ছিল। মনে হ'ত, তাস-খেলা তার স্বাভাবিক বৃত্তি। অবিশ্বাস্য রকমের ভাল খেলত। তার সঙ্গে আমি অনেক দিন ভাল খেলেছি। কোবেতে সে কিছুকাল ছিল।' বার্‌টন জিনে চুমুক দিলেন।

'গল্পটা বেশ মজার।' বার্‌টন বলতে লাগলেন, 'সে খারাপ [illegible] না। তাকে খুব পছন্দ হ'ত। সব সময় বেশ ফিট্‌ফাট পোশাক, চালাক-চতুর চেহারা। বলতে গেলে সুন্দরই বলা যায়। কোঁকড়ানো চুল, রক্তাভ গাল। মেয়েমহলে তার সম্পর্কে অনেক কথা হ'ত। লোকটার স্বভাবে অপরের ক্ষতিকর কিছু ছিল না, শুধু সে ছিল ছন্নছাড়া। অবশ্য বড় মদ খেত। আর এ ধরণের লোকেরা করেও থাকে তাই। তার নামে কখনও কখনও কিছু টাকা আসত, আর তাস খেলেও সে কিছু কামাত। আমার সঙ্গে খেলে সে বেশকিছু জিতেছে, জানি।' বার্‌টনের মুখে একটা করুণ স্মিত হাসি। "আমি নিজে দেখেছি ব্রিজে অনেক টাকা হেরেও তার মুখের হাসিখুশী ভাব মিলায়ে যায় নি।" পরিষ্কার কামানো চিবুকে বার্‌টন তাঁর পাতলা হাতখানা বুলাতে লাগলেন; হাতের শিরগুলো টান হয়ে উঠেছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে।

'এজন্যই হয়ত সে আমার কাছে এসেছিল এবং সম্ভবতঃ নামের মিল থাকায়ও। এক দিন আমার আপিসে এসে দেখা করে এবং একটা চাকুরি চায়। আমি একটু আশ্চর্য্যই হয়েছিলাম। বললে, বাড়ী থেকে আর টাকা আসবে না, কাজেই সে কাজ করতে চায়। তার বয়স জিজ্ঞেস করলাম।

বললে, 'পঁয়ত্রিশ।'

'এই বয়স পর্য্যন্ত আর কোন কাজ করেছ?' প্রশ্ন করলাম।

'না, তেমন কিছুই নয়।'

'আমি না হেসে পারলাম না।'

'এখন কিছু করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না,' আমি বললাম, 'আর পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে এসে দেখা করো, দেখব যদি কিছু করতে পারি।...

'সে নড়ল না। করুণ বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে বললে, কিছুদিন যাবৎ তাসেও তার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পালা চলেছে। তাসে লেগে থাকার আর ইচ্ছা নেই। আজকাল পোকার খেলছে। তাতেও হারছে। এখন একটা আধলাও নেই। যা ছিল সব বন্ধক দিয়েছে। হোটেলের বিল শোধ করবার মত কিছু নেই, তারাও আর বাকি দেবে না। লোকটা যেন হতাশায় ভেঙে পড়েছে। বললে, যদি কোন কাজ না পায় তা হলে তাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

তার দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, লোকটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। মদ সে অসম্ভব রকম বেশী খেয়েছে। এখন তাকে দেখাচ্ছিল পঞ্চাশের উপর। তার এই চেহারা যদি মেয়েরা দেখত তা হলে তার সম্বন্ধে আর কোন আশার কথাই তাদের মনে আসত না।

'আচ্ছা, তাস ছাড়া তুমি আর কিছুই কি জান না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।'

'সাঁতার জানি।'

'সাঁতার!'

'আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না লোকটা এ রকম অদ্ভুত উত্তর দিতে পারে।'

'ইউনিভার্সিটির দলের হয়ে আমি সাঁতারে যোগ দিয়েছিলাম।'

'এবার আর মনোভাবের কিছু আঁচ করতে পারলাম। বহু লোক আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব ক্ষুদে দেবতাদের কার্যাকলাপে অভিভূত হয়ে থাকে।'

'আমিও তরুণ বয়সে একজন ভাল সাঁতারু ছিলাম।' আমি বললাম।

'হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।' গল্পে একটু বিরতি দিয়ে বার্‌টন আমার দিকে তাকালেন।

'আপনি কোবে গেছেন কখনও?' বার্‌টন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' তবে একবার ওপথে আসার সময় এক রাত্রি ছিলাম।'

'তা হলে আপনি বোধ হয়, শিওয়া ক্লাব জানেন না। যখন বয়স কম ছিল আমি একবার ওখানকার ঘাট থেকে সাঁতরে তারুমির ফাঁড়ির মুখে গিয়ে উঠেছিলাম। প্রায় তিন মাইলের উপর। ফাঁড়ির চারদিকে তীব্র স্রোত থাকায় সাঁতারানো আরও কঠিন। যাই হোক, আমার নামের সেই লোকটিকে ঐ ফাঁড়ির কথা জানালাম এবং বললাম, সে যদি সাঁতরে আসতে পারে তা হলে তাকে একটা চাকরি দেব।'

'দেখলাম তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তুমি ত সাঁতারু এই-ই বললে।' আমি বললাম।

'আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়।' সে উত্তর দিলে।'

'আমি চুপ করে রইলাম, একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গী করার সে আমার দিকে চাইল এবং মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।'

'বেশ তাই হবে।' সে বললে, 'কখন আমাকে সাঁতরাতে হবে?'

আমার ঘড়ির দিকে চাইলাম, 'দশটা বেজে গেছে। কালকে তোমার সাঁতারে মিনিটের বেশী লাগা উচিত নয়। আমি সাড়ে বারটার ফাঁড়ির কাছে গাড়ীতে গিয়ে অপেক্ষা করব। ওখান থেকে পোশাক বদলাবার জন্য তোমাকে ক্লাবে নিয়ে যাব এবং এক সঙ্গে লাঞ্চ করব।'

'আপনি তাই করবেন।'

'হ্যাণ্ডশেক্‌' (করমর্দন) করে তাকে 'গুডলাক' (শুভকামনা) জানালাম। সে আমার কাছ থেকে চলে গেল। সেদিন সকালে আমার অনেক কাজ ছিল। কোন রকমে ব্যবস্থা করে ঠিক সাড়ে বারটায় ফাঁড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু দেখলাম, তাড়াহুড়ো না করলেও চলত। সে আর ওখানে পৌঁছয় নি।'

'শেষ-মুহূর্তে ভয় পেয়ে সটকে পড়ল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সে ভয়ে পিছিয়ে যায় নি। ঠিক সময়ে সাঁতার আরম্ভ করেছিল। কিন্তু মদে আর খামখেয়ালিতে তার শরীর ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। ফাঁড়ির চারদিকের সেই তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে সে এঁটে উঠতে পারে নি। তিন দিন পর্যন্ত আমরা তার লাস পাই নি।'

কয়েক মিনিটের জন্য আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার মনে একটু ধাক্কা লেগেছিল। বার্‌টনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম।

'আচ্ছা, আপনি যখন তাকে চাকরি দেবার কথা বলেছিলেন, তখন কি আপনার মনে হয়েছিল সে জলে ডুবে যাবে?'

মৃদু স্মিত হাসি তাঁর মুখে। নীল ভাসা ভাসা চোখে তিনি আমার দিকে চাইলেন। চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'দেখুন ব্যাপারটা হ'ল, সে সময় আমার আপিসে কোন চাকরি ছিল না।'

[Somerset Maugbm-এর A Friend in Need' গল্পের অনুবাদ।]

আশা ও আশঙ্কা

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

মানুষের মনে আশা যিনি দিয়েছেন, আশঙ্কাও নিশ্চয়ই তাঁরই দান। ইতর প্রাণীর মধ্যেও তিনি খাবার আগে শুঁকে দেখবার প্রবৃত্তি দিয়েছেন। এ প্রবৃত্তিও জীব-সুলভ সহজাত আশঙ্কার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের মনে কিন্তু ভগবান আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বস্তুও অকৃপণ ভাবে দিয়েছেন; সেটি হচ্ছে আশঙ্কা জয় করবার আগ্রহ। ইতর প্রাণীর মনোজগতে খুব সম্ভব অমন-ধারা কোনও প্রেরণার অস্তিত্ব নাই; অথবা থাকলেও তা নিতান্তই সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। ভয়ের জয়ের উপরে যেমন অভয়ের প্রতিষ্ঠা, ঠিক তেমনই আশঙ্কার জয়ের উপরেই সত্যিকারের আশার প্রতিষ্ঠা। আশঙ্কালেশহীন যে আশা তা হচ্ছে আকাশকুসুম। আর, আশঙ্কার অভিভূত যে মানুষ সে হচ্ছে জীবন্মৃত।

একথা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য সমষ্টির পক্ষেও ঠিক তেমনই সত্য। আশা আর আশঙ্কার দ্বন্দ্বে আশার বিজয়ের শঙ্খধ্বনি চিরদিন মানব-সভ্যতার অভিযানের পথনির্দেশ করে এসেছে, সর্বত্র তার প্রগতিকে অভিনন্দিত করেছে। আবার, আশঙ্কার অন্ধকার যখনই যেখানে ব্যাপক ভাবে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে আশাকে করেছে নিঃশেষে নির্বাপিত, সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত, বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত।

বস্তু হিসেবে সোনা সংসারী মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে তাতে খানিকটা খাদ মেশানো দরকার। খাদের মাত্রা বেশী হলে তাকে বলে 'মরা সোনা'। আরও বেশী হলে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। মানুষের মনের আশা আর আশঙ্কার বোঝাপড়ার ব্যাপারেও কতকটা অমনি-ধারাই হয়ে থাকে। যতক্ষণ না মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ততক্ষণ আশঙ্কা মানুষের আশার পরিপূরণের নব নব কৌশল যোগায়, তার কর্তব্যের অনুশীলনে প্রেরণা জাগায়। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আশঙ্কা মানুষের শরীরের ও মনের আলস্য আর অবসাদেরই শুধু প্ররোচনা যোগায়। তাকে কর্তব্যবিমুখ করে।

মাঘের প্রবাসীতে "সর্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কয়েকটি দিক" নামে শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখক সংক্ষেপে গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনার আশা, আর বাদবাকী আটটি অনুচ্ছেদে ওবিষয়ে রাজনৈতিক, নৈতিক, বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহুবিধ আশঙ্কার সবিস্তার বিবৃতি দিয়েছেন। আশঙ্কার চাপে আশার যে জীবন্ত সমাধি হয়েছে—তাঁর মনে সে বিষয়ে তিনি বিন্দু-মাত্রও সন্দেহের অবকাশ কোথাও রাখেন নাই। বস্তুতঃ তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে পরিকল্পনার দিক বা বিদিক খুব কমই রয়েছে। মনে হয়, পরিকল্পনা থেকে বিমুখ হয়েই তিনি কলম ধরেছিলেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লেখক বলছেন, "পণ্ডিত নেহরু হতে অনেকেই মনে করেছেন এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতির সিংহদ্বার উন্মোচিত হবে। তার কারণ, এর সাহায্যে পরিকল্পনাধীন এলাকাগুলিতে শুধু যে চরম উন্নতির (intensive development) পরম চেষ্টা হবে তাই নয়, তার চেয়েও বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এলাকাগুলির সকল সমস্যার উপর সর্বাঙ্গীণ আক্রমণ।···তার সঙ্গে আছে দেশবাসীকে কর্মযজ্ঞে আহ্বান, এই সবের সমন্বয়ে এই প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব। সেই কারণেই অনেকে এ বিষয়ে খুব উৎসাহিত হয়েছেন।" লেখক কিন্তু "সে রকম উৎসাহ বোধ কখনই করতে পারেন নি, তার অনেকগুলি কারণ আছে।" তিনি বলছেন, "আমাদের দেশে বহু পরিকল্পনা হয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা শিশুমৃত্যু বা অপমৃত্যুর শোচনীয় পরিণতি এড়াতে পারে নি। বিজাতি হৃদয়হীন শাসন তার একটা খুব বড় কারণ বটে, কিন্তু দু'চারটি ক্ষেত্রেও যে কোথাও কোথাও আন্তরিক সদিচ্ছা ও উৎসাহের অভাব ছিল এমন কথা বলা চলে না।"

সদিচ্ছা আর উৎসাহের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও প্রধানতঃ পরাধীনতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিকূলতার অতীতে আমাদের কোন কোনও প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। একথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েও আনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত যে, অতঃপর আমরা সবাই [illegible] সংযত করে শুধু আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয়েই ব্যাপৃত থাকব।

[illegible] "[illegible]" বাদলে তার পাশের আবহাওয়া

যান্ত্রিকতামুক্ত নিজস্ব করে কি উপায়ে নূতন মানুষ গড়া যায়, সেইটেই হ'ল জাতীয় নেতাদের প্রধান দায়িত্ব।" তার পরে, "ভারতবর্ষের মত ক্ষীয়মাণ দেশের তীব্রতম অর্থনৈতিক সঙ্কটের" সমাধান করতে হবে "গভীর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন" এনে। সেই "পরিবেশে যখন নূতন অর্থনৈতিক প্রসারের সূচনা দেখা দেবে তখন সেই সূচনাকে সর্বাঙ্গীণভাবে সার্থক করে তোলবার প্রকৃষ্ট উপায় কমিউনিটি প্রোজেক্ট। বস্তুতঃ সেটা খুবই ভাল উপায়।" লেখকের পরামর্শও খুবই ভাল, কিন্তু এই উক্তির ভিতরে মৌলিকতা কোথায় ?

২

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখক ভারত-সরকারের একটা হাঁড়ির খবর প্রকাশ করে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে এই—"এই পরিকল্পনার অধিকাংশ অর্থই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমেরিকার।" আমেরিকার প্রত্যক্ষ সাহায্যের "পরিমাণ খুব বেশী নয়।" কিন্তু পরোক্ষ সাহায্য নাকি বিস্তর। প্রবন্ধকার নিঃসংশয়িতভাবে সেটা সপ্রমাণ করে দিয়েছেন। সাধারণের অবগতির জন্য তিনি লিখেছেন : "আমেরিকা ধারে ভারতবর্ষকে যে গম সরবরাহ করেছিল এবং যে গম ভারত-সরকার এখানে নগদ দামেই বেচেছিলেন, সেই ধার ত্রিশ বছর পরে শোধ করতে হবে এই রকম সর্ত আছে। এখন সেই গম-বিক্রয়লব্ধ টাকাটা নগদ শোধ দেবার দরকার না হওয়ায় শোনা যায় সেটাই এই দ্বিতীয় তহবিলে রাখা হয়েছে এবং আমেরিকার সম্মতিক্রমেই এখন ভারত-সরকারের অংশ হিসেবে এই পরিকল্পনায় খরচ করা হচ্ছে।"

উপরের বিবৃতির মধ্যে ছোট্ট একটা 'শোনা যায়' রয়েছে। নিতান্ত বাক্যালঙ্কার হিসাবে নিশ্চয়ই ওটার প্রয়োগ হয় নাই। 'যা রটে তার কিছু বটে' মনে করে প্রমাণ হিসাবেই বোধ হয় ওটার আমদানি করা হয়েছে।

সরকার ত্রিশ বছর মেয়াদী ঋণে যে গম আমেরিকা থেকে আনালেন সেটা 'এখানে নগদ দামে' বেচলেন। ত্রিশ বছরের মেয়াদে আমাদেরও যদি সরকার ধারে পাওয়া গম ধারেই সরবরাহ করতেন, এবং আমাদের অবর্তমানে আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির কাছ থেকে দামটা আদায় করতেন তা হলে এ দুর্দিনে আমাদের কতই না সুবিধা হ'ত। তা ত করলেনই না; আবার গম বেচা টাকা সুদে খাটিয়ে রাখলে ত্রিশ বছর পরে সবৃদ্ধিমূল বেশ মোটা একটা অঙ্কে পরিণত হ'ত, তাও করলেন না। সে টাকাটা 'শোনা যায়' তাঁরা পরিকল্পনার পিছনে খরচ করে ফেলছেন। হয়ত কাজটা ঠিক হচ্ছে না; হয়ত বিনামূল্যে গম বিতরণ করলেই সবচেয়ে ভাল হ'ত। সে সবই বোঝা যায়; কিন্তু বোঝা যায় না টাকাটা আমেরিকার হ'ল কি ক'রে। ধারে গম দিয়েছে আমেরিকা ত্রিশ বছর পরে সুদশুদ্ধ তার দাম পাবে এই সর্তে। ধারে গম কিনলেন বলে ভারত-সরকার আর ধারে কেনা গম খেয়েছে বলে ভারতবাসী এ ত্রিশ বছর হাত-পা গুটিয়ে জড় হয়ে বসে থাকবে এমন কোনো

সর্ত কিছুই নাই। দেশের টাকা দেশের কাজে দেশে খরচ হবে তার জন্যে আমেরিকার 'সম্মতির'ই বা প্রয়োজন কোথায়?

৩

প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদের উপসংহারে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন: "মৌলিক বাধাগুলির গভীর বিশ্লেষণ করে সেগুলি দূর করবার সত্য সত্য ব্যবস্থা না করে এই পরিকল্পনায় হাত দিলে হাজারো সদিচ্ছা, হাজারো উৎসাহ ও হাজারো বার কর্মযজ্ঞে উদ্দীপ্ত আহ্বান সত্বেও পরিকল্পনা সফল হবে না এবং তাতে যে রকম বিরাট পরিমাণ আশাভঙ্গ হবে তার ফল দেশের পক্ষে মারাত্মক হবে।"

লেখক অবশ্য সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়েই দেশবাসীকে সাবধান করে দিচ্ছেন। কিন্তু মনে তাঁর আশঙ্কার অন্ধকার জমাট বেঁধেছে, আশার আলোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সাঁতার না শিখে জলে নামলে ডুবে মরবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তাতে আর ভুল কি? কিন্তু তবুও সাঁতার না শিখেই লোকে জলে নামে এবং অনেক স্থানেই তার ফল মারাত্মক হয় না। কোটি কোটি নরনারীর উৎসাহ-উদ্দীপনা যে কি বস্তু, তার যে কত শক্তি আর সম্ভাবনা দেশের লোকের মন থেকে সে স্মৃতি নিশ্চয়ই এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নাই। গান্ধীজী এক বছরে তাঁর প্রতিশ্রুত স্বরাজ দেশে আনতে না পেরে ত মোটেই ভগ্নোদ্যম হন নাই। আর, সেই আশাভঙ্গের ফলও ত দেশের পক্ষে মারাত্মক হয় নাই।—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শেষ অভিযান সম্মিলিত বিদেশী শত্রুর ব্যূহভেদ করতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তাই বলে কি তার সার্থকতা বিন্দুমাত্রও খর্ব হয়েছে?

আসলে মৌলিক বাধাগুলি পরিকল্পনার কাজের মধ্য দিয়েই বিদূরিত হবে—অপসৃত হবে। আগে সেগুলোর অপসারণের ব্যবস্থা করে তার পরে উন্নয়নের কাজে হস্তক্ষেপ করবার পরামর্শ কতকটা স্রোতের জল সরে গেলে নদী পার হবার যুক্তির মতই নিরাপদ এবং সমীচীন।

লেখকের মতে আমাদের দেশে সমবায়-আন্দোলনসকল সফল হয় নাই কতকগুলি "গভীর এবং মৌলিক কারণে।" তৃতীয় অনুচ্ছেদে তিনি লিখছেন—"যদি সত্য সত্যই দেশে সমবায়ের বান ডেকে আসত তা হলে সে তার নিজের গতিবেগেই সমস্ত বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত বিদেশী শাসনের আমলেও।" এ শুধু কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়। বান ডাকলে যে বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ বান ডাকায় কে? বিদেশী শাসনের আমলে সমবায়ের ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে তাকে আন্দোলন ত বলা যায়ই না, দোলন বললেও অযুক্তি হবে; আসলে সেটা ছিল খুব সম্ভব শুধু লোনেরই কারবার।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে একটি বিদেশী ভদ্রলোক চব্বিশ পরগণা জেলায় সুন্দরবনে চারটি দ্বীপের [illegible] নিয়ে স্থানীয় কৃষিজীবীদের সহকারিতায় সেখানে সমবায় প্রচেষ্টার প্রবর্তন করেন। অঞ্চলটি তখন ছিল জলা আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায়। সমবেত চেষ্টার ফলে আজ সেখানে চল্লিশটি সমবায়-সমিতি গড়ে উঠেছে, ২২,০০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। সেখানকার ১৫,০০০ অধিবাসীর জন্য অপর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। সমবায় পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত শস্যের সংরক্ষণ এবং বিক্রয়াদির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। তাদের কেন্দ্রীয় আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ চলেছে। সুদক্ষ কৃষকদের উৎসাহদানের জন্য বছর বছর সেখানে প্রচুর পারিতোষিকের ব্যবস্থা আছে। বছরে প্রায় এক লাখ টাকা সেখানকার কৃষিক্ষেত্রের বাঁধ প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণেই ব্যয়িত হচ্ছে। গো-পালন এবং গো-মহিষাদির সুপ্রজননের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা রয়েছে। সুতাকাটা, তাঁত-বোনা, সাবান তৈরি ইত্যাদি কুটীরশিল্পও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বীপ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে একটি করে হাসপাতাল ও দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে; উনিশটি প্রাইমারী, দুইটি মধ্য-ইংরেজী, একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ সব কাহিনী বা স্বপ্ন নয়। কলিকাতা থেকে গোসাবা বেশী দূর নয়, যাতায়াত এক দিনেই সম্ভব। যাঁরা মনে করেন "শিক্ষার অভাবে, বাইরের জ্ঞানের অভাবে, অনেক সময়ই আমাদের দেশের লোকের মন খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ, বড় কাজেও তারা দ্বন্দ্ব-কলহ-সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে একযোগে কাজে নামতে পারেন না", তাঁরা গোসাবার দৃষ্টান্তে সহজেই বুঝতে পারবেন নেতৃত্ব ও উৎসাহ পেলে সমবায়-সংগঠন-ক্ষেত্রেও এদেশের লোকের অসাধ্য কিছুই নাই।

৪

ঐ নেতৃত্ব নিয়েই ত হয়েছে যত গোলযোগ। চতুর্থ অনুচ্ছেদে লেখক দেশের লোকের শিক্ষা-সহবতের ঐকান্তিক অভাব প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে ঐ একই সঙ্গে বলেছেন:—"কিন্তু সে দোষ শুধু তাদের নয়। এই ত আমাদের দেশ, বহুকালের অবিদ্যা অবুদ্ধি অশিক্ষায় তারা জীর্ণ। এখন তবুও তাদেরই ত কাজ শিখতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে—তারাই কাজ করবে। তাদের উপর থেকে কোনও সরকার—হোক তা স্বদেশী সরকার—মুখাবৃষ্টি করলেও স্বাধীনতার মূল্য যায় ব্যর্থ হয়ে।" সরল ভাষায় এমন সুগভীর ভাবের ব্যঞ্জনা কদাচিৎ চোখে পড়ে।

দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেরা "দ্বন্দ্ব-কলহ-সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে একযোগে কাজে নামতে পারে না—সে দোষ শুধু তাদের নয়।" অর্থাৎ এ দোষের দায়িত্ব অপর পক্ষেরও আছে। সে অপর পক্ষ কাদের নিয়ে? যাঁদের 'শিক্ষার অভাব' নাই, বাইরের জ্ঞানের অভাব নাই, সমষ্টিগতভাবে খুব সম্ভব দেশের সেই সব 'মনীষী'ই ঐ অপর পক্ষ। তাই যদি হয় তবে তাঁদের সংশোধনের উপায় কি? শাস্ত্রে বলে—'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্'—অর্থাৎ যজ্ঞ, দান আর তপস্যাই মনীষীদের চিত্তশুদ্ধির [illegible]

দেখুন! ডালডা বনস্পতি কিন্‌লে কত দিক দিয়ে আপনার লাভ হবে

খেলা জিততে হ'লে আমার

যে শক্তির দরকার হয়,

ডালডাতে তা আমি পাই...

"রাম কের গোল দিয়েছে।"

"রাম, কি ক'রে শরীরটা এত ভাল রাখো?"

"ডালডা খেয়ে— ডালডা রান্নায় পক্ষে সবের সেরা।"

"বাঃ! ডালডায় রান্না! আমার যে শক্তির দরকার তা আমি এ থেকেই পাই।"

মাংস খাওয়া কি দরকার?

এ সম্বন্ধে বিনামূল্যে খবর জানতে চান তো নিচের ঠিকানায় লিখুন:-

দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস্‌
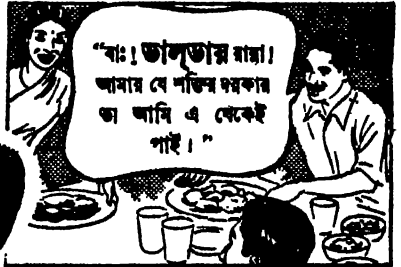
পোঃ, আঃ, বক্স, নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

সাফল্যের জন্ত শুধু খেলোয়াড়দেরই যে সুস্থ-সবল থাকা দরকার তা নয়—স্বাস্থ্য ও শক্তি আমাদের সকলেরই দরকার। চিকিৎসকদের মতে শরীরের শক্তির জন্ত যে স্নেহপদার্থ নিত্য দরকার, দেখবেন আপনার পরিবারের সকলে যেন তা পায়। এর জন্ত সব খাবার ডালডা দিয়ে রান্না করুন।

[illegible] দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পনার উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না। এ দেশের 'মনীষী'দের চিত্তশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। 'বহুকালের অবিদ্যা অবুদ্ধি অশিক্ষায় যারা জীর্ণ 'তাদেরই ত কাজ শিখতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে—তারাই কাজ করবে।' বেশ কথা, কিন্তু শিখতে হ'লে শিক্ষকের প্রয়োজন। এ রাজ্যের জনসাধারণের প্রত্যেককে রাতারাতি এক এক জন একলব্য হয়ে উঠবে এমনটা কবির কল্পনাতেও সম্ভব নয়। গীতাতেই অন্যত্র রয়েছে :

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁদের আচরণ দিয়ে যে আদর্শের প্রবর্তন করেন জনসাধারণ তারই অনুসরণ করে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনার কর্মযজ্ঞ উদ্‌যাপনের আহ্বানে ঐ শাশ্বত বাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শিক্ষিত-সমাজ এ আহ্বানে উদাসীন থাকলে দেশের দুর্গতি ক্রমাগত বেড়েই চলবে। আর, দেশসেবার আহ্বানে যথাশক্তি সাড়া দিয়েও যদি আশানুরূপ ফললাভ না হয় তা হলেও মারাত্মক রকমের আশাভঙ্গের আশঙ্কা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। এ ক্ষেত্রেও গীতার আশ্বাস স্পষ্ট :—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত ব্যক্তি কখনও দুর্গতিগ্রস্ত হয় না, ইহলোকেও নয়, পরলোকেও নয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, 'বহুকালকার অবিদ্যা অবুদ্ধি অশিক্ষায় জীর্ণ' জনসাধারণের শিক্ষার ভার বহুলাংশে দেশের শিক্ষিত সমাজকে নিতেই হবে। 'স্বদেশী সরকারের' দায়িত্বও এ বিষয়ে আরও বেশী। কাজেই সরকারী বেসরকারী সবারই একযোগে এ কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। 'সরকার' জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আর 'সরকারী প্রতিনিধি' হচ্ছেন জনগণের চিহ্নিত সেবক। স্বাধীনতার এই প্রথম সূত্রের স্বরূপ জনসেবার ভিতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। উন্নয়ন-পরিকল্পনার বিপক্ষে আজ যা নৈতিক আপত্তি তার নিরাকরণই হবে পরিকল্পনার সার্থকতার একটা বিশিষ্ট দিক।

৫

লেখকের মতে "জাতীয় আর্থিক কাঠামোর এমন কোনও দিক নেই যেখানে নতুন করে গড়ে ওঠার বা সুস্থ প্রসারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।" আর, যেহেতু (১) "রুশিয়ার মত কিংবা আরও অন্যান্য দেশের মত আমরা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাঁধি নি" এবং (২) "আমরা এখনও বহুপরিমাণে স্টার্লিং এবং ডলারের উপর নির্ভরশীল; অতএব এ অবস্থায় বর্তমান পারিপার্শ্বিকে উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালু করলে তা সার্থক হবার সম্ভাবনা নাই।" অনেকটা যেন সেই পাদরী সাহেবের বক্তৃতা : "এটি কর অঙ্গুলি—এটি এক অঙ্গুলি; এটি কর অঙ্গুলি—এটি দুই অঙ্গুলি, অতএব ঈশ্বর এক, দুই হইতে পারেন না।" কিন্তু তা নয় মোটেই। ভিতরে অনেক কথা রয়েছে। 'দাম ও চাহিদার আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ হ্রাসবৃদ্ধি, মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন; এমন কি বিভিন্ন দেশের বা এদেশেরই বিভিন্ন অংশে [illegible] বা [illegible] উদ্যোগকে 'হিং-টিং ছট্' বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। লেখক রুশিয়া-ক্ষেত্রের বাল্‌তি তৈরির চেষ্টার দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এ বিষয়ে একটা কথা বলবার আছে। তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে স্রষ্টার চোখে শিল্পীর চোখে দেখছেন না; দেখছেন শিকারীর চোখে। অর্জুন যখন গাছের উপরকার ভাস পক্ষীকে লক্ষ্য করে ধনুঃশর উদ্যত করেছিলেন তখন তিনি পাখীর মুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এ ক্ষেত্রেও খুব সম্ভব তাই হয়েছে। রুশিয়ার বাল্‌তি তৈরির চেষ্টা হয়ত সফল হবে, হয়ত হবে না। অমনধারা বহু সফলতা বিফলতার ভিতর দিয়েই উন্নয়ন-পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হবে। 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না'।

পঞ্চম অনুচ্ছেদের শেষের দিকে লেখক pricing process-এর প্রচণ্ড ঢেউয়ের অভিঘাত থেকে পল্লীশিল্প-পরিকল্পনার 'আণুবীক্ষণিক দ্বীপগুলি'কে বাঁচাবার তিনটি বিকল্প উপায়ের বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রথমে 'যে কিছু লোকসান সে সব সরকারী তহবিল থেকে পুরিয়ে দেওয়া'—দ্বিতীয় 'দ্বীপগুলোর চারপাশে পাহাড়ের মত দেওয়াল তুলে দেওয়া' আর তৃতীয় 'সারা দেশটাকেই এমন বদ্‌লে দেওয়া যাতে ও রকম বিপরীত ধাক্কাই সঞ্জাত না হয়'। জুতা আবিষ্কারের আগে রাজা হবুচন্দ্রকে তাঁর স্বনামধন্য মন্ত্রী কতকটা অমনিধারা পরামর্শই একটার পর একটা দিয়েছিলেন—ধরণীর ধুলার দৌরাত্ম্য থেকে রাজপাদপদ্মকে রক্ষা করবার জন্যে। তার কোনোটাই কিন্তু কাজে আসে নি, এবং শেষ পর্যন্ত কত সহজেই না জটিল সমস্যাটার সুমীমাংসা হয়েছিল, সেকথা আজ কারো অজানা নেই। এ ক্ষেত্রেও আশা করি, কতকটা অমনি ধারাই হবে।

আমাদের দারিদ্র্য pricing process-এর ঢেউয়ে আসে নি; এসেছে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে চড়ে। তার সামনে ছিল সঙীন আর পিছনে ছিল কামান। কি করে এদেশের কাঁচা মাল শোষণ করে, এদেশের গৃহশিল্প, পল্লীশিল্প নিঃশেষে ধ্বংস করে বিদেশী মাল দিয়ে এদেশের 'অগণিত ধনরত্নের অবাধ লুণ্ঠন বছরের পর বছর ধরে চলেছিল,' সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বিদেশী মালের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার খরচও বহুলাংশে এদেশের রাজস্ব থেকেই যোগানো হয়েছে। বিদেশী শাসক আর দেশের পঞ্চম বাহিনী এদেশের অর্থে পুষ্ট হয়ে নানাভাবে বিদেশী মালের বহুল প্রচলনে সহায়তা করেছে। এদেশের কাঁচা মাল বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চালান দেবার জন্য কোটি কোটি টাকায় নিত্য নূতন রেলপথ নির্মিত হয়েছে। বিদেশী শিল্পপতিদের স্বার্থের অনুকূল শুল্কহার, এবং পক্ষপাতদুষ্ট বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এক কথায় বিদেশীর নৃশংস বাণিজ্যিকতা আর আমাদের নিরেট তামসিকতার যোগাযোগেই [illegible] এ দশা।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট
সাবানের
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

এদেশের নিজস্ব শিল্পসত্তার যে আজও নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নাই, এখনও যে এদেশের কার্পাস রেশম এবং পশম শিল্প, এদেশের ধাতু এবং দারুশিল্প দেশ-বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে শুধু এদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি।—আজ বিদেশীর রাজশক্তি এদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু তামসিকতার মোহ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে এখনও অপসৃত হয় নাই। পল্লীশিল্পের উপর pricing process-এর প্রচণ্ড ঢেউয়ের মারাত্মক অভিঘাতের আশঙ্কা ঐ মোহেরই অন্যতম প্রকাশ। প্রচণ্ডপ্রতাপ বিদেশী রাজের আমলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে যে স্বদেশী আন্দোলন আলোড়িত করেছিল একান্ত ভাবে ভারতের এক প্রান্তের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটিকে, তার ঢেউ কিন্তু pricing process-এর ঢেউকে অনায়াসে উজানে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল ল্যাঙ্কাশায়ারে। সেদিনের সে ধাক্কা ল্যাঙ্কাশায়ার আজও সামলে উঠতে পারে নি। সেদিনের কবি গেয়েছিলেন :

নিজেরে ভাবিয়ে অক্ষম দুর্বল,
বাড়ায়ো না আর যাতনা কেবল।
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্বল সবল সেও কি ভাবিবে।

বাঙালী কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বাঙালী সেদিন গেয়েছিল :

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু আছি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠ।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দু'য়ে
আমরা রব কি উপোসি ঘরে শুয়ে।

Pricing process সেদিনও ছিল। অর্থনীতিবিদেরও অভাব ছিল না দেশে; কিন্তু বেসুরো যে গেয়েছে কেউ সেদিন, এমন ত মনে পড়ে না।

৬

অসহযোগ আন্দোলনেও বহু প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, গুরুকুল সেবা আর ত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। রাজনৈতিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও তাদের প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যেখানে কাঁচামাল উৎপন্ন হচ্ছে—সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের শ্রমের সাহায্যে সেইখানেই অথবা তার কাছাকাছি কোথাও স্থানীয় প্রয়োজনের উপযোগী শিল্প-সম্ভারও যদি উৎপন্ন হয় তবে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে—একথা বলাই বাহুল্য। চাই শুধু উপযুক্ত নেতৃত্ব আর কর্মিগণের মধ্যে ঐক্য ও একাগ্রতা।

১৯৪৬ সনের ৭ই জুলাই তারিখের হরিজন পত্রিকার বাংলা সংস্করণে শ্রীযুত প্যারেলাল লিখিত একটি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম "গ্রামসেবার উদ্দীপনা"। ঐ প্রবন্ধে স্বামী সত্যানন্দ (শ্রীবলদেও চৌবে) প্রতিষ্ঠিত, উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্গত দেহ রিঘাট গ্রামের "হরিজন গুরুকুল" প্রতিষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। তা থেকে খাদি উৎপাদনের বিবৃতিটুকু উদ্ধৃত করছি :

"স্বতন্ত্র একটি বিবৃতিতে স্বামিজী খাদি উৎপাদনের এবং তাহার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মজুরি হিসাবে যে অর্থ বণ্টন করা হইয়াছে তাহার খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য দিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪১৮ মণ সূতা উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার দাম ৪৪,১৬৫ টাকা। এই সূতা হইতে ৭৮,৮০৫ বর্গগজ খাদিবস্ত্র বোনা হইয়াছে। এই ব্যাপারে বোনাই, ধোলাই, রঞ্জন ও ইস্ত্রিকরণ বাবদ মজুরি স্বরূপ ২৬,৮৯১ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৬-এর জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইবে সেই পর্যন্ত গুরুকুলের উৎপন্ন সমগ্র খাদির দাম হইবে ৭৫,০০০ টাকা। গুরুকুলের তত্ত্বাবধানে ২,০০০ কাটুনি সূতা কাটিতেছে। গুরুকুলে সর্বশুদ্ধ যে পরিমাণ খাদি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ২০,০০০ টাকা মূল্যের খাদি কাটুনিরাই লইয়াছে। অবশিষ্টের প্রধান ভাগটা স্থানীয় লোকেরা কিনিয়াছে—আর খুব অল্প অংশই কখন কখন বিভিন্ন জেলায় পাঠান হইয়াছে।"

মনে রাখা দরকার যে এ বিবৃতিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সে সময়ে দমন-নীতির উন্মত্ত তাণ্ডব চলেছিল এদেশে। স্বামিজীর ভাষায় :

"১৯৪২ সনের আন্দোলনের সময় আমরা হিংসাত্মক কার্য্য হইতে সর্বতোভাবে বিরত থাকি। তথাপি নির্যাতনের ভাগ যথা-রীতি আমাদের লইতে হয়। আমাদের কুটীরগুলি পোড়াইয়া দেয় আর জিনিষ-পত্রাদি দখল করিয়া লয়। কিন্তু ঐ অঞ্চলে খাদিকার্য্য দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তাই আমি যখন জেলখানায় ছিলাম সেই সময়েও আমার কয়েকজন সহকর্মী চরকার কাজ আবার আরম্ভ করেন, আর সেই কাজ তদবধি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া প্রসার লাভ করে।"

এমনধারা ঘটনা ঐ সময়কার ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে, কিন্তু দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ কি? যে কাজ বিদেশী শাসকের অগ্নি-পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে—স্বাধীন ভারতে আজ তাকে অর্থ-নীতিবিরুদ্ধ বলা চলে না। দেশের বর্তমান পরিবেশ যদি পল্লী-শিল্পের প্রসারের পরিপন্থী বলে মনে হয় তবে দেশের হিতকামী সবারই উচিত গঠনকর্মের ভিতর দিয়েই সে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পরিবর্তন আনা। গীতাকার বলেছেন :

"দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥"

অর্থাৎ, যে দুঃখজনক মনে করে কায়ক্লেশ-ভয়ে কর্ম ত্যাগ করে তার সেই ত্যাগ রাজসিক—তা নিষ্ফল হয়।

৭

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে লেখক বলেছেন :—"এদেশে মুসলমান যেখানে আছে সেখানেও শিল্পের প্রসার হয় ...

কৌশল্যা বলেন যে “কোনও কিছুরই বদলে আমি লাক্স্ টয়লেট্ সাবান মেখে আমার ত্বকের নিয়মিত যত্ন নেওয়া ছাড়তে রাজি নই। আমি যে দেখতে পাই লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের ত্বক্ শোধন কাজ আমার চামড়ায় আনে এক অপূর্ব পরিবর্তন···আনে নবীনতর উজ্জ্বলতা, আনন্দদায়ী নতুন মসৃণতা।”

লাক্স্ টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 368-X52 BG

[illegible]
[illegible] দেখিয়ে দিয়েছেন pump priming method এদেশে [illegible] হবার নয়, কারণ এদেশে "সুযোগের অভাবে অলস হয়ে পড়ে আছে এমন যথেষ্ট মূলধনের" অভাব। সোজা বাংলায়—এদেশে [illegible] নাই; আর, থাকলেও তা কাজে আসবে না। অর্থাৎ: —'বোকারাম পাস করবে না, করলেও চাকরী পাবে না, পেলেও [illegible] পাবে না—পেলেও টাকাগুলো হবে সব ঢ্যাব্‌ঢ্যাব্‌!'

এদেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব; তবু ত পৃথিবীর [illegible] শিল্পপ্রধান দেশেরই লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে নিবদ্ধ হয়ে এই হতভাগ্য দেশের বাজারের উপর। আর পল্লীশিল্পের ক্ষেত্রে আথিক মূলধনের যে স্বল্পতা তার পরিপূরক হিসেবে কাঁচামাল আর নিপুণ কারিগরের সহজপ্রাপ্যতা রয়েছে এদেশে প্রচুর। স্বয়ংপূর্ণতাই হচ্ছে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেখানেও শোষণের স্থান থাকবে না আদৌ, লক্ষ্য হবে পারস্পরিক সহযোগিতা। আধুনিক সভ্য-জগতের অর্থনীতিশাস্ত্র খুব সম্ভব এ আদর্শ অনুযায়ী রচিত হয় নাই। কাজেই তার অনুশাসন বা ইঙ্গিত সর্ব্বথা প্রযোজ্য আর [illegible]নীয় নাও হতে পারে।

১৯৪৬ সনে পল্লীশিল্পের উন্নয়নের জন্য বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীমান্ সুবেদার প্রমুখ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। ঐ কমিটি যে পরিকল্পনা পেশ করেন তার বিস্তারিত বিবরণ "পল্লীশিল্প" শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯৪৬-এর ১০ই নবেম্বরের বাংলা "হরিজন পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়েছিল। পরি-কল্পনা থেকে শেষের দিকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

"এই পরিকল্পনার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের আয় বাড়িবে এবং [illegible]
হয় তাহা না লইয়াও তাহারা [illegible]
এইরূপ সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা (Social Insurance) ভারতীয় কৃষ্টিসম্মত হইবে। ইহার ফলে পূর্ব্বশিক্ষা যা কৌশল আয়ত্ত নাই এইরূপ নরনারীও অনায়াসে জীবিকার সংস্থান করিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য যাহারা আরও বেশী উপার্জ্জন করিতে সক্ষম তাহারা ইচ্ছা করিলে অপেক্ষাকৃত বেশী অর্থকরী পেশা যোগাড় করিতে পারে; পক্ষান্তরে কাহাকেও উপায়হীন এবং নিঃসম্বল হইয়া হইবে না।"

১৯৪৬ সনে বোম্বাই প্রদেশে যে পরিবেশ ছিল, আজ কি স্বাধীন ভারতের রাজ্যসমূহে তার অপকর্ষ ঘটেছে? তা যদি ঘটেই থাকে তা হলেও তার সংশোধনের উপায় বর্ত্তমান উন্নয়ন-পরিকল্পনার উদ্‌যাপনের মধ্যেই রয়েছে। এ পরিকল্পনার ত্রুটি কার্পণ্যও ধরা পড়বে, এবং সংশোধিত হবে তখনই যখন শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠার সঙ্গে একে কার্য্যে পরিণত করবার আন্তরিক চেষ্টা হবে।

—

কে, হোরজের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
এই মার্কা দেখে কিনুন • নকল থেকে সাবধান
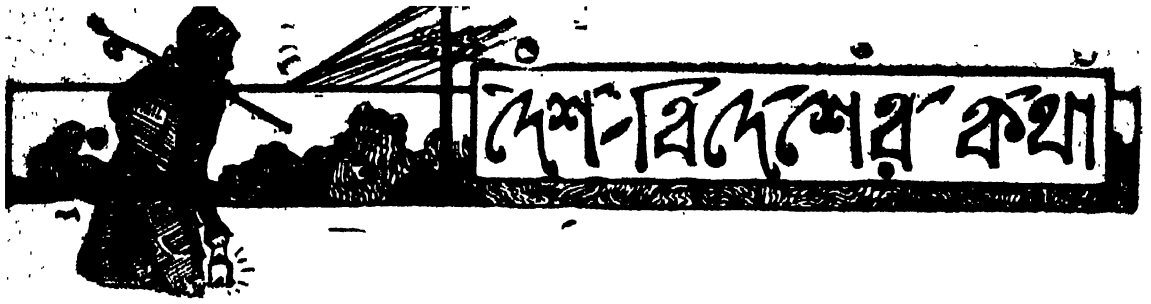
আমেরিকার মিনেসোটা রাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের বিভিন্ন অনুষ্ঠান

গত ২৪শে জানুয়ারী সেন্ট পল শহরে ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের গৃহে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের লইয়া মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বার জন ছাত্রছাত্রী ও ভারতীয় ছাত্রদের পরামর্শদাতা Dr. Pirsig সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা কোরান, বাইবেল, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করেন। ডক্টর নাগের কন্যারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত করেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী সেন্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক যমজ নগরের (twin cities) ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠান যে ক্লাবের নামে করা হয় তাহার নাম ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব। ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার Farm Campus অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাও অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং ডঃ এ. এ. ডাওরেলকে (এসিষ্ট্যাণ্ট এণ্ড ডীন অব দি কলেজ অব এগ্রিকালচার) সভাপতির পদে বরণ করেন। অতঃপর জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক" ভারতীয় ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক গীত হয়। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী-সিং নেগি অভ্যাগতদের স্বাগত-সম্ভাষণ করেন। পরে শ্রীমতী ভায়োলেট দাস সেতার বাজাইয়া শুনান। অতঃপর ডঃ কালিদাস নাগ 'ইণ্ডিয়াজ রোল ইন ওয়ার্ল্ড পিস' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর শ্রীমতী শ্যামাশ্রী নাগ ও শ্রীমতী পারমিতা নাগ রবীন্দ্র-সঙ্গীত করেন। ইহার পর চলচ্চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় মন্দির, স্থাপত্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ ও কাশ্মীর-উপত্যকার সৌন্দর্য এই ছবিগুলি অভ্যাগতদের দেখানো হয়। ছবিগুলি রঙীন এবং সকলে দেখিয়া আনন্দিত হন। অতঃপর ডঃ ডাওরেল বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একবার ভারতবর্ষে যান। তখন ভারতীয়দের আশ্চর্য্য আতিথ্যপরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হন। নিজেদের কাজের ক্ষতি করিয়াও তাহারা অতিথিদের সৎকার করে। সহ-সভাপতি শ্রীইয়াবলকর ইন্দো-আমেরিকান ক্লাবের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হয় এবং সকলকে জলযোগ করানো হয়। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরাম তার-তীয় হালুয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সকলে তাহার প্রশংসা করেন।

এখানে ডাঃ শ্রীঅশোক গুপ্ত, শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দত্ত প্রভৃতি কয়েক জন বাঙালী নানা বিষয় শিক্ষা উপলক্ষে আছেন তবে ভারত ও পাকিস্থানের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী। কৃষিশিক্ষার জন্য এখানে শ্রীলক্ষ্মী সিং নেগি, শ্রীইয়াবলকর শ্রীভেঙ্কটরাম, শ্রীকিষণ দাস পাহাড়িয়া, শ্রীএস. সিং শ্রীধরমপাল প্রভৃতি আছেন। 'এনিম্যাল হাজব্যাণ্ডি' শিক্ষার জন্য সিন্ধু দেশীয় শ্রীযুক্ত মাতানি আছেন। শ্রীদিলীপ গোস্বামী আসাম হইতে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিখিতে আসিয়াছেন। শ্রীসরযূপ্রসাদ মিশ্র এবং তাঁহার ভ্রাতা এখানে ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা করেন শ্রীমতী মাসুদা খাঁ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাস করিয়া এখানে এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স ও ষ্ট্যাটিসটিক্স পড়িতে আসিয়াছেন। শ্রীমতী ভায়লেট দাস 'এডুকেশন' পড়েন ইনি দিল্লী হইতে আসিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিশ্রী নাগ 'এডুকেশন পড়েন, শ্রীমতী শ্যামশ্রী নাগ ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা ও জার্নালিজম পড়েন, শ্রীমতী পারমিতা নাগ ইউরোপীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান পড়েন।

গত অক্টোবর মাসে স্থানীয় ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব গান্ধী জয়ন্তী উৎসব করেন। গান্ধী জয়ন্তী এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উভয় অনুষ্ঠানেই বহু আমেরিকান যোগদান করেন। তবে প্রজাতন্ত্র দিবসে লোকসমাগম অধিক হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস এবং গান্ধী জয়ন্তী ও মাঘোৎসব প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই পাকিস্থানের ছাত্রেরা অনেকে আসেন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের এবং মিশর প্রভৃতি দেশের ছাত্রেরাও এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এখানে আমেরিকানরা যখন বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের নিমন্ত্রণ করেন তখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ছাত্রছাত্রীকেই এক জায়গায় দেখা যায়। আগামী ৩০শে জানুয়ারী এখানকার ইউনিটেরিয়ান গীর্জায় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা গান্ধী-দিবস পালন করিবেন। পাশ্চাত্যদেশীয় অধ্যাপক আর্থাজানী সভাপতি হইবেন।

—শ্রীশান্তা দেবী

হায়দরাবাদে সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ১৬ই জানুয়ারী তত্রত্য শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারত বিজ্ঞানিক পরিচয় পরিষদ (All-India Cultural Contact Committee) নামক সংস্থার উদ্যোগে হায়দরাবাদে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। [illegible]

আমন্ত্রিত হইয়া প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নলিনীবাবু ইংরেজী ভাষায় এক [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"আমরা সকলে একই ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সুতরাং সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে উদার মনোভাব লইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে। অন্ধ্র প্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক মিলনসৌধ-রচনার যে মহৎ প্রচেষ্টার সূচনা করিলেন তাহা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অনুকরণযোগ্যও বটে।"

সভায় হায়দরাবাদ বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীরাজলিঙ্গম, প্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার ওয়ার্কিং সেক্রেটারী শ্রীসর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা প্রভৃতি আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

রাজমহেন্দ্রীতে অন্ধ্র সপ্তাহ উদ্‌যাপন

রাজমহেন্দ্রী গবর্ণমেণ্ট আর্টস কলেজের মেটকাফ হোষ্টেল-প্রাঙ্গণে গত ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই সাত-দিন-ব্যাপী অন্ধ্র সপ্তাহ বিপুল সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে খেলাধূলা নাট্যাভিনয় ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৫শে তারিখে হোষ্টেল-প্রাঙ্গণে বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত সুসজ্জিত মণ্ডপে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীকে. রামভদ্ররাও এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ট্রেডস ইউনিয়নের পক্ষ হইতে নলিনীবাবুকে প্রদত্ত মানপত্রে ভারতের জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বাংলার দানের কথা উল্লেখ করা হয়। কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট নলিনীবাবুর পরিচয় প্রদান করিলে পর নলিনীবাবু ইংরেজী ভাষায় লিখিত এক সুদীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "আপনারা বহু বরণীয় বাঙ্গালীর কথাই বলিলেন, কিন্তু আজ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার যে দেশপ্রেমিক সুসন্তানের প্রচারকার্য্যের ফলে অন্ধ্রদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষসাধন হইয়াছিল, দুঃখের বিষয়, সেই বিপিন পালের কথা আজ আপনারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনাদের প্রদত্ত মানপত্রে তাঁর নমোল্লেখ মাত্র নাই। এই রাজমহেন্দ্রীতেই একদা গবর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজের যে সকল ছাত্র [illegible] মানপত্র প্রদান করার অপরাধে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত [illegible] তাহারাই শেষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকে পরিণত হয়।" ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে নলিনীবাবু বলেন, "[illegible] এই আন্দোলনের প্রেরণা যে আসে বাংলার স্বদেশী [illegible] হইতে, ১৯২৩ সনে কোকনদা কংগ্রেসে প্রদত্ত কোণ্ডা [illegible] পাড়ুর ভাষণে তাহার স্বীকৃতি আছে।"

[illegible] নলিনীবাবু বলেন, "ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের [illegible] নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয় সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া নহে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের চিরন্তন আদর্শ।"

নলিনীবাবুর বক্তৃতার পর অন্ধ্রের জাতীয় গৌরব-কথা, তেলুগু কাব্য-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আরও কয়েক জন বক্তৃতা করেন। 'ঘটনা' নামে একটি তেলুগু নাটকের অভিনয়ের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

সেবায়তনে বার্ষিক উৎসব

গত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের নবম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আশ্রমের যোগমন্দির-প্রাঙ্গণে অধ্যাপক

বিভিন্ন বিভাগে স্থানীয় প্রতিযোগিগণ

শ্রীতারকচন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাবেশে এক সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে সম্পাদক শ্রীশৈলেশ-মোহন মজুমদার সেবায়তনের বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর "শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি" সম্বন্ধে

গ্রামবাসীদের মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

সারগর্ভ আলোচনাদি হয়। ২৪ তারিখে অধিবাসকালে আশ্রমাচার্য্য কর্ত্তৃক গৈরিক পতাকা প্রতিষ্ঠা, শাস্ত্রালোচনা, উপাসনা প্রভৃতি এবং সভার পূর্ব্বে ছাত্রগণের কুচকাওয়াজ হয়। সন্ধ্যায় [illegible]

আগত ক্রিয়াবান্ সাধকগণের ধর্মসভা, বিদ্যার্থিগণের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদির পর অনুষ্ঠান-উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামীর পুরস্কারপ্রাপ্তি

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী এ বৎসর লীলা পুরস্কার পাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কার পূর্ব্বে শ্রীহেমলতা দেবী (১৯৪৪), শ্রীপ্রভাবতী দেবী

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

সরস্বতী (১৯৪৬), শ্রীসীতা দেবী (১৯৪৮), শ্রীআশালতা সিংহ (১৯৫০) সালে পাইয়াছেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ১৯৫২ সালের জন্য পাইলেন। স্বর্গীয় রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই আয় হইতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাস্তু বিভাগীয় তড়িতনির্ব্বাহ যান্ত্রিক শ্রীরাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় এম-এস-সি সম্প্রতি বিলাতের বৈদ্যুতিক প্রবাহের যান্ত্রিক সংসদের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আমেরিকার তাড়িত যান্ত্রিক সংসদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বিলাতের সিটি ও গিল্ডস কলেজ হইতে অধ্যাপক সি. এল. ফর্টেস্কুর নিকট তাড়িত যান্ত্রিকের কার্য্যে শিক্ষালাভ করেন। তারপর তিনি জার্মানীর সুবিখ্যাত সিমেন্স স্কুকার্ট কারখানায়ও বিলাতের ব্যাবক ও উইলকক্স সঙ্ঘে কার্য্য করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি বিলাতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সমিতির অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইংলণ্ডের বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রবাহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা এবং বিদেশের যান্ত্রিক সমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

চক্রবৎ—শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। রীডার্স কর্ণার, ৫শিব ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম—৪৲ টাকা।

'চক্রবৎ'-এর প্রচ্ছদপটের অসংখ্য জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত ইহার অসংখ্য চরিত্র পাঠকের মনে দোলা লাগাইয়া দেয়। কাহিনী অবশ্য প্রশান্তর ভাগ্য-বিপর্যয়ের ক্ষণ হইতে সুরু হইয়াছে। দারিদ্র্যের কিনারায় আসিয়া সম্পদের চেহারাটা এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে কম লোকেই এবং সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে মমতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রাখিয়া ক্ষোভহীন মনে নূতন পথ চলিবার মনোবলও কম মানুষেরই আছে। নিজ জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে লেখক যেন প্রশান্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রশান্তই কাহিনীর কাণ্ড; অসংখ্য শাখা-পল্লবে অন্য যে চরিত্রগুলি এই বৃহৎ কাণ্ডকে অলঙ্কৃত করিয়াছে—তাহাদের সৌন্দর্য্য, প্রকাশ-প্রখরতা এবং ঋতু-অনুযায়ী অস্ত-উদয়ের ইতিবৃত্ত অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। মূল গল্পকে ছাড়াইয়া—তাহারা যে গল্প বলিতে চায়—তাহার প্রকাশকাল স্বল্প-পরিমিত হইলেও—প্রসার বহুদূরব্যাপী। কোন শাখা আকাশের বার্ত্তা চয়ন করিতে করিতে আলোর রাজ্যে পৌঁছিয়াছে—কোন শাখা বা রস-সন্ধানী শিকড় বাহিয়া প্রাণমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। এইভাবে জীবন-সত্যের বিভিন্ন রূপ ভালবাসার দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই অভয়ঙ্কর যেমন অপূর্ব্ব মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব্বকে তেমনই অদ্ভুত লাগে। দুটি হৃদয়ে একই বৃত্তি বিভিন্ন পরিবেশে রূপ বদলাইয়াছে মাত্র; উন্মাদ-বৃত্তির প্রান্তে আসিয়াও তাহারা নিজ নিজ গোত্র ,বঞ্চিত হয় নাই—অনুরাগের প্রগাঢ় নিষ্ঠা-সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। এমনিভাবে রণেন, অজিত, সতীশ, দেবু, চম্পা, ললিতারা গল্পের অগ্রগতির তালে ফুটিয়া উঠে—তরঙ্গ-আঘাতে যেমন এক একটি ফেনার ফুল। ইহারা ক্ষণকালের হইয়াও সর্ব্বকালের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আগাইয়া আসে। সৃষ্টি-প্রত্যূষ হইতে এই জিজ্ঞাসা—স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে অসীম কৌতূহল জাগাইয়া মানুষকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সমাধানের ছেদ টানিয়া জীবনকে মৃত্যুর স্তব্ধতায় সমাহিত করে নাই। এইভাবে কাহিনীর মধ্যে লেখক বহু চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহারা নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া কাহিনীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে—যেন সূত্রে মণিগণা ইব। বেদনা, কৌতুক, হাসি, অশ্রুতে ঝলমলে অনেকগুলি ফুল—যখন যেটি সামনে পড়ে—সেটির শোভায়, গন্ধে, স্নিগ্ধ প্রকাশে মন ভরিয়া উঠে। ফুল তো এখানে ওখানে অনেক ফুটিয়া থাকে, সবগুলিকে চিনিয়া—চয়ন করিয়া একত্র করিবার দক্ষতা তো সকলের থাকে না। ফুলের মত কাহিনী-চয়নেও দক্ষ লেখকের কল্পনার প্রকাশ। আশ্চর্য্য লাগে, এতগুলি চরিত্র লইয়া সাহিত্য-জগতে নবাগত লেখক কেমন অবলীলাক্রমে স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে গল্পের আসর জমাইয়াছেন। তিনি শুধু প্রশ্নের বাণই নিক্ষেপ করেন নাই—জীবনকে বহু দিক হইতে দেখিয়াছেন এবং মানুষের দুঃখ-বেদনায় দরদী মনকে মেলিয়া ধরিয়াছেন। সংসারের তুচ্ছতম বিষয়েও লেখকের দৃষ্টি সজাগ। এই সতর্ক দৃষ্টি চরিত্র-বিশ্লেষণে পরম সহায়ক হইয়াছে। তথাপি মনে হয় দুই শ্রেণীর পাঠকের কাছে আলোচ্য গল্পটি দুই রূপে প্রতিভাত হইবে। যে সব পাঠক অবিচ্ছিন্ন একই কাহিনীর রস উপভোগের জন্য [illegible]—[illegible] মধ্যে গল্পটাই যাঁহাদের কাছে অগ্রগণ্য—তাঁহারা [illegible] অনুধাবন করা দুঃসাধ্য নহে। কারণ কাণ্ড হইতে শাখা—শাখা হইতে পত্রপুষ্পদল—সবেরই রূপ স্বতন্ত্র, বিকাশ-রীতির ধারাও স্বতন্ত্র। এই বিকাশ-রীতি আবার রীতিমত বিস্তারলাভ করিয়াছে। অর্থাৎ গল্পের প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের নায়ক বা নায়িকা। ইহাদের বিস্তারে অখণ্ড গল্প-সন্ধানী পাঠকের চিত্ত ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু লেখকের এই নবরীতি প্রবর্ত্তনের সাহসকে অন্য শ্রেণীর চিন্তাশীল পাঠকরা যে সাধুবাদ দিবেন,—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দুয়ার হ'তে অদূরে—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—তিন টাকা।

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ইহা একটি নূতন রম্য-রচনা। হয়ত উপন্যাস বলা চলে। উপন্যাস বলিতেছি এইজন্য যে, ইহার মধ্যে কাহিনীও আছে, কিন্তু কাহিনী ইহার উপজীব্য নয়। বাস্তব এবং কল্পনা ইহার মধ্যে এমন অপূর্বভাবে মিশাইয়া গিয়াছে যে, উভয়ের সীমারেখা নির্ধারণ করা দুরূহ। কলতা কালীঘাট রেলওয়ের মাঝেরহাট ষ্টেশনে ছোট গাড়ীতে চড়িয়া বিভূতি বাবু কলতা চলিয়াছেন। এ যাত্রার কোন উদ্দেশ্য নাই, শুধু ঘুরিবার আনন্দেই ঘোরা। "বাংলাদেশ আমার বাবুটী মনটাকে অষ্টপ্রহর রাখত টেনে—এর নদী-নালা, ডোবা-জঙ্গলের মায়া মোহ দিয়ে; এর ভাঙ্গা অট্টালিকা, পুরনো দেউল, জটিল বট-অশ্বত্থের শ্যামল শ্রী দিয়ে, এর জীবনের হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মাধুর্য্য দিয়ে।" এই তুচ্ছ পর্যটন-কাহিনীর মধ্য দিয়া বিভূতিভূষণ সেই হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলে।—"রেল চলেছে ছুটে। রেল নয়তো, যেন রেল-রেল খেলা। সেইজন্যেই লাগছে আরোও ভালো—ছোটার সময় বোধ হয় যেন ইচ্ছে মতো নেমে পড়া যায়। মাঝে মাঝে রাস্তার একেবারে ধারে গ্রামও এসে পড়েছে এক-একটা। একটির পাশ দিয়েই চলেছি। রাস্তার পাশেই খাল, তার ওদিকেই। গায়ে গায়ে বাড়ি, এর উঠানের মাঝখান দিয়ে, ওর ঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা। সমস্ত গ্রামখানি নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। রোদের তাপে যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। হন্দ খড়ের আড়ালে দুটো বলদের অলস রোমন্থন, দুটি নগ্ন শিশুর খেলাঘর পাতা।" এই রম্য-রচনার মূল সুরটি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুটি পংক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে,

দেখা হয় নাই—চক্ষু মেলিয়া, ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।

বিভূতিভূষণ জানেন, নিঃসঙ্গ প্রকৃতির হয়ত সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে মানুষ থাকিলেই তাহা একান্ত আকর্ষণের বস্তু হইয়া পড়ে। তাই তিনি প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে স্থাপন করিয়া ছবি আঁকিয়া চলিয়াছেন। ষ্টেশনে এবং গাড়ীতে কত লোকের সহিত পরিচয় হইল; কত বদন, কত পালা-হুড়কো খেলে, কত বর-বধূ, কত গুণী-নারানী-পালবৌ, কত বালক-বালিকা, কত চানাচুরওয়ালা, কত মোটর-ড্রাইভার, কত দোকানী-পসারী, তাঁহার চিত্রে স্থান পাইয়া সুন্দর হইয়া উঠিল। যিনি লিখিতে জানেন, তিনি সামান্যকে অসামান্য করিয়া তুলিতে পারেন। এ রচনা একটি নূতন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় লেখক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য তাঁহার হাস্য-কৌতুক। স্নিগ্ধ হাস্যে তিনি তাঁহার রচনাকে মণ্ডিত করিতে পারেন। হাস্য-রস তাঁহার রচনাকে আকর্ষণের বস্তু করিয়া তোলে। চোখে-দেখা বলিয়া তাঁহার চরিত্রগুলি জীবন্ত। বাস্তবে-বিস্ময়ে বিজড়িত এই নূতন ধরণের রসরচনা পাঠ করিয়া রসজ্ঞ পাঠক মুগ্ধ হইবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শাশ্বত বঙ্গ—কাজী আবদুল ওদুদ। ৮বি তারক দত্ত রোড, কলিকাতা—১৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০০, মূল্য ৫॥

প্রবন্ধ-পুস্তক। ইহাতে সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি রচনা—রবীন্দ্রকাব্যপাঠ, সমাজ ও সাহিত্য, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, আজকার কথা, নজরুল প্রতিভা প্রভৃতি পৃথক পৃথক গ্রন্থাকারে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি রচনা ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তন্মধ্যে কতকগুলিতে ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সমাজ, সাহিত্য ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদ এবং বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য এই সকল প্রবন্ধ-পুস্তককে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক বিষয় ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শতবর্ষ পরে রামমোহন, কোম্পানীর আমলে, কবিগুরু-স্মরণে, সুভাষচন্দ্র, রস ও ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক বাংলা-সাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধ। 'নজরুল প্রতিভা' সম্পর্কিত তিনটি প্রবন্ধে লেখক কবির শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। 'আজকার কথা' শীর্ষক অংশে লেখক বিভিন্ন সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই পর্যায়ে, বাংলার মুসলমানের কথা' প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য। 'শরৎপ্রতিভা,' 'বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব,' 'ভারতবর্ষের সাধনা,' 'মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধগুলিও উপাদেয়। 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' অংশে মোট চারিটি প্রবন্ধের মধ্যে 'দেশের জাগরণ' এবং 'ব্যর্থতার প্রতিকার' খুবই চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। 'সমাজ ও সাহিত্য' অংশে মোট সতেরটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এই অংশের 'শিক্ষা-সঙ্কট', গ্যেটে, 'শরৎসাহিত্য', 'বঙ্কিম-প্রতিভা', বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা—এই কয়টি প্রবন্ধে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। গ্রন্থের নবপর্য্যায় অংশে মোট আঠারটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙালীর পড়িয়া দেখা উচিত। 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখক এই দুই শ্রেষ্ঠ মানবের একমুখী বিশ্বপ্রেমের বিভিন্নমুখী ধারার সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের ভূমিকায় রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

একই বিষয়বস্তু পুস্তকের বিভিন্ন অংশে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচিত এবং আংশিক পুনরুক্তি হওয়ায় পাঠকের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা যে নাই তাহা নহে। সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও চিন্তাকর্ষক লিখনভঙ্গী ও স্বচ্ছ যুক্তি-বিন্যাস-প্রণালী পুস্তকখানিকে কেবল সুপাঠ্য নয় শিক্ষাপ্রদও করিয়াছে। এরূপ সারগর্ভ চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থের সমাদর হওয়া উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বাংলার পাঁচজন ঔপন্যাসিক—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্ত প্রেস, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১৷৹।

সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার করিতে অনেকে ভরসা পান না, কারণ আজিকার নির্দ্ধারিত মূল্য কাল বাতিল হইয়া যাইতে পারে। অথচ পুরানোর চেয়ে নূতন সাহিত্য সম্বন্ধেই বোধ হয় আমাদের মনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল বেশী, তাই রসভোক্তাদের অভিমতের সঙ্গে নিজেদের ধারণা মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেদিক দিয়া নব-সাহিত্যে আলোচনার প্রয়োজন যথেষ্ট। তাহা ছাড়া সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি এবং নব নব সম্ভাবনার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণও সমালোচকের কর্তব্য। সুশীলবাবু আমাদের বাঞ্ছিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যগুলি রসগ্রাহিতার পরিচায়ক এবং ভাবা মোটের উপর হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ভাষার পরিপাট্যের প্রতি আর একটু দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত। "(যুদ্ধ) যুদ্ধপূর্ব বাংলার হঠাৎ একটা মন্বন্তরের সঙ্গে পলায়নবাদ ও সংশয়বাদ সাহিত্য-জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে" (পৃ. ৭০)—অর্থ কি? "তার গোপনীয়তাকে, তার চাবুককে, ঢাকাঢাকিসুলভ ভুক্তিতাকে—উন্মুক্তির বাহুল্যে [illegible] অবদানকর" (পৃ. ১৪)—একটু প্রতিকূল মনে হয় না কি? [illegible] যে (চিন্তাকর্ষক) অর্থে আজকাল অনেকে ব্যবহার করিতেছেন, [illegible] করিয়াছেন, তাহা ব্যাকরণ এবং অভিধান-সম্মত কি? [illegible] (রাজমহল "[illegible]" অর্থে), [illegible]

(পৃ. ৫৯) ; ... কি ... বিভূতিবাবুর পূর্বে ... নাই ; লেখকের নিকট আরও ভাল জিনিষ আশা করি বলিয়াই ...গুলির উল্লেখ করিলাম। গ্রন্থমধ্যে ছাপার ভুলও অনেক রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থানে স্থানে অর্থগ্রহণে অসুবিধা ঘটে।

থেরী-গাথা (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—ভিক্ষু শীলভদ্র। মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ, বঙ্কিম চাট্যার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বা স্থবিরাদিগের এই সকল গাথা কেবল ধর্ম্মের দিক দিয়া নয়, ইতিহাস ও সাহিত্যের দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পূর্ব্বে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'থেরী-গাথা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থকার অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত এই পালি গাথাসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া একটি মূল্যবান রিক্থ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়লাভের পক্ষে এই জাতীয় গ্রন্থের প্রভূত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের গান—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিযান পাবলিশিং হাউস্ লিঃ। ৪, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ১৷৷০।

গ্রন্থকার রাজনৈতিক কর্ম্মে লিপ্ত, কিন্তু স্বভাবতঃ সাহিত্য ও সঙ্গীত-রসিক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতেও তাহার পরিচয় আছে। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ', 'বর্ষণ' এবং 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরবৈচিত্র্য'—এই তিনটি বিষয়বস্তু লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত বলিয়া প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে ধারাবাহিকতা বা ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। 'বর্ষণ' প্রবন্ধে কয়েকটি বিদেশী বর্ষার কবিতার সুখপাঠ্য বাংলা অনুবাদ আছে।

পদধ্বনি—শ্রীঅনিল বিশ্বাস। জেনারাল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দামের উল্লেখ নাই।

প্রায় একশ' পৃষ্ঠার কবিতার বই। কবিতাগুলিকে গ্রন্থকার পাঁচটি পর্য্যায়ে ভাগ করিয়াছেন: পোড়োমাঠ, পরিক্রমা, রোমন্থন, লোকারণ্য, মনায়ন। ভাষায় কোথাও কোথাও উগ্র নবীনতার চিহ্ন আছে—যথা: 'কল্পাঙ্কুর', 'পাসন্থ সসেনী সখীত্ব', 'ব্যাপ্তিক্রেণ' ইত্যাদি, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝও আছে; আশ্বাসের কথা এই যে, কাব্য-লক্ষ্মীর রূপ একেবারে ঢাকা পড়ে নাই। ছন্দে সম্ভবতঃ কবি ইচ্ছা করিয়াই অনেক স্থলে বাঁধা-রীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। কবিতাদেবীর পদধ্বনি মস্তিষ্কের কাছাকাছি ভাসিয়া আসিয়াছে। হৃদয়ের দেশেও কি পৌঁছিবে না?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নাট্যকার (নাটক)—শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী। উত্তরায়ণ লিমিটেড, ১৭১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

রঙ্গমঞ্চে জাতির পরিচয় স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটে ওঠে। আধুনিক কালে বাংলা নাটককে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজবার আন্তরিক প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং এই নব-নাট্য-আন্দোলনের ফলে কয়েকখানি ভাল নাটক রচিত হয়েছে। সেই নব-নাট্য-চেতনারই ... ফল এই 'নাট্যকার' নাটকখানি। লেখকের নিজের ভাষায় ... নাটকের উদ্দেশ্য "সমাজের কয়েকটা খণ্ডচিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজ সম্বন্ধে ... প্রয়াস।" নাট্যকার বাস্তব ঘটনার সঙ্গে রূপকের মিশেল দিয়ে ... চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য

সাধু, [illegible] পরিকল্পনাতেও নূতন—তবু যথোচিত নাটকীয় [illegible] অভাব এবং উপস্থাপনের ত্রুটিতে 'নাট্যকার' নাটক হয়ে ওঠে নি। একে বলা যেতে পারে একটি রস-রচনা। 'নাট্যকারে' নাট্যরসও সার্থক পরিণতি লাভ করেনি। চরিত্র-পরিকল্পনা, ঘটনাবিন্যাস, 'ক্লাইম্যাক্স' সৃষ্টি—সর্ব্বত্রই একটা বেপরোয়া ভাব বিদ্যমান। ভালোমাদ এক নাট্যকার দিয়ে নাটকের সুরু। তার ক্লাইম্যাক্স বা চরম মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করতে হলে ততোধিক অতি-নাটকীয় ঘটনা বা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু লেখক এই চরিত্রের বেশ ও পরিণতিতে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। মাঝে মাঝে ঘটনা-বিন্যাসেও যথোচিত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় নেই। কোন নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ে কোন নাট্যকারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা চলে না। বড়-জোর পুলিশ সে নাটক অভিনয়ের অনুমতি না দিতে পারে। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে আলোচ্য নাটকের অন্যতম পাত্র নাট্যকারের নূতন প্রগতি-পন্থী নাটকটি পূর্বেই ছাপা হয়েছে, তবু কোর্টে মামলা না করে হঠাৎ নাট্যকারকে গ্রেপ্তার করার কোন আইন আছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ এই নাটকে নাট্যকারকে সরাসরি গ্রেপ্তার করার দৃষ্টান্ত আছে। ত্রুটি সামান্য—কিন্তু নাটকে বাস্তবতার দাবি খুবই বেশী। যে কোন আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গী বা বিষয়বস্তু নিয়েই নাটক লেখা হোক না কেন—তা যেন 'নাটক' হয়—এই মূল সত্য নবীন নাট্যকারদের ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার অমৃতময়ী বাণী—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। ২০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য—২।০ টাকা।

পরমহংসদেবের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রম বলিয়া দু-এক জন সমাজতত্ত্ববিদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পর তাঁহার জন্ম। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের নব-জাগরণের ইতিহাসে যে কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন, পরমহংসদেব তাহা অন্যভাবে করিয়া আমাদিগকে পূর্ণতর জীবনের আস্বাদলাভের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সকল দেশের ভাবুকেরাই উচ্ছ্বসিত ভাবে তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়া থাকেন।

মণিলাল বাবু সেই ইতিহাসের সহিত পাঠকদের পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবের জন্মকাল হইতে দেহরক্ষা পর্য্যন্ত ঘটনাবলী নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক পূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে, কিন্তু লেখকের রচনায় স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে পরমহংসদেবের চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

সুরের পরশ—দেবাচার্য্য। বুক সাপ্লায়ার্স, ৯ কালী মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি গ্রন্থকারের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস 'বিমুগ্ধা পৃথিবী' রচনা করিয়া তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন বর্ত্তমান পুস্তকখানি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বোমা বর্ষণের ফলে যখন ব্রহ্মদেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত, আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উপন্যাসের কাহিনী সুরু হইয়াছে সেই পরিস্থিতির বর্ণনা হইতে। এমনই এক বিপদের সময় [illegible] সহিত আলোকের প্রথম সাক্ষাৎ। দুজনে পরিচিতিতার [illegible]

[illegible] সুন্দর কথা। এঁড়াইয়া নিরানন্দ-কলরের চিরন্তন সত্যকে আমাদের [illegible] সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন অশোকা আর অলোকের ঘটনাবহুল [illegible] কথায়। প্রত্যেকটি চরিত্র আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। [illegible]গুলিও সুন্দর ফুটিয়াছে—বিশেষ করিয়া অলোকের পিসতুত [illegible]কের সার্থক সৃষ্টি।

"[illegible] পরশের" সুর জীবনযাত্রার সুর। জীবনে চলার পথে ইহা [illegible] একই সুরে বাজে না। কখনও অপরিসীম বেদনায় গুমরিয়া কাঁদে, [illegible] আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দেয়।

[illegible] সরস ভাষা ও সংলাপ উপভোগ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গীতামৃত—শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, [illegible] দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ১২+৩৩৪ পৃষ্ঠা। মূল্য [illegible] টাকা।

"[illegible]গবদ্গীতার" বহু ভাষ্য, বহু টীকা, বহু ব্যাখ্যা, বহু অনুবাদ নানা [illegible] গদ্যে পদ্যে হইয়াছে। গীতার উপদেশ শুধু অর্জুনের সমস্যারই [illegible] করে নাই, মানব জীবন-যুদ্ধে যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় [illegible] সমাধানের নির্দেশও ইহার অমর শ্লোকাবলীর মধ্যে নিহিত। জাতি-[illegible] নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষেই গীতাপাঠের সার্থকতা স্বতঃসিদ্ধ। [illegible] সদ্গ্রন্থের গদ্য ও পদ্যানুবাদ বাংলায় বহু হইয়া থাকিলেও আর [illegible] প্রয়োজন নাই এ কথা বলা যায় না। 'গীতামৃত' নাম দিয়া [illegible] বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে সম্পূর্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত সমগ্র [illegible] বেশ সরস ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ শ্লোকের [illegible] অনুরূপ সরল পদ্যাকারেই প্রায় ১৬০টি নির্ঘণ্টে বিশ্লেষণ করিয়া [illegible] পাঠক মাত্রেরই পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। 'গীতামৃত' বেশ [illegible] ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থে মূল শ্লোকাবলী পরিবেশিত হইলে [illegible] হইত।

[illegible]গীতা (কাব্য)—শ্রীপ্রয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসার্স ব্যানার্জি কোম্পানী, পোঃ গিড়নী, জেলা মেদিনীপুর (।০+৩৪৪) পৃষ্ঠা। [illegible] টাকা।

[illegible] ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত, অতুলনীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থ এদেশের সকলের [illegible]রূপে নিত্যপাঠ্য। বহু বৈদেশিক ভাষায়ও অনূদিত হইয়া গীতার [illegible]বলী অন্দেশবাসীদের আত্মশক্তির উন্মেষের সহায়ক হইয়া থাকে। [illegible] ধনঞ্জয় যখন দারুণ বিষাদগ্রস্ত ও সম্পূর্ণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়া-[illegible] এই উপদেশাবলীই তাঁহার প্রাণে নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছিল, [illegible] প্রদর্শনপূর্ব্বক অতুলনীয় কীর্ত্তিলাভে তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। [illegible]জালী জাতি দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। বাঙালী যদি [illegible] কীর্ত্তিলাভ করিতে চায় তবে এই গীতার অমোঘ উপদেশাবলী আবার [illegible] অনুসরণ করিতে হইবে। গ্রন্থকার অতীব সহজ সাবলীল অমিত্রাক্ষর-[illegible] গীতার এবং সরল গদ্যে গীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ করিয়াছেন। [illegible]তে মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলী গীতামাহাত্ম্যসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] বাংলা-ভাষাভিজ্ঞ নর-নারীদের গীতামাধুর্য আস্বাদনের বিশেষ সহায়তা [illegible]।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

[illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible] লিমিটেড, ।।ওরি [illegible] স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹

বইখানি কয়েকটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধের সংগ্রহ। বিষয়বস্তু [illegible] সুনির্ব্বাচিত ও প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থকার যে একজন চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক, প্রত্যেক প্রবন্ধেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় পুস্তক অধুনা বিরল, যাহা পাঠকের চিন্তাশীলতা উদ্রিক্ত করে, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রবন্ধগুলির নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা, জীব ও জীবনযাপন, ইংরেজী ভাষার শব্দ-রহস্য, স্তন্যপায়ী জীবজন্তুর কথা, কীটপতঙ্গের জীবন-রহস্য, সমুদ্রের রহস্য, বনবিষ্ণুপুরের ইতিবৃত্ত, জাপানের আদিধর্ম্ম, পারসী জাতির ধর্ম, ইহুদী ধর্ম্মের উপদেশ ও উপাখ্যান, খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের আত্ম-বলিদান, বাইবেলে ভারতীয় আচার-পদ্ধতির দৃষ্টান্ত, বহুকালের ও দূরদেশের কথা, যোগ ও পাশ্চাত্ত্যমতে লগ্নফল (জ্যোতিষ-তত্ত্ব) এই পুস্তক গ্রন্থাগারে থাকিলে পাঠকগণ উপকৃত হইবেন।

সাহিত্য-সংগমে—শ্রীবিনায়ক সান্যাল। শৈলশ্রী, ১।১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ২৯৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

বইখানি কাব্য ও সাহিত্য-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে শিল্পের স্বরূপ, কাব্যে সত্য-শিব-সুন্দর, কাব্যে ভাব ও শৈলী, কথা-সাহিত্যের কথা এবং কাব্য ও বস্তুতন্ত্রতা; দ্বিতীয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনদর্শন আলোচিত হইয়াছে—যথা, রহস্যবাদ ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র কাব্যের অধ্যাত্মসম্পদ, রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি, রবীন্দ্র-কাব্যে রূপক রবীন্দ্র-কাব্যচ্ছন্দের ভূমিকা ও রবীন্দ্রকাব্যে প্রতীচ্য-প্রভাব; শেষাংশে দাশুরায়ের পাঁচালি, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, কবি মোহিতলাল ও পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। বইখানিকে সমালোচনা-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। একটি অতি উচ্চাঙ্গের বিতর্কমূলক অথচ অনুভূতিশীল শিল্পীমনের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট। লেখকের বাংলা-সাহিত্য ছাড়া ইংরেজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও পড়াশুনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য হইতে বহু উদ্ধৃতি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মগ্রাহী করিয়াছে। রচনাও নিপুণ ও সুস্পষ্ট ছন্দে লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করিতে সহায়তা করিয়াছে। সাহিত্য জীবনের দর্পণস্বরূপ, যে দেশের সাহিত্য যত উন্নত, সে দেশের স্থান সভ্যজগতে তত উচ্চে। আবার এই সাহিত্যের যথার্থ-স্বরূপ ও প্রকৃত নিগূঢ়ার্থের সহিত যাঁহারা পাঠকের পরিচয় করাইয়া দেন এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের মান ও স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই সাহিত্য-সমালোচকগণও মূল-সাহিত্যিকগণের সহিত সমান আসনে বসিবার দাবি করিতে পারেন। আমাদের দেশে সমালোচনা-সাহিত্য খুবই কম অথচ ইহাদের সাহায্য ছাড়া কোনও জাতীয়-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ঠিক পথে চালিত হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যদেশে কৃতী ও সুনিপুণ সমালোচকগণের সংখ্যা অল্প নহে, সেইজন্য সে দেশে সাহিত্যিকগণের সম্মানও যথোচিত। এই পুস্তকে আমরা একজন উচ্চস্তরের শিল্পী ও সমালোচকের সাক্ষাৎ পাই।

শ্রীবি[illegible]

"হোলি - হে"

শ্রীনীহারেন্দু সেনগুপ্ত

বিশাখাপত্তন জাহাজ-নির্ম্মাণ কারখানার একটি দৃশ্য

ফিউয়েল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, ধানবাদ। ঝরিয়া কয়লা-খনিসমূহের পরীক্ষাগারের একাংশ
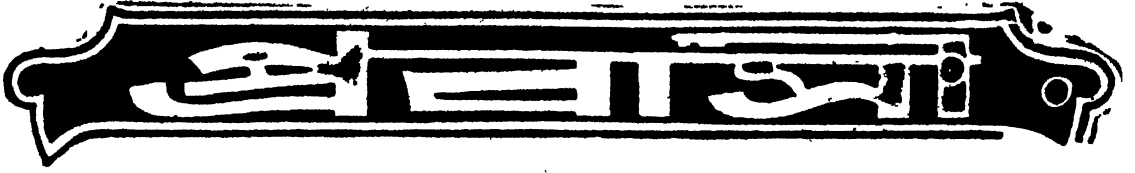
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৫৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ষ্টালিন

মানব সমাজের ইতিহাসের ধারায় নূতনের প্রবর্ত্তন ও নবচেতনার আনয়ন যে সকল যুগপ্রবর্ত্তক করিয়াছেন তাঁহাদের একজনের জীবনের অবসান হইল গত ৫ই মার্চ্চ রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায়।

যোসেফ ভিসারিওনোভিচ ষ্টালিনের মৃত্যুতে জগতের রাষ্ট্রনৈতিক অঙ্গন হইতে বর্ত্তমান সময়ের প্রচণ্ডতম শক্তিশালী এবং প্রখরতম মেধাবী নায়কের অপসারণ ঘটিল। একজন পুরুষের জীবনে এত প্রকার ক্রান্তি ও বিবর্ত্তন বোধ হয় জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই এবং ঐ সকল ক্রান্তি ও বিবর্ত্তনজনিত ফলাফল যেভাবে সারা মরজগৎকে আজ আচ্ছন্ন করিয়া আছে উহাও অভূতপূর্ব্ব তাহাতে সন্দেহ নাই।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন মতবাদের বিজয় অভিযানের ভিত্তিপত্তনের অব্যবহিত পরেই এই শক্তিশালী পুরুষসিংহ রণনায়কের ভূমিকায় সমরাঙ্গনে অবতরণ করেন। তাহার পর তাঁহার পরমপ্রিয় স্বদেশের উপর দিয়া যে ঝড়-ঝঞ্ঝার অবিশ্রাম দাপট চলিতে থাকে তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ইতিমধ্যে সোভিয়েটের উচ্চতম অধিকারীদিগের মধ্যে লেনিনের মৃত্যু ও ট্রট্স্কির নির্ব্বাসন যাত্রায় ষ্টালিন একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন। তাহার পর দেশে অশেষ চাঞ্চল্য-দুর্ভিক্ষ-মহামারী এবং নিদারুণ অভাব ও দুর্দৈব আসে। সে সকলের মধ্যে স্থির অটল বুদ্ধিতে রাষ্ট্র-চালনা ও রাষ্ট্র-রক্ষার কার্য্য তাঁহার অপরিসীম মেধায় সম্ভব হয়। উহার পর বাজে প্রলয়ের বিষাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। হিটলারের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত হইয়া সোভিয়েট সময়ের বদলে ভূমি দান করে। কিন্তু দুই কোটি লোক হারাইয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ও অসংখ্য যুদ্ধে পরাজিত এবং ক্ষীণবল হইয়াও সোভিয়েট জনশক্তি হার মানে নাই, বিজেতার সম্মুখে নত হয় নাই—কেবলমাত্র ষ্টালিন ও তাঁহার সহকারীবর্গের আহ্বানে ও অভয়দানে। সোভিয়েটের সেনা ও জনগণের মনোবল অটুট থাকায় হিটলারের অক্ষশক্তির জগৎ জয়ের আশা ধূলিসাৎ হয়।

ষ্টালিন শান্তিবাদী ছিলেন একথা সম্পূর্ণ অলীক। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের তন্ত্রে, বিশেষতঃ তাহার ষ্টালিন-ভাষ্যে, বিশ্বশান্তি তখনই সম্ভব যখন সসাগরা বসুন্ধরা ঐ তন্ত্রের একচ্ছত্র, একনায়কীয় শাসনে আসিবে। যত দিন তাহা না হয় তত দিন শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি সকলই মিথ্যা। সুতরাং তত দিন নিরবচ্ছিন্ন শক্তির আবাহনই চলিবে।

ষ্টালিন বিশ্বপ্রেমী ছিলেন ইহাও অলীক। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিজের রাষ্ট্রের শক্তিতে ও যোগ্যতায়, সুতরাং স্বরাষ্ট্রের শক্তিগঠন ও প্রগতির উদ্দীপনে তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রথমে অন্য সকল রাষ্ট্র তাঁহার কূটনীতির ক্রীড়নক পুত্তলিকা বা বিরোধী শত্রু বলিয়াই গণ্য হইত। সম্প্রতি অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ নীতির কিছু পরিবর্ত্তনের সূচনা ঘোষিত হয় সোভিয়েট হইতে, কিন্তু তাহা প্রকৃত কিংবা কূটনীতির চাল মাত্র তাহা বুঝিবার সময় এখনও দূরেই আছে।

জগতের ইতিহাসে ষ্টালিন ও তাঁহার নীতি কি স্থান পাইবে তাহার বিচার করিবেন দূর ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। রুশরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রবলতম পৌরুষের পরিচয় চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে তাঁহার নামে।

পশ্চিম বাংলার শাসনতন্ত্র

পশ্চিম বাংলার বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে ক্রমাগত তর্কবিতর্ক, বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। বিপক্ষ দল সমালোচনার অবকাশে নানা দোষত্রুটির কথা তুলিতেছেন, নানা প্রকার সরকারী অবহেলা ও দুর্নীতির অভিযোগও আনিতেছেন যাহার মধ্যে কিছু ঠিক, কিছু বেঠিক, আবার কিছু রংফলানো সত্য। এ সমস্তই এখন একটি খেলায় দাঁড়াইতেছে, তবে মাঝে মাঝে দু'চারটি কঠিন সত্যকে অস্বীকার করার পথ সরকারী তরফ পাইতেছেন না। উহা খবরের কাগজে ফলাও করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, বিপক্ষ দল কিছু আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছেন, সরকারী দল দিনের শেষে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন।

কঠোর বাস্তব তো এই যে, দেশের ও দশের দুর্গতি ক্রমেই চরমে পৌঁছাইতেছে। বিপক্ষ দল সেটা নিজেদের শক্তিলাভের সুযোগ মনে করিয়া উল্লসিত হইতেছেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের সে দিকে লক্ষ্য করিবার মত বুদ্ধিবিবেচনা নাই, স্থবিরপ্রধান ও জড়ভরত পারিষদ দল হইলে যে দুর্দ্দশা হয় তাহাই হইয়াছে।

কংগ্রেস ছিল আগে এইরূপ অবস্থার সহায়, আজ পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস তো অতি অযোগ্য স্বার্থলোলুপ, হীনদলে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং সেখানে আশার তো কিছুই নাই, ভয়ের কারণই রহিয়াছে। সমগ্র ভারতে কংগ্রেস অবনতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তাহার অধঃপতন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

পশ্চিম বাংলার বাঙালীর অবস্থা এখন "ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর", দুই দিকের দুই পক্ষই ভয়ের ও বিপদের কারণ; এই দারুণ সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থার জন্ত দায়ী কে?

দায়ী সেই অধম যে নির্ব্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা না দেখিয়া দলীয় স্তোকবাক্যে ভুলিয়া ভোট দিয়াছিল। দায়ী সেই নির্ব্বোধ যে নিজেকে মহাবুদ্ধিমান মনে করিয়া ভোটদানের "ঝঞ্ঝাট" এড়াইয়া ঘরে বসিয়াছিল এবং দায়ী সেই অর্ব্বাচীন অপরিণতমস্তিষ্ক বুদ্ধিহীন সন্তানের দল যাহারা মহা উৎসাহে গালভরা শ্লোগানের চীৎকারে গগন ফাটাইয়া নিজেদের ভবিষ্যতের পথে কাঁটা পুঁতিয়াছে এবং অল্পবুদ্ধি জনসাধারণকেও সেই পথে চালাইয়াছে।

সহজ কথায় দায়ী আমরা, আপনারা ও আমাদের সন্তান-সন্ততি। সুতরাং পরকে দোষ দিয়া কি হইবে?

বিধান সভায় যোগ্য লোক একেবারেই নাই ইহা সত্য নয়। কিন্তু প্রায় সকলেই কোন-না-কোন দলের ফাঁদে পা বাধাইয়া বসিয়া আছেন এবং এমন কোনও দল নাই যাহার ইতিবৃত্তে এরূপ কিছু দেখা যায় যাহাতে মনে হয় যে সেখানে দলগত স্বার্থ অপেক্ষা দেশের ও দশের স্বার্থ উচ্চে। পশ্চিম বাংলার বাঙালী অধম ভারবাহী—এবং তাহাতেও অসমর্থ—জীব, যাহার মাথায় হাত বুলাইয়া ভার চাপাইয়া ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সকল ভাগ্যান্বেষী বুদ্ধিজীবী নিজস্ব ও দলগত স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। ইহাই ত খাঁটি কথা!

নিরাপত্তা বিল

নিরাপত্তা আইন সরকারী অসামর্থ্যজ্ঞাপক বিধি। জনসাধারণের আস্থা ও সক্রিয় সহায়তা থাকিলে ঐরূপ বিধির প্রয়োজন হয় না। যেখানে সরকারী দল জনসাধারণকে নিজেদের নিঃস্বার্থ সেবার চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করিতে পারে না বা চাহে না, সে ক্ষেত্রেই ঐরূপ বিধির প্রয়োজন। সরকার যদি বলিষ্ঠ জনমত নিজ পক্ষে আনিতে পারেন তবে রাষ্ট্রধ্বংসকারীর সাধ্য কি যে সে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাংলায় অবস্থা কি সেরূপ?

বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা (সংশোধন) বিল পদে পদে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া আলোচনার শেষে দফাওয়ারী বিতর্কের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছায়। জনমত সংগ্রহের জন্ত বিলটি প্রচারের এবং বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই দুইটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া সমালোচনার উত্তর দিতে উঠিয়া বিরোধী পক্ষের ক্রুদ্ধ চীৎকার এবং প্রতিবাদ ধ্বনির সম্মুখীন হন। তিনি দৃপ্ত ভঙ্গীতে নিজের বক্তব্য পেশ করিতে থাকিলেও বার বার প্রবল গোলমাল উঠিয়া তাঁহার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরও ঢাকিয়া দেয়। ডাঃ রায় গোলমালের মধ্যে বলেন যে, চীৎকার করিয়া নির্ব্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন করা যাইবে না। তাঁহারা যে ১৬০ জন একদিকে সমবেত হইয়াছেন সে সংখ্যা যেমন আছে তেমনি থাকিয়া যাইবে।

সংশোধন প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করার পক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করা হয় নাই। তথাপি বিরোধী দলের সদস্যগণ যে এই প্রস্তাব আনিয়াছেন তাহার কারণ একান্ত নিরাশায় তাঁহারা বিলটি গ্রহণে বিলম্ব ঘটাইতে চাহেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রশ্ন করেন, তাঁহারা (কংগ্রেসের সদস্যগণ) কি জনসাধারণের প্রতিনিধি নহেন? তাঁহারা কি জনসাধারণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হইয়া আসেন নাই? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহারা মত দিতে পারেন।

ডাঃ রায় বলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে যে, এই আইনের বিধানগুলির আর কোন প্রয়োজন নাই; কেননা অবস্থা এখন শান্ত। কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি দেশে কতকটা শান্তি আনিতে পারিয়াছেন। ইহা না থাকিলে কি হইবে তিনি বলিতে পারেন না।

নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলির বিরুদ্ধে যে সমালোচনা হইয়াছে তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এই আইনের কোন ধারা অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে তাহা যে সরাসরিভাবেই করা হয় তাহা নহে। একমাত্র ২১ নং ধারা ব্যতীত অন্য সকল ধারার সম্পর্কেই আদালতে নালিশ করা যাইতে পারে এবং আদালতে অনুমোদিত না হইলে কোন শাস্তি দেওয়া চলে না। ২১নং ধারার ক্ষেত্রেও মামলাগুলি তিন জন বিচারপতির একটি বোর্ডের নিকট উত্থাপন করিতে হয়। বিচারপতিগণ সরকারী আদেশের বিরোধী হইলে সেইভাবে তাঁহাদের অভিমত জানাইতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ আটক বা বহিষ্কার আদেশ অনুমোদন করিলেও সরকার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বুঝিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার পুলিস

পশ্চিম বাংলার পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা, দুর্নীতি ও অযোগ্যতার নানা অভিযোগ বিধান সভায় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত শাসনতন্ত্রই যখন দূষিত তখন পুলিস তাহার বাহিরে যাইবে কিরূপে? পুলিসের দোষ দূরীকরণের অন্তরায় যাহা রহিয়াছে তাহার সম্যক্ চর্চ্চা কেন সে বিষয়ে কোন আভাসও ঐ সব বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রকাশিত হয় নাই। পুলিসে যোগ্য লোক অনেক আছে ঊর্দ্ধতন স্তরে কিন্তু তাহারা অসহায়। পুলিস বিভাগ যে মন্ত্রীর হস্তে, তাঁহার সামর্থ্যের অভাবই তাহাদের প্রধান বাধা। অন্য দিকে বাধা রহিয়াছে, কংগ্রেসের ঘৃণ্য শিবাদলের স্বার্থ। তৃতীয় বাধা আমাদের অপরূপ

সংবিধান ও তাহার ততোধিক আশ্চর্য্য প্রয়োগ উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে। চতুর্থ বাধা এক দল কর্ম্মচারী যাহারা মনে করে তাহাদের সকল দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে এদেশে আসিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া।

গত ২৫শে ফাল্গুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকারের পুলিস বাজেটের আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে বিভিন্ন সদস্য রাজ্যের পুলিস বাহিনীর, বিশেষ করিয়া কলিকাতার পুলিস বাহিনীর উর্দ্ধতন স্তরে নিদারুণ অকর্ম্মণ্যতা, শোচনীয় দুর্নীতি ও নানারূপ অপকার্য্যের অভিযোগ উত্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া এই দিন পুলিস বাজেটের উপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী বিতর্কে কংগ্রেসের তিন জন এবং বিরোধী পক্ষের যোল জন সদস্য বক্তৃতা করেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাহাজানি, ব্যাঙ্কে ডাকাতি ও খুন ইত্যাদির পুলিস কোন কিনারাই করিতে পারে নাই বলিয়া উহার তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জ্জি বিরোধীপক্ষ হইতে বিতর্কের সূচনা করিয়া পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার অভিযোগ উত্থাপনে বলেন যে, গত পাঁচ বৎসরে যতগুলি খুন হইয়াছে, তাহার একটারও কিনারা হয় নাই। মিসেস এডিথ ঘোষ, শ্রীমতী জ্যোৎস্না বসুর হত্যাকারীরা ধরা পড়ে নাই। দুর্বৃত্তরা এক জন লোককে খুন করিয়া বাক্সে প্যাক করিয়া ওয়াটারলু স্ট্রীটে প্রকাশ্য দিবালোকে রাখিয়া গেল। তাহার হত্যাকারীরা ধরা পড়িল না। সন্ধ্যার পর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এন সি পালের দোকানে এত বড় ডাকাতি হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত তাহার কিনারা হইল না। আগে একটা খুনের কিনারা না হইলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অফিসার ধমক খাইত, শাস্তি পাইত। আজ এরা প্রমোশন পায়, নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়। জাল ঔষধ বহু জায়গায় আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও আইনের ত্রুটির জন্য কোন মামলা করা যায় না। ঐ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা উচিত বলিয়া শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জি মন্তব্য করেন।

আমরা বলি, যদি উচিত তবে হরিপদবাবু আদ্যোপান্ত বিবৃতি দিয়া সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন না কেন? ম্যাসাজ ক্লিনিকের নামে পতিতালয় স্থাপনা রোধের জন্য যে আইন প্রণয়ন হইল, তাহাও তো সম্পূর্ণ অকেজো। সে বিষয়ে তো কেহ উল্লেখও করিলেন না। আইন প্রণয়ন বা সংশোধন তো পুলিসের হাতে নয়।

শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জি এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে দুর্নীতির অভিযোগ করিয়া বলেন যে, রাণীগঞ্জ, মালদহ, জিয়াগঞ্জ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি চোরাকারবারীদের স্বর্গ।

ডাঃ রায়—কার স্বর্গ?

শ্রীযুত চ্যাটার্জ্জি—আপনাদের নয়, আমাদেরও নয়, চোরাকারবারীদের স্বর্গ। ১৯৫০ সালে সেল ট্যাক্সের ঐ এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার নিজে আসানসোলে ট্যাক্স অফিসার ও ইন্সপেক্টারকে লইয়া রাণীগঞ্জের প্রত্যেক গুদামে হানা দিলেন। অনেক অবৈধ মাল ধরিলেন। চোরাকারবারীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা কমিশনারের নিকট একটা ডেপুটেশন পাঠাইল। এই ডেপুটেশনে ফল হইল—ট্যাক্স অফিসার ও ইন্সপেক্টারকে সরাইয়া দেওয়া হইল এবং এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারকে পদচ্যুত করা হইল।

শ্রীসুস্থং মল্লিক চৌধুরী (ফ-মা) পুলিসের বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্যতার অভিযোগ করিয়া বলেন যে, দার্জ্জিলিঙের যে মেয়েটি চুরি হয়, তাহার পিতা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট ঐ সম্পর্কে একখানি পত্র লেখেন। কলিকাতার জনৈক বিশিষ্ট ব্যায়াম-বীরের নামও ঐ ঘটনার সহিত জড়িত আছে। ঐ মেয়েটিকে বিহারের এক 'প্রেমকুঞ্জে' লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে আটক রাখা হয়। কিন্তু পুলিস জানিয়াও ঐ মেয়েটিকে সেখান হইতে উদ্ধার করে নাই। কলিকাতার একটি মহিলা কলেজের একটি মেয়ে বেলিয়াঘাটা অঞ্চল হইতে নিখোঁজ হয়। পুলিস তাহারও কোন কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রীযুত মল্লিক চৌধুরী অভিযোগ করেন যে, পুলিসের যোগসাজসে এইভাবে বাঙালী মেয়েদের অপহরণ করিয়া দুর্বৃত্ত জাতীয় অবাঙালীর হাতে দেওয়া হইতেছে।

ডঃ অতীন বসু (ফঃ বঃ সু) বলেন যে, আপার চিৎপুর রোডের জনৈক ডাক্তারকে একটি মিথ্যা 'কল' দিয়া নলিন সরকার স্ট্রীটে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহাকে একটি বাড়ীতে আটক রাখিয়া মারপিট করা হয়। তিনি শ্যামপুকুর পুলিসে সংবাদ দিলেও সংশ্লিষ্ট গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করা হয় না। তিন দিন পর ঐ ডাক্তারের ডিসপেন্সারীতে হানা দিয়া গুণ্ডারা লুঠ করে। পুলিস তখনও ঐ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করে না। ডঃ বসু অভিযোগ করেন যে, পুলিস গুণ্ডাদের এইভাবে আস্কারা দিতেছে।

মানভূমের বাঙালী ও সর্ব্বোদয়

সম্প্রতি চাণ্ডিলে আচার্য বিনোবার নেতৃত্বে এক সর্ব্বোদয় সম্মেলন হয়: তাহাতে মানভূমের বিশিষ্ট লোকসেবক কর্মী শ্রীঅরুণ ঘোষ নিম্নরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন। ইহাতে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

"দুঃখের কথা সর্ব্বোদয় সমাজের পক্ষ হইতে সমাজের ব্যক্তিদের দ্বারা যে ভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে মানভূমের জনগণ মনে করিতেছে—সর্ব্বোদয় সমাজের সহিত বা ভূদান কর্ম্মের সহিত যুক্ত হওয়া অন্যায়। জনগণ কেন ইহা মনে করিতেছে সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু জনমত এইরূপ যে, আমাদের পক্ষ হইতে ইহাতে যুক্ত হইলে আমরা জনগণের বিরাগভাজনই হইতে পারি। সে জন্যই ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি অনুভব করিয়া আমাদের সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি বলিতেছি।

ভূদান-যজ্ঞ সর্ব্বোদয় সমাজের পক্ষ হইতে পরিচালনা করা হইতেছে—সর্ব্বোদয় আদর্শের পথে। দেশের ভূমিব্যবস্থা শুধু ভূদানব্যবস্থা কেন, দেশের সমস্ত কাজের ব্যবস্থা কোন রকমে করাটাই আজ বড় কথা নয়। কি ভাবে করা হইবে তাহাই আজ গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীবাদের ভিত্তিতে, সর্ব্বোদয়ের ভিত্তিতে এই ভূমিব্যবস্থা করিতে

হইবে ইহাই লক্ষ্য। সেজন্ত সর্ব্বোদয় আদর্শ অনুসরণ করিয়া কাজ হইতেছে কিনা তাহাই বিচার করিবার আছে। আদর্শবাদীরা বলেন, মহান লক্ষ্যসমূহের সাধন শুদ্ধ ব্যবস্থা ও শুদ্ধ উপায়ের দ্বারা হইবে। কিন্তু আমরা মানভূমে দেখিতেছি, এই কাজ কলুষিত পন্থাসমূহের দ্বারা পরিচালিত করা হইতেছে। সর্ব্বোদয় সমাজের পক্ষ হইতে এই মহান্ কাজ আদর্শবান কর্ম্মীদের দ্বারা হইবে ইহাই সবাই আশা করেন। কিন্তু মানভূমে আজ আমরা কি দেখিতেছি? মানভূমের জনগণের অধিকার রক্ষার সত্যাগ্রহীদের দল যখন অগ্রসর হয় তখন বিহার-সরকারের পরিচালনাধীনে পুলিসের তত্ত্বাবধানে "সি" ক্লাস দাগী অপরাধীদের সংগ্রহ করিয়া যাহারা সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করে—তার পর দিনই সেই সব লোককেই যদি জনগণ ভূদানের তথা সর্ব্বোদয় সমাজের কর্ম্মীরূপে কাজ করিতে দেখে তবে জনগণ তাহাতে এই সমাজ সম্বন্ধে কি ধারণা করিতে পারে? জেলায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে বাংলা স্কুলের উপর যখন উৎপাত করা হয়—আগুন লাগাইয়া উৎপীড়ন করা হয়—বিরাট সুগঠিত পঞ্চায়েত ভাঙ্গিয়া শেষ করার ব্যবস্থা করা হয়—জেলার গঠনকর্ম্ম বিনষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়—সেই সব অন্যায় কাজের পরিচালকরূপে জনগণ যাহাদিগকে মানভূম জেলায় দেখে তাহারাই ভূদান ও সর্ব্বোদয় আদর্শের বাণী বহন করিতেছে তখন জনগণ কি মনে করিতে পারে?

এখানে ভাষা-সমস্যা লইয়া যে বিরোধ চলিয়াছে তাহার প্রমাণ এই সর্ব্বোদয়েই আছে। সর্ব্বোদয় সম্মেলন মানভূমে হইতেছে। মানভূমের ভাষা বাংলা। কিন্তু এখানে প্রদর্শনীতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখুন জনগণের ভাষা বাংলার কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান আছে, আপনারা হিন্দী লিখুন আপত্তি নাই, কারণ ভারতের বহু লোককে পড়িতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বোদয়ের যেখানে আদর্শ জনগণের সহিত সংযোগ—সেই সর্ব্বোদয়ে জনগণের ভাষার আজ কোন স্থান নাই। কর্ত্তৃপক্ষ জনগণের ভাষাকে গুরুত্ব দেন নাই, বহিষ্কার করিয়াছেন।"

সরকারী কর্ম্মচারীদের সততা পরীক্ষা

২রা মার্চ্চের 'বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকায় সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তর প্রদেশে সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে সততার সার্টিফিকেট প্রদানের যে নীতি গৃহীত হইয়াছে তাহার ফলে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই নীতি অনুসারে উর্দ্ধতন অফিসারকে প্রতি বৎসর নিম্নতন কর্ম্মচারী সম্পর্কে এইরূপ একটি সার্টিফিকেট দিতে হইবে, "এমন কোন বিষয় আমার গোচরীভূত হয় নাই যাহাতে অমুক সরকারী কর্ম্মচারীর সততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ করা যাইতে পারে।" উক্ত পত্রিকার এলাহাবাদস্থিত সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন ও আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ কোন সামান্ত ব্যক্তিগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্ত উর্দ্ধতন অফিসারকে কোন বিশেষ কর্ম্মচারীর সততা সম্পর্কে কেহ রিপোর্ট দিলে তাঁহার পক্ষে তখন আর সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হইবে না। সাধারণের আশঙ্কা হইতেছে যে, ফলে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হইবে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোবল নষ্ট হইয়া তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পাইবে।

ইহার অন্তদিকও আছে। যে ভাবে অসৎ, অযোগ্য ও অলস কর্ম্মচারীতে সরকারী বিভাগ ভরিয়া যাইতেছে তাহাতে এইরূপ পরীক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন মনে হয়।

পশ্চিম বাংলার বাজেট

আগামী ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে মোট ৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে—৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব খাতে এবং বাকী এক কোটি তিন লক্ষ টাকা অন্যান্ত বাবদ। নূতন বাজেটে রাজস্ব আয় হইবে ৩৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং ঐ খাতে খরচ হইবে ৪৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসর আয় হইয়াছে ৩৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা এবং খরচ হইয়াছে ৪২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব বাঁটোয়ারা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পশ্চিম বাংলা গত তিন বছর ধরিয়া ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা করিয়া পাইয়া আসিতেছিল। ফাইন্যান্স কমিশনের নূতন বাঁটোয়ারা অনুসারে পশ্চিম বাংলা ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবে। দেশমুখ বাঁটোয়ারা অনুসারে পশ্চিম বাংলা আয়করের বণ্টনীয় অংশের শতকরা ১৩'৫ পাইয়া আসিতেছিল। নূতন বাঁটোয়ারা হিসাবে, মোট বণ্টনীয় অংশের শতকরা ১১'২৫ ভাগ পাইবে। তবে কেন্দ্রীয় আবগারী করের কিছু অংশ এবার হইতে প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইবে—এবং আবগারী করের মোট বণ্টনীয় অংশ হইতে পশ্চিম বাংলা শতকরা ৭'১৬ ভাগ পাইবে। পাট-রপ্তানী-কর হইতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলাকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন।

পশ্চিম বাংলার কৃষি আয়কর হইতে আয় হইয়াছে ৬৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মোট রাজস্বের ১'৮ ভাগ, ভূমি রাজস্ব হইতে ২'০৭ কোটি টাকা (মোট রাজস্বের শতকরা ৫'৭ ভাগ); প্রাদেশিক আবগারী হইতে ৫'৯২ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট রাজস্বের শতকরা ১৬'৩ ভাগ; ষ্ট্যাম্প হইতে ২'৮৯ কোটি টাকা (মোট রাজস্বের ৭'৯ ভাগ); রেজিষ্ট্রেশন হইতে ৪৩ লক্ষ টাকা (মোট রাজস্বের শতকরা ১'২ ভাগ); বিক্রয় কর হইতে ৬'৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট রাজস্বের ১৮'১ ভাগ, এবং অন্যান্ত কর বাবদ ৩'৯৭ কোটি টাকা, কিংবা মোট রাজস্বের শতকরা ১০'৯ ভাগ আয় হইয়াছে। বাংলাদেশে মোট রাজস্বের শতকরা ৬১'৯ ভাগ হইতেছে কর রাজস্ব। কেন্দ্রীয় আয়কর হইতে পশ্চিম বাংলা ৬'৮১ কোটি টাকা তাহার প্রাপ্য অংশ হিসাবে পাইয়া আসিতেছিল, (অর্থাৎ মোট রাজস্বের শতকরা ১৮'৮ ভাগ)।

পশ্চিম বাংলার মাথা পিছু গড়পড়তা রাজস্ব হয় ১৪'৪৯ টাকা, ইহার মধ্যে কর রাজস্ব হইতেছে ১২'০৭ টাকা। মাথাপিছু খরচ হয় ১৬'৫৯ টাকা। ইহার মধ্যে শাসন-ব্যবস্থার জন্ত খরচ হয় মাথা-পিছু এক টাকা করিয়া, উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্ত গড়পড়তার

মাথাপিছু খরচ হয় ৪.৩ টাকা ; পুলিস বাবদ মাথাপিছু ৪.৫৬ টাকা খরচ হয় ; সামাজিক মঙ্গলের জন্ম ৪.৭ টাকা ; শিক্ষা বাবদ মাথাপিছু ১.৬ টাকা ; চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্ম মাথাপিছু ২ টাকা করিয়া খরচ হয়।

নূতন বাজেটে পুলিসের জন্ম খরচ হইবে মোট ৫.৮৮ কোটি টাকা, শিক্ষার জন্ম মোট ৪.৫২ কোটি টাকা, চিকিৎসা খাতে ৩.৫৩ কোটি টাকা, জনস্বাস্থ্যের জন্ম ১.১৫ কোটি টাকা ইত্যাদি। ১৯৩৮-৩৯ সনে অবিভক্ত বাংলার রাজস্ব ছিল ১২.৭৭ কোটি টাকা, তখন পুলিসের জন্ম খরচ হইত প্রায় দুই কোটি টাকা। বর্ত্তমান বিভক্ত বাংলায় (পূর্ব্বেকার বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র) পুলিস বাবদ খরচা হইবে মোট প্রায় ৬ কোটি টাকার মত।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা সরকার যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন—ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট, গভীর জলের মাছ ধরা ব্যবসায়, হরিণঘাটার দুধের ব্যবসায় এবং উত্তর কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে। গভীর জলের মাছ ধরার ব্যাপারটি প্রথম হইতেই গভীর রহস্যাবৃত ছিল। ট্রলার কেনা, অফিসারদের এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে পৃথিবী ভ্রমণ করা এবং শেষকালে ট্রলারগুলিকে জলে আটকাইয়া এই ব্যবসাটিকে বানচাল করিয়া দেওয়ার পিছনে যেন মনে হয় অনির্দ্দিষ্ট হস্তের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তই গোপনে গভীরে কাজ করিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ, মাছের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে দাম কমে—এ যেন গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক কামনা নয়। কলিকাতার মাছ প্রধানতঃ ভেড়ীর মাছ। ভেড়ীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা চান না যে কলিকাতার মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় কিংবা মাছের মূল্য হ্রাস পায়। এ সহজ তথ্যটুকু হৃদয়ঙ্গম যদি হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ট্রলার প্রভৃতি কিনিয়া অনর্থক এতগুলি টাকা জলে ফেলিয়া দিতেন না। কলিকাতার মৎস্যরাজ (fish-king) মনে হয় গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা শক্তিশালী।

মিলধুতির উৎপাদন হ্রাসের বিরুদ্ধে বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিবাদ আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। মাদ্রাজের মুষ্টিমেয় তাঁতির সমস্যাকে সারা ভারতীয় সমস্যায় রূপান্তরিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের আর একটি মতিভ্রমের পরিচায়ক। কাপড়ের দাম আজ জোড়া প্রতি প্রায় দুই টাকা করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে—সেই অনুপাতে জীবনমানও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে বাংলার তাঁতী যে ধ্বংস হইতেছে তাহার কি উপায়? কাপড়ের কল তো অধিকাংশই অ-বাঙালীর এবং সেখানকার শ্রমিকও অধিকাংশ অ-বাঙালী। তাহাদের প্রতি দরদ আমরা বুঝি, কিন্তু বাঙালী তাঁতী কি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে?

পরিকল্পনার বাজেটে কল্পনা বহু আছে, যেন খিতাইয়া পড়া জলানির মত। উপরের অংশটুকু কয়েক বছরের ঘাটতিতে উবিয়া গিয়াছে। বেকার সমস্যা ও গ্রাম্য অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহা ছাত্রদের ভারতীয় অর্থনীতির সহজপাঠ হিসাবে কাজে লাগিবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

১৯৫৩-৫৪ সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে যদিও অভাবনীয় কিংবা অস্বাভাবিক কোন ব্যবস্থা নাই—ইহার অতি গতানুগতিক স্বাভাবিকতা ইহাকে এক অর্থে অস্বাভাবিক করিয়াছে। আগামী বাজেটকে বলা হইয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাজেট—কিন্তু বাজেটে সত্যিকারের পরিকল্পনা কোথায়? রাজস্বখাতে যদিও নামমাত্র ঘাটতি হইবে এক কোটি টাকার, কিন্তু নূতন বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪০ কোটি টাকা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে—এই সময়ে বছরে ২৬ কোটি টাকা করিয়া কেন্দ্রীয় বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকিবে। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর, অর্থাৎ ১৯৫১, '৫২ এবং '৫৩ সনের বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকা দূরের কথা, ঘাটতির পরিমাণ অত্যধিক হইয়াছে। অবশ্য মাঙ্গলিক রাষ্ট্রের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ঘাটতি বাজেট অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু যদি আর্থিক বিবর্দ্ধনের জন্ম ঘাটতি হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতি সাধারণতঃ ঘাটতি খরচ দ্বারা কার্য্যকরী করা হয়। ঘাটতি খরচা মাত্রই খারাপ নয়—তবে দেখা দরকার কিসের জন্ম এবং কি অবস্থায় ঘাটতি খরচ হইতেছে, অর্থাৎ অতিরিক্ত নোট ছাপানো হইতেছে।

নৈমিত্তিক প্রয়োজন যেখানে ঘাটতি খরচ দ্বারা চালানো হয়—তাহা জাতীয় অর্থনৈতিক-দেউলিয়া অবস্থার সূচক। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩২৭ কোটি টাকা খরচ হইবে শিল্প বিবর্দ্ধনের জন্ম—ইহার মধ্যে ৯৪ কোটি টাকা খরচ হইবে সরকারী খাতে এবং ২৩৩ কোটি টাকা হইবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট আছেন। এ অবস্থায় ঘাটতি খরচ পরিকল্পনার কল্পনা বিলাস মাত্র।

ভারতীয় শিল্প হইতে আয় মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৬.৬ ভাগ মাত্র। এদেশে মোট ২৫ লক্ষ লোক শিল্পকারখানায় নিয়োজিত আছে—তাহাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের শতকরা ১.৮ ভাগ মাত্র। ঘাটতি খরচ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, এবং শিল্প বিবর্দ্ধন ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যই মুখ্যতঃ এইরূপ খরচ করা হয়। ভারতে ঘাটতি খরচের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ এই দুইটি উদ্দেশ্যের কোনটিই নয়। এ দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিল্প বিবর্দ্ধন ও শ্রমিক নিয়োজন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত পুঁজিবাদীদের দায়িত্বের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘাটতি খরচের দ্বারা যদি যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের সরবরাহ বৃদ্ধি না করা হয় তাহা হইলে মুদ্রা-মান বাড়িতে বাধ্য। হিটলারী জার্ম্মানীতে কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ায় দ্রব্যমূল্য কঠিন ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকার জন্ম ঘাটতি খরচ ঐ সকল দেশে কোন ক্ষতি করে নাই। কিন্তু ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র এবং এখানে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা প্রায় প্রহসন। সেইজন্য এ দেশে ঘাটতি খরচের খারাপ ফল যাহাতে না ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বাজেটে কোন কর বৃদ্ধি করা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ করিয়াছে কে ? জনসাধারণ, না মুষ্টিমেয় ধনী কয়েকজন ? ব্যক্তিগত আয়করের নিম্নমান ৩,৬০০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৪,২০০ টাকায় তোলা হইয়াছে। ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক আয়কর দেয় এবং নিম্নমান বাড়াইয়া দেওয়ায় নাকি ৭০ হাজার লোক আয়কর হইতে রেহাই পাইবে। ভারতে অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা অত্যধিক সে কথা স্মরণ রাখা উচিত। ভারতের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা, কেরোসিন, দেশলাই, কয়লা, চিনি, চা, সুপারি প্রভৃতির উপর কর আছে—এই সকল করের আওতায় আপামর জনসাধারণ সকলেই পড়িয়া যায়। তাই আয়কর কিংবা অন্য কোন প্রত্যক্ষ কর কর-কাঠামোর বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। এ দেশে অপ্রত্যক্ষ করের চাপে গরীবরা নিপ্পেষিত হয়, আর সেই পরিমাণে ধনিকরা প্রত্যক্ষ কর হইতে রেহাই পায়।

রাজস্ব বাঁটোয়ারা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যদিও কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির রাজস্ব রাষ্ট্রতন্ত্র দ্বারা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি কতকগুলি বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিয়া একটি ভবিষ্যৎ কমিশনের উপর এই বিষয়গুলির সমাধান করিবার ভার রাষ্ট্রতন্ত্রে ছিল। সেই অনুসারে ১৯৫১ সনের ২২শে নবেম্বর কতকগুলি রাজস্বের বাঁটোয়ারা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি ফিনান্স কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের কার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় :

(১) কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে আয়কর বিলির অংশ নির্দ্ধারণ করা।

(২) কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদেশগুলিকে দেওয়া।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার এবং 'খ' শ্রেণীর প্রদেশগুলির মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করা।

(৪) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে আয়কর, কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত আয়কর ব্যতীত, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দ্ধারিত এবং সংগৃহীত হইবে। তবে তার কিছু অংশ প্রদেশগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। আবগারী কর কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট জিনিসের উপর ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল প্রদেশ পাট উৎপাদন করে, যথা, বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা, তাহারা স্যার অটো নিমেয়ারের সুপারিশ অনুসারে পাট রপ্তানী শুল্কের শতকরা ৬২.৫ ভাগ পাইয়া আসিতেছিল। নিম্নে বাঁটোয়ারাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে :

আয়কর :—অটো নিমেয়ারের সুপারিশ অনুসারে মোট আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগে পড়িয়াছিল এবং বাকী ৫০ ভাগ 'ক' শ্রেণীর প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক আয়কর আরোপিত এবং সংগৃহীত হয়। কিন্তু কিছু অংশ প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় বিশেষ নীতি অনুসারে অর্থাৎ, জনসাধারণের সংখ্যা অনুপাতে কিংবা আয়কর-সংগ্রহের পরিমাণ অনুসারে। অটো নিমেয়ারের বাঁটোয়ারার মধ্যে কিন্তু এই দুইটি নীতির কোনটিই অনুসৃত হয় নাই। তাঁহার বাঁটোয়ারার ভিত্তি ছিল তদর্থ (অর্থাৎ ad hoc)। ভারতে বাংলা এবং বোম্বাই প্রদেশ সবচেয়ে শিল্পোন্নত, তাই তাহাদের আয়করের ভাগ সবচেয়ে বেশী দেওয়া হয়, অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ হিসাবে। ভারত-বিভাগের পর বোম্বাইয়ের ভাগ ২০ হইতে ২১শে বৃদ্ধি করা হয় এবং বাংলার ভাগ ২০ হইতে কমাইয়া ১২ করা হয়। বাংলা অবশ্য তাহার অংশ কমাইয়া দেওয়ায় আপত্তি জানাইয়াছিল, তবে তাহা গ্রাহ্য করা হয় নাই। বাংলার কথা ছিল যে, যদিও পূর্ব্ববঙ্গ বাদ গিয়াছে, তথাপি সেই অনুপাতে আয়কর হ্রাস পায় নাই, কারণ প্রধানতঃ আয়কর আসে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলগুলি হইতে, পূর্ব্ববঙ্গ ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। তাই যদিও দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে, তথাপি দুই-তৃতীয়াংশ আয়কর কমিয়া যায় নাই। তবে বর্ত্তমান এক-তৃতীয়াংশ বাংলার আয়কর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু ভারত-বিভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার আয়করের প্রাপ্য অংশ শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস করিয়া দেন। ১৯৫০-৫১ সনে দেশমুখ সুপারিশ অনুসারে বাংলার ভাগ শতকরা ১২ হইতে ১৩.৫ বৃদ্ধি করা হয়।

'খ' শ্রেণীর প্রদেশগুলির সহিত কেন্দ্রীয় রাজস্ব একত্রিত করণের পর হইতে এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকে তাহার মোট সংগৃহীত আয়করের ৫০ ভাগ করিয়া পাইয়া আসিতেছিল।

ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজস্ব বাঁটোয়ারা ব্যাপারে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর প্রদেশগুলির মধ্যে কোন শ্রেণী তারতম্য করা হয় নাই। প্রদেশগুলির মধ্যে বিভাজ্য আয়করের অংশ শতকরা ৫০ ভাগ হইতে ৫৫ ভাগে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রদেশের নিজস্ব প্রাপ্য অংশের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত নীতি গ্রহণ করিয়াছেন :

"(ক) জনসংখ্যা অনুপাতে প্রদেশের প্রয়োজন, এবং (খ) প্রদেশে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণ।"

প্রদেশসমূহের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণের শতকরা ২০ ভাগ প্রদেশে আয়কর সংগ্রহ অনুসারে দেওয়া হইবে এবং বাকী প্রাপ্য অংশের শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যা অনুপাতে দেওয়া হইবে। তবে প্রকৃত বাঁটোয়ারার সুবিধার্থে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, উপরি-উক্ত নীতি অনুসারে প্রতি বছর প্রাপ্য অংশ বাহির করা অসুবিধা হইতে পারে, তাই প্রত্যেক 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর প্রদেশের প্রাপ্য আয়করের অংশ শতকরা নির্দ্দিষ্ট ভাগ হিসাবে স্থির করা হইয়াছে। ১৯৫৩-৫১ সন হইতে বিগত তিন বছরের সংগ্রহ পরিমাণ ধরিয়া, কমিশন প্রত্যেক প্রদেশের আয়করের ভাগ নিম্নলিখিত হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন :

প্রদেশ	ভারত বিভাগের পূর্ব্বে	ভারত বিভাগের পরে	দেশমুখ সুপারিশ অনুসারে	ফিনান্স কমিশনের বাঁটোয়ারা
মাদ্রাজ	১৫	১৮	১৭.৫	১৫.২৫
বোম্বাই	২০	২১	২১.০	১৭.৫০
পশ্চিমবঙ্গ	২০*	১২	১৩.৫	১১.২৫
পঞ্জাব	৮*	৫	৫.৫	৩.২৫
উত্তরপ্রদেশ	১৫	১৯	১৮.০	১৫.৭৫
বিহার	১০	১৩	১২.৫	৯.৭৫
মধ্যপ্রদেশ	৫	৬	৬.০	৫.২৫
আসাম	২*	৩	৩.০	২.২৫
উড়িষ্যা	২	৩	৩.০	৩.৫০
হায়দরাবাদ	—	—	—	৪.৫০
মধ্যভারত	—	—	—	১.৭৫
মহীশূর	—	—	—	২.২৫
পেপসু (পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পঞ্জাব রাজ্যসমূহ)	—	—	—	০.৭৫
রাজস্থান	—	—	—	৩.৫০
সৌরাষ্ট্র	—	—	—	১.০০
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	—	—	—	২.৫০

(* বিভাগের পূর্ব্বে)

"গ" শ্রেণীর রাজ্যসমূহের জন্য প্রদেশসমূহের প্রাপ্য আয়করের অংশের শতকরা ২.৭৫ ভাগ হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বাংলার প্রাপ্য অংশ শতকরা ১৩.৫ ভাগ হইতে ১১.২৫ ভাগে হ্রাস করা হইয়াছে, আর বোম্বাইয়ের শতকরা ২১ ভাগ হইতে ১৭.৫০ ভাগে হ্রাস করা হইয়াছে। কমিশনের অভিমতে দেশের রাজস্ব আয় সামগ্রিক হিসাবে দেখিতে হইবে এবং কোন বিশেষ প্রদেশ দাবি করিতে পারে না যে, তাহার সংগৃহীত করের নির্দ্দিষ্ট অংশ সে পাইবে।

পাট রপ্তানী শুল্ক : পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৫ সনের ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের আইন অনুসারে স্যর অটো নিমেয়ার যে সুপারিশ করেন তাহাতে পাট উৎপাদক প্রদেশগুলি পাট রপ্তানী শুল্কের শতকরা সাড়ে বাষট্টি ভাগ পাইত। ভারত-বিভাগের পর পাট রপ্তানী শুল্কের প্রাপ্য অংশ শতকরা ২০ ভাগে হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। তবে বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ নানারূপ দুর্য্যোগের সম্মুখীন হওয়ায় তাহাকে অতিরিক্ত কিছু ধরিয়া দেওয়া হয়। নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র পাট রপ্তানী শুল্কের অধিকারী হয়, কিন্তু পাট উৎপাদক প্রদেশসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান (grants-in-aid) নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। যথা :—পশ্চিম বাংলা ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, আসাম ৪০ লক্ষ টাকা, বিহার ৩৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ৫ লক্ষ টাকা। ফিন্যান্স কমিশন সুপারিশ করেন যে, পাট রপ্তানী শুল্কের বাবদ যে সহায়ক অনুদান দেওয়া হইতেছে তাহার পরিমাণ এইরূপভাবে বৃদ্ধি করা হউক—পশ্চিম বাংলা ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; বিহার ৭৫ লক্ষ টাকা; আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ টাকা।

পাট উৎপাদন শুল্ক নির্দ্ধারণের ভিত্তি ছিল মোট পাট উৎপাদনের পরিমাণ। ১৯৪৯-৫০ সনের পাট রপ্তানীর পরিমাণ ধরিয়া কমিশন উক্ত সুপারিশ করিয়াছেন। ১৯৫২-৫৩ সন হইতে নূতন সহায়ক অনুদান কর্য্যকরী হইবে।

কেন্দ্রীয় আবগারী কর : কেন্দ্রীয় আবগারী কর বাঁটোয়ারা করার জন্য কমিশনের নিকট পেশ করা হয় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় আবগারী ও প্রাদেশিক আবগারী স্বতন্ত্র। কিন্তু কমিশন নিজেদের দায়িত্বে অনুমোদন করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় আবগারীর কিছু অংশ প্রদেশগুলিকে দেওয়া হউক এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে অনুমোদন গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সমস্ত কেন্দ্রীয় আবগারী বাঁটোয়ারার মধ্যে আসিবে না। কেবলমাত্র তিনটি জিনিষের উপর কর যথা :—(১) সিগারেট, চুরুট প্রভৃতি, (২) দেশলাই এবং (৩) ভেজিটেবল ঘি বাঁটোয়ারা করা হইবে। কারণ এই তিনটি জিনিষের বহুল ব্যবহার আছে এবং ইহাদের ব্যবহার কর যথেষ্ট পরিমাণে আদায় হয়। এই তিনটি কেন্দ্রীয় আবগারী করের মোট পরিমাণের শতকরা ৪০ ভাগ প্রদেশসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে :

প্রদেশ	শতকরা	প্রদেশ	শতকরা
আসাম	২.৬১	উড়িষ্যা	৪.২২
বিহার	১১.৬০	পেপসু	১.০০
বোম্বাই	১০.৩৭	পঞ্জাব	৩.৬৬
হায়দরাবাদ	৫.৩৯	রাজস্থান	৪.৪১
মধ্যভারত	২.২৯	সৌরাষ্ট্র	১.১৯
মধ্যপ্রদেশ	৬.১৩	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	২.৬৮
মাদ্রাজ	১৬.৪৪	উত্তরপ্রদেশ	১৮.২৩
মহীশূর	২.৬২	পশ্চিমবঙ্গ	৭.১৬

প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে উক্ত কেন্দ্রীয় আবগারী করের বাঁটোয়ারা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে যে সকল প্রদেশ যথা :—বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্বে তামাকের উপর কোন কর বসাইত না এবং তৎপরিবর্ত্তে কেন্দ্র হইতে কিছু ক্ষতিপূরণ বাবদ পাইত, তাহারা আর এইরূপ অনুপূরক সাহায্য পাইবে না। এই প্রদেশগুলি এখন হইতে তামাকের উপর আবগারী কর বসাইতে পারে।

আবগারী করের বাঁটোয়ারা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রেসিডেন্টের আদেশ যথেষ্ট হইবে না—আইন পাস করাইতে হইবে।

সহায়ক-অনুদান : ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রদেশসমূহকে সহায়ক-অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ সাহায্য দেওয়ার জন্য কমিশন কতকগুলি নীতি স্থির করিয়া দিয়াছেন : যথা, (১) প্রদেশকে আর্থিক সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে; (২) প্রদেশের মিতব্যয়িতা; (৩) প্রদেশের সামাজিক উন্নয়ন জন্য সহায়ক-অনুদান দেওয়া হইবে। অনুন্নত প্রদেশের

প্রয়োজন মিটানো হইবে: (৪) বিভাগের ফলে যে সকল প্রদেশ বহু রকম অসুবিধায় পড়িয়াছে তাহারা সাহায্য পাইবে। কমিশনের মতে বিভক্ত প্রদেশের সমস্যা শুধু প্রাদেশিক নহে, তাহা জাতীয় এবং সামরিক সংরক্ষণের খাতিরে সীমান্ত প্রদেশগুলি সাহায্য পাইবে।

কমিশন যে সকল প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নত নয়, তাহাদের জন্য এইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিহার, মধ্য-প্রদেশ, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, মধ্যভারত এবং পেপসু প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের জন্য সহায়ক-অনুদান পাইবে। রাজস্ব ঘাটতি মিটানোর জন্য মহীশূর, সৌরাষ্ট্র ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন কেন্দ্র হইতে সাহায্য পাইবে। নিম্নলিখিত তালিকাতে দেখা যাইবে প্রদেশসমূহ কি পরিমাণ মোট রাজস্ব বাঁটোয়ারা পাইতেছিল এবং কি পরিমাণ ভবিষ্যতে পাইবে।

প্রদেশ	১৯৫১-৫২ সন হইতে বিগত তিন বৎসরের গড়পড়তা (কোটি টাকা)	কাইন্তাগ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গড়পড়তা (কোটি টাকা)
আসাম	২.২১	৩.৪৫
বিহার	৬.৫৫	৮.৫৫
বোম্বাই	১১.৬০	১১.২৫
হায়দরাবাদ	১.২৫	৩.৫৯
মধ্যভারত	০.০৬	১.৪৬
মধ্যপ্রদেশ	৩.৩৫	৪.২০
মাদ্রাজ	৮.৫৬	১১.১০
মহীশূর	৩.৪৫	৩.৬৮
উড়িষ্যা	২.০১	৩.৭৪
পেপসু	০.১৬	০.৬৫
পঞ্জাব	৩.৪৩	৩.৮২
রাজস্থান	০.১০	২.৮৯
সৌরাষ্ট্র	২.৭৫	৩.০২
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৩.২২	৩.২৩
উত্তরপ্রদেশ	৮.৮৮	১১.৭০
পশ্চিমবঙ্গ	৭.৫৪	৯.৬০
মোট	৬৫.১২	৮৫.৯৩

কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজস্ব বাঁটোয়ারা পাঁচ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে, অর্থাৎ ১৯৫৭ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত।

নূতন ভারত-মার্কিন কারিগরি চুক্তি

ভারত-সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতি কার্য্য-পরিচালনা-মূলক তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। প্রথম চুক্তি অনুযায়ী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকার ১৩ কোটি টাকা এবং যুক্তরাষ্ট্র ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার ব্যয় করিবেন। ইহার ফলে অতিরিক্ত ২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে এবং ৬০ হাজার টন অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইবে। চুক্তি অনুসারে উড়িষ্যার হীরাকুণ্ডে বিদ্যুৎ উৎপাদক কারখানা স্থাপন, গঙ্গাপুর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জলাধার নির্মাণ, মহীশূরে তুঙ্গায় জল নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ স্থাপন, রাজস্থানের জোয়াই পরিকল্পনা এবং সৌরাষ্ট্রে ৬টি সেচ-পরিকল্পনার কার্য্যে সাহায্য দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় চুক্তিতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামকর্মী-দের শিক্ষার জন্য বৈষয়িক উন্নয়ন ও কৃষি সম্প্রসারণ কার্য্যের সহায়ক প্রচার-পুস্তিকা দ্বারা কর্মীদের সাহায্য করা হইবে।

তৃতীয় চুক্তি অনুযায়ী ভারত-সরকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ সার উৎপাদনের পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকা এবং জাপানে যাইবেন। সিন্ধ্রীর সার উৎপাদনের কারখানা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অনুসারে এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই সকল চুক্তি তখনই সফল হইবে যখন উপযুক্ত লোক শুধু যোগ্যতার পরিমাপে, এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। দলগত স্বার্থ, চাটুকার পোষণ মাত্র যে সরকারের মূলনীতি, তাহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শ্রীসুশান্ত বসু "নূতনের সন্ধানে" পত্রিকায় লিখিতেছেন:

"ভারতের মূল সমস্যা দারিদ্র্য দূর করার সমস্যা। এই দারিদ্র্যের মূলে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতে ঔপনিবেশিক দাসত্ব এবং তার পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। পরিকল্পনা কমিশনও তা স্বীকার করেন—তাই তাঁরা বলেছেন যে ভূমি সমস্যার গুরুত্ব অন্য সকল বিষয় হতে অনেক বেশি···ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এর গুরুত্ব বহু পূর্বেই উপলব্ধি হয়েছিল তাই ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস জীর্ণ এবং নিপীড়নকারী ভূমি-ব্যবস্থা এবং রাজস্ব-প্রথার আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছিল এবং অবিলম্বে খাজনা ও রাজস্বের পরিমাণ কমাবার সুপারিশ করেছিল।"

তাহার পর বহু বৎসর গত হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এবং ঈশাক কমিটির রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুত বসু বলেন যে, বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কৃষকদের হাত হইতে জমি ক্রমশঃই এরূপ ব্যক্তিদের করায়ত্ত হইতেছে যাহারা স্বহস্তে চাষ করে না। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. এম. লরেন্সোর অনুসন্ধান হইতে দেখা যায় যে, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্দ্ধমান জেলার বহু জমি আজ বিদেশী মহাজনদের হস্তগত হইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন কৃষিখাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থ বরাদ্দ করিলেও "বর্ত্তমান ভূমি-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার" এই মূল সমস্যার কোন সমাধানের পথ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের যে পন্থা পরিকল্পনা কমিশন ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন উত্তরপ্রদেশের জমিদারী-প্রথা বিলোপ আইনের প্রয়োগ দেখিয়া তাহাতে আশান্বিত হওয়া যায় না।

শিল্পখাতে বরাদ্দের স্বল্পতার সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুত বসু লিখিতেছেন যে, শিল্প ব্যতীত কোন জাতির পক্ষে আজ স্বাধীনতা রক্ষা করা

অসম্ভব। তিনি তাঁহার এই বক্তব্যের সমর্থনে পণ্ডিত নেহরুর রচনা উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন—পণ্ডিতজী নিজেও বলিয়াছেন যে, জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্র-শিল্প বিস্তার প্রচলন ব্যতীত কোন দেশে জীবনযাত্রার উচ্চমান প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, দারিদ্র্যও নির্মূল হইতে পারে না, এমনকি সেই দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় থাকিলেও তাহা নামমাত্র। ১৯৫০ সনে শুল্ক কমিশনও (Fiscal Commission) বলিয়াছিলেন যে, কৃষির উন্নতির জন্তও শিল্পবিস্তার একান্ত প্রয়োজন। কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকায় মন্দার সময়ে ভারতকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, কারণ কৃষি-দ্রব্যের মূল্য যে দ্রুত হারে নিম্নগামী হয় শিল্পদ্রব্যের মূল্য সে হারে হয় না। তিনি লিখিতেছেন যে, পণ্ডিতজী ইম্পিরীয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজকে বিশেষ সুবিধাদান এবং তাহার সর্ত্তাবলী অপ্রকাশিত রাখার নীতির বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করিয়াছিলেন। অথচ বর্ত্তমানেও মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ও ব্রিটিশ শেল-অয়েল কোম্পানীর সহিত অনুরূপ চুক্তি নেহরুজী নিজেই সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তাহার সর্ত্তাবলী প্রকাশ করেন নাই।

লেখকের অভিমতে শিল্পোন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতির কোন আশা নাই। শুল্ক কমিশন শিল্পবিস্তারের নিমিত্ত পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি ও জাপানের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩৮ সনে পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পর্কীয় সাবকমিটির দৃঢ় অভিমতকে সমর্থন করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, গুরু শিল্প স্থাপন ভারতের উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত।

আমাদের মতে বস্তুতঃপক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন শুধু ভারত-সরকারের পাঁচশালা প্রচেষ্টা মাত্র। পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে যাইয়া প্রতিপদে স্তোকবচন, কুসংস্কার ও বাধাবিঘ্নের পরিসর জ্ঞাপনের দরুন নেহরু সরকার উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার ফলে পরিকল্পনাও ক্রমে আপোষগত হইয়া নিস্তেজ ও জড় রূপ ধারণ করিয়াছে।

যদি দেশে প্রাণ থাকে, মানুষ থাকে তবে নেহরু সরকার ও তাহার অনুবর্ত্তী সকল প্রাদেশিক সরকারের ক্লীবত্বের যুগের অবসান ঘটিবে। তখন পরিকল্পনার সহিত বাস্তবের যোজনায় জীবন্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অনুশীলন হইবে।

বারুইপুর এলাকায় গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা

সাপ্তাহিক "বন্ধু" পত্রিকা লিখিতেছেন: "একটি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, বারুইপুর-মধ্যম কল্যাণপুর উন্নয়ন পরিকল্পনা নাকি বর্ত্তমানে সরকার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসিগণের ভ্রান্ত ধারণাই নাকি ইহার সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে কয়টি 'ব্লক' সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে হতাশার ভাব দেখা দিয়াছে।"

উক্ত পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী, "বারুইপুর-মধ্যম-কল্যাণপুর এলাকায় গত চার মাসে যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই আজ অসমাপ্ত অথবা পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্থানীয় উদ্বাস্তুগণ কর্ত্তৃক প্রায় ২২,০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ চাষী সম্প্রদায়ের। তাহারা আজ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন। পরিকল্পনার কার্য্য বন্ধ করা হইলে শুধু যে সরকারপক্ষকেই বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাই নহে, অধিবাসিগণের মধ্যেও দুর্য্যোগ আনিয়া দিবে। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উন্নয়নের কার্য্যেও জনসাধারণের আস্থা থাকিবে না।"

পশ্চিম বাংলা সরকার এই গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকেও পার্টি তোষণ ও চাটুকার পোষণ নীতির অঙ্গরূপে লইয়াছেন। অপব্যয় সত্ত্বেও যাহাতে কিছু ফল দেখান যায় সেইজন্য এরূপ কেন্দ্র বাছিয়া লওয়া হইয়াছে যেখানে সমস্যা কম। তাহা সত্ত্বেও বারুইপুরে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় লুঠের ভাগবাঁটোয়ারায় কিছু মতান্তর ঘটিয়াছে।

নিষ্ঠুর পরিহাস

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত 'ভারতী' লিখিতেছেন:

"সম্প্রতি কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে কতিপয় ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া যুগপৎ লজ্জা ও বেদনায় অভিভূত হইতে হয়।

"সংবাদে প্রকাশ, ২৫ হইতে ২৮ বৎসর বয়স্কা আট জন বিবাহিতা মহিলা প্রায় দেড় বৎসরকাল কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে থাকিয়া সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য স্বামীদের সংবাদ দেন। উক্ত মহিলাদের কেহই আর আরোগ্যলাভ করিবেন না এইরূপ ধরিয়া লইয়া ইঁহাদের সকলেরই স্বামী ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পর পুনরায় তাঁহাদের সাহচর্য্যে স্বামীরাও আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায় এখন কেহই তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইতেও চাহিতেছেন না। ফলে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ এই অসহায় মহিলাদের লইয়া মহা অসুবিধায় পড়িয়াছেন।"

এই মহিলাদের স্বামীরা যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সভ্য-সমাজ বিস্ময়ে হতবাক্ হইবেন। ইহারাই অগ্নিসাক্ষী করিয়া এক দিন এই ভাগ্যহীনা মহিলাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। 'ভারতী'র কথায় "প্রশান্ত মনে মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করিলে হত-ভাগিনীদের ক্রমশীর্ণায়মান হস্তের প্রীতিস্নিগ্ধ শুশ্রূষার কথা স্মরণে আসিয়া আজিও ইহাদের বক্ষে কথঞ্চিৎ শিহরণ জাগাইয়া তুলিতে পারে। তবু মাত্র দেড় বৎসরের ব্যবধানে প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি মানবচিত্তের সুকুমার বৃত্তিনিচয় একেবারে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হইয়া পড়িল, না ইহা হিন্দু সমাজে পুরুষজাতিকে বহুবিবাহের যে নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়া রাখিয়াছে তাহার পুরাদস্তুর সুযোগ গ্রহণ করিবার এ এক অশিষ্ট ও অশোভন প্রয়াস?"

"সীতা সাবিত্রীর দোহাই পাড়িয়া এই কয়টি বঙ্গ-ললনার অনাথ বা অনুরূপ কোন আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত বোধ বা মিথ্যা সান্ত্বনা লাভ করিবার মত নীতিবাগীশ মানুষ আজিও একান্ত দুর্লভ নহে তাহা জানি এবং আরও জানি ইহার পরেও অন্যান্য দেশের মত নারীত্বের মর্য্যাদা তথা সম্ভ্রম সংরক্ষণ প্রয়াসে যথানিয়ন্ত্রিত বিবাহ-বিচ্ছেদ বা অনুরূপ কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাবমাত্র চারিদিক হইতে প্রতিবাদ ও সমালোচনার তুমুল তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া বসিবে।

"তাহা হইলেও ধর্ম্মের নামে নারীজাতির এই অসম্মান ও অবমাননা করিবার অভিসন্ধি যেখানে যেরূপেই দেখা দিক না কেন, তাহাকে চিরতরে রুদ্ধ করিবার পথে প্রচণ্ড একটি আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব পুরুষের অপেক্ষা না করিয়া জাতির কন্যা-ভগিনীদের নিজেদেরই গ্রহণ করিয়া লইতে অগ্রণী হইতে হইবে।"

দুঃখের বিষয়, যে বাংলাদেশ একদিন সারা ভারতকে সমাজ-সংস্কারের পথ দেখাইয়াছিল আজ সেই বাংলাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতি-পরিপন্থী। তাহার কারণ, আজ দেশে যোগ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আদর নাই। আছে ধ্বংসোন্মুখ জাতির ভাবপ্রবণতা ও নীচ বাক্যবাগীশদিগের সমাদর। বাঙালীর বিবেচনা-শক্তি কি লোপ পাইতে বসিয়াছে?

মেদিনীপুরের রাজনীতি

"মেদিনীপুর পত্রিকা" ১লা ফাল্গুন সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন, "মেদিনীপুরে এখনও যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা লোপ পায় নাই, আজও যে নূতন মতবাদ এবং নবীন কর্ম্মী ও নেতার কর্ম্মক্ষেত্র একেবারে সঙ্কুচিত হয় নাই প্রগতিশীলতায় ভাটা পড়ে নাই বিগত নির্ব্বাচনে মেদিনীপুর তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছে।"

নির্ব্বাচন কমিশনার সম্প্রতি যে চারিটি দলকে সর্ব্বভারতীয় দল হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন সেই কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, জনসংঘ এবং কৃষক-প্রজা (প্রজা-সমাজতন্ত্রী) দলই বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে মেদিনীপুরবাসীর সমর্থন পাইয়াছিল। এই চারিটি দলের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনের পীঠস্থান," মেদিনীপুরে "দুর্নীতি, স্বজনতোষণ, 'স্তাবক-তোষণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীগত মনোভাব ও অক্ষমের নেতৃত্ব···কংগ্রেস সংগঠনের প্রাণশক্তির বনিয়াদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।" প্রাক্তন কংগ্রেস-কর্ম্মীরা আজ প্রায় সকলেই কংগ্রেসের বাহিরে, কারণ কংগ্রেসের মধ্যে আজ এক হুকুমদারী মনোভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখনও মেদিনীপুরের অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। পত্রিকার অভিমতে আন্তরিকভাবে আহ্বান আসিলে এবং আবর্জ্জনা সাফ করিয়া কংগ্রেস পুনর্গঠিত হইলে এখনও কংগ্রেস জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারে।

কৃষকপ্রজা দলের প্রভাব একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের প্রভাবের কারণ, "মেদিনীপুর জেলায় এখনও গান্ধীবাদে অত্যন্ত আস্থাবান কর্ম্মী ও জনগণের অভাব নাই" এবং এই দলের বর্ত্তমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন। তবে এই দলের সংগঠন অত্যন্ত দুর্ব্বল।

মেদিনীপুরের রাজনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, মেদিনীপুরের ইতিহাসের প্রতি স্তরে এবং সর্ব্ব সময়েই একটি বিপ্লবের ধারা অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে।

"কম্যুনিষ্ট দলের প্রথম প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এই বিপ্লবী মনোবৃত্তি ৪২শের সশস্ত্র আন্দোলনের বহু কর্ম্মী ও সমর্থককে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং কংগ্রেসের উপর অত্যন্ত বিরাগভাব পোষণ করেন এরূপ ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের সমস্ত সমর্থন দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট দলকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

"সমগ্র জেলার মধ্যে কয়েকটি স্থানে ইহাদের যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং সংগঠন ব্যবস্থা অপর সকল দল অপেক্ষা প্রাণবান্ ও শক্তিশালী। কিন্তু নির্ব্বাচনের মুখে যে সকল অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি স্বাভাবিক নিয়মেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায়, ধ্বংসকারী সমালোচনা প্রাধান্য লাভ করায় ও বিশেষভাবে তাঁহাদের বড্ড বেশী রাখিয়া রাখিয়া ভাব একদেশদর্শী অপপ্রচার ও ঘৃণা সৃষ্টির উৎকট আবহাওয়া সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ সাম্প্রতিক ইউঃ বোর্ড নির্ব্বাচনে তাঁহাদের শক্ত ঘাটিতেও বিপরীত ফল। তথাপি যদি কেহ বলেন মেদিনীপুরে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই তাহা হইলে তিনি সত্যের অপলাপ করিবেন।"

মেদিনীপুরে জনসংঘের কোনও সর্ব্বাত্মক ও সুদৃঢ় সংগঠন নাই তথাপি ঐ দল মেদিনীপুরেই সর্ব্বাধিক আসন লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি মেদিনীপুরবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধা। পত্রিকার অভিমতে এই দলের কর্ম্মীবৃন্দ যদি তৎপর হইয়া নিজেদের সাংগঠনিক উন্নতি বিধান করেন তবে মেদিনীপুরে তাঁহাদের "একটা ভবিষ্যৎ আছে বলিয়াই মনে হয়।"

এই তো মেদিনীপুরের অবস্থা। তবুও ঐ জেলা এখনও সজীব। অন্য কয়েকটি জেলা যথা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রায় নির্জ্জীব। সেখানকার সংবাদপত্রেও এরূপ কোনও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।

মুর্শিদাবাদী রেশম

শ্রীদুকড়িচন্দ্র নন্দী "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার এক পত্রে মুর্শিদাবাদে রেশমশিল্পের দুরবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইংরেজরা এদেশে আসিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার কাশীমবাজার শহরের ও বাংলার রেশমশিল্প উৎপাদনের অন্যান্য কেন্দ্রগুলি নিজেদের অধিকারে আনিয়া বাংলার রেশম কুঠিগুলির ধ্বংসসাধন করে। তাহারা স্বদেশ হইতে যন্ত্রদ্বারা রেশম ও রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া ভারতের বাজারে তাহা সস্তা দরে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে এবং বাংলার ব্যবসায়ী সমাজকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করে। ফলে বাংলার এই যে সুপ্রাচীন শিল্পসম্পদ একদা

পৃথিবীর সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল বৈদেশিক বণিকদের প্রতিকূলতায় সে গৌরবরশ্মি আজ ম্লান ও ক্ষীণপ্রভ।

দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছিয়াছে যে, "বর্ত্তমানে ইসলামপুর চক কেন্দ্রের অধিকাংশ বয়নশিল্পী নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কেহ-বা চানাচুর ভাজা কেহ-বা সরকার বাহাদুরের নূতন রাস্তা প্রস্তুতের কাজ, কেহ-বা মজুরে পরিণত হইয়াছে। স্ত্রী-কার্য্যগণ দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

এই অবস্থা চলিতে থাকিলে রেশমশিল্পের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। যে সকল শিল্পী এখনও নিজেদের পেশা পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও অর্থাভাবে কোন কাজই করিতে পারিতেছেন না। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতি মহাজন রেশমের ব্যবসা এবং বাজারের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। লেখকের অভিমতে জাতীয় সরকার যদি অগ্রণী হইয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম ও সময়োপযোগী বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করেন এবং তাহা বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করেন তবেই এই শিল্পকে বাঁচান সম্ভব।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভায় বা পরিষদে এমন কেহ আছেন কি যার মনে এই সংবাদ সাড়া জাগাইবে? গণতান্ত্রিক দেশে অযোগ্য লোককে ক্ষমতা দিলে যা হয় ইহাও তাহারই এক নিদর্শন। পশ্চিম বাংলার সবকিছুই তো ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। আর তাহার পথ সোজা করিয়াছি আমরাই—গত নির্ব্বাচনে।

আসানসোলে কলেজ সমস্যা

২৪শে ফেব্রুয়ারীর "বঙ্গবাণী" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে আসানসোলের কলেজ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে আসানসোলে আসানসোল কলেজ নামক যে কলেজটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে আট শতাধিক ছাত্র ও ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনায়াসে বার শত হইতে পারিত; কিন্তু কলেজের কোন নিজস্ব উপযুক্ত গৃহ না থাকায় স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। অর্থের অভাবই আসানসোল কলেজের সম্প্রসারণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যদিকে বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজে মাত্র ৫০।৬০ জন ছাত্রী পড়ে; কিন্তু সরকারের ডিসপারসাল স্কীম অনুযায়ী এই বালিকা কলেজ প্রচুর পরিমাণে সরকারী অর্থ সাহায্য পায় এবং এই কলেজের নিজস্ব ভবনও নির্মিত হইয়াছে। এই কলেজের অদূর ভবিষ্যতে অর্থের দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইবার আশা কম।

এ ক্ষেত্রে পত্রিকার পরামর্শ হইতেছে দুইটি কলেজ একত্র করিয়া একটি বৃহদায়তন কলেজ করা। আজকাল সহশিক্ষা অনেক স্থলেই চালু হইয়াছে। আসানসোল কলেজেও অনেক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। সুতরাং এদিক হইতে বিশেষ আপত্তি উঠিবার কারণ নাই। পত্রিকার মতে "সরকার বালিকা কলেজে যেরূপ উদার হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেছেন যদি সেইরূপ অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা হয়।"

এ বিষয়ে সবিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ সমস্যা পূরণ করিতে হইলে সবল মস্তিষ্ক শিক্ষামন্ত্রীর প্রয়োজন। দুর্বিবচালিত পশ্চিম বাংলায় তাহা সম্ভব হইবে কি?

বাঁকুড়ার জল সরবরাহের অব্যবস্থা

২৪শে ফেব্রুয়ারীর 'হিন্দুবাণী'র এক সংবাদে প্রকাশ, "গন্ধেশ্বরী নদীর পাম্পিং ষ্টেশনে নলকূপ নাই। বালির সামান্য নীচেই কয়েকটি পাইপ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, তাতে জল চুঁইয়ে প্রবেশ করে। পাইপগুলি যেস্থানে বসানো আছে, তার উপরে জল থাকে না। ফলে বালির উপর লোকে এসে অবাধে মলত্যাগ করে। ইহাতে পানীয় জল সহজেই দূষিত হবার সম্ভাবনা। আগে পৌরসভা থেকে এই স্থানটি পাহারাদার দ্বারা সংরক্ষিত থাকত। বর্ত্তমানে সে রকম ব্যবস্থা নাই। আশা করি পৌরসভা এ বিষয়ে সচেতন হবে।"

আসাম চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন আইনের আংশিক পরিবর্ত্তন

২০শে ফেব্রুয়ারীর 'যুগশক্তি'র সংবাদে প্রকাশ, আসাম সরকার ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম বেতন আইন সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে শ্রমিকগণ কম দরে খাদ্যশস্যের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা পাইবেন। কম দরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য বর্ত্তমান মাগ্‌গীভাতা সাময়িকভাবে বর্দ্ধিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাগানসমূহের পরিচালকগণ খাদ্যশস্য মজুত রাখিবেন এবং সারা বৎসর নিয়ন্ত্রিত দরে শ্রমিকদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিবেন। বর্ত্তমান মূল বেতন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

আসামের রাজ্যপালের আদেশ অনুযায়ী যত দিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে তত দিন কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে না এবং কোন কমিশন দেওয়া যাইবে না। "গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ণীত পূর্ব্ববর্ত্তী লোকসান পূরণ এবং যুক্তিসঙ্গত সংরক্ষিত তহবিল গঠনের পর অংশীদারদের মধ্যে বণ্টনের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে শ্রমিকদের দাবী পূরণ করিতে হইবে।...শ্রমিকদিগকে কাজে বিরত রাখা, ছাঁটাই করা এবং সপ্তাহে কাজের সময় কমান যাইবে না।...পরিচালকগণকে শ্রমিকদের জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত ছুটির তালিকা মানিয়া লইতে হইবে।"

করিমগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

উক্ত 'যুগশক্তি'তে আরও প্রকাশ যে, গত ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে করিমগঞ্জ বাজারে হঠাৎ আগুন লাগিয়া বাজারের ছোটবড় প্রায় দুই শত দোকান ও বাসগৃহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ বহু লক্ষ টাকা অনুমিত হয়। আগুন লাগিবার কিছু পরে করিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির দমকল অগ্নি নির্ব্বাপণে সাহায্য করিতে আসিয়া ব্যর্থ হয়। পরে বদরপুর রেল ষ্টেশনের দমকল উপস্থিত হইয়া প্রশংসনীয়ভাবে কার্য্য করায় আগুনের প্রকোপ প্রভূতভাবে

হ্রাস পায়। শেষদিকে শিলচর পৌরসভার দমকলও আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণের কার্য্যে অংশ গ্রহণ করে। করিমগঞ্জের বাজারে গত চার-পাঁচ বৎসরে যে কয়টি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে তন্মধ্যে এবারকার ক্ষতিই নাকি সর্ব্বাধিক। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই, তবে ভস্মীভূত দোকানগুলির অধিকাংশই ছিল পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের।

"বাজারে বার বার কেন এবং কি ভাবে আগুন লাগে তাহা সঠিক কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ভাবে অগ্নি সংযোগও সম্ভবপর। গত সপ্তাহে বাজারে যে হৃদয়-বিদারক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বেলাও এইরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকেই মনে করেন যে, হয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, নয় ত অগ্নিবীমার অন্যায্য টাকা পাওয়ার লোভ হীনপ্রকৃতির ব্যক্তি বা দল বিশেষকে অগ্নিপ্রদানে প্ররোচিত করে।"

ভারতীয় খনি ও ফলিত ভূতত্ত্বের বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী

সম্প্রতি ধানবাদে অবস্থিত ভারতীয় খনি ও ফলিত ভূতত্ত্বের বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পৌরোহিত্য করেন। জাতীয় শিল্পবিস্তারের পরিকল্পনায় এই বিদ্যালয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশের খনিজসম্পদ কি উপায়ে সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় এসম্পর্কে যে সকল বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিতে পারেন তাঁহারা এই বিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করেন।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান মারফত খনিজকার্য্য করা হইত এবং তাহা তত্ত্বাবধান করিতেন এক জন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী। আমরা আরও জানিতে পারি যে, কেবলমাত্র ধাতুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই খনিজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ভারতে খনিজশিল্পের অধোগতি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ধাতুশিল্পের যে পুনরুজ্জীবন হয় তাহার মূলে ছিল বিদেশী প্রয়াস; দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০১ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে এক প্রস্তাবে ইংলণ্ডের রাজকীয় খনি বিদ্যালয়ের অনুরূপ একটি খনি বিদ্যালয় ভারতে স্থাপনের জন্য অভিমত জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে নানারূপ সমস্যা দেখা দিল। প্রথমতঃ বড় বড় বিদেশী কোম্পানীগুলি মোটা মাহিনার চাকুরীতে ভারতীয়দের নিযুক্ত করিতে চাহিত না। দ্বিতীয়তঃ ছোট ছোট কোম্পানীগুলিতে বেতনের হার এত কম ছিল যে, তাহাতে কেহই কার্য্য করিতে সম্মত ছিলেন না। ফলে সরকারী পূর্ত্ত বিভাগেই সকলে কার্য্য গ্রহণ করিতেন।

১৯০৩ সালে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিভাগীয় ডিরেক্টর জেনারেল এইচ. ডব্লু. অরেঞ্জ খনিজ শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে জোর দেন। ফলে খনিজ শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার হয় এবং বাংলাদেশে খনিজশিল্পের উৎসাহদানের নিমিত্ত ভারত-সরকার রাষ্ট্রীয় কারিগরি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

ভারতে খনিজ শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে শিবপুর কলেজে এক জন খনিজবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। অপর এক জন শিক্ষককে (instructo) নিযুক্ত করা হয় বিভিন্ন খনি অঞ্চলে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে শিক্ষা দিবার জন্য। শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার খনি কোম্পানীগুলির সহিত যে আলোচনা করেন তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, কারণ কোম্পানীগুলি শিক্ষানবিশের সুযোগপ্রদানের বিনিময়ে প্রতি ছাত্রের জন্য আট শত হইতে নয় শত টাকা দাবী করে। তদ্ব্যতীত তাহারা ছাত্রদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেও অস্বীকৃত হয়।

এই সকল কারণে খনিজ-শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ফলে ১৯২৬ সনের ৯ই নবেম্বর ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের পরিচালনা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই একটি কয়লা খনিতে বিস্ফোরণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা দেয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত যে সময়ে খনিশিল্প মন্দার মধ্য দিয়া যাইতেছিল তখন খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি ঘটে। শিক্ষানবিশি এবং কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য ভারতীয় খনিজ সভার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। যাহারা ভূতত্ত্বের ছাত্র তাহাদিগকে ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভের অভিজ্ঞ অফিসারদের সহিত নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চারি শত জন খনি ইঞ্জিনীয়ার এবং ভূতত্ত্ববিদ্ এই স্কুল হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে বিহারী-বাঙালীর মধ্যে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলে শিক্ষার আবহাওয়া কিছু দূষিত হইয়াছে। বিহারের মন্ত্রীসভার হাত যে কাজে পড়িয়াছে তাহাতেই এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

ভারতে বীমা ব্যবসায়ে দেশী ও বিদেশী কোম্পানী

বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে ভারত-সরকারের বীমা বিভাগের কন্‌ট্রোলার সম্প্রতি ভারতে ১৯৫১ সনের বীমা ব্যবসায়ের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "অর্থনৈতিক পত্রিকা"র তাহার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, ১৯৫১ সনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির জীবনবীমা ব্যবসায়ের পরিমাণ ১৯৫০ সন অপেক্ষা কম হইলেও বিদেশী কোম্পানীগুলির জীবনবীমার কাজ ঐ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সনে ভারতীয় কোম্পানীগুলি মোট ৪,৫২,০০০টি নূতন জীবনবীমার কাজ করিয়াছে। এইগুলির মোট মূল্য ১১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা

এবং প্রিমিয়াম বাবদ বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। ১৯৫০ সনের তুলনায় জীবনবীমার সংখ্যা ২১ হাজারটি কম এবং বীমাকৃত টাকার পরিমাণও এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। অপর দিকে বিদেশী কোম্পানীগুলি ১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২ হাজারটি বীমা করিয়াছে, এবং সে বাবদে তাহাদের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা। ভারতের বীমাব্যবসায়ের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া বীমা-নিয়ন্ত্রক বলিয়াছেন, ১৯৫০ সনের তুলনায় ১৯৫১ সনে অগ্নি, সামুদ্রিক ও বিবিধ বীমার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অগ্নি ও সামুদ্রিক বীমার সংখ্যাই বেশী হইয়াছে।

১৯৫২ সনের ৭ই অক্টোবর তারিখে ভারতে স্থিত ৩২৪টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২২২টি কোম্পানী ভারতীয়, বাকীগুলি অ-ভারতীয়। ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে ১১৯টি জীবনবীমার কার্য্য করিয়া থাকে। অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে ৪টি কেবল জীবনবীমার কাজ করে। ১৯৫১ সনের শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে ৬৭৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ৩১,-৭৯,০০০ জীবনবীমা চালু ছিল। অপর দিকে অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে ২,৩৫,০০৪টি জীবনবীমা চালু ছিল এবং তাহাদের মোট মূল্য ১১৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। দাবী পূরণ এবং অন্যান্য বাবদ ভারতীয় কোম্পানীগুলির ৩০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা এবং অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলির ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভারত সভার ইতিহাস

ছিয়াত্তর বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত সভার জয়ন্তী উৎসব সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য সভার কর্তৃপক্ষ ইহার আনুপূর্ব্বিক একখানি ইতিহাস পুস্তকও প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির রচয়িতা সুসাহিত্যিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

ভারত সভার প্রতিষ্ঠাবধি পঁচাত্তর বৎসরের (১৮৭৬-১৯৫১) ইতিহাস এই পুস্তকখানিতে দেওয়া হইয়াছে। এ ইতিহাস, এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষের উন্নতিমূলক বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনেরই ইতিহাস। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দশ বৎসর পূর্ব্বে শিবনাথ-আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক এই সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই ইহা ভারতবাসীর মুখপত্র রূপে সিবিল সার্বিস, অস্ত্র আইন, দেশীয় সংবাদপত্র আইন, ইলবার্ট বিল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রজার ভূমিস্বত্ব নিরূপণ, মাদক দ্রব্য নিবারণ, চা-বাগানের শ্রমিক প্রভৃতি বহু বিষয়ে সমগ্র দেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে। আমাদের ভিতরকার নবোন্মেষিত জাতীয়তাবোধ ভারত সভা প্রবর্ত্তিত এইরূপ বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়া বস্তুগত ও সত্তোপেত হইবার সুযোগ পায়।

কংগ্রেস স্থাপিত হইলে নিখিল-ভারতীয় প্রচেষ্টাগুলির ভার ইহা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ভারত সভা সমগ্র বাংলা ও উত্তর ভারতের শাখা-সমিতিগুলির মাধ্যমে জন-সংযোগ নিরত রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে আশ্চর্য্য জন-অভ্যুত্থান ঘটে, তাহা ভারত সভার এবম্বিধ জন-সংযোগ সাধনেরই প্রত্যক্ষ ফল। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারত সভার নেতৃবৃন্দ বরাবর লড়িয়াছিলেন। অখণ্ড ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় রূপ দানে ইহার প্রয়াস ছিল অপরিসীম। পুস্তকখানিতে এ সকল বিষয় সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। এখানি ইংরেজীতে রচিত হওয়ায় জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীর কৃতিত্বের কথা—যাহা আজ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেকে বিকৃত করিতে চাহিতেছেন—অ-বাংলাভাষীরাও যথাযথ জানিতে পারিবেন।

পুস্তকখানির প্রকাশ একটি কারণে বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার আয়োজন চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধনে রাজা রামমোহন রায় হইতে শতাধিক বর্ষব্যাপী বাঙালীর মুক্তি-প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনাও করা হইয়াছে।

বিদেশে ভারত-সরকারের সম্পত্তির খতিয়ান

২৩শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যপরিষদে শ্রী এম. ওয়ালিউল্লার এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় সচিব শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বিদেশে ভারত-সরকার কর্তৃক ক্রীত বা নির্ম্মিত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত যে বিবরণ দাখিল করেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর বিদেশে ভারত-সরকার ৯৯,৯০,-৭১৯ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ক্রীত সম্পত্তির মূল্য ছিল ৬০,১৫,৪৬৩ টাকা। তদ্‌ব্যতীত তিব্বতে, ইয়াটুং, গ্যাণ্টিখাং, গোংসা, কারিজঙ্খিত সম্পত্তির মূল্য জানা যায় নাই। তিব্বতে গ্যাংসিতে অবস্থিত ভারতীয় ট্রেড এজেন্সী হাউসের জন্য কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই, তবে জমির জন্য খাজনা বাবদ মাসে ২০০৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। সানফ্রানসিসকোতে অবস্থিত ৫৩,৫৭১৲ মূল্যের একটি সম্পত্তি গদর পার্টির দান। একক হিসাবে যুক্তরাজ্যে অবস্থিত লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের মূল্যই সর্ব্বাধিক—৪৬,৬৬, ৬৬৭ টাকা।

গৌরীসেনের টাকা কতদূরে কিভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে তাহার আরও পূর্ণ হিসাব বোধ হয় পাওয়া যাইবে না।

ভারতের বাজারে মন্দার সূচনা

"অর্থনৈতিক পত্রিকা" লিখিতেছেন: "পণ্যের বাজারে মন্দার প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমানরূপে ছড়াইয়া পড়িতেছে।" বাজারে দ্রব্য অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে। প্রচলিত অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী যুদ্ধপরবর্ত্তীকালে এইরূপ মন্দার সূচনা স্বাভাবিক, তবে উক্ত পত্রিকার ভাষায় "এই বারের এই মন্দা একদিকে শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ সকলকেই চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।"

এক দিকে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি ঘটিতেছে, অন্য দিকে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাই এবং বেতন হ্রাসের নীতি কার্য্যকরী করা হইতেছে। ফলে মন্দা আরও তীব্রতর রূপে দেখা দিতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, "বর্ত্তমানে ভারতে গরীব ও মধ্যবিত্তের উপর করের চাপ অত্যধিক। ইহাতে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় আয় এবং জাতীয় সঞ্চয়ের অনুপাত লক্ষ্য করিলেই সহজে অনুমান করা যায় যে, বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতীয় জনসাধারণ করদানের সর্ব্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কর্ম্মহীনতার ক্রতাবনতি, ক্রমাগত ঘাটতি বাজেটের দরুন জাতীয় সঞ্চয় এবং মূলধন গঠনের হার হ্রাস হইয়া পড়িতেছে এবং ভারতবাসীর আর অতিরিক্ত করদানের ক্ষমতা নাই।" তদ্ব্যতীত ভারতীয় জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দুই প্রকার কর দিতে হয়। যদি অপ্রত্যক্ষ কর হ্রাস না হয় "তাহা হইলে ভোগ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি হেতু চিরলাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত সমাজের আর দুর্গতির সীমা বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই।"

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উৎপাদনবৃদ্ধি অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাজারে এইরূপ মন্দা চলিতে থাকিলে উৎপাদন হ্রাস পাইতে বাধ্য। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার সরকারী করনীতির পরিবর্ত্তন সাধন। বর্ত্তমানের সরকারী নীতি যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বাজারের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর চড়া হারে ট্যাক্স প্রবর্ত্তনের নীতির পরিবর্ত্তন অবিলম্বে আবশ্যক। করের হার হ্রাস পাইলে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইতে পারে এবং তাহাতে ক্রেতার সুবিধা হইবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস ও ছাঁটাই নীতির সমালোচনা করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "ইকনমিক ইউনিট হিসাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে টিকিয়া থাকিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন উহার উৎপাদনের পড়তা হ্রাস করা—উৎপাদন হ্রাস করা নহে। দেশে উৎপাদন হ্রাস করার দ্বারা মূল্য-মান হ্রাস করা যায় না। এইজন্য উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করার নীতি গ্রহণের আবশ্যকতা আছে।" বর্ত্তমানে করভার লাঘব করা ইহার অন্যতম উপায়।

"অর্থনৈতিক পত্রিকা" বিশেষ নূতন কিছু লিখেন নাই। কিন্তু স্লোগান ও বিদেশী রাজনৈতিক-মহৌষধে বিষাক্ত দেশে একপ কথা বলা প্রয়োজন। তবে পড়তা হ্রাস কি করিয়া করা যায় তাহা বলা হয় নাই। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের প্রত্যক্ষ উপায় কুশলী কর্ম্মী ও অলস কর্ম্মীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়া তোলা। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি চাহিব অথচ খরচ যোগাইব না একপ আবদার আমাদের দেশেই চলে।

বিদ্যুৎশিল্পে গালা

পৃথিবীর বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম শিল্পের জন্য বৎসরে দুই লক্ষ মণ গালার প্রয়োজন হয়। অথচ এক একটি লাক্ষা কীটের আবরণ হইতে এক আউন্সের ১০ হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ লাক্ষা পাওয়া যায়। কাজেই পৃথিবীর একমাত্র বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে প্রভূত পরিমাণ লাক্ষা কীটের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের জন্য গালার এইরূপ ব্যাপক ব্যবহারের কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইহার বিদ্যুৎ অপরিবাহী ক্ষমতা খুব বেশী; দ্বিতীয়তঃ ইহা অভ্রের উপর খুব ভালভাবে লাগিয়া থাকে; তৃতীয়তঃ দ্রব্যের উপরিভাগে ইহা বার্ণিশের মত কাজ করে; এবং চতুর্থতঃ অত্যধিক বৈদ্যুতিক চাপেও পরিবহন ক্ষেত্র বাড়ে না ও অঙ্গার সৃষ্টি করে না।

খাঁটি অভ্র সহজেই ফাটিয়া যায়। সেজন্য অভ্রের সহিত গালা মিশাইয়া 'ম্যাকানাইট' প্রস্তুত করা হয়—অভ্রের তুলনায় যাহা বেশ শক্ত এবং যাহাকে সহজেই যে কোনও আকারের করিয়া লওয়া চলে। কাগজের সহিত গালা মিশাইয়া বিদ্যুৎ অপরিবাহী নল, রড প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। আবার রেশম বা সূতী বস্ত্রের উপর গালা লাগাইয়া ট্রান্সফরমার, আর্ম্মেচার প্রভৃতির উপযোগী অপরিবাহী বস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক সুইচ, ডায়াল, প্লাগ এডপটার প্রভৃতি সরঞ্জাম নির্ম্মাণে গালা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয় লাক্ষা ভারতে শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী ব্যবহৃত হয় না। আজ ভারত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ভারতে দশ লক্ষ কিলোওয়াট অধিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে ভারতীয় গালার চাহিদা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইবে।

পুণাতে রহস্যময় ব্যাধি

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পুণা এবং আহম্মদনগর জেলা দুইটিতে গত দেড় বৎসর যাবৎ এক অদ্ভুত ব্যাধি দেখা দিয়াছে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হইল তীব্র পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান শারীরিক দুর্বলতা। এই রোগ সম্পর্কে পুণাতে চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে এক আলোচনা হইয়াছে। পুণার সাসুন হাসপাতালে এইরূপ রোগাক্রান্ত কয়েকটি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ চন্দ্রচূড় বলিয়াছেন যে, যদিও এই রোগের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই তবু মনে হয় যে পানীয় জল বা গৃহীত খাদ্যের মধ্যে নিহিত কোন ত্রুটির জন্যই এই রোগ দেখা দেয়। চিকিৎসকমণ্ডলীর সম্মুখে পঠিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, প্রথমে ইহাকে সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া মনে করিলেও পরে সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, দেখা গিয়াছে একটি গ্রামে এই রোগ কয়েকটি বিশেষ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, অন্যান্য গ্রামবাসীকে আক্রমণ করে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পরিবারের একজন আক্রান্ত হইলেও অপর সকলেই সুস্থ আছে। বোম্বাইয়ের জনস্বাস্থ্যবিভাগের অধিকর্ত্তা ডাঃ ডি. কে. বিশ্বনাথন জানাইয়াছেন যে, কর্ণেল জোগবার

নেতৃত্বে হফকিন্ ইনস্টিটিউটের এক দল বিশেষজ্ঞ এই রোগের কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত—সংক্রমণের ফলেই এই রোগ দেখা দিয়াছে যদিও তাহার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই।

আহম্মদনগর জেলার বোটেগ্রামে অবস্থিত সরকারী কুটির হাসপাতালে ১০০ জন রোগী আহার্য্যের পরিবর্তনের ফলে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

২রা মার্চের বোম্বে ক্রনিক্লের আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সুরাটে এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়াছে। রোগী প্রথমে পিঠে ব্যথা অনুভব করে, তাহার পর হৃদয়ে এবং কিছুক্ষণ পরে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত এই রোগের কারণ নির্ণীত হয় নাই।

কলিকাতাতেও একদিনের জ্বরে শ্বাসকষ্টে লোক মরিতেছে। রোগ নির্ণয় সম্ভব হইতেছে না। রোগে মৃত্যুর পর শবব্যবচ্ছেদ প্রথা প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে। তাহাতে মৃত্যুর কারণ সঠিক নির্ণয়ে সাহায্য হয়। এদেশে কুসংস্কারের ফলে তাহা এখনও সম্ভব হইতেছে না।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের বাজেট ঘাটতি

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেট প্রাদেশিক বিধানসভায় পেশ করেন। বাজেটে রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ ২৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং রাজস্বখাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। ফলে ১৯৫৩-৫৪ সনে দুই কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। মূলধন খাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইতে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক পাওয়া যাইবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে।"

সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৯৫২-৫৩ সনের সংশোধিত বাজেটে রাজস্বখাতে ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এই সনের মূল বাজেটে ৬৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছিল।

নূতন বৎসরের বাজেটে শিল্প-প্রচেষ্টার সাহায্য দানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। "সোনার বাংলা" পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী পূর্ব্ববঙ্গের তাঁতিদের নিয়মিতভাবে সূতা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঢাকার নিকট কালিগঞ্জে মুসলিম কটন মিল স্থাপনের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৫৪ সনে এই মিলটিতে উৎপাদন কার্য্য সুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কুটির-শিল্পীদিগকে ঋণদানকল্পে উক্ত বাজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কর্ণফুলী পরিকল্পনার জন্য ১৯৫৩-৫৪ সনে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে প্রথমতঃ ২০ হাজার কিলোওয়াট পরিমিত বিজলী পাওয়া যাইবে; কর্ণফুলী অববাহিকার দক্ষিণাঞ্চল বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং নৌচালনার উপযোগী ৩২০ মাইল দীর্ঘ জলপথ নির্ম্মিত হইবে। বিজলী ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার আগামী ছয় বৎসরে সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে সাত শত পঞ্চাশ মাইল বাঁধ এবং রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য পাক-ইটালিয়ান ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন নামক একটি ইটালীয় রাস্তা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। পাকিস্থান সরকার এই চুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আগামী বৎসর একটি রাস্তা উন্নয়ন ট্রেনিং পরিকল্পনার জন্য মার্কিন সরকার মোট ১১ লক্ষ ডলার অর্থ সাহায্যে স্বীকৃত হইয়াছেন। চট্টগ্রাম, বগুড়া এবং ঢাকায় ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হইবে।

উপযুক্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর অভাবে গত বৎসর সরকারের গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। এই খাতে বাজেটে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংশোধিত বাজেটে এইখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা।

১৯৫২-৫৩ সনে সরকার মোট ৮৫টি কোর্ট অব ওয়ার্ডস পরিচালিত জমিদারী এবং ৭টি ব্যক্তিগত জমিদারী দখল করিয়াছেন। যে সকল জমিদারী ১৯৫১-৫২ সনে সরকার দখল করিয়াছিলেন ১৯৫২-৫৩ সনে উহাদের অন্তর্বর্ত্তীকালীন ক্ষতিপূরণ পাওনা হইলেও তাহা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

মোহাজেরদের (শরণার্থীদের) পুনর্ব্বসতির জন্য পাকিস্থান সরকার পূর্ব্ববঙ্গ সরকারকে ১৯৫২-৫৩ সনে ঋণস্বরূপ ১ কোটি টাকা ও দান-স্বরূপ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এখনও পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ মোহাজেরের বাসস্থানের ও জীবিকা সংস্থানের সমস্যা বর্ত্তমান।

ধানের ক্ষেতে যন্ত্রের কাজ

পি. আলেকসীয়েক লিখিতেছেন: "সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের কৃষকদের বিশাল যৌথখামারসমূহের মধ্যে একত্রীকরণের ফলে সোবিয়েৎ কৃষিকর্ম্মকে ব্যাপকভাবে যন্ত্রায়িত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।...সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের ধানচাষের এলাকাগুলিতে খামার-সমূহের অধীনে ৫০০ হতে ১০০০ হেক্তর (হেক্তর=পৌনে সাত বিঘা) পরিমিত ধানী জমি আছে। পুরানো সেচব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নূতন সেচব্যবস্থা নির্ম্মাণের কল্যাণে প্রতিটি ক্ষেতের পরিসর ২০ হইতে ৩০ হেক্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে যাহার দরুন ধানচাষের যাবতীয় পর্য্যায়েই কার্য্যকরীভাবে ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে।

"ধানচাষের জন্য যখন জমি তৈরি হতে থাকে তখন থেকেই ধানচাষের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার সুরু হয়। একাজে এক্সক্যাভেটর,

স্ক্রেপার, গ্রেডার, বুলডোজার, ডিচার এবং সমবেত ডিচার-বিজার ইত্যাদি নানান্ ধরণের যন্ত্র ব্যবহার হয়। এই সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে খাল কাটা, জমি সমান করা, উদ্বৃত্ত মাটি সরানো এবং আল বাঁধার কাজ সবই সম্পন্ন হয়। আলের ধারগুলো বাঁধা হয় একটু ঢালু করে যাতে করে ট্রাক্টরগুলোর পক্ষে এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেতে যাওয়া সম্ভব হতে পারে।

"...ধানের জমি চষবার কাজে প্রধানতঃ শক্তিশালী ট্রাক্টরচালিত কোলটার (coulter) জাতীয় লাঙ্গল ব্যবহার করা হয় যার ফলাগুলো জমির প্রয়োজনানুযায়ী ২২ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার গভীর। যে জমিতে কোনদিন চাষ হয় নি সে ধরণের জমিতে চাষ করবার জন্ত 'ব্রাসকাটার' ও 'মারস লাঙ্গলের' ব্যবহার করা হয়। ভারী 'ডিস্ক' অথবা দাঁতালো 'ট্রাক্টর হ্যারো' যন্ত্র দিয়ে মাটির ঢেলা গুঁড়ো করা হয়, আর প্রতি বছর 'গ্রেডার' অথবা বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেতের মাটি সমান করে দেওয়া হয়।"

"ধান বুনবার আগেকার চাষের কাজ করা হয় কোলটার বিহীন ট্রাক্টর লাঙ্গলের সাহায্যে। শক্ত জমিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় ভারী ট্রাক্টরচালিত 'চিসেল কালটিভেটর' যেগুলো ২০ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত গভীর করে জমি চষতে পারে। এই সমস্ত ব্যবস্থার কল্যাণে ক্ষেতের মাটি খুব ভাল করে গুঁড়োনো হয় আর বসন্তকালীন আগাছাগুলো পরিষ্কার করা হয়ে যায়। নরম জমির মাটি ট্রাক্টর-চালিত রোলারের সাহায্যে সমান করে দেওয়া হয়।

"সাম্প্রতিক কালে ট্রাক্টর-চালিত 'ডিস্ক ড্রিল' যন্ত্রের সাহায্যে শুধুমাত্র ১·৫ থেকে ২·০ সেন্টিমিটার (এক ইঞ্চির কম) গভীর করে সার বেঁধে ধান বুনবার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এ কাজটা ডিস্ক যন্ত্রের উপর বিশেষ ধরণের গার্ড বসিয়ে সমাধা করা হয়ে থাকে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের বিস্তৃত জলাজমিতে ধান রোপণের জন্ত 'এয়ারপ্লেনের' ব্যবহার করা হয় যার দরুন রোপণ কার্য্যের জন্ত ব্যয়িত সময় বহুলাংশে কমে যায় ও শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বেড়ে যায় (১৫ গুণ অথবা তার চেয়েও বেশী)। জমির উপরিভাগ তৈরি করার কাজেও 'এয়ারপ্লেনের' ব্যবহার করা হয়, এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে সার প্রয়োগের দরুন এর কার্য্যকারিতা অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং হাতে কাজ করার খরচ শতকরা ৯৫ থেকে ৯৭ ভাগ কমে যায়।

"সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রায়িত পদ্ধতিতে ধান কাটার সমস্তাসমূহও সমাধান করা হয়েছে। এই জন্ত সাধারণতঃ দুই বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়: প্রথম পদ্ধতিতে স্বয়ংচালিত কমবাইন যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি ধান কেটে তোলা হয়; অন্ত পদ্ধতি—যাকে বলা চলে ক্রমিক পদ্ধতি, অনুযায়ী প্রথমে ধানগাছগুলোকে ট্রাক্টর-চালিত 'রীপার' যন্ত্রের সাহায্যে কেটে সারবন্দীভাবে পেতে রাখা হয়, তার পর এভাবে থেকে যখন ধানগাছগুলো যথেষ্ট পরিমাণ শুকিয়ে যায় তখন আবার সেগুলোকে বিশেষ ধরণের কমবাইন যন্ত্রের সাহায্যে নিড়ানো হয় ও খামারে তোলা হয়।

"এই সমস্ত নানা ধরণের যন্ত্রের বহুল ব্যবহার সোবিয়েৎ ধান-চাষীদের সমস্ত রকমের কঠিন মেহনতী কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ও তাদের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

"সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে জমি তৈরি ও জমি চষার কাজে শক্তিশালী ডিসেল ট্রাক্টরের ব্যবহার খুব ব্যাপক আকারে হতে সুরু করেছে। একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের স্বয়ং-চালিত ধানী কমবাইন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন ধরণের লাঙ্গল যার শিরালা জমির উপর দিয়ে অনায়াসে যেতে পারে, কিংবা এই ধরণের আরও অনেক যন্ত্র।"

হরিজন পত্রিকার আর্থিক অবস্থা

হরিজন পত্রিকার যুগ্মসচিব ১৪ই ফেব্রুয়ারীর 'হরিজন' পত্রিকায় বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার আয়ব্যয়ের এক হিসাব দিয়া লিখিতেছেন:

"পত্রিকার গ্রাহকগণের চাঁদার আয়ে বৎসরের পর বৎসর ঘাটতি চলিতেছে এবং দেনা বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিচালনে সর্ব্বপ্রকার ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াও এবং সম্পাদকীয় কর্ম্মে ও পরিচালনে কর্ম্মীদের পারিশ্রমিক না লইয়াও পত্রিকার খরচ উঠিতেছে না। শুভ যোগাযোগে গান্ধী স্মারকনিধির নিকট হইতে ২,২৫০৲ টাকা এককালীন সাহায্য পাওয়ায় পত্রিকা রাখা সম্ভব হইয়াছিল। ভূ-দানযজ্ঞ আন্দোলন পরিচালনা সূত্রে বিনোবাজীর বঙ্গদেশে শুভাগমন ও পরিব্রজ্যা পর্য্যন্ত পত্রিকা বাঁচাইয়া রাখা বন্ধুবান্ধবের একান্ত ইচ্ছা। ইহা সম্ভবপর করিতে হইলে পাঠকগণের ও বন্ধুদের নূতন গ্রাহক সংগ্রহে সক্রিয় সহযোগিতা চাই।"

বাঙালী ত লেখাপড়া চিন্তা বিবেচনা ইত্যাদি ছাড়িয়াই দিয়াছে। তাহা হইলেও "হরিজনে"র নিবেদন আমরা সমর্থন করি।

ইংরেজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা

৭ই ফেব্রুয়ারীর 'হরিজন' পত্রিকায় শ্রীমগনভাই দেশাই লিখিতেছেন:

"ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্ত ইংরেজী মাধ্যমের পরিবর্ত্তন ন্যায়সঙ্গত কালের মধ্যেই সাধিত হওয়া প্রয়োজন। এই পরিবর্ত্তন সিদ্ধ করিবার জন্ত উর্দ্ধপক্ষে সংবিধান আরম্ভের পর ১৫ বৎসর সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম এখনও পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষাই রহিয়াছে। বিভিন্ন পদস্থ রাজপুরুষ এবং এমনকি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার সুপারিশ করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ইংরেজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা প্রচলনের "পন্থা নির্ণয়ের উল্লেখমাত্র নাই, ইহা শোচনীয় ব্যাপার বলিতে হয়।" শ্রীদেশাইয়ের অভিমতে সংবিধান-নির্দিষ্ট সময়—অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের পূর্ব্বেই দেশীয় ভাষা উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে যদি সুপরিকল্পিতভাবে সে প্রচেষ্টা করা হয়।

তর্ক

শ্রীশিবচন্দ্র ন্যায়াচার্য্য

বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ প্রয়োজনীয়-তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর", "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং-স্তর্কেন যোজয়েৎ"—এই রকমের বহু উক্তি প্রাচীনকাল হইতে এ যাবৎ তর্কের অসারতা প্রতিপাদন-প্রয়াসে চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে তর্কের প্রতি লোকের বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তর্কের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রতি ব্যক্তিই নিজের মতবাদ স্থাপনে তর্ককে ভিত্তি করিয়াছেন। তর্কের ভিত্তিতে অপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ দৃষ্টি-গোচর হয় না, মতবাদের মূলে তর্ক থাকিবেই, তাহা ভুল বা ঠিক যাহাই হউক। যাহারা তর্কে বীতশ্রদ্ধ তাহাদের উক্তির মূলেও রহিয়াছে তর্ক। সে তর্ক সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন নহেন। "তর্ক করিও না। সহজ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা কর"—এসকল উক্তির মূলেও রহিয়াছে তর্ক। সুতরাং তর্ক-বীতশ্রদ্ধামূলক উক্তির অবস্থা দাঁড়ায়, গাছের যে শাখায় বসিয়া আছি তাহারই মূলচ্ছেদনের মত। দার্শনিকদিগের মধ্যে বেদান্তীই তর্কের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনে অধিকতর অগ্রসর। এপক্ষে নৈয়ায়িক তর্কের প্রতি অধিকতর আস্থা-সম্পন্ন, বিশেষতঃ নব্যনৈয়ায়িক—বঙ্গভূমির সন্তান।

নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ মহর্ষি গৌতমের মতে তর্কের স্বরূপ না জানিলে মুক্তি অসম্ভব। তাঁহার মতে ষোলটি পদার্থের জ্ঞান মুক্তির জন্য আবশ্যক, তন্মধ্যে তর্ক অন্যতম। তর্কের স্বরূপ-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলা চলিতে পারে—বিচারস্থলে বিরুদ্ধ পক্ষের ভুল মতকে "ভুল" ইহা স্বীকার করাইবার অন্তিম উপায় তর্ক। যেমন রাত্রিকালে আলো দেখিয়া কেহ হয়ত বলিল "সূর্য্যের আলো"। তখন তাহার মতকে ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রতিবাদ হইবে—"উহা সূর্য্যের আলো নহে, রাত্রিকালে সূর্য্যালোক থাকে না"। এই প্রতিবাদের পরও বক্তা যদি ভুল স্বীকার না করেন, তখন তর্ক উপস্থাপিত হইবে—"উহা সূর্য্যের আলো হইলে আকাশে সূর্য্য দেখা যাইবে", অথবা "উহা যদি সূর্য্যের আলো হয় তাহা হইলে এ সময় রাত্রি হইতে পারে না।" সুস্থ মস্তিষ্কে এরূপ ক্ষেত্রে বিচারের প্রসঙ্গ উঠে না, তর্কেরও প্রয়োজন হয় না, কিন্তু জটিল বিষয়ে বিচার আবশ্যক, তর্কও একান্ত অপরিহার্য্য—তর্ক ছাড়া সে স্থলে নির্ণয় অসম্ভব। এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িকের একটি বিবাদ-স্থলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈভাষিক বৌদ্ধগণ বলেন, ঘট পট প্রভৃতি স্থূল বস্তু কতকগুলি সূক্ষ্মবস্তুর সমষ্টি, পুঞ্জীভূত সূক্ষ্ম বস্তুকেই একটি স্থূল বস্তু বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্ম পুঞ্জাতিরিক্ত কোন স্থূল বস্তু জগতে নাই। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সূক্ষ্ম বস্তুর পুঞ্জকে এক একটি স্থূল বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে "এক" বলিয়া যাহাকে আমরা মনে করি, তাহা ভুল স্বীকার করিতে হয়। "একটি ঘট দেখিতেছি"—এস্থলে ঘট এক নহে, সূক্ষ্ম বস্তুর সমষ্টি মাত্র, সুতরাং যাহাকে দেখিতেছি সে অনেক, অনেককে এক মনে করা ভুল।

সমষ্টির মধ্যে এক একটি সূক্ষ্ম বস্তু আছে সত্য, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় 'একটি লোক', একটি ঘট" এ রকম মনে করা ভুল। ইহার উত্তরে বৌদ্ধ বলেন, স্থূল বস্তুকে এক বলিয়া মনে করা ভুল ইহা মানিলে ক্ষতি কি? এক বলিয়া আমরা যাহা দেখি তাহা ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান—বৌদ্ধ এইরূপে নৈয়ায়িকের তর্ককে ইষ্ট করিয়া লন। এরূপ ক্ষেত্রে তর্ককে ইষ্টাপত্তি বলা হইয়া থাকে। ইষ্টাপত্তির দ্বারা বিচারস্থলে কোনো পক্ষকে নিরস্ত করা চলে না। সুতরাং নৈয়ায়িক দ্বিতীয় তর্ক উপস্থিত করিলেন, "যাহাকে একটি বস্তু বলিয়া মনে করি তাহা যদি কোন স্থলেই সত্য না হয়, তাহা হইলে একটি জিনিষ দেখিতেছি এ ভ্রম হওয়া অসম্ভব"। গাধা সম্বন্ধে যাহার বাস্তবিক জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে ঘোড়া দেখিয়া গাধা বলিয়া ভুল করা অসম্ভব। যে বস্তু সম্বন্ধে পূর্ব্বে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ নাই অন্যত্র তাহাকে ভুল করা চলিতে পারে না—ইহাই নিয়ম। এই নিয়মকে বৌদ্ধ অস্বীকার করিলে নৈয়ায়িক বলিবেন—যে বস্তুর বাস্তবিক প্রত্যক্ষ কোন স্থানেই হয় না তাহারও ভ্রম হওয়া যদি সম্ভব স্বীকার কর, তাহা হইলে জগতে ভুল বা ঠিক কিছুই বলা চলে না। তুমি যাহাকে ঠিক মনে কর আমি বলিব তাহা অদৃশ্য বস্তুর ভ্রম। বাস্তবিক জগতে কোন বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয় না, সমস্ত প্রত্যক্ষই অদৃশ্য বস্তুর ভ্রম। সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ অসম্ভব, "ভুল দেখিয়াছ" বা "ঠিক দেখিয়াছ" একথা কাহাকেও বলা চলে না।

ইহার পরও বৌদ্ধ অন্য পথে নিজ মত স্থাপনে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, নৈয়ায়িকও তর্কদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু সে সব উক্তি এখানে অনাবশ্যক, তর্কের উদাহরণের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

একণে তর্কের স্বরূপের আলোচনায় আসা যাক্। তর্ক

করিতে গেলে মিথ্যা কথা বলিতে হয়, সে মিথ্যা কথাও আবার জানিয়া শুনিয়া বলা, যাহা মিথ্যা বলিয়া জানি—তাহাই জোর করিয়া বলা হয় তর্কক্ষেত্রে। প্রত্যেক তর্কেই অসম্ভব বস্তুকে জোর করিয়া বলা হইয়া থাকে। তর্কের প্রথম উদাহরণে "রাত্রিকালে আকাশে সূর্য্য দেখা যাইবে" বলা হইয়াছে। রাত্রিবেলা আকাশে সূর্য্য দেখা অসম্ভব ইহা বিচারকারী উভয় পক্ষই জানেন, তথাপি জোর করিয়া বলা হইয়াছে—আকাশে সূর্য্য দেখা যাইবে। বিষয়টি অসম্ভব জানা সত্ত্বেও তর্কস্থলে জোর করিয়া মানিয়া লওয়া হয়। এই জোর করিয়া মানিয়া লওয়াকে তার্কিকগণ "আহার্য্যারোপ" নাম দিয়াছেন। আহার্য্যারোপ মিথ্যা, এই মিথ্যার সৃষ্টির জন্ত তর্ক করা হয়। সুতরাং কাহারও সহিত তর্ক করা মানে মিথ্যাকথা বলা। তর্ক মিথ্যা হইলেও নীতিবিদ্‌দিগের দৃষ্টিতে ইহার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র কম নহে।

মনু বলিয়াছেন,"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ, বেদাবাক্যাবিরোধিনা যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে, সধর্ম্মং বেদনেতরঃ"। যে ঋষিদের ধর্ম্মোপদেশকে বেদের অবিরোধী তর্কের দ্বারা বিচার করে; সে-ই ধর্ম্মকে জানিতে পারে, অন্তে পারে না। আস্তিকগণ বেদের অবিরোধী তর্ককেই মর্য্যাদা দিয়াছেন, কিন্তু বেদের অর্থ অনুসরণ করিয়া তর্ক চলে না, তর্ক নিজের পথেই চলে। ফলতঃ তর্কের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত বেদার্থের বিরোধী হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আস্তিকগণ প্রচলিত বেদার্থের অন্তথা করিয়া তর্কের দ্বারা বেদকে সিদ্ধান্তের অবিরোধী সম্পাদন করেন—এ প্রসঙ্গে মহাতার্কিক উদয়নাচার্য্যের গর্ব্বোক্তি স্মরণ হয়। তিনি বলিয়াছেন, "বয়মিহ পদবিদ্যাং তর্কবিদ্যা মান্বীক্ষিকীং বা, যদি পথি বিপথং বা বর্ত্তয়ামঃ স পন্থাঃ উদয়তি দিশি যস্তাং ভানুমান্ সৈব প্রাচী নহি তরণিরুদীতে দিক্ পরাধীনবৃত্তিঃ।"

আমরা অর্থাৎ তার্কিকেরা ব্যাকরণশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র বা দণ্ডনীতি প্রভৃতিকে পথ বা বিপথে যেখানেই লইয়া যাইব, তাহাই হইবে ঠিক পথ। যে দিকে সূর্য্য উদিত হয়, তাহাই হয় পূর্ব্ব দিক, সূর্য্য কখনও পূর্ব্ব দিকের অনুসরণ করিয়া উদিত হয় না। কথাটি তার্কিকের গর্ব্বোক্তি হইলেও তর্কেরই মহিমাদ্যোতক। তর্ক নিজের পথেই চলিবে, শাস্ত্রের অর্থানুসরণ করিয়া চলিবে না, তর্কের ফলে শাস্ত্রের যাহা অর্থ স্থির হইবে, তাহাই হইবে প্রকৃত অর্থ। বহু স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে, বিচারক্ষেত্রে কেহ হয়ত প্রতিবাদীকে বেদের দোহাই দিয়া নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এমতাবস্থায় প্রতিবাদী বেদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বেদকে অপ্রামাণিক না বলিয়া তর্কের দ্বারা বেদের অর্থ নিজ সিদ্ধান্তের অবিরোধীরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের একটি বিবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক আস্তিক-দার্শনিক অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ও আস্তিক-দার্শনিক, উভয়েই বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন, কেহই বেদবিরোধী কথা বলিতে সাহসী নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন-প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক যখন বহু তর্কের অবতারণাপূর্ব্বক অবশেষে বলিলেন, জীব ও ঈশ্বর যদি পৃথক না হয়, তাহা হইলে বন্ধমোক্ষ বলিয়া কিছু থাকে না, সদানির্মুক্ত ঈশ্বরস্বরূপ জীব মুক্তই রহিয়াছে, মুক্তির জন্ত এই সব বেদান্তাদিশাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন। নৈয়ায়িকের এই তর্কের উত্তরে বেদান্তী শ্রুতির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রদর্শন করেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিই জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদের প্রমাণ। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক নিজের সিদ্ধান্তকে তর্কের দ্বারা বেদ-অবিরুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছেন—"নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি", "দ্বে ব্রহ্মণীবেদিতব্যে" ইত্যাদি বহু শ্রুতি নৈয়ায়িকের স্ব-পক্ষে থাকায়, নৈয়ায়িক "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইহার অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখাদি না থাকায় ব্রহ্মের মত হইয়া যান, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান না। যেমন অধিকতর অর্থসম্পন্ন হইলে সাধারণ ব্যক্তিকেও বলা হয় রাজা, বাস্তবিক সে রাজা নহে, কিন্তু রাজার মত। এস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মের সমান, ব্রহ্মের সহিত এক নহে।

এইরূপে নৈয়ায়িক স্বীয় মতকে বেদ-অবিরোধী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান বেদার্থের অন্তথাও করিয়াছেন। তর্ক যদি ঠিক হয় তাহা হইলে বেদার্থ তাহার বিরোধী হইতে পারে না, ইহা নৈয়ায়িক বিশ্বাস করেন। সুতরাং নৈয়ায়িকের তর্ক নিজের পথে চলে। ফলে প্রচলিত বেদার্থের সহিত কখনও কখনও বিরোধ উপস্থিত হয়, সে বিরোধও আবার তর্কের দ্বারাই অপসারিত হইয়া থাকে। প্রাচীন দার্শনিকগণ সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধের আশঙ্কায় তর্ক করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। সত্য সিদ্ধান্তের সহিত যথার্থ তর্কের কখনও বিরোধ হইতে পারে না এধারণা তাঁহাদের ছিল। মতবাদ সত্য হইলে বিরোধী তর্ক থাকিতে পারে না, বিরুদ্ধ তর্ক থাকিলে মতবাদ সত্য হইতে পারে না। যথার্থ মতবাদের বিরুদ্ধে তর্ক নামে যাহা উপস্থিত করা হয়, তাহা তর্ক নহে, তর্কাভাস বা কুতর্ক। যাহার সদুত্তর দেওয়া চলে না এমন বস্তু কখনও কুতর্কের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কুতর্কের সহিত সদুত্তরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কুতর্ক হইলে তাহার সদুত্তর থাকিবেই ইহাই হইল নিয়ম। অবশ্য বিচারক্ষেত্রে এক পক্ষ সে সদুত্তর উদ্ভাবন করিতে নাও পারেন। তাহাতে কিছু আসে যায় না। সদুত্তরবিহীন

কুতর্ক অসম্ভব, ইহা জোর করিয়া বলা চলে। আবার "তর্ক সদুত্তরবিহীন" একথাও জোর করিয়া বলা চলে। এদিকে সত্য মতকে বিরোধীতর্কশূন্য, আর তর্ককে মিথ্যাবিরোধী বলা চলে।

সাধারণ মানুষের মনে, এমন কি অনেক দার্শনিকেরও মনে তর্কের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা যায়। তর্ক যেন তথ্যনির্ণয়ে উপযোগী নয়। তর্ক করিয়া অনর্থক ঝঞ্ঝাট বাড়ানো হইয়া থাকে, এইরূপ মনোভাব তথ্যনির্ণয়ের পক্ষে ঘাতক। তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে তর্কের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ভীতি অযৌক্তিক। নিজ মত অসত্য হইলে তাহার বিরুদ্ধে তর্ক থাকিবে, যাহার বিরুদ্ধে তর্ক আছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তর্কবিরুদ্ধ মত অসত্য, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে অন্যায়। নিজ মত সত্য হইলে বিরুদ্ধে তর্ক থাকিবে না, কুতর্ক থাকিতে পারে, কুতর্ক সদুত্তরবিহীন নহে, কুতর্কের সদুত্তর পাওয়া যাইবেই, এবং সদুত্তরের দ্বারাই নিশ্চয় করিতে হইবে—ইহা কুতর্ক। সুতরাং তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে তর্কের পথ নির্ভয়, স্বমতের সত্যতা পরীক্ষার জন্য তত্ত্বান্বেষীকে তর্কের পথে চলিতে হয়, পথে কুতর্কের বাধা অপসারণ করিতে হয়, অনপসারণীয় তর্কের বাধা যখন উপস্থিত হয়, তখন প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়, অসত্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয়, বাধা না পাইলে লক্ষ্যপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। তর্কের বাধা না থাকিলে তত্ত্বান্বেষী অসত্য পথে চলিবে, ঠিক লক্ষ্যে কখনও পৌঁছিবে না—এই সব কারণে তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে তর্ক অপরিহার্য্য। তর্কই তাহাকে পথ দেখাইবে, বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবে, লক্ষ্যে পৌঁছিবার সুযোগ দিবে, কুতর্কের বাধাজাল অপসারণ করিবে।

ভারতীয় দার্শনিকগণ তর্ককে বলিয়াছেন "বিষয়পরিশোধক"। বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়কালে নানা আশঙ্কার উদয় হয়, কখনও বা বিপরীত নিশ্চয় হয়। এক বার শঙ্কা উপস্থিত হইলে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। শঙ্কার ফলে বস্তু-স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব হয়, শঙ্কাজালে বস্তুটি এমনভাবে জড়াইয়া যায় যাহাতে তাহাকে চিনিতে পারা মুশকিল হয়। এইরূপ বস্তু সম্বন্ধে বিপরীত-নিশ্চয় কালেও বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় করা অসম্ভব হয়, এমতাবস্থায় দার্শনিকগণের তর্কই হয় একমাত্র অবলম্বন। তর্ক বস্তুকে শঙ্কাজাল এবং বিপরীত-নিশ্চয় হইতে বিচ্ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্ন বস্তু ইতরের সহিত জড়িত থাকে না, নিজের শুদ্ধ স্বরূপ লইয়া থাকে। বস্তুতে এই শুদ্ধি তর্কই লইয়া আসে। এজন্য ইহার নাম বিষয়পরিশোধক। তর্কের অপর নাম সংশয়ব্যুদাস, সংশয়কে দূর করে বলিয়াই তর্কের এই নাম।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তর্ক হইতে বিষয়পরিশুদ্ধি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন আত্ম-সম্বন্ধে কাহারও জিজ্ঞাসা হইল "আমি" বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হয় তাহার স্বরূপ কি? আমার উৎপত্তি-বিনাশ আছে কিনা, জন্মই আমার উৎপত্তি, মরণই বিনাশ এরূপ মানিলে ক্ষতি কি? এই অনুসন্ধানের ফলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তর্ক উপস্থিত হইবে, যদি আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার যে সকল সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়, সেগুলিকে আত্মার বিশেষ কর্ম্মের ফল বলা চলে না। জন্মের পূর্ব্বে আত্মা ছিল না, তাহার কোন কর্ম্মও ছিল না। সুতরাং জন্ম-সময়ে যে সুখদুঃখ আত্মার হয়, তাহা স্বকৃত কর্ম্মের ফল বলা চলে না। বেদাদি শাস্ত্র সুখদুঃখকে কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ মানিয়া থাকেন, তার্কিকেরাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। বহু তর্কের উপর উক্ত মত সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সকল তর্ক এখানে অনাবশ্যক।

সুখদুঃখ স্বকৃত কর্ম্মের ফল—এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার উৎপত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছে। এই তর্ককে অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ বলা হয়। ন্যায়ভাষ্যকার আত্মার বিনাশের বিরুদ্ধেও তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন—আত্মার যদি মৃত্যুকালে বিনাশ হয়, তাহা হইলে ইহজন্মে কৃত দান দয়া প্রভৃতি কর্ম্মের ফলভোগ সম্ভবপর হয় না। এই তর্কের নাম কৃতহানপ্রসঙ্গ। এইরূপে তর্ক বিষয় পরিশুদ্ধি করিয়া থাকে। তর্ক উৎপত্তি-বিনাশের সংশয়জালে জড়িত আত্মাকে সংশয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধস্বরূপে পরিচিত করিবার সুযোগ দিয়া থাকে। প্রত্যেক তর্কের মূলেই একটি নিয়ম থাকে। এই নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই তর্ক করিতে হয়, মূলীভূত নিয়মের উপর তর্কের তর্কত্ব নির্ভর করে। মূলীভূত নিয়ম বেঠিক হইলে তর্কাভাস হয়—তখন তাহাকে তর্ক বলা হয় না।

এ প্রসঙ্গে তর্কের কয়েকটি মূলীভূত নিয়মের আলোচনায় আসা যাক্। ভাষ্যকার যে তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে "যে ব্যক্তি যে বস্তুর পূর্ব্বে থাকে না, সে ব্যক্তির বিশেষ কাজের ফল সেই বস্তু হইতে পারে না"—এই নিয়ম। প্রথমোক্ত তর্কের "সূর্য্যের আলো থাকিলে আকাশে সূর্য্য থাকিতে হইবে" এই নিয়ম মূলীভূত। সমস্ত তর্কের মূলেই এই রকম এক একটি নিয়ম আছে, এই নিয়মকে তর্কের অঙ্গ বলিয়া মানা হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িক বরদরাজ তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে তর্কের পাঁচটি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন, "ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্য্যয়ে, অনিষ্টানমুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকং। অঙ্গান্যতমবৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ।" ইহার মধ্যে ব্যাপ্তি অর্থাৎ নিয়ম একটি অঙ্গ। মতবাদ ভুল হইলে, সে মতকে অনুসরণ করিয়া চলিলে এমন একটি ক্ষেত্র

পাওয়া যায়, যেখানে মতের ভুল প্রত্যক্ষ হয়, সে ভুলকে আর অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। ভুল মতের অনুসরণের ফলে এমন একটি অনভিপ্রেত বস্তু আসিয়া পড়ে, যাহাকে কোনমতেই স্বীকার করা চলে না। অনভিপ্রেত বস্তুর এই আপত্তির নাম তর্ক। তর্কের দুইটি অংশ। একটি অংশের কাজ বিরুদ্ধ মতের অনুসরণ করা, দ্বিতীয়াংশের কাজ অনভিপ্রেত বস্তুকে আপাদন করা, জোর করিয়া লইয়া আসা, আপাদন আপত্তি আহার্য্যারোপ এগুলি সমানার্থক শব্দ।

এক্ষণে বিষয়টির পরিষ্কার ধারণার জন্য একটি উদাহরণের আলোচনায় আসা যাক্। তর্কের প্রথম উদাহরণে বলা হইয়াছে—"উহা সূর্য্যের আলো হইলে এক্ষণে সূর্য্য দেখা যাইবে"। এই তর্কে প্রথমাংশের দ্বারা বিরুদ্ধ মতের অনুসরণ করা হইয়াছে,বিরুদ্ধ মত ভুল জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করা হইয়াছে—ইহা আহার্য্যারোপ। দ্বিতীয়াংশের দ্বারা অনভিপ্রেত বস্তুকে টানিয়া আনা হইয়াছে। রাত্রিতে সূর্য্য দেখা অসম্ভব জানা সত্ত্বেও ইচ্ছ পূর্ব্বক মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাও আহার্য্যারোপ, ইহাকে অনিষ্টাপাদনও বলা হইয়া থাকে। এই দুইটি আহার্য্যারোপের মধ্যে একটি সংযোজক সূত্র রহিয়াছে, তাহা হইল নিয়ম। এই নিয়ম থাকার ফলে প্রথমটিকে মানিয়া লইলে দ্বিতীয়টিকে মানিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রথমটিকে ধরিয়া টানিলে নিয়মসূত্রে আবদ্ধ দ্বিতীয়টি যেন আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। রাত্রিতে সূর্য্যালোক স্বীকার করিলে, "সূর্য্যালোক থাকিলে সূর্য্য থাকিতে হইবে" এই নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ সূর্য্যকেও রাত্রিকালে মানিতে বাধ্য হইতে হয়, উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একটি মানিলে অপরটিকে না মানিয়া উপায় নাই। বস্তুমাত্রই নিয়মের অধীন, নিয়মই বস্তুর শৃঙ্খল, শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তুকে উলট-পালট করিতে গেলে শৃঙ্খল বাধা দেয় —এই বাধাই হইল তর্ক। বস্তুর এই নিয়মগুলিকে জানাই দার্শনিকের কাজ। নির্ভুল মতের মূলে থাকে প্রমাণ, প্রমাণের মূলে নিয়ম থাকে, নিয়মের মূলে তর্ক।

তর্কের প্রথমাংশের দ্বারা যে আহার্য্যারোপ হয়, তাহার নাম ব্যাপ্যের আহার্য্যারোপ। দ্বিতীয়াংশের দ্বারা যে আপাদন বা আহার্য্যারোপ হয়, তাহার নাম ব্যাপকের আহার্য্যারোপ। আহার্য্যারোপ=মিথ্যানিশ্চয়। ব্যাপ্যের আহার্য্যারোপের দ্বারা ব্যাপকের আহার্য্যারোপের নাম—নব্যনৈয়ায়িকের মতে তর্ক। এই তর্ক অনিষ্টপ্রসঙ্গস্বরূপ হওয়া চাই। অনিষ্টত্ব তর্কের একটি অঙ্গ। এই অঙ্গটি না থাকিলে তর্ককে বলা হয় "প্রতিবন্দি"। সব ক্ষেত্রে তর্ক প্রথমেই বিরুদ্ধবাদীর অনিষ্টাপাদন করিতে পারে না, বিরুদ্ধ পক্ষ অনেক সময় প্রতিপক্ষের তর্ককে প্রথমতঃ ইষ্ট করিয়া থাকে। পরে প্রতিপক্ষ যখন অন্যান্য তর্ক উপস্থাপিত করে, তখন পূর্ব্ব তর্ক অনিষ্টাত্মক হয়। যে স্থলে তর্ককে কোনমতেই বিরুদ্ধপক্ষের 'অনিষ্ট' করা যায় না, সে স্থলে তর্ক হইয়া দাঁড়ায় প্রতিবন্দি, প্রতিবন্দির দ্বারাও অনেক ক্ষেত্রে কাজ চালানো হইয়া থাকে। বিবেচক ব্যক্তি সব সময়ে প্রতিবন্দিকেও ইষ্ট করিতে পারেন না। যাহাকে লইয়া বিচার তাহার উপরে প্রতিবন্দি অনিষ্টাপাদন করে না, অন্যত্র অনিষ্টাপাদন করিয়া থাকে, প্রকৃত ক্ষেত্রে কোন অনিষ্ট হয় না। অন্যত্র অনিষ্টকেও বিবেচক ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। এইজন্য প্রতিবন্দিও অনেক স্থলে বিচারের উপযোগী হয়।

এপর্য্যন্ত তর্কের বিষয় যাহা কিছু বলা হইয়াছে সবই নব্যনৈয়ায়িক মতানুসারী। এক্ষণে তর্ক বিষয়ে অপরাপর দার্শনিক মতের আলোচনায় আসা যাক্। প্রাচীনকালে দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায় তর্ককে বিচারের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে অপরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান করিতে গেলে অন্তে তর্ক আবশ্যক। দশাবয়বের মধ্যে তর্ক সংশয়ব্যুদাস নামক অন্তিম অবয়ব। তর্ক ছাড়া 'পরার্থ' অনুমান অসম্ভব, এই মত পরবর্ত্তী কালে পঞ্চাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণ খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়-ভাষ্যকার পঞ্চাবয়ব নিরূপণ-প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সে সব কথা এ স্থলে অনাবশ্যক। মীমাংসকগণ তর্ককে মীমাংসাস্বরূপ মানিয়াছেন। এ বিষয়ে মীমাংসক নারায়ণভট্টের উক্তি যথা—"এবং সর্ব্বত্র তর্কৌঘৈরর্থাভাস-নিরাসতঃ, বাক্যার্থস্থাপনী সর্ব্বা মীমাংসা তর্ক-রূপিণী।" অর্থাৎ —ভুল অর্থের নিরাস সব স্থলে তর্কের দ্বারাই হইয়া থাকে, এই জন্য বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করে তর্কস্বরূপ মীমাংসা। শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য তর্ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থ নির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ"—শ্রুতির অর্থে সংশয় উপস্থিত হইলে বাক্যের তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক তর্কের দ্বারাই বিপরীত অর্থের খণ্ডন ও প্রকৃত অর্থের নিশ্চয় হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি-ব্যাখ্যায় গোবিন্দানন্দ তর্ককে অনুমানস্বরূপ বলিয়াছেন, বাচস্পতি ও আনন্দগিরি বলিয়াছেন বিচারাত্মক। (২।১।১১ শারীরক ভাষ্যটীকা দ্রষ্টব্য)। নব্য-নৈয়ায়িকেরা অনুমানস্বরূপ তর্ক স্বীকার করেন না। অনুমান প্রমাণ, তাহার বিষয় প্রামাণিক, প্রামাণিক বিষয় কখনও অসত্য হয় না। তর্কের বিষয় অসত্য, অপ্রামাণিক; তর্ক প্রমাণ নহে, সুতরাং অনুমান ও তর্ক এক হইতে পারে না। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধরও তর্ককে অনুমানস্বরূপ মানিয়াছেন।

জৈন দার্শনিকেরা তর্ককে উহ নামক স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে তর্ক প্রসঙ্গানুমান, অমতের

বিপরীতপক্ষে যে দোষের অনুমান করা হয়, তাহারই নাম তর্ক। যুক্তি-সাপেক্ষ অনুমানকেও অনেকে তর্ক বলিয়া থাকেন। এই সব মতের খণ্ডন-যুক্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নৈয়ায়িক তর্ককে প্রমাণস্বরূপ না মানিলেও তাহাদেরও তর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তর্ককে সম্ভাবনাত্মক, বৈশেষিকাচার্য্য শিবাদিত্য তর্ককে সংশয়াত্মক বলিয়াছেন। এ বিষয়ে ভাষ্যকার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ"—ন্যায়দর্শনের এই সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—যাহার সম্বন্ধে মনুষ্যের পরিষ্কার ধারণা নাই, সে বিষয়ে প্রথমে মনুষ্যের জানিবার ইচ্ছা হয় বিষয়টি কি ভালভাবে জানি। ইহার পর বস্তুর বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্ম দেখিয়া মনে করে, বিষয়টি এই রকম বা অন্য রকম, একই বস্তু পরস্পরবিরুদ্ধ দুই প্রকারের হইতে পারে না, সুতরাং বস্তুতে সন্দিগ্ধ দুইটি প্রকারের মধ্যে কোনটি বস্তুতে সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধানের ফলে কয়েকটি বিশেষ কারণকে বস্তুতে সম্ভবপর' বলিয়া মনে করে। এই সম্ভাবনার ফলে বস্তুটি এই রকম হওয়াই সম্ভব ইহা ধারণা করিয়া লয়। এইভাবে কারণের সম্ভাবনার দ্বারা যে অপর জিনিষের সম্ভাবনা করা হয়, তাহারই নাম তর্ক।

সম্ভাবনা নিশ্চয় নহে, অনিশ্চিত প্রমাণের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না, সম্ভাবনা করা চলিতে পারে। তাই তর্কস্থলে প্রমাণ বা কারণের সম্ভাবনার ফলে অপর বিষয়ের সম্ভাবনাই হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, যেমন কেহ ইচ্ছা করিলেন, যিনি জানেন বা দেখেন, যাহাকে "আমি" শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়, তাহার স্বরূপ জানা দরকার। তাহার পর সন্দেহ হইল, আমার (আত্মার) উৎপত্তি বিনাশ আছে কিনা? আত্মাকে পরিষ্কাররূপে জানা নাই, আত্মা আছে এইটুকু মাত্রই জানা আছে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের আত্মাকে আমি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া থাকে, আমি আছি ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মনের দ্বারাই আত্মার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার উৎপত্তি বিনাশ হইয়াছে, বা হইবে কিনা এ সম্বন্ধে কাহারও সাক্ষাৎ অনুভব নাই। মানুষ তাহার জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরাবর জানিয়া থাকে, "আমি আছি", আমার উৎপত্তি হইল বা নাশ হইল ইহা সে কখনও জানে নাই। সুতরাং এমনও হইতে পারে—জন্মের সময় যখন তাহার অজ্ঞানাবস্থা সেই সময় তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তাহার বোধও হইয়াছে, এবং বিস্মৃত হইয়াছে। অথবা বোধ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া মানুষ তাহার উৎপত্তি জানিতে পারে নাই।

এইরূপে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে হয় ত জানা যায় আমার নাশ হইতেছে। কিন্তু সেকথা সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত কেহ ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ আছে ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না, নাই এ বিষয়েও নিশ্চয় করা চলে না; ফলে সন্দেহ স্বাভাবিক—আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ আছে কিনা? এইরূপে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি আত্মসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পায়, এমন কতকগুলি কারণ আত্মাতে সম্ভবপর, যাহার ফলে আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ না হওয়াই সম্ভব। যেমন—১। আত্মা যদি উৎপন্ন না হয়, জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, তবেই সম্ভব হয় আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ জন্মকালীন সুখাদিভোগ। ২। যদি আত্মার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জন্মকালীন সুখ-দুঃখ আত্মার পূর্ব্বকর্ম্মের ফলস্বরূপ বলা চলে না। এই দুইটি তর্কের মধ্যে প্রথমটির মূলে রহিয়াছে—"নিজ কর্ম্মের ফলে পূর্ব্বে নিজেকে থাকিতে হইবে" এই নিয়ম। দ্বিতীয়টির মূলে রহিয়াছে, "যে জিনিষের পূর্ব্বে যে থাকে না, সে জিনিষ তাহার কর্ম্মফল স্বরূপ হয় না"—এই নিয়ম। আত্মার বিনাশের বিরুদ্ধেও ভাষ্যকার এই রকম তর্ক উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন—যদি মরণের সময় আত্মার নাশ হয়, তাহা হইলে ইহজন্মে অপরাধ করিয়া মৃত্যু হইলে সে কর্ম্মের ফলভোগ হয় না, কেহ হয়ত অপরাধ করিয়া মারা গেল, তাহার সে অপরাধের শাস্তি হয় না। যে অপরাধ করিয়াছে সে মৃত, বিনষ্ট, শাস্তি ভোগ করিবে কে? অথচ শ্রুতি বলিতেছে, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"—শতকোটি কল্পেও কর্ম্মের ফলভোগ ব্যতীত নিস্তার নাই। সুতরাং মনে হয়, আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, জন্ম-মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে আত্মা বিদ্যমান থাকে। এই ভাবে শ্রুতির অবিরোধী তর্কের দ্বারা আত্মার নিত্যস্বরূপের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অবশেষে প্রমাণের দ্বারা আত্মার নিত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবধারিত হইয়া থাকে।

এখানে আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ না থাকার পক্ষে প্রমাণের সম্ভাব্যতাপ্রযুক্ত আত্মাতে উৎপত্তি-বিনাশ না থাকার সম্ভাবনা করা হইয়াছে। এই সম্ভাবনাই তর্ক, বা উহ—ইহা সংশয়ও নহে, নিশ্চয়ও নহে, সংশয় নিশ্চয় হইতে পৃথক জ্ঞানবিশেষ। সংশয়-নিশ্চয় ভিন্ন তৃতীয় প্রকারের সবিকল্পজ্ঞান পরবর্ত্তী যুগের নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে সম্ভাবনা সংশয়স্বরূপ, সম্ভাবনাস্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অপ্পয় দীক্ষিতের প্রসিদ্ধ কুবলয়ানন্দ গ্রন্থের টীকাকার "উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের" ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "উৎকটৈককোটিক আহার্য্য নিশ্চয়"ই সম্ভাবনা। কোনও কোনও বৈয়াকরণের মতে যোগ্যতা নিশ্চয় সম্ভাবনা। ভাষ্যকারও সম্ভাবনা শব্দের অর্থ

পরিষ্কার করেন নাই। তবে তর্ক নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, সম্ভাবনাত্মক তর্ক যথার্থ জ্ঞান নহে, কারণ তর্ক অবধারণাত্মক বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নহে, তর্কস্থলে "ইহা এইরূপই" এরূপ নিশ্চয় করা হয় না।

ভাষ্যকারের এই সকল উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মনে করেন, ভাষ্যকারের মতে সম্ভাবনা নিশ্চয় এবং সংশয় ভিন্ন জ্ঞান। বাস্তবিকপক্ষে ভাষ্যকারের মতে সম্ভাবনা আহার্য্যজ্ঞান ইহা বলিলে কোনও ক্ষতি হয় না। ভাষ্যকার-স্পষ্টতঃ কোনও স্থলে সম্ভাবনাকে সংশয়-নিশ্চয়-ভিন্ন-জ্ঞান রূপে উল্লেখ করেন নাই, কেবল বলিয়াছেন, তর্কস্থলে "ইহা এই রূপই" এরকম নিশ্চয় হয় না, আহার্য্যনিশ্চয় স্থলেও ঐ রকম নিশ্চয় হয় না, সুতরাং আহার্য্যনিশ্চয়স্বরূপ তর্ক ইহা ভাষ্যকার-সম্মত বলিয়া স্বীকার করা চলে। তবে ভাষ্যকারসম্মত তর্কের সহিত নব্যনৈয়ায়িক-সম্মত তর্কের আর একটি বিরোধ হয়। নব্যনৈয়ায়িক-মতে অনিষ্ট-প্রসঙ্গ ভিন্ন তর্ক হইতে পারে না, তাঁহাদের মতে তর্কের সার্ব্বত্রিক স্বরূপ অনিষ্টপ্রসঞ্জনতা।

ভাষ্যকারমতে তর্ক সর্ব্বত্র অনিষ্টপ্রসঙ্গাত্মক নহে, কোনও কোনও স্থলে তর্ক অনিষ্টপ্রসঙ্গাত্মক। ভাষ্যকার-প্রদর্শিত উদাহরণে বলা হইয়াছে, "যদি আত্মার উৎপত্তি না থাকে, তবেই সম্ভব হয় স্বকর্ম্ম ফলোপভোগ"। এ স্থলে কোনও অনিষ্টপ্রসক্তি নাই, ইহা আহার্য্য যথার্থজ্ঞান, আহার্য্যারোপ অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কল্পনা নহে। নব্যমতে তর্ক সর্ব্বত্র আহার্য্যারোপস্বরূপ। ভাষ্যকার তর্ক শব্দ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, নব্যেরা তর্কের এতটা ব্যাপক অর্থ স্বীকার করেন না। নব্যসম্মত সকল তর্কই ভাষ্যকারোক্ত তর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়, ভাষ্যকারোক্ত অনেক তর্ক নব্যসম্মত তর্কের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এই সব কারণে তর্ক-বিষয়ে ভাষ্যকারের মতকে ব্যাপক, নব্যমতকে সঙ্কীর্ণ বলা যাইতে পারে। অনাহার্য্য প্রমাণের নিশ্চয় অনুমান উৎপন্ন করিয়া থাকে, অনুমান আহার্য্য হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। এইজন্য ভাষ্য-কারোক্ত তর্কস্থলে প্রমাণের যে আহার্য্যনিশ্চয় হইয়া থাকে তাহা হইতে অনুমান উৎপন্ন হয় না। ভাষ্যকার অনাহার্য্য যথার্থ নিশ্চয়কেই তত্ত্বজ্ঞান শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া বলিয়া-ছেন, তর্ক তত্ত্বজ্ঞান নহে।

ইহা গেল ভাষ্যকার-সম্মত তর্কের কথা। এক্ষণে তর্কের সংশয়রূপতার আলোচনায় আসা যাক্। যাহা এক বস্তুতে একযোগে সম্ভব নহে, এমন দুটি বস্তুর যুগপৎ এক বস্তুতে জ্ঞান হইলে সংশয় বলা হয়। সংশয়স্থলে চিত্তের অবস্থা থাকে দোলায়মান, কোনও এক পক্ষে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে না। সংশয়ের দুইটি কোটি, এই দুইটি কোটি পরস্পরবিরোধী। এই বিরোধী কোটিদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া সংশয়াত্মক জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন দূর হইতে কেহ শুষ্ক বৃক্ষকে মনে করে "উহা গাছ না মানুষ"। এস্থলে বৃক্ষত্ব মনুষ্যত্বের পরস্পরবিরোধী এক বস্তুতে জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং সংশয়, কিন্তু তর্কস্থলে এরূপ অনুভব হয় না। বিবাদ-ক্ষেত্রে এক পক্ষ নিজ মতের সত্যতায় নিশ্চিত হইয়াই অপর পক্ষের মতে দোষ দিবার জন্য তর্ক উপস্থাপিত করিয়া থাকে। সে স্থলে কোন পক্ষেরই স্বমতে সন্দেহ থাকে না যদিও সেস্থলে আহার্য্যসংশয় এক পক্ষের আছে বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, এবং সে সংশয়ের সূচনা "যদি" শব্দের দ্বারাই হয়। যদি শব্দের অর্থ পক্ষান্তরে— একটি পক্ষ উপস্থিত থাকিলেই পক্ষান্তরে বলা যায়। ফলতঃ দুইটি পক্ষের জ্ঞান তর্কস্থলে হইয়া থাকে, এই দুটি পক্ষ পরস্পরবিরোধী, অন্যথা বিবাদ হইতে পারে না।

সংশয়স্থলেও বিরোধী দুটি পক্ষ বা কোটি থাকে। এমতাবস্থায় তর্ককে সংশয়স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সন্দিগ্ধ বিষয়েও সত্যনির্দ্ধারণের জন্য অনেক সময় তর্ক করা হইয়া থাকে। সে স্থলে একটি সংশয়ের পর অপর সংশয়ের (তর্কের) কোনও উপযোগিতা থাকে না। সংশয় দূর করিবার জন্যই সে স্থলে তর্ক। সংশয় সংশয়কে দূর করিতে পারে না। নিশ্চয়ই সংশয়কে দূর করে ইহা সর্ব্বসম্মত। তর্ককে সংশয়াত্মক মানিলে সংশয় দূর সম্ভব নহে, এই সব কারণে নব্যনৈয়ায়িকগণ তর্ককে সংশয়াত্মক স্বীকার করেন নাই। তর্ককে সংশয়াত্মক বলা অনুভববিরুদ্ধও বটে। অনুমানের সহিত তর্কের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অনুমানের স্থলে ব্যাপ্যের নিশ্চয় দ্বারা ব্যাপকের নিশ্চয় হইয়া থাকে, তর্ক স্থলেও ব্যাপ্যের আহার্য্যনিশ্চয়ের দ্বারা ব্যাপকের আহার্য্য-নিশ্চয় হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তি বা নিয়ম, উদাহরণ, পক্ষ অর্থাৎ যে স্থলে ব্যাপকের নিশ্চয় হইয়া থাকে, এইগুলি তর্ক অনুমান উভয় স্থলেই থাকে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ শুধু এইটুকুই যে, অনুমান সত্য, তর্ক মিথ্যা। তর্কে যে স্থলে ব্যাপকের নিশ্চয় করা হইয়া থাকে, সে স্থলে ব্যাপক থাকে না, অনুমানের দ্বারা যে ব্যাপকের যেখানে নিশ্চয় করা হয়, সেখানে সেই ব্যাপক থাকে। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের উদাহরণ, যথা— "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এই স্থলে পর্ব্বতে ধূম ও বহ্নির নিশ্চয় করা হইয়া থাকে এবং তাহা সত্য। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিতে হইবে ইহা হইল নিয়ম। ব্যাপ্য ধূমের নিশ্চয় দ্বারা ব্যাপকের বহ্নির নিশ্চয় হয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, পাকশালা প্রভৃতি স্থলে অগ্নি-ধূমের একত্রা-বস্থান দেখিয়া এই নিয়ম স্থির করা হয়। এই নিয়মকে অস্বীকার করিয়া কেহ হয়ত বলিল—"ধূম থাকিলে আগুন থাকিতে হইবে এমন কি নিয়ম আছে?" তুমি হয়ত দশ

জায়গায় ধূম-অগ্নিকে একত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছ, তাই বলিয়া ধূম থাকিলে আগুন থাকিতেই হইবে এরূপ মনে করিবার তো কোন কারণ নাই। হয়ত ধূম আছে অথচ আগুন নাই, এরকম স্থলও দেখা যাইতে পারে। এই প্রতিবাদকে ব্যভিচারাশঙ্কা বলা হয়।

ইহার উত্তরে অনুমানকারী তর্ক উপস্থিত করিবেন, "ধূম থাকিলেও যদি আগুন না থাকে, তাহা হইলে ধূমের উৎপত্তি অগ্নি হইতে হয় ইহা স্বীকার করা চলে না"। যাহা না থাকিলেও যে বস্তু থাকে সে বস্তুর উৎপত্তি তাহা হইতে হয় না—এস্থলে অগ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি না হওয়ার কারণ বা ব্যাপ্য = বহ্নি না থাকাকালীন অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বের ব্যাপক হইল অগ্নি হইতে অনুৎপত্তি। বস্ত্র থাকিলেও অগ্নি থাকে না, সুতরাং বস্ত্রের উৎপত্তি অগ্নি হইতে হয় না। ইহা এস্থলে উদাহরণ। এস্থলে প্রমাণ-নিরপেক্ষভাবে পক্ষে (ধূমে) বহ্নি না থাকাকালীন অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আহার্য্যারোপ করা হয় এবং সেই নিশ্চয়ের দ্বারা বহ্নি হইতে অনুৎপত্তির আরোপ করা হয়। এস্থলে তর্ককারী ব্যাপ্য ব্যাপক দুইটিকে পক্ষে (ধূমে) অসিদ্ধ বলিয়াই জানেন, নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা থাকে। পক্ষে ব্যাপ্যকে নাই বলিয়া জানিলে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের জ্ঞান হয়, ব্যাপককে নাই বলিয়া জানিলে বাধিত হেত্বাভাসের জ্ঞান হয়। এই হেত্বাভাসের জ্ঞান থাকিলে অনুমান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য তর্কস্থলে অনুমানের মতই সমস্ত বিষয় থাকা সত্ত্বেও তর্ক অনুমান নহে—তর্ক মিথ্যা, অনুমান সত্য। ইহা হইল তর্ক ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ।

এক্ষণে তর্কের প্রয়োজনের কথায় আসা যাক্। তর্কের প্রয়োজন দুইটি—কোন স্থলে বিপরীত আশঙ্কাকে দূর করা, কোন স্থলে বিপরীত ভ্রমকে দূর করা। কখনও নিজের ভ্রম বা শঙ্কা দূর করিবার জন্য নিজ মনেই তর্ক করা হয়। কখনও বা অপরের ভ্রম বা শঙ্কা দূর করিবার জন্য অপরের সহিত তর্ক করা হয়। প্রথমতঃ প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চয় করা হয়, এই নিশ্চয়ের পরও অনেক সময়ে সংশয় উপস্থিত হয়—যাহা জানিলাম তাহা ঠিক কিনা? এই সংশয়কে প্রামাণ্য সংশয় বলা হইয়া থাকে, এই সংশয়কে তর্কের দ্বারা দূর করা হইয়া থাকে। সংশয় দূর হইলে প্রমাণ পুনরায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিশ্চয় উৎপাদন করে। এই জন্য তর্ককে প্রমাণের অনুগ্রাহক বলা হইয়া থাকে। পরমত খণ্ডনকালেও প্রথমতঃ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষ উপস্থিত করিতে হয়, পরে স্বমতের অস্বীকার করিয়া পরমত স্বীকারে যে দোষ হয় তাহাই তর্কের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়। এক কথায় বলিতে গেলে তর্কের প্রয়োজন মিথ্যাজ্ঞান নিরসন, সংশয় ও বিপরীত নিশ্চয় এই দুইটিই মিথ্যাজ্ঞান, এবং সত্যনির্ণয়ের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক দুইটিকে তর্ক দূর করিয়া দেয়। প্রতিবন্ধক দূর হইলে প্রমাণের দ্বারা সত্যনির্ণয় হইয়া থাকে। সাক্ষাৎভাবে প্রমাণই তত্ত্বনির্ণয় করিয়া থাকে, বিরোধী শঙ্কা ও বিরোধী ভ্রমের বিঘটন দ্বারা তর্কপরম্পরায় তত্ত্বনির্ণয়ে উপযোগী হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে, আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য তর্ক। আশঙ্কা সর্ব্বত্রই সুলভ। যে তর্কের দ্বারা শঙ্কার নিবৃত্তি হইবে সেই তর্কের উপরেও আশঙ্কা হইবে। তাহার নিবৃত্তির জন্য অপর একটি তর্ক উপস্থিত করিতে হইবে, তাহাতেও আবার শঙ্কা হইবে। এইরূপে তর্ক ও শঙ্কার অনন্তকাল দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিবে, সত্যনির্ণয় সম্ভবপর হইবে না। ইহার উত্তরে মহা নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন, "ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ"—শঙ্কা অনন্তকাল চলে না, যে মুহূর্ত্তে শঙ্কাকারীর কার্য্যের সহিত শঙ্কার বিরোধ হয়, সেই মুহূর্ত্তে শঙ্কা অন্তর্হিত হয়, যতক্ষণ শঙ্কা থাকে ততক্ষণ তর্ক করিতে হয়। স্বকার্য্যের ব্যাঘাত বা বিরোধ শঙ্কার শেষসীমা, ইহার পর আর শঙ্কার উদয় হয় না। যেমন যেখানে ধূম উদ্গত হয় সেখানেই কোন-না-কোন সময়ে অগ্নি থাকে, যে স্থলে কোন সময়েই অগ্নি থাকে না সেব স্থল হইতে ধূমের উদ্গম হইতে পারে না। ধূমের মূলদেশে অগ্নি থাকিবেই ইহাই হইল নিয়ম। এই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়া থাকে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" —ধূম আছে, সুতরাং পর্ব্বতে অগ্নি আছে। এই নির্ণয়ের মূলীভূত নিয়মের উপর শঙ্কা উঠিবে; ধূম থাকিলে আগুন থাকিতে হইবে এমন কি কথা আছে? ধূম আছে অথচ অগ্নি নাই এমন স্থানও থাকিতে পারে। পৃথিবীর যত স্থানে ধূম থাকে সব স্থান কেহ দেখে নাই, সুতরাং ধূম আছে অথচ অগ্নি নাই এমন স্থান হয়ত সম্ভব, আমরা তাহা দেখি নাই। ইহার নাম ব্যভিচারাশঙ্কা। ইহার উত্তরে তার্কিক বলিবেন, ধূম থাকিলেও যদি বহ্নি না থাকে তাহা হইলে ধূমের উৎপত্তি অগ্নি হইতে হয় ইহা মানা চলে না।

শঙ্কা হইবে—ধূম অগ্নি হইতে সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয় কিনা? তাহাও সন্দিগ্ধ। অগ্নি ছাড়াও হয়ত ধূমের উৎপত্তি সম্ভব। ইহার উত্তরে দ্বিতীয় তর্ক উপস্থিত হইবে। অগ্নি ছাড়াও যদি ধূমের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে গৃহে ধূম দিবার প্রয়োজন হইলে শঙ্কাকারীর পক্ষে আগুন জ্বালানো উচিত নয়। যে বস্তু যাহা ছাড়াই উৎপন্ন হইতে পারে, সে বস্তুর কারণ তাহা হয় না। ধূম অগ্নি ছাড়া উৎপন্ন হইতে পারে এই আশঙ্কা থাকিলে অগ্নিকে ধূমের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করা চলে না। অগ্নি ধূমের কারণ এ নিশ্চয় না থাকিলে

ধূমের প্রয়োজনে অগ্নি জ্বালাইবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ শঙ্কাকারীও ধূমের প্রয়োজনে অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং মানিতে হইবে, ধূমের কারণ অগ্নি এ নিশ্চয় শঙ্কাকারীর আছে। অগ্নি ধূমের কারণ এ নিশ্চয় থাকিলে অগ্নি ছাড়াও ধূম উৎপন্ন হইতে পারে, এ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না। আশঙ্কার প্রতিবন্ধক নিশ্চয়, নিশ্চয় না থাকিলেই আশঙ্কা হইতে পারে। অবশ্য আহার্য্যাশঙ্কা সব স্থলেই হইতে পারে। যেমন রামকে গৃহমধ্যে দেখিয়াও রাম গৃহে আছে কিনা এই শঙ্কা ইচ্ছাপূর্ব্বক করা চলিতে পারে। কিন্তু এই ইচ্ছাপূর্ব্বক আশঙ্কা "রাম গৃহে আছে" এ নিশ্চয়ের বিরোধী নহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক শঙ্কা থাকিলেও রাম গৃহে আছে এ নিশ্চয় ঐ স্থলে প্রতি মুহূর্ত্তে হইতে থাকে। সেই রকম অগ্নি ধূমের কারণ এই নিশ্চয়ের পর যদিও আগুন হইতে ধূম উৎপন্ন হয় কিনা এই আহার্য্যশঙ্কা করা চলিতে পারে, কিন্তু এই আহার্য্যশঙ্কা "অগ্নি ধূমের কারণ" এই নিশ্চয় জন্মিতে বাধা দেয় না। অগ্নি ধূমের কারণ এই নিশ্চয় থাকিলে "ধূম না থাকিলেও আগুন থাকিতে পারে"—এরূপ ব্যভিচারাশঙ্কা উঠিতে পারে না। ব্যভিচারাশঙ্কা না থাকিলে পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া আগুন আছে মনে করিয়া লইতে কোন বাধাই থাকে না। এইভাবে শঙ্কাকারীর কার্য্যের সহিত শঙ্কার বিরোধ তর্কের দ্বারা পরিস্ফুট হইলে শঙ্কার নিবৃত্তি হয়। তর্কেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। অনন্তকাল শঙ্কা ও তর্কের দ্বন্দ্ব চলে না, তর্কের দ্বারা সত্যনির্ণয় সম্ভবপর হয়।

এক্ষণে আর একটি বিচারের প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। শঙ্কাকারীর ধূমের প্রয়োজনে আগুন জ্বালাইবার প্রবৃত্তি, "অগ্নি ধূমের কারণ" অথবা "অগ্নি হইতেই সর্ব্বত্র ধূম উৎপন্ন হয়"—এই নিশ্চয় ছাড়া হইতে পারে না—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠে,"ধূম সর্ব্বত্র অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয় কিনা ?" "আগুন ছাড়াও ধূম উৎপন্ন হয় কিনা ?" "অগ্নি হইতেও ধূম উৎপন্ন হইতে পারে"—এই সকল শঙ্কাকে অগ্নির ধূমের প্রতি কারণতাশঙ্কা বলা হইয়া থাকে। কারণতাশঙ্কা থাকিলে কারণতা নিশ্চয় হয় না। কারণ বলিয়া নিশ্চয় না থাকিলেও কেবল পূর্ব্বোক্ত শঙ্কাবশেই প্রবৃত্তি হইতে পারে। যেমন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাস্থলে—"এই বস্তুর সহিত ইহার সংযোগে এই রকম জিনিষের সৃষ্টি হইতে পারে" এই আশঙ্কাবশেই পরীক্ষার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ অগ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কাবশেই ধূমের প্রয়োজনে আগুন জ্বালাইবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র আগুন হইতেই ধূম উৎপন্ন হয় এ নিশ্চয় শঙ্কাকারীর পক্ষে আগুন জ্বালাইবার প্রবৃত্তির জন্য অনাবশ্যক।

ইহার উত্তর অতি সহজ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাস্থলে পরীক্ষাকারী কারণ অকারণ নানা বস্তু লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কেননা সে স্থলে তাঁহার সংশয় রহিয়াছে—এই বস্তুর সহিত ইহার সংযোগে এই রকম জিনিষের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহার সংযোগ ছাড়াও হয়ত হইতে পারে। সুতরাং যাহার সংযোগে হইতে পারে, যাহার সংযোগে নাও হইতে পারে, এমন কারণ অকারণ সমস্ত বস্তু লইয়াই তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে হয়। পরীক্ষার ফলে নূতন জিনিষের আবিষ্কার হয়, আবিষ্কারকালে কারণগুলির কারণরূপে প্রত্যক্ষ হয়। সেই এক জায়গায় প্রত্যক্ষের ফলে বৈজ্ঞানিকের নিশ্চয় হইয়া যায়, এইগুলি ইহার কারণ। কার্য্যের উৎপত্তি-দর্শনই সে স্থলে পরীক্ষাকারীর সন্দেহ নিরসন করে। তাঁহার আর পুনরায় শঙ্কা হয় না যে, ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইতেও পারে, সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তির প্রত্যক্ষদর্শনই কারণতার নিশ্চায়ক—ইহাই হইল বস্তুস্থিতি।

এমতাবস্থায় বহ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি বারংবার যাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার পক্ষে বহ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি হইতেও পারে, অথবা বহ্নি ছাড়াও হয়ত ধূমের উৎপত্তি সম্ভব —এই রকমের কারণতা সম্বন্ধে আশঙ্কা সম্ভব নহে। যে শঙ্কাকারী মুখে বলিতেছে, ধূম অগ্নিহইতে উৎপন্ন হয় কিনা ইহা সন্দিগ্ধ, অথচ ধূমের প্রয়োজনে অগ্নি জ্বালিতেও প্রবৃত্ত হয়, অগ্নি ছাড়া ধূমের যাহা কারণ নহে তাহা আনিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে শঙ্কাকারীর "অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হইবেই" এইরূপ কারণতা নিশ্চয় আছে ইহা মানিতে হইবে। অন্যথা ধূমের প্রয়োজনে ধূমের অকারণের উপাদানও সে করিত। সুতরাং অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হয় কিনা এই শঙ্কা, অগ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিবার পর স্বাভাবিক রূপে হইতে পারে না। ঐ শঙ্কা অস্বাভাবিক বা আহার্য্য, আহার্য্যসংশয় নিশ্চয় জন্মিতে বাধা দেয় না। সুতরাং "অগ্নি হইতে ধূম সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয় কিনা" এইরূপ কারণতার আহার্য্যাশঙ্কা থাকিলেও, "অগ্নি হইতেই ধূম সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়" এইরূপ কারণতা নিশ্চয় জন্মিবে। অগ্নির ধূম-কারণতা নিশ্চিত হইলে,"অগ্নি না থাকিলেও ধূম থাকিতে পারে" এই জাতীয় ব্যভিচারাশঙ্কা থাকে না। ফলে "যেখানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে" এই রকম নিয়মের অবধারণ হইয়া থাকে, তখন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অবধারণ নির্ব্বাধ হয়।

ইহা গেল তর্কের অনবস্থা দোষ নিরাকরণের কথা। এক্ষণে তর্ক-প্রসঙ্গে অবশিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় আসা যাক্‌। বিচারক্ষেত্রে প্রমাণ প্রথম সোপানে থাকে, তদুপরি সোপানে নিয়মের স্থান, নিয়মের ঊর্দ্ধে তর্কের স্থান, তর্কের ঊর্দ্ধে কার্য্যকারণভাবের স্থান, তাহারও ঊর্দ্ধে লাঘবগৌরব, তাহার ঊর্দ্ধে

আর কিছু নাই। সমস্ত বিচারেরই অন্তিম নিয়ামক লাঘব-গৌরব। লাঘবগৌরবকে নব্যনৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ যেমনভাবে বুঝিয়াছিলেন, তেমনভাবে অন্যান্য দার্শনিকগণ বুঝেন নাই, ফলে তাঁহাদের বিচার নব্যনৈয়ায়িকের সামনে উন্মত্তজল্পিতপ্রায় হইয়াছে। এদিকে নব্যনৈয়ায়িক ও মীমাংসক উভয়েই লাঘবগৌরবকে বিচারক্ষেত্রে চরম মর্য্যাদা দেওয়ায়, অনেক স্থলে উভয়েই একই লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন। লাঘবগৌরব সম্বন্ধে মীমাংসক বলিয়াছেন, "কল্পনাগৌরবং যত্র তৎপক্ষং ন সহামহে কল্পনালাঘবং যত্র তৎপক্ষং রোচয়ামহে"; অর্থাৎ, বিচারস্থলে যেপক্ষে কল্পনার লাঘব সে পক্ষই আমাদের অভিপ্রেত, যে পক্ষে কল্পনার গৌরব, সে পক্ষকে স্বীকার করি না। নিজ মত সত্য হইলে তাহাতে লাঘব থাকিবেই, মিথ্যা হইলে গৌরব হইবেই—ইহাই হইল নিয়ম, এই নিয়ম সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। তর্ককে সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কখনও কখনও বিচারে অগ্রসর হইলে এমন ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, যেখানে প্রতিবাদীকে কেবল তর্ক দ্বারা নিরস্ত করা চলে না। তর্কের উত্তর সে জোগাইয়াই চলে—সে উত্তর ভুল বা ঠিক যাহাই হউক। সে ক্ষেত্রে তর্ককে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে লাঘব গৌরবের আশ্রয় ভিন্ন গতি নাই।

উদাহরণস্বরূপ নৈয়ায়িকের ঈশ্বরসিদ্ধির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নৈয়ায়িক ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, অনীশ্বরবাদী সাংখ্য-মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাহা মানেন না। জগতের একজন কর্ত্তা আছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য নৈয়ায়িক প্রথমতঃ বলিলেন —যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহার মূলে একটি চেতন পদার্থ থাকে, চেতন বস্তু মূলে না থাকিলে জগতে কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহাকে বলা হয় চেতনাধিষ্ঠান। উৎপত্তির মূলে অধিষ্ঠাতা চেতন, জন্য পদার্থ মাত্র চেতনাধিষ্ঠিতোৎপত্তিক। উৎপাদ্য বস্তুর কারণগুলিকে যে প্রত্যক্ষ করে, সে-ই উৎপত্তির মূলে অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া থাকে। এই নিয়মকে স্বীকার করিলে এই বিরাট পৃথিবীসৃষ্টির মূলে একটি অধিষ্ঠাতা চেতন স্বীকার করিতে হয়, যাহার পৃথিবীর উপাদান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। জাগতিক সাধারণ জীবের পক্ষে পৃথিবীর উপাদানগুলির প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। সুতরাং পৃথিবীসৃষ্টির মূলে একটি অসাধারণ চেতন বস্তুকে অধিষ্ঠাতা বলিয়া মানিতে হয় যিনি পৃথিবীর উপাদান-গুলিকে প্রত্যক্ষ জানিয়া নিজ-প্রয়াসে পৃথিবীকে উৎপাদন করেন। এই স্বীকৃত চেতন পদার্থই ঈশ্বর, পৃথিবীর অদৃশ্য স্রষ্টা।

ইহার উত্তরে মীমাংসক বলেন, যাহা উৎপন্ন হইবে তাহারই মূলে কর্ত্তা থাকিতে হইবে, এরূপ নিয়ম স্বীকার করি না। সুতরাং উক্ত নিয়মের বলে পৃথিবীর অদৃশ্য স্রষ্টা স্বীকার করিবারও প্রয়োজন নাই। জগতে কতগুলি বস্তুর উৎপত্তিতে চেতনাধিষ্ঠান দেখা যায়। বস্ত্র প্রভৃতির উৎপত্তি চেতন কর্ত্তার অধিষ্ঠান ছাড়া হয় না। সুতরাং তাহাদের উৎপত্তির মূলে চেতনকে অধিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু কতকগুলি বস্তু এমন আছে, যাহাদের উৎপত্তির মূলে চেতনকে অধিষ্ঠাতৃ-রূপে দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি চেতনাধিষ্ঠিত বা কর্তৃসাপেক্ষ নহে। নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি চেতনকর্ত্তা ছাড়াই উৎপন্ন হয়। যেখানে কর্ত্তা দেখা যায় সেখানেই কর্ত্তা স্বীকার করা আবশ্যক, যেখানে কর্ত্তাকে দেখা যায় না সেখানে কর্ত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং সমস্ত উৎপত্তির মূলে কর্ত্তা স্বীকার করিয়া পৃথিবীর উৎপত্তিমূলে একটি অদৃশ্য কর্ত্তা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক তর্ক উপস্থিত করিলেন—যদি কর্ত্তা ছাড়া বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বস্তুর উৎপত্তিতে কর্ত্তার প্রযত্ন কারণ ইহা মানা চলে না। এই তর্ক মীমাংসকের নিকট ইষ্ট, তাঁহারা বস্তুমাত্রের উৎপত্তিতে কর্তৃপ্রযত্নকে কারণ-রূপে স্বীকার করেন না, কোনও কোনও বস্তুর উৎপত্তিতেই কর্ত্তার প্রযত্ন কারণ, ইহাই তাঁহাদের মত। সুতরাং মীমাংসকের নিকট নৈয়ায়িকের উক্ত তর্ক অনিষ্ট প্রসঞ্জক হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত তর্ককে অনিষ্ট-প্রসঞ্জক করিবার জন্য নৈয়ায়িক লাঘব-গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নৈয়ায়িক বলেন, কর্ত্তার প্রযত্নসাপেক্ষ, কর্তৃপ্রযত্ননিরপেক্ষ দুই রকমের উৎপত্তি কল্পনা করায় গৌরব, সমস্ত উৎপত্তিকে কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে লাঘব।

প্রত্যক্ষতঃ যেখানে কর্ত্তা উপলব্ধ হয় সেখানে উৎপত্তিকে কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ মানিতেই হয়। যেখানে কর্ত্তা উপলব্ধ নয়, সেখানে অদৃশ্য কর্ত্তা থাকার সম্ভাবনার ফলে সে স্থলের উৎপত্তিকে কর্তৃনিরপেক্ষ মানা চলে না। সুতরাং এইরূপে সমস্ত উৎপত্তিকেই কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ মানিয়া লইতে কোনও বাধাই থাকে না। এইরূপ স্বীকারের ফলে সর্ব্বত্র কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া যায়। সুতরাং ইহার অতিরিক্ত কোনও কর্তৃ-প্রযত্ন-নিরপেক্ষ উৎপাত্ত স্বীকার করা হয় না। যতখানি স্বীকারে বস্তুস্থিতির সামঞ্জস্য হইয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছুই দার্শনিক স্বীকার করেন না। যাঁহারা প্রত্যক্ষতঃ কর্ত্তার অনুপলব্ধি-স্থলে উৎপত্তিকে কর্তৃপ্রযত্ন-নিরপেক্ষ স্বীকার করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষতঃ কর্ত্তার উপলব্ধি-স্থলে উৎপত্তিকে কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ নহে বলিয়া স্বীকার চলে না। সুতরাং দুই রকম উৎপত্তিই তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যাঁহারা স্থলবিশেষে উৎপত্তিকে কর্তৃসাপেক্ষ দেখিয়া উৎপত্তি কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ বলিয়া নিশ্চয় করেন, পরে তাঁহার

যেস্থলে কর্ত্তা দেখা যায় না, সেস্থলেও অদৃশ্য কর্ত্তা স্বীকার করিতে পারেন।

এইরূপে লাঘববশতঃ উৎপত্তিমাত্রকে কর্ত্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে, স্বীকৃত ব্যক্তির পক্ষে "যদি কর্ত্তা ছাড়া বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বস্তুর উৎপত্তিতে কর্ত্তার প্রযত্নকে কারণ মানা চলে না" এই পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকের তর্ক অনিষ্ট-প্রসঞ্জনাত্মক হইয়া দাঁড়ায়, ফলতঃ তাঁহাকে জগতের অদৃশ্য কর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। লাঘব-বশতঃ যে কার্য্য-কারণভাব স্বীকৃত হয়, তাহাই তর্কের মূল অবলম্বন। তর্ক যখন অনিষ্ট-প্রসঞ্জন করে, তখন মূলীভূত নিয়মকে অস্বীকার করিয়া তর্ককে ইষ্ট করা চলে, লাঘব-গৌরবই এই সময় তর্ককে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে একমাত্র সহায়ক হয়। লাঘবগৌরবকেই সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক নিয়মের মূলীভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শুধু দার্শনিক বলি কেন, জগতে প্রতি মনুষ্যই লাঘববশতঃ এক একটি নিয়মের কল্পনা করে। ইহার উদাহরণস্বরূপ মনুষ্য-মাত্রের স্বীকৃত একটি নিয়মের আলোচনায় আসা যাক্। মনুষ্যমাত্রের পিতা আছে—ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের বিশ্বাস। পিতা ছাড়া মানুষের উৎপত্তি সম্ভব নহে ইহা প্রত্যেকের ধারণা, মানুষ থাকিলেই তাহার উৎপত্তির কারণরূপে পিতৃরূপে একটি মনুষ্য থাকিতে হইবে—এই নিয়ম স্বীকারের প্রতি কারণ কি? প্রতি মনুষ্যের পিতৃত্বের পরিচয় কেহ পায় নাই, সুতরাং এমতাবস্থায় যাহার পিতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহারই পিতা আছে। যাহার পাওয়া যায় না তাহার নাই এরূপ স্বীকার করিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা করা হয় না, নিজ পুত্রের উৎপত্তির প্রতি মানুষ আপনাকে পিতারূপে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় এবং পিতা ছাড়াও মানুষের উৎপত্তি হয় ইহাতে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায় না। ফলে মানুষমাত্রের উৎপত্তি পিতৃসাপেক্ষ—ইহা লাঘববশতঃ অবধারণ করে। অন্যথা মানুষের উৎপত্তিকে পিতৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ পিতৃপ্রযত্ন-নিরপেক্ষ ভেদে দুই প্রকারের মানিতে হয়, তাহাতে গৌরব—সুতরাং লাঘবই উক্ত নিয়মাবধারণের মূল।

এইরূপে নিয়মাবধারণকে নৈয়ায়িকগণ আখ্যা দিয়াছেন "ব্যভিচারাদর্শনসহকৃতান্বয়সহচারদর্শননিমিত্তকনিয়মকল্পনা"। অর্থাৎ, নিয়মের ব্যতিক্রম কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ না করা, স্থল-বিশেষে নিয়ম কল্পনার অনুকূল বস্তুর প্রত্যক্ষ করা—এই দুইটি থাকিলে লাঘববশতঃ একটি সাধারণ নিয়মের কল্পনা করা হয়।

উৎপত্তিকে কর্ত্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ স্বীকার করার স্থলে ও উৎপত্তির মূলে কর্ত্তা থাকিবেই—এই নিয়মের পক্ষে নিয়ম-কল্পনার পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির অনুরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং যাঁহারা উৎপত্তি চেতনাধিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা সচরাচর যে সকল কারণ-বলে মনুষ্য-প্রভৃতির উৎপত্তি-মূলে অপর একটি মনুষ্যকে পিতারূপে স্বীকার করেন, ঠিক সেই জাতীয় কারণের বলেই চেতনা-ধিষ্ঠিত উৎপত্তিবাদীরাও "উৎপত্তির মূলে চেতন কর্ত্তা থাকিতে হইবেই"—এই নিয়মের কল্পনা করিয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদের স্বীকৃত নিয়মকে অগ্রাহ্য করা চলে না। এই নিয়মকে অস্বীকার করিলে নিজেদের স্বীকৃত নিয়মকেও অস্বীকার করিবার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠে। কর্ত্তামাত্রই শরীরী, শরীর ছাড়া কেহ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। জগতের অদৃশ্য কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করিলে তাহার শরীর থাকিতে হইবে, শরীর থাকিলে তাহার প্রত্যক্ষও কোনস্থলে হইবে। নৈয়ায়িকও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বলিয়া মানেন না, এমতাবস্থায় জগতের অদৃশ্য কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে উদয়নমতানুযায়ী প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—ঈশ্বরেরও শরীর আছে, সে শরীর আমাদের মত অনিত্য বা স্থূল নয়, তাহা সাধারণের প্রত্যক্ষগম্যও নয়, সূক্ষ্ম পরমাণু-পুঞ্জই ঈশ্বরের শরীর—সেই পরমাণুসমূহকে যোগীরাই দেখিতে পান। নব্যনৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—'শরীর ছাড়া কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে, এরূপ কোন নিয়ম নাই'। কর্ত্তা শরীরের ক্রিয়া দ্বারা কার্য্য করেন এরূপ নিয়ম স্বীকার করা চলে না, যেহেতু কর্ত্তা শরীর-ক্রিয়া ছাড়াই নিজ শরীর-ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং, "কর্ত্তা শরীরের ক্রিয়াদ্বারা কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকেন" এই নিয়ম-বলে জগৎকর্ত্তার শরীর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না, "কর্ত্তৃত্বমাত্রের প্রতি শরীর প্রযোজক" ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এই প্রত্যক্ষের বলে কর্ত্তামাত্রের শরীর আছে এই নিয়ম স্বীকার করা চলে না, কারণ জন্য-কর্ত্তৃত্বের প্রতি শরীর প্রযোজক, নিত্য-কর্ত্তৃত্বের প্রতি নহে। ঈশ্বর নিত্য কর্ত্তা, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কাহারো অধীন বা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব মাত্র শরীর ছাড়া হইতে পারে না এরূপ স্বীকার করা চলে না। ঈশ্বর জগতের নিত্যকর্ত্তা অশরীরী, শরীর ছাড়াও ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব। সুতরাং শরীর না থাকায় ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তা হইতে কোন বাধাই থাকে না, এইরূপে নব্যনৈয়ায়িকগণ জগৎকর্ত্তৃরূপে শরীরবিহীন ঈশ্বরসিদ্ধি করিয়াছেন।

এই মতে শরীরপ্রযোজ্য শরীরাপ্রযোজ্য দুই রকমের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হইলেও কোন গৌরব হয় না। "কার্য্যমাত্রের কর্ত্তা কারণ"—লাঘববশতঃ এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইবার পর জগৎকার্য্যের অশরীরী কর্ত্তা ঈশ্বরের সিদ্ধি

হইয়া থাকে, এবং ঈশ্বরের এই একটি মাত্র কর্তৃত্বকে শরীরাজন্য কল্পনা করা হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎপত্তিমাত্রকে কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ নিরপেক্ষ দুই রকমের কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে বহুতর উৎপত্তিকে কর্তৃপ্রযত্ন-নিরপেক্ষ কল্পনা করায় গৌরব, ইহা অপেক্ষা সমস্ত উৎপত্তিকে কর্তৃপ্রযত্ন-সাপেক্ষ মানিয়া লইয়া একটি মাত্র কর্তৃত্বকে নিত্য বা শরীরাজন্য স্বীকার করায় কল্পনাগৌরব হয় না। এইরূপে নৈয়ায়িকগণ লাঘবানুগৃহীত তর্কের দ্বারা অনুগৃহীত প্রমাণের বলে সত্যনির্ণয় করিয়া থাকেন।

লাঘবগৌরবই সত্যনির্ণয়ে অন্তিম নিয়ামক, তর্কেরও ঊর্দ্ধে ইহার স্থান। লাঘব শব্দের অর্থ এস্থলে কল্পনালাঘব, গৌরব শব্দের অর্থ কল্পনাগৌরব। কার্য্যকারণ-ভাব-কল্পনা-লাঘব অধিকাংশস্থলে তর্কের সহায়ক হইয়া থাকে, স্থলবিশেষে বস্তুকল্পনার লাঘবও সহায়ক হইয়া থাকে। লাঘবকে প্রমাণের সহায়কও বলা চলে—নৈয়ায়িকগণ অধিকাংশ স্থলে প্রমাণের সমর্থনে তর্কের উল্লেখ না করিয়া লাঘবের উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং বিরুদ্ধবাদিমতে গৌরবের উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেস্থলে অনুকূল তর্ক থাকা সত্ত্বেও উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করেন, সত্যনির্ণয়ের অন্তিম উপায় লাঘবগৌরবকেই আশ্রয় করেন। লাঘবগৌরবের মত আরও দুইটি প্রমাণের সহকারী আছে—তাহাদের নাম "প্রথমোপস্থিতত্ব" এবং "বিনিগমনাবিরহ"। ইহাদের মধ্যে বিনিগমনাবিরহকে গৌরবের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, গৌরবেই উহার পর্য্যবসান। প্রথমোপস্থিতত্ব প্রমাণের একটি স্বতন্ত্র সহকারী। ইহার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ, অল্পস্থলেই প্রমাণের সমর্থনে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। লাঘবগৌরব, বিনিগমনাবিরহ প্রথোমপস্থিতত্ব এই সমস্তই তর্কেরও সহকারী, ইহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত তর্ক প্রমাণকে অনুগৃহীত করে, তর্কের দ্বারা অনুগৃহীত প্রমাণ নির্ম্মল বা নিঃসন্দিগ্ধ তত্ত্বাবধারণ করে। বঙ্গদেশের বিরাট অবদান সুবিস্তীর্ণ নব্যন্যায়শাস্ত্র; ইহার যাবতীয় সিদ্ধান্ত লাঘবগৌরবের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। যাবৎ নব্যন্যায় বা তর্কশাস্ত্র পৃথিবীতে থাকিবে; তাবৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞের সম্মুখে লাঘবগৌরব বিচারক্ষেত্রে মর্য্যাদাহীন হইবে না, লাঘবানুগৃহীত তর্কও মর্য্যাদাবিহীন হইবে না।

কালের বিচিত্র গতি অনুসারে আজিকার জগৎ—নব্য-নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়বিচ্ছিন্ন, তর্কবীতশ্রদ্ধ, বিচারক্ষেত্রে লাঘব-গৌরব সম্বন্ধে অচেতন। হয়ত এমন দিন আসিবে যখন জাগতিক চিন্তাধারা পরিণতিলাভ করিবে, তার্কিক সম্প্রদায়-বিচ্ছেদের ফলে বিচারক্ষেত্রে প্রাকৃতার্কিক যুগের চিন্তাধারার অনুরূপ যে চিন্তাধারা ইদানীন্তন জগতে প্রবর্ত্তমান, তাহার পরিণতি সমকালে তার্কিক সমাজ পুনঃ নিজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই ভাবী দিনের আশায় আজও মুষ্টিমেয় তার্কিক সমাজ তার্কিকসম্প্রদায়ের ক্ষীণধারা প্রবাহিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা বরেণ্য যাঁহারা—'যে নাম কেচিদিহনঃপ্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং, জানন্ত তে কিমপিতানপ্রতি নৈষ যত্নঃ। উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥'—ভবভূতির এই মতে মত মিলাইয়া আজিও তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপন-ধারা অতি ক্ষীণরূপে প্রবাহিত রাখিয়াছেন।

হে সূর্য প্রণাম

শ্রীকরুণাময় বসু

আশ্চর্য সোনালি ভোর, টুপটাপ আলোর মুকুলে
নির্মল প্রশান্তি ঝরে দিগন্তরে, বনে, পুষ্পে, তৃণে;
একটি অখণ্ড সত্তা রূপ নেয় দেদীপ্য দেউলে
তমসার প্রান্ত ভেদি উদ্বোধিত জ্যোতির্ময় দিনে।

হে সবিতা, কি যে লেখ চিরকাল অগ্নির অক্ষরে,
তাই তো প্রান্তর হ'তে জন্ম লয় প্রাণের অঙ্কুর;
আলোর কণিকা প্রাণ চলে যায় কাল কালান্তরে
জীবনের বাণী বহি, তার সাথে বাঁধা স্বর্গ-সুর।

এসেছে তমিস্রা দিন—হিংস্র লুব্ধ মানুষের দল
মানুষের রক্ত শুষি গড়ি তোলে ঐশ্বর্য মিনার;
দ্রৌপদী বিবস্ত্রা আজ, সঙ্গোপনে ফেলে অশ্রুজল
ক্রোড়ে লয়ে রুগ্ন শিশু, সম্মুখেতে কৃষ্ণ অন্ধকার।

তমসা অসত্য জানি, হে সবিতা হানো অগ্নিবাণ,
আঁধার নিশ্চিহ্ন হোক, কৌরবের আজি হবে শেষ;
অধর্ম বিলুপ্ত হোক, মানুষেরে করো পরিত্রাণ
এ দুঃখ-রাতের তীরে দেখা দিক নব মহাদেশ

সত্য রবে চিরঞ্জীব, তমসার মৃত্যু পরিণাম,
আলোর দেবতা তুমি যুগে যুগে, হে সূর্য প্রণাম।

প্রতিধ্বনি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

সামান্য একখানি পত্র নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।

সুলোচনা বললে, এ হতেই পারে না। এই তো ঘরদোরের অবস্থা, এর মধ্যে আর একটা সংসার এনে ফেললে কম ঝঞ্ঝাট বাড়বে মনে কর? তার ওপর সুস্থ মানুষ নয় যে—যা জুটলো খেলে, এধার ওধার ঘুরলে, দু'চারদিন থেকে আবার চলে গেল।

সুরপতি বললে, রুগী মানুষ বলেই তো তাদের জায়গা দেওয়া দরকার। সুস্থ মানুষ কে আর হাজার অসুবিধা জেনেশুনে তোমার বাসায় আসবে বল!

কিন্তু ভেবেছ কি—একটা ঘর জোড়া হয়ে থাকবে, তোমার আপিসের ভাত হয়তো সময়মত হয়ে উঠবে না, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হবে?

সে যা হয় হবে, আমি 'না' বলতে পারব না। সুরপতি বললে, আজ বিশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে কে এসে ছ'মাস ছ'মাস থেকেছে বল? আর এই চিঠির জবাব ওভাবে দেওয়া···না, না, সে আমি পারব না। পড় না চিঠিখানা, পড়লে—তুমিও···

সুলোচনা নরম গলায় বললে, বুঝি সবই কিন্তু কথায় বলে আত্ম রেখে ধর্ম্ম। পৃথিবীতে দুঃখের অভাব নেই, তাই মনে করে মানুষ তো দুঃখের সাগরে ভাসতে পারে না!

দুঃখের সাগরে না ভাসাটা কি আমাদের ইচ্ছাতে ঘটে? আমাদের মত দিন-আনা দিন-খাওয়া গৃহস্থ যারা? ম্লান-হাসি ফুটে উঠল সুরপতির মুখে। অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সুরপতি। সংসার আর আপিস দু'জায়গাতেই মুখ বুজে কাজ করে। যত কঠিন যত ক্লেশকর হোক না সে কাজ, ওর মুখে অনুযোগ বা আপত্তির সুর কখনো ফোটে না।

যদি কেউ মৃদু হেসে বলে, এত খেটে তোমার লাভ?

মৃদু হেসে উত্তর দেয় সুরপতি, কাজ না করে যে থাকতে পারি না। শাস্ত্রে বলেছে কাজ কর, কাজ না করলে তোমার মুক্তি নেই।

কিসের মুক্তি?

তা কি জানি! তবে সংসারে যে অনেক বন্ধন—অনেক চাপ, তার থেকে ত বটে।

এতে করে বেশী জড়িয়ে পড়ছ না বুঝি? এও আসক্তি।

আমরা তো যোগীঋষি নই—এই আসক্তি রইলই বা। মৃদু হেসে আপত্তি খণ্ডন করে সুরপতি।

সুলোচনার আপত্তি খণ্ডন করবার জন্যই চিঠিখানা মেলে ধরলে। চিঠিতে লেখা আছে:

বড় বিপদে পড়ে তোমাকে জানাচ্ছি দিদি। এখানকার সব ডাক্তারই এক রকম জবাব দিয়েছেন। আমি একা মেয়েমানুষ কত আর ভাবব, কোন দিক বা সামলাব! কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা দেখব ভাবছি। ওখানে তোমরা ছাড়া আর কেউ তো নেই, তোমরা যদি দিন কতকের জন্য কষ্ট স্বীকার করে আশ্রয় দাও, আশ্বাস দাও, তা হলে···

এই সকাতর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয় অন্ততঃ সুরপতির পক্ষে। ওরা অবশ্য সুলোচনারই নিকট আত্মীয়, আপন বোন সুলোচনার। পত্র লিখেছে সুলোচনাকেই। এতে সুলোচনার আপত্তি ওঠাই তো আশ্চর্য্য! এই তো মধ্যবিত্তের সংসার—একটি উপার্জ্জনশীল প্রাণীকে আশ্রয় করে কোন রকমে চলে। এই ভাবের অবস্থা কল্পনা করতেও ভয় হয় অথচ এরই মধ্য দিয়ে আহোরাত্র চলতে হচ্ছে।

নিজের সংসারের দিকে চেয়েই সুলোচনার এই আপত্তি। ভাইবোনেরা রক্ত সম্পর্কীয় সত্য কথা, কিন্তু তার চেয়েও সত্য সেই রক্তের টান বাপমায়ের স্নেহচ্ছায়ায় যেমন তীব্র অনুভূত হ'ত, এখন নিজ সংসারের রচনায় তা যেন সেই পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কি অদ্ভুত এই রচনা! স্নেহ মমতা ভালবাসা সমস্ত মিলিয়ে এই রচনা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করছে জীবনকে—এর বাইরে যাবার সামর্থ্য কোথায় সুলোচনার। ভয় হয় বইকি। কি সে দুরারোগ্য ব্যাধি যার বীজ লালন করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে জয়ন্ত? ব্যাধি সংক্রামক নয় তো? যত বার নিজেকে সন্ধ্যার জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবছে সে—এ অবস্থায় সে কি করত, ততবারই সে ভাবছে এমন ধারা অবস্থা সে কেন কল্পনা করছে? এ কল্পনা করাও অকল্যাণ। মানুষ যা-কিছু ভোগ করে অদৃষ্টের দোষে। না হলে সামনের ওই তিন তলার সৌধে তার প্রতিষ্ঠা হ'ল না কেন? দাসদাসী রেখে সে-ও তো,···না—না, কেন ভাবছে এইসব মর্মান্তিক কথা?

এই নিয়ে আপত্তি এবং বাদানুবাদ।

অবশেষে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দিলে সুলোচনা।

বললে, এক কাজ করি বরং—বড় ঘরটা এদের ছেড়ে দিই—বেশী ছোঁয়া-নেপা হবে না, যে ক'দিন থাকে একটু দূরে দূরেই থাক। ঘরটা জোড়া থাকবে বলে কি আর করা যাবে বল।

২

সন্ধ্যা বললে, তোমাদেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে দিদি। এখানকার কে ভাল ডাক্তার সবই তো জামাইবাবু জানেন।

সুলোচনা বললে, ওঁর আবার যে আপিস—এক দিনও ছুটি পান না। তার চেয়ে এক কাজ করলে না কেন? সুদেবকে সঙ্গে করে আনলে অনেক উপকার হ'ত। এখানে-ওখানে ছুটোছুটি তো কম করতে হবে না।

সন্ধ্যা বললে, সে এবার বি-এ দিচ্ছে আর দুটো মাস বাকী। উনি বললেন—মিছিমিছি একটা বছর কেন আর নষ্ট হয় ছেলেটার।

এই প্রত্যুত্তরে সুলোচনা খুশী হলেন না, টেনে টেনেই বললেন, কিন্তু পড়াশুনোর চেয়ে মানুষের জীবনের দাম কি বেশী নয়?

সে তো ঠিকই। উনি বলেন কি জান দিদি—বলেন যে জীবন আমরা সৃষ্টি করলাম তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তো নিতে হবে আমাদের। তাকে পথ চিনিয়ে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি।

কি জানি ভাই অত বড় বড় কথা বুঝি না। ঘরের মধ্যে যদি বৃষ্টির জল পড়ে ফাটা ছাদ মেরামত করাই তখন উচিত। কতটা চুনবালি বা সিমেণ্ট নষ্ট হ'ল সে হিসেব খতিয়ে দেখবার ফুরসত থাকে না তখন।

তুমিও তো খুব সোজা করে বললে না দিদি। সন্ধ্যা হেসে উঠল। কোথায় ঘরের ছাদ আর কোথায়…

ঐ হ'ল—ঘরটাই তো আসল বস্তু যার মধ্যে সবাই মাথা গুঁজে থাকি। সেই ঘর ঠিক রাখাই হ'ল আসল কাজ, সংসার রক্ষা করা। যাক, রাত্তিরে জয়ন্ত কি খাবে বলে দাও, সেই মত ব্যবস্থা করি।

ও রোগা মানুষের ঝঞ্চাট তোমাকে পোয়াতে দেব না দিদি, সঙ্গে স্টোভ আছে যা করবার করে নেব।

কেন—উনুন তো জ্বলবেই—

রান্নাও তো কমগুলি লোকের নয়—আর দু'এক দিনের কাজও নয়। ও ব্যবস্থা আমি করব'খন। তুমি শুধু জামাইবাবুকে বলগে, একজন ভাল ডাক্তার—

আচ্ছা বলছি। মুখ ভার করে সুলোচনা সরে গেলেন।

আপিস থেকে ফিরে এসে সব শুনে সুরপতি বললে, ডাক্তারের ভাবনা কি, এখনই যাচ্ছি।

থাম, যথেষ্ট বীরত্ব দেখাতে পার তা জানি। প্রায় শাসনের সুরে বললে সুলোচনা। বেলা ন'টায় নাকেমুখে দুটো ভাত গুঁজে সারাদিন আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে জলটল না খেয়েই ছুটছ আবার। বলি এত করে আমাকে জব্দ করেও কি তোমার আশা মেটে নি?

সুলোচনার কণ্ঠে ক্রন্দনের আভাস জাগতেই সুরপতি ব্যস্ত হয়ে বললে, এখুনি মানে কি এখুনি! আগে হাতমুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে নিই, তারপর—

থাক, খুব হয়েছে! তোমার ভাল মন্দ কিছু হলে ভোগ ভুগতে হবে ত আমাকেই। তুমি ত দু'চক্ষু বুজে খালাস!

আহা আস্তে, ওরা শুনতে পাবে।

এর আর লুকোছাপা কি! আমাদের মত ঘরে কে আর কার অবস্থা না জানে বল। যে করে সংসার চলে, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বিয়ে হয়, কুটুম-কুটুম্বিতে রক্ষা করতে হয়—সে আর না জানে কে। চালা ঠেস দিয়ে থাকে একটি খুঁটিতে সেই খুঁটি হেললেই—

দাও দাও, কি খেতে দেবে দাও। প্রসঙ্গান্তরে আসবার চেষ্টা করলে সুরপতি।

সন্ধ্যা এসে দাঁড়াল সামনে। জামাইবাবু, ওর জন্য ক'টা ডিম সেদ্ধ করলাম—দুটো এনে দেব কি? দিই, উনি বলছেন—এবেলা আর ডিম খাবেন না।

না, না, ছেলেরা বরং—

কেউ খেতে চায় না ডিম। চার জোড়া হাঁসে গাদা গাদা ডিম দিচ্ছে, এ-ও-সে সবাই নিয়ে যায়। তাই আসবার সময় এনেছিলাম এক হাঁড়ী। তা ডিম নিয়ে নাকি কোথাও যেতে আসতে নেই?

না হলে রাশি রাশি ডিম শহরে আসছে কোথা থেকে? মানুষেই তো আনছে।

না, না, তা নয়, ওঁরা সবাই বললেন, রুগী নিয়ে আর ডিম নিয়ে একসঙ্গে যাত্রা করতে নেই, পথে বিপদ-আপদ ঘটতে পারে।

ঘটেছিল কিছু?

না, তা ঘটে নি। মনটাতে কিন্তু খুঁত-খুঁতুনি লেগেছিল। যতই না মানি—মন যে বেয়াড়া। কোন্ ছেলেবেলাকার ছোঁয়াচ কোথায় যেন লেগে থাকেই।

ও-সব কিছু মনে করো না সন্ধ্যা। আচ্ছা তোমার ডিম আন, খেয়ে দেখি।

মুরগীর ডিম কিন্তু, অবিশ্যি তত ছোট নয়। লেগহর্ণ-জাতের মুরগী কিনা—ডিম দেখলে মনে হবে হাঁসের ডিম।

সন্ধ্যা চলে যেতেই সুলোচনা মুখ বাঁকিয়ে বললে, খাবে ত?

না খেলে দেহ থাকবে কেন—এই মাত্তর তুমিই ত বললে!

যা খুশী করগে—তোমাদের ত ঘেন্নাপিত্তি নেই! দুম দুম করে পা ফেলে সুলোচনা চলে গেল।

৩

ডাক্তার তাঁর মত প্রকাশ করলেন। অবশ্য সুরপতিকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্তের অশ্রুতস্বরে অনেক কথা বললেন।

ডাক্তার চলে যেতেই সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন মুখে এসে দাঁড়াল। কি বললেন, ডাক্তারবাবু? অত্যন্ত শুকনো ও কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলে সে।

না, না, তেমন কিছুই নয়। আশ্বাস দিলে সুরপতি। রোগটা অবশ্য অবহেলা করে করেই পাকিয়েছ। ওষুধ, পথ্য, সেবা, যত্ন এসব নিয়মমত চললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওখানকার ডাক্তার যা বলেছে—ঠিক সে রোগ নয়—

ওখানকার ডাক্তার কি বলেছে, তা তো আপনি জানেন না।

জানি না কি রকম? তুমি ত লিখেছিলে ব্যাধি দুরারোগ্য।

ইনি কি বললেন?

এখন ঠিকমত কিছু বলতে পারেন না। কয়েকটা পরীক্ষা নিতে হবে। ব্লাড্, স্পুটাম, এক্স-রে—

জানি—সে রাজসূয় যজ্ঞ। ওখানকার যা রিপোর্ট তা দেখলে হবে না। আশ্চর্য্য নয় জামাইবাবু, চিকিৎসা শাস্ত্র একই অথচ এক এক ডাক্তারের পরীক্ষা-প্রণালী এক এক রকম? পরীক্ষার ফল আলাদা আলাদা—কারও সঙ্গে কারও মেলে না।

যাই হোক, ডাক্তারদের উপর আমি বিশ্বাস রাখি। সুরপতি বললে।

আমিও রাখব। না রেখে উপায়ই বা কি! সন্ধ্যার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, রোগটা কি আমায় জানাবেন, দোহাই আপনার, লুকোবেন না। আমি সব কিছুর জন্তই তৈরি হয়ে আছি।

আর কিছু জানার জন্ত জিদ ধরলে না সন্ধ্যা। এর জেরা থেকে সহজেই নিষ্কৃতি মিলল বলতে হবে। কিন্তু রাত্রিতে এর চেয়েও কঠিন সওয়ালের ধাক্কায় পড়তে হ'ল সুরপতিকে।

কি গো, ডাক্তার কি বললে?

বললেন ত—হতাশ হবেন না, ভাল করে চিকিৎসা করান—সেবা করুন—

হুঁ—ডাক্তার যদি এক কথায় জবাব দিত তা হলে ওদের আর করে খেতে হ'ত না! সুলোচনার কণ্ঠে বাঁকা সুর।

সত্যি বলছি—উনি বললেন, অনেকগুলি পরীক্ষা না করলে—

ন্যাকা বুঝিও না আমায়! ডাক্তার কচি খোকা কিনা তাই রুগী দেখে নাড়ী টিপে—সব বৃত্তান্ত শুনে রোগ বুঝতে পারলে না! তা হলে রোগটা হয়েছে শিবের অসাধ্যি—তাই।

শিবের অসাধ্য ব্যাধিটা কি?

জালিও না বাপু! কথায় বলে না,

ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়—
পাঁচপণ দিয়ে বিশ পণ নেয়।

তোমার হ'ল গিয়ে তাই! কিন্তু জিজ্ঞেস করি—আমার কচি-কাচার ঘরে এই কালশত্রু নিয়ে বাস করব কি করে! সাধ করে ঝগড়া করেছিলাম তখন?

যাই হোক—

না, কোন কথা শুনতে চাই না আমি, হাসপাতালের ব্যবস্থা কর।

তেমন তেমন হলে সেই ব্যবস্থাই হবে, না হলে উপায় বা কি। বিব্রতভাবে সুরপতি জবাব দিলে।

তা যদি না কর ত—যে দিকে দু' চোখ যায় ছেলে মেয়ে-গুলির হাত ধরে চলে যাব। অত ভালমানুষি দেখাতে পারব না বলছি। সুলোচনার স্বরে শাসনের সুর।

৪

ডাক্তারী পরীক্ষা চলল—আরও দিন কয়েক ধরে। অবশেষে ডাক্তারবাবু বললেন, আপনারা পারবেন কি সে রকম সেবা-যত্ন করতে? মানে ঘড়ি ধরে ওষুধ পথ্যি খাওয়ানো, টেম্পারেচার নেওয়া, চার্ট তৈরি করা...তা ছাড়া বুঝছেনই ত—ওপন কেস এটা, আরও পাঁচটা ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে—মানে এসব রুগী তফাতে রাখাই ভাল। হাসপাতাল রয়েছে যখন—সেখানকার চমৎকার ব্যবস্থা—চেষ্টা করলেই সিট পেয়ে যাবেন। ডাক্তারবাবুকে গোটা দুই কল দিন—

সন্ধ্যা বজ্রাহতের মত বসে রইল।

সুরপতি তাকে আশ্বাস দিলে, হতাশ হয়ো না। যিনি রোগ দিয়েছেন তিনিই আরোগ্য করে দেবেন।

সন্ধ্যা উদ্‌ভ্রান্তের মত বললে, আপনি বিশ্বাস করেন?

থতমত খেয়ে গেল সুরপতি। আমতা আমতা করে বললে, বিশ্বাস করি মানে? কি বিশ্বাস করি?

ভগবানকে? স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে সন্ধ্যা। বিশ্বাস করেন তাঁর দয়াতে কঠিন কঠিন রোগ ভাল হয়ে যায়?

সুরপতি হতবুদ্ধির মত বললে, বিশ্বাস না করলে আমরা বাঁচব কি নিয়ে। ..

না, না, জামাইবাবু ঠিক করে বলুন, স্পষ্ট করে বলুন। ভগবানকে না মেনেও অনেকে বেঁচে রয়েছে, সে কথা নয়। ভগবানকে মেনে—তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে কেউ ভাল হয়ে উঠেছেন—মানে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন এ খবর জানেন কি? বলুন—বলুন।

সন্ধ্যার ব্যাকুল কণ্ঠে সুরপতির চমক ভাঙল। মনে হ'ল—এ তো তার নিজের বিশ্বাসের কথা নয়, অন্যকে আশ্বাস দেওয়ার কথা। প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেক মানুষকে এমন আশ্বাস দিয়ে থাকে। মানুষের বলবুদ্ধি ভরসার পুঁজি শেষ হলে অর্থাৎ এই জগতের আশ্বাস ফুরোলে মনোজগৎ না হলে তার চলে না। মনই ত সৃষ্টি করে জগৎকে, বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। তাই প্রার্থনা স্তবমন্ত্র প্রণাম প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন। কিন্তু ঈশ্বর নাই বলবার সাহস কই। তিনি যদি নাই ত জগৎ চলছে কেমন করে? কেমন করে···

শৈশবের স্মৃতি কুয়াসার মত ছেয়ে এল চারিদিকে—মুছে দিল বাইরের পৃথিবীকে। অতি শৈশব থেকে চাঁদের পানে চেয়ে, তারার পানে চেয়ে—আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনে—গৃহে আর গৃহের বাইরে পূজার আয়োজন আর মঠ-মন্দিরের দেব দেবী দেখে ওই কল্পনার জগৎকে আর এক ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন প্রত্যক্ষ-গোচর করে এসেছে সঙ্গোপনে। সুদীর্ঘকাল ধরে ওরা লালিত হয়েছে মনের অন্তঃপুরে—কল্পনা আর বাস্তবে মিশে গেছে আশ্চর্য্যভাবে। ঠিক, ঠিক, এই দেবতাকে অবলম্বন করে বেঁচে রয়েছে মানুষ—সৃষ্টির আদিকাল হতে এবং বেঁচে থাকবে মহা-প্রলয়ের মহাক্ষণ পর্য্যন্ত।

কণ্ঠে জোর দিয়ে বললে সুরপতি, হাঁ, বিশ্বাস করি আমি। অনেক কেস দেখেছি এমন—

সন্ধ্যার মুখ-চোখ সেই অটল বিশ্বাসের নির্ভরতায় ঝলমল করে উঠল। খুশীভরা কণ্ঠে বললে, তা হলে দেবতার দুয়ারে আমার মানত রইল জামাইবাবু, উনি ভাল হয়ে উঠুন—

৫

তদ্বির-তদারক করে হাসপাতালে আশ্রয় পেলে জয়ন্ত। সেটাও ঈশ্বরের করুণা ছাড়া কি! না হলে সুলোচনাকে নিরস্ত করত কে? সে অপ্রীতির হাত থেকে সুরপতি যে নিস্তার পেলেন—এটি তাঁরই করুণা বলতে হবে। হাঁ—তাঁরই করুণা। কোথায় আছেন তিনি? কোথায় নাই—তাই বল। বাড়ীর সবচেয়ে কাছে যে শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ, সেইখানেই প্রার্থনা জানিয়েছে সুরপতি। আকুল প্রার্থনা। আমার মুখরক্ষা কর প্রভু। তুমি অশরণের শরণ, অগতির গতি—তোমার শরণ নিলাম আমি। আমাকে রক্ষা কর।

এর পর এক দিন সন্ধ্যার অনুরোধে কৃষ্ণপক্ষের শনিবারে কালীঘাটে সপরিবারে চলল পূজো দিতে। ভিড় ঠেলে যথারীতি পূজো দিলে দেবীর। প্রার্থনা করলে সুরপতি, সুলোচনা, সন্ধ্যা আর ছেলে-মেয়েরা। মায়ের মন্দিরে জমা হ'ল অনেক প্রার্থনা—বহুবিচিত্র মনোভিলাষে গড়া প্রার্থনার রাশি। সে সবই কি কুড়িয়ে নিলেন দেবতা;—না হাউই বাজীর মত, আগুনের ফুলের মত একটু কালের দীপ্তি ছড়িয়ে শূন্যমণ্ডলের গর্ভে মিলিয়ে গেল? শূন্যের মহা-অগ্নি বুঝি গ্রাস করে নিলে অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গগুলিকে? যাই হোক, এমনি করে একযোগে প্রতি সপ্তাহে পূজো আর প্রার্থনা চলতে লাগল—কাটল আরও দুটি মাস।

এক দিন সুলোচনা সুরপতিকে নিভৃতে বললে, এত পূজো-আচ্চা দিয়েও ত কিছু হচ্ছে না, ডাক্তার কি বলে?

বলবেন আর কি—সময় নেবে।

মুখ ভার হয়ে উঠল সুলোচনার। নীরস কণ্ঠে বললে, তুমি ত বলে খালাস! এদিকে একটা ঘর জোড়া রইল—একপাল মানুষের খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ—আমি আর দাসী-বাঁদীর মত টেপাগোঁজা হয়ে কাঁহাতক পারি বল?

কি উপায় বল? ঘাড় পেতে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে যখন—আদ্দেক এসে বলব কি পারব না?

তার আমি কি জানি! আমি ত তোমায় দায়িত্ব নিতে বলি নি—তখন পই পই করে বারণ করি নি?

কথায় বলে:

আত্ম রেখে ধর্ম্ম,
তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম।

একজনের জন্যে গুষ্টিসুদ্ধ লোক ত মরতে পারে না!

ভাল করে ঠাকুরকে মান যেন এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পারি আমরা।

মানব বই কি—মানব না? তিক্ত হাসি ফুটে উঠল সুলোচনার মুখে। কালই পূজো দিয়ে আসব তারকেশ্বরে। যে ঠাকুর মৃত্যুর দেবতা অল্পে তুষ্ট, তাঁকে মানব দায় উদ্ধারের জন্য।

তাই হ'ল। সুরপতি সস্ত্রীক তারকেশ্বর গেলেন। ফিরে এলেন সন্ধ্যাবেলায়। এসে দেখেন সন্ধ্যার মুখখানি শুকিয়ে গেছে—চুপ করে ও বসে আছে অন্ধকার ঘরে। এতই বিমনা যে সন্ধ্যাজ্বালার কথা ওর মনেই হয়নি।

যত সব অনাছিষ্টি! সন্ধ্যে উৎরে গেছে, লোকজন রয়েছে বাড়ীতে—না পড়েছে ধুনো গঙ্গাজল, না জ্বালা হয়েছে আলো।

গজগজ করতে করতে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে বসল সুলোচনা।

সুরপতিকে দেখে সন্ধ্যা কেঁদে উঠল।

কি হবে জামাইবাবু—আজ নাকি ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছেন? আর নাকি কোন আশাই নেই! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সন্ধ্যা।

বিষণ্ণ হয়ে উঠল অন্ধকারমাখা বাড়ীখানি। ওঘরে এই-মাত্র আলো জ্বাললে সুলোচনা। দুয়োরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শঙ্খধ্বনি করলে তিন বার। তারপর মাটির প্রদীপ উঁচু করে দেবতার পটের সামনে আন্দোলিত করলে বারকয়েক। একটি ধূপ জ্বেলে ধূপদানিতে রেখে গলবস্ত্রে মেঝের উপর প্রণাম করতে লাগল দেবতার উদ্দেশে। প্রণাম আর প্রার্থনার অভিনিবেশে অনেকক্ষণ কাটল। ঘরের অন্ধকার দূর হ'ল—অন্য ঘরে অন্তরিত হ'ল সেই অন্ধকার। এ ঘরের অনুচ্চ কণ্ঠের স্তব-প্রার্থনার সঙ্গে ও-ঘরের চাপা কান্নার ধ্বনি আশ্চর্য্যভাবে মিশে গেল। আলো হাতে ঘরে ঢুকল সুলোচনা। কাঁদছ কেন, মানত কর ভগবানের কাছে। তিনি বিপদ দিয়েছেন—তুলে নেবেন তিনিই। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ। প্রসন্ন শান্ত স্বরে বললে সুলোচনা।

না দিদি, আর কোন আশা নেই। পাশের বেডের রোগীর মুখে শুনলাম ডাক্তারবাবু নাকি জবাব দিয়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়ল সন্ধ্যা।

কতক্ষণ আর সান্ত্বনা দেওয়া যায়—সংসারের নানান কাজ রয়েছে ত! এতগুলি প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা, সেবা-আয়োজনের দায়িত্ব তার উপরই ত। সুলোচনা আর সেখানে দাঁড়াল না।

কয়েকদিন পরে জয়ন্তর মৃত্যু হ'ল।

বিদায়-দিনে সন্ধ্যা সাশ্রুনয়নে বললে, তোমরা যা করলে তা চিরদিন মনে থাকবে দিদি। এ বিপদে কোন আত্মীয়ই এমন করে নি। তোমাদের ঋণ আমি কোনদিন শুধতে পারব না।

সুলোচনা অত্যন্ত খুশী হ'ল। বললে, এ আর বেশী কি ভাই, আপনজন থাকলেই মানুষ সেখানে আসে। আপদ-বিপদে তারাই ত বল বুদ্ধি ভরসা। কথায় বলে না:

মানুষের কুটুম এলে-গেলে,
গরুর কুটুম চাটলে চুটলে।

সন্ধ্যারা চলে গেলে অবসরমত সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে সুলোচনাকে, আচ্ছা একটি কথা শুধোব?

কি কথা?

তুমি রাগ করবে না ত?

না গো না। প্রসন্ন মুখে বললে সুলোচনা।

তুমি ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করেছিলে? জয়ন্ত সেরে উঠুক—না আমরা দায়মুক্ত হই?

সুলোচনার মুখে লঘুছায়া ভেসে গেল। বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার ন্যাকা-ন্যাকা কথা শুনলে গা জ্বালা করে! ঠাকুরের কাছে মানত আমি একাই করেছি, তুমি করনি? সংসারে দায় অদায় একা বুঝি আমারই?

হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠল সুরপতি। হঠাৎ যেন দেখল—কোথাও অন্ধকারের লেশমাত্র নাই—উজ্জ্বল আলোয় ঘরের ভিতর বাহির সমান স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত নিরীহ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আর প্রতিবাদভীরু ভাল-মানুষের মত চুপ করে রইল সে। সুরপতির মত বৃহৎ সংসারভারক্লিষ্ট অল্প আয়ের মানুষরা দায়মুক্তি ছাড়া আর কি প্রার্থনাই বা করতে পারে ভগবানের কাছে?

ফাল্গুনে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন-প্রাঙ্গণে এলো বসন্ত আবার!
শিমূলে পলাশে পুনঃ রাঙিল কান্তার!
বাতাবী পুষ্পের গন্ধে উতলা পবন!
পাখীদের গানে গানে মুখর কানন।
জানি নাকো এ বসন্ত আর কতবার
আসিবে জীবনে মোর! এ পুষ্প-সম্ভার
বারে বারে ধরণীরে পরাবে মালিকা।
শিমূল জ্বালাবে বনে রক্ত-দীপ-শিখা।

আম্র-মুকুলের লোভে আসিবে কোকিল
সিন্ধুর ওপার হ'তে। চঞ্চল অনিল
জাগাবে মর্ম্মরধ্বনি পাতায় পাতায়!
আমি শুধু রহিব না ধরণীতে হায়!
ফাল্গুনের এ পৃথিবী অপূর্ব্ব সুন্দরী!
মনে হয় দেখি শুধু নিশিদিন ধরি।

আড়াইল গ্রাম

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আড়াইল গ্রামের নাম জানেন। আড়াইল বা "অড়েলী গ্রাম" ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকট প্রয়াগের অপর পারে অবস্থিত। এখানে শ্রীবল্লভাচার্যের গৃহ ছিল। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদ-রজে এই স্থান একদিন পবিত্র হইয়াছিল।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় প্রয়াগধামে ত্রিবেণীর উপরে "বাসা ঘর" স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় বল্লভভট্ট আড়াইল গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়াগধামে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া বল্লভভট্ট চৈতন্যদেবের চরণদর্শনার্থ তথায় আগমন করেন। বল্লভভট্ট মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য বল্লভভট্টকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পর ভক্তি ও স্নেহময় অভিবাদনের পর উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণকথার তরঙ্গ ছুটিল। কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর ভাববন্যা উচ্ছলিত হইল; প্রভু বহিরঙ্গ দর্শনে ভাব-সঙ্কোচ করিলেন। প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ দর্শন করিয়া বল্লভভট্টের বিস্ময় উপস্থিত হইল; তিনি বিচার করিতে লাগিলেন, "এরূপ প্রেম কি মর্ত্ত্যলোকে সম্ভব? নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষ মনুষ্য নহেন, তবে কি 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' কৃপাপরবশ হইয়া মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন?"

ভট্টপাদ এই মহাপুরুষকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া গৃহস্থাশ্রম সফল করিবার আন্তরিক ইচ্ছা করিলেন, কারণ—

> অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
> যদ্ গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণ ভূমীশ্বরাবরাঃ॥*

(পৃথু মহারাজ সনৎকুমারাদি ভাগবতগণকে বলিয়াছিলেন) যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ এবং নির্ধন হইলেও ধন্য। কিন্তু—

> ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিল সম্পদঃ।
> যদ্ গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ বিবর্জ্জিতাঃ।†

যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষ কোটরের দ্বারা আকীর্ণ।

বল্লভভট্টপাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া অতি বিনীত ভাবে মহাপ্রভুকে নিজ-গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম নিজজন রূপ ও তদনুজ অনুপমকে বল্লভভট্টের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। যখন বল্লভভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন অমানি-মানদ ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগের অযোগ্যতার কথা জানাইলেন। মহাপ্রভুও কৌলীন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী বল্লভভট্টকে বহিরঙ্গ জ্ঞানে জড়-প্রতিষ্ঠা দান করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—

> ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি হীন।
> বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥‡

---

* ভাঃ ৪।২২।১০

† ভাঃ ৪।২২।১১

‡ চৈতন্যচরিতামৃত, ১৯।৬৯

মহাপ্রভুর এই ছলনাময়ী পরীক্ষায় বঞ্চিত না হইয়া বল্লভভট্ট বলিলেন,—

বল্লভাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথজী

তুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি।
তুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম্‌॥
অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌
যজ্জিহবাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্‌
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥*

শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভভট্টের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার উদিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন,—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌
শুচিঃ সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ॥†

মহাপ্রভু বল্লভভট্টের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। বল্লভ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে নৌকাতে আরোহণ করাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ অনুপম, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস রাজপুত এবং বল্লভভট্ট স্বয়ং। মহাপ্রভু ত নৌকায় উঠিয়াই যমুনার 'চিক্কণ শ্যামল জল' দর্শনে কৃষ্ণোদ্দীপনজনিত প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অমনি হুঙ্কার করিয়া যমুনার শ্যামল জলে ঝাঁপ দিলেন। গৌর-অঙ্গ যমুনার শ্যাম-অঙ্গে মিলিত হইয়া যেন মেঘের কোলে দামিনীর দমক প্রকাশ করিতে লাগিল। নদীর মধ্যে প্রভুর এই ভাব দর্শন করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া শশব্যস্তে প্রভুকে ধরাধরি করিয়া নৌকার উপরে উঠাইলেন। প্রভু নৌকার উপরে উঠিয়া ভাবাবেশে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 'মহাপ্রভুর ভরে' নৌকা টলমল করিতে লাগিল; নৌকা ডুবুডুবু প্রায়, ঝলকে ঝলকে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। বহিরঙ্গ বল্লভভট্টের সম্মুখে ভাবসম্বরণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভু "দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম" সম্বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু অবশেষে 'দেশ-পাত্র' দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। নৌকা ক্রমে 'আড়াইলের ঘাটে' আসিয়া উপস্থিত হইল।

বল্লভভট্ট আড়াইলের ঘাটেই প্রভুকে স্নান করাইলেন। পাছে আবার মহাপ্রভু ভাবাবেশে 'কি করিতে কি করিয়া বসেন' এই আশঙ্কায় ভট্টপাদ মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিলেন। প্রভুর স্নানকৃত্য সমাপনের পর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বল্লভভট্ট নিজগৃহে লইয়া আসিলেন এবং স্বহস্তে মহাপ্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। মহতের সেবাই 'গৃহস্থের মুখ্যধর্ম্ম' জানিয়া বল্লভভট্ট তাঁহাকে নূতন কৌপীন বহির্বাস পরিধান করাইলেন এবং গন্ধপুষ্প, ধূপ-দীপের দ্বারা প্রভুর 'মহাপূজা' করিলেন।

শ্রীপাদ বল্লভভট্ট বিশেষ আভিজাত্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি 'বৈদিক, যাজ্ঞিক, কুলীন, প্রবীণ'। তথাপি মহাপ্রভুর সুখের জন্য "ভট্টাচার্য্যে মাত্র করি পাক করাইল।" বলভদ্র ভট্টাচার্য্যই পাক-কার্য্য করিলেন।

বল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অতীব যত্নের সহিত নানাবিধ উপকরণে ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রভুর অবশেষ শ্রীরূপপাদ ও শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুতকে প্রদান করাইলেন। বল্লভভট্ট স্বহস্তে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদ-সংবাহন করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্য বল্লভকে প্রসাদপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করিয়া

* চৈতন্যচরিতামৃত, ১৯।৭০-৭২

† শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়, ৩।১১-১২

পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীভট্টপাদ প্রসাদ 'সম্মান' করিয়াই মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে পুনরায় আগমন করিলেন এবং প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

প্রয়াগে গঙ্গাতটে দশাশ্বমেধেশ্বর শিবতলা

এমন সময় ত্রিহুট* দেশবাসী এক মহাভাগবত বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলেন। এই বৈষ্ণববরের নাম রঘুপতি উপাধ্যায়। ইনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব। উপাধ্যায় শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য। তিনি ভট্ট-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণ-বন্দনা করিলেন। প্রভু উপাধ্যায়কে "কৃষ্ণে মতি রহু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসীর মুখে 'নমো নারায়ণায়' বাক্য শ্রবণ করিবার পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণে মতি রহু' বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণববর উপাধ্যায় মহোদয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং আপনাকে যথেষ্ট সৌভাগ্যান্বিত মনে করিলেন।

বৈষ্ণব-সম্মেলনে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গের অবকাশ নাই। মহাপ্রভু প্রথমেই উপাধ্যায়কে বলিলেন,—

* * * "কহ কৃষ্ণের বর্ণন"

উপাধ্যায় ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ-নির্দ্দেশক স্বরচিত একটি শ্লোক পাঠ করিলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

যাঁহারা সংসার ভয়ে ভীত, এরূপ ব্যক্তিগণের কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজন করেন, করুন; আমি কিন্তু এই স্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, যাঁহার গৃহের অলিন্দে পরব্রহ্ম খেলা করেন।

* বর্ত্তমান কালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটি জেলা ত্রিহুট বিভাগের অন্তর্গত।

প্রভু বলিলেন—

* * "উপাধ্যায়, 'আগে কহ'।"

তখন উপাধ্যায় প্রভুকে নমস্কার করিয়া আবার শ্লোক বলিতে লাগিলেন,—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটিবিটং ব্রহ্ম॥

বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র বিট্ঠলেশ্বরজী

কাহাকেই বলি, আর কেই বা বিশ্বাস করিবে, কলিন্দ-নন্দিনী-তটস্থ কুঞ্জে গোপবধূগণের প্রেমিক পরব্রহ্ম লীলা করিয়া থাকেন?

উপাধ্যায়ের শ্লোক শ্রবণ করিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রভুর প্রেম দর্শনে উপাধ্যায় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে জানিলেন,—ইনি মনুষ্য নহেন, 'নরলিঙ্গ পরব্রহ্ম।'

প্রভু উপাধ্যায়কে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

"উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান কার?"

উপাধ্যায় বলিলেন,—

"শ্যামমেব পরং রূপম্।"

মহাপ্রভু—শ্যামসুন্দরের বাসস্থানের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?
উপাধ্যায়—'পুরী মধুপুরী বরা'।

মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ইহাদের মধ্যে কোন বয়স শ্রেষ্ঠ ?

প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমের দৃশ্য

উপাধ্যায়—"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।"

মহাপ্রভু—অপ্রাকৃত রসের মধ্যে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ ?

উপাধ্যায়—"আদ্য এব পরো রসঃ।"

উপাধ্যায়ের মুখে এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর আর আনন্দ ধরে না। প্রভু প্রেমাবেশে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপরী বরা।
বয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥"

প্রভু উপাধ্যায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, উপাধ্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ভট্টপাদ নিজ পুত্রকে আনিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত করাইলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আড়াইল গ্রামের সকল লোক গ্রাম ভাঙ্গিয়া বল্লভ-ভবনে আসিয়া পড়িলেন। প্রভুর দর্শনমাত্রেই সকলে 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন, সকলের মুখে মুখে কৃষ্ণনাম। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ প্রভুকে স্ব-স্ব গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ অবস্থা দেখিয়া বল্লভভট্ট সকলকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি প্রয়াগে গমন করিয়া যেন প্রভুকে স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে আমি আর প্রভুকে রাখিব না, অবিলম্বে প্রয়াগে ফিরাইয়া লইয়া যাইব ; প্রভুর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, তিনি প্রেমোন্মাদে মধ্যযমুনাতে ঝম্পপ্রদান করেন। এরূপ অবস্থায় আমি আর কিছুতেই মহাপ্রভুকে আড়াইল গ্রামে রাখা সমীচীন মনে করি না। বল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া গঙ্গা-পথে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন।

বর্ত্তমান আড়াইল গ্রাম হইতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক বা গাদি প্রায় দেড় মাইল। যে গ্রামে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক অবস্থিত, তাহার নাম "দেওরখ্"। "দেওরখ্" পল্লী

আড়াইল গ্রামে শ্রীনৃসিংহ মন্দির

আড়াইল পরগণার অন্তর্গত। বল্লভাচার্য্যের বৈঠকের বিবরণদাতাদের নিকট শুনা গেল, 'দেওরখ্' পল্লীর যেস্থানে বর্ত্তমানে বল্লভাচার্য্যের গাদি বা বৈঠক অবস্থিত সেস্থানেই বল্লভভট্টপাদের গৃহ ছিল এবং সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ঐ গাদি প্রায় ৪৬০ বৎসরের পুরাতন। তবে বর্ত্তমান গৃহ-প্রাকারাদি আধুনিক। বল্লভাচার্য্যের গাদির পশ্চাদ্-ভাগে একটি বিস্তৃতশাখ বটবৃক্ষ বিরাজমান। স্থানীয় লোকেরা বলেন, এই বৃক্ষটি বল্লভাচার্য্যের সময়কার। ঐ বৃক্ষের পাদমূলেই বল্লভাচার্য্যের বৈঠক। বর্ত্তমানে বল্লভাচার্য্যের প্রাচীন গৃহের কোনও নিদর্শনই নাই। একমাত্র ঐ বটবৃক্ষরাজই বল্লভ-ভবনের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে এবং ঐ গাদি বল্লভভট্টের অনুগ সম্প্রদায়ের অধস্তন-পারম্পর্য্যে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

এখানে বল্লভাচার্য্যের পূজিত কোন শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান এখন আর নাই। একটি গৃহস্থ পূজারী ঐ গাদির পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজ পূজিত একটি গোপাল-বিগ্রহ ও গোবর্দ্ধনশিলা তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। পূজারীর নাম শ্রীবল্লভদাস। বল্লভদাসের পিতা এবং পিতামহও এই গাদির পূজক ছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ শ্রীগোপালজীউর মন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মুরলীধর লালজী দেওরখ্ গ্রামস্থ বল্লভাচার্য্যের বৈঠকের অধিকারী। পূজারী বলিলেন, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, মুম্বাই প্রভৃতি দেশ হইতে বল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুগ ধনকুবেরগণ সময় সময় দর্শনার্থ আগমন করিয়া যে আর্থিক সাহায্যাদি করেন, তদ্দ্বারাই বৈঠকের সেবা চলিয়া যায়।

'দেওরখ্' শব্দটি 'দেব-ঋষি' শব্দের অপভ্রংশ। বল্লভ-

সম্প্রদায়ের গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, বল্লভাচার্য্যের সঙ্গলাভ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে দেবতা ও ঋষিগণ অবস্থান করিতেন। দেব ও ঋষিগণের অবস্থিতি-ক্ষেত্র বলিয়া এই স্থানের নাম 'দেওরখ্' হইয়াছে। এই

আড়াইল গ্রামে বল্লভাচার্য্যের বাস্তুভিটার ভগ্নস্তূপ

দেওরখ্ গ্রাম 'নৈনি' ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল। যাঁহারা প্রয়াগ হইতে আড়াইলে আসেন তাঁহাদিগকে যমুনা পার হইতে হয়।

পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বল্লভ-সম্প্রদায়ের কতিপয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যে প্রায় আট বিঘা পরিমিত স্থানে উক্ত প্রাকার-পরিবেষ্টিত গাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাকারের উচ্চ প্রদেশে প্রায় প্রত্যেক তিন হস্ত ব্যবধানে অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য এক একটি গবাক্ষের ন্যায় ছিদ্র লক্ষিত হয়। বিধর্ম্মিগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বৈঠক-মন্দিরের প্রাচীরে একটি শিলালিপি সংযুক্ত আছে। উহা হিন্দী ভাষায় লিখিত, নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল:

শিলালেখ

ইস প্রান্তকে তীর্থাটনকে সময় তীর্থরাজ শ্রীপ্রয়াগ রাজকে সম্বৎ
১৮৬২ বিঃ কে কুম্ভপূর্ব মে স্নানার্থ শ্রীমহাপ্রভুজীকে দর্শনার্থ
আগমনকে স্মরণমে মুম্বাই-নিবাসী স্বর্গীয় শেঠ মুরারজী
গোকুলদাসজীকী পত্নী শ্রীমতী ধন-কুবের বাই দ্বারা
যহ জীর্ণোদ্ধারক্রিয়া গয়াজী কোই বৈষ্ণব
মহাত্মা শ্রীমহাপ্রভুজীকে দর্শনার্থ আবে
সোমৈয়ে ভাগবত স্মরণ বাঁচে।
১৯০৬

চৈতী হাওয়া

শ্রীকালিদাস রায়

চৈতী হাওয়ার দিন যে এলো।
ফুলের বাসে মাতাল হ'য়ে
বাতাস আজি এলোমেলো॥

চপল বাতাস আমার 'পরে
টিটপনা যে বড়ই করে,
ঘাটের পথে উঠান ছাতে
বেসামাল সে করে যে লো॥

ঢাকতে এদিক উদুম ওদিক
ঠাকুরঝি তায় দাঁড়িয়ে হাসে।
হাওয়া হ'ল বেহায়া আজ
লাজ রাখে না এ চৈত মাসে।
হাঁটুর কাপড় রাখতে গেলে,
ধাক্কা দিয়ে দেয় সে ঠেলে
আঁচল উড়ায় করে সে হায়
মাথার ঝুঁটি এলোথেলো।

চোরা বাতাস ফাঁক পেয়ে আজ
মর্ম্মমাঝেও প্রবেশ করে।
সেথা হতেও সব লাজ-ভয়
উড়িয়ে সে দেয় তেপান্তরে।
মন লাগে না ঘরের কাজে
মন লাগে না দেহের সাজে।
ঠাকুরঝি আজ বাটনা বেটো,
কুটনা কুটো, সন্ধ্যা জেলো॥

মনকে বাতাস বার করে আজ
যায় যে নিয়ে সেই বিদেশে,
যেথায় আছে মনের মিতা
রুক্ষ কেশে মলিন বেশে।
ডেকো না কেউ আজকে মোরে
বেঁধো না কেউ কাজের ডোরে
দূত হয়ে আজ বাউল বাতাস
তার বারতা কয়েছে লো॥

সবুজ-সন্ধ্যা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৮

প্রভাতের দিনগুলি হৈ চৈ করিয়া কাটিয়া যায়। সকালে সর্দ্দারকে কাজ বুঝাইয়া দেয়, কুলীরা কাজে লাগে, গাছ কাটা চলিতে থাকে। বিকালটা গাছ গণিতে, মাপ করিতে, গরুর গাড়ী বোঝাই করিতে, হিসাব লইতে কাটিয়া যায়।

প্রতিদিন সে ব্রীচেজ পরিয়া মাথায় হ্যাট চড়াইয়া গাছ কাটা তদারক করে। একটি সবল মোটা গাছ পাইলে সে তৃপ্তি স্নেহের চক্ষে সেটিকে দেখে—তাহার উচ্চতার দৃঢ়তার মূল্য টাকার অঙ্কপাতে মনে মনে কষিয়া ফেলে। তার পরে কুড়ুলের কোপ পড়িতে থাকে—খটাখট। গুঁড়িটায় ক্ষত সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে ক্ষতটা বাড়িয়া চলে, অটল দৃঢ় গাছটা তখন মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠে, একটা বেদনায় শিহরণ ডালে ডালে পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়ে, হঠাৎ সর্দ্দার হাঁকে—হুঁসিয়ার তফাৎ ভাগো, তফাৎ ভাগো।

আরও গোটাকয়েক কোপ, তারপরে আচমকা একটা মড় মড় আওয়াজ, পরক্ষণে সেই উচ্চমাথা গাছটা হুড়মুড় করিয়া মাটিতে পড়ে, ডালপালা মট মট করিয়া মানুষের হাতের মতই ভাঙিয়া যায়। কুলীরা কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছাড়ে, কুড়ুল ফেলিয়া মাথার ঘাম মোছে। কিন্তু লাভের দিক ছাড়া এই সবল সরল দৃঢ় গাছটার হিসাব লইবার মত আর একটা দিক যে আছে তাহা যেন কাহারও নজরে পড়ে না। অথচ সে দিকটা কম নহে, একটা সতেজ প্রাণ শাখা-প্রশাখায় পল্লবপুঞ্জে জীবনের উল্লাসবোধ। বর্ষারম্ভে যখন ফুল ফোটে, মানুষের মতই তখন তাহার গোপন আনন্দ-শিহরণ, শীতের শেষে যখন পরিপক্ব ফলগুলি এলোমেলো হাওয়ার দাপটে ঝরিয়া পড়ে তখন মানুষের মতই সার্থকতার পূর্ণ পরিতৃপ্তি। এই খানেই শেষ নয়, আরও আছে অরণ্যলোকের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা-বোধ, ছুধিয়ালতা তাহার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, কাঠবিড়াল ডালে ডালে ছুটাছুটি করে। ঘুঘু বাসা বাঁধে।

ঠিকাদারের কর্ম্মচারী ব্রীচেজ পরা হিসাবী প্রভাত এদিকটা একেবারেই দেখিতে পায় না।

তবুও মাঝে মাঝে এই অরণ্যলোক প্রভাতের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহার হিসাবী মন যেন ইহার পুরা হিসাব লইতে পারে না। এক একদিন কাজ ফেলিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, ছায়ানিবিড় সরু পথ দিয়া চলিতে থাকে, কাঠবিড়াল ছুটিয়া পালায়—গাছের ডালে ঘুঘু ডাকে, একটা স্নিগ্ধ মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসে, তাহার বেশ লাগে। কিন্তু হঠাৎ যখন বাতাস থামিয়া যায়, ঘুঘু ডাকে না, একটা বিরাট স্তব্ধতা বিরাট বনকে রহস্যময় করিয়া তোলে তখন সে আর চলিতে পারে না, বনানীর সত্তা হইতে সহসা পৃথক হইয়া পড়ে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয়, একটা অর্থহীন আশঙ্কা ঘনাইয়া উঠে। সে তাড়াতাড়ি কুলীদের কোলাহলের মধ্যে ফিরিয়া আসে।

এদেশে সন্ধ্যা প্রভাতের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। রাত না হইতেই রাতের নিস্তব্ধতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বেলা পড়িয়া আসিতেই কাঠবোঝাই গরুর গাড়ী মাঠের পথ ধরিয়া দূরে অদৃশ্য হইয়া যায়, কুলীরা কাজ বন্ধ করিয়া আড্ডায় ফিরিয়া আসে। অন্ধকার হইবার আগেই রাত্রে আহার সমাধা করে। আলো জ্বালিবার প্রয়োজন নাই। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে—পৃথিবীটা যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে কোথাও আলো জ্বলে না, প্রভাতের মনে হয় এই পৃথিবীতে যে একটুখানি আলো সে তাহার তাঁবুর মধ্যে। কাজ থাকিলে সে খাতাপত্র লইয়া বসে। সময় এক রকম করিয়া কাটিয়া যায়। কিন্তু কাজ না থাকিলেই মুশকিল, বাহিরের অন্ধকার জগৎটা তাহার চেতনাকে অধিকার করিয়া বসে। সে তাঁবুর বাহিরে আসে, পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে নিজের প্রভুত্ববোধটাকে খাড়া করিয়া ধরিতে চায়। কিন্তু দূরের তমসাবৃত বনানীর দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হয় যেন ঐ অরণ্যলোক রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসে, একটা প্রকাণ্ড কাল ঢেউয়ের মত তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়। সে অস্বস্তি বোধ করে।

৯

মাঘের শেষ, শীত কমিয়া গিয়াছে। মাঠে ঘাসের চিহ্নমাত্র নাই, নদীতে ক্ষীণ জলধারা ক্ষীণতর হইয়াছে। সারা দিন ধরিয়া বসন্তের উষ্ণ নিঃশ্বাসের মত একটা এলোমেলো বাতাস বহিতেছে।

ধানকাটা শেষ হইয়া গেলে বহু বেকার লোক আসিয়া গাছ কাটার কাজে যোগ দিয়াছে, তাই কাজ পুরাদমে চলিতেছে। এই কর্ম্মস্রোতের মধ্যে প্রভাত বেশ আনন্দেই ভাসিয়া চলিয়াছে।

সেদিন দুপুরের দিকে প্রভাত তাহার বন্দুকটা লইয়া বনের দিকে বেড়াইতে বাহির হয়। বনের পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে চলিতে থাকে। এক একবার একটা দমকা হাওয়া আসে, গাছের ডাল হইতে অসংখ্য শুকনো পাতা ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে। বন জুড়িয়া বসন্তের সবুজ রূপসজ্জার আয়োজন চলে, প্রভাতের তরুণ মনে স্থান-কালের মোহ ঘনাইয়া উঠে, সে নিজের একটা গান ধরিয়া চলিতে থাকে। সামনে একটা সরু নালা—জল নাই, কেবল পাথর আর বালু, তাহাতে অসংখ্য অজ্ঞাত আরণ্যকের পদচিহ্ন, প্রভাত সেটা পার হইয়া ওপারের ঘন জঙ্গলে গিয়া প্রবেশ করে।

চারিদিকে বড় বড় শালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া

আছে, ছোট ছোট পলাশ ও পিয়ালের ঝোপ অনেক, দৃষ্টি বেশীদূর চলে না। স্নিগ্ধ কচি পাতার গন্ধে স্থানটি আচ্ছন্ন।

প্রভাত সেইখানে দাঁড়ায়, বন্দুকটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখিয়া পকেট হইতে সিগারেটের টিন বাহির করে। হঠাৎ সামনের দিকে একটু দূরে একটা খড়খড় আওয়াজ শুনিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়ায়। এবার সে আওয়াজটা পরিষ্কার শুনিতে পায়, একটা খড়খড় খসখস আওয়াজ। প্রভাত সিগারেটের টিনটা নিরাপদে পকেটে ফেলে, তারপরে বন্দুক তুলিয়া লইয়া সাবধানে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

গুটিতিনেক পলাশের ঝোপ পাশ কাটাইয়া গিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে কে যেন তাহাকে আচমকা ধরিয়া দুই তিন পা পিছনে টানিয়া আনে, ভয়ানক চমকিয়া পিছন ফিরিতেই দেখে বাঘ নয় এক সাঁওতালনন্দনের কীর্ত্তি। সে শক্ত মুঠায় তাহার একটা হাত ধরিয়া পিছন দিকে টানিয়া লইতেছে।

ভয়ে প্রভাতের বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। এইবার আশ্বস্ত হইয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেই সাঁওতাল ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে আরও খানিকটা দূরে সরিয়া আসিতে বলে। বিষয়টা বুঝিতে না পারিয়া প্রভাত ভারি বিরক্ত হইয়া উঠে, অথচ সাঁওতালের ইঙ্গিতটা অগ্রাহ্য করিতে সাহস পায় না, নিঃশব্দে পিছনে হটিয়া আসে। কয়েকটা বড় বড় শালগাছের আড়ালে আসিয়া সাঁওতাল নিঃশব্দে হাসিতে থাকে।

এইবার প্রভাতের বিরক্তি রাগে পরিণত হয়, সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিবার উদ্যোগ করিতেই সাঁওতাল তাহার মুখের কাছে হাত আনিয়া থামাইয়া দেয়। চাপা গলায় বলে, "চেঁচাসনে সাহেব, রাগ করিসনে—বল ত ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?" সাঁওতালের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রভাতের রাগটা পড়িয়া আসে, তাহার এহেন অদ্ভুত ব্যবহারের একটা সঙ্গত কারণ আছে অনুমান করিয়া চাপা গলায় উত্তর দেয়, "একটা আওয়াজ শুনে দেখতে যাচ্ছিলাম।"

সাঁওতাল বলে, 'জানিস ওটা কিসের আওয়াজ'।

—"আহাম্মক, জানলে আর দেখতে যেতুম না।"

—"আহাম্মক আমি না সাহেব তুই, ওদিকে আর এক পা এগোলেই প্রাণ নিয়ে ছাউনিতে ফিরতে হ'ত না।"

প্রভাত আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে, 'কেন রে কিসের আওয়াজ?'

—"নিজের চোখেই দেখবি আয়।"

সাঁওতাল সামনে না গিয়া অতি সন্তর্পণে ডান দিকে চলিতে থাকে, প্রভাত তাহাকে অনুসরণ করে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়া পাথর ডিঙাইয়া শুকনো পাতা এড়াইয়া সাঁওতাল বনের পশুর মতই নিঃশব্দে চলে, প্রভাত সাবধানে চলিতে গিয়া পাথরে হোঁচট খাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লয়। এইভাবে কিছুদূর গিয়া সাঁওতাল ঘুরিয়া সামনে চলিতে সুরু করে। চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ থামিয়া যায়, ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাটিতে কি যেন দেখে, তার পর প্রভাতকে বলে, 'দেখ সাহেব'। সেই জায়গাটায় মাটি বেশ পরিষ্কার, কাঁকরও কম, নীচু হইয়া প্রভাত দেখে, ধুলার উপর ছেলেমানুষের পায়ের দাগের মত ছোট ছোট পদচিহ্ন। প্রভাত বলে, 'দেখলুম, মানুষের পায়ের দাগ।'

শুনিয়া সাঁওতাল নিঃশব্দে হাসে—আবার চলিতে থাকে। কিছুদূর গিয়া বাঁ হাতে ঘুরিয়া অতি সন্তর্পণে ফিরিয়া আসে, গাছের আড়াল দিয়া কখনও হেঁট হইয়া কখনও বসিয়া একটু একটু করিয়া অগ্রসর হয়। সামনে কয়েকখানা বড় বড় পাথর, তাহার আড়ালে আসিয়া সাঁওতাল দাঁড়ায়; এক পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখে, তার পর প্রভাতকে দেখিতে বলে। যথেষ্ট সাবধানে প্রভাতও উঁকি মারে, কিছুদূরে সামনে একটু ফাঁকা জায়গায় দুটি বড় বড় লোমশ বপু দেখিতে পায়। চাপা গলায় বলে, 'বাঘ বুঝি'?

সাঁওতাল ঘুরিয়া দাঁড়ায়, আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে, "সাহেব বাঘ দেখিস নাই?"

প্রভাত লজ্জিত হইয়া পড়ে। বাঘ দেখিয়াছে, কিন্তু জঙ্গলে সব জানোয়ারকেই বাঘ বলিয়া ভুল হয়। সে আরও সামনে ঝুঁকিয়া ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। সাঁওতাল কানে কানে বলে, 'ও দুটো বানা (ভালুক) সাহেব, ভালুক চিনে রাখ।'

সত্যই তো ভালুক! প্রভাত দেখে ভালুক দুইটা কি প্রকাণ্ড, আবার বড় বড় নখ দিয়া তাহারা একটা মস্ত মাটির ঢিপি চিড়িয়া ফেলিতেছে আর মাঝে মাঝে সেখানে মুখ লাগাইয়া কিছু একটা খাইতেছে। প্রভাত জিজ্ঞাসা করে, 'কি খাচ্ছে?'

সাঁওতাল বলে, 'উই-এর ঢিপি ভেঙে উই খাচ্ছে, উই খেতে বানা খুব ভালবাসে।'

দু'জনে কিছুক্ষণ ভালুক-দম্পতির মধ্যাহ্ন-ভোজ দেখে, তার পর সাঁওতাল বলে, 'চল্ সাহেব, আর এখানে থাকব না।'

বেশ খানিকটা দূরে আসিয়া প্রভাত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে এবং একটা গাছের নীচে বসিয়া পড়িয়া সিগারেটের টিন বাহির করে। সাঁওতালও বসে, তাহার হাতের টাঙ্গী ও ধনুক পাশে রাখিয়া দেয়। প্রভাত একটা সিগারেট ঠোঁটে ধরিয়া আর একটা সাঁওতালের দিকে বাড়াইয়া দেয়। সাঁওতাল হাসে, 'ও আমরা খাই নে সাহেব'।

প্রভাত বলে, 'অখাদ্য নয়, খেয়ে দেখ ভালই লাগবে।' নিজের সিগারেট ধরাইয়া সাঁওতালের সিগারেটটিও সে ধরাইয়া দেয়। তার পর কাত হইয়া পড়িয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সকৌতুকে সাঁওতালের বিব্রত ভাবটা লক্ষ্য করে।

হঠাৎ সে উঠিয়া বসে। বলে, "তোর মুখটা আমার চেনা মনে হচ্ছে; তোকে আমি কোথাও দেখেছি নিশ্চয়।"

নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া সাঁওতাল প্রভাতের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসে, বলে, 'হ্যাঁ দেখেছিস একদিন, তোর কাছে এক জোড়া খরগোস বেচে এসেছি'।

প্রভাতের মনে পড়ে এই কালো সুন্দর সাঁওতাল তরুণকে সে ছাউনিতে এক দিন দেখিয়াছে, জিজ্ঞাসা করে, 'কি তোর নাম রে?'

—আমার নাম লালধন।

—নামটাও বেশ, চেহারাটাও বেশ, কিন্তু···প্রভাত হাসিয়া উঠে।

লালধন এতক্ষণে সিগারেটটা শেষ করিয়া ফেলে, বলে, 'কিন্তু কি সাহেব ?'

—কিন্তু বুদ্ধিটা মোটা, তা জংলী লোকের আর কত বুদ্ধি হবে ?

লালধন হাসে, রাগ করে না। অদ্ভুত পোশাক-পরা ফর্সা মানুষটি যে সাঁওতালদের চেয়ে অনেক উপরে একথা তাহার বাপ-দাদারা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেও স্বীকার করিয়া লয়। এ মানুষটা যেন অন্য জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়—সে কেমন কোথায় তাহা লালধন জানে না, অথচ জানিতে কৌতূহল হয়। সে প্রশ্ন করে, 'সাহেব তোর ঘর কোথায় ?'

অন্য সময় হইলে প্রভাত এ প্রশ্নের জবাব দিত না, কেননা তাহার মতে জন্তুর সমশ্রেণীর একটা জংলীর এহেন প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু এখন প্রভাতের কৌলীন্যবোধটা তেমন সজাগ ছিল না, উত্তর দিল, 'আমার ঘর বাংলা মুলুকে।'

—অনেক দূর ?

—অনেক দূর।

কল্পনাপ্রবণ সাঁওতাল তরুণের মনে একটা আশ্চর্য্য দূর দেশের ছবি ফুটিয়া ওঠে, সে দেশের মানুষ দেখিতে সুন্দর, সেখানে খাদ্যের অভাব নাই, অর্থের অভাব নাই, আনন্দের অভাব নাই। লালধন প্রভাতের মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে—প্রভাত হাসিয়া উঠে। লালধন লজ্জিত হয়, একটু সরিয়া বসে, প্রশ্ন করে, 'তুই এ জঙ্গল কাটছিস কেন সাহেব ?'

—কাঠ বিক্রি হবে।

—এত কাঠ বিক্রি হবে ? এ যে গুণে শেষ করা যায় না, এত কাঠ কিনবে কে ?

—কেনবার লোকের অভাব নেই, কাঠেরই অভাব।

আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ঘরের চাল বাঁধিতে কিছু, গরুর গাড়ীর চাকা গড়িতে কিছু ও খাটিয়া তৈরি করিতে কিছু কাঠ দরকার হয়, কিন্তু এত বড় মারাংবীর (বড় বন) উজাড়-করা কাঠ দিয়া কি হয় ? গাদা করিলে সেটা স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে ! লালধন যেন আর ভাবিতে পারে না অথচ একটা ব্যথাবোধ মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। সে চুপ করিয়া থাকে।

ইতিমধ্যে কয়েকটা সিগারেট শেষ করিয়া প্রভাত লাফাইয়া উঠিয়া পড়ে, তাহার কেজো মন ব্যস্ত হইয়া ওঠে। লালধনও উঠিয়া দাঁড়ায়। হাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে—পাতা ঝরার আওয়াজ কমিয়া গিয়াছে, অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়াছে। প্রভাত বলে, লালধন আমাকে এগিয়ে দে, তা না হলে বনের মধ্যে দিক ভুল হয়ে যাবে।

টাঙ্গীখানা কাঁধে ফেলিয়া লালধন বলে, 'চল্ সাহেব'। লালধন আগে যায়, তাকে অনুসরণ করে প্রভাত।

একটা অদৃশ্য পথ ধরিয়া লালধন চলে।

কিছু দূর যাবার পর একটা ঢালু পাড় ধরিয়া তাহারা নামিতে থাকে, প্রভাত বুঝিতে পারে সামনে একটা ছোট নদী বা নালা আছে। হঠাৎ লালধন থামিয়া যায়, ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়ে, প্রভাতকেও বসিতে ইঙ্গিত করে। প্রভাতের বুকটা আবার ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে—এবার নিশ্চয় বাঘ ! লালধন কান পাতিয়া শোনে, প্রভাত কিছুই শুনিতে পায় না - কেবল অনেক দূরে একটা ঘুঘু থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে। এইবার সে সামনের একটা পলাশের ঝোপের দিকে একটু সামান্য আওয়াজ শুনিতে পায়, খুবই সামান্য আওয়াজ—উদগ্রীব হইয়া তাকাইয়া থাকে, অথচ কিছুই দেখিতে পায় না। এমন সময় লালধন ঘাড় ফিরাইয়া তাহাকে ইসারা করে, আঙুল দিয়া ঝোপের বাঁ দিকটা দেখাইয়া দেয়—প্রভাত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেদিকে তাকায় - কি যেন দেখা যায়—পাতার আড়ালে মনে হয় একটু মেটে রং কি যেন নড়িতেছে। এইবার তাহা আড়াল হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে আসিয়া পড়ে। প্রভাত হাঁফ ছাড়ে—সর্ব্বাঙ্গের আড়ষ্ট পেশীগুলি আবার শিথিল হয়—না, বাঘ নয়, এক জোড়া বন-মোরগ। মোরগটা দেখিতে কি সুন্দর, বড় বড় পালকগুচ্ছে কত রঙের বৈচিত্র্য আর কি ঔজ্জ্বল্য ! চলিবার ভঙ্গীটাই বা কত সাবলীল, বুকটা ফুলাইয়া ঘাড় উঁচু করিয়া চারিদিকে তাকায়, তার পরে সাবধানে পা ফেলে। মুরগীটা দেখিতে মোটেই সুন্দর নয়। মেটে রং মোরগটার তুলনায় অনেক ছোট। লালধন আস্তে ধনুকখানা বাগাইয়া ধরে, প্রভাত তাহার পিঠে একটা খোঁচা দেয়—সে ঘাড় ফিরাইতেই নিজের বন্দুকটা দেখাইয়া তাহাকে চুপ করিয়া বসিতে ইঙ্গিত করে। লালধন মুহূর্ত্তে উৎসাহিত হইয়া ওঠে—যথাসম্ভব হাত গুটাইয়া উদ্গ্রীব হইয়া বসে। প্রভাত নিঃশব্দে বন্দুকে টোটা ভরিয়া তাক করে—হঠাৎ বন কম্পিত করিয়া আওয়াজ হয়—গুড়ুম।

প্রভাত ও লালধন একসঙ্গে লাফাইয়া ওঠে, তাড়াতাড়ি আগাইয়া যায়, দেখে মোরগটা কাত হইয়া পড়িয়া আছে, মুরগীটার কোন খোঁজ নাই। প্রভাত মোরগটা তুলিয়া লয়, লালধন ঝোপের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারে যদি হঠাৎ মুরগীটাও পাইয়া যায়। হইলও তাহাই—কতকগুলি শুকনো পাতার আড়ালে সেটা লুকাইয়া ছিল, লালধনের সাড়া পাইয়া ঝট পট করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, ছররায় একখানা ডানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লালধন লাফ দিয়া তাহাকে ধরে, তার পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলে, "নে সাহেব, এক চোটে তুই দুটা পাখী মেরেছিস।"

প্রভাত নিজের প্রশংসায় খুশী হয়, বলে 'তোকে দিলুম নিয়ে যা।'

ঘাড় নাড়িয়া লালধন বলে না সাহেব, 'এ তোর শিকার, আমি নেবো না।'

বন্দুকটা মাটিতে রাখিয়া প্রভাত মুরগী দুটাকে এক সঙ্গে বাঁধে, লালধন বন্দুকটার কাছে উবু হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

প্রভাতকে চেনা পথে তুলিয়া দিয়া লালধন ঘরের দিকে ফেরে।

আর বেশী বেলা নাই, বনের ভিতর দিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিতে থাকে।

১০

রবিবার দুপুরবেলা কাজ বন্ধ, কুলীরা প্রায় সকলেই হাটে চলিয়া গিয়াছে—তাই ছাউনি একেবারে নিঝুম। তাঁবুর ভিতরে প্রভাত হিসাবের কাগজ রাখিয়া দিয়া বই তুলিয়া লয়। বেশীক্ষণ সে বই পড়িতে পারে না, বই ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসে। দমকা হাওয়ায় তাঁবুটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, শুকনো ঝরা পাতাগুলি আওয়াজ করিয়া এলোমেলো উড়িয়া যায়—প্রভাত তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ফাল্গুন আসিয়া পড়িয়াছে, কেবল প্রভাত নয়, কাহারও যেন কাজে মন বসিতে চায় না—ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া ওঠে। প্রভাত দূরের গাঢ় শ্যাম বনানীর দিকে চাহিয়া থাকে—হঠাৎ তাহার কি মনে হয়, তাঁবুতে ঢুকিয়া বন্দুকটা তুলিয়া লয়, তার পরে মাঠের মাঝখান দিয়া বনের দিকে চলিয়া যায়।

প্রভাতের পা যেন আজ থামিতে চায় না, এক একটা বনের তরঙ্গ ভেদ করিয়া আর একটা তরঙ্গে প্রবেশ করে। কখনো জলহীন ছোট নদীর বালুর চড়ার উপর দিয়া ভারি জুতার ছাপ ফেলিয়া চলে। যেখানে বন গভীর, উপরে পাতার নিবিড় আচ্ছাদন সেখানে আবছায়া স্নিগ্ধ, অন্ধকারটুকু যেন প্রাণবন্ত, অত্যন্ত মমতাময়, তাহার স্পর্শে আসিয়া প্রভাতের কেজো হিসাবী মনটাও হঠাৎ কেমন করিয়া উঠে।

খানিকক্ষণ চলিয়া প্রভাতের বোধ হয়, সে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, আর এগুনো উচিত হইবে না।

একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিয়া সে সিগারেট ধরায়, পরিতৃপ্তির সঙ্গে টানে। একটা দমকা বাতাস গোটা বনটাকে দোলা দিয়া চলিয়া গেলে আর একটা দোল খাইবার জন্ত বন নিঃশব্দে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। পাখীদের ডাক আবার শোনা যায়। কাছাকাছি একটা গাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল,—সিগারেটের টুকরা ফেলিয়া দিয়া প্রভাত উঠিয়া দাঁড়ায়, বন্দুকে টোটা ভরিয়া ঘুঘুটির সন্ধানে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। দু'চার পা যাইবার পরেই একটা শালগাছের উঁচু ডালে প্রভাত ঘুঘুটিকে দেখিতে পায়, বন্দুক তুলিয়া আওয়াজ করে, পাক খাইয়া ঘুঘুটা পড়িয়া যায়। তাড়াতাড়ি গাছের নীচে গিয়া প্রভাত ঘুঘুটাকে খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু ছোট ছোট ঝোপ শুকনো ডালপালা ও ঝরা পাতার মধ্যে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। ঘুঘুটা যে পড়িয়াছে সে বিষয়ে প্রভাতের কোন সন্দেহই নাই—সে পরিষ্কার দেখিয়াছে। ডালপালা ও পাতা সরাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সে ভাল করিয়া খোঁজে তবু পায় না। শেষে বিরক্ত হইয়া চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, বন্দুকটা কাঁধে তুলিয়া ফিরিয়া চলে। সামনে একটা নূতন সাজানো হালকা সবুজ পাতায় ঢাকা বড় পলাশের ঝোপ, প্রভাত সেটাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে সামনে যাহা দেখে তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া একেবারে থামিয়া যায়। প্রভাত রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছিল—এতক্ষণে অবস্থাটা বুঝিয়া আশ্বস্ত হয়—ভয় পাইবার মত কিছু সে দেখে নাই। যাহাকে দেখিয়াছে সে একটি কালো সাঁওতালী মেয়ে মাত্র। প্রভাতের ভাবটা লক্ষ্য করিয়া মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে, তার পরে সঙ্কীর্ণ আঁচলের আড়াল হইতে একটা মরা ঘুঘু বাহির করিয়া বলে, 'এই নে সাহেব তোর ঘুঘু।'

প্রভাত এইবার আরও আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে, 'এটা তুই কোথায় পেলি?'

মেয়েটি আবার হাসিয়া ওঠে, ঘুঘুটাকে মাটিতে রাখিয়া দিয়া বলে, তুই তো খুঁজে পেলি নে সাহেব, আমি পেয়েছি, নে।

প্রভাত জংলী তরুণীর নির্ভয় সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া যায়—ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে—কালো রং, বয়স ষোল-সতর, এলোমেলো একমাথা কোঁকড়া চুল, সুঠাম দেহলতা, ময়লা মোটা শাড়ীখানা আঁটিয়া পড়া—মেয়েটি দেখিতে তো বেশ।

প্রভাত আন্দাজ করে তরুণী সাঁওতালের মেয়ে,—কেননা এ জঙ্গলে এমন নির্ভয়ে সাঁওতাল ছাড়া আর কেহই ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না। সে প্রশ্ন করে 'তুই কে'?

—আমি? মেয়েটি প্রভাতের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়, প্রশ্নটা ঠিক বুঝিতে পারে না। তার পরে হঠাৎ আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে, 'আমি ফুলি'।

প্রভাত দেখে মেয়েটি হাসিলে তাহাকে আরও ভাল দেখায়, বলে—তোদের বস্তি বুঝি কাছেই?

—না, বস্তি অনেক দূরে।

—তা হলে একলা এখানে এসেছিস কেন, তোর ভয় করে না!

—একা কেন আসব সাহেব, আমার অনেক সঙ্গী আছে, তারা হরতুকি আর বয়রা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোর ঘুঘু নে আমি যাচ্ছি।

—ঘুঘুটা তোকেই দিলুম।

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানায়।

প্রভাত বলে, 'আমি তো ওটা ফেলে রেখেই যাচ্ছিলাম, তুই পেয়েছিস, নিয়ে যা।'

—আমি ঘুঘু নিতে আসি নি, আমি বন্দুক দেখতে এসেছি। সাহেব তুই বন্দুক দিয়ে বন-মুরগী মেরেছিলি?

আশ্চর্য্য হইয়া প্রভাত বলে, 'তুই কেমন করে জানলি?'

মেয়েটি হাসিয়া আধখানা ঘুরিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'আমি জানি।'

এমন সময় দূর হইতে নারীকণ্ঠের একটা ডাক ভাসিয়া আসে, ঠিক ডাক নয় একটা সুর, মেয়েটা হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তার পরে ছুটিয়া বনানীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়।

প্রভাত ভাবে জংলী মেয়েটা জানোয়ারের মতই অদ্ভুত, ভয় নাই, লজ্জা নাই। ইহার পাশে একটি আধুনিক শিক্ষিতা বাঙালীর

মেয়েকে দাঁড় করাইয়া দিলে কেমন হয়? প্রথমতঃ, অচেনা যুবকের সঙ্গে সে সহজভাবে কথা কহিতেই পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ, এই বনে তাহাকে একা ছাড়িয়া দিলে সে অবিলম্বে মূর্চ্ছা যাইবে। চলিতে চলিতে প্রভাত মনে মনে খানিকটা হাসিয়া লয়।

১১

দিন চলিয়া যায়, ফাল্গুনও শেষ হইয়া আসে। পলাশের ডালে ডালে অগ্নিশিখার মত রাশি রাশি লাল ফুল ফুটিয়া ওঠে—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অরণ্য-রেখা লালে লাল হইয়া যায়। দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে দু-এক ঝাপ্‌টা গরম বাতাস আসে, বুঝা যায় গ্রীষ্ম আসিতে আর বেশী দেরি নাই। প্রকৃতির রূপটা যেন দ্রুতবেগে বদলাইয়া যাইতে থাকে। সেদিন সকাল হইতে বাতাস বন্ধ থাকে, রোদের তাত একটু বাড়ে। দুপুরের দিকে গরমটা আরও বাড়িয়া যায়, বাতাস একেবারেই চলে না, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত স্থির। কুলীরা কাজ ফেলিয়া ছায়ায় আসিয়া বসে, মাথার পাগড়ি খুলিয়া হাওয়া করে। গোটাকয়েক চিল রৌদ্রময় আকাশে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধ হইতে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

অপরাহ্ন আসে, রোদের তেজ কমিয়া যায়, নির্মেঘ আকাশে কিসের যেন একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা ঝুলিয়া পড়ে। গরম আরও বাড়িয়া যায়। কুলীরা কুড়ুল থামাইয়া ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছিতে থাকে। বাতাস একেবারেই বয় না। নিশ্বাস লইতেও যেন কষ্ট হয়। রোদের তেজ আরও কমিয়া আসে, সেই অদৃশ্য পরদাটা স্থূলতর হয়, একটা গেরুয়া রং আকাশময় ঘনাইয়া ওঠে, তাহার অন্তরালে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া যায়। দূর—বহুদূর হইতে একটা অস্ফুট আওয়াজ ভাসিয়া আসে, ক্রমে সে আওয়াজ স্ফুটতর হয়, একটা ঝয়্ ঝয়্ময়্ ময়্ শব্দ, পরক্ষণে আসে দমকা বাতাস, গাছের ডালপালা কাঁপাইয়া চলিয়া যায়, আবার আসে। হঠাৎ বনের আড়ালে কিসের যেন সোরগোল পড়িয়া যায়, বাতাস বেগে ছুটিয়া আসে, রক্তাভ ধূলায় চারিদিক মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া উঠে। "আঁধি-আঁধি" চিৎকার করিয়া কুলীরা ছুটিয়া পালায়। বাতাসের বেগ ততক্ষণ ভীষণ বাড়িয়া যায়, গেরুয়া রঙের বালি আকাশ জুড়িয়া উড়িয়া চলে, তীক্ষ্ণ সূঁচের মত মুখে-চোখে আসিয়া বেঁধে। সামনের জিনিষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

প্রভাতও ছুটিয়া তাঁবুতে আসিয়া ঢোকে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ধুলাবালির এই ভীষণ ঝড় বহিয়া যাইবার পর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে সুরু করে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাইয়া যায়, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসে।

ভোরবেলা তাঁবুর বাহিরে আসিয়া প্রভাত দেখে আকাশ একেবারে পরিষ্কার, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে; মাঠের মধ্যে নীচু জায়গাগুলিতে গত সন্ধ্যার বৃষ্টির জল এখনও জমিয়া আছে। বৃষ্টি-ভেজা মাঠের উপর দিয়া প্রভাত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়।

তাঁবুতে ফিরিয়া প্রভাত দেখে কুলীর সর্দ্দার বুড়ো মোহন সিং তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সর্দ্দার সেলাম করিয়া বলে, 'হুজুর চৈতমাস তো এসে পড়ল।'

প্রভাত সম্মতি জানাইয়া বলে, তাতে আর সন্দেহ কি।

সর্দ্দার বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলে, "গৃহস্থি সুরু হতে ছুটো পুরো মাসও বাকি নেই।"

প্রভাত এইবার বুঝিতে পারে বুড়ো সর্দ্দার সকালবেলা নিছক গল্প করিতে আসে নাই, বিশেষ কোন কথা আছে, সে তাঁবুর ভিতর হইতে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসে, বলে, "গৃহস্থির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই বাপু।"

—কুলীদের তো আছে হুজুর।

কথাটা প্রভাত অস্বীকার করিতে পারে না, বলে, "তা আছে, কিন্তু আমরা তো এখানে গৃহস্থি করতে আসি নি, গাছ কাটতে এসেছি।"

"যাঁদের ঘরে গৃহস্থি আছে মাসখানেক পরেই তারা একে একে পালাতে সুরু করবে।"

প্রভাত এইবার সোজা হইয়া বসে, এতক্ষণে 'গৃহস্থি'র সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা পরিষ্কার বুঝিতে পারে, বিশেষ চিন্তিত হইয়া বলে, 'গাছ কাটা আমার অর্দ্ধেকও হ'ল না, কুলী পালালে চলবে কেন সর্দ্দার।'

—জৈঠ পড়লে তাদের আধা পালাবেই হুজুর।

—তা হলে উপায়?

—কুলী বাড়াতে হবে হুজুর, যা কুলী আছে তার ডবল কাজে লাগাতে হবে, এই দেড়-দু'মাসের মধ্যে জঙ্গলের সব বড় শাল কেটে খতম করতে হবে। আর ভি একঠো কথা আছে।

—কথাটা কি বলে ফেল।

—হুজুর বর্ষা সুরু হলে নদী-নালাতে জল হবে, বোঝাই গরুর গাড়ী চলতে পারবে না।

প্রভাত যথেষ্ট ভীত হইয়া পড়ে, কাজের মাঝখানে যে এসব বাধা উপস্থিত হইতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এদেশে সত্যই রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, বর্ষা বাদে অন্য যে-কোন সময়ে যেখান দিয়া খুশী গরুর গাড়ী চালান সম্ভব। কিন্তু বর্ষা সুরু হইলে গরুর গাড়ী অচল। বর্ষার আগে গাছ কাটা শেষ করিতেই হইবে—অন্য উপায় নাই। প্রভাত হুকুম করে, কুলী বাড়াও, কুলী বাড়াও সর্দ্দার, ডবল তিন ডবল—বর্ষার আগে আমার কাজ শেষ করতেই হবে।'

সর্দ্দার খুশী হইয়া বলে, 'হাঁ হুজুর।'

সর্দ্দার এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করে, বহু কুলী সংগ্রহ হয়, কাজের বেগ দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়, কাঠের গাদা স্তূপাকার হইয়া উঠে।

অরণ্যরেখা একটু একটু করিয়া দূরে সরিয়া যায়। যেখানে গভীর বন ছিল সেখানে তরুহীন টিলাগুলি ধনানীর কঙ্কালের মত রৌদ্রে পড়িয়া শুকাইতে থাকে। নদীর বুক জুড়িয়া আর অরণ্যের ছায়া পড়ে না, বালুর চড়ায় পশুপক্ষীর পদচিহ্ন বিরল হইয়া উঠে।

১২

সকালবেলা বড়কু মাঝি তাহার আঙিনায় দাঁড়াইয়া খৈনি টিপিতেছিল। এক টিপ খৈনি গালে ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে আঙিনা পার হইয়া জোড়া মহুয়াতলার দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে উতুম টাঙ্গী ধার দিতেছিল। বড়কু নিঃশব্দে আসিয়া কাছে বসে।

ফাল্গুন শেষ হইয়া গিয়াছে। মহুয়াগাছের পুরোনো পাতা নিঃশব্দে ঝরিয়া গিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তিমাভ নতুন পাতা গজাইয়াছে, মহুয়া ফুল ফুটিয়াছে। সারাদিন টুপ টাপ করিয়া কিসমিসের মত ছোট ছোট নরম ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে, শিশুরা ছুটাছুটি করিয়া কুড়ায় —একটা উগ্র গন্ধে মহুয়াতলা আমোদিত।

সকাল হইতে ঠাণ্ডা পুবে-বাতাস বহিতেছে, তাহাতে গাছ কাটার অবিরাম খট্ খট্ আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কিছুদিন আগে যে আওয়াজ যথেষ্ট মনোযোগ দিলে কখনো কখনো শোনা যাইত, সেই আওয়াজ আজকাল পারিপার্শ্বিকের একটা স্থায়ী অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। গাছ কাটা চলিতেছে, বনের সীমা প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু আগাইয়া আসিতেছে।

উতুম বড়কুকে বলে, 'তোর দেহটা আজ ভাল আছে তো?'

কিছু দিন হইতে বড়কুর শরীর ভাল যাইতেছিল না, কোন বিশেষ কারণে মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না, আর সর্ব্বদা একটা দুর্ব্বলতাবোধ। বড়কু ঘাড় নাড়িয়া জানায়—সে ভাল আছে, তার পরে আস্তে আস্তে বলে, 'শিকারে গেলি না?' টাঙ্গীখানায় ধার ঘসিতে ঘসিতে উতুম বলে, 'যাব, মিতান আর লালধনও সঙ্গে যাবে।'

বড়কু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, উতুম বলে, 'পুবজঙ্গলে আর শিকার মেলে না, পশ্চিমের মারাং-বুরোর দিকে যেতে হয়। তাও কি সহজে কিছু পাওয়া যায়, ছোট বড় সব জানোয়ার সাবধান হয়ে গেছে—তা আর হবে না কেন, বন পয়মাল করে দিল।'

বড়কুর মাথাটা যেন ঝুঁকিয়া পড়ে, কোন সাড়া দেয় না, উতুম যেন নিজের মনেই বলে, 'বাঘা পাহাড়ীর জঙ্গল সাফ, গিধিটাঁরের জঙ্গল সাফ, লালকি গাঢ়ার জঙ্গল সাফ—জঙ্গল এসে ঠেকেছে সোনাসুতির ওপারে।'

বড়কুর চেতনা যেন এতক্ষণে ফিরিয়া আসে, চেঁচাইয়া বলে, তুই মিছে কথা বলছিস উতুম।' উতুম আশ্চর্য্য হইয়া বড়কুর শুকনো মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, 'অবাক করলি বড়কু মাঝি, তুই জানিস নে এ খবর! কেন, তোর ছেলে লালধন তোকে বলে নি?'

উতুমের জবাবে বড়কুর মেজাজ যেন আরও বিগড়াইয়া যায়, চীৎকার করিয়া বলে, 'মিছে কথা, মিছে কথা, তোরা সবাই মিছে কথা বলছিস—যে অমন কথা বলে সে যেন নির্ব্বংশ হয়ে যায় —নির্ব্বংশ হয়ে যায়।'

ইতিমধ্যে শিকারে যাইবার জন্য তীর ধনুক ও টাঙ্গী লইয়া লালধন, মিতান আসিয়া দাঁড়ায়।. উতুম বড়কুর চটিয়া উঠিবার হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া জবাব দেয়, 'তুই যে কানে শুনতে পাস না তা তো জানতাম না বড়কু? সারাদিন ঐ যে পুব থেকে খট্খট্ আওয়াজ আসে সেটা কিসের বল ত?'

বড়কু আবার চুপ করিয়া যায় মাথাটা তাহার দুই হাঁটুর মধ্যে আবার ঝুলিয়া পড়ে। সে যেন কিছু শুনিতে পায় না, দেখিতেও পায় না। উতুম টাঙ্গী হাতে করিয়া উঠিয়া পড়ে, লালধনকে বলে, চল বেটা কোন দিকে যাবি।'

লালধন জবাব দেয়, 'পশ্চিমের বড় পাহাড়ে চল, পূবে গেলে অমনি হয়রান হবি।'

উতুম বলে, 'তাই চল!'

হঠাৎ বড়কু উঠিয়া দাঁড়ায়, লালধনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'সত্যি বল বেটা, সোনাসুতির ওপার পর্য্যন্ত মারাং-বীর সাফ হয়ে গেছে?'

লালধন বলে, 'তোকে ত কতবার বলেছি বাবা, তুই কিছুতেই বিশ্বাস করবি নে।'

বড়কু মিনতি করিয়া বলে, 'এই থামকোমদারের (মহুয়া-গাছের) নীচে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলছিস নে বেটা।'

—ঐ তোর এক কথা, মিছে কথা কেন বলব।

—তোরা আমাকে নিয়ে চল লালধন, আমাকে সোনাসুতির ধারে নিয়ে চল, আমি নিজের চোখে দেখব।

লালধন বুঝাইয়া বলে, 'তুই অত দূর যেতে পারবি নে বাবা, কম করেও সোনাসুত এখান থেকে দেড় কোশ পথ পূবে।'

—দেড় কোশ পথ যেতে পারব না? বড়কু মাঝি কি মরে গেছে? ইচ্ছে করলে আমি এখনও দশ কোশ পথ চলতে পারি।— বলিতে বলিতে বড়কু মাঝি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, তাহার কোটরগত চোখ দুটি জ্বলিয়া ওঠে।

চারজনে নিঃশব্দে পূবমুখো চলিতে থাকে। বুড়ো বড়কু সঙ্গী তিন জনের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলে, তাহার ভিতরে আজ একটা শক্তি আসিয়াছে। পথ তাহার অতি পরিচিত, কয়েক বছর আগেও সে রীতিমত শিকারে বাহির হইয়াছে, লালধন শিকারে বাহির হইতে সুরু করিলে সে আর বেশী চলাফেরা করে না। আজ বহু দিন পরে উঁচুনীচু রেখাহীন বনের পথ ধরিয়া চলিতে তাহার ভালই লাগে; চোখ কান আগের মত সজাগ হইয়া ওঠে।

দুটো ছোট নদী পার হইয়া যায়—বন বেশ গভীর। বড়কু একটু অস্বস্তি বোধ করে, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হইয়াছে, কি যেন ঘটা উচিত ছিল, কি যেন ঘটিতেছে না—বড়কু ভারি চিন্তিত হইয়া পড়ে। হঠাৎ বিষয়টা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়—সে লালধনকে চাপা গলায় প্রশ্ন করে, 'বেটা, এতটা পথ এলাম কোথাও ত একটা জানোয়ারের সাড়া পেলাম না? একটা চিতরা বা একটা খরগোশও ত ছুটে পালাল না?'

লালধন জবাব দেয়, 'পূবের জঙ্গলে আর জানোয়ার নেই বাবা!'

আরও একটা নালা পার হইয়া ওপারের বেশ উঁচু টিলায়

জলাকীর্ণ ঢালু গা বাহিয়া উপরে উঠিতে থাকে। উঠিতে উঠিতে তাহারা অবিরাম খটখট আওয়াজ শুনিতে পায়, মাঝে মাঝে মানুষের কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসে। হঠাৎ বড়কুর পা দুটো ভারি বোধ হয়, চলার শক্তি কমিয়া আসে। ধীরে ধীরে সে চলে, অনেকটা চড়াই উঠিবার পর টিলার মাথায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই উচু জায়গাটায় দাঁড়াইয়া এক মুহূর্তে তাহারা বহুদূর বিস্তৃত এক বিরাট দৃশ্যপট দেখিতে পায়। সামনে সোনাসুত নদী—উপর হইতে একটা সোনার সুতার মতই আঁকিয়া-বাঁকিয়া পড়িয়া আছে, তাহার ওপারে উচুনীচু মাঠ দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে, সেখানে একদা যে সকল প্রাচীন শাল পলাশ গাছ আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—আজ তাহারা নাই, আজ তাহারা গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া কয়লার খনির অথবা চড়া বাজারে চালান হইয়া গিয়াছে। রহিয়াছে বনকুল আর পিয়ালের ঝোপ! কোন্‌টা গিধিটার কোন্‌টা লালকিগাড়া চিনিতে পারা যায় না—প্রকাণ্ড বড় সাদা পাথরের স্তূপটার জন্য কেবল বাঘাপাহাড়ী চিনিতে পারা যায়। আরণ্যের সঙ্গে তাহার অতীত ইতিহাসেরও যেন অন্তর্ধান হইয়াছে।

সোনাসুতের ওপারে উত্তরের দিকে কতকটা জঙ্গল এখনও বাকি আছে, সেখানে গাছকাটা চলিতেছে। টিলার উপরে দাঁড়াইয়া দলটি তাহা পরিষ্কার দেখিতে পায়। অনবরত কুড়ুল চলিতেছে—একটা বড় শালগাছ হুড়মুড় করিয়া পড়ে, আরও একটা পড়ে, আরও একটা পড়ে। হঠাৎ লালধনের হাত হইতে টাঙ্গী ছিনাইয়া লইয়া বড়কু তাহার মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে চীৎকার করিয়া উঠে 'হো-রি-রি রি-রি'। হিংস্র বন্য পশুকে মুখোমুখি আক্রমণ করিবার সময় সাঁওতাল বীর যে ভাবে হুঙ্কার দিয়া উঠে, যে ভঙ্গীতে অগ্রসর হয় সেই ভাবে টাঙ্গীখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বড়কু হুঙ্কার দিয়া উঠে, 'হো-রি-রি-রি রি'। তাহার চোখ দুটো দিয়া আগুন ছুটিয়া বাহির হয়, শিথিল পেশী আর শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, পা দুখানা কাঁপিতে থাকে, বড়কু টিলার উপর হইতে ছুটিয়া নামিতে চেষ্টা করে। লালধন তাহাকে ধরিয়া ফেলে, হাত হইতে টাঙ্গীখানা কাড়িয়া লয়। বড়কু ঝাঁকানি দিয়া ছাড়াইয়া যাইতে চায়, বলে, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বেটা, চলে যাই দুশমনের বহটা (মাথা) কেটে নিয়ে আসি।'

লালধন ছাড়ে না, বড়কু চেচাইতে থাকে, আমার লেঙ্গাতিয়ের (ডান হাতের) উপর চোট মারছে, ছেড়ে দে বেটা, আমি ওর বহটা কেটে নিয়ে আসি। 'হো-রি-রি-রি-রি', দুশমন আমার কোরামের (বুকের) উপর চোট মারছে, আমি ওর বহটা কেটে নিয়ে আসি।

বড়কু আবার ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করে—লালধন তাহাকে শক্ত করিয়া ধরে, উতুম আর মিতান আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়। বড়কুর পা দুটা ভয়ানক কাঁপিতে থাকে, সে আর দাঁড়াইতে পারে না, বসিয়া পড়ে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে, হো-রি-রি-রি-রি।

এক রকম কাঁধে করিয়াই লালধন, মিতান আর উতুম বড়কুকে ঘরে লইয়া আসে। সারাদিন জ্বরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করে আর চেঁচাইয়া উঠে হো-রি-রি-রি-রি।

১৩

চার দিন জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া বড়কু মাঝি মারা যায়।

যে বিপদের ছায়াটা এতদিন ধরিয়া একটু একটু করিয়া আগাইয়া আসিতেছিল সেটা যেন হঠাৎ পল্লীর উপর আসিয়া পড়ে। কারণে অকারণে যে সাঁওতাল মেয়েদের মুখে হাসি ধরে না, আজ তাহাদের মুখে হাসি নাই।

যথারীতি বড়কুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নদীর ওপারেই একটা বিরাট মহুয়াগাছ, তাহার নীচে পল্লীর সমাধিস্থান। বড়কু মাঝিকে সেইখানে বাপ পিতামহের পাশেই কবর দেওয়া হয়।

লালধন একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে। জীবনটা বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটিতেছিল, হঠাৎ সব আনন্দ যেন এক মুহূর্তে ফুরাইয়া যায়। সংসারে আপনার বলিতে তাহার কেহই নাই, সে আজ একেবারেই একা—নিজের জন্যে শিকার করিবে, নিজেই খাইবে, নিজের সুখ-দুঃখের কথা নিজের মনেই কহিবে। সারাদিন সে ঘরের বাহির হয় না, শিকারে যাইবার জন্য উতুম ডাকিতে আসিয়াছিল, সে যায় নাই।

লালধনের তরুণ মনে শোকের চেয়ে একটা অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া বেশী ঘনাইয়া উঠে। এক অশুভ অদৃশ্য শক্তি যেন তাহাকে অনুসরণ করিতে সুরু করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এক একবার সে ভাবনাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়—আড় হইতে বাপের বোনা খরগোশ ধরিবার জালগাছা নামাইয়া ঘরময় ছড়াইয়া দেয়, কোণ হইতে মস্ত বড় ধনুকখানা আনিয়া পাশে রাখে, বাপের স্পর্শময় এই সব জিনিসের সান্নিধ্যে সে যেন কতকটা নিরাপদ মনে করে।

অপরাহ্ণের ছায়া আঙ্গিনা জুড়িয়া পড়ে, লালধন সেই ছায়ায় বসিয়া বাপের টাঙ্গীখানা ধার দেয়। এমন সময় বাঁশের দরজা ঠেলিয়া নিঃশব্দে ফুলি আসিয়া আঙ্গিনার মাঝখানে দাঁড়ায়। লালধন দেখিতে পায় না, ফুলি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরে গিয়া ঢোকে, শূন্য কলসীটা তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসে। বলে, সারাদিন খাস নি কিছু?

এইবার লালধন মুখ তুলিয়া চায়, ফুলিকে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হয়, একটু পরেই চিন্তাগুলি আবার এলোমেলো হইয়া যায়—কিছু বলিতে পারে না—বিহ্বলের মত তাকাইয়া থাকে।

ফুলি কলসীটা মাটিতে রাখিয়া লালধনের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার বড় বড় চুলগুলি আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'আজ রান্না করিস নাই—খাস নাই?

লালধন সে কথার জবাব দেয় না, বলে, কলসীটা বাইরে নিয়ে এলি কেন'?

ফুলি বলে, 'ঘরে ত এক ফোঁটা জল নাই—জল আনতে যাব।'

—তুই আমার জন্যে জল আনতে যাবি?

—আমি যাব না ত কে যাবে।

লালধন ফুলির হাতখানা চাপিয়া ধরে। সেই কচি কোমল হাতের মধ্যে নির্ভর করিবার মত কিছু যেন খুঁজিয়া পায়, ডাকে, 'ফুলি!'

ফুলি লালধনের পাশে বসিয়া পড়ে, বলে বাপের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে?

মাথা নাড়িয়া লালধন বলে, হাঁ, আপনার জন আমার আর কেউ নাই।

ফুলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তারপর বলে, 'কেন, আমি আছি।'

লালধন আশ্চর্য্য হইয়া ফুলির মুখের দিকে তাকায়, কথাটার তাৎপর্য্য যেন বুঝিতে পারে না, ফুলির দৃষ্টির মধ্যে অর্থটা এইবার পরিষ্কার বুঝিতে পারে, হঠাৎ তাহার অন্তর এক নিবিড় সুখে কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, সে ফুলির হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু এই স্বপ্নাতুর অবস্থাটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, মন আবার শঙ্কিত হইয়া উঠে, লালধন বলে, না ফুলি, মিতান মাঝি আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে না।

ফুলি ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করে, 'কেন?'

—পণের জিনিষ, টাকাকড়ি সব ত জোগাড় হয় নি।

—তুই তাড়াতাড়ি জোগাড় কর।

—বাবা নাই, জোগাড় করতে আমার অনেক দেরি হবে।

—না, দেরী হবে না, তুই যোয়ান মরদ, তুই মন করলে সব পারবি।'

লালধন নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, ফুলি তার কানে কানে বলে, 'আমি দিন গুনৃছি।'

লালধনের বুকের মধ্যে আবার একটা আনন্দের তরঙ্গ আসিয়া পড়ে; সে ফুলিকে জড়াইয়া ধরে, নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরে, ফুলির মুখের উপর তাহার উত্তপ্ত মুখখানি চাপিয়া রাখে।

ফুলি বলে, 'ছেড়ে দে, বেলা গেল জল আনতে যাব।'

লালধন তাহাকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দেয়—দাঁড়াইয়া দেখে ফুলি দুই হাতে তার কোঁকড়া চুলের গোছা পাট করে, আঁচলখানা টানিয়া কোমরে জড়ায়, তারপরে কলসী তুলিয়া লইয়া ঝাঁপের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। লালধনের মনে একটা সাহস জাগিয়া উঠে, দেহে একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়—সে সোজা হইয়া মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ায়।

১৪

লালধন নূতন উদ্যমে আবার শিকারে বাহির হয়। উতুম, মিতান, লালধন খুব ভোরে পশ্চিমের মারাং-বুরোর শিকার করিতে যায়। পূবদিকে জঙ্গল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, দু'দিকে শিকারের নামগন্ধ নাই, জানোয়ার বড় পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে। আজ ইহারা খরগোশ-ধরা জাল সঙ্গে আনে নাই, কেবল বড় শিকার মতলব করিয়া বাহির হইয়াছে।

রাত-ভর ছোট-বড় কোন জানোয়ারই থাকে না, সব নীচে নামিয়া আসে। হাড়-গাড় (হায়না) গ্রামের আশে-পাশে চলিয়া যায়, সেখানে কুকুর ধরিবার ফন্দিতে ঘোরাফেরা করে, তড়ক্ও (চিতাবাঘ) গরুটা বাছুরটা পাইবার আশায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে টহল দিয়া ফেরে, বানা (ভালুক) মহুয়াগাছের সন্ধানে দু'চার ক্রোশ জমিন নষ্ট জ্ঞান করে, মহুয়াপ্রীতি তাহার অসামান্য, সারাম (হরিণ) পাহাড়তলীর সমতল ফাঁকা জায়গায় চরিতে আসে, তাহার পিছনে আসে কুল (ডোরাদার বড় বাঘ)। হরিণের স্বাভাবিক সাবধানতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সে ভালবাসে।

ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা পাহাড়ের ঘনতর জঙ্গলে ও ডেরা-ডাণ্ডায় ফিরিয়া আসে। লোকে যেমন প্রতিবেশীর স্বভাব-চরিত্র, চলাফেরার, কথাবার্ত্তার বিশেষ ভঙ্গীগুলির সহিত পরিচিত থাকে, অরণ্যবাসী সাঁওতালেরাও তেমনি প্রতিবেশী ছোট-বড় প্রত্যেক জানোয়ারের স্বভাবচরিত্র ও চলাফেরার বিশেষ ভঙ্গীগুলির সহিত খুবই পরিচিত। তাই লালধন, উতুম আর মিতান এই সময়ে পাহাড়মুখো হরিণ-দলের সন্ধানে চলে।

সবে ভোর হইয়াছে, পাহাড়ের কোল এখনও আবছায়া অন্ধকার-ময়। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, কেরকেচ আর সুইয়া পাখী অবিরাম শিস্ দিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বনমোরগের ডাকও শোনা যাইতেছে। তিন শিকারী পাহাড়ে না চড়িয়া, পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া অতি সাবধানে চলিতে থাকে। তাহাদের দৃষ্টি থাকে নীচে পাহাড়তলীর দিকে, হরিণের পাল যদি আসে, সেই দিক হইতেই আসিবে। সামনে কতকগুলি বড় বড় পাথরের চাই, এই-গুলি বড় ভয়ের জায়গা, এই রকম পাথরের আড়ালে ডোরাদার বড় বাঘও হরিণের আশায় এই সময়ে বসিয়া থাকে। নিঃশব্দে গুঁড়ি মারিয়া তাহারা এক একখানি পাথরের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়, কান খাড়া করিয়া রাখে, বন্য পশুর মতই ঘ্রাণ লইবার জন্য টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লয়, নিঃসন্দেহ হইলে আবার পা বাড়ায়।

এইভাবে পাথরগুলি ডিঙ্গাইয়া তাহারা চলে। এক জায়গায় পাহাড়ের গা বেশ ঢালু, চলা কঠিন, পা টিপিয়া টিপিয়া ইহারা চলে। হঠাৎ লালধনের পায়ে লাগিয়া এক টুকরা পাথর গড়াইয়া নীচে পড়ে—সামান্য একটু আওয়াজ হয়, পর মুহূর্ত্তে হাত তিরিশেক দূরের জঙ্গল হইতে বিরাটকায় এক দু'ডালের হরিণ তাহাদের পাশ দিয়া হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যায়। পিছনে ছিল মিতান, সে লালধনের মাথায় একটা চাটি মারে—লালধন লজ্জিত হইয়া পড়ে—শিকারীর পক্ষে এহেন অসাবধানতা অমার্জ্জনীয়, মস্ত বড় একটা শিকার নাকের কাছ দিয়া ফস্কাইয়া গেল।

এতক্ষণে ভোরের কাঁচা রোদ অরণ্যলোকে আসিয়া ঢালিয়া পড়িয়াছে। শিকারীরা এইবার আরও নীচে নামিয়া পাহাড়ের গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ পাহাড়ের গোড়াতেই

ন ক্রমে গভীর, শিকারী তিন জন আরও সাবধানে চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে এক একটা সরু নালা পাহাড় হইতে নামিয়া নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে, বর্ষার সময় পাহাড়ের জল এই পথে নীচে নামে। এক নালাগুলির দু'পাশের গাছপালা মাথায় মাথায় ঠেকিয়া যায়, নীচে নামিলে মনে হয় যে একটা ঢাকা পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক হিসাবে এগুলি পথই বটে, গা ঢাকা দিয়া নিঃশব্দে চলাফেরার জন্য বড় বাঘ এই সব নালা-পথই বেশী পছন্দ করে। কয়েকটা নালা পার হইয়া গিয়া তাহারা আর একটা নালায় গিয়া নামে। সামনে ছিল উতুম মাঝি, নালায় নামিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হটিয়া আসে, পিছনের দুই জনও দাঁড়াইয়া যায়, কি ঘটিয়াছে তাহা উতুমের অঙ্গভঙ্গী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারে। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহারা আবার নালায় গিয়া নামে, তার পরে হেঁট হইয়া নালার বালি পরীক্ষা করে। উতুম ঠিকই দেখিয়াছে, ভুল করে নাই, বালির উপরে পরিষ্কার বাঘের পায়ের ছাপ। মস্ত বাঘ, বড় বড় পাঞ্জাগুলি বালিতে বসিয়া গিয়াছে, সে কিছুক্ষণ আগেই নীচে হইতে নালার উপরের দিকে গিয়াছে। তিন জনে আবার নালা হইতে উপরে উঠিয়া আসে, উতুম মাথার উপরে হাত ঘুরাইয়া একটা হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী করে, অর্থাৎ ফিরিয়া চল, এই পথে যখন বড় বাঘ একটু আগে চলাফেরা করিয়াছে তখন হরিণের নামগন্ধ এদিকে নাই।

তাহারা সামনের দিকে আর অগ্রসর হয় না, আরও নীচে নামিয়া আসে, সেখানে ভূমি উঁচুনীচু, উপরকার সরু নালাগুলি সেখানে আসিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জঙ্গলও গভীর। কান খাড়া করিয়া তাহারা খুব ধীরে ধীরে চলে, সামান্য শব্দ শুনিলেই স্থির হইয়া দাঁড়ায়, শব্দের কারণটা অনুমান করিয়া লয়, আবার চলিতে সুরু করে। বেলা অনেক বাড়িয়া যায়, ইহাদের উৎসাহের যেন কিছুমাত্র কমতি নাই, শিকার করিতেই হইবে, ইহারা যেন অধৈর্য্য হইতে জানে না।

একটা খাদের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ তিন জনেই একসঙ্গে দাঁড়াইয়া যায়—কান পাতিয়া কি যেন শোনে, তিন জনের মুখেই একটা উল্লাসের ভাব ফুটিয়া উঠে। মিতান এক টুকরা পাথর কুড়াইয়া লইয়া অরণ্য-সঙ্কুল খাদের মাঝখানে ছুঁড়িয়া মারে, তৎক্ষণাৎ কয়েকটা হ্রস্ব অনুনাসিক আওয়াজ ভাসিয়া আসে। মিতান সোৎসাহে ঘাড় নাড়ে, অর্থাৎ—ঠিক অনুমান করিয়াছি। তার পর বলা-কহার প্রয়োজন হয় না, ধনুকে তীর লাগাইয়া লালধন যায় বাঁয়ে, মিতান যায় ডাইনে, উতুম সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কাটিয়া যায়, খাদের বাঁ দিক হইতে একটা তিতিরের ডাক শুনা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ডান দিক হইতেও একটা তিতির ডাকিয়া ওঠে। উতুম সাবধানে খাদের দিকে নামিয়া আসে, বড় বড় কয়েকখানা পাথর কুড়াইয়া লয়, বিকট ভাবে চেঁচাইয়া ওঠে ও ধপাধপ পাথর ছুঁড়িয়া মারে। পাথরগুলি গাছপালার উপর পড়িতেই খাদের মাঝখানে একটা ছুটোপাটি সুরু হয়। এক দল বড় জানোয়ার হুড়মুড় করিয়া পালাইতে থাকে। হঠাৎ বাঁ দিকে কর্কশ চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায়, কি যেন বার দুই-তিন গোঙাইয়া ওঠে, তার পরে আবার সব চুপ হইয়া যায়। উতুম তাড়াতাড়ি ওদিকে দৌড়াইয়া যায়, একটু ঘুরে গিয়াই চেঁচাইয়া ওঠে, 'সাবাস'—লালধন প্রশংসা পাইবার মত কাজ করিয়াছে বটে, একটা মস্ত বুনো শুয়োরকে তীর মারিয়া এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া দিয়াছে। মিতানও আসিয়া উপস্থিত হয়, আহ্লাদে মৃত শুয়োরটাকে উদ্দেশ করিয়া একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়া ওঠে।

শুয়োরটার চার পা লতা দিয়া বাঁধে, একটা শক্ত কাঠে ঝুলাইয়া অদল-বদল করিয়া তিন জনে সেটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া চলে।

বেলা তখন প্রায় দুপুর। শিকার লইয়া শিকারীরা পল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক মণ দেড় মণ ওজনের শুয়োরটা ওঠা-নামার পথ দিয়া বাহিয়া আনা যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ। সোমর মাঝির ঘরের সামনে সেটা নামাইয়া রাখিয়া তিন জনে মাথার ঘাম মোছে। উতুম ডাকে—সোমর এ সোমর। সে ডাকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। উতুম আর একটু গলা চড়াইয়া ডাকে 'এ সোমর ভাই, একটু হাত লাগিয়ে দে এসে, আমরা আর বইতে পারছি নে।' এবারেও সে ডাকের কোন সাড়া আসে না। লালধন ঝাঁপের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারে, আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'ঘরে তো কেউ নেই'। উতুম আর মিতান আগাইয়া আসে, দরজা ঠেলিয়া আঙিনায় ঢুকিয়া অবাক হইয়া যায়, সোমর মাঝির ঘর শূন্য, লোকও নাই, জিনিষপত্রও নাই।

ইতিমধ্যে শিকার দেখিয়া সেখানে শিশু ও স্ত্রীলোকের দল আসিয়া জমে। উতুম প্রশ্ন করে, 'সোমর মাঝির ঘরটা খালি কেন—কথাটা কি?'

এক সঙ্গে অনেকেই বলে, 'আজ সকালে সে তার বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে।' এই সন্দেহ উতুমও করিয়াছিল।

আজ সোমর গিয়াছে, কাল আর কেহ যাইবে, বন যেখানে নাই—সাঁওতাল সেখানে কেমন করিয়া থাকিবে?

উতুম চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়িতে থাকে।

১৫

জঙ্গলের মধ্যে এখানে-ওখানে বহু পিয়াল গাছ, পিয়াল ফল পাকিয়া কালো আঙুরের মত থোলো থোলো ঝুলিয়া আছে, ছোট একটি ঝুড়ি লইয়া ফুলি সেই পাকা ফল সংগ্রহ করে। পরনে তাহার একখানি মোটা আর খাটো লাল সাড়ী, চুলে একরাশ বনফুল গোঁজা। ফুলি পিয়াল ফল তোলে, গুন গুন করিয়া গান করে। আবার মাঝে মাঝে দুই-একটা ফল মুখে ফেলিয়া দেয়। একটা গাছ শেষ করিয়া সে আর একটা গাছের কাছে যায়; ঝুড়িটি মাথার উপর রাখিয়া এক হাতে ডাল ধরিয়া টানিয়া নামায় আর এক হাতে ফলগুলি ছাড়াইতে থাকে। হঠাৎ পিছন দিকে দুম

করিয়া একটা আওয়াজ হয়—ফুলি ভীষণ চমকাইয়া ওঠে, মাথার উপর হইতে ফলভর্ত্তি ঝুড়িটি পড়িয়া যায়—সে বিদ্যুদ্‌বেগে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। প্রভাত হাসিতে থাকে। ফুলি ভয় ও বিরক্তিতে ভুরু দুটি কুঁচকাইয়া প্রভাতের দিকে তাকায়, তার পর হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

প্রভাত বলে, 'খুব ভয় পেয়েছিলি ?'

ফুলি মাথা নাড়িয়া জানায়, সে মোটেই ভয় পায় নাই।

প্রভাত বলে, 'অথচ লাফ দিয়ে উঠলি আর তোর মাথার ঝুড়িটা পড়ে গেল।'

ফুলি এতক্ষণে তাহার সম্পত্তির অবস্থাটা চাহিয়া দেখে—ঝুড়িটা একদিকে কাত হইয়া আছে আর পিয়াল ফলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ফুলি গম্ভীর হইয়া বলে 'তুই লোক ভাল না সাহেব, আমার সব পিয়াল ফল নষ্ট করে দিলি।'

প্রভাত হাসিয়া বলে, নষ্ট হয় নি, আবার কুড়িয়ে নে।

ঝুড়িটা টানিয়া লইয়া ফুলি ছড়ানো ফল কুড়াইতে বসে, বলে—তা আমি জানি সাহেব।

প্রভাত বন্দুকটা পাশে রাখিয়া সেখানে বসিয়া পড়ে, চাহিয়া চাহিয়া ফুলিকে দেখে, তাহার চালচলন খুব নূতন ধরণের লাগে। মেয়েটা কত সাহসী আবার কত সরল। শিক্ষা বা সভ্যতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই অথচ অশ্লীল বা অশোভন নয়! ইহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভাত একেবারে অনভিজ্ঞ, সেইখানে তাহার মুশকিল। কোন্ কথাটা বলা চলে বা চলে না, কোন্ ব্যবহারটা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত তাহা সে জানে না, তাই সে এই মেয়েটার কাছে সহজ হইতে পারে না। অথচ এই স্থান ও কালে কোন সভ্যসমাজের মেয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইলে সে একটুও অস্বস্তি বোধ করিত না, বরং সে অবস্থায় ঘটনা যে পথে চলিত তা সে অনুমান করিয়া নিজে নিজেই হাসিতে থাকে।

ফুলি এদিক-ওদিক ঘুরিয়া নিপুণভাবে ফলগুলি কুড়াইয়া চলে। প্রভাত মনে মনে স্বীকার করে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে একটি অপূর্ব্ব ছন্দ আছে, সভ্য প্রভাতের অভিধানে যাহাকে রূপ বলে তাহা অবশ্য ইহার নাই, তবুও ইহার একটা এমন কিছু আছে যাহা রূপ না হইলেও রূপের চেয়ে কম নহে, সেটা হয় ত মাধুর্য্য হইতে পারে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোর নাম কি ?

ঘাড় ফিরাইয়া ফুলি প্রভাতের দিকে তাকায়, তার পরে একটু হাসিয়া বলে, 'আমার নাম ফুলি'।

প্রভাত আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ফুলি ! এ যে বাঙ্গালীর নাম।

ফুলি উত্তর দেয়, হাঁ সাহেব, আমার মা, বাবা বাঙ্গলামুলুকে অনেক দিন ছিল।

প্রভাত উৎসাহিত ভাবে প্রশ্ন করে, 'আর তুই ?'

ফুলি হাসিয়া বলে, না সাহেব, আমি জন্মেছি এই জঙ্গলে। তার পরে একটু থামিয়া বলে, তোর তো বাংলামুলুকে ঘর।

প্রভাত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'তুই জানলি কেমন করে ? আমার কপালে তো লেখা নাই—আমি বাঙালী।'

ফুলি হাসিতে হাসিতে বলে, 'আমি জানি।'

ভাবটা এতক্ষণে সহজ হইয়া আসে, প্রভাত বলে, তোকেও বাঙালীর মেয়ের মত দেখায়।

ফুলি সবেগে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দেয়, 'না, আমি সাঁওতালী। কিন্তু বাংলামুলুক আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে, বাপ-মায়ের কাছে ওদেশের অনেক গল্প শুনেছি। খুব ভাল দেশ না সাহেব ?'

প্রভাত উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'খুব ভাল দেশ, অমন দেশ আর নাই।'

পিয়াল ফলের ঝুড়িটি আবার ভর্ত্তি করিয়া ফুলি উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রভাতের দিকে ফিরিয়া একটু হাসে, তার পরে চলিতে সুরু করে। প্রভাত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, বলে, 'তুই চললি নাকি ? তোর ফল তোলা হয়ে গেল।'

ফুলি দাঁড়ায়, বলে, 'হাঁ সাহেব, ঘরে যাব, আর বেশী বেলা নাই।'

প্রভাত বন্দুকটা কাঁধে ফেলিয়া বলে, তুই তো এক ঝুড়ি ফল নিয়ে ঘরে চললি, আমি কি খালি হাতে ফিরব ?'

ফুলি চট করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, বলে, এক জোড়া ঘুঘু মার সাহেব, আমি দেখি।

প্রভাত উৎসাহিত হইয়া উঠে, বলে, 'ঠিক কথা বলেছিস, তুই না থাকলে ঘুঘু খুঁজে দেবে কে ? একটু দাঁড়া আমি এখনই একজোড়া ঘুঘু মারছি।' প্রভাত সাগ্রহে উপরের দিকে তাকাইয়া গাছের ডালে ঘুঘু খোঁজে—ফুলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

প্রভাত অপ্রস্তুত হইয়া বলে, 'হাসলি কেন ?'

ফুলি হাসিতে হাসিতে বলে, 'এই তো একটু আগে তুই বন্দুক চোট করেছিস, এখানে গাছের ডালে পাখী পাবি কোথায় ? কাছাকাছি একটা পাখীও পাবি না সাহেব।'

কথাটা ঠিক, প্রভাত লজ্জিত হইয়া পড়ে, এই সাধারণ জিনিষটা সে খেয়াল করে নাই।

ফুলি বলে, আয় আমার সঙ্গে, তোকে ঘুঘু দেখিয়ে দেব।

মাথার উপর ঝুড়িটি বসাইয়া ফুলি আগে আগে চলে, প্রভাত চলে তাহার পিছনে। ফুলির চলিবার ভঙ্গীটি প্রভাতের ভারি ভাল লাগে, কোমরে আঁচল জড়ানো, মাথার উপরের ঝুড়িটি ধরিবার প্রয়োজন হয় নাই, দুটি হাত দু'পাশে চলার ছন্দে দোল খায়, গ্রীবা একটু বাঁকাইয়া ফুলি হাল্কা ভাবে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়। খানিকটা দূরে গিয়া ফুলি দাঁড়ায়, ঝুড়িটি মাথার উপর হইতে নামাইয়া লইয়া উপরের দিকে তাকাইয়া দেখে। একটু খোঁজাখুঁজি করিতেই একটি উঁচু শাল গাছের ডালে একজোড়া ঘুঘু দেখিতে পায়, আঙুল দিয়া প্রভাতকে দেখাইয়া নিঃশব্দে পিছনে হটিয়া আসে। প্রভাত টোটা ভরিয়া সাবধানে বন্দুক তুলিয়া নিশানা করে,

ফুলি উদ্গ্রীব হইয়া প্রভাতের প্রত্যেক কাজ লক্ষ্য করে, তাহার মুখ-চোখ প্রবল উত্তেজনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হয়, দুটি ঘুঘুই একসঙ্গে পাক খাইয়া নীচে আসিয়া পড়ে। ফুলি ছুটিয়া যায়, কোমরে জড়ানো ছোট আঁচলখানি খুলিয়া যায়, চুলের ফুলগুলি খসিয়া পড়ে, সেদিকে তাহার কিছুমাত্র খেয়াল থাকে না, গাছের নীচেকার শুকনো ঘাসপাতা ও ছোট আগাছার মধ্যে ঘুঘু দুটিকে খুঁজিয়া বেড়ায়। একটু পরে দুটিকেই পায়, হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রভাতের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, খুশীতে সে একেবারে ভরপুর। প্রভাত অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে—তাহার এলোমেলো চুল, তাহার উজ্জ্বল চোখ, অঞ্চলমুক্ত পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী এক মুহূর্তের জন্ম প্রভাতের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কি যেন বলিতে চায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লয়, হাসিয়া বলে, 'যাক দুটোই খুঁজে পেয়েছিস।'

ফুলির উত্তেজনায় তখনও ভাটা পড়ে নাই, বলে, তোর বন্দুকে যাদু আছে সাহেব, এক চোটে দুটো পাখী মেরে ফেললি।'

শুনিয়া প্রভাত হাসে। বলে, এ দুটোর একটা তোর।

ফুলি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানায়, বলে, না সাহেব আমি নেব না।

প্রভাত রাজী হয় না। বলে, তুই না নিলে আমি পথে একটা ফেলে দেব—কে খাবে দুটো পাখী ?

ফেলিয়া দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়, ফুলি তাই একটা ঘুঘু লইতে রাজী হয়।

এতক্ষণে ফুলি প্রকৃতিস্থ হয়, আঁচল টানিয়া আবার কোমরে বাঁধে, চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দেয়। তার পরে কলের ঝুড়িটি মাথায় তুলিয়া হাতে ঘুঘুটি ঝুলাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া যায়।

প্রভাত অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে।

১৬

—এত বড় মজার ব্যাপার, আজকাল প্রায় রোজই তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে ?

—তা কেন হবে না সাহেব, জঙ্গল তো কেটে তোরা শেষ করে দিয়েছিস—যেটুকু আছে তাতে দুটো মানুষ ঘোরাফেরা করলে দেখা হবেই।

নালার ধারে একটা পলাশগাছ কাত হইয়া জন্মিয়াছে, মোহনারের মোটা মোটা লতা সেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহাদের বড় বড় পাতায় গাছটা প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সেই গাছটার একটু অনুচ্চ ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ফুলি বাছিয়া বাছিয়া মোহনারের বড় বড় পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। সামনের একটা গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া প্রভাত সিগারেট টানে।

প্রভাত বলে, কিন্তু তোর বস্তির আর কারু সঙ্গে ত দেখা হয় না।

কথাটা শুনিয়া ফুলি প্রভাতের মুখের দিকে না তাকাইয়াই বলে, আমায় বস্তিতে লোকই বা ক'টা, অনেকে ত চলে গেছে, তা ছাড়া —ফুলি থামিয়া যায়।

প্রভাত আশ্চর্য্য হইয়া ফুলির মুখের দিকে তাকায়, বলে, 'থেমে গেলি কেন ? তা ছাড়া কি ?'

—তা ছাড়া আমাদের বস্তির সাঁওতালরা তোর উপর কেউ খুশী নয়।

—কেন ?

মারাংবির কেটে সাফ করে ফেললি সাহেব, তুই সাহেব সাঁওতালের দুশমন।

কথাটা শুনিয়া প্রভাত চুপ করিয়া থাকে, সাঁওতালদের সঙ্গে শত্রুতার হেতুটা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, আজ পর্য্যন্ত কোন সাঁওতালের সে ক্ষতি করে নাই—অথচ সেদিন লালধনও এই ধরণের কথা তাহাকে বলিয়াছিল। জলের সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ, অরণ্যের সঙ্গে সাঁওতালের যে সেই সম্বন্ধ—প্রভাতের পক্ষে তাহা বোঝা অসম্ভব।

হঠাৎ প্রভাত প্রশ্ন করে, 'তা তুই আমাকে দেখে পালাস না কেন ? আমার সঙ্গে কথা বলিস কেন ?'

ফুলি কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না, তারপরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, 'আমার খুশী।'

প্রভাত সিগারেটটা শেষ করিয়া প্রান্তটুকু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ফুলি সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দূরের পাতাগুলি হাত বাড়াইয়া ছেঁড়ে, প্রভাত সেই সুন্দর ভঙ্গীটি তাকাইয়া দেখে। আভরণহীন সুডোল নগ্ন কালো বাহুটির তৎপরতা আর ঐ সব সময় খুশীর ভাব, সেটা কি আশ্চর্য্য ! বসন নাই, ভূষণ নাই, আহার বোধ করি পুরাপুরি নাই, অথচ কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হাসি। প্রভাত ভাবে, মেয়েটার মনে বোধ হয় আনন্দের একটা অবিরাম উৎস আছে। প্রভাতের তৃষিত দৃষ্টিটা ফুলি অনুভব করে, ঘাড় বাঁকাইয়া প্রভাতের দিকে তাকায়। প্রভাত তাহাতে বিব্রত হয় না, তাহার দৃষ্টির অর্থটা লুকাইবার চেষ্টা করে না। ফুলি মুখ ফিরাইয়া লয়, বলে, 'সাহেব, তুই এদেশ থেকে চলে যা।'

প্রভাত আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে, 'কেন ?'

—তুই চলে গেলে জঙ্গল থাকবে।

—আমি চলে গেলে আর একজন এসে জঙ্গল কাটবে।

—তা কাটুক, তুই ত কাটবিনে !

প্রভাত হাসিয়া উঠে, এ তো মজা মন্দ নয়। বলে, 'আর এক জন কাটলে দোষ নেই, আমি কাটলেই দোষ !'

—যে জঙ্গল কাটে সে যে দুশমন হয়।

—তা হলে আমি তোর দুশমন ?

ফুলি অনেকক্ষণ প্রভাতের প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না, তারপরে হঠাৎ হাসিয়া উঠে।

লণ্ডনের এলবার্ট হলে এঞ্জেলম্যান ও বি-বি-সি'র
প্রমনেড প্রোগ্রামের শ্রোতৃবৃন্দ

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের নূতন দপ্তরখানার কাফেস্থিত
বুলেটিন বোর্ডে শ্রীমতী বাসিল সিং (নিউ দিল্লী) ও ক্লারা চিউ (চীন)

প্রজাতন্ত্র-দিবসে নিউ দিল্লীতে সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ। উপরে ভারতে নির্মিত ছয়টি বিমান

প্রজাতন্ত্র-দিবসে নিউ দিল্লীতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বাজার এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণসহ কুচকাওয়াজ
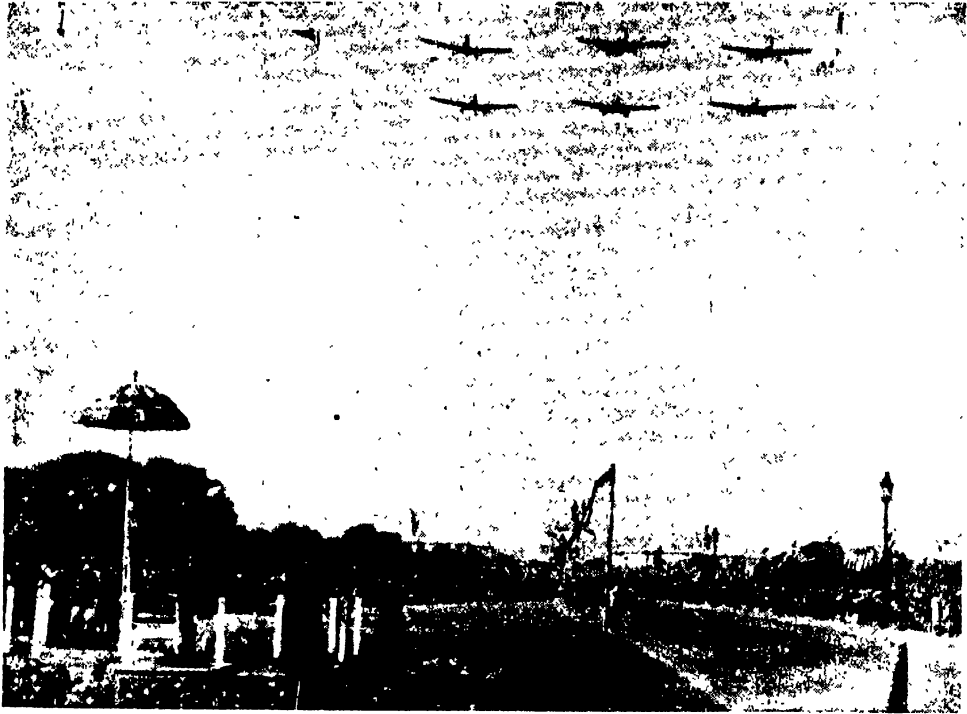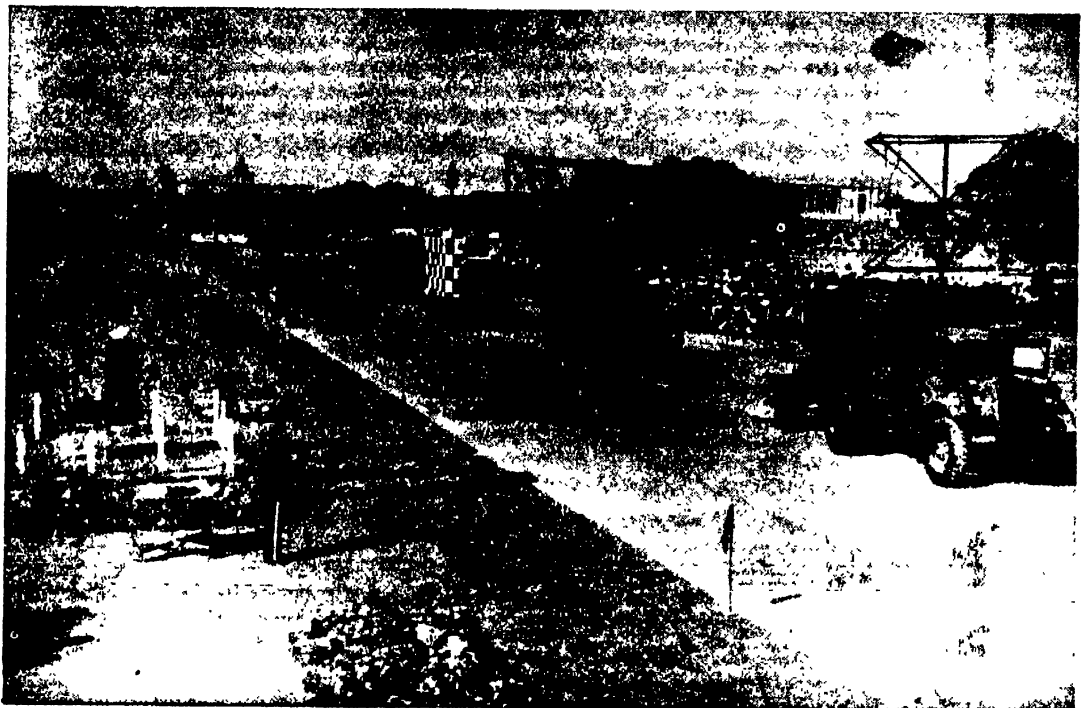
গাছতলা ক্রমে মোহনারের পাতায় ভরিয়া যায়, প্রভাত বলে, এত পাতা দিয়ে কি হবে?'

ফুলি বলে, 'হাটে নিয়ে বেচবো।'

প্রভাত হাসিয়া বলে, 'মেয়েটা তামাশা করতেও জানে দেখছি।'

ফুলি বলে, 'না সাহেব, তামাশা নয়, সত্যিই হাটে নিয়ে বচবো, তা না হলে এত কষ্ট করে এত দূরে এসেছি পাতা নিতে।'

প্রভাত বলে, 'কিনবে কে? পাতা দিয়ে হবে কি? জঙ্গলের দশে আবার পাতায় অভাব।'

ফুলি জবাব দেয়, 'তা ঠিক সাহেব, জঙ্গলের দেশে পাতার অভাব াই, এত পরিশ্রম করেও যা পাব তা এক সের নুনু'র (লবণ) দাম।

—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এতে হবে কি?

—বর্ষা এসে পড়ল, বাঁশের ছাতা ছাওরা হবে সাহেব, বাঁশের ছাতা দেখ নি?

এতক্ষণে প্রভাতের খেয়াল হয় পাতা দিয়া ছাওয়া বাঁশের ছাতা সে দখিয়াছে। এদেশে গরীব লোকে সকলেই সেই ছাতা ব্যবহার করে।

মোহনারার পাতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়, ফুলি হাত গুটাইয়া রিয়া বসে। সে যখন পলাশগাছের ডালটায় উঠিয়াছিল তখন ভাত উপস্থিত ছিল না, এখন প্রভাতের সামনে বেহায়ার মত ামিয়া আসিতে চায় না, ডালে বসিয়া পা ঝুলাইয়া থাকে।

প্রভাত ব্যাপারটা আঁচ করিয়া ফুলির সামনে গিয়া বলে, 'আমি তাকে ধরে নামিয়ে দিচ্ছি।'

ফুলি ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না সাহেব, আমি নিজেই পারব—তুই রে যা।'

প্রভাত সেকথা কানেই তোলে না, বলে, তুই নামতে পারবি নে, ড়ে যাবি, আমি তোকে ধরে নামিয়ে দিচ্ছি।

ফুলি আবার বলে, 'আমি ঠিক নামতে পারব—তুই সরে যা।'

প্রভাত সেকথার কোন উত্তর দেয় না, একেবারে কাছে গিয়া লির বাহু দুটি ধরিয়া ফেলে, কিন্তু ফুলির মুখের দিকে চাহিতেই সে াশ্চর্য্য হইয়া যায়। আসলে গাছের অন্তরালে ফুলি যেন কি দখিতে পাইয়াছে—তাহার চোখ দুটি বিস্ফারিত, মুখের হাসি কাথায় মিলাইয়া গিয়াছে—তাহার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া গয়াছে। হঠাৎ প্রভাতকে সবলে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ফুলি লাফ য়া ডাল হইতে নামিয়া পড়ে, প্রভাত রীতিমত ভড়কাইয়া য়, বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলিয়া লয়।

ফুলি কিন্তু ছুটিয়া পালায় না অথবা চেঁচামেচিও করে না, সে াভাতকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে গাছের ীচে বসিয়া স্তূপাকার পাতাগুলি একটির পর একটি করিয়া গুছাইয়া াইতে থাকে।

প্রভাত ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারে না, ভিতরে অস্বস্তি াধ করে। কিন্তু একটু পরে যখন একটা পলাশগাছের আড়াল ইতে লালধন বাহির হইয়া সিধা তাহাদের দিকে চলিয়া আসে খন রহস্যটা পরিষ্কার হইয়া যায়।

লালধনও তাহাকে উপেক্ষা করে, সে আসিয়া ফুলির সামনে দাঁড়ায়। ফুলির মুখের ভাব আগের মত শান্ত, সে লালধনের উপস্থিতি একটুও টের পায় নাই, নিজের মনে পাতা গুছাইয়া চলে।

লালধনের কালো মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর, সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ফুলির সামনে দাঁড়াইয়া থাকে, তারপরে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তুই এখানে কি করছিস?'

ফুলি কোন জবাব দেয় না, আপনার কাজ করিয়া যায়। লালধন অসহিষ্ণু হইয়া উঠে বলে, 'কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস নে বুঝি।'

এতক্ষণে ফুলির সমস্ত গাম্ভীর্য্য ভাসিয়া চলিয়া যায়, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

এইবার লালধন রাগিয়া উঠে, ঝাঁঝালো ভাবে বলে, 'এত হাসি কেন?"

হাসিতে হাসিতে ফুলি বলে, 'হাসবই বা না কেন? দেখতে পাচ্ছিস কি করছি, তবে বারে বারে জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

উত্তর শুনিয়া লালধনের রাগটা কমে না, বরং বাড়িয়া যায়, বলে, 'গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে বড়বনে না গিয়ে তুই একা এদিকে এলি কেন?'

ফুলি জবাব দেয়, 'ওদের আমি এদিকে আসতে বলেছিলাম, ওরা এল না, তাই আমি একাই চলে এলাম।'

লালধন তেমনি ঝাঁঝালো ভাবেই বলে, 'সেই দুপুর থেকে আমি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, পারলি লুকিয়ে থাকতে?'

ফুলি সহজ ভাবে উত্তর দেয়, জঙ্গল আজকাল এতটুকু, চেঁচিয়ে ডাকলেই আমি সাড়া দিতাম।'

—দিতিস নাকি?

—দিতাম বই কি।

দুই জনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, লালধন এসব যুক্তির ধার ধারে না, প্রশ্ন করে, বল, বড় বনে না গিয়ে তুই এদিকে আসিস কেন?

ফুলি মুখ তুলিয়া লালধনের দিকে তাকায়, কি একটা জবাব দিতে গিয়া আর দেয় না। লালধন আরও জোর দিয়া প্রশ্নটা আবার করে, 'বল তুই কেন এদিকে আসিস।'

এইবার ফুলি জবাব দেয়, 'সে আমার খুশী।'

জবাব শুনিয়া লালধনের কালো মুখখানা আরও কালো হইয়া যায়।

একটা লতা দিয়া পাতার বোঝাটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফুলি উঠিয়া দাঁড়ায়, লালধনকে বলে, 'দে বোঝাটা মাথায় তুলে।'

লালধন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে, সেকথায় কান দেয় না।

ফুলি বলে, 'বেশ ভারী হয়েছে, দে তুলে মাথায়।'

লালধনের দিক হইতে কোন সাড়া আসে না। হঠাৎ সাবলীল ভঙ্গীতে ফুলি ভারি পাতার বোঝাটা দু'হাতে ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া মাথার উপর তুলিয়া লয়, বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুরিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। লালধন যেমন দাঁড়াইয়াছিল কিছুক্ষণ তেমনিই দাঁড়াইয়া থাকে, তারপরে ফুলির পথ ধরিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যায়।

প্রভাত এতক্ষণে যেন সজাগ হইয়া উঠে, সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরায়। ক্রমশঃ

রাজা গণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৪০৯-১৪২১ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়বঙ্গের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহা বাঙালীর পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই সময়ে তিন জন হিন্দুরাজা হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বহুকাল পরে গৌড়বঙ্গে স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তিন জনের নাম গণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব। দুঃখের বিষয়, হিন্দু-সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়া এবং মুসলমান-সূত্র হইতে প্রাপ্ত প্রাচীনতর তাবাকাৎ-ই-আকবরী (১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ), আইন-ই-আকবরী (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও তারিখ-ই-ফিরিস্তির (১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ) বিবরণ অপেক্ষা বহু পরবর্ত্তী কালের রিয়াজ-উস-সালাতিনের (১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) বিবরণকে প্রাধান্য দেওয়ায় ব্লকম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া রিয়াজের ইংরেজী অনুবাদক আবদুল সালাম, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মিঃ ষ্টেপলটন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ রাজা গণেশ ও তৎপুত্র জালাল উদ্দিন সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাতে সুবিচার করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া ডঃ ভট্টশালী তাঁহার *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal* (1922) নামক গ্রন্থে রিয়াজের বিবরণের উপর নির্ব্বিচারে নির্ভর করিয়া রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনদেবকে এবং জালাল উদ্দিন ও মহেন্দ্রদেবকে অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অধুনা-প্রকাশিত (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) *History of Bengal* Vol. II-এর ১২০-১২৮ পৃষ্ঠায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় ডঃ ভট্টশালীর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনদেবকে অভিন্ন স্থির করায় এবং রাজা মহেন্দ্রদেবকে রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া অভিনব মত প্রকাশ করায় সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। আমাদের মতে মুসলমান ও হিন্দু-সূত্র হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের যথাযথ বিচারপূর্ব্বক ঐ সমস্ত বিষয়ে সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করার সময় আসিয়াছে। আমরা এক্ষণে সাধ্যমত সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে হিন্দু-সূত্র হইতে যে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(১) "যশঃ প্রসূনে স্ফুটিতে নৃসিংহ নাম্নঃ তদা মাদ্গুবরাজকস্য।
তদ্গন্ধ সন্দোহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥৩৬
কায়স্থ বংশাগ্র্যঃ বরগুণজ্ঞো লোকানুকম্পী বরধর্ম্মযুক্তঃ।
দাতা-সুধীরো জনরঞ্জকশ্চ শ্রীবিষ্ণুপাদাম্বুজযুগ্মানুরক্তঃ ॥৩৭
দূতৈস্তমানীয় নিজস্থধাম্নি দিনাজপুরে বহুসত্ত্বযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহ লাড়ুলীত্যুপাধৌ সমস্ত মন্ত্রিত্বমবাপ তত্রং ॥ ৩৮
তদ্বুদ্ধি চাতুর্য্যবলেন রাজা শ্রীমান গণেশো বরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্থপালান্ যবনাত্মজান্ হি জিত্বাচ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥ ৩৯
গ্রহপক্ষাক্ষি শশধৃক্ মিতে শাকে স বুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনান্ জিত্বা গৌড়েকচ্ছত্রধৃগভূৎ ॥ ৪০
(১৪০৯ শক ইং ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস রচিত "শ্রীবাল্যলীলা সূত্রং"*)

অর্থাৎ, "তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ নৃসিংহের যশঃপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার সৌরভে বিমোহিত হইয়া কায়স্থ বংশের অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ জন-সেবক, গুণজ্ঞ, ধার্ম্মিক, দাতা, সুধীর জনরঞ্জক, বিষ্ণুভক্ত রাজা গণেশ দূত পাঠাইয়া বহুসভ্যযুক্ত নিজধাম দিনাজপুরে সেই নৃসিংহ লাড়ুলীকে আনাইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করতঃ মঙ্গললাভ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার চাতুর্য্যবলে শ্রেষ্ঠ দস্যুসদৃশ যবনাত্মজ গৌড়াধিপগণকে জয় করিয়া গৌড়েশ্বরতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২৯ শকে (১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ=৮১৪ হিঃ) গণেশ যবনগণকে জয় করিয়া গৌড়ে একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিলেন।

(২) সেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥
(১৪৯০ শকে—১৫৬৮ খ্রীঃ রচিত ঈশান নাগরের "অদ্বৈতপ্রকাশ")

(৩) শ্রীমান্দনুঃ স [গজদন্ত †] সুতোঽভিবেল
স্বৈ স্বৈ গুণৈ [সকল রাজগণাগ্রগণ্যঃ]।
[স্বস্যৈব] সা নিজভুজপ্রবিণার্জ্জিত শ্রীঃ
শ্রীরায় রাজ্যধর নাম পদং প্রপন্নঃ ॥৩
সৈন্যাধিপত্যমিত সৈন্ধব তূর্য্য শঙ্খ—
ছত্রাবলী ললিত কাঞ্চন রূপ্য [দণ্ড]
[শয্যাসনাদিকং] দানং বহুভূষণঞ্চ
জমালদীন নৃপতি মুদিতো গুণৌঘৈঃ ॥৪
যো ব্রহ্মাণ্ড কনকতুরগ সপ্তনং বিশ্বচক্রং
পৃথ্বীং কৃষ্ণাজিনং সুবর্ণকরণ ধেনুং শৈলোদরীং চ।

---

* অদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত শ্রীমুরলীমোহন গোস্বামীর নিকট "শ্রীবাল্যলীলা সূত্রং" এর যে হস্তলিখিত পুঁথি ছিল তাহা হইতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি তিনি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা ১৩২০ সালে আমার "বগুড়ার ইতিহাসের" দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তৎপর ১৩২২ সালে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় ঢাকা উথলি নিবাসী অদ্বৈতবংশীয় শ্রীনাথ গোস্বামী সংগৃহীত অপর একখানি হস্তলিখিত "শ্রীবাল্যলীলা সূত্রং" দৃষ্টে লিপিকর-প্রমাদ সংশোধন করাইয়া ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। উহাতে "শ্রীবিষ্ণুপাদাম্বুজযুগ্মানুরক্ত" স্থলে "হরিভক্তচূড়ঃ" পাঠ দৃষ্ট হয়। রাজা গণেশ বোধ হয় ১৪০৭ খ্রীঃ দিনাজপুরের রাজপদ লাভ করেন।

† মূলে "গজদন্ত" পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু (I. H. Q, Vol. 17, P. 1449) আর, সি, হাজরার সংশোধিত পাঠ দ্রষ্টব্য। বন্ধনীর মধ্যগত অংশগুলি কীটদষ্ট হওয়ায় তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হইল।

[দধে তেজোমি] বিবদবলী দেবতানামমন্দং
ভিন্দন্ দৈন্যং সপদি দধতে ধর্ম্মসূনোরভিখ্যাং ॥৫

(বৃহস্পতি রায়মুকুট কৃত "স্মৃতিরত্নহারে"র হস্তলিখিত পুথির প্রারম্ভ শ্লোক। "Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript"—*A. S. B. III* p. 226-30 N. 2138 এবং বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হস্তলিপি সংখ্যা ৫২১৫ দ্রষ্টব্য) *

অর্থাৎ, যিনি গজদন্ত অর্থাৎ গণেশের পুত্র, যিনি নিজভুজবলে শ্রীরায়রাজ্যধরপদ (রাজপদ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নানাগুণসমূহ দ্বারা সৈনাধিপত্য, হস্তী, অশ্ব, ছত্রাবলী, স্বর্ণ, রৌপ্যদণ্ড, বহু ভূষণ প্রভৃতিও [প্রাপ্ত হইয়াছিলেন] সেই প্রমোদিত জালাল উদ্দিন নৃপতির জয় হউক। যিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বর্ণ-অশ্ব, রথ, বিশ্বচক্র, পৃথ্বী, কৃষ্ণাজিন, সুরতরু শৈলোদরী ধেনু তেজস্বী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া তাঁহাদের দৈন্য দূর করিয়া ধর্ম্মপুত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৪) রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের উল্লেখ আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রাপ্ত হই :

"বিহায় গুণি-শেখরঃ শেখরভূমিবাসস্পৃহাং।
স্ফুরৎ-সুরতরঙ্গিণী-তট-নিবাস-পর্য্যুৎসুকঃ॥
ততো দনুজমর্দন-ক্ষিতিপ-পূজ্যপাদঃ ক্রমাৎ।
উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥" ১০

(শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর [১৪৮৮—১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ] ভ্রাতুষ্পুত্র [চন্দ্রদ্বীপ নিবাসী] জীব গোস্বামীকৃত "বৈষ্ণবতোষণী" নামক গ্রন্থে নিজের বংশ-পরিচয়ের শ্লোক।)

অর্থাৎ, রাজা দনুজমর্দ্দন যাঁহার পাদপূজা করিতেন সেই গুণিশ্রেষ্ঠ কৃতিপদ্মনাভ গঙ্গাতীরবাসী হইবার ইচ্ছায় শেখরভূমিবাস ত্যাগ করিয়া নবহট্ট [নৈহাটী] বাস করিয়াছিলেন। এই পদ্মনাভের পঞ্চ পুত্র মধ্যে কনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র কুমার। কুমারের পুত্র সনাতন, রূপ ও বল্লভ। বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। "বৈষ্ণবতোষণী"র মতে কুমার "কঞ্চিৎদ্রোহ মবাপ্য * * বংগালয়ং সংগতঃ" বঙ্গে গমন করেন। "ভক্তিরত্নাকরে"র মতে কুমার

"নিজগণ সঙ্গে বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা।"

সম্ভবতঃ রাজা দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন বলিয়াই কুমার নবহট্ট হইতে সুদূর চন্দ্রদ্বীপে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমরা উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম তন্মধ্যে এক, দুই, তিন নং প্রমাণগুলিতে রাজা গণেশ ও তৎপুত্র জালাল উদ্দিনের উল্লেখ আছে এবং ৪নং প্রমাণে রাজা দনুজমর্দ্দনের উল্লেখ আছে। ঐ সকল প্রমাণের কোথাও রাজা গণেশকে দনুজমর্দ্দন কি রাজা দনুজমর্দ্দনকে রাজা গণেশ বলা হয় নাই। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব উভয়কেই "চণ্ডীচরণপরায়ণ" বলা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্রের প্রমাণে দেখা যায় যে, তথায় রাজা গণেশকে "শ্রীবিষ্ণুপাদাব্জযুগলামুরক্ত" বলা হইয়াছে। রাজা গণেশ ও তাঁহার মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল সমসাময়িক। এই নরসিংহ নাড়িয়াল অদ্বৈত প্রভুর পিতামহ ছিলেন। অদ্বৈত বাল্যলীলাসূত্রের রচনার সময় অদ্বৈত প্রভু [জন্ম ১৪৩৪ খ্রীঃ] জীবিত ছিলেন এবং গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে তাঁহার পিতামহ ও রাজা গণেশ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের ৪নং প্রমাণের রাজা দনুজমর্দ্দন ও মুদ্রার রাজা দনুজমর্দ্দনদেব যে একই ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ সনাতন ও রূপ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। পদ্মনাভ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর পিতামহ ছিলেন। ১৪৮৮ খ্রীঃ সনাতন গোস্বামীর জন্ম ও ১৫৫৮ খ্রীঃ তাঁহার তিরোভাব হয়। সুতরাং প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া ইহার ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৫ শকাব্দ) তাঁহার প্রপিতামহ বর্ত্তমান ছিলেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে এবং পদ্মনাভের সমসাময়িক রাজা দনুজমর্দ্দনের পক্ষে ১৩৩৯ শকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করা অসম্ভব নহে। দনুজমর্দ্দন দেব ১৩৩৯ শকে [হিঃ ৮২০] পাণ্ডুনগর, [ফিরোজাবাদ] সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগাঁ হইতে ও ১৩৪০ শকে [হিঃ ৮২১] সুবর্ণগ্রাম হইতে এবং মহেন্দ্রদেব ১৩৪০ শকে [৮২১ হিঃ] পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বৈষ্ণবতোষণীর উল্লিখিত রাজা দনুজমর্দ্দন ও মুদ্রার দনুজমর্দ্দনদেব যে একই ব্যক্তি তাহা মনে করা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাক, এই দনুজমর্দ্দনদেব কে ছিলেন? ১৩২৪ সালে [১৯১৮ খ্রীঃ] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ১৭৭-১৮১ পৃঃ পর্য্যন্ত রাজা গণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান কর্তৃক বিজিত কোন জনপদে বা দেশে কোন হিন্দুরাজা নিজ নামে ভারতীয় অক্ষরে বা ভাষায় ইহার পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন করিতে ভরসা করেন নাই। গণেশ যাহা করিতে পারেন নাই, যদু যাহা করিতে পারেন নাই তাহা সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। * * * মহেন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনদেবের বংশের অধিকার চন্দ্রদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল।" অতএব রাখালবাবুর মতে এই দনুজমর্দ্দনদেবের মূল রাজ্য চন্দ্রদ্বীপে ছিল। মুদ্রা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ওয়াইজ কায়স্থ জাতির কুলপঞ্জিকা হইতে দনুজমর্দ্দনদেবের পরিচয় ও কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। [*J. A. S. B.* Old Series VOL. XLIII P. T. 1, page 206] বৃন্দাবন পুততুণ্ড মহাশয় কৃত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসের চন্দ্রদ্বীপের অন্যতম রাজা প্রেমনারায়ণের সভাস্থ ধ্রুবানন্দের কারিকার মতে চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা দনুজমর্দ্দনদেব হইতে পঞ্চম পুরুষে রাজা জয়দেব। অপুত্রক রাজা জয়দেবের কন্যার সহিত বলভদ্র বসুর বিবাহ হইয়াছিল।

বলভদ্রের পুত্র রাজা পরমানন্দ রায় দনুজমর্দ্দন হইতে ষষ্ঠ পুরুষ হইতেছেন। আইন-ই-আকবরীর মতে আকবরের রাজ্যের ঊনত্রিংশ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপের তৎকালীন রাজা জলপ্লাবনে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং কুমার পরমানন্দ রায় উচ্চ দেবমন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া ছয় পুরুষে দেড় শত বৎসর হয়। এই হিসাবে রাজা দনুজমর্দ্দনদেব (১৫৮২—১৫০=১৪৩২ খ্রীঃ, অর্থাৎ) ১৩২৯ শকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পক্ষে ১৩৩৯-৪০ শকে মুদ্রাঙ্কন করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

উপরে হিন্দু-সূত্র হইতে আমরা যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে রাজা গণেশ দিনাজপুরের রাজা ছিলেন ও রাজা দনুজমর্দ্দন-দেব চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন ইহা প্রতীত হয়।

এক্ষণে মুসলমান-সূত্র হইতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমেই বলিয়া রাখি কোন মুসলমান ইতিহাসেই রাজা দনুজমর্দ্দনদেব কি রাজা মহেন্দ্রদেবের উল্লেখ নাই। নিজামুদ্দিন আহম্মদের তবাকাৎ-ই-আকবরী, আবুল ফজলের আইন্-ই-আকবরী ও মহম্মদ কাশীম ফিরিস্তার তারিখ-ই-ফিরিস্তায় রাজা গণেশের উল্লেখ আছে। ইহারা তিন জনেই সমসাময়িক। ইহাদের মধ্যে রাজা গণেশের বংশসম্বন্ধে আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, নিজামুদ্দীনের বিবরণও সংক্ষিপ্ত। কেবল ফিরিস্তার বিবরণ কিছু বিস্তৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ১২২-২৩ পৃষ্ঠায় ঐ সকল বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। তাহার সারমর্ম এই :

(১) সুলতান সমসুদ্দিনের পিতা সৈফ উদ্দিন হামজা শাহের মৃত্যুকালে [৮১৪ হিঃ=১৪১১ খ্রীঃ] সমসুদ্দিন অল্পবয়স্ক ও অল্পবুদ্ধি ছিলেন। এই সুযোগে রাজা গণেশ রাজকোষ ও রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া প্রথমতঃ সমসুদ্দিনকে (সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ) রাজতক্তে রাখিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন এবং তিন বৎসর কয়েক মাস পর সমসুদ্দিনের মৃত্যু হইলে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(২) রাজা গণেশ মুসলমানদের সহিত সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিতেন।

(৩) রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জিৎমল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং জালাল উদ্দিন উপাধি গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের সহিত রাজ্যশাসন করেন এবং আধুনিক নৌসিরবান্ বলিয়া খ্যাত হন। তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ সুলতান হন এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ন্যায়বিচার ও দানশীলতার সহিত রাজত্ব করেন।

পূর্ব্বোক্ত তবাকাৎ-ই-আকবরী (১৫৯৩ খ্রীঃ), আইন-ই-আকবরী (১৫৯৫ খ্রীঃ), ও তারিখ-ই-ফিরিস্তার (১৬১১ খ্রীঃ) বিবরণের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। ইহাতে মনে হয় যে, ঐ তিন জন গ্রন্থকার একই আকর হইতে তাঁহাদের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবাকাৎ-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-ফিরিস্তার মুখবন্ধে যে নজির-গ্রন্থের তালিকা আছে তন্মধ্যে তারিখ-ই-বাঙ্গলার নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই তারিখ-ই-বাঙ্গলা হইতে উঁহারা সকলেই রাজা গণেশ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎকালে সুপরিচিত এই তারিখ-ই-বাঙ্গলা এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার রচনাকাল ও উপযোগিতা বুঝিতে হইলে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। হাজী ইলিয়াসের বংশীয় দ্বিতীয় নাসির উদ্দিন মহম্মদ ১৪৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন। ফিরিস্তা প্রথমতঃ তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতান সইফুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৪৮৭-৯০) পুত্র বলিয়াছেন। তৎপর তারিখ-ই-কান্দাহারীর নজির উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মতে দ্বিতীয় নাসির উদ্দিন জালাল উদ্দিন ফতে শাহের (১৪৮১-৮৭) পুত্র ছিলেন। কিন্তু তবাকাৎ-ই-আকবরীতে দ্বিতীয় নাসির উদ্দিনকে সুলতান সৈফ উদ্দিন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়াই লিখিত আছে, কান্দাহারীর মতটা লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, নিজামুদ্দীনের নিকট তারিখ-ই-কান্দাহারী ছিল না। দ্বিতীয় নাসির উদ্দিনের পর তাঁহার হত্যাকারী সমসুদ্দীন মুজাফ্‌ফর শাহ (১৪৯১-৯৩) সুলতান হন। এই মুজাফ্‌ফরের হত্যার বিবরণে ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন মন্ত্রী সৈয়দ শরিফ মক্কীর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ রাজপ্রাসাদ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। তৎপর মুজাফ্‌ফর সসৈন্যে প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হন। ফিরিস্তা এখানেও তারিখ-ই-কান্দাহারীর মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুজাফ্‌ফর হাবসীর রাজত্বকালে এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মুসলমান ও হিন্দু নিহত হইয়াছিল। পরে তারিখ-ই-আকবরীর মত উদ্ধৃত করিয়া ফিরিস্তা বলেন যে, তারিখ-ই-আকবরীর মতে জনগণ মুজাফ্‌ফর শাহের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলে আলাউদ্দীন নামক একজন সৈন্য প্রহরিগণের সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া বোল জন পাইকসহ রাত্রিকালে রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া মুজাফ্‌ফরকে হত্যা করিয়াছিল।

উপরোক্ত পরস্পরবিরোধী বিবরণ হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, ফিরিস্তার নিকট তারিখ-ই-বাঙ্গলা ব্যতীত অন্ততঃ তারিখ-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-কান্দাহারী এই দুইখানি নজির-গ্রন্থ ছিল, কিন্তু নিজামুদ্দিনের নিকট তারিখ-ই-কান্দাহারী ছিল না। স্বতন্ত্র একখানি নজির-গ্রন্থ ছিল কিন্তু তাহা ফিরিস্তার নিকট না থাকায় তাঁহাকে নিজামুদ্দিনের মত স্বতন্ত্র উল্লেখ করিতে হয়। ফিরিস্তা ও নিজামুদ্দিনকে মুজাফ্‌ফর হাবসীর বিবরণের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নজির-গ্রন্থের উপর নির্ভর করিবার হেতু এই হইতে পারে যে, তারিখ-ই-বাঙ্গলা তাঁহাদের উভয়ের নিকট থাকিলেও তাহাতে মুজাফ্‌ফর হাবসীর বিবরণ ছিল না অর্থাৎ তারিখ-ই-বাঙ্গলা ১৪৪২ খ্রীঃ গণেশের পৌত্র সমসুদ্দীন আহম্মদের মৃত্যুর পরে ও ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত ও সমাপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত তিনখানি প্রাচীন মুসলমানী ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রায়

দুই শত বৎসর পরবর্ত্তী মুন্সী শ্যামপ্রসাদ ও রিয়াজ-উস-সালাতিনের বিবরণের তুলনা করা যাক। রিয়াজের রচয়িতা গোলাম হোসেন সলিম জেদ্দেপুরী ইংরেজ কোম্পানীর আমলে মালদহের ডাকমুন্সী ছিলেন ও কোম্পানীর মালদহস্থ কুঠীর বড়সাহেব জর্জ্জ আডনির আদেশে ১৭৮৭ খ্রীঃ এই ইতিহাসখানির সঙ্কলন করেন। প্রায় এই সময়ে মেজর ফ্রাঙ্কলিনের অনুরোধে মুন্সী শ্যামপ্রসাদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানি হস্তলিখিত ইতিহাস-পুস্তক হইতে বুকানন হ্যামিল্টন ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দিনাজপুরের বিবরণে রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুন্সী শ্যামপ্রসাদের গ্রন্থ ঠিক কি লেখা ছিল তাহা জানা যায় না। বুকানন সাহেব উহার যে মর্ম্ম দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে ডঃ যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন :

"It looks like a careless and incorrect summary of riaz-us-salatin" (*History of Bengal* Part II, page 123)।

রিয়াজ-উস্-সালাতিন সম্বন্ধে স্বয়ং যদুনাথ লিখিয়াছেন, "১৭৮৭ সালে লিখিত এই পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা কোনই প্রামাণিক প্রাচীন নথির-গ্রন্থ উদ্ধৃত, এমন কি নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভুলের দৃষ্টান্ত এত বেশী যে, অতি সাংঘাতিক দু'একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করিব" ইত্যাদি— [সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা— ১৩৪৭ সাল, পৃঃ ২০৫]। বুকানন সাহেবের ও রিয়াজের বিস্তৃত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) সমসুদ্দিনের মৃত্যুর পর রাজা গণেশ বাংলার তখত অধিকার করেন এবং নৃশংস ভাবে মুসলমান আলেম ও সেখগণকে হত্যা করিতে থাকেন। তিনি রাজ্য হইতে ইসলাম ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন।

(২) রাজা গণেশের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রসিদ্ধ দরবেশ নূর কুতুব আলম জৌনপুরের সুলতান সর্দ্দার ইব্রাহিমকে আহ্বান করিলে ইব্রাহিম সসৈন্য আসিয়া ফিরোজাবাদে শিবির স্থাপন করেন।

(৩) গণেশ ভীত হইয়া নূর কুতুব আলমের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার আদেশে দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক পুত্র যদুকে জালাল উদ্দিন নামে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া সিংহাসনে বসান। অবশেষে নূর কুতুব আলমের আদেশে ইব্রাহিম জৌনপুরে ফিরিয়া যান এবং নূর কুতুবের অভিশাপে সেই বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(৪) গণেশ যখন শুনিলেন ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছে তখন যদু জালাল উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এবং তাহাকে সুবর্ণ-কামধেনু প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত ধেনুর মুখ দিয়া প্রবেশ ও পশ্চাৎ দিক দিয়া বাহির করাইয়া হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি ঐ সুবর্ণখণ্ডগুলি ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। তৎপর যদুকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন এবং মুসলমানগণের উপর অধিকতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৫। যদু [প্রায় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক] কারাগারে থাকিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া গণেশকে হত্যা করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং রাজা হইয়া খুব হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করান। যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সুবর্ণ কামধেনু প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইয়া জাতিচ্যুত করান।

৬। জালাল উদ্দিন সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮১২ হিঃ তে [১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ] ও তৎপুত্র আহম্মদ তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন।

গোলাম হোসেন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সম্বন্ধে কোন নজির-গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। অনেক স্থলে "লোকে বলে" [গোয়েন্দ], "অনেকে বলে" [ব বৌলে বাজে] এইরূপ লিখিত থাকায় মনে হয়, মিথ্যা গুজবে নির্ভর করিয়া রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐ সমস্ত অলীক উক্তি লিখিত হইয়াছে। কারণ—

১। রাজা গণেশ যে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারী ও জালাল উদ্দিন যে হিন্দু, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যাচারী ছিলেন—রিয়াজের এই উক্তি বহু পূর্ব্ববর্ত্তী নিজামুদ্দিন, আবুল ফজল, ফিরিস্তা ও হিন্দু-সূত্র হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাদ্বারা সমর্থিত হয় না। হিন্দু-সূত্র হইতে বরং পাওয়া যায় যে, জালাল উদ্দিন ব্রাহ্মণগণকে বহু মহাদান করিয়া তাহাদের দৈন্য দূর করিয়াছিলেন এবং রাজা গণেশ ধার্ম্মিক জনরঞ্জক, দাতা ও সুধীর ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে রাজা গণেশ মুসলমানদের সহিত সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিতেন।

২। ইব্রাহিমের আক্রমণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার বলেন, **"True history shows that story of Ibrahim having invaded Bengal in person in 818 A. H. cannot be true."**

রাখালবাবুও সেই কথা বলেন।

৩। ৮১৮ হিঃ (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইব্রাহিমের মৃত্যুর কথা সত্য হইতে পারে না। কারণ ৮১৮ হিঃ হইতে ৮৪০ হিঃ পর্য্যন্ত ইব্রাহিমের মুদ্রা পাওয়া যায়। রাখালবাবু, ডঃ যদুনাথ ও ডঃ ভট্টশালী সকলেই ইহা স্বীকার করেন। রাজা গণেশকে জালাল উদ্দিন হত্যা করাইয়াছিলেন বলিয়া রিয়াজ যাহা লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইতিহাসেই তাহার সমর্থন নাই।

৪। ফিরিস্তা রাজা গণেশের পুত্রের নাম জিৎমল বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু রিয়াজের মতে তাহার নাম যদু। ফিরিস্তার উক্তিই গ্রহণযোগ্য। জালাল উদ্দিন সাত বৎসর ও তৎপুত্র আহম্মদ তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া রিয়াজ যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও ভুল। প্রকৃতপক্ষে জালাল উদ্দিন ৮১৮ হিঃ (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ৮৩২ হিঃ (১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত মোট প্রায় সতর বৎসর রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব কয়েক বৎসর তাঁহাকে বেদখল করিয়া রাখেন। আহম্মদ প্রায় বার বৎসর রাজত্ব করেন। ইব্রাহিমের ফিরোজাবাদে অভিযান এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁহার মৃত্যু ও রাজা গণেশের হত্যার ঘটনা মিথ্যা হইলে রিয়াজের লিখিত সমসুদ্দিনের [৮১৫-১৭ হিঃ] মৃত্যুর পর রাজা গণেশের বাংলা অধিকার, তৎপর নূর কুতুব আলমের আহ্বানে ইব্রাহিমের সসৈন্য ফিরোজাবাদে আগমন, তদ্দৃষ্টে ভীত গণেশ কর্তৃক দ্বাদশ বর্ষবয়স্ক পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া বাংলার সিংহাসন দান, তৎপর নূর কুতুব আলমের আদেশে ইব্রাহিমের জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন ও সেই বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া এবং ইব্রাহিমের মৃত্যুসংবাদে গণেশ কর্তৃক পুত্র যদুর (জালাল উদ্দিন) সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হওয়া, গণেশ কর্তৃক পুনরায় বাংলা অধিকার এবং প্রায় তিন বৎসর পরে যদু কর্তৃক ষড়যন্ত্র-মূলে গণেশের হত্যাসাধন ও বাংলার সিংহাসন অধিকারের সম্পূর্ণ বিবরণ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। এই ঘটনাগুলি ঘটিয়া থাকিলে নিজামুদ্দিন, আবুল ফজল ও ফিরিস্তার ঐ সম্বন্ধে নীরব থাকিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বস্তুতঃ পূর্বোক্ত মুদ্রা-সমস্যার সমাধান করিতে কোন অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের মনে হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে হাজি ইলিয়াসের বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গৌড়বঙ্গের কতিপয় শক্তিশালী হিন্দু ভূম্যধিকারী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাঁহাদের মধ্যে রাজা গণেশ, রাজা দনুজমর্দনদেব ও রাজা মহেন্দ্রদেব প্রধান ছিলেন। রাজা গণেশ দিনাজপুরের ও রাজা দনুজমর্দনদেব চন্দ্রদ্বীপের সামন্ত রাজা ছিলেন। রাজা মহেন্দ্রদেব কোন্ স্থানের সামন্তরাজা ছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। ১৪০৯ হইতে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা গণেশই প্রকৃত পক্ষে বাংলার সুলতানগণের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সমগ্র বাংলার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই ৮১৭ হিঃ-তে (১৪১৪ খ্রীঃ) সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহের (সমসুদ্দিন) মৃত্যু হইলে পূর্বোক্ত হিন্দুরাজগণ রাজা গণেশের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে বিতাড়িত করেন এবং রাজা গণেশ গৌড়বঙ্গের স্বাধীন রাজা হন। সম্ভবতঃ তখনও গোলযোগ চলিতে থাকায় এবং অল্পকাল মধ্যেই রাজা গণেশের মৃত্যু হওয়ায় তিনি নিজ নামে কোন মুদ্রা প্রচার করিবার অবকাশ পান নাই। অতঃপর তৎপুত্র জিৎমল (যদু) মুখ্যতঃ মুসলমান প্রধানগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হন এবং জালাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু জিৎমল মুসলমান হওয়ায় দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব নিজ নিজ উদ্দেশ্য বিফল হইতে দেখিয়া জালাল উদ্দিনকে আক্রমণ করতঃ সিংহাসনচ্যুত করেন এবং দনুজমর্দনদেব ১৩৩৯ শকে (৮২১ হিঃ =১৪১৭-১৪১৮ খ্রীঃ) মহেন্দ্রদেবের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করিয়া পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগাঁ হইতে এবং ১৩৪০ শকে সুবর্ণগ্রাম হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। এই সময় জালাল উদ্দিন বোধ হয় কতকটা নিরাপদ স্থান মনে করিয়া সপ্তগ্রামে প্রস্থান করেন। দনুজমর্দনদেবের সপ্তগ্রামে মুদ্রিত কোন মুদ্রা না পাওয়ায় ঐ ধারণা আরও দৃঢ় হয়, এবং মনে হয় দনুজমর্দনদেব সপ্তগ্রাম অধিকার করিতে পারেন নাই। বোধ হয় দনুজমর্দনদেব ৮১৯ ও ৮২০ হিজরির কতক অংশ পর্যন্ত রাজত্ব করিবার পর নিহত হইলে মহেন্দ্রদেব ১৩৪০ শক (৮২১ হিঃ=১৪১৮ খ্রীঃ) রাজা হইয়া পাণ্ডুনগর (ফিরোজাবাদ) হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। কিন্তু জালাল উদ্দিনের নিকট ফিরোজাবাদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। তখন জালাল উদ্দিন ফিরোজাবাদ অধিকার করিয়া তথা হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। তৎপর জালাল উদ্দিন মহেন্দ্রদেবের হস্ত হইতে ৮২৩ হিঃতে চট্টগ্রাম ও ৮২৪ হিঃতে সোনার গাঁ উদ্ধার করিয়া ঐ ঐ স্থান হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। খুব সম্ভব ৮২৪ হিঃ [১৪২১ খ্রীঃতে] মহেন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপে পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাজা গণেশ, দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব গৌড়বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইলেও গণেশের উত্তরাধিকারী জিৎমল মুসলমান হওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব গণেশের মুসলমান উত্তরাধিকারী জালাল উদ্দিনের হস্তে পরাজিত হওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। গণেশের মুসলমান উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস বর্ণনকালে মুসলমান ঐতিহাসিকগণকে প্রসঙ্গক্রমে গণেশের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের কথা তাঁহাদের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পরন্তু দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের বিস্মৃত কাহিনী দূরাগত জনশ্রুতিতে গণেশের দ্বিতীয় অভ্যুদয়ের কাহিনীতে পরিণত হইয়া গোলাম হোসেন ও শ্যামপ্রসাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকিবে।

একটি ঘরোয়া নাটক

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

শীতের বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কলতলায় বাসন মাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে—ঝন্ ঝন্! দোতলায় মাসীমা কলতলায় নেমেছেন। এই ফাঁকে জল না তুললে আজ আর জল পাওয়া যাবে না—একথা জেনেও মণিমালার বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। কেমন একটা মধুর আলস্যের আরাম উপভোগ করছে মণিমালা। ছোট ছেলে নন্তু গলির মোড়ে চানাচুরওয়ালার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। হতভাগা ছেলেটা এই বয়স থেকেই এমনি হাভাতে হয়ে উঠেছে। তোশকের নীচে লক্ষ্মীপূজার বাতাসার জন্ত দুটো পয়সা রেখেছিল মণিমালা। ছেলেটা তাই নিয়ে চানাচুর কি তেলেভাজা কিনতে বেরিয়ে গেছে। আর ছেলেটারই বা দোষ কি। ভাল করে দু'বেলা খাবারও জোটে না মায়ের অর্ধেক দিন। সংসার তাদের ছোট—স্বামী-স্ত্রী আর নন্তু। কিন্তু এই ছোট্ট সংসারেও কোনদিন সুখের মুখ দেখল না মণিমালা। আর দেখবেই বা কি করে? রজনীর জীবনের বেশীর ভাগ দিনই কাটল কিছু না করে।

না—এবার আড়মোড়া ভেঙে উঠতে হ'ল মণিমালাকে। শুধু জল তোলাই ত নয়। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, চালের কাঁকর বাছা—সব তাকে এক হাতেই তো করতে হবে। সুতরাং ছেঁড়া বিছানাকে সুখাসন কল্পনা করে শীতের পড়ন্ত বেলার তুলার উত্তাপে ডুবে থাকলে চলবে কেন! তাদের নীচুতলার ঘরে তখন রীতিমত অন্ধকার জমে উঠেছে। মণিমালা সুইচ টিপল। ঘরের পাঁচটা কাজ সেরে কাঁকর বাছতে বসল মণিমালা। এমন সময় এসে পিছনে দাঁড়াল রজনী, বললে, "আজ আদমজী জুটমিলে গিয়েছিলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক কথা হ'ল।" এই বলে রজনী একবার আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। কিন্তু মণিমালা না বললে কোন কথা, না তাকালে একবার মুখ তুলে। স্বামীর কল্পিত দিগ্বিজয়কে এমনি করে এঁদো গলির বদ্ধ ঘরের ভাঙা মেঝেয় লুটিয়ে দিলে মণিমালা—তার নীরব অবজ্ঞায়। মন ভেজাবার জন্তে রজনীর এ কৌশল বড্ড বেশী পুরনো হয়ে গেছে মণিমালার কাছে। রজনী আবার বললে—'এই ভর সন্ধ্যেবেলায় বসে বসে এই পোকা বাছার কাজ করলে তোমার চোখ খারাপ হয়ে যাবে যে!'

'তা আমি তো আর দশভুজা নই যে, কখন তুমি আড্ডা মজলিশ শেষ করে বাড়ী ফিরবে—সেই আশায় মুখে হাসি টেনে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব?'

রজনী দেখলে—ও পথে গেলে সুবিধা হবে না, বললে—'দেবীর মেজাজ আজ শরীফ নেই দেখছি। ব্যাপার কি বল তো?'

'আহা-হা—কি সুখেই রেখেছ যে সব সময় নেচে-কুঁদে বেড়াব! চাল আনলে ডাল থাকে না—নুন জোগাড় হয় তো তেল ফুরিয়ে যায়—তাদের আবার মেজাজ শরীফ থাকবে কোন্ সোহাগে শুনি? বলতে লজ্জাও করে না তোমার?'

এক পেয়ালা চায়ের জন্ত গলা চিঁ চিঁ করছিল রজনীর। রণে ভঙ্গ দিয়ে বললে, 'আমি হার মানছি মালা। আমার কিছু জিজ্ঞেস করাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু এক পেয়ালা চাও কি পেতে পারি না?'

মুখ না তুলে মণিমালা বললে, 'উনুনে ঐ জল ফুটছে। ঘরে চিনি নেই এক দানাও। নন্তুকে পাঠিয়েছি চিনি আনতে। ধারে দেয় তো চা হবে—নইলে··

নইলে স্বদেশী চা—স্বদেশী চা-ই সই। কথা কেড়ে নিয়ে রজনী বললে—'চিনি না থাকে নুন মিশিয়ে দাও। তবু গলাটা একবার ভিজুক।'

'চাকরি খোঁজার ছুতো করে সারাদিন তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটাও। ঐ সময়টা নন্তুকে নিয়ে বসলে হয় না। ছেলেটা যে গোল্লায় যেতে বসেছে। ভদ্দরলোকের ছেলে লেখা-পড়া না শিখলে খাবে কি?'

'ছেলের বাবা যা করে খাচ্ছেন'—একটা সস্তা টিপ্পনি কাটল রজনী।

'হাসি-মস্করা করে করেই তো নিজের সংসারের এই হাল হয়েছে। এবার আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথাটি না খেলেও আর চলছে না।'

'কিন্তু অমন বিদুষী মা থাকতেও হতচ্ছাড়া বাবাকে নিয়ে টানাটানি কেন মণিমালা?'

'বেশ—কাল থেকে হেঁসেলের ভার তুমি নাও—ছেলের লেখা-পড়ার ভার আমি নিচ্ছি।'

'কিন্তু এও বলব মণি—মাসের পনর দিনই তো ভাঁড়ারে সব জিনিষ বাড়ন্ত, এ নিয়ে তুমি ছাড়া এমন করে আর কেউ সংসার চালাতে পারত না।'

কথার ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মণিমালা। সোহাগ মেশানো তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললে, 'থাক—আর বাজে বকতে হবে না। নন্তু চিনি নিয়ে এসেছে। চা খাবে এস।'

···শুধু চা নয়—চায়ের সঙ্গে মুড়ি আর নতুন গুড় খেতে দিয়েছে মণিমালা। সত্যি এমন লক্ষ্মী বউ হয় না সকলের। ঝাঁটাই মারুক আর গালমন্দই দিক—ছন্নছাড়া এই সংসারের হাল ধরে রেখেছে মণিমালা—শুধু তাই নয়, নিত্য অভাবের অন্ধ কুঠরিতে সে আনবার চেষ্টা করছে আলোর প্রসন্নতা। শুধু রজনী যদি মানুষের মত হ'ত।

বাইরে থেকে কার গলায় সাড়া পাওয়া গেল—'রজনী বাড়ী আছ—রজনী ?'

কে ডাকতে এসেছে—চট করে ঠাহর করতে পারল না রজনী। ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আহ্বান শুনে তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। নিশ্চয়ই কোন জবরদস্ত পাওনাদার। কিন্তু ইদানীং কোন পাওনাদারকেই তো সে তার সঠিক ঠিকানা দেয় নি। হতে পারে—লোকটা কোন সূত্রে জেনে একেবারে আসল আস্তানায় এসে হানা দিয়েছে। গলা নামিয়ে রজনী বলল, 'নন্তুকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলতে বলো—বাবা বাড়ী নেই। কখন ফিরবেন তার কিছু ঠিক নেই।'

ততক্ষণে নীচের কণ্ঠস্বর সিঁড়ির মাঝখানে এসে গেছে।

'রজনী কোথায় ? এখনো বাবুর বাড়ী ফেরবার সময় হয় নি বুঝি ?' বিজন ততক্ষণে দারান্দায় উঠে এসেছে।

'আরে বিজন যে !' বলতে বলতে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রজনী।

'এস এস। কতদিন পরে দেখা।' পাওনাদার নয়, মুদী নয়, কয়লাওয়ালা নয়—এ যে একেবারে কলেজের বন্ধু বিজন। বেলুড়ের কাছাকাছি এক ইস্পাতের কারখানার লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। এ যে গরীবের ঘরে হাতীর পদক্ষেপ। মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল রজনী। বাল্যবন্ধু হলে কি হয়—এখন সে পদমর্যাদায় উচ্চকিত, ধনগরিমায় দূরাভিসারী। কিন্তু কি আশ্চর্য ! বিজন হাঁটু ভেঙে একেবারে মাটিতে বসে গেল ! বিজনের বিনয়প্রকাশে রজনীর আসবাবপত্রহীন ছোট্ট কুঠরিটি যেন আরও ছোট্ট, আরও ম্লান হয়ে এল।

'তারপর ব্যাপার কি বল ত ? সেই যে দু'মাস আগে ধর্মতলার মোড়ে দেখা। এর পর ভুলেও একবার খোঁজ করলে না তুমি—রজনী। সত্যি আশ্চর্য লোক !'

'সেই থেকেই রোজই যাব যাব ভাবি। কিন্তু সাত কাজে আর হয়ে ওঠে না।' রজনী কথা তুলে উসখুস করতে লাগল। কত দিন পরে বিজন এসেছে—এক কাপ চা না দিলে কি মান বাঁচে ! কিন্তু মণিমালার আজ যা মেজাজ—হয়তো আজ সবার আগে চা আর চিনি বাড়ন্ত হবে।

'বৌদি কোথায় ? সেই হাওড়া থেকে এতদূর এসে শেষে কি লক্ষ্মীদর্শন না করেই যাব ?'

দু'জনেই হেসে উঠল।

'লক্ষ্মীছাড়া থাকলে হয় তো লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে না। তুমি বসো—আমি বলে আসি।'

রজনীকে আর যেতে হ'ল না। একথালা খাবার আর চা নিয়ে মণিমালা হাসিমুখে বিজনের সামনে এসে দাঁড়াল।

'এই যে বৌদি—এ যে একেবারে মেঘ না চাইতেই জল।' বিজন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তবু ভাল যে এদ্দিনে গরীব বৌদিকে মনে পড়ল। নইলে কলকাতায় শুনেছি চাকরি নিয়ে এসেছ বছরের ওপর আর আজ বুঝি আসবার ফুরসত পেলে ?' মণিমালার সুন্দর মুখ অনুযোগের মৃদু উত্তেজনায় আরও রক্তিম হয়ে উঠল। বয়স পঁচিশেরও বেশী মণিমালার—কিন্তু স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে আজও সে ষোড়শী তরুণীকে হার মানায়। নোংরা পরিবেশ, অসচ্ছল জীবনযাত্রা, বেপরোয়া, অপদার্থ স্বামী। সব জড়িয়ে সামনে-পিছনে সীমাহীন নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার। তবু বিজনের মনে হ'ল, এই ঘন তমসার মাঝখানেও শুকতারার মত জ্বল জ্বল করছে মণিমালা—তার কল্যাণ-সুন্দর দীপ্তিতে। সত্যি—পুরুষের চিত্ত-চমৎকারী চেহারাই বটে। 'দোষটা কি শুধু একতরফা আমারই ঘাড়ে চাপাবে বৌদি ?' আত্ম-পক্ষ সমর্থনের ভঙ্গীতে বিজন বলল, 'তোমরা পাকিস্তানের ঘরবাড়ী বেচে কলকাতায় এসেছ জানি, কিন্তু কোথায় আছ অনেক খোঁজ করেও তা জানতে পারি নি। তারপর মাসদুয়েক আগে রজনীর সঙ্গে ধর্মতলার মোড়ে দেখা…।'

'হাঁ, হাঁ—সেই থেকে আমরাও তোমার ওখানে একদিন হানা দিয়ে তোমাকে চমকে দেব ভাবছিলাম। কিন্তু বেলুড় আর বেলেঘাটা কি সোজা পাড়ি !'

রজনী কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল।

'কষ্ট করে যখন এদ্দুর এসেছ তখন ভাল মন্দ দুটো মুখে দাও ঠাকুরপো। পোশাক-আসাক দেখে মনে হচ্ছে সোজা আপিস থেকেই চলে এসেছ। তা এখন তো অসময় নয় যে দুটো মুড়ি মুড়কির খাবার জিভে রুচবে না।'

'ছি, ছি, এভাবে লজ্জা দিলে আমাকে কিন্তু সত্যি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তোমার হাতের তৈরি খাবার আমি কতদিন যেচে এসে খেয়ে গেছি—তা কি এত সহজেই ভুলে গেলে বৌদি ?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মণিমালা বলে, 'সে সব দিনের কথা এখন গল্পের মতই মনে হয় ঠাকুরপো।'

মুহূর্তে পরিহাস-উচ্ছল আবহাওয়ার উপর নেমে আসে একটা বেদনার্ত স্তব্ধতা। মণিমালা বলল, 'এ কি—এই খাবারেরও খানিকটা আবার ভদ্রতা করে ফেলে রাখতে হবে না কি ?'

'না না, ভদ্রতা নয় বৌদি। আর পারছি নে। অনেক দিন পরে এসেছি বলে কি এ ভাবে প্রতিশোধ নিতে হবে ? আজ আর চলছে না। নন্তু কোথায় ? নন্তুকে ত দেখছি না ?'

'হতভাগা ছেলেটার কথা আর বলো না। সারাদিন গলি-ঘুঁজিতে টো টো করে ঘুরে বেড়াবে। আর ওরই বা দোষ কি বল ? ইস্কুলের মাইনে বাকি পড়েছে, বই খাতা কিনে দিতে পারছি নে। তোমার কাছে ত আমাদের কিছুই লুকোবার নেই ঠাকুরপো। এক রকম খালি হাতেই কলকাতায় এসেছি আমরা। উনি এসে হাওড়ায় জুট মিলে একটা চাকরি পেয়েছিলেন। তা মাসতিনেক পরেই কি জানি ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।'

'হাঁ—ভদ্দরলোকের ছেলে কখনও জুটমিলে চাকরি করতে পারে ? তার চেয়ে মুটেগিরি করেও সংসার চালানো অনেক ভাল।'

রজনী ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

'তা, সেই থেকে ত উনি বেকার। তাই বলে তোমার বন্ধু সংসার চালাবার জন্তে সত্যি সত্যি মোট বইতে শুরু করলেন তা ভেবে কিন্তু অবাক হয়ো না ঠাকুরপো।'

'হাঁ—তোমারও যেমন কথা। ভদ্দরলোকের ছেলে কি কখনও মোট বইতে পারে। বরং না খেয়ে ঠায় উপোস করে মরে যাবে তবু নিজের প্রেষ্টিজ হারাতে পারবে না। কি বল বিজন?'

বিজন জবাব দিলে না। জবাব দিলে মণিমালা। 'তোমার বন্ধু আমাদের উপোস করে প্রেষ্টিজ রাখবার সোজা রাস্তাই বাতলে দিয়েছেন ঠাকুরপো। কিন্তু প্রেষ্টিজ দিয়ে ত আর পেট ভরে না।'

'কেন?' অবাক হয়ে গেল বিজন। 'সেদিন না রজনী বলছিল কোন্ মার্চেণ্ট আপিসে কাজ পেয়েছে? ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট আলাপ। ভাল করে সব কথা বলবারও ওর সময় ছিল না।'

'সে ত দু'মাস আগের কথা।' রজনী প্রায় ধমক দিয়ে উঠল।

'দু'মাস আগেই বা তুমি কোন্ আপিসে চাকরি করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনতে শুনি?'

'চাকরি মানে ত সেই মাছিমারা কেরানী! ও আমার ধাতে সইবে না। আমি ভাল একটা চান্স খুঁজছি বিজন, আমি বিজনেস করব!'

'শুনলে ত ঠাকুরপো—তোমার বন্ধুর কথা! টাকা রোজগারের মুরোদ থাক আর না থাক—এমনিতে কথার ঠাকুর। কি সুখেই যে আছি—তা আর তোমাকে কি বলব ঠাকুরপো! তা তুমি ত শুনেছি মস্ত বড় চাকরি পেয়েছ, দাও না তোমাদের কারখানায় ওঁর একটা সুবিধে করে···।'

'হাঁ, তোমার আবদার রাখবার জন্তে ও একটা চাকরি এখন গড়াক আর কি!' শ্লেষের সুরে রজনী বললে।

বহু দিন পরে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসে এমনি অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বে তা ভাবতে পারে নি বিজন।

দু'কুল রক্ষা করবার জন্তে বললে, 'তা রজনী যদি রাজী হয়—চেষ্টা করব বৈ কি বৌদি। আমার ধারণা ছিল রজনী চাকরি করছে। আচ্ছা কথাটা আমার মনে রইল। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। আজ তবে আসি বৌদি।'

কৃতজ্ঞতামাখানো, স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটল মণিমালার ঠোঁটে। আর একটা পান বিজনের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আজকের আসা মঞ্জুর হ'ল না কিন্তু। আর এক দিন আসতে হবে সময় করে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' সহাস্যে দ্রুত বেরিয়ে এল বিজন। ভাঙা মনের কাহিনী শুনবার মত অস্বস্তিকর কাজ খুব কমই আছে সংসারে।

দৈন্য আর কুশ্রীতার অন্ধকারে আলোর রেখা হয়ে দেখা দিলে বিজন। নিত্য অভাবপীড়িত সংসার তার আগমনে মুহূর্তের জন্ত সজীব হয়ে উঠে। চাল ডাল নুনের অভাব ভুলে গিয়ে মণিমালা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। যতই তাদের অভাব-অনটন-অভিযোগ থাকুক না কেন—বিজন এলে মণিমালার হাতে অন্নপূর্ণার থালা যেন আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। রজনী বিস্মিত হয়ে ভাবে—মণিমালার লুকানো ভাণ্ডার কি অফুরন্ত!

বিজনের কারখানায় এখনও চাকরি হয় নি রজনীর। তবে হবার আশা আছে। এ নিয়ে খুব চেষ্টা করছে বিজন। অবশ্য চাকরির জন্ত যে রজনীর খুব তাড়া আছে তাও মনে হয় না। বরং বেলুড়ে বিজনের আপিসে দেখা করবে—এই ছুতা করে তিন তিন বার গোটা পনের টাকা মণিমালার কাছ থেকে ধার নিয়েছে রজনী। শেষ পর্যন্ত টাকাটা যে রেসের মাঠে ধুলো আর ধোঁয়ায় উড়ে গেছে সে খবরও অবশ্যি গোপন থাকে নি মণিমালার কাছে। এরই মধ্যে রজনী মণিমালাকে নিয়ে বিজনের কোয়ার্টারে বেড়িয়ে এসেছে। চমৎকার তিনখানি ঘর—ঝকঝকে-তকতকে—খোলামেলা, কিন্তু সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী—বিজন আর তার চাকর।

মণিমালা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এবার একটি টুকটুকে বৌ নিয়ে এস ঠাকুরপো। এত বড় বাড়ী—কেমন খাঁ খাঁ করছে।' বিজন জবাব দিতে একটুও দ্বিধা করে নি—যেন এ সম্পর্কে সে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। ফুরফুরে হাওয়ায় সিগারের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে বলেছিল বিজন—'লক্ষ্মীছাড়ার প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হওয়া কি এতই সহজ বৌদি?'

এর পর কথার রোমন্থন করা চলত আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত। কিন্তু কি ভেবে যেন মণিমালা এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় নি। বিজনের কথায় যে একটা গোপন ব্যথায় বেশ লুকিয়ে ছিল—তা বুঝতে কারও দেরি হয় নি সেদিন।

যথানিয়মে আবার শনিবার এল। এই শনিবার অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা চাই রজনীর—এমন 'সিওর টিপস'টা কাজে লাগাতে না পারলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে রজনী। কে জানে—এই পাঁচ টাকাই হয় ত তার সারা জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেবে! ঘোড়ার পিছনে বহু টাকা জলে ঢেলেছে রজনী—কিন্তু এই শনিবারের জন্ত যে টিপস সে জোগাড় করেছে—তা শুধু দুর্লভ নয়—অব্যর্থও বটে। সুতরাং যেমন করেই হোক পাঁচটা টাকা তাকে জোগাড় করতেই হবে। ইদানীং সে লক্ষ্য করেছে—মণিমালার হাতে টাকা আছে। শুধু জুৎসই একটা গল্প বানিয়ে বলতে পারলেই বৌয়ের হাত উপুড় হতে আর দেরি হবে না। কি বলা যায়—তাই ভাবতে ভাবতে দুপুর নাগাদ বাড়ী ফিরে এল রজনী। সাধারণতঃ এ সময় সে কোন দিনই বাড়ী ফেরে না—তাই বলে মণিমালাও বাড়ী থাকবে না নাকি—সারা দিন সংসারের খাটুনির পর ক্লান্তিতে একবার বিছানায় গা এলিয়ে দেবে না দুপুর ছুটোয়? কিন্তু সত্যিই ঘর শূন্য—মণিমালা নেই। নন্ত ছাদে ঘুড়ি উড়াবার জন্ত সাজসরঞ্জাম যোগাড়ে ব্যস্ত।

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল রজনীর। হঠাৎ ট্রাঙ্কের কোণে ঐ চিরকুটে কি লেখা রয়েছে মণিমালার নামে। লেখাটা ত শুধু পড়া নয়—কে যেন কাল অক্ষরের বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মারলে রজনীর বুকে। পংক্তিগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থপূর্ণ।

মণি,

আজ দুপুরে একটু শীগগির আসতে চেষ্টা করো। বাড়ীটাও তখন বেশ ফাঁকা থাকবে। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এস কিন্তু।

ইতি
বিজন

চিঠির অক্ষরগুলো যেন শব্দ করে হেসে উঠল। সূর্য্যমুখীর রাত্রির তপস্যা এত দিন পরে সার্থক হয়েছে। বেলেঘাটার এঁদো গলির বদ্ধ কুঠরি থেকে তার সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী এবার পাখা মেলেছে সীমাহীন মুক্ত আকাশের পানে। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন তার কাছে জলের মত স্পষ্ট হয়ে এল। বেলুড়ের ইস্পাতের কারখানা থেকে বিজনের এতদূর পর্য্যন্ত ঘন ঘন আনাগোনা, মাখামাখি, হাসিঠাট্টা··! সর্ব্বাঙ্গে কে যেন সাপের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে রজনীর। কিন্তু আজ এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না সে। হোক সে বেকার, অপদার্থ, অক্ষম—তবু মণিমালার মত বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীকে নিয়ে সে আর ঘর করবে না। ছিঃ ছিঃ, মণিমালার মনে এতও ছিল! একটা দারুণ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগল রজনী।···খানিকক্ষণ পরেই সিঁড়িতে স্যাণ্ডেলের শব্দ শোনা গেল। মণিমালা আসছে—আসছে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে। একটা খুশীর তরঙ্গ যেন উথলে উঠেছে মণিমালার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে—অন্ততঃ দেখে রজনীর তাই মনে হ'ল। কিন্তু রজনী শব্দ করলে না। রাগে ও ঘৃণায় তার সারা শরীর রী রী করতে লাগল।

এমন অসময়ে রজনীকে বাড়ী ফিরতে দেখে একটু অবাকই হ'ল মণিমালা।

'আজ যে হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়ল—এত সকাল সকাল?'

'তাতে তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে বুঝি?' স্ত্রীর কাছে নীচু হয়ে কথা বলার প্রয়োজন ফুরিয়েছে রজনীর। আজ তার হাতে উদ্যত তলোয়ার।

'ওমা কি যে বল!' ফিক্ করে হেসে ফেলল মণিমালা, 'কোন দিন এত শিগগীর আস না কি না—তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।'

'কিন্তু তুমি এত সকাল সকাল চলে এলে কেন?' প্রথম তীর নিক্ষেপ করলে রজনী।

'ওমা বাড়ীতে না এসে কোথায় যাব?' চোখ কপালে তুলে মণিমালা বললে।

'কেন যেখান থেকে এইমাত্র আশনাই সেরে এলে সেখানে।'

'কি বলতে চাও তুমি?' কঠিন কণ্ঠে মণিমালা জিজ্ঞেস করলে।

'আমি যা বলতে চাই—তুমি তা খু-উ-ব ভাল করেই জান। কিন্তু কেন তার জন্যে এই লুকোচুরি?' শ্লেষে তীক্ষ্ণ শোনাল রজনীর কথাগুলো। 'রোজ রোজ দুপুরে যেখানে ফষ্টিনষ্টি করতে পালিয়ে যাও—সেখানে পাকাপাকি ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করলেই পার।···বিজন আমার বন্ধু—কিন্তু বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সে যে আমারই ঘরে এত বড় ডাকাতি করতে আসবে···।'

'যা জান না—তা নিয়ে আর একজন সম্পর্কে যা খুশী বলবার কোন অধিকার নেই তোমার।' মণিমালা ফোঁস করে উঠল।

'আমার কাছ থেকে যতই লুকোবার চেষ্টা কর না কেন—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। বিজনের লেখা এই চিরকুটই তার সাক্ষী হয়ে আছে।' এই বলে চিরকুটখানি মণিমালার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে রজনী।

মুখে বুঝি কেউ চূণকালি লেপে দিলে। আকস্মিক ধরা পড়ে গিয়ে মণিমালা বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে এল বরফের মত! একবার আড়-চোখে তাকিয়ে তাই দেখল রজনী। আসামী হাতে-নাতে ধরা পড়েছে—এরপর আর কি বলবার থাকতে পারে মণিমালার!

শান্ত অথচ তীব্র কণ্ঠে মণিমালা জবাব দিল—'নিজের সংসারের দিকে তোমার কোনদিনই লক্ষ্য নেই জানি, কিন্তু তুমি যে এত নীচে নেমে গেছ, আমি তা ভাবতেও পারি নি।'

ধরা পড়েও কি না আবার চোপা! রজনীর সব রক্ত মাথায় উঠে গেল, 'হঠাৎ দুপুরে আমি এসে পড়ায় খুব বেকায়দায় পড়ে গেছ না? কোথায় গিয়েছিলে—কোথায় যাও তুমি রোজ দুপুরে?'

'ঐ চিরকুট পড়েই ত তুমি সব জেনেছ।'

'তবু তোমার মুখ থেকে জানতে চাই।'

'আমি বলব না।'

'তোমাকে বলতেই হবে। ক'দিন ক'মাস থেকে তোমাদের এই লীলাখেলা চলছে···।' চীৎকার করে উঠল রজনী।

'তুমি শুধু বদমেজাজী নও, তুমি অতি নীচ, ইতর···।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি অতি নীচ, ইতর, পশু। কিন্তু এই অমানুষের আস্তানায় তোমার মত দেবীদের ত স্থান নেই। তোমার নিঃশ্বাসে বিষ, তোমার দৃষ্টিতে পাপ···।'

'বেশ—সে পাপের স্পর্শে তোমার জীবনকে আমি বিষময় করে তুলতে চাই নে। আমি এই মুহূর্ত্তে এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি! আর নন্তকেও আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম।'

'না, না—নন্ত তোমার সঙ্গে যাবে না। নন্তকে আমি তোমার পাঁকে পড়তে দেব না। আজ থেকে নন্ত জানবে—তার মা নেই।'

'বেশ তাই হবে।' এই বলে ঋজু পদক্ষেপে মণিমালা সত্যিই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল—বলতে গেলে একবস্ত্রে।

উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কাটলে রজনীর মনে হ'ল বাড়ীটা বড্ড ফাঁকা লাগছে। রাগের মাথায় এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। তা মণিমালা খুব বেশী দূর হলে দমদমে, তার মাসীমার বাড়ীতে গিয়ে উঠবে। রাগ পড়লে হয় ত ছেলের টানে কালই আবার নিজে থেকেই ফিরে আসবে। কিন্তু আসল

কাজই করা হয় নি. রজনীর—'রেসের জন্ম পাঁচটা টাকা এখনও যোগাড় হয় নি। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ সুবিধামত এক দিন মেটালেও চলবে—কিন্তু শনিবারের এমন টিপস যদি কাজে লাগাতে না পারে···হায়! হায়। জীবনে এমন দুর্লভ সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে!

সুতরাং টাকার সন্ধানে তখ খুনি বেড়িয়ে পড়ল রজনী।

মোড়ের মাথায় ভূপালের সঙ্গে দেখা। জেলাকোর্টে উকিলদের একজন ছিল ভূপাল সান্যাল—রজনীর সঙ্গে তাসের আড্ডায় পরিচয়। সেই থেকে ভূপালের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিল রজনী। সে না হলে ভূপালের ব্রিজ খেলা জমত না। কিন্তু দেশ-বিভাগ সব মৌতাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে—ছিন্নমূল হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার কোন ঠিকানা নেই। আজ প্রায় পাঁচ বছর পরে ভূপালের সঙ্গে দেখা রজনীর। একই পাড়ায় থাকে, অথচ প্রথম দেখা হ'ল আজ। ভূপাল কিছুতেই ছাড়ল না—রজনীকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল।

অনেক দিন পরে নিজের দেশের লোকের সঙ্গে দেখা। সুতরাং মন খুলে দু'জনেই দু'জনের কাছে সুখ দুঃখের কথা কইতে সুরু করল। কথার মাঝখানে ভূপালের ছোট মেয়ে রুমু ছুটে এল।

'বাবা পিসীমা বললে—মণিমাসীমার টাকাটা এক্ষুণি পাঠিয়ে দিতে! মার কাছে টাকা ছিল না—তাই দিতে পারেন নি। অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসে গেছেন মণিমাসীমা।'

'সত্যিই ত—বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কোর্টের তাড়ায় মাইনের টাকাটা রেখে যাবার কথা একেবারেই মনে ছিল না। তা রমেশ কোথায়—রমেশকে পাঠিয়ে দাও।'

'রমেশ বাজারে গেছে। রমেশ বুঝি এ সময় বাড়ী থাকে?'

'পিন্টু কোথায়—পিন্টু?'

'ক্যারম খেলছে। দেব পাঠিয়ে পিন্টুকে?'

'হ্যাঁ, তাই আসতে বলগে। কিন্তু একা পিন্টু···হ্যাঁ, তবে আর কি মুশকিল। ভদ্রমহিলা ত তোমাদেরই পাড়ায় থাকেন—এগারোর বি চৈতন্য সাহা লেন!'

রজনী অবাক হয়ে গেল ঠিকানা শুনে। এ ত তার নিজের ঠিকানা। তবে কি ভাড়াটেদের কারও কথা বলছে ভূপাল?'

'কি নাম বল ত?' ঢোঁক গিলে রজনী জিজ্ঞেস করল।

'মণিমালা দেবী। তাও ভদ্রমহিলার টাকা রোজগারে কত ঝামেলা। স্বামীকে লুকিয়ে ভদ্রমহিলাকে পড়াতে আসতে হয়। স্বামীটা একটা পাঁড় মাতাল—বৌয়ের হাতে টাকা আছে জানলে মারধর করে কেড়ে নেয়। উপোস করে থাকতে হয় দিনের পর দিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। তাই লুকিয়ে ভদ্রমহিলা টিউশানি করে যা পান তাই দিয়ে সংসার চালান। আজ টাকাটা না পেলে ওদের বড্ড কষ্ট হবে রজনী—হয়ত এই টাকাটার জন্যেই উনি পথ চেয়ে বসে আছেন। তা পিন্টু ছেলেমানুষ—ওর হাতে টাকা দিয়ে একলা পাঠাব না—তুমি ফেরবার পথে টাকাটা দিয়ে যাবে—কেমন?

রজনী আচ্ছন্নের মত মাথা নাড়ল।

'কিন্তু সাবধান—ভদ্রমহিলার গোঁয়ারগোবিন্দ স্বামী যেন এ টাকার কথা ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। তবে আর ভদ্রমহিলার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। বিজন সেদিন দুঃখ করে তাই বলছিল, 'ভগবান অকালে আমার সংসারের সুখ মুছে দিয়েছেন দাদা, কিন্তু মণিদির দুঃখের কথা শুনলে আর চোখের জল ধরে রাখা যায় না। মনে হয়—এই যোগিনীর জীবনই আমার ভাল—ঢের ভাল।'

'কে বিজন?' রজনীর জন্য বুঝি আরও বিস্ময় জমা ছিল।

'ও তোমাকে বলা হয় নি। বিজন আমার আপন পিসতুত বোন। বিয়ে হয়েছিল এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কোলিয়ারিতে কাজ করত। কিন্তু বোনের আমার কপালে বুঝি ভগবান এত সুখ লেখেন নি। বছর না ঘুরতেই এক্সিডেন্টে স্বামীটি মারা গেল। এখন আমার কাছেই এসে পড়েছে। দেখবার শোনবার মত আত্মীয়-স্বজনও তেমন কেউ নেই। কোলে একটি বাচ্চা। তাই ওর জন্যে মাষ্টারনী রেখে দিয়েছি। ম্যাট্রিকটা পাস করলে কারও গলগ্রহ না হয়ে নিজের খরচটা অন্ততঃ নিজে চালাতে পারবে। তা ভদ্রমহিলাকে বিজনেরও খুব পছন্দ হয়েছে। যেমন জানেন শোনেন ভাল—তেমনি মিষ্টি স্বভাব।···একি তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না রজনী। না না, তাড়া কিছু নেই। ফেরবার পথেই টাকাগুলো দিলেই চলবে। আর পিন্টু তোমার সঙ্গে থাকবে। বাড়ী চিনতে কোন কষ্ট হবে না। এগারোর বি···তবে হ্যাঁ একটা কথা—ওর বদমায়েস স্বামীটা যেন ঘুণাক্ষরেও টিউশানির টাকার কথা না জানতে পারে।···এই···আরও দু' কাপ চা দিয়ে যা···হ্যাঁ এতক্ষণ নিজের কথাই বললাম। এবার তোমার খবর কি বল রজনী?'···

চিরতুষারের পারে তিব্বত

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

৪

পরদিন অতি প্রভাতে সিরিং ভ্রাতৃদ্বয় আলগড়াই অভিমুখে রওনা দিল। রেন্থক থেকে খাড়া দেড় মাইল নেমে ঋষিচু নদী। উচ্চতা ২০০০ ফুটের মত। সেখান থেকে পেডং যেতে খাড়া পাঁচ মাইল উঠতে হবে। পেডং প্রায় ৫০০০ ফুট, আবার সেখান থেকে আলগড়াই আরও দু'মাইল উপরে; আলগড়াইয়ের উচ্চতা ৬৪০০ ফুট। সুতরাং এই উৎরাই ও চড়াইয়ের বহর মোটেই সহজ নয়। সিরিং ভ্রাতৃদ্বয়ের এ পথে যাওয়া আসা আছে, তাই তারা অতি প্রত্যূষেই রওনা হ'ল।

জেলাপের পথ

শ্রীপ্রধান আমাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যা থেকেই চেষ্টা করছিলেন। রেন্থক বাজারে লোক পাঠিয়েছিলেন, সেখানে মাড়োয়ারীদের ঘোড়া আছে। কিন্তু তারা কালোবাজারের দর চায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে আলগড়াই যেতে যে ঘোড়ার জন্য তিনি পাঁচ টাকা করে দিয়েছিলেন, তার জন্য এখন চাইল বার টাকা। নিতে হয় নাও, না নিতে হয় না নাও। বাধ্য হয়েই আমাদের রাজী হতে হ'ল। কেননা রাজী না হলে হাঁটতে হবে, আর চড়াইও বড় সহজ নয়। এদিকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, তাই সময়মত পৌঁছে কালিম্পঙের গাড়ী ধরাও চাই।

রওনা হবার পূর্ব্বে শ্রীপ্রধান আমাদের বেশ ভাল করে খাইয়ে দিলেন। অন্যান্য খাবারের সঙ্গে অনেকগুলি নেপালী জিলাপীও পেলাম। ঘোড়া রেন্থক বাজার থেকে পাওয়া যাবে। বাজার এখান থেকে মাইলখানেক দূর। সঙ্গে উনি লোক দিলেন।

বাজার পর্য্যন্ত যেতে সমস্ত পথটাই উৎরাই। বাজারটি নেহাৎ মন্দ নয়। এখানে পোষ্ট আপিসও আছে। সিকিমের বহু জিনিষপত্র ভারতে যাবার এদিকের এই শেষ বাজার। বাজারটি আবার কালিম্পং-লাসা রাস্তার উপর। যাত্রীদলের বিশ্রামের স্থান, সুতরাং এর কিছু প্রাধান্য আছে।

সঙ্গের লোকটি ঘোড়ার মালিক মাড়োয়ারীর কাছে আমাদের নিয়ে গেল। ঘোড়া খুব প্রত্যূষেই প্রস্তুত রাখার কথা। আমরা উপস্থিত হয়ে দেখি, তার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। এ সব ব্যাপারে ঘোষ ওস্তাদ; তিনি হিন্দী নেপালী সব ভাষাই বলতে পারেন। তিনি হিন্দীতে ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মাড়োয়ারী ত আমলই দিতে চায় না। অনেক কথা কাটাকাটির পর বলল, ঘোড়া দিতে পারি, লোক দিতে পারব না। অন্ততঃ একজন লোক সঙ্গে না দিলে ঘোড়া নিয়ে আসবে কে? সে কথা সে মাড়োয়ারী জানে না। মন্দ ব্যাপার নয়! আবার ঘোষের সঙ্গে বিস্তর কথা কাটাকাটির পর অবশেষে মাড়োয়ারী বলল—লোকের খরচ সে দিতে পারে, লেকিন আদমী হামাদের জোগাড় করে লিতে হোবে। আমরা বিদেশী, লোক কোথায় পাব? আগে সে এ কথা বলে নি কেন? তা হলে আমরা শ্রীপ্রধানের নিকট হতে লোক আনতাম। ঘোষ বড় সরকারী চাকুরে, আমি এম-এল-এ, খুব জরুরী কাজ, এই অঞ্চলের সর্ব্ব প্রধান নাগরিক শ্রীপ্রধানের আমরা খুব খাতিরের লোক, তার উপরে ঘোষের অনর্গল হিন্দীবাত—কোন ঔষধেই কোন ফল হ'ল না। ওর ঐ এক কথা, লোকের ব্যবস্থা সে করতে পারবে না। ঘোষ বললেন, ঘোড়া যখন ভাড়া করা হয়েছে তখন লোক জোগাড়ের দায়িত্ব আমরা কেন নেব? ঘোড়া ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ত তোমার। বেশ, আলগড়াই ফরেষ্ট আপিসে ঘোড়া বাঁধা থাকবে, তুমি লোক পাঠিয়ে নিয়ে এস। মাড়োয়ারীর ঐ এক কথা, লোক সে দিতে পারবে না। এখান থেকে লোক সঙ্গে না নিলে ঘোড়াও সে ছেড়ে দেবে না। তবে

হাঁ, আমরা লোক নিলে লোকের মজুরী সে দিতে পারে। এ তর্কের বোধ করি আর শেষ নেই। আমি নির্ব্বাক হয়ে শুনছিলাম, আর বার বার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, যদি হাঁটতেই হয় তবে আর দেরী কেন। বেলা বাড়িয়ে লাভ কি?

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে লোক-সমস্যার সমাধান হ'ল। কাছেই একজন নেপালী দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে বললেন, তিনি যেতে রাজী আছেন। তখন মাড়োয়ারী হাত বাড়িয়ে বললে, 'রুপিয়া লাইয়ে।' ঘোষ বললেন, 'রুপিয়া ইঁহা কেও, উহাঁ পুঁহুচকে দেঙ্গে।' মাড়োয়ারী সট্ করে বলে দিল, 'তব্ পয়দল যাইয়ে, ঘোড়া ইঁহা খুঁটিমে বাঁধা রহেগা।' এর পরেও কি ধৈর্য্য রাখা যায়? ঘোষ দেখলাম, ও কথা কানে নিলেন না, লক্ষ্মী ছেলের মত চব্বিশ টাকা মাড়োয়ারীর হাতে গুণে দিলেন। অদূরে ঘোড়ার আমদানী হ'ল। জিন পরাবার সময় বড় ঘোড়াটা বেশ একটু লাফালাফি করতে লাগল। ঘোষ বললেন, এইটে তেজী ঘোড়া, এইটেই তিনি নেবেন।

অতঃপর পাড়া দেড় মাইল ঋষিচু নদী পর্য্যন্ত নামতে হবে। এত পাড়াইয়ে কেউ ঘোড়ায় চড়ে নামে না। আমরা হেঁটেই নামতে সুরু করলাম।

ঘোষ বললেন, উঃ কি ব্যবসাদার দেখেছেন? টাকাটা অগ্রিম নিল। তা ছাড়া বলে কি 'পয়দল যাইয়ে, ঘোড়া ইঁহা খুঁটিমে বাঁধা রহেগা।' কালোবাজারের দর আদায় করছে, সেজন্য একটু ভয় বা ভাবনা কিছুই নেই। সিকিমে সর্ব্বত্র দর বেঁধে দেওয়া, দেওয়ানকে জানান উচিত। সিকিমে আইনকানুন বড় নেই, দেওয়ান ইচ্ছা করলেই সায়েস্তা করতে পারেন।

'কাকে কত সায়েস্তা করবেন, তারা সব নিজেরা ঠিক আছেন ত?'

'কি রকম?'

'তবে শুনুন।

'কিছু দিন আগের কথা, আমার জেলার বর্ডার দারোগার ত সকলেই ঘুষ খেতে আরম্ভ করল। জেলা পুলিসের বড়কর্ত্তা বেশ কড়া লোক। তাঁকে আমি কয়েকটি সত্য ঘটনার কথা বললাম। উনি বললেন যে, জেলার সমস্ত পুলিস ডিপার্টমেন্ট ঘাঁটলেও এমন দু'জন দারোগা বেরুবে না যারা ঘুষ খায় না। যাকে দেবেন সে-ই ঘুষ খাবে। বললেন এর প্রতিকার হতে পারে যদি উপর ঠিক হয়। এই কথা শুনে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ল। বর্ষাকালে আমাদের জেলার বর্ডারে যাবার রাস্তা তখনও পত্তন হয় নি, তখন খবরদারী করবার জন্য লঞ্চের একান্ত প্রয়োজন। নদীপথ বেয়ে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। এ কথা উপরে যথাস্থানে নিবেদন করলে সেখান থেকে হুকুম হ'ল, কোন বিশেষ কোম্পানীতে লঞ্চ বিক্রী আছে, তারই দুখানি খরিদ করা হউক। পুলিসের সর্ব্বময় বড়কর্ত্তা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে লঞ্চ দুখানি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করলে উপরওয়ালা বললেন, তার কোন প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে ভাল দাম দিয়ে লঞ্চ দুখানি খরিদ করা হ'ল। লঞ্চ দুখানি বেশ ভাল। কিন্তু লঞ্চ দুখানি

তিব্বত-সরকারের উপহারসহ লেখক

সেই যে ডকে প্রবেশ করলে—আর বহুদিন পর্য্যন্ত বের হ'ল না। থাকল বর্ডারের খবরদারী। পুলিসের সর্ব্বময় বড়কর্ত্তার সঙ্গে পরে আমার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমি লঞ্চ দুখানির খবর জিজ্ঞাসা করি। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—ওকথা জিজ্ঞাসা করবেন না, ও নিষিদ্ধ প্রশ্ন। তাই বলছি, যথাস্থানেই যদি এই বিভ্রাট ঘটে তবে চুনোপুঁটি দারোগার অনাচার সামলান যাবে কি করে? অতএব দেওয়ান বাহাদুরের আকার ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা ও ভাবনের সংবাদ না নিয়ে তাঁর কাছে নালিশ করতে যাওয়ার প্রস্তাবে আমি উৎসাহ বোধ করি না। যাই হোক, আপনার মেজাজের প্রশংসা করি। দেওয়ানের কাছে নালিশ করবেন বলে যে এবাউট-টার্ণ কুইক মার্চ্চ করেন নি সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি ত ভাবছিলাম, আজ সমুদ্রের পাঁচ হাজার ফুট বোধ হয় হেঁটেই চড়াই করতে হবে।'

ঘোষ বললেন, "কাজেই বুঝুন আমরাই ইতস্ততঃ করি, গরজে কালোবাজারের দর মেনে নিই, তা হলে জনসাধারণের অপরাধ কি? বাড়ীতে ছেলে মর মর, বাবা কণ্ট্রোল দরে ওষুধ পেল না, তখন ব্ল্যাকে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?" সঙ্গের নেপালীটির সঙ্গে ঘোষ বেশ নেপালী ভাষায় আলাপ জুড়ে দিলেন। ছেলেটি বড় ভাল। ও একজন প্রাথমিক শিক্ষক। ছেলেরা নিয়মমত বেতন দেয়

না। অতএব সংসার চালান তার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তাই এক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ীতে ওখানে মুনিব খাটে। আজও তাই

কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য

যাচ্ছিল। আমাদের বিপদ দেখে সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আসতে রাজী হ'ল। তার নিয়োগকারী গৃহস্থ অবশ্য তার আশায় থাকার নূতন লোক নিতে পারবেন না, তাঁর কাজের একটু ক্ষতিই হবে। তা নেপালীটি ফিরে গিয়ে ঘটনা বুঝিয়ে বললেই তিনি সব বুঝবেন। আপন সংসারের সুখ দুঃখের অনেক কথাই ছেলেটি বলল। বড় দুঃখের সংসার, সবিস্তারে এখানে সব কথা বলতে গেলে একটি কাহিনী হয়ে পড়বে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ঋষিচু নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এখানকার উচ্চতা বোধ করি দু'হাজার ফুটেরও কম। নদীর এপারে সিকিম, ওপারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। নদীর উপরের সেতু পার হয়ে আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করলাম। সেতুর উপর হতে আমরা প্রকৃতির মনোরম শোভা খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ঘোষ কয়েকটি ফটোও তুললেন। দেরী করার উপায় নেই। সামনে সাত মাইল প্রায় ৪৫০০ ফুট উঠতে হবে। পেডং পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল, সোজা খাড়াই; সোজা খাড়াই পথ ভীষণ এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে গিয়েছে। ঘোষ তাঁর তেজী ঘোড়ায় চড়লেন, আমি আমারটিতে চড়লাম। আর নেপালী ছেলেটি পরদলে উঠতে আরম্ভ করল। খাড়াই বটে! এ যেন গিরি লঙ্ঘনের ব্যাপার। বিসর্পিত পথ বড় বড় গাছের ছাওয়ায় ঢাকা; আমরা উঠেই চলেছি। ঋষিচু নদীর সেতু ছোট হতে হতে বিন্দুবৎ হয়ে গেল, আর নদী একটি সূত্রে পরিণত হ'ল। রেম্বুক বাজার, রেম্বুকের নার্সারী সব আমাদের নীচে পড়ে রইল।

খানিকটা উঠেই ঘোষের তেজী ঘোড়া পাথর বিছান পথের উপর ধপাং করে শুয়ে পড়ল। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কি, ঘোড়া মহাশয় চলতে অনিচ্ছুক। ঘোষ হাতের চাবুক তুলতেই তেজী ঘোড়া আবার ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেপালী ছেলেটিও আমাদের সঙ্গে সমানে উঠছিল। আমরা সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

আপনি যে রকম ভারী—আমরা সকলেই এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে এক চোট হেসে নিলাম। আবার ঘোড়ায় চড়ে পথ চলা সুরু করলাম। এবার আমি আগে ঘোষ পেছনে। কিছুদূর গিয়ে আবার ঘোষের ঘোড়া শুয়ে পড়ল। সৌভাগ্যবশতঃ ঘোড়া শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর কোন আঘাত লাগে না।

এই রকম কিছু পরে পরেই চলতে থাকল। কয়েক ফার্লং গিয়েই তেজী ঘোড়ার একবার করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করা চাই-ই। বড় কঠিন খাড়াই পথ, কিন্তু তাই বলে একটি জোয়ান ঘোড়া এই রকম করবে এ অভাবনীয়। ঘোষও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি এ ঘোড়া নিয়ে উপরে উঠবেনই। এতগুলো টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে। প্রায় অর্দ্ধেক পথ উঠে একটি সরাইখানা পাওয়া গেল, দেখি এখানে আমাদের দৈত্যগণ এবং গত দিনের সেই তিব্বতীদল বিশ্রাম করছে। আমরা দাঁড়ালাম না, উঠেই চললাম। ঘোষের বড় ভয়, তেজী ঘোড়া ওদের সামনেই না শুয়ে পড়ে। ঘোড়া এবার বেশ খানিক চলল। আমরা প্রায় মাইলখানেক চলেছি, ভাবছি, যাক এবার ঘোষের ঘোড়া আর বেশী গোলমাল করবে না, এমন সময় ধড়মড় শব্দ শুনে পেছনে চেয়ে দেখি, তেজী ঘোড়া পপাত ধরণী-তলে। চার ঠ্যাং ছড়িয়ে দিয়ে কাত হয়ে ঘোষের একখানি পা, তার পিঠ ও মাটির মধ্যে আটকে ফেলেছে। আমরা দৌড়ে এসে টানাটানি করে ঘোষকে বের করলাম, ঘোড়াটির জিন ছিঁড়ে ছিটকে পড়েছে। এইবার আসল ব্যাপার বোঝা গেল। ঘোড়ার পিঠে দগদগে ঘা। কেনই বা তিনি জিন কষার সময় লাফালাফি করে নিজের তেজস্বিতা প্রমাণ করেছিলেন, কেনই বা কালোবাজারী মাড়োয়ারী অগ্রিম টাকা আদায় করেছিলেন, এবার সব পরিষ্কার বোঝা গেল। এ নইলে আর এরা সামান্য ব্যবসা ফেঁদে দু'দিনে টাকার কুমীর হয়। ঘোষের পা ধরে আমরা টানাটানি করলাম। লাগে নি ত? উনি দু'এক পা খুঁড়িয়ে নিয়ে বললেন, না, ঠিক আছে। অতঃপর এই ঘোড়ায় পুনরায় জিন চাপান প্রায় অসম্ভব বলে মনে হ'ল। প্রয়োজনীয় কি একটা চামড়ার ফিতে ছিঁড়ে গিয়েছে। ভাগ্যক্রমে পাশেই একটি পাহাড়িয়া চাষীর কুটির ছিল। এই পাহাড়ীরা ঘোড়ার ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, তার বাড়ীর থেকে সরঞ্জাম নিয়ে এসে জিনটি মেরামত করে আবার ঘোড়ার পিঠে ভাল করে বেঁধে দিল। আমরা তখন পেডং প্রায় ধর ধর করছি, খাড়াইও একটু কমে গিয়েছে, আমরা অতি সন্তর্পণে চলতে লাগলাম। আমার ঘোড়া আগে আগে খুব ধীরে ধীরে চালালাম। ঘোষও পিঠের ঘায়ে যত কম চাপ পড়ে এইভাবে বসে চললেন। ঘোড়া আর তখন কোন গোলমাল করল না।

পেডং গ্রামের বাজারের মধ্য দিয়ে আমাদের রাস্তা। এই রাস্তা আলগোড়াই থেকে আগাগোড়া মোটর যাওয়ার উপযোগী করা হচ্ছে। অর্থাৎ, সীমান্তের পেডং গ্রাম কালিম্পং হতে বরাবর মোটরের রাস্তা দ্বারা যুক্ত হচ্ছে। পেডঙের বাজার রোজই বা

মেদুকের বাজারের চেয়ে বড়। মফঃস্বল থেকে ক্রমশঃ আমরা সদরমুখী। কালিম্পঙের সভ্যতার হাওয়া এখানে এসে লেগেছে। পেডং যেন বর্ত্তমান সভ্য জগতের প্রবেশদ্বার।

বাজারের সীমানা প্রায় ছাড়িয়েছি, এমন সময় এক নেপালী পুলিস এসে আমাদের গতিরোধ করল। দারোগাবাবুর নাকি হুকুম, আমাদের থানায় যেতে হবে। আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমাদের থানায় যাবার দরকার নেই, তোমার দারোগাবাবুর দরকার থাকলে আমাদের কাছে আসতে বলগে। পুলিসটি আমাদের গম্ভীর চালে ভড়কে গেল।

বাজার থেকে ডাক-বাংলো প্রায় আধ মাইল. পেডং আলগোড়াই রাস্তার উপরে পড়ে। এখন মোটর চলাচলের জন্য পেডং হতে আলগোড়াই সমস্ত রাস্তাটিরই পরিসর বাড়ান হচ্ছে। এই জন্য ডিনামাইট দিয়ে প্রায় স্থানেই পাহাড় ধ্বসান হচ্ছে। অন্য কোন পথে যাওয়ার কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তা অনেক স্থানেই সম্পূর্ণ বন্ধ। এই সব স্থানে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে ঘুরে এসে রাস্তা ধরতে হচ্ছিল। ঘোড়া নিয়ে এইরূপ করা রীতিমত কষ্টকর বোধ হচ্ছিল। রাস্তায় একজন কনট্রাক্টর দেখি আমাদের পরিচিত, তিনি বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি ত আমাদের দেখে অবাক। তাঁকে সংক্ষেপে আমাদের বিষয় বলে, নেপালী পুলিসের সঙ্গে আমাদের মোলাকাতের কথা বলে দিলাম। তিনি বললেন, দারোগার সঙ্গে দেখা হলে তিনিও বলে দেবেন। এখানে পূর্ব্বে পাসপোর্ট দেখার একটি নিয়ম ছিল। এখন সিকিম যেতে পাসপোর্ট লাগে না। তবুও অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ বা লেখালেখির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তিব্বতে চীন আসছে, অতএব কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক এখন একটু বেশী।

ডাক-বাংলো পার হয়ে আমরা পেডঙের সরকারের সংরক্ষিত বনের মধ্যে পড়লাম। এই বনের মধ্য দিয়ে আলগোড়াই যাবার পথ। কালিম্পঙের সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত প্রায় সকল বনের মধ্যেই আমি ঘুরেছি। যত রক্ষিত বনভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মধ্যে এই পেডং বনভূমিই শ্রেষ্ঠ বলে আমার মনে হয়েছে। এর চাপ, তুণ, উটিস, ধুপী, চির হন্বিং পিপলীর জুড়ি আর কোথায়ও নাই। আমাদের সঙ্গে যে প্রাথমিক শিক্ষকটি ছিল, সে দেখি এসব গাছ চেনে। ধুপীর নাম যে Cryptomoria Japonica—তাও সে জানে। এত পাহাড় চড়াই করে সমানে আমাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে এসেছে, তথাপি গাছপালা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনায় তার খুবই আনন্দ। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আমাদের বনভূমির আবাদ পর্য্যবেক্ষণ করলাম। এজন্য মাঝে মাঝে পথ চলাও ক্ষান্ত দিয়েছি। আমার সঙ্গীরাও একটু বিশ্রাম করে নিয়েছেন। মানুষের সৃষ্ট বনের ভিতর দিয়ে পেডং বনভূমি কালিম্পঙের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আলগোড়াই পৌঁছানোর পর একস্থানে এসে উৎরাই করতে হয়; এখান হতে আমরা ঘোড়া দুটি সহ শিক্ষককে বিদায় দিলাম। ওর মজুরী সেই মাড়োয়ারীর দেবার কথা, তথাপি ঘোষ ওকে দরাজ হাতে বকশিশ দিলেন। শিক্ষকটি খুব কৃতজ্ঞতা জানাল। তার বড়ই অভাব, এতক্ষণ তার অনেক দুঃখের কথা ঘোষ শুনেছেন।

চীনযাত্রী তিব্বতী প্রতিনিধি দল

আলগোড়াইয়ে ফরেষ্ট-রেঞ্জারের বাড়ীতে আমরা অতিথি হলাম। ইনি বিশেষ ভদ্রলোক, D. F. O.-র নিকট হতে খবর পেয়ে আমাদের জন্য পূর্ব্ব হতেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এর বাংলোতে যেতে হলে আলগোড়াই বাজার থেকে একটি পাহাড়ের উপর সোজা উঠে যেতে হয়। আমরা স্নান-আহারাদি সেরে রেঞ্জারের বাড়ীর বারান্দায় বসে দূর দূরান্তরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এখান থেকে ঝিশিস্থম পাহাড় দেখা যায়। মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলার অবস্থায় ঝিশিস্থম অনেকবার আমাদের চোখে পড়তে লাগল। পূর্ব্ব দিনের অনেক কথা আমাদের ঐ পাহাড়ের প্রতি চেয়ে মনে পড়তে লাগল। ওখান থেকে কাপুপ পাহাড় কি ভয়ঙ্করই না দেখেছিলাম। কোথায় কাপুপ, আর কোথায় আজ আমরা? একটা 'গপ্প' করে এলাম। নাথুলা পার হয়ে, জেলাপ পার হয়ে, হিমালয়ের হিমরাজ্য ভেদ করে এসে বারান্দায় বসে এখন অতীতের কথাগুলি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে আমাদের বেশ ভাল লাগছিল। যে weapon carrierটি আমাদের কালিম্পং নিয়ে যাবে, সেটি বাজারের রাস্তায় অপেক্ষা করছে। বাজারের মধ্যে পেডং থেকে যে পথ সোজা নেমে এসেছে, সেটি পরিষ্কার নজরে পড়ছিল; আর এই পথ দিয়েই একটু পূর্ব্বে এসেছি। আমরা মাঝে মাঝে এই পথের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। দৈত্যেরা এই পথে নামবে; তারা এলেই আমরা কালিম্পং রওনা হব। ঘোষ বললেন, "এই সব পথে চড়াই-উৎরাই কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যারা এই রকম করে তাদের হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ রোগ হয়। এইজন্য পাহাড়ীরা বেশী দিন বাঁচে না। দেখেছেন, একটা বুড়ো মানুষও আমাদের নজরে কোথাও পড়ে নি। বুড়ো হবার আগেই এরা মারা যায়।"

আমি বললাম, "এত পথ চলার মধ্যে একটি বুড়ো মানুষ মাত্র আমার নজরে পড়েছে। তাকে পিঠের উপর বোঝার মত ঝুলিয়ে একজন যুবক উপরে উঠছিল, ছেলেটি বোধ হয় ওর কোন আপনার জন।"

বরফের রাজ্য

ঘোষ বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও দেখেছি, রোঙলির পথে নামার সময় ওরা উপরে উঠছিল।"

আমি বললাম, "ঐ একটি, আর দ্বিতীয়টি কোথাও আমাদের নজরে পড়ে নি। এরা কেউ বেশী দিন বাঁচে না।"

ঘোষ বললেন, "ওদের ফুসফুস ব্যাঙের মত ওরা ফোলাতে পারে, তা নইলে ঐ লঘু বাতাসে (rarefied air) ভারী বোঝা নিয়ে ওরা চড়াই করে কি করে?" জন্ম থেকেই ওরা rarefied air-এ অভ্যস্ত, ওরা কালিম্পঙে গেলে দার্জিলিঙে এলে গরমে হাঁপিয়ে পড়ে, আর সমভূমিতে গেলে মরে যায়। পুরুষানুক্রমে ওদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস এমনি তৈরি হয়েছে যে, ওরা ঐ হিমরাজ্যের rarefied air-এ-ই বাসের উপযোগী। তবে ভাল খেতে পায় না, আর কুলিগিরি ওদের একমাত্র পেশা। দিনের পর দিন চড়াই-উৎরাই করে, কাজেই হৃৎপিণ্ড সবারই প্রায় dilated হয়ে যায়। তাতেই মরে, ভাল খেতে না পেয়ে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করে থাইসিস হয়েও মরে।"

আমি বললাম, "সমাজব্যবস্থা একেবারে বদলে যাবে। এদের মধ্যে যখন কম্যুনিজম প্রচারিত হবে তখন বুঝতেই পারছেন কি হবে। তিব্বতে ত চীন এসেও গেলেন। কালে-মাকড়ী জিভ-নাড়ার দল আর বেশী দিন গোলামী করবে না। আপনার সেই নেপালীটির কথা মনে আছে?"

—"মনে নেই, যেটার সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ জন রক্ষিতা আছে, যেটা টাকার কুমীর?"

—"হ্যাঁ, আলুর ব্যবসা করে যে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে। শত শত পাহাড়ী নেংটি পরে, পিঠে বোঝা বয়ে, দিনের পর দিন কঠিন পাহাড় চড়াই করে তার এখানে আলু নিয়ে আসবে, আর সে একচোটে তা ঘরে নিয়ে বসে বসে মুনাফা লুটবে। যারা তৈরি করবে, বোঝা বইবে, তারা খেতে পায় না, মাঝের থেকে এদের সকলকে ঠকিয়ে মুনাফা মারবে চোরাকারবারী ব্যবসাদারেরা! এ জিনিষ বেশী দিন চলবে না। সাম্যবাদ প্রচারের এমন সুন্দর ক্ষেত্র কোথাও নেই। কম্যুনিজমের নীতি সত্যি-কারের সাম্য আনবে কিনা, তা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী কিনা, ওসব বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব বুঝবার সময় এদের পরে হতে পারে, আজ নয়। সাম্যবাদের নীতি একটু প্রচারিত হলেই, কি ভাবে ওরা শোষিত হচ্ছে তা একটু বুঝতে পারলেই, আজ ওরা ক্ষেপে উঠবে। সোজা খাবার রুটি দাবি করবে। যারা ওদের রুটির ভরসা দেবে, তাদের কথাই ওদের শুনতে ভাল লাগবে।"

ঘোষ রাজনীতির মধ্যে বড় যেতে চান না; তিনি অন্য কথায় এসে পড়লেন। বললেন, "দেখুন যাঁরা এভারেষ্ট বিজয়ে বের হন, তাঁদের নিয়ে সমস্ত বিশ্বে কত না তোলপাড় হয় কিন্তু আমাদের শের্পা কুলিরা পিঠে মোট নিয়ে প্রভুরা যত উপরে উঠে তত উপরেই উঠে। কিন্তু তাদের কথা ক'টা লোকে ভাবে? অত উপরে মোট বয়ে উঠা কি সহজ কথা? শের্পারা যদি সুযোগ ও উৎসাহ পায়, তা হলে পৃথিবীর সকলের আগে ওরাই এভারেষ্ট জয় করতে পারে।"

আমি বললাম, "আমাদের শের্পাদের ত এখনও দেখা যাচ্ছে না। আপনি তেজী ঘোড়া নিয়ে যে পথে চড়াই করে এসেছেন, আগাগোড়া সেই পথ ত ওদের মণখানেক বোঝা বয়ে আসতে হবে। পৌঁছতে পারবে ত?"

ঘোষ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখুন আমাদের তিব্বতী দৈত্যেরা আসছে।"

সত্যই দেখি পিঠে বোঝা ঝুলিয়ে, সামনে ঝুঁকে পড়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের দৈত্যরা পেডঙের পথে আলগোড়াই বাজারে নেমে আসছে।

আমাদের কথামত রেঞ্জার মাল আর উপরে তুললেন না। weapon carrier-এ উঠিয়ে দিলেন। আমরা তখনই রওনা দেব বলে নীচে নেমে এলাম। কোথায় ছোট সিরিং কোথায় বড় সিরিং, আমাদের দৈত্যগণকে খুব খোঁজাখুঁজি চলল। আমি বললাম, আসবার সময় বাজারের মধ্যে যে নেপালীর চা'র দোকানটা দেখে-

ছিলাম, বোধ হয় ওরা সেখানে থাকতে পারে। সেখান থেকে লোক ঘুরে এসে বলল, ওরা সেখানে নেই। হুঁ, গেল কোথায়? ওরা এলেই যে আমরা রওনা দিতে পারি। এদিক ওদিক খোঁজা-খুঁজি চলল। মেঞ্জার বললে এইমাত্র ওদের দিয়েই ত মোটগুলি

গোম্পার ফ্রেস্কো

গাড়ীতে উঠিয়ে নিলাম। ড্রাইভার গাড়ীতেই বসে আছে। আমি তার পাশে আসনে উঠে বসলাম। সমস্ত বাজারের দোকান খুঁজে এসে লোক বলল, তাদের কোথাও পাওয়া গেল না। এমন সময় পেছনে চেয়ে দেখি, আমাদের ছোট সিরিং ও বড় সিরিং দিব্যি ট্রাকের মধ্যে মালগুলির পাশে বসে আছে। তাদের জন্ত যে সর্বত্র খোঁজ করা হচ্ছে তা তারা কিছুই বোঝে নি। আমি এই শিশু দুইটিকে মালের কাছে না বসে পাশের সিটের উপর উঠে ভাল করে বসতে বললাম। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়ল; আমরা মেঞ্জারকে ধন্যবাদ দিয়ে কালিম্পং অভিমুখে রওনা দিলাম। আলগোড়াই থেকে কালিম্পং আট মাইল। কিন্তু যেতে আমাদের বেশ একটু দেরী হ'ল। পথে তিব্বত থেকে পশমবাহী খচ্চরের দীর্ঘ সারি। তাদের পাশ কাটিয়ে অবশেষে কালিম্পঙে পৌঁছলাম।

ডি-এক-ও'র বাংলোতে যেতে খাড়া চড়াই উঠতে হয়। weapon carrier বলেই পারে। অন্ত গাড়ীর এই রকম চড়াই উঠার সাধ্য নাই। এ গাড়ীর সাহায্যেই ইংরেজ ও আমেরিকা লড়াই জিতেছিল। আমাদের সিরিং ভ্রাতৃদ্বয় মালগুলি গাড়ী থেকে বাংলোতে নামাল। এইবার এদের বিদায়ের পালা। তখনও বেশ বেলা আছে। ঘোষ এদের বাংলোর লনে দাঁড় করিয়ে ফটো তুললেন। ফটো তোলায় ওরা মহাখুশী। মুখে কথা না বললেও ওরা এই ফটো পেলে যে আরও কত খুশী হয় তা উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। ঘোষ ওদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। নেপালী ওরা কিছু কিছু বোঝে। ইয়াটুঙের নিকটেই ওদের বাড়ী ছিল; এখন
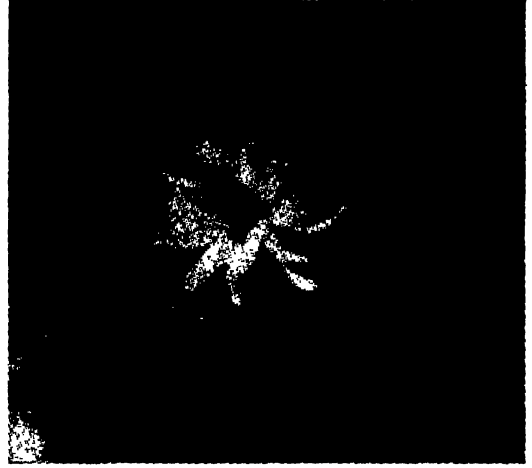
ক্যাক্টাস

বাড়ী-ঘর বলতে বিশেষ কিছু নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কাজ জুটল ত পিঠে বোঝা নিয়ে যেখানে যেতে হয় চলল। কাজ পেলে পেট চলে, না পেলে উপোস করে। যে ক'দিন ওরা আমাদের সঙ্গে ছিল, তার প্রতিদিন প্রত্যেককে ৫৲ টাকা করে, এক দিনের ৭।০ টাকা করে ঘোষ ওদের দিলেন। তারপর বকশিশ ভাল করেই দিলেন। তা ছাড়া আমাদের রেশনের চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ছাতু, গুড়, চিঁড়ে ইত্যাদি যা কিছু ছিল সব ওদের দিয়ে দিলেন। টাকা পেয়ে ওরা যত না খুশী হ'ল, এগুলি পেয়ে যেন ওরা তার চেয়ে খুশী হ'ল। বেচারারা কোনদিন স্নান করার সুযোগ পায় না। এক সেট মাত্র পোষাক, তা প্রথম পরার দিন থেকে না ছেঁড়া পর্যন্ত গায়েই থাকে। ঘামে ঘামে হলদে গায়ের উপর এক পর্দা ময়লা পড়েছে; একটু ডলা দিলেই যেন চাপটি বেঁধে উঠে আসতে পারে। ঘোষের দেওয়া রেশনগুলি পুঁটলি বেঁধে, তাঁর দেওয়া বুট জোড়া হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ওরা সেলাম দিয়ে বিদায় নিল। কালিম্পং বাজারের দিকে তারা চলল। তাদের সঙ্গে যেন একটা নিবিড় ঐক্য জন্মে গিয়েছিল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে কষ্ট হ'ল। কোন্ জনসমুদ্রে আবার ওরা হারিয়ে যাবে। ঘোষ বললেন, ফটো তোলা হলে, গ্যাংটক বা কালিম্পং বাজারে খোঁজ করলে সিরিংদের আবার কোনদিন হয়ত সন্ধান মিলতে পারে। আবার এ দিকে এলে ওদের ফটো হয়ত ওদের দেওয়া যেতে পারে।'

আমি বললাম, 'সে আশা দুরাশা। আমরা কবে আসব, ওদের খোঁজ করব, পাব, তবে দেব, সে অনেক যদি।' ঘোষও যে

এটা বোঝেন না, এমন নয়। সিরিংরা বড় আপনার হয়ে গিয়েছিল। আমাদের উত্তরের মনই বড় ভারাক্রান্ত হ'ল। ঘোষ হঠাৎ একটু রাজনীতির কথা বলে ফেললেন। 'জগতে ব্যাপার মন্দ নয়, এক দল লোক সুন্দর খাবে-দাবে, গরম জলে স্নান করে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরবে, আর একদল লোক কোন দিন পোশাক বদলাতে পারবে না, শীতের মধ্যে স্নান করার গরম জল পাবে না, উদর-অন্ত বোঝা বয়েও পেট ভরে খেতে পাবে না, চিরকাল, 'হিউয়ার্স অব উড এণ্ড ড্রয়ারস অব ওয়াটার' হ'য়ে থাকবে।'

জেলাপের পথে

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা যে অতগুলি টাকা পেল তা দিয়ে কি করবে।'

ঘোষ বললেন, 'ও টাকা বেশীক্ষণ থাকবে না, কিছু পচাই কিনতে, কিছু জুয়াখেলায়, এক্ষুণি উড়ে যাবে। মিতব্যয়ী এরা কদাপি নয়। সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার বা ভালবেসে সরল লোকগুলোকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার কেউ নেই। ওরাও এই একঘেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে বাঁচবার জন্য এই জুয়াখেলার বদভ্যাসে আসক্ত না হয়েই বা কি করে।'

কথাটা একটু হাল্কা করার জন্য আমি বললাম, 'দেখুন ওরা যখন বোঝা এনে নামাত তখন আমি লক্ষ্য করেছি, ওয়াটারপ্রুফের যে অংশটা ওদের পিঠের উপর থাকত সেটা ওদের ঘামে চবচবে হয়ে ভিজে যেত। আমাদের ওয়াটারপ্রুফ ত দেখেছি বেশী বৃষ্টি হলে জল মানে না। এখন কথা হচ্ছে, আপনি আমাদের যে ছাতু ও চিড়ে খাওয়াতেন, তা ত ওয়াটারপ্রুফের মধ্য থেকে ওদের ঘাম শুষে নিত না?'

ঘোষ হেসে বললেন, 'না, না, তা হলে কি আর আর্জেন্টিনা দেশের বোকা পাঁঠার গন্ধ পেতেন না? ঐ তিন পাউণ্ড মাংস ত ওদের উদরেই গিয়েছিল।'

ডি-এফ-ও, শ্রীমণ্ডল, এতক্ষণ আপিসেই ছিলেন। গ্যাংটক যাবার পথে আমরা কালিম্পঙে তাঁরই অতিথি হয়েছিলাম। তিনিই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে ডিশিকুম, দলীপচাঁদ ও কালিম্পঙের নানা স্থান দেখিয়েছেন। আমরা ইয়াটুং ঘুরে এসেছি, নাথুলা জেলাও অতিক্রম করেছি, আমাদের ভ্রমণ সফল হয়েছে, শুনে তিনি মহা খুশী। সেবার যখন তাঁর অতিথি ছিলাম, তখন তিনি একা ছিলেন, আজ তাঁর বিদুষী গৃহিণী এসেছেন। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির পথে এসেছেন। শ্রীমণ্ডল শিলিগুড়ি গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আজই এসেছেন। তাঁকে বাড়ীতে রেখে আপিসে গিয়েছিলেন। আমাদের বৈকালীন চা পান করালেন। রওনা হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কেউ দাড়ি কামাই নি। আমার এতে অসুবিধা না হলেও ঘোষের বড় বাধ বাধ ঠেকছিল। আমাদের পোশাকও মলিন। রোজ গরম জলে স্নান করলেও, প্যাণ্ট ঐ একটিই ব্যবহার করতাম, লটবহরের ভয়ে দ্বিতীয়টি সঙ্গে নিই নি। এই সব নিয়ে ভদ্রমহিলার সামনে বাধ বাধ ঠেকবারই কথা, এখন ত আমরা সভ্য জগতে এসে পড়েছি। মণ্ডলদম্পতি অবশ্য বড় ভাল মানুষ, তাঁরা আমাদের গল্প শুনে খুব খুশী। রাত্রে আমাদের তাঁদেরই অতিথি হতে বললেন। কিন্তু আমরা শ্রীএস. কে. বসু মহাশয়কে তিব্বতে যাবার পথে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম যে, ফিরে তাঁর ওখানেই উঠব। অতএব আমরা সে কথা বলে মাফ চাইলাম।

শ্রীএস. কে. বসু বিপত্নীক। তাঁর বাড়ী 'আরণ্যক' কালিম্পঙের এক প্রান্তে—শ্রীমণ্ডলের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। নিজের প্রতিভায় বসু মহাশয় বনবিভাগে নাম করা অফিসার বলে গণ্য হয়ে এসেছেন। তিনি সুপণ্ডিত, এখন অবসর গ্রহণ করার পর লেখাপড়া নিয়ে বৎসরের অধিকাংশ সময় এই আরণ্যকে একাকী দিন কাটান। তাঁর উপযুক্ত দুই পুত্র আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। সে প্রচণ্ড আঘাত তাঁকে সইতে হয়েছে। আমাদের পেয়ে যে তিনি কি খুশী হলেন তা বলবার নয়। রওনার পূর্ব্বেও এঁর সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম, তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেনও ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রাচীন বয়সে এত হাঁটাহাঁটি করতে ভরসা পান নি।

বেলা তখনও ছিল। বসু মহাশয় বললেন, 'আরে, আরে এস, এস, তোমাদের নাথুলা জেলাপ দেখাই। আমার এখান থেকে দেখা যায়।' বলে তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। একবার এক ঝলক বরফ দেখা—পাহাড়ের মাথা দেখা গেলেও পরক্ষণে তা কুয়াশায় ঢেকে গেল। ওদিকটায় একটু কুয়াশা। ঘোষের ক্যামেরা নিয়ে বসু মহাশয় আমাদের দু'জনের ফটো তুললেন। আমার তেমন চা পান করার অভ্যাস নেই, কিন্তু বসু মহাশয়কে সেকথা বলার সাহস হ'ল না। যে লোকটি তাঁর কথাইও ফাও ইতিপূর্ব্বেই তাকে চা তৈরীর হুকুম হয়েছে। আবার আমরা চা খেলাম।

বসু মহাশয় জ্ঞানের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, অরণ্য সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বইও লিখেছেন। আমাকে সেইগুলি উপহারও দিয়েছেন। কত কথাই না তিনি বলে যেতে লাগলেন। তাঁর বাড়ীতে লাগান ক্যাম্ফার গাছগুলি দেখালেন। কর্পূর তৈয়ারী সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। অধুনা বনবিভাগে পয়ের তৈরী ও কর্পূর তৈরীর ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক অপচয়ের কথা বললেন। বড় সাধ হয়, এই মহাপুরুষের সঙ্গে কিছুদিন কাটাই। কিন্তু এমন কর্ম্মবদ্ধ জীব যে তা সম্ভব করে উঠতে পারি না। রাত্রির খাবার তৈরী হওয়া পর্য্যন্ত আমরা একটানা আলাপ করে চললাম। হুয়েনসাঙের ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে ওঁর নূতন লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমাদের শোনাতে লাগলেন। কি অগাধ পাণ্ডিত্য!

পর দিন প্রভাতে আমরা সব একসঙ্গে দার্জ্জিলিং রওনা দিলাম। বসু মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে চললেন। পেষাক রোড দিয়ে চললাম। আবার রাস্তায় পড়লাম। আবার সেই শাল জঙ্গল পার হলাম। পরিষ্কার আকাশ। হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গগুলি পরিষ্কার নজরে পড়তে লাগল। বহুস্থান হতে নাথুলা ও জেলাপের দর্শন পেলাম। দার্জ্জিলিং ঢুকবার পথে ঘুম তাকদা রোড থেকে নাথুলা ও জেলাপ পরিষ্কার দেখা গেল। মনে হয় যেন, ঐ ওখান দিয়ে বরফ ডিঙিয়ে আমরা তিব্বতে গিয়েছি, আর ঐ ওখান দিয়ে ফিরেছি।

দার্জ্জিলিঙে বসু মহাশয়কে ও ঘোষকে তাঁদের বাড়ীতে পৌঁছে দিলাম। ঘোষ বাড়ীতে যাবার আগে দাড়ি কামিয়ে নিলেন। কনসারভেটার শ্রীনাথের কাছেই আমার কাজ ছিল। কিন্তু শুনলাম, তিনি সুকনায় গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও বনবিভাগের মন্ত্রী শ্রীমুন্সীর নাকি দার্জ্জিলিং ভ্রমণে আসার কথা সেই উপলক্ষে। অতএব আমি একাকী তাকদায় ফিরলাম এবং সেখানকার রেঞ্জারকে সঙ্গে নিয়ে সিংড়িডের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। সেখানকার চাঁপ, কাপাসি, পিপলি, লাপচা, কেওলা, ওয়ালনাট, উটিস, বুক, ফালুট বজ্রবাট, সিলভার কার প্রভৃতি নূতন সৃষ্ট বনের অবস্থা দেখে দেখে ফিরলাম।

তার পর এক বছরের বেশী কেটে গিয়েছে, আজও আমি সিকিং ভাইদের ভুলতে পারি নি। যখনই পাহাড় আমার মনকে টানে, তখনই গায়ে সাতপুরু ময়লা জমা, নোংরা পোশাক পরা, উদয়-অস্ত একঘেয়ে বোঝা টানা, গৃহহীন, বিশ্রামহীন, শ্রান্ত, ক্লান্ত দুটি

লেখক ও তাঁহার সঙ্গী ডাঃ ঘোষ (বামে)

অসহায় মানব-শিশু আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারা যেন পৃথিবীর অগণিত দুঃখী অসহায় মানুষের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

সমাপ্ত

বসন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বনে বনে ফুলদল
সমীরণে চঞ্চল,
হাসে আলো-ঝলমল
ফাগুন-আকাশ।

মনে কেন দখিনার
লাগে না পরশ আর,
বিষাদ-কুহেলি-ভার
ঘেরে চারি পাশ?

আমেরিকার পরিশ্রমী মেয়ে

শ্রীশান্তা দেবী

গত দু'দিন প্রায় সারা দিনরাত বরফ পড়েছে। দিনে দুই-তিন বার করে বরফ সরিয়েও পথের ধারের সিঁড়ি এবং বেড়াবার মত জায়গাটুকু পরিষ্কার রাখা যায় না। বরফ পড়ার সঙ্গে আবার ঝোড়ো হাওয়া, হাওয়ার চোটে গুঁড়ো বরফ উড়ে এসে চোখে মুখে ঢোকে। সচরাচর বরফ পড়ার খানিক পরে বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নিরা কোদাল হাতে পথ পরিষ্কার করতে বেরোন, চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলেমেয়ে থাকলে তারাও বেরোয়। কাল দেখলাম বৃদ্ধ কর্ত্তা-গিন্নীরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর পেরে উঠছেন না। আমাদের সামনের বাড়ীতে এক মহিলা থাকেন, সত্তর-পঁচাত্তর বয়স হবে, বোধ হয় বাড়ীতে একলাই থাকেন। সর্ব্বদা দেখি অন্য বাড়ীতে অনেকক্ষণ বরফ পড়ে থাকলেও তার সিঁড়ি আর পথ পরিষ্কার, নিজেই ফিটফাট করে রেখেছেন। কাল তিনি পাড়ার একটি পনর-ষোল বছরের মেয়েকে পয়সা দিয়ে বরফ সরালেন। তার চেয়েও ছোট একটি মেয়ে আর এক বাড়ীর বরফ সরিয়ে কিছু রোজগার করে গেল। আর সে বরফ কি কম? দশ-বার ইঞ্চি উঁচু হয়ে বরফ পড়েছে। অনেক জায়গায় স্কুল বন্ধ, গাড়ী বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে হ'ল এদেশে শারীরিক পরিশ্রমের মর্য্যাদা কতটা। দেশে থাকতেই শুনতাম এদেশে কোন কাজকেই মানুষ তার মর্য্যাদাহানিকর ভাবে না, এখানে এসে দেখছি সত্যই তাই। নিজের বাড়ীর কাজ ত সবই লোকে নিজেরা করে, তার উপর পয়সা রোজগার করবার জন্য পরের কাজও করতে তারা দ্বিধা করে না। কলেজে ইস্কুলে ছেলে-মেয়েরা বাসন মেজে, গাড়ী ধুয়ে, বিছানা পেতে, ঝাঁট দিয়ে, পরিবেশন করে টাকা রোজগার করে। অনেকে পড়ার আংশিক খরচ এইতেই চালায়, অনেকে সখের খরচের জন্য টাকা রোজগার করে। কলেজের ডীনের কন্যাও হাত-খরচের টাকার জন্য দোকানে জিনিষ বিক্রীর সাহায্য করতে অনায়াসে যায় এবং তার বাবা মা সেটাই ঠিক মনে করেন। তাঁরা বলেন, 'ওকে আমি যতটা খরচ করতে দিতে পারি তাতে ওর মন ভরে না, তাই ও নিজে রোজগার করে।' পয়সার জন্য এরা সব পরিশ্রমের কাজই করে বটে, কিন্তু ঠিক চাকর বা ঝি বলতে যা বোঝায় তা বোধ হয় এদেশে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এককালে এদেশে দাস-প্রথা ছিল এবং দাসরা ছিল নিগ্রো, সাদারা সেই নামটা নিতে বোধ হয় চায় না। তাই সাময়িকভাবে 'বেবী সিটার', 'মায়ের সহায়' ইত্যাদি অনেকে হয় বটে, কিন্তু মাস বা দিন মাইনে হিসেবে ঝি চাকর কেউ হতে চায় না। সেইজন্য একটা কাগজে পড়ছিলাম একজন মহিলা লিখেছেন যে, যদি আপিস সেক্রেটারীর মত 'গার্হস্থ্য সেক্রেটারী' নাম দিয়ে এবং তাকে 'মিস অমুক' বা 'মিসেস অমুক' সম্বোধন করে লোক রাখার প্রথা প্রবর্ত্তন করা যায় তা হলে অনেক বড় বড় চাকুরে মহিলার সুবিধা হয়। এখানে এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা বছরে ৮০০০ হাজার ডলার রোজগার করেন, বিধবা তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। এই মহিলাদের টাকা থাকা সত্ত্বেও সংসারের রান্নাবান্না বাসনমাজা সব করে আপিসে যেতে হয়, কারণ চাকর ঝি পাওয়া যায় না। এঁরা যদি 'গার্হস্থ্য সেক্রেটারী' পান তা হলে এঁদের অনেক সুবিধা হয়। এই সমস্যাটা ঠিক কতখানি এবং কি রকম আমরা বাইরের লোক অবশ্য ঠিক বুঝি না, কারণ বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দেখি 'বালিকা সহায়'দের জন্য প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সংসারের কাজে, ছেলেপিলে মানুষ করায়, বা বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও রোগীদের পরিচর্য্যার জন্য তাদের লোকে চায়। যদি একেবারেই না পাওয়া যেত, তা হলে নিশ্চয় বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ত না। একটা বিজ্ঞাপনে এই রকম সাংসারিক কাজের জন্য একটি মেয়েকে মাসে ১৫০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ টাকা দেওয়া হবে লিখছে। তবু আমরা যত লোককে চিনি কারুর বাড়ীতে মাসমাহিনার ছাত্রছাত্রী বা অন্য লোক দেখি নি। কেবল এক বাড়ীর গৃহকর্ত্তা কিছুদিন বিদেশে যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী তত দিনের জন্য একটি কলেজের ছাত্রীকে বাড়ীতে সহায় হিসাবে রেখেছিলেন দেখেছি। এই সব মেয়ে যদি সপ্তাহে পুরা পাঁচ দিন আপিসে কাজ করে তবে সপ্তাহেই তারা ৫০ ডলার অর্থাৎ ২৫০ টাকার কাছাকাছি পায়।

এদেশের ছোট ছোট মেয়েরা কত রকম সৎ উপায়ে টাকা রোজগার করে তার একটা হিসাব কাগজে দেখছিলাম। এই সব মেয়ের বয়স তের থেকে উনিশ-কুড়ি। এই বয়সে মেয়েদের শতকরা আশীজন পুরা বা আংশিক হাতখরচ নিজেরাই রোজগার করে। এদের প্রধান কাজ ছোট শিশু সামলান। মা-বাবারা যখন শিশুদের বাড়ীতে রেখে কাজে বা উৎসবে যান তখন এই সব তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে কিছু পয়সা নিয়ে তাদের এসে সামলায়। বেশ শক্ত মেয়েরা, অন্য কাজও অনায়াসে করে। কেউ বাগান পরিষ্কার করে, কেউ ট্র্যাক্টর চালায়, কেউ মেঝে পালিশ করে, কেউ বা

লনের ঘাস ছাঁটে, অথবা খবরের কাগজ ফিরি করে। কেউ বা বাড়ী রং করে। যাদের বিদ্যাবুদ্ধি বেশী তারা এত অল্প বয়সেও এর চেয়ে ঢের দায়িত্বপূর্ণ কাজও করে। নদীর জল মাপার কাজও একটি মেয়েকে করতে শোনা গিয়েছে। এরা বলে বাপ-মারা আমাদের খেতে পরতে এবং আরামে গরম বিছানায় ঘুমোতে দেন সেটা তাঁদের কর্ত্তব্য অবশ্য। কিন্তু আমাদের বয়সে আজকালকার দিনে সখের খরচ আমাদের নিজেদের টাকায় করা উচিত।

এই টাকা রোজগার করার ভাল এবং মন্দ দুই দিকই অবশ্য আছে। অনেক সময় মা-বাবা ছেলেমেয়েও পরস্পরের কাজে সাহায্য করে টাকা নেয়। এতে কেউ বা বিরক্ত হয়, কেউ বা এটাই উচিত মনে করে। অবশ্য নিজের লোকের বা বন্ধু বান্ধবের সাহায্য করে টাকা নেওয়াটা বাঁধা রীতি নয়, তা হলে এ নিয়ে তর্ক উঠত না বা মতভেদ হ'ত না। এমন মা আছেন যিনি নাতিকে সামলাতে এসে মেয়ের কাছে টাকা নেন আবার এমন মানুষও আছেন যিনি পরের বিপদে সাহায্য ত করেনই উপরন্তু নিজের পয়সা খরচ করে তাদের উপকার করেন।

তবে এটা ঠিক যে, খুব ছোট বয়স থেকেই এদেশের ছেলেমেয়েরা পয়সা রোজগার করতে শেখে। এই বড় আর বরফ পড়ার প্রচণ্ড আক্রমণে দেখছি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে 'তোমাদের কি রাস্তা পরিষ্কার করে দেব?' বলে বলে। তাদের বয়স বার থেকে ষোল-সতের হবে। কিন্তু সাত-আট এমন কি হয়ত ছয় বছরের ছেলেও সঙ্গে আছে। যতটুকু কাজ এই শিশুরা করে বড় ভাই-বোনেরা হয়ত তার জন্য এদের কিছু ভাগ দেয়।

এদেশে অনেক ছেলেমেয়েই খুব অল্প বয়সে বিবাহ করে। দেখে মনে হয় আমাদের দেশের মত কন্যাদায় এদের মোটেই নেই। অনেক মেয়েই অল্প বয়সে নিজের বিয়ে ঠিক করে নেয়। তবে যে সব ছেলেদের তারা বিয়ে করে সেই ছেলেরা কেউ কেষ্টবিষ্টু নয়। স্কুলে কলেজে পড়তে পড়তে সহ-পাঠীদেরই অনেকে ভাবী বর বলে ঠিক করে। যদি কলেজে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে যায় তাতেও তাদের অন্নকষ্ট হয় না; অথচ বিয়ের পর এরা একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকে না। এদের পক্ষে রোজগার করা খুব সোজা, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই তারা কিছু-না-কিছু কাজ জুটিয়ে নেয় এবং তাইতে বেশ সংসার করে, এমন কি পুরনো গাড়ীও একটা কিনে চড়ে বেড়ায়।

দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয় কিন্তু ছোট ছোট মেয়েরা বিয়ের পরই অনায়াসে সংসারের সমস্ত কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুসন্তান পালন করে। যদি পয়সার টানাটানি থাকে বা পয়সার সখ থাকে শিশুসন্তান নিয়েও মেয়েরা এর উপর একটা চাকরী করে। যতক্ষণ মা কাজ করে হয়ত বাবা ছেলে সামলায়, তারও যদি কাজ থাকে অপরের সঙ্গে ব্যবস্থা করে।

কলেজে অবশ্য সব বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পড়ে না। অনেকে ষোল বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে বা ছেড়ে দিয়েই কোন একটা কাজে লেগে যায় এবং সে সব কাজে পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশীই রোজগার করে।

টাকা এরা যেমন রোজগার করে তেমনি খরচও এদেশে বেশী। যে সব জিনিষ লোকে বেশী খায় যেমন দুধ, চিনি, মাখন, ময়দা তার দাম আমাদের দেশের চেয়ে বেশী নয় কিন্তু খাঁটি। কিন্তু মাছ, মাংস, ফল ও তরকারীর দাম খুব বেশী। ভেড়ার মাংস খুব কম লোকেই খায়, তার দাম দশ টাকা সের, ডিমও একটা তিন আনা চার আনা। কিন্তু খাবার খরচ ত মানুষের সবচেয়ে কম খরচ। আসল খরচ অন্য। যারা একটা মাত্র ঘর ভাড়া করে থাকে তাদের একটা ঘরেই নব্বই হইতে এক শত টাকা ভাড়া দিতে হয়। তার উপর ঘর গরম করে রাখার খরচ মস্ত। আমাদের এই বাড়ীটা সারা বছর গরম করে রাখবার খরচের একটা হিসাব পেয়েছিলাম তিন শত ডলার অর্থাৎ প্রায় পনর শত টাকা। মারাত্মক শীতের দেশে পোশাকের খরচ ত রাজোচিত। বছরে আট-নয় মাস ওভারকোট পরতেই হয়। বাকি তিন-চার মাসও লোকে হাল্কা একটা পরে। বরফ ও কাদার সময় উপরি উপরি দুই জোড়া জুতা পায়ে দিতে হয়, মেয়েদের মাথায় রুমাল, উলের কানপাট্টা, ফ্যাশনেবল টুপি হরেক রকম লাগে। আমাদের দেশে এসবের কোনই বালাই নেই। হাতে বার মাস দস্তানা, পায়ে দু'বেলা দু'রকম মোজা কখনও বা উপরি উপরি দু-চার জোড়া।

তার পর আছে গাড়ী এবং সর্ব্বোপরি শ্রমলাঘবের নানা-রকম যন্ত্র। হাতে করে ইস্ত্রী করতে জোর লাগে, কলের ইস্ত্রী চাই। হাতে কাপড় কাচতে পিঠ ভেঙে যায়, কলের ধোপা চাই। বাসন ধুতে কে এত সাবান-জল ঘাঁটবে? কলের বাসন মাজুনী আছে। জঞ্জাল কে আবার বাইরে ফেলতে যাবে? কল চালিয়ে কেটে ড্রেনে ধোবার কল হয়েছে।

গান ও স্বরলিপি

স্বরলিপি—শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাগ—মিয়াঁ মল্লার

বোলেরে পপীয়রা, অব ঘন গরজে।
উন, উন, কর আই বদরিয়াঁ
বরষন লাগে সদারঙ্গীলে,
মেহেরবা, দামিনীসি কৌন্দ চৌন্দ কো
মনুয়া লরজে ॥*

মিয়াঁ মল্লার, কানড়া ও মল্লারের মিলিত রূপ, ইহাতে গান্ধার কোমল ও দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত থাকে ও অবরোহণে কানড়ার নিয়মানুসারে গান্ধার ও ধৈবত বক্র যথা :—র্সা, ধ ণা পা, মা পা জ্ঞা মা রা, সা, কিন্তু কোন কোন সময় মল্লারের নিয়মানুসারে অবরোহণে 'ধৈবত' সরল ভাবেও ব্যবহৃত হয়, যথা :—র্সা, ধা পা মজ্ঞা, মা রা, সা। এই রাগে গান্ধার ও ধৈবত আন্দোলিত হয়। যথা :—মাজ্ঞা, মাজ্ঞা, মাজ্ঞা, পাধা, পাধা, পাধা, পাধা, এই প্রকার মধ্যম যুক্ত হইয়া গান্ধার ও নিষাদ যুক্ত হইয়া ধৈবত আন্দোলিত হইয়া রাগকে অধিকতর ব্যক্ত করে। আলাপ করিবার সময়, এই রাগে দুই নিষাদ কোন কোন সময় পর পর ব্যবহার করা হয় যথা :—পা ণা না র্সা আবার অবরোহণে :—র্সা না ণা মা পা, অর্থাৎ আরোহণে প্রথমে কোমল নিষাদ ও তাহার ঠিক পরেই আবার শুদ্ধ নিষাদ এবং অবরোহণে প্রথমে শুদ্ধ নিষাদ ও তৎপরেই কোমল নিষাদ ব্যবহার করা হয়। এই রাগে অধিক বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকেই হইয়া থাকে ও নিম্নলিখিত রাগবাচক বিন্যাসগুলি, বার বার পরিলক্ষিত হয়:—
মা পা ণা ধা, না র্সা, র্সা না ণা মা পা, ণা ধা ণা ধা, ণা মা পা, মজ্ঞা মজ্ঞা, মা, রা সা রা পা, মজ্ঞা মজ্ঞা, মা পা মা, রা, সা। ইহার বাদী সংবাদী 'পা সা' অথবা 'পা রা'।

মুখ্য অঙ্গ :—সা মরা পা, মজ্ঞা মজ্ঞা মা, রা সা ণ্‌া ধ্‌া ন্‌া সা।

আরোহণ :—সা মরা পা, মা পা ণা ধা, না র্সা।

অবরোহণ :—র্সা ণা পা, মা পা, মজ্ঞা, মা রা সা ॥ ('বাহারে'র সহিত এই রাগের সাদৃশ্য আছে)

মিয়াঁ মল্লার—তেতালা

স্থায়ী

0					১					+					৩					0				
-া	-া	-া	সমা	|	পা	ণা	মা	পা	|	র্সা	-া	ধণা	পা	|	মজ্ঞা	-া	জ্ঞা	মা	|	ণাঃ	পঃ	-া	জ্ঞা	|
০	০	০	বো		লে	রে	০	প		পী	০	০	য়া		রা	০	অ	ব		ঘ	ন	০	গ	

* প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য পরলোকগত রামকৃষ্ণ বেজবোয়ার গায়কী অবলম্বনে।

:মঃ সরা সা -া | সা সা মা রা | পা -া ধনা র্সর্রা | র্সা -া -া ণা | পা ণা মা পা | র্সা]
০ র জে ০ অ ব ঘ ন গ ০ র০ ০০ জে ০ ০ বো লে রে ০ প গী

(অন্তরা)

সমা -া মা জ্মা | -া মা পা মজ্ঞা | মা ণধা -া না | র্সা না র্সা -া | -া না না না |
উ ০ ন উ ০ ন ক র আ ই০ ০ ব দ রি য়াঁ ০ ০ বর্ ষ ন

র্সা না র্সা -া | না র্সা -া র্রা | র্ধা -া ণা পা | পা -া মা মা | মপা মা -া জ্ঞা |
লা ০ গে ০ স দা ০ রং গী ০ লে ০ মে ০ হ র বা০ ০ ০ ০

মসা -া সা মরা | -া মা পা -া | ণা -া ধা ধনা | র্সা নর্সা -া র্রা | ণা ধা ধণা মা |
দা ০ মি নী ০ সি কৌ ০ দ ০ ০ চৌ০ ০ দ ০ কো ম হু য়া ০

পমা পা পধা ণা | ধনা র্সর্রা র্সা ণা | পা ণা মা পা | র্সা -া ণা পা | মজ্ঞা -া মজ্ঞা -া |
ল ০ র০ ০ ০০ ০০ জে বো ল ০ রে প পী ০ ০ য় রা ০ ০ ০

মা -া রা সা | রা -া সা সা | রপা -া মজ্ঞা -া | মজ্ঞা -া মজ্ঞা -া | মপা মা রা -া | রা -া সা -া |
০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ব ঘ০ ০ ন ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ গ ০ র ০ জে ০

সা -া রা সা | -া রা সা -া | রা ধা -া ধা | রা ধা ণা পা | :রঃ -া সসা সা |
বো ০ ল রে ০ প পী ০ য় রা ০ অ ব ঘ ০ ন গ ০ র০ জে

৩ 0 ১ + ৩
রা সা -া সা | -া সা -া মণা | ণা ণমা পা -া | র্সা -া -া -া | ণা ণা -া -া
বো লে ০ রে ০ বো ০ লে রে ০০ ০ প পী ০ ০ ০ প পী ০ ০

0 ১ + ৩
ণণা পমা মরা মপা | ণা -া -া -া | ণণা পমা মরা মপা | ণা র্রা -া র্সা
আ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

0 ১ + ৩ 0
না -া না না | -া না না -া | না, র্সা ণধা -া | ধনা র্সা নর্সা র্রা | র্সা -া ণধা ণা
বো ০ ল রে ০ প পী ০ য় রা ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ রে ০ আ রে

১ + ৩ 0 ১
ণধা ণা ধা ণা | ধনা র্সর্রা র্সা -া | ধনা র্সর্রা র্সা -া | ধন্া সরা সা -া | মমা রসা ন্সা রমা
০ হাঁ ০ ০০ ০০ রে ০ অ০ ০০ ব ০ অ০ ০০ ব ০ আ০ ০০ ০০ ০০

+ ৩ 0 ১
ণণা মপা র্সা -া | র্রর্রা র্সণা ধনা র্সা | ধপা মরা সসা, সমা | পা ণা মা পা
০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ বো লে রে ০ প

+ ৩ 0 ১ + ৩
না না না না | না না না না | না না ণা ধা | না না না র্সা | র্সনা র্সা -া -া | -া ণা ণা ধা
বো লে রে প পী য়া ঘ ন গ র জে গ র জে অ ব ঘ ন ০ ০ ০ হাঁ ০ ০

0 ১ + ৩ 0
ধনা র্সা -া ণা | পা ণা মা পা | র্সা -া -া -া | র্রা র্সা ধা পা | মা রা সা -া
হাঁ০ ০ ০ বো লে রে ০ প পী ০ ০ ০ বো লে রে পা পী য় রা ০

১ + ৩ 0 ১ +
র্রা র্সা ধা পা | ধা পা মা, পা | পা মা, রা রা | সা -া -া সমা | পা ণা মা পা | র্সা
অ ব ঘ ন গ র জে বো লে রে পা পী য়া ০ ০ বো লে রে ০ প পী

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

২৪

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিক।

দেবানন্দ যাহাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতেছিল তাহাদের কেন্দ্রগুলি পশ্চিমবঙ্গে নানা জায়গায় ছড়াইয়া ছিল। কলিকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশেষ করিয়া মুরারিপুকুরের কেন্দ্রে তখন আয়োজন অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের মতে কাজ আরম্ভ করিবার মত আয়োজন হইয়াছিল।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডকে কেহ ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার কাছে যে পার্শেল বোমা পাঠানো হইয়াছিল তাহাতে কোন কাজ হইল না। মিঃ কিংসফোর্ড ভাবিলেন তাঁহার এক বন্ধু যে বই পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন পড়া শেষ হইলে তাহা ফেরত পাঠাইয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে তিনি পার্শেল খুলিলেন না।

চন্দননগরে বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ সজাগ হইল। চন্দননগরে ব্রিটিশ ডিটেক্‌টিভ পুলিশের ঘাঁটি বসিয়াছিল সেকথা আগে বলা হইয়াছে। নানা সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টি মাণিকতলা বাগানে যাঁহারা ধ্যান ধারণা ও যোগাভ্যাস করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বাগানে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। ইহারা মাণিকতলা বাগানের প্রাচীরের ওপারে বসিয়া গাঁজা টানিত ও হল্লা করিত। বিপ্লবীদল এত খবর রাখিতেন না।

দেবানন্দ ও তাহার চন্দননগরের বন্ধু বলাই গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে থাকিত। দেবানন্দের সঙ্গে মেদিনীপুরের দলের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই দলের মধ্যে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত নারায়ণ নামে ছেলেটিও ছিল। দেবানন্দ, বলাই, নারায়ণ এবং আরও জনকয়েক যুবক লইয়া ছোট একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি নানা রকমের আলোচনা করিত, নিজস্ব দলের বাহিরের লোক আসিলে মুখ বন্ধ করিত।

বলাই ধ্যানধারণা, যোগাভ্যাস অপছন্দ করিত। সে বিদ্রূপ করিয়া মাঝে মাঝে বলিত—দেশের শত্রু ও জাতির শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই সোজা জিনিসটা সোজা কথায় জোরের সঙ্গে না বলে ভগবৎ প্রেরণার কথা এত বেশী বলা হয় যে, মাঝে মাঝে কেমন আমার ভয় হয়। দেশের মুক্তির জন্য এত ভগবৎ প্রেরণার ষ্টিমুলাণ্ট দরকার হবে কেন?

দেবানন্দ সতীনের শিক্ষা ও দেবেন পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সংসর্গের কথা ভুলিতে পারে নাই যদিও তাহার নিজের মত অনেকটা বলাইয়ের মতের অনুরূপ ছিল। সে ইচ্ছা করিয়া বলাইয়ের সঙ্গে তর্ক করিত। বলাই বলিত—দেখ দেবু, বাজে তর্ক করিস না আমার সঙ্গে। তুই যেমন তোর সতীন দা ও দেবেন পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ঘুরেছিস আমিও তেমনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি। চন্দননগরে তিনি সারস্বত আশ্রম করেছিলেন—আদর্শ আর্যসন্তান বানাবার জন্য। প্রান্তর-সমিতির ব্যাপার ত জানিস না। কাঁটালপাড়ায় একবার প্রান্তর-সমিতির উদ্যোগে আনন্দমঠের মহেন্দ্রের দীক্ষার অভিনয় হয়েছিল। কি ভীষণ লাঠিযুদ্ধ হয়েছিল সেদিন। ওসব সন্তান-ভাবের চর্চ্চা অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি।

তবু বলাইয়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া দেবানন্দ বলিত—দেখ, দীর্ঘকাল পরাধীন থেকে আমাদের মনের অভ্যাস এমন হয়েছে যে শুধু আইডিয়া নিয়ে আমরা কাজ করতে পারিনে, ভাববিলাসের বা ধর্ম্মবিলাসের অনুপান দরকার হয়। আমাদের দেশের লোককে দিয়ে কাজ করাতে হলে এই অনুপানাদি দিতেই হবে।

বলাই বলিত—ওসব অবসকিওর্যাণ্টিজমের ওকালতি রাখ দেবু। তোর নিজের মনের ভাব আমি কি জানি না? তবে তুই যা বললি তার মধ্যে কিছু সত্যি আছে মনে হয়। লোককে দলে টানবার জন্য ভাব বা ধর্ম্মের উত্তেজনা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু চিন্তা বা কর্ম্মের ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব করবেন তাঁরা যদি এই উত্তেজনার ভিকটিম (বশীভূত) হয়ে পড়েন, এই উত্তেজনার ওপরে উঠতে না পারেন, তা হলে কি ফল হবে মনে করিস তুই?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—মা ফলেষু কদাচন। আমি ধরে নিয়েছি হামাগুড়ি দিতে দিতে একদিন আমরা হাঁটতে শিখব। ভাবনা চিন্তা সব আমি আপাততঃ শিকেয় তুলে রেখেছি।

বলাই—তুই একজন সত্যিকারের বিপ্লবী দেবু। এসব কথা যাক্। কিংসফোর্ডের গতি করবার ভার কাদের ওপর পড়ল জানিস কিছু?

দেবানন্দ—এখনও বোধ হয় নির্ব্বাচন হয় নি। আমি আমার নাম দিয়েছি, তোর নামও বলেছি।

বলাই—আমাকে কি নেবে? বলবে, তোমার চোখের পাওয়ার এত বেশী, চশমী খুললে চোখে দেখতে পাও না, যখন তখন কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর আসে তোমার।

দেবানন্দ তাহার বলিবার ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিল। তাহাদের আলাপ চলিতেছিল এমন সময় নারায়ণ আসিল। সে বলিল, কিংসফোর্ডের শ্রাদ্ধের পুরুত ঠিক হয়ে গেল।

দেবানন্দ ও বলাই উভয়ে সাগ্রহে বলিল—কারা যাচ্ছে রে? আমাদের নাম আছে?

নারায়ণ—মেদিনীপুরের একজন যাচ্ছে। আর এক জন বাওড়ার লোক, নাম দীনেশ রায় কি প্রফুল্ল চাকী? চেনেন নাকি?

দেবানন্দ ও বলাই উভয়ে হতাশ হইল তাহারা নির্ব্বাচিত হয় নাই জানিয়া।

নারায়ণ বলিল, কাল পরশু বোধ হয় ওরা মজঃফরপুর রওনা হবে।

দেবানন্দ—সুশীলকে এর মধ্যে দিলেও পারতেন। বেত মার'র শোধ নিতে পারত বেচারা।

বলাই কোন উত্তর দিল না। সে কি চিন্তা করিতেছিল। দেবানন্দ বলিল—দেখ বলাই, একটা কথা মনে উঠেছে। মালপত্তর যা তৈরি হয়েছিল বেশীর ভাগ ত মাণিকতলা বাগানে গিয়েছে, যা আছে সেগুলো নূতন কোন জায়গায় সরিয়ে রাখা ভাল নয়? কোন রকম গোলমাল হলে মাণিকতলার জিনিসগুলো যাবে, এখানকারগুলোও যাবে।

বলাই তাহার কথায় সায় দিল।

দেবানন্দের গোলযোগের আশঙ্কা সত্য হইল। ক্ষুদিরাম ও দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোমা ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিল না, ছিলেন মিসেস কেনেডী ও তাঁহার কন্যা। তাঁহাদের মৃত্যু হইল।

মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার খবর দিয়া পরের দিন এম্পায়ার এই মর্ম্মে লিখিল—পুলিস জানে কাহারা বোমা ফেলিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইতেছে। ১লা মে তারিখের এম্পায়ার কাগজ রাত্র আটটায় মাণিকতলা বাগানে পৌঁছিল। কর্ত্তৃপক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন খবর পড়িয়া। বাগানে যাহারা আছে তাহাদের এখনই সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দিনের পর দিন পরিশ্রম, বহু অর্থ-ব্যয় ও বহু কষ্টে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছিল সেগুলির কি ব্যবস্থা হইবে? সেগুলি ফেলিয়া যাওয়া মানে এতদিনের কাজ পণ্ড করিয়া দেওয়া। তাহা হইতে পারে না। সকলে মিলিয়া সারা রাত পরিশ্রম করিয়া মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া সংগৃহীত রাইফেল, বোমা, রিভলবার প্রভৃতি পুঁতিয়া ফেলিল। এই পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সকলে শুইতে গেল। স্থির হইল, সকালে উঠিয়া অধিকাংশ কর্ম্মী অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

রাত্রি চারটায় পুলিশবাহিনী মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। ছোট বড় যত কর্ম্মী সে রাত্রে বাগানে ছিল পুলিসের হাতে ধরা পড়িল। মাটি খুঁড়িয়া পুলিস অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিয়া ফেলিল। যাহা তাহারা বাহির করিতে পারিল না বা সহজে তাহাদের পক্ষে বাহির করা সম্ভব ছিল না একজন নেতা তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। এই ব্যবহারে বিস্মিত পুলিশ বিনা ক্লেশে সন্ধান পাইয়া জিনিসগুলি বাহির করিয়া লইল এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিল না। হয়ত গভীর হতাশায় তাঁহার মন এমন করিয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল যে অল্প যাহা কিছু বাঁচাইতে পারা যাইত তাহা বাঁচানো তিনি নিরর্থক মনে করিলেন। অথবা ঘরে আগুন লাগিয়া চোখের সম্মুখে সর্ব্বনাশ হইতে দেখিলে গৃহস্থ যেমন পাগল হইয়া যতটুকু জিনিস হাতে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে পারিতেন তাহাও অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেন, তিনি সেই রকম করিলেন।

মুরারিপুকুরের বাড়ীর পরে বিপ্লবী দলের কলিকাতার অন্য কেন্দ্রগুলি তল্লাসী হইল। ` নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ী তল্লাস করিয়া পুলিশ দেবা ‍ বলাই এবং আরও কয়েক জনকে ধরিল। ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী গ্রেপ্তার হইলেন। ৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের বাড়ী, ৩০।২ নং হ্যারিসন রোড, ৪নং হ্যারিসন রোড ও ২৩ নং স্কটস লেনের বাড়ী তল্লাসী হইল ও অনেকে গ্রেপ্তার হইলেন। শিবপুরে উল্লাসকর দত্তের গৃহ তল্লাসী হইল। প্রথম দল গ্রেপ্তার হইবার কয়েক দিনের মধ্যে নরেন্দ্র গোস্বামী এবং আরও কয়েকজনকে লইয়া দ্বিতীয় দল, তারপর চন্দননগরের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় ও আর কয়েকজনকে লইয়া তৃতীয় দল ধরা পড়িল।

মুরারিপুকুরের বাগানে বিপ্লবীদের গুপ্ত অস্ত্রাগার আবিষ্কারের পরে মেদিনীপুরের বোমা-ষড়যন্ত্র আবিষ্কার হইল। বিপ্লবীদের তৈয়ারি সবগুলি বোমা যে পুলিসের হাতে পড়ে নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৫ই মে তারিখে গ্রে ষ্ট্রীটে বোমা বিস্ফোরণে। মুরারিপুকুর ও অন্যান্য কেন্দ্রে যাহারা থাকিত, পুলিসের হাতে তাহারা ধরা পড়িলেও দেশের সকল বৈপ্লবিক কর্ম্মীকে যে তাহারা ধরিতে পারে নাই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল শহরের ট্রাম গাড়ী ও ল্যাম্প পোষ্টগুলির গায়ে মারিয়া দেওয়া অসংখ্য বৈপ্লবিক ইস্তাহারে। পুলিস কমিশনার মিঃ হ্যালিডে ঘোষণা করিলেন—যাহারা ইস্তাহার লাগায় তাহাদের ধরিতে পারিলে পাহারাওয়ালারা প্রত্যেক অপরাধীর জন্য ১০০্ পুরস্কার পাইবে।

কলিকাতায় ও মফস্বলে বাড়ী তল্লাসীর হিড়িক আরম্ভ হইল। বন্দেমাতরম্ প্রেস ও যুগান্তর প্রেসে পুলিস হামলা করিল। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ী তল্লাস হইল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের ম্যাচ ফ্যাক্টরি তল্লাস হইল।

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে মিসেস ও মিস কেনেডীর মৃত্যুর সংবাদে যুগান্তর এই মর্ম্মে লিখিল, "শত্রুকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় দুর্ঘটনাক্রমে কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটিলে তাহাতে ইংরেজের মত ভগবানের অসন্তুষ্ট হইবার কোন হেতু নাই। পৃথিবী হইতে অসুরদলকে উৎসাদিত করিতে হইলে অনেক পুতনাকে মারিতে হইবে। ইহাতে পাপ নাই, ইহার মধ্যে দয়ামায়ার স্থান নাই; সেদিন এক জন ইংরেজ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হিন্দু রমণী আত্মহত্যা করিল; ভগবান এজন্য সমস্ত ইংরেজ জাতকে ধ্বংস করিতে পারেন না? সিরাজকে যখন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তখন ভগবান বেশ আত্ম-সংযমের পরিচয় দেন নাই কি? তখন তিনি ক্রুদ্ধ হন নাই কেন? তখন তিনি ইংরেজকে অভিশাপ দেন নাই কেন?" সন্ধ্যা এই মর্ম্মে বলিল—"মজঃফরপুরের বোমার ব্যাপারে সমস্ত দেশ বিচলিত হইয়াছে। কাজি কিংসফোর্ড সস্ত্রীক মজঃফরপুর হইতে পলায়ন করিয়াছে। পুলিস গণ্ডা দশ-বারো লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দেশবাসী চমকিত ও ভীত। কেহ নিজের জন্য উৎকণ্ঠিত, কেহ সরকারের কথা ভাবিয়া, কেহ দেশের কথা ভাবিয়া, কেহ আবার ধর্ম্মের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছে।"

"এরকম ব্যাপার আগে এ দেশে ঘটে নাই। এদেশে এতদিন মানুষ শুধু মরিতে জানিত, তাহারা মারিতে শিখিয়াছে; এ শিক্ষা নূতন। চিরদিন তাহারা ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়া থাকিত, আজ তাহারা ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহা নূতন জিনিস। চিরদিন তাহারা ধৈর্য্যশীল জাতি বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত; তাহারা যে এতখানি অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে পারে একথা কেহ ভাবে নাই।" ইহার পর সুর বদলাইয়া সন্ধ্যা লিখিল, "মা এ তুই কি করিলি? আমরা ভাবিয়াছিলাম দুইটা গরম কথা, খানিকটা ভ্রূকুটি, গোটা-কয়েক চোখা চোখা বুলিতে কাজ হইবে। উপাধ্যায় মহাশয় এক দিন মা কালীর বোমার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে ছিল ঠাট্টা। বিডন স্কোয়ারের এক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'ফিরিঙ্গীকে ভয় দেখাবার জন্য আমি বোমার কথা বলি।' পাগলি মেয়ে, সেইজন্য কি তোর এতদূর যাওয়া উচিত হয়েছে?"

মাণিকতলা ও মজঃফরপুরের বোমার ব্যাপারের পরে মডারেট কাগজগুলি গবর্ণমেণ্টকে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া নূতন দমননীতি প্রয়োগ না করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। হিন্দু পেট্রিয়ট বলিল, "The proper remedy for the Nihilist spirit is a popular form of Government" (নিহিলিষ্ট স্পিরিটের উপযুক্ত প্রতিষেধক লোকপ্রিয় শাসনযন্ত্র)। ইণ্ডিয়ান মিরর এই মর্ম্মে বলিল, "আমরা দেখিতেছি যে আয়ার্লণ্ডের ফেনিয়ান সোসাইটির মত এদেশেও গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দমন-নীতি ইহার প্রতিকার নহে।" একদল কাগজ হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কথা তুলিয়া বিপ্লবী আন্দোলনের নিন্দা করিতে লাগিল। এই দলের মধ্যে বেঙ্গলীর মত মডারেট কাগজ ও সন্ধ্যার মত এক্সট্রিমিষ্ট কাগজও ছিল। বেঙ্গলী বলিল,—"Bloodshed is abhorrent to Indian nature" (ভারতীয় চরিত্র রক্ত-পাতের বিরোধী)। "বয়কট আন্দোলন বোমার আবির্ভাবের জন্য দায়ী"—এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলির এই কথার প্রতিবাদ করিয়া সন্ধ্যা বলিল, "গুপ্তহত্যা ও বোমা নিক্ষেপ ফিরিঙ্গীদের ব্যাপার। ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যা হিন্দুধর্ম্মের নীতিবিরুদ্ধ জিনিস।" একখানা কাগজ নিহিলিষ্টদের পথে বাঙালীরা পা দিয়াছে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিল, ইহার ফলে ভারতবর্ষের পতন হইবে। অন্য একখানা কাগজ বলিল, "পাশ্চাত্ত্যের সাম্যবাদ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মনে শিকড় গাড়িলে তাহাদের সর্ব্বনাশ আগাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সাম্যবাদ হইতে সোশিয়ালিজম আসিবে; আর এক ধাপ গেলে এনার্কিজম।" আর একখানা প্রাচীনপন্থী কাগজ লিখিল, "নিহিলিজম ও এনার্কিজম হিন্দুজাতির প্রাচীন আদর্শের বিরোধী। গীতায় প্রচারিত হিন্দুর আদর্শ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা। হিন্দুজাতি শান্তিপ্রিয়, ইহা নিন্দার কথা নহে; কারণ হিন্দুর শাস্ত্র তাহাকে শান্তিকামী হইতে শিখাইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে রাশিয়া, ইটালী ও আয়ার্লণ্ডের সোসিয়ালিষ্ট ও নিহিলিষ্টদের কর্ম্মকলাপের কথা জানিতে পারিয়া কয়েকজন উগ্রমস্তিষ্ক যুবক তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছে।" নায়ক বলিল, "ইংরেজীভাবাপন্ন ভারতবাসীরা বোমা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী। যথার্থ হিন্দুর ইহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। সন্ত্রাসবাদ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার বিষময় ফল। ইহা শত শত ভারতবাসীর অনুকরণ-প্রিয়তার ফল। বিদেশীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা হিন্দুরা আজ নূতন আরম্ভ করে নাই। মহারাণা প্রতাপ হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহ, গুরুগোবিন্দ সিংহ হইতে ঝান্সীর রাণী, অনেক হিন্দু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত হিন্দুর মত প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিয়াছেন। এখনকার হিন্দুদের সে শক্তি থাকিলে তাহারা প্রকাশ্যে লড়ুক, নচেৎ ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করুক। আর একটা কথা। ইউরোপের কোন গবর্ণমেণ্টকে কি বোমা মারিয়া ধ্বংস করা সম্ভব হইয়াছে? জনগণের সমর্থন ছাড়া কোন রাজনৈতিক মতবাদ সফল হইতে পারে না।"

একখানা কাগজ এই মর্ম্মে বলিল—"বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো কয়েকজন ছেলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করিতে চাহে দেখিয়া আমাদের হাস্য ও করুণার উদ্রেক হয়।" প্রফুল্ল চাকী ও মাণিকতলা বাগানে যাহারা ধরা পড়িয়াছিল, সঞ্জীবনী মুক্ত কণ্ঠে তাহাদের দুর্জ্জয় সাহসের প্রশংসা করিল। বন্দেমাতরম্ লিখিল, "Terrorist movements owe their origin to the unnatural social, economic or civic arrangements about them." (অস্বাভাবিক সামাজিক, অর্থনৈতিক বা নাগরিক জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়)।

কোন কোন মুসলমান কাগজের দেখিবার ভঙ্গী অন্য রকম। দারুস সুলতান বলিল,—"পাঁচ-দশ জন দুষ্ট লোক ইহার জন্য দায়ী নহে। যে সকল এক্সট্রিমিষ্টরা স্বরাজের জন্য চিৎকার করে তাহারাও দায়ী। যে সকল রাজনৈতিক প্রচারক ও স্বরাজিষ্টরা তথাকথিত পেট্রিয়টের মনে কুআদর্শের বীজ বপন করে তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করা সরকারের কর্ত্তব্য। বাংলাদেশ সিডিশানের কেন্দ্র, এই কেন্দ্র হইতে পঞ্জাবে ও মাদ্রাজে সিডিশানের সংক্রমণ গিয়াছে। বাঙালীদের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও এখন সিডিশানের কথা বলেন—ইহা দুঃখের বিষয়। এ অবস্থায় সরকারের কর্ত্তব্য এই অকৃতজ্ঞ জাতির মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং মুসলমানগণ যে রাজভক্তি দেখাইয়াছেন তাহার পুরস্কার দেওয়া। সরকারের কর্ত্তব্য যাহারা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত তাহাদের সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে সরকারী চাকুরি হইতে বঞ্চিত করা। বাঙালীর কাছে রাজভক্তির প্রত্যাশা করা যায় না।"

এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি মত প্রকাশ করিল যে এদেশের সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় বোমা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী। পায়োনিয়ার এই

মর্ম্মে লিখিল—বিপ্লবীরা একজন ইংরেজকে হত্যা করিলে দশ জন ভারতবাসীকে হত্যা করিতে হইবে। এশিয়ান লিখিল, অন্য কোন দেশ হইলে বোমাওয়ালাদের পোড়াইয়া মারা হইত। টাইমস লিখিল, ভ্যাঙ্কুভার হইতে আমাদের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছে যে, ভারতবর্ষে বিপ্লবী-আন্দোলন ও বোমা তৈয়ারির কাজ চলিতেছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী কোন একটি দেশের ইঙ্গিতে। টাইমস আরও খবর দিল, আমেরিকার নিউ ওয়েষ্টমিনষ্টারের কাছে মিলিসাইডে একটি স্কুল হইয়াছে ভারতবাসীদের মিলিটারি শিক্ষা দিবার জন্য। আমেরিকায় যে সকল শিখ আছে তাহারা এই স্কুলে মিলিটারির পাঠ লইতেছে। টাইমস ও পায়োনিয়ার ভারতবাসীদের নীতিজ্ঞান দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল। বলিল,—ইউরোপ এশিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার করিবার মহান্ কর্তব্যভার স্কন্ধে লইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এশিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈষয়িক দিকটা গ্রহণ করিয়াছে, আধ্যাত্মিক অংশ গ্রহণ করে নাই। ("Western materialism has begot an idea of cynical self-interest in them and made them sceptical about their ancient philosophical religion of renunciation.") টাইমসের মুখে হিন্দুদের এই ত্যাগধর্মের প্রশংসা কেহ কেহ উপভোগ করিল। ইংলিশম্যান বলিল,—গীতা ও পিকরিক এসিডের যেমন সমন্বয় দেখা যাইতেছে তাহাতে বঙ্গ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে যে সকল চাঁদা তোলা হয় সে টাকাগুলি কোথায় যায় তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইয়াছে। গীতা ও পিকরিক এসিডের সমন্বয়ের কথায় বন্দেমাতরম এই মর্ম্মে লিখিল,—গীতার গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপদেশ ও ইউরোপের এনার্কিষ্টদের পন্থার এই সমন্বয় বাঙালী বিপ্লবী ও ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্যের পরিচয় দিতেছে। ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের বিপ্লবী মতবাদের মধ্যে এই আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ভারতীয় বিপ্লববাদের সব চাইতে বেশী বিপজ্জনক ও আশাজনক বৈশিষ্ট্য।

বাংলায় বোমার আবির্ভাবে এলাহাবাদের পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের কাগজ অভ্যুদয় লিখিল,—ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রু নয়, তাহারা দেশের শত্রু। মিঃ গোখেলের কাগজ, পুণার জ্ঞান লিখিল,—বোমা-ষড়যন্ত্রকারীরা যতটা নিন্দার পাত্র তাহা অপেক্ষা বেশী করুণার পাত্র, কারণ গত তিন-চার বৎসর লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার যে নীতি চালাইয়াছেন সেই নীতির ফসল ইহারা। পুণার 'কাল' গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া লিখিল,—র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যার পরে যে নীতি তাঁহারা চালাইয়াছিলেন তাহা যেন চালানো না হয়। বাল গঙ্গাধর তিলকের কাগজ পুণার কেশরী বলিল,—ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থ। ইংরেজ কিছুদিন হইতে ভারতবর্ষে যে উগ্র দমননীতি চালাইতেছে তাহার ফলে ৩০ কোটি লোকের মধ্যে দুই-চারি জনের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না ইহা অসম্ভব কথা।

আলিপুরে বোমার মামলা আরম্ভ হইয়াছে।

রাত তখন বেশী হয় নাই। ১নং ওয়ার্ডের প্রশস্ত কক্ষের একপাশে গীতার ব্যাখ্যা হইতেছিল। জেলের কম্বল পাতিয়া বসিয়া কেহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেছিল, কেহ ধ্যানস্থ হইয়াছিল। এক দিকে পাঁচ-ছয় জনের একটি দলের মধ্যে নিম্ন স্বরে আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনার বিষয় এই যে, আর কয়েকটি পিস্তল ও রিভলবার জেলের মধ্যে আনিতে পারিলে জেল ভাঙ্গিয়া পলাইতে হইবে। মোম সংগ্রহ করা হইয়াছে ব্যারাকের ছাঁচ তৈয়ারির জন্য। এই ছাঁচ হইতে নূতন চাবি তৈয়ারি করিতে হইবে। জেলের পাকশালার পিছনে পায়খানা, তার পর জেলের প্রাচীর। ব্যারাক হইতে বাহির হইতে পারিলে এই পথে প্রাচীর ডিঙ্গাইতে হইবে। মোটর অপেক্ষা করিবে প্রাচীরের ওপাশে। সে বন্দোবস্ত হইয়াছে। মোটরে উঠিয়া বাংলো পার হইয়া একেবারে অরণ্যময় বিন্ধ্য-কাইমুরের পার্ব্বত্য অঞ্চল। সেখানে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে গরিলা-যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। তাহার সুবিধা না হইলে আফগানিস্থান বা পারস্যের দিকে পলায়ন করিতে হইবে।

একজন বলিল—আজ যে রিভলবারটা পাওয়া গেছে সেটা কোথায়?

হাতের ইসারায় একজন নিজের শয়নবেদী দেখাইল। শয়ন-বেদী মানে মেঝের উপর কাদা দিয়ে গাঁথা ইটের একটু উঁচু বেদী—পাশিয়ার মত। বেদীর উপরে কম্বল পাতিয়া শোয়া হইত। বেদীর উপরে কয়েকখানা ইট সরাইয়া গর্ত করিয়া সেই গর্তের মধ্যে রিভলবার লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। বেদীর উপরে কম্বলের বিছানা পাতা, দেখিয়া সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না।

খানিকটা দূরে মেঝেতে চাদর পাতিয়া বলাই ও আরও তিন জন তাস খেলিতেছিল। তাসজোড়া পাকশালার জমাদারকে ঘুষ দিয়া আনা হইয়াছিল। চাদরের একপাশে দেবানন্দ টান হইয়া শুইয়া ছিল। তাস খেলিতে খেলিতে বলাই বেসুরো গলায় গান ধরিল। কাছের এক বেদীর উপরে আপাদমস্তক ঢাকিয়া একজন ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মুখের আচ্ছাদন সরাইয়া সে বলিল—এই তানসেন, ক্ষমা দে বাবা। ঐ গলায় আর গাইতে হবে না।

কয়েক জন উচ্চ হাস্য করিল মন্তব্য শুনিয়া।

বলাই দৃক্‌পাত না করিয়া গাহিয়া চলিল—এবার কালী তোমায় খাব।

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—তুই তিন থালা লপ্‌সি খেয়েছিস, তবু ক্ষিদে যায় নি?

যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—শুধু তিন থালা লপ্‌সি নাকি? জীবনের মামা দেখা করতে এসে তার জন্য যে আমগুলো এনেছিলেন তার অর্দ্ধেকের বেশী ও চুরি করে খেয়েছে। জীবন বেচারা ঘুমুচ্ছিল। ওর আমগুলো খেয়ে আমের খোসা জীবনের বিছানার নীচে গুঁজে রাখছিল। জীবন জেগে উঠে বলল—তুই কি করছিস এখানে?

বলাই কি বলল জানিস—

হাসি চাপিতে না পারিয়া সে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

একজন বলিল—আমি দেখেছি। আমের রস মাখা দু'হাত জীবনের মুখে বুলিয়ে বলল—তোকে একটু আদর করছি ভাই।

হাসির হররা উঠিল।

হাসি শুনিয়া আর দুই তিন জন সেখানে আসিল। একজন বলিল—এত হাসি কিসের?

বলাই হাতের তাস ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে পেট চাপিয়া ধরিল, চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—আমার পেট গেল রে।

যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন ভেঙ্গাইয়া বলিল—পেট গেল রে! আমার বিস্কুটের টিনটা অর্দ্ধেক সাবাড় করেছিস হতভাগা, তুই খেয়ে খেয়ে মরবি।

বলাই তাহাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল—ওঁর বিস্কুটের টিন সাবাড় করেছে? তুই আমাকে মাছ ভাজা দিলি না কেন? জমাদারটা এতগুলো মাছভাজা পাঠাল রাতের পাহারাওয়ালার হাত দিয়ে, নিজেরা সব মেরে দিলি।

বিস্কুটওয়ালা বলিল—তুই কাল দুপুরে বিজয়ের কাছার সঙ্গে আমার কাছা বেঁধে দিয়েছিলি কেন? বিজয় ত আমাকে মারতে আসে। আমি বলি, মিছে আমার ওপর রাগ করছিস ভাই, এটা নিশ্চয় বলাইয়ের কাজ।

সকলে এই কলহ শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবানন্দ একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—সতোন-দার খবর কি জানিস? আর কত দিন হাসপাতালে থাকতে হবে?

বলাই বলিল—তুই বড় বাজে প্রশ্ন করিস দেবু। ঐটে তোর দোষ। অসুখ না সারলে হাসপাতাল থেকে ফিরবে কি করে?

পেটে দুই হাত চাপিয়া বলাই আবার চীৎকার আরম্ভ করিল—আমার পেট গেল রে। ওরে তোরা মোটা সাহেবকে খবর দে। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাক। আমি ব্যথায় মরে গেলাম রে।

তাহার চীৎকার শুনিয়া নেতাদের কেহ কেহ সেখানে আসিলেন। বলিলেন—কি হয়েছে বলাই?

বলাই শুইয়া পড়িয়াছিল। কোঁকাইয়া বলিল—পেটের ব্যথায় মরে গেলাম। আমাকে হাসপাতালে পাঠান।

তাঁহারা বলিলেন—কাল সকালে ডাক্তার এলে ব্যবস্থা হবে। আজ ঘুমোবার চেষ্টা কর। কেউ ওর পেটে তেল মালিশ করে দাও।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দেবানন্দ বলাইয়ের পেটে হাত বুলাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চেঁচাইয়া বলাই চুপ করিল। যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহারা একে একে চলিয়া গেল।

বলাই দেবানন্দকে বলিল, তোকে আর হাত বুলোতে হবে না। তুই শুয়ে পড়। দু'একটা কথা বলে রাখি তোকে।

দেবানন্দ বলাইয়ের পাশে শুইল। বলাই বলিল, আটত্রিশ জনকে দায়রায় পাঠিয়েছে। কি শাস্তি হবে এদের জানিস? তোর আমার কি শাস্তি হবে বল দেখি?

দেবানন্দ—শাস্তির কথা আমি একটুও ভাবি না। আমি শুধু ভাবি কাজ কিছু হ'ল না, বোধনেই বিঘ্ন ঘটল।

বলাই—আমাদের দ্বীপান্তর হবে বোধ হয়।

দেবানন্দ—হোক। যেদিন ছাড়া পাব সেদিন থেকে আবার আয়োজন সুরু করব। একটা কবিতা শোন—

> রক্ত আমার উঠিছে নাচিয়া রুদ্ধ ধমনী বাহিয়া
> জীবন আমার স্পন্দিছে আজ মরণ-চুম্ব যাচিয়া;
> স্রষ্টা যাচিলে মোর ক্ষুদ্র প্রাণ পুষ্পেরি মত তুলিয়া
> মর্ম্ম ছিঁড়িয়া ডালি দিব করে আনমনে সব ভুলিয়া।

বলাই উঠিয়া বসিল। বলিল, ঠিক বলেছিস 'জীবন আমার স্পন্দিছে আজ মরণ-চুম্ব যাচিয়া।' শোন দেবু, তুই ধীর, স্থির কর্ম্মী। আমি বড় অস্থির মানুষ। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা আমার সইবে না। দ্বীপান্তর আমি চাই না। বড্ড টিডিয়াস। এমন কিছু করতে হবে যাতে—। কাল নির্ঘাত হাসপাতালে যাচ্ছি। সেখানে—

বলাই কি ভাবিতে লাগিল।

দেবানন্দ—সেখানে কি বলছিলি?

বলাই—কি বলছিলাম—ওঃ, সেখানে মরণ-চুম্বন দেবেন তিনি যাঁর ধ্যান করছি।

সে হাসিতে লাগিল। দেবানন্দ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বলাই ও আরও দুই তিন জন মিলিয়া বাকী সকলের অগোচরে যে আঘাত হানিবার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছে তাহা সে জানিত। বলাইয়ের হাসপাতালে যাইবার চেষ্টা তাহারই উপক্রমণিকা।

সে শুধু বলিল, কালই যাবি?

বলাই—লপসি খেয়ে, ঘুমিয়ে আর কতদিন কাটাব ভাই? বিন্ধ্যপর্ব্বতের জঙ্গলে গরিলা-যুদ্ধের প্ল্যান হচ্ছে, সে আমি পারব না। দেখিস না কেমন কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর চেপে ধরে মাঝে মাঝে? সেদিন দাদা এসেছিলেন, আমি শেষ বিদায় নিয়ে রেখেছি।

শেষ বিদায়ের কথায় দেবানন্দ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, শেষ বিদায় এখনি? শেষ আঘাত হানা দেখে তবে শেষ বিদায় নেব। আঘাতের পর আঘাতে যখন ইংরেজের দেড়শ' বছরের শক্ত আসন কাঁপতে কাঁপতে ধ্বসে পড়বে ধুলোয়—বিদায় নেবার কথা তখন ভাবব।

বলাই—অতদিন বাঁচবি কি ভাই?

দেবানন্দ—বাঁচব বৈ কি? এ দেহ যায় নূতন দেহ নিয়ে আঘাত হানব। যাদের দেখবার চোখ আছে তারা বলবে দেবানন্দ ইজ ডেড, লং লিভ দেবানন্দ!

বলাই নিজের মনে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

> রক্ত আমার উঠিছে নাচিয়া রুদ্ধ ধমনী বাহিয়া
> জীবন আমার স্পন্দিছে আজ মরণ-চুম্ব যাচিয়া।

রাত্রি গভীর হইল। দেবানন্দ ও বলাই পাশাপাশি শুইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া দেবানন্দ এক স্বপ্ন দেখিল। দেখিল এক বিপুল জনতা কাহার পুষ্পমাল্য ও স্তবকে আচ্ছাদিত দেহ বহন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। জনতার মধ্য হইতে মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি উঠিতেছে—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! যাঁহার মৃতদেহ এভাবে নীত হইতেছে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া দেবানন্দ পথপার্শ্বের একটি বাড়ীর উচ্চ রকে উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃতদেহ আসিয়া পড়িল। স্তূপীকৃত পুষ্পমাল্যের আচ্ছাদনের বাহিরে মুখের একাংশ দেখা যাইতেছিল, উৎসুক দৃষ্টিতে সেইটুকু দেখিয়া দেবানন্দ চমকিয়া উঠিল। সে মুখখানা ঠিক বলাইয়ের মুখের মত। বলাই বলিয়া চীৎকার করিয়া দেবানন্দ রক হইতে লাফাইয়া ভিড়ের মধ্যে নামিল। সেই মুহূর্ত্তে একগোছা ফুলের মালা বাড়ীর দোতলার ঝোলানো বারান্দা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মাথার উপর পড়িল। উপরের দিকে চাহিয়া দেবানন্দ দেখিল অনেক অপরিচিতার মধ্যে একখানি মুখ। সে মুখ কিটির। ফুলের মালা অঞ্জলি দিয়া কিটি দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার জানাইতেছে মৃতের উদ্দেশ্যে। ফুলের মালার গোছা মৃতদেহের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া দেবানন্দ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে চাহিল—অঞ্জলি যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে কিটি দেখিল কি না। এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

উঠিয়া বসিয়া অন্ধকারের মধ্যে দেবানন্দ হাত বাড়াইল বলাই শুইয়া আছে কি না দেখিবার জন্য। তাহার হস্তস্পর্শে জাগিয়া বলাই বলিল, দেবু, হাত ছুঁড়ছিস কেন রে?

দেবানন্দ বলিল, তুই আছিস কি না দেখছি ভাই।

বলাই হাসিয়া বলিল, তোর গায়ে হাত দিয়ে দেখ তুই আছিস কি না। ঘুমো এখন।

বলাই ঘুমাইয়া পড়িল।

দেবানন্দের ঘুম আসিতেছিল না। তাহার চোখের সম্মুখে তখনও ভাসিতেছে অগণিত জনতা পুষ্পমাল্য ও স্তবকে আচ্ছাদিত এক মৃতদেহ বহন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, জনতার মধ্য হইতে মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি উঠিতেছে—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!

সমাপ্ত

হৃষীকেশে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরে গিরি, পূর্বে শৈল, সামনে পাহাড়শ্রেণী।
মধ্যে তাহার খরস্রোতে বহে গঙ্গা মুক্তবেণী।
ঋষিকুণ্ডেতে যমুনার জল
তপঃ-প্রবাহে করে টলমল
আবক্ষ নীরে অবগাহি সবে করিতেছে তর্পণ।
সলিল পরশে পবিত্র হ'ল বাসনাসক্ত মন।

তপোবনে ছোট কুটিরে কুটিরে জ্বলে সাধুদের ধুনী।
হয়ত এখানে লুকায়ে আছেন তপঃসিদ্ধ মুনি।
মায়া অবিদ্যা হেথা হ'ল শেষ
বোধমন্ত্রের শোনা যায় রেশ
সত্যের জ্যোতি প্রকাশে যেন রে সকলি জ্যোতির্ম্ময়।
অনাহত সুরে গাহে প্রাণ মন—পরম পুরুষ জয়।

ভাগীরথী হেথা রঙ্গিণী মেয়ে চলেছে উপলে নাচি।
দু'হাতে ছড়ায়ে মুক্তির ধারা, সিঞ্চি প্রাচীন প্রাচী।
যুগে যুগে কত ধর্ম্ম-জোয়ার
এলো, মিলাইয়া গেল বার বার
কোথা প্রচারক, পরিব্রাজক, ধর্ম্মধ্বজী বীর?
হৃষীকেশ আজো বিরাজে অটল, ধ্যান-নিমগ্ন শির।

শত তাপ-জ্বালা-জর্জ্জর মন আন ভাগীরথী-তীরে।
পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া ভাস প্রেমাশ্রু-নীরে,
এসো রে ব্যর্থ, এসো কৃতার্থ
ভোল ক্ষণতরে বিষয়-স্বার্থ
হৃদয়-পদ্ম হবে প্রস্ফুট চাহ অন্তরে ফিরে।

হাফিজ-প্রসঙ্গ

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ পারসীক কবি হাফিজের সহিত বাঙালীর প্রথম পরিচয় রাজা রামমোহন রায়ের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও ১৮০৩ সনের একটি অপূর্ব্ব রচনার মাধ্যমে। ঐ সময় তিনি *Tuhfatul Muwahhiddin* নামক এক ফার্সী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া একেশ্বরবাদিগণকে উপহার দেন; ঐ অনুবাদের মধ্যে রামমোহন হাফিজের দুইটি শ্লোকের উল্লেখ করেন।

১৮০৫ সনে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হাফিজের কবিতার বাহ্যার্থ (literal sense) অথবা আধ্যাত্মিক অর্থ লওয়া উচিত এই বিষয়ে তর্ক হয়। তাহাতে বহু ভাষাবিদ্ জনৈক বিদেশী পণ্ডিত বলেন:

"The question does not admit of a general or direct answer, for even the most enthusiastic of his commentators allow that some of them are to be taken literally, and his editors ought to have distinguished them . . . After his juvenile passions had subsided, we may suppose his mind took that religious bent which appears in most of his compositions."

ইহার ভাবার্থ—এই প্রশ্নের সাধারণ বা সরাসরি জবাব দেওয়া যায় না, কেননা তাঁর ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী যাঁহারা তাঁহাদেরও মত এই যে, তাঁহার (হাফিজের) কোন কোন কবিতার বাহ্যার্থ গ্রহণ করাই সমীচীন, এবং তাঁহার কাব্যের সম্পাদকদের উচিত ছিল সেগুলি পৃথক করিয়া লওয়া। তাঁহার যৌবনের কামনা যখন শান্ত হইয়া গিয়াছিল, আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তখন তাঁহার মনের গতি আধ্যাত্মিক প্রবণতার পথে মোড় ফিরিয়াছিল এবং তাঁহার অধিকাংশ রচনায় এই আধ্যাত্মিক প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতা হাফিজের মূল কবিতাবলীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মহর্ষির দুইটি প্রিয় গজলের কথা ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁহার "দীওয়ান-ই-হাফিজ" (১৯৩৮ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত দুটি গজলের অনুবাদ এই:

(১) কখনো মন প্রাণ হ'তে মোর, প্রেম তোমারি যাবে না;
কখনো মোর স্মরণ হ'তে সে মাধুরী যাবে না।

(২) প্রেম তোমারই এমনই মোর মন ও প্রাণে বিঁধেছে,
শির যাবে যাক্, প্রাণ হ'তে মোর, প্রেম তোমারি যাবে না।

হাফিজের অনেক গজল মহর্ষির কণ্ঠস্থ ছিল, ভাবে মগ্ন হইয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। চন্দ্রালোকিত যামিনীতে নির্জ্জন পাহাড়ে-প্রান্তরে তিনি হাফিজের সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। ফারসী ভাষাবিদ্ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ও সাহায্যে হাফিজের কয়েকটি গজল বাংলায় অনুবাদ করিয়া ১৮৭৯ সনের মাঘোৎসবের সময় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্র কিছুদিন নিয়মিতভাবে হাফিজ পড়িয়া বাংলায় তর্জ্জমা করিতেন। গজলের বঙ্গানুবাদ ভাই গিরীশচন্দ্র কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

"সদ্ভাবশতকে"র (১৮৬০) কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার হাফিজ ও অন্যান্য মুসলমান কবি হইতে কবিতা রচনার কিরূপ প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনচরিতকার ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। হাফিজ সম্বন্ধে মজুমদার-কবি বলিতেছেন—

"পারসীক মহাকবি হাফিজ প্রবর
যাঁহার জনমে ধন্য সিরাজনগর।
বিচিত্র বিচিত্র বাক্য কুসুম তাঁহার,
নিরমল তত্ত্বরস অমিয়-আধার।"

"দুরাশা" নামক কবিতায়—

"প্রেম নাই, প্রিয়লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে?"

"মরি কিবা শোভা" কবিতায়—

"এ সব স্বভাবশোভা রচিত যাঁহার
হাফেজ! মজ না কেন প্রেমরসে তাঁর।

* * *

মনে ভেবে বিষম বিরহ রিপুভয়
হাফেজ, বিমুখ কেন করিতে প্রণয়?"

অযোধ্যার নবাব-পরিবারের ফতে আলি ১৮৫৮ সনে হাফিজের মূল রচনার সাধারণ ব্যাখ্যা ফার্সী ভাষায় প্রচার করেন। ইহা লিথোগ্রাফ পুস্তকরূপে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাইত। ১৮৮১ সনে মেজর এইচ. এস. জারেট কলিকাতায় হাফিজের ৫৭৩টি মূল গজল ফার্সী ভাষায় বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে সম্পাদনা করেন।

তারপর ১৮৯১ সনে লেঃ কর্ণেল এইচ. উইলবারফোর্স ক্লার্ক হাফিজের মূল ফার্সী রচনাবলী হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তাঁহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"This is not a translation of a translation. Being unacquainted with German, I have been unable to avail myself of the German translations. Thus I have been forced to make the translation from the original Persian."

অর্থাৎ—ইহা অনুবাদের অনুবাদ নহে। জার্ম্মান ভাষার সঙ্গে পরিচিত না থাকায় আমি জার্ম্মান অনুবাদসমূহের সুযোগ লইতে

পারি নাই। কাজেই আমি মূল ফার্সী হইতে অনুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

লেঃ কর্ণেল ক্লার্ক সাহেবের উক্ত পুস্তক হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে জার্মান ভাষায় হাফিজের কবিতার কিছু কিছু তর্জ্জমা হইয়াছিল।

১৮১৮ সনে ফন হামার অমিত্রচ্ছন্দে ইহার অনুবাদ করেন, ১৮৫৮ সনে রোসেন্‌সংবেগ মিত্রচ্ছন্দে এবং ১৮৬৫ সনে নেসেলমান্ মিত্রচ্ছন্দে হাফিজের কবিতা অনূদিত করেন। এতদ্ব্যতীত ১৮৫৪ সনে লিপজিগে হেরমান ব্রোখাস সপ্তদশ শতাব্দীতে সুদী নামক এক পণ্ডিতের প্রকাশিত হাফেজের রচনার অনুবাদ পুনঃপ্রকাশিত করেন। ইহারও বহুপূর্ব্বে ১৭৭০ সনে ভিয়েনাতে ব্যারণ রেভিসকি হাফেজের ফার্সী রচনাংশের অনুবাদ নমুনা-স্বরূপ প্রকাশ করেন। সর উইলিয়াম জোন্স, রিচার্ডসন ও কার্লাইল ইংরেজীতে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত অনুবাদের অনুবাদ প্রকাশিত করেন—ক্লার্ক ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে ১৮৮৭ সনে পেষ্টানজি কুভারজি টক্কর হাফেজের ৮২টি গজল ছন্দালোচনা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত করেন।

লেঃ কর্ণেল ক্লার্ক কৃত, কলিকাতা হইতে ১৮৯১ সনে প্রকাশিত হাফেজের মূল ফার্সী হইতে দুই খণ্ডে সমাপ্ত ইংরেজী অনুবাদ প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,

"To render Hafiz in verse, one should be a poet at least equal in power to the author. Even then it would be wellnigh impossible to clothe Persian verse with such an English dress as would truly convey its beauties."

"দিওয়ান-ই-হাফিজে"র ৫৭৩টি গজল (ইহার মধ্যে অনেকগুলি জাল, অর্থাৎ অন্যলোকের রচনা) ছাড়া, হাফিজ লিখিয়াছিলেন প্রায় ৭০টি রুবাইয়াৎ (অর্থাৎ চার পংক্তির পদ্য) যাহা কান্তিচন্দ্র ঘোষ সুললিত ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন; প্রায় ৪০টি কিতা-ইয়ৎ (অর্থাৎ টুকরো কবিতা), এবং অন্যান্য খণ্ড কবিতা; ইহাদের বিশদ বর্ণনা ক্লার্কের পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কান্তিচন্দ্র ঘোষ হাফিজের রুবাইয়াতের একটি বিখ্যাত শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,

স্মরণ রেখো, বন্ধু আমার, এইটি শুধু মনে
নারীর তুষ্টি হয় না শুধুই মিষ্ট আলাপনে;
হৃদয় দুয়ার খুলবে, খুলো—সম্ভ্রমেতে, ভয়ে—
নারীর মনটি পায় না কেহ ছন্দ বিনিময়ে!

হাফিজের জীবদ্দশায় তাঁহার রচনাগুলি সঙ্কলিত বা গ্রন্থাকারে সম্বদ্ধ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সমাধিফলকে উৎকীর্ণ ৭৯১ হিজরীকে (=১৩৮৮ খ্রীঃ) অনেকে কিংবদন্তীর প্রভাবে মৃত্যুর বৎসর নয় বলিয়া থাকেন। কিন্তু সিরাজনগরে মসল্লা নামক স্থানে এই সমাধি বহু ভক্তের তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মহা-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। সে যুগের, কুসংস্কারগতপ্রাণ, মিথ্যা আচার-সর্ব্বস্ব মুসলমান সমাজকে উন্নত ও প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মনীতিপরায়ণ করিবার জন্য তিনি গজল, ভাষণ ও আলোচনার দ্বারা চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার শব বহন করিতে সেই সমাজ অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে দৈবক্রমে তাঁহার রচিত একটি কবিতা সকল দ্বন্দ্বের অবসান করে। কবিতাটি এই—

"হাফেজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যাত্রা করিতে চরণকে সঙ্কুচিত করিও না;
সে যদিও পাপে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু স্বর্গলোকে যাইতেছে।"

হাফেজ ভারতবর্ষে আসেন নাই—তদানীন্তন সুলতান গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণের উত্তরে আশীর্ব্বাণী পাঠাইয়াছিলেন। কাজী আব্দুল ওদুদের ভাষায় সেই বাণীটির মর্ম্ম এইরূপ:

"ইরাণের মিছরির টুকরো যাচ্ছে বাংলায়, এ থেকে মধুগর্ভ হবে ভারতের সব শুকসারী।"

হাফিজের এক পুত্র কিছুদিন পরে ভারতে আসিয়া দেহরক্ষা করেন, তাঁহার সমাধি বুরহানপুরে রহিয়াছে। অভিজ্ঞ-দের মতে হাফিজের ছন্দগুলি অত্যন্ত কঠিন, (তাহার দুই-একটির নমুনা বাংলা ভাষায় ডঃ শহীদুল্লাহ্ ও কবি নরেন্দ্র দেব দিয়াছেন), ভাষা সুগভীর আধ্যাত্মিকভাবে সজীব, অসাধারণ কবিত্ব ও সুমধুর অনুভূতিতে লাবণ্যময়। অনেকগুলি গজল উৎসাহপূর্ণ, আশাময় ও আত্মনিবেদনের মহিমায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। প্রত্যেক গজলের শেষ কবিতায় তাঁহার নিজের নাম পাওয়া যায়। বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের মত এক একটি গজলে পাঁচ-দশ বা ততোধিক কবিতা আছে। রাগরাগিণী সহযোগে এগুলি গীত হইয়া থাকে। গজলসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে ফার্সী ভাষার আদিবর্ণ "আলেফ" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষবর্ণ "ইয়া" পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে অন্তভাগে স্থাপিত (আমাদের অকারান্ত, আকারান্ত ঈশ্বরস্তুতি ধরণের পদ্য)। রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রেম। 'গজলে'র আভিধানিক অর্থ "প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে প্রেমপূর্ণ বাক্যালাপ ও কার্য্যকলাপ"। বৈষ্ণবকবিতার সহিত এইখানে মিল থাকিলেও বৈষ্ণবকবিতায় পরমাত্মা পুরুষ, জীবাত্মা নারী; গজল কবিতায়—সুফীকবিতার ন্যায়—পরমাত্মা নারী, জীবাত্মা পুরুষ। সুফী-কবিতায় খোদা অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী বিশ্বপ্রিয়া; বিশ্ব তাঁহাকে পাইতে ব্যাকুল। ডঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন,"গজলের কবি ভিতরের লোক—তিনি প্রেমাস্পদের সহিত নিজেরই মিলন-বিরহ প্রভৃতি অনুভূতির বর্ণনা করেন।" তাই তাঁহার রচনা অধিক বাস্তবধর্ম্মী, আন্তরিক এবং তজ্জন্য অধিক প্রাণস্পর্শী। বাংলায় সুললিত ছন্দে গজলের অনুবাদ প্রকাশ করা একান্ত কঠিন; ছন্দোবন্ধের অনুরোধে অবিকল অনুবাদ হইয়া উঠে না, সুতরাং বহুস্থলে মূলের যথার্থ ভাবের ব্যতিক্রম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হাফেজের কয়েকটি গজলের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁহারপুস্তক সংগ্রহের মধ্যে

মূল পারসীক ভাষায় হাফিজের রচনা একখণ্ড রক্ষিত আছে।

মোহিতলাল মজুমদারও হাফেজের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এদিকে বেশীদূর অগ্রসর হন নাই। নজরুল ইসলাম মূলের ছন্দ অনুযায়ী হাফিজের কয়েকটি গজলের ও রুবাইয়াত বাংলায় তর্জমা করিয়াছেন। তার একটি দৃষ্টান্ত, "এক লহমার খুশীর তুফান, এই তো জীবন—ভাবনা কিসের?" ডঃ শহীদুল্লাহ্ হাফিজের বাটটি গজল সাধ্যমত মূল ভাব বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্প্রতি হাফিজের ৫৬৯টি গজলের মধ্যে সুনির্বাচিত মাত্র ৪০টির সুললিত বঙ্গানুবাদ—"দিওয়ান-ই-হাফিজ" নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। "কবি ফিট্জেরাল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ" করিলেও তিনি কতকটা স্বাধীন ভাবেই অনুবাদ করিয়াছেন। এই ৪০টির নির্ব্বাচন-ব্যাপারে তিনি দেখাইয়াছেন—প্রধানতঃ কোন্ কোন্ গজল এদেশের পাঠকদের কাছে সুবোধ্য হইতে পারে। তিনি গজলের দুরূহ দ্বিপদী শ্লোককে বুঝিবার সুবিধার জন্য বিস্তার করিয়া কোথাও চতুষ্পদী কোথাও বা ষটপদী করিয়াছেন। কয়েক স্থানে একাধিক গজলকে ভাঙিয়া নূতন স্রোতে মিশাইয়া একটি পৃথক গজলরূপে রচনা করিয়াছেন।

এখন দেশ বিদেশের বিভিন্ন কবির অনুবাদে হাফিজের একই কবিতা কি বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার কিছু নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Saki (Murshid) with the light of wine (Divine Love)
upkindle the cup (of the heart) of—ours.
Minstrel (Murshid) speak, saying "The world's work
hath gone (agreeably) to the desire of—ours.
In the cup (of the heart) we have beheld the reflection
of the face of the Beloved (God)—
O thou void of the knowledge of the joy of the
perpetual wine-drinking of—ours.
Never death that one, whose heart is alive with (true)
love of God."

—(CLARCKE)

সুরাদাতা, সুরের জ্যোতিঃতে আমার পাত্র সমুজ্জ্বল কর
গায়ক, গান কর, সংসারের কাজ আমার সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে।
ওহে তুমি আমার নিত্য সুরার রসাস্বাদনে বিমুখ, জানিও আমি
পানপাত্রে সখার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছি।
যাহার মন প্রেমেতে জীবিত, তাহার কখনও মৃত্যু নাই, জগতের কার্য্যালয়ে
আমার অমরত্ব অঙ্কিত হইয়াছে।

(ভাই গিরিশচন্দ্র)

মদের আলোর পাত্র সাকী! কর রৌশন মোদের
গাও হে গায়ক! বাঞ্ছা যত আজি পূরণ মোদের
বঁধুর মুখের ছায়া দেখি পান-পিয়ালার ভিতর।
জানবে কি স্বাদ নিত্যপানের আনাড়ীগণ মোদের।

(শহীদুল্লাহ্)

ওগো সাকি, জীবনের আনন্দরূপিণী!
সুরার সৌন্দর্য্যধারা—চন্দ্রালোক জিনি—
বিজয়িনী, দাও দাও ছড়াইয়া আজ,
দীপ্ত করো পাত্র আমাদের!
হে কবি, শোনাও তব মিলনের গান,
ভরিয়া উঠেছে হের সকলের প্রাণ!
পূর্ণ যত অসম্পূর্ণ জীবনের কাজ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ আমাদের!
সুরাপাত্রে প্রতিবিম্ব হেরি প্রেয়সীর,
অধরের মধুপানে হৃদয় অধীর!
জানো কি প্রেমের স্বর্গে করিছে বিরাজ—
প্রমত্ত এ চিত্ত আমাদের!
সঞ্জীবিত চিত্ত সখী নিত্য প্রেমে যার,
মৃত্তিকার ধরণীতে মৃত্যু নাই তার
লোকোত্তর প্রেমের বারতা
বিশ্ব-ইতিহাসে রহে গাঁথা
চিরসত্তা বহে আমাদের!

(নরেন্দ্র দেব)

নরেন্দ্র দেবের নিম্নলিখিত অনুবাদটি উপভোগ্য:

আঁধারভরা নামছে নিশা
তিমির রাতে হারিয়ে দিশা
সাগর এবার উতল হ'ল সই,
প্রলয়-নাচে তরঙ্গদল
আবর্ত্তিছে অশান্ত জল
সন্তরণের শক্তি বলো কই?
ঝঞ্ঝা মাঝে শঙ্কাহারা
সাগরতীরে দাঁড়িয়ে যারা:
হাল্কা ওদের মনের যত বোঝা।
কেমন করে বুঝবে ওরা
কোন অতলে ডুবছি মোরা
খবর মোদের নয়ত জানা সোজা।

(নরেন্দ্র দেব)

হাফিজের প্রিয়া যে অপার্থিব, তাঁহার সুরা যে ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরের দয়াতেই যে তাঁহার কবিত্ব ও কবিখ্যাতির উদ্ভব—এই সকল অপূর্ব্ব মনোভাব তাঁহার কয়েকটি ছোট ছোট গজলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"পেলাম না কারো কাছে চিহ্ন আমার মনচোরার,
হয় আমি পাইনি খবর, নয়ত নেইরে চিহ্নটি তার।"
"নজর কাহার স্বরূপ তোমার দেখেছে কি কখন?
আপন আপন বুদ্ধিমতো সবাই করে বিচার।"
"গুলের কৃপায় বুলবুলি তার শিখেছে সব বুলি,
স্বভাবে সে পায়নি ঠোঁটে গান ও গজলগুলি।"
"যখন থেকে প্রেম তোমারি ফুটাল মোর কথন
বিশ্বের জিভে হ'ল নিতি মোর প্রশংসা-বচন।"

সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া কবি বলিতেছেন—

"মাতাল পীরের দাসত্ব যে আমার পরশমণি
এক নিমেষে পরম গতি তাঁর ধূলাতে দিল।"

হাফিজ সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন—ডঃ শহীদুল্লাহ-কৃত একটি শ্লোকের অনুবাদে তাহা পরিস্ফুট—

"বাহাত্তর এই মর্ত্ত্যের লড়াই, তর্কাতর্কি সবই মিছে
পায় নি তারা সত্যেরই পথ, চলেছে তাই খেয়াল পিছে।"

হাফিজ ছিলেন মূলতঃ কবি, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া জীবনমৃত্যুর রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হৃদয় লইয়া বৈষ্ণব কবিদের মত তিনি পরম প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছেন। অনেকে বলেন, চল্লিশ বৎসর বয়সে সুফীবাদের আশ্রয় লইয়া তিনি যৌবনের ভোগবিলাস ছাড়িয়া আনন্দময়ের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুফীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও তিনি সংসার ত্যাগ করেন নাই। পুত্রের বিয়োগে তাঁহার রচিত গানগুলি অত্যন্ত করুণ :

"এক যে তোতা ছিল চিনির ধ্যানে খুশী নিত্য
নাশেরবান্ তার আশার নক্সা, হঠাৎ বাতিল করল।"

এখানে তোতা হাফিজ নিজে—চিনি ঈশ্বর।

স্ত্রী-বিয়োগে মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, মাদ্রাসার তর্কবিতর্কে আমার হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়াছে, এখন একটু প্রেমাস্পদ ও সুরার সেবা করিয়া লই। অর্থাৎ জ্ঞানসাধন ছাড়িয়া প্রেমসাধনার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তখন অতীন্দ্রিয় মিলনানন্দের অভিলাষী। কবীরের দোহায়ও এই সুর; টেনিসনের "For me the Heavenly Bridegroom waits" মনে পড়িয়া যায়। হাফেজ বলিলেন, প্রেমের বিদ্যা পুথির ভিতর নাই—হে হাফিজ! মাদ্রাসার ভাণ্ডারে প্রেমের মাণিক খুঁজিও না; পা বাহিরে রাখ, যদি অনুসন্ধানের ইচ্ছা কর।

চার্লস ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন—

"Hafiz was eminent for his piety; passed much of his time in solitude, devoting himself to the service of God and reflection on His Divine nature . . . By his countrymen, his works are held inferior only to the Quoran . . ."

হাফিজ নাম নহে, উপাধি; কবির নাম সামসুদ্দিন মুহাম্মদ। তাঁহার কবিতার আধ্যাত্মিক সম্পদ, ফিরদৌসির কাব্যের ভাষার ঐশ্বর্য্য, সাদির কবিতার নৈতিক দীপ্তি, জালাল-উদ্দিন রুমির বর্ণনানৈপুণ্য, ওমর খৈয়ামের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, জামির ছন্দকৌশল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মনীষিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, প্রেরণা যোগাইয়াছিল—একথা স্মরণ রাখিবার যোগ্য।

বাসন্তী

শ্রীশান্তি পাল

ভাঁট ফুলের ওই গন্ধ মিঠে
ফাগুন হাওয়া ছড়িয়েছে—
আম-মুকুলের গা বেয়ে দেখ্
রসের ধারা গড়িয়েছে।
মৌমাছিদের জাগল সাড়া
কোকিল ডেকে ডেকেই সারা,—
কোন্ কিশোরীর শাড়ীর আঁচল
বকুল-শাখে জড়িয়েছে?
কাহার হাতের পরশ পেয়ে
কেশর-পরাগ ঝরিয়েছে?
জল ছেড়ে ঢোল-কলমীলতা
জড়িয়ে ধরে কোন্ কূলে?
নয়নতারা নয়না হানে—
মাখছে মুখে রং গুলে।
উপোসী প্রাণ হাঁপিয়ে মরে
বন থেকে সব বেরিয়ে পড়ে
ফুলে ফুলে কইছে কথা—
কাননতলে মন খুলে
পলাশ শিমুল ঝুমকো জবা
মালতী মউল বকুলে।

ও চামেলী? রাজার মেয়ে,
ডাকছে শোন বুলবুলি—
অশোক কোথায়? মাধবী কই?
ফুটল রঙের ঘুলঘুলি!
চাঁপার দিকে চাইতে গিয়ে
আজকে মনে প'ড়ছে প্রিয়ে,
চাঁপা-বরণ মুখখানিতে
ঝরত মধু কুলকুলি,
হিজল শাখে ভাট-শালিকে
নাচত দুলে দুলদুলি।
পারুল সে কি পড়ল বাঁধা
কারোর বাহু-বন্ধনে?
বলত সে যে আসবে ফিরে
ফাগুন-মধু-নন্দনে।
দেখতে পেলে হামড়ে প'ড়ে
টানব বুকে নিবিড় করে,
হৃদয়-ছেঁচা ঢেউয়ের ঘায়ে
লুটিয়ে দেবে ক্রন্দনে;
ঠোঁট দুখানি উঠবে রেঙে
চারু-চুমার চন্দনে!

বালীর রাজপুরীর এক রাত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

এক ঝাঁক সাদা পায়রা বালীদ্বীপের বেডঙের পুরীর (রাজপুরী) উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের পায়ের রূপার ঘুঙুরগুলি ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুন্ ঝুন্ করে বেজে উঠল। উঠানে লাল খাঁচায় ধূসর পায়রাগুলো "বক্ বকম্ বক্ বকম্" করে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। কাশোয়ারি তার লম্বা গলা বের করে ঘাসের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত ছিল। তাই দেখে দাসী-বালিকা মুন্না হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। পুরীর সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী রাজরাণী বেরনিস তাঁর স্বপ্নালস আঁখি দিয়ে নীল আকাশের সাদা পায়রাগুলি চেয়ে দেখছিলেন। মুন্নার হাততালিতে চমক ভাঙল, মুন্নাকে ইশারা করে কাছে ডাকলেন। মুন্না কাজে লেগে গেল—বেরনিসের চুল আঁচড়াতে বসে গেল। সে তার ছোট ছোট হাত দিয়ে বেরনিসের চুলগুলি গোছা গোছা করে ধরে সুগন্ধি নারকেল তেল মাখাতে লাগল। বেরনিসের সুদীর্ঘ কেশদাম সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। মুন্না সুন্দর চুলগুলি হাতে নিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে গল্প বলছিল—"ঠাকরুণ, ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন? সে এমনিভাবে ব্যবস্থা করেছিল যে রাজা এলেই যেন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। রাজা তাঁর ময়ূরগুলা দেখতে যাচ্ছিলেন। সে একেবারে তাদের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু তিনি তার দিকে একবারও চোখ তুলে চাইলেন না। সে তার অভিবাদন জানাল, রাজাও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। সে তাঁর পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে তাঁর সারঙ্গ ধরে টেনে বললে, প্রভু, বহুদিন আমার হাতের সিরি (পান) খান নি।"

মুন্না বলতে লাগল, "তখন যদি আপনি দেখতেন, রাজা তার প্রতি কি রকম ব্যবহার করছিলেন, তিনি তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। সোজা এমনি করে চলে গেলেন।" মুন্না নিজের চোখ দুটি কুঞ্চিত করে রাজার অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি অনুকরণ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

"পথে একটি মরা গোবরে পোকা পড়ে থাকলে যেমন করে চাইতেন ঠিক তার দিকে সেই ভাবে চাইলেন।"

"তিনি চলে গেলেন, আর সে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কি বোকা আর তার মনেই বা কত অহঙ্কার ছিল! পুরীর সব মেয়ে তার প্রতি অবজ্ঞায় হেসে উঠল।"

বেরনিস বললেন, "ও মেয়েটার একটুও লাজ নেই, কি বেহায়া, ঠিক যেন ভিক্ষুকের মেয়ে। না হবেই বা কেন? অনক আগুন-বীমা তাকে রাজপ্রাসাদে না আনা পর্য্যন্ত সে কেসিমানের গণিকা ছিল, তখন সে তার বুক কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত।"

মুন্না তার কাজ শেষ করে তালপাতার একটি সুদৃশ্য ঝুড়ি বেরনিসের সামনে তুলে ধরলে, তাতে একগুচ্ছ 'কামবড়িয়া' ফুল ছিল। ফুলগুলি শাদা, শুধু তাতে একটু গোলাপী আভা—মুন্না বেরনিসের কালো চুলে ফুলগুলি গুঁজতে গুঁজতে বলতে লাগল, 'আমার প্রভুপত্নী এ প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। একটি সুন্দর সুস্থ শিশু যদি আমার প্রভুপত্নীর কোল আলো করে, তবে মহারাজ তাঁকেই পাটরাণী করবেন।'

'মুন্না!' বেরনিসের তীব্র কণ্ঠস্বরে মুন্না ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। বেরনিস বললেন, 'চলে যা, আমি তোর এসব খোশামুদে কথা শুনতে চাই না।'

মুন্না ত্রস্তে চিরুণী ও প্রসাধনের পেটিকা নিয়ে পালিয়ে গেল। বেরনিস তাঁর হাতের উপর মাথা রেখে নীরবে ভাবতে লাগলেন। আজ এক বৎসর হ'ল প্রভু অলিতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করতে পারল না, বহুদিন হ'ল তার কক্ষে মহারাজার শুভাগমন হয় নি। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, প্রভুর বাইশটি বিবাহিতা পত্নী, কিন্তু কেউ সন্তানের জননী নয়। পুরীর ভৃত্য, কর্ম্মচারী দাসী সবারই গৃহ, রাজ-অঙ্গন ছোট শিশুতে পূর্ণ, শুধু রাজরাণীদের কক্ষেই ছোট শিশুর পদধ্বনি শোনা যায় না। অব্যক্ত বেদনায় বেরনিস বক্ষদেশ চেপে ধরলেন, তারপর ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে দিয়ে অবশের মত এলিয়ে পড়লেন। ডাকলেন, 'মুন্না।'

মুন্না কাছেই ছিল, ত্রস্তে ছুটে এল। অতি নম্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকরুণ, কি আদেশ করছেন?'

বেরনিস মুন্নাকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'মুন্না, তুই ত এখন বড় হচ্ছিস, কাকে বিয়ে করবি বল্ দেখি?'

মুন্না লজ্জায় মাথা নোয়ালে।—'বাগানের মালী রেডিয়াকে, না যে পায়রা রাখছে তাকে?' বেরনিস স্নেহভরে মুন্নার নত মস্তক তুলে ধরলেন।

মুন্না বললে, 'মূর্ত্তিশিল্পী মেককে।'

বেরনিস মৃদু হেসে বললেন, 'তোর ত পছন্দ আছে!'

মুন্না করুণ মুখে বললে, 'সে কিন্তু আমাকে চায় না, তার অনেকগুলি সুন্দরী প্রিয় পাত্রী আছে।'

সত্যি মুন্না একটুও সুন্দর নয়. তার মুখটা ছিল বানরের মত। বেরনিস বললেন, 'অপেক্ষা কর, তুই এখনও ছোট, আরও এক বছর পর দেখিস'—বলতে বলতে থেমে গেলেন।

মুন্না ধীরে ভীত স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'কাল প্রভু কার সঙ্গে রাত্রিযাপন করলেন?' এক মুহূর্ত্ত থেমে বললেন 'তামন সারির পেডেণ্ডা (পাণ্ডা, পণ্ডিত) ইডা বাপুস রাইর সঙ্গে।'

কিছু থেমে বেরনিস বললেন, 'সত্যি পেডেণ্ডা একজন বিখ্যাত

ও সং লোক।' বেরনিস আবার অলসভাবে নীলাকাশে পায়রার খেলা দেখতে লাগলেন।'…

রাজবাড়ীর এই অন্দরমহলটি বড় সুন্দর। চীনা মিস্ত্রীরা কারুকার্য্যমণ্ডিত করে এই প্রাসাদ তৈরি করেছে, চীনা টালি দিয়ে এর ছাদ ছাওয়া। বসবার ঘরের দেয়ালগুলিতে খালি সবুজ রঙের টালি বসানো। উঠানে জলের ফোয়ারা ও সুন্দর পুষ্পোভান। অলিত তাঁর পত্নীদের মধ্যে যাঁরা সুন্দরী ও উচ্চবংশীয়া, তাঁদের সম্মান দেখাচ্ছেন। তাঁদের জন্ম সুরম্য অট্টালিকা, পুষ্পকুঞ্জ, জলের ফোয়ারা কোনকিছুরই অভাব রাখেন নি। কিন্তু অলিত কাকে পাটরাণী নির্ব্বাচন করবেন, এখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি।

'সংসারে এমন লোকও আছে যে কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়েই দিন কাটায়, নারীর দিকে ফিরেও চায় না'—বলে মুন্না তীক্ষ্ণভাবে প্রভুপত্নীর মুখের দিকে চাইল। বেরনিস রাগ করলেন না, কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। বড় ধূসর ঈগল যেমন তার বিস্তৃত ডানা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে নামে, তেমনি করে বেরনিসের মনে ক্লান্তির ছায়া নেমে এল।

বেরনিস বললেন, 'মুন্না বল দেখি কি করি, কি করে সময় কাটে?'

মুন্না ভেবে বললে, 'কিছুক্ষণ তাঁতে কাপড় বুনুন, তারপর ঝিলের কাছে বসে পানকৌড়ির খেলা দেখুন, তোরঙ্গ খুলে সবগুলো সারঙ্ নিয়ে একটা একটা করে পরে দেখুন। তালপাতা এনে দিচ্ছি, পূজার নৈবেদ্য রাখবার জন্ম ছোট ছোট থালা বুনুন, তারপর ঘুমিয়ে পড়ুন। যখন বড় আঙ্গিনায় নাচে যাবার সময় হবে তখন জেগে উঠবেন, আমি এসে পোশাক পরিয়ে দেব।'

বেরনিস মাথা নেড়ে বললেন, 'না এসব হচ্ছে না।'

মুন্না বেরনিসের দিকে একটা ছোট তেপায়া এগিয়ে দিলেন। তার উপর একটি রূপার থালা ছিল, তাতে রূপোর বাটায় পান, ছোট কাঠের কৌটায় চুন। একটি রূপার বাক্সে তামাক, আর পিসানপাতার উপর কুচানো সুপারি। বেরনিস ঠেলা দিয়ে তেপায়া সরিয়ে দিলেন। কারণ রাজা অলিত পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা মোটেই পছন্দ করেন না। বেরনিস বললেন, 'পুরীতে নাচ হবে, এ খবর ত আমি জানি না।'

মুন্না যা যা শুনেছিল বলতে লাগল। বললে, 'তামানসারি থেকে নাচের দল আসবে তারা 'বারিস' নৃত্য করবে। প্রভু তাদের নূতন পোশাক উপহার দিয়েছেন, তাই তারা আজ নেচে কৃতজ্ঞতা জানাবে। তিন শ' রিংগিট মূল্যের তাদের পোশাক, তারা বলেছে যে বারিসের মুকুটে সত্যিকারের রূপো আছে, তারা আরও বলেছে যে পুরুষদের সঙ্গে নাকি একটা মেয়েও নাচবে। এ কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এ বড় অন্যায়।'

মুন্না বলতে লাগল, 'পরীর নাচ ছোট ছেলেদের দিয়েই করানো উচিত। কিন্তু তামানসারির নাচের দল সর্ব্বদাই একটা নূতন কিছু করে, তাই তাদের মাথায় এ ফন্দি এসেছে। রাজা যদি মেয়ে নিয়ে নাচতে আসে তবে আমাদের প্রভু কি বলেন দেখব।'

বেরনিস জিজ্ঞেস করলেন 'কে সে মেয়ে?'

'এক গরীব শূদ্র মেয়ে, লাম্বন তার নাম, ছোট মেয়েটি, প্রবাল-মন্দিরে উৎসবের সময় আমি তাকে লেগং নাচ নাচতে দেখেছি।'

বেরনিসের কানে সবগুলি কথা গেল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে ভাবছিলেন। বললেন, 'খাঁটি রূপোর মুকুট…রাকাকে খাঁটি রূপোর মুকুটে খুবই সুন্দর লাগবে।'

মুন্নাও বলে উঠল, 'হাঁ রাকাকে খুব সুন্দর দেখাবে। দু'জনেই চুপ করে ঝিলের জলের দিকে চেয়ে রইল।

সহস্র দর্শকে পুরীর অঙ্গন ভরে গেল। রাজকর্মচারী, তাঁদের স্ত্রীপুত্র দাসদাসীতে রাজ-অঙ্গন গিস্ গিস্ করতে লাগল। বিশিষ্ট অতিথিরা রাজার অপেক্ষা করছিলেন। প্রভু অলিত এসে তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। এই অঙ্গনের পরই রাজা অলিতের খাস-কক্ষ। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গৃহদেবতার সুদৃশ্য মন্দির। তার অতি কারুকার্য্যময় কাঠের দরজা। ভিতরে গরুড়পাখীর উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের চারদিক ঘিরে পরিখার জল টলমল করছে। দুয়ারের দিকে তিনটি সেতু এগিয়ে গেছে। মন্দিরের সিঁড়িতে সুন্দর করে ঝিনুক গাঁথা। চারদিকের জমিতে নানা রকম বৃক্ষলতা। কোকোগাছ, সুপারিগাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কামবডি গাছের ধূসর ডালে উজ্জ্বল ফুল ফুটে আছে। লম্বা লম্বা চাপা গাছ, তার গাঢ় রঙের পাতা। মন্দিরে যাবার পথে দু'পাশে সযত্নরোপিত লম্বা লম্বা ঘাস, তাতে মাঝে মাঝে ফুলগাছও রয়েছে।

রাজবাড়ীর চতুর্থ অঙ্গনে লড়াই করবার জন্ম মুরগী রাখা হয়েছে —সংখ্যায় তারা চল্লিশটি। চারদিকের পোষা জীবজন্তুতে অঙ্গন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাসোয়ার ও তার সঙ্গিনী দুটিরই অদ্ভুত আকৃতি। বহু জাতের পায়রা, ছোট সবুজ টিয়া, তাদের বুক লাল টুকটুকে —এদের পশ্চিম বালী থেকে ধরে আনা হয়েছে। লাম্বোক দ্বীপের সাদা কাকাটুও ছিল। বানরদের গলায় লম্বা শিকল বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যেন তারা ইচ্ছামত শয়তানী করতে পারে। আস্তাবলে অনেকগুলো টাট্টু ঘোড়া বাঁধা ছিল। মাল-টানার মোষগুলো প্রাসাদের দেয়ালে গা ঘষ ছিল। অসংখ্য কালো শূয়োর, কুকুর, মুরগী, হাঁস ছিল। তিনটি বড় বড় কচ্ছপ ও একটি বিশাল লেগোয়ান রান্নাঘরের দরজার কাছে পড়ে ছিল, তাদের দিয়ে ভোজ খাওয়ানো হবে। আর এক অঙ্গনে বড় বড় ধানের গোলা, আর ধান মাড়াবার জন্ম বাঁধানো চত্বর। অসংখ্য ভাঁড়ার-ঘর, রান্নার যাবতীয় সামগ্রী রাখবার বহু কুঠরি। পূজার জন্ম আলাদা অঙ্গন ছিল, আর একটি অঙ্গনে ছায়ানাট্যের মূর্ত্তিগুলি রাখা হয়েছিল।

রাজা তোকরদা অলিত তাঁর বৈঠকখানাতে কৌচের উপর আসন করে বসেছিলেন। ঘর তখনও বেশ উজ্জ্বল ছিল—বৈঠকখানা-

কক্ষের দরজা খোলা ছিল। চীনা কারিগরের তৈরি সুদৃশ্য কারুকার্য্যময় কাঁচের জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত। এই জানালাগুলো অনেকটা জাভা-সুলতানের রাজপ্রাসাদের মত। কক্ষের উপরে কড়িকাঠে পূজার সরঞ্জাম ও অনেক বই সাজানো ছিল। তালপাতার লম্বা লম্বা টুকরার উপর নানা রকম লেখা ছিল। একটি সুদৃশ্য তৈল-প্রদীপ ছাদ থেকে ঝুলছিল, তার আচ্ছাদন ছিল নীল কাঁচের। এটি ডিসারের ডাচ কণ্ট্রোলার তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

অলিত মধ্যবয়সী ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ও দেহে যেন কেমন একটা অসম্পূর্ণতা ছিল। তাঁর গায়ের রং বিশেষরকম ফর্সা ছিল। তাঁর পত্নীরা ও সভাসদেরা তাঁকে সুদর্শন বলতেন। কিন্তু অলিতের নিজের মনে হ'ত তিনি কুৎসিত। এমন কি, ভাবতেন, একটি সাধারণ শূদ্রও তাঁর চেয়ে সুন্দর। কারণ তিনি মনে করতেন, কঠোর পরিশ্রমের দরুনই শূদ্র-দেহের এই বলিষ্ঠ সৌন্দর্য্য। যখন তাঁর সুশ্রী তরুণ বন্ধু রাকা তাঁর সঙ্গে থাকত তখন তিনি নিজকে রূপে বড় খাটো মনে করে বিশেষ ক্ষুব্ধ হতেন। অলিত অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে আফিং খাচ্ছিলেন।

তাঁর মন বাস্তব জগতের উর্দ্ধে ছিল। কাল রাতে পেডেণ্ডার সহিত ভগবদ্গীতা সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয়েছিল, সে সবই মাথায় ঘুরছিল। একটি আট-নয় বছরের বালক তাঁর পদসেবা করছিল, তার নাম ওকা। সে প্রভুরই দূরসম্পর্কিত, তারই কোন নীচজাতীয়া স্ত্রীর পুত্র, পিতা কে অবশ্য কেউ জানে না। তিনি ছেলেটিকে পোষ্য নিয়েছিলেন। ওকার ক্ষুদ্র মুখখানি আফিমের কল্‌কের উপর ঝুঁকে ছিল, পরের ছিলিমের জন্য আর একটি আফিমের গুলি সে তাতে নিবিষ্ট মনে গরম করছিল। আফিমের তীব্র মিষ্টি গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হয়ে গেল। আফিমের ধোঁয়ায় বালকের কপাল ঘুমে ঢুলে পড়ছিল—বুক ধড়ফড় করতে লাগল। অলিত চোখ না খুলেই তার কল্‌কে এগিয়ে দিলেন আর এক ছিলিম ভরে দেবার জন্য। ওকা আফিম ভরে দিলে, তখনকার মত—এটিই শেষ ছিলিম, কারণ অলিত আফিম পাঁচ বারের বেশী একসঙ্গে খান না। ওকা খুব শান্ত এবং স্বল্পভাষী, তাই অলিত তাকে খুব পছন্দ করতেন। অলিত যতক্ষণ আফিম খান, ততক্ষণ খুব শান্তিতে ও আনন্দে থাকেন, কিন্তু অন্য সময়ে তাঁর মনে অবসাদ আসে। তাঁর সে অবসাদের কোন কারণ ছিল না। তিনি ছিলেন তরুণ, তিনি ছিলেন অর্থশালী, তিনি ছিলেন ক্ষমতাবান্। তাঁর বহু স্ত্রী এবং তাঁরা সবাই পতিপরায়ণা। তাঁর বিশ্বস্ত সভাসদের অভাব নেই। তাঁর সুদূরবিস্তৃত বহু ধান্যক্ষেত্র ছিল। কিন্তু তবু সময় সময় মনে হ'ত তিনি যেন লক্ষ্যহীন—সংসার তাঁর কাছে শূন্য, উদ্দেশ্যহীন।

দ্বারে ছায়া পড়ল, অলিত দেখলেন রাজকার্য্যে তাঁর কাছে অনেক লোক এসেছে। এক জন চীনদেশীয় বণিক এক লম্বা-চওড়া দরখাস্ত করেছে যে, অলিতের রাজ্যের সীমানায় তার জাহাজডুবি হয়েছিল, আর সে জাহাজ থেকে প্রজারা অনেককিছু চুরি করেছে, এ বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। চীনা বণিক ক্ষতিপূরণ চাইলে, তাতে রাজা চটে গেলেন। তাঁর প্রজারা যে বণিকের জীবনরক্ষা করেছিল, সেটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বণিক বুয়ালেলের ডাচ রাজপুরুষের কাছে যাবে বলে বিনীতভাবে ভীতিপ্রদর্শন করলে। দ্বারপাল এসে ওকার কাছে ফিস ফিস করে কি বলল। ওকা তাই অলিতকে জানালে। অলিত তখন চীনা বণিকের দিকে চেয়ে বললেন, কর্ম্মচারীরা পরে তার বিষয়ে ব্যবস্থা করবে—বলেই ভিতরের দ্বার দিয়ে দ্রুত অঙ্গনের দিকে চলে গেলেন। রাকা এসে সামনে দাঁড়াল, জোড়হাতে অভিবাদন করে মৃদু হেসে বললে, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল, প্রভু কি ক্ষমা করবেন?' অলিত রাকার পিঠ চাপড়ে দিলেন। তিনি সেই চীনে লোকটির কথা একেবারে ভুলে গেলেন, আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'তুমি আমায় বড় ভাল লাগছে।' এই বলে রাকাকে নিয়ে বৈঠকখানা-কক্ষে গেলেন। তখন সব লোক চলে গিয়েছিল, ওকা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তিনি কৌচের উপর আসন করে বসলেন এবং রাকাকে বসতে বললেন। রাকা জিজ্ঞেস করলে, 'আজ আপনার মনটা ভাল নেই মনে হচ্ছে।'

অলিত বললেন,—'তোমার কি খবর বল? সারাদিন তোমার কি করে কাটল? আমার ত আজ আর ভাল লাগছে না।'

রাকা বললে, 'আমরা সবে পূজোর অর্ঘ্য নিয়ে মন্দিরে গেলাম, পূজো দিলাম যাতে আমাদের নাচ ভাল হয়, এর আগে সারা দিন অভিনয় করছিলাম।'

অলিত মৃদু হেসে বললেন, 'ও তা হলে সারাদিন তুমি আর কিছু কর নি শুধু পূজো আর অভিনয়?'

রাকাও মৃদু হেসে উত্তর করলে, 'না আর কিছু করি নি।'

'তবে কেন তুমি এত দেরি করলে? তোমার জীবনে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু নতুন ঘটে, আমিও তোমার অংশীদার হতে চাই।'

রাকা বললে, 'ঈর্ষা করবেন না বন্ধু, আমার বড় অমঙ্গল হয়ে গেছে।'

'সে কি?'

'আমার স্ত্রী এক মৃত সন্তান প্রসব করেছে।' অলিত একটু নীরব থেকে বললেন, 'কিছু ভেবো না, আবার সন্তান পাবে।'

মৃদু হেসে রাকা বললে, 'হাঁ অনেক স্ত্রী থেকে অনেক সন্তান পাব, কি বলেন?'

হঠাৎ অলিত জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমার স্ত্রী দেখতে কেমন?'

'সে সাধারণ মেয়েমানুষের চেয়ে অনেক লম্বা, প্রায় আমারই মত। তার হাত আর মুখ খুব বড়। কিন্তু তার চোখ দুটি বড় সুন্দর। বড় বড় ভাসা চোখ, ঠিক বন্য হরিণীর মত। আর দৃষ্টিতে শক্তি আছে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। আচ্ছা, তুমি তাকে খুব ভালবাস?'

রাকা সরল হাসিতে ভেঙে পড়ল। বললে, আপনি কাব্যে ভালবাসার কথা পড়েছেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেম বলে কোন

বস্ত্র নেই। মানুষ বানরের মত, পাখীর মত জীবনযাপন করে। মেয়েদের নিয়ে কোন কোন সময় খেলা করতে খুবই ভালবাসে। কিন্তু যখন ভাঁটা আসে, তখন সবই ফুরিয়ে যায়। আমি ধারণাই করতে পারি নে, আপনি আবার প্রেম ভালবাসা এসবের মানে কি বুঝেন?'

অলিত ভ্রূ কুঁচকে চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে বললেন, 'তোমার স্ত্রী কেমন?'

আমি আমার নিজের ইচ্ছের বিয়ে করি নি, আমার বাবা আমার বিয়ে দিয়েছেন। আমার মা এখন দৃষ্টিহীনা, কাজেই আমার স্ত্রী এখন খুব কাজে লাগে। সমস্ত পরিবারের ভার তার ওপর। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সে ঠিক একজন কার্য্যক্ষম পুরুষের মত সমস্ত সংসারের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। এ ছাড়া অবসর সময়ে সে বসে বসে তালপাতায় লেখা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে ও তা বুঝতে পারে। তাকে দেখে আপনি খুশী হবেন।' অলিত রাকার কথাগুলো নীরবে শুনলেন, ভাবে বুঝা গেল তিনি খুশী হয়েছেন।

ভৃত্যেরা কচি ডাব কেটে দু'ভাগ করে নিয়ে এল, সিরিও আনল। অলিত ও রাকা ডাবের ভিতরের টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি দুধের মত নরম শাঁস খেলেন। নিজে রাকাকে সিরি তৈরি করে দিলেন। এবার ওকাকে ঈশারা করলেন আফিম দেবার জন্ত। ওকা কলকেতে আফিম ভরে দিলে। অলিত প্রথমে বেশ করে খেয়ে নিলেন, তারপর রাকার দিকে এগিয়ে দিলেন। রাকা মৃদু হেসে কলকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'নাচের আগে আফিম খাব না।'—অলিত ব্যঙ্গ করে বললেন, 'ভোরের পূজোর আগে পুরোহিতের মত?' রাকা মুখ মোচড়ালে, তারপর পেডেণ্ডা যে ভাবে মন্ত্র বলে ও হাতের আঙুল নেড়ে মুদ্রা করে তার অনুকরণ করে দেখাতে লাগল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমারও ত পেডেণ্ডা হবার কথা ছিল।' অলিত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি ত এখনও তরুণ, এককোঁটা জ্ঞানও তোমার মাথায় ঢোকে নি।'

তারপর ওকাকে আদেশ করলেন, 'যাও ইড়াবগাস রাকার বারিস নাচের পোশাক নিয়ে এস, সে আমার ঘরেই তার বেশ-পরিবর্ত্তন করবে।'

চারদিকে জনতার কোলাহল শোনা যেতে লাগল। পুরীর অঙ্গন লোকচলাচলে সরগরম হয়ে উঠল। এক দল ভৃত্য একরাশ নারকেলের মালা নিয়ে এল, তাতে তেল ও সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়ালের কিছু দূরে দূরে রাখতে লাগল, রাতের আঁধার দূর করবার জন্ত। দলে দলে লোক এসে ভিড় করতে লাগল। রাজবাড়ীতে নাচ হবে—ঝড়ের বেগে যেন চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে জনতার হাততালি ও উচ্চ হাস্য শোনা যাচ্ছিল। তরুণীরা মাথায় বেশ করে তেল মেখে, পরিপাটী করে চুল বেঁধে খোপায় ফুল গুঁজে এল। তাদের ও বুড়োদের কারো কোলে, কারো পিঠে শিশুরা বসে আছে। কিশোরীদের চোখে-মুখে উত্তেজনা, তারা এক-একখানা উজ্জ্বল রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে এসেছে। তামানসারির নাচের দল এসে আসরে বসেছে, তারা তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ করছিল। ভৃত্যেরা আরও প্রদীপ জ্বেলে দিতে লাগল। নাচের আসর ঝকমক করে উঠল। যারা অঙ্গনে বসতে জায়গা পেলে না, তারা রাজপুরীর প্রবেশ-দ্বারেই বসে গেল। ফেরিওয়ালী মেয়েলোকেরা তাদের মাদুর বিছিয়ে বসল ও পাতার ঠোঙায় করে মৃদু দীপালোকে খাবার খেয়ে ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। নিমেষে কুকুরগুলি এসে ওগুলো চেটে খেয়ে ফেলতে লাগল। কিশোর বালকেরা কানে ফুল গুঁজেছে, হাতে সিগারেট নিয়েছে, বেশ জমকালো সারং পরেছে। তারা জায়গা না পেয়ে দেয়ালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। নাচের আসরের উপর পর্দ্দা ঝুলে ছিল। লোকেরা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল পর্দ্দার ভিতর কি আছে দেখতে। আসরে দু'জন নাচওয়ালা নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে নেচে লোকেদের হাসাতে লাগল, মায়েরা তাদের শিশুদের তুলে তাই দেখাতে লাগল। আসরের মাঝখানে লাম্বন চুপ করে বসে আছে, পরনে তার জমকালো সোনালী পোশাক, ঠিক মনে হচ্ছিল কাঠের দেবী-প্রতিমূর্ত্তি। মাথায় তার মুকুট, তাতে চাঁপা ফুল গোঁজা। চাঁপা ফুলের মিষ্টি গন্ধে, আর নাচবার আনন্দে তার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তার মাসী তার পাশে বসে ছিল। ঘরে তার বকবকরের চোটে শান্তিতে থাকবার জো নাই। কিন্তু সেও যেন এত লোকজন, এত জাঁক-জমক দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। সে শুধু মাঝে মাঝে লাম্বনের সারং ধরে টেনে ঠিক করে দিচ্ছিল, নয় ত তার কানে ফিস ফিস করে কিছু বলছিল। লাম্বনের অপর পার্শ্বে কেসিমানের বিখ্যাত নৃত্য-শিক্ষক বসে ছিল, সে-ই লাম্বনকে নাচ শিখিয়েছে। তার লম্বা চুল অনেকটা ধূসর হয়ে এসেছে। তা গ্রন্থিবদ্ধ করে শিরস্ত্রাণের নীচে ঢেকে রেখেছে। গায়ে লম্বা হাতার কালো কোট। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন দরবারী পোশাকে একজন রাজ-অমাত্য, পান মুখে দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে সে ভাবছিল। যদিও দাঁত ছাড়া শুধু মাড়ি দিয়ে পান চিবানো তার পক্ষে ছিল খুব কঠিন, তবুও সে সুপারি কুঁচিয়ে নিয়ে বুড়োদের মত সিরি খাওয়াটা লজ্জাকর মনে করত।

গামেলান বাদকদের সঙ্গে ঘণ্টা বাজাত পাক। সে তাদের মধ্যে বসে ছিল। তার চোখে-মুখে একটা ঔৎসুক্য। সে তার সবচেয়ে সেরা পোশাক পরেছে, কানে জবাফুল গুঁজেছে, আর একটি নূতন লাল টক্‌টকে সাপুট কোমরবন্ধ পরেছে। এটি তার স্ত্রী পুপলুগ তাকে উপহার দিয়েছিল। সে তার সঙ্গে কিরিচ আনে নি; কিন্তু একটি ধারালো ছুরি তার কোমরবন্ধ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে কিন্তু এগুলো তার শিরস্ত্রাণের কাছে কিছুই নয়। কারণ গামেলান-বাদকেরা তাদের নিজেদের টাকা দিয়েই নূতন শিরস্ত্রাণ কিনে এনেছে, গাঢ় বেগুনী রঙের, এবং তাতে সোনালী সূতায় ফুলতোলা। বাদ্যযন্ত্রের চাকচিক্যের মতই ছিল সেগুলোর চাকচিক্য যাতে নূতন জমকালো পোশাকপরা নাচওয়ালারা তাদের খাটো

মনে না করে। পাক্ বিশাল ঘন্টার কাছে গিয়ে বসল, আজ সে-ই এটা বাজাবে, কিন্তু এই বাজের কাছে তার আঙুলগুলো শোভা পাচ্ছিল না। মাঠে কাজ করে করে তার আঙুলগুলো শক্ত কর্কশ হয়ে গিয়েছিল, তার কানও যেন বাজের তাল রাখতে পারছিল না। কিন্তু সে বাজনা এত বেশী ভালবাসত যে, মনে হ'ত ঘন্টার মৃদু মিষ্টি আওয়াজ শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়বে। একবার সে নাচের আসরে তার ছোট বোন লাম্বনের কাছে গেল। তার মনে একটা উত্তেজনা ও ভয়ের ঝড় বইছিল, কারণ পুরুষের সঙ্গে মেয়েও নাচবে এটি দূষণীয় ছিল, পূর্ব্বে কখনও এ রকম হয় নি। সে ধাক্কা দিয়ে পর্দা সরিয়ে শিক্ষকের কাঁধের উপর দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু লাম্বন হাসল না, শুধু শান্ত দৃষ্টি তুলে তাকালে। যেন সে জমকালো পোশাকে সজ্জিতা হয়ে সত্যি সত্যি জলদেবী হয়ে গিয়েছিল। পাকেরও মনে হ'ল, ঐ যে সুসজ্জিতা মেয়েটি বসে আছে, সে তার সেই বোন নয়—যে আজ সকালেই ছেঁড়া সারং পরে তার খাবার জন্ম ভাত জল নিয়ে এসেছিল। সে তার মেয়ে রানটুনকে যেমন ভালবাসত, তেমনই পিতৃস্নেহে ভালবাসত তার এই ছোট বোন লাম্বনকে।

নাচের সীমানা বর্শা ও নিশান দিয়ে চিহ্নিত ছিল। নিশানের খুঁটিগুলির মাথায় নানা ধরণের প্রদীপ জলছিল, যা পাক্ আগে কখনও দেখে নি। এগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি নয় এবং তেল রাখবার জন্ম নীচে কোন পাত্রও বসানো ছিল না। প্রদীপগুলো ছিল কাঁচের, এবং তা থেকে খুব উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছিল। সে দেখতে পেলে দর্শকদের সামনের সারিতে তার স্ত্রী পুগলুগ তার দুটি মেয়েকে নিয়ে বসে আছে। তাদের হাতে দু'টুকরা আখ ছিল, তারা তাই বসে বসে ভদ্রভাবে খাচ্ছিল। পুগলুগ একটা নূতন ধরণের হলুদ রঙের সারং পরেছিল। তাতে বড় বড় পাখী আঁকা ছিল। পাক্ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবল, পুগলুগ এটা কিনতে পয়সা কোথায় পেলে। দেখে আশ্চর্য্য হ'ল, তার বক্ষোদেশ একেবারে উন্মুক্ত···। তার নবজাত শিশু ক্লেপনকেও আনে নি। বার দিনের উৎসবের সময় যে দোলনা কিনে আনা হয়েছিল, তাতে শুইয়ে রেখে এসেছে। হঠাৎ তার স্বর্ণের উপর নজর পড়ল। তার বুক কেঁপে উঠল, সজোরে তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। স্বর্ণ তার চুলগুলো আঁচড়ে পেছনে শক্ত করে খোঁপা বেঁধে রেখেছে, আর তা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, যেন সে উচ্চবংশজাতা। কিন্তু আসলে সে এক শূদ্রকন্যা। লন্টার পাতার দুলের পরিবর্ত্তে তার কানে রূপার দুল ঝিকমিক করছিল—তাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, পাক্ আর দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। কিছুক্ষণ পর সে মন স্থির করে নিলে। সে উঠে দাঁড়াল, ভিড়ের মধ্যে পথ কেটে চলতে লাগল। আপন মনে বললে, 'আমি শুধু পান কিনব, আর কিছু না'—যদিও তার সিরির কৌটা ভর্ত্তি ছিল। সে কিছুতেই স্বর্ণের কাছে পৌঁছুতে পারল না। সে তখন গেটের বাইরে যেখানে ফেরিওয়ালীরা বসে ছিল সেখানে গেল। 'তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু কিনবে না?' বলে একটি ফেরিওয়ালী তাকে ডাকলে। সে পেছন ফিরে দেখল, সামুদ্র মেয়ে দাশনী তাকে ডাকছে—যে সাগরতীরে তার জন্ম এক দিন খাবার নিয়ে গিয়েছিল। ডাক শুনে পাক্ তার মাদুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মাথার কালো চুল সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল, আর তার কালো পবিত্র মুখখানি ছোট ছোট আঁচিলে ভর্ত্তি ছিল। সে কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'পান চাই?' 'দু কিপং মূল্যের,' পাক্ বললে। সে তাড়াতাড়ি তাকে গিলি তৈরি করে দিলে। পাক্ গিলি নিয়ে, তার পাত্রটা খুলে পয়সা বের করে দিলে। দাশনী তার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে পয়সা ফিরিয়ে দিলে। পাক্ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর না ভেবে-চিন্তেই বললে, 'সিরি দাও'। এর মানে 'আমি রাতটা তোমার সঙ্গে কাটাব।' সেও তার অর্থ বুঝতে পারল। কাছেই একটি ফাজিল ছোকরা ছিল, সে হেসে ভেঙে পড়ল, বললে, সাবধানে যাও, বাড়ীর পথে নইলে হারিয়ে যাবে। 'চুপ কর' বলে পাক্ পালাল।

এইবারে সে স্বর্ণের কিছু কাছে এগুতে পারলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্ণ তাকে না দেখতে পেলে ততক্ষণ সে ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল। স্বর্ণের চোখে চোখ মিলল, সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। সে এবার নিজেকে প্রতারিত করতে পারল না। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি তার সুদীর্ঘ আঁখিপল্লব তুলে তার সে দৃষ্টির উত্তর জানালে। পাকের হাত উসখুস করতে লাগল, তার মনে হ'ল এখুনি ছুটে গিয়ে স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরে। সে নিজের ঠোঁট জোরে কামড়াতে লাগল। একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, এই যে নাচ সুরু হচ্ছে। পাক্ ধীরে ধীরে বের হয়ে ভিড় ঠেলে আসরে চলে গিয়ে ঘন্টা নিয়ে বসল। এবার পাক্ এমন একটা দৃশ্য দেখল যা তাকে স্বর্ণের চেয়ে আরও প্রবলভাবে আকৃষ্ট করলে। সে অভিভূত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্গনে বিস্তৃত চত্বরে বিশিষ্ট লোকেদের বসবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল। সে স্থান এখন দীপমালায় সুশোভিত হয়ে গেল। দাসীরা ছুটাছুটি করে চারদিকে মিহিবোনা মাদুর বিছাতে লাগল। দেয়ালে আলোর ছায়া পড়ে একবার উজ্জ্বল, একবার আঁধার হতে লাগল। পাক্ দেখতে পেলে ভিতরের কক্ষে অনেকগুলো প্লেট সাজানো আছে। রাশি রাশি প্লেট, আর কি সুন্দর! পাক্ উঠে গেল ভাল করে দেখবার জন্ম। তাতে কোন ফুল লতা পাতা ছিল না। শুধু নীল রঙের একটা রেখা ছিল, দেখে মনে হ'ল চীনা প্লেট। তার নিজের প্লেট দুটো ছিল সাদা ধবধবে এবং তাতে গোলাপ ফুল আঁকা ছিল। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হ'ত যেন গোলাপের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে—ঐ প্লেট দুটো সে সাগর-পারে ভাঙা জাহাজ থেকে সংগ্রহ করে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। সে মাঝে মাঝে তার প্লেট দুটো মাটির নীচে থেকে বের করে দেখত আর তার দৃষ্টির ক্ষুধা মেটাত। এক নিমেষের জন্ম তার মনে অহঙ্কার জাগল—সে রাজার চেয়েও ধনী।

সে জনতার উপর দিয়ে দেখতে পেলে, একটি সোনালী কাজ-করা চেয়ার ছয় জন লোক কাঁধে করে নিয়ে আসছে, তার উপর এক জন পক্ককেশ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বসে আছেন। তিনি হলেন পামেটুটানের অ্যাকোরভা, রাজা অলিতের পিতৃব্য, রাজ্যের সহকারী অভিভাবক। তাঁর অসংখ্য অনুচর তাঁর পেছন পেছন আসছিল, তারা চেয়ার নামালে, তার পর তাঁর পায়ে প্রণতি জানালে। তিনি বসবার আসরে একটি উচ্চাসনে বসলেন ও দর্শকদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কয়েকজন ভৃত্য ছুটে অলিতকে তাঁর খুড়োর আগমন সংবাদ জানাতে গেল।

রাজরাণীরা সেজেগুজে রাজার কক্ষের সামনে বসলেন। তাঁদের কাছে কাছে তাঁদের পরিচারিকারাও বসলে। রাণীরা অতি জমকাল সারং পরেছেন। রেশমী বস্ত্র দিয়ে তাঁদের বক্ষদেশ বাঁধা। কালো রঙের লেসের শালে তাঁদের কাঁধ গা ঢেকে রেখেছেন। তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য গয়না। মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে, কপাল থেকে চুল পালিশ করে পেছনের দিকে নিয়ে খোঁপা বেঁধেছেন। খোঁপাগুলি ফুলে সুশোভিত। তাঁরা হাসছিলেন, ঘোরাফেরা করছিলেন, কথা বলছিলেন—দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন এক ঝাঁক বিদেশী পাখী। তাঁরা একে অন্যের শাড়ী গয়না দেখছিলেন। কেউ মনে মনে হিংসা করছিলেন, কেউ অন্যের পোশাকের প্রশংসা করছিলেন। এভাবে তাঁদের কলগুঞ্জনে আসর মুখরিত হয়ে উঠল। কখনও তাঁরা উত্তেজিত, কখনও তাঁরা প্রফুল্ল, তাঁদের দৃষ্টি কখনও কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এবার প্রাসাদের নিয়মভঙ্গ হয়েছে—এই বোধ হয়, প্রথম তাঁরা জনতার সামনে বের হলেন। যখন তাঁরা আসরে প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁদের ঔৎসুক্যপূর্ণ কলতান রাজার ও রাকার কর্ণে প্রবেশ করল। রাণীরা চকিতে শান্ত হয়ে গেলেন, মনে হ'ল যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না। রাকা নাচের পোশাক পরে এসেছে, তার ভিতর থেকে যেন একটা শক্তি বের হয়ে সকলকে সম্মোহিত করে রাখলে। সে একটা সাদা পাজামা পরে ছিল, পা দুটি তার সেই পাজামায় ছিল ঢাকা। তার দু'কাঁধে সোনালী কাজ-করা উজ্জ্বল রঙের ফিতা বাঁধা ছিল। সে সোনার জলে হল করা শক্ত কাইন পরেছিল। কোমরে তার কিরিচ ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। সে ত্রিকোণাকৃতি শিরস্ত্রাণ দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছিল, তাতে শত শত রূপার চুমকি ঝিকমিক করছিল। এই শিরস্ত্রাণে তাকে বেশ লম্বা-চওড়া একজন বীর যোদ্ধা মনে হতে লাগল। রাকা নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল, সে সামনের অলিন্দে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াল—নারীদের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে।

অলিত তার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার আঙুলে আঙুল জড়িয়ে তার পর তাকে ছেড়ে দিলেন। তাঁর পত্নীরা যেখানে সারিবদ্ধ হয়ে বসেছিলেন, অলিত সেখানে তাঁদের দিকে চেয়ে হাসলেন। তাঁরা সবাই সুন্দরী ছিলেন। অলিত সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি হেসে বললেন, 'আমার ফুলবাগানে ফুল ফুটেছে।' পত্নীরা তাঁদের প্রভুর ঠাট্টায় খুশী হয়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। টুয়ান ছিল এদের মধ্যে প্রগল্‌ভা, সে তার দাসীকে বললে, কে বেশী সুন্দর, আমাদের প্রভু না রাকা, বুঝতে পারছি না। . .

বেরনিস চত্বরের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তার পর প্রভুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। অলিতের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়লে, তিনি চোখ নীচু করলেন, কটাক্ষ করে এমন মধুর হাসি হাসলেন যে, দেখে মনে হ'ল তাঁদের মধ্যে গভীর প্রণয় আছে। অলিতও তাঁর হাসির দৃষ্টির উত্তর ফিরিয়ে দিলেন। বেরনিসের ক্ষুধার্ত্ত হৃদয় অলিতের সঙ্গে মিলনের আশায় অস্থির হয়ে উঠল। দাসী-বালিকা মুন্না বললে, প্রভু আজ আর বই পড়বেন না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বেরনিস প্রথম অঙ্গনে বসে পড়লেন। গামেলান বাজতে সুরু হ'ল। নাচের আসরে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রইল। গামেলানের মিষ্ট মধুর সুর ঢাকের উচ্চ বাদ্যের সঙ্গে বেজে উঠল। অলিত এই বাজনা শুনতে বড় ভালবাসতেন। গামেলানের কোমল মূর্চ্ছনায় তিনি যেন তাঁর শৈশব ফিরে পেতেন। শৈশবের মধুর স্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠত, যেন মায়ের কোলে বসে তিনি গামেলান শুনছেন। অলিত নিজের দিকে ফিরে চাইলেন। যদিও তিনি রাকার চেয়ে এক বছরের ছোট, মনে হ'ল, তিনি যেন রাকার চেয়ে অনেক বড়। রাকা কেমন সুন্দর হাসিখুশী চঞ্চল, সে কেমন ভাবে মুরগীর লড়াই দেখে উত্তেজিত হয়। আবার সূর্য্যাস্তের সময়ই বা কেমন নীরব শান্ত হয়ে যায়। বালীতে তার মত কেউ নাচতে পারে না।

নাচ সুরু হ'ল। রাকা এক হাত লাম্বনের কাঁধে রেখে নাচের দলের সঙ্গে অগ্রসর হ'ল। লাম্বন থর থর করে কাঁপছে বুঝতে পেরে রাকা নুয়ে ধীরে জিজ্ঞেস করলে, 'ভয় পেয়েছ?' লাম্বন শুধু ধীরে মাথা নাড়লে। রাকা বললে, 'আমি যখন কিরিচ নিয়ে আসব, তুমি যেন ভয় পেয়ে চলে যেও না।' লাম্বন তার দিকে চেয়ে বললে, 'না, না আমি ত তোমাকে ভয় করি নে।'

তার নাচের ভূমিকা ছিল সূর্পনখার। সে হবে রাক্ষসরাজ রাবণের বোন সূর্পনখা, বনদেবী সেজে বনবাসে লক্ষ্মণকে ভুলাতে যাবে। লক্ষ্মণ তার নাক কেটে তাকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। তারা বারে বারে এই নাচের তালিম দিয়েছে, যাতে তালভঙ্গ হয়ে লাম্বন সরে না যায়, পাছে তার নাক সত্যিকারের কেটে যায়। রাকা তার চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখলে তার পোশাক ঠিক আছে কি না। মাথায় তার লেস-বসানো চামড়ার মুকুট, তার মধ্যে অনেকগুলি কামবোডিয়া ফুল গোঁজা ছিল, তারই একটা ফুল সে ঠিকমত গুঁজে দিলে, তার কটিতে সোনার কটিবন্ধ খুব কষে এঁটে দিলে। লাম্বনের মুখের তীব্র পুষ্পসৌরভ, কুনজিং চূর্ণ, আর কাজল এ তিনের তিক্তমধুর গন্ধ বের হতে লাগল। রাকা তাকে কোমরবন্ধ পরাবার সময় লাম্বনের ঈষৎ উন্নত বক্ষদেশের স্পর্শ লাগল। রাকা হাসলে। এই সেই ছোট লাম্বন। যাকে কাল পর্য্যন্ত মাষ্টারের কাছে নিয়ে নাচ-গান শিখিয়েছে, কোলের কাছে বসিয়েছে, তার মুখের দিকে চেয়ে রাকা বিস্মিত হ'ল। লাম্বনের দেহ-স্পর্শে তার হাত উষ্ণ হয়ে

উঠল, মনে হ'ল তার হাতে যেন একটি জীবন্ত মোলায়েম পক্ষীদেহ। রাকা তাকে একটু ঠেলা দিয়ে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিলে। সে নত নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। গামেলান বাজতে লাগল। আকাশে হাওয়া না থাকলে পিসার পাতার যেমন অবস্থা হয়, তেমনই অবস্থা হ'ল তার—সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মন দোলা খেতে লাগল। রাকা তাড়াতাড়ি ফিরে, অন্য চারজন নাচওয়ালা যেখানে বসে ছিল তাদের মধ্যেই বসে পড়ল। গামেলান নানা ছন্দে বাজতে লাগল। প্রথমে একজন নাচওয়ালা নেচে নেচে ধর্মছত্রের নীচে চলে গেল। তারপর আর একজন নাচওয়ালা উঠল। প্রথমের চেয়ে তার নাচ ভাল হ'ল। জনতা আনন্দধ্বনি করে উঠল।

ভৃত্য এসে রাকার সামনে নতজানু হয়ে কচি ডাব তুলে ধরল, তার ভিতরের পাতলা দুধালো শাঁস খাবার জন্য। যদিও রাকার গলা উত্তেজনায় শুকিয়ে গিয়েছিল তবু সে তা ফিরিয়ে দিলে। প্রত্যেক বারেই নাচের সময় রাকার গলা অমনি শুকিয়ে যায়। জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস বইতে থাকে, শরীর হাল্কা হয়ে যায়। নিজেকেই যেন সে নিজে চিনে উঠতে পারে না। তার পুরাতন শিক্ষক বলেন, এটা তার 'তন্ময় অবস্থা'। রাকার মনে হ'ল তার সামনে যেন নীল পর্দা বিছিয়ে আছে, তার চোখের সামনের জনতা নীল পর্দাতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার যেন মনে হ'ল সে মেঘের মধ্যে ডুবে আছে। গামেলান বেজেই চলেছে। দর্শকদের হাসি-তামাশা কিছুই তার কানে গেল না। নাচ দেখে এ ওর গায়ে পড়ছে, চীৎকার করছে, যুবকেরা এ সুযোগে মেয়েরা যেদিকে বসেছিল, সেদিকে ঠেলাঠেলি করে এগুতে লাগল, যেন ওদিকে গেলেই নাচ ভাল দেখা যাবে। রাজপত্নীরা তাঁদের আসরে মাদুরে পা বিছিয়ে বসেছিলেন, তাঁদের চাঞ্চল্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাঁধা জন্তু ছাড়া পেয়েছে। তাঁদের হাসি মাঝে মাঝে হাওয়াতে ভেসে আসছিল। রাকার কানে এসব কিছুই ঢুকল না। সে শুনতে পেলে গামেলান তাকে ডাকছে। সে দেখতে পেলে নীল শূন্য আকাশে স্ফটিকের গোলার মত একটা উজ্জ্বল আলো। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কথক-ঠাকুর বলতে লাগল, 'রাস্তা প্রস্তুত, আমার প্রভু শীঘ্রই আসবেন। তিনি বনজঙ্গলে বেড়ান, হাঁটলে তার পায়ের নীচে ফুল ফুটে উঠে। তিনি ভয় দেখালে বাঘ তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে।' গামেলান বেজেই চলছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক খুব জোরে বেজে উঠল। রাকা ধর্মছত্রের নীচে দাঁড়াল, যা বাস্তব জীবনে আর কল্পনার রাজ্যে ব্যবধান টেনে দিয়েছে। রাকার মনে হ'ল, সে যেন আকারে বেড়ে গেছে, আরও লম্বা হয়ে গেছে—সে যেন দেবতাতে পরিণত হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে দীপমালার দিকে অগ্রসর হ'ল।

অলিত একদৃষ্টে নাচ দেখছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর চোখ রাকার উপর থেকে ফেরে নি। ইডাকাটু পাশের একজন লোককে বললে, আমাদের প্রভু যেন চোখ দিয়ে নাচ গিলছেন। এবার লাম্বন নাচতে উঠে দাঁড়াল। তার ক্ষুদ্র দেহ ছিপছিপে, মুখে অসম্ভব স্থির গাম্ভীর্য। দুই হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়ে, উরুতে উরু সংলগ্ন করে নাচতে আরম্ভ করল। সে হাঁটু দিয়ে ধীরে ধীরে পক্ষীর মত হেঁটে আসছিল। তার সুকোমল হাত দুটি পাখীর মত উড়ছিল। বিশাল মুকুটের নীচে তার সরু গ্রীবা কম্পিত হতে লাগল। সে রাকার দিকে এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হ'ল। তার ক্ষুদ্র পা দুটি মেঝের ধূলি উড়াতে লাগল, তার কোমর কুমুদের ডাঁটার মত দুলতে লাগল। সে ধীরে ধীরে রাকার কাছে এগিয়ে এল, রাকাও তার সঙ্গে সঙ্গে এগুল। রাকার বাহু দুটি একে অন্যকে জড়িয়ে রেখেছিল, তার আস্তিনের রং ঝলমল করে উঠল। গামেলান বেজে চলল। লতা যে ভাবে গাছকে বেষ্টন করে, লাম্বনও সে ভাবে নাচের ভঙ্গীতে চারদিকে ঘুরে সাপের মত তাকে বেষ্টন করতে এল। কথক-ঠাকুর বলে উঠল, 'লক্ষ্মণ সাবধান, অপ্সরা থেকে সাবধান।' রাকা ও লাম্বন একজন আর একজনকে ছাড়িয়ে চলল, এক নিমিষের জন্য তাদের মুখ কাছে এসে আবার সরে গেল—আবার কাছে এল—গামেলান বেজেই চলল। আবার তাদের একের মুখ অন্যের কাছে এসেই দূরে সরে গেল। বারবার নাচের ভঙ্গীতে এ দৃশ্য চলল, ঠিক মনে হচ্ছিল যেন দুটি প্রজাপতি উড়ে উড়ে খেলা করছে। রাকা আর লাম্বনের মুখ বারবার ঝুঁকে পড়ছিল। প্রভু মুগ্ধ হয়ে তন্ময় হয়ে নাচ দেখছিলেন। কথক-ঠাকুর বলছিল, 'লক্ষ্মণ সাবধান'। হঠাৎ রাকা তরবারি খুলে লাম্বনের মাথার উপর তুলল। প্রণয়লীলা থেমে গেল। দর্শক ভীত তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল। অলিতের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। লাম্বনের উপর রাকার তরবারি ঝলসে উঠল। নিমেষে লাম্বন অদৃশ্য হ'ল। গামেলান বাজতে লাগল, জোরে বেজে উঠল ঢাক। লক্ষ্মণ রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই করতে ছুটে গেল। অন্য দুটি নাচওয়ালা রাক্ষস সেজেছিল।

অধিকাংশ শিশুই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ছোট ছোট বানরবাচ্চার মত শিশুরা তাদের মায়ের গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিল। রাজবাড়ীর অধিকাংশ দাসী-বালিকারা একজনের উপর আর একজন মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। পুরুষদের আসরেও সিরি চিবাতে চিবাতে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৃদ্ধ তাকয়োডাও বার্দ্ধক্যের জন্য বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারেন নি। শুধু অলিতই আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে নাচ দেখছিলেন। গামেলানের শেষ গৎ বেজে উঠতেই জনতা ভেঙে পড়ল। তারা ত্রস্তে উঠে মশালের আলো নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলতে লাগল, যাতে পথে ভূতপ্রেত আশ্রয় না করে। অনেক রমণী রাত্রির ভীতি দূর করবার জন্য ছুরি ও রসুন সঙ্গে এনেছিল। তামনসারির লোকেরা বাদ্যযন্ত্র কাঁধে করে চলল। নারিকেলমালার প্রদীপ ধূম উদগীরণ করতে করতে মৃদু আলো বিকীর্ণ করছিল। রাজরাণীরা একে অন্যের গায়ে ঠেস দিয়ে রাজা অলিতের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের কেশদামের পুষ্পকলিগুলি এখন শুকিয়ে তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছিল। বেরনিস দূরে অধৈর্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, অধীর আগ্রহে

ভাবছিলেন—রাত্রি তাঁর জন্ত কি নিয়ে আসবে। রাজা চুপ করে বসেছিলেন। তিনি নাচের দলের দিকে চেয়ে হাসলেন। ইড়া কাটুট রাজার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার চিন্তাধারা বুঝবার জন্ত। আনক আংবিমা হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'প্রভুর যেন এই ছোট নাচওয়ালীকে বেশ ভাল লেগেছে।' প্রভু আসর থেকে শূন্য দৃষ্টি তুলে দাঁড়ালেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, রাত্রির শীতল বাতাস তাকে স্নিগ্ধ করে দিলে। তালগাছের পাতা থেকে শিশির টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগল। অলিত বললেন, 'সে এখনও বালিকা, তবে এক দিন নিশ্চয়ই সে সুন্দরী রমণীতে পরিণত হবে।'*

* Vicki Baum এর "A Tale from Bali" থেকে।

বাংলার কবীর লালন ফকির

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

জাতি-ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্য-যুগের ভারতীয় সমাজে মহাত্মা কবীরের আবির্ভাব একটা নব-যুগের সূচনা করিয়াছিল। কলহরত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কবীর একটা মধুর মিলনের সূত্র সংযোগ করিয়াছিলেন। কত মিথ্যা যে পাণ্ডিত্যের আর আলিমদের অহমিকা, কবীরের মরমী সাধনা যাহা প্রমাণ করিয়াছিল, তাহা কবীরের কুসংস্কার-মুক্ত সাধনা-রীতি হিন্দু-মুসলমানের আত্ম-চেতনা জাগ্রত করিয়াছিল—তাহাদের মিথ্যা কলহ হইতে বিরতির পথে টানিয়া আনিয়াছিল। রামে-রহিমে, কাশী-কাবায় যে পার্থক্য নাই, তাহা বহু ভক্ত হিন্দু ও মুসলমান সাধক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে কাশীতে কবীর যে মোহন পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এক শত বৎসর আগে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতেও লালনের সাধনায় সেই পরিবেশের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী বিরাহিমপুর পরগণার অন্তর্গত ছেউড়িয়া গ্রামে কালীগঙ্গার তীরে লালন ফকীরের আশ্রম ছিল। তিনি সেই আশ্রমে সশিষ্য ও সস্ত্রীক বাস করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণ সকল সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া লালনের মধুর ধর্মোপদেশে বিভোর হইয়া থাকিত। লালন ছিলেন কবীরের মতই বর্ণহীন। হিন্দু মুসলমান উভয়ের গোঁড়ামিকেই তিনি সমান ঘৃণা করিতেন। হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব গোঁসাই আর মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির বলিয়া পূজা করিত। কবীরের মতই তাঁহার জাতি সম্বন্ধেও সকলের সন্দেহ ছিল। তিনি নিজেও সে কথা কখনও প্রকাশ করেন নাই। জাতি সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই তিনি গাহিতেন—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালায় কেউ তসবী গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে?
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী কিসে রে?
জগৎ বেড়ে জাতের কথা,
লোকে গৌরব যথা তথা,
লালন সে জাতের কাঁথা
ঘুচিয়েছে সাধ বাজারে।"

এই গানটির সঙ্গে কবীরের একটি দোহা স্মরণ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে—দুই কালের এই দুই সাধকের মধ্যে ভাবের কত মিল ছিল:

"মাইকে গলেমে সুত নেহি পুত কহাবে পাঁড়ে।
কতেমা বিবিকা সুন্নত নেহি, কাজী বামন দুনো ভাঁড়ে।"

কবীরের সাধনা ও বাণীর সঙ্গেও যে লালন ফকিরের পরিচয় সামান্ত ছিল না তাহা তাঁহার কোন কোন দোহা হইতে প্রতীয়মান হয়—যথা:

"শুদ্ধ ভক্ত মাতোয়ারা
ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
সেই ধরেছে ব্রজের কালা,
শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বলে।"

শুধু যে বাচন-ভঙ্গীতে কবীরের সঙ্গে লালনের মিল তাহা নহে। সাধনা-পদ্ধতিতেও দুই জনের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কান্তাভাবে সাধনাই কবীরের সাধনার বৈশিষ্ট্য। এক ভগবান পুরুষ আর সমগ্র বিশ্বসংসার প্রকৃতি। ভক্তহৃদয়ের ইহাই মধুরতম অনুভূতি। মাধুর্যের উপাসক মহাত্মা কবীর অবিরাম সেই কান্তাভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, আর গাহিতেন:

'করো যতন সখী সাঁইয়া মিলন কী।'

লালনের জীবনেও সেই কান্তাভাবে সাধনার প্রয়াস পরিস্ফুট। তিনি পরম-পুরুষকে স্বামী হিসাবে পাইতে চান, কিন্তু সর্বদাই নিজের অযোগ্যতায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন।—

"আমি চরণদাসীর যোগ্য নয়,
নইলে আমার দশা কি এমন হয়?
ভাব জানিনে প্রেম জানিনে
দাসী হতে চাই চরণে
ভাব দিয়ে ভাব নিলে মনে
সেই যেন রাঙ্গা চরণ পায়।"

বৈষ্ণবের মত কান্তাভাবে সাধনার রস লালন ফকির আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীভাবে ভজন যে সামান্য ব্যাপার নহে আর সকলে যে তাহার অধিকারীও নয়, তাহা তিনি গানে প্রকাশ করিয়াছেন:

"যে ভাব গোপীর ভাবনা
সামান্য মনের কাজ নয় সে ভাবও জানা।
বৈরাগ্যভাব বেদের বিধি
গোপিকা-ভাব অকৈতব নিধি।
ডুবল তাতে নিরবধি রসিকজনা।"

লালনের রসিক অন্তঃকরণ নিরন্তর গোপীকাভাবে বিভোর হইয়া থাকিত।

লালনের জীবনে আত্ম-জ্ঞানের সাধনা যে কত গভীর-ভাবে চলিয়াছিল তাঁহার গানে তাহারও পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেহ-খাঁচার মধ্যে আত্মা-রূপী পাখীকে তিনি চিনিতে পারেন না, সেইজন্য তাঁহার কত আক্ষেপ। তাহাকে ধরিতে পারিলে, পায়ে মনোবেড়ি দিয়া রাখিতেন।—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম তার পায়।"

তারপর—

"কি এক অচিন পাখী পুষিলাম খাঁচায়,
না হ'ল জনম ভরে তার পরিচয়।"

আরও—

"কে কথা কয়রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনমভোর মিলে না।
খুঁজি হারে আসমান জমি,
আমারে চিনিনে আমি,
এও বিষম ভুলে ভ্রমি।"

এই আত্ম-জ্ঞানের জন্য পাগল লালন ফকিরের ভাবটা কবীরও অনুভব করিয়াছিলেন। তিনিও তাই গাহিয়াছেন:

"আতম জ্ঞান বিনা নর ভটকে কোই মথুরা কোই কাশী।
জৈসে মৃগা নাভি কস্তুরী, বন বন ফিরত উদাসী।"

বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছিল, তাহা বিদূরিত করিবার প্রয়াস লালন সারা জীবনই করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমে হিন্দু মুসলমান শিষ্যগণ সকল জাতিভেদ ভুলিয়া মিলিত হইত। তিনি তাঁহার শিষ্যদের সর্বদা উপদেশ দিতেন—মিথ্যা জাতির মোহ, গর্ব, অহমিকা ভুলিয়া নশ্বর দেহের কথা ভাবিতে আর কাল-ক্ষেপ না করিয়া আসল কাজে লাগিয়া যাইতে:

"চাঁদ-বদনে বল গো সাঁই
বান্দার এক দমের ভরসা নাই।
কে হিন্দু কে যবনের চেলা,
পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা।"

ভক্তিই হইল মুক্তি-পথের পাথেয়। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক একমাত্র ভক্তি পাথেয় তাহার চাই-ই। লালন তাই তাঁহার হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের বুঝাইলেন:

"ভক্তিহীন হইলে গো তারে ভজন হবে না,
কর গুরুর চরণ ভজন সাধন,
তার বিনা কুল পাবে না।"

ভগবান চাহেন শুধু ভক্তি। তিনি ত হিন্দু-মুসলমানের বিচার করেন না।—

"ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছে সাঁই।
হিন্দু কি যবন ভাল কোন জাতের বিচার নাই।"

লালন কলহরত হিন্দু-মুসলমানদের কাছে এই পরম সত্যটি বার বার তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার যুগে হিন্দু ও মুসলমান যে মিথ্যা কলহ ভুলিয়া ভাব ও ভক্তির ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

ভক্ত সাধকজীবনে কোন সম্প্রদায়কেও স্বীকার করেন নাই; মরণেও সকল সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ১১৬ বৎসর বয়সে লালন যখন ছেউড়িয়ার আখড়ায় দেহত্যাগ করেন তখন কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক প্রণালীতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহারই উপদেশানুসারে বাউল সম্প্রদায় লইয়া শুধু হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল।

স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদীরা মিথ্যা সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে লালনের সাধনাকে ব্যর্থ করিয়াছে, বাংলার হিন্দু-মুসলমান-দের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চরম দুর্দিন ডাকিয়া আনিয়াছে। লালনের দেশের মানুষ আবার তাঁহার মধুর উপদেশে কর্ণপাত করিবে কি—আবার মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইবে কি?

গোলকুণ্ডা দুর্গ
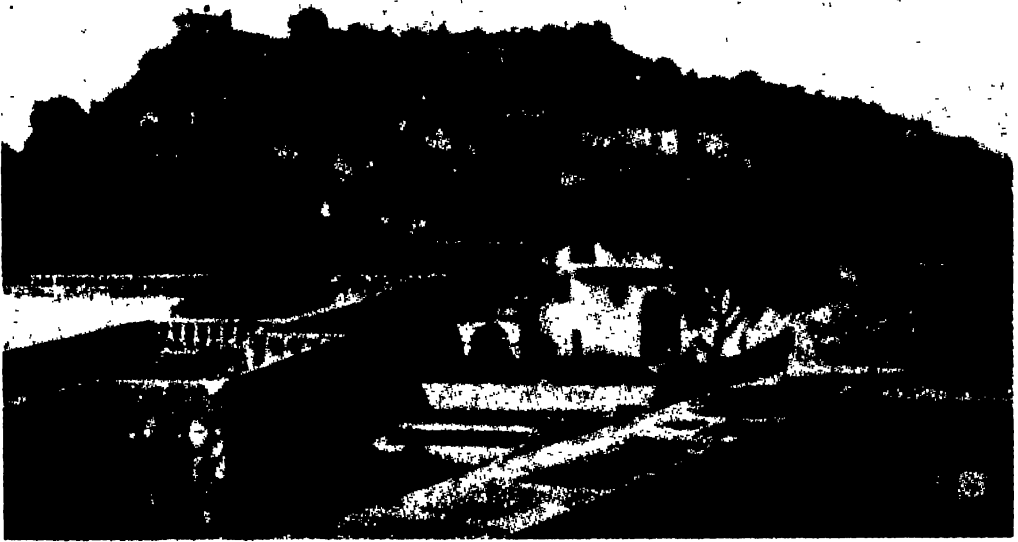
দক্ষিণ-ভারতের পথে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আবার ডাক এল গোদাবরীর ওপার থেকে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কল্যূরের বন্ধুরা পত্রযোগে জানালেন, কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদে যাতে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার উদ্যোগে এক নিখিল ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা যায় তারই তোড়জোড় সুরু হয়েছে পুরোদমে। অনুষ্ঠান সুরু হবে ১৪ই তারিখে আর তার পরিসমাপ্তি হবে ১৬ই জানুয়ারী। দিনকতক পরে পেলাম বন্ধু শ্রীমহেশ্বর শর্ম্মার চিঠি। জানিয়েছেন—১৪ তারিখের মধ্যে আমার হায়দরাবাদে পৌঁছনো চাই-ই। ষ্টেশনে নেমে আমি যেন সরাসরি চলে যাই নানাল নগর কংগ্রেস-মণ্ডপে। সেখানে অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস-প্রতিনিধি-শিবিরে খোঁজ নিলেই শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সম্মেলন সম্বন্ধে সকল কথা জানতে পারা যাবে।

শর্ম্মাজীর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হায়দরাবাদ যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হলাম। গেল বারে পুণ্যসলিলা গোদাবরী-তীরে দেখে এসেছি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিমিশ্র রূপ, এবার যাওয়া হবে মুসলমান আমলের দক্ষিণ-ভারতের প্রাণকেন্দ্র হায়দরাবাদে, ইসলামিক সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে হবে প্রত্যক্ষ পরিচয়—একথা ভাবতেও যেন মনে খুশির আমেজ লাগল।

হাতের কাজকর্ম্ম সব গুছিয়ে ফেলে হায়দরাবাদ যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হলাম, সৌভাগ্যক্রমে এই সময় কবি-বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক দিন এলেন আমাদের আপিসে। তাঁর নিকট থেকে যোগাড় হ'ল তাঁর হায়দরাবাদ-প্রবাসী আত্মীয় শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট লেখা একখানি পরিচয়-পত্র।

নানা হাঙ্গামায় রওনা হতে দেরি হয়ে গেল। ১৪ই তারিখ বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ হাওড়া ষ্টেশনে হাজির হয়ে হায়দরাবাদের টিকিট কেটে ট্রেনে আরোহণ করলাম। চারটা চল্লিশ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে দিলে। বাঁশঝাড়, কলাবন, এঁদো পুকুর, তরুছায়া-প্রচ্ছন্ন পল্লী, শীতের শস্যহীন শূন্য মাঠ পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলল প্রচণ্ড বেগে। কোলাঘাটের সেতু পেরিয়ে ট্রেন যখন এসে থামল মাচাদা ষ্টেশনে, শীতের সংক্ষিপ্ত বেলাটুকু শেষ হয়ে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ তখন তারায় তারায় ভরে উঠেছে।

পরদিন ভোরে ট্রেন এসে পৌঁছল ইছাপুর ষ্টেশনে। উড়িষ্যার সীমানা অতিক্রম করা গেছে, এবার সুরু হ'ল অন্ধ্রদেশের পার্ব্বত্যভূমি। সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করি নি। শেষ-রাত্রি থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঠায় বসে আছি নূতন দেশে অভিনব পরিবেশে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য দেখব বলে। ভোরের আলোর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টির সামনে উদঘাটিত হ'ল ভূপ্রকৃতির এক অভিনব রূপবৈচিত্র্য। পশ্চিম দিকে আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে নীল পাহাড়ের আদরা। পূবদিকে দিগন্তপ্রসারিত বন্ধুর প্রান্তরের

একাংশ জলমগ্ন। চক্রবালসীমায় আকাশের গাত্রসংলগ্ন মেঘমালাকে যেন নীলাভ পাহাড় বলে ভ্রম হচ্ছে। হঠাৎ দেখি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—এই মেঘের পাহাড়ের স্থানে স্থানে ফাটল ধরে গেছে আর কে যেন নীল পটের উপর নিপুণ তুলিকায় এঁকে চলেছে রক্তলিপন। দেখতে দেখতে মেঘচূড়ায় আরোহণ করে পূর্ব্বাকাশে আবির্ভূত হলেন সত্যের মত স্বয়ম্প্রকাশ সূর্য্যদেব—প্রান্তরের প্রান্তলীন জলধারার বুকে প্রতিফলিত হ'ল তাঁর আরক্ত মহিমার রশ্মিচ্ছটা।

খেজুরগাছ আর তালীবন সমাকীর্ণ অন্ধ্রদেশের এক্রেন্দী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ-ভারতের পথে। চিপুরুপল্লী ষ্টেশনের পর থেকেই দেখি মাটির রং আবিরের মত রাঙা। কৃষক-বনিতারা ক্ষেত্রকর্ম্মে রত, পরনে তাদের টকটকে লাল রঙের সাড়ী। মাঠের বুকে মাঝে মাঝে কাঠির মত সরু সরু এক জাতীয় অনুচ্চ গুল্মদ্রুমের ছোট ছোট ক্ষেত। রং তাদের ডগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত ফিকে লাল। নবোদিত সূর্য্য কি তার অজস্র বর্ণ-বৈভব নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে এই পার্ব্বত্য জনপদের পথে-প্রান্তরে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ ট্রেন এসে থামল কব্বুর ষ্টেশনে। তার পর আবার চলতে লাগল দুর্ব্বার বেগে। কব্বুরে ইতিপূর্ব্বে এসেছি, কিন্তু এর দক্ষিণে আর এগোই নি। এতক্ষণ পরিচিত রাস্তার উভয় পার্শ্বের দৃশ্য সৌন্দর্য্যে মন আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে ছিল না নূতনত্বের মোহ—অচিন্ দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পুলকানুভূতি।

আধুনিক পরিকল্পনায় নির্ম্মিত শ্রমিকদের বাসগৃহ

পাহাড়ের রাজ্য পেছনে ফেলে এবার চলেছি গোদাবরী-উপত্যকার ভেতর দিয়ে—রেলপথের দু'ধারে সুদূরপ্রসারিত সমতল প্রান্তর। মাঠের বুকে এখানে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি পল্লী। তাল-পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরগুলি ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে কয়েক সারিতে অবস্থিত। অধিকাংশ কুটীরেরই চাল উপরের দিকে ক্রমসূক্ষ্মায়মাণ—মন্দির-চূড়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট। কোন কোন দোচালা ঘরের চালের উভয় প্রান্ত প্রায় মাটি পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। দু'তিন হাত উঁচু বাঁশ ও মাটির বেড়ায় সাদা এবং লাল রঙের প্রলেপ।

গাঁয়ের পাশে জলার ধারে অজস্র ফুটে রয়েছে কলমি ফুলের মত বেগুনি রঙের ফুল। মাঝে মাঝে মাইলের পর মাইল জুড়ে সুবিস্তীর্ণ

আসফিয়া ষ্টেট লাইব্রেরী, হায়দরাবাদ
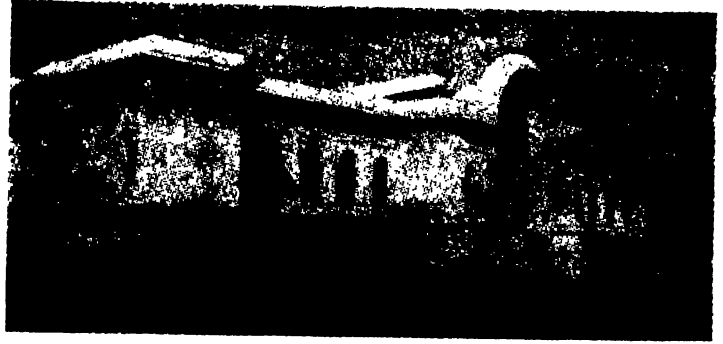
তামাক আর লঙ্কাক্ষেত। লঙ্কাক্ষেতে ঘনসবুজ পাতার আড়ালে নজরে পড়ছে আগুনের শিখার মত রাশি রাশি পাকা লঙ্কা।

সূর্য্য কখন অস্ত গেছে টের পাই নি। নির্জ্জন উপত্যকা-ভূমিতে রাত্রি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে বিছিয়ে দিলে তার কৃষ্ণা-বগুণ্ঠন। জনহীন প্রান্তরের বুকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যাতীত তালগাছ। রাত্রির রহস্যময় পরিবেশে তাদের জীবন্ত সত্তা বলে মনে হচ্ছে—তারা যেন উপত্যকাভূমির অতন্দ্র রক্ষীদল।

রাত ন'টা নাগাদ ট্রেন এসে পৌঁছল বেজওয়াদা জংশনে। এখানে গাড়ী বদল করে চাপতে হবে ওয়াদি প্যাসেঞ্জারে। ষ্টেশনে নেমে ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিলাম। এক মাদ্রাজী হোটেলে রসম সম্বর প্রভৃতি সংযোগে অন্ন আহার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল।

মাঝ রাতে ওয়াদি প্যাসেঞ্জার ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। এক পেয়ালা কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে ট্রেনের একটা কামরায় উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, দলে দলে মেয়ে-পুরুষ প্ল্যাটফর্ম্ম পার হয়ে গাড়ীতে উঠছে—সুবেশা, সালঙ্কারা সম্ভ্রান্তিপন্ন পরিবারের মহিলার সংখ্যাও কম নয়। পরনে তাদের বিচিত্র বর্ণের সাড়ী, সকলেরই মস্তক অনবগুণ্ঠিত, পিঠের উপর দোলানো দীর্ঘ বেণী—প্রকাণ্ড এক একটা সুটকেস কাঁধে নিয়ে তাঁরা চলেছেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে। পুরুষেরা মুক্তহস্ত বটে, মেয়েরা কিন্তু অনেকেই মুক্তকচ্ছ নন্। এই সমস্ত সুটকেস-বাহিকারা বঙ্গললনাদের মত অ-বলা নন্, সুতরাং অবলীলাক্রমে ভারী জিনিষ বহন করা এঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য
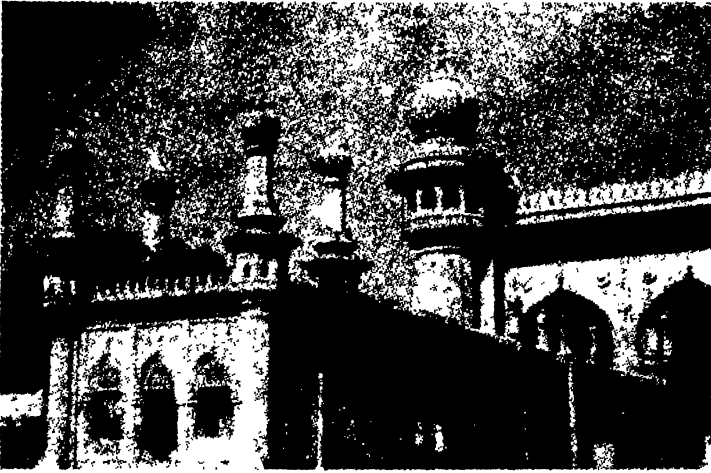
মক্কা মসজিদ

নয় মোটেই। "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" কথাটা মনে হ'ল, এ অঞ্চলের পুরুষদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে। ঘুমে চোখ দুটি জড়িয়ে আসছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে ওয়াঙ্গাপল্লী বলে একটা ষ্টেশনের নিকটে। অদূরে বৃক্ষলতাবর্জ্জিত একটি কৃষ্ণশৈলের গায়ে কংক্রীটের তৈরি ধবধবে শাদা রঙের শ্রেণীবদ্ধ পাকা বাড়ীগুলি যেন কালো মেঘের কোলে বলাকা-পংক্তির মত শোভা পাচ্ছে। এ অঞ্চলে দেখছি দক্ষিণ-ভারতের ভূ-প্রকৃতির একটা নূতন রূপ। দু'ধারে পাথুরে পাহাড়—প্রকৃতি এখানে নগ্না নিরাভরণা শ্যামলশ্রীবর্জ্জিতা।

সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন ছাড়াবার পর চোখে পড়ল—অদূরে সুবিস্তীর্ণ জলরাশি রৌদ্রকিরণে রূপার পাতের মত ঝক ঝক করছে। এই সেই বিখ্যাত হ্রদ হোসেন সাগর যার পরিধি এগার মাইলেরও অধিক। এই হ্রদের বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়ে দেন ইব্রাহিম কুলী কুতুব শাহ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বেলা দশটা নাগাদ ট্রেন এসে পৌঁছল হায়দরাবাদ ষ্টেশনে। কামরা থেকে নেমে কংগ্রেসের এক স্বেচ্ছাসেবকের হাতে আত্মসমর্পণ করলাম। ফলে, নূতন জায়গায় এসে মুশকিলে পড়তে হ'ল না। টিকিট কেটে নানাল নগরগামী বাসে আরোহণ করলাম। বাস চলল কংক্রীটের তৈরি তকতকে ঝকঝকে সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত সাদা রঙের বিরাট সৌধমালা তাদের বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে আর ইসলামিক স্থাপত্য-রীতির ছাপযুক্ত গঠনকৌশলের-বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল বিশেষ ভাবে। সুবিশাল মনোহর বর্ত্মসমন্বিত, সুপরিকল্পিত শহরটির সর্ব্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন বিগত দিনের বিপুল বৈভবের জলুস। এখানকার রাজপথের ন্যায় বিশাল এবং সুন্দর রাজপথ ভারতবর্ষের আর কোথাও নাকি নেই—প্রাসাদমালায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

ছয়-সাত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে মোটর থামল। সেখান থেকে আন্দাজ আধ মাইলটাক হেঁটে এসে পৌঁছলাম কংগ্রেসের ডেলিগেট ক্যাম্পে। এখানে আগে ছিল মিলিটারি ব্যারাক। পাশাপাশি অনেকগুলি পাকা ঘর অবস্থিত। তারই এক একটিতে এক এক প্রদেশের কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে—বাইরে দেয়ালে টাঙানো বিভিন্ন প্রদেশের নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড। অনগ্র কংগ্রেস শিবির বের করতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। যথাসময়ে না আসার জন্যে শর্ম্মাজী কিরূপ অনুযোগ দেবেন তাই ভাবতে ভাবতে অনগ্র ডেলিগেট ক্যাম্পের আপিস-কক্ষে ঢুকলাম। কিন্তু কোথায় মণ্ডেশ্বর আর সর্ব্বেশ্বর, ভেতরে সব অপরিচিত লোকের ভিড়—একটিও চেনা মুখ নজরে পড়ল না। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসে এক তাড়া কাগজপত্র দেখছিলেন, তাঁকে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কথা জিজ্ঞেস করলে বললেন—"সে তো শুনেছি শহরের ভেতরে কোথায় হচ্ছে, কিন্তু আপনাকে তার কোন হদিস তো দিতে পারছি না। আপনি বরং এনকোয়ারি আপিসে গিয়ে খোঁজ করুন।"

এরই নাম গ্রহের ফের। ট্রেনের এই ধকলের পর কোথায় ভেবেছিলাম ধুলো ধোঁয়া আর কয়লার গুঁড়োয় মলিন বেশভূষা ছেড়ে ভদ্রস্থ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করব, না মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র মাথায় করে বেরুতে হবে এনকোয়ারি আপিসের উদ্দেশে। কিন্তু বেলা প্রায় বারোটা বাজে; আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আমন্ত্রণে এখানে এসে আজকের অনুষ্ঠানেও যদি যোগ দিতে না পারি তা হলে অধর্ম্ম হবে—যে উদ্দেশ্যে আসা তাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারখানা কি? সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ সভার স্থান পরিবর্ত্তন করলেন অথচ আমাকে জানালেন না কেন? বুঝলাম, আমার জীবনে বরাবর যা ঘটে থাকে, এবারও হয়েছে তাই—অর্থাৎ বিদেশ বিভুঁইয়ে সুরু হয়ে গেছে ভাগ্যবিধাতার কৌতুক-লীলা।

অবস্থাটা কল্পনা করুন। তিন দিন অস্নাত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সংস্কৃতি সম্মেলনে সমাদরে আমন্ত্রিত অতিথি আমি নিতান্ত অসংস্কৃত, বিপর্য্যস্ত চেহারা নিয়ে ভরা দুপুরের চনচনে রোদে রাস্তা অতিক্রম করে চলেছি নানাল নগর কংগ্রেস এনকোয়ারি আপিসের দিকে। মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা। নিজেকে যেন বড় অসহায় মনে হতে লাগল।

এনকোয়ারি আপিসে গিয়ে কোনো সুরাহা হ'ল না। কর্ত্তা-

ব্যক্তিটি আমলই দিলেন না—কংগ্রেসের ডেলিগেট ছাড়া আর কারুর আরজি শুনবার মত মেজাজ ও গরজি তাঁর নয়। কত জন্মের সুকৃতি থাকলে কংগ্রেসের ডেলিগেট হওয়া যায় তাই ভাবতে লাগলাম। এখান থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে শেষে ফিরে এলাম অন্ধ্র ডেলিগেট ক্যাম্পে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে সব খুলে বললাম। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, 'আরে একটা কথা ভুলেই গেছলাম। মনে পড়ছে, কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের মধ্যে শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার দু'একজন সভ্য আছেন। আপনি আর দেরি না করে সরাসরি চলে যান অভ্যর্থনা সমিতির আপিসে।' মরুভূমিতে যেন ওয়েসিসের সন্ধান পাওয়া গেল, আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। যথাস্থানে পৌঁছে, এক ভলান্টিয়ারের প্রমুখাৎ অবগত হলাম—চার-পাঁচ মিনিট আগে সভ্যেরা সকলে চলে গেছেন সাবজেক্ট কমিটির মিটিঙে। একে গভীর ক্লান্তি তার উপর বার বার আশাভঙ্গের দুঃখ—মনে হ'ল পথেই

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বসে পড়ি। শেষে ভাবলাম, চলে যাই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ক্যাম্পে। সেখানে অন্ততঃ দু'একজন চেনা লোকের সন্ধান তো পাওয়া যেতে পারে। ঠিকই তো—বাঙালী বাঙালীকে না রাখলে কে রাখবে। সেখানে পৌঁছে দেখি ক্যাম্প একদম খালি, সবাই চলে গেছেন বাইরে। কেবল দু'জন যুবক বারান্দায় চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। ভাবলাম, ভিড় নেই, এখানে একটু জিরিয়ে নিলে মন্দ হয় না। যুবকদ্বয়ের কাছে সকল কথা খুলে বলে, আমাকে ঘণ্টাখানেক এখানে বিশ্রাম করতে দেবার অনুরোধ জানালাম। কিন্তু ভাল গলল না, এক জন তো বই থেকে মুখই তুললেন না। অপর জন উন্নাসিকতা প্রকাশ করে বললেন—"না তা হবে না, এখানে কংগ্রেস ডেলিগেট ছাড়া আর কারুর ঢোকবার হুকুম নেই।"—বুঝলাম যে সকল ভাগ্যবান কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাঁরা ছাড়া আর সবাই এই দ্বারপণ্ডিতদ্বয়ের নিকট হরিজনের সামিল। 'সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া' আবার এলাম অন্ধ্র ক্যাম্পে। ইচ্ছা হ'ল সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বলি,

"ভুবন ভ্রমিয়া শেষে এসেছি তোমারি দেশে,
আমি (বিদেশিনী নই) বিদেশী গো।"

আমার অবস্থা দেখে ভদ্রলোকের দয়া হ'ল। বললেন—"বেলা ৪টা বাজে, আর এই ওয়াইল্ড গুজ চেজিং করে লাভ কি। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন। চান করে চাঙ্গা হয়ে নিন।"

নিকটবর্তী একটা কলে স্নান সমাপন করে এসে দেখি টেবিলের উপর কফি এবং অন্যান্য আহার্য প্রস্তুত। সেগুলো যেন অমৃতাস্বাদনবৎ লাগল।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করবার পর মেজাজটা বেশ শরীফ হ'ল। ভদ্রলোককে রাত্রে আমার এখানে থাকবার ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়ে নবনির্মিত নানাল নগরের পথে বেরিয়ে পড়লাম।—ভাবলাম

চার মিনার

এখানে এসে কলা-বেচা যখন হ'লই না, তখন রথই না হয় দেখা যাক। কিছুক্ষণ চলতে চলতে একটা নিভৃত স্থানে এসে মাটির উপরে বসে পড়লাম। চারিদিকে উচ্চাবচ অধিত্যকাভূমির অবাধ বিস্তৃতি—দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হয় না। বেলা পড়ে এসেছে। পড়ন্ত রোদের আভা পার্বত্য প্রান্তরের বুকে কেমন একটা মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। অনতিদূরে গিরিসানুদেশস্থ গোলকুণ্ডা দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের পানে তাকিয়ে মৃত অতীত যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। দক্ষিণ-ভারতের কুতুবশাহী নৃপতিদের রাজধানী ছিল গোলকুণ্ডা যার মূল তেলুগু নাম হচ্ছে গোল্লা কুণ্ডা (মেষপালকের পাহাড়)। কুতুবশাহী আমলে এই গোলকুণ্ডার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের খ্যাতি দূরদূরান্তরে প্রচারিত হয়ে বিদেশী পর্যটকদের পর্যন্ত প্রলুব্ধ করেছিল। এই গোলকুণ্ডার মাটির বুকে লুকানো ছিল হীরার খনি—এখানকারই জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর

মীর আলম হ্রদ, হায়দরাবাদ

রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাদশাহী ফৌজের হাতে টানা শাহী সৈন্যদলের হ'ল শোচনীয় পরাজয়। ১৬৮৭ খ্রীঃ ফাত-দরওয়াজা দিয়ে বিজয়ী মোগল সৈন্যদল প্রবেশ করল দুর্গাভ্যন্তরে। ভাগ্যহত টানা শাহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দী হয়ে অন্তরায়িত হলেন দৌলতাবাদে। এমনিভাবে কুতুবশাহী বংশের পতনের পর হ'ল আশফজাহী বংশের অভ্যুদয় —গোলকুণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হ'ল তাঁদের প্রভুত্ব।

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদ নগরীতে কুতুবশাহী বংশের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোলকুণ্ডার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে ধীরে ধীরে। আজ তার হীরক-ভাণ্ডার নিঃশেষিত, পূর্ব্বসমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত। শুধু গিরিশিরে দাঁড়িয়ে আছে অতীত গৌরবের মূক সাক্ষী, কামান এবং বন্দুকের গুলিতে ক্ষতবিক্ষতগাত্র ভগ্ন জীর্ণ গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গ।

দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ রাজমুকুটের শোভা বর্দ্ধন করে আসছে। গোলকুণ্ডাগামী প্রধান রাজপথের পার্শ্বস্থ কারওয়ান পল্লীতে একদা বাস করত সেই সকল সুনিপুণ রূপকার যারা খনি থেকে উত্তোলিত হীরক কেটে আর পালিশ করে তাকে দান করত অপরূপ সৌন্দর্য্য। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বিখ্যাত ফরাসী-পর্য্যটক এবং হীরক-সন্ধানী টাভার্ণিয়ের দিনকতক অবস্থান করেছিলেন এখানকারই এক প্রকাণ্ড সরাইয়ে।

একদা পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্গসমূহের অন্যতম ছিল এই গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গ। কুতুবশাহী বংশের চরম গৌরবের দিনে গোলকুণ্ডা নগরী যখন ছিল ঐশ্বর্য্যের অলকাপুরী, শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রমের লীলা-নিকেতন তখন এই গিরিদুর্গের প্রতিষ্ঠা। তার পর কালক্রমে দেখা দিল শাহীবংশের পতনের পূর্ব্বসূচনা। এই বংশের শেষ নৃপতি আবুল হাসান টানা শাহের আমলে বিলাসিতা এবং দুর্নীতির স্রোত রাজধানীর বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'ল অপ্রতিহত গতিতে। রাজা স্বয়ং দিন-রাত মগ্ন হয়ে রইলেন বিলাসব্যসনে আর ভোগসুখে। ওদিকে বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল রাজধানীর আকাশ-বাতাস। বাদশাহ আওরঙ্গজেব দেখলেন দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার এই সুবর্ণসুযোগ। তাঁর নির্দ্দেশে বাদশাহী সৈন্যদল একদা গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গের উপর চড়াও হয়ে হানলে তার পাষাণ-গাত্রে প্রচণ্ড আঘাত। গোলকুণ্ডার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সূচনা দেখে নৃপতি টানা শাহের চমক ভাঙল। বিলাসের ফাঁস সবলে ছিন্ন করে মোগল আক্রমণ প্রতিরোধপূর্ব্বক বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে বন্দী করতে তিনি হলেন বদ্ধপরিকর। কিন্তু হায়, হতভাগ্য রাজা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, কেবলমাত্র একজন ছাড়া তাঁর আর সকল সৈন্যাধ্যক্ষ এবং আমীর-ওমরাহই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গোলকুণ্ডার স্বাধীনতা রক্ষার্থে টানা শাহের বিশ্বস্ত সেনাপতি আব্দুর রজ্জাক লরি সেদিন অকুতোভয়ে এসে দাঁড়ালেন স্বজন-পরিত্যক্ত চক্রান্তজাল-বেষ্টিত নৃপতির পার্শ্বে। এই দেশপ্রেমিক পার্শ্বচরের সহ-যোগিতায় টানা শাহ সুদীর্ঘ আট মাসকাল মোগল আক্রমণ ঠেকিয়ে

নানাল নগরের মহাপ্রান্তরে বসে শুনতে পাচ্ছি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পথে মহাকালের পদধ্বনি। দূরে কংগ্রেসের অধিবেশন-ক্ষেত্র আর প্রদর্শনী-তোরণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বিচিত্র বর্ণের আলোক-ছটায়। ইতিহাসের পটপরিবর্ত্তন হ'ল। আকাশের বুকে অগ্নি-অক্ষরে লিখিত হয়েছে যেন নবযুগের নূতন ইতিহাস—যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল একদা ছিল সামন্ত রাজাদের লীলাভূমি আজ সেখানে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে গণতন্ত্রের বিজয়গীতি। যে বাঞ্জারা পাহাড়ে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কুতুবশাহী নৃপতিদের সমাধি বিদ্যমান, তারই পাদস্পর্শী প্রান্তরের বুকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হ'ল সামন্ততন্ত্রের সমাধির উপর গণতন্ত্রের জয়ধ্বজা।

নির্জ্জনতা ছেড়ে চলে এলাম জনতার হাটে—কংগ্রেস-প্রাঙ্গণে। টিকিট কেটে বাঁশের তৈরি সুন্দর ফটক দিয়ে প্রবেশ করলাম প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে। 'হায়দরাবাদ আর্ট এণ্ড কালচার' নামক ষ্টলটির আলোক-সজ্জা এবং রূপচ্ছটা মনকে আকৃষ্ট করল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই হায়দরাবাদের আদিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্র, মাছ ধরার জাল ইত্যাদির বিচিত্র সংগ্রহ দেখে নৃতত্ত্বামোদীর কৌতূহল চরিতার্থ হ'ল। প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ধাতব মূর্ত্তি থেকে সুরু করে হায়দরাবাদের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের কত যে নিদর্শন সেখানে সংগৃহীত হয়েছে তার আর অন্ত নেই।

কতকগুলো ষ্টল ঘুরে ঘুরে দেখে শেষে অন্ধ্র কংগ্রেস ক্যাম্পে ফিরে এলাম। রাত তখন সাতটা। বসে বসে আমার আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"—প্রবেশ করলেন অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার ওয়ার্কিং সেক্রেটারী বিশালবপু সদাহাস্যময় শ্রীসর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা। ঘটনার আকস্মিকতারই নাটকে নূতন সিচুয়েশন সৃষ্টি হয়। আমার হায়-দরাবাদে আসবার পর যে সকল নাটকীয় ব্যাপার ঘটছিল তা ক্লাই-

ম্যাজে গিয়ে পৌঁছল এই 'সাইকোলজিক্যাল মোমেণ্টে' শর্ম্মাজীর অপ্রত্যাশিত অভ্যাগমে।

ভাবি, আমাদের জীবনের ছোট-বড় কোনো ঘটনার উপরই আমাদের হাত নেই, খেয়ালী বিধাতার হাতে আমরা যেন খেলার পুতুল। কর্ত্তৃত্বাভিমান ছেড়ে দিয়ে, যে অদৃশ্য শক্তি আমাদের জীবনের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছেন তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলেই তো অনর্থক উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচা যায়—অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায়ই উপভোগ করা যায় অনাবিল আনন্দ।

যাই হোক, আমরা উভয়ে পরস্পরের পানে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ কারুরই বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না।

চোখে-মুখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে শর্ম্মাজী প্রশ্ন করলেন—"ভদ্রজী, ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি। আপনাকে টেলিগ্রাম করে জানানো হ'ল, শহরের ঠিকানা, আর আপনি এসে উঠলেন কি না কংগ্রেস-ক্যাম্পে।" শর্ম্মাজীকে দু'একটা প্রশ্ন করবার পর সব পরিষ্কার হ'ল। ব্যাপারখানা মজারই বটে। শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হয় যে, নানাল নগরের পরিবর্ত্তে হায়দরাবাদ শহরে এম.এল.এ.'-স কোয়ার্টার্সে সম্মেলনের অধিবেশন হবে এবং সেকথা জানিয়ে আমাকে এই মর্ম্মে তার করা হয় যেন, আমি নানাল নগরে না গিয়ে সরাসরি এম.এল.এ.'-স কোয়ার্টার্সে উঠি। শর্ম্মাজী ঠিকানা লেখেন—১২২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। এক বছর যাবৎ এই ঠিকানায়ই তিনি আমার সঙ্গে পত্রব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু প্রবাসী আপিসের নাম থাকায় চিঠিগুলো আমার হাতে পৌঁছবার পক্ষে কোনো বাধা হয় নি। কিন্তু এবারকার টেলিগ্রামে শুধু নম্বরটাই ছিল —বাহুল্য-বোধে প্রবাসী আপিসের নামটা আর লেখেন নি।

দুঃখপ্রকাশ করে শর্ম্মাজী বললেন—যা হবার তা তো হ'ল। এবার চলুন আমার সঙ্গে—সভা আরম্ভ হবে আটটার সময়। সভার একটা কাজেই আমি এখানে এসেছিলাম। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই সভাই এবারকার সম্মেলনের শেষ অনুষ্ঠান।

আশ্বস্ত হলাম—তবু গুঁড়া কিছু আছে শেষে।

দু'জনে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে আরোহণ করলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলাম এম.এল.এ.-'স কোয়ার্টার্সে সভাস্থলে। শর্ম্মাজীর প্রতীক্ষায় সভা তখনও আরম্ভ হয় নি, তিনি কি ভাবে আমাকে আবিষ্কার করেছেন তা বেশ রসিয়ে বললেন। তার পর সভার কাজ সুরু হ'ল। নির্ব্বাচিত সভাপতি বি.এল. আত্রেয় আসতে পারেন নি অনিবার্য্য কারণে, সভাপতিত্বের ভার পড়েছে হায়দরাবাদ বিধানপরিষদের সদস্য এম. এস. রাজলিঙ্গমের উপর। ইনি ওয়ারাঙ্গলের লোক, জাতিতে তেলুগু। সমাজ-উন্নয়ন, কুটিরশিল্পের প্রসার ইত্যাদি গঠনমূলক কর্ম্মের উপর বরাবর এঁর গভীর অনুরাগ। কিছুকাল ইনি সেবাগ্রাম আশ্রমের ডেয়ারি কার্য্যের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। শ্রীরাজলিঙ্গমের উদ্যোগে অন্ধ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র এবং কুটিরশিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশসেবার অপরাধে বারকয়েক এঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে—শ্রমিকদের উন্নয়ন এঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

নবাব সার সালার জঙ্গ (১)

সভায় অনেকে বক্তৃতা করেন। অধিকাংশ বক্তৃতা হয় ইংরেজীতে, কেউ কেউ তেলুগু ভাষায়ও বলেন। আমি ইংরেজীতে 'Cultural Heritage of India' (ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) এই বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করি।

সভাপতির বক্তৃতা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। তিনি বলেন—"শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শের মধ্যে মৌলিকত্ব আছে। শর্ম্মাজীর পুস্তকসমূহে শঙ্কর-দর্শন, মার্ক্সবাদ এবং গান্ধীবাদের যে তুলনামূলক সমালোচনা আছে তা অভিনব। কিন্তু নিছক ভাববিলাস বা থিয়োরির প্রতিষ্ঠা শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ নয়। ভাবাদর্শকে কর্ম্মে রূপায়িত করবার প্রেরণাই এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের বহুসংখ্যক শ্রমিক এবং আদিবাসী কল্যাণকেন্দ্র স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং কর্ম্মসাধনার মধ্যে পাচ্ছেন নিপীড়িত শ্রমিকের মুক্তিপথের সন্ধান।"

সভা ভঙ্গ হ'ল রাত প্রায় দশটায়। আমার থাকবার জায়গা হ'ল

শ্রীরাজলিঙ্গমের আস্তানায়, আহারের ব্যবস্থা হ'ল তাঁর অন্তঃপুরে। অন্নাদি পরিবেশন করলেন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের পত্নী।

নবাব সার সালার জঙ্গ (৩)

তাঁর সপ্রতিভ ভাব এবং সহজ সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার মনকে মুগ্ধ করল। আহার্য্যের মধ্যে ছিল কিছু ভাজাভুজি—সেগুলি বেশ লাগল। আলু বেটে দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ডের মত তৈরি করা হয়েছিল। তাও মন্দ লাগল না। আহার্য্যের প্রাচুর্য্যে পেট ত ভরলই, আদরে আপ্যায়নে প্রীতির স্পর্শে মনও উঠল ভরে—বিদেশে-বিভূঁইয়ে অনাত্মীয়ের কাছে এই যে প্রীতিলাভ এর মূল্য ত কম নয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম। পরদিন গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনীর নিকট বিদায় নিয়ে হায়দরাবাদের রাজপথে বেরিয়ে পড়লাম। শর্ম্মাজী সেদিনই চলে যাবেন কর্ণুরে। আমার দিন-কতক হায়দরাবাদে থাকবার ইচ্ছা। শর্ম্মাজী আমাকে পৌঁছে দিলেন সুলতান বাজারে ন্যাশনাল ড্রাগ কন্‌সারন্ নামক ওষুধের দোকানে—সেখানে বসেছিলেন একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। তাঁকে ধীরেনবাবুর পত্রখানা দিলাম। তিনি স্মিতহাস্যে আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কথার মধ্যে বেজে উঠল আন্তরিকতার সুর। ইনিই সুধীরবাবু। এঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছে এমন সময় আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। সুধীরবাবু বললেন—আমার দাদা।

নমস্কার করবার পর প্রত্যভিবাদন জানিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। ভদ্রলোক যে অত্যন্ত সদালাপী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন তা বুঝতে দেরি হ'ল না। কথায় কথায় জানতে পারলাম সুধীরবাবুর দাদা প্রমোদবাবু হায়দরাবাদের আদি প্রবাসী বাঙালীদের অন্যতম। আজ থেকে আটাশ বৎসর আগে যাঁদের উদ্যোগে হায়দরাবাদ বাঙালী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি তাঁদের একজন।

সুধীরবাবুদের আস্তানারই আমার থাকবার জায়গা হ'ল। ফার্মেসীটি শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। এখানে বসে হায়দরাবাদের চলমান জীবনের রূপটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। সদর রাস্তার উপর দিয়ে লোকজন এবং যানবাহন চলাচলের আর বিরাম নেই। জনসংখ্যার দিক দিয়ে হায়দরাবাদ নগরী ভারতের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে।

সেদিনই সুধীরবাবুর চেষ্টায় জুটল কংগ্রেসের কমপ্লিমেণ্টারি পাশ। বেলা চারটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম কংগ্রেস প্রাঙ্গণে। অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত রইলাম। শুধু একটা কথাই মনে হতে লাগল—পণ্ডিত নেহরু যে নব মহাভারত রচনা করছেন তাতে বাঙালীর স্থান কোথায়?

সুধীরবাবু কর্ম্মিতকর্ম্মা কাজের লোক। তাঁর চেষ্টায় হায়দরা-বাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার বিশেষ সুবিধা হ'ল। এখানে চার মিনার, চার কামান, মক্কা মসজিদ, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি কত যে দেখবার জিনিষ আছে তার আর অন্ত নেই।

সার সালার জঙ্গ মিউজিয়াম দেখবার আগ্রহ ছিল আমার সব চেয়ে বেশী। শুনেছিলাম সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের এরূপ ব্যক্তিগত সংগ্রহ আর কারুর নেই। মন্ত্রী প্রথম সালার জঙ্গের পৌত্র তৃতীয় সালার জঙ্গের নামে তাঁরই বাসভবনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁরা দু'জনেই আজ ইহজগতে নেই। কিন্তু হায়দরাবাদের ইতিহাসে এই দুই সালার জঙ্গ দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মধ্যযুগীয় কুশাসনের হাত থেকে হায়দরাবাদকে উদ্ধার করে প্রথম সালার জঙ্গ এখানে যে যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছিলেন তা তাঁর অপরিসীম মানবহিতৈষণা, দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর পৌত্র তৃতীয় সালার জঙ্গ ছিলেন সৌন্দর্য্যানুরাগী, কলারসিক। হায়দরাবাদের মুসী নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী আফজলগঞ্জস্থ তাঁর ভবনে প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়মটিতে ভাস্কর্য্য চারু এবং কারুশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন সযত্নে সংরক্ষিত, তা শুধু তাঁর শিল্পানুরাগ নয়—দরাজ মনেরও পরিচায়ক।

কলারসিক বাঙালী হায়দরাবাদে বেড়াতে গেলে সালার জঙ্গ মিউ-জিয়ম দেখে আসতে ভুলবেন না। সেখানে দেখতে পাবেন দেশ-বিদেশের বিচিত্র শিল্পকলা-সংগ্রহের মধ্যে স্থান পেয়েছে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং মনীষী দের আঁকা ছবি। সুদূর প্রবাসে জগতের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রের এই সংগ্রহশালায় বাংলার শিল্পীশ্রেষ্ঠদের প্রতিভার দানকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখলে বাঙালী মাত্রেরই মনে জাগবে জাতীয় গৌরববোধ—অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে বিমল আত্মপ্রসাদে।

ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজে একদিন

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

বহু দিন হইতে বাংলায় কার্পাস-চাষ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছি। গত বৎসর, ১৯৫১-৫২ সনে সরকারী পরিকল্পনা-মুযায়ী ঝাড়গ্রাম কৃষি-কলেজে যে কার্পাস-চাষ হয় তাহাতে বেশ ভাল ফলন হইয়াছে জানিয়া, অসময়ে হইলেও (১৯৫২, নবেম্বর মাসে) ইহা দেখিতে যাই। কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর পি. কে. সেন মহোদয় পৌঁছিবার দিন ও তাহার পরের দিন সকালে অনুগ্রহ করিয়া কলেজ এবং কলেজ-সংশ্লিষ্ট জমি দেখান এবং তাঁহার বাড়ীতেই রাত্রের জন্ম থাকিবার ব্যবস্থা করেন।

কলেজটি ঝাড়গ্রাম রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দুরে অবস্থিত। এখানকার রাজাবাহাদুর প্রায় ৪৫০ বিঘা জমি ও নগদ এক লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ায় ১৯৪৯ সনে এই কলেজের সূচনা হয়। ঝাড়গ্রাম শহরের মধ্যে ৫১ বিঘা জমিতে কলেজ, বোর্ডিং ও তৎসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র করা হইয়াছে। এখানে অন্যান্য কলেজের মত আই-এ, আই-এসসি পড়িবার ব্যবস্থা থাকিলেও, কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে আই-এসসি এগ্রিকালচারে ২০০ জন এবং বি-এসসি এগ্রিকালচারে ৯৬ জন ছাত্র এখানে শিক্ষা পাইতেছে। কলেজ এবং বোর্ডিঙের কাজ এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হইলেও ছাত্রদের বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়িবার কোন অসুবিধা হয় না। বহু ছাত্র শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া এখানে অধ্যয়ন করে। কলেজ-সংলগ্ন বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বর্ষাতি ও রবিশস্য, শাক-সবজী, ফল-মূলাদির চাষ হইয়া থাকে। হাঁস, মুরগী, গো-পালন প্রভৃতিও হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের আগাছা, আবর্জ্জনা এবং জীব-জন্তুর মলমূত্রাদি স্তূপাকারে একত্রিত করিয়া কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। এখানে কলেজ-সংলগ্ন বিস্তৃত শালবন হইতে প্রচুর শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করিয়া "পচাপাতা" সার প্রস্তুতের সুবিধা আছে। বোর্ডিঙের মলমূত্রাদি ও ব্যবহৃত জল কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সহজে স্থানান্তরিত করা যায় এ প্রকার কাঠের কি লোহার পাতলা ফ্রেমে পায়খানার ব্যবস্থা করা যায়। ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে গর্ত্ত করিয়া প্রতি সপ্তাহে কিংবা কিছু দিন পর পর ঐ গর্ত্তের উপর সরাইয়া রাখিলে, ময়লার অপচয় নিবারণ সহজ হয়। বোর্ডিঙের পায়খানার ময়লাও অনুরূপ ভাবে গর্ত্তে ফেলিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখা যায়। স্বাস্থ্যনীতি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া এ সকল বন্দোবস্ত করা আবশ্যক এবং ময়লা ও আবর্জ্জনা যাহাতে কৃষিকার্য্যে লাগানো যায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন রকমের কার্পাস, বিশেষতঃ পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সী আয়ল্যাণ্ড' কার্পাসের চাষও পরীক্ষণ হিসাবে চার-পাঁচ কাঠা জমির মধ্যে হইতেছে দেখিলাম। ছাত্রদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ পরিশ্রমে ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত পৃথক পৃথক জমির ব্যবস্থা আছে। এখানে নানাবিধ ফসল চাষের ব্যবস্থা থাকায় কি কি ফসল কি পরিমাণ উৎপাদন করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকার জন্য ছাত্রেরা চাষবাসকে বৃত্তিহিসাবে অবলম্বন করিতে পাবে, তাহা বুঝিবার ও শিখিবার এখানে যথেষ্ট সুবিধা আছে। কলেজ হইতে বিভিন্ন রকমের যে চাষ হয়, সে সকল কাজে ঠিকা মজুরী হিসাবে পারিতোষিক পাইয়া যাহাতে ছাত্রেরা কাজ করে সে বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করা আবশ্যক। শ্রমের মর্য্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সাধারণ মজুরদের মত এভাবে কাজ করিলে তাহাদের চাষে ও ইহার পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইবে। এ প্রকার কাজের যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষ পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিলে পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য অনেকেই এ প্রকার কাজে উৎসাহিত হইবে। এখানে ট্রাক্টর, পাম্প প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রাদি আছে এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দিবার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন। আমাদের দেশে সাধারণের জমি যেমন বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত তাহাতে এ সকল যন্ত্রাদি কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের অসুবিধা আছে। সমবায় প্রণালীতে প্রতিবেশী চাষীগণ একত্রিত হইয়া নিজেরা জমি যৌথভাবে চাষ করিলেই এ সকল যন্ত্রাদি ব্যবহারের সুবিধা হয়। এখানে যে সকল ছাত্র নিজেদের পরিশ্রমে ছোট ছোট টুকরা জমিতে চাষ করিতেছে, তাহারা একত্রিত হইয়া চাষ করিয়া নিজেদের পরিশ্রম ও জমির পরিমাণানুযায়ী ফসল বণ্টন করিয়া লইলে কর্ম্মজীবনে কিভাবে যৌথ চাষ দ্বারা ট্রাক্টর, পাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া লাভবান হইতে পারে, তাহা শিখিবার সুযোগ পাইবে। ইন্দারা হইতে গরুর সাহায্যে ৪০ হাত নীচের জল তুলিয়া এখানে ক্ষেত্রে দেওয়া হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল ধরে, এ প্রকার চৌবাচ্চা ইন্দারা-সংলগ্ন থাকিলে ঘণ্টায় কি পরিমাণ জল তোলা হয় তাহা বুঝা যায়। এই চৌবাচ্চায় ১ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি ফুকারের ৫টি ছিদ্র দিয়া, বিভিন্ন সময়ে জল বাহির হইবার ব্যবস্থা থাকিলে, বিভিন্ন

পরিমাণ জমি ভিজাইতে কতটা জলের আবশ্যক তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়। ১ ইঞ্চি পরিমাপের ছিদ্র দিয়া জল বাহির করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভিজাইতে যে জল আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণ জলই ১ ইঞ্চি ফুকারের নল দিয়া বাহির করিলে, তাহা হইতে অধিকতর পরিমাণ জমি ভিজিবে। এভাবে ঐ পরিমাণ জলই ৫ ইঞ্চি নল দিয়া বাহির হইলে তাহাতে দ্বিগুণের অধিক জমি ভিজিবে। এতদ্ভিন্ন জমির মধ্যে পংক্তি করিয়া জল চালাইলে জমি ভিজাইতে (furrow irrigation) যে পরিমাণ জলের আবশ্যক, বিক্ষিপ্ত ভাবে সকল জমি ভিজাইবার জন্য তাহার প্রায় দ্বিগুণ জলের আবশ্যক হয়। ছাত্রদিগকে এ সকল বিষয়ে এভাবে শিক্ষা দিতে পারিলে, ভবিষ্যতে জল পাওয়ার সুবিধানুযায়ী এবং জমি হইতে কত নীচে জল পাওয়া যাইতে পারে বুঝিয়া সেচের জন্য দোন, ঢেঁকিকল, পার্শিয়ান হুইল, নানা রকমের পাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। নদী, খাল, পুষ্করিণী কিংবা বাঁধে রক্ষিত জলের মত ইন্দারা হইতে বেশী পরিমাণ জল বেশী সময় তোলা সম্ভব হয় না। ইন্দারার জল সেচের জন্য তুলিতে হইলে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। আট-দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলে পুনরায় জল পাওয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসের শুষ্ক দিনে ইন্দারা হইতে ক্ষেতে জল দিতে হইলে পানীয় ও সাংসারিক নানা কাজের জন্য জল পাওয়া কষ্টকর হয়। কত ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ কতটা খুঁড়িলে চাষের জন্য সর্ব্বদা প্রচুর জল পাওয়া যায় তাহাও জানা আবশ্যক। পরীক্ষার জন্য বহু ছাত্রের পুস্তক পড়িতে হয়, এজন্য অবসর সময়ে তাহাদের নিকট খেলার প্রতিই অধিকতর আসক্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাহাদের অধিকাংশেরই পাস করিয়া চাকুরী করাই উদ্দেশ্য মনে হয়।

কলেজ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে যে চারি শত বিঘা জমি আছে তাহা সর্ব্বত্র সমান নয়। এখানে পানীয় জলের জন্য ইন্দারা করা হইবে। ঢালু জমিতে বর্ষার সময় বৃষ্টির জলের বিভিন্ন স্রোত যেখানে একত্র হইয়া ছোট নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার চারিদিকে বাঁধ দিয়া চাষের জন্য জল সঞ্চয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ জমির সীমানায় সর্ব্বত্র আইল বাঁধিয়া সেই আলগা মাটিতে খেজুরের বীজ, বাদাম, কাঁঠাল, মাঝে মাঝে আমের আঁঠি বর্ষার সময় বপন করা হইয়াছিল। সেগুলি যেভাবে অল্প খরচে ঘনভাবে অঙ্কুরিত হইয়া বেড়ার মত কাজ করিয়া একটি স্থায়ী আয়ের উপায়স্বরূপ হইতেছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই জমিতেই গত বৎসর প্রায় এক শত পঞ্চাশ বিঘা কার্পাস (পার্ব্বতী আমেরিকান) লাগানো হইয়াছিল। বড় গাছের ছায়ায় এবং যেখানে মানুষ বাস করে তাহাদের ব্যবহৃত জল পাইয়া যে সকল কার্পাস গাছ এ বৎসরও বাঁচিয়া আছে, সেগুলিতে অজস্র কার্পাস ফলিতেছে দেখিলাম, বাকি সব গাছই শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় এবং তাহার পর জমি আর্দ্র থাকা অবস্থায় সাব দিয়া মাঝে মাঝে চাষ দিয়া রাখিতে পারিলে সব গাছই জীবিত থাকিত এবং এ বৎসরও তাহা হইতে তুলা পাওয়া যাইত। সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী কার্পাস-চাষের জন্য বরাদ্দ অর্থ হইতে কতক টাকা ধার দিয়া এই গাছগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এখানে ত্রিশ বিঘা জমি লইয়া দশটি কৃষিক্ষেত্র খোলা হইবে। এদেশে সাধারণ গৃহস্থদের প্রতি-পরিবারে ত্রিশ-চল্লিশ বিঘার অধিক জমি নাই। সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্ত এই পরিমাণ জমি লইয়া কিভাবে চাষ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হয় তাহা দেখাই এ প্রকার চাষের উদ্দেশ্য। কলেজের বেতনভোগী এক জন অভিজ্ঞ চাষীর তত্ত্বাবধানে বি-এস্‌সি. এগ্রিকালচার পাস করিয়া যাহারা পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে এরকম দুই জন ছাত্র এখানে থাকিয়া প্রতিটি ফার্ম্মের কাজ করিবে। এ প্রকার একটি ফার্ম্মকে লাভজনক ভাবে চালাইবার মত দক্ষতাকে তাহাদের পরীক্ষাতে বিশেষ স্থান দেওয়া হইবে। একটি ফার্ম্মের কাজ এ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রকার ফার্ম্মের কাজ পৃথকভাবে চালিত হইলেও যাহাতে তাহারা সমবায়-নীতিতে একত্রে কাজ করিয়া কম খরচে অধিকতর লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহিত করা হইবে। ফার্ম্মের আশেপাশে কতক দরিদ্র মজুরের বাস। ইহাদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইবে। কলেজের কৃষিকার্য্যের জন্য আবশ্যক মজুরের কাজে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। এভাবে কলেজের সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের জীবনযাত্রার মানের কতটা উন্নতি হইল দেখা এবং আবশ্যকমত অধিকতর উন্নতিবিধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাও কলেজের ছাত্রদেরই কর্ত্তব্য হইবে।

গতানুগতিক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া এই কলেজে যে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্ব্বক অভিনব পদ্ধতিতে মানুষ গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা লইয়া কাজ হইতেছে তাহা দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার বিভিন্ন রকম কাজের জন্য বিশেষ কতকগুলি বৃত্তি ও পারিতোষিকের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এসকল কাজে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। আশা করি, দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উন্নতির জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাতে এ প্রকার দানের যে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আলোচনা

"জাহানারার আত্মকাহিনী"

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী, ডি-লিট

ডঃ শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো আমার "জাহানারার আত্ম-কাহিনী"র সমালোচনা করিয়াছেন। [১৩৪৮, প্রবাসী ফাল্গুন]। তিনি আমার ১৪ দফা ভুল ধরিয়াছেন। আমি ভুলগুলির উত্তর দিতেছি।

১ম ভুল: "জাহাঙ্গীরের মহিষী মানসিংহের ভগ্নী মানবাই"—আমি লিখিয়াছি। ডঃ কানুনগো প্রমাণ চাহিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনীর ১৫ পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণ আছে। জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন, "আমার পিতা আকবর মানসিংহের পিতৃস্বসাকে বিবাহ করিয়াছেন। আমি তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছি।"

ডঃ কানুনগো লিখিয়াছেন, "মানসিংহের ভগ্নীর নাম কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে খুঁজিয়া পাই নাই।"—জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনীর ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রমাণ আছে। স্মিথের *Akbar the Great Mogul*-এর ২য় সংস্করণের ২২৫ পৃষ্ঠায় আছে।

শাজাহানের মাতার নাম জগৎ গোঁসায়িনী লেখায় ডঃ কানুনগো "গোসা" করিয়াছেন। প্রথমতঃ আমার নামের ভুল, দ্বিতীয়তঃ বানান ভুল। ডঃ কানুনগো কোন তথ্য না জানিলে যে উহা ঐতিহাসিক সত্য হইবে না এই অহঙ্কার কেন? জগৎ গোঁসায়িনী ও মানবাই ভিন্ন ব্যক্তি—যদিও দুই জনেই জাহাঙ্গীরের পত্নী। মানবাই ভগবানদাসের কন্যা, বিহারীমলের পৌত্রী; জগৎ গোঁসায়িনী মতিরাজা বা মোতা রাজার কন্যা, মালদেবের পৌত্রী।—জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী ১৯ পৃঃ, আইন-ই-আকবরী (২য় সং, Blochmann সম্পাদিত) ৩২৩ পৃঃ। সার যদুনাথ সরকারের *Mughal Administration*-এ ২য় সং, ১৫৪ পৃ, জগৎ গোঁসায়িনী জীবন্ত হইয়া আছেন। মানবাই-এর পুত্র খসরু; জগৎ গোঁসায়িনীর পুত্র শাহজাহান। অভিমানিনী মানবাই খসরুর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বিষ পানে আত্মহত্যা করেন। জাহাঙ্গীর মনের দুঃখে "৩২ ঘড়ি (৪ দিন) অন্নজল গ্রহণ করেন নাই"।

গোঁসায়িনী শব্দের জন্য তিনি আমার ব্যাকরণের ভুল ধরিয়াছেন। আমি বাংলা পুস্তক লিখিয়াছি, হিন্দী লিখি নাই। বাংলা ভাষায় গোস্বামী শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ গোঁসায়িনী সম্পূর্ণ শুদ্ধ।

২য় ভুল: "আফিঙের বিষ প্রয়োগে মুঘলবংশের সন্তানদের হত্যা করা হ'ত"—আমি লিখিয়াছি। এই অপরাধে ডঃ কানুনগো আমাকে দোষারোপ করিয়াছেন, অতি তীব্র বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন—"আমরা জানিতাম, এইরূপ পানীয় নেশাখোরের অমৃত, রাজপুতানার অম্বল। সে যুগে হিন্দু মুসলমানের পক্ষে প্রায় সমান হালাল।" যাক, আমি নেশাখোর নই, নেশাখোরের পক্ষে যাহা জানা সম্ভব, তাহা আমি জানি না, তবে একজন ফার্সীনবীশ ডাক্তার যে 'হালাল' ও 'হারামে'র পার্থক্য জানেন না—সে ইঙ্গিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করি। ডঃ কানুনগো Steingass-এর *Persian English Dictionary* ৫২১ পৃ. দেখুন।—"হালাল" অর্থে "অনুমোদিত", 'হারাম' অর্থে অননুমোদিত বোঝায়। ডঃ কানুনগো ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আফিঙ 'হালাল' (নিষিদ্ধ) বলিয়া আওরঙ্গজেবের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ডঃ কানুনগো বার্নিয়ারের ভ্রমণ-কাহিনী (১০৫ পৃঃ), মানুচীর *Storia di Mogor* (১ম খণ্ড, ৩৮০ পৃঃ), সার যদুনাথ সরকারের *History of Aurangzib* (১ম খণ্ড, ৫৬৪ পৃঃ) পড়িয়া দেখুন। সেখানে, স্পষ্ট লেখা আছে, "আফিঙের বিষ পান করাইয়া মুঘল বংশধরদিগকে হত্যা করা হইয়াছে।"

৩য় ভুল: ডঃ কানুনগো জাহানারার হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন। এই ভনিতা কেন? তিনি ত নিজেই জাহানারার ভ্রাতা দারা শিকোর জীবনী লিখিয়াছেন। সে সময় কি কাশীর পণ্ডিত জগন্নাথের জীবনী পাঠ করেন নাই? বিহারী সতসই নামক হিন্দী গ্রন্থ কি দেখেন নাই? এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে যে জাহানারার জীবনী আছে তাহা দেখুন না। খাওয়াতিন-ই-মুঘলিয়া আধুনিক পুস্তক হইলেও মুঘল পুরনারীদের সম্বন্ধে নানা প্রকার সংবাদ পাইবেন।

৪র্থ ভুল: "মাণমাণিক্যোজ্জ্বল স্বর্ণরেণু পাখায় মেখে···মক্ষি-রাণী"—লেখার জন্য ডঃ কানুনগো আমায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিলেও সৌন্দর্য্য-বিলাসী মুঘল সম্রাটদের বিষয় লিখিতে হইলে সাহিত্য, শিল্প ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান থাকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। মৌমাছি কালো হইলেও সূর্য্যের কিরণসম্পাতে মধুমক্ষিকার পাখায় সোনালী আভা প্রতিফলিত হয়।

৫ম ভুল: ডঃ কানুনগো আমার একটি বাক্যের অংশের উপর অস্ত্রোপচার করিয়াছেন এবং খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'দূরে ঐ ছাদের অপর প্রান্তে···'। ইহা আমার পুস্তকের কোথায় খুঁজিয়া পাইলাম না। অধ্যাপক ডঃ কানুনগো যে প্রয়োজনমত আমার লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মতন সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিকের নিকট আশা করি না। আমাকে আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি দুর্গ, পরিখা, খাল প্রভৃতি শব্দগুলির

এক সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জড়াইয়া পড়িয়াছেন। মুসলিম যুগে সমস্ত প্রাসাদই ছিল দুর্গ; ও প্রত্যেক দুর্গসংলগ্ন ভূখণ্ডে পয়ঃপ্রণালী বা খাল থাকিত। খালের পার্শ্বে নির্মিত হইত প্রাচীর।

৬ষ্ঠ ও ৭ম ভুল: প্রতাপসিংহের ঘোটককে "চেটক" না লিখিয়া চৈত্তক লিখিয়াছি। সুতরাং অধ্যাপক কানুনগো আমাকে স্কুলে পড়িবার উপদেশ দিয়াছেন। মূল শব্দটি 'চৈত্তক'। রাজস্থানী ভাষায় উহার অপভ্রংশ "চেটক"। স্বরবর্ণের ঐকার কোথায় একার হয়—তাহা যে-কোন হিন্দী ব্যাকরণে আছে। দন্ত্য 'ত' মূর্দ্ধন্য 'ত' রাজস্থানী ভাষায় সর্ব্বদাই দেখা যায়, উহার উচ্চারণ 'ট'-এর মতন হয়। সংস্কৃত ভাষায়ও 'ত'-এর উচ্চারণে পরিবর্ত্তনের রীতি আছে। আমার পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় লেখা। সুতরাং 'চেটক' না লিখিয়া 'চৈত্তক' লেখাই যুক্তিসঙ্গত। রমেশচন্দ্র দত্ত 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় চৈত্তক লিখিয়াছেন।

আকবর-বিরোধী রাজপুতনার বীরপুত্র পাত্তাকে পুট্টা লেখার জন্য তিনি আমাকে রাজপুতনার শিশুপাঠ্য ইতিহাস পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন। রাজপুতনার ইতিহাসে মূল শব্দ পুত্রটি "পাত্তা" অপভ্রংশ। পুত্তর, পাত্তর, পাত্তা, পুত্তা, পুট্টা সবগুলিই অপভ্রংশ। পাত্তা শব্দটি স্নেহদ্যোতক, আদরের ডাক, কালক্রমে উহা রাজস্থানী ভাষায় নামে পরিণত হইয়াছে।

৮ম ভুল: আমি লিখিয়াছিলাম—"বেগম নুরজাহানের জেসমিন প্রাসাদে জাহানারা বসিয়াছিলেন"। ডঃ কানুনগো জানিতে চাহিয়াছেন, জেসমিন প্রাসাদের সঙ্গে বা আগ্রা-দুর্গের মুসম্মন বরুজের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? জাহাঙ্গীর নুরজাহানের জন্য আগ্রা-প্রাসাদের অভ্যন্তরেই একটি নূতন অংশ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, শাহজাহানের সময়ও উহা ছিল এবং জাহানারা উহা ব্যবহার করিতেন।

৯ম ভুল: "চীন বিটপীর" উল্লেখে ডঃ কানুনগো আমাকে চীন বিটপীর তলায় জীবন্ত গোর দিতে চাহিয়াছেন। তিনি সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে কস্মিন্‌কালেও চীনবৃক্ষ ছিল না, এখনো নাই"। চীনদ্রুমের উল্লেখ ভারতের বহু তন্ত্রগ্রন্থে আছে, তান্ত্রিকের নিকট উহা পুণ্যবৃক্ষ। সর্ব্বোল্লাস তন্ত্র বা শ্যামাচার তন্ত্র দেখিতে পারেন। দিল্লী-আগ্রার উদ্যান ও রাজপথ চীন বিটপী-শোভিত ছিল। বাংলাদেশে পাণ্ডুয়ানগরে শাহজালালের কবরের পার্শ্বে গুল-ই-চীনীর নাম কি তিনি শুনেন নাই?

১০ম ভুল: "বুলন্দ দরওয়াজা" শব্দের পাদটীকায় (নং ৩৬, পৃ, ৭১) আমি লিখিয়াছি, "এই তোরণের মধ্য দিয়া ৭টি হস্তী পাশা-পাশি প্রবেশ করতে পারে"। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই তোরণের মধ্য দিয়া ৭টি গাধাও প্রবেশ করতে পারে না।" আক্রমণের আবেগে ডঃ কানুনগো দুরবীর্ণ জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পার্সি ব্রাউনের *Islamic Architecture* গ্রন্থে Figure No. 2 দেখুন—এই দরওয়াজা দৈর্ঘ্যে ১৭৬ ফুট, প্রস্থে ১৩০ ফুট, গভীরতায় ৮৮½ ফুট (পৃঃ ১০০।১০১)। এম. ডব্লিউ. স্মিথের *Architecture of Fathepur Sikri* গ্রন্থের Plate no. LXIV-এ উহার বিশেষ বিবরণ আছে।

ডঃ কানুনগো "অশ্বক্ষুরাকৃতি তোরণ" সমালোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার করিয়াছেন। বুলন্দ দরওয়াজার পাদটীকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা অশ্বক্ষুরাকৃতি তোরণের পাদটীকায় আরোপ করিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়াছেন। সেই কল্পিত অপরাধের জন্য ডঃ কানুনগো আমার জন্য ঘোড়ার চিকিৎসা বিধান করিয়াছেন।

ডঃ কানুনগো জানিয়া রাখুন অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি বিশিষ্ট আকার—উহার সহিত অশ্বক্ষুরের কোন সম্বন্ধ নাই। কার্গসন সাহেব এই শব্দটি প্রথম লিখিয়াছেন। প্রিন্সটন ইউনিভারসিটি হইতে গত বৎসর প্রকাশিত *Near Eastern Society and Culture* নামক পুস্তকে *Islamic Art and Archeology* অধ্যায়ের ২১নং চিত্র দেখিতে পারেন। বুলন্দ দরওয়াজার পাদটীকাকে অশ্বক্ষুরাকৃতি তোরণের মধ্যে আরোপ করিয়া ডঃ কানুনগো ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

১১শ ভুল: "তুর্কী বেগমের প্রাসাদ এখনো জলের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে" (পৃঃ ৭৭) লেখার জন্য ডঃ কানুনগো ফতেপুর সিক্রীর পরিত্যক্ত প্রান্তরে জল খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি হতাশ হইয়া লিখিয়াছেন—"ফতেপুর সিক্রিতে জল কোথায়?" চারি শত বৎসর ব্যবধানেও তিনি ফতেপুরের পরিত্যক্ত প্রাসাদে জল দেখিতে আশা করেন নাকি? মুঘল যুগে প্রত্যেক প্রাসাদেই কৃত্রিম জলধারা ও ঝরণার ব্যবস্থা ছিল, উদ্যানবাটিকা ছিল, পয়ঃপ্রণালী ছিল, উহার উপর সেতু ছিল। মুঘল সম্রাটগণ জীবন উপভোগ করিয়াছেন, শাহজাহানের জন্য প্রতিদিন কাশ্মীর হইতে বরফ, ফুল ও জল রাজধানীতে আনয়নের ব্যবস্থা ছিল, নিদারুণ গ্রীষ্মে মুঘলরাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরে জল, সরোবর, ঝরণা, উদ্যান, সেতু কল্পনা নয়—নিতান্ত বাস্তব। ডঃ কানুনগো ফতেপুর সিক্রি সম্বন্ধে *Architectural Survey Report* পড়ুন; *Mughal Gardens* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এই সম্পর্কে পঠিতব্য।

"পরীমহল"কে অপ্সরামহল লেখায় ডঃ কানুনগো আমার ভুল ধরিয়াছেন। "পরী" শব্দটি ফার্সী 'পর' অর্থ 'ডানা'; 'পরী' কথার শাব্দিক অনুবাদ 'ডানাওয়ালী'। আমার অনুবাদের ভাষার সঙ্গে ডানাওয়ালীর কথা লিখিলে ধ্বনি-সামঞ্জস্য হইত না। অপ্সরামহল কথাটি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর নয় কি?

১২শ ভুল: আমি (৯১ পৃঃ) লিখিয়াছি "আকবরের বাসকক্ষের সম্মুখে একটি দোলনায় বসে সখিগণ যোগাভ্যাস করতেন"। ডঃ কানুনগো আমার ভুল ধরিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "জিনিষটা দোলনা নয়; একটি দড়ি-বাঁধা ঝুড়ি"। তারপর লিখিয়াছেন, "প্রতি রাত্রিতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ঝুড়িতে বসাইয়া—উপরে শয়ন-কক্ষের বাহিরে ঐ ঝুড়ি বাঁধিয়া রাখা হইত"। আমি লিখিয়াছি, "দোলনা," তিনি লিখিয়াছেন, "দড়িবাঁধা ঝুড়ি"। "আমি লিখিয়াছি

তাঁহারা যোগাভ্যাস করিতেন।" তিনি লিখিয়াছেন, "দড়িবাঁধা ঝুড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতেন।" তাঁহাকে অনুরোধ করিব, বদায়ূনীর দ্বিতীয় খণ্ডের মূল ২৫৮ পৃষ্ঠা পড়ুন, সমগ্র গ্রন্থখানি না পড়িয়া কয়েকটি ফারসী শব্দের ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়া বদায়ূনীর মতন কঠোর লেখকের মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করা যায় না। বদায়ূনী আকবরের ধর্মমতের উপর বিরূপ ছিলেন। আকবর অমুসলমানের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিয়াছেন ইহাতে বদায়ূনী মনে করিয়াছেন যে, ইসলামের অপমান করা হইয়াছে। আকবর হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও সুফীদের সঙ্গে যোগাভ্যাস করিতেন—ইহা বদায়ূনীর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে দেবী ও পুরুষোত্তম নামক দুই জন ব্রাহ্মণের নামের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বদায়ূনী অনেক সময় ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তি করিয়া শব্দযোজনা করিয়াছেন। ডঃ কানুনগো বদায়ূনীর ব্যঙ্গোক্তি এবং কটূক্তি অনুধাবন করেন নাই। তাই তিনি সম্রাট আকবরের আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বদায়ূনীর সঙ্গে সঙ্গে "দড়ি-বাঁধা ঝুড়িতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।" বদায়ূনী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, "চার পাই"। Haig সাহেব ইংরেজী অনুবাদ লিখিয়াছেন, "ঝুড়ি"—অমনি ডঃ কানুনগো সাহেবের সুরে সুর মিলাইয়া লিখিলেন "ঝুড়ি"। আমি "দোলনা" লিখিয়াছি, কারণ বদায়ূনী "মোয়াল্লেকা" শব্দটি বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। উহা আরবী শব্দ, অর্থ দোলায়মান। বাস্তবিক জিনিষটি দোলনা। উহা ঝুড়ি নয়।

১৩শ ভুল: ডঃ কানুনগো আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—(ক) সেলিমের মাতার নাম কোন ইতিহাসে আছে কি? (খ) প্রসবের সময় সেলিমের মাতা সেলিম চিশতীর ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিয়াছেন কি? উত্তর দিতেছি—(ক) সেলিমের মাতা ছিলেন যোধপুর রাজকন্যা। তাঁহার অন্নপ্রাশনের নাম ইতিহাসে লেখা নাই, পিতৃ-পরিচয়েই তাঁহার পরিচয়—যোধপুররাজের পরিচয় অনুযায়ী তাঁহাকে যোধপুরী বেগম বলা হয়। তাঁহার মুসলমানী নাম মিরিয়ম জমানী। আব্দুল লতিফের আগ্রা গাইড পড়িয়া যদি ডঃ কানুনগো মনে করিয়া থাকেন, মিরিয়ম জমানী আকবরের পর্তুগীজ খ্রীষ্টান মহিষীর নাম—তবে আমার বলার কিছু নাই। অনেকে যোধপুরী বেগম নামটি ভুল করেন, কারণ জাহাঙ্গীরের মাতা ও পত্নী দুই জনই যোধপুর রাজবংশের সন্তান—একজন বিহারীমল্লের কন্যা, অন্যজন পৌত্রী। ডঃ কানুনগো হঠাৎ এত বিচলিত হইলেন কেন? সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধির পার্শ্বে মিরিয়ম জমানীর কবর আছে। নাম ত পরিচয় মাত্র। সেলিমের মাতা যোধপুরী বেগম, এই তার যথার্থ পরিচয়। (খ) জাহাঙ্গীর তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে (২ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "আমার মাতার প্রসবের সময় হইলে সম্রাট আকবর তাঁহাকে সেলিম চিশতীর 'খানকা'য় (ক্ষুদ্র কুটীরে) প্রেরণ করিলেন যেন আমি সেইখানে ভূমিষ্ঠ হই।" ডঃ কানুনগো আর প্রমাণ চাহিলে আবুলফজল, বদায়ূনী দেখুন।

১৪শ ভুল: "ছুলেরা"র সঙ্গে জাহানারার প্রেমের কাহিনী অবতারণা করায় অপরাধে ডঃ কানুনগো জাহানারার আত্ম-কাহিনীকে সিনেমার পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীলা আন্দ্রিয়া বুটেনশনকে *Mother India* রচয়িত্রী আমেরিকার কুখ্যাতা "মিস মেয়োর সমগোত্রীয়া"র পর্যায়ে ফেলিয়াছেন।

"ছুলেরা" নামটি কল্পিত। অনেকেই প্রিয়জনকে প্রিয় নামে সম্বোধন করিয়া আনন্দ পায়, প্রিয়জনকে আনন্দ দেয়। ছত্রসাল বুন্দেলা মুঘল রাজপরিবারের রাখীবন্দ ভাই—মুঘল রাজপরিবারের সহিত বুন্দেলা পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বংশানুক্রমিক ও ইতিহাস-বিশ্রুত। ছত্রসালের ছুলেরা নামকরণ করার মধ্যে মনের বিলাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ডঃ কানুনগো "আমার বইখানিকে ইতিহাস বিবেচনা করায় তাঁহার মন বিভ্রান্ত হইয়াছিল, সমালোচনার সময় তিনি লিখিয়াছেন "তাঁহার চক্ষু স্থির।" চক্ষু স্থির হইবার পূর্ব্বে তিনি আমার পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকা মনোযোগ দিয়া পড়িয়া লইতে পারিতেন। উহাতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে—বিদেশিনী আন্দ্রিয়া বুটেনশন জাহানারার কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীতে পরিবর্তিত করিয়াছেন। আমি মুখবন্ধের শেষ পাতায় (৬ পৃঃ) শেষ বাক্যে লিখিয়াছি, "আমি বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকের উপযুক্ত করে লিখলাম জাহানারার আত্মকাহিনী।" সুতরাং জাহানারার আত্মকাহিনী যে ইতিহাস নহে তাহা বুঝিতে পারিলে ডঃ কানুনগোর মন "আতঙ্কে ও সন্দেহে ভারাক্রান্ত" হইত না।

ডঃ কানুনগো অভিযোগ করিতে পারেন যে, জাহানারার আত্ম-কাহিনীর মুখবন্ধে মুঘল সম্রাটদের আত্মজীবনীর অবতারণা করিয়া আমি পুস্তকখানিকে ঐতিহাসিক রূপ দিয়াছি। মুখবন্ধে তৈমুরের মালফুজাৎ, বাবরের তুজুক, জাহাঙ্গীরের জীবনী এবং গুলবদন বেগমের হুমায়ুননামার উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য নহে। সাহিত্যে veri-similitude নামে পরিচিত এক প্রকার লিখনপদ্ধতি বা রচনাশৈলী আছে। Historical Romance নামে এক শ্রেণীর রচনা আছে। এই প্রকার রচনার জন্য ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। সেই হেতু ঐতিহাসিক টীকা, টিপ্পনী ও মুখবন্ধের প্রয়োজন হয়, Robert Graves রচিত *J, Claudius* নামক বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তকখানি তিনি নিশ্চয় পাঠ করিয়াছেন। *J, Claudius*-এর নায়ক সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র—এই বইখানি পাঠ করিয়া কোন ঐতিহাসিকের "চক্ষু স্থির" হয় নাই। আন্দ্রিয়া বুটেনশনের *Life of a Mugul Princess* বইখানির মুখবন্ধ লিখিয়াছেন বর্তমান জগতের একজন বিখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক—লরেন্স বিনিয়ন। তিনি উহাকে ইতিহাসের পর্য্যায়ে ফেলেন নাই। আমাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ডঃ কানুনগো লরেন্স বিনিয়নকে গালি দিয়াছেন—অপরাধ যেন লরেন্স বিনিয়ন অমন "পঞ্চম শ্রেণীর" সিনেমা-পর্য্যায়ভুক্ত বইয়ের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন।

উত্তর

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, পিএইচ-ডি

ঐতিহাসিক বিচারের উদ্দেশ্য খোলা মন লইয়া সত্যানুসন্ধান, সত্য গোপন করিয়া তর্কে বাজিমাৎ করা নয়। বিচারের বেলায় বাপ-বেটা, গুরু-শিষ্য, ভাই-বন্ধু নাই, উহা ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। আমার মন্তব্য 'বন্ধু' মাখনলাল কিংবা 'আসল' ঐতিহাসিক মাখনলালের বিরুদ্ধে নয়। মাখনলালের যে কৃত্রিম রূপ বুটেন্‌শনের বহির অনুবাদে, "জাহানারার আত্মকাহিনী"র প্রচ্ছদপটে, "মুখবন্ধে"র মুখোশে এবং ঐতিহাসিক পাদটীকায় ধরা পড়িয়াছে, আমি উহাকেই আক্রমণ করিয়াছি। শ্রীযুত মাখনলাল কিংবা তাঁহার ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদি বুটেন্‌শনের বহির বাংলা অনুবাদ না করিতেন তাহা হইলে আমার অথবা কোন ঐতিহাসিকের কাছে "আত্মকাহিনী"র কানাকড়ি মূল্যই হইত না। ডক্টর মাখনলালের সম্মান রক্ষার জন্যই প্রবাসী-সম্পাদক ঐ বহি আমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন।

আমি ছাত্র এবং বন্ধুগণের মারফত কাশ্মীরে সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য স্থানে পুস্তকের 'মুখবন্ধে' মাখনলাল-কথিত "কাশ্মীর থেকে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত" জাহানারার আত্মকাহিনীর সন্ধান করিয়াছি। সমালোচনা ছাপাইয়াও ছয় মাস আশঙ্কায় কাটাইয়াছি যদি-বা বুটেন্‌শন কর্ত্তৃক মাখনলালের সাক্ষ্য অনুযায়ী "আবিষ্কার" বাহির হইয়া পড়ে! প্রতিবাদ পড়িয়াই আশ্বস্ত হইয়াছি। এইবার বুঝিলাম বন্ধু "রস"সৃষ্টির মতলবে অসম্ভাবস্থায় সদর রাস্তায় হাততালি দিয়া লোক জমা করিয়াছেন; পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া সমালোচককে জব্দ করিতে চাহিয়াছেন।

জাহানারার আত্মকাহিনীর ঐতিহাসিক মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে। এইবার মেমসাহেবের পাণ্ডুলিপি 'আবিষ্কার' কাশ্মীরে ছাপা ফার্সি মূল পুস্তক সম্বন্ধে ডক্টর মাখনলাল নিরুত্তর। এখন ধুয়া ধরিয়াছেন —তাঁহার লেখা 'মুখবন্ধ' ইতিহাস নহে, বই অতি উৎকৃষ্ট বিলাতী ঔপন্যাসিকের "veri-similitude" নামক 'রচনাশৈলী'—যাহা আমি অজ্ঞতানিবন্ধন বুঝিতে পারি নাই।

সমালোচনা, ঐতিহাসিক বাদানুবাদ খোলা ময়দানের খেলা; উহাতে কেহ বেকায়দায় পড়িয়া গেলে মার খাইতেই হইবে। সমালোচনাকে ভয় করিলে আদৌ বহি লেখা হয় না। আমার সমালোচনা যে নিতান্তই অভিসন্ধিমূলক ডঃ মাখনলাল নথিপত্র সহ উহার প্রমাণ সুধী ব্যক্তিগণের ধর্মাধিকরণে উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার ভাষা ও যুক্তির সহিত তাল রাখিয়া আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেই হইবে।

২

["আফিমের বিষ…"]

বিবাদের বিষয়, 'বন্দী রাজপুত্রগণকে আফিমের বিষ' দেওয়া হইত কি পোস্ত ভিজানো জল দেওয়া হইত? মাখনলাল আমার কথাটা উল্টা রাখিয়া জানাইয়াছেন, "আমি লেখাপড়ায় নহি।" আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি, মাখনলালের মুখে ধোঁয়া কখনও কেহ দেখে নাই, তবে তাঁহার কলমে মাঝে মাঝে ধোঁয়া বাহির হয়; ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার আর্ট তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন।

ইসলাম সাম্রাজ্য পত্তনের পর হইতে দিল্লীর বাদশাহীর পতন পর্য্যন্ত গুপ্তহত্যার ব্যাপারে আফিমের মত বাজে জিনিষ ব্যবহার হইত না। এই কার্য্যের জন্য অতি উৎকৃষ্ট সুপেয় সরবৎ ইউনানী হেকিমেরা যোগাইতেন। মোগল যুগে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী শাহাজাদাগণকে যে পানীয় দেওয়া হইত উহা আফিমের জল নহে, পোস্ত-ভিজানো জল। ইহার প্রমাণ ডক্টর মাখনলালের বহিতেই রহিয়াছে—"তোমাকে পপীর বিষ দেব না…পানপাত্রে পপীর বিষাক্ত সরবৎ দেওয়া হয়েছিল" (পৃঃ ১৭৭)। "বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত করিয়া লিখিত" পুস্তকে দুই দুই বার 'পপী' কেন? আসলে বস্তুটাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং কাজটা আমার উপর না চাপাইয়া উপায় কি? ফার্সি 'পোস্ত' আসল মানে ছাল অর্থাৎ আফিমের ফুলের গোটার ছাল। 'পপী'র ফুল সখের বাগানে, উত্তর-ভারতে চাষার জমিতে ফোটে। ফুল শুকাইয়া গেলে গোটা বাঁধে; গোটার ছাল চিরিয়া যে 'কষ' পাওয়া যায় উহাই শুকাইলে আফিম হয়। গোটার ভিতর হইতে যে ছোট ছোট দানা বাহির হয় উহার কিছু অংশ দাওয়াই হিসাবে হেকিমেরা ব্যবহার করেন, বাদবাকী বাঙালী বিধবা ঝাল তরকারী রাঁধিয়া খাইয়া ফেলেন। ঐ শুক্‌না চেরা ফুলের গোটা ফেলিবার জিনিষ নয়। উহা ভিজাইয়া কিংবা কাথ বাহির করিয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী মোগল শাহাজাদাগণকে দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থায় কাহারও সরাসরি দুনিয়া হইতে সরিয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল না; বন্দীগণ চিন্তাশক্তিরহিত জীবন্মৃত হইয়া কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিত। বাংলাদেশেও কড়া নেশার জন্য পোস্তগোটা—সিদ্ধি এবং সুরার অতি পাজী সংস্করণ ব্যবহৃত হইত।* মীর্জ্জাবংশীয় যাঁহারা আধমরা হইয়া লক্ষ্ণৌ শহরে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের জন্য এবং বিলাসী নাগরগণের বাসনাপূর্ত্তির জন্য শুনিয়াছি, হেকিমেরা এইরূপ মাজুন এখনও প্রস্তুত করেন।

শ্রীযুত মাখনলাল লিখিয়াছেন, "একজন ফার্সি-নবীশ ডাক্তার যে হারাম-হালালের পার্থক্য জানেন না—সে ইঙ্গিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করি।" কুণ্ঠার আবশ্যকতা কি? এই কথা ঢোল-সহরতে ঘোষণা করিলেও লজ্জিত না হইয়া বরং আমি খুশী হইতাম। হারাম-হালাল বড় কঠিন ঠাঁই; ফার্সি-আরবী উহাতে হালে পানি পায় না।

---

* "…তামাকুরা গাঁজা পোস্ত ঘোঁটা সিদ্ধি সুরা।
সেজে লও সরস কলসী পাঁচ পুরা॥
… …
ঘটি ঘটি ঘোঁটা সিদ্ধি পীয়ে পোস্ত বড়।
[জয়রাম দাস-রচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, সর্গ ১৭, পৃঃ [illegible]]

[illegible]

[illegible] আবদুল্লাহ ... আমি [illegible] "খোজা-জিলাখো-এর" খেতাব [illegible] দিয়াছি। আকিলকে [illegible] এই কারণ? ঐ বৎসর লৌহুতে আওরঙ্গজেবের [illegible] হিন্দুস্থানে বাদশাহী কায়েম করিয়াছিলেন, উহারই [illegible] ও এক বুড়া হোলাভাজা খাইয়া অকালে অভাবের [illegible] এপ্‌তার করিয়াছিলেন দুর্দান্ত আমীর খাঁ পিণ্ডারী ও তাঁহার [illegible] পাঠান লস্কর।* বলিতে গেলে, আকিলে উদাসীন হইবার পর হইতেই মোগল সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছিলেন; জাহাঙ্গীর হিন্দুর উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন, বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া শাহজাহান ময়ূর-তক্ত হারাইলেন, আর প্রজার নেশার খাতির ছুটাইতে গিয়া হিন্দুর কাছে বেকুব বনিলেন বাদশাহ আলমগীর। ইহা জানিয়াও কেহ বলিতে পারেন—আকিল হারাম? তৌবা! তৌবা!

৩

[বুলন্দ দরওয়াজা]

ডঃ মাখনলাল "বুলন্দ দরওয়াজা"র যে মাপ দিয়াছেন উহা নির্ভুল। ঐ মাপের গোটা দরওয়াজাটা ভাঙিয়া ফেলিলে মাখনলাল-কথিত সাতটার জায়গায় সতেরটা হাতী সওয়ারসহ পাশাপাশি মসজিদে নিশ্চয়ই ঢুকিতে পারিবে। ইহার জন্য plate ইত্যাদি দেখা অনাবশ্যক। ঐ মাপ দরওয়াজার কোন্ জায়গা হইতে কোন্ জায়গা পর্যন্ত —যাহা E. W. Smith-এর বহিতে লেখা আছে, উহা তিনি "গজব" রক্ষার জন্য বেমালুম চাপা দিয়া গিয়াছেন এবং উদ্ধৃত অংশের নীচে কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। আকবর বাদশাহের এই কীর্তিটি লোপাট না করিয়া, আজ পর্যন্ত কোন্ মাপের কয়টা জন্তু আসা-যাওয়া করিতে পারে উহা সুধীগণ নিয়ে উদ্ধৃত অংশ হইতে অনুমান করিয়া লইবেন। যথা:

"There are three entrances in the porch. The central one is larger than the others and forms the principal entrance . . . known as the *horse-shoe* gate. The others are smaller . . . The principal, the *horse-shoe* gate *measures* 12 ft. 9 in. *across* and 18 ft. 6 in. in *height*."
(E. W. Smith: *Architecture of Fathehpur-Sikri*. Vol. IV., p. 18: *Italics are mine.*)

বুলন্দ দরওয়াজা এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান লইয়া ডক্টর মাখনলাল অনর্থক বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল পুস্তকে আছে (পৃঃ ১১, পঙ্‌ক্তি ৪), "বুলন্দ দরওয়াজার (৩৬ পাদটীকা) সম্মুখ বিরাট [illegible] কোথায় [illegible] কি [illegible] ... [illegible] অশ্বক্ষুরাকৃতি সেই তোরণের শিলাফলক [illegible] (ঐ পঙ্‌ক্তি ১৮)...এই শিরোনামটা আরবী অক্ষরে [কোন্ ভাষায়?] তোরণ দ্বারে খোদিত আছে। আমি অশ্বক্ষুরাকৃতি তোরণের মধ্য দিয়া দরগায় প্রবেশ করলাম" (ঐ পঙ্‌ক্তি ১৮: মূল ইংরেজী বহি "through horse shoe gate···p. 79)। দেখা যাইতেছে "তোরণ" শব্দ দ্বারা তিনি একই বস্তু বুঝিয়াছেন; এবং উহার একটি মাত্র পাদটীকা। যাহা বুলন্দ দরওয়াজার কোন অংশে নাই (উহার প্রবেশদ্বারেও নয়),—তিনি মূল ইংরেজী কথাটার উপর অব্যাপারের ব্যাপারং করিয়া কাঠের পাল্লায় স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ডক্টর মাখনলাল বলিয়াছেন, "ডক্টর কানুনগো জানিয়া রাখুন অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি বিশিষ্ট আকার। উহার সহিত অশ্বক্ষুরের কোন সম্বন্ধ (?) নাই।" খিলানের সহিত ক্ষুরের সম্বন্ধ কেহ ঘটায় না, কথঞ্চিৎ আকৃতির সামঞ্জস্য না থাকিলে শব্দটা কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল? উহা তিনি স্বয়ং পড়িয়াছেন, না পরকে পড়িয়া নাম টুকিয়া লইয়াছেন? ইহার প্রমাণ অতঃপর পাওয়া যাইবে।

সমালোচনায় আমি লিখিয়াছিলাম, "ইহাকে নাল-দরওয়াজা (horse-shoe gate) কেন বলে সিক্রির একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়। ঘোড়ার ব্যারাম হইলে আজও ঘোড়ার নাল কাঠের পাল্লায় মারিয়া দেয়।" এই সাদা কথার শাস্ত্রীকৃত ভাষ্য পাঠ করিয়া পাঠকগণ বিচার করিবেন।

৪

["জাহানারার হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য"]

সমালোচনায় আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম—"জীবনীতে হিন্দু-শাস্ত্রালোচনার বহুপরিচয়ে" (পাদটীকা ১০) দাবীর সমর্থনে "দুই-একটা বহির নাম কিংবা কোন সমসাময়িক ইতিহাসের নজীর?" ইহার জবাবে ডক্টর মাখনলাল আমাকে তিনখানা পুস্তক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(ক) শাওয়াতিন-ই-মুঘলিয়া (এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার)। এই পুস্তকে নিবদ্ধ জাহানারার জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, "আধুনিক পুস্তক হইলেও মুঘলপুরনারীদের সম্পর্কে নানাপ্রকার সংবাদ পাইবেন।" এই প্রকার একখানা উৎকৃষ্ট দেশী পুস্তক বিদ্যমান থাকিতে ডঃ মাখনলাল একখানা বিলাতী কেচ্ছা অনুবাদ করিয়া হয়রান হইলেন কেন? উক্ত আধুনিক পুস্তকের ভিতরে কি আছে জানা থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই সমসাময়িক ইতিহাসের নজীর-প্রার্থী আমাকে এই অমূল্য-সংবাদ দিতেন না। ঐ বহি যদি কেহ বাংলা কিংবা ইংরেজীতে তর্জমা করেন, তাহা হইলে উহার কোন্ অংশ সেকাল এবং এই কালের কোন্ বহি হইতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে লওয়া হইয়াছে, দেখিয়া শুনিয়া তুলাতুলনা করা যাইবে।

(খ) পণ্ডিত জগন্নাথের জীবনী। পড়িবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু পাওয়া যাইবে কোথায়? পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ছিটা-ফোঁটা যাহা পাইয়াছি তাহা পূজনীয় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রকুমার যে [illegible]

* [illegible] শতাব্দীতে আমীর খাঁর জীবনচরিত 'আমীর-নামা' প্রণেতা [illegible] লিখিয়াছেন—আমীর খাঁ এবং তাঁহার পাঠান [illegible] পথে এক [illegible] ; বিকালে একজন পাঠান তাহার জন্য [illegible] এক টাকা দাবি আদায় করিয়াছিল। [illegible] খাইবার জন্য [illegible] জিজ্ঞাসা করিল। [illegible] ঐ লোকে [illegible] তাড়াতাড়ি করিয়া খাইয়া আমীর [illegible]

[illegible] শাহজাদা দারার জন্য জগন্নাথ পণ্ডিতের হাতে আশাল- [illegible] নতুন করে তাঁহার নির্দেশানুযায়ী কিছু যোজনা করিয়াছি ; কিন্তু যতদূর মনে করিতে পারি, জাহানারাকে পণ্ডিতরাজ হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এমন কথা তিনি কোথায়ও লিখেন নাই। ডক্টর চৌধুরী-দম্পতি কোন কোন রচনায় জগন্নাথ পণ্ডিতের জীবনীর উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা জাহানারার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ও শাস্ত্রচর্চার কোন উল্লেখ করিয়াছেন কি ? ডক্টর দে মহাশয়ের Sanskrit Poetics, নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পুস্তকাবলীর ভূমিকা এবং Gaekwad Oriental Series-এ মুদ্রিত সম্রাট্-সিদ্ধান্তের মুখবন্ধে জগন্নাথ সম্বন্ধে মোটামুটি জানা যায়—জাতিতে তিনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সম্রাট্ শাহজাহানের দরবারে মন্ত্রী আসফ খাঁর নামে আসফ-লহরী এবং গুণমুগ্ধ শাহজাদা দারার জীবনী 'জগদাভরণম্' কাব্য লিখিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ঐ একই কাব্যে তিনি দারার স্থলে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের নাম বসাইয়া প্রাণাভরণম কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। লাহোরীর বাদশাহনামার সম্রাট্ 'মহাকবি রায়' এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ জগন্নাথ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, ইংরেজী প্রবন্ধে এবং বাংলার "প্রবাসী" পত্রিকায়—উহাতে জাহানারা তাঁহার গান শুনিতেন কিংবা শাহজাদীকে তিনি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, এমন কোন কথা নাই।

যবনীপ্রলুব্ধ মূর্তিমান "রসগঙ্গাধর" পণ্ডিতরাজের সহিত সম্রাট্-দুহিতা জাহানারার দেখা হওয়া ইতিহাসে আদৌ সম্ভব নয়। এই-রূপ সাক্ষাৎকারের সুবিধা থাকিলে ভামিনী-বিলাস রচয়িতা একটা বিভ্রাট বাধাইয়া বসিতেন। 'জাহানারার আত্মকাহিনী' শ্রেণীর কোন উর্দু-ফার্সি বহিতে কোথায়ও হয়ত কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু জগন্নাথ পণ্ডিতের কোন কাব্যে জাহানারা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কথা আমি খোঁজ-খোঁজা করিয়াও পাইলাম না।

যাহা হউক, আমি স্বীকার করিতেছি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বড় কঠিন ঠাঁই।* তিনি 'আসফ-লহরী' ইত্যাদি অনেক প্রশস্তি লিখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত পুস্তক এখনও লোকচক্ষুর গোচর হয় নাই। কোন পণ্ডিত হয়ত 'জাহানারা লহরী'র পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়া বসিবেন। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগন্নাথ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা বলেন। একজনের কাছে শুনিলাম [illegible] লাইব্রেরীতে এখনও অনেক পুঁথি catalogue করা হয় নাই। ঐ গুলির মধ্যে জগন্নাথ পণ্ডিতের রচিত কয়েকখানা বহির দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি অযত্নে পড়িয়া আছে—যথা, ঠগোপনিষৎ, [illegible]চিন্তামণি, বগ্‌আমার্কপুরাণম্, বিপরীত-তর্ক সিদ্ধান্তম্ এবং অবিদ্যা-[illegible]। সত্যমিথ্যা খোদাতালা জানেন !

(গ) বিহারী সতসই [হিন্দী]। ডঃ মাখনলালের জোরে [illegible] নাম বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। আমি পূর্বে বিহারীলালের নাম শুনিয়াছি, হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার জীবনী পড়িয়াছি, কিন্তু উক্ত দোঁহাগুলির অর্থ কোন টীকা-ব্যতীত বুঝিবার মত হিন্দিজ্ঞান আমার [illegible] নাই।

কবি বিহারীর জন্মকাল আনুমানিক ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ ; মৃত্যুকাল ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের সমকালীন হইলেও মোগল-দরবারের সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সংযোগ ছিল না, কোন বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন নাই। কবি বাল্যাবস্থা বুন্দেলখণ্ডে, যৌবন মথুরায় শ্বশুরালয়ে এবং কবিতা-রচনাকাল আম্বের-রাজ মীর্জা রাজা জয়সিংহের দরবারে কাটাইয়াছেন। তাঁহার সতসইয়ের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণলীলা।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত মাখনলালের কথায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বিহারীর কয়েকটি সটীক ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণের* সাত শত উনিশটা দোঁহা মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছি। কবিতার রস ভাগ্যে জুটিল না, কারণ আমি সম্রাট্-নন্দিনীকে খুঁজিতেছিলাম বিহারীর কবিতায়। আমার এখন 'অন্ধঃ অন্ধেন নীয়মানঃ' অবস্থা। একটা সন্দেহ হইতেছে, মাখনলাল নিশ্চয়ই কোথায়ও বিহারীর অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত অনাঘ্রাত পাণ্ডুলিপি হস্তগত করিয়াছেন।

৫

[সিক্রী-পরিক্রমা]

সমালোচনায় আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম, তুর্কী সুলতানা বেগমের প্রাসাদের আশেপাশে জল কোথায়, যাহার উপর ঐ প্রাসাদ "এখনো···প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ?" ইহার উত্তরে ডঃ মাখনলাল জবর ধমক দিয়াছেন—"চারি শত বৎসর পরে" জলের আশা ? খাল-বিল সব ভরাট হইয়া গিয়াছে [বিস্তার ?]। যে সমস্ত বহির নাম করিয়াছেন ঐগুলির মধ্যে দেখিলাম, তুর্কী বেগমের প্রাসাদের নিকট জলাশয় ছাড়া আর সবকিছুই আছে।

মাখনলাল চর্মচক্ষে ফতেপুর সিক্রীর হয়ত কিছুই দেখেন নাই ; কিংবা লিখিবার সময় দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নমুনা—

(ক) মেমসাহেব যেখানে লাল বেলে পাথর লিখিয়াছেন, সেখানে সব "শ্বেত প্রস্তর" হইয়া গিয়াছে। প্রতিবাদে "অপ"বাদের অভিযোগ তিনি বেমালুম পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। দেখিলাম সোনহারা প্রাসাদের (*Bibi Mariam's Kothi*) পাদটীকায় (পৃঃ ৯৮, পাদটীকা ৪৯) মাখনলাল একেবারে খারিজাৎ করিয়াছেন। তিনি সাক্ষ্য দিতেছেন, "সোনহারা প্রাসাদ সবটাই বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিয়ে তৈরী হয়েছিল। আজ তার চিহ্নও নাই।" বাহবা,

---

* ১) বিহারী কী সতসই ; সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপদ্মসিংহ শর্মা দিল্লী।

২) বিহারী-বোধিনী ; টীকাকার লালা ভগবান দীন "দীন" ; সাহিত্য সেবাসদন, বেনারস।

৩) বিহারী-সতসই ; সুবোধ কাব্যমালা সিরিজ, সম্পাদক [illegible] পুরী, লাহেরিয়াসরাই।

৪) বিহারী-সতসই সটীক ; [illegible]

[illegible] III. [illegible] "[illegible] দোলনা যা-কি [illegible] বুঝিবার একমাত্র উপায় পূর্ব্বে উক্ত E. W. Smith সাহেবের *Fathepur Sikri* (Part I, Chapter V*) ।

(খ) আকবরের বাসকক্ষ [*Khawabgah* শয়ন-প্রকোষ্ঠ]

প্রতিবাদে ডক্টর মাখনলাল জানাইয়াছেন, "আমি লিখিয়াছি তাঁহারা যোগাভ্যাস করিতেন, তিনি (ডাঃ কানুনগো) লিখিয়াছেন দড়িবাঁধা ঝুড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতেন" [কাহাকে ?] । সমালোচনায় আমি স্পষ্টই লিখিয়াছিলাম, "সুফিরা যোগাভ্যাস করিতেন না ; আকবরের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করিতেন।" ঐ বাক্যটি কি অবশেষে নিরর্থক হইল ?

বিবাদের বিষয় "দোলনা" বনাম "ঝুড়ি", "যোগাভ্যাস" বনাম তত্ত্বালোচনা। মূলগ্রন্থ পড়িবার বিদ্যা আমার নাই ; কিংবা অধম অপেক্ষা শতগুণ বিদ্বান্ Lowe সাহেব অথবা আমার গুরুস্থানীয় Sir Wololey Haig—যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি "ঝুড়ি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, তাঁহাদের কাহারও নাই। ডঃ মাখনলাল লিখিয়াছেন, "অনুবাদ পড়িয়াই এত পাণ্ডিত্য, মূল পড়িলে যে কি করিতেন বলা যায় না।" কোন আশঙ্কার কারণ নাই, শ্রীযুত মাখনলাল যাহা করিতেছেন আমিও তাহা করিতাম ! প্রথম বয়স হইতে আমরা দুই জনেই সমান-তালে যদি "মূল" পঠন এবং উৎপাটন কার্য্যে লাগিয়া যাইতাম, তাহা হইলে আবুল-ফজল-বদায়ুনী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কবর হইতে "হাহারা মামুহারা" ডাক ছাড়িতেন, ইতিহাস-সরস্বতী ৺মা শীতলারূপে আবির্ভূতা হইতেন।

অনেক কসরত করিয়া মাখনলাল মূল হইতে একটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ বাহির করিয়াছেন, যাহা একত্র করিলে তাঁহার মতে "[illegible]-চার্‌পাই" প্রস্তুত হয় বটে। এখন কথা হইতেছে, এই চার্‌পাই অর্থাৎ খাটিয়াটি কি প্রিয়ার বিলাসবিভ্রম হরণ করিয়া [illegible] ন্যায় বাতাসের কোলে আপন মনে দুলিত, কিংবা [illegible] সম্রাট শয়নপ্রকোষ্ঠের বাহিরে হাত বাড়াইয়া মাঝে [illegible] খাটিয়ায় দোল দিয়া 'সুফী'গণের 'যোগাভ্যাসে' সহায়তা [illegible] ? দ্বিতীয় কথা, এই চার্‌পাই বাঁশ-দড়ি কিংবা ঝুলনের [illegible] কোন বস্তুর সহায়তা ব্যতীত মহাশূন্যে কি করিয়া [illegible] হইত ? কেহ যদি বিশ্বাস করিতে পারেন, আকবর [illegible] "[illegible]" বাহিরে সুফীগণের জন্য নাগরদোলা খাটানো [illegible], উহাতে বসিয়া তাঁহারা যোগাভ্যাস করিতেন, বাদশাহ হয় [illegible], না হয় তামাশা দেখিতেন, তাহা হইলে শাস্ত্রী-কৃত ভাষ্য [illegible] বলিতে হইবে। বদায়ুনী-কথিত ব্যাপারে, যদের

---

* [illegible] (Sonhara Mahal) was so called because [illegible] which embellished both the exterior [illegible]

মানুষ [illegible] 'পুর-বাসী'গণের [illegible] হইতে [illegible] *basket* ("ঝুড়ি") কেমন করিয়া উঠিত নামিত উহার [illegible] খলিফা হারুণের বোগদাদ শহরেই প্রথম পাওয়া যায়।* আকবরের যোগাভ্যাসের খবর পুরোনো মাল ঘাঁটিয়া বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া জানাইবার প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে।

৬

["কুক্রকুটীরে সেলিমের মাতা যোধাবাই"]

এইবার ডক্টর মাখনলাল চীৎকার "কুক্রকুটীরে" চাপা পড়িয়াছেন। তিনি মূল ফার্সি শব্দ, তাঁহার অপ্রকাশিত "তুজুকের" পাণ্ডুলিপি হইতে অর্থ বাহির করিয়াছেন 'খানকা' কুক্রকুটীর। প্রথম কথা—কোন্ অভিধান দেখিয়া তিনি এই অর্থ বাহির করিয়াছেন ?† দ্বিতীয় কথা—কোন্ "আত্মজীবনী"র [তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর] মূল ফার্সিতে 'খানকা' শব্দ লেখা আছে ? তিনি ইহার কোন হদিস দেন নাই ; দিলে মতলবসিদ্ধি হইত না। আবুল ফজল, বদায়ুনী

---

* R. Levy, Baghdad Chronicles.

পাদটীকা [দোলনা ও ঝুড়ি]।

আকবরের শয়নকক্ষে অন্দরমহল দিয়া সুফী, সন্ন্যাসীদের লইয়া যাইবার জো নাই। এইজন্য রাত্রিতে উহাদিগকে ঝুড়িতে বাঁধিয়া জানালায় [illegible] রাখিবার জন্যই এত হাঙ্গামা। মিথ্যাভিমানের খাতিরে পাঠকগণকে [illegible] দোলায় ঝুলাইয়া রাখা কোন কাজের কথা নহে। "ঝুড়ি" শব্দে এই [illegible] থাকিতে পারে। ঝুড়ি বলিতে আমরা সাধারণতঃ কোদাল-ঝুড়ি, না [illegible] কলের ঝুড়ি বুঝিয়া থাকি। যে জিনিষটির কথা বদায়ুনী লিখিয়া গিয়াছেন, উহা তিনি ভালরকম জানিতেন। উহা মানুষ কিংবা মালপত্র দোতলায় উঠাইবার জন্য কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ দীপালি-পর্ব্বে, এইরকম ঝোলায় দড়ি বাঁধিয়া বড় বড় মিঠাইয়ের ঝুড়ি দুই জন লোক মাঝখানের একটা ডাণ্ডা কাঁধে করিয়া বড় বড় লোকের বাড়ীতে লইয়া যায়। যাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন তাঁহারা এই রকম একটা ঝুড়ি বা ঝোলায় বসিয়া শিবাজী যে মোগল প্রহরীর চোখে ধুলা দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শুনিয়াছি, চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পর্দানশীন অভিজাতবংশীয়া সঙ্কটাপন্ন রোগিণীদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য বড় বড় হেকিমদিগকে বাড়ীর ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া আপত্তিকর ছিল। এইজন্য তাঁহাদিগকে এইরকম ঝুড়িতে বসাইয়া অন্দরমহলের উপরের তলার জানালার কাছে ঝুলাইয়া রাখা হইত, হেকিম পর্দার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। ঝুড়ির প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ : আনুমানিক দুই হাত লম্বা, দেড় হাত প্রস্থ, বাঁশ-দড়ির চারটী পায়ার দ্বারা প্রস্তুত একটি এক হাত আন্দাজ গভীর ঝোলা। ঝোলার তলদেশে একটু ছোট মাপের তক্তা, উহার উপর বসিলে একটি মানুষের প্রায় বুক পর্য্যন্ত নীচে ঝুলিয়া থাকে। ইহা ছেলে দোলাইবার দোল্‌না ; কিংবা ঝুলনের রাধাকৃষ্ণের চতুর্দ্দোল নহে। যে বস্তু আমি নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহার জন্য ঝুড়ি ছাড়া অন্য কোন শব্দ আমার জানা নাই ; আপনার খুশীমত দোল্‌না, ঝুড়ি, চার্‌পাই, যাহা ইচ্ছা বুঝিতে পারেন।

† Steingass, p. 443 ;—*Khanaga*ʼ for P. *Khanagah* ; a monastery for Sofis or Darwishes, a convent, a chapel, a hermitage

[illegible] "গোঁসাইন্" জাতিকে [illegible] পরিবর্তন কিংবা উহার [illegible] প্রমাণ উপস্থিত না করেন, তবে আমি জগৎ গোঁসাইন্ লিখিয়া যাইব, কাহাকেও আক্রমণ করিব না।—"

"মোতি বা মোতা রাজা" কেমন করিয়া ডক্টর মাখনলালকে পাইয়া বসিল? মোটা শব্দের হিন্দী স্ত্রীলিঙ্গ মোটী—যথা, মোটা মোটী। ফার্সিতে আদৌ ট্ বর্ণ নাই, উহার স্থানে ত বর্ণ হয়। হিন্দুস্থানী প্রচলিত শব্দ ত বর্ণ দ্বারা লিখিত হইলেও কোন ভারতীয় খাস ইরাণী কিংবা ফরাসীর ন্যায় বিকৃত করিয়া ত উচ্চারণ করেন না; সুতরাং যাহা আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মোটা রাজা পড়িয়া থাকি, ডঃ মাখনলাল সে স্থলে ইরাণী এবং কাবুলীওয়ালার "দাল-রুতি"র ন্যায় "মোতা" রাজা পড়িবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। মূল অর্থে জাহাঙ্গীর হইতে টড্ পর্য্যন্ত এবং ঐ সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত রাজস্থানের ইতিহাসে খুর্‌রমের মাতামহ মোটা রাজা নামেই পরিচিত।

১০

[ছুলেরা-জাহানারা সংবাদ]

পঞ্চাশের কোঠায় জাহানারার মন কিশোরীর মত চঞ্চল হওয়া অস্বাভাবিক সন্দেহ করিয়া আমি সাহিত্যিকগণের কাছে অপরাধী হইয়াছি। এই উক্তি আমি সম্রাট-নন্দিনীর ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়াছিলাম; কিন্তু সুরসিক ডঃ মাখনলাল ধরিয়া লইয়াছেন উহা শাশ্বত মানবপ্রেমের প্রতি অবিচার। প্রেমের ব্যাপারে প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, "বিত্তেশানাং ন খলু বয়ঃ যৌবনাত্যন্তমস্তি," সুতরাং কুবের-ভাণ্ডারের অধিকারিণী শাহজাদী জাহানারার আবার বয়সের হিসাব কেন?

ডক্টর মাখনলাল লিখিয়াছেন, "ছুলেরা নামকরণ···মানসিক ঔদার্য্য ডঃ কানুনগোর নাই।" ইহাও সত্য কথা। সমালোচনার মন্তব্য ছিল, "বুন্দীরাজ ছত্রসাল বুন্দেলা" ইতিহাসে "সোনার পাথর-বাটি"। প্রতিবাদেও তিনি এই 'সোনার পাথর বাটি' আঁকড়াইয়া থাকিয়া আছেন, আমরাও বুন্দেলা-ছত্রসালের [illegible] অপ্রত্যাশিত অধ্যায় যোগ করিয়া দিয়াছেন; যথা—

"ছত্রসাল বুন্দেলা বুন্দী রাজপরিবারের [illegible] তাই [illegible] রাজপরিবারের সহিত বুন্দেলা পরিবারের [illegible] ইতিহাস-বিশ্রুত···।"

এই ইতিহাস-বিশ্রুত ঐতিহাসিক কে? নিশ্চয়ই, আব্দুল হামিদ্ লাহোরী প্রমুখ সে যুগের এবং আচার্য্য যদুনাথ প্রমুখ এ যুগের কেহ নহেন। ছত্রসাল বুন্দেলার পিতা চম্পৎ রায় বিদ্রোহী, দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতক, আওরঙ্গজেবের ঘৃণার পাত্র। মোগল বাহিনী কর্ত্তৃক ধৃত হইবার উপক্রম দেখিয়া ছত্রসালের পিতা চম্পৎ রায় এবং মাতা কালীকুমারী একসঙ্গে বুকে ছোরা বসাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন (অক্টোবর ১৬৬১ খ্রীঃ)।* তখন বালক ছত্রসালের বয়স মাত্র এগার বৎসর, তিনি মাতুলালয়ে পরের গলগ্রহ। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের কড়া পাহারায় জাহানারা পিতার সঙ্গে আগ্রা দুর্গে ১৬৫৮ খ্রীঃ হইতে বন্দিনী; বালক 'ছুলেরা' ছত্রসাল কোন্ ফাঁকে জাহানারার হাতে রাখী বাঁধিয়া আসিলেন?

ঐতিহাসিক ডক্টর মাখনলাল [তাঁহার লিখিত পাদটীকা অনুসারে উপন্যাস নহে, রসিকতাও নহে], মেমকল্পিত জাহানারার প্রণয়ী 'ছুলেরা'কে সনাক্ত করিতে যাইয়া বুটেন্‌শনের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, উহা ক্ষমার অযোগ্য। মহাবত খাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৬৩৪ খ্রীঃ; ছত্রসালের জন্ম ১৬৫০ খ্রীঃ, সুতরাং জন্মের অন্ততঃ ষোল বৎসর পূর্ব্বে এই ছুলেরা-ছত্রসাল কি করিয়া জাহানারার প্রেমপতাকা উড়াইয়া শাহজাহানের দরবারে মহাবত খাঁ কর্ত্তৃক অপমানিত হইবার জন্য উপস্থিত হইতে পারেন? বুটেন্‌শন্ তাঁহার বহিতে ছুলেরা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "চৌহান", "হরবংশের কুমার" (অধ্যায়, পৃঃ ১১৩), সামুগড়ের যুদ্ধে নিহত (পৃঃ ১৪০)। এতগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া একজন গবেষক কোন যুক্তিতে এই ব্যক্তিকে বুন্দেলা ছত্রসাল সনাক্ত করিয়া মেমসাহেবের গোটা বহিটাকে খেলো করিয়া দিলেন? বুটেন্‌শন মাত্র এক জায়গায়—নেজাবৎ খাঁর মুখে, "বুন্দেলা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু অনুবাদক এই ভুলের মশলাকে লাগাইয়াছেন তিন জায়গায়। যাঁহারা ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহারাও বুটেন্‌শনের বহিখানা আগাগোড়া পড়িয়া সহজে ধরিয়া ফেলিতেন Bundiwala লিখিতে যাইয়া ভুল কিংবা অনবধানতাবশতঃ উক্ত জায়গায় Bundela হইয়া গিয়াছে। কবি বলিয়াছেন,

> ইক্ হাড়া বুন্দী ধনী দুবো মহোবা পাল।
>
> সালত ঔরঙ্গজেব উর ইয়ে দোনো ছত্রসাল।

(এক জন বুন্দীপতি, অন্য জন মহোবার রাজা। এই দুই ছত্রসাল আওরঙ্গজেবের বুকে শল্যস্বরূপ)

ডঃ মাখনলাল 'বুন্দেলা'কে বাছিয়া লইয়া "জাহানারার আত্মকাহিনী"র মধ্যে 'লাল' স্বরূপ প্রবিষ্ট করাইয়াছেন।

---

1. *Tuzuk-i-Jahangiri* (For Jagatgossain)
   (a) Jagat gosain Gokhtar-i-Mota rajah
   (Aligarh Text, 1864; p. 8)
   (b) The same (*Newal Kishore Press edition*; p. 7)
   (c) Jagat Gossain (Eng. trans. *Rogers and Beveridge*, Vol. I, p. 19).

২। G. H. Ojah [যোধপুর রাজ্যকা ইতিহাস : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫, ঐ পাদটীকা]

এই স্থলে মোটা রাজার নাম ও পরিচয়ের প্রমাণ-পঞ্জী নীচে দেওয়া হইল। উল্লিখিত পুস্তকে জগৎ গোঁসাইন্ নামের সহিত তাঁহার পিতা মোটা রাজার উল্লেখ পাওয়া যাইবে। অন্যান্য পুস্তক এই :—

(ক) বীর বিনোদ (প্রথম খণ্ড; পৃঃ ১৭৩, পাদটীকা ২)

(খ) [illegible] (তৃতীয় খণ্ড; পৃঃ ২২৯২)

(গ) [illegible] রাজ্যের ইতিহাস—বিশ্বেশ্বরনাথ রেউ লিখিত। (প্রথম [illegible]

* 1. Sarkar, Short History of Aurangzib, p. [illegible]

[illegible] প্রবাসী'র পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিব। আমি লিখিয়া- [illegible] "[illegible] অন্তর্গত [illegible]।" [illegible] বলিতে পারেন, আমি মহোদয় [illegible]

[illegible] বিচ, এই আসল [illegible] নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। পুস্তক-সমালোচনার বাদ-প্রতিবাদ ছাপানো আমাদের রীতিবিরুদ্ধ। তথাপি বর্তমান ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইল। [illegible] পরিত্যক্ত হইল। ডঃ কানুনগো প্রতিবাদের প্রায় সকলেরই যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। [illegible] হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ আর ছাপা হইবে না।—প্রবাসীর সম্পাদক।

গন্ধসার উৎপাদনে আধুনিক রসায়ন

শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এস্‌সি

আধুনিক সভ্যজগতে মানুষের জীবনে প্রসাধনকলা এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হতে চলেছে। কি করে নিজেকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, এই প্রয়াস মানুষকে আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কত বিভিন্ন পথে কত অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিযুক্ত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ ব্যাপারে মনুষ্যসমাজে পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান অনুরাগী, শুধু তাদের প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। আদিম অধিবাসীদের বিচিত্র বেশভূষা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গাত্রচর্ম্মের ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য-গ্রহণ, উৎসব উপলক্ষে নিজেদের সৌন্দর্যবীর্যাদির প্রদর্শন—সকলই বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আজকের সভ্য জগতের বিচিত্র, রুচিসম্মত ও সুকুমার প্রসাধনশিল্পে পরিণত হয়েছে।

অসংখ্য প্রসাধনদ্রব্যের মধ্যে গন্ধসার scent সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বসেছে। এর প্রধান কারণ হ'ল আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের পরই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান, যা আমাদের কোন জিনিষের প্রতি অনুরক্ত ও প্রলুব্ধ করতে সক্ষম। "সৌরভ" অদৃশ্য হওয়ার দরুন গন্ধসার ব্যবহারে উভয়েরই কোন বিশেষ দ্বিধাবোধ হয় না। যা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, আস্বাদ করা যায় না অথচ যা আমাদের উন্মনা করে তোলে সেই অপূর্ব্ব সৌরভ যে আমাদের পরম আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াবে তাতে বিচিত্র কি! অবসাদগ্রস্ত মনকে ও রোগপীড়িত দেহকে উৎফুল্ল এবং উজ্জীবিত করতে গন্ধসারের কার্য্যকারিতা অতুলনীয়। পূজার ঘরে ধূপ, চন্দন, পুষ্পাদির সৌরভ যে একটা অতীন্দ্রিয়, স্বর্গীয় প্রভাব সৃষ্টি করে তা আমরা সকলেই অনুভব করেছি। এই অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সৌরভের মূল উপাদানের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসেই [illegible] বিভিন্ন ফুল ও [illegible] প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। [illegible] অনুরূপ [illegible] ঐ প্রকৃতিজাত সৌরভের অনুকরণ-প্রবৃত্তি। এমন কোন গন্ধ বা প্রকৃতিজাত ফুল-ফলাদির মধ্যে নাই, সাধারণতঃ তা আমাদের নিকট সুরভি বলে অনুভূত হয় না—কাজেই বিজ্ঞানীদের গবেষণার উদ্দেশ্যই হ'ল কি করে কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতিজাত সুরভি-গুলির অনুরূপ গন্ধসার প্রস্তুত করা যায়। গন্ধসার আহরণের প্রাচীন প্রথা হ'ল—সুরভিযুক্ত ফুলফলাদি কোনও দ্রবের (solvent) সাহায্যে নিষ্কাশণ করা। গোলাপ-নির্য্যাস, আতর, কস্তুরী, অগুরু, চন্দন প্রভৃতি এই উপায়েই সংগৃহীত হ'ত; কোন কোন ক্ষেত্রে আজও হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং উৎপাদনের পরিমাণও চাহিদা অনুযায়ী যৎসামান্য। এ কারণে প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুত গন্ধসার অত্যন্ত মহার্ঘ্য; সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত গন্ধসার আজকের দিনে মানুষকে এদের ব্যবহার করবার সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এবং এ কারণে আমাদের দেহ থেকে ঘর্ম্ম প্রায় প্রতি মুহূর্তেই অনবরত নির্গত হয়। এই দেহনিঃসৃত পদার্থ বায়ুস্থিত বিভিন্ন জীবাণু-কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হয়ে উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পদার্থে পরিণত হয়।

সুতরাং আমাদের এবিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। দেহ পরিষ্কার রাখলে অবশ্য অনেকটা [illegible] কিন্তু ঘর্ম্মনিঃসরণ বন্ধ করা মানুষের অসাধ্য, [illegible] বিপজ্জনক, কারণ এই প্রক্রিয়া জীবনধারণের [illegible] হার্য্য। কি করে এই দুর্গন্ধকে [illegible] মন্দীভূত করা যায় এই সমস্যার সমাধান করে [illegible] রসায়ন-বিজ্ঞান—প্রভূত পরিমাণে বিভিন্ন [illegible] কৃত্রিম উৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কার করে। [illegible] কয়েকটি কৃত্রিম গন্ধসারের [illegible]।

মানুষের [illegible]

থাকা চাই, যেমন (ক) গন্ধসারটি যেন বিষাক্ত না হয়, (খ) সহজেই কোন সহজলভ্য দ্রবে দ্রবণীয় হওয়া চাই, (গ) বিশুদ্ধ, (ঘ) অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকা চাই ও (ঙ) গন্ধসারের সৌরভটি যেন বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। যে গন্ধসারে এই পাঁচটি গুণ বহুল পরিমাণে বর্তমান থাকে তাই উৎকৃষ্ট। সাধারণতঃ গন্ধসারগুলি বিভিন্ন মৌলিক উপাদান (constituents) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। এই মৌলিক উপাদানগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণীর উপাদানের বাষ্পীয় চাপ (vapour pressure) বেশী, এদের বলা হয় 'পরিবাহক' (body or blender)। অন্য শ্রেণীর উপাদানের বাষ্পীয় চাপ কম, তাদের বলা হয় 'ধারক' (fixative)। পরিবাহকের বাষ্পীয় চাপ সাধারণতঃ তিন মিলিমিটার (পারদের উচ্চতানুযায়ী) পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু 'ধারকে'র বাষ্পীয় চাপ ·০০১ মিলিমিটারের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে-কোনও গন্ধসারেই বেশীর ভাগ থাকে পরিবাহক এবং অল্পপরিমাণ থাকে ধারক। যে উপাদানের গন্ধ যত তীব্র তা ততই জলে কম দ্রবণীয় হয়, কিন্তু তৈলজাতীয় এবং জৈব পদার্থ (organic) দ্রবে সহজেই দ্রবণীয় হয়। এর কারণও সুস্পষ্ট—আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার অভ্যন্তরে যে গন্ধ আহরণকারী স্নায়ুতন্ত্র আছে (olfactory nerves) তাহা এক প্রকার চর্বিময় তন্তু (lipoid) দ্বারা আবৃত—কাজেই গন্ধদ্রব্যটি বাষ্পাকারে ঐ চর্বির সঙ্গে মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করি না। যে উপাদান যত বেশী মিশ্রিত হবে, তার গন্ধ তত বেশী তীব্র বলে অনুভূত হবে। মৃগনাভি-জাত কস্তুরী, সিভেট নামক বিড়ালের জননযন্ত্রনিঃসৃত পদার্থ, তৈল-উৎপাদনকারী তিমিমাছ-সঞ্জাত 'এমবার গ্রীস' নামক পদার্থ এই প্রকার কম বাষ্পীয় চাপযুক্ত জলে অদ্রবণীয় বা অল্পদ্রবণীয়; এই কারণে এইগুলি ধারক হিসাবে অপরিহার্য্য ও প্রায় সমস্ত গন্ধসারেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'ধারক' উপাদানের বাষ্পীয় চাপ খুব কম হওয়ার দরুন ঘনীভূত (concentrated) অবস্থায় ইহাদের গন্ধ ততটা অনুভূত হয় না, হলেও রুচিকর বলে মনে হয় না। গন্ধসার প্রস্তুতকালে এদের প্রচুর পরিমাণে দ্রবে মিশ্রিত করে নেওয়া হয়, এবং এই মিশ্রণের জন্য যে তরল পদার্থ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে অতি পরিচিত 'সুরাসার' (Ethyl Alcohol)—অন্যান্য মিশ্রণদ্রবের (diluent) তুলনায় এর কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যেমন, (ক) ইহা বর্ণহীন স্বচ্ছ, (খ) সম্পূর্ণভাবে কোনও অবশিষ্ট না রেখে বাষ্পীভূত হয়ে যায়, (গ) এর গন্ধ মনোরম, উত্তেজক, কিন্তু তীব্র নয় যাতে, করে অন্যান্য 'পরিবাহক' বা 'ধারকে'র সৌরভ চাপা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিছুদিন পূর্বে dilnent হিসেবে Iso-Pr.p.l-alcohol-এর ব্যবহারের সূত্রপাত হয়েছে। এর প্রধান কারণ এর সহজলভ্যতা ও শুল্কমুক্ততা। কিন্তু এর গন্ধ ততটা মনোরম নয়, বরং বেশী তীব্র। এজন্য এটি শুধুমাত্র নিকৃষ্ট ও অল্পমূল্যের গন্ধসারেই ব্যবহৃত হয়। অকৃত্রিম ধারকদের মধ্যে কস্তুরীই প্রধান। কস্তুরীর প্রধান গুণ হ'ল যে এর একটি তন্দ্রা-আকর্ষণকারী (soporofic) শক্তি আছে। উপরন্তু যৌন-যন্ত্রাদির উপরও এর একটা হর্মোন অনুযায়ী কার্য্যকারিতা দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষজাত সৌরভ উপাদানগুলির জন্য কস্তুরীই প্রধান 'ধারক'। গন্ধসার উৎপাদনকারীরা দেখেছেন যে, স্ত্রীলোকেরা কস্তুরী-ঘটিত গন্ধসারই বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু কস্তুরী একটি দুর্লভ বস্তু—একমাত্র সু-উচ্চ তুষারমণ্ডিত হিমালয় প্রদেশজাত এক প্রকার পুরুষ-হরিণের নাভিদেশ থেকে এটি সংগৃহীত হয়ে থাকে। একটি মৃগনাভির জন্য একটি হরিণের প্রাণনাশ অনিবার্য্য—কাজেই কস্তুরীর নিষ্ঠুর আহরণ-প্রথা এই হরিণের বংশ প্রায় লোপ করে দিতে বসেছে। কিন্তু 'সিভেট' আহরণ করতে হলে বিড়ালটিকে হত্যা করবার প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে এই জাতীয় বিড়ালের যৌনযন্ত্রের সন্নিকটস্থ থলির মত প্রত্যঙ্গের মধ্য থেকে চামচজাবা এই পদার্থ মাঝে মাঝে বার করে নেওয়া যায়। 'এমবার গ্রীস' অনেক সময় সমুদ্রতীরস্থ কোন কোন স্থানে সঞ্চিত অবস্থায়ও পাওয়া যেতে দেখা গেছে। একমাত্র কস্তুরী ছাড়া বাকী দুটোই ঘনীভূত অবস্থায় অতি দুর্গন্ধময়, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হলে এরা অতি সুগন্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের চন্দন-তৈলও কোন কোন ক্ষেত্রে 'ধারকের' কাজ করতে পারে, কিন্তু ধারক হিসাবে কস্তুরী ও সিভেটই হ'ল গন্ধসার জগতের সেরা।

বিজ্ঞানীরা তাই এ দুটি পদার্থ নিয়ে মেতে গেলেন। এদের সংগঠন-অনুসন্ধানে এরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলেন। ব্যবসায়ীরা প্রচুর অর্থব্যয় এবং পুরস্কার ঘোষণা করে এই সব বৈজ্ঞানিককে উৎসাহ দিতে লাগলেন। অবশেষে ১৯২৬ সনে Ruz'cka 'কস্তুরী'র প্রধান গন্ধ-উৎপাদনটা পৃথক করতে সক্ষম হলেন। তিনি দেখালেন যে, এটি একটি ketune শ্রেণীর জৈব পদার্থ। এর নাম রাখলেন Muskone, Ruzicka-ই কিছুদিন পরে এই Muskone কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করে গন্ধসার-শিল্পে যুগান্তর এনে দিলেন। এই উপাদানের সংগঠন আবিষ্কার বিজ্ঞানেও চাঞ্চল্য এনে দিল। একদিন বিজ্ঞানীরা [illegible] এসেছিলেন যে, Organic Compound (জৈব [illegible]) [illegible] বেশী কার্বন পরমাণুযুক্ত [illegible]

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচে
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচে
সান্‌লাইট
সাবানের
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
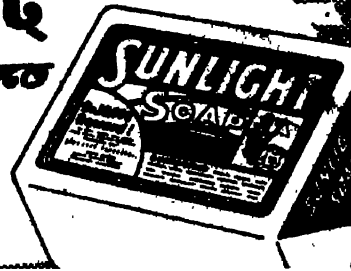
অন্য [illegible] সাইক্লোনে কার্বন-পরমাণুর সংখ্যা রয়েছে ১৬, এবং এটি একটি অতিশয় stable (স্থায়ী) পদার্থ। পরে জানা গেছে যে, প্রায় প্রত্যেক সৌরভযুক্ত পদার্থই এরূপ বহু কার্বন-পরমাণুযুক্ত—এদের সংগঠনের পদ্ধতি অদ্ভুত—এদের গঠনকে 'ম্যাক্রোসাইক্লিক কার্বন রিং' বলা হয়। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই কিছুদিনের মধ্যে বাজারে আরও দুটি গন্ধসারের প্রচলন হ'ল—'Exaltone' ও 'Exaltolide'—এ দুটি গন্ধও কস্তুরীর অনুরূপ।

এর পর হিল ও কেরোথার্স নামক দু'জন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকার কীটোন, ল্যাক্টোন অ্যাল্ডিহাইড ও কার্বোনেটের সংগঠনে কার্বন-পরমাণুর সংখ্যা বাড়িয়ে এদের গন্ধের তারতম্যের অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত হলেন। এঁরা দেখলেন যে, ল্যাক্টোন ও কীটোনগুলিই উৎকৃষ্ট ধরণের গন্ধসার উৎপাদন করতে সক্ষম। এভাবে তাঁরা অনেকগুলি কৃত্রিম গন্ধসার আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

'পরিবাহক' শ্রেণীর গন্ধগুলি সাধারণতঃ মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী হয়। বেশীর ভাগ ফুল ও ফলের গন্ধই এই জাতীয়। এটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, একরাশ যুঁই বেলী রজনীগন্ধা বা ঐ জাতীয় ফুল ঘরে থাকলে, ঘরের বাতাস কিরূপ সুমিষ্ট, মৃদু সৌরভে আমোদিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি একগোছা ফুলের মধ্যে নাক ডুবিয়ে জোরে আঘ্রাণ নিই তখন ততটা মিষ্ট গন্ধ পাই না—এমন কি কোন কোন ফুলের ক্ষেত্রে কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। বিলিতী ভায়োলেট ফুলের গন্ধও এই রকম বিভ্রান্তকারী। বিদেশী আরও কতকগুলি ফুল ও দুগন্ধ ফুল, যেমন—ক্যামি, ম্যাগনোলিয়া ইত্যাদি এ জাতীয় গন্ধযুক্ত। [illegible] সক্রিয় উপাদান হ'ল আর একটি কীটোন—এর নাম দেওয়া হয়েছে আইরোন। টিম্যান ও ক্রুগার এই আইরোনটিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে যাইয়া নূতন একটি সুগন্ধি আবিষ্কার করেন। সোরেন্স ও মেন্‌জার আবিষ্কার করেন অনুরূপ গন্ধযুক্ত একটি 'carboxylat' বা মিথিল [illegible] ভায়োলেট ফুলের মত গন্ধ দেয়, কিন্তু ঘনীভূত অবস্থায় এর গন্ধ অতি তীব্র ও ঝাঁঝালো।

প্রায় সমস্ত গন্ধসারের মৌলিক উপাদানগুলিই ল্যাক্টোন কীটোন ও এলডেহাইড জাতীয়। তাই এগুলি বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে বিকৃত হয়ে যায়। এই কারণে এদের স্থায়িত্ব বাড়াবার জন্য এগুলিকে Acetal বা ketol-এ পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় এগুলির গন্ধের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না। উপাদানগুলির বিশুদ্ধতার উপরও এদের গন্ধ নির্ভর করে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ইণ্ডোল নামক পদার্থটি চমৎকার পুষ্পগন্ধ বিতরণ করে, কিন্তু সামান্যমাত্র দূষিত হলে এর থেকে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

নিম্নে অধুনা-ব্যবহৃত কতকগুলি গন্ধ-উপাদান (পরিবাহক ও ধারক) এবং তাদের গন্ধ-বৈশিষ্ট্যের তালিকা দেওয়া গেল। প্রত্যেকটি দ্রব্যই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় এবং কয়েকটি সুলভ, সরল মৌলিক উপাদান লইয়া ওদের গঠন (synthesis) সম্ভব। এগুলির বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণে বিভিন্ন প্রকারের সৌরভযুক্ত গন্ধসার প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে যে, মিশ্রিত উপাদানগুলি যেন পরস্পরের সঙ্গে কোনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে না যায়।

কোন্ জাতীয়।		উপাদানটির নাম।	Acetal বা Ketol-এ পরিবর্তনকারী।	গন্ধ
	১।	Vanillin	—	কেক, পুডিং প্রভৃতিতে সচরাচর যে গন্ধ থাকে।
Aldehyde.	২।	Cirtaal	—	লেবুর গন্ধ।
	৩।	Benzaldelyde	—	তিক্ত বাদামের গন্ধ।
	৪।	Phenylacetaldehyde কে	Ethylene Glycol দ্বারা	গোলাপের জাত।
	৫।	ঐ	1-2-Dihydroxybatane	হায়াসিন্থ ফুল।
	৬।	ঐ	2-4-Dihydroxy-4-methyl pentane	Mignonette ফুল।
	৭।	Heptaldehyde কে	Glycerol দ্বারা	[illegible]
	৮।	Hydrotropic Aldehyde কে	2-4-Dihydroxy-4-methyl pentane	Mignonette ফুল।
	৯।	ঐ	Ethylene Glycol দ্বারা	[illegible]
	১০।	Cinnamonaldehyde কে	ঐ	দারুচিনি, [illegible]
	১১।	Di-isopropyl Ketone কে Catechol দ্বারা		[illegible]

রোজকার ধুলোময়লার
রোগবীজানু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফবয়ের
LIFEBUOY
লাইফবয় সাবান

	১২।	Di[illegible]	ঐ	[illegible]
	১৩।	Methyl Amyl Ketone ও Catechol দ্বারা		যুঁই ফুল।
	১৪।	Piperonal	—	চেরী ফুল।
	১৫।	Lauric Aldehyde	—	ফরাসী [illegible]
	১৬।	Anisic "	—	মিশ্র পুষ্পগন্ধ।
Ester জাতীয়	১।	Benzyl Acetate	—	যুঁই ফুল।
	২।	Ethyl "	—	মৃদু মনোরম গন্ধ।
	৩।	Methyl Salicylate	—	[illegible] ফুলের গন্ধ।
	৪।	Methyl-n-nonyl Acetate	—	নেবু ফুল।
	৫।	Iso-octyl	—	বিলিতী [illegible]
	৬।	Geranyl formate	—	গোলাপ।
Ketone জাতীয়	১।	Ionone	—	ভায়োলেট ফুল।
	২।	Muscone	—	কস্তুরীসদৃশ।
	৩।	Mehyl Isopropyl ketone	—	কর্পূর।
	৪।	Benzyl acetone	—	যুঁই ফুল।
	৫।	Menthone	—	পিপারমিন্ট।
	৬।	Exaltone	—	কস্তুরী।
	৭।	Irone	—	ভায়োলেট ফুল।
Alcohol জাতীয়	১।	Menthol	—	পিপারমিন্ট।
	২।	Geraniol	—	গোলাপ।
	৩।	Phenyl Ethyl Alcohol	—	ঐ।
Lactone জাতীয়	১।	Exaltolide	—	কস্তুরীসদৃশ।
	২।	Ambettolide	—	এম্বার গ্রীসসদৃশ।
	৩।	Coumanin	—	সদ্য কাটার পর শুকনো খড়ের মিঠে গন্ধ
	৪।	a-octyl-r-butyrolactane	—	পীচ ফলের গন্ধ।
	৫।	a-Rhodinyl-r- ঐ	—	কস্তুরী ও পীচ ফলের মিশ্র গন্ধ।

"আমি জানি
লাক্স টয়লেট সাবান আপনার
ত্বককে আরও মনোরম ক'রে তুলবে"